[illegible] ব্রাহ্মপরিবার সকলের [illegible] জীবন [illegible]
[illegible] গুপ্ত রাখ [illegible]

ব্রাহ্মিকাদিগের দায়িত্ব—দেশের চতুর্দ্দিকে যেরূপ ব্রাহ্ম পরিবার বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের সহিত তাঁহাদের কিরূপ নিগূঢ় সম্বন্ধ তাহা উপরে নির্দ্দেশ করা গেল, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ব্রাহ্ম মহিলাদিগের অন্তরে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত না হইলে ব্রাহ্ম পরিবার সকলে ধর্ম্মাগ্নি থাকিতে পারে না। অনেক স্থানে এরূপ দেখা গিয়াছে, নারীর স্বার্থপরতার সংস্পর্শে ব্রাহ্ম পুরুষের অন্তরের ধর্ম্মাগ্নি নষ্টীভূত হইয়া গিয়াছে। বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্ম পরিবারের সংখ্যা অনেক বর্দ্ধিত হইতেছে। এই সকল পরিবার কি এক একটী আদর্শ ব্রাহ্ম পরিবার হইয়া, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের সাহায্য করিতে পারিতেছে? যদি তাহা না হয়, তবে তাহার কারণ কি? অধিকাংশ স্থানেই নারীর ধর্ম্মভাবের অভাব একটী প্রধান কারণ। এ বিষয়ে যতই চিন্তা করা যায়, ততই অনুভব করা যায় যে, নারীগণের অন্তরে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে না পারিলে, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের আশানুরূপ ফল ফলিবে না। আমরা পুরুষগণের অন্তরে ধর্ম্মাগ্নি উদ্দীপ্ত করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকি। উহার অধিকাংশ স্থলে নারীগণের যোগ দিবার সুবিধা হয় না। যে সকল আলোচনাতে পুরুষদিগের বিশেষ উপকার হয়, সে সকল আলোচনাতে নারীগণ অনেক সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারেন না। তদ্ভিন্ন নারীগণের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবন্ত ভাবে প্রচার করিবার জন্যও কোনও উপায় অবলম্বিত হইতেছে না। এজন্য জীবন সমর্পণ করিতে পারেন এরূপ কোনও মহিলা এখনও আমাদের মধ্যে দৃষ্ট হইতেছেন না। অথচ ইহাতে সন্দেহ নাই যে, নারীর পবিত্রহৃদয় ধর্ম্মের, সাধুতার ও স্বার্থনাশের বিশেষ উপযোগী। জগতের সকল দেশে নারীপ্রকৃতি আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতাকে রক্ষা করিতেছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, হিন্দু ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্ম কত শিথিল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও তাহাদের যে শক্তি দৃষ্ট হইতেছে, তাহা নারীগণেরই নিষ্ঠার গুণে। নারীহৃদয়ের অনুরাগ যদি এক বার উদ্দীপ্ত করা যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মও দৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত হইবে। [illegible] পুরুষগণের মধ্যে ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহার ফলও কিয়ৎপরিমাণে ফলিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে নারীদিগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিলে ভাল হয়।

একদিন একজন প্রাচীনা ভগিনী কাঁদিয়া বলিলেন "আমাদিগকে যদি ফেলিয়া যান, আপনারাও অগ্রসর হইতে পারিবেন না। আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য ফিরিয়া আসিতে হইবে।" তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মধ্যে যে কত গভীর সত্য আছে তাহা [illegible] অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই। আমরা অনেক স্থানে একটী দৃশ্য দেখিয়া থাকি, একজন ভদ্রলোক, পরিবারের [illegible] নৌকাতে [illegible] আরোহণ [illegible]

[illegible] আমার মহিলাগণের [illegible] চরমে [illegible] কাজে লাগিল না। তিনি একাকী যেখানে [illegible] পৌঁছিতেন, কিন্তু নারীগণ সঙ্গে থাকাতে [illegible] তাঁহার চলিবার শক্তি থাকিয়াও কোনও কাজে লাগিল না। সামাজিক উন্নতি বিষয়েও চরমে এই ঘটনা। নিশ্চয় [illegible] ধর্ম্মের যত লম্বা বড় কথা বলি না কেন, পুরুষগণ যতই [illegible] অগ্রসর হইতে চলুন না কেন, এবং অগ্রসর হইবার শক্তি যত থাক্ না কেন, নারীদিগের জন্য [illegible] অথবা পথে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে হইবে; এবং [illegible] নারীগণের যতটা চলিবার শক্তি, তদনুরূপ উন্নতি হইবে, তাহার অধিক হইবে না। এ বিষয়ে আর উদাসীন থাকিলে আমাদের চলিতেছে না।

নকল ধর্ম্ম ও আসল ধর্ম্ম—জনসমাজে দুইপ্রকার ধর্ম্ম দেখা যায় এক নকল ধর্ম্ম আর এক আসল ধর্ম্ম। নকল ধর্ম্মে ধর্ম্মসমাজের সমুদায় নিয়ম প্রতিপালন আছে, নীতির বিশুদ্ধতা আছে, লোকের সহিত সৌজন্য ও সদ্ভাব রক্ষা আছে; কিন্তু ভিতরে পূর্ণ সংসারাসক্তি। সে নীতি এবং সে সৌজন্য সংসারাসক্তি প্রণোদিত; এই জন্য যে নীতিতে [illegible] দিক বেশ বজায় থাকে, লোকের শ্রদ্ধা ও সাহায্য পাওয়া যায়। এই সকল ধর্ম্মের উপাস্য দেবতা স্বার্থ। ইহার উপাসক, ধর্ম্মের পরিচ্ছদ যতই পরিধান করুক না কেন, তাহার অন্তরাত্মা স্বার্থেরই পূজা করিতেছে। কিন্তু জনসমাজে এই সকল ধর্ম্মের আদরের কিছু ত্রুটি নাই। সর্ব্বদাই লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, "লোকটী বেশ! কেমন বিনয়ী, কেমন অমায়িক, চরিত্রে কোনও দোষ নাই—ধর্ম্মের সকল কার্য্যে কেমন যোগ আছে। নিয়মমত উপাসনাটী করিয়া থাকেন, ধর্ম্মসমাজের কার্য্যের সাহায্যার্থ কিছু কিছু দানও আছে" ইত্যাদি। পৃথিবীর লোক ধর্ম্মের বাহিরের নিয়ম প্রতিপালন ও একটু নীতির বিশুদ্ধতা রক্ষিত হইলেই সন্তুষ্ট—ইহার অধিক আর চায় না। কিন্তু আসল ধর্ম্মের চক্ষে ইহা যথেষ্ট নহে। অন্তরে যদি ঈশ্বর-প্রীতি না থাকে, বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের অগ্নি যদি অন্তরে প্রজ্বলিত না হয়, তবে সেখানে ধর্ম্ম নাই। আসল ধর্ম্মের নীতি, ক্ষতি-লাভগণনা বা জনসমাজের অনুরাগ বিরাগের অপেক্ষা করিবে না, তাহা ঈশ্বরপ্রেমের উৎস হইতে উৎসারিত। তাহার সৌজন্য, জনসমাজের [illegible] কিন্তু বিনয় ও প্রীতির উৎস হইতে [illegible] পরসেবা লোকপ্রশংসার আকাঙ্ক্ষাতে [illegible] প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের খনি হইতে উত্থিত। [illegible] করিতে না পারিলে, [illegible]

অন্যের প্রশংসা তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেছে। তাঁহাদের অনেক সময় ও অর্থ, লোকতুষ্টির জন্ম নিযুক্ত হইতেছে। ইহার কারণ এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্মকে অবলম্বন করিবার জন্ত তাহারা এক সময়ে লোকের অপ্রিয় হইয়াছেন এবং যাহাকে জগতের কল্যাণ, মুক্তির উপায় স্বরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন,—অন্ততঃ মুখে প্রকাশ করিয়া থাকেন—তাহার চিন্তায় ও উন্নতির জন্ত তাঁহারা স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। যদি তাঁহাদের অন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রীতি থাকিবে, তবে তাহার উন্নতির জন্ত স্বার্থনাশের প্রবৃত্তি জন্মিবে না কেন? ইহাতেই বোধ হয় তাঁহারা নকল ধর্ম্ম লইয়া সন্তুষ্ট হইতেছেন। বিশ্বাস বৈরাগ্য ও সেবার অগ্নি ব্রাহ্মসমাজে প্রজ্বলিত না হইলে আর গতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

সামাজিক উপাসনা।—ব্রাহ্মসমাজে যে আকারে বর্ত্তমান সামাজিক উপাসনাপ্রণালী প্রচলিত আছে, তাহা প্রাচীন হিন্দু সাধকদিগের নিকট সম্পূর্ণ নূতন। ইহা খ্রীষ্টীয় সমাজের প্রচলিত উপাসনা প্রণালীর অনুরূপ। বলা বাহুল্য যে, এই উপাসনা প্রণালী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর এবং বিশেষ ফলপ্রদ। ইহার প্রধান উপকারিতা এই,—একজন সাধক একাকী নির্জ্জনে তিন বৎসর সাধনের পর যে ফল লাভ করিতে পারেন, এই সমবেত উপাসনার সাহায্যে একজন ব্রহ্মোপাসক অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহা অপেক্ষা অধিক উপকার লাভ করিয়া থাকেন। ইহাতে সাধুর মুখে ঈশ্বরের নাম শুনা হয়। ইহাতে সাধু সংসর্গ হয়, এবং অন্যের হৃদয়ের সাধুতা ও ভক্তি-ভাবের সংস্পর্শে আসিয়া নিজের জীবনের সাধুভাব জাগ্রত করে, পাপ পরিত্যাগের প্রবৃত্তি জন্মে। সর্ব্বোপরি উপকার এই যে, দুইটী হৃদয় এক প্রাণ হইয়া ঈশ্বরের চরণে শরণাপন্ন হইলে তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যীশু এই সমবেত প্রার্থনা ও উপাসনার মূল্য বুঝিতে পারিয়াই বলিয়াছিলেন—"যদি তোমরা দুইটী আত্মা এই পৃথিবীতে কোন বিষয়ে সম্মিলিত হও এবং তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার নিকট প্রার্থনা কর, তবে সেই প্রার্থনা তোমাদের স্বর্গীয় পিতা পূর্ণ করিবেন।" অনেক মৃত প্রাণ ব্যক্তি এই সমবেত উপাসনায় যোগদান করিয়া নবজীবন লাভ করিয়াছেন,—অনেক শুষ্ক প্রাণ সরস হইয়াছে। সামাজিক উপাসনা ব্রাহ্ম সাধকের বিশেষ সাধনপথ। কিন্তু এ হেন ফলপ্রদ সামাজিক উপাসনার মধ্যেও কতগুলি সাধন-বিঘ্ন আছে। যে স্থলে সে সকল অন্তরায় ঘটে, সেই স্থলেই এমন উপকারী বস্তুকে বিষাক্ত করিয়া তুলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এস্থলে একটি কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। যিনি আচার্য্যের কার্য্য করেন, তাঁহার দৃষ্টি যদি ঈশ্বরের উপর না থাকে, তিনি যদি আত্ম জীবনের দীনতা অনুভব না করিয়া অস্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করেন, তবে সেই উপাসনায় কাহারও উপকার হওয়া দূরে থাকুক বরং অন্যের হৃদয়কে উপাসনা হইতে দূরে লইয়া যায়। বিলাতে "Pulpit admonition and praying at others" এর জ্বালায় লোক উজনালয় হইতে প্রস্থান করে। ব্রাহ্ম সমাজেও যে এ আশঙ্কা নাই তাহা বলা যায় না। উপাসনা ও প্রার্থনায় সরলতা, স্বাভাবিকতার অভাব হইলেই মহা অনিষ্ট। ঈশ্বর সামাজিক উপাসনারূপ যে অমূল্য সাধনোপায় আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া জীবন ধন্য করি।

সেবা—যেখানেই লোক নিজের সুখ ও সুবিধা ভুলিয়া গিয়া অপরের সুখোৎপত্তির চেষ্টা করে, সেখানেই ভগবানের কৃপা অবতীর্ণ হয়। নিস্বার্থ প্রেম ও সেবার স্থলে ভগবান স্বয়ং বর্ত্তমান। নরসেবা করিলেই মহান্ পরমেশ্বরের সেবা করা হয়। যাঁহারা বিদেশে বন্ধু বান্ধব শূন্য স্থানে একাকী কুষ্ঠ রোগীদিগের সেবা করিতেছেন, যাঁহারা অন্ধ আতুরদিগকে মাতা পিতার ন্যায় যত্ন ও স্নেহের সহিত পালন করিতেছেন, যাঁহারা দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত নরনারীর সম্মুখে অন্ন উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা ভগবানের সেবা করিতেছেন। উজ্জ্বল জ্ঞানচক্ষে দর্শন করিয়া ভগবানের রাজ্যের একগাছি তৃণকে রক্ষা করিলেও তাঁহারই সেবা করা হয়। তাঁহার সৃষ্ট জীবের সেবাতেই তিনি সেবা প্রাপ্ত হন। নিরাকার চিন্ময় দেবতার বাহ্যিক সেবা এরূপেই হইয়া থাকে। এদেশে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধানতঃ ধর্ম্ম দুই প্রকার। সেবার ধর্ম্ম এবং জ্ঞানের ধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবতকার সেবাধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন। ভাগবতে নবম স্কন্ধে, চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান্ দুর্ব্বাসাকে কহিতেছেন :—

মৎ সেবয়াপ্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়াপূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকাল বিপ্লুতং॥

অর্থ,—"আমার সেবা করিতে যাহারা সমুৎসুক চিত্ত, তাহারা সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাইলেও তাহা লইতে ইচ্ছা করেন না; কালে ধ্বংসশীল অন্য বস্তুর ত কথাই নাই।" সেবাতে মানুষকে নিঃস্বার্থ হইতে শিক্ষা দেয়। স্বার্থশূন্য হৃদয়েই অহেতুকী ভগবদ্ভক্তি জন্মিয়া থাকে। সেবার পথে না চলিলে ধর্ম্মসাধনেও স্বার্থপরতা আসিতে পারে। সেবাই স্বার্থবিনাশের মহাস্ত্র। এজন্যই সাধকগণ বারংবার সেবাব্রতের এত প্রশংসা করিয়াছেন। সেবাতে অহংভাব, দাম্ভিকতা বিনাশ করিয়া মানব হৃদয়কে মেষবৎ বিনম্র করে। যিনি পরের সেবা করেন না, নিশ্চয় জানিও তিনি অহঙ্কারের হস্ত হইতে মুক্ত হন নাই। সেবা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়াই চৈতন্য বলিয়াছিলেন :—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোপিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন, কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

অর্থ,—"তৃণের ন্যায় নীচ ও বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বপ্রকার অভিমান ত্যাগ করতঃ হরিনাম কীর্ত্তন করিবে।" সেবাতেই বিনয়, ভক্তিজন্মগ্রহণ করে। জ্ঞানার্জ্জন, নির্জ্জন উপাসনা, আলোচনা, শাস্ত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সেবা ব্রতও গ্রহণ করা চাই; তাহা হইলেই আমরা যথার্থ ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব। পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রেই সেবার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। যাহার হস্ত দুঃখীর অশ্রুজল মুছিতে উদ্যত হয় না,

সে ধর্ম্মের একটী উৎকৃষ্ট ফল আস্বাদন করে নাই। পরমেশ্বর করুন, ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এই সেবার ভাব প্রস্ফুটিত হউক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কাহার?— সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ একান্তে আত্ম-পরীক্ষা করিয়া দেখুন, তাহাদের অন্তরাত্মা এই প্রশ্নের কি উত্তর দেয়? ইহাত অনেক সভ্যের মুখে শুনিয়াছি যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের সমাজ; ইহার প্রচারকগণও নিরন্তর এই সত্য ঘোষণা করিতেছেন। সে ঘোষণার কথা বলিতেছি না। প্রত্যেকে সত্যপ্রিয় লোকের ন্যায় বিচার করিয়া দেখুন, তিনি অন্তরের অন্তরে ইহাকে ঈশ্বরের হস্তরচিত বিবেচনা করেন কি না? ভাবিয়া দেখুন ইহার মধ্যে ঈশ্বরের কার্য্য দর্শন করেন কি না? এবং সেই কার্য্যের সাহায্যের জন্য স্বার্থনাশ করিতে আনন্দ অনুভব করেন কি না? তাহা যদি হইবে, তবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান সম্পাদককে প্রকাশ্য বিজ্ঞাপনে এরূপ কথা কেন বলিতে হইবে— "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আর্থিক অবস্থা বড় মন্দ।" ইহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের পক্ষে কি অগৌরবের কথা! সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ অনেক সময়ে নববিধান সমাজের সভ্যগণকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও বিপথগামী বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। এবং ইহাও সকলের বিদিত আছে যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যসংখ্যা নববিধান সমাজের সভ্যসংখ্যা অপেক্ষা বহুগুণে অধিক। এখন জিজ্ঞাসা করি, নববিধানের বন্ধুগণ তাঁহাদের সমাজের এতগুলি প্রচারককে খাওয়াইতেছেন তাঁহাদের প্রচারের ব্যয় বহন করিতেছেন, আর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ আপনাদের নামমাত্র কয়েকজন প্রচারকের ও প্রচারকার্য্যের ব্যয়ভার বহন করিতে পারিতেছেন না, ইহার কারণ কি? কারণ নববিধানের অঙ্গীভূত ব্যক্তিগণ আপনাদের সমাজকে ঈশ্বরের বিধান বলিয়া মনে করেন এবং তাহার কার্য্যের সাহায্যের জন্য স্বার্থনাশ করাকে পরম পুণ্যকার্য্য ও সৌভাগ্য বলিয়া মনে করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ আপনাদের সমাজকে সেরূপ ধর্ম্মের ও বিশ্বাসের চক্ষে দেখেন না বলিয়াই স্বার্থনাশের প্রবৃত্তি জন্মে না। কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা কল্পনা করিয়া কিছু বলিতেছি। এমন কতবার হইয়াছে যে, একই সময়ে একই সহরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারক ও নববিধান সমাজের একজন প্রচারক উপস্থিত হইয়াছেন। সে সহরে নববিধানের সভ্য দুই চারিজন, এবং অধিকাংশ ব্রাহ্ম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে সভ্য। সেই কতিপয় নববিধানানুরাগী লোক তাঁহাদের প্রচারকের জন্য অম্লানচিত্তে ২০০ শত টাকা ব্যয় করিলেন, কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের প্রচার-যাত্রার গাড়িভাড়ার ৩০৲ টাকা তোলাও অতিশয় কঠিন বোধ হইতে লাগিল। কেবল সংকীর্ণ ও ভ্রান্ত বলিয়া বিদ্রূপ করিলে হয় না, তোমরা দেখাও তোমরা যাহাকে সত্য বল, ও ঈশ্বরের নিজ হস্ত রোপিত সমাজ বলিয়া ঘোষণা কর, তাহার জন্য স্বার্থনাশ করিতে প্রস্তুত আছ।

জীবনের পরীক্ষা—যখন কোনও পুরুষ ও রমণীর মধ্যে প্রথম প্রীতির সঞ্চার হয়, তখন তাহাদের হৃদয় নব নব ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কত আশা, কত সুখের কল্পনাতে তাহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়, তাহারা ভাবে যেন সকল বস্তু কেবল তাহাদেরই সুখের জন্য রহিয়াছে। বাহিরে যেন কোনও বাধা নাই, তাহাদের মিলনের পথে আপাততঃ যে বাধা রহিয়াছে, তাহাই যেন একমাত্র বাধা। সেই বাধা একবার দূরীভূত হইলেই যেন তাহাদের অবিচ্ছিন্ন সুখের পথ খুলিয়া যাইবে এবং তাহারা অনন্ত প্রেমের সাগরে সন্তরণ করিতে পারিবে। কিন্তু কিছুকাল পরেই তাহাদের ভ্রম প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ক্রমে ক্রমে যখন সংসারের গুরুভার তাহাদের মস্তকের উপরে পতিত হয়, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে কত চিন্তা, কত ভাবনা আসিয়া তাহাদের প্রাণ অধিকার করে; রোগ, শোক, দরিদ্রতা প্রভৃতি কঠোর পরীক্ষার ভারে তাহাদের হৃদয় অবসন্ন হয়। তখন তাহারা পূর্ব্ব প্রেমের ভাবোচ্ছাসের কথা ভুলিয়া গিয়া হয়ত নিজের নির্বুদ্ধিতার বিষয় মনে করিয়া অনুতপ্ত হয় এবং পরস্পরকে পরস্পরের অসুখের কারণ বলিয়া মনে করে। কিন্তু যাহারা প্রকৃত প্রেমিক, তাহারা পূর্ব্বপ্রেমের কথা স্মরণ করিয়া সকল দুঃখ, বিপদ ও পরীক্ষার ভার অক্লেশে বহন করিতে সমর্থ হয়। নিজের ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া অপরের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিতে, অপরকে সুখী করিতে ব্যস্ত হয়। দুঃখ কষ্টে বরং তাহাদের প্রেমের ভাবকে আরও উজ্জ্বল করিয়া দেয়। এইরূপে পরীক্ষার সময়ে কে প্রকৃত প্রেমিক এবং কে কেবলমাত্র ভাবোচ্ছ্বাসের অধীন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্ম্মজগতেও ঠিক এইরূপ দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়। এই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোকে যখন প্রথমে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, তখন কত ভাবোন্মত্ত হইয়া তাঁহারা আসেন। তাঁহাদের প্রাণ তখন উৎসাহে পরিপূর্ণ, তাঁহাদের জীবন তখন তেজ ও বিশ্বাসে উজ্জ্বল। তখন তাঁহারা কোনও বাধাকে বাধা বলিয়া মনে করেন না, কোনও বিপদ বা পরীক্ষাকে বিপদ বলিয়া গ্রাহ্য করেন না। সংগ্রাম ও নির্য্যাতনের ভিতর মনে করেন যে কেবল বাহিরে প্রতিকূল অবস্থা রহিয়াছে; লোকের যে প্রতিকূলতা রহিয়াছে, তাহা দূর হইলেই ধর্ম্মসাধনের সকল পথ একেবারে পরিষ্কার হইয়া যাইবে। কিন্তু হায়! কিছুকাল পরে প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে বাহিরের যে সকল বাধা বা প্রতিকূল অবস্থা তাহা কিছুই নয়। সাধনরাজ্যের পথে তাঁহারা যত চলিতে থাকেন, ততই বুঝিতে পারেন যে ধর্ম্মসাধনের শত্রু, বাহিরে নয়, আপনার ভিতরেই রহিয়াছে। আপনারই মধ্যে প্রবল প্রবৃত্তি সকল সুযোগ অপেক্ষা করিতেছে, একটু ছিদ্র পাইলেই সমস্ত প্রাণকে অধিকার করিয়া পরমেশ্বর হইতে দূরে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে। স্বার্থপরতা, অহঙ্কার প্রভৃতি রিপুকুলকে দমন করা কত কঠিন, তখন তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন। এখন যে প্রাণ পরমেশ্বরের সহবাসের অতুল আনন্দ অনুভব করিয়া ধন্য হইতেছে, পর মুহূর্ত্তেই হয়ত তাহা কোনও কুপ্রবৃত্তির অধীন হইয়া, তাঁহার প্রেম-মুখ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া হাহাকার করিতেছে। যাঁহারা কেবলমাত্র ভাবের দ্বারা

চালিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ অবস্থায় মধ্যে পড়িয়া অস্থির হইয়া উঠেন; তখন আর তেমন উৎসাহ নাই, আশাপূর্ণ ভাব নাই, পরমেশ্বরের নামও তেমন মিষ্ট লাগে না। এইরূপে যাঁহারা কেবল ভাবের জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ভাব না পাইয়া শান্তিহারা হন, ব্রাহ্মধর্ম্ম শান্তি দিতে পারে না হয়ত এইরূপ আশঙ্কাও করেন। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমিক, তাঁহারা যে লক্ষ্য লইয়া প্রথমে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন, সকল অবস্থার মধ্যে তাহাতে স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া ধর্ম্মসাধনে রত থাকেন। জীবনে অনেক বার পরীক্ষা আসিলেও কিছুতেই তাঁহাদের প্রাণকে আপনার প্রভু পরমেশ্বরের পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে না। জীবনে যখন অবিশ্বাসের দুর্দ্দিন আসে, যখন অন্ধকার আসিয়া প্রেমময়ের প্রেমমুখ দেখিতে দেয় না, তখনও তাঁহারই দিকে চিত্ত রাখিয়া আপনার লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন। সাধন ভজনের দ্বারা আপনার ভিতরের শত্রু সকল উচ্ছেদ করিয়া সেখানে আপনার জীবনের প্রভুকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। দুর্ব্বলতা, পরীক্ষা, প্রলোভন প্রভৃতি তাঁহাদের প্রাণকে পরমেশ্বর হইতে দূরে লইয়া যাইতে পারে না, বরং তাঁহার চরণকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত করে। পরমেশ্বর করুন, আমরা দিন দিন পরীক্ষার পথে সুদৃঢ় হই।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

অন্তরে ও বাহিরে।

আমরা চারিস্থলে ঈশ্বর দর্শন করিয়া থাকি; প্রথম—জড় জগতে। এই দৃশ্যমান জগৎ অনিত্য, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল; ইহার স্থায়িত্ব কোথায়? জগতের অস্তিত্ব আপেক্ষিক মাত্র; ইহার সত্তা আমাদিগের জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেছে। এই যে রূপাদি দেখিতেছি ইহা আমার নিকট যে প্রকার, অন্যের পক্ষে হয় ত তাহা নহে। মানব যাহাকে রক্তবর্ণ দেখে, পশুগণ হয় ত তাহাকে অন্যরূপ দেখে। আমি যে শব্দ একরূপ শ্রবণ করিতেছি, তাহা অন্যের নিকট হয় ত অন্য প্রকার প্রতিভাত হইতেছে; আমার পক্ষে যাহা মধুর, অন্যের পক্ষে হয় ত তাহা কর্কশ। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, দৃশ্যমান জড়জগতের একটা স্থায়ী সত্তা কিছুই নাই। এই ত গেল জগতের দার্শনিক অনিত্যভাব। সহজ চক্ষেও মানব দেখিতেছে, এবং যাহারা কিছুমাত্রও চিন্তা করে না তাহারাও স্পষ্ট জানিতেছে যে, আজ যথায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন মহানগরী, কাল তথায় মহাশ্মশান, আজ যে রাজপ্রাসাদ ধনমদে উন্মত্ত হইয়া মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে, কাল তাহা সমভূমিতে পরিণত হইতেছে। জড়জগতের এইরূপ অনিত্যতা অতি সুস্পষ্ট ব্যাপার। নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, বিচিত্র জড়জগতের মধ্যে কি স্থায়ী কোন বস্তু নাই? অবশ্যই আছে। যেমন বাষ্প, মেঘ, বৃষ্টি, তুষার প্রভৃতি বস্তুনিচয় একই জলের বিভিন্ন পরিণতি মাত্র; এই সকলেরই মূলে যেমন একই জলীয় অণু বর্ত্তমান, সেইরূপ এই বিচিত্র পরিবর্ত্তনশীল জগতের মূলে এক স্থায়ী, অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু বর্ত্তমান রহিয়াছেন; এই বিভিন্ন পদার্থনিচয় সেই একই পদার্থের বিচিত্র পরিণাম মাত্র, এবং এই অপরিবর্ত্তনীয় বস্তুই ঈশ্বর। সেই জন্যই প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন,—"নিত্যোঽনিত্যানাং"; যাবতীয় অনিত্য বস্তুর মধ্যে সেই এক নিত্য পদার্থ বর্ত্তমান। আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্রও গভীর গবেষণা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, যাবতীয় বিচিত্র শক্তির মূলে এক মহাশক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই যে মহামন্ত্র ঘোষিত হইতেছে, বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণও উচ্চৈঃস্বরে সেই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। ইহাই জড়জগতে ঈশ্বর-দর্শন।

দ্বিতীয়তঃ প্রাণিরাজ্যে। সাধকগণ পরমেশ্বরকে নিয়ত সকল চেতনের চেতয়িতারূপে সন্দর্শন করেন। জড়জগতে যিনি মহাশক্তিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, যাবতীয় চেতনের মধ্যে তিনিই এক মহাচেতয়িতারূপে, প্রাণরূপে বিদ্যমান। এস্থলেও সাধকগণ তাঁহাকে যাবতীয় পরিবর্ত্তনশীল বিচিত্র চেতনের মূলে এক অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য, মহাচৈতন্যরূপে, পরমজ্ঞানরূপে প্রত্যক্ষ করেন—এখানেও তিনি সমুদয় বিচিত্রতার মধ্যে এক স্থায়ী পদার্থও নিয়ন্তারূপে বর্ত্তমান। তাই আর্য্যঋষি বলিলেন, "চেতনশ্চেতনানাম্"; তিনি সকল চৈতন্যের মূলে এক মহাচৈতন্য।

তৃতীয়তঃ মানব-ইতিবৃত্তে। বিশেষভাবে ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, যাবতীয় ঘটনার মূলে এক মহাপুরুষের নিয়ন্তৃত্ব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সাধকগণ ঈশ্বরকে এস্থলে বিধাতারূপে সন্দর্শন করেন। "একোবহুনাং যো বিদধাতিকামান্" তিনি একাকী সমুদয় প্রাণিজগতের কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন। তিনি যাবতীয় ঘটনাকে নিয়মিত করিতেছেন। যাহার যাহা আবশ্যক, যেরূপ বিধান করিলে জগতের কল্যাণ হয়, সেই জ্ঞানময় মহাপুরুষ তৎসমুদয় অবগত হইয়া যথাবিধি জগৎ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। আমরা এস্থলে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হই।

এই যে তিন স্থলে সাধকগণ ঈশ্বরকে দর্শন করেন ইহা পরোক্ষ দর্শন। এরূপ দর্শনে আত্মা তৃপ্ত হয় না, মন সন্দেহের অতীতরাজ্যে উপনীত হয় না; উত্থান, পতন, পাপের জ্বালা নিবারণ হয় না। কিন্তু যে সাধক তাঁহাকে আত্মায়দর্শন করেন তিনিই প্রকৃত দর্শন পাইয়া থাকেন। "তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্"; যেধীরেরা তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া দর্শন করেন—আত্মার পরমাত্মারূপে, আধাররূপে দর্শন করেন, তাঁহারাই শাশ্বতী শান্তিলাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু অন্যের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। যতদিন এইরূপ আত্মাতে দর্শন করা না যায়, ততদিন প্রকৃত দর্শন হয় না। আর অন্তরে দেখিলেই তাঁহাকে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তখন জড়জগতে, প্রাণিরাজ্যে এবং ইতিহাসে তিনি স্পষ্টতররূপে প্রকাশিত হন, তখন অন্তর বাহির সমান হইয়া যায়। যতদিন না অন্তরে দেখা যায়, ততদিন এই যে জগৎ-শাস্ত্র, প্রাণিশাস্ত্র ইহা পাঠ করিতে পারা যায় না। আত্মার ঈশ্বর-দর্শনরূপ চাবি হাতে না পাইলে জগৎ-সিন্ধুক উদ্ঘাটিত করিতে পারা যায় না। আর যখন এই

চাবি হাতে আসে তখন সাধকগণ অতি সামান্য ঘটনা হইতে মহোপদেশ সকল লাভ করেন, তখন তাঁহারা পক্ষিগণের ক্রিয়া কলাপ দর্শন করিয়া নির্ভর শিক্ষা করেন। এই চাবি হাতে পাইয়াই মহাত্মা নানক বলিলেন, "হে মন! যখন তোমার আহার হরি প্রস্তুত রাখিয়াছেন, তখন তুমি চিন্তিত হইতেছ কেন? পর্ব্বত ও প্রস্তর মধ্যে কত শত জীব জন্মগ্রহণ করিতেছে, হরি অবিশ্রান্ত তাঁহাদের আহার যোগাইতেছেন, আর তোমাকে তিনি পরিত্যাগ করিবেন?" ইত্যাদি। অতএব আমাদিগকে সর্ব্ব প্রযত্নে অগ্রে আত্মার ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে, তাহা হইলে অন্তর বাহিরে সর্ব্বত্রই তাঁহার সাক্ষ্য পাইব। এইরূপ সাধন না হইলে আমাদের সমস্তই বৃথা হইল। পরমেশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন এইরূপে তাঁহাকে অন্তরে বাহিরে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই।

যথার্থ আধ্যাত্মিক উপাসনা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মদর্শন ব্রাহ্মের প্রথম সাধন। কিন্তু ইহাই ধর্ম্মের চরম অবস্থা নহে। ভগবত-তত্ত্ব শ্রবণ ও সংসারের অসারতা দর্শনে ঈশ্বর লাভের প্রবৃত্তি জন্মায়। কিন্তু ধ্যান ধারণা দ্বারা চিত্ত স্থির ও নিষ্কাম হইলেই ব্রহ্ম দর্শন হইয়া থাকে। ঈশ্বরদর্শন হইতেই যথার্থ উপাসনা প্রসূত হয়, তখনই সাধকের প্রাণের ভাবগুলি উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করে। সেই অবস্থাতেই তিনি জীবন্ত ঈশ্বরের অনুপ্রকাশে আপনাকে দেখিতে পান। দ্বিতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে যেমন আমাদের বাক্য ও কার্য্য সর্ব্বদা তাহার দ্বারা নিয়মিত হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের জীবন্ত সত্তা ও দৃষ্টি দ্বারা সাধকের জীবন নিয়মিত হইয়া থাকে। তখন তিনি পাপ, প্রলোভন হইতে উদ্ধার পান। ঈশ্বরদর্শন ভিন্ন পাপ ও সংসারাসক্তি হইতে মুক্তি পাইবার উপায় নাই। আমরা ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা দেখিয়া অনেক সময় নিরাশ হই। সর্ব্বদা এই প্রশ্ন হয় "ব্রাহ্মগণ কেন প্রলোভনের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন না, কেন সংসার আসক্তিতে ডুবিয়া যান।" কেবল তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণে পাপ যায় না—দর্শন চাই। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া শ্রুতিসুখ পরিতৃপ্ত হইতেছে, বালকগণও বহু শ্রবণ ও পাঠ করিতেছে, কিন্তু কয়জন ব্রাহ্ম সহিষ্ণু হইয়া দর্শনের জন্য লালায়িত? ঈশ্বরকে সত্যবস্তু রূপে ধরিতে না পারিলে, তাঁহার দৃষ্টি আপন জীবনে অনুভব করিতে না পারিলে, কেহ কি পাপ ছাড়িতে পারে? সহিষ্ণু হইয়া ব্যাকুল ভাবে সাধন করিলেই তিনি প্রকাশিত হন। "সাধন বিনে সে ধন মিলে না।"

ব্রহ্মদর্শন হইলে কি নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকা যায়? তখন তাঁহার আদেশে জীবনকে পরিচালিত করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। এ সময়ে একটী বিশেষ সাধন অবলম্বন করিতে হয়। পূর্ব্বে আপনার প্রাণের সাধুভাব গুলিকে ঈশ্বরের প্রেরণা বলিয়া মনে করিয়া সাধক স্বীয় জীবন পরিচালন করিতেন, এখন সে ভাবে চলিলে সাধকের মৃত্যু। তিনি মঙ্গলময়, অতএব যাহা মঙ্গল ও কল্যাণকর, তাহা তাঁহার ইচ্ছা, এই ভাব জীবনের প্রথম অবস্থায় ভাল। যেমন, "জগৎ আছে, অতএব ঈশ্বর আছেন" এরূপ চিন্তা জীবনের প্রথম অবস্থাতেই ফলপ্রদ, সেইরূপ "ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা" এই ভাবে কার্য্য করা প্রথম অবস্থায় উপকারজনক। কিন্তু এই শুষ্ক জ্ঞান পরে সাধকের প্রাণে তৃপ্তি দিতে পারে না। তখন তিনি সাক্ষাৎভাবে ভগবানের ইচ্ছা বুঝিয়া তাহা প্রতিপালন করিতে ব্যস্ত হন। সাধকের জীবনে এই অবস্থাতেই জগৎ বিশ্বাসের নিদর্শন দেখিতে পায়। ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালনে সাধক এতদূর আনন্দ ও সুখপ্রাপ্ত হন যে, কোন প্রকার বিঘ্ন বাধা তাঁহাকে সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না। সংসারের নিন্দা ও প্রতিবাদ, অত্যাচার ও উৎপীড়ন এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালন হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না। সংসারের অনুরাগ ও বিরাগ তাহার জীবনকে বিন্দুপরিমাণেও বিচলিত করিতে পারে না।

কিন্তু এই অবস্থাতেও মানব মৃত্যুর হস্ত হইতে সম্পূর্ণ রূপে অব্যাহতি পাইতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে বিশেষ আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা হয় বটে; কিন্তু আমিত্ব ভাব ভিতরে সূক্ষ্মভাবে লুক্কায়িত থাকাতে নিজ ইচ্ছার স্রোতে সাধক কখন কখন ভাসিয়া যান। তখন আলস্য ও জড়তা আসিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালন করিতে বাধা দেয়। সাধনের প্রথম অবস্থায় পুরুষকার ও ঈশ্বরের দয়ার উপর নির্ভর হয়। কিন্তু এই অবস্থায় পুরুষকার বিনাশ, আত্মবিনাশই মুখ্য সাধন। "আমি" ধর্ম্মজগতের পরম শত্রু। এই আমিত্ব দ্বারা পরিচালিত হইয়াই, ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালন করিতে গিয়া নিজের ইচ্ছা প্রতিপালন করিয়া থাকি। এই অবস্থায় সাধক বাহিরের সংগ্রাম অতি সহজে অতিক্রম করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহার বিনাশের অস্ত্র আপনার হস্তে। আমিত্বই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শত্রু, সাধক এই অবস্থাতেই ইহা অনুভব করেন। এ অবস্থাতে সাধক নিজের ইচ্ছাকে এত ভয় করেন যে, যখন কোন বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিতে না পারেন, তখন অন্যের ইচ্ছার অনুগত হইয়া চলা সঙ্গত মনে করেন, তবু নিজের ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দেন না।

এই প্রকার আত্মইচ্ছার পরাজয় ও ব্রহ্মইচ্ছার জয় হইলেই জীবনের পরিত্রাণ আরম্ভ হয়। কিন্তু পাপের বাসনা মানবের প্রাণ হইতে সহজে উৎপাটিত হয় না। পাপবাসনার বিনাশ না হইলে জীবনের ক্লেশ, অশান্তি ও দুঃখ যায় না। যথার্থ উপাসনা জীবনে অনুষ্ঠিত হইলে,—ঈশ্বর সংস্পর্শ প্রাণে অনুভূত হইলে, জীবনের মধ্যে কি তাহার কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় না? ব্রহ্মোপাসনার প্রথম ফল ব্রহ্মানন্দ। এই আনন্দের সঙ্গে অন্য কোন আনন্দের তুলনা হয় না। ব্রহ্ম-সংস্পর্শ-সুখের সঙ্গে কোন সুখের উপমা হইতে পারে না। এই আনন্দের ধারা—এই সুধা প্রাণে আসিলেই মানুষ ইহজগতে স্বর্গসুখ ভোগ করে।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া,
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি।
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র নচৈবায়ং স্থিত শ্চলতি তত্ত্বতঃ।
যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।

চিত্ত যোগাভ্যাস দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া যে অবস্থায় উপরত হয়; যে অবস্থায় বিশুদ্ধ আত্মা পরমাত্মাকে অবলোকন করিয়া তাঁহাতেই তুষ্ট লাভ করে, ইন্দ্রিয়ের অতীত, কেবল বুদ্ধি দ্বারা গ্রাহ্য, নিত্যসুখ অনুভব করে, ও তাহা হইতে বিচলিত হয় না; যে অবস্থা লাভ করিলে অন্য কোন লাভকে ততোধিক লাভ মনে করে না এবং গুরু দুঃখ দ্বারাও বিচলিত হয় না, তাহাই সাধকের যোগের অবস্থা, ব্রহ্মভোগের অবস্থা।

দ্বিতীয় ফল প্রেম। প্রাণে ব্রহ্মকরুণার স্পর্শ হইলে, নীরস হৃদয় সরস হয়, অপ্রেমিক হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয়।

তৃতীয় ফল, মানবের চিরবাঞ্ছিত শান্তিধনলাভ। মানবপ্রাণ নিয়তই এই পৃথিবীতে শান্তি অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। কিন্তু এই পিপাসা আর কোনও স্থানে নিবারণ হয় না। সাধক যদি অন্তর ও বাহিরের শত্রুর তাড়নায় অস্থির থাকিলেন,—পাপ-সংগ্রামে নিয়ত বিপর্য্যস্ত থাকিলেন, তবে ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া কি ফল হইল? সাধকের প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা শান্তিলাভ করা, পাপের জ্বালা নির্ব্বাণ করা। আত্মাতে ব্রহ্ম-স্পর্শ হইলেই পাপের জ্বালা নিবারণ হয়, শোক দুঃখের হস্ত হইতে প্রাণ রক্ষা পায়। প্রতি দিন উপাসনা করিলে যদি প্রাণে প্রেম, আনন্দ শান্তি লাভ না হয়, তবে সেই উপাসনা উপাসনাই নহে। পরমেশ্বর কৃপা করুন আমরা প্রকৃত উপাসনার অবস্থা লাভ করিয়া ধন্য হই।

ব্যাখ্যান রত্নাবলী।

১৩ই মার্চ্চ সাধনাশ্রমে বিবৃত।

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে,
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্।
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়,
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ।

"হে পার্থ, যে সকল ব্যক্তি তাহাদের জীবনের সমুদয় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করে, আমাতেই অনুরক্ত হয়, এবং অনন্যমনা হইয়া আমার সঙ্গে যুক্ত হয় ও যুক্ত হইয়া আমারই ধ্যান ও উপাসনা করে, আমি স্বয়ং তাহাদিগকে মৃত্যু এবং সংসাররূপ সাগর হইতে উদ্ধার করি। আমাতে আবেশিত-চিত্তদিগকে আমি মৃত্যু-সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করি। আমাতে তুমি মনকে স্থাপন কর, আমাতে বুদ্ধি নিবেশিত কর, তাহা হইলে আমাতে বাস করিতে পাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।"

এক রকম অবস্থায় কর্ম্ম, বন্ধন স্বরূপ হয়; কর্ম্ম মানবাত্মাতে অহঙ্কার, শুষ্কতা, নীরসতা আনিয়া দেয়, চিত্তকে উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত করে। যাহারা সর্ব্বদাই একটা না একটা কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকে, যাহারা একাকী সংসারের নানাপ্রকার লোকের সঙ্গে কারবার করে, অতি শীঘ্রই তাহাদের চিত্ত তিক্ত হইয়া যায়, মানুষের প্রতি প্রীতি লোপ পাইয়া ঘৃণা হৃদয়ে স্থান পায়। অনেকে সারাদিন নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া তিক্ত মন লইয়া বাড়ীতে আসেন, আসিয়া হয়ত সামান্য কারণে পত্নীকে অপমান করেন, সন্তানদের প্রহার করেন। সমস্ত দিনে চিত্তের যে উত্তেজনা হইয়াছিল, তাহা শান্ত করিতে দুই ঘণ্টা কাল বসিয়া থাকিতে হয়।

বাইবলে মেরী ও মার্থার গল্পেতেও এই উপদেশটী লুক্কায়িত রহিয়াছে। মেরী ও মার্থা দুই ভগিনী; মেরী সর্ব্বদাই খ্রীষ্টের সেবা করিত ও তাঁহার উপদেশ শুনিতে ভাল বাসিত। মার্থা নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিত। একদিন সে যীশুকে বলিল "মেরীকে বলুন, আমার সঙ্গে আসিয়া কাজ করে"। যীশু বলিলেন— "মেরীই ঠিক বুঝিয়াছে ও ঠিক করিতেছে।" বাস্তবিক যদি কার্য্যেতে চিত্তের শান্তিহরণ করিয়া চিত্তকে মলিন করে, তবে তাহাতে উপকার না হইয়া অপকারই হইল।

কিন্তু ইহা ভিন্ন আর একপ্রকার কর্ম্ম আছে। যাহারা সকল কর্ম্ম তাঁহাতে সমর্পণ করে; তাঁহাতে নিরত হয়, তাঁহার সহিত যোগস্থাপন করে, তাঁহার ইচ্ছার সহিত ইচ্ছাকে মিলিত করিয়া দেয়, সেই কর্ম্মই তাহাদের মুক্তির সাহায্য করে। তখন সে কর্ম্ম আর বন্ধনস্বরূপ হয় না। প্রেমেতে যখন ইচ্ছার যোগ হয়, প্রেম যখন কর্ম্মের জন্মদাতা, জাগ্রতপ্রীতি যখন কর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান তখন সেই কর্ম্ম মুক্তিকে আনয়ন করে। যখন কর্ম্মের ফলাফলের উপর দৃষ্টি থাকে না, যখন এরূপ বলিতে পারা যায় যে, সফলতা বিফলতা প্রভু জানেন, আমি তাঁর প্রেমে বাধ্য হইয়া করিতেছি, তখন সেই কর্ম্ম মুক্তিকে আনয়ন করে। যখন কর্ম্মেতে নিজের শক্তি না দেখিয়া তাঁহারই শক্তি দর্শন করি, যখন তাঁহারি মহিমা ও গৌরব দর্শন করি, তখনই সেই কর্ম্ম মৃত্যুসংসারসাগর হইতে মুক্ত করে। সেণ্টপল্ যেমন বলিয়াছিলেন "যীশুর প্রতি প্রেম আমাকে বাধ্য করিতেছে," সেইরূপ ভাবে কর্ম্ম করিলে তাহা মুক্তি প্রদান করে। পাখীগুলি যেমন স্বাধীনতা বিবর্জ্জিত হইয়া ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট উপায়ে কুলায় নির্ম্মাণ করে, তেমনি প্রেমিক স্বাধীনতা হারাইয়া, বাধ্য হইয়া, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আত্ম সমর্পন করেন। সেই অধীনতায় কাজ, প্রেম ও বিশ্বাসকে বাড়ায়। তখন তাহার উপর মৃত্যুর অধিকার থাকে না। যাহার অনুরাগ অনন্তে, যাহার নির্ভর সত্যে, যাহার প্রেম সাধুতার প্রতি, সে মৃত্যুর অতীত। কারণ মৃত্যু এই সকলকে স্পর্শ করে না। তখন সেই সাধক ঈশ্বরেতে বাস করেন। তাঁহারই আশ্রয়ে থাকেন। মৎস্য যেমন জলে, পক্ষী যেমন বায়ুসাগরে সুখে বিচরণ করে, তেমনি সেই সাধক ব্রহ্মের সত্তাসাগরে ডুবিয়া থাকেন। সেই আত্মা তাঁহার দ্বারা সুরক্ষিত হয়।

যাঁহারা এই আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই সত্য বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। আমরা কি এখানে অকর্ম্মণ্য হবার জন্য বসিয়া আছি? তাহা নয়; কাজ করিতে হইবে, কিন্তু যে কাজ ঈশ্বর-প্রীতি হইতে উৎসারিত নয়, সেই কর্ম্মকে বিশ্বাস করি না। আমরা তাঁহারি জন্য কাজ করিব; তাঁহারই জন্য বাস করিব, তাঁহারই শক্তিতে নির্ভর করিব। তাঁহার প্রতি প্রেম হইতে জাগ্রত প্রীতি হইতে যে কাজ

করিব তাহাই ঠিক হইবে; নতুবা অন্ত কর্ম্ম বৃথা। অনেকে কোন কাজ না লইয়া থাকিতে পারে না, সেরূপ ভাবে কাজ করিলে সে কাজে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারিব না; কিন্তু ঈশ্বর-প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া ও নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জ্জন দিয়া যদি কাজ করিতে পারি তবেই তাহা সার্থক হইবে।

পঞ্জাব প্রচার যাত্রীদিগের পত্র।

আমরা ২৫ এ তারিখ প্রাতে বৈদ্যনাথ পরিত্যাগ করিয়া অপরাহ্ণ প্রায় ৪ টার সময় বাঁকীপুর পৌছি। ২৬শে তারিখ প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের গৃহে উপাসনা হয়; শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় বেহার নেসনেল্ কলেজ গৃহে বক্তৃতা হয়। প্রথমে একটী সঙ্গীত হয়, তৎপরে শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজীতে সংক্ষেপে কিছু বলেন। তাহার সার মর্ম্ম এই:—

"শক্তির (power) ধর্ম্ম এই যে, ইহাতে পরিবর্ত্তন সংঘটন করে, অথবা সংঘটনের চেষ্টা করে। যেখানেই শক্তি, সেই খানেই পরিবর্ত্তন। আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা কি এই শক্তি জন্মাইয়া দিতেছে? বিশেষভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, শিক্ষাতে এই শক্তি জন্মান দূরে থাকুক, বরং অপকার করিতেছে। শিক্ষাতে জ্ঞানের বিকাশ হইতেছে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা বিচার করিয়া মিথ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্য গ্রহণের শক্তি হইতেছে না। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, জ্ঞান দ্বারা যাহা অন্যায় ও পাপ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবনে সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিতে পরিতেছেন না। তাঁহাদের এমন বল্ নাই যে, স্বীয় স্বীয় মলিন জীবনকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন। এই কারণে ভাল ভাল শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে নানারূপ অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত দেখা যায়। যে শিক্ষায় জীবনে নৈতিক বলের সঞ্চার না করে, যে শিক্ষায় বুঝিয়া শুনিয়াও লোক পাপ-পথ পরিত্যাগ করিয়া সত্যের পথ অবলম্বন করিতে না পারে, যে শিক্ষায় সরলতার স্থলে কপটতা আনিয়া দেয়, যে শিক্ষায় মনুষ্যত্বকে বিনাশ করে, সে শিক্ষায় প্রয়োজন কি? শিক্ষিত ব্যক্তিরাই যদি শিক্ষার দায়িত্ব বুঝিয়া জীবনকে চালাইতে সক্ষম না হইল, তবে সে শিক্ষায় কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই।

আমরা দেখিতেছি, বর্ত্তমান শিক্ষায় মানুষের আভ্যন্তরীণ জীবনকে পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারিতেছে না। এই পরিবর্ত্তনের জন্য শক্তির দরকার। স্কুল কলেজের শিক্ষাতে এই শক্তি পাওয়া যাইতেছে না। ঈশ্বর ভিন্ন জীবন পরিবর্ত্তনের এই শক্তি আর কেহ দিতে পারে না। প্রাণে সেই ব্রহ্মশক্তি অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক। এজন্য সকলকে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইবে, তিনি ভিন্ন আর গতি নাই।" তৎপর এই বিষয়ে ভাই প্রকাশদেব ও সুন্দর সিং হিন্দি ভাষায় খুব উচ্ছ্বাসের সহিত কিছু কিছু বলেন। তৎপরে সময়োপযোগী সঙ্গীত হয়। তদনন্তর শাস্ত্রী মহাশয় উপনিষদের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় প্রাণস্পর্শী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন; তাহার সার মর্ম্ম এই;—যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহম্ তেন কুর্য্যাম," যাহা ক্ষণস্থায়ী, যাহার উপর কিছু মাত্র নির্ভর করা যায় না, তাঁহার প্রতি প্রীতি স্থাপন করিয়া মানুষ সুখী হইতে পারে না, পরন্তু তাহাতে পদে পদে কেবল অশান্তি ভোগ করিতে হয়। কিন্তু যাহা স্থায়ী, নিত্য, অনন্ত তাহাতে প্রীতি স্থাপন করিতে পারিলে আর ভয় থাকে না, দুঃখ অশান্তি ভোগ করিতে হয় না। অতএব সংসারের ক্ষণস্থায়ী বস্তুতে প্রীতি স্থাপন না করিয়া সেই অক্ষর, অবিনাশী অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মে প্রীতি স্থাপন করাই শ্রেয়।"

অতি অল্প সময় পূর্ব্বে বক্তৃতার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। তবুও বক্তৃতা স্থলে প্রায় দুই শত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন! সকলেই আগ্রহের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ আর ও ২।১ দিন থাকিয়া কার্য্য করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

তৎপর দিবস প্রাতে প্রকাশ বাবুর গৃহে উপাসনা হয়, শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন। প্রকাশ বাবুর পরিবার একটী বিশ্বাসী প্রেম পরিবার। আমরা এই পরিবারে আসিয়া আনন্দ পাইয়াছি ও উপকৃত হইয়াছি। ভগবান্ ব্রাহ্মসমাজে এরূপ পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন।

আমরা সে দিন বেনারস যাত্রা করিয়া ২৭এ মার্চ্চ সোমবার অপরাহ্নে পৌছি। এখানে ২৮এ তারিখে কারমাইকেল লাইব্রেরী গৃহে এক সভা আহূত হয়। সভাতে প্রায় একশত লোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই;—

"ব্যক্তিগত স্বাধীনতা মানবের উন্নতির মূল। এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রাচীনকালে আমাদের দেশের লোকের ছিল না। রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্ম্ম বিষয়ে লোক সম্পূর্ণরূপে অধীন ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজী শিক্ষা আসিয়া লোকের প্রাণে এই স্বাধীনতার ভাব কতক পরিমাণে জাগাইয়া দিতেছে। কিন্তু আশানুরূপ ফল হইতেছে না। এই স্বাধীনতা পূর্ণরূপে লাভ করা চাই। কোন শ্রেণীর লোক জগতে রাজত্ব করিয়া থাকে? যাহাদের অনেক ধন সম্পত্তি আছে, অথবা অন্য পার্থিব ক্ষমতা আছে তাহারাই কি? না তাহারা নহে। সাংসারিক বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকের নিকট তাহারাই গণনীয় বটে; কিন্তু তাহাদের রাজত্ব ক্ষুদ্র স্থান ও সমাজে সীমাবদ্ধ। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতরূপে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ কাম ক্রোধাদি রিপু ও সমস্ত বিষয় বা মনকে আপনার অধীন করিয়াছেন, এক কথায় সকল প্রকারের আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃতরূপে মনুষ্যজাতির রাজা। পৃথিবীর বড় বড় সম্রাট যাঁহারা, তাঁহাদের মস্তক একজন সূত্রধরের পদ তলে অবনত কেন? যীশুর কি অনেক ধন সম্পত্তি ছিল, না তিনি বড় পণ্ডিত ছিলেন? তাহা নহে। কিন্তু তিনি প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চিত্ত সংসারাসক্তি, ইন্দ্রিয়সেবা প্রভৃতির অতীত এক সত্যরাজ্যে বিচরণ করিত। বুদ্ধ, মহম্মদ, চৈতন্য নামক প্রভৃতি মহাপুরুষগণও এই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা আজ পৃথিবীর কোটী কোটী লোকের হৃদয়ে রাজত্ব করিতেছেন।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের অবস্থা অতি শোচনীয়। লোক সকল সামাজিক কুরীতি, এবং উপধর্ম্মের প্রাণহীন নিয়ম-প্রণালীর দাস হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এই অধীনতার হাত এড়াইতে পারিতেছেন না। এই অবস্থায় দেশের উন্নতির আশা করা যায় না। আমাদিগকে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। হৃদয় যাহাতে রিপু ও ইন্দ্রিয়াদির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে, তজ্জন্য সাধন করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকারের অসত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সার সত্য গ্রহণ করিতে হইবে। তবেই আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিব।" বক্তৃতা সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তৎপর ভাই প্রকাশদেব উর্দ্দু ভাষায় কিছু বলেন। তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই;—"মানবের মধ্যে তিন প্রকারের ভাব দেখা যায়; ১ম শারীরিক, ২য় মানসিক, ও ৩য় পশুভাব। শারীরিকভাব মানুষকে ভোগবিলাসের দিকে লইয়া যায়; ভাল আহার, ভাল পরিচ্ছদ প্রভৃতি সুখ সেবনে চিত্তকে লিপ্ত করে। মানসিক ভাব, যশ, মান, ধন, পদ প্রভৃতি লাভের জন্য ব্যস্ত করে। পশুভাব দ্বারা চালিত হইয়াই মানুষ ইন্দ্রিয়-সেবায় রত হয়, রিপুর দাস হইয়া মহাপাপে লিপ্ত হয়। মানুষ এই তিন প্রকারের ভাব দ্বারা চালিত হইয়া ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয়, তাহার জীবন পশুর জীবন হইয়া পড়ে। কিন্তু যদি এই তিন প্রকার ভাবকে আপনার শাসনাধীন করিতে পারা যায়, তবে ইহা দ্বারা ক্ষতি না হইয়া বরং মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। যে শরীর মন ও ইন্দ্রিয়, সংসারের ভোগে লিপ্ত থাকিয়া নানারূপ অশান্তি ও অধর্ম্ম উৎপাদন করে, তাহা শাসনাধীন হইলে প্রভুর কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া শান্তি ও বিমল ধর্ম্মভাব উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু কি প্রকারে এই তিন প্রকারের ভাবকে শাসনাধীন করা যায়? বিদ্যা, বুদ্ধি, মানুষের বল এখানে পরাস্ত। কেবল একমাত্র ব্রহ্মশক্তিই ইহাদিগকে শাসনাধীন রাখিতে পারে, আর কাহারও সাধ্য নাই। পরমেশ্বর করুন, আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হই এবং তাঁহার শক্তি আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হউক।" তদনন্তর শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় কিছু বলিয়া উপসংহার করেন। পর দিবস প্রাতে ফয়জাবাদ যাত্রা করি।

(প্রাপ্ত)

অভয় ধাম।

পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ লইয়াই সাধারণতঃ মনুষ্যজীবন নির্ব্বাহিত হয়। কখন সুখ কখন দুঃখ, কখন পাপ কখন পুণ্য, কখন আলোক কখন অন্ধকার, এইরূপে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা জীবনে গতায়াত করিতেছে। ধর্ম্মজীবনে দেখিতে পাওয়া যায়, দশ দিন বেশ উপাসনার উচ্ছ্বাস চলিতেছে; ভাবের সরসতা এবং মাধুর্য্যে মন প্রাণ মুগ্ধ হইয়া যাইতেছে; সংসার মধুময় বোধ হইতেছে; যে দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, সে দিকেই প্রভুর অপার কৃপাহস্ত দেখিয়া পুলকিত হই; যাহা শ্রবণ করি, তাহাতেই তাঁহার সংবাদ পাই; সংসার যেন ব্রহ্মময় হইয়া গিয়াছে। আবার কোথা হইতে নীরসতার বাতাস আসিয়া সকল ভাব ভক্তি ধূলিকণার ন্যায় উড়াইয়া দিল। পুষ্করিণী জল শুকাইয়া গেলে মৎস্যের যেমন দুরবস্থা হয়,—জলাভাবে মৎস্য যেমন যাতনাভোগ করিতে থাকে, তেমনি প্রাণ বিশুষ্কতায় অস্থির হইয়া উঠে। তখন সাধুসহবাস, সদ্গ্রন্থ পাঠ এমন কি আরাধনা প্রার্থনাদিও ভাল লাগে না। সংসার যেন মূর্ত্তিমতী রাক্ষসীর ন্যায় মুখ ব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আইসে। ধর্ম্মজীবন এরূপ জোয়ার ভাঁটা, এমন উত্থান পতন, সরসতা নীরসতার অবস্থার মধ্য দিয়া আজীবন অতিবাহিত করিতে হইবে কি? ধর্ম্মরাজ্যে নিরাপদ স্থান কি নাই? এমন স্থান কি নাই, যেখানে গেলে আশঙ্কা, সন্দেহ এবং পাপ ও প্রলোভনের সম্ভাবনা চলিয়া যায়। যে স্থানে চির আলোক, চির সৌন্দর্য্য—চির বসন্ত বিরাজিত, এমন নিরাপদ স্থান কি নাই?

পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। নিশ্চল, অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থা লাভই আমাদের লক্ষ্য। যে অবস্থা লাভ করিলে পাপ ও মোহের সহিত সংগ্রামের ভয় থাকে না, যে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পতনের আশঙ্কা চলিয়া যায়, সেই অবস্থা লাভই সাধনার উদ্দেশ্য। সুন্দর উপাসনা আলোচনা চলিতেছে, সাধুসঙ্গে থাকিয়া দিন দিন প্রাণ সতেজ হইতেছে; কিন্তু যে দিন একমাত্র উপার্জ্জনশীল যোগ্য পুত্রটি মৃত্যুমুখে পতিত হইল, সে দিন হইতে হৃদয়ের তার ছিন্ন হইয়া গেল। এত দিনের উপাসনা, আলোচনা, সাধুসঙ্গ বালুকা-শোষিত জলের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া গেল। সাধন ভজনের পরিবর্ত্তে শোক দুঃখের তীব্র যাতনা ভোগ হইতে লাগিল। এরূপ হইলে, জীবন বড়ই বিড়ম্বনাময়। কিন্তু সকল দেশের সাধুগণ আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চতর সোপানে দণ্ডায়মান হইয়া মানবজাতিকে যে অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা সাধনপথে দিন দিন অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারাও সাক্ষ্য দিতেছেন যে, ধর্ম্মরাজ্যের যাত্রীগণ ইহজীবনেই এমন নিরাপদ স্থান লাভ করেন, যেখানে গেলে পাপভয়, বাসনার ভয় এবং সংসারমোহ হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না।

পরমাত্মার সহিত আত্মার নিগূঢ় যোগ স্থাপিত হইলেই পতনের আশঙ্কা থাকে না। যতদিন জীবে এবং ব্রহ্মে সম্বন্ধ স্থাপিত না হইবে, যতদিন দূরের দেবতার ন্যায় সাধক তাঁহাকে পূজা করিবেন, ততদিন প্রকৃত অবস্থা লাভ হইবে না। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতকার অর্জ্জুনের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন :—

"যে অবস্থা বিশেষে অবস্থিত থাকিয়া মানব আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত না হয়, তাহাই যোগ শব্দবাচ্য জানিবে।"

পরমেশ্বর আশ্রয়দাতা, মানবাত্মা আশ্রিত। পক্ষিমাতা যেমন শাবকদিগকে স্বীয় পক্ষপুটে নিরাপদে রক্ষা করে, ব্রহ্মাণ্ডের জননীও তেমনি ভাবে মানবাত্মাকে রক্ষা করেন। এই আশ্রিতের ভাব লাভ করাই ধর্ম্মজীবনের উদ্দেশ্য। এই নিরাপদ অবস্থা লাভ করিয়াই মহাত্মা দায়ূদ বলিয়াছেন :—

"God *is* our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea; *though* the waters thereof roar *and* be troubled, *though* the mountains shake with the swelling thereof." এ কথার মর্ম্ম এই যে, "হে প্রভো, তুমি আমাদের আশ্রয় ও অবলম্বন; বিপদকালে তুমি অতি নিকট সহায়। মেদিনী যদি স্থানান্তরিত হয়, গিরিরাজি যদি সাগরগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়, সাগরের জলরাশি যদি ভীষণ তরঙ্গ তুলিয়া গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করে, তাহার আস্ফালনে পর্ব্বত সকল যদি চঞ্চল হইয়া উঠে, তথাপি আমরা ভীত হইব না।"

যতক্ষণ সাধক সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিত না হন, ততক্ষণই সন্দেহ আশঙ্কা ও ভয় থাকে; কিন্তু যখন সেই অচ্যুত সদনে উপস্থিত হন, তখন আর পরিবর্ত্তনের আশঙ্কা থাকে না। তখনই ব্রাহ্ম সাধক বলিয়া থাকেন, "কি ভয় অভয় ধামে তুমি মহারাজা, ভয় যায় যাঁর নামে।" সেই অভয় ধাম লাভ করিবার জন্যই আমাদের সাধন ভজন, আলোচনা, সৎসঙ্গ। যদি দেখা যায় যে, দিন দিন জীবন অভয়ধামের দিকে অগ্রসর না হইয়া পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার মধ্যেই বাস করিতেছে, তবে বুঝিতে হইবে গন্তব্য স্থান বহুদূরে। পরমেশ্বর কৃপা করুন, আমরা এই অভয়ধাম প্রাপ্ত হইয়া নিরাপদ হই।

পাঁচ ফুলের সাজি।

৮ম সংখ্যা।

S. T. Coleridge,—

"What is Virtue but a medicine, and Vice but a wound."

পুণ্য ঔষধী এবং পাপ আত্মার ক্ষত ব্যাধি ব্যতীত আর কি?

Seneca,—

"We might live as if we were living in the sight of all men; we must think as though some one could and can gaze into our inmost breast."

আমাদের জীবন এরূপে যাপন করা কর্ত্তব্য যেন আমরা সকল মনুষ্যের চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছি। এরূপে চিন্তা করা উচিত যে কোন না কোন ব্যক্তি আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম দেশ পর্য্যন্ত দেখিতে পারেন এবং দেখিতেছেন।

Sadi,—

"Eat whatever comes from the hand of the friend; for, a sick man is not wiser than a doctor."

সখার হস্ত হইতে যাহা আইসে তাহাই ভোজন কর; কারণ রোগী বৈদ্যাপেক্ষা জ্ঞানী নহে।

Shakespeare,—

"A heart unspotted is not easily daunted."

নিষ্কলঙ্ক হৃদয় সহজে ভীত হয় না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,—

"ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥"

যখন মন চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হয়, তখন উহারা সমুদ্রে বায়ু কর্ত্তৃক ঘূর্ণায়মান নৌকার ন্যায় পুরুষের বুদ্ধিকে বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে।

F. W. Newman,—

"To indulge in mere *play* with the ideas of things infinite, appears to be more fatal to religion than any other corruption."

অনন্তবস্তু সকলের বিষয়ে লঘুতার সহিত কল্পনায় প্রবৃত্ত হওয়া, অন্য কোন প্রকার অনিষ্ট অপেক্ষা ধর্ম্মের পক্ষে অধিকতর মারাত্মক।

J. G. Whittier,—

"For lo! in human hearts unseen
The Healer dwelleth still,
And they who make His temples clean
The best subserve His will."

কারণ ঐ দেখ! মানবঅন্তরে অদৃশ্য ভাবে নিরন্তর বৈদ্যনাথ বাস করিতেছেন, এবং যাঁহারা তাঁহার মন্দির সমূহকে নির্ম্মল করেন তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার ইচ্ছা পালনে তৎপর।

"The paths of pain are thine. Go forth
With patience, trust, and hope;
The sufferings of a sin-sick Earth,
Shall give thee ample scope."

কষ্টের পথ সমূহ তোমার। ধৈর্য্য বিশ্বাস ও আশার সহিত এই পথে চলিয়া যাও; পাপে রুগ্ন ধরণীর জ্বালা যন্ত্রণায় তুমি বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র প্রাপ্ত হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ।

শোক সংবাদ—আমরা ব্যথিত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের ভগিনী নিতম্বিনী চট্টোপাধ্যায় গত ৬ই মার্চ্চ আগড়তলা রাজধানীতে ইহলোক লীলা সংবরণ করিয়াছেন। পরোপকার, সরলতা এবং আতিথেয়তা প্রভৃতি সদ্গুণে তাঁহার হৃদয় অলঙ্কৃত ছিল। পরমেশ্বর তাঁহার সন্তান সন্ততিদিগকে সুপথে রক্ষা করুন এবং শোকদগ্ধ স্বামীর প্রাণে শান্তি দান করুন।

উৎসব—উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দাস এবং সহায় বাবু কৈলাস চন্দ্র সেন জলপাইগুড়ি গিয়াছিলেন। গত ১৮ই চৈত্র হইতে ২১শে চৈত্র পর্য্যন্ত চারি দিন উৎসব হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে উপাসনা, আলোচনা, পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা এবং সংগীত সংকীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। ২০শে তারিখ শনিবার দিন অপরাহ্ণে রেলওয়ে ষ্টেসনে "কলির ধর্ম্ম" সম্বন্ধে নবদ্বীপ বাবু বক্তৃতা করেন। রবিবার দিন অপরাহ্ণে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হয়। সংকীর্ত্তনদল বাজারে উপস্থিত হইলে মুন্সী জালালউদ্দিন মিঞা হিন্দিতে এবং কেহ কেহ বাঙ্গালাতে বক্তৃতা করেন।

এই উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় ব্রাহ্মবন্ধুগণ ভিক্ষা দ্বারা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া গরিব দুঃখিকে চাউল, বস্ত্র ও পয়সাদি বিতরণ করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত রূপে ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে;—৩০শে মার্চ্চ সন্ধ্যাকালে উদ্বোধন হয়। ৩১শে মার্চ্চ প্রাতঃকালে বাবু কালী প্রসন্ন বসু উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে বাবু বিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী ও কালী প্রসন্ন বাবু ব্রাহ্ম ধর্ম্ম-মুলক শাস্ত্র পাঠ করেন। সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন উপাসনা করেন। ১লা এপ্রেল প্রাতঃকালে মৌলবী আবদুল আজিম আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে বালক বালিকাদিগের সম্মিলন হয়। কালী প্রসন্ন বাবু কথোপকথনচ্ছলে তাহাদিগকে কিছু উপদেশ দেন। সন্ধ্যাকালে উপাসনা হয়, ভুবন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২রা এপ্রেল প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে গরিবদিগকে চাউল ও কাপড় বিতরণ করা হয়। কালী প্রসন্ন বাবু তাহাদিগকে কিছু উপদেশ দেন। সন্ধ্যাকালে উপাসনা হয়, কালী প্রসন্ন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

সাময়িক উৎসব—সিরাজগঞ্জ হইতে কোনও বন্ধু লিখিয়াছেন, "টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবান্তে শ্রীযুক্ত চণ্ডী কিশোর কুশারী, শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী এবং বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সিরাজগঞ্জ আগমন করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে এখানে কয়েকদিন সাময়িক উৎসব হইয়া গিয়াছে। ২রা বৈশাখ শুক্রবার বাবু চণ্ডী কিশোর কুশারী মন্দিরে উপাসনা করেন, এবং বুধবার সন্ধ্যাকালে "কর্ম্মপাশ" সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়ের বাড়ীতে বক্তৃতা দেন। শুক্রবার অপরাহ্নে মধ্য ইংরাজী স্কুলে তিনি ছাত্রদিগকে নীতি সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তৎপর গুরুগোবিন্দ বাবু কিছু বলেন। শনিবার দিবস অপরাহ্নে এণ্ট্রান্স স্কুল গৃহে চণ্ডী বাবু রাজীতে নীতি সম্বন্ধে উপদেশ দেন। ঐ দিন বাজারে মদ, গাঁজা অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবনের অপকারিতা সম্বন্ধে প্রকাশ্য বক্তৃতা হয়। রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় চণ্ডী বাবু মন্দিরে "বিষয়-বৈরাগ্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

প্রচার—স্থানীয় প্রচারক দল নিয়মিত রূপে কলেজ স্কোয়ারে এবং বিডন উদ্যানে সংগীত সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি করিতেছেন।

সাধনাশ্রমের বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিক্রম পুরের) প্রচারার্থ বিক্রমপুর গমন করিয়াছেন। তাঁহার পরিবার আশ্রমে আছেন। বিক্রমপুরবাসী বন্ধুগণের অর্থ সাহায্য প্রার্থনীয়। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দাস জলপাইগুড়ি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে দিঘাপতিয়া নামক স্থানে অবতরন করেন। সেখানে শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু কালীনারায়ণ রায় মহাশয়ের গৃহে পারিবারিক উপাসনা হয় এবং এক দিন স্কুল গৃহে "ধর্ম্মের দুই দিক" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

নামকরণ—মাণিকদহের বাবু রামগোপাল বিশ্বাসের তৃতীয় সন্তানের নামকরণ হইয়াছে। বাবু অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার আচার্য্যের কার্য্য করেন। বালকের নাম সুধাংশুবিন্দু রাখা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে রাম গোপাল বাবু সাঃ ব্রাঃ সমাজে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। ঈশ্বর শিশুর মঙ্গল বিধান করুন।

দান—আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, মাননীয় ডাঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় খাসিয়া অঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

নব বর্ষের উৎসব—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে নব-বর্ষ উপলক্ষে ব্রহ্ম মন্দিরে উৎসব হইতেছে।

৩০শে চৈত্র মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় বক্তৃতা।

৩১শে চৈত্র বুধবার প্রাতে ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন, তৎপর উপাসনা। অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৫½ টা পর্য্যন্ত আলোচনা এবং ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন, তৎপর উপাসনা।

১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার প্রাতে ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন, তৎপর উপাসনা। অপরাহ্ণে ২টা হইতে ৫½টা পর্য্যন্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা, ৬টার সময় সংকীর্ত্তন, তৎপর উপাসনা।

দান প্রাপ্তি স্বীকার।

চেরাপুঞ্জী ব্রাহ্মসমাজ, স্কুলগৃহ, প্রচারাশ্রম ও ঔষধালয় নির্ম্মাণের সাহায্যার্থ অদ্যাবধি যে অর্থসাহায্য পাওয়া গিয়াছে, ধন্যবাদের সহিত তাহার দান প্রাপ্তি স্বীকার করা গেল: বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ১৲, গিরিশচন্দ্র কাঞ্জিলাল নীলকামারি ১৲, মিঞা জালাল উদ্দীন জলপাইগুড়ি ১৲, বাবু হরনাথ দাস রঙ্গপুর ১৲, বেণীমাধব মিত্র কাঁথি ১৲, জনৈক উকীল রাজসাহী ১৲, জগমোহন দাস গোহাটী ১৲, শ্রীমতী হরসুন্দরী দত্ত বৰ্দ্ধমান ১৲, বাবু দুর্গামোহন দাস কলিকাতা ৫০৲, কোয়েটা ব্রাহ্মসমাজ ৩৸৵০ বাবু রাজেন্দ্রনাথ গুহ চেরাপুঞ্জী ১৲, বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় শিলং ৫৲, শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গোলাঘাট ২৲, ব্রাহ্মসমাজ গোলাঘাট ৩৲, ব্রাহ্মসমাজ দিনাজপুর ২৷৵০ রাজচন্দ্র চৌধুরী শিলং ৫৲, বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত শিলং ১৲, প্রকাশচন্দ্র দেব শিলং ২০৲ মিঃ পি, এন, দত্ত বর্ম্মা ২৲, মিঃ পি, সি, রায় কলিকাতা ২৲, নবীনচন্দ্র দত্ত বোলপুর ১৲, শশীভূষণ বসু কলিকাতা ১৲, চাইবাসা ব্রাহ্মসমাজ ২৲, দক্ষিণ ভারতবর্ষ ব্রাহ্মসমাজ মান্দ্রাজ ৫৶০, বাবু হাজমকিশোর সিং জোরাই ৫৲, শ্রীরঙ্গবিহারী লাল কলিকাতা ২৲, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ঐ ১৲, কৈলাসচন্দ্র সেন ঐ ১৲, পরেশনাথ সেন ঐ ২৲, একজন বন্ধু ঐ ২০৲, গৌরলাল রায় কাকিনীয়া ২৲, অনাথবন্ধু রায় ঐ ১৲, যজ্ঞেশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সংগৃহীত কাকিনীয়া ২৲, জষ্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষ কলিকাতা ১০৲, বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস ঐ ৸০, ব্রাহ্মসমাজ মাণিকদহ ১০৲, ব্রাহ্মসমাজ কোন্নগর ১৲, বাবু রামলাল সাহা বগুড়া ৫৲, শিবনাথ দত্ত শিলং ১৲, মথুরানাথ নন্দী, ঐ ২৷০, হরকিশোর শর্ম্মা ঐ ২৲, চন্দ্রকান্ত সেন জয়ন্তীয়া পাহাড় ৫৲, বিমলচন্দ্র শ্যাম শিলং ১৲, বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন ঐ ১৲, একজন বন্ধু ঐ ১৲—ঐ ১৲, সৈদয়চরণ দাস ঐ ৫৲; রায় শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর শিলং ১০৲, বাবু রাধানাথ দে কলিকাতা ১৲, মিঃ আর, এন, রায় কলিকাতা ১০৲, ডাঃ পি, কে, রায় ঐ ৫৲,

বাবু রজনীনাথ নন্দী পূর্ণিয়া ২৲, গোপালচন্দ্র মল্লিক কলিকাতা ৪৲, শরৎচন্দ্র মজুমদার শ্রীহট্ট ২৲, মিঃ আর, এস, দাস শিলং ১৲, এক জন বন্ধু ঐ ২৲, মিঃ জি, সি, মুখোপাধ্যায় ঐ ১৲, বাবু রাধানাথ গুপ্ত ঐ ১৲, রামকানাই সেন ঐ ১৲, কে, সি, এণ্ড কোং ঐ ১৲, মিঃ এস, সি, দত্ত ঐ ২৲, শ্রীমতী যামিনী ঘোষাল ঐ ১৲, কুমারী কামিনী সেন কলিকাতা ৩৲, কুমারী কুমুদিনী খাস্তগীর ঐ ২৲, বাবু দুর্গানারায়ণ বসু মেদিনীপুর ১৲, ব্রাহ্মসমাজ ঐ ১৲, বাবু মধুসূদন রাও কটক ৩৷০, মিঃ জি, সি, বসু কলিকাতা ২৲, রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া ঐ ১০৲, বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ঐ ২৲, ত্রিপুরাচরণ রায় রাঁচী ২৲, গৌরীকান্ত রায় সিমলাপাহাড় ২৲, ভুবনমোহন সেন ফরিদপুর ৪৲, জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ১০৲, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান ৬৸৴০—মোট ২৯০/০।

নিবেদক
শ্রীনীলমণি চক্রবর্ত্তী।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আর্থিক অবস্থা বড় মন্দ। ইহার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়াছে। কি প্রকারে কিছু আয় বৃদ্ধি হয়, আমরা সে বিষয়ে চিন্তা করিতেছি। ইহার সভ্য মহোদয়গণ যদি কিছু কিছু চাঁদা বৃদ্ধি করিয়া দেন, তাহা হইলে যথেষ্ট উপকার করা হয়। কিন্তু সমাজের চাঁদা এবং তত্ত্বকৌমুদী, মেসেঞ্জার ও পুস্তক হিসাবে এত টাকা বাকি পড়িয়া রহিয়াছে যে, সেই সকল বাকি আদায় করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। অতএব আমাদিগের বিনীত নিবেদন এই যে, সভ্য ও গ্রাহক মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক যত শীঘ্র পারেন এই সমস্ত বাকি শোধ করিয়া এবং সমাজের আয় বৃদ্ধি সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিয়া বাধিত করিবেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ২৭শে মার্চ্চ, ১৮৯৩

শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়,
সহকারী সম্পাদক
সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

কলিকাতা অথবা মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্ম পরিবার ও ছাত্রাবাসে যে সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, তাহার অনেক সংবাদ তত্ত্বকৌমুদী বা মেসেঞ্জার পত্রিকায় যথা সময়ে এমন কি কোন কোন অনুষ্ঠান আদৌ, প্রকাশিত হয় না। এ নিমিত্ত আমাদিগের বিনীত নিবেদন এই যে, ব্রাহ্ম সমাজ স্তম্ভে প্রকাশযোগ্য প্রত্যেক অনুষ্ঠান অথবা অন্যান্য সংবাদাদি আমাদিগের প্রচারক, পরিচারক, ও সেবক মহোদয়গণ, এবং মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্ম বন্ধুগণ, যথাসময়ে অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ২৭শে মার্চ্চ, ১৮৯৩

শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়,
সহকারী সম্পাদক
সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

বিশেষ প্রয়োজন বোধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয় প্রভৃতি সম্পত্তির ট্রষ্টডিড্ আছে, তাঁহাদিগের নিকট হইতে সেই সমস্ত ট্রষ্টডিড্ অথবা তাহার নকল আনিয়া এক ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করা হয়; এবং এই মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় তাঁহাদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হয়।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এই নির্দ্ধারণানুসারে আমরা ব্রাহ্মসমাজ সমূহের সম্পাদক মহাশয়গণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া, তাঁহাদিগের সমাজের ট্রষ্টডিড্, এবং তাহা মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় স্বরূপ কি পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিবেন, এই সংবাদ, আগামী ১৫ই মে (১৮৯৩) তারিখের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১৮ই মার্চ্চ, ১৮৯৩

শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক
সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অনেক দিন হইল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা দরিদ্র ছাত্র, নিঃসম্বল পরিবার, ও অন্ধ আতুরদিগের সাহায্যার্থে একটী দাতব্য ফণ্ড স্থাপন করিয়াছেন। এই ফণ্ড হইতে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর অসহায় ব্যক্তিদিগের সাহায্য করা হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, এই ফণ্ডের আয় অতি অল্প। অর্থাভাবে অনেক প্রার্থীকে ফিরাইয়া দিতে হয়। এই ফণ্ডের কার্য্য ভালরূপ চলিলে ইহা দ্বারা সাধারণের সহিত একটী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতে পারে, এবং অনেক দুঃখী লোকের সাহায্য হইতে পারে। অতএব আমার বিনীত অনুরোধ যে, প্রত্যেক পারিবারিক (জাতকর্ম্ম, নামকরণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি) অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই ফণ্ডে কিছু কিছু দান করিয়া বাধিত করেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ২৮শে মার্চ্চ, ১৮৯৩

নিবেদক
শ্রীগুরুচরণ মহলানবিস
সম্পাদক,
সাঃ ব্রাঃ সমাজের দাতব্য বিভাগ।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৩১শে চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

২য় সংখ্যা।
১৬ ভাগ।

১৬ই বৈশাখ শুক্রবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

রাখগো আমারে।

ঝড় মাঝে নিপতিত তরীর মতন,
মোর এ হৃদয়-তরী—বিপদসঙ্কুল ;
চারি দিকে উঠিতেছে তরঙ্গ বিশাল,
ঝটিকার শান্তি নাই—ছুটে অবিরাম।
ডুবু ডুবু হইয়াছে তরণী আমার
ডুবিয়া যাবে কি প্রভু অতল সলিলে !
মূর্খ কর্ণধার আমি না জানি বাহিতে,
এ বিপদে কেবা আর রাখিবে আমারে ?
চারিদিকে জলরাশি নাচে অবিরত,
অশনি দিতেছে তাল সে ভীম নৃত্যের !
কম্পিত এ কলেবর অতি শ্রান্ত প্রাণ,
এ ঘোর বিপদ-মাঝে দয়াময় পিতা,
রাখগো চরণে তব কৃতঘ্ন সন্তানে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

আহ্বান—ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্র অতি সুবিস্তৃত, অভাব কেবল দাস দলের। তাই আমরা নব বর্ষের প্রারম্ভে ক্ষীণ কণ্ঠে বিনীতআহ্বান করিতেছি, ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ প্রভু পরমেশ্বরের কার্য্যে অগ্রসর হউন। আপনারা কি দেখিতেছেন না যে, ব্রাহ্মসমাজের সেবা যথোপযুক্ত রূপে হইতেছে না। যে সমাজের আশ্রয়ে আসিয়া আপনারা পরিত্রাণলাভ করিতেছেন, সেই সমাজের জন্ত কি আপনাদের কিছু করিবার নাই ? ব্রাহ্মসমাজ আপনাদিগেরই সমাজ। খাটিবার জন্তই ঈশ্বর আপনাদিকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন। যিনি নিশ্চেষ্ট থাকিবেন, তিনি ব্রহ্মের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইবেন। যিনি তাঁহার কার্য্যে জীবন দান করিবেন, তিনিই নব জীবন লাভ করিবেন।

ব্রাহ্মসমাজে সেবকের অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। নানা স্থানের ব্রাহ্মসমাজ হইতে বারংবার প্রচারক চাহিয়া পাঠাইতেছেন; আসাম ত্রিপুরার বন্ধুগণ স্থায়ী প্রচারক চাহিতেছেন। অনেক স্থলেই দুঃখ ও লজ্জার সহিত উত্তর দিতে হইতেছে যে, "আমাদের লোক নাই।" আপনারা কি এই অভাব অনুভব করিতেছেন না ? আমাদের কথায় নয়—ঈশ্বরের আহ্বান শুনিয়া আপনারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করুন।

ব্রাহ্ম যুবকগণ! কি ভাবিতেছ ? কলেই কি পৃথিবীর ধন মান উপার্জ্জন করিয়া জীবনলীলা শেষ করিবে ? কেহ কি ঈশ্বরের আহ্বান শুনিয়া তাঁহার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবে না ? তোমাদের বিদ্যা, তোমাদের উৎসাহ, তোমাদের বল, তোমাদের বুদ্ধি তাঁহার পবিত্র প্রচার কার্য্যে ব্যয়িত হউক, এই প্রার্থনা।

ধনী বন্ধুগণ কি পৃথিবীর সুখ-প্রিয় ধনীদিগের ন্যায় ঐশ্বর্য্যরাশি কেবল বিলাসেই ক্ষয় করিবেন ? আপনাদের ধন পরমেশ্বর তাঁহার কার্য্যে ব্যয় করিতে বলিতেছেন, একথা কি উপেক্ষা করিবেন ? হায়, আমাদের ডাক আমাদের অনুরোধ কে শুনিবে ? হে ব্রাহ্মসমাজের দেবতা ! তুমি একবার সুমধুর আহ্বানে তোমার ভক্তবৃন্দকে আহ্বান কর। তুমি না ডাকিলে, কেহ আসিবে না, আসিলেও স্থির থাকিতে পারিবে না।

সেবার্থীগণের প্রতি—ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহারা যেন তাঁহাদের মহৎব্রতের গুরুত্ববিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন। বিশ্বাস, বৈরাগ্য, সেবাই তাঁহাদের জীবনের সম্বল। এই সাধনে আত্মসংযম, নিষ্ঠা, নির্ভর ও ব্যাকুলতার আবশ্যক। এই সকলের অভাবে তাঁহাদের মহদুদ্দেশ্য বিফল হইবে। তাঁহাদের জীবনের প্রতি ব্রাহ্মসমাজ আশান্বিতঅন্তরে দৃষ্টিপাত করিতেছে, তাঁহাদের নিকট কত শোকার্ত্ত, তাপিত নরনারী আসিয়া প্রাণ জুড়াইবে আশা করিতেছে। সেবার্থী প্রত্যেক ব্রাহ্মব্রাহ্মিকা নিত্য সাধনে নিষ্ঠা রাখিবেন, জীবন্ত সাধনে রত থাকিবেন এবং আলস্যকে মহাপাপ মনে করিয়া নিয়ত পরিশ্রম করিবেন। নূতন সাধনার্থীগণ তাঁহাদের সংসর্গে আসিয়া যেন নবভাব প্রাপ্ত হন, শান্তিলাভ করিতে পারেন, এবং ঈশ্বরের সেবার জন্য উৎসাহিত হন। সংসারী সাধু গৃহস্থের ন্যায় কেবল সংসার ধর্ম্ম—গৃহধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে তাঁহাদের

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তাঁহাদের জীবনের বিশেষত্ব সর্ব্বদা রক্ষা করিতে হইবে। ব্রাহ্মবন্ধুগণ সাধনে ও সেবায় তাঁহাদের সহায় হইবেন। সর্ব্বদা তাঁহাদের সহিত সাধনে যোগদান করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করিবেন এবং নানাপ্রকার সৎপরামর্শ দ্বারা এবং অর্থ দ্বারা সহায়তা করিবেন।

প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞান ও আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম—উপনিষদের মধ্যে যে প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানের আভাস পাওয়া যায়, এবং বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপে যে ধর্ম্ম অভ্যুদিত হইয়াছে এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি? প্রভেদ এই, প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞান কেবল জ্ঞানীদিগের মধ্যে বদ্ধ ছিল। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ঋষিগণ গভীর আত্ম চিন্তার ফল স্বরূপ বিমল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া আত্ম-তৃপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কেবল জ্ঞানিদিগের নিকটেই এই আলোক প্রকাশ করিতেন; পরস্পরকে এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতেন। সাধারণ প্রজাপুঞ্জকে এ জ্ঞান দিবার বাসনা তাঁহাদের হৃদয়ে উদিত হয় নাই। সাধারণ জনগণের বিশ্বাস ও কার্য্য কলাপের প্রতি তাঁহারা হস্তার্পণ করিতেন না। কোন কোনও ঋষি কখন কখনও লৌকিক ক্রিয়া কলাপের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন; এবং সেই সকল হইতে মানব-চিত্তকে সেই অক্ষর অবিনাশী পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন বটে, কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহারা লৌকিক ক্রিয়া কলাপের প্রতি উদাসীন থাকিতেন। এইরূপে দেশ মধ্যে একই সময়ে দুই প্রকার চিন্তাস্রোত প্রবাহিত ছিল। একটী স্রোত কতিপয় জ্ঞানীর মধ্যে প্রবাহিত ছিল, অপরটী যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানরূপ স্রোত সাধারণ জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রবাহিত ছিল। ভারতবর্ষের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে চিরদিন এই প্রথা দেখা গিয়াছে যে, তাঁহারা যে কিছু সত্য প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বা যে কিছু বিচার উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে করিয়াছেন, এবং পণ্ডিতদিগের জন্যই করিয়াছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সর্ব্বাগ্রে এই চিরন্তন রীতি পরিবর্ত্তিত করিলেন। প্রতিভার চক্ষে তিনি দেখিয়াছিলেন যে, বিমল ব্রহ্মজ্ঞানকে সামাজিক ধর্ম্মরূপে ও সর্ব্বসাধারণের আচরণীয় ধর্ম্মরূপে পরিণত না করিতে পারিলে দেশের দুর্গতি দূর হইবে না। এই কারণে তিনি চিরন্তন বিচারপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার বিচার পুস্তক সকল প্রচলিত ভাষাতে রচনা ও প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহা করিতে যে তাঁহাকে কতদূর শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষাতে গদ্য লিখিবার নিয়ম ছিল না। লোকে গদ্য লিখিতে ও পড়িতে জানিত না। রামমোহনকে গদ্য পড়িবার রীতি শিক্ষা দিয়া তবে গদ্য লিখিতে হইয়াছে। লোকানুগ্রহের ভাব তাঁহার হৃদয়ে এত প্রবল ছিল যে, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানকে সাধারণ প্রজাপুঞ্জের গ্রহণোপযোগী করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিলেন। তদবধি ব্রাহ্মধর্ম্ম সামাজিক ধর্ম্ম হইয়া রহিয়াছে। ইহা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানবসমাজকে পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়। সুতরাং মানবসমাজের পাপ তাপের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য এবং এই ধর্ম্মকে সর্ব্বত্র প্রচার করিবার জন্য আমাদিগকে সর্ব্বদাই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। সে বিষয়ে শিথিলতা থাকিলে আমাদের লক্ষ্য কখনই সিদ্ধ হইবে না। 'কোনওরূপে টিম্ টিম্ করিয়া একটু প্রচার চলিতেছে; দুই চারিজন প্রচারক ছাড়িয়া দিয়া দেখিয়াছি, তাঁহারা একটু আধটু নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছেন; নিয়মতন্ত্র প্রণালী অনুসারে কাজটাও কোনওরূপে চলিতেছে; সভাও হইতেছে, বক্তৃতাও হইতেছে, আবার কি?' যদি এইরূপ ভাবিয়াই তৃপ্ত থাকিতে হয়, তবে ইহাকে সামাজিক ধর্ম্ম করিবার প্রয়াস পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ঋষিরা যেমন আত্ম তৃপ্ত হইয়া থাকিতেন, সেইরূপ নিজ নিজ চাড থাকিলেই ত হয়। দশজনে মিলিয়া একটা হৈ চৈ করিবার প্রয়োজন কি? আর যদি ইহাকে সামাজিক ধর্ম্ম করিবার অভিপ্রায় থাকে, তবে ইহার শক্তি কিসে জাগে সর্ব্বদা সেইদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিসে জগতের পাপ তাপের সহিত সংগ্রামে কৃতকার্য্য হওয়া যায়, কিসে মানবের হৃদয় পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া যায় সেই বিষয়ে মনোযোগী থাকিতে হইবে।

আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কাছে কি পাইয়াছি?—সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতা নগরীতে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়, তাহার নাম ছিল "কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।" যখন তাহা হইতে একদল লোক বাহির হইয়া "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপন করিলেন, তখন "কলিকাতা সমাজ" আদি সমাজ নাম গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে ভারতবর্ষীয় সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইল; তাহারই একদল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নাম গ্রহণ করিলেন। কোন্ সত্য প্রচার করিবার জন্য পরমেশ্বর এই নব সমাজ স্থাপন করিলেন? আমরা এই সমাজের নিকট বিশেষভাবে কি বস্তু পাইয়াছি এবং পাইতেছি, এ বিষয়টী আমাদের সকলেরই চিন্তা করা বাঞ্ছনীয়।

মানবের সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগ। এ যোগে কোনও ব্যবধান নাই, কোনও বাধা নাই, সকল নরনারীই ইহাতে অধিকারী। কিন্তু পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ই পরমেশ্বর হইতে মানবসন্তানকে কোন না কোনরূপে ব্যবধানে রাখিয়াছে। কেহ অভ্রান্ত ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যদিয়া, কেহবা মনুষ্যের ভিতর দিয়া যাইতেছেন। পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে জানা, দর্শন করা যেন মানবের ভাগ্যে অসম্ভব। সকলেই সমস্বরে এক উত্তর দিয়া থাকেন;—"পৃথিবীর রাজার নিকট যাইতে হইলে যেমন একবারে সাক্ষাৎ লাভ হয় না, প্রথম দ্বারবান, ক্রমে প্রধান কর্ম্মচারীর হাত হইয়া যাইতে হয়, তেমন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রাজাধিরাজের নিকট যাইতে হইলেও গ্রন্থ এবং মহাপুরুষদিগের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে যাওয়া যায় না।" অর্থাৎ তুমি ক্ষুদ্র মনুষ্য, তোমার একবারে সেই মহান্ বিশ্বাধিপতির দরবারে—অচ্যুতসদনে যাইবার কি অধিকার আছে? কাহারও মধ্যদিয়া সেখানে যাইতে হইবে। ভাষা ও ভাবের সুন্দর আবরণে আবৃত হইয়া এই কথাগুলিই ব্রাহ্মসমাজে নানা জনের কাছে, নানা মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে। কোথাওবা জাত্যভিমান কোথাওবা

ধর্ম্মাভিমানে ঈশ্বরকে মানবের সম্মুখ হইতে দূরে লইয়া যাই-তেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এই স্থলেই বিশেষত্ব দেখা যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম উদার ও সার্ব্বভৌমিক, এই সত্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যতঃ প্রচার করিতেছেন। এই উদার ভূমিতে মানবাত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে কোনও ব্যবধান রক্ষিত হইতে পারে না। "তুমি আর আমি, মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে" এ কথাটি ইহার মূল মন্ত্র। এই মহামন্ত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি। মুখে যিনি যাহাই বলুন, কার্য্যতঃ মহাপুরুষবাদ এবং অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ ও গুরুবাদ প্রভৃতির মূলোৎপাটন সাধারণ সমাজই করিতেছেন, এবং মহান্ পরমেশ্বর সকলেরই অধিগম্য এই মহাসত্য ঘোষণা করিতেছেন। প্রত্যেক ব্রাহ্ম যুবক ও প্রাচীন ব্রাহ্ম এবং ধর্ম্মপিপাসু নরনারী এজন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিকট চিরঋণী। চিন্তা বিহীন লোকে বলিতে পারেন, "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আর আমাদিগকে নূতন কি দিলেন? যাহা পূর্ব্বে ছিল তাহাই ত আছে।" কিন্তু যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী তাঁহারা দেখিতেছেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সৃষ্টি করিয়া পরমেশ্বর মহাসত্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। পৃথিবীর ধার্ম্মিক চিন্তাশীল লোকেরা এই জন্যই ইহার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। যাঁহারা এক সময়ে এ সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, তাঁহারাও এখন স্বীকার করিতেছেন যে, পৃথিবীতে সত্য প্রচারের জন্যই এ সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে।

জীব, ব্রহ্মে কিছুমাত্র ব্যবধান নাই, সাধন রাজ্যে সকলেরই সমান অধিকার, যাঁহারা এই আদর্শ অনুযায়ী সাধনা দ্বারা জীবন গঠিত করিতে চাহেন, তাঁহারা এখানেই তাহা পাইবেন। পরন্তু যাহারা এই সমাজরূপ কল্পতরু মূলে এই মহাধন পাইয়াছেন, তাঁহারাই শরীর, মন, ধন ঐশ্বর্য্য ইহার চরণে উৎসর্গীকৃত করিয়া চরিতার্থ হইবেন। এই নিগূঢ় তত্ত্ব না বুঝিলে এবং এই আদর্শ পথে গমন না করিলে কেহই এ সমাজের জন্য দেহ মন অর্পণ করিতে পারিবেন না। এমন কি এ সমাজের অঙ্গীভূত থাকাও তাঁহাদের পক্ষে সুদূর পরাহত।

নামমাহাত্ম্য প্রচার—ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন, শ্রবণ ও জপকে সাধকগণ একটী প্রকৃষ্ট সাধনোপায় বলিয়া সর্ব্বদাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের পবিত্র নাম জ্বলন্ত অনলরূপে প্রাণে প্রবিষ্ট হইয়া পাপাসক্তি ও সংসারাসক্তিকে আশ্চর্য্য-রূপে দগ্ধ করিতে থাকে। ইহার শক্তি অতি আশ্চর্য্য ও অমোঘ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু নামমাহাত্ম্য প্রচারের প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আমাদিগের মধ্যে আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। বৈষ্ণবগণ যেভাবে নাম-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন, ব্রাহ্মগণ যদি সর্ব্বাংশে সেইভাবেই নামের মহিমা প্রচারে প্রবৃত্ত হন, তাহাতে সর্ব্বথা কল্যাণ হইবে না। কারণ বৈষ্ণবগণ যেভাবে নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া থাকেন, অথবা গ্রন্থ বিশেষে যেভাবে নামের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যেন কয়েকটা বর্ণ মাত্র উচ্চারণ করিলেই মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে। অজামিলের বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির বিবরণ সকলেই জানেন,—তিনি আজীবন সাংসারিকতায় ও পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত থাকিয়াও মৃত্যুকালে একবার মাত্র আপন পুত্রকে "নারায়ণ" বলিয়া ডাকিয়াই মুক্তি-লাভ করিয়াছিলেন। একদা নারদ হরি-নামমাহাত্ম্য অবগত হইবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব এই তিন প্রধান দেবতার নিকট যাইয়াও বিশেষ কিছুই অবগত হইতে না পারিয়া অবশেষে বিষ্ণুর উপদেশে যমের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি নিজে কিছু না বলিয়া নারদকে সঙ্গে করিয়া যেখানে পাপীগণ অসহ্য নারকীয় যন্ত্রণাতে দগ্ধ হইতেছিল সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নারদ তাহাদের দুঃখ দেখিয়া যখন হরি হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন, অমনি সেই নরকস্থ পাপীগণ দিব্য-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া স্বর্গে গমন করিতে লাগিল। তখন নারদ বুঝিতে পারিলেন, হরিনামের মাহাত্ম্য কত! নামের মহিমা যতই হউক, তাহা যদি এইভাবে প্রচারিত হয়, তাহাতে কখনই সুফল ফলিবে না। বাস্তবিক নাম তখনই প্রাণের কল্যাণ সাধন করে, যখন তাহা শ্রদ্ধার সহিত, একান্ত ভক্তির সহিত উচ্চারিত হয়। অন্যথা হেলায় ও অন্যমনস্কভাবে ঈশ্বরের নাম লইলে পরিত্রাণ হইবে না। সেরূপে নাম উচ্চারণ করিলে কাহারও সংসারাসক্তি হ্রাস হইবে না। কোন এক সময়ে, ঈশ্বরের নাম, যে কোনভাবে শ্রবণ ও স্মরণ করিলেই প্রবলরূপে মানবের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিত, আর এখন করে না, এমন নহে। তবে যাহা সত্য নয় তাহা প্রচার করিয়া কি ফল? আরও একটা বিষয়ে আমাদিগের সাবধান হওয়া আবশ্যক। আমাদের সাধনের উপায়—পাপনাশের উপায় সকল যথাসম্ভব আধ্যাত্মিক হওয়া প্রার্থনীয়। শতযোজন দূর হইতে "গঙ্গা গঙ্গা" শব্দ উচ্চারণ করিলেই মুক্তি, তাহার দর্শন ও স্পর্শনে ত কথাই নাই একথা কল্পনাপ্রিয় কবিদিগের মুখে শোভা পায়। এরূপে নামের কয়েকটা অক্ষর মাত্র উচ্চারণ করিলেই পাপক্ষয় ও পুণ্য বৃদ্ধি হয়, এইরূপ সংস্কার জন্মিলে মানব কখনই পাপ হইতে বিরত হইবে না। কত লোক সারাদিনরাত্রি নানা প্রকারে পাপের অনুষ্ঠানে লিপ্ত থাকিয়া একবার গঙ্গাস্নান করিয়াই আপনাকে শুদ্ধ বলিয়া মনে করিতেছে। আবার পর দিন সেই পাপেই লিপ্ত হইতেছে। কত লোকে একদিকে নামের মালা জপ করিতেছে, অপর দিকে তৎসঙ্গে সঙ্গেই পাপ-চিন্তা পোষণ করিতেছে এবং নাম জপ শেষ করিয়াই পাপা-নুষ্ঠানে রত হইতেছে। বাহিরের উপায় (তীর্থ-দর্শন প্রভৃতি) এই নিমিত্তই লোকের পাপক্ষয় করিতে সমর্থ হয় না। উপযুক্ত চেষ্টা ও ভক্তির সহিত যে উপায় অনুষ্ঠিত হয় না, তাহা মানব মনকে কখনই পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, তাহা কখনই প্রকৃত কল্যাণকর হইতে পারে না। এজন্য সাধক সেই উপায়ই গ্রহণ করিবেন, যাহা অবলম্বন করিতে বাহিরের প্রক্রিয়া বিশেষের উপর নির্ভর করিতে হয় না, আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধাই যাহার ভিত্তি ভূমি এবং যাহাতে মনে প্রকৃত জ্ঞান ভক্তির উদ্রেক হয়। সেই উপায়ই যথার্থ মানবের কল্যাণকর, যাহাতে অন্তরের ব্যাধি বিনষ্ট হয়। অন্যথা

যেমুখে বলিতেছে "আমি খৃষ্টে বিশ্বাস করিয়াছি, আমি পরিত্রাণ পাইয়াছি," অথচ সেই সঙ্গে সঙ্গেই রাগদ্বেষের বশীভূত হইয়া অপরকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতেছে, যার পর নাই অভদ্র ব্যবহার করিতেছে, তাহার এইরূপ পরিত্রাণের মূল্য কি? ব্রাহ্ম এইরূপ পরিত্রাণ লাভের যেমন কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে করেন না, তেমনি যখন দেখা যায় নামের পর নাম উচ্চারণ করিয়াও প্রাণের কালি ঘুচিতেছে না, পাপাসক্তি কমিতেছে না,তখন সেই বাহিরের নাম গ্রহণেরও কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে করিবেন না। যথারীতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত নাম উচ্চারিত না হইলে সে নামের শক্তি কখনই প্রাণকে স্পর্শ করে না, তাহা কখনই প্রাণকে পরিবর্ত্তিত ও পাপ-পথ হইতে রক্ষা করিতে সাহায্য করে না। এজন্য ব্রাহ্মগণের উচিত, তাঁহারা যখন নামের মহিমা প্রচার করিবেন তখনই যেন ভক্তি ও নিষ্ঠা প্রভৃতির কথা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করেন। অন্যথা সত্যাসত্যবিচারবিমুখ হইয়া, প্রকাশিত নানা গ্রন্থের অনুসরণ করিয়া নামমাহাত্ম্য প্রচার করিলে লোকদিগকে অকারণ বৃথা আশাবাক্য শ্রবণ করান হয় এবং তাহা কখনই কার্য্যকর হয় না।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

সাধারণ লোকের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার।

ব্রাহ্মধর্ম্ম অদ্যাপি প্রধানতঃ শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ইহার প্রচারকগণ শিক্ষিত লোক; এবং তাঁহারা যখন প্রচারার্থ বহির্গত হন, তখন শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকটেই গমন করেন, এবং প্রধানতঃ তাঁহাদের নিকটেই প্রচার করেন। যদিও সময়ে সময়ে প্রকাশ্য রাজপথে বা বাজারে বক্তৃতাদি করা হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা অশিক্ষিতদিগের মধ্যে প্রচারের বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয় না। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এই ধর্ম্মকে প্রচার করিবার নিমিত্ত যত প্রকার উপায় ও ব্যবস্থা করা হইয়াছে, অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রচারার্থ তদনুরূপ কিছুই করা হয় নাই।

এই ধর্ম্মকে কেবল মাত্র শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আবদ্ধ রাখাতে দুই প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে। প্রথম, শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অন্তরে ধর্ম্মভাব গড়িয়া তোলা অতিশয় শ্রমসাধ্য ব্যাপার। ইংরাজী শিক্ষার গুণে প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির ধর্ম্মভাব প্রথমে ভগ্ন হইয়া যায়; ভগ্ন জিনিষকে পুনরায় গঠন করা সহজ নহে। এই জন্যই ৬৩ বৎসর পরে লোকসংখ্যার তালিকায় জানা গেল যে, সমগ্র ভারতবর্ষে ৩৫৫০ শতের অধিক ব্রাহ্ম নাই। এবং এই কারণে ব্রাহ্মধর্ম্মের শক্তি জাগিতেছে না। ইহা অতি দুর্ব্বলও ক্ষীণভাবে কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে পড়িয়া রহিয়াছে।

গয়া, কাশী, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে যখন মেলা হয় সে সময়ে যদি কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি সেই সকল স্থানে গমন করেন, তিনি দেখিতে পাইবেন, মৃত হিন্দু ধর্ম্মের এখনও শক্তি কত। সহস্র সহস্র নরনারী ধর্ম্মার্থে কত ক্লেশই বহন করিয়া থাকে। তাহারা সরল বিশ্বাসে এখনও প্রচলিত ধর্ম্মকে ধরিয়া রাখিয়াছে। ঐ সরল বিশ্বাস, ঐ নিষ্ঠা, ঐ চিত্তের একাগ্রতাকে ভগ্ন না করিয়া কি সত্যের দিকে হৃদয়কে সঞ্চালিত করা যায় না?

কেহ কেহ মনে করেন, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম অজ্ঞ ও অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের জন্য নহে। অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইহার উচ্চ সত্য সকল গ্রহণ করিতে পারিবে না; আর যদিও গ্রহণ করে, তাহার পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিবে না।

প্রথম কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে ত্রীশ্বরবাদের ন্যায় জটিল ধর্ম্মমত যদি অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রচার হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক ও মানবের প্রকৃতিনিহিত সত্যসকল কেন তাহারা গ্রহন করিতে পারিবে না? এ সকল সত্য ত তাহাদের হৃদয়ে নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, কেবল উদ্বোধ করিয়া দেওয়া মাত্র প্রয়োজন। একটু ভাল করিয়া তাহাদের হৃদয়দ্বারে উপস্থিত করিতে পারিলেই তাহারা গ্রহণ করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ এরূপই বা কেন মনে করা হয়, যে তাহাদিগকে ধর্ম্ম দেওয়া হইবে আর তৎসঙ্গে জ্ঞান দেওয়া হইবে না। ধর্ম্মের সত্য সকল হৃদয়ে ধারণ করিবার নিমিত্ত যে জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে। কেহ যেন মনে না করেন যে, কতকগুলি গ্রন্থ পাঠ না করিলে জ্ঞান লাভ হয় না। সাধুসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ, মৌখিক উপদেশে অনেক নিরক্ষর ব্যক্তি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে সে জ্ঞান দৃষ্ট হয় না। সুতরাং সাধারণ জনমণ্ডলীকে যখন ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া হইবে, তখন জ্ঞানোপদেশের ও ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে। তাহাতে কিছুমাত্র কঠিনতা দৃষ্ট হয় না।

ব্রাহ্মধর্ম্মকে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আবদ্ধ রাখার দ্বিতীয় অনিষ্ট ফল এই যে, সাধারণ জনমণ্ডলী ইহার প্রতি উদাসীন থাকিতেছে। তাহারা ভাবিতেছে ইহা শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অপরাপর কাণ্ডের ন্যায় একটা কাণ্ড, যাহার সহিত তাহাদের কোনও সম্পর্ক নাই।

ইহাকে তাহাদের হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য প্রচার প্রণালীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আবশ্যক। তাহাদের মধ্যে প্রচার করিবার সময়ে তিনটী বিষয় স্মরণ করিতে হইবে। প্রথম, চিত্তকে আকৃষ্ট ও চমৎকৃত করে, লোকের সামাজিকতা প্রবৃত্তি ও সৌন্দর্য্যবোধকে চরিতার্থ করিতে পারে, এমন সকল বিষয় তাহাতে থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, তাহাদিগকে অনেকটা গুরূপদেশের দ্বারা চালাইতে হইবে। যেমন খনির মধ্যে অল্প সংখ্যক লোকে খনন করিয়া ধাতুর উদ্ধার করে, সেই ধাতুই মুদ্রার আকারে মুদ্রিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারার্থ গৃহীত হয়, তেমনি ইহাদিগকেও অনেক পরিমাণে মুদ্রিত সত্য দিতে হইবে। উদ্ধারের শ্রমভার শিক্ষকদিগের উপরে রাখিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ ইহাদিগকে উপদেশ দিবার সময়ে যে সকল ঘটনা ও চিন্তা ইহাদের জীবনে প্রতিদিন ঘটিয়া থাকে, সেই সকল ঘটনা অবলম্বন করিয়া উপদেশ দিতে হইবে।

এই সকল প্রণালী চিন্তা করিলে আমাদের দেশের প্রাচীন-গাণ ও কথকতা প্রণালী ইহাদিগের বিশেষ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। আমরা আশা করি, এবিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের দৃষ্টি ত্বরায় আকৃষ্ট হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১ম ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

১৮৯৩।

বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারি বর্ত্তমান বৎসরের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠনের জন্য অধ্যক্ষ সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। তাহাতে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু নীলরতন সরকার, বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস, বাবু উমাপদ রায়, বাবু মধুসূদন সেন, বাবু কালীশঙ্কর সুকুল, বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও বাবু বঙ্কুবিহারী বসু বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন, এবং প্রচারক মহাশয়দিগের প্রতিনিধি স্বরূপ ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় একজন অতিরিক্ত সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন পাঁচজন কর্ম্মচারী সমেত মোট ১৮ জন সভ্য লইয়া এ বৎসরের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে।

নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত নিয়মানুসারে গত বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সভাই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এই সময় মধ্যে পূর্ব্বতন কমিটির ১টী সাধারণ, ১টী বিশেষ এবং নূতন কমিটির ৮টী সাধারণ অধিবেশন হইয়াছে।

বিগত ডিসেম্বর মাসে মাঘোৎসবকার্য্য সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত একটি সবকমিটি গঠিত হইয়াছিল। ঐ কমিটি অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সহিত পরামর্শ করিয়া উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ভগবান্ এবার মাঘোৎসবে আশাতিরিক্ত ভাবে কৃপা বিতরণ করিয়াছেন। ১লা মাঘ (১৩ই জানুয়ারি) হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারি) পর্য্যন্ত উৎসব হইয়াছিল। উৎসবের বিশেষ বিবরণ "তত্ত্বকৌমুদী" ও "ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারে" প্রকাশিত হইয়াছে, এজন্য তাহার বিশেষ বিবরণ এখানে দেওয়া হইল না। এবার উৎসব উপলক্ষে একটী বিশেষ কার্য্যের সূত্রপাত হইয়া গিয়াছে। ১২ই মাঘ প্রাতঃকালে সাধনমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মন্দিরে আসিয়া সাধকমণ্ডলীর প্রত্যেক সভ্যকে বিশেষভাবে আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। তাঁহার গমনের পর মন্দিরে বেলা ১টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন, প্রার্থনাদি হয়। এই সময় অনেকে স্বীয় স্বীয় অলঙ্কার, বস্ত্রাদি দান করেন এবং কয়েকটী বন্ধু ব্রাহ্মসমাজের কাজে জীবন উৎসর্গ করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতদ্ভিন্ন ৭ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারি) তারিখে বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের সভ্য মিঃ জি, এ, মোদক মহাশয় সিটী কলেজ গৃহে "Hindrances to the Progress of Brahmoism" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। ১৬ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারি) সমাজ মন্দিরে বোম্বাই ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মিঃ বি, বি, নগরকার মহাশয় "The Formation of National Character." বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন।

১১ই মাঘ রাত্রিকালীন উপাসনার সময় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন—বাবু সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, হেমচন্দ্র গুহ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ এবং বিহারীলাল বসু। পরে বাবু রামচন্দ্র চৌধুরী ও বাবু উপেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দীক্ষিত হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত স্থান হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ উৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন;—

লাহোর, লক্ষ্ণৌ, গয়া, সেওয়ান, (ছাপরা) হাজারিবাগ, রামপুর হাট, মুর্সিদাবাদ, বোলপুর, নলহাটী, ধূলিয়ান, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, কাঁথি, চট্টগ্রাম, শিলং, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, রাজসাহী, রংপুর, নেলফামারী, জলপাইগুড়ী, পাবনা, নওগাঁ (রাজসাহী) রসপুর, কাঙ্কাড়, বানিবন, জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগর, মজিলপুর, হরিনাভি, শ্রীরামপুর, সাতক্ষীরা, কোন্নগর, হুগলি, বরাহনগর, নলধা, বাগআঁচড়া, চাসুড়িয়া, জালালপুর, নারায়ণগঞ্জ, বজ্রযোগিনী, ভরাকর, মাণিকদহ, মাণিকগঞ্জ, কুমারখালি, খলিলপুর, জগন্নাথপুর, কুষ্টিয়া, ফুলবেড়িয়া, সঙ্করপুর, বাগুড়ী প্রভৃতি।

৮ই ফেব্রুয়ারি নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বিশেষ উপাসনান্তে এই বৎসরের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও সমাজের প্রধান প্রধান বিভাগের কার্য্য সম্পাদন জন্য নিম্নলিখিত সব-কমিটীগুলি গঠিত হইয়াছে। যথা, Business, পুস্তক প্রচার, লাইব্রেরী, দাতব্য, ব্রহ্মবিদ্যালয় ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়, ব্রাহ্মবালিকা বোর্ডিং। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আরও কয়েকটী বিশেষ কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। যথা খাসিয়া পাহাড়ে ধর্ম্মপ্রচার সাহায্যার্থ কমিটি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রচার কমিটী, ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যগুলি ইংরাজী ভাষায় বিবৃত করিয়া পুস্তক লিখিবার জন্য কমিটি, পারিবারিক প্রার্থনামালা সংগ্রহ করিবার জন্য কমিটী, গৃহ তাড়িত ব্রাহ্মযুবকদিগের সাহায্য করিবার জন্য কমিটী, এবং ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের উন্নতির জন্য বিশেষ কমিটী।

মফঃস্বলের অনেক স্থানে ব্রহ্মমন্দির হইয়াছে এবং সেই সকল মন্দিরের অনেক গুলিতেই Trust deed প্রস্তুত হইয়াছে। এই সকল Trust deed একত্র করিয়া মুদ্রিত করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা চেষ্টা করিতেছেন।

প্রচার—প্রচারক মহাশয়েরা নিজে নিজে কি প্রকারে কার্য্য করিবেন, তাহা কার্য্য নির্ব্বাহক সভাতে জ্ঞাপন করিয়াছেন। ডিব্রুগড় ও কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়গণ উক্ত স্থানদ্বয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে স্থায়ী প্রচারক পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, এবং যাঁহারা গমন করিবেন তাঁহাদের যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিতে চাহিয়া ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের প্রচারক সংখ্যা নিতান্ত অল্প থাকাতে ও অন্যান্য কারণে, অত্যন্ত দুঃখের সহিত আপাততঃ তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারা যায় নাই।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—গত তিন মাসে কলিকাতা থাকিয়া মন্দিরে ও সাধনাশ্রমে নিয়মিতরূপে আচার্য্যের কার্য্য এবং ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও ব্যাখ্যাদি করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তত্ত্ব-কৌমুদীর সম্পাদকতা ও মেসেঞ্জার পত্রিকা পরিচালনের সহায়তা করিয়াছেন; এবং ছাত্রসমাজে মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা করিয়াছেন। উৎসবের সময় উপাসনা ও বক্তৃতাদি করিয়াছেন ও মধ্যে মধ্যে মন্দিরে আচার্য্যের কাজ করিয়াছেন। তিনি মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে প্রচারার্থে পঞ্জাব গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস,—জানুয়ারী মাসে কুচ-বিহার ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে তথায় গমন করেন। সেখানে উপাসনা, পাঠ ও আলোচনা হয়; একদিন "ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" বিষয়ে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। তথা হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমন কালে পথে অসুস্থ হইয়া কিছুদিন রংপুরে অবস্থিত করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া পৌছেন। ১৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিয়া এখন পুনরায় কলিকাতায় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

বাবু শশিভূষণ বসু—কলিকাতা—মাঘোৎসব উপলক্ষে মন্দিরে কয়েক দিন আচার্য্যের কার্য্য করেন। বিডন স্কোয়ারে একটি প্রকাশ্য বক্তৃতা এবং "এখন কি চাই" সম্বন্ধে মন্দিরে ও ছাত্রসমাজে "বীরত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

নিমতা উৎসবে আচার্য্যের কার্য্য করেন। এবং "ব্রাহ্মধর্ম্ম কি" সম্বন্ধে স্থানীয় সমাজ গৃহে একটি বক্তৃতা করেন।

মেদিনীপুর উৎসবে গমন করেন। তথায় এক সপ্তাহের অধিককাল থাকিয়া উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন করেন। এতদুপলক্ষে উপাসনা ও উপদেশ ব্যতীত বেলীহলে "মানব জীবনের উন্নতি" "আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা" এবং সমাজ গৃহে "ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, এবং নগর সংকীর্ত্তনের দিন সাধারণের জন্য একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। ইহা ব্যতীত কোন কোন পারিবারিক অনুষ্ঠানে উপাসনা করেন।

টাঙ্গাইল উৎসবে গমন করেন। সমাজ গৃহে আচার্য্যের কার্য্য করেন, এবং টাউনহলে "ধর্ম্মের লক্ষণ" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। স্থানীয় স্কুলগৃহে ছাত্রদিগকে জন্য নীতি সম্বন্ধে উপদেশ দেন এবং নগরসংকীর্ত্তনের দিন প্রকাশ্য স্থানে একটী বক্তৃতা করেন, কোন কোন পরিবারে উপাসনা ও মহিলাদিগের জন্য উপদেশ দান করেন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—বর্দ্ধমান উৎসব উপলক্ষে সম্পাদকের ভবনে উপাসনা ও উপদেশ দেন, উৎসব দিবসে সমাজ ভবনে প্রাতে বেদীর কার্য্য করেন।

বংশবাটী।—ছাত্র সভার উৎসব উপলক্ষে "নীতিশিক্ষা ও চরিত্রসংগঠন" বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন।

রামপুর হাট।—উৎসবের উদ্বোধন ও উৎসব দিবসে সন্ধ্যা-কালে বেদীর কার্য্য করেন। নগরকীর্ত্তন বাহির হইবার পূর্ব্বে, সম্পাদকের ভবনে "নাম মাহাত্ম্য" ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

কলিকাতা সাধনাশ্রমে কয়েক দিবস আলোচনা এবং "ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্ব" বিষয়ে চারি দিবস বক্তৃতা করেন। কোন ব্রাহ্ম পরিবারে উপাসনা করেন। মাঘোৎসব উপলক্ষে ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক উৎসবে, "জড়বাদ খণ্ডন" বিষয়ে বক্তৃতা, এবং দুই দিবস অপরাহ্নে বেদীর কার্য্য করেন। সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, "কোন্ শক্তি জগৎকে পরিচালিত করিতেছে?" এই বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এক দিন অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনা করেন। দাসাশ্রমের সাম্বৎসরিক সভায় "সেবাধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

ইহা ভিন্ন কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে ব্রাহ্ম ও অন্যান্য লোকের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে কথোপকথন ও আলোচনা করেন এবং ধর্ম্ম বিষয়ে পুস্তক রচনা করেন।

এতদ্ভিন্ন বাবু কালী প্রসন্ন বসু, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মন প্রসাদ, বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী, প্রভৃতি মহাশয়েরা নানা প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন।

এই কয়েক মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতে প্রচারক পাঠাইবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিয়াছে:—মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, রামপুরহাট, বরাহনগর, কোন্নগর, হরিনাভি, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, সৈদপুর, ডিব্রুগড়, লাহোর ও কুমিল্লা।

উপাসকমণ্ডলী—এই তিন মাসে নিয়মিতরূপে প্রত্যেক রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সায়ংকালে ও প্রত্যেক মাসের অন্তে উপাসনার কার্য্য হইয়াছে। আচার্য্যগণ ও সহকারী আচার্য্যগণ এবং তদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদ উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। নিম্নে আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব দেওয়া গেল। হিসাবে ১০০॥/০ এক শত টাকা নয় আনা হস্তে স্থিত লেখা হইল বটে, কিন্তু উক্ত টাকা মন্দির সংস্কার কার্য্যে ব্যয় হইয়া গিয়াছে। মন্দির সংস্কারের জন্য অনেক দেনাও রহিয়াছে।

উপাসক মণ্ডলীর সংক্ষিপ্ত আয় ব্যয়ের বিবরণ।

জমা		খরচ	
চাঁদা আদায়	৭৮।০	গ্যাসের আলোর ব্যয়	১৮৲
দান সংগ্রহ ও দানাধারে		বেতন হিঃ	৫২॥০
প্রাপ্ত	৬৲১২॥	মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগের	
এককালীন দান প্রাপ্তি	৫৲	বেড়া মেরামতের ব্যয়	৪৸৵৫
গ্যাস হিঃ ছাত্র সমাজ		ক্ষুদ্র ব্যয়	৫৶১০
হইতে প্রাপ্ত	৮৲		
বিবিধ হিঃ	।০		৮০।/১৫
		হস্তেস্থিত	১০০॥/০
	৯৭॥১২॥		
পূর্ব্ব স্থিত	৮৩।৵২॥		১৮০৸৵১৫
	১৮০৸৵১৫		

সঙ্গতসভা—গত জানুয়ারি হইতে ২১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই তিন মাসে সঙ্গতসভায় ১০টী অধিবেশন হয়। তাহাতে নিম্নলিখিত ৩টী বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল (১) উপাসক-মণ্ডলীর সুব্যবস্থা করিবার উপায় কি? (২) অভিমান (৩) সংসার। পরে গত ৭ই, ১৪ই ও ২১এ মার্চ্চ এই তিন দিন কঠোপনিষৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে।

গত ১১ই জানুয়ারী মঙ্গলবার সঙ্গতসভায় বিশেষ উৎসব হয়। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ইহাতে গত বৎসরের সঙ্গতসভার রিপোর্ট পঠিত হয় ও তৎপরে কয়েকটী বন্ধু ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করেন।

দাতব্য বিভাগ—দাতব্য বিভাগের গত তিন মাসের কার্য্য প্রায় পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিয়াছে। এই তিন মাস মধ্যে একটী অন্ধ, একটী কুষ্ঠরোগী, একটী পীড়িত, ৪টী পরিবার এবং ১২টী ছাত্র ও দুইটী ছাত্রীর সাহায্য করা হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ যদি নিজ নিজ পারিবারিক অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে এই দাতব্য বিভাগে কিছু কিছু অর্থ দান করেন, তাহা হইলে ইহার দ্বারায় অনেক দুঃখীর দুঃখ মোচন হইতে পারে। সম্প্রতি মহিশুরের মহারাজা এই দাতব্য বিভাগে ১০০৲ শত টাকা দান করিয়াছেন তজ্জন্ত আমরা মহারাজকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। এই সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদত্ত হইল;—

জমা		খরচ	
এককালীন দান	১৩৫॥০	মাসিক চাঁদা দান	৫১৲
অনুষ্ঠান উপলক্ষে	৭৲	এককালীন দান	১০॥০
বার্ষিক দান	১২॥০	বিবিধ ব্যয়	৶০
মাসিক দান	৩৲		
			৬১॥৶০
	১৫৮৲	হস্তে স্থিত	২৪৩৲
পূর্ব্ব স্থিত	১৪৬॥৶০		
			৩০৪॥৶০
	৩০৪॥৶০		

ব্রাহ্মছাত্রী নিবাস—ব্রাহ্মছাত্রীনিবাসের কার্য্য এই তিন মাসকাল পূর্ব্ববৎ চলিয়াছে। ছাত্রী সংখ্যা ৩৯ হইয়াছিল, এইক্ষণে ৩৪টী আছে। তত্ত্বাবধারিকাগণ পূর্ব্বের ন্যায় যত্নের সহিত কার্য্য করিতেছেন। এই সঙ্গে গত ৩ মাসের আয় ব্যয়ের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

জমা		খরচ	
চাঁদা আদায়	২০॥০	খোরাকী, জলখাবার ও	
ছাত্রীদিগের বেতন	১০১১।০	আলোর ব্যয়	৪৯৪।৶১০
এককালীন দান	২০৲	বাটী ভাড়া	২০৭৲
এড্‌মিশন ফী:	১০৲	বৃত্তি হিঃ	১০০৲
সৌদামিনী বৃত্তি	২০৲	বিবিধ ব্যয়	৮॥০
এককালীন দানপ্রাপ্ত	৩৲	ছাত্রীদিগের স্কুলের বেতন	৫৮৲
		কর্ম্মচারীর বেতন	২৭৬॥৵৫
	১০৮৪৸০	জিনিস খরিদ	৫৶০
পূর্ব্ব স্থিত	১২৭৸৶১০		
			১১৪৯৸/৫
	১২১২॥৶১০	হস্তে স্থিত	৬২৸৵৫
			১২১২॥৶১০

পুস্তক প্রচার—"ব্রহ্মসঙ্গীত, ৬ষ্ঠ সংস্করণ" ও "কবির ও তাঁহার উপদেশ" প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়।

আয়		ব্যয়	
বেতন আদায়	৪৫০৸৶০	বেতন বাবত	৫১২॥০
স্কলারসিপ আদায়	৩৯॥০	গাড়ি বাবতে	১৯৭৸৶১০
চাঁদা ও দান	৩০২৸০	বিবিধ	৯৶৫
বিবিধ আদায়	২৪।/১০	ঋণ শোধ	৩৪॥০
		স্কুল বাটীভাড়া	৮৭৲
	৮১৭॥১০	স্কলারসিপ	১৮৲
পূর্ব্ব স্থিত	৯২॥৫	স্কুল কমিটির নির্দ্ধারণ অনুসারে খরচ লেখা হয়	১০৲
			৮৬৯৵১৫
		স্থিত	৪০৸৵০
মোট আয়	৯১০৲১৫	মোট	৯১০৲১৫

একজন শিক্ষক ও একজন শিক্ষয়িত্রী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীমতী অবলা বসু অনুগ্রহ পূর্ব্বক দুই ঘণ্টা করিয়া নিয়মিতরূপ শিক্ষা দিতেছেন, এজন্য তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

বর্ত্তমান ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা ৮৯।

ছাত্র সমাজ—এই তিন মাসে ছাত্র সমাজে নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছে।

(১) বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র। "অমঙ্গল ও তাহার প্রয়োজনীয়তা" ৭ই জানুয়ারী। (২) "চৈতন্তের ধর্ম্ম প্রচার" ১১ই ফেব্রুয়ারী। (৩) "ভারতে ধর্ম্ম সমস্যা" ২৫শে ফেব্রুয়ারী।

(৪) বাবু মনোরঞ্জন গুহ। "কর্ম্মযোগের মূল কি?" ১৮ই ফেব্রুয়ারী।

(৫) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। "বঙ্গীয় ছাত্রগণের বর্ত্তমান অবস্থা" ১১ই মার্চ্চ।

(৬) বাবু শশিভূষণ বসু। "বীরত্ব" ১৮ই মার্চ্চ।

মাঘোৎসব উপলক্ষে ২৫শে জানুয়ারী ছাত্র সমাজের বিশেষ উৎসব হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ইংরাজীতে উপাসনা করেন ও বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ইংরাজীতে "জীবনের মহত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

এতদ্ব্যতীত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ও ৪ঠা মার্চ্চ ছাত্র সমাজের আলোচনা সভা হয়। প্রথম সভায় বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিতীয় সভায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

খাসিয়া মিশন—বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতায় রহিয়াছেন। কলিকাতায় থাকিয়া তিনি খাসিয়া ভাষায় একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং তথাকার মন্দির নির্ম্মাণার্থ অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। তিনি বাঙ্গালাতে একখানি রিপোর্ট প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। চেরাপুঞ্জির প্রচার নিবাসে একটী নূতন ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মিত

হইয়াছে। আমাদের ক্ষুদ্র বিদ্যালয় তাহাতেই স্থানান্তরিত হইয়াছে। বাবু কামিনীকুমার ঘোষ সেই বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা শিক্ষা দিতেছেন। পরমেশ্বরের কৃপায় দুইজন খাসিয়া বন্ধু খাসিয়া মিশনের প্রচার কার্য্যে যোগ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

সিটিকলেজ—সিটি কলেজ হইতে ১০টী দরিদ্র ব্রাহ্ম-যুবকের বেতন আমরা যথানিয়মে পাইতেছি, এজন্য কর্ত্তৃপক্ষ-দিগকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। সিটি কলেজের নিয়মানুসারে উক্ত কলেজের কৌন্সিলে আগামী তিন বৎসরের জন্য বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ডাঃ জে, এন, মিত্র ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

সামাজিক কমিটি—আগামী তিন বৎসরের জন্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু আনন্দমোহন বসু, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস ও বাবু মধুসূদন সেন মহাশয় সামাজিক কমিটির সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

মিশন কমিটি—প্রচারক নিয়োগ, শিক্ষা প্রভৃতি বন্দোবস্তের জন্য বাবু আনন্দমোহন বসু, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু মধুসূদন সেন, বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস, বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়গণ মিশন কমিটির সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। চারি বৎসর পর্য্যন্ত ইঁহারা কার্য্য করিবেন।

ব্রাহ্ম সম্মিলনী—বিগত মাসে বরাহনগরে বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে ইহার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

তত্ত্ব-কৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার—এই দুই পত্রিকা পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিতেছে। বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। কার্য্য বিশেষে নিযুক্ত থাকাতে বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয় এই তিন মাসের মধ্যে অধিকাংশ সময় ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সাধনমণ্ডলী—সাধনমণ্ডলী এখন প্রচার নিবাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব ও শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, এই সাতজন এই মণ্ডলীর প্রথম সভ্যরূপে প্রবেশ করিয়াছেন। ইঁহারা সমুদয় সময় ও শক্তি নিয়োগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের পরিচর্য্যা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

১২ই মাঘ পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে আগমন করিয়া এই মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উপাসনার পর আচার্য্য এই কার্য্যের সহায়তার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তৎপরে উক্ত কার্যের সাহায্য স্বরূপ প্রায় ৬০০ ছয় শত টাকা মূল্যের অলঙ্কার বস্ত্রাদি ও নগদ টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এই মণ্ডলী পরিচালনের জন্য যে সকল নিয়ম প্রস্তুত করিয়াছেন সেই নিয়মের ৩য় ধারা অনুসারে দুই বৎসরের জন্য সেবাকমিটিতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব, শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস, ও শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, মণ্ডলীর প্রতিনিধিরূপে মনোনীত হইয়াছেন। এবং শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, ও শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, উক্ত কমিটিতে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রতিনিধিরূপে মনোনীত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক ও সেবাকমিটির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী সেবাকমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

সাধনাশ্রমে প্রতিদিন প্রাতে ধর্ম্মব্যাখ্যান উপাসনা, প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদি এবং সায়ংকালে সঙ্গীত ও প্রার্থনা হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সাধনার্থীদিগের জন্য ভগবদ্গীতা ও দায়ুদের গীত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ব্রাহ্মিকাদিগের শিক্ষার জন্য ও বিশেষ বিশেষ পুস্তক পাঠ হইয়া থাকে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও নবদ্বীপচন্দ্র দাসের কার্য্যবিবরণ প্রচারক মহাশয়দিগের কার্য্যবিবরণের সহিত পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—প্রতি সপ্তাহে পাঁচ দিন সন্ধ্যাকালে মন্দিরে উপাসনা করিয়াছেন; কয়েকটী ব্রাহ্মপরিবার পরিদর্শন করিয়াছেন ও তিনটী ব্রাহ্মপরিবারে উপাসনা করিয়াছেন। প্রতি শনিবার নিমতা ব্রাহ্মসমাজে গমন করিয়া তথাকার উপাসনা সম্পন্ন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের সহিত সহানুভূতি আছে, এরূপ কয়েকটী পরিবার পরিদর্শন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়—তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদনের সহায়তা করিয়াছেন, এবং সময় সময় ব্রাহ্মপরিবারে উপাসনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী—ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন সহায়সমিতি এবং সময় সময় তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদনে সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল—তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদনের সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব—প্রচারার্থীদিগকে হিন্দী শিক্ষা দিয়াছেন। নিয়মিতরূপে ওয়েলিংটন ও বীডন উদ্যানে প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছেন। কোন কোন ব্রাহ্ম পরিবারে উপাসনা করিয়াছেন। গত মার্চ্চ মাসের তিনি শেষ ভাগে শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত প্রচারার্থ পঞ্জাব গমন করিয়াছেন।

সহায়—যাঁহারা অন্য কাজে নিযুক্ত আছেন, এরূপ ৫৪ জন ব্রাহ্মকে সেবা কমিটী সহায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত এই সহায় দলের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। সহায়গণ নিম্নলিখিত কয়েকটী কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন:—সঙ্গীত শিক্ষা, স্বরলিপি শিক্ষা, ব্রাহ্ম পরিবার পরিদর্শন, কলিকাতার ছাত্রদের মধ্যে কার্য্য, ব্রাহ্মসমাজের সহিত সহানুভূতি আছে এরূপ পরিবার সকল পরিদর্শন, বাহিরে প্রচার ও কলিকাতার সমীপবর্ত্তী সমাজ সকল পরিদর্শন।

সাধনাশ্রমের আয় ব্যয়।

আয়		ব্যয়	
বাড়ী ভাড়া বাবদ আদায়	৪৫॥০	১০।৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বাড়ী ভাড়া ও সরঞ্জাম খরচ	১৫৯॥৶৫
দান প্রাপ্ত	৭১৫।৵১৫		
ওয়ার্কারদিগের আয়	৩৪৲	মিশন হাউসের ভাড়া (১৮৯৩ সালের অগ্রিম)	৪০০৲
প্রাপ্য আদায়	১॥৶০		
	৭৯৬॥/১৫		
পূর্ব্ব স্থিত	৯৫/০	ওয়ার্কারদিগের ব্যয়	৩২৯৸৶৫
			৮৮৯॥/১০
		হস্তে স্থিত	২/৫
মোট	৮৯১॥৵১৫	মোট	৮৯১॥৵১৫

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস, লাইব্রেরি, ব্রহ্মবিদ্যালয়, রবিবাসরিক বিদ্যালয় প্রভৃতির কার্য্যের বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

অনুষ্ঠান—আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে অবগত হইয়াছি যে, এই কয়েক মাসের মধ্যে ৬টী জাতকর্ম্ম ও নামকরণ, ৩টী শ্রাদ্ধ ও ৪টী বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

মৃত্যু—আমাদের সিমলাস্থ বন্ধু বাবু কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর সিমলা ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ অধ্যক্ষ সভার সভ্য ছিলেন।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

আয়		ব্যয়	
জেনরেল ফণ্ড	৩৬৬৸০	প্রচার ব্যয়	৬৯৸৵১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের		কর্ম্মচারীর বেতন	৯৩৷৷০
চাঁদা বার্ষিক ২৭৯৷০		ডাকমাশুল	৮৷১০
মাসিক ৬৯৷৷০		পাথেয়	৩৫৲
এককালীন ১৮৲		সিটী কলেজের দান হইতে কয়েকটী গরিব ব্রাহ্ম ছাত্রের স্কুলের বেতন	৮৫৷৷/০
	৩৬৬৸০		
প্রচার ফণ্ড	৩২৯৵০	সৌদামিনী বৃত্তি	৩০৲
বার্ষিক ১২৩৷৷৵০		বিবিধ	২৪৵০
মাসিক ১৩২৷৷০		গচ্ছিত শোধ	৭১৸০
এককালীন ৭৩৲		হাওলাত শোধ	৪৩০৲
	৩২৯৵০	কমিশন হিসাবে	১৭৷০
		মুদ্রাঙ্কণ	৪৲
সিটী কলেজের দান অর্থাৎ কয়েকটী ব্রাহ্ম ছাত্রের স্কুলের বেতন বাবত উক্ত কলেজ হইতে সাহায্য প্রাপ্ত	৮৭৲	প্রচারকগৃহ (বাড়ী-সংস্কার)	১৪৸৶০
		সুশীলাবালা ও চারুবালা বৃত্তি	২১৲
প্রচারকগৃহ হিসাবে (বাড়ীভাড়া)	৪৭১৷৷৵১৫	সাধন কুটীর নির্ম্মাণের সম্পাদক	১০০৲
দুর্গামরী ফণ্ড	৪৫৲	ঋণ দান	৭৫৲
পাথেয়	১৫৲		২৩০৬৷০
বিবিধ	৭৷৶০		
ডাকমাশুল	১৲		
হাওলাত	৮০৬৲		
শুভ কর্ম্মের দান	৫৫৲		
সুশীলা বালা ও চারুবালা বৃত্তি	৪২৲		
গচ্ছিত	৬২৷০		
পার্শেণ্টেজ	১১৸/০		
প্রচার ফণ্ড	৷৷০		
	২৩০০৷৷১৫		
পূর্ব্ব স্থিত	১১৮৩৷৷১০	স্থিত	১১৭৭৸/৫
মোট	৩৪৮৪/৫	মোট	৩৪৮৪/৫

পুস্তক বিক্রয়ের হিসাব।

জমা		খরচ	
বাকী মূল্য আদায়	২৫৶০	মুদ্রাঙ্কণ	৩৫৯৲
নগদ বিক্রয়	৬৬৮/১৫	অপরের পুস্তক বিক্রয়ের মূল্য শোধ	৯৩৷৷৶১০০
সমাজের ৪৫৯৸১০		কমিশন	৫৷৷/০
অপরের ২০৮৷/৫		বিবিধ	২৪৸/১০
	৬৬৮৷/১৫	পুস্তক খরিদ	৩৸০
		পুস্তকের ডাকমাশুল	১৪৸৶০
কমিশন	১৪৸৶৫	কাগজ	৪০১৸৶১৫
পুস্তকের ডাকমাশুল	১০/১০	কর্ম্মচারীর বেতন	৬৯৸০
গচ্ছিত	৩০৷/১০	পুস্তক বাঁধাই	২০৲
		ডাকমাশুল	/১০
	৭৪৮৷৷৶০		
			৯৬৩৷৷৵৫
পূর্ব্বের স্থিত	৩৭৪৬৷৷৵০	স্থিত	৩৫৩১৷৷৵১৫
মোট	৪৪৯৫৷/০	মোট	৪৪৯৫৷/০

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

আয়		ব্যয়	
মূল্যপ্রাপ্তি	৪১৪৲৫	ডাকমাশুল	৯৪৷৷৶১০
বিজ্ঞাপন	১১৲	বিবিধ	১৫৸০
এককালীন দান	১০৲	কর্ম্মচারীর বেতন	৭৭৸৶১৫
বিবিধ	১৲	কমিসন	৭৷০
		কাগজ	৫৪৶০
		প্রিণ্টিং	১৪০৲
পূর্ব্ব স্থিত	২৭৩৷৷৵৫		৩৮৯৸৵৫
		স্থিত	৩১৯৸৫
মোট	৭০৯৷৷৵১০	মোট	৭০৯৷৷৵১০

তত্ত্বকৌমুদী।

আয়		ব্যয়	
মূল্যপ্রাপ্তি	৩২৬৸৶৫	বিবিধ	৪৸৶০
নগদ বিক্রয়	৷০	ডাকমাশুল	৩৭৷৷৶০
		কাগজ	৩৬৵০
	৩২৭৶৫	কমিশন	১৪/১০
		কর্ম্মচারীর বেতন	৬৯৸০
পূর্ব্ব স্থিত	১৫৫৮৷৷৶৫	মুদ্রাঙ্কণ	১০৮৲
			২৭০৷৷/১০
		স্থিত	১৬১৫৷/০
মোট	১৮৮৫৸৵১০	মোট	১৮৮৫৸৵১০

পঞ্জাব প্রচারযাত্রীদিগের পত্র।

আমরা ২৯শে মার্চ্চ বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যার অন্তর্গত ফয়জাবাদ নামক স্থানে পৌছি। এখানে আমাদিগের ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ সরকার আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। আমরা তাঁহারই গৃহে অবস্থিতি করি। ঐদিন অপরাহ্নে "সনাতন ধর্ম্মসভা" গৃহে এক সভা আহূত হয়। ভাই প্রকাশদেব উর্দ্দূ ভাষায় বক্তৃতা করেন; হিন্দিতে সঙ্গীত হয়, শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজীতে কিছু বলেন।

পর দিবস প্রাতে আমরা প্রাচীন অযোধ্যা নগরী দর্শন করিতে যাই। এই স্থান সরযূনদীতীরে অবস্থিত। সরযূর দৃশ্য অতি মনোহর। এখানে কতকগুলি হিন্দু দেবালয় আছে। অযোধ্যা হিন্দুদিগের তীর্থস্থান, সুতরাং পর্ব্ব উপলক্ষে এ স্থানে বহু লোকসমাগম হইয়া থাকে। রামচন্দ্রের জন্ম ও তিরোভাব, সীতার রন্ধনশালা, লক্ষ্মণের দুর্গ প্রভৃতি নামে কতকগুলি স্থান আছে। ইহার অধিকাংশ গৃহই মুসলমান রাজত্ব কালে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। লক্ষ্মণদুর্গেতে একজন প্রাচীন সাধু আছেন। আমরা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি একজন পণ্ডিত লোক, ব্রাহ্মধর্ম্মের সংবাদ বিশেষ রূপ জানেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ ও উপাসনাপ্রণালী সম্বন্ধে নিজেই অনেক কথা উত্থাপন করিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারে আমরা প্রীতিলাভ করিলাম।

অপরাহ্নে মহেন্দ্রবাবুর গৃহে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা, সঙ্গীত ও উপদেশ হয়। ভাই প্রকাশদেব ও সুন্দর সিং কিছু কিছু বলেন। শাস্ত্রী মহাশয় গীতার একটী শ্লোক পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যা উপদেশপূর্ণ ও অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। পর দিবস অপরাহ্নে স্থানীয় টাউনহলে শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয়—"New India, Her new experiences", বক্তৃতা চিন্তাপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বক্তৃতার প্রারম্ভে ও শেষে সঙ্গীত হয়। তৎপর একজন ইয়ুরোপীয় মহিলা প্রচারিকা বক্তৃতার প্রশংসা করিয়া বক্তাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

আমরা তৎপর দিবস (১লা এপ্রিল) লক্ষ্ণৌ যাত্রা করি। লক্ষ্ণৌ উপস্থিত হইয়া আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী বসুর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করি। এখানে ভগবদাশ্রম হইতে ভাই লছমনপ্রসাদ আমাদের সঙ্গে মিলিত হন। অপরাহ্নে বিপিন বাবুর গৃহে বাবু হরিমোহন ঘোষাল "জগাই মাধাইর উদ্ধার" বিষয়ে কথকতা করেন। তৎপর দিবস পূর্ব্বাহ্নে শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন রায় মহাশয়ের গৃহে উপাসনা হয়। শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপদেশ অতি প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। অপরাহ্নে স্থানীয় টাউনহলে শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজীতে ও ভাই প্রকাশ দেব উর্দ্দুতে বক্তৃতা করেন। উভয়ের বক্তৃতাই সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর বিপিন বাবুর গৃহে উপাসনা হয়। পরদিবস প্রাতে ভগবদাশ্রমে (ভাই লছমনপ্রসাদের বাসস্থান) উর্দ্দুতে উপাসনা ও উপদেশ হয়। ভাই প্রকাশদেব আচার্য্যের কার্য্য করেন। স্থানীয় কয়েকটী লোক আগ্রহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। অপরাহ্নে বেঙ্গল ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশনে শাস্ত্রী মহাশয় "যৌবন কালই ধর্ম্মসাধনের উপযুক্ত সময়" বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজ।

নববর্ষের উৎসব—নববর্ষ উপলক্ষে গত ৩০শে ও ৩১শে চৈত্র এবং ১লা বৈশাখ এই তিন দিন উৎসব হইয়াছিল। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল ;—

৩০শে চৈত্র মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র "ব্রহ্মশক্তির পরাক্রম" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। কৃষ্ণকুমার বাবুর শরীর অসুস্থ থাকায় বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বক্তা একটী ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া অতি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, ধনবল, বাহুবল এবং লোক বল প্রভৃতি কোন বলই বিধাতার বিশ্বকার্য্যের প্রতিরোধ করিতে পারে না। দুর্জ্জয় ব্রহ্মশক্তির গতিতে বাধা দেয় কাহার সাধ্য ? সকল অসার, অনিত্য, ক্ষণধ্বংসী চঞ্চলতাকে পরাভূত করিয়া ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি প্রবাহ অনাদি কাল হইতে স্থির প্রবাহিত হইতেছে। সর্ব্বত্র ব্রহ্মের বিজয়নিশান প্রোথিত হইয়া মঙ্গল ও শান্তি ঘোষণা করিতেছে। মানব সেই মহাশক্তির আশ্রয়ে বাস করিলেই নিরাপদ স্থান লাভ করে।

৩১শে চৈত্র বুধবার প্রাতে সংকীর্ত্তন ও তৎপর উপাসনা হয়। বাবু সীতানাথ দত্ত উপাসনা করেন এবং উপদেশ দেন। অপরাহ্নে আলোচনা হয়। উপাসকমণ্ডলীর সম্পাদক বাবু বঙ্কুবিহারী বসু কয়েকটী প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তাঁহার একটী কথা এই যে, বর্ত্তমান সময়ে আচার্য্যগণ মৌখিক উপদেশ দিয়া থাকেন। এই উপদেশ যদি তাঁহারা লিখিয়া পাঠ করেন, তবে নানা বিষয়ে উপাসকমণ্ডলীর উপকার হয়। এ বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনার পর সভা ভঙ্গ হয়। রাত্রিতে ৭টার সময় পুনরায় উপাসনা আরম্ভ হয়। বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন।

১লা বৈশাখ প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে বাবু সীতানাথ দত্ত এবং শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করেন। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার পর উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদে গ্রহণ করিবার জন্য এ সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। আচার্য্য বেদী গ্রহণ করিলে, শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদ দুবেদীর বামদিকে কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইলেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ এবং অন্যান্য ধর্ম্মবন্ধুগণ যথাস্থানে উপবেশন করিলেন পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় বলিলেন ;—"শ্রদ্ধাস্পদ ধর্ম্মবন্ধুগণ! ব্রহ্মপরায়ণ ধর্ম্মোৎসাহী আমাদিগের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত লছমনপ্রসাদ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদে বৃত হইবার জন্য ইচ্ছুক হওয়াতে অদ্য আমি তাঁহাকে আনন্দের সহিত আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি। আপনারা ইহাঁর শুভ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করুন।" তৎপর ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল। সমবেত প্রার্থনার পর আচার্য্য প্রচার-ব্রত-গ্রহণার্থীকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন করেন এবং ব্রতগ্রহণার্থী নিম্নলিখিত উত্তর দান করেন ;—

১ম প্রশ্ন —"শ্রদ্ধেয় ভ্রাতঃ, অদ্য ১৩০০ বঙ্গাব্দে, ৬৪ ব্রাহ্মসংবতে ১লা বৈশাখে বৃহস্পতিবাসরে, আপনি সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর ও উপস্থিত ধর্ম্মবন্ধুগণের সমক্ষে যে প্রচার ব্রত গ্রহণে

অগ্রসর হইয়াছেন, ইহাতে আপনি জীবন্ত পরব্রহ্মের আহ্বান অনুভব করিয়াছেন কি না?"

উত্তর।—"মহান্ প্রভুর আহ্বানেই আমি, দুর্ব্বল এবং অনুপযুক্ত হইয়াও, প্রচারকার্য্যকে আমার জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছি।"

২য় প্রশ্ন।—"আপনি কি অনন্যকর্ম্মা হইয়া চিরজীবনের জন্য এই ব্রত গ্রহণ করিতেছেন?"

উত্তর।—"প্রভুর আজ্ঞাতেই এ জীবন চিরদিনের জন্য তাঁহার সেবাতে উৎসর্গ করিয়াছি, এখন তিনিই আমার একমাত্র বল।"

৩য় প্রশ্ন।—"আপনি কি প্রণালীতে জীবনে এই পবিত্র ব্রত প্রতিপালনে ইচ্ছুক হইয়াছেন?"

উত্তর।—"যাহাতে একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের পবিত্র পূজা দেশমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠান সকল গৃহে গৃহে ও জনসমাজে প্রবর্ত্তিত হয়, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সকল সর্ব্বত্র সমাদৃত ও অনুষ্ঠিত হয়, নরনারীর জীবনে সর্ব্বতোভাবে সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতার মর্য্যাদা রক্ষিত হয় এবং জনসমাজ বিশুদ্ধ প্রীতিশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের প্রেমরাজ্য বিস্তারে এবং ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইতে পারে, যাহাতে অসত্য, পাপ, কুসংস্কার ও অত্যাচারের দিন অবসান হয়, নাস্তিকতা ও সংসারাসক্তির বিলোপ হয়, জনসমাজ হইতে হিংসা দ্বেষ অনুদারতা বিবাদ বিসম্বাদ তিরোহিত হয়, এরূপ লক্ষ্য রাখিয়া স্বতঃ পরতঃ উপদেশ প্ররোচনা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা আমি আমার ব্রতপালন করিতে প্রস্তুত থাকিব।"

৪র্থ প্রশ্ন।—"আপনি যে মহৎ ব্রত গ্রহণ করিতেছেন, তাহা প্রতিপালনে আপনার পক্ষে কি কি কার্য্য নিষিদ্ধ বলিয়া অনুভব করেন?"

উত্তর।—"বাক্যে ও ব্যবহারে পৌত্তলিকতা বা নিরীশ্বতার প্রশ্রয় দিব না। একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি কি গ্রন্থকে অভ্রান্ত বা মুক্তির মুখ্য উপায় বলিয়া প্রচার করিব না। সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যে কোন প্রকার মধ্যবর্ত্তিতা স্বীকার করিব না। উপদেশ বা অনুষ্ঠানে জাতিভেদ কিম্বা পৌরহিত্যাভিমানের প্রশ্রয় দিব না। অন্ধ ভক্তি বশতঃ কেহ কোন অবৈধ বা ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মান বা ভক্তি প্রদর্শন করিলে তাহা গ্রহণ করিব না। যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠানে বিবেক বা নীতির অবমাননা করা হয়, তাহাতে যোগ দিব না। সত্য প্রচারে রত হইয়া অপর কোন ধর্ম্মশাস্ত্র কি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতি উপহাস বা বিদ্রূপ প্রদর্শন করিব না। ধর্ম্মপ্রচারকের পদকে অর্থোপার্জ্জনের ও বৈষয়িক সুখ ভোগের উপায় স্বরূপ করাকে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি।"

৫ম প্রশ্ন।—"পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে আপনার মত ও বিশ্বাস কি?"

উত্তর।—"ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন ব্যতীত আত্মার প্রকৃত বিকাশ হয় না। এজন্য আমি যেমন আরাধনা ধ্যান ও প্রার্থনাতে বিশ্বাস করি, সেইরূপ সকল প্রকার জনহিতকর কার্য্য ও পরিত্রাণের উপায় বলিয়া বিশ্বাস করি।"

৬ষ্ঠ প্রশ্ন।—"আপনি এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রসূত বলিয়া বিশ্বাস করেন কি না এবং ইহার নিয়মাবলীর অনুগত হইয়া চলিতে প্রস্তুত কি না?"

উত্তর।—"ব্রাহ্মধর্ম্ম যাঁহার ইচ্ছাপ্রসূত, এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও তাঁহারই ইচ্ছাপ্রসূত বলিয়া বিশ্বাস করি, এবং যথাসাধ্য সকল বিষয়ে ইহার নিয়মাবলীর ও নির্দ্দেশের অনুগত হইয়া চলিব। ঈশ্বর আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং ধর্ম্মবন্ধুগণ আমার এ পথের সহায় হউন। "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্" এই মন্ত্র আমার জীবনের অবলম্বন হউক।"

তদনন্তর আচার্য্য এই মর্ম্মে উপদেশ দেন। "ধর্ম্ম সাধন করা কঠিন কার্য্য, প্রচার করা আরও কঠিন। নিজে পরিত্রাণ লাভ করা এবং অপরের পরিত্রাণের উপায় বিধান করাই প্রচারক-জীবনের উদ্দেশ্য। যিনি নিজে পরিত্রাণ লাভ করেন নাই, তিনি পরিত্রাণের সংবাদ কিরূপে প্রচার করিবেন? সুতরাং প্রচারকের ব্রতের ন্যায় গুরুতর ব্রত আর কি আছে? সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মশক্তির সহিত যুক্ত না হইলে, কেহই এই মহাব্রতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। কত লোক ঈশ্বরের সেবা করিবেন, ধর্ম্মপ্রচার করিবেন, এই মহদুদ্দেশ্য লইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, পরে নানাবিধ পরীক্ষার মধ্যে পতিত হইয়া বায়ুতাড়িত ধূলিকণার ন্যায় কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। যাঁহারা ঈশ্বরের নির্দ্দেশ অনুসারে এই ব্রত গ্রহণ করিবেন এবং এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মের জীবন্তলীলা দেখিতে পাইবেন, তাঁহারাই এখানে স্থির হইয়া থাকিতে পারিবেন। আপনি আজ বিশেষভাবে ঈশ্বরের অঙ্গুলী-সঙ্কেত দর্শন করুন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে তাঁহারই কার্য্যক্ষেত্র, তিনি যে ধর্ম্ম প্রচারার্থ আপনাকে ইহার সহিত যুক্ত করিতেছেন এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া আজীবন এই মহাব্রত পালন করুন। পরমেশ্বর আপনার সহায় হইবেন"।

শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদের বয়স প্রায় ৫২ বৎসর। তাঁহার জন্মস্থান অযোধ্যা প্রদেশে। তিনি এখন লক্ষ্ণৌ নগরে অবস্থিতি করিয়া প্রচার করিতেছেন। তিনি ইংরাজি অধ্যয়ন শেষ করিয়া সামরিক বিভাগে ১৩০৲ টাকা বেতনে কোনও কার্য্যে নিযুক্ত হন। প্রায় ১২ বৎসর কাল এই কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত সম্পাদন করেন। বলা বাহুল্য কিছুদিন গত হইলেই পেন্সনের সময় হইত; কিন্তু তিনি আর কার্য্যে থাকিতে পারিলেন না। কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিলেন। অদ্য ৮ বৎসর যাবৎ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত যুক্ত হইয়া প্রচার করিতেছেন। এবার তিনি প্রচারক-ব্রত গ্রহণ করিলেন। পরমেশ্বর ইহাকে ব্রতে সুদৃঢ় রাখুন।

সাধনাশ্রম—১লা বৈশাখ প্রাতে মন্দিরের উপাসনার পর, সাধনাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়, বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন, বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ও বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল নিম্নলিখিত মর্ম্মে কিছু কিছু বলেন এবং প্রার্থনা করেন। "অদ্য সাধনাশ্রমের জন্মদিন। গত বৎসর এই দিনে দুইজন মাত্র পরিচারক ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ

প্রায় ১৫ জন হইয়াছেন। যাঁহাদের চরণতলে বসিয়া যুবকগণ বিশ্বাস, বৈরাগ্য, সেবা এবং বিনয় ও ভক্তির ভাব শিক্ষা করিতে পারেন, এমন পূজ্যপাদ বয়োজ্যেষ্ঠ সাধকগণ যোগদান করিয়া ইহার গাম্ভীর্য্য ও সাধুদৃষ্টান্তের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই এক বৎসরে প্রভু পরমেশ্বর বিশেষ ভাবে আশ্রমবাসীগণের প্রতি তাঁহার কৃপাবারি বর্ষণ করিয়াছেন। অর্থাভাবের সময় আশ্চর্য্যরূপে অর্থ প্রেরণ করিয়াছেন এবং সাধন ভজন ও সাধু সহবাস এবং জ্ঞানালোচনার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এ সকল কথা স্মরণ করিয়া আশ্রমবাসীগণ আজ কৃতজ্ঞচিত্তে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন"।

শ্রাদ্ধ—কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর ভবনে গত ৪ঠা বৈশাখ পরলোকগতা ভগিনী নিতম্বিনী চট্টোপাধ্যায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রার্থনা করেন এবং বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী এবং বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল স্বর্গীয়া ভগ্নীর জীবনচরিত সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন ও প্রার্থনা করেন। পরমেশ্বর পরলোকগত আত্মাকে শান্তিদান করুন।

দান—বাবু ক্ষেত্রমোহন চন্দের সহধর্ম্মিণী ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায়, পারিবারিক উপাসনা হয়। এতদুপলক্ষে তিনি সাধনাশ্রমে এক টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীমতী জগৎলক্ষ্মী ঘোষ সাঃ ব্রাঃ সমাজ প্রচার বিভাগে ৬৲ টাকা ও খাসিয়া প্রচারে ১৲ টাকা; বাবু গিরিশচন্দ্র কাঞ্জিলাল বার্ষিক পিতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচার বিভাগে ১৲ টাকা; বাবু ভুবনমোহন ঘোষ বার্ষিক মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজ ফণ্ডে ২৷৷০ টাকা এবং কটকের বাবু মধুসূদন রাও তাঁহার প্রথম পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে খাসিয়া মিসন ফণ্ডে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা দাতাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

ছাত্রসমাজ—৩রা বৈশাখ শনিবার ছাত্রসমাজে বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র "ধর্ম্মজীবনের দায়িত্ব" বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন, এবং গত ১০ই বৈশাখ শনিবার গ্রীষ্মের ছুটি উপলক্ষে বিদায়সূচক বিশেষ উপাসনা হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। বাবু কালীশঙ্কর সুকুল এবং বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বক্তৃতা করেন। গ্রীষ্মের বন্ধে বিদেশীয় ছাত্রগণ বাড়ী গমন করেন বলিয়া প্রতি বৎসরই এ সময় ছাত্রসমাজের কার্য্য বন্ধ থাকে।

উৎসব—খলিলপুর হইতে বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নাথ লিখিয়াছেন;—"খলিলপুর ব্রাহ্মসমাজের অষ্টম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে থানখানাপুরের বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দাস, বাবু রজনীকান্ত সরকার এবং আমি উপাসনার কার্য্যাদি সম্পাদন করিয়াছি। শোলাকুড়া নিবাসী বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ মহাশয় সমবেত লোকমণ্ডলীর সহিত ধর্ম্মালোচনা এবং একদিন বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ১৯এ চৈত্র রবিবার পর্য্যন্ত তিন দিন উৎসব হইয়াছিল। এই উৎসবে হিন্দু ভ্রাতৃগণও উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। প্রতিদিন দুই বেলা প্রায় ৩০।৩৫ জন লোক উপাসনাদিতে যোগদান করিতেন। ২১শে চৈত্র রবিবার অপরাহ্নে সমাজগৃহ হইতে কীর্ত্তনদল বাহির হয়। কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে বাজারে উপস্থিত হইলে, দ্বারকানাথ বাবু তৎকালোচিত বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা সারগর্ভ ও শ্রোতৃ মণ্ডলীর হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল।"

মহিলাসমাজের উৎসব—শিলং হইতে বাবু কামিনীকুমার ঘোষ লিখিয়াছেন;—"পরমেশ্বরের কৃপায় নিম্নলিখিত প্রণালীতে শিলং মহিলাসমাজের বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ১৫ই চৈত্র সোমবার বাবু নবগোপাল দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে মধ্যাহ্নে উপাসনা হয়, শ্রীমতী সারদামঞ্জুরী দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১৬ই চৈত্র মঙ্গলবার বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয়ের বাসায় পাঠ ও উপাসনা হয়, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা সেন পাঠ ও উপাসনা করেন। ১৭ই চৈত্র বুধবার লাবান উপাসনা মন্দিরে মধ্যাহ্নে পাঠ ও উপাসনা হয়, শ্রীমতী সারদামঞ্জুরী দত্ত রচনা পাঠ করেন এবং শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা সেন উপাসনা করেন।"

বাবু কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয়ের কার্য্যবিবরণ—৯ই এপ্রেল রবিবার থানাখানাপুর স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক বাবু রামচন্দ্র মজুমদার ও বৈকুণ্ঠচন্দ্র দাস মহাশয়ের বাসায় প্রাতে পারিবারিক উপাসনা ও আলোচনা। সায়াহ্নে সামাজিক উপাসনা ও উপদেশ। ১৫ই শনিবার—ঐ সকল বাসায় পারিবারিক উপাসনা। ১৬ই রবিবার—প্রাতে পারিবারিক উপাসনা, অপরাহ্নে থানখানাপুর ছাত্রসমাজের বাৎসরিক সম্মিলনে সভাপতির কার্য্য করেন। ১৭ই সোমবার—বন্ধুবর উমেশচন্দ্র নাগ ও বাবু চন্দ্রনাথ সাহার সহিত একত্র উপাসনা ও আলোচনা করেন।

ভ্রম সংশোধন।—গত বারের তত্ত্বকৌমুদীতে ব্রাহ্মসমাজ কলমে নিতম্বিনী চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুদিন "৬ই মার্চ্চ" স্থলে "৬ই এপ্রেল" ও "স্থানীয় প্রচারক দল" স্থলে "স্থানীয় প্রচারদল" এবং দান প্রাপ্তি স্বীকারের মধ্যে "কে, সি, এণ্ড কোং" স্থলে "মিঃ, কে, সি, এণ্ড" এবং "শ্রীমতী যামিনী ঘোষাল" স্থলে "শ্রীযুক্ত যামিনী ঘোষাল" হইবে।

বিজ্ঞাপন।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৬ই বৈশাখ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

২৩ সংখ্যা। ১৬ ভাগ।

১লা জ্যৈষ্ঠ রবিবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

বন্দনা।

তোমারি রচনা, হে জগ-কারণ,
দৃশ্য অদৃশ্য এ অগণ্য ভুবন;
তোমারি জ্যোতিতে বিশ্ব জ্যোতির্ম্ময়,
তোমার শক্তিতে সৃষ্টি স্থিতি লয়;
এক অদ্বিতীয় অক্ষয় অবিনাশী,
কোটী রূপে বিশ্বে আপনা প্রকাশি',
রহিয়াছ সৃষ্টি তব ক্রোড়ে ক'রে;
জয় জয় জয় জগদীশ হরে।

'ঐ ভীম নিনাদে বিশাল গগন,
তোমারি মহিমা করিছে কীর্ত্তন!
করব উল্লাসে হয়ে উচ্ছ্বসিত,
ভৈরব গর্জ্জনে সিন্ধু গাহে গীত!
জ্যোতির্ম্ময় বৈভব কোটী চন্দ্র তারা,
মহিমা বন্দনে সবে মাতোয়ারা!
ধ্বনিছে সঙ্গীত সদা সমস্বরে;
জয় জয় জয় জগদীশ হরে।

অসীম প্রতাপে তুমি হে রাজন্!
সর্ব্ব চরাচর করিছ শাসন;
নেহারি তোমার ইচ্ছার ইঙ্গিত,
স্থাবর জঙ্গম হয় যে স্তম্ভিত!
অযুত তারকা কোটী চন্দ্র ভানু,
চরণে চাহিয়া সবে নত জানু!
নমিছে কৃতজ্ঞ প্রেম ভক্তি ভরে;
জয় জয় জয় জগদীশ হরে।

এ লোক আশ্রয়, পরলোক গতি,
অনাদি অনন্ত বিভু বিশ্বপতি;
পূর্ণ, পরাৎপর, মঙ্গল-হেতু,
সংসার অর্ণবে তুমি মহা সেতু;
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিমা তোমারি,
ও পদ পূজিয়া ধন্য নরনারী,
ভক্তি প্রেমোচ্ছ্বাসে বিশ্ব গেছে ভরে;
জয় জয় জগদীশ হরে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ব্রাহ্মসমা[illegible]ক্তিকে ঘনীভূত করিবার উপায় কি?—ব্রাহ্মধর্ম্ম [illegible]মাজিক ধর্ম্ম। সামাজিক ধর্ম্ম হইতে গেলেই ইহাকে স[illegible]জ্র পাপতাপের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। জগ[illegible] পাপ তাপের সহিত সংগ্রাম করিতে গেলেই তদুপ[illegible] বল চাই। বহু দিনের সঞ্চিত পাপরাশির সহিত সংগ্রাম করা কিরূপ শ্রমসাপেক্ষ ও তাহাতে কত বলের প্রয়োজন তাহা আমরা প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করিতেছি। ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজকে কিরূপ দেখিতে চান? ব্রাহ্মসমাজ একটী ক্ষীণ দুর্ব্বল ও শক্তিহীন দল হইয়া রহিয়াছে, কেহ কথা শোনে না, প্রচারে শক্তি নাই, পাপের সহিত সংগ্রাম করিবার ক্ষমতা নাই; ইহার অধিকাংশ সভ্যগণ বিষয়সুখে রত, স্বসুখপরতন্ত্র ও উৎসাহহীন, এরূপ দেখিতে চান? অথবা ব্রাহ্মসমাজ জাগ্রত ও জীবন্ত শক্তিরূপে কার্য্য করিতেছে, দলে দলে পাপীর হৃদয় পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছে, বহু দিনের পাপরাশি উন্মূলন করিতেছে, সত্য ধর্ম্মের শক্তি সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইতেছে, এরূপ দেখিতে চান? অধিকাংশ ব্রাহ্ম বোধ হয় বলিবেন, আমরা ব্রাহ্মসমাজকে জাগ্রত ও জীবন্ত শক্তিরূপে দেখিতে চাই। কিন্তু প্রশ্ন এই, ব্রাহ্মসমাজ জাগ্রত শক্তিরূপ ধারণ করিবে কিরূপে? কোন্ সাধনাতে সেই শক্তি আসিবে? ইহার উত্তরে আমরা বলি—"এই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম, দেখ ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ কেমন উচ্চ, ইহার নীতি কেমন মহৎ" বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়াইলে হইবে না। অন্ততঃ কয়েকজন প্রতিজ্ঞা করিয়া বস, যে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনে সাধন করিব। যখন তাহা জীবনে সাধিত হইবে, তখন লোকে দেখিবে ব্রাহ্মধর্ম্ম কাহাকে বলে, এবং তখনি ইহার শক্তি জাগিবে। কেবল উপদেশে যদি মানব হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রে এত সদুপদেশ থাকিতে দেশের

এত দুর্গতি হইত না। কেতাবের উপদেশ জীবনে ফলাইতে হইবে। অতএব ব্রাহ্মসমাজের একটী সাধনক্ষেত্র চাই, যেখানে থাকিয়া ব্রাহ্মসাধকগণ নিবিষ্টচিত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিবেন। বলা বাহুল্য যে, এই কারণেই ব্রাহ্মসাধনাশ্রম বা Brahmo Workers' Shelter স্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের শক্তিকে ঘনীভূত ও বর্দ্ধিত করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। সেই শক্তিকে ঘনীভূত করিতে পারিলে, তবে আমরা দেশের বহুদিনের সঞ্চিত পাপরাশির সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইব। ঈশ্বর করুন, সাধনাশ্রম দ্বারা এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হউক।

কৃপাসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ—পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর ধনী দৃষ্ট হয়। কতকগুলি লোক উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রচুর বিভব ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন, অথবা হঠাৎ কোনও কারণে সম্পদ তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছে। ঐ সম্পদ উপার্জ্জন করিতে এক সময়ে যথেষ্ট শ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে শ্রম ঐ ধন সম্পত্তির বর্ত্তমান অধিকারীদিগকে করিতে হয় নাই। তাঁহাদের পিতা পিতামহ প্রভৃতি গুরুজন বা অপর কেহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিনা শ্রমে পাইয়াছেন এবং অল্প আয়াসে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। ইহারা প্রথমোক্ত শ্রেণীর ধনী; দ্বিতীয় শ্রেণীর ধনী অন্য প্রকারের। তাঁহারা স্বনামা পুরুষ; নিজ পরিশ্রম, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি গুণে প্রচুর সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। এইরূপে এই জগতে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিদিন ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতির দ্বারা বিভবশালী হইতেছেন। নিত্য নিত্য তাঁহাদের হস্ত দিয়া কত অর্থ আয় কত অর্থ ব্যয় হইয়া যাইতেছে; কিন্তু একটী বিষয়ে তাঁহারা অত্যন্ত মনোযোগী। মূলধনের প্রতি তাঁহাদের সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি। সমুদায় আয় ব্যয়ের মধ্যে গড়ের উপরে মূলধন বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাঁহারা সর্ব্বদা তাহা অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। এজন্য বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী মাত্রেই আয় ব্যয়ের হিসাব প্রতিদিন মনোযোগ পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া থাকেন। এতদ্দেশে এবিষয়ে কত কৌতুককর গল্প প্রচলিত আছে। এক পয়সার গুড়মিল মিটাইবার জন্য পাঁচ পয়সার তৈল ব্যয় হয়, ইত্যাদি। যে দোকানদার কেবল দোকান খুলিয়া বসিয়া থাকে, কেবল দ্রব্য সামগ্রী আনিতেছে ও বেচিতেছে, কিন্তু হিসাব নিকাশের দিকে দৃষ্টি নাই, মূলধন বাড়িতেছে কি কমিতেছে সে বিষয়ে মনোযোগ নাই, তাহার দুর্দ্দশা ত্বরায় ঘটিয়া থাকে। ত্বরায় সে ঋণজালে জড়িত হইয়া মূলধন হইতে বঞ্চিত হয়। পৃথিবীতে ধনসঞ্চয় নিতান্ত সতর্কতা মিতব্যয়িতা ও আত্মপরীক্ষার কর্ম্ম।

ধনসঞ্চয়ের ন্যায় ধর্ম্মসাধন বিষয়েও দুই শ্রেণী দৃষ্ট হয়, কৃপাসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ। যাঁহারা কৃপাসিদ্ধ তাঁহারা যেন হঠাৎ কোনও গুপ্তধনের অধিকারী হইয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে কোনও সাধু সঙ্গ মিলিয়া যাওয়াতে তাহাদের হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ও অন্তরে এত ধর্ম্মবল লাভ করিয়াছেন, যে তাহা তাঁহাদের চিরজীবনের সম্বল হইয়া গিয়াছে। কোনও কোনও সময়ে ঈশ্বরের কৃপাবারি প্রবল জলস্রোতের ন্যায় আসিয়া মানব অন্তরে প্রবেশ করে। সেই প্রবল স্রোতে মানুষকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। যাহা অপর সময়ে দুঃসাধ্য ছিল তাহা এই কৃপাস্রোতের প্রভাবে সুসাধ্য হইয়া যায়। কিন্তু এরূপ সাধুসঙ্গ ও করুণাস্রোত সকল জীবনে ও সকল সময়ে মিলে না। অধিকাংশ মানবকে সাধনের দ্বারা ধর্ম্মজীবনকে গঠন করিতে হয়। এই সাধনকে তপস্যা বলা যাইতে পারে। তপস্যা বলিলে কৃচ্ছ্র সাধন বুঝিতে হইবে না; শরীরকে যম, নিয়ম, উপবাসাদির দ্বারা ভগ্ন ও জীর্ণ করা বুঝিতে হইবে না; গ্রীষ্মে পঞ্চতপা হওয়া ও শীতে আকণ্ঠ জলে নিমগ্ন হইয়া ইষ্টদেবতার নাম করা বুঝিতে হইবে না; কিন্তু তপস্যার অর্থ ধর্ম্মজীবন গঠনের উদ্দেশ্যে বৈরাগ্য ও সংযমের দ্বারা আত্ম-শাসন করা। এই আত্ম-শাসন আত্মপরীক্ষা-সাপেক্ষ। যে উচ্চ উদ্দেশ্যকে মূলধন স্বরূপ সম্মুখে রাখা গিয়াছে, সে বিষয়ে কি পরিমাণে উন্নতি হইতেছে, তাহা সর্ব্বদা আলোচনীয়। ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ, সামাজিক জীবনেও সেইরূপ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃক্রম যে পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হইতে চলিল, আমাদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত, ইহার উচ্চ আদর্শ কতদূর সাধিত হইয়াছে বা হইতেছে।

রাণারের ডাক—এদেশে রেলওয়ে প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে রাণারের দ্বারা ডাকের চিঠী প্রেরণ করা হইত। এখনও অনেক স্থানে রাণারগণ ডাক বহন করিয়া থাকে। প্রত্যেক তিন কি চারি মাইল অন্তর রাণারদিগের এক একটা আড্ডা থাকে। একদল রাণার ডাক লইয়া দৌড়িতে থাকে, আর একদল রাণার যথাসময়ে আড্ডাতে প্রস্তুত হইয়া বসিয়া থাকে। যেই প্রথমোক্ত দল উপস্থিত হয়, এবং আপনাদের স্কন্ধের বোঝা নামাইয়া দেয় অমনি আর একদল তৎক্ষণাৎ সেই বোঝা স্কন্ধে তুলিয়া লয় এবং দৌড়িতে আরম্ভ করে। এইরূপে ডাক যথাসময়ে স্বীয় গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকে। দেশের মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতিও এই রাণারের ডাকের ন্যায়। যে দেশে এক শ্রেণীর লোক স্কন্ধের বোঝা নামাইবামাত্র আর একদল সেই ভার স্কন্ধে তুলিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত, সেই দেশের উন্নতি অবাধে চলিয়া থাকে। কিন্তু যেখানে একদল কৃতী লোক অন্তর্হিত হইলে তাঁহাদের কার্য্য ভার স্বীয় স্বীয় স্কন্ধে লইবার জন্য অপর কোনও দল প্রস্তুত দেখা যায় না, সে দেশের উন্নতির স্রোত ত্বরায় বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের দেশের সেই প্রকার অবস্থা দেখিতেছি। একদল কৃতী লোক অন্তর্হিত হইলে তাঁহাদের স্থান অধিকার করিবার লোক দেখা যাইতেছে না। কি রাজনীতিবিভাগে, কি শিক্ষা বিভাগে, কি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কার্য্যে সর্ব্বত্রই এই দুর্দ্দশা দৃষ্ট হইতেছে। এক কৃষ্ণদাস পাল অন্তর্হিত হইলেন, তাঁহার স্থান অধিকার করিবার লোক নাই; এক ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র গেলেন, তাঁহার স্থানাভিষিক্ত হইবার কেহ নাই; এক কেশবচন্দ্র সেন গেলেন, তাঁহার ভার বহন করিবার উপযুক্ত আর কাহাকেও পাওয়া গেল না; সর্ব্বত্রই এই দুর্দ্দশা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চদশ জন্মোৎসব উপস্থিত; ইহার সভ্যগণ একবার বিবেচনা

করুন, তাঁহাদের সমাজের কার্য্য ও প্রচার কার্য্য সমুচিতরূপে চালাইবার উপযুক্ত লোক কিরূপ প্রস্তুত হইতেছে। ইহার প্রচারক সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত না হইয়া হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। অপরাপর বিভাগেও কার্য্য করিবার উপযুক্ত কৃতী লোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে দেখা যাইতেছে না। প্রশ্ন এই, বর্ত্তমান সময়ে কার্য্যভার যাঁহাদের উপরে ন্যস্ত রহিয়াছে তাঁহারা যখন অন্তর্হিত হইবেন, তখন কোন্ দল তাঁহাদের কার্য্যভার মস্তকে গ্রহণ করিবেন? এবং এরূপ লোক প্রস্তুত করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন? আমরা কোনও প্রকারে উপস্থিত কার্য্যটা চালাইয়া দিতেছি, কিন্তু মানুষ প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতেছি না। মানুষ প্রস্তুত হওয়া না হওয়া অনেকটা শিক্ষা প্রণালীর উপরে নির্ভর করে। আমাদের যে উৎসাহী, কার্য্যদক্ষ ও অনুরাগী পুরুষ ও মহিলার অপ্রতুল আছে, অথবা শিক্ষা ও উন্নতির অবসর ও সুবিধার অভাব আছে তাহা নহে; কিন্তু তাঁহাদের শক্তি সকলকে সমবেত করিয়া শিক্ষিত ও উন্নত করিবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত নাই, এবং সেরূপ করিতে পারেন এরূপ শক্তিশালী পুরুষও নাই। এইজন্য আমাদের দুর্ব্বলতা রহিয়া যাইতেছে, আমরা কার্য্যের বিস্তৃতির দিকে যত মনোযোগ দিতেছি, স্থায়িত্বের দিকে তত মনোযোগী হইতেছি না।

প্রচার কার্য্যের বিস্তৃতি ও গভীরতা।—বিগত কয়েক বৎসর হইতে যে ভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্য চলিতেছে তাহা এই;—দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল ব্রাহ্মসমাজ আছে, তাহাদের সভ্যগণ উৎসব বা অনুষ্ঠানাদির সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিকটে প্রচারক চাহিয়া পাঠাইয়াছেন; সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা প্রচারকদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রচারক মহাশয়গণ তদুপলক্ষে যথাসাধ্য অপরাপর সমাজও পরিদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে আমাদের যে কতিপয় প্রচারক আছেন তাঁহাদের অধিকাংশই নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, কাহাকেও মানুষ প্রস্তুত করিবার জন্য কলিকাতাতে স্থায়ীরূপে রাখিবার বন্দোবস্ত করা হয় নাই। ইহার ফল এই হইয়াছে, যে পরিমাণে প্রচার কার্য্যের বিস্তৃতি দেখা যাইতেছে সেই পরিমাণে গভীরতা ও স্থায়িত্ব দৃষ্ট হয় না। পঞ্চদশ বৎসরে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা ছড়াইতে গিয়া আট জন প্রচারকের চারি জনকে হারান ভাল হইয়াছে; না, এই পঞ্চদশ বৎসর কাল দুই জনকে কলিকাতাতে আবদ্ধ রাখিয়া আট জন প্রচারকের স্থলে কুড়ি জন প্রচারক করিতে পারিলে ভাল হইত? যীশু দ্বাদশ জন মানুষ প্রস্তুত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই জগৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মহম্মদ চারিজন খলিফা ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারাই পৃথিবী কাঁপাইয়াছেন; চৈতন্য, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, রূপ সনাতন, প্রভৃতি কতিপয় মানুষ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাতেই হরিনাম বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত হইয়াছে। অপরদিকে দেখা যায়, থিয়োডোর পার্কারের ন্যায় তেজস্বী পুরুষ স্থির হইয়া বসিলেন না, মানুষ প্রস্তুত করিবার দিকে মনোযোগী হইলেন না, কেবল দাসত্ব-প্রথা ও উপধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া অধিকাংশ সময় রেলওয়ে গাড়ী ও হোটেলে যাপন করিলেন। তার ফল এই হইল যে, তাঁহার কার্য্য চালাইবার জন্য তাঁহার পরবর্ত্তী কেহই রহিল না এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উপাসক-মণ্ডলী ক্রমশঃ হীন ও ক্ষীণ হইয়া অবশেষে বিগত ২।৩ বৎসর হইল ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া গেল। আমেরিকা দেশে সত্য-ধর্ম্মের যে এক মাত্র বিজয় নিশান ছিল, তাহাও বিলুপ্ত হইয়া গেল। অতএব বলিতেছি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মপ্রচারের বিস্তৃতি অপেক্ষা গভীরতা ও স্থায়িত্বের দিকে অধিক মনোযোগী হউন। উপরে উপরে ধর্ম্মের কথা ছড়াইয়া সন্তুষ্ট না হইয়া মানুষ প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যগ্র হউন। ঈশ্বর-কৃপাতে সাধনাশ্রম নামে যে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এই, ধর্ম্মজীবনের গভীরতা ও স্থায়িত্ব বিধান করা এবং ব্রাহ্মসমাজের ভাবী কার্য্যের জন্য মানুষ প্রস্তুত করা। ব্রাহ্ম-সাধারণ আশ্রমের এই লক্ষ্য সাধনে সহায় হউন। এজন্য যদি আমাদের প্রচারক মহাশয়দিগের মধ্যে কাহাকেও কিছু দিনের জন্য স্থায়িরূপে আবদ্ধ রাখিতে হয় তাহাও বাঞ্ছনীয়।

ব্রাহ্মসমাজে নারীশক্তি।—ব্রাহ্মসমাজ এদেশে অনেক শ্রেণীর লোকের পক্ষে আশার বাণী আনিয়াছেন। অনেক বিষয়ে সুমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন ও পরে আরও ঘটাইবেন। কিন্তু ভারতীয় নারীগণের অবস্থার উন্নতি বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ যাহা করিয়াছেন ও ভবিষ্যতে আরও করিবেন তাহা অপরাপর বিভাগের কার্য্য অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। ব্রাহ্মমহিলাগণ ব্রাহ্মসমাজের প্রসাদে শিক্ষা ও স্বাধীনতার সুখ সম্ভোগ করিতেছেন, পারিবারিক সুখ ও শান্তির অধিকারিণী হইয়াছেন, গৃহে ও সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে পবিত্রচরিত্রা, সুশিক্ষিতা ও ধর্ম্মানুরাগিণী রমণীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। এক্ষণে একমাত্র কলিকাতার ব্রাহ্ম-ছাত্রীনিবাসেই প্রায় চল্লিশটি বালিকা বাস করিয়া যথাবিধি শিক্ষা লাভ করিতেছে। এই সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইবে, হ্রাস হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন এই, ব্রাহ্মসমাজ এই নারীশক্তিকে বর্দ্ধিত ও নিজের এবং জনসমাজের সেবাতে নিযুক্ত করিবার কি উপায় করিতেছেন? বর্ত্তমান সময়ে যে সকল কার্য্যের ভার পুরুষদিগের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহার অনেকগুলি নারীদিগের হস্তে থাকিলে উৎকৃষ্টতর ফল ফলিতে পারে। যে সকল কার্য্যক্ষেত্রে পুরুষের পদার্পণ করা আশঙ্কাজনক, সেখানে নারীগণ অবাধে বিচরণ করিতে পারেন। কিন্তু সে সকল কার্য্যের ভার লইবার উপযুক্ত মহিলা কৈ? আবার যাঁহারা আছেন তাঁহাদিগকে কার্য্যে লাগাইবার উপযুক্ত উপায়ই বা কি আছে? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি, যে বর্ত্তমান বর্ষে ব্রাহ্মসমাজের নারীশক্তিকে সমবেত ও বর্দ্ধিত করিবার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য।

প্রশংসা ব্যাধি—ব্যাধি নানাপ্রকার। মানুষ যখন আত্ম-প্রীতিতে অন্ধ হইয়া পরকীয় গুণরাশি দর্শনে অনিচ্ছুক হয়, সংকীর্ণতার সীমা যখন অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া দৃষ্টিকে ক্ষুদ্র স্থানে আবদ্ধ রাখে এবং অপরের গুণ দর্শনে অক্ষম করে, তখন সে মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া আপনার সমূহ অনিষ্ট সাধন করে। এ প্রকার ব্যাধি অতি ভয়ানক ব্যাধি। এই ব্যাধি মানবের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির প্রতিরোধক; সুতরাং সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। কিন্তু আর এক প্রকার ব্যাধি আছে, তাহা স্বভাবতঃ ব্যাধি না হইলেও ক্রমে ব্যাধিতে পরিণত হয়। তাহা প্রশংসার ব্যাধি। কাহারও সৎগুণ দেখিলে রসনা তাহার উপযুক্ত প্রশংসা করিবে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু সৎকীর্ত্তির প্রশংসা করা অতি প্রশংসনীয় কার্য্য হইলেও তাহা কখন কখন ব্যাধির আকার ধারণ করে। যখন পরকীয় গুণরাজির বর্ণনায় একমাত্র রসনাই ব্যবহৃত হয়, যখন বক্তৃতার গভীর ধ্বনির সহিতই প্রশংসার পর্য্যবসান হয়, যখন আকাশের তর্জ্জন গর্জ্জনের স্থায় বৃথা আস্ফালনেই প্রশংসার পরিসমাপ্তি হয়, তখন সেই প্রশংসাও ব্যাধিরূপ পরিগ্রহ করে। কারণ সেই প্রকার প্রশংসা ধ্বনি মানবকে আত্ম-প্রতারিত করিয়া থাকে। সে মনে করে যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু সাধু তাহার প্রশংসায় ত আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত, সর্ব্বদাই রত; আর কি চাই? ইহাই যথেষ্ট। এইরূপ অর্থ-হীন বাক্য ব্যয়েই যাহার মন সন্তুষ্ট, তাহার পক্ষে সদ্-দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা এক প্রকার অসম্ভব হয়। বাক্‌যন্ত্রের অতিশয় চালনার দ্বারা অন্তর দৃষ্টিহীন হয় এবং অকারণ সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া সেখানেই আপন কর্ত্তব্য শেষ করিয়া থাকে। এ প্রকার বৃথা বাক্যব্যয় করা ব্রাহ্মগণের পক্ষে এক প্রকার স্বভাবের মধ্যে পরিণত হইয়াছে। তাঁহারা অপরাপর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানগুলির প্রশংসায় সর্ব্বদা ব্যস্ত, অপরের কষ্ট সহিষ্ণুতা, ও ধর্ম্মপ্রচারের জন্ম সর্ব্ববিধ ত্যাগ স্বীকার, ও একান্ত যত্নপরায়ণতার প্রশংসায় নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছেন। কোথায় একজন প্রচারক কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ পাইবামাত্র আপনার সকল প্রকার প্রিয় আশা ও উদ্দেশ্য পরিবর্জ্জন করিয়া আত্মীয় বান্ধবগণের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অম্লান বদনে শত শত যোজন দূরে চলিয়া যাইতেছেন, কোথায় কোন্ ব্যক্তি সংসার-ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইতেছেন, কোথায় বা কে আপনার যথাসর্ব্বস্ব সদনু-ষ্ঠানে প্রদান করিতেছেন, কোথায় বা সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্তগণের সেবায় আত্মসমর্পণ করিতেছেন, ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করিয়া বক্তৃতার পর বক্তৃতা করিতে ব্রাহ্মগণ কখনই বিমুখ নহেন। তাঁহাদের বাক্‌যন্ত্রের চালনায় সর্ব্বদাই তাঁহারা অতিশয় ব্যগ্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ব্রাহ্মগণ ইহাতেই সন্তুষ্ট, ইহাই আদি এবং ইহাই অন্ত; সেই সকল অনুষ্ঠানের সময় যখন উপস্থিত হয়, তখন আর কাহারও সহিত দেখা নাই। এই প্রকার অসার বাক্য মাত্র প্রয়োগেই যাহারা সন্তুষ্ট, তাহারা কি ব্যাধিগ্রস্ত নহে? এই ব্যাধি মানবকে অকারণ আত্ম-সন্তুষ্টিতে ভুলাইয়া রাখে। যাহাতে কিছুই ব্যয় নাই পাছে একটা আঁচড়ও লাগে না, এমন অর্থশূন্য প্রশংসা বাক্য প্রয়োগ করা কিছুই কঠিন কার্য্য নয়। এইরূপ প্রশংসা বাক্য প্রয়োগ করা না করায় বিশেষ কোন প্রভেদও দৃষ্ট হয় না। যাহারা সেরূপ প্রশংসা ধ্বনির ব্যবহার করে না তাহারাও যেমন কিছুই করে না, অপরেরাও বাক্‌-যন্ত্রের চালনা ভিন্ন কার্য্যতঃ কিছুই করেন না। লাভের মধ্যে প্রথম পক্ষ অন্যের প্রশংসা করেন বলিয়া কোনরূপ অর্থহীন সন্তুষ্টি লাভ করেন না,—গর্ব্বিত হন না; কিন্তু শেষ পক্ষ অকারণ আত্ম-সন্তুষ্টি লাভ করিয়া বৃথা গর্ব্বিত হন, এবং কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়াও সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং যে প্রশংসা বাক্য মাত্রেই পর্য্য-বসিত হয় তাহাও ব্যাধি বিশেষ। এই ব্যাধি অতি সংক্রামক। ইহা ব্রাহ্মগণকে আক্রমণ করিয়াছে এবং দিন দিন তাহা-দিগকে প্রগল্‌ভতার চরম সীমায় লইয়া যাইতেছে। আশা করি ব্রাহ্মগণ বৃথা বাক্যপ্রয়োগরূপ প্রশংসার পরিবর্ত্তে কিয়ৎ-পরিমাণে কার্য্যতঃ তাঁহাদের সদনুষ্ঠান সকলের অনুসরণ করিয়া, উপযুক্ত প্রশংসা করিতে প্রস্তুত হইবেন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে আত্মপরীক্ষা।

দেখিতে দেখিতে বিধাতার কৃপাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। কিরূপ সংগ্রাম ও আন্দোলনের মধ্যে ইহার জন্ম হইয়াছিল এবং আজ কিরূপ কার্য্যক্ষেত্র ইহার সম্মুখে বিস্তৃত তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহার জন্মকালে কত লোকে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া-ছিলেন যে, ইহার জীবন দীর্ঘকাল ব্যাপী হইবে না। পরলোক-গত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছিলেন "ব্যক্তিগত বিদ্বেষে যাহার জন্ম, তাহার স্থায়িত্ব সম্ভব নহে।" সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আপনার পঞ্চদশবর্ষব্যাপী জীবনের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষে ইহার জন্ম হয় নাই পরন্তু বিধাতার শুভইচ্ছায় এবং তাঁহারই মঙ্গল বিধিতে ইহার অভ্যুদয় হইয়াছিল। নতুবা এই পঞ্চদশ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া কার্য্য করা ইহার পক্ষে সম্ভব হইত না। আমরা এই পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে ইহার কার্য্যপ্রণালীতে কি কি গুণ ও দোষ লক্ষ্য করিলাম তাহা একবার আলোচনা করা যাউক।

ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্রতা সংরক্ষণ—ইহা কেহই অস্বী-কার করিতে পারিবেন না, যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও অনুষ্ঠানের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একটি মহোপকার সাধন করিয়াছেন। যথাসময়ে এই সমাজ অভ্যুদিত না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে নরপূজা, মধ্যবর্ত্তিবাদ প্রভৃতি কত কুসংস্কার যে প্রবিষ্ট হইত তাহাকে বলিতে পারে? ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম অনু-ষ্ঠানের যে বিশুদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছিলেন

এবং মহাত্মা কেশবচন্দ্র প্রথম বয়সে যাহার পূর্ণতা বিধানের জন্ত প্রাণপণে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সেই আদর্শের সংরক্ষণ ও উন্নতি বিধানে নিযুক্ত রহিয়াছেন। একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগীদিগের দৃষ্টি প্রধানতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দিকেই আকৃষ্ট। ব্রাহ্মসমাজ বলিতে লোকে ইহাকেই বুঝিয়া থাকে এবং ইহার প্রচারিত উদার সার্ব্বভৌমিক এবং বুদ্ধি ও বিবেকসঙ্গত ধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই মহোপকার সাধনে সমর্থ হইয়াছেন, এজন্ত বিধাতাকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করিতেছি।

কার্য্যোৎসাহ—সমুদায় একতন্ত্র শাসনপ্রণালীর দোষ এই যে, সমাজের কার্য্যের দায়িত্বভার প্রধানতঃ মন্ত্রণা স্বরূপ কতিপয় ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকে এবং সমাজের অধিকাংশ লোক সামাজিক কার্য্যে উদাসীন ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়ে। নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালীর গুণ এই যে, ইহাতে দায়িত্বভার সমাজের অন্তীভূত প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে লইয়া যায়। দায়িত্ব-জ্ঞানের ন্যায় মানবের স্বাধীন চিন্তার উন্নতি ও চরিত্রের বিকাশের অন্ত উপায় অতি অল্পই দেখা যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, ইহার নিয়মতন্ত্র প্রণালী দ্বারা ব্রাহ্মসাধারণের কার্য্যোৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারা পুনরায় কার্য্যে মনোযোগী হইবেন এবং যে সকল শক্তি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে তাহা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধনার্থ সমবেত হইবে। আজ পঞ্চদশ বৎসরের পরীক্ষার পর মঙ্গলময় বিধাতাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক বলিতেছি যে, আমাদের সে আশা অনেক পরিমাণে পূর্ণ হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের ক্ষেত্রে যাঁহারা আজ কার্য্য করিতেছেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ না হইলে তাঁহারা কোথায় থাকিতেন? ব্রাহ্মদলের ন্যায় ক্ষুদ্রদলের দ্বারা যে সকল সদনুষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে তাহাই বা কোথায় থাকিত?

নিয়মতন্ত্র প্রণালীজনিত একতা — জনসমাজের কার্য্য দ্বিবিধ রূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে। হয় কোন প্রতিভা-শালী পুরুষের হস্তে সমুদায় কার্য্যভার অর্পণ করিয়া তাঁহারই নেতৃত্বাধীনে থাকিয়া কার্য্য করা, না হয় দশজনে মিলিত হইয়া নিয়মতন্ত্র প্রণালী অনুসারে কার্য্য করা। যেখানে কোন প্রতিভাশালী পুরুষের নেতৃত্ব নাই এবং নিয়মতন্ত্র প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিবার রীতিও নাই, সেখানে কার্য্য অচল হইয়া যায় এবং সেই দল ত্বরায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও টুকরা টুকরা হইয়া পড়ে। ইহার দৃষ্টান্ত দেখিবার জন্য অনেক দূরে যাইতে হইবে না। নববিধানস্থ বন্ধুগণ যে আপনাদেরই মধ্যে মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারিতেছেন না তাহার কারণও এই। তাঁহাদের মধ্যে অনেক সাধনশীল ধর্ম্মানুরাগী ও ত্যাগী পুরুষ আছেন, যাঁহারা সমবেত হইলে কত মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারেন। কিন্তু বৃথা বিবাদে তাঁহাদের অধিকাংশ শক্তি ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। ইহার কারণ কি? কারণ এই, মহাত্মা কেশব চন্দ্রের পরলোক গমনের পর তাঁহারা এমন কোন প্রতিভাশালী পুরুষ পাইতেছেন না যাঁহার নেতৃত্বাধীনে তাঁহারা সকলে হৃষ্টচিত্তে সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারেন। অথচ দশ জনে মিলিত হইয়া নিয়ম-তন্ত্র প্রণালী অনুসারে যে কার্য্য করিবেন তাহারও উপায় নাই। নববিধানাচার্য্য মহাশয় সে পথ বন্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি আপন দলস্থ লোকদিগকে নিয়ম-তন্ত্র প্রণালীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে শিখাইয়া গিয়াছেন। প্রতিভাশালী ব্যক্তির নেতৃত্ব নাই, নিয়মতন্ত্র প্রণালীও নাই, ইহার ফল যাহা ঘটিতে পারে তাহাই ঘটিতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের মধ্যে যে মতদ্বৈধ নাই তাহা নহে। আমাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আছে; তাঁহারা বিশেষ বিশেষ ভাবাপন্ন। মত ও ভাবে এক দলের সহিত অন্য দলের অনেক অনৈক্য আছে, তথাপি নিয়মতন্ত্র প্রণালী থাকাতে এই সমুদয় দল একত্র থাকিয়া কার্য্য করিতে পারিতেছেন। নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে ইহাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছে যে, পরস্পরের মত ও ভাবের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। এবং ইহাও শিখাইয়াছে যে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য কোন এক বিশেষ ব্যক্তির বা বিশেষ দলের নহে, কিন্তু সকলেরই কার্য্য। এই উভয় শিক্ষার গুণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ একত্র সম্বদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে পারিতেছেন।

সমাজসংস্কার—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি সমাজ সংস্কার বিষয়ে ইহার সভ্যদিগের বিশেষ মনোযোগ দৃষ্ট হইতেছে। নারীগণের শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভের বিষয়ে ইঁহারা বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এজন্ত দেশের লোকের হস্তে ইঁহাদিগকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। ইঁহারা নারীগণের অবস্থার উন্নতি করিতে চান, এই অপরাধে পথে ঘাটে, বক্তৃতাস্থলে, রঙ্গভূমিতে ইঁহাদিগের কত প্রকার কুৎসা রটনা করা হইয়াছে। কিন্তু বিধাতার কৃপায় এই সমাজের সভ্যগণ আপনাদের অবলম্বিত সংস্কার পথ হইতে অদ্যাপি ভ্রষ্ট হন নাই। যখন দেশের সর্ব্বত্রই হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থান স্রোত প্রবাহিত, যখন দলে দলে লোক সকল প্রকার সংস্কারের বিরোধী হইতেছে, তখন কেবল এই সমাজের সভ্য-গণ অটল ও নির্ভীকচিত্তে সমাজ সংস্কারের নিশান উড্ডীন রাখিয়াছেন। ইহা চিন্তা করিলেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা যে দেশের মহোপকার সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা অনুভব করিতে পারা যায়। এই সমাজ জীবিত না থাকিলে আজ বঙ্গদেশের নাম ভারতে ডুবিয়া যাইত, এবং বাঙ্গালীগণ ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাৎবর্ত্তী জাতি বলিয়া পরিগণিত হইত। এইতো গেল গুণের কথা, দোষের কথাও কিছু আছে। প্রথম:—

ধর্ম্মসাধনে ঔদাসীন্য—প্রধানতঃ দুইটী বিষয় ধরিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নাম হইয়াছিল। (১) সমাজসংস্কার। (২) নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপন। বাল্য বিবাহের প্রতিবাদ ও ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপন করিবার জন্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগকারিগণ, প্রধানতঃ উৎসাহী হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই, বিগত পঞ্চদশ বর্ষকাল সেই আদিম ভাবই প্রবল দৃষ্ট হইয়াছে। সমাজসংস্কার ও নিয়ম-

তন্ত্র প্রণালী, এই দুইটী বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের যেরূপ উৎসাহ দেখা গিয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং ব্রাহ্মসমাজ ও জনসাধারণের সেবা বিষয়ে সেরূপ উৎসাহ দৃষ্ট হয় নাই। ইহার প্রমাণ হস্তের নিকটই আছে। পোনের বৎসরের মধ্যে ইহার সভ্যগণ নিয়মাবলী প্রণয়ন, সংশোধনাদি বিষয়ে যেরূপ পরিপক্কতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এত কালের মধ্যে অনেক গবর্ণমেণ্টও এত নিয়ম প্রণয়ন করেন নাই। নিয়মতন্ত্র প্রণালীর ব্যবস্থাটা যাহাতে সুন্দর ও উন্নত হয় সে বিষয়ে সভ্যদিগের মনোযোগের কোন দিন ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে এমনই মনোযোগ যে প্রচারক সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে; এবং যে অল্পসংখ্যক আছেন তাঁহাদিগকেও প্রতিপালন করা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। আবার এই নিয়মতন্ত্র প্রণালীর ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, ইহার যে মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের হৃদয়ে ভাল করিয়া বসে নাই। তাঁহারা যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন নিয়মতন্ত্র প্রণালীর এই অর্থ বুঝিয়াছিলেন যে, ব্যক্তিগত প্রভুত্বকে দমনে রাখা। তাঁহারা মনে মনে বলিয়াছিলেন "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশব বাবুর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব, কিন্তু আমাদের মধ্যে এরূপ হইবে না; আমরা নিয়মতন্ত্র প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিব অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রাধান্যকে সর্ব্বদা শাসনে রাখিব।" দুঃখের বিষয়, এই ভাব এখনও অনেকের মনে প্রবল রহিয়াছে। এবং এই ভাব প্রবল থাকাতেই সমাজের আধ্যাত্মিক কার্য্যের অনেক ক্ষতি হইতেছে। পরস্পরের সহায়তা করা অপেক্ষা পরস্পরকে দখলে রাখার দিকে অধিক দৃষ্টি দেখা যাইতেছে। নিয়মতন্ত্র প্রণালীর উদ্দেশ্য আমরা এই বুঝি যে, পরস্পরের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে সমবেত করিয়া প্রভু পরমেশ্বরের সেবাতে নিয়োগ করা; পরস্পরের বিরোধী হইয়া শক্তিক্ষয় করা দূরে থাক্, সত্য নির্দ্ধারণে, সত্য সাধনে ও সমাজের উন্নতি বিধানে পরস্পরের সহায় হওয়া ও পরস্পরকে সবল করা। কিন্তু আমাদের বিগত পঞ্চদশ বর্ষের কার্য্যে বোধ হইয়াছে যে, পরস্পরকে সবল না করিয়া বরং দুর্ব্বল করাই যেন আমরা নিয়মতন্ত্র প্রণালীর লক্ষ্য বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছি।

মানবশক্তির প্রাধান্য—নববিধানস্থ বন্ধুগণ 'বিধান, বিধান' করিয়া জগতকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ তাঁহাদের প্রতিবাদী, সুতরাং নিজেদের সমাজকে বিধান বলিতে যেন ভয় পান। ইঁহাদের কার্য্য দেখিলে এইরূপ বোধ হয়, যেন উঁহাদের সমাজে ঈশ্বর লীলা করুন, আর আমাদের সমাজে আমরাই লীলা করি। আমরা কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠন করিয়াছি, আমরা অধ্যক্ষ সভা নিয়োগ করিয়াছি, আমরা প্রচারক গ্রহণ, শাসন ও বর্জ্জন করিতে পারি। আমরা, আমরা, আমরা, সর্ব্বত্রই আমরা। এই উৎকট অহংভাব নিবন্ধন কার্য্যের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। আমাদের সমাজের সভ্যগণই স্বীয় সমাজকে বিশ্বাস ও নিষ্ঠার চক্ষে দেখিতে পাইতেছেন না, ইহার জন্য স্বার্থত্যাগকে ঈশ্বরের জন্য স্বার্থত্যাগ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছেন না! চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে, যে এই কারণেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য তেমন করিয়া জমিতেছে না।

এসকল পুরাতন কথা, অনেক বার বলা হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসবের প্রাক্কালে সকলের আলোচনার্থ আর একবার উপস্থিত করা গেল। আশা করি সভ্যগণ প্রশান্তচিত্তে এসকল বিষয় আলোচনা করিবেন এবং এই সকল অভাব মোচনার্থ ব্যাকুলচিত্তে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবেন।

নিষ্ঠা।

বিগত ২৪শে বৈশাখ রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক বিবৃত উপদেশ।

তিন প্রকার বন্ধনে ধর্ম্মসমাজে নরনারীগণ সংযুক্ত থাকেন। মতের বন্ধন, সাধনের বন্ধন এবং সামাজিকপ্রেমের বন্ধন। মত, সাধন ও সমাজপ্রেম এই তিন বিষয়েই যাঁহার নিষ্ঠা আছে, সাধ্য কি কোনও প্রলোভন তাঁহাকে ধর্ম্মসমাজ হইতে ভ্রষ্ট করে? অটল অচল পর্ব্বতের ন্যায় তিনি সকল নির্য্যাতন, অপমান সহ্য করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে থাকেন। এমন কি ধর্ম্মরক্ষার জন্য বিরোধীদিগের হস্তে প্রাণদান করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন না।

হিন্দুসমাজের সাধনপ্রণালীতে বহুপ্রকার ভিন্নতা থাকা সত্বেও মতে তাঁহারা একীভূত। খৃষ্টীয় রোমানক্যাথলিক সম্প্রদায়েও ঐরূপ দেখা যায়। রোমানক্যাথলিকদিগের মধ্যে সাধনের ভিন্নতা আছে; কিন্তু মূল ধর্ম্মমতের ভিন্নতা নাই। বৌদ্ধসমাজে এই মূল মতের একতা দেখা যায় না—একদল বৌদ্ধ ঈশ্বরবাদী, একদল নিরীশ্বর; কিন্তু তাহাদের সাধনে কোনও বিভিন্নতা নাই। মুসলমানদিগের মতে ও সাধনে কিছু কিছু ভিন্নতা থাকা সত্বেও সমাজের প্রতি প্রত্যেক মুসলমানের অবিচলিত প্রেমে সকলকে একীভূত করিয়া রাখিয়াছে। যদিচ ধর্ম্মসমাজ সুদৃঢ় রাখিবার জন্য এই তিন শক্তিরই প্রয়োজন, কিন্তু অভাব পক্ষে কোনও একটিতে বিশেষ নিষ্ঠা না থাকিলে সমাজ তরু দণ্ডায়মান থাকিতেই পারে না। ব্রাহ্মসমাজ এই ত্রিবিধ শক্তিরই সমন্বয় প্রদর্শন করিবেন। ব্রাহ্মগণ শুধু মতে, কিম্বা সাধনে অথবা সামাজিক প্রেমে আকৃষ্ট হইলে আদর্শ ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হইবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন পূর্ণাঙ্গ, সমাজও তেমনি পূর্ণাঙ্গ হইবে। ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু, কিম্বা খ্রীষ্টান অথবা বৌদ্ধসমাজের ন্যায় গঠিত হইলে, ঐ সকল সমাজের মধ্যে যে সমুদয় অভাব ও অপূর্ণতা রহিয়াছে সে সকল অভাব ও অপূর্ণতা এ সমাজেও থাকিয়া যাইবে। অতএব মতে, সাধনে ও প্রেমে ব্রাহ্মগণ একীভূত হইয়া যাইবেন এবং আদর্শ সমাজ গঠন করিয়া তদনুকরণে জগতের প্রবৃত্তি জন্মাইবেন।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে দেখা যায়, মতের বন্ধন ছিন্ন হওয়াতেই "আদি" ও "ভারতবর্ষীয়" দুইটি দল গঠিত হইয়া-

ছিল। পুনরায় পরস্পর যেই কিছু মতের অমিল হইল, অমনি শেষোক্ত সমাজ ভাঙ্গিয়া দুটি হইল; কিন্তু আজ কাল ব্রাহ্মসমাজে সাধনের ভিন্নতা উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে এরূপ ঘটনা এই নূতন। ব্রাহ্মসমাজের মূল মত অতি পবিত্র, অপরিবর্ত্তনীয়। আনুষঙ্গিক কোন কোনও বিষয় পরিবর্ত্তিত কিম্বা পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। জীবে ব্রহ্মে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, আত্মার অনন্ত উন্নতি ইত্যাদি মূল মতগুলি অভ্রান্ত ও অপরিবর্ত্তনীয়। এই মতানুসারে সাধন অবলম্বন করিতে গিয়াই ব্রাহ্মগণ অভ্রান্ত গুরুবাদ, অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ প্রভৃতির অলীকতা দেখিতেছেন এবং সে সকল পরিত্যাগ করিতেছেন। যাহাতে লক্ষ্যপথে যাইতে বাধা জন্মায় এবং ধর্ম্মসমাজের জীবন্ত শক্তিকে বিনাশ করে, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। এই জন্যই ব্রাহ্মগণ অনেক পূর্ব্ব সংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন। সাধন সম্বন্ধেও এই কথা। ব্রাহ্মসমাজের সাধনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। সাধকের প্রাণে যতই ঈশ্বর লাভের পিপাসা বলবতী হইবে, ততই সাধন-কামনা পূর্ণ করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বিত হইবে। কিন্তু ব্রহ্মসাধনের মূল প্রণালী—স্বরূপ-সাধন, চিরদিন অব্যর্থ থাকিবে। ব্রহ্ম অপরিবর্ত্তনীয় নিত্যপুরুষ, তাঁহার স্বরূপও অপরিবর্ত্তনীয়, নিত্য। এখন আমরা তাঁহাকে সত্য, জ্ঞান, প্রেম, আনন্দ, পুণ্য বলিতেছি, কোটি কোটি বৎসর পরও সাধকগণ এই কথাই বলিবেন। তিনি কখনও অসত্য, অপ্রেম হইবেন না—পাপাবহ হইবেন না; তিনি চিরদিনই সত্যং জ্ঞানমনন্তং, শান্তং মঙ্গলং এবং ধর্ম্মাবহ পাপনুদং। সুতরাং আরাধনা সাধনে—স্বরূপসাধনে যাঁহারা একনিষ্ঠ হইবেন না, তাঁহারা বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান হইতে বাস্তবিকই বঞ্চিত থাকিবেন। একদিকে যেমন জীব ও ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিষয়ে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে হইবে, তেমনি স্বরূপ সাধনে একনিষ্ঠ হইতে হইবে। স্বরূপ সাধনে বিশেষ রূপ রত না থাকিলে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান ম্লান হয়, এবং সেই অবস্থাতেই সাধক কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা এবং মধ্যবর্ত্তি বাদের অন্ধকারে পতিত হইয়া থাকেন। তরঙ্গায়িত সাগর-বক্ষে নিমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে ভেলা যেমন জীবন রক্ষার উপায় স্বরূপ, এই কুসংস্কার এবং পাপ মোহময় সংসারে ভগবানের স্বরূপ সাধন তেমনি আমাদের একমাত্র আশ্রয়-সেতু। দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিক যেমন ধ্রুব নক্ষত্র লক্ষ্য করিয়া সমুদ্রে গমন করে, তেমন আমরাও ভগবানের স্বরূপ মনন, চিন্তন, করিয়া ভবসমুদ্রে গন্তব্য পথের অনুসরণ করিব।

একদিকে যেমন মত ও সাধনে নিষ্ঠা থাকিবে, অপর দিকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তেমন প্রীতি থাকা বাঞ্ছনীয়। ব্রাহ্মসমাজকে যিনি প্রাণের সহিত ভাল বাসিতে পারেন না, সাধনে ও মতে তিনি কখনও সুদৃঢ় থাকিতে পারিবেন না। যাঁহাদের ভগবানে প্রেম জন্মিয়াছে, তাঁহারাই মানবপ্রেমিক হইতে পারেন। অতএব মত, সাধন এবং সমাজপ্রেম এই তিন অঙ্গে ব্রাহ্মদিগকে পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন, "আগে নিজের পরিত্রাণ, তারপর সমাজ। আমার পরিত্রাণের উপায় অন্বেষণ না করিয়া কি সমাজের চিন্তা করিতে পারি?" কিন্তু তাঁহারা একবার স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে একথার অসঙ্গতি দোষ সহজেই অনুভব করিতে পারেন। যদি বিশ্বাস করেন যে, বর্ত্তমান সময়ে জীবের পরিত্রাণের জন্য প্রভু পরমেশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়াছেন, তবে সমাজ ও নিজের মধ্যে সীমা স্থাপন করিতেছেন কেন? যাহাতে আমার পরিত্রাণ, আমার আত্মীয় স্বজনের ও সেই উপায়েই পরিত্রাণ হইবে। আপন পরের পার্থক্য ভুলিতে না পারিলে ধর্ম্মের নিগূঢ় মহিমা বুঝিতে পারা যায় না। অন্যের পরিত্রাণের উপায় না করিলে, নিজের পরিত্রাণ হইবে না, একথার রহস্য অনেকে চিন্তা করেন না। যিনি কেবল নিজকে লইয়া ব্যস্ত, তিনি আত্মপরায়ণ। এই আত্মপরায়ণতার জাল ছিন্ন করিয়া সমাজপ্রেম সাধন না করিলে মুক্তি নাই, ঈশ্বরের সহবাসে থাকিবার উপায় নাই। পরমেশ্বর আমাদের কৃপা করুন, মতে, সাধনে এবং সমাজপ্রেমে দিন দিন অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার মহিমা ঘোষণা করুন।

নির্জ্জন-চিন্তা।

(জনৈক মহিলা লিখিত)

দেখ দেব! শোক আসিয়া যখন প্রাণের প্রিয়বস্তুগুলি হরণ করিবে, তখন যেন অধীর হইয়া তোমা হইতে দূরে গিয়া না পড়ি। বরং শোকের মধ্যেই যেন সুখের চিহ্ন দেখিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারি। আমার প্রাণের দেবতা, তুমি যে ক্লেশ দিবে তাহা সহ্য করিতে পারিবনা? এত অপ্রেমিকের কথা! তুমি প্রিয়তম! তুমি যে ক্লেশ দিবে তাহা সহ্য করিব না, তবে আমার তোমার প্রতি প্রেম কি? শুধু কি শোক, তাহা ছাড়া আরও কঠোর হইতে কঠোরতম যত ক্লেশ হইবে, সকলি অকাতরে সহিব, তবেত প্রকৃত প্রেমিকের কার্য্য হয়! তবে দেব, তবে এই প্রার্থনা—হৃদয়ে সেই বল দাও যাহাতে প্রবল বন্যার ভীমস্রোতে অতলে মগ্ন না হই, যেন তোমা হইতে বিচ্যুত না হই।

দেখ দেব! আমার কি শোচনীয় দশা! "হৃদয় থাল ভরি, ভক্তি পুষ্পহার" লইয়া আমি তোমার নিকট যাই, তোমার ধ্যানে মনকে নিয়োজিত করি, হঠাৎ একি হইল, যাহা তোমাকে দিতে আসিয়াছিলাম তাহা যে আমাকে আমি অর্পণ করিলাম! তোমার নাম করিতে নিজেরই নাম করি—তোমার গুণ গান করিতে নিজেরই গুণ গান করিয়া ফেলি; প্রাণ জুড়াইতে আসিয়া প্রাণের দাবানল প্রজ্জ্বলিত করি; পুণ্য প্রেমে ভূষিত হইতে আসিয়া পাপে তাপে বিদগ্ধ হই। দেব, রক্ষা কর; এ দুর্দ্দশা হইতে আমাকে উদ্ধার কর।

প্রহরী যখন চোরের হস্ত বাঁধিয়া লইয়া যায়, তখন সেই চোরের কেমন একটা ভয়াবহ ঘন নৈরাশ মিশ্রিত অবস্থা হয়; বিষাদে তাহার মুখ বিষন্ন হয়, প্রাণ দারুণ অনুতাপাগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকে। ধরা পড়িয়াছে, আর রক্ষা নাই, এই ভয়ে সে মৃতপ্রায় হয়। সেইরূপ যখন বিবেক প্রহরী আসিয়া পাপকে

ধরিয়া ফেলে তখন পাপেরও ওইরূপ অবস্থা হয়, তখন দীনতা আসে, আত্মগ্লানি আসে, আত্মদৃষ্টি প্রখর হয়।

এমনও দেখা যায়, কত প্রচণ্ড দস্যু কারাবাসের ভীষণ যাতনা ভোগ করিয়া সকল দুষ্কর্ম্ম পরিত্যাগ করে। সেইরূপ এই বিবেক প্রহরীর আক্রমণে অনেক ঘোর পাপী মহাসাধু হইয়া জগতের কল্যাণ করিতে থাকে।

মন সংশয় যুক্ত হইলে, বিশ্বাস টলটল করিলে, ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট হইবার উপক্রম হইলে, জগতের সাধু মহাজনদিগের জীবন অনুধ্যান করি। পাপীর উদ্ধার কিরূপে হইয়াছিল তাহাই স্মরণ করি, তখন প্রাণে দুর্জ্জয় বল প্রাপ্ত হই, সমস্ত সংশয় ছেদ হইয়া যায়।

মানবের চক্ষের সম্মুখে তাঁহার অতুল প্রেমচ্ছবি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। পিতার অতুল ভালবাসায় তাঁহার পিতৃভাব, মাতার অপার্থিব স্নেহে তাঁহার মাতৃত্বের পরিচয় এবং বিশ্বপ্রেমিকতায় তাঁহারই অনন্ত প্রেমের নিদর্শন। তাই সাধক বিহ্বলচিত্তে বলেন, তুমি পিতা, তুমি মাতা, পরিত্রাতা।

সেই বিবাহে প্রকৃত ফল প্রসব করে এবং তাহাই প্রকৃত বিবাহ, যাহার উদ্দেশ্য থাকে জগতে প্রকৃত সাধু মহাত্মা ও মনস্বিনীর আবির্ভাব হইবে—তাহাদের দ্বারা পরমেশ্বরের নাম জয়যুক্ত হইবে—জগতের কল্যাণ হইবে। সেরূপ সংকল্প লইয়া কেহ যদি বিবাহ করিতে প্রস্তুত থাকেন তিনি নমস্য।

সকল বাসনার সমাধি হউক। কেবল একটি বাসনা বলবতী হউক, যাহাতে নবজীবন লাভ করি। সকল আশার ধ্বংস হউক হে প্রভো, কেবল তোমার আশা প্রাণের একমাত্র সম্বল হউক।

পাপই মোহ, মানুষ সুখ সরোবর ভাবিয়া তাহাতে ঝাঁপ দেয়, কিন্তু চিরসুখের পরিবর্ত্তে চিরদুঃখ পায়।

আমার অন্তরে যত কিছু কু আছে সে সকল পৃথিবীর দ্রব্য। পৃথিবীর মলিনতা আমাকে কলঙ্কিত করে। আমি মহান অনন্ত পুণ্যের সন্তান—আমার উপর পৃথিবীর কু রাজত্ব করিবে? কে বড়? পৃথিবীর কু বড় কি আমার সু বড়? কুর সহিত সংগ্রাম করিয়া আপনাকে জয়যুক্ত করিতে হইবে। তা না হইলে ঈশ্বরের সন্তান নামে পরিচয় দিতে পারিব না।

ঈশ্বরকে ডাকিবার শ্রেষ্ঠ পথ কাতর ব্যাকুলতা। যখনি প্রাণ শূন্যভাবে হাহাকার করে, তখনি বুঝি তাঁহাকে ডাকিবার সুসময় উপস্থিত হইয়াছে। যখন নিরাশ অবসন্ন শূন্যহৃদয়ে চতুর্দ্দিক শূন্য দেখি, তখন তাঁহাকে ডাকিবার সুসময়।

তাঁহার করুণার বিশেষ চিহ্ন আত্মপ্রসাদ ও নির্ম্মল সুখ।

যখন কোন পাপে পড়িবার উপক্রম হইবে, প্রকৃত অনুতাপের সহিত প্রার্থনা করিব।

যিনি ঈশ্বর-প্রত্যাশী তিনি তাঁহার চিত্তের প্রতি সতত প্রখর দৃষ্টি রাখেন। অজ্ঞাতসারে যদি সামান্য পাপ তাঁহাকে আক্রমণ করে, বিবেক অমনি দংশন করিতে থাকে। তাঁর নিকট বিবেক সর্ব্বদা দণ্ড লইয়া বসিয়া আছে, যখনি একটু ক্ষুদ্র পাপ হইবে, বিবেক আত্মগ্লানিরূপ শাণিত ছুরিকা হৃদয়ে বিদ্ধ করিতে থাকে, সে তীক্ষ্ণ আঘাতে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রভূত কল্যাণ হয়।

মৃত্যু এক এক সময় আসিয়া সম্ভাষণ করিয়া যায়, "আমি আসিতেছি, আসিতেছি, প্রস্তুত থাক।" অতি সুমিষ্ট স্বরে বলিয়া যায় "আমিই অমৃতের দিকে লইয়া যাইব, অনন্তের পথ দেখাইয়া দিব, তুমি নির্বিঘ্নে চলিয়া যাইবে, ভয় কি? জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে দেখিবে, দেখিবে আমি কত কোমল।"

পঞ্জাব প্রচারযাত্রীদিগের পত্র।

আমরা লক্ষ্ণৌ হইতে রওনা হইয়া ৪ঠা এপ্রিল হরিদ্বারে পৌঁছি। এখানে পঞ্জাবী বন্ধু শ্রীযুক্ত সুন্দর দাস ভল্লা আমাদিগকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেন। মধ্যাহ্নে তাঁহার গৃহে হিন্দিতে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে আমরা হরিদ্বারের হিন্দুতীর্থস্থান দর্শন করিতে যাই। এ স্থান পরম রমণীয়। পর্ব্বতের পাদমূলে বেগবতী গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে। এ স্থান হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থস্থান। ভারতবর্ষের নানা দেশবাসী হিন্দুগণের এখানে সমাগম হইয়া থাকে। বিহার, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের লোকই অধিকাংশ। যোগী, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই এখানে স্নান করিতে আগমন করেন। আমরা এখান হইতে পাকরী নামক স্থানে শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবদাস ভল্লার আলয়ে গমন করি। তথায় উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব উপাসনা করেন এবং গীতার একটী শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ দেন।

লাহোর।

৬ই এপ্রিল—প্রাতঃকালে আমরা লাহোর পৌঁছি। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রায় ৩০ জন সভ্য আমাদিগের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনেক দিন হইতে তাঁহারা আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, অদ্য এই সম্মিলনে তাঁহারা সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইলেন। আমরা বন্ধুবর বাবু অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভবনে সাদরে গৃহীত হইলাম। অপরাহ্নে ব্রাহ্মবন্ধুদিগের সহিত কথা বার্ত্তা হয়।

৭ই এপ্রিল—এখানে "সৎসঙ্গ" বলিয়া একটি সভা আছে। তাহাতে ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা হইয়া থাকে। অদ্য তাহার অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়—"ঈশ্বরের অস্তিত্ব"। শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি সত্তাবাদ (Ontological argument), কারণবাদ, (Causal argument), কৌশলবাদ (Design argument) এবং বিবেকবাদ (Moral argument) এই চারি প্রকারের যুক্তি দ্বারা আলোচ্য বিষয়টি অতি সুন্দর রূপে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দিলেন।

৮ই এপ্রিল—অপরাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে ধর্ম্মবিষয়ে কথা বার্ত্তা হয়। একজন পুত্রশোকার্ত্ত ব্যক্তি "শান্তিলাভের উপায় কি?" এই প্রশ্ন করেন। শাস্ত্রী মহাশয় শাস্ত্রের বিবিধ বচন উদ্ধৃত, এবং নিজের ও অপরের জীবনের পরীক্ষিত সত্য সকল বিবৃত করিয়া মানব জীবনের প্রকৃত শান্তির উপায় অতি বিশদরূপে নির্দ্দেশ করেন।

৯ই রবিবার—মধ্যাহ্নে সম্মিলনী (কনফারেন্স) হয়; আলোচ্য বিষয়—সাধনমণ্ডলী (Brahmo Workers' Shelter) গঠন। এখানে কিরূপে একটি সহায় দল সংগঠিত হইতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হইয়া সহায়দল গঠনের প্রস্তাব স্থির হয়। সায়ংকালে শাস্ত্রী মহাশয় মন্দিরে উপাসনা করেন। পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দেন। এই উপদেশে তিনি সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রকে দেশভ্রমণকারীদিগের গাইড্ বুকের সহিত তুলনা করেন। যদি কেহ ঘরে বসিয়া কেবল গাইড্ বুক পড়ে ও নিজে দেশ ভ্রমণ না করে, তাহার যে দশা হয়, যে ব্যক্তি কেবল শাস্ত্রে ধর্ম্মের কথা পড়ে, কিন্তু নিজে সাধন না করে, তাহারও সেই দশা হয়।

১০ই, সোমবার—সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে স্থানীয় বাঙ্গালীদিগের এক আলোচনা সভা হয়।

১১ই, মঙ্গলবার—সায়ংকালে মন্দিরে ইংরাজীতে উপাসনা ও উপদেশ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপদেশের বিষয় "ব্রহ্মোপাসনার আবশ্যকতা"।

১২ই, বুধবার—স্থানীয় ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত গিরিধর রায় মহাশয়ের ভবনে সায়ংসমিতি হয়।

১৩ই, বৃহস্পতিবার—সায়াহ্নে মন্দিরে শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় "বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ চিহ্ন"।

১৪ই, শুক্রবার—সৎসঙ্গের অধিবেশন হয়, আলোচ্য বিষয় "নীতিশিক্ষা"। শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১৫ই শনিবার—সায়ংকালে মন্দিরে বাঙ্গালায় উপাসনা হয়, শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। "ধর্ম্ম যদি আত্মার অন্নপানের অভাব দূর না করে, ও জীবনকে পরিবর্ত্তিত না করে, তবে তাহা ধর্ম্মই নয়" এবিষয়ে উপদেশ দেন।

১৭ই, সোমবার—প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু তারাপ্রসন্ন দত্ত মহাশয়ের গৃহে উপাসনা হয়, শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন। সায়ংকালে শ্রীযুক্ত বাবু রামনারায়ণ সরকার মহাশয়ের গৃহে সায়ংসমিতি হয়।

১৮ই, মঙ্গলবার—পঞ্জাবের সর্দার (Chief) দিগের শিক্ষার জন্য এখানে "Chiefs' College" নামে একটি কলেজ আছে। প্রাতে আমরা উক্ত কলেজের জনৈক শিক্ষক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কলেজ পরিদর্শন করিতে যাই। কলেজের সহিত একটি বোর্ডিং আছে, শিক্ষার্থীগণ এই বোর্ডিংএ থাকে। এই বোর্ডিংএর নিয়মাদি এবং শিক্ষার্থীদিগের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার বন্দোবস্ত দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। এই কলেজ ও বোর্ডিং দ্বারা পঞ্জাবের সরদারদিগের শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই কলেজ গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানাধীন।

অপরাহ্নে মন্দিরে ইংরাজি ভাষায় উপাসনা হয়, শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" উপনিষদের এই শ্লোক উল্লেখ করিয়া উপদেশ দেন।

১৯এ, বুধবার—সায়ংকালে মহেন্দ্রনাথ সরকার নামক এখানকার একজন বাঙ্গালি বাবুর গৃহে "জগাই মাধাই উদ্ধার" সম্বন্ধে বাবু হরিমোহন ঘোষাল কথকতা করেন। কথকতায় মধ্যে মধ্যে সংকীর্ত্তনও হইয়াছিল।

২১এ, শুক্রবার—সায়ংকালে শাস্ত্রী মহাশয় মন্দিরে "চরিত্রের শাসন" বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

২২এ, শনিবার—সায়ংকালে মন্দিরে ইংরাজী বক্তৃতা হয়। বক্তা শাস্ত্রী মহাশয়, বিষয়—"ব্রাহ্মসমাজ ও ইহার কার্য্য।" তিনি বক্তৃতাতে ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য ও ইহা দ্বারা কি কি কার্য্য হইয়াছে সংক্ষেপে অতি স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া দেন।

২৩এ, রবিবার—প্রাতে শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ মন্দিরে উর্দ্দুতে উপাসনা করেন। অপরাহ্নে স্থানীয় শিক্ষা-সভা হলে বঙ্গসাহিত্য সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজীতে শিক্ষা সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটী বক্তৃতা করেন। সায়ংকালে ভাই প্রকাশদেব মন্দিরে উর্দ্দুতে উপাসনা করেন। "জীবনে ধর্ম্মলাভ করা চাই" এ বিষয়ে উপদেশ দেন। তাঁহার ভাবের উচ্ছ্বাস ও ভাষার লালিত্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

২৪এ, সোমবার—বাবু তারণচন্দ্র দাস মহাশয়ের গৃহে উপাসনা হয়; শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। "যোবৈ ভূমা তৎ সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি" উপনিষদের এই শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া একটি সারগর্ভ উপদেশ দেন।

স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় উৎসাহী সভ্য সাধনাশ্রমের সহিত বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তাঁহাদিগকে লইয়া একদিন উদ্যান-সম্মিলন হয়। তথায় শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রীমহাশয় সাধনাশ্রমের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী বর্ণন করেন। তৎপর তাঁহাদের অনেকে ইহার "সহায়" (Helpers) শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন। এই জন্য ২৬এ তারিখে ভাই গিরিধর রায়ের গৃহে বিশেষ উপাসনা হয়। উপাসনান্তে শাস্ত্রী মহাশয় সাধনমণ্ডলী সম্বন্ধে অনেক উপদেশজনক কথা বলেন। তদনন্তর কয়েকজন ভদ্র মহোদয় ও ভদ্রমহিলা সহায়শ্রেণীভুক্ত হন।

এবার পঞ্জাবস্থ বন্ধুগণের সহিত আমাদের প্রাণের বিশেষ যোগ সংস্থাপিত হইয়াছে। ভগবানের করুণাতে এরূপেই তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সন্তানদিগের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়া থাকে। এখানকার ব্রাহ্মবন্ধুদিগের উৎসাহ অনেক গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কয়েক জন নূতন লোক ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তত্ত্বকৌমুদী ও মেসেঞ্জারের কয়েকজন গ্রাহক হইয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন প্রাপ্য চাঁদা প্রভৃতি প্রায় ৮০৲ টাকা আদায় হইয়াছে। একজন মহিলাপ্রদত্ত ১০০৲ শত টাকা দান সাধনাশ্রমে প্রেরিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সর্দ্দার দয়াল সিংহ মহোদয় পঞ্জাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমাদের পাথেয় ব্যয়ের সাহায্যার্থ ২২০৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা পঞ্জাববাসী ভ্রাতা ভগিনীদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়া ২৭শে এপ্রিল অমৃতসর যাত্রা করি।

পঞ্জাব প্রদেশে অমৃতসর একটী প্রধান স্থান। এখানে রণজিৎ সিংহ "হরমন্দির" নামে সুবিখ্যাত এক স্বর্ণমন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দির অমৃতসর নামক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার মধ্যস্থলে স্থাপিত। মহাত্মা নানকের শিখধর্ম্ম পঞ্জাবে কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, এই হরমন্দির দর্শন করিলে

তাহা সহজেই অনুভূত হয়। এই মন্দিরে দিন রাত্রি প্রায় ২৪ ঘণ্টাই (রাত্রি তিনটা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দিন এবং রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত) ধর্ম্মালোচনা, ভজন (সঙ্গীত) ও পাঠ হইয়া থাকে। এই ভজন ও পাঠাদিতে এক অদ্বিতীয়, মহান্ পরমেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন হয়। একেশ্বর বাদের পবিত্রতা রক্ষার জন্য গুরু নানকের যে কিরূপ প্রাণগত ইচ্ছা ছিল, তাহা এই ভজন ও পাঠাদি শ্রবণ করিলেই বুঝা যায়। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, নানকের সেই পবিত্র ধর্ম্মও এখন গ্রন্থ-পূজায় ও নানারূপ কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছে। মন্দিরে পাঠ ভজনাদির নিয়ম সমূহ বৃত্তিভোগী সেবক ও পুরোহিতগণ দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। দিবারাত্রি শত শত নরনারী এই মন্দির দর্শন ও প্রদক্ষিণ করিতেছে; ইহাদের অধিকাংশই শিখ। ইহাদের ধর্ম্মালোচনা এবং লোক সমাগমের স্রোত দর্শন করিলে মনে আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হয়। এখানে একটি দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখিলাম; সেটী ইহাদের নরসেবার ভাব। আপনি ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছেন, অমনি হয়ত একজন আসিয়া আপনাকে পাখার বাতাস দিতে লাগিল। এরূপ বিনয় ও সেবা সকলেরই অনুকরণীয়।

আমরা অমৃতসর হইতে দিল্লী যাত্রা করি। এখানে বাবু হেমচন্দ্র সেন ডাক্তার মহাশয় তাঁহার গৃহে একদিন আমাদিগকে আহ্বান করেন। সেখানে সঙ্গীতাদি হয়। শাস্ত্রী মহাশয় উপনিষদের একটী শ্লোক অবলম্বন করিয়া উপদেশ দেন। স্থানীয় আরও কয়েকজন বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন।

পর দিবস আমরা আগ্রা সহরে গমন করি। এখানে আমাদের বন্ধু বাবু নীলমণি ধর মহাশয় বাস করেন। আমরা তাঁহারই গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করি। মধ্যাহ্নে পারিবারিক উপাসনা হয়, শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন। অপরাহ্নে ডাক্তার বাবু অমূল্যরতন বসাকের গৃহে উপদেশ, সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি হয়। শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রায় ৫০ জন বাঙ্গালী ও কয়েকজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

৩রা মে—প্রাতে নীলমণি বাবুর গৃহে উপাসনা হয়, শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন। আমাদের এই দৈনিক উপাসনায় আমরা দিন দিন ভগবানের কৃপা অধিকতর অনুভব করিতেছি। অপরাহ্নে স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজ গৃহে এক সভা হয়। স্কুল কলেজ বন্ধ থাকাতেও শতাধিক শিক্ষিত লোক উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ একটি হিন্দি সঙ্গীত হয় তৎপর ভাই প্রকাশ দেব উদ্দুতে সংক্ষেপে অথচ উজ্জ্বলরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন; তৎপর শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজীতে তৎসম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। সর্ব্বশেষে আর একটি সঙ্গীত হয়। এখানকার লোকে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে একরূপ কিছুই অবগত নহে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তাঁহাদের মনোযোগ ও একাগ্রচিত্ততা দেখিয়া বোধ হইল বক্তব্য বিষয়ের প্রতি তাঁহারা আকৃষ্ট হইয়াছেন। বক্তৃতান্তে সবজজ লালা বৈজিনাথ বক্তাদ্বয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, বক্তৃতা অতি সারগর্ভ হইয়াছে, সকলেরই উচিত, যে এই উপদেশানুসারে জীবন পরিচালিত করেন।

এখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কতকগুলি বই বিক্রয় হয়, এবং কোন কোন উচ্চপদস্থ লোক নীলমণি বাবুর গৃহে আসিয়া আগ্রহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন। এস্থান ধর্ম্মপ্রচারের একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া মনে হয়। যত্নের সহিত কার্য্য করিলে এখানে সুফল ফলিতে পারে।

ব্রাহ্মসমাজ।

সেবা-সংবাদ—সাধনাশ্রম হইতে বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারার্থ বিক্রমপুরে গমন করিয়াছেন, যথাসময়ে এসংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বজ্রযোগিনী নামক গ্রামে উপস্থিত হইবার কিছুদিন পরে গ্রামস্থ অনেক লোক বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়, চণ্ডী বাবু প্রচারার্থ অন্য কোনও স্থানে গমন না করিয়া রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করেন। সংক্রামক ব্যাধি ক্রমশঃ ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এপর্য্যন্ত চৌদ্দ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এ সংবাদ পাইয়া সাঃ ব্রাঃ সমাজের দাতব্য বিভাগের সম্পাদক মহাশয় বাবু কুঞ্জবিহারী গুহ নামক একজন সেবার্থীকে কিছু ঔষধ সহ তথায় প্রেরণ করিয়াছেন। বিক্রমপুর নিবাসী ব্রাহ্মগণের নিকট অনুরোধ যে, তাঁহারা এসময় যথোচিত অর্থ সাহায্য দ্বারা উপকৃত করেন। "২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিস, দাতব্য বিভাগের সম্পাদক" এই ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইবেন।

পঞ্জাব প্রচার যাত্রীদল—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীপ্রমুখ পঞ্জাব প্রচার যাত্রীদল পথে বাঁকীপুর, বারাণসী, ফয়জাবাদ, লক্ষ্ণৌ এবং হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া লাহোরে উপনীত হন। তথায় প্রায় তিন সপ্তাহকাল তাঁহারা অবস্থিতি করিয়া ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দিতে উপাসনা, বক্তৃতা এবং আলোচনাদি করেন। প্রভু পরমেশ্বরের কৃপায় লাহোরের ব্রাহ্মভ্রাতাগণের নবোৎসাহ উদ্দীপ্ত হইয়াছে। কোন কোন নূতন লোক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। লাহোরে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মসমাজের সেবা এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে একটি সহায়দল সংগঠিত হইয়াছে। তাঁহারা প্রভুর আশীর্ব্বাদ মস্তকে গ্রহণ করিয়া নব উদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হউন, এই প্রার্থনা।

তথায় এসময়ে তত্ত্বকৌমুদী এবং মেসেঞ্জারের কয়েকজন গ্রাহক হইয়াছেন। একজন মহিলা ১০০৲ এক শত টাকা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন। লাহোরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য আমাদের বন্ধুবর সরদার দয়াল সিংহ মহাশয় বিশেষ মনোযোগী এবং উৎসাহী হইয়াছেন। লাহোরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থায়ী প্রচারক মণ্ডলী গঠনের জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। পরমেশ্বর তাঁহার এই শুভসংকল্পের সহায় হউন। তিনি পঞ্জাব প্রচার যাত্রীগণের পাথেয় ব্যয় স্বরূপ ২২০৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা পঞ্জাববাসী ভ্রাতা ভগিনীদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সাধনাশ্রম—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লাহোর অঞ্চলে গমন করায়, শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক পদে বৃত হইয়াছেন। তিনি আশ্রমে বাস করিয়া নিয়মিত উপাসনাদি করিতেছেন।

নামকরণ—বাবু কুঞ্জবিহারী সেনের প্রথম পুত্রের নামকরণ গত ২৮শে বৈশাখ সাধনাশ্রমে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্তানের নাম ধ্রুবজ্যোতি ব্রহ্মানন্দ রাখা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কুঞ্জবাবু সাঃ ব্রাঃ সমাজের প্রচার বিভাগে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

জাতকর্ম্ম—বাবু বঙ্কবিহারী বসুর গ্রেষ্ট্রীটের বাড়ীতে তাঁহার পঞ্চম সন্তানের (দ্বিতীয় পুত্র) জাতকর্ম্ম উপলক্ষে উপাসনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস উপাসনা করেন। বঙ্কবাবু সাঃ ব্রাঃ সমাজে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বাবু মধুসূদন সেনের দৌহিত্রের জন্ম উপলক্ষে গত ২৪শে বৈশাখ তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসাতে উপাসনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন ও সন্তানের পিতা শ্রীমান্ জ্ঞানেশরঞ্জন রায় প্রার্থনা করেন। পরমেশ্বর শিশুদিগের মঙ্গল বিধান করুন।

শ্রাদ্ধ—শ্রীমান্ লালমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাটী বিক্রমপুর, বজ্রযোগিনী গ্রামে। ইনি কলিকাতায় থাকিয়া অধ্যয়ন করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ইনি উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন। কয়েক দিন হইল ইঁহার পিতা পরলোক গমন করিয়াছেন, হিন্দু সমাজের আত্মীয় স্বজনগণ হিন্দুমতে শ্রাদ্ধাদি করিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করেন; কিন্তু গত ২৩শে বৈশাখ তিনি নিজ গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারেই পিতার আদ্যশ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। পরমেশ্বর পরলোকগত আত্মাকে শান্তিদান করুন এবং শ্রীমান্ লালমোহনের প্রাণে ধর্ম্মবল বিধান করুন।

দীক্ষা-সংবাদ—সোনাই চা বাগান হইতে বাবু ক্ষেত্রনাথ নন্দী লিখিয়াছেন;—"কিছুদিন পূর্ব্বে তত্ত্বকৌমুদীতে, আমাদের সুকবি আসামী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়। বিগত ১১ই বৈশাখ সোনাই চা-বাগান ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার আর দুইটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা, শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠপূর্ব্বক যথারীতি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে আমাদের বন্ধু বাবু মতিলাল হালদার উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনা ও দীক্ষার পর, তিনি সরল ও সুমিষ্ট ভাষায় ভ্রাতৃত্রয়কে তাঁহাদের নিজ নিজ জীবন ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য কি তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। আসামের ন্যায় শিক্ষা ও জ্ঞানালোচনা সম্বন্ধে এরূপ পশ্চাৎপদ প্রদেশে একটী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবার, কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন, ইহা ব্রাহ্মগণের পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ সন্দেহ নাই।"

বার্ষিক উৎসব—বগুড়া ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু যাদবচন্দ্র পাল লিখিয়াছেন,—বগুড়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবোপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় এখানে আগমন করেন। তিনি গত ৩১শে চৈত্র বুধবার এখানে পৌছেন। সেই দিন সূত্রাপুর ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় তিনি আচার্য্যের কার্য্য করেন। পর দিন ১লা বৈশাখ নববর্ষোৎসব উপলক্ষে উক্ত সমাজে দুইবেলা আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২রা বৈশাখ আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক উৎসব। এই উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা, সংগীত ও সংকীর্ত্তন হয়। প্রচারক মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্নে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও কিছু কিছু বলেন।

৩রা বৈশাখ বাবু শরদিন্দু ঘোষ মহাশয়ের বাসায় পারিবারিক উপাসনা হয়, শশী বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

৪ঠা বৈশাখ রবিবার দুইবেলা সমাজে উপাসনাদি হয়।

৫ই বৈশাখ সোমবার বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়।

৬ বৈশাখ অপরাহ্নে বগুড়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের উদ্বোধন হয়। সেই দিন হইতে ৯ই বৈশাখ রাত্রি পর্য্যন্ত উৎসব চলিয়াছিল। উৎসবে উপাসনা, সংগীত, সংকীর্ত্তন, পাঠ, আলোচনা এবং উপদেশাদি হইয়াছিল।

৮ই বৈশাখ প্রচারক মহাশয় টম্‌সন্ হলে ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতি সম্বন্ধে একটী তেজস্বিনী বক্তৃতা করেন, বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

৯ বৈশাখ সায়ংকালে নগরসংকীর্ত্তন বাহির হয়। সংকীর্ত্তনদল বাজারে উপস্থিত হইলে শশীবাবু বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল।

ইহা ভিন্ন গরিব বিদ্যালয়ের (Poor's Institution) "সুনীত সঞ্চারিণী" নামক ছাত্রসভাতে "ছাত্রজীবন কিরূপ হওয়া উচিত?" এই সম্বন্ধে একটী উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা করেন।

১১ই বৈশাখ রবিবার দুই বেলাই শশীবাবু উপাসনা করেন। ঐ দিন অপরাহ্নে উপাসনান্তে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু কেদারনাথ সাহা মহাশয়ের বাসায় প্রীতি ভোজন হইয়া উৎসব পরিসমাপ্ত হয়। শশীবাবুর আগমনে এখানে সকলেই বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছেন।

উৎসব—কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে প্রচারক বাবু শশিভূষণ বসু তথায় গমন করেন। ১লা মে হইতে ৪ঠা

যে পর্য্যন্ত উৎসব হয়। উৎসবে তিনি আচার্য্যের কার্য্য করেন, "ধর্ম্মোন্নতি" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা এবং আলোচনাদি করেন; বাবু অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহাশয়ের বাটিতে সমবেত উপাসনা হয়, তাহাতে আচার্য্যের কার্য্য করেন।

দান—কাকিনার বাবু অক্ষয়কুমার গুপ্ত ॥• এবং বাবু করুণাকুমার সেন ১৲ টাকা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারবিভাগে দান করিয়াছেন। দাতাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা যাইতেছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব—নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ষোড়শ-জন্মদিনের উৎসব সম্পন্ন হইবে।

১লা জ্যৈষ্ঠ রবিবার—প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে উপাসনা। সন্ধ্যাকালে উপাসনার পূর্ব্বে সংকীর্ত্তন হইবে।

২রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার—পূর্ব্বাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় সংকীর্ত্তন ৭ টার সময় উপাসনা। অপরাহ্নে শাস্ত্র পাঠ ও ধর্ম্মালোচনা। সন্ধ্যাকালে উপাসনা।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ই ও ১৬ই জুলাই, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সংশ্রবে বর্ত্তমান বৎসরের ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক বার্ষিক পরীক্ষা গৃহীত হইবে। কলিকাতাস্থ পরীক্ষার্থীগণ সিটিকলেজ গৃহে এবং প্রদেশীয় পরীক্ষার্থীগণ আপন আপন স্থানে সুপরিচিত ব্রাহ্মগণের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষিত হইবেন। যে সকল পরীক্ষার্থী ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র নহেন, তাঁহাদিগকে আগামী ১লা জুলাই কিম্বা তৎপূর্ব্বে বিদ্যালয়ের সম্পাদকের নিকট আবেদন করিতে হইবে। প্রত্যেক আবেদন পত্রের সঙ্গে পরীক্ষার্থীর সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে কোন সুপরিচিত ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মিকার স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র পাঠাইতে হইবে। আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক:—পরীক্ষার্থীর নাম, বয়স, ব্যবসায় (ছাত্র হইলে কলেজ বা স্কুল ও শ্রেণীর নাম), ধর্ম্ম, অভিভাবকের নাম, এবং যে ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মিকার তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা দিতে চান তাঁহার নাম।

পরীক্ষার বিষয়।

ENGLISH SENIOR COURSE :—Caird's *Introduction to the Philosophy of Religion*: Chaps. I—V, and Chap. VIII. *The New Testament* in English : The Four Gospels. and the *Bhagavadgita* . Chaps. I—XII.

ENGLISH JUNIOR COURSE :—Wright's *Grounds and Principles of Religion* : Chaps. I—XI ; and any one of the following—(1) *The New Testament* in English : The Four Gospels, (2) The *Bhagavadgita* : Chaps. I—XII.

বাঙ্গালা উচ্চতর কোর্স্ :—বাবু সীতানাথদত্ত-প্রণীত 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'; পণ্ডিত অঘোরনাথ গুপ্ত-প্রণীত 'শাক্যমুনিচরিত'; ও 'ভগবদ্গীতার' বঙ্গানুবাদ, ১ম—১২শ অধ্যায়।

বাঙ্গালা নিম্নতর কোর্স্ :—বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ১ম ভাগ', প্রথম তিন বক্তৃতা; আদি ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত 'ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস', ৭ম—১০ম অধ্যায়; ও শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীবশর্ম্মা-প্রণীত 'ঈশাচরিতামৃত'।

কলিকাতা,
২১০।৩।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
১৪ই মে, ১৮৯৩।

শ্রীসীতানাথ দত্ত,
ব্রহ্মবিদ্যালয়-সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আর্থিক অবস্থা বড় মন্দ, আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়াছে। কি প্রকারে কিছু আয় বৃদ্ধি হয়, আমরা সে বিষয়ে চিন্তা করিতেছি। ইহার সভ্য মহোদয়গণ যদি কিছু কিছু চাঁদা বৃদ্ধি করিয়া দেন, তাহা হইলে যথেষ্ট উপকার করা হয়। কিন্তু সমাজের চাঁদা এবং তত্ত্বকৌমুদী, মেসেঞ্জার ও পুস্তক হিসাবে এত টাকা বাকী পড়িয়া রহিয়াছে যে, সেই সকল বাকী আদায় করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। অতএব আমাদিগের বিনীত নিবেদন এই যে, সভ্য ও গ্রাহক মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক যত শীঘ্র পারেন এই সমস্ত বাকী শোধ করিয়া এবং সমাজের আয় বৃদ্ধি সম্বন্ধে অন্তরূপে বিশেষ চেষ্টা করিয়া বাধিত করিবেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়,
সহকারী সম্পাদক,
সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

কলিকাতা অথবা মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্ম পরিবার ও ছাত্রাবাসে যে সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, তাহার অনেক সংবাদ তত্ত্বকৌমুদী বা মেসেঞ্জার পত্রিকায় যথা সময়ে—এমন কি কোন কোন অনুষ্ঠান আদৌ, প্রকাশিত হয় না। অতএব আমাদিগের বিনীত নিবেদন এই যে, ব্রাহ্মসমাজ স্তম্ভে প্রকাশযোগ্য প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সংবাদ অথবা অন্যান্য সংবাদাদি আমাদিগের পরিচারক, ও সেবকগণ এবং মফস্বলস্থ ব্রাহ্ম বন্ধুগণ যথাসময়ে প্রচারক, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়,
সহকারী সম্পাদক,
সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৩১শে বৈশাখ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

৪র্থ সংখ্যা। ১৬শ ভাগ।	১৬ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বলে ৩ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে ব্রাহ্মসমাজের অধিপতি, ব্রাহ্মসমাজ ত তোমারই বিধি। সংসারের তাপিত ও শোকসন্তপ্ত নরনারী ইহার আশ্রয়ে আসিয়া শান্তিলাভ করিবে, পাপের জ্বালা নির্ব্বাণ করিবে, ইহাই তোমার ইচ্ছা। তোমার এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম কাহারও নিকট নিরাশার কথা বলে না। মহাপাপীও তোমার এই প্রেমেরধর্ম্মের প্রসাদে পরিত্রাণ পাইবে। তুমি পরিত্রাতা, মুক্তিদাতা, স্বয়ং এবার পাপীর পরিত্রাণের ভার লইয়াছ! তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে অস্পৃশ্য মহাপাপীর নিকট স্বর্গের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে। কতলোক অনন্ত নরকের ভয় দেখাইয়া গুরু ও মধ্যবর্ত্তীর চরণে আশ্রয় লইতে উপদেশ দিতেছিলেন; কিন্তু তুমি এবার পাপীর নিকটে প্রকাশিত হইয়া আশার সুমধুর বাণী শ্রবণ করাইতেছ;—"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি, সেই পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার।"

প্রভো, তুমি তোমার এই মহৎকার্য্যে সাক্ষ্য দিবার জন্য বারংবার আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ, জগতে আশার সুসমাচার প্রচার করিতে বলিতেছ। কিন্তু আমরা তোমার কৃপার আহ্বানধ্বনি শুনিয়াও শুনিতেছি না, তোমার দয়ার বিধি ব্যবস্থা দেখিয়াও দেখিতেছি না, নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত তোমার পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিতে পারিতেছি না, তাই আমাদের নিরাশা ও সংশয় ঘুচিতেছে না। প্রভো, আমাদের ত অপরাধের সীমা নাই, তোমার অযাচিত করুণার দান, এই ব্রাহ্মধর্ম্ম পাইয়াও তাহার সমাদর করিলাম না, জীবনে সাধন করিলামনা, অসার বিষয় লইয়াই ব্যস্ত রহিলাম; এবং যাঁহারা তোমার দয়ার কথা শুনিয়া তোমার এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-তরুতলে আশ্রয় লইতে আসিতেছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট তোমার কৃপার সাক্ষ্য না দিয়া, আশার কথা না বলিয়া, কেবল নিরাশার কথা বলিয়া বলিয়া সংশয় ও নিরাশার উদয় করিলাম। জীবনের অবস্থা ও কার্য্য দ্বারা যেন বলিতেছি, তোমার দয়াতে ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধনে, পাপীর উদ্ধার হয় না। প্রভো, এই মহা অপরাধ হইতে উদ্ধার কর—সুমতি দেও। আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা তোমার ব্রাহ্মধর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত সাধন করিতে পারি, জীবনে তোমার করুণার সাক্ষ্য দিতে পারি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

আশার কথা—আজ কাল কেহ কেহ নিরাশার কথা বলিতেছেন। এ সকল কথায় তাঁহাদের নিজের যেমন অপকার হইতেছে, তেমন অপরের জীবনেও মহা অনিষ্ট ঘটিতেছে। ১০, ১২, ১৫ বৎসর কাল যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে রহিয়াছেন, তাঁহারাও আপন আপন জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলিয়া এই নিরাশার মাত্রা বৃদ্ধি করিতেছেন; "ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ঈপ্সিতবস্তু পাইলাম না, ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনের পাপ তাপ দূর করিতে পারিল না; এত দিন ব্রাহ্ম-সমাজে বাস করিলাম, উপাসনায় যোগ দিলাম, কত উপদেশ শুনিলাম, কিন্তু পাপ গেল না, প্রাণে শান্তি পাইলাম না।" ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা যে কিছুই হয় না, ইহাই যেন প্রমাণ করিতেছেন। কেহ গুরুর আশ্রয় লইতে উপদেশ দিতেছেন, কেহ সাধন প্রণালীর দোষ দিতেছেন, কেহ বা সংসর্গের দোষ ইত্যাদি কারণ উল্লেখ করিতেছেন।

যাঁহারা এইরূপ নিরাশার কথা বলিয়া নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে-ছেন ও অন্যের গুরুতর অনিষ্ট করিতেছেন, তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যের গুরুত্ব ও দায়িত্ব কিছুমাত্র অনুভব করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা, প্রাণের দিকে চাহিয়া বল দেখি, যতদিন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছ, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিয়াছ কি? নিজের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত কর, কোথায় ছিলে, করুণাময়ের অযাচিত করুণারগুণে কোথায় আসিয়াছ! যে দয়া মহাপাপের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া নবজীবনের দ্বারে আনয়ন করিয়াছে, সেই করুণার বিরুদ্ধে কথা বলিতে কি জিহ্বা সঙ্কুচিত হয় না? তাঁহার দান এই ব্রাহ্মধর্ম্ম, তাঁহার বিধি এই ব্রহ্মোপাসনা। তাঁহার দয়ায় পাপীর পরিত্রাণ হয় না, এই কথা বলিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মের শত বার চিন্তাকরা উচিত।

জীবন দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিলাম না, ইন্দ্রিয়সংযম কাহাকে বলে জানিলাম না, সংসারের ভোগ বিলাসেই সময়

কাটাইলাম, অথচ বলিতেছি "ব্রহ্মকৃপাহিকেলম্" কথাটি অর্থশূন্য; ব্রাহ্মধর্ম্ম পাপীর উদ্ধার করিতে পারিল না!"

"বিনা দুঃখে হয় না সাধন, সেই যোগিজনার বাঞ্ছিত চরণ রে! সুখশয্যায় শুয়ে কেবা পেয়েছে কখন, সেই দেবের দুর্লভ অমূল্য রতন রে! অশ্রুপাত ক'রে বীজ কর রে বপন রে, যদি মনের আনন্দে শস্য করিবে কর্ত্তন রে।"

মানুষের নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে পৃথিবীর রাজার নিকট দণ্ড ভোগ করিতে হয়; ঈশ্বরের করুণার বিরুদ্ধে কথা বলিলে কি নিস্তার আছে? ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা, নিজের শত দোষ দুর্ব্বলতার কথা বল; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমার পরিত্রাণ দিতে পারিল না, ঈশ্বরের করুণা পাপীর উদ্ধার করিতে পারিল না, এমন কথা কখনও মুখে আনিও না। ভাই বোন, আশা কর, সহিষ্ণু হইয়া তাঁহার নামে পড়িয়া থাক, নিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহার উপাসনা কর, নিশ্চয় তাঁহার দর্শন পাইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবঞ্চনা নাই; তিনি যাঁহাকে আশা দিয়া আনিয়াছেন, তাঁহার প্রাণের পিপাসা মিটাইবেন। সাবধান, সংসারের ঘোলা জলে পিপাসা মিটাইয়া বসিয়া থাকিও না। তাঁহার করুণার প্রতীক্ষা কর, তোমার এই দুর্দ্দিন থাকিবে না।

সঙ্গীত ব্যবহারে সাবধানতা—ব্রহ্মসঙ্গীত অতি উপাদেয়, অতি লোভনীয় এবং অতিশয় উপকারী। ব্রহ্মোপাসনার পক্ষে সঙ্গীত এক প্রকৃষ্ট সহায় এবং মানব-মনের উপর ইহার প্রভাব অসাধারণ। এজন্য প্রায় সকল শ্রেণীর সাধকই ব্রহ্মোপাসনার সময় সঙ্গীত করিয়া থাকেন। যে সঙ্গীত সর্ব্বসাধারণের এত প্রিয় এবং এরূপ সাধন-সহায়, তাহারও ব্যবহারের রীতির বিকৃতিতে কেমন অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়, এবং এরূপ সর্ব্বজনপ্রিয় ও কল্যাণসাধক বিষয় কেমন অকল্যাণের হেতু বলিয়া গণ্য হয়, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া অতি বাঞ্ছনীয়। ব্রাহ্মগণ প্রিয় ব্রহ্মসঙ্গীতের কেমন অযথা ব্যবহার করেন, এবং তদ্রূপ ব্যবহারে কিরূপ অনিষ্টোৎপাদন হয়, তাহার আলোচনা হওয়া একান্ত আবশ্যক। সঙ্গীতের প্রকৃত ব্যবহার না হইলে যে তাহা অনিষ্টোৎপাদক হয়, তাহা আমরা সহসা বুঝিতে পারি না, এবং বুঝিতে পারি না বলিয়াই তন্নিবারণে যত্নশীল হই না। সঙ্গীতের অনুরোধে অনেক সময় অবস্থার অতিরিক্ত এমন কি প্রতিকূল ভাবযুক্ত কথাও ব্যক্ত করিতে হয়। একজন কোন বিশেষ সময়ে বিশেষ ভাবে যে বিষয় অনুভব করিয়া সঙ্গীতে তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সর্ব্বাংশে তাহা যে অপরের প্রাণের অবস্থার সঙ্গে মিলিবে এরূপ সম্ভাবনা অল্প। হয় ত সঙ্গীতের এক অংশের সহিত প্রাণের মিল আছে এবং সেই অংশের জন্যই গানটী গাওয়া আবশ্যক হয়, কিন্তু গানের একাংশ গাইয়া অপরাংশ পরিত্যাগের রীতি প্রায় দৃষ্ট হয় না। একটী গান ধরিলে শেষ পর্য্যন্ত গাওয়াই রীতি। ইহাতে অনেক সময় দেখা যায়; যে প্রার্থনা করিবার সময় যাহা প্রার্থনা করা কখনই উচিত মনে হয় নাই, সেই গানের অনুরোধে তেমন বিষয়ও প্রার্থনা করা হয়। এরূপ ব্যবহার অজ্ঞাতসারে গানের অনুরোধে হইয়া থাকে, এবং ইহাদ্বারা যে আত্ম-প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা আছে তাহাও জানা যায় না। অনেক সময় লোকে সহজ কথায় যাহা বলিতে পারে না, সুর তালের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সে সব কথা অতি সহজে ব্যক্ত করে, এবং এরূপ ব্যবহারে যে অসরলতাও, আত্মদৃষ্টির অভাব প্রকাশ পায় তাহাও বুঝিতে পারে না। ইহা দ্বারা অকারণ কাল্পনিক ভাবসকল মনের উপর আসিয়া থাকে, এবং তাহা মানুষকে অতি উচ্চ অবস্থায় উপস্থিত করিতেছে বলিয়া ভ্রান্তি জন্মায়। এজন্য সঙ্গীত করিবার সময় অতিশয় আত্ম-দৃষ্টিপরায়ণ হওয়া আবশ্যক। গানের অনুরোধে অবস্থার অতিরিক্ত ভাব প্রকাশের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এবং তাহার অনিষ্টের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। ঘটনাটী সত্য সুতরাং ইহাদ্বারাই প্রতীয়মান হইবে, সঙ্গীত করিবার সময় কত সাবধানতা গ্রহণ করা আবশ্যক। একটী গানের প্রথম অংশ এই যে, "আমায় অনেক দিয়াছ নাথ"; এবং এই গানের শেষ অংশে আছে যে, "তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না ফিরিব না।" এই গানটি অতি সুন্দর, কবিত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত ব্যাকুল প্রাণের উক্তি। ইহার সুর এবং তাল অতি সুমধুর এজন্য গানটী গাহিতে যেমন ভাল লাগে, তেমনি প্রাণে বিশেষ তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ গান গাহিতে প্রবৃত্তি হওয়া অতি স্বাভাবিক। একদা মন্দিরে এই সঙ্গীতটি গীত হইতেছিল। মন্দিরে অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলপ্রাণ অনেক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন; অনেকেই গানের ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। গানটি শেষ হইয়া গেলে, উপাসনাও শেষ হইল এবং উপাসনান্তে যেমন প্রতিদিন সকলে গৃহে গমন করিয়া থাকেন, সেরূপ সেদিনও সকলেই চলিয়া গেলেন। কিন্তু সেদিন একটী বালিকা উপাসনায় উপস্থিত ছিল, সে নিতান্ত সরলপ্রাণা এবং তাহার অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি উপাসনাস্থলে ছিলেন, সে তাঁহাদিগকে অতিশয় সত্যনিষ্ঠ ও ব্যাকুলপ্রাণ বলিয়াই জানিত, সুতরাং সে মনে করিয়াছিল যে, ইঁহারা আজ আর ঈশ্বরকে লাভ না করিয়া ফিরিয়া যাইবেন না। কারণ গানের শেষভাগে আছে, "তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না ফিরিব না।" সে এই মনে করিয়া চুপ করিয়া চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছে। কতক্ষণ পরে সে বুঝিতে পারিল যে, সকলেই চলিয়া যাইতেছেন। ইহাদ্বারা তাহার মনের অবস্থা কেমন হইল, সহজেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই প্রকারে কত লোকের যে কত সদ্ভাব বিনষ্ট হইয়া যায়, লোকের প্রতি পূর্ব্বসঞ্চিতশ্রদ্ধা বিচলিত হইয়া তৎস্থানে অশ্রদ্ধার সঞ্চার হয়, তাহা কে বলিতে পারে। এজন্য সঙ্গীত, শুধু সঙ্গীত কেন, সকল প্রকার ভাব প্রকাশের সময়েই সাবধান হওয়া উচিত। সঙ্গীত সম্বন্ধে এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহার সুর এবং তালে মানুষকে বড়ই প্রতারিত করিয়া থাকে; আত্মহারা করিয়া ফেলে। এ সকল বিষয়ে আমরা দৃষ্টিহীন হইলে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইব।

ব্রহ্ম-বাণী—নানা বিষয়ে আসক্ত ও নানা আকর্ষণে আকৃষ্ট এবং সদা বিভ্রান্ত মানব মনের পক্ষে গন্তব্য পথ নির্ণয়

করিবার জন্য ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করা অতি আবশ্যক। সর্ব্বতোভাবে এই ব্রহ্মবাণীর অনুসরণ করিতে প্রস্তুত না হইলে, মানবের পক্ষে কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ যাঁহারা কোন নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ বা মহাপুরুষের অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন না, তাঁহাদের পক্ষে আত্মার প্রকাশিত স্বর্গীয় আলোক অনুভব করা এবং ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করা যে কতদূর আবশ্যক তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু এই ব্রহ্মবাণী শ্রবণ ও তাহার অনুসরণ, সরল ধর্ম্মপিপাসুর পক্ষে সহজ, ও অন্নপান-গ্রহণের ন্যায় স্বাভাবিক হইলেও সাধারণতঃ ইহা অতিশয় কঠিন এবং অতি দুর্লভ। ইহা এইজন্য কঠিন ও দুর্লভ নয়, যে ঈশ্বরের বাণী কদাচিৎ প্রকাশিত হয়, এবং সকলের নিকট তাহা প্রকাশিত হয় না। কাঠিন্য এইজন্য যে, সেই বাণী শ্রবণের জন্য মানব-মনের যেরূপ আগ্রহ ও একাগ্রতা এবং যেরূপ সরলতা ও সত্যপ্রিয়তা থাকা আবশ্যক সাধারণতঃ তাহা দৃষ্ট হয় না। আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য বিষয় সম্বন্ধেই যেরূপ গোলযোগ করি ও ভ্রমে পড়ি, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে অতীন্দ্রিয় বিষয় ঠিকভাবে অনুভব করিতে ভুল হইবার সম্ভাবনা আরও কত অধিক। বাহ্য বিষয় অনুভব করিতেই সচরাচর কেমন ভুল হয়, সে বিষয়ে একটি গল্প আছে। একদা প্রাতঃকালে তিত্তির পক্ষীর ডাক শ্রবণ করিয়া একজন মুসলমান বলিলেন, যে এই পক্ষী বলিতেছে, "সোভান্ তেরি কুদ্রৎ।" সেই ডাক একজন হিন্দু শ্রবণ করিয়া বলিলেন "না আপনি ভুল বলিতেছেন; ও ত 'সোভান্ তেরি কুদ্রৎ' এইকথা বলে নাই; ও বলিতেছে, 'রাম, লক্ষ্মণ, দশরথ'।" তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে যখন এবিষয়ে ঐক্য হইল না, তখন তাঁহারা নিকটস্থ এক দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিত্তির পক্ষী কি বলিতেছে। দোকানদার বলিল যে, "আপনাদের দুই জনেরই ভুল হইয়াছে; পক্ষী বলিতেছে, প্যাজ, রসুন, আদ্রক।" প্রশ্নের মীমাংসা না হইয়া, আরও গোল বাঁধিল দেখিয়া তাঁহারা তিন জনেই আবার একজন পালোয়ানের নিকট সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; তিনি বলিলেন, "এবিষয়ে আপনারা সকলেই ভ্রমে পড়িয়াছেন, তিত্তির পক্ষী ও সব কিছুই বলিতেছে না, সে বলিতেছে 'দণ্ড, মুদ্গর, কসরৎ'।" এই ভাবে চারিজনে চারি প্রকার বলিলে তাঁহাদের কোন মীমাংসাই হইল না এবং উত্তরোত্তর গোলযোগ বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহারা ক্ষান্ত হইয়া আপনাপন সিদ্ধান্তই ঠিক মনে করিলেন। একটা সামান্য বাহ্য বিষয়েই যদি এত মতের অনৈক্য সম্ভবে, এবং আপনাপন রুচির অনুরূপ সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে অন্তরগ্রাহ্য, অন্তরেন্দ্রিয়ের উপলব্ধির বিষয়ে কত অনৈক্য ঘটিবার সম্ভাবনা। এই জন্যই দেখা যায়, ব্রহ্মের বাণী শ্রবণ; এবং তাহার অভিপ্রায় প্রকৃত রূপে অনুভব করিবার পক্ষে বিষম কাঠিন্য আছে। সচরাচর মানুষ আপনাপন পার্থিব শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও স্বার্থের অনুরূপ ভাবেই বাণী শ্রবণ করিয়া থাকে অথবা প্রকাশিত বাণী সেই ভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকে। যাহা রুচি বিরুদ্ধ, বা সংস্কার বিরুদ্ধ এরূপ আদেশ শুনিবার দৃষ্টান্ত প্রায়ই দেখা যায় না। বাস্তবিক যাহারা সম্পূর্ণরূপে সরল ও উদার নহে, যাহারা সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত নহে, যাহারা সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ ও আত্ম-রুচি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ও সমর্থ নহে, তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মবাণীর প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করা সম্ভবপর নয়। এজন্যই বিভিন্ন ব্যক্তি এবং নানা সম্প্রদায় ব্রহ্মবাণীর বিভিন্নভাব ও অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। নিজের জন্যই যখন ব্রহ্মবাণীর প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ এত কঠিন; যখন অতি সরল, নিঃস্বার্থ ও সম্পূর্ণ-রূপে পূর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করিতে পারে না, তখন অপরের সম্বন্ধে বাণীশ্রবণ ও তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ যে আরও কত কঠিন, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। যাঁহারা এইরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সাহসকে দুঃসাহস ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের মতানৈক্যের ইহাই প্রকৃত কারণ। এসকল দেখিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মগণের সাবধান হওয়া আবশ্যক, যে তাঁহারা যেন সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্বসংস্কার, স্বার্থ, ও রুচি বর্জ্জিত হইয়া ব্রহ্মবাণী শ্রবণের প্রয়াসী হন; এবং নিরন্তর তাহারই অপেক্ষা করেন।

জীবে দয়া।—জীবে দয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের একটি প্রধান সাধন। যিনি ভগবানের অনন্ত কৃপা স্বীয় জীবনে নিয়ত ভোগ করিতেছেন, তিনি কি প্রাণীদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারেন? বাস্তবিক ধর্ম্মপথে যিনি যে পরিমাণে অগ্রসর হইবেন, তাঁহার হৃদয় সেই পরিমাণে দয়া ও প্রেমে পূর্ণ হইবে। সাধক ভগবানের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে, তাঁহার সৃষ্ট জীব-দিগকে প্রাণের সহিত আলিঙ্গন না দিয়া থাকিতে পারেন না। তখন তিনি সর্ব্বজীবে সেই প্রাণরূপী, চৈতন্যরূপী পরব্রহ্মকে দর্শন করিয়া আত্মপর গণনা বিস্মৃত হইয়া যান। তখন বনের বৃক্ষ লতা পর্য্যন্ত তাঁহার আপনার হইয়া যায়। জড় ও চৈতন্য সর্ব্বপ্রকার পদার্থের মধ্যে ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া তিনি আনন্দিত হন, এবং দুই বাহু প্রসারণ করিয়া সকলকে আলিঙ্গন করেন। এই অবস্থাই হিন্দু ঋষি এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন:—

> অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা ক্ষুদ্রচেতসাং
> উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং।

অর্থাৎ, "ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন, এইরূপ গণনা ক্ষুদ্রচিত্ত অজ্ঞানী লোকের স্বভাব, উদারচিত্ত লোকের পক্ষে জগতের সকলেই কুটুম্ব।" বাস্তবিক ধার্ম্মিকদিগের নিকট এই সংসার স্বীয় পরিবারের ন্যায়। সমস্তই তাঁহার প্রাণপ্রিয় বস্তু। কিন্তু এখন একটি গুরুতর প্রশ্ন এই যে, যাহারা জগৎ সংসারের মধ্যে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি উপলব্ধি করিয়া সকলকে আপনার করিবার জন্য সাধন অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রাণীবধ করিতে পারেন কি না? এস্থলে মনুষ্যবধের কথা উল্লিখিত হইতেছেনা, পশু পক্ষীর জীবন নাশের বিষয়ই আলোচ্য। বিশ্বপ্রেম লাভ করিবেন বলিয়া যখন ব্রাহ্মসাধক সাধনা অবলম্বন করিয়াছেন, তখন তাঁহার পক্ষে পশু পক্ষ্যাদির প্রাণনাশ করা বা তৎসাহায্য করা কি কর্ত্তব্য?

নিরামিষ ভোজনের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া স্বীয় স্বীয় মত সমর্থন করিয়া থাকেন। আমরা সে সকল জটিল তর্কের কথা উত্থাপন করিতেছি না। আমাদের আলোচ্য বিষয় এই যে, এক দিকে বিশ্বপ্রেম ও অপর দিকে জীবের প্রাণনাশ, এই দুই বিষয়ে সামঞ্জস্য কোথায়? সময় সময় ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতেও জীবে দয়া সম্বন্ধে কত উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে। এমন কি জীবে দয়া যে মুক্তির একটি অঙ্গ বিশেষ, তাহাও কোন কোন আচার্য্য প্রকাশ করিতেছেন। অথচ সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই, অনেকেই জীবহত্যা করিয়া থাকেন। পশু পক্ষী মৎস্যাদির প্রাণনাশে রত থাকিলে কি রূপে সর্ব্বজীবে প্রেম-সাধন হইবে? প্রেম-সাধনের প্রথমেই জীবে দয়া অভ্যাস করিতে হয়। জীবের প্রতি দয়া করিতে অভ্যস্ত না হইলে প্রেম-সাধন কখনও হইবে না।

মহাভারতের আদি-পর্ব্বে শততম অধ্যায়ে শান্তনুর রাজ্যের বর্ণনার মধ্যে এই কথা লিখিত আছে,—"তাঁহার (শান্তনুর) শাসন সময়ে মৃগ, বরাহ প্রভৃতি পশু পক্ষীদিগের প্রতি হিংসা হইত না। তাঁহার রাজ্যে অহিংসা রূপ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রধান ছিল।" প্রাচীন কালের ব্রাহ্ম ধর্ম্মের লক্ষণের মধ্যেও জীবে দয়ার কথা স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে! জীবে দয়া সাধন না করিলে সে কালের ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন হইত না। আমাদের মধ্যেও এবিষয়ের বিধি ব্যবস্থা আছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত পত্রিকায় ব্রাহ্মধর্ম্মের যে নয়টি মূল মত প্রকাশিত হইতেছে, তাহার ৭ম সংখ্যক মতে লিখিত আছে—The Father-hood of God and the Brother-hood of Man and kindness to all living beings ইহার অর্থ এই যে, ঈশ্বরের পিতৃত্ব স্বীকার ও মানবের ভ্রাতৃত্ব এবং সমুদয় প্রাণীদিগের প্রতি দয়া করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মতের সহিত জীবহত্যার সামঞ্জস্য কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে? Kindness to all living beings এর অর্থ কি, তাহার আলোচনা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এই মতের সহিত আমাদের ব্যবহারের সামঞ্জস্য আছে কি না, এবং ভগবৎপ্রেম লাভ করিতে হইলে, প্রাণীগণের প্রতি দয়ালু হওয়া কর্ত্তব্য কি না, ইত্যাদি বিষয় সকলে গভীরভাবে চিন্তা করেন, ইহা প্রার্থনীয়।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

সাধনা ও করুণা।

ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ ধর্ম্মজীবন লাভ ও ঈশ্বর লাভের জন্য এক দিকে যেমন নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া থাকেন, এ সকল অবলম্বন করিলেই হইবে না, ঈশ্বরের করুণা ভিন্ন কেহ ধর্ম্মজীবন প্রাপ্ত হয় না, ঈশ্বর লাভের অধিকারী হয় না। তাঁহারা এক দিকে যেমন বলিয়া থাকেন, সংগ্রন্থ পাঠ কর, সৎসঙ্গ কর, নিরন্তর আত্মদৃষ্টির সহিত আত্ম-নিগ্রহ কর, ঈশ্বরের আরাধনা, শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং ধ্যান ধারণাতে নিযুক্ত থাক, অপর দিকে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া থাকেন, ইহাই যথেষ্ট নহে, ঈশ্বরের করুণা ভিন্ন কেহ ধর্ম্মজীবন পাইতে পারে না, তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন কেহ তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। আপাততঃ এই দুই প্রকারের উক্তিকে বিরুদ্ধবৎ মনে হয়। মনে হয় যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিন্ন ধর্ম্মজীবন লাভ না হয়, তাঁহাকে পাওয়া না যায়, তবে আর ধর্ম্মসাধন করিয়া কি ফল? সাধু সঙ্গ করিয়া, সৎগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া, নানা প্রকারে কষ্টকর ও পরিশ্রমজনক সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া কি ফল? আমি যখন চেষ্টা করিয়া, পরিশ্রম করিয়া তাঁহাকে পাইতেই পারিব না, তাঁহার করুণা ভিন্ন যখন প্রকৃত জীবন লাভ হইবেই না, তখন আর এ সকল আয়োজনের কি প্রয়োজন? যখন তাঁহার অনুগ্রহ হইবে তখনই জীবন লাভ হইবে, তখনই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব। বৃথা কষ্টকর ব্যাপারে যাইয়া কি ফল? আপাততঃ উক্ত দুই প্রকারের উক্তিকে বিরুদ্ধবৎ মনে হইলেও বিশেষভাবে অনুসন্ধান এবং চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, একদিকে যেমন ধর্ম্মসাধনের আবশ্যকতা আছে, অপরদিকে তেমনি ঈশ্বরের দয়া ভিন্ন তাঁহাকে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মসাধন ও ঈশ্বরের করুণা দুইই আবশ্যক। উহার একটির অভাবে ধর্ম্মজীবন কখনই পাওয়া যায় না।

যাঁহারা মনে করেন, ঈশ্বর সকল সময়ে দয়া করেন না, তিনি উদাসীন; মানবের তপস্যা, স্তব স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া তবে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন; তিনি মানবের সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন হইয়া আছেন, বহু তপস্যার পর তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে হয়, তাঁহাদের পক্ষে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অধিক আয়াস করিতে হয় না। এক কথাতেই ইহার উত্তর হয় যে, সাধন ভজন দ্বারা তাঁহার অনুগ্রহকে আকর্ষণ করিলেই মনস্কামনা সিদ্ধ হইতে পারে। এ স্থলে সাধন ও কৃপা উভয়েরই প্রয়োজন দেখা যাইতেছে। কিন্তু আমরা সেরূপ মনে করি না, আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বর নিয়ত করুণাময়, নিয়ত জাগ্রত, তাঁহার প্রসন্ন-দৃষ্টি লাভের জন্য মানবের চেষ্টা যত্নের অপেক্ষা নাই। তিনি চিরপ্রসন্ন, চিরপ্রেমময়, তাঁহার সন্তানের অভাব মোচনের জন্য তাঁহার ইচ্ছার কখনও বিরাম নাই,—তাঁহার করুণাস্রোত কোনও সময়ে প্রবাহিত, কোনও সময়ে অবরুদ্ধ হয় তাহা নয়। কিন্তু তাহা সর্ব্বদাই আমাদের কল্যাণের জন্য নিয়ত প্রবাহিত। যদি তাহাই হয়, তিনি যদি নিয়ত করুণাময় এবং নিয়ত প্রসন্ন হন, তাঁহার প্রেমলাভ করিবার জন্য যদি আমাদের স্তব স্তুতির অপেক্ষা না থাকে, তবে আর সাধন ভজনের কি প্রয়োজন?

প্রয়োজন এই যে, ঈশ্বরের কৃপাস্রোত নিয়ত প্রবাহিত হইলেও, তিনি নিয়ত সহায় এবং প্রসন্ন হইলেও, নানাকারণে আমরা তাহা লাভ করিবার অধিকারী থাকি না। আমাদের মধ্যে এমন প্রতিকূলতা নিয়ত বাস করিতেছে, যাহা সেই নিয়ত প্রবাহিত করুণাস্রোতকেও আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেয় না।

যেমন, প্রবল বর্ষার সময়ও যদি কেহ উপযুক্তরূপে দেহ আবৃত করিয়া বাহিরে গমন করে, তাহা হইলে সেই বৃষ্টির ধারা তাহার পক্ষে কোন কার্য্যকর হয় না; যদি কেহ সুদৃঢ় প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহে বাস করে, বর্ষার ধারা পতিত হওয়া না হওয়া তাহার পক্ষে দুইই সমান; যেমন রুদ্ধ দ্বার গৃহবাসীর পক্ষে সূর্য্যোদয় হওয়া না হওয়ার ইতর বিশেষ কিছুই নাই, সেইরূপ আমরা নানাপ্রকারে ঈশ্বরের দয়াকে আমাদিগের হইতে দূরে রাখিয়া থাকি, আমাদের অনিচ্ছা, আমাদের উদাসীনতা এবং আত্মপ্রভাব প্রভৃতি সর্ব্বদাই সেই করুণা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত রাখিতেছে। নিয়ত যে করুণা-সাগরে আমরা নিমগ্ন আছি, আমাদের এমনই স্বভাবের বিকৃতি যে, তাহাও অনুভব করিবার শক্তি আমাদের থাকে না। আমরা আমাদের মধ্যে এমন বিরুদ্ধ ভাবের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি, যাহা সেই প্রেমময়ের নিয়ত প্রেম প্রবাহকেও বাধা দিয়া আমাদিগকে সেই প্রেমধারা হইতে দূরে রাখে,—তাহা হইতে বঞ্চিত করে।

যতদিন না এই বিরুদ্ধভাব অপনীত হইয়া মানুষ আপনার দীনতানুভব করিতে সমর্থ হয়, যতদিন না সে প্রকৃতরূপে অকিঞ্চন হইয়া সেই করুণার প্রার্থী হয়, ততদিন সেই করুণা থাকিয়াও না থাকার মধ্যে পরিণত হয়। তাহার প্রভাব কোন কার্য্যকর হয় না। একদিকে যেমন সরল ও অকিঞ্চন না হইলে তাঁহার করুণা সম্ভোগের অধিকারী হওয়া যায় না, অপরদিকে ইহাও দৃষ্ট হয় যে, তাঁহার করুণা যেন সর্ব্বদাই অবিভক্ত অনুরাগের অপেক্ষা করে। যে হৃদয় অবিভক্ত অনুরাগের সহিত ঈশ্বর লাভের জন্য প্রয়াসী নয়, করুণা যেন সে স্থলে অভিমানীর ন্যায় প্রত্যাখ্যান করিয়া যায়। একাগ্রতাময়ী শ্রদ্ধা ভিন্ন সেই করুণা কোথাও স্থির হইয়া কার্য্য করে না। ঈশ্বর সর্ব্বদাই আমাদের সমগ্র প্রাণের প্রয়াসী, আমরা যে কতক তাঁহাকে দিব আর কতক অপরের জন্য রাখিয়া দিব, এমন শ্রদ্ধা ভক্তি তিনি চাহেন না। এজন্য প্রাণের সমগ্র অকিঞ্চন ভাব ও ঐকান্তিক ভক্তিই সেই করুণা লাভের জন্য প্রয়োগ করিতে হয়। সেই অবস্থাতেই মানবের পক্ষে ঈশ্বর লাভ সহজ ও সুসাধ্য হয়।

এই অকিঞ্চনতা ও ঐকান্তিক ভক্তি লাভের জন্য ধর্ম্ম সাধনের প্রয়োজন। মানব প্রথমেই আপনার শক্তি ও সামর্থ্যের প্রকৃত পরিচয় পায় না। সে মনে করে, আমি সাধন ভজন করিয়া আত্মচেষ্টাতেই সেই ব্রহ্মধনকে লাভ করিব। আমার তপস্যা প্রভাবেই তিনি নিকটস্থ হইবেন। যতদিন মানবের এ প্রকার জ্ঞান থাকে, ততদিন সে উপায়ের পর উপায় গ্রহণ করিতে থাকে। কিন্তু তাহার পরিজ্ঞাত এবং লোক-প্রচলিত উপায় সমূহ গ্রহণ করিয়াও যখন বিশেষ কোন সুবিধা পায় না, তখন তাহার আত্ম-শক্তির প্রতি সন্দেহ জন্মিতে থাকে; তখন আত্ম-প্রভাব এবং আত্ম সাধন-ভজনের মূল্য যে অতি সামান্য, তাহা সে বুঝিতে সমর্থ হয়। তখনই বাস্তবিক সে অকিঞ্চনতা লাভের অধিকারী হয়। মানুষ কল্পনা করিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া যে এই অকিঞ্চনতা আনয়ন করিবে, তাহার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। বার বার পরাস্ত হইয়া—বার বার আত্ম-শক্তির অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় পাইলেই আত্মায় অকিঞ্চনতা আসিতে পারে—সাধক তখনই বাস্তবিক ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা-পরায়ণ-চিত্তে ঈশ্বর-করুণার ভিখারী হয় এবং তাহার অপেক্ষায় জীবনধারণ করিতে থাকে এবং তখনই সেই করুণা তাহাকে চিরদিনের জন্য আশ্রয় দেয়—আলিঙ্গন করে—তখনই সে নিরাপদ অবস্থায় যাইবার উপযুক্ততা লাভ করে।

একদিকে সাধন ভজন দ্বারা যেমন আত্ম-শক্তির অকর্ম্মণ্যতা অসামর্থ্য অনুভব হয়, অপর দিকে তেমনি সেই করুণাময়ের জন্য ক্রমশঃ আকাঙ্ক্ষার পরিবৃদ্ধি হইতে থাকে—তাঁহার আনন্দময়সত্তা অনুভবের জন্য ব্যাকুলতা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তখন আর ব্রহ্ম-করুণা সেই আত্মার উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে বাধা প্রাপ্ত হয় না এবং তাহাকে একবারে অধিকার করিয়া বসে। সুতরাং তাহার পক্ষে প্রকৃত জীবন লাভ এবং ঈশ্বর লাভ সহজ হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, একদিকে যেমন তাঁহার করুণাই তাঁহাকে পাইবার পক্ষে একান্ত সহায়, আত্মচেষ্টার যেন কোনই মূল্য নাই, অপরদিকে সাধন ভজন ভিন্নও সেই করুণার আশ্রয় পাইবার সম্ভাবনা নাই। সেই নিয়ত প্রবাহিত করুণাস্রোত যাহাতে অবাধে আত্মার উপর আত্মপ্রভাব বিস্তার করিতে পারে তাহারই জন্য আত্মার অকিঞ্চনতা এবং ঐকান্তিক ভক্তির সঞ্চার হওয়া আবশ্যক। সেই অকিঞ্চনতা ও ভক্তির সমাবেশ কল্পনা বা চিন্তা দ্বারা লাভের সম্ভাবনা নাই। তাহা পাইতে হইলেই নিয়ত চেষ্টাপরায়ণ চিত্তে সাধন ভজনে প্রবৃত্ত থাকিতে হয়। আত্মশক্তির অকর্ম্মণ্যতা কেহ ভাবিয়া ভাবিয়া অনুভব করিতে পারে না এবং অবস্থায় পড়িয়া স্বীয় স্বীয় শক্তিহীনতার পরিচয় লাভ না করিলেও কেহই প্রকৃতরূপে অকিঞ্চন হইতে পারে না। এজন্য যেমন যথানিয়মে সাধন ভজন করা আবশ্যক, তেমনি সেই করুণাময়ের করুণা লাভ করা নিতান্ত প্রয়োজন। এই দুইয়ের সম্মিলনেই সাধক সিদ্ধ-মনোরথ হইয়া থাকেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন।

(সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ষোড়শ জন্মদিন উপলক্ষে লিখিত।)

১১ই মাঘ এদেশে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। ২রা জ্যৈষ্ঠ—অদ্যকারদিনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম। সমাজ আমাদের পিতা মাতা—পিতা মাতার জন্মদিনে যেমন সন্তানগণ আনন্দ প্রকাশ করেন, আমরাও আজ তেমনিভাবে ক্ষুদ্র হৃদয়ের আনন্দ-ধারা সেই জগজ্জননীর পাদ পদ্মে অর্পণ করিব। কোন শ্রেণীর সন্তানেরা পিতা মাতার জন্মোৎসবে আনন্দ প্রকাশ করে না?—যাহারা পোষ্য-পুত্র। পোষ্য-পুত্র স্বীয় জনক জননীর সম্বন্ধে চির উদাসীন। পরন্তু তাহারা যে ধর্ম্ম পিতা মাতার কাছে লালিত পালিত হয়, তাহাদের প্রতিও তেমন অনুরাগ জন্মে না। আজ আমরা আনন্দ প্রকাশ করিব—কারণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আমাদের পিতা মাতা।

ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, মহাজনগণের অনেকেই সামান্য ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহার প্রেম-ধর্ম্ম

জগতের নরনারী গ্রহণ করিয়া সংসারের সর্ব্ববিধ দুঃখ দুর্দ্দশা প্রশমিত করিতেছে, সেই মহাত্মা ঈশা গরিব সূত্রধরের গৃহে ঘোড়ার আস্তাবলে জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধ রাজপুত্র হইলেও লুম্বিনী নামক স্থানে শালবৃক্ষ মূলে জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা নিতান্ত দীন দুঃখীর মত জন্ম গ্রহণ করিয়াও জগতের উপর আজ পর্য্যন্ত অবিচলিত প্রভুত্ব করিতেছেন। অপরদিকে যাঁহারা জগৎকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা তাঁহাদের সমকালে কত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান পণ্ডিত ছিলেন, যাঁহারা ক্ষুর ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ তর্ক যুক্তি দ্বারা বিপক্ষের মত সমূহ খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা একটী লোকও জগতে পরিত্রাণের পথে অগ্রসর হয় নাই। সাধারণ লোক দ্বারাই পরমেশ্বর ধর্ম্ম বিপ্লব সংঘটন করিয়াছেন। ইহাতে প্রভু পরমেশ্বরের এই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে যে, তিনি সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য অতি সামান্য লোকের দ্বারাই মহৎকার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া থাকেন। যিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালু বিন্দুর সমবায়ে পর্ব্বত রচনা করেন, বিন্দু বিন্দু জল কণার সমাবেশে সমুদ্র সৃষ্টি করেন, তিনি জালজীবী, ভিকারী এবং গরিবদিগের দ্বারাই পৃথিবীতে যুগপ্রলয় সম্পন্ন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজ-সৃষ্টির ভিতরেও ঈশ্বরের এই অপূর্ব্ব লীলা নিহিত রহিয়াছে। ধনে, মানে, জ্ঞানে, প্রভুত্বে পৃথিবীর কত দেশ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সে সকল স্থানে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় না হইয়া দুর্ব্বল, অল্প-জ্ঞান, হীনতেজ বঙ্গদেশে কেন ইহার জন্ম হইল? এই খানেই প্রভুর লীলা দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মসমাজের জন্ম না হইলে প্রভুর মহত্ত্ব বাড়ে কিসে?

ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইতে লাগিল; কিন্তু ইহাতে ও বিধাতার লীলা পূর্ণ হইল না। লোকে ভাবিতে লাগিল "দেশের কতকগুলি গণ্য মান্য বড় লোক একত্রিত হইয়া স্বীয় স্বীয় ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে। বড়লোকদিগের দ্বারাই এরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।" তাই এবার প্রভু লীলা পূর্ণ করিলেন। পৃথিবীর মধ্যে যাঁহারা দুর্ব্বল, একতা-বিহীন, এবং নানাপ্রকার কুসংস্কার-রত সন্তান, তাহাদিগের প্রতি দয়া করিয়া যেমন স্বর্গের পবিত্র ধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছিলেন, এখন সেই দুর্ব্বলদিগের মধ্যে যাহারা বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞানে অধিকতর পশ্চাৎপদ তাহাদের দ্বারা এই নব শক্তির উৎসস্বরূপ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। দুর্ব্বল সন্তানদিগের দ্বারা অতি মহৎ কার্য্য সম্পাদন করাই এই লীলার উদ্দেশ্য।

এই সুবিস্তৃত সুদৃশ্য ব্রহ্মমন্দির কাহাদের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে? কোন শ্রেণীর লোক এখানে সমবেত হইয়া ভগবানের নাম করিয়া থাকেন? যাহাদের ধন বল নাই, পদ বল নাই, যাহারা দেশে তেমন সুপরিচিত নহে, তাহারাই এ সমাজের আশ্রিত।

রাজপথ দিয়া কত লোক গমনাগমন করিবার কালে মন্দির দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করে,—"এই কি সাধারণ সমাজের ব্রহ্মমন্দির? এত বড় মন্দির; কিন্তু এখানকার লোকদিগকে ত চিনি না। রাজপুরুষগণ বলেন,—"ইহাদিগকে ত চিনি না।" ইহারা চিরকাল অচেনাই থাকুক, প্রভুর মহিমা—প্রভুর গৌরব প্রকাশিত হউক।

আজ কোন্ শ্রেণীর লোক বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন? যাঁহারা এ সমাজে বিধাতার হস্ত দেখিতেছেন,—ইহাকে বিধাতার লীলাক্ষেত্র ভাবিয়া ইহার আশ্রয়ে বাস করিতেছেন। আজ তাঁহারাই আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, যাঁহারা এ সমাজের উপাসনা প্রণালী, এ সমাজের কার্য্যপ্রণালী, নিয়মাদি প্রতিপালন করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। অদ্য তাঁহাদেরই মুখ প্রফুল্ল, যাহারা গুরুবাদ, মধ্যবর্ত্তীবাদ, শাস্ত্রবাদ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারের বাধা অতিক্রম করিয়া ভগবানের সহিত সাধারণ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইতে অভিলাষী।

কৃষ্ণের জন্মোৎসবে বৈষ্ণবের কত আনন্দ। খ্রীষ্টের জন্মদিনে অতি গরিব খৃষ্টানেরও মুখের বিষাদ কালিমা বিমুক্ত হয়। অদ্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিনে ইহার আশ্রিতগণ কি তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দ প্রকাশ করিবেন না?

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আমাদের অতি প্রিয় বস্তু। আমাদের রক্ত দান করিয়া কি ইহার চরণ বিধৌত করিব না? ইহার সেবা করিব না? আমাদের জ্ঞান, আমাদের সাধন ভজন, আমাদের জনহিতকর কার্য্য সকলই এই সমাজ হইতে প্রসূত হইতেছে। এই মাতৃদেবীর সেবায় কি আমরা প্রত্যেকে আজীবন চেষ্টা করিব না?

মনে কি নাই বন্ধুগণ! কত রাত্রি জাগরণে যাপন করিয়াছ, কত পরিশ্রম করিয়াছ, ইহার সেবার জন্য কত উৎসাহ উদ্যম এবং সৎসাহস প্রদর্শন করিয়াছ? আজ তাহা স্মরণ কর। অবসন্ন হৃদয়ে আশা উদ্দীপ্ত হইবে।

কে আমাদিগকে এখানে আনিয়াছেন, একত্রিত করিয়াছেন, সাধন করাইতেছেন? আমরা বিচ্ছিন্ন, অজ্ঞাত, অপরিচিত ভাবে কোথায় পড়িয়া রহিয়াছিলাম। এই সমন্বয় কে করিলেন? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ লইয়া কে এই ঘর বাঁধিলেন? এই মন্দির কাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে? এ সকল কি লৌকিক ব্যাপার! এ সকল ঘটনা কি মানব-বুদ্ধি দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে? না, সেই মহান্ পরমেশ্বরের লীলা। তিনি প্রত্যক্ষভাবে এ সমাজ পরিচালিত করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য রক্ষার জন্য তাঁহার এই অত্যদ্ভুত লীলার বিকাশ।

বন্ধুগণ! আমরা ইহাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব? এই মহৎ দান উপেক্ষা করিয়া কোন্ বস্তু গ্রহণ করিব? কাঞ্চন পরিত্যাগ করিয়া কাচ গ্রহণ করিব কি? এমন দুর্ম্মতি যেন আমাদের কাহারও না হয়।

ভাই ভগিনীগণ! তোমাদের চরণে বিনীত প্রার্থনা, বর্ত্তমান যুগে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় এই ব্রাহ্মসমাজ। আসুন, আমরা ইহার সহিত প্রাণের পূর্ণযোগ স্থাপন করি। ইহাকে পরিত্রাণের উপায় জানিয়া বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন ও ক্ষমতা সমুদয় ইহার চরণতলে অর্পণ করি। এ সমাজ মানব রচিত নয়, পরমেশ্বরের লীলা-নিকেতন। আমরা এখানে মুক্তির জন্য

আসিয়াছি, সাংসারিক কার্য্য সিদ্ধির জন্ত আসি নাই। এ সমাজের কল্যাণোদ্দেশে দিতে পারি না, আমাদের এমন কোন্ প্রিয় বস্তু আছে? আমরা যথাসর্ব্বস্ব ইহাতে আহুতি দান করিব। তবেই ব্রহ্মকৃপা অবতীর্ণ হইবে। পরমেশ্বর আমাদিগকে শুভবুদ্ধি দান করুন।

সত্যং।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ষোড়শ জন্মোৎসব উপলক্ষে ১লা জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতঃকালীন উপাসনার পর শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক বিবৃত উপদেশ।

আরাধনাতে প্রধানতঃ এই কয়টি স্বরূপ সাধনের ব্যবস্থা আছে;—সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, অখণ্ড এবং আনন্দ শান্ত মঙ্গল ও পবিত্র। সকল স্বরূপের আদি এবং ভিত্তি ভূমি সত্য স্বরূপ। "সত্যং" বলিলেই প্রকাশিত, অপ্রকাশিত, মানবের জ্ঞাত অজ্ঞাত মহান্ পরমেশ্বরের সমুদয় স্বরূপ বলা হয়। সত্যের অভ্যন্তরে সমুদয় স্বরূপ নিহিত রহিয়াছে। সত্য স্বরূপ সাধন না করিলে অন্ত কোনও স্বরূপের ভাবও উপলব্ধি হইতে পারে না। অন্যান্য স্বরূপগুলি সত্য স্বরূপের অন্তরস্থ অঙ্গ বিশেষ।

এতদ্দেশীয় ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ তিন শ্রেণীতে সাধকদিগকে বিভক্ত করিয়াছেন;—প্রবর্ত্তক, সাধক এবং সিদ্ধ। তাঁহারা এবিষয়টি এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন;—প্রবর্ত্তক সাধক বাহ্য জগতে পরমেশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু তিনি কোনও স্থানে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া "নেতি নেতি" "অর্থাৎ ইহা নয় ইহা নয়" বলিয়া নিরাশ হন। ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশে অনন্ত তারকারাজি প্রস্ফুটিত, নিম্নে সুবিশাল সমুদ্র, পর্ব্বত নদ নদী ও সুশ্যামল বৃক্ষ লতা পরিপূর্ণ বসুধা, কিন্তু ইহার কিছুই ত সত্য নয়। সকলই সৃষ্টি স্থিতি লয়ের অধীন। সাগর শুষ্ক হইয়া মরুক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে, মরুভূমি আবার সাগর হইতেছে; উন্নতশীর্ষ পর্ব্বত সমভূমি হইতেছে, সমতল ক্ষেত্র উচ্চ পর্ব্বতের আকার ধারণ করিতেছে। অপরদিকে প্রিয়তম জনগণ এক একটি করিয়া অদৃশ্য হইতেছে। শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই অনন্ত মরণ সাগরে ঝাঁপ দিতেছে। অদ্য যে গৃহ আনন্দ, শান্তিতে প্রফুল্ল, কল্য সে গৃহে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। যে সুখ ও সম্পদের লীলা ভূমিতে মানব এই মুহূর্ত্তে পরমানন্দে বিচরণ করিতেছে, কিছুক্ষণ পরে সে স্থান শ্মশানক্ষেত্র রূপে দর্শন করিয়া ভীতচিত্তে পশ্চাৎপদ হইতেছে। অতএব ঊর্দ্ধে অধোভাগে, চতুর্দ্দিকে জড় জীবজগতে নিয়ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব সত্য কোথায়? অটল, অচল, অবিনাশী বস্তু কোথায়? অনিত্যের মধ্যে নিত্য অক্ষর পুরুষ কোথায়? এবম্বিধ চিন্তা পরম্পরা দ্বারা ব্যাকুল মানবাত্মা যখন সত্যের অনুসন্ধান করিতে ইতস্ততঃ ধাবমান হয়, সেই অবস্থাকে সাধকগণ প্রবর্ত্তকের অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই অবস্থা অনুসন্ধানের অবস্থা। সত্যানুসন্ধানই সাধকের মুখ্যউদ্দেশ্য। চারিদিকে অসত্য ও অস্থায়ী বস্তু দর্শন করিয়া সাধক সত্য লাভের জন্ত অস্থির হইয়া উঠেন। সাধক চাহেন সত্য বস্তু—ধ্রুব বস্তু; কিন্তু দেখেন চারিদিকে কেবল অসার ও অনিত্য। এই জন্যই তিনি বলিতে থাকেন "ইহা নয়, ইহা নয়।"

বাহ্য জগতে নিরাশ হইয়া সাধক আত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তখন দেখিতে পান, এক অক্ষর অবিনাশী সত্যের সহিত তিনি সংযুক্ত আছেন। এক পূর্ণ অমৃত ভাণ্ডার হইতে তিনি জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতি আত্মিক ভাবসমূহ প্রাপ্ত হইতেছেন। এক মহাসত্যহইতে মানবাত্মার সকল সম্পত্তি প্রসূত হইতেছে। এই চৈতন্য রূপী আদি সত্তার সহিত আত্মার নিগূঢ় যোগ দেখিয়া সাধক বলিয়া উঠেন "অস্তীতি অস্তীতি" "তিনি আছেন, তিনি আছেন।" এই যে, আমার আশ্রয়-কর্ত্তা, মূলাধার রূপে চিন্ময় পুরুষ আমারই হৃদয়ে বাস করিতেছেন।" এই অবস্থাতেই ব্রহ্মসাধক বলেন—"কোথা যাস্‌রে ভাই তার অন্বেষণে বল দেখি আমায়? যে জন ডাক্‌তে জানে, কাতরপ্রাণে ঘরে বসে সে যে পায়"।

সাধক আত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সত্যস্বরূপের সাধনে তন্ময় হইয়া যান। এতদিন বাহ্য জগতে যাঁহার দর্শন না পাইয়া তিনি ব্যাকুল ও নিরাশচিত্তে অতিকষ্টে কাল যাপন করিতেছিলেন, এখন অন্তরে সেই দুর্লভ বস্তুর সাক্ষাৎ পাইয়া মোহিত হইলেন। এই সাধনের অবস্থা যখন পরিপক্ব হয়, যখন সত্য বস্তুর সহিত আত্মার নিগূঢ় ঘনিষ্ট যোগ হয়—যখন সংশয়, কল্পনা, ভাবুকতা তিরোহিত হইয়া উজ্জ্বল ব্রহ্মজ্ঞান বিকশিত হয়, তখন সাধকের প্রাণের অন্তস্থল ভেদ করিয়া সুমধুর ধ্বনি উত্থিত হয় "ত্বংহি ত্বংহি" তুমিই তুমিই। তখন তিনি যাহা দর্শন করেন, যাহা শ্রবণ করেন, সকলের মধ্যেই সেই প্রাণের দেবতাকে দেখিতে পান। তখন তিনি আকাশে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রে এবং প্রকৃতির রমণীয় আভরণের মধ্যে তাঁহাকে দেখেন। শিশুর কোমল মুখে, ফুলের সৌন্দর্য্যে তাঁহারই সৌন্দর্য্য দেখিতে পান। সকল অস্থায়ী ও অসারের প্রাণরূপে সেই সত্যস্বরূপকে দর্শন করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হন, ইহাকেই সিদ্ধাবস্থা বলে। সিদ্ধাবস্থায় অন্তর বাহির এক হইয়া যায়। তখন চক্ষু মুদিত ও অমুদিত একই অবস্থা। সাধক আশ্রিত রূপে,—অনুগৃহীত রূপে, ব্রহ্ম সহবাস লাভ করেন।

কেহ কেহ বলেন;—"নাম সাধন কর, নামেতেই মুক্তি। নাম করিতে করিতে ঈশ্বরের স্বরূপ যখন প্রস্ফুটিত হইবে, তখনই আরাধনা করিবে, তৎপূর্ব্বে আরাধনা সাধনের প্রয়োজনীয়তা নাই।" কেহ কেহ বা বলেন;—"দিবানিশি ধ্যান কর, ধ্যানই অনন্ত-কালের সম্বল। আবার কেহ কেহ বলেন;—"আরাধনা সাধন কেবল ধ্যানরাজ্যে প্রবেশের জন্ত। আরাধনার সহিত মানবাত্মার নিত্যকালের সম্বন্ধ নাই। ধ্যানই আত্মার লক্ষ্য। সুতরাং সাধক যখন ব্রহ্মধ্যানে তন্ময় হইয়া যান, তখন আর আরাধনার প্রয়োজন কি? অতএব সাধন করিতে করিতে এমন উচ্চাবস্থা লাভ হইবে, যখন আরাধনা সাধনের প্রয়োজন থাকিবে না।"

এমন কি এই সকল যুক্তি অবলম্বন করতঃ কেহ কেহ আরাধনা পরিত্যাগ করিয়া অন্ত উপায়ে সাধন করিতেও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু ভগবানের কৃপায় সাধন রাজ্যের যতটুকু মর্ম্ম বুঝিয়াছি, তাহাতে ইহাই বিশ্বাস হইয়াছে যে, আরাধনা অনন্তকালের সাধন।

মানবাত্মার মধ্যে জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা এই তিনটি বিষয় রহিয়াছে। অনন্ত কাল এই তিনেরই উন্নতি হইবে। আত্মার অনন্ত উন্নতি শব্দের অর্থ, আত্মা জ্ঞান ভাব ইচ্ছাতে উন্নীত হওয়া। এই জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছাতে উন্নত হইতে গেলেই ভগবানের স্বরূপ সাধন অপরিহার্য্য। পরমেশ্বরের স্বরূপ সাধন ভিন্ন কথনও আত্মার এই সকল অপূর্ণ স্বরূপ প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। অনন্ত জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যের আদর্শ সম্মুখে না রাখিয়া মানবাত্মা কিরূপে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যে অনন্ত উন্নতি লাভ করিবে? পরমেশ্বর স্বীয়রূপে যদি সাধকের নিকট অনন্ত কাল প্রকাশিত না থাকেন, তবে সাধক কোন্ বস্তু অবলম্বন করিয়া অনন্ত উন্নতি পথে গমন করিবে? ঈশ্বর আমাদের পরিচালক, আদর্শ এবং উন্নতিদাতা, স্বরূপ সাধনের মধ্য দিয়াই আমরা এই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি।

পরন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সত্যস্বরূপের অভ্যন্তরে সমুদয় স্বরূপ নিহিত রহিয়াছে। সত্যে তন্ময় হওয়া অর্থাৎ তাঁহার উপলব্ধি করাই ধ্যানের উদ্দেশ্য। সুতরাং সমুদয় স্বরূপের আদি, সত্যস্বরূপ সাধনাই ধ্যানের লক্ষ্য। স্বরূপ সাধন ও ধ্যান বাহিরে ভিন্নার্থ বোধক হইলেও মূলে অভেদাত্মক বিষয়। যাহারা স্বরূপসাধন পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদের সাধনের উদ্দেশ্য কি তাহা কেহ বুঝিতে পারে না।

সাধনের যে তিনটি অবস্থা উল্লিখিত হইল, সেই তিন অবস্থাতেই আরাধনা সাধন—সত্যের সাধন প্রয়োজনীয়। সাধক প্রথম অবস্থায় সত্যের জন্য লালায়িত হন, দ্বিতীয় অবস্থায় সত্যের সহিত পরিচিত হন, এবং তৃতীয় অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থায় সত্যের সহিত যুক্ত হন, তখন তাঁহার সত্যের ভোগ হয়। সুতরাং সাধকের আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আরাধনার মূলমন্ত্রগুলি পরিবর্ত্তিত হয় না। "তুমি সত্য, তুমি জ্ঞান, তুমি প্রেম, তুমি পুণ্য" ইত্যাদি সাধন অনন্ত কালের সঙ্গী। তবে অধিকারী ভেদে উপলব্ধির তারতম্য হয় মাত্র। কেহ সত্য কি তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল, কেহ সত্য বস্তু জানিয়া আনন্দিত, কেহ বা সত্যস্বরূপের সম্ভোগে শান্তিপ্রাপ্ত। কিন্তু উচ্চ ও নীচ সকল শ্রেণীর সাধকই সত্যের সাধন করিবেন, নতুবা লক্ষ্যভ্রষ্ট তরণীর ন্যায় বিপথগামী হইতে হইবে।

সত্য স্বরূপসাগরে নিমগ্ন হইলে দেখা যায়, আরাধনা অমৃত রাজ্য বিশেষ। ইহার প্রাত স্বরূপে মধুচক্র রচিত। পিপাসিত মনভৃঙ্গ অনন্তকাল পান করিলেও অমৃত ভাণ্ডারের পরিসমাপ্তি হইবে না। মানবাত্মার অনন্ত আকাঙ্ক্ষার নিকট ভগবানের পূর্ণ স্বরূপগুলিই উপযুক্ত প্রলোভনীয় বস্তু। সুতরাং সত্যস্বরূপের সাধন—স্বরূপ সাধন পরিত্যাগ করিয়া অন্যবিধ সাধন অস্বাভাবিক। সেরূপ কোনও সাধনে কখনও সাধকের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই অমূল্য ধন প্রাপ্ত হইয়াও আমরা সমুচিতরূপে ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। অদ্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসবের পূর্ব্বদিনে আমরা সকলে এই বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণ করি যে, পরমেশ্বরের অযাচিত কৃপাগুণে বর্ত্তমান সাধন প্রণালী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। জাতিভেদ ও নানাপ্রকার পাপমোহাচ্ছন্ন দেশে সত্যের সাধন করিবার জন্য পরমেশ্বর এই দুর্ব্বল দীন সন্তানদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। যাঁহারা এই সাধন প্রণালীকে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া বিশ্বাস করিবেন, তাঁহারাই পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবেন। সত্যের সাধন করা—আরাধনাসাধনা করা—তাঁহারই আদেশ। আমরা এই আদেশ শিরোধার্য্য পূর্ব্বক যেন এই সাধনে নিয়োজিত থাকি। সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর আমাদিগকে কৃপা করুন, আমরা যেন প্রকৃত সত্য লাভ করিতে সমর্থ হই।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার কার্য্য।

(বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠ রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু কর্ত্তৃক মন্দিরে বিবৃত উপদেশ।)

আগামী কল্য আমাদের প্রিয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন। আমাদের সকলেরই বড় আনন্দের দিন। এ সময় প্রাণ খুলিয়া দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। শুনিয়াছি ধর্ম্মবীর মহাত্মা মার্টিন লুথারের সমাধির উপর প্রশ্নোত্তর চ্ছলে এই কয়েকটী কথা লিখিত আছে,—

Is it mans ? It shall fade away.
Is it God's ? It shall stand for ever.

ইহা কি মানবের? তাহা হইলে ইহা ধ্বংস হইয়া যাইবে। ইহা কি মহান্ পরমেশ্বরের? তাহা হইলে ইহা চিরদিন স্থায়ী হইবে।

আজ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বারে দাঁড়াইয়া অনেকেই এই প্রশ্ন করিতে পারেন যে, "ইহা মানবের, না, সেই মহান্ পরমেশ্বরের?" এই পঞ্চদশ বৎসরের কার্য্যপ্রণালী অনন্ত সাক্ষ্য দিতেছে যে, ইহা তাঁহারই দান।

আমরা সকলেই জানি যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। আজ কাল প্রায় সমস্ত সুসভ্য জগতেই রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিভাগে নিয়মতন্ত্রপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতেছে। রাজনৈতিক বিভাগের বড় বড় লোকেরা সাধারণ নিয়মতন্ত্রে লোকদিগকে শিক্ষিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। আমেরিকা মহাদেশে সাধারণতন্ত্র অথবা নিয়মতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হওয়ায় অশেষ কল্যাণ হইয়াছে। ইংলণ্ড দেশের বড় লোকেরা এক্ষণে রাজার পরিবর্ত্তে প্রজাতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তনের জন্য উৎসুক হইয়াছেন। পরমেশ্বর মানবকে স্বাধীন করিয়াছেন। তিনি তাহাকে জগতে প্রেরণ করিবার সময় তাহার হৃদয় ভূমিতে উজ্জ্বল অক্ষরে এই কথা লিখিয়া দিয়াছেন। "ওরে মানব তুই অভ্রান্ত শাস্ত্র কিম্বা অভ্রান্ত গুরুর কথা শুনিয়া চলিস্ নে।" স্বাধীনতাতেই সুখ, ইহাতেই মানবের তৃপ্তি ও আনন্দ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও সেই নিয়মতন্ত্রপ্রণালী ধর্ম্মসমাজে প্রবর্ত্তিত করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। নিয়মতন্ত্রপ্রণালী কি? এক সাধারণ নিয়মে লোকদিগকে পরিচালিত করা। অগাধ বারিধি-গর্ভে যেমন বৃহৎ তিমিও থাকে এবং ক্ষুদ্র মৎস্যও থাকে, উভয়েই আনন্দ-মনে সঞ্চরণ করে;—যেমন নীল আকাশে বৃহৎ বাজপক্ষী ও চকোর উভয়েই পক্ষ বিস্তার করিয়া মুক্তভাবে উড়িয়া বেড়ায়, এই নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে সেইরূপ সকলে সমান-ভাবে কার্য্য করিতে পারে। ইহাদ্বারা নরনারীর মনের ভাব বিকশিত হয়। ইহাতে মানব মনের শক্তির বিকাশ হয়। ইহা বর্ত্তমান সময়ে পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ বিধান।

যিনি সামান্য লোক, তাঁহারও যদি গুণ থাকে, তিনিও এখানে এক বৎসর, না হয় দুই বৎসর, না হয় দশ বৎসর পরে আপনার ক্ষমতানুসারে যোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইবেন। এই প্রণালীতে মানবের প্রভূত কল্যাণ হয়। রাজনৈতিক বিভাগে আমরা দেখিয়াছি, যেখানে রাজারই প্রতাপে দেশ শাসিত হয়, সেখানে কোন লোক মাথা তুলিতে চেষ্টা করিলে রাজা তাহার মস্তক টিপিয়া ধরেন। নিয়মতন্ত্র অথবা সাধারণ তন্ত্র সেরূপ নহে। ইহাতে বালক, যুবা, যুবতী, প্রবীণ ও প্রবীণার সকলের যথাযোগ্য অধিকার।

দ্বিতীয়তঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মের জটিলভাব হইতে জন-সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই ভারতে ধর্ম্মের এমন সকল প্রণালী ও এমন সকল কথা আছে, যাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা বড় কঠিন ব্যাপার। সে সকল এত জটিল যে, ঠিক জিলিপির পাকের ন্যায় বোধ হয়। অনেক কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে ধর্ম্মের অভিধান স্কন্ধে করিয়া বেড়াইতে হয়। ধর্ম্মের এইরূপ জটিল ও কুটিল ভাবে ভারতের সমূহ অনিষ্ট হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই প্রচার করিয়াছেন যে, সরল ভাবে ডাকিলেই পরমেশ্বরকে লাভ করা যায়। ছোট ছেলে যেমন তাহার পিতাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করে, ছোট বালক যেমন ক্ষুধার সময় জননীর অঞ্চল ধরিয়া খাবার প্রার্থনা করে; তৃষ্ণার সময় মানব যেমন জল-পান করে—তাহার মধ্যে যেমন কোন কৃত্রিমতা নাই, সেইরূপ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও এই শিক্ষা দিতেছেন যে, "সরল প্রার্থনাই মুক্তির পরম সাধন।"

যাঁহারা অভ্রান্ত গুরু ও শাস্ত্রের আদেশে চলিতে চান, তাঁহাদের এ সংসারে অনেক বিপদ ঘটিয়া থাকে। তাহাদের সেই দশা হয়, যেমন এক জাহাজের নাবিকেরা জাহাজস্থিত কম্পাসের নিকটে কাপ্তেনের মৃত্যুতে তৎক্ষণাৎ সেই দিগ্দর্শন শলাকার গতি পেরেক দিয়া রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল, এবং সেই গতিহীন যন্ত্রের অনুসারে চলিয়া অবশেষে বিপাকে পড়িয়াছিল। সেইরূপ যাহারা এ সংসারে জীবন-তরি চালাইতে যায়, তাহাদেরও পদে পদে ঐ অজ্ঞ নাবিকদিগের দশা ঘটিয়া থাকে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বিশেষভাবে এই কয়েক বৎসর এই শিক্ষা দিতেছেন যে, সরলভাবে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা, তাঁহার ধ্যান করা ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ।

আমাদের উপাসনা-প্রণালীর ন্যায় উৎকৃষ্ট উপাসনা-প্রণালী আর কখন পৃথিবীতে হয় নাই। এই প্রণালীমত সাধন করিলে মানবের জীবন গঠিত হয় এবং পরিত্রাণ হয়। কে বলে এ সাধনে উপকার হয় না? আমরা অনেকেই শুনিয়াছি, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ, যখন "সত্যম্" বলেন, তখন তাঁহার সমস্ত শরীরের রোম সকল খাড়া হইয়া উঠে। "সত্যম্, জ্ঞানম্" বলিয়াই ভারতের ঋষিরা নির্জ্জনে ও গিরি শিখরে বসিয়া সেই মহান্ পরমেশ্বরের বন্দনা করিয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ সকল প্রকার সামাজিক উন্নতি সাধনে তৎপরতা। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের প্রিয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সামাজিক উন্নতি বিষয়ে পরমেশ্বরের কৃপায় অনেক পরিমাণে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন। সামাজিক উন্নতি ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। এই কয়েক বৎসরে যে সকল সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহাতে আমাদের প্রাণে অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছে। সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে অনেক কার্য্য প্রত্যক্ষভাবে সমাজ হইতে না হইলেও ইহার সুযোগ্য সভ্যদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জয় চারিদিকে ঘোষিত হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কয়েকজন সুযোগ্য সভ্যের দ্বারা ইহা পরিচালিত হইতেছে। এই পত্রিকা দেশে বিদেশে প্রচারিত হইয়া অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছে, এবং রাজনৈতিক বিভাগে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। দীন দরিদ্র কুলীদের উপর যাহারা নৃশংস ব্যবহার করে, তাহাদিগকে দমন করিতে এই পত্রিকাই কিয়ৎপরিমাণে সক্ষম হইয়াছে। এই পত্রিকা দীন দুঃখিদের পিতা মাতা হইয়া নানারূপে দেশের অনেক হিতসাধন করিতেছে।

রমণীদিগের বিষয়েও এখানে কিছু বলা আবশ্যক। এই কয়েক বৎসরে রমণীদিগের অনেক বিষয়ে উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ রমণীদিগকে স্বাধীনতা ও শিক্ষা দানে তৎপর হইয়াছেন। আরঙ্গজিব বলিয়াছিলেন যে, রমণীদিগের আত্মা নাই, তিনি যদি আজ জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে দেখিতেন, ভারতে রমণীদিগের দ্বারা কত কার্য্য সংসাধিত হইতেছে। রমণীরা জ্ঞানে ও ধর্ম্মে কত উন্নতি লাভ করিতেছেন। আমাদের আদর্শ অতি উচ্চ। যদিও অনেক বিষয়ে আমাদের দুর্ব্বলতা আছে, কিন্তু এই উচ্চ আদর্শ অনুসারে আমরা চলিতে অভিলাষী হইয়াছি, এবং জগতের নিকট এই সুন্দর আদর্শ ধরিতে প্রস্তুত হইয়াছি। জ্ঞান, প্রেম, কার্য্যের সামঞ্জস্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। রাজনীতি, সমাজ, বিজ্ঞান এবং দর্শন সকলেরই উন্নতি করা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আর একটি প্রধান কার্য্য এই, সত্য ও চরিত্রকে আদর করা। আমরা ধ্যানকে আদর করি, কিন্তু যদি দেখি, এক ব্যক্তি পাঁচ ঘণ্টা ধ্যান করে, অথচ তাহার চরিত্র হীন, তাহার সত্যানুরাগ নাই—সে ব্যক্তি সমাজের ভয়ে ভীত—তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সেরূপ ধ্যানের কোন মূল্য দেন না। আমরা ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানীর চরিত্র দেখিতে

চাই, সত্যানুরাগ দেখিতে চাই। সত্যের প্রভাব বিস্তার করাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এক প্রধান লক্ষণ। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেক বালক কাহারও কথা না শুনিয়া এবং সমাজের ভয়ে ভীত না হইয়া উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন। অনেক পুরুষ ও রমণী স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। কত যুবাপুরুষ উৎসাহের সহিত এখানে যোগদান করিয়াছেন। যাঁহাদের আনন্দযুক্ত বদন দেখিলে প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুত্র কন্যাগণ, শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভাকাঙ্ক্ষিনীগণ! আপনাদের নিকট এই বিনীত প্রার্থনা যে, আপনারা পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া দেশে বিদেশে মহান্ পরমেশ্বরের জয় ঘোষণা করুন। মহাত্মা ঈশা বলিয়াছিলেন, "Let your light so shine before men, that they may See your good works, and glorify your Father which is in Heaven. ইহার ভাব এই, জীবনের জ্যোতি চারিদিকে বিস্তার কর তাহা হইলে লোকে তোমাদের কার্য্য দর্শন করিয়া সেই পরমেশ্বরের জয় ঘোষণা করিবে। বন্ধুগণ ভগ্নীগণ সেই মহান্ পরমেশ্বরের নাম চারিদিকে ঘোষণা কর। ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন নরনারীর আর পরিত্রাণের পথ নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ আদর্শ আমরা সকল স্থানে ধরিব। বন্ধুগণ! ইহা মানবের, না সেই মহান্ পরমেশ্বরের? ইহা সেই মহান্ পরমেশ্বরেরই দান। ইহা দ্বারা দেশের কল্যাণ হইবে এবং জগতের মঙ্গল হইবে।

পঞ্জাব-প্রচার-যাত্রীদিগের পত্র।

আমরা ৪ঠা মে ঝান্সী পৌছি। এখানে কতিপয় বাঙ্গালী ভদ্রলোকের যত্নে একটি প্রার্থনাসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রার্থনা সমাজের সম্পাদক মহাশয় আমাদিগকে আহ্বান করেন। সমাজের কয়েক জন সভ্য আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। বাবু মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের গৃহে আমরা অবস্থিতি করি।

৫ই মে—অপরাহ্নে মহেন্দ্র বাবুর গৃহে সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন এবং প্রার্থনাদি হয়। শাস্ত্রী মহাশয় উপনিষদের শ্লোক অবলম্বন করিয়া উপদেশ দেন। উপদেশ এরূপ প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল যে, কেহ কেহ অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই।

৬ই মে—অপরাহ্নে মারহাট্টা স্কুল গৃহের প্রাঙ্গণে এক প্রকাশ্য সভা হয়। ইংরাজ, পার্শী, মারহাট্টা, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর প্রায় তিন শত লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ একটি হিন্দি সঙ্গীত হয়, তৎপর শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ ও প্রকাশ দেব উর্দ্দু ভাষায় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। সুন্দর সিংহের বক্তৃতার সার মর্ম্ম—"ধর্ম্ম প্রবৃত্তি মানবের স্বাভাবিক। যেমন ক্ষুৎপিপাসা শরীরের পক্ষে, তেমন ধর্ম্মপিপাসা আত্মার পক্ষে স্বাভাবিক। সুতরাং ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য কোনও অভ্রান্ত গ্রন্থ বা গুরুর প্রয়োজন হয় না। আত্মা স্বভাবতই ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল, পরমেশ্বর গুরু ও উপদেষ্টা হইয়া সেই ব্যাকুল, তৃষিত আত্মাতে ধর্ম্মবারি প্রদান করেন।" বক্তা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা সংক্ষেপে এবিষয়টি সুন্দররূপে বর্ণন করেন।' শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেবের বক্তৃতার মূলমর্ম্ম এই;—"যে ধর্ম্ম মানুষকে নবজীবন দিতে পারে না, তাহা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। কেবল ধর্ম্মের উচ্চ মত মানিলে কোন ফল হয় না। বেদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে উচ্চ সত্য নিহিত আছে; তাহাতে আমার কি? আমার জীবনে যদি সত্য প্রতিফলিত না হইল, তবে উচ্চ তত্ত্ব কণ্ঠস্থ করিয়া কি ফল হইবে? আমাদের দেশে কত লোক শাস্ত্রে বিশ্বাস করিয়া ধর্ম্মের নানা প্রকার বাহ্য অনুষ্ঠান—কৃচ্ছ সাধন ইত্যাদি করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের জীবন দেখিলে ধর্ম্মের প্রতি লোকের অবিশ্বাস জন্মিয়া যায়। এমনই অসত্য, দুষ্ক্রিয়া পাপাচরণে তাহাদের জীবন পূর্ণ। অতএব আমাদিগকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। ধর্ম্ম এবং ব্যবহারিক জীবন একরূপ না হইলে নবজীবন লাভ করা যায় না। ব্রাহ্মধর্ম্ম নবজীবন দিবার জন্য আসিয়াছে। কার্য্য ও বাক্যে সম্পূর্ণরূপে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন। ঈশ্বর করুন এ ধর্ম্ম জীবনে অবতীর্ণ হউক।"

তৎপর শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই, "পৃথিবীতে সভ্যতার এই উন্নতির দিনে সংকীর্ণ ধর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারিবে না। যতই শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, ততই লোকের ধর্ম্মান্ধতা চলিয়া যাইতেছে। ধর্ম্ম বিশ্বাস, গ্রন্থ, তীর্থ স্থান ও ব্যক্তি বিশেষকে অতিক্রম করিয়া এক বিশ্বজনীন উদারতার দিকে ছুটিতেছে। এমন সময় আসিবে, যখন লোকে সেই বিশ্বজনীন উদার ধর্ম্মের ছায়াতে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিবে। এই ধর্ম্ম কোন জাতি বিশেষের নহে, কিন্তু সকল জাতিরই পরিত্রাণের ধর্ম্ম হইবে। এ ধর্ম্মের ঈশ্বরের প্রকাশ (revealation) একটি লক্ষণ, কিন্তু কোন গ্রন্থ বিশেষে ইহা আবদ্ধ নহে। এ ধর্ম্মে মানবাত্মায় ঈশ্বরের প্রকাশ হয় ইহাও একটি লক্ষণ; কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষেও সময় বিশেষে আবদ্ধ থাকিবে না। উদারতা, ঈশ্বরের পিতৃত্ব, মানবের ভ্রাতৃত্ব ইহার অন্যবিধ লক্ষণ। আধ্যাত্মিকতা এই ধর্ম্মের স্বরূপ। ব্রাহ্মধর্ম্মই এই উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্ম।" বক্তা নানারূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয়টি অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করেন। বক্তৃতা অতি সারগর্ভ ও প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। বক্তৃতান্তে মিঃ সোরাবজী বাইরামজী নামক একজন সম্ভ্রান্ত পার্শী ইংরাজিতে বলিলেন, "আমরা ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যে বাস করিতেছি, ধর্ম্মের নানারূপ অনুষ্ঠান করিয়াও ঈশ্বর হইতে অনেক দূরে রহিয়াছি। আমাদের মধ্যে কত অন্যায় রহিয়াছে। বাস্তবিক আমরা প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে। এই অন্ধকারের মধ্যে শ্রদ্ধাষ্পদ শাস্ত্রী মহাশয় ও অপর বক্তাদ্বয় যে প্রকৃত ধর্ম্মের সুসংবাদ আমাদের নিকট প্রচার করিলেন এজন্য ইঁহাদিগকে ও ব্রাহ্মসমাজকে এই সভার পক্ষ হইতে আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি। আর ইঁহাদের নিকট প্রার্থনা এই যে, ইঁহারা যেন আমাদিগকে বিস্মৃত হইয়া না যান, যেমন অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইঁহারা আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সুসংবাদ শ্রবণ করাইলেন; যেন এরূপ মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাদিগকে উপকৃত করেন।" তৎপর

স্থানীয় প্রার্থনা সমাজের পক্ষ হইতে বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী ধন্যবাদ প্রদান করেন। অবশেষে আর একটী হিন্দী সঙ্গীত হইলে সভা ভঙ্গ হয়।

তৎপর দিবস প্রাতে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক একজন প্রাচীন হিন্দু আমাদিগকে তাঁহার গৃহে আহ্বান করেন। তথায় উপাসনা ও উপদেশ এবং কীর্ত্তনাদি হয়। শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তথায় প্রায় ২৫ জন বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন।

উপরোক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের যত্নে এখানে একটি অনাথালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহা কিয়ৎপরিমাণে আমাদের দাসাশ্রমের অনুরূপ। এখানে আপাততঃ ১৫টি রোগী আশ্রয় পাইয়াছে। বেতন ভোগী ভৃত্যগণ ইহাদের সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকে। যদুবাবু স্বয়ং ইহার তত্ত্বাবধান করেন। যদুবাবুর বয়স ৬০ বৎসর, তিনি গভর্ণমেণ্ট হইতে পেন্সন পান। তিনি যদিও বৃদ্ধ, কিন্তু তিনি নিদ্রা বা উপবেশনে—আলস্যে দিন কর্ত্তন করেন না। তাঁহার সমুদয় সময় নানারূপ জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হয়। তাঁহার শরীর ও মনের সুস্থতা, কার্য্যোৎসাহ, শ্রমশীলতা এবং সহৃদয়তা অনুকরণীয়। যদুবাবু আমাদিগকে তাঁহার অনাথালয় দর্শন করিতে আহ্বান করেন। আমরা উপাসনান্তে তথায় যাই। মিঃ সোরাবজি এবং আর কয়েক জন বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীও গমন করেন। রোগিগণ এক স্থানে মিলিত হইলে তাহাদিগকে সঙ্গীত ও বাদ্য শ্রবণ করান হয়। পরে শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ সরল উর্দ্দু ভাষায় কিছু ধর্ম্মোপদেশ দেন।

ইহাদের প্রকৃতি অতি সরল, আগ্রহের সহিত ইহারা উপদেশ শ্রবণ করিল। যদু বাবু ইহাদের জন্য নানারূপ ফল ও মিষ্টান্ন আনিয়া রাখিয়াছিলেন, পরিশেষে তাহা ইহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করা হয়। যাহাদের সংসারে কেহ নাই, তাহারা এরূপ সস্নেহ ব্যবহার প্রাপ্ত হইতেছে, এ দৃশ্য আমাদের দেশে নূতন। ভগবান করুন, এরূপ সাধু-কার্য্যের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্তি হউক।

অপরাহ্নে যদু বাবুর গৃহে পাঠ, ব্যাখ্যা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত কীর্ত্তনাদি হয়। শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রায় ৪০ জন ভদ্রলোক ও ১২ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। অদ্যকার সম্মিলন প্রধানতঃ মহিলাদিগের জন্যই হইয়াছিল। উপদেশ, প্রার্থনা ও সংকীর্ত্তনাদি অতি সরস হইয়াছিল। আমাদের ঝান্সীর কার্য্য এবার এখানেই শেষ হইল। ভগবানের কৃপায় এখানে একটী নূতন ভাবের উদয় হইয়াছে। এখানে অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে প্রায় কিছু জানিতেন না। তাঁহাদের দৃষ্টি ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ আমাদের কাগজের গ্রাহক হইয়াছেন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তকাদি ক্রয় করিয়াছেন এবং সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মসমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ষোড়শ জন্মোৎসব— সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ষোড়শ জন্মদিন উপলক্ষে গত ১লা ও ২রা জ্যৈষ্ঠ উৎসব হইয়াছে। ১লা রবিবার প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং উপদেশ প্রদান করেন। ঐদিন সন্ধ্যাকালে বাবু শশিভূষণ বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। ইঁহাদের প্রদত্ত দুইটী উপদেশ স্থানান্তরে মুদ্রিত হইয়াছে। ২রা জ্যৈষ্ঠ প্রাতে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে বাবু সীতানাথ দত্ত ইংরাজি ও সংস্কৃত পুস্তক হইতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মানুমোদিত প্রবন্ধ ও শ্লোক পাঠ করেন, তৎপর আরাধনা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু মনোরঞ্জন গুহ, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু সীতানাথ দত্ত, বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাবু বিপিনচন্দ্র পাল এবং বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল প্রভৃতি আরাধনা ও উপাসনা প্রণালী সম্বন্ধে স্বীয় স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। সন্ধ্যা সমাগমে কীর্ত্তন হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। তাঁহার উপদেশ স্থানাভাব বশতঃ এবার প্রকাশিত হইল না। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য পরমেশ্বর এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে স্থাপন করিয়াছেন। আমরা যেন এখানে ব্রহ্মের জীবন্ত লীলা দর্শন করিয়া, দিন দিন ইহার সেবায় অধিকতর আকৃষ্ট হই।

পঞ্জাব-প্রচার যাত্রীদল— আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ পঞ্জাব প্রচার-যাত্রিগণ দুই মাসের পর, গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন। ইঁহারা লাহোর গমনের সময় যেমন স্থানে স্থানে প্রচার করিয়াছিলেন, আসিবার কালেও আগ্রা, খাণ্ডোয়া, ঝান্সী, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়াছেন। এবার প্রচারকার্য্যে বিশেষ শুভ লক্ষণ দেখা গিয়াছে। ইঁহাদের উপাসনা, ধর্ম্মালোচনা, শ্লোক-ব্যাখ্যা এবং বক্তৃতা ও সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের বিরোধীগণও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং অনেক ধর্ম্মপিপাসু-প্রাণ এ ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইঁহারা যে স্থানে গমন করিয়াছেন, সেখানেই বিশেষ ধর্ম্মান্দোলন হইয়াছে। বিধাতা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের জন্য দিন দিন যে ভারতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেন, এ যাত্রায় তাহার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। পরমেশ্বর তাঁহার সত্যধর্ম্ম জগতে প্রচার করুন।

উৎসব— গত ২০শে চৈত্র শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটী লিখিত উপদেশ পাঠ করেন। উপদেশটী অতি সারগর্ভ ও চিন্তাপূর্ণ হইয়াছিল।

হাজারীবাগ ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং বাবু রেবতীমোহন সেন তথায় গমন করিয়াছিলেন। উৎসবে উপাসনা, আলোচনা, বক্তৃতা ও কথকতা ইত্যাদি হইয়াছিল। নগেন্দ্র বাবু দুইদিন বক্তৃতা করেন এবং রেবতী বাবু চৈতন্যলীলা সম্বন্ধে কথকতা করেন। বক্তৃতা ও কথকতা অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হইলে পরে প্রকাশ করা যাইবে।

জন্মদিন—মাণিকদহের জমিদার বাবু বিপিনবিহারী রায় স্বীয় জন্মদিন উপলক্ষে সাঃ ব্রাঃ সমাজে ২৲, সাধনাশ্রমে ২৲, ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়ে ২৲, এবং দাসাশ্রমে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

জাতকর্ম্ম—হরিনাভিনিবাসী বাবু শ্রীশচন্দ্র রায়ের পুত্রের জাতকর্ম্ম সাধনশ্রমে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। এতদুপলক্ষে শ্রীশবাবু সাধনাশ্রমে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ অপার সারকিউলার রোডস্থ ভবনে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর নবজাত কুমারের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে বিশেষভাবে উপাসনাদি হইয়াছে। বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা এবং বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস উপদেশ দান করেন। পরমেশ্বর শিশুদিগের মঙ্গল করুন।

শ্রাদ্ধ—পরলোকগত জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ ২১০।৪ নং ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন, বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়-চৌধুরী স্বর্গীয়া দেবীর জীবন চরিতের অংশবিশেষ পাঠ করেন। জগদীশ্বর বাবুর উইল অনুসারে তাঁহার পত্নী এতদুপলক্ষে নিম্নলিখিতরূপে দশটি টাকা দান করিয়াছেন,—সাধনাশ্রম ২৲, অনাথাশ্রম ১৲, জয়গায়ক দল ২৲, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ভাণ্ডার ১৲ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১৲ সাঃ ব্রাঃ সমাজের দাতব্য বিভাগ ১৲ দাসাশ্রম ১৲ জলথাবার ১৲।

৩রা জ্যৈষ্ঠ বহুবাজারস্থ বাবু হরিমোহন দত্তের পরলোগত পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্নে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এবং রাত্রিতে বাবু কেদার নাথ রায় উপাসনা করেন। পরমেশ্বর পরলোকগত আত্মাদিগের মঙ্গল বিধান করুন।

পরলোকগতা বালিকার জন্মোৎসব—২রা জ্যৈষ্ঠ বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর পরলোকগতা কন্যা অপরাজিতার জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। এতদুপলক্ষে দেবী বাবু সাঃ ব্রাঃ সমাজে ১৲ এবং সাধনাশ্রমে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

উপনিষদ প্রকাশ—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা প্রভৃতি প্রণেতা বাবু সীতানাথ দত্ত কর্ত্তৃক ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, এই ছয় খানি উপনিষদের সরল ও সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত টিকা এবং বঙ্গানুবাদ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী এই গ্রন্থ সংশোধন করিয়া দিতেছেন ও তাঁহার সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হইতেছে। সুতরাং অনুবাদ যে বিশুদ্ধ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। ২১০।৩।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ঠিকানায় পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, পার্শেলে প্রেরিত হইবে। মূল্য ৷৵০ আনা।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি—বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বাবু দ্বারকানাথ সরকারের একই বিষয়ের দুইখানি পত্র পাওয়া গিয়াছে। এবার স্থানাভাব বশতঃ প্রকাশিত হইল না। পত্রপ্রেরকগণ ক্ষমা করিবেন।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নিম্নলিখিত মহাশয়গণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য বিভাগে ১৮৯২ সালে নিম্নলিখিত অর্থদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচাঁদ বসু কলিকাতা মাসিক দান ১২৲ বাবু অভয়াচরণ মল্লিক ৭৲ শ্রীমতী শিবমনোমোহিনী সিংহ, মুঙ্গের ২৲ বসন্তকুমারী বসু কলিকাতা ৷৹ বাবু সত্যরঞ্জন খাস্তগির শিবপুর ২৲ বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ।৹ বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ।৹ বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্র বার্ষিক চাঁদা ৫৲ বাবু যদুনাথ ঘোষ ৩৲ বাবু কেদারনাথ মিত্র ৩৲ বাবু বিপিন-বিহারী দত্ত ১৲ বাবু বিহারীলাল মল্লিক ১৲ বাবু হেমচন্দ্র সুর ৩৷৵১০ শ্রীমান্ সুবোধ প্রবোধের জন্মদিন উপলক্ষে ১৲ শ্রীমতী কিশোরীবালা চক্রবর্ত্তী দার্জ্জিলিং ১৲ বাবু গোবীকান্ত রায় সীমলা হিল ৫৲ বাবু বেণীমাধব মিত্র ১৲ বাবু কালীপ্রসন্ন বসু প্রদত্ত ১০০ শত টাকার সুদের দরুণ ৩৩৲ রায় গুনাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর কলিকাতা ১৫৲ বাবু ভবসিন্ধু দত্ত ২৲ বাবু বরদানাথ হালদার ৩০৲ বাবু ভুবনমোহন ঘোষ ১৲ বাবু গুরুচরণ মহলানবিস ২৲ বাবু মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৲ বাবু নন্দকুমার চৌধুরী ২৲ বাবু রাখালচন্দ্র সেন ১৲ বাবু বিপিন-বিহারী রায় জমিদার মাণিকদহ ১০৲ বাবু নন্দলাল সেন কলিকাতা ২৲ বাবু রাইচরণ দাস উকিল কুষ্টিয়া ১৲ বাবু এককড়ি সিংহ বানিবন ১৲ বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু কলিকাতা ১৫৲ বাবু বাণীকান্ত রায় চৌধুরী ১৷৹ বাবু পার্ব্বতীচরণ দাস পূর্ণীয়া ১০৲ বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক ২৲ উমাচরণ দাস ভবানীপুর ৫৲ বাবু প্রসাদদাস মল্লিক কলিকাতা ৫০৲ কোন দীনভ্রাতা ৫৲ বাবু ভগবানচন্দ্র গুহ সিরাজগঞ্জ ১৲ বাবু দেবকণ্ঠ রায়ের গৃহিণী ১৲ তাঁহার বিধবা ভ্রাতৃজায়া ১৲ বাবু প্রাণচন্দ্র লাহিড়ী সিমলা হিল ২৲ বাবু বিপিনবিহারী বসু লক্ষ্ণৌ ১৲ বাবু রাধানাথ দেব কলিকাতা ২৲ বাবু কুঞ্জলাল শীল মাণিকদহ ১৲ বাবু গোপালচন্দ্র রক্ষিত কলিকাতা ১৲ বাবু জগদীশচন্দ্র বসু ২৫৲ রায় বিপিনকৃষ্ণ বসু বাহাদুর নাগপুর ১০৲ বাবু যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাকিনিয়া ১৲ বাবু কানাইলাল সাহা তিল্লি ১৲ বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ১৲ শ্রীমতী রমাসুন্দরী ঘোষ ১৲ বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা কুমারখালি ৬৲ কোন বন্ধু কলিকাতা ৩০৲ পণ্ডিত রামগতি ভট্টাচার্য্য মজিলপুর ২৲ শ্রীমতী জগৎলক্ষ্মী ঘোষ কলিকাতা ১৲ বাবু কালীপ্রসন্ন বসু ১৷৹ শ্রীমতী গোলাপমণি ঘোষ (মাঃ বাবু সারদাপ্রসাদ সিংহ) ২৲ মোট ৩৭৮৷৵১০।

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ

সম্পাদক দাতব্য বিভাগ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

৫ম সংখ্যা।
১৬শ ভাগ।

১লা আষাঢ়, বুধবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

তপস্যা।

তপস্যা সংযম বিনা প্রকৃতি দুরন্ত,
বসেনা ত সত্যের সাধনে;
বাসনা কামনা শত নাহি যার অন্ত,
থাকে চিত্ত তাহারি চিন্তনে।

অস্থির চঞ্চল মনে বসাইতে চাহি,
ধীর স্থির ক্ষণমাত্র নয়;
কি ভাবে, কি চাহে, তার আদি অন্ত নাহি,
ক্ষুদ্র সুখ লয়ে শুধু রয়।

কে জেনেছে সার তত্ত্ব তপস্যা বিহনে,
দিব্য জ্ঞান হয়েছে প্রকাশ?
কে করেছে সিদ্ধিলাভ কঠোর-সাধনে,
কে করেছে বাসনা-বিনাশ?

দেও সে তপস্যা-বল, প্রবৃত্তি-কুয়াসা,
কেটে যাক্ দিব্য জ্ঞানোদয়ে;
ঘুচে যাক্ চঞ্চলতা, সংশয় নিরাশা,
সার তত্ত্ব ফুটুক হৃদয়ে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

তপস্যা ও সাধন—জগতের ইতিবৃত্তে দেখি, যে সকল সাধু মহাত্মা জগতে অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, এবং লক্ষ লক্ষ নরনারীকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কঠোর তপস্যাদ্বারা সেই সকল সত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বহুদিনের নির্জ্জনবাস, চিন্তা, ও আত্ম-নিগ্রহের পর যাহা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই সজনে আসিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন। যেথানেই সাধনা, যেথানেই তপস্যা, সেই খানেই বিষয়ে বৈরাগ্য ও আত্ম-নিগ্রহ। কিন্তু তপস্যা করিতে হইলেই যে সাধককে অরণ্যবাসী হইতেই হইবে তাহা নহে। প্রতি-নিয়ত মানব-সমাজের মধ্যে এক একটী বিদ্যালাভের জন্য কত তপস্যা দৃষ্ট হইতেছে। যিনি বিশ্ব বিদ্যালয়ের এম, এ উপাধি লাভ করিয়া বহির্গত হইয়াছেন, তাঁহার তপস্যার বিষয় একবার স্মরণ কর। একাদিক্রমে ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বর্ষ-কাল নিত্য বিদ্যালয়ে গতায়াত করিয়াছেন; আপনার সুখ-প্রিয় প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া প্রত্যহ চারি পাঁচ ঘণ্টা বিদ্যালয়ে বদ্ধ থাকিয়াছেন; গৃহে পাঠাভ্যাসে রাত্রির অধিক কাল যাপন করিয়াছেন; তৎপরে উপাধি লাভ করিয়াছেন। যে সুগায়কের মধুর কণ্ঠনিঃসৃত সংগীত শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইতেছ, তাঁহার তপস্যার বিষয়ে একবার মনে ধারণা কর। তিনি কতদিন শিক্ষকের দ্বারে পড়িয়া থাকিয়াছেন, প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া কতকাল ধরিয়া রাগ রাগিণীর আলাপ করিয়াছেন। এ সকল কি তপস্যা নহে? ধর্ম্মও সেইরূপ তপস্যা-সাধ্য। আধ্যাত্মিক সত্য সকলকে আয়ত্ত করিবার জন্যও সেইরূপ তপস্যার প্রয়োজন। সেইরূপ চিত্তের একাগ্রতা, আত্মনিগ্রহ ও অনুশীলনের প্রয়োজন। যে সত্য তপস্যা ও সাধন-লব্ধ নহে, তাহা জীবনে স্থায়ী হয় না। তপস্যা যেন শাণ পাথরের ন্যায়, তাহাতে হৃদয়কে শাণ দিয়া সত্যকে উজ্জ্বল ও ধারাল করিতে হয়। তপস্যাদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে আত্মার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি উজ্জ্বল ও সত্য-ধারণের শক্তি বর্দ্ধিত হয়। সেইরূপ চিত্তেই অধ্যাত্ম-তত্ত্ব সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। যে চিত্তে নির্জ্জন চিন্তা ও তপস্যা নাই, সে চিত্ত গভীর তত্ত্ব গ্রহণের উপযোগী নহে; তাহা সর্ব্বদা উপরে উপরে বিচরণ করে ও বহির্মুখীন হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মসমাজে তপস্যার ভাবকে জাগ্রত করা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা যেরূপ চিন্তাবিহীন ভাবে কথা বলি ও কার্য্য করি, তাহাতে এক এক সময়ে নিজেদেরই লজ্জা হয়। আমাদের মধ্যে একজন তপস্বী অদ্যাপি উজ্জ্বল আদর্শ স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনের জন্য যেরূপ কঠোর তপস্যা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে ও চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহার ফল এই হইয়াছে, তিনি যে টুকু লাভ করিয়াছেন তাহা চিরদিন ধরিয়া আছেন। কিছুতেই সেই ভূমি হইতে তাহাকে বিচলিত করিতে পারিতেছে না। তাঁহার অবলম্বিত পন্থা সম্পূর্ণরূপে আমাদের অবলম্বনীয় না হইলেও তাঁহার দৃঢ়তা ও সাধন-পরায়ণতা যে অনুকরণীয় তাহা কে অস্বীকার করিবেন। এই তপস্যাতে তিনি যখন প্রবৃত্ত

হইয়াছিলেন, তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনকে লক্ষ্য ও অপর সকল কার্য্যকে উপলক্ষ্য করিয়াছিলেন। আমাদিগকে ও সেই ভাবে তপস্যা করিতে হইবে, তবেই ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের জীবনে সাধিত হইবে।

সজন উপাসনা—উৎকৃষ্ট বস্তুর অপব্যবহারে সর্ব্বত্রই বিষময় ফল ফলে। একভাবাপন্ন, সরল কতিপয় ধর্ম্মপিপাসু আত্মা সমবেত হইয়া, যখন জগদীশ্বরের আরাধনা করেন; তখন তাহার মধ্যে অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। একের প্রাণের সরলতা ও ব্যাকুলতা অন্য পাঁচজনকে অনুপ্রাণিত করে; একের ভক্তি ও বিশ্বাস অন্যের মৃত প্রায় ভাবগুলিকে জাগ্রত করে। সরল ও ব্যাকুল হৃদয়গুলির সমবেত প্রেমের উপর প্রভু পরমেশ্বরের কৃপা পড়িয়া অপূর্ব্ব ভাবের উদয় করে। কিন্তু যখন হৃদয়ের মধ্যে সরলতার অভাব দেখা যায়, প্রাণে ব্যাকুলতা আর তেমন থাকে না, নিজের জীবন অপেক্ষা অন্যের জীবনের উপর অধিক দৃষ্টি পড়ে, নিজে ডুবিবার চেষ্টা না করিয়া, অন্যকে ভাবে ভাসাইবার চেষ্টা হয়, এক কথায় যখন প্রার্থনা ও উপাসনার সময় ঈশ্বরের উপর দৃষ্টি স্থাপিত না হইয়া অন্যের উপর পড়ে, তখন সেই সমবেত উপাসনা-দ্বারা উপকার না হইয়া জীবনের সমূহ অনিষ্ট উৎপন্ন হয়।

ব্রাহ্মসমাজে শব্দের দ্বারা আরাধনা ও প্রার্থনা করিবার যে প্রথা আছে, তাহাদ্বারা উপাসনা ও প্রার্থনাতে অসত্যভাব প্রবেশ করিতেছে কিনা, সমবেত উপাসনার উপর লোকের অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হইতেছে কিনা, তাহা একবার গভীরভাবে ভাবিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ঈশ্বরের নাম মুখে রহিয়াছে, কিন্তু চক্ষু রহিয়াছে মনুষ্যের উপর; প্রার্থনা করিতেছি ঈশ্বরের নামে, কিন্তু অন্তরে অন্যকে উপদেশ দেওয়ার দিকে দৃষ্টি রহিয়াছে। অল্পাধিক পরিমাণে ইহা সকলেই অনুভব করিতেছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সামাজিক উপাসনা কিঞ্চিৎ পাতলা ভাব ধারণ করিয়াছে, অনেক সময় ইহাও শুনা যায় যে উপাসনার সময় আচার্য্যগণ অন্যের মধ্যে ভাবের উদয় করিবার জন্য নানা কথা বলিয়া থাকেন। ব্রাহ্মের একপ্রাণ হইবার স্থান উপাসনা-ক্ষেত্র। সামাজিক উপাসনাই ব্রাহ্মসমাজের সাধন-প্রণালীর বিশেষত্ব। এই সম্মিলনের স্থানে যদি পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধাও অবিশ্বাস উৎপন্ন হয়, তবে ব্রাহ্মের বড় বিপদ। উপাসনার সময় সপ্তম স্বর্গের কথা বলিয়া, ভাবের তরঙ্গে অন্যকে ভাসাইতে চেষ্টা হইল, অথচ জীবনের মধ্যে তাহার কোন লক্ষণ নাই। সেই মহান্ পরমেশ্বরের উপর যখন প্রাণের দৃষ্টি পড়ে, তখন রসনা সংযত হয়; প্রাণ মন প্রশান্ত ভাব ধারণ করে।

আরও একটী বিষয় ভাবিবার আছে। একদিকে যেমন পাঁচজনের মধ্যে বসিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার সময় সাধকের জীবনের নিষ্ঠা, সরলতা ও ঈশ্বরের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, অন্য দিকে যাঁহারা উপাসক তাঁহাদের এক ভাবাপন্ন হওয়া আবশ্যক। যাঁহাদের সহিত প্রাণের মিল নাই, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া সমবেত উপাসনা প্রকৃতভাবে হওয়া কঠিন। সর্ব্বপ্রকার লোকের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য প্রচার করা এক কথা, আর যখন প্রাণ খুলিয়া ব্রহ্ম চরণে আত্ম-নিবেদন করি, তখন সর্ব্বশ্রেণীর লোককে উপস্থিত হইতে দেওয়া অন্য কথা। সামাজিক উপাসনাতে যখন নানা শ্রেণীর সম-বিশ্বাসী লোক উপস্থিত হন, তখন উপাসনার প্রণালী পরিবর্ত্তিত করা আবশ্যক কিনা তাহাও ভাবিবার বিষয়। সরলতা, ভাবের একতা ও পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার যোগ এবং প্রণালীতে আস্থা, সমবেত উপাসনার প্রাণ। এই বিষয়ে ব্রাহ্মসাধারণের বিশেষতঃ যাঁহারা উপাসনাদি করেন, তাঁহাদের মনোযোগ হওয়া আবশ্যক।

সঙ্কল্প পালন—পরমেশ্বর কৃপা করিয়া তাঁহার সন্তানদিগের প্রাণে সাধু সঙ্কল্প অভ্যুদিত করেন। যিনি সেই সঙ্কল্প-পথে আজীবন স্থির থাকেন, তিনিই তাঁহার প্রিয় সন্তান। যিনি সঙ্কল্প প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ, তিনি ধর্ম্মরাজ্য হইতে বহু পশ্চাতে গমন করেন। সাংসারিক কার্য্যে আমরা দেখিতে পাই, অঙ্গীকার প্রতিপালন করা সামাজিক ও রাজনৈতিক আদেশ। কেহ যদি তোমার নিকট অঙ্গীকার করে যে, সে তোমার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবে; নিরূপিত সময়ে তাহা না করিলে রাজপুরুষগণ তাহার দণ্ডবিধান করিবেন এবং জনসমাজ তাহাকে প্রবঞ্চক মিথ্যাচারী বলিয়া ঘৃণা করিবে। যিনি পরমেশ্বরের সিংহাসনতলে দাঁড়াইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধনে জনসমাজের সেবাতে কিম্বা ধর্ম্ম-প্রচারে জীবন দান করিবেন, তিনি যদি সেই অঙ্গীকার পালন না করেন, তবে পরমেশ্বরের সম্মুখে তাঁহার স্থান আছে কি? তিনি নিশ্চয়ই সত্যরাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হইবেন। সকল দেশেই প্রতিজ্ঞা পালনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

যাঁহারা কোনও প্রকার সাধু সঙ্কল্প প্রকাশ করিবেন, তাঁহাদের প্রতি নিবেদন এই যে, বিশেষ চিন্তা, প্রার্থনা ও আলোচনা না করিয়া যেন কেহ প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ না হন। কিন্তু যে অঙ্গীকার একবার মুখ হইতে বাহির হইবে, তাহা প্রতিপালন করিতে যেন সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন। পরমেশ্বরের এবং সম-সাধকদিগের নিকট অঙ্গীকার করা খেলা নহে। সঙ্কল্প না করা ভাল, কিন্তু একবার কোনও সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে শরীর মন দিয়া তাহা পালন করিতে হইবে। যেখানেই আমরা সঙ্কল্প প্রতিপালনের শিথিলতা দেখিতে পাই, সেখানেই মনে ব্যথা পাই। আমরা ব্রত-রক্ষার জন্য সঙ্কল্প পালনের জন্য প্রাণপাত করিব। পরমেশ্বর আমাদের সহায় হউন।

জীবনপ্রদ-মন্ত্র—প্রতিদিন কত ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা আরাধনা-মন্ত্র সাধন করিতেছেন, কত স্থান হইতে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, কিন্তু উপাসনার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তেমন গভীরতা কেন জন্মিতেছে না? অধিকাংশ স্থলে এই

মহামন্ত্র কেবল বায়ুতরঙ্গে পর্য্যবসিত হইতেছে কেন? মন্ত্র-সাধনের সহিত সাধকের জীবন কেন গঠিত হইতেছে না? এ কথার উত্তর অতি সহজ। মন্ত্র তাহারই পক্ষে জীবিত এবং কার্য্যকর, যিনি তাহা বিশ্বাসের সহিত উচ্চারণ করেন। ব্রহ্মনাম সেই ক্ষেত্রেই ফল প্রসব করে,যে ক্ষেত্রের জমি বিশ্বাস ও ভক্তি জলে আর্দ্র। বিশ্বাসবিহীনের কাছে আরাধনা মন্ত্রের —ব্রহ্মনামের কোনই মূল্য নাই। কত লোকে দিন রাত্রি সত্যং উচ্চারণ করিতেছেন, কিন্তু উচ্চারণের সহিত হৃদয়ের কোনই যোগ দেখা যায় না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন সত্যং শব্দ উচ্চারণ করেন, তখন হয় ত তাঁহার সমগ্র শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে, তিনি সম্মুখে সত্যকে দেখিতে পান। "সত্যং" এই শব্দ তাঁহার কাছে কোন শব্দ নহে, জীবন্ত পরমেশ্বর।

বিশ্বাসী ব্যাকুল আত্মার কাছেই মন্ত্র জীবিত; অন্ধের কাছে মৃত। কেবল পাখীর মত উচ্চারণ করিলে কখনও জীবন পরিবর্ত্তন হয় না, ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি হয় না, বিশ্বাস ও ব্যাকুলতার প্রয়োজন। কেহ কেহ সমস্ত জীবন "সত্য সত্য" করিয়া কোনও ফল পাইতেছেন না, শেষে আরাধনার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া ভিন্ন সাধন অবলম্বন করিতেছেন। মন্ত্রের দোষ নহে, দোষ নিজের। বিশ্বাসী না হইলে মন্ত্র-সাধনে ফল ফলে না; বিশ্বাসী না হইলে ব্রহ্মকৃপা লাভ হয় না; সূর্য্যরশ্মি সকল প্রকার কাচেতেই পতিত হয়; কিন্তু আতসী দর্পণেতে পতিত হইলেই অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া থাকে। তদ্রূপ নাম সকলেই উচ্চারণ করেন; কিন্তু বিশ্বাসী হৃদয়েই নামের ফল ফলিয়া থাকে। কেহ যদি গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে অবস্থিতি করেন এবং বলিতে থাকেন যে, বিধাতার কিরূপ বিচার, এই ঘরে বাতাস ও আলোক দিতেছেন না। তবে যেমন সকলেই তাঁহার অজ্ঞতা দেখিয়া হাস্য করেন, তেমনি স্বার্থপরতা, বিষয়াসক্তিদ্বারা চিত্তদ্বার রুদ্ধ করিয়া যাঁহারা বসিয়া আছেন, তাঁহারা যদি বলেন যে, সাধনে কিছু হয় না, আরাধনাতে তাঁহাকে পাওয়া যায় না,তবে তাঁহারা ও উপহাসাস্পদ হন। মুখে উচ্চারিত মন্ত্র সঞ্জীবিত হয় না। অতএব মন্ত্র জীবিত হওয়ার পক্ষে সর্ব্বাগ্রে আমাদিগের সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তবেই মন্ত্রদ্বারা সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইবে, নতুবা কণ্ঠস্থ মন্ত্রোচ্চারণে কোনই ফল নাই। প্রস্তুত না হইলে, কোন ফলই প্রসূত হয় না।

ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মসমাজ—১লা জ্যৈষ্ঠের তত্ত্ব-কৌমুদীতে "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে আত্ম-পরীক্ষা" নামে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটী ইচ্ছা করিয়াই এরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছিল, যাহাতে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। আমাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। প্রবন্ধটী অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কাহারও কাহারও বিরাগ উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহারা অনুভব করিতেছেন যে, উক্ত প্রবন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের প্রতি যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাঁহারা তাহার পাত্র নহেন। আমরা এ সম্বন্ধে দুইখানি পত্রও প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার একখানি যথাস্থানে প্রকাশিত হইল। তত্ত্বকৌমুদী মনোযোগপূর্ব্বক যাঁহারা পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে, উক্ত প্রবন্ধের লিখিত বিষয়গুলি আরও অনেকবার তত্ত্ব-কৌমুদীতেই প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে কাহারও দৃষ্টি এরূপ আকৃষ্ট হয় নাই। যাহা হউক এবিষয়ে সকলের মনোযোগ যখন হইয়াছে, তখন এই উপলক্ষে কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করা যাউক।

উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যদি কাহারও মনে এ প্রকার ধারণা জন্মিয়া থাকে যে, উক্ত প্রবন্ধ-লেখক নিয়মতন্ত্র-প্রণালীর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসহীন হইয়াছেন, তবে তিনি সে সংস্কার পরিত্যাগ করিবেন। এ সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখকের বক্তব্য এই;—মানব-সমাজের ইতিবৃত্ত-পাঠক মাত্রেই জানেন যে, সুশৃঙ্খলরূপে মানব-সমাজের কার্য্য পরিচালনার জন্য অদ্যাবধি যত প্রকার শাসন-প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্বায়ত্ত শাসন-প্রণালী অথবা নিয়মতন্ত্র-প্রণালীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাও যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ তাহা নহে; তবে অপরাপর শাসন-প্রণালীর দোষভাগের সহিত তুলনা করিলে, ইহার দোষ ভাগ সামান্য বলিয়া বোধ হয়। এই নিয়মতন্ত্র-প্রণালীর দুইটী প্রধান গুণ; প্রথম ইহাতে অযথা ব্যক্তিগত শক্তিকে শাসনাধীনে রক্ষা করে; দ্বিতীয় এতদ্দ্বারা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত শক্তি সকলকে সমাজের কল্যাণ-সাধনে নিযুক্ত করে। প্রথম কার্য্যটী Negative অভাবাত্মক, দ্বিতীয়টি Positive ভাবাত্মক। অভাবাত্মক কার্য্যটী অপেক্ষা ভাবাত্মক কার্য্যটীর দিকেই বুদ্ধিমান ব্যক্তির দৃষ্টি অধিক নিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয় আর একটী কথা স্মরণ রাখিবার উপযুক্ত; অগ্রে জীবনীশক্তি পরে তাহাকে শৃঙ্খলাধীন করা। ধর্ম্মজীবনের উন্নতি কিরূপে হইবে? এই প্রশ্ন ধর্ম্মসমাজের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান। কিরূপ শাসন-প্রণালীদ্বারা তাহা নিয়মিত হইবে, সে প্রশ্ন দ্বিতীয় স্থানীয়। আমাদের সমাজের সভ্যগণের প্রতি ক্ষোভ করিয়া এই কথা বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন নিয়মতন্ত্র-প্রণালীর ভাবাত্মক দিক অপেক্ষা অভাবাত্মক দিকের প্রতি অধিক মনোযোগী এবং নিয়মতন্ত্র প্রণালীর উন্নতির জন্য তাঁহারা যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধন ও প্রচারের উন্নতি-বিধানার্থ সেরূপ শ্রম করেন নাই। ইহা আত্মপরীক্ষার মুহূর্ত্তে আপনাদের দুর্ব্বলতা দেখিয়া ক্ষোভের কথা। যাহা হউক একটী সত্য আমাদিগকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে, অগ্রে ধর্ম্মজীবনের উন্নতির ব্যবস্থা, পরে সমাজের কার্য্য চালাইবার বিধি ব্যবস্থা। ঈশ্বর করুন সেই প্রধান কার্য্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি দিন দিন অধিকতররূপে আকৃষ্ট হউক।

প্রচার ও প্রচারের ব্যবস্থা—পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে আমরা ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছি যে, প্রচারকার্য্যে সভ্যদিগের এমনি মনোযোগ যে, প্রচারক সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস হইয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ এরূপ নহে, সভ্যগণের দোষে পুরাতন প্রচারকগণ প্রচারক-পদত্যাগ করিয়াছেন। সাধারণ

ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের প্রতি ও তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রতি কেহ এরূপ অভিযোগ করিতে পারেন না যে, তাঁহারা প্রচারকদিগের প্রতি সহিষ্ণুতা ও সমুচিত শ্রদ্ধার সহিত ব্যবহার করেন নাই। পূর্ব্বোক্ত অভিযোগের অর্থ এই যে, প্রচারকার্য্যে আশানুরূপ উৎসাহ থাকিলে প্রচারক সংখ্যা বর্দ্ধিত হইত। সে বিষয়ে মনোযোগের অভাব দৃষ্ট হয়। আমরা যদি প্রথম অবধি প্রচার কার্য্যের বিস্তৃতি অপেক্ষা গভীরতার দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিতাম, যদি পূর্ব্ব হইতে একদল উপযুক্ত প্রচারক প্রস্তুত করিবার দিকে মনোযোগী হইতাম, তাহা হইলে এতদিনে ভারতের নানা স্থানের কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য করিবার কত লোক পাইতাম। বহু বিস্তীর্ণ-ক্ষেত্রের উপরে সাময়িক প্রচার-কার্য্যে চতুর্দ্দশ বৎসর শক্তিক্ষয় না করিয়া সেই শক্তির কিয়দংশ যদি কতকগুলি মানুষ প্রস্তুত করিবার জন্য নিয়োগ করা যাইত, তাহা হইলে, বোধ হয়, অধিকতর উৎকৃষ্ট ফল দেখা যাইত। এই মাত্র বক্তব্য যে, আমরা যদি নিজেদের অভাব ও ক্রটী লক্ষ্য না করি, যদি তাহা সংশোধন করিবার প্রয়াস না পাই, তাহা হইলে, সে সকল কিরূপে সংশোধিত হইবে?

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

মুক্ত ও শান্তভাব-সাধন।

ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় প্রাপ্ত হওয়া যায়;—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥

অর্থ:—"হে অর্জ্জুন, আমি স্বীয় প্রকৃতিকে স্ববশে রাখিয়া, বার,বার এই সকল ভূতকে সৃজন করিতেছি, ইহারা স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত। আমাকে এই সকল কর্ম্ম আবদ্ধ করিতে পারে না; আমি এই সকল কর্ম্মে অনাসক্ত থাকিয়া, ইহাদিগেরই মধ্যে উদাসীনবৎ আসীন আছ।"

এই কতিপয় বচনের মধ্যে অধ্যাত্মরাজ্যের কতকগুলি গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে। সংক্ষেপে তাহার কিঞ্চিৎ প্রদর্শন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সেই অনন্ত অবিনাশী পুরুষের সহিত আমাদের আত্মার প্রভেদ কোথায়? আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি, তিনি পূর্ণ, আর আমরা অপূর্ণ, এই উভয়ের মধ্যে মহাপ্রভেদ; ইহা সত্য। কিন্তু নিগূঢ়ভাবে চিন্তা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, আর একটী বিষয়ে আত্মা ও পরমাত্মাতে গুরুতর প্রভেদ আছে। তিনি মুক্ত, আমরা বদ্ধ। কি জড়, কি চেতন, ঈশ্বর ভিন্ন আর তাবৎ পদার্থই কঠিন দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ। জড়ের বিচিত্র শক্তির বিচিত্র ক্রীড়া; কিন্তু সে ক্রীড়ার সাধ্য নাই যে রেখামাত্র স্বীয় নির্দ্দিষ্ট পথ অতিক্রম করিয়া যায়। জড়ের শক্তি সমূহ দুর্ভেদ্য কার্য্য কারণের নিয়ম দ্বারা শাসিত। প্রকাণ্ড সূর্য্য হইতে সাগর-কূলবর্ত্তী ক্ষুদ্র বালুকাকণা পর্য্যন্ত কোন জড়পিণ্ডের সাধ্য নাই যে আপনার স্থিতি বা গতিকে অনুবিধ করে। জড় সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা বিরহিত।

যখন জড়রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রাণিরাজ্যে প্রবেশ করি, তখন জড়ের স্থিতিশীলতার পরিবর্ত্তে প্রাণীর গতিশীলতার পরিচয় পাই বটে, চিন্তারাজ্যে জ্ঞানক্রিয়া সম্পন্ন জীবের আবির্ভাব দেখিতে পাই বটে, কিন্তু মনুষ্য হৃদয়ের কর্ত্তৃত্ববুদ্ধির কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জড়ের ন্যায় না হইলেও তাহারা কর্ত্তৃত্ববিহীন ও অন্ধশক্তিদ্বারা চালিত। ইতর প্রাণিরাজ্য পরিহার করিয়া যখন মানব জীবনে প্রবেশ করি, তখন দেখি মানবজীবন দেহ ও আত্মা এই উভয় রাজ্যে বিভক্ত। মানবদেহ অপরাপর জড়পিণ্ডের ন্যায় প্রাকৃতিক শক্তি সমূহের অনুগত ও সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তৃত্ববিহীন। কেবল মানবাত্মাতেই আমরা কর্ত্তৃত্ববুদ্ধির প্রথম আভাস প্রাপ্ত হই। কিন্তু সেই কর্ত্তৃত্ব জ্ঞানটুকুও এত অজ্ঞতাতে আবৃত, দুর্ব্বলতাতে অভিভূত ও মোহে জড়িত যে, তাহা কিছুই নয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইরূপে জড় ও চেতন রাজ্যে সর্ব্বত্রই দাসত্ব ও বদ্ধভাব; ইহার সহিত সেই পরম পুরুষের মুক্ত ভাবের তুলনা কর।

তিনি সকলের মধ্যেই আছেন অথচ কাহারও অধীন নহেন। ঘোর বিপ্লবকারী প্রচণ্ড বাত্যা, পর্ব্বত সমান সাগর তরঙ্গের বিকট নৃত্য, আগ্নেয়গিরি সকলের মহা বিনাশকারী অগ্ন্যুৎপাদ, সভ্য জনপদ সকলের গর্ব্বখর্ব্বকারী ভীষণ ভূমিকম্প এই সকলের মধ্যেই তিনি বর্ত্তমান অথচ কাহারও অধীন নহেন। তিনি যেন এই সকল দুর্জ্জয় শক্তির ক্রীড়ার মধ্যে উদাসীনবৎ আসীন আছেন। ইহারা তাঁহারই ইচ্ছা হইতে উৎসারিত হইয়া ভুবনকে কম্পিত করিতেছে, ভাঙ্গিতেছে, চূর্ণ করিতেছে, গড়িতেছে, কিন্তু তিনি সর্ব্বোপরি অধিপতি রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিষ্ক্রিয় ও শান্তভাবে বিরাজিত আছেন; অপর দিকে মানবাত্মার সংগ্রামের মধ্যে ও তিনি। মানবের রোগ, শোক, দারিদ্র্য, পাপের আত্মগ্লানি, আশা ও নিরাশা, হর্ষ ও বিষাদ, প্রভৃতি কত ভাব ও চিন্তার তরঙ্গ ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল হৃদয় দিয়া বাহিয়া যাইতেছে, তিনি এই সকলের সাক্ষী এবং তাঁহার অমোঘ সাহায্য ধর্ম্মের বিজয় বিধানে নিযুক্ত; অথচ তিনি এই সকল বিক্ষোভকারী কারণের মধ্যে থাকিয়া ও এই সকলের অতীত। এ সকলে তাঁহাকে বিক্ষুদ্ধ বা তাঁহার সত্য সঙ্কল্প হইতে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিতেছে না। তিনি মানবের ভাব তরঙ্গের উপরে উদাসীনবৎ আসীন রহিয়াছেন। কেবল ব্যক্তিগত জীবনের সংগ্রামের মধ্যে নহে; কিন্তু মানবসমাজের বিবাদ, বিদ্রোহ, রক্তপাত, হাহাকার, বিষয় বাণিজ্যের ব্যস্ততা, কার্য্যতৎপরতা সকলের মধ্যেই তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন অথচ তিনি এ সকলের অতীত; এ সকল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি স্বীয় শুভ সঙ্কল্পে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কল্যাণফল-বিধাতা হইয়া রহিয়াছেন।

ঈশ্বরের এই মুক্ত-ভাবের ত্রিবিধ কারণ দৃষ্ট হয়;—১ম তাঁহাতে জ্ঞানের অভাব নাই—২য় তাঁহাতে শক্তির অভাব

নাই, তব তাঁহাতে প্রেমের অভাব নাই। আমরা অল্পজ্ঞান-সম্পন্ন, সেই কারণেই আমরা সম্পূর্ণ আত্মরক্ষাবিধানে অসমর্থ; সর্ব্বদা ভীত, উৎকণ্ঠিত ও উদ্বিগ্ন। আমাদের কার্য্যের ফলাফল ও পরিণাম অধিকাংশ স্থলেই আমাদের জ্ঞানের অগোচরে থাকে; সুতরাং ভবিষ্যৎ সর্ব্বদাই আমাদের নিকট তমসাচ্ছাদিত ও আশঙ্কা-জনক। তিনি পূর্ণ জ্ঞান, সুতরাং তাঁহাতে কোন উৎকণ্ঠা বা আশঙ্কার কারণ বিদ্যমান নাই; নিজের স্ববলম্বিত পথ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ বা বিতর্ক নাই। ২য়তঃ অনেক সময় দেখিতে পাই যে, আমরা জ্ঞানদ্বারা যাহা লক্ষ্য করি, অশক্তি-নিবন্ধন তাহা অবলম্বন বা পরিহার করিতে পারি না, সেই স্থানেই দুঃখের উৎপত্তি হয়। তাঁহাতে এরূপ দুঃখ সম্ভবে না। তিনি পূর্ণ শক্তি, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছার চরিতার্থতা তাঁহার আয়ত্তাধীন; তাঁহার শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার পথে কোন অন্তরায় নাই। তাঁহার প্রেমের ও অন্যতা নাই। মানবের শুভ সঙ্কল্পের ন্যায় তাঁহার শুভ সঙ্কল্প স্বীয় অবলম্বিত পথ হইতে বিচলিত হয় না। তাঁহার প্রেম হইতে মানব-প্রেমের এই প্রভেদ দেখিতে পাই যে মানব প্রেম সচরাচর প্রেমাস্পদকেই আলিঙ্গন করে। যে ব্যক্তি শরীর মনের সৌন্দর্য্যদ্বারা বা অন্য কোন প্রকার কমনীয় গুণের দ্বারা আমাদের প্রেমকে আকর্ষণ করে, সেই আমাদের প্রীতিভাজন হয়। কিন্তু যাহার প্রেমোদ্দীপক কোন কমনীয় গুণ নাই; অথবা যে ব্যক্তি দেহ মনের কদর্য্যতাদ্বারা আমাদের প্রেমকে বাধা দেয়, আমাদের দুর্ব্বল মন অনেক স্থলেই আর সেরূপ ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করিতে পারে না। ঐশ প্রেমের প্রকৃতি অন্য প্রকার। তাহা প্রেমের অপাত্রকেও প্রীতি করিতে পারে। যে স্বীয় প্রকৃতি ও চরিত্রের কদর্য্যতা বশতঃ মানবের ঘৃণাস্পদ, মানবীয় প্রেম যাহার পাপাচারে পরাস্ত হইয়া তাহাকে দূরে পরিহার করিয়াছে, ঐশ-প্রেম তাহারও উদ্ধার-সাধনে নিযুক্ত হয়। পাপী আপনার চারিদিকে পাপের প্রাচীর তুলিয়া দেয়, মনে করে তাহার সেই প্রকোষ্ঠের মধ্যে ব্রহ্মশক্তিরও প্রবেশ সম্ভব নহে, কিন্তু ঐশ-প্রেম সে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পাপীর উদ্ধার-সাধন করে। বাজপক্ষী যখন অন্য পক্ষীর পশ্চাদ্ধাবিত হয়, তখন উপর হইতে নিম্নে, নিম্ন হইতে উপরে, এক বৃক্ষ হইতে আর এক বৃক্ষে, এক বন হইতে আর এক বনে এইরূপে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল প্রদক্ষিণ করিয়াও ক্লান্ত হয় না। সে তাহার বধ্য জীবকে ধরিবেই ধরিবে। সেইরূপ ব্রহ্মকৃপা পাপীর পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তাহার উদ্ধার সাধন করিবেই করিবে।

ঐশ-প্রেম যেরূপ প্রেমের অপাত্রকেও আলিঙ্গন করে, সেইরূপ ঐশভাবাপন্ন ব্যক্তিরাও ঘৃণাস্পদকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। একদিকে দেখিতে গেলে ইহা দ্বারাই প্রকৃত ঈশ্বর প্রীতির বিচার হয়। যিনি ঘৃণাস্পদের প্রতি যে পরিমাণে প্রীতি করিতে সমর্থ, তিনি সেই পরিমাণে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিমান। জগতে এক প্রকার ধার্ম্মিকতার প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। যাহাতে নীতি আছে, পবিত্রতা আছে, বিনয় আছে, সৌজন্য আছে, কিন্তু ঘৃণাস্পদের প্রতি প্রবল প্রীতি নাই। আমরা বলি সে জীবনে ব্রহ্ম-শক্তির কার্য্য সমুচিতরূপে আরম্ভ হয় নাই। মানব-প্রেমে যেমন ঘৃণাস্পদকে প্রীতি করিতে পারে না, তেমনি ইহাতে হ্রাস বৃদ্ধি আছে। ইহা এক সময়ে সতেজ, উগ্র ও উষ্ণ থাকে আর এক সময়ে দুর্ব্বল, মৃদু ও শীতল হয়। এইরূপে মানবসমাজে মানুষ প্রেমাস্পদকে সততই পরিত্যাগ করিতেছে। ঐশ-প্রেমের প্রকৃতি এরূপ নহে। তাহাতে প্রবলতা ও স্থিরতা চিরবিদ্যমান।

ঈশ্বর পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণশক্তি ও পূর্ণপ্রেম, সুতরাং তিনি স্বভাবতঃই মুক্ত; তিনি সকল নিয়মেরই অধিপতি অথচ কোন নিয়মেরই বশীভূত নহেন; তিনি সকল সংগ্রামেরই সাক্ষী অথচ কোন সংগ্রামদ্বারা বিক্ষুব্ধ নহেন। তিনি মানবের সকল ভাব তরঙ্গের মধ্যে বিদ্যমান অথচ কিছুতেই স্বীয় শুভসংকল্প হইতে বিচ্যুত হন না। তিনি আত্ম-প্রতিষ্ঠিত, স্বতন্ত্র ও শান্ত। জ্ঞানশালী ধীরেরা ও বিশ্বাসী ভক্তেরা যখন তাঁহাকে সত্যের সত্য জানিয়া তাঁহাতে সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়া এই শান্ত অবস্থাতে উপনীত হন। তখন আর তাঁহাদের চিত্ত শোক মোহের অধীন হইয়া স্বীয় শুভ সংকল্প হইতে বিচলিত হয় না ও সকল প্রকার বিক্ষোভকারী ঘটনার মধ্যে তাঁহাদের চিত্ত সেই পরাৎপরে বিশ্রান্তি লাভ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকে।

উৎসব উপলক্ষে ২রা জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্নে মন্দিরে উপাসনার পর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উপদেশ।

আমাদের দেশের প্রাচীন অধ্যাত্ম-শাস্ত্র পাঠ করিলে দেখা যায়, মহর্ষিগণ কোনও স্থলে বলিতেছেন, "জ্ঞানদ্বারাই ব্রহ্মলাভ করা যায়।" আবার অন্যত্র বলিতেছেন, "জ্ঞানদ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না।" উপনিষৎ (যাহা বেদের শিরোভূষণ) পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে বিপরীত ভাবের শ্লোক দেখা যায়।—

"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা, নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা; জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্বঃ ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।"

চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বাক্যদ্বারা, যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। তবে কি প্রকারে তাঁহাকে লাভ করা যায়? জ্ঞানপ্রসাদে নির্ম্মলচিত্ত হইয়া ধ্যানপরায়ণ হইলেই সেই নিরুপাধি ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। আবার স্থানান্তরে বলিতেছেন—

না বিরতো দুশ্চরিতান্না শান্তো না সমাহিতঃ

না শান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈবমাপ্নুয়াৎ।

যে দুশ্চরিত্র হইতে বিরত হয় নাই, যাহার চিত্ত শান্ত সমাহিত হয় নাই, সে কেবল জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না। এই দুই শ্লোকের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? যেখানে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না, সেখানে জ্ঞান শব্দে লৌকিক জ্ঞান, বুদ্ধির চাতুর্য্য, বিচারশক্তি, অথবা তর্কশক্তি বুঝিতে হইবে। যেখানে বলিতেছেন, জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেখানে পারমার্থিক জ্ঞান উদ্দেশ্য। অনেকে মনে করেন, মানুষ সকল প্রকার জ্ঞানই বুদ্ধি ও

বিচারশক্তিদ্বারা লাভ করে। ইহার তুল্য ভ্রান্ত মত আর কিছুই নাই। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদ্বারা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্য সকল লাভ করা যায়, কিন্তু ধর্ম্ম কেবল বুদ্ধি ও বিচার শক্তির সাহায্যে লাভ করা যায় না। ধর্ম্ম হৃদয়ের বিষয়, সাধনার বিষয়। বিচার শক্তির পরিচালনাদ্বারা ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করা যায়, কিন্তু ধর্ম্মকে পাওয়া যায় না—ধর্ম্ম ও ধর্ম্মতত্ত্ব এক নহে। আমরা কি দেখি নাই, ধর্ম্মতত্ত্বে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কত ব্যক্তি জীবন সম্বন্ধে নিতান্ত হীন? তাহাদের জীবনে ধর্ম্মের কোন লক্ষণ নাই। মহাপণ্ডিত বলিয়া জগতে বিখ্যাত অথচ ভক্তি জানে না, উপাসনায় মন স্থির থাকে না, ভগবানে মন বসে না; শাস্ত্র-জ্ঞানে পণ্ডিত, ধর্ম্মবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ হইয়াও ছয় রিপুর গোলাম। ধর্ম্মতত্ত্বে পাণ্ডিত্য এবং জীবনগত ধর্ম্মে অনেক তফাৎ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্ন দিলে তাহারা পুস্তক হইতে মুখস্থ করিয়া সমুদায় উত্তমরূপে উত্তর করিতে পারে। দুঃখের বিষয়, যাহারা এইরূপে ধর্ম্মতত্ত্বে শিক্ষিত হয়, তাহাদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকেই জীবনে ধর্ম্মলাভ করিয়া থাকে।

যাহাদিগের জীবনের লক্ষ্য স্থির আছে, শাস্ত্র ও বিচার-শক্তি তাহাদিগকে উদ্দেশ্য-পথে গমন করিতে সাহায্য করে। কেবল ধর্ম্ম শাস্ত্র নয়, সকল শাস্ত্র সম্বন্ধেই এই রূপ; সমুদায় জ্ঞানই সেই পরম জ্ঞানের প্রতি চিত্তকে নিবিষ্ট করে, যদি জীবনের লক্ষ্য ঠিক থাকে। বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি ভিন্ন যে সত্য লাভের অন্য রাস্তা নাই তাহা নহে। বাহিরের সত্য সম্বন্ধেও একথা খাটে। যে পুর্ণিমার চাঁদ দেখিয়া গোল থালার মত চক্‌চকে একটা জিনিস বই কিছু দেখিল না, যে মজিল না, সেই সৌন্দর্য্যে যার প্রাণ গলিল না, তাহার কিছুই দেখা হইল না। বাগানে গোলাপ ফুল দেখিতে গিয়া, যদি তুমি তাহার রং, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ দেখিয়া আইস; কিন্তু তোমার হৃদয়ের ফুল না ফোটে, তবে তোমার গোলাপ ফুল দেখা হইল না। গোলাপ ফুল কেবল চামড়ার চোখে দেখা যায় না; হৃদয়ের চক্ষু চাই। যতক্ষণ দুই চক্ষু না দেখে, ততক্ষণ দেখা হয় না। কেবল শুষ্ক জ্ঞানতে ধর্ম্মজীবন লাভ করা যায় না। যাহাতে প্রাণ শীতল করে, যাহাতে হৃদয়ের জ্বালা দূর হয়, সেই কৃপার জল অন্তরে না পড়িলে ধর্ম্ম হয় না। চাতক যেমন নদী সরোবরের জল উপেক্ষা করিয়া "ফটিক-জল" বলিয়া চীৎকার করে, ব্রহ্মসাধক ও সেইরূপ সংসারের সহস্র ভোগের বিষয় উপেক্ষা করিয়া, বিদ্যা বুদ্ধি ও তর্কে অতৃপ্ত হইয়া, ব্রহ্মের করুণাবারি লাভের জন্য ব্যাকুল হন।

অধিকাংশ লোক শুষ্ক ধর্ম্মমত লইয়াই ব্যস্ত। প্রকৃত ধর্ম্ম যাহা তাহা তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। পাষাণ প্রাণ তাঁহার করুণা ভিন্ন গলে না। বিশুদ্ধ মত, দর্শন ও বিজ্ঞানেতে মুক্তি হয় না। বড় তৃষ্ণার্ত্ত যে, সে জল চায়; তাহাকে যদি শুষ্ক তর্কের বালুকা দাও, তবে তাহার তৃষ্ণা মিটিবে কেন? সে ঘোলাজলও খাবে, কিন্তু তপ্ত বালুকায় তাহার তৃষ্ণা-নিবারণ হবে না। তোমাদের কাছে পরিষ্কার জল থাকে তো দাও। নতুবা যে ধর্ম্মপিপাসু সে শুষ্ক মতে ভুলিবে না, সে ঘোলা খাবেই। তোমরা পরিষ্কার জল দিতে পার না? ইহা প্রাণের পিপাসা বোঝে না, যে কেবল তর্ক বিচার লইয়া ব্যস্ত, সে এক জগতের লোক; আর যে প্রাণের যাতনায় অস্থির, বড়রিপুর আঘাতে ব্যতিব্যস্ত, সে আর এক জগতের লোক। সে শুষ্ক মতের ধর্ম্মে ভুলে না। অবশ্যই মতামত দৃঢ় থাকা চাই। দর্শন বিজ্ঞানের যে প্রয়োজন নাই তা নয়। কিন্তু শুধু তাহাতে প্রাণ ভিজে না। তাহাতে ছটা রিপুর উৎপাত ঘুচে না। এক বিন্দু ভক্তি পেলে বেঁচে যাই। অনেক শাস্ত্র-চর্চা করিয়া দেখিলাম, তাহাতে প্রাণে শান্তি পাইলাম না। ব্রাহ্মসমাজে এক বিন্দু ভক্তি আসুক, বাচালতা চলিয়া যাক্, মরুভূমিতে বন্যা প্রবাহিত হউক্।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এদেশের অনেক উপকার করিয়াছেন; ব্রাহ্মধর্ম্মের মতের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন। নরনারীর আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা সমর্থন করিয়াছেন ও করিতেছেন। আজ আমাদের নারীগণ জ্ঞানে ও শিক্ষায় উন্নতি লাভ করিয়াছেন; আমরা জাতিভেদের উন্মূলন করিতেছি; পৌত্তলিকতা তুলিয়া দিতেছি; কিন্তু কেবল এই সকল সংস্কারে তৃপ্ত হইলে চলিবে না। এ সকল সব ভাল। কিন্তু ভাই ভগিনীসব! প্রাণের ভিতর ভগবানের প্রতি স্বাভী ভক্তি লাভ করিতে পারিয়াছি কি না? যাহারা সংশয়বাদী, নাস্তিক তাহারাও তো এই সকল সংস্কারের কাজে ব্রতী। ইংলণ্ডে ব্রাড্‌ল প্রভৃতি কত নিরীশ্বরবাদী প্রাণগত পরিশ্রম করিয়া, জীবন দিয়া সংস্কারের কার্য্য করিয়াছেন। মহৎ কার্য্য যেমন আস্তিকের তেমনি নাস্তিকেরও কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। সর্ব্বদা অন্তর্দৃষ্টি যেন জাগ্রত থাকে, যে প্রাণের ভিতর প্রাণেশ্বরকে দেখিতে পাইতেছি কি না? আমাদিগের মধ্যে বিশ্বাস ভক্তি আসুক। তাঁর নামে সকলে এক হইয়া যাই।

প্রত্যেক ব্রাহ্মিকা ও ব্রাহ্মের হৃদয়ে ভক্তির ফোয়ারা খুলে যাক। ঈশ্বরেতে সকলে এক হইয়া যাক্। তাঁহার অনুগত জীবন যাহাতে হয়, সেজন্য ব্যস্ত হই। শুষ্ক ভাব, নীরস ভাব, বাচালতা আর ভাল লাগে না। শুষ্ক কথায় আর প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না। প্রাণ শীতল হয় না। শুষ্ক কথায় ধর্ম্মপিপাসুর প্রাণের তৃষ্ণা মিটে না। জল দাও, জল দাও, বাঁচি। সেই যৌবন কাল হইতে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিতেছি; এখন বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছি, এখনও কি ধর্ম্মের কথা লইয়াই থাকিব? আসুক্ আমাদিগের মধ্যে ভক্তি আসুক, আধ্যাত্মিকতা আসুক। এই যে রিপু কটা— এই যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, হে ব্রাহ্মগণ, প্রাণেরদিকে তাকাইয়া একটা একটা করিয়া গণিয়া লও দেখি, কার কটা কমিয়াছে? যাহার যত বয়স, সে ততটা মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী; পরকালের জন্য কে কতটা প্রস্তুত ভাবিয়া দেখ। "ইহা করিয়াছি, তাহা করিয়াছি" বলিয়া জবাব দিলে হইবে না। হৃদয় পবিত্র হইয়াছে কি না? রিপু দমন হইয়াছে কি না? সত্য-স্বরূপেতে হৃদয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কি না? তাঁহার ধর্ম্মকে জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছ কি না? এসকল প্রশ্নের উত্তর দাও।

ব্যাখ্যান-রত্নাবলী।

২৮শে মে, ১৮৯৩, সাধনাশ্রমে ব্যাখ্যাত।

"Many there be which say of my soul, There is no help for him in God.

"But thou, O Lord art a shield for me; my glory and the lifter up of mine head.

"I cried unto the Lord with my voice, and he heard me out of his holy hill.

"I laid me down and slept; I awaked; for the Lord sustained me." Ps. III, 2-5.

"এমন অনেক লোক আছে, যাহারা আমার আত্মার সম্বন্ধে বলে 'ও যে সর্ব্বদা 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করে, ঈশ্বর হইতে ওর কোন আশা নাই।' কিন্তু তুমি আমার বর্ম্মস্বরূপ, আমার ঢাল আমার গৌরব তুমিই আমার মস্তক উন্নত করিয়া রাখিয়াছ।

"আমি প্রভু পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম; তিনি দয়া করিয়া আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। সুতরাং আমি অকাতরে নিদ্রা গেলাম ও সুখে জাগ্রত হইলাম। কারণ প্রভু পরমেশ্বর আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।"

যখনই ঈশ্বরের কোনও সাধক তাঁহার করুণার উপর নির্ভর স্থাপন করিতে অগ্রসর হন, তখনই পৃথিবীর লোক বলে "ও লোকটা বৃথা 'ঈশ্বর, ঈশ্বর' করে; ঈশ্বরের নিকট হইতে কোন সাহায্যের আশা নাই।" নানাপ্রকার লোক এইরূপ বলিয়া থাকে। প্রথমতঃ যাহারা সংসারে আসক্ত, বিষয়সুখে নিমগ্ন, মোহে অন্ধ; যাহারা বিষয়কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহারই পূজা করে, যাহারা ধর্ম্মের ধার ধারে না, যাহারা ঈশ্বরচিন্তাকে হৃদয় হইতে বিদায় করিয়াছে, যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসস্থাপন করে না। তাহারাই বলে "এব্যক্তি বাতুল এ পাগল, এ 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করিয়া জীবনটা নষ্ট করিল। কোথায় বা ঈশ্বর, কোথায় তাঁর দয়া? ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া কিছুই হইবে না। ঈশ্বরের নিকট ইহার কোনও আশাই নাই"। দ্বিতীয়তঃ যাহারা পাপেতে আসক্ত, মৌমাছি মধুর ভিতর যেমন জড়াইয়া পড়ে ডুবিয়া যায়, উঠিতে পারে না, তেমনি পাপাসক্তির প্রবলতা বশতঃ, চিত্তের নিকৃষ্টতা ও স্থূলতা বশতঃ, যাহারা পাপে ডুবে, আর উঠিতে পারে না, তাহারা এইরূপ কথা বলিয়া থাকে। অনেক সময় হয় তো তাহারা ধর্ম্মবিষয়ক কথা বলে, ধর্ম্মের তত্ত্ব সকল লইয়া নাড়াচাড়া করে; তাহারা 'কোথায় ঈশ্বর, ঈশ্বরের সাহায্য পাওয়ার আশা বৃথা' এইরূপ কথা মুখে না বলিলেও নিজেদের ব্যবহার দ্বারা বলে। কারণ কি, যদি সত্য পরমেশ্বরেতে মানুষের ঠিক বিশ্বাস থাকে, তবে তার কখনই পাপে মতি হইতে পারে না, সে কখনই ক্ষুদ্র সুখে ডুবে না। পাপাসক্ত ব্যক্তি মুখে না বলুক, কাজে নাস্তিক। তৃতীয়তঃ, যাহারা নাস্তিক, যাহারা অনেক চিন্তা করিয়া, বিচার করিয়া দেখিয়াছে, যে ঈশ্বরের সত্তার কোন প্রমাণ নাই, ঈশ্বরের করুণার কথা তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। এই সকল লোক বলিয়া থাকে, "কোথায় ঈশ্বর, 'ঈশ্বর ঈশ্বর করিতেছ কেন? ঈশ্বরের হাত তো কোথাও নাই।"

"কিন্তু এই তিন শ্রেণী ভিন্ন আর এক শ্রেণীর লোক এরূপ কথা বলিয়া থাকে। আমার বোধ হয় এই তিন শ্রেণীর লোক অপেক্ষা সেই লোকদের অবস্থা অধিক শোচনীয়। এই সকল লোক ধর্ম্মসমাজেই বাস করে। ইহারা ধর্ম্মের কথা মুখে বলে, ঈশ্বরের নাম ইহাদের রসনাতে সর্ব্বদাই আছে, ধর্ম্মকর্ম্মেও ধর্ম্মসমাজের কাছে ইহাদের উৎসাহ খুব আছে। কিন্তু অন্তরে ইহারা বিষয়াসক্ত। পরমেশ্বরকে সত্য বস্তু বলে, কিন্তু পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া চলাকে নির্ব্বোধের কাজ মনে করে। মুখে ইহারা সর্ব্বদা বলে 'ধর্ম্ম আমাদের প্রাণ হউক, ধর্ম্মেতে আমাদের উৎসাহ হউক,' কিন্তু অন্তরে ঈশ্বরে নির্ভর রাখে না। যখনই কোন লোক ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তখনই তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার কি ক'রে চলে?' যদি বলা যায় 'ঈশ্বরের অনুগ্রহে দিন চলিতেছে,' তবে তাহারা বলিবে 'হাঁ, ঈশ্বরের অনুগ্রহে তো চলিতেছে; তবে, কি ক'রে চলে?' ইহারা বলে "ঈশ্বর, ঈশ্বর' কর, ঈশ্বরের পূজা কর, কিন্তু নিজের কাছে এমন কিছু রাখ, যাতে নিজেকে বাঁচান যায়।" ইহারা নির্ভর নিজের উপর রাখে, ঈশ্বরের উপর রাখে না। ইহারা ধর্ম্মসমাজের নাস্তিক। ইহারা অন্য তিন শ্রেণীর নাস্তিক অপেক্ষা হীন। সত্য বলিয়া কোন মানুষ ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিলে ইহারা বলে, "পরমেশ্বর হইতে তোমাদের কোন সাহায্যের আশা নাই।" প্রকৃত বিশ্বাসী যিনি, তিনি এ সকল শুনিয়া বলেন, But thou, O Lord, art a shield for me; My glory and the lifter-up of mine head.—এ সকল কথা তো শুনিতেছি, কিন্তু হে প্রভু তুমি আমার হৃদয়ের ঢাল, তুমি আমার গৌরব। 'তুমি আমার গৌরব' একথার অর্থ কি? আমাদের সহায় ভরসা সব তিনি; আমাদের যা কিছু উৎসাহ তাঁহারি জন্য; আমাদের যাহা কিছু কোমরের জোর তা তাঁহারি; আমাদের যাহা কিছু কাজ তা তাঁহারি; আমাদের যাহা কিছু শক্তি তা তাঁহারি; আমাদের যাহা কিছু ভরসা, তাঁহারই উপর। "তুমি আমাদের শক্তি, আমাদের পিতা, চিরকাল সঙ্গে আছ," এই বিশ্বাস চিত্তে জাগ্রত থাকাই বিশ্বাসী ব্যক্তির লক্ষণ। এই বিশ্বাসের কাছে যখন আপনার জীবন মিলাই, তখন লজ্জায় মাথা মাটীতে পুতিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়। তখন বলি 'কেন পরমেশ্বরের সাক্ষী দিতে যাই, কেন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে যাই, কেন ব্রহ্মশক্তির কথা বলি?' সত্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিলে কি ভয় মনে থাকিতে পারে? মানুষ আগুন হয়ে যায় যে ধর্ম্মে, কাম ক্রোধ লোভ পুড়ে যায় যাতে, হৃদয় পরিশুদ্ধ হয় যাতে, সে অগ্নিতে কেন প্রজ্বলিত হই না? আমরা নিশ্চয়ই এই চারি শ্রেণীর কোন শ্রেণীতে রহিয়াছি। নিশ্চয়ই ঈশ্বরেতে নির্ভর এখনও হয় নাই। হয় মানুষের উপর, নয় নিজের শক্তির উপর, নয় অন্য কিছুর উপর নির্ভর রহিয়াছে। একখানা মন বলে, 'ঈশ্বরেতে নির্ভর করি,' আর আধখানা বলে 'There is no help for me in God.' এরূপ মন নিয়ে কাজ ক'র্ত্তে আর ইচ্ছা করে না। ভগবানের কৃপায়

সেই সত্য বিশ্বাস যদি আসে, যাহে সমুদয় হৃদয়ের সহিত বলা যায়, 'আছেন, আমার জন্ত প্রভু পরমেশ্বর সহায় আছেন', তাহা হইলে আমাদের দিয়ে তাঁর কাজ হবে। নতুবা এ প্রথায় আধখানা মনের আধখানা বিশ্বাস, আধখানা নির্ভর দিয়ে কিছু হবে না।

পাঞ্জাব প্রচারযাত্রীর পত্র।

একটী বিশেষ কারণে ঝান্সি হইতে আমাদিগের প্রচার-দল দুই ভাগে বিভক্ত হয়, শাস্ত্রী মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব হোসেঙ্গাবাদ হইয়া ইন্দোর এবং বাবু হরিমোহন ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ কানপুর হইয়া এলাবাদ যাত্রা করেন। ইন্দোরের কার্য্য বিবরণ:—

১৩ই মে ইন্দোর—প্রাতে স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব উপাসনা করেন। সন্ধ্যার সময় সঙ্গীত প্রার্থনা এবং স্থানীয় ব্রাহ্ম বন্ধুগণের সহিত কথা বার্ত্তা হয়।

১৪ই মে—শাস্ত্রী মহাশয় প্রাতে হিন্দিতে উপাসনা এবং অপরাহ্নে মন্দিরে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা সভায় দুই শতের অধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব মন্দিরে উপাসনা করেন ও "নবজীবন লাভ ভিন্ন কেহ ঈশ্বর দর্শন করিতে পারে না" এই বিষয়ে উপদেশ দেন। উপাসনা ও উপদেশে উপাসকগণের মধ্যে এক অপূর্ব্ব ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, সকলে কৃতার্থ হইয়া ঈশ্বরকে ধন্তবাদ করেন।

দ্বিতীয় দলের কার্য্যবিবরণ—বাবু হরিমোহন ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ ৮ই মে কানপুরে পৌঁছেন। এবং ইঁহাদের সহিত শ্রীমান্ জগদীশচন্দ্র রায় লক্ষ্ণৌ হইতে আসিয়া যোগদান করেন। ইঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ ঘোষ গবর্ণমেণ্ট উকীল মহাশয়ের গৃহে অবস্থিতি করেন। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার বাসায় সংগীত সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি হয়। শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ প্রার্থনা করেন। তৎপর দিবস প্রাতে পারিবারিক উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ উপাসনা করেন। অপরাহ্নে ঐ বাসাতেই উর্দুতে বক্তৃতা হয়, বক্তা শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ বিষয়—"বিশ্বজনীন শুভ সংবাদ।" বক্তৃতা সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

১০ই মে—প্রাতে ক্ষেত্র বাবুর গৃহে উপাসনা হয়, হরিমোহন বাবু উপাসনা করেন। অপরাহ্নে ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন উল্লেখ করিয়া হরিমোহন বাবু ও শ্রীমান্ জগদীশচন্দ্র রায় কিছু কিছু বলেন, তৎপর সঙ্কীর্ত্তন হয়।

১১ই মে—ক্ষেত্র বাবুর গৃহে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ উপাসনা করেন। সন্ধ্যার সময় হরিমোহন বাবুর কথকতা হয়। তৎপর দিবস ইঁহারা এলাহাবাদ যাত্রা করেন। স্থানীয় ব্রাহ্মবন্ধুগণ ইহঁাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন, ইহারা উকিল শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে অবস্থিতি করেন।

১২ই মে—সন্ধ্যার সময় প্রিয়বাবুর গৃহে সঙ্গীত সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়, শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ প্রার্থনা করেন।

১৩ই মে—প্রাতে প্রিয়বাবুর গৃহে উপাসনা হয়, হরিমোহন বাবু উপাসনা করেন। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের ৬।৭ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার পর প্রায় ১০।১২ জন বাঙ্গালী আসিয়া একত্রিত হন। শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ প্রার্থনা করেন, সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন হয়।

১৪ই মে—বাবু কেদারনাথ মণ্ডল মহাশয়ের গৃহে উপাসনা হয়, হরিমোহন বাবু উপাসনা করেন। সন্ধ্যার পর স্থানীয় ব্রহ্মোপাসনালয়ে সাপ্তাহিক উপাসনা হয়। হরিমোহন বাবু উপাসনার কার্য্য করেন। প্রায় ২৫ জন বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন। অদ্যকার উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি অতি মধুর হইয়াছিল।

১৫ই মে—অদ্য প্রাতে ইঁহারা গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম প্রয়াগতীর্থ দেখিতে যান। অমাবস্যা উপলক্ষে নানা শ্রেণীর অনেক লোক স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। কোন কোন যাত্রীর দু একটি কার্য্য অতি আশ্চর্য্য জনক হইয়াছিল। একজন আপনার মস্তক বালুকায় (গলদেশ পর্য্যন্ত) প্রোথিত করিয়া পড়িয়া আছেন এবং দুই হস্তবিস্তার করিয়া যাত্রীদিগের নিকট ভিক্ষা চাহিতেছেন। আর একজন ঊর্দ্ধবাহু, চিরকালের জন্ত বাম হস্তখানা ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া রাখিয়াছেন। হাতের অবস্থা দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। ইনিও ভিক্ষার জন্ত ব্যস্ত। অদ্য সন্ধ্যার সময় রামচরণ সুকুল নামক একটী বাবুর গৃহে পাঠ, ব্যাখ্যা, কীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি হয়। হরিমোহন বাবু সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করেন। প্রায় ৪০ জন বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের অধিকাংশই হরিসভার সভ্য। সকলেই অতি আগ্রহের সহিত কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করেন।

১৬ই মে—গঙ্গার অপর পারে ঝুন্সী নামক একটি স্থান আছে, এস্থান নির্জ্জন, দৃশ্য অতি মনোহর। এখানে অনেক সন্ন্যাসী ফকির বাস করেন। অদ্য ইঁহারা এই স্থান দেখিতে গমন করেন এবং হংসরাজ নামক একজন পরমহংসের আশ্রমে অতিথি হন। পরমহংস মহাশয় ইঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি, বিনীত ভাব ও মিষ্ট বাক্য এবং উদার ধর্ম্মমতে সহজেই চিত্ত আকৃষ্ট হয়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি অনেক সার কথা বলেন, তাহার মধ্যে প্রধান তিনটি এই—(১) যাহা ভাল, সত্য বলিয়া বুঝিবে, তাহা প্রাণপণে করিবে, আর যাহা মন্দ, অসত্য তাহা পরিত্যাগ করিবে। (২) সাবধান কোন লোকের ফাঁদে পড়িও না। স্বভাবের নিয়ম কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া যাহারা ২।১ ঘণ্টার মধ্যে কিছু লাভ করিতে চায়, তাহারা অনেক দূরে সরিয়া পড়ে। মানুষের সাহায্য চাই বটে, কিন্তু চিনিয়া লওয়া বড় কঠিন। তাঁহার (ভগবানের) মধ্য দিয়া যে সাধুকে পাওয়া যায়, সেই প্রকৃত সাধু। (৩) বিশ্বাস চাই, তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া পড়িয়া থাকিতে পারিলে যেখানেই থাক, কৃতকার্য্য হইবে। তৎপর হিন্দিতে ভজন ও প্রার্থনা হয়। শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ প্রার্থনা করেন। পরমহংস মহাশয় নিবিষ্ট চিত্তে যোগ দেন এবং আদি সমাজের সঙ্গীত শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সংগীত করা হয়।

ইঁহারা আশ্রমে রাত্রি যাপন করিয়া, তৎপর দিবস প্রাতে সহরে প্রতিগমন করেন।

সন্ধ্যার সময় স্থানীয় হরিসভার সম্পাদক মহাশয়ের যত্নে এক সভা আহূত হয়। প্রায় ৫০ জন হিন্দু মহিলা ও শতাধিক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় বাবু হরিমোহন ঘোষাল জগাই মাধাই উদ্ধার বিষয়ে কথকতা করেন। ভগবানের নামের শক্তি অদ্ভুত, তাঁহার নামে সকলের হৃদয় বিগলিত হইল, এক মধুর ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইল। ভগবানের শক্তিতে জগাই মাধাইর নবজীবন লাভ, পাপীর জীবনে বিধতার লীলার এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। ইহাতে প্রাণ কাহার না বিগলিত হয়?

১৮ই মে—সন্ধ্যার সময় পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একটী বাবুর গৃহে পাঠ, ব্যাখ্যা, প্রার্থনা ও কীর্ত্তন হয়। প্রথমে শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ প্রার্থনা করেন, পরে শ্রীমান্ জগদীশচন্দ্র রায় শাস্ত্রীয় বচন পাঠ করিয়া কিছু বলেন, তৎপর বাবু হরিমোহন ঘোষাল কিছু বলেন। প্রায় ৪০ জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ইহাঁদের অধিকাংশ হরিসভার সভ্য। সকলেই অতি আগ্রহের সহিত কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করেন ও আনন্দ প্রকাশ করেন।

১৯এ মে—অপরাহ্নে কায়স্থ পাঠশালা হলে এক সভা হয়, সভায় প্রায় শতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। আরম্ভ সূচক একটী হিন্দি সঙ্গীত হইলে, শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ উর্দ্দুতে "ধর্ম্ম মানবের স্বাভাবিক" এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন, তৎপর আর একটি সঙ্গীত হয় এবং বাবু হরিমোহন ঘোষাল "ধর্ম্ম সাধনের উপায় ও জীবনে তাহার প্রকাশ" এই বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলেন; সর্ব্বশেষে আর একটী সঙ্গীত হয়। বক্তৃতা সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। স্থানীয় কোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বক্তাদ্বয়কে ধন্যবাদ দেন ও ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য ও কার্য্য সম্বন্ধে ইংরাজিতে কিছু বলেন, তৎপর সভা ভঙ্গ হয়।

২০এ মে—অদ্য খুরদাবাদস্থ বাবু শরচ্চন্দ্র গাঙ্গুলী বি, এ, ইহাঁদিগকে তাঁহার গৃহে আহ্বান করেন। সেখানে হরিমোহন বাবর কথকতা হয়। প্রায় ৬০ জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

২১এ মে—অদ্য শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব ইন্দোর হইতে এলাহাবাদে আসিয়া ইহাঁদের সহিত সম্মিলিত হইলেন। প্রায় এক পক্ষ কাল পরে আবার সকলে সম্মিলিত হইলেন। সন্ধ্যার সময় স্থানীয় উপাসনালয়ে শাস্ত্রী মহাশয় সাপ্তাহিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। অদ্যকার উপাসনা ও উপদেশ প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। প্রায় ৫০ জন বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন।

২২এ মে—প্রাতে প্রিয়নাথ বাবুর গৃহে উপাসনা হয়, শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন। প্রায় ২০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। অপরাহ্নে কায়স্থ পাঠশালা হলে শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজিতে বক্তৃতা করেন। প্রায় দেড় শত লোক উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, কালে এ ধর্ম্মই সমস্ত জাতির ধর্ম্ম হইবে এই বিষয় অতি উজ্জ্বলরূপে বর্ণন করেন। তৎপর প্রিয়নাথ বাবু এই বলিয়া বক্তাকে ধন্যবাদ দেন, যে "আমরা অতি সারগর্ভ ও চিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিলাম। ইহাই সত্যধর্ম্ম, ইহা সরল ও সকলের উপযোগী, এই উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতার জন্য আমরা বক্তাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।" সর্ব্বশেষে একটী সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

আমাদের প্রচার কার্য্য এবার এখানেই শেষ হইল। এলাহাবাদস্থ অনেকেই আমাদিগকে তাঁহাদের গৃহে উক্তরূপে কার্য্য করিবার জন্য আগ্রহের সহিত আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদিগকে শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিতে হইল বলিয়া আমরা তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। তাঁহাদের সদিচ্ছার জন্য অন্তরের সহিত আমরা ধন্যবাদ করি।

দু একটী কথা বলিয়া উপসংহার করিব। পঞ্জাবের অবস্থা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা পঞ্জাবের প্রচারক্ষেত্র অধিকতর ফলোপধায়ী। মহাত্মা নানক এই ভূমি অনেক পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। জাতিভেদ প্রথাও এখানে অত্যন্ত শিথিল এবং লোকের হৃদয় স্বভাবতই ধর্ম্মপ্রবণ। এ সময়ে এখানে যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য প্রচার করিলে অচিরে সুফল ফলিবে।

শেষ কথা এই, এবার আমরা উজ্জ্বলরূপে অনুভব করিয়াছি, মানবের শক্তিতে কিছুই হয় না। মানুষ বুদ্ধি বিবেচনাদ্বারা সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। স্বয়ং পরমেশ্বরই তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার শক্তিতেই কার্য্য হয়। এলাহাবাদে মাত্র ৬।৭ জন বাঙ্গালী ব্রাহ্মসমাজের সহানুভূতিকারক আছেন, আর কেহই ব্রাহ্মধর্ম্ম বা ব্রাহ্মসমাজের সহিত কোনও সংস্রব রাখিতেন না। তাঁদের যোগ হরিসভার সহিত। কিন্তু ব্রহ্মের নামের শক্তিতে আশাতীত ফল দেখা গিয়াছে। সাধারণতঃ প্রায় সকলেরই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছে। তিন জনের বিশেষভাবে হৃদয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহাদের একজন উকিল ও একজন গ্রাজুয়েট। আর একজন সাধনাশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। একজন হিন্দুস্থানীর মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তিনি আমাদের কাগজের গ্রাহক হইয়াছেন। আমরা যেখানে নিরাশ হইয়াছিলাম, ভগবান সেখানে আশাতীত ফল দিয়াছেন। আমরা ২৪এ মে কলিকাতায় পৌঁছি। শেণ্টার সংসৃষ্ট কতিপয় বন্ধু আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য হাবড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

মান্যবর

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! গত ১লা জ্যৈষ্ঠের তত্ত্বকৌমুদীতে সাধারণ "ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে আত্মপরীক্ষা" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইলাম।

কেন একথা বলিতেছি, তাহা এই পত্রে যথাশক্তি খুলিয়া বলিতে চেষ্টা করিব। প্রবন্ধটীর শেষাংশ পাঠ করিয়া বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের একটী কথা মনে পড়িল। তিনি নিজ-জীবন-বিবরণীর একস্থানে বলিয়াছেন, "আমি নিরহঙ্কারী হইয়া কথা বলিব, একথা আমি বলিব না। কেন না যখনই দেখিয়াছি যে, কোন ব্যক্তি নিরহঙ্কারিতার অভিমান করিয়া, কথা কহিবার সূচনা করিয়াছেন, তাহারই অব্যবহিত পরে তাঁহার আত্ম অহমিকার বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছি।" আমিও দেখিতেছি যে "আত্মপরীক্ষা" প্রবন্ধের লেখক যখন আমাদের সমাজের সভ্যগণ স্বীয় সমাজকে বিশ্বাস ও নিষ্ঠার চক্ষে দেখিতে পাইতেছেন না" বলিয়া অনুযোগ করিতেছেন, তখন তিনি নিজে স্বীয় সমাজকে কোন্ চক্ষে দেখিতেছেন তৎপ্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে যে বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা কি নিজ সমাজের উপর "বিশ্বাস ও নিষ্ঠার" পরিচায়ক? সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের "সর্ব্বত্রই আমরা" ও "উৎকট অহংভাব" বিদ্যমান, ধর্ম্মসাধনে ও প্রচারে এবং জনহিত-ব্রতে কোন উৎসাহ নাই, এইরূপ কলঙ্ক নিজ সমাজের স্কন্ধে ক্ষেপন করাই যদি সমাজের প্রতি বিশ্বাস ও নিষ্ঠার লক্ষণ হয়, তবে সে বিশ্বাস ও নিষ্ঠা না থাকাই বরং শ্রেয়ঃ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে এই চক্ষে দর্শন করিয়া লেখক যে কিরূপে পঞ্চদশ বৎসরের পরীক্ষার পর মঙ্গলময় বিধাতাকে ধন্যবাদ প্রদান" করিলেন তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যে সমাজ কেবল "নিয়মতন্ত্রপ্রণালী-স্থাপন" ও "বাল্যবিবাহের প্রতিবাদ" করিবার জন্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ধর্ম্মসমাজ বলিয়া গণ্য হইবার কখনই যোগ্য নহে! "ব্রাহ্মসমাজ বলিলে লোকে" যদি সে সমাজকে বুঝিয়া থাকে, এবং সে সমাজের ধর্ম্মই যদি "উদার সার্ব্বভৌমিক এবং বুদ্ধি বিবেকসঙ্গত ব্রাহ্মধর্ম্ম" হয়, তবে আমি বলিব ব্রাহ্মসমাজ লুপ্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত হইয়াছে। অহমিকার ধর্ম্ম কখনই ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। লেখক যে কথাগুলি অপরকে "প্রশান্তচিত্তে" আলোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা যদি নিজে "প্রশান্তচিত্তে" ভাবিয়া লিখিতেন, তাহা হইলে এরূপ পরস্পর বিরোধী কথার কখনও উল্লেখ করিতে সাহসী হইতেন না। তিনি একস্থলে যে কথা বলিয়াছেন, অপরস্থলে নিজেই তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। এস্থলে আরও দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া আবশ্যক। লেখক একস্থলে বলিতেছেন, "পোনের বৎসরের মধ্যে ইহার সভ্যগণ নিয়মাবলী প্রণয়ন, সংশোধনাদি বিষয়ে যেরূপে পরিপক্কতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহা প্রশংসা কল্পে কি শ্লেষচ্ছলে লেখা হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম না। কেননা পরক্ষণেই লেখা হইয়াছে যে, "ইহার (নিয়মতন্ত্র প্রণালীর) যে মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের হৃদয়ে ভাল করিয়া বসে নাই। যাহাদিগের মূলেই ভুল, তাঁহাদিগের "পরিপক্কতা" চমৎকারই বটে। তাঁহারা যে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর ব্যবস্থাটা কেমন "সুন্দর" ও "উন্নত" করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। যে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর "সুন্দর" ও "উন্নত" ব্যবস্থা একটী ধর্ম্ম সমাজের "আধ্যাত্মিক কার্য্যের অনেক ক্ষতি" করিতেছে, তাহার আবার গুণ কি, সে গুণের কথা না বলাই সঙ্গত ছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যদি আধ্যাত্মিকতার ক্ষতিকারক হয়, অহংভাবের প্রশ্রয়দাতা হয়, তবে "বিধাতার শুভ-ইচ্ছায় এবং তাহারই মঙ্গল বিধিতে ইহার অভ্যুদয় হইয়াছিল, লেখক কোন্ প্রাণে একথা বলিতে সাহসী হইলেন বুঝিতে পারিতেছি না। বিধাতার মঙ্গল বিধির উপর যাহা সংস্থাপিত নহে, তাহার পক্ষে "পঞ্চদশ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া কার্য্য করা" সম্ভব নহে, এই অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়া কোন্ ঐতিহাসিক গবেষণার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহা লেখকই বলিতে পারেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গুণ স্বরূপ যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা এই, কার্য্যোৎসাহ, নিয়মতন্ত্র-প্রণালী-স্থাপন এবং সমাজ সংস্কার। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যদি কেবল মাত্র এই গুণত্রয়ের সমষ্টি হয়, তবে উহা ঈশ্বরের কার্য্য হইলেও ধর্ম্মসমাজ বলিয়া অভিহিত হইবার উপযুক্ত নহে। এই তিনটী শক্তি বিদ্যমান না থাকিলে কোন সমাজই সজীব অবস্থায় অবস্থিতি করিতে পারে না। কিন্তু এ নিমিত্ত উহাকে ব্রাহ্মসমাজ নামে অভিহিত করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ না বলিয়া কেবল সাধারণ সমাজ বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। আমাদিগের বিপক্ষেরা যাহা বলিয়া থাকেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে যিনি বিশ্বাস ও নিষ্ঠার চক্ষে দেখেন, এমন এক ব্যক্তি আজ সে কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। এই নিমিত্তই দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। যদি প্রবন্ধ-লেখকের কথা বিশ্বাস করা যায়, তবে ইহাই বলিতে হয় যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একটী ধর্ম্ম সমাজ নহে, উহা কতকগুলি কার্য্যোৎসাহী লোকের অধিষ্ঠানভূত নিয়মতন্ত্র-প্রণালীগত সমাজ-সংস্কার সভা। যে সভার কার্য্যোৎসাহ জনসাধারণের সেবায় নহে, সর্ব্বত্রই কেবল অহং ভাব প্রচারে নিযুক্ত এবং যাহার নিয়মতন্ত্র-প্রণালী আধ্যাত্মিক ভাব বিনাশেই আপনার সুন্দর ও উন্নত পরিপক্কতার পরিচয় দিয়া থাকেন। সে সভা সমাজ-সংস্কারের মধ্যেও হেয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এই হিতৈষীমিত্র জন সাধারণের সম্মুখে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে চিত্র উপস্থিত করিয়াছেন, উহার নীচতম শত্রু ও তদপেক্ষা কুৎসিত চিত্র অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইতেন না।

আর একটী বিষয়ে কয়েকটী কথা বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব। প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচুর উৎসাহের যদি অভাব দৃষ্ট হয়, তবে তাহার নিমিত্ত ব্রাহ্মসাধারণ অপেক্ষা ব্রাহ্ম-প্রচারকগণই অধিক দায়ী। প্রচারক সংখ্যা যে কমিয়া যাইতেছে, ইহা ব্রাহ্মসাধারণের অমনোযোগ বশতঃ নহে, প্রচারকদিগের মতিচ্ছন্নতা বশতঃ। মতিচ্ছন্নতা কথাটী কঠিন হইলেও আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক উহা প্রয়োগ করিতেছি। যাঁহারা এক সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন, এখন সরিয়া পড়িয়া কেহ আপনাকে অবতার বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, কেহ কালীর দ্বারে, কেহ বা শিবমন্দিরে শিরলুণ্ঠন করিতেছেন, এ সকল দেখিয়া শুনিয়া কে তাঁহাদিগকে মতিচ্ছন্ন বলিয়া মনে

না করিয়া থাকিতে পারে? মতিচ্ছন্ন না ভাবিলে তাঁহাদিগের চরিত্রের বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হয়। যাঁহারা এখনও ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও কাহারও কাহারও গতি এই মতিচ্ছন্নতার পথেই পরিধাবিত হইতেছে। এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া প্রচার কার্য্যে ব্রাহ্মদিগের যে উৎসাহের হানি হইবে, প্রচারকদিগকে প্রতি-পালন করিতে চন্ত সঙ্কুচিত হইবে, তাহা তত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যদি ধর্ম্মসাধনার ফল এইরূপ বিকৃত হয়, প্রচলিত সাধনার প্রতি লোকের যে অনাস্থা জন্মিবে তাহা অসম্ভব নহে। যে সাধনায় আপনার বিশ্বাস ও চরিত্রকে কোন স্থায়ী ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিতে সমর্থ নহে, সে সাধনা প্রকৃত নহে। অথচ ব্রাহ্মসমাজে তাঁহারাই সাধক বলিয়া গণ্য, যাঁহারা এইরূপ উৎশৃঙ্খলতার পশ্চাতে ব্যস্ততা সহকারে প্রধাবিত হন, যাঁহারা মতিচ্ছন্ন ব্যক্তির পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া, তাঁহাদিগের নিকট ধর্ম্মোপদেশ ভিক্ষা করেন, তাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করেন। সমাজের যাঁহারা ধর্ম্মোপদেশক ছিলেন, তাঁহাদিগের ধর্ম্মের গতি যখন বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইতেছে, তখন প্রকৃত সাধনা কি, সে সম্বন্ধে লোকের মনে স্বভাবতঃই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। গুরুমন্ত্র যে দেশের লোকের প্রধান সাধনা, ঈশ্বরের স্থানে গুরুকে স্থাপিত করিতে যে দেশের লোকের আগ্রহ, যে দেশের সাধকমণ্ডলী ঈশ্বরের পূজা প্রচলিত করা অপেক্ষা আত্মসেবালাভে অধিকতর কৃতার্থ হন, সে দেশে ব্যক্তিগত প্রভুত্বকে সংযত রাখিবার আবশ্যকতা যে সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকিবে, ইহা প্রকৃতির নিয়মসঙ্গত। বরং ইহার অন্যথা হইলেই বিপদের আশঙ্কা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ব্যক্তিগত প্রাধান্যকে যদি প্রথম উদ্যমেই বিনাশ করিয়া থাকেন, তাহা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বশতঃ নহে, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্রতা ও ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য। এই শুভ উদ্দেশ্যে যখনই প্রয়োজন হইবে, ব্রাহ্মসমাজ ব্যক্তিগত প্রভুত্ব দমন বা বিনাশ করিতে প্রস্তুত হইবেন। যখন এ কার্য্যে অসমর্থ হইবেন, তখনই মনে করিতে হইবে, ব্রাহ্মসমাজের জীবনীশক্তি লোপ হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে সমুচিত পরিমাণে ব্যক্তিগত প্রভুত্ব দমন করিতে পারেন নাই, সেই কারণেই দেখিতেছি যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, পূর্ব্বকার ব্যক্তিগত প্রাধান্য বশতঃ তাঁহারাও অদ্যাপি ব্রাহ্মের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইতেছেন। তাঁহাদিগের পদানুসরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে অনেকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে না হউক ব্রাহ্মের লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যদি অমঙ্গল হয়, তবে ব্যক্তিগত অন্যায় প্রভুত্ব বিনাশের চেষ্টাবশতঃ এবং নিয়মতন্ত্রপ্রণালীর অনুসরণ হেতু হইবে না, এই উভয়ের উপেক্ষা নিবন্ধনই হইবে।

আমি জানি আমার এই পত্রখানি অনেকের অপ্রীতিকর হইবে, অনেকে ইহার প্রতিবাদ করিতে উৎসুক হইবেন। তবে প্রতিবাদ করা আবশ্যক মনে করিবেন কি না বলিতে পারি না। যদি কেহ প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার নিকট আমার সানুনয় অনুরোধ এই, যেন নিজ নাম দিয়া প্রতিবাদ করেন। অনামিক প্রতিবাদ করা আমার অভ্যাস নাই; সুতরাং অপরেও আত্মনাম গোপন রাখিয়া, আমার কোন কথার প্রতিবাদ করেন, ইহা প্রার্থনীয় মনে করি না।

নিবেদক

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজ।

সাধনাশ্রমের উৎসব—গত ১লা জুন সাধনাশ্রমে বিশেষ উৎসব হইয়াছে। ঐ দিন ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট উপাসক সমবেত হইয়া বিশেষ উপাসনা করেন। ঐ উপাসনা-স্থলে একজন বি,এ উপাধিধারী ব্রাহ্মযুবক ভবিষ্যতে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে সমস্ত দেহ মন নিয়োগ করিবেন বলিয়া সংকল্প প্রকাশ করেন। এই যুবক অতি অল্পবয়সে হিন্দু সমাজের ভয়ানক উৎপীড়ন সহ্য করিয়া স্বীয় বিশ্বাস পথে দৃঢ় রহিয়াছেন। আমাদের আশা হয়, এই ধর্ম্মভাবাপন্ন যুবক যে গুরুতর সংকল্প করিয়াছেন, তাহা চিরজীবন পালন করিতে সমর্থ হইবেন। পরমেশ্বর ইহার প্রাণে বল দান করুন।

বেলা ৭টার সময় নিমন্ত্রিত ও নিয়মিত উপাসকগণ উপস্থিত হইলে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে ধর্ম্মালোচনা হয়। সন্ধ্যারপর পুনরায় উপাসনা হয়। এবেলাও শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সময় সময় জলধারা পতিত হইয়া যেরূপ নিদাঘের শুষ্ক মৃত্তিকা আর্দ্র করিয়া দেয়, সেইরূপ উৎসবের সময় ব্রহ্ম-কৃপা অবতীর্ণ হইয়া উপাসকের নীরস প্রাণকে সরস করিয়া দেয়। এই উৎসবে অনেকেই ব্রহ্ম-কৃপালাভ করিয়া থাকেন।

দান—আসামের বাবু রামচন্দ্র ভ মজুমদার তাঁহার মাতার আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে সাঃ ব্রাঃ সমাজে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। এবং ধুবড়ীর বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রথম চাকুরীতে প্রবেশ করায় প্রথম মাসের বেতন হইতে সাঃ ব্রাঃ সমাজে ১৲ ও সাধনাশ্রমে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন। জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগরের বাবু এককড়ি সিংহের পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে সাঃ ব্রাঃ সমাজে ১৲, সাধনাশ্রমে ১৲ ও দাসাশ্রমে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা দাতাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

লাহোরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব—লাহোর হইতে বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গত ষোড়শ জন্মদিন উপলক্ষে তথায় উপাসনাদি হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে সকল স্থানে এরূপ অনুষ্ঠান হয়, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

বিবাহ—শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবীর সহিত ময়মনসিংহের প্রচারক বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বিবাহ হইয়াছে।

পাত্র পাত্রী উভয়েরই নিবাস ময়মনসিংহ জেলায়। বিবাহ কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন।

১০।৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ ভবনে আরও একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রী শ্রীমতী সুরবালা মিত্র, পাত্র বাবু নির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক। বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। উভয় বিবাহই ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টরী হইয়াছে। প্রথমোক্ত বিবাহ উপলক্ষে ১৲টাকা, দ্বিতীয় বিবাহ উপলক্ষে ২৲ টাকা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে দান করা হইয়াছে। আমরা পাত্র ও পাত্রীগণের শুভ কামনা করিতেছি। পরমেশ্বর ইঁহাদের মঙ্গল বিধান করুন।

নামকরণ—ডিব্রুগড়ের বাবু ক্ষেত্রনাথ ঘোষের দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ হইয়াছে। বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন। পরমেশ্বর শিশুর মঙ্গল করুন।

উৎসব—মুর্শিদাবাদ হইতে বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ-চন্দ্র দাস মহাশয় এখানে আগমন করেন। ১৭ই, ১৮ই ও ১৯এ জ্যৈষ্ঠ এই তিন দিন এখানে উৎসব হইয়াছিল। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ প্রচারক মহাশয় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তজ্জন্য উক্ত দিবস প্রাতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল ... উৎসবের উদ্বোধন সূচক উপাসনা এবং অপরাহ্ণে ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ঐ দিন রাত্রে নবদ্বীপ বাবু এখানে পৌঁছেন। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার উৎসবের দিন প্রাতে মন্দিরে তিনি উপাসনা করেন। ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর না করিলে জীবের পরিত্রাণ নাই, এই বিষয়ে উপদেশ দেন। ২টার পর হইতে আলোচনা, সংগীত, সংকীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। সন্ধ্যারপর উপাসনা হয় ও কবিরের দোঁহা পাঠ করিয়া তদবলম্বনে উপদেশ দেন। ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন যে পাপের মূল নষ্ট হয় না, ইহাই উপদেশের বিষয় ছিল। ১৯এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার প্রাতে সম্পাদক-ভবনে পারিবারিক উপাসনা হয়। টাঙ্গাইল হইতে সমাগত শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস বসু মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্ণে নগরসঙ্কীর্ত্তন ও চকে বক্তৃতা হয়। নবদ্বীপ বাবু ও দুর্গাদাস বাবু বক্তৃতা করেন। ২১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার জুবিলী হলে "পরিত্রাণের সঙ্কেত" বিষয়ে নবদ্বীপ বাবু বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। ২২এ জ্যৈষ্ঠ রবিবার সন্ধ্যারপর মন্দিরে তিনি আচার্য্যের কার্য্য করেন। নবদ্বীপ বাবুর আগমনে এখানে সকলেই বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছেন।

দোগাছিয়ার উৎসব—এই উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রমুখ-কতিপয় ব্রাহ্মভ্রাতা তথায় গমন করেন। ১৯শে মে প্রাতে উৎসব মণ্ডপে উপাসনা হয়, প্রচারক নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণে নগরসংকীর্ত্তন হয়; প্রচারক বাবু শশিভূষণ বসু বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাস্থলে অনেক লোক সমাগম হইয়াছিল। পর দিবস ২০শে মে শ্রীযুক্ত বাবু করালীচরণ রায়ের বাটীতে উপাসনা হয়, নবদ্বীপ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণে উৎসবমণ্ডপে পাঠ, আলোচনা ও "কার্য্যের দ্বারাই মানবের পরিচয়" বিষয়ে বক্তৃতা হয়। শশী বাবু অসুস্থ হওয়ায় নবদ্বীপ বাবুই সকল কার্য্য সম্পাদন করেন। আলোচনাতে জাতিভেদ সম্বন্ধেই অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

২১শে মে প্রাতে প্রচার-দল রহিমপুর নামক গ্রামে গমন করিয়া বাবু নগেন্দ্রনাথ নিয়োগীর বাটিতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। প্রাতে স্থানীয় হরিসভায় সংকীর্ত্তন ও উপাসনাদি হয়। নবদ্বীপ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং মনের চঞ্চলতা নিবারিত না হইলে ব্রহ্মকে প্রাণে লাভ করা যায় না, এই মর্ম্মে একটী সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন। তৎপর তিনি আলোচনা, পাঠ ও "কিরূপে পরমেশ্বরের কৃপা মানবকে পরিত্রাণ করে" এই সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। সভায় অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। উপবীত পরিত্যাগ সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা হয়।

২২শে মে প্রাতে দোগাছিয়া গ্রামে প্রচার-দল গমন করেন। উৎসব-মণ্ডপে উপাসনা হয়। নবদ্বীপ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণে করালী বাবুর বাটীতে উপাসনা ও আলোচনাদি হয়। নবদ্বীপ বাবুই আচার্য্যের কার্য্য করেন। আলোচনার সময় বাটীর মহিলাগণ, পৌত্তলিকতার উৎপত্তি, জাতিভেদ মিশ্রিত উপাসনার অসিদ্ধতা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

২৩শে মে প্রচার-দল বাবু এককড়ি সিংহের পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগরে মাধবপুর নামক স্থানে আগমন করেন। উক্ত দিবস মাধ্যাহ্নিক উপাসনা নবদ্বীপ বাবু সম্পন্ন করেন। রজনীতে নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বাবু রেবতীমোহন সেন "চৈতন্য লীলা" সম্বন্ধে কথকতা করেন। কথকতা অনেকের প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। পর দিবস ২৪শে মে এককড়ি বাবুর পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে নবদ্বীপ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। এককড়ি বাবু তাঁহার পিতার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ ভস্মপ্রোথিতসমাধির উপর পিতার জন্ম ও মৃত্যুর দিন লিখিত প্রস্তর খণ্ড স্থাপন করেন। অদ্য সায়ংকালে প্রচার-দল কৃষ্ণনগরস্থ বাক্সিরগড়া নামক স্থানীয় প্রসিদ্ধ জমিদারের বাটীতে গমন করেন। বাবু ক্ষেত্রনাথ সিংহরায় ও বাবু বেদকণ্ঠ সিংহরায় ইঁহাদিগকে বিশেষ যত্ন সহকারে আপনাদিগের ভবনে স্থান দান করেন। অদ্য রাত্রে তাঁহাদের বহির্বাটীতে উপাসনা হয়; শশী বাবু উপাসনা করেন। শশী বাবু উপাসনান্তে একটী শ্লোক অবলম্বন করিয়া উপদেশ প্রদান করেন। ২৫শে হইতে ২৭শে মে পর্যান্ত অত্যন্ত ঝড় ও বৃষ্টির জন্য বিশেষ কোন কার্য্য হয় নাই, কেবল রেবতী বাবু একদিন "চৈতন্য লীলা" কথকতা করেন। ২৮শে মে সায়ংকালে বিশেষ উপাসনা হয়, শশী বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং বিনয়, সরলতা ও সত্যানুরাগ যে ধর্ম্মসাধনের প্রধান সহায় এই মর্ম্মে একটী উপদেশ প্রদান করেন।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

৬ষ্ঠ সংখ্যা। ১৬শ ভাগ।	১৬ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বলে ৩ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

সাধন-ঘর।

চল যাই নির্জ্জন-মন্দিরে ;
জগতে করিয়া পৃষ্ঠ চল ধীরে ধীরে,
পশি গিয়ে সাধন-কুটীরে ;
পশে যথা মীন স্থির সুগভীর নীরে।

চল চল চিন্তার আগারে ;
বিষয় বাণিজ্য দ্রোহ, বিতর্ক বিচারে,
ফেলে চল সকল অসারে ;
রোধো দ্বার, কোলাহল থাকুক সংসারে।

বড় ভীরু স্বর্গীয় বিহঙ্গ ;
বাসা বাঁধে সুনির্জ্জনে ছাড় লোক-সঙ্গ,
স্বর্ণ-কান্তি তার সেই অঙ্গ
দেখিবে ত মৌনী থাক ; দিও নাক ভঙ্গ।

সুনির্জ্জনে দেখা প্রিয় সনে,
কবে আসে কবে যায়, জানে কোন্ জনে ?
যদি আশা প্রেম-আস্বাদনে,
একাকী জাগিয়া থাক নির্জ্জন ভবনে।

গুপ্ত ধন গাড়া ধরণীতে ;
চাও যদি সেই ধন খুঁড়িয়া তুলিতে,
চিন্তার খনিত্র হাতে বসো এক ভিতে,
খোঁড়ো মাটী এক-নিষ্ঠ-চিতে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সাধনা—মনু বলিয়াছেন যে, খনিত্রের দ্বারা ভূমি খনন করিয়া মানুষ যেমন বারি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মানুষকে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। বিদ্যালাভের পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। একদিকে বলিতে গেলে বিদ্যা সকলের হস্তের নিকটেই আছে। যে জড় ও আত্ম-জগতের তত্ত্ব আলোচনা করিয়া জ্ঞানিগণ প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন, সেই জড় জগৎ ও সেই মানব মনরূপ গ্রন্থ আমাদের প্রত্যেকেরই সমক্ষে উদ্ঘাটিত রহিয়াছে। কেবল অভিনিবেশ সহকারে তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তত্ত্ব সকল উদ্ধার করিতে হয়। এই অভিনিবেশ যেন খনিত্রের ন্যায়, ইহার গুণে মন ক্রমশঃ ভিতর হইতে আরও ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে এবং অবশেষে অভীষ্ট বিষয়ের উদ্দেশ পাইয়া সিদ্ধি লাভ করে। কেবল যে পদার্থতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধেই এই নিয়ম তাহা নহে। অধ্যাত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে ও এই সাধনা আরও প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়। সে সম্বন্ধেও এ কথা বলিতে পারা যায় যে, মানবের মুক্তিপ্রদ শান্তি-বারি প্রত্যেকের হস্তের নিকটেই রহিয়াছে। যে সংসারকে মরুভূমি বলিয়া অনেক সাধক বর্ণনা করিয়াছেন, সেই মরুর মধ্যেই জল নিহিত হইয়া রহিয়াছে। কেবল সাধনখনিত্রের সাহায্য চাই। একাগ্রচিত্তে খনন করিতে করিতে কঠিন ভূমির অন্তরাল হইতেই ভক্তিপ্রদ বারি বিনির্গত হইতে পারে। এই যে সাধনের একাগ্রতা ইহাকেই তপস্যা বলা যায়। সত্য জ্ঞানের ন্যায় সত্য ধর্ম্ম লোক মুখে পাওয়া যায় না। ধর্ম্ম যে নিজে উপার্জ্জন করিতে না পারে তাহার জন্য ধর্ম্ম নাই। পর-মুখাপেক্ষী ও শ্রমকাতর ব্যক্তির যেমন বিদ্যালাভ হয় না, তেমনি পরমুখাপেক্ষী ও শ্রমকাতর ব্যক্তির ধর্ম্ম লাভও হয় না। এই তত্ত্বটী আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

অটল-ভিত্তি—ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ইহার বিরোধী ব্যক্তিগণ এই দোষারোপ করিতেছেন যে, ইহাদের সাধনের ও কার্য্যের স্থিরতা নাই। ইহার অগ্রণী ব্যক্তিগণ এক সময়ে যে সকল মত ও কার্য্য-প্রণালী প্রচার করিয়াছেন, আবার কিছু দিনের মধ্যে সে সকলকে পরিত্যাগ করিতেছেন বা পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিতেছেন। যৌবনের কথা বার্দ্ধক্যে স্থির থাকিতেছে না। এই অভিযোগ যে কিয়ৎ পরিমাণে সত্য নহে, তাহা নহে। আমাদের বোধ হয় নির্জ্জন চিন্তা ও সাধন পরায়ণতার অভাবেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। অনেক তত্ত্ব আমরা গভীর চিন্তা না করিয়াই অবলম্বন করিয়া থাকি। আপাততঃ উপরে উপরে যে সকল যুক্তি আমাদের হৃদয়-গ্রাহী বোধ হয়, তাহাই অবলম্বন করি। নিগূঢ় রূপে নিবিষ্ট হইয়া তত্ত্বালোচনা করি না। ইহার ফল এই হয় যে, আমাদের বিশ্বাস ও

কার্য্য সকল অগভীর ভিত্তির উপরে স্থাপিত হইয়া থাকে। পরে অবস্থার পরিবর্ত্তনে যখন নূতন ভাব ও নূতন সত্য সকল আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে থাকে, তখন আমাদের ভাবান্তর উপস্থিত হয়। গভীর নির্জ্জন চিন্তা ও সাধনা দ্বারা লোকে যে সকল তত্ত্ব লাভ করে, তাহার সম্বন্ধে এরূপ ঘটে না। তাহার স্থিতি ক্ষণিক ভাব-স্রোতের উপরে নির্ভর করে না। মহাত্মা যীশু একদিন উপদেশ দিবার সময়ে শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন যে, "যাহারা তাঁহার উপদেশ শুনিয়া তদনুরূপ কার্য্য করে তাহাদের জীবন সুদৃঢ় পাষাণ-নির্ম্মিত ভূমির উপরে স্থাপিত হয়। কিন্তু যাহারা তাহা করে না, তাহাদের জীবন যেন বালুকা রাশির উপরে স্থাপিত। ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতিতে বিনষ্ট হইয়া যায়।" এই উপদেশের তাৎপর্য্য এই, জীবন সম্বন্ধীয় কোনও উপদেশকে যতক্ষণ কার্য্যে পরিণত করিতে না পারা যায়, ততক্ষণ তাহার গুরুত্ব ও গভীরতা সম্যক রূপে প্রতীতি করিতে পারা যায় না। কার্য্যে পরিণত করিতে গেলেই একদিকে আপনাদের বলের পরিমাণ, অপর দিকে সেই সত্যের গুরুত্ব আমরা অনুভব করিতে পারি; এবং বারংবার আলোচনা দ্বারা তাহার জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে উজ্জ্বল হইতে থাকে। তখন আমরা তাহার সপক্ষে ও বিপক্ষে কি কি যুক্তি আছে তাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে থাকি। তখন আর তাহা লোকের মতের উপরে নির্ভর করে না। তৎসম্বন্ধীয় প্রত্যেক বিষয়ই আমাদের সাক্ষাৎ গোচর হয়, এরূপ ভাবে যে বিশ্বাস একবার উৎপন্ন হয়, তাহা অটল ভূমির উপরে স্থাপিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সাধন করে না, তাহার ভাব অন্য প্রকার। তাহার সমুদায় মত ও বিশ্বাস কেবল পরের মুখের উপর ও কল্পনার উপর স্থাপিত; সুতরাং তাহা প্রতিকূল স্রোতের মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না।

স্বপাক-সাধন—নিজ হাতে পাক করিয়া আহার করিলে যে এক প্রকার অপূর্ব্ব তৃপ্তি হয়,তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অন্যে নানারূপ উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার মধ্যেও দেখা গিয়াছে,নিজ হাতের রান্না করা অন্ন ব্যঞ্জন যেমন তৃপ্তিকর হয়, সে সকল তেমন তৃপ্তিকর হয় না। অনেকে এইরূপে স্বপাক-সাধন করিয়া থাকেন। তবে কি পুনরায় ব্রাহ্ম-সমাজে "বার রাজপুতের তের চুলা" আরম্ভ হইবে? সকলেই কি পুনরায় স্বপাক খাইতে আরম্ভ করিব? যদিচ শারীরিক আহারে এ সাধনের তত প্রয়োজন নাই,বরং ইহাতে সময়ের অপচয় এবং বৃথা ধর্ম্মাভিমান অর্জ্জিত হয়, (তবে মাঝে মাঝে করা যাইতে পারে) কিন্তু আধ্যাত্মিক স্বপাক সকলেরই প্রয়োজনীয় এবং ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে প্রত্যেকে নিজ জীবনে সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। নিজে ধর্ম্ম সাধন করা যদিও শ্রমসাধ্য, ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসাধন সকলের পক্ষে সহজ নয়, এবং ভক্তি প্রেমে গদ-গদ হইয়া ভগবৎ আরাধনা করা বড়ই কঠিন, তথাপি নিজে সেই পবিত্র স্বরূপের সহবাসের বিমল আনন্দ সম্ভোগের জন্য যাহা কিছু করি, তাহাতেই যথেষ্ট চরিতার্থতা লাভ করি। এ সাক্ষ্য সকলেই দিবেন। এই প্রকার নিজে নিজে যদি সেই প্রেমস্বরূপের প্রেমায় পাক করি,এবং আহার করি; এবং চারিদিক হইতে যদি সেই মধু সঞ্চয় করি এবং জীবনে সম্ভোগ করি; ইহাতে যে তৃপ্তি, অন্যের পাক করা কি সঞ্চয় করা প্রেমান্নে কি প্রেমমধুতে সে তৃপ্তি হয় না। তাই ব্রাহ্মধর্ম্ম এই স্বপাকের ব্যবস্থা করিয়া-ছেন। শুধু আচার্য্য প্রেমান্ন পাক করিবেন আর সকলে আহার করিবেন তাহা নহে; সকলকেই তাহার জন্য খাটিতে হইবে; সকলকেই সে অন্ন নিজ হাতে পাক করিয়া লইতে হইবে। সাক্ষাৎ ধর্ম্মের এই মহিমা, অন্য সকল ধর্ম্মে গুরু প্রভৃতির উপর ভার আছে, তাঁহারা পাক করিবেন ও সঞ্চয় করিবেন, আর সকলে সেই অন্ন আহার করিবে। ইহাতে আরাম আছে, কিন্তু তৃপ্তি নাই, স্বাস্থ্যও রক্ষা হয় না। অপিচ দূষিত অন্ন আত্মাতে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে ধ্বংস করে। যাহারা নিজে পাক করিয়া আহার করিতে শিক্ষা করে—পথে ঘাটে একাকী হইলেও কখনই তাহারা আহারাভাবে মারা যায় না। যাহারা স্বয়ং পাক করিতে অভ্যস্ত, শেষে তাহারা অন্যের পাক করা দ্রব্য স্বাদু কি বিস্বাদু চিনিয়া লইতে পারে; তাহাতে কোন্ বস্তুর অভাব আছে, বলিয়া দিতে পারে। যে নিজে রাঁধিতে জানে, সেই অন্যের রন্ধনের দোষ গুণ ধরিতে পারে; তখন পরের হাতে খাইতেও আপত্তি হয় না। কেন না সে তখন যা তা আহার করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, সুতরাং যাহা সুস্বাদু, যাহা পুষ্টিকর, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব প্রত্যেকে স্বপাক সাধন করিতে হইবে। নিত্য সাক্ষাৎ-ভাবে প্রেম ভক্তি, জ্ঞান বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে হইবে; তবে ধর্ম্মজীবন বাঁচিবে এবং বর্দ্ধিত হইবে। ধন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম! জীবকে এই স্বপাকসাধন শিক্ষা দিতেছেন, ধন্য ঈশ্বর এবার কাহাকেও আলস্যে থাকিতে দিতেছেন না এবং পরের হাতে পাক করা অন্নে আর সুখী হইতে দিতেছেন না। যদি তাঁহাকে চাও, নিজে খাট এবং "নিজ হাতে দাও আহার" এই বলিয়া দ্বারে পড়িয়া থাক। অবিশ্বাসী হইও না; অসহিষ্ণু হইও না, দাতা দয়ালু ঈশ্বর তোমাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

এ সাধন কে দিল?—জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম-সাধনের প্রণালী আছে, সেই সকল প্রণালীর সাধকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে এক ভাবাপন্ন দুটী উত্তর শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন এই সাধন আপ্তবাক্য, ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, আবার কেহ বা বলেন কোন দেবতা, এঞ্জেল বা গুরু ইহা দান করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক এই ব্রাহ্মসমাজের সাধন-প্রণালী কোথা হইতে পাওয়া গেল। মানবাত্মার পরিত্রাণের জন্য যখন যাহা প্রয়োজন স্বয়ং বিধাতাই তাহার বিধান করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের উৎকৃষ্ট আরাধনা-প্রণালী অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ-সাধন "সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ইত্যাদি" প্রথমতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রচলন করেন। তিনি ঈশ্বরদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই ইহার ব্যবস্থা করেন ও ইহার অনুসরণ করেন। আরাধনার শেষাংশ "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" পরলোকগত নববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় প্রচলিত করেন, শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ইহার শেষে "ধর্ম্মাবহং

পাপঘ্নদং ভগেশং” এই কয়েকটী কথা যোগ করিয়া লইয়াছেন। বর্ত্তমান প্রণালীর ধ্যানের অংশ যাহা প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের প্রাণের ধন, তাহাও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রচলিত করেন। তৎপর সমন্বয়ে মিলিত প্রার্থনা শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বাবু আনয়ন করেন। এইরূপে ইহার পূর্ণাঙ্গ সাধনের প্রণালী ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রচলিত হয়। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় প্রার্থনার শেষাংশ কিছু পরিবর্ত্তন করেন। যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহারা দেখিতেছেন এই সাধন-প্রণালী ঈশ্বরের এক মহৎ দান; তিনিই জীবের ত্রাণের জন্য ইহা পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মদিগকে দান করিয়াছেন। অন্তর্যামী বিধাতাপুরুষ সর্ব্বদাই দেখিতেছেন তাঁহার সন্তানের কখন কি অবস্থা; কোন পাঠ দিলে, কি প্রণালীতে শিক্ষা দিলে উত্তম জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে এবং তাহার তত্ত্ব সকল বুঝিতে পারিবে ও তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে। তিনি তাহা জানিয়াই উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন এবং পুরাতনকে রহিত করেন। ঈশ্বর-প্রেরিত নূতন ব্যবস্থা যেই মানব গ্রহণ করিতে থাকে। অমনি তাহার শ্রেষ্ঠতা জনসমাজ মধ্যে ঘোষিত হইতে থাকে। অবশ্যই এই নূতন ব্যবস্থা অতি অল্প লোকেই গ্রহণ করিতে পারে ও ধারণ করিতে পারে। প্রথমতঃ ইহা অতি অল্প লোকেই গ্রহণ করে। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় যত অল্প লোকেই গ্রহণ করুক না কেন, যেই ইহার তেজ প্রকাশ পাইতে থাকে, অমনি পুরাতন সব যেন জাগিয়া উঠিতে থাকে। যাহারা একরূপ চির নিদ্রায় অভিভূত ছিল, দেখি তাহাদের যেন ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিয়া যায়; তাহারা পুনরায় সেই পুরাতনকে আবার নূতন ভাবাপন্ন করিয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা পায়। কিন্তু সে বৃথা চেষ্টা; যখন স্বয়ং ঈশ্বর নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন আর পুরাতনের প্রয়োজন নাই। যদি পুরাতনের প্রয়োজন থাকিত, তাহা হইলে আর নূতন ব্যবস্থা হইত না, এখন নূতনের প্রয়োজন সেইজন্য তিনি নূতন বিধি করিয়াছেন। যাহারা ইহাকে ধরিতে পারিবে তাহাদেরই মঙ্গল। ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যাহারা এক সময়ে এই নূতনকে ধরিয়াছিল, তাহারাই সাধনাভাবে ইহাকে জীবনে পরিণত করিতে না পারিয়া আবার পুরাতনকে গ্রহণ করিল! কোথায় তাহারা নূতনের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া দৃঢ়তার সহিত সাধনে পড়িয়া থাকিবে, না অবিশ্বাসীদের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, পুরাতনে গিয়া আপনার পরিত্রাণের পথে কণ্টক রোপণ করিল। এখন প্রশ্ন এই; নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া কি আর পুরাতনকে একেবারেই চাহিবে না? চাই বই কি, যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমন্ত্রের মধ্যে একমেবাদ্বিতীয়ং এইটী বিশ্বাস করি, ইহা অতি পুরাতন। কিন্তু নূতন কথা জীব ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। সেইরূপ ধ্যানের কথা অতি প্রাচীন; কিন্তু এই জীবন্ত আরাধনা নূতন ব্যবস্থা। ইহাকে ছাড়িয়া এসময় ঈশ্বর লাভ হয় না। এখন ব্রাহ্মদের প্রতি অতিগুরুতর ভার অর্পিত হইয়াছে; গুরুতর দায়িত্ব পড়িয়াছে। এই নূতন সাধনপ্রণালী দ্বারা, সাক্ষাৎ ভাবে জীবন্ত ব্রহ্মের আরাধনাদ্বারা, পরিত্রাণ লাভ করিয়া, পরম পিতা মাতা পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া জগতকে দেখাইতে হইবে। তাঁহারা নিষ্ঠার সহিত সাধনে রত থাকিয়া জীবনে ইহার ফল না দেখাইলে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইবেন এবং জগতের নিকট ও অপরাধী হইবেন। তাঁহারা এ সাধনে সিদ্ধ হইতে পারিলে, যাঁহারা আজিও আকৃষ্ট হন নাই, তাহারাও আকৃষ্ট হইবেন; যাঁহারা ফিরিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও পুনরায় আসিবেন। হে করুণাময় পিতা, যদি ব্রাহ্মদিগকে দয়া করিয়া এই নূতন সাধন দিয়াছ, তবে ইহাতে সিদ্ধি দান কর; নূতন সাধনে নবজীবন দেও।

প্রচারে প্রেম ও সহিষ্ণুতা—প্রচারক জীবনের দায়িত্ব অতি গুরুতর। কাহারও অনুরোধে উপরোধে কেহ প্রচারক ব্রত গ্রহণ করেন নাই। কাহারও মনস্তুষ্টি-সাধন প্রচারকের জীবনের উদ্দেশ্য নহে। পবিত্র জীবনের আস্বাদ পাইয়া, ঈশ্বর-প্রেম ও ভক্তির মধুরতা অনুভব করিয়া, তাঁহাদের প্রাণে স্বতঃ এই ইচ্ছা হয় যে যাহারা এই সুখের অধিকারী হয় নাই, তাহাদের নিকট এই ধন বিতরণ করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরভক্ত অন্যের পরিত্রাণ ও মুক্তির কথা ভাবেন না; ভাবেন আপনার মুক্তি ও পরিত্রাণ। তিনি দিয়াই সুখী, দিয়াই কৃতার্থ হন। প্রেম ও কৃতজ্ঞতা এই মুক্তির খবর সকলের নিকট বলিবার জন্য তাঁহাকে উৎসাহিত করে। তিনি এই প্রচার ব্রত অন্যের উদ্ধারের জন্য গ্রহণ করেন না। —কিন্তু এ কার্য্য দ্বারা তিনিই মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন এই বিশ্বাসের অধীন হইয়াই তিনি প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে দাস-ভাব জাগ্রত হয়, আমি প্রভুর সন্তানগণের দাস—আমি তাঁহাদের সেবা করিতে নিযুক্ত, তাঁহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে নিযুক্ত নই। সকলে এই পরিত্রাণের সংবাদ শুনিতেছে না, সকলে হয় ত নিন্দা করিতেছে ও তাঁহার বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছে; তথাপি তাঁহার প্রেম ও সহিষ্ণুতার অভাব হইতেছে না। যখনই পৃথিবীতে নির্যাতন ও উৎপীড়ন আসিতেছে, তখনই তিনি তাঁহার প্রাণস্থিত দেবতার দিকে দৃষ্টি করিতেছেন ও বলিতেছেন:— “পিতা প্রেম দাও সহিষ্ণুতা দাও—তুমি যেমন প্রেম ও সহিষ্ণুতা দ্বারা সকলকে টানিতেছ, আমাকে সেই ভাবে টানিতে সমর্থ কর। প্রচারকজীবনের এই প্রেম ও সহিষ্ণুতার অভাবে সকল ধর্ম্মসমাজে মহা অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে।

ঈশ্বরের সেবক তাঁহার প্রভুর আদর্শ সম্মুখে রাখিবেন। ঈশ্বরের করুণা যেমন পাপাসক্ত ও সংসারাসক্ত ব্যক্তির গৃহে যাইয়া তাহার মন ফিরাইবার জন্য প্রেম ও সহিষ্ণুতার সহিত প্রতীক্ষা করে, ঈশ্বরের প্রেমিক সাধক তেমনি পাপীর পশ্চাতে ধাবিত হন, তাঁহার আকৃতিতে প্রেম লাগিয়া রহিয়াছে। তাঁহার মুখে একটীও উচ্চ কথা নাই—মধুরতা সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। যাঁহারা জীবনে ঈশ্বরের দাসত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন—তাঁহারা সর্ব্ব প্রথমে আপনার হৃদয়কে প্রেম ও দাস্যভাবে পূর্ণ করুন। কত তিরস্কার নিন্দা, উপকারের পরিবর্ত্তে অকৃতজ্ঞতা পাইবেন—কিন্তু প্রেম ও সহিষ্ণুতা দ্বারা সকল সময় কার্য্য করিতে হইবে।

যে পদের যত গৌরব তাহার শিক্ষা ও উপযুক্ততাও তত

অধিক। প্রভুর দাস হইয়া যাঁহারা তাঁহার পবিত্র নাম, পবিত্র ধর্ম্মের কথা জগৎকে বলিবেন তাঁহারা কি সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজনক পদে অভিষিক্ত নহেন? এ কার্য্যের প্রথম উপযুক্ততা প্রেম, দ্বিতীয় প্রেম, তৃতীয়ও প্রেম। প্রেমহীন জীবনে এ ব্রত প্রতিপালন করিতে পারিবেন না। কেহ কেহ জ্ঞানের প্রভাবে অনেককে অনেক তত্ত্ব বলিতে পারেন। তাহাতে প্রভুর নাম প্রচার হইবে না; আত্ম-প্রচার সম্ভবে। দীনদাস প্রেমদাস, আত্মদমনকারী ব্যক্তিদ্বারাই তাঁহার কার্য্য হইবে। ঈশ্বর তাঁহার দাসপদ-প্রার্থীদিগকে উপযুক্ত করুন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

সাধন-ঘর।

জগতের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে যে সকল সাধু মহাজন আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বলে মানবসমাজে তুমুল ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই নির্জ্জন-বাস ও গভীর তপস্যাদ্বারা সেই সকল সত্য লাভ করিয়াছিলেন। শাক্যসিংহের কঠোর তপস্যার বিষয় সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মহাত্মা যীশুর পূর্ব্ব জীবনের বিষয়ে অতি অল্পই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু তথাপি যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্টই অনুমান করা যাইতে পারে যে তিনি জলাভিষেককারী জনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বহুদিন অরণ্য-মধ্যে নির্জ্জনবাস ও তপস্যা করিয়াছিলেন। চৈতন্যের জীবনচরিত যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে তিনি একাকী তীর্থ পর্যটন ও নির্জ্জনবাসের সময়েই ভক্তিতত্ত্বের মহত্ত্ব অনুভব করেন ও তৎপরে বহুদিন শ্রীবাসের গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সেই ভক্তির সাধন করেন এবং পরে প্রচারার্থে বহির্গত হন। মহাপুরুষ মহম্মদের তপস্যা বিষয়ে তাঁহার জীবনচরিতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্ম বন্ধু গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় প্রণীত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"যখন প্রকৃত ভাবে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার সময় নিকটবর্ত্তী হইল, তখন লোক-সংসর্গ ছাড়িয়া নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তায় দিন যাপন করিবার জন্য তাঁহার মন একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি সেই সময় হেরা পর্ব্বতের নিভৃত গহ্বরে যাইয়া বসিলেন। অহর্নিশি সেই গর্ত্ত মধ্যে ঈশ্বর-মনন চিন্তায় নিযুক্ত থাকিতেন, কিয়দ্দিন অন্তর আবশ্যকমতে গৃহে আসিয়া পরিবারের সঙ্গে মিলিত হইতেন, তৎপরে পুনর্ব্বার গহ্বরে প্রবেশ করিয়া নির্জ্জন সাধনায় নিবিষ্ট থাকিতেন। যে গর্ত্তে তিনি সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার দৈর্ঘ্য আট হস্ত, পরিসর দুই হস্ত পরিমাণ, উহা মক্কা হইতে তিন মাইল অন্তর। কাবা মন্দির হইতে যাহারা মেনাবাজারে গমন করে, হেরা পর্ব্বত তাহাদের বামপার্শ্বে থাকে। যে কালে হজরত এইরূপ নির্জ্জন সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম। হজরত মহম্মদ অধিকাংশ সময় আপনার প্রিয় গিরিগহ্বর কুটীরে যাপন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া কোরেশ নারীগণ সময়ে সময়ে আসিয়া খাদিজাকে অনুযোগ করিয়া বলিতেন "অয়ি যোষিৎকুল-গৌরবে, মহম্মদকে তুমি নানা প্রকার অনুগ্রহে অনুগৃহীত করিলে, ধন-সম্পত্তি মান সম্ভ্রম তাঁহার প্রেমের অনুরোধে বিসর্জ্জন করিয়া বসিলে, এদিকে এইক্ষণ তিনি তোমার প্রণয় সংসর্গ ছাড়িয়া দূরে থাকেন, তাঁহার জন্য এত করিলে, তিনি তোমার প্রতি এইক্ষণ বীতরাগ, এ কেমন?" খাদিজা তদুত্তরে কহিতেন, 'ভগিনীগণ, তোমরা যাহা কল্পনা করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছ, আমার মন তদ্বিষয়ে নিশ্চিন্ত; হজরত হইতে যাহা সংঘটিত হইতেছে তাহা আমার প্রতি বীরাগ ও অপ্রেমপ্রযুক্ত নহে, বরং তাহা সৌভাগ্য উষার উদয় বশতঃ ঘটিতেছে। প্রেরিতত্ত্ব সূর্য্যের প্রকাশ হওয়ার উপক্রম, স্বর্গীয় সম্পদের রশ্মিজালে আমার চিত্তাকাশ যে অচিরে আলোকিত হইবে, তাহার পূর্ব্বাভাস দেখিতেছি। বহু বৎসর যাবৎ আমি হৃদয়ক্ষেত্রে এই কামনা বীজ বপন করিয়াছি, অনেক কাল হইল আমার সুখ শান্তিরূপ মূলধন এই মহাপণ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় উৎসর্গ করিয়া বসিয়াছি। এইক্ষণ সেই সময় উপস্থিত যে, হজরত অনুপ্রাণিত হইবেন, পবিত্রাত্মার আলোক স্বর্গ হইতে আসিতেছে, কিন্তু মনুষ্যের সামান্য চক্ষু তাহা দেখিতে পাইতেছে না।

যাহা হউক, তিনি অনেক সময় এইরূপে লোকসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া নিভৃত হেরা গহ্বরে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। ক্রমে নির্জ্জন প্রদেশে ঐশ্বরিক জ্যোতি ও একত্ববাদের গূঢ়তত্ত্ব তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত ও প্রতিফলিত হইতে লাগিল; মোহকালিমা তদীয় হৃদয় দর্পণ হইতে নিষ্কাষিত হইল, স্বর্গীয় আলোকের প্রকাশে মনের অন্ধকার পলায়ন করিল। তিনি সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া জনসংসর্গ হইতে দূরে অবস্থান করিলেন। আরবীয় জ্ঞানবান লোকেরা লক্ষণ বুঝিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে "অবশ্য মোহম্মদ ঈশ্বরপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়াছে।" এদিকে হজরত সাধন বারি সিঞ্চনে স্বীয় হৃদয়োদ্যানকে অনুক্ষণ স্নিগ্ধ ও সতেজ রাখিতেছিলেন, প্রেমের পতাকা অনুরাগ ভূমিতে উন্নমিত করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার প্রশান্তচিত্তে অনুপ্রাণনের লক্ষণ সকল স্পষ্ট প্রকাশ পাইতে লাগিল; তাঁহার প্রশস্ত অন্তঃকরণ স্বর্গাধিপতির নিষেধ বিধির অবতরণ ভূমি হইল।"

এইরূপ সকল মহাজনের জীবনেই দৃষ্ট হয় যে তাঁহারা নির্জ্জনে সাধনাদ্বারা যাহা লাভ করিয়াছেন, তাহাই সজনে আসিয়া বিতরণ করিয়াছেন। আমাদের ব্রাহ্মসমাজের ক্ষুদ্র ইতিবৃত্তের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দুই বৎসর কাল গিরি শৃঙ্গে বাস ও তপস্যা করিয়া যে শক্তি লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই শক্তির প্রভাবেই ব্রাহ্মসমাজ পুনরুজ্জীবিত হইয়া, বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

কেবল অধ্যাত্ম বিষয়েই বা কেন, কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি শিক্ষাসম্বন্ধীয়, কি বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় কোন

গভীর তত্ত্বই বিনা নির্জ্জন সাধনায় আবিষ্কৃত হয় না। একটা সামান্য বাহিরের বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রায় সকল লোকের মুখেই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পোষ্ট আফিসের বন্দোবস্তের প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পরম্পরাক্রমে কত লোকের নির্জ্জনচিন্তার ফলে ঐ বন্দোবস্ত দাঁড়াইয়াছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। ইংরাজদিগের জীবনে নির্জ্জনতা আছে বলিয়াই তাঁহারা সারবান বিষয় সকল উৎপন্ন করিতে পারেন। প্রায় প্রত্যেক ইংরাজ গৃহস্থের গৃহে একটী নির্জ্জনগৃহ দেখিতে পাওয়া যায়, সেটী পাঠাগার বা চিন্তাগার (study)। তিনি যখন সেই গৃহে প্রবিষ্ট হন, তখন পরিবার পরিজনের সকলেই জানেন, যে তিনি পাঠ বা চিন্তাতে নিযুক্ত আছেন, গুরুতর কারণ ব্যতীত তাঁহার চিন্তার ব্যাঘাত করা কর্ত্তব্য নহে। এই বন্দোবস্তের গুণে সে নির্জ্জনগৃহটী অনেক সময় গিরিগহ্বরের ন্যায় নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ থাকে। সেখানে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যায়, গৃহস্বামী চিন্তাতে নিমগ্ন থাকেন। এইরূপ নির্জ্জনবাসের প্রথা না থাকিলে গ্লাডষ্টোন প্রভৃতি রাজ-পুরুষগণ প্রতিদিন যে পরিমাণে পাঠ চিন্তা ও অন্যান্য কাজ করিতেছেন, তাহার দশ ভাগের এক ভাগও করিতে পারিতেন না।

প্রাচীন হিন্দু গৃহস্থদিগের গৃহে নির্জ্জন-চিন্তা ও পাঠের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ না থাকুক একটী ঠাকুর ঘর থাকিত। সেটী পূজার ঘর। স্নানান্তে সকলে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া ইষ্ট দেবতার আরাধনা করিতেন। গৃহের বালক বালিকা, দাস দাসী অতিথি অভ্যাগত সকলেই জানিত, ওটী ঠাকুর ঘর, উহাতে পবিত্র ভাবে প্রবেশ করিতে হয় এবং পূজার্থই প্রবেশ করিতে হয়।

বর্ত্তমান সময়ে দেখিতেছি ব্রাহ্মগৃহস্থ নবীনের অনুকরণ করিয়া না নির্জ্জন পাঠ মন্দির রাখিতেছেন, না প্রাচীনের অনুকরণ করিয়া ঠাকুর ঘর রাখিতেছেন। তাঁহাদের পুত্র কন্যাগণ ইহা দেখিতে পাইতেছে না, যে গৃহস্থধর্ম্ম করিতে গেলে যেমন রন্ধনের জন্য রান্নাঘর রাখিতে হয়, আহারের জন্য খাবার ঘর রাখিতে হয়, তেমনি পাঠ, চিন্তা ও উপাসনার জন্যও সাধন-ঘর রাখিতে হয়। ইহার অভাবে যে তাহারা ধর্ম্মভাববিহীন হইয়া বর্দ্ধিত হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? আমরা এ বিষয়ে ব্রাহ্মগৃহস্থদিগের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতেছি। ব্রাহ্মগৃহস্থের গৃহে নির্জ্জনবাস, আত্মচিন্তা ও সাধন ভজনের জন্য সাধন-ঘর থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

দেহাত্মবুদ্ধি।

(প্রাপ্ত)

শ্রীভগবানুবাচ—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।

(শ্রীমদ্ভাগবৎ দশম স্কন্ধ)

ভগবান্ বলিতেছেন :—

বাতপিত্ত শ্লেষ্মময় শরীরে যাহার আত্মজ্ঞান, পুত্র কলত্রাদিতে যাহার আত্মীয় জ্ঞান, মৃত্তিকা-বিকারে যাহার দেবতাবুদ্ধি, ও জলেতে যাহার তীর্থজ্ঞান; সাধুতে যাহার সে জ্ঞান নাই, সে ব্যক্তি গো তৃণবাহীগর্দ্দভস্বরূপ। যদিও বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মাময় ক্ষণভঙ্গুর শরীর আত্মা নহে, তথাপি সংসারের অধিকাংশ লোকের কার্য্য-কলাপ পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, তাহারা যেন দেহকে সারবস্তু বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। অনেকে দেহকে সুসজ্জিত করা, দেহের লাবণ্য এবং সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা যত প্রয়োজনীয় মনে করেন, আত্মার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা তত প্রয়োজনীয় মনে করেন না। দেহের সামান্য রোগ উপস্থিত হইলে, তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু আত্মার কঠিন রোগ উপস্থিত হইলেও তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন না। যখন দেহ ও আত্মায় বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন দেহের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া আত্মার কল্যাণের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন। ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়া অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং তদ্দ্বারা দেহ রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া শরীর-পালনের বন্দোবস্ত করেন। ইঁহারা কেবল স্ব স্ব শরীর রক্ষার জন্য ব্যগ্র হইতেছেন তাহা নহে। আত্মীয়দিগের শরীর রক্ষার জন্যও ব্যস্ত, কিন্তু তাহাদিগের আত্মরক্ষার জন্য তেমন ব্যস্ত নহেন। প্রিয়তম ব্যক্তির পীড়া হইলে আর আত্মীয়ের প্রাণে শান্তি থাকে না; তিনি যাতনায় অস্থির। কি উপায় অবলম্বন করিলে রুগ্ন ব্যক্তি অচিরে রোগমুক্ত হইবে, তাহারই জন্য উৎকণ্ঠিত হন, কিন্তু সে ব্যক্তি যদি দুর্নীতিরূপ গরলপানে আত্মাকে বিপদাপন্ন করিতে থাকে, তাহা হইলে তত উৎকণ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় না। নাস্তিকতার বাণে তাহার আত্মা জর্জ্জরিত হইলেও আত্মীয়ের প্রাণে কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখের উদ্রেক হয় না। মায়াবিনী কপটতা তাহার সমস্ত আত্মাকে গ্রাস করিলেও আত্মীয়ের প্রাণে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় কিনা সন্দেহ।

আত্মীয় আত্মীয়ের জন্য যাহা করিতেছেন, পরোপকারী ব্যক্তিদিগের কোন কোন মহাত্মাও তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিতেছেন। কোন দেশে প্রবল দুর্ভিক্ষের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; অনশনে অনেক নরনারী প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল, কোনও সদাশয় ব্যক্তি দূরদেশ হইতে এই দুর্গতির কথা শুনিয়া হয় ত তথায় শত শত মুদ্রা প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে দেশের লোক সকল ঈশ্বরকে ভুলিয়া পাপের গভীর কূপে ডুবিয়া মরিতেছেন। এই কথা শুনিয়া হয় ত তাঁহার প্রাণে কিঞ্চিন্মাত্রও আঘাত লাগিল না। কোন দেশ মহামারীর প্রবল আক্রমণে জনশূন্য হইয়া যাইতেছে, তিনি শ্রবণ করিয়া অস্থির হইলেন। সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিবার জন্য চিকিৎসক ও ঔষধ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পানাসক্তির ঘোরতর মহামারীদ্বারা যে সে দেশের নরনারীর আত্মার দুর্গতির একশেষ হইতেছে, ইহা শুনিয়া তাঁহার চিত্তে দয়ার আবির্ভাব হইতেছে না। তিনি শারীরিক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের অবস্থানের জন্য লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এক মনোরম বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের দুর্দ্দশার বিষয় একবারও ভাবিতেছেন না।

এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে, যে দেহাত্মবুদ্ধি আজিও অধিকাংশ লোকের মনে ষোল আনা রাজত্ব করিতেছে। দুঃখের বিষয় যে, যাঁহারা মুখে ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাও কার্য্যতঃ শরীরকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা আমরা শরীর নিগ্রহের পক্ষ সমর্থন করিতেছি না। কোন কোন ব্যক্তি শরীর ধারণ পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের শাস্তি মনে করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের মতে শরীর-নিগ্রহ মুক্তি-সাধনের অন্তর উপায়। আমরা তাহা মনে করি না। প্রত্যুত আমরা মনে করি যে, শরীর ও আত্মায় গূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। শরীরে কোন রূপ গ্লানি উপস্থিত হইলে, নিরুদ্বেগে ধর্ম্ম সাধন চলিতে পারে না। এজন্য শরীর সুস্থ রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু সর্ব্বদায়ই শরীরের কল্যাণ উপলক্ষ্য, আত্মার কল্যাণ লক্ষ্য হওয়া উচিত। শরীরকে যাঁহারা লক্ষ্য মনে করিতেছেন এবং লক্ষ্য মনে করিয়া কেবল তাহার কল্যাণসাধনেই ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারাই দেহাত্মবাদী। ভাগবতের শ্লোক তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই প্রযুজ্য, তাঁহারাই উপলক্ষ্যকে লক্ষ্য মনে করিয়া গন্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন।

কৃপণ যেরূপ লক্ষ্য—সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জলাঞ্জলি দিয়া, উপলক্ষ্য—ধন সঞ্চয়ের জন্যই ব্যগ্র হয়, দেহাত্মবাদিগণও তদ্রূপ আত্মার মঙ্গল সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল শরীর লইয়াই ব্যস্ত থাকে। শরীর ও আত্মার মধ্যে যখন বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন দেহাত্মবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। ক, দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন। চিকিৎসক ব্যবস্থা দিলেন যে মহামাস তৈল ভিন্ন ব্যাধির অবসান হইবে না। ক যদি ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য জীবন্ত মনুষ্য হত্যা করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, তিনি দেহকে আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেছেন। কারণ জীবন্ত মনুষ্য হত্যাদ্বারা আত্মার দুর্গতি হইয়া থাকে।

এই দেহাত্মবুদ্ধি কিরূপে দূরীকৃত হইতে পারে, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। আত্মাকে জানিতে পারিলে এবং দেহের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ তাহা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলে, দেহাত্মবুদ্ধির অবসান সম্ভবপর। আত্মাকে জানিতে হইলে, অধ্যবসায়ের সহিত অন্তর পরীক্ষা করা প্রয়োজনীয়। মনের স্বাভাবিক দৃষ্টি বহির্মুখী। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশু জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা বহির্জ্জগতের জ্ঞান লাভ করিতে থাকে। বহির্জ্জগৎই সর্ব্বাগ্রে তাহার চিত্তকে আকর্ষণ করে। বহুদিন এইভাবে গত হয়। তৎপর বিশেষ শিক্ষা প্রদত্ত হইলে, অন্তর্দৃষ্টি খুলিতে পারে। অসভ্য দেশের প্রায় সকল নরনারী এবং সুসভ্য দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তি সমূহ বহির্জ্জগৎ লইয়াই জীবনাতিবাহিত করে, সুতরাং স্থূল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু ভিন্ন তাঁহাদিগের অন্যবিধ সত্তা উপলব্ধি করিবার সাধ্য নাই। এজন্য স্থূল শরীরই তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয় এবং সমস্ত জীবন এই শরীরের সেবাতেই অতিবাহিত হইয়া থাকে। মানুষ বিশেষ শিক্ষা পাইলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বহির্জ্জগৎ ও শরীর অতিক্রম করিয়া তন্মূলে অতীন্দ্রিয়, নিরাকার, চৈতন্যময় শক্তির রাজ্য দেখিতে সমর্থ হয়। এই বিশেষ শিক্ষা কি? প্রথমতঃ অতীন্দ্রিয় রাজ্যের তত্ত্ব যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহাদিগের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তাঁহাদিগের অবলম্বিত পথ আশ্রয় করিতে হয়। বিশ্বাসীদিগের বাক্যে এতটুকু আস্থা রাখিতে না পারিলে, যথারীতি অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি জন্মিবে না। অনুসন্ধান করিতে করিতে যদি বিশ্বাসীবাক্যের সত্যতা প্রতিপাদিত হয়, তাহা হইলে অতীন্দ্রিয় আত্মার জ্ঞান বদ্ধমূল হইতে থাকিবে, এবং তৎসঙ্গে দেহাত্মবুদ্ধি লোপ পাইতে থাকিবে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, বিশ্বাসী লোকের পরিচয় পাইবার উপায় কি? যে ব্যক্তি বাহ্য ব্যবহারে প্রমাণ করিতেছেন যে, আত্মাই সার বস্তু এবং যিনি আত্মার কল্যাণকে উপেক্ষা করিয়া দেহের কল্যাণের জন্য ব্যস্ত হন না, পরন্তু প্রয়োজন হইলে আত্মার জন্য দেহকে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, তিনিই দেহাত্মবুদ্ধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, তিনিই অতীন্দ্রিয় আত্মাকে বিলক্ষণরূপে জানিতে পারিয়াছেন। কেহ মনে করিতে পারেন, আমরা এতদ্দ্বারা অভ্রান্ত গুরুবাদ সমর্থন করিতেছি। অতীন্দ্রিয় আত্মজ্ঞান পরায়ণ ব্যক্তির উপদেশ বিশ্বাস পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিলে, তাঁহাকে কি অভ্রান্ত গুরু বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে না? মতে তাঁহাকে অভ্রান্ত না বলিলেও কার্য্যতঃ তাঁহাকে অভ্রান্ত বলা হইতেছে। মানবের উপদেশ গ্রহণ ভিন্ন জীবন-পথে অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই। বাল্যকালে পিতামাতা কিংবা অন্য কোন গুরুজনের উপদেশ লইয়া চলিতে হয়, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে কত বিষয়ে কত জনের উপদেশ লইতে হয়। শরীরে ব্যাধি জন্মিলে চিকিৎসকের উপদেশ লওয়া কর্ত্তব্য। গৃহ প্রস্তুত করিতে ইঞ্জিনিয়ারের ব্যবস্থা লওয়া হইতেছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও অধ্যাপকের উপদেশ গ্রহণে চলিতে হয়। এই সকল উপদেষ্টাদিগকে কি অভ্রান্ত বলিতে হইবে? প্রত্যুত ইহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে যে, যিনি দশ স্থলে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তিনি একাদশ স্থলে অকৃতকার্য্য হইলেন। জনৈক চিকিৎসক কোন এক রোগাক্রান্ত এক শত ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করিলেন, কিন্তু সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই শ্রেণীর রোগাক্রান্ত অন্য ব্যক্তিকে আরোগ্য করিতে পারিলেন না। চিকিৎসকের অকৃতকার্য্যতার এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া যেমন তাঁহার ভ্রম স্বীকার করিতে হয়, ধর্ম্মযাজকদিগের অকৃতকার্য্যতা দেখিয়া সেইরূপ তাঁহাদিগকে ভ্রমাধীন বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। একজন ধর্ম্মোপদেষ্টা দুই শত শিষ্যকে ধর্ম্মোপদেশ করিলেন, তাহার মধ্যে দেড় শত শিষ্য উপকার পাইলেন, অবশিষ্ট পঞ্চাশ জনের কোন ফল হইল না, তথনও যদি এই পঞ্চাশ জন লোক তাঁহার উপদেশকে শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাকে পরম গুরু বলিয়া স্বীকার করে, তাহা হইলে বলিব, এই সকল লোক জ্ঞানকে জলাঞ্জলি দিয়াছে। ইহারা ভ্রান্ত গুরুর কুফলপ্রদ উপদেশকে অগ্রাহ্য না করিয়া তৎপথেই চলিতেছে। এই সকল ব্যক্তি যদি কোন চিকিৎসকের অকৃতকার্য্যতা দেখিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করেন এবং অন্য চিকিৎসক অন্বেষণ করিতে থাকেন, তবে

ধর্ম্মোপদেষ্টা সম্বন্ধে তদ্রূপ না করিলে, বলিব যে, ইঁহারা অভ্রান্ত গুরুবাদ মানিয়া লইতেছেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি কোন ধর্ম্মোপদেষ্টার উপদেশ মতে চলিয়া উপকার হয় কি না দেখিবার জন্ম সে উপদেশ গ্রহণ করিলে, উপকার হইলে তাহা পরিত্যাগ না করিলে এবং উপকার না হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ বর্জ্জন করিলে, তাঁহার তদ্রূপ আচরণ অভ্রান্ত গুরুবাদের পক্ষসমর্থক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। সুতরাং আমরা যেরূপ উপদেশ গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়া আসিয়াছি, তদ্দ্বারা ঘুণাক্ষরেও অভ্রান্ত গুরুবাদ সমর্থিত হইতেছে না। তবে যেমন অন্ন অনভিজ্ঞ বা দশ বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বহুদর্শী অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপদেশ সকল বিশ্বাস পূর্ব্বক পরীক্ষার্থ গ্রহণ করিয়া থাকে, ধর্ম্ম বিষয়ে ও তদ্রূপ উপদেশ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কেহ এরূপ করিলে তাঁহাকে দোষী করা যাইতে পারে না। আমরা দেহাত্মবুদ্ধির সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিলাম। যাঁহারা স্বয়ং আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া দেহাত্ম-বাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন নাই, তাঁহারা বিশ্বাসী আত্মার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অবলম্বিত পথ গ্রহণে দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিবেন।

প্রেম-তত্ত্ব।

(কবিরের উক্তি)

(১) ইয়ে তো ঘর হায় প্রেমকা খালাকা ঘর নহি, শীশ উত্তারে ভূঁয়ি ধরে তব্ পঁহুছে ঘর মাহি।

এই প্রেমের গৃহ সামান্য নহে, যে আপনার মস্তক ছেদন করিয়া ভূমিতে রাখিতে পারে, সেই এই প্রেমের গৃহে প্রবেশ করিতে পারে।

(২) প্রেম না বাড়ী উপজে, প্রেম না হাটে বিকায়, রাজা রাণা যো রুচে শীশ দেয় লেযায়।

প্রেম ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয় না, বাজারেও বিক্রয় হয় না, কিন্তু রাজা রাণা যাহার ইচ্ছা হয়, মস্তক দিলেই লাভ করিতে পারে।

(৩) প্রেম পিয়ালা যো পিয়ে শীশ দক্ষিণাদে, লোভী শীশ নাদে সেকে নাম প্রেমকা লে।

যে প্রেম পাত্র পান করিতে চায়, তাহাকে আপনার মস্তক দাক্ষিণা দিতে হয়, এজন্ম লোভী ব্যক্তি মস্তক দিতে পারে না। কেবল বৃথা প্রেমের নাম করিয়া থাকে।

(৪) আয়া প্রেম কাহা গয়া দেখাথা সব্ কোয় ছিন, রোয়ে ছিন্ মে হাসে সো তো প্রেম নাহোয়।

প্রেম যখন আসিয়াছিল তখন সকলেই দেখিয়াছিল, কিন্তু সে প্রেম কোথায় চলিয়া গেল? যে প্রেমে ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে তাহাকে প্রেম বলা যায় না।

(৫) প্রেম প্রেম সব কোই কহে, প্রেম না চিন্হে কো আট পহের ভিজা রহে, প্রেম কহাওয়ে সো।

সকলেই প্রেম প্রেম বলিয়া থাকে, কিন্তু প্রেম কেহ চিনে না; যে প্রেম অষ্ট প্রহর সিক্ত রাখে, তাহাকেই প্রেম কহে।

(৬) ঘাড়ে ঘাটে ছিন্ একমে সো তো প্রেম না হোয় অঘট প্রেম পিঞ্জর বসে প্রেম কাহাওয়ে সো।

যে প্রেম ক্ষণে বৃদ্ধি পায় ও ক্ষণে হ্রাস হয় তাহা প্রকৃত নহে, কিন্তু যে প্রেমের কখন হ্রাস হয় না তাহাই প্রকৃত প্রেম।

(৭) প্রেম পিয়ারে লাল সেঁা মন দে কীজে ভাও, সৎ-গুরুকে কৃপাসে ভালাবনায় দাও।

আপনার মন দিয়া প্রিয়তমের প্রেমের দরকার, সৎগুরুর (ভগবানের) কৃপায় এই দাও (বাজি) ভালই হইয়াছে।

(৮) যা ঘট প্রেম না সঞ্চারে সো ঘট জান শ্মশান, যেইসে খাল লোহার কি শ্বাস লেৎ বিন প্রাণ।

কর্ম্মকারের ভস্ত্রার যেমন শ্বাস প্রশ্বাস আছে। কিন্তু প্রাণ নাই। সেই প্রকার প্রেমহীন ব্যক্তির হৃদয় শ্মশানের মত।

(৯) প্রেম বাণিজ্য নাহি কর সেকে, চড়ে না নামকি গেল, মানুষ কেরি খালেড়ি ওড় ফিরে জুঁ বয়েল।

প্রেম বাণিজ্য দ্বারা লাভ করা যায় না, অথবা প্রেমের নাম লইলেই প্রেমিক হওয়া যায় না, যে প্রকার বৃষ মনুষ্যের চর্ম্ম গায়ে পরিয়া মনুষ্য হইতে পারে না।

(১০) প্রেম বিনা ধীরজ নাহি বিরহ নাহি বৈরাগ, সৎ গুরু বিনা মিটে নাহি মন কাসাকা দাগ।

প্রেম বিনা ধৈর্য্য হয় না, বিরহ বিনে বৈরাগ্য হয় না, আর ভগবানের কৃপা না হইলে মনের দাগ ঘুচে না।

ব্যাখ্যান-রত্নাবলী।

সাধনাশ্রম ২৬এ মে, ১৮৯৩ ব্যাখ্যাত।

"My defence is of God, which saveth the upright in heart."—Ps. vi, 10.

"আমার রক্ষা প্রভু পরমেশ্বর হইতেই হয়, যিনি বিশুদ্ধ-হৃদয় ব্যক্তিদিগকে পরিত্রাণ করেন।"

ঈশ্বরের পরিত্রাণপ্রদ শক্তি সকল আত্মার নিকটেই সর্ব্বদা বিদ্যমান; কিন্তু সকল আত্মায় ইহা প্রকাশিত হয় না; যেমন তাড়িত সকল বস্তুতে, সকল স্থানে প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু ইহার শক্তি সকল স্থানে প্রকাশ পায় না। ইহার প্রকাশ পাইবার জন্ম যেমন বিশেষ অবস্থা প্রয়োজন, তেমনি পরিত্রাতা পরমেশ্বরের পরিত্রাণপ্রদ শক্তির প্রকাশের জন্ম আত্মার বিশেষ অবস্থার আবশ্যক। সে অবস্থা কি?—uprightness of heart. যাঁহাদের হৃদয় বিশুদ্ধ, হৃদয়ে নিকৃষ্ট অভিসন্ধি, মলিন বাসনা নাই, যাঁহাদের হৃদয়ে স্বার্থের কোন সম্বন্ধ নাই, সেই সকল আত্মাতেই তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ শক্তি প্রকাশ পায়। যে পরিমাণে হৃদয়কে এই অবস্থায় মানুষ লইয়া যায়, সেই পরিমাণে তাহাতে সেই শক্তি প্রকাশ হয়। এই শক্তি সর্ব্বদা হৃদয়ে বিদ্যমান; কিন্তু তখনই ইহার বিক্রম, ইহার তেজ, ইহার শক্তি দর্শন করা যায়, যখন হৃদয় পবিত্র হয়, অভিসন্ধি রহিত হয়। তখনই চিত্তে ঈশ্বরের শক্তি দুর্জ্জয় বিক্রমে কাজ করে। তখনই মানবাত্মার সেই শক্তির তেজ, সেই শক্তির গভীরতা, সেই শক্তির বিক্রম দেখিয়া জগৎ স্তব্ধ

হয়। এই জন্যই এই বিশ্বাসী ব্যক্তি বলিতেছেন, তিনি বিশুদ্ধ-হৃদয় ব্যক্তিকেই পরিত্রাণ করেন। হৃদয়ের বিশুদ্ধতা না হইলে এই শক্তি অবতীর্ণ হয় না। যাঁহারা আপনাদের হৃদয়ে এই বিশুদ্ধতা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিয়াছেন, My defence is of God; প্রভু পরমেশ্বর আমার রক্ষক। তাঁহারা সেই সাহসে সাহসী, সেই বলে বলী, তাঁহারা সেই শক্তিতে শক্তিমান্। তাঁহারা সত্যের বলে সাহসী, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সাহসী। যাঁহাদের হৃদয় বিশুদ্ধ, যাঁহাদের হৃদয়ে পরমেশ্বরের সেবা ভিন্ন অন্য কোন অভিসন্ধি নাই, তাঁহাদের সাহস, পরাক্রম দেখিয়া জগৎ স্তব্ধ হইয়াছে। সংসারে যাহার কোন সম্বন্ধ নাই, সংসারে যার এমন ঐশ্বর্য্য কিছু নাই, যাহাতে সাহস হইতে পারে, এমন ব্যক্তি বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া সত্যধর্ম্মের জয় জীবনে দেখাইয়াছেন, জগতের নিকট ঈশ্বরের নামের সাক্ষ্য দিয়াছেন। সংসারাসক্ত লোক এই প্রকার ব্যক্তির প্রতি কত অভিসন্ধির আরোপ করে; কিন্তু সমুদয় বাধা উৎপীড়ন অগ্রাহ্য করিয়া নির্ভীক হৃদয়ে পরমেশ্বরের মহৎ নামের সাক্ষ্য দিয়াছেন। আর কোন্ জিনিস হ'তে এইরূপ সাহস আসিতে পারে? নির্ম্মলচিত্ত হ'তে বিশুদ্ধ হৃদয় হ'তে, অভিসন্ধিরহিত, বাসনা-কামনা বিবর্জ্জিত চিত্ত হ'তেই সে সাহস হয়। My defence is of God. প্রভু পরমেশ্বর হইতে আমার রক্ষা। যাঁহারা আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হস্তে রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগের রক্ষা এইরূপে। কিন্তু যাহাদের হৃদয় বিশুদ্ধ নয়, যাহাদের চিত্তে মলিন বাসনা আছে, অভিসন্ধিতে মলিনতা আছে, তাহাদের রক্ষা এই রকমে নয়। যে কিছু চায় অন্তরে তার আর সাহস হয় না। সে মরণের গোড়া নিজের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছে। যে পরিমাণে চিত্তের বিশুদ্ধতা, সেই পরিমাণে সাহস, সেই পরিমাণে প্রসন্নতা, সেই পরিমাণে পরমেশ্বর হইতে রক্ষা। যখনই বিশ্বাসী বলিয়া লোকে বাধা দেয়, উৎপীড়ন করে, সমালোচনা করে, তখনই বিশ্বাসীর কর্ত্তব্য যে হৃদয়ের অভিসন্ধি কামনা পরীক্ষা করেন। লোকের উপর প্রতিহিংসা লইবার প্রবৃত্তি, লোকের উপর ক্রোধের ভাব রাখা অত্যন্ত অন্যায়। হৃদয়ের অভিসন্ধি পরীক্ষা করিয়া দেখ, যদি স্বার্থপরতা, সুখপ্রিয়তা বা কোন রকমের দুর্ব্বলতা, কোন রকমের মলিনতা থাকে, তবে আপনাকে মেরেছ। নিজের মৃত্যু তোমার নিজের কাছেই আছে। তবে আর মানুষকে দোষ দেখিয়ে দিতে হবে না। তুমি নিজেই অন্তরের মধ্যে গলিত কুষ্ঠ রাখিয়াছ। নিজেই মৃত্যু ডাকিয়াছ; নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছ। কিন্তু যদি তোমার চিত্তের বিশুদ্ধতা থাকে, যদি একমাত্র প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করা ভিন্ন, তাঁহার দাসানুদাস হইয়া তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্য অন্য অভিসন্ধি না থাকে, তবে তোমার শক্তি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর হ'তে, তোমার রক্ষা ঈশ্বরের দিক হইতে। সকল বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির রক্ষা তাঁহার নিকট হইতে। "আমার রক্ষা প্রভু পরমেশ্বর হইতে, কারণ আমার মধ্যে অন্য অভিসন্ধি কিছুই নাই।"

এই আশ্রমে ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ দেখিতে হইলে কি প্রয়োজন? রোজই তো মেঘ হইতেছে; কিন্তু সকল সময় কি তাড়িতের শক্তি প্রকাশ পাইতেছে? মেঘের বিশেষ অবস্থা হইলেই তাড়িত শক্তির প্রকাশ হয়। আশ্রম করিলেই কি হইল? দশ জন লোক একত্র থাকিলেই কি হইল? দশ জনে একত্র বসিলেই কি হয়? বিশুদ্ধতা, বিশুদ্ধতা, বিশুদ্ধতা, হৃদয়ের বিশুদ্ধতা চাই। বিশুদ্ধতা যদি থাকে, একজন ব'স, দুজন ব'স, দেখিবে ব্রহ্মশক্তি অবতীর্ণ হয় কি না! He Saveth the upright in heart. তিনি বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ ব্যক্তিদিগের উদ্ধার করিবেন। অতএব আমরা যেন তাঁর করুণায় এমন অবস্থা পাই, যাহাতে হৃদয়ে হাত দিয়া বলিতে পারি, "My defence is of God, which saveth the upright in heart, প্রভু পরমেশ্বর ভিন্ন আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, অতএব ঈশ্বরের নিকট হইতে আমার রক্ষা।"

ব্রাহ্ম সাধনাশ্রম

বা

BRAHMO WORKER'S SHELTER

সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। **আশ্রম-স্থাপনের উদ্দেশ্য**—যাঁহারা বিষয়কর্ম্মে নির্লিপ্ত থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মসাধন, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার এবং ব্রাহ্মসমাজ ও জনসাধারণের সেবাতে সমুদয় দেহ মন নিয়োগ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের একত্র বাস, একত্র সাধন ও একত্র কর্ম্ম কারবার ব্যবস্থা করিয়া একটী ঘনানিবিষ্ট ব্রাহ্ম সাধকদল গঠন করা ইহার প্রথম উদ্দেশ্য। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনার্থী ও সেবার্থী সকল শ্রেণীর নরনারীর সাধনের ও সম্মিলনের একটী ক্ষেত্র প্রস্তুত করা ও রক্ষা করা ইহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

২। **ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধন**—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগে একমাত্র নিরাকার সত্যস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের সহিত যুক্ত হওয়া এবং তাঁহার ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া জগতের প্রতি প্রীতিতে ও জগতের কল্যাণসাধনে দেহ মনকে নিয়োগ করাই ব্রাহ্মধর্ম্মসাধন। এই আশ্রমের অবলম্বিত সাধনপ্রণালীতে পূর্ব্বোক্ত মহদুদ্দেশ্য সর্ব্বদাই লক্ষ্য স্থানে রাখা হইবে। এখানে সকল দেশের ও সকল কালের ঈশ্বরপরায়ণ জ্ঞানী, ভক্ত, ও কর্ম্মী সাধুগণের প্রতি এবং সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইবে এবং জ্ঞান, ভক্তি ও সদনুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি রাখা হইবে।

৩। **সাধন-প্রণালী**—এখানে আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা, শাস্ত্রপাঠ, সদালোচনা ও সদনুষ্ঠান প্রভৃতি স্বাভাবিক ও আধ্যাত্মিক উপায়ে ধর্ম্মসাধন করা হইবে।

৪। আশ্রমবাসীদিগের ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনার্থী অন্যান্য ব্যক্তিগণের ধর্ম্মসাধনের সাহায্যার্থ এখানে প্রতিদিন প্রাতে সমবেত ব্রহ্মোপাসনা হইবে। বিশেষ বিঘ্ন না ঘটিলে আশ্রমস্থ ব্যক্তিগণ উপাসনায় যোগ দিতে বিরত হইবেন না।

৫। আশ্রমের ওয়ার্কারদিগের কার্য্য—ব্রাহ্মগণের ধর্ম্মসাধনের সহায়তা করা, ব্রাহ্ম-পরিবার সকল পরিদর্শন করা, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক পুস্তক পুস্তিকা লেখা, মুদ্রিত করা, ও বিক্রয় করা, ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষা বিষয়ে সহায়তা করা, ব্রাহ্মগৃহস্থের ও ছাত্রদিগের কেহ পীড়িত ও সাহায্য-প্রার্থী হইলে তাহার ব্যবস্থা করা, নানা স্থানে ও নানা উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার করা, তদ্ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করা ইত্যাদি ওয়ার্কারদিগের কার্য্য।

৬। এই আশ্রমের ওয়ার্কারগণ ব্রাহ্মধর্ম্মসাধন, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মপ্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য সকল প্রকার কার্য্য করিতে ও সকল প্রকার ক্লেশ বহন করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। এখানে বৈরাগ্যের জন্য বৈরাগ্য শিক্ষা দেওয়া বা অভ্যাস করা হইবে না এবং যিনি যে প্রকার কার্য্যের উপযুক্ত সেই প্রকার কাজে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার দিকে দৃষ্টি রাখা হইবে; কিন্তু ওয়ার্কারদিগের মনের ভাব এইরূপ হওয়া আবশ্যক যে, ঈশ্বরের জন্য ও ব্রাহ্মসমাজের জন্য ছাড়িতে পারি না এমন সুখ নাই বা করিতে পারি না এমন হীনকাজ নাই, এমন কি তাঁহারা সকল প্রকার স্বার্থনাশকে পরম সুখের ও গৌরবের বিষয় মনে করিবেন।

৭। শ্রমশীলতা—এই আশ্রমের ওয়ার্কারগণ শ্রমশীল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ জীবনের আদর্শ প্রদর্শন করিবেন। এই আশ্রম অপরের শ্রমোপার্জ্জিত ও দয়াপ্রদত্ত সাহায্যে প্রতি-পালিত হইবে। সুতরাং ওয়ার্কারগণ বিনা পরিশ্রমে সেই অন্ন গ্রহণ করা পাপ মনে করিবেন।

৮। বাধ্যতা—ওয়ার্কারগণ যেমন একদিকে ঈশ্বরের হস্তে সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগকে অর্পণ করিবেন, তেমনি অপর দিকে সাধন ও কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের পরামর্শের অধীন থাকিয়া কার্য্য করিবেন।

৯। সহায়—যাঁহারা অনন্যকর্ম্মা হইয়া উক্ত উদ্দেশ্যত্রয়-সাধনে দেহ মন নিয়োগ করিতে প্রস্তুত নহেন, বিষয়-কর্ম্ম করিতেছেন বা করিতে ইচ্ছা আছে, অথচ যথাসাধ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা ওয়ার্কারদিগের সহায় বলিয়া গণ্য হইবেন। তাঁহারা ওয়ার্কারদিগের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিবেন।

১০। ওয়ার্কারগণ আপনাদের ভরণ পোষণের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিবেন। স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া যিনি যে কিছু সাহায্য করেন, তাহা ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মধর্ম্মসাধন, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবার ব্যাঘাত না করিয়া আশ্রমের ব্যয়ের সাহায্যের উদ্দেশ্যে ও আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের পরামর্শানুসারে যাহাতে কিছু উপার্জ্জন করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিবেন। অভাবপক্ষে ভিক্ষা করিবেন, কিন্তু কখনই আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ঋণ করিবেন না এবং এক কার্য্যের জন্য যাহা দেওয়া হয় তাহা অপর কার্য্যে ব্যয় করিবেন না।

১১। ওয়ার্কারদিগের মধ্যে যাঁহারা অবিবাহিত তাঁহারা অবিবাহিত থাকিতে পারিলেই ভাল। কিন্তু বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। তবে বিবাহ করিতে হইলে, ওয়ার্কার বা ওয়ার্কারভাবাপন্ন পুরুষ বা নারীকেই বিবাহ করা প্রার্থনীয়।

১২। মফঃস্বলের কোনও ব্রাহ্মবন্ধু আশ্রমে অতিথি-রূপে উপস্থিত হইলে, তিনি দুইবেলা এখানে থাকিতে ও আহার করিতে পাইবেন। তৎপরে অন্য কোনও স্থানে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কিন্তু সমাগত বন্ধু যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধনার্থী হন, তাহা হইলে তিনি নিজ ব্যয়ে এখানে অবস্থিতি করিতে পারিবেন। কিন্তু অবস্থিতি কালে তাঁহাকে আশ্রমের নির্দ্দিষ্ট কাজ করিতে হইবে।

১৩। যে কেহ এই আশ্রমের ওয়ার্কার বা সহায় শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি তত্ত্বাবধায়কের নিকট স্বীয় নাম ঠিকানা ও অভিপ্রায় জানাইবেন; জানাইলে যে স্থলে যেরূপ ব্যবস্থা উচিত বোধ হয়, করা যাইবে। যখন কাহাকেও ওয়ার্কার বা সহায়রূপে গ্রহণ করা স্থির হইবে, তখন তদর্থ বিশেষ উপাসনার জন্য উপাসনার দিন স্থির করিয়া তাঁহাকে উক্ত বিশেষ উপাসনাতে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইবে। উক্ত বিশেষ উপাসনাক্ষেত্রে পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের সন্নিধানে তাঁহাকে ওয়ার্কার বা সহায় বলিয়া গ্রহণ করা হইবে। তৎপরে তিনি যদি ওয়ার্কার হন, তবে শ্রমে ও সাধনে প্রচারেও সেবাতে, সুখে ও দুঃখে আয়ে ও ব্যয়ে অপর ওয়ার্কারদিগের সহিত একীভূত হইয়া যাইবেন এবং যদি সহায় হন, তবে অপর সহায়দিগের সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ও কার্য্যসূত্রে আবদ্ধ হইবেন। যিনি ওয়ার্কার বা সহায়শ্রেণীভুক্ত হইবার অভিপ্রায় করিবেন, তিনি সে অভিপ্রায় তত্ত্বাবধায়কের গোচর করিবার পূর্ব্বে, বিশেষ প্রার্থনা ও আত্মপরীক্ষাতে কয়েকদিন যাপন করিবেন ও ঈশ্বরের আহ্বানধ্বনি শুনিতে প্রয়াসী হইবেন। যিনি সেই আহ্বানধ্বনি শুনিয়া অগ্রসর হইবেন, তিনিই দাঁড়াইতে পারিবেন, অপরের পক্ষে তাহা দুষ্কর।

১৪। যতদিন কোনও ভাবী ওয়ার্কারের আবেদন আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের বিচারাধীন থাকিবে, ততদিন তাঁহাকে আশ্রমের উপাসনায় ও কার্য্যে বিশেষভাবে যোগ দিতে হইবে।

ব্রাহ্ম সাধনাশ্রম
২১০।৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী
তত্ত্বাবধায়ক।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

মান্যবর

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিনীত নিবেদন,

(১) সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য; এবং বিবাহই গৃহস্থাশ্রমের প্রথম পদবিক্ষেপ।

সুতরাং বিবাহ বিষয়ে দুএকটী মনের কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আশা এই, এ সম্বন্ধে-ব্রাহ্মগণের অভিপ্রায়, আপনার পত্রিকাতে বিবৃত হইয়া, সম্ভব হইলে, এ গুরুতর বিষয়ে, সকলের বিশ্বাসের একতা সম্পাদিত হয়। আমার ধারণার স্থূল মর্ম্মমাত্রই নিম্নে প্রদত্ত হইল। এবং প্রয়োজন মতে, সবিস্তারে ও বিনীতভাবে আরও বলিবার ইচ্ছা রহিল।

(২) মানুষের আত্মা এক। তাহা কেবল সেই একমেবাদ্বিতীয়মে সমর্পিত হইলে, আত্মার শুদ্ধাচার। একাধিককে যদি সে স্পর্শ করে, তবে সে অশুচি হইল। এই জন্যই, এক সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ব্যতীত, কোন ব্যক্তি, সৃষ্ট বস্তু, বা গ্রন্থবিশেষের পূজা, বা তাহার প্রতি অযথা সম্মাননা, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ ভাব বলিয়া বিশ্বাস করি।

(৩) আত্মার পক্ষে স্পর্শনীয় প্রভু যেমন এক, শরীরের পক্ষেও ঠিক্ সেইরূপ বলিয়া প্রতীতি জন্মিয়াছে। সুতরাং নরনারীর শরীর একাধিককে অবলম্বন করিলে, পবিত্র ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের চক্ষে, তাহা পবিত্রতাচ্যুত হইল বলিয়া ধারণা হইয়াছে।

(৪) ভূমণ্ডলের বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রে এবিষয়ের স্পষ্টরূপ কোন বিধান আছে কিনা, অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন তাহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি না। কিন্তু বিবিধ জাতির আচার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাই, এক-স্ত্রী-এক-স্বামীর বন্দোবস্তই ধর্ম্ম জীবনের পক্ষে সঙ্গত।

(৫) এদেশের আর্য্যগণমধ্যে এই ভাব কতক পরিমাণে বিকশিত হইয়াছিল। সক্ষমের স্বার্থ-প্রাবল্যহেতু, পুরুষ একাধিকবার পত্নী গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু জনসমাজের শ্রেষ্ঠতর অর্দ্ধাংশকে "সাচ্চা" রাখিবার চেষ্টা তাঁহাদেরই। এবং এ কথা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, কতক পরিমাণে তাঁহারা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। প্রাচীন কালের স্ব-ইচ্ছাচালিত, নৃশংস কিন্তু মহান্ সতীদাহের কথা ছাড়িয়া দিলেও এমন সহস্র সহস্র সাধ্বী পতিপ্রাণা হিন্দুবিধবা এখনও আছেন, যাঁহারা ধ্যানেও এক ভিন্ন দ্বিতীয় পুরুষে জানেন নাই।

(৬) আমরা সেই হিন্দুগণের পরবর্ত্তী। পবিত্রতার পথে পূর্ব্ব পিতামহগণ যতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন, তাহার পর হইতে, আরও অধিকদূর অগ্রসর হওয়া, আমাদেরই পক্ষে সঙ্গত। স্ত্রীজাতিকে, অন্ততঃ শারীরিক পবিত্রতার পথে, স্থির রাখিবার উদ্যম তাঁহাদেরই। অপর অর্দ্ধাংশকে সেই অবস্থায় লইবার চেষ্টা পরবর্ত্তী আমাদিগেরই করণীয়। তবে বাল্য-বিধবা ও বাল্য-বিপত্নীকের কথা স্বতন্ত্র।

(৭) রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করিলেও, সে সকলের বর্ণনা মধ্যে তৎকালীন আচার ব্যবহারের এই ভাব দেখা যায়। বহুপত্নীক দশরথের দৃষ্টান্ত সত্বেও, তাঁহারই পুত্র রাম অলঙ্ঘ্য অনুরোধ ও অশেষ ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া, কোন মতেই দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করেন নাই।

(৮) বাইবেল্ গ্রন্থেও এবিষয়ে পরম রমণীয় কবিত্বপূর্ণ সঙ্কেত রহিয়াছে। পুরুষ একাকী যখন সেই মঙ্গলময়ের শুভপালনী ইচ্ছা পূর্ণ করিল না, তখন তাহারই এক অস্থি দ্বারা নারীর সৃষ্টি হইল।

(৯) বহুপত্নীক মুসলমানেরাও প্রথম বিবাহকে "সাদী", এই পবিত্র নাম প্রদান করেন। পরবর্ত্তী পত্নীগ্রহণ "নেকা", এই অশ্রেষ্ঠ নামে পরিচিত হইল। এখনও নেকা-পত্নী কোন শুভ অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ কাজে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

(১০) বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রারম্ভে এই পবিত্রতার প্রতি প্রবর্ত্তকগণের তীব্র দৃষ্টি ছিল। যখন পরবর্ত্তীদের দলপুষ্টির বাসনা বলবতী হইল, তখনই সেই পবিত্রতার চ্যুতি হইল।

(১১) ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কথা দূরে থাকুক, যে কোম্ত-শিষ্যগণ স্রষ্টার অস্তিত্ব, পরকাল, ও আত্মার অমরত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদেরও বিশ্বাস জীবনে একবারের অধিক বিবাহ নরনারীর পক্ষে পবিত্রতাচ্যুতি।

(১২) তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, অচঞ্চলচিত্তে এ নীতি-পালন রক্তমাংসের পক্ষে অতীব দুঃসাধ্য। কিন্তু ধর্ম্মোদ্দেশে, লোভ মোহ প্রভৃতি রিপুগণের কোন্‌টী বশীকরণই বা সুসাধ্য? নিতান্ত দুঃসাধ্য বলিয়া, সে আত্মসংযম কি ধর্ম্মজীবন গঠনপক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করি না? ইতি

কলিকাতা। ৫ই আষাঢ় ১৩০০ সন } অবনত শ্রীকেদারনাথ রায়।

ব্রাহ্মসমাজ।

শোক সংবাদ—আজ আমরা একটী গভীর শোকের সংবাদ ব্রাহ্মবন্ধুগণকে প্রদান করিতেছি। ব্রহ্মভক্ত বাবু পুণ্যদাপ্রসাদ সরকার আর ইহ জগতে নাই। গত ৬ই আষাঢ় তৃতীয় প্রহরের সময় বৰ্দ্ধমানে সেই বিশ্বাসী ভ্রাতা মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। গত তিন বৎসর হইতে তিনি ক্ষয়কাশ রোগে ভুগিতেছিলেন। রোগমুক্ত হওয়ার জন্য বায়ু পরিবর্ত্তন, দেশী এবং ডাক্তারী চিকিৎসা ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, ব্রাহ্মবন্ধুগণের যত্নে চিকিৎসাদির বিশেষ কোন ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু কিছুতেই কাল-রোগ হইতে তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিলেন না।

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা পুণ্যদাপ্রসাদের জলন্ত-বিশ্বাস, কর্ত্তব্যজ্ঞান, এবং সেবাময় জীবন আদর্শ স্থানীয়। তাঁহার জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মের সামঞ্জস্য হইয়াছিল। তিনি এক দিকে যেমন ঔষধের শিশি এবং পথ্য লইয়া রোগীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেন, তেমনি কবাট বন্ধ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। ঘোরতর ব্যারামের অবস্থাতেও তাঁহার মুখ বিষণ্ণ দেখা যায় নাই, কেহ তাঁহার কাতরোক্তি শোনে নাই। সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও শান্ত মূর্ত্তি। তিনি যাঁহার বাড়ীতে দুদিন বাস করিয়াছেন, যাঁহার সহিত দুদিন মিশিয়াছেন,

তিনিই তাঁহার দেবভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন, এবং শতমুখে তাঁহার চরিত্র ও ভগবদ্ভক্তির প্রশংসা করিয়াছেন।

কেহ কখনও তাঁহার মুখে নিরাশার কথা শোনেন নাই। ঈশ্বরকে দেখা যায় না, পাওয়া যায় না, ইত্যাদি কথা বলিলে তিনি দুঃখিত ও বিরক্ত হইতেন। তিনি কোন বন্ধুর নিকট স্পষ্ট বলিয়াছেন "আমি নিয়তই মাকে দেখিতে পাই, মার কথা শুনি, মার সহিত আমার যোগ হইয়া গিয়াছে।" ব্যায়ামের সময়ও তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ ধ্যান করিতেন।

ধার্ম্মিক লোকের ভার স্বয়ং পরমেশ্বর গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভক্ত পুণ্যদার জীবনে আমরা একথার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। আশাতীতরূপে তাঁহার চিকিৎসার জন্য শত শত টাকা নানা স্থানের ব্রাহ্মদিগের নিকট হইতে আসিয়াছে। সকলেই আগ্রহের সহিত তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং তাঁহাকে সাহায্য করিয়া সকলেই নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন।

তিনি উচ্চ অঙ্গের লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই; কিন্তু আধ্যাত্মিক গভীর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সংগীত বিদ্যায় তাঁহার অধিকার ছিল না, স্বাভাবিক স্বর ও তত মিষ্ট ছিল না, তান লয় ঠিক করিয়াও গাহিতে পারিতেন না; কিন্তু তিনি যখন ভাবে গদগদ হইয়া গান করিতেন, তখন বড়ই মধুর লাগিত, তেমন গান গাহিতে অনেকেই পারেন না। তিনি অনুরুদ্ধ হইয়া সমবেত উপাসনায় কখন কখন আচার্য্যের কার্য্য করিতেন; তাঁহার উপাসনায় উপাসকমণ্ডলীর প্রাণে এক নবভাবের সঞ্চার হইত।

জগতে পুণ্যদাপ্রসাদের শত্রু নাই। গ্রামের যে সকল লোক এক সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া পুণ্যদার সহিত বিশেষভাবে বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, পরিশেষে তাঁহারা পুণ্যদার চরিত্রের নিকট নত হইয়াছিলেন। যাঁহারা সাধু ভক্ত শত্রুগণও মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় তাঁহাদের নিকট অবনত হইয়া থাকে। পুণ্যদার জীবন ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে।

বাস্তবিক যেদিক দিয়াই দেখা যায়, সকল বিষয়েই পুণ্যদার জীবন পূর্ণতার দিকে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছিল। সেই উচ্চ শিক্ষাবিহীন, দরিদ্র, পল্লিগ্রামবাসী উৎপীড়িত, আমাদের দীনভ্রাতা স্বর্গে গমন করিয়াছেন, আমরা তাঁহার সেই পবিত্র স্নেহব্যঞ্জক মূর্ত্তি আর দেখিতে পাইব না; কিন্তু তিনি যে আদর্শজীবন রাখিয়া গিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজের যুবক-যুবতীগণ যেন তদনুসরণ করেন। বিশ্বাস, বৈরাগ্য সেবা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। এই মূলমন্ত্রসাধনে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন। পরমেশ্বর এই সাধন-পথে ব্রাহ্মসমাজকে দিন দিন অগ্রসর করুন।

ব্রাহ্ম-সাধনাশ্রম—অতি দূরস্থানবাসিনী একজন ব্রাহ্মমহিলা বাড়ীতে কয়েকটী বালকবালিকাকে পড়াইয়া মাসিক চারি টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। তিনি সেই টাকা মাসে মাসে শেল্‌টারে প্রেরণ করিবেন বলিয়া, সংকল্প করিয়াছেন। ইতিমধ্যে প্রথম মাসের টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার এই শুভ উদ্দেশ্যের জন্য আমরা তাঁহাকে বার বার ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সম্প্রতি কোন ব্রাহ্মবন্ধু শেল্‌টারবাসিদিগের জন্য প্রায় ৯৲ টাকা মূল্যের আম্র কাঁটাল প্রভৃতি ফল প্রেরণ করিয়াছেন। এরূপ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, অনেকে শেল্‌টারের সাহায্য করিতেছেন। নানা কারণে দাতাদিগের নাম প্রকাশিত হয় না। প্রভু পরমেশ্বর আশ্চর্য্য উপায়ে শেল্‌টারকে রক্ষা করিতেছেন। গত জানুয়ারী মাস হইতে এই পর্য্যন্ত, এই পাঁচ মাসে শেল্‌টারে ১১৮৮॥৵৫ ব্যয় হইয়াছে। পরমেশ্বরের চরণতলে প্রণত হইয়া আমরা আমাদের সাহায্য-দাতাদিগকে বারম্বার ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

জন্মদিন—কলিকাতার বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক তাঁহার পুত্র ও কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের কুষ্ঠাশ্রমের প্রায় ১৫০ জন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছেন। আমরা গোপালবাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ব্রাহ্ম-সমিতি—বরাহনগরের বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় একটী ব্রাহ্ম-সমিতি গঠন করিতে সংকল্প করিয়াছেন। আপাততঃ মাসে একবার সমিতির অধিবেশন হইবে। তাহাতে মনোনীত কতিপয় ব্রাহ্ম নিমন্ত্রিত হইবেন। তথায় উপাসনা, আলোচনা এবং প্রীতিভোজন হইবে। এই সমিতির ব্যয়ের জন্য শশিপদ বাবু সম্প্রতি ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং সমিতি স্থাপন উপলক্ষে সাঃ ব্রাঃ সমাজে ৫৲ ও সাধনাশ্রমে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। শশিপদ বাবুর এই সাধুসংকল্পের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

উৎসব—গত ২৪শে ও ২৫শে জুন ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হইয়াছে। ২৪শে জুন শনিবার রাত্রে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন, তৎপরদিন প্রাতে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে বাবু হরিমোহন ঘোষাল কথকতা করেন। তৎপর বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা করেন, এবং রাত্রে বাবু কেদারনাথ রায় উপাসনা করেন। কলিকাতা হইতে যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া উৎসবে গিয়াছিলেন, ভবানীপুরের ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাঁহাদিগকে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

বাগেরহাট হইতে বাবু হরিনাথ দাস লিখিয়াছেন।

"পরমেশ্বরের কৃপায় নিম্নলিখিত প্রণালীতে বাগেরহাট ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে বরিশাল হইতে বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এবং উৎসবের শেষভাগে কলিকাতা হইতে বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী আগমন করিয়াছিলেন।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার অপরাহ্ন ৭ ঘটিকার সময়ে উপাসনালয়ে উৎসবের উদ্বোধন সূচক উপাসনা হয়। বাবু হরিনাথ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। স্থানীয় মুন্সেফ বাবু সিতিকণ্ঠ মল্লিক "উৎসবের জন্য বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হওয়া" সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার প্রাতে বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। "এই উৎসবে বাহিরের আড়ম্বর ও উচ্ছ্বাসের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, আত্মাতে বিশ্বাস; সত্যনিষ্ঠা প্রেম ও পবিত্রতা লাভ হইতেছে কি না সেই দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হইবে" এই মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার পরে কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়। সন্ধ্যার পরে বাবু সিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এবং পিরোজপুরের বাবু আশুতোষ মিত্র মহাশয় বিশেষভাবে প্রার্থনা করেন।

২০শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রাতে বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং গীতার একটী শ্লোক অবলম্বন করিয়া উপদেশ দেন।

অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার পরে উপাসনালয় হইতে নগরকীর্ত্তন বাহির হইয়া সন্ধ্যার পরে উপাসনালয়ে সমাগত হয়। অদ্যকার কীর্ত্তনে ভগবানের বিশেষ করুণা প্রকাশ পাইয়াছিল। কীর্ত্তনের পরে বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী "ধর্ম্ম ছেড়ে শান্তি কোথায়?" এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন।

২১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার বাবু নবীনচন্দ্র সিংহ আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়। সন্ধ্যার সময় বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী দেশের বর্ত্তমান ধর্ম্মের অবস্থা এবং আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন।"

খাসিয়া মিশন—খাসিয়া মিশন সম্বন্ধে হাইকোর্টের জজ মাননীয় চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন;—

"গত অক্টোবর মাসে যখন আমি শিলঙ্গে ছিলাম, সেই সময়ে খাসিয়াজাতির কল্যাণের জন্য বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তীর তত্ত্বাবধানাধীনে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মপ্রচার-আশ্রম দর্শন করিতে যাই। তথায় যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাতে বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। দেখিলাম তথায় খাসিয়া ভাষায় লিখিত ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ কয়েক খানি পুস্তক এবং বাঙ্গালা সুরে খাসিয়া ভাষায় রচিত ধর্ম্মসঙ্গীতপুস্তক রহিয়াছে এবং খাসিয়া ভাষায় উপাসনাদি হইতেছে। এই মিশন অতি সাধু কার্য্য করিতেছেন। শুনিলাম সম্প্রতি চেরাপুঞ্জীতে একটী শাখাআশ্রম খোলা হইয়াছে। আমি এই মিশনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।"

আসাম গবর্ণমেণ্ট খাসিয়া মিশন সম্বন্ধে গত সেন্‌সস্ রিপোর্টে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন;—

"খাসিয়া জাতির মধ্যে একটী ক্ষুদ্র ব্রাহ্মমিশন কার্য্য করিতেছে, যাহা বেশ কৃতকার্য্য হইতেছে বলিয়া শুনা যায়।"

নামকরণ—গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ শিলঙ্গের বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ সেনের সপ্তম সন্তান ও তৃতীয় পুত্রের শুভ নামকরণ ব্রাহ্মধর্ম্ম-পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। বালকের নাম সুধীন্দ্রকুমার রাখা হইয়াছে।

দান—আসামের অন্তর্গত নওগাঁয়ের বাবু রামদুর্লভ মজুমদার তাঁহার মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে খাসিয়া মিশনে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা দাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ব্রাহ্মসম্মিলনী—আগামী রবিবার ২রা জুলাই শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ কর মহাশয়ের উল্টাডিঙ্গিস্থ উদ্যান-ভবনে সম্মিলনীর মাসিক অধিবেশন হইবে। প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় উপাসনা হইবে। সম্মিলনীর সভ্যগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৪ই জুলাই অপরাহ্ন ৬½ ঘটিকার সময় ১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ সিটিকলেজভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব।

২। বাবু বাণীকান্ত রায় চৌধুরী প্রস্তাব করিবেন;—

(ক) সমাজের বর্ত্তমান নিয়ম সকল বিচারিত ও সংশোধিত হইয়া গৃহীত হইবার বন্দোবস্ত করা হউক।

(খ) সমাজের ৪০ নিয়মের ২য়, ৩য়, ৪র্থ, প্যারা পরিবর্ত্তিত হউক।

৩। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১৫ই জুন ১৮৯৩

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
সম্পাদক।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

৭ম সংখ্যা।
১৬শ ভাগ।

১লা শ্রাবণ, রবিবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

সহিষ্ণু বিশ্বাস।

অপরে দেখাই পথ, নিজে পথহারা;
অপরে সাহস দিই, নিজে ভয়ে সারা;
অপরে দেখিয়া মোরে কোমর বাঁধিছে জোরে
আমি যে অতলে ডুবি না দেখি কিনারা;
আমি যে হারায়ে ফেলি মোর ধ্রুব-তারা।

নির্ভর নির্ভর বলি; যখন হুঙ্কারি
আসে বায়ু, ঘন ঘটা চৌদিক বিস্তারি
ঢাকে যবে ত্রিসংসারে, ডুবে ধরা অন্ধকারে,
কেন গো নির্ভরে প্রাণ বাঁধিতে না পারি?
কেন গো তরাসে কাঁপি, ফেলি অশ্রুবারি?

আলোরি ঈশ্বর কি গো? নন কি আঁধারে?
তবে কেন ভয়-ভীত আমি এ প্রকারে?
বিরস কেন গো প্রাণ? বদন কেন বা ম্লান?
তরাসে হারায়ে পথ নিরাশা-বিকারে
কেন গো একাকী তবে দেখি আপনারে?

জাগিলে বিশ্বাস, দেখি প্রেম আলিঙ্গনে
আলিঙ্গিত এ জীবন, সজনে নির্জ্জনে
এক সত্তা আছে ঘিরে, এক হস্ত আছে শিরে,
একেরি মঙ্গল বিধি অলক্ষ্য যতনে
শত দুর্ব্বলতা মাঝে রাখিছে এ জনে।

কোথা হতে আসে মেঘ ডুবায় বিশ্বাস?
সাহস পলায় কেন? কেন জাগে ত্রাস?
আশঙ্কা দুশ্চিন্তা ভারে ভেঙ্গে পড়ি এ প্রকারে,
শরীরের স্বাস্থ্য টুটে; পরাণে হতাশ;
অন্তরে পশিলে শূন্য, বাহিরে আকাশ?;

একি দশা! পুনঃ দেখি পেয়ে দুঃসময়
অন্তরে রিপুর দ্বন্দ্ব জাগে গো দুর্জ্জয়,
কঠিন প্রতিজ্ঞা ডোরে, বাঁধিব সে সবে জোরে,
শ্রান্ত দেহ ক্লান্ত মন পরাভূত হয়;
হেরে যাই, ক্ষোভে দুঃখে প্রাণ বিষময়।

বুঝেছি সংগ্রাম বিনা না হয় সাধনা;
আঁধার না পেলে আলো চাহে কোন্ জনা?
যেবা সয় সেই রয়; আসে তার সুসময়;
ওই যে গর্জ্জন, উহা করিছে ঘোষণা
আসিবে কৃপার ধারা, তাহারি সূচনা।

সহিষ্ণু বিশ্বাস তবে চাহি তব দ্বারে,
হউক গর্জ্জন ধরা, ডুবাক আঁধারে,
ও চরণে মতি রাখি, আমি যেন পড়ে থাকি
অন্ধ মার্জ্জারের শিশু থাকে যে প্রকারে,
না দেখি, উদ্দেশে যেন ডাকিগো তোমারে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

লাভ ও প্রদর্শন—শ্রীমদ্ভাগবতে এরূপ লিখিত আছে যে,মহর্ষি বেদব্যাস লোক-হিতার্থ বিশাল ভারত গ্রন্থ ও অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়া, অবশেষে এই চিন্তাতে নিমগ্ন হইলেন—"আমি তো লোকের শান্তি লাভের উপায় বিধানার্থ বহুশাস্ত্র রচনা করিলাম, কিন্তু আমার প্রাণে শান্তি হইল না কেন?" এই বলিয়া তিনি নির্জ্জনে বসিয়া ক্ষোভ করিতেছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্যাসকে খিন্ন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ব্যাস আনুপূর্ব্বিক সমুদায় কারণ বর্ণন করিলেন। তখন নারদ তাঁহাকে ভক্তিতত্ত্বের অনুসন্ধান করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। ব্যাসের মনে যে প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছিল, তদনুরূপ প্রশ্ন আমাদের সকলেরই মনে সময়ে সময়ে উত্থিত হওয়া উচিত। মানবের মুক্তির পথ বলিয়া যে পথ নির্দ্দেশ করিতেছি, সে পথ অবলম্বন করিয়া আমরা মুক্তির অমৃত রস আস্বাদন করিতে পারিতেছি কি না? অপরের দুঃখাগ্নি যাহাতে নির্ব্বাণ হয়,তাহার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি,কিন্তু আপনার হৃদয়ের দুঃখাগ্নি নির্ব্বাণ হইতেছে কি না? যে ঔষধে অপরের রোগ শান্তি হইবে বলিয়া আশা করিতেছি, তাহাতে নিজের রোগ শান্তির লক্ষণ দেখিতেছি কি না? এরূপ প্রশ্নের দ্বারা বারংবার আত্মপরীক্ষা করায় বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের

চঞ্চল অসার ও বহির্মুখীন চিত্ত, সর্ব্বদাই দেখাইতে, শুনাইতে ব্যগ্র হয়; লাভ অপেক্ষা প্রদর্শন বিষয়ে অধিক মনোযোগী হয়। কিন্তু এ জগতে যাঁহারা যে কোনও বিষয়ে গভীরতা ও সত্যতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের গতি বিপরীত দিকে দৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা প্রদর্শনকে ভুলিয়া গিয়া লাভের জন্যই ব্যগ্র হইয়াছেন। বিদ্যা বিষয়ে দেখি, তাঁহারাই যথার্থ বিদ্বান হইয়াছেন, যাঁহারা লোকে কি হইলে সন্তুষ্ট হয়, এ প্রশ্ন না করিয়া এ বিষয়টার প্রকৃত-তত্ত্ব কি, এই প্রশ্নের দ্বারাই আপনাদিগকে সর্ব্বদা ব্যস্ত রাখিয়াছেন। চরিত্র সম্বন্ধেও দেখি, যাহাদের দৃষ্টি কেবল মানব-চক্ষুর উপরে, তাহারা সারবান চরিত্র লাভ করিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা মানবচক্ষুকে ভুলিয়া গিয়া ধর্ম্মের জন্য, সাধুতার জন্যই, আত্মশাসন ও আত্মোন্নতি বিধানে মনোযোগী, তাঁহারাই সত্য-ভূমির উপরে স্থাপিত সুদৃঢ় চরিত্র লাভ করিয়া থাকেন। জন-সমাজের, বিশেষতঃ সংবাদপত্রের ক্রীড়া-পুত্তলিকা স্বরূপ সভ্য-সমাজের এ প্রকার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, যে যত পরচ্ছন্দানুবর্ত্তী, বিবেক-বিহীন ও অসার হইবে সেই তত লোকানুগ্রহের অংশী হইবে, আর যে যত সারবান, নিষ্ঠাবান ও বিবেকপরায়ণ হইবে, সেই তত জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভে অসমর্থ হইবে। বোধ হয় ইহাও বিধাতার মঙ্গল বিধি, প্রকৃত সাধুতার ন্যায় কোমল আধ্যাত্মিক বস্তুকে তিনি অনেক সময়ে লোক চক্ষের অগোচরেই রক্ষা করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক লাভ করিবার প্রবৃত্তি অপেক্ষা প্রদর্শনের প্রবৃত্তিটা কোন বিভাগেই ভাল নহে। ধর্ম্মসাধন বিষয়ে ইহা অতীব নিন্দনীয় ও চরিত্রের অসারতা উৎপাদক। যতবার আমাদের চিত্ত চতুর্দ্দিকে অসার উত্তেজনার মধ্যে পড়িয়া বহির্মুখীন ও প্রদর্শনপ্রিয় হইয়া পড়িবে, ততবারই আমাদিগকে আত্মপরীক্ষা দ্বারা সেই চিত্তকে অন্তর্মুখীন করিয়া লইতে হইবে। সত্য পদার্থ লাভ করিতে পারিলে তাহা প্রদর্শনের জন্য ব্যগ্র হইতে হইবে না, তাহা আপনি আপনাকে প্রচার করিবে। জনসমাজের কোলাহলের মধ্যে ধর্ম্মসাধন করিতে গিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদাই সংগ্রাম করিতে হইতেছে; যতবার আমরা সত্যের সন্নিধানে যাইতে চাহিতেছি, ততবারই অসারতাতে আমাদের চিত্তকে যেন বহির্মুখীন করিয়া দিতেছে। এই সংগ্রামে ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

ব্যাধির লক্ষণ—ঈশ্বরের প্রশংসা শুনিতে ভাল লাগে, না নিজের প্রশংসা শুনিতে ভাল লাগে? আত্মচিন্তা ভাল লাগে না পরের চিন্তা ভাল লাগে? নিজের দোষ বলিতে ভাল লাগে, না পরের দোষ বলিতে ভাল লাগে? নিজের সমাজ ভাল লাগে, কি অন্য দলে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়? তুমি ব্রাহ্ম, আপনাকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে মনে আনন্দ ও উৎসাহ হয়, না লোকে পাছে তোমাকে ব্রাহ্ম বলিয়া জানে এই ভয়ে সর্ব্বদা ত্রাসযুক্ত? তুমি যেখানে যাও সর্ব্বাগ্রে কি ব্রাহ্মদের ও ব্রাহ্মসমাজের অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়, না সে সকল হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা হয়? তোমার পদের সম্মান রক্ষা করিতে ভাল লাগে, না তোমার ধর্ম্মসমাজের সম্মান বৃদ্ধি করিতে ভাল লাগে? ইত্যাদি প্রশ্নগুলি সম্মুখে রাখিয়া সর্ব্বদাই আত্ম-পরীক্ষা করা ভাল। এখন দেখিতেছি, অনেকে আপনাকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন, তাঁহারা যখন কলিকাতা সহরে বাস করেন, তখন খুব উৎসাহী ব্রাহ্ম থাকেন; কিন্তু বাহিরে গেলে আর ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস হয় না। এ সহরে তিনি ব্রাহ্ম আছেন, আর এক সহরে বদলি হইলেন ত আর ব্রাহ্ম নাই, ইহার কারণ কি? যাঁহারা এরূপ করেন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন, ব্রাহ্মদের চরিত্র লোক-সমাজে আদরের বস্তু না হইয়া ঘৃণার বস্তু হইয়াছে, তাই তাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন; কেহ কেহ বলেন, আমাদের চরিত্র ব্রাহ্ম চরিত্র নয় আর কি বলিয়া ব্রাহ্ম নামে পরিচয় দিই। কিন্তু প্রশ্ন এই, চিরদিনই ত উক্ত উভয় কারণ বিদ্যমান, তবে পূর্ব্বেই বা কেন তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে এত আগ্রহান্বিত ছিলেন, আর এখনই বা কেন তাহা নাই? এ বিষয়ে চিন্তা করিলে ইহাই মনে হয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম যে তাঁহাদের পরিত্রাণের জন্য আসিয়াছে এবং এই ধর্ম্ম গ্রহণ করাই যে গৌরবের বিষয় এ বিশ্বাস তাঁহাদের নাই। ঈশ্বর জীবকে উদ্ধারের জন্য যে এই নূতন ধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না। এই বিশ্বাসহীনতা হইতেই তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। যখন এই মূল ভিত্তি বিশ্বাস টলিল, তখন নামে ব্রাহ্ম থাকিলেও প্রকৃত ব্রাহ্মত্ব থাকে না, তখন পদের চিন্তাই প্রবল হয়, কাজেই ব্রাহ্মসমাজের গৌরব বৃদ্ধি অপেক্ষা নিজের পদ গৌরবই শ্রেষ্ঠ মনে হয়। এই শোচনীয় অবস্থায় নিজের সমাজের কি দলের অনুসন্ধান করা দূরে থাকুক তাহা হইতে পলাইয়া দূরে দূরে থাকিতেই ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। তখন নিজের দোষ বলিতে কি দেখিতে আর ইচ্ছা থাকে না, অন্যের দোষ বলিতে ও দেখিতেই ভাল লাগে। তখন আত্মচিন্তা অপেক্ষা পর চিন্তাই ভাল লাগে, অবশেষে মানুষ এমন স্থানে গিয়া দাঁড়ায় যে, ঈশ্বরের প্রশংসা অপেক্ষা নিজের প্রশংসা শুনিতেই মিষ্ট লাগে।

আর যদি অন্য ব্রাহ্মদিগের জীবনের দুর্গতি দেখিয়া ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা হইতেছে এরূপ হয়; তাহা হইলেও বক্তব্য এই, তুমি নিজ চরিত্রকে কেন এইরূপ কর না, যাহাতে তোমার গুণে তাহাদেরও গৌরব বৃদ্ধি হয়। খ্রীষ্টান-দিগের মধ্যে কি অপরাধী দুষ্ক্রিয়ান্বিত লোক নাই? তথাপি খ্রীষ্টান নামের এত গৌরব কেন? বহুসংখ্যক খ্রীষ্টীয় পুরুষ ও রমণীর উৎকৃষ্ট চরিত্রের গুণে কি নহে? এস তুমি আমি ব্যক্তিগত ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনে সাধন করি, মনুষ্যত্বের আদর্শকে জীবনে এরূপভাবে অর্জ্জন করি, যাহাতে আমাদের জীবনে প্রভু পরমেশ্বরের নাম ও তাঁহার সত্য ধর্ম্ম গৌরবান্বিত হইবে। যাহার বুদ্ধি এ পথে না গিয়া অন্য পথে যায়, তাহার ভিতরে ভয়ানক ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে বুঝিতে হইবে।

বিশুদ্ধ জ্ঞানই বিমল ভক্তির ভিত্তি—অনেক সময় দেখা যায়, যাঁহারা ভক্তির প্রয়োজনীয়তা অধিকতররূপে প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, এবং লোকে ভক্তি-পথ অধিক পরিমাণে আশ্রয় করে এরূপ ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনেক সময় জ্ঞান বা বিশুদ্ধ মতকে শুষ্ক বালুকারাশি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, এবং ভক্তিকেও ঘোলা জল প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বর্ণন করেন। তাঁহাদের উক্তি সকল শুনিলে মনে হয় যেন জ্ঞান বা বিশুদ্ধ মতের সহিত শুষ্কতার একটা অচ্ছেদ্য নিত্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। জ্ঞান বা বিশুদ্ধ মতাবলম্বীও যে সরস হইতে পারে; সে পথে চলিলেও যে লোকের পিপাসার শান্তি হইতে পারে; তাঁহাদের উক্তি শ্রবণ করিলে এরূপ বোধ হয় না। পক্ষান্তরে যে ভক্তির আবশ্যকতা তাঁহারা অধিক পরিমাণে সমর্থন ও প্রদর্শন করিতে চাহেন, তাহাকেও ঘোলা জল প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করাতে সেই ভক্তিরও যথেষ্ট নিন্দা করা হয়। তাঁহাদের উক্তি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভক্তি আর বিশুদ্ধ হইতে পারে না। ভক্তির সহিত ঘোলা কথাটার যেন একটা অচ্ছেদ্য নিত্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। এইরূপ ভক্তি সমর্থনকারী এবং জ্ঞান ও বিশুদ্ধ মতের নিন্দাকারিগণ অজ্ঞাতসারে বিষম অনিষ্টের সূত্রপাত করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, তাঁহাদের উক্তি দ্বারা জ্ঞান বা ভক্তির কোন দিকে যাইতেই লোকের প্রবৃত্তি হয় না। বিশুদ্ধ জ্ঞান ও মত যদি শুষ্ক বালুকার সহিত তুলিত হয় এবং ভক্তিও যদি কেবল ঘোলা জলই হয়, তবে এই দুই দিকের কোন দিকেই লোকের যাইবার প্রবৃত্তি হইবে না। শুষ্ক বালুকাতে যে লোকের পিপাসা মিটে না, তাহা কে না জানে? কিন্তু জ্ঞান বা বিশুদ্ধ মত কি নিরবচ্ছিন্ন শুষ্ক বালুকা নামেই অভিহিত হইবার উপযুক্ত? তবে ত জ্ঞান মানবের পক্ষে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় বস্তু। সাধ করিয়া কে কতকগুলি শুষ্ক বালুকা গলাধঃকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে? জ্ঞানের সহিত শুষ্কতার যে একটা নিত্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা আছে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না; বরং ইহাই সত্য যে প্রকৃত জ্ঞানই বিশুদ্ধ সুমিষ্ট ও পুষ্টিকর এবং তাহাই হৃদয়কে সরস, সবল ও উন্নত করে, এবং বিমল জ্ঞানই আত্মাকে চিরশান্তি দিয়া থাকে। অন্যথা লোকে কাল্পনিক ও ক্ষণিক শান্তিপ্রদ একটা অবস্থার সহিত পরিচিত হইতে পারে বটে, এবং যাহাকে ঘোলা জল নামে অভিহিত করা হয়, সেই অবিশুদ্ধ ভক্তি জলের আস্বাদন পাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা কখনই প্রাণের স্বাস্থ্য লাভের উপায় নহে। অস্বাস্থ্যকর পানীয় জল পান করিয়া পিপাসার হাত এড়াইয়া কোন মতে প্রাণকে সান্ত্বনা দিবার প্রবৃত্তি যাহাদের আছে, তাহারা কখনই দূরদর্শী বুদ্ধিমান নামে পরিচিত হইবার উপযুক্ত নহেন। উপযুক্ত চিকিৎসক বিকৃত পিপাসান্বিত রোগীকে কখনই তাহার প্রার্থনীয় অবিশুদ্ধ জল প্রদান করেন না। কিন্তু যাহাতে বিশুদ্ধ প্রণালীতে উপযুক্ত ঔষধ সেবনে তাহার পিপাসার নিবৃত্তি হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং তাহাই কল্যাণকর। স্বাস্থ্যলাভ ও পিপাসার প্রকৃত শান্তি সেই উপায়েই হয়। আপাততঃ শান্তি বা প্রাণের সান্ত্বনা লাভের দিকে ক্ষীণদৃষ্টি অল্প জ্ঞান লোকেরই গতি হইয়া থাকে। পিপাসার সময় তাহারা যে কোন জল পাইবে, তাহাই পান করিবে, এরূপ ভয় দেখাইয়া লাভ কি এবং তাহাতে উৎসাহ দিয়াই বা ফল কি? তাহা ত চিরদিনই হইয়া আসিতেছে। লোকে ত নানা প্রকারে ঘোলা জলই পান করিতেছে। কিন্তু তাহা কি সুবুদ্ধির কাজ হইতেছে? না তাহা দ্বারা পরিণামে স্বাস্থ্য লাভের কোন উপায় হইতেছে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সেরূপ পথ অবলম্বন করা কখনই উচিত নয়, যাহা কেবলই আরামপ্রদ, কিন্তু স্বাস্থ্যকর নয়। যে কোন উপায়ে একমাত্র শান্তি লাভ বা পিপাসার নিবৃত্তিই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আত্মার প্রকৃত স্বাস্থ্য ও কল্যাণ লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য যদি নিরন্তর শুষ্ক মরুভূমির উপর দিয়াই যাইতে হয় বা শুষ্ক বালুকা রাশি খুঁড়িয়া খুঁড়িয়াই বিশুদ্ধ জল পাইতে হয়, তাহাই কি কর্ত্তব্য নহে? এবিষয়ে চাতকের দৃষ্টান্তই আমাদের অনুকরণীয়। সে পিপাসায় প্রাণ হারাইবে, তথাপি মুখ নিচু করিয়া জলপান করিবে না। নির্ম্মল বৃষ্টিধারাতেই তাহার পরিতৃপ্তি। আমাদের উপদেষ্টাগণের সেই চেষ্টা করাই উচিত যে যাহাতে লোকের সেই বিশুদ্ধ পানীয় জলের অন্বেষণে প্রবৃত্তি হয়; তাহার পরিবর্ত্তে যদি তাঁহারা লোকে ঘোলা জল খাইবে বলিয়া ভয়-প্রদর্শন করেন, তাহাতে কি ফল? লোকে ত ঘোলাজল খাইয়া আসিতেছে এবং অসুস্থও হইতেছে। অসুস্থ হইয়া পিপাসা নিবৃত্তি করিয়া কি লাভ? ইহাই প্রার্থনীয় যে যাহাতে লোকে বিশুদ্ধ জল প্রাপ্ত হয় এবং তাহার জন্য চেষ্টা পরায়ণ হয়, তাহারই জন্য উৎসাহিত করা, পথ প্রদর্শন করা। নতুবা বিশুদ্ধ মতকে নিন্দা করিয়া তাহাকে শুষ্ক বালুকা নামে অভিহিত করিয়া কিছুই লাভ নাই। কোন উদ্দেশ্যই তাহাতে সিদ্ধ হইবে না। তাহাতে না লোকের বিশুদ্ধ মতের দিকে যাইবার জন্য প্রবৃত্তি হইবে, না ভক্তি পথ আশ্রয় করিতে (যাহাকে ঘোলা জল নামে অভিহিত করা হয়) প্রবৃত্তি হইবে। আমাদিগকে ইহাই দেখাইতে হইবে যে বিশুদ্ধ মতের সহিত শুষ্কতার কোন ঘনিষ্ট অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নাই। এবং ভক্তির সহিত ও আবিলতার কোন নিত্য অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নাই। এবং সর্ব্বদা এই ভাবেই লোককে উৎসাহিত করিতে হইবে যে বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথেই চলিতে হইবে। তাহাতেই শান্তিপ্রদ বিমল ভক্তি লাভের সম্ভাবনা আছে, অন্যথা আপাততঃ শান্তি পাইলেও রোগের হাত হইতে উদ্ধারের উপায় নাই।

প্রচারক দল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা—ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য বিধাতা ভারত-ক্ষেত্রের জমি প্রস্তুত করিতেছেন, এখন প্রচারক চাই। ভারতের চারিদিকে দলে দলে প্রচারক চাহিতেছে। পঞ্জাবের ভ্রাতাগণ তথায় এক ব্রাহ্ম-সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। এসময় উপযুক্ত বহু প্রচারকের আবশ্যক। প্রচারকের যেরূপ অভাব দেখা যাইতেছে এবং চারিদিক হইতে প্রচারকের জন্য যেরূপ চিটির উপর চিটি আসিতেছে, তাহাতে বোধ হয় অচিরেই প্রভু পরমেশ্বর এক মহাকার্য্য সাধন করিবেন। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ.

প্রস্তুত হউন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ আপনাদিগকে কি বলিতেছেন, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন;—

"যাহারা অদ্যাপি ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় না লইয়াছে, তাহাদিগকে তাঁহার আশ্রয়ে আনিতে সাধ্যানুসারে যত্নবান্ হও; যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত প্রচারিত হয়, তাহাতে শরীর মন সমর্পণ কর। কেহ প্রবক্তা হইয়া, চুম্বকানুকারী অগ্নিময় বাক্য সকল নিঃশ্বসিত করিয়া সকলের চিত্তকে আকর্ষণ কর, কেহ বা সুনিপুণ গ্রন্থকার হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল সকলের মনে মুদ্রিত কর এবং কেহ বা পর্য্যটক পরিব্রাজক হইয়া ঋষিদিগের ন্যায় সামান্য জীবন যাপন করতঃ ঈশ্বরের নিমিত্তে সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় পতাকা উড্ডীন কর, ইহার কোমল ভাব সকল সকলের হৃদয়ে রোপিত কর। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সময় এই আরম্ভ হইয়াছে; এই সময়ে আমরা যেন সকলের সঙ্গে যোগ দিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে যত্ন করি। আমাদের এই ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইবে।"

বহু বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা এখনও সম্পূর্ণভাবে কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কার্য্যক্ষেত্র বিশাল বিস্তৃত। বৌদ্ধগণ পুনরুত্থিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিতেছেন, মুসলমানগণ জাপানে রাজত্ব বিস্তৃত করিতেছেন; ইংলণ্ডের সুসভ্য দেশেও শিষ্যদল বৃদ্ধি করিতেছেন, উপধর্ম্মের সেবকগণ ব্যাঘ্র ভল্লুকের মুখে প্রাণ দিতে যাইতেছেন; দুরন্ত বর্ব্বর মানবের হস্তে প্রাণ হারাইতেছেন; আর ব্রাহ্মগণ নিজের দেশেই হীন মলিন দুর্ব্বল হইয়া রহিয়াছেন; সত্য ধর্ম্মের আলোক পাইয়াও তাহার জন্য জীবন মন সমর্পণ করিতে সাহসী হইতেছেন না। এ কলঙ্ক কতদিন ব্রাহ্মগণ সহিবেন?

লক্ষণ জানা এবং অবস্থালাভ—এক ব্যক্তি ব্যাকুলতা কাহাকে বলে তাহা জানিবার জন্য জিজ্ঞাসু হইলে, উত্তরদাতা তাহাকে ভাষায় কিছু না বলিয়া তাহার হাত পা ধরিয়া পুকুরের জলে নিক্ষেপ করিলেন। সে জলে পড়িয়া, অতি ব্যস্ততার সহিত উপরে আসিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিল। নানাপ্রকারে তাহার ব্যস্ততা প্রকাশ পাইতে লাগিল, এবং কতক্ষণ পরে উপরে উঠিল। উত্তরদাতা কহিলেন, "ব্যাকুলতার অর্থ এই।" তুমি জল হইতে উপরে আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছ। ইহাই ব্যাকুলতার অবস্থা। তখন সে ব্যাকুলতা জিনিসটা কি অতি সহজেই বুঝিতে পারিল। অনেকে এইরূপ ব্যাকুলতার অবস্থা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র না হইয়া ব্যাকুলতা কাহাকে বলে, তাহার লক্ষণ জানিবার জন্য ব্যগ্র হয়। কিন্তু ব্যাকুলতার লক্ষণ জানাপেক্ষা ব্যাকুল হওয়া যেমন আবশ্যক, তেমনি ঈশ্বর-দর্শন কাহাকে বলে তাহার লক্ষণ জানা অপেক্ষা, ঈশ্বর-দর্শনই প্রয়োজনীয়। কাহারও জীবনে সৌভাগ্যক্রমে যদি ঈশ্বর-দর্শন লাভ হয়, তাহার কি ঈশ্বর-দর্শনের লক্ষণ জানা নাই, বলিয়া ঈশ্বরকে চিনিয়া লইবার অসুবিধা ঘটে? এ কথা কেহই স্বীকার করিবেন না। কারণ ঈশ্বর-দর্শন এমন ব্যাপার তাহা জীবনে ঘটিলে প্রাণ নিজেই তাহা বুঝিতে পারিবে। জ্যামিতির সংজ্ঞা জানা না থাকিলে কোন একটা ক্ষেত্রের নাম কি তাহা হয় ত কেহ না বলিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর-দর্শন কি সেরূপ ব্যাপার? ঈশ্বর-দর্শন ঘটিলে লোকের আর লক্ষণ জানিবার অপেক্ষা থাকে না। যতক্ষণ সেরূপ সন্দেহ থাকে, যতক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া মাথা চুলকাইয়া ঈশ্বর দর্শন হইয়াছে কি না, তাহা বুঝিতে হয় বা লক্ষণের সহিত মিলাইয়া লইবার অবস্থা থাকে, ততক্ষণ বুঝিতে হইবে যে, ঈশ্বর-দর্শন লাভ হয় নাই। সমুদ্র গমনার্থী কোন ব্যক্তি ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া যদি নিদ্রিত হয় এবং তাহার জাগ্রত হইবার পূর্ব্বেই যদি ষ্টীমার সমুদ্রে উপস্থিত হয়, তবে সে ব্যক্তি জাগ্রত হইয়া কাহারও নিকট প্রশ্ন না করিয়াই বুঝিতে পারে যে ষ্টীমার সমুদ্রে উপস্থিত হইয়াছে। অথবা যে ব্যক্তি কখনও পাহাড় দেখে নাই, সে যদি রেল গাড়ীতে যাইতে যাইতে হঠাৎ কোন পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন কাহারও নিকট হইতে জানিবার পূর্ব্বেই সে বুঝিতে পারে যে যাহা দেখিতেছে তাহা পাহাড়। এইরূপ বিশেষ বিশেষ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, যাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়, কাহারও নিকট জিজ্ঞাসার আবশ্যকতা থাকে না। ঈশ্বর-দর্শনও এরূপ ব্যাপার যে, তাহা বুঝিবার জন্য কাহারও নিকট জানিবার অপেক্ষা করিতে হয় না। ঈশ্বর-দর্শন হইলেই জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটিবে। প্রাণে বিশেষ অবস্থা সমাগত হইবে। গঙ্গাস্নান করিলে পাপ যায়, কিন্তু গঙ্গাস্নানের পরেও যদি ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিতে হয়, যে পাপ গেল কি না, তাহা হইলে গঙ্গাস্নানে পাপ যায় এ কথার যেমন কোন মূল্য থাকে না, অথবা যিশুখ্রীষ্টে বিশ্বাসী হইয়া পরিত্রাণ পাইলাম কি না তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিতে হইলে, সেই কথার যেমন কোন মূল্য থাকে না, তেমনি ঈশ্বর-দর্শন হইল কিনা তাহা যদি লক্ষণের সহিত মিলাইয়া বুঝিতে হয়, বা মনে কোনরূপ সন্দেহ থাকে, তাহা হইলেও সেই দর্শনের কোন অর্থ থাকে না। ঈশ্বর-দর্শন চিন্তা করিয়া বুঝিবার বিষয় নহে, কিন্তু তাহা একটী বিশেষ অবস্থা-লাভের ব্যাপার। দর্শন-লাভ হইলে একদিকে যেমন তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে, অন্য দিকে সঙ্গে সঙ্গে জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিবে। অন্যথা ঈশ্বর-দর্শন হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে প্রবঞ্চিত হইতে হয়। বৃথা আত্মাভিমান ও আত্মবিস্মৃতি আসিয়া প্রাণকে অধিকার করিবার সুবিধা পায়। এরূপ কাল্পনিক বিশ্বাস যাহাদের হয়, তাহাদের প্রকৃত দর্শন লাভের জন্যও আর আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টা থাকে না। সুতরাং প্রকৃত দর্শন-লাভের জন্যই ব্যস্ত হইতে হইবে; তাহার জন্য দর্শনদাতার মুখাপেক্ষী হইয়া তাঁহার করুণার উপর নির্ভরশীল হইয়াই পড়িয়া থাকিতে হইবে। যখন তিনি অনুগ্রহ করিয়া দর্শন দিবেন, তখন তাহা বুঝিতে আর বেশী সময় লাগিবে না। বেশী উপদেশেরও আবশ্যক হইবে না। প্রাণ নিজেই তাহা অনুভব করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে এবং আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়া কৃতার্থ হইবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

"ধর্ম্মে শ্রুতিলব্ধ জ্ঞান"।

একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আগরাতে বাস করিতেন। স্মৃতিশক্তির জন্য তাঁহার বড় প্রশংসা ছিল। বন্ধু বান্ধবে তাঁহাকে শ্রুতিধর বলিতেন। একবার বঙ্গদেশ হইতে তাঁহার কয়েকজন বন্ধু আগরাতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে আগরার তাজমহল নামক সুপ্রসিদ্ধ সমাধিমন্দির দেখিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইলেন। কিন্তু সে সময়ে তাজের জীর্ণ-সংস্কার হইতেছিল। একজন ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার ঐ কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত হইয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন। আগরাবাসী ভদ্রলোকটী সমাগত বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে তাজের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে তাজে প্রবেশের হুকুম নাই। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব স্বয়ং দ্বারে দণ্ডায়মান। তিনি তাঁহার নিকটস্থ হইয়া সবিনয়ে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, কারণ বঙ্গদেশীয় বন্ধুগণ আর অধিক দিন অবস্থিতি করিতে পারিবেন না। ইংরাজ কর্ম্মচারী অনুমতি দিলেন না। যখন তাঁহারা ফিরিয়া আসিতে উদ্যত, তখন ইংরাজ কর্ম্মচারী বলিলেন—"বাবু, তোমরা বাঙ্গালা দেশ হইতে আসিয়াছ, দার্জ্জিলিং যাইবার পথের সন্ধান বলিয়া দিতে পার?" আগরাবাসী বন্ধুটী অমনি বলিলেন;—"জানি, দার্জ্জিলিং যাইতে হইলে দুইটী পথ আছে, একটী কারাগোলা দিয়া, একটী সিলিগুড়ি দিয়া। এক এক পথে এতগুলি আড্ডা আছে" ইত্যাদি। এইরূপে কোথায় গরুর গাড়ি মিলে, তাহার ভাড়া কত, কোথায় ঘোড়া পাওয়া যায়, প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমুদায় সংবাদ দিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ইংরাজ কর্ম্মচারী বলিলেন—বাবু তোমরা ভিতরে এস, আমি বিবরণগুলি লিখিয়া লইব।" এই সুযোগে তাঁহাদের ভিতরে প্রবেশ হইয়া গেল। তাঁহারা যখন তাজ দেখিয়া বিনির্গত হইলেন, তখন নবাগত বন্ধুগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি ত দার্জ্জিলিঙ্গে কখনও যাও নাই, পথের এত খবর দিলে কিরূপে!" আগরাবাসী বন্ধু বলিলেন—"কয়েক মাস হইল একখানা গাইড্ বুক (Guide book) পড়িয়া ছিলাম, তাহা হইতে ঐসকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি।" তাঁহারা সকলে শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন।

একজন যেমন কখনও দার্জ্জিলিঙ্গ না দেখিয়াও পথের সমুদায় বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বলিয়াছিলেন, সেরূপ ঘটনা সংসারে প্রতিদিন ঘটিতেছে। গ্রন্থকার ও মুদ্রাকরগণ কলিকাতায় বসিয়া সমগ্র জগতের ভূগোল বিবরণ প্রণয়ন করিতেছেন। তাঁহাদের কয়জন পৃথিবীর সে সকল স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন? এইরূপে এক ব্যক্তি একখানি রেলওয়ের ম্যাপের সাহায্যে ও কতকগুলি গাইড বুকের সাহায্যে সমুদয় ভারতবর্ষের সকল প্রধান প্রধান নগরের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানের বিবরণ ও অপরাপর অবশ্য জ্ঞাতব্য সংবাদ দিতে পারে; অথচ হয়ত সে নিজে হাবড়া হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্তও কখনও গমন করে নাই।

ধর্ম্মরাজ্যেও দেখি সর্ব্বদা এই ব্যাপার ঘটিতেছে। পরোপদেশে সকলের অতিশয় পাণ্ডিত্য। রিপু-দমনের উপায় কি জিজ্ঞাসা কর, অমনি সঙ্গত সভার দশজন সভ্য রিপু-দমনের প্রকার ও প্রণালী নির্দ্দেশ করিবার জন্য অগ্রসর হইবেন। ঈশ্বর-দর্শন কাহাকে বলে প্রশ্ন করিবামাত্র পাঁচজন ঈশ্বর-দর্শনের স্বরূপ নির্ণয় করিতে বসিবেন, গাইড বুকে যাহা পড়িয়াছেন, সাধু সঙ্গে বসিয়া যাহা শুনিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা করিবেন। গাইড বুক দৃষ্টে—ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করা এক কথা, আর ধর্ম্মরাজ্যের পথে নিজে চলিয়া অভিজ্ঞতা দ্বারা জ্ঞানলাভ করা আর এক কথা। কেবল গাইড বুক পড়িয়া দেশের বিবরণ জানিয়া রাখিয়া যেমন মন সন্তুষ্ট হয় না; তেমনি ধর্ম্মতত্ত্ব কেবল শুনিয়া রাখিলেও চিত্ত পরিতুষ্ট হয় না। পৃথিবীর কোনও মহাজনই শ্রুত কথাতে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন নাই। আমরা কি চিরদিন পরকে রাস্তা দেখাইব, সে রাস্তাতে নিজেরা কি চলিব না? মৃত্যু দিনে মৃত্যু শয্যা শয়ন করিয়া যদি দেখি যে, চিরদিন কেবল গাইড বুক দেখিয়া পরকে পথের সমাচার দিয়াছি, নিজে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত ও যাই নাই, তাহা তাহা হইলে সে মৃত্যু কি ক্ষোভের মৃত্যু হইবে?

আর এক অর্থে শাস্ত্র সকলকে গাইড বুকের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। গাইড বুক প্রথমে যখন প্রণীত হইয়াছিল, তখন এরূপ ব্যক্তিদিগের দ্বারাই প্রণীত হইয়াছিল, যাঁহারা সচক্ষে ঐ সকল স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গাইড বুক প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও এই ছিল যে, অপরে তাঁহাদের সংকলিত বিবরণ পাঠ করিয়া সেই সকল স্থান দর্শনে ইচ্ছুক হইবে; এবং যাহারা দেখিতে যাইবে তাহারা তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থাবলী হইতে বিশেষ সাহায্য লাভ করিবে। শাস্ত্রকারগণ ও সাধুগণ এই জন্য শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, ও ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন যে, তাহা পাঠ ও শ্রবণ করিয়া সাধারণ জনসমাজে ধর্ম্মসাধনের প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইবে, এবং যাহারা ঐরূপে ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইবে, তদ্দ্বারা তাহাদের বিশেষ সাহায্য হইবে। কিন্তু লোকে ঘরে বসিয়া গাইড বুক পড়িয়া অপরকে যেরূপ পথের বিবরণ বলে, আমরা যদি সেই ভাবে শাস্ত্র ও সাধুপদেশের ব্যবহার করি, তাহা হইলে কি তাহার অপব্যবহার করা হয় না?

অথচ এইরূপ অপব্যবহার আমরা প্রতিদিন করিতেছি। পরকে উপদেশ দিবার প্রবৃত্তি এমনি প্রবল যে, আমরা পথ না দেখিয়াও পরকে পথের উপদেশ সর্ব্বদাই করিতেছি। এইরূপ করিয়া করিয়া অবশেষে নিজে দেখিবার প্রবৃত্তি ও আর থাকে না। ধর্ম্ম জীবনের এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক।

নির্জ্জনচিন্তা।

(জনৈক মহিলালিখিত।)

যখন মোহ নাশ হয়, তখন বাসনা-কণ্টকের তীক্ষ্ণ আঘাত উপেক্ষা করিয়া তোমার আলয়ের দিকে ছুটিয়া যাই। অমনি কে গো তুমি, আমায় আলিঙ্গন কর? জীবনের সে কি মধুময় অবস্থা, হৃদয় অমৃত সাগরে ভাসিতে থাকে। চির বিরহীর শেষ মিলনে কি এত সুখ হয়? সে সুখের বর্ণনা জগতের কোন শাস্ত্রে কি লিখিত আছে? চারিদিক মধুর, কে বলে তুমি নাই? এই যে মধুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াছ। এ মিলনের জীবন্ত সুখ, জাগ্রত ভাবে পাইয়া কে বলিবে "তুমি নাই?"

তিনি ধন্য, তাঁহার অনুপম সত্য-জ্যোতি সমস্ত মানবের হৃদয়ে ঢালিয়া দিতেছেন। যাহারা আঁধারে পথ হারা হইয়া বিচলিত হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিতেছেন। যে তাঁহাকে পাইল সে তো অনন্ত আশ্বাস পাইয়াছে; অনন্ত সুখে সুখী হইয়াছে; যে তাঁহাকে পাইল না তাহার কি হইবে? হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, চির শান্তির আলয় কোথায়, চির প্রেম কোথায় জাগে, চির বসন্ত কোথায় বিরাজ করিতেছে?

অসময়ে সে যে চির জরায় আক্রমণে দীপ্তশিরা হইয়াছে, করিবার কত ছিল কিছুই সে করিতে পারিল না; অকাল বার্দ্ধক্য তার উৎসাহ যুক্ত চক্ষু নিষ্প্রভ করিয়া দিতেছে, শত শত মরণ কীট জীবনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে প্রবেশ করিতেছে; সে প্রতিপদে বিঘূর্ণিত হইতেছে; তার মলিন হৃদয়ঘন মলিনতার নিবিড় আঁধারে দিন দিন আচ্ছন্ন হইতেছে। কি উদ্দেশ্যে সে জঘন্য জীবন, পাপভারাক্রান্ত প্রাণ লইয়া এখনও সংসারে রহিয়াছে? এরূপ জীবন কত কাল সে বহন করিবে? কিন্তু বাহ্য পদার্থ বিনষ্ট হইয়াছে তাহাতে ক্ষতি কি? পার্থিব বল দ্বারা কেহ কখন ধর্ম্ম সংগ্রামে বিজয়ী হইতে পারে না; ধর্ম্মের নব জ্যোতিতে হৃদয় গৃহ আলোকিত হউক গভীর আঁধারে প্রকৃত পথ পাইবে, আর কিছু না পার পথের কণ্টকটি দূর করিও প্রভুর প্রিয়কার্য্য হইবে।

মানুষ পাপে পড়িয়া যখন পরমেশ্বরের নিকট যায়, কেমন সভয়ে লজ্জায় ম্লান হইয়া পড়ে, মনে করে যাব না, ফিরিয়া যাই, ডুবেছি ত আরো ডুবি। কিন্তু পাপী যদি দয়াময়ের দয়ার উপর নির্ভর করে, আশার ক্ষীণ রশ্মি লইয়া মলিন প্রাণে তাঁহার সন্নিধানে যায়, তবে কি হয়,—না মরণোন্মুখ ব্যক্তি যেমন কখনও কখনও বেঁচে উঠে, ধীরে ধীরে তার প্রয়াণোন্মুখ প্রাণ ফিরে আসে, ধীরে ধীরে শরীরে বল সঞ্চার হয়, সেইরূপ পাপ মন একটু একটু করিয়া পুণ্যের বল লাভ করিতে থাকে।

করুণাময়ী জননী কি আমাদের সংসারারণ্যে ফেলে দিয়ে অন্তর্হিত হইয়াছেন? তাহা তো নয়। মানবই তাঁহাকে চায় না, তাই সংসার দুঃখের হয়। মানব পাপের গভীর কূপে পড়িয়া হাহাকার করে, অশান্তির অন্ধকারে চিরদিন ডুবিয়া থাকে। মানব যদি একবার পূর্ণ বিশ্বাসভরে জগন্মাতাকে দেখিত, তাঁহা হইলে শান্তি, আনন্দ, আশাপ্রাপ্ত হইত।

যদি তুমি মনে কর আমি পরের সেবা করিব। শুধু সংকল্প করিলে তো তোমার সেবাকার্য্য ভালরূপ সুসম্পন্ন হইবে না—তুমি প্রভুর প্রভৃত্য হইতে পারিবে না। যদি তুমি ঈশ্বরের প্রেমে বিশ্বপ্রেমে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া থাক, সকলে আমার প্রেমময় পিতার সন্তান যদি এ ভাবে জগৎ সংসারকে দেখিতে পার, তবে দেখিবে তোমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে, সুন্দর ফল প্রসব করিবে।

প্রকৃত গঙ্গাস্নান তাহাই যাহাতে সেই শুদ্ধ বুদ্ধে অবগাহন করিয়া হৃদয় পুণ্যপ্রবাহে স্নাত হয়, মুখশ্রী ব্রহ্মানন্দ জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইয়া যায়। সে গঙ্গাস্নানে কত কোটী কোটী পাপ বিধৌত হইয়া, প্রাণে পুণ্যের সঞ্চার হয়। ব্রহ্ম সহবাস জনিত যে আধ্যাত্মিক গঙ্গাস্নান হয়, তাহার ফল ইহকাল পরকাল অনন্তকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়।

সংসারে থাকিয়া বিবেককে উজ্জ্বল করিতে হইবে। বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিব, রুচিকে উন্নত করিব, পাপকে জয় করিব, অপ্রেমের পরিবর্ত্তে প্রেম আনিব, ক্রোধের ঔষধ ক্ষমা আনিব, অনৈক্যের স্থলে একতা আনিব, অসহিষ্ণুতার পরিবর্ত্তে সাহিষ্ণু হইব। এত শিক্ষা যে সংসার আমাদিগকে শিখাইতেছে, সে সংসার পরিত্যাগ করা কি কাহারও উচিত?

পাপী যখন পাপের তীব্র যাতনায় ছট ফট করিতে থাকে, তখন যদি কোন মাহেন্দ্র ক্ষণে সে একবার বিবেক কর্ণ পাতে, তবে তাহার মোহান্ধকার ভেদ হইয়া যায়, জ্ঞাননেত্র প্রস্ফুটিত হয়, সে শুনিতে পায় জগতজননী ডাকিতেছেন, তার সকল পাপভয় দূরীভূত হয়, সকল দুঃখ যন্ত্রণার অবসান হয়। চিরানন্দ চিরপ্রেম তাহার প্রাণের ভূষণ হয়।

পরমেশ্বর এমন একটী গুণ আমাদের মধ্যে দিয়াছেন যে; যদি আমি উচ্চ আশা প্রাণে ধারণ করি, তাহাতে কিছু না কিছু উন্নত হইবই হইব। অতএব নিরাশ না হইয়া যে যতটুকু পারি উচ্চ আশায় উৎফুল্ল হইব। কেন না আত্মা অমর, ক্ষুদ্রতা লইয়া থাকিলে আত্মার অধোগতি হইবে। আত্মা অনন্ত রাজ্যের যাত্রী; উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাহার সম্বল সাধুসংকল্পের সহায় ঈশ্বর। সুতরাং তাহার ফল নিশ্চয় ফলিবে।

যদি আমি ধর্ম্মে দৃঢ় হই, তবে আমার ভয় কি? ঐ পাপ আসিতেছে ঐ দুঃখ আসিতেছে ভয় কি? ধর্ম্মাধর্ম্মে যদি আত্মা আচ্ছাদিত থাকে তবে পাপ কি করিতে পারে?

এ সংসার কি ভয়ানক স্থান। ঐ পাপানল, ঐ অশান্তির প্রখর বিষ, ঐ শোকের হৃদয়ভেদকারী জ্বালা; অবিশ্বাসের তীব্র গরল, দুঃখের করাল মূর্ত্তি; মৃত্যুর ভয়াবহ ব্যাদান। এই ভয়ানক সংসারে যদি সেই দয়াময় শান্তিময় প্রেমময় দেবতাকে অবলম্বন না করি, তবে আত্মাকে চারিদিকে প্রচণ্ড উত্তাপ হইতে রক্ষা করিব কিরূপে?

কেবল বাসনা ত্যাগ করিলে ধর্ম্মজীবন লাভ করা যায় না। বাসনাকে করতলগত করিয়া যদি জগতের হিতব্রতে নিযুক্ত করা যায়, তবেই প্রকৃত ধর্ম্মজীবন হয়। কেবল বাসনা ত্যাগ করিয়া

জড়পিণ্ডের ন্যায় বসিয়া থাকিলে ধর্ম হয় না। প্রথমে আপনার দুরন্ত হৃদয়কে বশীভূত কর, তবে জগতের কল্যাণ করিতে পারিবে, নিজের মনুষ্যত্ব উদ্দীপ্ত কর তবে সহস্র মানবকে আকৃষ্ট করিতে পারিবে।

মানব স্বাধীন, পশুরা বদ্ধ। পশুদিগের যে নিয়মে বদ্ধ করিয়াছেন, তাহারা সেই নিয়মেই বদ্ধ আছে। কিন্তু মানবের পক্ষে তাহা নয়, মানবকে স্বাধীন করিয়াছেন, ইচ্ছা হয় পাপের দিকে যাও, ইচ্ছা হয় পুণ্যের দিকে ফিরে এস। স্বাধীন ইচ্ছার সঙ্গে যিনি প্রবৃত্তিকে জয় করেন, তাঁরই পুরস্কার ধর্ম্মানন্দ। ধরিয়া বাঁধিয়া যে প্রেম হয় সে তো প্রেম নয়। যিনি আপনা আপনি প্রেম করেন, সেই প্রেমই আসল প্রেম। প্রকৃত প্রেমিক সরল প্রেম চাহেন। মানব স্বাধীন ইচ্ছার সঙ্গে যখন প্রেম দান করেন তখনি তিনি তাহা হাত পাতিয়া গ্রহণ করেন।

যৌবনকালে যেরূপ মনের সমস্ত শক্তি জাগ্রত হয়, তাহাতে যদি ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত না হয়, তবে সে যৌবন পিশাচত্বে পরিণত হইবে। যৌবনে যেরূপ তেজ ও উৎসাহে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করা যায়, বার্দ্ধক্যের অবসন্নতায় তাহা সম্ভব নহে।

যিনি কর্ত্তব্যবান সহস্ররূপ কর্ত্তব্য মধ্যে তিনি ডুবিয়া থাকেন, কিন্তু ত্রিসন্ধ্যা দৃঢ় নিয়ম করিয়া পিতার নাম করেন—শত কার্য্যের মধ্যে এক একবার ঈশ্বরের কার্য্যে আত্মাকে ডুবাইয়া দেন, তাহাতে কর্ত্তব্যের কর্কশতার মধ্যে কত সরস ভাব উদয় হয়।

বিশ্বাস ভক্তি প্রেম ধ্যান ধারণায় যতই একনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইবে; ততই আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি হইবে। দিন দিন আধ্যাত্মিক রাজ্যের অমূল্য রত্ন সকল দ্বারা হৃদয় গৃহ অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিত হইবে। কিন্তু সাধক যদি ইহাতে গর্ব্বিত হয়েন তবে সর্ব্বনাশ। যাঁর ধন তাঁর কাছে ফিরিয়া যায় সাধক যত উচ্চে উঠিয়াছিলেন পতন হইবে, তত নীচে। সেই দেব দেব পরম দেবের কৃপায় আমার আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে এই বিশ্বাসে উৎসাহিত হইয়া যিনি আনন্দ করেন তারই মঙ্গল।

ঐ দেখ বজ্র আসিয়া ভক্তের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া গেল; শত শত্রু শাণিত অস্ত্র হৃদয় বিদ্ধ করিল, পৃথিবীতে মস্তক রাখিবার স্থানটুকুও রহিল না, তথাপি কি প্রশান্ত কি গম্ভীর মুখে একই কথা। "তোমার ইচ্ছার জয় হউক।" তাঁহাকে না পাইলে তাঁহার অক্ষয়, অমর, অনন্ত, সুধা শান্তি প্রেম না পাইলে কি সাধক এত নির্ভয় নিশ্চিন্ত হইতে পারেন? ধন্য সাধু ভক্তেরা। তাঁহারা ভয়ঙ্কর পরীক্ষানলে বিদগ্ধ হইয়াও প্রত্যক্ষরূপে জগতের সম্মুখে পরমেশ্বরকে দেখাইয়া গিয়াছেন। এবং কালের অক্ষয় পটে চিরদিনই দেখাইবেন।

মনে যদি কুভাব জন্মে, মনেই থাক্, যদি কুভাবের অনুযায়ী কার্য্যকর, তোমার জীবন বিষ উদ্গীরণ করিবে, যতক্ষণ সর্পাবিষ উদ্গীরণ করে না, ততক্ষণ তাহা বিষ বটে। কিন্তু অপরের অনিষ্ট করিতে পারে না। যখন বিষ ঢালে তখনই সর্ব্বনাশ হয়।

বাদ্যযন্ত্রে সুনিপুণ বাদক যখন তাহাতে আঘাত করেন; কি সুন্দর স্বরলহরী উঠে—নিতান্ত কর্কশ প্রাণেও সে স্বরলহরীর আঘাত হইতে থাকে; তেমনি এ হৃদয়যন্ত্রে কবে বিবেক বাদকের আবির্ভাব হইবে, যাহার এক আঘাতে হৃদয়স্থিত পুণ্য-প্রেম পবিত্রতার ধ্বনি ধ্বনিত হইয়া বিমুগ্ধ করিবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ২য় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

১৮৯৩।

বিগত তিন মাস নিম্নলিখিত ভাবে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

এই সময়ে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১৩টী সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও এই তিন মাসের মধ্যে দুইটী উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রথমটী বাঙ্গালা বর্ষ শেষ ও নববর্ষ উপলক্ষে দ্বিতীয়টী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব। প্রথম উৎসব উপলক্ষে ৩০শে চৈত্র তারিখে অপরাহ্নে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় "ব্রহ্মশক্তির পরাক্রম" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। পরদিন প্রাতে সমাজমন্দিরে উপাসনা হয়। বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। রাত্রে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১লা বৈশাখ প্রাতে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনা করেন। অপরাহ্নে বাবু সীতানাথ দত্ত ও নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে পাঠ করেন। রাত্রে শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকপদে নিযুক্ত হন। তদুপলক্ষে যে বিশেষ উপাসনা হয় তাহাতে বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

দ্বিতীয় উৎসব উপলক্ষে ১লা জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতে উপাসনা হয়। তাহাতে বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। রাত্রে বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। পরদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিনে প্রাতঃকালে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে পাঠ ও আলোচনা হয়। রাত্রে উপাসনা হয়, তাহাতে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

১ম ত্রৈমাসিক রিপোর্টে অবগত করা হইয়াছিল, যে মফস্বল ব্রাহ্মসমাজের Trust Deedগুলি একত্র করিয়া মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইতি মধ্যে অনেকগুলি Trust Deed পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার অধিকাংশ ছাপা হইয়া গিয়াছে। আশা করা যায় তাহা শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

প্রচার—বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে বিগত নববর্ষের দিনে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। তিনি ইতিঃপূর্ব্বে প্রায় ৮ বৎসর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। বিগত বৎসর তিনি প্রবেশার্থী প্রচারক বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। তৎপরে যথাবিহিত ভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক রূপে গৃহীত ও অভিষিক্ত হইয়াছেন।

আমাদের প্রচারকগণ নিম্নলিখিত রূপে গত তিন মাস কার্য্য করিয়াছেন।

বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস। বিগত মাঘোৎসবের সময় হইতে অনেকদিন পর্য্যন্ত তিনি অসুস্থ ছিলেন। শরীর সুস্থ হইলে কলিকাতাতে কিছুদিন থাকিয়া তৎপরে জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যান। সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া উপাসনা, উপদেশ, পাঠ, ব্যাখ্যা এবং আলোচনাদি করেন। একদিন রেলওয়ে ষ্টেশনে "কলির ধর্ম্ম" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন, এবং আর একদিন বাজারে "আর ঘুমাইও না" এই বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন।

জলপাইগুড়ি হইতে প্রত্যাগমনের সময় নাটোর এবং দিঘাপাতিয়ায় অবতরণ করেন, নাটোরে সমাজের অর্থ সংগ্রহ সম্বন্ধে কিছু কাজ করেন। দিঘাপাতিয়াতে পারিবারিক উপাসনা করেন এবং একদিন "ধর্ম্মের দুইদিক"এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তথা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

বিশেষরূপে আহূত হইয়া হুগলি জেলার অন্তর্গত দোগাছিয়া গ্রামে উৎসব করিতে যান। সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া উপাসনা, উপদেশ, পাঠ, ব্যাখ্যা ও আলোচনাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। একদিন "কার্য্য দ্বারাই মানবের পরিচয়" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই সময় ইঁহার নিকটবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে কীর্ত্তন ও উপাসনাদি দ্বারা ঈশ্বরের নাম প্রচার করেন একদিন রহিমপুর নামক গ্রামে "কিরূপে পরমেশ্বরের কৃপা মানবকে পরিত্রাণ করে" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

এ স্থান হইতে একটী ব্রাহ্মবন্ধুর অনুরোধে জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগর ও মাধবপুর গ্রামে যান, সেখানে উপাসনাদি হয়, একটী বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনা করেন, তথা হইতে বাহিরগড়া গ্রামে যান। এখানে উপাসনাদি করেন। তথা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তথায় আহূত হইয়া যান, সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া উপাসনা উপদেশ ও আলোচনাদি দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করেন, একদিন স্থানীয় টাউনহলে "পরিত্রাণের সঙ্কেত" এই বিষয়ে বক্তৃতা এবং বাজারে "মানব আপনার কার্য্যের ফল আপনিই ভোগ করে" এই বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। এই সময়ে নশিপুর নামক স্থানে ২ দিন পারিবারিক উপাসনাদি করেন। তথা হইতে কলিকাতা ফিরিবার সময় নলহাটীতে কয়েক দিন থাকিয়া সমাজে ও পরিবারে উপাসনাদি করেন।

একবার বৰ্দ্ধমানে যান সেখানে পারিবারিক উপাসনাদি করেন। কলিকাতায় থাকার সময় মধ্যে মধ্যে উপাসকমণ্ডলীর সাপ্তাহিক উপাসনাকার্য্য করেন, কয়েকটী পরিবারে উপাসনাদি করেন, সাধনাশ্রমের নির্দ্দিষ্ট কাজ করেন এবং তদ্ব্যতীত দুটী উৎসবে কাজ করেন।

সহরের বাহিরেও মধ্যে মধ্যে কোন কোন স্থানে উপাসনাদি করেন। ভবানীপুর সুবরবন সমাজের উৎসবে এক বেলা উপাসনার কার্য্য করেন। সম্প্রতি নোয়াখালি গমন করিয়াছেন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—কলিকাতা সাধনাশ্রমে নিম্নলিখিত তিনটী বিষয়ে তিন দিবস বক্তৃতা;—অজ্ঞেয়তাবাদ খণ্ডন। (২) উপাসনার বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন। (৪) সাকার ও নিরাকার উপাসনা। এতদ্ভিন্ন, অজ্ঞেয়তাবাদ, ঈশ্বরদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তিন দিবস আলোচনা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, সমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে উপাসনা ও উপদেশ এবং একটি অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন। ছাত্রসমাজের আলোচনার সভাপতির কার্য্য করেন।

হাজারিবাগ—উৎসব ও অন্য সময়ে সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ দিবস ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ। এক দিবস কোন রমণীয় স্থানে সামাজিক উপাসনা। নিম্নলিখিত দুইটী বিষয়ে কেশব হলে দুইটী প্রকাশ্য বক্তৃতা;—(১) সেবাধর্ম্ম। (২) সৃষ্টিকৌশল। এক দিবস ব্রহ্মমন্দিরে নাম কীর্ত্তন বিষয়ে বক্তৃতা।

বংশবাটী—ব্রহ্মমন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন। উৎসব উপলক্ষে কোন ভদ্রলোকের বাটীতে স্ত্রীলোক ও সর্ব্বসাধারণের উপযোগী উপাসনা ও উপদেশাদি। এক দিবস ধর্ম্মালোচনা। উৎসব উপলক্ষে গড়বাটীতে প্রকাশ্য বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয়,—'নীতিহীন ধর্ম্ম, ও ধর্ম্মহীন নীতি।'

শিবপুর। (জেলা হুগলি) জমিদার মহাশয়ের বাটীতে বক্তৃতা। (বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে সংগীত ও কীর্ত্তন) এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মবিষয়ে পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য এবং অন্যান্য লোকের সহিত ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

বাবু শশিভূষণ বসু—কলিকাতা—মন্দিরে দুই দিন সাপ্তাহিক উপাসনা ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন উপলক্ষে একদিন আচার্য্যের কার্য্য করেন। কোন কোন পরিবারে উপাসনা করেন। পত্রিকায় ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

বগুড়া—বৎসরের শেষ দিন ও নববর্ষ উপলক্ষে উপাসনা করেন। কোন কোন পরিবারে উপাসনা, উপদেশ প্রদান বগুড়া সমাজের উৎসবোপলক্ষে কয়েক দিন আচার্য্যের কার্য্য করেন। টমসন হলে "ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতি" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। স্কুলগৃহে "ছাত্রজীবন কিরূপে গঠিত হয়" সম্বন্ধে ছাত্রদিগের জন্য একটী বক্তৃতা করেন। আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ের উৎসবে "অধ্যাত্ম জীবন কিরূপে গঠিত হয়" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। এবং সাধারণ লোকের জন্য "ধর্ম্ম-জীবনের মধুরতা" এবং "চরাচর ব্রহ্মাণ্ডে পরমেশ্বরের আবির্ভাব দর্শন" এই মর্ম্মে একটী বক্তৃতা করেন।

কাকিনীয়া—উৎসব উপলক্ষে কয়েক দিন সমাজে আচার্য্যের কার্য্য করেন। কোন পরিবারে বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন। ধর্ম্মোন্নতি সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন।

দোগাছিয়া—সাধারণ লোকের জন্য "পরমেশ্বরকে জানিলে মানুষ মৃত্যুভয় হইতে মুক্তিলাভ করে" এই মর্ম্মে একটী বক্তৃতা করেন। জাঙ্গিপাড়াকৃষ্ণনগরে কোন পরিবারে ২ দিন উপাসনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন। এবং উক্ত স্থানে সামাজিক উপাসনার দিনে আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপর শরীর অসুস্থ হওয়ায় এবং ভয়ানক বর্ষার জন্য কিছু দিন হইল কার্য্য করিতে পারেন নাই।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—২৩শে মার্চ্চ তারিখে পঞ্জাব যাত্রা করেন; পথিমধ্যে দেওঘর, বাঁকীপুর, বারাণসী,

ফরজাবাদ প্রভৃতি স্থানে দুই এক দিন করিয়া থাকিয়া প্রচার করেন। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে লক্ষ্ণৌ পৌছেন। এখানে দুই দিন দুইজন ব্রাহ্মবন্ধুর গৃহে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। স্থানীয় রিফাইন হলে একদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন এবং Bengali Students, Association এ "বুদ্ধের ধর্ম্মশীলত্বাৎ" বিষয়ে বাঙ্গলা ভাষায় বক্তৃতা করেন। এখান হইতে গমনকালে হরিদ্বার হইয়া লাহোরে যান।

লাহোর—তিন দিন ব্রহ্মমন্দিরে ইংরাজী বক্তৃতা হয়,—বিষয়—"'Signs of the time." "Regulation of conduct" "Brahmo Samaj, its aim and work" আর এক দিন শিক্ষা সভা হলে "প্রকৃত শিক্ষা" বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা হয়। দুই দিন সৎসঙ্গ সভায় আলোচনা করেন, বিষয়—"ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ" ও "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"। দুই দিন স্থানীয় ব্রাহ্মবন্ধুদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা করেন। এক দিন মহিলাদিগের সহিত আলোচনা করেন। মন্দিরে দুই দিন ইংরাজীতে ও দুই দিন হিন্দিতে এবং এক দিন বাঙ্গলাতে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। দুইজন ব্রাহ্মবন্ধুর গৃহে দুই দিন এবং একটি ছাত্রাবাসে একদিন উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। স্থানীয় কয়েকজন ব্রাহ্মকে লইয়া সাধনাশ্রমের একটি সভায় দল গঠন করেন। একদিন কথকতা সভায় চৈতন্যের জীবন সংক্ষেপে বলেন।

দিল্লী—বাবু হেমচন্দ্র সেন নামক একটি বন্ধুর গৃহে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া উপদেশ দেন ও প্রার্থনা করেন।

আগ্রা—একজন ব্রাহ্মবন্ধুর গৃহে ২ দিন উপাসনা করেন, আর একজন স্থানীয় ডাক্তারের বাড়ীতে শাস্ত্রপাঠ, ব্যাখ্যা প্রার্থনাদি করেন। একদিন ভিক্টোরিয়া কলেজ হলে "সার্ব্বজনিক ধর্ম্ম" বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন।

ঝান্সী—তিন জন ভদ্রলোকের গৃহে শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রার্থনাদি করেন। মারহাট্টা প্রাইমারী স্কুল প্রাঙ্গণে একদিন "ভারতের ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম" বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন।

ইন্দোর—ব্রহ্মমন্দিরে "Test of universal religion" বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন।

এলাহাবাদ—একদিন একজন ব্রাহ্মের গৃহে উপাসনা করেন। একদিন মন্দিরে সামাজিক উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। একদিন কায়স্থ পাঠশালা হলে, ইংরাজী ভাষায় "উদার ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

কলিকাতা—অধিকাংশ সময় সাধনাশ্রমের উপাসনা করিয়াছেন। আশ্রমবাসীদিগের শিক্ষা ও কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। একদিন সুবার্বন ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে আচার্য্যের কার্য্য করেন। এতদ্ভিন্ন তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদন করেন এবং মেসেঞ্জার সম্পাদনে সহায়তা করেন ও সপ্তাহে তিন দিন গীতা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত লছমনপ্রসাদ—প্রধানতঃ লক্ষ্ণৌ সহরে থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে তথায় বিশেষ ভাবে উপাসনা করেন। ইতিমধ্যে প্রায় ৯০০ শত রোগীকে ঔষধ বিতরণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি এলাহাবাদ, ফতেপুর, পৈনতাপুর, ব্যারাটিয়া, মারমাখাপুর, ভাগীপুর, প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন বাবু কালীপ্রসন্ন বসু, ঢাকা, খানখানাপুর, তিল্লি, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে ও বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী খাসিয়া পাহাড়ে থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত স্থান হইতে প্রচারক মহাশয়দিগের নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল;—ব্রহ্মদেশ, দোগাছিয়া, বাগেরহাট, কাকিনিয়া, বগুড়া, হাজারিবাগ, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, নোয়াখালি, ও বর্দ্ধমান।

উপাসকমণ্ডলী—এই তিন মাস ইহার কার্য্য নিয়মিত ভাবে চলিয়াছে। গত বৎসর যাঁহারা আচার্য্য ও সহকারী আচার্য্য ছিলেন, তাঁহারাই এবৎসরের জন্য পুনর্নিযুক্ত হইয়াছেন। বাবু সীতানাথ দত্ত, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, বাবু শশিভূষণ বসু পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই তিন মাস আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। বাবু বঙ্কবিহারী বসু ও বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন মহাশয় যথাক্রমে সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রতিদিন সায়ংকালে ও রবিবার প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হইয়াছে।

উপাসকমণ্ডলীর আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
দানপ্রাপ্তি	৩৻৫	বেতন হিঃ খরচ	১০৲
চাঁদা আদায়	৫৭৲	ক্ষুদ্র ব্যয়	১৭৮/১৫
মন্দির মেরামত হিঃ প্রাপ্ত	৫৲	গ্যাসের আলো হিঃ	২১৲
অনুষ্ঠান উপলক্ষে মন্দিরের		মন্দির মেরামত হিঃ	১৬৫।৴১৭॥
আলো হিঃ প্রাপ্তি	৫৲	হাওলাত শোধ	২৫৲
হাওলাত	১০০৲		———
	———	মোট খরচ	২৩৯।/১২॥
	১৭০৻৫	হস্তেস্থিত	৩১৴১২॥
পূর্ব্বস্থিত	১০০॥/০		———
	———		২৭০॥/৫
মোট জমা	২৭০॥/৫		

সঙ্গত-সভা—এইসময় মধ্যে সঙ্গতসভার ১৩টী অধিবেশন হয়, ১১ই এপ্রিল মঙ্গলবার সমাজমন্দিরে বর্ষশেষ উপলক্ষে উপাসনা হওয়ায় সঙ্গতসভার অধিবেশন হইতে পারে নাই। উক্ত ১৩টী অধিবেশনের প্রথম দুই অধিবেশনে কঠোপনিষৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়, পরে ১১টী অধিবেশনে নিম্নলিখিত ৪টী বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল:—(১) ব্রাহ্মদের গৃহ কিরূপ হওয়া উচিত; (২) ধার্ম্মিকের লক্ষণ কি? (৩) ব্রাহ্মসমাজে পরস্পরের প্রতি প্রীতির যোগ হইবার উপায় কি? (৪) আমাদের পরস্পর প্রীতির যোগ হইবার কার্য্যগত উপায়, এই চারিটী বিষয়ের প্রত্যেকটীই ২।৩ দিন করিয়া আলোচিত হয়।

ব্রাহ্মছাত্রীনিবাস—ব্রাহ্ম ছাত্রনিবাসের কার্য্য গত ৩ মাস একপ্রকার চলিয়াছে। ছাত্রীসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াছে, এখন ২৭।২৮ জন হইবে। ইহার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা বিশেষ প্রয়োজন। ছাত্রীনিবাসে অন্ততঃ ৪০টী বালিকা আসিলে ইহার কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে এরূপ আশা হয়।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
চাঁদা আদায়	২৪॥০	খোরাকী, জলখাবার	
ছাত্রীদিগের বেতন	১২৩	ও আলোর ব্যয়	৩৭১৸৴০
বৃত্তি হিঃ জমা	৪৪॥০	বাড়ীভাড়া	২০৭৲
এককালীন দান	২৲	বৃত্তি হিঃ খরচ	৫৪॥০
এডমিশন ফীঃ	৫৲	বিবিধ ব্যয়	৭॥৶০
হাওলাত	৯৯৲	ছাত্রীদিগের স্কুলের বেতন	৪৮৲
		কর্ম্মচারীর বেতন	২৬৭।২০
	৮৯৮৲		
পূর্ব্বকার স্থিত	৬২৸৵৫		৯৫৬৷১০
		হস্তেস্থিত	৪॥৵১০
	৯৬০৸৵৫		৯৬০৸৵৫

দাতব্য বিভাগ—দাতব্য বিভাগের গত তিন মাসের কার্য্য ভালই চলিয়াছে; ১৫টী ছাত্র, ২টী ছাত্রী, ৫টী পরিবার, ১টী অন্ধ ও একটী কুষ্ঠরোগীকে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে। বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাবের সংবাদ পাইয়া, এখান হইতে বাবু কুঞ্জবিহারী গুহকে ওলাউঠার চিকিৎসার উপযোগী এলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সহ তথায় পাঠান হইয়াছিল, তদ্দ্বারা কয়েকটী রোগীর চিকিৎসা হইয়াছিল, ঈশ্বর কৃপায় ওলাউঠার প্রকোপ কমিয়াছে। ব্রাহ্মবন্ধুগণ পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই দাতব্য বিভাগে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিলে অনেক উপকার হয়। আশানুরূপ অর্থাভাবে অনেক দুঃখীকে সাহায্য দানে বঞ্চিত করিতে হয়।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
অনুষ্ঠান উপলক্ষে		মাসিক দান	৬৪॥০
দানপ্রাপ্তি	১১৲	এককালীন দান ও	
এককালীন দানপ্রাপ্তি	৬২৲	বজ্রযোগিনীর ঔষ-	
বার্ষিক দান	১৬৲	ধের মূল্য	৩৯৸৶৫
মাসিক দান	৫৸০		
			১০৪।৶৫
	৯৪৸০	হস্তেস্থিত	২৩৩।১৫
পূর্ব্বকার স্থিত	২৮৩৲		
			৩৩৭৸০
	৩৩৭৸০		

সাধনাশ্রম—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের কার্য্য বিবরণ প্রচারক মহাশয়দিগের কার্য্য বিবরণের সহিত দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব—মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে পঞ্জাব যাত্রা করেন। একদিন লক্ষ্ণৌ রিফাইন হলে উর্দ্দুতে বক্তৃতা করেন। ভগবদাশ্রমে হিন্দিতে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। হরিদ্বার—মিঃ সুন্দর দাস ভাল্লা নামক এক জন বন্ধুর গৃহে একদিন ও পঞ্জাবী আর একটি বন্ধুর গৃহে একদিন হিন্দিতে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। লাহোর—ব্রহ্মমন্দিরে এক দিন উর্দ্দুতে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। আগ্রার ভিক্টোরিয়া কলেজ হলে এবং মন্দিরে উর্দ্দুতে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ইন্দোর—তিন দিন মন্দিরে হিন্দিতে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। এতদ্ভিন্ন পঞ্জাব প্রচার দলের কার্য্যের সাহায্য করেন। কলিকাতা—সাধনাশ্রমে কখনও কখনও উপাসনা করেন। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পত্রিকার সম্পাদনের সহায়তা করেন এবং বাঙ্গালা ধর্ম্মগ্রন্থ উর্দ্দুতে অনুবাদ করেন। পঞ্জাববাসী ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুরাগীদিগের সহিত চিটি পত্র লিখিবার ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত ছিল। তাহা তিনি সম্পন্ন করিয়াছেন এবং সপ্তাহে তিনদিন হিন্দি শিক্ষা দিয়া থাকেন।

বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধনাধ্যক্ষের কার্য্য এবং কার্য্যালয়ের অন্যান্য কার্য্যের সহায়তা করেন ও কয়েকটি ব্রাহ্ম পরিবার পরিদর্শন করেন। সপ্তাহে পাঁচ দিন সমাজমন্দিরে সায়ংকালে উপাসনারকার্য্য করেন। মধ্যে মধ্যে আশ্রমের উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন প্রতি শনিবার নিমতা ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা করিয়াছেন।

বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী—ব্রাহ্মবালক বোর্ডিংএর অধ্যক্ষের কার্য্য করেন, ব্রাহ্মবালিকা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। মধ্যে মধ্যে সাধনাশ্রমে উপাসনা করেন। এতদ্ভিন্ন তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদনের সহায়তা করিয়াছেন।

বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়—শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য লাহোরে গমন করেন। সেখানে পঞ্জাব প্রচারযাত্রীগণের সহিত যোগদান করিয়া প্রচারের সাহায্য করেন। একদিন তথাকার ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন। কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়া বিশেষ ভাবে ব্রাহ্ম মিশন প্রেসের তত্ত্বাবধায়কের কার্য্য করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে কোন কোন বাড়ীতে উপাসনা করিয়াছেন। একদিন রবিবার প্রাতে মন্দিরের উপাসনায় এবং একদিন সাধানাশ্রমের উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদনের সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল—নিয়মিত রূপে সাধনাশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষতা ও তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদনের সহায়তা করিয়াছেন। কখন কখন দাসাশ্রমে গিয়া রোগীদিগকে উপদেশ দিয়াছেন ও সংগীত, প্রার্থনা করিয়াছেন এবং মাণিকতলা সমাজে মধ্যে মধ্যে উপাসনা করিয়াছেন।

এই তিন মাসের মধ্যে সাধনাশ্রমে এক দিন উৎসব হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় সপ্তাহে ৩ দিন ভগবদ্গীতা পড়াইতেছেন, নগেন্দ্র বাবু সপ্তাহে দুই দিন তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকেন।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা		খরচ	
বাড়ী ভাড়া	৫৪৲	প্রয়োজনীয় জিনিস খরিদ	
পুরাতন কাগজ বিক্রয়	৵০	ও আলো প্রভৃতির ব্যয়	৮৮৸১০

জমা		খরচ	
অলঙ্কার বিক্রয়	৩৫॥৶১৫	অতিথি এবং আশ্রম-বাসীগণের আহারাদির ব্যয়	৩৩৩॥৶১০
দানপ্রাপ্তি	২৩৬৸৶০	দাতব্য	১৲
ভিক্ষাপ্রাপ্তি	২৮॥৶৫		৪২৩।৶০
আশ্রমস্থ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হইতে প্রাপ্তি	৬৬।০	হস্তেস্থিত	।৶৫
	৪২১৸০		৪২৩৸/৫
পূর্ব্বস্থিত	২/৫		
	৪২৩৸/৫		

ছাত্রসমাজ—এই তিন মাসের মধ্যে অধিকাংশ সময় বালকদিগের গ্রীষ্মাবকাশ জন্য ইহার কাজ বন্ধ ছিল। ছুটির পর হইতে এখনও কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। ছুটীর পূর্ব্বে ৩রা বৈশাখ বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয় "ধর্ম্মজীবনের দায়িত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং ১০ই বৈশাখ তারিখে গ্রীষ্মের ছুটী উপলক্ষে বিদায় সূচক বিশেষ উপাসনা হয়। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র ও কালীশঙ্কর সুকুল মহাশয় বক্তৃতা করেন।

তত্ত্ব-কৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার—এই তিন মাসে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। যথারীতি পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।

পুস্তক—রাণীনগরের বাবু কেদারনাথ সরকার "জাতিভেদ" নামক একখানি পুস্তক সমাজকে দান করিয়াছেন। বাবু কেদারনাথ রায় কৃত "শ্মশানভস্ম" ২ ভাগ ১ম সংস্করণ। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস কৃত "ব্রাহ্মধর্ম্মতত্ত্ব" ২য় সংস্করণ ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত "পুষ্পাঞ্জলি" ও "বক্তৃতাস্তবক" নামক পুস্তক দ্বয়ের স্বত্বাধিকার সমাজ ক্রয় করিয়াছেন।

অনুষ্ঠান - আমরা যতদূর সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে জানিতে পারিয়াছি যে, এই তিন মাসের মধ্যে ৭টী জাতকর্ম্ম ও নামকরণ, ৩টী শ্রাদ্ধ, ২টী বিবাহ ও ২টী দীক্ষা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

সভ্য ও সহযোগী—এই তিন মাসের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তিন জন সভ্য ও ১৩ জন সহযোগী নিযুক্ত হইয়াছেন।

মৃত্যু—বিশেষ দুঃখের সহিত জ্ঞাপন করিতে হইতেছে, যে আমাদের বড়বেলুনবাসী শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু বাবু পুণ্যদাপ্রসাদ সরকার মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। যত দিন শক্তি ছিল তিনি অকাতরে ব্রাহ্মসমাজের জন্য তাঁহার জন্মস্থান বড়বেলুনে ও অন্যান্য স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য খাটিয়াছেন। পুণ্যদা বাবু আপন সরল বিশ্বাস ও ভক্তিতে সকলের বিশেষ আদরণীয় ছিলেন। তাঁহার অভাবে, ব্রাহ্মসমাজ এক জন সেবক হারাইলেন। ব্রাহ্মসাধনাশ্রম তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রের ভরণ পোষণের বন্দোবস্ত করিতেছেন। আশা করি ব্রাহ্মবন্ধুগণ এ বিষয়ে যথাযোগ্য সহায়তা করিবেন।

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্মসম্মিলনীর উৎসব—২৫এ জুন উল্টাডিঙ্গীতে বাবু রাজকৃষ্ণ কর মহাশয়ের বাগানে ব্রাহ্মসম্মিলনীর মাসিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবে প্রায় ৫০ জন উপস্থিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বাহ্নে ৮ ঘটিকার সময় উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন, তৎপর আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আলোচনার বিষয় উত্থাপন করেন, শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কালীশঙ্কর সুকুল, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি অনেকে স্বীয় স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। আলোচনা সময়োপযোগী ও সুফলপ্রদ হইয়াছিল। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় পাঠ ও প্রার্থনা করেন। তৎপর সকলে গৃহে গমন করেন। এবারের উৎসবে সকলেই উপকৃত হইয়াছেন।

সাধনাশ্রমের উৎসব—গত ১লা জুলাই সাধনাশ্রমের মাসিক উৎসব হইয়াছে। প্রাতে ৭ টার সময় পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তৎপর উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা করেন। অপরাহ্নে পাঠ ব্যাখ্যা হয়। সন্ধ্যার পর পুনরায় উপাসনা হইয়া উৎসব সমাপ্ত হয়। যখন পরমেশ্বর প্রাণে উপস্থিত হন, তখনই প্রকৃত উৎসব হয়। তিনি কৃপা করুন, ব্রাহ্মগণ প্রকৃত উৎসব সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হউন।

শিক্ষালয় ও ব্রাহ্মছাত্রীনিবাস—এতদিন ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয় এবং ব্রাহ্মছাত্রীনিবাস দুইটী স্বতন্ত্র সব কমিটির তত্ত্বাবধানে ছিল। এখন কার্য্যের সুবিধার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা এই দুটিকে একীভূত করিয়া একটী কমিটীর কর্ত্তৃত্বাধীন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উক্ত কমিটীর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। নূতন বন্দোবস্তে ছাত্রীনিবাস এবং স্কুলের কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইবে বলিয়া অনেকেই আশা করিতেছেন।

প্রচার--শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস নোয়াখালীর বাবু হরকান্ত বসুর পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে তথায় গমন করেন। তাঁহার সহিত বরিশাল হইতে বাবু বরদাকান্ত রায়ও গমন করেন। বালকের নাম মোহিনীকান্ত রাখা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে হরকান্ত বাবু সাঃ ব্রাঃ সমাজে ১৲, সাধনাশ্রমে ১৲, ঢাকা ব্রাহ্ম-সমাজে ১৲ এবং নোয়াখালী ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন। নোয়াখালী অবস্থিতি কালে নবদ্বীপ বাবু, হরকান্ত বাবু ও স্থানীয় অন্যান্য বন্ধুগণের বাড়ীতে প্রতিদিন পাঠ ব্যাখ্যা ও উপাসনাদি করিয়াছেন। তৎপর বরিশালে আগমন করিয়া প্রতিদিন এক এক বাড়ীতে উপাসনা করিয়াছেন এবং ছাত্র-সমাজে "কাহার নেতৃত্বে চলিব?" এ সম্বন্ধে একদিন বক্তৃতা করিয়াছেন। বাবু ললিতকুমার বসুর দুইটি কন্যার নামকরণ উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। কন্যা দুটির নাম উষাবালা ও নলিনীবালা রাখা হইয়াছে।

বাঁশবাড়িয়ায় উৎসব—বাঁশবাড়িয়া ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং বাবু রেবতীমোহন সেন তথায় গমন করেন। উৎসবে উপাসনা, বক্তৃতাদি হয়। নগেন্দ্র বাবু বক্তৃতা করেন।

সাধন-গৃহ প্রতিষ্ঠা—বরিশাল হইতে বাবু মথুরানাথ দাস লিখিয়াছেন;—"বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন দাস তাঁহার নিজ বাটীতে একখানি সাধন-গৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন। বিগত ২২শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার সেই গৃহ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তদুপলক্ষে উপাসনা, কীর্ত্তন ও প্রীতিভোজন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রাতে, শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন দাস মধ্যাহ্নে ও শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দুভূষণ রায় সন্ধ্যার পরে উপাসনা করিয়াছিলেন।

কালীমোহন বাবু প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে সর্ব্বদাই এই গৃহে বসিয়া সাধন ভজন করিয়া থাকেন। এইরূপ নির্জ্জন সাধনে দৃঢ়নিষ্ঠা সাধারণের অনুকরণীয়। আমরা ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি যে প্রত্যেক ব্রাহ্মের বাড়ীতে এইরূপ এক একখানি সাধন গৃহ প্রস্তুত হউক।"

খাসিয়া মিশন—পরমেশ্বরের কৃপায় দিন দিন খাসিয়া মিশনের উন্নতি হইতেছে। এক্ষণে খাসিয়া পাহাড়ে পাঁচ স্থানে পাঁচটী ব্রাহ্মসমাজ আছে। তন্মধ্যে চেরাপুঞ্জী প্রচার আশ্রমের সংশ্লিষ্ট সমাজটী নূতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহে এই সমাজে অনেকগুলি পুরুষ ও রমণী উপস্থিত হইয়া থাকেন। গৃহটী ক্ষুদ্র বলিয়া বড়ই অসুবিধা হইতেছে, উপযুক্ত একটী সমাজমন্দির নির্ম্মিত না হইলে এই অসুবিধা দূর হইবে না। কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারা যাইতেছে না। আশা করা যায় যে ব্রাহ্মবন্ধুগণের সাহায্যে এই অভাব শীঘ্র দূর হইবে। বর্ষার প্রবলতা বশতঃ মৌসমাই-এর ব্রাহ্মসমাজ গৃহ দুই বৎসরের মধ্যেই অতিশয় জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তজ্জন্য বাধ্য হইয়া প্রস্তরের দেওয়াল বিশিষ্ট অপর একটী গৃহ ক্রয় করিতে হইয়াছে। তাহা ক্রয় ও সংস্কার করিতে অনেক টাকা ঋণ করিতে হইয়াছে। যাঁহাদের খাসিয়া মিশনের সঙ্গে সহানুভূতি আছে, তাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করা যাইতেছে। লাইক্যানসেউ-এর সমাজগৃহ পথের ধারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট সেই রাস্তা বিস্তৃত করিয়াছেন। তজ্জন্য স্থানান্তরে একটী নূতন সমাজগৃহ প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। দুইজন নূতন লোক এই সমাজে যোগ দিয়াছেন। শেলা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য রীতিমত চলিতেছে। তথা হইতে দুই তিন জন বন্ধু লাইক্যানসেউএর সমাজের কার্য্য চালাইবার জন্য গত তিন মাস নিয়মিতরূপে প্রতি সপ্তাহে আসিয়াছেন। নানা কারণে মৌথার সমাজের অবস্থা ভাল নহে।

কয়েক দিন হইল রুসনসিং নামে একজন খাসিয়া বন্ধু প্রচার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার উদ্দেশে খাসিয়া মিশনে যোগ দান করিয়াছেন। তিনি অতিশয় ব্যাকুল, উৎসাহী এবং কষ্টসহিষ্ণু। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য স্বজাতীয়দের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা খাটিতেছেন এবং বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আমাদের চেরাপুঞ্জীর চিকিৎসালয়ের দিকে দিন দিন লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। প্রত্যহ অনেক পুরুষ ও রমণী এইখানে ঔষধ লইবার জন্য আসিয়া থাকেন। কেহ কেহ ১০।১২ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আসেন। গত তিন সপ্তাহে দেড় শতের অধিক লোক ঔষধের জন্য আসিয়াছিলেন। এখন হইতে এই চিকিৎসালয়ের জন্য কলিকাতা দাসাশ্রম হইতে ঔষধ পাওয়া যাইবে।

কিছুদিন হইল খাসিয়া ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতার কোনও বন্ধু অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তিকা প্রকাশের সকল ব্যয় ভার বহন করিয়াছেন। খাসিয়াগণ আগ্রহের সহিত ইহা গ্রহণ করিতেছে।

চেরাপুঞ্জীর অন্তর্গত নংরিম নামক গ্রামে একটী গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। তথায় শীঘ্র একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইবে। সময়ে সময়ে এই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করা হইয়া থাকে। তাহাতে বহুসংখ্যক পুরুষ ও রমণী উপস্থিত হইয়া থাকেন।

চেরাপুঞ্জী প্রচারআশ্রম-নির্ম্মাণ এক প্রকার শেষ হইয়াছে। কিন্তু তাহার টীনের ছাদ করিতে এবং একটী উপযুক্ত সমাজমন্দির নির্ম্মাণ করিতে এবং মৌসমাই ও চেরাপুঞ্জী সমাজগৃহের জন্য যে ঋণ হইয়াছে, তাহা পরিশোধ করিতে অনেক অর্থের আবশ্যক। ব্রাহ্মগণ এবং ব্রাহ্মসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষগণ কি এই শুভকার্য্যের জন্য কিঞ্চিৎ সাহায্য করিবেন না?

কলিকাতা ছাত্রসমাজের উৎসব—গত ২৪এ ও ২৫এ আষাঢ় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, ছাত্রসমাজের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিন, সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় "সেবাধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র উপাসনা করিয়াছিলেন, অপরাহ্নে শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল এবং সায়ংকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা করিয়াছিলেন ও উপদেশ দিয়াছিলেন।

পত্রপ্রেরকগণের প্রতি—তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিবার জন্য আমাদের হস্তে অনেকগুলি পত্র আসিয়াছে। তত্ত্ব-কৌমুদীর কলেবর ক্ষুদ্র। স্বীয় স্বীয় বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে না লিখিলে স্থানের সংকুলন হয় না। যাহা হউক প্রকাশযোগ্য পত্রগুলি ক্রমে ক্রমে মুদ্রিত হইবে। লেখক মহাশয়গণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

৮ম সংখ্যা
১৬শ ভাগ।

১৬ই শ্রাবণ, সোমবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

একতা।

আয় ভাই কাছে কাছে দাঁড়ায়ে সকলে,
প্রাণে প্রাণে জাগুক শকতি;
বিবাদ বিচ্ছেদে দেখ দিন যায় চলে,
দিনে দিনে বাড়িছে দুর্গতি।

পেয়েছ যে মহামন্ত্র সাধিতে যে কাজ,
সেই মন্ত্র জাগাও হৃদয়ে;
পরিহরি অভিমান, বৃথা ভয় লাজ,
সেই মন্ত্রে যাও এক হয়ে।

দেখাও জগতে, সেই মন্ত্রের সাধনে
পাসরিতে পার হে আপনা;
সর্ব্বস্ব ভেটিতে পার প্রভুর চরণে,
ধন জন সুখের বাসনা।

একতা দৃঢ়তা বিনা কবে সৈন্যদল
রণক্ষেত্রে জিনিছে সংগ্রাম?
একতা দৃঢ়তা বিনা কবে ধর্ম্মবল
জিনিয়াছে এই ধরাধাম।

একতা দৃঢ়তা তবে কর হে সাধনা
ক্ষুদ্র ভাব রাখিয়া পশ্চাতে;
পরিহরি সুখ, স্বার্থ অসার জল্পনা,
সঁপ নিজে ব্রহ্মের কৃপাতে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

একতা ও দৃঢ়তা—জগতে সর্ব্বত্র দেখিতেছি, একটা বিষয়ের প্রতি যদি দশজনের গাঢ় অনুরাগ জন্মে তাহা হইলে, তাহাদের ব্যক্তিগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাহারা এক সঙ্গে কাজ করিয়া থাকে। অনেক পল্লীগ্রামে সময়ে সময়ে বারইয়ারি হয়। দশজন সমবয়স্ক বন্ধু একত্র হইয়া স্থির করে যে, সাধারণের নিকট চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটা পূজার উৎসব করিবে; কয়েক দিন যাত্রা, গান আমোদ প্রমোদ চলিবে; গ্রামের পুরুষ রমণী বালক বৃদ্ধ সকলেরই একটা কিছু নূতন দেখিবার, শুনিবার, বলিবার, কহিবার বিষয় হইবে; গ্রাম্য জীবনের সমভাবাপন্ন ভাব কয়েক দিনের জন্য একটু তিরোহিত হইবে। দশজন যুবক এইরূপ একটা সংকল্প হৃদয়ে লইয়া দলবদ্ধ হইল। পরস্পরের উৎসাহে পরস্পর উৎসাহিত। কে নেতা কে নীত এ চিন্তাই তাহাদের অন্তরে উদিত হয় না। কিরূপে কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে, এই চিন্তাই সকলের অন্তরে প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই তাহাদের মধ্যে এমন এক অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়, যাহাতে তাহারা অকাতরে শ্রম করে, পরস্পরের সাহায্য করে, যে যে প্রকার কার্য্যের উপযুক্ত সে সে প্রকার কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয়; কেহ বাঁশ কাটিতেছে, কেহ তাহা বহন করিতেছে, কেহ গৃহ নির্ম্মাতার কার্য্য করিতেছে, কেহ লোক ডাকিতেছে, কেহ মাটি কাটিতেছে। কে উৎকৃষ্ট কার্য্য করিতেছে, কে নিকৃষ্ট কার্য্য করিতেছে, এ গণনাই তাহাদের থাকে না। প্রসন্নচিত্তে শ্রম করে; প্রসন্নচিত্তে পরস্পরের ত্রুটী বহন করে; প্রসন্নচিত্তে একের ভ্রম প্রমাদ অপরে সংশোধন করিয়া লয়। তাহাদের মধ্যে কি মতভেদ উপস্থিত হয় না? কোনও বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক চলে না? নিশ্চয় এরূপ ঘটনা হয়। কিন্তু তাহাতে তাহাদের প্রেমের বিচ্ছেদ ঘটে না; কার্য্যের ও ব্যাঘাত হয় না। একজন অপর এক ব্যক্তিকে কর্কশ কথা বলিয়াছে, সে ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তিকে গিয়া বলিল—"দেখ ভাই কাণ্ডটা দেখেছ, আমাকে কি গালাগালিটা দিল। এমন লোকের সঙ্গে কাজ করিতে নাই?" তৃতীয় ব্যক্তি বলিল—"ছেড়ে দেও, ওর মেজাজটা একটু কড়া তা ত জানাই আছে, চল চল কাজটা সারিয়া আসা যাউক।" এই বলিয়া দুই জনে কাজটা সারিতে গেল। জিজ্ঞাসা করি আমরা কি এমনি অধম হইয়াছি, যে একটা বারইয়ারির উৎসাহে মানুষকে যতটা বাঁধিতে পারে, ব্রাহ্মধর্ম্মে ও ব্রাহ্মসমাজের হিতসাধন ব্রতে কি আমাদিগকে ততটাও বাঁধিতে পারে না? ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই যে আমরা সকলে যদি ব্রাহ্মধর্ম্মসাধন ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য অন্ততঃ সেরূপ উৎসাহী ও অনুরাগী হইতাম যেরূপ একটা বারইয়ারির ব্যাপারে মানুষ হইয়া থাকে,

তাহা হইলে আমরা অশেষ প্রকার বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক সঙ্গে থাকিয়া কাজ করিতে পারিতাম। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য যে মহৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, সামান্য একটু সমালোচনা, বা অপমান যে সহ্য করিতে পারিতেছি না, ইহাতেই প্রমাণ, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যরূপ মহৎ ব্যাপারটা অপেক্ষা আমাদের ক্ষুদ্র সুখ ও স্বার্থের প্রতি অধিক দৃষ্টি। অবশ্য মতগত গুরুতর পার্থক্য নিবন্ধন কোনও কোনও স্থলে একত্র কাজ করা কঠিন হইতে পারে; কিন্তু সেরূপ স্থলেও ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রেম প্রবল থাকিলে, সেই পার্থক্য নিবন্ধন হৃদয়ের প্রভেদ ঘটে না। এই জন্যই বলি, মুখে আমরা ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া যতই চীৎকার করি না কেন, মনে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রেম আমাদের অল্পই। কার্য্যে তাহার পরিচয় প্রতিদিন দিতেছি। আমরা ব্রাহ্মবন্ধুর কর্কশ কথা শুনিয়া কবে বলিতে পারিব—"আঃ ছেড়ে দেও, মানুষটার মেজাজ কড়া, চল কাজটা সারিয়া আসি?"

আবার যদি মনে করি, একাজটা প্রভু পরমেশ্বরের নির্দ্দিষ্ট কাজ; তিনি ইহার প্রেরক ও ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাহা হইলে কি লজ্জাই হয়! তাঁহার কাজে হাত দিয়া ও আপনাদের ক্ষুদ্রভাব ভুলিতে পারিতেছি না। তাঁহার প্রতি আমাদের এমনি প্রেম!

কর্ম্মযোগ—আমাদের এ কি দশা হইল, যদি নানা প্রকার কার্য্যে হাত দি, লোকে বলে "এত কাজ কাজ করিলে চলিবে কেন? ধ্যান ধারণাতে বস। কাজ কাজ করিয়া শুকাইয়া মরিও না।" আবার যদি কাজ কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া ধ্যান ধারণাতে বসি, লোকে বলে "যা, লোকগুলা কেবল আলস্যে দিন কাটায়।" এ যে সেই ঈশপ কথিত পিতা পুত্রের ঘোড়া বিক্রয়ের ন্যায় হইল, সকলকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া ঘোড়া বিক্রেতা কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। লোকের সন্তোষ সাধনের কথা দূরে থাক, আমাদের নিজের মনেই বোধ হয় একটা সাধনের পথ স্থির হইতেছে না। আমাদেরও মনে যেন এই ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে যে, ধ্যান ধারণা, ঈশ্বর-প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনের মধ্যে এক প্রকার বিরোধ আছে। যোগী অথবা প্রেমিক কখনও কর্ম্মী হইতে পারে না, এবং কর্ম্মী কখনও যোগী হইতে পারে না। অথচ একথা সত্য যে ঈশ্বরোদ্দেশে ও তাঁহারই আদেশে যে কার্য্য কৃত হয়, তাহা তপস্যা ও যোগের অঙ্গ স্বরূপ? তদ্দারা প্রবৃত্তি সকলকে নিয়মিত করে, কর্ত্তব্য জ্ঞানকে উজ্জ্বল করে; হৃদয়কে বিশুদ্ধ করে, এবং আত্মাকে পরিপুষ্ট ও সুমিষ্ট করে। কর্ম্ম যখন এই সুমিষ্ট ফল উৎপন্ন না করিয়া তিক্ত ফল উৎপন্ন করিতে থাকে, তখন বুঝিতে হইবে যে, সে কর্ম্মের ভিত্তি ধর্ম্মের ভিত্তি নহে। প্রকৃত ব্রাহ্মসাধকের জীবনে গভীর ধ্যান ধারণা ও অক্লান্ত কার্য্য এই দুইএরই সমাবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদিগকে ও এই আদর্শের অনুসরণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মের প্রীতি কর্ম্মের পোষক ও কর্ম্ম প্রীতির পোষক হইবে।

আত্মচিন্তা—সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে এবং স্তুতি নিন্দায় অবিচলিত থাকাই ধর্ম্ম জীবনের লক্ষণ। নদীর তরঙ্গে ক্ষুদ্র কাষ্ঠ খণ্ডকে উলট পালট করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু সুদৃঢ় পর্ব্বতের মূল দেশে তরঙ্গকে প্রতিহত হইতে হয়। নিয়তই দেখিতেছি মানুষ সংসার কর্তৃক পরিচালিত হয়। সংসারের ক্ষতি লাভ দ্বারা জীবন নিয়মিত হইয়া থাকে। যিনি সুন্দর গৃহে বাস করিতেছেন, দুবেলা নানাবিধ সুখাদ্য আহার করিতেছেন, যাঁহার অর্থের অভাব নাই এবং জীবনে আত্মীয় বিচ্ছেদ ঘটে নাই; সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্মান ও বিলক্ষণ আছে, তিনি পরম সুখী। হঠাৎ ইহার কোনও ব্যতিক্রম ঘটিলে,—যদি টাকাগুলি চুরি যায়, কিম্বা কাহারও মৃত্যু হয় অথবা দেশের লোকে সম্মানের পরিবর্ত্তে অসম্মান করে,—তবে তাঁহার সুখের উৎস শুকাইয়া যায়। চিন্তায় চিন্তায় তাঁহার শরীর ও স্বাস্থ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংসার যাঁহাদের সুখ শান্তি দাতা, তাঁহাদের অবস্থা নিশ্চয়ই এরূপ হইবে। সংসারের ইষ্টানিষ্টে তাঁহাদের মন সুখ দুঃখ ভোগ করিবে। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা সংসারস্তরের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন; সংসারের বাতাস তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। যে অবস্থায় সাংসারিক জীব কাঁদিয়া আকুল হয়, তাঁহারা সে অবস্থাতে পতিত হইলেও প্রশান্ত থাকেন। তাঁহারা স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যে স্থির থাকিয়া সমুদায় প্রশান্ত-চিত্তে বহন করেন। তাঁহাদের দৃষ্টি সেই সত্য ও মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি; সংসার তাঁহাদের লক্ষ্য নহে। যেমন খোসা ফেলিয়া দিয়া সুস্বাদ আম্র ভোজন করিতে হয়, খোসা কেহ খায় না, খোসার সহিত কোনও সম্পর্কও নাই, তেমনি এই সংসার আবরণের ভিতরে সেই জগজ্জননীকে যাঁহারা লাভ করিয়াছেন অথবা তাঁহার দিকে যাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা সুখ দুঃখের চঞ্চলতাকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া স্থির বস্তুকে ধারণ করেন। তাঁহাদের দৃষ্টি ভিতরের দিকে। আমরা কে কত টুকু ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইয়াছি, এই বিষয়ে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিব। উপাসনা, আলোচনা ধর্ম্মপুস্তক পাঠ বেশ চলিতেছে, লোকে দেখিয়া ভাবিতেছে "ইনি পূজনীয় ব্যক্তি, ইনি যথার্থই ঈশ্বর ভক্ত।" তিনি নিজেও হয়ত ভাবিতেছেন যে, হাঁ কিছু কিছু অগ্রসর হইতেছি বটে। কিন্তু যে দিন তাঁহার সুখের ঘরে আগ্ন লাগিল, পুত্র কিম্বা স্ত্রীটি মারা গেল, অথবা অন্য কোনও বিপদ আসিয়া পড়িল, সে দিন তিনি এমন অস্থির হইলেন যে, ঈশ্বরের নামও মুখে আনিলেন না। ইহাতেই টের পাওয়া যায়, মূল বস্তু বহু দূরে। যিনি প্রকৃত উপাসনাশীল, সংসার তাঁহার উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে না। যদি লোকে দেখিতে পায় যে, ব্রাহ্মগণ অতি তুচ্ছ কথায় রাগিয়া উঠেন, সামান্য ক্ষতিতেও তাঁহাদের মুখে বিষাদের গাঢ় কালিমা পড়ে, নিন্দাকারীকে শত্রু ভাবেন, তবে পৃথিবীর লোকে অবশ্যই বলিবে যে, "ইহারা যখন সকল বিষয়েই অপর সাধারণ লোকের মত রহিয়াছে, তখন ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া কেন বেড়ায়?" বাস্তবিক ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে সকল সাধু মহাত্মা সংসারের অতীত স্থলে বাস করিতেছেন, তাঁহারাই

এই ধর্ম্মের আদর্শ জগৎকে দেখাইতেছেন। তুমি ব্রাহ্ম, উপাসনা মন্দিরে গমন করিতেছ, হঠাৎ আসিয়া কেহ কানে কানে বলিল "মহাশয় আপনাকে অমুক ব্যক্তি বড়ই নিন্দা করিয়াছে। আপনার বিরুদ্ধে এই এই কুৎসিত কথা বলিয়াছে।" ইহা শুনিয়া যদি তোমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে, উপাসনা ক্ষেত্রে বসিয়া যদি তুমি ভগবানের দিকে না চাহিয়া সেই নিন্দাকারীর প্রতিহিংসার চিন্তাতে ব্যাপৃত হও,—তবে সাধারণ জীবন হইতে তোমার জীবনের বিশেষত্ব রহিল কোথায়? ধর্ম্মালোচনার সময় সৎসঙ্গেও যদি তুমি ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ বাণ ক্ষেপণ কর, অর্থাৎ সকল বিষয়ে সকল কার্য্যেই তুমি যদি সংসারের দাস হইলে, তবে উপাসনা করিয়া কি ফল হইল? প্রতি দিন প্রত্যেক ব্রাহ্মের এ সম্বন্ধে আত্মচিন্তা করা কর্ত্তব্য যে, তিনি সংসারের হস্ত হইতে কতটুকু রক্ষিত আছেন। ব্রাহ্মসমাজে যে কিছু নিন্দা, বিসম্বাদ অশান্তি দেখা যায়, তাহা এই সাংসারিক বুদ্ধি প্রবণতা হইতে উদ্ভূত। যাহারা সংসারের দাস তাহাদের মধ্যে কলহ বিবাদ বিসম্বাদ অশান্তি চিরদিনই বর্ত্তমান থাকিবে। পৃথিবী যথার্থই স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়, যদি সাধকগণ সংসারের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন। পরমেশ্বর কৃপা করুন, আমরা দিন দিন এই পথে অগ্রসর হই।

অবিরাম গতি—পর্ব্বত হইতে ধীরে ধীরে স্রোতস্বতী অবিরাম গতিতে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। তীরে শ্যামল শস্যক্ষেত্র, উপরে অনন্ত আকাশ। সন্ধ্যাসমাগমে নদীতীরে যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারা তদানীন্তন স্রোতস্বতীর পরম রমণীয় শান্ত ও প্রফুল্ল মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া আনন্দ রসে আপ্লুত হইয়া থাকেন। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের হেমাভকিরণ নদী বক্ষে নিপতিত হওয়ায় বারি রাশিকে স্বর্ণ জড়িত মখমলের ন্যায় দেখাইতেছে। তীরস্থ বৃক্ষ সমূহের স্থির প্রতিচ্ছায়া নির্ম্মল জলের অভ্যন্তরে মনোহর দৃষ্ট হইতেছে। চতুর্দ্দিকেই মূর্ত্তিমতী নিস্তব্ধতা। অকস্মাৎ এই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া খরবেগে বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তপস্বীর ন্যায় স্থিরোপবিষ্ট বৃক্ষ-শ্রেণী ঝড়ের আঘাতে দুলিতে লাগিল। ভয়ানক তরঙ্গ শ্রেণী উত্থিত হইয়া ভীম গর্জ্জনে প্রবাহিত হইতে লাগিল। স্থির যোগিনী স্রোতস্বতী উন্মাদিনীর ন্যায় তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল। আবার কিয়ৎকাল পরে সে নৃত্য থামিয়া গেল। আধ্যাত্মিক জীবনেও আমরা এরূপ দেখিতে পাই। ঈশ্বর প্রীতিতে একটা অস্খলন বাহিনী গতি থাকে, আবার সময়ে সময়ে উচ্ছ্বাসও হয়। এক শ্রেণীর সাধকের হৃদয় ঐ স্থির অচঞ্চল স্রোতস্বতীর ন্যায় নিয়ত ভগবানের দিকে ছুটিতেছে। বাহিরে তাঁহাদের ভাবের কোনই প্রকাশ দেখা যায় না। তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা, ভাব, উৎসাহ উদ্দীপনা নিস্তব্ধ, স্থির স্রোতস্বতীর ন্যায়। তাহা গর্জ্জন-বিহীন, শব্দ-বিহীন, তরঙ্গ-বিহীন। আর এক শ্রেণীর সাধক বাহ্যিক ভাবের জন্যই লালায়িত। যে দিন তাঁহারা নৃত্য করিতে পারিলেন না, যে দিন উপাসনাকালে চক্ষের জল পতিত হইল না এবং তাবাবেশে অঙ্গ সঞ্চালন হইল না, সে দিন যেন তাঁহাদের উপাসনাই হইল না। ভাবের মাদকতা ভিন্ন যেন তাঁহাদের প্রাণ সজীব থাকে না।

আধ্যাত্মিক জীবনে এরূপ ঘটনা নিত্যই ঘটিয়া থাকে। কখন শুষ্কতা, কখন মিষ্টতা, কখন উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়া সাধককে যাইতে হয়। যাঁহারা ভাবের প্রয়াসী, যে দিন ভাবের অভাব হয়, সে দিন তাঁহারা শুষ্ক হন। যাঁহারা নিয়তই উপাসনার মধুর আস্বাদ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মিষ্টতার অভাব হইলে উপাসনা হইল না বলিয়া স্থির করেন। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীর হৃদয়ের অবস্থা অন্য রূপ। তিনি দেখেন, তাঁহার প্রভু নিয়তই নিকটে আছেন। মা যে দিন সন্তানকে আদর না করেন, সে দিন কি সন্তান-স্নেহ তাঁহার হ্রাস হইয়া থাকে? যখন আদর করেন, তখনই কি স্নেহ বলবান হয়? বাস্তবিক ভাবের মিষ্টতা না পাইলেও ভক্ত-হৃদয় অবসন্ন হয় না। ঐ অবিরাম বাহিনী নদীর ন্যায় তাঁহার চিত্ত নিয়তই ভগবানের দিকে ছুটিতেছে। তিনি মিষ্ট, তিক্ত, আনন্দ, নিরানন্দ কিছু বোঝেন না। এই রূপ অবিরাম বাহিনী জীবন নদী কখনও আধ্যাত্মিক অবসাদ অনুভব করে না। নিয়তই তাহাতে স্ফূর্ত্তি। তাঁহাদের চিত্তবিক্ষেপ হয় না। এরূপ জীবনই আদর্শ স্থানীয়।

শান্তম্—প্রাচীন ঋষিরা বলিয়াছেন "শান্তমুসাসীত" শান্ত ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা কর। আধুনিক সাধক বৈষ্ণবগণ ও পঞ্চ সাধনের মধ্যে শান্তভাবেই প্রথম সাধন করিতে বলিয়াছেন। তাঁহারা শান্তভাব সাধনের দ্বারা স্বরূপেতে উপস্থিত হন তৎপর অন্যান্য ভাবের সাধনেতে তাঁহাকে সম্ভোগ করেন। সাধনরাজ্যে যাঁহারা চলিয়াছেন বা চলিতেছেন তাঁহারাই এইটী বেশ অনুভব করিয়াছেন যে, চিত্তের প্রশান্ততা ব্যতীত সেই শান্তম্ ঈশ্বরেতে প্রবেশ করিতে কেহ পারে না। তাই সকল শ্রেণীর সাধকগণের পক্ষেই সর্ব্ব প্রথমে চিত্তের প্রশান্ততা অভ্যাস করিতে হয়। চিত্তের স্থিরতা ভিন্ন এই মহৎ ব্যাপার জীবনে সম্পন্ন করা কখনই সম্ভবপর নয়। চিত্তের প্রশান্ততা লাভ করিতে হইলে অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন, যত অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের শুদ্ধতা জন্মিবে, তত চিত্ত সংযত হইয়া আসিবে, তখন চিত্তের প্রশান্ততার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর-স্বরূপ আত্মার নিকট প্রকাশ হইতে থাকে। এইরূপে স্বরূপ রাজ্যে যত অগ্রসর হইবে ততই ঈশ্বরোপাসনা মধুর হইবে। যাঁহারা যত স্বরূপরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারা তত উপাসনাতে সিদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষে ভগবদারাধনার ন্যায় মিষ্ট দ্রব্য আর কিছু নাই। যত দিন তিনি আমাদের নিকট মধুর না হইতেছেন, ততদিন উপাসনাতে আমাদের প্রাণ ডুবিয়া যাইবে না, এবং এই কার্য্যকে শ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া বিশ্বাসও করিতে পারিব না; সুতরাং ইহা ধরিয়াও থাকিতে পারিব না। যখন তিনি মধুর হইবেন যখন চিত্ত তাঁহাতে ডুবিবে তখন এই সত্য অনুভব করিতে পারিব। তাঁহার নামে যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয়ভার। বাস্তবিকই তাঁহার নামে তখন শোক তাপ থাকে না, তখন হাজার নির্য্যাতন কর প্রাণের

সেই মধুময় ভাব, সেই আনন্দময় ভাব, সেই শান্তিময় ভাব আর কিছুতেই কাড়িয়া লইতে পারিবেনা। তখনই মানুষ যাহা সত্য বুঝে, প্রাণ দিয়া অথচ প্রশান্ত ভাবে সে কার্য্য সমাধান করিতে পারে। যীশু এই শান্তিময় রাজ্যে প্রবেশ করিয়াই জীবনদান করিয়াছেন, বুদ্ধ এই শান্তিময় রাজ্যে প্রবেশ করিয়া সব বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছিলেন, এখনও যাঁহারা আপনার প্রভুকে আদর্শ করিয়া জীবনপথে চলিতেছেন তাঁহারা এই কথা বলিতেছেন :—"আমরা যেন তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া নির্যাতনের মধ্যেও শান্তির সহিত আপনার কাজ করিতে পারি এবং নির্যাতনকারী-দিগকে প্রেম করিতে পারি। শান্তিহারা যেন না হই।

প্রার্থনা সম্বন্ধে সতর্কতা—একজন ভিক্ষুক ধনীগৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষা করিতে আসিয়া আম চাহিল। জ্যৈষ্ঠ মাস সকলে আম খায়, গরিব বলিয়া তাহার কি আর আম খাইবার সাধ হয় না? সে আপন আকাঙ্ক্ষা ধনীর দ্বারে প্রকাশ করিল। কিন্তু বাড়ীর লোকেরা তাহাকে আম না দিয়া এক-মুষ্টি চাউল প্রদানের ব্যবস্থা করিল। গরিব কি করে, তাহা লইয়াই চলিয়া গেল। এই ভিক্ষুকের দশা আমাদের জীবনে নিয়ত ঘটিতেছে। উপাসনার সময় ঈশ্বরের দ্বারে আমরা কত উচ্চ উচ্চ বিষয়ের প্রার্থনা করি। কিন্তু আমাদের অপেক্ষা আমাদের অবস্থা যিনি ভাল জানেন, তিনি আমাদিগের যাহা পাওয়া উচিত তাহাই প্রদান করেন। ধনীর ভূষণ বসন দেখিয়া গরিবের তাহার প্রতি লোভ উপস্থিত হইলে, যেমন সে অবস্থার অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা করিয়া শেষে ক্ষুব্ধ হয়, মনস্তাপ সহ্য করে। আমাদেরও সেই দশাই ঘটে। সাধু সজ্জনের উন্নত অবস্থা দেখিয়া মনের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া একেবারে তাহা পাইবার জন্য প্রাণে আকাঙ্ক্ষা হয়—এবং প্রার্থনাও উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহা পাইবার মত অবস্থা নয় বলিয়া পাই না। এই প্রকার অধিক দিন হইতে থাকিলে ক্রমে প্রার্থনার প্রতি অনাস্থা জন্মিতে থাকে। প্রার্থনা করিয়া করিয়া বিফলমনোরথ হইলে শেষে আর প্রার্থনা করিবার প্রবৃত্তি হয় না। অবিশ্বাস আসিয়া প্রাণকে আক্রমণ করে, এজন্য সর্ব্বদাই আত্ম-দৃষ্টিকে প্রবল রাখা কর্ত্তব্য। লোভ পরবশ হইয়া না চাহিয়া আবশ্যক জ্ঞানে চাওয়াই উচিত এবং সে ভাবে চাহিলেই পাওয়া যায়।

অজ্ঞানতা নিবন্ধন যেমন অবস্থার অতিরিক্ত বস্তু চাওয়া হয়। আবার ইচ্ছা করিয়াও সময় সময় তেমনি অবস্থার অতিরিক্ত বস্তু প্রার্থনা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে প্রবল দেখা যায়। বিশেষতঃ যখন সজন উপাসনা হয়, তখন এইরূপ ঘটনা প্রায় ঘটিতে দেখা যায়। আরাধনা যখন হইয়া গেল, তখন ত প্রার্থনা করিতেই হইবে। কারণ নিয়ম আছে আরাধনার পরে প্রার্থনা করিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় অনেক সময় কল্পনার সাহায্যে যাহা বাস্তবিক তেমন প্রার্থনীয় বা আবশ্যক নয় তাহাও প্রার্থনা করা হয়। যিনি উপাসনা করেন, তাঁহার সামান্য ক্রটীটি যাহা আছে, যাহার জন্য প্রাণে সংগ্রাম হইতেছে, তিনি সেই সামান্য বিষয় প্রার্থনা করা অনেক সময় উচিত মনে করেন না। কারণ তদ্দ্বারা উপাসকগণের নিকট কিয়ৎ পরিমাণে হীন হইবার আশঙ্কা আছে। এই অবস্থায় লোকের নিকট হীন হইবার ভয়কে অতিক্রম করা সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না, এজন্য প্রার্থনায় বিষয় সকল সৃষ্টি করিয়া লওয়া হয়। সুতরাং এই প্রকার সৃষ্টি করা প্রার্থনা যে সফল হইবে না, তাহা ত সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহাদ্বারা একদিকে যেমন কপটতা বৃদ্ধি পায়, তেমনি যে ভয়ে লোকে এরূপ প্রার্থনা করে তাহার হস্ত হইতেও নিষ্কৃতি লাভ হয় না। কারণ লোকে তাহার জীবনের গতি অন্য রূপ দেখিয়া এবং প্রার্থনার বিষয় লাভের জন্য তেমন আগ্রহ বা চেষ্টা না দেখিয়া তাহার প্রতি হতশ্রদ্ধ হইতে থাকে। শরীরের সম্বন্ধে যেমন ক্ষুধা, আত্মার পক্ষে যদি কোন অভাব তেমনি কষ্টদায়ক না হয়, শরীরের ক্ষুধা শান্তি না হইলে যেমন ছটফট করিয়া বেড়াইতে হয়, শরীর অবশ হইয়া আসে, ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে হয়; যতক্ষণ না আহারীয় পাওয়া যায় ততক্ষণ আর কিছুতেই উদ্বেগের শান্তি হয় না; আত্মার পক্ষে অভাব বোধ সেইরূপ অশান্তিকর তীব্র যাতনাদায়ক না হইলে বাস্তবিক সরল প্রার্থনা বাহির হয় না। সেরূপ ভাবে প্রার্থনা বাহির না হইলে প্রার্থনা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনাই বা কি? শারীরিক ব্যাধির ভাণ করিলে যেমন চিকিৎসক ঔষধের ব্যবস্থা করেন না, যদি বা করেন তাহা তাহার চৈতন্যোদয়ের উপযোগী করিয়াই করেন। আমাদের অন্তর্যামী দাতা কি তাহা করেন না? প্রার্থনা অভাব মোচনের নিমিত্ত। অভাব বোধ না থাকিলে অকারণ প্রার্থনা করিয়া কি লাভ? তখন আত্মার যাহাতে চৈতন্য আসে, অভাব যথেষ্ট আছে অথচ তাহার জ্ঞান নাই, যাহাতে এরূপ অসাড়তা নষ্ট হয়, তাহারই জন্য প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। প্রার্থনার সময় প্রবল ব্যাকুলতার সহিত নানা কথা উচ্চারণ করিয়া যদি কিছুকাল পরেই আমোদ প্রমোদে রত হওয়া যায়, প্রার্থনার বিষয় লাভের পূর্ব্বেই যদি তাহার জন্য প্রাণে কোন আকাঙ্ক্ষা না থাকে, এমন কি, কি প্রার্থনা করিয়া আসিলাম, তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত না থাকে, তাহা হইলে এমন বিকৃত ভাবাপন্ন প্রার্থনা না করা অপেক্ষা স্থিরভাবে আত্ম-দৃষ্টির সহিত নিজের অবস্থা অনুভব করিবার প্রয়াসী হওয়াই কি কর্ত্তব্য নয়? ব্যাধি অনেক প্রকারের দেখা যায়, অনেক সময় প্রার্থনাও ব্যাধির মধ্যে গণ্য হইয়া পড়ে। এ প্রকার ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা না পাইলে কল্যাণের আশা কম। এজন্য প্রার্থনা যাহাতে সরল, স্বাভাবিক, ও অভাবের অনুরূপ হয়, সে বিষয়ে আমাদের যত্নশীল হইতে হইবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

একতার উপায় কি?

সভ্য জগতের সর্ব্বত্রই এক ধ্বনি শ্রুত হইতেছে একতা একতা—একতা। একতা অতি মিষ্ট; একতা দেখিলে ও লাভ করিলে পরম আনন্দ। একতা ভিন্ন মানব সমাজ কোথায় থাকিত? বিষয় বাণিজ্যের উন্নতি কিরূপে হইত? মানব-

শক্তির অদ্ভুত কীর্ত্তি সকল কিরূপে প্রকাশ পাইত? বর্ত্তমান সময়ের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন বলিয়াছেন যে, অসভ্য ও বর্ব্বর অবস্থা এবং সভ্যতার মধ্যে এই প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, যে অসভ্য বর্ব্বরগণ একতার মূল্য জানে না, সভ্য জাতি সকল তাহা অবগত আছে। ইহা ত সত্য কথা, বনে যে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদগণ বিচরণ করিতেছে, তাহারা যদি একতাসূত্রে বদ্ধ হইতে জানিত, তাহা হইলে মানবগণ কি তাহাদের উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হইত? জানে না, পারে না, বলিয়াই তাহারা ক্রমশঃ লোপ প্রাপ্ত হইতেছে।

এই একতার মূল্য প্রাচীনকালের পণ্ডিতগণ বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের যে উপদেশ তাহা এদেশের সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট সুপরিচিত।

"অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈ গুর্ণত্বমাপন্নৈর্ বধ্যন্তে মত্ত দন্তিনঃ॥"

"অতি ক্ষুদ্র বস্তু সকলকেও যদি সমবেত করা যায়, তদ্দ্বারা মহৎ কার্য্য সাধিত হইতে পারে। তৃণ অতি ক্ষুদ্র কিন্তু তাহার সমষ্টি দ্বারা কাছি প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা মত্ত হস্তীকেও আবদ্ধ করা যায়।"

কিরূপ সংক্ষেপে ও সারগর্ভ বাক্যে একতার মূল্য ব্যক্ত করা হইয়াছে! সভ্যতার উন্নতি সহকারে এই একতা প্রবৃত্তি সর্ব্বত্র বর্দ্ধিত হইতেছে। যে সকল ধর্ম্মসমাজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া বিবাদ ও বিদ্বেষে কালাতিপাত করিতেছিলেন, তাহারাও বর্ত্তমান সময়ের একতা-প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া আপনাদের প্রাচীন সংকীর্ণতা পরিহার পূর্ব্বক সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু একদিকে যেমন মানব-হৃদয়ে স্বাভাবিক একতাপ্রবৃত্তি আছে, তেমনি অপর দিকে চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতা-প্রবৃত্তিও আছে। এই স্বাধীনতা-প্রবৃত্তি এত প্রবল, যে ইহাকে আবদ্ধ করিবার জন্য, রাজা, গুরু পুরোহিতগণের সহস্র চেষ্টা বিফল হইয়াছে। জ্ঞানরাজ্যে, বিষয় বাণিজ্যে মানবচিন্তার স্বাধীনতা নিবন্ধন যে সহস্রপ্রকার বৈচিত্র সংঘটিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। কারণ সেখানে কেহই মানবচিন্তাকে নিয়মিত করিবার প্রয়াস পায় না; সকলেই স্বাধীনভাবে চিন্তা করে ও কার্য্য করে। সুতরাং বৈচিত্র্য সংঘটিত হওয়া অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য। কিন্তু ধর্ম্ম-বিষয়ে মানব অপর পথ অবলম্বন করিয়াছে। জীবনের অপর-অপর বিভাগে যে চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতা অবাধে দিয়াছে, ধর্ম্মবিষয়ে সে স্বাধীনতা দিতে সমর্থ হয় নাই। ঈশ্বর ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তিনি মানবের মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, এই মূলগত সংস্কার ও বিশ্বাস নিবন্ধন বার বার মানবের ধর্ম্ম-চিন্তাকে নিয়মিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় বেদে বা বাইবেলে বা কোরাণে লিপিবদ্ধ আছে। যাহার চিন্তা সে পথ পরিত্যাগ করে সে অপরাধী, সে পাপী। "নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ"—যে বেদনিন্দক সেই নাস্তিক। এইরূপ শাসনের দ্বারা মানুষের স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিয়া একতা স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে, ইউরোপ প্রভৃতি দেশে এই একতা স্থাপনের উদ্দেশে রাজবিধি সকল প্রণীত হইয়াছে, বিশেষ আদালতের সৃষ্টি হইয়াছে, মানুষকে স্বাধীন-চিন্তার অপরাধে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে; ধন সম্পদে বঞ্চিত করা হইয়াছে, জলন্ত চিতানলে জীবন্ত দগ্ধ করা হইয়াছে। তথাপি কেহ মানব মনকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই, চিন্তা ও কার্য্যের সম্পূর্ণ একতা স্থাপনে সমর্থ হয় নাই। অধিক কি সমুদয় খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের লোক বাইবেল গ্রন্থকে অভ্রান্ত ও ঈশ্বর-প্রণীত গ্রন্থ বলিয়া মনে করে, অথচ ইংলণ্ডের ন্যায় একটী ক্ষুদ্র দেশে প্রায় দুইশত প্রকার খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় আছে, ইহাঁরা পরস্পরের সহিত উপাসনাতে, ধর্ম্মসাধনে, ও জনহিতকর কার্য্যে সম্মিলিত হন না। বিদেশেই বা গমন করি কেন? এই ভারতবর্ষে কত প্রকার হিন্দু সম্প্রদায় আছে, তাহা যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা একবার পরলোকগত অক্ষয়-কুমার দত্ত মহাশয়ের প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নামক গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ইহারা সকলেই হিন্দু উপাসক সম্প্রদায়, সকলেই বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন অথচ চিন্তা ও কার্য্যে,সাধনে ও অনুষ্ঠানে কি বিচিত্রতা!! মানবমনকে নিয়মিত করিবার জন্য, চিন্তা ও কার্য্যের একতা উৎপাদনের জন্য শাস্ত্ররূপ শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল! কৈ, সে একতা ত স্থাপিত হইল না!

এখন প্রশ্ন এই, তবে ব্রাহ্মগণ কিরূপে আপনাদের মধ্যে একতা স্থাপন করিবেন? তাঁহারা অভ্রান্ত গুরু ও অভ্রান্ত শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না। মানবের চিন্তা ও কার্য্যকে নিয়মিত করিবার জন্য যে সকল রজ্জু উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহাও তাঁহারা ছিন্ন করিয়াছেন, তবে আর কিরূপে পরস্পরকে আবদ্ধ রাখিবেন? কিরূপে মত ও আচরণের বিচিত্রতা নিবারণ করিবেন? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, যে একতার অর্থ বিচিত্রতার অভাব তাহা স্থাপন করা ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য নহে এবং সম্ভবও নহে। এইরূপ একতা স্থাপন করিতে গিয়াই পৃথিবীর মহাজনগণ ঘোর ভ্রান্তির কার্য্য করিয়াছেন, মানবসমাজের উন্নতির পথে অর্গল পাত করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের এই ভ্রান্তি দেখিতে পাই যে, তাঁহারা কেবল মাত্র মানবের ধর্ম্মস্পৃহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই, সেই সঙ্গে সঙ্গে এক একটী সাধনপ্রণালী ও আইন দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এবং সেই সকল বিধি যাহাতে মানব লঙ্ঘন না করে সে জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। মহম্মদ কেবল একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া ও পৌত্তলিকতার দোষ কীর্ত্তন করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি নিজে যে কিছু সামাজিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে সত্য বলিয়া অনুভব করিলেন, সমগ্র মানবজাতিকে চিরদিনের জন্য সেই পথে আনিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। এবং সেই জন্যই কোরাণকে ঈশ্বর প্রদত্ত অভ্রান্ত শাস্ত্র ও আপনাকে "আখিরি প্যাগম্বর" বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহার ফল এই হইল যে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইতেছে অথচ পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ পুরুষ ও রমণীর চিত্ত তাঁহার হস্ত-খাত খালের মধ্যে পড়িয়া আছে, স্বাধীন ভাবে চিন্তা ও কার্য্য করিতে সাহস করিতেছে না। কিন্তু এত করিয়াও

কি তিনি চিন্তা ও কার্য্যের বৈচিত্র্য সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? মুসলমানদিগের যে সকল বিভিন্ন সম্প্রদায় তাহারাই এই উক্তির সাক্ষী।

তবে ব্রাহ্মসমাজ কিরূপ একতার প্রার্থী। বিচিত্রতার মধ্যে যে একতা তাহাই ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনীয়। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সাধনগত, শিক্ষাগত, রুচিগত, মতগত সহস্রপ্রকার বিচিত্রতা থাকিবে, অথচ সকলে একদলে বদ্ধ থাকিবেন, একসঙ্গে কার্য্য করিবেন ও এক উদ্দেশ্যের অনুসরণ করিবেন। ইহা কি সম্ভব? জনসমাজের পরস্পর বিচ্ছিন্ন প্রাণিপুঞ্জ যখন একত্র কার্য্য করিবার জন্য সম্মিলিত হয়, তখন তাহাদের সম্মিলনের একটা ভিত্তি থাকে। নানা বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও একটা বিষয়ে মিলন থাকে:—সেই ভূমির উপরে সকলে দাঁড়ায়। যতক্ষণ সেই মিলনের স্থানে বিরোধ না ঘটে ততক্ষণ তাহারা একত্র থাকিয়া কার্য্য করে। মনে কর একটী সুরাপান নিবারণী সভা হইয়াছে—তাহাতে আস্তিক আছে,—নাস্তিক আছে, আমিষাশী আছে, নিরামিষাশী আছে, ত্রীশ্বরবাদী আছে, একেশ্বরবাদী আছে, ইহাঁরা সকলে পরস্পরের পার্থক্য জানিয়াই সম্মিলিত হইয়াছেন, এবং পার্থক্য সত্ত্বেও কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদের মূলমতে ও মূল-উদ্দেশ্যে একতা আছে। ব্রাহ্মসমাজকেও এইরূপ ভূমির উপরে একতার ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের মূল মতগুলির সহিত ও ইহার মূল উদ্দেশ্যের সহিত যাঁহাদের একতা থাকিবে, তাঁহারা সকলে একত্রে বাস ও কার্য্য করিবেন। ঐ মূলমত ও মূল-উদ্দেশ্যের অতিরিক্ত যিনি যাহা সাধন ও প্রচার করুন, তাহা করিতে দিতে হইবে, ও তাহা সত্ত্বেও তাহাদিগকে আপনার লোক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

এই স্থলে কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন। ব্রাহ্মসমাজের মূলমত ও মূল-উদ্দেশ্য বিষয়েই যদি মতান্তর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে একতা লাভের উপায় কি? ইহার উত্তর এই আমরা বিশ্বাস করি ব্রাহ্মসমাজের মূলমত ও মূল-উদ্দেশ্য জানিতে কাহারও বাকি নাই। যদি সে বিষয়ে কাহারও সংশয় থাকে, তবে তাহারও উপায় আছে। ব্রাহ্মদিগের অধিকাংশের মতে মূল মত ও মূল উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লও। লইবার পর সে বিষয়ে যাঁহাদের একতা তাঁহাদের সকলকে ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার কর, তাহার অতিরিক্ত যদি কেহ মানেন বা করেন তন্নিবন্ধন তাঁহাকে ব্রাহ্মনাম হইতে বঞ্চিত করিতে যাইও না। যাঁহারা ঐ অতিরিক্ত মূলমতের কিছু মানেন, এবং তন্নিবন্ধন নির্যাতন সহ্য করেন, তাঁহাদের প্রতিও পরামর্শ এই:—তোমরা আপনাদিগের মত ও ভাব পরীক্ষা দেখ, যদি দেখ যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে তোমাদের একতা আছে, তবে তোমরা আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া জান ও ঘোষণা কর। কাহারও কথায় কর্ণপাত করিও না। কিন্তু সহস্র বাধা সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকে পরিত্যাগ করিও না; ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরে দাঁড়াইও না একতার ব্রত সকলে গ্রহণ কর। প্রেমের প্রথম সোপান উদারতা। একত্র বাস কর, একত্র কার্য্য কর, উদার ভাবে পরস্পরের পার্থক্য বহন করিতে শিক্ষা কর, কালে প্রেম জন্মিবে।

ব্যাখ্যান রত্নাবলী।

(২৯ জুলাই (১৮৯৩) সাধনাশ্রমে বিবৃত)

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব॥"

ভগবদ্গীতা, ৭ম অধ্যায়, ৭ শ্লোক।

অর্থ—"হে ধনঞ্জয় আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। সূত্রে মণি সকল যেরূপ সন্নিবিষ্ট থাকে, এই সমুদয় জগৎ সেইরূপ আমাতে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।"

মণি সকল যখন সূত্রের দ্বারা একত্র বদ্ধ হইয়া মণিমালিকা প্রস্তুত করে, বা পুষ্প সকল যখন সূত্রের দ্বারা একত্র সন্নিবদ্ধ হইয়া মালারূপে পরিণত হয়, তখন আমরা তাহার অভ্যন্তরে কি দেখিতে পাই? মালাতে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে মণি সকল পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল, পরস্পরের সহিত অসম্বদ্ধ ছিল, এক সূত্রের দ্বারাই তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইল; তাহারা এক দেহের অঙ্গরূপে পরিণত হইল। সূত্রই তাহাদের একত্ব সম্পাদনের মূলীভূত কারণ। আজ যদি সূত্র ছিন্ন হয় তৎক্ষণাৎ তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। অতএব সূত্র মালার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান পদার্থ, সূত্র না থাকিলে, মালার মালাত্ব হয় না। অথচ যে সূত্র এত উপকারী, যে সূত্র এত প্রয়োজনীয়, যে সূত্র একত্ব সম্পাদক, সেই সূত্রকে কেহ দেখিতে পায় না, তাহা সর্ব্বদা চক্ষুর অন্তরালেই থাকে।

ঈশ্বরকে এই ব্রহ্মাণ্ডের যাবৎ বস্তুর মধ্যে সূত্র স্বরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার দ্বারাই ইহার একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যাবৎ পদার্থ এক দুশ্ছেদ্য-বন্ধনে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। একটী তৃণ কণার সহিত জল, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী প্রভৃতি যাবৎ ভূত ও সমগ্র জড় জগৎ গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবী খাদ্য দিতেছে ও রস যোগাইতেছে। অগ্নি উত্তাপ দিতেছে ও বায়ুপোষণ করিতেছে, সূর্য্য বর্ণ ফলাইতেছে, এইরূপে যে কোন পদার্থের কথা চিন্তা করা যায়, দেখিতে পাই যে তাহা ব্রহ্মাণ্ডের অপরাপর পদার্থের সহিত নানা প্রকার সম্বন্ধে আবদ্ধ। অতএব দেখিতেছি এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ সূত্রহীন মালার পুষ্প সকল বা মণিগণের ন্যায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা অসম্বদ্ধ নহে। কিন্তু মালার অন্তর্গত মণিগণের ন্যায় পরস্পরের সহিত আবদ্ধ ও এক দেহের অঙ্গীভূত। কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে মালার সূত্র কে? সে বস্তু কোথায় যাহাদ্বারা ইহারা পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ রহিয়াছে এবং যাহাতে ইহাদের একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে? সে বস্তু, ব্রহ্ম বস্তু। এই চিন্ময় ব্রহ্মসত্তা নয়নের অন্তরালে থাকিয়া এবং জড় ও চেতনের মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া সমুদায়ের মধ্যে একত্ব রক্ষা করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ের একজন চিন্তাশীল পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, এই জগৎ যে এক জ্ঞানশীল শক্তি দ্বারা শাসিত তাহার প্রমাণ এই যে ইহার ক্ষুদ্র ও মহৎ যাবৎ পদার্থ ঘনিষ্ট সম্বন্ধে

পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ। একের শাসনাধীন না থাকিলে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের এরূপ একতা এবং সেই লক্ষ্যসিদ্ধি বিষয়ে বিবিধ বস্তুর সাহায্য কখনই দেখিতে পাওয়া যাইত না। যখন দেখি যে পোষ্ট আফিস টেলিগ্রাফ আফিস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আফিসের মধ্যে এমন যোগ রহিয়াছে, যে পরস্পরের সহায়তায় একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে, তখন যেমন বুঝিতে পারি যে, তাহারা একই গবর্ণমেণ্টের অধীন, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের বস্তু সকলের মধ্যে সম্বন্ধের ঘনিষ্টতা লক্ষ্যের একতা ও সেই লক্ষ্য সাধনে পরস্পরের সহায়তা দেখিয়াই সহজেই প্রতীতি করিতে পারি যে ঐ সকল বস্তু এক শক্তি দ্বারা নিয়মিত, ও একই পরামর্শের অধীন। অতএব একথা অতীব সত্য যে, সেই চিন্ময় পুরুষই মালাস্থিত সূত্রের ন্যায় জড় ও চেতনের মধ্যে নিহিত থাকিয়া তাহাদের একত্ব সম্পাদন করিতেছেন এবং বিবিধ পদার্থকে এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিকে নিয়োগ করিতেছেন। অতএব তাঁহাকে এই ব্রহ্মাণ্ড মালার পরম সূত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না।

তাঁহার এই চির বিদ্যমানতা ও প্রত্যেক পদার্থের সহিত এই ঘনিষ্ট যোগ যখন আমরা লক্ষ্য করি, তখন আমাদের মন বিশ্রাম লাভ করে, তখন বাস্তবিক আমাদের এই জীবনকে মহাসত্য ও মহাশক্তির ক্রোড়ে প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহার দ্বারা সুরক্ষিত দেখিতে পাই এবং নির্ভরের ভাব স্বতই হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। এই মহাসত্য সূত্রের ন্যায় নয়নের অন্তরালেই চিরদিন রহিয়াছে। মণিমালিকার মণি সকলকেই যেমন বাহিরে দেখি, সূত্রকে যেমন দেখিতে পাই না। তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকলকেই বাহিরে দেখি, তাহাদের অন্তরালে যে মহাসত্য বিদ্যমান তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ ধীরেরাই সংশয় রহিত বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম আত্মদৃষ্টি দ্বারা সেই পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী।

(প্রাপ্ত)

এক সময় যাহা একান্ত প্রার্থনীয় বলিয়া মীমাংসিত হয়, যাহার অভাবে কার্য্য আর ভালরূপে চলিতে পারে না বলিয়া বিশ্বাস হয় এবং যে অবস্থা পাইবার জন্য নানাপ্রকারে যত্ন চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন হয়, অন্য সময় আবার তাহার সহিত দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিতে করিতে দেখা যায় যে, মন আর তাহাতে পরিতৃপ্ত হয় না। আবার সেই প্রাচীন রীতি যাহা এক সময় অসহ্য ও নিতান্ত অপ্রার্থনীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহাই পাইবার জন্য লোকের ব্যাকুলতা হইয়া থাকে। আমাদের এই উক্তির প্রমাণ স্বরূপ বলিতে হইতেছে, যাঁহারা এক সময় ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে একতন্ত্রতার অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়া সমাজমধ্যে সাধারণতন্ত্র ও নিয়মতন্ত্রপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন এবং সে জন্য বিশেষ যত্নপরায়ণ ছিলেন, এই কয়েক বৎসর সেই সাধারণতন্ত্র ও নিয়মতন্ত্রপ্রণালীর মধ্যে থাকিয়া এখন আবার পূর্ব্বাবস্থা পাইবার জন্য তাঁহাদের অনেকের প্রাণে আকাঙ্ক্ষার উদয় হইতেছে। এমন কি নিয়মতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র অনুসারে ধর্ম্মসমাজের কার্য্য চলিতে পারে না এবং চলা উচিত নয় বলিয়াও তাঁহাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত হইতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্টি এরূপ সিদ্ধান্তের একটী কারণ হইলেও আমাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, বাস্তবিকই ধর্ম্মসমাজের কার্য্য নিয়মতন্ত্রপ্রণালীদ্বারা সুচারুরূপে চালিত হইতে পারে কিনা।

জগতে আর যতপ্রকার সভাসমিতি আছে, অধিকাংশ স্থলেই নিয়মতন্ত্র প্রণালীদ্বারা যদি কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে, ধর্ম্মসমাজের কার্য্য সে প্রণালীতে না চলিবার পক্ষে বিশেষ কি অন্তরায় আছে? রাজনীতি, শিক্ষা, জনহিতকর অনুষ্ঠান প্রভৃতি সাধারণ কার্য্য সকল সম্পাদনের জন্য জগতে কতপ্রকার সভাসমিতি আছে এবং সর্ব্বত্রই নানাপ্রকার নিয়মপ্রণালীও বর্ত্তমান রহিয়াছে। নিয়মানুসারে সেই সকল কার্য্য যদি সুনির্ব্বাহিত হইতে পারে, তাহা হইলে ধর্ম্মসমাজের কার্য্যে এমন কি আছে, যাহা সাধারণের মতে বা নিয়মে সুনির্ব্বাহিত হইতে পারে না? নিয়মতন্ত্রতার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, নিয়মানুসারে যাঁহারা কার্য্যের ব্যবস্থা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন বা আপনাপন মত জ্ঞাপন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সকলেই সমান। সকলের মতেরই সমান মূল্য। যিনি ২৫ বৎসর ধর্ম্মসাধন করিয়াছেন, তাঁহার মতেরও যে মূল্য আজ যিনি সমাজের সভ্য হইলেন, তাঁহার মতের ও সেই মূল্য। ইহাদ্বারা কার্য্যের সুশৃঙ্খলা না হইয়া বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। বহুদিনের অভিজ্ঞতা ও অল্পকালের অভিজ্ঞতার কোন তারতম্য করা হয় না, ইহাদ্বারা সুবিচারের বিঘ্ন হয়। এই আপত্তি যদি বাস্তবিক যুক্তিযুক্তও হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মসমাজ সম্বন্ধেও যেমন যুক্তিযুক্ত অন্য সমাজ সম্বন্ধেও তেমনি যুক্তিযুক্ত। ধর্ম্মসমাজে বহুদিন অবস্থিতি এবং সাধন ভজনাদি দ্বারা যেমন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি কিয়ৎপরিমাণে বিশেষত্ব লাভ করিয়া থাকেন, অপরাপর সমাজ সকলেও তাহা ঘটিয়া থাকে। তবে সে সকল স্থানে সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আপত্তি উপস্থিত না হইয়া ধর্ম্মসমাজের বেলা এরূপ আপত্তি উপস্থিত হয় কেন? এ কথা স্বীকার্য্য যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির যে বিশেষত্ব আছে, তাহা সর্ব্বত্রই আদরণীয় এবং তাঁহাদিগকে সর্ব্বত্রই বিশেষ বিশেষ কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইয়া থাকে। রাজনৈতিক সভাতে যেমন দেখা যায়, যাঁহারা বহুকাল হইতে এই ব্রতে ব্রতী এবং বিশেষ জ্ঞানবান, প্রধান প্রধান কার্য্যের ভার তাঁহাদিগের প্রতিই অর্পিত হয়; নবাগত লোকের পক্ষে সে সকল কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মসমাজেও তাহাই দেখা যায়। যাঁহারা সাধন ভজনাদি দ্বারা বিশেষ অগ্রসর, যাঁহারা ধর্ম্মজীবন গঠনে অপর সাধারণকে সাহায্য করিতে সমর্থ, তাঁহাদিগকেই সেই সকল কার্য্যের ভার দেওয়া হয়, ধর্ম্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সকলেই যে উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করেন তাহা নয়। সে বিষয়ে যাঁহারা সক্ষম তাঁহাদের পরামর্শ ও উপদেশ অনুসারেই কার্য্য হয়। অপরাপর স্থলে যেমন

কতকগুলি কার্য্য সাধারণের বিচারের উপযোগী থাকে। ধর্ম্মসমাজেরও কতকগুলি কার্য্য সাধারণের বিচারের উপযোগী এবং সেই সকল কার্য্যেই সাধারণের মত প্রদানের সুবিধা দেওয়া হয়। অতএব দেখা উচিত অন্যান্য স্থলে নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে কার্য্য সম্পন্ন হইতে বাধা না থাকিলে ধর্ম্মসমাজে কেন বাধা উপস্থিত হইবে। বরং ইহাই সমধিক সম্ভবপর যে ধর্ম্মসমাজের কার্য্য নিয়মতন্ত্রপ্রণালী অনুসারে অধিক পরিমাণে সুশৃঙ্খলার সহিত চলিবে। কারণ যেরূপ সহিষ্ণুতা ও উদারতা থাকিলে আপনাপেক্ষা অল্প অভিজ্ঞের কথা গ্রাহ্য করা সম্ভব হয়, তাহা ধর্ম্মসমাজের লোকের বিশেষতঃ ধর্ম্মসাধনে অগ্রসর ব্যক্তির নিকট হইতেই অধিক পরিমাণে আশা করা যায়। কারণ তাঁহারা সর্ব্ব প্রকারে জিতাত্মা, সংযমী, সহিষ্ণু ও প্রেমিক হইবেন। অপরের সমালোচনা তাঁহারা যে পরিমাণে সহ্য করিতে সক্ষম হইবেন অন্যের পক্ষে তদ্রূপ আশা করা যায় না। রাজনৈতিকের নিকট বা অপরাপর স্থলে যাদৃশ সহিষ্ণুতা ও উদারতার পরিচয় পাইবার সম্ভাবনা আছে, যদি ধর্ম্মসমাজের অগ্রগণ্যগণ তাহা প্রদর্শন করিতে না পারেন—যদি কনিষ্ঠের নিকট হইতে বা অল্প কালের যোগ যাহাদিগের, তাহাদিগের নিকট হইতে সমালোচনা, পরামর্শ বা জ্ঞাতব্য বিষয় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না হন, তাহা হইলে ধর্ম্মসাধন এবং ধর্ম্মজগতে অধিক সময় বাসের যে ফল জীবনে ফলিত হইবার কথা, তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হন নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। অন্যথা ধর্ম্মসমাজের পক্ষে অতি গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হইবে যে তাঁহারা ধর্ম্মসাধনের গৌরবের প্রয়াসী নহেন; তাঁহাদের যে সহিষ্ণুতা ও উদারতা আছে ধার্ম্মিকগণের চরিত্রে তাহা নাই। যে স্থানে অপরেরা ধীরভাবে কার্য্য সম্পন্ন করেন, আপনাপন জ্ঞানের বা অভিজ্ঞতার অভিমান করিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হয়েন না এবং সাধারণতন্ত্রের বিরোধী হয়েন না, ধর্ম্মসাধনে অগ্রসর ব্যক্তিগণ যদি সে সকল স্থানে অধীরতার পরিচয় দেন, আপনাপন কার্য্যের প্রতিবাদ গ্রহণে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ হন, এবং সাধারণতন্ত্রের বিরোধী হন, তাহাদ্বারা ধর্ম্মেরই নিন্দা করা হয়। ধর্ম্মসাধন মানবের জীবনে যে সকল সদ্গুণ সঞ্চার করিয়া দিবে বলিয়া আশা ছিল, তাহারই প্রতিকূলে সাক্ষ্য উপস্থিত হয়। সুতরাং ইহা সত্য নয় যে, ধর্ম্মসমাজের কার্য্য নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে চলে না বা চালান উচিত নয়।

যে যে স্থানে সাধারণতন্ত্রতার প্রতিকূলে অভিযোগ উপস্থিত হয়, সেই সেই স্থানে লোকে অযথা অভিমান ও কর্তৃত্ব প্রিয়তারই পরিচয় প্রাপ্ত হয়। যাহা ধর্ম্মসাধনে অগ্রসর ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়। সাধারণতন্ত্র বা নিয়মতন্ত্রপ্রণালী অনুসারে যে সকল বিষয় নির্দ্ধারিত হয়, তাহা যে সকল সময়ই সুমীমাংসা বা অধিকতর কল্যাণকরই হইবে, তাহা সুদৃঢ়রূপে বলিতে না পারিলেও তাহা যে এক ব্যক্তির মীমাংসিত বিষয় অপেক্ষা অধিকতর সুমীমাংসিত ও কল্যাণকর হইবে, তাহা বলিতে পারা যায় এবং ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়, যে সাধারণের মতে যে সকল কার্য্য হয়, তাহাতে কোন দুষ্ট অভিসন্ধি বা স্বার্থপরতা থাকে না। পরামর্শ পূর্ব্বক মন্দ অভিপ্রায়ে দশজনে কার্য্য করিতে পারে না। যদি তাহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সে সকল ব্যক্তি যে সমাজে অবস্থিতি করে, তাহা কখনই ধর্ম্মসমাজ নামের যোগ্য নহে। বিশেষতঃ অধিকাংশের মতে কোন অকল্যাণকর মীমাংসা হইলেও, তাহার সংশোধনের পথ প্রশস্ত থাকে। কিন্তু একতন্ত্রতার প্রাধান্য যেখানে, সেখানে একবার ভ্রম হইলে, তাহার সংশোধনের সম্ভাবনা অতি কম। এজন্যও সাধারণতন্ত্র ও নিয়মতন্ত্রদ্বারা ধর্ম্মসমাজের কার্য্য অধিকতর পরিমাণে সুনির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

ধর্ম্মসাধনে অধিক অগ্রসর ব্যক্তির মত এবং অল্প অগ্রসর ব্যক্তির মতে যদি তারতম্য করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে অধিক জ্ঞানবান এবং অল্পজ্ঞানব্যক্তি, ধনী ও নির্ধন, শারীরিকবলে বলী ও দুর্ব্বলেরও মতের বিভিন্নতা থাকা আবশ্যক। যে, যে বিষয়ে প্রধান সে, সেই বিষয়ে অধিকতর সাহায্য করিতে সক্ষম, এবং তাহাদের সাহায্য লইবার জন্য সর্ব্বদা ব্যবস্থা থাকাও আবশ্যক। কিন্তু সাধারণ বিষয়ের মীমাংসায় সাধারণের সকলেরই সমান অধিকার না থাকিলে, কখনই কার্য্যের সুব্যবস্থা হইতে পারে না এবং তদভাবে যে সাম্য ধর্ম্মসমাজের প্রাণ এবং মূল লক্ষ্য, তাহার প্রতিকূলতা করা হয়। অকারণ সমাজ মধ্যে অতি অকল্যাণকর বৈষম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজ-দেহকে দুর্ব্বল ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়। বৈষম্যবাদ কখনই সমাজের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের সাহায্যকারী নয়। তাহার অনিষ্ট ফল চিরকাল মানবসমাজ ভোগ করিয়া আসিয়াছে। আবার সেই বৈষম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াসী হইলে, ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, আমরা নূতন আদর্শে, নবভাবে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে সংকল্প করিয়াছিলাম এবং যাহার আয়োজন করিতে এতদিন যত্ন চেষ্টা করিতেছিলাম তাহা আমাদের আর বাঞ্ছনীয় নয় বা তাহার উপকারিতার আর আমাদের বিশ্বাস নাই। একতন্ত্রতার অনিষ্টকারিতা অপেক্ষা বৈষম্যবাদের অনিষ্টকারিতা অধিকতর প্রবল। সুতরাং যথোচিত সহিষ্ণুতা, ধীরতা ও উদারতার সহিত আমাদিগকে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে এবং সাধারণতন্ত্রের কল্যাণকর সুফল লাভের প্রতীক্ষাতেই অবস্থিতি করিতে হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ২য় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

১৮৯৩।

(গতবারের শেষ)

ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয়—গ্রীষ্মের বন্ধের পর ইহার কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। ইহার মধ্যে একজন শিক্ষয়িত্রী পদত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীমতী অবলা বসু, বাবু কালীশঙ্কর সুকুল, বাবু জয়শঙ্কর রায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রীষ্মাবকাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্কুলে কার্য্য করিয়াছেন এবং গ্রীষ্মাবকাশান্তে বাবু জয়শঙ্কর রায়, বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র দাস ও কুমারী প্রেমদা দাস অনুগ্রহ করিয়া

কার্য্য করিতেছেন। এজন্য আমরা তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষালয়ে ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা ৮৫।

শিক্ষালয়ের আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
বেতন আদায়	৩৬৭৵০	কর্ম্মচারীর বেতন	৩৯৯।১৫
বৃত্তি আদায়	৪৫॥০	গাড়িভাড়া	১১৪৶১৫
চাঁদা ও দান প্রাপ্তি	১৭৮॥০	বিবিধ	৭৸৵১০
চরিত্র পুস্তক বিক্রয়	২৸০	বৃত্তিদান	২৫৲
বিবিধ	১।০	স্কুল কাটাভাড়া	৮৭৲
	৫৯৫৵০		৬৩৩।৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	৪০৸৵০	হস্তেস্থিত	২॥/০
মোট	৬৩৬৲	মোট	৬৩৬৲

নানাপ্রকারে শিক্ষালয়ের ৪০৬৲ টাকা দেনা আছে।

নীতিবিদ্যালয়—নীতিবিদ্যালয়ের কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে দুই মাস বিদ্যালয়ের কার্য্য স্থগিত ছিল। একটী আনন্দের সংবাদ এই যে নীতিবিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকারের বিশেষ উদ্যোগ ও সহায়তায় বালীগঞ্জে, একটী নীতিবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের ভবনে ইহার কার্য্য হইয়া থাকে। শ্রীযুক্তা সরলা রায় এই বিদ্যালয়টীর জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহার জন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্রী।

উপরোক্ত কমিটি কয়েকটী ব্যতীত আর কোনটীরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্য্যবিবরণ পাওয়া যায় নাই।

আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

আয়			ব্যয়		
সভ্য ও সহযোগিগণের			প্রচার		৮৭৩/৯
চাঁদা আদায়		৪৭৮॥৶০	মাসিক	৪৮৪॥/৯	
বার্ষিক	৩৭৭৲৯		এককালীন	৩৭৬।০	
মাসিক	১০১॥৵৩				
				৮৬০৸/৯	
	৪৭৮॥৶০		ইন্‌কম্‌ ট্যাক্স	১২।০	
প্রচারার্থ দানপ্রাপ্তি		৩৩৭॥০			
বার্ষিক	১০১৲			৮৭৩/৯	
মাসিক	১৯৫৲		কর্ম্মচারীর বেতন		১০৫৵০
এককালীন	৪১॥০		কমিশন		৩।৵০
			ডাকমাশুল		১১৸/০
	৩৩৭॥০		প্রচার গৃহ সংস্কার		৫৸/৬
প্রচারক গৃহ ভাড়া		১৩৲	সব কমিটি হিঃ		॥৵৬
সুদ আদায়		৩।০	বিবিধ		১০১৸৩
জন্ম রেজেষ্টরি ফি		১৲	পাথেয়		৩২৲
পাথেয়		৫৯॥০	উৎসব		৯০৸/৬
বিবিধ		৲৬	ট্রাষ্টডীড্‌ মুদ্রাঙ্কন		২২৲৩
সিটি কলেজ বৃত্তি		৮২॥০	সিটি কলেজ বৃত্তি		৮১৲
ট্রাষ্টডীড্‌ মুদ্রাঙ্কন		২৲	সুশীলাবালা ও চারুবালা		
ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরী		৮৸৬	বৃত্তি		২১৲
বাগআঁচড়া মিশন		৮১।/৯	সৌদামিনী বৃত্তি		১০৲
খাসিয়া মিশন		১৩৲	ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরী		৩/০
কলিকাতা উপাসকমণ্ডলী		১৯৲	খাসিয়া মিশন		১২৲
দুর্ভিক্ষ		৯০৮৲৯	বাগআঁচড়া মিশন		৭৫৲
স্থায়ী প্রচার		৩১৬৭॥৶০	কলিকাতা উপাসকমণ্ডলী		৪৸৵০
তত্ত্ব-কৌমুদী		১৭৫৬।৵৩	প্রচারক গৃহ		২৮৮৬৲
ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার		৬১৩৸৵৩	ব্রাহ্মমিশন প্রেস		১৮৭৪৵৬
পুস্তক হিঃ		৩৬০৪৵৩	ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার		১১১৩॥০
হাওলাত ও সস্‌পেন্স		৪৫৸০	স্থায়ী প্রচার হিঃ		২৩২॥/৯
বিগত ত্রৈমাসিকের			তত্ত্ব-কৌমুদী হিঃ		৩৬৩।
স্থিত		১১৭৭৸/৩	পুস্তক হিঃ		১০৫৭।/৩
			হাওলাত ও সস্‌পেন্স		১৮২০৸৵৯
মোট		১২৩৭৩॥৬	হস্তেস্থিত		১৫৭২।০
			মোট		১২৩৭৩॥৬

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

আয়		ব্যয়	
মূল্যপ্রাপ্তি	৬৪১।৯	কর্ম্মচারীর বেতন	৪০॥১
বিজ্ঞাপন	২৪৲	মুদ্রাঙ্কন	১৫০৲
নগদ বিক্রয়	।৬	কাগজ খরিদ	৬৮॥৶০
ডাকমাশুল হিসাবে ফেরৎ		কমিশন	৪৲
জমা	৭৲৯	ডাকমাশুল	১০৬॥৶৭
বিবিধ হিঃ	৲১	বিবিধ	৯॥/৬
এককালীন দান	১৲	হাওলাত	২৩৩৵৩
	৬৭৩॥৵১		৬১২॥৵৪
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	৩১৯৸৩	স্থিত	৩৮০৸০
	৯৯৩।৵৪		৯৯৩।৵৪

তত্ত্ব-কৌমুদী।

আয়		ব্যয়	
মূল্যপ্রাপ্তি	৪৩৩॥৫	কর্ম্মচারীর বেতন	৮৬॥/১০
নগদ বিক্রয়	৵০	মুদ্রাঙ্কন	৯৪॥০
ডাকমাশুল	৸০	কাগজ	৫৫৸৶১০
		কমিশন	৸৵০
	৪৩৪।৵৫	ডাকমাশুল	৪৭৲
গত ত্রৈমাসিকের		বিবিধ	৮।৶০
স্থিত	১৬১৫।/০	হাওলাত	১৫২৩।/১৫
	২০৪৯॥৶৫		১৮১৬॥৶৫
		স্থিত	২৩৩৲১০
			২০৪৯॥৶১৫

পুস্তকের ফণ্ড।

আয়		ব্যয়	
নগদ বিক্রয়	১৪১৸৵৫	অপরের পুস্তক বিক্রয়ের	
ঐ অপরের	৩৩ ৶৫	মূল্য শোধ	৬৭ / ০
বাকী মূল্য আদায়	৮৩ ॥১০	পুস্তক ক্রয়	৬।৵ ০
ডাকমাশুল	৮।/০	কর্ম্মচারীর বেতন	৩৬॥৶১০
কমিশন	১২॥৵১০	ডাকমাশুল	৬।/১০
		পুস্তক বাঁধাই	৪০৲
	২৭৯॥/১০	কমিশন	৪৪৸৶১০
গত ত্রৈমাসিকের		কাগজ	১ / ১০
স্থিত	৩৫৩১॥৵১৫	বিবিধ	৪॥/ ০
		হাওলাত	৩৪৪০৸৵১৫
	৩৮১১।৫		
			৩৬৪৮৲১৫
		স্থিত	১৬৩৶১০
			৩৮১১।৫

ব্রাহ্মমিশন প্রেসের

১ম ছয় মাসের হিসাব

আয়		ব্যয়	
ছাপাই (যত টাকার		মুদ্রাঙ্কন, কাগজাদি বাবদে	
কাজ হইয়াছে)	১৯৬২৶০	যাহা অপরকে ধার দেওয়া	
১ম ত্রৈঃ ১০৮০৷৷৵০		হইয়াছে	২৩৩৫৸৫
২য় ত্রৈঃ ৮৮১৷৷০		১ম ত্রৈঃ ১৩৪৩৶১৫	
আদায়	২১৬০৷/০	২য় ত্রৈঃ ৯৯২৷৷১০	
১ম ত্রৈঃ ১১৮৪৵৫		বেতন	১১৮৩৷০
২য় ত্রৈঃ ৯৭৬৵১৫		১ম ত্রৈঃ ৬৪১৶৫	
প্রেস প্রস্তুত হিঃ	২২১৲	২য় ত্রৈঃ ৫৪২৲১৫	
১ম ত্রৈঃ ১১৩৷৷০		সরঞ্জামি	১৩৫৷৵৭৷৷
২য় ত্রৈঃ ১০৭৷৷০		১ম ত্রৈঃ ৭৪৷৷০	
গৃহ প্রস্তুত হিঃ	৬০৲	২য় ত্রৈঃ ৬০৸৵৭৷৷	
১ম ত্রৈঃ ৩০৲		বিবিধ	৫১৷৶১০
২য় ত্রৈঃ ৩০৲		১ম ত্রৈঃ ৩৫৵৫	
বিবিধ	৩৬৸৵০	২য় ত্রৈঃ ১৭৷/৫	
১ম ত্রৈঃ ৩৫৷১০		ডাকমাশুল	১৷/৫
২য় ত্রৈঃ ১৷৷/১০		১ম ত্রৈঃ ৷৶৫	
হাওলাত জমা	১৫৬৬৷/৫	২য় ত্রৈঃ ৸৵০	
১ম ত্রৈঃ ৮৩৬৷৷৶৫		গৃহ প্রস্তুত	৫৶১০
২য় ত্রৈঃ ৭১৯৷৷৵০		২য় ত্রৈঃ ৫৶১০	
	———	সুদ	১৫১৷৷০
	৬০০৬৷৷৵৫	১ম ত্রৈঃ ৭৫৲	
গত বর্ষের স্থিত	৪৶১৫	২য় ত্রৈঃ ৭৬৷৷০	
	———	বাটীভাড়া	৬০৲
	৬০১০৸৵০	১ম ত্রৈঃ ৩০৲	
		২য় ত্রৈঃ ৩০৲	
		ওয়ারেণ্টিয়ার	১৯০৷৷০
		১ম ত্রৈঃ ১০২৷৷০	
		২য় ত্রৈঃ ৮৮৲	
		প্রেস প্রস্তুত	৬৯৷৫
		১ম ত্রৈঃ ১৷৷৶০	
		২য় ত্রৈঃ ৬৭৷৷/৫	
		হাওলাত শোধ	১৮০৯৸১৫
		১ম ত্রৈঃ ৯৪৮৷৷৵১০	
		২য় ত্রৈঃ ৮৬১৵৫	
			৫৯৯৪৶১৭৷৷
		লাইসেন্স	১২৲
			———
			৬০০৬৷৶১৭৷৷
		স্থিত	৪৷৵২৷৷
			———
			৬০০৸৵১০

পাঁচফুলের সাজি।

১। Marcus Aurelius.—

"Wander at random no longer Alas! You have no time left to peruse your diary to read over the Greek and Roman history, or so much as your own common place book, which you collected to serve you when you were old. Hasten then towards the God. Do not flatten and deceive yourself. Come to your own aid [illegible] may, if you have a kindne[illegible] [illegible]urself."

লক্ষ্যহীনভাবে আর বিচরণ করিও না। হায়! তোমার দৈনন্দিন লিপি পাঠ করিবার, গ্রীক এবং রোমান্ ইতিহাস পুনরায় অধ্যয়ন করিবার বা এমন কি বৃদ্ধ হইলে তোমার উপকার হইবে বলিয়া যে বহু বিষয়িণী পুস্তিকা সঙ্কলিত করিয়াছিলে, তাহাও পাঠ করিবার সময় অবশিষ্ট নাই। ত্বরায় গন্তব্য স্থানের দিকে গমন কর। আত্মশ্লাঘা করিও না এবং আত্মপ্রতারিত হইও না। যদি আপনার প্রতি দয়া থাকে, তবে সময় থাকিতে থাকিতে আপনার সহায়তা কর।

২। Epictetus.—

"Think of God oftener than you breathe. Let discourse of God renewed daily more surely than your food."

শ্বাস প্রশ্বাস লওয়া অপেক্ষা অধিকবার ঈশ্বরের বিষয় চিন্তা করিও। প্রত্যহ আহারাপেক্ষা নিশ্চিন্তরূপে ভগবৎ প্রসঙ্গ পুনঃপুনঃ আলোচিত হইতে থাকুক।

৩। Shelley.—

Time.

Unfathomale sea, whose waves are years!
Ocean of time, whose waters of deep woe,
Are brackish with the salt of human tears!
Thou shoreless flood which in thy ebb and flow,
Claspest the limits of mortality;
And, Sick of prey yet howling on for more,
Vomitest on its inhospitable shore!
Treacherous in calm, and terrible in storm,
Who shall put forth on thee,
Unfathomable sea?

হে অতলস্পর্শ সমুদ্র, বর্ষগণ তোমার তরঙ্গ! হে কাল-জলধি, তোমার গভীর বিষাদের জলরাশি মানবাশ্রুতে লবণাক্ত! হে অকূল তরঙ্গোচ্ছ্বাস তুমি তোমার জোয়ার ভাটাতে নশ্বরত্বের সীমা সকলকে আলিঙ্গন কর, এবং বিনাশে বীতরাগ তথাচ আরও পাইবার জন্য বরণ করিয়া তোমার ধ্বংসাবশেষ সমূহ তাহার আতিথ্য বিহীন কূলে উদ্গীরণ করিয়া থাক, তুমি শান্তির সময়ে বিশ্বাসঘাতক এবং ঝটিকাকালে ভয়ানক, হে অতলস্পর্শ কালবারিধি, কে তোমাতে (জীবন-তরী ভাসাইবে) ভাসিবে?

ব্রাহ্মসমাজ।

প্রচার—শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস বরিশাল হইতে প্রত্যাগমনের সময় নোয়াখালীতে নিম্নলিখিত কার্য্যাদি করেন;—স্থানীয় টাউন হলে "সত্যধর্ম্ম কি?" এবং "কি উপায়ে ধর্ম্মলাভ করা যায়?" এই দুইটি বক্তৃতা করেন। স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, দে দুই দিনই উপস্থিত থাকিয়া আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরিবারে পরিবারে উপাসনা উপদেশ আলোচনাদি করিয়া তথা হইতে যশোহর গমন করেন। তথায় পরিবারে উপাসনা, আলোচনা এবং বার

লাইব্রেরিতে এক দিন "আমাদের কিসের অভাব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

গঙ্গার তীরবর্ত্তী বেলুর নামক গ্রামে গত ৩০শে জুলাই রবিবার আমাদের প্রচারক-দল গমন করিয়াছিলেন। সেখানে সংগীত সংকীর্ত্তন উপাসনা ও ব্যাখ্যা ও উপদেশাদি হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস উপাসনা ও শ্লোক অবলম্বনে উপদেশ দান করেন, এবং শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু কিছু বলেন।

বর্ত্তমান মাসের প্রথম ভাগে সাধনাশ্রম হইতে শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব এবং বাবু হরিমোহন ঘোষাল মফঃস্বল গমন করিয়া নিম্নলিখিতরূপে কার্য্য করিয়াছেন :—

বর্দ্ধমান—শ্রীযুক্ত বাবু রাজগোপাল রায় নামক একজন পেন্সনপ্রাপ্ত ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহে হরিমোহন বাবু ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে কিছু পাঠ এবং সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা করেন। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদবিহারী বসু মহাশয়-দিগের গৃহে উপাসনা করেন। ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে একদিন "বিল্বমঙ্গলের জীবন" সম্বন্ধে কথকতা করেন। বিল্বমঙ্গলের নবজীবন প্রাপ্তি, ভগবৎ-প্রেম ও সাধন-পথে সংগ্রাম প্রভৃতি বিষয়গুলি উজ্জ্বলরূপে বর্ণিত হইয়াছিল।

রামপুরহাট—স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব হিন্দিতে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। সাপ্তাহিক উপাসনায় বাবু হরিমোহন ঘোষাল মন্দিরে উপাসনার কার্য্য করেন এবং বাইবেলের একটী উপদেশ উল্লেখ করিয়া কিছু বলেন একদিন বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের গৃহে হরিমোহন বাবু উপাসনা করেন ও প্রকাশ দেব প্রার্থনা করেন।

নলহাটী—আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সিদ্ধান্ত মহাশয় এখানে রজনী বিদ্যালয় স্থাপন এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা গরীবদিগের মধ্যে বিশেষরূপে কার্য্য করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন কয়েকটি ব্রাহ্ম-বালিকার প্রতিপালন ও শিক্ষার ভারও গ্রহণ করিয়াছেন। নীলকান্ত বাবুর গৃহে প্রকাশ দেব হিন্দিতে উপাসনা করেন।

ভাগলপুর—শ্রীযুক্ত ব্রহ্মদে নারায়ণ মহাশয়ের গৃহে উপাসনা হয়, প্রকাশদেব জী হিন্দিতে উপাসনা করেন। স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে একদিন হিন্দিতে উপাসনা হয়, প্রকাশ দেব জী উপাসনা করেন এবং উপনিষদের বচন উদ্ধৃত করিয়া উপদেশ দেন। একদিন শ্রীযুক্ত ব্রহ্মদেব নারায়ণ মহাশয়ের গৃহে আলোচনা সভা হয়। প্রকাশ দেবজী প্রার্থনা করেন। একটী প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও প্রকাশ দেব জী প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্ম ও তাহা সাধন সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন। শ্রীযুক্ত ব্রহ্মদেব নারায়ণের গৃহে হরিমোহন বাবু বিল্বমঙ্গলের জীবন বিষয়ে কথকতা করেন। ভাগলপুরস্থ বন্ধুগণ বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত ব্রহ্মদেব নারায়ণ ইহাঁদের কার্য্যের অনেক সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহা-দিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

কাটিহার—রবিবার সন্ধ্যার পর সাপ্তাহিক উপাসনা হয়। বাবু হরিমোহন ঘোষাল উপাসনা করেন। ১৭ই জুলাই—অপরাহ্নে স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে এক সভা হয়। প্রথমে একটি হিন্দী সঙ্গীত হইলে প্রকাশ দেব জী সংক্ষিপ্ত প্রার্থনাপূর্ব্বক হিন্দীতে "মুখে ধর্ম্মমত মানিলে হয় না, জীবনে সাধন করা চাই" এ বিষয়ে তেজস্বী ভাষায় বক্তৃতা করেন। তৎপর আর একটী হিন্দী সঙ্গীত হইলে হরিমোহন বাবু কিরূপে "এই ধর্ম্ম জীবনে সাধন করিতে হয়" এ বিষয়ে কিছু বলিয়া উপসংহার করেন। সভাতে বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী প্রায় ৮০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই মনযোগের সহিত বক্তৃতাদি শ্রবণ করেন। তৎপর মন্দিরে হিন্দিতে উপাসনা হয়, প্রকাশ দেবজী আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং প্রকৃত শান্তি কিসে পাওয়া যায় এ বিষয়ে উপদেশ দেন।

এতদ্ভিন্ন উপরোক্ত স্থান সকলে ব্রাহ্মধর্ম্মের পুস্তক বিক্রয় ও সাধনাশ্রমের জন্য দান সংগৃহীত হইয়াছে। এবং কেহ কেহ আমাদের কাগজের গ্রাহক হইয়াছেন। ইহাঁরা তথা হইতে পূর্ণিয়াতে গমন করেন। সেখানে গিয়া শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব জ্বররোগে আক্রান্ত হন। শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীচরণ গুপ্তের গৃহে হরিমোহন বাবু একদিন কথকতা করেন, ও উপাসনাদি হয়। শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব পীড়িত হইয়াছিলেন বলিয়া, ইহারা সত্বর কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

শ্রাদ্ধ—পরলোক পুণ্যদাপ্রসাদ সরকারের আদ্যশ্রাদ্ধ গত ২২শে জুলাই ব্রহ্মমন্দিরে সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। বাবু কালীচন্দ্র ঘোষাল পুণ্যদা বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত পাঠ করেন। তাঁহার অনাথা স্ত্রী শ্রীযুক্তা রজতবালা সরকার একটি শিশুসন্তান সহ এখন ব্রাহ্মবন্ধুগণের আশ্রয়ে আছেন। ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাঁহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন; কিন্তু তিনি সাধারণের সাহায্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা অপেক্ষা শিক্ষয়িত্রী অথবা তদ্রূপ অন্য কোনও কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা ভাল মনে করেন। অতএব যাহাতে তিনি উপযুক্ত রূপে শিক্ষা-লাভ করিতে পারেন, আমাদের সেই উপায় বিধান করিয়া দিতে হইবে। আশা করি সকলেই এ বিষয়ে সাহায্য করিবেন।

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু গুণাভিরাম বড়ুয়া রায় বাহাদুরের প্রথম পুত্র জ্বররোগে পুরুলীয়া নামক স্থানে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। এই বৃদ্ধ বয়সে অল্প দিনের মধ্যে বড়ুয়া মহাশয় কয়েকবার শোকের আঘাত পাইলেন। প্রথমতঃ তাঁহার কন্যা (ডাঃ নন্দকুমার রায়ের স্ত্রী) বিধবা হন, তৎপর সহধর্ম্মিণী পরলোক গমন করেন, এবার প্রথম পুত্রটি হারাইলেন। অপর লোক হইলে এরূপ নিদারুণ শোকের আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেন; কিন্তু বড়ুয়া মহাশয়ের বিশ্বাস ও ভক্তি তাঁহাকে এই কঠোর পরীক্ষাতেও সুস্থির রাখিয়াছে। বায়ুর আঘাতে কদলী বৃক্ষই ভূপতিত হইয়া থাকে, সুদৃঢ় পর্ব্বতকে টলাইতে পারে না। গত ২২শে জুলাই পরলোক গত আত্মার কল্যাণার্থ কলিকাতায় ডাঃ মোহিনীমোহন বসুর বাটিতে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। বড়ুয়া মহাশয়ের প্রার্থনা

অতি প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস ও ভক্তিভাব দেখিয়া উপাসকগণ তৃপ্ত হইয়াছিলেন। পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া কিরূপে শোকে দুঃখে অবিচলিত থাকিতে হয়, এই বৃদ্ধ সাধকের জীবন তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মসমাজের নানা বিভাগে ৩০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীমান্ শ্রীরঙ্গবিহারী লালের খুল্লপিতামহের আদ্য শ্রাদ্ধ গত ২৬শে জুলাই ২১০।৫ নম্বর ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের করেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমান শ্রীরঙ্গবিহারী সাঃ ব্রাঃ সমাজে ২৲ দাতব্য বিভাগে ২৲ সাধনাশ্রমে ২৲ দাসাশ্রমে ২৲ এবং অনাথাশ্রমে ২৲ মোট ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৩০শে জুলাই বেণেটোলা ২৪৫।৩নং ভবনে বাবু প্রসন্নকুমার কুণ্ডের পিতার আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ জে, এন, মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। পরমেশ্বর পরলোকগত আত্মাদিগের কল্যাণ বিধান করুন।

নামকরণ—২২শে জুলাই, কলিকাতা ২১৭ নং ভবনে বাবু অধরচন্দ্র মিত্রের কন্যার নামকরণ হইয়াছে। বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। বালিকার নাম সুরীতি রাখা হইয়াছে।

শিলঙ্গের বাবু মথুরানাথ নন্দীর দুইটি পুত্রের নামকরণ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। [illegible] দ্বিতীয়টির নাম কার্ত্তিকেন্দ্র রাখা হইয়াছে। পরমেশ্বর শিশুদিগের কল্যাণবিধান করুন।

বরিশালের কার্য্যবিবরণ—বরিশাল হইতে জনৈক ব্রাহ্মবন্ধু নিম্নলিখিত কার্য্যবিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন;—

জাতকর্ম্ম—শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র দাস মহাশয়ের পুত্রের জাতকর্ম্মোপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা হয়। বাবু কালীমোহন দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। নিবারণ বাবু বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিবাহ—বরিশালনগরে পরলোকগত ডাক্তার জগৎচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের ২য় পুত্র শ্রীমান্ বিনয়ভূষণ গুপ্তের সহিত কলিকাতা প্রবাসী শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ মৈত্রের ১মা কন্যা শ্রীমতী কুমারী ইন্দুমতীর শুভবিবাহ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। বিবাহ ১৮৭২ সালের ৩ আইন মতে রেজেষ্টরি হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বিনয় বাবুর মাতা বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রাদ্ধ—বরিশাল নিবাসী বাবু বামনচন্দ্র গাঙ্গুলীর পরলোকগত শ্বশুর কালীমোহন রায় চৌধুরীর আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছে। বাবু দ্বিজদাস দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

বরিশাল নিবাসী বাবু চণ্ডীচরণ গুহের পিতামহের আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছে। বাবু কালীমোহন দাস উপাসনা করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে চণ্ডী বাবু দাসাশ্রমে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের ৩২শৎ জন্মোৎসব—৯ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় উৎসবের উদ্বোধন হয়। বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

১০ই আষাঢ় শুক্রবার—বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে উপাসনা, সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন হয়। দুবেলাই বাবু কালীমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে পাঠ, আলোচনা, সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তনাদি হয়।

১১ই আষাঢ় শনিবার—প্রাতে উপাসনা, সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন হয়। বৈকালে "ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ" সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী উপাসনা ও বক্তৃতা করেন।

দান—আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে নিম্নলিখিতরূপ দান করিয়াছেন:—বাবু কান্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রচার বিভাগে ১৲ ও খাসিয়া প্রচার ভাণ্ডারে ১৲, বাবু রজনীকান্ত সরকার প্রচার বিভাগে ২৲, বাবু গুরুদয়াল রায় ৪৲. মিঃ এল, এন চৌধুরী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, সাধনাশ্রমে ৫৲,।

ভ্রমসংশোধন—নোয়াখালী হইতে বাবু রজনীকান্ত রায় লিখিয়াছেন, "গত ১লা শ্রাবণের তত্ত্বকৌমুদীতে আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত বাবু হরকান্ত বসুর পুত্রের নামকরণের বিবরণে ২টী ভ্রম দেখা গেল।" ১ম বালকের নাম "সোহিনীকান্ত" রাখা হইয়াছে "মোহিনীকান্ত" নহে। ২য় তিনি নামকরণ উপলক্ষে ৫৲ পাঁচ টাকা দান করিয়াছেন—ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা, নোয়াখালী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা এবং কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও আশ্রমে ৩৲ টাকা গত ২রা জুলাই রবিবার নামকরণ হইয়াছে।

পুরস্কার বিতরণ—মান্দ্রাজের ব্রাহ্মবন্ধুগণের তত্ত্বাবধানে গরিব বালক বালিকাদিগের একটী স্কুল আছে। সম্প্রতি রাজা বাশগজপতি রায় বাহাদুর স্কুলের ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গরিব বালক বালিকাদিগকে বস্ত্র দান করিয়াছেন। স্কুলের তত্ত্বাবধায়কগণ এতৎ সংসৃষ্ট একটী বোর্ডিং খুলিবার সংকল্প করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সাধুসংকল্পের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ব্রাহ্মদিগের তত্ত্বাবধানে বালক বালিকাদিগের জন্য বোর্ডিং স্কুল যত স্থাপিত হইবে, ততই সমাজের মঙ্গল।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

৯ম সংখ্যা
১৬শ ভাগ।

১লা ভাদ্র, বুধবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

আত্ম-সমর্পণ।

কতই বলিনু! বাক্যে হইনু প্রাচীন,
তব দয়া ঘোষিয়া জগতে;
তবু হে বিশ্বাস কেন অতিশয় ক্ষীণ,
কেন ডরি যেতে তব পথে?

কত প্রিয় সম্বোধনে সম্বোধি তোমায়,
প্রাণ মম চরণে ঢালিয়া;
কি হবে সে মিষ্ট ভাষা, যদি অসহায়,
দেখি নিজে বিপদে পড়িয়া?

তুমি সত্য, কি হবে এ সত্য সম্বোধনে,
সত্যে যদি না হলো নির্ভর?
জীবন-সংগ্রামে শক্তি দেয় না যে ধনে,
সে ধনে না ধন ভাবে নর।

যদি হে নির্ভর মোর রহিল জগতে,
যদি আশা পার্থিব সম্বলে,
তবে কেন তব দয়া ঘুষি নানামতে,
কেন ডাকি সত্য সত্য বলে?

দেও হে বিশ্বাস-আঁখি এ মোহ আঁধারে;
করি আমি সত্যের সাধনা;
যে শক্তি পালিছে এই নিখিল সংসারে,
তারি ক্রোড়ে সঁপিছে আপনা॥

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বন্ধন-জাল—গুটিপোকা যখন আপনার দেহ হইতে রস বিনির্গত করিয়া আপনার কোষ নির্ম্মাণ করিতে থাকে, তখন এক বিচিত্র ব্যাপার দৃষ্ট হয়। সে ক্রমে ক্রমে আপনার রচিত কারাগারেই আবদ্ধ হয়। মানুষও সেইরূপ নিরন্তর আপনার রচিত কারাগারে আপনিই আবদ্ধ হইতেছে। মানব আপনাকে আবদ্ধ করিবার জন্য আপনি নানাপ্রকার জাল সৃষ্টি করে। কেহ কেহ শব্দের জালে জড়িত হইয়া আবদ্ধ হয়। উপাসনা ও প্রার্থনায় ভাষাকেই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা জ্ঞান করিয়া সেই ভাষাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহাতেই আত্মতৃপ্ত হয়, এবং ভাষার অতীত আর কিছুর জন্য তাহাদের প্রাণ ব্যাকুল হয় না। এই রূপে প্রাচীন সাধকদিগের মধ্যে অনেকে মুখে একটা নাম মাত্র বার বার উচ্চারণ করিয়া ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ কার্য্য হইল বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ ভাবের জালে আবদ্ধ হন। তাঁহারা যখন ঈশ্বর-চিন্তাতে বা তাঁহার গুণ কীর্ত্তন বা শ্রবণে নিযুক্ত হন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে এক প্রকার ভাবোদ্রেক হইতে থাকে। এই ভাব-প্রবণতা প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ। কাহার কাহারও প্রকৃতিতে ভাবপ্রবণতা কিছু অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই ভাবপ্রবণ ব্যক্তিগণ যখন ভাবোচ্ছ্বাসের সুখ সম্ভোগ করিতে থাকেন, তখন তাহাকেই ধর্ম্মের চরমাবস্থা বলিয়া মনে করেন। ভাব তাঁহাদের মনের চারিদিকে একপ্রকার জাল বিস্তার করে, যাহাতে তাঁহাদের দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়া যায়। তাঁহারা ভাবেই তৃপ্ত হইয়া সন্তোষ লাভ করেন। আবার বাহিরের ক্রিয়া কাহার কাহারও পক্ষে বন্ধন জাল স্বরূপ! তাঁহারা কতকগুলি ধর্ম্মের বাহিরের নিয়ম পালন করিতেছেন এবং তাহাকেই ধর্ম্মজ্ঞানে তৃপ্ত হইয়া আছেন। সেই বাহ্যক্রিয়া অন্তরকে স্পর্শ করিতেছে কি না, হৃদয়কে সমুন্নত করিতেছে কি না, সে বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। বাহিরের নিয়ম পালন করিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট। ইহাও তাঁহাদের পক্ষে একপ্রকার জালস্বরূপ। আমরা যখনই অনবহিত হই, বাহিরের বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া আত্ম দৃষ্টি বিহীন হই, তখনি অজ্ঞাতসারে এই সকল জাল আমাদের চিত্তকে আবদ্ধ করে। আমরা ঘোর ভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকি। ঈশ্বরকে সত্যস্বরূপ বলি, দয়াময় বলি, পিতা মাতা বলি, অথচ তাঁহার প্রতি সে প্রকারে নির্ভর করিতে পারিতেছি কি না সে দিকে দৃষ্টিই থাকে না। বাহিরে একটা ধর্ম্মের ব্যাপার ও সাধন চলিতে থাকে, অথচ অন্তরে শূন্যতা—অসারতা—নির্ভরহীনতা। এই শোচনীয় অবস্থা হইতে ঈশ্বর আমাদিগকে উদ্ধার করুন।

মতদ্বৈধ—ব্রাহ্মদের মধ্যে যখন এই অল্প সময়েতেই মতের ভিন্নতা প্রযুক্ত তিন দল হইয়াছে, তখন বাহির হইতে

দেখিয়া অনেকে যে ব্রাহ্মসমাজের স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিবেন ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। ইহারই মধ্যে যখন এরূপ ঘটিল তখন কিছু দীর্ঘকাল গেলে না জানি ইহার কত শাখা প্রশাখা নির্গত হইবে এবং এই সমাজ হীনবল হইতে হইতে শেষে কাল-গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতে পারে এরূপ আশঙ্কা হৃদয়ে উদিত হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু এরূপ চিন্তা কেবল ইহার বিরোধীদিগের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু যাঁহারা ইহার মধ্যে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে কি স্বাভাবিক? যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহারা ইহার এই উত্তর দিবেন—ইহা যদি আমার তোমার জিনিস হইত, তবে তোমাদের আশঙ্কার কথা শুনিয়া ভাবিতাম। ইহার এই প্রথম উদ্যমেই যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে ইহার স্থায়িত্ব সম্ভব বোধ হয় না; কিন্তু ইহা ত তোমার আমার জিনিস নয়; ইহা ঈশ্বরের জীবন্ত পরিত্রাণপ্রদ বিধি। করুণাময় ঈশ্বর এবার এই জীবন্ত সাক্ষাৎ ধর্ম্ম দ্বারা জীবকে উদ্ধার করিবেন। সুতরাং ইহাতে যতই মতদ্বৈধ দেখ না কেন, যতই ইহাকে দুর্ব্বল দেখ না কেন, জগতে আপনার শক্তিতে ইহা জয়যুক্ত হইবেই হইবে। আমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাসী হইয়া পড়িয়া থাকিবে তাঁহারাই পরিত্রাণ লাভ করিবে। তবে কি শুধু বাহিরের লোকেরাই নিরাশার কথা বলেন এবং ঐ আশঙ্কায় চক্ষুতে দেখেন? না তাহা নহে। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরেও এরূপ লোক আছেন, যাঁহারা ইহাকে বিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেছেন না, তাঁহারাও অন্তর্বিরোধ দেখিয়া সময়ে সময়ে নিরাশ হইতেছেন ও এমন কি অল্প কারণে বিরক্ত হইয়া সরিয়া পড়িতেছেন। এইরূপ অল্প বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণরূপে ইহার সহিত একীভূত হইতে চান না। ভয়ে ভয়ে এরূপভাবে অনুষ্ঠান করেন যাহাতে প্রাচীন দলে সহজে মিলিতে পারেন। তাঁহারা ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে পারেন না; পৃথিবীর সুখ সম্পদ মান সম্ভ্রমকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া থাকেন। এরূপ দুর্ব্বল বিশ্বাসী লোক সকল সমাজেই থাকিবে; তাহা দেখিয়া ভীত হইলে চলিবে না বরং তাহা দেখিয়া অপর সকলকে সাবধান ও উৎসাহী হইতে হইবে। পৃথিবীতে যথার্থ ধর্ম্ম রক্ষাকরা, বিশ্বাস অনুসারে চলা অতিশয় কঠিন ব্যাপার বলিয়া সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

আমরা এই মতদ্বৈধ দেখিয়া কিছু ভীত হই না, বরং অনেক সময় আনন্দিত হই। অনেক সময় ইহারই মধ্যে জীবনীশক্তির বিদ্যমানতা দেখি। মনে হয় ইহা বিধাতার জীবন্ত বিধি, ইহাতে কোন আবর্জ্জনা আসিতে পাইবে না। মতভেদের মধ্যে চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ যে ধর্ম্মে কোন অভ্রান্ত মনুষ্য বা গ্রন্থ নাই সেখানে মত ও রুচিগত বৈচিত্র্য থাকাই সম্ভব। যেখানে সে বৈচিত্র্য নাই, সেখানে কিঞ্চিৎ পরিমাণে মৃতভাব আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য এবং ইহা দেখিয়া আমাদিগকে সময়ে সময়ে অতিশয় দুঃখিত হইতে হইতেছে যে, মতগত পার্থক্যনিবন্ধন অনেক স্থলে হৃদয়েরও পার্থক্য ঘটিতেছে, প্রেমের পরিবর্ত্তে অপ্রেম জন্মিতেছে; তদ্দ্বারা সমগ্র মণ্ডলির ঘননিবিষ্টতা বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। তাহা মানবপ্রকৃতির দুর্ব্বলতাবশতঃ, আমাদের প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের হীনতাবশতঃ। যাঁহারা এই প্রকার দুর্ব্বলতা ও হীনতা দর্শন করিয়া বিষণ্ণ ও নিরাশ হইতেছেন, তাঁহাদিগকে একটী কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। তাহা এই, ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের যে আদর্শ, তাহা অনেক পরিমাণে এদেশের পক্ষে নূতন। এই নূতন আদর্শ অনুসারে সমাজকে গঠন করা কি দুই দিনের কার্য্য? এরূপ কার্য্যে কত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন! আমাদের শরীর মনের মধ্যে, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে কত দুর্ব্বলতার বীজ নিহিত হইয়া রহিয়াছে! সে সকল কি একদিনে উন্মূলিত হইতে পারে? আমরা যেরূপ মাল মসলা, এই মাল মসলাতে কার্য্য আরম্ভ করিতে গেলেই বহুকাল বার বার বিফলপ্রযত্ন হইতে হইবে। তাহাতে নিরাশ হইলে চলিবে না। এই বিশ্বের বিধাতার নিকট সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিতে হইবে। তিনি এই জড়রাজ্যে কদর্য্যতার ভিতর হইতে সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা কত যুগের অবিশ্রান্ত বিবর্ত্তন ক্রিয়ার ফল। আমরা কি ইচ্ছামাত্র দুর্ব্বলকে সবল করিয়া লইতে পারি?

দ্বিতীয়তঃ যতই ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের মূলমতের উপরে দণ্ডায়মান হইয়া অপর সকল বিষয়ে পরস্পরের প্রতি উদার হইতে পারিবেন, ততই মতভেদনিবন্ধন প্রেমের বিচ্ছেদ অপনীত হইবে। এরূপ একটী প্রতিজ্ঞা প্রত্যেক ব্রাহ্মের অন্তরেই থাকা কর্ত্তব্য, যতক্ষণ মূলমতে ঐক্য আছে, ততক্ষণ কখনই মণ্ডলী হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না বা কাহাকেও বিচ্ছিন্ন করিবার ইচ্ছা করিব না; তাহা করিলে অপরাধী হইব। একতার প্রতি একটা দৃষ্টি ও তাহা রক্ষার জন্য আগ্রহ প্রত্যেক ব্রাহ্মের অন্তরে থাকা আবশ্যক।

উপাসনাতে বিনয়—মানুষের কাছে বিনীত থাকিতে অনেকেই শিক্ষা করেন, কিরূপে বিনয় লাভ করা যায়, বিনয় লাভ করিতে হইলে লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করেন, এবং যথাসাধ্য কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু ঈশ্বরের নিকট গমন করিতে এবং উপাসনার বাক্য উচ্চারণ করিতে যে তদপেক্ষা অধিক বিনয়ের প্রয়োজন এ কথা যেন অনেকেই চিন্তা করেন না। জেলার মাজিষ্ট্রেটের কাছে উপস্থিত হইতে গেলে, কেমন শান্ত শিষ্ট হইতে হয়, জিহ্বাকে সংযত করিয়া কথা বলিতে হয় তাহা সকলেই জানেন। মহান্ পরমেশ্বরের মন্দির-দ্বারে যাঁহারা উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদের কি তদপেক্ষা অধিকতর সম্ভ্রম ও বিনয়ের সহিত কথা বলাও উপবেশন করা উচিত নহে? উপাসনায় বলা হইতেছে "আমি ঘোর পাপী, তুমি পরিত্রাণ কর।" কিন্তু সেই কথাগুলি এমন ভাবে উচ্চারিত হইতেছে যে, যেন তিনি জোর করিয়া ঈশ্বর হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া লইবেন। পাপী হইয়া পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করা, মহান্ পরমেশ্বরের সমীপে এরূপ বিষয়ে কথা বলিতে কতদূর বিনয়ের আবশ্যক, তাহা উপাসক চিন্তা করেন না। সুতরাং অনেক সময় বক্তৃতার মত কথা বলিয়া যান। নিজের দুষ্কৃতি

স্মরণ হইলেই পরমেশ্বরের নিকট যাইতে ভয় হয়, এবং তাঁহার অপার করুণা মনে হইলে, ভক্তির উদয় হয় এই ভয় এবং ভক্তিই বিনয়ের প্রতিষ্ঠাতা। যেখানে ভয় ও ভক্তি নাই, সেখানেই হৃদয় বিনীত হয় না। স্বাভাবিক উপাসনা হইলে নিশ্চয় উপাসকের হৃদয় বিনয়ে অবনত হইবে। যেখানে প্রকৃত ভাব নাই, সেখানেই অহঙ্কারমূলক উচ্চ উচ্চ কথা। কিন্তু সকল কার্য্যই সাধনসাপেক্ষ। উপাসনা যেমন নিত্য সাধনার বিষয়, তদ্রূপ সমবেত উপাসনায় কিরূপে উপাসনা করিতে হয়, কিরূপে বিনয়ের সহিত বাক্য উচ্চারণ করিতে হয়, তাহাও সাধনের বিষয়। সাধন না করিলে, হৃদয়ের সদ্‌গুণ লাভ হয় না, বাক্য সংযত হয় না। বাস্তবিক সমবেত উপাসনায় অনেক সময় অবিনয়প্রসূত বাক্য বাহির হইয়া পড়ে, তজ্জন্ত বিশেষ ব্রত অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

হ্রী মানব প্রকৃতির একটী শ্রেষ্ঠ ভূষণ। হ্রীমান্ পুরুষ ও হ্রীমতী নারী সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু হ্রী কেবল শরীর সম্বন্ধে নহে, আত্মা-সম্বন্ধেও একপ্রকার হ্রী আছে। নিজ দেহকে অযথারূপে প্রদর্শন করা যেমন হ্রীর নিয়মবিরুদ্ধ, সেইরূপ নিজ আভ্যন্তরীণ ভাবরাশিকে অযথারূপে প্রদর্শন করাও আধ্যাত্মিক হ্রীবিরুদ্ধ। আমাদের উপাসনা ও প্রার্থনাদিতে অনেক সময়ে হ্রী বিহীনতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে উপদেষ্টার ন্তায় উচ্চ আসনে না বসিয়া প্রার্থীর ন্তায় নিম্ন আসনে বসাই হ্রী-সঙ্গত কার্য্য। এই সত্যটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

সরল পথ—ধর্ম্মরাজ্যের যাত্রীগণ চিরদিনই সরল পথে গমন করিয়া থাকেন। কুটিল লোকেরাই কুটিল পথ অবলম্বন করে, বিরোধীদিগের মতের সহিত সামঞ্জস্ত রক্ষা করিয়া চলে, সন্ধি স্থাপন করে। যাহা অসত্য, অনিষ্টকারী, মানবাত্মার বিষস্বরূপ তাহার সহিত আবার সন্ধিবন্ধন কি? দুঃখের বিষয় এই যে, এক সময় ব্রাহ্মগণ যে সকল দূষিত রীতি নীতিকে পাপ ও কুসংস্কার বোধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যে সকল আচরণের ছায়া স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন, যে সকল ভাব অবলম্বন করা ধর্ম্মসাধনের পক্ষে ক্ষতিজনক বলিয়া উপদেশ দিতেন, এখন অনেকেই আবার সেই সকল বিরোধী ভাব গ্রহণ করিতেছেন। প্রাচীন সমাজের সহিত সন্ধিবন্ধন করাই যেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য। তাঁহাদের কার্য্যে যেন ইহাই প্রকাশ পায় যে, প্রাচীন সমাজের সহিত সন্ধিবন্ধন না হইলে ব্রাহ্মসমাজ টিঁকিবে না। কেহ কেহ প্রবন্ধে, বক্তৃতায় এবং আলোচনায়ও এরূপ ভাবের কথা প্রকাশ করিতেছেন। এই অবস্থায় পতিত হইয়া সরল ধর্ম্মসাধকগণ যেপথ অবলম্বন করিয়াছেন, আমাদের তাহা চিন্তাকরা কর্ত্তব্য এবং তদনুসরণ করাই ধর্ম্মসঙ্গত।

একদিন মহাত্মা মহম্মদ কাবা মন্দিরে কোরাণের বচন পাঠ করিতেছিলেন। বিরোধী কোরেশগণ তাহা শ্রবণ করিতেছিল। "অনন্তর তোমরা কি লাত ও গরি এবং তৃতীয় মনাতকে (কোরেশদিগের পৌত্তলিক দেবতা) দেখিয়াছ?" ইত্যাদি বচন পাঠ করিয়া পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করেন এবং যথারীতি পরমেশ্বরের নিকট মস্তক অবনত করেন। কোরেশগণ ভাবিল যে, মহম্মদ তাহাদের দেবতাকে স্বীকার করিয়া নমস্কার করিলেন। ইহা ভাবিয়া তাহারা সকলে আনন্দিত হইল। কোরেশদল সর্ব্বোপরি এক অনাদ্যনন্ত পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করিতেন। যেমন হিন্দুগণ বলেন যে, একমাত্র সত্যস্বরূপ চিন্ময় পরব্রহ্ম হইতে সকল দেবতার সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্ম আছেন এ কথাও সত্য এবং তৎ-সৃষ্ট ইন্দ্র চন্দ্রাদি দেবতা আছেন, তাহাও সত্য। সাকার নিরাকার উভয়ই সত্য। কোরেশগণ ঠিক এইরূপ বিশ্বাস করিত। এক নিরাকার ঈশ্বর তাহাদের লাত ও গরি প্রভৃতি দেবতাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ছিল। সুতরাং মহম্মদ যখন তাহাদের লাত গরিকে স্বীকার করিলেন, তখন তাহারা মহম্মদের নিরাকার ঈশ্বরকে স্বীকার করিবে আশ্চর্য্য কি? এই দিন হইতে কোরেশদল মহম্মদের কার্য্যের সহায়তা করিতে লাগিল। দুই দলে—সাকার নিরাকারে মিলন হইল। মক্কায় শান্তি স্থাপিত হইল। চতুর্দ্দিকের লোকে জানিল যে, বিবাদ নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই মহম্মদ বুঝিতে পারিলেন যে, কোরেশদল তাঁহার সহিত কি ভাবে যোগদান করিতেছে, কি ভাবে তাহার দল পুষ্টি করিতেছে। তখন মহম্মদ কোরেশ দলপতিকে ডাকিয়া কহিলেন;—"আপনারা আমার সম্বন্ধে যাহা মনে করিয়াছেন, তাহা অসত্য, আমি আপনাদের দেবতাকে স্বীকার করি নাই এবং সম্মান দানও করি নাই, সম্মান দিতেও প্রস্তুত নহি, একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন কেহ উপাস্ত নাই।" কোরেশ দলপতিগণ মহম্মদের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া মহা ক্রুদ্ধ হইল। পুনরায় বিবাদানল প্রজ্বলিত হইল। মহাত্মা যীশু দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া মন্দিরের জিনিস পত্র ভাঙ্গিয়াছিলেন। বাস্তবিক সরল ধার্ম্মিকদিগের নিকট কোনও প্রকার অসত্য ও কুসংস্কার তিষ্ঠিতে পারে না। ব্রাহ্মগণ এক সময় এ বিষয়ে অতি সৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন আর কুসংস্কারের প্রতি তেমন ঘৃণা নাই, বরং অনেক কুসংস্কারের সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। এ অবস্থা সরলতার অবস্থা নহে, ইহা সাংসারিক বুদ্ধিমূলক; ইহাতে ধর্ম্মজীবনের অধোগতিই হইতে থাকিবে।

প্রেমসাধন—সকল ধর্ম্মশাস্ত্র, সকল মহাজন, সকল সম্প্রদায়ের লোকেই উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন "প্রেম সাধন কর, প্রেমেতেই ধর্ম্ম, প্রেমেই মুক্তি।" বাস্তবিক জগতে যেখানে অপ্রেম, অশান্তি, সেখানে ধর্ম্ম থাকে না। কিন্তু জীবনে এই মহাব্রত পালন করা বড়ই কঠিন। স্বার্থকে পদদলিত করিয়া অন্যের সুখ ও সুবিধা বিধান করা, নিজের মান মর্য্যাদার প্রতি না চাহিয়া কেবল পরকে সুখী করিবার চেষ্টা করা বড়ই গুরুতর কার্য্য। একজন লোক অভ্যাসের গুণে দুই ঘণ্টা ধ্যানে বসিতে পারে বা কর্ত্তব্যের অনুরোধে দেশহিতকর কার্য্য করিতে পারে; কিন্তু প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতে, নিন্দকের দুর্ব্বাক্য শির পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারা বড় কঠিন কার্য্য। প্রত্যেকের দৈনিক জীবনে নিয়ত এবিষয় পরীক্ষিত হইতেছে। সংসারের

লোকে প্রতিদিন অপরের নির্যাতন, উৎপীড়ন এবং নিন্দা সহ্য করিতেছে। নিন্দকের কথা তীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে, লোকের অবিচার, পক্ষপাতে কত লোকে জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। যে সংসারে কেবলই দোষ অনুসন্ধান, নিন্দা, বাকবিতণ্ডা, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা, কলহ, রক্তপাত ইত্যাদি নিয়ত ঘটিতেছে, সেখানে সর্ব্বোপরি প্রেমকে রক্ষা করা বড়ই কঠিন।

কেহ একটি সাধুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জনসমাজের হিতসাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য, এজন্ত নিজের শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু নিন্দকের জিহ্বা তাঁহারও দুর্ণাম রটনা করিতে ছাড়িতেছে না। দুর্ব্বল মানুষ নিন্দার স্রোতে কয়দিন সুদৃঢ় থাকিতে পারে? এমন ব্যক্তিরও চিত্ত অপ্রেমে উত্তেজিত হয়। বাস্তবিক এই জ্বালাময় সংসারে প্রেমের শীতল বারি দ্বারা যাঁহার হৃদয় নিয়ত বিধৌত হইতেছে, তিনি ভিন্ন কেহই শান্তিলাভ করিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের সাধু দৃষ্টান্ত সকলেরই অনুকরণীয়। রামচন্দ্র পুরী মহা নিন্দক ছিল। সে নীলাচলে যেখানে সেখানে বেড়াইত এবং নিজে ভিক্ষা করিয়া খাইত; কিন্তু কোন বৈরাগী কত খায়, কিরূপে বাস করে, তাহারও সন্ধান লইত। এ সময় চৈতন্য নীলাচলে ছিলেন। সে বিশেষভাবে "চৈতন্যের অবস্থিতি, রীতি, নীতি, ভিক্ষা, শয়ন, আচরণ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ সন্ধান লইতে লাগিল। তখন চৈতন্যের জন্য চারি পণ কড়ির প্রসাদ আসিত, তাহা চারি জনে খাইতেন। রামচন্দ্র বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, "চৈতন্য মিষ্টান্ন খায়, মিষ্টান্ন সেবনে সন্ন্যাসীর জিহ্বার দোষ জন্মে। চৈতন্যের চাল চলন বিলাসীর মত।" চৈতন্যের বাসস্থানে রামচন্দ্র প্রতিদিন যাইত। চৈতন্য তাহার নিন্দা-বাক্য শুনিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইতেন না। পূর্ব্ববৎ তাহাকে আদর সম্ভ্রম করিতেন।

একদিন রামচন্দ্র প্রাতঃকালে চৈতন্যের ঘরে কতকগুলি পিপীলিকা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন "রাত্রিতে এখানে মিষ্টান্ন আসিয়াছিল, তাহাতে এত পিপড়া বেড়াইতেছে। হায় বিরক্ত সন্ন্যাসীদিগের একি ইন্দ্রিয় লালসা।" চৈতন্য মিষ্টান্ন ভোজন করিতেন না তিনি সামান্য প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন। কিন্তু রামচন্দ্র পুরীর ঐ মিথ্যাবাদে তিনি বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক বরং গোবিন্দকে ডাকিয়া কহিলেন "আমার জন্য অদ্য হইতে অর্দ্ধ প্রসাদ আনিবে।" একথা ভক্তমণ্ডলীতে রাষ্ট্র হইলে সকলে মহা দুঃখিত হইলেন। চৈতন্য অর্দ্ধাশনে দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিলেন।

ভক্তগণ সকলে মিলিত হইয়া চৈতন্যকে কহিলেন "রামচন্দ্র পুরী অত্যন্ত নিন্দক, তার কথায় অন্ন পরিত্যাগ করিয়া আপনি শরীর ক্ষীণ করিতেছেন কেন? নিন্দকের কথায় আত্মবিনাশ করা কি ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য?" চৈতন্য ধীরভাবে উত্তর করি-লেন; "তোমরা পুরীর কেন নিন্দা করিতেছ, উনি ত সত্য কথাই বলিয়াছেন, বাস্তবিক জিহ্বার বিলাসিতা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে। ভাল খাইয়া ভাল পরিয়া যতিধর্ম্ম রক্ষা করা যায়না। রামচন্দ্র পুরী মঙ্গলের জন্যই আমাকে সংযত হইতে বলিয়াছেন। তোমরা তাঁহার কথা অন্যভাবে গ্রহণ করিতেছ কেন?" চৈতন্যের উদারতা এবং প্রেম দেখিয়া ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন।

রামচন্দ্র পুরীর ন্যায় নিন্দক লোকের সংখ্যা বর্ত্তমান সময়ে বিরল নহে; কিন্তু চৈতন্যের ন্যায় তেমন প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। চৈতন্য শরীর ধ্বংসকারী বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই অবস্থাতেও তিনি নিন্দকের দৃষ্টি হইতে রক্ষা পান নাই। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে সকল সময়েই নিন্দকের দল বিদ্যমান থাকে। কিন্তু নিন্দাকারীর নিন্দাবাক্য উপদেশ রূপে গ্রহণ করাতেই ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। আমাদের মধ্যে যাঁহারা চৈতন্যের ন্যায় উক্ত প্রকারে অযথা নিন্দাগ্রস্ত হইয়াছেন, অথবা হইতেছেন, তাঁহারা নিন্দাকারীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবিষয়ে সকলেরই আত্মচিন্তা করা কর্ত্তব্য। আমাদের মধ্যে যাঁহারা প্রতীচ্য ভাবাপন্ন, সম্ভবতঃ তাঁহারা ঐরূপ নিন্দাকারীকে এই বলিয়া তাড়াইয়া দিবেন যে "আমার আহার বিহার প্রভৃতি সম্বন্ধে তোমার মন্তব্য প্রকাশ করিবার কি অধিকার আছে? তুমি নিজে সাবধান হও।" যাঁহারা প্রাচ্যভাবাপন্ন তাঁহারা অবশ্য নিন্দকের কথায় কর্ণপাত করিবেন না, চক্ষু উন্মীলন করিবেন না; কিন্তু মনে মনে ভাবিবেন, লোকটা অনেক নিম্নস্তরে বাস করিতেছে। যতিধর্ম্মের সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, আধ্যাত্মি-কতার ভাব গ্রহণ করিতে পারে, এমনও শক্তি নাই। এই দুই দিকে দুই প্রকার ভাব। একদিকে নিন্দককে নীতিশিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা, অপর দিকে অহঙ্কারের ভাব। কিন্তু প্রকৃত প্রেম হইতে ইহারা উভয়ে বঞ্চিত। প্রাচ্য ভাবাপন্নই হউন, আর প্রতীচ্য ভাবাপন্নই হউন, যিনি শত্রুকে আলিঙ্গন করিতে পারেন, নিন্দকের উক্তি উপদেশের ন্যায় গ্রহণ করিতে পারেন, এমন বিনীত, শান্ত এবং প্রেমিকই আদর্শ স্থানীয়।

ব্রাহ্মসমাজে এই প্রেমের ভাব জাগ্রত করিবার জন্ত বিশেষ সাধন আবশ্যক। ব্রাহ্মসমাজে নিন্দক উৎপীড়নকারীর সংখ্যা অনেক; কিন্তু তাহাদিগকে ভালবাসিতে পারেন, এরূপ ব্যক্তি কয় জন আছেন? সামান্ত দোষের কথা উল্লেখ করিলে যাহারা অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করে, তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। কিন্তু যাঁহারা প্রেমসাধন করিতে প্রয়াসী, ঈশ্বর-দর্শনার্থী তাঁহা-দের নিকট সকলেই সাধু দৃষ্টান্তের আশা করেন। পরমেশ্বর কৃপা করুন, ব্রাহ্মগণ শত্রুকে প্রেম করিতে, নিন্দকের বাক্য উপদেশ স্বরূপ গ্রহণ করিতে যত্নবান্ হউন।

উদারতা—বাজীকরদিগের হাতে একখণ্ড অস্থি থাকে, তাহার স্পর্শে যেন এক বস্তুকে অন্ত বস্তুতে পরিণত করিতে পারে, এমনভাবেই তাহারা সেই অস্থি খণ্ডের ব্যবহার করে। তাহারা কৌশল প্রদর্শনকালে সেই অস্থিখণ্ড এক একটী পদার্থে স্পর্শ করায় আর অমনি তাহা অন্ত পদার্থে পরিণত হয়। বাজীকরেরা যেমন লোক চক্ষুকে ভ্রান্ত করিবার মানসে অস্থিখণ্ডের ব্যবহার করিয়া থাকে। সমাজ মধ্যেও এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা উদারতার ন্যায় সুন্দর শব্দটীকেও সেই ভাবে ব্যব-

হার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কথার ভাবে বোধ হয়, উদারতা শব্দের এমন একটী আশ্চর্য্য শক্তি আছে যাহার প্রভাবে দোষ, দুর্ব্বলতা, কুসংস্কারপ্রিয়তা প্রভৃতি সকলই যেন সুন্দর হইয়া যায়। এক ব্যক্তি এক সময়ে জাতিভেদ প্রথার বিশেষ বিপক্ষ ছিলেন, সময় ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাঁহার মনের পরিবর্ত্তন হইল। তিনি ক্রমে জাতিভেদের সমর্থন আরম্ভ করিলেন এবং কার্য্যেও তাহার পোষকতা করিতে লাগিলেন। যদি তুমি তাহার প্রতিবাদ কর অমনি তোমাকে তিনি অনুদার বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন এবং উদারতার সুমহান্ আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। এক সময়ে যিনি কোন কুসংস্কারের অতিশয় বিরোধী ছিলেন এখন অবস্থায় পড়িয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন হইল আর কার্য্যেও তাহার পরিচয় পাওয়া গেল, তুমি তাঁহাকে সেই কুসংস্কারের প্রতিকূলে তোমার মত জ্ঞাপন কর, অমনি দেখিবে তাঁহার মুখ হইতে উদারতা নামক মহাস্ত্র নিঃসৃত হইয়া আসিবে। প্রয়োজনবশতঃ কাহারও পাপের সহিত ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়াছে, শাসন করিতে যাও অমনি তুমি অনুদারতার সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছ বলিয়া অভিযুক্ত হইবে। ব্রাহ্মগণ যে সকল পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়াকে এক সময় অপ-রাধের ও ক্ষতির কারণ বলিয়া মনে করিতেন, মনের পরিবর্ত্তন বা অন্য কোন প্রয়োজনে এখন সেই সকল অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আবশ্যক হইয়াছে, তাহার প্রতিকূলে কিছু বলিতে যাও তুমি অনুদার হইবে। এইরূপে উদারতারূপ ঐন্দ্রজালিক অস্ত্রের সাহায্যে অনেক দোষ দুর্ব্বলতা ও কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিবার পথ যেন দিন দিন প্রশস্ত হইতেছে। উদারতা শব্দের যে এমন একটী আশ্চর্য্য গুণ আছে, তাহার দেহ যে রাক্ষসের মায়িক শরীরের ন্যায় যত ইচ্ছা বড় হইতে পারে বা যত ইচ্ছা ক্ষুদ্র হইতে পারে এরূপ জ্ঞান কিন্তু সকলের নাই। যদি বাস্ত-বিকই উদারতাশব্দের এমন কোনগুণ থাকিত যে,যাহার স্পর্শেই দোষ গুণে, দুর্ব্বলতা সবলতায়, কুসংস্কার সুসংস্কারে পরিণত হইতে পারিত, তাহা হইলে উদারতা জিনিসটী বড়ই মায়াত্মক এবং অতিশয় ভয়ের কারণ হইত এবং অনুদার উপাধি লাভ যতই নিন্দনীয় হউক না কেন তাহাই প্রার্থনীয় হইত। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে উদারতা শব্দের এমন ভীষণ শক্তি নাই। তাহার স্পর্শেই দোষ গুণে পরিণত হয় না।

উদারতা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা যদিও অসাময়িক, কারণ তাহার ব্যাখ্যা বহুবার হইয়াছে, তথাপি যখন লোকে তাহার অর্থের নানারূপ বিপর্য্যয় ঘটাইতেছে তখন তাহার আলোচনায় লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। উদারতাসম্বন্ধে ভাবিতে গেলেই দেখা যায়, ইহা স্থিতিস্থাপক রবারের মত বস্তু নয় যে,যত ইচ্ছা টানিয়া বড় করা যায় বা যত ইচ্ছা চাপ দিয়া ছোট করা যায়। ইহার বাস্তবিক একটী নির্দ্দিষ্ট আয়তন আছে, যত চেষ্টা করনা কেন ইহা আপনার অবয়ব কখনই পরিত্যাগ করে না। ইহা সত্য ও কল্যাণকে অতিক্রম করিয়া বিন্দু পরিমাণেও আপনার সীমা বৃদ্ধি করে না। সম্পূর্ণরূপে সত্য ও কল্যাণই ইহার অবয়ব। ইহা সর্ব্বদাই সত্যকে আশ্রয় করে, সত্যেরই অনুসরণ করে। সত্যেই ইহার মূল দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যাহা কিছু অসত্য, যাহা কিছু দুষ্ট, যাহা কিছু অকল্যাণকর, উদারতার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। সত্যাসত্যের বিচার শূন্য হইয়া কিছু গ্রহণ বা পরিত্যাগ কখনই উদারতা নয়। বিচারবিহীন ভাবে প্রয়োজনীয় হইলেই বা ভাল লাগিলেই যে কোন মত গ্রহণ বা পরিত্যাগ, কখনই উদারতা নয়। উদারতা বিন্দু পরি-মাণেও অসত্যের সংশ্রব সহ্য করিতে পারে না। ইহা শিশুর ক্রীড়ার কর্দ্দমও নয় যে ইচ্ছানুরূপ ইহাকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়। ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি সুদৃঢ়, তাহার ব্যতিক্রম করা আর সত্যের অপলাপ করা একই কথা। ব্যাখ্যার বলে বা বুদ্ধিচাতুর্য্যে সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্যবৎ প্রতীয়মান করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা উদারতা নামের নিকট দিয়াও যায় না। যাহা চিরদিন পরিহার্য্য চিরদিনই পরিত্যাজ্য। উদারতার প্রকৃত তাৎপর্য্য সত্যকে নিরাপত্তিতে আদর করা, লাভ ক্ষতি গণনাবিহীন হইয়া সত্যকে আশ্রয় করা। সে সত্য যে দেশ যে কাল যে লোকের নিকট হইতেই সমাগত হউক না কেন, তাহা ছোট, বড, নিকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট পদস্থ অপদস্থ যে কোন ব্যক্তিরই আবিষ্কৃত হউক না কেন। সত্য, এই জ্ঞান জন্মিলেই গ্রহণীয় এবং মনের এরূপ প্রশস্ত জ্ঞানই উদারতা। কোন বিষয়ের প্রতিবাদ না করা, মনোমালিন্য বা অন্য কোন আশঙ্কায় কোন মতে সায় দিয়া যাওয়া নিরীহ প্রকৃতির কার্য্য হইতে পারে এবং লোকরঞ্জনের উপায়স্বরূপ হইতে পারে; কিন্তু তাহা উদারতার সীমাদেশ স্পর্শ করিবারও যোগ্য নহে। সে ব্যক্তি উদারতা শব্দ মুখে বার বার উচ্চারণ করিলেও তাহার মহত্ত্ব ও মাধুর্য্য অনুভব করিতে অস-মর্থ। উদারতা চিত্তকে প্রশস্ত করে, সত্যের জন্য আকুল করে এবং নিয়ত সত্যের অনুসরণে ব্যস্ত করে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ধর্ম্ম-কঞ্চুক।

চীনদেশীয় সাধু কংফুচ সর্ব্বদা বলিতেন,—"তাহা তুমি উপদেশ করিও না যাহা তুমি নিজে আচরণ কর না। যদি ও বা উপদেশ কর তাহা হইলে ত্বরায় তদনুরূপ আচরণ কর।" তাঁহার এ প্রকার বলিবার অভিপ্রায় এই, মানুষ যদি নিজ উপদেশের অনুরূপ আচরণ না করে, তাহা হইলে তাহার চরিত্র অন্তঃসারবিহীন, সত্যতাবিহীন ও মেরুদণ্ডবিহীন হইয়া পড়ে। জগতে এরূপ বহুসংখ্যক লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা সর্ব্বদা উচ্চ উচ্চ কথা মুখে বলিতেছে অথচ তাহাদের কার্য্য তদনুযায়ী নহে। এই সকল লোক মানব সমাজে অতিশয় ঘৃণিত। ইহাদিগকে ধর্ম্ম-কঞ্চুকধারী বা প্রচলিত ইংরাজীতে হামবাগ বলে। এরূপ ব্যক্তি অপেক্ষা তাহারা শ্রেষ্ঠ যাহারা উচ্চকথাও বলেনা—উচ্চকাজেও লিপ্ত নহে; ধর্ম্ম-কঞ্চুকে আপনাদিগকে আবৃত করিয়া অসাধুতাচরণ করে না। সকল প্রকার অপরাধের মধ্যে ধর্ম্ম-কঞ্চুক ধারণের অপরাধ অতি গুরুতর।

কিন্তু লোকে কি ইচ্ছা করিয়া ধর্ম্ম-কঞ্চুক ধরিয়া থাকে? অনেকস্থলে এরূপ হয় বটে। স্বার্থপর ও ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তিরা দেখিয়াছে যে ধর্ম্মের প্রতি জনসমাজের প্রগাঢ় আস্থা; এমন কি ধর্ম্মের বহিরাবরণের প্রতিও লোকের অতিশয় সম্ভ্রম। ইহা দেখিয়া লোকচক্ষে ধূলি দিবার জন্য তাহারা ধর্ম্মের বহিরাবরণ ধারণ করে ও তদ্দ্বারা আপনাদের দুরভিসন্ধি পূর্ণ করিয়া লয়। এইরূপে কত শত শঠ, প্রবঞ্চক ও দুষ্ক্রিয়ান্বিত লোক সন্ন্যাসী ও সাধু সাজিয়া এদেশে ভ্রমণ করিতেছে। তাহারা দেখিয়াছে যে সন্ন্যাসী ও সাধুদিগের প্রতি এদেশের লোকের প্রগাঢ় আস্থা এবং ঐ আচরণে আবৃত থাকিলে অনায়াসে সর্ব্বত্র গতায়াত করিতে পারা যায়, সকলের সম্মানিত হইয়া থাকা যায়, অথচ যথেচ্ছ সুখ ভোগ করা যায়। ইহা দেখিয়া তাহারা ধর্ম্মের আচরণকে আত্ম-রক্ষার উপায় স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই ব্যাপারটা এতদূর প্রবল হইয়াছে যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পুলিস সর্ব্বদা সতর্ক। যেখানে একদল নূতন সন্ন্যাসী ও সাধু আসিয়া বসে, সেই খানেই বিশেষ পুলিস নিযুক্ত হয় এবং চুরি বা ডাকাতির জন্য যে সকল ওয়ারেণ্ট আছে, তাহারা তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতে থাকে।

আমরা এক ধর্ম্ম-কঞ্চুকধারীর কথা জানি। সে ব্যক্তি এক সময়ে সকল প্রকার সমাজ-সংস্কারের প্রতি অনুরাগ জানাইত এবং মুখে সর্ব্বদা উদার সত্য সকল প্রচার করিত। অনেক লোকে তাহার বাক্‌পটুতার গুণে আকৃষ্ট হইত। কিন্তু লোকটির গুপ্ত চরিত্র কখনই ভাল ছিল না। মধ্যে মধ্যে তাহার অখ্যাতি শুনা যাইত। কখনও শুনা গেল কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে অভদ্র ব্যবহার করাতে প্রহার খাইয়াছে। কখনও জনশ্রুতি হইল কোনও শরণাগতা নিরাশ্রয়া বিধবাকে বিপথে নীত করিয়াছে ইত্যাদি। অবশেষে সকল শ্রেণীর লোকে তাহার প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে দেখিল যে বিষয় কার্য্যে অপর দশজন বিষয়ীর ন্যায় থাকিয়া অবাধে নিজ দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার সুবিধা হয় না। অবশেষে স্থির করিল যে ধর্ম্মের পরিচ্ছদ ধারণ করিতে হইবে, তাহা হইলে অবাধে স্বীয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিবে। আর এমন সুবিধাই বা ভারতবর্ষ ভিন্ন অপর কোন্ দেশে পাইবে। এখানে সকল শ্রেণীর, সকল ভাবের, সকল রুচির পুণ্যাত্মা ও পাপাচারীর জন্য ধর্ম্ম আছে। এক তান্ত্রিক সাধনের নামে কি দুষ্ক্রিয়াই না আচরিত হইতেছে। সেই সুচতুর ব্যক্তি অবশেষে তন্ত্রের শরণাপন্ন হইল। গৈরিক বসনে আপনাকে আবৃত করিয়া ভস্মে আবৃত হইয়া চিম্‌টা ও ত্রিশূল হস্তে কিয়দ্দিবস ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিল। লোকে দেখিল একজন ইংরাজী শিক্ষিত কৃতী লোক, যে বিষয় কর্ম্ম করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিত, সে এখন বৈরাগ্যের বেশ ধারণ করিয়াছে। এ ব্যক্তি নিশ্চয় কিছু পাইয়াছে। এই ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সকলে তাহার প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন করিতে লাগিল। ক্রমে দেখা গেল, কতকগুলি ভৈরবী জুটাইয়াছে। ঐ সকল স্ত্রীলোকের সহিত সর্ব্বসমক্ষে নির্লজ্জ আচরণ করে এবং নির্লজ্জতার মাত্রা যত অধিক হয় ততই অজ্ঞ ও ধর্ম্মান্ধ লোকে তাহাকে সাধক বলিয়া সম্ভ্রম করে। এইরূপে তাহার চিরপোষিত দুষ্প্রবৃত্তির চরিতার্থতা অবাধে চলিতে লাগিল।

অবশ্য ইহা ধর্ম্ম-কঞ্চুক ধারণের উৎকট দৃষ্টান্ত। কিন্তু ধর্ম্মকে এরূপে নিজ দুষ্প্রবৃত্তির আচ্ছাদনের উপায় স্বরূপ না করিয়াও লোকে অনেক সময়ে ধর্ম্ম-কঞ্চুক ধারণ করিয়া থাকে। মুখে উচ্চ উচ্চ কথা বলিবার অভ্যাস হইয়া যায়, কিন্তু কার্য্যতঃ তদনুরূপ আচরণ করিবার প্রবৃত্তি থাকে না। এই সকল ব্যক্তি যে লোক-প্রবঞ্চনার উদ্দেশেই উচ্চ কথা কহিয়া থাকেন, তাহা নহে। কিন্তু অভ্যাস বশতঃ ঐরূপ হইয়া থাকে। এক সময়ে তাঁহারা সেই সকল সত্যে সমগ্র হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন; এক সময়ে ঐ সকল বিষয় তাঁহাদের সাধনের লক্ষ্যস্থলে ছিল; এক সময়ে তাঁহারা সরল ও ঐকান্তিকভাবে ঐ সকল সত্যের অভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কালসহকারে হৃদয় মনের দুর্ব্বলতা বশতঃ বার বার সাধন-ভ্রষ্ট ও পরাভূত হইয়া অন্তরের ব্যাকুলতা ক্রমে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে; নিরাশাতে হৃদয়ের উৎসাহকে মন্দীভূত করিয়াছে; ক্রমে আত্ম-দৃষ্টির অভ্যাস চলিয়া গিয়াছে। এখন মুখে উচ্চ উচ্চ কথাগুলির অভ্যাস আছে কিন্তু জীবনের মধ্যে কোনও সংগ্রাম নাই; জীবনকে আলস্য ও জড়তাতে ঘিরিয়াছে। এ অবস্থাও অতিশয় শোচনীয়।

ধর্ম্ম-কঞ্চুক হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সত্যতা সাধনের দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যাহা মুখে প্রার্থনা করিতেছি তাহা জীবনে সাধন করিব, এবং যাহা জীবনে সাধন করিবার চেষ্টা করিব না, তাহা মুখে প্রার্থনাও করিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া প্রার্থনা করিলেও অনেক উপকার দর্শিতে পারে। মনে কর আমরা একদিন আমাদের সম্মিলনী সভাতে প্রার্থনা করিলাম—"হে প্রভো আমাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর।" এ প্রার্থনার যদি কোনও অর্থ থাকে, তবে সে অর্থ এই, আমরা আত্মবিরোধ ও অশান্তিনিবন্ধন ক্লেশ অনুভব করিতেছি এবং শান্তিকে স্পৃহণীয় মনে করিতেছি। ইহাই যদি সত্য হয় তবে আমাদের পরবর্ত্তী আচরণে তদনুরূপ লক্ষণ সকল লক্ষিত হওয়া উচিত, অর্থাৎ ইহা দেখা চাই যে আমরা স্বতঃপরতঃ শান্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছি। নতুবা প্রার্থনার গুরুত্ব ও দায়িত্ব থাকে না। ঈশ্বর-চরণে নিবেদিত প্রার্থনা এক একটী প্রতিজ্ঞা-বাক্যের ন্যায়। তুমি মুখ ফুটিয়া যে প্রার্থনা করিলে, তদ্দ্বারা শপথপূর্ব্বক ঈশ্বর-সন্নিধানে এই কথা বলিলে যে তুমি তদনুরূপ আচরণ করিবে। যদি না কর তবে তুমি অপরাধী ও ধর্ম্ম-কঞ্চুকধারী। কয়জনে প্রার্থনাকে এরূপ গুরুতরভাবে লইয়া থাকেন? দৈনিক প্রার্থনারূপ দ্বার দিয়া অনেক সময়ে আমাদের জীবনে অসত্যতা ও অসারতা প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। উপাসক মাত্রেরই এবিষয়ে সজাগ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

জাতীয়তা।

(প্রাপ্ত)

বায়ুর গতির যেমন স্থিরতা নাই কখনও প্রবল, কখনও দুর্ব্বল। অদ্য পূর্ব্ব হইতে কল্য হয়ত উত্তর দিক হইতে, আবার পরের দিন হয়ত দক্ষিণ দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। মানব মনেতেও এইরূপ চঞ্চলতা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ২ বৎসর পূর্ব্বে মনের যেরূপ গতি ছিল, যে সকল বিষয় প্রিয় ছিল আজ হয়ত তাহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হইতেছে। নূতন বিষয়, নূতন চিন্তা আসিয়া মনকে অধিকার করিয়াছে। মনের এই অস্থিরতা, এই নিয়তপরিবর্ত্তনশীলতাকে দমন করিবার জন্যই সাধক সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন—এই নিমিত্তই ধর্ম্মসাধন অতি আয়াস-সাধ্য। মনের প্রকৃতিতে স্বভাবতঃ যে অস্থিরতা আছে, তাহাকে নিরন্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে না দিয়া শান্ত ও সমাহিত ভাবে অবস্থিত রাখিতে সচেষ্ট হওয়াই প্রার্থনীয়। মনের যথেচ্ছগতিকে বাধা না দিলে সে কখনও সত্য ধারণও গ্রহণের উপযুক্ত হয় না।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সময়ে সময়ে সে চেষ্টার অত্যন্ত অভাব লক্ষিত হয়। যে সকল বিষয় সুমীমাংসিত হইয়াছে, যে সকল অনিষ্টকর বিষয়ের অনিষ্টকারিতাসম্বন্ধে একবার উপযুক্ত সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে, দেখাযায় আবার সেই সকল বিষয়ও লোকের প্রিয় হইতেছে। সুমীমাংসিত বিষয়ের ও পুনর্মীমাংসা করিবার জন্য আন্দোলন, আলোচনা চলিতেছে। এইরূপ অস্থিরতা যেমন ধর্ম্মসাধনের বিঘ্নকারী তেমনি মানসিক দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক। এজন্য পুরাতন হইলেও আজ একটী বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা ইহাতে যে উদারতা, সর্ব্বজনীনতা, চিরবিদ্যমান থাকিবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই হেতু নাই। দেশ বা কাল ইহাকে আবদ্ধ করিবে না। কোন জাতি বা সম্প্রদায় ইহার বিশেষ আদরণীয় ও উপেক্ষণীয় হইবে না। ইহা যেমন সত্য গ্রহণ সম্বন্ধে উদার, ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রহণ করিতে যেমন দেশ, কাল বা জাতির প্রতি ইহার কোন বিশেষ পক্ষপাতিত্ব থাকিবে না, তেমনি সামাজিক আচার ব্যবহার, গার্হস্থ্য রীতিনীতি সম্বন্ধেও কোন দেশ, জাতি সম্প্রদায় বা কালে ইহা আবদ্ধ থাকিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটাইতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহারা অতি সুবিজ্ঞ হইলেও, ইহার বান্ধব হইলেও, ইহার প্রকৃতি অনুভব করিতে এবং কল্যাণ সাধন করিতে কখনও উপযুক্ত পাত্র নহেন। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মূল প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হইবেন, তাঁহারা সজ্জন ও জ্ঞানী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহৎ লক্ষ্য ধারণে যেমন অক্ষম, ইহার সেবা করিতেও তেমনি অসমর্থ। জাতীয়তা বা সাম্প্রদায়িকতা ইহার লক্ষণ হইতে পারে না। কোন বিশেষ জাতির আচার ব্যবহার বা জ্ঞান গরিমায় ইহা আবদ্ধ থাকিবে না। ধর্ম্মমত ও সত্য গ্রহণসম্বন্ধে যেমন যাহা কল্যাণকর তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীর অবলম্বনীয়, আদরণীয়, তেমনি আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও যাহা জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুমোদিত, যাহা মানব মাত্রেরই কল্যাণকর, তাহাই ব্রাহ্মের অবলম্বনীয়, তাহাই আদরণীয়। তাহা কোন্ দেশের কোন্ জাতির বা কোন্ সম্প্রদায়ের সে বিচার করিবার অবসর ব্রাহ্মের নাই। কারণ তাঁহার অবলম্বিত ধর্ম্মের প্রকৃতিই সেরূপ নয়। এজন্য ইহা যেমন সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে, আপনার জ্ঞান বিশ্বাস যেমন চারিদিকে ছড়াইবে, তেমনি সামাজিক পারিবারিক সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর আচার ব্যবহারও সর্ব্বত্র হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিবে।

জাতীয়তা শব্দ এক অর্থে ব্রাহ্মের অভিধান হইতে উঠিয়া যাইবে। সে অর্থ এই, যাহাতে লোককে অপরের সদ্‌গুণ দর্শনে ও তাহার অনুসরণে অন্ধ করে ও অনিচ্ছুক করে। আপন দেশের যাহা ভাল, তাহার প্রতি অত্যধিক অনুরাগ প্রদর্শিত হউক, তাহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। কিন্তু জাতি বিশেষ বা দেশ বিশেষের প্রতি অন্ধ-প্রেম মানবের কল্যাণের পথকে অবরুদ্ধ করে। এইরূপ অন্ধপ্রেম মানবকে অকারণ আত্মম্ভরী ও আত্মপ্রশংসাপ্রিয় এবং অপরের প্রতি উদাসীন ও বিদ্বেষপরায়ণ করে। ইহা দ্বারা লোকের দৃষ্টি অতি সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হয়। জ্ঞানোন্নতির সরল ও সহজ পথ ইহা দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া যায়। এজন্য স্বজাতিপ্রেম অতি কল্যাণকর ও অতি স্পৃহনীয় হইয়াও উন্নতির বিষম বিরোধী হয়। স্বজাতি-প্রেম যেমন মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে, তেমনি জাতীয়তারূপ অন্ধতায় লোককে অপরের প্রতি শুধু উদাসীন করিয়াছে এমন নয় কিন্তু নিত্য বিবাদ, বিদ্বেষ, অপ্রেমের বশীভূত করিয়া মানবকে বিপথগামী করিয়াছে ও করিতেছে। অনুচিত স্বজাতি-প্রেম বা অন্ধ-জাতীয়তা আজ উঠিয়া যাউক রাজ্যের প্রধান ভার ও গলগ্রহস্বরূপ যুদ্ধ-ব্যবসায়ী সৈনিকগণের অধিকাংশকে এখনই বিদায় দেওয়া যাইতে পারিবে। এক শ্রেণীর লোক যে মানুষবধের নিত্য নূতন কৌশল আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে, তাহাদের জ্ঞান শক্তি এ বিষয়ে নিয়োগ করিবার কোন প্রয়োজন হইবে না। তাঁহাদের শক্তি দেশের অন্যবিধ কত কল্যাণকর বিষয়ে নিযুক্ত হইয়া এখনই কত হিতসাধন করিতে সমর্থ হইবে। জাতীয়তা যেমন লোককে যুদ্ধপ্রিয় করে, তেমনি সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর বিষয়ে পরদ্বেষপরায়ণ করিয়া লোককে অতি সংকীর্ণ, অতি সামান্য স্থানে আবদ্ধ করিয়া থাকে। ইহা যেমন জ্ঞান ধর্ম্মের পরিপন্থি, তেমনি বিষয় বাণিজ্যেরও বিষম প্রতিবন্ধক।

বর্ত্তমান সময়ের জ্ঞানিগণ ইহা সম্যকরূপে অনুভব করিয়া যেমন একদিকে অবাধ বাণিজ্য-প্রণালীর সমর্থন করিতেছেন তেমনি যুদ্ধ বিগ্রহ যাহাতে না ঘটে, যাহাতে রাজনীতিতেও এক কল্যাণকর একতা স্থাপিত হইয়া, মানব সাধারণের মধ্যে বান্ধবতা ও নৈকট্যাদি পরিবর্দ্ধিত হইয়া সকল মানব এক সাধারণ জাতিতে পরিণত হইতে পারে, তাহারই জন্য আয়োজন করিতেছেন। দিন দিন লোকের একতার দিকে গতি হইতেছে। এ সময় ব্রাহ্মসমাজ উদার ও অতি মহৎ ধর্ম্ম পাইয়াও কি সংকীর্ণ জাতীয়তায় আবদ্ধ হইতে পারেন। যাঁহারা

সেরূপ ইচ্ছা করেন তাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের উচ্চতম জ্ঞান ও ধর্ম্মের অনুপযোগী হইয়া নিতান্ত সংকীর্ণতা এবং উন্নতির বিষম প্রতিবন্ধকতারই সমাদর করিবেন। তাঁহারা পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার ও মহৎ ভাব পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া উহার সুমহান্ ফল নিজজীবনে সম্ভোগ করিতে পারিবেনই না, অপরের পক্ষেও বিষম কণ্টকস্বরূপ হইবেন। যাঁহারা জাতীয়তা রূপ সংকীর্ণ সীমায় আপনাদিগকে আবদ্ধ করিতেছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রকৃতিই বিস্মৃত হইতেছেন। ইহার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস আমাদিগকে যাহা শিক্ষা প্রদান করিতেছে, তাহা বিস্মৃত হওয়া এবং তাহার প্রতি দৃষ্টিহীন হওয়া অতি অমঙ্গলের হইবে। সুতরাং জাতীয়তাবাদিগণ বা জাতীয়তাপ্রিয়গণ আপনাদের ক্ষণিক পরিতুষ্টি বা রুচির চরিতার্থতার জন্য ইহার কল্যাণকর মহৎ আদর্শকে হীন না করেন ইহাই প্রার্থনীয়।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনার পত্রিকার সাহায্যে একটী গুরুতর বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা, অধ্যক্ষ সভা ও সাধারণ সভার সভ্যদিগের এবং মন্দিরের ট্রাষ্টীগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-উপাসনা-মন্দিরের ট্রাষ্টডীডের ৫ম পৃষ্ঠাতে মন্দিরের ব্যবহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ নিয়ম লিখিত আছে ;—"এই মন্দির, যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা সেই চিরন্তন ও অপরিবর্ত্তনীয় মহান্ ঈশ্বরের পূজা ও অর্চ্চনার জন্য ব্যবহৃত হইবে ; কিন্তু এরূপ কোন নামে তাঁহার পূজা ও অর্চ্চনা হইতে পারিবে না যাহা কোনও লোক কর্ত্তৃক এক কিম্বা অধিক 'বিশেষ প্রাণীর' প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে।" (for the worship and adoration of the Eternal and Immutable Being who is the Author and Preserver of the universe, *but not under or by any name, designation or title used or applied to any particular being or beings by any man whatsoever.*) মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টডীডেও ঠিক এইরূপ নিয়মই করিয়াছিলেন। প্রভেদ এই যে সেখানে "কোনও লোক কর্ত্তৃক" এই স্থলে "কোনও লোক অথবা দল কর্ত্তৃক" "(by any man or set of men whatsoever)" লিখা আছে। এখানে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, "বিশেষ প্রাণী" (particular being or beings) এই বাক্যে পরব্রহ্ম ছাড়া দেবদেবী মহাপুরুষ প্রভৃতি সকল প্রকার প্রাণীকেই বুঝাইতেছে, শুধু মানুষ কি পশুকে বুঝাইতেছে না। কারণ, এস্থলে Being শব্দে পরব্রহ্মকে বুঝায় বলিয়া বড় অক্ষরে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু শেষে যে being শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা ছোট অক্ষরে লিখিত এবং তাহার পূর্ব্বে "বিশেষ" এই বিশেষণটী দেওয়া আছে, ইহাতে এই বুঝা যায় যে, তাহা পরব্রহ্ম নহে, পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, কিন্তু লোক কর্ত্তৃক পরব্রহ্মের স্থানে অধিষ্ঠিত হইতে পারে। এই বিধিটী অতি স্পষ্ট ভাষাতে লিখিত হইয়াছে। বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকিলে এরূপ বিধি করা হইত না। আর বিশেষ বিবেচনার পর এবং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই যে এ বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সকল ট্রাষ্টডীডে বিশেষ উদারতা দৃষ্ট হয়। যাহা সকল সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় নহে, যাহা ভবিষ্যতে পরিবর্ত্তন করা দরকার এরূপ বিষয় কখনও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হয় না, কারণ এ সকল নিয়ম বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালের জন্যই করা হয়। আমরা কি এখন ইহার কোন অংশ পরিবর্ত্তন করা দরকার বোধ করিতেছি? ইহাতে কি এরূপ কিছু আছে, যাহা আমাদের উন্নতির ব্যাঘাত করে? কখনই নহে। কেহ যে একথা বলিতে পারেন সে বিষয়ে আমাদের গভীর সন্দেহ আছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, এই নিয়মটী সর্ব্বদা ভঙ্গ করা হইতেছে। ট্রাষ্টডীডের কোন নিয়ম ভঙ্গ হইতে দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে। ট্রাষ্টডীডের নিয়ম যে ভঙ্গ হইতেছে তাহা আমরা প্রমাণ করিতেছি।

অনেকেই "হরি" নাম ব্যবহারে কোন দোষ দেখেন না এবং "হরি" নাম ব্যবহার করিতে ভালবাসেন। এই হেতু আমরা দেখাইতে ইচ্ছা করি, "হরিনাম" ব্যবহারে অনিষ্ট আছে এবং "হরিনাম" ব্যবহার করাতে ট্রাষ্টডীডের নিয়ম ভঙ্গ করা হইতেছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন, "হরি" কোনও বিশেষ দেবতার নাম নহে, উহা পরব্রহ্মেরই নাম। সর্ব্ব প্রথম আমাদের একটী কথা বলা প্রয়োজন যে, আমরা জানি ব্রাহ্মেরা "হরি"নাম দ্বারা পরব্রহ্মকেই বুঝাইয়া থাকেন। কিন্তু বিচার্য্য বিষয় এই যে, অন্য লোকে "হরি"নামে পরব্রহ্মকে বুঝে না, কোনও বিশেষ দেবতা বুঝে। ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে অন্যদেশে যেরূপই হউক, বঙ্গদেশে "হরিনামে" হিন্দুগণ বিশেষ দেবতাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। "হরি"নাম তাঁহাদের নিকট নিরাকার অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম প্রতিপাদক নহে। হিন্দুগণ "হরি" মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করেন। যদিও সাধারণতঃ ঘটেতে হরিকে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হয়, তথাপি "হরি" সাকার হস্ত পদ বিশিষ্ট দেবতা এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে মূর্ত্তিও গঠন করা হয়। এ কথা বলা প্রয়োজন বোধ হইতেছে যে, সাধারণতঃ যে সকল দেবতার মূর্ত্তি গঠন করা হয়, সময় সময় তাহাদিগকেও ঘটে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করা হয়। মূর্ত্তি গঠন করিবার সুবিধা না হইলেই ঘটে পূজা হইয়া থাকে। হরির পূজা সর্ব্বদা হয় বলিয়া লোকে সাধারণতঃ মূর্ত্তি গঠন করিতে পারে না। বিশেষ বিশেষ সময়েই মূর্ত্তি গঠন করে। কোনও স্থানে "হরি" বিগ্রহ রূপে নিয়মিত গৃহে পূজিত হয়। আমরা এরূপ স্থলও জানি এমন কি হিন্দু-মহিলাগণ পর্য্যন্ত "হরি" ও নিরাকার ব্রহ্মে

প্রভেদ করেন। তাঁহাদের নিরাকার ব্রহ্মের ভাব আছে এবং সে ভাব প্রকাশ করিতে হইলে তাঁহারা "ঈশ্বর", "জগদীশ" "পরমেশ্বর" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন। সকলেই জানেন "হরি," "বিষ্ণু," "শিব," "দুর্গা," "কালী," "জগদ্ধাত্রী" প্রভৃতি দেবদেবীগণ "ঈশ্বর" হইতে ভিন্ন। সকল হিন্দুই জানেন "ঈশ্বরের" মূর্ত্তি হয় না। তাঁহারা "ঈশ্বরের" মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করেন না, ঈশ্বরের সম্মুখে "লুট" দেন না, বলি দেন না। কিন্তু হরি সম্বন্ধে এই সমস্তই হয়। এক শ্রেণী "হরি" বলিতে "বিষ্ণু" অথবা "নারায়ণ" বুঝেন, অন্য শ্রেণী "কৃষ্ণ" বুঝেন; কিন্তু সকলেই সীমাবদ্ধ দেবতা বুঝেন। "হরি" শব্দের ধাতু-প্রত্যয়গত অর্থ কি পুরাকালের গ্রন্থাদিতে উহা কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দেখিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। ইহা নিশ্চয় সত্য যে, এখন এক শ্রেণীর লোকে "হরি" নাম কোনও বিশেষ সীমাবদ্ধ দেবতা সম্বন্ধে ব্যবহার করিতেছে। যে কোন সাধারণ লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইবে "হরি" বলিতে তাহারা কোনও বিশেষ দেবতাকে বুঝে। ইহার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিতে পারেন না। ইহা নিশ্চয় সত্য। অতএব হরি'নাম পরব্রহ্মে আরোপ করিলে তাঁহাকে এরূপ একটী নামে পূজা করা হয় যাহা কোনও একশ্রেণীর লোককর্ত্তৃক কোনও বিশেষ দেবতা সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইতেছে। সুতরাং আমরা স্পষ্টরূপে অনুভব করিতেছি যে আরাধনা, প্রার্থনা সংগীত ইত্যাদিতে পরব্রহ্মকে "হরি" নামে পূজা করিলে উপাসনা মন্দিরের ট্রাষ্টডীডের বিরুদ্ধ কার্য্য করা হয়। কেবল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির সম্বন্ধে কেন (আমরা যতদূর জানি) সমস্ত মন্দির সম্বন্ধেই এই বিধি আছে। তাই মন্দিরে হরিনাম ব্যবহারে সকল স্থানেই অন্যায় করা হয়।

অনেক স্থলে ইহা দেখা গিয়াছে যে যখন ব্রাহ্মগণ "হরি" সংকীর্ত্তন করিয়াছেন তখন দলে দলে লোক তাহাতে যোগ দিয়াছে এবং সে স্থলে নমস্কার করিয়াছে, এমন কি অনেক সময় বাতাসা ইত্যাদি লুট দিয়াছে। কিন্তু তাঁহারাই যখন অন্য নামে সংকীর্ত্তন করিয়াছেন, তখন সকলে চলিয়া গিয়াছে। ইহাতেই দেখা যায় "হরি" নাম গ্রহণ সত্য প্রচার সম্বন্ধে কি অনিষ্ট করে। অনেক বৃদ্ধ হিন্দু মনে করিতেছে যে ব্রাহ্মেরা দিন দিন হিন্দু হইতেছে শীঘ্রই হিন্দু হইয়া যাইবে। কেন না ব্রাহ্মগণ এতদিন পরে হরিনাম মাহাত্ম্য বুঝিয়া হরিনাম গ্রহণ করিতেছেন; অনেকে হিন্দু ক্রিয়াকাণ্ডও গ্রহণ করিতেছেন। অনেক যুবককে তাঁহারা এ সকল কথা বলিয়া ভুলাইতে সক্ষম হইতেছেন। যুবকেরা সহজেই এসকল কথায় বিশ্বাস করিতেছে।

আর একটী কথা সকলেই জানেন আমাদের মধ্যে এরূপ এক শ্রেণীর ব্রাহ্ম আছেন, যাঁহারা যে সকল স্থানে 'হরি' প্রভৃতি দেব দেবীর নামে সংকীর্ত্তন ও উপাসনাদি হয়, তাহাতে যোগ দেন না অথবা যোগ দিতে ভাল বাসেন না। হইতে পারে তাঁহারা এক সীমাতে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু সমস্ত ব্রাহ্ম এক সাধারণ উপাসনাতে যোগ দেন ইহা কি প্রয়োজনীয় নহে? আমাদের উপাসনা ও সংগীতাদি কি এরূপ হওয়া উচিত নহে যে সকলেই তাহাতে যোগ দিতে পারে? তাহাই যদি হয় তবে এ বিষয়ে দৃষ্টি না করিলে কি বিশেষ অনিষ্ট হয় না? সকলে যাহাতে মিলিত ভাবে উপাসনাদি করিয়া উপকৃত হইতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। কাযেই এই শ্রেণীর মতের প্রতি সম্মান রাখিয়া কার্য্য করা উচিত। কেহ কেহ বলিতে পারেন এই শ্রেণী অপর শ্রেণীর মতে চলে না কেন? কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা যায় যে তাহা হইতে পারে না। এক শ্রেণী "হরি" প্রভৃতি দেব দেবীর নাম ব্যবহৃত হইলে সেই উপাসনা সংগীতাদিতে যোগ দিতে পারেন না—যোগ দেওয়া অন্যায় মনে করেন। আর অপর শ্রেণী হরি প্রভৃতি নাম ব্যবহার করিতে ভাল বাসেন এ সকল নাম তাঁহাদের অনেক সাহায্য করে। কিন্তু তাঁহারা এরূপ বলিতে পারেন না যে এ সকল নাম ব্যবহৃত না হইলে তাঁহাদের ধর্ম্মজীবন চলিতে পারে না অথবা এ সকল নাম যে সব উপাসনা ও সংকীর্ত্তনে ব্যবহৃত না হয়, তাহাতে যোগ দিতে পারেন না কিম্বা যোগ দিলেও তাহাতে সমগ্র হৃদয়ের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন না। কাজেই দেখা যায় কোন শ্রেণীর উপর মিলন নির্ভর করিতেছে। বাস্তবিক বিশ্বজনীন উদার আরাধনা সংকীর্ত্তন তাহাই, যাহাতে সকলেই যোগ দিতে পারে—যাহাতে কাহারও কোন আপত্তির কারণ বিদ্যমান না থাকে। কেহ কেহ ইহাকে যথেষ্ট মনে না করিতে পারেন ইহার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। কিন্তু ইহার কোন অংশের বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে পারেন না। বিশেষত্ব তাঁহারা নিজে নিজে সাধন করিবেন। সাধারণের নিকট সেরূপ করিতে গেলে চলিবে না। আমাদের উপাসনা সংগীতাদিতে এই নিয়ম রক্ষিত না হইলে যে অচিরে আর এক বিবাদ উপস্থিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছুদিন হইতে অনেকের হিন্দুয়ানীর দিকে যেরূপ প্রবল গতি দেখা যাইতেছে তাহাতে শীঘ্রই ইহার প্রতিক্রিয়া হইবে। অনেকেই এখন ইহা ভয়ের সঙ্গে অবলোকন করিতেছেন, কিন্তু বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই মনে করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারাও বেশী দিন অপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। কাজেই আমাদের পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হওয়া উচিত। এই হেতু, যে সকল ভাব বা ভাষা আপত্তিজনক তাহা আমাদের উপাসনাদিতে সর্ব্বথা বর্জ্জন করা দরকার। এবং সেই জন্য আমাদের সংগীত পুস্তকের কোন কোন গানের অংশবিশেষ পরিবর্ত্তন হওয়াও দরকার। অতএব সমস্ত ব্রাহ্মভ্রাতাদের নিকট বিনীত প্রার্থনা তাঁহারা উপাসনা সংগীতাদির সময় যেন এরূপ ভাষা ও ভাব রক্ষা করেন, যাহাতে কাহারও কোন আপত্তি না হইতে পারে—যাহাকে সকল দলের লোকই যোগ দিতে পারে। আর আমাদের কার্য্যনির্ব্বাহক ও অধ্যক্ষ সভার সভ্য ও ট্রাষ্টিমহোদয়গণের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে যাহাতে মন্দিরে 'হরি' প্রভৃতি দেব দেবীর নামে পরব্রহ্মের পূজা হইয়া ট্রাষ্টডীডের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাঁহারা যেন সে দিকে দৃষ্টি রাখেন এবং ব্রহ্মসংগীত পুস্তকস্থিত সংগীতগুলির আপত্তিজনক অংশসকল

পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। সত্যসংরক্ষণ জন্ত আমরা এই দুইটী প্রার্থনা করিতেছি।

উপসংহারে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ১৮৭৫ সনের অক্টোবর মাসের "সমদর্শীতে" "ভক্তিভাব ও ভক্তিভাষা" নামে যে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"আর একটী প্রথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত হইতেছে তাহারও প্রতিবাদ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে এ দেশীয় ও অপর দেশীয় প্রাচীন ধর্ম্ম সম্প্রদায়গণ যে সকল শব্দ ব্যবহারকরিয়াছেন, তাহাও আমাদিগের মধ্যে অনেকে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জগতের লোকে সে শব্দগুলি ব্যবহার করিলে এক প্রকার অর্থ বুঝিয়া থাকে, আমরা সেই শব্দগুলি অপর প্রকার অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহাতে বর্ত্তমানে নিরর্থক লোকের বিদ্রূপ ও উপহাসভাজন হইতে হয়, ভবিষ্যতেও নানাপ্রকার বিতণ্ডার কারণ হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও প্রচারকদিগের ভাষা সম্বন্ধে নিতান্ত সতর্ক হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

বগুড়া, ৬ই জুন। ১৮৯৩ — অনুগত জনৈক সভ্য।

মাননীয় শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয় গত ১৬ জ্যৈষ্ঠের তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদকীয় স্তম্ভে আপনি "জীবে দয়া" বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

আপনার প্রথম কথা এই "সাধক ভগবানের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে তাঁহার সৃষ্ট জীবদিগকে প্রাণের সহিত আলিঙ্গন না দিয়া থাকিতে পারেন না, তখন তিনি সর্ব্বজীবে সেই প্রাণরূপী, চৈতন্যরূপী পরব্রহ্মকে দর্শন করিয়া আত্মপর গণনা বিস্মৃত হইয়া যান। তখন বনের বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত তাঁহার আপনার হইয়া যায়.................কিন্তু একটী গুরুতর প্রশ্ন এই যে, যাঁহারা জগৎসংসারের মধ্যে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি উপলব্ধি করিয়া সকলকে আপনার করিবার জন্ত সাধন অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রাণীবধ করিতে পারেন কিনা?" আপনার এ প্রশ্নের আপনি উত্তর দিয়াছেন, তাহা সদুত্তর কিনা জানি না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আপনার কথা মানিয়া চলিতে গেলে কেবল মৎস্য মাংস কেন অপর কোন দ্রব্য আহারও মানুষের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না; কারণ, সকলেতেই ব্রহ্ম রহিয়াছেন, প্রাণী জগতে যেমন তাঁহার প্রকাশ উদ্ভিদ জগতেও তেমনি তাঁহারই প্রকাশ। সুতরাং ব্রহ্মপ্রকাশ বলিয়া যদি মাংসাদি আহার বর্জ্জনীয় হয়, তবে আর মানুষের আহারের জন্ত রহিল কি? তাই বলিতেছিলাম আপনার কথা মানিয়া চলিতে গেলে মানুষের ভাগ্যে আহার আদবেই ঘটিয়া উঠে না।

আপনার দ্বিতীয় কথা "একদিকে বিশ্বপ্রেম অপরদিকে জীবের প্রাণনাশ এই দুইয়ের সামঞ্জস্য কোথায়?" প্রাণনাশ ও অপ্রেম কি অপরিহার্য্য কার্য্য কারণ সূত্রে আবদ্ধ, যেখানে প্রাণনাশ দেখিব সেখানেই কি ভাবিতে হইবে তাহার মূলে অপ্রেম আছে? জলপ্লাবন দাবানল প্রভৃতি এক একটী নৈসর্গিক ঘটনাতে কত লক্ষ লক্ষ নির্দ্দোষ প্রাণীর জীবন নাশ হয়। এই সকল দৈব-ঘটনাতে ত একমাত্র ঈশ্বরেরই হাতে ভূরি ভূরি প্রাণী নষ্ট হয়, তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে যে এইগুলি ঈশ্বরের অপ্রেমের পরিচায়ক? কখনই না। এই সব আপাত দৃশ্যমান অমঙ্গল ঘটনার পশ্চাতে প্রেমময়ের মঙ্গল উদ্দেশ্য লুক্কায়িত। প্রেম, অপ্রেম কাজে নয়, উদ্দেশ্যে। বৃথা আমোদের জন্ত প্রাণীবধ অপ্রেমমূলক ও দূষণীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু উচ্চতর উদ্দেশ্য (যথা মানবজাতির সভ্যতার উন্নতি ও স্বাস্থ্যরক্ষা) সিদ্ধির জন্ত জীব হত্যায় দোষ কি? কে বলিল তাহারা তাহাদের প্রাণ দিয়া আমাদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্ত সৃষ্ট হয় নাই? আহারার্থ প্রাণীনাশ- প্রকৃত প্রকৃত পক্ষে নির্দ্দয়তা নয়। গৃহে বিড়াল কুকুর পুষিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার না দেওয়া, গরু ঘোড়া রাখিয়া অনাহারে, অল্পাহারে দিবারাত্র খাটাইয়া লওয়াই প্রকৃত নির্দ্দয়তা। পূর্ব্বোক্ত প্রাণী-হত্যার সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের সামঞ্জস্য থাকিতে পারে, কিন্তু শেষোক্ত জঘন্য ব্যবহারের সঙ্গে কস্মিন্‌কালেও থাকিতে পারে না। আপনি বিশ্বপ্রেমবাদী ব্রাহ্মের পক্ষে আহারার্থে জীবহত্যা গর্হিত কাজ বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন তাই এত কথা লিখিলাম।

কলিকাতা, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ — অনুগত শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সোম।

মান্তবর শ্রীযুক্ত "তত্ত্বকৌমুদী" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

নিম্নলিখিত পত্রখানি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

মান্তবর শ্রীযুক্ত "ধর্ম্মতত্ত্ব" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

গত ১লা চৈত্র তারিখের ধর্ম্মতত্ত্বে কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে যাহা লিখিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক বোধ হইয়াছে। অতএব এই পত্রখানি আগামী বারের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

১ম। আমি কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের পরিচালক নহি, কিন্তু উহার সম্পাদক এবং সভ্যদিগের আদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকি।

২য়। "কোন্নগর সমাজ বিরোধীসমাজের অঙ্গীভূত নহে" এই কথা আমি বলিয়াছি লিখিয়াছেন, কিন্তু আমি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করি নাই। আমি বলিয়াছিলাম যে "কোন্নগর সমাজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত নহে" এবং সাধারণ সমাজের

সহিত ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ থাকিলেও কোন্নগর সমাজ উক্ত সমাজের অন্ধ অনুসরণকারী নহে।" সকল সমাজেরই দোষ গুণ সম্বন্ধে ইহার মত দিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে এবং সাধারণ সমাজের আচার্য্য ভিন্ন অন্য কাহাকেও আচার্য্য নিযুক্ত করিবার স্বাধীনতা আছে। এই সকল কারণে আমি বলিয়াছিলাম যে কোন্নগর সমাজ Neutral চিরকালই আছে এবং তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।" তবে এ কথা সত্য যে কোন্নগর সমাজ-মন্দিরের ট্রাষ্টীদিগের আচার্য্যকে পদচ্যুত করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে এবং ভবিষ্যতে কোন কারণে উক্ত ট্রাষ্টীপদ শূন্য হইলে তাহা পূরণের ভার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে ন্যস্ত আছে।

৩য়। এস্থলে ইহাও বলা নিতান্ত আবশ্যক যে "বিরোধী সমাজ" অর্থে যদি কোচবিহার বিবাহের বিরুদ্ধে মতদাতা বুঝায় তবে কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ "বিরোধী সমাজ"; কারণ উক্ত বিবাহের সময় এই সমাজ প্রকাশ্যভাবে উহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন এবং সে মতের কোন পরিবর্ত্তন আজিও ঘটে নাই। আর যদি "বিরোধী সমাজ" অর্থে নববিধানবিরোধী বুঝায় তবে কোন্নগর সমাজ "বিরোধী সমাজ"; কারণ নববিধানের মত সকলের যখন প্রথম সূত্রপাত হয় তখন হইতেই কোন্নগর সমাজ উহার বিরোধী এবং নববিধানের প্রশ্রয় দিতে কোন্নগর সমাজ কখনও প্রস্তুত নহেন।

৪র্থ। গত মাঘোৎসবের সময় এক দিবস শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্যের কার্য্য করায় কোন্নগর সমাজের সভ্যগণ স্থির করেন যে, সকল সমাজের স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ ভাবে ও সাধারণ মতের উপর নির্ভর করিয়া পরস্পরের মধ্যে যত মিলিত হইতে পারা যায় ততই ভাল, এবং সেই জন্যই এবার নববিধানের প্রচারকদিগকে কোন্নগর সমাজের বার্ষিক উৎসবে উপাসনা করিবার জন্য আহ্বান করেন।

পরিশেষে নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে নিবেদন করিতে বাধ্য হইতেছি যে আমার পরমারাধ্য পিতৃদেবকে অসম্ভ্রমের সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা কতদূর উদার, ন্যায়সঙ্গত ও ভদ্রোচিত হইয়াছে, আপনারা বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। অধিক বলা বাহুল্য।

বশম্বদ
শ্রীসত্যপ্রিয় দেব।

ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্ম-যুবকদিগের সান্ধ্য-সম্মিলন— শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীনাথ দত্ত মহাশয় ব্রাহ্ম যুবকদিগের জন্য গত ৪ঠা আগষ্ট শুক্রবার ৪৫নং মেছোবাজার লেনে এক সান্ধ্য-সমিতির আয়োজন করেন। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র যুবকদিগকে উপদেশ প্রদান করেন এবং বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও পার্ব্বতী বাবু কোন কোনও পুস্তক হইতে পাঠ করেন। মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত হইয়াছিল। এইরূপ আমোদ মিশ্রিত নীতিশিক্ষার উপায় যুবকগণের চরিত্রগঠনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

উৎসব—গত ১১ই আগষ্ট শিবপুর ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস ও বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তথায় গমন করেন। এই শনিবার অপরাহ্নে স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ড্রইং হলে নবদ্বীপ বাবু "ছাত্র-জীবনে নীতি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার স্থলে প্রায় ১০০ শত ছাত্র উপস্থিত হইয়া মনোযোগের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে উপাসনালয়ে আদিনাথ বাবু উপাসনা করেন। অপরাহ্নে কলেজের ছাত্রাবাসে নবদ্বীপ বাবু শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং সঙ্গীত সংকীর্ত্তন হইয়া উৎসব পরিসমাপ্ত হয়।

নির্জ্জন-সাধন—গত বৎসর আমাদের কয়েকজন প্রচারক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতনে গিয়া এক মাস কাল বাস করেন। এবার সাধনাশ্রম হইতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রভৃতি তথায় কিছুদিন বাস করিবেন বলিয়া গমন করিয়াছেন। যাঁহারা শান্তিনিকেতনে গিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন তথাকার প্রকৃতির নিস্তব্ধতা এবং দূরপ্রসারিত প্রান্তরের গাম্ভীর্য্য ও নির্জ্জনতা সাধকের প্রাণে কেমন নবভাবের সঞ্চার করে। মহর্ষি শান্তিনিকেতন স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মগণের মহোপকার সাধন করিয়াছেন।

দান—শিলঙের বাবু মথুরানাথ নন্দী তাঁহার পুত্রদ্বয়ের নামকরণ উপলক্ষে খাসিয়া মিশনে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার পরলোকগত পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে দাসাশ্রমে একশত টাকা দান করিয়াছেন।

গত পূর্ব্ব রবিবার হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য পুনরারম্ভ হইয়াছে এবং ইহার দ্বাদশ বার্ষিক পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তকের তালিকা "মেসেঞ্জার" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, অধ্যয়নার্থিগণ দেখিয়া লইবেন।

বিগত ৩১এ জুলাই সোমবার ১১০ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট ভবনে বাবু প্রবোধচন্দ্র মহলানবিসের প্রথম পুত্রের জাতকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে, বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

নূতন ব্রাহ্মসমাজ—অল্পদিন হইল বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তীর উদ্যোগে চেরাপুঞ্জীর অন্তর্গত নংরিম নামক স্থানে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। অনেক খাসিয়া পুরুষ ও রমণী সেই সমাজে উপস্থিত হইয়া থাকেন।

নূতন সমাজমন্দির—খাসিয়া পাহাড়স্থ মৌসমাই ব্রাহ্মসমাজের নূতন গৃহ প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। পুরাতন গৃহ জীর্ণ হওয়াতে একটী পাতরের পুরাতন ঘর ক্রয় করিয়া মেরামত করিয়া লওয়া হইয়াছে।

দীক্ষা—উ বিস্রোয়ার এবং উ হিস্রোমণি নামক দুইজন উৎসাহী খাসিয়া যুবক সম্প্রতি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। এই দীক্ষাকার্য্যে বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। লাইক্যানসেউ ব্রাহ্মসমাজে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। আনন্দের বিষয় এই যে ইহাঁরা উভয়েই আপন আপন পরিবারের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন এবং কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। দুইজন নূতন লোক উক্ত সমাজে যোগ দিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে একজন এই গ্রামের সর্দার, বয়স প্রায় ৫৫ বৎসর। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে অত্যন্ত মদ্যপান করিতেন। তাহাতে তাঁহার পক্ষাঘাত রোগ জন্মে। দেড় বৎসর হইল ইনি মদ ত্যাগ

করিয়াছেন এবং সেই হইতে তাঁহার মনে পূর্ব্বকৃত দুষ্কার্য্যের জন্য অত্যন্ত অনুতাপের উদয় হইয়াছে। ভাল ভাবে জীবন যাপন করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে গভীর আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। পরমেশ্বর তাঁহাকে শান্তিদান করুন!

প্রচার—বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী এক খাসিয়া বন্ধু সমভিব্যাহারে ওয়ালিং নামক এক স্থানে প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। তথায় দুই দিন থাকিয়া বক্তৃতা ও আলোচনাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন। অনেক পুরুষ ও রমণী আগ্রহের সহিত ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলেন। এবং কতকগুলি খাসিয়া পুস্তক বিক্রীত হইয়াছিল।

হরিসেনা—কয়েক বৎসর গত হইল তালতলাতে "হরিসেনা" নামে একটী ধর্ম্ম-সাধনমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য অতি সুন্দর, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই মণ্ডলীর উন্নতি কামনা করি। ইহার অনুষ্ঠানপত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল।

উপাসনালয়—এই জগতের স্রষ্টা পাতা ও নিয়ন্তা জীবন্ত পরমেশ্বরের উপাসনা না করিলে নরনারী কখনই সুখশান্তি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমানকালে এই উপাসনার প্রতি সকলেরই কেমন একটা শিথিল ভাব দেখা যাইতেছে। যাহাতে গৃহে গৃহে ঈশ্বরোপাসনা প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্যই বিগত ১২৯১ সনের ১১ই ফাল্গুন তারিখে এই হরিসেনামণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি তালতলা ২৯।১ নং নেউগীপুকুর ইষ্ট লেনস্থ শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ কুমার মহাশয়ের ভবনে প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৬৷টার সময় উক্ত সেনাদলের সামাজিক উপাসনা হইয়া থাকে। সর্ব্বসাধারণকে এই উপাসনায় যোগ দিবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে। যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তিনি এই সেনাদলকে স্বীয় গৃহে লইয়া গিয়া হরিসংকীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিতে পারেন। গৃহে লইয়া যাইতে কিছুমাত্র ব্যয় হইবে না।

নীতি-বিদ্যালয়—যাহাতে বালকগণের চরিত্র পবিত্র ও ধর্ম্মানুমোদিত হয়, তাহার জন্য হরিসেনাদল উপরোক্ত স্থানে একটী নীতি-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। প্রতি রবিবার প্রাতে ৬৷টার সময় উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। যাঁহারা আপনাদিগের পরিবারস্থ বালকদিগকে সচ্চরিত্র ও নীতিপরায়ণ করিতে ইচ্ছা করেন, অথচ আপনাদিগের সময়াভাবে তাহাদিগকে যথোচিত শিক্ষা দিতে পারেন না, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক বালকদিগকে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে সেনাদল বিশেষ আহ্লাদিত হইবেন। বলা বাহুল্য যে, ইহাতেও কিছুই ব্যয় হইবে না।

ধর্ম্ম-পুস্তকালয়—হরিসেনাদল আপনাদের উপরোক্ত কার্য্যালয়ে একটী ক্ষুদ্র ধর্ম্ম-পুস্তকালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে সকল জাতীয় ধর্ম্মপুস্তক সংগৃহীত হইতেছে। তত্ত্ববোধিনী, ধর্ম্মতত্ত্ব এবং তত্ত্বকৌমুদী নামক তিনখানি ধর্ম্মপত্রিকা ইহাতে নিয়মিত ভাবে আসিয়া থাকে। যিনি ইচ্ছা করিবেন তিনি প্রতিদিন প্রাতে ৬৷টার সময় আসিয়া বিনামূল্যে পুস্তক ও পত্রিকা পাঠ করিতে পারিবেন। উক্ত সময়ে কাহারও অসুবিধা হইলে তাঁহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইবে। পুস্তক বা পত্রিকাদি গৃহে লইয়া যাইবার নিয়ম নাই।

সেনার প্রয়োজন—হরিসেনাদলে সেনার প্রয়োজন আছে। যিনি দেশের দুর্গতি-মোচন জন্য ভগবানের কার্য্য করিতে হরিসেনাদলে প্রবেশ করিবেন, মণ্ডলী তাঁহাকেই সমাদরে গ্রহণ করিবেন।

ভিক্ষা—বলা বাহুল্য যে সেনাদলের সমস্ত কার্য্যই সাধারণের নিকট অর্থ ভিক্ষা করিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তিনি এই দলকে অর্থের দ্বারা সাহায্য করিতে পারেন।

নিবেদন—যাঁহারা হরিসেনাদলের সহিত মিলিত হইতে অথবা ইহাকে অর্থ সাহায্য করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক হরিসেনা উপাসনালয়ের ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিবেন।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার।

চেরাপুঞ্জী প্রচার আশ্রম ও ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যার্থ পূর্ব্ব প্রাপ্তিস্বীকারের পর যে অর্থ পাওয়া গিয়াছে, কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নে তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করা গেল। বাবু শিবনাথ দত্ত শিলং ১৲, রামচন্দ্র দত্ত ঐ ২৲ রমণকৃষ্ণ দত্ত ঐ ১৲ রামগতি দাস ঐ ১৲, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা সেন ঐ ১॥০ বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার ঐ ১৲, বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ১৲, দীননাথ দাস ঐ ৩৲, বিপিনবিহারী মজুমদার ঐ ২৲, নবগোপাল দত্ত ঐ ২৲, ভারতচন্দ্র দেব ঐ ১৲, কে, সি, চট্টোপাধ্যায় ঐ ২৲, সত্যেন্দ্রকুমার বসু ঐ ১৲, সহানুভূতিকারী ঐ ২৲. ডাঃ পি, সি রায় কলিকাতা ২৲, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ঐ ৫৲, রামানন্দ চাট্টোপাধ্যায় ঐ ১৲, রামদুর্ল্লভ মজুমদার নওগাঁ ৫৲, সাধুচরণ রায় কটক ৫৲, মিঃ কে এন রায় (সি এস) ৭৲, জনৈক ব্রাহ্মমহিলা আলিপুর ২॥০, বাবু বিপিনবিহারী রায় মাণিকদহ ১৫৲, বরদানাথ হালদার ভবানীপুর ৫৲, শ্রীমতী জগৎলক্ষ্মী ঘোষ কলিকাতা ১৲, বাবু বলরাম সেন শিলং ২৲, সুরতচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা ১৲, হেমচন্দ্র কাজলি ১৲, কান্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বরুন ১৲, নবকিশোর সেন শ্রীহট্ট ২৲, অতুলচন্দ্র ঘোষ ঐ ১০৲, লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী নাগপুর ৫৲, কেদারনাথ কুলভী বাঁকুড়া ২৲, একজন বন্ধু ১৲, একটী ক্ষুদ্র বালক ৵১০, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান ২৸০—মোট ৯৭৸৶১০, পূর্ব্বকার প্রাপ্তি স্বীকার—২৯০/০ সর্ব্বসমষ্টি ৩৮৭৸৶১০

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২রা ভাদ্র প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১০ম সংখ্যা
১৬শ ভাগ।

১৬ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

চিরসঙ্গী।

যথায় তথায় রই, ভুলি বা জাগ্রত হই,
প্রভু জানি তোমা বই দীনে কেহ রাখে না;
জীবনের অন্ধকারে, ডুবি পাপ তাপ ভারে
তোমা বিনা সে দুস্তরে আর কেহ দেখে না।

চঞ্চল হৃদয় মোর, বিষয়-বিপ্লব ঘোর,
তোমারে যদি হে ভুলি বিচিত্র তা নয় হে,
আপনা ভাবি একাকী, নিরাশে মগন থাকি,
তখনো করুণা তব দূরে নাহি রয় হে।

আছ তুমি কাছে কাছে, এ মূঢ় ভুলিয়া আছে,
তুমি রাখ; অবিশ্বাসী ভয়ে সারা হইছে;
দেখিলে বাঁচিয়া যায়, নাহি দেখে সে কৃপায়,
থাকিতে সুখের পথ দুঃখ ডেকে লইছে।

এ ঘোর মোহের ঠুলি, কৃপা করি দেও খুলি,
সতত নিকটে দেখি অশনে বা শয়নে;
তোমারি আলোকে চলি, তোমারি আদেশে বলি,
জীবন্ত ধর্ম্মের জ্যোতি দেখি প্রভু নয়নে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

নৈকট্য সাধন—অবতারবাদ ও অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদে ঈশ্বরকে মানব-হৃদয় হইতে দূরে ফেলিয়া দেয়। ঈশ্বর ভূভার হরণের জন্য ও মানবের উদ্ধারের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং স্বয়ং মানবকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু সমুদায় অতীতের কথা। এখন যদি তুমি তাঁহার লীলার বিষয়ে কিছু জানিতে চাও, তাহা হইলে অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে; মৃত ভাষা অধিগত করিতে হইবে; পুরোহিত ও ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যাখ্যাকর্ত্তাদিগের সাহায্যে সেই মৃত ভাষার দুর্ব্বোধ উক্তি সকলের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে; তদ্ভিন্ন তুমি ঈশ্বরের করুণার পরিচয় পাইবে না; মুক্তিপ্রদ ধর্ম্ম লাভ করিতে পাইবে না। এই মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের কথার ভাবে এই প্রকার বোধ হয় যেন তাঁহারা মনে করেন, যে পুরাকালে মানব মন পাপে এতদূর কলঙ্কিত হয় নাই, মানব-হৃদয় এতদূর ভ্রষ্ট ও পতিত হয় নাই, সুতরাং সে সময়ে ঈশ্বর মানব-সংসারে অবতীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন; একণে আর সে দিন নাই। মানব একণে এতদূর মলিন ও ভ্রষ্টাচারী যে ঈশ্বর একণে মানব-সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছেন এবং দূরে বাস করিতেছেন। একণে যদি তাঁহার ইচ্ছা ও আদেশ জানিবার ইচ্ছা হয়, তবে বেদ, বাইবেল, বা কোরাণের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন কর। সেইখানে তাঁহার বিধি ও নিষেধ অবগত হও। অবতারবাদের ন্যায় বিজ্ঞানের বর্ত্তমান মতেও ঈশ্বরকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। ঈশ্বর এক বৃহৎ কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলের পশ্চাতে রহিয়াছেন। জড়শক্তির দ্বারা এবং সেই শক্তির নিয়ামক কতকগুলি নিয়মের দ্বারা জগৎ চলিতেছে; ইহার উপরে তাঁহার সাক্ষাৎ হস্ত নাই। এই সকল সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মকে তিনি পরিবর্ত্তিত করিবেন না; সুতরাং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা নিরর্থক; তাহাতে কোনও প্রকার লাভ নাই। স্তুতি বন্দনারই বা প্রয়োজন কি? যাঁহাতে পরিবর্ত্তন নাই, প্রসন্নতা অপ্রসন্নতার সম্বন্ধ নাই, তাঁহার স্তুতি বন্দনাতে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী মনোযোগপূর্ব্বক আলোচনা কর, এবং তন্মধ্য হইতে আপনাকে রক্ষা-করিবার উপায় উদ্ভাবন কর। ব্রাহ্মধর্ম্ম এরূপ দূরস্থ ঈশ্বরে তৃপ্ত নহেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাকে হৃদয়ের নিকটস্থ ও জীবন্ত পুরুষরূপে প্রতীতি করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। তিনি যে কেবল অতীত কালেই আপনার করুণার সাক্ষ্য দিয়াছেন এরূপ নহে; কিন্তু প্রতিদিন আমাদের প্রত্যেকের জীবনে করুণার সাক্ষ্য দিতেছেন। কেবল প্রাচীন কালের সাধুদিগের কর্ণে আদেশ বাণী প্রচার করিয়াছিলেন তাহা নহে এখনও প্রত্যেক সরল ও পবিত্র আত্মাতে আদেশবাণী প্রচার করিতেছেন; প্রত্যেকের বিবেকে থাকিয়া কর্ত্তব্যের উপদেশ করিতেছেন। দৈনিক জীবনে এই নৈকট্য সাধন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহোপদেশ।

ব্রহ্মণি স্থিত:—প্রাচীন শাস্ত্রে এই একটী বাক্য আছে "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি স্থিতঃ";—ব্রহ্মকে যিনি প্রকৃতরূপে জানিয়াছেন

তিনি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত শব্দের অর্থ কি? ব্রহ্মে সেরূপ ব্যক্তির চিত্ত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। পদ্ম যেমন মৃণালের দ্বারা মূলের সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ সেইরূপ সেই প্রকৃত জ্ঞানী ও বিশ্বাসীর চিত্ত ব্রহ্মে সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ। পদ্মটী যখন জলের উপরে ভাসিতেছে, তখন চক্ষে দেখিলে বোধ হয় না যে তাহার তলে মৃণাল আছে; বা তাহা কোনও পদার্থের সহিত দৃঢ়রূপে বদ্ধ রহিয়াছে। বরং যখন বায়ুভরে জলরাশি আন্দোলিত হইতেছে বা স্রোতের বেগে কল্লোলিত হইতেছে, তখন দেখিতেছি পদ্মটী একবার এদিকে একবার ওদিকে নীত হইতেছে, একস্থানে স্থির থাকিতেছে না, যেন মূলে কোনও বন্ধন নাই। কিন্তু অপেক্ষা কর বায়ু থামিয়া গেল; স্রোত মন্দীভূত হইল; জল প্রশান্ত আকার ধারণ করিল; তখন দেখ যেখানকার পদ্ম সেইখানে দাঁড়াইয়াছে; আপনার মূলকে আশ্রয় করিয়াই আছে। ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিও এইরূপে সর্ব্বপ্রকার বিপদ ও প্রলোভনের মধ্যেও তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি নিরাপদ স্থানকে অধিকার করিয়াছেন। জীবনের বাহিরের আন্দোলনে তাঁহাকে স্বস্থান-চ্যুত করিতে পারে না। বাহিরে দেখিতে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল ও মন বাহিরে ঘুরিতেছে কিন্তু তাঁহার অন্তরাত্মা এক প্রশান্ত ও নিস্তব্ধ স্থানে বাস করিতেছে; যেখানে বাহিরের বিক্ষোভের কারণ সকল গমন করিতে পারিতেছে না। যোগযুক্ত ব্যক্তিরাই এই স্থানকে অধিকার করিয়া থাকেন। জ্ঞানযোগ অথবা কর্ম্মযোগ উভয় বিধ যোগের দ্বারাই ঐ যোগযুক্ত অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা জ্ঞানযোগী তাঁহারা বিমল তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ইহা সুন্দররূপে প্রতীতি করিয়াছেন, যে সমুদায় অধ্রুবের মধ্যে সেই ব্রহ্ম বস্তুই ধ্রুব। ইহা জানিয়া তাঁহারা সেই ধ্রুব পদার্থেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; এবং বাহিরের বিষয় সকলকে পরিবর্ত্তনশীল ও ক্ষণভঙ্গুর জানিয়া তদ্দ্বারা আর বিচলিত হন না। কর্ম্মযোগিগণ আর এক পথ দিয়া ঐ স্থলেই উপনীত হইয়া থাকেন। তাঁহারা কর্ত্তব্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ফলাফল কামনা ত্যাগ করেন; এবং বাহিরের সুখ দুঃখের দ্বারা আর আপনাদের চিত্তকে বিচলিত হইতে দেন না। জয় পরাজয়ের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টিই থাকে না। স্বীয় স্বীয় জীবনের কর্ত্তব্য সমাধা করিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে বাস করেন। লোকের অনুরাগ বিরাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। এরূপ কর্ম্মযোগের অবস্থা অতীব স্পৃহণীয়। জ্ঞানযোগী ও কর্ম্মযোগী উভয়েই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত।

নির্জ্জনবাস—

একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে হিতমাত্মনঃ।
একাকী চিন্তয়ানোহিপরং শ্রেয়োঽধিগচ্ছতি।

।২৫৮ শ্লোক ৪র্থ অধ্যায় মনু।

অর্থাৎ "নির্জ্জন প্রদেশে একাকী অবস্থান করত সর্ব্বদা আপনার হিত চিন্তা করিবে। নির্জ্জন চিন্তা দ্বারা পরম শ্রেয় লাভ হইয়া থাকে। নিরত লোক কোলাহলের মধ্যে বাস করিলে মানুষ আত্ম-বিস্মৃত হইয়া যায়। আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, কাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি ইত্যাদি প্রশ্ন মনে উদয় হয় না। কেবল বাহ্য বিষয় লইয়া মন ব্যস্ত থাকে। বিশেষ ভাবে আত্ম-চিন্তা পরায়ণ না হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা প্রাণে উদয় হয় না। যাঁহার জীবন বহির্মুখী, যিনি কেবল বাহিরের কথা বার্ত্তা, আলোচনা, আন্দোলনে মগ্ন থাকেন, তিনি আত্মার অভ্যন্তরে কিরূপে প্রবেশ করিবেন? জন কোলাহলময় স্থান বাজার বিশেষ। হাট বাজারে গেলে যেমন মনের চঞ্চলতা উপস্থিত হয়, কোন বিষয়ে দৃঢ় অভিনিবেশ হয় না, কোলাহলময় সংসার ও তদ্রূপ। এই জন্যই পূর্ব্বতন ব্রহ্মর্ষিগণ নির্জ্জন সাধনের প্রয়োজনীয়তা বারংবার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সজন ও নির্জ্জন উভয় বিধ সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন। নিরবচ্ছিন্ন নির্জ্জনতা প্রার্থনীয় নহে এবং কেবল সজনতা ও আত্মার অনুকূল নহে। কিন্তু মতে যাহাই থাকুক, কার্য্যতঃ ব্রাহ্মগণ অতি অল্পক্ষণই নির্জ্জনবাস করিয়া থাকেন। যাঁহারা বিষয় কর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহারা রাত্রিদিন কোলাহলের মধ্যে বাস করেন, যাঁহারা বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের ও নির্জ্জন সাধনের সুবিধা ঘটিয়া উঠে না। নির্জ্জন সাধন ভিন্ন ধর্ম্ম জীবন গঠিত হয় না। ধর্ম্ম জীবন কেন, যিনিই সংসারে কোন বিশেষ কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাকেই নির্জ্জন-বাস করিতে হইবে।

যাঁহারা ধর্ম্ম-সাধন করিতেছেন, নির্জ্জনবাস তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। মহাত্মা মহম্মদ হরা পর্ব্বতের গহ্বরে তপস্যা করিতেন; যীশু ও নির্জ্জনে ধ্যান করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এদেশীয় ঋষিগণ নির্জ্জনতা এরূপ ভাল বাসিতেন যে, তাঁহারা লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া গিরিমূলে চিরদিনের জন্য বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতেন। বাস্তবিক নির্জ্জনবাস, নির্জ্জন সাধন ভিন্ন ধর্ম্ম জীবন লাভ করা অসম্ভব। এজন্য প্রত্যেকের দৈনিক জীবনে কিয়ৎকাল নির্জ্জন-বাসের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। যাঁহারা কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত তাঁহাদেরও মধ্যে মধ্যে নির্জ্জন-বাসের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। নিরবচ্ছিন্ন লোক-কোলাহলে, বিশেষতঃ নগরে বাস করিলে চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হয়। প্রাণের স্থৈর্য্য এবং শান্তভাব বিনষ্ট হইয়া যায়, ক্রমে উপাসনার প্রতি মন বীতশ্রদ্ধ হয়।

নির্জ্জন বাস ও গভীর চিন্তা ব্যতীত অদ্যাপি জগতে কোনও মহৎ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই। এমন কি রাজনীতিজ্ঞ পুরুষগণ যে সকল কঠিন ও জটিল রাজনৈতিক প্রশ্ন লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন এবং সে সম্বন্ধে যে সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন, তাহাও নির্জ্জন বাস ও গভীর চিন্তার ফল। যে সকল উৎকৃষ্ট প্রণালীতে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট এদেশে কার্য্য চালাইতেছেন, যথা পোষ্ট আপীসের কার্য্যপ্রণালী, বিচার প্রণালী ইত্যাদি সে সকল প্রণালী কি সহজে উদ্ভাবিত হইয়াছে? পরম্পরাক্রমে কত প্রতিভাশালী ব্যক্তি নির্জ্জনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সেই সকল বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন এবং এক একটী প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। আমাদের দেশে এক সময়ে নির্জ্জন বাস ও গভীর অনুশীলনের প্রণালী ছিল, এক্ষণে তাহা তিরোহিত হইয়াছে। এক্ষণে আমাদেরও

নির্জ্জনে গভীররূপে কোনও তত্ত্বের আলোচনা করিতে দেখা যায় না। সকল কার্য্যই হাটের মধ্যে চলিতেছে। এমন কি ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার ও ব্রাহ্মসমাজ গঠনরূপ গুরুতর কার্য্য ও ব্রাহ্মগণ নিতান্ত চিন্তাবিহীন ভাবে হাটের মধ্যে বসিয়া করিতেছেন। নির্জ্জনে দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিনের পর দিন ব্রাহ্মধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব সকলের আলোচনাতে প্রবৃত্ত আছেন, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি অধিক মিলিবে না। নির্জ্জন চিন্তা ও সাধনাভাবে আমাদের কার্য্য সারবান হয় না। অতএব প্রত্যেক পরিবারে ও প্রত্যেক দিনে যাহাতে কিয়ৎকাল নির্জ্জনতা সম্ভোগের ব্যবস্থা থাকে তাহা প্রার্থনীয়। যাঁহাদিগকে কার্য্যানুরোধে কোলাহলের মধ্যে থাকিতে হয়, তাহাদেরও মধ্যে মধ্যে নির্জ্জন বাস ভাল।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ—আমরা অনেকবার বলিয়াছি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনের আদর্শ এবং ব্রাহ্মসমাজ সেই আদর্শ সাধনের ক্ষেত্র। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ কেবলমাত্র এই কথা বলিয়া দেন যে বি, এ, পরীক্ষা দিতে হইলে, সাহিত্যে এই প্রকার বিদ্যা চাই, অঙ্কে এইরূপ পারদর্শিতা চাই, মনোবিজ্ঞানে এ প্রকার দক্ষতা চাই; ইত্যাদি। কিন্তু তদ্বিষয়ে আশানুরূপ পারদর্শিতা লাভের সহায় স্বরূপ গ্রন্থাবলী যদি নির্দ্দেশ না করেন, তাহা হইলে পারদর্শিতা লাভের বিষয়ে সকলের সমান রূপ উন্নতি দৃষ্ট হয় না। এই জন্য গ্রন্থাবলী নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হয়। কিন্তু গ্রন্থাবলী নির্দ্দেশ করিলেও সকল কার্য্য শেষ হয় না। যদি অধ্যাপনা কার্য্যের জন্য কলেজ না থাকে, এবং শিক্ষাকার্য্যে পারদর্শী ও সুদক্ষ অধ্যাপকদিগকে নিযুক্ত করা না যায়, তাহা হইলে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট শিক্ষার আদর্শ কার্য্যে সাধন হইতে পারে? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদর্শিত বিদ্যার আদর্শকে কার্য্যে সাধন করিবার জন্যই, নানা কলেজের সৃষ্টি। এই সকল কলেজ প্রতিনিয়ত সেই আদর্শকে চক্ষের সমক্ষে রাখিয়া সাধন করিতেছেন। সর্ব্বদা আপনাদের ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন কতদূর সে আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া চিন্তা করিলে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধের প্রকৃতি যেন কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিতে পারি। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের সমক্ষে ধর্ম্মজীবনের একটী আদর্শ ধরিয়াছেন। সেই আদর্শকে ব্যক্তিগত জীবনে এবং সামাজিক জীবনে সাধন করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজ সেই সাধনক্ষেত্র। এখানে আমরা সকলে সমবেত ভাবে পরস্পরের সাহায্যে সেই আদর্শকে জীবনে সাধন করিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনকে সম্পূর্ণ নূতন ভিত্তির উপরে স্থাপন করিতে চাহিতেছেন। দেশের লোকের বদ্ধমূল সংস্কার এই যে ঐ নূতন ভিত্তির উপরে সমাজকে স্থাপন করিলে, সমাজের দুর্গতির সীমা থাকিবে না। মানুষ যে ভাবের মধ্যে বর্দ্ধিত হয়, যে সকল সামাজিক ব্যবস্থা শৈশব অবধি দেখিয়া থাকে, তাহাদের চিন্তা স্বভাবতঃই সেই পথে চলিয়া থাকে। তদ্বিরুদ্ধ কোনও প্রকার ব্যবস্থা যে হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা সমাজের যে কুশল হইতে পারে, ইহা তাহাদের মনেই আসে না। সুতরাং কোনও নূতন সামাজিক তত্ত্ব প্রচারিত হইলে তাহারা সন্ত্রস্ত হয়, এবং সেই নূতন তত্ত্বাবলম্বীদিগকে সমাজের ঘোর শত্রু বলিয়া গণনা করে। সর্ব্ব দেশে ও সর্ব্ব কালে এই নিয়ম লক্ষিত হইয়াছে। ভারতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম কেন ঘটিবে? এ দেশের প্রাচীনতা-প্রিয় জাতি সকল যে ব্রাহ্মধর্ম্মের নূতন আদর্শকে সন্দেহ ও ভীতির চক্ষে দেখিবেন তাহাতে বিচিত্র কি? কিন্তু আমাদিগকে নিরন্তর আলোচনা করিতে হইবে, পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে হইবে, আমরা ব্রাহ্মসমাজরূপ সাধনক্ষেত্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ কতদূর কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছি। আমাদের কার্য্য কলাপকে কতদূর ধর্ম্মবিশ্বাসের অনুগত করিতে পারিতেছি। বিশ্বাস ও তদনুগত জীবন, ইহাতেই ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ ইহা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

পারিবারিক জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্য—ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনের যে নূতন আদর্শ আনয়ন করিয়াছেন; তাহার প্রভাব আমরা ইতিমধ্যেই নানা বিভাগে দর্শন করিতেছি। ইহা ব্যক্তিগত জীবনে নীতি ও সদনুষ্ঠানের ভাব বর্দ্ধিত করিয়াছে; ইহা সর্ব্বসাধারণ্যে বিদিত। তাহার আর বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন নাই। সামাজিক জীবনে বাল্যবিবাহ রহিত করা, বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা, বহুবিবাহ নিবারণ করা, অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত করা প্রভৃতি অনেক প্রকার সংস্কারকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাও সকলে অবগত আছেন। এবং ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যে এই সকলই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের বিরাগ-বৃদ্ধি জন্মিবার প্রধান কারণ। ব্রাহ্মসমাজ এই সকল সমাজ-সংস্কারের কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন বলিয়াই লোকে ইহার প্রতি এত খড়্গহস্ত হইয়াছেন। কিন্তু সমাজ-সংক্রান্ত কতকগুলি কুরীতির উন্মূলন ও কতকগুলি উৎকৃষ্ট রীতির প্রচলন করিয়াই ব্রাহ্মগণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের হস্তে অতীব গুরুতর কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। পারিবারিক জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারিলে তাঁহাদের অবলম্বিত সত্য সকল বদ্ধমূল হইবে না। তাঁহারা এতদিনের পরিশ্রম ও যত্নের দ্বারা যাহা কিছু করিতেছেন, তাহা কালে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। যতদিন ব্রাহ্মপুরুষগণ একা একা ধর্ম্মের সংগ্রাম করিতেছিলেন, ততদিন তাঁহাদের মনে ভবিষ্যতের চিন্তা উদিত হয় নাই। তাঁহারা তখন কেবল এই চিন্তা করিয়াছেন, কিরূপে বিশ্বাসানুসারে অনুষ্ঠান করিব, কিরূপে জীবনের সঙ্গিনীকে এই ধর্ম্মের আলোকে আনিব,—কিরূপে প্রাচীন সমাজের নির্যাতন সহ্য করিয়া স্থির থাকিব। কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদিগকে আর এক প্রকার চিন্তাতে নিযুক্ত হইতে হইতেছে। এখন তাঁহাদের অনেকেরই গৃহ পুত্র কন্যাতে পূর্ণ হইয়াছে। ব্রাহ্ম গৃহস্থের গৃহে পুত্র কন্যার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে বালক বালিকা সম্মিলনের দিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের বেদীর উত্তর পার্শ্বের স্থানও ভাল করিয়া পূর্ণ হইত না, এক্ষণে তাহারা মন্দিরের অর্দ্ধেক স্থান পূর্ণ করিয়া ফেলে। এই সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মগণের দায়িত্ব ও চিন্তা বাড়িয়া যাইতেছে। এখন ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেছে। ইহাদিগকে কিরূপে শিক্ষা দিলে, পরিবার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে? এই চিন্তা আমাদের সকলের অন্তরে প্রবল হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; কারণ যাহারা আমাদের ক্রোড়ে জন্মিয়াছে, আমাদের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছে, আমাদের শিক্ষা ও শক্তির সম্পূর্ণ অধীন থাকিয়াছে, আমরা যদি তাহাদেরই অন্তরে ধর্ম্মাগ্নি সঞ্চারিত করিতে না পারিলাম, তাহাদিগকে সুশিক্ষিত ও সমুন্নত করিতে না পারিলাম, তখন কোন্ সাহসে বাহিরের লোককে ডাকি, কোন্ সাহসে অপরকে ধর্ম্মাগ্নি দিবার ইচ্ছা করি। যে ব্যক্তি ধন উপার্জ্জন করিতে জানে, কিন্তু ধন রক্ষা করিতে জানে না, সে যেমন সময়ে দারিদ্র্য ভোগ করে, সেইরূপ যে ধর্ম্মসমাজ লোক ডাকিবার জন্য ব্যগ্র; কিন্তু যাহারা হস্তে আছে, তাহাদের রক্ষা ও উন্নতি সাধনের জন্য সচেষ্ট নহে, তাহাদিগকেও অধিক দিন বৃদ্ধি পাইতে হয় না; তাহারা ত্বরায় নানা প্রকার পাপ ও অত্যাচারের আলয় হইয়া উঠে।

ব্রাহ্ম-বালকদিগের নীতি—আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি, অনেক ব্রাহ্ম গৃহস্থের গৃহে বালকগণ আশানুরূপ শিক্ষা পাইতেছে না। কোনও কোনও স্থলে পিতা মাতা পুত্র কন্যাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য ও গতিবিধি হইতে দূরে রাখিতেছেন; এখানকার কার্য্যে তাহাদিগকে মনোযোগী করিতেছেন না; এখানকার পুস্তক পত্রিকাদি পড়িতে দিতেছেন না; এখানকার উপাসনা ও উৎসবাদিতে যোগ দিতে দিতেছেন না; অপর দিকে ব্রাহ্মসমাজ-বিদ্বেষী হিন্দুভাবাপন্ন বালকবালিকাদিগের সহিত বা খ্রীষ্টভাবাপন্ন ফিরিঙ্গী শিশুদিগের সহিত মেশা বন্ধ করিতে পারিতেছেন না, শিক্ষার অনুরোধে সেইরূপ বিদ্যালয়ে পাঠাইতেছেন। ফল এই হইতেছে, তাঁহাদের বালকবালিকাগণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগহীন এবং কোনও কোনও স্থলে ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। কোনও কোনও গৃহে বালকগণ এরূপ দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইয়া উঠিতেছে যে, স্মরণ করিলে কর্ণদ্বয় আবরণ করিতে হয়। অনেক গৃহে বালকগণ শিক্ষা বিষয়ে দেশের উন্নতির সঙ্গে চলিতে পারিতেছে না; অশিক্ষিত ও অজ্ঞ থাকিয়া যাইতেছে। এক্ষণে ব্রাহ্মগণ চিন্তা করুন, এই সকল বালক যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে, তখন ইহাদিগকে লইয়া কিরূপ সমাজ গঠিত হইবে। ব্রাহ্মেরা নিজেরাই সেই সকল যুবককে নিজ নিজ কন্যা দিতে চাহিবেন কি না? আর ঘরে ঘরে উচ্ছৃঙ্খল যুবক থাকিলে, তাঁহারা বালিকাদিগের নীতি পরিশুদ্ধ রাখিয়া চলিতে পারিবেন কি না? বিশেষতঃ তাঁহারা বাল্যবিবাহ ও রমণীর অবরোধ প্রথা তুলিয়া দিতেছেন, তাঁহারা কি নিজ সমাজের বালক বালিকাদিগকে সর্ব্বদা দূরে দূরে রক্ষা করিতে পারিবেন? তাহা কি সম্ভব? তবে তাঁহাদের জন্য কি প্রকার ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করিতেছে? আর কতদিন তাঁহারা এ সকল বিষয়ে উদাসীন থাকিবেন? দেশের যে প্রকার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্ম-বালকদিগের শিক্ষার বিষয়ে আমাদের মধ্যে অন্ততঃ কয়েক ব্যক্তি যদি বিশেষ মনোযোগী না হন, এবং সেই কার্য্যে জীবন সমর্পণ না করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে বড় বিপদ দেখা যাইতেছে। যদি সম্ভব হয় সহরের বাহিরে কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে ব্রাহ্ম-বালকদিগের জন্য একটী বোর্ডিং স্থাপন কর। সেখানে উৎকৃষ্ট জ্ঞান শিক্ষা এবং ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত কর। প্রত্যেক ব্রাহ্ম-পরিবারকে সেখানে স্বীয় বালকদিগকে রাখিতে বাধ্য কর। সাবধান থাক, জ্ঞান শিক্ষা বিষয়েও যেন তাহারা উৎকৃষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ তাহাদের অন্তরে উত্তমরূপে মুদ্রিত করিবার চেষ্টা কর। অথবা অন্য কোনও উপায় যদি আলোচনার দ্বারা উৎকৃষ্টতর বলিয়া বোধ হয় তাহা অবলম্বন কর। বর্ত্তমান শিথিলভাবে বালকগণকে বর্দ্ধিত হইতে দিলে আমাদের কল্যাণ নাই।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

স্বানুভূতি, সৎশাস্ত্র ও সদ্গুরু।

একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক উপহাসচ্ছলে বলিয়াছেন যে শিশুরা যেরূপ কখনও কখনও স্বীয় জনকের স্কন্ধের উপরে চড়িয়া বলিয়া থাকে—"বাবা! আমি মাথাতে তোমা অপেক্ষা বড়" সেইরূপ আমরাও অনেক সময়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের স্কন্ধে বসিয়া বলিয়া থাকি—আমরা তোমাদের অপেক্ষা বড়। এই উপহাসোক্তির মধ্যে কিছু সত্য নিহিত আছে। জগতের বর্ত্তমান উন্নতি যে ভূতকালের উন্নতির উপরে স্থাপিত তাহা আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই।

মানব-জ্ঞানের সকল বিভাগেই দৃষ্ট হয় যে, বর্ত্তমান অতীতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। যদি কেহ অদ্য জগতের সুখ সম্পদ বৃদ্ধির কোনও নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভূতকালে যে কিছু উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহার আলোচনা করিতে হয় ও তন্মধ্যে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট আছে, তাহাকে স্বীয় পরামর্শের মধ্যে গ্রহণ করিতে হয়। একজন একটা নূতন প্রকারের লোহার কল প্রস্তুত করিতে যাইতেছেন। তাঁহাকে আলোচনা দ্বারা দেখিতে হইবে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত লৌহের কি পরিমাণ উৎকৃষ্টতা হইয়াছে, সেই লৌহকে কতদূর কাজে লাগান যাইতে পারে? অথবা যতদূর উন্নতি হইয়াছে, তাহার উপরে আরও কতটা উন্নতি করিয়া লওয়া যাইতে পারে ইত্যাদি। তাহা না করিয়া সে ব্যক্তি যদি বলেন, ভূতকালে যাহা কিছু হইয়াছে, তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ নাই; আমি বিশ্বামিত্রের সৃষ্টির ন্যায় সম্পূর্ণ নূতন জগত রচনা করিব; আমি খনি হইতে লৌহ তুলিব, গালাইব, খাদ বাহির করিব, ইস্পাত করিব ইত্যাদি, তবে সকলেই এরূপ ব্যক্তিকে বাতুল বলিয়া বিদ্রূপ করে। যে কার্য্য লোকে শত শত বৎসর ধরিয়া করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে তুমি সময় নষ্ট কর কেন? বিজ্ঞান বিষয়েও এইরূপ। কোনও বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত যদি অতীতের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যতদূর বিজ্ঞানের তত্ত্ব আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য না করিয়া নিজে গোড়া

হইতে আরম্ভ করিতে যান, তবে সকলেই তাঁহাকে বাতুল বলিয়া ও উপহাস করে। বিজ্ঞান সম্বন্ধে দিন দিন যে উন্নতি হইতেছে তাহাও অতীতের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

মানব জীবনের বা মানব সমাজের কোনও বিভাগেই দেখা যায় না যে অতীতকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া কোনও উন্নতি দাঁড়াইতেছে। বরং ইহা বলিতে হয় যে, কোনও ব্যক্তি বা কোনও সম্প্রদায় যদি অতীতকে অগ্রাহ্য করিয়া চলে তবে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। একজন প্রসিদ্ধ মার্কিন পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"সত্য এমন বস্তু, যদি অনবধানতা বশতঃ পথে ফেলিয়া যাও, তবে পুনরায় কুড়াইয়া লইবার জন্য পিছাইয়া আসিতে হয়।" ইহার অর্থ এই, আজ যদি অতীতের কোনও মহাসত্যের প্রতি উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাও, কিছুদিন পরে আবার সমাজের পশ্চাদ্দিকে গতি দেখিতে পাইবে—এই শাস্তি। কোনও বিষয়েই যদি অতীতকে অগ্রাহ্য করিয়া চলা কর্ত্তব্য না হয় তবে ধর্ম্ম-জ্ঞান বিষয়ে কেন কর্ত্তব্য হইবে? জগদীশ্বর কি কেবল বর্ত্তমান সময়েই মানব-হৃদয়ে সত্য সকল উদ্ভাসিত করিতেছেন? এ বিষয়ে দুই শ্রেণীর লোকে দুই অতিরিক্ত সীমায় গমন করিয়া থাকেন। এক শ্রেণী অতীতকালে উদ্ভাসিত সত্য সকলের প্রতি এত জোর দেন যে তাহার সহিত তুলনায়, বর্ত্তমানে ব্যক্তিগত জীবনে উদ্ভাসিত সত্য সকলকে অতি হীন বোধে উপেক্ষা করিয়া থাকেন:—অপর শ্রেণী ব্যক্তিগত জীবনে উদ্ভাসিত সত্যকে এত শ্রেষ্ঠ স্থান দেন যে অতীতে উদ্ভাসিত সত্য সকলকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এই দুই প্রকার ভ্রমের দুই প্রকার ফল। অতীতের উপরে অতিরিক্ত জোর দিলে, অতীতেই আবদ্ধ থাকিলে, অতীতের আলোকের অনুরোধে নিজ আলোক নির্ব্বাণ করিলে, উন্নতির দ্বার বদ্ধ হইয়া যায়। সেরূপ সমাজ উন্নতিবিহীন গতিবিহীন ও উদ্যম-বিহীন হইয়া থাকে। আবার অতীতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া চলিলে মানব নানাপ্রকার ভ্রমের মধ্যে পতিত হয়। বিশেষতঃ ঈশ্বর-বিশ্বাসী প্রত্যেক ব্যক্তিই ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন ঈশ্বরই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তিনিই যুগে যুগে মানব-হৃদয়ে সত্যকে প্রকাশ করিয়াছেন। সময়ে সময়ে মানব-অন্তরে যে সকল সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা (মানবীয় দুর্ব্বলতা ও ভ্রমের দ্বারা জড়িত হইয়া) প্রাচীন শাস্ত্র সকলে নিবদ্ধ রহিয়াছে। অতএব প্রাচীন শাস্ত্র সকলকে অতীতের প্রকাশিত সত্য সকলের খনিস্বরূপ মনে করিলেও হয়। সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি আপনার ধর্ম্ম জীবন গঠন করিবার সময়ে এ সকলকে একেবারে উপেক্ষা করিতে পারেন না। অতীতকে সমাদর করিতে হইলে ইহাদিগকেও মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিতে হয়।

এক্ষণে উপায় কি? যদি অতীতের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক নিষিদ্ধ, যদি নিজের আলোককেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাবিয়া অপর সকল আলোককে উপেক্ষা করা ও নিষিদ্ধ, তবে কর্ত্তব্য কি? এই স্থলে যোগবাশিষ্ঠের একটী বচন স্মরণ হয়, তাহা এই:—"স্বানুভূতেঃ সুশাস্ত্রস্য গুরোশ্চৈবৈকবাক্যতা।"

অর্থাৎ স্বানুভূতি, সুশাস্ত্র ও সদ্গুরু এই তিনের একবাক্যতা অন্বেষণ করিতে হইবে। এখানে স্বানুভূতি অর্থাৎ ব্যক্তিগত বিবেক সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্ব প্রধান। তাহাই ভিত্তি। স্বানুভূতিকে প্রথমে সুশাস্ত্রের সহিত তুলনা করিতে হইবে; তৎপরে সদ্গুরু অর্থাৎ জীবন্ত সাধক ও সাধুদিগের মধ্যে কাহারও সহিত যদি ঘনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ থাকে, তবে তাঁহার প্রদর্শিত আলোকের সহিত তুলনা করিতে হইবে। যদি শাস্ত্রে ও সাধু বচনে স্বানুভূতি-লব্ধ সত্যের সায় পাওয়া যায়, তাহা হইলে বড় সুখের বিষয়। অবশ্য একথা বলিলে ইহা ও বলা হইল যে শাস্ত্র ও গুরুবাক্য যদি স্বানুভূতির বিরোধী হয়, তাহা হইলে স্বানুভূতি-প্রদর্শিত পথ অবলম্বনীয়। তথাপি পূর্ব্বোক্ত উপদেশের তাৎপর্য্য এই সত্য-নির্ণয়েচ্ছু ব্যক্তিকে সুশাস্ত্র ও সদ্গুরুর উপদেশের প্রতি একটা শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাব রক্ষা করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন তিনি সত্য-নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন না।

সদ্গুরু শব্দের অর্থ কি? গুরু শব্দটী বিদ্যালাভে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিদ্যালাভ বিষয়ে গুরু দুই প্রকার কার্য্য করিয়া থাকেন। প্রথম নিজ জ্ঞান-স্পৃহার সংস্পর্শে শিষ্যদিগের অন্তরে জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপ্ত করেন, দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানলাভের প্রণালী নির্দ্দেশ করেন। সংগীত বিদ্যার দৃষ্টান্তের দ্বারা অর্থটী বিশদ করা যাইতে পারে। একজন সংগীত রসাভিজ্ঞ ও সংগীতবিদ্যা-পারদর্শী ওস্তাদ্ বা গুরু আছেন। কতকগুলি যুবক তাঁহার নিকটে সংগীত শিক্ষা করিতেছেন। ইহাঁরা ঐ ওস্তাদের নিকট দুই ভাবে উপকৃত হইতে পারেন। প্রথমতঃ তাঁহার সংগীতানুরাগ দ্বারা ইহাঁদের মনে সংগীতানুরাগ জন্মিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ ওস্তাদ নিজে গাইয়া নানাপ্রকার রাগরাগিণীর লক্ষণ ও প্রণালী দেখাইয়া দিতে পারেন। শিষ্যেরা "ইমন" আলাপ করিতেছে ঠিক হইতেছে না, গুরু একটু গাইয়া দেখাইয়া দিলেন। ধর্ম্ম-জগতেও আমরা সাধনপথে অগ্রসর ব্যক্তিদিগের নিকট উক্ত উভয় প্রকার উপকার লাভ করিতে পারি। আমরা তাঁহাদের বিশ্বাস, বৈরাগ্য, সেবার অগ্নির সংস্পর্শে সেই অগ্নি লাভ করিতে পারি; দ্বিতীয়তঃ অনেক প্রশ্নে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার সাহায্য পাইতে পারি। যাঁহারা নিজ জীবনের আলোক দ্বারা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের আলোককে আরও উজ্জ্বল করিয়া দেন তাঁহারাই আমাদের ধর্ম্মপথের প্রকৃত বন্ধু, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মপথের বন্ধু বল, সহায় বল, শিক্ষক বল, গুরু বল বিষয়টা একই।

এই গুরুবাদ সম্বন্ধেও আমরা দুই শ্রেণীর লোককে দুই অতিরিক্ত সীমাতে যাইতে দেখিতেছি। এক শ্রেণী গুরুর চরণে ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব বিক্রয় করিয়া ক্ষুদ্র হইয়া যাইতেছেন; অপর শ্রেণী সাধক ও সাধুদিগের প্রতি সমুচিত আদরের অভাবে অহমিকার হস্তে পতিত হইয়া ধর্ম্মকে হারাইতেছেন। গুরুবাদের যে অনিষ্ট ফল এদেশে ফলিয়াছে তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয় দুঃখে ম্লান হয়! মানুষগুলি মনুষ্যত্ব বিহীন হইয়া শিশুর মত হইয়া গিয়াছে; চিন্তা ও বিচার শক্তিকে জলাঞ্জলি দিয়া জড়প্রায় হইয়া পড়িয়াছে; পাপকে বাধা দিবার সাধ্য আর তাহাদের নাই! মনুষ্যকে এরূপ মনুষ্যত্ব হীন অবস্থাতে যাহারা পরিণত করে তাহারা মানবের বন্ধু নহে,

পরম শত্রু। সুতরাং গুরু এই শব্দ উচ্চারণ মাত্র বহু সংখ্যক ভুক্ত-ভোগী লোকের দারুণ ঘৃণা ও আতঙ্ক উপস্থিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। আমরা শব্দের জন্য কলহ করিতেছি না। গুরু শব্দ রুচি-সঙ্গত না হয় "সাধুপদেশ" বল বা অন্য শব্দের সৃষ্টি কর। ভিতরকার কথাটা এই, ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর ব্যক্তি-দিগের উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক কর্ণপাত করিতে হইবে এবং স্বানুভূতির আলোককে তাঁহাদের আলোকের সহিত মিলাইতে হইবে; তবে সত্য-নির্ণয়ের পক্ষে সহায়তা হইবে।

অতীতের প্রতি ও সাধুজনের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাব থাকিলে তাঁহাদের গুণাবলী আমাদের হৃদয়ে কার্য্য করিতে পারে। অপরের যে কিছু সদ্‌গুণ আছে, বিনয়ী ব্যক্তি তাহা দেখিতে পায়। অহঙ্কারীর নিজ অহঙ্কার তাহার দৃষ্টিকে আবরণ করে। অনেক অমূল্য বস্তু তাহার চক্ষের নিকটে থাকে অথচ সে দেখিতে পায় না। ব্রাহ্মসমাজ এই সাধুভক্তিকে এদেশের লোকের মনে উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যীশু, বুদ্ধ, মহম্মদ প্রভৃতির প্রতি লোকের যে শ্রদ্ধা বাড়িতেছে, তাহার মূলে কি ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টা নহে? প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি লোকের যে শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে, তাহার মূলেও কি ব্রাহ্মসমাজের ও তত্ত্ববোধিনী সভার চেষ্টা নহে? অতএব সাধুভক্তি ভগ্ন না করিয়া রক্ষা করাই ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টা। কেবল ভঙ্গ করা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নহে, গঠন করাই ইহার প্রধান কার্য্য। ইহা সকল দেশের সকল সাধুতাকে পরিপোষণ করিবে; সকল কালের সকল সাধুর সহিত হৃদয়ের যোগ স্থাপন করিবে। এই মহালক্ষ্য জগতের পক্ষে নূতন এবং ইহা ব্রাহ্মসমাজের মহা কর্ত্তব্য।

জীবন-সংগ্রাম ও পাপ পুণ্যের জন্মভূমি।

আমরা এই জগতে তিন প্রকারের পদার্থ দেখিতে পাই। এক জড়, দ্বিতীয় ইতরপ্রাণী, তৃতীয় মানব। এই তিন প্রকারের পদার্থেরই এক একটা বিশেষত্ব আছে। জড়ের বিশেষত্বকে জড়তা, সাধারণ প্রাণিগণের বিশেষত্বকে স্থূলচৈতন্য,এবং মানবের বিশেষত্বকে সূক্ষ্মচৈতন্য নামে অভিহিত করিতে পারা যায়। জড় সৃষ্টি প্রকরণের নিম্ন সোপানে প্রতিষ্ঠিত, স্থূলচৈতন্য তাহার মধ্যসোপানে বিরাজিত, এবং সূক্ষ্মচৈতন্য তাহার শীর্ষস্থলে সুশোভিত। জড় জড় শক্তির অধীন, স্থূলচৈতন্য প্রাণশক্তি দ্বারা পরিচালিত, এবং সূক্ষ্মচৈতন্যের রাজ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রতিষ্ঠিত।

সূক্ষ্মচৈতন্য মানবের বিশেষত্ব হইলেও, সে এই ত্রিবিধ উপকরণেই গঠিত হইয়াছে। জড়শক্তি, প্রাণশক্তি এবং আত্মশক্তি এই শক্তিত্রয়ের কার্য্যফলেরই নাম মানব-জীবন বা মানব চরিত্র। এই বিভিন্ন ও কিয়ৎপরিমাণে পরস্পর-বিরোধী শক্তিত্রয়ের সমাবেশ হইতেই মানবচরিত্রের অদ্ভুত বিচিত্রতার উৎপত্তি হইয়াছে। এই ত্রিবিধ পদার্থ ও ত্রিবিধ শক্তি দ্বারা গঠিত বলিয়াই আমরা একই কালে আপনা-দিগকে বদ্ধ এবং মুক্ত, মলিন এবং নির্ম্মল, পরাধীন এবং স্বাধীন জীবরূপে অবগত হইতেছি।

এই জড় দেহ জড় নিয়মের অধীন; মাধ্যাকর্ষণী শক্তি, রসায়নশক্তি, তড়িৎশক্তি প্রভৃতি জড়শক্তি এই দেহপিঞ্জরকে প্রতিনিয়ত ভাঙ্গিতেছে ও গড়িতেছে। এই প্রাণ মন জীব-নিয়মের অধীন, ইন্দ্রিয়শক্তি এবং ইন্দ্রিয়জ সুখ দুঃখাদির আসক্তি বিরক্তি প্রভৃতি বাসনাকুলের দ্বারা ইহারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই দেহ মনের অতীত আত্মা আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারের দ্বারা উদ্বোধিত ও বিকসিত হইতেছে।

এই শক্তিত্রয় বিভিন্ন এবং কিয়ৎপরিমাণে পরস্পর বিরোধী হইলেও মানবজীবনে সর্ব্বদা পরস্পরের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ থাকিয়া আপন আপন কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। আমাদিগের জড়দেহ কেবল জড়শক্তির অধীন নহে, কিন্তু প্রাণশক্তিরও অধীন। কেবল তাহাই নহে, ইহার উপরে প্রাণ-শক্তির যতটা প্রভুত্ব আছে, কেবলমাত্র জড়শক্তির সেরূপ কোনওই আধিপত্য নাই। কেবল রসায়নের নিয়মের দ্বারাই এই জড়দেহযন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হয় না; প্রাণশক্তির সাহায্য ব্যতি-রেকে রসায়নশক্তি এই জড়দেহের উপরে কার্য্য করিতে গিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এই জন্যই সর্ব্বপ্রকারের প্রকৃষ্ট চিকিৎসা প্রণালীতে রোগীর প্রকৃতিভেদে, একই জাতীয় রোগে, বিভিন্ন ঔষধ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আমাদিগের প্রকৃতিতে এই জড় দেহের জড়শক্তি সতত প্রাণশক্তিকে অবলম্বন করিয়াই বাস করিতেছে। এমন কি চেষ্টা করিলে,অতি সহজেই এই প্রাণশক্তি দেহস্থিত জড়শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধিকারচ্যুত করিয়া রাখিতে পারে। বিষয় বিশেষে গভীর ভাবে মনোনিবেশ করিলে, অতি সহজেই এই দেহকে ক্ষুৎপিপাসা এবং শীতোষ্ণের অতীত করিয়া তুলিতে পারা যায়। ভারতের যোগিগণের জীবনবৃত্তান্তে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ শ্রুত হওয়া যায়, ইউরোপের মধ্যযুগে একজন খৃষ্টীয় তপস্বী ঈশার মৃত্যুযাতনা আপনার জীবনে উপলব্ধি করিবার চেষ্টায় গভীর ধ্যাননিমগ্ন হইয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রমে ঈশার দেহের যে যে স্থলে লৌহবিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে,এই ধ্যাননিমগ্ন তাপসের শরীরের সেই সেই স্থান বিদীর্ণ হইয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কেবল এইরূপ যোগধ্যানেই যে মানবের জীবশক্তি তাহার দেহের জড়শক্তিকে পরাস্ত করিয়া থাকে, তাহা নহে। অন্যান্য অবস্থাধীনে অন্যান্য প্রণালীতে এবং এই জীবশক্তি জড়শক্তির উপরে নিয়োজিত হইয়া তাহাকে আপনার অধিকারচ্যুত করিয়া রাখে। কাম ক্রোধ রিপু অত্যধিক মাত্রায় উত্তেজিত হইলে যে মানবের জড়জ্ঞান প্রায়ই লুপ্ত হইয়া যায়, ইহা কে না জানে? অত্যধিক মানসিক উত্তেজনাতে আমরা প্রায়শঃই তো জড়-শক্তিকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিতেছি। যেমন জীবশক্তি জড়শক্তির নিয়ামক রূপে মানবপ্রকৃতিতে নিহিত রহিয়াছে, তেমনি আত্মশক্তি এই দেহস্থ জড়শক্তি ও এই অন্তরস্থ প্রাণ-শক্তি উভয়েরই নিয়ামক এবং প্রভু হইয়া উভয়েরই উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

মানব প্রকৃতিতে এই ত্রিবিধ শক্তির সমাবেশ হইতে যেমন

মানব চরিত্রের বিচিত্রতার উৎপত্তি হইয়াছে, তেমনি এই শক্তিত্রয়ের পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব ও কার্য্য হইতেই মানব জীবনের সর্ব্ব প্রকারের নৈতিক সংগ্রামেরও সৃষ্টি হইয়াছে। এই মহাযুদ্ধে নিক্ষিপ্ত ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র সমূহের দ্বারা উদগীরিত ধূম্ররাশিই মোহরূপে তাহার প্রাণকে আচ্ছন্ন করিতেছে; এই সকল অস্ত্র-প্রক্ষিপ্ত বাণ সকলই শোক দুঃখ প্রভৃতি রূপে মানবের কোমল মর্ম্মস্থলকে দিবানিশি বিদ্ধ করিতেছে। এই সংগ্রামের সমাপ্তি না হইলে মানব অদ্যাপি শাশ্বতী শান্তি ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ করিতে সক্ষম হয় না।

এই সংগ্রামক্ষেত্রেই পাপ পুণ্যেরও জন্ম হইয়া থাকে। নতুবা বিধাতা পুরুষ অন্য কোনও রূপে বা অন্য কোনও প্রণালীতে মানবকে সাক্ষাৎভাবে পাপ পুণ্য প্রদান করেন নাই। যেমন জলের ধর্ম্মই শৈত্য, অগ্নির ধর্ম্মই উত্তাপ, তেমনি মানব প্রকৃতির এই অপরিহার্য্য শক্তি-সংঘর্ষণের ধর্ম্মই পাপ পুণ্যের প্রতিষ্ঠা। যতদিন এই সংগ্রাম, ততদিন মানবের পাপ ও পুণ্য-বোধ, সুখ এবং দুঃখবোধ, থাকিবেই থাকিবে। এই সংগ্রাম যতদিন না আরম্ভ হয়, অর্থাৎ মানব যতদিন কেবল মাত্র জড় নিয়ম বা জীব নিয়মেরই অধীন থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার অন্তরে পাপ পুণ্যের জ্ঞান প্রকাশ পায় না। অপোগণ্ড শিশু, যে কেবল জড় শক্তি এবং নিম্নতর জীবশক্তি দ্বারাই জীবিত থাকে এবং আপনার ইন্দ্রিয় চালনা করে, তাহার তো কোনওই পাপ পুণ্য বোধ নাই। ক্রমে জীবশক্তির বিকাশে যখন তাহার অন্তরে বিভিন্ন বাসনা জাগ্রত হইতে আরম্ভ করে, এবং এই সকল বাসনার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইয়া যখন মানব-জীবনে এক মহাসংগ্রামের সূত্রপাত করে, তখন হইতেই তাহার অন্তরে ভাল মন্দ এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে পাপ পুণ্য বোধেরও সঞ্চার হইয়া থাকে। অতি শৈশবে মানব প্রকৃতিতে এক শক্তিরই প্রাধান্য থাকে, অপর শক্তি তখন সেই এক শক্তিরই বশে বাস করে, তখনও মানবের জীবনে শক্তিদ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় না, অতএব সে কালে মানবের পাপও নাই পুণ্যও নাই; কর্ত্তব্যও নাই অকর্ত্তব্যও নাই; কর্ত্তৃত্বও নাই, কর্ম্মও নাই, কর্ম্মফল সংযোগও নাই। মানব প্রকৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা ক্রমে তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন অতি শৈশবে জীবনের প্রত্যূষকালে মানবের পাপ পুণ্য থাকে না; তেমনি জীবনের পরিণতিতে, যদি সৌভাগ্যক্রমে এই শক্তি দ্বন্দ্ব নিবৃত্ত হইয়া যায়, শৈশবে যেমন এক শক্তির অনন্য-প্রতিযোগী প্রভুত্ব মানবের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া একই প্রণালীতে নির্ব্বিরোধে শিশু জীবনকে পরিচালিত করে, পরিণত বয়সে যদি সেইরূপ এক শক্তিরই অনন্য-প্রতিযোগী প্রভুশক্তি মানবচরিত্রে বদ্ধমূল হইয়া গিয়া, মানবের জীবনকে নির্ব্বিরোধে একই পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম হয়, তবে তখনও আর এই পরম সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির পক্ষে পাপ পুণ্যের সংগ্রাম থাকে না। জীবন-প্রভাতে যেমন মানব-প্রকৃতি নিহিত সমুদায় শক্তি জড়শক্তি এবং নিম্নতর জীবশক্তির সম্পূর্ণ বশে থাকে, জীবন-মুক্তিতেও তেমনি আমাদিগের প্রকৃতিগত শক্তি সমূহ এক সূক্ষ্ম চৈতন্য শক্তির সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া থাকে, এবং এই জন্যই মুক্তজীব "পুণ্য পাপে বিধূয় পরম সাম্যমুপৈতি।"

এই সূক্ষ্ম চৈতন্যশক্তির আবির্ভাব ব্যতিরেকে মানবহৃদয়ে প্রকৃত পাপবোধ জন্মিতে পারে না। আমরা সচরাচর যাহাকে পাপ পুণ্য নামে অভিহিত করি, অনেক সময়ই তাহা কেবলমাত্র লৌকিক নিয়ম ও তাহার ব্যতিক্রমের নামান্তর মাত্র। কিন্তু আত্মশক্তি জাগ্রত হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব জীবনের পাপ পুণ্যের সংজ্ঞা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তখন পাপ ও পুণ্য বাহিরের কার্য্যক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরিত হইয়া অন্তরের চিন্তাও ভাবের ক্ষেত্রে গিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বে, যখন মানুষ কেবল জড় ও জীবনশক্তির অধীন ছিল, তখন যাহা পাপ ছিল না, এমন কি তখন যাহা পুণ্য ছিল, এখন তাহা মহাপাপে পরিণত হইয়া উঠে। যতদিন না আত্মশক্তির স্ফুরণ হয়, ততদিন জীবনশক্তিকে যথোচিত ভাবে রক্ষা করা, যথাবিধি আহার, নিদ্রা ইত্যাদি, পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। ততদিন জীবন ক্ষয় ও স্বাস্থ্যভঙ্গ; মহাপাপ। কিন্তু আত্মশক্তি জাগ্রত হইলে, আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য যদি প্রয়োজন হয়, আপনার জীবনশক্তিকে ক্ষয় করা, অনিদ্রায় অনশনে শরীরকে সংযত ও ক্লিষ্ট করা, মহা পুণ্যকার্য্য হইয়া উঠে, তাহা না করিলে পাপ হয়। যাহারা যে নিয়মের অধীন থাকে, সেই নিয়মের দ্বারাই তাহাদের পাপ পুণ্য নির্দ্ধারিত হয়। যাহারা জড়নিয়মের বা কেবল জীবন-নিয়মের অধীন তাহাদের পাপ পুণ্য ঐ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। যাঁহারা ঈশ্বরের কৃপায় আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রজাস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্য তুলাদণ্ডে তাঁহাদের পাপ পুণ্যের পরিমাপ হয়। কেবল জীবন-শক্তির অধীন যাঁহারা, সমাজের বিধান মান্য করিয়া সংসারের ধন মান আয়োজন করা, জীবনের সুখ-স্বচ্ছন্দতা ভোগ করা তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বরের অধ্যাত্ম-রাজ্যের প্রজা যাঁহারা হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে বিষয়-ত্যাগ ও বৈরাগ্যই ধর্ম্ম, ইহার ব্যতিক্রম অধর্ম্ম। ব্রাহ্মবন্ধু এখন নির্দ্ধারণ করুন, তিনি কেবল জীবন রাজ্যেই বাস করিবেন, না পরব্রহ্মের অধ্যাত্মরাজ্যে তাঁহার দাস হইবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন।

পাঁচ ফুলের সাজি।

1. Socrates—

"Intimacy with the good leads to the practice of virtue, whereas the companionship of the wicked destroys it."

সাধুগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা আমাদিগকে ধর্ম্মসাধনে লইয়া যায়, আর দুষ্টের সহবাস তাহা নষ্ট করে।

2. S. T. Coleridge.

"O fair is Love's first hope gentile mind!
As Eve's first star through fleecy cloudlet peeping"

ক্ষুদ্র ঘনরাশির ধার হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিবার.

সময় সন্ধ্যার প্রথম তারকাটী যেমন দেখায় প্রেমের প্রথম আশা তেমনি মৃদু অন্তরের পক্ষে সুন্দর।

"For what is freedom, but the unfettered use
Of all the powers which God for use had given?
But chiefly this, him first, him last to view
Through meaner powers and secondary things
Effulgent, as through clouds that veil his blaze."

কারণ, ব্যবহারার্থে ঈশ্বর যে সমুদায় শক্তি দিয়াছেন, স্বাধীনতা তাহারই স্বাধীন ব্যবহার ব্যতীত আর কি? কিন্তু প্রধানতঃ এই যে, তাঁহার জ্যোতি আবরণকারী মেঘমালাস্বরূপ নিকৃষ্টতর শক্তি এবং বস্তু সমূহের মধ্য দিয়া সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বশেষ রূপে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করা।

৩। চাণক্য—

"মুহূর্ত্তমপি জীবেচ্চ নরঃ শুক্লেন কর্ম্মণা।
ন কল্পমপি কষ্টেন লোকদ্বয়-বিরোধিনা॥"

নির্ম্মল (পুণ্য) কর্ম্ম সাধন করিয়া এক মুহূর্ত্ত বাঁচিলেও জীবন সার্থক হয়; ইহপরকাল বিনষ্ট করিয়া যুগান্তকাল জীবন ধারণ করিলেও ফল নাই।

৪। যোগবাশিষ্ট—

"ন দৈবংনচ কর্ম্মাণি ন ধনানি ন বান্ধবাঃ।
শরণং ভবভীতানাং স্বপ্রযত্নাদৃতে নৃণাং॥"

(তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে) যত্ন না করিলে, কি দৈব কর্ম্ম, কি ধন কি বন্ধু, কোন বস্তুই ভব-ভয়-ভীত মানবকে রক্ষা করিতে পারে না।

৫। তলবকারোপনিষৎ—

"যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

বাক্য যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, যাঁহাদ্বারা বাক্য নিয়োজিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে পরিচ্ছিন্ন বস্তু উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

ব্রহ্মজ্ঞানিগণ বলেন, লোকে মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনকে জানিতেছেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

6. The Koran.

"God loveth not corrupt ing"

ঈশ্বর অসদাচার ভাল বাসেন না।

"God is gracious unto His servants."

ঈশ্বর তাঁহার সেবকগণের প্রতি সদয়।

"Know that God is mighty and wise."

জানিও যে ঈশ্বর শক্তিমান এবং জ্ঞানবান।

"God loveth those who repent,
and loveth those who are clean."

যাঁহারা অনুতাপ করেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে ভাল বাসেন, এবং যাঁহারা নির্ম্মল তাঁহাদিগকে ভাল বাসেন।

7. St. Matthew—

"Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for their's is the kingdom of heaven."

"Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake."

Rejoice and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you."

যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য উৎপীড়িত হন তাঁহারাই ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই।

(তখনই) তোমরা ধন্য, যখন মনুষ্যগণ ধর্ম্মের জন্য, তোমাদিগকে গালি দিবে, নির্যাতন করিবে, এবং মিথ্যাপূর্ব্বক তোমাদের বিরুদ্ধে যথেচ্ছ অপবাদ দিবে।

উল্লাস কর, এবং নিরতিশয় আনন্দিত হও, কারণ স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার মহৎ। কারণ এই রূপেই তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণকে নিপীড়িত করিয়াছিল।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন কিম্বা কাপি ফেরত দিতে বাধ্য নহেন।)

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়,

গত ১লা ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে "জনৈক সভ্য" স্বাক্ষরিত "হরিনামের অনিষ্টকারিতা" সম্বন্ধে এক পত্র এবং "শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সোম" স্বাক্ষরিত "আহারার্থে প্রাণিনাশ প্রকৃতপক্ষে নির্দ্দয়তা নয়" সম্বন্ধে এক পত্র, এই দুই পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই উভয় পত্রের মতামত সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, তাহা নিম্নে লিখিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। আমার বক্তব্য বিষয় আমি অতি সংক্ষেপেই জানাইব।

১ম পত্র সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে,—"হরি" শব্দ উচ্চারণ করিলেই যে সাকার হরিকেই বুঝিতে হইবে আমাদের এরূপ বোধ হয় না। রাম, কৃষ্ণ, কালী প্রভৃতির ন্যায় হরি কোন অবতার নহেন। তবে পত্রপ্রেরকের আপত্তি এই যে, "সাকার বাদিগণ অনেক সময় হরির মূর্ত্তি গঠন করিয়া থাকেন।" কিন্তু সাকার-বাদিগণ মূর্ত্তি গঠন করিলেই বা হরিকে অবতার বলিলেই যদি নিরাকার হরির পূজা বর্জ্জন করা যায়, তাহা হইলে নিরাকার পূজার জন্য কোন নামই থাকিতে পারে না।

অবতার-বাদিগণ এবং পৌত্তলিকগণ নিরাকার হরির ন্যায় অন্যান্য নামের কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাহা একবার দেখা যাউক।

১। "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" এস্থলে অবতারব দিগণ দিল্লীশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়াছেন।

২। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের প্রথমেই জগৎপিতা শব্দের অর্থ হরপার্ব্বতী এবং পরমেশ্বর শব্দের অর্থ পার্ব্বতীনাথ করিয়াছেন।

৩। নর্ম্মদা নদীর ধারে ওঁকারনাথ নামক এক বিখ্যাত তীর্থস্থান আছে, সেস্থানে এক মন্দিরে এক প্রস্তরের মহাদেব আছেন, তাঁহার নাম ওঁকারজী বা ওঁকারেশ্বর।

আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, যে তিনটী দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, "হরি" শব্দের যে গতি "ঈশ্বর"—"পরমেশ্বর"—"জগৎপিতা" এবং "ওঁ" শব্দেরও সেই গতি, তবে কি নিরাকার হরিকে কেবল মনেই রাখিতে হইবে? মুখ ফুটিয়া কিছুই বলা যাইবে না? আর এক কথা পৌত্তলিকগণ সাকার ভাবে কল্পনা করিলেই বা অবতার বলিলেই যদি নিরাকার হরি সাকার হইয়া যান, তবে মনেই বা রাখিব কিরূপে? সাকারবাদিগণ রাগরাগিণীর ও সাকার মূর্ত্তি কল্পনা করিতে ছাড়েন নাই। তাহাতেই কি রাগরাগিণীও সাকার হইয়া গেল?

২য় পত্র সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে,—পত্রপ্রেরক বলিয়াছেন, "বৃথা আমোদের জন্ত প্রাণিবধ অপ্রেম মূলক ও দূষণীয় সন্দেহ নাই।" এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, যখন ঈশ্বর আমাদিগকে আহারার্থে বহুপ্রকার দ্রব্য দিয়াছেন এবং তাহা আহার করিয়া আমরা বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট শরীরে সংসারযাত্রানির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইতেছি, এরূপ স্থলে সাধারণ ভাবে "আহারার্থে প্রাণিবধ" কার্য্যকে কি "বৃথা আমোদজনক কার্য্য" বলা উচিত নয়? আমাদের বিবেচনায় আহারার্থে সাধারণভাবে প্রাণিবধ, বৃথা আমোদজনক কার্য্যের মধ্যেই গণ্য; তবে এরূপ বিশেষ স্থল থাকিতে পারে, যে সময় প্রাণিবধ না করিলে প্রাণ-ধারণ করা বড় কঠিন হইয়া পড়ে, অথবা কোন বিশেষ আবশ্যকীয় কার্য্য সিদ্ধি হয় না। তদ্রূপ স্থলে প্রাণীবিশেষের মঙ্গলার্থ প্রাণী-বিশেষ বধ করিলে ক্ষতি নাই।

প্রাণিবধকালে যেমন প্রাণিগণ কষ্ট অনুভব করে, উদ্ভিদগণ অবশ্য তাহা করে না, অন্ততঃ আমরা উদ্ভিদগণের কষ্ট বুঝিতে এবং বিশ্বাস করিতে পারি না, সুতরাং উদ্ভিদ ভক্ষণ প্রকৃত পক্ষে নির্দ্দয়তা নহে।

ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব ঈশ্বরাদেশে বা দৈব ঘটনাতে মারা পড়িলে প্রেমময়ের মঙ্গল উদ্দেশ্য অবশ্য তাহার পশ্চাতে থাকে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি; কিন্তু আহারার্থে অনেক প্রকার পদার্থ থাকিতে মনুষ্য দ্বারা অকারণ প্রাণিবধের পশ্চাতে কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য আমরা বুঝিতে পারি না। হস্তী, ঘোটক, মহিষ প্রভৃতি জন্তুগণ উদ্ভিদ আহার করিয়াই শক্তি সঞ্চয় করে। কেহ কেহ বলেন, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতির শরীরে বেশী শক্তি থাকে, কিন্তু সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতিরা অন্যান্য মাংসের ন্যায় নরমাংসও ভক্ষণ করে, তবে কি নরমাংস ভক্ষণ, অন্যান্য মাংস ভক্ষণ, মৎস্য ভক্ষণ এবং উদ্ভিদ ভক্ষণ সবই সমান? যদি সমান না হয়, তবে অকারণ বা অতি সামান্য কারণে জীবগণকে কষ্ট দেওয়া কখনই উচিত নহে এবং উদ্ভিদের সহিত মৎস্যের এবং মৎস্যের সহিত অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর জীবের তুলনাও হইতে পারে না। কারণ যদি উদ্ভিদ আহার করিলেই মৎস্য আহার করা উচিত হয় এবং মৎস্য আহার করিলেই অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর জীবের মাংস ভক্ষণ করা উচিত হয়, তবে নরমাংস ভোজনেই বা দোষ কি? পত্রপ্রেরক বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম-প্রকাশ বলিয়া যদি মাংসাদি আহার বর্জ্জনীয় হয়, তবে আর মানুষের আহারের জন্য রহিল কি?" যদি পত্রপ্রেরকের কথা ঠিক হয়, তবে একজন অসভ্য নরমাংসাশী বলিতে পারে যে, "যদি ব্রহ্মপ্রকাশ বলিয়া নর-মাংসই বর্জ্জনীয় হয়, তবে আর মানুষের আহারের জন্য রহিল কি?

নশিপুর,
মুর্শিদাবাদ,
৯ই ভাদ্র ১৩০০।

অনুগত
শ্রীজগন্নাথপ্রসাদ গুপ্ত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু

মহাশয়,

সাধারণ লোকদিগের মধ্যে যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হয় তাহার প্রতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টিপতিত হইয়াছে দেখিয়া, আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। সাধারণ লোকেরা সত্য-ব্রাহ্মধর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না, সত্যধর্ম্ম শিক্ষিতদিগের, এইরূপ ভ্রান্তসংস্কার যদি কাহারও থাকে, তাঁহাদিগের বিবেচনা করা উচিত যে সত্যের পথ সরল, না মিথ্যা কল্পনার পথ সরল, সত্যের ধারণা সহজ, না মিথ্যার ধারণা সহজ, অবশ্যই মিথ্যা কল্পনার পথ জটিল, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষিতের, অশিক্ষিতের, পণ্ডিতের, মূর্খের, ধনবানের, দরিদ্রের, রাজার, ভিক্ষুকের। পৃথিবীর সমস্ত নরনারীদিগেরই ব্রাহ্মধর্ম্মে অধিকার আছে, সকল সন্তানেরাই পিতার ধনে সমাংশভাগী হইয়া থাকে। পরম কারুণিক পরম পিতার ন্যায়বিধানে ঐ নিয়মের কখনই ব্যতিক্রম হইতে পারে না। জ্যেষ্ঠ যদি বুদ্ধিহীন অশিক্ষিত কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পৈতৃক ধনে বঞ্চিত করেন তাহা হইলে তাঁহাকে যেরূপ জ্ঞাতি বঞ্চনা রূপ মহাপাতকে লিপ্ত হইতে হয়, সেইরূপ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি অশিক্ষিতদিগকে তাঁহাদিগের উপলব্ধ সত্য সকল প্রদান না করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মধনে বঞ্চনারূপ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপে পতিত হইতে হইবে, অতএব শিক্ষিত ভ্রাতাদিগের সর্ব্বপ্রযত্নে অশিক্ষিতদিগের মধ্যে সত্যধর্ম্ম প্রচার করা কর্ত্তব্য, সম্প্রতি ব্রাহ্ম সাধারণের যে সাধারণ লোকের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাঁহারা অশিক্ষিতদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতে নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া জানাইতেছি—বরাহনগরে অনেক শ্রমজীবী লোকের বাস, এই শ্রমজীবীদিগের উন্নতির জন্য বরাহনগর-নিবাসী বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বহুদিন হইতে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ইহাদিগের মধ্যে যাহাতে ধর্ম্মভাব জাগরিত হয়, তিনি সে বিষয়েও বিশেষ চেষ্টা করিয়া

থাকেন এ দেশের লোকের বহুদিনের বিশ্বাস যে সাধারণ লোকেরা কখনই নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু বরাহনগরের শ্রমজীবীরা ঐ কথার যথার্থতা খণ্ডন করিয়াছে। তাহারা নিয়মিতরূপে সমাজে উপস্থিত হইয়া ভক্তি-পূর্ব্বক উপাসনায় যোগ দিত। আপনারা উৎসাহী হইয়া নিজগৃহে ধর্ম্মোপদেশের নিমিত্ত সভা আহ্বান করিত। মাঘোৎসবের সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বরাহনগর শ্রমজীবীদিগের বৎসর বৎসর যে উৎসব হইত বরাহনগর হইতে পঞ্চাশ ষাট জন শ্রমজীবী দলবদ্ধ হইয়া ভক্তিভরে ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইত, তাহা অনেকেই জানেন এবং কলিকাতা হইতেও ব্রাহ্মবন্ধুগণ সময়ে সময়ে বরাহনগরে আসিয়া শ্রমজীবীদিগের ধর্ম্মোৎসাহ দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন ও সময়ে সময়ে শ্রমজীবীদিগের বাটীতে উপস্থিত হইয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; এই সকলের দ্বারা কি প্রমাণিত হইতেছে না যে অশিক্ষিতেরাও নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে সমর্থ; সাধারণ লোকে নিরাকারের উপাসনা করিতে পারে, এই সত্য এদেশে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু যুক্তি ভিন্ন কার্য্যতঃ অন্য কোথাও ইহার সত্যতা সপ্রমাণ হয় নাই। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে শশিপদ বাবুর শারীরিক অসুস্থতা হেতু চেষ্টার শৈথিল্য ও উপযুক্ত প্রচারকের অভাবে ইহাদিগের আর সেরূপ উৎসাহ দেখা যায় না, কিন্তু এখানে একটি সুন্দর কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই সুফল ফলিবে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম প্রচারকেরা নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিতেছেন, যদি মধ্যে মধ্যে তাঁহারা ও ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ বরাহনগরে আসিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন, যদি শ্রমজীবীদিগের গৃহে গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দান করেন, তাহা হইলে নিরুৎসাহ শ্রমজীবীরা উৎসাহিত হইয়া ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইবে তাঁহারাও কর্ত্তব্যপালন করিয়া কৃতার্থ হইবেন। আশা করি ধর্ম্ম প্রচারকগণ আমাদের কথা উপেক্ষা করিবেন না।

কাশীপুর } নিবেদক।
শ্রীপঞ্চানন শিরোরত্ন

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

শ্রদ্ধাস্পদেষু।

গত ১৬ই আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীতে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় মহাশয় একাধিক বিবাহের বিরুদ্ধে একখানি দৃঢ় প্রতিবাদ-সূচক পত্র লিখিয়াছেন। আমি নিতান্ত কর্ত্তব্যের অনুরোধে এ সম্বন্ধে দু একটি কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্রখানি প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

একাধিক বিবাহের বিরুদ্ধে দু চারিটি কথা বলা কিম্বা লেখনী চালনা করা কিছুই কঠিন নহে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যখন পরীক্ষা উপস্থিত হয়, যখন পত্নী বা পতি পর-লোকে গমন করেন, তখন আর পূর্ব্ববৎ দৃঢ়তা থাকে না। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা বা আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া অনেকেই পুনরায় বিবাহিত অথবা বিবাহের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হইয়া থাকেন। এক সময় যাঁহাদের মুখে "উচ্চ ব্রহ্মচর্য্য, পূর্ণাবয়ব প্রেম, আদর্শ দাম্পত্য ও নিত্যকালের বিবাহ" ইত্যাদি কথা শ্রবণ করিয়া বন্ধুগণ মুগ্ধ হইতেন, পত্নী বিয়োগের পর আবার তাঁহাদের বিপরীত ভাব দেখিয়া দুঃখিত হইতেছেন। অতএব যাঁহারা বিপত্নীক অথবা বিধবা এবং বৈতরণীর পারে উপস্থিত, তাঁহাদের এ সকল তত্ত্বের আলোচনা করিলেই শোভা পায়। নতুবা যে সময় পড়িয়াছে, তাহাতে নীরব থাকিয়া কার্য্য দ্বারা স্বীয় স্বীয় মত প্রচার করাই যুক্তিযুক্ত।

এখন রায় মহাশয়ের যুক্তি কয়টির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে চেষ্টা করি। তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন, মানবাত্মা যেমন এক পরমেশ্বরে সংযুক্ত হইলেই শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়, তেমন মানব শরীরও কি পত্নী কি পতি অবলম্বন করিলেই পবিত্র থাকে ইত্যাদি। এরূপ উপমা নিতান্তই অসঙ্গত। ঈশ্বর পূর্ণ নিত্য, সর্ব্বত্র বর্ত্তমান এবং চিন্ময়, তাঁহার সহিত মানবাত্মার নিত্য কালের সম্বন্ধ। তিনি আত্মার মূলাধার, কর্ত্তা, আশ্রয়দাতা রূপে নিয়ত বর্ত্তমান। পরমেশ্বরের সহিত মানবাত্মার আকাশেরও ব্যবধান নাই, এত ঘনিষ্ঠ যোগ। শরীরে শরীরে—জড় বস্তুতে জড় বস্তুতে কি এইরূপে ঘনিষ্ঠ যোগ সম্ভবে? মানবাত্মা অনন্তকাল ঈশ্বরের সন্নিধানে বাস করিবে, শরীর দুদিনের জন্য। নশ্বর দেহকে কি দম্পতিগণ অনন্তকাল চিন্তা করিবেন? ইহাই কি বিবাহের আদর্শ? মিলন হয় আত্মায় আত্মায়, শরীরের সহিত মিলন হয় না। যদি কেহ বলেন, দম্পতির আত্মিক যোগই অনন্তকাল স্থায়ী, উভয়ে প্রেমে একীভূত হইয়া অবিচ্ছেদ যোগে অমর জীবন যাপন করিবে। ইহাও মানব জীবনের সম্পূর্ণ আদর্শ বলিয়া অনুমিত হয় না। প্রথমতঃ পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার যে সম্বন্ধ, সেইরূপ সম্বন্ধ কোন মানবের সহিত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ মানবপ্রেম মনুষ্য বিশেষের প্রতি কেন্দ্রীভূত না হইয়া মানব সাধারণের প্রতি বিস্তৃত হওয়াই আদর্শ। প্রেমিক শাক্যসিংহ গোপাকে যেমন ভাল বাসিতেন, দরিদ্র কৃষক রমণীকেও তেমনি প্রেমের চক্ষে দেখিতেন। এমন কি এড্উইন আর্নলডের কাব্যে লিখিত হইয়াছে যে, শাক্য সিংহ গৃহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "I loved thee most Because I loved so well all living souls"

"আমি ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত জীবকে এত ভাল বাসিয়াছি বলিয়াই তোমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিয়াছি।" এতদ্ভিন্ন কোন গ্রন্থকার বলেন যে, "জগতের সমস্ত জীবকে যে ভাল না বাসে তাহার ভালবাসা ভালবাসা নহে, তাহাই মোহ। বুদ্ধ-দেবের ভালবাসা প্রকৃত ভালবাসা, মোহ নহে। মোহ ব্যক্তি-বিশেষ কি বিষয়বিশেষের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে, ভালবাসা জগন্ময় ছড়াইয়া পড়ে।"

যিনি দুই প্রেম বাহু প্রসারণ করিয়া নরনারীকে আলিঙ্গন করেন। তাঁহার প্রেম কোনও এক স্থানে সীমাবদ্ধ থাকিতে

পারে না। প্রেমে সংকীর্ণতা নাই। যথার্থ ঈশ্বর প্রেমিক সাধু নিজের পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রদিগকে যেমন ভাল বাসেন, অন্যান্যকেও তেমনি প্রীতির চক্ষে দেখেন। তাঁহার পবিত্র প্রেমের চক্ষে ভিন্নতা ও পার্থক্যবোধ স্বার্থপরতা বলিয়া পরিগণিত হয়। অতএব রায় মহাশয়ের মতে "একমেবাদ্বিতীয়ং" সাধনের ন্যায় পত্নী কিম্বা পতিতে একমেবাদ্বিতীয়ং সাধন বিশ্বজনীন আদর্শ প্রেম সঙ্গত নহে।

কিন্তু শরীর সম্বন্ধে অন্যবিধ নিয়ম। বহুবিবাহ স্বভাববিরুদ্ধ কার্য্য। বহুজনের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেমে আত্মা পরিতুষ্ট হয়। কিন্তু বহুবিবাহ দ্বারা হৃদয় মনের অধোগতি হয়। কিন্তু একের অভাবে দ্বিতীয় বার বিবাহেতে উক্ত দোষ স্পর্শে না। তবে যাঁহারা মৃত পতি কিম্বা পত্নীর স্মৃতি-চিহ্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিবেন, তাঁহার নিকট বিবাহ প্রলোভন স্বরূপ।

রায় মহাশয় ৫ম প্যারাতে লিখিয়াছেন, এদেশের হিন্দুসমাজ তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতর অর্দ্ধাংশকে "সাচ্চা" রাখিবার জন্য বিধবার বিবাহ দেন নাই এবং "সহস্র সহস্র হিন্দু বিধবা এখনও আছেন, যাঁহারা ধ্যানেও এক ভিন্ন দ্বিতীয় পুরুষ জানেন নাই।" কোন্ সভ্যদেশে পতিপরায়ণা নারী নাই? হিন্দুসমাজ বলপূর্ব্বক বিধবাদিগকে অবিবাহিত রাখেন। এরূপে যাহাদের বাহ্য সতীত্ব রক্ষা হয়, প্রকৃত সতীত্ব তাহাদের অনেক দূরে অবস্থিত। কারাবাসিগণ কোনও দুষ্কার্য্যই করিতে পারে না। দুরন্ত কয়েদীগুলি প্রহরীর ভয়ে ও নির্যাতনে মেষের মত শান্ত থাকে, এজন্য কি কেহ তাহাদিগকে সাধু বলিবেন, এবং তাহাদের মৃদু স্বভাবের প্রশংসা করিবেন? নির্যাতনপ্রাপ্ত, কারাবাসিনী শত সহস্র সতী বিধবা অপেক্ষা একটি স্বাধীন সতী নারীর মূল্য অধিক নহে কি? সতীত্বের প্রসঙ্গ হইলে অনেকেই এতদ্দেশীয় সতীদিগকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে পৃথিবীর অপর দেশে কেহ সতী নারী নাই। সতীর পাদস্পর্শে সকল দেশের ভূমিই পবিত্রীকৃত হইয়াছে। তবে পার্থক্য এই যে, এদেশে জাতিভেদ, অবরোধ প্রথা, অস্বাভাবিক ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি সামাজিক শাসন দ্বারা বিধবাদিগকে যেরূপ সংযত রাখিতে চেষ্টা করা হইতেছে, অপর দেশে এরূপ চেষ্টা হয় না। কিন্তু সেখানে স্বাভাবিক সতীগণ সতীত্বের উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিয়া জগতকে আলোকিত করিতেছেন।

৬ষ্ঠ প্যারাতে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার স্থূলমর্ম্ম এই, হিন্দুজাতি যেমন অর্দ্ধাংশকে সাচ্চা রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজ তেমন অপর অর্দ্ধাংশকে (অর্থাৎ পুরুষদিগকে) সাচ্চা রাখিবেন। কিন্তু কথা এই যে, যে উপায়ে হিন্দুজাতি স্ত্রীজাতিকে 'সাচ্চ' রাখিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজ যদি সে উপায়ে পুরুষদিগকে "সাচ্চা" রাখিতে ইচ্ছা করেন, তবে সমাজ-শাসনের ভার কাহার প্রতি অর্পিত থাকিবে? রায় মহাশয় বাল্যবিধবা এবং বাল্য বিপত্নীকদিগকে এই নিয়ম হইতে বাদ দিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে "বাল্যবিধবা এবং বাল্য-বিপত্নীক" কিরূপ, তাহার টিকা করিলে ভাল হইত।

তৎপর তিনি সপ্তম প্যারাতে ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। লিখিয়াছেন যে, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করিলেও সে সকলের বর্ণনার মধ্যে তৎকালীন অপর ব্যবহারের এই ভাব দেখা যায়। "রামচন্দ্র একটি বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা উল্লেখ করিয়া এক পত্নী গ্রহণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। সাধারণতঃ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা এবং ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের চরিত্রই জনসমাজ কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়া থাকে। যে ভগবদ্গীতার ন্যায় মোক্ষতত্ত্ব পূর্ণ শাস্ত্র পৃথিবীতে আর নাই বলিয়া হিন্দুগণ এবং হিন্দুসমাজের হিতে পতিপ্রাণ ব্রাহ্মগণও বলিয়া থাকেন, সেই গীতা যাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে, তাঁহার ষোড়শ শত স্ত্রী ছিল। মহাভারতকার-ব্যাসের স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে ব্যবহার ও তাঁহার বংশলীলা সকলেই অবগত আছেন। হিন্দু শাস্ত্রের আদেশ এই যে, পুত্রোৎপাদনের জন্য বিবাহ করিতে হইবে। একটিতে হয় ত ভালই, নতুবা দুটি, না হয় তিনটি, এরূপে যত ইচ্ছা করিতে পার। বংশ রক্ষা না হইলে স্বর্গ লাভ হয় না।

রায় মহাশয় মুসলমান ও বৈষ্ণব সমাজের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তাঁহারাও এক বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ সম্বন্ধে রায় মহাশয়ের উক্তি ভিন্ন আর কোনও প্রমাণই পাওয়া যায় না। মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহম্মদ স্বয়ং সর্ব্বপ্রথমে খাদিজা নাম্নী এক বিধবার পাণিগ্রহণ করেন। তৎপর সন্তানবতী বিধবা ও কুমারী প্রভৃতি কয়েকটি বিবাহ করেন। মুসলমান সমাজের খলিফা ও ধার্ম্মিকা রমণীগণও একাধিক বিবাহ করিয়াছেন। এরূপ স্থলে কিরূপে বলা যাইতে পারে যে, মুসলমান ধর্ম্মসমাজ একাধিক বিবাহকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন।

তৎপর বৈষ্ণব সমাজের কথা। বিবাহের উচ্চ আদর্শের বিষয় বলিতে গিয়া বৈষ্ণব সমাজের কথা উল্লেখ না করিলেই ভাল হইত। চৈতন্যের সমসাময়িক বৈষ্ণবগণ এক প্রকার সন্ন্যাসী বৈষ্ণব ছিলেন। চৈতন্য স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করিতেন না; কিন্তু চৈতন্যের পরেই বৈষ্ণব সমাজে সেবাদাসী রাখার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে, বৈষ্ণব সমাজে যে এই কুপ্রথা প্রবেশ করিয়াছে, নিত্যানন্দের অসাবধানতাই ইহার মূল কারণ। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে চৈতন্যধর্ম্মের আদর্শকে ম্লান করেন।

উপসংহারে রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "অচঞ্চল চিত্তে এ নীতি পালন রক্ত মাংসের পক্ষে অতীব দুঃসাধ্য, কিন্তু ধর্ম্মোদ্দেশে, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুগণের কোন্টী বশীকরণটবা সুসাধ্য?" বাস্তবিক ধর্ম্মসাধন করিতে ইন্দ্রিয়-সংযম নিতান্তই আবশ্যক। ইন্দ্রিয় সমূহ সংযত না হইলে ধর্ম্মমন্দিরের দ্বারেও কেহ উপস্থিত হইতে পারিবেন না। কিন্তু বিবাহই যদি ইন্দ্রিয় সংযমের অন্তরায় হয়, তবে কাহারও বিবাহ করাই উচিত নয়। এরূপ হইলে প্রাচীনকালের সন্ন্যাস ধর্ম্মই ধর্ম্মসাধনার্থিগণের অবলম্বনীয়। রায় মহাশয় সর্ব্বশেষে লিখিয়াছেন—"নিতান্ত দুঃসাধ্য বলিয়া, সে আত্মসংযম কি ধর্ম্মজীবন গঠনপক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করি না? দ্বিতীয়বার বিবাহের সময়ই কি কেবল আত্মসংযমের কথা উপস্থিত করিতে হইবে, প্রথমবারের সময় কি সকলেই সিদ্ধ পুরুষ থাকেন? তখন কি আত্মসংযমের কথা বলিয়া বিবাহে বাধা দেওয়া উচিত নয়? রায় মহাশয়ের যুক্তি অনুসারে শুদ্ধ আত্মসংযমের অনুরোধে কাহারও বিবাহ করা উচিত নয়।

এখন আমার নিজের দু একটি কথা লিখিয়া পত্র শেষ করিব। বিবাহিত কি অবিবাহিত সকলের পক্ষেই ইন্দ্রিয় সংযম অত্যাবশ্যকীয়। বিবাহিত কি অবিবাহিত জীবনে পার্থক্য এই, একজনের অসংযমের ফল বাহিরে প্রকাশ পায়, অপরের অসংযমের ফল কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু হৃদয়ের অভ্যন্তর দেশ, পাপের বিষে জর্জ্জরিত হইয়া যায়। সেই অবস্থাতেও লোকে তাহাকে ব্রহ্মচারী বলিয়া থাকে।

ফল কথা এই, বিবাহে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, যাহাতে বিবাহিত জীবনেও ইন্দ্রিয় সংযম করিতে পারা যায়, সেরূপ আলোচনা, উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাই উপদেষ্টার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বিবাহের সহিত ঐন্দ্রিয়িক সম্বন্ধের যতই হ্রাস হইবে, ততই মানব-হৃদয়ে দেবত্ব সঞ্চারিত হইবে।

কলিকাতা। কালীচন্দ্র ঘোষাল।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

অনেকগুলি প্রেরিতপত্র অনেক দিন হইতে আমাদের হস্তে রহিয়াছে। স্থানাভাব বশতঃ সে সমুদায় মুদ্রিত হইতে পারে নাই। অথচ পত্রপ্রেরকগণ মনে করিতেছেন যে তাঁহাদের পত্র বুঝি ঘৃণা পূর্ব্বক উপেক্ষিত হইল। তবে এ কথাও বলা আবশ্যক যে সকল পত্রই যে সকল সময়ে প্রকাশের উপযুক্ত হয় তাহা নহে। আমরা বিগতবারে ও বর্ত্তমানবারে স্থান সমাবেশ করিয়া অনেকগুলি পত্র মুদ্রিত করিলাম। তথাপি অনেকগুলি অবশিষ্ট রহিল, তাহার সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে :—

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র সেন বরিশাল "আমরা কি চাই" নামে একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছেন। এ খানি বহুদিন আমাদের হস্তে পড়িয়া রহিয়াছে। পত্রখানিতে লেখক ব্রাহ্মসমাজের অনেকগুলি দোষের উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের ত্রুটীবিষয়ে তত্ত্বকৌমুদীতে স্বতঃপরতঃ এত উল্লেখ করা হইয়াছে যে ব্রাহ্মসমাজের ত্রুটীর কথা শুনিতে শুনিতে ইহার পাঠকগণ ক্লান্ত, আর ভাল লাগে না। এক জন যদি বসিয়া বসিয়া ক্রমাগত বলিতে থাকে, "আমি অধম" "আমি অধম" "আমি অধম" শেষে লোকে বিরক্ত হইয়া বলে—আরে বাপু! অধম হোস্ অধম আছিস্, এত বলে আর কি হবে।" তত্ত্বকৌমুদীর পাঠকদিগের যেন সেই দশা ঘটিয়াছে। তাঁহারা বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন,—"আরে বাপু! ব্রাহ্মসমাজের ত্রুটীর কথা আর শুনিতে ভাল লাগে না।" সুতরাং সেন মহাশয়ের পত্র মুদ্রিত করিতে পারা যায় নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু গগনচন্দ্র হোম—ইনি এক সুদীর্ঘ পত্রে এই দুঃখ করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মসমাজের যুবক দলের প্রতি প্রবীণদিগের স্নেহ নাই। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মকে দেখে না; ব্রাহ্ম ব্রাহ্মকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক নহে ইত্যাদি। ব্রাহ্মদিগের হৃদয়বিহীনতা দেখিয়া গগন বাবু এত বিরক্ত হইয়াছেন যে, তাঁহার ভাষা অতি তীব্র হইয়াছে। ভাষার এই তীব্রতার জন্য এবং পূর্ব্বোক্ত কারণে এ পত্রখানিও মুদ্রিত করিতে পারা গেল না।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ সরকার—বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠের তত্ত্বকৌমুদীতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে 'আত্ম-পরীক্ষা' নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদ করিয়া পত্রখানি লিখিত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে একখানি সুদীর্ঘ পত্র অগ্রে প্রকাশিত হওয়াতে এখানি প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হয় নাই। ইহাতে নূতন কথা এই বলা হইয়াছে যে তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদক এক সময়ে সাধারণতন্ত্র প্রণালীর এত গুণ কীর্ত্তন করিয়া এক্ষণে তাহার অপবাদ করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে লোকে বলিতেছে, তাঁহার মনে গুরুগিরির ভাব আসিয়াছে। এ সম্বন্ধে বক্তব্য, সম্পাদক এখনও সাধারণতন্ত্র-প্রণালীর গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহার বিশ্বাস মানব-সমাজকে শাসন করিবার জন্য অদ্যাবধি যত প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সাধারণতন্ত্রপ্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি ইহাকে একটা উপাস্য দেবতা মনে করেন না। শাসনপ্রণালী অপেক্ষা ধর্ম্মজীবনের দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক মনে করেন।

জনৈক বন্ধু (ঢাকা)—পত্রখানি অতিশয় দীর্ঘ। পত্রপ্রেরকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্রের দীর্ঘতার দিকে দৃষ্টি রাখিবেন।

ব্রাহ্মসমাজ।

সৈয়দপুর হইতে একজন ব্রাহ্মবন্ধু লিখিয়াছেন।

"গত ১২ই ভাদ্র সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের নূতন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য্যোপলক্ষে উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বসু মহাশয় সময়োপযোগী প্রার্থনা করিয়া উৎসবের উদ্বোধন করেন। বৈকালে নগর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সমাজে প্রত্যাগমনান্তর শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস প্রচারক মহাশয় মন্দিরের প্রতিষ্ঠা পত্র পাঠ করেন। সম্পাদক সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত রাজা গোবিন্দলাল রায় বাহাদুর ও অন্যান্য মহোদয়গণ যাঁহারা এই সমাজ নির্ম্মাণ জন্য সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করেন। বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু বঙ্কবিহারী বসু, বাবু হরনাথ দাস, বাবু গিরিশচন্দ্র কাঞ্জিলাল এবং অন্যান্য বন্ধুগণ উপস্থিত হইয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রচারক মহাশয় উপাসনা করেন এবং হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনা ও উপদেশ প্রদান করতঃ উৎসবের কার্য্য শেষ করেন।

প্রচার—শান্তিনিকেতনে অবস্থিতিকালে শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব এবং শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বসু একদিন বোলপুরে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন হয়। অন্য একদিন বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল "নিত্যানন্দের প্রেম প্রচার" সম্বন্ধে কথকতা করেন, উভয় দিনই স্থানীয় অনেকে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

বিবাহ—গত ১১ই ভাদ্র শনিবার দিনাজপুর নগরে একটী অসবর্ণ বিধবা-বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র ময়মনসিংহ নিবাসী শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী দাস। পাত্রী দিনাজপুর বালিকাবিদ্যালয়ের পণ্ডিত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসের ভগিনী শ্রীমতী জ্ঞানদাসুন্দরী। এই বিবাহ ১৮৭২ সালের ৩ আইনানুসারে রেজিষ্টারি করা হইয়াছে। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং বাবু ভুবনমোহন কর মহাশয় বর কন্যাকে সময়োপযোগী উপদেশ দেন। বিবাহ সভায় স্থানীয় অনেকে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্ক বাবু এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিম্নলিখিত রূপ দান করিয়াছেন। সাঃ ব্রাঃ সমাজ ৫৲, জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজ ১৲, দিনাজপুর ব্রাহ্মসমাজ ২৲, রংপুর ব্রাহ্মসমাজ ২৲, ব্রাহ্মসাধনাশ্রম ১৲, দাসাশ্রম ১৲, অনাথাশ্রম ১৲, ব্রাহ্ম-ছাত্রীনিবাস ১৲, খাসিয়া মিশন ১৲, গরিবদিগের ক্ষুদ্র ভগিনী সম্প্রদায় ১৲; মোট ১৬৲।

শ্রাদ্ধ—টাঙ্গাইল উপবিভাগের করটীয়া ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু হরনাথ ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে গত ৮ই ভাদ্র বিশেষ উপাসনাদি হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। হরনাথ বাবু প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর তাঁহার কন্যাকে শান্তিতে রাখুন এবং পৃথিবীতে তাঁহার স্বামী ও সন্তানদিগকে সান্ত্বনা দান করুন। ইঁহার জীবনে বেশ ধর্ম্ম ভাব ছিল। তিনি যে ৩টী পুত্র ও একটী কন্যাকে পৃথিবীতে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহারা মায়ের এই ধর্ম্ম ভাবের অধিকারী হউক। হরনাথ বাবু আপনার সহধর্ম্মিণীর আত্মার তৃপ্তির জন্য তাঁহার নামে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে ১০০৲ টাকা স্থায়ীফণ্ডে দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন এবং এখন সাঃ ব্রাঃ সমাজে ৩৲ দাতব্য বিভাগে ২৲ এবং সাধন-আশ্রমে ৫৲ টাকা দানকরিয়াছেন।

বিগত ১৩ই ভাদ্র সোমবার পরলোকগত নবীন চন্দ্র রায় মহাশয়ের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রাতে ব্রাহ্মসাধনাশ্রমে তাঁহার পরিবারস্থ আত্মীয় স্বজন বিশেষ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম-মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৬ই ভাদ্র মুদ্রিত ও ১৭ই ভাদ্র প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১১শ সংখ্যা।
১৬শ ভাগ।

১লা আশ্বিন, শনিবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

এ ঘোর শৃঙ্খল।

কে বাঁধিল চিতে মোর এ ঘোর শৃঙ্খলে ?
কত ভাবি এবার উঠিব,
এবার শাসিয়া মনে প্রতিজ্ঞার বলে ;
নব ভাবে জীবন গড়িব !

সুদৃঢ় সংকল্প কত বাঁধি দৃঢ় করি,
কত যুক্তি, কতই মন্ত্রণা ;
হায়রে জীবন-নীর ধীরে আয় সরি,
একে একে মিলায় কল্পনা।

চেয়ে দেখি পড়ে আছি সেই পুরাতনে,
সে ম্লানতা, সেই সে জড়তা,
সেই অধোদিকে নীর বহিছে সঘনে,
সেই—সেই—সেই দুর্ব্বলতা।

কে বাঁধিল চিতে মোর এঘোর শৃঙ্খলে ?
কে রচিল এ বিষম জাল ?
কেন মনোরথ-শত যায়গো বিফলে ?
ওঠা পড়া রবে কতকাল ?

কৃপা-হস্ত দেও প্রভু, দাঁড়াই সাহসে,
চুহকারি ছিঁড়িয়া শৃঙ্খল ;
ডুবাই তাপিত চিত তব প্রেম-রসে,
তব বলে হই হে সবল।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সার—একজন ব্রাহ্ম একদিন অপর একজন ব্রাহ্মকে বলিতেছেন—"দেখ কোনও লোক যদি স্রোতের জলে নামিয়া সেই জলে মাথা ডুবাইয়া পাদুখানি মাটী হইতে তোলে, তাহা হইলে তাহার কি দশা হয় ? উত্তর—"সে স্রোতের বেগে নীত হয়।" প্রশ্ন—"কিন্তু যে ব্যক্তি কঠিন মৃত্তিকাতে শক্ত করিয়া পা দুখানি রাখিয়া মাথা ডুবায়, তাহাকে কি স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে ?" উত্তর—"না, তাহাকে স্বস্থানচ্যুত করিতে পারে না।" তখন প্রথম ব্যক্তি বলিলেন—"ইহা স্মরণ রাখিও, তোমরা যে নানাপ্রকার চিন্তা ও ধর্ম্মভাবের স্রোতে নামিবে, যদি নিজেদের পায়ের জমি ঠিক না রাখ স্রোতে ভাসিয়া যাইবে। অপর ধর্ম্মের প্রতি প্রেম বল, সদ্ভাব বল, উদারতা বল, সব নিজের জমি ঠিক রাখিয়া।" দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন—"সে জমি কি ? উত্তর—"একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত দেখা এবং তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়া তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হওয়া। আমরা কি পৌত্তলিককে বলিতে পারি, আমি যাহা ধরিয়াছি তাহা আমার পক্ষে সত্য, তুমি যাহা ধরিয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে সত্য। ঐ পুতুল পূজিয়াই তোমার মুক্তি। ইহা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। মুক্তি আবার কি ? তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে আত্মাতে পাওয়ার নামই মুক্তি। তাহা পুতুল পূজিয়া কিরূপে হইবে ? যাহাই কর, যতই ঘুরিয়া বেড়াও, যতই ছুটাছুটি কর, যতই ইহার বাড়ী, তাহার বাড়ী অন্ন চাখিয়া বেড়াও না কেন, ইহা ভিন্ন মুক্তি নাই। ঋষিরা বলিয়াছেন—"তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং" তাঁহাকে যাঁহারা আত্মস্থ করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহাদেরই মুক্তি, মুক্তি অন্যের জন্য নহে। পা রাখিবার এই জমিটুকু হারাইলে চলিবে না। ঈশ্বর আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত এই যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের একটা সার কথা, তেমনি তাঁহাকে জীবনে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতে হইবে, ইহাও দ্বিতীয় সারকথা। ঈশ্বরের উপাসক কি পরিমিত দেবতার নিকটে মস্তক অবনত করিতে পারেন? তাহা হইলে কি ঈশ্বরকে সর্ব্বোচ্চ স্থান হইতে অপসৃত করা হয়না ? একজন বিদেশবাসী লোকের বিষয়ে এরূপ শুনা গিয়াছে যে, সেব্যক্তি বয়স্তদিগের ভয়ে স্বদেশাগত স্বীয় বৃদ্ধ পিতাকে গৃহের প্রাচীন ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। ইহা যেরূপ ব্যবহার, যিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন ও তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে লোকভয়ে পৌত্তলিকতাচরণ করাও সেইরূপ ব্যবহার। সে পৌত্তলিকতা যাহা এই কথা বলে "আমি যে ঈশ্বর ঈশ্বর করি আপনারা শুনিয়াছেন, সেটা কিছু নহে সেটা বাক্যের খেলা মাত্র, আপনারা যেরূপ আদেশ করিতেছেন তাহাই করিব।" এরূপ আচরণ কি ঈশ্বর সম্বন্ধে অপরাধ ও পাপ নহে ? সে উদারতা, উদারতা

নহে তাহা মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ, যাহাতে সত্যস্বরূপের উপাসনা ও পৌত্তলিকতাচরণের মধ্যে প্রভেদ দেখে না।

ধর্ম্মের আসল ও নকল—ঢাকা সহরে একবার কয়েকজন ভদ্রলোক একটী রঙ্গভূমি করিয়া অভিনয় করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহাদের নাট্যোল্লিখিত পুরুষদিগের মধ্যে মহাপুরুষ মহম্মদ একজন ছিলেন। অভিনয়ের দিন বহুসংখ্যক মুসলমান সভাস্থলে উপস্থিত। অভিনয় চলিতেছে, অবশেষে একজন মহম্মদ সাজিয়া রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন। যেই এই বাক্য উচ্চারণ "হজরত মহম্মদ এলেন"—অমনি সিংহগর্জ্জনে হুঙ্কার দিয়া মুসলমানগণ মার মার করিয়া উঠিল। "কি এত বড় আস্পর্দ্ধা ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষের আবার নকল।" তুমুল দাঙ্গা উপস্থিত হইল, মুসলমানদিগকে শান্ত করাই দুষ্কর। অভিনেতাগণ তৎক্ষণাৎ অভিনয় বন্ধ করিয়া দিলেন; করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা ও অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, তবে তাহারা শান্ত হইল। প্রশ্ন করি, মুসলমানগণ এত উত্তেজিত হইল কেন? ইহা কি স্বাভাবিক নয়? যে জিনিষটাকে প্রাণ দিয়া সত্য মনে কর, যাহার স্মরণে চিত্তকে উদ্দীপ্ত করে, তোমার মন প্রাণ অগ্নিময় হয়, তোমার আপাদ মস্তক নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাতে পূর্ণ হয়, তুমি কি তাহার নকল দেখিতে পার? রঙ্গভূমিতে বারাঙ্গনাদিগের মধ্যে একজন যদি আচার্য্য সাজিয়া আসে, ও যদি ব্রাহ্মদিগের উপাসনার নকল করে, তাহা হইলে কোন ব্রাহ্ম আছেন, যাঁহার হৃদয়ে ব্যথা লাগে না? তখন ব্রাহ্মগণ কি গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করিয়া সেরূপ অভিনয় বন্ধ করিয়া দেন না? অথবা মনে কর, কোনও রঙ্গভূমিতে যদি ঈশ্বর সাজিয়া কেহ আসে ও বলে,—"এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর আসিলেন,' তাহা হইলে সেই রঙ্গভূমির অধিকাংশ লোক বিরক্ত হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করে কি না? গোঁড়া মুসলমানদিগের ন্যায় প্রহার করিতে উদ্যত না হও, পলায়ন কর কি না? তবে দেখ প্রাণের সহিত যাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেছ তাহার নকল প্রাণে সহ্য হয় না। কোন প্রেমিক বা প্রেমিকা এরূপ আছেন, যিনি আপনার প্রেমের নকল বসিয়া দেখিতে পারেন?

ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মের পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতা যাঁহারা একবার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহারা কি ধর্ম্মের নামে বীভৎস আচরণকে বসিয়া দেখিতে পারেন, অথবা তাহার প্রশ্রয় দিতে পারেন? আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের আস্বাদন যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারা কি একজন তান্ত্রিকের কদাচার দেখিয়া প্রীতিলাভ করিতে পারেন? বরং ইহাই কি স্বাভাবিক নয়, যে ধর্ম্মের ঐরূপ অপব্যবহার দেখিলে তাঁহাদের চিত্ত শোকে দুঃখে ম্লান হইয়া পড়ে? আমরা ইতিবৃত্তে যে সকল ধর্ম্মসংস্কারকদের বিবরণ পাঠ করি, যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য লোকের হস্তে নির্পীড়িত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই হৃদয় ধর্ম্মের ম্লানতা দেখিয়া শোকে নিমগ্ন হইয়াছিল। মহাত্মা যীশুর অপর একটী নাম ছিল "man of sorrows" শোকার্ত্ত মনুষ্য। অর্থাৎ তাঁহার মুখ চিরবিষাদে ম্লান থাকিত। বাইবেল গ্রন্থে তাঁহার যে জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে, তাহাতে একস্থানে তাঁহার অশ্রুপাতের কথা দেখা যায়, কিন্তু তিনি যে কখনও হাস্য করিয়াছিলেন তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এইরূপ আরও অনেক সাধুজনকে সর্ব্বদা দুঃখিত দেখা গিয়াছে। এ দুঃখ কি তাঁহাদের নিজের পাপের জন্য না জগতের পাপ তাপের জন্য? জগতে ধর্ম্মের দুর্গতি দেখিয়াই তাঁহারা সর্ব্বদা দুঃখিত থাকিতেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে এদেশীয় ধর্ম্মের দুরবস্থা দেখিয়া তিনি দুঃখিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাহার সংস্কারে প্রাণ মন সমর্পণ করিবেন। ধর্ম্মের বিকৃত ভাব দেখিয়া সাধুদিগের চিত্তে এতই দুঃখ হয়। তখন যে ব্যক্তি একবার ধর্ম্মের পবিত্রতায় ও আধ্যাত্মিকতার আস্বাদন পাইয়াছেন, তিনি কিরূপে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের আচরণ দেখিয়া আনন্দিত হইতে পারেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

বল্মীক মিব পুত্তিকাঃ—প্রাচীন শাস্ত্রে উপদেশ আছে:—

"ধর্ম্মংশনৈঃ সঞ্চিনুয়াৎ বল্মীকমিব পুত্তিকঃ"।

অর্থ—পুত্তিকারা যে প্রকার ধীরে ধীরে বল্মীক নির্ম্মাণ করে সেই রূপ ধর্ম্মকে শনৈঃ শনৈঃ সঞ্চয় করিবে। ধর্ম্ম শব্দে এখানে চরিত্রকে মনে করিতে হইবে। পুত্তিকাদিগের বল্মীক নির্ম্মাণের ন্যায় চরিত্র-সংগঠন [illegible] কাল ও সহিষ্ণুতা সাপেক্ষ। মানব চরিত্র অতি ধী[illegible] হইয়া থাকে। হৃদয় পরিবর্ত্তন এক দিনে ঘটিতে [illegible]নের একটী উক্তিতে একজন পাপাসক্ত ব্যক্তির মুখ পাপের দিক হইতে পুণ্যের দিকে ফিরিতে পারে। কিন্তু সেই পরিবর্ত্তিত হৃদয়কে চিরদিন পুণ্যের পথে প্রতিষ্ঠিত রাখা, সমুদায় প্রাচীন অভ্যাসকে পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রত্যেক চিন্তা ও কার্য্যকে পরিশুদ্ধ করিয়া তোলা, তাহা পুত্তিকাদিগের বল্মীক নির্ম্মাণের ন্যায় শ্রম ও অধ্যবসায় সাপেক্ষ। দিনের পর দিন যাইতেছে কিছু কিছু জ্ঞান সঞ্চিত হইতেছে, হৃদয় মনের শক্তি বিকাশ হইতেছে, হস্তদ্বয় একটীর পর আর একটী সৎকার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে, হৃদয়ের সাধুভাব বর্দ্ধিত হইতেছে, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর বর্দ্ধিত হইতেছে। মানব চরিত্র এইরূপে গঠিত হয়। কেবল তাহা নহে। পুত্তিকারা যখন বল্মীক নির্ম্মাণ করে বা গৃহ নির্ম্মাতা যখন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে, তখন দেখিতে পাই যে, নির্ম্মাণোপযোগী স্থান একবার স্থিরীকৃত হইলে, এবং নির্ম্মাণোপযোগী সামগ্রী একবার সংগৃহীত হইলে, তাহাদের কার্য্য অবাধে চলিতে থাকে। কোনও আকস্মিক দৈব দুর্ব্বিপাক উপস্থিত না হইলে, তাহদের কার্য্যের ত্রুটী ঘটেনা। কিন্তু চরিত্র-গঠনরূপ কার্য্যে প্রতি পদেই সংগ্রাম; তাহার প্রত্যেক উপকরণ গুরুতর সংগ্রামের পর লাভ করিতে হয়; দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম, রোগ শোকাদির সহিত সংগ্রাম, প্রতিকূল ঘটনা সকলের সহিত সংগ্রাম, চতুর্দ্দিকের লোকের জড়তা ও বিরুদ্ধভাবের সহিত সংগ্রাম, এইরূপ সংগ্রাম নিরন্তর চলিতে থাকে। ইহার উপরে আবার প্রাচীন অভ্যাস [illegible]ভাবে নবীনকে নিরন্তর বাধা দিতে থকে। সুতরাং চরিত্র গঠন কার্য্যে

যাঁহারা ব্রতী হন তাঁহাদিগকে পুত্তলিকাদিগের অপেক্ষাও ধৈর্য্য-শীল হইতে হয়। ইহা দেখিয়াই উপনিষদকার মহর্ষি বলিয়াছেন "নায়মাত্মা বলহীনে ন লভ্যঃ;" এই পরমাত্মা বলহীন ব্যক্তির লভ্য নহেন। চরিত্র গঠন দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তির কর্ম্ম নহে। আত্ম-শাসন ও আত্ম-সংযমের দ্বারাই সুধীগণ এই মহৎ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন।

বহির্ম্মুখীন সাধন—মনোহর স্বর সংযোগে সংগীত কীর্ত্তন এবং সুললিত ভাষায় ধর্ম্মব্যাখ্যা উপাসনাদি হইতেছে, ভাবোচ্ছ্বাসে সকলের হৃদয়ই বিগলিত, এই অবস্থার ভিতর আসিয়া অনেক কঠিন প্রাণও বিগলিত হয়; শুষ্ক হৃদয়ে প্রেমের ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু যেই সেই মনোমুগ্ধকারী সংগীত ও বীণাধ্বনি নীরব হইল, উপাসন[illegible] স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন, তখন প্রাণ পূর্ব্ববৎ শুষ্ক [illegible] দগ্ধ হইতে লাগিল। এতদ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় যে, সংগীত ও বক্তৃতার মনোমুগ্ধকারী শক্তিতেই কিয়ৎকালের জন্য [illegible] উচ্ছ্বাস হইয়া থাকে। বিবিধ সুললিত বাদ্যরাগিণী-যুক্ত সংগীত ও উদ্দীপনা পূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিলে, সকলের প্রাণেই আনন্দের সঞ্চার হয়। আবার সেই সংগীত ও বক্তৃতা যদি ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় হয়, তবে ধর্ম্মপথের যাত্রীগণ যে তাহাতে যোগদান করিয়া সরসতা লাভ করিবেন, তাহার সন্দেহ কি আছে? কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, এইরূপ সময় সময় দশজনের সহিত মিলিত হইয়া, সংগীত ও সংকীর্ত্তনের দ্বারা প্রাণে যে ভাব সঞ্চারিত হয়, তাহা অতি অস্থায়ী। এরূপ উপায়ে পরমেশ্বরের সহিত আত্মার সাক্ষাৎ যোগ স্থাপিত হয় না। এমন কি সময় সময় কীর্ত্তন ও বক্তৃতার দ্বারা অপকারও হইয়া থাকে। প্রাণ এমনি বহির্ম্মুখী হইয়া পড়ে যে, তাহাকে গৃহে লইয়া যাওয়া কঠিন হয়।

পরমেশ্বরের সহিত মানবাত্মার যোগই উপাসনা। শান্ত সমাহিত না হইলে আত্মোপলব্ধি হয় না, আত্মোপলব্ধি না হইলে আত্মা ও পরমাত্মার যোগ অনুভূত হইতে পারে না। মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনিতে সাধকের প্রাণ নৃত্য করিয়া উঠিল, বাহিরেও নৃত্য আরম্ভ হইল; আমি কে, পরমেশ্বরের স্বরূপ কি, জগত কি বস্তু এ সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া কিয়ৎপরিমাণে শারীরিক উত্তেজনা এবং কিয়ৎপরিমাণে সঙ্গগুণে মন উত্তেজিত হইল। তখন প্রাণের ভিতর দৃষ্টি করিলে, তিনি দেখিতে পাইবেন, যাঁহাকে পাইবার জন্য কীর্ত্তন, নৃত্য, অশ্রুজলপাত হইতেছে, সেই চিন্ময় দেবতা প্রাণের মধ্যে নাই, প্রাণ শূন্য শ্মশানবৎ। তখন সাধক বুঝিতে পারেন, নৃত্য কীর্ত্তন সকলই বিফল। যাঁহার জন্য এত আয়োজন, কার্য্য কালে যদি তাঁহাকে ভুলিয়া যাই, তবে ওপথে না যাওয়াই ভাল।

বাস্তবিক সমবেত উপাসনা, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, শ্রবণ, এক অবস্থাতে সাধনের সহায়, অপর দিকে আত্ম দৃষ্টি বিহীনের পক্ষে এই সকল উপায় আত্মাকে ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত করিয়া দিয়া সাধকের প্রাণকে শূন্য করিয়া ফেলে। এ সকল উপায় দীর্ঘকালের অবলম্বনীয় না হইলেও সময় সময় উপকারক, ইহাতে সাধকের ঈশ্বর লাভের ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া দেয়। কিন্তু তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে প্রাণের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে হইবে! নির্জ্জনে আত্মচিন্তা, পাঠ, ধ্যান ইত্যাদি দ্বারা প্রাণ যেমন অন্তর্ম্মুখীন হইবে, কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া কোলাহলে প্রমত্ত হইয়া তেমন ফললাভ করিতে কেহ সমর্থ হইবেন না।

বর্ত্তমান সময়ে উচ্চ কীর্ত্তন, নৃত্য, অশ্রুপাত ইত্যাদি সরস উপাসনার লক্ষণ বলিয়া অনেক স্থলে বর্ণিত হইয়া থাকে। কিন্তু পরীক্ষার সময় দেখা গিয়াছে, যাঁহারা জীবনে কেবল ঐরূপ সরস উপাসনা ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সামান্য সামান্য প্রলোভনের হস্তে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ নহেন। অতএব বাহিরের আয়োজনের দিকে মনোযোগ প্রদান না করিয়া অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। অন্তরে প্রবিষ্ট না হইলে চিন্ময় পরমাত্মার সহিত ঘনিষ্ট যোগ অসম্ভব।

স্বার্থনাশেই ধর্ম্মের শক্তি—দান প্রেমের অনুরূপ। যাঁহার প্রতি যতটুকু প্রেম, তাঁহাকে ততটুকু দান করা যায়। ভৃত্যকে একখানা সামান্য বস্ত্র দিয়াই প্রচুর দেওয়া হইল মনে করা যায়; স্বদেশের উপকারের জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিয়াই পরিতুষ্ট হওয়া যায়।

ধর্ম্মরাজ্য সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম। যাঁহার প্রেম যতটুকু, তাঁহার দান ততটুকু। ঈশ্বর ও ধর্ম্মের প্রতি যাঁহাদের হৃদয়ের প্রেম নাই তাঁহারা আমোদ প্রমোদে ধন ও শক্তি ক্ষয় করেন কিন্তু ধর্ম্মোদ্দেশে কিছুমাত্র স্বার্থ হানি করিতে প্রস্তুত নহেন। আবার অন্য অন্য ব্যক্তি ধর্ম্মসমাজকে একটুকু ভালচক্ষে দেখেন—এবং অন্যের উপকারার্থ অনুগ্রহ স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ দানও করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি যথার্থ ঈশ্বর-বিশ্বাসী, যাঁহার হৃদয়ের সমগ্র প্রীতি ঈশ্বরের প্রতি অর্পিত হইয়াছে, তাঁহার ভাব অন্যরূপ। ধর্ম্মের জন্য অর্থ দান করাত তুচ্ছ—ইহাত তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সূচনাতেই হয়। যে দিন ঈশ্বর করুণার বায়ু তাঁহার প্রাণে লাগিয়াছে, সেই দিন দরিদ্রতাকে জীবনের ভূষণ করিয়াছেন। ধন, জন, জীবন যৌবন যথাসর্ব্বস্ব প্রভুর চরণে দিয়াই তৃপ্ত। উপদেশে, বল প্রয়োগে কখনও দান হয় না—যাহার প্রাণ যায়, সে পৃথিবীর নিষেধ না মানিয়া পতঙ্গের ন্যায় আপনার জীবন যৌবন ধন জন সকল প্রভুর প্রেমানলে আহুতি দিতে পারে। ইহা কি স্বপ্ন—বুদ্ধ, চৈতন্য, যীশু কি ইহার সাক্ষী নহেন। কত বিশ্বাসী, সাধুর জীবনে এই আত্মোৎসর্গের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বাসী জীবনের কথা পুণ্যকথা। আজ একটী বিশ্বাসী জীবনের কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

সম্রাট থিওডিয়াসের সময়, এণ্টনিকাস্ নামক একজন রাজ-বংশীয় সম্ভ্রান্ত পুরুষ রোমনগরে বাস করিতেন। তিনি ধনগৌরবে রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি ইউফ্রিসিয়া নাম্নী একটী উচ্চ বংশীয়া মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। এই দম্পতি অতি ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। অল্পদিন পরে ইহাদের একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তাহার ও নাম

ইউফ্রিসিয়া রাখা হয়। তৎপর ইঁহারা উভয়ের জীবন ধর্ম্মের পরিচর্য্যায় সমর্পণ করিবেন বলিয়া সংকল্প করিলেন। এক বৎসরের মধ্যে এণ্টনিয়াসের মৃত্যু হয়। ইউফ্রিসিয়ার বয়স তখন অধিক হয় নাই। রূপে গুণে, কুলে ও ঐশ্বর্য্যে তিনি রোমে শ্রেষ্ঠ স্থানীয়া ছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ তাঁহার পুনর্ব্বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল। তিনি রোম পরিত্যাগ করিয়া মিসর দেশে চলিয়া গেলেন। তাঁহার অল্প বয়স্কা কন্যা সঙ্গে ছিল। মিসর দেশে তাঁহার বিস্তৃত জমিদারী ছিল। তাঁহারা কোন ধর্ম্মাশ্রমের নিকট যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেই ধর্ম্মাশ্রমে তিনি আপন কন্যাকে লইয়া সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। কিয়ৎকাল পরে ইউফ্রিসিয়া সেই আশ্রমের তত্ত্বাবধায়িকাকে আপনার সমুদায় সম্পত্তি দানের প্রস্তাব করিলেন। তত্ত্বাবধায়িকা বলিলেন "আমরা এই পৃথিবীর ধন দিয়া কি করিব, আমরা স্বর্গের ধন ভিক্ষা করি।" ইউফ্রিসিয়া ধনের সংব্যবহার করিতে না পারিয়া বড় দুঃখিত হইলেন। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর সেই তত্ত্বাবধায়িকা বলিলেন—"উপাসনা গৃহের আলোর জন্য কিঞ্চিৎ দান করিতে পার।" ইহা শুনিয়া তিনি কৃতার্থ হইলেন।

একদিন ধর্ম্মাশ্রম হইতে ফিরিয়া আসিয়া কন্যা মাতাকে বলিল—"মা, আমার জীবন ধর্ম্মের পরিচর্য্যায়, ঈশ্বর সেবায় অর্পণ করিব—আর বিবাহ করিব না।" মাতা একমাত্র কন্যার এই কথা শুনিয়া দুঃখিত না হইয়া আনন্দে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্ধের যষ্টি একমাত্র কন্যাকে ধর্ম্মাশ্রমে তত্ত্বাবধায়িকার হস্তে অর্পণ করিয়া এই বলিয়া শেষ উপদেশ দিলেন—"ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চলিও, আশ্রমবাসীদের বাধ্য থাকিও—আর তুমি যে রাজবংশ হইতে উৎপন্ন, এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী তাহা কখনও মনে রাখিও না।" অল্পদিন পরে জননীর মৃত্যু হইলে রোমের সম্রাট বালিকার অভিভাবক হইলেন; সম্রাট কুমারীকে লইয়া যাইবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন এবং একজন উচ্চবংশীয় পুরুষের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ স্থির করিলেন। রাজা বার বার অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, "তুমি আসিয়া পৈত্রিক অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী হও ও বিবাহ করিয়া সুখী হও। ইউফ্রিসিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন, "সকল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান করুন। আমি ঈশ্বরের কার্য্যে জীবন অর্পণ করিয়াছি—আমি আর বিবাহ করিব না। আপনি ও রাণী উভয়ে আমার জন্য প্রার্থনা করিবেন—যেন আমি প্রভুর উপযুক্ত দাসী হইতে পারি।" এই পত্র পাইয়া রাজা ও সভাস্থ সকল লোক অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন ও পত্রানুযায়ী কার্য্য করিলেন।

ইউফ্রিসিয়া প্রভুর চরণে কি দিয়াছিলেন? প্রথম ধন দানের জন্য আকাঙ্ক্ষা। ধন তুচ্ছ—কেহ তাঁহার ধনকে গ্রহণ করিল না। দ্বিতীয় দান আত্মজীবন সমর্পণ। তাঁহার আর কি প্রিয় ছিল? একমাত্র কন্যা—তাঁহাকেও আনন্দের সহিত ঈশ্বরের সেবায় দিয়াছিলেন। মহাত্মা যীশু মানব-হৃদয়ে এই স্বার্থনাশের ভাব উদ্দীপ্ত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই জগতে জয়যুক্ত হইয়াছেন।

ব্রাহ্ম বালক বালিকা—আমরা ব্রাহ্ম বালকদিগের নীতি সম্বন্ধে গতবারে কিছু বলিয়াছিলাম। দেখিয়া সুখী হইয়াছি যে, সে দিকে ব্রাহ্মবন্ধুদিগের কাহারও কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা অনুভব করিতেছেন যে, এ বিষয়ে ত্বরায় একটা উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। সুখের বিষয়, কয়েক বৎসর হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কয়েক বৎসর হইতে ব্রাহ্ম বালিকাদিগের শিক্ষার্থে একটী বিদ্যালয় ও একটী বোর্ডিং স্থাপন করিয়া চালাইয়া আসিতেছেন। এবং বিগত বর্ষের প্রারম্ভ হইতে উক্ত সমাজের কতিপয় সভ্যের প্রযত্নে ব্রাহ্ম বালকদিগের জন্য একটী বোর্ডিং স্থাপিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। এক প্রকার বলিতে গেলে কার্য্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মবন্ধুগণ মনে করিলে এইগুলির বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারেন। আপাততঃ একটী কারণে উক্ত বিদ্যালয় ও বোর্ডিংগুলির দ্বারা সর্ব্বশ্রেণীর ব্রাহ্মগণের সমান উপকার হইতেছে না। বালিকা বোর্ডিংএ মাসিক ৯৷৷০ টাকা ও বালক বোর্ডিংএ ১২৲ টাকা ফী ধার্য্য করা হইয়াছে। ইহাতেও ব্যয় সংকুলান হইতেছে না। সহরে বোর্ডিংগুলি রাখিয়া ইহা অপেক্ষা কম ফী লইয়া কোন মতেই কার্য্য চালাইবার উপায় নাই। অথচ প্রত্যেক কন্যার জন্য সর্ব্বশুদ্ধ মাসিক ১৪।১৫ টাকা ব্যয় করিতে পারেন, বা প্রত্যেক বালকের জন্য মাসিক ১৮।১৯ টাকা দিতে পারেন এরূপ ব্রাহ্মগৃহস্থেরই বা সংখ্যা কত। ব্রাহ্মদিগের অধিকাংশই দরিদ্র; সামান্যরূপ আয়ের দ্বারা কোনও প্রকারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। অথচ প্রতি ব্রাহ্মগৃহেই পুত্র কন্যার সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহাদের জ্ঞানশিক্ষার, সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার, সদুপায় বিধান করা সমাজের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই জন্যই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করা। মানুষ একা একা সকল কাজ করিয়া উঠিতে পারে না, একাএকা সকলদিকে মনোযোগী হইতে পারে না এই জন্যই সমাজ। যাহা তোমার আমার পক্ষে করা কষ্টসাধ্য তাহা দশজনের সমবেত শক্তির দ্বারা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এই জন্য বিদ্যালয়াদি স্থাপন। ঈশ্বরকৃপায় যাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, তাঁহাদের এরূপ কার্য্যে সহায়তা করা অতীব কর্ত্তব্য। কৃতজ্ঞতার সহিত আমরা স্বীকার করিতেছি যে, ব্রাহ্মবন্ধুদিগের অনেকে সহায়তা করাতেই কার্য্যগুলি এখনও চলিয়াছে। কিন্তু তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে আমাদের সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নয়। যাহাতে এই সকল উপায়ে আমাদের ভাবী বংশীয়দিগের শিক্ষার বাস্তবিক উন্নতি হয়, এবং যাহাতে তাহাদের মনে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, সে বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কেহ কেহ অনুভব করিতেছেন, যে বোর্ডিংগুলি সহর হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে বিবিধ উপকার লাভের সম্ভাবনা—প্রথমতঃ সহরের বাহিরে গেলে অল্প ব্যয়ে খরচ পত্র চালাইতে পারা যায়, সুতরাং ছাত্র ছাত্রীদিগের ফী কমাইয়া দিয়া সর্ব্বশ্রেণীর ব্রাহ্মগণের উপকার সাধন করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সহরের

বাহিরে থাকিলে বালক বালিকার স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল থাকিতে পারে। তাহারা প্রকৃতি মাতার অধিকতর নিকটে থাকিতে পারে, দৌড়িবার ও খেলিবার জন্ম বিস্তীর্ণ মাঠ পাইতে পারে, দৈহিক শ্রমসাধ্য কার্য্যের অভ্যাস করিতে পারে। সহরে এই সকলের অনেক ব্যাঘাত হইতেছে। তৃতীয়তঃ সহরে মানুষের জীবনের মধ্যে কৃত্রিমতা ও স্বার্থপরতা অনেক পরিমাণে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এখানে জীবনের বাহ্য হাব ভাবের দিকে মানুষের অধিক দৃষ্টি পড়ে; সুতরাং সহরের ন্যায় স্থান হৃদয়ের কোমল ও সরল গুণাবলীর বিকাশের পক্ষে অনুকূল নহে। ব্রাহ্মগণের অধিকাংশের সাংসারিক অবস্থা যেরূপ হীন, তাহাতে তাহাদের সন্তানগণকে সহরের বাবুগিরিতে বর্দ্ধিত করিলে ভবিষ্যতে ঘোর অনর্থ উপস্থিত হইবে। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা অতীব ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিবে। সুতরাং ব্রাহ্ম যুবকগণ আর বিবাহ করিতে সাহসী হইবে না। বহুসংখ্যক যুবক যুবতী অবিবাহিত থাকিয়া যাইবে; অথচ তাহাদের অভ্যাসপ্রাপ্ত সামগ্রী যোগাইতে পিতা মাতার মহা ভারবোধ হইতে থাকিবে। তৎপরে চিন্তা করিতে হইবে, অবিবাহিত কন্যাদিগের ভরণ পোষণের উপায় বিধান করিয়া যাওয়া কত জন ব্রাহ্মগৃহস্থের সাধ্যায়ত্ত। ভবিষ্যতের এই সকল অনর্থ পরিহার করিবার জন্য ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগকে যথাসাধ্য দৈহিক শ্রমে, স্বল্প ব্যয়ে, অভ্যস্ত করা ভাল। প্রকৃতিমাতার যত নিকটে রাখিতে পারা যায় ততই ভাল। বিস্তীর্ণ মাঠ, স্বহস্তারঞ্জিত উদ্যান ও সুনীল আকাশের মধ্যে বর্দ্ধিত হইলে তাহাদের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা।

অপর দিকে সহরে বাসের সপক্ষেও বলিবার আছে। ব্রাহ্ম-সমাজের যত প্রধান প্রধান কার্য্য বড় বড় সহরে। যত কিছু সভাসমিতি সমুদয় সহরে। যদি বালক বালিকাকে এই সকল হইতে দূরে রাখা যায়, তাহা হইলে, সমাজ হইতে তাহারা যে শিক্ষালাভ করিতে পারিত তাহার ব্যাঘাত হইবে; সমবিশ্বাসী দিগের সংস্পর্শজনিত যে লাভ হইতে পারিত তাহা আর হইবে না। দ্বিতীয়তঃ বোর্ডিংগুলি সহরে থাকাতে সকলের চক্ষের উপরে রহিয়াছে, ভাল মন্দ যাহা ঘটিতেছে, তৎক্ষণাৎ লোকের চক্ষে পড়িতেছে, এবং যেখানে সংশোধন আবশ্যক সংশোধন করা যাইতেছে। তদ্ভিন্ন যখনি কোনও প্রকার বিশেষ সাহায্য আবশ্যক হইতেছে তখনি স্থানীয় ব্রাহ্ম-মণ্ডলীর সহায়তা পাওয়া যাইতেছে। দূরে গেলে উক্ত উভয় সুবিধা পাওয়া যাইবে না। এইরূপে উভয় দিকেই ভাবিবার আছে। যাহা হউক ত্বরায় এই বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের একটী পরামর্শ সভা (conference) হওয়া আবশ্যক। আগামী মাঘোৎসব হইতে যাহাতে এগুলির বিশেষ উন্নতি করিতে পারা যায় এখন হইতে তাহার আয়োজন করা কর্ত্তব্য।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

অভ্যাস-শৃঙ্খল।

অভ্যাসের শক্তি যদি কেহ জানিতে চান তবে তাঁহাকে আর অধিক দূরে যাইতে হইবে না। মানবের গতিক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবেন। কতবার পড়িয়া, কত আঘাত পাইয়া, কত ব্যথা পাইয়া একটী শিশুকে হাটিতে শিখিতে হয়, তাহা আমরা সকলে অবগত আছি। বালক যখন নিজ পিতার প্রাঙ্গণে পাদচারণা করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাকে কত সন্তর্পণে, কত সাবধানে চলিতে হয়। প্রত্যেক পদবিক্ষেপে পড়িবার ভয়ে টল টল করিতে থাকে। দেখিলেই বোধ হয় সেই পাদচারণা কার্য্যে তাহাকে সমুদায় মনটা দিতে হইতেছে। কিন্তু একবার চিন্তা করিয়া দেখ, অভ্যাসের গুণে সেই কার্য্যই কালে কিরূপ স্বাভাবিক ও অনায়াস-সাধ্য হইয়া যায়। কেবল তাহা নহে তাহা কিরূপ প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে।

অভ্যাসের গুণ এই যে, ইহাতে কার্য্যজনিত শ্রমের অল্পতা করে অথচ কার্য্যপ্রবৃত্তিকে বর্দ্ধিত করে। ইহার উপরে যদি তৎ তৎ কার্য্যের সঙ্গে সুখের যোগ থাকে, যদি তদ্দ্বারা কোন দৈহিক বা মানসিক আনন্দ লাভ করা যায়, তাহা হইলে অভ্যাসগুণে সেই কার্য্য-প্রবৃত্তি চিত্তে অতিশয় প্রবল হয়। এক জন যদি প্রাতঃসঞ্চরণের নিয়ম করেন, তাহা হইলে দেখা যায়, প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইবামাত্রই তাঁহার মনে বহির্গমনের প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ প্রবল হয়। প্রাতঃকালের বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের যে সুখ, সেই সুখের স্মৃতি অজ্ঞাতসারে তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে থাকে। যদি পল্লীর মধ্যস্থলে একখানি বায়ুসেবিত, সুখকর-আসনবিশিষ্ট, পুষ্পোদ্যান-মধ্যস্থিত ও সাধারণের ব্যবহারোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখ, দেখিবে সায়ংকালে একটী দুইটী করিয়া পল্লীর লোক প্রতিদিন সেখানে আসিয়া বসিতেছে। ইহার কারণ কি? সেই স্থানটীর সুখকরতাই তাহার লোভনীয়তার কারণ। নিত্য সেই সুখ ভোগ করিয়া লোকের তাহা অভ্যাসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। নিত্যই সেই সুখের স্মৃতি লোকের মনকে অজ্ঞাতসারে আকৃষ্ট করে। এই যে গুপ্ত সুখ-লালসা ইহা মানব মনে অতি নিগূঢ়ভাবে কার্য্য করে। যে ব্যক্তির অন্তরে ইহা প্রবিষ্ট হইয়া থাকে সেই ব্যক্তি অনেক সময়ে ইহাকে লক্ষ্য করিতে পারে না; সে এক অন্ধ প্রকৃতির বশীভূত হইয়া কার্য্য করে। এই কারণেই পণ্ডিতগণ ইহাকে মোহ শব্দে অভিহিত করিয়াছেন এবং ইহাকে সকল পাপের নিদান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে মোহ হইতেই সমুদায় পাপের উৎপত্তি হয়। লোকে এই সুখ-লালসা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যখন কোনও নিষিদ্ধ সুখের দিকে ধাবিত হয় তখন আত্ম-সংযমে অসমর্থ হইলেই পাপে পতিত হয়।

সকল পাপের মূলেই এই সুখলালসা দৃষ্ট হইবে। এরূপ ঘটনা অনেকবার ঘটিয়াছে এবং প্রতিদিন ঘটিতেছে, যে শত শত মানব কোনও কার্য্যবিশেষের অনিষ্টকারিতা অনুভব

করিয়াও তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিতেছে না। বার বার অনুতাপ করিতেছে, বার বার প্রতিজ্ঞা করিতেছে, বার বার নিষ্কৃতিলাভের উপায় চিন্তা করিতেছে, অথচ পতঙ্গ যেমন জ্বলন্ত অনল মধ্যে পতিত হয়, সেইরূপ বার বার সেই পাপাগ্নির মধ্যে পতিত হইতেছে। এক ব্যক্তি অতিশয় সুরাসক্ত; এই সুরাসক্তি নিবন্ধন তাহার গৃহে শান্তি নাই; শরীরে স্বাস্থ্য নাই; লোকসমাজে সম্ভ্রম নাই; ইহারই জন্য সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে; পরিবার পরিজনকে পথের ভিক্ষুক করিয়াছে; বালক বালিকাদিগকে শিক্ষাবিহীন রাখিয়াছে; তাহাকে একদিন অনুকূল মুহূর্ত্তে ধরা গেল, ও তাহার অবস্থা তাহার নিকট উজ্জ্বল ভাষাতে চিত্রিত করা গেল। শুনিতে শুনিতে তাহার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল; সে অকৃত্রিম ভাবেই অনুতাপিত হইল; আর সুরাপান করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। সকলে মনে করিলাম লোকটা বুঝি এইবার হইতে শুধরাইয়া গেল। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! কয়েক দিন পরে শুনি সে পুনরায় পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে এবং আবার সুরাপঙ্কে পড়িয়াছে। সেই উন্মাদিনী সুরার মূর্ত্তি সে আবার যখন দর্শন করিল তখন আর সে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিল না। নিবিষ্টচিত্তে ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলে কি দেখা যায়? আমরা দেখিতে পাই প্রচ্ছন্ন সুখলালসাই তাহার পতনের হেতু। সুরাপান করিলে একপ্রকার স্নায়বীয় উত্তেজনা হইয়া থাকে, তাহা সুখপ্রদ। এই উত্তেজনার স্মৃতি সুরাপায়ীর মনে পড়িয়া থাকে। যখনি সে সুরার মূর্ত্তি দর্শন করে, তখনি সেই স্মৃতি অন্তরে জাগিয়া উঠে এবং সেই দিকে চিত্তের প্রবল আকর্ষণ হয়। এই প্রলোভনের মুহূর্ত্তে আত্ম-সংযমের শক্তির অভাবে, মানুষ পতিত হইয়া যায়। কোনও প্রকার পাপ অভ্যাসপ্রাপ্ত হইলে এই দশা ঘটিয়া থাকে যে তাহাকে বাধা দিবার শক্তি হ্রাস হইয়া যায়।

কলিকাতায় কোনও ভবনে কয়েক জন উৎসাহী ও ধর্ম্মানুরাগী যুবক বাস করিতেন। সেই ভবনেই একটী ঘরে একজন অধিক বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন। ঐ বর্ষীয়ান ব্যক্তি আচারে ব্যবহারে অতিশয় ভদ্র ছিলেন এবং ঐ যুবক দলকে স্নেহ করিতেন। কিন্তু তিনি দুষ্ক্রিয়ান্বিত ছিলেন। তাহার বৃদ্ধ বয়সে ঐরূপ আচরণ দেখিয়া যুবকগণ অতিশয় দুঃখিত হইতেন। একদিন যুবকগণ পরামর্শ করিয়া সেই বয়োবৃদ্ধকে কিঞ্চিৎ নীতির উপদেশ দেওয়া আবশ্যক বলিয়া স্থির করিলেন। যুবকদিগের মধ্যে একজন অপর সকলের মুখ-পাত্র স্বরূপ হইয়া এক দিন একান্তে সেই বয়োবৃদ্ধকে অনেক অনুযোগ করিলেন এবং তাঁহার চরিত্রের সংশোধনের জন্য অনুরোধ করিলেন। যুবকগণ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, যুবকদিগের মুখে প্রতিবাদ শুনিয়া তিনি চটিয়া যাইবেন এবং তাঁহাদিগকে অনেক তিরস্কার করিবেন। কিন্তু ঐ বর্ষীয়ান ব্যক্তি তাহার কিছুই করিলেন না। তিনি অতিশয় বিনয়ের সহিত আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিলেন "তোমরা যাহা বলিতেছ তাহা সকলি সত্য, আমি ও কতবার মনে করি এসকল পথ পরিত্যাগ করিব কিন্তু পারি কৈ?" "পারি কৈ"—এই ভয়ানক কথা। মানুষের মনে যতক্ষণ জয়ের আশা থাকে, যতক্ষণ সে মনে করে যে তাহার শত্রু তাহাকে চিরবন্দী করিয়া রাখিতে পারিবেনা, সে ঈশ্বর-কৃপাতে আপনার প্রবৃত্তি কুলকে সংযত করিয়া ধর্ম্মের ভূমিতে উঠিবেই উঠিবে, ততক্ষণ তাহার কোমরে বল থাকে, মনে উৎসাহ থাকে, হৃদয়ে সাহস থাকে; কিন্তু বার বার সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া যখন নিরাশা হৃদয়ে আসিয়া প্রবিষ্ট হইতে থাকে, তখন মানুষের কোমর ভাঙ্গিয়া যায়। আর সে উঠিতে পারে না। পশুশালায় লৌহ-পিঞ্জর-বদ্ধ ব্যাঘ্র যেমন প্রথম প্রথম আপনার বন্দিদশার কঠোরতা অনুভব করিতে সমর্থ না হইয়া লৌহময় গরাদের উপরে আঘাত করিতে থাকে, সম্মুখে মানুষ দেখিলেই আক্রমণ করিবার জন্য উল্লম্ফন করিতে থাকে, কিন্তু কালে যখন জানিতে পারে যে, সে ঘোর কারাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াস পাওয়াই বৃথা, তখন যেমন হতবীর্য্য, ভগ্নোদ্যম, জড়-ভাবাপন্ন হইয়া আপনার ভাগ্যের হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া দেয়, তেমনি হায় এ জগতে কত পাপী প্রথম প্রথম পাপ কারাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য কত প্রয়াস পায়, কিন্তু অবশেষে পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াস বিফল জানিয়া আপনাকে ভাগ্যের হস্তে অর্পণ করে এবং এই সর্ব্বনেশে "পারি কৈ" বলিয়া পাপের সহিত সন্ধি বন্ধন করে।

অবশেষে এই অভ্যাস একটা শৃঙ্খলের ন্যায় হইয়া প্রকৃতিকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করে। ইচ্ছাশক্তিকে বিশেষ সবল না করিলে এই অভ্যাস-শৃঙ্খল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা দুষ্কর। ইচ্ছা-শক্তির সবলতা ইচ্ছা করিলেই পাওয়া যায় না। যেমন বিষের দ্বারা বিষের চিকিৎসা করিতে হয়, তেমনি অভ্যাসের দ্বারা অভ্যাসের ব্যাধি দূর হয়। তোমার প্রকৃতি তোমার নিয়মাধীন হইতে চলিতেছে না; তুমি তাহার আপত্তি শুনিও না; নিজ প্রকৃতিকে তাহার রুচির অনুরূপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে দিও না। প্রকৃতি যাহা চাহে তাহাই যদি সর্ব্বদা যোগান যায়, তাহা হইলে প্রকৃতি আদুরে হইয়া পড়ে। তখন আর তাহাকে নিয়মিত করিবার উপায় থাকে না। এজন্য প্রকৃতিকে বাধ্য করিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহার আচরণে প্রবৃত্ত করা উচিত। প্রথমে সে সকল কার্য্য ক্লেশকর হইবে, কিন্তু অবশেষে অভ্যাসের গুণে প্রীতিকর হইবে। আপনাকে সংযত করিতে করিতে সংযম অভ্যাস প্রাপ্ত হইবে। তখন অভ্যাসের দ্বারা অভ্যাসকে জয় করা যাইবে।

ধর্ম্ম ও নীতি।

(প্রাপ্ত)

এক কথায় বলিতে গেলে ধর্ম্মের বাহ্য বিকাশের নামই নীতি। কিন্তু জগতে ধর্ম্মহীন নীতি ও আছে। নাস্তিকগণ—ঈশ্বরের অভক্তগণও সেই নীতি অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা পদ্ম-পত্র-স্থিত জলবৎ অতি চঞ্চল, অস্থায়ী, অস্থির প্রকৃতি। ধর্ম্মই নীতির প্রাণ। যে হৃদয়ে ধর্ম্মের গভীরতা নাই, সেখানে

নীতি ম্লানীভূত। পরীক্ষার দিনে, প্রলোভনের দিনে সেখানে ধর্ম্মের চিহ্ন কেহ দেখিতে পায়না।

এই পৌত্তলিকতা, অবতারবাদ এবং জাতিভেদ প্রপীড়িত দেশে লোকে ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠানের দিকে যেমন মনোযোগ প্রদান করে, নীতির দিকে তেমন নহে।

"পরিহাস" * * "প্রাণ-সংশয় ও সমস্ত বিত্তের নাশ সম্ভাবনায় মিথ্যা কথা বলিবে। কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিলে লোকে তাহাকে নিন্দা করে, সে অন্যায়, কারণ অনেক স্থলে মিথ্যা সাক্ষ্যে বরং ধর্ম্ম আছে।" (মহাভারত ব্যাশীতিতম অধ্যায়)। শ্রীমদ্ভাগবত্ অষ্টম স্কন্ধে, অষ্টাদশ অধ্যায়ে এরূপ লিখিত আছে, "স্ত্রীবশী-করণ কালে, হাস্য পরিহাসে, বিবাহে বরের গুণানুকীর্ত্তনে, জীবিকাবর্ত্ত রক্ষার নিমিত্ত, প্রাণ-সংকটে, গোব্রাহ্মণের হিত-সাধন জন্য এবং কাহারও প্রাণ হিংসা উপস্থিত হইলে, মিথ্যাকথন দোষাবহ নহে।" পুনশ্চ মহাভারতে ৩৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে, ব্যাস বলিতেছেন,—"যে ব্যক্তি আপৎকালে গুরুর নিমিত্ত ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্য জাতির ধন হরণ করে, তাহাকে চৌর্য্য দোষে দূষিত হইতে হয় না।"

এরূপ উপদেশ কি নীতির মূলচ্ছেদকর নহে? যাঁহারা এই উপদেশানুসারে স্বীয় স্বীয় জীবন পরিচালন করেন, তাঁহারা কি সত্য পথ যাত্রী? সত্যই ধর্ম্ম,সেই সত্যের অপলাপ করিলে কি ধর্ম্মরক্ষা হয়? কিন্তু পুরাণশাস্ত্রকার বলিতেছেন, "মিথ্যা কথা বলিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয় না। যদি দেবে, দ্বিজে ভক্তি থাকে, শাস্ত্রানুযায়ী ক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হয়, তবে মিথ্যা কথা বলিলে, চুরি করিলে, সুরাপান করিলেও পতিত হইবে না। অবশ্য এসকল কুক্রিয়ার বিরুদ্ধেও অনেক উপদেশ আছে; কিন্তু যেমন এক কলসী দুগ্ধে বিন্দু মাত্র গোমূত্র নিক্ষিপ্ত হইলে সমুদয় দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ দু একটী ঈদৃশ উপদেশে শাস্ত্রের সজীবতা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

আধ্যাত্মিকতার উচ্চ তত্ত্ব, প্রাণায়াম যোগ, তপস্যার গভীর উপদেশ, সকল তত্ত্ব বিফল হইয়া যায়, যদি ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিহীনতার প্রশ্রয় দেয় এবং পাপ কার্য্যকে পুণ্য কার্য্য বলিয়া কীর্ত্তন করে। নীতিহীনতা মহাপাপ, যিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ভাবে যে সকল পাপে লিপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান কি রূপে স্ফূর্ত্তি পাইবে? সত্যের দ্বারা হৃদয় পবিত্রীকৃত না হইলে সেই সত্য স্বরূপকে কেহ কি চিন্তা করিতে পারেন? ধর্ম্ম পরিশুদ্ধ অনাবিল, স্ফটিকবৎ। তাহাতে পাপের কলঙ্ক কালিমা প্রবেশ করিলে তাহা ধর্ম্ম নামে উক্ত হইতে পারেনা।

যে দেশের ঋষিগণ পৃথিবীতে সর্ব্ব প্রথম ব্রহ্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, যে দেশের ব্রহ্মতত্ত্ব সাধক অদ্যাবধি জগৎরূপ ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যের স্থলাভিষিক্ত হইয়া রহিয়াছেন, যে দেশের উপাসকগণ সর্ব্ব প্রথম, রজনীর অন্ধকার অবসানে ঊষার নবীন আলোক প্রকাশের ন্যায় এক মাত্র সত্য ধর্ম্ম আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ জনিত স্বর্গীয় আলোক প্রকাশ করেন, "একমেবাদ্বিতীয়ং" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি কথা সভ্যতার শৈশব কালে যাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন, পৃথিবীর সমুদয় নরনারী আধ্যাত্মিক বিষয়ে, ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে যাঁহাদের নিকট ঋণী, তাঁহাদের দেশে,—ব্রহ্মর্ষি মহর্ষি গণের নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে—পৌত্তলিকা ও অবতার-বাদ প্রবেশ করিয়াই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এদেশে নর-পূজা, অস্বাভাবিক সাধন, ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠান ইত্যাদি আবর্জ্জনা রাশির অভ্যন্তরে ভারতীয় প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞান লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছে।

হিন্দু ধর্ম্মকে পুনরায় জাগ্রত করিবার জন্য সম্প্রতি এদেশে একদল উৎসাহী লোক দণ্ডায়মান হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাঁহারা জাতীয় গৌরব স্বরূপ উপনিষদোক্ত বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার না করিয়া তন্ত্র ও পুরাণোক্ত কাল্পনিক ধর্ম্মমত প্রচার করিতেছেন। অধিকতর দুঃখের বিষয় এই যে, কোন কোন ব্রাহ্মভ্রাতাও জাতীয়ভাব রক্ষা করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে পুনরুত্থানকারীগণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ভ্রমে পতিত হইয়া আত্ম-বিস্মৃত হইতেছেন।

তন্ত্র ও পুরাণোক্ত ধর্ম্মের দোষ এই যে, তাহাতে সাধকের বাহ্য অনুষ্ঠানের দিকে যেরূপ মতি হয়, নীতি এবং আধ্যাত্মিকতার দিকে তেমন মনোযোগ থাকে না। আদর্শের দোষেই এরূপ হইয়া থাকে। উপাস্য দেবতার অনুরূপই সাধকের চরিত্র গঠিত হয়। উপাস্য দেবতা সত্যের অপলাপ করেন, সুরাপান করেন, অপরাপর অসাধু আচরণ করেন। সাধকও তেমনিই চরিত্র লাভ করেন। তন্ত্রোক্ত দেবতা মাদক দ্রব্যে পরিতুষ্ট, সুতরাং সাধকগণ ও সুরা গঞ্জিকার সেবক হন। খৃষ্টান মিশনারীদিগের কথায় গবর্ণমেণ্ট সুরা ও গঞ্জিকা বিক্রয় বন্ধ করিলে তন্ত্রোক্ত সাধন অসম্পূর্ণ থাকিবে। এদেশের সন্ন্যাসী বৈষ্ণব এবং যোগিগণ অনেকেই সাধনের সময় মাদক দ্রব্য ব্যবহার করেন।

একদিকে অবতারবাদ, পৌত্তলিকতা এবং জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি যেমন নীতি-হীনতার কারণ, অপর দিকে জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল স্বীকার করা এবং তজ্জন্য নৈতিক সংগ্রামে নিশ্চেষ্ট থাকাও বিনাশের দিকে গমনের প্রশস্ত পথ। অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে সকলে মিলিয়া কর্ম্মকর্ত্তাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়া থাকেন যে, "পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফলে এরূপ ঘটিয়াছে, বিধাতার লিপি কে খণ্ডন করিবে? মানুষ পাপ করিবে কি পুণ্য করিবে, কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে ইত্যাদি শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সকল কথা বিধাতা পুরুষ একদিন লিখিয়া রাখিয়াছেন, তদনুযায়ী নিয়ত কার্য্যাদি সম্পাদিত হইতেছে। কাহার সাধ্য, সেই বিধাতার বিধি অতিক্রম করে? মানুষের স্বাধীনতা নাই, মানুষ অবস্থার দাস, বুদ্ধি কর্ম্মেরই অনুসরণ করে। সকলে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফল ইহ জীবনে ভোগ করিতেছে। কেহ ইচ্ছা করিয়া পাপ কিম্বা পুণ্যকর্ম্ম করিতে পারে না। পূর্ব্বজন্মের তপস্যা বা পাপাচরণের ফলে ইহ জীবনে সুখ বা দুঃখভোগ হইতেছে।" সুতরাং নীতিহীনতা এবং পাপের প্রতি তেমন ঘৃণা হয় না। ঈশ্বরের বিধিদ্বারাই যখন পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, তখন পাপীর দোষ কি?

নীতি এবং ধর্ম্ম যে অচ্ছেদ্য যোগে সংবদ্ধ, পাপাচরণ এবং ঈশ্বর দর্শন যে দুই বিভিন্ন এবং বিপরীতপথগামী,সাধারণ হিন্দুশাস্ত্র এ বিষয়ে সূক্ষ্ম মীমাংসায় উপনীত হয় নাই। এ দেশের

সাধকগণ ধর্ম্মলাভের জন্ত যেরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন, নৈতিক উন্নতির জন্ত তেমন আকাঙ্ক্ষা নাই। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, নীতিহীন ধর্ম্ম অপ্রতিহতপ্রভাবে এদেশে রাজত্ব করিতেছে। পঞ্জাবের বিখ্যাত যোগী হরিদাস চল্লিশ দিন ভূগর্ভে প্রোথিত অবস্থায় ছিলেন, তৎপরে সেখান হইতে উঠিয়া একটি পতিতা রমণী সহ প্রস্থান করেন। বর্ত্তমান সময়ে একজন উচ্চ শিক্ষিত হিন্দু, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে এই যোগীর যোগক্রিয়ার যশোকীর্ত্তন করিয়াছেন। বাস্তবিক যে দেশের ধর্ম্ম নীতিবিহীন হইয়া বিকৃত মূর্ত্তি ধারণ করে, সে দেশের আদর্শ যে এরূপ কুৎসিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি আছে?

সুরাপান নৈতিক হীনতার চরম লক্ষণ। এমন পাপ নাই, যাহা সুরাপায়ীকে স্পর্শ করিতে না পারে। সুরাপানে যাবতীয় পশুভাব উত্তেজিত হয়, সুতরাং সুরাপায়ী নিয়ত পাপ ও প্রলোভনে নিমগ্ন থাকে। হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তন্ত্র "মহানির্ব্বাণ" ঈদৃশ উত্তেজক পদার্থ সেবন করিয়া চিত্তের মত্ততা আনয়ন করতঃ ঈশ্বরাধনার ব্যবস্থা দিয়াছেন। কেবল সুরার ব্যবস্থা প্রদান করিয়া মহানির্ব্বাণকার ক্ষান্ত হন নাই, তৎসঙ্গে আরও নারকীয় ভোগের ব্যবস্থা দিয়াছেন। সাধারণতঃ তাহা পঞ্চ"ম"-কারের সাধন বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। সুরাপান সম্বন্ধে মহানির্ব্বাণ বলিতেছেন;—

সুরা দ্রবময়ী তারা জীবনিস্তারকারিণী।
জননী ভোগমোক্ষাণাং নাশিনী বিপদারুজাং। ১০৫
দাহিনী পাপ সংঘানাং পাবিনী জগতাং প্রিয়ে।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা জ্ঞানবুদ্ধিবিদ্যাবিবর্দ্ধিনী। ১০৬
মুক্তৈর্মুমুক্ষুভিঃ সিদ্ধৈঃ সাধকৈঃ ক্ষিতি পালকৈঃ।
সেব্যতে সর্ব্বদা দেবৈরাদ্যে স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে। ১০৭
সম্যাগ্‌বিধিবিধানেন সুসমাহিতচেতসা।
পিবন্তি মদিরাং মর্ত্ত্যা অমর্ত্ত্যা এবতে ক্ষিতৌ। ১০৮
একাদশ উল্লাস।

ইহার অর্থ এই, সুরা, দ্রবময়ী সাক্ষাৎ জীবনিস্তারকারিণী তারা স্বরূপা, ইহা ভোগ ও মোক্ষের জননী এবং রোগ ও বিপদ সমূহের নাশকারিণী। হে প্রিয়ে! ইহা দ্বারা পাপসমূহ দগ্ধ হয় এবং ইহার প্রভাবে মনুষ্যের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা এই সমস্তই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। হে আদ্যে! (অন্ত কথা কি) মুক্ত, মুমুক্ষু, সিদ্ধ, সাধক, নৃপতি, ও দেবগণ পর্য্যন্ত আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্ত ইহার সেবা করিয়া থাকেন।

মহানির্ব্বাণকার মূর্ত্তিমান পাপ সুরা রাক্ষসকে ধর্ম্মের ভূষণে ভূষিত করিয়া এবং তাহার কপালে পবিত্রতার কৃত্রিম ফোটা দিয়া সাধকের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। এ দেশের সহস্র সহস্র পুরুষ রমণী ধর্ম্মসাধন করিতে গিয়া সুরাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে এবং ইহার কালকূট বিষে জর্জ্জরিত হইয়া অচিরে মনুষ্যত্ব বিনাশ করে; তান্ত্রিক গুরু স্বহস্তে শিষ্যের মুখে এই বিষ পাত্র তুলিয়া দেয়, শিষ্য অমৃত জ্ঞানে পান করে। যে সকল কুলকামিনীগণ হিন্দুগৃহের দেবী স্বরূপা, তাঁহারাও ইষ্টদেবতার প্ররোচনায় অনেক সময় এই কালকূট পান করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মগণ চিরদিন এই মহাতত্ত্ব ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন যে, নীতি এবং ধর্ম্ম একই সূত্রে গ্রথিত। নীতিহীন ধর্ম্ম প্রাণ হীন দেহের ন্যায় অকর্ম্মণ্য। যদি দেখা যায়, কেহ অবিশ্রান্ত সাধন করিতেছেন, দিন রাত্রি ভাবস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তবে যেমন সকলেই সুখী হইবেন, তেমন তিনি যদি সেই ভাবস্রোতের মধ্যে থাকিয়া জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে সত্যের অপলাপ করেন এবং কথা বার্ত্তায় সামঞ্জস্য রক্ষা না করেন, এবং নীতি হীনতায় প্রশ্রয় দেন তবে সকলেই ততোধিক দুঃখিত হইবেন। নীতিহীনতায় এ দেশ রসাতলে গিয়াছে। এখন ব্রাহ্মদিগকে বিশেষ ভাবে সতর্ক হইতে হইবে, যেন তাঁহাদের মধ্যে নীতিবিহীন ধর্ম্ম প্রবেশ লাভ না করিতে পারে।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরক দিগের মতামতের জন্ত সম্পাদকদায়ী নহেন, কিম্বা কাহার ও পত্র ফেরত দিতে তিনি বাধ্য নহেন)

মান্তবর

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়

গত ১৬ই ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথ প্রসাদ গুপ্ত মহাশয় যে পত্র খানা লিখিয়াছেন, তাহার একঅংশ সম্বন্ধে দুই একটী কথা লেখা দরকার বোধ হইতেছে; অনুগ্রহ পূর্ব্বক তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

তাঁহার প্রথম কথা:—"হরি শব্দ উচ্চারণ করিলেই যে সাকার বুঝিতে হইবে এরূপ নহে।" ১লা ভাদ্রের তত্ত্ব-কৌমুদীতে যে একপ কোন কথা আছে তাহা দেখি না। আমরাও একথা বলি না। পত্রে বরং এরূপ কথা আছে যে, ব্রাহ্মগণ "হরি" শব্দে নিরাকার ব্রহ্মকেই বুঝিয়া থাকেন। তবে কথা এই যে, "হরি" বলিলে হিন্দুগণ সাকার সীমাবিশিষ্ট কোন দেবতাকে বুঝিয়া থাকেন। এবিষয়ে "হরি" "কালী" "দুর্গা" "কৃষ্ণ" কোন প্রভেদ নাই।

তাঁহার দ্বিতীয় কথা, "হরিনাম ছাড়িলে নিরাকার পূজার জন্ত কোন নামই থাকিতে পারে না" এবিষয়ে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। যিনি একথা বলিতে পারেন তাঁহার "ব্রাহ্মধর্ম্ম" যে কিরূপ বুঝি না।

তাঁহার তৃতীয় কথা, "হরি শব্দের যে গতি ঈশ্বর প্রভৃতি শব্দের ও সেই গতি" ইহা প্রমাণের জন্ত তিনটী উদাহরণ দিয়াছেন। প্রথম উদাহরণ যে তিনি কিরূপে উল্লেখ করিতে পারিলেন বুঝি না। তিনি কি ইহা জানেন না যে, ঐ বাক্যে দিল্লীশ্বরকে জগদীশ্বর বলা হয় নাই, দিল্লীশ্বরকে ঈশ্বর রূপে পূজাও করা হয় নাই? এবং জগদীশ্বর শব্দে কেহ কখনও দিল্লীশ্বর বুঝে নাই বুঝে না এবং বুঝিবে না।

(২) কালিদাস পুস্তকের এক স্থানে কি ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা দেখার বিশেষ প্রয়োজন নাই। হিন্দুগণ অনেক সময় তাঁহাদের কোন বিশেষ দেবতাকেও সর্ব্বোপরি কর্ত্তা অসীম, মহান, পরমেশ্বরের স্থান প্রদান করিয়া থাকেন। এমনকি

কোন শ্রেণী নাই যাহারা পরমেশ্বর শব্দ বলিতে পার্ব্বতী-নাথকে বুঝে অথবা উক্ত নামে পার্ব্বতীনাথ কি কোন সীমা বিশিষ্ট দেবদেবীকে পূজা করে।

৩য়। "ওঁ" এবং "ওঁকারনাথ" অথবা "ওঁকারজি" সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোন মতেই এক নহে। আর শুধু "ওঁ" নামও ব্যবহার হয় না, অন্য নামের সহিতই ব্যবহার হয়। সাধারণ ভাবে এসম্বন্ধে এই বক্তব্য যে, যদি নিতান্তই প্রমাণিত হয় যে ঐ সব নাম দেব দেবীতে ব্যবহার হয়, তবে তাহাতে হরি নামের সপক্ষে কিছু প্রমাণ হইল না। তখন এই প্রমাণ হয়, ইহাদের ব্যবহারও অন্যায়। এসকল নাম ছাড়িলেও অনেক নাম আছে।

৪র্থ কথা,—"এ সকল নাম ছাড়িলে নিরাকার হরিকে মনে রাখিতে হইবে, মুখ ফুটিয়া কিছু বলা যাইবে না।" এ বিষয়ে অতিরিক্ত কিছু বলা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

৫ম কথা,—"পৌত্তলিকগণ সাকার ভাবে কল্পনা করিলেই যদি নিরাকার হরি সাকার হইয়া যান, তবে মনেই বা রাখিব কিরূপে?" পূর্ব্ব পত্রে ত এরূপ কোন কথা পাইলাম না, তিনি একথা কোথা হইতে আনিলেন বুঝিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মসমাজে বোধ হয় এরূপ কেহ নাই যে বলিবে, নিরাকার হরি সাকার হইয়া যাইতে পারেন। প্রধান কথা এই যে, লোকে শব্দের অর্থ যুক্তি তর্ক করিয়া বুঝে না। কাযেই হরি প্রভৃতি দেব দেবীর নাম ব্যবহার করিলে লোকে তাহাদের পূজিত দেব দেবীকেই বুঝিবে সুতরাং তাহা সত্য প্রচার সম্বন্ধে মহা বিঘ্নকর।

পূর্ব্ব পত্র-প্রেরক একটী কথা বলেন নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন, হরিনাম ভিন্ন ভক্তি হয় না; এসম্বন্ধে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এই বলিলেই হইবে যে, ভক্তি কোন নামের উপর নির্ভর করে না। প্রকৃত ঈশ্বর দর্শনের উপরেই নির্ভর করে। যে সকল সম্প্রদায় হরিনাম ব্যবহার করে না, তাঁহাদের মধ্যে অনেক ভক্ত আছেন। ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঢাকার শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ রায় মহাশয়গণের ভক্তি যে কাহারও অপেক্ষা কম একথা বোধ হয় কেহ বলিতে সাহস করিবেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, ইহাতে নানা জাতি ও নানা সম্প্রদায়ের লোক আসিবে কাযেই সকলের পক্ষে হরিনাম গ্রহণ সম্ভবপর হইবে না। তাঁহাদের কি আর ভক্তি হইবে না?

হরি প্রভৃতি দেব দেবীর নাম ব্যবহারের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে অনেক বলিবার আছে, দরকার হইলে ভবিষ্যতে বলিব। এবিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস যে শিক্ষা দিতেছেন, সে দিকে লক্ষ্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আমাদের বিশ্বাস—"জনৈক সভ্য" যে পত্র খানা লিখিয়াছেন তাহা যেরূপ সুযুক্তি পূর্ণ তাহাতে উহার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিতে পারিবেন না। উহার বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিবার আছে তাহা শুনিবার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম।

ময়মনসিংহ
৮। ৯। ৯৩

বিনয়াবনত
শ্রীচন্দ্রমোহন বিশ্বাস।

শ্রদ্ধাস্পদ
শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

আমার নিম্নলিখিত পত্রখানা আপনার পত্রিকায় আগামী বারে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

আপনার ১৬ই ভাদ্রের পত্রিকায় "স্বানুভূতি, সৎশাস্ত্র ও সদ্গুরু" নামক প্রবন্ধে "কোনও বিষয়েই যদি অতীতকে অগ্রাহ্য করিয়া চলা কর্ত্তব্য না হয়, তবে ধর্ম্ম-জ্ঞান বিষয়ে কেন কর্ত্তব্য হইবে?" লিখিত আছে অর্থাৎ জড়বস্তু ও তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানকে আধ্যাত্মিক বস্তু ও তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের সহিত এক ভূমিতে তুলনা করা এবং দৃষ্টান্তে উভয় বিষয়ে এক রকম সাধনার প্রয়োজন বুঝাইতে চেষ্টা করায় একটী গুরুতর ভ্রম ঘটিয়াছে। তাহার কারণ এই,—ঈশ্বর নানা রকম জড়বস্তু সৃষ্টি করিয়া জগতে রাখিয়া দিয়াছেন। সুতরাং শিক্ষক মহাশয়েরা জড়বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞান ঐ জড়বস্তু ছাত্রের সম্মুখে ধরিয়া শিক্ষা দিতে পারেন এবং ছাত্রগণও ঐ বস্তুর সহিত শিক্ষকের উপদেশ মিলাইয়া উহা প্রকৃত কি না তাহা বুঝিতে পারে। এই ভাবে আমাদের জড়জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এই জন্য জড়জ্ঞান গুরুর সাহায্যেই আমরা শিখিতে পারি। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে এই নিয়মের অন্যথা দেখিতে পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক জগতে আত্মা নিজে দর্শক, ঈশ্বর বস্তু। এখানে তিনি নিজে দেখান অর্থাৎ নিজে কৃপা করিয়া উপাসকের আত্মাতে প্রকাশিত হন। ইহাতে উপাসকের নিজের একমাত্র ব্যাকুল ইচ্ছা এবং ব্রহ্মের কৃপার প্রয়োজন। কোনও মনুষ্যের এরূপ শক্তি নাই, শিষ্যকে ঈশ্বর দর্শন করাইতে পারেন। সুতরাং এখানে ঈশ্বরকে দেখান সম্বন্ধে মনুষ্যগুরুর কার্য্য কিছুই নাই এবং গুরু যে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দেন তাহা সত্য কি না তাহা মিলাইয়া লইতে ছাত্রের উপায় নাই। এই জন্য উপদেষ্টার উপদেশে আমাদের ঈশ্বর জ্ঞান হয় না। যদি আধ্যাত্মিক জগতে জড়জগতের ন্যায় কতকগুলি বস্তু পূর্ব্বে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়া রাখিতেন তবে মনুষ্য-গুরু ঐগুলি লইয়া শিক্ষা দিতে পারিতেন। কিন্তু এ রাজ্যে দর্শক আত্মা ও বস্তু ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। ঈশ্বর যখন আত্মাতে কৃপা করিয়া নিজে প্রকাশিত হন তখনই আত্মা তাহা অনুভব করিতে পারে নচেৎ নহে। তবে আধ্যাত্মিক জগতে কি কি উপায়ে ঈশ্বর দর্শন হইতে পারে তাহার পথমাত্র আমরা বলিয়া দিতে পারি। ঐ পথে চলিলে ঈশ্বর দর্শন নাও হইতে পারে, ব্রহ্ম কৃপার সম্পূর্ণ প্রয়োজন। ইহা দ্বারাই দেখা যাইতেছে, জড়জগতে আমরা নিজে বস্তুকে ধরিয়া সাক্ষাৎভাবে শিক্ষা দিতে পারি। আর আধ্যাত্মিক জগতের পথমাত্র বলিয়া দিতে পারি। সুতরাং এই দুই পথ এবং তাহার সাধন পথ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কেহ কেহ আত্মার এক একটী গুণকে বস্তু মনে করেন কিন্তু তাহা ভুল। আপনার ও মনের বিশ্বাস সম্ভবতঃ আমারই ন্যায়। কিন্তু প্রবন্ধটী অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আশা করি আগামীতে এই ভ্রম সংশোধন করিয়া বাধিত করিবেন।

পটুয়াটুলী ঢাকা
২৩এ ভাদ্র

অনুগত
শ্রীকৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

তামাকের অপকারিতা।

[তত্ত্ববোধিনী হইতে উদ্ধৃত]

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এ কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। একদিকে যেমন সেই নবাবিষ্কৃত দেশে য়ুরোপীয়াদি নানা জাতীয় লোক দলে দলে উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক আপন আপন অবস্থা উন্নত করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে তদ্রূপ বাণিজ্যের উপযোগী বিবিধ পদার্থ—যাহা হয় ত সভ্যজন সমীপে চিরদিন অপরিচিত থাকিত, তাহাও তথা হইতে দিগদিগন্তরে প্রেরিত হইয়া বাণিজ্য বিভাগেরও অসাধারণ উন্নতি সাধন করিতে লাগিল। অন্যান্য দ্রব্যের কথায় প্রয়োজন নাই, আমাদের আলোচ্য বিষয় যে তামাক, যাহা বর্ত্তমান সময়ে কি সভ্য কি অসভ্য ভদ্রাভদ্র সকল শ্রেণীর অধিকাংশ নরনারীরই আদরের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমেরিকা আবিষ্কৃত না হইলে সেই তামাকের ব্যবহার কেহ জানিতে পারিতেন না। এই তামাক কোন এক দেশ বিশেষের বনজাত উদ্ভিদ কি না, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা বড়ই কঠিন; সুতরাং ইহার জন্মস্থান লইয়া মতভেদ হওয়া অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ, এই উদ্ভিদ যে স্থানেই জাত হউক না কেন, ইহার নামকরণ ও ব্যবহার যেন আমেরিকা অঞ্চল হইতেই হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করিবার কারণও অনেক আছে।

১৪৯২ খৃঃ অব্দে কলম্বস্ যখন প্রথমবার আমেরিকায় গমন করেন, সেই সময় যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গী ছিলেন তাঁহারাই কিউবা উপদ্বীপে বনজাত তামাক ও তত্রত্য অসভ্য অধিবাসীদিগকে তাহার ধূমপান করিতে প্রথম দর্শন করেন। তৎপরে কলম্বসের ঐ দেশে দ্বিতীয়বার গমনকালে রামনন্ পেইন নামে জনৈক ফরাসী তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। তিনিও আমেরিকার অসভ্য অধিবাসিগণকে নাসিকায় তামাকের নস্য গ্রহণ করিতে প্রথম দেখিতে পান। ১৫০২ খৃঃ অব্দে স্পেনবাসী লোকে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলবাসীদিগকে তামাকের পাতা খাইতে প্রথম দর্শন করেন। ফ্রান্সীস্কোফারণাণ্ডীজ নামে একজন চিকিৎসক স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের আদেশে আমেরিকার অন্তর্গত মেকসীকো প্রদেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি নির্ণয় করিবার জন্য ১৫৫৮ খৃঃ অব্দে তথায় গমন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে য়ুরোপে তামাকের গাছ আনয়ন করেন। সেই প্রদেশে এই উদ্ভিদ্ [Tobacco] নামে পরিচিত। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে [Ovadea] যে ইতিবৃত্ত প্রণয়ন করেন তৎপাঠে জানা যায় যে, সেন্‌ডোসিনগোয়ের অধিবাসিগণ ইংরাজী [Y] বর্ণের মত কাষ্ঠের একপ্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার যোগে ধূমসেবন করিত এবং ঐ যন্ত্রের নামও আবার তাহারা [Tobacco] বলিত। যে প্রণালীতে তাঁহারা তামাকের ধূম গ্রহণ করিত তাহা অতি কৌতুক-জনক। কেন না, উপরোক্ত [Y] আকৃতি বিশিষ্ট যন্ত্রের নিম্ন ভাগস্থ আধারে তামাক রাখিয়া তাহার দুইটী ডানার উপরিভাগের দুই প্রান্তভাগ নাসিকার দুই ছিদ্রে প্রবিষ্ট করিয়া নিশ্বাসযোগে টানিয়া টানিয়া ধূমপান করিত। ফ্রান্সদেশবাসী জন্ নাইকট্ নামে একজন পোর্ত্তুগিজ রাজদূত ১৫৬০ খৃঃ অব্দে আমেরিকা হইতে তামাকের বীজ স্বদেশে প্রেরণ করেন। সেই নাইকটের নাম হইতেই য়ুরোপের সর্ব্বত্র এই উদ্ভিদের নাম [Nicotina Tobaccum] হইয়াছে। ইহার প্রায় একশত বৎসর অন্তে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে সর বালটর র‍্যালে [Sir Walter Raleigh] আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে তামাক আনয়ন করেন।* আমেরিকায় ইংরেজজাতির প্রথম অধিকৃত স্থানের নাম বর্জিনিয়া। ঐ স্থানের প্রথম শাসনকর্ত্তা [Ralph Lane] ও [Sir Francis Drake] তামাক খাইবার যন্ত্র আনিয়া র‍্যালেকে উপহার প্রদান করেন। সে যন্ত্র মৃণ্ময় ছিল, র‍্যালে মহোদয় তদ্দৃষ্টে রৌপ্য যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন।

যদিও স্পেনবাসীরা প্রথমতঃ য়ুরোপে তামাক আনয়ন করেন বটে; কিন্তু তথাপি সে দেশের লোকে প্রথমে তামাক ব্যবহার করেন নাই, ইংরেজ জাতিই য়ুরোপে তামাক সেবন শিক্ষার দীক্ষা গুরু। [Ralph Lane] আমেরিকার অসভ্য লোকদিগের আদর্শে তামাক খাইতে শিক্ষা করিয়া তথা হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং তাঁহারই দৃষ্টান্ত অবলম্বনে র‍্যালে তামাক খাইতে আরম্ভ করেন। তৎপরে ইঁহার অনুকরণ করিয়া রাজ্ঞী এলিজেবেতের সভার অন্যান্য অমাত্যবর্গও তামাক খাইতে অভ্যাস করেন। ইংরেজ জাতির মধ্যে অনেকে তামাক খাইতে লাগিলেন বটে; কিন্তু ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে তাহার অপবিত্র বীজ অনেক কাল পর্য্যন্ত বপন করিতে দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয় চারলসের সময় হইতে এতকাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে তামাকের চাস নিষিদ্ধ ছিল, কেবল ইদানীন্তন অর্থাৎ ১৮৮৬ খৃঃ অব্দ হইতে পরীক্ষা স্বরূপে তথায় তাহার চাস হইতেছে। এদিকে ইংরেজ জাতির দেখা দেখি য়ুরোপের অন্যান্য স্থানের অধিবাসিগণ ক্রমান্বয়ে তামাক খাইতে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। বলিতে কি, সপ্তদশ শতাব্দীতে এই কুশিক্ষার স্রোতে অন্যান্য দেশও ভাসিতে আরম্ভ করিল। বস্তুতঃ তামাকের যেন কি এক অলৌকিক মোহিনী শক্তি আছে, চিরদিনই লোকে দেখা দেখি উহার পদতলে মস্তক অবনত করিয়া শিষ্য হইয়া পড়ে। উহার মন্ত্রে একবার মুগ্ধ হইলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ অতি সৌভাগ্যের কথা।

তামাক স্বাস্থ্য ও নীতিবিরোধী পদার্থ, এই জন্য উহার ব্যবহার লইয়া প্রথম প্রথম য়ুরোপ অঞ্চলে তুমুল বিবাদ বিসম্বাদ আরম্ভ হয় এবং উহার ব্যবহার নিবারণ করিবার জন্য নানা প্রকার রাজশাসন ও ধর্ম্মশাসনও প্রচারিত হইয়াছিল।

* Pareira Page 567.

কোন কোন স্থলে প্রাণদণ্ডের আদেশ ও ভয় প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করে নাই।

এখন অন্যান্য দেশ ছাড়িয়া একবার ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখা যাউক, ভারতবর্ষ তামাকের জন্ম স্থান কিম্বা ইংরেজ জাতির ন্যায় বিদেশস্থ হইয়া ইহা নিজ অধিকার বিস্তারে ভারতবর্ষবাসীদিগকে আয়ত্ত করিয়াছে। আমরা অনুসন্ধানে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে তামাক ভারতের বনজাত উদ্ভিদ বলিয়া বিশেষ কোন পরিচয় পাইতেছি না। আমেরিকায় ও য়ুরোপ অঞ্চলে যাহাকে [Tobacco] বলে, সেই একই উদ্ভিদের আসিয়ারও স্থানে স্থানে অর্থাৎ পারস্য রাজ্যে যেরূপ তুম্বাকি বা তোম্বাক ভারতেও তদ্রূপ তামাক বা তামাকু শব্দে পরিগণিত হওয়া অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। মহাত্মা এল্‌ফিনস্টন সাহেব উত্তম কথাই বলিয়াছেন যে, আমেরিকাদেশে এই উদ্ভিদ যে শব্দে পরিচিত, অন্যান্য দেশের লোকেও যখন সেই একই ধাতু ব্যবহারে ইহার পরিচয় দিয়া থাকেন, তখন আমেরিকা হইতেই যে, ইহার নামকরণ প্রথম হইয়াছিল, ইহা আশ্চর্য্য বা অসম্ভব নহে। তামাক ভারতবর্ষের বনজাত উদ্ভিদ হইলে অতি প্রাচীন কাল হইতে এ দেশের জনসমাজে ব্যবহৃত হউক বা না হউক, ভোলা মহেশের নিকট অপরিচিত থাকিত না। কেন না, তিনি ত ভাঙ্গ ধুতুরা লইয়াই লীলা খেলা করিয়াছেন, তাঁহার তন্ত্রে মন্ত্রে তামাকের গন্ধও নাই। গাঁজা মদ ও আফিং যে কোন মাদক দ্রব্যই কেন লোকে ব্যবহার না করুক, তামাক এ সকলেরই অগ্রগামী। এমত অবস্থায় শঙ্কর ইহার সন্ধান পাইলে কখনই ছাড়িতেন না, নিতান্ত পক্ষে তাঁহার ঝুলিতে দুই এক ছিলিম তামাকের সন্ধানও পাওয়া যাইত। এদেশীয় লোকের মধ্যে যাঁহারা নিদানাদি শাস্ত্রের ব্যবস্থামতে চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রবীণ ও সুপণ্ডিত অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গিয়াছে যে, নিদানাদি গ্রন্থে তামাকের কোন উল্লেখ নাই। মহাত্মা ভাবমিশ্র বহুতর চিকিৎসা শাস্ত্র মন্থন করিয়া "ভাবপ্রকাশ" নামে যে উৎকৃষ্ট চিকিৎসাতত্ত্বের গ্রন্থ প্রচার করেন, উক্ত গ্রন্থেও তামাকের কোন প্রমাণ নাই।

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মসমাজ।

দুর্ভিক্ষ—নানা স্থান হইতে অন্নকষ্টের সংবাদ শ্রুত হওয়া যাইতেছে। স্থানীয় ব্রাহ্মগণ এসম্বন্ধে যথার্থ সংবাদ প্রদান করিলে আমরা বাধিত হইব। যে সকল স্থানে প্রকৃত পক্ষে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাহার প্রকৃত বিবরণ জানিতে পারিলে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সেই সকল স্থানে চাউল বিতরণের জন্য লোক পাঠাইতে পারেন। আমরা পূর্ব্ব বঙ্গের অন্নকষ্ট প্রপীড়িত স্থানের তত্ত্ব জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র থাকিলাম।

শান্তি নিকেতনে বাস—ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে যে, সাধনাশ্রম হইতে কয়েকজন সাধক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শান্তি নিকেতনে নির্জ্জন বাসের জন্য গমন করিয়াছেন। ইঁহারা তথায় কয়েক দিন বাস করিয়া আশ্রমে পুনরাগমন করিয়াছেন। শান্তি নিকেতনের দূরপ্রসারিত প্রান্তর, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আশ্রম এবং প্রকৃতির শান্তিপ্রদ দৃশ্য সাধনের বিশেষ অনুকূল। যাঁহারা নাগরিক কোলাহলে দিবানিশি ব্যতিব্যস্ত হইতেছেন, আত্ম চিন্তা করিবার যাঁহাদের অবসর নাই, কাক সমাকুল বট-বৃক্ষের ন্যায় কোলাহলময় স্থান যাঁহাদের শয়ন মন্দির বা বিশ্রামভবন। এক কথায় বাজার যাঁহাদের বাসস্থান, বাজার যাঁহাদের সাধন স্থান, তাঁহাদের পক্ষে সেইরূপ নির্জ্জন গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দেশে মধ্যে মধ্যে গমন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। মহর্ষি এই আশ্রম স্থাপন করিয়া নির্জ্জন সাধনার্থী ব্রাহ্মদিগের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। আমাদের পরিচারকগণ যতদিন শান্তি নিকেতনে ছিলেন, মহর্ষির ব্যয়েই তাঁহাদের আহারাদি নির্ব্বাহ হইয়াছে। শান্তি নিকেতনের তত্ত্বাবধায়ক বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ইঁহাদের প্রতি বিশেষ ভদ্রতা এবং যত্ন প্রদর্শন করিয়াছেন। আশ্রমধারী পণ্ডিত মহাশয়ও সৌজন্য ও শিষ্টতা দ্বারা বিশেষ আপ্যায়িত করিয়াছেন। বাস্তবিক সাধনার্থীদিগের জন্য শান্তি নিকেতনে অতি সুন্দর বন্দোবস্ত আছে।

প্রচার—ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস তথায় গমন করেন। গত ১২ই ভাদ্র হইতে চারি দিবস উৎসব হয়। স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে ছাত্রসমাজের এক অধিবেশন হয়, তাহাতে নবদ্বীপ বাবু ছাত্রজীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। উৎসবান্তে তিনি তথায় যে কয়দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন, প্রতিদিন বাসায় বাসায় উপাসনাদি করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে গমন করেন। ১৩ই হইতে ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তথায় উৎসব হয়, উপাসনায় শশী বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি এক সপ্তাহের অধিক কাল তথায় অবস্থিতি করিয়া কোন কোন পরিবারে উপাসনা করেন, ছাত্রদিগের সহিত আলোচনা করেন এবং টাউন হলে "জীবন্ত শক্তির লক্ষণ" এবং "জাতীয় চরিত্রের অবনতি ও উন্নতি" সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা করেন। স্থানীয় সমাজ গৃহে ছাত্রবৃন্দের জন্য "Solemn Warnings" সম্বন্ধে ইংরাজি বক্তৃতা ও ভিক্টোরিয়া স্কুল গৃহে "ছাত্র জীবনের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব" বিষয়ে বাঙ্গালা বক্তৃতা করেন।

আত্মীয় সভা—কয়েক জন ব্রাহ্মবন্ধুর উদ্যোগে আত্মীয় সভা নামে একটি সভা স্থাপিত হইয়াছে। দরিদ্র ব্রাহ্মগণের উপকার এবং নিজেদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করাই এই সভার উদ্দেশ্য। পরমেশ্বর উদ্যোগ কর্ত্তাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দান—আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে বালক বালিকাদিগের রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ বরিশাল হইতে শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দত্ত ৫৲ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন ও বালক বালিকাদের আমোদ বিধানার্থ মাননীয় জষ্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ ২০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা—আগামী ২৭এ সেপ্টেম্বর প্রত্যেক ব্রাহ্মের বিশেষ স্মরণীয় দিন। ঐ দিন ভারত-গৌরব-রবি ঈশ্বর-প্রেমিক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রিষ্টল নগরে ইহলোক লীলা সংবরণ করেন। তাঁহার জীবন-কাহিনী আলোচনা, এবং তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য ব্রাহ্মগণ প্রতি বৎসর ২৭এ সেপ্টেম্বর তারিখে সভা করিয়া থাকেন। এবার কলিকাতা সিটি কলেজ গৃহে সভা হইবে। নানাধর্ম্মাবলম্বী বিখ্যাত বক্তাগণ বক্তৃতা করিবেন এবং রাজার স্বরচিত সংগীতাদি গীত হইবে। আমরা আশাকরি, কলিকাতার ন্যায় মফঃস্বলের প্রত্যেক সমাজের সভ্যগণ প্রতিবৎসরে উক্তমহাত্মার স্মরণার্থ সভা করিবেন এবং যাহাতে এতদুপলক্ষে কোন প্রকার স্থায়ী শুভানুষ্ঠান হয়, তাহার চেষ্টা করিবেন।

সাধন-আশ্রমে উৎসব—গত ১লা সেপ্টেম্বর সাধনাশ্রমের মাসিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিন শ্রীযুক্ত বাবু জয়শঙ্কর রায় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইনি অবিবাহিত প্রৌঢ়। কুমিল্লা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সেই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গত মাঘোৎসবের পর হইতে সাধনাশ্রমে যোগ দিয়াছেন। ইনি আপাততঃ সঙ্কল্পাধীন প্রচারক রূপে গৃহীত হইলেন। পরমেশ্বর ইহাঁর সাধু সঙ্কল্পের সহায় হউন।

শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস, এবং শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব ও শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঘোষাল ছোটনাগপুর অঞ্চলে প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

টাঙ্গাইল ব্রহ্মোপাসনালয় নির্ম্মাণার্থ সাহায্য প্রার্থনা-পত্র।

সবিনয় নিবেদন

ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে টাঙ্গাইল একটী প্রসিদ্ধ স্থান। ৭।৮ বৎসর গত হইল এখানে একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু উপাসনালয়ের অভাবে বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল, করটিয়ার সদাশয় জমীদার মাননীয় হাফেজ মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব উপাসনালয় নির্ম্মাণের জন্য ৪৫০ শত টাকা দান করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু দুই সহস্র টাকার কমে একটী পাকা গৃহ নির্ম্মাণ করা সম্ভব নহে—এই অবিশ্বাসের যুগে ধর্ম্ম ও নীতির মাহাত্ম্য সংস্থাপন দেখিয়া যাঁহারা পুলকিত হন, এমন প্রত্যেক সজ্জনের নিকট আমরা উপাসনালয় নির্ম্মাণের জন্য অর্থ ভিক্ষা করিতেছি। আশা করি ধর্ম্মপরায়ণ নরনারীগণ এই মহৎ কার্য্যের জন্য আমাদিগকে অর্থদান করিতে কখনও বিমুখ হইবেন না। যিনি যাহা দান করিবেন, তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করা যাইবে।

নিবেদক,

শ্রীহরনাথ ঘোষ, ডাক্তার, করটিয়া, টাঙ্গাইল।
শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, সঞ্জীবনী সম্পাদক, কলিকাতা।
শ্রীপ্রসন্নকুমার বসু, সঞ্জীবনী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ঐ।
শ্রীমথুরানাথ গুহ, স্কুল সব ইনস্পেক্টর, টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজ-সম্পাদক।
শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র গুহ, বি, এ, শিক্ষক টাঙ্গাইল স্কুল, মন্দির কমিটি সম্পাদক।

অর্থাদি প্রার্থনাকারীদের মধ্যে কোন একজনের নিকট পাঠাইতে পারেন।

ব্রাহ্মবালকদিগের শিক্ষা।

কোন একজন সদাশয় বন্ধুর সাহায্যে আত্মীয় সভা কতিপয় দরিদ্র ব্রাহ্মবালকের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বালকগণকে কলিকাতাস্থ কোনও এণ্ট্রেন্স স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইবে। ব্রাহ্মসমাজের সকল বিভাগের ব্রাহ্মবালকই সভার সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারিবে। প্রার্থীদিগকে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিত আবেদন পাঠাইতে হইবে।

ব্রাহ্মবালিকাগণের শিক্ষা।

আত্মীয় সভা মফঃস্বলস্থ কয়েকটী দরিদ্র বালিকার শিক্ষার ব্যয়ভার আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বালিকাদিগকে কলিকাতা অথবা তৎনিকটস্থ বোর্ডিং স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইবে। ব্রাহ্মসমাজের সকল বিভাগের বালিকাগণই সভার সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারিবে। বালিকাগণের কর্ত্তৃপক্ষগণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন। ইতি।

১০।৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। — শ্রীসূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক—আত্মীয় সভা।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১২ই অক্টোবর অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় ১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ সিটি কলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব।

২। বাবু বাণীকান্ত রায় চৌধুরী প্রস্তাব করিবেন:—ব্রাহ্ম ছাত্রীনিবাস সব কমিটীর সম্পাদক বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়কে উক্ত সব কমিটীর সম্পাদক-পদ হইতে অবসৃত করিবার কারণ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত একটি কমিশন নিযুক্ত হউক।

৩। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক বক্তৃতা ও উপদেশাদি মধ্যে হরিনাম ব্যবহার সম্বন্ধে ময়মনসিংহের বাবু বরদাকান্ত বসু মহাশয়ের একখানি পত্র সম্বন্ধে বিচার।

৪। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পুনর্নিয়োগের নিয়ম সম্বন্ধে বিচার।

৫। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অফিস, ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ — শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ, সম্পাদক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ৩রা আশ্বিন প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১২শ সংখ্যা। ১৬শ ভাগ।

১৬ই আশ্বিন, রবিবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

সেবা-ব্রত।

মন কেন চাও রে মিষ্টতা?
কেন এত স্ব-সুখ-পরতা?
এই ত বিধির লেখা, জীবনে চলিবে একা,
কেন তবে চাও রে মিত্রতা?
অন্বেষণ কেন যথা তথা?

কেন তুমি জলৌকার মত,
ধরি ধরি করিছ নিয়ত?
যা কিছু ধরিতে চাও, ধরিবারে নাহি পাও,
বার বার হও আশা-হত
তবু কেন উৎসুক সতত?

সুখে কেন এতই লালসা?
কেন সেবা কর না ভরসা?
পর সুখে সুখী হয়ে, নিজে যাও পাসরিয়ে
রহিবে না তোমার এ দশা;
প্রাণে পাবে প্রেমের বরষা।

মর্ত্তো সেবা, উপরে ঈশ্বর,
এ দুটী ত নিত্য সহচর;
সুখ-তৃষ্ণা ফেলি পাছে, বল বুদ্ধি যাহা আছে,
সেবা-ব্রতে রাখ নিরন্তর;
পাবে সুখ জুড়াবে অন্তর।

ওহে প্রভু, ওহে বিশ্বপতি!
নাহি সুখ চাহিতে শকতি,
নীরস সরস হই, যথায় তথায় রই,
সেবা-ব্রতে থাক্ সদা মতি;
তব পদে এই হে মিনতি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সামাজিক শাসন-প্রণালী—জনসমাজের কার্য্য দুই প্রকারে চলে, এক কোন এক প্রতিভাশালী নেতার অধীনে, দ্বিতীয় দশজনের সম্মিলিত জ্ঞান ও সম্মিলিত শক্তির অধীনে। প্রাচীন কালে প্রথমোক্ত বন্দোবস্তই ছিল। আদিম বর্ব্বর অবস্থায় যখন অন্তর্বৈর ও বহির্বৈরে জাতি সকল সর্ব্বদা উত্যক্ত উপদ্রুত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত, তখন যে ব্যক্তি প্রতিভা ও বুদ্ধির প্রাখর্য্যে তাহাদের মধ্যে অগ্রণী হইত, তাহাদিগকে বিপৎকালে বিপদুদ্ধারের উপায় বলিয়া দিতে পারিত, স্বদল-রক্ষার নানা প্রকার কৌশল উদ্ভাবন করিতে পারিত, লোকে স্বভাবতঃই সেই প্রতিভাশালী ব্যক্তির অনুগত হইত। আত্ম-রক্ষার জন্য তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিত। এখনও আরবদেশে ও মধ্য আসিয়াতে এমন সকল যাযাবর জাতি রহিয়াছে, যাহারা এক একজন প্রতিভাশালী নেতার অধীনে বাস করিতেছে। আদিমকালে এই সকল প্রতিভাশালী নেতাকে কেহ সভা করিয়া মনোনীত করিত না। স্বীয় প্রতিভার গুণে ঐ সকল ব্যক্তি এক এক দলের উপরে স্বীয় অধিকার স্থাপন করিতেন। রণজিৎ সিংহ যে সমগ্র পঞ্জাবের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাহা কি শিক রাজাদিগের সভাতে মনোনীত হইয়া? শিবজী যে মহারাষ্ট্রীয় শক্তিকে ত্রাসের বস্তু করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা কি কোন সভার ভোট অনুসারে? তাহা নহে, সাহসে উদ্যোগে ও প্রতিভাতে যে সর্ব্বাগ্রগণ্য হইয়াছে সেই অপরদিগকে স্বীয় পদানত করিয়া লইয়াছে। উচ্ছৃঙ্খল ও নিয়ম-প্রণালী-বিহীন সমাজের এই অবস্থা অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান কালের সভা ও নিয়মানুগত সমাজে আর এক প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন যে প্রতিভার আদর বিলুপ্ত হইয়াছে, বা গুণিগণের গুণের প্রতি অনুরাগ নাই, তাহা নহে। "গুণৈঃহি সর্ব্বত্র পদং নিধীয়তে"—বিধাতা গুণকে এরূপ শক্তি দিয়াছেন, যদ্দারা ইহা সকলেরই হৃদয়কে আকৃষ্ট করে ও সর্ব্বত্র স্বীয় অধিকার স্থাপন করে; এখনও প্রতিভাশালী ও গুণী ব্যক্তিগণ প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকেই সকল সভ্যসমাজের অগ্রগণ্য শ্রেণীতে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে প্রাচীন কালের সহিত এখনকার প্রথম প্রভেদ এই,—সেকালে অধিকাংশ লোক ক্ষুদ্র থাকিত, সুতরাং তাহাদের মধ্যে একজনের মস্তক উচ্চে উঠিলে তাহাকে অতিশয় মহৎ দেখাইত; বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষাগুণে অনেকে উচ্চতা লাভ করাতে সেইরূপ প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগকে তত বড় দেখায় না। প্রাচীন গ্রীসদেশীয় রাজ-

নীতি-বিশারদ থেমিষ্টক্লিস বা পেরিক্লিস, কিংবা রোমীয় রাজনীতিবেত্তা কেটোর নাম যে ইতিহাসের আকাশে উজ্জল তারকার ন্যায় জলিতেছে, তাহার কারণ এই অন্ধকারের মধ্যে সেই এক একটী আলোক ছিল। বর্ত্তমান সময়ের গ্লাডষ্টোন রাজনীতি বিষয়ে সেই প্রাচীন রাজনীতিজ্ঞদিগের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহেন, তবে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে আরও ক্ষুদ্র ও মহৎ অনেক তারকা জলিতেছে বলিয়া তাঁহার জ্যোতি সে প্রকার দীপ্তিশালী বোধ হইতেছে না। দ্বিতীয় প্রভেদ এই,—গ্লাডষ্টোনকে অপর দশ জনকে সঙ্গে লইয়া কাজ করিতে হইতেছে। তাঁহার কার্য্য ঐ দশজনের চিন্তা ও কার্য্যের দ্বারা নিয়মিত হইতেছে। জনসমাজের এই দুই প্রকারে কার্য্য করিবার রীতি আছে। যাহারা দশজনে মিলিয়া কাজ করিতে অসমর্থ; দশজনে একত্র বসিতে গেলেই বিবাদ কলহে তাহাদের দিন পর্য্যবসিত হয়, এবং ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহারা তদ্দ্বারাই প্রমাণ করে যে নিয়মতন্ত্রপ্রণালী তাহাদের জন্য নহে। কোন এক প্রতিভাশালী নেতার অধীনে থাকা তাহাদের পক্ষে শ্রেয়; তাহা হইলে তাহাদিগের দ্বারা কার্য্য হইতে পারে। কোন গৃহে যদি একদল বিবাদ ও কলহকারী দুরন্ত বালক থাকে, তবে সেখানে একজন জবরদস্ত কর্ত্তা না থাকিলে, ঐ বালকদিগের দ্বারা কোনও কার্য্য হয় না। ব্রাহ্মগণ পরস্পরের সহিত বিবাদ করিয়া কি এই প্রমাণ করিতেছেন, নিয়মতন্ত্রপ্রণালী তাঁহাদিগের জন্য নহে; শিশু-দিগের জন্য যে শাসনপ্রণালী ব্যবহৃত হয়, তাঁহাদিগের জন্য ও সেইরূপ প্রণালীর প্রয়োজন?

ঘোষের গঙ্গা—একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারককে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নব-বিধানের মধ্যে প্রভেদ কি?" ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক উত্তর করিলেন, "আপনি এই তিনটী সত্যের প্রতি প্রণিধান করুন"—

১। একমাত্র নিরাকার, পূর্ণপরাৎপর পরমেশ্বরই মানবের উপাস্য।

২। মহম্মদ ঈশ্বর-প্রেরিত মহাজন ও অভ্রান্ত পথ-প্রদর্শক।

৩। মহম্মদ-প্রণীত কোরাণ অভ্রান্ত ও সর্ব্বথা অবলম্বনীয়।

এই সত্যত্রয়কে যাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আপনি ব্রাহ্ম বলেন কি না?

উত্তর। না তাহারা ত মুসলমান।

প্রশ্ন। আচ্ছা আর তিনটী সত্যের প্রতি প্রণিধান করুন।

১। একমাত্র নিরাকার পূর্ণ পরাৎপর পরমেশ্বরই মানবের উপাস্য।

২। কেশবচন্দ্র সেন ঈশ্বর প্রেরিত মহাজন ও অভ্রান্ত পথ প্রদর্শক।

৩। কেশবচন্দ্র সেন প্রণীত নবসংহিতা প্রভৃতি অভ্রান্ত ও সর্ব্বথা অবলম্বনীয়।

উপরি উল্লিখিত সত্যত্রয় যাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগের প্রভেদ কি?

উত্তর। প্রভেদ এই মাত্র মহম্মদের পরিবর্ত্তে কেশবচন্দ্র সেনকে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্ন। তবে মহম্মদের ধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেন বলিবেন না? যদি মহম্মদে আবদ্ধ বলিয়া তাহাকে উদার ব্রাহ্মধর্ম্ম না বলেন, তবে কেশবচন্দ্রে আবদ্ধ ধর্ম্মকে উদার ব্রাহ্মধর্ম্ম কেন বলিবেন? পূর্ব্বোল্লিখিত সত্যত্রয়কে যে ভাবে দেওয়া হইয়াছে, বোধ হয় নববিধানী বন্ধুদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকেই সে ভাবে মানিয়া থাকেন। যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত কথোপকথনটী উদ্ধৃত করিবার অভিপ্রায় এই, সাধুভক্তি অতি স্পৃহণীয় বস্তু হইলেও কোনও সাধুবিশেষে ধর্ম্মকে যখন আবদ্ধ করা যায় তখন আর তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম থাকে না, ইহাই প্রদর্শন করা। কলিকাতার দক্ষিণে রাজপুর হরিনাভি প্রভৃতি জনপদ সকলের সন্নিকট দিয়া এক সময়ে গঙ্গা বহমানা ছিল। কালক্রমে নদী সে পথ পরিত্যাগ করিয়া অপর পথে প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু গঙ্গার প্রতি লোকের এমনি ভক্তি যে তাহারা মজা গঙ্গার প্রাচীন খাতে পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহার জলকে গঙ্গাজল বলিয়া সেবা করিতেছে। যে সকল ধনী লোক ঐ সকল পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন, তাঁহাদের নামে ঐ সকল পুষ্করিণী প্রসিদ্ধ হইয়াছে যথা:—অমুক ঘোষের গঙ্গা, অমুক বসুর গঙ্গা ইত্যাদি। যেমন গঙ্গা না মজিলে আর ঘোষের গঙ্গা বা বসুর গঙ্গা হইতে পারে না, সেইরূপ ধর্ম্ম সংকীর্ণ ও বিকৃত না হইলে ব্যক্তি-বিশেষে আবদ্ধ হয় না। এই সকল সংকীর্ণ ক্ষেত্র হইতে ধর্ম্মকে উদ্ধার করা ব্রাহ্মসমাজের মহান উদ্দেশ্য।

ধর্ম্ম উপদেশে ও জীবনে—একবার একখানি জাহাজ সমুদ্রগর্ভে যাইতে যাইতে ঘোরতর বাত্যার মধ্যে পতিত হইয়াছিল। সেই জাহাজে অপরাপর আরোহীদিগের মধ্যে একজন বিশপ অর্থাৎ প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন। তিনি নিত্য জাহাজের লোকদিগকে লইয়া উপাসনা করিতেন, এবং ধর্ম্ম ধর্ম্ম ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া সকলকে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ঝড়ের প্রকোপ যখন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন আরোহিগণ স্বভাবতঃ অস্থির হইয়া পড়িল। কেহ কাঁদিতেছে, কেহ প্রার্থনা করিতেছে, কেহ বা হতোস্মি করিতেছে, নারীগণ ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। এইরূপে ক্ষণকালের মধ্যে ভীষণ দৃশ্য উপস্থিত হইল। এদিকে জাহাজ মত্তের মত দুলিতেছে; আবলম্বেই সাগর গর্ভে যায়। কাপ্তেন ধীরচিত্তে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে মনোযোগী আছেন এবং জাহাজখানি রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস পাইতেছেন। বিশপটী সকলের অপেক্ষা ত্রস্ত ও ব্যস্ত। তিনি ছুটাছুটী করিতেছেন, একবার নীচে যাইতেছেন একবার উপরে আসিতেছেন। আরোহীদিগের ত্রাসকে আরও দশগুণ বৃদ্ধি করিতেছেন। অব-শেষে ঝড় যখন অতিশয় বাড়িয়া উঠিল, তখন তিনি ত্রস্তে ব্যস্তে কাপ্তেনের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,"কাপ্তেন! কাপ্তেন! জাহাজের অবস্থা কিরূপ দেখিতেছ?" কাপ্তেন ধীরভাবে উত্তর করিলেন,—আর কি? আপনি সকলকে প্রস্তুত করুন, আমরা সকলে সত্বরে প্রভু পরমেশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে উপস্থিত হইব।" শুনিয়া বিশপের প্রাণ উড়িয়া গেল; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এমনি কি হবে, বোধ হয় তাহা হবে না।"—যিনি ঈশ্বর

ঈশ্বর করিয়া লোককে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছিলেন; বিপদকালে তাঁহার মুখে ঈশ্বরের নাম আসিল না, কিন্তু এক-জন জাহাজের কাপ্তেন, বিষয়ী লোক, তাঁহার মুখে সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের নাম প্রকাশ পাইল। জগতে দেখা যায় অধিক ধর্ম্ম ধর্ম্ম যাহারা করে সময়ে সময়ে তাহাদের এই প্রকার শাস্তি হইয়া থাকে; তাহারা ধর্ম্মের প্রতি আস্থা হীন হইয়া যায়। উপদেশে অনেক সময়ে উপদেষ্টার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে।

যাহারা সর্ব্বদা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে, তাহারা যে অনেক সময়ে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, ইহার নিদর্শন মানব সমাজে ভূরি ভূরি পাওয়া গিয়াছে। কত দূর হইতে, কত নিষ্ঠার সহিত, কত ব্যয় ভূষণ করিয়া লোকে কাশী গয়া প্রভৃতি তীর্থ স্থানে আসিয়া থাকে। কিন্তু ঐসকল ধর্ম্মক্ষেত্রে যাহারা সর্ব্বদা বাস করিতেছে, সেখানকার ধর্ম্ম কার্য্যের ভার যাহাদিগের প্রতি ন্যস্ত রহিয়াছে, সেই কাশীর পাণ্ডা ও গয়ার গয়ালিদিগের বিষয় একবার স্মরণ করিলেই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাদিগকে দেখিলে ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা জন্মিয়া যায়। ধর্ম্মকে তাহারা একটা জীবিকার উপায় স্বরূপ জানে, ইহার অতিরিক্ত ধর্ম্মের সহিত তাহাদের কোনও সম্পর্ক নাই। প্রসিদ্ধ মার্টিন লুথার রোম-নগরে গিয়াই ক্যাথলিক ধর্ম্মের অসারতা দর্শন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের প্রধান ক্ষেত্রে তিনি ধর্ম্মের যেরূপ অবমাননা দেখিয়া-ছিলেন এরূপ আর কুত্রাপি দেখেন নাই। দৈনিক জীবনে ধর্ম্ম সাধনের নিয়ম থাকার প্রয়োজন, অথচ সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হয়, ধর্ম্মের বাহিরের মূর্ত্তির সহিত পরিচয় হইয়া পাছে তাহার আভ্যন্তরিক প্রাণের প্রতি উদাসীন হইয়া যাই।

জীবন পরিবর্ত্তন—ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্য জীবন পরিবর্ত্তন। কি উপায়ে মানবের হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয়—কি করিলে মানবের চিত্ত পাপের দিক হইতে ফিরিয়া ঈশ্বরের দিকে যায়? ধর্ম্মের কথা অনেকে বলিতে পারেন, অনেক লোক ঈশ্বর-প্রয়াসী, ধর্ম্মসাধনে অনেক সময় ক্ষেপণ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় পাপের দিকে সংসারের দিকেই থাকিতে পারে। মানবের হৃদয় যখন সংসার হইতে ঈশ্বরের দিকে ফিরে, তখন তাহার কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন প্রকাশ পায়। নদীতে জোয়ার আসিয়াছে কিনা তাহা যেমন নদী বক্ষাস্থত কাষ্ঠ, পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলা যায়, সেইরূপ মানব জীবনের গতি ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়াছে কিনা, তাহা মানবের জীবনের ঘটনা সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বলা যাইতে পারে। যে জীবনে যথার্থ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সেই জীবনের প্রথম লক্ষণ দীনতা। আত্ম সমর্থনের ভাব আর তাঁহার জীবনে দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্যের নিন্দা তিরস্কার সর্ব্বদা মস্তক পাতিয়া বহন করিতেছেন। দীনতা তাঁহার ভূষণ। দ্বিতীয় লক্ষণ, স্বার্থ-নাশ। ধর্ম্মের জন্য ছাড়িতে পারি না এমন স্বার্থ ও সুখ নাই। যাঁহার মুখ ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়াছে, তাঁহার ঈশ্বরের জন্য, ধর্ম্মের জন্য অদেয় আর কি আছে?

জীবনের এই পরিবর্ত্তন লাভ করিবার জন্য সকল ধর্ম্ম সাধনার্থীই ইচ্ছুক। এই হৃদয় পরিবর্ত্তন কি উপায়ে হয়? নদীতে জোয়ার হয় চন্দ্রের আকর্ষণে। যখন সমুদ্রের জল চন্দ্রের আকর্ষণে স্ফীত হয়, তখন নদীতে জোয়ার হয়। নদী ও সমুদ্র ইচ্ছা করিয়া পৃথিবীতে এই জোয়ার উৎপন্ন করিতে পারে না। তবে কি পৃথিবীর ও সমুদ্রের কিছুই করণীয় নাই? আছে পৃথিবী চন্দ্রের নিম্নে আপন বক্ষ বিস্তার করিয়া অবস্থান করিতে পারে; কিন্তু জল ঊর্দ্ধে তুলিবার, নদীর স্রোত ঊর্দ্ধ দিকে প্রবাহিত করিবার শক্তি চন্দ্রেতে আছে।

মানব হৃদয়ের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে ও এই নিয়ম। সেই দয়ার চন্দ্রের শক্তিতেই মানবের হৃদয়ের স্রোতঃ পরিবর্ত্তিত হয়; নিজে ইচ্ছা করিয়া হৃদয়ে এক বিন্দু পরিবর্ত্তনও আনিতে পারে না; কিন্তু মানবকে এই টুকু করিতে হইবে, সেই প্রেম চন্দ্রের নিম্নে আপন হৃদয়কে আনিয়া রাখিতে হইবে; পরিবর্ত্তন তাঁহার কৃপায় হইবে।

সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্তেই নবজীবনপ্রাপ্ত ব্যক্তি-দিগের বিবরণ পাঠ করা যায়। তবে এ সম্বন্ধে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত যেমন আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনাতে পরিপূর্ণ এরূপ প্রায় অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। সেণ্টপলের হৃদয় পরিবর্ত্তনের বিবরণ সকলেই অবগত আছেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মে জগাই মাধাইএর উদ্ধার অল্প আশ্চর্য্যকর নহে। মুসলমান ধর্ম্মে ওমরের নবজীবন লাভ একটী বিস্ময়কর ঘটনা। ওমর একজন মহম্মদের প্রধান শত্রু ছিলেন। তিনি কাবা মন্দিরে সমবেত কোরেশ বংশীয় আত্মীয় স্বজনগণের সমক্ষে দেবতা-দিগের নামে শপথ পূর্ব্বক এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বহির্গত হইয়া-ছিলেন, যে মহম্মদের মস্তক স্কন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন না করিয়া উপবেশন করিবেন না বা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। তদনুসারে তিনি সশস্ত্র হইয়া স্বীয় ভগিনীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভগিনী ও ভগিনীপতি তৎ-পূর্ব্বেই মহম্মদের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক প্রকারে ওমরকে সান্ত্বনা করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু সেই সিংহের ন্যায় বলশালী বীর কিছুতেই শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলেন না। তিনি স্বীয় ভগিনী ও ভগিনীপতিকে গুরুতর-রূপে প্রহার করিলেন। ভগিনীকে যখন প্রহার করেন, তখন তাঁহার ভগিনী তাঁহাকে বলিলেন—"ভাই আমরা এসলাম ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছি, হজরত মহম্মদকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, আমাদিগকে খড়্গ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিলেও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না।" মহম্মদের জীবনচরিত লেখক বলিয়াছেন—"ধর্ম্মেতে ভগিনীর দৃঢ়তা দেখিয়া ওমর বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইলেন ও আপন কার্য্যের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন।" তৎপরে স্বীয় ভগিনী ও ভগিনীপতি ও অপর বিশ্বাসিগণের মুখে কোরাণের কয়েকটী সুরা শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি যেমন বিরোধী ছিলেন তেমনি মহম্মদের অনুগত হইয়া পড়িলেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে দুইটী কারণে ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা লোকের হৃদয়ে প্রবল অনুতাপের উদয় হওয়া কঠিন। প্রথম ব্রাহ্মগণ অনন্ত নরকে বিশ্বাস করেন না, সুতরাং তাঁহা-দের অন্তরে পাপের অনিষ্টকারিতা বোধ তত তীব্র হইবার

কথা নহে। দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন, যে সকলেরই পরিত্রাণ হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে কেহই বর্জ্জিত হইবে না। এই মতও পাপ-বোধের তীব্রতাকে মন্দীভূত করে। কিন্তু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে ভয়, অপেক্ষা প্রেম মানব অন্তরে অধিক কার্য্য করিয়া থাকে। ভয় সকল প্রকৃতির উপরে কার্য্য করে না। কিন্তু প্রেম সকল প্রকৃতির উপরে কার্য্য করিয়া থাকে। শাস্তির ভয় অপেক্ষা ঈশ্বর-প্রীতির দ্বারা মানব-হৃদয়ের অধিক পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। আর ইহা জানিলেই বা কি যে এক সময়ে অনন্ত মুক্তি হইবে। তাহা বলিয়া কি কোনও প্রকৃতিস্থ হৃদয় পাপকে স্পৃহণীয় বোধ করিতে পারে? রোগী যদি জানে দশদিন পরে রোগ নিশ্চয় যাইবে, চিকিৎসকগণ যদি সে বিষয়ে তাহাকে নিশ্চয়-রূপে বলিয়া থাকেন তাহা হইলে কি সে রোগ যন্ত্রণাকে স্পৃহণীয় মনে করিতে পারে? সে কি বলে "আচ্ছা থাক্ থাক্ এই রোগ যাতনা আমার দেহে থাক্, সেইরূপ পাপের কালিমা-ময় মূর্ত্তি যে দেখিয়াছে সে কি পাপ পুষিয়া রাখিতে চাহে। অতএব ইহা নিশ্চিত যে পাপীর নিকটে ঈশ্বরের উদার প্রেমের মহিমা ভাল করিয়া ধরিতে পারিলে, তাহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইবেই হইবে।

অনন্তের আহ্বান—অনন্ত নিয়ত মানবকে মধুরস্বরে ডাকিতেছেন। সমুদ্রস্থ পোতারোহী ব্যক্তি যখন অনিমেষ-নয়নে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করেন, তখন দেখেন আকাশ, সাগরের বেলাভূমির ন্যায় দণ্ডায়মান। উত্তাল তরঙ্গরাজি যেন চতুর্দ্দিকে আকাশের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। চক্ষুর দৃষ্টি সীমা-বদ্ধ। যেখানে কিছু নাই, সেখানেও একটা কিছু সাকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে। কিন্তু অন্তশ্চক্ষু যখন এই অদূরস্থিত কল্পনা-ময় যবনিকা ভেদ করে, তখন প্রাণ এক অনাদ্যনন্ত অসীম সত্তা-সাগরে ডুবিয়া যায়। আকাশরূপী অনন্ত তখন সময় বুঝিয়া মানব প্রাণকে মধুর আহ্বানে আকর্ষণ করিতে থাকে। সান্ত জড়রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ঐ অনন্তের রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য আকাশ গম্ভীর ধ্বনিতে আহ্বান করে। আবার যখন প্রেমে হৃদয় প্লাবিত হয়, যখন প্রীতিভাজনকে দেখিয়া দেখিয়া আশা তৃপ্তি হয় না, প্রাণ পূর্ণ হয় না, দর্শনে বিমুখতা জন্মে না, তখনও ঐ অনন্তের ক্রিয়া। সান্ত প্রেম, পরিমিত ভোগ মানব প্রাণকে তৃপ্তি দান করিতে পারে না। মানব হৃদয় অতি ক্ষুদ্র বটে; কিন্তু প্রেমসুধা যতই কেন ঢাল না, ভাণ্ডার চিরদিন অপূর্ণ থাকিবে। প্রীতিভাজনকে দেখিয়া দেখিয়া, দেখার সাধ মিটে না। অনন্তকাল দেখিতে, ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয়। এখানেও হৃদয় অনন্তমুখীন হইয়া রহিয়াছে। সান্ত প্রেমে, সান্ত ভোগে মানব হৃদয় পরিতৃপ্ত নহে। প্রেমরূপী অনন্ত চিরকাল মানবকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহার ডাকে আকৃষ্ট না হইয়া সান্তভাব লইয়া কেহই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তাই মানবহৃদয় অনন্ত প্রেমের জন্য পাগল। এইরূপে এক মহাসত্তা জ্ঞান, পুণ্য, আনন্দ প্রভৃতির অভ্যন্তরেবাস করিয়া জ্ঞাত অজ্ঞাতসারে মানব হৃদয়কে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। বিশ্বাসী অবিশ্বাসী, পণ্ডিত মূর্খ, সভ্য অসভ্য সকলেই সেই অনন্তের আকর্ষণে আকৃষ্ট এবং তাঁহার দিকে গমনোন্মুখ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "প্রথম বয়সে আমার নিকট এই নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশ, অনন্ত দেবের পরিচয় দেয়। একদিন শুভক্ষণে এই অগণ্য নক্ষত্রপূর্ণ অনন্ত আকাশ আমার নয়নপথে প্রদীপ্ত হইল। তাহার আশ্চর্য্য ভাবে একেবারে আমার সমুদয় মন, সমুদয় আত্মা আকৃষ্ট হইল। অমনি বুদ্ধি আসিয়া সিদ্ধান্ত করিল যে, ইহা কখনও পরিমিত হস্তের রচনা নহে। সেই মুহূর্ত্তে অনন্তের ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হইল।" * * "আমার এই বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বরই শালগ্রাম শিলা, ঈশ্বরই দশভুজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী; কিন্তু শুভক্ষণে যেমন এই অনন্ত আকা-শের উপরে আমার নয়নযুগল উন্মীলিত হইল, অমনি আমার জ্ঞান উন্মীলিত হইয়া পৌত্তলিক ভাবকে ক্ষণকালের মধ্যে তিরোহিত করিয়া দিল। অমনি জানিলাম, অনন্ত আকাশের অগণ্য নক্ষত্র পরিমিত হস্তের কার্য্য নহে, অনন্ত পুরুষেরই এই অনন্ত রচনা। প্রথম উপদেশ অনন্ত আকাশ হইতে পাইলাম।"

অসীম জড় ও চৈতন্যকে পরাভূত করিয়া অনন্তের আহ্বান-ধ্বনি সর্ব্বত্রই উত্থিত হইতেছে, যিনি তাহা শ্রবণ করিয়া তদনুসরণ করেন, তিনিই অমৃতময় রাজ্যে উপস্থিত হন। মহর্ষি যেমন অনন্তের আহ্বান শ্রবণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অনেকেই সজ্ঞানে ঐ মধুরধ্বনি শ্রবণ করেন, কিন্তু মহর্ষির ন্যায় সেই অনন্তের অনুসরণ কয় জনে করিয়া থাকেন? বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই এক অবারিত অনাহত শব্দ উত্থিত হইতেছে তাই ব্রাহ্মকবি গাহিয়াছেন;—

"বার বার প্রেমভরে—ডাকিছ গো মা,
প্রেম বাহু প্রসারিয়ে—ডাকিছ গো মা,
স্নেহে বিগলিত হয়ে—ডাকিছ গো মা,
আয় আয় আয় বলে—ডাকিছ গো মা,
অপরাধ ক্ষমা করে—ডাকিছ গো মা,
হাসিমুখে প্রেমভরে—ডাকিছ গো মা,
জীবের দশা মলিন দেখে—ডাকিছ গো মা।"

ধন্য সেই অনন্ত পথের যাত্রী, যিনি মাতার ডাক শুনিয়া মাতার অঞ্চল ধরিয়া অনন্ত পথে গমন করেন।

রামমোহন রায়—আর কতদিন আমরা রামমোহন রায়ের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন বিষয়ে উদাসীন থাকিব? তাঁহার ন্যায় স্বদেশবৎসল ব্যক্তি কয়জন জন্মিয়াছেন? তাঁহার ন্যায় স্বদেশের জন্য এত পরিশ্রম বা কে করিয়াছেন? আমরা তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন অদ্যাপি স্থাপন করিতে পারিলাম না, ইহা এদেশের লোকের পক্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গালিদিগের পক্ষে বড় নিন্দার কথা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একবার বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি-স্তম্ভ। এ কথা সত্য তাহার আর সন্দেহ কি? চৈতন্য নানক, কবীর প্রভৃতি মহাত্মাগণের কি কির্ত্তি স্তম্ভ আছে? তাঁহারা সহস্র সহস্র

নরনারীর চিত্তে বাস করিতেন, ইহাই তাঁহাদের কীর্ত্তি-স্তম্ভ। রামমোহন রায়ও সেই প্রকার মানব-চিত্তে বাস করিবেন, তাঁহার আবার স্বতন্ত্র স্মৃতিচিহ্ন কি? কিন্তু জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় গুণাবলীর বিকাশের দিকে দৃষ্টি করিলে, স্বদেশোপকারী মহাজনগণের কোনও প্রকার স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়। মহাজনদিগের স্মৃতিচিহ্ন দ্বারা দেশকে পূর্ণ করার ন্যায় জাতীয় প্রতিভা ও জাতীয় গুণাবলীর বিকাশের উৎকৃষ্ট উপায় অতি অল্পই আছে। কেবল রামমোহন রায় কেন, জ্ঞানে ধর্ম্মে ও পরোপকারে যে কেহ শ্রেষ্ঠ পদবী অধিকার করেন, তাঁহারই স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কি দুর্ভাগ্যের বিষয়! দেশের কি দুর্দ্দশা! হরে, নরে, পরাণে সকলেরই স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হয়, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি যিনি তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিতে কেহই উদ্যোগী নহে। এক সময়েই ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হইয়াছে, একদিনে তাঁহাদের উভয়ের স্মরণার্থ সভা আহূত হইয়াছিল, কোন দিন হয়ত শুনিব ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একটী উৎকৃষ্ট প্রতিমূর্ত্তি বিলাত হইতে নির্ম্মিত হইয়া আসিয়াছে; ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসনের হলে তাহা খোলা হইবে; কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রতিমূর্ত্তির কথা আর শুনা যাইবে না। ইহার কারণ এই, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন বিষয়ে জমিদারগণ উৎসাহী। তিনি তাঁহাদেরই লোক ছিলেন। সুতরাং সেটা শীঘ্র হইবার আশা আছে। বিদ্যাসাগর দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন; দরিদ্রগণ তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া উঠিতে পারিবে না। যাহা হউক রামমোহন রায়ের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করা বাঙ্গালি মাত্রেরই কর্ত্তব্য; বিশেষ ব্রাহ্মদিগের। রামমোহন রায় সহরের প্রান্তে যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন, সে ভবন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে, সে ভবন তাঁহার বংশধরদিগের হস্ত হইতে অন্য হস্তে গিয়াছে। এক্ষণে সেই বাটীতে সুকিয়া ষ্ট্রীটের থানা রহিয়াছে। একটু চেষ্টা করিলে টাকা তুলিয়া ঐ বাড়ীটী ক্রয় করিয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রাখা যাইতে পারে। তাহাতে তাঁহার নামে একটী লাইব্রেরী স্থাপন করা যাইতে পারে। তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি তাহার মধ্যে রাখা যাইতে পারে। আমাদের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি যদি প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া এবিষয়ে লাগেন, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। বিগত ২৭ সেপ্টেম্বর সিটীকলেজ ভবনে রাজার স্মরণার্থ সভা হইয়াছিল, প্রতি বৎসর এইরূপ সভা হইবে। কিন্তু তাঁহার একটা স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন বিষয়ে সকলের মনোযোগী হওয়া উচিত।

বিশ্বাসীর বাধ্যতা।

বিশ্বাসিগণ আপন জীবনে এক প্রকার বাধ্যতা অনুভব করেন, যে বিষয়ে চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মহাপুরুষ মহম্মদের জীবন চরিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি যখন প্রকাশ্যে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার স্বজাতীয় কোরেশ বংশীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার ও তাঁহার শিষ্য দলের প্রতি বিবিধ প্রকার নির্যাতন আরম্ভ করিলেন। কয়েকজন কোরেশ দলপতি সমবেত হইয়া একদিন মহম্মদের খুল্লপিতা আবুতালেবের নিকট গমন করিয়া বলিলেন:—"তোমার এই ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক অদ্ভুত নূতন ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়াছে। সে আমাদের দেবতাদিগের নিন্দা করে, ও লোক সকলকে বিপথগামী করিতেছে; এতদ্ভিন্ন সে আমাদিগকে পথভ্রান্ত-ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া থাকে। আমরা প্রথমতঃ এজন্য তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, যে তুমি তাহাকে উপদেশ দিবে পুনর্ব্বার যেন সে আমাদিগকে ও আমাদের ঠাকুর সকলকে এরূপ অনুচিত কথা না বলে। অতঃপর সে যদি তোমার উপদেশে নিবৃত্ত না হয় তবে আমরা যে উপায়ে হোক তাহাকে নিবারণ করিতে সচেষ্ট হইব।" শান্তি-প্রিয় আবুতালেব কোরেশ দলপতিদিগের এই বৈর-নির্যাতন-স্পৃহা-সূচক বচন শ্রবণ করিয়া স্পষ্টই অনুভব করিলেন যে, আত্মীয় স্বজনগণের মধ্যে ঘোর বৈরানল প্রজ্বলিত হইল। মহম্মদ তাঁহার অবলম্বিত পথ হইতে নিবৃত্ত না হইলে এ বৈরানল নির্ব্বাণ করিবার উপায়ান্তর নাই। এবং ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, মহম্মদকে শত্রুকুলের হস্তে নিদারুণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। ইহা অনুভব করিয়া আবুতালেব মহম্মদকে স্বীয় সন্নিধানে ডাকিলেন এবং ব্যগ্রতার সহিত তাঁহার অবলম্বিত পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কোরেশগণ তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিল, তাহা জ্ঞাপন করিলেন, এবং আশঙ্কিত বিপদ প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করিলেন না। কিন্তু মহম্মদ ভীত হইবার পাত্র ছিলেন না। বিশ্বাসবলে তাঁহার হৃদয় সবল ছিল। তিনি উত্তর করিলেন:—"তাত, মোহম্মদের প্রাণ যে ঈশ্বরের শক্তিপূর্ণ হস্তে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার নামে আমি বলিতেছি, যদি কোরেশগণ সূর্য্যকে আনয়ন করিয়া আমার দক্ষিণ হস্তে ও চন্দ্রকে বাম হস্তে স্থাপন করে এবং এই অলৌকিকতা প্রদর্শন করিয়া আমাকে বলে যে তুমি কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাক, তাহা হইলেও আমি অবশ্য প্রয়াস পাইব, হয় এসলাম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিব, না হয়, প্রাণ দিব।" শুনিয়া আবুতালেব স্তব্ধ হইয়া গেলেন। বুঝিলেন মহম্মদ নিবৃত্ত হইবেন না।

জিজ্ঞাসা করি মহম্মদ যে বাধ্যতা জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সে বাধ্যতা কোথা হইতে আসিল? সকল মহাজনের জীবনেই এই প্রকার বাধ্যতা দেখিতে পাওয়া যায়। মহাত্মা যীশু তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে সর্ব্বদাই ভাবে ও সংকেতে বলিতেন যে, ত্বরায় তাঁহাকে শত্রুহস্তে নিধন প্রাপ্ত হইতে হইবে। অথচ সেই পথেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন যাহাতে শত্রু হস্তে নিধন প্রাপ্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এ বাধ্যতা কোথা হইতে আসিল? তিনি কি মনে করিলে মৃত্যুকে পরিহার করিতে পারিতেন না? প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া গোঁড়া ধর্ম্মযাজকদিগের শত্রুতার অগ্নি প্রজ্বলিত না করিয়া কি থাকিতে পারিতেন না? তিনি কি

মনে করিলে ন্যাজারেথ নগরের সূত্রধরের কারখানাতে সুখে সচ্ছন্দে দিন যাপন করিতে পারিতেন না? কে তাঁহাকে এ পথে আসিতে বাধ্য করিল? আর সে বাধ্যতা যা এত প্রবল কি প্রকারে হইল, যাহাতে মৃত্যুভয়ও ভয় বলিয়া গণ্য হইল না? সকল মহাজনের জীবনে এই একই প্রশ্ন। চৈতন্য যে সময়ে হরিনাম প্রচারের জন্য বহির্গত হইলেন, সে সময়ে সেই নবদ্বীপ নগরেই কত পণ্ডিত ছিলেন, যাঁহারা সচ্ছন্দচিত্তে নিজ গৃহে বসিয়া ছাত্রবৃন্দের পাঠনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। চৈতন্যও যৌবনের প্রারম্ভে ঐরূপ পাঠনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মনে করিলেন কি জীবনের অবশিষ্ট কাল পায়ের উপরে পা দিয়া ছাত্র পড়াইয়া শেষ করিতে পারিতেন না? সে পথ থাকিতে কে তাঁহাকে নূতন পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য করিল, যে পথে গিয়া তিনি লোকের উপহাস বিদ্রূপ ও নির্য্যাতনের পাত্র হইলেন? এ বাধ্যতা কোথা হইতে আসিল? মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের বিষয় স্মরণ কর। তিনি যে সময়ে বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা সহরে আসিয়া বাস করিলেন, তখন হঠাৎ ধনী হইবার দিন ছিল। তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ও তৎকালে, রামদুলাল সরকার, বিশ্বনাথ-মতিলাল, মতিলাল শীল, ও রামকমল সেন প্রভৃতি অনেকে সামান্য সামান্য অবস্থা হইতে অল্প দিনের মধ্যে প্রচুর ধনশালী হইয়া উঠিতেছিলেন। রামমোহন রায় মনে করিলে কি সেই পথ অবলম্বন করিতে পারিতেন না? তাঁহার ন্যায় ধন মান সঞ্চয় করিবার সুবিধা কাহার ছিল? তিনি যদি বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া না আসিতেন তাহা হইলে কি অচিরকালের মধ্যে ধনিদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি হইতে পারিতেন না? হিন্দুসমাজের দলপতি ও সর্ব্বোচ্চপদস্থ ব্যক্তি হইয়া কি জীবনের অবশিষ্ট কাল থাকিতে পারিতেন না? কে তাঁহাকে সে পথ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কাররূপ দুরূহ কার্য্যে আত্ম-সমর্পণ করিবার জন্য বাধ্য করিল? তিনি কি তাঁহার কার্য্যের ফলাফল বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন? তিনি কি জানিতেন না যে এই পথে গমন করিলে তিনি স্বদেশ বাসিদিগের দ্বারা নিগৃহীত হইবেন? তাহা তিনি পরিষ্কাররূপে জানিতেন, পরিষ্কাররূপে নিজ গ্রন্থে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, যে তাঁহার বিবেক তাঁহাকে যে পথে অগ্রসর হইতে বাধ্য করিয়াছে সে পথে অগ্রসর হইয়া তিনি আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন এবং বিবিধ প্রকারে লোকের নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন; কিন্তু তথাপি তিনি দুঃখিত নহেন।"

এ বাধ্যতা কোথা হইতে আসিল? প্রত্যেক নিঃস্বার্থ, পরপ্রেমিক ও বিশ্বাসী হৃদয়ে এই বাধ্যতা অনুভূত হইয়া থাকে। মলিন ও কলুষিত হৃদয়ে এই বাধ্যতা অনুভূত হয় না। চিত্ত যত কলুষিত হয়, ততই বিবেকের বাধ্য করিবার শক্তি হ্রাস হইয়া যায়। আর যতই চিত্ত নির্ম্মল ও স্বার্থশূন্য হয় ততই তাহা ধর্ম্ম নিয়মের অনুগত হয়। আমরা কি স্বীয় স্বীয় জীবনে এই বাধ্যতা অনুভব করি না? ব্রাহ্মগণ কোন্ বলে স্বীয় স্বীয় স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন? আজ যদি তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়স্থিত বিশ্বাসকে গোপন করেন, যদি আজ প্রাচীন সমাজের নিকট মস্তক অবনত করিয়া বলেন—"যে তাঁহারা এতদিন যাহা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা ভ্রান্তি, তাহা হইলে তাঁহারা কল্যই লোকের প্রিয় ও আদরণীয় হইতে পারেন। কিন্তু তাহা না করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে আশ্রয় করাতে তাঁহারা প্রতিদিন কত প্রকার লোকের নির্য্যাতন সহ্য করিতেছেন। এ সমুদায় এক দিনে নিবারিত হইতে পারে, অথচ কে তাঁহাদিগকে এই নির্য্যাতন সহ্য করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিতে বাধ্য করিতেছে?

সত্য, ন্যায়, প্রীতি, পবিত্রতা প্রভৃতি সমুদয় মঙ্গল ভাবেরই মানব-হৃদয়ের উপরে এক প্রকার বাধ্যতা আছে। হৃদয় স্বভাবতঃই এই সকলের অনুগত হয়, যদি স্বার্থপ্রবৃত্তি বা অপর কোনও কলুষিত ভাব আসিয়া তাহাকে কলুষিত না করে। এই জন্যই ব্রাহ্মকবি গাইয়াছেন ;—

সহজেই ধায় নদী সিন্ধুপানে
কুসুম করে গন্ধদান ;
মন সহজে সদা চাহে তোমারে,
তোমাতেই অনুরাগী, মোহ যদি না ফেলে আঁধারে।"

বাস্তবিক নদীর গতি যেমন স্বভাবতঃ নিম্নাভিমুখে যায়, কুসুমের গন্ধ যেমন স্বভাবতঃ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয় তেমনি নির্ম্মল মন স্বভাবতঃ ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত হইয়া থাকে। কিন্তু চিত্তের এই নির্ম্মলতা লাভ করাই দুষ্কর।

যেমন সাধারণ ভাবে সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতার এক প্রকার বাধ্যতা আছে। প্রকৃতিবিশেষে, কার্য্যবিশেষের সেই প্রকার বাধ্যতা দৃষ্ট হয়। কোন্ কার্য্যে কোন্ ব্যক্তির হৃদয় মনের অনুরাগ জন্মিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। ঈশ্বর কোন্ দিকে কাহাকে প্রেরণ করেন তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহার প্রেরণা যখন হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন মানুষকে পরাধীন করিয়া ফেলে। সেণ্টপল বারবার বলিয়াছেন, "আমি বন্দী, আমার স্বাধীনতা নাই, আমি প্রচার না করিয়া থাকিতে পারি না।" এই পরাধীন ভাব মানবের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির এক নিগূঢ় তত্ত্ব। যদি কাহারও হস্ত পদ রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকে, তবে সে ব্যক্তি দৌড়িতে পারে না কেন বলিয়া অনুযোগ করা যেমন বৃথা, তেমনি ঈশ্বরানুপ্রাণিত ব্যক্তিগণের কার্য্য কলাপের প্রতিবাদ করাও বৃথা। তাঁহারাও অনুভব করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের স্বাধীনতা নাই। গুটিপোকার পক্ষে গুটি না বুনিয়া থাকা যেরূপ অসম্ভব, তাঁহাদের পক্ষে ঈশ্বরাদিষ্ট পথে না চলাও সেইরূপ অসম্ভব। ঈশ্বরানুপ্রাণিত ব্যক্তিদিগের এই লক্ষণ দেখিয়া জগৎ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, ও ব্রহ্মশক্তির গুরুত্ব ও প্রভাব অনুভব করিয়াছে।

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ধর্ম্মভাব।

(ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে উপাসনা কালে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ)

অদ্য আমাদের প্রিয় পত্রিকা ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের বার্ষিক উৎসবের দিন। অদ্য প্রাতে আমেরিকা হইতে সমাগত এক-

খানি পত্রিকা হস্তে করিয়া একটী চিন্তা হৃদয়ে উদিত হইতেছিল। সে চিন্তাটী এই:—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঐ পত্রিকা খানি যখন প্রথম বাহির হয়, তখন এক খণ্ড কাগজ মুদ্রিত হইত এবং দেখিলেই বোধ হইত, কাগজখানি অধিক দিন স্থায়ী হইবে না। যাঁহারা কাগজ খানি বাহির করিয়াছিলেন, তাঁহারা ও ভয়ে ভয়ে বাহির করিয়াছিলেন। উদার ধর্ম্মভাব লোকে পছন্দ করিবে কিনা তাঁহাদের মনে এই আশঙ্কা ছিল। কিন্তু দেখিতে পাইলাম যতই বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল, ততই তাঁহাদের কাগজের উন্নতি হইতে লাগিল। এক দিকে কাগজের কলেবর বৃদ্ধি হইতে লাগিল; অপর দিকে তাহার অন্তর্ভূত বিষয় সকলেরও বিশেষ উৎকর্ষ লক্ষিত হইতে লাগিল। এবারে সে কাগজখানির আরও উন্নতি হইয়াছে। কাগজখানি হস্তে পড়িলেই আনন্দ হয়। কাগজখানি হাতে করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কার্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে কত প্রভেদ। পাশ্চাত্য দেশ সকলের সদনুষ্ঠানের গতি যেন নদীর গতির ন্যায়। নদী সকল গিরিশৃঙ্গ হইতে যখন নিঃসৃত হয়, তখন তাহাদের আয়তন অতি সংকীর্ণ থাকে। প্রস্তর রাশির মধ্য দিয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া একটী জলধারা নামিতেছে। একটী শৃগাল বা একটী কুকুর মনে করিলেই তাহাকে পান করিয়া যাইতে পারে। তখন সে নির্ঝরিণীকে দেখিলে বোধ হয় না যে কখনও তাহার এত বল বিক্রম হইবে, যে তাহা সুবিশাল পদ্মার ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গ্রাম জনপদ প্রভৃতি উন্মূলিত করিয়া ধাবিত হইবে। কিন্তু নদী যতই সমতলে অবতীর্ণ হইতে থাকে, ততই শাখানদী সকলের সহিত সম্মিলিত হইয়া বিশাল আকার ধারণ করে; তখন মহা মহা তরণী সকল তাহার বেগকে অতিক্রম করিয়া পারে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। পাশ্চাত্য শুভানুষ্ঠানের প্রকৃতি এইরূপ। আজ দুই চারিটী লোক লইয়া একটী শুভকার্য্যের সূত্রপাত হইতেছে। অপেক্ষা কর কিছু দিন না যাইতে যাইতে দেখিতে পাইবে, কত শত শত লোক তাহাতে যোগ দিয়াছেন, এবং তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র কতদূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। জানি না আপনারা সকলে শুনিয়াছেন কি না ইংলণ্ডে ভদ্রমহিলাদিগের একটী সভা আছে। হাঁসপাতালের রোগীদিগকে ফুল উপহার দেওয়া ঐ সভার উদ্দেশ্য। সভার সভ্যগণ স্থানে স্থানে এক একটী ঘর ভাড়া করিয়া রাখিয়াছেন। সেই ঘরে সপ্তাহে দুই দিন বা তিন দিন প্রাতে মহিলা সভ্যগণ পালা করিয়া সমবেত হন। গরিব লোকদিগকে ফুল যোগাইবার জন্য দাদন দেওয়া থাকে। যে দিন সভাগৃহ খোলা হয়, সে দিন চতুর্দ্দিক হইতে ভার ভার ফুল আসিতে থাকে; এবং মহিলা সভ্যগণ সেই সকল তোড়া বটন করিয়া হাঁসপাতালে প্রেরণ করিতে থাকেন। কয়েক ঘণ্টা এই কার্য্যে যাপন করিয়া সকলে স্বীয় স্বীয় ভবনে প্রতিনিবৃত্ত হন। এই সভা বহু বৎসর জীবিত রহিয়াছে এবং বৎসর বৎসর তাহার উন্নতি হইতেছে। প্রথম প্রথম দুই একটী হাঁসপাতালে ফুল প্রেরণ করা হইত, এক্ষণে বহুসংখ্যক হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়। সে দিন আর একটী অদ্ভুত সভার বিবরণ পাঠ করিয়াছি। সে দেশের পল্লীগ্রামস্থ একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদক এই সভা স্থাপন করিয়াছেন। তিন বৎসর হইতে ৭।৮ বৎসর বয়সের বালক বালিকা ইহার সভ্য। অর্থাৎ যাহারা কোন প্রকারে আপনার নাম স্বাক্ষর করিতে পারে, তাহারা ইহার সভ্য। প্রত্যেক নূতন সভ্যের নিকটে একখানি ছাপা পোষ্টকার্ড প্রেরিত হয়, তাহাতে স্থূল স্থূল কয়েকটী প্রতিজ্ঞা থাকে তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া ফেরত পাঠাইলেই সভ্য হওয়া যায়। সভ্যদিগকে অপরাপর কার্য্যের মধ্যে একটা কাজ এই করিতে হয় যে, খ্রীষ্টের জন্মোৎসবের পূর্ব্বে পুরাতন খেলানা সকল সংগ্রহ করিয়া ডাকযোগে সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হয়। তিনি ঐ সকল পুরাতন খেলানাকে একটু রঙ্ চঙ্ দিয়া নূতন করিয়া গরীবদিগের কুটীরে কুটীরে শিশুদিগকে বিতরণ করেন। পুরাতন খেলানা সংগ্রহ করা শিশু সভ্যদিগের একটা মহা উৎসাহকর কার্য্য। অনেক শিশু সভ্য সম্বৎসর ধরিয়া পুরাতন খেলান সংগ্রহ করিয়া রাখে। খ্রীষ্ট মাসের পূর্ব্বে পিতা মাতার দ্বারা বাক্সবন্দী করিয়া সম্পাদকের নিকট ডাকে প্রেরণ করে। সংবাদপত্রে পড়িলাম এই সভার দিন দিন এত উন্নতি হইতেছে যে বিগত বৎসর প্রায় ১৫।১৬ হাজার খেলানা সংগ্রহ হইয়াছিল। সে দেশের সকল প্রকার শুভানুষ্ঠানের ভাব এই প্রকার।

আমাদের দেশে ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থা। আমাদের দেশে অনেক শুভানুষ্ঠান মহোৎসাহে আরম্ভ হয়, কিন্তু নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় পরিণামে ম্লান ভাব ধারণ করে। লোকের উৎসাহ ও অনুরাগ বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাক্ মন্দীভূত হইয়া যায়। কাজটা মরা জরা হইয়া চলিতে থাকে। ইহার কারণ কি? প্রধান কারণ এই, আমাদের দায়িত্ব জ্ঞান অতি অনুজ্জ্বল। কর্ত্তব্য বোধে যাহাতে হস্তার্পণ করি, তাহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে যে আমরা বাধ্য, তাহা আমরা অনুভব করি না। যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করা যায়, তাহা অতি অসম্পূর্ণ রূপেই সম্পাদন করিয়া থাকি। দ্বিতীয়তঃ এই সকল সদনুষ্ঠানকে আমরা ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমরা মনে করি, হাঁসপাতালে রোগীদিগকে ফুল প্রেরণ করা, গরিবের ছেলেদিগকে খেলানা বিতরণ করা ইহাতে আবার ধর্ম্ম কি আছে? হাঁ যদি একজন উদয়াস্ত ধ্যানে বসিয়া থাকিতে পারে বা কুম্ভক করিতে পারে, বা তিন ঘণ্টা ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া চেঁচাইতে পারে, তাহারই ধর্ম্ম হয়। ভিতরে এই প্রভেদটী লুকাইয়া রহিয়াছে। সে দেশের লোকে মনে করে, মানবের রোগ শয্যার ন্যায় কষ্টকর অবস্থা কি আছে। দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি এক ভাবেই যাইতেছে, সেই রোগযন্ত্রণা, সেই ঔষধ সেবন, সেই চিকিৎসকের মূর্ত্তি, সমুদায়ই হৃদয়কে বিষণ্ণ ও মলিন করিতে থাকে। এরূপ ব্যক্তির হস্তে একটী ফুলের তোড়া যদি যায়, তাহার মলিন মুখে কি একটু প্রসন্নতার উদয় হয় না? সেই পুষ্পগুচ্ছ তাহাকে প্রকৃতির শুদ্ধতা, সজীবতা ও প্রসন্নতা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহার যন্ত্রণাময় নরকবাসের মধ্যে স্বর্গের স্ফূর্ত্তিময় নিঃশ্বাস আনিয়া দেয়। এই আনন্দটুকু উৎপাদন করা কি ধর্ম্ম নয়? সেইরূপ আমরা সকলেই জানি খেলানার প্রতি শিশুদিগের কিরূপ আগ্রহ। একটী সুন্দর খেলানা পাইলে তাহাদের প্রাণে কি আনন্দই হয়। এই আনন্দ কি কেবল ধনির

সন্তানের প্রাণেই হয়, দরিদ্রের সন্তানের প্রাণে কি হয় না? কিন্তু হায় কত দরিদ্রের কুটীরে কত সহস্র সহস্র শিশু রহিয়াছে যাহারা বৎসরের মধ্যে একটীও খেলানার মুখ দেখিতে পায় না। তাহারা শৈশব-সুলভ অজ্ঞতাবশতঃ স্বীয় পিতা মাতার অবস্থা না জানিয়া কত সময় কাঁদিয়া জননীর অঞ্চল ধরে—"মা খেলানা দেও"। এবং হয়ত খেলানার পরিবর্ত্তে জননীর হস্তের প্রহার পাইয়া ক্রন্দন করিতে থাকে, না হয়, মাতা ও সন্তান উভয়ের চক্ষে জলধারা বহিতে থাকে। এই সকল দরিদ্রের গৃহে বৎসরান্তে যে দিন কতকগুলি সুন্দর খেলানা উপস্থিত হয়, তখন কল্পনা করিয়া দেখ সেখানে কি আনন্দধ্বনিই উঠিয়া থাকে। মাতা ও সন্তানের প্রাণে কি অপূর্ব্ব সুখের সঞ্চার হয়। দরিদ্রদিগকে এতটুকু সুখ দিবার জন্য যাঁহারা শ্রম করা আবশ্যক বোধ করিয়াছেন তাঁহারা কি ধর্ম্মকার্য্য করিতেছেন না? আমরা সদনুষ্ঠান সকলকে ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না বলিয়াই তাহাতে মন প্রাণ দিয়া লাগিতে পারি না। এ বিষয়ে ব্রাহ্মেরাও প্রাচীন প্রাচ্যভাবকে অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না। একজন পরোপকারার্থে কোনও কার্য্য করুন, ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছা জানিয়া তাহাতে প্রাণ মন সমর্পণ করুন, বিশুদ্ধ ঈশ্বর-প্রীতি তাঁহার চালক হউক, সবই হউক, তথাপি ব্রাহ্মদিগের অনেকের মুখে শুনা যাইবে,—"উনি কাজ কাজ করেন, কাজে কি হইবে ধর্ম্ম চাই।" ধর্ম্ম যেন মানবজীবন হইতে একটা স্বতন্ত্র বস্তু। সে ব্যক্তি যে দিন কাজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এক কোণে বসিয়া কুম্ভক করিতে আরম্ভ করিবেন সে দিন ঐ ব্রাহ্মগণ বলিবেন হাঁ এত দিনের পর ধর্ম্ম গজাইতেছে। এইরূপে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় দেশের ধর্ম্মভাবগত মতের পার্থক্য থাকাতেই কার্য্যগত প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে। আমরা ব্রাহ্ম, আমাদের জীবনে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় ভাব সম্মিলিত হইবে। আমরা প্রাচ্য ধ্যান ও পাশ্চাত্য কর্ম্ম উভয়ই জীবনে সাধন করিব। জ্ঞানে ও ধ্যানে ও তপস্যাতে যেমন আগ্রহ থাকিবে, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে ও তেমনি অনুরাগ হইবে। ঈশ্বর আমাদিগকে এই পূর্ণ ধর্ম্মভাব প্রদান করুন।

রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা।

গত ২৭ শে সেপ্টেম্বর সিটিকলেজ গৃহে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়াছি। অনেক দিন হইতে এমন দৃশ্যনয়ন পথে পতিত হয় নাই। অদ্য রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিন। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সুদূর ব্রিষ্টল নগরে মানবলীলা সংবরণ করেন। আজ তাঁহার স্বদেশ বাসী হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম সকলে তাঁহাকে স্মরণ করিবার জন্য সম্মিলিত।

অদ্য সিটিকলেজ গৃহে সভা হইবে বলিয়া সামান্য ভাবে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। অধিক লোক সমাগত হইবার জন্য জাকাল বিজ্ঞাপন কিম্বা কোনও প্রকারের আয়োজন করা হয় নাই। প্রতি বৎসর যেমন সামান্য ভাবে উদ্যোগ হইয়া থাকে, এবার ও, সেইরূপ হইয়াছিল। সিটিকলেজের ত্রিতল গৃহে সভাধিবেশনের স্থান হয়। সভাপতির দক্ষিণভাগে মহিলাগণের বসিবার আসন এবং অন্যান্য দিকে পুরুষগণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সভারম্ভ হইবার কথা। দুইটার সময় হইতে লোক যাইতে আরম্ভ করে। চারিটার সময় হল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ৪॥ টার সময় এত লোক হইল যে, সভা স্থলে দাঁড়াইবার একটুক স্থানও রহিল না। কলেজের নিম্নে, প্রাঙ্গনে এবং উঠিবার সিঁড়িতে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। লোকের উৎসাহ প্রফুল্লভাব এবং আগ্রহ দেখিয়া প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি উদ্যোগ কর্ত্তাগণ নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়া লোক স্রোত দেখিতে লাগিলেন এবং কি উপায়ে অদ্যকার কার্য্য সকলের সন্তোষজনকরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ লোক স্রোত বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন যে, কলেজ প্রাঙ্গনে আর একটি সভা করিয়া বক্তৃতাদি করিবেন।

এই পরামর্শ স্থির হইলে ছাত্র, শিক্ষক এবং অন্যান্য ভদ্রলোকগণ নিজ হস্তে কলেজ গৃহ হইতে বেঞ্চ আনিয়া প্রাঙ্গনে স্থাপন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছেন, তাঁহারাই স্বহস্তে বেঞ্চ আনিয়া অন্যকে বসিতে দিতেছেন, ইহা বড়ই সুখকরদৃশ্য। সকলের হৃদয়ে যেন উৎসাহ ও আনন্দের তাড়িত স্রোত বহিতেছে। অতি অল্প সময় মধ্যে নব সভার আয়োজন শেষ হইল। অনেকে বেঞ্চে বসিলেন, অনেকে চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। উপরে এবং নীচে প্রায় দুই হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। দুই স্থানে একই সময় দুই ২৫ সভার কার্য্য হইতে লাগিল। উপরে মাননীয় ডাঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সুবিখ্যাত বক্তা শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্নিময়ী ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বক্তৃতার ভাষা, ভাব এবং উচ্ছ্বাসে শ্রোতাগণ মুগ্ধ হইয়াছিল। তাড়িত সঞ্চারের ন্যায় মুহূর্ত্তের জন্য সকলের হৃদয়ের অবসন্নতা দূরীভূত হইয়াছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের শিক্ষা সম্বন্ধীয় অপারিসীমজ্ঞান ও প্রতিভার বিষয় বক্তা অনন্ত ভাষায় বর্ণনা করেন। কালিচরণ বাবু গুণগ্রাহী, সাধুগণের মর্য্যাদা রক্ষাকারী, অপক্ষপাতী এবং প্রতিভান্বিত বক্তা। একাধারে এসমস্ত গুণের সমাবেশ অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখা যায়। এজন্যই কালীচরণ বাবুর বক্তৃতা কামানের গোলার মত সকলের হৃদয়কে ভেদ করে।

কালীচরণ বাবুর বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন গুহ এবং তৎপর শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা প্রদান করেন। নগেন্দ্র বাবুর বক্তৃতায় সভাপতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে,তিনি বিশেষ ভাবে বক্তার গুণানুবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ঐ সভাতে শ্রীযুক্ত বাবু সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মধুময়কণ্ঠে রাজার স্বরচিত সংগীত করিয়াছিলেন।

নীচে কলেজ প্রাঙ্গনের সভায় শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ

মোহালের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বক্তৃতা করেন। যদিচ বক্তৃতা করিবার জন্য ইঁহারা কেহই প্রস্তুত ছিলেন না; তথাপি ইঁহাদের সকলেরই বক্তৃতা অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র অতি ওজস্বিনী ইংরাজি ভাষায় রামমোহন রায়ের চরিত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। তৎপর কৃষ্ণবাবু বাঙ্গালাতে কিছু বলেন, অবশেষে শাস্ত্রী মহাশয় বক্তৃতা করেন। সভাপতি মিঃ বসু প্রথমতঃ সভা আরম্ভসূচক অতি হৃদয়গ্রাহী মন্তব্য প্রকাশ করেন, তৎপরে বক্তাগণের বক্তৃতা শেষ হইলে, তিনি অনন্ত ভাষায় সংক্ষেপে বক্তৃতা করেন। সভাস্থ সকলে অতি নিবিষ্ট-চিত্তে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। রাত্রি হইলে এই স্থলের বক্তৃতা বন্ধ হয়। এখানে আলোর কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। উপরে আলোকময় গৃহে তখনও বক্তৃতা চলিতে থাকে।

এবার লোকের আগ্রহ এবং উৎসাহ দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁহার জীবনে সকল গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি সামঞ্জস্যভূত উন্নতি সাধনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ঈশ্বর-প্রেমিক ছিলেন। পরমেশ্বরের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। তিনিই এদেশে ব্রহ্মোপাসনার বীজ বপন করেন। তিনি একদিকে যেমন ধার্ম্মিক, ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন, অপর দিকে অদ্বিতীয় রাজনৈতিক এবং সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। তাঁহার প্রেম কেবল এ দেশে আবদ্ধ ছিল না। তিনি পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে আপনার মত ভাল বাসিতেন। অপর দিকে ব্রহ্ম বিদ্যালাভের জন্য সংস্কৃত, হিব্রু, লাটিন পারসি, আরবি প্রভৃতি ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। একাধারে বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম্ম জ্ঞান বিশ্বপ্রেম, রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি যাবতীয় গুণ সন্নিবেশিত হইয়াছিল। সকল বিষয়ে এরূপ অপূর্ব্ব সমন্বয় বর্তমান সময়ে কয় জনের জীবনে ঘটিয়াছে? এসকল কারণেই তিনি উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তিনি যে আদর্শ সাধন করিবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়াছিলেন, পরমেশ্বর করুন, এদেশের লোক যেন সেই আদর্শ সাধন করিতে সমর্থ হয়। সত্য রক্ষা, স্বাধীনতা স্ত্রীজাতির প্রতি প্রেম, বিশ্বজনীন ধর্ম্ম-সাধন, জ্ঞানালোচনা, শিক্ষানুরাগ প্রভৃতি বিষয়গুলির পূর্ণতা সাধনই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। এদেশের লোক যতই তাঁহার উচ্চ আদর্শের দিকে গমন করিবে, ততই দেশের মঙ্গল। এজন্যই রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় আগ্রহ, উৎসাহ এবং সকলকে ঐকান্তিক যত্নের সহিত যোগদান করিতে দেখিলে প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। এবং আশা হয় যে, দেশবাসিগণ এক দিন না এক দিন রামমোহন রায়ের আদর্শ অনুসারে জীবন গঠন করিয়া ভারতমাতার দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইবে।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদকদায়ী নহেন, কিম্বা কাহারও পত্র ফেরত দিতে বাধ্য নহেন)

বাণীবনে ব্রাহ্মপল্লি স্থাপন।

বহুসংখ্যক ব্রাহ্মগণের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া একস্থানে বাস ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং বিবিধ উপায়ে হিতকর কার্য্য ও জনসাধারণের সেবা করা এই ব্রাহ্মপল্লি স্থাপনের উদ্দেশ্য।

নানা কারণে ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ লোকেরই আর্থিক অবস্থা অতিশয় ভাল নয়। পৈতৃক বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া অনেকেই নগরে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বলা বাহুল্য নগরে বাস করা বহু ব্যয়সাপেক্ষ। অধিকাংশ ব্রাহ্মগণই প্রচুর অর্থাভাবে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। ভাড়াটিয়া বাড়ীতে, অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে, পরিবারস্থ অনেক লোক একত্রে অতি ক্লেশে কালযাপন করিতেছেন। তাহাতে অনেকের স্বাস্থ্যও নষ্ট হইয়া যাইতেছে। পুরুষানুক্রমে এরূপে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করা কি বিষম কষ্টজনক তাহা ভুক্তভোগী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির অভাব হইলে পরিবারস্থ সকলে অকূল সাগরে ভাসিতে থাকেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষার্থ ব্রাহ্মসমাজের দ্বারে উপস্থিত হওয়া ভিন্ন তাহাদের আর গত্যন্তর নাই। এই শ্রেণীর নিরুপায় ব্রাহ্মদিগকে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য খৃষ্টান সমাজের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজে অনাথ-নিবাস কিম্বা আমস্ হাউস (Alms house) ইত্যাদি কিছুই নাই। বাস্তবিক এই শ্রেণীর ব্রাহ্মগণের পুরুষানুক্রমে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ করা বড়ই কষ্টজনক এবং বিড়ম্বনাময়। এই দুরবস্থা দূরকরণের একমাত্র উপায় এই যে, মফঃস্বলে কোনও উর্ব্বরস্থানে ভূমি ক্রয় করিয়া প্রত্যেকের বাড়ী নির্ম্মাণ করা। তাহাতে একদিকে গৃহহীন ব্রাহ্মগণ যেমন গৃহ পাইবেন তদ্রূপ স্বীয় ভূমিজাত শস্যাদি দ্বারা এবং সুলভ মূল্যে ক্রীত অন্যান্য আহার্য্য বস্তু দ্বারা অতি সহজেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

কলিকাতাই ব্রাহ্মসমাজের কেন্দ্রস্থল সুতরাং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে এইরূপ ব্রাহ্মপল্লি সংস্থাপিত হইলে সাধন ভজনের ও জ্ঞানালোচনায় কলিকাতার সহিত নিয়তই তাহাদের যোগ থাকিবে। গঙ্গাতীরস্থ অধিকাংশ স্থানই ম্যালেরিয়া গ্রস্ত। জমীর মূল্যও অধিক আহার্য্য দ্রব্যাদিও দুর্ম্মূল্য। এই জন্য ও অন্যান্য নানা কারণে আমরা ব্রাহ্মপল্লি স্থাপনের জন্য এই বাণীবন গ্রামকে মনোনীত করিয়াছি।

এস্থান উলুবেড়ে মহকুমার উত্তর পশ্চিম কোণে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। উলুবেড়ে হইতে আম্‌তা অভিমুখে যে খাল গিয়াছে তাহার ধারেই এই গ্রাম। বারমাস খাল দিয়া উলুবেড়ে হইতে নৌকাতে যাতায়াত করা যায়। কলিকাতা হইতে উলুবেড়ে জাহাজে দুই ঘণ্টার পথ। উলুবেড়ে হইতে বাণীবন নৌকা কিম্বা পদব্রজে এক ঘণ্টার রাস্তা। শীঘ্রই এই স্থান দিয়া মেদিনীপুর অভিমুখে রেল যাইবে, তাহা হইলে কলিকাতা গমনাগমনের আরও সুবিধা হইবে। এখন জাহাজ ও নৌকায় যাতায়াতে ।৶ মাত্র ব্যয় হয়।

এখানে জমীদারের অধীনে জোত-স্বত্ব প্রতি বিঘা ১০, ১৫, ২০৲ টাকায় বিক্রয় হয়। খরচ পত্র বাদে ন্যূনপক্ষে প্রতি বিঘা জমিতে ৬৲ টাকা আয় হয়। এস্থানে ম্যালেরিয়া নাই, সকলের স্বাস্থ্যই ভাল থাকে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার,—এখানে যাঁহারা বাস করিবেন, তাঁহারা যেমন সাংসারিক বিবিধ প্রকার সুবিধা প্রাপ্ত হইবেন, তেমন তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে বিশেষ উৎসাহশীল হইতে হইবে। এখানে যাঁহারা বাড়ী ঘর করিবেন, তাঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেন। পরিচারক এবং সহায়। যাঁহারা অনন্তকর্ম্মা হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং জনসমাজের সেবা করিবেন তাঁহারা পরিচারক বলিয়া গণ্য হইবেন। যাঁহারা বিষয়কর্ম্ম করিয়া অর্থ ও সামর্থ্য দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করিবেন, তাঁহারা সহায় রূপে গণ্য হইবেন। সহায়-দিগের প্রদত্ত সাহায্য, পুস্তক বিক্রয়ের আয় এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত দান দ্বারা পরিচারকগণের ভরণপোষণ চলিবে। তাঁহারা কোনও প্রকার বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত হইবেন না।

বর্ত্তমান সময়ে এতদঞ্চলের স্থানে স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। আমরাগড়িগ্রামে নববিধান সমাজের ব্রাহ্মগণ এক প্রচারক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন, খালোড় গ্রামে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন। সকল গ্রামেই ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনিতে লোকে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। এ অবস্থায় নিয়ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন, কথকতা, আলোচনা এবং বক্তৃতা ও ব্যাখ্যাদি দ্বারা প্রচার করিলে বিশেষ ফলোদয় হইবার সম্ভাবনা।

এ অঞ্চলের অনেক গ্রামেই বড় বড় স্কুল আছে। বাণীবন ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে স্কুল নাই। এ গ্রামের অধিকাংশ লোকই গরিব, নিরক্ষর এবং নৈতিকাংশে অতি হীনাবস্থাপন্ন। অতএব এখানে সর্ব্বপ্রথম একটী স্কুল স্থাপন করিয়া শিক্ষা বিস্তারের উপায় বিধান না করিলে এই গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবে না। অতএব সম্প্রতি বাণীবনের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বিত হইবে; স্কুল স্থাপন, রোগীর চিকিৎসা, নীতিবিদ্যালয় এবং সঙ্গতমণ্ডলী স্থাপন।

উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য আমরা নিয়ত চেষ্টা করিতেছি; জানি না, আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টায় কি ফল প্রসূত হইবে। অল্পদিন হইল অত্রস্থানে একটী মাইনর স্কুল স্থাপন করা হইয়াছে। একজন ব্রাহ্মযুবক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হেড্‌মাষ্টারের কার্য্য করিতেছেন। এখানে বাড়ী করিবার জন্য আপাততঃ কিছু জমি খরিদ করা হইয়াছে,সেখানে সম্ভবতঃ তিনটী ব্রাহ্মপরিবার বাড়ী নির্ম্মাণ ও কৃষিকার্য্যাদি করিবেন। উপযুক্ত লোকের অভাবে এ পর্য্যন্ত প্রচার কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। আমরা ব্রাহ্মবন্ধুদিগের সমীপে সানুনয় নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা আমাদের এই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিয়া চরিতার্থ করুন। যাঁহারা এই উদ্দেশ্যের সহিত যুক্ত হইয়া পরিচারক কিম্বা সহায়রূপে এখানে বাড়ী করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা আমার নিকট পত্রাদি লিখিলে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারিবেন। এই ব্রাহ্মপল্লি কলিকাতা সাধনাশ্রমের অঙ্গীভূতরূপে তাঁহাদের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া প্রস্তাবিত লক্ষ্যত্রয় সাধন করিবেন।

বাণীবন ব্রাহ্মপল্লি ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩।	নিবেদক শ্রীএককড়ি সিংহ রায় কলিকাতা সাধনাশ্রমের জনৈক সহায়

মান্যবর
শ্রীযুক্ত তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়,

গত ১লা আশ্বিনের তত্ত্ব-কৌমুদীতে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র মোহন বিশ্বাস মহাশয় আমার পত্রের একাংশ সম্বন্ধে যে যে কথা বলিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক হওয়াতে লিখিতেছি; অনুগ্রহ পূর্ব্বক তত্ত্ব-কৌমুদীতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

ব্রাহ্মগণ "হরি" শব্দে নিরাকার ব্রহ্মকেই বুঝিয়া থাকেন। ইহা সকলেই জানে, কিন্তু ১লা ভাদ্রের তত্ত্ব-কৌমুদীতে পত্র প্রেরকের অভিপ্রায় এইরূপ যে "ব্রাহ্মগণের এইরূপ বুঝা উচিত নহে।" তাহা যদি না হয় তবে তিনি ব্রাহ্মসমাজ হইতে "হরি" শব্দ দূর করিতে ইচ্ছুক কেন?

কথার দিকে দৃষ্টি না করিয়া, কথার ভাবের দিকেই দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য।

আমি লিখিয়াছিলাম "সাকারবাদিগণ মূর্ত্তি গঠন করিলেই বা অবতার বলিলেই যদি নিরাকার হরির পূজা বর্জ্জন করা যায়, তাহা হইলে নিরাকার পূজার জন্য কোন নাম থাকিতে পারে না।" একথার অর্থ এবং ভাব ইহা কখন নহে যে, কেবল "হরি নাম ছাড়িলে নিরাকার পূজার জন্য কোন নামই থাকিতে পারে না" এইরূপে কথার অন্যরূপ ভাব গঠন করিয়া পত্র প্রেরক বলিয়াছেন যে "যিনি একথা বলিতে পারেন তাঁহার "ব্রাহ্মধর্ম্ম" যে কিরূপ বুঝা না।"

এই উক্তিতে প্রকাশ পায় যে, পত্র প্রেরকের "ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব অতি উজ্জ্বল!"

আমার অন্যান্য কথার কোন যুক্তিসঙ্গত উত্তর না দিয়া কেবল আলগা কথা বলা হইয়াছে।

এক স্থলে পত্র প্রেরক বলিয়াছেন "এসকল নাম ছাড়িলেও অনেক নাম আছে।" কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, একটী নামেরও উল্লেখ নাই।

"পৌত্তলিকগণের অতি আদরের সামগ্রী তাঁহাদের অনেকের নিত্যপাঠ্য "বিষ্ণু সহস্র নাম" প্রভৃতি পুস্তক একবার পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে "তাঁহারা পৌত্তলিক ভাবে এবং সাকার ও সীমাবদ্ধ ভাবে কোন নাম ব্যবহার করিতে ছাড়েন নাই।"

অদ্বৈত, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, শিব, অনন্ত, ব্রহ্ম, ওঁ, বিশ্বনাথ, জগন্নাথ, বিশ্বম্ভর, হরি, পরব্রহ্ম, ঈশ্বর, জগদীশ, পরমেশ্বর, মহেশ্বর, জগৎপিতা প্রভৃতি পুংলিঙ্গ শব্দ এবং

আদ্যাশক্তি, ' জগন্মাতা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দও তাঁহারা ছাড়েন নাই। পত্র প্রেরক অনুগ্রহ পূর্ব্বক "তাঁহার কথিত অনেক নাম প্রকাশ করিবেন।" আমরা জানিতে চাহি কোন্ নাম সীমাবদ্ধ মূর্ত্তির প্রতি পৌত্তলিকগণ ব্যবহার করেন নাই।

পত্র প্রেরক যে কথা বলিবেন তাহা ভাল যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া দিবেন। "ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, ইহাতে নানা জাতি ও নানা সম্প্রদায়ের লোক আসিবে, তাহা ত বুঝিলাম, কিন্তু তাঁহারা নিরাকার হরি যদি না বলিতে পান, তবে কি কি নাম করিবেন? পত্র প্রেরকের মতে ত "অনেক আছে।" পত্র প্রেরক যাহা সুযুক্তি পূর্ণ বুঝিয়াছেন, তাহা সকলের পক্ষে সুযুক্তি পূর্ণ হওয়ার পক্ষে বিশেষ প্রমাণের আবশ্যক এবং সেই সকল সুযুক্তিপূর্ণ উজ্জ্বলপ্রমাণ জানিতে আমরা উৎসুক রহিলাম।

বিশ্বনাথ, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি শব্দ বলিলেই পৌত্তলিক গণ হাসিতে পারেন এবং বলিতে পারেন যে "কাশির মন্দিরের বিশ্বনাথ এবং যে মূর্ত্তির তাঁহারা বৎসর বৎসর পূজা করেন সেই জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি ইত্যাদি" কিন্তু এরূপ স্থলে ব্রাহ্মগণের কি বলা উচিত নহে যে "বিশ্বনাথ সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, আমরা তোমাদের মন্দিরের প্রস্তরের মূর্ত্তির উদ্দেশে এ শব্দ ব্যবহার করিতেছিনা। বিশ্বনাথ, হরি, জগদ্ধাত্রী বলিলে তোমরা যে সীমাবদ্ধ ভাব বুঝিয়া থাক, আমাদের হৃদয়ে সেরূপ ভাব নাই ইত্যাদি।

নশিপুর,
মুর্শিদাবাদ,
১০ই আশ্বিন
১৩০০

অনুগত

শ্রীজগন্নাথ প্রসাদ গুপ্ত।

ব্রাহ্মসমাজ।

দুর্ভিক্ষ—পূর্ব্ববঙ্গে যথার্থ ই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। সাহায্য দানের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উদ্যোগী হইয়া সম্প্রতি ১০৫৲ একশত পাঁচ টাকা পাঠাইয়াছেন। দিন দিনই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বৃদ্ধি হইতেছে। অচিরে চতুর্দ্দিক হইতে প্রভূতপরিমাণে সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে অন্নাভাবে অনেক নরনারীর মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা। আমরা সানুনয় অনুরোধ করিতেছি, যে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদিগকে সাহায্য দান করিতে সকলে মুক্তহস্ত হউন। সহৃদয় ব্যক্তিগণ প্রতিবারে যেরূপে দুর্ভিক্ষের সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, এবারও সেইরূপ সাহায্য করিবেন, আমাদের এরূপ আশা আছে। পরমেশ্বরের সেবকগণ কি ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান না করিয়া, নিশ্চিত মনে কালযাপন করিতে পারেন? সাঃ ব্রাঃ সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের নামে ২১১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় সাহায্য প্রেরণ করিবেন।

"মেসেঞ্জার" পত্রিকার জন্মোৎসব—গত ২৭শে সেপ্টম্বর, সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় মেসেঞ্জার পত্রিকার ১০ম জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। মেসেঞ্জারের স্থানীয় গ্রাহকগণ এবং সাহায্যকারী অন্যান্য অনেকে নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বেদী গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ অতি সারগর্ভ, হৃদয়গ্রাহী এবং সাময়িক ভাবাত্মক হইয়াছিল। তিনি সহজ ভাষায় সংক্ষেপে অতি সার কথা বলিয়াছিলেন। উপদেশটি প্রবন্ধাকারে অন্যত্র মুদ্রিত হইল। উপাসনার পর মেসেঞ্জারের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র পত্রিকার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তৎপরে ম্যানেজার বার্ষিক হিসাব পাঠ করেন। তাহাতে দেখা যায় যে, মেসেঞ্জারের গ্রাহকগণের শতকরা ৩০ জন মূল্য বাকী রাখেন। কিন্তু সকলের নিকট হইতে নিয়মিত সময়ে সম্পূর্ণ মূল্য আদায় হইলেও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে ব্যয় সংকুলন হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে অনেক ব্যয় হ্রাস করিয়া কোনরূপে ব্যয় সংকুলন হইতেছে। অতএব আমারা ব্রাহ্মগণের নিকট নিবেদন করিতেছি যে, যাঁহাদের নিকট মেসেঞ্জারের মূল্য বাকী আছে, তাঁহারা আপনাপন দেয় টাকা অতি শীঘ্র প্রেরণ করেন এবং মেসেঞ্জারের গ্রাহক বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হউন। একটুকু চেষ্টা করিলেই সকলে অতি শীঘ্র গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারেন।

মৃত্যু সংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, বোম্বে প্রার্থনাসমাজের সভ্য নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ মহাশয় গত ১৩ই সেপ্টেম্বর মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। কর্ত্তব্য পরায়ণতা, শ্রমশীলতা এবং স্বদেশ বৎসলতার সহিত ধার্ম্মিকতা মিশ্রিত হইয়া তাঁহার পবিত্র চরিত্রকে আরও সুশোভিত করিয়াছিল। তাঁহার বিয়োগে বোম্বে প্রার্থনা সমাজ একটি উজ্জ্বল রত্ন হারাইলেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত সময়ান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। পরমেশ্বর তাঁহার স্বর্গগত আত্মাকে শান্তি প্রদান করুন।

রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা—২৭শে তারিখের স্মরণার্থ সভার কার্য্যবিবরণ প্রবন্ধাকারে সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হইল। এবার রামমোহন রায়ের গুণাবলীতে যুবকগণ এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছেন যে, ২৮শে তারিখে সিটি কলেজের বি, এ ক্লাশের ছাত্রগণ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মুখে রাজার চরিত্রকাহিনী শুনিবার জন্য ইচ্ছা করেন। কলেজের প্রিন্সিপালের অনুরোধে শাস্ত্রী মহাশয় ঐদিন ছাত্রদিগের নিকট রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে ইংরাজিতে বক্তৃতা করেন। সময় সময় ছাত্রদিগকে এরূপে সদুপদেশ পূর্ণ উপদেশ দিবার জন্য ছাত্রগণ শাস্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছেন।

বিবাহ—মেদিনীপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু অভয়াচরণ বসুর পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর সহিত লাহোরের শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সত্যপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভবিবাহ গত ১৯শে সেপ্টেম্বর সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। বিবাহ উপলক্ষে রামবাবু নিম্নলিখিত রূপ দান করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগ ৫৲ সাধনাশ্রম ২৲ বালিকা বোর্ডিং ২৲ দাসাশ্রম ২৲ দাতব্য বিভাগ ৩৲ মোট ১৪৲ টাকা।

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে সাধনাশ্রমে আর একটি বিবাহ হইয়াছে। পাত্র ময়মনসিংহ নিবাসী বাবু হরানন্দ গুপ্ত, পাত্রী কলিকাতা নিবাসী পরলোক গত গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিতের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী লক্ষীমণি রক্ষিত। এ বিবাহে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। উভয় বিবাহই তিন আইন অনুসারে রেজেষ্টরী হইয়াছে। আমরা নবদম্পতিদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি এবং প্রার্থনা করিতেছি ঈশ্বর তাঁহাদিগকে ধর্ম্মপথে রক্ষা করুন।

ব্রাহ্ম-ছাত্রীনিবাসের বার্ষিক উৎসব—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর শনিবার এবং ১লা অক্টোবর রবিবার দুই দিন ছাত্রীনিবাসের বার্ষিক উৎসব হইয়াছে। প্রথম দিন ছাত্রীনিবাসের প্রায় ৩০টি ছাত্রীকে আলিপুর পশুবাটিকা দেখাইবার জন্য লইয়া যাওয়া হয়। লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু এবং ছাত্রীনিবাসের সম্পাদক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও সঙ্গীত অধ্যাপক বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রভৃতি ইহাঁদের সহিত গমন করেন।

তৎপর দিন রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় বিশেষ উপাসনা হয়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা করেন এবং উপদেশ দেন।

শাস্ত্রী মহাশয় প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে ছাত্রীনিবাসের সকলকে লইয়া উপাসনা করেন। প্রথমতঃ কোন গ্রন্থ হইতে কিছু পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, তৎপর প্রার্থনা করেন। মেয়েরা গান করেন। ইহাতে ছাত্রীগণের প্রভূত উপকার হইতেছে।

রামমোহন রায় ক্লব—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর শনিবার পূর্ব্বাহ্ন ৬॥ ঘটিকার সময় বেনেটোলা লেনস্থ সিটিকলেজের দ্বিতীয় তলে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের উদ্যোগে "রামমোহন রায় ক্লব" নামে একটি সভা স্থাপিত হইয়াছে। সভার উদ্দেশ্য ও কার্য্যবিবরণ সময়ে প্রকাশিত হইবে। পরমেশ্বর এই সভাকে স্থায়ী করুন।

সম্পাদকের নিবেদন—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর মফঃস্বলে যে যে স্থানে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা হইয়াছে, সেই সেই স্থানবাসিগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক সভার কার্য্য স্মরণ প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। কার্য্য বিবরণ সংক্ষিপ্ত রা প্রার্থনীয়।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধীয় অবান্তর নিয়মের দ্বিতীয় নিয়মানুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে জানান যাইতেছে যে, যাঁহারা আগামী বৎসরের (১৮৯৪ সনের) জন্য অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনীত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আগামী ২০এ নবেম্বর তারিখের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে আপনাদের নাম ধামাদি প্রেরণ করিবেন। এই তারিখের পরে আর কাহারও নাম গৃহীত হইবে না। প্রার্থিগণের আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হওয়া আবশ্যক।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ২৯এ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়। — শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ, সম্পাদক সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

আগামী ১২ই অক্টোবর অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় ১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ সিটিকলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব।

২। বাবু বাণীকান্ত রায় চৌধুরী প্রস্তাব করিবেন—ব্রাহ্ম-ছাত্রীনিবাস সব কমিটীর সম্পাদক বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়কে উক্ত সব কমিটীর সম্পাদক-পদ হইতে অবসৃত করিবার কারণ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত একটি কমিশন নিযুক্ত হউক।

৩। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক, বক্তৃতা ও উপদেশাদি মধ্যে হরিনাম ব্যবহার সম্বন্ধে ময়মনসিংহের বাবু বরদাকান্ত বসু মহাশয়ের একখানি পত্র সম্বন্ধে বিচার।

৪। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পুনর্নিয়োগের নিয়ম সম্বন্ধে বিচার।

৫। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অফিস ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ — শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ, সম্পাদক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১৮ই আশ্বিন প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ সংখ্যা।
১৬শ ভাগ।

১লা কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

সেবা-স্তুতি।

সুখ সুখ করি; সুখ চিরদিন রয় না;
সম্পদের হাসি ক্ষণকাল;
সে হাসি-সম্ভোগ-সুখ সব ভাগ্যে হয় না;
সকলি ত গ্রাস করে কাল।

মিষ্টতার লোভে মন নানা পথে ফিরে
পান করে তিক্ততা গরল;
সম্পদ চাহিতে ডুবে বিপদের নীরে;
শান্তি-আশে জ্বালিছে অনল।

এ সুখ-আলেয়া পথ ভুলায় আঁধারে,
আলো ঢালি নিরাশ-নয়নে;
যত যাই পথ নাই; কর্দ্দম পাথারে
ডুবে পদ, আঁধার নয়নে।

এই ত বিধির বিধি, সুখ যেবা চায়
নহে সুখ তাহার কারণে;
ভুলায় তাহাবে সুখ মরীচিকা-প্রায়,
দুখানলে পোড়ায় জীবনে।

যাক্ সুখ, যাক্ শান্তি, যাক্ গো মিষ্টতা;
থাক তুমি সেবা! মোর প্রাণে;
ছাড়ে যদি ধন, মান, প্রণয়, মিত্রতা,
তুমি মোরে রেখ শান্তি-দানে।

ব্রহ্ম কন্যা তুমি সেবা, তুমি ব্রহ্ম-বাণী,
ধীর স্থির তুমি ভব-নীরে;
নর-কার্য্য-সিংহাসনে একমাত্র রাণী,
তব বোঝা সদা নরশিরে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সেবা-সাধন—কোনও পদার্থে রঙ্ করিতে হইলে, রঙ্ওয়ালারা সর্ব্বপ্রথমে তাহাতে একটা পাংশুবর্ণ রঙ্ লাগাইয়া জমি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহাকে তাহারা আস্তর বলিয়া থাকে। অগ্রে এই আস্তর না দিলে, সে পদার্থে ভাল করিয়া রঙ্ ফলে না। মানব চরিত্রেও সেইরূপ কর্ত্তব্য-পরায়ণতার রঙ্ না লাগাইলে তাহাতে সাধন ভজনের রঙ্ ফলে না। কর্ত্তব্যপরায়ণতাকেই আমরা সেবা নাম দিতেছি, কারণ ধর্ম্মের পক্ষে সমুদায় কর্ত্তব্য কার্য্যই ঈশ্বর সেবা। পূর্ণস্বরূপ পরমেশ্বরের এমন কি অভাব আছে যাহা মানব তুমি পূরণ করিতে পার? আর তিনি তোমার স্তুতিবাদেরই বা অপেক্ষা কি রাখেন? তবে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে যদি আপনাকে নিয়োগ করিতে পার, তিনি হৃদয়ে থাকিয়া যে কর্ত্তব্য কার্য্যের উপদেশ করেন, তাহা যদি সমুচিতরূপে সম্পাদন করিতে পার, তাহা হইলে তাঁহার উৎকৃষ্ট সেবা হয়। পবিত্র এবং বিশ্বাসী চিত্তের লক্ষণ এই যে, তাহা এই সেবাকে একটী ব্রত বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে। এই সেবা-ব্রত ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনের একটী প্রধান ভিত্তি। যাহাতে সেবা-ব্রত নাই, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা নাই, তাহার ভজন সাধনে আমাদের আস্থা হয় না। সে যদি কীর্ত্তনে নাচিয়া উন্মত্ত প্রায় হয়, যদি উপাসনাকালে কাঁদিয়া গড়াগড়ি যায়, যদি উচ্চ ধর্ম্মের কথা বলিয়া গগন ফাটায়, কিছুতেই আমাদের আস্থা জন্মে না। বৃক্ষকে যেমন মানুষ ফলের দ্বারা বিচার করে, আমরা সেইরূপ ধর্ম্ম-জীবনকে ফলের দ্বারা বিচার করি। কর্ত্তব্য-পরায়ণতাবিহীন লোকের ধর্ম্মোন্মাদকে চাবুকের দ্বারা আরোগ্য করিতে ইচ্ছা করে। ব্রাহ্মদিগকে সেবা-বিহীন ধর্ম্মভাবে রত হইতে দেখিলে আমরা অধোগতি বলিয়া মনে করি।

আমাদের একজন পরলোকগত শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু সর্ব্বদা এই বলিয়া ক্ষোভ করিতেন, যে "নাচিবার ব্রাহ্ম পাই, কাঁদিবার ব্রাহ্ম পাই, সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ প্রার্থনা করিবার ব্রাহ্ম পাই, কিন্তু ধীর ও দৃঢ়ভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিবার জন্য অতি অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মই পাই। এরূপ ব্রাহ্ম অতি অল্পই দেখি, যাঁহার হস্তে কোনও গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে থাকিতে পারি যে তাঁহার সাধ্যে যতটা আছে, তিনি করিতে ত্রুটী করিতেছেন না, সে কার্য্য সমুচিতরূপে সম্পাদিত হইতেছে।" এই কর্ত্তব্য-পরায়ণতার শিথিলতা ও দায়িত্ব জ্ঞানের অল্পতা নিবন্ধন ব্রাহ্মদিগের দ্বারা কোনও কার্য্য সকল সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত

হইতেছে না। ইহা কি সামান্য ক্ষোভের কথা! যাহাদিগের নৈতিক অবস্থা এই, তাহারা আর ভজন সাধন কি করিবে। কর্ত্তব্য-পরায়ণতাবিহীন ধর্ম্মভাব থাকা অপেক্ষা না থাকাতে ক্ষতি কি?

সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম কর—সাধুরা বলেন "সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম কর" "অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর" "সমুদয় কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে ঈশ্বরকে স্মরণ কর" তাঁহাদের এরূপ বলিবার অভিপ্রায় কি? তাঁহারা আপনাদের জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যে পাপ ত দূরের কথা, যখনই অন্য কথায় মন দিয়াছেন, বা বৃথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখনই যে তাহাতে কোন ফল হয় নাই তাহা নহে তাহাতে চিত্তের মধ্যে একপ্রকার চাঞ্চল্য উপস্থিত হওয়ায় বরং কুফল ফলিয়াছে। এমন উত্তম জীবন এমন উত্তম বাক্‌শক্তি পাইয়া যে আপন রসনায় ঈশ্বরের নাম না করে, তাহার জীবন অতি অসার। আবার অন্যদিকে দেখিয়াছি পবিত্র ঈশ্বরের নাম করাতে জীবন পবিত্র হইয়াছে, উজ্জ্বল হইয়াছে, সরস হইয়াছে, মহত্ত্ব বাড়িয়াছে। যখনই কেহ প্রার্থনা পূর্ব্বক কোন কাজে প্রবৃত্ত হন, হৃদয়ে অসাধারণ বল ও উৎসাহ লাভ করেন, যখনই ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক কোন কাজে প্রবৃত্ত হন, অমনি আর তাহাতে অন্যায় হইবার আশঙ্কা থাকে না। একদিকে ঈশ্বর স্মরণ দ্বারা আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়াছেন অন্যদিকে আবার দেখিয়াছেন, এই ঈশ্বর বিস্মৃতিতেই সমুদয় পাপ উৎপন্ন হইতেছে। ইহা জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াই তাঁহারা সকলকে এই উপদেশ দিয়াছেন। বালক কালে আমরাও সর্ব্বদাই দেখিয়াছি, যখনই বাড়ী হইতে বাহির হইতাম বা কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম তখন পিতা মাতা জ্যেষ্ঠতাত পিতৃস্বসা প্রভৃতি বার বার ঈশ্বরের নাম করিতেন এবং আমাদিগকে ঈশ্বরের নাম লইয়া যাত্রা করিতে বলিতেন। ব্রাহ্মসমাজে যখন প্রথম প্রথম আমরা আসিয়াছিলাম, এই ভাব আমাদের মধ্যে খুব উজ্জ্বল ছিল। প্রার্থনা করিয়া ও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া সমুদয় কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পথে ঘাটে যখনই মন একটুকু হালকা হইত বা বাজে কথায় প্রবৃত্ত হইতাম, অমনি প্রার্থনা করিতাম। এই ভাব কমিয়া যাওয়াতে এখন দেখিতে পাই অনেক সময় ব্রাহ্মেরা বৃথা কথায় কাটাইতেছেন, অনেক সময় বিশেষতঃ তর্কের সময় আত্মহারা হইয়া যাহা বলা উচিত নয় বা অসঙ্গত তাহাও বলিতেছেন। বলিতে কি একরূপ ন্যায়ের পথ বা সত্যের পথ হইতে কিছু কিছু সরিয়া পড়িতেছেন। এখন পুনরায় আমাদিগকে সর্ব্বদা প্রার্থনাপূর্ব্বক কাজ করিতে হইবে। যখনই দেখিব যে চিত্ত বহির্ম্মুখীন হইতেছে বাজে কথায় মাতিতেছে, তখনই চিত্তকে স্থির করিয়া প্রার্থনা দ্বারা আত্মাকে শুদ্ধ করিতে হইবে এবং ঈশ্বরের প্রশংসা কীর্ত্তনে নিযুক্ত হইতে হইবে। বিশেষ সভা সমিতিতে এই প্রকার ভাবে কাজ না হইলে অনেক সময় ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক আসিবে। ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে বিনীত অনুরোধ কোন্ প্রকার কথায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন সে দিকে যেন সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন। ঈশ্বরকে ভুলিয়া সৎকার্য্য করিলেও তাহা পণ্ড। তাঁহারই জন্য সব। তাঁহাকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া সব করিতে হইবে। কখন মৃত্যু উপস্থিত হইবে কে জানে? যেন মৃত্যু সময় প্রভুকে ভুলিয়া মরিতে না হয় এই জন্য সাধুরা বলিয়াছেন, সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম কর, অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর, ঈশ্বরকে স্মরণে রাখ।

"অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর" এ কথার তাৎপর্য্য এরূপ নহে যে, সর্ব্ব কর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল দিনরাত্রি প্রার্থনাই করিতে হইবে। সংসারের নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকার অবস্থাতে তাহা সম্ভবও নহে। কিন্তু ইহা সম্ভব, যাহা কর, যেখানে যাও, ঈশ্বরের দিকে মুখ থাকিবে। মনে কর এক ব্যক্তি এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইবে বলিয়া বহির্গত হইয়াছে। সে পথে নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ও অপর একজন বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিতে করিতে যাইতেছে। সে কি প্রতি পাদবিক্ষেপে স্মরণ করে আমি অমুক স্থানে যাইতেছি? তাহা করে না, অথচ তাহার সমুদয় পাদবিক্ষেপের সমষ্টির গতি সেই স্থানের অভিমুখেই থাকে। সেইরূপ তুমি প্রত্যেক কার্য্য করিবার সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ না রাখিতে পার, অন্ততঃ এইটুক দেখ যে তোমার সমগ্র কার্য্যের সমষ্টির গতি ঈশ্বরাভিমুখে রহিয়াছে কি না। অথবা মনে কর এক ব্যক্তি গৃহে পত্নীর অতি গুরুতর পীড়া দেখিয়া কর্ম্মস্থানে গিয়াছে। সে শীঘ্র শীঘ্র কর্ম্মস্থান হইতে বিদায় লইয়া গৃহে আসিতেছে, পথে বাজারে গিয়া কিছু দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতেছে। কর্ম্মস্থানে হিসাবে জমাখরচ কাটিবার সময়, বা বাজারে দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য স্থির করিবার সময় পত্নীকে মনে না থাকুক, কিন্তু একথা কি বলা যায় না যে, তাহার মন বাড়ীতে পড়িয়া রহিয়াছে। তেমনি আমরা যে যে কাজ করি, মন যেন ঈশ্বর চরণে পড়িয়া থাকে।

ব্রাহ্ম-সাহিত্য পাঠে ব্রাহ্মদিগের উদাসীনতা—ব্রাহ্ম প্রতিদিন যেমন অন্ততঃ একবার পূর্ণাঙ্গ উপাসনা করিবেন, তেমন প্রতিদিনই তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোনও পুস্তক অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা অভ্রান্ত শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা নিয়ত শাস্ত্রের বচনাদি পাঠ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করাকে পুণ্যকার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। ব্রাহ্মগণ কোনও অভ্রান্ত শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি এবং অন্যান্য ধর্ম্মের মধ্যে যে সকল প্রকৃত সত্য বাক্য রহিয়াছে, গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাহা পাঠ করা বাঞ্ছনীয়। প্রতিদিন উপাসনার পূর্ব্বে কিম্বা পরে পাঠের নিয়ম করিলে, উপাসনার সহিত পাঠ ও নিত্য অভ্যাস হইয়া যায়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ও পত্রিকাদি পাঠ করিতে উদাসীন। এমন কি তত্ত্বকৌমুদী মেসেঞ্জার প্রভৃতি কাগজও অনেকে একবার পাতা উল্টাইয়া দেখেন না। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, মফঃস্বলস্থ কোনও ধনী শিক্ষিত ব্রাহ্ম মেসেঞ্জার গ্রহণ করেন; কিন্তু বাড়ীর বালকেরা তাহা

খুলিয়া পাঠ না করিলে, পত্রিকা খানি আর খোলা হয় না। কলিকাতার অনেকেই তত্ত্বকৌমুদী পড়েন না। ব্রাহ্মদিগের পত্রিকা যদি ব্রাহ্মগণ পাঠ না করেন, তবে কে পাঠ করিবে? আমরা যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় পাঠ না করিবার কারণ আলস্য এবং উদাসীনতা। সাহিত্যের চর্চ্চা এক সময়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অতিশয় প্রবল ছিল। কিন্তু একণে ব্রাহ্মগণকে সাহিত্যচর্চ্চা বিষয়ে উদাসীন দেখা যাইতেছে। ইহার ফল এই হইতেছে, তাঁহারা সাহিত্য জগত হইতে পিছাইয়া পড়িতেছেন। আশা করি এবিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

যোগচক্ষু।

যুধিষ্ঠিরকে বকরূপী ধর্ম্ম অনেক গুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাহার একটী প্রশ্ন এই, "আশ্চর্য্য কি?" যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, "মানুষ নিয়ত অপরের মৃত্যু ঘটনা দেখিতেছে, তথাচ নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা করে না। সংসারের বিনাশশীলতা এবং নশ্বরতা দেখিয়া স্বীয় মৃত্যুর বিষয় চিন্তা না করাই আশ্চর্য্যের বিষয়।" কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্যের বিষয় আছে। মানুষ নিয়ত ব্রহ্ম সত্তার মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, ব্রহ্ম আকাশে আত্মা পক্ষী বিচরণ করিতেছে, ব্রহ্ম সমুদ্রে মীনের ন্যায় মানব সন্তান ডুবিয়া রহিয়াছে, তথাচ পরস্পর বলিতেছে "ঈশ্বর কোথায়, ঈশ্বর কোথায়?" সূর্য্য চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া মধ্যাহ্ন গগনে প্রকাশিত, তাহার প্রখর কিরণে পৃথিবী আলোকিত, এ সময় যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, "সূর্য্য কোথায়? আলোক কোথায়? সূর্য্য কিরণ কিরূপ বস্তু?" তবে যেমন সকলেই হাস্য করিবেন, তেমন সাধারণ জনগণের ঈশ্বরানুসন্ধানের কথা শুনিয়া ব্রহ্মবিদগণ আশ্চর্য্যান্বিত হন।

কলওয়ে সাহেব কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থে নিম্নলিখিত উদাহরণটী প্রাপ্ত হওয়া যায়। "একদা কোন নদীর মৎস্যসমূহ একত্রিত হইয়া পরস্পর আলোচনা করিতেছিল যে "সকলেই বলে যে, জল হইতে আমরা সৃষ্ট এবং রক্ষিত হইতেছি, কিন্তু জল কি বস্তু আমরা কখনও দেখিতে পাইলাম না। তখন তাহাদের মধ্য হইতে অপেক্ষাকৃত সুবোধ কএকটী মৎস্য বলিল, "আমরা শুনিয়াছি যে সমুদ্রের মধ্যে এক অতি বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত মৎস্য বাস করেন, তিনি সমুদয় বিষয় জানেন, চল আমরা তাঁহার নিকট যাই এবং আমাদিগকে জল দেখাইতে বা জল কিরূপ, তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে, তাঁহাকে অনুরোধ করি।" এই কথা শুনিয়া তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই সেই বিজ্ঞ মৎস্যের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। সে তাহাদিগের আবেদন শ্রবণ করিয়া এইরূপ উত্তর করিল।

হে প্রশ্ন মীমাংসার্থিগণ "তোমরা পরমেশ্বরের মধ্যে বাস করিতেছ অথচ তাঁহাকে জান না।

"তোমরা নদীর কূলে বসিয়া আছ অথচ একবিন্দু জলের জন্য তৃষ্ণায় মরিতেছ।" বাস্তবিক আমাদের এই প্রকারই দশা।

সাধারণ লোকের দৃষ্টি অতি স্থূল। সাধারণ লোকে যাহাকে জল বলে, সূক্ষ্মদর্শী বৈজ্ঞানিক তাহাতে গ্যাসদ্বয়ের মিলন দেখিয়া থাকেন। সাধারণ লোক বলে, "আকাশটা পৃথিবীর চন্দ্রাতপ". বৈজ্ঞানিক বলেন, "উহা কোনও বস্তু নহে"; নির্ব্বোধ মানব মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণিকা দেখিয়া তাহা জল বলিয়া পান করিতে চায়, বৈজ্ঞানিক বলেন, "ওখানে যাইও না, উহা জল নয়।" সাধারণে পৃথিবীকে থালার মত দেখে, বৈজ্ঞানিক গোল দেখেন। সেইরূপ স্থূলবুদ্ধি লোকে দেখে, গাছ পাথর, চন্দ্র, সূর্য্য, ঘর, বাড়ী, সংসার ইত্যাদি জড় বস্তু। ব্রাহ্ম বৈজ্ঞানিক দেখেন, ইহার মধ্যে চৈতন্যরূপী দেবতা। জড়ে তাহার চক্ষুকে আবরণ করিতে পারে না। ব্রাহ্ম বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি জড়স্তর ভেদ করিয়া চৈতন্য রাজ্যে উপস্থিত হয়। বিষ্ণুপুরাণ প্রণেতা এক স্থানে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে "তুমি জ্ঞানাত্মা, এই মূর্ত্তরূপ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা তোমার জ্ঞানময় রূপ; কিন্তু অজ্ঞেরা জগৎকে ভূতময় দেখিতেছে। অবুদ্ধিগণ জ্ঞান স্বরূপ এই অখিল জগৎকে অর্থ রূপে (স্থূল রূপে) অবলোকন করতঃ মোহ সংপ্লবে (সংসার সাগরে) ভ্রমণ করিতেছে, হে পরমেশ্বর! যাঁহারা জ্ঞানচিৎ শুদ্ধচেতা, তাঁহারা অখিল জগৎকে তোমার জ্ঞানাত্মকরূপ বলিয়া দেখেন।"

মুষা পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, আমি তোমাকে কোথায় পাইব?" পরমেশ্বর উত্তর করিলেন, "জানিও যখনই তুমি অনুসন্ধান করিয়াছ, তখনই তুমি আমাকে পাইয়াছ।" একজন আরবীয় লোককে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কিরূপে জান যে, পরমেশ্বর আছেন?" সে ব্যক্তি উত্তর করিয়াছিল, "প্রাতঃকালকে দেখিবার জন্য কি আলোর আবশ্যক হয়?"

বাস্তবিক মানব যে আলোক দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে চায়, সেই আলোকই তিনি। মানব সন্তান তাঁহাতেই বাস করে, তাঁহাতেই বিশ্রাম, তাঁহাতেই শয়ন, ভ্রমণ, অশন বসন, তাঁহাতেই ক্রীড়া কৌতুক আমোদ প্রমোদ করে, অথচ তাঁহাকে চিনে না। কেহ যদি দুপ্রহর বেলায় লণ্ঠন জ্বালিয়া সূর্য্যের কিরণ দেখিবার জন্য গৃহের বাহির হয় এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকে "ওগো বলতো কোন্ স্থানে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়াছে, আমি এই লণ্ঠনের আলোর সাহায্যে তাহা দর্শন করিব," তবে যেমন সকলেই তাহাকে উন্মত্ত বলিয়া স্থির করিবেন, তদ্রূপ সাধারণ মানব সন্তান ভ্রান্ত পথে গমন করিয়া কেবলই উদ্ভ্রান্ততার পরিচয় প্রদান করে।

দৃষ্টিশক্তি সকলেরই কি এক প্রকার? বুদ্ধ, ঈষা, মুষা যে চক্ষে দর্শন করিতেন, সাধারণ মানবও সেই চক্ষেই দর্শন করে; কিন্তু তাঁহাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি বৈজ্ঞানিকের ন্যায় স্থূলভেদ করিয়া চৈতন্য রাজ্যে যাইতে পারে না। সাধারণের দৃষ্টি স্থূলে জড় জগতেই আবদ্ধ থাকে। জড় এবং চৈতন্যের মধ্যস্থলে যবনিকা

রহিয়াছে, এই যবনিকা যিনি উত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনিই চৈতন্য রাজ্য দর্শন করিয়াছেন। এই যবনিকার নাম মোহ। মোহহীন না হইলে কেহই চৈতন্যের সাক্ষাৎ লাভ করিতে সমর্থ হন না। মোহ আবরণ উন্মোচিত না হইলে চৈতন্য রাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় না। এই জন্য গীতাকার বলিয়াছেন ;—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

২য়—৬৯ শ্লোক।

অর্থাৎ "অজ্ঞানাচ্ছন্ন সর্ব্বভূতের পক্ষে যাহা নিশা স্বরূপ, তাহাতে ব্রহ্মর্ষি ব্যক্তি প্রবুদ্ধ থাকেন, যাহাতে অন্যান্য সকলে প্রবুদ্ধ থাকে, তাহা তত্ত্বদর্শী মুনির পক্ষে নিশা স্বরূপ।" স্থূল কথায় বলিতে গেলে সাধারণ মানবের যখন রাত্রি, মুনির তখন দিন, মুনির যখন দিন তখন সাধারণের রাত্রি। সাধারণের প্রকৃত দর্শন হয় না বলিয়াই এরূপ হইয়া থাকে। ঋষিগণের প্রকৃত দর্শন হইয়া থাকে ; এই জন্যই তাঁহারা প্রকৃতিতে চৈতন্যের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সত্যের সাক্ষাৎকার একবার প্রাপ্ত হইলেই মানব যোগচক্ষু প্রাপ্ত হয়। তখন সাধক জড়ে ও চেতনে সেই এক পরম চৈতন্যের শক্তির প্রকাশ দর্শন করিতে থাকেন। সেই একই সত্তার আলিঙ্গনে সমুদয় সুরক্ষিত। যোগ-চক্ষে এই পরমাশ্রয়কে না দেখিলে হৃদয়ে প্রকৃত বিশ্বাস ও নির্ভরের সঞ্চার হয় না। নির্ভর ভিন্ন ধর্ম্মও নাই। এই কারণে এই যোগচক্ষু লাভ করিবার জন্য সকলেরই সাধন পরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ৩য় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

১৮৯৩।

বিগত তিন মাসে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১৪টী সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার দুইটী অধিবেশনে বিশেষভাবে ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা হয়। একদিনের আলোচনায় স্থির হয় যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশনের নির্দ্দিষ্ট সময়ের আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে অর্থাৎ ৭ ঘটিকার সময় সকলে সমবেত হইয়া ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত ধ্যান, প্রার্থনা সঙ্গীতাদিতে যাপন করিবেন। তদনুসারে বর্ত্তমান সময়ে কার্য্য চলিতেছে। এবং তাহা দ্বারা উপকারও হইতেছে।

চিকাগো মহামেলায় পৃথিবীস্থ সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের একটী মহাসম্মিলন হইয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভা টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন।

প্রচারকগণের নিয়োগ ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় নিয়মানুসারে বর্ত্তমান বর্ষে তাঁহাদিগকে পুনর্নিয়োগ করা উচিত ছিল। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এ বিষয়ের গুরুত্বানুভব করিয়া এবং নিয়মের অর্থ সম্বন্ধে অধ্যক্ষসভার অভিপ্রায় অবগত হওয়া আবশ্যক মনে করিয়া বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। এবং এবিষয়ের মীমাংসার্থ অধ্যক্ষসভায় প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছেন।

খাসিয়া মিসন—দিন দিনই এই মিসনের উন্নতি হইতেছে। চিরাপুঞ্জিতে একটী প্রচারভবন প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটী সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। গৃহ নির্ম্মাণের জন্য নানা স্থানের সহৃদয় বন্ধুগণের নিকট হইতে প্রায় চারিশত টাকা পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও ইহার জন্য ঋণ আছে। মৌসমাই সমাজের জন্য একটী প্রস্তরের দেওয়ালযুক্ত ঘর ক্রয় করা হইয়াছে। এই গৃহ নির্ম্মাণের জন্যও ঋণ করিতে হইয়াছে। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তীর উপরেই এই মিসনের কার্য্য ভার অর্পিত আছে। তিনি আপনার কার্য্যের সাহায্যার্থ একজন খাসিয়া বন্ধুকে সহকারী রূপে গ্রহণ করিয়াছেন আর একজন বাঙ্গালি সহকারীও গ্রহণ করিবার কথা চলিতেছে।

দুর্ভিক্ষ—পূর্ব্ববাঙ্গালায় বিশেষতঃ ঢাকার অন্তর্গত অনেক স্থানে অতিরিক্ত জলপ্লাবন হওয়ায় লোকের বিশেষরূপ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে এই অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য ঢাকার ব্রাহ্মগণ একটী সভা স্থাপন করিয়া কষ্টপ্রশমনের চেষ্টা করিতেছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহাদের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া সম্প্রতি ১০০ একশত টাকা তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। আবশ্যক হইলে এখান হইতে লোক প্রেরণের জন্যও প্রস্তুত আছেন। এজন্য সমাজের পত্রিকাতে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

প্রচার—এই সময় মধ্যে নিম্নলিখিত স্থান হইতে প্রচারকগণের নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। কুমিল্লা, দিনাজপুর, সৈদপুর, বর্দ্ধমান, চাইবাসা, ধুবড়ি, ঢাকা, শিবপুর, বেলুড়। আমাদের প্রচারকগণ নিম্নলিখিতরূপে গত তিন মাস কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস—

নোয়াখালি—এখানে প্রায় সপ্তাহ কাল থাকিয়া সমাজে ও পরিবারে উপাসনা উপদেশ এবং পাঠ ব্যাখ্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। একদিন একটী বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন এবং আলোচনা করেন।

বরিশাল—এখানে প্রায় ৫।৬ দিন থাকিয়া সমাজে এবং পরিবারে উপাসনা উপদেশ এবং পাঠ ব্যাখ্যা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনাদি করেন। ছাত্রসমাজে "কাহার নেতৃত্বে চলিব" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং আলোচনা করেন।

খুলনা—এখানে ৩।৪দিন থাকিয়া পরিবারে উপাসনা এবং পাঠ ব্যাখ্যাদ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন, স্থানীয় টাউনহলে "সত্য ধর্ম্ম কি ?" এবং "ধর্ম্ম কি উপায়ে লাভ করা যায় ?" এই দুই বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং আলোচনা করেন।

যশোহর—এখানে ৩।৪দিন থাকিয়া সমাজে এবং পরিবারে উপাসনা উপদেশ ও পাঠ ব্যাখ্যা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন।

স্থানীয় বার লাইব্রেরিতে "আমাদের কিসের অভাব? এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন, একটী পল্লিতে একজন বন্ধুর গৃহে বিশেষ উপাসনা করেন এবং উপদেশ প্রদান করেন।

শিবপুর—প্রার্থনাসমাজের উৎসবে উপাসনা উপদেশ এবং পাঠ ব্যাখ্যাদি করেন এবং ছাত্র জীবনে নীতি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

শ্রীরামপুর—সমাজে উপাসনা করেন এবং উপদেশ প্রদান করেন।

বেলুড়গ্রামে—উপাসনা করেন এবং উপদেশ প্রদান করেন।

দিনাজপুর—সমাজে ও পরিবারে উপাসনা করেন; উপদেশ প্রদান করেন, ও একটী বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনাদি করেন।

সৈয়দপুর—মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সমাজে উপাসনা করেন এবং উপদেশ প্রদান করেন ও বিশেষ রূপে তথাকার বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

ধুবড়ী—সমাজের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তথায় সমাজে এবং পরিবারে উপাসনা করেন, পাঠ ব্যাখ্যা এবং উপদেশ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন, বিশেষ রূপে আলোচনা করেন, ছাত্র-সমাজে "ছাত্রজীবনের অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটী বিষয়" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। আর একদিন "জীবন্ত ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

চাইবাসা—এখানে প্রায় ৯।১০ দিন থাকিয়া উৎসবে উপাসনা পাঠ ব্যাখ্যা এবং উপাসনাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন।

পুরুলিয়া—উপাসনা পাঠ ব্যাখ্যা এবং একদিন টাউন হলে "প্রকৃত মনুষ্য জীবন সংগঠন" এবিষয়ে বক্তৃতা করেন।

আসেনসোল—এখানে উপাসনা পাঠ ব্যাখ্যা এবং উপদেশ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন।

বাঁকুড়া—সম্প্রতি এখানে অবস্থিতি পূর্ব্বক উপাসনা উপদেশাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন।

কলিকাতায়—অবস্থিতি কালে ব্রাহ্ম সাধনাশ্রমে এবং পরিবারে উপাসনাদি করিয়াছেন। বিশেষ ২ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনাদি করিয়াছেন। পরিবার ও ছাত্রাবাস পরিদর্শন করিয়াছেন। তত্ত্বকৌমুদীতে মধ্যে মধ্যে লিখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সমাজের অন্যান্য কার্য্য যথাসাধ্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—বংশবাটী ছাত্র সভায় সভাপতি রূপে নিম্ন লিখিত ২টি বিষয়ে দুই দিবস বক্তৃতা করেন। ১। "রক্ষণশীলতা" ২। "ইয়োরোপের নিকট আমরা কি শিক্ষা করিতে পারি।"

তেলিনীপাড়া—জমীদার মহাশয়দের বাটীতে উপাসনা ও বক্তৃতা করেন।

ঢাকা—পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ। ছাত্র সমাজের উৎসব উপলক্ষে, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ এবং ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে "নিম্নলিখিত ২টি বিষয়ে বক্তৃতা ১। "নীতি শিক্ষা ও চরিত্র সংগঠন।" ২। "ধর্ম্মমতের বিরোধ ও সামঞ্জস্য।" পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা।

কলিকাতা। একটী শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা। ছাত্রসমাজে প্রশ্নোত্তর। সিটিকলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থ সভায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা। পরিচারকাশ্রমে তিন দিবস ধর্ম্মালোচনা এবং একদিবস "সাকার ও নিরাকার উপাসনা" বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা। কোন ছাত্রাবাসে প্রার্থনা ও আলোচনা। কোন ব্রাহ্মপরিবারে জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা। ছাত্রসমাজে "সেবাধর্ম্ম" বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা ব্রহ্মবিদ্যালয় ও ছাত্রসমাজে সৃষ্ট কৌশল বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা। একটি ব্রাহ্মবিবাহে আচার্য্যের কার্য্য। রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় "রাজা রামমোহন রায় হিন্দু নারীর জন্য কি করিয়াছেন?" এই বিষয়ে বক্তৃতা।

কলিকাতা ও মফস্বলে এবং অন্যান্য লোকের সহিত আলোচনা ও ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তকরচনাতেও অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু। কলিকাতা—কোন কোন পরিবারে, বন্ধুদিগের সহিত ও নিমতা ব্রাহ্মসমাজে মধ্যে মধ্যে উপাসনা করেন।

কুমিল্লা—এখানে উৎসবে আচার্য্যের কার্য্য করেন। কোন কোন পরিবারে উপাসনা ও উপদেশাদি প্রদান করেন, ব্রাহ্মবন্ধু ও ছাত্রদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা করেন। স্থানীয় টাউন হলে "জীবন্ত শক্তির লক্ষণ" ও "জাতীয় চরিত্রের অবনতি ও উন্নতি" সম্বন্ধে এবং ছাত্রদিগের জন্য সমাজগৃহে ইংরেজিতে "Solemn warnings" এবং ইংরাজি স্কুল গৃহে "ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য "সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

পত্রিকায় ধর্ম্ম বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেন এবং "The Principles of Brahmoism and the order of divine Service in the Brahmo Samaj. নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিতেছেন। এবং অন্য একখানি পুস্তক প্রণয়নে রত আছেন। প্রচারক মহাশয়দিগের বাৎসরিক অবসর গ্রহণের নিয়মানুসারে কিছু দিন বিশ্রাম করেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—মন্দিরে রবিবাসরীয় উপাসনায় অধিকাংশ সময় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন এবং সাধনাশ্রমের তত্ত্বাবধায়কতাও দৈনিক উপাসনায় অধিকাংশ সময় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। ব্রাহ্মবালিকা বোর্ডিং ও শিক্ষালয়ের সম্পাদকীয় কার্য্য নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন, ছাত্রসমাজে উপাসনা বক্তৃতা আলোচনাদি করিয়াছেন। কোন কোন ব্রাহ্মপরিবারে অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদন করিয়াছেন এবং মেসেঞ্জার সম্পাদনের সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ প্রসাদ—এই তিন মাস কাল মধ্যে যতদিন লক্ষ্ণৌয়ে ছিলেন তথায় দৈনিক ও সাপ্তাহিক উপাসনাদি করিয়াছেন। প্রত্যহ প্রাতে দরিদ্রদিগকে হোমিও-প্যাথি ঔষধ বিতরণ করিয়াছেন। রোগীর সংখ্যা প্রায় ১৫০০ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত প্রকাশ্য রাজপথে বক্তৃতা ও ধর্ম্মালোচনা করিয়াছেন। কোয়েটা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে আহূত হইয়া তথায় যাইবার কালে এবং তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে লাহোর, রক্ষ সক্কর প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি করিয়া উপাসনা, বক্তৃতা, ও ধর্ম্মালোচনা করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার একমাস কালের অধিক অতিবাহিত হয়। তিনি এই সকল স্থানে ধর্ম্ম প্রচার এবং কোন কোন সর্দ্দার ও শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়া বিশেষ উপকৃত ও উৎসাহিত হইয়াছেন।

বক্তৃতা ও উপদেশের বিষয়	স্থান
Terms of divine love.	লাহোর ব্রহ্মমন্দির।
To be divine is the real aim of life	রক্ষ ভজনমণ্ডলী মণ্ডপ
The object of life	কোয়েটা।
Terms of enjoying the utsob	ঐ
Materials of holy life	ঐ
The practical feature of our religion	ঐ
What we mean by conversion	ঐ
The open enemies of God	ঐ
Life here and here after	ঐ
A good old way	ঐ
Our duties	ঐ
Home and its teachings	রক্ষ
The basis of religion is to be with God	সক্কর
The materials of happy life	সক্কর
The human life	লাহোর
The duties of educated Indian	ঐ

প্রচারের এবং তাঁহার লক্ষ্ণৌ দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্য হেতু নিম্নলিখিত এককালীন দান জন্য দাতাদিগকে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছেন।

সর্দ্দার দয়াল সিং লাহোর—৬০৲

কোয়েটা ব্রাহ্মসমাজ —৮০৲

দেওয়ান নেভালরাও সক্কর—১০৲

লক্ষ্ণৌ হাইদ্রাবাদে দাতব্য চিকিৎসালয়টি হইয়া তাঁহার প্রচার কার্য্যের অনেক সুবিধা ও উন্নতি হইয়াছে। স্থানীয় বন্ধুগণ একটি শাখা চিকিৎসালয় খুলিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু সহকারী অভাবে আপাততঃ তাহা সম্ভব পর নহে। দুইটি যুবক তাঁহার চিকিৎসালয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। সে জন্য তাঁহাদিগের নিকট তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

এতদ্ভিন্ন বাবু কালীপ্রসন্ন বসু নিম্নলিখিত রূপে কার্য্য করিয়াছেন। তিনি কিছুকাল তিল্লিগ্রামে স্থানীয় উপাসকদিগকে লইয়া মাঝে মাঝে উপাসনা করিয়াছেন, ও রবিবার উপাসনার সময় উপদেশ দিয়াছেন। কিছুকাল ঢাকায় থাকিয়া কয়েকটী উপাসক লইয়া ভজনালয়ের এক প্রকোষ্ঠে তিন দিবস উপাসনা করেন, রবিবার প্রাতে ভজনালয়ে উপাসনা করেন। তৎপর কলিকাতা আগমন করেন। কলিকাতায় অবস্থিতি কালে দুই দিন সাধনাশ্রমের ও এক দিন প্রাতে ভজনালয়ের উপাসনা কার্য্য করিয়াছিলেন। সাধনাশ্রমের উপাসনালয়ে একদিবস সায়াহ্নে কোন মহিলার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা করেন। দুইটী বন্ধুর অনুরোধে একদিবস ইডেন উদ্যানে উপাসনা করেন। কোন এক শনিবার সায়াহ্নে বাবু বিপিন বিহারী রায় মহাশয়ের বাসায় উপাসনা করেন। ছাত্র সমাজের উৎসবে পাঠ ব্যাখ্যা ও বেলুড় গ্রামে ধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করেন। এক দিন ভবানীপুরে মনোরঞ্জন গুহের বাসায় পারিবারিক উপাসনা করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত রঙ্গপুর ব্রাহ্মসমাজের বিল্ডিং ফণ্ডের জন্য কয়েক টাকা দান সংগ্রহ করেন। ধর্ম্ম বিষয়ক একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে নিযুক্ত আছেন। কলিকাতা হইতে বোলপুর গমন কালে বর্দ্ধমানে কামিনীকান্ত গুপ্তের বাটীতে উপাসনা করেন। বোলপুরে উপস্থিত হওয়ার পর বন্ধু মণ্ডলীতে একদিন উপাসনা করেন। বোলপুর গ্রামে ধর্ম্ম বিষয়ক একটী বক্তৃতা করেন। নলহাটীতে বাবু নীলকান্ত সিদ্ধান্তের বাড়ীতে উপাসনা করেন। রামপুরহাটে বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষের বাসায় উপাসনা করেন। রবিবার দুই বেলা সমাজে উপাসনা করেন। সায়াহ্নে উপাসনায় উপদেশ দেন এবং অপরাহ্নে আলোচনা করেন। বাজারে সঙ্গীত প্রার্থনা করেন, তৎপর মন্দিরে আসিয়া সঙ্গীত ও প্রার্থনা বক্তৃতা করেন। রামপুরহাট হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া কেবল একটী বন্ধুর জন্ম দিনোপলক্ষে উপাসনা করেন।

এবং বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী প্রধানতঃ চেরাপুঞ্জিতে থাকিয়া কার্য্য করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে খাসিয়া পাহাড়ের অন্যান্য স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

সাধনাশ্রম।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাসের কার্য্য-বিবরণ প্রচারকগণের কার্য্যবিবরণের সহিত দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য পরিচারকগণের কার্য্য বিবরণ এইরূপ।

শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব—ইনি রামপুরহাট ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন এবং কোন ব্রাহ্মের গৃহে প্রার্থনা করেন ও নলহাটিতে উপাসনা করেন। ভাগলপুরের কোনও পরিবারে উপাসনা করেন এবং উপনিষদের শ্লোক উল্লেখ করিয়া উপদেশ দেন। একদিন আলোচনা সভাতে প্রার্থনা ও আলোচনাদি করেন। কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। শান্তিনিকেতনে অবস্থিতি কালে বোলপুরে একদিন বক্তৃতা করেন। এক্ষণে তিনি প্রচারার্থে ছোটনাগপুর অঞ্চলে গমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় সাধনাশ্রমের দৈনিক উপাসনায় কখন কখন আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন, কোন কোন

বাসায় এবং মন্দিরে রবিবার প্রাতঃকালে মধ্যে মধ্যে উপাসনা করিয়াছেন। কয়েকটী পারিবারিক অনুষ্ঠানে উপাসনা করিয়াছেন। এবং ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে ২ সপ্তাহ বাবু (জয়শঙ্কর রায় মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে) শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। ইনি নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মমিশন প্রেসের তত্ত্বাবধায়কতা করিয়াছেন এবং তত্ত্বকৌমুদী পরিচালনের সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধনাধ্যক্ষের কার্য্য ও কার্য্যালয়ের অন্যান্য কার্য্যের সহায়তা করেন ও কয়েকটি ব্রাহ্ম পরিবার পরিদর্শন করেন। রবিবার প্রাতে কয়েক দিন সমাজ মন্দিরে উপাসনার কার্য্য করেন। মধ্যে মধ্যে আশ্রমের উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এবং প্রতি দিন সায়ংকালে সমাজ মন্দিরে উপাসনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন প্রতি শনিবার নিয়ত। ব্রাহ্মসমাজে সাপ্তাহিক উপাসনা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী—ব্রাহ্ম ছাত্রনিবাসের তত্ত্বাবধায়কতা এবং বালিকা শিক্ষালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য নিয়মিত রূপে সম্পাদন করিয়াছেন। সময় সময় সাধনাশ্রমের দৈনিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন ও কোন কোন বাসায় উপাসনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদনের সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল—সাধনাশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষতা ও ব্রাহ্ম ছাত্রীনিবাস ও বালিকা শিক্ষালয়ের হিসাবাদি কার্য্যে নিয়মিত রূপে সহায়তা করিয়াছেন এবং শান্তিনিকেতনে অবস্থিতি কালে বোলপুরে এক দিন নিত্যানন্দের প্রেম প্রচার সম্বন্ধে কথকতা করেন ও ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক দিন বক্তৃতা করেন। কখন কখন সাধনাশ্রমের দৈনিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন এবং তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদনের সহায়তা করিয়াছেন।

সাধনাশ্রমে এই সময় মধ্যে ৩টী মাসিক উৎসব হইয়াছে ১লা সেপ্টেম্বরের উৎসবে বাবু জয়শঙ্কর রায় সংকল্পাধীন সেবক রূপে গৃহীত হইয়াছেন। আগষ্ট মাসে আশ্রমবাসীগণের অধিকাংশ বোলপুরে নির্জ্জন সাধন আলোচনাদিতে যাপন করিয়াছেন।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
বাটীভাড়া	৪৪৲	প্রচারার্থে পাথেয়, ডাকমাশুল	
পুস্তক বিক্রয়ের আয়	৬৲	ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যয় ৬৬৷/১০	
আতিথিফণ্ডের দানপ্রাপ্তি	১৲	আশ্রমবাসিগণের	
আশ্রমবাসিগণের		আহার ও অন্যান্য	
নিকট হইতে প্রাপ্তি	১৮১৲	বাবতে ব্যয়	৪১৯৸৴১০
জিনিস বিক্রয়	২০৷৹	অতিথিগণের জন্য ব্যয়	
দান প্রাপ্তি	১০০৸৴১০		১৩৷/০
ভিক্ষা প্রাপ্তি	১৪৬৴/১৫		
			৪৯৯৸৴০
	৪৯৯৷৵৫	স্থিত	৵১০
পূর্ব্বস্থিত	।৵৫		
		মোট	৫০০৲১০
মোট	৫০০৲১০		

পুস্তক প্রচার—আমাদিগের প্রচারক বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম সূত্র নামক পুস্তকের ১৫০০ খণ্ড এবং সেই পুস্তকের সত্বাধিকার ২০ টাকা মূল্যে সমাজকে বিক্রয় করিয়াছেন। উত্তরবঙ্গ রেলওয়ের রাণীনগর ষ্টেশনের বাবু কেদারনাথ সরকার মহাশয় তাঁহার কৃত "আলোক" নামক পুস্তকের ৭৭৫ খণ্ড পুস্তক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে দান করিয়াছেন। আমরা এই দান জন্য দাতাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

সঙ্গত সভা—এই তিন মাসে সঙ্গত সভার ১৩টী অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে প্রথম দুইমাস ইমিটেসন অব ক্রাইষ্ট নামক পুস্তক পাঠ ও ব্যাখ্যা ও আলোচনা হয় এবং ৩য় মাসে ব্রাহ্ম বালক বালিকাদের শিক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রকার আলোচনা হইয়াছিল।

দাতব্য বিভাগ—গত তিন মাস কাল দাতব্য বিভাগের কার্য্য প্রায় পূর্ব্ববৎই চলিয়াছে। এই তিন মাস মধ্যে ১৫টী, ছাত্র, ২টী ছাত্রী ৫টী পরিবার, ১টী অন্ধ এবং একটী কুষ্ঠ রোগীকে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে। অর্থাভাবে কয়েক জনকে সাহায্য করিতে পারা যায় নাই।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা		খরচ	
বার্ষিক চাঁদা আদায়	১১৷০	মাসিক দান	৮০৷৹
মাসিক	১৫৷০	এক কালীন	১৫৷৵৹
অনুষ্ঠান উপলক্ষে	২২৲		৯৬৵৹
এক কালীনদানপ্রাপ্তি	১১৷০	হস্তে স্থিত	২০৭৸৹
বিবিধ হিঃ	১০/৫		
	৭০৷/৫		৩০৩৸৵৹
পূর্ব্বকার স্থিত	২৩৩।১৫		
		মোট	৩০৩৸৵
মোট	৩০৩৸৵		

ছাত্রসমাজ—বিগত জুলাই মাসে ছাত্র সমাজের নূতন বৎসর আরম্ভ হয় এবং কর্ম্মচারিগণের হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সভাপতি, শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র সহকারী সভাপতি, শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ও সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া কার্য্য চালাইতেছেন। কর্ম্মচারিগণ ব্যতীত অন্যান্য বৎসরের ন্যায় ছাত্রসমাজ আপনাদের মধ্য হইতে ১০ জন সভ্য লইয়া একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিযুক্ত করেন। বিগত তিনমাস মধ্যে ছাত্রসমাজের সাধারণ সভার একটী ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার তিনটী অধিবেশন হইয়াছে।

বক্তা	বিষয়	স্থান	সময়
বাবু মনোরঞ্জন গুহ	মানবাত্মারতৃপ্তিঅন্ন	উপাসনা মন্দির	১০ই জুলাই
„ কৃষ্ণকুমার মিত্র	বিদ্যাসাগরেরসমাজসংস্কার	ঐ	২২এ জুলাই,

,,কালীশঙ্কর সুকুল	ধর্ম্মেরনামে অধর্ম্ম	ঐ	৫ই আগষ্ট
,,কৃষ্ণকুমার মিত্র	শক্তিসঞ্চার	ঐ	২২এ আগষ্ট
,,কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঈশ্বরেরপূজা,	জেনারেল এসেম্ব্লি	১৯এ আগষ্ট
,, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঈশ্বরের অস্তিত্ব,	উপাসনা মন্দির	৯ই সেপ্টেম্বর
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী	জীবনের মধ্যপথ	ঐ	২৩এ সেপ্টেম্বর

বিগত ১৯ শে জুলাই অপরাহ্ন ৭॥ ঘটিকার সময় একটি আলোচনা সভা হয়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বিগত ২রা সেপ্টেম্বর অপরাহ্ন ৭॥ ঘটিকার সময় উপাসনা মন্দিরে ছাত্রসমাজের বিশেষ উপাসনা হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছাত্রসমাজের সম্পাদককে সঙ্গে লইয়া মিরজাফরের গলিতে ১নং ছাত্রনিবাসে গমন করেন। তথায় উপাসনার পর কিছুকাল সংকীর্ত্তন হয় এবং অবশেষে ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা হয়।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সম্পাদককে সঙ্গে লইয়া ৭ই আগষ্ট মিরজাফরের গলির ১নং বাটী, ১৭ই আগষ্ট শ্যামাচরণ দের ষ্ট্রীটের ১০নং বাটী ২৪ শে আগষ্ট বৈঠকখানার ১১৯ নং বাটী, ৩১ শে আগষ্ট বৈঠকখানার ১২৬ নং বাটী পরিদর্শন করিয়াছেন এবং ছাত্রদিগের জ্ঞাতব্য বিষয়ে ছাত্রদের সঙ্গে কথোপকথন করেন।

বিগত ১৬ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ন ৭ ঘটিকার সময় সায়ংসমিতি হয়। প্রায় ৩০০ লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। ছাত্র ও ছাত্রীগণ অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক ও মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ৪১৫ জন ইংরেজ পুরুষ ও রমণী ছিলেন।

ছাত্রসমাজের ৯টী সভ্যকে লইয়া একটী শুশ্রূষা বিভাগ গঠিত হইয়াছে।

বৃন্দাবন মল্লিকের গলির ১নং বাসাস্থ ছাত্রসমাজের জনৈক সভ্য ও ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীটের ১২নং বাসায় আর একটী সভ্য পীড়িতাবস্থায় সম্পাদককে শুশ্রূষা করিবার লোকের বন্দোবস্ত করিবার জন্য লিখিয়া পাঠান, সম্পাদক শুশ্রূষা বিভাগের সভ্যগণের কতিপয় সভ্যকে প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করেন। ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস এই দুই স্থানেই বিনা ভিজিটে চিকিৎসা করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রসমাজের সভ্য সংখ্যা ২৪৩। সভ্য সংখ্যা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে।

এই তিন মাসে নিয়মিত চাঁদা ও সায়ংসমিতির ব্যয় নির্ব্বাহার্থে এককালীন দান লইয়া আয় ৭০৲ টাকা আয় হইয়াছে; ব্যয় ও প্রায় এরূপই হইয়াছে। এই আয় হইতে পূর্ব্ব বৎসরের কিঞ্চিৎ ধারও শোধ হইয়াছে।

রবি বাসরীয় নীতি বিদ্যালয়—ইহার কার্য্য রীতিমত চলিতেছে। এক্ষণে ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা ১৩২। বালক ও বালিকার সংখ্যা সমান। এই তিন মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত এককালীন দান পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ ২০৲ শ্রীযুক্ত মুকুকেশী দত্ত ৫৲ শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ দাস ৫৲ শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীনাথ দত্ত ৫৲ এই সকল দানের জন্য আমরা দাতাগণকে ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছি।

উপাসক মণ্ডলী—মন্দিরে নিয়মিত রূপে প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় উপাসনা হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও কৃষ্ণকুমার মিত্র উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় মণ্ডলীর বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতির মানসে মণ্ডলীর সম্পাদককে এক পত্র লেখেন, সেই পত্র উপাসক মণ্ডলীর এক বিশেষ অধিবেশনে বিচারার্থ উপস্থিত করাতে উপস্থিত সভা মহোদয়গণ মণ্ডলীর অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য একটী কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই কমিটি কিসে উপাসক মণ্ডলীর উন্নতি সংসাধিত হয় তাহার আলোচনা করিতেছেন। মণ্ডলীর আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উপাসকমণ্ডলীর আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
দান প্রাপ্তি	২৲	বেতন ইঃ খরচ	২৫৸০
চাঁদা আদায়	১৩০৸৶১৫	ক্ষুদ্র ব্যয়	১৮৸৵৫
গ্যাস ইঃ ছাত্রসমাজ		গ্যাসের আলো ইঃ	২৬৲
হইতে প্রাপ্ত	৫৲	মন্দির মেরামত ইঃ	১৭৴১০
		হাওলাত শোধ	৭৭৲
	১৩৭৸৴১৫		
পূর্ব্বস্থিত	৩১৵১২॥		১৬৪৶১৫
		হস্তেস্থিত	৪৷৴১
মোট	১৬৯৶৭।		
			১৬৯৶৭॥

ব্রহ্মবিদ্যালয়—বিগত জুলাই মাসে এই বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে ও তৎপর নববর্ষ (দ্বাদশ বর্ষ) আরম্ভ হইয়াছে। বিগত বৎসর বিদ্যালয়ের কার্য্য সন্তোষকররূপে চলে নাই। চারিটী শ্রেণীর মধ্যে ইংরেজ সিনিয়ার ও বাঙ্গালা জুনিয়ার, কেবল এই দুটী শ্রেণীর কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিয়াছিল। নিয়মিতরূপে কার্য্য করিতে পারেন এরূপ শিক্ষকের অভাবই এই বিশৃঙ্খলার কারণ। পরীক্ষাকালে কেবল তিন জন ছাত্র সমগ্র সিনিয়ার কোর্সের এবং একজন ছাত্র কেবল 'নিউটেষ্টেমেণ্টের' পরীক্ষা দিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত মফস্বলের একটী ছাত্র বাঙ্গালা জুনিয়ার কোর্সের পরীক্ষা দিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বৎসর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এত অল্প হয় নাই। গত বৎসর কোর্স বিশেষ কঠিন হইয়াছিল, বোধ হয় ইহাই এরূপ অল্পতার প্রধান কারণ। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় ধর্ম্মবিজ্ঞান, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 'ভগবদ্গীতা' বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত 'নিউটেষ্টেমেণ্ট' ও বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা জুনিয়ার কোর্সের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। নববর্ষের কোর্স বিশেষ সহজ করা হইয়াছে। ইংরেজি ধর্ম্মবিজ্ঞান, বাঙ্গালা ধর্ম্মবিজ্ঞান, হিন্দুশাস্ত্রের 'ভগবদ্গীতা' ও খ্রীষ্টান শাস্ত্রের 'নিউটেষ্টেমেণ্ট' এই চারি বিষয়ে চারিটী স্বতন্ত্র কোর্স গঠিত হইয়াছে। শিক্ষার্থিগণ এই চারি কোর্সের মধ্যে কোন একটী বা তদধিক কোর্স অধ্যয়ন করিতে পারিবেন।

বাবু সীতানাথ দত্ত ইংরেজি ধর্ম্মবিজ্ঞান ও 'ভগবদ্গীতা' এবং বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা ধর্ম্মবিজ্ঞান অধ্যাপনার ভার লইয়াছেন। এই তিনটী শ্রেণীর কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিতেছে। নিয়মিত শিক্ষকের অভাবে 'নিউটেষ্টেমেন্টের' শ্রেণী এখনও খোলা হয় নাই।

ব্রাহ্ম ছাত্রীনিবাস ও ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়— গত জুলাই মাসে ব্রাহ্মছাত্রীনিবাস ও শিক্ষালয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নির্দ্ধারণ অনুসারে একত্রিত করিয়া এক সব কমিটির কর্ত্তৃত্বাধীনে আনা হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উক্ত কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। জুলাই মাস হইতে একজন শিক্ষক ও একজন শিক্ষয়িত্রী নূতন নিযুক্ত হইয়াছেন। স্কুলের বর্ত্তমান ছাত্র ও ছাত্রীসংখ্যা ৮৩। তন্মধ্যে ১৮টী ছাত্র অবশিষ্ট ছাত্রী। বোর্ডিংএর ছাত্রীসংখ্যা বর্ত্তমানে ২৭; তন্মধ্যে ২৩টী শিক্ষালয়ে পাঠ করে আর ৪টী বেথুন বিদ্যালয়ে পাঠ করে। বোর্ডিং বাবদে খরচ আদায়ের অতিরিক্ত হয় না। শিক্ষালয়ের খরচ নিয়মিত বেতন ও চাঁদাবাবদে যত আদায় হয় তাহা অপেক্ষা বেশী হইতেছে। ব্রাহ্ম সাধারণের আর্থিক সহানুভূতি ব্যতীত এরূপ শিক্ষালয় চালান কঠিন। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, যে সমস্ত বিষয় এই শিক্ষালয়ে বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা আছে, অর্থাভাবে তাহা দিতে পারা যাইতেছে না। এদিকে সহৃদয় ব্রাহ্মমহোদয়গণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

গত তিন মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
বেতন আদায়	১৪০৫॥৶১৫	খোরাক জলখাবার ও আলো	৩৮১৸৶৫
বোর্ডিং ফি ৯৫৫৸/১৫		কর্ম্মচারী ও চাকরের	
স্কুল ফি ৪৪.৸৶		বেতন	৫৫৩।১৫
	১৪০৫॥৶১৫	শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী ৪৭৭॥০	
চাঁদা ও এককালীন দান	৪৫৫॥৶	চাকর ৭৫৸১৫	
কর্জ্জজমা	২৫০৲		৩৫৩ ১৫
	২১১১।৵১৫	ধোপা	৪৫।১৫
পূর্ব্বস্থিত	৭৶	গাড়ী হিসাবে খরচ	২৩২৸/৫
		বাড়ীভাড়া	২৭৮৲
		গাড়ী খরিদ ও গাড়ী ভাড়া বাবদে কর্জ্জশোধ	২৫০৲
		বিবিধ খরচ	৮৩৸৶৫
			১৮২৫।/৫
		হস্তেস্থিত	২৯৩৶১০
সমষ্টি	২১১৮॥১৫	সমষ্টি	২১১৮॥১৫

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার ও তত্ত্ব-কৌমুদী— ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার সম্পাদন সাহায্যের জন্য একটী সব কমিটি গঠিত হইয়াছে। কমিটির সভ্যগণ সম্পাদক মহাশয়কে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছেন। সম্প্রতি মেসেঞ্জারের ১০ম বার্ষিক জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। উপাসনা পূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ হয় তৎপর ইহার উন্নতিকল্পে নানা প্রকার আলোচনা হইয়াছিল। দিন দিন মেসেঞ্জারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতেছে। তত্ত্বকৌমুদী সম্বন্ধে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। উভয় পত্রিকাই নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে।

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস— সমাজ কার্য্যালয় হইতে পূর্ব্বে ব্রাহ্ম মিশন প্রেসের জন্য যে টাকা ঋণ দেওয়া হয়, তদ্ব্যতীত এই তিন মাসে ২৫০০ টাকা প্রেসকে ঋণ দেওয়া হইয়াছে। এই টাকা দ্বারা অন্যান্যের নিকট প্রেসের যে ঋণ ছিল তাহা পরিশোধ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে প্রেসের দেনা, (বাজার দেনা হাওলাত ও কর্জ্জ দরুন) প্রায় ৫৬০০ টাকা। পাওয়ানা ৬১৩৭৸/৭॥ আছে। প্রেসের তিন মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

আয়		ব্যয়	
ছাপাই হিঃ (যত টাকার কাজ হইয়াছে)	১২৬৮৵০	মুদ্রাঙ্কন, কাগজ প্রভৃতি বাবতে ধার দেওয়া হইয়াছে	১৯৪৪৸/৭॥
আদায় (মুদ্রাঙ্কন কাগজ প্রভৃতি বাবতে বাকী আদায়)	১৫৯১/৫	বেতন হিঃ	৬৪৯৸৵১৫
		সরঞ্জাম	৮১/১৭॥
		বিবিধ	৯॥২॥
প্রেসপ্রস্তুত হিঃ	১৪২।৵১০	ডাকমাশুল	১৵০
কাগজ বিক্রয় হিঃ	৩৮২।০	কাগজ খরিদ	৩৬৬৸/১৫
গৃহপ্রস্তুত হিঃ	৩০৲	প্রেস প্রস্তুত	১৪৪৸
প্যাকিং হিঃ	২॥/১০	সুদ	৬৯৲
কর্জ্জ জমা	২৫০০৲	বাটী ভাড়া	৩০৲
হাওলাত জমা	১০০৪/০	ওয়ারাণ্টিয়ার	১২৬৲
		ছাড	১।০
	৬৯২০॥৫	কর্জ্জ শোধ	২৫০০৲
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	৪।৵২॥	হাওলাত শোধ	৯৮৫॥৵১৫
			৬৯১০৲১৭॥
		স্থিত	১৪৸/১০
মোট	৬৯২৪৸৵৭॥	মোট	৬৯২৪৸৵৭॥

আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

আয়		ব্যয়	
মূল্যপ্রাপ্ত	৪৩০/০	কর্ম্মচারীর বেতন	১০১৲
বিজ্ঞাপন	৪৭৲	মুদ্রাঙ্কন	৯০৲
নগদ বিক্রয়	॥৵১০	কাগজ	৮৮৶১০
ডাকমাশুল ফেরৎ জমা	৭।০	কমিশন	৮।০
বিবিধ হিঃ	২॥৵০	ডাকমাশুল	৯৯৶০
		বিবিধ	২৪।৫
			৪১৮৸১৫
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	৩৮০৸০	হাওলাত ও সপেন্সস্	৩২৩।৵০
			৭৪২৶১৫
		স্থিত	১২৬৶১৫
মোট	৮৬৮।/১০	মোট	৮৬৮।/১০

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

আয়

সভ্য ও সহযোগিগণের
চাঁদা আদায় ৩০৭৲১০
বার্ষিক ১৯০৸৶১৫
মাসিক ১১৬৲১৫

৩০৭৲১০

প্রচারার্থ দানপ্রাপ্তি ৩৬৯।৵০
বার্ষিক ৭৩৷০
মাসিক ১৮২৲
এককালীন ১১৩৸৵০

৩৬৯।৵০

প্রচারক গৃহ ১১৭৷/১৫
ভাড়া ৭২৷০
কাষ্ঠের গৃহ হিঃ ফেরত
৪৫/১৫

১১৭৷/১৫

সুদ ১৯৩৷০
জন্ম রেজেষ্টরি ফি ৸০
পাথেয় ২৮৲
বিবিধ ১৩৯৲
সিটিকলেজ বৃত্তি ৭৯৷০
ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরী ৷০
খাসিয়া মিশন ৯।০
দুর্গাময়ী ফণ্ড ১০৲
সুজাতা বৃত্তি ৪৪৲
সম্পাদক কলিকাতা
উপাসক মণ্ডলী
হাওলাত আদায় ৭৫৲
বিল্ডিং ফণ্ড
সম্পাদকের
নিকট হইতে ফেরত ৯৭।৵১০
স্থায়ী প্রচার ফণ্ড ২৯৷০
তত্ত্ব-কৌমুদী ১৮০৸৵৫
ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার ১২৬৵১৫

১৮০৭৶১৫

হাওলাত ও সস্‌পেন্স ২১৭৬৵০

৩৯৮৩৷/১৫

বিগত ত্রৈমাসিকের
স্থিত ১৫৭২।০
সমাজ ফণ্ড ৭৯৫।০
মেসেঞ্জার ৩৮০৸০
তত্ত্ব-কৌমুদী ২৩৩৲১০
পুস্তক ১৬৩৶১০

১৫৭২।০

মোট ৫৫৫৫৸/১৫

ব্যয়

প্রচার ৫৪৬।০
কর্ম্মচারীর বেতন ১২০৲
কমিশন ৭৶০
ডাকমাশুল ৫।১০
প্রচার গৃহ ৫৸/১০
বিবিধ ৩০৫/০
(উৎসব কার্য্যালয়ের আসবাব চিকাগোতে তারে সংবাদ, বার্ষিক কার্য্যবিবরণ প্রভৃতিতে ব্যয়)
সুদ ১৫৲
পাথেয় ২৮৲
ট্রাষ্টডীড্ মুদ্রাঙ্কন ৩।৵০
সিটি কলেজ বৃত্তি ৮২৷০
সৌদামিনী বৃত্তি ১০৲
সুজাতা বৃত্তি ৪৪৲
দুর্ভিক্ষ ১০৫৷/০
খাসিয়া মিশন ২৫৶১০
বাগআঁচড়া মিশন ৫।৵০
কলিকাতা উপাসক-
মণ্ডলী ১৪৵০
ব্রাহ্মমিশন প্রেস ২৫০০৲

৩৮২২৸১০

হাওলাত ও সস্‌পেন্স ১২৬৯৸৫

৫০৯২৷১৫

হস্তোদ্বৃত্ত ৪৬৩।/০
সমাজ ফণ্ড ১৫৬।০
মেসেঞ্জার ১২৬৵১৫
তত্ত্ব-কৌমুদী ১৮০৸৵৫

৪৬৩।/০

মোট ৫৫৫৫৸/১৫

তত্ত্ব-কৌমুদী।

আয়

মূল্যপ্রাপ্তি ২৮৪৷৶১০
নগদ বিক্রয় ২৷০
ডাকমাশুল ৶০

২৮৭।৵১০

গতত্রৈমাসিকের স্থিত ২৩৩৲১০

মোট ৫২০৶০

ব্যয়

কর্ম্মচারীর বেতন ১২৮৲
মুদ্রাঙ্কন ৫৪৲
কাগজ ১০০৷/১০
কমিশন ৮৸/১০
ডাকমাশুল ৩৭৷/০
বিবিধ ১০৷১৫

৩৩৯৷১৫

স্থিত ১৮০৸৵৫

মোট ৫২০।৶০

পুস্তকের ফণ্ড :

আয়

নগদ বিক্রয় ২০৮।৶০
ঐ অপরের ৩৬৵১০
বাকী মূল্য আদায় ৫২।৵১০
ডাকমাশুল ৬৵১০
কমিশন ২।৶০
বিবিধ ।/১০

৩০৫৸৶০

হাওলাত ও সসপেন্স ৪৩৮/৫
সমাজ হিঃ হইতে হাও-
লাতের অংশ ফেরত
১৩৪/৫
মেসেঞ্জার হিঃ হইতে
ঐ ঐ ঐ
৩০০৲

৪৩৪/৫
গচ্ছিত ৪৲

৪৩৮/৫

৭৪৪৲৫

গত ত্রৈমাসিকের
স্থিত ১৬৩৶১০

মোট ৯০৭৶১৫

ব্যয়

অপরের পুস্তক বিক্রয়ের
মূল্য শোধ ১৩৷৶০
পুস্তক ক্রয় ৬৪৫৲
কর্ম্মচারীর বেতন ৬২৲
মুদ্রাঙ্কন ৫৪৷০
ডাকমাশুল ৭৷৶৫
পুস্তক বাঁধাই ৫০৲
কমিশন ১৮৲১৫
কাগজ ৫০৷/১০
বিবিধ ১৷৶৫
হাওলাত ও সস্‌পেন্স ৪৲

মোট ৯০৭৶১৫

ব্রাহ্মসমাজ।

রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৬৷ টার সময় নিলফামারিস্থ ব্রাহ্মসমাজ গৃহে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে একটী সভা হয়। সভায় স্থানীয় প্রথম মুনসেফ মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ ঘোষাল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু রজনীকান্ত সরকার বি, এল ও বাবু বিশ্বেশ্বর গুপ্ত রাজার সংগুণাবলী আলোচনা করিয়া দুইটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপর অন্যান্য দুই একজনেও রাজার মহত্ত্বের বিষয় কিছু কিছু বলেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় রাজার জীবনের আধ্যাত্মিকতা অবলম্বন করিয়া একটী বক্তৃতা করার পর ৯৷ টায় সময় সভা ভঙ্গ হয়।

বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময়ে কাকিনীয়া ছাত্রসমাজ গৃহে একটী সভা হয়; অনেক ভদ্রলোক এবং ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। অত্রস্থ ইংরেজী স্কুলের হেড মাষ্টার উক্ত মহাত্মার জীবনী সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন।

বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর বুধবার অপরাহ্ন ৬॥ ঘটিকার সময়ে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ গৃহে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ এক সভার অধিবেশ হইয়াছিল। স্থানীয় মুন্সেফ বাবু সীতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত এম্ এ, বি এল, বাবু সত্যানন্দ দাস বি, এ, ও বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী রাজার জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বহরমপুর কলেজে ছাত্রদের উদ্যোগে রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিবস উপলক্ষে গত বুধবারে বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা ৭ টার সময় এত লোক হইয়াছিল যে, অনেক কষ্টে অনেকে দাঁড়াইতে স্থান পাইয়াছিলেন। সভাপতি বাবু দীননাথ গাঙ্গুলী। বক্তা বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, গৌরবল্লব সেন, মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত, নফরচন্দ্র রায়।

বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর বুধবার রাত্রে কাঁথি হাই স্কুল গৃহে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উকীল বাবু উপেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার এম্ এ, বি, এল, ও মুন্সেফীর সেরেস্তাদার বাবু তারকচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা" আহূত হইয়াছিল। হেড মাষ্টার বাবু তারকগোপাল ঘোষ বি, এ, কর্ত্তৃক "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের মহত্ব" হৃদয়গ্রাহী রূপে বিবৃত হইয়াছিল। স্থানীয় সিনিয়ার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু হরকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া এবং স্থানীয় অপরাপর অনেক ভদ্রমণ্ডলী সভায় যোগ দান করিয়া রাজার মহত্বের প্রতি আপনাদিগের হৃদয়ের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বক্তৃতা প্রায় ২ ঘণ্টা ব্যাপী হইয়াছিল।

বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর বুধবার মহেশতলা উচ্চ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সমবেত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে এক সভা করেন। সভাস্থলে প্রধান শিক্ষক এবং হেড পণ্ডিত মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। সুযোগ্য শিক্ষক বাবু রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর বুধবার রাঁচি ব্রাহ্মসমাজ ভবনে, উক্ত মহাত্মার মহত্ব অনুধ্যান ও গুণাবলী আলোচনা জন্য, প্রায় ২০ জন ভদ্রলোক ও ১৬টী স্কুলের ছাত্র সমবেত হইয়াছিলেন। বাবু রাজকুমার দাস, এম, এ, গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ২য় শিক্ষক মহাশয় রাজার গুণাবলী আলোচনা করিয়াছিলেন।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহে সূর্য্যকান্ত হলে কতিপয় গণ্যমান্য লোকের উদ্যোগে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ এক সভা হইয়াছিল। সভায় সহরের সম্ভ্রান্ত অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান, উকীল বাবু শ্যামাচরণ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বিষয়টীর গাম্ভীর্য্য গম্ভীর ভাবে বুঝাইয়া দিলে সঙ্গীতের পর সিটিস্কুলের একজন শিক্ষক কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে বাবু অক্ষয়কুমার মজুমদার এম এ, বি এল, মহাত্মার জীবন-বিবরণ ভাষার সুশৃঙ্খলার সহিত বিবৃত করেন। বাবু শ্রীনাথ চন্দ, বাবু অমরচন্দ্র দত্ত ও পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন কিছু কিছু বলিয়া ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে এখানে তদ্রূপ সভা এই প্রথম। এ সভায় বিভিন্ন শ্রেণীর লোক যোগ দেওয়ায় আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।

লাহোর, বোম্বাই এবং মান্দ্রাজস্থ ব্রাহ্মসমাজ রাজা রামমোহন রায়ের ষষ্টিতম মৃত্যুৎসব করিয়াছিলেন। ২৪ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে রাজার মৃত্যুদিনে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

সঞ্জীবনী।

বিগত ২৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময়ে মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরিস্থ বেলীহল গৃহে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ একটী সভা আহূত হইয়াছিল। স্থানীয় কলেজের শিক্ষক বাবু অভয়চরণ বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সর্ব্ব প্রথমে "কোথা আছ, দেখ এসে মহামতি রামমোহন। তোমার জন্মভূমি ভারতভূমি হয়েছে কি সুশোভন" এই সুন্দর সঙ্গীত গীত হইবার পরে, সভাপতি মহাশয় রাজার জীবনী সম্বন্ধে একটী মন্তব্য প্রকাশ করেন। রাজা রামমোহন রায় যে কেবল ব্রাহ্মদিগেরই স্মরণীয় তাহা নহে, কিন্তু সমুদয় বাঙ্গালি জাতি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ, ইহা সভাপতি মহাশয় সুন্দররূপে বিবৃত করেন। তৎপরে বক্তা বাবু হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় রাজার জীবনী অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করেন। বক্তা, রাজার অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমশীলতা, তাহার প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা এবং বিশ্বজনীন প্রেম ও উদারতা, প্রভৃতি মহৎ গুণাবলি, সভাস্থ, সমুদয় ভদ্র মহোদয়দিগকে অতি সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন। বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, সভাস্থ ভদ্রমহোদয়গণের মধ্য হইতে কেহ কেহ কিছু বলেন। পরিশেষে রাজার স্বরচিত একটী সঙ্গীত গীত হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়। সভাস্থলে, কতিপয় গণ্য মান্য ভদ্র মহোদয়ের সমাবেশ হইয়াছিল এবং সভাস্থ সকলেই ইহাতে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমান মিউনিসিপালিটির টাউন হলে এক সভা আহূত হয়। স্থানীয় ব্রাহ্মগণের আহ্বান অনুসারে কলিকাতা হইতে বাবু বিপিনচন্দ্র পাল তথায় গমন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন।

ঝান্সী প্রার্থনা সমাজে এক সভা হয়, সমাজের সম্পাদক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

খাসিয়া পাহাড়ে এক সভা হয়, বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রাদ্ধ—জলপাইগুড়ির ষ্টেশন মাষ্টার আমাদের বন্ধু বাবু নিমচাঁদ দে পরলোকে গমন করিয়াছেন। যদিও হিন্দু সমাজে ছিলেন; কিন্তু নিমচাঁদ বাবু ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ইহাঁর প্রাণের ঐকান্তিক যোগ ছিল। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের তিনি সম্পাদক ছিলেন। ব্রাহ্মঅতিথিদিগকে তিনি সমাদরের সহিত আপন গৃহে স্থান প্রদান করিয়া আপ্যায়িত করিতেন। স্বীয় কার্য্য দক্ষতা সচ্চরিত্রতা, এবং ন্যায় পরায়ণতার গুণে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট বিশেষ প্রশংসা এবং সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁর সহৃদয়তা, এবং দয়াশীলতা অনেকেরই অনুকরণের যোগ্য। কয়েকটি দরিদ্র বালকের এবং ইহাঁর একটি দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় পরিবারের ভরণপোষণের সম্পূর্ণ ভার ইনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ৩।৪ জন আফিসের অল্প বেতনের কেরাণী ইহাঁর বাসায় প্রত্যহ আহারাদি করিতেন। সরলতা, চরিত্রের পবিত্রতা, এবং দয়া ও ন্যায় পরায়ণতার গুণে জলপাইগুড়ির ছোট বড় সকল প্রকার লোকের সঙ্গেই ইহাঁর সৌহার্দ্য ছিল। সাহেব সাহেব বাঙ্গালী সকলেই ইহাঁকে ভাল বাসিতেন—শ্রদ্ধা করিতেন। ইহাঁর আত্মার কল্যাণার্থ জলপাইগুড়ির ব্রাহ্মবন্ধুগণ সমবেত হইয়া একদিন উপাসনাদি করিয়াছিলেন। পরমেশ্বর ইহাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারে শান্তি দান করুন।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে বিক্রমপুরের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে নিম্নলিখিত রূপ দান প্রাপ্ত হইয়াছি।

দাসাশ্রমের দ্বারা আদায়	১৮৲
শ্রীমতী রুক্মিণী মহলানবিশ, কলিকাতা	৮৲
বাবু হরচন্দ্র চৌধুরী, শেরপুর	১০৲
„ রোহিনীকুমার দাস, বগুড়া হইতে	১৬৲
„ উমেশচন্দ্র দত্ত, কলিকাতা	১৲
একটী ভদ্রমহিলা	৫৲
	৫৮

দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য সাহায্য প্রার্থনা।

পূর্ব্ববাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ ঢাকা জিলার অন্তঃপাতী বিক্রমপুরে ভয়ানক অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে প্রবল বন্যায় গরিব লোকদিগের এবং গোবৎসাদির যে ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল তাহা স্মরণ হইলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যাহাদের ঘরে ধান ছিল তাহারাও জলের জন্য ধান ভানিতে অক্ষম হইয়া অনাহারে দিন কাটাইয়াছে। যাহাদের কিছু ছিল না তাহাদের কষ্ট সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সম্প্রতি প্রায় ২৬।২৭ শত লোক দিনান্তে এক বেলাও আহার পায় না। বিক্রমপুরের কয়েকজন ধনী আপনাপন গ্রামের লোকদিগের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে অনেক পরিমাণে সাহায্য করিতেছেন, কিন্তু এ সকল সাহায্যে সমস্ত বিক্রমপুরের দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের অভাব ঘুচিতেছে না।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ ওয়ার্কিং কমিটী নামে একটি কমিটী স্থাপন করিয়া বিক্রমপুরে সাহায্য করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এই সংবাদ পাইয়া উক্ত কমিটীর নিকট আপাততঃ ১০০৲ এক শত টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র টাকা পাঠাইতে না পারিলে অনেক লোকের মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নহে। এ সকল স্থানে উপযুক্তরূপে সাহায্য করিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন। এখনও কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ এই দুই মাস কাল সাহায্য করিতে হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা একমাত্র জগদীশ্বরের কৃপা ও সহৃদয় দাতাদিগের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এইরূপ দুর্ভিক্ষের দ্বারা জগদীশ্বরের কি মঙ্গল অভিপ্রায় সুসম্পন্ন হয়, তাহা আমরা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি না। কিন্তু একটি কথা বুঝিতে পারা যায় যে অনাহারে ক্লিষ্ট ভ্রাতা ভগিনীদিগের আর্ত্তনাদে আমাদের হৃদয় বিগলিত হয় কি না এবং আমাদের অন্ন হইতে একমুষ্টি অন্ন দিয়া ক্ষুধার্ত্ত ভ্রাতা ভগিনীদিগের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করি কি না, তাহা তিনি এই সকল ঘটনা দ্বারা আমাদিগকে দেখাইয়া দেন। যাঁহারা সুখ স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতেছেন, তাঁহারা সকলে যদি এবিষয়ে মনোযোগী হন তাহা হইলে অনায়াসে অনেক দুঃখীর দুঃখ মোচন হইতে পারে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে দেশহিতৈষী দাতাগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে অর্থাদি দান করিয়া যেমন অনেক বিপন্নের বিপদ-উদ্ধার ও মুমূর্ষুর প্রাণ রক্ষার সহায়তা করিয়াছেন আশা করি এবারেও সেইরূপ করিবেন।

যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক সত্বর নিম্ন স্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় পাঠাইলে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। আমাদের নিকট টাকা আসিলে আমরা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থানে তাহা পাঠাইয়া দিব। পূর্ব্ব বঙ্গের অন্যান্য স্থানেও দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। কিন্তু বিক্রমপুরের লোকের কষ্ট বেশী পরিমাণে হইয়াছে বলিয়া আমরা সেখানেই এখন সাহায্য করিতে সংকল্প করিয়াছি। টাকা অধিক আসিলে আমরা অন্যান্য স্থানেও টাকা পাঠাইতে চেষ্টা করিব। যাহাতে দুর্ভিক্ষফণ্ডের টাকা কোনও রূপে অযথা ব্যয় বা অপব্যয় না হয় সে বিষয়ে আমরা বিশেষ দৃষ্টি রাখিব। নিবেদন ইতি

	নিবেদক
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়	
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট	শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
কলিকাতা।	সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২৪এ আশ্বিন ১৩০০	

বিজ্ঞাপন।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১লা কার্ত্তিক প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ সংখ্যা। ১৬শ ভাগ।

১৬ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷৹
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵৹

কাছে থাক।

কোন পথে যাই ভগবান?
গভীর আঁধার ঠেলি, ইচ্ছা তব পথে চলি,
শত বাধা বিঘ্ন আসি দাঁড়ায় সম্মুখে,
ভীষণ পাষাণ দেয় চাপাইয়া বুকে।
বসে পড়ি, হয়ে ম্রিয়মান,
কোন পথে যাই ভগবান?

চারিদিক্ গভীর আঁধার,—
বিপন্ন দেখিয়া মোরে, শত মায়া-মূর্ত্তি ধরে,
শত প্রলোভন লয়ে, অশান্তি নিচয়,
হুঙ্কারি গ্রাসিছে মোর সমগ্র হৃদয়।
গতি, পিতা কি হবে আমার?
চারিদিক্ গভীর আঁধার।

এস পিতা, তুমি এস কাছে;—
এ আঁধার দূর করি, ক্ষুদ্র দুই বাহু ধরি,
লয়ে যাও তবালোকে তোমারি সুপথে!
ছুটে যাই মহোল্লাসে পূর্ণ মনরথে,
তুমি বিনা আর কেবা আছে?
এস পিতা, তুমি এস কাছে।

হও মম জীবন-সম্বল;
তব শক্তি-স্পর্শ লাগি, উৎসাহে উঠুক জাগি,
অবসন্ন দীন হীন ক্ষুদ্র মোর প্রাণ;
ক্ষুদ্র তৃণ হয়ে যাক্ দুর্জ্জয় পাষাণ
দূরে যাক্ পাপ কোলাহল!
হও মম জীবন-সম্বল।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

আত্ম-মন্দির—বিশ্বাসী মুসলমানগণ মক্কা নগরস্থ কাবা মন্দিরকে অতিশয় ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন যে স্বর্গে ঐ আকারের কৃষি প্রস্তর নির্ম্মিত একটী মন্দির আছে, তাহারই অনুসারে কাবা মন্দির বিনির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ষে বর্ষে বহুসংখ্যক যাত্রী মক্কাস্থ কাবামন্দিরে ঈশ্বর-দর্শন-লালসাতে সমাগত হইয়া থাকে। একবার একজন যাত্রী, অপরাপর যাত্রী সমভিব্যাহারে মক্কা নগরে উপস্থিত হইল। সে আশা করিল যে কাবামন্দিরে তাহার ঈশ্বর-দর্শন হইবে। কিন্তু সেই জনকোলাহল, ও বিষয় বাণিজ্যের আড়ম্বরের মধ্যে সে কাবামন্দিরে বিশেষভাবে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইল না। যখন সে দুঃখিত অন্তরে মন্দির প্রদাক্ষণ করিতেছে, তখন যেন ভিতর হইতে দৈববাণী হইল, তুমি নিজ গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হও, সেখানে তোমার দেবমন্দির দেখিতে পাইবে। সে ব্যক্তি স্বীয় ভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেখিল যে ঈশ্বর সেখানে বিরাজিত রহিয়াছেন। পারস্য ভাষাতে লিখিত একখানি গ্রন্থে এই উপদেশটী প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই উপদেশের মধ্যে গভীর তাৎপর্য্য নিহিত আছে। উপদেশটী এই:—যে ব্যক্তি নিজ ভবনে ঈশ্বরকে দেখিতে না পাইয়া দূরদেশে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছে, তাহার জন্য ঈশ্বর কোনও স্থানেই নাই। আর যে অগ্রে তাঁহাকে গৃহে দেখিতে পায় সে তাঁহাকে দূরেও দেখিতে পায়। আত্ম-মন্দিরে, প্রকৃতি-রাজ্যে ও মানব-ইতিবৃত্তে এই ত্রিবিধ স্থানে আমরা সচরাচর ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া থাকি। কিন্তু অগ্রে তাঁহাকে আত্ম-মন্দিরে দেখিলেই তাঁহাকে প্রকৃতিরাজ্যে ও মানব-ইতিবৃত্তে দেখিতে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি আত্ম-মন্দিরে তাঁহাকে দেখে না, সে তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পায় না। আমরা যে জড়রাজ্যে ও মানব-ইতিবৃত্তে তাঁহার লীলা দর্শন করিব তৎপূর্ব্বে ত তাঁহার সহিত পরিচয় চাই, বিনা পরিচয়ে কাহার লীলা দেখিব? আত্মমন্দিরেই সেই পরিচয় অগ্রে হয়। গো মেষ ত প্রকৃতির শোভা দেখিয়া থাকে, তাহারা তন্মধ্যে অনন্তের আভাস দেখে না কেন? কারণ এই, তাহাদের অন্তরে অনন্তের পরিচয় নাই। এই কারণেই ঋষিগণ তাঁহাকে আত্মমন্দিরে দেখিবার জন্য বার বার উপদেশ দিয়াছেন।

কৃচ্ছ্র-সাধন—ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিবার উদ্দেশে কৃচ্ছ্র সাধনের রীতি অনেক ধর্ম্মেই দেখিতে পাওয়া যায়। শরীর ও মনকে নিদারুণ নিগ্রহ করিলে তবে দেবতা প্রসন্ন হইয়া থাকেন। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এদেশে ও

অপরাপর দেশে তপস্বিগণ অতি কঠোর সাধনা করিয়াছেন। আমাদের দেশে পুরাণে ও লৌকিক প্রবাদে কত কঠোর তপস্যার বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। যাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয় যে মানব কি প্রকারে নিজ শরীর মনকে এতদূর নিগ্রহ করিতে পারে। অদ্যাপি এই ধর্ম্মপ্রবণ দেশে কত কৃচ্ছ্র-সাধন দেখা যাইতেছে। কত লোক উর্দ্ধবাহু হইয়া রহিয়াছেন, কত লোক পঞ্চতপা হইতেছেন, কত লোক গজাল নির্ম্মিত শয্যাতে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। কেবল যে এ দেশেই এ প্রকার তপস্যার প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, যে ইউরোপ খণ্ড আজ সুখ সমৃদ্ধি, ও বিষয় বাণিজ্যের বিস্তারের জন্য প্রসিদ্ধ, যেখানে বিষয় সুখ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, সেই ইউরোপ খণ্ডেও এক সময়ে তপস্বিগণ কঠোর তপস্যা করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসিগণ বৌদ্ধ যতিদিগের ন্যায় মরুপ্রান্তে ও গিরিগহ্বরে বাস করিয়া দুরন্ত তপস্যা করিয়াছেন, যাহা শ্রবণ করিলে চিত্ত চমকিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে লোকে কৃচ্ছ্র সাধনের প্রয়োজনীয়তা তত অনুভব করেন না। দেহকে বা হৃদয়কে নিগ্রহ করিলে যে ঈশ্বর প্রসন্ন হন, এ বিশ্বাস আর দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা কৃচ্ছ্র সাধনের পক্ষ, তাঁহাদের ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিলে, দেখা যায় যে তাঁহারা দুই কারণে এই প্রকার পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে কামনার বিষয় হইতে চিত্তকে দূরে না লইলে, কামনার অগ্নি কথনই নির্ব্বাণ হয় না। শাস্ত্রে কহিয়াছেন,—

"ন জাতু কামঃ কামানমুপভোগেন শাম্যতি ;
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।"

অর্থাৎ কামনার বিষয়ের উপভোগ দ্বারা কামনা কথনই নিবৃত্ত হয় না বরং অগ্নিতে ঘৃত দিলে যেমন তাহা আরও বৰ্দ্ধিত হয় সেইরূপ হইয়া থাকে। অতএব তাঁহাদের উপদেশ এই, যদি কামনাকে নিবৃত্ত করিতে চাও, তবে চিত্তকে বলপূর্ব্বক কামনার বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন কর। কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে ধন চাহিতেছ, তাহার জন্য যে তোমার প্রকৃত ব্যাকুলতা আছে, কিরূপে বুঝিব? যদি দেখি সেজন্য প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছ;—দুষ্কর তপস্যা করিতেছ, তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে তুমি তাহার প্রার্থী বটে। তপস্যার দ্বারা ব্যাকুলতারই পরিচয় হয়। ঈশ্বর এরূপ ব্যাকুলতা দেখিলেই প্রসন্ন হন। এই উভয় প্রকার যুক্তির মধ্যে যে কিয়ৎ পরিমাণে সত্য নাই, তাহা কে বলিবে? আমরা কি জীবনে সময়ে সময়ে অনুভব করি নাই, যে আমাদের চিত্ত যখন সুখাসক্তিতে নিতান্ত নিমগ্ন হয়, এবং আমরা যখন তাহা লক্ষ্য করি, তখন হয়ত বলপূর্ব্বক মনকে সেই সুখ হইতে বিচ্ছিন্ন করা আবশ্যক হয়। তখন অনিয়ন্ত্রিত সুখস্পৃহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে, আমাদের আত্মশক্তি বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। এরূপ জিতাত্মা পুরুষদিগকে সুখস্পৃহা আর জীবনের লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। এই কারণে সাধনের প্রারম্ভে অনেক সাধক সুখস্পৃহাকে দমন করিবার আশায় যে সুখ নিষিদ্ধ নহে তাহাকেও অনেক সময়ে বর্জ্জন করিয়া থাকেন। তাহা কেবল মনকে স্বীয় বশে আনিবার চেষ্টা মাত্র। এইরূপ দুষ্কর তপস্যার দ্বারা মানবের হৃদয় নিহিত ব্যাকুলতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কারণে লোকের ধর্ম্ম সাধনের পথে কিঞ্চিৎ পরীক্ষা ও ক্লেশ থাকে, তাহা অপ্রার্থনীয় নহে। এই জন্যই প্রাচীন কালের জ্ঞানিগণ শিক্ষার্থী শিষ্যদিগকে কঠিনরূপে পরীক্ষা করিয়া তবে গ্রহণ করিতেন। যাহারা দুঃখ ক্লেশ বহন করিয়া থাকিত, তাহারা জ্ঞানলাভের উপযুক্ত বলিয়া গৃহীত হইত। অতএব কৃচ্ছ্র-সাধন দ্বারা ব্যাকুলতাই প্রকাশ পায়, তাহাতে সন্দেহ কি? আমরা শরীর মনের অকারণ নিগ্রহরূপ কৃচ্ছ্র সাধনের পক্ষপাতী না হইলেও আত্মার সংযম শক্তি বৰ্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত কোনও কোনও স্থলে নির্দ্দোষ সুখকেও বর্জ্জন করা আবশ্যক বোধ করি। আত্মার সংযম শক্তি একবার বৰ্দ্ধিত হইলে আর এরূপ সাধনের প্রয়োজন থাকে না। তখন সুখ ভোগই কর, পরিহারই কর, কিছুতেই আত্মার স্বাধীনতা ও কর্ত্তৃত্ব শক্তি বিলুপ্ত হয় না।

শ্রবণ ও সাধন—সত্য শ্রবণ করিয়াছি অনেক, কিন্তু সাধন করিয়াছি অতি অল্প। আমাদের মধ্যে কত ব্যক্তিকে ক্ষোভের সহিত এরূপ কথা বলিতে হয়! বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করা অবধি অদ্য পর্য্যন্ত যত উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি তাহা যদি ব্রীহি যবাদির ন্যায় রাশীকৃত করিতে পারা যাইত তাহা হইলে বোধ হয় হিমালয়কেও অতিক্রম করিত। প্রতিদিন প্রাতে কর্ণদ্বয় ও চক্ষুদ্বয় উন্মুক্ত করিয়া উত্থিত হইতেছি, জলস্রোতের ন্যায় চতুর্দিক দিয়া কত উপদেশের স্রোত চক্ষু কর্ণে প্রবিষ্ট হইতেছে; রাজপথে কয়েক ব্যক্তি পরস্পর বাদানুবাদ করিতে করিতে যাইতেছে, কর্ণ পাতিয়া শুনি এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে হিত কথা বলিতেছে, ধর্ম্ম বা নীতির নিয়মানুসারে উপদেশ দিতেছে, এইরূপ ধর্ম্ম ও নীতির উপদেশ যথা তথা আমাদের চক্ষুদ্বয় ও কর্ণদ্বয়কে আক্রমণ করিতেছে। কিন্তু বাহির হইতে চক্ষুদ্বয়কে আকর্ষণ করিয়া যদি ভিতরে প্রবেশ করি, যদি আত্মানুসন্ধান ও আত্ম-বিচারে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? দেখি ঐ সকল সত্যের অতি অল্প অংশই প্রকৃতভাবে জীবনে সাধন হইয়াছে। প্রকৃত সত্যকে জীবনে পরিণত করার নাম সাধন। যদি এক ব্যক্তি কেবল সমুদায় রাগ রাগিণীর স্বরলিপি মুখস্থ করিয়া রাখে, তদ্দ্বারা সে গায়ক বলিয়া সম্মানিত হইতে পারে না। যতক্ষণ স্বরলিপি-বদ্ধ রাগ রাগিণী কণ্ঠে ফলিত না হয়, ততক্ষণ সে ব্যক্তি গায়ক বলিয়া সম্মানিত হইতে পারে না। সেইরূপ যে ব্যক্তি কেবল ধর্ম্ম ও নীতির উচ্চ উচ্চ কথা লোকমুখে শুনিয়া রাখিয়াছে বা শাস্ত্রে পড়িয়া রাখিয়াছে, কিন্তু জীবন তদনুযায়ী করিতে পারে নাই, সেও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না। কাগজের স্বরলিপিকে কণ্ঠে আনা যেমন সংগীতের সাধন, সাধু মুখের বা গ্রন্থের সত্যকে সেইরূপ জীবনে আনা ধর্ম্ম জীবনের সাধন। এইরূপ সাধন পরায়ণ ব্যক্তিই সত্যের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন;

অপরে পারে না। জগতের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাজনদিগের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, তাঁহারা এক একজনে এক একটী পুরাতন সত্য জীবনে সাধন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর পিতা একথার স্থায় প্রাচীন কথা কি ছিল? য়িহুদী জাতির মধ্যে তৎপূর্ব্বে কত ভক্ত ও প্রেমিকের মুখ দিয়া ঐ সত্য নির্গত হইয়াছে। কত শত শত লোকে শুনিয়াছে, উপেক্ষা করিয়াছে; যীশু তাহা সাধনের বস্তু বলিয়া অবলম্বন করিলেন এবং সাধনের গুণে তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিলেন। এইরূপে ঈশ্বর মহান ও মানব তাঁহার দাস, এই প্রাচীন সত্যকে সাধনের দ্বারা মহম্মদ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আমাদের এক একবার মনে হয়, আজ পর্য্যন্ত যে সকল উচ্চ উচ্চ কথা শুনিয়াছি ও শিখিয়াছি, তাহা যদি ভুলিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে যেন ভাল হয়। আবার এক একটী করিয়া সত্য সাধনের দ্বারা আয়ত্ত করি। তাহা হইলে ধর্ম্ম জীবনের বাস্তবিক উন্নতি হইতে পারে। একটী বিদ্যালয়ের কোন শ্রেণীতে যে সকল বালক পাঠ করিত, তাহাদের মধ্যে একটী বালকের মেধাশক্তি কিঞ্চিৎ অল্প ছিল। কোনও বিষয়ের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে, তাহার অপেক্ষাকৃত অধিক বিলম্ব হইত। এজন্য শিক্ষক তাহার প্রতি মধ্যে মধ্যে অতিশয় বিরক্ত হইতেন। কিন্তু ঐ বালকের একটী গুণ এই ছিল যে সে একটী বিষয় পাকা করিয়া না বুঝিয়া অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারিত না। যাহা বুঝিত তাহা পাকা করিয়াই বুঝিত। শিক্ষকের বিরাগভাজন হইলেও সে না বুঝিয়া বুঝিয়াছি বলিত না, কিংবা অন্য বিষয়ে মন দিত না। কিন্তু সেই শ্রেণীর অনেক বালক শিক্ষকের ভয়ে ও নিজেদের অসহিষ্ণুতা বশতঃ একটা বিষয় ভাল করিয়া না বুঝিয়াও অন্য বিষয়ে ধাবিত হইত। চরমে এই দাঁড়াইল যে ঐ প্রথমোক্ত বালকটীই সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইল। সে যেটুকু শিখিল, তাহাতে পরিপক্ক বুৎপত্তি জন্মিল। ধর্ম্ম সাধন সম্বন্ধেও এইরূপ। বহুসংখ্যক অধীর ও অসহিষ্ণু লোক এরূপ আছে, যাহারা কেবল সত্য শুনিয়াই সন্তুষ্ট, পাকারূপে সাধনের দ্বারা আয়ত্ত করিতে ইচ্ছুক নহে, আবার কতকগুলি লোক এরূপ আছে, যাহারা একটী বিষয় সাধন না করিয়া বিষয়ান্তরে চিত্ত নিবেশ করিতে পারে না। একটী অগ্রে ভাল করিয়া সাধন করি পরে, আর একটী দেখিব, এই তাঁহাদের মনের ভাব। এই প্রকার ভাব ধর্ম্ম সাধনের অনুকূল।

শক্তির দায়িত্ব—পুত্তিকারা বল্মীক নির্ম্মাণ করে, মধুমক্ষিকারা মধুর চক্র নির্ম্মাণ করে, তাহাদের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে মনোযোগী, যাহার যেটুকু করিবার আছে সে সেটুকু সুচারুরূপে ও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্নরূপে করিতেছে। প্রত্যেকে আপনার অংশটুকু সুন্দররূপে করে বলিয়াই, সমগ্র বস্তুটী সুন্দর হয়। মানব-সমাজের উন্নতিরও ঐ নিয়ম। আমাদের প্রত্যেকের যে অংশটুকু করিবার আছে যদি আমরা তাহা সুন্দররূপে করি তাহা হইলে সমগ্র সমাজের উন্নতি সুন্দররূপেই সাধিত হইতে পারে। বহু বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে কার্য্য করা বা বহুসংখ্যক লোকের উপকার করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না; সেরূপ প্রতিভা লইয়া সকলে জন্মগ্রহণ করে না, এবং সুযোগও সকলে পায় না। কিন্তু এরূপ সামান্য মানব কেহ নাই, এরূপ হীনাবস্থাপন্ন কেহ নাই যাহার জীবনের একটু ক্ষেত্র নাই এবং সেই ক্ষেত্রে কিছু করিবার নাই। এক বিন্দু জলের মধ্যে যে অগণ্য কীটাণু বাস করে, তাহাদেরও প্রত্যেকের জীবনের ক্ষেত্র আছে, কার্য্য আছে। অতএব তুমি যতই সামান্য ও হীনাবস্থাপন্ন হও না, তোমার নিজ জীবনে প্রতিদিনের কর্ত্তব্য অনেক কাজ আছে। বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পাইলে না বলিয়া ক্ষোভে সময় ক্ষয় না করিয়া যদি তুমি এই প্রতিজ্ঞারূঢ় হও যে তোমার জীবনক্ষেত্রে যতটুকু কর্ত্তব্যভার তোমার উপরে পড়িয়াছে সেইটুকু তুমি সুচারুরূপে সম্পাদন করিবে, তাহা হইলে নিজ বিবেকের ও ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিতে পার এবং চরমে তোমার সেই কার্য্য সমগ্র মানবসমাজের উন্নতির অঙ্গ স্বরূপ হইতে পারে। লোকে দেখুক আর না দেখুক আমার জীবনটুকু আমি সুন্দররূপেই গঠন করিব, এরূপ প্রতিজ্ঞা মনুষ্যোচিত। আর যাঁহারা এই পৃথিবীতে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন, সারবান জীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে এইরূপ প্রতিজ্ঞার সহিত কার্য্য করিয়াছেন। এ উপদেশ অতি প্রাচীন উপদেশ। ঈশ্বর আমাদের দেহ মনে যে কিছু শক্তি সামর্থ্য দিয়াছেন তাহা কৃপণের ধনের ন্যায় পুতিয়া রাখিবার জন্য দেন নাই। সে সকলের নিয়োগেরদ্বারা নিজের ও অন্যের কল্যাণ সাধনের জন্যই দিয়াছেন। এই সকল শক্তি যে আমরা লাভ করিয়াছি তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার দায়িত্বও আছে। আমরা সে সকলকে সমুচিতরূপে ব্যবহার করিবার জন্য দায়ী, তাঁহার অভীষ্ট পথে নিয়োগ করিবার জন্য দায়ী। এই দায়িত্ব জ্ঞান সর্ব্বদা প্রবল থাকা উচিত। সুপ্রসিদ্ধ থিওডোর পার্কার মৃত্যুর প্রাক্কালে এই বলিয়া ক্ষোভ করিলেন—ঈশ্বর আমাকে প্রভূত শক্তি দিয়াছিলেন, তাহার অর্দ্ধেকও ব্যবহার করা হইল না।" অথচ পার্কার অল্প কালের মধ্যে যে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন সে বিষয়ে চিন্তা করিলে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাই। তিনি একজন কৃষকের সন্তান। উত্তমরূপ শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। অল্প বয়সেই তাঁহাকে শিক্ষা সাঙ্গ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টাতে রত হইতে হইয়াছিল। অথচ নিজেরই শ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে কি জ্ঞানে, কি প্রেমে, কি মানব-সেবাতে, সকল বিষয়ে আদর্শস্থানীয় হইয়াছিলেন। এই দায়িত্ব জ্ঞানই তাঁহাকে উন্নতির অভিমুখে লইয়া গিয়াছিল। আমাদের অন্তরে এই দায়িত্ব জ্ঞান অল্প বলিয়া আমাদের চরিত্রের সেরূপ উন্নতি দৃষ্ট হয় না। ব্রাহ্মধর্ম্ম এ দেশকে নব-জীবন প্রদান করিবেন, ব্রাহ্মগণ শ্রম, অধ্যবসায় উদ্যোগ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত এদেশবাসীদিগকে প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু অনেক স্থলে দেখিতেছি ব্রাহ্ম যুবকগণও বৃক-তাড়িত মেষযূথের ন্যায় অসহায় ও নিরুপায় হইয়া বেড়াইতেছেন; প্রতিজ্ঞা সহকারে নিজ নিজ দেহ মনের শক্তিকে নিজের ও অপরের অবস্থার উন্নতির জন্য নিয়োগ করিতে পারিতেছেন না।

দেশের সর্ব্বত্রই সকল শ্রেণীর মধ্যেই দরিদ্রতা ও অন্ন কষ্ট দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। বর্ষে বর্ষে দলে দলে অর্দ্ধ শিক্ষিত যুবকদল বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া কর্ম্মপ্রার্থী হইতেছে। কিন্তু এত লোকে অন্ন পাইতে পারে এরূপ চাকুরী কোথায়? কাজেই দরিদ্রতা দিন দিন বাড়িতেছে। কিন্তু সকল সম্পদের খনি স্বরূপ বিস্তীর্ণ ভূমি পড়িয়া রহিয়াছে; মানবের বুদ্ধি, শ্রম ও মানবের শক্তিকে নিয়োগ করিলে, ইহা হইতেই একটা উপায় বিনির্গত হইতে পারে। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্ম যুবকগণের মধ্যেও সে প্রকার উদ্যোগ দৃষ্ট হইতেছে না, তাহারাও পথভ্রান্ত মেষযূথের ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। এই সকল যুবককে কাজের লোক করিয়া তুলিতে পারে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এরূপ কৃতী লোক দেখা না দিলে এ দুর্গতি ঘুচিবে না।

ব্রাহ্মগণের দরিদ্রতা—দরিদ্রতার কথা বলিলেই অনেক ব্রাহ্ম পরিবারের দুরবস্থার কথা স্মরণ হয়। এই দরিদ্রতা দিন দিন বাড়িতেছে। তাহার একটী প্রধান কারণ এই, ব্রাহ্মগণের অধিকাংশই বড় বড় সহরে বাস করিতেছেন। মফঃস্বলে বিরোধী ব্যক্তিদিগের মধ্যে বাস করাতে অনেক অসুবিধা বলিয়া, নিরন্তর লোকের উপহাস, বিদ্রূপ ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয় বলিয়া, ব্রাহ্ম পরিবার সকল সহরেও প্রধান প্রধান নগরে থাকিতে ভাল বাসেন। কারণ বড় বড় নগরে লোক অনেকটা স্বাধীন; প্রত্যেকে আপনার ইচ্ছানুরূপ চলিতে বলিতে পারে, এক জনের জীবন অপর দশ জনের জীবনের সহিত তত আবদ্ধ নয়। কিন্তু সহরে বাস করাতে আর একটী অনর্থ উপস্থিত হইতেছে; সকলের জীবন নাগরিক জীবন হইয়া যাইতেছে। সহরে থাকিতে গেলেই পাচক বা পাচিকা ও দাস দাসী রাখিতে হয়, বাহির হইতে গেলেই ভদ্র পোষাক পরিতে হয়, দ্বারে জিনিস পত্র বিক্রয় করিতে আসিলেই দুই একটা ক্রয় করিতে হয়, এইরূপে, এটা ওটা করিয়া ব্যয় বাড়িয়া যাইতেছে। ওদিকে প্রকৃতি মাতার স্নিগ্ধ সহবাস হইতে দূরে থাকাতে দেহের বল, মনের শক্তি সমুচিত বিকাশ পাইতেছে না। বড় বড় সহর মানবহৃদয়ের কোমল গুণাবলী বিকাশের অনুকূল স্থান নহে। বড় সহরে লোকে স্বার্থপর হয়। তোমার দ্বারেই যাঁহার ঘর তাঁহার সহিত হয়ত তোমার দশ বৎসরের মধ্যে আলাপ হয় নাই। এক তালাতে মানুষ মরিয়াছে তিন তালাতে নৃত্যগীত চলিতেছে, কেহ কাহারও সংবাদ লয় না। কেহ কাহারও সুখ দুঃখের অংশ লইতে চায় না। পল্লীগ্রামে থাকিতে গেলেই দশ জনের সহিত সম্বদ্ধ হইতে হয়। অল্প পরিসর স্থানে প্রত্যেকেই অপর সকলকে জানে; একজনের একটু বিপদ ঘটিলেই দশজনে সংবাদ পায় এবং পরস্পরের সহায়তা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া থাকে। আমাদের বোধ হয়, মফঃস্বলে কোনও একটা স্বাস্থ্যকর স্থান দেখিয়া যদি একটী ব্রাহ্ম উপনিবেশ স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে বর্ত্তমান অবস্থার অনেক উন্নতি হইতে পারে। সেই উপনিবেশস্থ ব্যক্তিগণ কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতিতে মনোযোগী হইবেন; দৈহিক শ্রমের দ্বারা স্বীয় স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিবেন এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানোন্নতি, বিদ্যাচর্চ্চা, ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ও উপায় থাকিবে। এরূপ আদর্শ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মগণ যদি এদেশবাসীদিগকে পথ দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে একটা কাজ হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "মান্দ্রাজ ইউরেশীয়ান এসোসিএশন" নামক সভার যত্নে তত্রত্য ইউরেশীয়ানগণের জন্য মহীসুর রাজ্যে একটা উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের বোধ হয় এরূপ উপনিবেশ স্থাপন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টও অনেক সাহায্য করিতে পারেন। ব্রাহ্মদিগের দারিদ্র্য নিবারণের একটা কোনও উপায় ত্বরায় না করিলে, অচিরকালের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজ বিশেষ দুর্গতি প্রাপ্ত হইবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

তৃপ্তি।

মানব প্রাণ সর্ব্বদাই তৃপ্তির জন্য ব্যস্ত। আহার বিহার প্রভৃতি দৈহিক ক্রিয়া হইতে গুরুতর কর্ত্তব্য পালন পর্য্যন্ত সকল কার্য্যেই মানব তৃপ্তি পাইতে ইচ্ছা করে। যে কার্য্যে তৃপ্তি পাইবার আশা নাই সে কার্য্যে লোকে নিতান্ত পীড়াপীড়ি না হইলে সহজে যাইতে চাহে না। মানবপ্রকৃতিতে যেমন এই তৃপ্তি পাইবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান, বিধাতার বিধানও সেইরূপ দেখা যায়। মানব আহার করিবে, কোনরূপে শরীরের পুষ্টিকর কতকগুলি আহার্য্য সৃষ্টি করিলেই হইত, কিন্তু তাহার সঙ্গে সুস্বাদ সুগন্ধি ইত্যাদি বিদ্যমান রাখিয়া মানবকে কেমন তৃপ্তিপ্রদান করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কর্ত্তব্যের অনুরোধে তুমি কঠোর পরিশ্রম করিতেছ, শরীর অবসন্ন হইতেছে—গাত্র ঘর্ম্মাক্ত হইতেছে; কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরে আশ্চর্য্য শান্তি লাভ হইতেছে। এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যেই মানব যখন প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অনুসারে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে, তখনই তাহার সঙ্গে অপূর্ব্ব তৃপ্তি লাভ করে। আহার বিহার প্রভৃতি দৈহিক ক্রিয়া কাণ্ডের মধ্যে যেমন কার্য্য করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তৃপ্তি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। ধর্ম্ম সাধনের মধ্যেও তাহার অভাব দেখা যায় না। সরল ভাবে প্রকৃত পদ্ধতি অনুসারে সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হইলে সেই সাধন ভজনের সঙ্গে সঙ্গে সাধক অপূর্ব্ব তৃপ্তিও পাইয়া থাকেন। এরূপ তৃপ্তিলাভ না হইলে সাধকের পক্ষে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সাধনভজনে নিযুক্ত থাকা সকল সময় সম্ভব হইত না। কিন্তু আহার বিহার প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় কার্য্য ও অপরাপর গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ তৃপ্তিলাভের ব্যবস্থা নিয়ত বর্ত্তমান থাকিলেও—তৃপ্তিলাভ মানবজীবনের উদ্দেশ্য নহে। জীবনের উদ্দেশ্য কল্যাণ লাভ ও স্বাস্থ্যলাভ। তাহা পাইবার জন্য মানবকে অধিকাংশ সময় যে কঠোর পরিশ্রম, দৃঢ় নিষ্ঠা ও প্রবল ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়া যাইতে হয় তাহার পুরস্কার এবং সৎকর্ম্মে নিয়ত নিযুক্ত রাখিবার পক্ষে

ইহা একটী অপূর্ব্ব কৌশল। বিধাতার আশ্চর্য্য দান। সুতরাং আমরা যদি এই তৃপ্তি লাভকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করি, তাহাতে আমাদের অত্যন্ত ভ্রান্তি হইবে। তাহাতে আমাদের কল্যাণলাভ অপেক্ষা আরাম ও শান্তির জন্য ব্যস্ততা প্রবল হইবে। এবং যে কোন কার্য্য দ্বারা প্রাণে পরিতৃপ্তি পাইতে পারি, আমরা তাহারই অন্বেষণে অধিকতর ব্যস্ত হইব। তদ্দ্বারা আমরা কেবলই সুখপ্রিয়, কোমলভাবাপন্ন হইয়া গুরুতর কর্ত্তব্যের পথে চলিতে অক্ষম হইব।

সদনুষ্ঠান ও ধর্ম্মসাধন প্রভৃতি কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত তৃপ্তিলাভ হয় বলিয়া, লোকের এরূপ সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে এই তৃপ্তি পাওয়াই বুঝি আমাদের লক্ষ্য এবং এই নিমিত্তই দেখা যায় যখন উপাসনাদিতে মানব আর তেমন তৃপ্তি পায় না, তখন অতি সহজেই উপাসনাদির প্রতি দোষারোপ করিয়া, ইহা দ্বারা জীবনের কোনও সুফল লাভের আশা নাই মনে করিয়া উপাসনা করিতে ক্ষান্ত হয়। কিন্তু একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে আমরা সকল সময় তৃপ্তি পাইবার উপযুক্ত বা অধিকারী থাকি না। সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ অবস্থায় না থাকিলে কখনই কেহ তৃপ্তি পাইতে পারে না। এজন্যই দেখা যায়, যে সুমিষ্ট বস্তু ভোগে এক সময় কত তৃপ্তি পাওয়া যায়, তাহাই পীড়ার সময় বিষম অতৃপ্তির কারণ হয়। যে দুগ্ধ সুস্থাবস্থায় উপাদেয় জ্ঞানে লোকে আগ্রহের সহিত পান করিয়া থাকে, তাহাই আবার সময় বিশেষে বিষম অতৃপ্তির কারণ হয় এবং লোকে অতিশয় বিরক্তির সহিত তাহা পান করিয়া থাকে। আবার ইহাও দেখা যায় মানুষ প্রবল বিকারের সময় যখন তৃপ্তি পাইবার আশায় জলপান করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা করে তখন চিকিৎসক তাহাকে জল দিতে নিষেধ করেন। কারণ সে জল তাহার ক্ষণিক তৃপ্তির কারণ হইলেও পরিশেষে বিশেষ কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। যখন কাহারও শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হয় তখন সে গাত্রে সহজেই জল প্রদানের জন্য ব্যস্ত হয় এবং যদিও সেই জল ক্ষণকালের জন্য যন্ত্রণার শান্তি করে; কিন্তু পরক্ষণেই তাহা বিষম যাতনার কারণ এবং অকল্যাণকর হয়। সুতরাং সকল সময় সকল বস্তুতেই যে তৃপ্তি পাওয়া যাইবে এবং তাহা যে কল্যাণকর হইবে এমন নয়।

লোকে এখন ভাল উপাসনা হইল কি না তৃপ্তি দ্বারা তাহার বিচার করিয়া থাকে। কিন্তু সকল সময় তৃপ্তি লাভ দ্বারা ভাল উপাসনা হইয়াছে বলিয়া মনে করা বিষম ভ্রম। যখন প্রাণের অবস্থা সুস্থ থাকে, তখন ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন মননাদি তৃপ্তির কারণ হইবে। কিন্তু যদি কেহ গুরুতর পাপানুষ্ঠান করিয়া আসে তখনও যদি সে উপাসনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করে, তবে সে উপাসনা কখনই প্রকৃত উপাসনা নহে এবং তাহা কখনও আত্মার কল্যাণকর নহে। তখন যদি তাহার প্রকৃত উপাসনা হয় এবং সে আত্মাপরাধ স্মরণ করিতে করিতে নিজ কুৎসিত ছবির সহিত প্রাণে প্রকাশিত সুন্দর ছবির তুলনা করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রাণে নিশ্চয় প্রবল অনুতাপ উপস্থিত হইবে। এবং তাহা দ্বারাই তাহার কল্যাণ হইবে। এই অবস্থায়ও যাহারা তৃপ্তির জন্য ব্যস্ত হয় তাহারা নিতান্তই দুরাকাঙ্ক্ষ; তাহাদের আশা কখনই পূর্ণ হইবার নহে। কিন্তু লোকে এমনই তৃপ্তির জন্য ব্যস্ত যে এরূপ রুগ্নাবস্থায়ও যে কোন প্রকারে তৃপ্তি পাইবার চেষ্টা করে; এবং ভাবোদ্দীপক নানাপ্রকার বাক্য ও সংগীতাদির সাহায্যে প্রাণের ব্যাধির যাতনা চাপা দিয়া রাখিয়া কোন প্রকারে আত্মবিস্মৃত হইয়া তৃপ্তির সহিত সময় কাটাইতে যায়। এরূপ অবস্থাকে চিকিৎসকগণ বিকারের লক্ষণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন এবং পরম বৈদ্য পরমেশ্বরও তাহার কল্যাণের জন্য তখন তাহার প্রাণে তৃপ্তি না দিয়া অশান্তির প্রবল অনল জ্বালিয়া দিয়া থাকেন। অনুতাপের বিষম জ্বালায় ছটফট করিয়া সময় কাটানই তাহার পক্ষে তখন আবশ্যক।

সুতরাং তৃপ্তি যদি পাইবার আশা থাকে তাহা হইলে প্রাণকে সর্ব্বদা সুস্থ রাখিতে হইবে। অন্যথা ক্ষণিক তৃপ্তি পাইলেও তাহা কখনই কল্যাণকর হইবে না। ঈশ্বরের শান্তিপ্রদ পবিত্র নাম মানবপ্রাণে শান্তি দিয়া থাকে ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু যদি সে নাম লইয়া, তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিয়াও তৃপ্তি না পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে তাঁহার নামে তৃপ্তি পাওয়া যায় না বা উপাসনা দ্বারা আরাম লাভ হয় না। তখন অন্য কারণ অনুমান করাই উচিত। সুস্থ শরীরে চন্দন লেপন করিলে শরীর স্নিগ্ধ হইবে ইহাই নিয়ম। যদি তাহা না হয়, তবে সহজেই বুঝিতে হইবে শরীরে কোন ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই কারণেই স্নিগ্ধকারী চন্দন লেপন করিয়াও তুমি তৃপ্তি পাইতেছ না। এইরূপ যদি দেখ উপাসনায় তৃপ্তি হয় না, ঈশ্বরের নাম লইলে প্রাণে শান্তি আসে না, তাহা হইলে তোমার পক্ষে সর্ব্বাগ্রে অনুসন্ধান করা উচিত প্রাণে কোন ব্যাধি জন্মিয়াছে কি না। তাহা না করিয়া যদি তুমি উপাসনার প্রতি দোষারোপ কর বা ঈশ্বরের নামের শক্তিতে সন্দিহান হও, তদ্দ্বারা তোমার অজ্ঞানতারই পরিচয় পাওয়া যাইবে, এবং সেরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া চলিলে তোমার তৃপ্তিলাভও ঘটিবে না, প্রাণের কল্যাণ লাভও হইবে না।

ধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতা ও উদারতা।

সাম্প্রদায়িকতা শব্দটী ব্রাহ্মদিগের চক্ষে অতিশয় ঘৃণিত হইয়াছে। ইহাতে সংকীর্ণতা, অনুদারতা, অপ্রেম, অন্ধতা প্রভৃতি সমুদায় প্রকাশ করে। কাহারও কাহারও মনে এই সাম্প্রদায়িকতার ভয় এত অধিক যে তাঁহারা সেই কারণে বিপরীত দিকে অতিরিক্ত সীমাতে যাইতেছেন; পাছে লোকে সাম্প্রদায়িক বলে এই আশঙ্কাতে সত্যে অসত্যে প্রভেদ রাখার আবশ্যক বোধ করিতেছেন না। গণ্ডী শব্দটী এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের পক্ষে একটী মহা ত্রাসের বস্তু হইয়াছে। অপর দিকে দেখিতেছি যে কতকগুলি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্মকে এত সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ভাবে দেখিতেছেন, যে আপন আপন অবলম্বিত প্রণালীর ব্যতিক্রম সহ্য করিতে পারিতেছেন না, সেরূপ ব্যতিক্রমকারীদিগকে অব্রাহ্ম বলিয়া বর্জ্জন বা নিগ্রহ করিতে

চাহিতেছেন। এই কারণে বোধ হইতেছে যে কাহাকে সাম্প্রদায়িকতা বলে ও উদারতারই বা অর্থ কি তাহা ধীরচিত্তে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে উপকার দর্শিতে পারে।

সাম্প্রদায়িকতা শব্দটী সম্প্রদায় শব্দ হইতে উৎপন্ন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে সম্প্রদায় শব্দে গুরু ও শিষ্য পরম্পরা বুঝায়—অর্থাৎ কোনও বিশেষ ধর্ম্মমত বা সাধনপ্রণালী গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে যে দলের মধ্যে নামিয়া আসে,সেই দলকে সম্প্রদায় বলে। অতএব এক একটী সম্প্রদায় কতকগুলি নবপ্রচারিত সত্যের সংরক্ষক, পোষক ও সাধক। চিন্তা করিলেই দৃষ্ট হইবে, সত্যবিশেষের সংরক্ষণ ও পোষণের জন্য এরূপ সম্প্রদায় গঠিত হওয়া অনিবার্য্য ও বিধাতার বিধান। তরু-বীজের রক্ষণ ও পোষণের সঙ্গে ইহার তুলনা হইতে পারে। বিধাতা অধিকাংশ তরুর বীজকে একটী কোষের মধ্যে নিহিত করিয়াছেন। আম্রের কেসুরটী কেমন কঠিন আবরণে আবৃত হইয়া থাকে? সে আবরণটী না থাকিলে বীজটী অকালে বিনষ্ট হইয়া যাইত। সেইরূপ কোনও সত্য যখন জগতে অবতীর্ণ হয়, তখন তাহাকে কতিপয় হৃদয় প্রেমদ্বারা দৃঢরূপে ধারণ করে, একাগ্রতার সহিত সাধন করে, উৎসাহের সহিত প্রচার করে, এইরূপে তাহা বলশালী হইয়া জগতকে অধিকার করে। এরূপে সত্যকে ধারণ ও সাধন না করিলে কোনও সত্যই জগতে স্থানপ্রাপ্ত হইত না। বর্ত্তমান সভ্যজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে এই প্রণালীতেই সত্য সকল সংরক্ষিত ও প্রচারিত হইতেছে। প্রথমে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে ধারণ ও পোষণ, শেষে জগতে ঘোষণ। এইরূপে দাসত্ব প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, বাণিজ্যের স্বাধীনতা বিস্তার হইয়াছে, সুরাপান নিবারিত হইতেছে। জগতের ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলও এই বিধাতা-নির্দ্দিষ্ট পথের অনুসরণ করিয়াছে। সাধুমুখ দিয়া কোনও নূতন সত্য অবতীর্ণ হইলেই প্রেমিক-হৃদয় দিয়া সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে ও সেই সত্যকে ধারণ করিয়াছে। যত দিন সেই সকল সত্য সম্পূর্ণরূপে জগতকে অধিকার না করিবে ততদিন ঐ সকল সম্প্রদায়ের জীবনের উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকিবে ও তাহারা জীবিত থাকিবেই থাকিবে।

এক্ষণে চিন্তা করা উচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের আকারে যে সকল সত্য এতদ্দেশে প্রচারিত হইতেছে, তাহার সংরক্ষণ ও পোষণের জন্য সম্প্রদায় গঠিত হওয়া স্বাভাবিক, অনিবার্য্য ও প্রয়োজনীয় কি না? বিশেষ ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে এই সকল সত্য কেবল জ্ঞানগত সত্য নহে, তাহা সাধনের বিষয়। যদি কেবল জ্ঞানগত সত্য হইত, তাহা হইলে তাহার জন্য সম্প্রদায় বন্ধনের প্রয়োজন হইত না। প্রতিদিন বিজ্ঞানের কত নূতন নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে, যাহার জন্য কোন সম্প্রদায় গঠন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে না। আবিষ্কার কর্ত্তাগণ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া পণ্ডিত মণ্ডলীর গোচরার্থ প্রচার করিতেছেন, তাহাতেই সেই সকল সত্য সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধীয় সত্য সকল সেরূপ নহে, তাহা সাধনসাপেক্ষ। এই সাধন অপরের সাহায্যসাপেক্ষ সুতরাং এই সকল সত্য সাধনের জন্য সম্প্রদায় বন্ধন অপরিহার্য্য।

সম্প্রদায় বন্ধন যদি স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় হইল তবে সম্প্রদায় সম্প্রদায়, গণ্ডী গণ্ডী করিয়া চীৎকার কর কেন? সম্প্রদায় কেন গঠন হইতেছে এই বলিয়া দুঃখ না করিয়া বরং এই বলিয়া দুঃখ কর এই সম্প্রদায়ের ঘননিবিষ্টতা, দৃঢ়তা, একাগ্রতা কেন এরূপ হইতেছে না, যদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল সমুচিত রূপে সংরক্ষিত,পোষিত ও সাধিত হইতে পারে? ব্রাহ্মদল নামে একটী দল কেন হইতেছে, ইহা বলিয়া দুঃখ না করিয়া বরং আমরা এই ভাবিয়া দুঃখিত হইতেছি যে এই দলের বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও একাগ্রচিত্ততা কেন এত বর্দ্ধিত হইতেছে না যাহাতে এই দলটী একটী কামানের গোলার ন্যায় দৃঢবদ্ধ হয়। এক্ষণে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে দল সৃষ্টি হওয়া যখন স্বাভাবিক ও বিধাতার বিধি, তখন সেই দলের প্রতি প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ প্রেমও স্বাভাবিক কি না? এ জগতে চিন্তা, ভাব, ও কার্য্যগত একতার উপরে সচরাচর প্রীতির ভিত্তি স্থাপিত হয়। অতএব এক সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের পরস্পরের প্রতি বিশেষ প্রীতিমান হওয়া স্বাভাবিক কি না? বিশেষতঃ আর একটী বিষয় চিন্তা করিলে স্বসম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিবার কারণ দৃষ্ট হয়। যে সত্য পালনের জন্য তুমি নিগ্রহ সহ্য করিতেছ, সেই সত্য পালনের জন্য যদি অন্য কাহাকেও নিগৃহীত হইতে দেখ, তাহা হইলে তোমার হৃদয় কি সহজে তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় না—যদি না হয় তবে তোমার দায়িত্ব জ্ঞান অদ্যাপি ফোটে নাই।

যদি স্বসম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ প্রীতিও স্বাভাবিক হইল—তবে সাম্প্রদায়িকতা এত ঘৃণিত হইল কেন? তবে সাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে? স্বসম্প্রদায়ের প্রীতিকে সাম্প্রদায়িকতা বলে না, কিন্তু সেই প্রীতির বিকারকে সাম্প্রদায়িকতা বলে। যেমন দাম্পত্য প্রেমের বিকার ঈর্ষা তেমনি স্বসম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতির বিকার সাম্প্রদায়িকতা। একজন রমণী যদি নিজ পতিকে প্রাণ মনের সহিত ভাল বাসে তাহাতে নিন্দার কি আছে? কিন্তু যদি সেই প্রেমের অর্থ এই হয় যে সে নারী আর কোনও পুরুষের কোনও সদগুণ দেখিতে পায় না, বা পতি অন্য কোনও রমণীর সহিত হাসিয়া কথা কহিলেই ঈর্ষা করে, তাহা হইলেই বলিতে হয় তাহার প্রেম বিকৃত ও এক ব্যাধি বিশেষ। সেইরূপ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেমের অর্থ যদি এই হয় যে অপর সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট ও অনুকরণের যোগ্য আছে, তাহার প্রতি অন্ধ, অথবা স্বসম্প্রদায়ের কেহ অপর সম্প্রদায়ের লোকের সহিত আত্মীয়তা করিলেই ঈর্ষান্বিত হইব, ও তাহার প্রতি চক্ষু রাঙ্গাইব, তাহা হইলেই মনে করিতে হইবে যে তাহা সাম্প্রদায়িকতা, তাহা চিত্তের একটী ব্যাধি। নতুবা স্বসম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতিমান ও স্বাবলম্বিত সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবান হইলেই কাহাকেও সাম্প্রদায়িকতা দোষে দোষী করা যায় না।

সাম্প্রদায়িকতা কি তাহা বুঝিতে পারিলে উদারতা কি তাহাও বুঝিতে পারা যায়। উদারতা অনেক প্রকারের আছে, এক প্রকার উদারতা আছে, তাহা উদাসীনতা সম্ভূত। আমি সকল ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন সুতরাং আমি সকল ধর্ম্মাবলম্বীকেই

উদারভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমেরিকা দেশে "নৈতিক উন্নতি সভা" নামে একটী সভা হইয়াছে, তাহাতে আস্তিক নাস্তিক উভয়কেই গ্রহণ করা হয়, কারণ তাঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি উদাসীন। ধর্ম্মবিশ্বাস যাহাদের অন্তরে প্রবল, এবং ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মপ্রচারার্থই যাঁহাদের চেষ্টা তাঁহাদের উদারতা এইরূপ উদাসীনতা সম্ভূত উদারতা নহে। দ্বিতীয়তঃ এক প্রকার উদারতা আছে তাহা লোকরঞ্জন প্রবৃত্তি-সম্ভূত। হিন্দুর নিকটে তাহার মনের মত কথাটী বলিলে, তাহার প্রশংসা পাওয়া যায়, মুসলমানের নিকট তাহার বিশ্বাসের অনুরূপ কথা গুলি বলিলে—সে প্রীত হয় অতএব তাহাই কর। ব্রাহ্মধর্ম্মে ত এমন কথা অনেক রহিয়াছে, যাহার সহিত কাহারও বিরোধ নাই, সেইরূপ কথাগুলি বল না কেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে—সকলকেই প্রীত রাখা যাইবে। এ উদারতাও আমাদের প্রার্থনীয় নহে। লোকরঞ্জন আমাদের উদ্দেশ্য নহে সত্যের অনুসরণ উদ্দেশ্য। তৃতীয়তঃ এক প্রকার উদারতা আছে যাহা ঈশ্বরের ও ধর্ম্মের জ্ঞানসম্ভূত। ধর্ম্মের মহৎ ও উচ্চভাব হৃদয়ে ধারণ করিলে, মানুষ আর ইহা মনে করিতে পারে না, যে ঈশ্বরের অনুপ্রাণনশক্তি কেবল এক দেশে বা এক জাতি মধ্যে বা এক ব্যক্তি মধ্যে বদ্ধ হইতে পারে। তিনি নানা ভাবে ও নানা স্থানে লীলা করিয়াছেন ও সর্ব্বদা করিতেছেন। স্বীয় মণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার প্রকাশ দেখিয়া যেরূপ আনন্দিত হইব, অন্যত্র তাঁহার যে কিছু লীলা দর্শন করিব, তাহাতেও আনন্দিত হইব। এইরূপে বিস্তীর্ণ মানব-হৃদয়ে ঈশ্বরের লীলা দর্শন হইতেও উদারতার উৎপত্তি হয়। চতুর্থতঃ এক প্রকার উদারতা আছে তাহা প্রেমসম্ভূত। যেখানে সরলতা ও সাধুতা সেই খানেই হৃদয়ের অনুরাগ ও ভক্তি শ্রদ্ধা তাহাতে সম্প্রদায়ের বিচার নাই।

শেষোক্ত দুই প্রকার উদারতাই ধর্ম্মের অনুগত ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়। যাঁহারা গণ্ডী গণ্ডী ধ্বনি তুলিয়া ব্রাহ্ম-সমাজকেও একটা বন্ধনরজ্জু বলিয়া অনুভব করিতেছেন তাঁহাদের জানা উচিত যে ইহা বিধাতার বিধি এবং অপরিহার্য্য। এ আকারে ভগ্ন কর আকারান্তরে ফুটিবেই ফুটিবে। তবে যদি ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মভাব মানব অন্তর হইতে বিলুপ্ত করিতে পার, অথবা সন্ন্যাসের ধর্ম্মকে প্রবর্ত্তিত করিতে পার, তাহা হইলে সম্প্রদায় বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পার, নতুবা নহে।

ব্রাহ্ম পর্য্যটকের পত্র।

আমাদের একজন ব্রাহ্মবন্ধু কতিপয় হিন্দু তীর্থস্থান পর্য্যটন করিতে যাইয়া চিত্রকূটে যাহা দর্শন করিয়াছেন, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা দেখিলে ঐ সকল তীর্থবাসী সাধুদিগের ভাব অনেক অবগত হওয়া যাইতে পারে।

চিত্রকূট।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত বান্দা জেলার করই নামক একটী উপজেলা আছে, চিত্রকূট সেই করইর অধীন। এলাহাবাদ হইতে জব্বলপুর পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের যে লাইন গিয়াছে, সেই লাইনের মধ্যবর্ত্তী মাণিকপুর নামক একটী ষ্টেশন হইতে আবার একটী লাইন ঝান্সী পর্য্যন্ত গিয়াছে, করই সেই লাইনের অন্তর্গত একটী ষ্টেশন। করই হইতে চিত্রকূট ৪ মাইল দূরে অবস্থিত।

চিত্রকূট অতি প্রাচীন স্থান। এই স্থান অতি নির্জ্জন ও রমণীয় বলিয়া প্রাচীন কাল হইতে অনেক সাধু পুরুষ এখানে একান্তচিত্তে, আপনাপন ইষ্টদেবতার সেবাতে নিযুক্ত থাকিতেন; সেই জন্য এই স্থান তপভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। রামায়ণে বর্ণনা আছে রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন জন্য বন ভ্রমণ কালে এই স্থানে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাত্মা হিন্দুগণ এই স্থান পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া অনেক ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক দেখিতে গিয়া থাকেন। স্থানটী অত্যন্ত রমণীয়, প্রায় চতুর্দ্দিকে পাহাড়। ইহার মধ্যে মধ্য-স্থলের একটী পাহাড়ের পাদদেশ দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইতেছে, স্থানীয় অধিবাসিগণ এই নদীকে গঙ্গা বলিয়া অভিহিত করেন। এই নদীর অপর পারে একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর চিত্রকূট সহর অবস্থিত। এই চিত্রকূটে ছোট বড় প্রায় ৫০।৬০টী দেবালয় আছে, প্রায় সকল দেবালয়েই রাম-সীতার মূর্ত্তি। এই সকল দেবালয়ের মহান্তগণ শ্রী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব, মহাত্মা রামানুজাচার্য্য এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এখানে এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। ১ম আচারী, ২য় সাধারণী এই বৈষ্ণবগণ প্রধানতঃ সাধু তুলসী দাস কৃত রামায়ণকে বিশেষভাবে মান্য করিয়া থাকেন।

১ম আচারীগণ। ইহারা দেবালয়ে বাস করেন ও রামসীতার মূর্ত্তি পূজা করেন। এই আচারিগণের মধ্যে আবার দুই শ্রেণী, ১ম গৃহী, ২য় বৈরাগী। গৃহিগণ স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া, ঠাকুর বাড়ীর মহান্তরূপে অবস্থিতি করিয়া শিষ্যাদি করিয়া থাকেন। ও রাজা রাজড়া প্রদত্ত যায়গীর ইত্যাদির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। আর বৈরাগিগণ চিরকাল অবিবাহিত থাকিয়া কেবল ধর্ম্মালোচনাতেই নিযুক্ত থাকেন।

এই বৈরাগিগণের দেবালয়ে স্ত্রীলোক বাস করিতে পারেন না। বৈরাগীদের আচার ব্যবহার অতি সুন্দর; প্রায় সকলেই প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে তিনবার স্নান করিয়া থাকেন, ডোর কৌপীন পরিধান করেন ও রামাত বৈষ্ণবগণের ন্যায় বিশেষ তিলক ধারণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা একটু বয়স্ক তাঁহারা সর্ব্বদা মালা জপ করেন ও সাধারণতঃ বৈকালে পরস্পর একত্রিত হইয়া শাস্ত্রালোচনা ও সৎপ্রসঙ্গ করিয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই দয়ালু প্রকৃতি, প্রাণিহিংসা করেন না, অনেকেই দিন রাত্রির মধ্যে মধ্যাহ্ন কালে একবার আহার করেন। ইঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হস্তে অর্থাৎ (পূর্ব্বে জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এক্ষণে বৈষ্ণব হইয়াছেন) আহার করিতে কাহারও আপত্তি নাই কিন্তু অন্য জাতির হস্তে আহার করেন না। যেস্থানে ব্রাহ্মণ

বৈরাগী না পাওয়া যায় সেস্থলে নিজে নিজে পাক করিয়া আহার করেন। ইঁহারাও অনেক শিষ্য সেবক করেন এবং রাজা রাজড়া প্রদত্ত যায়গীরও অল্পাধিক পরিমাণে ইঁহাদের সকলেরই আছে।

২য়। সাধারণীগণের স্নানাহার ঐ রূপই, তবে তাঁহারা জাতি-ভেদ স্বীকার করেন না। এই জাতিভেদ অস্বীকার করার একটু বিশেষত্ব আছে, তাহা এই, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির হস্তে ইঁহারা আহার করেন। কিন্তু তাহা ছাড়া খৃষ্টান, মুসলমান কি ইতর লোকের হস্তে আহার করেন না।

ইঁহারা দেবালয়বাসী নহেন। চিত্রকূট সহর হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে জানকী কুণ্ড নামক একটি অতি নির্জ্জন স্থান আছে। (এই স্থান বুন্দেল খণ্ডের রাজার অধীন) সেই স্থানের পর্ব্বতের পাদদেশে স্থানীয় গঙ্গা কুল কুল ধ্বনি করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহারই নিকট কতকগুলি পর্ব্বত গুহা, সেই গুহার মধ্যে এই সমস্ত সাধুগণ বাস করিয়া নির্জ্জনে আপনাপন অভীষ্ট দেবতার সাধন ভজনে নিযুক্ত আছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ চীর কুমার ও কেহ কেহ গৃহত্যাগী।

এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। গুহা গুলির সম্মুখে নদী ও তৎপরে বৃক্ষরাজী পরিপূর্ণ পাহাড়। এই সমস্ত পাহাড়ে নানা শ্রেণীর পক্ষী সর্ব্বদাই বিহার করিতেছে; বিশেষতঃ ময়ূর ময়ূরীগণের কেকারবে সর্ব্বদাই একটী অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ভাব মনে জাগ্রত হয়। ঈশ্বর কৃপায় আমি এইরূপ একটী গুহাতে কয়েক দিন বাস করিয়াছিলাম।

এই সমস্ত গৃহত্যাগী গুহাবাসী রামোপাসক বৈষ্ণবগণের চরিত্র অতি সুন্দর। ইঁহাদের ভগবানে বিশ্বাস ও জীবে দয়া দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমি যে গুহাতে ছিলাম, সেই গুহাটীতে অন্য দুইটী সাধু আছেন। একদিন রাত্রে অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি হয় তাহাতে আমার অত্যন্ত শীত করিতে থাকে, কিন্তু আমার নিকট কম্বল বা গাত্র বস্ত্র কিছু না থাকায় শীত নিবারণের কোন উপায় ছিল না। ইহা জানিয়া উক্ত সাধু দ্বয়ের মধ্যে রামজী দাস নামক একটী সাধু, আপনার নিজের গাত্রের লুইখানি আমার গাত্রের উপর ফেলিয়া দিয়া হিন্দি ভাষায় বলিলেন যে "সঙ্গে একখানি গরম কাপড় রাখার প্রয়োজন, তুমি এই খানি কাহাকেও দিও না"। আমি বলিলাম "আপনি আমাকে নিজের গাত্রের কাপড় খানি দিলেন, আপনার কি হইবে?" প্রত্যুত্তরে তিনি কহিলেন যে "তোমার দুঃখ দেখিয়া সীতাপতি তোমাকে এই কাপড় দিলেন, আমি দি নাই। আমাকে আবার সীতাপতি দিইয়ে দিবেন, ইহাতে তুমি কিছু মনে করিও না।"

ইঁহাদের সহিত প্রায় প্রতিদিন বৈকালে ধর্ম্মালোচনা হইত। এখানকার বর্ত্তমান সাধুগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান সাধুর নাম রামা বাবা। তাঁহার সহিত বিশেষ ভাবে শাস্ত্রালোচনা ও সাকার নিরাকার ইত্যাদি বিষয় লইয়া বিচার হইত। তিনি আমাকে খুব ভাল বাসিতেন। কিন্তু আমাকে তাঁহাদের পানীয় জল ইত্যাদি স্পর্শ করিতে দিতেন না। আমি হাড়ি মেথরের অন্নও খাইতে পারি বলিয়া তাঁহারা আমার স্পর্শ দ্রব্য ভোজন করিতে ইচ্ছুক নহেন। একদিন একটী বাবাজী আমাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন, তাহার পর রামা বাবার নিকট যখন শুনিলেন যে আমি হাড়ি মেথরেরও অন্ন খাইতে পারি, তখন বাবাজী নিমন্ত্রণ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন যে, এইরূপ হাড়ি মেথরের অন্ন যাহারা খায় তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে পারি না।

এই সমস্ত গুহাবাসী সাধুগণের মধ্যে একটী গুহায় একজন অদ্বৈতবাদী সাধু থাকেন, তাঁহার নাম কৃপাল নাথ। তিনি উলঙ্গ থাকেন, কাহারও সহিত কথা কহেন না, বিশেষ আবশ্যক হইলে শ্লেটে হিন্দি ভাষায় লিখিয়া দেন। তাঁহার সহিত আমার এইরূপে কিছু কথাবার্ত্তা হয়। তিনি প্রশ্ন করিলেন "তুমি কে?" আমি উত্তর করিলাম "আমি অতি দীন মনুষ্য।" তাহাতে তিনি বলিলেন যে "আপনার এখনও দিব্য জ্ঞান হয় নাই" পরে প্রশ্নোত্তরে জানিলাম যে "আমি সেই পরমাত্মা"—এইরূপ জ্ঞান না হইলে অন্য জ্ঞানকে দিব্য জ্ঞান বলিয়া তিনি মনে করেন না। তাঁহার সাধনের বিষয় কি জিজ্ঞাসায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, "আত্মায় পরমাত্মায় এক বলিয়া চিন্তন করাই আমার সাধন।"

ইঁহাদের আহারাদি চারি প্রকার নিয়মে উপার্জ্জিত হয়। ১ম, যাঁহাদের অজাগর বৃত্তি তাঁহারা কাহারও নিকট কিছু চাহেন না ও আত্ম জ্ঞান অদ্যাপি হৈতে বাহির হইয়া কোথাও যান না, ঈশ্বর প্রতি বিশেষ প্রীতি ও স্বাভাবিক তাহাই তৃপ্তি পূর্ব্বক আহার করেন। ২য়, মাধুকরি অর্থাৎ মধ্যাহ্ন সময়ে গৃহস্থদের বাড়ী ও দেবালয় ইত্যাদি স্থানে যাইয়া রুটী ভিক্ষা করিয়া আনেন এবং তাহাই আহার করেন। ৩য়, চুটকি অর্থাৎ প্রাতে ৮।৯ ঘটিকার সময় গৃহস্থদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া ময়দা ভিক্ষা করিয়া আনেন ও তাহাই স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করেন। ৪র্থ শ্রেণীর সাধুরা উক্ত তিন প্রকারের কিছুই করেন না, কোন কোন স্থানে তাঁহাদের বৃত্তি আছে তাঁহারা তাহাই ও সাধারণের প্রদত্ত অর্থ দ্বারা খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া স্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করেন। এই সমস্ত সাধুগণের মধ্যে কেহই শিষ্য সেবক করেন না। কেহ জিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হইলে ইঁহারা তাহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করেন ও ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকেন। ইঁহাদের নিকট শুনিলাম এখানে যমুনা নামক একটী সাধু ছিলেন যিনি ৫।৬ বৎসর হইল পরলোকবাসী হইয়াছেন, তাঁহাকে সকলেই সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া জানিতেন। লোকে তাঁহাকে বিরক্ত করিত বলিয়া তিনি কয়েকটি কুকুর পুষিয়া ছিলেন, তাঁহার গুহার নিকট কাহাকেও যাইতে দেখিলে তিনি সেই কুকুর গুলিকে লেলাইয়া দিতেন, কোন ব্যক্তি সেই কুকুরদের বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিলে তবে তিনি তাহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন ও ধর্ম্মোপদেশ দিতেন।

এই সাধারণী বৈষ্ণবগণের মধ্যে কাহাকেও মূর্ত্তি পূজা

করিতে দেখি নাই। মূর্ত্তি পূজার কথা জিজ্ঞাসা করিলে কহিতেন যে আমরা নিজেরা মূর্ত্তি পূজা করি না ও তাহার আবশ্যকও নাই; তবে দেবালয়ে যাইয়া মূর্ত্তির নিকট অন্যদের ন্যায় প্রণামাদি করিয়া থাকি। ভগবানের নাম জপ করাই আমাদের প্রধান সাধন। কিন্তু রাম অবতারে ইঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। ইঁহাদের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা বেদ বেদান্ত প্রভৃতি পাঠ করিয়া থাকেন।

এখান হইতে ৫।৬ মাইল দূরে অনসূয়া নামক এক পাহাড়ে অত্রীমুনির আশ্রম নামে একটী স্থান আছে, সেখানেও ২।১ জন সাধু থাকেন। এই সমস্ত স্থান নির্জ্জন সাধনের বিশেষ উপযোগী বলিয়া স্থানে স্থানে অনেক সাধু বাস করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সকলের সহিত আমার আলাপ করিবার সুবিধা হয় নাই, ভগবানের কৃপায় আমি এখানে ১৫ দিন বাস করিয়া ছিলাম। আমার নিকট অর্থ সম্বল না থাকায় আমি প্রত্যহ মধ্যাহ্ন সময় চিত্রকূটে যাইয়া এক এক দিন এক এক দেবালয়ে অতিথি হইতাম ও ডাল রুটী পাইয়া সন্তোষের সহিত আহার করিতাম, এখানে এত বাঁদর যে পাছে খাদ্য দ্রব্য কাড়িয়া লইয়া পলায়, সে জন্য আমার আহারের সময় একজন লোক লাঠি হাতে পাহারা দিত। এইরূপে এই স্থানে ভগবানের অশেষ কৃপা উপভোগ করিয়া স্থানান্তরে যাই।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন, কিম্বা কাহারও পত্র ফেরত দিতে বাধ্য নহেন)

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন।

মহাশয়, আমার যে পত্র গত ১লা আশ্বিনের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার অনুপূরক স্বরূপ এই পত্রখানা পাঠাইতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক ১৬ই আশ্বিনের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

উপনিষদের প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে যেরূপ "ওঁ শান্তিঃ হরি ওঁ" আছে, ভক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রণীত উপাসনা পদ্ধতিতেও সেই প্রণালী অবলম্বিত হইয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। কালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইলে উক্ত সমাজের উপাসনা পদ্ধতিতে "ওঁ" এবং "হরি" শব্দ পরিত্যক্ত হয়। এই পরিত্যাগের অন্য কিছু অর্থ ই বুঝি না। উক্ত সমাজের প্রথম মুদ্রিত "ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে" উল্লেখ আছে,—"যে সকল নাম ঈশ্বর-প্রতিপাদক নাম হইয়াও কোন দেব দেবীর প্রতি আরোপিত হইয়াছে তাহা ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শব্দরূপে ব্যবহার নিষিদ্ধ।" এই জন্যই যে "ওঁ" এবং "হরি" শব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহা উল্লিখিত বাক্য দ্বারাই বুঝা যায়। অধুনা উক্ত সমাজ যে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ভঙ্গ করিয়া চলিয়াছেন তাহা সকলেরই বিদিত, আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই না। আমাদের বক্তব্য কেবল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে উপাসনা ও সঙ্গীতাদিতে "হরি" নাম ব্যবহার করিতে পারেন না, তাহা জনৈক ব্রাহ্মের পত্রেই যথাযথ রূপে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু এইক্ষণ যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংগীতাদিতে "হরি" শব্দের এত ছড়াছড়ি তাহার কারণ কি? এ সকল বিষয় যতই ভাবা যায়, যতই মূল অনুসন্ধান করা যায়, ততই দৃঢ়তররূপে ধারণা হয় যে, ইহা আমাদের বংশানুগত দোষ। বাস্তবিকই ইহা বংশগত দোষ গুণের ন্যায় আমাদের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, সুবিধা পাইলেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইহা ভিন্ন আর কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না।

অনেক দিন হইল আমার অতীব শ্রদ্ধেয় কোন বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন "চন্দ্রমোহন, সন্দেশ খাইতে খাইতে যাহাদের রসনা উহার রসে বিভোর হইয়া গিয়াছে, তাহারা যেমন মিঠাইয়ের দোকানের নিকট দিয়া গমন করিলে স্বতঃই তাহাদের জিহ্বা রসাইয়া উঠে, তেমনই আমাদের হৃদয় একবার স্বভাবসিদ্ধ কোন ইচ্ছা, আবেগ বা ভাব দ্বারা বিকৃত হইলে, অন্য দিকে তাহার দৃঢ়তা থাকিলেও যখনই সেই প্রলোভনের সুযোগ পায় তখনই তাহাতে প্রাণ না ঢালিয়া থাকিতে পারে না। তখন অন্য সকল দিক দেখিবার ও বিবেচনা করিবার শক্তি বা ইচ্ছা থাকে না, আত্মদমনও অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং সেই প্রলোভনের মাদকতা সকল জ্ঞান ও দৃঢ়তা ডুবাইয়া তাহাতেই বিভোর করে।" এই স্থলে এই কথা গ্রহণ করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। কেন না দেখিতে পাইতেছি যাহা এক সময় নিজ জ্ঞান বিবেচনা এবং বিশ্বাস অনুসারে দোষাবহ বলিয়া পরিত্যাগ করি, তাহাই আবার ভাবে পড়িয়া গ্রহণ করিয়া থাকি। নতুবা আমরা নিজকে ব্রাহ্ম, সমাজকে ব্রাহ্মসমাজ, ধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়া, ধীরে ধীরে বর্ত্তমান বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈরাগ্য ধর্ম্ম অপব্যবহারের ন্যায় "হরি" শব্দ ব্যবহার করিয়া লোকের মনে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে ঘৃণা এবং দ্বৈধ ভাব জন্মাইয়া দিতেছি কেন? সেই জন্যই বলিতেছিলাম উহা বংশগত দোষ গুণের ন্যায় রক্তে, মাংসে, এবং হৃদয়ে এরূপ জড়িত হইয়া গিয়াছে যে উহা ছাড়িয়াও ছাড়িতে পারি না। যে প্রাচীন সম্প্রদায়ের সহিত ধর্ম্মাদি সম্বন্ধে সমভাব না থাকায় তাঁহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছি তাঁহারাও তাঁহাদের উপাস্য দেবতাকে হৃদয়ের গভীর ভাবব্যঞ্জক স্তোত্রাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবার সময় "ব্রহ্ম" নামে প্রকাশ না করিয়া পারেন না। এই "ব্রহ্ম" নাম এমনই মহান্। এমন হৃদয়গ্রাহী সুমধুর মহান্ ব্রহ্মনাম কেন যে প্রাণে ভাব উদ্রেক করিতে সক্ষম হইবে না বুঝি না। একটী কথা জিজ্ঞাসা করি ভক্তি, নামে না অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে? অবশ্য সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে বাধ্য হইবেন যে ভক্তি প্রধানতঃ গুণ ও দর্শনের উপর নির্ভর করে। যখন দর্শন হয় অথবা প্রাণে উপলব্ধি হয় তখনই ভাব ও ভক্তি হয়। বিশ্বাসেও (Believe) মনে যে ভাবের উদয় না হয় এমন বলিতে পারি না, কিন্তু যে পর্য্যন্ত প্রকৃত বিশ্বাস (Faith) না হয় সে পর্য্যন্ত প্রকৃত ভাব,

ভক্তি হয় না। যে ভাব-ভক্তি-প্রভাবে চিরদিন পড়িয়া থাকিতে পারি না তাহার কোন প্রয়োজন নাই।

নামের মধ্যে বিশেষ কিছু মধুরতা আছে বলিয়া আমার তেমন মনে হয় না। "হরি", "কালী", প্রভৃতি যেমন "ব্রহ্ম"ও তেমন। তবে বিশ্বজনীন নাম গ্রহণই সুসঙ্গত। কোন নামেই মাদকতা নাই। কেন না যে মদ্যপানে লোক উচ্ছন্ন যাইতেছে সেই "সুরা" নামেরও তাহা নাই, যদি থাকিত তবে লোকে ধনে প্রাণে মারা যাইত না। অতএব নামের কোন গুণ নাই ইহা স্বীকার্য্য। তবে "হরি" নাম নিতে বাধা কি, ইহা বিচার্য্য। উহার বিচারের আবশ্যকতা নাই। কেন না আমরা যাঁহার উপাসক, যিনি আমাদের উপাস্য দেবতা, তাঁহার নামে নিজকে, সমাজকে, এবং ধর্ম্মকে জগতে প্রকাশ করিয়াছি অতএব অন্য নামের প্রয়োজন করে না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম ইহা অন্য নামে অভিব্যক্ত হওয়া উচিত নয়। "হরি" প্রভৃতি নাম বিশ্বজনীন ধর্ম্মে প্রচারিত হইতে পারে না। এদেশবাসী জাতি মাত্রেই জানে যে হিন্দুগণ "কৃষ্ণ", "বিষ্ণু", "চৈতন্য", এই তিনকেই "হরি" নামে প্রচার করিয়াছেন। একদা একজন শিক্ষিত ভক্ত বৈষ্ণবকে একজন হরিনাম ভক্ত ব্রাহ্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "মহাশয় 'হরি' ও "কৃষ্ণ" ভিন্ন কি না?" তদুত্তরে তিনি ভাবের সহিত বলিলেন "না তাহা কখনই নাহে যেই হরি, সেই কৃষ্ণ সেই আমার চৈতন্য" ব্রাহ্ম তদুত্তরে আবার 'ব্রহ্ম" ও "হরি" এক বলাতে ভক্ত তাঁহার সঙ্গে আর আলাপ করা দূরে থাকুক স্থান পরিত্যাগের উদ্যোগ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। এই ভক্ত বৈষ্ণবের ভক্তির সরলতা ও নিষ্ঠার গভীরতা অনুভব করিয়া পরে কি কেহ বলিতে পারিবেন লোকে "ব্রহ্ম" ও "হরি" এক বলিয়া বিশ্বাস করে? ব্রাহ্মসমাজ পূর্ব্বাবধি স্বীকার করিয়া আসিতেছেন যে, যে সকল নাম কোন দেব দেবী কি অবতারে আরোপ করা হইয়াছে সেই সকল নাম ব্রাহ্মসমাজে বিজ্ঞাপিত হইবে না এবং সেই নামে উপাসনাদি হইবে না এমত স্থলে "হরি" নাম ব্রাহ্মসমাজে "ব্রহ্ম" রূপে গ্রহণ করা কোনরূপে ন্যায়-সঙ্গত মনে করি না। কেহ কেহ বলেন "হরি" "ব্রহ্মের" নামান্তর। মানিলাম নামান্তর তাহাতে কি লাভ হইল? দেশে যখন অন্য অর্থে ব্যবহৃত, তখন প্রয়োজন কি? অপর কেহ কেহ বলেন হরির প্রতিমূর্ত্তি নাই, তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? বিষ্ণুর যখন প্রতিমূর্ত্তি আছে তখন হরিরও প্রতিমূর্ত্তি আছে। "বাসবদত্তা" নামক পুস্তকে "হিরণ্যনগর ও হরিহর রূপ দর্শন" এই প্রস্তাব পাঠ করিলে মূর্ত্তি আছে কি না অথবা শ্রীমদ্ভাগবতে "হরি" শব্দে কাহাকে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে সকলেই জানিতে পারিবেন। এবং আমি বোধ করি সকলেই ইহা জানেন। অপর কেহ কেহ বলিয়া থাকেন "হরি" নামটী সিদ্ধ হইয়াছে "কালী" "দুর্গা" নামটীও ত সিদ্ধ কিন্তু "আল্লা" নামটী কি সিদ্ধ নহে? বরং "আল্লা" নামে কোনরূপ পৌত্তলিক ভাব নাই কেবল ভাবা অন্যরূপ। তবে হরিনাম ভক্তেরা "আল্লা" নাম তেমন ভাবে গ্রহণ করেন না কেন? ইহার জন্যই বলিতে হইতেছে ইহা আমাদের মজ্জাগত ও বংশানুগত ভাব।

বিশ্বজনীন ধর্ম্ম সংকীর্ণতায় আনা কর্ত্তব্য নহে এবং আমি অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে এই "হরি" নামের বাহুল্যতাই ব্রাহ্মধর্ম্মের মন্থর গতির অন্যতম কারণ। প্রাচীনেরা নব্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকেন যে "দেখ ব্রাহ্মদের রক্তের তেজ যেই পড়িয়া আসিতেছে এবং যেই ধর্ম্মের দিকে টান পড়িতেছে অমনি "হরি" ভিন্ন গতি দেখিতেছে না। অতএব তোমরা সাবধান হও। দেখিবে কয়েক দিন পরে "কালী" "দুর্গা" ও কাহবে এবং প্রতি মূর্ত্তিও নির্ম্মাণ করিবে।"

তাই ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী এবং এই মহান্ ধর্ম্মের মহত্ত্ব ও পবিত্রতা রক্ষণে যত্নশীল মহোদয়গণকে সানুনয়ে বলিতেছি আপনারা সময় থাকিতে হরি নামরূপ প্রাচীন ধর্ম্মের আবরণ হইতে প্রিয়তম সুমহান্ ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করুন এবং এই রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হউন নতুবা কিছুকাল পরে অন্যান্য একেশ্বর-বাদের ন্যায় ইহাও "হরি" নামরূপ মহা আবর্ত্তে পড়িয়া হিন্দু-সমাজের কুক্ষিগত হইবে। এখনও সময় আছে। সময় থাকিতে জাগ্রত হউন, উত্থান করুন, পড়িয়া থাকিবার সময় নাই। যাঁহার যতটুকু শক্তি আছে তাহা ব্যবহার করিতে কেহ নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না।

ব্রাহ্মপল্লী ময়মনসিংহ
১২ই আশ্বিন ১৩০০ } শ্রীচন্দ্রমোহন বিশ্বাস।

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকার সম্পাদক
মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু—

মহাশয়!

আমার এই পত্র খানি তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় প্রকাশ করিলে অনুগৃহীত হইব।

কোন বিশেষ কারণে আজ কাল ব্রাহ্মসমাজে গুরুবাদ ও মধ্যবর্ত্তিবাদ লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে ও তজ্জন্য স্থানে স্থানে সভা সমিতিও হইতেছে। কিন্তু যেরূপ ভাবে ইহার আন্দোলন হইতেছে, তাহাতে এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা হওয়া দূরে থাকুক বরং আরও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। আমার বিবেচনায় উক্ত গুরুতর বিষয়ের এইরূপ ভাবে আন্দোলন না হইয়া উহার মধ্যে কিছু সত্য আছে কি না তাহাই ধীরভাবে বিচার করা উচিত। স্বপক্ষে (যাঁহারা গুরু স্বীকার করেন না) ও বিপক্ষে (যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের সাধনপ্রণালীর অসম্পূর্ণতা অনুভব করিয়া গুরু গ্রহণ করিয়াছেন,) যে সমস্ত যুক্তি ও অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দেখা যাইতেছে, তাহাতে নিম্নলিখিত তিনটী বিষয় মীমাংসীত না হইলে, এই গোলযোগ মিটিবার সম্ভাবনা কম বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং আমি ব্রাহ্মসাধারণের মনযোগ আকর্ষণ জন্য সেই তিনটী প্রশ্ন নিম্নে লিখিতেছি, আশা করি ব্রাহ্ম মহোদয়গণ ধীরভাবে নিম্নলিখিত তিনটী বিষয় বিচার করিয়া দেখিবেন।

১ম প্রশ্ন। ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত সাধন প্রণালীর মধ্যে কিছু অসম্পূর্ণতা আছে কি না?

২য় প্রশ্ন। ব্রাহ্মসমাজ কখনও অভ্রান্ত গুরু স্বীকার করেন না ও করিতে প্রস্তুতও নহেন। কিন্তু এতদিন যেভাবে গুরু স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে তাহার কিছু ব্যতিক্রম হইতেছে। এখন প্রশ্ন এই যে, ধর্ম্ম রাজ্যে অগ্রগামী কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট [ব্যক্তি কে? তাহার কোন কথা হইতেছে না।] বিশেষ ভাবে ধর্ম্ম শিক্ষা করা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত কি না?

৩য় প্রশ্ন। যোগ শিক্ষাকারিগণ বলেন যে, ঈশ্বর সকলের মধ্যে সমভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া সকলকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিলেও, জনসাধারণ বিষয়মোহ ও কাম ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া, এতদূর আত্মবিস্মৃত ও বহির্ম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে যে তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া দূরে থাকুক, যে পথ অবলম্বন করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহাও তাহারা অবলম্বন করিতে পারে না। সুতরাং কোন একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার আত্মশক্তি দ্বারা বিষয়ী ব্যক্তির বহির্ম্মুখীন মনকে অন্তর্ম্মুখীন করিয়া, ব্রহ্ম দর্শনের পথ খুলিয়া দিতে পারেন। ইহারই নাম শক্তি সঞ্চার। এরূপ শক্তি সঞ্চারের মধ্যে কোন সত্য আছে কি না?

এক্ষণে ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা উক্ত তিনটী প্রশ্ন গভীর ভাবে বিবেচনা করিয়া উহাদের মধ্যে যদি কিছু সত্য থাকে, তবে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া লউন, নচেৎ হাজার হাজার লোকে বহু বৎসর ধরিয়া উহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিলেও বর্ত্তমান গোলযোগ মীমাংসা হইবে না। ইতি

৮ই কার্ত্তিক, ১৩০০। সেবক, শ্রীসত্যদর্শী।

ব্রাহ্মসমাজ।

দান—কবটীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ ঘোষ মহাশয় তদীয় স্বর্গীয়া পত্নী শরৎকুমারী ঘোষের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ঐ টাকা দ্বারা "শরৎকুমারী ফণ্ড" নামে একটী ফণ্ড স্থাপিত হইবে।

সভাসমিতি—গত ২৩এ অক্টোবর হইতে ২৬এ পর্য্যন্ত ৪ দিন ঢাকা নগরীতে পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

বিগত ১২ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটের সময় সিটি কলেজ গৃহে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ মোহন বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার অন্যান্য কার্য্যের পর শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয়ের নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত হয় যে "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা, বক্তৃতা, সঙ্গীতাদিতে যেন "হরি" অথবা পৌত্তলিকতা সূচক অন্য কোনও নাম ব্যবহার করা না হয় এবং যেন সঙ্গীত ও অন্যান্য পুস্তকের নূতন সংস্করণে ঐ সকল নাম বাদ দেওয়া হয়"। শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র রায় তাঁহার প্রস্তাবের অনুমোদন করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এই প্রস্তাবের সংশোধন করিয়া প্রস্তাব করেন যে বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয়ের প্রস্তাব এবং এতদ্ বিষয়ক অন্যান্য পত্রাদি কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় প্রেরিত হউক, তৎপরে তাঁহারা বিবেচনা করতঃ যাহা কর্ত্তব্য মনে করেন, তাহা অধ্যক্ষ সভাকে জানাইবেন। শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র রায় এই প্রস্তাবের সহিত একমত হইয়া পূর্ব্বপ্রস্তাবের সমর্থন পরিহার করেন এবং এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

মৃত্যু—শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন কাঁথি নিবাসী বাবু হরিপ্রসাদ দেব সরকার আর ইহলোকে নাই। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ একজন উদ্যমশীল ব্যক্তিকে হারাইলেন। হরিপ্রসাদ বাবু ৬।৭ মাস হইতে বহুমূত্র রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। গত ১২ই অক্টোবর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। পরমেশ্বর তাঁহার আত্মাকে শান্তিতে রক্ষা করুন।

দীক্ষা—মান্দ্রাজ হইতে অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"গত ১লা অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যা সার্দ্ধ ছয় ঘটিকার সময় স্থানীয় ব্রহ্মোপাসনা মন্দিরে শ্রীযুক্ত এল্ সুব্রহ্মণ্যম্ আয়ার ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। ইনি এখানকার খৃষ্টান কলেজের সিনীয়র বি. এ. ক্লাসে অধ্যয়ন করেন। এতদুপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত এম্, আর, ভেঙ্কাটা রত্নম্ নয়াড়ু গারু এম্, এ, মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তদীয় অগ্নিময় উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ প্রোৎসাহিত হইয়াছিলেন এবং নব দীক্ষিত ভ্রাতার অন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল সুদৃঢ় রূপে মুদ্রিত হইয়াছিল। ঈশ্বর এই ধর্ম্মমণ্ডলীকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং ভারত মাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রচারিত পরম ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার জন্য লোকের চিত্তকে আকর্ষণ করুন।"

বিবাহ—গত ৩রা অক্টোবর কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র দাসের কন্যা শ্রীমতী গিরিবালা দাসের সহিত শ্রীহট্ট নিবাসী বাবু প্রফুল্লচন্দ্র সোমের বিবাহ ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে নিষ্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৩ আইন অনুসারে এই বিবাহ রেজেষ্টারী করা হয়। পাত্রের বয়স ২৭ বৎসর এবং কন্যার বয়স ১৭ বৎসর।

গত ৫ই কার্ত্তিক শনিবার আমাদের ঢাকাস্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সুবালা দেবীর সহিত শিলং প্রবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরকিশোর

শর্ম্মার বিবাহ পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহ সভাতে স্থানীয় ব্রাহ্মগণ এবং ঢাকার কতিপয় গণ্য মান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। বাবু চণ্ডী-কিশোর কুশারি এবং বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী দ্বারা বিবাহের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। শিলংস্থ বাবু শিবনাথ দত্ত বর কন্যাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। উপদেশটী অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে এই সর্ব্ব প্রথম ব্রাহ্মবিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। বর শিলং চিফ কমিশনরের আফিসে কার্য্য করেন। বয়স ২৭ বৎসর। কন্যার বয়স ২১ বৎসর। ১৮৭২ সনের তিন আইন অনুসারে এই বিবাহ রেজেষ্টারী হইয়াছে।

গত ১৪ই কার্ত্তিক, সোমবার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ ১০।৩ নং ভবনে একটী ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত বিপত্নীক, বয়স ৩৭ বৎসর। পাত্রী, শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যমা কন্যা কুমারী শ্রীমতী কাদম্বিনী মুখোপাধ্যায়, বয়স ২৩ বৎসর। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই বিবাহ ১৮৭৩ সালের ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করা হয়।

পীড়া—আমাদিগের লাক্ষ্মৌ নিবাসী প্রচারক শ্রীযুক্ত ভাই লছমন প্রসাদ অনেক দিন হইতে জ্বর রোগে কষ্ট পাইতে ছিলেন। তিনি প্রায় ২০ দিন সংজ্ঞাহীন ছিলেন এখন আর জ্বর হয় না বটে, কিন্তু তিনি এতাদৃশ দুর্ব্বল হইয়াছেন যে প্রায় দুই মাস শয্যাগত থাকিতে হইবে। নানা স্থান হইতে তাঁহার বন্ধুগণ পত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি এখন সে সকলের উত্তর দিতে অসমর্থ। বন্ধুগণ তাঁহার জন্য প্রার্থনা করুন।

শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত অনেক দিনের পরিশ্রমের পর ঈশ, কেন, কঠ প্রশ্ন, মুণ্ডক, ও মাণ্ডুক্য এই কয়ক-খানি উপনিষদ টীকা ও অনুবাদ সহিত মুদ্রিত করিয়াছেন। এই কার্য্যটী তিনি অতিশয় নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। যে দিন পুস্তকখানি বাহির হয় সে দিন এতদর্থে বন্ধু বান্ধবকে লইয়া বিশেষ উপাসনা করিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। কারণ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ যে কার্য্যই করুন তাহা পরব্রহ্মের নামে উৎসর্গ করা কর্ত্তব্য। আমাদের যতদূর স্মরণ আছে, আমাদের পরলোকগত বন্ধু জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় ও তাঁহার প্রণীত চৈতন্যচরিত যে দিন শেষ করেন, সে দিন বিশেষ উপাসনা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম গ্রন্থকারদিগের এইরূপই কর্ত্তব্য। সীতানাথ বাবুর গ্রন্থখানি অতি সাবধানতার সহিত প্রণীত হইয়াছে। টীকাতে তিনি শঙ্করেরই অনুগমন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম "শঙ্করকৃপা" রাখিয়াছেন। অনুবাদ মূলের প্রকৃত ভাবব্যঞ্জক অথচ সুখপাঠ্য হইয়াছে। গ্রন্থখানি ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায় মূল্য ১৲ টাকা।

পরলোকগত জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় তাঁহার শ্রীপঞ্চস্থ বাসভবনে পূজার সময় ব্রাহ্মোৎসব করিতেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে তাঁহার বিধবা পত্নী তাঁহার এই প্রথাটী যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছেন। এবারে তিনি কলিকাতা হইতে কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধুকে এতদর্থ নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা কয়েক দিন তাঁহার ভবনে বাস করিয়া উপাসনা সংগীত সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিয়াছেন।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে যে বিক্রমপুরের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে নিম্নলিখিত রূপ দান পাওয়া গিয়াছে;

গত প্রকাশিতের পর।

বাবু রাধাবল্লভ চৌধুরী, কলিকাতা		৫৲
„ বৈকুণ্ঠনাথ দাসের দ্বারা আদায়		।০
„ বিপিনবিহারী সেন, আহিরি টোলা, কলিকাতা		১৲
„ গোপালচন্দ্র মল্লিক, কলিকাতা		১৲
„ ক্ষেত্রমোহন দত্ত	ঐ	১৲
শ্রীমতী সরস্বতী সেন	ঐ	১৲
মাং বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগছি, পাবনা।		
বাবু দুর্গানাথ বাগছি, পাবনা		২৲
„ গিরীশচন্দ্র রায়	ঐ	২৲
„ মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী	ঐ	২৲
„ বৈদ্যনাথ ছকি	ঐ	॥০
„ দ্বারিকানাথ বিশ্বাস	ঐ	১৲
„ বিপিনচন্দ্র পাল	ঐ	॥০
„ শ্রীশচন্দ্র রায়	ঐ	।০
জনৈক বন্ধু	ঐ	১৲
দুই বন্ধু	ঐ	৸০
বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র	কলিকাতা	৪৲
„ কেদারনাথ কুলভি, বাঁকুড়া		১॥০
শ্রীমতী অম্বিকা দেবী,	কোন্নগর	১০৲
বাবু বটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা		১৲
„ শ্যামাচরণ বসু ৬৪।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা		১৲
শ্রীমতী কুমারী গুপ্ত নশিপুর, মুরশিদাবাদ		২৲
বাবু জগন্নাথপ্রসাদ গুপ্ত	ঐ	২৲
শ্রীমতী স্বরস্বতী গুপ্ত	ঐ	।০
বাবু অধরচন্দ্র মজুমদার	কলিকাতা	॥০
„ রসিকলাল পাঠক	ঐ	২৲
„ সত্যনারায়ণ শাস্তগিরী	নসিরগঞ্জ আরা	২৲
„ মহেন্দ্রনাথ সরকার	সয়দাবাদ	৫৲
হোসঙ্গাবাদ জনৈক বন্ধু		১০৲
বাবু বনমালী রায়, জমিদার,	বনওয়ারী নগর	২০০৲
„ উদয়রাম দাস মিসা,	আসাম	৪৲
„ শশিভূষণ বিশ্বাস,	কলিকাতা	৫৲
„ গোবিন্দলাল রায়	চোরবাগান কলিকাতা	২৲
„ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	॥০
„ নবীনকৃষ্ণ গুপ্ত	মুর্শিদাবাদ	৬৲
শ্রীমতী বিধুমুখী রায় চৌধুরী	কলিকাতা	২৲
বাবু কালীনারায়ণ রায়	দিঘাপতিয়া	৪৲
ডাক্তার এম, এম, বসু	কলিকাতা	১৲
„ পি, সি, রায়	ঐ	২৲
রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর,	ঐ	১৲
বাবু কেদারনাথ রায় সি, এস	ঐ	১৲
„ রামদুর্ল্লভ মজুমদার	ঐ	৪৲
„ অভয়চরণ মল্লিক	ঐ	২৲
„ বিপিনবিহারী দত্ত	ঐ	১৲
ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকার	ভবানীপুর	১৲
শ্রীমতী শৈলবালা রায়	কলিকাতা	১০৲
বাবু দেবেন্দ্রনাথ পাল	ঐ	২৲
„ ক্ষেত্রমোহন দাস, প্রেসিডেণ্ট বালিশিরা আত্মীয় সমিতি কালীঘাট দক্ষিণ শ্রীহট্ট		১০৲
		৩১৯৲
	পূর্ব্ব প্রকাশিত	৫৮৲
		৩৭৭৲

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১৭ই কার্ত্তিক প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৫শ সংখ্যা।
১৬শ ভাগ।

১লা অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক [illegible] মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

ধরে থাকি তোমারি কৃপায়।

পড়িয়া উঠিয়া, উঠিয়া প'ড়িয়া,
অনুতাপ অশ্রু মুছিতে মুছিতে;
ধৈর্য্যডোর দৃঢ় ছিঁড়িয়া, যুড়িয়া,
সংকল্পের ঘর ভাঙ্গিতে গড়িতে,
ধাইছে জীবন ভাই জীবন-জলধি-পানে
দেয় না ক্ষণেক দাঁড়ায়ে ভাবিতে।

এই ত নিয়তি, আসেচে শকতি,
দুর্ব্বলতা মাঝে, উঠিতে পড়িতে;
সংগ্রাম—সংগ্রাম—এই জেনো গতি,
এই বিধি ভাই এ মর্ত্ত্য মহীতে;
হায় হায় করে তবে বিষাক্ত-বিষাদ-বাণে
শান্তিহীন কেন করিতেছ চিতে?

পতনের তরে, মুখে অশ্রু ঝরে
ঝরুক সে অশ্রু বহু মূল্য তার;
শোকাশ্রু ভিতরে, চাও আশা ভরে
দিওনা ঘেরিতে নিরাশ আঁধার!
আশা যদি বেঁচে থাকে সকলি রহিল ভাই,
তাঁর কৃপা ধরে উঠিবে আবার।

দেও শুভ মতি তবে বিশ্বপতি
পড়েও আশাতে উঠিয়া দাঁড়াই,
বিশ্বাসে নির্ভরে জাগুক শকতি;
উঠি কিম্বা পড়ি তব পানে ধাই।
দুর্ব্বলে, সবলে, সদা, আলোকে আঁধারে যেন
ধরে থাকি তোমারি কৃপায়।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ব্রাহ্মধর্ম্ম কি দিয়াছেন?—আমরা অনেক সময় নিরাশার কথা বলি ও শুনিতে পাই। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া জীবনকে আশানুরূপ উন্নত করিতে পারি নাই। যাহা ছিলাম তাহাই রহিয়াছি। এই কথা কি সত্য? আমরা যাহা ছিলাম তাহাই কি রহিয়াছি? আমাদের জীবনের কি কিছুই উন্নতি হয় নাই? ঈশ্বরের পরিত্রাণপ্রদ করুণা কি আমাদের জীবনের কোন পরিবর্ত্তন ঘটায় নাই? আত্মজীবনে ও অন্যের জীবনে কোন পরিবর্ত্তনের চিহ্ন কি দেখিতে পাই নাই? ধর্ম্মবিশ্বাস মানব প্রাণে কি পরিবর্ত্তন ঘটায়? ধর্ম্ম মানুষকে কি দেয়? মানুষ কি জন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে? ইহার প্রধান উদ্দেশ্য দুইটী। প্রথম পাপ হইতে উদ্ধার হওয়া—দ্বিতীয় শান্তি-লাভ। মানুষ নানা প্রকার পাপের ও দুষ্প্রবৃত্তির অধীন। ঈশ্বরের নাম, ঈশ্বরের করুণা, প্রথম মানুষকে পাপ হইতে বাঁচায়। আর মানুষ নানা প্রকার শোক তাপের অধীন। দুঃখ দারিদ্র্য মানুষকে সর্ব্বদা যন্ত্রণা দেয়। ঈশ্বর বিশ্বাস মানুষকে রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে সান্ত্বনা দেয়। ব্রাহ্ম নর-নারীর মধ্যে এসব চিহ্ন কি আমরা দেখিয়াছি? নিজের জীবনের ও অন্যের জীবনের দিকে চাহিয়া ঈশ্বর করুণার এই সাক্ষী কি আমরা দিতে পারি না, যে ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিত্রাণপ্রদ স্পর্শে আমরা অনেক পাপ হইতে উদ্ধার পাইয়াছি। ঈশ্বরের করুণা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজরূপ দ্বার দিয়া আমাদের জীবনকে পবিত্র ও উন্নত করিয়াছে এসাক্ষী কি আমরা জগতের নিকটে দিতে পারি না? আমরা স্থির-চিত্তে ভাবিয়া দেখি আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি। যে হৃদয় কেবল পাপের পথে ছুটিত আজ সেই হৃদয়ে কি পাপের প্রতি ঘৃণা ও ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ দেখিতে পাই না? ঈশ্বরের করুণা স্মরণ, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া ও সেই করুণার সাক্ষী দেওয়া, প্রত্যেক ব্রাহ্মের পক্ষে কর্ত্তব্য। অপূর্ণ জীবনের দুর্ব্বলতা ও ত্রুটি একেবারে দূর হয় না; পড়িব উঠিব আবার প্রার্থনা করিব, ইহাতে আত্মার বল বৃদ্ধি হয়। আমরা নিজের জীবনে ও অন্যের জীবনে ঈশ্বরের দয়া দেখিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিত্রাণপ্রদ শক্তি দেখিয়া আজ কৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁহার করুণার সাক্ষী দিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে অনেক পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন; ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন।

ঈশ্বরের করুণারূপী ব্রাহ্মধর্ম্ম কি আমাদিগকে শোক দুঃখের

মধ্যে শান্তি দেন নাই? সন্তানের মৃত্যুতে পিতা মাতা যখন অধীর না হইয়া প্রশান্তভাবে ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা করেন "প্রভো তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" তখন জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম জয় যুক্ত হইল ইহা কি বলিতে পারি না? স্বামীর মৃত্যুতে যখন শিশুসন্তান লইয়া সংসারে ভাসমানা পত্নী ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করেন "প্রভো আমার সংসারের স্বামী, পরম স্বামী যে তুমি তোমার আশ্রয়ে আমাদিগকে রাখিয়া গিয়াছেন; আমাদের ভয় কি; তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমার স্বামীকে তোমারই অমৃত ক্রোড়ে লইয়াছ, তোমার দয়া ধন্য।" তখন কি ব্রাহ্মধর্ম্মের শান্তিপ্রদ শক্তি দেখিতে পাই না? ঘোর শোক যন্ত্রণার মধ্যে তাঁহার দয়া কি হৃদয়ে অমৃত ও শক্তি প্রদান করে নাই। আত্মজীবনে ও পরজীবনে তাঁহার দয়ার হস্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিত্রাণ-প্রদ শক্তি স্মরণ ও অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইতেছি। তাঁহার করুণার সাক্ষী কি দিব না? আমরা সকলে এই সাক্ষ্য দি যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সুশীতল চরণে আশ্রয় লইলে পাপীর পাপ যায় ও শান্তি পাওয়া যায়।

প্রচার-সহায়—প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দৈনিক জীবনে দেখা যায় যে, আপনারা যে ধর্ম্ম বিশ্বাস করে বা যাহা দ্বারা নিজেরা পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে, তাহা জগতে প্রচারিত হউক বা সকলে গ্রহণ করুক এই জন্য শারীরিক মানসিক বা আর্থিক সকল প্রকার সাহায্য দান করিয়া থাকে। ব্রাহ্মধর্ম্মে যাঁহারা প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা কেবল সহায় নহেন তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রচারক। কিন্তু এই মহাসত্য পাইয়াও দেখিতেছি প্রচারের জন্য ব্যগ্রতা দূরে থাকুক, প্রচারের সহায়তার জন্যও অনেক ব্রাহ্মের তেমন ব্যগ্রতা নাই। প্রচারক কোন স্থানে গেলে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া নানাপ্রকারে প্রভুর নাম প্রচারের সুবিধা করিয়া দেওয়া, কি অর্থের দ্বারা সাহায্য করা, ইহার জন্যও তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। হয়ত প্রচারক ধার করিয়া চলিয়া আসিলেন, কিন্তু সেখানে স্বচ্ছল অবস্থাপন্নব্রাহ্ম রহিয়াছেন, দুইটী টাকা পাথেয় দিতে পারিলেন না। ইহাতে এই বুঝা যায় ব্রাহ্মধর্ম্মকে তাঁহারা এত প্রিয় জ্ঞান করেন না যে সে জন্য কিঞ্চিৎ ব্যয় করিতে পারেন। অর্থের মায়া কি সাংসারিক সুখ-স্পৃহা এত প্রবল যে ধর্ম্ম তাহার উপর আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মগণ নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, নূতন জিনিস জগৎকে দিতে যাইতেছেন, এ সময় তাঁহাদের কত শ্রম কত ত্যাগ স্বীকার করিলে এ কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারিবেন, তাহা প্রত্যেকের ভাবিয়া দেখা উচিত। কর্ত্তব্য জ্ঞানেও প্রচার-কার্য্যে সহায় হওয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য। আবার অনেক স্থলে দেখি ব্রাহ্মদিগের অপেক্ষা অপর সম্প্রদায়ের লোকের নিকট অধিক সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারা অর্থ সাহায্য করেন, আমাদের পুস্তক ও পত্রিকাদি গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ব্রাহ্মগণের যখন এত ঔদাসীন্য তখন প্রচারক সংখ্যা বর্দ্ধিত না হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাঁহারা উৎসাহিত হইয়া আসেন তাঁহারাও এই ঔদাসীন্য দর্শনে নিরুৎসাহ হইয়া যান। শুনিতে পাই এমন ব্রাহ্মও অনেক আছেন, যাঁহারা নিজ সমাজের কাগজ না লইয়া অপর সমাজের কাগজ লইয়া থাকেন। এরূপ ভাব দেখিয়া কিছু বলিলে অনেক সময় তাঁহারা উদারতার কথাই বলেন। যাহা হউক ইহাদের প্রতি আমাদের পরামর্শ এই যে সমাজে থাকিয়া নিজে কৃতকৃতার্থ হইতেছ সর্ব্বাগ্রে তাহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা কর। তোমাদের সমাজের কাগজ যদি মনের মতও না হয় তবু গ্রহণ কর, তোমাদের প্রচারকগণ মনের মত নয় তবু সহায়তা কর বরং মনের মত করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট হও, তাহাতে দোষ নাই। কিন্তু প্রচার-সহায় হইতে কখনই উদাসীন হইও না। ঈশ্বর ব্রাহ্মসাধারণকে তাঁর ধর্ম্মপ্রচারের সহায় করিয়া লউন।

আদেশবাদ—ব্রাহ্মধর্ম্মে যখন অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ কি অভ্রান্ত গুরুবাদ নাই, প্রত্যেক ব্রাহ্মই আপনার বিবেক অনুসারে চলিবেন এবং তাহাতেই আত্মার অনন্ত উন্নতি সাধিত হইবে, এই যখন বিশ্বাস; তখন বিবেকের অনুসরণ ব্যতীত ব্রাহ্মের আর গত্যন্তর নাই। বিবেকের আজ্ঞা ছাড়িয়া বা অমান্য করিয়া শাস্ত্র বা মানুষের অনুসরণ করিলে তিনি আর ব্রাহ্ম বলিয়া অভিহিত হইবারই যোগ্য থাকিলেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়,—এই শিক্ষাএই উপদেশই পাইয়াছি বা জীবন্ত ব্রহ্মের নিকট এই শিক্ষা বা এই উপদেশ পাইয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। যদি ইহা বিশ্বাস না করিয়াও কোন লোক ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়া থাকেন তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের বা ব্রাহ্মসমাজের দোষ নয়। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের দুর্ব্বলতা। এই বিবেককেই বিশ্বাসী ব্যক্তিরা ঈশ্বরের আদেশ বা ঈশ্বরবাণী বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। প্রভেদ এই, বিবেক বলিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ বুঝায় না কিন্তু আদেশ ও বাণী বলিতে ঘনিষ্ঠ যোগ বুঝায়। ফলতঃ ঈশ্বর আদেশ ব্যতীত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসুর প্রকৃত জীবন্ত ধর্ম্ম জানিবার অন্য উপায় নাই। বিশেষ পুরাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নবধর্ম্মে কোন লোক আসিতে পারে না। নবধর্ম্মের জন্য কোন লোক সংসারের সকল আশা ছাড়িয়া জীবন উৎসর্গ করিতে পারে না। তখনই দুর্ব্বল মানুষ সবল হয় এবং সকল বাধা বিঘ্ন ছাড়িয়া ঈশ্বরের পথ অনুসরণ করিতে পারে, যখন সে আপনার প্রভুর আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। পিতার আদেশেই দুর্ব্বল সন্তানের প্রাণে বলের অভ্যুদয় হয়, ব্রাহ্মসমাজ এই মহাসত্য ঘোষণা করিয়াছেন বিশেষতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই মহাসত্যেরই অনুসরণ করিয়া ঈশ্বরের সেবা করিতেছেন। তবে আদেশবাদের বিরুদ্ধে কখন কখন কোন কোন কথা হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহা আদেশবাদের বিরুদ্ধে নয় প্রকৃতরূপে অভ্রান্ত গুরুবাদেরই বিরুদ্ধে। একজন আদেশ পাইয়াছেন কি ভ্রমে পড়িয়াছেন তাহা তিনি জানেন। কিন্তু ব্রাহ্মসাধারণের তাঁহার অনুসরণ করা আদেশবাদ নয়, অভ্রান্ত গুরুবাদই বলিতে হইবে। তাই ঈশ্বর আদিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য কখন কখন এরূপ প্রতিবাদ করিয়াছেন, ঈশ্বর তাঁহাদের মধ্যে আপনার জীবন্ত লীলাই দেখাইয়াছেন।

বিশ্বাস চক্ষুতে দেখিলে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যিনি আদেশ পান, তিনি ভ্রমে পড়িলেও তাহাই মান্য করিবেন সত্য, কিন্তু আর সকলে তাহার অনুসরণ করিলে বুঝা গেল, তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহাসত্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। তাই যেমন অভ্রান্ত মনুষ্যবাদের প্রতিবাদ পূর্ব্ব হইতে হইয়া আসিতেছে, তদ্রূপ এখনও হইতেছে। সেইরূপ আদেশবাদের কথা বলিয়া অভ্রান্ত মনুষ্যবাদের বা লোকের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ পূর্ব্বেও হইয়াছে এখনও হইতেছে। মানবের স্বাধীন বিবেকের কথা বলিয়াই অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। আদেশবাদ কখনই অমান্য করা হয় নাই। আদেশই ব্রাহ্মের ধর্ম্মশাস্ত্র, গুরু ও নেতা। ব্রাহ্ম আদেশেরই অনুসরণ করিবেন।

ঈশ্বর প্রেমিকের ধর্ম্ম এবং সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম।— সংসারে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়। এক শ্রেণীর লোক সমুদয় পূর্ব্ব সংস্কার বর্জ্জিত হইয়া পরমেশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, সেই ব্যাকুলতা দ্বারাই তাঁহারা ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা কোন প্রকার শাস্ত্র, গুরু কিম্বা সমাজ বা ধর্ম্মনীতির অভ্রান্ত আদেশে চালিত হন নাই। তাঁহারা পিতা মাতার বা ধর্ম্মের দেশ প্রচলিত ধর্ম্মের অনুকরণ করেন নাই। যে চিরপোষিত সংস্কার তাঁহাদের রক্ত মাংসের সহিত মিশ্রিত ছিল, তাহা সম্পূর্ণ রূপে বিদূরিত করিয়া নূতন প্রাণ মন লইয়া তাঁহারা ঈশ্বর-প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মহম্মদ, শাক্যসিংহ, যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি এ শ্রেণীর সাধক। ইঁহারা প্রাচীন শাস্ত্র কিম্বা কোন মত প্রচার করেন নাই, পরমেশ্বরের নিকট হইতে যে সত্য পাইয়াছেন, তাহাই প্রচার করিয়াছেন। অপর শ্রেণীর লোক গতানুগতিকের ন্যায় কেবল পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া থাকেন। এ শ্রেণীর লোক ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করেন না, ঈশ্বরভক্তদিগকে ঈশ্বরের স্থানে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ স্থাপন করিতে প্রয়াসী হন। ইহাঁদিগের দ্বারা এরূপেই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। মহম্মদের অনুবর্ত্তিগণ কোরাণকে অভ্রান্ত এবং মহম্মদকে কেন্দ্র করিয়া এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছেন। খ্রীষ্টের অনুকরণকারিগণ বাইবেলকে অভ্রান্ত এবং যীশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরের আসনে অভিষিক্ত করিয়া ধর্ম্মসাধন করিতেছেন। বুদ্ধের শিষ্যগণ বুদ্ধকেই মুক্তির উপায় বলিয়া মনে করেন। চৈতন্য নানক, কবীর প্রভৃতি মহাত্মাগণের পথাবলম্বিগণ এরূপে তাঁহাদিগকে পূজা করিতেছেন। তাঁহারা স্বয়ং পরমেশ্বরকে লাভ করিবার জন্য তেমন ব্যস্ত নহেন, তাঁহাদের অবলম্বিত মহাপুরুষগণের মর্য্যাদা এবং অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য যত ব্যগ্র।

মহম্মদ ঈশ্বর লাভের জন্য মহা ব্যাকুল হইয়া হরা পর্ব্বতের গহ্বরে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। দিন রাত্রি সেই একমেবাদ্বিতীয়ং সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে লাগিলেন। হিন্দু ঋষিগণ যেমন হিমালয় পর্ব্বতে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া, পরব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার অনন্ত যোগ অনুভব করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে "প্রাণস্য প্রাণম্" রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, মহম্মদও তেমনি হরা গহ্বরে ধ্যানযোগে নিরাকার পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করেন। কিন্তু বর্ত্তমান মুসলমান সম্প্রদায় কি করিয়া থাকেন? তাঁহারা কোরাণকে অভ্রান্ত রূপে মান্য করা ও উপাসনার সময় বারবার মহম্মদের নাম উচ্চারণ করা এবং কতকগুলি সামাজিক বিধি অনুসারে পরিচালিত হওয়াকেই মুসলমান ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং তদনুযায়ী কাজ করেন। মহম্মদ যে প্রণালীতে ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছিলেন, যেরূপ পূর্ব্ব সংস্কার বর্জ্জিত হইয়া সাধন ভজন করিয়াছিলেন, ইহাঁরা সে সকল বিষয়ের অনুসরণ করেন না, কেবল মহম্মদের স্বত্ব সাব্যস্তের জন্য ব্যস্ত। অর্থাৎ মহাপুরুষগণ ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যস্ত ছিলেন, তদীয় শিষ্যগণ মহাপুরুষদিগকে লাভ করিবার জন্য মহা ব্যাকুল। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ই এরূপে ঈশ্বরের সম্মান এবং অধিকার খর্ব্ব করিয়া মহাপুরুষদিগকে সেই সম্মান ও অধিকার প্রদান করিতেছে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ইহাই প্রধান কলঙ্ক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম, অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মে কোনও ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতে উপদেশ দেন না। এ ধর্ম্মের বিশেষত্ব এই যে, পরমেশ্বরের সহিত মানবাত্মার সাক্ষাৎ যোগ উপলব্ধি করিবার জন্য অভ্রান্ত গুরু কিম্বা শাস্ত্রের অনুসরণ করিতে হয় না। মহম্মদ, বুদ্ধ প্রভৃতি যেরূপ পূর্ব্বসংস্কার বর্জ্জিত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মসাধন এবং মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম তেমনি স্বাধীনভাবে সকলকে ঈশ্বর লাভের পথ প্রদর্শন করেন। গতানুগতিক হইয়া গুরু কিম্বা শাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা হারাইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম নিষেধ করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধকদিগকে বলেন "তোমরা মহম্মদ, বুদ্ধ, খৃষ্ট প্রভৃতির ন্যায় হও। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী প্রভৃতির ন্যায় অনুকরণকারী হইও না। ব্রাহ্মধর্ম্মের ইহাই বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বকে যাঁহারা রক্ষা করেন না, যাঁহারা গুরু কিম্বা পুস্তক বিশেষের স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র, তাঁহারা এ ধর্ম্মের বিনাশসাধন করিতেছেন। কোন ব্যক্তিবিশেষের নামের সহিত, শাস্ত্রের সহিত এ ধর্ম্মের যোগ নাই। এ ধর্ম্মের যোগ স্বয়ং পরমেশ্বরের সহিত।

পারিবারিক ব্রহ্মোপাসনা—উপাসনাই ধর্ম্ম সমাজের প্রাণ। উপাসনা বিহীন সমাজ নাস্তিক সমাজ মধ্যে পরিগণিত। মুখে উচ্চ ধর্ম্মমত মানিলে কি হইবে? উচ্চতর আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিবার জন্য কোনও আয়োজন না করিলে সকলি বৃথা। ঈশ্বর লাভের একমাত্র উপায় উপাসনা। কেবল বিশুদ্ধ মত পোষণ করিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। উপাসনার দ্বার দিয়াই ঈশ্বরের রাজ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বহু ব্রাহ্ম পরিবারে পারিবারিক উপাসনা হয় না। হিন্দুরা যেমন গাত্রোত্থান করিবার সময় দুর্গা কালীকে স্মরণ করেন ব্রাহ্মগণ সেইরূপ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান ও রাত্রিতে নিদ্রার সময় দু তিন মিনিট কাল মাত্র পরমেশ্বরের নাম করিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহাদের উপাসনা। পরিবারস্থ সকলে সম্-

বেত হইয়া দিন রাত্রি মধ্যে কোনও এক সময় উপাসনা করিবার বিধি না থাকিলে যে কোন পরিবারই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইতে পাবেন না, একথা তাঁহারা বিস্মৃত হন।

পারিবারিক উপাসনা প্রতি পরিবারে প্রতিষ্ঠিত না থাকাতেই ব্রাহ্ম সন্তানগণ উপাসনাশীল হইতেছে না। যে সকল পরিবারে প্রতিদিন অন্ততঃ একবার পারিবারিক উপাসনা হয়, সে সকল পরিবারের সন্তানগণ উপাসনা করিতে এরূপ অভ্যাসশীল হয় যে, পরিণামে তাহারা যখন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস করে, তখন সেই পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ নিয়ত উপাসনা করিয়া থাকে। যে সকল গৃহে পারিবারিক উপাসনা হয় না, সে সকল ব্রাহ্ম গৃহস্থের বালক বালিকাগণ উপাসনাতে বিমুখ হয়। তখন সকলে বলিয়া থাকেন, "ব্রাহ্ম ছেলে মেয়েরা ভাল হইতেছে না।" বাস্তবিক ব্রাহ্ম পুত্র কন্যাগণ উপাসনা-বিহীন নাস্তিক হইবার প্রধান কারণ ব্রাহ্ম পরিবারে পারিবারিক উপাসনা বিহীনতা।

কি গভীর দুঃখের বিষয়, যে ধর্ম্ম সাধন করিবার জন্য ব্রাহ্মগণ আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিলেন, কত নির্যাতন, কত বিপদ, কত প্রকার ক্লেশ সহ্য করিলেন, এখন পরিবারের মধ্যে সেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন না। ইহাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারেরও বিশেষ বিঘ্ন হইতেছে। লোকে দেখিতেছে, ব্রাহ্মেরা যাহা মুখে বলে, কার্য্যে তাহা করে না। ব্রাহ্মগণ মুখে বলিতেছে, "ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইতে হইবে।" কিন্তু কার্য্যতঃ নিজ নিজ পরিবারে ঈশ্বরের নামও উচ্চারণ করিতেছে না। এরূপ কার্য্যতঃ নাস্তিকতা দেখিয়া কি ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ ইঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন? বাস্তবিক পারিবারিক উপাসনা-বিহীনতাই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রধান বিঘ্ন। "প্রচারকের অভাব, অর্থের অভাবে প্রচার হইতেছে না।" এ সকল কথা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা না করিয়া যদি ব্রাহ্মগণ ঘরে ঘরে পারিবারিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করেন, তবে অচিরে সেই উপাসনার বলে ব্রাহ্মধর্ম্ম চারিদিকে প্রচারিত হইবে। সদর মফঃস্বলস্থ যে সকল ব্রাহ্ম পরিবারে পারিবারিক উপাসনা, উৎসব আলোচনাদি নিয়ত হইয়া থাকে, আমরা জানি সে সকল পরিবারের সংসর্গে আসিয়া অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। উপাসনা হইতে আমরা সকল পাইব, সকল অভাব পূর্ণ হইবে। অতএব আমাদের বিনীত অনুরোধ, ব্রাহ্মগণ পারিবারিক উপাসনার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হউন। প্রতি পরিবার হইতে দিনে নিশীথে ব্রহ্ম নামের জয়ধ্বনি উত্থিত হইলে নিশ্চয়ই পরমেশ্বরের সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

নাম সাধন ও আরাধনা—বহুবার ঈশ্বরের নাম গ্রহণ এবং নানা প্রকারে তাঁহার স্তুতি করিবার ব্যবস্থা সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষ ভাবে প্রচলিত আছে। প্রয়োজনীয় নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সমূহ সমাধা করিতে যে সময় টুকু ব্যয়িত হয়, তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট সমস্ত সময় অনেক ধর্ম্মসাধক ঈশ্বরের নাম স্মরণ মননেই যাপন করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। ব্রাহ্মসমাজও ঈশ্বরের আরাধনা এবং নাম সাধনকে আপনাদের অতি প্রয়োজনীয় সাধনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রকারে সুন্দর ভাষায় ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা এবং তাঁহার স্তব করিবার কারণ কি? অন্যান্য সম্প্রদায় হয় ত মনে করেন এইরূপে ভক্তির সহিত তাঁহার আরাধনা করাতে এবং বারম্বার তাঁহার নাম কীর্ত্তন করাতে ঈশ্বরের বিশেষ প্রসন্নতা লাভের সম্ভাবনা আছে। বিশেষতঃ এদেশের পুরাণাদিতে দেখা যায়,ঈশ্বর জগতের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, ইহার সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন হইয়া আছেন, কোনও আপদ্ বিপদের সংবাদ লইতেছেন না, যদি কোন গুরুতর অমঙ্গল ঘটনা আসিয়া সৃষ্টিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়, জগৎবাসিগণের ধর্ম্মহানি হইয়া অধর্ম্মের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে, জগৎপতির সে দিকেও দৃষ্টি নাই। সৃষ্ট প্রাণিগণ স্তবস্তুতি দ্বারা তাঁহার চেতনা সঞ্চার করিলে এবং জগতের দুঃখের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তবে তিনি সেই অনিষ্টের নিবারণের জন্য কোন উপায় বিধান করেন। সুতরাং এই শ্রেণীর সাধকগণের পক্ষে বারম্বার ঈশ্বরের নাম গ্রহণ এবং তাঁহার স্তবস্তুতি করা নিতান্তই প্রয়োজন। কারণ তাঁহাদের দেবতার প্রসন্নতা লাভের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। ব্রাহ্মগণ ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন বিশ্বাস করেন না যে তিনি কখনও জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন হন বা তাঁহার সন্তানের কল্যাণ সাধন জন্য তাঁহার চেতনা সঞ্চার করিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরকে চির জাগ্রত, চির কল্যাণময় এবং জগতের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্বন্ধ বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন। উদাসীনতা আমাদিগের মধ্যেই আছে, ব্রাহ্মগণ ইহাই জানেন, ঈশ্বরেরও যে উদাসীনতা হইতে পারে, তাহা ত ব্রাহ্ম জানেন না। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ হয় ত মনে করেন যে নানারূপে স্তবস্তুতি দ্বারা বা তাঁহার প্রশংসা-গীত দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারা যায় ও তাঁহার বিশেষ প্রসন্নতা লাভ করা যায়। ব্রাহ্ম তাহাও মনে করেন না এবং তাহা করাও উচিত নয়। কারণ এইরূপে স্তব স্তুতির বশীভূত হওয়া ক্ষুদ্রতার পরিচায়ক। মানবীয় দুর্ব্বলতা ও প্রশংসা প্রিয়তা হেতু এরূপ সম্ভব। মহান্ ঈশ্বরে এরূপ ভাবের আরোপ করিলে তাঁহার আর মহত্ত্ব এমন কি ঈশ্বরত্ব থাকে না। যদি তাহা হয় অর্থাৎ ঈশ্বর চিরজাগ্রত চিরকল্যাণময়—জীবের চির হিতৈষী হন, তাঁহার প্রসাদ লাভের জন্য যদি কোনরূপ স্তব স্তুতির অপেক্ষা না থাকে,এমন কি যদি তিনি আমাদের মঙ্গল সাধনে আমাদের অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে ব্যগ্র হন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার আরাধনা ও স্তবস্তুতি করি কেন? বারম্বার তাঁহার নাম গ্রহণের ব্যবস্থাই বা কেন?

এইরূপ আরাধনা ও নাম সাধনের হেতু ইহা নয় যে, ঈশ্বর তদ্দ্বারা কিছু অধিক পরিমাণে আমাদের নিকটবর্ত্তী হইবেন বা অধিক পরিমাণে প্রীত হইবেন। তাঁহার নৈকট্যও আর বাড়িতে পারে না, তাহার প্রীতিও যাহা আছে তাহার আর বৃদ্ধি নাই। তবে এইরূপ আরাধনা ও নাম সাধনের কি কোনই কারণ নাই। সে কারণ ঈশ্বরের দৃষ্টি অধিক আকর্ষণ বা

তাঁহাকে অধিক পরিমাণে প্রসন্ন করা নহে। কিন্তু আমরা যে নানা প্রকারে তাঁহা হইতে দূরে থাকি ও তাঁহার বিরুদ্ধভাবাপন্ন থাকি তাহার অপনোদন করা। আমরা নিরন্তর বহির্বিষয়ে আসক্ত হইয়া, বহির্বিষয়ের চিন্তা ও অনুধ্যানে রত হইয়া ঈশ্বর হইতে দূরে অবস্থিতি করি। তাঁহা হইতে ভিন্নভাবাপন্ন হইয়া আমাদের প্রকৃতি বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহা সহজ ছিল, তাহা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়। কারণ আমাদের প্রকৃতি এই, অধিক পরিমাণে যে বিষয়ের চিন্তাতে আমরা নিযুক্ত হই, আমাদের স্বভাবের মধ্যে তাহাই সংক্রামিত হইতে থাকে। ক্রমে আমরা সেইরূপ ভাবাক্রান্ত হইতে থাকি। সংসর্গের শক্তি আমাদের জীবনে এই জন্যই এত প্রবল। আমরা যাদৃশ সংসর্গে থাকি সেইরূপ ভাবাপন্ন হইয়া পড়ি; অর্থাৎ নিরন্তর সেই চিন্তা, সেই ভাবের মধ্যে অবস্থিতি করাতে, সেই সকল দোষ বা গুণ আমাদের মধ্যে সংক্রান্ত হয়। যে যেরূপ ভাবনা করে সে সেইরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, ইহা একটী স্থির মীমাংসিত সত্য। সুতরাং আমাদের প্রকৃতিকে এই বহির্বিষয়ের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া, সেই চিন্ময় পবিত্র স্বরূপের সহবাসের উপযোগী করিতে হইলে, যত অধিক সময় তাঁহার গুণ স্মরণ মননে নিযুক্ত থাকিতে পারা যায়, ততই উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। আমরা চারিদিকে যে সকল পদার্থ দ্বারা পরিবেষ্টিত আছি, যে সকল ঘটনার মধ্যে নিরন্তর বাস করিতেছি, সেই সকলের সহিতই অধিক পরিমাণে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ আছি। সেই সকলই আমাদের প্রিয় হইয়া আছে। আমাদের প্রকৃতিতে সেই সমস্ত ভাবই প্রবল। এই যে আমরা স্থুল বহির্বিষয়াসক্ত হইয়া আছি, এই আসক্তি হইতে মুক্ত হইতে হইলে এবং ঈশ্বরের ভাবে ভাবুক হইতে হইলেও তাঁহার প্রকৃতি প্রাণে প্রস্ফুটিত দেখিতে ইচ্ছুক হইলে, সেই চিন্তা, সেই সহবাস, যাহাতে জ্ঞাতসারে অধিক পরিমাণে হয়, আমাদের তাহাই করা কর্ত্তব্য। আরাধনা, ধ্যান, বা তাঁহার নাম শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা আমাদের প্রকৃতি সেই ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। দিবসের মধ্যে যত অধিক সময় তাঁহার গুণ কীর্ত্তন ও মননে যায়, ততই আমাদের মধ্যে তাঁহার প্রকৃতি সংক্রান্ত হইতে থাকে ও আমরা, সেই সহবাসের উপযুক্ত হই। আমরা ক্ষুদ্রাশয়তা হইতে উন্মুক্ত হইয়া মহদাশয় হইয়া তাঁহার জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা সম্ভোগের অধিকারী হই। এজন্যই দেখা যায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অসার বিষয়ের চিন্তাতে রত থাকিতে ক্লেশ অনুভব করেন। তিনি তাঁহার প্রিয়তমের স্বরূপ ধ্যান, তাঁহার পবিত্র কীর্ত্তি-ঘোষণা তাঁহার সুমধুর নাম শ্রবণ কীর্ত্তনেই সদা ব্যাপৃত থাকেন, তদ্দ্বারা তিনি ব্রহ্মকে আকৃষ্ট না করিয়া, তাঁহাকে অধিক প্রীত না করিয়া, নিজেই তাঁহার সুমধুর প্রীতি আস্বাদন করিয়া সমধিকরূপে তাঁহাতে প্রীত হন। এবং সেই প্রকৃতি প্রাপ্ত হন; ইহাই আরাধনা ও নাম সাধনের ফল। তোষামোদ করিয়া ঈশ্বরের প্রীতি পাওয়া যায় না। তাহা দ্বারা ক্ষুদ্রাশয় মানবের প্রীতি ও প্রসন্নতা পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং মহান্ ঈশ্বরের নাম স্মরণ মনন এবং তাঁহার গুণ কীর্ত্তন যাহাতে আমাদের প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া, তাঁহার প্রকৃতি সম্পন্ন করিতে পারে, আমরা সর্ব্বপ্রযত্নে যেন সেই নিমিত্তই ব্যাকুল হই এবং তজ্জন্য তাঁহার চিন্তা ও নামসাধনেই ব্যস্ত থাকি।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

সাধন-নিষ্ঠা।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সামাজিক ধর্ম্ম। জনসমাজের কার্য্য কলাপের ভিতর থাকিয়াই আমাদিগকে এই ধর্ম্মকে সাধন করিতে হইবে; এবং এখানকার বিবিধ প্রকার বিঘ্ন বিপদ ও প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিয়াই আমাদিগকে উন্নতি লাভ করিতে হইবে। প্রাচীন কালের ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মের এইখানে প্রভেদ; ইহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু জনসমাজের কোলাহলের ও কার্য্য স্রোতের মধ্যে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন, করার পথে যে একটা বিপদ আছে তাহা আমরা অনেক স্থলেই ভুলিয়া যাই। সে বিপদ এই:—দশজনের মধ্যে বসিয়া ধর্ম্ম সাধন করিবার কালে আমাদের দৃষ্টি অনেক সময় আপনাদের উপর হইতে উঠিয়া পরের উপরে পতিত হয়; অর্থাৎ নিজে সাধন পথে কতদূর অগ্রসর হইতেছি এই চিন্তা অপেক্ষা লোকে কি ভাবে আমার সাধনকে গ্রহণ করিতেছে এই চিন্তা লইয়া মন অধিক ব্যাপৃত হইয়া পড়ে। এই বহির্মুখীন ভাব অভ্যাস প্রাপ্ত হইলে চরিত্রের গূঢ় মর্ম্ম স্থানে এক প্রকার অসত্যতা প্রবিষ্ট হয়। তখন লোকে অজ্ঞাতসারে মনে করে যে ধর্ম্ম-সাধন, ধর্ম্ম-প্রচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান সব কেবল পরেরই জন্য। তাহার সহিত নিজ জীবনের সম্বন্ধ না থাকিলেও হানি নাই। এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ ভজন সাধন করে, ধর্ম্ম প্রচার করে, ও বিবিধ সদনুষ্ঠানে রত হয় কিন্তু তদ্দ্বারা তাহার নিজ হৃদয় ও জীবনের কল্যাণ সাধিত হয় না, সে সমুদায় কেবল পরের জন্যই থাকে।

এই বহির্মুখীনতা বৃদ্ধি পাইলে মানব চরিত্র অতীব অবজ্ঞার বস্তু হইয়া পড়ে। তখন যে লোকাকর্ষণের উদ্দেশে মানব বহির্মুখীন ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহাও বিফল হইয়া যায়। সেরূপ ব্যক্তির সাধনে, প্রচারে ও সদনুষ্ঠানে আর কেহ আকৃষ্ট হয় না। তাহার নিজের জীবনের ও মুখের ভাষার অসামঞ্জস্য দর্শনে সকলেই বীতশ্রদ্ধ হইয়া যায়। আবার এই বহির্মুখীন ভাব মানবকে ঘোর আত্ম-প্রতারণার ভিতর ফেলিয়া দেয়। ধর্ম্মের বাহিরের সাধন ও ক্রিয়াতে নিযুক্ত থাকিয়া মানুষ অজ্ঞাতসারে মনে করিতে থাকে যে ধর্ম্ম সাধন সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করা হইতেছে; আর অধিক কিছু করিবার নাই। এই ভ্রান্ত আত্মতৃপ্তি মানুষকে ব্যাকুলতা ও সংগ্রাম বিহীন করিয়া ফেলে। তখন পরোপদেশের জন্য যাহা বলা যায়, তাহা নিজে করিবার জন্য প্রবৃত্তি ও চেষ্টা থাকে না। জগতে এইরূপ ভ্রান্ত আত্মতৃপ্ত সাধকের সংখ্যা কম নহে।

ব্রাহ্মগণ যদি সর্ব্বদা সতর্ক আত্ম-পরীক্ষা-পরায়ণ ও প্রার্থনা শীল না থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদিগেরও এই প্রকার আত্ম তৃপ্তির মধ্যে পতিত হইবার সম্ভাবনা। এবং ইহা কি সত্য

নহে যে আমাদের অনেকের সাধন এই বহির্মুখীন-ভাবদোষে দূষিত। আমাদের সাধন ও কার্য্যের মধ্যে তলে তলে এক প্রকার অসত্যতা প্রবিষ্ট হইয়াছে।

এই অন্তঃসার বিহীন বহির্মুখীন ভাব দূর করিবার উপায় কি? ধর্ম্ম-জগতের ইতিবৃত্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে সকল সাধক জনসমাজের কোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও আত্মার নির্জ্জনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন এবং ছায়াকে পরিহার করিয়া প্রকৃত সার বস্তুকে ধরিবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারাই চরমে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই যে ছায়াকে পরিহার করিয়া বস্তুকে ধরিবার প্রয়াস ইহাকেই সাধন নিষ্ঠা বলে। সাধন-নিষ্ঠ ব্যক্তিগণ জন কোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও তাহার প্রতি উদাসীন। অসার কোলাহলে তাঁহারা কোন দিন গন্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত হন না, না পাইয়াও পাইয়াছি বলেন না অথবা ছায়াকে দেখিয়া বস্তু বস্তু করিয়া চীৎকার করেন না। যদি সহস্র রসনা তাঁহাদের গুণ কীর্ত্তন করে, অথবা তাঁহাদিগকে সাধক-শ্রেষ্ঠ বা অগ্রসর ব্যক্তি বলিয়া ঘোষণা করে, তথাপি তাঁহারা এক মুহূর্ত্তের জন্যও আপনাদের প্রকৃত অবস্থা বিস্মৃত হন না। যখন শত শত ব্যক্তি ছায়ার পশ্চাতে ধাবিত হয়, তখন হয়ত সকলের চক্ষের অগোচরে থাকিয়া তাঁহারা নিবিষ্ট চিত্তে সত্য বস্তুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত থাকেন। যে সকল সাধু মহাত্মার নাম ধর্ম্ম-জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং যাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জগতের কোটী কোটী নরনারী জীবন পথে অগ্রসর হইতেছে, তাঁহাদের জীবনে বিশেষ গুণ কি ছিল, এই চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইলেই এই সাধন-নিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়। জগতের প্রচলিত ধর্ম্ম সাধনে যদি তাঁহারা আত্মতৃপ্ত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবনে সে প্রকার কঠোর সংগ্রাম জাগিত না। তাঁহাদের মহত্ত্বের গূঢ় রহস্য এই:—যে তাঁহারা অপরের মুখে ঈশ্বর পরকাল ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয় যাহা শুনিলেন তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারিলেন না, নিজ সাধনের দ্বারা সেই সকল সত্যকে আয়ত্ত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন।

কোন প্রকার বিঘ্ন বিপদ বা প্রলোভনের দ্বারা সেই লক্ষ্য হইতে দৃষ্টিকে আকৃষ্ট হইতে দিলেন না। অবশেষে নিরন্তর একাগ্রতার সহিত সত্যের ধ্যান করিতে করিতে হৃদয়ে সত্যের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইল, এবং অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ম্ময় ধামে দিব্য জ্ঞান-চক্ষুতে সেই সত্য পুরুষকে দর্শন করিলেন। ইহারই নাম সিদ্ধিলাভ। এই ভাব প্রাপ্ত হইয়াই ঋষিগণ বলিয়াছেন:—"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ, আযে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।":—

অর্থঃ—হে দিব্য ধামবাসী অমৃতের পুত্র সকল, তোমরা শ্রবণ কর আমি অন্ধকারের পরপারে আদিত্য বর্ণ এই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।"—এইরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াই সাধন-নিষ্ঠ সাধকগণ জগতে ধর্ম্ম-ধন বিতরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মদিগের চিত্ত যেমন বার বার বহির্মুখীন হইবার সম্ভাবনা তাঁহাদিগকে তেমনি দৃঢ়তা ও একাগ্রতার সহিত সাধন-নিষ্ঠা অবলম্বন করিতে হইবে।

যোগ ও ব্রাহ্মসমাজ।

(প্রাপ্ত)

যোগ কথাটির বিভিন্ন বিবৃতি আছে। সে সমুদায় বিবেচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সরল অধ্যাত্ম-যোগ কি এবং উহা কোন বেশে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছে, ইত্যাদি বিষয় এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

ঈশ্বরের সহিত যোগ, কোন্ অর্থে ধার্ম্মিকগণ যোগ শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন? যোগ বলিলেই বিয়োগের অস্তিত্ব বুঝায়। কিন্তু ঈশ্বরের সহিত বিয়োগ সম্ভবে না, কারণ তাহা হইলে আত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর ও জীব নিত্যযুক্ত; কিন্তু এই যোগ জীব অনুভব করে না, কারণ পাপ ও অজ্ঞান জীবের অন্তশ্চক্ষুকে মলিন, ও উজ্জ্বল দৃষ্টিশক্তি-হীন করিয়া রাখিয়াছে। এই অজ্ঞান ও পাপ যত দূরীকৃত হইবে, ততই দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হইবে, জ্ঞানচক্ষু খুলিবে। এই অধ্যাত্ম চক্ষু উন্মীলিত করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় ব্যাকুল মানবাত্মা কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহাদেরই নাম যোগ সাধন। ব্রাহ্ম-যোগ-সম্প্রদায় উহা কি রূপে গ্রহণ করিতেছেন এবং উহা গ্রহণ করা উচিত, ইহাই আমাদের অনুসন্ধেয়।

ঈশ্বর চিন্ময় অতীন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের সাহায্য দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার উপায় নাই। আত্মার মধ্যে তাঁহার সত্তানুভূতিই যোগ। আত্মার মূলে ব্রহ্মশক্তি, জ্ঞানের মূলে তাঁহার জ্ঞান, প্রেমের মূলে তাঁহার প্রেম, প্রত্যেক শক্তির মূলে তাঁহার শক্তি প্রত্যক্ষ করাই যোগ। তিনি আমাতে এবং আমি তাঁহাতে, বিন্দুর মাঝে সিন্ধু ও সিন্ধুর মাঝে বিন্দু এবং সান্তে অনন্তে একটী ঘনিষ্ট প্রেমের সম্বন্ধ অতি পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি করাই যোগ। যোগ কর্ত্তব্য হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। কর্ত্তব্যই ধর্ম্মের মজ্জা, অস্থি। যোগ বুজরুকি নহে, অণিমা লঘিমা ইত্যাকার সিদ্ধি নহে। যোগ একটী আধ্যাত্মিক অবস্থা—শারীরিক নহে।

কিন্তু শরীর ও আত্মায় আধার আধেয় সম্বন্ধ। সুস্থ শরীরে সুস্থ আত্মা চাই, নচেৎ সাধনে অনেক ব্যাঘাত জন্মিবে। কি প্রকারে দেহ সুস্থ রাখা যায়, উহা কিঞ্চিৎ যত্ন করিলেই জানা যায়। যুক্তাহার, যুক্তবিহার, যুক্তনিদ্র, যুক্তচেষ্ট, ও সাবধান হইলেই শরীর মহাশয়কে সুস্থ রাখা যায়; মোটামুটী ইহাই বলা যাইতে পারে।

এখন আমাদের চাই কি? সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

১। স্বাস্থ্য—সুস্থ শরীর চাই। আহার, নিদ্রা, বিহারাদিতে নিয়ম ও সাবধানতা থাকিলে ইহা সুলভ হয়। প্রাণায়ামাদি ইহার উপায় হইতে পারে, কিন্তু উহা ভয়াবহ; কারণ অনেক স্থলেই সমূহ অনিষ্টজনক। আমি যোগ সাধনকে প্রাণায়াম না বলিয়া "বাসনাবিরাম" বলি।

২। স্থান—যেস্থানে বসিলে মনঃসংযমের ব্যাঘাত হয় না, এমত স্থান চাই। নাতিগ্রীষ্ম, নাতিশীত, পরিষ্কৃত, নির্জ্জন, নিঃশব্দ স্থানই সাধনের অনুকূল। দেহ মনের প্রসন্নতা ও অক্লেশজনক স্থান চাই।

যে প্রকারে থাকিলে নিদ্রাবেশ, আলস্য, জড়তা, চঞ্চলতা, অসুখাদি উৎপন্ন হয় বা হইতে পারে, সে প্রকারে অবস্থান করিলে চলিবে না। মহর্ষি পতঞ্জলি একস্থলে সূত্রে বলিয়াছেন "আসন সহজ ও স্থির" হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহার টীকাকার ৮৪ প্রকার আসনের অবতারণা করিয়াও ক্ষান্ত না হইয়া ৮৪০০০ চৌরাশি সহস্র প্রকার আসন আছে, এই প্রকার বলিয়াছেন। অনেকেই এই সমুদায় উপায়কে, উদ্দেশ্য বলিয়া ভ্রম করিয়া "আসন" কুস্তি সাধনে কাল নষ্ট করেন। আমরা উহা করি নাই, অতএব উহা হইতে কোন উপকার সম্ভব কি না বলিতে ও পারি না। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে শারীরিক প্রক্রিয়া অপেক্ষা, মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারা শীঘ্র মানসিক ফল উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ এই কাল তপস্যাদি কঠোর সাধনের কাল নহে। অতএব এখন সে সমুদায় কঠোর ব্যায়ামাদি অভ্যাস করা নিষ্প্রয়োজন। সহজ, স্থির ও অক্লেশ উপবেশন করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে।

৪। সংযম।—ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা থাকিলে মনঃস্থির হয় না। অনেক বৈজ্ঞানিক কঠোর সংযমী, কারণ অন্যথা হইলে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি স্থির ভাবে বহুক্ষণ হস্তে ধারণ করিতে পারেন না। প্রসিদ্ধ কুস্তীগীরেরা সংযমী, নচেৎ স্নায়বিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন অনেক কসরৎ অসম্ভব হইত। এই কারণেই প্রাচীন গ্রীসে অলিম্পিক মেলায় মল্লযুদ্ধে যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিতেন, তাঁহারা সংযমী হইতে বিলক্ষণ চেষ্টা করিতেন। উপযুক্ত ব্যায়াম ইন্দ্রিয়-সংযমের সহায়তা করে। অতএব সংযম শারীরিক স্থিরতার জন্যও প্রয়োজন। আন্তরিক স্থিরতার জন্য, উহার সমানই প্রয়োজন। মন অপবিত্র ও বস্তুবিষয়ে বিক্ষিপ্ত থাকিলে, চিত্তবিকার নিবন্ধন বিষয়বিশেষে মনোনিবেশ অসম্ভব। বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়-ভোগ ইন্দ্রিয়সুখ-লালসা বর্দ্ধিত করে। উহার বৃদ্ধি হইলে, অধ্যাত্ম-বিষয় লালসা হ্রাস পায়। যদি তাহাই হইল, তবে কেই বা ও কিসের জন্যই বা মনঃসংযম করিবে। বাক্যাদির সংযমও নিতান্ত প্রয়োজন।

৪। চিত্তবৃত্তি নিরোধ।—মানসিক বৃত্তি সমূহকে অভ্যাস দ্বারা বহির্বিষয়াদি হইতে ফিরাইয়া বস্তু বিশেষের ধ্যানে নিয়োগ করা সাধকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। রূপ রসাদিতে বিচরণশীল মনকে ক্রমশঃ ধ্যেয় বস্তুতে স্থির করিতে হইবে। শাস্ত্রকারেরা বলেন যে নাভি, হৃদয়, জিহ্বাগ্র, নাসাগ্র, ভ্রূমধ্য, ললাট-মধ্যে বা অন্য স্থানে, চক্ষুদ্বয়কে স্থিরভাবে সংলগ্ন করিয়া, দৃষ্টি স্থির করিলে মনঃস্থির ও চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। অনেকেই বলেন যে কুম্ভক নিশ্বাস রোধাদি দ্বারাও এই সকল ফল লাভ করা যায়। কিন্তু তাঁহারাও বলেন যে প্রকৃত উপায়ে, উপযুক্ত মাত্রায় প্রাণায়াম না হইলে কুষ্ঠ, উন্মাদ, ক্ষয়যক্ষ্মা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ব্যাধির উৎপত্তি হয়। কখন কখনও বা হঠাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে এবং তজ্জন্য অনুজ্ঞা করিয়াছেন যে সর্ব্বদা গুরুসান্নিধ্য ব্যতীত উহা করণীয় নহে। অল্প দিন হইতে এক প্রকার যোগ-রোগ ব্রাহ্মসমাজের দেহে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রাণায়ামের এই সমুদায়, (অন্তের কথা পরে বলিব) বিষময় ফল অনেক স্থলে ভয়ঙ্কর আকারে প্রকাশিত হইতেছে। দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ ব্রাহ্ম যোগ-সম্প্রদায়ের নিকট উহা অবিদিত নাই।

৫। ধ্যেয় বস্তু।—ধ্যান ত করিব, কিন্তু কি ধ্যান করিব? যোগশাস্ত্র বলেন যে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ ও আত্মা সমাহিত হইলে যাহা ধ্যান করিবে তৎসম্বন্ধে তথ্য জ্ঞাত হইতে পারিবে। এত গেল সিদ্ধাবস্থার কথা। সাধনাবস্থায় কি ধ্যান করিব? বৌদ্ধযোগী আত্মতত্ত্বাদি অনুধ্যান করেন, অথবা সর্ব্বধ্যান বর্জ্জন করিয়া মানসিক শূন্যতা লাভের চেষ্টা করেন। শূন্যতা ও মৃত্যু একই কথা। আমরা শূন্যতা চাই না, পূর্ণতা চাই। আস্তিক সাধক ঈশ্বর ধ্যান করেন। মহর্ষি পতঞ্জলি ইহাকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন। ঈশ্বরধ্যান কিন্তু একটী গোলমেলে কথা। উহা কি আকারে করিব? তাঁহার বিষয়, নাম, স্বরূপ, বা তৎসম্বন্ধীয় বিষয়বিশেষে নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত মনকে স্থিরভাবে প্রয়োগ করা চাই। কিন্তু উহার মধ্যে কোন্‌টী করিব? যে স্বরূপাত্মক নাম, বা স্বরূপ চিন্তা করিলে প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, বা আনন্দের উদয় হয়, তাহাই ভাবিতে হইবে। চিত্ত সহজেই তাহাতে স্থির হইবে—কারণ মন ও হৃদয় উভয়ে যুক্ত হইয়া ইচ্ছার সহিত কার্য্য করিবে; আত্মার সমুদায় বৃত্তি বহির্বিষয় হইতে নিগৃহীত হওতঃ অন্তর্মুখীন হইয়া এককালে এক কার্য্যে রত হইবে। কিছুকাল নিয়মিত সময়ে নিয়মিত রূপে এই প্রকার করিলে, আত্মার গূঢ় অতুল ও বর্ণনাতীত আনন্দানুভূতি জন্মিবে, আত্মা তখন ভূমানন্দ সাগরে, যেন "অগেয়ান" হইয়া নিমগ্ন হইবে। তখন ঈশ্বরজ্ঞানের ক্ষীণ পিপাসা ঈশ্বরদর্শন লালসারূপ অদম্য ও খরতর বেগবান প্রবাহের আকার ধারণ করিবে। সেই সঙ্গে সঙ্গেই বিষয় লালসা, ইন্দ্রিয়লিপ্সা, চঞ্চলতা প্রভৃতি লোপ পাইতে থাকিবে। ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রেম যতই স্ফূর্ত্তি পাইবে, ততই মন ও হৃদয়ের সদ্বৃত্তিসমূহ মুকুলিত হইতে থাকিবে, দুর্ব্বলতা ও মলিনতা দূর হইতে থাকিবে, "হৃদয়কাননে ফুটিবে ফুল, চারিদিক হবে সৌরভে আকুল।" আত্মার নিদ্রিত বৃত্তি ও শক্তিসমূহ জাগ্রত হইতে থাকিবে। এই জন্যই উপনিষদের ঋষিগণ দূর অতীত কাল হইতে নিদ্রিত মানবকে বলিতেছেন "উঠ, জাগ, আত্মা ও পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া মুক্ত ও কৃতার্থ হও।" আত্মার সমুদায় শক্তি বলপূর্ব্বক এককালে প্রয়োগ না করিলে, উহাদের সম্যক্ স্ফূরণ না হইলে পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না, সেই জন্য ঋষিগণ বলিয়াছেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

পুনঃ, যে স্বরূপ সাধন করিব তাহা সত্যমূলক হওয়া চাই—মিথ্যার দ্বারা সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। সরল ও ব্যাকুল ভাবে ভ্রমবশতঃ মিথ্যাকে যদি ধ্যায়, ভাবদর্শী ভগবান অবশ্যই পরিশেষে কৃপাপূর্ব্বক সত্যালোক প্রকাশ করিবেন সন্দেহ নাই। তখন আবার সত্যের ধ্যান ও ভজনা করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে বিলম্ব হইবে। নচেৎ সত্য ও মিথ্যার দ্বারা এক সময়ে সত্যলাভ করিলে সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ কি? অতএব সত্যের ভজনা না করিলে সত্যস্বরূপের দর্শন লাভ হইবে কি প্রকারে? সত্যের ধ্যান ও পূজা করিতে হইলে সত্যভাবী,

সত্যকারী, সত্যাচারী, এবং সত্যপ্রিয় হওয়া অবশ্যই কর্ত্তব্য। নচেৎ সত্যের প্রকৃত ভজনা হওয়া আকাশকুসুমবৎ অলীক দিবা-স্বপ্ন মাত্র।

এক এক স্বরূপ এক এক প্রকৃতির আত্মার প্রিয়। যে স্বরূপটী সাধন করিবে, আত্মাও সেইভাবে রঞ্জিত হইবে। যেমন আরসুলা কুম্ভীর পোকার ধ্যান করিতে করিতে তাহার প্রকৃতি অনেক পরিমাণে লাভ করে। একটী স্বরূপ সাধন করিতে করিতে, অন্যগুলি একে একে আকাশে তারকার উদয়ের ন্যায় অন্ধকারের মধ্য হইতে যেন ফুটিয়া উঠে। প্রেমাদি ভাবের বর্ণ ধ্যানে মাখামাখী না হইলে আত্মায় তাঁহার স্বরূপের রং খুলে না—ফুটিয়া উঠে না। স্বরূপ ফুটিলে অজ্ঞান ও অপবিত্রতা দূরীভূত হইবেই হইবে। কারণ সমলিন সলিলে পরিষ্কার প্রতিবিম্ব কখনই পড়িবে না। উহা যত স্থির ও নির্ম্মল হইবে—প্রতিবিম্ব ততই স্পষ্ট হইবে। উহা বিধর্ম্মী পদার্থকে নাশ করিবে—যেমন জ্যোতির প্রকাশে অন্ধকার বিনষ্ট হয়। অতএব ধ্যেয় বস্তুর সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতার সহিত সাধকের নির্ব্বাচনশক্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। একেশ্বরবাদী সাধকগণ যে সমুদায় স্বরূপাত্মক মন্ত্রাদি সাধন করেন, তাহার কয়েকটী মাত্র নিম্নে উল্লিখিত হইল।

১। ওঁ তৎসৎ।
২। ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম।
৩। ওঁ সত্যং শিবং সুন্দরং।
৪। ওঁ সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম।
৫। ওঁ সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্ ব্রহ্ম।
৬। ওঁ শান্তং শিবং অদ্বৈতং।
৭। ওঁ শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং।
৮। ওঁ আনন্দ রূপং অমৃতং।

অদ্বৈতবাদিগণ "তত্ত্বমসি," "সোহং" ইত্যাদি বিষয় ধ্যান করিয়া থাকেন।

ক্রমশঃ—

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন, কিম্বা কাহারও পত্র ফেরত দিতে বাধ্য নহেন)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়,
সমীপেষু।

মহাশয়!

গত ১৬ই কার্ত্তিকের তত্ত্ব কৌমুদীতে "শ্রীসত্যদর্শী"ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট তিনটী প্রশ্ন উপস্থিত করিয়া তাহার মীমাংসা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে এই সকল প্রশ্ন এমন কিছু নূতন বা অমীমাংসিত নহে। কিন্তু যখন বারম্বার এই সকল প্রশ্নের আলোচনা হইতেছে এবং সন্দেহ ও বিতর্ক আসিয়া লোকের মনকে আন্দোলিত করিতেছে,তখন এই প্রকার সন্দেহ ও বিতর্কের অবসান করিতে সকলেরই যথাসাধ্য প্রয়াসী হওয়া আবশ্যক। প্রশ্ন কয়েকটীর যথাযথ উত্তর প্রদানে সক্ষম কি অক্ষম তাহার বিচার না করিয়াও কর্ত্তব্য জ্ঞানে এই গুরুতর কার্য্যে অগ্রসর হইলাম।

সত্যদর্শী মহাশয়ের প্রথম প্রশ্ন এই যে"ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত সাধন প্রণালীর মধ্যে কিছু অসম্পূর্ণতা আছে কিনা" এই প্রশ্নের মীমাংসা করা বেশী কিছু কঠিন নয়। কারণ ব্রাহ্মগণ বিশ্বাস করেন মানবাত্মা অনন্ত উন্নতিশীল। আত্মা নিরন্তর উন্নতির পথেই অগ্রসর হইবে। সুতরাং এইরূপ অনন্ত উন্নতিশীল আত্মার কল্যাণোপযোগী ধর্ম্মও যে উন্নতিশীল এবং সেই ধর্ম্মের সাধন-প্রণালীও যে উন্নতিশীল হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উন্নতিশীল আত্মার পোষণক্ষম সাধন প্রণালী কখনই সীমা বিশিষ্টও সম্পূর্ণ হইবে না। ইহাতে নিত্য নূতন বিষয় সংযোজিত হইবে; নিত্য নূতন তত্ত্ব ও ভাব সকল মিলিত হইয়া ক্রমশঃ ইহাকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইবে। সম্পূর্ণ হইল বলিয়া সীমা নির্দ্দেশ করিবার অবস্থা কখনও হইবে না। সুতরাং বর্ত্তমান সাধন প্রণালী যে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এরূপ নির্দ্দেশ করা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী। ব্রাহ্ম কখনও কোন প্রণালীকে সম্পূর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। বর্ত্তমান সাধন প্রণালীর কত উন্নতি হইবে, কত নূতন নূতন তত্ত্ব ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইবে তাহা কেহই জানে না। তবে ব্রাহ্মগণ কেন যে আপনাদের সাধন-প্রণালীকে অসম্পূর্ণ জানিয়াও তাহা অবলম্বন করিয়া আছেন, তাহার উত্তর দেওয়াও কঠিন নহে। কারণ তাঁহারা নিজেরা যেমন অসম্পূর্ণ তাঁহাদের সাধন-প্রণালীও তেমনি অসম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ সাধন প্রণালীর অস্তিত্বের সম্ভাবনাও নাই। যদি থাকিত ব্রাহ্মগণ তাহার অনুসরণ করিতেন। কিন্তু তাহা নাই। সুতরাং তাঁহাদের নিকট যাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে,তাহাই অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মসাধন করিতেছেন। ব্রাহ্মগণ এমনও মনে করেন না যে কোন প্রণালী বিশেষেই সকল অভাব দূর হইতে পারে। প্রণালীর স্বতঃ এমন কোন ক্ষমতা নাই, যাহার আশ্রয় মাত্রেই মানবের সকল অভাব ঘুচিয়া যাইতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন—আন্তরিক অনুরাগ ও নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মকৃপার প্রত্যাশী হইয়া ও তাঁহাতে নির্ভরশীল হইয়া নিরত পরিশ্রমশীল অন্তরে সাধনে রত থাকা। নতুবা যদি প্রণালীরই বিশেষ কোন ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই ধর্ম্মের চরম সীমায় যাইতে পারিত। কেহ গুরু, কেহ শিষ্য থাকিত না। এখন যে এক একজন গুরুর পশ্চাতে শত শত শিষ্য ছুটিয়া যাইতেছেন তাহা আর ঘটিত না। কোন একটী প্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সকলেই একবারে ধার্ম্মিক প্রধান হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। একই প্রণালী অবলম্বন করিয়া জীবনে কত তারতম্য দৃষ্ট হয়। এরূপ তারতম্য ঘটিবার কারণ কি? অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে যিনি যে পরিমাণে ব্যাকুলতা সহকারে নিয়ত পরিশ্রমের সহিত সাধনে রত রহিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়াছেন। সুতরাং একমাত্র কোন প্রণালীর আশ্রয় লইলেই সকল অভাব যায় না। বিশেষ নিষ্ঠা ও অনুরাগের সহিত সাধন করিলেই তবে উন্নতি হইতে পারে।

সত্যদর্শী মহাশয়ের ২য় প্রশ্ন "ব্রাহ্মসমাজ কখনও অভ্রান্ত গুরু স্বীকার করেন নাই ও করিতে প্রস্তুতও নহেন ইত্যাদি......এখন প্রশ্ন এই যে ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রগামী কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট বিশেষভাবে ধর্ম্মশিক্ষা করা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত কি না।" ব্রাহ্মসমাজ অভ্রান্ত গুরু কেন স্বীকার করেন না? যদি এমন হয় যে বাস্তবিক কেহ অভ্রান্ত আছেন, অথচ তাঁহাকে অভ্রান্ত বলিয়া মান্য করা হয় না, তাহা হইলে এরূপ আচরণ নিতান্তই অশ্রদ্ধেয় এবং সত্যের বিরোধী। ব্রাহ্মগণ এমন খামখেয়ালের কথা কখনও বলেন না। বরং ব্রাহ্মগণ ইহাই বলেন যে যিনি যে বিষয়ে অভ্রান্ত তাঁহাকে সেই বিষয়ে অভ্রান্তরূপে মানাই উচিত। বিজ্ঞানের এমন কোন কোন সত্য আছে, যাহাকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং সে সত্য যিনি জানেন তাঁহাকে সেই বিষয়ে অভ্রান্ত মানিতে কোন দোষই নাই। বরং না মানাই দোষ। তা বলিয়া সেই ব্যক্তিকে সমগ্র বিজ্ঞান শাস্ত্রে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। বিজ্ঞানের কত বিষয় অমীমাংসিত, অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, সুতরাং সমগ্র বিজ্ঞান বিষয়ে কাহাকেও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা ন্যায়সঙ্গত নহে। এইরূপ প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধেই বলা যায়, যাহা বাস্তবিক সত্য তাহার জ্ঞান যাঁহার আছে সে বিষয়ে তিনি অভ্রান্ত। কিন্তু পূর্ণ জ্ঞান মানবের মধ্যে কাহারও থাকিবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ণ জ্ঞান একমাত্র ঈশ্বরেই বর্ত্তমান। তিনিই সকল বিষয়ে অভ্রান্ত। মানব কোন কোন বিষয়ে অভ্রান্ত হইলেও সম্যক জ্ঞান যখন তাহাতে সম্ভবে না, তখন কিরূপে তাহাকে সম্যকরূপে অভ্রান্ত বলিয়া মানা যাইতে পারে। বাহ্য বিষয়েই যখন নানা প্রকার ভ্রম হইয়া থাকে। তখন অন্তর্জগতে আরও কত ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ মানব জীবন অনন্ত উন্নতিশীল তাহার পোষণোপযোগী ধর্ম্মও অনন্ত উন্নতিশীল। সেই অনন্ত উন্নতিশীল ধর্ম্মের কত তত্ত্ব অনাবিষ্কৃত ও অমীমাংসিত আছে কে জানে? সুতরাং এরূপ অনন্ত উন্নতিশীল বিষয়ে কাহাকেও অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করা ন্যায় ও যুক্তি বিরুদ্ধ। যদি কেহ আপনাকে সেরূপ অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন, তাঁহার সেই সাহসকে অতি সাহস ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। যদি বাস্তবিক অভ্রান্ত কোন ব্যক্তি থাকিতেন, আর ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার না করিতেন, তাহা দূষনীয় হইত। কিন্তু সেরূপ ব্যক্তি নাই এবং হইতেও পারেন না। এজন্য ব্রাহ্মগণ অভ্রান্ত গুরু স্বীকার করেন না। তবে ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রসর অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শিক্ষা করা অথবা বিশেষভাবে ধর্ম্মশিক্ষা করা কখনই অকর্ত্তব্য নহে। গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত বিষয় যখন অপরের নিকট শিক্ষা করা যায়, ধর্ম্ম সম্বন্ধে কেন শিক্ষা করা না যাইবে। শিক্ষণীয় প্রত্যেক বিষয়ই শিক্ষা করিতে হইবে। শিক্ষার প্রণালী নানাজনের নানাপ্রকার হইতে পারে; কিন্তু শিক্ষা করিতেই হইবে। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সাধারণ শিক্ষা ভাষা শিক্ষার ন্যায়। জনসমাজে জন্মিলেই মানুষ কথা বলিতে শিখে। কাহার নিকট কথা বলিতে শিক্ষা করিল, তাহা যেমন নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই; দেশস্থ সকলেই এই ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষক। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সাধারণ জ্ঞানও তেমনি। সকলেই কিছু কিছু ধর্ম্মতত্ত্ব জানে কাহার নিকট যে সে তত্ত্ব শিক্ষা হইল তাহা নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। আন্তরিক জ্ঞানার্জ্জন বৃত্তি হইতে লোকে বিশেষ ভাবে কোন ব্যক্তির শরণাগত না হইয়াও অনেক তত্ত্ব শিক্ষা করিতে পারে। এবং সেই শিক্ষাই বিশেষ শিক্ষার মূল ভিত্তিরূপে কার্য্য করে। এই সাধারণ শিক্ষার পর ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সাহিত্যের পণ্ডিতের নিকট গমন করিলে শিক্ষা অনেক পরিমাণে সহজে ও অল্প সময়ে হয়। কিন্তু কোন শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ না করিলেই যে শিক্ষালাভের সম্ভাবনা নাই; এমন বলিবার কি সুযোগ আছে। যদি তাহা সম্ভব হইত তাহা হইলে আদিতত্ত্ব কিরূপে আবিষ্কৃত হইল। আত্যন্তিক আগ্রহ প্রবল জ্ঞান-পিপাসা ও একান্ত যত্নের সহিত চেষ্টা করাতেই জগতে নানা তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে। সকলেরই প্রথম শিক্ষক জ্ঞানদাতা সর্ব্বজন গুরু পরমেশ্বর। তিনি শিক্ষা না দিলে কোন তত্ত্বই শিক্ষা করিবার উপায় নাই। সুতরাং প্রত্যেক বিষয়েই মানুষ তাঁহার মুখাপেক্ষা করিয়া,তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল হইয়া থাকিতে পারিলে শিক্ষা করিতে পারে। কিন্তু তাহা সময় ও পরিশ্রম সাধ্য। এজন্য যে তত্ত্ব একবার প্রকাশিত হইয়াছে,তাহা জানিবার জন্য আর সেরূপ পরিশ্রম ও সময় ব্যয় না করিয়া, সেই তত্ত্বজ্ঞের নিকট শিক্ষা করাই যুক্তি সঙ্গত। তদ্দ্বারাই সহজে অল্প সময়ে শিক্ষার বিস্তার হইতে পারে। ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষার জন্যও এই নিমিত্তই প্রকাশিত তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষকের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহা দ্বারা এমন প্রমাণিত হয় না যে সেই শিক্ষকের নিকট না গেলে আর সে তত্ত্ব শিক্ষার উপায় ছিল না বা তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ না করিলে কাহারও পরিত্রাণ হইবে না। ধর্ম্ম রাজ্যে এই এক ভয়ানক বিভীষিকা বর্ত্তমান আছে, যে ব্যক্তি-বিশেষের শরণাপন্ন না হইলে, তাঁহার প্রদর্শিত পথে না চলিলে আর কাহারও উপায় নাই। পরিত্রাণ নাই। তাঁহার কথার উপর সন্দেহও বিচার করিবার শিক্ষার্থীর কোন অধিকার নাই। সম্পূর্ণরূপে আত্ম-বিচারবুদ্ধি ও বিবেককে বিসর্জ্জন দিয়া কোন ব্যক্তির হস্তে আত্ম সমর্পণ না করিলে আর কিছুতেই শিক্ষা পাইবার উপায় নাই। এমন কি এ দেশে ধর্ম্মগুরু কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়ের ভার লইয়াই ক্ষান্ত হন না—শিষ্যের সর্ব্ব প্রকার বিষয়েরই বিধাতা হইয়া থাকেন। সেরূপ বিষয়েরও শিষ্যের স্বাধীনতা থাকে না। ব্রাহ্মগণ এই প্রকার অন্ধ ভাবে অনুসরণ করাকে—আত্ম বিবেককে বিসর্জ্জন দিয়া সম্পূর্ণরূপে পরের অনুসরণ করাকে সঙ্গত মনে করেন না। তদ্দ্বারা আত্মার অধোগতির যথেষ্ট প্রমাণ সকল জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই জন্য ব্রাহ্মগণ কাহাকেও এমন ভাবে গুরু স্বীকার করেন না, যাঁহার অধীনতাতে বিবেক মলিন হইতে পারে বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের সম্মুখীন হইবার সম্ভাবনা না থাকে। পরম গুরু পরমেশ্বর প্রত্যেক আত্মার জন্য তাঁহার শিক্ষার দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছেন। সেই দ্বারে

গমন করিতে অভ্যস্ত হওয়াই নিরাপদ। কারণ সেই গুরুর সহিত কাহারও বিচ্ছেদ ঘটে না। তিনি সর্ব্বদা সকলের সঙ্গেই আছেন। পৃথিবীর গুরু সকল সময় সঙ্গে থাকিতে পারেন না। সকল নর নারীর পক্ষে গুরুর সাক্ষাৎ পাওয়াও সম্ভবপর নয়, কারণ গুরুর সংখ্যা বেশী নয়। এবং সকল বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ও সম্যক নহে। এজন্য জীবনের সমগ্র বিষয় শিক্ষার ভার কাহারও প্রতি অর্পণ করা কর্ত্তব্য নহে। যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁহার নিকট সে বিষয় অবশ্যই শিক্ষা করা যাইতে পারে। তাহাতে অল্প পরিশ্রম ও সময়ে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। সুতরাং তাহা কেন ব্রাহ্মের পক্ষে অকর্ত্তব্য হইবে? কিন্তু সর্ব্বদাই স্বানুভূতি সুশাস্ত্র ও সদুপদেষ্টার উপদেশকে মিলাইয়া কার্য্য করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ের গুরুগণ তাহাতে বাধা দেন বলিয়াই ব্রাহ্মগণ সেরূপ গুরুকরণে অনিচ্ছুক। এবং ব্রাহ্মগণ এমনও মনে করেন না যে এই রূপে গুরুর অধীন না হইলে কাহারও পরিত্রাণ লাভ হয় না। একজন যদি আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রমে কোন সত্য আয়ত্ত করিতে পারিয়া থাকেন, অন্যেও তাহা পারিবেন। ইহাই ব্রাহ্মের বিশ্বাস। এজন্য কোন আশঙ্কা-জনক পথে গমন না করিয়া পরম গুরু পরমেশ্বরের নিকট যাইতে এবং তাঁহার শিক্ষাকে শিরোধার্য্য করিতেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উপদেশ। মানবের মধ্যে যিনি সেই শিক্ষার অনুরূপ শিক্ষা প্রদান করিতে পারেন বা সেজন্য প্রয়াসী হন, ব্রাহ্ম সেরূপ শিক্ষকের শিক্ষা গ্রহণ করিতে কখনই বিমুখ হইবেন না।

সত্যদর্শীর ৩য় প্রশ্ন এই যে "যোগশিক্ষাকারিগণ বলেন যে .... । বিষয়ী ব্যক্তির বহির্ম্মুখীন মনকে অন্তর্ম্মুখীন করিয়া ব্রহ্ম দর্শনের পথ খুলিয়া দিতে পারেন। ইহারই নাম শক্তিসঞ্চার। এরূপ শক্তি সঞ্চারের মধ্যে কোন সত্য আছে কি না"। এইপ্রশ্নের মীমাংসা কিরূপে করা উচিত। সাধারণতঃ ফল দ্বারাই কার্য্যের গুণাগুণ নির্ণয় করা হইয়া থাকে। যোগশিক্ষাকারিগণ শক্তি-সঞ্চারের যেরূপ ফললাভের আশা করেন। এদেশের সহস্র সহস্র নর নারীর জীবনে কি তাহা প্রতিফলিত হইতেছে? শত শত বৎসর ধরিয়া এ দেশ এরূপ শক্তি সঞ্চারের ফল পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু শক্তি সঞ্চার হইলেই যে বিষয়ী ব্যক্তির মন অন্তর্ম্মুখীন হয় বা ব্রহ্মদর্শনের পথ খুলিয়া যায় এমন দৃষ্টান্ত ত বেশী দেখা যায় না। কোন সম্প্রদায় বিশেষের নামোল্লেখ না করিলেও এ দেশের শক্তিসঞ্চারগ্রস্ত কোন কোন সম্প্রদায় জগতে ধর্ম্মজীবনের কেমন সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন তাহা সকলেরই জানা আছে। ঈশ্বর-দর্শনের পথ খুলিয়া গেলে অর্থাৎ ঈশ্বর-দর্শনের সুবিধা পাইলেও যদি জীবনের এরূপ দুরবস্থা থাকে বা সেই দর্শন বিষয়ে উদাসীনতাই থাকে অথবা বহির্ম্মুখীন মন অন্তর্ম্মুখীন না হয়, তাহা হইলে সে শক্তি সঞ্চারের শক্তি কেমন তাহা বুঝা যাইতেছে। এ দেশের পক্ষে শক্তিসঞ্চারের কথা নূতন নয়। তদ্দ্বারা যে সকল ফল লাভ হয়, তাহাও বহু দিন হইতেই পরীক্ষিত হইয়া আসিতেছে, যদি প্রকৃতই শক্তি-সঞ্চার মানবের ঈশ্বর দর্শনের পথ খুলিয়া দিতে সমর্থ হইত এবং বিষয়ীর বহির্ম্মুখীন মনকে অন্তর্ম্মুখীন করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে এ দেশের কোটীকোটী নরনারীর জন্য যাহা শতশত বৎসর খোলা আছে তাহার ফল কি এমন হইত। যখন এ দেশের নর নারীর জীবনে সে ফল ফলে নাই, তখন শক্তি সঞ্চারের যে ফলের আশা যোগশিক্ষাকারিগণ করিতেছেন তাহা নিতান্তই দুরাশা। যোগশিক্ষাকারিগণের উদ্দেশ্য যদি সফল হইত জগতের পক্ষে তাহা একটী অতি শুভসংবাদ এবং অত্যন্ত কল্যাণকর ব্যাপার হইত। কিন্তু শত শত বৎসরে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। শক্তি সঞ্চার দ্বারা যাঁহারা ঈশ্বর দর্শনে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সেই ঈশ্বর দর্শন লাভ একমাত্র শক্তিসঞ্চার বা অন্যবিধ সাধনের ফল তাহাও নিরূপিত হয় নাই। কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে, তাঁহাদিগকেও নিরন্তর নাম সাধন ও অন্যবিধ সাধন ভজনে রত থাকিতে হইয়াছে। সুতরাং কোন্ সাধনের ফলে ঈশ্বর দর্শন হইল কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ ঈশ্বরের কৃপাবাদিগণ ঈশ্বর দর্শনকে তাঁহার কৃপার দান মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং মানবপ্রভাব কি ঈশ্বর-প্রভাব কোন্ প্রভাবে সেই শুভফল পাওয়া গেল, তাহা কেহই স্থিররূপে নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। এজন্য শত শত বৎসর যে ব্যাপারের ফল এদেশ পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহার পশ্চাতে বিফল মনোরথ হইবার জন্য কোন বুদ্ধিমানেরই যাওয়া উচিত নয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম এরূপ শক্তি সঞ্চারের ফলবত্তা বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে করেন না। যদিও কিছু ফলবত্তা থাকে তাহাও তেমন আকাঙ্ক্ষণীয় বলিয়া মনে হয় না। কারণ তদপেক্ষা সহজ ও সফল প্রণালী জগতের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। শক্তিসঞ্চারের প্রকৃষ্ট অর্থ এই যে কোন ভক্তিমান ব্যাকুলাত্মার নিকট গমন করিলে বা তাঁহার সহবাসে থাকিলে সহজেই ভক্তিবৃত্তি প্রবল হইয়া থাকে—ব্যাকুলতা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বিশ্বাসীর সহবাসে থাকিলে বিশ্বাসের সঞ্চার হয়। অনাসক্ত বৈরাগীর সহবাসে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। এইরূপ সাধুসহবাসের ফল সর্ব্বত্রই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। বিশ্বাসী, ভক্ত, ও প্রেমিকের বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম অন্য ব্যক্তিতে সঞ্চারিত হওয়াকে যদি শক্তি সঞ্চার নাম দেওয়া যায়, সেরূপ শক্তি সঞ্চারকে ব্রাহ্মসমাজ অতি আদরের সহিত চিরদিন গ্রহণ করিবেন। ফলতঃ আধ্যাত্মিক জগতে ইহাই শক্তি। এবং এই শক্তিলাভ করিলেই সাধক সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারেন। প্রেম, ভক্তি বিশ্বাসাদির ন্যায় আধ্যাত্মিক শক্তি ভিন্ন অপর যে শক্তি তাহা জড়ীয় শক্তি হওয়াই সম্ভব। তাহা শরীরের কল্যাণ সাধনে উপযুক্ত হইলেও হইতে পারে। আত্মার কল্যাণ সাধনে জড়ীয় শক্তির প্রভাব বেশী আছে এমন নয়। সুতরাং সেরূপ শক্তি সঞ্চারের প্রয়োজন ব্রাহ্মসমাজ স্বীকার করেন না।

নিবেদক

কলিকাতা। শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

(ভ্রাতৃদ্বিতীয়া)

মহাশয়,

এই পত্রের শিরোনামের বিষয় লইয়া অদ্য কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে বাসনা করি। হিন্দু সমাজের অনেকগুলি প্রাচীন গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান আমরা ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে গ্রহণ করিতে সক্ষম হই নাই। কেন হই নাই, তাহা বলিবার আবশ্যকতা অদ্য আমি দেখিতেছি না। কোন কোন অনুষ্ঠান অতিশয় আদরের সহিত ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে জাতাহের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেক ব্রাহ্ম পরিবারে দারিদ্র্যের মধ্যেও যে প্রকার আড়ম্বরের সহিত জাতাহ পর্ব্ব সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা আমরা সকলেই জানি। অবস্থার অতিরিক্তরূপ আয়োজন না করিয়া জাতাহ পর্ব্বানুষ্ঠান সম্পাদিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে হয়। জাতাহের ন্যায় হিন্দুসমাজ প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান যে ব্রাহ্ম পরিবার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, ইহার সর্ব্ববাদিসম্মত। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া আমি তদ্বিধ একটী অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করি। কিন্তু কতিপয় শ্রদ্ধেয় এবং আমার ভক্তিভাজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম, নিজ নিজ পরিবার মধ্যে, সাতিশয় সমারোহ সহকারে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন দেখিয়াই আমি এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

হিন্দুশাস্ত্র হইতে এই বিষয়ে কি জানিতে পারা যায়, তাহা অগ্রে দেখা যাউক।

"নির্ণয়ামৃতাদিতে" উক্ত হইয়াছে, যমদ্বিতীয়াতু "প্রতিপদ্যুতা গ্রাহ্যেতি। যমদ্বিতীয়া মধ্যাহ্ন ব্যাপিনী পূর্ব্ববিদ্ধা চেতি হেমাদ্রিঃ। অর্থাৎ নির্ণয়ামৃতাদিতে কহিতেছেন, প্রতিপদযুক্তা দ্বিতীয়া, যমদ্বিতীয়া। হেমাদ্রিতে উক্ত হইয়াছে, মধ্যাহ্নের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্নকালব্যাপিনী দ্বিতীয়া, যমদ্বিতীয়া।

অত্র বিশেষো হেমাদ্রৌ স্কান্দে :—
"ঊর্জ্জে শুক্ল দ্বিতীয়ায়ামপরাহ্নেঽর্চ্চয়েৎ যমম্।
স্নানংকৃত্বা ভানুজায়াং যমলোকং ন পশ্যতি॥
ঊর্জ্জে শুক্ল দ্বিতীয়ায়াং পূজিত স্তর্পিতো যমঃ।
বেষ্টিতঃ কিন্নরৈর্হৃষ্টৈ স্তস্মৈ যচ্ছতি বাঞ্ছিতং॥

অর্থাৎ ঊর্জ্জের (কার্ত্তিক মাসের) শুক্ল দ্বিতীয়াতে অপরাহ্নে যমের অর্চ্চনা করিবে, স্নানান্তে সূর্য্যজায়া ছায়ার অর্চ্চনা করিবে, তাহা হইলে যমলোক দর্শন করিতে হইবে না। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল দ্বিতীয়ায় পূজিত ও তর্পিত যম, হৃষ্ট ও কিন্নরগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বাঞ্ছিত যাহা তাহা প্রদান করেন।

ভবিষ্য পুরাণেও প্রায় ঐরূপ উল্লেখ আছে। গৌড়দেশের নিমিত্ত নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা :—

যমঞ্চ চিত্রগুপ্তঞ্চ যমদূতাংশ্চ পূজয়েৎ।
অর্ঘ্যশ্চাত্র প্রদাতব্যো যমায় সহজদ্বয়ৈঃ॥
মন্ত্রস্তু।
"এহ্যেহি মার্ত্তণ্ডজ। পাশহস্ত!
যমান্তকালোকধরামরেশ।
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কৃতদেব পূজাং
গৃহাণ চার্ঘ্যং ভগবন্নমস্তে॥
ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক্ষভক্তমিদং শুভম্।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥"
জ্যেষ্ঠাগ্রজাতেতি বদেদিতি স্মার্ত্তাঃ॥ ইত্যন্ন দানমিত্যপ্যাহুঃ।

ইতি নির্ণয় সিন্ধৌ ২য় পরিচ্ছেদঃ।

উপরি-উক্ত সংস্কৃত বচনগুলির ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। উদ্ধৃত শ্লোকগুলি দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অপর নাম যমদ্বিতীয়া এবং ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সঙ্গে যম ও যমুনা পূজা জড়িত রহিয়াছে। যম ও যমুনা পূজা না করিয়া ভ্রাতৃদ্বিতীয়ানুষ্ঠান শাস্ত্রের বিধি নহে। তবে যম ও যমুনা পূজা বাদ দিয়া ভ্রাতার আদর অভ্যর্থনা করিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু তাহা কার্ত্তিকের শুক্ল দ্বিতীয়াতে না করিয়া একটী বিশেষ তারিখ ধরিয়া করাই যুক্তিসঙ্গত। ব্রাহ্ম কোন কার্য্য নিরর্থক ভাবে করিবেন না। তিনি যাহা কিছু করিবেন, তাহা যুক্তির অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। অর্থহীন ভাবে কোন কার্য্য করা যদি কাহারও পক্ষে গর্হিত হয়, তবে তাহা ব্রাহ্মেরই পক্ষে। ব্রাহ্ম ভগিনী যদি ভ্রাতার আদর বা পূজা করিতে চাহেন, তবে তিনি কার্ত্তিকের শুক্লদ্বিতীয়ায় না করিয়া অপর একটী নির্দ্দিষ্ট দিবসে করিলেই যুক্তিসঙ্গত হয়। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভ্রাতৃপূজার অনুষ্ঠান একটী সাংবৎসরিক অনুষ্ঠান বলিয়াই বুঝিতে হইবে। ভ্রাতৃপূজার সাংবৎসরিক অনুষ্ঠান করিতে হইলে ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে তাহা হয় না, কেন না কার্ত্তিকের শুক্ল দ্বিতীয়া ত ঠিক ৩৬৫ দিবস পরে আসে না, প্রায়ই ৩৬৫ দিবসের অনেক অগ্রে বা পরে আসে। সুতরাং কার্ত্তিকের শুক্ল দ্বিতীয়া ধরিয়া ভ্রাতৃপূজা করিতে হইলে ভ্রাতৃপূজার সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার যম ও যমুনা পূজার অংশ বাদ দিয়া ভ্রাতৃদ্বিতীয়া অনুষ্ঠান যদি ব্রাহ্মের অনুষ্ঠেয় হয়, তবে আরও কতকগুলি অনুষ্ঠান ব্রাহ্মপরিবারমধ্যে গৃহীত হইলে জাতীয়ভাব বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়তা হয়। যথাঃ—বিজয়ার নমস্কার ও আলিঙ্গনাদি এবং জামাতৃঅর্চ্চন, (জামাইষষ্ঠী বা ষষ্ঠীবাটা) ও নবান্ন প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্ম যদি ভ্রাতৃ-অর্চ্চন করেন, তবে তাঁহার পক্ষে বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একটী দিন পিতৃ-অর্চ্চন, মাতৃ অর্চ্চন, দাস দাসী অর্চ্চন প্রভৃতি বহুবিধ পূজার্চ্চনার প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক। নতুবা বৎসরের মধ্যে কেবল মাত্র এক দিন একটী ভ্রাতৃ-অর্চ্চনের ব্যবস্থা করা যুক্তি ও তর্কানুমোদিত হয় না। আর এক কথা ভবিষ্য পুরাণে উক্ত হইয়াছে "স্নেহেন ভগিনী হস্তাৎ ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্, দানানিচ প্রদেয়ানি ভগিনীভ্যো বিধানতঃ॥ স্বর্ণালঙ্কার বস্ত্রান্নপূজা সৎকার ভোজনৈঃ। সর্ব্বা ভগিন্যঃ সংপূজ্যা * * * * ॥

ব্রাহ্মগণ যে হিন্দু আচার গ্রহণ করিয়া ভ্রাতৃপূজার অনুষ্ঠান করিতেছেন সেই আচারানুসারেই আবার ভগিনীকেও স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি বহুবিধ মনোহারী পদার্থ প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ব্রাহ্মগণ দেখেন, হিন্দুগণ ভগিনীকে কিছু বড় একটা দানাদি করেন না বা পূজাদি করেন না, সেই জন্য তাঁহারাও ভগিনী অর্চ্চন অংশ বাদ দিয়াছেন। আমার আসল বক্তব্য এই যে, হিন্দু সমাজ মধ্যে প্রাচীন কাল হইতে যে সকল পৌত্তলিক অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে তাহার পৌত্তলিক অংশ বাদ দিয়া যদি অপর অংশ গ্রহণ করা ব্রাহ্মসাধারণের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে বিজয়ার নমস্কার আলিঙ্গনাদির ন্যায় জাতীয় প্রেমোদ্দীপক অনুষ্ঠানগুলি গ্রহণ করা অত্যন্ত উচিত। তৎপর সম্ভব হইলে বিচারপূর্ব্বক আরও অনেক অনুষ্ঠান ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রবেশ করান যাইতে পারে। কিন্তু তাহা না করিয়া কেবল মাত্র ভ্রাতৃদ্বিতীয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। ইতি

দেবগৃহ
১২ই নভেম্বর
১৮৯৩

নিবেদক
শ্রীউমাপদ রায়।

ব্রাহ্মসমাজ।

নামকরণ—আমাদের প্রেমাস্পদ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ বসুর প্রথমা কন্যার নামকরণ কার্য্য গত ২৬শে কার্ত্তিক সুসম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার নাম শ্রীমতী সুধাময়ী রাখা হইয়াছে। গৌরীবাবু এই উপলক্ষে সাধনাশ্রমে ১৲ দান করিয়াছেন। এবং গত ২৭শে কার্ত্তিক শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী বসুর ২য় পুত্রের নামকরণ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্কবাবু এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারফণ্ডে ১৲ টাকা ও সাধনাশ্রমে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন. এই উভয় অনুষ্ঠান উপলক্ষেই শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। ঈশ্বর শিশুদিগকে দীর্ঘায়ু করুন।

কুমারখালি ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব—গত ৫ই এবং ৬ই কার্ত্তিক শনি ও রবিবার কুমারখালি ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। দুই দিবসই প্রাতে ও সন্ধ্যাতে মন্দিরে উপাসনা উপদেশাদি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্রদাস মহাশয় উপসনার কার্য্য করিয়াছেন। রবিবার অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম,এ মহাশয় ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় "জীবনের কৃতকার্য্যতা"।

স্থায়ী প্রচার ফণ্ড—স্বর্গীয় জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্থায়ী প্রচার ফণ্ডে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দানের সংকল্প করিয়াছিলেন। তিনি এখন সমাজের হস্তে সেই টাকা অর্পণ করিয়াছেন। ঈশ্বর পরলোক গত আত্মার তৃপ্তি সাধন করুন। অনাথা বিধবা পৃথিবীতে শান্তিলাভ করুন। তাঁহার আরও অনেক গুলি সৎ সংকল্প আছে। লোকাভাবে সেগুলি সুসম্পন্ন হইতেছে না। তিনি নিজ গ্রামে যে সব সদনুষ্ঠানের বাসনা করিয়াছিলেন, তাহা সুসম্পন্ন করিতে হইলে, লোকের আবশ্যক। ঈশ্বর সাধুসঙ্কল্পের সহায় হউন। স্থায়ী প্রচার ফণ্ডের উন্নতি না হইলে প্রচার কার্য্যের সুশৃঙ্খলা হওয়া কঠিন। যাঁহারা এই ফণ্ডে দান স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদের অঙ্গীকৃত দান প্রদান করিয়া ফণ্ডকে পুষ্ট করুন যাঁহারা এ বিষয়ে এখনও উদাসীন আছেন, তাঁহারা চিন্তা করুন, আপনার সমাজকে ভাল বাসিতে হইলে এইরূপেই তাহার পরিচয় দেওয়া উচিত।

উৎসব—গত ৩১এ আশ্বিন হইতে ৪ঠা কার্ত্তিক পর্য্যন্ত মাণিকদহস্থ শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী রায় মহাশয়ের ভবনে পারিবারিক ব্রাহ্মোৎসব হইয়াছিল। কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মগণ উৎসবে সমাগত হইয়াছিলেন। ৩১এ আশ্বিন রাত্রে উদ্বোধন হয়। প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১লা কার্ত্তিক প্রাতে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বসু ও সায়াহ্নে বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন। ২রা কার্ত্তিক প্রাতে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস ও সায়াহ্নে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্য ছিলেন। ৩রা কার্ত্তিক বিপিন বাবুর বাটীর সন্নিকটস্থ একটী বটবৃক্ষের তলে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস উপাসনা করেন ও শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মল্লিক বক্তৃতা করেন। সায়ংকালে উপাসনা হয়। বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। ৪ঠা কার্ত্তিক প্রাতঃকালে উপাসনা হয়। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস উপাসনা করেন। অপরাহ্নে নগরকীর্ত্তন ও বাজারে বক্তৃতা হয় এবং সায়াহ্নে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য নবদ্বীপ বাবু প্রার্থনা করেন। তৎপরে কীর্ত্তনাদি করিয়া উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হয়। এতদ্ব্যতিরেকে উৎসবে "উষা কীর্ত্তন" এবং অপরাহ্নে আলোচনা হইত। এবারে উৎসবে অনেক তাপিত আত্মা শান্তি পাইয়াছে। ধন্য তাঁহার কৃপা, যাঁহার বিধানে মধ্যে মধ্যে উৎসবাদ আসিয়া তাপিত আত্মার শান্তিবারি সিঞ্চন করে ও উন্নত জীবন লাভের পক্ষে সহায়তা করে।

সদনুষ্ঠান—আমাদের করটীয়াস্থ বন্ধু ডাক্তার হরনাথ ঘোষ মহাশয় ইতিপূর্ব্বে আপনার পরলোকগতা সহধর্ম্মিণী শরৎ কামিনীর নামে একটী স্থায়ী ফণ্ড সংস্থাপিত করিয়া ১০০৲ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। সে সংবাদ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। অল্প দিন হইল তাঁহার খুল্লতাত ভগ্নীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ও এইরূপ তাঁহার নামে একটী ফণ্ড সংস্থাপন জন্য ১৫৲ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। এই ফণ্ড শ্যামাসুন্দরী ফণ্ড নামে অভিহিত হইবে। এই টাকা মূল ধন স্বরূপ থাকিয়া উহার আয় হইতে সমাজের কার্য্যে ব্যয় হইবে। শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে মৃত ব্যক্তির নামে এইরূপ ফণ্ড সকল স্থাপন করিলে মৃত ব্যক্তিদের জন্য স্মৃতিসূচক অনুষ্ঠান হয় এবং উহা দ্বারা সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়; আমরা অনুষ্ঠান সকলে অযথা অনেক টাকা ব্যয় করিয়া থাকি। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনই ফল হয় না। এরূপ ফণ্ড সংস্থাপন করিলে বিশেষ উপকারের আশা করা যায়। হরনাথ বাবুকে এই সাধু সঙ্কল্পের জন্য আমরা ধন্যবাদ করি। অনুষ্ঠাতাদিগের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হউক ইহা বাঞ্ছনীয়।

প্রচার—শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় বাঁকুড়া অঞ্চল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মাণিকদহে শারদীয় উৎসবে যান। সেখানে উৎসবের কার্য্য সমাপন করিয়া কুমারখালি ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তথায় যান। সেখানে উৎসবের কার্য্য সমাপন করিয়া ঢাকাতে পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীতে যোগদান করেন। তথায় পরিবারে উপাসনা করেন এবং একদিন প্রাতে সমাজে উপাসনা করেন। তথা হইতে ফরিদপুরে যান। তথায় সমাজে উপাসনা করেন এবং পরিবারে উপাসনা পাঠব্যাখ্যাদি করেন। তথা হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

দানপ্রাপ্তি—কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে যে বিক্রমপুরের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে নিম্নলিখিতরূপ দান পাওয়া গিয়াছে।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

তালিকা দেখ।

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস কলিকাতা	৷৹
ব্রাহ্মসমাজের একজন দরিদ্র সহানুভূতিকারী বারোদী নদীয়া	।৹
মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা	১৲
শ্রীমতী গিরিবালা দাস ঐ	২৲
শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী, নাগপুর	৫৲
রাঁচি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের নিকট হইতে বাবু ত্রিপুরাচরণ রায় দ্বারা সংগৃহীত	২৸৶৹
শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ বসু কলিকাতা	।৹
শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু ,,	৫৲
শ্রীযুক্ত তারণচন্দ্র দাস লাহোর	১৲
সরদার দয়াল সিংহ লাহোর	২৫৲
একটী মহিলা কলিকাতা	৫৲
কোন এক বন্ধু ,,	৫৲

ক্রমশঃ

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৬শ সংখ্যা। ১৬ শভাগ।	১৬ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹ মফস্বলে ৩ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵৹

প্রার্থনাতে জেগে রও।

প্রহর না হতে রাতি, গগন ছাইল
ঘন ঘনে; আসিছে আসিছে
মেঘরাশি; বায়ুভরে চৌদিকে ধাইল;
ঘোরাধারে ধরণী গ্রাসিছে।

হুঙ্কারি ডাকিল বায়ু; উঠে লম্ফ দিয়া,
তরুশিরে ভাঙ্গে মড়মড়;
চপলা চমকে শত নয়ন ধাঁধিয়া;
শত বাজ ছোটে কড়মড়,

ঝিমির ঝিমির ঝিম্ বর্ষে সারারাতি:
শন্ শন্ গবাক্ষে হুঙ্কারে;
সারানিশি চিকিমিকি চপলার ভাতি;
ভেকদল ডাকে চারিধারে।

প্রভাতে উঠিয়া দেখি, সুনীল আকাশে
মেঘবিন্দু নাহি কোনো ধারে,
নবীন অরুণ-বিভা প্রাচীতে প্রকাশে;
হেম-দ্রবে মাখায় সংসারে।

নব-জলে স্নাত তরু সুস্নিগ্ধ কোমল,
তদুপরি সে কিরণ ধারা,
নয়নের প্রীতি-প্রদ পবিত্র উজ্জ্বল,
কিবা ধরা চিত্ত-চমৎকারা।

এই ছিল কালরাতি, এই সুপ্রভাত,
সে প্রসন্ন প্রকৃতির হাসি,
কোথা বর্ষা, সে বিজলী, কোথা বজ্রপাত,
নবানন্দে ধরা যায় ভাসি।

নিরাশে ডুবোনা ভাই, বিপদ আঁধার
রহিবে না জেন চিরকাল;
শান্তি পবিত্রতা প্রেম পাইবে আবার,
কেটে যাবে ঘন মোহজাল।

প্রার্থনাতে জেগে রও, ব্রহ্মকৃপা স্মরি,
ধৈর্য্যডোরে বাঁধহে আপনা;
বিপুল বিপ্লব মাঝে সেই কৃপা ধরি
কর তুমি সত্যের সাধনা।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

সাধন-সম্পত্তি – একজন সাধক বলিয়াছেন, "অনুতাপের লক্ষণ কি, তাহার প্রকৃতি কি এবং তাহার কার্য্যই বা কি এ শাস্ত্র জানিতে চাই না, কিন্তু অনুতাপ করিতে চাই।" প্রকৃত সাধকের কথাই এই। অনুতাপের শাস্ত্র শুনিয়া আমার কি হইবে, অনুতাপের কারণ সত্ত্বেও যে আমার হৃদয়ে যথেষ্ট অনুতাপের উদয় হয় না, এই দুঃখেই ম্রিয়মান্ আছি। যাঁহারা আপনাদের জীবন পরীক্ষা করিয়া আপনাদিগকে অন্তরে ঘৃণা করিতে থাকেন—তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশের প্রতি এক প্রকার বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়; মন বলিতে থাকে, "দূর হোক ও সকল বলিয়া ও শুনিয়া কি হইবে?" যদি একজন বসিয়া বসিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক সুচিকিৎসকের প্রণীত স্বাস্থ্যরক্ষা গ্রন্থ সকল পাঠ করে, এবং সে বিষয়ে তাহার পরিপক্ক জ্ঞান জন্মে, কিন্তু কার্য্যকালে যদি দেখা যায়, যে তাহার নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে দৃষ্টি নাই, এবং দিন দিন সেই স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, তবে তাহার শাস্ত্র জ্ঞানে সন্তোষের কারণ কি থাকে? স্বাস্থ্য-রক্ষার উপায় জানিয়া তাহার লাভ কি যখন তাহাকেই রোগ-শয্যাতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে হইতেছে। সেইরূপে ধর্ম্মের শাস্ত্র জানিয়া ফল কি, যদি সেই জ্ঞান পাপ হইতে বাঁচাইতে না পারে। আমাদিগকে কি অনেক সময়ে এই বলিয়া অশ্রুপাত করিতে হয় না, যে পরকে পথ দেখাইবার জন্ত বাতি ধরিলাম, কিন্তু নিজের গৃহের অন্ধকার গেল না। অপরকে স্বাস্থ্যলাভের উপায় বলিয়া দিলাম কিন্তু নিজের স্বাস্থ্যলাভ হইল না? একজন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি দর্শনকার বলিয়াছেন—যে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, যাহা কিছু শুনিয়াছ কি শিখিয়াছ তাহা মন

হইতে বিদায় করিয়া, চিত্তকে জ্ঞানহীন ও একমাত্র সন্দেহের নিলয় করা আবশ্যক। সাধকের পক্ষেও বোধ হয় এই কথা বলিতে পারা যায় যে প্রকৃত ভাবে সাধন করিতে হইলে, যাহা কিছু শুনিয়াছ কি শিখিয়াছ তাহা ভুলিয়া যাও, তুমি যে টুকু চরিত্রে উপার্জ্জন করিবে সেইটুকু তোমার, সেই টুকুকেই তুমি নিজের সাধন সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করিতে পার; তদ্ভিন্ন আর যাহা কিছু মনে সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা তোমার নহে। এই সাধনসম্পত্তি যাঁহারা প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই বাস্তবিক ধর্ম্মজগতে শ্রেষ্ঠ।

প্রচার—একজন ডাক্তার ম্যালেরিয়া-নাশক বটিকা" বলিয়া এক প্রকার বটিকা প্রস্তুত করিলেন, এবং তাহার গুণাবলী বর্ণনা করিয়া নানা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন। ছোট অক্ষরে, বড় অক্ষরে নানাভাবে নানা ভঙ্গীতে তাঁহার বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রের প্রথম স্তম্ভেই দৃষ্ট হইত; এবং কিরূপে তাঁহার ঔষধ সেবনে একজন রুগ্ন জীর্ণ কঙ্কাল-সার ব্যক্তি সুস্থ ও সবলকায় হইয়াছে, কিরূপে তাহার মুখে স্বাস্থ্য ও প্রসন্নতার আভা ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার একটী ছবিও ছিল। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ও জ্বরপীড়িত ব্যক্তিগণ প্রথম প্রথম দলে দলে তাঁহার ঔষধ ক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার অনেক ধনাগম হইতে লাগিল। কিন্তু কিছুদিন পরে উক্ত ডাক্তার বদলী হইয়া একটী ম্যালেরিয়া পীড়িত জেলাতে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তাঁহার পরিবার পরিজনগণ সকলে ম্যালেরিয়াতে পীড়িত হইয়া পড়িলেন; অকালে দুই একটী সন্তান কালগ্রাসে পতিত হইল; তিনিও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়া বার বার পীড়িত হইয়া ছুটী লইতে বাধ্য হইলেন। এই সংবাদ যখন সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন তাঁহার ম্যালেরিয়া-নাশক বটিকা লোকের নিকট একটা উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। অসার শূন্যগর্ভ বিজ্ঞাপনের কথা উঠিলেই লোকে বলে—যথা "অমুকের ম্যালেরিয়ানাশক বটিকা।" সেব্যক্তি যদি বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরটা এত অধিক না করিত তাহা হইলে হয়ত লোকের বিদ্বেষ বুদ্ধি এত অধিক হইত না। দ্বিতীয় ছবি ঠিক ইহার বিপরীত। একজন চিকিৎসক একবার একটী গাছ আবিষ্কার করিলেন যাহা রক্তআমাশয়ের পক্ষে মহৌষধ মনে হইল। কিন্তু উক্ত পীড়া বিশেষের পক্ষে যথার্থ উপকারী কি না জানিবার জন্য প্রথমে গোপনে তাহার আরক ও বটিকা প্রস্তুত করিলেন ও বহুসংখ্যক রোগীকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সত্যপ্রিয় প্রকৃতিতে কিছুমাত্র হাঁক ডাক ছিল না। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "আপনাদিগকে দেখাইবার মত এখনও কিছু হয় নাই; মনে একটা খেয়াল আসিয়াছে মাত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি, যদি ফল কিছু দাঁড়ায় জানিতেই পারিবেন।" ক্রমে যখন তিনি ঔষধের উপকারিতা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেন, তখন ধীরে ধীরে তদনুসারে চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। সংবাদপত্রে যে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহা মনে আসিল না। কিন্তু কি জানি কেমন করিয়া সে সংবাদ দিন দিন চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। প্রতিদিন দশ পনর ক্রোশ দূর হইতে লোকে ঔষধ ক্রয় করিবার জন্য আসিতে লাগিল। তাহাতে তিনি ধনী হইয়া গেলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত উভয় ছবির মধ্যে প্রভেদ কি তাহা চিন্তা করিলেই প্রচারের প্রকৃত প্রণালী কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। যাহা পাইলে লোকে বাস্তবিক পাপ তাপ হইতে রক্ষা পায়, এরূপ কোনও বস্তু যদি তোমার নিকট থাকে, তাহা আপনাপনি প্রচারিত হইবে, আর যদি তাহা না থাকে তুমি যতই প্রচারের আড়ম্বর করিবে ততই লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিবে। এই অসার আড়ম্বর-প্রিয়তা হইতে ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন।

ব্রাহ্মদিগের দরিদ্রতা—ব্রাহ্মদিগের দরিদ্রতা বিষয়ে অগ্রে কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। ইহা ব্রাহ্মমাত্রেরই একটী গভীর চিন্তার বিষয়। মানুষ সামান্য অবস্থাতে থাকে, বা গুরুতর দৈহিক পরিশ্রম দ্বারা জীবন ধারণ করে, ইহা কিছুই দুঃখের বিষয় নহে, তাহাতে ধর্ম্মজীবনের হানি না হইয়া বরং সাহায্য হইবার কথা। কিন্তু মানুষ নিজ সাধ্যের অতীত অবস্থাতে থাকে, এবং দিন দিন ঋণজালে জড়িত হয়, ইহা কোনরূপেই প্রার্থনীয় নহে। ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এই শ্রেণীর লোক সংখ্যা বৰ্দ্ধিত হইলে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজ নিম্নশ্রেণীর খৃষ্টীয় ও ফিরিঙ্গী সমাজের ন্যায় অশেষ নীচতা ও দুর্গতির আকর হইবে। যথাসময়ে ব্রাহ্মগণের চিন্তিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। সমগ্রদেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মদিগের দারিদ্র্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ইহার কতকগুলি কারণ আছে। হিন্দুসমাজ মধ্যে একান্নভুক্ত পরিবার প্রথা প্রচলিত থাকাতে, একজন ভ্রাতা যদি কম উপার্জ্জন করে তবে অপর ভ্রাতাদিগের উপার্জ্জন দ্বারা তাহার ও তাহার স্ত্রী পুত্রের অভাব সকল পূরণ হইয়া যায়। কিন্তু ব্রাহ্মগণের অধিকাংশকেই একান্নভুক্ত পরিবার হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বীয় পদের উপর দাঁড়াইতে হইয়াছে। যেখানেই যাউন, সঙ্গে সঙ্গে একটী ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পরিবার গলদেশে বাঁধা আছে। সংসার সাগরের তরঙ্গে যে সন্তরণ করিবেন, ঐ বোঝাটী পৃষ্ঠের উপরে চাপান আছে, যতদিন যে রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিবেন ঐগুলির ভরণ পোষণের চিন্তা করিতে হইবে। একটু অব্যাহতি নাই, একটু নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই। এদিকে পুত্র কন্যার সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, আয় তদনুরূপ বাড়িতেছে না। ইহার উপরে আবার অধিকাংশ ব্রাহ্ম বড় বড় সহরে বাস করিতে বাধ্য হইতেছেন। পল্লীগ্রামে থাকিলে নানাপ্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়; মনোমত সঙ্গ পাওয়া যায় না, পুত্র কন্যার শিক্ষাদির সুব্যবস্থা হয় না; সুতরাং সহরে বাস তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিতেছে। সহরে থাকিতে গেলেই নানাপ্রকারে ব্যয়। ভদ্রলোকের সহিত দেখা করিতে হইলে, ভাল কাপড়খানি, ভাল জুতা যোড়াটী, ভাল কোটটী চাই, এক যোড়া মোজা চাই, ছাড় গাছটী চাই; মহিলাদিগেরও ভাল ধুতি, ভাল জ্যাকেট ভাল জুতা প্রভৃতি চাই। এ সকল ব্যয় আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। অনেক সময়ে ইচ্ছা করিলেও বাধা দিয়া রাখা যায় না। এইরূপে ব্রাহ্মগণ দারিদ্র্য ও ঋণভারে প্রপীড়িত হইতেছেন। ইহার

কোনও উপায় করিতে না পারিলে, ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে ভয়ানক দুর্নীতি প্রবেশ করিবে। এই দারিদ্র্য নিবারণের উপায় কি তাহা সকলেরই ধীরচিত্তে বিচার করা আবশ্যক। একটী উপায় ত হাতের নিকটেই দেখা যায়। ব্রাহ্মদিগের সহরে বাস ঘুচাইতে পারিলে ভাল হয়। ব্রাহ্মদিগের জন্য যদি মফস্বলের কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে একখণ্ড ভূমি পাওয়া যায়, এবং সেখানে ব্রাহ্ম-পরিবারদিগের থাকিবার বন্দোবস্ত করা যায়, তাহা হইলে সহর-বাসের অনিষ্ট ফল হইতে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা করা যাইতে পারে; অথচ অনেকগুলি পরিবার একত্র থাকিলে সঙ্গলাভ ও পুত্র কন্যার শিক্ষা বিষয়ে কোনও অসুবিধা ঘটে না। আমরা দেখিয়া চিন্তিত হইতেছি যে, সহর হইতে মফস্বলে যাইবার প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত না হইয়া অনেক দরিদ্র ব্রাহ্মের সহরে আসিবার প্রবৃত্তিই অধিক দৃষ্ট হইতেছে। আহার করিবার কোনও সংস্থান থাকুক বা না থাকুক সকলেই সহরের দিকে ছুটিতেছেন। আশা করি, এই গুরুতর বিষয়টী এবারকার বার্ষিক কনফারেন্সের বিশেষ আলোচনার বিষয় হইবে।

আদর্শ ও জীবন—একজন ব্রাহ্ম গৃহস্থের গৃহে একটী দরিদ্র বিধবা নারী স্বীয় পুত্রটীকে লইয়া ভিক্ষা করিতে আসিত। গৃহস্থ যখনি তাহাকে দেখিতেন তখনি তাঁহার দয়ার উদয় হইত, তিনি হায় হায় করিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু অর্থসাহায্যও করিতেন। তাঁহার নিজের অবস্থা হীন হওয়াতে আর অধিক সাহায্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি যে সাহায্য করিতেন, তাহা শুষ্ক মরুভূমিতে জলবিন্দুর ন্যায় ক্ষণেকের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইত। এইরূপে কিছুদিন যায়, যখন একদিন একজন অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রী ইউরোপীয় মহিলা তাঁহার ভবনে আসিয়াছেন, সেই সময়ে উক্ত বিধবা নারীও উপস্থিত। তাহার দুর্দশার কথা শুনিয়া ঐ ইউরোপীয় মহিলার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি অধিক হায় হায় করিলেন না; দয়ার বাহ্য প্রকাশ কিছুই দেখাইলেন না; কিন্তু তাহাকে পরদিন সেই সময়ে আসিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন যথাসময়ে তিনি উপস্থিত হইলেন এবং বিধবাটীকে লইয়া গাড়িতে তুলিয়া ডিষ্ট্রিক্ট্ চ্যারিটেবল সোসাইটীর সম্পাদক পরলোকগত রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের বাটীতে লইয়া গেলেন। দিগম্বর বাবু বলিলেন, "হাতে টাকা আছে কি না আফীসে না জানিয়া বলিতে পারিতেছি না।" ইউরোপীয় মহিলা বলিলেন—"আমার হাতে আফীসের উপরে চিঠী দিন আমি এক্ষণই জানিয়া আসিতেছি। রাজার নিকট চিঠী লইয়া সেই গাড়িতেই চ্যারিটেবল সোসাইটীর আফীসে বড় বাবুর নিকট গিয়া জানিয়া আসিলেন যে টাকা আছে, তাহাকে মাসে মাসে কিছু কিছু দেওয়া যাইতে পারে। তদনুসারে ঐ বিধবা নারীর জন্য মাসিক ৪৲ টাকা করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইল। মাসের পর মাস হায় হায় চলিয়াছিল তথাপি তাহার যে দুঃখ নিবারণ হয় নাই, তাহা একজন প্রকৃত কর্ম্মশীলা ও সদয়-হৃদয়া মহিলার দ্বারা দুই দিনে হইয়া গেল। এতদ্দ্বারা এইমাত্র বক্তব্য যে হৃদয়ের উৎকৃষ্ট ভাব সকলকে কার্য্যে পরিণত না করিতে পারিলে, তাহার মূল্য অতি অল্পই থাকে। পূর্ব্বোক্ত গৃহস্থ যে ঐ বিধবা নারীর দুঃখে দয়ার্দ্র হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু সে দয়াকে কার্য্যে পরিণত করিবার বুদ্ধি না ঘটাতে তাহার কোনও মূল্য ছিল না। হৃদয়ের উচ্চভাব সম্বন্ধে যেরূপ, জীবনের উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধেও সেইরূপ। জীবনের উন্নত আদর্শ চক্ষের নিকটে আনিয়া ফল কি যদি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারা যায়। যাহারা অসাধ্য আদর্শের কল্পনা করে, ও তাহা চিত্তে পোষণ করিয়া সুখী হয়, তাহারা এ পৃথিবীতে ভাবুক ও অকর্ম্মণ্য লোক বলিয়া গণ্য হয়। এরূপ অকর্ম্মণ্যতা ও ভাবুকতা নিশ্চিন্ত উপন্যাস পাঠকদিগের পক্ষেই শোভা পায়। জনসমাজের সুখ দুঃখ, উন্নতি অবনতি বিষয়ে যাহাদের দৃষ্টি এবং জনসমাজের উন্নতি সাধনের সংকল্প। তাঁহাদের পক্ষে ইহা সাজে না। তাঁহারা সর্ব্বদা চিন্তা করেন হৃদয়স্থিত আদর্শ কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা যায়; এবং তাহা জীবনে সাধন করিতে না পারিলে, তাঁহাদের মনে শান্তি ও আরাম থাকে না। আমাদের এত কথা বলিবার অভিপ্রায় এই, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের সমক্ষে একটী সামাজিক আদর্শ আনিয়া দিয়াছেন। প্রাচীন সমাজের যেরূপ বিধি ব্যবস্থা ছিল, তাহা আর আমাদের মনঃপূত হইতেছে না। আমরা উৎকৃষ্টতর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু লক্ষ্য করিলে কি হইবে, যদি তাহা একান্ত হৃদয়ে সাধন করিবার চেষ্টা না করা যায়? আমাদিগকে ধীরচিত্তে বিবেচনা করিতে হইবে যে সামাজিক ভাবে আমাদিগকে কি কি গুণাবলী অর্জ্জন করিতে হইবে, তৎপরে এরূপ সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে ঐ সকল গুণাবলী সমাজ মধ্যে বিকশিত হইতে পারে।

ভাবী ব্রাহ্মসমাজ—ভাবী ব্রাহ্মসমাজ কিরূপ হইবে, এ চিন্তা ব্রাহ্ম মাত্রেরই করা কর্ত্তব্য এবং এ বিষয়ে ব্রাহ্ম মাত্রেরই ভাবিবার ও করিবার কিছু আছে। বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী প্রধান লক্ষণ এই যে ইহা সামাজিক ভাবে সাধন হইতেছে—সমাজের উন্নতি অবনতির সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। আমাদের সামাজিক জীবন বিকৃত, দূষিত ও দুর্নীতি পূর্ণ হইলে, আমরা সেরূপ সমাজে এ ধর্ম্মকে সাধন করিতে পারিব না। এই কারণে ব্যক্তিগত সাধনের ন্যায় সামাজিক জীবনের উন্নতির দিকেও ব্রাহ্মদিগকে মনোযোগী হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে এরূপ একটী দল থাকা আবশ্যক—যাঁহারা আমাদের সামাজিক জীবনের উন্নতি সাধনে সবিশেষ মনোযোগী থাকিবেন, ও তদর্থ বিবিধ প্রকার উপায় অবলম্বন করিবেন; ভাবী ব্রাহ্মসমাজ ইঁহাদিগের দ্বারাই গঠিত হইবে। ভাবী ব্রাহ্মসমাজ বলিলেই সকলের দৃষ্টি স্বভাবতঃ ব্রাহ্মবালক বালিকাদিগের উপরে পতিত হইবে। ইহাদিগের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের উপর ভাবী ব্রাহ্মসমাজের সুখ দুঃখ বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। আমরা যতই চিন্তা করিতেছি ততই বোধ হইতেছে যে সম্ভব হইলে সমুদায় ব্রাহ্ম বালক বালিকাকে বোর্ডিংএ রাখিয়া শিক্ষা দিতে পারিলেই ভাল হয়। এক দিকে

দেখিতে গেলে পিতা মাতার সঙ্গের ন্যায় সঙ্গ কোথায় আছে, এবং গৃহই বালক বালিকার পক্ষে ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট শিক্ষার স্থান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বালক বালিকা যে গৃহে থাকিয়া সর্ব্ববিধ সুশিক্ষা লাভ করিতে পারে, এরূপ গৃহই এখন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অধিক নাই। বিশেষ যে সকল সামাজিক সদ্গুণ উপার্জ্জনের উপরে ভাবী ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি ও কল্যাণ নির্ভর করিতেছে, সেই সকল সদ্গুণ উপার্জ্জনের অনুকূল ব্যবস্থা অতি অল্প পরিবারেই আছে। একটী বোর্ডিং-এর ন্যায় স্থানে যে শৃঙ্খলা যে নিয়ম, যে সময়ের সদ্ব্যবহার, যে ধর্ম্মোপদেশের ব্যবস্থা করা সম্ভব; গৃহস্থের গৃহে ততদূর সম্ভব বোধ হয় না। এই সকল শাসন ও শিক্ষার মধ্যে থাকিয়া বর্দ্ধিত হইলে বালক বালিকার মনে সেই সকল বদ্ধমূল হইয়া যায়; এবং উত্তরকালে সেই সমুদায় ভাবী সামাজিক উন্নতির নিদানভূত হইতে পারে। এই জন্য বোর্ডিংগুলিকে সমাজের হস্তে পরমোপকারক যন্ত্র-স্বরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। সেখানে ভাবী ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ের একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ বলিয়াছেন যে শৃঙ্খলা, ও সময়ের সুব্যবস্থা ইংরাজের গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের একটী প্রধান লক্ষণ। বাস্তবিক ইংলণ্ডে গমন করিলে সর্ব্বাগ্রেই এইটী চক্ষে পড়ে। আমরা দূর হইতে বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করি, গ্লাডষ্টোনের ন্যায় ৮৪ বৎসরের বৃদ্ধ এত কাজ করেন কিরূপে? কিন্তু ইহার তলে যে এই শৃঙ্খলা (Method) আছে তাহা চিন্তা করি না। ইংরাজের গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনে (Method) না থাকিলে তাহাদিগের দ্বারা এত কাজ কোনও প্রকারে হইতে পারিত না। আমাদের বোধ হয় মধ্যবিত্ত ইংরাজ পরিবার সকলের বালক বালিকাগণ যে বোর্ডিংএ শিক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়, এই শৃঙ্খলার মূল সেখানে। সেখানে শৃঙ্খলাধীন থাকিয়া কাজ করিয়া তাহারা অভ্যস্ত হয়, পরে যখন গৃহধর্ম্মে প্রবেশ করে, তখন সেই অভ্যাস থাকিয়া যায়। এইরূপে শৃঙ্খলা ও সময়ের সুব্যবস্থা এক্ষণে ইংরাজের সামাজিক জীবনে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মদিগকেও সেইরূপ বালক বালিকাদিগকে বোর্ডিংএ রাখিয়া সেই সকল সদ্গুণে বর্দ্ধিত করিতে হইবে, যদ্দ্বারা উত্তরকালে ভাবী ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতি পক্ষে সহায়তা হইতে পারে।

স্বোপার্জ্জিত ধন—প্রতিদিন লোকে বাজার হইতে অর্থ দিয়া কত সুন্দর সুন্দর ফুল ফল ক্রয় করিয়া আনিয়া থাকে। আবার লোকে স্বীয় বাগানের স্বহস্ত-রোপিত গাছ হইতে—যে গাছে সে নিজে যত্নের সহিত সার প্রদান করিয়াছে এবং জলসিঞ্চন করিয়া বহু দিনের যত্ন ও সেবার পর যে গাছ ফুল ও ফল দানে সক্ষম হইয়াছে, সেই গাছ হইতে ফুল ফল সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই যে দুই প্রকারের ফুল ফল ইহাদের বস্তুগত যে বিশেষ কোন পার্থক্য আছে এমন নয়। বরং বাজার হইতে আনীত ফুল ফল অধিকতর মনোরম অধিকতর সৌন্দর্য্যে ভূষিতও হইতে পারে। কিন্তু সেই ব্যক্তির নিকট এই দুই প্রকার ফুল ফলের মূল্য কি সমান? তিনি কি এই উভয়কে এক চক্ষে দর্শন করেন? কখনই নয়। নিজ যত্নার্জ্জিত ফল ফুলের সহিত ক্রীত ফল ফুলের তুলনাই হইতে পারে না। যাঁহারা কখনও এই প্রকারে নিজ বাগানের স্বহস্তে রোপিত এবং যত্নসেবিত গাছ হইতে ফুল ফল লাভ করিয়াছেন; তাঁহারাই তাহার মূল্য বুঝিতে পারেন। তাঁহারাই এই দুই প্রকার ফুল ফলের বস্তুগত সাম্য বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও উভয়ের প্রভেদ অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। একদিন কোন গৃহস্থের বাটী হইতে একটী বেগুণ অপহৃত হয়। সেই বেগুণ অপহৃত হওয়ায়, তাঁহার এত কষ্ট হইয়াছিল, যে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমার যদি অন্য কোন বেশী মূল্যবান জিনিস যাইত, তথাপি আমার এরূপ কষ্ট হইত না। ইহা দ্বারা বুঝা যায় স্বোপার্জ্জিত বস্তু আর পরের অর্জ্জিত বস্তুতে কত প্রভেদ। ফুল ফলেই যে এরূপ প্রভেদ তাহাও নয়। ধন রত্নাদি সকল বস্তুতেই এইরূপ প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পিতৃ পুরুষের উপার্জ্জিত ধনের একরূপ মূল্য। আর নিজ-উপার্জ্জিত ধনের অন্যরূপ মূল্য। ইহার দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্রই দেখা যায়। লোকে পৈত্রিক ধন যত সহজে নষ্ট করিতে পারে, স্বোপার্জ্জিত ধন তত সহজে নষ্ট করিতে পারে না। বাহিরের ধন রত্ন বা অপরাপর বস্তুর সহিত যেমন স্বোপার্জ্জিত বস্তুর বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয়, ধর্ম্মধন সম্বন্ধে কি তাহা উক্ত হইতে পারেনা? বরং এখানে এ কথা আরও বেশী খাটে। কারণ ধর্ম্ম স্বোপার্জ্জিত ভিন্ন হয় না বলিলেই হয়। যাহারা হঠাৎ বড় মানুষ হইবার আশায় অন্যের হস্ত অবলম্বন করিয়া, অন্যের শক্তিতে শক্তিমান হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যদিও মনে করিতে পারেন যে খুব সহজেই ধর্ম্মের তত্ত্ব সব আয়ত্ত করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু সে সংস্কার বেশী দিন কাযের বেলায় সাহায্য করে না। যদিও করে, তাহারও মূল্য স্বোপার্জ্জিত তত্ত্বের নিকট অতি সামান্য। বৎসরের পর বৎসর মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, একান্ত অনুরাগ ও যত্নে একটী তত্ত্ব উপার্জ্জন করিলে, তাহা যেরূপ প্রাণের জিনিস হইবে, অন্য হইতে লব্ধ, অনায়াস বা অযত্নলব্ধ তত্ত্ব কখনই সেরূপ প্রাণের আদরের বস্তু হইতে পারে না এবং তাহা ধরিয়া থাকিবার প্রবৃত্তিও তেমন প্রবল হইতে পারে না। এজন্য যাঁহারা গুরুর শরণাগত হইয়া, রাতারাতি বড় মানুষ হইতে চাহেন, তাঁহাদের জীবন কখনই তেমন গভীর, তেমন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাহারা চিরদিনই পর মুখাপেক্ষী, পরানুসরণকারী হইয়া ভাসা ভাসা ভাবে চলিয়া থাকেন। তাঁহাদের জীবন নিরাপদ অবস্থায় যাইয়া সুশান্ত হইবার সুবিধা প্রাপ্ত হয় না। গুরুর অভাব হইলেই চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখেন। এজন্যও সকলেরই কর্ত্তব্য বিশেষ যত্ন ও আয়াসের সহিত ধর্ম্মকে নিজ সম্পত্তি করিতে প্রয়াসী হওয়া। সহিষ্ণুতা ও ধীরতার সহিত সত্যের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইতে যত্নশীল হওয়া। অন্যথা নিরাপদ অবস্থা পাইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

শক্তি-সমবায়।

মানব সমাজে সৎ ও অসৎ উভয় শক্তিই একত্র বাস করিতেছে, উভয়েই স্বীয় ইষ্ট সিদ্ধির দিকে ধাবিত হইতেছে। মঙ্গলময় বিধাতা কেন তাঁহার সৃষ্টি কার্য্যের মধ্যে অসৎ ও অমঙ্গলকে স্থান দান করিলেন, এই প্রশ্নও অতি দুরূহ ও গভীর। ইহার সমালোচনাতে প্রবৃত্ত হওয়া এই প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে। সৃষ্টি কার্য্যে মঙ্গলের সহিত অমঙ্গলের বিদ্যমানতা দেখিয়াই বর্ত্তমান যুগের চিন্তাশীল নাস্তিকগণ বলিয়াছেন, "হয় বল, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান নহেন, না হয় বল তিনি পূর্ণ মঙ্গল নহেন। তিনি যদি পূর্ণ মঙ্গল ও পূর্ণ শক্তিশালী হইতেন তাহা হইলে কি তাঁহার সৃষ্ট কার্য্যের মধ্যে অমঙ্গল বিদ্যমান থাকিত? সে যাহা হউক সৃষ্টি কার্য্যে আমরা মঙ্গলের সহিত অমঙ্গলকে বিদ্যমান দেখিতেছি। কেবল তাহা নহে, ইহাও অনুভব করিতে পারিতেছি যে,অসতের সহিত সংগ্রামে অসৎকে পরাস্ত করিয়া সৎ প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং অমঙ্গলকে নিবারণ করিয়া মঙ্গল আপনাকে জয়যুক্ত করিবে, ইহাই যেন বিধাতার বিধি। পার্শ্বে অসৎ না থাকিলে সৎ কাহার সহিত সংগ্রাম করিত ও কিরূপে প্রস্ফুটিত হইত? অতএব অসতের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের যে প্রকার সিদ্ধান্তই হউক না কেন, অসতের সহিত সংগ্রাম আমরা পরিহার করিতে পারিতেছি না। সৎ ও অসৎ দুই আমাদের চিন্তাকে আন্দোলিত করিতেছে, ভাবকে উত্তেজিত করিতেছে, জীবনকে আঘাত করিতেছে।

সৌভাগ্যক্রমে বিধাতা অসৎকে মানব জীবনের পার্শ্বে থাকিতে দিয়াও তাহার জয়ী হইবার উপায় রাখেন নাই। যাহা অসত্য, যাহা অসৎ তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হইবেই হইবে; মূলবিহীন বৃক্ষের ন্যায়, প্রাণবিহীন দেহের ন্যায় শুষ্ক ও বিনষ্ট হইবেই হইবে। ঋষিগণ বলিয়াছেন:—"সমূলো বা এষঃ পরিশুষ্যতি যোনৃত অভিবদতি।" যে অমৃতকে আশ্রয় করে সে সমূলে পরিশুষ্ক হয়। যুগে যুগে প্রত্যেক বিশ্বাসী এই কথা বলিয়াছেন এবং জগতের ইতিবৃত্তেও এই কথা প্রমাণিত রহিয়াছে। যাহা সত্য, যাহা প্রকৃত বস্তু তাহার অপলাপ অসম্ভব। গালিলিয় বলিলেন, "পৃথিবী ঘুরিতেছে," অজ্ঞ লোকে তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল, ঘরে ঘরে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই মতের প্রতিবাদ করিতে লাগিল; মানব সমাজে অনেক অশান্তি, অনেক বিরোধ, অনেক বিপ্লব ঘটিল; কিন্তু তাহা বলিয়া পৃথিবী থামিল না। যে ঘুরিতেছিল সেই ঘুরিতেই লাগিল। অবশেষে লোকের জ্ঞানকে সংশোধন করিয়া লইতে হইল। এইরূপ আজি হউক, কালি হউক, দুই শতাব্দীর পরেই হউক সত্যের দ্বারা জ্ঞানকে সংশোধন করিয়া লইতেই হইবে।

জগদীশ্বর যেরূপ অসত্যকে জয়শালী করেন নাই, সেইরূপ অসত্য ও অসৎকে সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করিবার শক্তি দেন নাই। জনসমাজের অল্প সংখ্যক অসদাচারী লোক বহু সংখ্যক শান্তি-প্রিয় ও সদাচারী লোককে সময়ে সময়ে যেরূপ উপদ্রুত করে, তাহা দেখিলে মনে হয়, যদি অসদাচারিগণ স্বীয় অভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার জন্য সমবেত হইতে পারিত, তাহা হইলে জনসমাজের কার্য্য চালান এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িত। আজ যদি জগতের সমুদয় উচ্ছৃঙ্খল ও নরদ্রোহী ব্যক্তিগণ শপথ পূর্ব্বক জনসমাজ উৎসন্ন দিবার জন্য দলবদ্ধ হয় এবং ডাইনামাইট অস্ত্র ধারণ করে, তাহার জন্যই সমগ্র জগৎ টলমল করিয়া উঠে। কিন্তু এই নরদ্রোহিগণ যে আপনাপন শক্তিকে সমবেত করিবে, তাহার পথে অন্তরায় অনেক রহিয়াছে। সমবেত ভাবে কার্য্য করিবার জন্য অধার্ম্মিককেও ধর্ম্মনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় এবং উদ্দাম স্বার্থপ্রবৃত্তিকে কিয়ৎপরিমাণে শৃঙ্খলিত করিতে হয়। স্বার্থান্ধ ও পাপাসক্ত নরদ্রোহিগণ তাহা পারে না বলিয়াই তাহাদের দ্বারা যতটা অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারিত, তাহা হইতে পারিতেছে না। কিন্তু অসতের পক্ষে সমবেত হওয়া যেরূপ দুষ্কর সত্যের পক্ষে সেরূপ নহে। প্রকৃতিই এই, তাহাতে প্রেম, কোমলতা ও আত্মবিনাশ আছে, সুতরাং তাহা সমবেত হইবার অনুকূল। এক্ষণে যে জনসমাজে অসতের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ এ নহে যে, তন্মধ্যে সৎ বিদ্যমান নহে, কিন্তু তাহার কারণ এই যে সৎ যাঁহারা তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও উদাসীন ভাবে রহিয়াছেন। যে সকল জাতি সমবেত শক্তির ইষ্টফল একবার লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সমবেতভাবে কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি দিন দিন বর্দ্ধিত দেখা যাইতেছে। সমাজ মধ্যে কোনও প্রকার দুর্নীতি বা কুরীতির প্রচলন দেখিলে তাঁহারা নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিতেছেন না। কিন্তু তাহার নিবারণ ও প্রতিবিধানের জন্য দশ জনে পরিকর বদ্ধ হইতেছে। পদ্মানদীতে কোনও নৌকা স্রোতের মুখে উঠিতে পারিতেছে না দেখিলে, অমনি চারিদিকে ক্ষেত্রে যে সকল কৃষক কাজ করিতেছিল, তাহারা ছুটিয়া আসে ও দশজনে ধরিয়া নৌকাখানি পার করিয়া দেয়। তাহাদের বুদ্ধিতেই বলে এরূপ কাজ দশজনে হাত না দিলে হয় না। সেইরূপ সভ্যদেশ সকলের অধিবাসীদিগের এই স্বাভাবিক বুদ্ধি জন্মিতেছে যে, সামাজিক অনিষ্ট নিবারণ ও সামাজিক উন্নতি-সাধন দশজনে সমবেতভাবে বদ্ধপরিকর না হইলে হয় না। এই সংস্কার তাঁহাদের অন্তরে দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে। আমাদের ভাব ইহার বিপরীত বলিয়া আমরা স্বীয় স্বীয় শক্তিকে সমবেত করিতে পারিতেছি না। আমাদের ভাব যেন এই প্রকার—"যাহার নৌকা সেই টানিয়া তুলুক আমি, মাথা ঘামাইতে যাইব কেন? আবার অনেক ভাল ভাল লোকের এ প্রকার ভাব দেখা গিয়াছে—"সৎ ও অসৎ দুই সমাজ মধ্যে থাকিবে, সকল সমাজেই আছে; অসৎকে দেখিয়া ভয় পাইলে চলিবে না; সতের উপদেশ দেও, সতের আচরণ কর, অসৎ আপনি নিবারিত হইবে।" ইহাও এক প্রকার স্ব-সুখ-পরতা ও উদাসীনতা। সৎ ও অসৎ সকল সমাজেই থাকে ইহা সত্য, সকল জীবনেই থাকে ইহাও সত্য। কিন্তু সৎ

জয়শীল থাকে ও সাহসে থাকে এবং অসৎ সংকুচিত থাকে ও শাসনে থাকে, ইহাই সমাজের প্রকৃত সুস্থ অবস্থা। তাহা না হইয়া যদি দেখি যে, সৎ সংকুচিত, হীন-সাহস ও পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে, এবং অসৎ অবাধে ও মনের আনন্দে বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছে, তাহা হইলে কি প্রকার সামাজিক অবস্থা প্রকাশ করে? অতএব যাঁহারা সতের পক্ষপাতী, তাঁহাদের সেই পক্ষপাতিত্ব কেবল হৃদয়ে বদ্ধ রাখিলে চলিবে না। আপনাপন শক্তিকে সমবেত করা তাঁহাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ও অতীব কর্ত্তব্য। পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিয়া অসৎকে শ্রীবৃদ্ধিশালী হইতে দিলে, তাঁহারা ঈশ্বর ও মানবের নিকট অপরাধী হইবেন।

উপরে সাধারণ ভাবে যে সত্যের আলোচনা করা হইল, তাহা বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মদিগের জীবনে প্রয়োগ করিতে পারা যায়। আমরা সকলেই যে শক্তিশালী লোক তাহা নহে। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিকে যদি আমরা সমবেত করি, তাহা হইলে তদ্দ্বারা অনেক অনিষ্ট নিবারিত ও ইষ্ট সাধিত হইতে পারে। যখন এদেশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রথ টানা হয়, তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকাও আসিয়া রথের কাছিতে হাত দেয়। তুমি মনে করিতে পার যে কাছি শত শত বয়ঃপ্রাপ্ত লোকে ধরিয়াছে, তাহাতে ক্ষুদ্র বালক বালিকার হাত দিয়া আর কি হইবে। কিন্তু তাহা নহে, ঐ বালক বালিকার ক্ষুদ্র আকর্ষণ রথের গতির পক্ষে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছে। সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজ রূপ রথের গতির পক্ষে তোমার আমার ক্ষুদ্র ও মহতের সকলেরই হাত দেওয়া আবশ্যক। এই সমবায় প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত না হইলে আমাদের কোনও কার্য্য সুচারুরূপে চলিবার উপায় দেখা যায় না।

যদি কোনও ব্রাহ্ম একরূপ মনে করেন, কাজ ত একপ্রকার চলিতেছে, আমি আবার কি করিব, কোথায় যোগ দিব। তবে বলিতে হইবে যে তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের গুরুত্ব এবং মহত্ত্ব এখনও সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্র অনন্ত বিস্তৃত। তাহার কয়েকটীমাত্র নির্দ্দেশ করিতেছি।

প্রথম—প্রচার। প্রচার ব্রাহ্মসমাজের একটী প্রধান কাজ। সকলে একবার চিন্তা করিয়া দেখুন একাজটী কিরূপ দুর্ব্বল ও ক্ষীণভাবে চলিতেছে। এ ক্ষেত্রে এখনও কত শত লোকের কার্য্য করিবার স্থান রহিয়াছে।

দ্বিতীয়—ব্রাহ্ম শিশুদিগের শিক্ষা। আমাদিগের মধ্যে কত পুরুষ ও কত মহিলা এ কার্য্যে জীবন দিলে তবে এ কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে!

তৃতীয়—সাহিত্য। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সমবায় শক্তি থাকিলে এবং সাহিত্যে পারদর্শী লোক থাকিলে, তাঁহারা ব্রাহ্মমিশন প্রেসটীকে সাহিত্য জগতে একটী প্রবল শক্তিরূপে পরিণত করিতে পারিতেন; ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থাবলী প্রণয়ন ও মুদ্রণ করিতে পারিতেন; ব্রাহ্ম গৃহস্থের গৃহে পাঠ্য সুনীতিপূর্ণ উপন্যাসাবলী প্রকাশ করিতে পারিতেন; বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত মুদ্রিত করিয়া ব্রাহ্মদিগের জ্ঞানকে উন্নত করিতে পারিতেন; সাধু মহাত্মাদের জীবন চরিত মুদ্রিত করিয়া লোকের ধর্ম্ম জীবনের সাহায্য করিতে পারিতেন। সমবায় শক্তির ও অনুরাগের অভাবে তাহা হইতেছে না।

চতুর্থ—ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের (culture) উন্নতি। এ বিষয়ে ব্রাহ্মগণ দিন দিন পশ্চাতে পড়িতেছেন বই অগ্রসর হইতেছেন না। আমাদের মধ্য হইতে কতকগুলি লোক দলবদ্ধ হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়টীকে কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারের ও বিদ্যার উন্নতির কত উপায় বিধান করিতে পারেন। সমবায় শক্তির অভাবে তাহার কিছুই হইতেছে না।

পঞ্চম—জনহিতৈষণ। সুরাপান নিবারণ, পতিতা রমণীদিগের উদ্ধার, দারিদ্র্য দুঃখ নিবারণ প্রভৃতি কত জনহিতকর কার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে, সমবেত ভাবে কার্য্য করিলে যে সকল কার্য্যে ব্রাহ্মগণ বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

এত প্রকার কার্য্যক্ষেত্র হাতের নিকট থাকিতে কোনও ব্রাহ্ম যেন এই বলিয়া দুঃখ না করেন যে তাঁহার খাটিবার কার্য্যক্ষেত্র কোথায়? আমরা আমাদের স্বেচ্ছাচার-প্রবৃত্তি ঈর্ষ্যা প্রভৃতিকে সংযত করিয়া সমবেত হইতে পারি না এই কথাই বলুন। তাহাই সত্য কথা।

ধর্ম্মসাধনে সাধুসঙ্গ।

মহাকবি ভবভূতি প্রণীত একখানি সংস্কৃত নাটকের মধ্যে নিম্নলিখিত কবিতাটী প্রাপ্ত হওয়া যায়;—

বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথা তথৈব জড়ে;
নতু খলু তয়োর্জ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহন্তি বা।
ভবতিচ পুন র্ভূয়ান্ ভেদঃ ফলং প্রতি তদ্যথা
প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্‌গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ॥

অর্থ—"গুরু প্রাজ্ঞ ও জড় বিচার না করিয়াই সকলের প্রতি সমানভাবে বিদ্যা বিতরণ করিয়া থাকেন; তিনি কাহারও বোধশক্তি প্রদান করেন না বা হরণ করেন না; কিন্তু ফলে দেখিতে পাই অনেক তারতম্য ঘটিয়া থাকে; নির্ম্মল আতসী কাচই সূর্য্যরশ্মিকে প্রতিফলিত করিতে পারে মৃৎপিণ্ড তাহা পারে না।"

বিদ্যালয়ে সকলেই গমন করে, উৎকৃষ্ট শিক্ষকের সংসর্গে অনেক ছাত্রও বাস করে, সকলে সমান বিদ্যালাভ করে না কেন? ইহার উত্তরে কেহ বা বলিবেন সকল ছাত্রের ধারণাশক্তি সমান নহে, কেহবা বলিবেন সকল ছাত্র সমানরূপ প্রণিধান করে না। তবে দেখিতেছি দুইটী বিষয়ের পার্থক্য নিবন্ধন ফলগত তারতম্য উপস্থিত হয়। প্রথম ধারণাশক্তি, দ্বিতীয় প্রণিধান-শক্তি। ধারণাশক্তির উপরে কাহারও হাত নাই। সকলে সমানরূপ মস্তিষ্ক লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। কাহারও কাহারও মেধা অতীব আশ্চর্য্য। যে বিষয় তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত হয়, তাঁহারা ত্বরিত তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন এবং তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন। আবার কাহার কাহারও প্রকৃতি কিঞ্চিৎ জড়ভাবাপন্ন; কোনও বিষয়ের

মর্ম্মগ্রহণ করিতে তাঁহাদের বিলম্ব হইয়া থাকে। এরূপ কথিত আছে, যে সার আইজাক নিউটন যখন শিশু ছিলেন তখন তাঁহার নিকটে ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম ভাগের সাতচল্লিশ প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া শুনান হইয়াছিল। তিনি শুনিবামাত্র বলিলেন ইহা ত সত্য। যে প্রতিজ্ঞার সত্যতা বোধ করিতে কত বয়ঃপ্রাপ্ত বালকের মস্তক ঘুরিয়া যায়; শিশু নিউটন স্বতঃসিদ্ধ ভাবে অনুভব করিলেন যে তাহা সত্য। কিন্তু এই মানব সংসারে সার আইজাক নিউটন হইয়া সকলে জন্মগ্রহণ করে না। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণাধ্যাপক অশেষ-শাস্ত্রজ্ঞ পরলোকগত তারানাথ তর্ক বাচস্পতি মহাশয়ের বিষয়ে এরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, তিনি পঠদ্দশাতে সপ্তাহের অধিকাংশ দিন, এবং দিনের অধিকাংশ সময় গল্প করিয়া বেড়াইতেন, হয় ত একদিন রাত্রে কয়েক ঘণ্টা পাঠ্য গ্রন্থ লইয়া বসিলেন, অমনি দিব্যালোকের ন্যায় সমুদয় বিষয়ের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমুদয় কণ্ঠস্থ করিয়া লইলেন। সেকালে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে নাথুরাম শাস্ত্রী নামে একজন পশ্চিম দেশীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কাব্যেরও অলঙ্কারের অধ্যাপক ছিলেন; তিনি বাঙ্গালা জানিতেন না সংস্কৃত ভাষাতেই কথা কহিতেন ও অধ্যাপনা কার্য্য চালাইতেন। তিনি অনেক সময়ে হাসিয়া বলিতেন—

"মম যত্র যত্র সন্দেহ স্তত্রৈব তারা পৃচ্ছতি।"

অর্থ—"যেখানে যেখানে আমার সন্দেহ আছে, সেই সেই খানেই তারা প্রশ্ন করে।" তারানাথের এই ধারণাশক্তি লইয়া সকলে জন্মগ্রহণ করে না।

বিদ্যা লাভ বিষয়ে ধারণাশক্তির ন্যায় প্রণিধান-শক্তিরও প্রয়োজন। অনেক বুদ্ধিমান ছাত্র প্রণিধানের অভাবে উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকটে থাকিয়াও বিদ্যালাভ করিতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন এই, এই প্রণিধান সকলের হয় না কেন? উত্তর,— জ্ঞানলাভের জন্য যাহার ব্যাকুলতা আছে, তাহারই প্রণিধান হয় অপরের হয় না। প্রতিদিন চক্ষের উপরে দেখিতেছি, দেশের শত শত ধনিসন্তানের বিদ্যা-শিক্ষার জন্য কত উপায় অবলম্বিত হইতেছে। তাহাদিগকে বিদ্যালাভে সহায়তা করিবার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া উপযুক্ত শিক্ষক সকল দেওয়া হইতেছে; তাঁহারা উঠিতে বসিতে সঙ্গে রহিয়াছেন; উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়, উৎকৃষ্ট শিক্ষক, উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় প্রভৃতি সমুদয় আয়োজন রহিয়াছে, অথচ তাহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক বালকই কৃতবিদ্য হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইতেছে। ইহার কারণ কি? তাহাদের সকলেই কি জড়মতি? তাহা নহে, কারণ ঐ সকল বালকের অনেকে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিষয় কার্য্যনির্ব্বাহে সবিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেছে। তাহার কারণ তাহাদের জ্ঞানস্পৃহার অভাব, সুতরাং শ্রম প্রবৃত্তির অভাব। এইরূপে প্রতিদিন এই সত্যের ভূরিভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে জ্ঞান-স্পৃহা-সম্পন্ন, ব্যাকুল ও শ্রমশীল ছাত্রই গুরূপদেশের দ্বারা উপকৃত হয়। যাহার স্বাবলম্বন নাই, জ্ঞানস্পৃহা নাই, শ্রমশীলতা নাই, তাহার কর্ণে বিদ্যা ঢালিয়া দিলেও তাহার উপকার হয় না। বিদ্যা-লাভে স্বাবলম্বন-শক্তিই উন্নতির ভিত্তি, গুরূপদেশ সহায় মাত্র।

কিন্তু স্বাবলম্বন-শক্তি মূল ভিত্তি বলিয়া গুরূপদেশের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করা যায় না। এক্ষণে সকল বিষয়েই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়াছে। একটী দুরূহ বিষয়কে সমুচিত রূপে অধিকৃত করিতে হইলে, যে যে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রয়োজন, তাহাও নানাবিধ গ্রন্থে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে একজন লোক নিজ গৃহে বসিয়া শ্রম ও অনুসন্ধানের দ্বারা অধিকাংশ বিদ্যা লাভ করিতে পারে। তবে বড় বড় কলেজে বড় বড় বেতন দিয়া প্রোফেসার নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন কি? ডাক্তারি গ্রন্থ ঘরে বসিয়া পড়িয়া ও নিজ পরীক্ষার দ্বারা ত একজন ডাক্তার হইতে পারে, তবে মেডিকেল কলেজ খুলিয়া হাজার হাজার টাকা বেতন দিয়া প্রোফেসার নিযুক্ত করা হয় কেন? ইহার কারণ এই, ঐ সকল কৃতবিদ্য প্রোফেসার সেই সকল গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় সাধনের দ্বারা আয়ত্ত করিয়াছেন; তদ্ভিন্ন নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা তৎসংক্রান্ত অনেক নূতন তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সন্নিধানে বসিলে অল্প সময়ের মধ্যে এত বিশদরূপে এত মূল্যবান জ্ঞান-সম্পত্তি লাভ করা যায়, যাহা নিজে অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে বহুকাল সাপেক্ষ। যখন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও উৎকৃষ্ট শিক্ষক উভয় সম্মিলিত হয়, তখন বিদ্যালাভ কার্য্য সহজে ও সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হয়।

বিদ্যালাভ সম্বন্ধে অধ্যাপক যে কার্য্য করিয়া থাকেন ধর্ম্মজ্ঞান লাভ সম্বন্ধে সাধু-সঙ্গও সেই কার্য্য করিয়া থাকে। এখানেও স্বাবলম্বন উন্নতির মূল ভিত্তি। যাহার ব্যাকুলতা নাই, নিজের সাধন ও শ্রম নাই, তাহাকে কে ধর্ম্ম দিতে পারে? তাহাকে যদি যুগ যুগ ধরিয়া ধার্ম্মিক জনের সঙ্গে ফেলিয়া রাখ, তথাপি সে ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবে না। যে সকল ব্যাপারের দ্বারা কত ঐরাবত চূর্ণ হইয়া যাইতেছে, কত পাতকী নবজীবন পাইতেছে, কত জীবনে বিপ্লব ঘটিতেছে, যে ব্যক্তি তাহার মধ্যে থাকিবে, সকলি দেখিবে, শুনিবে, অথচ কিছুরই উপকার প্রাপ্ত হইবে না। পদ্ম-পত্রের জল যেরূপ উপর দিয়া গড়াইয়া যায়, পত্রকে সিক্ত করে না, সেইরূপ সদুপদেশ সকলও তাহার মনের উপর দিয়া গড়াইয়া যাইবে, তাহার মনকে সিক্ত করিতে পারিবে না। আমরা কি এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইতেছি না? কিন্তু স্বাবলম্বন মূল ভিত্তি বলিয়া এখানেও সাধু সঙ্গকে একেবারে অগ্রাহ্য করিলে চলে না। অপরাপর বিষয়ের ন্যায় বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম গ্রন্থেরও অপ্রতুল নাই; ধর্ম্মজীবনের সকল অবস্থার উপযোগী গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে সকল পাঠ করিয়াও অনেকে ধর্ম্মজীবনের সাহায্য লাভ করিতে পারে তবে আবার সাধু-সঙ্গের প্রয়োজন কি? আবার বলিতেছি বিদ্যালাভ বিষয়ে অধ্যাপক যাহা করিয়া থাকেন ধর্ম্মসাধন বিষয়ে সাধুসঙ্গও তাহা করিয়া থাকে। শাস্ত্রে ত ধর্ম্মের তত্ত্ব সকল নিহিত আছে, কিন্তু সেই সকল তত্ত্বকে সাধনের দ্বারা আয়ত্ত করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে সেই সকল তত্ত্বের মর্ম্মগ্রহণ সম্বন্ধে এবং অনেক নূতন তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার সম্বন্ধে কত সহায়তা হইতে পারে? এবিষয় লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত

হওয়ার কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। ব্রাহ্ম যদি বিদ্যা লাভের জন্য অধ্যাপকের অধীন হওয়াতে আপত্তি না করেন, তবে ধর্ম্মসাধন বিষয়ে সাধুজনের অধীন হইতে কেন আপত্তি করিবেন? আমাদের বোধ হয় যাহা সহজ ও স্বাভাবিক তাহাকে অতিরিক্ত মাত্রাতে গ্রহণ করাতেই লোকের বিরুদ্ধভাব উৎপন্ন হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই একটী মহাসত্য স্মরণ রাখিতে হইবে সেটী এই—"তোমার ধর্ম্মের ভার ঈশ্বর কাহারও উপরে অর্পণ করেন নাই, তাহা তোমাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে, সাধন করিতে হইবে ও উপার্জ্জন করিতে হইবে।" এবিষয়ে কাহারও প্রতি সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিলে আপনাকে মনুষ্যত্ব হইতে হীন করিয়া শিশুত্বে পরিণত করা হয় এবং যে উদ্দেশে এরূপ করা হয় সেই উদ্দেশ্যই সফল হয় না; এরূপ ব্যক্তি প্রকৃত ধর্ম্মজীবন প্রাপ্ত হইতে পারে না।

যোগ ও ব্রাহ্মসমাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৭। নাম ও সঙ্গীত সাধন। স্বরূপাত্মক নাম ও স্বরূপ ধ্যান একই বস্তু। কিন্তু নাম সাধনে সাধারণতঃ ধ্যানের ন্যায় গভীরতা থাকে না। হৃদয়তন্ত্রীর সহিত সুর মিলাইয়া বিভুগুণ গান করা আত্মার পক্ষে বিশ্রাম, আমোদ ও উপকারজনক। সর্ব্বদাই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করতঃ ধ্যান-নিরত হওয়া সম্ভবপর নহে। মস্তিষ্কের অবকাশ প্রয়োজন, নচেৎ অত্যধিক তপ্ত মৃন্ময় তণ্ডুলাধারের তণ্ডুল সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই শতখণ্ড হওনের ন্যায়, উহার উদ্দেশ্য সাদ্ধ বিষয়ে ব্যাঘাত জন্মে। নাম, স্বরূপ বা ভাবোদ্দীপক সঙ্গীতের মানসিক বা শাব্দিক ভাবে স্বভাব আবৃত্তি নানাপ্রকারে হিতজনক। এই সমুদায় অভ্যাসের সহিত "তস্মিন্ প্রীতি" এবং "তস্যপ্রিয় কার্য্য সাধনং" নিতান্ত প্রয়োজন। প্রকৃতরূপে নাম করিতে পারা ও ব্রহ্ম দর্শন সম্ভোগ করা একই বস্তু এবং ব্রহ্ম দর্শন ও প্রকৃত জীবনও একই বস্তু। সেই জন্যই গুরু নানক বলিয়াছিলেন, "আজীবা, বিসরে মর্‌জানা, আক্তথান্ আখা সাঁচা নাম, সাঁচা নামকি লাগে ভুখ; যো খাওয়ে সো তরিয়াওয়ে দুঃখ।" অর্থাৎ তাঁহাকে স্মরণই জীবন; তাঁহার বিস্মৃতিই মৃত্যু। খাঁটি নামই প্রকৃত জীবন। প্রকৃত নামের ক্ষুধা হইলে উহা যে ব্যক্তি ভোজন করেন তিনি দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইয়া অক্ষয় আনন্দ ধাম লাভ করেন। এই কারণেই মহামতি ব্যাসদেবের সর্ব্ব বিধির সার বিধি এই যে "স্মর্ত্তব্যো সততং বিষ্ণুঃ," এবং নিষেধ এই যে "ন বিস্মর্ত্তব্যো কদাচনঃ।" এই কারণেই রোমক সাধক বলিয়াছেন "think of God *oftener than you* breathe"—কেবল প্রতি নিশ্বাসে নহে, যতবার নিশ্বাস লও তদপেক্ষা অধিকবার তাঁহার প্রেমমুখ স্মরণ করিও। যাঁহার অজপা সাধিত হইয়াছে, তিনি ধন্য। তাঁহার ভাব ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধশীল।

এই যে "দমে দমে নাম" লওয়া ইহা কল্পনা না প্রকৃত প্রস্তাবেই সম্ভব, তাহা যিনি ভগবদ্‌প্রেমসিক্ত আত্মার সৌম্য মূর্ত্তি ও নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপশিখা ভাব পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তিনিই জানেন। এইরূপ সাধুগণ চলা ফেরা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কার্য্যের দ্বারা ব্রহ্মের নাম প্রচার ও গুণকীর্ত্তন করেন। তাঁহাদের হৃদয় মধুচক্র সদৃশ মধুর সৌরভময় ও চিত্তভৃঙ্গাকর্ষক। তাঁহাদের আত্মা যেন আনন্দ ও মাধুর্য্যরসে বিভোর হইয়া আছে "কেবা শুনাইল তব নাম? জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।" এই নাম 'বৃথা উচ্চারণ' করিলে বিপরীত ফল হয়, অর্থাৎ নামাপরাধ হয়। বৃথা নাম লওয়ার অর্থ এই যে, যে সময়ে মন বিষয়ান্তরে নিযুক্ত, তৎকালে শূন্য ভাবে উহা উচ্চারণ করা, শুষ্কতাজনক শূন্য ভাবে, অর্থাৎ প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি ভাব শূন্য হইয়া নামকে কেবল শাব্দিক বস্তুতে পরিণত করিলে একটী বৃথা নাম করিবার প্রবৃত্তিরূপ অভ্যাস ও তজ্জনিত আধ্যাত্মিক অবনতি জন্মে। মহাজনেরা নাম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন—এমন কি ঈশ্বরের নামকে তাঁহাপেক্ষাও গুরুতর বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে আমরা নাম দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করি—অতএব নাম মহদ্বস্তু। বস্তুতঃ ধারণার অবস্থাতে নাম ও নামিত বস্তুর প্রভেদ দূর হয়।

৯। সহকারী উপায়। বিষয়াসক্ত চিত্তকে সাধনের উপযোগীও অনুকূল করিতে হইলে প্রথমতই সত্যাসত্য, সারাসার বিচার জনিত বিবেক ও বৈরাগ্য প্রয়োজন। অসার ত্যাগ করিয়া সার জ্ঞান ও লাভের আকিঞ্চন হইলেই 'বাসনায়াম্' বাসনা সংযম হইবে। গভীর বারিধিতে নিমগ্ন হইয়া হস্ত পদ ইতস্ততঃ বলপূর্ব্বক সঞ্চালন করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য; ইতস্ততঃ যাইলে বিপদ। স্থির ভাবে সংযত ইচ্ছা ও সংযতচেষ্ট হইয়া গন্তব্য পথে যাইতে হইবে। আত্মা নিজেই আত্মার ইঞ্জিনিয়ার। উহার ব্যাকুল ইচ্ছা থাকিলে, উহা পূরণের পথ নিজেই আবিষ্কার করিবে ও খুঁজিয়া, লইবে। যাহা যাহা করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুবিধা হইবে, উহা তাহা জানিতে পারিবে ও করিবে।

সৎসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থ, সদালোচনা হইতে জীবন্ত ও মৃত ব্যক্তিগণের সাধু চিন্তা, ভাব ও সাধন-রহস্য অবগত হওয়া যায় এবং বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, প্রভৃতি মহানুভাবোদ্রেককারী কথাগুলি আত্মার বল, স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তি সম্পাদন করে।

আত্ম পরীক্ষাদির দ্বারা বিশেষ ফল হয়। আমাদের কি অভাব, কত পরিমাণে উহা দূর হইতেছে বা না হইতেছে, তৎসম্বন্ধে কি কি করিতেছি বা উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে ইত্যাকার ভাবনাদ্বারা সাধনরূপ সোপানে আরোহণের অবলম্বন একান্ত প্রয়োজন।

লক্ষ্য স্থির হওয়া চাই। আমরা কি চাই তাহা স্থির হইলে, কোন্ পথে, কোন্ উপায়ে উহা লাভের সুবিধা হইবে, স্থির করিয়া লক্ষ্যের দিকে পদ সঞ্চালন করিতে হইবে, নচেৎ ইতস্ততঃ করিলে কোন ফল হইবে না।

এইত গেল অতিশয় সংক্ষেপে সহজ ও প্রকৃত আধ্যাত্ম যোগ সাধনের সম্বন্ধে কয়েকটী মোটামুটি কথা। ইহার মূল

আত্মা ও আত্মজ্ঞানে। কিন্তু শাখা জীবনের প্রত্যেক অংশ। সাধন এই কথাটীর আদি, মধ্য ও অন্ত্য অক্ষর কি, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তবে বলি "চরিত্র, কর্ত্তব্য ও আত্ম-বশীকরণ।" প্রকৃতিস্থ আত্মার পক্ষে এই সমুদায় স্বাভাবিক কার্য্য। সাধনের বস্তু নহে। কিন্তু যাহাদের আত্মা বিকৃত, তাহাদের পক্ষে আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করার প্রয়োজন। ইহার প্রকৃষ্ট উপায় বহু সদ্‌গ্রন্থে ও সাধুমুখে লাভ করা যায়, বিবেচনা দ্বারাও বাহির করা যায় বটে, কিন্তু সাধন-প্রবীণ ব্যক্তিরাই শ্রবণাদি ও পরীক্ষা দ্বারা ভালরূপ জানেন। আমাদের লক্ষ্য উচ্চ হওয়া চাই, কখনই নীচ হওয়া উচিত নহে। যদি আমাদের চরিত্র মৌলিক না হয়, তাহা হইলে আদর্শ চরিত্র সম্মুখে রাখিয়া তাহার নকল করিতে হইবে। পাপ হইতে মুক্তি কামনা করিবার, অজ্ঞান তিমির হইতে উত্তীর্ণ হইবার, এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই উত্তম পুরুষের সহিত নিত্য যোগে মিলিত হইতে বাসনা, আকাঙ্ক্ষা ও আশা করিবার প্রত্যেক মানবেরই অধিকার আছে। এ "আশাই" মুক্তির হেতু। কিন্তু "আশার" সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত চেষ্টা চাই। মুক্তি বা যোগ কিছু ব্যক্তি ও সম্প্রদায় বিশেষের পৈত্রিক বা একচেটীয়া বস্তু নহে। সর্ব্বত্রই জীবের প্রাণে পিপাসা আছে, ও পিপাসার শান্তির জন্য নির্ম্মল ও শীতল সলিলের উৎসও আছে। সম্প্রদায় বিশেষের অন্তরে ধর্ম্মাভিমানজনিত স্ফীতি অবৈধ।

আত্ম-বশীকরণ। ইহা সাধারণের পক্ষে বড় সহজ নহে। ভয়ানক কঠিন। রিপুগণের আয়তন এমন বেয়াড়া রকমের বৃদ্ধি পাইয়াছে যে আমরা সুবিধা পূর্ব্বক উহাদিগকে "পাক্‌ড়াইতে" পারি না। উহারা ধরা ছোঁয়া দেয় না, অথচ লুক্কায়িত চীলের মত কোথা হইতে আসিয়া ছোঁ মারিয়া আমাদের অন্তরস্থ বহু যতনের সামগ্রী সমূহ কাড়িয়া লইয়া যায়। হাফেজের মত উচ্চ আত্মাও উত্তাল তরঙ্গের বিভীষিকাময় ভীষণ আকার দেখিয়া কাতর, ব্যাকুল ও অসহায় ভাবে চিৎকার করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনিই ধীর ভাবে অনাথশরণের চরণ ধরিয়াছেন, যিনি "ভাসায়ে দিয়েছেন দুকূল, সেই অকূল কাণ্ডারীর করে," তিনিই আত্মার মধ্যে, দুর্ব্বলতার মধ্যে "মাভৈঃ!" রবের বজ্রনির্ঘোষ শুনিয়াছেন। তিনি তরঙ্গমধ্য হইতে তীরস্থ লঘুচিত্ত ব্যক্তিগণকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে পারেন "আমি দুর্ব্বল হইয়াও সবল। আমি মরিতে মরিতে বাঁচিতেছি।" আমার দীর্ঘ নিশ্বাস বা ক্রন্দন তোমরা শুনিও না, আমার অশ্রু তোমরা দেখিও না। আমি একলা সংগ্রাম করিব, একলা বাঁচিব বা মরিব। আমি আমার আত্মা-প্রকোষ্ঠের ক্ষুদ্র কোণে বসিয়া আমার,-বন্ধুকে হৃদয় বেদনা জানাইব। আমি একলা কাঁদিব, তিনি একলা শুনিবেন।"

মুষ্টিআঘাতের দ্বারা কাঁঠাল পাকান কতদূর ভাল জানি না। অধিকাংশ লোকেই কিল-পক্কতার পক্ষপাতী। বৃক্ষ-পক্কতার দিকে বুঝি কেহই নহেন। কোন কোন যোগ কামিগণ চাহেন, যে আমরা বসিয়া থাকিব, কিন্তু বন হইতে একটী জটাজুটধারী গুরু-অভিধান সাধক বহু সাধনের ধন অর্জ্জন করিয়া আনিয়া আমাদের প্রাণে সঞ্চার করিবেন। সেই শক্তি লাভ করিয়া আমরা জিতেন্দ্রিয় হইয়া সাধন করিব। অলস ব্যক্তির পক্ষে উহা সহজ নহে, গুরুই আসুন, আর যিনিই আসুন। স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও যত্নশীল ব্যক্তির পক্ষে উহা সহজ, অতএব গুরু-বল-সাহায্য নিষ্প্রয়োজন।

"ব্রহ্ম দর্শন।" ধর্ম্মের বাজারে একটা প্রকাণ্ড হৈ চৈ পড়িয়াছে যে অমুকের ব্রহ্ম দর্শন হইতেছে, হইয়াছে বা হইবে এবং অমুকের নিকট একটী গুপ্ত তাড়িতাধার আছে, যাহার শক্তির কিঞ্চিন্মাত্র সঞ্চারিত হইলেই, রেলগাড়ির এঞ্জিনের ন্যায় উহা আমাদিগকে পশ্চাৎ হইতে ঠেলিয়া ধাক্কা দিয়া হুট করিয়া গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবে। বেশ কথা। কিন্তু প্রথমতঃই ত মাশুল দিতে হইবে, আত্ম-বিক্রয় করিতে হইবে, দেউলিয়া হইতে হইবে ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতাচরণ করা হইবে। পরে গন্তব্য স্থানে উপনীত হওনের সম্বন্ধেও কিন্তু আমার অতি গভীর সন্দেহ আছে। ব্রহ্মদর্শন বস্তুটী ইতিপূর্ব্বে গোলকুণ্ডার খনি-মধ্যে, বা হিমালয়ের নিবিড়তার মধ্যে লুকান ছিল—"নিহিতং গুহায়াম্" ছিল, ব্রহ্ম "গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং" ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন—কেহ কেহ বা তাঁহার কণামাত্র লাভ করিয়া মহতাখ্যান উপার্জ্জন করিলেন। তাঁহারা যে এই সাত রাজার ধনের বিন্দুমাত্র অংশ লাভ করিলেন, তাহার মূল্য নাই—কেবল বিনিময়ে বিন্দু বিন্দু শোণিত, হৃদয় ও জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়। সকলে তাহা দিতে পারে না। কিন্তু অনেকেই উহা পাইতে চায়। তাহারা উহার মর্য্যাদা জানে না, কত কাঠ খড় প্রয়োজন তাহা জানে না। ইহার খদ্দের বাড়িল বটে, কিন্তু আসল বস্তু কেহ দিতেও পারে না—কেহ কিনিতেও পারে না—অথচ চাই, মন ভুলান চাই—অমনি একটা নকল মেকির সৃষ্টি হইল, যাহা পথে ঘাটে পাওয়া যাইতেছে। "ব্রহ্মদর্শন" এখন, বুঝি অনেকেই করিতে-ছেন। বস্তুটী সাধকের হৃদয়গুহা হইতে সজোরে টানিয়া রাজ-পথে বাহির করা হইয়াছে—শেষে কতদূর গড়াইবে বলা যায় না। আবার ইহারও গতিক বড় সুবিধাজনক নহে। শুনা যাইতেছে যে, ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গে তৎপারিষদবর্গও থাকেন, তিনি একলা থাকেন না বা ইহাঁদের নিকট একলা আসিতে সাহসী নহেন। এক হইতে তেত্রিশ কোটী খেচর, ভূচর উভচর, জলচর, দেবদেবীগণ ইহলোক ও পরলোক প্রভৃতি হইতে যে যেখানে ছিলেন আহার নিদ্রা বর্জ্জন করিয়া কোন কোন সাধকের মনোরঞ্জনার্থ তাঁহার ক্ষুদ্র ও কোমল মস্তিষ্কের বিস্তৃত কল্পনারাজ্যে মহা সমারোহের সহিত আসিয়া নৃত্য গীত আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনই সহানুভূতি নাই। আমরা ব্রহ্মদর্শনকে এমন কিম্ভূত-কিমাকার বস্তু মনে করি না—উহা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইবে একদিনে বা জীবনে উহা ফুরাইবে না—উহা গুরুতর হইতেও গুরুতর বস্তু—ব্রহ্মের কৃপাই তাহা লাভের একমাত্র উপায়, মানব-কৃপা নহে।

উহার জন্য ছুটাছুটী করিলে চলিবে না; বৎসর বৎসর ধীরে ধীরে ভূমি কর্ষণ, ও বীজ বপন করিতে হইবে—উপযুক্ত

ঋতুতে কৃপাবারি বর্ষিত হইবে—এবং উপযুক্ত কালে আমরা অমৃত লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব।

(ক্রমশঃ)

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন, কিম্বা কাহারও পত্র ফেরত দিতে বাধ্য নহেন)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

অভ্রান্ত গুরুবাদ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

অবিচারিত ভাবে অনেক গুলি মত ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া, ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ের উপরে বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এক্ষণে কেহ সেই সকল মতের বিরুদ্ধে কিছু বলিলে কি করিলে তাহাকেও অবিচারিত ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী বলিয়া মনে করা হয়। এইরূপ বিচার বিহীন সিদ্ধান্ত যে সমাজে যে পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সমাজ সেই পরিমাণে অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়ে, গোঁড়ামীই কেবল সেখানে সমাজাস্থিতির কর্ত্তা হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ ভাব হইতে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের কতই না অনিষ্ট হইয়াছে। নব গঠিত ব্রাহ্মসমাজ যাহাতে এই রোগের হস্ত হইতে রক্ষা পান, ইহাই প্রার্থনীয়। আমরা ইচ্ছা করি, যে সকল মত লইয়া বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজের অভিভাবকগণ স্থির ভাবে সে সকল বিষয় লইয়া বিচার করুন, তাহাতে ব্রাহ্ম সাধারণের মত ও মন অধিকতর উদার হইবে এবং মতান্তর জনিত মনান্তরও অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইবে আশা করা যায়। "পুনর্জ্জন্মবাদ" ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী বলিয়াই ব্রাহ্মসাধারণের বিশ্বাস ছিল, কিন্তু চিন্তাশীল ও সাধনশীল ব্রাহ্ম অভিভাবকগণ পুনর্জ্জন্মবাদকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী মনে করেন না, পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস করিয়াও একজন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম থাকিতে পারেন এরূপ মনে করেন। এরূপ জানিতে পারায় উক্ত বিষয় লইয়া গোঁড়ামী ভিতরে ভিতরে কিছু কমিয়া যাইতেছে। অন্যান্য বিষয় লইয়া আলোচনা হইলেও অনেক উপকারের সম্ভাবনা।

ব্রাহ্মসমাজে যোগ লইয়া যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে অভ্রান্ত গুরুবাদের আলোচনা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। "সত্যই" যখন আমাদের শাস্ত্র, তখন এতকাল যাহা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি, সত্যটা পাছে বা তাহার বিরুদ্ধ হয়, এরূপ ত্রাস ব্রাহ্মের মনে উপস্থিত হওয়া কদাচ সঙ্গত নহে। যাহা মিথ্যা ও কুসংস্কার বলিয়া বহুকাল পরিত্যাগ করিয়াছি, সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে তাহাকে অম্লানবদনে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করাই সত্যানুরাগের লক্ষণ। বিশ্বাস করি ব্রাহ্মগণের মধ্যে এরূপ সত্যানুরাগ ও সৎসাহস বিরল নহে। এক্ষণে আমি আলোচ্য বিষয়ের অবতারণ করার পূর্ব্বে পাঠকগণকে একটী বিষয় বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি; "অভ্রান্ত গুরুবাদ ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী কিনা" ইহাই আমার আলোচ্য বিষয়, কিন্তু কিরূপে গুরুনির্ণয় করা হইবে এবং কেই বা গুরু হইবেন সে সকল কথা এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে, এবিষয়টী সর্ব্বদা মনে রাখিয়া আলোচনা করিতে হইবে।

আমার মনে হয় ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধন তত্ত্বের যাহা মূলমন্ত্র তাহারই উপর অভ্রান্ত গুরুবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল তত্ত্ব। যাঁহারা ধর্ম্মকে কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক ব্যায়াম মনে করেন, ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব মানেন না, মানুষ যে ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মবাক্য শ্রবণ করিতে পারে এসমস্ত বিশ্বাস করেন না, বিবেকের অতিরিক্ত ঈশ্বর প্রত্যাদেশ যাঁহারা মানেন না, তাঁহাদের সহিত আমার আলোচনা নহে এবং এবিষয় আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইতে ও প্রয়াসী নহি। যাঁহারা ঐ সমস্ত বিষয় অন্ততঃ মতে মানেন তাঁহাদিগের নিকটই আমার বিচার প্রার্থনা।

স্বীকার্য্য।

১। ঈশ্বর অভ্রান্ত ইহা স্বীকার্য্য।

২। ঈশ্বরের বাণী অভ্রান্ত ইহা স্বীকার্য্য।

৩। ঈশ্বরবাণী মানবাত্মায় প্রকাশ পায় ইহা স্বীকার্য্য।

এই তিনটী স্বীকার্য্য ধর্ম্মের প্রাণ এবং এই স্বীকার্য্য ত্রয়ই অভ্রান্ত গুরুবাদের জনক। এই তিনটীকে অস্বীকার করিলে অভ্রান্ত গুরুবাদ কিছুতেই টেকে না এবং এই তিনটীকে স্বীকার করিলে অভ্রান্ত গুরুবাদকে উপেক্ষা করা যায় না। মানুষ আপনার অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যে সকল কথা বলে, তাহা আমরা বহু পরিমাণে বিশ্বাস করিতে পারি বটে, কিন্তু অভ্রান্তরূপে স্বীকার করিতে আপত্তি করিতে পারি। যে সকল দার্শনিক মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী এক সময় সত্য বলিয়া স্থির প্রতিষ্ঠিত ছিল। সময়ে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। কিন্তু ঈশ্বরের বাণী কখনই ভ্রান্ত হইতে পারে না। পাঠক মনে রাখিবেন জগতে যে সকল কথা ঈশ্বরবাণী বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরবাণী কিনা এবং তাহা সত্য কি মিথ্যা এ প্রবন্ধে আমরা সে বিষয়ের আলোচনা করিব না, সে বিষয়ে এক্ষণ মনোযোগও করিব না, কেন না তাহাতে আমাদের চিত্ত মূল বিষয়ের বিচারে অক্ষম হইবে। জগতে এ পর্য্যন্ত কেহ ঈশ্বরবাণী শুনিতে পাইয়াছেন কিনা তাহা আমাদের বিচার্য্য বিষয় নহে। কিন্তু "মানুষ ঈশ্বরবাণী শুনিতে পায়" ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী কথা নহে এবং এরূপ কথা বিশ্বাস করিয়াও একজন খাঁটি ব্রাহ্ম থাকিতে পারেন তাহার কিছু সংশয় নাই। এক্ষণ কতকগুলি কথা উপর্য্যুপরি রাখিয়া আমি আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। ঈশ্বর অভ্রান্ত।

২। ঈশ্বর-বাণী অভ্রান্ত।

৩। ঈশ্বর-বাণী মানবাত্মায় প্রকাশ পায়।

৪। এমন কোন ব্যক্তি থাকা অসম্ভব বা অযৌক্তিক নহে যিনি ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া শিষ্যকে সেই উপদেশ দিতে পারেন।

৫। ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া উপদেশ দিলে সে উপদেশ অভ্রান্ত।

৬। যিনি সেইরূপ অভ্রান্ত উপদেশ প্রদান করেন, তিনিই ত অভ্রান্ত গুরু।

ইহার যে কোন কথা অস্বীকার করিলে সমগ্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে অস্বীকার করা হয়। গুরুবাদের যে মূল তত্ত্ব অতি সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হইল, তাহাতে কোন মানুষকে অভ্রান্ত বলা হইল না। কেবল অভ্রান্ত গুরুর কথাই বলা হইল। প্রয়োজন হইলে এ সকল কথা অধিকতর পরিষ্কার করা যাইবে।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ,

ব্রাহ্মসমাজ।

শোক-সংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় গত ১২ই নবেম্বর কলিকাতার বাটীতে ইহলোক লীলা সংবরণ করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এ বৎসর দুইটী উজ্জ্বল রত্ন হারাইলেন, পুণ্যদাপ্রসাদ এবং ক্ষেত্রমোহন। ক্ষেত্র বাবুর বিয়োগে তাঁহার বিধবা পত্নী এবং শিশুসন্তানগণ যেমন শোকসাগরে ভাসিতেছেন, তাঁহার বন্ধুগণও তেমনি শোকে নিমগ্ন হইয়াছেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিই তাঁহার বিচ্ছেদে ম্রিয়মান্ হইবেন। গত ২৬এ নবেম্বর হরিঘোষের ষ্ট্রীটে ক্ষেত্র বাবুর বন্ধু বাবু মহেন্দ্র চন্দ্র দাঁর গৃহে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু সীতানাথ দত্ত উপাসনা করেন, বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত পাঠ করেন। উপাসনা ক্ষেত্রে অনেকেই অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারেন নাই। ক্ষেত্র বাবুর অনাথা পত্নী শ্রাদ্ধোপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগ সাধনাশ্রম, দাসাশ্রম, প্রভৃতিতে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত আগামী বারে প্রকাশিত হইবে। পরমেশ্বর শোকদগ্ধা বিধবার প্রাণে শান্তিদান করুন, এবং এই অনাথ পরিবারকে ধর্ম্মপথে রক্ষা করুন।

প্রচার—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নির্দ্ধারণ অনুসারে বাবু কালীচন্দ্র ঘোষালবিক্রমপুরে গমন পূর্ব্বক দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত কোন কোন স্থানে সাহায্য প্রদান করেন; কিন্তু দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হওয়ায় সম্প্রতি তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের কার্য্য ব্যতীত তিনি নানা স্থানে বক্তৃতা, উপাসনা, সংগীত এবং কথকতাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

নামকরণ—গত ৫ই নবেম্বর বজ্রযোগিনী নিবাসী বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষালের কন্যার নামকরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বাবু কালীচন্দ্র ঘোষাল উপাসনা করেন। কন্যার নাম সুবালা রাখা হইয়াছে।

গত ৬ই অগ্রহায়ণ আমাদের পাবনাস্থ বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগ্‌চির তৃতীয় পুত্রের নামকরণ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে, সন্তানের নাম শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র রাখা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এই উপলক্ষে কৈলাস বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন, ঈশ্বর শিশুদিগকে দীর্ঘায়ু করুন।

বিবাহ—গত ১৯এ কার্ত্তিক কুষ্টিয়ার বাবু দুর্গাচরণ বিশ্বাসের ভ্রাতা বাবু কুঞ্জবিহারী বিশ্বাসের সহিত ময়মনসিংহের বাবু রামদুর্ল্লভ মজুমদারের কন্যা শ্রীমতী সুবালা মজুমদারের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এতদুপলক্ষে রামদুর্ল্লভ বাবু নিম্নলিখিতরূপ দান করিয়াছেন;—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগ ১০৲ দাতব্যবিভাগ ৩৲ সাধনাশ্রম ২৲ গৃহতাড়িত ব্রাহ্মদিগকে ২৲ দাসাশ্রম ২৲ ব্রাহ্মবালক বোর্ডিং ২৲ বালিকা বোর্ডিং ৫৲, মোট ২৬৲ টাকা।

২রা অগ্রহায়ণ কলিকাতার মন্দিরে আর একটি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র ভবানীপুর নিবাসী বাবু গিরিশচন্দ্র দে, পাত্রী টাকীর বাবু কেদারনাথ রায়ের কন্যা শ্রীমতী প্রভাবতী রায়। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন। উভয় বিবাহই ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টারী হইয়াছে। পরমেশ্বর নব দম্পতিদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

উৎসব—সিন্দুরিয়াপটি পারিবারিক ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক ব্রাহ্মোৎসব গত ১১ই অগ্রহায়ণ সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃকালে বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন, রাত্রিতে বাবু কেদারনাথ রায় উপাসনা করেন। উপাসনান্তে দুই বেলাই প্রীতি-ভোজন হয়।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

উৎসব—শিলং ব্রাহ্মসমাজের উনবিংশতিতম উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে;—

৪ঠা নবেম্বর শনিবার—রাত্রে উদ্বোধন। বাবু রাচন্দ্র চৌধুরী উপাসনা এবং উপদেশ প্রদান করেন।

৫ই রবিবার—প্রাতে লাবান উপাসনা-সমাজে উপাসনা হয়, বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং বেলা ৩টার সময় শিলং ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে "বিশ্বাস" সম্বন্ধে বাঙ্গালায় বক্তৃতা করেন। তৎপরে তিনি উপাসনা করেন।

৬ই সোমবার—রাত্রে বাবু সদয়াচরণ দাস মহাশয়ের বাড়ীতে উপাসনা হয়। নীলমণি বাবু পাঠ ও উপাসনা করেন।

৭ই মঙ্গবার—প্রাতে লাবানে পথে পথে উষাকীর্ত্তন হয়। বাবু লালমাধব বসু মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া নীলমণি বাবু প্রার্থনা করেন। মধ্যাহ্নে মহিলা সমাজের উৎসব হয়। রাত্রে বাবু নবগোপাল দত্ত সমাজ মন্দিরে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও প্রার্থনা করেন।

৮ই বুধবার—উৎসবের দিন। বাবু রাচন্দ্র চৌধুরী প্রাতে সমাজ মন্দিরে উপাসনা এবং উপদেশ প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে "ঈশ্বরের প্রতি প্রেম" সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তৎপরে কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন এবং "প্রভুকে জীবনে গৌরবান্বিত কর" এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

৯ই বৃহস্পতিবার—রাত্রে বাবু রাচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীতে কীর্ত্তন হয়। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী প্রার্থনা করেন।

১০ই শুক্রবার—রাত্রে বাবু তারকনাথ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে উপাসনা হয়। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন।

১১ই শনিবার—বেলা ৪॥টার সময় মৌখার ব্রাহ্মসমাজে "ঈশ্বরে মানবীয় ভাব আরোপ" এই বিষয়ে খাসিয়া ভাষায়

এক বক্তৃতা করেন। পরে রাত্রে বাবু তারিণীচরণ নন্দীর বাসায় কীর্ত্তনাদি হয়। বাবু শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রার্থনা করেন।

১২ই রবিবার—প্রাতে লাবান উপাসনা সমাজে উপাসনা হয়। বাবু রাইচরণ দাস উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে নির্জ্জন পাহাড়ে প্রার্থনাদি হয়। বাবু সদয়াচরণ দাস এবং বাবু রাচন্দ্র চৌধুরী প্রার্থনা করেন। অপরাহ্নে সমাজ মন্দিরে উপাসনা হয়। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন এবং "স্পর্শমণি" এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

দুর্ভিক্ষ।

ইতিপূর্ব্বে আমরা জানাইয়াছি যে, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রিলিফ ফণ্ডের হস্তে আমরা কিছু টাকা পাঠাইয়াছি। সেই কমিটী দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে বিক্রমপুরে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই লোক উত্তর বিক্রমপুরে ৩৮ খানা গ্রামে সাহায্য করিয়াছেন। ঐ ৩৮ খানা গ্রামে ১১২৮ জন লোককে সাহায্য করা হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে পুরুষ ১০৬ জন, স্ত্রীলোক ৩৯৬ জন, বালক বালিকা ৬২৬ জন, মোট ১১২৮ জন। এই কার্য্যে ব্রাহ্মসমাজের টাকা হইতে বেশী টাকা ব্যয় হয় নাই। মুন্সিগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের লোকের হাতে যে টাকা দিয়াছেন, সেই টাকা দ্বারাই অধিকাংশ স্থানে সাহায্য করা হইয়াছে। ঐ ৩৮ খানা গ্রাম ভিন্ন আরও দুইটী গ্রামের দুইটী ভদ্র পরিবারকে গোপনে সাহায্য করা হইয়াছে। তৎপরে বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষালকে সাহায্যার্থে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

প্রথমাবস্থায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল, সেই সময় মুন্সিগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের যত্নে অনেক লোকের কষ্ট নিবারণ হইয়াছিল।

ভদ্রলোক এবং কৃষকদিগের অধিক কষ্ট হয় নাই। চাউল দুর্ম্মূল্য হওয়াতেই তাহাদের যাহা কিছু কষ্ট হইয়াছিল। অনাথা বিধবা দিগের ভয়ানক কষ্ট হইয়াছিল, দুঃখের বিষয় ইহারা দিনের পর দিন উপবাস করিয়া কাটাইয়াছেন, তথাপি প্রকাশ্যে সাহায্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন নাই। আমাদের এজেণ্ট গোপনে অনেক চেষ্টা করিয়া কয়েকটী বিধবার সাহায্য করিয়াছেন। বিক্রমপুরে এখন ধান পাকিতেছে, ইহাতে শ্রমজীবীদিগের কতক পরিমাণে সুবিধা হইতেছে।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার—কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতে যে, বিক্রমপুরের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে:—

গত প্রকাশিতের পর।

নাম	স্থান	দান
বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	এসেনশোল	১৲
„ আশুতোষ রায়	ঐ	॥০
„ সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	।০
একজন বন্ধু		২৲
মজুমদার এণ্ড কোং	কলিকাতা	১৲
বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ হইতে প্রাপ্ত বাবু দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সংগৃহীত মারঘারিটা	আসাম	৫০৲
বাবু কালীকৃষ্ণ বসাক	কলিকাতা	১৲
„ উমাকান্ত দাস	ঐ	৮৲
„ মাখনলাল ঘোষ	ঐ	।০
„ দেবেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়	ঐ	।৵০
„ দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী	ঐ	।০
„ দেবেন্দ্রনাথ রায়	ঐ	।০
„ ফণীন্দ্রনাথ বসু	ঐ	১৲
„ দীননাথ গুপ্ত	হাজারিবাগ	২৫৲
মিঃ এম, এল, নীল মারফত বাবু কালীকৃষ্ণ বসাক		১৲
বাবু দীননাথ গাঙ্গুলী	ধারওয়ার	৫৲
„ হীরালাল হালদার	কলিকাতা	২৲
„ কালীপ্রসন্ন বসু	ঐ	॥০
„ কুঞ্জবিহারী মিত্র	সইদপুর	২৲
„ উদয়চরণ মল্লিক	কলিকাতা	১৲
„ বনমালী ধর	ঐ	॥০
„ দুর্গানারায়ণ বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত	মেদিনীপুর	৪।০
„ চন্দ্রশেখর ঘোষাল	আজমির	১৲
„ বিনোদলাল মুখোপাধ্যায়	ঐ	২৲
„ লক্ষ্মণ সিং	দার্জ্জিলিং	৪৲
„ হরিনাথ রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত	চাইবাসা	৭॥৵
		১২০৸/০
	পূর্ব্ব প্রকাশিত	৪২৯৮৵০
		৫৫০॥৶০

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্বকৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের গ্রাহক এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যমহোদয়গণকে পত্র লিখিয়া এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া আমরা বড় আশা করিয়াছিলাম যে তাঁহারা স্ব স্ব দেয় টাকা অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাসময়ে এবং সত্বর পাঠাইয়া সমাজের অনেক অভাব ও দুঃখ দূর করিবেন। বৎসর ত শেষ হইতে চলিল, এখন দেখি অনেক সভ্য ও গ্রাহকের হিসাবে বিস্তর অনাদায় রহিয়াছে। যাঁহাদিগকে ধারে পুস্তক বিক্রয় করা হইয়াছিল তাঁহাদিগের নিকট হইতে,এবং মফস্বলস্থ কোন কোন এজেণ্টের নিকট হইতে সমস্ত বৎসরে যে টাকা পাইয়াছি তাহা নিতান্ত সামান্য।

আগামী মাঘোৎসবের পূর্ব্বে সমাজের অনেক দেনা পরিশোধ করিতে হইবে,এবং অন্যান্য নানা প্রকারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। এক্ষণে সমাজের সভ্য ও সহযোগী মহোদয়গণ তাঁহাদিগের স্বীকৃত চাঁদা ও পুস্তকের মূল্য, এবং পত্রিকাদ্বয়ের গ্রাহক মহোদয়গণ পত্রিকাদ্বয়ের মূল্য পাঠাইতে আর যেন বিলম্ব না করেন তাঁহাদিগের সকলেরই নিকট আমার এই বিনীত প্রার্থনা।

পত্রিকার অনেক বৎসরের মূল্য বাকী আছে। সুতরাং তাঁহাদিগের পত্রিকা বন্ধ করা কর্ত্তব্য এইযুক্তি অনুসরণ করিতে আমরা আদৌ প্রস্তুত নাই। একজন গ্রাহকও যদি তাহাই বাঞ্ছনীয় মনে করেন, আমারা নিতান্তই মর্ম্মাহত হইব।

সাঃ ব্রাহ্মসমাজ ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৩০ নবেম্বর ১৮৯৩	শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার বিগত তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনে সাঃ ব্রাঃ সমাজের সঙ্গীত, পুস্তক, বক্তৃতা ও উপদেশাদি হইতে হরি প্রভৃতি পৌত্তলিক নাম উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত যে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল, অধ্যক্ষ সভা কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে সে সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কি তাহা স্থির করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বিষয়টি অতিশয় গুরুতর। এনিমিত্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এরূপ স্থির করিয়াছেন যে এবিষয় সম্বন্ধে ব্রাহ্ম মাত্রেরই মতামত সংগ্রহ পূর্ব্বক যথা সম্ভব নির্দ্ধারণ স্থির করিতে চেষ্টা করিবেন। অতএব কলিকাতা এবং মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজ এবং ব্রাহ্মমাত্রেই অনুগ্রহ করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মতামত নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা অত্যন্ত উপকৃত ও বাধিত হইব।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয় ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা ৩০ নবেম্বর ১৮৯৩	শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়। সহকারী সম্পাদক,সাঃ ব্রাঃ সমাজ

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১৮ই অগ্রহায়ণ প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৭শ সংখ্যা।
১৬শ ভাগ।

১লা পৌষ, শুক্রবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৶৹

"যৎকল্যাণ মভিধ্যায়েৎ তত্রাত্মানং নিয়োজয়েৎ।"

"যাহা কিছু কল্যাণ বলিয়া জানিবে, তাহাতে আপনাকে নিয়োগ করিবে।"

বিশাল জগৎ-তত্ত্ব কি তুমি বুঝিবে?
দেখা বোঝা সকলি অসার,
প্রকৃতির যবনিকা তুমি উদ্ঘাটিবে
হেন সাধ্য কি আছে তোমার।

যে ভূমে দাঁড়ায়ে আছ, ওই পদতলে
লক্ষ রেণু; এক রেণু লয়ে
দেখিতে বুঝিতে যাও, চিন্তার অতলে
মগ্ন হবে দিশা হারা হয়ে।

জীবনের আদি কোথা? এই সূত্র ধরি
যাও জীবে দেখিতে বুঝিতে,
লাখ লাখ যুগ যাও কল্পনাতে তরি
এ সমস্যা রহি যাবে চিতে।

আপনা বুঝিতে যাও আদি অন্ত লয়ে,
কি বুঝিছ? কে তুমি এখানে?
এ গোলোক-ধাঁধা-মাঝে কোন্ পথ দিয়ে
আসিয়াছ কাহার সন্ধানে?

কি দেখিবে? কি বুঝিবে? দেখা বোঝা যত,
পথ চলা আলোকে আঁধারে;
ভাঙ্গিছে গড়িছে বিশ্ব যে শক্তি নিয়ত
তারি ক্রোড়ে সঁপ আপনারে।

আলোকে আঁধারে পথ যা কিছু দেখিছ,
তাহে চল; আলোক আসিবে;
ফেলিতে চরণ দেখ সে পথে রাখিছ,
আগু পিছু কি আর ভাবিবে?

কেবা কি করেছে কবে আগু পিছু ভেবে?
কে বেঁচেছে কেবা বাঁচায়েছে?
বুনিয়ে বুদ্ধির জাল কে তরেছে ভবে?
গুটি-পোকা নিজে জড়ায়েছে।

বুনো না বুদ্ধির জাল আগু পিছু করি;
কল্যাণেতে সদা লাগি রও;
যে শক্তি পালিছে বিশ্ব সদা ক্রোড়ে ধরি
আগু পিছু তাঁরি হাতে দেও।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সরল পথ—জীবনের সরল পথ সকলেই চায়; কিরূপে সে সরল পথ পাওয়া যায়? বিশ্বাসী এবং নির্ভরশীল ব্যক্তি-রাই এই সরল পথ পাইয়া থাকেন; অপরের জন্য তাহা নহে। অভিসন্ধির সরলতা যেখানে, জীবন পথের সরলতা ও সেখানে। মনুষ্য সত্য ও সৎভিন্ন অন্য কিছু লাভ করিবার অভিসন্ধি রাখে বলিয়াই জীবনের পথ কুটিল হইয়া যায়। আর যে সাধুর চিত্তে সত্য ও সৎকে আশ্রয় করা ভিন্ন অন্য কামনা নাই, তাহার জীবনের পথ চিরদিন সরল। তাঁহার জীবনে যে বিপদ আসে না, বা তাহার প্রতি লোকের বিরাগ বা বিদ্বেষ বুদ্ধি জন্মে না, বা তাঁহাকে সময়ে সময়ে প্রলোভন জালে জড়িত হইতে হয় না, তাহা নহে; এ সকলি তাঁহার পক্ষে সম্ভব এবং হয়ত ঘটি-য়াও থাকে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে কোন প্রকার অভি-সন্ধি না থাকাতে সে প্রলোভন জাল তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না; বা সে বিদ্বেষ তাঁহাকে পথচ্যুত করিতে পারে না। পূর্ণেন্দু যেমন ক্ষণিক মেঘজাল হইতে মুক্ত হইয়া দ্বিগুণ শোভা ধারণ করে, সেইরূপ তাঁহার বিমল চরিত্রও সেই ক্ষণিক উপ-রাগ হইতে মুক্ত হইয়া অধিকতর সমুজ্জ্বল হয়। হয়ত তাঁহার জীবদ্দশাতে নানাবিধ কারণে লোকে তাঁহার মহত্ত্ব ও সাধুতা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু এই মর্ত্ত্য-লীলার অন্তে যখন তাঁহার স্মৃতি ও তাঁহার স্বর্ণোপম কার্য্য সকল এ জগতে পড়িয়া থাকে, তখন পরবংশীয় পুরুষেরা তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করিয়া ও কীর্ত্তি কলাপ আলোচনা করিয়া মুগ্ধ হইতে থাকে। কত সাধু মহাজনের জীবনচরিতে এই কথার সাক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তের জন্য আমাদিগকে দূরে যাইতে হইবে না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জীবদ্দশাতে তিনি স্বদেশবাসীদিগের কিরূপ বিরাগ ভাজন

হইয়াছিলেন তাহা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। যখন হিন্দু স্কুল স্থাপনের সূচনা হয়, তখন সহরবাসী ভদ্রলোকেরা বলিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় কমিটীতে থাকিলে তাঁহারা সে কমিটীতে থাকিবেন না। তাঁহার প্রতি কলিকাতা সহরের বড়লোকদিগের বিদ্বেষবুদ্ধি এতই প্রবল ছিল। ইংলণ্ডে যখন রাজার মৃত্যু হয়, তখন হোরেস হেমান উইলসন্ সাহেব ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ইংলণ্ডে বাস করিতেছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয়ের সহিত উইলসন সাহেবের অতিশয় প্রীতি ছিল। রাজার মৃত্যু হইলে ডাক্তার উইলসন রামকমল সেনকে সেই সংবাদ দিয়া শেষে লিখিলেন—"কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, রামমোহন রায় সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না।" পাছে রামকমল সেন বিরক্ত হন এই ভয়ে এ কথাটাও যেন তিনি ভয়ে ভয়ে লিখিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের প্রতি লোকের এতই বিদ্বেষ ছিল। কিন্তু আজ সে বিদ্বেষ কোথায়? সমুদ্রতীরে শিশুহস্ত-নির্ম্মিত বালুকাময় প্রাচীরের ন্যায় তাহা কালস্রোতে ধৌত হইয়া গিয়াছে। রামমোহন রায়ের গুণাবলী ও কীর্ত্তিকলাপ জাগ্রত রহিয়াছে আর সকলি কালগর্ভে বিলীন হইয়াছে। ইহার কারণ কি, রামমোহন রায় সুখের ও দুঃখের কুটিল পথ পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যের সরল পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আর এই সরল পথে চলিবার যে পুরস্কার তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "লোকে আমার যতই প্রতিকূলতাচরণ করুক না কেন, এই চিন্তা জনিত আত্মপ্রসাদ হইতে কেহই আমাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না যে, আমার অভিসন্ধি তাঁহার নিকট বিদিত যিনি নির্জ্জনে দর্শন করিয়া সজনে পুরস্কৃত করেন।" এই সংকল্পের বিশুদ্ধতাই তাঁহার সর্ব্ব প্রধান অস্ত্র স্বরূপ ছিল, এবং ইহাই তাঁহার পথের সরলতাকে রক্ষা করিয়াছিল।

সত্যাদর—কিছুদিন হইল কলিকাতা সহরে উপর্য্যুপরি কয়েক দিন আফিং কমিশনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত কমিশনের সহিত ইংলণ্ডের আফিং ব্যবসায় নিবারণী সভার সম্পাদক আলেকজণ্ডার সাহেব আসিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মদিগের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া বিগত ৪ঠা ডিসেম্বর সোমবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সুরাপান নিবারণ সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতার মধ্যে অনেক সারবান কথা ছিল। কিন্তু তাঁহার মুখে একটী কথা শুনিয়া আমরা অতিশয় লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছি। তিনি বক্তৃতার মধ্যে দুঃখ করিয়া বলিলেন, আমি এদেশে আসিয়া এদেশের ভদ্রলোকদিগের মুখে অনেক ভাল ভাল ও বড় বড় কথা শুনিয়াছি, কিন্তু অনুসন্ধান দ্বারা পরে বুঝিতে পারিয়াছি যে, তাহার অধিকাংশ কপটতাপূর্ণ। এদেশীয় শিক্ষিত লোকদিগের কপটতা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। আলেকজণ্ডার সাহেব একজন বারিষ্টার; তিনি স্বীয় বিশ্বাসের জন্য নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া কেবল জনহিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; সুরাপান নিবারণের উদ্দেশে আফ্রিকা দেশে গমন করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে কপটতা দেখিয়া মর্ম্মাহত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। আমাদের লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, একজন বিদেশীয় ভদ্রলোক এদেশে কয়েক দিনের জন্য আসিয়া এদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সহিত মিশিয়া এই দেখিয়া গেলেন যে, ইংরাজী শিক্ষাতে ইহাদিগকে কপট করিয়াছে। তিনি এই ধারণা লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন—ইহাই দুঃখের বিষয়। এই কপটতা এক প্রকার ব্যাধির ন্যায় অনেকের চরিত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে, অপরকে প্রবঞ্চনা করিতে করিতে অনেকের জীবনে প্রবঞ্চনাই স্বভাব ও সত্য-প্রিয়তা তাহার ব্যতিক্রম স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন কি বর্ত্তমান সময়ে যে অনেকের মুখে স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার ভিতরেও কপটতা প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এই জন্য সে সকল কথারও কোনও প্রকার শক্তি জাগিতেছে না। এই অন্তঃসারবিহীন কপটতা মানব-চরিত্র হইতে অন্তর্হিত না হইলে কোনও প্রকার মহৎ ও উচ্চ ভাব তাহাকে অধিকার করিতে পারে না। এজগতে মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব কপটের জন্য নহে। চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যগত সত্যতা না থাকিলে মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয় না।

ক্ষুদ্র কার্য্যে মহৎ ভাব—শ্রম বিভাগের দৃষ্টান্ত দিতে হইলেই লোকে সচরাচর আলপিন নির্ম্মাণ প্রণালীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকে। এক পয়সাতে হয় ত চল্লিশ পঞ্চাশটী আলপিন পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ঐ আলপিন গুলি কত লোকের শ্রমের ফল স্বরূপ? একজন লোহার তার কাটিয়াছে, একজন ঘষিয়াছে, একজন অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করিয়াছে, একজন আলপিনের মাথাটী করিয়াছে। এইরূপে নানা হস্তের ভিতর দিয়া একটী আলপিন প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেকে যদি স্বীয় স্বীয় অংশ সুচারুরূপে সম্পন্ন না করে তাহা হইলে সমগ্র আলপিনটী সুন্দর ও উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। ধর্ম্মসমাজের কার্য্যকেও এই ভাবে দেখিতে হইবে। আমাদের যাহার প্রতি যে কার্য্যের ভার আছে, আমরা প্রত্যেকে যদি তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন না করি, তাহা হইলে সমগ্র কার্য্যটী কখনই সুন্দর ও উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। এই ভাবটী যদি আমাদের সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সমাজের বিশেষ কল্যাণ হয়। এক অর্থে ধর্ম্মসমাজের সকল কাজই সমান, কারণ সকল কাজই ঈশ্বরের কাজ, এবং তদ্দ্বারা তাঁহারই সেবা হয়। কিন্তু আর এক দিক দিয়া দেখিলে সকল কাজ সমান নহে, কোনও কাজ ক্ষুদ্র ও সামান্য এবং কোনও কাজ মহৎ। যাঁহার হস্তে ক্ষুদ্র কাজটীর ভার পড়িয়াছে তিনি যদি মনে করেন, এই সামান্য কাজে আবার মনোযোগী হইব কি? বড় কাজ যখন আসিবে তখন সুচারুরূপে সম্পন্ন করিব এবং নিজের সমগ্র শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করিব, তাহা হইলে সমাজের অধিকাংশ কার্য্যই দুর্দ্দশাপন্ন হইবে। যাঁহার হস্তে ক্ষুদ্র কার্য্যটীর ভার পড়িয়াছে, তাঁহাকেও মহৎভাবে দেখিতে হইবে। তিনি স্মরণ রাখিবেন যে, তাঁহার

চরিত্রের উন্নতি বা অধোগতি তদুপরি নির্ভর করিতেছে। তিনি যদি দায়িত্ববিহীন ভাবে, ঔদাসীন্যের সহিত সে কর্ম্মটী সমাধা করেন, তাহা হইলে ঐ প্রকারে কার্য্য করা তাঁহার অভ্যাস হইয়া যাইবে। একবার দায়িত্ববোধের শিথিলতা জন্মিলে, তিনি যে কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইবেন, কোনটীই সুচারুরূপে করিতে পারিবেন না; তাঁহার বিবেক অনুজ্জ্বল হইয়া যাইবে এবং তিনি ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী ও মানবের অবজ্ঞার পাত্র হইবেন।

জীবনের মধ্য পথ—যুবরাজ সিদ্ধার্থ যখন পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া তপস্যার্থে নিরঞ্জন নদীর অভিমুখে গমন করেন, তখন পাঁচজন ব্রাহ্মণ যুবক তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়াছিলেন। ইঁহারাই সেই অরণ্য মধ্যে তাঁহার কঠোর তপস্যার সাক্ষী ও সঙ্গী ছিলেন। কিন্তু যে দিন বুদ্ধ কঠোর তপস্যাকে বিফল জানিয়া পরিত্যাগ করিলেন ও নিয়মিত অন্নপান গ্রহণ করিতে লাগিলেন, সেই দিন তাঁহার প্রতি উক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর মন চটিয়া গেল। তাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বারাণসীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। শাক্য সিংহ তাহাতে ভগ্নহৃদয় না হইয়া দ্বিগুণ প্রতিজ্ঞার সহিত পুনরায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। যখন তিনি সিদ্ধিলাভ করিলেন, তখন সর্ব্বাগ্রে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন এবং কাশীধামে তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের নিকট নিম্নলিখিত ভাবে স্বীয় মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলেন:—"হে ব্রাহ্মণগণ। দুই অতিরিক্ত সীমাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে; একদিকে, যে ইন্দ্রিয় সুখাসক্তির দ্বারা চিত্তকে কলুষিত করে, তাহাকে বর্জ্জন করিতে হইবে; অপরদিকে যে কঠোর তপস্যা শরীরকে ভগ্ন ও চিত্তকে অশান্তি পূর্ণ করে, তাহাকে ও পরিহার করিতে হইবে।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম মহাত্মা শাক্যসিংহের প্রদর্শিত এই পথকে অবলম্বন করিয়াই চলিতেছেন। কিন্তু এই পথ অতি কঠিন পথ, তাহা আমরা প্রত্যেকে প্রতিদিন অনুভব করিতেছি। আমরা প্রতিদিন বলিয়া থাকি যে সংসারে বাস করিব অথচ তাহাতে লিপ্ত হইব না। এই মর্ম্মে কত উপদেশ আমাদের বেদী হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে; কত দৃষ্টান্ত আমাদের সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। রাজর্ষি জনকের দৃষ্টান্ত আমরা কতবার প্রদর্শন করিয়াছি ও সে বিষয়ে কতবার আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ের একজন ধর্ম্মোপদেষ্টা সর্ব্বদা বলিতেন যে ধনীর গৃহের দাসী যেরূপে ধনী সন্তানের সেবা করে, সেইরূপে সংসারের সেবা কর। অর্থাৎ ধনীর দাসী যেমন ধনীর সন্তানকে খাওয়ায় ধোওয়ায়, নাচায়, আদর করে; জননী নিজ সন্তানকে যাহা করিয়া থাকে, তাহা সমুদায় করে, এবং হয় ত অন্তরের সহিত প্রীতিও করে, কিন্তু ইহা বিলক্ষণ স্মরণ থাকে যে, সে সন্তান তাহার নহে, সে বড় হইলেই তাহার হস্ত হইতে যাইবে। সেইরূপ সংসারকে খাওয়াও ধোওয়াও নাচাও আদর কর, কিন্তু সর্ব্বদা স্মরণ রাখ যে, তাহা তোমার নহে, এ দৃষ্টান্তটীও অতি সুন্দর তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কাজে দেখিতেছি এ ভাবে, সংসারকে সেবা করার ন্যায় কঠিন কাজ অতি অল্পই আছে। যাঁহারা বলিতেছেন, সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরের সেবা করিব তাঁহাদের অনেকে বিষয় সুখের মাত্রাকে এত বাড়াইতেছেন, যে ঈশ্বর-সেবা চাপা পড়িয়া যাইতেছে। যীশু বলিয়াছেন "কেহই দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না, বিষয় ও ঈশ্বর উভয়কে এক সঙ্গে সেবা করা যায় না।" ব্রাহ্মগণ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন—ঠিক কথা। দুই প্রভু রাখিলে সেবা করা কঠিন; কিন্তু ঈশ্বরকে একমাত্র প্রভু করিয়া সংসারকে তাঁহার অনুগত করিয়া কেন সেবা করা যাইবে না। একথা ত শুনিতে বেশ। কিন্তু এভাবে কার্য্য করা কত কঠিন। অনেক হিন্দু গৃহস্থের বাড়ীতে দেখা যায়, শয়ন ঘর, বৈঠকখানা, পাঠাগার প্রভৃতি বড় বড়, ঠাকুর ঘরটী অতি সংকীর্ণ, এক পাশের একটী কুঠরী। তেমনি অনেক ব্রাহ্মের জীবনে ইহা কি সত্য নহে যে, বিষয়সুখ সমুদায় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি সংকীর্ণ একটী কুঠরীর মধ্যে বদ্ধ হইয়াছে? আমরা নিজ নিজ জীবন যতই আলোচনা করি ততই ভগবদ্গীতার নিম্নলিখিত বচনটী স্মরণ হয়:—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

অর্থ—নিরন্তর বিষয় মধ্যে বাস ও বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে মানবের তাহাতে আসক্তি জন্মে; আসক্তি হইতে কামনার উদয় হয়; কামনা হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয়; ক্রোধ হইতে চিত্ত-বিভ্রম জন্মে; চিত্ত-বিভ্রম হইতে স্মৃতি ভ্রংশ; স্মৃতি ভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ; বুদ্ধিনাশ হইতে মহাবিনাশ; অবনতির এই ক্রম।

কি উপায় অবলম্বন করিলে এই স্বাভাবিক ক্রম বিনাশকে বাধা দিতে পারা যায় ও জীবনের মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া চলা যায়, তাহা গভীর চিন্তার বিষয়। আমাদের বোধ হয় জীবনের আদর্শকে উন্নত করিতে না পারিলে এবং সুখ ও দুঃখের ভূমিকে ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যের ভূমির উপরে দণ্ডায়মান হইতে না পারিলে এই মধ্যপথ ধরিতে পারা যায় না।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা—শেক সাদী প্রণীত বোস্তাঁ গ্রন্থে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটী প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই আখ্যায়িকাটী কনওয়ে সাহেব প্রণীত গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। আখ্যায়িকাটী এই:—একবার য়িহুদী জাতির আদি পিতা ইব্রাহিম সাত দিন উপবাস করিয়া রহিলেন। উপবাসান্তে সংকল্প করিলেন যে, একজন অতিথিকে আহার না করাইয়া আহার করিবেন না। এই সংকল্প করিয়া তিনি উৎসুক চিত্তে মরুর অভিমুখে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন যে, একজন অতি প্রাচীন ও জরাজীর্ণ লোক তাঁহার ভবনাভিমুখে আগমন করিতেছে। ঐ বৃদ্ধকে দেখিয়া ইব্রাহিম অতিশয় আপ্যায়িত হইলেন এবং অতি সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া নিজ ভবনে গ্রহণ করিলেন। ক্রমে

আহারের সময় উপস্থিত হইলে, যখন অন্ন ব্যঞ্জন আনীত হইল তখন ইব্রাহিম তাঁহার প্রথানুসারে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন দেখা গেল, যে সেই বৃদ্ধ তাঁহার পরিবার পরিজনের সহিত স্তুতিবাদে যোগ দিলেন না। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ঐ বৃদ্ধ বলিলেন যে, তিনি অগ্নির উপাসক তাঁহাদের সম্প্রদায়ে আহারের পূর্ব্বে ও প্রকার স্তুতি করিবার নিয়ম নাই। তখন ইব্রাহিম অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বৃদ্ধকে তাড়াইয়া দিলেন। বৃদ্ধ চলিয়া গেলে এক দেবদূত হঠাৎ ইব্রাহিমের নিকট প্রকাশিত হইয়া বলিলেন—"ইব্রাহিম প্রায় শত বৎসর কাল প্রভু পরমেশ্বরের করুণা, সূর্য্য কিরণ, বৃষ্টিধারা, ও অন্ন পানের আকারে ঐ ব্যক্তিকে প্রতি-পালন করিয়াছে; তুমি সামান্য মতগত পার্থক্য নিবন্ধন উহাকে তাড়াইয়া দিলে?" এই বলিয়া দেবদূত অন্তর্হিত হইলেন। ইহা অতি প্রাচীন উপদেশ, এবং অতি সামান্য কথা; কিন্তু সামান্য কথাও স্মরণ রাখা কত কঠিন। আমরা কতবার এই সামান্য উপদেশ ভুলিয়া সংকীর্ণতার মধ্যে পতিত হই। একজন এদেশীয় ব্রাহ্ম ইংলণ্ড বাস কালে একবার ব্রিষ্টল নগরে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। সে নগরে তাঁহার পরিচিত কোনও পরিবার ছিল না। তাঁহার লণ্ডনস্থ কোনও ইংরাজ বন্ধুর এক ভগিনী ব্রিষ্টলে বাস করেন। উক্ত লণ্ডনস্থ ইংরাজ বন্ধু প্রস্তাব করি-লেন যে, তাঁহারা উভয়ে ভগিনীর বাটীতে গিয়া থাকিবেন। তদনুসারে তাঁহার ভগিনীকে লেখা হইল। তাঁহার ভগিনীপতি তখন গৃহে ছিলেন না। ভগিনীপতির সহিত পরামর্শের অপেক্ষা না করিয়াই ভগিনী লিখিলেন, "উত্তম কথা, তোমরা এস আমরা অতিশয় সুখী হইব।" কিন্তু যখন দুই বন্ধুতে ব্রিষ্টল যাত্রা করিতেছেন তখন টেলিগ্রাম আসিল যে, সে গৃহে ব্রাহ্মবন্ধুর আতিথ্য গ্রহণ সম্ভব নহে। যাহা হউক অন্য প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহারা ব্রিষ্টলে গমন করিলেন। ব্রিষ্টলে গিয়া অনু-সন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলেন, তাঁহার ভগিনীপতি একজন গোঁড়া খ্রীষ্টান, তিনি আসিয়া বাইবেল অনুসন্ধান করিয়া কি এক বচন পাইয়াছেন, যাহাতে একজন খ্রীষ্টাবিশ্বাসী ব্যক্তিকে আতিথ্যে গ্রহণ করা উচিত বোধ হয় নাই। যাহা হউক লোকের ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপরে কাহারও হাত নাই। কিন্তু যে প্রকার ভাব হইতে উক্ত খ্রীষ্টীয় গৃহস্থ একজন ব্রাহ্মকে স্বীয় ভবনে স্থান দিতে পারিলেন না, সেই প্রকার ভাব কি আমাদেরও অন্তরে অনেক সময়ে কাজ করে না? ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় উদার ধর্ম্ম যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রেমের বাহু সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোককে আলিঙ্গন করিবার জন্য বিস্তৃত থাকিবে, ইহাই লোকে দেখিতে আশা করে।

গুরুবাদ কিম্বা আচার্য্যবাদ—গুরুবাদ কিম্বা আচার্য্য বাদ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদনীয়, তাহা বিশেষবিবেচ্য বিষয় নয়। কিন্তু ইহাই বিচারের বিষয় যাহা দ্বারা আত্মার কল্যাণ সাধিত হয়। যাহাতে মানবাত্মা ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে পারে, তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অবলম্বনীয়। গুরুবাদ মানা অনাবশ্যক কিম্বা আচার্য্যবাদ মানা অনাবশ্যক, এরূপ নামের প্রভেদ জন্য নয়। কিন্তু যাহা মানবাত্মাকে তাহার স্বাধীন বিবেক-নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে বাধা প্রদান করে—যাহাতে তাহার বিচার শক্তিকে বিনষ্ট করিয়া বা সেরূপ বিচারের পথ অবরুদ্ধ করিয়া, ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইবার পথে ব্যাঘাত উপস্থিত করে, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অননুমোদিত। শব্দের তার-তম্য নয়, কিন্তু অবস্থা ও বস্তুগত তারতম্যই বিচার্য্য। প্রচলিত গুরুবাদ বা আচার্য্যবাদ মানবাত্মাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের সহিত সম্বদ্ধ হইতে এবং সাক্ষাৎভাবে তাঁহার সম্মুখীন হইতে বাধা দেয় বলিয়াই তাহা ব্রাহ্মগণের পরিত্যাজ্য।

নববিধানী বন্ধুগণ তাঁহাদের প্রতিবাদকারিগণের অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন লোককে প্রকাশ্যে বা গোপনে গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখিয়া আচার্য্যবাদের সমর্থন করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজ কোন দিন গুরুবাদ বা তাঁহারা যেরূপ আচার্য্যবাদ মানিতে বলেন, তাহা মানেন নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে পরিমাণে দূষণীয় গুরুবাদ অর্থাৎ যাহা উপরে নির্দ্দেশ করা গেল, একপ গুরুবাদের আশ্রয় লইয়াছেন সেই পরিমাণে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হই-য়াছেন। অথবা যাঁহারা তটস্থ হইয়া আছেন, তাঁহারাও ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে সেই পরিমাণে বিচ্যুত হইবার জন্য পা বাড়াইয়া আছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের সহিত যোগের ধর্ম্ম। তাহাতে যে কোন ব্যক্তি বা বিষয় বাধা দেয়, তাহাই পরিত্যাজ্য, তাহার নাম যাহাই হউক। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কেহ কেহ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত পরিতাপের কারণ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে নব-বিধানী বন্ধুদিগের সান্ত্বনা লাভের কোনই হেতু নাই। কারণ তাঁহারা গুরুবাদের অন্য নামকরণ করিয়াই কি রক্ষা পাইবেন, মনে করিতেছেন? তাহার সম্ভাবনা নাই। নববিধানী বন্ধুগণ এসম্বন্ধে তাঁহাদের পত্রে যেরূপ লিখিতেছেন, তাহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহারাও গুরুবাদের দূষণীয়তা হইতে রক্ষা পান নাই। প্রতিবাদকারিগণ কি আদেশবাদের প্রতিবাদ করিয়া পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন? আদেশবাদ অগ্রাহ্য করা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধি নয়। কারণ তাহাই ব্রাহ্মগণের অবলম্বন এবং তাহাই শাস্ত্র। তাহাই ধর্ম্ম জীবনের আলো। তবে তাঁহারা কোন কোন আদেশের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সরল ভাবে বিবেকের অনুমোদনীয় নয় বলিয়া যদি কেহ কোন ব্যক্তির আদেশের প্রতিবাদ করে, তাহার অনুসরণ না করে, তাহা নিন্দনীয় নয়, বরং তাহাই ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য। তাঁহারা যেরূপ আদেশবাদ বা আচার্য্যবাদ মানিতে বলেন, তাহাই ব্রাহ্মের পরম শত্রু। সেই শত্রুকে মিত্র বলিয়া মনে করা কখনই নিরাপদের অবস্থা নয়। তাঁহারা আদেশ বাদের সমর্থন করেন, প্রত্যেক ব্রাহ্মই করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কি প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত আদেশ মান্য করিয়া চলেন? যদি চলি-তেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মন্দিরের বেদী লইয়া এমন বিবাদ

বিসংবাদ কেন? তাঁহারা যখন সকলের নিকট প্রকাশিত আদেশকে মান্য করা উচিত মনে করেন না, সেরূপ সকলের পক্ষেই সকল আদেশ মান্য করিয়া চলা উচিত না হইতে পারে। এরূপ অনুদারতা এবং ব্রাহ্মভাবের বিরোধিতাই অনিষ্টের কারণ এবং তাহাই ব্রাহ্মের পক্ষে অননুমোদনীয়। আচার্য্য বাদ নামেই সব দোষ কাটিয়া যায় না। মূল বস্তুতে দূষণীয় ভাব রাখিয়া নাম পরিবর্ত্তন বা ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়াই নিস্তার পাইবার উপায় নাই।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ধর্ম্ম প্রচার।

এক শ্রেণীর লোকে স্বভাবতঃ প্রাণের আবেগে বা প্রকৃতিপ্রদত্ত শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া কবিতা এবং প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে কেহ উত্তেজিত করুক আর না করুক, কেহ উৎসাহ প্রদান করুক আর না করুক, তাঁহারা না লিখিয়া পারেন না বলিয়া লিখিয়া থাকেন। অনুরোধ উপরোধের জন্য তাঁহারা বসিয়া থাকেন না অথবা লোকে তাঁহাদের লিখিত কবিতা বা প্রবন্ধ আদর করে কি অনাদর করে তাহার প্রতিও তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। আর এক শ্রেণীর লেখক আছেন তাঁহারা প্রয়োজন মত লিখিয়া থাকেন অথবা না লিখিলে কাজ চলে না বলিয়া লিখিয়া থাকেন। যেমন কোন ব্যক্তি একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিতেছেন। প্রতিদিন বা সপ্তাহে তাঁহাকে কাগজ জনসমাজের নিকট উপস্থিত করিতে হয়। সুতরাং তাঁহাকে কিছু লিখিতেই হইবে। যে কোন রূপেই হউক পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিতেই হইবে। তাঁহার অন্তরের অবস্থার প্রতিও দৃষ্টি করিবার সময় বা সুবিধা নাই। সে সময় তাঁহার অন্তর হইতে কোন সরস লেখা বাহির হওয়া সম্ভব কি না, সে বিচার করিবার অবসরও তাঁহার নাই। যেরূপেই হউক তিনি না লিখিয়া পারেন না। আবার অনুরোধ ও ফরমাইস্ দ্বারা চালিত হইয়াও লোককে অনেক সময় লিখিতে হয়। এই বিভিন্ন প্রকারের লেখক ও তাঁহাদের রচিত প্রবন্ধে যে প্রভেদ, ধর্ম্ম প্রচারে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যের মধ্যেও সেরূপ প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা স্বভাবের তাড়নায়, প্রাণের আভ্যন্তরীণ উত্তেজনার বশীভূত হইয়া স্বাভাবিক ভাবে ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের প্রচারে আর যাঁহারা প্রয়োজন বলিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন—কোন বিশেষ সমাজের মত বা ভাব প্রচার করিতে ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রচার না করিলে তাঁহাদের দিনপাত হয় না, এই জন্য স্বভাবের প্রবল তাড়নায় নয়, কিন্তু লোকের অনুরোধ উপরোধ বা অনুরাগ বিরাগ দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করেন; এই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রচারে বহু প্রভেদ। এই দুই শ্রেণীর লোকের সহিত পরিচিত না হইয়া, তাঁহাদের স্বভাব, অবস্থা ও উদ্দেশ্যাদি অবগত না হইয়াও লোকে অতি সহজে কার্য্যের প্রণালীও অবস্থা দেখিয়াই তাহার প্রভেদ অনুভব করিতে পারে। বিবেচক লোকের নিকট তাহাদের কার্য্যের তারতম্য অতি সহজেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলও সেইরূপ ফলিয়া থাকে। এজন্য যাঁহারা প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছেন বা করিতেছেন তাঁহাদের বিশেষ সতর্কতার এবং আত্মপরীক্ষার সহিত দেখা প্রয়োজন, কোন্ ভাব দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন বা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। পৃথিবীতে কার্য্যের অভাব নাই। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যেরও অভাব নাই। সুতরাং কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইহাই দেখা আবশ্যক—সে কার্য্য দ্বারা নিজের কল্যাণ হইবে কি না—নিজের আত্মার সদ্গতি হইবে কি না। যে কার্য্যে নিজের সদ্গতি লাভের সম্ভাবনা নাই; তাহা দ্বারা অপরেরও কোন উপকারের প্রত্যাশা নাই। সুতরাং কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত হইলে আত্মকল্যাণ ও জগতের কল্যাণ উভয় সাধিত হইবে, তাহা নিরূপণপূর্ব্বক তবে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। ভাল কাজে নিযুক্ত হইয়াও এজন্য লোকের অধোগতি হইয়া থাকে। শেষে নিজের নিকটেও জীবন ভারবহ বোধ হয়, অপরের নিকটও বিরক্তিকর হইয়া পড়ে। শুধু বিরক্তিকর নয় কিন্তু অকল্যাণকর হইয়া থাকে। এজন্য কার্য্য সৎ হইলেও তাহাতে আত্মার রুচি ও অনুরাগ স্বাভাবিক বা অন্য কারণপ্রসূত, অতি ধীরভাবে তাহার বিচার করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

বর্ত্তমান যুগে লোকের মন বিষয় বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যেমন ব্যস্ত, একদিকে যেমন রজনী প্রভাত হইতে না হইতে বলবানের বল, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, ধনীর ধন, বিদ্বানের বিদ্যা বিষয় ও বাণিজ্যের কোলাহল বৃদ্ধির জন্য—তাহার শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিযুক্ত হইতেছে, অপর দিকে ধর্ম্ম প্রচারের জন্যও লোকের আগ্রহের সীমা নাই। লোকে যেমন সাংসারিক উন্নতির জন্য শরীর মন বুদ্ধি বিদ্যা ধন প্রভৃতি নিয়োগ করিতেছে; অন্য দিকে ধর্ম্ম প্রচারের জন্যও হাজার হাজার লোক আপনাদের সুখ দুঃখকে উপেক্ষা করিয়া অগম্য স্থানে যাইতেছে—ভীষণ বিপদাশঙ্কাকে অগ্রাহ্য করিয়া, জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নূতন প্রদেশে গমন করিতেছে এবং নূতন নূতন বিপদকে আহ্বান করিয়া আনিতেছে। লোকের অর্থ বিদ্যা বুদ্ধি এ কার্য্যে যে কম ব্যয় হইতেছে এমন নয়। কিন্তু লোকে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যে এত ব্যস্ত, ইহার মূলে প্রবেশ করিয়া আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা কি সর্ব্বদাই দেখিতেছি যে লোকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া, সত্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া এবং সত্য হইতে বিচ্যুত হইয়া বিষম অনর্থের পথে, অকল্যাণের পথে যাইতেছে, আত্মা অধোগতির দিকে যাইতেছে, তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া কল্যাণের দিকে আনয়ন করিয়া, সকলেই কি মানবের সদ্গতির জন্যই ব্যস্ত? তাঁহাদের ভাষা সেরূপ ভাবই প্রচার করে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তাঁহাদের ভাষার অনুরূপ অন্তঃকরণবিশিষ্ট ব্যক্তিও যে অনেক আছেন তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল সময় এরূপ অনুভব করিবার অবকাশ পাওয়া যায় না। ধর্ম্ম প্রচারের মূলেও এক প্রকার ক্ষুদ্র স্বার্থ বা প্রলোভন দেখা যায়। তাহা নানাপ্রকারের হইলেও প্রধানতঃ এই ভাবের যে

লোকে প্রকৃত সত্য লাভ করুক বা না করুক আমি যাহা বুঝিতেছি তাহা গ্রহণ করুক। লোকের অজ্ঞানতা ঘুচিয়া প্রকৃত সত্যালোক লাভ হউক তাহার প্রতি উদারভাবে তত দৃষ্টি নাই, কিন্তু আমি যে সম্প্রদায়ের লোক তাহার প্রচারিত মত গ্রহণ করুক। এই প্রকার মত প্রচারের সহিত আত্মবুদ্ধি বিবেচনার আত্মজ্ঞান গরিমার শ্রেষ্ঠতার ভাবও মনে প্রবল না থাকে এমন নয়। এজন্যই দেখা যায় লোকে সত্য প্রদান করিবার জন্য যেমন ব্যস্ত, সত্য গ্রহণ করিবার জন্য তেমন ব্যস্ত নয়। দলগত মত প্রচার ও দলবৃদ্ধির জন্য যত ব্যস্ত প্রকৃত বিচারশক্তির বৃদ্ধির সহিত সত্যাসত্য নিরূপণ করিবার প্রবৃত্তি ব শক্তিকে প্রবল করিবার জন্য তেমন ব্যস্ত নয়। প্রকৃত প্রচারক তিনি যিনি লোকের সত্যানুসন্ধিৎসা বৃত্তিকে প্রবল করেন। স্বাধীনভাবে বিচারের প্রবৃত্তিকে বৃদ্ধি করেন। তিনি কোন দলের মত গ্রহণ করাইবার জন্য ব্যস্ত না হইয়া, বা আত্মদলের মত গ্রহণ করাইবার জন্য তত ব্যস্ত না হইয়া ধর্ম্মক্ষুধা ও সত্য অনুসন্ধান ও গ্রহণের ক্ষুধাকেই প্রবল করিয়া থাকেন। তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। নতুবা দল বৃদ্ধি বা স্বমত গ্রহণ করাইবার প্রবৃত্তি যাঁহাদের প্রবল তাহারা খুব ত্যাগশীল ও ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহারা প্রকৃত ত্যাগস্বীকার করিতে পারেন নাই। আত্মজ্ঞান ও বুদ্ধির প্রশংসাধ্বনি শ্রবণ করিতে—আত্মগৌরব-ঘোষণা শ্রবণ করিতে তাঁহাদের মন এখনও ব্যস্ত। দলের স্বার্থ তাঁহারা ছাড়াইতে পারেন নাই। সুতরাং সেরূপ প্রচারেও প্রকৃত কল্যাণ লাভের আশা কম। তাহা দ্বারা ঈশ্বরের প্রসন্নতা অপেক্ষা স্বদলের ও আত্মপ্রশংসা লাভের সম্ভাবনাই অধিক। যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারের ব্রত গ্রহণ করিতেছেন বা করিয়াছেন তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে দেখা উচিত কোন্ ভাব প্রাণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবল। লোকে ঈশ্বরের মহিমা বুঝিতে সমর্থ হউক এবং বুঝিয়া তাহা জীবনে পরিগ্রহ করিয়া, তাঁহার মহিমা মহিমান্বিত করুক—সত্যের উদার আশ্রয় লাভ করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হউক, এরূপ আকাঙ্ক্ষাই প্রবল অথবা লোকে দলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অথবা দলের প্রচারিত মত সকল মান্য করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করুক, এরূপ আকাঙ্ক্ষাই প্রবল। ঈশ্বরের মহিমা বিস্তৃত হউক, জয় যুক্ত হউক এরূপ উদ্দেশ্য না লইয়া যদি কেহ ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ব্যস্ত হন, তাঁহার সেই ব্যস্ততা সেই আগ্রহের মূলে নিজ গৌরব-প্রয়াস প্রকাশ পাইবেই পাইবে। সুতরাং তাহা যেমন সত্য প্রচারের সহায় হইবে না; তেমনি নিজ কল্যাণ লাভের অনুকূলও হইবে না। কার্য্য ও ব্যবসা জগতে অনেক প্রকারের আছে। ধর্ম্মপ্রচারও যেন সেইরূপ কোন আর দশটা কার্য্যের মত একটা কার্য্য বা অপর কোন ব্যবসায়ের মত একটা ব্যবসায় না হয়। তাহাদ্বারা ইহলোকে তৃপ্তি পাওয়া গেলেও প্রকৃত কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা তাহাতে নাই। সুতরাং প্রচারব্রত গ্রহণ অতি উচ্চ কার্য্য হইলেও তাহাতেও সর্ব্বদা সজাগ আত্মদৃষ্টির সহিত নিজকে পরীক্ষা করা উচিত। গৌরবের প্রয়াস দলগতই হউক আর আত্মগতই হউক অতি অনিষ্টকারী এবং মারাত্মক।

দোষ কাহার—সাধন প্রণালীর না সাধকের?

(প্রাপ্ত)

কিছু দিন হইতে ব্রাহ্মসমাজে সাধনপ্রণালীর সম্বন্ধে নানা কথা হইতেছে। গত ১৬ই কার্ত্তিকের তত্ত্বকৌমুদীতে শ্রীযুক্ত সত্যদর্শী মহাশয় এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। এবিষয়টী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের অক্ষমতা আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি, কিন্তু আর কেহই এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতেছেন না বলিয়া, নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতেছি।

সর্ব্ব প্রথমে আমাদের সাধন প্রণালীটী কি তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। আমাদের সাধনের চারিটী অঙ্গ (১) উদ্বোধন, (২) আরাধনা, (৩) ধ্যান, (৪) প্রার্থনা।

(১) উদ্বোধন—আমরা অনেক সময় বহির্মুখীন থাকি, অতএব সর্ব্বপ্রথমে আমাদের প্রাণকে পরব্রহ্মের উন্মুখীন করিতে হইবে—এইরূপ অবস্থাতে আনিতে হইবে, যাহাতে তাঁহার প্রকাশ সম্ভবপর হয়। তাঁহাকে পাওয়ার জন্য সরল ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাতে নির্ভর হইলেই এই অবস্থা হইল—উদ্বোধন হইল। বোধ হয় বলিতে হইবে না; এই অবস্থাকেই প্রার্থনা বলা হয়। প্রাণের এই অবস্থা হইল—প্রার্থনা হইলে, পরব্রহ্ম আত্মাতে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। (২) আরাধনা স্বরূপ বর্ণনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। আত্মাতে পরব্রহ্মের প্রকাশ হইলে তাঁহাকে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতে, তাঁহার স্বরূপ সকল বিশেষ ভাবে মনন করিতে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে গভীররূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হওয়া যায়। এসময় প্রাণে কৃতজ্ঞতাও উপস্থিত হয়। এবং তাঁহাকে যতই বেশী উপলব্ধি করা যায় ততই প্রেম, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার উদয় হয়। ইহার নাম আরাধনা। এই ভাবে গভীর হইতে গভীরতর রূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে করিতে প্রাণ তাঁহাতে নিমগ্ন হয় অর্থাৎ (৩)। ধ্যানের অবস্থাতে উপনীত হয়। এই ভাবে গভীর উপলব্ধি হইলে তাঁহার রূপানুরাগ উদ্দীপ্ত হয়, তাঁহাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয় এবং এই অবস্থাতে, তুলনায় নিজ দুরবস্থা বেশী হওয়াতে তাহা দূর করিবার আকাঙ্ক্ষা ও প্রবল হয়; প্রাণ (৪) প্রার্থনায় অবস্থায় উপনীত হয়। তাই দেখিতেছি আমাদের সাধন প্রণালী সংক্ষেপতঃ এই—প্রার্থনা, প্রার্থনার ফলস্বরূপ আত্মাতে ব্রহ্ম প্রকাশ হইলে তাঁহার চিন্তা, তাহার ফল স্বরূপ গভীররূপে ব্রহ্ম উপলব্ধি এবং ইহার ফল স্বরূপ প্রবলতর আকাঙ্ক্ষা বা প্রার্থনা।

এখন দেখা যাউক উক্ত সাধন অবলম্বনে ফল লাভ হইতে পারে কি না। প্রার্থনা বা সরল ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা হইলে যে আত্মাতে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন—ব্রহ্মদর্শন হয়—একথা আমরা দৃঢ়তর জানি, সর্ব্ববাদী-সম্মত। সর্ব্বদেশীয় ও সকল শ্রেণীস্থ

লোক ইহা স্বীকার করিতেছেন। কাজেই ইহার সত্যতা প্রমাণ জন্য আজ আমরা কিছু বলিব না। যদি কেহ আপত্তি করেন তবে এ বিচার করা যাইবে। ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক, পত্রিকা ও বক্তৃতা, উপদেশাদিতে এবিষয় অনেকবার আলোচিত হইয়াছে। বিশেষতঃ মেসেঞ্জার পত্রিকাতে এ সম্বন্ধে কত সুন্দর সুন্দর উদ্ধৃত ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। আগুন জ্বালিলে যেরূপ বাতাস আসিবেই, দ্বার খুলিলে যেরূপ ঘরে আলো প্রবেশ করিবেই, সেইরূপ প্রার্থনা বা আকাজ্ক্ষা হইলে ব্রহ্ম প্রাণে প্রকাশিত হইবেনই। ইহা না হইয়া পারে না, ইহা একটী আধ্যাত্মিক নিয়ম। সুতরাং অনেক সময় পর্য্যন্ত মনন বা স্বরূপ চিন্তা দ্বারা যে এই দর্শন গভীর হইবে, অধিকতর স্পষ্টরূপে যে ব্রহ্ম উপলব্ধি হইবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। কোন বস্তু অনেক সময় পর্য্যন্ত মনোযোগের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলে যে উক্ত বস্তুর জ্ঞান অধিক হইবে, উহাকে অধিকতর স্পষ্টরূপে জানা যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং কোন বস্তু, বিশেষতঃ কোন সুন্দর বস্তু চিন্তা করিতে করিতে যে মন তাহাতে মগ্ন হইয়া যাইবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। কাজেই এরূপ স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই অনেক সময় পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-আরাধনা করিলে প্রাণ তাহাতে নিমগ্ন হইয়া যাইবে—ধ্যানের অবস্থাতে উপনীত হইবে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রেমস্বরূপ সুন্দর পরব্রহ্মকে প্রাণে দেখিলে যে প্রেম ভক্তি জন্মিবে, প্রাণ তাঁহাকে ছাড়িয়া উঠিতে চাহিবে না ইহাও সহজেই বুঝা যাইতেছে। অনন্তব্রহ্মে প্রাণ যতই ডুবিবে, তাঁহাকে আরও অধিকতররূপে উপলব্ধি করিবার জন্য প্রাণ ততই ব্যাকুল হইবে এবং ব্রহ্ম উপলব্ধি হইলে নিজ ক্ষুদ্রতা, অসারতা স্পষ্টতর ভাবে বোধ হইবেই হইবে। ধ্যান হইতে প্রাণ স্বাভাবিক ভাবে প্রার্থনার অবস্থায় উপস্থিত হয়। এই অবস্থার ফল আরও অধিকতররূপে ব্রহ্ম উপলব্ধি সুতরাং আমরা দেখিতেছি, ইহারা পরস্পর এরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ যে স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যেকে পরবর্ত্তী অবস্থা আনিয়া দেয়। সহজ যুক্তিতেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি ইহা আমাদিগকে উন্নতজীবন লাভে সমর্থ করে। এই স্বাভাবিক নিয়মের উপরেই আমাদের সাধন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত। মনোবিজ্ঞান, সাধারণ যুক্তিও এই প্রণালীর পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে। স্বশ্রেণীস্থ ও অন্য শ্রেণীস্থ শত শত সাধক ইহার পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছেন। আমরা দেখিতেছি ইহা উন্নত ধর্ম্ম জীবন লাভের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং নিশ্চিত ফলপ্রদ উপায়।

এখন একটী গুরুতর প্রশ্ন রহিয়াছে। উদ্বোধন হইলে—সরল ব্যাকুল প্রার্থনা হইলে ফল হইবে বুঝা যায়। কিন্তু প্রশ্ন এই উক্ত প্রার্থনার অবস্থা পাইবার জন্য কি সাধন আছে? এবিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ নিম্নলিখিত সাধন নির্দ্দেশ করিতেছেন। (১) সৎগ্রন্থ পাঠ, (২) প্রকৃতি চর্চ্চা, (৩) সাধুসঙ্গ ও (৪) নিজ জীবনে ব্রহ্মকৃপা ও তাঁহার কার্য্য বিষয়ে এবং নিজ অবস্থা বিষয়ে চিন্তা। ইহাদের প্রত্যেক উপায় দ্বারাই যে কিছু উপকার হইতে পারে, ধর্ম্মজীবন লাভের—ব্রহ্মলাভের আকাজ্ক্ষা জন্মিতে পারে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন, কিন্তু সকল সময়, সকল অবস্থাতে ইহারা কার্য্যকারী কিনা তাহাই বিচার্য্য। ইহাদের সকলের যে সমান উপকারিতা আছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। সৎগ্রন্থ পাঠে ও প্রকৃতি চর্চ্চাতে যে অনেক সময় প্রাণ জাগ্রত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা একথা বলিতে পারি না, সকল সময়ে ইহারা কার্য্যকারী হইবে। ইহাদের কার্য্যকারিতা অনেকটা আমাদের প্রাণের অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রাণের অবস্থা অনুকূল না হইলে ফল লাভ হয় না। সাধু সঙ্গ ইহাদের অপেক্ষা অধিক ফল দায়ক। যেটী যেরূপ বস্তু সেইটী আমাদের প্রাণে সেই ভাবই জাগাইয়া দেয়। সাধু জীবন্ত মানুষ উন্নত জীব, কাযেই তাঁহার সংসর্গে প্রাণে সদ্ভাব জাগ্রত হইবে, উচ্চ আকাজ্ক্ষা প্রদীপ্ত হইবে, তাঁহার কথার ফল বেশী হইবে। কারণ তাঁহার কথার পশ্চাতে প্রকৃত জীবন রহিয়াছে। তীর যত বলের সহিত নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহা যেমন তত গভীর ভাবে বিদ্ধ হইবে, সেইরূপ কথা প্রাণের যত গভীর স্থল হইতে উত্থিত হইবে, তাহা তত গভীর ভাবে শ্রোতার প্রাণে প্রবেশ করিবে, বক্তব্য বিষয় বক্তার যতদূর জীবন লব্ধ সত্য হইবে, উহা তত কার্য্যকারী হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া একথা বলা যায় না সাধুসঙ্গ সর্ব্বদাই কার্য্যকারী হইবে। ইহার ফলও প্রাণের অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে। বস্তুটী কোমল না হইলে অথবা অনুকূল অবস্থায় না থাকিলে তীর যেমন লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারে না সেইরূপ সাধুসঙ্গকারীর প্রাণের অবস্থা "কোমল" (অর্থাৎ পাপে বেশী লিপ্ত নয়) অথবা সেই সময়ের জন্য অনুকূল না হইলে বিশেষ ফল হইবে না। কাজেই অবস্থা বিশেষে সাধুসঙ্গকারীর উপর সাধুর কার্য্য এত ক্ষীণ হইতে পারে যে কিছুই হইল না মনে করা যায়; কারণ উহা সেস্থলে বিশেষ কার্য্যকারী নহে, প্রাণকে জাগ্রত করিতে সক্ষম নহে। সাধুর এরূপ ক্ষমতা নাই যে, সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা দূর করিয়া উক্ত লোককে সম্পূর্ণরূপে অনুকূল অবস্থাতে আনিয়া দিতে পারে। কারণ কোন ব্যক্তির উপরই কাহারও সম্পূর্ণ আধিপত্য নাই। মানুষের কর্ত্তৃত্ব তাহার নিজের উপর অন্যের উপর নহে। কোন মানুষের উপরই তাহার নিজের এবং স্বয়ং পরমেশ্বরের ভিন্ন অন্য কাহারও সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব নাই। কাযেই প্রত্যেক মনুষ্যের উপর তাহার নিজের এবং প্রভু পরব্রহ্মের কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী। সুতরাং এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে, প্রার্থনার অবস্থা আনয়ন সম্বন্ধেও স্বীয় ও ব্রহ্মকৃপার কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা ও সকল সময়ের জন্য ফলদায়ক। জীবন্ত মঙ্গলময় বিধাতা পরব্রহ্ম যে আমাদের সকল বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া আমাদের কোন চেষ্টা না থাকা সত্ত্বেও অথবা বিরুদ্ধ চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও নানা ভাবে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিতে পারেন, প্রাণকে তাঁহার উন্মুখীন করিতে পারেন, প্রাণে প্রবল আকাজ্ক্ষা জাগাইয়া দিতে পারেন, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। মানব নিজ চেষ্টাতে কি করিতে পারে তাহাই বিচার্য্য। কি হইলে প্রার্থনা বা ব্যাকুল আকাজ্ক্ষার অবস্থা লাভ হইতে পারে? অভাব বোধ হইলে তাহা দূর করিবার আকাজ্ক্ষা

জন্মিবে। নিজে গভীর পাপে লিপ্ত আছি—অথবা জীবনের লক্ষ্য স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে দূরে রহিয়াছি, গভীর ভাবে প্রাণে এরূপ অনুভব করিতে পারিলেই প্রার্থনা আসিবে। ভাসা ভাসা রূপে একটু বোধ হইলে প্রাণে গভীর আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে না। নিজে কোন্ অবস্থায় আছি ইহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে এ আকাঙ্ক্ষা জন্মিতে পারে। বিশেষ চিন্তা করা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে গভীর অভাব বোধ কতকটা জাগাইয়া দিতে পারে সত্য, কিন্তু বিশেষ গভীর ভাবে জাগাইয়া দিতে পারেন না। কারণ উপলব্ধি সম্পূর্ণ চিন্তার কার্য্য। যতই চিন্তা করা যাইবে জ্ঞান ততই পরিষ্কার হইবে। আর সকল উপায়ই বাহিরের, তাহাদের এখানে বিশেষ ক্ষমতা নাই। কাযেই এ অভাববোধ পক্ষে গভীর আত্মচিন্তা বা আত্মপরীক্ষাই একমাত্র উপায় (অবশ্য ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন আমরা অন্য উপায়ের কথাই বলিতেছি) এই উপায় যে নিশ্চয় ফলপ্রদ তাহাও সহজেই বুঝা যাইবে। গভীর ভাবে নিজ অবস্থা চিন্তা করিলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিলে নিজ দুরবস্থা বিশেষ রূপে অনুভব হইবে ও তাহা প্রাণে মুদ্রিত হইবে। একথা সহজেই বুঝা যাইতেছে ইহা না হইয়া পারে না। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। কাযেই আত্মচিন্তাই শ্রেষ্ঠতম এবং নিশ্চিত ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। এ উপায় অবলম্বনও সকলের পক্ষে সহজ। মানুষ যত দুরবস্থাপন্ন হউক না কেন, যত গভীর ভাবে পাপে নিমগ্ন থাকুক না কেন সকলের নিজ অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারে। সামান্য ইচ্ছা হইলেই এপথ অবলম্বন করিতে পারে। আমরা দেখিতে পাইতেছি উপরিলিখিত উপায় চতুষ্টয়ের মধ্যে চতুর্থটী দ্বারা অর্থাৎ নিজ অবস্থা চিন্তা দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে উপকৃত হওয়া যায়। শুধু তাহা নহে, চতুর্থ উপায়টী সকল সময়েই ফলপ্রদ। এ প্রণালীতে সাধন করিলে কোন মতেই বিফল হইতে হয় না। এখন প্রমাণিত হইল আমাদের সাধন প্রণালী উন্নত ধর্ম্মজীবন লাভ পক্ষে সম্পূর্ণ কার্য্যকারী।

মূল প্রশ্নের মীমাংসার পূর্ব্বে আরও কয়েটী বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন, কি ভাবে সাধন করিলে এই প্রণালীতে ফল পাওয়া যাইবে না তাহা দেখা উচিত। প্রার্থনা আরাধনা কি তাহা বলা হইয়াছে, কি নয় সে বিষয় কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। ইহার পর আমরা আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদের মত প্রদান করিব।

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্ম পর্য্যটকের পত্র।

ওঁকারনাথ।

মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত নিমার অথবা খাণ্ডোয়া জেলার মধ্যে মান্ধাতা নামক একটী স্থান আছে। ওঁকারনাথ সেই মান্ধাতার নিকট নর্ম্মদা নদীর অপর পারে অবস্থিত। খাণ্ডোয়া হইতে হোলকার ষ্টেট রেলওয়ের রাস্তায় থৈঁড়ি ঘাট নামক নর্ম্মদা নদীর তীরে একটী ষ্টেসন আছে, সেই ষ্টেসন হইতে ওঁকারনাথ ৭ মাইল। থৈঁড়িঘাট হইতে ওঁকারনাথ যাইবার বেশ পাকা রাস্তা আছে; যাওয়া আসার জন্য গরুর গাড়ী পাওয়া যায়।

থৈঁড়ি ঘাটে একটী বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী আছেন, তাঁহার সহিত আলাপে জানিলাম তিনি প্রায় ২৫ বৎসর হইল ঐ অঞ্চলে আছেন, ৩।৪ বৎসর হইল তিনি থৈঁড়ি ঘাটে নর্ম্মদা নদীর তীরে একটী ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করিয়া সেখানে বাস করিতেছেন। অতীত অভ্যাগত আসিলে তিনি তাঁহাদের আহারাদি দিয়া সেবা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় নিজের আশ্রমে কোন প্রকার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন নাই। প্রণবাদি মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন। তাঁহার জন্মস্থান হুগলি জেলা। এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন।

এই ব্রহ্মচারীজী কহিলেন যে ওঁকারনাথের মহাদেবের নামানুসারে ঐ স্থানের নাম ওঁকারনাথ হয় নাই, যে পাহাড়ে ঐ মহাদেব আছেন সেই পাহাড়ের নাম ওঁকারনাথ। আমি ঐ পাহাড়ের চারিদিক ঘুরিয়া বিশেষ রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি যে পাহারটীর আকার কতকটা ওঁএর মত।

এই ওঁ আকৃতি পাহাড়টীর দৈর্ঘ্য প্রায় ২ মাইল ও প্রস্থ ½ মাইল হইবে। ইহার সম্মুখ দিয়া পূর্ব্ববাহিনী নর্ম্মদা নদী গম্ভীর শব্দ করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে এবং পাহাড়ের মস্তক দেশ হইতে নর্ম্মদার একটী শাখা বহির্গত হইয়া (এই শাখাকে স্থানীয় অধিবাসীরা কাবেরী কহে) পাহাড়টীকে বেষ্টন করিয়া আবার পাহাড়ের পাদদেশে মূল নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহাতে পাহাড়টীকে একটী দ্বীপের ন্যায় দেখা যায়।

এই পাহাড়ের উপর উঠিলে চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। সেই স্থানের চতুর্দ্দিকেই পাহাড়। নর্ম্মদা নদীর উভয় কূল আমাদের দেশের নদীর বাঁধের ন্যায়। পাহাড় শ্রেণী প্রাচীরের মত মস্তক উন্নত করিয়া শোভা পাইতেছে। ইহাতে উক্ত স্থানের সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সাধকের প্রাণে বিশেষ ভাবে প্রবেশ করিয়া, সেই অনন্ত বিশ্বনির্ম্মাতাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই জন্য বোধ হয় এই স্থান হিন্দুসাধকদিগের একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই পাহাড়ের পাদদেশে একটী ছোট সহরের মত বাজার আছে, সেই বাজারের মধ্যস্থলে ওঁকার নাথ নামক মহাদেবের মন্দির। এই মহাদেব দেখিবার জন্য নানাদেশ হইতে হিন্দু-তীর্থযাত্রীগণ আসিয়া মহাদেব দর্শন ও পূজাদি দিয়া থাকেন। এখানকার লোকেরা শ্রাবণ মাসকে পুণ্যমাস মনে করেন। সেই জন্য শ্রাবণ মাসে এখানে যাত্রীদিগের অত্যন্ত ভীড় হয় এবং অনেক লোক পুণ্য হইবে বলিয়া এই স্থানে সমস্ত শ্রাবণ মাস বাস করিয়া থাকেন।

এই ক্ষুদ্র বাজারের পূর্ব্ব দিকে কিছুদূরে ঐ পাহাড়ের মধ্য দেশে কয়েকটী গুহা আছে, তাহাতে কয়েক জন সাধু বাস করিয়া থাকেন। এই অল্প সংখ্যক সাধু এক একজন এক এক সম্প্রদায় ভুক্ত, সকলের গুহাতেই দেবতার মূর্ত্তি আছে এবং প্রায় সকলেই গাঁজা ভাঙ্গাদি খাইয়া থাকেন এই।

একটী গুহাতে আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু শ্রদ্ধেয় বাবু প্যারীলাল ঘোষ মহাশয় থাকেন, আমি তাঁহার গুহাতেই কয়েক সপ্তাহ ছিলাম।

প্যারী বাবুর কঠোর বৈরাগ্য ও সাধন ভজন দেখিয়া আমার মহাত্মা বুদ্ধদেবের কথা স্মরণ হইত, বাস্তবিক তাঁহার বৈরাগ্য ও সাধন দেখিলে তাঁহাকে দ্বিতীয় বৌদ্ধদেব বলিয়া বোধ হয়। তিনি ভোরে উঠিয়া শৌচাদি করিয়া একটী বিশেষ আসনে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হন, তাহার পর মধ্যাহ্ন সময়ে ১০।১৫ মিনিটের জন্য একবার উঠিয়া স্নানাদি করিয়া আবার ধ্যানে নিমগ্ন হন। ঠিক সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে উঠিয়া একপোয়া আন্দাজ দুগ্ধ ও কিঞ্চিৎ বেলপত্র বাটা খাইয়া পুনরায় ঘণ্টা খানেক বাদে সাধনাতে নিযুক্ত হন। রাত্রে ২।৩ ঘণ্টামাত্র নিদ্রা যান, কোন কোন দিন আরও কম নিদ্রা যান বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে তিনি প্রায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কঠোর সাধনাতে নিযুক্ত আছেন। তিনি এখন মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া আছেন, কথা কহেন না, আমার সহিত তাঁহার লেখালেখির দ্বারা কিছু কিছু হইত।

ক্রমশঃ

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন, কিম্বা কাহারও পত্র ফেরত দিতে বাধ্য নহেন)

অভ্রান্ত গুরুবাদ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

গতবারের "তত্ত্ব-কৌমুদী"তে উপরোক্ত বিষয়ে একখানি পত্র বাহির হইয়াছে। আশা করি ইহা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে; কারণ ইহাতে পরস্পরের চিন্তা বিনিময় করিবার একটা সুবিধা হইয়াছে। পৃথিবীতে যত কলহ, বিবাদ, তাহার অনেকেরই মূলে পরস্পরের সম্বন্ধে অজ্ঞতা বিদ্যমান; সুতরাং যাহাতে অন্যের মনের ভাব জানিবার পক্ষে সুবিধা হয়, তাহা কদাচ সামান্য বস্তু নহে। এই কারণেই শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন বাবুর পত্রখানকে মূল্যবান মনে করা উচিত এবং যে উদ্দেশ্যে পত্রখানি বাহির হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সকলেরই মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মগণ অভ্রান্ত গুরুবাদকে বহু দিন হইল সমাধিস্থ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে স্বচ্ছন্দচিত্তে বাস করিতে-ছিলেন; হঠাৎ এই শত্রু স্বীয় সমাধি হইতে উত্থান করিয়া সমাজে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ও আপনার গাত্রের পূতিগন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে। এখন আর নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। গুরুবাদী ভ্রাতৃগণের কি বলিবার আছে, তাহা জানিয়া আলোচনাদ্বারা যাহাতে আমরা একটী স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, তদ্বিষয়ে প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই যত্নশীল হওয়া উচিত মনে হইতেছে। আমি এই কর্ত্তব্যবুদ্ধির অধীন হইয়া নিম্নে কয়েকটী কথা বলিব। আশা করি বন্ধুগণ অবহিতচিত্তে আমার পত্রখানি পাঠ করিয়া স্বীয় স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করতঃ গুরুবাদ সম্বন্ধে যাহাতে একটা নিশ্চিত মীমাংসা হইয়া যায়, তদ্বিষয়ে সহায়তা করিবেন। যে সমাজে স্বাধীন চিন্তা অপ্রতিহত, সে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির চিন্তা ভিন্ন বিষয়ের দিকে প্রবাহিত হওয়াই স্বাভাবিক। সেখানে একতা রক্ষা করিতে হইলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া স্থিরচিত্তে ও নিষ্ঠার সহিত বিরোধী মতের আলোচনা করিয়া নির্দ্ধারিত সত্যের অনুসরণ করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। আমরা যেন এই মহৎ সত্য বিস্মৃত না হই।

শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন বাবু লিখিয়াছেন:—

"আমার মনে হয় ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনতত্ত্বের যাহা মূলমন্ত্র তাহারই উপর অভ্রান্ত গুরুবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্ব।"

কথাটা নিতান্ত আত্মবিরোধিতা দোষে দূষিত বলিয়া বোধ হইতেছে। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগ যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে গুরুর সম্বন্ধেও সেই যোগ যেরূপ সম্ভব, শিষ্যের সম্বন্ধেও সেইরূপই সম্ভব; সুতরাং যদি অভ্রান্ত গুরু স্বীকার কর, তাহা হইলে অভ্রান্ত শিষ্যও স্বীকার করিতে হইবে। অতএব যদি কেবল অভ্রান্ত গুরুই স্বীকার কর, তাহা হইলে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ কেবল গুরুর সম্বন্ধে স্বীকার করা হইল, শিষ্যের সম্বন্ধে আর স্বীকার করা হইল না; সুতরাং জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ যুগপৎ স্বীকার ও অস্বীকার করা হইতেছে। আত্মবিরোধিতা দোষ ঘটিল না কি? আর যদি গুরু ও শিষ্য উভয়েই অভ্রান্ত হন, (মনোরঞ্জন বাবুর অভ্রান্ততার ভিত্তি অন্ততঃ তাহাই প্রমাণ করিতেছে,) তাহা হইলে গুরু ও শিষ্যে কোন প্রভেদ রহিল না, দুজনে এক হইয়া গেলেন, আমাদেরও বিবাদ মিটিয়া গেল। এস্থলে এই আপত্তি উঠিতে পারে যে, শিষ্যও অভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু সাধন সাপেক্ষ। বেশ কথা। কিসের সাধন? অবশ্য পরমাত্মার সহিত যোগেরই সাধন, কারণ মনোরঞ্জন বাবু বলিয়াছেন, তাহাই অভ্রান্ততার ভিত্তি। সকল আত্মারই সহিত যখন পরমাত্মার একই সম্বন্ধ, তখন গুরু যে প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ অনুভব করিয়া অভ্রান্ত হইয়া-ছেন, শিষ্যকেও ঠিক সেই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, এবং সেই প্রণালী তাহারও নিকট প্রকাশিত হইবে; সুতরাং গুরুর আর দাঁড়াইবার স্থল কোথায়? একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। মনে করুন এক ব্যক্তি ঢাকায় গিয়াছিল, আর এক ব্যক্তি ঢাকায় যাইবে; উভয়েরই একই পথ, এবং একই ব্যক্তি উভয়েরই নেতা। এরূপ স্থলে শেষোক্ত ব্যক্তির পক্ষে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি কি অত্যাবশ্যক? কখনই নহে। সেইরূপ, সকল মানবেরই গন্তব্যস্থান ও পথ যখন এক এবং ঈশ্বর যখন সকলেরই নেতা, তখন যিনি একটুকু অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি ব্যতীত আমার চলিবে না কেন? এতদ্ব্যতীত গুরু অভ্রান্ত হইলে শিষ্যের কিছুই লাভ নাই; কারণ শিষ্য যতক্ষণ গুরুকে অভ্রান্ত বলিয়া না জানিতেছেন, অর্থাৎ গুরু যে প্রণালীতে সত্য লাভ করিয়া

অভ্রান্ত হইয়াছেন, শিষ্যও সেই প্রণালীতে সত্য লাভ করিয়া অভ্রান্ত না হইতেছেন, অর্থাৎ যতক্ষণ তাহাতে অভ্রান্ততা দর্শনের চক্ষু না ফুটিতেছে, ততক্ষণ গুরুর অভ্রান্ততা শিষ্যের সম্বন্ধে কিছুই নহে। এবং শিষ্য যখন স্বয়ংই অভ্রান্ত হইলেন, তখন ত দুই জনে একাসনে আসীন হইলেন, এবং গুরুর আর প্রয়োজন রহিল না। বস্তুতঃ অভ্রান্ত গুরুবাদ স্বীকার করিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবর্ত্তিবাদ স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগ অন্ততঃ শিষ্যের সম্বন্ধে অস্বীকার করা হয়; কারণ গুরু অভ্রান্ত বলিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে বলা হইল যে শিষ্য অভ্রান্ত নহেন, অর্থাৎ অভ্রান্ত ঈশ্বরকে প্রাণে পাইতে পারে না; সুতরাং তাঁহাকে গুরুরূপী মধ্যবর্ত্তীর আশ্রয়ে থাকিতে হইবে।

শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন বাবু অভ্রান্ত গুরু প্রমাণের জন্য যে যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা কতদূর সারগর্ভ, এখন তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

১। ঈশ্বরের বাণী অভ্রান্ত;

২। ঈশ্বরের বাণী মানবাত্মায় প্রকাশ পায়।

উল্লিখিত বাক্যদ্বয় (premises) মনোরঞ্জন বাবুর নিজের। কিন্তু এই দুই বাক্য হইতে যুক্তি শাস্ত্রের নিয়মানুসারে কি কি সিদ্ধান্তে (conclusion) উপনীত হওয়া যায়? এই কি নয় যে "মানব অভ্রান্ত"? মানবাত্মা বলিতে কিছু ব্যক্তি বিশেষের আত্মা বুঝায় না। সুতরাং মনোরঞ্জন বাবুর বাক্যদ্বয় কেবল ব্যক্তি বিশেষের অভ্রান্ততা প্রমাণ করিতেছে না, সমগ্র মানব জাতির অভ্রান্ততা প্রমাণ করিতেছে। মনোরঞ্জন বাবু পরে বলিয়াছেন, যে এই বাণী শুনে সেই অভ্রান্ত। কিন্তু 'শুন' আর প্রকাশ পাওয়া একই কথা। সকলেই যদি অভ্রান্ত হইল, তাহা হইলে সকলেই অভ্রান্ত গুরু,

গুরুতে গুরুতে ধূল পরিমাণ।
দশ বিশ গণ্ডা ভূতলে শয়ান॥

এতদ্ব্যতীত সকলই গুরুময় হইয়া গেল, শিষ্য বেচারির আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না।

আর একটী কথা। 'গুরু' সম্বন্ধ বাচক শব্দ; অর্থাৎ গুরু বলিলেই শিষ্য বুঝায়, এবং শিষ্য ব্যতিরেকে গুরুর ধারণাই হয় না। সুতরাং গুরু যদি অভ্রান্ত হন, তবে তিনি শিষ্যেরই সম্বন্ধে অভ্রান্ত, অর্থাৎ শিষ্য যদি তাঁহাকে অভ্রান্ত বলিয়া জানেন তবেই তিনি অভ্রান্ত, নতুবা নয়। সত্যের প্রত্যক্ষ প্রকাশ ভিন্ন যখন অভ্রান্ততার নিদর্শন পাওয়া যায় না, এবং শিষ্যের মনে যখন সত্য প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হয় নাই (কারণ প্রকাশিত হইলে আর গুরুর প্রয়োজন থাকিত না); তখন শিষ্য গুরুকে অভ্রান্ত বলিয়া জানিতে পারেন না, অর্থাৎ তিনি অভ্রান্ত নহেন।

আর একটী কথা। মনোরঞ্জন বাবুর দ্বিতীয় বাক্য (the second premise) শিষ্যের সম্বন্ধে সত্য নহে; কারণ শিষ্য যতক্ষণ শিষ্য, অর্থাৎ যতক্ষণ তাহার নিকট প্রত্যক্ষভাবে সত্য প্রকাশিত হয় নাই, ততক্ষণ তিনি জানেন না যে মানবের আত্মায় সত্য প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী শুনা যায়; সুতরাং তিনি কি প্রকারে বলিতে পারেন যে "ঈশ্বরের বাণী মানবাত্মায় প্রকাশ পায়" ইহা সত্য। যুক্তি শাস্ত্রের নিয়ম এই যে, যদি দুইটী বাক্যের (premises) মধ্যে একটী অসত্য হয়, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত ও (conclusion) অসত্য। সুতরাং মনোরঞ্জন বাবুর "গুরু অভ্রান্ত" এই সিদ্ধান্ত যাহা "ঈশ্বরের বাণী মানবাত্মায় প্রকাশ পায়" এই অসত্য বাক্য (premise) হইতে করা হইয়াছে, তাহাও অসত্য; অর্থাৎ গুরু অভ্রান্ত নহেন।

আর একটী কথা। মানব যখন পরিমিত, অর্থাৎ সত্য যখন পূর্ণরূপে তাঁহার মধ্যে প্রকাশিত হইতে পারে না, তখন তিনি চিরদিনই অজ্ঞ অর্থাৎ ভ্রমশীল, অর্থাৎ ভ্রান্ত; সুতরাং শিষ্য যদি জানেনও যে গুরুর মধ্যে কোন সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি তিনি বলিতে পারেন না যে গুরু অভ্রান্ত, অর্থাৎ অপূর্ণ মানব পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সান্ত অনন্ত হইয়াছে। অতএব গুরু কোন ক্রমেই অভ্রান্ত হইতে পারেন না।

অবশেষে শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন বাবু বলিয়াছেন, "ইহাতে কোন মানুষকে অভ্রান্ত বলা হইল না। কেবল অভ্রান্ত গুরুর কথাই বলা হইল।" তাহা হইলে মনোরঞ্জন বাবুর মতে গুরু মানুষ নহেন; কারণ তিনি স্পষ্টতঃ গুরু ও মানুষ এই দুই শ্রেণীবিভাগ করিলেন। গুরু যদি মানুষই না হইলেন, তবে "মানবাত্মায় ঈশ্বরের বাণী প্রকাশ পায়" এই যুক্তির দ্বারা গুরুর অভ্রান্ততা প্রমাণ হইল কিরূপে? একেই বলে যে ডালে বসা সেই ডালই কাটা।

শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন বাবু যুক্তিদ্বারা গুরুর অভ্রান্ততা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার যুক্তিদ্বারা যদি গুরুর অভ্রান্ততা প্রমাণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার যুক্তিও অভ্রান্ত; কারণ ভ্রান্ত যুক্তিদ্বারা কখনও অভ্রান্ততা প্রমাণ হইতে পারে না; আর তাঁহার যুক্তি যদি অভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে তিনিও অভ্রান্ত; কারণ স্বয়ং ভ্রান্ত হইলে কখনও অভ্রান্ত যুক্তি উৎপাদন করিতে পারিতেন না; কারণে যাহা নাই তাহা কার্য্যে থাকিতে পারে না। তাঁহার যুক্তি যদি অভ্রান্ত গুরু প্রমাণ করে, তাহা হইলে তাঁহার যুক্তি গুরু অপেক্ষা অভ্রান্ত; আর তাঁহার যুক্তি যদি অভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং তাঁহার যুক্তি অপেক্ষা অভ্রান্ত, কারণ কার্য্য অপেক্ষা কারণ শ্রেষ্ঠ, সুতরাং মনোরঞ্জন বাবু মহা মহা অভ্রান্ত, অর্থাৎ তিনি অভ্রান্ত গুরুর পিতামহ।

শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন বাবু বলিয়াছেন অভ্রান্ত গুরুবাদ ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী নহে। কেন নহে? যে যুক্তির বলে তিনি গুরুর অভ্রান্ততা প্রমাণ করিতেছেন, তাহা যখন মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল, অর্থাৎ গুরুর অভ্রান্ততা যখন প্রমাণিত হইল না, অর্থাৎ তিনিই ভ্রান্তই রহিয়া গেলেন, তখন তাঁহাকে অভ্রান্ত বলিলে অসত্য কথা বলা হয়। যাহা অসত্য তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী, সুতরাং অভ্রান্ত গুরুবাদ ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী।

"ওঁ ব্রহ্মকৃপাহিকেবলং"।

দীনহীন
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভ্রান্ত গুরুবাদ সম্বন্ধে আমরা আরও অনেকগুলি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। ক্রমে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

ত—স

সবিনয় নিবেদন এই—

১৬ই অগ্রহায়ণের তত্ত্বকৌমুদীতে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ মহাশয়ের পত্র খানি পড়িয়া শঙ্কিত হইয়াছি। অসত্যকে যার-পর নাই ভয় করি, কিন্তু সকল সময় তাহাকে চিনিয়া উঠিতে পারি, এরূপ বিদ্যা বুদ্ধি নাই। সুতরাং গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়ের অবতারণার পূর্ব্বেই যদি "গোঁড়ামি" "অন্তঃসার শূন্যতা" ইত্যাদির বিভীষিকা এবং সত্য ও বিশ্বাসের বিরোধ বিষয়ক সুমিষ্ট শ্লেষের কয়েক মাত্রা সেবন করিয়া লইতে হয়, তবে অল্প বুদ্ধি লোক সহজেই শঙ্কিত হইতে পারে। পুনর্জন্মের দৃষ্টান্তটী পড়িয়া ও আশ্বস্ত হইতে পারি নাই। কারণ এখনও সরল ভাবে (কিন্তু "অবিচারিত ভাবে" নয়) বিশ্বাস করি যে দয়াময়ের রাজ্যে একবার মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া, নেকড়ে বাঘ, ঢোঁড়া সাপ, চিংড়ি মাছ, গুলাউঠার বীজ ইত্যাদি পর্য্যায় ক্রমে অধোগমনের ব্যবস্থা নাই। ব্রাহ্ম অভিভাবকগণ যতই চিন্তাশীল, উপাসনাশীল এবং শ্রদ্ধাস্পদ হউন না কেন, তাঁহাদের উল্লিখিত রূপ বিশ্বাস থাকিলে, অন্ততঃ এবিষয়ে আমি তাঁহাদের পদানুসরণ করিতে অসমর্থ। সত্যই যখন আমাদিগের শাস্ত্র, তখন অসত্যে কি করিয়া বিশ্বাস স্থাপন করি? এর নাম যদি গোঁড়ামি হয়, তবে হে গোঁড়ামি! তুমি কমিও না, কমিও না, কমিও না।

স্বীকার্য্য-অধ্যায়ের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পারাগ্রাফটীর প্রারম্ভেই "ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধন-তত্ত্বের মূলমন্ত্রের" উপর অভ্রান্ত গুরুবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। "প্রভু পরমেশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা", ইহাই ত ব্রাহ্মধর্ম্ম, ইহাই ত তাহার সাধন, ইহাই ত তাহার তত্ত্ব, ইহাই ত তাহার মূল, ইহাই ত তাহার মন্ত্র। ইহাতে 'অভ্রান্ত' হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে নিজেরই অভ্রান্ত হওয়া প্রয়োজন, কারণ নির্ব্বাচন কর্ত্তা স্বয়ং। এ কথাটী গুহ মহাশয়ের উক্ত প্রবন্ধের আলোচ্য নহে বলিয়াছেন। আর বলিয়াছেন, "মানুষকে অভ্রান্ত বলা হইতেছে না, অভ্রান্ত গুরুর সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।" অভ্রান্ত গুরুদের কি মনুষ্যত্ব লোপ পায়? বাস্তবিক ত্রিভুজের বাহু ছাড়িয়া কোণ মাত্র লইয়া "গৰ্দ্দভসেতু" * লঙ্ঘনের চেষ্টা যেরূপ, গুহ মহাশয়ের এ চেষ্টাও দেখিতেছি সেইরূপ। সুতরাং আগে এবিষয়টার একটা মীমাংসা না হইলে চলিতেছে না। গুরু অভ্রান্ত হইলে কি হইল, যদি আমি তাঁহাকে চিনিতে গিয়া ভুল করিয়া বসিলাম? অভ্রান্ত গুরু নির্ণয়ের একটী অভ্রান্ত উপায় চাহি। সে উপায়টী কি শিষ্য নির্দ্ধারণ করিবেন? তবে ত তাঁহার নিজেরই আগে অভ্রান্ত হওয়া চাহি। আর অভ্রান্ত হইলে তাঁর গুরুর প্রয়োজনই বা কি? সে উপায়টী কি গুরু বলিয়া দিবেন? তাহা হইলে ত নির্ব্বাচনই অগ্নিস্থানগামী হয়, কারণ তাহার পূর্ব্বে গুরুকে গ্রহণ করিতে হইতেছে।

অভ্রান্ত গুরুর নির্ণয় সম্বন্ধে যদি এত গোল, তবে তাঁহার অস্তিত্ব লইয়া তর্কে কি লাভ?

"অভ্রান্ত" মানুষ কি হওয়া সম্ভব? মানুষ যে অপূর্ণ; আর তার চিরকাল উন্নতি হইবে—অর্থাৎ সে চিরকালই অপূর্ণ থাকিবে, নচেৎ উন্নতি বন্ধ হইবে। অপূর্ণ যে, সে কি অভ্রান্ত হইতে পারে? সুতরাং গুরু যদি অভ্রান্ত হইতে চাহেন, তাঁহাকে মানুষ ভিন্ন আর কিছু হইতে হইবে। একমাত্র সেই পূর্ণ পুরুষই আমাদের অভ্রান্ত গুরু সেই জন্য সর্ব্বাগ্রে ভিক্ষা করি "অসত্য হইতে সত্যেতে লইয়া যাও।"

গুহ মহাশয়ের স্বীকার্য্যগুলি না মানিলেও অভ্রান্ত গুরুবাদ টিকিতেই পারে না। সে গুলি যিনি মানেন, তিনি যদি মানুষকে পূর্ণ করিয়া দিবার মতন ক্ষমতাশালী পুরুষ না হন, তবে তিনি ও অভ্রান্ত গুরুবাদকে টিকাইতে পারিবেন না; কারণ; "মানুষ ভ্রান্ত" এই চতুর্থ স্বীকার্য্যটীকে তাহার এড়াইবার যো নাই।

এক্ষণে কতকগুলি কথা উপর্য্যুপরি রাখিয়া পত্রের উপসংহার করিতেছি।

১। ঈশ্বর অভ্রান্ত।

২। ঈশ্বরের বাণী অভ্রান্ত।

৩। মানুষ ভ্রান্ত।

৪। মানুষের শ্রুতি ভ্রান্ত।

৫। বিশ্বময় ঈশ্বরের বাণী অবিরত উচ্চারিত হইতেছে, কিন্তু এমন কোন মানুষ থাকা অসম্ভব এবং অযৌক্তিক যে, সেই বাণী শুনিতে এবং তদ্বিষয়ক উপদেশ দিতে তাহার কদাচ ভুল হইতে পারে না।

৬। তবেই ত আর মানুষ অভ্রান্ত গুরু হইতে পারিল না।

উপসংহারে এবিষয়ের অবতারণার জন্য গুহ মহাশয়কে ধন্যবাদ করি। কিন্তু তাঁহার নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, মতভেদ হইলেই যে প্রতিপক্ষ গোঁড়ামী, অবিচার, অসরলতা ইত্যাদি অপরাধে অপরাধী হয়, এরূপ মনে করিবার কোন কারণই নাই। বিশেষতঃ এরূপ যুক্তিতে আলোচনার উপর এক রশ্মিও আলোক নিক্ষেপ করে না। ইতি।

বিনয়াবনত

কলিকাতা শ্রীউপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী।

ব্রাহ্মসমাজ।

উৎসব—খালোড় হইতে কোন বন্ধু লিখিয়াছেন;—

নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে খালোড় ব্রাহ্মসমাজের ৬ষ্ঠ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে;

১৮ই কার্ত্তিক রাত্রে উৎসবের উদ্বোধন ও উপাসনা বাবু রসিকলাল দায় সম্পন্ন করেন। ঐ দিন হইতে উপাসক মণ্ডলীর প্রাণে একটী নবভাবের সঞ্চার হইয়াছিল।

১৯এ কার্ত্তিক—কলিকাতা সাধনাশ্রম হইতে আগত শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন ঘোষাল প্রাতে উপাসনার কার্য্য করেন এবং বৈকালে সমাজ গৃহে "জগাই মাধাই উদ্ধারের"

* "Ass's bridge."

বিষয়ে কথকতা করেন। এই দিন কথকতা শুনিবার জন্য অনেক লোক আসিয়াছিলেন।

২০এ কার্ত্তিক—সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতঃকালের উপাসনার কার্য্য কলিকাতা হইতে সমাগত শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন চন্দ্র পাল সম্পন্ন করেন। মধ্যাহ্নে আলোচনা হয়। বৈকালে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিপিন বাবু একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়া সমাজ গৃহে আগত বহু সংখ্যক লোকের মনোরঞ্জন করেন। রাত্রে উপাসনার কার্য্য হরিমোহন বাবু করেন। উপাসনা মধুর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

২১এ কার্ত্তিক—প্রাতে বাবু ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য উপাসনার কার্য্য করেন। বৈকালে বাগনানের বাজারে নগর সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়। রাত্রে সমাজ গৃহে ব্যক্তিগত প্রার্থনা হয়।

২২এ কার্ত্তিক—রাত্রে শান্তিবাচন।

গত ২৯ নভেম্বর তারিখে খাসিয়া পাহাড়স্থ চেরাপুঞ্জী প্রচার আশ্রমের প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রাতে আশ্রমে বাঙ্গালা এবং খাসিয়া ভাষায় উপাসনা হয়। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। সন্ধ্যাকালে আশ্রমে প্রার্থনাদি হয়। এবং ক্ষুদ্র একটী প্রবন্ধ পঠিত হয়। পরে বাঙ্গালা এবং খাসিয়াতে প্রার্থনা হয়।

সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চদশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস এবং শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঘোষাল তথায় গমন করেন। নিম্নলিখিত রূপে তথাকার উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে;—

১২ই অগ্রহায়ণ রবিবার—প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন হয়। নবদ্বীপ বাবু উপাসনা করেন। অপরাহ্নে বাজারে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়। হরিমোহন বাবু বক্তৃতা করেন। রাত্রিতে পুনরায় মন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ হয়, নবদ্বীপ বাবু উপাসনা করেন। ১৩ই অগ্রহায়ণ রাত্রিতে মন্দিরে নবদ্বীপ বাবু "ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের শক্তির পরিচয়" এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১৪ই অগ্রহায়ণ সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব। দুই বেলা উপাসনা, উপদেশ, পাঠ ব্যাখ্যা ও আলোচনা হয়। নবদ্বীপ বাবুই সমস্ত কার্য্য করেন। ১৫ই তারিখে সন্ধ্যাকালে বাজারের নিকটবর্ত্তী ধানগড়া নামক গ্রামে মুসলমানদিগের সভার অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সেখানে সকলে উপস্থিত হন। প্রার্থনার পর নবদ্বীপ বাবু ও হরিমোহন বাবু উভয়ে বক্তৃতা করেন, সেখানে প্রায় তিন শত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন, বক্তৃতা শুনিয়া তাহারা প্রীত হইয়াছিলেন। ১৬ই অগ্রহায়ণ উৎসবের শেষ দিন নবদ্বীপ বাবু উপাসনা করেন। উপাসনান্তে শ্রীমান্ অনাথ বন্ধু সরকার ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

পাবনা হইতে বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগছি লিখিয়াছেন;—

গত ৪ঠা ও ৫ই অগ্রহায়ণ শনি ও রবিবার দুইদিন পাবনা ব্রাহ্মসমাজের সপ্তত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় এতদুপলক্ষে এখানে আসিয়াছিলেন। প্রথম দিন প্রত্যুষে উষা সঙ্গীত করিতে করিতে সহরের অনেক স্থান প্রদক্ষিণ করিয়া সমাজে উপস্থিত হওয়া যায়। দ্বিতীয় দিনও ঐরূপ উষা কীর্ত্তন হয়। প্রথমদিন প্রাতে মন্দিরে নবদ্বীপ বাবু উপাসনা করেন। অপরাহ্নে বাজারে কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর নবদ্বীপ বাবু "সকলেরই নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তৎপর কীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দিরে যাওয়া যায়, সন্ধ্যাকালে বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয় "আদর্শ অনুসারে জীবন পথে অগ্রসর হওয়া উচিত" এই বিষয়ে ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা করেন। দ্বিতীয় দিন দুই বেলা মন্দিরে উপাসনা উপদেশ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। নবদ্বীপ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ই জানুয়ারী ১৮৯৩ বৃহস্পতি বার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় সিটিকলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। চতুর্থ ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ ও হিসাব।

২। আগামী বর্ষের অধ্যক্ষ সভার জন্য ভোট গণনাকারী সবকমিটী নিয়োগ।

৩। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য নিয়োগ সম্বন্ধীয় অবান্তর নিয়মের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রস্তাব।

৪। বিধবা অথবা বিপত্নীদিগের পুনর্ব্বিবাহ সম্বন্ধীয় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে পুনর্ব্বিচারের জন্য বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন।

৫। সমাজের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ সম্বন্ধে বিচার।

৬। বিবিধ।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৭ই ডিসেম্বর ১৮৯৩

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ।
সাঃ ব্রাঃ সমাজ সম্পাদক

ভোটিং পত্র।

আগামী বর্ষের অধ্যক্ষ সভা গঠনের নিমিত্ত ভোটিং পত্র সভ্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। যদি কোন সভ্য ভোটিং পত্র প্রাপ্ত না হন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে জানাইলে পাইতে পারিবেন। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের মফঃস্বলস্থ সভ্য মহোদয়গণকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা যেন স্ব স্ব ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়গণের নিকট হইতে ভোটিং পত্র লইয়া এবং তাহা পূরণ করিয়া আগামী ৫ই জানুয়ারী ১৮৯৪ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ
২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১লা পৌষ ১৩০০

শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়।
সহকারী সম্পাদক সাঃ ব্রাঃ সমাজ

কোলের দেশে চাঁইবাসা সহরে ব্রাহ্মসমাজের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ইহাতে আনুমানিক এক হাজার টাকা ব্যয় হইবে। সহরটি নিতান্ত সামান্য ও দরিদ্র হইলেও এখানকার অধিবাসিগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইতিমধ্যেই ৩২১ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং আরও শতাবধি টাকা এস্থান হইতে সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা। যদ্যপি এখনও অনেক টাকার অভাব রহিয়াছে, তথাপি ভগবানের কৃপাও সাধারণের দাতব্যের উপর নির্ভর করিয়া, আমরা এই গুরুতর কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। এক্ষণে সর্ব্বসাধারণের নিকট আমাদের সানুনয় প্রার্থনা যে তাঁহারা কৃপা করিয়া এই অনুষ্ঠিত কার্য্যে সহায়তা করিবেন। দান যতই সামান্য হউক না কেন সাদরে ও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহোদয়গণকে দান গ্রহণ করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে।

চাঁইবাসা
২রা ডিসেম্বর ১৮৯৩

শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ।
সম্পাদক

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ৭ই পৌষ প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৮শ সংখ্যা। ১৬শ ভাগ।

১৬ই পৌষ, শনিবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

জীবন সঞ্চার।

কোমল শিশির-বিন্দু পড়ে কোন্ ক্ষণে?
কে সাজায় নব দুর্ব্বাদলে?
রবিতাপে খিন্ন তরু, কে তারে গোপনে
সিক্ত করে শান্তি-প্রদ জলে?

দেখিনা ত কোন্ ক্ষণে জমে সে শিশির,
মুক্তাপাঁতি বিমল প্রভাতে,
প্রেমাশ্রু সলিল সিক্ত মুখে প্রকৃতির
দেখি শুধু অরুণ-বিভাতে।

ধরার উত্তপ্ত মুখে স্নিগ্ধ কর দিয়া
করে বায়ু করে সম্ভাষণ?
যে পরশে প্রেম বিন্দু শিশির হইয়া
সেই তাপ করে নিবারণ?

জানিনা ত কবে পড়ে সে শিশির বারি,
দেখি শুধু সৌন্দর্য্য তাহার,
সংসার-তাপিত চিত্তে করুণা তাঁহারি
গোপনেতে বর্ষে এ প্রকার।

হৃদয় পাতিয়া থাক ঊর্দ্ধপানে চেয়ে
দুর্ব্বাদল যথা সদা রয়;—
বর্ষিবে সে কৃপারাশি জেন সুসময়ে
যাবে তাপ যুড়াবে নিশ্চয়,

আসিছে বসন্ত কাল, তাপিত সংসারে,
তরুলতা সাজিবে আবার,
জীর্ণ অবসন্ন তরু অমৃত আসারে
পাবে, হবে জীবন-সঞ্চার।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

নিরাশা ও আশায় দ্বন্দ্ব—উৎসব সমাগত। আবার আশাপূর্ণ নয়নে ব্রাহ্মগণ মহোৎসবের দিকে চাহিতেছেন। যদি কেহ বলেন, তোমরা ত বার বার আশা কর, বার বার ঈশ্বরের করুণা লাভ কর, অথচ বার বার তাহার সমুচিত ব্যবহার কর না, তবে আর আশা কর কেন? আমরা মুক্ত-কণ্ঠে ও অবনতমস্তকে আপনাদের সকল দুর্ব্বলতা স্বীকার করি—অথচ আবার আশা করি। এই আশাই আমাদের জীবন। জীবনের উচ্চ আদর্শ যাঁহারা হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নিরন্তর এই নিরাশা ও আশার মধ্যে আন্দোলিত হইতে হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের নিকট যে উন্নত আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনকে গঠন করা কি সহজ কথা? যখনই আমরা আত্ম-পরীক্ষা করিব তখনই দেখিব যে আদর্শ হইতে অনেক দূরে রহিয়াছি। তবে আমরা সকল সময় আত্মপরীক্ষা করি না, বলিয়াই নিরন্তর আত্মগ্লানি সহ্য করি না এবং অনেক সময়ে যেখানে আত্ম-তৃপ্তির কারণ নাই সেখানেও আত্ম-তৃপ্ত হইয়া থাকি। ইহার উপরে স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমাদের কার্য্য করিবার শক্তিও অল্প। আমরা হৃদয়ের উত্তেজনাতে অনেক কার্য্যে হস্তার্পণ করি, যাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে আমাদের শক্তিতে কুলায় না। অনেক স্থলে আমাদের বিবেকের দুর্ব্বলতা বশতঃও আমরা অনেক কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ থাকি। আপনাদের এই সকল দুর্ব্বলতা স্মরণ হইলে, বাস্তবিক এক এক সময়ে নিজেদের প্রতি এতই অশ্রদ্ধা হয়, যে তখন আর আপনাদিগকে ঈশ্বর ও মানবের সেবার উপযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু মানবের আধ্যাত্মিক জীবনের গূঢ় রহস্য এই যে নিরাশার পার্শ্বে আশা লুকাইয়া থাকে;—মানবের দুর্ব্বলতার মধ্যেই ঈশ্বরের সবলতা নিহিত থাকে। প্রকৃত বিশ্বাসী ব্যক্তি আপনার দুর্ব্বলতা যতই গভীররূপে অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহার করুণার উপরে ততই গাঢ় নির্ভর উপস্থিত হয়। অতএব শত দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও আজ ব্রাহ্মগণ আশাপূর্ণ অন্তরে প্রভু পরমেশ্বরের করুণার দিকে চাহিতেছেন। বৎসর যতই শেষ হইয়া আসিতেছে; আত্ম-পরীক্ষার তীব্র ছুরিকা আমাদের হৃদয় মনকে কাটিতেছে। কত শুভ সংকল্প বিফল হইয়াছে, কত অনুষ্ঠিত কার্য্য পরিত্যক্ত হইয়াছে, কত শুভ উদ্যোগ অসমাপ্ত রহিয়াছে; কত ভ্রম, প্রমাদ, ত্রুটী দুর্ব্বলতা সঞ্চিত হইয়াছে। আজ কোন্ ব্রাহ্ম এরূপ আছেন, যিনি মহোৎসবের আনন্দ ভেরীর নিনাদ শুনিয়া

উঠিয়া দাঁড়াইবার সময়ে এ কথা বলিবেন না—"আমার যাহা করা উচিত ছিল অথচ করিতে পারিলাম না, প্রত্যুত যাহা করা অনুচিত ছিল অথচ করিলাম, আমার সে সকল অপরাধ ক্ষমা কর আমি অনুতাপ সহকারে প্রার্থনা করিতেছি।" তবে কথা এই আর মৃত সংকল্পের শ্মশানে বসিয়া রোদন করিয়া কি হইবে, অনুতাপাশ্রুরূপ প্রায়শ্চিত্তের পণ উৎসর্গ করিয়া আমাদিগকে নবশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনাপূর্ণ অন্তরে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে। এই ব্যাপার জীবনে সর্ব্বদা চলিতেছে। এই নিরাশা ও আশার দ্বন্দ্বে ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

নিম্নভূমি—সর্ব্বদাই দেখা যায়, মানুষ যতক্ষণ কোনও গুরুতর কার্য্যে হস্তার্পণ না করে, কোনও কঠিন ব্রত সাধনের ভার আপনার উপরে না লয়, ততক্ষণ সে আপনার বলের প্রকৃত পরিমাণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কর্ত্তব্য ক্ষেত্র হইতে দূরে বসিয়া অনেক দুর্ব্বল ব্যক্তি আপনাকে সবল ভাবিতে পারে, ভীরু আপনাকে সাহসী বিবেচনা করিতে পারে, সংকীর্ণ-চেতা ব্যক্তি আপনাকে উদার মনে করিতে পারে, কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি যখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন, যখন কোনও গুরুতর দায়িত্ব আপনাদের উপরে গ্রহণ করেন, যখন কোনও মহৎ-আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে প্রয়াসী হন, তখন আপনাদের দুর্ব্বলতা আপনাদের চক্ষে প্রতিভাত হইতে থাকে; তখন অন্তরের গূঢ় ব্যাধি যে কিছু আছে তাহা ধরা পড়ে। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ জীবনে সাধন করিতে গিয়া এবং ব্রাহ্মসমাজের মহৎ কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়া আপনাদের অন্তরে কোথায় কি ব্যাধি আছে, তাহা প্রতিদিন লক্ষ্য করিতে পারিতেছি। ইহাও পরম লাভ। ইহাতে বিনয় আনিয়া দেয়। যেখানে বিনয় সেইখানেই ব্রহ্মকৃপা। অতএব মহোৎসবের আনন্দে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমরা এই বিনয়কে হৃদয়ে স্থান প্রদান করি। আপনাদের কোথায় কোন ব্যাধি আছে, তাহা জানিতে ত আর বাকি নাই। সেই সকল স্মরণ করিয়া অবনত মস্তকে ব্রহ্ম-কৃপার জন্য অপেক্ষা করি। বৃষ্টির জল সর্ব্বত্রই পতিত হয়, কিন্তু উচ্চভূমি হইতে তাহা গড়াইয়া চলিয়া যায় এবং নিম্ন ভূমিতে গিয়া সঞ্চিত হইয়া থাকে। ইহা অতি প্রাচীন দৃষ্টান্ত। কিন্তু ইহার প্রাচীনতা নিবন্ধন ইহার গভীরতা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। এই যে মহোৎসব আসিতেছে [illegible] কে সমধিক উপকৃত হইবে? বিনয়ে যাহার মস্তক অবনত থাকিবে উৎসব তাঁহারই জন্য আসিবে। কত উৎসবে আমরা দেখিয়াছি ব্রহ্ম কৃপার স্রোত বন্যার জলের ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছে; যাঁহারা অহঙ্কারে বা অভিমানে মস্তক উন্নত করিয়া থাকিয়াছেন, তাঁহারা সকলে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহারা যে শুষ্ক হৃদয় লইয়া ছিলেন তাহা লইয়াই পড়িয়া থাকিয়াছেন আর যাঁহাদের হৃদয় নিম্ন ভূমির ন্যায় অবনত থাকিয়াছে তাঁহারাই ব্রহ্ম-কৃপার স্রোত প্রাণ ভরিয়া সম্ভোগ করিয়াছেন। জগদীশ্বর সুসময়ে আমাদিগকে বিনয় দিয়া উৎসবের জন্য প্রস্তুত করুন।

প্রকৃত নির্ভরশীলতা—আহারাচ্ছাদন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শারীরিক প্রয়োজনীয় পদার্থের জন্য চিন্তিত না হইয়া সম্যকরূপে সে সকল বিষয়ে পরমেশ্বরের প্রতি ভারার্পণ করিয়া এবং তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল হইয়া, তাঁহার ইচ্ছা পালন করা, তাঁহার প্রিয়কার্য্যে রত থাকা, ইহাই সর্ব্ব সময়ের সর্ব্ব দেশের বিশ্বাসিগণের লক্ষণ বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে। সংসারের চিন্তা একেবারে দূর করিয়া সে সকল বিষয়ের ভার সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে পারা একদিকে যেমন বিশ্বাসের লক্ষণ, অপরদিকে এসকল ক্ষুদ্র বিষয়ের জন্য লোকের মুখাপেক্ষী হওয়া এবং মানবের সাহায্য-প্রার্থী হওয়া বা মানবের উপর নির্ভর করা, তেমনি হীনতা-ব্যঞ্জক এবং আশঙ্কা-জনক। সাধক সর্ব্বদাই আহার পান প্রভৃতি বিষয়ে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিবেন। তিনি যে ভাবে রাখেন, যে ভাবে চলিতে বলেন সে ভাবেই থাকিবেন এবং চলিবেন। তাহা যেমন গৌরবকর তেমনি নিরাপদ। দুর্ব্বল মানবের প্রতি সাধকের আস্থা এমন কম যে সামান্য শারীরিক প্রয়োজন সাধনার্থেও তাহার উপর নির্ভর করিতে সাহসী হন না এবং তাহাকে নিরাপদ অবস্থা জ্ঞান করেন না। বরং সেরূপ করাকে অত্যন্ত লঘুতা-ব্যঞ্জক ও গৌরব-হানিকর বলিয়াই জানেন। সামান্য শারীরিক প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্যই যদি লোকের প্রতি নির্ভর করিতে ভরসা না হয় এবং তাহা যদি ধর্ম্মহানিকর ও বিশ্বাসের অল্পতার পরিচায়ক হয়—যে শরীরের সহিত অতি অল্প সময়ই আত্মার সম্বন্ধ থাকিবে, যে শরীরের অস্তিত্ব কয়েক বৎসর বা মাস বা দিনেই পর্য্যবসিত হইবে, যাহার প্রয়োজন অতি সামান্য চেষ্টা ও যত্নে সিদ্ধ হইতে পারে, তাহার ভারই যদি মানবের প্রতি দেওয়া এত আশঙ্কা-জনক ও ধর্ম্মহানিকর হয়, তাহা হইলে যে আত্মা অনন্ত কাল থাকিবে—অনন্ত উন্নতিই যাহার স্বভাব, তাহার কল্যাণ সাধনের ভার লোকে কোন্ ভরসায় যে আর একজন ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল ও সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন মানবের উপর প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায় তাহার রহস্য বুঝা যায় না। শরীরের জন্য ভাবনা করা ধর্ম্মহানিকর, তাহার ভার অন্য লোকের উপর দেওয়া যদি হীনতা-ব্যঞ্জক ও অপমানকর হয় তবে আত্মার ভার অন্য মানবের দেওয়া কি হীনতার প্রকাশক নয়, তাহা কি আত্মার অপমানকর নয়? শরীরের ভারই যদি অন্য লোকের প্রতি দিতে ভরসা না হয় তাহা হইলে আত্মার ভার কোন্ ভরসায় অন্য লোকের প্রতি দেওয়া যাইতে পারে? যাঁহারা এরূপে আত্মার ভার অন্য লোকের উপর দেন, তাঁহারা হয় আত্মার প্রতি উদাসীন; না হয় আত্ম-জ্ঞানে বঞ্চিত। যাঁহারা ভরসা করিয়া আত্মার ভার ঈশ্বরে অর্পণ করিতে পারেন না, তাঁহাতে নির্ভরশীল হইয়া তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া ও তাঁহার ব্যবস্থার অপেক্ষায় থাকিতে সাহসী হন না, তাঁহাদের ঈশ্বরের প্রতি শারীরিক ভারার্পণের কথাও অসঙ্গত ও অর্থহীন হইয়া পড়ে। তাঁহারা ঈশ্বরকে একটা কথার কথা বলিয়া মনে করেন। কাজের বেলায় তাঁহাতে নির্ভরশীল হইতে পারেন না। প্রকৃত বিশ্বাসী তিনি, যিনি কি শারীরিক কি আধ্যাত্মিক সকল

বিষয়েই সেই সর্ব্বশক্তিমানের প্রতিই নির্ভরশীল হন। কেবল শরীরের ভার নয়; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আত্মার ভারও তাঁহাতে অর্পণ করিয়া আশ্বস্ততার সহিত তাঁহারা ধর্ম্মপথে চলিয়া যান। ব্রাহ্মগণ শরীর ও আত্মা উভয়ের ভারই পরমেশ্বরে অর্পণ করিতে অভ্যস্ত হউন। তাহাতেই পরম কল্যাণ লাভ হইবে। ঈশ্বর আমাদিগকে শুভ মতি প্রদান করুন যেন সকল বিষয়েই আমরা তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে পারি।

কে ঈশ্বরের করুণার সাক্ষী দিবে?—সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের নাম প্রচার করিবার জন্য লোকের প্রয়োজন। যে সকল ব্রাহ্ম নরনারী তাঁহার করুণায় নবজীবন পাইয়াছেন—তাঁহার করুণার পরিচয় পাইয়াছেন—তাঁহারা কি সেই করুণার কথা জগতের নরনারীর নিকট বলিয়া, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের শীতল ছায়াতে সকলকে ডাকিবেন না? আমরা সর্ব্বদাই অনুভব করিতেছি ব্রাহ্মধর্ম্মের সমাচার নরনারীর নিকট বলিবার জন্য শত শত ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার জীবন উৎসর্গ করা প্রয়োজন। যাহা বুঝিতেছি তাহার অনুসরণ করিয়া সকলকেই আহ্বান করিতেছি—যাহারা ঈশ্বরের করুণার সাক্ষী দিতে ইচ্ছুক তাঁহারা ত্বরায় জীবন মন এই কার্য্যে নিয়োগ করুন। জীবনের যত বেশী দিন তাঁহারা করুণার কথা বলিতে পারেন ততই ভাল। যাঁহাদের প্রাণে ইচ্ছা আছে—ও যাঁহারা তাঁহার ডাক অনুভব করিতেছেন তাঁহারা আর বিলম্ব করিবেন না। আমরা ঈশ্বরের কার্য্যে ঈশ্বরের নামে তাঁহাদিগকে ডাকিতেছি। আমাদের এই ডাক কাহারও কর্ণে না পৌঁছিলেও প্রভু তাঁহার কার্য্য করাইবার জন্য লোক ডাকিয়া আনিবেন, এই বিশ্বাসের অধীন হইয়া সকলকে ডাকিতেছি ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তিনিই তাঁহার কার্য্য করাইয়া লইবেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্য অতি বিস্তৃত, এখানে কার্য্য করিবার লোকের সংখ্যা অতি অল্প। পঞ্জাবে প্রচারক্ষেত্র খুলিবার জন্য প্রস্তাব হইতেছে, পূর্ব্ববাঙ্গালায় বিশেষ ভাবে প্রচারের বন্দোবস্ত আবশ্যক। বোম্বে, মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে লোক প্রেরণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। জাপান ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার করিবার অতি উপযুক্ত ক্ষেত্র। কিন্তু তাঁহার ক্ষেত্রে কাজ করে লোক কোথায়? আমরা আবার ঈশ্বরের নামে ব্রাহ্ম নরনারীদিগকে আহ্বান করি, যাঁহারা তাঁহার কার্য্যে জীবন দিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা আর বিলম্ব করিবেন না। এবার মাঘোৎসবের পরে যেন সকলে কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রবেশ করিতে পারেন। ঈশ্বরের আহ্বান শ্রবণ করিয়া তাঁহার করুণার নির্ভর করিয়া একাযো অগ্রসর হউন। তিনিই তাঁহার পথ দেখাইবেন, তিনিই এপথের সহায়, কোনও ভয় নাই। তাঁহার কার্য্যে এ জীবন দিতে পারিলে কিনা হইল। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

কার্য্যে-সুশৃঙ্খলা—ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে সুশৃঙ্খলতার অভাব সর্ব্বদাই অনুভব করা যায়। উচ্চ আদর্শ লইয়াই অনেক সময় কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতেই দেখি সেই আদর্শ হইতে দূরে পড়িয়াছি। মনে মনে কতই সুন্দর ছবি গড়িয়া, কাগজে অঙ্কিত করিতে গেলাম, কিন্তু কাগজে আর সেই ছবি অঙ্কিত হইল না, এখন সে ছবি কদাকার। মন আর সেই ছবি দেখিয়া সন্তুষ্ট হয় না। প্রায় প্রত্যেক কার্য্যেই এই প্রকার ভাব দেখিতেছি। স্থিরচিত্তে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে, এই শিথিলতার মূলে বিশেষভাবে আমাদের হৃদয় নিহিত যে দুই একটী দোষ লক্ষিত হয়, এস্থলে তাহারই উল্লেখ করিব। প্রথম কারণ এই আমরা অনেক কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বিশেষ চিন্তা ও আত্ম-পরীক্ষা করি না। সেই কার্য্য পরিচালন করিবার শক্তি ও সামর্থ্য আমাদের মধ্যে আছে কি না, তাহার বিষয় বিশেষরূপে ভাবি না। অতি দায়িত্ব-বিহীনভাবে অনেক কার্য্যের সূচনা করি, কিন্তু ইহার পরিণাম কে রক্ষা করিবে, কি ভাবে রক্ষা হইবে, তাহার বিষয় ভাবি না। কোন কার্য্যে হস্ত দিবার পূর্ব্বে সেই কার্য্য পরিচালনের উপযুক্ত ব্যক্তির অনুসন্ধান করা যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহা একেবারে ভুলিয়া যাই। জগতে অনেক সৎকার্য্য আছে, কিন্তু জীবনের লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সেই কার্য্যে কতটুকু লিপ্ত হইতে পারিব, তাহা বিবেচনা না করিয়া গুরুতর কার্য্যে আমরা হাত দি। তাহার ফল এই হয় যে, সেই কার্য্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

ইহার দ্বিতীয় কারণ কার্য্যে অনুরাগ ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার অভাব। আমাদের জীবনে এক প্রকার এমন লঘুভাব রহিয়াছে যে, আমাদের জীবনের নিকট যাহা উপস্থিত হয়, তাহাই ধরি ও তাহার পশ্চাতেই ছুটী। সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের যেন কোন কেন্দ্র নাই। সৎকার্য্য আমাদের জীবনের নিকট অনেক সময় প্রলোভনের কার্য্য করে। একটী দৃষ্টান্ত দিলে আমাদের কথা পরিষ্কার হইবে। ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কার্য্য আধ্যাত্মিক উন্নতি। সেই কার্য্যের সহায়তার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা, উপাসকমণ্ডলী, আচার্য্য ইত্যাদি। যদি সমাজের অন্ততঃ ৪।৫ জন প্রধান প্রধান ব্যক্তি দিনরাত এই কাজের জন্য খাটেন, তবে এই উপাসকমণ্ডলীর উন্নতি হয়। কিন্তু তাহা হইতেছে না। মুখ্য ও গৌণকার্য্যের বিচারে আমাদের শক্তি অতি অল্প। আমাদের লোকের যদি অল্পতা থাকে, অনেক কার্য্যভার না লইলেই হয়। আশা করি, নববর্ষের কার্য্যারম্ভের সময় এই সকল বিষয় আলোচিত হইবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্রহ্মোৎসব।

কুসুমকুন্তল তরুগণ এবং কুসুমকুন্তলা লতারাজি যখন সুসময়ে সৃষ্টির সর্ব্বোত্তম উপাদেয় ও মনোহর আভরণে ভূষিত হইয়া, সুসৌরভে চারিদিক আমোদিত করিতে থাকে, যখন তাহারা ফুলসাজে সজ্জিত হইয়া উল্লাসের সহিত মধু সঞ্চয়কারী মধুকরগণকে প্রমত্ত করিয়া, আকর্ষণ করিতে থাকে এবং তাঁহাদের অনুকূল আমন্ত্রণে আমন্ত্রিত হইয়া লুণ্ঠনব্যবসায়ী মধুকরগণ

যখন আপনাদের চিরাভ্যস্ত লুণ্ঠন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, মধুভাণ্ডে মুখ দিয়া মধু সঞ্চয় করিতে থাকে এবং আপনাদের স্বভাবসুলভ চপলতা বিস্মৃত হইয়া, যখন শান্তভাবে মধু সঞ্চয়ে নিযুক্ত থাকে এবং মধুর গুন গুন ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতে থাকে, তখন মনে হয়, তাহারা উৎসব করিতেছে। কারণ উৎসব সেই অবস্থাকেই বলা উচিত, যে অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় এবং প্রিয় পদার্থের সহিত সংযোগ ঘটে। যাহা সর্ব্বাপেক্ষা লভনীয় এবং আরাম ও কল্যাণপ্রদ তাহার সহিত সম্মিলনই প্রকৃত আনন্দের উপযুক্ত সময়। মধুমক্ষিকাদিগের পক্ষে মধু-সংগ্রহের কালই সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় কাল। তাহাই তাহাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শান্তি আরামপ্রদ সময়। সে সময়ে তাহাদের স্বভাবেও আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। তাহাদের স্বভাবসুলভ নিত্য চপলতা আর তখন লক্ষিত হয় না। এমন যে চপল—এমন যে অস্থির, যাহারা মুহূর্ত্তকালও স্থিরভাবে অবস্থিতি করে না, তাহারাও তখন শান্তভাবে মধুভাণ্ডে মুখ সংলগ্ন করিয়া আনন্দে মধুপান করে, মধু সঞ্চয় করে এবং গুন গুন ধ্বনিতে তাহাদের সুসময়দাতার মহিমা কীর্ত্তন করে। তখন তাহারা দুর্ব্বল হইয়াও সবল হয় সহজভীরু হইয়া নির্ভীক হয়, তখন তাড়াইলে তাহারা আপন স্থান হইতে বিচলিত হয় না। মধুকরের পক্ষে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সময় এবং প্রার্থনীয় অবস্থা। তাহাদের পক্ষে ইহাই প্রকৃত মহোৎসব।

উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহা দ্বারাই আমাদের ব্রহ্মোৎসব কি তাহা বুঝা যাইতেছে। মানবাত্মার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় এবং কল্যাণকর অবস্থা কি? ব্রহ্ম-সত্তাতে নিমগ্ন হইয়া মানব যখন আত্মার চিরসম্বল চিরকালের অবলম্বন অমৃত ধন আস্বাদনে তৃপ্ত হয়, যখন তাহার আরাম ও বিশ্রাম স্থল প্রিয়তম পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহাতেই যখন আত্মা বিচরণ করে, তাঁহাতেই সান্ত্বনা লাভ করে এবং তাঁহার আরামপ্রদ পবিত্র সহবাসে থাকিয়া যখন আপনার জীবন সম্বল পুণ্যধন সঞ্চয় করিতে করিতেও তাঁহার পবিত্র যশঃ ও মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকে এবং সংসারের সকল ভাবনা বিস্মৃত হইয়া, সেই সত্তা সাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়, যখন বিষয়ীর বিষয়কামনা, কর্ম্মীর কর্ম্মলালসা তাঁহাকে পাইয়া নিবৃত্ত হয়; যখন যশঃপ্রার্থীর যশঃলালসা ধনাভিলাষীর ধন-পিপাসা এবং পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার ভোগ বিলাসীর ভোগ বিলাসের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে পাইয়া, তাঁহার সুধাময় সহবাসে নিমগ্ন হইয়া শান্ত হয়, চিরাভ্যস্ত চপলতা ও অস্থিরতা যাইয়া যখন মধুকরের ন্যায় সুধাময় পরমেশ্বরে প্রাণ মন সংযোজন পূর্ব্বক সুস্থির প্রশান্ত হয়, তখনই তাহার পক্ষে প্রকৃত ব্রহ্মোৎসব উপস্থিত হয়। তখনই সে উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়। পরমাত্মাতে আত্মা বিহার করিবে, তাহাতেই নিমগ্ন হইয়া পৃথিবীর অন্য সকল বাসনা কামনা অতিক্রম করিয়া সেই আনন্দ ও শান্তির খনি হইতে আনন্দ শান্তি আহরণ করিবে, ইহাই মানবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয়, সর্ব্বাপেক্ষা আরামপ্রদ ও সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর অবস্থা; তাহারই নাম ব্রহ্মোৎসব। ব্রহ্মকে লইয়া আনন্দ করা, তাঁহাতে বিশ্রাম করা এবং তাঁহাকে পাইয়া শান্ত হওয়া ইহাই ব্রহ্মোৎসবের চরম ফল।

আমরা এই উৎসবের অধিকারী, এই প্রকার উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিবার জন্যই আমরা সৃষ্ট হইয়াছি। ব্রহ্মোৎসবে বাহিরের আড়ম্বর ধূমধাম তখনই শোভনীয়, যখন তাহা সেই ব্রহ্মসত্তা সাগরে নিমগ্ন হইবার পক্ষে সাহায্যকারী হয়। তখনই ব্রহ্মোৎসবের আয়োজন সার্থক হয়, যখন আত্মা তাঁহার চির-প্রার্থিত বস্তু ও চির আরামের স্থল অধিকার করিতে পারে। আমাদের জন্য সেই ব্রহ্মোৎসব আবার আসিতেছে। সেই প্রার্থনীয় সময় সমাগত হইতেছে যে সময় আমরা বিশেষ ভাবে এই উৎসব করিতে সুবিধা পাই। বাস্তবিকই কি ব্রাহ্মগণ এই উৎসবে তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় অধিকার ব্রহ্ম-সহবাস লাভে সক্ষম হইবেন? বাস্তবিকই কি তাঁহাকে প্রাণে পাইয়া ব্রাহ্মগণ পৃথিবীর ধন মান যশাকাঙ্ক্ষা বিস্মৃত হইতে সক্ষম হইবেন এবং সেই অমৃতভাণ্ডে মুখ যোজনা করিয়া অমৃতের আস্বাদন করিতে করিতে অমরত্ব পাইতে পারিবেন। যদি তাহা পারেন, তাহা হইলে মাঘোৎসব সার্থক হইবে এবং তাহার আয়োজন সার্থক আয়োজন হইবে। নতুবা উৎসবের জন্য আমরা সকল কার্য্যই করিব, কিন্তু সেজন্য যে পরিশ্রম ও সময় ব্যয় হইবে তাহা পরিশ্রম মাত্রই সার হইবে এবং যে সময় ব্যয় হইবে তাহার বৃথা সময়ক্ষেপ মাত্রই হইবে।

এই উৎসবের জন্য যে আয়োজন তাহা কি প্রকারের আয়োজন? আমাদের বল, বুদ্ধি, ধন,জন এ কার্য্যে যে বেশী সহায়তা করিবে তাহা নয়। কিন্তু এই আয়োজনের আদি অন্ত নির্ভর ও ব্যাকুলতা। সেই ক্ষুধা পাওয়া চাই, যে ক্ষুধা জন্মিলে মানুষের আর অন্য চিন্তার অবসর থাকে না। দুর্ভিক্ষের সময় মানুষ যেমন অনন্য-কর্ম্মা হইয়া, অনন্যচিত্ত হইয়া কেবল আহার্য্য বস্তুরই অনুধ্যান করে, তাহারই অন্বেষণ করে এবং যাহা পায় তাহাই উদরস্থ করে, অমৃত ধনের জন্য—পুণ্য ধনের জন্য আমাদের সেই ক্ষুধা পাওয়া চাই। সেইরূপ নির্ভর ও ব্যাকুলতা চাই, অনুদ্গত-পক্ষ বিহগশাবক তাহার মাতার জন্য যেমন ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করে। তাহার নিজের কিছুই করিবার শক্তি নাই, বাসা হইতে উড়িয়া যাইয়া আহার করে এমন সাধ্য নাই, ক্ষুধায় প্রাণ আকুল অথচ নিজে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে তাহার এমন কোনই শক্তি নাই, তখন মাতাই তাহার একমাত্র ভরসা। মাতা আসিয়া আহার না দিলে তাহার আহার পাইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই। সেই অবস্থায় তাহার মাতার জন্য যে ব্যাকুলতা—মাতার জন্য যে অপেক্ষা করিয়া থাকিবার ভাব, আমাদিগকে সেইভাবে অপেক্ষা করিতে হইবে, সেই ভাবে অনন্যো-পায় হইয়া নির্ভর ও ব্যাকুলতার সহিত জগন্মাতার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। পক্ষীশাবক যেমন জানে তাহার মাতা আসিয়া তাহাকে আহার দিবেই, আমাদেরও সেইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস লইয়াই থাকিতে হইবে, যে জগন্মাতা আমাদের ক্ষুধায় অন্ন দিবেনই দিবেন। তাঁহার অঙ্গীকার অব্যর্থ-অঙ্গীকার। তাহা তিনি পূর্ণ করিবেনই—আমাদের আশা কখনই অপূর্ণ রাখিবেন না।

মধু সঞ্চয়কারী মধুকরগণকে কি কেহ নিমন্ত্রণ করিয়া ডাকিয়া আনে? কেহ কি যাইয়া বলে যে বনে ফুল ফুটিয়াছে, তোমরা যাও, মধু সংগ্রহে প্রবৃত্ত হও। কেহ কি এমন সংবাদ লইয়া তাহাদিগকে ডাকিতে যায়? কে যে তাহাদিগকে সে সংবাদ দেয় কেহই তাহা জানে না। তবে মনে হয়, ফুলের আকর্ষণেই তাহারা মধু সঞ্চয় করিতে যায়। ফুলের সৌরভই তাহাদের প্রাণকে আকুল করিয়া থাকে। আমাদের উৎসবের নিমন্ত্রণ কর্ত্তা কে? কোন মানুষ কি এই নিমন্ত্রণের ভার পাইয়াছেন? মানুষের যে আমন্ত্রণপত্র যায় তাহা ত অতি সামান্য, উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু প্রকৃত আমন্ত্রণ সেই সুধাময়ী জগন্মাতাই করিয়া থাকেন। তাঁহার সুমধুর আহ্বানের বিরাম নাই। অনাহত শব্দে নিরন্তর তিনি তাঁহার সন্তানগণকে ডাকিতেছেন। সে আমন্ত্রণধ্বনির বিরাম নাই। যাহার কর্ণ সেই ধ্বনি শুনিতে পায়, সে আর সুস্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। তাহার পৃথিবীর বিষয় সম্পদ একদিকে পড়িয়া থাকে; তাহার প্রাণ সেদিকে দৃষ্টিপাত করিবারও অবসর পায় না। এই ধ্বনি শুনিয়া যাঁহারা উৎসবে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারাই বাস্তবিক ব্রহ্মোৎসবের উৎকৃষ্ট ফল লাভে সমর্থ হইবেন। তাঁহাদের পক্ষেই "নিমন্ত্রিত আজি সখার প্রেম ভবনে" এই গান করা শোভা পাইবে। ব্রহ্মোৎসব কোন সময়বিশেষে আবদ্ধ নহে। কোন স্থান বিশেষেও তাহা আবদ্ধ নয়। ব্যাকুলাত্মার পক্ষে—ব্রহ্মপিপাসুর পক্ষে তাঁহার সহবাস লাভ, তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ সকল সময়ে সকল স্থানেই সম্ভবে। মূল আয়োজন নির্ভর ও ব্যাকুলতার সহিত অকিঞ্চন ভাবে, তাঁহার জন্য অপেক্ষা করা তাঁহাকে ডাকা।

অনেক প্রতিবন্ধক এই পথে বাধা প্রদান করিবার জন্য আগবাড়াইয়া আছে। সাংসারিকতা প্রভৃতি বাহিরের শত্রু অপেক্ষা অন্তরের শত্রু—অক্ষুধা অরুচি ও আলস্য প্রভৃতি শত্রুগণই অলক্ষ্য ভাবে প্রধানতঃ শত্রুতা সাধন করিয়া থাকে। আমাদের পক্ষে সেই সকল আন্তরিক শত্রুর সহিত সংগ্রাম করাই বিশেষ কঠিন। কারণ তাহারা অন্তরে লুক্কায়িত ভাবে থাকিয়া কার্য্য করে। প্রথমতঃ এসকলকে ধরিতে পারাই নিতান্ত দুঃসাধ্য। তৎপর এই সকলকে ধরিতে পারিলেও অতিক্রম করা আরও কঠিন। অতিক্রম করিতে হইলেই নিজের অন্তরের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। পরের সহিত সংগ্রাম করিবার ইচ্ছা সহজেই হইতে পারে। কিন্তু নিজের সহিত সংগ্রাম করা সহজসাধ্য নহে এবং লোকে তাহাতেই অধিক পরিমাণে অনিচ্ছুক হইয়া থাকে। এই ভিতরকার শত্রুকে ধরিয়া তাহাকে পরাস্ত করিতেই বিশেষ ব্যগ্র হইতে হইবে। একা একা এই সকল শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিতে অনেক সময় প্রবৃত্তিও হয় না, তেমন জোরে আঘাত করিতে সুবিধাও হয় না। এজন্য সমবেত চেষ্টা এবং ব্যাকুলাত্মাগণের সম্মিলনেই আমরা বিশেষ বল প্রাপ্ত হই এবং প্রবল বলে অন্তরের শত্রুকে আক্রমণ করিতে পারি। এই জন্য উৎসবক্ষেত্রে ব্যাকুলাত্মাগণের সম্মিলন বিশেষ ফলদায়ক এবং তাহাই ব্রহ্মোৎসব সম্ভোগের পক্ষে সুসময়। ব্যাকুলাত্মাগণ সকলে সম্মিলিত হউন। ব্রহ্মোৎসবে ব্রহ্মধন লাভ করিয়া সকল মনোরথ হউন। ফলদাতা সিদ্ধিদাতা পিতা সকলকে ব্রহ্মোৎসবের শ্রেষ্ঠ দান—তাঁহার পরিচয় ও তাঁহাতে নিমগ্ন হইবার সুযোগ আমাদিগকে প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন।

দোষ কাহার—সাধন-প্রণালীর না সাধকের?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কতকগুলি সুমিষ্ট বাক্য, প্রার্থনা নয়। অন্য লোকের দেখা দেখি হউক অথবা অন্য যেরূপেই হউক, আমাদের মধ্যে সময় সময় যে একটুকু ভাসা ভাসা আকাঙ্ক্ষা জন্মে অথচ প্রাণের গভীর প্রদেশের ভাব, পাপ লইয়া—অন্য জিনিস লইয়া বেশ আছি, তাহা ছাড়িতে প্রস্তুত নহি। গভীর প্রদেশে কোন অভাব বোধ নাই, কোন কষ্ট নাই,—এরূপ আকাঙ্ক্ষাও প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা নহে—প্রার্থনা নহে। এরূপ প্রার্থনায় কোন ফল হইতে পারে না। এভাবে চিরজীবন সাধন করিলেও ব্রহ্মদর্শন লাভ হইবে না। কারণ এখানে প্রাণের পরিবর্ত্তন নাই। এরূপ সাধনে বরং আমরা প্রকৃত জীবন লাভের অন্তরায় আনয়ন করি! এভাবে চলিলে শেষে আমাদের প্রকৃত প্রার্থনাতে অবিশ্বাস জন্মে এবং আমরা সাধনাদি পরিত্যাগ করি। অপর পক্ষে এই সকল বাহ্যানুষ্ঠানে অহঙ্কার জন্মে। ব্রহ্ম লাভ সম্বন্ধে আরও কতকগুলি অন্তরায় আছে। এসম্বন্ধে মহাত্মা ইমার্সন (Emerson) বলিতেছেন। "When we have broken our God of tradition, and ceased from our God of Rhetoric, then may God fire the heart with his presence. অর্থাৎ সংস্কার লব্ধ ঈশ্বর, বাক্যের ঈশ্বর, অনুমানের ঈশ্বর, সর্ব্বপ্রকার কল্পনার ঈশ্বর, প্রাণে প্রকাশিত হইতে পারেন। যে পর্য্যন্ত ইহাদিগকে ভাঙ্গিয়া না ফেলি সেই পর্য্যন্ত তিনি প্রকাশিত হইতে পারেন না। কারণ আমরা ছায়াকেই ব্রহ্ম মনে করিয়া তৃপ্ত থাকি; আর তাঁহার জন্য ব্যাকুল হই না। এই অবস্থা যে প্রকৃত ব্রহ্মদর্শনের কত শত্রু তাহা বলা যায় না। ইহা আমাদিগকে যতদূর ভ্রান্ত করিয়া থাকে, আর কিছুতেই এরূপ পারে না। কারণ ইহা অনেক বিষয়েই ব্রহ্মের অনুরূপ অথচ ব্রহ্ম নয়। বিশেষ পরীক্ষা ভিন্ন আমরা এ ভুল ধরিতে পারি না। কি কি ভাবে এরূপ অবস্থা হয় এবং তাহাতে কেন ব্রহ্ম লাভ হইতে পারে না, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনি অনেক পুস্তক পড়ি, ইহাতে তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের প্রাণে একটী ভাব দাঁড়াইয়া যায়, আমাদের প্রাণে তাঁহার একটী প্রতিকৃতি (Image) গঠিত হয়। ইহা কখনও সত্য ব্রহ্ম নহে। আবার আমরা নিজে তাঁহার নানা স্বরূপ বর্ণনা করিয়া প্রাণে তাঁহার ভাব জন্মাইতে পারি। এই অবস্থায়ও প্রাণে তাঁহার একটী প্রতিকৃতি গঠিত হয়। ইহাও সত্য ব্রহ্ম নহে। পূর্ব্বে কোন সময়ে ব্রহ্মদর্শন হইলে, স্মরণ-শক্তির ক্রিয়া দ্বারা সেই অবস্থাটী

প্রাণে আনয়ন করিতে পারি—এই অবস্থায়ও প্রাণে তাঁহার ভাব জন্মিবে তাঁহার প্রতিকৃতি গঠিত হইবে। ইহাও সত্য ব্রহ্ম নহে। যাহা বলা হইয়াছে ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি, কি প্রকারে আমরা প্রার্থনার ন্যায় আমাদের আরাধনারও অপব্যবহার করিতে পারি। ব্রহ্মদর্শন হইলে বিশেষ ভাবে তাঁহার চিন্তা করার নাম আরাধনা। প্রথম প্রাণে ব্রহ্ম প্রকাশিত না হইলে আরাধনা অসম্ভব হয়, কাযেই সেই "আরাধনাতে" ফল হইতে পারে না। সত্যং জ্ঞানং ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ দ্বারা অথবা পূর্ব্বে যে সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ ভাবে প্রাণে পাইয়াছি তাহার স্মরণ দ্বারা কোন মতেই প্রকৃত ব্রহ্মদর্শন হইতে পারে না। কোনও প্রকার মধ্যবর্ত্তী থাকিলেই ব্রহ্ম দর্শন হইতে পারে না। এস্থলে এসকলকে মধ্যবর্ত্তী করা হইয়াছে ইহার মধ্যে ব্রহ্মের কার্য্য নাই। এই ভাবে কোন মতেই ব্রহ্মদর্শন হইতে পারে না। আমাদের একথাতে কিছু সত্য আছে কিনা বিচার করিয়া দেখা যাউক। বর্ণনা শুনিয়া বা বর্ণনা করিয়া আমরা কখনও কোন বিষয় দেখিতে পারি না। অথবা একবার কোন বস্তু দেখিলে পুনর্ব্বার দেখিবার সময় পূর্ব্ব ভাব স্মরণ দ্বারাও বস্তুটী দেখিতে পারি না। দেখিতে হইলে সকল সময়েই সাক্ষাৎ ভাবে দেখিতে হইবে। অর্থাৎ বস্তুটী আমাদের চক্ষুর সম্মুখে থাকিবে ইহা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর বিশেষ ভাবে ক্রিয়া করিবে। উহার পরিবর্ত্তে অন্য বস্তু এই ক্রিয়া করিলে তাহারই দর্শনই হইবে, ইহার দর্শন হইবে না। সকল প্রকার বস্তু-জ্ঞান সম্বন্ধেই এই কথা। দর্শন,-স্পর্শন-শ্রবণ সকল বিষয়েই এক কথা। এখানেও মধ্যবর্ত্তীতা কার্য্যকারী নহে। বর্ণনাদি দ্বারা বস্তুর দর্শন হয় না। মনের মধ্যে বস্তুটীর একটী প্রতিকৃতি গঠিত হয় মাত্র। পূর্ব্বে আমরা যে সকল বস্তু দেখিয়াছি বা গুণ জানিতে পারিয়াছি, তাহার বিভিন্ন সংযোজনা দ্বারা আমরা বর্ণনানুযায়ী বস্তুটী মনে ধারণা করিতে পারি। উহা বর্ণিত বস্তুর সম্পূর্ণ অনুরূপ হইবে, কিন্তু উক্ত বর্ণিত বস্তুর অস্তিত্ব কিম্বা অভাবের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক নাই। অস্তিত্ব না থাকিলেও আমরা মনে এরূপ বস্তু ধারণা করিতে পারি। আর বস্তুটী থাকিলেও এই উপায়ে বস্তু দেখা হইল না, বস্তু সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ হইল না, বস্তুটীর একটী প্রতিকৃতিকেই আমরা জানিলাম। এস্থলে শুধু আমাদের জ্ঞানের ক্রিয়া এই প্রতিকৃতিটী সম্পূর্ণ রূপে আমাদের জ্ঞানদ্বারা গঠিত কাযেই উহাকে আমাদের সৃষ্ট বস্তু বলিতে হয়। আমাদের জ্ঞানের বাহিরে ইহার অস্তিত্ব নাই। এই জন্যই ইহাকে কল্পনা বলা হয়, কল্পিত বস্তু বলা হয়। বাহিরে উহার অনুরূপ বস্তু থাকিতে পারে। কিন্তু যাহা আমরা এই ভাবে দেখিতেছি বা অনুভব করিতেছি, ইহা আমাদের কল্পনা ভিন্ন কিছু নহে। পূর্ব্বে যে বস্তুটী দেখিয়াছি স্মরণদ্বারা তাহার জ্ঞান জন্মাইলে, অর্থাৎ তাহাকে ধারণা করিতে গেলেও যে উহা কল্পনাই হইবে, বস্তু সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান হইবে না, উক্ত বস্তুর দর্শন হইবে না তাহা আর বলিতে হইবে না। কাযেই এই ভাবে লব্ধ যে ব্রহ্ম তাহাও ব্রহ্ম নয়—কল্পনা সৃষ্ট তাঁহার প্রতিকৃতি মাত্র। উহার জীবন নাই। আমরা উহার অধীন নহি। উহাই সম্পূর্ণরূপে আমাদের অধীন। আমাদের পুতুল মাত্র। এতাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান লাভে কেবল মানবীয় শক্তিরই কার্য্য, মানবশক্তি বহির্ভূত কোন শক্তি পরমাশক্তি, চৈতন্যময় ব্রহ্মের কোন কার্য্য নাই। কিন্তু দুই শক্তির কার্য্য ভিন্ন বস্তুজ্ঞান অসম্ভব—ব্রহ্মজ্ঞানও অসম্ভব। ব্রহ্মদর্শনে ব্রহ্মশক্তিই কার্য্য করিবে, মানব কেবল গ্রহণ করিবে। এইজন্য আমরা বলি ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন তাঁহার দর্শন হইতে পারে না। তাই প্রাণের গভীর স্থান হইতে গীত উঠে "তুমি নাহি দিলে দেখা কেহ কি দেখিতে পায়, তুমি না ডাকিলে কাছে সহজে কি চিত ধায় * * "মানবাত্মা কিছু করিতে পারে না, মধ্যবর্ত্তী কিছু দূরে দাঁড় করাইলে তাহা শুধু কল্পনা হইবে, সেখানে ব্রহ্মদর্শন অসম্ভব হইবে।

সৃষ্টি ও মানব ইতিবৃত্ত আলোচনা দ্বারা আমাদের প্রাণ জাগ্রত হইতে পারে। কিন্তু সৃষ্টির মূলে সৃষ্টিকর্ত্তা পরব্রহ্মকে দেখিতে যাইয়া, অনেক সময় আমরা কল্পনার, অনুমানের, ব্রহ্মে উপনীত হই। যখন সৃষ্টি ও ইতিহাসকে আমরা মধ্যবর্ত্তী রূপে স্থাপিত করি; তাহাদের সাহায্যে ব্রহ্মদর্শন লাভ করিতে যাই তখন আমরা অনুমানের ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই লাভ করি না। জ্ঞানের কার্য্য দেখিয়া স্থির করি উহার মূলে জ্ঞানময় কর্ত্তা আছেন। এ সিদ্ধান্ত সত্য; কিন্তু ইহাতে বস্তুটী সম্বন্ধে অনুমানই করিতেছি। যুক্তিতর্ক কোন বস্তুর জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। যুক্তি কুসংস্কার দূর করিয়া প্রতিবন্ধক সকল দূর করিতে পারে, দর্শনের সহায়তা করিতে পারে; কিন্তু দর্শন করাইতে পারে না। দর্শন করিবার এক ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই। যুক্তি, তর্কদ্বারা, "সুতরাং," "অতএব" দ্বারা যে বস্তু জ্ঞান আমরা লাভ করি, তাহা অনুমান ভিন্ন কিছুই নহে। সেখানেও শুধু আমাদের জ্ঞানকার্য্য করিতেছে; কল্পনা কার্য্য করিতেছে। কাযেই এই উপায়ে সত্য ব্রহ্ম লাভ হইতে পারে না। ইহাতে কাল্পনিক ব্রহ্ম, অনুমানের ব্রহ্মই (God of Infrence) লাভ হয়। তবে আত্মাতে সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মদর্শন হইলে, সৃষ্টি ও ইতিহাসের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মদর্শন হয়। কিন্তু সে সময় যুক্তির কার্য্য থাকে না, কার্য্য হইতে কারণে যাওয়া হয় না। এ সকল মধ্যবর্ত্তীরূপে থাকে না। এরূপ দর্শন না হইলে উহাদিগকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া ব্রহ্মদর্শনের চেষ্টা করিলেই কল্পনার ঈশ্বর লাভ হইবে। এ বিষয়ে বেশী কিছু বলিবার দরকার নাই।

সংগীত সংকীর্ত্তন আমাদের প্রাণকে সহজে জাগ্রত করিতে পারে এবং ব্রহ্মদর্শন হইলে তাহাকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করিবার সাহায্যও করিতে পারে। কিন্তু সংগীত সংকীর্ত্তন দ্বারা ব্রহ্মদর্শন করিতে গেলে, পূর্ব্বোক্ত রূপ ফলই হইবে, কারণ এখানেও বর্ণনা। বিশেষতঃ সংগীত সংকীর্ত্তন যেরূপ মত্ততা ও আনন্দ আনিয়া দিতে পারে, তাহাতে বিশেষভাবে আত্মপরীক্ষা না করিলে, উহা হইতে মহা অনিষ্ট হইতে পারে, উচ্চজীবন লাভ হইয়াছে, এই ভ্রম জন্মিতে পারে। ভাবুকতা আসিতে পারে।

অন্য লোকের উপাসনাদিতে যোগ দেওয়াতেও উপকার

হইতে পারে, প্রাণ সহজে জাগ্রত হইতে পারে এবং উপলব্ধির গভীরতাও জন্মিতে পারে। কিন্তু উহা দ্বারা ব্রহ্মদর্শন লাভ করিতে গেলেও পূর্ব্বোক্ত ফলই আসিবে কারণ এখানেও বর্ণনা; বিশেষতঃ অনেক সময় প্রাণ পরিবর্ত্তিত না হইলেও ভাবের উত্তেজনা জন্মিতে পারে, অন্যের ভাব সংক্রামিত হইতে পারে। বিশেষ আত্মচিন্তা না থাকিলে অন্যের জিনিষকে নিজের বলিয়া মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারি।

বিপদের কথা এই যে এই কল্পিত বস্তু সম্পূর্ণরূপে সত্য বস্তুর অনুরূপ। ইহা ভাব উদ্রেক করিতে পারে, ইহার প্রতি ভালবাসা জন্মিতে পারে, ইহাকে পাইবার ইচ্ছা হইতে পারে। এই জন্যই সহজে সন্দেহ জন্মে না, সত্যবস্তু লাভ হইতেছে এরূপ ভ্রম হয়। বিশেষভাবে আত্মপরীক্ষা না করিলে এ ভ্রম ধরা যায় না। কারণ অধিকাংশ সময় একটুকু তৃপ্তি, সামান্য আনন্দ দ্বারাই জীবনের অবস্থার বিচার করি। অথচ সত্য ব্রহ্ম ছাড়া কল্পিত "ব্রহ্মে"ও এই লাভ হইতে পারে। সত্য বস্তুতে ও কল্পিত বস্তুতে প্রভেদ এই যে কল্পিত বস্তুর কোন শক্তি নাই। সত্যবস্তুই শক্তির আধার। কাযেই এরূপ ব্রহ্মলাভে জীবন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। আমরা যেরূপ ক্রমশঃ অনন্ত উন্নতির দিকে যাইতে চাহি, তাহা হয় না, জীবন যেখানে, সে খানেই দাঁড়াইয়া থাকে, কাযেই উক্তপ্রকার সাধনশীল জীবনে এরূপ দুরবস্থা দেখা যায়, যাহা ব্রহ্মলাভ হইলে কোনমতেই থাকিতে পারে না। জীবনের উন্নতি দ্বারা বিচার না করিলে, বিশেষভাবে আত্মপরীক্ষা না করিলে, আমরা এই ভ্রম হইতে রক্ষা পাইতে পারি না। তাই অধিকাংশ সময়ে আত্ম-প্রতারিত হই। ব্রহ্মলাভ হইল, অথচ জীবন যেস্থানে ছিল সেইস্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল, ইহা হইতে পারে না। কাযেই জীবনের গতি-দ্বারাই বিচারিত হইবে আমরা কি লইয়া আছি। এখন আমরা দেখিতেছি যে ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার মধ্যবর্ত্তী দূর না করিলেই যত দুরবস্থা। মধ্যবর্ত্তী দ্বারা ব্রহ্মলাভ অসম্ভব বলিয়াই, ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার মধ্যবর্ত্তীবাদের ঘোর শত্রু। এই জন্য ব্রাহ্মকবি গান করেন "তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই" ইহার বিরুদ্ধ কিছু করিতে গেলেই বিপদ এবং ইহার অনুসরণ করিলেই প্রকৃত জীবন লাভ হইবে। তখন আর আমাদের কিছু হইল না বলিয়া ক্রন্দন করিতে হইবে না।

ধর্ম্মসাধনে গভীর চিন্তাশীলতার প্রয়োজন কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের নিতান্তই অভাব। আমরা কার্য্যে এতই ব্যস্ত এবং জাতীয় চরিত্রগুণে আমাদের চিন্তাশীলতার এতই অভাব যে কোন বিষয়েই গভীর ভাবে ডুবিতে পারি না। আমরা চাহি সহজ ধর্ম্ম। যে সকল অবস্থার মধ্য দিয়া না গেলে ধর্ম্মলাভ হইতে পারে না, আমরা সে সকল অবস্থা লাভ করিতে প্রস্তুত বা বিশেষ চেষ্টিত নহি। যে যত্ন ও পরিশ্রম প্রয়োজন আমরা তাহা করিব না অথচ ফল পাইব, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? প্রণালীটী যদিও সহজ। ইহার সাধনা কোনমতেই সহজ নহে বরং বড়ই কঠিন। আমরা অনেকেই সেই কষ্টটুকু স্বীকার করিতে চাহি না—কাযেই আমরা ফললাভ করিতে পারি না।

যেখানে দুই শ্রেণীর লোক দুই প্রকার সাক্ষ্য দিতেছেন সেখানে বিশুদ্ধ যুক্তি ভিন্ন সত্যনির্দ্ধারণের অন্য উপায় নাই। উভয় শ্রেণীই সরল ধর্ম্মপ্রার্থী ও সত্যবাদী। এক শ্রেণী বলেন এই সাধনে ফল পাইতেছেন না অন্য শ্রেণী বলেন ফল পাইতে-ছেন। আবার আমাদের ন্যায়ও কেহ কেহ আছেন যাঁহারা বলিতেছেন ইহাতে ফল পাওয়া যায় অথচ জীবনে বিশেষ কোন ফল লক্ষিত হইতেছে না। এই অবস্থায় আমাদের জীবন দেখিয়া অথবা প্রথমোক্ত শ্রেণীর কথা শুনিয়া আমরা এ প্রকার মীমাংসা করিতে পারি না যে সাধন প্রণালীর দোষ আছে। যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ যুক্তি এই প্রণালীর কোন ত্রুটি না দেখাইতে পারে, সেই পর্য্যন্ত শুধু এই কারণে আমরা প্রণালীর দোষ দিতে পারি না। কাযেই বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে, আমরা ঠিক ভাবে সাধন করি না বলিয়াই এরূপ ঘটিতেছে। আমাদের জীবনে ফল না হইলেও ইহা বলিতে পারি না যে কোন জীবনেই ইহাতে ফল হয় নাই। অন্ততঃ দুই একজনও যখন এই প্রণা-লীতে সাধন করিয়া ফল পাইয়াছেন, তখন অবশ্য বলিতে হইবে প্রণালীর দোষ নাই দোষ আমাদেরই। বিকৃত ভাবে সাধন করি বলিয়াই আমাদের এই দুরবস্থা।

ব্রাহ্ম পর্য্যটকের পত্র।

ওঁকারনাথ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্যারী বাবু এই ওঁকারনাথে আসিবার পূর্ব্বে চিত্রকুটে ১½ বৎসর ছিলেন, তাহার পর প্রায় ৩½ বৎসর হইল ওঁকারনাথে আসিয়াছেন। এই ওঁকারনাথেই সাধনের কঠোরতা বৃদ্ধি করি-য়াছেন। তিনি এখন যোগ সাধন করেন, কোন মনুষ্য গুরুর নিকট কোন দিন কোন উপদেশ লাভ করেন না। দিন দিন তিনি ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন ও তাঁহার অবস্থা খুব আশাজনক বলিয়া তিনি কহিয়াছেন। কিন্তু এ কথাও বলিয়াছেন যে এখনও তাঁহার ব্রহ্মদর্শন হয় নাই। এক্ষণে তাঁহার নিজের কোন ইচ্ছা নাই, ভগবানের দর্শন লাভ হইলে, ভগবান তাঁহাকে যাহা আদেশ করিবেন তাহাই তিনি করিবেন,—এইরূপ তাঁহার ইচ্ছা।

তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে যদিও তিনি এপর্য্যন্ত কোন মনুষ্য গুরু স্বীকার করেন নাই বা সাধন ভজন সম্বন্ধীয় কোন কথা এপর্য্যন্ত কোন মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা করেন নাই বটে; কিন্তু সূক্ষ্ম দেহধারী আত্মাগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সাধনাদি সম্বন্ধে তাঁহাকে উপদেশ দিয়া থাকেন। প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছি যে শঙ্কর অর্থাৎ মহাদেব বিশেষ ভাবে তাঁহাকে উপদেশ দেন। মহাদেবকে তিনি একজন খুব বড় যোগী পুরুষ মনে করেন ও মানবাত্মা যে শ্রেণীর আত্মা মহাদেব সে শ্রেণীর আত্মা নহেন, কিন্তু মানবাত্মা হইতে উন্নত আর এক শ্রেণীর আত্মা।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপর প্যারীবাবুর গভীর শ্রদ্ধা আছে। তিনি একদিন গোস্বামী মহাশয়ের একখানি চিঠি আমাকে দেখাইয়া ছিলেন, তাহাতে

প্রধানত: এই দুইটী বিষয় লেখা ছিল। ১ম "আমি নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা ইহা জানিয়াছি যে বহির্জগৎ যেমন অকাট্য নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ অকাট্য নিয়ম সমূহ আছে। তন্মধ্যে ব্রহ্মদর্শনের ইহা একটী অকাট্য নিয়ম যে সদ্‌গুরুর কৃপা ভিন্ন তাহা হইবার নহে।" ২য় "হৃদয় হইতে সকল প্রকার সংস্কার ও বাসনা দূর হওয়া চাই, প্রচারের বাসনা থাকিলেও ব্রহ্মদর্শন হইবে না।"

এখন প্যারীবাবুর পৃথিবীর সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। আমি এতদিন তাঁহার গুহায় ছিলাম। কিন্তু আমাকে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয়, কি কলিকাতার, কি তাঁহার ভ্রাতা ভগ্নী বা বন্ধু বান্ধব প্রভৃতির কাহারও কোন কথা কোন দিন জিজ্ঞাসাও করেন নাই। কেবল একমনে সর্ব্বদাই ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। আমি মাঝে মাঝে তাঁহার সহিত সাধন ভজন সম্বন্ধীয় কথার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিতাম, একদিন তিনি স্পষ্টই লিখিয়া দিয়া ছিলেন যে "ভাই। আমার সময় এখন বড় অমূল্য, এখন আমার এরূপ অবস্থা যে ধর্ম্মালোচনা বা ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি করাকেও সময় নষ্ট বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং এখন এ সমস্ত কথা বলিবার সময় নাই, যদি ভগবান কখন দিন দেন, তবে তাঁহার করুণার কথা দ্বারে দ্বারে বলিব।"

প্যারী বাবু বাক্য বন্ধ করিয়া আছেন বলিয়া, স্থানীয় লোকেরা তাঁহাকে মৌনীবাবা বলিয়া অভিহিত করেন। এখানকার সমস্ত সাধু ও অন্যান্য লোকেরা ইহাঁকে খুব শ্রদ্ধা করেন, এমন কি একাদশীর দিন অনেক লোক বেলা ৪ টার সময় হইতে ইহাঁর গুহার নিকট এই অভিপ্রায়ে বসিয়া থাকেন, যে ইনি সন্ধ্যার সময় গুহা হইতে বাহির হইলে, ইহাঁকে দর্শন করিয়া গিয়া জলগ্রহণ করিবেন। স্থানীয় গুহাবাসী সাধুগণ আমাকে বলিয়াছেন যে "আমরা অনেক সাধু দেখিয়াছি। কিন্তু এমন সাধনাতে নিমগ্ন কোন সাধুকে কখনও দেখি নাই।"

প্যারী বাবু অতি সামান্য দুগ্ধাহার করেন বলিয়া তাঁহার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে স্থানীয় সাধুগণ অত্যন্ত দুঃখিত। তাঁহারা আমাকে কহিয়াছিলেন যে "আহার না করিলে শরীর কখনও থাকিবে না তুমি আহার করিতে মৌনীকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ কর ও গীতার বচন উদ্ধৃত করিয়া বল।" বাস্তবিক আমিও প্যারী বাবুকে আহার বৃদ্ধির জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন "ঈশ্বরের আদেশে বাধ্য হইয়া, এইরূপ আহার ত্যাগ করিতে হইয়াছে। আমি ইচ্ছা করিয়া আহার ত্যাগ করি নাই, তিনি আবার আদেশ করিলে আহার বৃদ্ধি করিব।" আমি আসিবার সময় দেখিয়া আসিয়াছি, তিনি দুগ্ধের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি করিয়াছেন।

আমি প্যারী বাবুর গুহাতে পাঁচ সপ্তাহ ছিলাম, তাঁহাকে যে সেট (দোকানদার) দুগ্ধাদি দেন, তিনিই আমাকে প্রত্যহ ২।৩ টার সময় ডালরুটী ইত্যাদি পাঠাইয়া দিতেন, আমি তাহাই পরম সুখে আহার করিতাম। এইরূপে এখানে ভগবানের কৃপায় আমার অভিপ্সিত বিষয় লাভ করিয়া, কৃতার্থ হইয়া নানাস্থান ভ্রমণ করিতে বহির্গত হই।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন, কিম্বা কাহারও পত্র ফেরত দিতে বাধ্য নহেন)

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পত্রখানি তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

অভ্রান্ত গুরুবাদ এবং ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে বাবু মনোরঞ্জন গুহ ১৬ই অগ্রহায়ণের তত্ত্বকৌমুদীতে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহা অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং যুক্তিবিরুদ্ধ। তিনি যে সকল কথা স্বীকার্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সকলগুলি স্বীকার্য্য বলা যায় না। ঈশ্বরের বাণী মানবাত্মায় প্রকাশ পায় সত্য, কিন্তু মানুষ জ্ঞানে প্রেমে এবং পবিত্রতায় এরূপ উন্নত নয় যে সেই বাণী যে ভাবে ঈশ্বরের নিকট হইতে আসে, ঠিক সেইভাবে ধারণ এবং হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। যেমন সকল দর্পণেই প্রতিবিম্ব পড়ে সত্য কথা। কিন্তু দর্পণের গুণানুসারে তাহার ইতর বিশেষ হয়, সেইরূপ যাঁহারা ধর্ম্মজগতে যত অগ্রসর তাঁহারা সেই পরিমাণে ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন কেহই সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ নহেন অথবা জ্ঞান এবং প্রেমেতে এত উন্নতি লাভ করেন নাই যে পূর্ণজ্ঞানী এবং প্রেমিক বলা যাইতে পারে, তখন সেই বাণী যতটুকু লাভ করেন তাহাও সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত বলা যায় না।

তারপর আর একটী কথা এই যে সেই বাণী প্রাণে অনুভব করিয়া, উপদেশ দেওয়ার সময় আবার তাহা ঠিক ঠিক রূপে বাহির হয় না। প্রাণে যাহা অনুভব করা যায়, তাহা মুখে কখনই অভ্রান্ত রূপে প্রকাশ করা যায় না। এবিষয় বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। তাহা হইলে দেখা যায় যে, ১মতঃ ঈশ্বরের বাণী মানুষ অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারে না, ২য়তঃ সেই বাণী যতটুকু গ্রহণ করে, তাহা আবার ঠিক সেই ভাবে মুখে প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর এবং তাঁহার বাণী অভ্রান্ত হইলেও উপদেষ্টার মুখে অভ্রান্ত ভাবে বাহির হয় না এবং তজ্জন্য অভ্রান্তগুরু (অথবা মনোরঞ্জন বাবুর মতে অভ্রান্ত ঈশ্বরের বাণী প্রকাশক হওয়াও সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।)

তিনি ইহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটী কথা লিখিয়াছেন যথা "চিন্তাশীল ও সাধনশীল ব্রাহ্ম "অভিভাবকগণ" পুনর্জ্জন্মবাদকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী মনে করেন না" এই অভিভাবক কয়জন এবং তাঁহাদের নাম কি প্রকাশ করিলে ভাল হইত। দেখিতেছি ব্রাহ্ম অভিভাবক নামে একটী নূতন কথা সৃষ্টি হইল। যাহা হউক ব্রাহ্ম অভিভাবকগণ পুনর্জ্জন্মবাদ স্বীকার করিতে

পারেন। কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার বা অস্বীকারের কোন আবশ্যকতা দেখি না। পরলোকের বিষয় সমস্ত সম্পূর্ণভাবে ভগবানের হস্তে। তদ্বিষয়ে কল্পনা না করাই ভাল। অমরাত্মা কোন একটা অবস্থায় থাকিবেই। কি অবস্থায় থাকিবে, যিনিই বর্ণনা করিবেন কল্পনা মাত্র। অতি দুঃখের বিষয় যে এতকাল ব্রাহ্মসমাজ যাহা ঈশ্বরের হস্তে রাখিয়াছিল, মনোরঞ্জন বাবুর ব্রাহ্ম অভিভাবকেরা তাহা লইয়াও টানাটানি করিতেছেন। যাহা হউক পুনর্জ্জন্মবাদীদিগের দুর্দ্দশার একটী দৃষ্টান্ত সংক্ষেপে লিখিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

কয়েক বৎসর হইল হুগলী জেলার কোন স্থানে উপাসনা এবং সংকীর্ত্তন হইতেছিল। সেই সময়ে বাহিরে একটা ছাগল দাঁড়াইয়া কোন রোগ বশতঃ চক্ষের জল ফেলিতেছিল এবং ঘন ঘন পা নাড়িতেছিল। হঠাৎ তাহার উপর কোন ভক্তের চক্ষু পড়িল এবং তখনই গুরুকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পুনর্জ্জন্মবাদী গুরু বলিলেন এ ছাগল পূর্ব্বজন্মে হরিভক্ত ছিল তাই হরিনাম শুনিয়া কাঁদিতেছে। সকলে তখন বাহিরে আসিয়া ছাগলকে ঘিরিয়া সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ছাগলের পাও ধরিতে লাগিলেন। ছাগল বেচারা ত তখন প্রাণান্ত। চীৎকার করিয়া পলাইতে পারিলে বাঁচে।

কেহ বলিতে পারেন ইহা অপেক্ষা পাগলের কাণ্ড আর কি আছে?

ঝালকাটী
বরিশাল
৬ই ডিসেম্বর ১৮৯৩

একান্ত অনুগত
শ্রীরজনীকান্ত দে।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

বিগত ১৬ই অগ্রহায়ণের তত্ত্বকৌমুদীতে "অভ্রান্ত গুরুবাদ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম" সম্বন্ধে আমার একখানা পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। জানা গেল সেই পত্রের লিখিত বিষয় সম্বন্ধে অনেকের মনে অনেক রূপ সন্দেহ ও আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে, সেই সকল আপত্তি খণ্ডন ও সন্দেহভঞ্জনের চেষ্টায় অদ্যকার এই পত্রখানা লিখিত হইল। অনুগ্রহপূর্ব্বক তত্ত্বকৌমুদীতে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

১। আমি লিখিয়াছিলাম "জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্ব।" ইহাতে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, তবে ত সকলেই ব্রহ্মযোগে যোগী, সুতরাং সকলেই আদেশ প্রাপ্ত। তবে আর গুরুশিষ্য সম্বন্ধ কিসের জন্য? বস্তুতঃ আমি আমার প্রবন্ধে এরূপ অর্থে উক্ত কথা প্রয়োগ করি নাই। প্রবন্ধ মধ্যে স্পষ্টই এই ভাব রহিয়াছে যে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যে সাক্ষাৎ যোগ হয়, ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এবং এরূপ যোগ লাভ করাই ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনের উদ্দেশ্য। যিনি সেই যোগ লাভ করিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যাদিষ্ট হন, এবং সেইরূপ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া উপদেশ দেন, তাঁহার সেই উপদেশ অভ্রান্ত উপদেশ এবং সেইরূপ উপদেশদাতা গুরু অভ্রান্ত গুরু, একথা ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী নহে। বরঞ্চ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক, যিনি ব্রহ্মযোগ করেন নাই, তেমন ব্যক্তি যদি শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া প্রত্যাদিষ্ট গুরুর বাক্য অনুসারে চলেন, তবে তাহাও ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী হয় না। কাষ্ঠ লোষ্ট্রের সহিত পরমাত্মার যে অচ্ছেদ্য যোগ রহিয়াছে, মানুষের সহিতও সেইরূপ যোগ রহিয়াছে। "জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগ" বলিতে আমি সে যোগের কথা বলি নাই, সাধন-সাপেক্ষ চৈতন্য-যোগের কথা বলিয়াছি। সুতরাং সকল মানুষেরই সে যোগে যুক্ত হওয়ার আশা থাকিলেও সকলেই কিছু সে যোগে যুক্ত নহে, যিনি যুক্ত অযুক্তেরা তাঁহার উপদেশ শুনিবে ইহাই ত সকল প্রকার শিক্ষার প্রণালী, ইহাতে আবার আপত্তি কি?

২। কেহ ভাবেন গুরু যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন, শিষ্যও ত সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া মুক্ত হইতে পারেন, তবে আর গুরু মানার প্রয়োজন কি? আমার বক্তব্য এই যে, গুরু আশ্রয় ভিন্ন কেহ ধর্ম্মলাভ করিতে পারিবে কি না আমার প্রবন্ধে আমি তাহার কিছুমাত্র আলোচনা করি নাই, কেবল অভ্রান্ত গুরুবাদ ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী নহে, আমি ইহাই দেখাইয়াছি, সুতরাং অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া অনাবশ্যক। গুরু আশ্রয় ভিন্ন পরিত্রাণ হয় একথা কেহ প্রমাণ করিলেও গুরু গ্রহণ করা অধর্ম্ম ইহা প্রমাণিত হয় না। মানুষ আপনা আপনি বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারে প্রমাণিত হইলেও, শিক্ষকের আশ্রয় গ্রহণ করায় বিদ্যা উপার্জ্জন হইতে পারে না, ইহা প্রমাণিত হয় না। অকূল আটলাণ্টীক সাগরে তরণী ভাসাইয়া কলম্বস্ নূতন মহারাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আর একজন যদি কলম্বসের ন্যায় অকূলে না ভাসিয়া তাঁহার উপদেশ ধরিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে আমেরিকায় যায়, তবে তাহাতে কি কিছু নির্ব্বুদ্ধিতা হয়? বস্তুতঃ জীবনের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বিষয়েতেই আমরা এইরূপ পরোপদেশ লাভ করিয়া কার্য্য করিয়া থাকি, ইহাতে অধর্ম্ম হয় না। বস্তুতঃ এরূপ না করিলে মানবজীবন বোধ হয় পশুজীবন হইয়া যায়। গত বৎসর কলিকাতায় আনীত ভল্লুক-প্রতিপালিত কন্যাটীই তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

৩। কেহ কেহ "অজ্ঞ ও ভ্রান্ত" এবং "ভ্রান্ত ও অপূর্ণ" একই কথা মনে করেন। কাজেই অভ্রান্ত গুরুবাদ কথাটা তাঁহাদের প্রাণে গুরুতর আঘাত করে। কেন না একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই বা পূর্ণ হইতে পারে? এটা যে অতি স্থূল-ভ্রান্ত তাহা সহজেই বুঝা যায়। ভ্রান্ত মাত্রই অজ্ঞ এবং অপূর্ণ। কিন্তু অজ্ঞ ও অপূর্ণ মাত্রই যে ভ্রান্ত হইবে এরূপ কোন কথা নাই। পৃথিবীর কেন্দ্র স্থলে কিরূপ উত্তাপ তাহা আমি জানি না, ইহাতে আমি অজ্ঞ এবং অপূর্ণ হইলাম বটে। কিন্তু ভ্রান্ত হইলাম কি? যে অবগত নহে তাহাকে অজ্ঞ ও অপূর্ণ বলে। আর যে ভুল করিয়াছে তাহাকেই ভ্রান্ত বলে। উভয় কথাই এক কি? ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি একত্র করিয়া মুদ্রিত করিলে ব্রাহ্মের বিচারে তাহা অবশ্যই অভ্রান্ত গ্রন্থ হইবে। কিন্তু তাহাকে পূর্ণগ্রন্থ বলা যাইবে কি? ইউক্লিড

জ্যামিতি যদি অভ্রান্ত গ্রন্থ হয়, তাহাতে তাহা পূর্ণ হইল কি? সুতরাং কোন মানুষকে যদি অভ্রান্তও বলা যায় তথাপি তাহাকে পূর্ণ বলা হইল না। কিন্তু আমার প্রবন্ধে আমি অভ্রান্ত মানুষের কথা বলি নাই, কেবল অভ্রান্ত গুরুর কথাই বলিয়াছি। এ কথাটার অর্থ বুঝিতেও অনেকে দেখিতেছি ভুল করিয়াছেন। বোধ হয় তাঁহারা এই উভয় বাক্যের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। জগদীশ পণ্ডিত অভ্রান্ত দার্শনিক এবং জগদীশ পণ্ডিত অভ্রান্ত মানুষ এই উভয় বাক্যে কি কিছু পার্থক্য নাই? এই কথাগুলি এত দূর বিস্তার করিয়া বলিতে হইবে প্রথম পত্র লিখিবার সময় আমার সেরূপ ধারণা হয় নাই।

৪। কেহ কেহ এরূপও চিন্তা করিয়াছেন যে "অভ্রান্ত গুরু জানিতে হইলে, অভ্রান্ত শিষ্যের প্রয়োজন নতুবা অভ্রান্তকে অভ্রান্ত ভাবে কিরূপে বুঝা যাইবে? সুতরাং গুরুর পূর্ব্বে শিষ্যের অভ্রান্ত হওয়ার প্রয়োজন এবং শিষ্য অভ্রান্ত হইলে আর গুরুর প্রয়োজন কি?" নিজে অভ্রান্ত না হইলে অন্যকে অভ্রান্ত বলিয়া জানা যায় না এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া নাস্তিকেরা যখন আমাদের সঙ্গে তর্ক করেন তখন তাঁহাদের কথায় কোন উত্তর দিতে পারি না। কিন্তু কোন ব্রাহ্ম এরূপ প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর দেওয়া অতিশয় সহজ হয়। কেন না ব্রাহ্মগণ আপনারা অভ্রান্ত, সর্ব্বজ্ঞ, পূর্ণ-পবিত্র ইত্যাদি না হইয়াও ঈশ্বরকে ঐসকল গুণ যুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অভ্রান্ত না হইয়া কাহাকেও অভ্রান্ত স্থির করা যায় না, ইহা যিনি বলেন, তিনি অজ্ঞেয়তা বাদী কিন্তু ব্রাহ্ম নহেন। অজ্ঞেয়তাবাদীর ঐ সকল আপত্তি খণ্ডন করিতে আমার কোন শক্তি নাই। অপর কেহ কেহ এরূপও ভাবিয়া থাকেন, আমরা আত্ম বুদ্ধি দ্বারা যখন গুরুকে নির্ণয় করিব তখন গুরু অপেক্ষা আমাদের বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ। এরূপ চিন্তা করা একান্ত বালকতা মাত্র। কেন না আমরা আত্ম বুদ্ধিদ্বারা ঈশ্বরকে নির্ণয় করিয়াছি এবং ঈশ্বরের অভ্রান্ততা জ্ঞাত হইয়াছি। এই জন্য ঈশ্বর অপেক্ষা আমাদের বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হইয়াছে এবং আমরা ঈশ্বর অপেক্ষা অভ্রান্ত হইয়াছি এরূপ নহে। আমরা সর্ব্বদা যে সমস্ত ব্যক্তিকে মহাত্মা বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, তাঁহাদিগকে মহাত্মা স্থির করিতে যাইয়া, আমরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা মহাত্মা হইয়া যাই এরূপ নহে, এরূপ চিন্তা একরূপ দুশ্চিন্তা মাত্র।

৫। কেহ কেহ বলেন "ঈশ্বর অভ্রান্ত এবং তাঁহার বাণীও অভ্রান্ত বটে, কিন্তু ভ্রান্ত অপূর্ণ মানুষের মধ্য দিয়া আসিতে তাহা খাঁটিরূপে আসিতে পারে না।" একথার মধ্যে একটী গুরুতর ভ্রান্তি এই যে মানুষ যদি কখনও অভ্রান্ত ঈশ্বর বাণী না পায়, তবে সে অভ্রান্ত ঈশ্বর বাণীর অস্তিত্ব কোথায় পাইবে? যাহা অভ্রান্তরূপে মানুষের কাছে পৌঁছে না, মানুষ তাহাকে অভ্রান্ত জানিলে ফলই বা কি? যাহাহউক এই কথার মধ্যে একটী প্রচ্ছন্ন বিশেষ তত্ত্ব রহিয়াছে। মুসলমান, খ্রীষ্টান, হিন্দু প্রভৃতি যদি বলেন, অপূর্ণ ও মলিন মানুষের মধ্য দিয়া খাঁটি অভ্রান্ত ঈশ্বর বাণী আসিতে পারে না, তবে আমি তাঁহাদের কথায় কোন উত্তর দিতে পারি না। কেননা মুসলমান বলিতে পারেন "আল্লা পবিত্র পুরুষ মহম্মদকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার মধ্যদিয়া খাঁটি সত্য প্রেরণ করিয়াছেন। খ্রীষ্টান ও বৈষ্ণব বলিতে পারেন ঈশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া, জগতে সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন," হিন্দু বলিতে পারেন, আমাদের বেদ অপৌরুষেয় ব্রহ্মবাক্য;" কিন্তু ব্রাহ্মগণের সেরূপ কিছু বলিবার অধিকার নাই, মানুষের মধ্যদিয়া ঈশ্বরের বাণী ও ব্রহ্মতত্ত্ব অভ্রান্তরূপে প্রকাশিত হয়, একথা অস্বীকার করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের কি দাঁড়াইবার স্থল থাকে? সেরূপ হইলে ব্রাহ্মগণকে বলিতে হয় "আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব যাহা কিছু বলিতেছি তাহার কিছুই অভ্রান্ত সত্য নহে। ইহা মলিন ও ভ্রান্ত মনুষ্যের কপোল কল্পিত মলিনতা ও ভ্রান্তি বিজড়িত চিন্তা মাত্র।" কোন বিশ্বাসী ব্রাহ্ম কি এরূপ বলিতে প্রস্তুত আছেন? ভগবান ব্রাহ্মসমাজকে এরূপ প্রচ্ছন্ন নিগূঢ় ভীষণ মতের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন। ১লা পৌষের তত্ত্বকৌমুদীর ১৯৬ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত হইয়াছে "আদেশবাদ অগ্রাহ্য করা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধি নয়, কারণ তাহাই ব্রাহ্মগণের অবলম্বন এবং তাহাই ধর্ম্ম জীবনের আলো।" শ্রদ্ধাস্পদ তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও প্রচারক, তাঁহার মুখে একথা শুনিয়া আমরা কিছু আশ্বস্ত হইলাম। আমরা বিশ্বাস করি ঈশ্বর এক ব্যক্তি, তিনি যখন মানুষকে প্রত্যাদেশ করেন, তখন এ ভাবে করেন না, যে আমি যে আদেশ করিব তাহা এ ব্যক্তি যেন খাঁটি বুঝিতে না পারে। যদি আমাকে কোন বিষয় আদেশ করা ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় এবং তিনি আদেশ করেন, কিন্তু জড় শক্তি কি আমার অপূর্ণতা সেই আদেশকে খাঁটিরূপে আমার নিকট উপস্থিত হইতে বাধা দিতে সক্ষম হয়, তবে ঈশ্বরকে কি শক্তিহীন বলা হয় না? আত্মসংকল্প ও বিবেকবাণীকে আদেশ ভাবিলেই ঐরূপ সব সন্দেহ উপস্থিত হয়। এ সকল সন্দেহ যে তর্কে মিটে না তাহা জানি, তবে প্রসঙ্গ ক্রমে বলিতে হইল।

৬। কেহ কেহ অভ্রান্ত গুরুবাদকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যগত আবরক ভাবিয়া ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী মনে করেন। ইহা কেবল গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার ফল, ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগের বাসনায়ই মানুষ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে। সুতরাং গুরু ব্রহ্ম আবরক নহেন। পরন্তু ব্রহ্মযোগের বিশেষ সহায়। এরূপ হইলে যদি ব্রহ্ম আবরক হন, তবে উপদেষ্টামাত্রই অল্লাধিক পরিমাণেই আবরক হইবেন।

৭। সাধনপন্থাকে অভ্রান্ত না মানিলে কখনই সাধন-নিষ্ঠা দাঁড়ায় না। যাঁহারা কোন অবস্থা লাভ করিতে প্রয়াসী হইয়া সাধন করেন, তাঁহারা অবশ্যই কিছু না কিছু অভ্রান্ত মানেন। কেহবা আপনার স্বকপোলকল্পিত মত ও পথকে অভ্রান্ত ভাবেন, কেহবা যাঁহাকে ঈশ্বরানুপ্রাণিত বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহার কথিত মত ও প্রদর্শিত পথকে অভ্রান্ত মানেন। একজন ভাবেন সাধন ভজনহীন আমি অভ্রান্ত, অন্য একজন মনে করেন, শান্ত সমাহিত যোগযুক্ত ব্যক্তি, অভ্রান্ত প্রভেদ এইমাত্র। যিনি দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রদর্শিত পথকে অভ্রান্ত ভাবেন, তাহার একটা যুক্তি এই আছে যে উক্ত ব্যক্তি ঈশ্বরাদিষ্ট সুতরাং অভ্রান্ত, প্রথম ব্যক্তির

মত এই যে আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই অভ্রান্ত। কেহ বা অভ্রান্ত গুরু মানে কেহ বা অভ্রান্ত অহং মানে, ইহার অধিক কিছু প্রভেদ নাই। ইতি

ভবানীপুর } নিবেদক শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

ব্রাহ্মসমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে আগামী চতুঃষষ্টি মাঘোৎসব সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে এই প্রণালীর সামান্যরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। আমরা তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহকগণকে এবং ব্রাহ্মসমাজের সহানুভূতিকারী প্রত্যেককেই এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত নিমন্ত্রণ করিতেছি। মফস্বলস্থ বন্ধুগণের স্মরণার্থ নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা উৎসবে আগমন করিবার সময় যেন শীত নিবারণের উপযুক্ত লেপ বা কম্বল সঙ্গে আনয়ন করেন এবং যাঁহারা সপরিবারে এখানে আগমন করিবেন, তাঁহারা যেন ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে সে সংবাদ অগ্রে প্রদান করেন।

১লা মাঘ, ১৩ই জানুয়ারি শনিবার—ব্রাহ্ম পরিবার সকলে উপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা।

২রা " ১৪ই " রবিবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। অপরাহ্নে বিডনপার্কে প্রচার, তৎপরে নগর সংকীর্ত্তন এবং উপাসনা।

৩রা " ১৫ই " সোমবার—সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন।

৪ঠা " ১৬ই " মঙ্গলবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে বক্তৃতা।

৫ই " ১৭ই " বুধবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উৎসব।

৬ই " ১৮ই " বৃহস্পতিবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে বক্তৃতা।

৭ই " ১৯এ " শুক্রবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে সঙ্গতের উৎসব।

৮ই " ২০এ " শনিবার—ব্রাহ্মিকাসমাজ ও বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব। সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন।

৯ই " ২১এ " রবিবার—প্রাতে উপাসনা। অপরাহ্নে আলোচনা, সায়ংকালে উপাসনা।

১০ই " ২২এ " সোমবার—প্রাতঃকালে উপাসকমণ্ডলীর উৎসব। অপরাহ্নে নগরসংকীর্ত্তন, সায়ংকালে উপাসনা।

১১ই " ২৩এ " মঙ্গলবার—সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব।

১২ই " ২৪এ " বুধবার—প্রাতঃকালে সাধনমণ্ডলীর উৎসব। মধ্যাহ্নে আলোচনা। সায়ংকালে বক্তৃতা।

১৩ই " ২৫এ " বৃহস্পতিবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। অপরাহ্নে বালকবালিকা-সম্মিলন। সায়ংকালে ছাত্রসমাজের উৎসব।

১৪ই " ২৬এ " শুক্রবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে বক্তৃতা।

১৫ই " ২৭এ " শনিবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। অপরাহ্নে রবিবাসরিক বিদ্যালয়ের সায়ংকালে বক্তৃতা।

১৬ই " ২৮এ " রবিবার—উদ্যানে ব্রাহ্মসম্মিলনীর উৎসব।

অনাথাশ্রম—অসহায়, অনাথ, অক্ষম লোকদিগের জন্য সিরাজ গঞ্জের ব্রাহ্মবন্ধুগণের যত্নে তথায় একটী ক্ষুদ্র আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় ভদ্রলোক ও প্রধান প্রধান রাজ কর্ম্মচারিগণ ইহার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। পরমেশ্বর উদ্যোগকারীদিগের প্রাণে বল বিধান করুন।

প্রচার—গত ১০ই ডিসেম্বর রবিবার কলিকাতা হইতে কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু গঙ্গাতীরবর্ত্তী বেলুড় নামক গ্রামে গিয়া উপাসনা, সংগীত, সংকীর্ত্তন এবং বক্তৃতাদি করিয়াছেন। গ্রামের লোকে বিশেষ মনোযোগের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতাবাসী ব্রাহ্মগণ অবসর মতে এরূপে নিকটবর্ত্তী স্থানে গমন করিয়া বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন, প্রার্থনীয়।

শ্রাদ্ধ—গত ১৭ই ডিসেম্বর রবিবার দিঘাপাতিয়া ষ্টেটের ম্যানেজার বাবু কালী নারায়ণ রায়ের পরলোকগত পিতৃ আদ্যশ্রাদ্ধ কলিকাতা বাসাবাটীতে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রী বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। কালী নারায়ণ বাবু পিতার সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত পাঠ ও প্রার্থনা করেন। শ্রাদ্ধোপলক্ষে কালী নারায়ণ বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১২৫৲ টাকা এবং সাধনাশ্রমে ৫৲ টাকা ও অন্যান্য স্থানে ৭০৲ টাকা মোট দুই শত টাকা দান করিয়াছেন। পরমেশ্বর পরলোকগত আত্মাকে শান্তি দান করুন।

গত ৬ই ডিসেম্বর কাঁথির পরলোকগত ব্রাহ্মবন্ধু বাবু হরিপ্রসাদ সরকারের আদ্য শ্রাদ্ধ গত ৫ই নবেম্বর সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা হইতে আগত বাবু ইন্দুভূষণ রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। হরিপ্রসাদ বাবুর স্ত্রী এতদুপলক্ষে সাঃ ব্রাঃ সমাজে ২৲ টাকা সাধনাশ্রমে ২৲ টাকা ও এবং স্থানীয়

ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা এবং অন্যান্য স্থানে ২৲ টাকা মোট ৭৲ টাকা দান করিয়াছেন। পরমেশ্বর পরলোকগত আত্মাকে তাঁহার অমৃত নিকেতনে স্থান দান করুন এবং স্ত্রীর প্রাণে শান্তি দান করুন।

জাতকর্ম্ম—জলপাইগুড়ির শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন চক্রবর্ত্তীর প্রথম পুত্রের জাতকর্ম্ম গত ৬ই কার্ত্তিক সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু অবিনাশচন্দ্র দাস, মুন্সী জালাল উদ্দীন এবং বাবু হরিদাস গুপ্ত মহাশয়েরা নবকুমারের কল্যাণ কামনায় বিশেষভাবে প্রার্থনা করেন।

বার্ষিক শ্রাদ্ধ—গত ৮ই পৌষ শুক্রবার নিমতা গ্রামে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভগ্নীর পরলোক গমন দিবসে বিশেষ উপাসনা হয়। বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। মহেন্দ্র বাবু প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে কয়েকজন ব্রাহ্ম বন্ধু নিমতায় গমন করিয়াছিলেন।

নামকরণ—গত ২৮শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার খাসিয়া পাহাড়স্থ শেলা নামক স্থানে উউ হৈয়াংটন কাজির্ণাম্ এবং উউ গোবিন্দচন্দ্র রায়ের কন্যার নামকরণ ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কন্যা দুইটীর নাম যথাক্রমে সৌদামিনী এবং কুমুদিনী রাখা হইয়াছে।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে যে বিক্রমপুরের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে।

বাবু দীননাথ গুপ্ত ডাক্তারিবাগ

(শ্রীমতী চঞ্চলা দেবী দ্বারা সংগৃহীত)	১১৷৷০
„ জানকী নাথ চট্টোপাধ্যায় পঞ্জাব	১৲
„ দুর্গা দাস বসু মেদিনীপুর (সংগৃহীত)	৮৲
„ অধরচন্দ্র মজুমদার কলিকাতা	১৲
সিমলা পর্ব্বতের একটি বন্ধু	৫৲
	২৬৷৷০
পূর্ব্বে প্রকাশিত	৫৫০৷৷৶
মোট	৫৭৭৶

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২০শে জানুয়ারী শনিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় কলিকাতা ১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ সিটি কলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ষোড়শ সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হইবে।

সভ্য মহোদয়গণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

বিবেচ্য বিষয়।

১। ষোড়শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী এবং আয় ব্যয়ের হিসাব।

২। কর্ম্মচারী নিয়োগ।

৩। অধ্যক্ষ সভা সংগঠন।

৪। অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ সম্বন্ধীয় অবান্তর নিয়মের নিম্নলিখিতরূপ পরিবর্ত্তন বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রস্তাব :—

(ক) অবান্তর নিয়মের দ্বিতীয় নিয়মে "অনানুষ্ঠানিক" শব্দের পর এই সকল শব্দের যোগ হইবে। যথা—"বয়স ২৫ বৎসরের অধিক কি না, তিন বৎসরের অধিক কাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য কি না।"

(খ) অবান্তর নিয়মের তৃতীয় নিয়মে নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে ;—"সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভা তাঁহাদের তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ৯ জন সভ্য লইয়া একটী মনোনয়ন সব-কমিটী গঠন করিবেন। ঐ ৯ জনের মধ্যে সাঃ ব্রাঃ সমাজের সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদক একজন থাকিবেন, এবং তিনি এই সব কমিটীর সম্পাদকের কার্য্য করিবেন। মনোনয়ন সব-কমিটী আবশ্যক বোধ করিলে সাঃ ব্রাঃ সমাজের উপযুক্ত সংখ্যক সভ্যের নাম তাঁহাদের মত জানিয়া অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনয়নার্থ প্রেরণ করিতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত সাঃ ব্রাঃ সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক-সভা আবশ্যক বোধ করিলে, সমাজের ২২ নিয়মানুসারে যাঁহারা ২৫ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক কিম্বা তিন বৎসরের অপেক্ষা ন্যূন কাল সমাজের সভ্য, তাঁহাদের মধ্য হইতেও অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনয়নার্থ প্রেরণ করিতে পারিবেন।

অধ্যক্ষ সভার পদপ্রার্থী সভ্যগণের নামের তালিকায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে মনোনীত সভ্যগণের মধ্যে কোনও ইতর বিশেষ করা হইবে না।

(গ) সপ্তম অবান্তর নিয়ম উঠিয়া যাইবে।

(ঘ) ৮ম, ৯ম, ১০ম অবান্তর নিয়মের "ভোট গণনাকারী" কিম্বা "গণনাকারী" শব্দের পরিবর্ত্তে "মনোনয়ন" হইবে।

(ঙ) পঞ্চম অবান্তর নিয়মের মুদ্রিত "ক তপসীল এবং ক তপসীলের অনুযায়ী মুদ্রিত" উঠিয়া যাইবে।

৫। বাবু বাণীকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন :—

(১) ব্রাহ্ম ছাত্রীনিবাস সব কমিটীর সম্পাদক বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের সম্পাদকীয় কার্য্যের অবসান বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার আচরণের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হউক।

(২) ব্রাহ্ম-ছাত্রীনিবাস সংস্থাপন অবধি বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় যেরূপ সুদক্ষতার সহিত ইহার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে ন্যায়ানুরোধে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার (অধ্যক্ষ সভারও) কার্য্য সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করা হউক এবং আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে অনুরোধ করা হউক যে কোন প্রকারে তাঁহাকে পুনর্নিযুক্ত করিয়া তাঁহার প্রতি যেন উপযুক্ত ব্যবহার এবং ছাত্রীনিবাসের শ্রীবৃদ্ধি করেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়	শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ।
২১১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট	সাঃ ব্রাঃ সমাজ সম্পাদক।
কলিকাতা ৭ই ডিসেম্বর ১৮৯৩	

আগামী ১১ই জানুয়ারী ১৮৯৩ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় সিটিকলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। চতুর্থ ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব।

২। আগামী বর্ষের অধ্যক্ষ সভার জন্য ভোট গণনাকারী সব্‌কমিটী নিয়োগ।

৩। অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ সম্বন্ধীয় অবান্তর নিয়মের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রস্তাব।

৪। বিধবা অথবা বিপত্নীকদিগের পুনর্ব্বিবাহ সম্বন্ধীয় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে পুনর্বিচারের জন্য বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন।

৫। সমাজের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ সম্বন্ধে বিচার।

৬। বিবিধ।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়	শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট	সাঃ ব্রাঃ সমাজ সম্পাদক।
কলিকাতা ৭ই ডিসেম্বর ১৮৯৩	

ভোটিং পত্র।

আগামী বর্ষের অধ্যক্ষ সভা গঠনের নিমিত্ত ভোটিং পত্র সভ্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। যদি কোন সভ্য ভোটিং পত্র প্রাপ্ত না হন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে জানাইলে পাইতে পারিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মফঃস্বলস্থ সভ্য মহোদয়গণকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে, যে তাঁহারা যেন স্ব স্ব ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়গণের নিকট হইতে ভোটিং পত্র লইয়া এবং তাহা পূরণ করিয়া আগামী ৫ই জানুয়ারী ১৮৯৪ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ	শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়
২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট	সহকারী সম্পাদক।
কলিকাতা ১লা পৌষ ১৩০০	

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১৮ই পৌষ প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৯শ সংখ্যা।
১৬শ ভাগ।

১লা মাঘ, শনিবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাংসরিক অগ্রিম মূল্য ২।৹
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵৹

প্রার্থনা।

হে দীনদয়াল পিতা! আবার তোমার দীনহীন সন্তানগণ উৎসব করিবার জন্য তোমার দ্বারে আসিয়াছে। প্রভো! এই অপরাধী সন্তানদিগের জীবনের সকল সংবাদ তুমি জান। যাহা করা উচিত ছিল না, তাহা করিয়াছি, যাহা করা উচিত ছিল তাহা করি নাই, পিতা আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। পিতা অনেককে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা উচিত ছিল; কিন্তু করি নাই, কত জনকে প্রীতি করা উচিত ছিল অথচ করি নাই, তুমি আমাদিগের অপরাধ ক্ষমা কর। তোমার সাধন ও সেবা যেরূপ নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত করা উচিত ছিল, তাহা করি নাই, তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর। সাধু সঙ্গে তোমার পবিত্র নামের হাওয়াতে বসিলে মহাপাপীর হৃদয়ও গলিয়া যায়, স্বর্গীয় ভাবে হৃদয় পূর্ণ হয়। ক্ষণকালের জন্য সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া যাই। এইরূপ স্বর্গীয়ভাবের আভাস ত উৎসব-ক্ষেত্রে বার বার পাইতেছি, আর দুইদিন যাইতে না যাইতেই হারাইয়া ফেলিতেছি। দুঃখী ও অপরাধী সন্তানের দুঃখ ও অপরাধ কি ঘুচিবে না? জীবনে কি তোমার সত্যের আলো চিরদিনের মত প্রতিষ্ঠিত হইবে না? প্রভো এবার উৎসবে তোমার মলিন সন্তানদিগের মলিনতা ঘুচাইতে হইবে, পাপের জ্বালা নির্ব্বাণ করিতে হইবে, তোমার করুণার হাওয়াতে নূতন সংকল্প প্রাণে আসিতেছে; নূতন প্রতিজ্ঞা জীবনকে অধিকার করিতেছে; তোমার প্রেমমুখ না দেখিয়া, তোমার সত্যালোককে চিরদিনের মত সম্বল না করিয়া তোমার উৎসবের দ্বার ছাড়িব না। ব্রাহ্মসমাজের অধীশ্বর, এবার তোমার ব্রাহ্মসমাজকে তোমার ক্রোড়ে দেখিব, আর সকল অশান্তি ও দুঃখ ভুলিয়া যাইব। তোমাকে ভুলিয়া, তোমাকে হারাইয়া আমাদের যে দুর্দ্দশা, তাহা ত জান। ক্ষত দেহে, মৃত প্রাণে নবজীবনের সঞ্চার কর। প্রভো এই প্রতিজ্ঞা ও সংকল্পের মধ্যে তুমি শক্তিরূপে প্রকাশিত হও। তোমার কৃপার উপরে একান্ত ভাবে নির্ভর করিয়া যেন আমরা তোমার মহোৎসবে প্রবৃত্ত হই। আশীর্ব্বাদ কর, যেন বিনয় ও আত্ম-সমর্পণের সহিত তোমার করুণার প্রতীক্ষা করিতে পারি। তোমার ভক্তগণের শুভাকাঙ্ক্ষা এবং তোমার আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া যেন তোমার প্রসাদের অপেক্ষা করিতে পারি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

প্রাচীনে নবীন—কালে সকলি প্রাচীন হয়। জগতের বহুপদার্থ কালে জরা প্রাপ্ত হয়, তাহাদের শ্রী সৌন্দর্য্য অন্তর্হিত হয়, এবং মৃত্যু তাহাদিগকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে। আবার যাহাদের শ্রী সৌন্দর্য্য একেবারে অন্তর্হিত হয় না, তাহারাও মানবের চক্ষে প্রাচীন হইয়া পড়ে। যাহা দশ দিন দেখিয়াছি তাহা আর দেখিতে ইচ্ছা করে না। এমনি চক্ষের স্বভাব, পরম সুন্দর যাহা, যাহা একদিন চিত্তকে বিস্ময়-রসে পূর্ণ করিয়াছিল, হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ বিস্তার করিয়াছিল, তাহা কালক্রমে প্রাচীন ও সৌন্দর্য্য হীন হইয়া পড়ে; আর চিত্তকে আশ্চর্য্য-রসে সিক্ত করে না। বিধাতার বোধ হয় এই প্রকার বিধি, মানব যদি পুরাতনে তৃপ্ত থাকিত তবে আর নব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি বিষয়ে প্রয়াসী হইত না। মানব-হৃদয়ে এই নূতনের স্পৃহা বলবতী থাকাতেই মানব সমাজ চিরদিন নবীকৃত হইতেছে। যে উন্নতি বা যে সৌন্দর্য্য একবার সাধিত হইয়াছে, মানব মন তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, ও তদপেক্ষা অধিকতর উন্নতি ও অধিকতর সৌন্দর্য্য উৎপাদনে প্রয়াসী হইতেছে। সকল বিভাগেই এই অতৃপ্ত নবীন স্পৃহা কার্য্য করিতেছে। কিন্তু এই জীবনেই এরূপ কতকগুলি বিষয় রহিয়াছে যাহা কখনও পুরাতন হয় না। প্রিয় জনের মুখ কোনও দিন আমরা পুরাতন বলিয়া অনুভব করি না। কোনও দিন বলি না ও মুখ পুরাতন হইয়াছে, আর আনন্দ বিধানের শক্তি নাই, এখন নূতন মুখ চাই। কে কবে আপনার প্রণয়িণীকে বা আপনার পুত্র কন্যাকে বলিয়াছে, তোমাদের মুখ প্রাচীন হইয়া গিয়াছে নূতন মুখ পরিধান কর? বরং এই কথাই কি সত্য নহে যে প্রেমাস্পদ ব্যক্তিদিগের মুখ যত পুরাতন হয়, ততই অধিক সুন্দর হয়। প্রেমের এমনি গুণ। ইহা যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকে নূতন করে। বিদেশে বহুদিন বাস করিতেছি, স্বদেশের ভাষা অনেক দিন শুনি নাই, বিদেশীর মধ্যে, বিভাষীর মধ্যে দিন চলিয়া যাইতেছে, যদি হঠাৎ একদিন একজন কোনও প্রিয় সুহৃদের প্রাচীন মুখ দেখিতে পাই, তবে

সে প্রাচীন মুখ হৃদয়ে কি আনন্দই প্রদান করে! তখন কি সেই প্রাচীনের জন্য সমুদায় নবীন ত্যাগ করিতে পারা যায় না? প্রেমের এমনি মহিমা। এই জগৎ ত অনেক দিনের প্রাচীন। কিন্তু যে দিন প্রেমের চক্ষে ইহার দিকে চাই, সে দিন আর প্রাচীন লাগে না। সে দিন ইহার গুপ্ত কথা সকল প্রকাশ হইয়া পড়ে; সে দিন ইহার পত্রে পুষ্পে ফলে কত নূতন উপদেশ দেখিতে পাই। কবি প্রেমের চক্ষে প্রকৃতিকে দর্শন করেন বলিয়া প্রকৃতি তাঁহার নিকট চিরযৌবনা।

আমরা যে মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছি তাহার ন্যায় প্রাচীন আর কি আছে? ঈশ্বরের নামের ন্যায় প্রাচীন শব্দ মানব ভাষাতে অতি অল্পই আছে। প্রেম-বিহীন হৃদয়ের পক্ষে ধর্ম্মের সমুদায় ব্যাপারই পুরাতন, ঈশ্বরের নাম পুরাতন, তাঁহার মহিমাগান পুরাতন;—তাঁহার দ্বারে প্রার্থনা পুরাতন; শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন সকলি পুরাতন। কিন্তু ব্রহ্ম-কৃপার আবির্ভাবে হৃদয়ে যদি প্রেম সঞ্চার হয়, তাহা হইলে আমরা সকলি নূতন দেখিব; তাহার শক্তির সংস্পর্শে সমুদায় নূতন হইয়া উঠিবে। অতএব ব্রহ্মকৃপার জন্য প্রতীক্ষা করি।

ঐকতান বাদন—বহু সংখ্যক বাদ্যযন্ত্র সংযোগে যে অপূর্ব্ব স্বর-লহরীর সৃষ্টি হয়, তাহাকে ঐকতান বাদন বলে। ঐকতান বাদনের দলে একজন দলপতি বা শিক্ষক থাকেন, তিনি সর্ব্বপ্রথমে একটা সুর বাঁধিয়া থাকেন, তৎপরে সেই সুরের সহিত মিলাইয়া অপর সকলকে স্বীয় স্বীয় যন্ত্র বাঁধিতে আদেশ করেন। একে একে সকল যন্ত্রগুলি যখন বাঁধা হয়, তখন তাঁহার ইঙ্গিত মাত্র সকলে এক সঙ্গে বাজাইতে আরম্ভ করে। কিন্তু আমরা সর্ব্বদাই অনুভব করিতেছি যে আমরা দশজনে এক সুর বাজাইতে পারিতেছি না। দশজনের সুর ভিন্ন ভিন্ন হইয়া বাজিতেছে এবং প্রীতি উৎপাদন না করিয়া অপ্রীতি উৎপন্ন করিতেছে। ইহার কারণ কি? আমাদের যন্ত্রনায়ক যিনি তাঁহার সুরের সহিত নিজ নিজ সুর মিলাইতে পারিতেছি না। যন্ত্রনায়ক স্বয়ং পরমেশ্বর। হৃদয়কে প্রশান্ত ও বিশুদ্ধ করিলেই তাঁহার সুর শুনিতে পাওয়া যায়; তাহা প্রতি জনেরই কর্ণে বাজে। যাঁহারা সেই সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়াছেন, তাঁহাদের জাতি, শিক্ষা, ভাষা ও সামাজিক অবস্থাগত বিচিত্রতার মধ্যে ও কেমন সুরের অপূর্ব্ব ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে! একজন জন্মিলেন বঙ্গে, আর একজন জন্মিলেন সুদূর পাশ্চমে, কিন্তু বাজিলে জানা গেল এক সুর বাজিতেছে। আমরা হৃদয়কে শুদ্ধ করিতে পারি না বলিয়াই, সেই বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বজনীন সুর শুনিতে পাই না। যেমন ফাটা বাঁশীতে ফাটা শব্দ নির্গত হয়, তেমনি আমাদের স্বার্থ-দূষিত অবিশুদ্ধ হৃদয় হইতে যে সুর বহির্গত হইতেছে তাহার মধ্যে স্বার্থের ফাটা আওয়াজ শ্রুত হইতেছে। বিবেক কর্ণ বধির প্রায় হওয়াতে ব্রহ্মাণ্ডের সুর ঠিকভাবে শুনিতে পাইতেছি না এবং নিজ নিজ সুর মিলাইতে পারিতেছি না। এইরূপ গোলে মালে বেসুর বাজিয়া বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে। মহোৎসব উপস্থিত-ব্রহ্মরাগ এইবার আবার একবার ভাল করিয়া বাজিবে। এ সময়ে আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে কর্ত্তব্য কি? ঐকতান বাদনস্থলে বাদকগণ যাহা করে, তাহা আমাদের প্রত্যেককে করিতে হইবে। বাদকগণের যখন যন্ত্র মিলাইবার সময় উপস্থিত হয়, তখন বলিতে থাকে "আঃ গোলটা একটু থামুক, সুরটা একবার শুনি, যন্ত্রটা মিলাইয়া লই।" তেমনি আমরা প্রত্যেকে যেন বলি "আঃ গোলটা একটু থামুক, যন্ত্রটা একবার মিলাইয়া লই।" আমাদের মধ্যে যাঁহারা উৎসবের প্রারম্ভ হইতেই নিজ নিজ যন্ত্র মিলাইয়া লইতে পারিবেন, তাঁহাদেরই হৃদয়ে উৎসবক্ষেত্রে ব্রহ্মাণ্ডের মহারাগ, ব্রহ্মরাগ বাজিবে। তাঁহারাই পূর্ণমাত্রায় উৎসবের আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারিবেন। অপরেরা প্রবঞ্চিত হইবেন; তাঁহারা সেই পরম পুরুষের সুর না বাজাইয়া নিজ নিজ বেসুর বাজাইবেন।

যদি ব্রহ্মডাঙ্গায় না দাঁড়াল জল—"কত দিন পার্থনা করিলাম"—যদি ব্রহ্মডাঙ্গায় না দাঁড়াল জল, তবে জগৎ জনে বলবে কেন ভকত বৎসল"। এই গানটী আবার স্মরণ করিবার দিন আসিয়াছে। ব্রহ্মডাঙ্গা কাহাকে বলে? বিশাল প্রান্তরের মধ্যে সময়ে সময়ে এক একটী উচ্চ ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়; যাহার উপরে বর্ষার জল কখনও দাঁড়ায় না; তাহা উষরক্ষেত্র, সেখানে শস্যাদি জন্মে না। তাহাকে ব্রহ্মডাঙ্গা বলে। যেবারে অতিশয় বন্যা হয় সেবারে ব্রহ্মডাঙ্গা পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়; লোকে বলে এবার ব্রহ্মডাঙ্গা ডুবিয়াছে। ভক্তগণ কখনও কখনও আপনাদের হৃদয়কে ব্রহ্মডাঙ্গা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যেমন একটী আট দশ হাত উর্দ্ধ মৃত্তিকার স্তূপে একটী পর্ব্বতকেও আমাদের দৃষ্টি হইতে আবরণ করিয়া রাখিতে পারে, সেইরূপ আমাদের হৃদয়স্থিত সামান্য অহঙ্কারও অনেক সময়ে পর্ব্বত সমান ব্রহ্ম-কৃপাকেও আমাদের দৃষ্টি হইতে আবৃত করিয়া রাখে। আপনাদের হৃদয়কে প্রকৃত বিনয়ে পূর্ণ করা যে কি কঠিন তাহা আমরা প্রতিদিন অনুভব করিতেছি। অহঙ্কার এমনি শত্রু যে ইহাকে এক দ্বার দিয়া বিদায় করিলে, রূপান্তর ধারণ করিয়া অপর দ্বার দিয়া হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়। এমন কি রামায়ণোল্লিখিত মহীরাবণ যেরূপ অবশেষে বিভীষণের আকার ধারণ করিয়া আসিয়া শিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছিল, তেমনি যে বিনয়ের দ্বারা অহঙ্কারের দমন হইবে, অহঙ্কার অনেক সময়ে সেই বিনয়ের আকার ধারণ করিয়া আগমন করে। এই অহঙ্কারের হস্ত হইতে আমরা নিষ্কৃতি পাই কিরূপে? উৎসবের দ্বারা তাঁহারাই উপকৃত হইবেন, যাঁহারা বিনয়ে আপনাদের হৃদয়কে বাস্তবিক নিম্নভূমির ন্যায় করিতে পারিবেন। আর এখনও যাঁহারা অহঙ্কারে গ্রীবা সমুন্নত রাখিবেন, তাঁহাদের হৃদয় ব্রহ্মডাঙ্গা হইয়া থাকিবে। উৎসবে যাহারা আসিয়া যোগ দিবেন তাঁহাদিগকে যেমন হৃদয় ক্ষেত্রকে নিম্নভূমির ন্যায় করিতে হইবে তেমনি ইহার কার্য্যের ভার যাঁহাদের উপরে পড়িয়াছে তাঁহাদিগকে আরও সমাধকরূপে হৃদয়কে নিম্নভূমি করিতে হইবে।

এই সকল কার্য্যের গৌরব যাহা কিছু তাহা সেই পরম প্রভুরই—এই ভাবটী যদি তাঁহারা অন্তরে জাগরূক রাখিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কার্য্যের উপরে ঈশ্বরের কৃপা বর্ষিত হইবে। যদি আত্ম-গৌরববুদ্ধি কিঞ্চিন্মাত্রও তাঁহাদের অন্তরে প্রবল হয়, তাহা হইলে তাঁহাদেরও হৃদয় উচ্চক্ষেত্রের ন্যায় শুষ্ক থাকিবে। ঈশ্বর করুন যেন আমরা সকলে যথাসময়ে হৃদয়কে নিম্নভূমির ন্যায় করিতে পারি।

উৎসবের বিশেষত্ব—আমরা যে মধ্যে মধ্যে উৎসব করিয়া থাকি তাহাতে বিশেষত্ব কি আছে? সেই ত উপাসনা, প্রার্থনা, ধ্যান, ধারণা, কীর্ত্তন ও সংগীত। সেই ত আলোচনা, বক্তৃতা ও উপদেশ। সেইসকল প্রাচীন ব্যাপার ভিন্ন বিশেষভাবে উৎসবের জন্য আর কি বিশেষ আয়োজন করা হয়, যাহার প্রতি আমরা এত গুরুতররূপে মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। গুরুত্ব ও বিশেষত্ব কোথায়? আমরা উৎসবে উপাসনা প্রার্থনাদির অনুষ্ঠান করিলেও ইহার বিশেষত্ব না আছে এমন নয়। সে বিশেষত্ব অন্তরে, বাহিরে নয়। আন্তরিক পরিবর্ত্তনেই এই বিশেষত্ব উপলব্ধি হয়। শরীর সম্বন্ধেও আমরা সময় সময় এরূপ পরিবর্ত্তন অনুভব করিয়া থাকি। একই বস্তু বিশেষ সময়ে আমাদের বিশেষ মিষ্ট লাগে, এবং তাহা দ্বারা শরীরের বিশেষ তৃপ্তি হয়। আমরা সকলেই জানি কোন কোন সময় সরবৎ খাইতে বিশেষ ইচ্ছা করে, অন্য দিন বা অম্লের আস্বাদন বিশেষ প্রীতিকর হয়। কোন দিন ঝালের আস্বাদন ভাল লাগে, আবার অন্য দিন হয় তিক্ত বস্তু বিশেষ তৃপ্তিদায়ক হইয়া থাকে। এই সকল দিনে অম্ল, ঝাল বা তিক্ত আস্বাদনের বস্তুগুলিতে যে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা নয়। তাহারা পূর্ব্বেও যেমন ছিল পরেও তেমনি থাকে। আমাদের শারীরিক পরিবর্ত্তনেই এক এক সময় এক বস্তু বিশেষ প্রিয় হয় ও তৃপ্তিদায়ক হয়। তেমনি উপাসনা, প্রার্থনা সংগীত, সংকীর্ত্তন প্রভৃতি সেই প্রাচীন বস্তু হইয়াও উৎসবে তাহা নূতন আকার ধারণ করিয়া, অন্তরের বিশেষ তৃপ্তিদায়ক এবং প্রাণদায়ক হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তিত প্রাণ লইয়া যাঁহারা উৎসবে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষেই উৎসবের বিশেষত্ব আছে। তাহার অভাবে "ঘাটের গঙ্গা জল" এই প্রবাদ বাক্যের ন্যায় উৎসবের উপাসনাদিও আমাদের পক্ষে বিশেষত্ব হীন ও পুরাতন বস্তু হইয়া পড়ে। কিরূপ পরিবর্ত্তন লইয়া উৎসবে প্রবৃত্ত হইতে হইবে? সে পরিবর্ত্তন রুচির পরিবর্ত্তন, আকাঙ্ক্ষার পরিবর্ত্তন। প্রতিদিন যে আকাঙ্ক্ষা লইয়া উপাসনা করি সেইরূপ আকাঙ্ক্ষা লইয়া যদি উৎসবে প্রবৃত্ত হই, তবে আমাদিগের সেইরূপ ফলই লাভ হইবে, তাহার বেশী আশা করিবার কি হেতু আছে। সুতরাং বিশেষ ব্যাকুলতা বিশেষ সংকল্প লইয়া উৎসবে গমন করিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাই শরীর উত্তপ্ত হইলে, সহজেই শীতল সরবৎ পানের আকাঙ্ক্ষা হয়। আমাদের প্রাণ কি সংসারের উত্তপ্ত বায়ুতে উত্তপ্ত হয় না? উত্তপ্ত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা যাহাতে প্রাণ শীতল হইতে পারে, তাহার সন্ধান পাই না—তাহা পাইতে ব্যাকুল হই না। অন্যবিধ বস্তু দ্বারা প্রাণের জ্বালা নিবারণ করিতে যাই, তাই মনে হয় প্রাণের জ্বালা যাইবার নয়, উৎসবে সে জ্বালা যাইবে না। আবার অনেক সময় জ্বালাকে জ্বালা বলিয়া বোধ করিবার শক্তিও থাকে না। তাহাতেও ব্যাকুলতা জন্মে না। এই জন্য বিশেষ ভাবে আত্মানুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে কেন ক্ষুধা হয় না, কেন সন্তাপকে সন্তাপ বলিয়া মনে হয় না, অতি তীক্ষ্ণ আত্মদৃষ্টি ভিন্ন এরোগ ধরিবার উপায় নাই; সুতরাং উৎসবে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে যাহাতে বিশেষ আত্মানুসন্ধান দ্বারা ক্ষুধার সঞ্চার হয়, পুণ্য পবিত্রতার জন্য প্রাণের আকাঙ্ক্ষা হয়, এখন তাহাই করিতে হইবে।

আর এক ভাবেও আমরা উৎসবের বিশেষত্ব অনুভব করিতে পারি। আমরা অনেক উপাদেয় বস্তু একাকী আহার করিয়া থাকি। সে সময়ে তাহার যে মিষ্টতা অনুভব করি, যখন দশজন সুহৃদের সহিত প্রীতি ও সদ্ভাবে তাহা আহার করি, তাহার মিষ্টতা কত অধিক অনুভব করিয়া থাকি। আবার আহার করিতে করিতে তাহা যদি কোন বন্ধুকে প্রদান করি তাহাতে কত অধিক তৃপ্তি অনুভব করি। তখন আহারের আনন্দের সঙ্গে অন্যবিধ আনন্দও সম্ভোগ করিতে থাকি। বস্তুগত তারতম্য না থাকিলেও বন্ধুজনের সমাগমে আনন্দের পরিমাণ কত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তেমনি উৎসবে যখন নানা স্থান হইতে ব্যাকুলাত্মা ও সজ্জনগণের সমাগম হয়,তখন একাকী উপাসনায় যে তৃপ্তি পাইতেছিলাম, তাহার পরিমাণ কত বাড়িয়া যায়। একগুণ শক্তি শতগুণ হয়। একগুণ প্রেম শতগুণ হয়। তখনকার গান, তখনকার আলোচনা, প্রার্থনাদি সকলই বিশেষ তৃপ্তি-দায়ক, আশাজনক এবং জড়তা-নাশক হয়। ভক্ত ও ব্যাকুলাত্মাগণের সম্মিলন তাড়িত শক্তির ন্যায় প্রাণের উপর আশ্চর্য্যরূপে কার্য্য করে। অনেক সময় সেই শক্তি কোথা হইতে আসে তাহা অনুভবও করা যায় না। তখনই উৎসবের বিশেষত্ব সহজেই অনুভূত হয়। বাস্তবিক উৎসবকে আধ্যাত্মিক ভোজে "ক্ষুধিত ও তৃষিত আত্মাগণের সম্মিলন" এই নামে অভিহিত করাই উচিত। ব্যাকুলতায় ব্যাকুলতার সঞ্চার করে। একের ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত অপরের নিষ্প্রভ ত্যাগস্বীকারের আকাঙ্ক্ষা জ্বলিয়া উঠে। শুভসম্মিলন যত হয় ততই আত্মার কল্যাণ। ধর্ম্ম জগতে অগ্রসর হইবার পক্ষে ততই অধিকতর সুবিধা পাওয়া যায়। আমাদের পক্ষে ব্রহ্মকৃপা অনুভব পক্ষে উৎসব অতি প্রশস্ত সময়। এমন সুযোগ লাভ করা সৌভাগ্যের বিষয়। আমরা আলস্য ও জড়তা পরিত্যাগ করিয়া এই উৎসব সম্ভোগ করিবার জন্য এখন হইতে প্রস্তুত হই।

স্বাভাবিক গতি—পুষ্প প্রদর্শনীতে লোকে যখন সমাগত ব্যক্তিদিগের মনস্তুষ্টির জন্য ফুল সকল সুসজ্জিত করিয়া রাখে, তখন সকলেই যথাশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর, সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য ও সুগন্ধযুক্ত ফুল সকলই সংগ্রহ করিয়া থাকে। এবং সে সকল ফুল যথাশক্তি সুন্দরভাবেই সাজাইয়া রাখে। দর্শক-

গণ সকল ফুলই বিশেষ আগ্রহের সহিত দর্শন করিতে থাকেন। সকল ফুলেই তাঁহাদের মনোহরণ করিবার শক্তি থাকিলেও সকল ব্যক্তিকেই যে সকল ফুল সমান আকৃষ্ট করে তাহা নহে। কেহ এক প্রকারের একটা গোলাপের দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, কেহ বা অপর প্রকারের একটা গোলাপে বেশী আকৃষ্ট হইতেছেন। একজন হয়ত বলিতেছেন "দেখ কেমন সুন্দর রূপে ফুলগুলি সাজাইয়াছে" এইরূপে এক এক জন এক এক প্রকার ফুলের প্রশংসা করিতেছেন। এসকল স্থলে ফুল সকল যে ব্যক্তি বিশেষকে কিছু অধিক আদর করিয়াছিল বা তাহার জন্য যে কিছু বেশী সাজ সজ্জা করিয়াছিল তাহা নহে। মালীগণ যে কোন ব্যক্তিবিশেষকে বিশেষভাবে কোনও রূপ আদর অভ্যর্থনা করিয়া বা কোনরূপে মনস্তুষ্টিকর বাক্য বলিয়া প্রলুব্ধ করিয়াছিল এমন নয়। লোকে আপনা হইতে, প্রকৃতিদত্ত বিশেষ বিশেষ মানসিক ভাব হইতেই এক একজন এক এক প্রকার ফুল বা সাজ সজ্জায় মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই লোকে এইরূপ বিভিন্নরূপে আত্ম-রুচি ও সৌন্দর্য্য নির্ণয়-শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। ইহাতে স্বভাব ভিন্ন অন্য কাহাকে চালক দেখা যায় না। এই প্রদর্শনীতে যেমন লোকে কাহারও কর্তৃক চালিত না হইয়াও কোন কোন ফুল বা সাজ সজ্জায় অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয়, তাহার পক্ষপাতী হয়, সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতেও লোকে স্বভাব হইতেই কোন কোন বিষয়ে অধিক আকৃষ্ট হয়। অধিক পরিমাণে পক্ষপাতী হয়। এখানেও স্বভাবের চালনা ভিন্ন অন্য কোনরূপ প্ররোচনা দেখা যায় না। এই স্বভাবের প্ররোচনা হইতেই কেহ বা প্রেম ও ভক্তির অধিকতর পক্ষপাতী, কেহবা জ্ঞানের সমাদর করিতে সমুৎসুক। অপরেরা আবার কর্ম্মপ্রিয়। কিন্তু স্বভাবের চালনায় লোকে যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে অধিক আকৃষ্ট হয়, অধিক পরিমাণে বিষয় বিশেষের প্রশংসা করে তাহাও লোকের সহ্য হয় না। দেখা যায় জ্ঞানী, ভক্ত ও প্রেমিককে তত পছন্দ করে না। ভক্ত ও প্রেমিক আবার জ্ঞানীকে একটু কেমন ভাবে দর্শন করেন। কর্ম্মীও হয়ত জ্ঞানী ও ভক্তকে তেমন ভালভাবে গ্রহণ করেন না। বিবাদের কোন হেতু না থাকিলেও এইরূপ বিবাদের অতীত বিষয় সকল লইয়াও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কত না বিরোধ চলিতেছে। ব্রাহ্মসমাজ এ প্রকার বিবাদকে নিতান্তই অযৌক্তিক ও অহেতুক মনে করেন। এবং সকলের প্রতিই উদার ও সদ্ভাব প্রদর্শন করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু লোকে তাহা শুনিতে চায় না। এই প্রকার সামান্য বিষয়ে বৃথা তর্ক দ্বারা পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া যায়। এবং এইরূপ অনর্থকর বিবাদ বিসংবাদে লোকে অপরের প্রতি উদাসীন হয় এবং অপরের নিকট হইতে যাহা পাইবার ছিল তাহাতে বঞ্চিত হয়। এজন্য সর্ব্বদাই সকল ভাবাপন্নকেই উদার প্রীতিতে গ্রহণ করিতে হইবে। একটী কথা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে যদিও স্বভাবই বিশেষ বিশেষ বিষয়ে আমাদিগকে আকৃষ্ট করে, তথাপি সকলের পক্ষেই সেই প্রদর্শনীতে প্রবেশের ন্যায় অধ্যাত্মরাজ্যের সকল দিকেই মনোযোগ দিতে হইবে। আগে এই রাজ্যের সকল বিষয়ের সহিত পরিচিত হইয়া, পরে যাহার যেটী ভাল লাগে তাহাতে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। তাহা না হইলে ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ থাকিবে, জীবন অঙ্গহীন থাকিবে। এই যে মহোৎসব নিকটবর্ত্তী হইতেছে, এই উৎসবে যেন আমরা ধর্ম্মের সকল তত্ত্বই অনুশীলন করিতে পারি। পক্ষপাতিতার অধীন হইয়া অপরের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করিয়া, যেন উদার প্রীতিতে সকলে সম্মিলিত হইতে পারি।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ক্ষয় ও উপচয়।

প্রকৃতির নিয়ম এই শ্রমান্তে বিশ্রাম, ক্ষয়ান্তে উপচয়। শ্রমকালে যে সকল শারীরিক শক্তি বিপর্য্যস্ত হয় বিশ্রামকালে প্রকৃতি তাহা পুনর্গঠিত করিয়া লন। এই কারণে নিদ্রার ন্যায় বন্ধু মানবের অতি অল্পই আছে। সমস্ত দিবসের শ্রম, উষ্ণতা, উত্তাপ, উদ্বেগ, প্রভৃতি সমুদায় হরণ করিয়া নিদ্রা মানবের দেহ মনকে সুস্থ, প্রকৃতিস্থ, প্রসন্ন ও কর্ম্মক্ষম করিয়া দেয়। এইরূপ প্রকৃতির মধ্যে ক্ষয় ও উপচয় সর্ব্বদা চলিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তের কার্য্য দ্বারা আমাদের দৈহিক ধাতুপুঞ্জ নিরন্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। শরীরের পুরাতন অণু সকল নানা আকারে দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যাইতেছে। এই ক্ষয় ক্রিয়া এত দ্রুত চলিতেছে, যে বর্ত্তমান সময়ের কোন কোনও পণ্ডিত গণনা করিয়া বলিয়াছেন, তিন বৎসরের পূর্ব্বে দেহে যে সকল পরমাণু ছিল, তিন বৎসর পরে তাহার একটী অণুও থাকে না। কিন্তু প্রকৃতি যেমন ক্ষয়ের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছেন, তেমনি উপচয়ের দ্বারও খুলিয়া রাখিয়াছেন। আমরা প্রতিদিন যে সকল অন্ন পান গ্রহণ করিতেছি তদ্দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত দৈহিক ধাতুপুঞ্জ গঠিত হইতেছে।

এই ক্ষয় ও উপচয়ের নিয়ম অধ্যাত্ম-রাজ্যেও খাটে। সংসার-মধ্যে আমরা যখন বাস করি এবং কার্য্যক্ষেত্রে যখন বিচরণ করি তখন আমরা সকল সময়ে অনুকূল অবস্থার মধ্যে থাকি না। কত পাপ প্রলোভনের মধ্যে পড়িতে হয়, কত চিত্তের বিক্ষোভকারী কারণ ঘটিয়া থাকে, কত উত্তপ্ত বায়ু আসিয়া আমাদের আত্মাকে শুষ্ক করিতে থাকে। এই সকল সংগ্রামের মধ্যে অনেক সময়ে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি সামর্থ্যের ক্ষয় হইতে থাকে। আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই যে আমাদের প্রাণের সরসতা হ্রাস হইতেছে; উৎসাহ মন্দীভূত হইতেছে; বিশ্বাস ও নির্ভর যেন ম্লানভাব ধারণ করিতেছে। একদিকে যখন এইরূপ ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন অপরদিকে উপচয়ের জন্য ব্যগ্র হইতে হয়। কিন্তু শরীরের ধাতুপুঞ্জ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, যেমন অন্ন জলের দ্বারা পুনরায় গঠিত হয়, সেইরূপ আত্মার ক্ষয়কে নিবারণ করিয়া উপচয়কে বৃদ্ধি করিবার উপায় কি? যেমন অন্ন পান দ্বারা দেহ রক্ষা হয়, আত্মা সেইরূপ সে

পরম পুরুষের শক্তি ও আবির্ভাব দ্বারা বাঁচিয়া থাকে। এই কারণে কোনও ভাবুক সাধক বিশ্বাসী ও অনুরাগী জনের চিত্তকে জলপার্শ্বে রোপিত বৃক্ষের ন্যায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নদী তীরবর্ত্তী তরু যেমন সর্ব্বদা সতেজ, সর্ব্বদা জীবন্ত ও সর্ব্বদা স্নিগ্ধ-কান্তি, তেমনি প্রেমযোগে সেই পবিত্র পুরুষের সহিত যুক্ত আত্মাও সর্ব্বদা সতেজ, জীবন্ত ও হরিদ্বর্ণময়।

যিনি আত্মার অনুপান স্বরূপ আত্মার জীবন রক্ষার ও স্বাস্থ্যের উন্নতি জন্য সর্ব্বদা তাঁহার সহিত যোগ অন্বেষণ করিতে হইবে। সংসারের কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যে আমরা অনেক সময়ে এই আধ্যাত্মিক যোগ সাধন বিষয়ে ইচ্ছানুরূপ মনোযোগী হইতে পারি না। প্রতিদিনের চিন্তা ও কার্য্যের স্রোত আমাদিগকে অনেক সময়ে বহিয়া লইয়া যায়। আমরা বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে থাকি। যদি সেই মনকে সময়ে সময়ে কার্য্যের ব্যস্ততা হইতে অপসৃত করিয়া বিশেষরূপে সেই পরম পুরুষের প্রতি মনকে নিয়োগ না করা যায়, তাহা হইলে আত্মা শুষ্ক ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে থাকে। শরীর সম্বন্ধে এরূপ অবস্থা অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে অবস্থাতে কোন ও বিশেষ পীড়া দেখা যায় না, কোন ও ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ নাই, কিন্তু তথাপি দেহ দুর্ব্বল কার্য্যে অপটু ও শ্রমে পরাঙ্মুখ। কার্য্যক্ষম ও শ্রম-প্রিয় ব্যক্তিরা যখন আপনাদের অন্তরে এই শ্রম-বিমুখতা লক্ষ্য করেন, তখন অনুভব করিতে থাকেন যে ত্বরায় কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া স্বাস্থ্য কর আহার ও স্বাস্থ্যকর বায়ু সেবন ও বিশ্রামের বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য নতুবা দেহ ত্বরায় পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইবে। সেইরূপ আমরা ও কি সময়ে সময়ে আত্মার মধ্যে এক প্রকার অবসাদ অনুভব করি না, যখন দেখি কোনও বিশেষ পীড়ার বিদ্যমান নাই কিন্তু হৃদয়, মন নিস্তেজ, নীরস ও অবসন্ন? এই সময়ে কার্য্য হইতে অবস্থিত হইয়া স্বাস্থ্যকর আধ্যাত্মিক আহার ও স্বাস্থ্যকর আধ্যাত্মিক বায়ু সেবনের জন্য যাইতে হয়।

আমরা উৎসব কালকে সংসার পথের শ্রান্ত ও ক্লান্ত পথিকগণের স্বাস্থ্যকর আধ্যাত্মিক বায়ু সেবনের সময় বলিয়া মনে করি। কিন্তু এ বায়ু কি প্রকার বায়ু? লোকে ব্রহ্ম শক্তিকে সচরাচর বায়ুর সহিত তুলনা করিয়া থাকে। কোন দিক দিয়া বায়ু বহিবে এবং কখন তাহা বেগে আসিবে তাহা যেমন কেহই বলিতে পারে না, সেইরূপ ব্রহ্মশক্তি যে কখন কোন উপায়ে, কোন সূত্র ধরিয়া হৃদয়ে অবতীর্ণ হইবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। আমাদিগকে কেবল অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়; ব্রহ্ম কৃপার প্রতি একান্ত নির্ভর রাখিয়া ও তাঁহার করুণার বায়ুর অপেক্ষা করিয়া সকল কার্য্যের সহিত যোগ দিতে হয়। কোন বিষয়টী কাহার নিকট যে জীবনের বার্ত্তা আনিবে তাহা কে বলিতে পারে? কত বার ত দেখিয়াছি বড় বড় ব্যাপারে যোগ দিলাম, অথচ হৃদয় কবাট খুলিল না; হঠাৎ একটী সামান্য কথাতে হৃদয় দ্বার খুলিয়া গেল ও হৃদয় মধ্যে ব্রহ্ম কৃপার বায়ু প্রবাহিত হইল।

অতএব আশা পূর্ণ ও নির্ভর-শীল অন্তরে আমাদিগকে মহোৎসবে প্রবেশ করিতে হইবে। যাঁহাদের সম্বৎসর শক্তি সামর্থ্যের ক্ষয় হইয়াছে, তাঁহাদের ক্ষতি পূরণের সময় উপস্থিত। স্বয়ং প্রভু পরমেশ্বর স্বহস্তে কৃপার অন্ন বিতরণ করিবেন, যে অন্নে রোগ যায়, দুর্ব্বলতা যায় অবসাদ যায়, সেই অন্ন বিতরণ করিবেন। ভক্ত সমাগমে তাঁহার শক্তি পবিত্র সুস্নিগ্ধ বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হইবে। সেই বায়ু যিনি প্রাণ ভরিয়া সেবন করিতে পারিবেন তিনি স্বাস্থ্যসুখ লাভ করিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিবেন। আমরা তবে প্রার্থনাপূর্ণ অন্তরে মহোৎসবে প্রবেশ করি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

১৮৯৩।

বিগত তিন মাসে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১২টী সাধারণ এবং ২টী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। আগামী বর্ষের অধ্যক্ষ সভা সংগঠন জন্য সমাজের সভ্যদিগের নিকট ভোটিং পত্র প্রেরিত হইয়াছে। আশা করা যায় এবার অধ্যক্ষসভা গঠনে অসুবিধা হইবে না।

হরি প্রভৃতি কোন কোন নাম কতিপয় সভ্যের মতে পৌত্তলিক বলিয়া আপত্তিজনক হওয়াতে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও ব্রাহ্ম মাত্রেরই এ সম্বন্ধে মতামত অবগত হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন।

দুর্ভিক্ষ।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রিলিফ ফণ্ডের হস্তে আমরা কিছু টাকা পাঠাইয়াছিলাম। সেই কমিটী দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে বিক্রমপুরে যে লোক প্রেরণ করেন, তিনি উত্তর বিক্রমপুরে ৩৮ খানা গ্রামে সাহায্য করিয়াছেন। ঐ ৩৮খানা গ্রামে ১১২৮ জন লোককে সাহায্য করা হয়, তন্মধ্যে পুরুষ ১০৬, স্ত্রীলোক ৩৯৬, বালক বালিকা ৬২৬, মোট ১১২৮ জন। এই কার্য্যে ব্রাহ্মসমাজের সংগৃহীত টাকা হইতে বেশী টাকা ব্যয় হয় নাই। মুন্সিগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের লোকের হাতে যে টাকা দিয়াছিলেন, সেই টাকা দ্বারাই অধিকাংশ স্থানে সাহায্য করা হইয়াছে। ঐ ৩৮ খানা গ্রাম ভিন্ন আরও দুইটী গ্রামের দুইটী ভদ্র পরিবারকে গোপনে সাহায্য করা হইয়াছিল। তৎপরে বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষালকে তথায় প্রেরণ করা হয়।

প্রথমাবস্থায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রবল হইয়াছিল, সেই সময় মুন্সিগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের যত্নে অনেক লোকের কষ্ট নিবারণ হয়।

ভদ্রলোক এবং কৃষকদিগের অধিক কষ্ট হয় নাই। চাউল দুর্ম্মূল্য হওয়াতেই তাহাদের যাহা কিছু কষ্ট হইয়াছিল। অনাথা বিধবাদিগের ভয়ানক কষ্ট হইয়াছিল। ইহারা দিনের পর দিন উপবাস করিয়া কাটাইয়াছে, তথাপি প্রকাশ্যে সাহায্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয় নাই। আমাদের এজেণ্ট গোপনে অনেক চেষ্টা করিয়া কয়েকটী বিধবার সাহায্য করিয়াছিলেন।

The Royal Opium Commission সমক্ষে সমাজের পক্ষ হইতে সাক্ষ্য প্রদান করিবার জন্য সমাজের কয়েকজন সভ্যকে অনুরোধ করা হয়। তাঁহাদের একজন ব্যতীত সকলেই এই কার্য্য সুদক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। এই কমিশন সংসৃষ্ট যাঁহারা বিলাত হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে J. G. Alexander সাহেব "Temperance" বিষয়ে, এবং Parliament মহাসভার সভ্য H. J. Wilson সাহেব "Some moral and Social Reforms in England" বিষয়ে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনালয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ছাত্রসমাজের সংশ্রবে Revd. Thomas Evans সাহেব এবং Mrs Hauser, President World's women's Christian Temperance Union Calcutta, উভয়েই Temperance বিষয়ে সমাজ মন্দিরে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই সকল বক্তৃতার জন্য বক্তাদিগকে আমরা হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতেছি।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা Royal opium commission Temperance পক্ষীয় সভ্যগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় এবং অন্য কতিপয় সভ্যকে অনুরোধ করেন। তাঁহাদিগের একজন এবং অপর কয়েকজনের উদ্যোগ ও চেষ্টায় বঙ্গমহিলা সমাজের এক সায়ংসমিতি হয়। তাহাতে Mrs. and Miss Pease, Messrs Arthur Pease M. P., H. J. Wilson M. P. এবং J. G Alexander মহোদয় এবং মহোদয়াগণ নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক সমাজের অনেক সভ্যের সঙ্গে আলাপ করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

খাসিয়া মিশন। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী যথাশক্তি এই মিশনের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। দিন দিন ইহার উন্নতি হইতেছে। চিরাপুঞ্জিতে যে প্রচার-ভবন প্রস্তত হইয়াছে, তাহাতে উপাসকমণ্ডলীর আর স্থান হয় না। বিদ্যালয় ও ঔষধালয়ের কার্য্য ভালই চলিতেছে। পারিবারিক অনুষ্ঠান ও ব্রাহ্মসমাজের প্রণালী অনুসারে হইতেছে। সম্প্রতি যাঁহারা প্রাচীন প্রণালী পরিত্যাগ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নির্যাতন সহ্য করিতে হইতেছে।

স্থায়ী প্রচার ফণ্ড। প্রচার এবং অন্যান্য কার্য্যে সাহায্য হেতু কয়েকটী ফণ্ড স্থাপিত হইয়াছে। এই ফণ্ডগুলির মূলধন অব্যয়িত থাকিয়া তাহাদের সুদ নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে ব্যয় সম্পন্ন হইবে। আয় ব্যয়ের হিসাবে এই ফণ্ডগুলির নাম উল্লেখ করা হইবে। স্বর্গীয় জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্থায়ী প্রচার ফণ্ডে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দানের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি এখন সমাজের হস্তে সেই টাকা অর্পণ করিয়াছেন।

প্রচার ও সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এই তিন মাস কাল মধ্যে শিরাজগঞ্জ, পাবনা, কুমিল্লা, কোচবিহার, বাগআঁচড়া, রামপুর-বোয়ালিয়া, চক্রবেড়িয়া, চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রচারকগণের নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল।

আমাদিগের প্রচারকগণ নিম্নলিখিতরূপে বিগত তিন মাস কার্য্য করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—কলিকাতা উচ্চ নীতি বিধায়িনী ছাত্র সভাতে "সাহিত্যে জাতীয় চরিত্র" সম্বন্ধে একটি, ছাত্রসমাজে একটি, এবং একদিন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান উপলক্ষে একটি বক্তৃতা করেন। ব্রাহ্মবালিকা বোর্ডিং এবং স্কুলের সম্পাদকতা, আশ্রমের উপাসনায় অধিকাংশ সময় আচার্য্যের কার্য্য, সময়ে সময়ে মন্দিরে উপাসনা, নিয়মিতরূপে তত্ত্ব-কৌমুদীর সম্পাদন কার্য্য এবং কোন কোন বাসায় উপাসনা ও অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—বাত, জ্বর প্রভৃতি পীড়ায় কষ্ট পাওয়াতে গত তিন মাস কাল ইচ্ছানুরূপ প্রচার কার্য্য করিতে পারেন নাই। কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে দুই দিবস উপাসনা, কোন ব্রাহ্মপরিবারে একটি শিশুর জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা, সিটিকলেজ ভবনে, ব্রাহ্মসম্মিলনীতে উপাসনা এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে 'মহাশক্তি' বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ভবানীপুর প্রার্থনাসমাজে উপাসনা এক দিবস একটি শিশুর নামকরণ উপলক্ষে উপাসনা, ব্রাহ্ম ও অন্যান্য লোকের সহিত ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে আলোচনা, সাময়িক পত্রিকায় ধর্ম্মবিষয়ে প্রবন্ধ, এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—বাঁকুড়া অঞ্চল হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কিছুদিন কলিকাতায় প্রচার করিয়া মাণিকদহে শারদীয় উৎসব, তৎপর কুমারখালি ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীতে যোগদান করেন। তথায় পরিবারে এবং সমাজে উপাসনা করেন। ঢাকা হইতে ফরিদপুরে গমন করিয়া তথায় সমাজে এবং পরিবারে উপাসনা পাঠব্যাখ্যানাদি করেন। তৎপর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া সাধনাশ্রমে, মন্দিরে এবং কোন কোন পরিবারে উপাসনাদি করেন, পরে পাবনা ও সিরাজগঞ্জের উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ঢাকায় যাত্রা করেন। পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্ম-সম্মিলনী হইতে কার্য্যনির্ব্বাহকসভা এক অনুরোধ পত্র প্রাপ্ত হন, তাহার মর্ম্ম এই যে, উক্ত সম্মিলনী পূর্ব্ব বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশ লইয়া একটা প্রচার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবেন এবং আমাদিগের প্রচারক বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়কে সেই ক্ষেত্রে প্রচার কার্য্যের ভার অর্পণ করিবেন। মাঘোৎসব নিকটবর্ত্তী, তাহার পর এই বিষয় সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কি তাহা স্থির করিবার সুবিধা জন্য কার্য্যনির্ব্বাহকসভা উক্ত প্রচারক মহাশয়কে এক মাসের নিমিত্ত একটি প্রচারদলসহ ঐ অঞ্চলে গিয়া প্রচার করিতে অনুরোধ করেন। উক্ত প্রচারক মহাশয় সিরাজগঞ্জে কয়েক দিন পীড়িতাবস্থায় ছিলেন তৎপর একটু সুস্থ হইলে পর ঢাকা হইয়া কুমিল্লা উৎসবে গমন করিয়াছেন। তাঁহার শরীর এখন সম্পূর্ণ সুস্থ বা সবল হয় নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু—মধ্যে মধ্যে নিমতা ব্রাহ্মসমাজে, কোন কোন ব্রাহ্ম পরিবারে এবং মন্দিরে তিন রবিবার রাত্রে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। "Brahmoism" নামক পুস্তিকা প্রকাশে রত ছিলেন। Indian Messenger পত্রিকা সম্পাদনেও কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, "আমি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, এই তিন মাস কাল মধ্যে আমার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাইবার কথা ছিল। কিন্তু কোন কোন বিশেষ কারণে সেখানে যাইতে পারি নাই এবং আশানুরূপ কার্য্যও করিতে পারি নাই।" সম্প্রতি তিনি বাঘআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করিয়াছেন। তথা হইতে কুচবিহার উৎসবে যাত্রা করিতেন কিন্তু অসুস্থতা বশতঃ তিনি কুচবিহার যাইতে অসমর্থ হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণপ্রসাদ—অক্টোবর মাসে কঠিন জ্বর রোগে প্রায় ২০ দিন সংজ্ঞাহীন থাকেন। তৎপর অল্প অল্প করিয়া আরোগ্য লাভ করেন। এই পীড়া তাঁহার কার্য্যের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে। তথাপি তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল অবস্থায়ও লক্ষ্ণৌ সহরের মধ্যে পূর্ব্বে যেখানে ছিলেন, সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক তথাকার সমাজে দৈনিক ও সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন এবং তথায় একটী ব্রহ্ম বিদ্যালয় সংস্থাপন পূর্ব্বক কয়েকটি বন্ধুর সাহায্যে সেই বিদ্যালয়ের কার্য্য এবং তাঁহার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ের কার্য্যও তিনি যথাশক্তি সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার শরীর এখনও দুর্ব্বল। আমাদিগের বন্ধু বাবু হীরালাল রায় এবং আর একটি যুবক তাঁহার যথেষ্ট সেবা ও সাহায্য করিতেছেন।

সাধনাশ্রম।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং নবদ্বীপচন্দ্র দাসের কার্য্য প্রচারকগণের কার্য্যবিবরণের সহিত দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য পরিচারকগণের কার্য্য বিবরণ এইরূপ :—

শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মমিশন প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষতা করিয়াছেন। শারদীয় উৎসব উপলক্ষে মাণিকদহ সমাজে, সাধনাশ্রমে, কয়েকটী পারিবারিক অনুষ্ঠানোপলক্ষে সিন্দুরিয়াপটি পারিবারিক সমাজের উৎসবে এবং মন্দিরেও কোন কোন রবিবার প্রাতে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মবালিকা বোর্ডিংএ উপাসনা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব গত সেপ্টেম্বর মাসে ছোট নাগপুর অঞ্চলে গমন করেন। চাঁইবাসা উৎসব উপলক্ষে একদিন হিন্দিতে উপদেশ দেন, তথাকার ছাত্র সভায় একটি বক্তৃতা করেন এবং দুই দিন সমবেত উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। পুরুলীয়া টাউন হলে এক দিন বক্তৃতা, আসেন্সোলে এক দিন উপদেশ প্রদান, বাঁকুড়ায় জেলায় দুই দিন সমবেত উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য, এক দিন বাজারে প্রকাশ্য বক্তৃতা এবং মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিনে একটি বক্তৃতা করেন। তৎপর কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া শারদীয় উৎসব উপলক্ষে মাণিক দহে এক দিন বাজারে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। তৎপর কয়েকদিন কলিকাতায় থাকিয়া পরে হাজারিবাগে গমন করেন। সেখানে বক্তৃতা উপাসনা এবং আলোচনাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে পারিবারিক দুর্ঘটনা বশতঃ জন্মভূমি পঞ্জাব প্রদেশে গমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নিয়মিত রূপে সাঃ ব্রাঃ সমাজের ধনাধ্যক্ষের কার্য্য, শারদীয় উৎসব উপলক্ষে মাণিকদহে আচার্য্যের কার্য্য, কলিকাতায় কয়েকটি ব্রাহ্ম পরিবারের তত্ত্বাবধান, রবিবার প্রাতে কয়েক দিন মন্দিরে উপাসনা, নিমতা ব্রাহ্মসমাজে প্রতি শনিবার সামাজিক উপাসনা এবং একটি অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী নিয়মিত রূপে ব্রাহ্মবালক ছাত্র নিবাসের তত্ত্বাবধায়কের কার্য্য, ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য, এবং শারদীয় উৎসব উপলক্ষে মাণিকদহে প্রকাশ্য বক্তৃতা, আশ্রমের উপাসনা এবং কোন কোন সময়ে অনুষ্ঠানোপলক্ষে উপাসনা, এতদ্ব্যতীত সময় সময় তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদনের সহায়তাও করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল মাণিকদহ শারদীয় উৎসবে যোগদান করিয়া ঢাকা ব্রাহ্মসম্মিলনীতে উপস্থিত হন। সম্মিলনীর অধিবেশন শেষ হইলে তিনি তথা হইতে বিক্রমপুরে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদিগকে সাহায্য করিবার জন্য প্রেরিত হন। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রশমিত হওয়ায় তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা ও কথকথাদি দ্বারা ঢাকা ও বিক্রমপুরের কোনও কোনও স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন ও তদ্ভিন্ন একটী পারিবারিক অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন। কলিকাতায় অবস্থিতিকালে আশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষতা ও তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদন বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন।

আয়		ব্যয়	
ভিক্ষাপ্রাপ্তি	৯৩॥৵১৫	অতিথিগণের জন্য ব্যয়	৫৬॥/০
দানপ্রাপ্তি	৯৪৵০	শেল্‌টারের জন্য সাধারণ	
ঘর ভাড়া প্রাপ্তি	২৪৲	ব্যয় এবং পাথেয়াদি	৯৭।৵১০
অতিথি ফণ্ডের জমা	১১৲	আশ্রমবাসীদিগের	
পুস্তক বিক্রয়	৯৸/০	আহারাদির ব্যয়	৪৮৮।১৫
পাথেয় হিঃ	৬৭৸/০		
জিনিস বিক্রয়	২৬॥০		৬৪১॥৫
আশ্রমবাসিগণের		স্থিত	৫॥৶৫
নিকট হইতে প্রাপ্ত	৩২০৵৫		
	৬৪৭/০		৬৪৭৶১০

উপাসকমণ্ডলী—মন্দিরে নিয়মিতরূপে প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় উপাসনা হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু শশিভূষণ বসু এবং বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রধানতঃ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
দানপ্রাপ্তি	১।৵১৫	কর্ম্মচারীর বেতন	২৬৳০
চাঁদা সংগ্রহ	১০৬।৵০	ক্ষুদ্র ব্যয়	১০/০
	———	গ্যাসের আলো হিঃ	২৬॥০
	১০৭৳১৫	মন্দিব মেরামত হিঃ	৫৲
পুর্ব্বস্থিত	৪।৶১২॥	হারমোনিয়ম মেরামত	১০৲
	———		———
মোট	১১২।৭॥		৭৮।/০
		হস্তেস্থিত	৩৩৳৶৭॥
			———
			১১২।৭॥

ব্রহ্মবিদ্যালয়—শাবদীয় ছুটীব পর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য পুনবাবদ্ধ হইয়াছে। ধর্ম্মবিজ্ঞানের ইংরেজি শ্রেণী ও ভগবদ্গীতাব শ্রেণীব কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিতেছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর সংশ্রবে গত ১২ই ডিসেম্বব শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "মহাশক্তি" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। উক্ত শ্রেণীর সংশ্রবেই উক্ত প্রচারক মহাশয় "ঈশ্ববের অস্তিত্ব" বিষয়ে পূর্ব্বে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসম্মিলনী—এই তিন মাসের মধ্যে ১১ই ডিসেম্বর হইতে ১৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৬ দিবস প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সিটিকলেজ ভবনে উপাসনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শশিভূষণ বসু, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকুমার মিত্র উপাসনা করিয়াছিলেন।

ছাত্রসমাজ—বিগত শাবদীয় অবকাশান্তে ২রা ডিসেম্বর তারিখে ছাত্রসমাজের কার্য্য পুনরায় আরব্ধ হয়। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই উপলক্ষে মন্দিরে উপাসনার কার্য্য করেন। ৯ই তারিখে রেভারেণ্ড টমাস ইভান্স সাহেব "on the need of Temperance-work in India" বিষয়ে মন্দিরে একটী বক্তৃতা করেন। এই সভায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন। বক্তৃতান্তে মিঃ এ এম বসু মহাশয় একটী সুললিত এবং উৎসাহসূচক বক্তৃতা দ্বারা বক্তাকে হৃদয়েব কৃতজ্ঞতা প্রদান করেন। Mrs. Hauser ও একদিন উপাসনালয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ১৬ই তারিখে "মহাশক্তি" বিষয়ে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মন্দিরে একটি বক্তৃতা করেন, এই বক্তৃতাটি ছাত্রসমাজ এবং ব্রহ্মবিদ্যালয় উভয়ের সমবেত চেষ্টায় হইয়াছিল। ১২ই এবং ১৬ই তারিখে শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় সম্পাদককে সঙ্গে লইয়া দুইটী ছাত্রনিবাস পরিদর্শন করেন।

ব্রাহ্মছাত্রীনিবাস ও ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়।—এই তিন মাসে ছাত্রী সংখ্যা ৭৭ জন ছিল, তন্মধ্যে ১৬টী বালক নয় বৎসরের ন্যূন বয়স্ক। বোর্ডিংএর ছাত্রী সংখ্যা ২৭টী। ৪টী ছাত্রী পরীক্ষা দিয়াছে এবং সকলকেই আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত করা হইবে।

আয়		ব্যয়	
ছাত্র ছাত্রীর বেতন আদায়		বোর্ডিং খরচ	৪৩৪৳৶০
	১২১১॥৵০	কর্ম্মচারীর বেতন	৬৭৮৶৫
বোর্ডিং ফি	৭৫১॥০	গাড়ী	২৮৮৳৵৫
স্কুল ফি	৪২০৵০	বাড়ী ভাড়া—	২৭০৲
প্রবেশিকা পরীক্ষার ফিঃ	—৪০৲	প্রবেশিকা পরীক্ষার ফি	৪০৲
	———	বিবিধ	৪৭।১৫
	১২১১॥৵০		———
			১৭৫৯।/৫
চাঁদা ও এককালীন দান		হস্তেস্থিত	১৩৬৶০
	৯১৩॥৵০		———
	———		
	১৬০২।১৫		
পূর্ব্বস্থিত	২৯৩৶১০		
	———		
মোট	১৮৯৫॥৫	মোট	১৮৯৫॥৫

রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়—নীতিবিদ্যালয়ের কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা ৯০। ইহার পুস্তকালয়ের জন্য বিলাত হইতে কতকগুলি সুন্দর পুস্তক আনান হইয়াছে। কুমারী মার্টিনোর নিকট হইতে এবিষয়ে অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, এজন্য তাঁহার নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি।

সঙ্গত সভা—এই তিন মাস কালে সঙ্গত সভার অধিবেশন নিয়মিতরূপে হইয়াছিল। কেবল ১২ই ও ১৯এ ডিসেম্বর এই দুই মঙ্গলবাব ব্রাহ্মসম্মিলনীর উৎসব ও সমাজ মন্দিরে বক্তৃতা হইয়াছিল বলিয়া সঙ্গতের অধিবেশন হয় নাই। অন্যান্য অধিবেশনে 'আত্মোৎসর্গ ও সর্ব্বমত্যস্তং গর্হিতং এই দুইটী বিষয়ের আলোচনা বিশেষ ভাবে হইয়াছিল।

গত ৩০এ অগ্রহায়ণ হইতে সঙ্গত সভার কয়েকটী উৎসাহী সভ্য কর্ত্তৃক মাঘোৎসবের উদ্বোধন স্বরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের বাড়ী বাড়ী ভোর সংকীর্ত্তন হইতেছে।

দাতব্য বিভাগ—দাতব্য বিভাগের কার্য্য গত ৩ মাস কাল প্রায় পূর্ব্ববৎই চলিয়াছে। এই তিন মাস মধ্যে ৯টী পরিবার ১২টী, ছাত্র, ৩টী, অন্ধ, এবং একটী কুষ্ঠ রোগীকে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে। যাঁহারা দয়া করিয়া এই দাতব্য বিভাগে অর্থ দান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জমা		খরচ	
অনুষ্ঠান উপলক্ষে	৩০॥	মাসিক দান	৬৯
বার্ষিক দান	৬॥০	এক কালীন দান	১৯৵০
মাসিক দান	৭৲		———
এককালীন	৵০		৮৮৵০
	———	হস্তেস্থিত	১৭৩৳০
	৫৪৵		———
পূর্ব্বকার স্থিত	২০৭৳		
	———		
	২৬১৳৵০		২৬১৳৵০

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার ও তত্ত্ব-কৌমুদী—এই পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদন কার্য্য ভার যাঁহাদিগের হস্তে অর্পিত আছে তাঁহারা যথাশক্তি এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

সমাজ।

আয়		ব্যয়	
সভ্য ও সহযোগিগণের		প্রচার ব্যয়	৫৪৪৶০
চাঁদা আদায়	৪২৩৶০	কর্ম্মচারীর বেতন	১৬৮৲
বার্ষিক ২৩১৶১৫		কমিশন	/১০
মাসিক ১৮৯৸৶৫		ডাকমাশুল	১১৸৶০
———		বিবিধ (অধ্যক্ষসভার,	
৪২৩৶০		মুদ্রাঙ্কন এবং অন্যান্য	
প্রচারার্থ দানপ্রাপ্তি	২৫৫।/০	ক্ষুদ্র ব্যয়)	৫১৵০
বার্ষিক ৪০॥৵০		সুদ	৪৫৲
মাসিক ১৩২।০		প্রচার গৃহ	৫৸/১০
এককালীন ৮২।৶০		পাথেয়	১৮॥০
———		আসাম মিশন	৪৲
২৫৫।/০		সিটিকলেজ বৃত্তি	৮০॥০
বিবিধ	১২৵১০	সৌদামিনী বৃত্তি	২০৲
সুদ	৮৩৷০	ট্রাষ্টডিড	৭৭।৶০
পাথেয়	২৪৲	দুর্ভিক্ষ ফণ্ড	৮৸১০
স্থায়ী প্রচার ফণ্ড	৫০৫৲	তত্ত্বকৌমুদী	১৮০৸/১৫
বিল্ডিং ফণ্ড	৩৸০	মেসেঞ্জার	১২৬৵১৫
খাসিয়া মিশন	১১৲	গচ্ছিত বা হাওলাত	১৬০৫৸/০
বাগআঁচড়া মিশন	৭৮৲		———
সিটিকলেজ বৃত্তি	৮০॥০		২৯৪৮৶০
দুর্গাময়ী ফণ্ড	২০৲	হস্তেস্থিত	২২২৸৫
দুর্ভিক্ষ ফণ্ড	৫৭৭৶০		———
নানাবিধ স্থায়ী ফণ্ড	৪৪০৲		
শরৎকামিনী ১০০৲			
শ্যামাসুন্দরী ১৫৲			
রাণী অন্নপূর্ণা গুপ্তা ৫০৲			
পার্ব্বতী গুপ্তা ২৫৲			
হীরালাল গুপ্ত ২৫৲			
থ্যালা গুপ্তা ২৫৲			
দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত ২৫৲			
আশারাম গুপ্ত ২৫৲			
জানকী গুপ্তা ৫০৲			
জয়নারায়ণ রায় ১০০৲			
———			
৪৪০৲			
তত্ত্বকৌমুদী	১৫॥০		
ইঃ মেসেঞ্জার	১।/৫		
পুস্তক	১২৯।০		
গচ্ছিত বা হাওলাত	৪৯।০		
	———		
	২৭০৮॥৵১৫		
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	৪৬৩৷১০		
	———		
	৩১৭১৸৶৫		৩১৭১৸৶১৫

Audited
BANKUBEHARY BOSE
Auditory
8/1/94.

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

আয়		ব্যয়	
মূল্য আদায়	২৬৭/০	কর্ম্মচারীর বেতন	৪১॥০
বিজ্ঞাপন	১০।/১০	মুদ্রাঙ্কন	১৩০৲
নগদ বিক্রয়	৸৶০	কাগজ	৪০৲
কাগজ বিক্রয়	৭॥০	ডাকমাশুল	১৮৫৸৶০
বিবিধ	২৸১০	বিবিধ	১৬৻১০
	———		———
	২৮৮॥৵০		৪১৩।৶১০
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত		হস্তেস্থিত	১।/৫
	১২৬৵১৫		———
	———		৪১৪৸১৫
	৪১৪৸১৫		

তত্ত্বকৌমুদী।

আয়		ব্যয়	
মূল্য আদায়	১১৯।৵০	কর্ম্মচারীর বেতন	৮১॥০
নগদ বিক্রয়	২৲	মুদ্রাঙ্কন	৮১৲
	———	কাগজ	৩০৻১০
	১২১।৵০	ডাকমাশুল	৮৬৸৫
গত ত্রৈমাসিকের		বিবিধ	৭।৶০
স্থিত	১৮০৸/১৫		———
	———		২৮৬॥৶১৫
	৩০২৶১৫	হস্তেস্থিত	১৫॥০
			———
			৩০২৶১৫

পুস্তক।

আয়		ব্যয়	
নগদ বিক্রয়	১৫১॥৵০	অপরের পুস্তক বিক্রয়	
ঐ অপরের	৩৪৻১০	মূল্য শোধ	২।৵০
বাকী মূল্য আদায়	২৯॥১০	কর্ম্মচারীর বেতন	১০॥০
ডাকমাশুল (ফেরৎ)	৭।৶১০	কাগজ	২৮/১০
কমিশন	॥/১০	মুদ্রাঙ্কন	৭৪।০
মুদ্রাঙ্কন	৬৲	ডাকমাশুল	৯।৶০
বিবিধ	৩৸৵০	কমিশন	১২৸৵১০
গচ্ছিত বা হাওলাত	৫৫॥/০	বিবিধ	৮।৵০
	———	গচ্ছিত বা হাওলাত শোধ	১৩৷০
	২৮৮॥৶০		———
			১৫৯।৶০
		হস্তেস্থিত	১২৯।০
			———
			২৮৮॥৶০

ব্রাহ্মমিশন প্রেস।

আয়		ব্যয়	
আদায় (মুদ্রাঙ্কন, কাগজ, দপ্তরি প্রভৃতি বাবদে যাহা আদায় হইয়াছে)	১৬৪৩৶৫	মুদ্রাঙ্কন, কাগজ, দপ্তরি প্রভৃতি বাবদে যাহা অপরকে ধার দেওয়া হইয়াছে	১৫৬৬/১০
ছাপাই (যত টাকার কাজ হইয়াছে)	১১৮২৲	সরঞ্জামী	৯৪৸৶১০
কাগজ বিক্রয়	১০৪॥৵৫	বিবিধ	৪।৶১০
প্রেস প্রস্তুত হিঃ	১২৮৲	ডাকমাশুল	॥৵৫
গৃহ প্রস্তুত হিঃ	৩০৲	কাগজ খরিদ	১০৩৵১৫
প্যাকিং হিঃ	৶০	বেতন হিঃ	৬৩৫/০
হাওলাত	৭৫৬॥৵১০	প্রেস প্রস্তুত	৮৯।৶১০
দঃ কর্ম্মচারীর বেতন ৬১৭।০		সুদ হিঃ	৭৮৲
টাইপের মূল্য ৬৪।৵১০		বাটীভাড়া	৩০৲
দঃ সুদ ৭৫৲		ওয়ার এণ্ড টিয়ার	১১৭॥০
		ছাড়	৩৮৵১৫
ছাড় হিঃ	৭৩॥৫	হাওলাত	১০৮৫৸৶১০
		দঃ কর্ম্মচারী ১৫০৵১৫	
		দঃ সুদ ৭৫৲	
		দঃ টাইপ ২৬০৸১৫	
	৩৯১৮৶৫		
গত ত্রৈমাসিকে স্থিত	১৪৸/১০		
			৩৮৪৩॥৫
	৩৯৩৩৲১৫	স্থিত	৮৯॥১০
			৩৯৩৩৲১৫

ব্রাহ্মসমাজ।

প্রচার—সাধনাশ্রম হইতে শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব এবং শ্রীযুক্ত সুন্দর সিং গত নবেম্বর মাসে হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজের অনুরোধে তথায় গমন করেন। ইঁহারা সেখানে তিন্ বক্তৃতা, উপাসনা, আলোচনা এবং সংগীতাদির দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। পারিবারিক দুর্ঘটনা বশতঃ শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব ইতিমধ্যে জন্মস্থান পঞ্জাবে গমন করেন, সে সময় শ্রীযুক্ত সুন্দর সিং হাজারিবাগে উক্ত প্রকারে কার্য্য করেন। সম্প্রতি মাঘোৎসব উপলক্ষে তাঁহারা উভয়েই সাধনাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস এবং বাবু হরিমোহন ঘোষাল পূর্ব্ববঙ্গে প্রচারে বহির্গত হইয়া, কুষ্টিয়া, সিরাজগঞ্জ, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া উপাসনা, বক্তৃতা ও সংগীতাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। হরিমোহন বাবু ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা সাধনাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, নবদ্বীপ বাবু ঢাকাতে অবস্থিতি করিতেছেন। সম্ভবতঃ ঢাকার ব্রাহ্মবন্ধুদিগের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এবার মাঘোৎসবের সময়ে তিনি ঢাকাতেই অবস্থিতি করিবেন।

"চটকাবেড়ে হইতে কোনও ব্রাহ্মবন্ধু লিখিয়াছেন,

চটকাবেড়িয়া ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে অনেক ভদ্রলোকের (যথা ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও সদগোপ প্রভৃতি) এবং কৃষক শ্রেণীর অনেক হিন্দু মুসলমানের বসতি আছে। কিন্তু এত দিনেও এত লোকের মধ্যে একমাত্র বাবু চন্দ্রনাথ চৌধুরী ব্যতীত আর কেহ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম যে কি, তৎসম্বন্ধে এখানকার অধিকাংশ লোক একবারে অনভিজ্ঞ। চন্দ্রবাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চৌধুরি মধ্যে মধ্যে অবকাশ সময়ে এখানে আসিয়া কয়েক বৎসর যাবৎ এখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তারের প্রয়াস পাইয়া আসিয়াছেন। এ বৎসর খ্রীষ্টম্যাসডে উপলক্ষে তিনি কলিকাতা সাধনাশ্রমের শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া এখানে আগমন করতঃ বিশেষভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় সুবাতাস বহিয়াছে। হিন্দুপ্রধান গ্রামে যেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকের জ্ঞান একবারেই নাই, এবং যেখানে মাম্‌লা মোকদ্দমাতে ও প্রচলিত ধর্ম্মের উপর অবিশ্বাসের জন্য, সাধারণের নৈতিক অবস্থা অতি শোচনীয়, সেখানে লোকে আগ্রহ পূর্ব্বক কাশী বাবুর সঙ্গীত ও বক্তৃতাদি শ্রবণ করিয়াছে ও প্রীত হইয়াছে।

কাশী বাবুর আগমনে আমরা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। এ অঞ্চলে বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এখন হইতে আরম্ভ হইল। ভগবান তাঁহার ধর্ম্মকে সকল ধর্ম্মের উপরে জয়যুক্ত করুন।"

উৎসব—বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবের প্রারম্ভে সম্পাদক বাবু মথুরামোহন মৈত্র অকস্মাৎ মানবলীলা সংবরণ করেন। ইনি তথাকার ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশেষ উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে কখনও তাঁহার শিথিলতা ছিল না। হঠাৎ তাঁহার অভাবে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে, বোধ হয় এবার বোয়ালিয়া সমাজের উৎসব হইবে না; কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কার্য্যবিবরণ প্রাপ্ত হইলে পরে প্রকাশিত হইবে।

গত ১লা জানুয়ারী নিমতা ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব অতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছে। পূর্ব্ব দিন অপরাহ্নে কলিকাতা হইতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ কতিপয় ব্রাহ্ম তথায় গমন করেন। স্থানীয় এণ্ট্রান্স স্কুলগৃহে সভা হয়। সংগীতের পর শাস্ত্রী মহাশয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর দিন কলিকাতা হইতে অনেকে গমন করেন। অতি প্রত্যূষে বাড়ী বাড়ী গিয়া ভোর কীর্ত্তন করা হয়, তৎপর ৭॥ টার সময় বহুসংখ্যক লোক মিলিত হইয়া নগরকীর্ত্তন করেন। ৮॥ টার সময় উপাসনা হয়, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। এবং যোগ সম্বন্ধে অতি উপাদেয় উপদেশ প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে গরিব দুঃখিদিগকে চাউল বিতরণ করা হয়, তৎপর আদি ব্রাহ্মসমাজের

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করেন, তৎপর বাবু বিপিনচন্দ্র পাল নির্ভর সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। রাত্রিতে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন এবং বিশ্বাস সম্বন্ধে উপদেশ দেন। এই উৎসব উপলক্ষে বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাধনাশ্রমে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

মাণিকদহ ব্রাহ্মসমাজের দশম বার্ষিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে। ১৬ই পৌষ উদ্বোধন। বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য উপাসনা করেন। ১৭ই পৌষ পূর্ব্বাহ্নে ব্রহ্মোপাসনা; বাবু উমেশচন্দ্র নাগ উপাসনা করেন। অপরাহ্নে শাস্ত্র পাঠ এবং সন্ধ্যাকালে উপাসনা হয়, কালীপ্রসন্ন বাবু উপাসনা করেন।

বাগআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজের একত্রিংশৎ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু এবং শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন তথায় গমন করেন। গত ১২ই পৌষ হইতে ১৭ই পৌষ পর্য্যন্ত উৎসব হইয়াছে। উৎসবে উপাসনা আলোচনা, মহিলা সমাজের উৎসব, বালকবালিকা সম্মিলন, নগর সংকীর্ত্তন প্রভৃতি হইয়াছে। বক্তৃতা উপাসনাদি শশী বাবু করিয়াছেন, কৈলাস বাবু সংগীত সংকীর্ত্তন করিয়াছেন।

মৃত্যু সংবাদ—আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু বাবু গুরুচরণ সমাদ্দারের পত্নী রক্তামাশায় রোগে গত ৯ই জানুয়ারী কলিকাতা ১০।৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে চারিটি শিশুসন্তান রাখিয়া ২৩ বৎসর বয়সে অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। পরমেশ্বর মাতৃহীন শিশুদিগকে রক্ষা করুন এবং শোক-দগ্ধ স্বামীর প্রাণে শান্তিদান করুন।

শ্রাদ্ধ—শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন দাসের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সাধনাশ্রমে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন। ললিত বাবু এতদুপলক্ষে সাঃ ব্রাঃ সমাজের স্থায়ী প্রচার বিভাগে ২৲ টাকা এবং পতিতা রমণীদিগের আশ্রমের জন্য ২৲ টাকা ও দাতব্য বিভাগে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বাগআঁচড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মল্লিকের পিতার আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে বাবু শশিভূষণ বসু উপাসনা করেন। রাজেন্দ্র বাবু এই উপলক্ষে সাঃ ব্রাঃ সমাজে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১৯শে অগ্রহায়ণ মাণিকদহের বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের পিতার শ্রাদ্ধ তাঁহার জন্মভূমি কাউনীবেড়া গ্রামে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মাণিকদহ হইতে কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু তথায় গমন করেন। কালীপ্রসন্ন বাবু নিজেই আচার্য্যের কার্য্য করেন।

আমাদের ময়মনসিংহস্থ ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের পরলোকগত পুত্র সত্যানন্দের স্মরণার্থ অনুষ্ঠানের নিম্নলিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

১২ই পৌষ মঙ্গলবার প্রত্যুষে দ্বারে দ্বারে উষা কীর্ত্তন তৎপর সমাধি-স্থানে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা। পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকার সময় সমবেত উপাসনা। মধ্যাহ্নে সংগীত, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা এবং মৃত্যু ও পরলোক বিষয়ে আলোচনা। ৪টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমাধি স্থলে ধ্যান, প্রার্থনা ও সংকীর্ত্তন, রাত্রিতে সম্মিলিত উপাসনা। ১৩ই পৌষ প্রাতে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মবালকবালিকা সেবা। সত্যানন্দ যে সকল বস্তু ভাল বাসিত, তাহার পিতা মাতা সেই সকল বস্তু স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া অতি যত্নে বালকবালিকাদিগকে ভোজন করাইয়াছিলেন। অপরাহ্নে ১৪০ জন দীন দুঃখী বালকবালিকাদিগকে নূতন কাপড় ও কমলালেবু প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য বিতরণ করা হয়। অন্যান্য প্রকারের শতাধিক দরিদ্রকে চাউল ও পয়সা দেওয়া হয়। সন্ধ্যাকালে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা হইয়া কার্য্য শেষ হয়। স্থানীয় উভয় সমাজের ব্রাহ্মগণই আগ্রহের সহিত এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া ছিলেন। শিশু স্মৃতি স্থায়ী করিবার জন্য, তাহার সমাধি স্থান প্রস্তরনির্ম্মিত হইতেছে; তথায় একটী ইষ্টকময় সাধন কুটীরও নির্ম্মিত হইতেছে। সত্যানন্দের নামে একটী স্থায়ী তহবিল স্থাপন করিবার জন্য শীঘ্রই কিছু টাকা কোন ও হিতকর কার্য্যে অর্পিত হইবে।

জাতকর্ম্ম—গত ২৫শে অগ্রহায়ণ মাণিকদহ নিবাসী সতীশচন্দ্র ঘোষের ষষ্ঠ সন্তানের (চতুর্থ কন্যার) জাতকর্ম্ম উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কন্যার মাতা সাঃ ব্রাঃ সমাজের দাতব্য বিভাগে ॥০ আনা দান করিয়াছেন।

বিবাহ—বিলাতের ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত ভয়সী সাহেবের তৃতীয়া কন্যার সহিত হায়দরাবাদের শ্রীযুক্ত মতিরাম সখীরাম এডভানির শুভবিবাহ করাচি সহরে সম্পাদিত হইয়াছে, পাত্র বারিষ্টারের কাজ করেন। নববিধান-প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। ইংলণ্ডীয় মহিলার সহিত ভারতবাসীর বিবাহ ব্রাহ্মসমাজে এই প্রথম।

দানপ্রাপ্তি—ডুমরাওণের বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার বসুর চতুর্থ পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে সাঃ ব্রাঃ সমাজে ৩৲ টাকা এবং সাধনাশ্রমে ১৲ টাকা এবং সিরাজগঞ্জের বাবু ভগবানচন্দ্র গুহের প্রথম পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে সাঃ ব্রাঃ সমাজে ১৲ টাকা ও সাধনাশ্রমে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ব্রাহ্মবালক ছাত্রাবাসে ময়ূরভঞ্জের মহারাজা এক-

কালীন ১০০৲ এক শত টাকা দান করিয়াছেন। আমরা এই দানের জন্ত মহারাজাকে বিশেষ ধন্তবাদ প্রদান করিতেছি।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন, কিম্বা কাহারও পত্র ফেরত দিতে বাধ্য নহেন)

মান্তবর

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

আপনার ১৬ই অগ্রহায়ণ ও ১৬ই পৌষের তত্ত্বকৌমুদীতে বাবু মনোরঞ্জন গুহ মহাশয়ের দুই খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। অভ্রান্ত গুরুবাদ যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বিরুদ্ধ নহে, উভয় পত্রেই তিনি ইহা প্রতিপন্ন করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম পত্রের সূচনাতেই তিনি বলিয়াছেন "অবিচারিত ভাবে অনেকগুলি মত ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ের উপরে বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। ব্রাহ্মেরা অবিচারিত ভাবে কোন মত গ্রহণ করিয়াছেন কি না তাহার বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়াও একথা অনায়াসে স্বীকার করা যাইতে পারে যে, তাঁহারা গুহ মহাশয়ের বিচার প্রণালী কখনও অবলম্বন করেন নাই, এবং সেইরূপ বিচার করিয়া কোন মত গ্রহণ বা পরিত্যাগও করেন নাই। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ যে অবিচারিত ভাবে কতকগুলি মত গ্রহণ করিয়াছেন একথা বলিবার গুহ মহাশয়ের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। গুহ মহাশয়ের বিচার প্রণালী কেবল অভিনব নহে, অদ্ভুতও বটে। কিন্তু গুহ মহাশয় বলিবেন, তোমরা যাহাই মনে কর না কেন, তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না, আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মূলমন্ত্র অভ্রান্ত গুরুবাদ তোমাদিগকে বুঝাইতে প্রয়াস নাই, "চিন্তাশীল ও সাধনশীল ব্রাহ্ম অভিভাবকগণকে আমি ইহা বুঝাইতে অভিলাষী। তাঁহারাও পূর্ব্বেই ব্রাহ্মধর্ম্মের আর এক মূলমন্ত্র পুনর্জ্জন্মবাদের অভ্রান্ততা স্বীকার করিয়াছেন। যদি তাঁহাদিগের নিকট জয়ী হইতে পারি, তোমরা মেষপালের ন্যায় রাখালের অনুসরণ করিবে। গুহ মহাশয় স্পষ্ট ভাবে এতগুলি কথা বলেন নাই, কিন্তু প্রকারান্তরে বলিয়াছেন। গুহ মহাশয় যে মতের পোষক তাহাতে অনুযাত্রীদিগকে উপেক্ষা করিয়া কেবল নেতৃবর্গের প্রতি লক্ষ্য রাখা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা অনুযাত্রী দল নিজেদের স্বার্থ লইয়াই অধিক ব্যস্ত। আমাদিগের কিসে কল্যাণ বা অকল্যাণ হইবে অগ্রে তাহাই দেখিতে চাই। গুহ মহাশয় কিম্বা অপর চিন্তাশীল ও সাধনশীল ব্রাহ্ম অভিভাবকদিগের বিবেচনার জন্ত আমি কোন কথা বলিতেছি না। আমাদিগের নিজের—অনুযাত্রী দলের বিবেচনার জন্ত আমি দুই চারিটী কথা বলিতে সাহসী হইয়াছি। গুহ মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ঈশ্বরের বাণী অভ্রান্ত, সেই বাণী যিনি শুনিয়া অভ্রান্ত উপদেশ প্রদান করেন তিনিই ত অভ্রান্ত গুরু। গুহ মহাশয়ের এই অভ্রান্ত যুক্তি প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমিও আর একটী অভ্রান্ত সত্য ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের নিকট উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি, যথা :—

(১) জল তরল পদার্থ।

(২) জল ঘটে অবস্থিতি করে।

(৩) ঘট জলের আধার,

সুতরাং ঘটও তরল পদার্থ। গুহ মহাশয়ের যুক্তি তত্ত্বের সহিত আমার যুক্তি তত্ত্বের সম ধর্ম্মত্ব কোথায়? যাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন তাহাদিগের অবগতির জন্ত কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। ঈশ্বরের বাণী অভ্রান্ত, সেই অভ্রান্ত বাণীর কোনও একটী কোন ব্যক্তি বিশেষের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইলে সেই ব্যক্তি সেই অভ্রান্ত বাণীর আধার মাত্র হইল। কোনও অভ্রান্ত বাণীর আধার যদি অভ্রান্ত হয়, তবে জলের আধার যে ঘট সেও তরল পদার্থ বলিয়া গণ্য হইবে না কেন? এই যুক্তি প্রণালী আর একটু প্রসারণ করিলে ইহাও প্রতিপন্ন হইবে যে আমার তিন বৎসর বয়সের বালকও অভ্রান্ত। সে বলে মানুষের দুই পা, দুই হাত, দুই কাণ, দুই চোখ, এক নাক। ইহা যে অভ্রান্ত। সত্য তাহার সন্দেহ নাই। এই অভ্রান্ত সত্য যে বলে সেই ত অভ্রান্ত পুরুষ। গুহ মহাশয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে মনুষ্য, মাত্রেই অভ্রান্ত। কেন না জগতে এমন মানুষ বোধ হয় নাই, যে কোন না কোনও অভ্রান্ত সত্য জ্ঞাত নহে।

এস্থলে গুহ মহাশয় অবশ্যই বলিতে পারেন, একটী কি দুইটী অভ্রান্ত সত্য জ্ঞাত থাকিলে বা কাহারও মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইলেই কেহ অভ্রান্ত গুরু হয় না। কিন্তু ঈশ্বরের কয়টী অভ্রান্ত বাণী শুনিয়া কয়টী অভ্রান্ত উপদেশ দিলে, মানুষ অভ্রান্ত গুরু হইতে পারেন, গুহ মহাশয় তাহা উল্লেখ করেন নাই। এইরূপ কোন নির্দ্দেশ না থাকায় লোকের মনে দুইটী সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইতে পারে। প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বরের কোন অভ্রান্ত বাণী শুনিয়া যিনি তাহা প্রকাশ করেন, তিনিই অভ্রান্ত গুরু। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে অভ্রান্ত গুরু অসংখ্য হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বরের একটী কিম্বা দশটী অভ্রান্ত বাণী শুনিলেই কেহ অভ্রান্ত গুরু হইতে পারেন না, ঈশ্বরের সমস্ত বাণী যিনি শুনিতে পান এবং তাহা শুনিয়া অভ্রান্ত উপদেশ দেন, তিনিই অভ্রান্ত গুরু। শেষোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলেও ইহা স্বীকার করা আবশ্যক যে, হয় ঈশ্বরের বাণীর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা আছে, নতুবা অসংখ্য ঈশ্বর বাণী শুনিবার পক্ষে শ্রোতার অসীম শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঈশ্বর যখন যাহা বলিবেন অভ্রান্ত গুরু তখনই তাহা শুনিতে পাইবেন। একদিকে ঈশ্বরের শক্তি সীমা বিশিষ্ট করা, কিম্বা অপরদিকে কোন মনুষ্যের শক্তি অসীম করা ব্যতীত শেষোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। গুহ

মহাশয় ইহার কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিয়া চলিতে চাহেন, জানিতে পারিলে উপকৃত হইব। আর যদি আমাদিগের ক্ষুদ্র চিন্তাশক্তির অতিরিক্ত মহাজনদিগের গন্তব্য অন্য কোনও প্রশস্ত পথ থাকে অনুযাত্রীবর্গ তাহাও জানিবার অনভিলাষী নহেন।

গুহ মহাশয় বলিয়াছেন, ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা একার্থ বোধক নহে, আমিও তাহা বলিতেছি না। কিন্তু ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা অনেক স্থলে পরস্পরের সহচর। অজ্ঞতা স্থলেও যেখানে জ্ঞানের অভিমান করা যায়, সেখানেই ভ্রান্তি বিদ্যমান। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে কিরূপ উত্তাপ তাহা আমি জানি না, ইহা আমার অজ্ঞতা বটে কিন্তু ভ্রান্তি নহে। এই অজ্ঞতা তখনই ভ্রান্তিতে পরিবর্ত্তিত হইবে, যদি আমি বলি যে, "কেন্দ্রস্থলে কিরূপ উত্তাপ আছে, তাহা ঠিক না জানিয়াও একথা অনায়াসে বলিতে পারা যায় যে, তথাকার উত্তাপ মানুষের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব।" তথাকার উত্তাপ কিরূপ না জানিয়া উহা মানুষের সহন শক্তির সীমাধীন কিনা তাহা কিরূপে নির্দ্দেশ করিব? ঈশ্বরবাণী বলিয়া জগতে যে সকল কথা প্রচারিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত ঈশ্বরবাণী কিনা এবং এপর্য্যন্ত কেহ ঈশ্বরবাণী শুনিতে পাইয়াছেন কি না তাহা অগ্রে বিবেচনা না করিয়া অভ্রান্ত গুরু কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। গুহ মহাশয় বলেন "ঈশ্বরবাণী কখনই ভ্রান্ত হইতে পারে না," একথায় কাহারও কোন সংশয় নাই। কিন্তু ইহার দ্বারা অভ্রান্ত গুরুবাদ প্রতিপাদিত হইল কিরূপে? মেঘ হইতে নির্ম্মল জলধারা নির্গত হয়, ইহা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু সেই জলধারা পুষ্করিণীতে পতিত হইলে তাহার বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হইল একথা যদি কেহ বলেন, তাহা হইলে তিনি মেঘের জলের বিশুদ্ধতা অস্বীকার করিলেন, ইহাই কি প্রতিপন্ন হইল। বিশুদ্ধ জল অবিশুদ্ধ পুষ্করিণীতে পতিত হইলে তাহার বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হইতে পারে গুহ মহাশয় নিজেও বোধ হয় তাহা অস্বীকার করিবেন না। পুষ্করিণীতে পতিত জল বিশুদ্ধ কিনা তাহা বিচার করিতে হইলে পুষ্করিণীর বিশুদ্ধ বা অবিশুদ্ধ অবস্থার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। মেঘের জল বিশুদ্ধ কিনা এস্থলে সে বিচার নিষ্প্রয়োজন। মেঘের জল বিশুদ্ধ হইলে পুষ্করিণীর জলও যে বিশুদ্ধ হইবে তাহা অনুমান করা সুসঙ্গত নহে। ঈশ্বর অভ্রান্ত, ঈশ্বরের বাণীও অভ্রান্ত ইহা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু মানুষ অভ্রান্ত নহে, মানুষের যেমন অজ্ঞানতা ও অপূর্ণতা আছে, তেমন ভ্রান্তি প্রমাদও আছে। নির্ম্মলতা যদি পুষ্করিণীর স্বভাবিক ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে পুষ্করিণীতে পতিত মেঘের জল বিশুদ্ধ কি না, এ প্রশ্ন উপস্থিত হইত না। কেন না তাহা হইলে উভয় জলই বিশুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত। মানুষও যদি অভ্রান্ত হইতেন তবে তিনি ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাণী অভ্রান্ত ভাবেই যে শুনিয়াছেন একথায় কাহারও সংশয় হইত না। কিন্তু মানুষের যখন ভ্রান্তি প্রমাদ আছে, তখন তিনি ঈশ্বরেরবাণী অভ্রান্ত ভাবে শুনিতে পাইয়াছেন কিনা, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই উপস্থিত হইবে। কিন্তু এ প্রশ্ন কাহারও মনে উপস্থিত হইলে গুহ মহাশয় বলেন, "সমগ্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে অস্বীকার করা হয়।" অভ্রান্ত গুরু স্বীকার না করিলে সমগ্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে অস্বীকার করা হয়, ইহা বিশেষ সাহসিকতার কথা বটে। অভ্রান্ত ঈশ্বর স্বীকার করিতে হইলে অভ্রান্ত গুরুও স্বীকার করিতে হইবে, না করিলে অজ্ঞেয়তা বাদী বলিয়া গণ্য হইতে হইবে, ইহা গুহ মহাশয়ের "অধিকতর উদারতার" লক্ষণ, গোঁড়ামীর চিহ্ন নহে। এস্থলে গুহ মহাশয়কে বলা উচিত, চিকিৎসক অগ্রে আত্ম রোগের প্রতিবিধান করুন। গুহ মহাশয় কি ইহাই বলিতে চাহেন, ঈশ্বরকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা যেরূপ সহজ, গুরুকে অভ্রান্ত স্বীকার করাও সেইরূপ সহজ? কিন্তু আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। কেন না আমরা জানি ঈশ্বর পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বদর্শী; যিনি পূর্ণ ও সর্ব্বদর্শী তাহার পক্ষে ভ্রান্তি অসম্ভব। সুতরাং ঈশ্বরকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা যেমন সহজ, কোন মানুষকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা তেমনই কঠিন। কেননা গুরুই হউন, আর অন্য মানুষই হউন, তিনি অপূর্ণ ও অদূরদর্শী, সুতরাং প্রতিপদে তাঁহার ভ্রান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। ভ্রান্তির এমন সম্ভাবনা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তিকে অভ্রান্ত গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে কোন্ কোন্ লক্ষণ দ্বারা তাঁহাকে চিনিয়া লইতে হইবে। গুহ মহাশয়ের তাহা উল্লেখ করা উচিত ছিল; কিন্তু তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই। অথচ যাঁহারা তাঁহার স্বীকার্য্য পথ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন নাই, তিনি তাঁহাদিগকে অসঙ্কুচিত চিত্তে অজ্ঞেয়বাদী ও অব্রাহ্ম বলিতেছেন। ইহাই কি উচ্চ সাধনার ও চিন্তাশীলতার লক্ষণ? তিনি তিনটী স্বীকার্য্যের উপর আর যে তিনটী সম্ভাবিত স্বীকার্য্য যোজনা করিয়াছেন, তাহা স্বীকার্য্য বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না। জগতে অনেক বস্তু অসম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু অসম্ভব না হইলেই যে উহা সম্ভব হইল ইহা স্বীকার্য্য বা স্বতঃসিদ্ধ নহে। সকলেই জানেন, "যে যে বস্তু কোন এক বস্তুর সমান তাহারা পরস্পর সমান," ইহা জ্যামিতি শাস্ত্রের একটী স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু এই স্বতঃসিদ্ধের উপর নির্ভর করিয়া যদি কেহ আমাকে বলে যে, রাম যখন আমার বন্ধু এবং সে যদুরও বন্ধু তখন যদু ও আমি পরস্পর বন্ধু, তাহা হইলে কি আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, যদু প্রকৃতই আমার বন্ধু। যদুর সঙ্গে আমার পরিচয় না থাকিতে পারে, যদুর যে গুণ কিম্বা দোষে রাম তাহার বন্ধু হইয়াছে, আমি তাহার পক্ষপাতী না হইতে পারি; রামের অপর গুণ বা দোষ আমার হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে, যদুর পক্ষে আমার বন্ধু হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু তাহা বলিয়াই উহা ধ্রুব নিশ্চিত সত্য নহে। আকৃতি সম্বন্ধে যাহা স্বতঃসিদ্ধ, প্রকৃতি সম্বন্ধেও তাহাই স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে তাহা বলা যায় না। ঈশ্বরের বাণী মানবাত্মায় প্রকাশ পায়, একথা বলিলেই কোন মানুষ অভ্রান্ত গুরু হইল না। ঈশ্বর পূর্ণ অভ্রান্ত, অপূর্ণ মানুষের পক্ষে পূর্ণ অভ্রান্ত হওয়া অসম্ভব। কোন মানুষ এক বিষয়ে অভ্রান্ত হইলেই তিনি অভ্রান্ত গুরু হইলেন না, কেন না তাহা হইলে প্রত্যেক মানুষই অভ্রান্ত গুরু একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। গুহ মহাশয়ের অভ্রান্ত গুরু সেরূপ কখনই নহে। পূর্ণ অভ্রান্ত গুরু না হইলে তাঁহার

কথার প্রকৃত সিদ্ধান্ত হয় না। কিন্তু পূর্ণ অভ্রান্ত গুরু অসম্ভব। অপূর্ণ অভ্রান্ত গুরু পদার্থটা কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। গুরুর ভ্রান্তি সম্ভাবনা মনে করিলেই তাঁহার কথা অবিচারিত ভাবে গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। জগতে শারীরিক দাসত্বের যে ভাবে সৃষ্টি হইয়াছিল, অভ্রান্ত গুরুবাদে ব্রাহ্মসমাজে আধ্যাত্মিক, মানসিক ও নৈতিক দাসত্ব সেই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। গুরুপদাকাঙ্ক্ষীদিগের ইহাতে লাভ থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদিগের ন্যায় অনুযাত্রীবর্গের ইহাতে ঘোরতর সর্ব্বনাশ হইবে।

নিবেদক
শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
৩রা জানুয়ারি ১৮৯৪।

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
শ্রদ্ধাস্পদেষু।

সকলের নিকট হইতেই উপদেশ গ্রহণ করিতে ব্রাহ্ম যেমন বিনীতভাবে প্রস্তুত, অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীই তেমন নহেন। সুতরাং মনে যেন থাকে যে উপদেষ্টা লইয়া কোন তর্ক হইতেছে না, সেই উপদেষ্টা "অভ্রান্ত" হইতে পারেন কি না সেই বিষয়েই সন্দেহ। যাঁহার কদাচ ভ্রম হইতে পারে না—যাঁহার কথার উপর বিবেকের বিচার চলিবে না—"অভ্রান্ত গুরু" ইত্যাকার। ভিতরে সত্য থাকিলেই যদি অভ্রান্ত হয়, তবে তসকলেই অভ্রান্ত গুরু; কারণ এমন লোক নাই যাহার ভিতরে কিছুমাত্র সত্য নাই—আগাগোড়াই ভ্রান্তি।

১। মনোরঞ্জন বাবুর দ্বিতীয় পত্রে সাতটী ধারা। প্রথম ধারায় তাঁহার সেই পুরাতন কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন। তাহা যে ভ্রান্তিমূলক, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

২। দ্বিতীয় ধারায় ভল্লুক-পালিত কন্যার দৃষ্টান্ত। মানুষকে ছাড়িয়া ভল্লুকের অনুসরণ করাতে তাহার ঐ দশা হইয়াছিল। সেই জগৎ-গুরুর উপদেশ উপেক্ষা করিয়া মানুষের উপদেশ অভ্রান্ত মনে করিয়া চলিলে না জানি কি দশা হয়! কারণ তাঁহার তুলনায় মানুষ ভল্লুক হইতে ও অধম।

৩। তৃতীয় ধারায় "অজ্ঞ ভ্রান্ত ও অপূর্ণ" কথাগুলি লইয়া বিরাট বিচার। কেহ কেহ নাকি 'অজ্ঞ' ও 'ভ্রান্ত' এবং 'ভ্রান্ত' ও 'অপূর্ণ' একই কথা মনে করেন! এই অজ্ঞাত অভিযুক্তকে ধরাশায়ী করিয়া তৎপর ব্যাখ্যা—"যে অবগত নহে তাহাকে অজ্ঞ ও অপূর্ণ (!) বলে। আর যে ভুল করিয়াছে তাহাকেই ভ্রান্ত বলে।" সাক্ষী চুইজন গ্রন্থ! বাস্তবিক দেখিলাম তাহারা কিছুই অবগত নহে আর কোন ভুলও করে নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অচেতন পদার্থ মাত্রেরই এই গুণ দেখিলাম—কিছুই অবগত নহে। আর কোন ভুলও করে নাই। তখন বুঝিলাম যে, কাষ্ঠ লোষ্ট্রের যে "অভ্রান্তি" প্রস্তাবিত "অভ্রান্ত গুরুর" ও সেইরূপ অসম্ভব অভ্রান্তি। বাস্তবিক বিচার শক্তি যাহার আছে, ভ্রমাভ্রম তাহারই সম্ভবে। গ্রন্থের পক্ষে কিছু অবগত হওয়া অথবা ভুল করা সম্ভবে না। "অভ্রান্ত গুরুদের কি মনুষ্যত্ব লোপ পায়?" এই কথার উত্তরে আমাদিগের, নরত্ব ও গুরুত্ব বিবেক সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন হইয়াছে—"জগদীশ পণ্ডিত অভ্রান্ত দার্শনিক এবং জগদীশ পণ্ডিত অভ্রান্ত মানুষ এই উভয় বাক্যে কি কিছু পার্থক্য নাই?" দুঃখের বিষয়, এহেন প্রশ্নের পরও আমাদের সন্দেহ যাইতেছে না। কারণ, আমাদের বোধ হয় যে অভ্রান্ত দার্শনিক জগদীশ পণ্ডিতের শ্রোত্রাকর্ষণ করিলে মানুষ জগদীশবাবু কোন কালেই আপত্তি করিতে ছাড়িবে না। সুতরাং তখন তাহার মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়াছে, কি করিয়া মনে করি।

৪। কোন্ ব্যক্তিতে কতখানি ভ্রান্তি আছে, জানিতে হইলে তাহার জ্ঞানের পরিমাণটা আমার আগাগোড়া জানা চাহি, আর সেই জ্ঞানের বিষয়গুলির সম্বন্ধেও সম্যক জ্ঞান চাহি। যতটুকু না জানি, তাহাতে ভ্রান্তি আছে কি না, জানিতে পারি না। ভগবানের কথা দূরে থাকুক, কোন মানুষের জ্ঞানের পরিমাণও যাথার্থ্য সম্যক্ নিরূপণ করিবার শক্তিই মানুষের নাই। যদি থাকিত, তবে সে নিজেই অভ্রান্ত হইত।

৫। ঈশ্বরের বাণী মানুষের ভিতর দিয়া খাঁটিরূপে আসিতে পারেই না, আমি এরূপ কথা বলি নাই। আমি বলিয়াছি যে, এমন কোন মানুষ থাকা অসম্ভব এবং অযৌক্তিক যে, সেই বাণী শুনিতে এবং তদ্বিষয়ক উপদেশ দিতে তাহার "কদাচ ভুল হইতে পারে না।" বাস্তবিক আমাদের যে ভুল হইবার উপযুক্ত অপূর্ণতা রহিয়াছে, এ অতি সত্য কথা। এখন যাহাকে সত্য বলিয়া মনে করি, জ্ঞানোন্নতি সহকারে তাহাতে ভ্রম লক্ষিত হইতে পারে। এই সহজ কথাটায় ওরূপ ত্রাহি ডাক ডাকিবার কোন কারণ দেখি না। "সত্যই যখন আমাদিগের শাস্ত্র, তখন এতকাল যাহা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছ, সত্যটা পাছে বা তাহার বিরুদ্ধ হয়, এরূপ ত্রাস ব্রাহ্মের মনে উপস্থিত হওয়া কদাচ সঙ্গত নহে।" (মনোরঞ্জন বাবুর প্রথম পত্রের ভূমিকায় দেখুন)। জড়শক্তি কিম্বা আমার অপূর্ণতা ঈশ্বরের আদেশকে খাঁটিরূপে আমার নিকট উপস্থিত হইতে বাধা দিতে সক্ষম হইলে, অবশ্য ঈশ্বরকে শক্তিহীন মানিতে হয়। সুতরাং আমার জন্য যদি কোন আদেশ থাকে তবে নিশ্চয়ই তাহা আমার নিকট পৌঁছিবে, তখন তদনুসারে কার্য্য করিব। যতক্ষণ না পৌঁছাইতেছে ততক্ষণ নিশ্চয় বুঝিব যে, আমার জন্য কোন আদেশ নাই। সে অবস্থায় যদি বিবেক-প্রণোদিত হইয়া কাহারও উপদেশ গ্রহণ করি তবে পাপ হইবে, কারণ তাহা ঈশ্বরের আদেশ নহে। সুতরাং গুরু গ্রহণ করা অধর্ম্ম। বিবেকবাণীকে আদেশ না ভাবিলে এইরূপ সব সন্দেহ উপস্থিত হয়।

৬। "ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগের বাসনায়ই মানুষ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে, সুতরাং গুরু ব্রহ্ম আবরক নহেন।" এরূপ যুক্তি গ্রাহ্য হইলে অতি সহজেই অভ্রান্ত গুরুর সদ্গতি হয়। ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগের অন্তরায় মনে করিয়াই আমরা অভ্রান্ত গুরুকে বর্জ্জন করি। সুতরাং তিনি বর্জ্জনীয়।

৭। "সাধন পন্থাকে অভ্রান্ত না মানিলে কখনই সাধন নিষ্ঠা দাঁড়ায় না।" একটা অভ্রান্ত সাধন প্রণালী যদি পাই, তবে ত বাঁচিয়া যাই। অবলম্বিত সাধন প্রণালীতে যদি ভ্রম থাকে, তবে তাহাকে অভ্রান্ত ভাবিয়া লইয়া সাধকের প্রভূত অকল্যাণ বই আর কোন ফল হইবে না। বাস্তবিক "এইরূপ বিচার বিহীন সিদ্ধান্ত যে সমাজে যে পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সমাজ সেই পরিমাণে অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়ে, গোঁড়ামিই কেবল সেখানে সমাজস্থিতির কর্ত্তা হইয়া দাঁড়ায়।" (মনোরঞ্জন বাবুর প্রথম পত্রের ভূমিকায় দেখুন)

উপসংহারে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, অভ্রান্ত গুরুবিরোধীদিগের উপর "অভ্রান্ত অহং" বাদ আরোপ করাতে সত্যের অপলাপ হইয়াছে। ইতি।

বিনয়াবনত
শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ৫ই মাঘ প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

২০শ সংখ্যা। ১৮শ ভাগ।

১৬ই মাঘ, রবিবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য

প্রার্থনা।

হে করুণাসিন্ধু! নববর্ষের কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবার সময়ে আমরা তোমার চরণে পতিত হইতেছি। আমাদের দুর্ব্বলতা তোমার অবিদিত নাই। আপনাদের মলিন জীবন দ্বারা তোমার সত্যধর্ম্মকে কিরূপ মলিন করিয়া ফেলিতেছি, তাহা স্মরণ করিয়া লজ্জাভারে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু প্রভো সরল ভাবে যে প্রার্থনা করে, অকপটে যে সংগ্রাম করে, তোমার কৃপা চিরদিনই তাহার সহায়। সেই কৃপা দ্বারা আমাদের সহায় হও, আমাদের দুর্ব্বলতাকে সবলতাতে পরিণত কর। তোমার সত্যধর্ম্ম সর্ব্বত্র বিস্তৃত হউক, তোমার সত্যরাজ্য সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হউক। তোমার চরণে এই প্রার্থনা!

পাঠকগণের প্রতি নিবেদন—কয়েক বারের তত্ত্ব কৌমুদী প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইল। পাঠকগণ এই ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। মাঘোৎসবের কার্য্যে ইহার পরিচায়কগণ ব্যস্ত থাকিতে হয়। এই নিমিত্ত প্রতি বৎসরই উৎসবের পরের কয়েক সংখ্যা বিলম্বে প্রকাশিত হইয়া থাকে। আশা করি এই বিলম্ব ত্বরায় শুধরাইয়া লওয়া যাইবে।

চতুঃষষ্টিতম মাঘোৎসব।

যৎকালে ভারতাকাশ অজ্ঞানের অমানিশায় এবং কুসংস্কার ও পাপের ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, যখন ইহার চতুর্দ্দিকেই অন্ধকার, যখন কেহই এরূপ আশা করেন নাই যে, অচিরাৎ সেই বিষম অন্ধকার ভেদ করিয়া সত্যধর্ম্মের উজ্জ্বল তপন নভোমণ্ডলে উদিত হইবে। তখন যে জাগ্রত পুরুষ আমাদের কল্যাণের জন্য মুক্তিপ্রদ ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় করিলেন, সেই সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের প্রসাদেই ব্রাহ্মসমাজ জীবন-পথে আর এক বৎসর অগ্রসর হইল। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত চতুষষ্টিতম মাঘোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ সমস্ত বৎসর শোক, দুঃখ, নীরসতা, বিশৃঙ্খলতা প্রভৃতির সহিত সংগ্রাম করতঃ অবসন্নপ্রায় হইয়া সতৃষ্ণ নেত্রে মাঘোৎসবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সকলেই আশা করিতেছিলেন, যখন মাঘোৎসব আসিবে এবং সাধু ভক্তগণের একত্র সমাবেশে ও ব্যাকুল প্রার্থনায় ভগবানের কৃপা-স্রোত অবতীর্ণ হইবে, তখন সেই স্রোতে আমরা সকলেই ভাসিয়া যাইব, আমাদের অবসন্ন দেহে উৎসাহের উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হইবে, আবার আমরা নবীন উৎসাহে নববর্ষের কার্য্যপ্রণালী আরম্ভ করিব। এইরূপে সকলেই উৎসুক হৃদয়ে দিন যাপন করিতেছেন; উৎসব-কমিটী উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত আছেন; প্রত্যেক ব্রাহ্ম গৃহসজ্জা, উপহার প্রভৃতির যথাসাধ্য আয়োজন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে দেখিতে পৌষ মাস চলিয়া গেল।

মাঘমাসের প্রথম দিন আসিল। ঐ দিনের নবসূর্য্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মগণ নূতন উৎসাহ লইয়া জাগ্রত হইলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারেও প্রত্যেক ব্রাহ্ম-গৃহস্থ নিজগৃহে উপাসনার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম-ছাত্রগণ তরুণ বয়সের তরুণ উদ্যমের সহিত ছাত্রাবাস সকল সুসজ্জিত করিলেন। অনেক পরিবারও ঐ দিন স্ব স্ব গৃহ পুষ্প পত্রাদিতে বিভূষিত করিলেন। অনেক স্থলে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয় নিশান উড্ডীন হইল। অতি প্রত্যূষ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দিন নানাস্থানে উপাসনা চলিতে লাগিল। সমস্ত দিন ব্যাপিয়া এবং কতক রাত্রি পর্য্যন্ত ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য স্ব স্ব গৃহে প্রার্থনা করিলেন।

২রা মাঘ, ১৪ই জানুয়ারী, রবিবার—প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমাজমন্দিরে উপাসনা করেন। অপরাহ্ণ ৩টার সময় বীডন উদ্যানে প্রচারার্থ গমন করা হয়। পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাপন করা হইয়াছিল যে, অপরাহ্ণে বীডন উদ্যানে বক্তৃতার পর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দিরে আগমন করা হইবে। সুতরাং সেই সময় মন্দিরে মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনি উঠিবামাত্র ব্রাহ্মগণ এবং অন্যান্য অনেক লোক চতুর্দ্দিক হইতে মন্দিরাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। পরে সেখান হইতে সকলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। সকলে ক্রমে বীডন উদ্যানে আসিয়া মিলিত হইলে প্রার্থনানন্তর বাবু মথুরামোহন গাঙ্গুলি, ভাই প্রকাশ দেব, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি মহাশয়গণ সময়োচিত ভাষায় এবং ভাবে বক্তৃতা করিলেন। এতদুপলক্ষে খাসিয়া পর্ব্বত হইতে সমাগত একজন খাসিয়া বন্ধু কিছু বলিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী তাঁহার ভাব ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন।

বক্তৃতাদির পর গায়কগণ উৎসাহের সহিত নিম্নলিখিত কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

নগরসংকীর্ত্তন।

তাল রূপক।

ব্যাকুল অন্তরে, ব্রহ্মনাম গাও প্রাণ-ভরে।
ব্রহ্মনাম গানে মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চারে।
এ নাম সাধুর হৃদয়ের ধন,
পাপীর অবলম্বন,
এ নাম শ্রবণে মহাপাতকী তরে।

তাল লোফা।

কাহার মধুর রব উঠেছে গগনে?
(কিবা মধুর মধুর রে!)
কাহার মধুর বাণী শুনিরে পরাণে?
তোরা বল বল রে!—হৃদয়-বীণা কে রে বাজায়—)
ভাই রে!
কে—রে এমন করি ভাঙ্গি ঘুমের ঘোর,
(তোরা জানিস কিরে ভাই!—এমন করে কে রে মাতায়—)
মৃদুল মোহন তানে হৃদয় করে ভোর?
(প্রাণ আকুল করে)
ভাই রে!
কোমল পরশে কার শিহরিছে প্রাণ?
(তোরা জানিস কি রে ভাই!—
মরা মানুষ কে—রে বাঁচায়, এমন করে কে—রে নাচায়—)
নীরস মলিন কণ্ঠে (আজ) উঠে কার নাম।

তাল খয়রা।

এস, পশিয়ে পরাণে, মরমের কাণে,
শুনি সে মধুর নাম,
(কিবা মধুর মধুর রে! পরাণ আকুল করে)
ঘুচিবে যাতনা, ভয় ভাবনা,
ঘুচবে সকল কাম।
(ব্রহ্ম নামের গুণে)
কাম ক্রোধ আদি, যত রিপুগণ,
নাম-গন্ধ যদি পায়;
কাঁপি থর থর, ভয়ে জড় জড়
আপনি দূরে পালায়।
(ব্রহ্ম নামের তেজে—)
মায়া-মোহ জাল, ভবের জঞ্জাল,
ছুঁইলে নামের আগুন,
আঁখির পলকে, হয় ভস্মময়,
এমনি নামের গুণ।
জ্ঞানের গরবে, স্ফীত যার প্রাণ,
সেও যদি নাম পায়;
ত্যজি অভিমান, তৃণের সমান,
(মান আর থাকে না থাকেনা—)
সকলের পায়ে লুটায়।
আপনার প্রেমে, আপনার নামে,
বাঁধা পড়ে দয়াময়।
নরাধম জন, লইলে শরণ
আপনি এসে কোলে লয়।

তাল—খেমটা।

আমরা ব্রহ্মনামে তরে যাব,—
আজ আমরা বেঁচে যাব।
ব্রহ্মনামের বলে সবে নবজীবন পাব,
সে চরণে হৃদয় মন সবাই ঢেলে দিব।
নামামৃত পানে বিষয়-তৃষ্ণা নিবারিব,
তাঁরই কৃপায়, তাঁরই সেবায় জীবন কাটাইব।
আনন্দরূপ দেখে ভয়-ভাবনা ঘুচাব,
"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক"—সুখে দুখে গাব।
ব্রহ্ম-প্রেমে বিভোর হয়ে আপনা ভুলিব,
যারে পাব তারেই প্রেম আলিঙ্গন দিব।
বিশ্বরূপ মাঝে ব্রহ্ম-রূপ নেহারিব,
ব্রহ্ম-শক্তির জয় গাইয়ে ব্রহ্মধামে যাব।

কীর্ত্তনের দল উৎসাহে গান করিতে করিতে ভক্তি-ভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে সমাগত হইলেন। এবং তথায় কিয়ৎক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া আদি ব্রাহ্ম-সমাজমন্দিরের নিকট আসিলেন। তথায় মন্দিরের সম্মুখে কতক্ষণ গান করতঃ পুনরায় তথা হইতে সকলে সাধারণ সমাজমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ কীর্ত্তনের পর উপাসক ও দর্শক সকলে স্ব স্ব স্থান পরিগ্রহ করিলে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনা করিলেন।

---

৩ রা মাঘ, ১৫ই জানুয়ারী, সোমবার—আজ উদ্বোধন উদ্বোধন। পূর্ব্ব হইতেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে সায়ংকালে মন্দিরে উদ্বোধন-কার্য্য সম্পাদিত হইবে। সুতরাং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মন্দিরে অনেক লোকের সমাগম হইল। ঠিক ৬½ ঘটিকার সময় উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। তাঁহার উপদেশের সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

উৎসবের ভিতর বাড়ী।

"সময়ে সময়ে বড় বড় সহরে মহামেলা হয়, তাহাকে Exhibition অথবা প্রদর্শনী বলে। সেই মেলাতে নানাপ্রকার দেখিবার পদার্থ থাকে। নানা দেশ বিদেশে যে যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য পাওয়া যায় একটী স্থান ঘিরে সেইগুলিকে নানা ভাবে সজ্জিত করিয়া রাখে। কিন্তু তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, সর্ব্বাপেক্ষা দেখিবার উপযুক্ত, যে বিশেষ জিনিস থাকে তাহার জন্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার জন্ত বিশেষ

ভাবে একটী স্থান ঘেরা হয়। সকলে তাহা দেখিতে পায় না। দেখিবার জন্য বিশেষ টিকিট হয়। মেলার যেদিকে মানুষ যায়, দেখিতে পায় কত সুন্দর জিনিস, কত হাসিবার জিনিস সজ্জিত রহিয়াছে। সে সব দেখে দেখে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, বন্ধু বান্ধবের সহিত কত আমোদ করে। অনেক সময়ে এমন হয় যে পয়সার অভাবে কেহ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর জিনিসটা না দেখিয়াই ফিরিয়া যায়। আবার এমন লোকও আছে যে মেলায় আসিয়া কেবল বন্ধু বান্ধবের সহিত আমোদ আহ্লাদেই সময় কাটায়। বাহিরের জিনিস দেখিয়াই বাড়ী ফিরিয়া যায়। সেখানে যদি কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, "কি দেখিলে, সেখানে যে এক অপূর্ব্ব সুন্দর জিনিস আছে, তাহা দেখিয়াছ কি?" সে বলে, "না তাহা ত দেখি নাই।" তখন প্রশ্নকর্ত্তা বলে, "তবে কি দেখিয়াছ? যাহা দেখিবার জন্য যাওয়া তাই দেখ নাই, তবে, কি দেখিলে? তবে আর কি হল?" তাহাকে সকলে এইরূপ লজ্জা দেয়। সে নিজের ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া বড়ই লজ্জিত হয়। আমাদের এই মহোৎসবে যাঁহারা প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, তাঁহারা জানিবেন, ইহার দুইটী বাড়ী। উৎসবের ভিতর বাড়ী আর বাহির বাড়ী। উৎসবের বাহির বাড়ীতে কত আমোদ হইতেছে, ছেলেরা নাগরদোলায় ঢুলিতেছে, কত লোক কত জিনিস কিনিতেছে খাইতেছে, নিশান উড়িতেছে, ঘণ্টা বাজিতেছে। এইটা উৎসবের বাহির বাড়ী। কিন্তু একটা ভিতরের বাড়ীও আছে। সে একটা আশ্চর্য্য বাড়ী। সেখানে আজব কারখানা। সেখানে প্রবেশ করিবার টিকিট আছে। সেই জায়গা সকলের শ্রেষ্ঠ জায়গা। তাহাকে কেহ বলে ব্রহ্মপুর, কেহ বলে হিরন্ময় পরমকোষ। ইহা কি? এখানে কি আছে? তাহা দেখা যায়, কিন্তু বাহির থেকে বলা যায় না। প্রবেশ না করিলে বুঝিতে পারা যায় না। যাঁহারা প্রবেশ করেন তাঁহাদের আনন্দ আর ধরে না। অপূর্ব্ব সত্য-জ্যোতিতে তাঁহাদের প্রাণ পরিপূর্ণ হয়।

এই স্থানে মহাসভা বসিয়া গিয়াছে। ইহা ইহকাল পরকাল-ব্যাপী সভা। এখানে যাঁহারা বসিয়াছেন, তাঁহাদের জাত নাই। ইহা বিশ্বাসী অমরাত্মাদের সভা। এখানে কেবলই বন্দনা উঠিতেছে। অনাহত ভেরীর রব, অনাহত বন্দনা। এখানে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের মস্তক দিব্যালোকে উজ্জল। এই অমরাত্মাদের কেহ ইহকালে বসিয়াছেন, কেহ পরকালে গিয়াছেন। এখানকার এক অপূর্ব্ব গন্ধ! এখানে চারি প্রকার গন্ধ পাওয়া যায়। যেমন বাবুদের বাগানে গেলে বেল, মল্লিকা, গোলাপ, জুঁই প্রভৃতি নানাপ্রকার পুষ্পের গন্ধ পাওয়া যায়, সেইরূপ এই স্থানে চারি প্রকার গন্ধ পাওয়া যায়। প্রেমের গন্ধ, আনন্দের গন্ধ, আশার গন্ধ ও পবিত্রতার গন্ধ। এই রাজ্যে যিনি প্রবেশ করেন, তাঁহার প্রাণ প্রেমে পূর্ণ হয়, প্রাণে আনন্দ ফুটিয়া উঠে, আশা ও পবিত্রতায় প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এই রাজ্যে যে যায় সে পূর্ব্বের রকম থাকিতে পারে না। আর এক রকম হইয়া যায়। বাহির বাড়ীতে যে বলিতেছিল, "ও আমার কাছে আসে কেন, দূরে দাঁড়াক—ও আমার কাছে দাঁড়ায় কেন?" সে যেমন এই ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করে, আর অমনি বলিয়া উঠে, "আয় আয়, নিকটে আয়"। যে বাহির বাড়ীতে কতবার বলিতেছিল, "কিছু হবেনা কিছু হবেনা," সে যেই এইখানে আসিয়াছে যেই সত্য হাওয়া তাহার গায়ে লাগিয়াছে, আর অমনি আশা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে অমনি বলিয়া উঠে, "আমি বাঁচিব, আমি বাঁচিব"। বাহির বাড়ীতে যে নিরা-নন্দে ছিল, প্রাণ যাহার তিক্ত বোধ হইতেছিল, যেই এখানে প্রবেশ করিল, আর অমনি আনন্দের সঞ্চার। এ কি হাওয়া গায়ে লাগিল! যাহার বাহির বাড়ীতে মনটা একেবারে মলিন হইয়াছিল, ঝড়ে কদলী বৃক্ষের ন্যায় যাহার চরিত্র ছিন্ন ভিন্ন ও আন্দোলিত হইতে-ছিল, অপবিত্রতার মলিনতাতে যাহার প্রাণটা পূর্ণ ছিল, সে ভিতর বাড়ীতে যেই প্রবেশ করিল, আর ওকি হইল? চক্ষু কি দেখিল? সকলি বদলাইয়া গেল। এই উৎসবে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছেন, কেবল বাহির বাড়ীতে খাওয়া দাওয়ায় ব্যস্ত না থাকিয়া ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করুন। শুধু বাহির বাড়ী হইতে ফিরিয়া ঘরে গেলে, যখন সকলে জিজ্ঞাসা করিবে, "কি দেখিলে," তখন কি উত্তর দিবেন? অনেকে এইরূপে বাহির বাড়ী হ'তে ফিরিয়া যান বলিয়া প্রাণে আনন্দ, আশা, কিছুই পান না। যিনি নিরাশ রহিয়াছেন, তিনি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান। যিনি নিরানন্দ রহিয়াছেন, তিনি নিরানন্দই থাকিয়া যান। যিনি অপবিত্র তাঁহারও কিছু হয় না। উৎসবের ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করা হইল না, তাহা হইলে ত কিছুই হইল না। এই ভিতর বাড়ীর দরজা কে খোলেন? স্বয়ং উৎসবের অধিপতি। তিনি স্বয়ং প্রসন্ন মুখে দ্বার খুলিয়া বলেন, "এস প্রবেশ কর।" আমরা এইখানে দাঁড়াইব। এই যে সেই আসল জায়গা। বলিব, "উৎসবের অধিপতি, দ্বার খোল।" তাঁহাকে যদি না পাওয়া যায় তবে কিছুই ত হইল না। সেই বিমল সন্নিধানে আসিলাম কি না, সেই হাওয়া গায় লাগিল কি না তাই দেখিতে হইবে। যেন প্রতারিত হইয়া ফিরিয়া না যাই। প্রভু এমন কৃপা করুন, যেন আমাদের উৎসবের আয়োজন সার্থক হয়। আমরা করযোড়ে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া যেন প্রার্থনা করিতে পারি।

৪ঠা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার—আজ উষা-কালে মন্দিরে প্রথমতঃ সংকীর্ত্তন হইল সংকীর্ত্তনের পর শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা করিলেন। তাঁহার উপদেশের সারমর্ম্ম এই:—

"দীনাত্মা লোকেরা ধন্য, কারণ স্বর্গ রাজ্যে তাঁহাদের অধিকার। ধর্ম্ম প্রযুক্ত তাড়িত লোকেরা ধন্য কারণ স্বর্গ রাজ্যে তাহাদের অধিকার।—কেবল যে খ্রীষ্ট এই উপদেশ দিয়াছেন তাহা নহে। দেশে বিদেশে সকল সাধু এক বাক্যে বলিয়াছেন যে, আপনাকে বিনয়ী ও দীন ভাবাপন্ন না করিতে পারিলে ধর্ম্ম রাজ্যে কেহই অধিকার পায় না। ভক্ত চৈতন্য মহা উৎপীড়ন বিনয়ের সহিত সহ্য করিয়া ধর্ম্মের জয় করিয়া-ছিলেন। আমরা ও সময়ে সময়ে এ পাপ জীবনেও দেখিয়াছি যেখানে দীন ভাবে ধর্ম্মের জন্য যাহা কিছু সহ্য করিয়াছি সেই খানেই ব্রাহ্মধর্ম্ম জয় লাভ করিয়াছেন। এক সময়

যেখানে লোকে প্রহার করিয়াছে আবার ইহাও দেখিলাম যে সেই লোকেরা আবার আগ্রহ সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনিয়াছে ও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, আমার বিশ্বাস এই যে যদি আমরা বিনয় ও দীনতার সহিত ধর্ম্মের জন্য লোকের উৎপীড়ন সহ্য করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বদেশে ও বিদেশে অতি সত্বর জয়লাভ করিবে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁহার জন্য সকল সহিতে পারি।

সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় "ধর্ম্মজীবনের বিকাশ" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল।

"আজ কাল চারিদিকে ধর্ম্মের আন্দোলন চলিতেছে। নানা প্রকার ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ৪টী প্রধান সম্প্রদায় এই পৃথিবীতে আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান। চারি সম্প্রদায়ের লোকই ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। অনেকে দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করিয়া মৃতপ্রায় হিন্দুসমাজকে জীবন দিবার জন্য তার স্বরে বক্তৃতা করিতেছেন। অনেক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা" বাহির হইতেছে। বৌদ্ধ প্রচারকগণও নীরব নন। ধর্ম্মপাল প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। ইউরোপ প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা হইতেছে। মুসলমানগণও নীরব নন। তাহারাও খুব প্রচার করিতেছে। Wellington squareএ একজন ইংরাজ মুসলমান হইয়াছেন।

খ্রীষ্টধর্ম্মের কথাই নাই। চারিদিকে খুব প্রচার হইতেছে মুক্তিফৌজ নূতন রকমে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। এই সমস্ত ধর্ম্মের আন্দোলন চারিদিকে খুব চলিয়াছে। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় দেখিতে পাই বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, ও গাণপত্য এদেশে খুব প্রধান। এই সকলের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ অনেক সময়ে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও আপনার সত্য প্রচার করিতেছেন। চারিদিকে অনেক শত্রু থাকা সত্ত্বেও দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইহার মধ্যে আবার Theosophy নামে নূতন মত বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। পরমেশ্বর থাকুন বা না থাকুন ক্ষতি নাই, বাহ্য প্রক্রিয়া পালন করিলেই হইল। ধর্ম্মবিশ্বাস থাকা বা না থাকাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এই গুলির মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ কি দেখাইতেছেন? মুক্তির পথে কি করে যেতে হবে। কোন্ পথ অবলম্বন করিলে প্রকৃতরূপে ধর্ম্মজীবনের বিকাশ হইতে পারে। ধর্ম্মজীবনেও ভৌতিক জগতের ন্যায় নিয়ম রহিয়াছে। মানবের ধর্ম্মমুকুল সকল সেই নিয়মে বিকশিত হয়। তার প্রথম নিয়ম, আত্মার পবিত্রতা। হৃদয় পবিত্র না হইলে পরমেশ্বরকে দেখা যায় না। ষড়রিপু আমাদের ভয়ানক প্রতিকূলাচরণ করে। ইহাদিগকে যাঁহারা নির্ম্মূল করিতে না পেরেছেন ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন তাঁদের অসম্ভব; যদ্দ্বারা কুভাবের দিকে মন ধাবিত হয় তার মধ্যে প্রথম ঘৃণিত পুস্তক পাঠ করা। অধিকাংশ যুবক ইংরেজী জঘন্য novel পড়েন। মন কলুষিত করিবার পক্ষে এমন আর কি হইতে পারে? দ্বিতীয় রঙ্গভূমি, নরকের পিশাচ রঙ্গভূমি ছাড়া আর কোথায় আছে? পবিত্রতা লাভের জন্য প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রে কত কঠোর বিধি ছিল।

২য়—পবিত্রতা লাভ করিলে আপনা আপনি পরমেশ্বরের প্রতি একটা প্রেমের ভাব হয়। ঈশ্বরের দর্শনে প্রাণ বিকশিত হয়। ইহার বিরুদ্ধে গুরু ও পুরোহিত মানবাত্মার অত্যন্ত ক্ষতি করিয়াছে। অভ্রান্ত গুরু মানবের যত ক্ষতি করিয়াছে আর কিছুতে তত নহে। অভ্রান্ত গুরু মানিতে গেলে, হিতাহিত বিবেচনা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার নৈকট্য ধর্ম্মজীবন লাভের উপায়।

৩য়—জ্ঞানালোচনা। জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি না থাকিলে কত যে ক্ষতি হয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় দেখাইয়াছেন। মহাত্মা চৈতন্য একদিন অদ্বৈতকে বলিয়াছিলেন জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। এক্ষণ বৈষ্ণব সমাজে এত পাপ প্রবেশ করিয়াছে যে তাহাতে হৃৎকম্প হয়। এ দেশে যুবকদের মধ্যে তেমন জ্ঞানচর্চ্চা নাই। অধিকাংশ পুস্তকের দোকানে স্কুলপাঠ্য ছাড়া অন্য ভাল বই পাওয়া যায় না। তার কারণ শিক্ষা ভাল রকমে প্রচার হয় নাই। ধর্ম্মজীবনের পক্ষে জ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

৪র্থ—সজন ও নির্জ্জন উপাসনা ও প্রার্থনা। এক সঙ্গে উপাসনা করিলে প্রাণে কেমন চমৎকার ভাব ও আনন্দ পাই।

৫ম। সাধুসহবাস। তাহাতে প্রাণের মধ্যে আপনি ভাব আসে। কর্ত্তাভজারা বলেন এক সঙ্গে সাধন না করিলে সাধনই হয় না।

৬ষ্ঠ। উদারতা। সত্য প্রাণে ধারণ করিতে গেলে সকল জাতি হইতে সত্য গ্রহণ করিতে হয়। সকল দেশীয় ধর্ম্মাচার্য্যগণ প্রায় একই কথা বলিয়া গিয়াছেন। যাহারা ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চান তাঁদের নিকট Asia, Europe একই কথা। যেখানে সাধুতা সেখানেই মাথা অবনত করিতে হইবে।

৭ম—স্বার্থত্যাগ ও নরসেবা। এদেশে যাঁরা ধর্ম্মজীবন সাধন করিয়াছেন তাঁহারা কেবল নিজেরাই করিয়াছেন। কিন্তু অপরের সেবা না করিলে তাহাতে ক্ষতি হয়। Love thy neighbour as thyself, তুমি তোমার প্রতিবেশীকে আপনার ন্যায় ভাবিবে। এই ৭টী ভাবে ধর্ম্মজীবনের বিকাশ। যাঁহারা ইহার সবগুলি গ্রহণ না করেন তাঁহাদের একাঙ্গ সাধন হয়। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজ এই ভাব দিবার জন্য দণ্ডায়মান। লোকে যা বলে বলুক এই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এক চমৎকার ভাব আছে।

৫ই মাঘ, ১৭ই জানুয়ারী, বুধবার—আজ প্রাতঃকালে মন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত ভাই প্রকাশ দেব আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উৎসব সম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে প্রার্থনার পর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয় বিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণ পাঠ করেন। ঐ রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে এ বৎসর ইংরেজী কোর্সে তিন জন, বাঙ্গালা নিম্নতর কোর্সে একজন, এবং ইংরেজি নিম্নতর কোর্সের কেবল বাইবেলে একজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেন। ইহার কারণ (১) নিয়মিত শিক্ষকের অভাবে কোন কোন শ্রেণীর কার্য্য নিয়মিত রূপে হয় নাই, (২) পাঠ্যের কঠিনতা। বর্ত্তমান বর্ষে দ্বিতীয় কারণ দূর করা হইয়াছে। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় ইংরেজি ধর্ম্ম বিজ্ঞানের, পণ্ডিত

শিবনাথ শাস্ত্রী 'ভগবদ্গীতার' বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বাইবেলের, এবং বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা কোর্সের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। পরীক্ষার্থিগণ সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের নাম এই :—

উচ্চতর ইংরেজি শ্রেণী।

প্যারীলাল ঘোষ	প্রেসিডেন্সিকলেজ, চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী	
মুনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	ঐ
অন্নদাপ্রসাদ সেন	সিটিকলেজ	ঐ

বাঙ্গালা নিম্নতর শ্রেণী

যোগানন্দ প্রামাণিক শান্তিপুর।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরকাল বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল :—

"সংশয়বাদীরা বলেন আত্মা একটী স্বতন্ত্র বস্তু নয়—তাহা মস্তিষ্কের ক্রিয়া মাত্র। এই মত সত্য হইলে মৃত্যুতেই আমাদের শেষ। আত্মা যে জড়ের ক্রিয়া নয়,গতবারে এই মত অনেকগুলি অখণ্ডনীয় যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম। মৃত্যুর পরেও যে আত্মা থাকে, আমি সে সম্বন্ধে কিছু বলি নাই। আত্মার পরকালে অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হইলে আত্মার অস্তিত্ব আগে প্রমাণ করিতে হয়। অনাত্ম-বাদখণ্ডন পূর্ব্বেই হইয়াছে। অনাত্মবাদখণ্ডন ও পরকাল দুটী স্বতন্ত্র বিষয় নয়। একই বিষয়ের দুটী অংশ।

অনাত্মবাদী বলেন মৃত্যুতেই শেষ। মৃত্যুর পরে আর কিছু নাই। চিতানলে বা পৃথ্বীগর্ভে সকলই ফুরাইয়া যায়। কিন্তু একটী কথা; জগতে কিছুরই বিনাশ হয় না।' ভঙ্গ হয়। পারবর্ত্তিত হয়। জড়ের বিনাশ নাই। তবে কি আত্মার বিনাশ আছে? ইহার উত্তরে বালতে পারেন, জড়ের ভঙ্গ আছে, তেমনি আত্মাও ভঙ্গ হইতে পারে। দেহ ভঙ্গ হইলে যেমন তার দেহত্ব থাকে না, আত্মা ভঙ্গ হইলে তার আত্মত্ব কিরূপে থাকে? যাহা পরমাণুর সমষ্টি তাহারই ভঙ্গ হইতে পারে, যাহা তাহা নয় তাহা ভঙ্গ হইতে পারিবে কেন? ভঙ্গ হওয়ার অর্থ পরমাণুর বিশ্লেষণ। সুতরাং যখন আত্মা পরমাণুসমষ্টি নয়, তখন আত্মা অখণ্ড, ইহা ভঙ্গ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং আত্মার আত্মত্ব চিরদিনই সমান। কেহ বলিতে পারেন, সর্ব্ব শক্তিমান্ পরমেশ্বর কি আত্মাকে বিনাশ করিতে পারেন না? যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি পারেন না ইহা কে মুখে আনিবে? ইচ্ছা করিলে তিনি পারেন, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেন কি না, যুক্তিসঙ্গত কি না ইহাই বিবেচ্য। জগতের সমস্ত পদার্থ কি বলে? জগতের একটী বালুকণাও বিনাশ হয় না। তবে কি তিনি জ্ঞানধর্ম্মের অধিকারী, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ আত্মাকে বিনাশ করিবেন? ইহা কি বিচারসঙ্গত? আত্মার অমরত্বের আলোচনা করিতে হইলে দুইটী দিক্ দেখিতে হয়। প্রথম পরমেশ্বরের স্বরূপ। তিনি দয়াময়, ন্যায়বান সত্য-সঙ্কল্প। অপর দিকে আত্মার প্রকৃতি। এই দুইদিকের তুলনায় সমালোচনা করিলে পরকালের অস্তিত্ব নিশ্চিত প্রমাণ হয়। পরমাত্মার সহিত মিলাইয়া আত্মার প্রকৃতি দেখুন। প্রথম ন্যায়বুদ্ধি, sense of justice সহস্র কণ্ঠে আত্মার অমরত্ব ঘোষণা করিতেছে। পদে পদে আমাদের ন্যায়-বুদ্ধি ক্লিষ্ট। প্রজার প্রতি রাজার, দরিদ্রের প্রতি ধনীর অত্যাচার যে কত, কে তাহার গণনা করিবে, পৃথিবীময় এই সব অত্যাচার স্মরণে হৃৎকম্প হয়।

যত তুমি ভাল হইবে,আত্মা পবিত্র হইবে,তত এই অত্যাচার দেখিয়া কষ্ট হইবে। ন্যায়-বুদ্ধি বলে, যে অন্যায় করে, তার অবশ্যই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু জগতে কি তাহা সর্ব্বদা দেখিতে পাই? অন্যায় অত্যাচারী কি সর্ব্বদা উপযুক্ত কর্ম্মফল ভোগ করে? অনেক স্থলে করে না। বলিতে পারেন, বাহ্যিক কষ্ট না পাইলেও আন্তরিক যন্ত্রণা অবশ্যই হয়।-একথাটা ভাল লাগে না। ইহলোকে উপযুক্ত আন্তরিক যন্ত্রণা যে সব স্থলে হয় এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। যখন দুষ্কার্য্য করে তখন খুব গ্লানি হয়। দ্বিতীয় বার অপেক্ষাকৃত অল্প। তার পর আরও কম। ক্রমে আত্মগ্লানি ক্ষীণ হইয়া আসে। শেষে দুষ্কার্য্য অভ্যাস হয়, কিছুমাত্র গ্লানি হয় না। তবে পাপের আন্তরিক যন্ত্রণা ইহ সংসারে কৈ? কিন্তু ন্যায়বাদী বলিতেছেন, পাপের উপযুক্ত কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। নতুবা, সাধু ও পাপীর অবস্থা এক হইয়া যায়। ইহার আর এক দিক আছে। অত্যাচরিত ব্যক্তি ন্যায়বান্ ভগবানের রাজ্যে যে অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিল, তাহার কি পূরণ হইবে না? ইহসংসারে Compensation দেখিতে পাই না। তবে তাঁর দয়া কোথায় থাকে? পরকাল আছে, তাই আমাদের ন্যায়-বুদ্ধি শান্তিলাভ করে।

মানবাত্মার প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখি আত্মার গতি পূর্ণতার দিকে। সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্রে আত্মা তৃপ্ত নয়। জ্ঞানপিপাসার কোথাও বিশ্রাম নাই। এ সংসারে তাহা চরিতার্থ হয় না। অনন্তের দিকে মানবাত্মা ছুটিতেছে। অতএব পরকাল আছে। অসীমের দিকে মানবের শক্তি ও ইচ্ছার গতি, কিন্তু সময় সীমাবদ্ধ। মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির সীমা নাই। অতএব মানুষ অনন্ত কালের জন্য। প্রেমের গতিও ক্রমোন্নতিশীল। মৃত্যুতেই যদি শেষ, তবে ইহকাল পরকালব্যাপিনী হৃদয়ের প্রসারিণী শক্তি কেন হইল? যে অনন্ত জীবনের বীজ আত্মার মধ্যে দেখি, তাহা ইহকালের জন্য নয়। শিশুর প্রসব হওয়া যেমন, মৃত্যু তেমনি দ্বিতীয় প্রসব।

প্রেম প্রেমাস্পদের সঙ্গে চিরসম্বন্ধে বদ্ধ হইতে চায়। প্রেম বলে, "মলেও যেন দেখা পাই।" প্রেমের এই স্বভাব তিনি দিয়াছেন। অথচ বিশ্বাসঘাতকের মত মরিবার সময় গলা টিপিয়া মারিয়া দেন ইহা কি সম্ভব? মৃত্যুতেই যদি শেষ হয়, তবে প্রেমাস্পদ মানুষ ও প্রেমাস্পদ পরমেশ্বরের সঙ্গে, আমাদের ক্ষণিক সম্বন্ধ। তবে তাঁহাকে সত্য সংকল্প কেন বল? তিনি প্রেমকে যে স্বভাব দিলেন তাহা কি মিথ্যা হইবে?

পবিত্রতার দিক্ দেখুন। বিবেক বলে 'পবিত্র হও'। চারি আনা হওয়া নয়, ষোলআনা পবিত্র হইতে হইবে। মানবের ধর্ম্মবুদ্ধি বলে "ধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে পালন কর।" এজন্য অনন্তকাল চাই। পূর্ণ ধর্ম্ম এ লোকে সম্ভব নয়। মহাসাধুও আপনার ত্রুটী দেখিয়া ক্ষুব্ধ হন। ধর্ম্মকে যতই ধারণ করিতে

যান ততই উচ্চ হইতেও উচ্চতর হয়। তখন দেখেন ইহজীবন পূর্ণ ধর্ম্ম সাধনের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু প্রাণের ভিতর হইতে কে সর্ব্বদাই বলিতেছে "ধর্ম্মকে পূর্ণরূপে সাধন কর।" তবে বিবেক কি মিথ্যাবাদী? তাহা বলিতে পারি না। তাই সে করিতে বলে "অনন্ত জীবনে অনন্ত ধর্ম্ম-ধন লাভ করিয়া জীব কৃতার্থ হইবে।"

তার পর আমাদের সুখেচ্ছা। সম্পূর্ণ সুখ চাই। কিন্তু ইহলোকে কার সুখ পূর্ণ হইয়াছে? জগতে পূর্ণ তৃপ্তি দেখিতে পাই না। জীবন্মুক্ত পুরুষের কি পূর্ণ তৃপ্তি হইয়াছে? অনন্ত প্রেম, জ্ঞান তাঁহার সম্মুখে। অনন্ত জীবনের অনন্ত সম্ভোগ, তাঁহার আশা এই। পরিমিত জীবনের কয়দিনে তাহা সম্ভব নয়। কোথাও কেউ বলে না, তৃপ্ত হইয়াছি আর চাই না। মানবের হৃদয় নিহিত, পরমেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত আশা কখনও তৃপ্ত হইবে না। প্রকৃতিতে দেখি, এক দিকে অভাব অপর দিকে তাহার পূরণ। কিন্তু ভাবুন দেখি, ক্ষুধা আছে অন্ন নাই, এরূপ হইলে জগৎ কয়দিন রক্ষা হইত? যিনি শারীরিক অভাব পূরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তিনি ইহার আত্মার অভাব অপূর্ণ রাখিবেন? তাঁহার ন্যায় ও করুণা মানবের স্বভাব ও জগতের উপমিতি শতকণ্ঠে বলিতেছে, যিনি এই ক্ষুধা দিয়াছেন তিনি অবশ্যই অন্ন দিবেন। "যোবৈভূমা তৎসুখম্। নাল্পে সুখমস্তি।"

পূর্ণ প্রেম, জ্ঞানের অধিকারী হওয়া কি এক দিনের কাজ? "লাখ লাখ যুগ হিয়াপর রাখিনু তবু হিয়া জুড়ান না গেল।"

আমরা জীবন কত ভাল বাসি। বাঁচিতে যত ভাল বাসি এত আর কিছুই নয়। বাঁচিয়া থাকিবার অনন্ত তৃষ্ণা মানুষের মনে কেন আসিল? ৬০। ৭০ বৎসরেই তৃপ্তি হয় না কেন? এটী অতি প্রবল যুক্তি, Plato এই যুক্তিটী বলিতেন। জীবন তৃষ্ণার প্রকৃতি কি? ইহার অনন্ত গতি। আর এই বর্ত্তমান জীবনে কেহ সন্তুষ্ট নহে, ইহা ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া আছে।

আর এক দিকে—যে যাহাকে ভাল বাসে সে কি ইচ্ছা করে তার প্রেমাস্পদ মরিয়া যাক্? সে চিরজীবী হয়, না মরে, এই ইচ্ছা করে? অনন্ত প্রেমময়ী মা তার ছেলেকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবেন? তিনি আশীর্ব্বাদ করিতেছেন 'চিরজীবী হও।'

পরমাত্মার সহিত যে নিগূঢ় যোগ তাহা এক অলৌকিক অবস্থা। এ যোগ হইলে আত্মা স্পষ্ট বুঝিতে পারে, ইহা অস্থায়ী নয়। ইহা অনন্ত। এ সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিতেছেন:—

পরকাল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু তাই মাত্র প্রমাণ নয়। অন্তরূপে, জ্ঞানে পরমেশ্বর ও পরকাল জানিতে পারি, সাধন ভজন দ্বারা জানিতে পারি। যিনি ব্রহ্মে স্থিতি করেন, তিনি ব্রহ্মকে দর্শন করেন এবং তিনি তাঁহার মধ্যে ইহকাল পরকাল দর্শন করেন; পৃথিবীতে থাকিয়াও এই অপার্থিব অবস্থা হয়, যদি সাধন করা যায়। মায়ান্ধ এ কথা বুঝে না।

৬ই মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার।

প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময় মন্দিরে উপাসনা হয়। প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং সায়ংকালে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

৭ই মাঘ, ১৯শে জানুয়ারী শুক্রবার।

প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু উপাসনা করেন। সায়ংকালে সঙ্গত সভার বার্ষিক উৎসব হয়। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনা করেন এবং সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী সেন সভার কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। কার্য্যবিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে। তৎপর শ্রীযুক্ত বাবু হরগোবিন্দ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু মথুরামোহন গাঙ্গুলী ও শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র পাল ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে স্ব স্ব জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন।

৮ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী শনিবার।

আজ বঙ্গমহিলাসমাজ ও ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসব। প্রত্যুষ হইতে মহিলাগণ মন্দিরে সমাগত হইতে আরম্ভ করিলেন। মন্দির কেবল মহিলাবর্গের উপাসনার জন্য পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট ছিল, মন্দিরে নারীগণ সমবেত হইয়া পর ব্রহ্মের গুণগানে চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা করিলেন। সিটিকলেজে পুরুষদিগের উপাসনা হয়। তথায় শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বসু উপাসনা করেন। তাঁহার উপদেশের সারমর্ম্ম নিম্নে বিবৃত হইল।

পরমেশ্বর দয়া করিয়া পাপীর উদ্ধারের নিমিত্ত দুই একটী উপায় করিতেছেন এমন নয়, কিন্তু শত সহস্র উপায় করিতেছেন, অসংখ্য উপায় করিতেছেন। অতএব আমাদিগের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। আসুরিক ভাবাপন্ন হইয়া আমরা তাঁহার অনেক উপায় ব্যর্থ করিয়াছি। তিনি আমাদিগকে তাঁহার প্রেরিত উপায় ব্যর্থ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন, বলিয়াই আমরা ব্যর্থ করিতে পারিয়াছি, না হইলে তাঁহার উপায়কে আমরা ব্যর্থ করি আমাদিগের এমন সাধ্য কি? আমরা কি সর্ব্বশক্তিমান অপেক্ষা ও অধিক শক্তিশালী? কিন্তু অতীতকালে আমরা তাঁহার যত উপায়ই ব্যর্থ করিয়া থাকি না কেন, তাহা বলিয়া আমরা ভবিষ্যতের আশা পরিত্যাগ করিতে পারি না। চিরকাল আমরা পাপে মজিয়া পাপের দাসত্ব করিব এজন্য ভগবান আমাদিগকে পৃথিবীতে আনেন নাই। অনন্তকাল আমরা পাপ এবং পাপজনিত ক্লেশ সহ্য করিব ইহা যখন ঈশ্বরের অভিপ্রায় নহে, তখন তাঁহার প্রেরিত উপায় অবশ্যই সফল হইবে। শত সহস্র উপায় যখন বিধান করিয়াছেন আরও করিবেন, তাহার একটী উপায় ও কি আমাদিগের উদ্ধার সাধন করিবে না? বিজয়ী ঈশ্বর নিজ ধনুক হইতে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শত সহস্র পরিত্রাণের বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন, একটী ও কি আমাদিগকে ভূপাতিত এবং তাঁহার পদতলে পাতিত করিতে পারিবে না? অতএব উপাসকগণ সাহসী হও। নৈরাশ্য পরিত্যাগ কর। কোন বিখ্যাত ধর্ম্মগ্রন্থে আছে যে স্বর্গ রাজ্যের কোন যাত্রীকে একদা নৈরাশ্য-অসুর পথ হইতে ধরিয়া আনিয়া তাহার কেল্লাতে

অবরুদ্ধ করিয়া নিত্য নিত্য অশেষ যন্ত্রণা দিতে লাগিল। কিন্তু ব্রহ্মের কৃপাবলে অকস্মাৎ একদিন সেই মনুষ্য জাগ্রত হইল। এবং কারাগার ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইল যে অসুর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছে; অমনি সে ছুটিয়া গিয়া সেই অত্যাচারীর মস্তক ছেদন করিল। ব্রহ্ম আমাদিগকে পরিত্রাণ দিবার জন্য কত উপায়ই বিধান করিতেছেন। চন্দ্র সূর্য্য আকাশে পর্য্যায়ক্রমে উদিত, অস্তমিত হইতেছে, কত নক্ষত্র আকাশে প্রস্ফুটিত হইয়া অন্ধকারময় আকাশকে উজ্জ্বল করিয়াছে, আমাদিগের বাসভূমি পৃথিবী নানা রূপে সুসজ্জিত। নদী তড়াগ সমুদ্র হ্রদ তরুলতা তৃণ গুল্ম অসংখ্য প্রকার জীব ইহাতে আছে। চক্ষে যাহা কিছু দেখিতেছি সকলই ত আমাদের পরিত্রাণের উপায়। এই যে মাঘোৎসব আসিয়াছে ইহাও আমাদিগের একটী পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু পরিত্রাণের উপায় পাইলে হয় না, উহার সদ্ব্যবহার চাই। পরিত্রাণের উপায় পাইয়া যদি অধিকতর আগ্রহের সহিত আমরা ঈশ্বরের অনুগত হইয়া তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত না থাকি, তাহা হইলে উপায় নিষ্ফল হইবে। ঈশ্বর যেমন আমাদিগের উদ্দেশ্য, তেমন আমাদিগের উপায়ও বটেন। পাপ হইতে পরিত্রাণের নানা উপায় দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি স্বয়ংই আবার সর্ব্ব প্রধান উপায়; তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কোন উপায় কার্য্যকর হইতে পারে না।

সাধুসঙ্গ একটী পরিত্রাণের উপায় যাহা মাঘোৎসবে আমরা বিশেষ ভাবে লাভ করিব বলিয়া প্রত্যাশা করি। কিন্তু ঈশ্বরে মতিগতি না জন্মিলে সাধুসঙ্গ আমাদের কি উপকারে আসিবে? কতলোক আছে যে ঈশ্বরেতে ভক্তি নাই বলিয়া সাধুসঙ্গ লাভ করিয়াও তাহাতে ফললাভ করিতে পারে না। অবশেষে সাধুনিন্দা করিয়া পাপ সঞ্চয় করে। এবং ঈশ্বরোপাসনাতে কিছু হয় না এরূপ মিথ্যাকথা প্রচার করিতে ও কুণ্ঠিত হয় না। অতএব সাবধান, মাঘোৎসবের আকারে আমাদের যে পরিত্রাণের উপায় আসিয়াছে, আমরা যেমন ইহার সুবিধা গ্রহণ করিব তেমন মাঘোৎসবের প্রেরয়িতা ঈশ্বরকে যেন ভুলিয়া না যাই। কিন্তু যেন মহোৎসাহে তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমাদিগের কামনা সফল হইবে।

সায়ংকালে ৬॥ ঘটিকার সময় সিটিকলেজে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। প্রার্থনান্তে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এ দিন বিশেষ কোনও কার্য্য হয় না। বার্ষিক রিপোর্ট ও কর্ম্মচারী নিয়োগ লইয়া অনেক বাদানুবাদের পর ২৯শে জানুয়ারী ১৭ই মাঘ সোমবার পুনরায় সভা হইবে বলিয়া সভা স্থগিত হয়।

৯ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী রবিবার।

প্রত্যূষে মন্দিরে সংকীর্ত্তন, তৎপরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। মধ্যাহ্ন ১ ঘটিকার সময় (Conference) আলোচনা সভা হয়। তথায় উৎসব উপলক্ষে সমাগত অধিকাংশ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ রায় (সি, এস) মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় "ব্রাহ্মবালক ও বালিকাদিগের শিক্ষা এবং ব্রাহ্মদিগের সাংসারিক অবস্থা" এই দুইটী বিষয়ের আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের উপর বালকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার ভার ছিল।

কৃষ্ণকুমার বাবু কলিকাতা সিটিকলেজের তত্ত্বাবধায়ক; তাঁহাকে প্রতিদিন বালকদিগের উন্নতি ও নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। সিটীকলেজে অনেকগুলি ব্রাহ্মবালক পাঠ করে, তাহাদের শিক্ষার অবস্থা, নীতিও চরিত্র কিরূপ, তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর তাঁহার প্রতিদিনই ঘটিতেছে। সুতরাং ব্রাহ্মবালকদিগের শিক্ষাসম্বন্ধে তিনি যাহা বলিলেন, তাহার প্রতি সকলেরই বিশেষ রূপে প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মবালক বালিকার শিক্ষাবিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব কিরূপ গুরুতর তাহা প্রদর্শন করিয়া তিনি তৎপরে ব্রাহ্ম পিতা মাতার বিবেচনার্থ কতকগুলি সারগর্ভ কথা বলিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ এবং কনফারেন্সে পঠিত অপরাপর বিষয় স্থানান্তরে মুদ্রিত হইবে।

কৃষ্ণকুমার বাবুর উক্তি শেষ হইলে অনেকে তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করেন। কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যে ব্রাহ্মবালক বালিকাদের জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মের নিকট হইতে তাঁহাদের আয়ের উপরে শতকরা কিছু কিছু ট্যাক্স লওয়া কর্ত্তব্য। এবিষয়ের আলোচনা শেষ হইলে, ব্রাহ্মদিগের সাংসারিক অবস্থা বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়।

"ব্রাহ্মদিগের সাংসারিক অবস্থা" বিষয়ে আলোচনা উপস্থিত করিবার ভার শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল।

তিনি তাঁহার বক্তৃতায় দরিদ্র ব্রাহ্মদিগের দুরবস্থার ছবি চিত্রিত করিয়া দেখাইলেন যে, ব্রাহ্মসমাজে দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতেছে। ইঁহাদের কাহারও কাহারও এরূপ হীনাবস্থা যে পুত্র কন্যার শিক্ষা দিতে সমর্থ নহে। এই সকল অশিক্ষিত বালক বালিকা উত্তরকালে কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। দারিদ্র্যের তাড়নায় ব্রাহ্মগণের নীতি আর রক্ষা হইবে না। তাহারা প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, পরস্বাপহারক হইয়া উঠিবে, এবং ব্রাহ্ম পরিবার সকল সর্ব্ববিধ নীচতার আলয় হইয়া উঠিবে। এই সকল উল্লেখ করিয়া অবশেষে তিনি দারিদ্র্য নিবারণের পাঁচ প্রকার উপায় নির্দ্দেশ করিলেন।

প্রথম, ব্রাহ্মপল্লী স্থাপন অর্থাৎ সহরবাস পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মদিগের মফস্বলে বাসস্থান নির্ম্মাণ করা।

দ্বিতীয়, ব্যয় সংকোচ। ব্রাহ্ম পুরুষ ও রমণীদিগকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহার্থ দৈহিক শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে অভ্যস্ত করা; ও আহার বিহারাদির ব্যয়ের স্বল্পতার দিকে দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দেওয়া।

তৃতীয়—অর্থ সংস্থান। অর্থাৎ জীবনবীমা প্রভৃতির ন্যায় অর্থ সংস্থানের উপায় করা।

চতুর্থ—স্বাধীন ব্যবসায়। ব্রাহ্মগণ যাহাতে রাজকার্য্য প্রার্থী না হইয়া স্বাধীন ব্যবসায় দ্বারা সংসার পালন করিতে পারেন তাহাই প্রার্থনীয়।

পঞ্চম—মিলিত ভাণ্ডার (co-oparative stores) এতদ্বারা সুলভ মূল্যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য সকল যোগান যাইতে পারে।

এই বিষয়ে যে আলোচনা উপস্থিত হয়, তাহাতে অনেকে যোগ দিয়াছিলেন। উপসংহারে সভাপতি বলেন যে দরিদ্র ব্রাহ্মযুবকদিগকে জীবন সংগ্রামে সাহায্য করিতে পারে এরূপ একটী কমিটী থাকা একান্ত আবশ্যক। সূর্য্যকুমার বাবুর পঠিত প্রবন্ধ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে।

রাত্রিকালের উপাসনাকার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশের সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল।

আর শুনা কথায় তৃপ্তি হয় না। প্রত্যক্ষ, স্থায়ী কিছু চাই। যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহার বিশেষ লক্ষণ এই যে এখানে সকলি প্রত্যক্ষ। পরকালে ঈশ্বরদর্শন লাভ করিবে, আমাদের ধর্ম্ম একথা বলে না। এখানেই তাঁহাকে দেখ। প্রচলিত ধর্ম্মের উপদেশ, পৃথিবীতে ধর্ম্মজীবন যাপন কর, বৈকুণ্ঠে ভগবানের দর্শন পাবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এমন কথা বলে না। ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ; জীবনে প্রত্যক্ষ না হইলে, সেটী আমার শুনা কথা থাকিল; নিজস্ব হইল না। সমুদ্রগর্ভে অনেক রত্ন আছে শুনিয়া আমার দারিদ্র্য ঘোচে না। শুনাকথাতে বা তর্কের মীমাংসায় হয় না, পাওয়া চাই। সাধুরা ধর্ম্মের অনেক উচ্চ কথা বলেন, তাহা শুনিয়া আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য ঘোচে না। শাস্ত্রে থাকিলে কি হইবে, প্রাণে চাই। সত্য কোনও স্থানেই কেবল শুনাতে হয় না। যে হিমালয় দেখে নাই সে কালিদাসের বর্ণনা পড়িয়া কি হিমালয়ের ভাব গ্রহণ করিতে পারে? প্রভুর নাম কত মধুর, ভক্তজন আস্বাদন করিয়া অজ্ঞান হইয়া যান। সংসারের লোকের নিকট সেই নাম একটা কথা মাত্র, তাহার মধ্যে আর কি অমৃত আছে? ঐ নামে কত মধুর ভাব, তাহাতে যে পুত্র শোক দূর হয় ইহা কেবল ভক্তজনের বিদিত। নাম বলিবামাত্র কোথায় গেল শোকতাপ। "যার শোক, যার তাপ, যার হৃদয় ভার" প্রত্যক্ষ কথা, তর্ক করিয়া কে বুঝাইবে? সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, হাহাকার করিতে করিতে যে বলিয়াছে "প্রভু, কোথায় তুমি" প্রাণে হাত দিয়া বলিয়াছে, "তুমিই সর্ব্বস্ব প্রভু।" প্রার্থনা প্রাণের হাহাকার, প্রাণের ক্ষুধা তৃষ্ণা। কেবল কথাই কি প্রার্থনা? মহর্ষি বলেন, সাধন কর, এখনই আত্মাতে তাঁহাকে দেখিবে। কুতার্কিক বলিবে উহা মনের খেয়াল, বিশ্বাসী বলবে সত্য। শাস্ত্রের কথা শুনা কথা। তবে কি শাস্ত্রের কথা অগ্রাহ্য করিব, কখনই নয়। সাধুসঙ্গ করিব, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্র আলোচনা করিব, এসকলে সাহায্য করে; কিন্তু যতক্ষণ না তুমি বলিতে পারিবে, হাঁ আমি দেখিয়াছি, সত্য বটে, নিজে আস্বাদন করিয়া দেখিয়াছি, জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি ঈশ্বর আছেন, নামে অপূর্ব্ব মাধুরী, ততক্ষণ ধর্ম্মজীবনের কিছুই হয় নাই। প্রকৃত বিশ্বাস যেখানে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন সেই খানে। ধর্ম্মজীবনের বুনিয়াদ বিশ্বাস। ইহা ক্রমোন্নতিশীল। ভাবিয়া দেখ দেখি, অনন্তজীবনের পথে কি অগ্রসর হইতেছ? প্রকৃত ধর্ম্মজীবন এক জায়গায় স্থির হইয়া থাকে না। হয় পশ্চাতে, নয় অগ্রসর হয়। যদি ধর্ম্মপথে এক এক পা অগ্রসর হইতে না পারি তবে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন হয় নাই। সাধুরা ধর্ম্মজীবনের উচ্চস্থানে উঠিয়া যাহা লাভ করিয়াছেন, নিম্নস্থানের লোকেরা তাহা জানে না। ধর্ম্মজীবন বটবীজের ন্যায়। ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। অনেক সময়ে, আমরা একই কথা বলি, এক রাস্তায় চলি, কলুর বলদের মত অগ্রসর হই না। একই তক ২০।২৫ বৎসর চলিয়াছে, অগ্রসর হয় না। অনেক সময় মনে করি মহাত্মাদের সবকথা বুঝিয়াছি। একজন গোয়ালন্দ দেখিয়া যদি ঢাকার বর্ণনা করে, তবে যেমন হয় আমাদের অনেকের দশা তেমনি। কাম ক্রোধের গোলাম হইয়া রহিয়াছে, অথচ ব্রহ্ম দর্শনের কথা বলে। ধর্ম্মজীবনের অনন্ত রাস্তা। অগ্রসর হও, চল। কত নূতন দেখিবে, পুরাতন নয়। যাহাদের উন্নতি হয় না, তাহারাই বলে নূতন কথা শুনা যায় না। যীশু বলিলেন—"আমি ও আমার পিতা এক; জগতের লোক তার অর্থ না বুঝিয়া যীশুকেই ঈশ্বর মনে করিয়া পূজা করিতে লাগিল। অনেকে মনে করে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকিলেই বুঝা ধর্ম্মের কথা বুঝা যায়; মিথ্যা কথা। প্রকৃত বিশ্বাসী সোজা পথে চলিয়া যান, পশ্চাতে ফিরিয়া দেখেন না। দ্বিতীয় লক্ষণ, বিশ্বাসী অচঞ্চল। সাধারণ লোকের দেখি, কেবলই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। শুনা কথা ত হইবেই। পরের মুখে ঝাল খাওয়া, উল্টে ত যাবেই। অনেকের শেষ গ্রন্থের অনুযায়ী মত হয়। যেখানে বিশ্বাস শুনা কথা, তাহা বদলাবে, তর্কের মীমাংসা বদলাবে; যেখানে দেখা জিনিস সেখানে অটল, অচঞ্চল। ধর্ম্মজীবন বিষয়েও তাই। যথার্থ ধর্ম্মজীবন যে লাভ করিয়াছে, সে অটল। সুখের সময় দয়াময় বলা সোজা, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বলা কঠিন। আর এক শ্রেণীর লোক দুঃখের সময় ভগবানকে ডাকে, সুখের সময় ভোলে। কাহারও মাঝামাঝি পথ আছে। স্ত্রীপুত্রও চাই, ভগবানও চাই। যথার্থ বিশ্বাসীর নিকট এক পরমেশ্বর; পাঁচটার মধ্যে একটা নয়। "সব যাক্ তুমি থাক।" এইভাব যাঁহার হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছেন। যে দুঃখে ডাকে, সুখে ডাকে সেই প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছে।

১০ই মাঘ, ২২শে জানুয়ারী সোমবার।

অদ্য প্রাতে কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর উৎসব। প্রথম সংকীর্ত্তন, তৎপরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

One thing have I desired of the Lord, that will I seek after; that I may dwell in the house of the Lord all the day of my life, to behold the beauty of the Lord, and to enquire in his temple. Ps. XXVII. 4.

"ঈশ্বরের নিকট আমার এই একটী মাত্র ভিক্ষা, এবং তাহারই জন্য আমি চেষ্টা করিব, যেন পরমেশ্বরের আলয়ে যাবজ্জীবন বাস করিয়া আমি তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শন করি, এবং তাঁহার মন্দিরে তাঁহাকে অনুসন্ধান করি।"

ভগবানের নিকটে কত লোক কত প্রার্থনা করিয়া থাকে। ধন, মান, পুত্র, ঐশ্বর্য্য কত কি চায়। আবার কত ধর্ম্মার্থী আছেন, তাঁহারা এই সকল চাহেন না বটে, কিন্তু অন্য কামনা জানান। স্বর্গলাভ, নির্ব্বাণ, মুক্তি, অষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি চান। ভক্তের প্রার্থনা কিন্তু একটি সে এই; "আমি যেন তোমাকে দেখিতে পারি।" চিরদিনই এই প্রার্থনা থাকে। ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য, সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য একান্ত প্রার্থনা। ভগবানকে কি দেখা যায়? এ কথা লোকের মুখে শুনিয়া কি আমরা ভয় পাইব? ভোগ করিবার বস্তুত ইহসংসারেই রহিয়াছে, তাহার অতিরিক্ত কি আবার কিছু পাওয়া যায়? ভক্তের কামনা তাই। ইহলোকের বস্তুতেই যদি ভক্তের তৃপ্তি হইত, তাহা হইলে আর ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য অনিমেষে দেখিবার জন্য আকাঙ্ক্ষী হইতেন না। সকল দেশের, সকল কালের ভক্তদিগের এই একই কথা; সংসারে যথার্থ সুখ ও আনন্দ পাওয়া যায় না। "রসোবৈসঃ—তিনিই রস স্বরূপ।"

কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকে শব-সাধনা করিয়া থাকেন। শবের উপরে বসিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করেন। ইহার গূঢ় মর্ম্ম এই যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যে বস্তু সকল আছে, তা হতে আপনাকে বিযুক্ত করিতে না পারিলে, সংসারকে মৃতবৎ দেখিয়া তাহার উপর বসিয়া ভগবানের সাধনা না করিতে পারিলে, প্রকৃত রূপে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। শবের ন্যায় সংসারের বস্তু সকলকে দেখিতে হইবে, তবে সেই অমৃত স্বরূপকে লাভ করা যাইবে।' যদি অক্ষয় বস্তু দেখিতে চাও, তবে ইন্দ্রিয়ের অতীত রাজ্যে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে। গীতা—"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। "সকল প্রাণীর নিকটে যাহা রাত্রি সংযমী তাহাতে জাগিয়া থাকেন।" এই মৃত্যুর পরপারে অমৃত স্বরূপ বাস করিতেছেন, এখানে মরিতে হইবে, সেখানে আমরা জীবিত হইব। আকার বিশিষ্ট বস্তু নশ্বর তাহা হইতে যে আনন্দ লাভ করি তাহার তিন লক্ষণ;—(১) তাহাতে পাপ মিশ্রিত থাকে; (২) সে আনন্দ পাতলা, যতই ভিতরে যাওয়া যায় ততই ফাঁকা ফাঁকা দেখা যায়। (৩) আর তাহা ক্ষণস্থায়ী। আর ইন্দ্রিয়াতীত ঈশ্বরের চরণ হইতে যে সুখ লাভ করা যায় তাহা নির্ম্মল, গাঢ় ও অক্ষয়। ভক্তের প্রাণ এই জন্য নশ্বর শোভা সৌন্দর্য্যে তৃপ্তি মানে না; নিরাকার সত্যস্বরূপ দেবতার সৌন্দর্য্য দেখিতে ব্যগ্র হয়? কোথায় তাঁহাকে দেখা যায়। অনেক স্থলে তিনি আপনাকে দেখান। সকল পদার্থে তিনি বাস করিতেছেন। কিন্তু এ সকল যথার্থ তাঁহার রূপ নয়, এ এ তাঁহার প্রতিরূপ ছায়া।' মন্দিরে কত সময়ে কত সুখ পাই, এও বাহ্য, ছায়া। কিন্তু যথার্থ কথা, দায়ুদ বলেন "তোমার মন্দিরে তোমার রূপ দেখিব।" আমরা বাহিরের রাজ্যে তাঁহাকে দেখি কিন্তু আবার হারাইয়া ফেলি। তাঁহার নিত্যগৃহে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ের, মনের, বিজ্ঞানের রাজ্যে নয়; অতি গভীরতম সেই স্থান, যেখানে তিনি নিত্য সৌন্দর্য্যে পূর্ণ রহিয়াছেন। সেখানে তাঁহার নিত্যপদ প্রাপ্ত হইয়া ভক্ত সকল বন্ধন হতে মুক্ত হন।" হিরন্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং—হিরন্ময় পরমকোষে সেই নিরঞ্জন। সেখানে তাঁহাকে দর্শন করিতে হয়। সে বাহিরের গৃহ নয়, অন্তরের গৃহ। আমাদের আত্মাতে তার দ্বার আছে, সেখান দিয়া তিনি প্রবেশ করেন। সকল ভক্ত আপনার অন্তরের ভিতর দিয়া সেই দেশে যান। সেখানকার দর্শন শেষ হয় না। অনন্তকাল থাকে। এই নিগূঢ় দর্শনই কি সকল সাধনের উদ্দেশ্য নয়? তাঁর দর্শন হলে আর কি বাকী থাকে, সকল আশা পূর্ণ হয়। প্রকৃত ব্রহ্মকাম তাঁহাকে পাইয়া কৃতার্থ তাঁহাকে পাইয়া সুখী হন। ব্রহ্মোপাসকদিগের সকলেরই চিরদিন যেন এই প্রার্থনা অবলম্বন হয়।

অপরাহ্নে নগরসংকীর্ত্তন বাহির হয়, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইবার কথা ছিল। সুতরাং ৩টার পর হইতে সকলে তথায় গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে সমবেত হইলে প্রথমতঃ একটী সঙ্গীত হইল। তৎপরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সময়োচিত প্রার্থনা করিলেন এবং তৎপরসকলে উৎসাহের সহিত নিম্নলিখিত কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন:—

লোফা।

তোরা আয় আয় রে গাই ব্রহ্ম নাম,
সবে মিলে হৃদয় খুলে গাই রে।
নামে সুধা-সিন্ধু উথলিবে,
মোদের তাপিত হৃদয় জুড়াইবে।

খয়রা।

অমৃত সাগরে, পাইনু অন্তরে,
কেন বা হেলিনু তায়,
(মোহে অন্ধ হয়ে রে)
বিন্দু বারি তরে, কেন মরু-পরে,
ছুটিনু মৃগের প্রায়;
(আশা-মরীচিকায়)
প্রাণের পিয়াসে, সুখের লালসে,
যা কিছু ছুটিয়া ধরি;
(দিশা হারা হয়ে রে)
না ধরিতে তাই, এ কিয়ে বালাই,
অমনি পলায় সরি;
(আশায় নিরাশ করে)
বুঝিনু এখন, ব্রহ্ম সনাতন,
অমূল্য পরশমণি;
(তাঁর তুলনা নাই রে) (অতুলন প্রেম-মণি)
অনিত্য সংসারে, মরণ-মাঝারে,
সেই ত অমৃতখনি। (মৃত-সঞ্জীবন)

দশকুশি।

(দেখ) দেখরে প্রেম নয়নে, হৃদয়ে হৃদয়-ধনে রে
প্রাণ সখা প্রাণে বিরাজিত, রে
(প্রাণের প্রাণ হয়ে রে)
সে প্রেমের উৎস হতে, প্রেম ধারা এ জগতে
দশদিশে হয় প্রবাহিত।
(হৃদয় সরস করে রে) (সুবিমল প্রেমধারে)
সে প্রেমে নিজে পাসরি, সুখ স্বার্থ পরিহরি
কর কর সত্যের সাধন রে।
(হৃদয় মন সঁপে রে) (প্রেমময়ের শ্রীচরণে)
প্রেমে দিব্য জ্ঞান পাবে, বাসনা বিলয় হবে,
নিবে যাবে পাপের দহন রে।
(প্রাণ শীতল হবে রে) (প্রেমময়ের প্রেম-নীরে)

একতালা।

মন ভুলো না, কভু ভুলো না, সেই সৎ স্বরূপে ভুলো না রে;
বিষয়-মোহে ভুলে, ভবে মজো না রে,
সেই সারাৎসারে ত্যজ না রে। (ওরে অবোধ মন)
ছাড় আপনারে, প্রেমে পাবে তাঁরে,
তিনি প্রেমে বাঁধা এ সংসারে। (ও সেই প্রেমময়)

ঝুলন।

মনের সাধে, আজ সবাই মিলে দয়াল বল—
আজ গাহরে ভাই দয়াল নাম, উড়ায়ে নিশান,
গগন কাঁপায়ে কর তাঁরি গুণ গান।
আজ গাহরে ভাই দয়াল নাম অমৃতের সার,
শ্রবণে কীর্ত্তনে প্রাণে অমৃত সঞ্চার।
আজ গাহরে ভাই দয়াল নাম, এ ভবে তরণী,
সংসার জলধি যাহে অতি তুচ্ছ গণি।
আজ গাহরে ভাই দয়াল নাম, পাপী জনের আশা,
ভগ্ন হৃদয়-বাসী দয়াল এমনি ভালবাসা।
আজ গাহরে ভাই দয়াল নাম, সুখের বারতা,
ঘুচুক রে বিচ্ছেদ প্রাণে জাগুক রে একতা।
আজ গাহরে ভাই দয়াল নাম মিলায়ে হৃদয়,
আজ পাপী তাপী সবাই বল জয় দয়াময়।
মিল—ওরে কিবা মধুর এই দয়াল নাম,
সংসার-মরু-মাঝে শান্তি ধাম প্রাণারাম রে।

ক্রমে কীর্ত্তন দল বাগান ছাড়িয়া রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে গাইতে গাইতে উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা একটী ব্রাহ্ম ভবনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে, মহিলাগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। গায়কদিগের মস্তকে রাশি রাশি পুষ্প বর্ষিত হইল। সেখানে বিচক্ষণ সঙ্গীতের পর আবার সকলে অগ্রসর হইলেন। কীর্ত্তনদল ক্রমে বহুবাজার ষ্ট্রীট, আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট এবং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইয়া মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তৎপরে সকলে উপবেশন করিলে উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

১১ই মাঘ ২৩শে জানুয়ারী মঙ্গলবার।—আজ মাঘের একাদশ দিবস। আজ সেই দিন, যে দিনে চতুঃষষ্টি বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই মহা নগরীতে বিশ্ববিজয়ী ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয় নিশান প্রোথিত করিয়াছিলেন। আজ সেই দিন, যে দিনে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহাকেতু বিশ্বজনীন প্রেমের মৃদুল হিল্লোলে ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইয়া ভারতের, দেশ বিদেশের, সমগ্র জগতের পাপী তাপী নরনারীর প্রাণে শান্তিধারা বর্ষণ করিবার জন্য সকলকে ইহার দিকে সর্ব্ব প্রথমে আকর্ষণ করিতেছিল এবং দুর্ব্বল ও হতাশ্বাস ভারতবাসীর প্রাণে সর্ব্বপ্রথম বল ও আশার সঞ্চার করিতেছিল। আজ সেই দিন যে দিনের কথা স্মরণ করিলে ব্রাহ্মের প্রাণ শিহরিয়া উঠে। আজ সেই মাঘের একাদশ দিবস। আজ মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি। দশদিন ধরিয়া কুশ-সমিধ আহৃত হইতেছিল, যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মিত হইতেছিল; সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পুরোহিত পরম পুরুষ অগ্নি প্রজ্বলিত করতঃ পূর্ণাহুতির আয়োজন করিতেছিলেন। এই দিন শীতজনিত ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মগণ মন্দিরাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। একজন, দুইজন, দশজন করিয়া ক্রমে শত শত নর নারী মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। অন্ধকার যত বিদূরিত হইতে লাগিল, ততই দেখা গেল যে মন্দির লোকে পরিপূর্ণ। গায়কেরা সঙ্গীত ধরিলেন। স্থানাভাবে বহুসংখ্যক লোককে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতে হইল। আজ আচার্য্য, উপাসক সকলেরই নূতন ভাব। সকলের মুখেই আশা ও উৎসাহের জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সকলেই প্রফুল্ল। সঙ্গীত চলিতেছে কিন্তু অনেকেই উৎসুক মনে উপাসনার আরম্ভ প্রতীক্ষা করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইল। গায়কেরা এতক্ষণ সঙ্গীত করিতেছিলেন কিন্তু এখন নূতন উৎসাহে সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। তৎপরেই উদ্বোধন আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। আচার্য্য প্রথমে এই মহোৎসবে প্রবেশ করিতে হইলে কি উপকরণ লইয়া যাইতে হয় তাহার বর্ণনা করিয়া, যে মহাপুরুষদিগের আধ্যাত্মিক রক্তে ব্রাহ্মগণের জন্ম, তাঁহাদের তর্পণ করিলেন।

উদ্বোধনের সময় হইতেই উপাসকবৃন্দের ভাবোচ্ছ্বাসের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে আরাধনা ধ্যান প্রভৃতির শেষ হইলে, আচার্য্য নিম্নলিখিত উপদেশটী দিলেন।

"ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ।"

পূর্ব্বকালের মহাত্মারা ত্যাগ দ্বারাই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উপনিষদেরও পূর্ব্বে যে সকল ধার্ম্মিক লোক ছিলেন, তাঁহারা একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্বকে পাইয়া-

ছিলেন। তাই উপনিষৎকার ঋষিগণ বলিতেছেন, আমাদের পূর্ব্বের মহাত্মারা ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" মানবাত্মা তো চিরদিনই অমর; ত্যাগের দ্বারা আবার অমর হওয়ার অর্থ কি? উপনিষদে এবিষয়ে উক্ত আছে।

"যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয় স্যেহ গ্রন্থয়ঃ
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্‌

"যে সময়ে এখানে সমুদায় হৃদয়-গ্রন্থি ভগ্ন হয়, তখনই জীব অমর হয়েন; এইমাত্র উপদেশ জানিবে।" ইহার অর্থ এই, আমরা যখনই অমর, অমৃতত্ব প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিব, তখনই বুঝিবে হৃদয়গ্রন্থি হইতে মুক্ত, সমুদয় কামনা হইতে নিষ্কৃত। কিসের দ্বারা সেই সকল মহাত্মারা অমৃতত্বকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ত্যাগের দ্বারা, কেবল ত্যাগের দ্বারা। ত্যাগে নৈকে। ত্যাগ কাহাকে বলে? অর্থাৎ ছাড়া, কাহাকে ছাড়া? আপনাকে ছাড়া, স্বার্থ নাশ করা কেবল এই পথ ধরিয়া তাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে অনুভব করিতে পারা যায়, যে সকল মহাত্মার ও মহাজনের কীর্ত্তি আলোচনা করিয়া থাকি, যাঁহাদের অনুসরণ করি, তাঁহারা সকলেই এই ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব পাইয়াছিলেন। মহাত্মাদের জীবনের কয়েকটী আশ্চর্য্য লক্ষণ আছে, যাহা চিন্তা করিলে তাঁহাদিগকে আর সাধারণ মনুষ্য মনে করা যায় না। তাহার কতিপয় লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছি।

প্রথম জীবের প্রতি অপূর্ব্ব প্রেম। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা বলেন, শাক্যসিংহ মুক্তাত্মা, তথাপি তিনি যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কেবল জীবের প্রতি অনুগ্রহের জন্য। জরা-মরণের হস্তে মানবের নিগ্রহ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় এত ব্যথিত হইয়াছিল যে তাহার জন্য এই ক্লেশ বহন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টিয়ান-গণ বলেন যীশু স্বয়ং পরমেশ্বর, তিনি যে এত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া জীবন দিলেন, সে কেবল জীবানুগ্রহের জন্য। এই জীবানুগ্রহ সকল মহাত্মার লক্ষণ। এই জীবানুগ্রহের গভীরতার বিষয় চিন্তা করিলে উঁহাদিগকে আর সাধারণ মনুষ্য বলা যায় না। আমাদের প্রেমের প্রকৃতি এই যে ব্যক্তি প্রেমাস্পদ, সুন্দর, কোমল, এবং অনুরাগশীল, তাহার উপরই যায়। কিন্তু যেথানে কদর্য্যতা, দুর্গন্ধ, অসাধুতা, সেখানে আমাদের প্রেম গিয়া আলিঙ্গন করে না। বরং যে পাপী তাহাকেও প্রেম করা যায়, কিন্তু যে প্রেমের পরিবর্ত্তে অপ্রেম দেয়, কৃতঘ্ন হইয়া অপকার করে, তাহাকে প্রীতি করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নয়। সাধুদের মহত্ত্ব দেখুন, যে হস্ত আঘাত করিতেছে, তাহাকে প্রেম দিয়াছেন। ঈশা, বুদ্ধ প্রভৃতি বড় বড় নাম অন্বেষণ করিতেছি কেন, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় লিখিয়াছেন যে পৌত্তলিকতা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ এত ব্যথিত হইয়াছিল যে ইহার উচ্ছেদের জন্য অর্থ সামর্থ্য শরীর, মন, সমুদয় নিয়োগ করিয়াছিলেন। যে জাতি তাঁহাকে উৎপীড়ন করিয়াছে, নগণ্য লোকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, পাষণ্ডের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছে, অপমান করিয়াছে, তাহারই উদ্ধারের জন্য অর্থ সামর্থ্য শরীর, বল সমুদয় নিয়োগ করিলেন। ইংলণ্ডে ভজনালয়ে গেলে, উপাসনা কালে রাজার চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িত। সেখানকার উপাসকগণ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "উপাসনায় যোগ দিতে গেলে, দেশের লোকের জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়।" কি প্রেম! "যার থরতর শরে জর জর, তাহারি কল্যাণ অন্তরের ধ্যান" এ যদি মহত্ত্ব না হয় তবে আর মহত্ত্ব কোথায়? মহাত্মাদিগের প্রেম, ও জীবানুগ্রহ অসাধারণ।

মহাত্মাদিগের আর একটী লক্ষণ আশা। ঈশ্বরের উপর ও মানুষের উপর আশা অসাধারণ। ঈশ্বরের উপর আশা করা বড় কঠিন নয়। কিন্তু মানুষের উপর আশা করা বড় কঠিন। পৃথিবীর পাপ তাপ দুর্গতি ইঁহারা যেমন দেখেন অন্য লোক এমন দেখে না। ইঁহারা লোকের নিকৃষ্টতা যেমন অনুভব করেন, অন্য লোক তেমন করে না। অথচ ইহারা মানুষের উপর আশাহীন হইতেন না। যদি মানুষের উপর বিশেষ আশা না থাকিত তবে আর ধর্ম্মপ্রচার করিতেন না। বিশ্বাস না থাকিলে কি আর তাহাদের কাছে গিয়া ধর্ম্মের কথা বলিতে পারিতেন? আমরা দেখিতে পাই অনেক নরহিতৈষী লোক মানুষের পাপ ও দুর্নীতি দেখিয়া দেখিয়া তাহাদের উপর আশা ও বিশ্বাস একেবারে হারাইয়া ফেলিয়া, শেষে নরবিদ্বেষী হইয়াছেন। কিন্তু ইহাদের কার্য্য দেখ! এত দুর্গতি, এত পাপ দেখিয়াও মানুষের উপর কত আশা রাখিতেন! আবার দেখ আশা রাখিতেন কোথায়! বড় ক্ষমতাশালী, সম্ভ্রমশালী যে সকল লোক, তাহাদের উপরে কি আশা রাখিতেন? তাহা নয়। পৃথিবী যাহাদের অগ্রাহ্য করিয়াছে, সেই দুর্ব্বল, অশিক্ষিত জেলেমালার মুখের দিকে তাকাইয়া ইঁহারা কি এক আশা পাইলেন। একটী বড় বাড়ী তৈয়ারি করিবার জন্য অনেক ইট কাঠ সংগ্রহ করা হইয়াছে। মিস্ত্রীরা ভাঙ্গা ইটগুলিকে দূরে ফেলিয়া দিতেছে। তখন একজন নূতন কারিকর আসিয়া বলিলেন "ও কি করিতেছ, আসল জিনিস যে ফেলিয়া দিতেছ। ঐ ভাঙ্গা ইটগুলিই যে মজবুত ইট!" মহাজনেরা ঠিক এই রকমে, আমরা যে সকল ইট কাট অকর্ম্মণ্য বলিয়া ফেলিয়া দি, তাহাই লইয়া অট্টালিকা প্রস্তুত করেন। ইঁহাদের চক্ষু আছে, ইঁহারা আমাদের চক্ষু দিয়া দর্শন করেন না। ইঁহারা সেই ভাঙ্গা ইটের মধ্যে এমন কিছু দেখিতে পান যাহা আমরা দেখিতে পাই না। ঈশ্বরের উপর ইঁহাদের কেমন আশা। যখন চারিদিক প্রতিকূল, তখনও আশা ছাড়েন নাই। যীশুর শত্রুগণ যখন চারিদিকে বাড়িতে লাগিল, যখন তাঁহার শিষ্যদিগের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে লাগিল, তখন তিনি কয়েকজন শিষ্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "Will ye also go away?" তিনি তখন তাহাদিগকেও ছাড়িতে প্রস্তুত? তার পর ঐ বারজনও ছাড়িয়া গেল। একাকী যখন তাঁহাকে হত্যা করিতে লইয়া যায় তখনও তিনি স্বর্গরাজ্যের প্রসঙ্গই করিতেছেন।

তৃতীয় অপূর্ব্ব সাহস। এই অপূর্ব্ব সাহস অনেক মহাত্মার জীবনেই দেখা গিয়াছে। সমুদয় দেশ ও জাতি যখন প্রতিকূল, তখনও তাঁহারা নির্ভীকচিত্তে দণ্ডায়মান থাকিতেন। মহম্মদ যখন ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন দেশের সমুদয় লোক

বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। মহম্মদের খুড়া মহম্মদকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তাঁহার বিরোধীরা তাঁহার খুড়ার কাছে গিয়া বলিল "আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র এ দেশে ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত করিয়াছে। সে দেবতাদিগকে বিদ্রূপ করিতেছে। লোকদিগকে দেবতার উপাসনা হইতে নিবৃত্ত করিতেছে। সমস্ত দেশের লোক উহার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছে; কেবল আপনাকে শ্রদ্ধা করে বলিয়া এখনও কিছু করে নাই। সুতরাং আপনাকে বলিতেছি আপনি শীঘ্র উহাকে নিবৃত্ত করুন নতুবা, জানিবেন, উহার জীবন রক্ষা করা ভার হইবে। মহম্মদের খুড়া মহম্মদকে ডাকিয়া বলিলেন, "মহম্মদ আমি তোমায় বাল্যকাল হইতে প্রতিপালন করিয়াছি, এতদিন তোমাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহে রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এখন আর তোমাকে আমার পক্ষপুটে রাখা অসম্ভব হইয়াছে; আমি স্নেহের অনুরোধে বলিতেছি তুমি নিবৃত্ত হও।" মহম্মদ খুড়ার নিকটে অত্যন্ত বিনীত ভাবে কথা বলিতেন, সর্ব্বদা অবনত মস্তকে চলিতেন। তাঁহার এই অনুরোধ শুনিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "আমার এক হস্তে সূর্য্য আর এক হস্তে চন্দ্র আনিয়া দিলেও নিবৃত্ত হইব না।"

এই আশা ও সাহসের মধ্যে কি দেখা যায়? ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ,এমন একটী গুণ ইহাঁদের ছিল যাহার জন্য যে সত্য জানিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে নিজকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কে পক্ষ কে বিপক্ষ তাহা গণনা করিবার অবসর হয় নাই। তাঁহাদের মানবের প্রতি যে বিশ্বাস তাহার মূলে এই। ঈশ্বরের হাতে সমস্ত সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন, বলিয়াই মানবে এমন বিশ্বাস ও এমন সাহস। যদি মনে করিতেন সত্যের জয় পরাজয় আমার উপর নির্ভর করে, তবে নিজের দুর্ব্বলতা দেখিয়া নিরাশ হইতেন। ত্যাগের দ্বারা, আত্মসমর্পণের দ্বারা, সত্যের হাতে নিজেকে ছাড়িয়া, সেই বল পাইয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যেমন পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ সমুদয় পদার্থকে স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, তেমনি পরমেশ্বরের শক্তি ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। সে জন্য ঈশ্বরের হাতে তাঁহারা আপনাদিগকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এজন্যই তাঁহাদিগের বাসনা বিলয় হইয়াছিল। সত্যের চিন্তনে, লোকভয় ও ক্ষুদ্রাশয়তার বন্ধন সমুদায় ছিন্ন হইয়াছিল। Kuow the truth and the truth shall make you free. সত্যের প্রেমে মানুষ আপনাকে ছাড়িয়া দিলে, তবে স্বাধীন হয়। তাঁহারা সত্যে আপনাকে দিলেন বলিয়া বল, আশা, সাহস পাইলেন, নবজীবন পাইয়া সত্যের বলে বলী হইলেন। মানবের অমরত্ব ত্যাগ ভিন্ন হয় না। যদি কোন মন্ত্র জপ করিতে হয় তবে এই মন্ত্র জপ কর "ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ।" ঈশ্বরের নাম যতই করি না কেন, বার বার উপাসনা করি না কেন, ত্যাগ,—ত্যাগ,—ত্যাগ ভিন্ন অমৃতত্ব পাওয়া যাইবে না। যিনি যে পরিমাণে স্বার্থনাশে প্রস্তুত, তিনি সেই পরিমাণে ধর্ম্মলাভে ইচ্ছুক, তিনি সেই পরিমাণে অমৃতত্ব লাভের অধিকারী; নতুবা অমৃতত্ব পাওয়া যাইবে না; স্বার্থনাশের ভাব না আসিলে বড় বড় কথা ও বাহিরের সাধন মাতালের নৌকা চালান'র মত; নৌকা বাঁধিয়া রাখিয়া সারারাত্রি দাঁড় টানার মত। ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধেও সর্ব্বদা এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ধর্ম্মের কথা কি লোকের কাণের কাছে বলিলেই হইল? মনে করিলে এক মাসের মধ্যেই এই কলিকাতা সহরের সকল লোককে ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনাইতে পারি। ব্যাণ্ড বাজাইয়া, বিজ্ঞাপন দিয়া পাড়ায় পাড়ায় মিটীং করিয়া কীর্ত্তনের দল বাহির করিয়া, অতি সহজেই এক মাসের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম সহরের সকল লোকের কাছে পৌছাইয়া দিতে পারি। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনাইলেই কি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইল? প্রচারের অর্থ কি? "একমাত্র ঈশ্বরই উপাস্য, তাঁহার উপাসনা ও প্রার্থনা করা উচিত, জাতিভেদ রাখিতে নাই," ইত্যাদি কথা কয়টা শুনানই কি প্রচার! যদি এই প্রচার হয়, তবে তা কঠিন নয়। কিন্তু প্রচারের অর্থ যদি মানুষের মন বদলান হয়, ব্রাহ্ম হইয়া যাওয়া, যদি স্বার্থপরের নিঃস্বার্থ হওয়া, বিষয়াসক্তের বিষয়াসক্তি শূন্য হওয়া হয়, তবে, আপনারা বলুন দেখি, কাজে তাহা হইতেছে কি না? দুজন লোকের মন বদলাইবার ভার দিলে আমি নাচার। এই পনর বৎসরের মধ্যে আমি তো অনেক বক্তৃতা করিয়াছি, অনেক উপদেশ দিয়াছি, ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই গিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম শুনাইয়া আসিয়াছি। কিন্তু ভাই রে, ক'জনের হৃদয় বদলাইয়াছি? যদি কাহারও হৃদয় বদলাইবার সাহায্য হইয়া থাকে তবে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, তবে মনে করি, আমার প্রচারক হওয়া সার্থক হইয়াছে। দশ জন লোকের যদি হৃদয় বদলাইয়া থাকে তবে জীবন সার্থক মনে করি। কিন্তু দশ হাজার লোক যে আমার বক্তৃতা শুনিয়াছে, তাহাতে প্রচার হয় নাই। যদি পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া দেওয়া, হৃদয় পরিবর্ত্তন হওয়া প্রচার হয়, তবে দেখ সে প্রচারক কে আছে! বক্তৃতা বেশ করিতে পারিব, আধ্যাত্মিক বিষয়ের কূট প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা কর, বেশ পরিষ্কার মীমাংসা করিয়া দিব; যদি জিজ্ঞাসা কর "যোগ কাহাকে বলে?" তবে বেশ বুঝাইয়া দিতে পারিব। কিন্তু ভাই, আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, আমার যোগ কতটা হইয়াছে, তবে যে লজ্জা পাই। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার কি কথায় হইবে? যদি দেখ যে ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য স্বার্থনাশ করিতে প্রস্তুত, ইহার জন্য কিছু stake করিতে প্রস্তুত, তবে আমি বলি, তাহার দ্বারা প্রচার হইবে। যদি নিজের স্বার্থ, সুখের পথটী বেশ পরিষ্কার রাখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে যাও, সে রকম করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইবে না। রেখে দাও ও বক্তৃতা; স্বার্থনাশ, স্বার্থনাশ, স্বার্থনাশ—ত্যাগেনৈক,—ত্যাগ হইলেই হয়। ইহার দৃষ্টান্ত জগতে যথেষ্ট। শিখ ধর্ম্মের এত প্রতাপ হইল কেন? শিখদিগের দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ একবার শিখধর্ম্মের উন্নতি চিন্তায় নির্জ্জন পর্ব্বতে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। কিছুদিন পরে আসিয়া সকল শিখকে সমবেত করিয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে লইয়া বলিলেন—"দেবীর এই আদেশ হইয়াছে—শিখধর্ম্মের রক্ষার জন্য একশত মানুষের মাথা চাই; কে শির দিবে এস; আমি এই তরবারিতে তাহার মাথা কাটিয়া দেবীর কাছে লইয়া যাইব।" এই বলিয়া বারম্বার চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগি-

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১ই ফাল্গুন প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

২০শ সংখ্যা।
১৬শ ভাগ।

১লা ফাল্গুন, সোমবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

মাঘোৎসব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কিন্তু কেহই অগ্রসর হইল না। তখন গোবিন্দ সিংহ বলিলেন "আচ্ছা, একশত জন না হউক, পঞ্চাশ জন এস।" পঞ্চাশ জনও আসিল না। তখন তিনি দুঃখিত হইয়া বলিলেন "শিখ ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে পারে এমন পঁচিশ জন লোক কি নাই? এস, পঁচিশ জনও এস"। তখনও কেহ অগ্রসর হইল না। তখন নিরাশ হইয়া গুরু গোবিন্দ সিংহ বলিলেন "দশজন, দশজন,"। তখনও কেহ আসিল না। তখন গোবিন্দ সিংহ বলিলেন "দশজন না হয় পাঁচ জন এস।" যখন পাঁচজনও আসিল না, তখন গুরুগোবিন্দ অস্থির হইয়া উঠিলেন। নিরাশায় উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন "শিখধর্ম্মের জন্য মাথা দিতে পারে এমন একজন লোকও কি নাই? শিখধর্ম্ম গেল যে! শিখধর্ম্মের রক্ষার জন্য কেহ কি প্রাণ দিতে পার না?" তখন একজন সরলমতি জাঠ দণ্ডায়মান হইল। গুরু গোবিন্দ সিংহের ন্যায় লম্ফ দিয়া তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। নিকটে এক তাঁবু ছিল, তাহার মধ্যে লইয়া গিয়া তাহাকে সুসজ্জিত পালঙ্কে বসাইলেন, বসাইয়া তাহার পদধূলি লইলেন। তাঁবুর ভিতরে তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া একটা পাঁঠা কাটিলেন, তাহার রক্ত গড়াইয়া তাঁবুর বাহিরে চলিল। তখন সেই রক্তাক্ত তরবারি হস্তে লইয়া বাহিরে গিয়া বলিলেন "আর চারি জন চাই, আর চারি জন হইলেই হইবে।" সমবেত লোকেরা সেই রক্তাক্ত তরবারি ও সেই রক্তের ধারা দেখিয়া অনুমান করিল সেই ব্যক্তিকে কাটা হইয়াছে। এইবার গুরুগোবিন্দ সিংহের আহ্বান শুনিয়া আর একজন অগ্রসর হইল, তাহাকেও ঐরূপ চুলে ধরিয়া তাঁবুর ভিতরে লইয়া পালঙ্কে বসাইলেন তাহারও পদধূলি লইলেন, এবং আগের বারের মত আর একটী পাঁঠা কাটিলেন। এইরূপে পাঁচ বার গেলেন, পাঁচবারে পাঁচজন লোক তাঁহার আহ্বানধ্বনি শুনিয়া জীবন দিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি তাঁবুর ভিতরে সেই পাঁচ জনকে একত্র করিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন ও বলিলেন "আজ হইতে তোমরা প্রত্যেকে গুরুগোবিন্দ সিংহ, আজ হইতে আমরা ছয় জন গুরুগোবিন্দ সিংহ হইলাম।" এই ছয় জন গুরুগোবিন্দ সিংহের দ্বারাই শিখধর্ম্ম জীবন পাইল। এই ছয় জনের জীবনই সমগ্র শিখমণ্ডলীর মধ্যে জীবন উৎপন্ন করিল। তাই বলি স্বার্থনাশ না হইলে শক্তি জাগে না। আমি অনেক দিন বসিয়া চিন্তা করিয়াছি, খ্রীষ্টধর্ম্মের জয় কিরূপে হইল? এ প্রশ্ন আজও আমায় ভালরূপে মীমাংসা হয় নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয় কালে দেখিতে পাই, দুইটী প্রবল পরাক্রান্ত শক্তি ইহার প্রতিকূলে ছিল—এক গ্রীসের সভ্যতা, আর এক, রোমের রাজশক্তি। এত বড় দুইটী শক্তিকে কিসে পরাস্ত করিল? শক্তি ছাড়া শক্তিকে অন্য কিছুতে বাধা দিতে পারে না। কোথায় সে শক্তির জন্ম, যাহা এই দুইটী পরাক্রান্ত শক্তিকে বাধা দিতে ও জয় করিতে সমর্থ হইয়াছে? বাইবেলে এই প্রশ্নের উত্তর কি নাই? এই দেখিতে পাই যে খৃষ্টের শিষ্যগণ নিঃস্বার্থতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তখন যে খ্রীষ্টান হইত, তাহারই যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সাধারণ ধনভাণ্ডারে দিতে হইত। আজ যদি ব্রাহ্মসমাজে নিয়ম করা যায় যে আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ দিতে হইবে, নতুবা ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্য হওয়া হইবে না, তবে কেমন সভ্য হয় দেখি? তার পর এই নিঃস্বার্থতা পদে পদে। প্রেরিতদিগের বিরুদ্ধে একবার অভিযোগ হয় যে বিধবাদের সমুচিত পরিচর্য্যা হইতেছে না। তাঁহারা কি এই অভিযোগ শুনিয়া অভিমান করিলেন? তাহারা কি বলিলেন কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা, যাহারা ঈশ্বরের প্রেরিত, তাহাদের নামে আবার অভিযোগ?" তাহা করিলেন না। সমুদয় মণ্ডলীকে ডাকিয়া সমবেত করিলেন; বলিলেন "আমরা বাস্তবিকই এই কাজ করিতে পারিয়া উঠিতেছি না; তোমরা লোক পছন্দ করিয়া দেও।" এই কথা শুনিয়া সমুদয় অপ্রেম ও অভিযোগ নির্ব্বাণ হইল। ইহাঁদিগের স্বার্থ বিনাশ পদে পদে। ইহাতেই তো শক্তি জাগিয়া উঠিল। ব্রাহ্মসমাজ যে এতদিন জাগিয়া আছে তাহার কারণ কি? তাহার কারণ কি এই যে তুমি আমি ও আর দশজনে বক্তৃতা ও উপদেশের দ্বারা ইহাকে রক্ষা করিতেছি? তাহা নয়; যে দু একজন লোক ইহার জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের সেই ত্যাগের ফলেই ইহা এতদিন বাঁচিয়া আছে। রাজা রামমোহন রায় যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন সহরের অনেক বড়লোক তাঁহার সঙ্গে জুটিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন রাজার এ সম্বন্ধে একটা Policy ছিল। তিনি বড় লোকদিগকে হাতে রাখিতেন। কিন্তু বড় লোক তো অনেক জুটিয়াছিল, তাহাতে কি হইল? তাহারা কি ব্রাহ্মসমাজ রাখিয়াছে? রাজা যখন ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন, তখন আর তাদের উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

কিন্তু একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন যিনি শ্মশানে প্রদীপ জ্বালিয়া বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করিতেছিলেন—তাঁহার জীবনের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ জীবিত রহিল। তাঁহার জীবন স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত। আর তারপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যিনি ইচ্ছা করিলে বড় লোকদের মধ্যে নিশ্চয় স্থান পাইতে পারিতেন, যিনি ইচ্ছা করিলে আজও British Indian associationএর secretary থাকিতে পারিতেন—একজন রাজা মহারাজা হইতে পারিতেন—তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখ! তিনি প্রাণ দিয়া ব্রাহ্মসমাজকে ধরিলেন, অর্থ, সামর্থ্য, সমুদয় ইহার জন্য নিয়োগ করিলেন। তারপর কেশবচন্দ্র—ইনি ইচ্ছা করিলে টাকশালের দেওয়ান হইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রাহ্মসমাজকে প্রাণ দিয়া ধরিলেন। তাঁহার সঙ্গের প্রচারকগণ প্রত্যেকে নিজের নিজের স্বার্থ ও সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে রাখিয়াছেন। সেই জন্যই বলি, "ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশু:—" এই স্বার্থ নাশ ব্যতীত শক্তি হইবে না, বাসনা বিলয় হইবে না। যার যত স্বার্থনাশ, তার ততটা শক্তি জাগিবে। ভাল কথা শাস্ত্রে ঢের আছে, তুমি বিশ পঁচিশ বৎসর বক্তৃতা করিয়া তাহার বেশী কিছু বলিতে পারিবে না। কিন্তু সত্যকে জীবন দিয়া ধরা চাই। প্রাণ দিয়া না ধরিলে সত্যের শক্তি হয় না। বিধাতা ব্রাহ্মসমাজের উপর এই ভার দিয়াছেন, সত্য মুখে বলা নয়, সত্যকে জীবন দিয়া ধরা। "অমূল্য রতন, অমূল্য রতন" তো কত বলিয়াছি। রত্ন কি বুঝিতেছি? ব্রাহ্মধর্ম্মকে রত্ন বলিয়া কি বুঝিতেছি। ইহা কি এমন জিনিস হইয়াছে, যে জন্য আপনাকে দিতে পারি? ব্রাহ্মসমাজে তো অনেক যুবক যুবতী আছেন, সকলেই কি সংসারের পথে চলিবেন? তোমরা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াও কি সকলেই—সকলেই—সংসারের পথে চলিবে? ব্রাহ্মসমাজকে প্রাণ দিয়া কি একজনও ধরিবে না? কেবল দৃষ্টান্ত শুনাই সার হইল? আমরা অহঙ্কার করিয়া যাহাদের সম্বন্ধে বলি যে তাহারা উপধর্ম্মের সেবা করে, তাহারা তো তাহাদের ধর্ম্মের জন্য জীবন দিতে পারে, আর আমরা পারি না? সত্যের জন্য প্রাণ দিতে পারে এমন কি কেউ নাই? একটু স্বার্থ ছাড়িলে কি জীবন সার্থক হয় না? শরীরের শক্তি কত বৃথা কাজে যাইতেছে, ঈশ্বরের সেবায় গেলে কি সার্থক হয় না? তিনি কি এতটুকুও প্রিয় নন? তবে কি প্রচার করি? কি উৎসব করি? প্রভু পরমেশ্বর আজ লজ্জা দিন, লজ্জা দিন। সত্যে প্রাণ না দিলে স্বাধীন হইব না। তবে এই প্রার্থনা করি। আজ উৎসবের দিনে হৃদয় দেখি, কতটুকু ছাড়িতে প্রস্তুত। বড় বড় কথা সকল আমাদের বলা আর ভাল দেখায় না। এসকল কথার গুরুত্ব গেল. আমাদের হাতে পড়িয়া কথাগুলির গুরুত্ব গেল। "স্বার্থনাশ" "স্বার্থনাশ" বলিয়া কথাটার গুরুত্ব গেল। ছোট ছোট স্বার্থ ছাড়ি দেখি। তিনি এই প্রতিজ্ঞার উদয় করিয়া দিন যে ছাড়িব। নতুবা তাঁহার ধর্ম্মের শক্তি জাগিবে না।

প্রায় দশটার সময় উপাসনা শেষ হইল। কিন্তু তখনও সঙ্গীত, কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। আজ আর কাহারও ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করে না। ১টার সময় আত্মচিন্তা আরম্ভ হইল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে অল্প সময়ের জন্য সঙ্গীতাদি বন্ধ নাই। ২ ঘটিকা হইতে পাঠব্যাখ্যা ইত্যাদি চলিতে লাগিল। মধ্যাহ্ন আত্মচিন্তার সময় মন্দিরে বেশী লোকের সমাবেশ ছিল না। কিন্তু পাঠব্যাখ্যার সময় হইতে আবার মন্দিরাভিমুখে জনস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। অপরাহ্ন ৪টার সময় মন্দির পূর্ণ হইয়া উঠিল।

প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় নানা শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধার করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, তৎপরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপনিষদের কয়েকটী শ্লোক পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। তারপর তিনি ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রেরিত একটী উপদেশ পাঠ করিলেন। মহর্ষি তাহার অসুস্থতা বশতঃ স্নেহাস্পদ ব্রাহ্মগণের সহিত মিলিত হইয়া মাঘোৎসব সম্পন্ন করিতে পারেন না। এই জন্য তিনি উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহা পাঠ করিয়া সেই কয়টী কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয় সকলকে অনুরোধ করিলেন। উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ওঁতৎসৎ

আয়ুষ্মন্!

ঈশ্বর তোমার কল্যাণ সাধন করুন। তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া কুশলে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কর। হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রস্ফুটিত করিয়া দিনান্তে নিশান্তে তাঁহার পূজা কর। তাঁহার নিকটে অনুক্ষণ শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম্মবল প্রার্থনা কর—তিনি "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং," তাঁহাকে ভয় কর, তবে আর লোকের ভয় থাকিবে না। "রসো বৈ সঃ," তিনি স্নেহের আকর, প্রেমের সাগর—তাঁহাকে প্রীতি কর, তাহা হইলে সকলের প্রিয় হইবে। বিপদে পড়িয়া, রোগে শোকে কাতর হইয়া তাঁহার নিকটে ক্রন্দন কর, তিনি তোমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন, তোমার অশ্রুজল মার্জ্জনা করিবেন। পাপে পতিত হইলে সেই পতিতপাবনের নিকট সন্তপ্তচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা কর—এমন কর্ম্ম আর করিব না, এই কথা মনের সহিত বল—তাহা হইলে তিনি তোমাকে ক্ষমা করিবেন—পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। যখন সম্পদের হিল্লোলে বিচরণ করিবে, তখন তাঁহাকে ভুলিও না। সেই সময়ে তোমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা তাঁহার সিংহাসনের প্রতি উত্থিত হউক। তাহা হইলে আপনার ক্ষমতার প্রতি আর অভিমান থাকিবে না। তোমার প্রতি আমার এই উপদেশ, তোমার প্রতি আমার এই আশীর্ব্বাদ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অদ্যকার ভাব লিখিয়া বর্ণনা করা যায় না। না দেখিলে প্রাণ তৃপ্ত হয় না। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইরূপ চলিল। সন্ধ্যার পর সান্ধ্যোপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। এসময় মন্দিরে কিছু

মাত্র স্থান ছিল না। অনেকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। বহুলোকের সমাগম হওয়াতে মন্দিরের এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল। অতি উৎসাহে ও আনন্দের সহিত উপাসনা শেষ হইল। উপাসনার পর শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার চৌধুরী সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। দীক্ষান্তে আচার্য্য নিম্নলিখিত উপদেশটী প্রদান করিলেন।

"আজ যাঁহারা প্রকাশ্যরূপে এই মাঘের ১১ দিবসে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের জীবনে ইহা একটী সুমহৎ ও অতি গুরুতর ব্যাপার। ইহা গ্রহণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের মস্তকে একটী গুরুতর দায়িত্ব লইতেছেন। যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন সে ধর্ম্মের প্রতি আমাদের দেশের লোকের কিরূপ ভাব তাহা তাঁহারা বিশেষ অবগত আছেন। এই ধর্ম্মের, এই ব্রাহ্মসমাজরূপ আন্দোলনের বিরুদ্ধে দেশের শত শত লোক খড়্গহস্ত। দেশের প্রচলিত মত, বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ড এবং যে সকল কুসংস্কার দেশমধ্যে প্রচলিত আছে, তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া আমরা দেশের লোকের দ্বারা ঘৃণিত ও অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়াছি। হে ভাই, হে ভগ্নি, এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমাজের লোকের নিকট প্রীতিলাভ করিবে, আশা করিও না। এখন একমাত্র লোকের ঘৃণা ও অত্যাচার সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু হৃদয়নিহিত বিবেক, পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ বাণী অনুসরণ করিয়া চলিবার চেষ্টা করিবে। লোকের নিন্দা বা প্রশংসার দিকে দৃষ্টি করিবে না। সত্যেই জীবন, আজীবন সত্যকে ধারণ করিয়া তোমাদের নিজ নিজ বিবেকের অনুসরণ কর। লোকের নিন্দা কয় দিনের জন্য, আমরা কয় দিনের জন্য এ সংসারে আসিয়াছি। সত্যের জন্যই জীবন, সত্যই গম্যস্থান। নিন্দা বা প্রশংসা কিছুই নয়। পরমেশ্বর লক্ষ্য। তিনিই সহায়। জয় পরমেশ্বরের জয়। কিছু ভয় নাই। মানুষ কিছুই নয়। মানুষ কীটাণুকীট। আজ যদি প্রচলিত ধর্ম্মের, মিথ্যা কুসংস্কারের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহার গুণকীর্ত্তন করি দেশের লোক কত আদর করিবে। কিন্তু সে আদর অভ্যর্থনা আমরা চাই না। দূর হউক কুসংস্কার, দূর হউক পৌত্তলিকতা।

পরমেশ্বরের কৃপায় সকল প্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মধর্ম্ম যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। যে দিন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ভারতে এই মহাযুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন আজ সেই মহাদিন। সেই যুদ্ধে যাঁহারা যোগদান করেন তাঁহারা সব সৈনিক, তোমরাও সৈনিক হইয়া আজ এই মহাযুদ্ধে যোগদান করিতেছ। প্রাণপণে যুদ্ধ কর। শুধু বাহিরের সহিত যুদ্ধ করিলে চলিবে না। আমাদের অন্তরে বাহিরে শত্রু। বাহিরের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যেমন যুদ্ধ করিবে, ভিতরের পরম শত্রু রিপু কট'র সহিতও প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিবে। আমার মনে হয় বাহিরের শত্রু অপেক্ষা অন্তরের শত্রুই অধিকতর প্রবল। হে ভাই, হে ভগ্নি, এবং সমাগত ব্রাহ্মবন্ধুগণ, তোমরা এই যুদ্ধে বিশেষ মনোযোগী হও। জয় প্রভু পরমেশ্বর, তোমারই জয়। তুমিই আমাদের যুদ্ধের সেনাপতি। আমাদের অন্তরে বাহিরে যুদ্ধ। তুমি সহায় হও।

এই পৌত্তলিকতা এবং অশেষ প্রকার সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ দণ্ডায়মান হওয়াতে কত প্রকার বিদ্রূপের পাত্র হইয়াছি। কিন্তু আমরা ওসব গ্রাহ্য করি না। জানি সত্য আমাদের পক্ষ। সুতরাং সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর আমাদের পক্ষ। আমরা নিন্দা বিদ্রূপ গ্রাহ্য করি না। তোমরা বীরের ন্যায় ধর্ম্মজীবন যাপন কর, নিন্দা প্রশংসা কিছুই গ্রাহ্য করিও না।

এই যে মহাযুদ্ধ, ইহা প্রেমের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে কেমন করিয়া যোগ দিতে হয়? যাঁহারা আমাদিগকে বিদ্বেষ করিবেন আমরা তাঁহাদিগকে প্রেম করিব। যাঁহারা আমাদের নিন্দা করিবেন, আমরা তাঁহাদের সদ্গুণের কথা বলিয়া তাঁহাদের প্রশংসা গান করিব। তাঁহারা গালি দিবেন, আমরা বলিব "হে পরমেশ্বর, তুমি তাঁহাদের কল্যাণ কর।" এ যুদ্ধে নিন্দার পরিবর্ত্তে প্রশংসা, গালির পরিবর্ত্তে কল্যাণ প্রার্থনা, প্রহারের পরিবর্ত্তে প্রেমালিঙ্গন; এই সকল অস্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে। যীশু এ সম্বন্ধে কি উপদেশ দিয়াছেন তাহা সকলেই জানেন। "তোমার দক্ষিণ গণ্ডে কেহ চপেটাঘাত করিলে তোমার বাম গণ্ড তাহাকে ফিরাইয়া দাও।" ইহা কি বাড়াবাড়ি উপদেশ? না, এ উপদেশ না মানিলে এ যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই। "মারলি তুই কলসির কাণা, তাই ব'লে কি প্রেম দিব না?" জয় হইল কার, পাপের না পুণ্যের? মার খাইয়া প্রেম দেওয়া হইল বলিয়াই ত পুণ্যের জয় হইল—মহাপাপীর উদ্ধার সাধন হইল। যদি বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে বিদ্বেষ, চপেটাঘাতের পরিবর্ত্তের চপেটাঘাত, এই যুদ্ধের অস্ত্র হয়, তাহা হইলে, হে ব্রাহ্মগণ, জানিও ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে না। সকল ঘৃণা, সকল অত্যাচার প্রেমের খাতিরে সহ্য করিতে হইবে। প্রেমের স্রোতে সমুদায় ভাসিয়া গেল এই যখন লোকে দেখিবে, তখন অবনত মস্তকে তাহারা সত্য গ্রহণ করিবে, পুণ্যের পথ অবলম্বন করিবে, তখনই যুদ্ধে জয়লাভ হইবে।

আমরা কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা পরিহার করিয়াছি। "ন তস্য প্রতিমা অস্তি।" আমরা ভালই করিয়াছি। কিন্তু আজ এখানে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের সকলকেই জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইহা অপেক্ষা কি অধিকতর পৌত্তলিকতা নাই? এমন লোক কি দেখি না যে পৌত্তলিক ক্রিয়া করে না—অথচ এই রিপু কয়টার দাস, স্বার্থপরতার দৃঢ় রজ্জুতে বদ্ধ। ইট কাট দিয়ে যে দেবতা গড়া হয় তাহার পূজা ছাড়িয়াছে, কিন্তু তামা রূপার দেবতার পূজা ছাড়িতে পারে নাই। ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর পৌত্তলিকতা—রিপুর পূজা, স্বার্থপরতার পূজা। পিতা মাতার বক্ষে শেল বিদ্ধ করিয়াছ, কিন্তু তোমার পৌত্তলিকতা ত যায় নাই।

আজ প্রাতঃকালে ভক্তিভাজন আচার্য্য যে উপাসনার সময় বলিয়াছেন তাহা ঠিক—খাতায় নাম লিখাইলেই ব্রাহ্ম হয় না। এই বাহ্যিক পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়াছ সত্য, কিন্তু যদি আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা না গেল তবে মা বাপ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া কি হইবে? সাবধান, হে ভাই, হে ভগ্নি, সাবধান। বাহ্যিক পৌত্তলিকতা অপেক্ষা

অধিকতর পৌত্তলিকতা আছে। চিত্তশুদ্ধি, ক্ষমা, স্বার্থত্যাগ চাই। এই চিত্তশুদ্ধি—নির্ম্মল হওয়া—অতি কঠিন। আমি অনেক দিন ব্রাহ্ম হইয়াছি কিন্তু যতই দিন যাইতেছে, ততই দেখিতে পাইতেছি এই রিপু কটা দমন করা কি কঠিন। এই যে বাহিক পৌত্তলিকতা ছাড়িয়াছি ইহার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের পৌত্তলিকতা ত যায় নাই। ইহা বড়ই কঠিন। এই যে ভিতরের রিপু কয়টা, ইহাদের বিনাশ করি কেমন করিয়া? তবে কি কোন উপায় নাই? আমি আর কিছু জানি না। ইহা কেবল তাঁরি কৃপা। আমি অনেক দেখিলাম আর কিছুতেই হয় না। কেবল একান্তচিত্তে তাঁর প্রার্থনা। তাঁহার সাধনা ভিন্ন হইবে না। যীশু বলিয়াছেন,"Pray without ceasing না থেমে অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর।" ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। ইহাতেই নির্ম্মল হইতে পারিব। জয়ডঙ্কা বাজাইয়া খবরের কাগজে প্রচার করিলেই ধর্ম্ম হয় না। তাহাতে অন্তরের বিষ ত যাবে না। অহরহ সেই বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিবে। এই বন্ধন, কিছুতেই যাইবে না। নম নম করে ধর্ম্ম হইবে না। তাহাতে জগতের লোক ভুলিবে, কিন্তু ভিতরের শত্রু যেমন তেমনই থাকিবে। আমি একজন পুরাতন ব্রাহ্ম অনেক বক্তৃতা করিয়াছি, অনেক গলাবাজি করিয়াছি। যখন প্রাণের ভিতর প্রবেশ করি, দেখি জ্বালা যায় না। যখন প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকি তখনই যাতনা ভুলিয়া যাই। ব্রহ্ম-সাগরে ডুব দাও, নতুবা এই অন্তরের যাতনা আর কিছুতেই যাইবে না। প্রাণ দিয়া ধর্ম্ম করা চাই,—অর্দ্ধেক হইলে চলিবে না। স্বামী চায় স্ত্রী প্রাণ দিয়া তাঁহাকে ভাল বাসুক। যিনি জগতের স্বামী তিনি কি চান? সংসারের ভাবে নয়, আধ্যাত্মিক ভাবে বলি, তিনিও বলিতেছেন, ঐ ষোল আনা প্রাণ দেওয়া চাই। বাইবেলে আছে "God is a jealous God." তিনি হিংসুকে পরমেশ্বর। আমরা আমাদের প্রাণের খানিকটা তাঁহাকে দি আর খানিকটা রিপুসেবা এবং স্বার্থ-পরতায় পরিপূর্ণ করিয়া রাখি, তাহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তিনি ঐ ১৬ আনাই চান। যীশু বলিয়াছেন, "সমুদায় প্রাণ মন দিয়ে তোমার প্রভুকে ভাল বাস।" সমুদায় কাজের মধ্যে তাঁহাকে দেখা চাই, দশটা কাজের মধ্যে তাঁহার উপাসনা একটা, এরূপ করিলে চলিবে না। সকল কাজ তাঁহার, তিনিই সব। এই ভাবে হৃদয়কে প্রস্তুত কর। গৃহে বসিয়া সন্ন্যাসী হইতে গেলে সম্পূর্ণ রূপে তাঁহাকে প্রাণ দেওয়া চাই। সকল কার্য্যেই তাঁহাকে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করা চাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে ভাবে চলিতেছেন সে ভাবে হইলে চলিবে না। হে প্রভু, আমরা যে ভাবে চলিতেছি এ ভাবে হইলে ত ধর্ম্মসাধন হইবে না। আমরা সংসারের সেবা করিতেছি, আমাদের দিনটা চলিয়া যাইতেছে। এ ভাবে হইলে চলিবে না। প্রাণ দিতে হইবে। সকল দেশের সাধুগণের এই একই কথা। বিদেশীয় সাধু যীশু বলিয়াছেন; "যারা পরমেশ্বরের জন্য প্রাণ দেয় তারা প্রাণ পায়।" উপনিষদে একটী আখ্যায়িকা আছে। আপনারা আখ্যায়িকাটীর খোসা ফেলে শাঁস গ্রহণ করুন। আখ্যায়িকাটী এই,—একবার এই মহাযজ্ঞের আয়োজন হয়। চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি মানবদেহের বৃত্তিসমূহ এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞের মন্ত্র, "অসতোমা সদ্গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, ... ইত্যাদি।" প্রথমতঃ যজ্ঞের হোতা হইল চক্ষু। চক্ষুর বড় অহঙ্কার। সে মনে করিল আমি কত কি দেখি, আমি না থাকিলে সমুদায় জগত অন্ধকারময় হইত। চক্ষুর এই অহঙ্কার হওয়াতে যজ্ঞ পণ্ড হইল। তৎপরে কর্ণ আসিল, তাহারও এইরূপ অহঙ্কার হওয়াতে যজ্ঞ পণ্ড হইল। ক্রমে ক্রমে রসনা প্রভৃতি অপরাপর বৃত্তিসমূহ আসিলেন। তাঁদেরও যজ্ঞ পণ্ড হইল। কি হইবে, সিদ্ধিলাভ যে হয় না। একজন বাকী ছিলেন। তিনি কে? তাঁহার নাম প্রাণ। শেষে প্রাণ গেলেন। তাঁহার অহঙ্কার হইল না। তিনি সিদ্ধিলাভ করিলেন। এই সামান্য গল্পটীতে কি মহৎ উপদেশ রহিয়াছে। চক্ষু, কর্ণ, রসনা, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ অহঙ্কারেই মত্ত, যজ্ঞসিদ্ধি হইবে কেন? যখন প্রাণ যায় তখনই হয়। "হে প্রভো, "অসতোমা সদ্গময়, ইত্যাদি" কাণ, চক্ষু রসনা কতবার বলিল, কিছুই হইল না। যখন প্রাণ গিয়াই বলে তখনই হয়। কেন হয়? প্রাণের কোন স্বার্থ নাই। প্রাণ সকলের জন্য আত্ম-বলি দিতে প্রস্তুত। মস্তকের কেশ হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত প্রাণ পরের জন্য দিতে প্রস্তুত। প্রাণ কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। নিস্বার্থ প্রাণ যখন প্রার্থনা করে "অসতোমা সদ্গময়, ইত্যাদি" তখনই প্রকৃত প্রার্থনা হয় এবং তাহা সুসিদ্ধ হয়। নাক মুখ চোক প্রার্থনা করিলে কি হইবে। সাধক যতক্ষণ কথার সাধক ততক্ষণ তাহার সাধনা হয় না। যখন প্রাণ দিয়া করে তখনই হয়। বড় বড় শক্ত শক্ত কথা বলিয়া সাধন করিলেই হয় না। প্রাণ না দিলে হইবে না। পরিবারের মধ্যে সবাই খাইতেছে সবাই পরিতেছে। যদি একজন এমন থাকে যে কেবল অন্যের সুখের জন্যই ব্যস্ত আর সকলে কেমন করিয়া সুখে থাকিবে, এই যাহার চিন্তা, যে সকলের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী, সেই পরিবারের প্রাণ। প্রাণের স্বভাব স্বার্থত্যাগ। আমাদের ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ কে হইবে। যে স্বার্থ ভুলিবে, অপরের জন্য খাটিবে তাহাকেই প্রাণ বলিব। যিনি নিঃস্বার্থ হিতৈষী, দেশের মধ্যে, জাতির মধ্যে তিনিই প্রাণ। ব্রাহ্ম-সাধনে পরের জন্য প্রাণ দেওয়া চাই। যদি প্রবল শত্রু আসিয়া বলে "তোমার ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রাহ্মসমাজ, ছাড়িতেই হইবে নতুবা এই তরবারির দ্বারা তোমার মস্তক কাটিয়া ফেলিব। এই জ্বলন্ত আগুনে তোমায় দগ্ধ করিয়া মারিব।" যদি আমি তরবারীতে প্রাণ দিই, চিতানলে পুড়ে মরি, তাহা হইলে প্রাণ দেওয়া হইল। যদি বল মরিতে হয় মরিব, তবুও সত্য ছাড়িব না, তাহা হইলেও প্রাণ দেওয়া হইল। "শির দিয়া শির নাহি দিয়া।" এ এক রকম প্রাণ দেওয়া। আর এক রকম প্রাণ দেওয়া আছে যাহা প্রতিদিন দিতে হয়। প্রতি পদক্ষেপে পরের সুখের জন্য তোমার প্রাণটী দিতে হইবে। দরিদ্রতার কশাঘাতে ছট ফট করিতেছ। তবু অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করাকে ঘৃণা কর, ভগবানকে প্রাণটী একেবারে দিয়া ফেলিয়াছ, দরিদ্রতা আসুক, সুখ আসুক দুঃখ আসুক, সকল অবস্থাতেই তোমার প্রাণ ভগবানের দিকে। এই যে প্রতিদিনের আত্ম বলিদান,

এ বড় ভয়ঙ্কর প্রাণদান। হে ব্রাহ্মগণ, তোমাদিগকে এই প্রাণদান করিতে হইবে। যদি পার তবে ভাল, নতুবা কিছুই হইল না। প্রতিক্ষণে পরের সুখের জন্য আত্মবলি দিতে হইবে।

উপাসনা শেষ হইলেও প্রায় রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত সকলে ভাবে বিভোর হইয়া কীর্ত্তন করিলেন। এইরূপে ব্রাহ্ম ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ ১১ই মাঘের মহোৎসব সম্পন্ন হইল।

১২ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী, বুধবার—আজ সাধনাশ্রমের উৎসব। গত বৎসর এই দিনে ভক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিচারকগণকে শুভাশীর্ব্বাদ করতঃ সাধনাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এক বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে ব্রহ্মকৃপা অজস্রধারে ব্রাহ্মসমাজের উপর বর্ষিত হইয়াছে। ১১ই মাঘের ন্যায় এই দিনটীও ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। ওয়ার্কারগণ অতি প্রত্যূষে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে দুই একটী ব্রাহ্ম বাটীতে গমন করেন। তদনন্তর সকলে মন্দিরে সমাগত হইয়া যতক্ষণ রজনীর অন্ধকার ছিল ততক্ষণ সংকীর্ত্তন করেন। প্রাতঃসূর্য্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইলে মন্দিরে বহুলোকের সমাগম হইল। অনেকেই ইহার পূর্ব্বে আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন। গত বৎসর যে অজস্রধারে ব্রহ্মকৃপা-বৃষ্টি হইয়াছিল, ওয়ার্কারগণ তাহার সমুহ সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভগবদিচ্ছার অধীন হইতে পারেন নাই, সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ, নিজত্ব নাশ করিতে পারেন নাই বলিয়া, ক্ষোভ অনুতাপে দগ্ধ হইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন এবার কি আবার সেইরূপ কৃপাস্রোত প্রবাহিত হইবে—আবার কি আমরা সেই স্রোতে ভাসমান হইয়া জন্মের মত স্বার্থপরতার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিব। এইরূপে তাঁহাদের হৃদয়ে যুগপৎ ক্ষোভ,অনুতাপ,আশা ও বিস্ময়ের তরঙ্গ উঠিতেছে, এমন সময়ে পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুসারে একজন গাইয়া উঠিলেন, "শোন রে শোন রে তাঁর বাণী।" গত বৎসর এই মহাসঙ্গীতের মহাশক্তিশালী বাক্যে সকলের হৃদয়ে তাড়িতপ্রবাহ ছুটিয়াছিল, এবার কি কিছুই হইবে না? অবশ্যই হইবে। এই কীর্ত্তনটী গাহিতে গাহিতে অনেকে মাতিয়া উঠিলেন। ওয়ার্কারদের অনেকের ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বহুক্ষণ গান হইলে উপাসনা আরম্ভ হইল,। সাধনাশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করিলেন। উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ভাই প্রকাশদেব, শ্রীযুক্ত বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল এই আশ্রম সম্বন্ধে স্ব স্ব জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়া ভগবৎ-কৃপার সাক্ষ্য প্রদান করিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন। তদনন্তর পঞ্জাব নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরশরণ দাস ঈশ্বরের হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিলেন এবং মহিলাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য আহ্বান করিয়া প্রার্থনা করেন। জলপাইগুড়ির শ্রীযুক্ত মুন্সী জালাল-উদ্দীন মির্জ্জা প্রার্থনা করিলেন এবং স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা ও অভাবের বিষয় কিছু কিছু বলিলেন। তাহার পর সাধনাশ্রমের নিত্যপাঠ্য স্তোত্রটী পঠিত হইয়া উপাসনা শেষ হইল। উপাসনা শেষ হইলেও ১২টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন চলিল। সকলে প্রায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ১টার সময় আলোচনা হইবার কথা ছিল বলিয়া কীর্ত্তন বন্ধ হইল।

১টা বাজিলে আলোচনা আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ-চন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্ম-বালিকাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে। প্রবন্ধ পাঠান্তে যে আলোচনা হয়, তাহাতে অনেকে যোগ দিয়াছিলেন। কেহ বা বালিকাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের অবলম্বিত প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ায় সপক্ষে কেহবা তাহার বিপক্ষে মত প্রকাশ করিলেন।

সায়ংকালে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ২ ঘণ্টার অধিককাল বক্তৃতা হয়। বক্তা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ ভাব নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের সমাবেশের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। বক্তৃতা অন্য স্থানে প্রকাশিত হইবে।

১৩ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—প্রাতে উপাসনা হয়। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "ধর্ম্মজীবনে নিরাশা" এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার উপদেশের সারমর্ম্ম এইরূপ,—

"কয়েক দিন ধরিয়া আমরা মাঘোৎসব উপভোগ করিয়া হৃদয়ে কত আনন্দ লাভ করিয়াছি। ব্রহ্মকৃপা স্পর্শে আমাদের প্রাণে কত আশা এবং উৎসাহ জাগিয়া উঠিয়াছে। পাপ তাপের কথা আমরা এখন ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু এই ভাব হয় ত অধিক দিন থাকিবে না। গত বর্ষে হয় ত অনেকে অনেক সময় শুষ্কতার মধ্যে পড়িয়াছেন। আবার আগামী বৎসরে হয় ত অনেককে শুষ্কতার মুখ দেখিতে হইবে। যতদিন না প্রকৃতভাবে ধর্ম্মজীবন গঠিত হয়, ততদিন সময়ে সময়ে শুষ্কতা বা সরসতা, সময়ে সময়ে উৎসাহ বা নিরুৎসাহ আসিবেই আসিবে। কিন্তু ইহার মধ্যে এক বিপদ আছে। এইরূপ শুষ্কতার মধ্যে সময়ে সময়ে নিরাশা আসিতে পারে। নিরাশা ধর্ম্মজীবনের পথে ঘোর শত্রু। চিররুগ্ন যাহারা, তাহারা অনেক দিন ধরিয়া অনেক প্রকার ঔষধ সেবন করিয়া, পথ্যের অনেক নিয়ম পালন করিয়া যখন দেখে যে, রোগের কিছুই উপশম হইতেছে না,তখন তাহাদের আর আরোগ্য লাভের আশা থাকে না, অথবা ঔষধের উপকারিতাতে আর বিশ্বাস থাকে না। ক্রমে ক্রমে কুপথ্য করিয়া তাহাদের রোগ বৃদ্ধি হয় এবং শেষে তাহারা হয় ত মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেইরূপ শুষ্কতার মধ্যে কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে যে, এতদিন এত উপাসনাদি সাধন ভজন করিলাম, কৈ পাপ ত গেল না, কিছু ত হইল না। তবে বুঝি পাপ আর যাইবার নয়, অথবা উপাসনার কোনও উপকারিতা নাই, অন্য কোনও বিশেষ সাধন অবলম্বন

করিতে হইবে। এইরূপ নিরাশার অবস্থার মধ্যে পড়িয়া কেহ কেহ হয় ত একেবারে উপাসনাদি ত্যাগ করিতে পারেন এবং কেহবা অন্য প্রকার সাধনপ্রণালী আশ্রয় করিতে পারেন। ইহাতে বিশেষ আধ্যাত্মিক ক্ষতি হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপ নিরাশার দুইটী কারণ অনেক সময়ে দেখা যায়; ঈশ্বরের করুণাতে অবিশ্বাস এবং তাঁহার মঙ্গলভাবের উপর নির্ভরের অভাব। অনন্ত মঙ্গলময় তিনি, যাহাতে আমাদের প্রকৃত মঙ্গল হয়, তিনি ত তাহাই বিধান করিতেছেন। আমরা কি জানি? আমরা যাহাকে অমঙ্গল বলিয়া কল্পনা করিয়া কত ভীত হই, কিছুদিন পরে হয় ত বুঝিতে পারি যে, তাহারই মধ্যে আমাদের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত ছিল। আমরা যাহাকে শুষ্ক মরুভূমি বলিয়া মনে করি, হয় ত তাহারই মধ্যে সুশীতল বারিস্রোত লুকায়িত রহিয়াছে। প্রকৃতভাবে কিসের দ্বারা আমাদের মঙ্গল হয়, তাহা কি আমরা জানি? যে শুষ্কতার মধ্যে পড়িয়া নিরাশ হইতেছি, হয় ত তাহারই পশ্চাতে তাঁহার অপার করুণা লুকায়িত রহিয়াছে। অতীত জীবনের দিকে চাহিলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা কোথায় ছিলাম, তিনি আমাদিগকে কোথায় আনিয়াছেন? জীবনের এত বৎসর এ ভাবে কাহার কৃপায় চলিয়া গেল? তিনি কি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন? আমরা যতই পাপগ্রস্ত হই না কেন, তাঁহার করুণার অনুপযুক্ত আমরা কিছুতেই হইতে পারি না। সংসারের জননী যেমন সুস্থ সন্তান অপেক্ষা আপনার রুগ্ন শিশুকে অধিক যত্ন করেন, যতদিন না রোগ দূর হয়, ততদিন তাহার কাছে বসিয়া থাকেন, যতদিন না তাহার রোগগ্রস্ত মলিন মুখে সুস্থভাব বিকাশ হয়, ততদিন তাঁহার মনে আনন্দ হয় না। সেইরূপ আমাদের আত্মার জননী যিনি, আমাদের অমরাত্মা যাঁহার অমৃত-ক্রোড়ে চিরকাল বাস করিবে, পাপগ্রস্ত আত্মাকে তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন না। তাঁহার সন্তান হইয়া মানবাত্মা পাপে মলিন রোগীর ন্যায় হইয়া থাকিবে, ইহা তিনি দেখিতে পারেন না। যত দিন না সেই আত্মা আপনার স্বাভাবিক পুণ্যের জ্যোতিতে উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়, ততদিন তিনি ক্ষান্ত হইতে পারেন না। পাপীর উদ্ধার সাধনের জন্য তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত। পাপীর উদ্ধারের জন্যই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠাইয়াছেন। পাপীকে আশ্রয় দিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইয়াছে। আমরা যতই দুর্ব্বল ও পাপী হই না, আমাদের জীবনে যাহা ঘটিয়াছে তাহা তিনিই করিয়াছেন। আমরা যে পথে আসিয়াছি তিনিই আনিয়াছেন, আমাদের যাহা যাহা প্রয়োজন তিনিই দিয়াছেন। তবে কেন আমরা নিরাশ হইব? শুষ্কতা বা সরসতা, দুর্ব্বলতা বা সবলতা সকল অবস্থার মধ্যে তাঁহার করুণাতে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার মঙ্গলভাবের উপর নির্ভর করিয়া পড়িয়া থাকিব। তাঁহার এত করুণা উপভোগ করিয়া যদি তাহাতে অবিশ্বাসী হই, তবে ঘোর নাস্তিকতা অপরাধে অপরাধী হইব। যিনি প্রতিদিন জীবন চালাইতেছেন, এ জীবনের ভার তাঁহার হাতে। এইরূপ বিশ্বাস থাকিলে আর নিরাশা আসিতে পারিবে না।

অপরাহ্নে মন্দিরে বালক বালিকা-সম্মিলন হয়। প্রায় ছয় শত বালক বালিকা সুন্দর সাজে সজ্জিত হইয়া মিলিত হইয়াছিল—তাহাদের সে দৃশ্য কি মনোরম! সকলে সম্মিলিত হইলে প্রত্যেকের গলায় ফুলের মালা দেওয়া হয়। প্রথমতঃ তাহারা একটী সঙ্গীত করে পরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় শিশুদিগকে তাহাদের উপযোগী একটী সদুপদেশ দেন এবং তিনি ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়ের পরলোকগতপুত্র নির্ম্মলরতনের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন "নির্ম্মলের পিতা ও মাতা নির্ম্মলের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তোমাদিগকে পুষ্প উপহার দিবেন।" তিনি যখন এই কথার উল্লেখ করেন তখন সেই বালকের স্মৃতি মনোমধ্যে উদিত হইয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের চিত্তে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় করিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশের পর পুষ্পোপহার দেওয়া হয়। তদনন্তর তাহারা সকলে আনন্দবাজারে আনন্দে আহার করে। ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় ইহার ব্যয়ভার বহন করেন।

সায়ংকালে ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "নীতিহীন ধর্ম্ম ও ধর্ম্মহীন নীতি" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটীর বিবরণ না পাওয়াতে প্রকাশ করিতে পারা গেল না।

১৪ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী, শুক্রবার—প্রাতঃকালে মন্দিরে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয় উপাসনা করেন তাহার উপদেশের সার মর্ম্ম :—

যোগ কাহাকে বলি? যোগের অর্থ ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্মিলন। বিশ্বসংসারে যোগ সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে। পরমাণুতে পরমাণুতে সংযোগ করিয়া ঈশ্বর জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন। তাঁহারই ইচ্ছাতে এখানে সুশৃঙ্খলা দৃষ্ট হইতেছে। যদি আমরা তাঁহার ইচ্ছানুগত হইয়া চলি, তাহা হইলে সমুদয় বিশ্বসংসারে যে যোগ-সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে, তাহারই সহিত আমাদের ঐক্য হইয়া চলা হইল। যদি তাঁহার ইচ্ছানুগত না হই, তাহা হইলে আমরা যোগভ্রষ্ট হইয়া সংসারে বিশৃঙ্খলা আনিলাম। এই প্রকার বিশৃঙ্খলা আসাতেই সংসারে দুঃখের মাত্রা বাড়িয়াছে, সুখের মাত্রা কমিয়াছে। ফলতঃ অতিরিক্ত সুখকামনা করিয়া আমরা সংসারের বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন করিতেছি, দুঃখের মাত্রা বৃদ্ধি করিতেছি। দুঃখের অংশ, সুখের অংশ ঈশ্বর সমুদয় মানুষের জন্যই রাখিয়াছেন। কিন্তু আমরা নিজ সুখের অংশে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া পরমেশ্বর অন্যের জন্য যে সুখের অংশ রাখিয়াছেন তাহাতে হাত দিতে যাই। এই প্রকারে অন্যের সুখে হস্তক্ষেপ করিয়া আমরা নিজেই কি সুখী হইতে পারি? তাহাও পারি না। অতিরিক্ত সুখ কামনা না করিয়া, ঈশ্বর আমাদিগকে যাহা বলেন যদি তাহাই করিতাম, সুখ কিম্বা দুঃখ ঈশ্বর আমাদিগকে যাহাই দেন না কেন, তাহাই আমাদের প্রাপ্য অংশ বলিয়া যদি শিরোধার্য্য করিয়া লইতাম, তাহা হইলে আমরা নিজেও সুখী হইতাম, অন্যকেও সুখী করিতে পারিতাম। আমাদিগের উচিত যে আমরা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের বাধ্য হই। এইরূপ পূর্ণ বাধ্যতা আমাদের

জীবনের মূল মন্ত্র হওয়া উচিত। আমাদিগের বৈরাগ্য এই বাধ্যতার অন্তর্গত হওয়া আবশ্যক। বৈরাগ্যের নিজের কোন মূল্য নাই। যে বৈরাগ্য বাধ্যতার অন্তর্গত নহে তাহা অনিষ্ট-কারী, তাহাতে পাপ হয়। আমাদিগের দেশে নগ্ন সন্ন্যাসী-দল এই প্রকারে বৈরাগ্যের আচরণ করে। তাহাদিগের গৈরিক বস্ত্র, জটাজুট, এবং ভস্মাচ্ছাদিত কলেবর তাহাদিগকে এক প্রকার ভয়ানক মূর্ত্তি প্রদান করে। এই মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদিগের বালক বালিকারা অত্যন্ত ভয় পায়। দুঃখের বিষয় অনেক ব্রাহ্ম ইহাদিগের বাহির দেখিয়াই ভুলিয়া যান। তাঁহারা উপদেশ শুনিবার জন্য ইহাদিগের নিকট যাদৃশ বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান হন, ব্রাহ্মসমাজের কোন উপদেষ্টার নিকট হয়ত কখনও সেইরূপে উপস্থিত হন নাই। ব্রাহ্মসমাজের কত উপদেষ্টা পূর্ণ বাধ্যতার পথ গ্রহণ করিয়া, যথার্থ প্রেমিক এবং ভক্তের ন্যায় যাহাতে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ রূপ পরিবার পৃথিবীতে বজায় থাকে, তজ্জন্য ব্রাহ্মসমাজের এই দুঃসময়ে প্রাণপণে খাটিতেছেন। আমরা তাঁহাদিগকে প্রেমিক ভক্ত যোগী বলিয়া বিবেচনা না করিয়া কি মাদক-সেবী নগ্ন সন্ন্যাসী দলকে কিম্বা বঙ্গদেশের কপট বৈরাগীদিগকে তাহা বিবেচনা করিব? যাঁহারা পিতার ঘর বজায় রাখিবার জন্য শরীরের রক্ত জল করিতেছেন, আমি পিতার সেই সুধী পুত্রদিগকেই যোগী বলিব? কিম্বা তাহাদিগকেই যোগী বলিব, যাহারা যোগের হুজুক তুলিয়া পিতার পরিবার ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পিতার ঘর ভাঙ্গিয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাইতে চান? শেষোক্তদিগকে কখনই যোগী বলিতে পারি না, বরং বিয়োগী বলিতে পারি। যোগের অর্থ মিলন। তুমি সমুদয় প্রাণের সহিত, মনের সহিত, হৃদয়ের সহিত পরমেশ্বরকে ভাল বাস। এবং নরনারীকে ভাই ভগিনী বলিয়া প্রেম কর, ইহাই যোগের মূল সূত্র। ভালবাসার স্বাভাবিক গতি মিলনের দিকে—যোগের দিকে। কিন্তু যাহারা পিতার ঘর ভাঙ্গিয়া দিতে প্রস্তুত, তাঁহারা কেমন প্রেমিক—কেমন যোগী। ব্রাহ্ম ভাই ভগিনী ব্রাহ্মসমাজের এই দুরবস্থার সময়ে যাঁহারা প্রকৃত শ্রদ্ধার পাত্র, যাঁহারা আমাদের পরিচালক হইবার যোগ্য তাঁহাদিগকে চিনিয়া লইবেন। ঈশ্বরের মেষদল যেন ছিন্ন ভিন্ন না হইতে পারে। তাহা হইলে বিপদ এবং মৃত্যু আসিবে। যেমন পরমাণুতে পরমাণুতে গ্রথিত করিয়া ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন করিলেন, সেইরূপ সমুদয় নরনারীকে একত্রিত করিয়া তিনি জগতে মহা পরিবারে মহাযোগ উৎপন্ন করিবেন। আমরা তাঁহারই কোলে ভাই ভগিনীকে দেখিয়া, এবং ভাই ভগিনীতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হইব। ঈশ্বর তাহাই করুন।"

সায়ংকালে বাবু শশিভূষণ বসু উপাসনার কার্য্য করেন এবং জগতের ধর্ম্মাচার্য্যদিগের বিষয়ে উপদেশ দেন। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম এই :—সময়ে সময়ে পৃথিবীতে ঝড়ের যেমন বিশেষ প্রয়োজন হয়, তেমনি মানব সমাজেও বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরও আবশ্যক হইয়া থাকে। সেই সকল বীর পুরুষ সমাজে মহাবিপ্লব উপস্থিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা সমাজের স্রোতকে অন্য দিকে ফিরাইয়া দেন। এই সকল মহৎ লোক জগৎকে আন্দোলিত করিয়াছিলেন, এবং নিজেদের উদ্ভাবনা শক্তিদ্বারা অনেক নূতন সত্য জগতে প্রদান করিয়াছিলেন।

(১) মুষা। ইনি য়িহুদী জাতির মধ্যে ঘোরতর পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়াছিলেন। মহান্ পরমেশ্বরের নাম প্রচার করিয়াছিলেন। সিনাই পর্ব্বতের উপর হইতে যে দশ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার প্রথম আজ্ঞা এই যে পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কোন দেব দেবীর নিকট মস্তক অবনত করিও না। মুষাই ইজ্‌রেলের বংশের পরিত্রাতাস্বরূপ হইয়া তাহাদের অশেষ কল্যাণ করিয়াছিলেন।

(২) শাক্য মুনি। এই প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তির বিষয় যত পাঠ ও চিন্তা করা যায়, ততই মন যেন গাম্ভীর্য্যরসে পূর্ণ হইয়া উঠে। আজ কাল ইয়ুরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য জগতে বুদ্ধের জীবন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি বিশেষ রূপে আলোচনা করিতেছেন, এবং অনেকে ইহাঁকে মহাত্মা খ্রীষ্ট অপেক্ষাও উচ্চস্থান প্রদান করিতেছেন। স্বর্গীয় পণ্ডিতবর Renan সাহেব তাঁহার সুবিখ্যাত খ্রীষ্টের জীবন চরিতে" মহর্ষি ঈশার গুণ কীর্ত্তন করিবার সময় বুদ্ধের নাম উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই। তিনি এক স্থানে বলিতেছেন "No man has trampled under foot the family joys, the happiness of this world (Sakyamuni excepted)" অর্থাৎ কোন মানব পৃথিবীর সুখ ঐশ্বর্য্য পদদলন করিতে সমর্থ হন নাই (শাক্য মুনি ব্যতীত)। একদিক হইতে দেখিতে গেলে এত বড় মহাপুরুষ বোধ হয় আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। শাক্য সিংহের জীবনে একটি বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়। (প্রোফেসার) মোক্ষমুলর এক স্থলে লিখিয়াছেন যে তাঁহার শিষ্য বৃন্দ একবার তাঁহাকে বলেন, "পৃথিবীর সকল মহাপুরুষ কোন কোন অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিয়া থাকেন, আপনিও আমাদিগকে কিছু দেখান।" তাহাতে শাক্য মুনি বলেন, "Confess before Men the sins you have committed, that is the true miracle,—"গোপনে যে সকল পাপ করিয়াছ তাহা জগতের কাছে প্রকাশ কর, তাহাই অলৌকিক কার্য্য" কেমন সরলতা! তাঁহার জীবন ধ্যানপরায়ণ ছিল। নিস্তব্ধ ও গম্ভীর ভাবে তিনি নিজ আত্মার মধ্যে প্রবেশ করিতেন। অনেকে বলেন তিনি নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, ইহা কখন বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। নির্ব্বাণ অর্থে ব্রহ্মে লীন হওয়া। বর্ত্তমান সময়ে চারিদিকে যেরূপ বিষয়ের কোলাহল, তাহাতে শাক্যমুনির ধ্যান অনুসরণ করা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহার অপূর্ব্ব বৈরাগ্যের বিষয়ও আমাদের বিষয়-বাসনাপূর্ণ সময়ে বিশেষরূপ চিন্তা করা আবশ্যক। শাক্যমুনি তপস্যাবলে ষড়রিপু দমন করিয়াছিলেন। তিনি যখন সাধন-সিদ্ধ হইয়া প্রচারে বহির্গত হন, তখন সেই ধর্ম্মবীর শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "সন্ন্যাসীর দল, আমি দুর্জ্জয় রিপু সকল দমন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছি। আশা করি, তোমরাও আমার ন্যায় জিতেন্দ্রিয় হইয়া দেশ

বিদেশে নির্ব্বাণ তত্ত্ব প্রচারে রত থাকিবে।" তাঁহার দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা-বল ছিল। যখন তিনি গভীর নিশীথে গৃহ পরিত্যাগ করেন, এবং তাঁহার প্রিয় অনুচর ছন্দক তাঁহার মহান্ ব্রতের পথে বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া দণ্ডায়মান হন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি মস্তকে শিলার সহিত বৃষ্টি পতিত হয়, ধাতুপূর্ণ আগ্নেয়গিরি যদি মস্তকে ভাঙ্গিয়া পড়ে, শক্তির শেল সম কুঠার যদি মস্তকে বিদ্ধ হয়, তথাপি আমি কখনও গৃহে থাকিব না।" এই দুই প্রতিজ্ঞার কথা শ্রবণ করিয়া ছন্দক অবাক হইয়া রহিল। শাক্য সিংহের জীবন অদ্ভুত ঘটনায় পূর্ণ। খ্রীষ্ট জন্মিবার ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি অপূর্ব্ব ত্যাগস্বীকার, বৈরাগ্য, জলন্ত পবিত্রতা, অসাধারণ প্রতিজ্ঞা ও নরনারীর কল্যাণের জন্য জীবন্ত প্রচারের ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন।

৩। সক্রেটিস্। ইনি গ্রীসে নীতি-বিপ্লব আনয়ন করেন। এই মহাপুরুষ যুবকবৃন্দের চরিত্রের উন্নতির জন্য চারিদিকে সুনির্ম্মল নীতি প্রচার করিতেন। তখন কোন লোকের চরিত্রের বিশুদ্ধতা অবগত হইতে হইলে লোকে জিজ্ঞাসা করিত, "সক্রেটিস্ কি তোমার চরিত্র নির্ম্মল করিয়া দিয়াছেন?" তিনি যুবকদিগের গুরু ও নেতা হইয়া যখন নীতির পথে আনিতে কৃতকার্য্য হইলেন, তখন দেশের অসচ্চরিত্র দুষ্ট লোকেরা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া এই মহাত্মার বিরুদ্ধে রাজার নিকট নানা অভিযোগ উপস্থিত করিল। সক্রেটিস্ রাজ-সমীপে নীত হইলে রাজা তাঁহাকে তাঁহার অভিযোগের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করিতে বলেন। শান্তস্বভাব সক্রেটিস্ তাহাতে কোন উত্তর না করাতে তাঁহাকে কারাবদ্ধ করা হয় এবং তাঁহার প্রাণ বিনাশের আজ্ঞা হয়। তিনি যে কয়েকদিন কারাগারে ছিলেন, তাঁহার অনুগত শিষ্যেরা সর্ব্বদাই তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকিত। তিনি শান্ত প্রফুল্ল মনে তাঁহাদিগকে পরলোকের বিষয় উপদেশ দিতেন। একবার তাঁহার কোন শিষ্য এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন "বিনাদোষে সক্রেটিসের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল," সক্রেটিস তাহা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি কি চাও যে, সক্রেটিস অপরাধ করিয়া প্রাণত্যাগ করে?" কয়েকদিন পরে তাঁহাকে হেমলক্ বিষপান করিতে দেওয়া হইল। তিনি স্বহস্তে পাত্র গ্রহণ করিয়া উহা পান করিলেন। মৃত্যু-সময় পর্য্যন্ত আনন্দ মনে শিষ্যদিগকে স্বর্গধামের বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। অবশেষে হেমলক্ বিষ সেবন করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল; তিনি চক্ষু মুদিত করিয়া ইহসংসার পরিত্যাগ করিলেন। সক্রেটিস্ পুরাকালের একজন প্রধান নীতি-সংস্কারক। ইঁহার গুণে গ্রীস দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও সক্রেটিসের ন্যায় লোকের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

৪। ঈশা। ইনি পৃথিবীতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। ইঁহার প্রতাপে জগতে কতই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। খ্রীষ্টের জীবনে দুইটী প্রধান বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়; বিশ্বাস ও পবিত্রতা। তিনি শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "যদি তোমাদের সর্ষপ কণার ন্যায় বিশ্বাস থাকে, পর্ব্বতকে বলিবে স্থানান্তরিত হও, এবং তখনই উহা স্থানান্তরিত হইবে।" তিনি বিশ্বাসীর চূড়ামণি ছিলেন। তিনি যেন জীবন্ত পরমেশ্বরকে মানবের সম্মুখে ধরিয়া দিতেন। তাঁহার বিশ্বাসের জীবন আমাদের বিশেষ শিক্ষার স্থল। বর্ত্তমান সময়ে চারিদিকে যেরূপ সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ, প্রবল হইতেছে, এসময়ে খ্রীষ্টের জীবন অধ্যয়ন করা নরনারীর অতীব কর্ত্তব্য। ইহাতে আমাদের বিশ্বাস খুব দৃঢ় হইতে পারে। অন্য দিকে তাঁহার জীবনে পবিত্রতার ভাব দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। তিনি কেমন জোরের সহিত বলিয়াছিলেন, "যদি তোমার ডান চক্ষু অভদ্র দর্শন করে, উহা উৎপাটন করিয়া ফেল, যদি তোমার দক্ষিণ হস্ত কোন অপবিত্র কার্য্য করে, তাহা কর্ত্তন করিয়া ফেল।" পবিত্রতার দিকে খ্রীষ্টের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তিরা ধন্য কারণ তাহারা পরমেশ্বরের দর্শন লাভ করিবে।" বিশ্বাস ও পবিত্রতা এই দুই পরম বস্তু সর্ব্বদা তাঁহার জীবনে উজ্জ্বল ভাবে স্থান পাইয়াছিল। পরমেশ্বরের পথে গমন করিতে হইলে, এই দুই বস্তুর বিশেষ প্রয়োজন, বিশ্বাস ও পবিত্রতা।

৫। মহম্মদ। ইনি আরব দেশের উদ্ধারকর্ত্তা। ইনি ধর্ম্মসংস্কারকদিগের মধ্যে ধর্ম্মবীরত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বিশ্বাস বলে সর্ব্বদা বলীয়ান হইয়া ইনি নিজ ব্রতপালনে সর্ব্বদা রত থাকিতেন। মহম্মদের বীরত্বের কথা স্মরণ করিলে শরীর যেন রোমাঞ্চিত হয়। ইনি যখন মহান্ পরমেশ্বরের নাম প্রচারে রত হন, তখন আরব দেশের অজ্ঞ ও পৌত্তলিক নরনারীরা ইঁহার পরম শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল। এই শত্রুকুলে পরিবেষ্টিত হইয়া এই ধর্ম্মবীর কাবার মন্দিরমধ্যে গমন করিয়া পুত্তলদিগের মস্তকে হস্ত রাখিয়া বলিতেন "সত্য আসিয়াছে এখন মিথ্যা তিরোহিত হউক।" এই বলিয়া শিষ্যদিগকে তাহা ভগ্ন করিতে বলিতেন। কি বীরত্ব! আমরা লোকের ভয়ে—সমাজের ভয়ে কত বিষয় সত্য বলিয়া বুঝিয়াও তাহা পালন করিতে পারি না। মহম্মদের জীবন আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে, যে নির্ভয়ে মহান্ পরমেশ্বরের নাম প্রচার কর—নির্ভয়ে সত্যের ঘোষণা কর।

অবশেষে আমাদের ব্রাহ্মসমাজের কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। যখন এই বঙ্গদেশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় নিরাকার পরব্রহ্মের নাম ঘোষণা করেন। কত নির্যাতন সহ্য করিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার বিষয় অধিক আর কি বলিব, আমরা অনেকেই তাঁহার বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছি। তৎপর আমেরিকার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন। আমরা আমেরিকার নিকট বিশেষ ঋণী। মহাত্মা থিয়োডোর পার্কার বোষ্টন নগরে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। পার্কারই "Harmonious development সর্ব্ব সামঞ্জস্যীভূত উন্নতির" বিষয় কথায় এবং কার্য্যে বিশেষ ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাশীকৃত গ্রন্থ পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তিনি নানা বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে, যেমন ধর্ম্মভাব তেমনি সাহিত্য, বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে

পাওয়া যায়। এদিকে যেমন তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও পাণ্ডিত্য ছিল, তেমন অপরদিকে দেশহিতৈষণাও ছিল। তিনি দেশের নানা হিতকর কার্য্যে রত থাকিতেন। দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে তিনি মহাযুদ্ধ করিয়াছিলেন। এবং তিনিই ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিয়া মহান্ নিরাকার পরব্রহ্মের নাম ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে চারিদিকে তাঁহার শত্রুদল বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু সেই বীরপুরুষ দ্বিতীয় লুথর সদৃশ হইয়া কুসংস্কার, ও নরদেবতার বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহাঁর জীবনচরিত পাঠ করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেকের তাঁহার গ্রন্থ ও তাঁহার জীবন চরিত পাঠ করা অতীব কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী।

অবশেষে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের নাম উল্লেখ করা আজ আবশ্যক, তাহা না করিলে আমরা অকৃতজ্ঞ হইব। যদিও সত্যের অনুরোধে আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি, তথাপি তাঁহার জীবনের বিশেষ বিশেষ গুণ আমাদের স্মরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কেশবচন্দ্রের জীবনে পবিত্রতার ভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার জীবনে Puritanic ভাব খুব প্রবল ছিল। আবার অন্য দিকে তাঁহার মধুর উপাসনা, প্রার্থনা ও উপদেশ সকল আমাদের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছে। সেজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। তাঁহার জীবন চরিত আমাদের সকলের পাঠ করা উচিত।

যে সকল মহাপুরুষের বিষয় এখানে বর্ণনা করা হইল, তাঁহারা জগতে বিশেষ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আরও অনেক লোক জগতের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের নিকটও বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব। আর যে সকল লোকের নাম জগতের ইতিহাসে উল্লিখিত হয় নাই, এমন সাধু লোকও জগতে অনেক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা গোপনে পরমেশ্বরের নাম কীর্ত্তন ও ধ্যানে জীবন কর্ত্তন করিয়াছেন। সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর তাঁহাদের নামকে গৌরবান্বিত করিবেন। কিন্তু আমাদের বিশেষ স্মরণ রাখা উচিত যে মহান পরমেশ্বরই মানবের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য, তিনিই গুরুর গুরু, পরম গুরু।

১৫ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারী, শনিবার—প্রাতঃকালে মন্দিরে উপাসনা হয়। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম এই :—

গত ১২ই মাঘ প্রাতে এই মন্দিরে কেমন উৎসাহের সহিত ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন হইতেছিল। ব্যাকুলতার ভাবে পরমেশ্বরের সন্তানগণের মুখ কেমন উজ্জ্বল ও সুন্দর হইয়াছিল। ব্রহ্মনাম এতই মধুর লাগিতেছিল যে অনেক বেলা হইয়া গেল, তথাপি অনেকে মন্দির ত্যাগ করিতে পারিলেন না। পথে এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন "এখন প্রাণে কত আনন্দ, হৃদয়ে কত আশা জাগিয়াছে, কিন্তু এই ভাব স্থায়ী হয় না কেন?" এই কথা আমারও প্রাণে লাগিল। মনে হইল যে মাঘোৎসবের সময় আমরা যেন নূতন হইয়া যাই, আবার কয়েক দিন পরে আমাদের যে হীন দশা সেই হীন দশা হয়। এই সময় একটী আখ্যায়িকার কথা স্মরণ হইল। এক সময়ে এক ব্যক্তি আসিয়া এক ধর্ম্মপ্রচারককে জিজ্ঞাসা করিল, "শ্রদ্ধেয় মহাশয়, আমি অনেক বৎসর ধরিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাদি করিয়া আসিতেছি, নীতিপালন এবং পরহিত সাধনও করিয়া থাকি। কিন্তু কিছুতেই আমার জীবনের পরিবর্ত্তন হইতেছে না আমার পাপও যাইতেছে না।" এই কথা শুনিয়া উক্ত ধর্ম্মপ্রচারক বলিলেন "যাও, গৃহে ফিরিয়া যাও এবং প্রভু পরমেশ্বরকে গৌরবান্বিত কর।" এই কথার মূলে অমূল্য সত্য নিহিত রহিয়াছে। যত দিন না আমরা আমাদের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে প্রভু পরমেশ্বরের অধীন করিতে পারিব, যতদিন না আপনাদের গৌরবকে ভুলিয়া জীবনের সকল কার্য্যের মধ্যে তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিতে শিক্ষা করিব, ততদিন কিছুই হইবে না। আমরা কত সাধন ভজন, কত উপাসনা সঙ্গীত করিয়া থাকি। কত উৎসব আসে এবং যায়, অথচ আমরা তাঁহার হাতে সম্পূর্ণরূপে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। আপনাদের শক্তি ও জ্ঞানকে আমরা কত বিশ্বাস করি, আপনাদের খ্যাতি এবং গৌরবের জন্য কত আমরা ব্যস্ত! সকল কার্য্যের সময় কি বলিতে পারি—"প্রভো! আমরা নয়, তুমিই গৌরবান্বিত হও?" ধর্ম্মজীবনের পথে যত প্রকার শত্রু আছে, তন্মধ্যে অহঙ্কার এবং আত্মাভিমানই প্রধান। ইহা ছাড়িয়াও ছাড়ে না। যে ব্যক্তি সকল ছাড়িয়া, সকল স্বার্থ সুখকে অগ্রাহ্য করিয়া সামান্য এক কৌপীন মাত্র ধারণ করিয়াছে, তাহারও কোথায় এই শত্রু লুক্কায়িত হইয়া বাস করে তাহা সে বুঝিতে পারে না। অলক্ষিত ভাবে এই আত্মাভিমান আমাদের জীবনে কতই অনর্থ সাধন করে, তাহা বলা যায় না। ইহা ভিতরে থাকিলে আলোচনার সময় সত্য নির্ণয়ের দিকে দৃষ্টি না থাকিয়া আপনার জেদ বজায় রাখিবার দিকে আকাঙ্ক্ষা হয়, কোনও সাধু কার্য্য করিবার সময় তাহার মধ্যে পরমেশ্বরের ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক এইরূপ মনে না হইয়া কিসে আপনার গৌরব বর্দ্ধিত হয় প্রাণে এই ভাবই আসে। অন্য কেহ মতের বিরুদ্ধে কথা কহিলে এই অভিমান প্রাণে জাগিয়া উঠে, অন্যের যে বিবেক আছে, সত্য বুঝিবার শক্তি আছে, সে যে ঈশ্বরের সন্তান একথা আর মনে থাকে না। এই অভিমানের ভাব থাকিতে ধর্ম্মজীবনের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় না। আমরা কত উৎসব করিতেছি, প্রভু পরমেশ্বরও করুণাদানে কখনও কৃপণতা করিতেছেন না। কিন্তু তাহা আমাদের জীবনে স্থায়ী হইতেছে না! পর্ব্বতশৃঙ্গে যতই বৃষ্টিধারা নিপতিত হউক না কেন, উন্নত বলিয়া সেখানে যেমন জল দাঁড়ায় না, সেইরূপ অহঙ্কৃত, আত্মাভিমানে স্ফীত ব্যক্তির জীবনে পরমেশ্বরের সত্য এবং করুণা স্থায়ী হয় না। আত্মাভিমান তাহা সরাইয়া দেয়। পরমেশ্বর করুন আমাদের এই শত্রু বিনষ্ট হউক। আমরা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার অধীন হই, জীবন, বাক্য, কার্য্য ও চিন্তায়

আপনাদের গৌরব অন্বেষণ না করিয়া তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিতে শিক্ষা করি। তিনি আমাদের জীবনের প্রভু, আমাদের সমাজের রাজা হউন। আমাদের সকল প্রাণ মিলিত হইয়া তাঁহারই দিকে ধাবিত হউক, আমাদের সকল ইচ্ছা একত্র মিলিয়া তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হউক। তাহা হইলে তাঁহার শান্তি, তাঁহার আনন্দে আমাদের প্রাণ, আমাদের জীবন প্লাবিত হইবে। এবং ব্রহ্মোৎসবের ফল স্থায়ী হইবে।

অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভবনে বাবরাসনীর নীতি বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ হয়। বালক বালিকাগণ সঙ্গীত, আবৃত্তি এবং অভিনয় দ্বারা দর্শকগণকে তুষ্ট করিয়াছিল।

সায়ংকালে মন্দিরে শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় উপাসনা করেন। তাঁহার উপদেশের সারাংশ এই:—

প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে ধরা যখন উত্তপ্ত হয়, লোকে যখন গ্রীষ্মের উত্তাপে ছটফট করিতে থাকে, উত্তাপ যখন অসহ্য হইয়া উঠে, তখন দেখা যায়, প্রকৃতির নিয়মানুসারে আকাশে মেঘের উদয় হয়, এবং বৃষ্টিধারায় ধরা শীতল হইয়া থাকে। মানবসমাজেও প্রায় এইরূপ প্রণালী দেখা গিয়া থাকে। প্রায় ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বৈদান্তিক পণ্ডিতগণ যখন শুষ্ক ক্রিয়াকলাপ লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, যখন অবিশ্বাস, নাস্তিকতা ও অপ্রেমে লোকের মন এক প্রকার শুষ্ক ও কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল, তখন মহাত্মা চৈতন্য নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরমেশ্বরের মধুর নামে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন। তিনি ন্যায় শাস্ত্রে মহা পাণ্ডিত হইয়াও পাণ্ডিত্য দূরে নিক্ষেপ করিয়া হরি-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া অসংখ্য নরনারীকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে দেখা যায় যে, তিনি পরমেশ্বরকে পাইবার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেন। তিনিই নগর সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহার পূর্ব্বে নগর সংকীর্ত্তন ছিল না, লোকে করতালী দিয়া কীর্ত্তন করিত। মহাত্মা চৈতন্য নগর সংকীর্ত্তন বাহির করিয়া কত লোককে যে প্রেমের জালে আবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। তিনি মধুরভাবে হরিনাম সাধন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রের মধ্যে যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য ভাবের উল্লেখ দেখা যায়, মহাত্মা চৈতন্য এই শেষ ভাবের সাধন করিয়া প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। এই ভাবের সাধন করিয়া তিনি প্রেমে বিভোর হইয়া নীলাম্বু-বক্ষে চন্দ্রের জ্যোতি দর্শনে ঝম্প প্রদান করেন। মহাত্মা চৈতন্য বঙ্গদেশে প্রেমের বিপ্লব উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন। পরমেশ্বর কৃপা করুন, আমরা যেন চৈতন্যের ব্যাকুলতা ও অনুরাগ জীবনে লাভ করিতে সমর্থ হই।

১৬ই মাঘ, ২৮এ জানুয়ারি, রবিবার—আজ উৎসবের শেষ দিন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও উদ্যান সম্মিলন হইয়াছিল। এবার সকলে উল্টাডিঙ্গি, বাবু রাজকৃষ্ণ বরের বাগানে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতেই বন্ধুগণ তথায় যাইতে আরম্ভ করেন। বেলা প্রায় ১০টা সময় সকলে একত্র হইলে সমবেত উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের সারমর্ম্ম এই;—

মাঘোৎসব—ব্রহ্মোৎসব, মানবীয় ব্যাপার নয়, ইহাতে স্বয়ং ভগবান ব্যাকুল আত্মাদিগকে লইয়া লীলা করেন, ইহাতে মানব-আত্মাতে স্বর্গের প্রভু স্বয়ং স্বর্গের অমৃতবারি সিঞ্চন করেন, স্বর্গের পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করেন। যাঁহারা পিপাসিত হইয়া আইসেন তাঁহারা তৃপ্ত হইয়া যান। তবে অনেক সময় দেখা যায়, বৃষ্টি খুব হইয়া গিয়াছে, একদিক ভাসিয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্য দিক শুষ্কই রহিয়াছে। অনেক সময় দেখা যায়, ফুল সকল ফুটিয়াছে, উত্তম সাজে সজ্জিত হইয়াছে, কিন্তু নিচে লুক্কায়িতভাবে কাঁটা সকল রহিয়াছে, তুলিতে গেলে, তাহাতে হাত লাগাইতে গেলে আঘাত পাওয়া যায়। তাই ব্রহ্মোৎসবে প্রতি বৎসরেই এক মহা কাণ্ড হয়, কিন্তু শেষে তাহার সুফল দীর্ঘকাল ভোগ করিতে পারি না। মাঘোৎসবের ব্যাপার যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই অবাক হইয়াছেন। কিন্তু শেষে তেমন ফল দেখেন না কেন? ইহার উত্তর আমি এই দিতে পারি যে এক দিক দিয়া বৃষ্টির জল গড়াইয়া গিয়াছে, সকল দিক ভিজে নাই। কাঁটার উপরই ফুল সকল পড়িয়াছিল, তাই এ ফল ফলিয়াছে। যদি এই সময় সকল দিকে দৃষ্টি করিতেন এবং ভিজাইতে চেষ্টা পাইতেন, বিশেষ কাঁটা সকলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তুলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে এ উৎসবের শেষে যাহা দেখিতে পাইতেন, তাহা এক অপূর্ব্ব জিনিষ হইত। কিন্তু তাহা না হওয়াতেই এই দুর্দ্দশা হইতেছে।

সে কাঁটা কি? আমি আজ একটী কাঁটার কথা বলিতেছি, সেইটীই প্রধান কাঁটা বলিয়া মনে হয়, সেটী আমিত্ব। নিজকে না ভুলিতে পারিলে এ বৃষ্টি এ পুষ্পবর্ষণে সে শোভা হইতেছে না। তাই মিল করিতে যাই, আলিঙ্গন করি, কোথায় কোমল স্পর্শে এবং গন্ধে আকৃষ্ট হইবে, না নিচের কণ্টকের আঘাতে দূরে পলায়ন করে। এই আমিত্বই মহাশত্রু। নিজে একটা কর্ত্তা হইব, নিজের কোটটী বজায় রাখিব, নিজের ষোল আনা আগে, তাহার পর আর সকল, এই জন্যই এ ফল ফলিতেছে। আজ সাম্মলনীর উৎসবে একথা এই জন্যই বলিতেছি, যদি সম্মিলন করিতে চাও আপনাকে ভোল নিজের যাহা করিবার আছে কর, আপনা আপনি সম্মিলন হইবে, সম্মিলনের জন্য ভাবিতে হইবে না এবং ব্যস্তও হইতে হইবে না। অবশ্যই তাই বলিয়া নিজের মত ও বিশ্বাসকে বিসর্জ্জন করিবে না। এই নির্জ্জনে ঈশ্বর সেই জন্য ডাকিয়া আনিয়াছেন, যাহার যে দিক ভিজে নাই ভিজাইয়া লও, যাহার যে কাঁটাটী তুলিতে পার নাই এখানে তুলিয়া লও। পিতা দয়ালু তিনি শত অপরাধ মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত আছেন এবং সেই জন্যই এই ব্যাপার আনিয়াছেন এখন আমরা তাঁহার সেই প্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য হই।

তৎপর বেলা প্রায় ৪টা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক অবস্থা বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত

উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর সেদিন আলোচ্য বিষয়ের অবতারণার ভার ছিল।

এই আলোচনাতে শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিশ শ্রীযুক্ত মথুরামোহন গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রভৃতি মহাশয়গণ কিছু কিছু বলেন।

সায়ংকালে মন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন :—

আমাদের মাহোৎসব সাঙ্গ হইল। ভক্তবৃন্দ ত্বরায় স্ব স্ব স্থানে গমন করিবেন। লোকে যখন মেলা হইতে ফিরিয়া আসে, তখন পাড়ার লোক দেখিতে আসে কে কি কিনিয়াছে, কে কি পাইয়াছে, কে কি আনিয়াছে। উৎসব হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইলে লোকে দেখিতে চাহিবে কে কি পাইল। অতএব উৎসবান্তে একবার আলোচনা করি, কে কি পাইলাম। ব্রহ্মশক্তির লীলা অতি অদ্ভুত। ইহা যখন অবতীর্ণ হয় তখন নানা দিকে নানা ফল উৎপন্ন করে। যেমন একই পৃথিবীর রস বৃক্ষ বিশেষে ও ফল বিশেষে বিশেষ বিশেষ রস প্রসব করিয়া থাকে, কোনও ফল মিষ্ট কোনও ফল তিক্ত, কোনও ফল কটু ইত্যাদি, তেমনি একই ব্রহ্মশক্তি হৃদয়ে হৃদয়ে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে। যদি এরূপ কোনও রাজাকে দেখেন, যাহার দ্বারে দশজন প্রাণী দশটী প্রার্থনা লইয়া উপস্থিত; তিনি সমুদয় প্রার্থনা শুনিয়া একটী শব্দ উচ্চারণ করিলেন, অমনি দশজনের দশ প্রকার প্রার্থনা পূর্ণ হইয়া গেল, তাহা হইলে তিনি কেমন বিস্ময়ান্বিত হন? ব্রহ্ম শক্তির আবির্ভাব ও ক্রিয়া এমনি বিস্ময়কর ব্যাপার। ব্রহ্ম এক শব্দ উচ্চারণ করিলেন, অমনি আমাদের দশজনের দশটী প্রার্থনা পূর্ণ হইয়া গেল। ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাবে দশটী হৃদয়ে দশটী সংকল্প জাগিল। কেহ প্রতিজ্ঞা করিলেন এবার হইতে উপাসনাশীল জীবন যাপন করিবেন; কেহ প্রতিজ্ঞা করিলেন, যাহার অনিষ্ট করিয়াছেন তাহার ক্ষতিপূরণ করিবেন, কেহ প্রতিজ্ঞা করিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে জীবন সমর্পণ করিবেন, কেহ প্রতিজ্ঞা করিলেন জীবনের অপবিত্রতা দূর করিবেন ইত্যাদি। এক শক্তি শতধা হইয়া শত প্রতিজ্ঞার উদয় করিল। হৃদয়ে সৎসংকল্পের জন্ম হইতেই আমরা ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া থাকি। অদ্য উৎসবান্তে একবার আলোচনা করিয়া দেখি হৃদয়ে কোনও সাধু সংকল্প জন্মিল কি না। কি লইয়া আমরা উৎসব হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছি। কাহার হৃদয়ে কি সংকল্প জাগিয়াছে, প্রত্যেকে লক্ষ্য করুন এবং যাহাতে সম্বৎসরে তাহা কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার উপায় বিধান করুন।"

এইরূপে চতুঃষষ্টিতম মাঘোৎসবের কার্য্য সম্পন্ন হইল। অপরাপর বৎসরের ন্যায় এবারেও নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ উৎসবে যোগ দিবার জন্য সমাগত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় কার্য্যবিবরণ সমগ্রভাবে প্রকাশ করিতে পারা গেল না। যাঁহাদের উপদেশাদির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাই প্রকাশিত হইল। যে সকল বক্তৃতাদির বিবরণ পাওয়া গেল না তাহা প্রকাশ করিতে পারা গেল না।

ব্রাহ্মসমাজ।

বর্ত্তমান বর্ষের জন্য শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি, শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় মহাশয় সম্পাদক, শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়দ্বয় সহকারী সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হইয়াছেন।

অধ্যক্ষ সভা—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এবারকার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন :—

কলিকাতার জন্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, উমেশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, নবদ্বীপ চন্দ্র দাস, ডাক্তার নীলরতন সরকার, বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, ডাক্তার, পি, কে, রায়, বাবু কালীশঙ্কর সুকুল, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শশিভূষণ বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, উমাপদ রায়, দুর্গামোহন দাস, শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু, মধুসূদন সেন, ডাক্তার জে, এন, মিত্র, বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার পি, সি, রায়, রায় গুণাভীরাম বড়ুয়া, কুমারী কামিনী সেন, বাবু বঙ্কবিহারী বসু, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, সীতানাথ নন্দী, বিপিনবিহারী সরকার, হরিমোহন ঘোষাল, জগদীশচন্দ্র বসু।

মফস্বলের জন্য মিঃ লছমন প্রসাদ লক্ষ্ণৌ, ডাঃ ডি, বসু পুরুলিয়া, নীলমণি চক্রবর্ত্তী খাসিয়া হিল, বিপিনবিহারী রায় মাণিকদহ, মুন্সী জালালউদ্দিন জলপাইগুড়ী, বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী ঢাকা, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঐ, শশিভূষণ বসু নেপাল, হীরালাল হালদার বহরমপুর, ভুবনমোহন কর দিনাজপুর, রজনীকান্ত ঘোষ ঢাকা, কুমারী কুমুদিনী খাস্তগীর মহীশূর, রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বগুড়া, কালীমোহন দাস বরিশাল, মিঃ কে, এন, রায় সি, এস, বাবু চণ্ডীচরণ সেন মুন্সীগঞ্জ, শ্রীনাথ চন্দ ময়মনসিংহ, মধুসূদন রাও কটক, পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত পূর্ণিয়া, কৈলাসচন্দ্র বাগচী পাবনা।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত স্থানের প্রতিনিধিরূপে অধ্যক্ষ সভাতে গৃহীত হইয়াছেন :—বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী শিলং, বাবু ভুবনমোহন সেন, ফরিদপুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়া, সাতকড়ি দেব কোন্নগর, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী দার্জ্জিলিং, মিঃ কে, জি, গুপ্ত কৃষ্ণনগর, বাবু বিশ্বনাথ কর কটক, কৃষ্ণকুমার মিত্র টাঙ্গাইল মধুসূদন সেন বোয়ালিয়া, শরচ্চন্দ্র রায় ময়মনসিংহ, নবদ্বীপচন্দ্র দাস বগুড়া, দ্বারকানাথ ঘোষ কাঁথি।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা—গত ১২ই ফেব্রুয়ারী অধ্যক্ষ সভার বিশেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান

বৎসরের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য মনোনীত হন :— বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ডাঃ পি, কে, রায়, ডাঃ এম, এম, বসু, বাবু কালীশঙ্কর সুকুল, বাবু উমাপদ রায়, মধুসূদন সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ পি. সি. রায় এবং বাবু বঙ্কবিহারী বসু।

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সাধনাশ্রমে একটি ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীমান্ হারাণচন্দ্র সিংহ রায়, বয়স প্রায় ৩০ বৎসর; পাত্রী কুমারী যমুনাবালা, বয়স অনুমান ২৮ বৎসর। কয়েক বৎসর হইল যে তিনটি অসহায়া নেপালী বালিকা ব্রাহ্ম সমাজের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এই পাত্রী তাঁহাদের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন। বিবাহ ৩ আইন অনুসারে রেজিষ্টারী হইয়াছে।

গত মাঘোৎসব যে কেবল কলিকাতাতেই সম্পন্ন হইয়াছে তাহা নহে, ভারতের আরও অনেক স্থানে ব্রাহ্মগণ উৎসাহের সহিত উৎসব করিয়াছেন। ঈশ্বরের করুণায় এমন দিন আসিবে যখন কেবল ভারতবর্ষ নহে, কিন্তু সমস্ত জগৎবাসী এই মহা উৎসবে যোগদান করিবে। আমরা অনেক স্থানের উৎসবের বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা এখন প্রকাশ করা সুবিধাজনক নহে। একজন্য প্রকাশিত হইল না।

আমরা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে আমাদের লক্ষ্ণৌস্থ নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ মিলিত হইয়া মাঘোৎসব করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌতে একটি ব্রহ্ম মন্দির আছে, এপর্য্যন্ত নববিধানী বন্ধুগণই তাহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণ স্বতন্ত্র স্থানে উপাসনাদি করিতেন। এবারও তাঁহারা স্বতন্ত্র উৎসবের উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে নববিধানী বন্ধুগণ একত্র মিলিয়া উৎসব করিবার জন্য তাঁহাদিগকে আহ্বান করেন। তৎপর সকলে মিলিত হইয়া প্রার্থনা পূর্ব্বক উৎসবের কার্য্য প্রণালী স্থির করেন এবং তদনুসারেই উৎসব হয়। নববিধান প্রচারক শ্রীযুক্ত দীননাথ কর্ম্মকার এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদ এই উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন করেন।

ব্রাহ্মবিবাহ—বিগত ২০এ জানুয়ারী ভাগলপুরে একটি ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রী আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কুমারী সরোজিনী এবং পাত্র শ্রীমান্ লালবিহারী রায় চৌধুরী বি. এ। নিবারণ বাবু স্বয়ং আচার্য্যের কার্য্য করেন। বিবাহ ৩ আইন অনুসারে রেজিষ্টারী হইয়াছে।

প্রচার যাত্রা—সাধনাশ্রম হইতে এক প্রচার-দল নির্গত হইয়া বেহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিয়াছেন। আপাততঃ শ্রীযুক্ত ভাই প্রকাশ দেব, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত ভাই সুন্দর সিং এই প্রচার দলে আছেন। কাশী বাবু কিছুদিন পরে ফিরিয়া আসিবেন এবং তৎস্থানে শ্রীমান্ শ্রীরঙ্গ বিহারী লাল গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিবেন। এই প্রচার-দল বর্দ্ধমান, রামপুর হাট, নলহাটী, মুর্শিদাবাদ, ভাগলপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানের সমাজ পরিদর্শন করিয়া বাঁকীপুর পর্য্যন্ত পৌছিয়াছেন। সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মবন্ধুগণ সাদরে ইঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং বিধাতা ইঁহাদের ক্ষুদ্র কার্য্যের প্রতি কৃপা করিয়াছেন। ইঁহারা ক্রমে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলাভিমুখে অগ্রসর হইবেন এবং উত্ত পশ্চিমে কিছুকাল স্থিতি করিবেন। ইঁহাদের প্রচার যাত্রার পূর্ব্বদিন কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে তদর্থ বিশেষ উপাসনা ও দান সংগ্রহ হয়। ঐ উপাসনা কালে ৩০৲ টাকার অধিক সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহাই সম্বল করিয়া ইঁহারা বহির্গত হইয়াছেন। অবশিষ্ট নির্ভর প্রভু পরমেশ্বরের উপর।

আমাদের নূতন সহযোগী "ব্রাহ্ম" খাসিয়া মিশন সম্বন্ধে এই প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ;—"সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খাসিয়া মিশন একটি অতি মহৎ কার্য্য। এই মিশনের ভারপ্রাপ্ত, বিশ্বস্ত কার্য্যকারক শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী নানারূপ বাধা ও প্রতিকূলতার মধ্যে যেরূপ সহিষ্ণুতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন, আমরা তাহার প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারি না। আমরা আশাকরি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই মিশনকে স্থায়ী ভূমিতে দাঁড় করাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন।"

নিম্নলিখিত প্রণালীতে মোসমাই, সওয়ারী ও নন্‌গ্রিম ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ মিলিত হইয়া চিরাপুঞ্জিতে মাঘোৎসব সম্পন্ন করেন :—

রবিবার ২২এ জানুয়ারী মিসন হাউসে উৎসবের উদ্বোধন সূচক উপাসনা হয়। মিঃ ইউ বরধন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

সোমবার—প্রাতে মিঃ ইউ বরধন রায় এবং সন্ধ্যায় মিঃ ইউ সাইমন উপাসনা করেন।

মঙ্গলবার—প্রাতে ইউ বরধন রায় উপাসনা করেন, মিঃ কাদারবিন প্রার্থনা করেন। মধ্যাহ্নে বালক বালিকা সম্মিলন হয়, তাহাতে মিঃ সাইমন প্রার্থনা করেন। অপরাহ্নে মিঃ সাইমন "অন্য ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের কি প্রভেদ" এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন, তৎপূর্ব্বে মিঃ ইউ হালী সিং প্রার্থনা করেন।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী সাধনাশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিন উপলক্ষে সাধনাশ্রমে বিশেষ উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ১৮৯২ সনের এই দিনে পরিচারকাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন। আশ্রমের এ ক্ষুদ্র জীবনে ঈশ্বরের যে অপার করুণার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, শাস্ত্রী মহাশয় কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাহা অতি উজ্জ্বল রূপে উপাসক বৃন্দের হৃদয়ে মুদ্রিত করেন। তৎপরে বাবু জয়শঙ্কর রায়, যিনি এক বৎসর কাল আশ্রমের সহিত সংসৃষ্ট আছেন, তাঁহাকে ওয়ার্কাররূপে গ্রহণ করা হয় এবং শ্রীমতী চঞ্চলা ঘোষ ও বাবু হরিমোহন ঘোষাল সংকল্পাধীন ওয়ার্কাররূপে গৃহীত হন এবং বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ, বাবু হারাণচন্দ্র সিংহ রায় ও মুন্সী জালাল উদ্দিন আশ্রমের সহায়শ্রেণীভুক্ত হন। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস উপাসনার কার্য্য করেন।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২০এ ফাল্গুন প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১২শ সংখ্যা।
১৬শ ভাগ।

১৬ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময় বিধাতা। তুমি কতবার আমাদের হৃদয়কে জাগ্রত কর আবার কতবার আমরা মোহ-নিদ্রাতে অভিভূত হই। কতবার হৃদয়ে শুভ সঙ্কল্পের অভ্যুদয় কর, কতবার তোমার চরণে প্রতিজ্ঞা করি, আবার কতবার তাহা বিস্মৃত হইয়া অবসন্ন ও জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়ি। এইরূপে আমাদের জীবন দুর্ব্বলতা সবলতার মধ্যে আন্দোলিত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু দুর্ব্বলতার দ্বারা সময়ে সময়ে অভিভূত হইলেও আমরা নিরাশ হই না, কারণ তোমার করুণা সর্ব্বদা আমাদের সহায়। অকপটচিত্তে যে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করে তুমি তাহার সহায়তা করিতে কখনই বিমুখ নও। তোমার প্রসাদে তাহার দুর্ব্বলতা সবলতাতে পরিণত হইয়া থাকে। আমরা নববর্ষের প্রারম্ভে তোমার চরণে পড়িয়া প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি আমাদিগকে বল দেও যাহাতে আমরা বর্ত্তমান বর্ষে সমধিক দৃঢ়তার সহিত তোমার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিতে পারি। তুমি আমাদের প্রত্যেকের উপরে যে কর্ত্তব্য ভার অর্পণ করিয়াছ তাহা যেন সমুচিত রূপে বহন করিবার জন্য চেষ্টা করি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

আগামী বর্ষের কার্য্য সূচনা—নূতন বৎসরের জন্য কর্ম্মচারী, অধ্যক্ষ সভা, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা প্রভৃতি মনোনীত হইয়া কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে কি কি কার্য্যে হস্তার্পণ করা হইবে সেই আলোচনা চলিয়াছে। মাননীয় সভাপতি মহাশয় তাঁহার বিগত সাম্বৎসরিক বক্তৃতাতে কতকগুলি কার্য্যের সূচনা করিয়াছেন। বিগত ব্রাহ্ম সম্মিলনীতে যে কয়েকটী গুরুতর বিষয়ের আলোচনা উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাঁহার বক্তৃতাতেও সেইগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বর্ত্তমান বর্ষে সেইগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কিঞ্চিৎ সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। সম্মিলনীর তিন দিনের সমালোচনাতে প্রধানতঃ চারিটী বিষয়ের অবতারণা করা হয়। (১ম) ব্রাহ্মবালকদিগের শিক্ষা (২য়) ব্রাহ্মবালিকাদিগের শিক্ষা (৩য়) ব্রাহ্মদিগের সাংসারিক অবস্থা (৪র্থ) ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক অবস্থা। সকলগুলিই অতিশয় প্রয়োজনীয় বিষয় এবং প্রত্যেক বিষয়েই কিছু কিছু করিবার আছে। ইহার মধ্যে ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষাবিষয়ে কিঞ্চিৎ সূত্রপাত করা হইয়াছে এই মাত্র। কিন্তু তাহাতেও করিবার অনেক আছে। ব্রাহ্ম বালকদিগের জন্য একটী বোর্ডিং এবং ব্রাহ্মবালিকাদিগের জন্য একটী বোর্ডিং ও বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। উক্ত উভয় উপায়ে যে ইষ্টফল ফলিতেছে, তাহা আমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় যে উক্ত উভয় বিষয়েও ব্রাহ্মবন্ধুদিগের সাহায্য সমুচিতরূপে পাওয়া যাইতেছে না। ব্রাহ্মবালক বোর্ডিংটী ব্রাহ্মবালকদিগের জন্য করা হইয়াছিল, কিন্তু ব্রাহ্মবালকের সংখ্যা আশানুরূপ হয় নাই। বালক-বালিকার প্রকৃত শিক্ষার ন্যায় গুরু দায়িত্বভার ধর্ম্মসমাজের পক্ষে অতি অল্পই আছে। অথচ সমুচিত অর্থ সাহায্যের অভাবে উক্ত উভয় কার্য্যই অতি কষ্টের সহিত ও অসম্পূর্ণ ভাবে চালাইতে হইতেছে। আশা করি বর্ত্তমান বর্ষে এবিষয়ে বন্ধুগণের মনোযোগ অধিকতর রূপে আকৃষ্ট হইবে।

তৎপরে ব্রাহ্মদিগের সাংসারিক অবস্থা। ইহাও একটী গুরুতর চিন্তার বিষয়। এবিষয়ে যে প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল তাহাও স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। ব্রাহ্মদিগের সাংসারিক অবস্থার উন্নতি বিধানের উপায় না করিতে পারিলে ত্বরায় সমাজের বিশেষ অবনতি হইবে, এই আশঙ্কা অনেকের মনে হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে এবিষয়েও কিছু ভাবিবার ও করিবার আছে।

সর্ব্বশেষে সমাজের বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক অবস্থা। ইহাই এক মহৎ কার্য্যক্ষেত্র। কলিকাতাতেই করিবার কত আছে। কলিকাতার উপাসকমণ্ডলীটীর অবস্থা অতিশয় নিষ্প্রভ। অন্যান্য ধর্ম্মসমাজে এরূপ এক একটী উপাসকমণ্ডলী কিরূপ

আধ্যাত্মিক শক্তির উৎসস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে তাহা চিন্তা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আর আমাদের উপাসকমণ্ডলীটীর অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দুঃখিত হইতে হয়। উপাসনাকার্য্যের ভার যাঁহাদের প্রতি অর্পিত হয়, উপাসকদিগের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ট যোগ নাই; উপাসকে উপাসকে ঘনিষ্ঠতা নাই। সহরের ব্রাহ্মদিগের সকলে নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনাতে আসেন না। উপাসকমণ্ডলীর কার্য্যে অনেকের বিশেষ উৎসাহ দৃষ্ট হয় না। অর্থের অসচ্ছলতানিবন্ধন উপাসকমণ্ডলীর অত্যাবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করাও সময়ে সময়ে কঠিন বোধ হয়।

এইরূপ যে দিকেই দেখা যাইবে সেই দিকেই করিবার যথেষ্ট আছে। সুখের বিষয় বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ইতিমধ্যেই এই সকল বিষয়ে মনোযোগ দিতেছেন, আশা করা যাইতেছে যে বর্ত্তমান বর্ষ অতীত না হইতেই আমরা এই সকল বিষয়ে কিছু কিছু ফল দেখিতে পাইব। ব্রাহ্মসম্মিলনীতে পঠিত প্রবন্ধগুলি স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্রাহ্ম বালকদিগের শিক্ষা।

(৯ই মাঘ দিবসের ব্রাহ্ম সম্মিলনীতে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র কর্ত্তৃক বিবৃত।)

ব্রাহ্মগণ পুত্রদিগকে কিরূপ শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন? যে শিক্ষাতে ধন মান লাভ হয়, সেই শিক্ষা দিতে চান, কি যদ্দ্বারা পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় সেই শিক্ষা দিতে চান? সন্তানগণ যদি বিনয়, প্রেম, সদিচ্ছা ও ঈশ্বর-ভক্তি-পরায়ণতা-শূন্য হইয়া কেবল ধনী ও মানী হয়, ব্রাহ্ম তাহাতে সন্তুষ্ট, না ধন মান-শূন্য হইয়াও যদি প্রেম, বিনয়, পবিত্রতা, সাধু ইচ্ছা ও ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট? আমাদের নিকট শিক্ষার উদ্দেশ্য কি?

প্রাচীন কালে গ্রীস দেশে স্পার্টা এক নগণ্য রাজ্য ছিল, ইহার অধিবাসিগণ দুর্ব্বল ছিল, তাহাদের চারিদিকে পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী জাতি সমূহ বাস করিত। লাইকারগাস নামক একজন প্রতিভাশালী জ্ঞানী, জন্মভূমিকে বীর ভূমি করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। বীর সৃষ্টি করা তাঁহার লক্ষ্য, সুতরাং স্বদেশের বালক ও বালিকাদিগকে সঙ্কল্পসিদ্ধির উপযোগী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

যাহারা বিকলাঙ্গ তাহারা কখনও বীর হইতে পারে না। সুতরাং তিনি আইন করিলেন যে বিকলাঙ্গ শিশুদিগকে বধ করিতে হইবে। বালকগণের যখন সাত বৎসর বয়স হইবে, তখন তাহাদের পিতামাতার নিকট হইতে তাহাদিগকে লইয়া আসিয়া রাজপুরুষদিগকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষালয়ে রাখিতে হইবে। ৭ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা ব্যায়াম ও যুদ্ধকৌশল শিক্ষা করিবে। সাহসুতা শিক্ষা দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে নৃশংস ভাবে বেত্রাঘাত করা হইত। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ হইতে রুধিরধারা বহির্গত হইত, তথাপি কেহ আর্ত্তনাদ করিতে পারিত না। শীত, গ্রীষ্মে একই পরিচ্ছদ পরিধান করিত—কখনও কখনও অনশন-ব্রত অবলম্বন করিতে হইত—উদর পূর্ণ করিয়া কখনও তাহারা আহার করিতে পাইত না—ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্ত করিবার জন্য তাহাদিগকে মৃগয়া বা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করা হইত। ৩০ বৎসর পূর্ণ না হইলে কেহ বিবাহ করিতে পারিত না—কোন সভা সমিতিতে যাইয়া তর্ক বিতর্কে যোগ দিতে পারিত না। লাইকারগাস যে শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহাতে অচিরকাল মধ্যেই স্পার্টার নরনারীগণ বিক্রমশালী হইয়াছিল। তাহাদের বীরদর্পে সমস্ত গ্রীসদেশ কম্পিত হইয়াছিল। লাইকারগাস স্বদেশবাসীকে বীর করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং সঙ্কল্পসিদ্ধির উপযোগী শিক্ষার প্রথাও প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহার লক্ষ্য সিদ্ধি হইয়াছিল।

আমরা ব্রাহ্মসমাজে জ্ঞানী, প্রেমী, দুর্জ্জয় ইচ্ছা-শক্তি-সম্পন্ন, ঈশ্বর-পরায়ণ লোক সৃষ্টি করিতে চাই। দশ হাজার ধনী লোক অপেক্ষা আমরা একজন ধার্ম্মিককে শ্রেষ্ঠ মনে করি। আমাদের যখন ইহাই মত, তখন পুত্রদিগকে কিরূপ শিক্ষা দিতে আমরা ইচ্ছা করি?

বর্ত্তমান সময়ে এদেশে অপরা বিদ্যার চর্চ্চা হইতেছে। কিন্তু পরা বিদ্যার প্রতি কাহারও মনোযোগ নাই। ব্রাহ্মদের পুত্রগণও দেশ-প্রথানুসারে কেবল অপরা বিদ্যায় শিক্ষিত হইতেছে। সুতরাং ব্রাহ্মদের লক্ষ্য সিদ্ধি হইতেছে না। পুত্রগণ জ্ঞান, প্রেম, সদিচ্ছা ও ঈশ্বরনিষ্ঠা পূর্ণ হইতেছে না। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি?

(১) অপরাবিদ্যা শিক্ষার জন্য দেশে বিদ্যালয়ের অভাব নাই। কিন্তু কোন বিদ্যালয়েই পরাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় না। আমাদের বালকদের জন্য যদি পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারিতাম তবে বিদ্যালয়েই পরা ও অপরা বিদ্যা শিক্ষা দিতে সক্ষম হইতাম। কিন্তু কেবল ব্রাহ্ম বালকদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করা এখন নানা কারণে সম্ভব বোধ হইতেছে না। সুতরাং আমাদের বালকগণ সাধারণ বিদ্যালয়ে অপরা বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে, গৃহে তাহাদিগকে পরা বিদ্যা শিক্ষা দিতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান উদ্দীপিত করিবার জন্য গৃহেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। পিতা মাতার উপরেই এই গুরুভার পড়িতেছে। তাঁহারা সন্তানদিগকে ক্রমে ঈশ্বর-বিষয়ক সহজ তত্ত্ব হইতে গভীরতর ধর্ম্মবিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন। এইরূপে বালকদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(২) প্রেম-বিহীন মানুষ মানুষই নহে। পরমেশ্বর সকল সদ্গুণের বীজই আত্মাতে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বিনা কর্ষণে সে বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রেমশিক্ষা হয় না। বালকদের প্রাণে প্রেম বিকাশ করিবার ভার পিতা মাতার উপরেই পড়িতেছে। পিতা অপেক্ষা মাতাই এই শিক্ষাদানের সমধিক অধিকারিণী। পিতা মাতা বালকদের প্রাণে ধীরে ধীরে কোমলভাবগুলি

ফুটাইয়া তুলিবেন। তাহারা যাহাতে ভাই ভগিনীকে ভাল বাসে, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত জীবকে ভাল বাসে, সেই শিক্ষা দিতে হইবে। এমন কি বৃক্ষলতাকে যাহাতে আদর যত্ন করিয়া জল দেয় সেইরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। অন্ধ প্রভৃতি আতুরদিগকে সন্তানদের দ্বারা ভিক্ষা দেওয়াইতে হইবে। বাড়ীতে কাহারও পীড়া হইলে সন্তানদের দ্বারা তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করাইতে হইবে। এইরূপে সন্তানদিগকে প্রেমশিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

(৩) বাঙ্গালী জাতির ইচ্ছাশক্তি বড় দুর্ব্বল। ব্রাহ্মগণ চতুর্দ্দিকে প্রতিকূল ঘটনা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বাস করেন। আমাদের সন্তানগণের ইচ্ছাশক্তি যদি দুর্জ্জয় না হয় তবে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। বাল্যকাল হইতে তাহাদিগকে সেই শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে তাহারা যাহা সৎ বলিয়া জানে সামান্য ক্লেশকে অবহেলা করিয়া তাহা পালন করিতে পারে। ইচ্ছাকে সর্ব্ব প্রযত্নে দৃঢ় করিতে হইবে। বালকদের ইচ্ছাশক্তি স্বভাবতঃ খুব দৃঢ় থাকে। কিন্তু দেখা যায় অনেক নির্ব্বোধ পিতা মাতা বলপূর্ব্বক তাহাদের ইচ্ছাশক্তিকে দমন করিয়া ক্রমে তাহাদিগকে শক্তিহীন করিয়া ফেলেন। আস্তে আস্তে প্রতিকূল ঘটনা জয় করিতে উৎসাহিত করিলে বালকদের ইচ্ছাশক্তি ক্রমে দৃঢ় হইতে পারে। এ সম্বন্ধে মাতা যদি বালকদিগকে সুন্দর সুন্দর গল্প বলেন তবে ইচ্ছাশক্তি জাগরণের সহায়তা হইতে পারে। বালকের পড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না, এই অনিচ্ছা জয় করাইতে হইবে, বালকের বাববাসরিক বিদ্যালয়ে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না, তাহার প্রাণে তথায় যাইবার ইচ্ছা জাগাইয়া দিতে হইবে। কোন অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য খাইবার লালসা হইয়াছে, সেই লালসাকে ভয় দেখাইয়া নহে, কিন্তু তাহার সদ্গুণের দোহাই দিয়া নিবৃত্ত করিতে উত্তেজিত করিতে হইবে। এইরূপ নানা উপায়ে বালকের ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করিতে হইবে।

(৪) ঈশ্বর বিশ্বাস ও ভক্তি শিক্ষার স্থান গৃহ। গৃহ ব্যতীত আর কোথাও তেমন সুন্দররূপে ঐ শিক্ষা হইতে পারে না। পিতা মাতাই বালক-জীবনের আদর্শ। পিতা অপেক্ষা মাতাই অধিকতর আদর্শ। সন্তানগণ যদি দেখিতে পায় পিতা মাতা প্রতিদিন ভক্তির সহিত পরব্রহ্মের পূজা করিতেছেন। পিতা মাতার সেই ভক্তিমাখা মুখের দিকে চাহিয়া সন্তান ঈশ্বরভক্তি শিক্ষা করিতে পারে। সন্তানগুলি ঈশ্বরপরায়ণ হইতেছে না, কোন কোন ব্রাহ্মের মুখে এই খেদের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস, গৃহে উপাসনার ব্যবস্থা না থাকাই এই শোচনীয় অবস্থার প্রধান কারণ। প্রতি গৃহে নিষ্ঠার সহিত প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনা হউক, সে গৃহের সন্তান বিশ্বাস ও ভক্তির দৃষ্টান্ত দেখুক; ইহা দেখিয়া তাহারাও স্বভাবতঃ বিশ্বাসী ও ভক্তিপরায়ণ হইবে। পিতা মাতা বৃক্ষ লতা, চন্দ্র সূর্য্য, মনুষ্যদেহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুর সম্বন্ধে গল্প করিতে করিতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা সন্তানের প্রাণে সহজে মুদ্রিত করিয়া দিতে পারেন। নানা ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া পরমেশ্বর আমাদিগকে কেমন ভাল বাসেন তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন। সন্তানেরা ৮।১০ বৎসর বয়স হইলেই সোজাসুজি দুই এক কথায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাও করিতে পারে। আহারের সময় পরমেশ্বর আমাদিগকে এই আহার দ্রব্য দিয়াছেন, ইহা মনে করিয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে পারে। কিন্তু সাবধান হইতে হইবে যেন সন্তানগণ প্রার্থনাটা কেবল কথার কথা মনে না করে। এইরূপে পিতা মাতা দৃষ্টান্ত, উপদেশ ও শিক্ষা দ্বারা সন্তানের প্রাণে ভগবদ্ভক্তি জাগ্রত করিয়া দিতে পারেন। ধনবল বা জনবলে ব্রাহ্মসমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইবে না, ধর্ম্ম যেখানে শ্রী সেখানেই বাস করেন। জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা ও ঈশ্বর-ভক্তির বিকাশের নামই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মই ব্রাহ্মদের একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্য লাভের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। লাইকারগাস যেমন শিক্ষার বলে এক দুর্ব্বল নগণ্য জাতিকে প্রবল পরাক্রান্ত করিয়াছিলেন, আমরাও তেমনই এই পূর্ণ শিক্ষার বলে দুর্ব্বল ব্রাহ্মদিগকে এ দেশে দুর্জ্জয় শক্তিতে পরিণত করিতে পারি।

ব্রাহ্মদিগের সাংসারিক অবস্থা।

(৯ই মাঘ ব্রাহ্মসম্মিলনীতে শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পঠিত)

মঙ্গল-বিধাতা পরমেশ্বরের কৃপায় এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতেছে। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের ত কথাই নাই, সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকাতেও ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় পতাকা উড্ডীয়মান হইতেছে। এখন আর ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক কেবল মহানগরী কলিকাতাতে আবদ্ধ নাই। এখন আর কেবল মাত্র কতিপয় কলিকাতাবাসী ব্রাহ্ম একত্র হইয়া সপ্তাহে একবার উপাসনা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। সে সকল দিন গত হইয়াছে। এখন নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত ও ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় ঘোষিত হইতেছে। এখন কত ভাই কত ভগিনী ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্ম পরিবারভুক্ত হইয়া আমাদের সমাজ পরিপুষ্ট করিতেছেন। ব্রাহ্ম পরিবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। এক্ষণে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগের জ্ঞান ধর্ম্মোন্নতির সুব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মপরিবারের বালক বালিকাগণের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের আবশ্যক হইয়াছে। এক্ষণে বিদেশস্থ ব্রাহ্মবন্ধুগণের বালক বালিকাদিগের কলিকাতায় বাসস্থান, তত্ত্বাবধান ও শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে আর চলে না। এই সকল গুরুভার বহন করিয়াই যে ব্রাহ্মসমাজ নিশ্চিন্ত থাকিবেন তাহা পারিবেন না। আজ কাল আর একটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। কেবল আলোচনায় হইবে না, যাহাতে সেই বিষয়ের একটা মীমাংসা ও তদনুরূপ কার্য্য হয় তাহাই করিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজে তিন অবস্থার লোক আছেন; সঙ্গতিপন্ন, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র। আমাদের মধ্যে সঙ্গতিপন্ন লোকের সংখ্যা অতি অল্প, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের সংখ্যাই অধিক। সঙ্গতিপন্ন ব্রাহ্মদিগের সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল। তাঁহারা কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া আপনাদিগের পারিবারিক সুব্যবস্থা

আপনারাই করেন। তাঁহারা অর্থদ্বারা সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর কার্য্যে ব্রাহ্মসমাজকে যথেষ্ট সহায়তা করেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহারা নিস্ব ব্রাহ্মদিগকে অর্থসম্বন্ধে সাহায্য করিয়া তাহাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। ইঁহাদিগের সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের কিছু ভাবিবার বা করিবার নাই। মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মদিগের অবস্থা এতাধিক সচ্ছল না হইলেও তাহারা অপরের সাহায্য ব্যতীত আপনাদিগের পরিবার প্রতিপালন ও বালক বালিকাগণের শিক্ষা দান করিতে সমর্থ। আপাততঃ তাঁহাদিগের এক প্রকার চলিতেছে। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই যত্র আয় তত্র ব্যয়। তাঁহারা কিছুই সংস্থান করিতে পারিতেছেন না। রোগাক্রান্ত হইয়া বা অন্য কোন প্রকারে অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম হইলে তাঁহাদিগের দুরবস্থার সীমা থাকে না। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে অকূলপাথারে ভাসিতে হয়। অন্যের গলগ্রহ হওয়া ব্যতীত তাঁহাদিগের উপায়ান্তর থাকে না। সুখের বিষয় যে ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ জীবনবীমা দ্বারা আপনাদিগের পরিবারবর্গকে এই অবস্থা হইতে রক্ষার উপায় করিয়া রাখিতেছেন। ইঁহাদিগের জন্য ব্রাহ্মসমাজের আপাততঃ কিছু করিবার না থাকিলেও ইঁহাদিগের অবস্থা সম্বন্ধে কতক চিন্তার কারণ আছে। দরিদ্র ব্রাহ্ম পরিবারের সাংসারিক অবস্থা অতি শোচনীয়। দরিদ্র ব্রাহ্মগণ অতি কষ্টে সংসার প্রতিপালন করেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করেন তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের সকল ব্যয় সংকুলন হয় না, কোন না কোন অভাব সর্ব্বদাই রহিয়া যায়। অর্থাভাবে ইঁহারা বালক বালিকাদিগকে সুশিক্ষা দিতে নিজেরা না পারিয়া অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হন। পরিবার মধ্যে রোগ বা অন্য কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলেও অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করা ভিন্ন তাঁহাদিগের উপায়ান্তর নাই। কোন কোন নিস্ব পরিবার ইতিমধ্যেই অনন্যোপায় হইয়া ব্রাহ্মসমাজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এরূপ ব্রাহ্ম পরিবারের সংখ্যা আপাততঃ অল্প বটে, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্ম পরিবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে তাহার সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক দরিদ্র ব্রাহ্মদিগের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ব্রাহ্মসমাজ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। ইঁহাদিগের অবস্থার উন্নতির কোন উপায় না করিয়া উদাসীন থাকিলে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই মহা অনর্থ সংঘটিত হইবে।

ইউরেসিয়ান ও দেশীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের দরিদ্রলোকদিগের পারিবারিক অবস্থা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, দারিদ্র্যের বিষময় ফল তাঁহারা সহজেই অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন। অর্থাভাবে উক্ত সম্প্রদায়দ্বয়ের বালকবালিকাগণ সুশিক্ষা লাভে বঞ্চিত। এই জন্য তাঁহাদিগের মধ্যে কত প্রকার পাপ প্রবেশ করিয়া ক্রমে তাঁহাদিগের সমাজকে কলঙ্কিত ও ঘৃণিত করিয়া তুলিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের দারিদ্র্যের কোন প্রতিকার করিতে না পারিলে ইহারও যে সেইরূপ দুর্গতি হইবে তাহার আর সন্দেহ কি? এখনই দেখা যাইতেছে যে কোন কোন নিস্ব ব্রাহ্মের বালক বালিকাগণ অর্থাভাবে কোন ভাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পারিতেছে না। সুতরাং তাহারা অশিক্ষিত অবস্থায় থাকিবে এবং কালে ব্রাহ্মসমাজের কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠিবে। কেবল ইহাই নহে,দারিদ্র্য সাধারণতঃ মনুষ্যকে নীচ করিয়া ফেলে। দারিদ্র্য প্রযুক্ত লোকে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য ও অন্যান্য অসদুপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। অতএব ব্রাহ্মসমাজের দারিদ্র্য যাহাতে দূর হয় সর্ব্বাগ্রে তাহার উপায় করা ব্রাহ্মদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মসমাজ এখনও এত বিস্তৃত হয় নাই যে ইহার দারিদ্র্য দূর করা অসম্ভব। চেষ্টা করিলে এখনও ব্রাহ্মপরিবারে অস্বচ্ছলতা ও অভাব অন্ততঃ কতক পরিমাণে দূর হইতে পারে।

বিষয়টীর গুরুত্ব সকলেই অনুভব করিয়াছেন। এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের দারিদ্র্য দূরীকরণের কয়েকটি উপায় ব্রাহ্মমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

১। ব্রাহ্ম-পল্লী-স্থাপন—কলিকাতায় বাস অতিশয় ব্যয়সাধ্য। এখানে সকল দ্রব্যই মহার্ঘ্য অথচ অস্বাস্থ্যকর। এই সকল কারণে মহানগরী মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র লোকের বাসের অযোগ্য। যাঁহারা এবিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে দরিদ্র ও এমন কি মধ্যবিত্ত অবস্থার ব্রাহ্মদিগের পক্ষেও কোন পল্লীগ্রামে বাস করা শ্রেয়স্কর। পল্লীগ্রামে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করায় ব্রাহ্মদিগের অনেক অসুবিধা হইতে পারে, কিন্তু কতকগুলি পরিবার একত্র হইয়া বাস করিলে সে সকল অসুবিধার আশঙ্কা নাই। অতএব সুবিধাজনক ও স্বাস্থ্যকর স্থানে ব্রাহ্মদিগের একটি পল্লী স্থাপন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। যে সকল ব্রাহ্মের এখানে কোন বিষয় কার্য্য নাই, তাঁহারা সেখানে গিয়া কোন ব্যবসায় বা কৃষি কার্য্য অবলম্বন করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। যাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে এখানে অবস্থিতি করিতে বাধ্য, তাঁহারা ও আপনাদিগের পরিবার সেখানে রাখিয়া ব্যয় সংকোচ করিতে পারিবেন। অবসরানুসারে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে তথায় যাইয়া তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধান করিবেন এবং যে সকল বন্ধু স্থায়ীরূপ তথায় বাস করিবেন তাঁহারাই তাঁহাদিগের অনুপস্থিতি কালে তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। নিকটে সুচিকিৎসক, বিদ্যালয় ও বাজার প্রভৃতি থাকে এরূপ কোন স্বাস্থ্যকর ও সুবিধাজনক স্থানে পল্লীটী সংস্থাপন করিতে হইবে। তাহার পর, যাঁহারা সেই পল্লীর অধিবাসী হইবেন তাঁহারা আপনাদিগের চেষ্টায় এবং ব্রাহ্মমণ্ডলীর সহায়তায় আপনাদিগের উপাসনার জন্য একটী উপাসনালয়, বালক বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয়, সাধারণের পাঠের জন্য একটী পাঠাগার প্রভৃতি শুভানুষ্ঠান সকল ক্রমশঃ করিয়া লইতে পারিবেন। কলিকাতার ব্রাহ্মছাত্রীনিবাস ও শিক্ষালয় অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বলিয়া সকলেই অনুভব করিতেছেন। অনেকের ধারণা এই যে কোন স্বাস্থ্যকর পল্লীতে এই দুইটী স্থানান্তরিত করিতে পারিলে ব্যয়ভার অনেক লাঘব হইবে; অথচ তাহাতে সক-

স্বলস্থ ব্রাহ্মবন্ধুদিগের বিশেষ অসুবিধা হইবে না। অতএব ব্রাহ্মছাত্রীনিবাস ও শিক্ষালয়ও কালে সংস্থাপিত পল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়া বড় অসম্ভব নহে। আমার স্মরণ হয় কোন কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু ইতিপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। আশা করাযায় যাহাতে তাঁহাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, তাঁহারা তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান হইবেন। ব্রাহ্মছাত্রীনিবাস ও শিক্ষালয় সংস্থাপিত পল্লিতে স্থানান্তরিত হইলে সেখানে ব্রাহ্মদিগের আর অসুবিধার কারণ থাকিবে না। মধ্যবিত্ত ও সামান্য অবস্থার ব্রাহ্মগণ সেই পল্লিতে বাস করিলে অল্প ব্যয়ে সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া কিছু কিছু সংস্থান করিতে পারিবেন। ইহা হইলে তাঁহাদের মৃত্যুতে তাঁহাদের পরিবারবর্গকে এক্ষণকার ন্যায় নিঃসম্বল হইয়া কাহারও গলগ্রহ হইতে হইবে না।

এসম্বন্ধে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয় পচম্বায় অবস্থিতি কালে তথায় বা তন্নিকটবর্ত্তী অন্য কোন স্বাস্থ্যকর ও সুবিধাজনক স্থানে একটি ব্রাহ্মপল্লী সংস্থাপনোদ্দেশে বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পচম্বা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি অতিশয় স্বাস্থ্যকর ও অনেক প্রকার ব্যবসায় ও কৃষিকার্য্যের বিশেষ উপযোগী। এই সকল স্থানে আহারীয় দ্রব্যাদি অতি সুলভ, ভূমির কর যৎসামান্য এবং গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় অতি অল্প। এই সমস্ত কারণে তাঁহারা উক্ত স্থানগুলি মনোনীত করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহারা যাঁহাদিগের জন্য এতাধিক পরিশ্রম করিলেন তাঁহারা এবিষয়ে উদাসীন। যদি পচম্বা সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি হয় অন্য কোন সুবিধাজনক স্থান মনোনীত করা হউক, কিন্তু এবিষয়ে আর নিশ্চিন্ত থাকা বিধেয় নহে।

২। ব্যয় সংকোচ—নানা কারণে ব্রাহ্মপরিবারের ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। একদিকে যেমন কলিকাতা বাস ও বালক বালিকাদিগের শিক্ষার গুরুতর ব্যয়, অন্য দিকে সেইরূপ সভ্যতা ও আনুষঙ্গিক বিলাসিতার নানা প্রকার ব্যয় ব্রাহ্মসমাজের অর্থাভাবের প্রধান কারণ। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ আপন আপন পারিবারিক কার্য্য সকল অপমান জনক মনে করিয়া অবহেলা করেন। পূর্ব্বে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, সঙ্গতিপন্ন লোকের বাটীর মহিলারাও রন্ধন ও অন্যান্য পারিবারিক কার্য্য অতিশয় গৌরবজনক মনে করিয়া আগ্রহের সহিত সম্পাদন করিতেন। অদ্যাপিও অনেক হিন্দু পরিবারে সেইরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের সমাজের সামান্য সামান্য গৃহস্থদিগের বাটীতে এক একজন পাচিকা না হইলে চলে না। আমাদিগের মহিলারা রন্ধন অপমানের কার্য্য মনে করেন। কাহারও কাহারও সংস্কার এই যে রন্ধন রোগোৎপত্তির কারণ। রন্ধনে রোগোৎপত্তি হয় কিনা তাহা জানি না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমাদিগের মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী প্রভৃতি সকলে দুই বেলা রন্ধন করিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগের কোন রোগের কথা শুনা যায় না।

আমাদিগের পরিবারের পরিচ্ছদের ব্যয়ও কিছু অযথা বলিয়া বোধ হয়। সম্ভ্রম রক্ষা, লজ্জা ও শীত নিবারণের জন্য যে পরিচ্ছদের প্রয়োজন তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই, কিন্তু বিলাসিতার জন্য পরিচ্ছদে অযথা ব্যয় করিয়া সমাজ মধ্যে কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা অতি অন্যায় কার্য্য।

পূর্ব্বকালে আমাদিগের দেশের মহিলাগণ পদব্রজে গঙ্গাস্নান ও তীর্থ দর্শনে যাইতেন; এখনও হিন্দু সমাজে সেই প্রথা রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের সমাজে গাড়ি না হইলে উপাসনালয়ে বা কাহারও বাটীতে যাতায়াত হয় না। বিগত উৎসবের সময় শকটবানেরা ধর্ম্মঘট করিয়া গাড়ি বন্ধ করাতে মহিলাগণের উপাসনালয়ে যাতায়াতের যে কত ব্যয় হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই সকল বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

৩। অর্থ সংস্থান—ব্রাহ্মদিগের সাংসারিক অবস্থা সাধারণতঃ এত অস্বচ্ছল যে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে আপন আপন পরিবারের জন্য কিছুই সংস্থান করিতে পারিতেছেন না। এই জন্য কেহ কেহ কোন কোন জীবনবীমা সমিতির সহিত সংসৃষ্ট হইয়াছেন। ইঁহাদিগের মৃত্যুতে ইঁহাদিগের পরিবারবর্গ একবারে নিরুপায় হইয়া পড়িবে না। আমার বিবেচনায় প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই ইঁহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মসমাজ হইতে এ সম্বন্ধে কিছু করিতে পারিলে ভাল হয়।

৪। স্বাধীন ব্যবসায়—পরের উপর নির্ভর অথবা সামান্য বেতনে পরের দাসত্ব করার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মগণ কোন না কোন লাভজনক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আপনাদিগের উদ্যম, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি ও সুখ স্বচ্ছন্দে জীবনাতিপাত করিতে পারেন। এবিষয়ে পার্শি ও মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়। কোন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে হইলে অভিজ্ঞতা ও অর্থ উভয়েরই প্রয়োজন। যাঁহারা যে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে অভিলাষী তাঁহাদিগকে অগ্রে সেই ব্যবসায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে। তৎপরে অর্থ সম্বন্ধে ব্রাহ্ম সমাজ হইতে কোন সুব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। সঙ্গতিপন্ন ব্রাহ্মেরাও এবিষয়ে অনেক সহায়তা করিতে পারিবেন।

৫। মিলিত ভাণ্ডার (co-operative store)—ব্রাহ্মদিগের একটী মিলিত ভাণ্ডার হওয়া অত্যন্ত প্রার্থনীয়। ইহা দ্বারা একদিকে ব্রাহ্ম সাধারণের নির্দোষ ও স্বাস্থ্যকর আহারীয় দ্রব্যাদি পাইবার বিশেষ সুবিধা হইবে, অপর দিকে কয়েক জন ব্রাহ্মের অর্থোপার্জ্জনের একটী উৎকৃষ্ট উপায় হইতে পারে।

উপসংহারে আমার এই প্রস্তাব যে ব্রাহ্মদিগের সাংসারিক অবস্থা উন্নতির উল্লিখিত অথবা অন্য কোন উপায় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একটী সমিতি সংগঠিত হইয়া এসম্বন্ধীয় আলোচনা শেষ হউক।

ব্রাহ্ম বালিকাদিগের শিক্ষা।

(১২ই মাঘ সম্মিলনীতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক পঠিত।)

ব্রাহ্ম বালিকাদিগকে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য; এই প্রশ্নের বিচার করিতে গেলেই আর দুইটী বিষয়ে চিন্তা করিতে হয়। প্রথম—ব্রাহ্মসমাজ নারী-জীবনের কিরূপ আদর্শ সমক্ষে রাখিয়াছেন?

দ্বিতীয়—ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্ম পরিবারের কি আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন?

প্রথমে নারী-জীবনের আদর্শ—আমাদের সমক্ষে দুই প্রকার আদর্শ উপস্থিত। এক আদর্শ প্রাচীন হিন্দু সমাজের, যাহাতে বলে :—

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে।

মনু।

অর্থ—নারীদিগের পৃথক্ যজ্ঞ নাই পৃথক্ ব্রত বা উপাসনাদি নাই, ইঁহারা যে পতির শুশ্রূষা করেন, তদ্দ্বারাই স্বর্গগামিনী হয়েন। এই মূল ভাবেরই অনুসরণে এই বিধি প্রচার হইয়াছে :—

বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং।

অর্থ—নারী বাল্যে পিতার অধীনে থাকিবেন, যৌবনে পতির অধীনে থাকিবেন, ও বার্দ্ধক্যে পুত্রগণের অধীনে থাকিবেন, রমণী কখনই স্বাধীনতা অবলম্বন করিবেন না।

পূর্ব্বোক্ত আদর্শ অনুসারে এই ভারতে লক্ষ লক্ষ রমণী চিরদিন আপনাদের প্রবৃত্তি ও অধিকারকে খর্ব্ব করিয়া পতি সেবাকে ও পরসেবাকে পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে দিন যাপন করিয়া আসিয়াছেন ও এখনও আসিতেছেন।

ব্রাহ্মসমাজ পরিস্ফুটরূপে না হউক অপরিস্ফুটভাবে নারী জীবনের আর এক আদর্শ ঘোষণা করিয়াছেন ও তাহার অনুসরণ করিতেছেন। সে আদর্শ এই—

"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাত বিচার।" অর্থাৎ ভক্তি দ্বারা মুক্তি লাভ করা বিষয়ে নরনারীর সমান অধিকার। ইহার অর্থ এই পুরুষের ন্যায় নারীও স্বাধীন ভাবে ঈশ্বরকে জানিবেন, তাঁহাকে প্রীতি করিবেন ও নিজ-জীবনের মহত্ত্ব সাধন করিবেন। ইহাই হইল সর্ব্ব প্রকার স্বাধীনতার ভিত্তি।

জীবনের মহত্ত্ব সাধন সম্বন্ধে পুরুষ ও নারীতে প্রভেদ নাই—পুরুষের পক্ষে যাহা জীবনের মহত্ত্ব-সাধনের পথ, নারীর পক্ষেও তাহাই মহত্ত্ব-সাধনের পথ। অর্থাৎ জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিয়া সত্যকে গ্রহণ করা, প্রেমকে উজ্জ্বল করিয়া সত্যকে প্রীতি করা ও ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করিয়া সত্যের অনুসরণ করা। যে জীবনে এই ত্রিবিধ উপকরণ সম্মিলিত হয়, এবং জাগ্রত ঈশ্বর প্রীতি তাহাদের পরিচালক হয়—সেই জীবনেই মহত্ত্ব সাধিত হয়।

এই আদর্শ অনুসারে চিন্তা করিতে গেলে এই ভাবিতে হইবে, কি প্রকারে শিক্ষা দিলে আমাদের বালিকাগণ জাগ্রত ঈশ্বর-প্রীতির দ্বারা উদ্দীপ্ত হইতে পারে এবং সেই জাগ্রত প্রীতি-দ্বারা পরিচালিত হইয়া, জ্ঞানের উজ্জ্বলতা, প্রীতির প্রবলতা, ও ইচ্ছা শক্তির দৃঢ়তা লাভ করিতে পারে। তাহাদিগকে সেই-রূপ শিক্ষাই দিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের জ্ঞানসঞ্চার অপেক্ষা জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপ্ত করার দিকে, পরের চিন্তা মনে ঢালিয়া দেওয়া অপেক্ষা চিন্তাশীলতা উৎপাদনের দিকে, সাধুতার কাহিনী শুনান অপেক্ষা সাধুতার আকাঙ্ক্ষা জন্মানর দিকে অধিক দৃষ্টি থাকিবে।

সর্ব্বোপরি ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে তাহাদের হৃদয়ে যদি ধর্ম্মাগ্নি না লাগে, তাহাদের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের বল বৃদ্ধি হইবে না। তাহারা হাজার শান্ত, সুশীল, পবিত্র ও মিষ্ট প্রকৃতি সম্পন্ন হউক না কেন, কিছুতেই তাহাদিগকে বিষয়াসক্তি, স্বার্থপরতা, অসার বিলাসপ্রিয়তা প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিতে পারা যাইবে না। তবে এরূপ শিক্ষা কিরূপে দেওয়া যায়।

ভাবী ব্রাহ্ম-পরিবারের আদর্শের বিষয়ে চিন্তা করিলেও বালিকাদিগের শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবার আবশ্যকতা অনুভব করা যায়। ব্রাহ্ম-পরিবারগুলির দ্বারা দুইটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। প্রথম ব্রাহ্ম পরিবার যেন এরূপ স্থান হয়, যাহাতে থাকিয়া পুরুষ ও রমণী প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় জীবনের মহত্ত্ব সাধন করিতে পারে; দ্বিতীয়, এক একটী পরিবার যেন এক একটী ধর্ম্মাগ্নির কুণ্ড-স্বরূপ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের বল বৃদ্ধি করিতে পারে। নারীগণের প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত কখনই এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না।

কিরূপ শিক্ষা প্রণালীর দ্বারা পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে? সে প্রণালী যেরূপ হউক না কেন, বালিকাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত করা তাহার একটী প্রধান লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য। সেই সঙ্গে মানসিক শক্তি ও হৃদয়ের ভাব সকলকে বিকশিত করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে যাহাকে উচ্চ শিক্ষা বলে, তাহা অপেক্ষাও গভীরতর শিক্ষা আমাদের বালিকা-দিগের পক্ষে আবশ্যক। এবং সেই প্রকার শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করি বলিয়াই আমি অনেকের ন্যায় বিশ্ব বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর উপরে আস্থা রাখিতে পারিতেছি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত অনেক যুবকের জ্ঞানের যে অবস্থা দেখি, তাহাকে উচ্চ শিক্ষা বলিয়া আখ্যাত করিতে লজ্জা বোধ হয়। আমি ত একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তি, আমি প্রকৃত জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের নিকটে বসিয়া নিজের অজ্ঞতা অনুভব করিয়া অনেকবার এত লজ্জা পাইয়াছি যে তাহার বর্ণনা হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর প্রতি আমার প্রথম আপত্তি এই, ইহাতে কতকগুলি জ্ঞানের কথা শুনায়, জ্ঞান স্পৃহাকে উদ্দীপ্ত করে না; অপরের কতগুলি চিন্তা মনে ঢালিয়া দেয়, চিন্তাশীলতা উদ্দীপ্ত করে না। পরীক্ষা ও পাশ হওয়ার প্রতি প্রধান দৃষ্টি থাকাতে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই জ্ঞান-স্পৃহার উদ্দীপনার প্রতি প্রয়াস না থাকিয়া কতকগুলি

জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রতি প্রয়াস থাকে; হৃদয় মনের প্রশস্ততা ও চিন্তাশীলতা লাভ অপেক্ষা পরের চিন্তা গিলাইবার দিকে প্রবৃত্তি থাকে। যদি তাহাদের জ্ঞানের প্রশস্ততার উদ্দেশে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের অতিরিক্ত আর পাঁচখানি সংগ্রহ পড়াইতে চাও, সেদিকে না শিক্ষক না ছাত্র কাহারও ভ্রূক্ষেপ হয় না। তাহারা সেই পাঠ্য পুস্তকের কতিপয় বিষয় লইয়া থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড় করিতে চায়। ইহা অনিবার্য্য।

দ্বিতীয় আপত্তি—একটা অতিরিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উত্তেজনার মধ্যে পড়াতে ছাত্র ছাত্রীদিগের মস্তিষ্ক অতিমাত্র উত্তেজিত হয়; তাহারা তাহাদের শরীর ও মন উভয়ের অপকার করে।

তৃতীয় আপত্তি—বিশ্ববিদ্যালয় সভা যাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তদতিরিক্ত অনেক জ্ঞাতব্য ও শিক্ষিতব্য বিষয় আছে, সে সকলের শিক্ষা দেওয়ায় সুবিধা হয় না। অগ্রে বাঙ্গালা ভাষাটাও যে ভাল করিয়া, পাকা করিয়া শিখাইব তাহাও ঘটিয়া উঠে না, দুধ দাঁত না ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে কট মটে ইংরাজী শিখাইবার প্রণালীতে শিশুদিগের মনের বিকাশকে খর্ব্ব করিয়া ফেলা হয়।

চতুর্থ আপত্তি—যে ধর্ম্ম ও নীতিকে আমারা সর্ব্বোপরি স্থান দিতে ইচ্ছা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালী নিঃশব্দ ভাষাতে এই বলে—ধর্ম্ম ও নীতির শিক্ষা মানবের শিক্ষার অন্তর্ভূত নহে। তুমি অসৎ ও অধার্ম্মিক কি না তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ নাই, তুমি এতটা সাহিত্য, এতটা অঙ্ক শাস্ত্র, এতটা সংস্কৃত, এতটা ইতিহাস শিখিয়াছ কি না আমরা তাহাই দেখিতে চাই; ইহা যদি শিখিয়া থাক আমাদের প্রদত্ত উপাধি লইয়া যাও। এই নিঃশব্দ শিক্ষার ফল,—ধর্ম্ম-শিক্ষাকে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে হীন করা।

এক্ষণে প্রশ্ন এই, আমরা কি আমাদিগের বালিকাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয় নিরপেক্ষ হইয়া উচ্চ শিক্ষা দিতে পারি না? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালীর ভিতরে না থাকিলে যে উচ্চ শিক্ষা ও প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায় না তাহা মনে করি না, বরং মনে করি এই প্রণালীদ্বারা প্রকৃত উচ্চ শিক্ষার ব্যাঘাত হইতেছে।

কেহ কেহ বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালী একটা বেশ উত্তেজক কারণ—A good incentive, এই কারণ পরিহার করিলে এরূপ বিপদ ঘটিতে পারে যে আমাদের আদর্শ উচ্চ শিক্ষা কেবল মনেই থাকিবে, কার্য্যে হইল কি না দেখিবার কেহ থাকিবে না। ইহার উত্তরে এই বক্তব্য, আদর্শটা কার্য্যে হইতেছে কি না দেখিবার জন্য কোনও একটা উপায় উদ্ভাবন করা কঠিন নহে।

আর একটী কথা, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালী পরিত্যাগ করিয়াও উৎকৃষ্ট শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় ও অতি ভালরূপেই সম্ভব হয়, তবে আমরা বালিকাদিগের জন্য সে প্রণালীর আবশ্যকতা মনে করি কেন? দুই উত্তর—

প্রথম,—আমাদের অনেক বালিকা হয়ত চির কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবে, হয়ত তাহাদের অনেককে আত্ম-পোষণ ও স্বজন-পোষণের জন্য উপার্জ্জন করিতে হইবে। কর্ম্ম করিতে গেলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও উপাধি আছে কিনা লোকে দেখিবে। সুতরাং সে শিক্ষা সকলকে দেওয়া চাই।

এ বিষয়ে চিন্তনীয় বিষয় একটী আছে,—কর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া ছায়ার পশ্চাতে ছুটিলে ত হইবে না। দেশে আজিও স্ত্রী শিক্ষার যে অবস্থা তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্তা মহিলাদের কর্ম্ম করিবার স্থান কোথায়? কলিকাতার বেথুন কলেজ, ঢাকার ইডেন স্কুল প্রভৃতি দুই একটী বিদ্যালয় ছাড়িয়া দিলে, আর স্থান কোথায়? বরং ইহা বলিলে অযুক্ত কথা বলা হয় না, যে বর্ত্তমান বালিকা বিদ্যালয় সমূহের অধিকাংশের যে হীনাবস্থা তাহার শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিতে হইলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রণালী অপেক্ষা স্বতন্ত্র প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত করিলে ভাল হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালীর দিকে গতির দ্বিতীয় কারণ—আমাদের রমণীদিগের মধ্যে যাহারা প্রতিভাশালিনী ও মনস্বিনী তাঁহারা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি সকল গ্রহণ করিতে চান, অথবা কেহ যদি চিকিৎসা বিভাগে প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চান, সে দ্বার কি তাঁহাদের জন্য উন্মুক্ত থাকা আবশ্যক নহে? আমি বলি অবশ্য মুক্ত রাখিতে হইবে।

আমি এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহার সার নিষ্কর্ষ এই:—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালীতে কি বলে, না বলে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া আমাদের অধিকাংশ বালিকাকে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দিতে হইবে, যদ্দ্বারা তাহারা যথার্থ জ্ঞানলাভ করিতে পারে, জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপ্ত হইতে পারে, চিন্তাশীলতা জন্মিতে পারে, হৃদয় মনের প্রশস্ততা হইতে পারে।

ধর্ম্মশিক্ষা এই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত।

সর্ব্বোপরি তাহাদের অন্তরে যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের কাজ কর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মে এরূপ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্ম-শিক্ষকদিগের সংসর্গ ও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্রের সংগ্রাম ইহার একটী প্রধান উপায়।

জ্ঞানানুরাগ, সদনুষ্ঠানরুচি পরসেবা প্রভৃতি, কার্য্যের শৃঙ্খলা ও গৃহের সুব্যবস্থা প্রভৃতি শিক্ষা দিবার উদ্দেশে প্রত্যেক ব্রাহ্ম বালিকা কিছুদিন করিয়া উপযুক্ত চরিত্র সম্পন্না মহিলাদিগের অধীনে বোর্ডিংএ থাকিতে পারিলে ভাল হয়। আমি সন্তানদিগকে পিতামাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার পক্ষ নহি। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ ব্রাহ্মপরিবারের বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে সেখানে থাকা অপেক্ষা বয়ঃপ্রাপ্ত বালিকাদিগের বোর্ডিংএ থাকিলেই শিক্ষা-লাভের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিক সাহায্য হইতে পারে।

অধিকাংশ বালিকার পক্ষে এইরূপ উপায় অবলম্বিত হইবে; অথচ যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত থাকুক। তাহাও কঠিনবোধ হয় না। কিছুকাল আমাদের প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়া পরে তাহারা সেই মঞ্চে পদার্পণ করিতে পারেন। সে জন্য শিক্ষার স্থান পাওয়া কঠিন নহে।

১৮৯৩ সালের

সঙ্গত সভার কার্য্য বিবরণ।

গত মাঘোৎসবে ৫ই মাঘ মঙ্গলবার এই সভার বিশেষ উৎসব হয়। তাহাতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সঙ্গতের কার্য্য বিবরণ পাঠান্তে কয়েকটী ভ্রাতা নিজ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন।

গত বৎসর এই সভায় উপস্থিত সভ্যের সংখ্যা গড়ে ৮।১০ জন হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে কয়েকটী মহিলাও যোগ দিয়াছিলেন। ৩০এ চৈত্র, ২৮এ অগ্রহায়ণ ও ৫ই পৌষ এই তিন মঙ্গলবারে সমাজ-মন্দিরে উৎসব, বক্তৃতা ও ব্রাহ্ম সম্মিলনীর বিশেষ উপাসনা থাকায় এই তিন দিন বাদে এ বৎসর এ সভার ৪৭টী অধিবেশন হয়। তাহার ১৩টী অধিবেশনে উপনিষদাদি শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই উপনিষৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন, সে জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। অবশিষ্ট ৩৪টী অধিবেশনের মধ্যে ১৪টী অধিবেশনে নানা বিষয়ে আলোচনা ও ২০টী অধিবেশনে নিম্নলিখিত ১০টী বিষয়ের আলোচনা হয়:—

(১) "অভিমান" (২) "সংসার" (৩) "সংসার কেন ধর্ম্মের প্রতিবন্ধক হয় ও তাহা নিবারণের উপায় কি?" (৪) "ব্রাহ্মদের গৃহ কিরূপ হওয়া উচিত" (৫) সাধুর লক্ষণ কি?" (৬) "ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ কি?" (৭) "ব্রাহ্ম-সমাজে পরস্পরের প্রতি প্রীতির যোগ কেন হইতেছে না ও তাহা হইবার উপায় কি?" (৮) "আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির যোগ করিবার কার্য্যগত উপায়।" (৯) "সর্ব্ব-মত্যন্তং গর্হিতং" (১০) "আত্মোৎসর্গ"। এই সকল বিষয়ের কোন কোনটী ৩।৪ দিন ধরিয়া আলোচিত হইয়াছিল। আমরা উপরোক্ত বিষয়ের কয়েকটীর সারমর্ম্ম নিবেদন করিতেছি—

২। ব্রাহ্মদের গৃহ কিরূপ হওয়া উচিত—"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ। যৎযদ্ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥" ইহা আমাদিগের আদর্শ মত। কিন্তু ইহা কার্য্যগত করিতে হইলে, আমাদিগের কতকগুলি নিয়মে আবদ্ধ হওয়া উচিত। তাহা এই—১ম, প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে ভক্তির সহিত ভগবানের পূজা করিতে হইবে। ২য়, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে প্রেম করা কর্ত্তব্য। ৩য়, দাস দাসীগণের প্রতি সদয় ব্যবহার। ৪র্থ, সকলের প্রতি সরল ব্যবহার। ৫ম, বিনয়ের সহিত মৃদু বাক্যের দ্বারা কথাবার্ত্তা কহা। ৬ষ্ঠ, অতিথি-সেবা। ৭ম, জীবে দয়া। ৮ম, জ্ঞানালোচনা ও শাস্ত্রাদি পাঠ। এই সকল বিষয় ব্রাহ্ম মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ ভাবে আমাদের জীবন গঠন করিতে চেষ্টা করিলে আমাদের পরিবার ব্রাহ্মপরিবার নামের উপযুক্ত হইবে ও আমাদের পরিবারে যে সমস্ত সন্তান সন্ততি জন্মিয়াছে বা জন্মিবে তাহারাও আমাদের দৃষ্টান্তের দ্বারা জীবন-গঠন করিতে শিক্ষা করিবে।

৩। ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ কি?—১ম, আত্মায় ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ যোগ সাধনই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। ২য়, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা, ইহাও তদ্রূপ প্রয়োজনীয়। হিন্দুজাতির প্রধান ভাব আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন বা আত্মার সহিত ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপন; আর য়িহুদী জাতির প্রধান ভাব মানব-ইতিহাসের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করা। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই দুই জাতির দুই বিশেষ ভাব একত্র সম্মিলিত করিয়াছিলেন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই ভাব প্রাণে অনুভব করিয়া "তস্মিন প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনামেব" ব্রাহ্মধর্ম্মের এই পূর্ণ লক্ষণ প্রচার করিয়াছেন।

৪। ব্রাহ্মসমাজে পরস্পরের প্রতি প্রীতির যোগ কেন হইতেছে না ও তাহা হইবার উপায় কি?—১ম, আমাদের পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস থাকায় আমাদের মধ্যে প্রীতির যোগ হইতেছে না। ২য়, আমরা অন্যের দোষ দেখিতে যেরূপ তৎপর, নিজেদের দোষ দেখিতে তেমন নহি। ৩য়, ভাবপ্রধান, জ্ঞানপ্রধান ও কর্ম্ম-প্রধান এই তিন শ্রেণীর লোক আমাদের মধ্যে দেখা যায়; কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর লোককে একটু অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। প্রধানতঃ এই তিনটী কারণে আমাদের মধ্যে প্রীতির যোগ হইতেছে না।

ইহা দূর করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে নিজকে হীন বলিয়া জানা প্রয়োজন। আমাদের আত্ম-দৃষ্টি প্রবল হইলে নিজেদের ত্রুটী দুর্ব্বলতা দেখিতে পাই ও তাহা দেখিলে অন্যের দোষ দেখিলেও তাঁহার প্রতি প্রীতির অভাব হইবে না বরং তাহা বৃদ্ধি পাইবে। ২য়, পরস্পর প্রাণ খুলিয়া আলাপ করার প্রয়োজন; এরূপ করিলে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ দূর হইবে। ৩য়, আমাদের নিজ নিজ মত সম্বন্ধে যে গোঁড়ামী আছে তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। ৪র্থ, আমরা সকলে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি ভগবানকে পাইবার জন্য, সকলেই পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী, এই ভাব মনে সর্ব্বদাই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। ৫ম, যদি প্রেমময় পরমেশ্বরের দিকে সকলের মুখ থাকে তাহা হইলে পরস্পরের প্রতি প্রেম অবশ্যম্ভাবী হয়। অতএব আমাদের আত্মার গতি যাহাতে তাঁহার দিকে হয় তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। ৬ষ্ঠ, পরস্পর পরস্পরের বাড়ী যাওয়া ও পরস্পরের সংবাদাদি লওয়াতে প্রীতি সংস্থাপিত হয়।

তৎপরে এই প্রীতির যোগ করিতে হইলে পর-দোষ কীর্ত্তন করা একবারে বিষবৎ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যাঁহাদের সহিত আত্মীয়তা করিতে ইচ্ছা করি, তাঁহাদের কখনও কোথাও নিন্দা না করা। যদি তাঁহাদের কাহারও কোনও দোষ থাকে, তবে তাঁহার নিকটেই তাহা বিনীত ভাবে বলা

উচিত; কিন্তু অন্যের নিকট বলিয়া তাঁহাকে হেয় করিবার চেষ্টা করা কখনই উচিত নহে।

৫। আত্মোৎসর্গ—আত্মোৎসর্গ করা বড় কঠিন ব্যাপার। আমরা মুখে আত্মোৎসর্গের কথা বলি বটে, কিন্তু জীবনে তাহা সম্পন্ন করা সুকঠিন। একজন সাধু বলিয়াছেন "আত্মোৎসর্গ করিয়াছ, তবে প্রার্থনা কর কেন?" অর্থাৎ আত্মোৎসর্গ করিলে প্রার্থনার আবশ্যকতা থাকে না। আমি যখন নিজের মন প্রাণ সমুদয় দান করিয়াছি, তখন আর আমার নিজের কিছুই থাকল না। আমার মনের উচ্চ নীচ প্রভৃতি সমস্ত বাসনা নির্ব্বাণ না হইলে যথার্থ আত্মোৎসর্গ হইবে না। এইরূপ সমস্ত বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া আত্মোৎসর্গ করিলে যাঁহাকে আত্মোৎসর্গ করা যায় তখন তিনি যাহা বলিবেন তাহা করা সম্ভব হয়। সুতরাং নিজের বাসনার জন্য প্রার্থনার আবশ্যকতা থাকে না, সে সময় আমার কেবল এই কর্ত্তব্য যে আমি কেবল তাঁহার মুখ-পানে তাকাইয়া থাকি।

কিন্তু আমাদের পক্ষে আত্মোৎসর্গ একটা সাধন। "আমি ভগবানের হইব" এইরূপ ভাব অল্পাধিক পরিমাণে সকলেরই হয়, কিন্তু এঅবস্থা আমাদের স্থায়ী হয় না। ইহা স্থায়ী করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বত্যাগী হইবার জন্য অর্থ, সময় ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েরই কিছু কিছু করিয়া ভগবানের কার্য্যে দিতে হইবে। এইরূপ ক্রমে ক্রমে সাধন করিতে করিতে আমাদের আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে পারিব। ইহাই ধর্ম্ম।

লোকে ধর্ম্ম সাধন করিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করে। ১ম, প্রতিজ্ঞা; কিন্তু মানুষ ইহা রক্ষা করিতে পারে না, বিফল হয়। ২য়, অনুকরণ, মানুষ ইহা করিতে যাইয়া বিফল হইয়া থাকে। ৩য়, সাধু-জীবনের প্রভাব; ইহা আতস-প্রস্তরের ন্যায় অন্যের জীবনে কার্য্য করে। ইহাতেই জীবনের যথার্থ পরিবর্ত্তন হয়।

মহান্ পরমেশ্বরের কৃপায় এবৎসর সঙ্গত সভা কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত কার্য্য দুইটী সম্পন্ন হইয়াছে।

১ম, সঙ্গতের একজন উৎসাহী সভ্য কর্ত্তৃক পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও প্রতিদিন সন্ধ্যার পর সমাজ-মন্দিরে পরব্রহ্মের উপাসনা হইয়াছে।

২য়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও সঙ্গত সভার কয়েক জন সভ্য ৩০এ অগ্রহায়ণ হইতে সমস্ত পৌষ মাস কলিকাতাবাসী ব্রাহ্মদিগের—কেবল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নহে, আদি ব্রাহ্মসমাজও নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মদিগের বাড়ী বাড়ীও ভোর সংকীর্ত্তন ও উপাসনা করতঃ ভগবানের নাম প্রচার করিয়া আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধর্ম্মভাব।

(চতুঃষষ্টিতম মাঘোৎসব উপলক্ষে ১২ই মাঘ ২৪এ জানুয়ারী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

বর্ত্তমান সময়ে দুই প্রকার স্রোত এদেশে সম্মিলিত হইতেছে—একটী পূর্ব্ব দেশীয়, অপরটী পাশ্চাত্য। আমরা ইচ্ছা না করিলেও আমাদের সামাজিক রাজনৈতিক, পারিবারিক প্রভৃতি সকল সম্বন্ধ ধীরে ধীরে এই পরিবর্ত্তন-স্রোতে ভাসিতেছে। একান্নবর্ত্তিতা, পূর্ব্বতন পারিবারিক গঠন প্রভৃতি সকলই পরিবর্ত্তনশীল। পিতা, পুত্র, ধনী ও দরিদ্র, বর্ষীয়ান ও যুবক, পুরুষ ও নারী, রাজা ও প্রজা, জমীদার ও রাইয়ত প্রভৃতি সকলেরই সম্বন্ধ এই উভয় চিন্তা-স্রোতের সম্মিলনে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এবং সর্ব্বশেষে এই স্রোত ধর্ম্মরাজ্যেও যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় ধর্ম্মভাবের সম্মিলন সংঘটিত হইতেছে।

এক্ষণে আলোচ্য—প্রাচ্য ধর্ম্মভাব কি? প্রাচ্য ধর্ম্ম বলিলে আমরা হিন্দুধর্ম্ম বুঝিব। কারণ পূর্ব্বদেশীয় অপর দুইটী ধর্ম্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে প্রসূত এবং ইস্লাম ধর্ম্মের মূলভাব য়িহুদী ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন। সুতরাং ইহাদের মধ্যেও প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যভাব বিদ্যমান। এই প্রাচ্য ভাবের ভিত্তি ও প্রকৃতি কি তাহা নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে কিরূপে উহা উৎপন্ন হইল দেখা আবশ্যক। সাধারণতঃ যদি ধর্ম্মভাবের মূল ভিত্তি বিচার করি, তাহা হইলে এই প্রশ্নে উপনীত হই—ঈশ্বর, মানবাত্মা ও জগৎ এই সকলের স্বরূপ ও সম্বন্ধ-বিষয়ে সেই সেই ধর্ম্ম সংস্থাপকগণ কি কি মত প্রকাশ করেন? সেই সেই মতের উপর স্থাপিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত জগতে তিন প্রকার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—(১) জগতে, (২) মানবাত্মায় এবং (৩) ইতিহাসে তাঁহাকে দর্শন করা। জড়জগৎ, চেতনরাজ্য এবং মানবসমাজ সর্ব্বদা সকলের চক্ষুর সমক্ষে বিদ্যমান রহিয়াছে। কোনও কোনও জাতি জড়ে, কোনও কোনও জাতি চেতনে এবং অপরেরা ইতিহাসে ঈশ্বরের সত্তা সন্দর্শন করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীকগণ জড় জগতের শোভায় তাঁহাকে "সুন্দরং" রূপে দর্শন করিয়াছেন। জড় জগতে ঈশ্বর-দর্শন অভ্যাস করিলে তাহার সৌন্দর্য্য এবং শৃঙ্খলা মানব-প্রাণকে আকর্ষণ করিবেই করিবে। সামান্য বালুকাকণা হইতে সুবিশাল হিমালয় পর্য্যন্ত যেখানে দেখি, সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য চারিদিকেই শৃঙ্খলা। অনুবীক্ষণ যোগে কীটাণুর দেহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে শোভার পরে শোভা পরিলক্ষিত হয়। জড়ে দেখিলে "সুন্দরং" ভাব জাগিবেই জাগিবে। এই কারণে গ্রীসদেশে স্থপতিবিদ্যা, শিল্প, কাব্য, অট্টালিকা প্রভৃতি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং যাহা কিছু হইয়াছে সমস্তই সুন্দর—ছবি রাস্তা, ঘর প্রভৃতি সমস্তই সুন্দর। আধুনিক ফরাসীজাতি যেরূপ সৌন্দর্য্যপ্রিয় প্রাচীন গ্রীকগণও সেইরূপ সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন। তাঁহারা জড়ের মধ্যে দেখিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন বলিয়া, ঈশ্বরকে সুন্দর দেখিতেন। এই সৌন্দর্য্য জ্ঞান তাঁহাদের মধ্যে এতদূর বিকশিত হইয়াছিল যে, সৌন্দর্য্যই তাঁহাদিগের মধ্যে পুণ্য এবং কদর্য্যতা পাপ বলিয়া পরিগণিত হইত।

কোনও কোনও জাতি চেতনে বা আত্মাতে ঈশ্বর দর্শন অভ্যাস করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাকে নিত্যরূপে দেখিয়াছেন। হিন্দুগণ নিত্যরূপে "ধ্রুবমধ্রুবেষু" সমুদয় অধ্রুব পদার্থের মধ্যে

তাঁহাকে ধ্রুবরূপে সন্দর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই, আত্মাতে দেখিলে নিত্য জ্ঞান হয় কেন? জড়জগতে তাঁহাকে সুন্দর বলিয়া উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু আত্মাতে দেখিলে তিনি কিরূপে নিত্য বলিয়া প্রতিভাত হন? ইহার কারণ আত্মাতে প্রবিষ্ট হইলে, বিশেষরূপে আত্মানুসন্ধান করিলে, পরিবর্ত্তনশীল নানারূপ অবস্থা প্রথমেই অনুভূত হয়। মানস সাগরে, হর্ষ, দুঃখ, শোক, ভয় বিস্ময় প্রভৃতি নিয়ত কত তরঙ্গই উঠিতেছে। ইহার সমুদয়ই অস্থায়ী, ক্ষণিক। এখনি এই বিশাল সমুদ্রে নিমগ্ন হও, দেখিবে তথায় কত তরঙ্গ উঠিতেছে, পড়িতেছে, পরস্পরে তুমুল আঘাত করিতেছে, আবার কোথায় বিলীন হইতেছে। এক্ষণকার যে চিন্তা, হর্ষ, শোক, তাহা পরক্ষণেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু এ সকলের মধ্যে কি স্থায়ী পদার্থ কিছুই নাই? এ সকল কি সূত্রবিহীন মুক্তার ন্যায়? চিন্তার মুক্তাগুলি কি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, অথবা এ সকলের মূলে অন্তর্নিহিত এমন কোনও সূত্র আছে, যাহা এই সকলের একত্র সন্নিবেশ দ্বারা অপূর্ব্ব সুচিক্কণহার রচনা করিয়াছে? অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখ এ সকলের মূলে আত্মত্ববোধ (personal identity) আছে কি না? এই আত্মত্ববোধ এই সমুদয় চিন্তাকে একসূত্রে বাঁধিয়াছে। এই আত্ম চিন্তাতেই "সূত্রে মণিগণাইব" সমস্ত সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আত্মা সকলের মূলে স্থায়ীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব আত্মাতে নিমগ্ন হইলে যখন সমুদয় অস্থায়ী ভাবের মধ্যে একটী স্থায়ী বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তখন স্বভাবতঃ এই প্রশ্নের উদয় হয় যে—আমার মধ্যে যেমন এক স্থায়ী সূত্র রহিয়াছে, তেমনি এই বাহ্যজগতের সমুদয় পরিবর্ত্তনশীল ঘটনার মধ্যে এমন কোন্ সূত্র রহিয়াছে, যাহা এই সকলকে একত্র রাখিয়াছে? এই প্রশ্ন মানবকে সমুদয় অনিত্য বস্তুর মধ্যে সেই নিত্য পদার্থকে দেখাইয়া দেয়। এইরূপেই হিন্দুগণ ঈশ্বরকে নিত্য বলিয়া দর্শন করিয়াছিলেন।

তৃতীয়তঃ কোনও কোনও জাতি মানব ইতিবৃত্তে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন। য়িহুদীগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁহারা মানব ইতিবৃত্তে বিধাতার লীলা সন্দর্শন করিতেন। তাঁহারা ঈশ্বরকে মানবের কার্য্যের সাক্ষী, বিচারক বলিয়া অনুভব করিতেন। এ দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যে সেরূপ ভাবে ঈশ্বরকে অনুভব করেন নাই তাহা নয়। মনুসংহিতাতে আছে—

"একোহহমস্মীত্যাত্মানং যত্বং কল্যাণ মন্যসে।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ॥"

হে ভদ্র! আমি একাকী আছি, এই যে তুমি মনে করিতেছ, এরূপ করিবে না। পুণ্য পাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ শুদ্ধ হইয়া তোমার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন।

এই বচন হইতে দেখা যাইতেছে যে হিন্দুগণও ঈশ্বরকে তাঁহাদের কার্য্যের সাক্ষী, বিধাতা ও বিচারক বলিয়া অনুভব করিতেন। কিন্তু এটী এদেশের মুখ্য ভাব নয়। এই ভাবটী য়িহুদীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। আত্মার মধ্যে যাঁহারা পরমাত্মাকে দেখিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন যে পরমাত্মা ওতপ্রোত ভাবে সমুদয় বস্তুতে বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, যেমন এই নিত্য পুরুষ হৃদয়ের পরমাকাশ আত্মার পরমাত্মা হইয়া, জীবনের আধাররূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, আত্মা হইতে তাঁহার আকাশেরও ব্যবধান নাই, সেইরূপ তিনি সকল বস্তুতে গূঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। যাঁহারা ইতিবৃত্তে তাঁহার অন্বেষণ করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাকে বাহিরেই দেখিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের ঈশ্বর কোনও এক সপ্তম স্বর্গে বাস করিতেছেন এবং মানবের কার্য্য সমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তিনি নিজ গৃহে সিংহাসনে বসিয়া রাজদণ্ড হস্তে সমুদয় শাসন করিতেছেন।

হিন্দুগণ আত্মমধ্যে দেখিয়াছেন বলিয়া "অনিত্যের মধ্যে নিত্য" এই ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন:—

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহূনাং যোবিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং
শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥"

যিনি তাবৎ অনিত্য বস্তুর মধ্যে একমাত্র নিত্য, যিনি সকল চেতনের একমাত্র চেতয়িতা, একাকী যিনি তাবতের কাম্যবস্তু বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদের নিত্য শান্তি হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।" তাঁহারা দেখিয়াছেন জড়ের মধ্যে যে শক্তি নিত্যরূপে বাস করিতেছে সেই শক্তিই মানবাত্মাতে চৈতন্যরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত H. Spencer ও একস্থানে বলিয়াছেন—'There is an infinite and eternal energy from which everything proceeds।' তিনি যে কেবল চৈতন্য তা নয় কিন্তু তিনি বিধাতা। তাঁহাকে আত্মস্থ বলিয়া জানিতে হয়। এই আত্মনিষ্ঠতা হিন্দুধর্ম্মের বিশেষভাব, আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করাই মুখ্য লক্ষ্য। ইহা হইতে আরও দুইটী ভাব সমুৎপন্ন হইয়াছে। ১ম নিত্যানিত্য বিবেক, ২য় মানবাত্মার পরাধীনতা। আত্মাতে দেখিলেই পরমাত্মা নিত্য ও অন্য সকল বস্তুই অনিত্য দেখা যায়। এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক, এই মানবাত্মার পরাধীনতা আসিল কিসে? ভারতের চিন্তাশীল সাধকগণ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি আত্মার এই তিনটী অবস্থা উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে স্বপ্ন ও সুষুপ্তি স্বাধীন অবস্থা নয়। স্বপ্নে যে সকল বিষয় দেখিতেছি তাহার কোনটীর উপরেই আমার হাত নাই। যে সকল বিষয় আমি কখনও ভাবি নাই হয়ত এমন কত বিষয় আমার কল্পনানেত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। ইহার কোনটীও আমার ইচ্ছামতে ঘটে নাই—সকলই আমার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। সুষুপ্তি অবস্থার ত কথাই নাই, তখন আমার আমিত্ব জ্ঞান পর্য্যন্ত ক্ষণকালের জন্য লুক্কায়িত হয়। এইরূপে তাঁহারা দেখিয়াছেন যে এই দুই অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অন্য এক শক্তির অধীন। তাঁহারা আরও দেখিয়াছেন যে এই যে জাগ্রতাবস্থা, যাহাতে আমি যাইতেছি, খাইতেছি,

বসিতেছি, উঠিতেছি, যে অবস্থায় আমার কর্তৃত্বজ্ঞান সর্ব্বদা আমার সম্মুখে বহিয়াছে ইহাও সম্পূর্ণ স্বাধীন অবস্থা নয়। কারণ প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমাদের যে জ্ঞান ক্রিয়া (sensation) হইতেছে, এবং পরে মন যে মাল মসলায় চিন্তার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছে সেই জ্ঞান-ক্রিয়াব উপর আমাদের কোনও হাত নাই। চক্ষু খুলিবামাত্র সূর্য্যালোক আমাদের গোচরে আসিতেছে, তার উপর আমাদের কি হাত আছে? ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া জড়জগৎ আমাদের উপর যে ভাব উৎপন্ন করিতেছে, তাহার উপর আমাদের কি হাত? এইরূপে দেখিতে পাই যে কোনও জ্ঞান ক্রিয়াই আমাদেব ইচ্ছাধীন নয়। তৎপরে দেখিতে পাই যে আমাদের এই যে জীবন ইহার আদি ও অন্ত কিছুবই উপর আমাদের কর্তৃত্ব নাই। এ জীবনের যখন আরম্ভ হইয়াছে, তখন আমাদের ইচ্ছাতে হয় নাই। আবার যখন এই জীবনের শেষ হইবে তখনও আমাদের ইচ্ছা নিরপেক্ষ ভাবেই হইবে। আমাদের জন্মের উপর কোনও হাত নাই, যে জীবন সকলে পোষণ করিতেছি, তাব অন্তের উপর কর্তৃত্ব নাই। জীবন যে এখন আছে তাহাতেও তার জ্ঞানের উপব কর্তৃত্ব নাই। সমুদয় ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান আমাদেব ইচ্ছাধীন নয়। প্রতি নিয়ত যে সকল ক্রিয়ার উপর আমাদের জীবন নির্ভর করিতেছে, তার উপর কি হাত আছে? শ্বাস, প্রশ্বাস, রক্ত-সঞ্চালন, পাকস্থলীর ক্রিয়া ইহার কোন্‌টী আমাদের ইচ্ছাধীন? কি আশ্চর্য্য যে সকল আমরা স্বহস্তে লইলে কোনও রূপ বিপদের সম্ভাবনা নাই, সেই গুলিই কেবল আমাদের হাতে, আর যেখানে পদে পদে বিপদ তাহার কোনওটাই আমাদের হস্তে অর্পিত হয় নাই, সমস্ত গুলিরই পরিচালনের ভার অন্য এক শক্তির হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। যদি শ্বাসযন্ত্র পাকস্থলী প্রভৃতির কার্য্য আমাদেব হস্তে থাকিত তাহা হইলে কি মুহূর্ত্ত কালের জন্যও আমাদের জীবনের আশা ছিল? তবে আর স্বাধীনতা কোথায়? পশ্চিমদেশীয় ঋষি এমার্শন বলিয়াছেন:—

"Life is a stream, it is descending into us, from where we know not."

"আমাদের এই জীবন-সরিৎ নিয়ত আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কোথা হইতে প্রবাহিত, তাহা আমরা অবগত নহি।"

(ক্রমশঃ)

দীক্ষার্থীদিগের প্রতি শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশ।

"ঈশ্বর আমারদিগের মনে কি এক স্পৃহা দিয়াছেন, যে স্পৃহাতে আমরা তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত। এই ঈশ্বর-স্পৃহা মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ে জাগরুক; পশু মধ্যে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ঈশ্বর ব্যতীত আমারদিগের যে জীবন ধারণ সে পশু জীবনের সঙ্গে সমান। ঈশ্বর বিনা আমরা চলিতে, বলিতে, এমন কি নিঃশ্বাস কি নিমেষ ফেলিতেও পারি না। তাঁহার কৃপাতেই আমরা জীবন ধারণ করিতেছি, তাঁহার কৃপাতেই আমরা চলিতেছি, বলিতেছি এবং নিঃশ্বাস ও নিমেষ ফেলিতেছি। সকল সময়ে, সকল স্থানে, সকল কার্য্যে, সকল অবস্থাতেই তাঁহার কৃপার পরিচয় পাইতেছি। তাঁহার কৃপাই আমারদিগের সম্বল— "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।"

আমরা বিপদে পড়িলে কে এমন বন্ধু আছে যে, সেই বিপদ হইতে আমারদিগকে উদ্ধার করে? কে এমন বন্ধু আছে যে আমাবদিগকে মোহ-পাপ হইতে রক্ষা করে? সে কেবল একমাত্র ঈশ্বর। আমরা বিপদে পড়িলে তিনি রক্ষা করেন, এমন কি বিপদে পড়িবার আগেও আমারদিগকে সাম্‌লাইয়া দেন্। সংসাবে মা যেমন সন্তানকে বিপথে পতিত হইবার পূর্ব্বেই সাম্‌লাইয়া দেন্, সেইরূপ ঈশ্বর সর্ব্বদা আমারদিগকে সাম্‌লাইয়া দিতেছেন; এবং বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। তিনি অহরহ আমাবদিগকে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন। আমরা তাহা না শুনিয়া, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া পাপে পড়িতেছি। কে সেই পাপ হইতে আমারদিগকে রক্ষা করিবে; কে সেই পাপ হইতে আমারদিগকে পরিত্রাণ করিবে? যাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া পাপে পড়িয়াছি, তিনি ভিন্ন আর আমারদিগের সে পাপের পবিত্রাতা নাই। যখন পাপে পড়িব, তখন তাঁহার নিকট ক্রন্দন কবিব, যখন বিপদে পড়িব তখন তাঁহাকেই ডাকিব; তিনি আমাবদিগকে রক্ষা করিবেন— তিনি আমারদিগকে উদ্ধার করিবেন। নদীতে নৌকা ডুবু ডুবু হইলে, নৌকার লোক সকল যেমন "হে ঈশ্বর রক্ষা কর" বলিয়া আর্ত্তনাদ করে, সেইরূপ আমরা বিপদে পড়িলে "রক্ষা কর" বলিয়া তাঁহার নিকট কাঁদিব—ঈশ্বর ভিন্ন আমারদিগের আর গতি নাই। ঈশ্বর ভিন্ন কেমন করিয়া চলে?

তিনি আমারদিগেব একমাত্র সুখদাতা ও সম্পদ বিধতা। আমবা তাঁহাব নিকট কৃতজ্ঞ হইব, আমবা তাঁহাকেই প্রীতি করিব, তাঁহাকেই ভক্তি কবিব। আমাবদের ভক্তি প্রীতি ও জ্ঞান সেই এক ঈশ্বর ব্যতীত আব কিছুতেই চরিতার্থ হয় না। আমাবদের জ্ঞান তাঁহাকে জানিয়াই তৃপ্তি লাভ কবে, আমাবদের হৃদয় তাঁহাকে প্রীতি ও ভক্তি করিয়াই কৃতার্থ হয়। প্রীতি ও ভক্তি পুষ্পেব দ্বারাই তাঁহাব পূজা কবিতে হয়। তোমরা তোমাদের প্রীতি ও ভক্তি পুষ্পের দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবে।

তিনি আমাবদিগেব ইচ্ছাকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। আমরা ইচ্ছা করিলে তাহাকে লাভ কবিতে পাবি। তবে আমরা তাঁহাকে পাই না কেন? ইচ্ছা করি না, চেষ্টা কবি না বলিয়াই আমরা পাই না। আপন ইচ্ছায় তাঁহার প্রতি যে প্রীতি ও ভক্তি অর্পণ করা যায়, তাহাই প্রকৃত ভক্তি ও প্রীতি। জোর করিয়া চাবুক মারিয়া কাহারও ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করা যায় না। একজন অর্থলোভে ভক্তি, প্রীতি সমাদর দেখাইতে পারে; কিন্তু তাহা প্রকৃত ভক্তি বা প্রকৃত প্রীতি নহে। সেরূপ কপট ভক্তি ও প্রীতি কোন কাজেরই নয়। অনিচ্ছায় ভক্তি প্রীতির কোন মূল্য নাই। তিনি চাহেন, আমরা ইচ্ছা

করিয়াই স্বাধীন ভাবেই তাঁহাকে ভক্তি করিব। ইচ্ছা দ্বারা আমরা জ্ঞান শিক্ষা করি এবং সেই জ্ঞান দ্বারা আমরা তাঁহাকে লাভ করিতে পারি। জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে হয়। আমরা যে তাঁহাকে পাই না, তাহা কেবল জ্ঞানের অভাবে। চেষ্টা করিলে আমরা জ্ঞান লাভ করিতে পারি। জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে সচেষ্ট হও, দেখিবে তাঁহার প্রসাদ অবতীর্ণ হইবেই হইবে।

তাঁহাতে চিত্ত সমাধান কর, অবশ্যই তিনি প্রসাদ-বারি বর্ষণ করিবেন।" কৃষক যেমন নিজে চেষ্টা করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করে, তৎপর আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিলেই, সেই ক্ষেত্রে শস্য জন্মে, তেমনি আমরা তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিব, কিন্তু ফলদাতা তিনি; তাঁহার কৃপা হইলেই আমারদের চেষ্টা সফল হইবে। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিলে, তিনি কৃপা করিবেন, তিনি আমারদের সহায় হইবেন, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীমান্ মনীন্দ্র ও শ্রীমান্ প্রিয়নাথ! চিরজীবন তাঁহাকে পাইবার জন্য তোমরা তোমারদিগের জ্ঞান বুদ্ধি নিয়োগ কর। যাগ্যবল্ক ঋষি বলিয়াছেন:—

"নতং বিদাথ যাইমাঃ জজানা ন্যৎ
যুষ্মাকং অন্তরং বভূব নীহারেন প্রাবৃতা
জল্প্যাচাসুতৃপ উক্থ শাসশ্চরন্তি।"

এই আশ্চর্য্য জগৎ দেখিয়া, চারিদিকে আশ্চর্য্য সৃষ্টিকৌশল দেখিয়াও তোমরা তাঁহাকে জানিলে না; যিনি অন্তরে রহিয়াছেন তোমরা তাঁহাকে অন্তরেও দেখিলে না? কেমন করিয়াই বা তাঁহাকে জানিবে? অজ্ঞান কুয়াসা সব যে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। বৃথা জল্পনাতে রহিয়াছ। প্রাণের তৃপ্তি সাধন ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে ব্যস্ত রহিয়াছ। অতএব অজ্ঞানতাকে পরিহার কর, বৃথা জল্পনা বাচালতাকে পরিত্যাগ কর। ইন্দ্রিয় সংযম কর। সত্য বিনা জ্ঞান কখন তৃপ্ত হয় না, অজ্ঞানের কল্পনা তেত্রিশ কোটী দেবতা, কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা যে সত্য আবিষ্কৃত হয় তাহাতে দেখি যে ঈশ্বর একই অদ্বিতীয়।" তোমরা সমাহিত চিত্ত হইয়া জ্ঞান প্রেম ও ভক্তি-যোগে সেই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মের" পূজা করিবে। তোমরা অপর দেবদেবীর পূজা করিও না। একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল মন্ত্র। প্রতিদিন ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। উপাসনাই আত্মার অন্নপান। আহার অভাবে শরীর যেমন রুগ্ন ও দুর্ব্বল হয়, উপাসনা অভাবে আত্মাও সেইরূপ দুর্ব্বল হয়। দিনাদৌ দিনান্তে, নিশাদৌ নিশান্তে, দিনার্দ্ধে নিশার্দ্ধে যখনই পারিবে তাঁহার উপাসনা করিবে। একদিনও যেন বন্ধ্যা না হয়। উপাসনাহীন হইয়া যেন দিন না যায়। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমাদিগকে বিধি দিতেছেন, যদি কোন দিন বিপদে বা রোগে একেবারে মুহ্যমান বা হতচেতন হইয়া পড়, সে দিন উপাসনা বাদ দিতে পার। নতুবা প্রতিদিন তাঁহার উপাসনা করিবে। ফুল চন্দন দিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হয় না। "তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" তাঁহাকে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

ব্রাহ্মসমাজ।

মনাই চা-বাগান ব্রাহ্মসমাজে গত মাঘোৎসবের সময় চন্দননগর নিবাসী বাবু কালীচরণ বসু নামক এক ব্যক্তি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ মনীন্দ্রনাথ ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ প্রিয়নাথ বিগত ১লা ফাল্গুন সোমবার প্রাতে সার্দ্ধ আট ঘটিকার সময় পার্কষ্ট্রীটস্থ ভবনে পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষির নিকট পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। পূজ্যপাদ মহর্ষি উপাসনা ও দীক্ষা কার্য্য সমাধা করেন এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া দীক্ষার্থী-দ্বয়কে উপদেশ প্রদান করেন। স্থানান্তরে তাঁহার উপদেশ প্রকাশিত হইল।

প্রচার—পশ্চিম প্রচার যাত্রীদল ১৯এ ফেব্রুয়ারী ভাগল-পুরে শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হন। ২০এ প্রাতে উক্ত বাসায় উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। রাত্রিতে ব্রাহ্মবন্ধু বাবু জয়-কৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের বাসায় উপাসনা হয়, গুরুদাস বাবু উপাসনা করেন। ২১এ প্রাতে নিবারণ বাবুর বাসায় উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব উপাসনা করেন। রাত্রিতে শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ সিংহের বাসায় উপাসনা হয়, গুরুদাস বাবু উপাসনা করেন। ২২এ তারিখ ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে মন্দিরে গুরুদাস বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন ও উপদেশ দেন। ২৩এ তারিখ প্রাতে নিবারণ বাবুর বাসায় উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল উপাসনা করেন। অদ্য অপরাহ্নে প্রচারদল ভাগলপুর হইতে মুঙ্গেরে যাত্রা করেন এবং রাত্রিতে মুঙ্গেরের ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের বাসায় উপস্থিত হন। তথায় উপাসনা হয়, গুরুদাস বাবু উপাসনা করেন। ২৪শে প্রাতে স্থানীয় উকিল বাবু মহেন্দ্র-লাল রায়ের বাড়ীতে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব উপাসনা করেন। অপরাহ্নে বাজারে কীর্ত্তন ও হিন্দি বক্তৃতা হয়। প্রকাশদেব বক্তৃতা করেন। রাত্রিতে মন্দিরে উপাসনা হয়। গুরুদাস বাবু উদ্বোধন সূচক পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া আরাধনা করেন, তৎপরে শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব উপদেশ প্রদান করেন। ২৫শে তারিখ প্রাতে চণ্ডীবাবুর বাসায় উপাসনা হয়, গুরুদাস বাবু উপাসনা করেন। ঐ দিন যাত্রীদল বাঁকি-পুরে গমন করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ই মার্চ্চ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজউপাসনালয়ে সায়ংকালীন উপাসনার পর সাঃ ব্রাঃ সমাজের কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব।
২। আচার্য্য ও কর্ম্মচারী নিয়োগ ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠন।
৩। গত ২৩এ জুলাই উপাসক মণ্ডলীর বিশেষ অধি-বেশনে মণ্ডলীর উন্নতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য যে কামটী গঠিত হইয়াছিল, তাহার রিপোর্ট সম্বন্ধে মীমাংসা।
৪। বিবিধ।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
৪ঠা মার্চ্চ, ১৮৯৪।

বঙ্কবিহারী বসু
সম্পাদক।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২৭এ ফাল্গুন প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

২৩শ সংখ্যা। ১৬শ ভাগ।

১লা চৈত্র, বুধবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে জীবনদাতা! আমাদের নিকট সকল কথা যে পুরাতন হইয়া যাইতেছে। চারিদিক হইতে প্রতিদিন এমন কত উচ্চ উচ্চ উপদেশ শুনিতেছি যাহা কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। যখন দশজনে মিলিয়া উপাসনাতে বসিতেছি, তোমার আরাধনাতে নিযুক্ত হইতেছি, তখন অভ্যাস বশতঃ অতি উচ্চ উচ্চ ভাব ও অতি উচ্চ উচ্চ কথা মুখে প্রকাশ পাইতেছে। তোমার নিকট যখন প্রার্থনা করিতেছি,তখন সর্ব্ব প্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আকাঙ্ক্ষা জানাইতে ক্রটী করিতেছি না; কিন্তু জীবন যে নিম্ন ভূমিতে ছিল তাহাই থাকিয়া যাইতেছে। সেই বিষয়াসক্তি, সেই স্বার্থপরতা, সেই সুখ-প্রিয়তা। ক্রমে আমাদের জীবনের উপরে সাধু-জীবনের ও সাধূপদেশের শক্তি ম্লান হইয়া যাইতেছে। এই ব্যাধিতে আমাদিগের ধর্ম্মজীবনকে দুর্ব্বল ও নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিতেছে। আমরা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজ নিজ জীবনের স্বার্থপরতাতে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছি। এই সংকট হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। আমাদের বাক্য ও কার্য্য সকলকে তোমার জীবনী-শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত কর। আমাদের সাধন সরস হউক; আমাদের ধর্ম্মজীবন সতেজ ও সবল হউক; তোমার চরণে এই প্রার্থনা।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ধর্ম্মসমাজের শক্তি কোথায়?—আমরা যে কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মকে নিজ নিজ জীবনে অবলম্বন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চাহিতেছি তাহাই নহে,ইহাকে প্রচার করিতে চাহিতেছি। অর্থাৎ ইহাকে সামাজিক শক্তিরূপে পরিণত করিয়া এতদ্দ্বারা জন সাধারণকে উন্নত করিতে চাহিতেছি, জনসমাজের প্রচলিত কুসংস্কার, পাপ ও দুর্নীতি নিবারণ করিয়া তৎস্থানে সত্যজ্ঞান, ও উৎকৃষ্ট নীতিকে প্রচলিত করিতে চাহিতেছি। জন-সমাজের এ প্রকার সংস্কার করিতে যাহারা প্রয়াসী হয়, তাহাদের সহিত সমাজের লোকের বিরোধ ঘটনা হওয়া অনিবার্য্য; কারণ যাহারা প্রাচীন কুসংস্কার ও প্রাচীন রীতি নীতির পক্ষপাতী, তাহারা এই সংস্কার-পথাবলম্বীদিগকে সমাজের শত্রু বলিয়া গণনা করিবেই করিবে। কিন্তু আমাদিগকে ভাবিতে হইবে যে, সে শক্তি কি শক্তি যাহার বলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ দেশের প্রচলিত কুসংস্কার ও রীতি নীতিকে পরাজিত করিয়া তৎস্থানে সত্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবে? এই প্রশ্নের বিষয়ে চিন্তা করিতে গেলেই দেখিতে হইবে যে, জগতে যে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় জয়লাভ করিয়াছে, মানবের চিন্তাকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, মানবের রীতি নীতিকে উন্নত এবং সংশোধিত করিয়াছে, তাহারা কোন্ শক্তিতে তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছে? যতই আমরা ইতিবৃত্ত আলোচনা করিব ততই দেখিতে পাইব যে বৈরাগ্যের শক্তি ভিন্ন অন্য কোনও শক্তির দ্বারা জগৎ জয় হয় নাই। স্বার্থনাশ, স্বার্থনাশ, স্বার্থনাশ, এই সকলের মূলমন্ত্র ছিল। কোন্ যুগ-প্রবর্ত্তক মহাজন এরূপ জন্মিয়াছেন যিনি বৈরাগ্যরূপ অস্ত্র ধারণ করেন নাই? যীশু নিজের বিষয়ে এই কথা বলিয়াছিলেন—"শৃগালদিগের গর্ত্ত আছে, পক্ষীদিগের বাসা আছে, কিন্তু আমার মস্তক রাখিবার স্থান নাই"—বুদ্ধ এই বৈরাগ্যের আবশ্যকতা এতদূর অনুভব করিয়াছিলেন যে নিজে রাজপুত্র হইয়া ভিক্ষা ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহম্মদ যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন তখন দশ টাকার সম্পত্তিও গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ, অথচ তিনি মনে করিলে রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে পারিতেন। চৈতন্য সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। নানক বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পথের ফকির হইয়াছিলেন। মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা জন ওয়েসলি বলিয়াছিলেন—"আমি ত্রিশ শিলিঙ্গের অধিক অর্থ নিজের নিকট রাখা পাপ বলিয়া মনে করি"। সুপ্রসিদ্ধ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক কেরির বিষয়ে এরূপ কথিত আছে যে যখন তিনি পরলোক গমন করিলেন, তখন তাঁহার ডেক্‌সের মধ্য হইতে চৌদ্দটী পয়সা মাত্র পাওয়া গেল। অথচ সেই কেরী নানারূপে মাসে অন্ততঃ ৭০০।৮০০ শত টাকা উপার্জ্জন করিয়া প্রচার কার্য্যে অর্পণ করিয়াছেন। ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া দেখ কে কোথায় জগতকে কাঁপাইয়াছে, কে কোথায় মানব হৃদয়কে পরিবর্ত্তিত

করিয়াছে, যে বৈরাগ্যের মন্ত্রে দীক্ষিত হয় নাই? তুমি আমি আপন আপন সুখ সচ্ছন্দতায় ডুবিয়া থাকিব, আপন আপন সাধ্যে ভোগ বিলাস যতদূর ভোগ করা যায় করিব, আর এই স্বার্থপর, আরাম-প্রিয় ও বিষয়াসক্ত জীবদিগের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের শক্তি বাড়িবে, এ আশা-আকাশ কুসুমের ন্যায়।

শক্তির অপচয়—আমরা প্রতিদিন অনুভব করিতেছি, আমাদের শক্তির কত অপচয় হইতেছে। যে সময় যাইতেছে, সেই সময়ে প্রত্যেকের দ্বারা যতটা কাজ হইতে পারিত তাহা হইতে পারিতেছে না। দশজনে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিতে পারিলে যতটা কাজ হইতে পারিত, তাহা হইয়া উঠিতেছে না। আমরা সকলেই ব্রাহ্মসমাজকে ভাল বাসি। প্রত্যেকেই বলেন "আমি ব্রাহ্মসমাজকে ভাল বাসি"। একথা শুনিলেই একটা সহজ কথা মনে উদয় হয়—যদি ব্রাহ্মসমাজকে কেহ বাস্তবিক ভাল বাসে, তবে তাহার উন্নতির জন্য কি সচেষ্ট হয় না? যদি ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ আমাদের প্রত্যেকেরই প্রার্থনীয় হয়, তবে আমরা কেন তাহার কল্যাণোদ্দেশে মিলিত হইতে পারি না? পরস্পরের সহিত যে একটু প্রভেদ রহিয়াছে, তাহার বোধটা এত প্রবল রহিতেছে যে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ চিন্তা তাহার নিকট স্থান পাইতেছে না—এরূপ হইতেছে কেন? ঈশ্বরের সত্য রাজ্য বিস্তারের জন্য যাঁহারা ইচ্ছুক তাহাদের সকলেরই যাহাতে শক্তির অপচয় না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যাঁহার যতটুকু দিবার আছে, তিনি ততটুকু দিবেন, যাঁহার যতটুকু করিবার আছে তিনি ততটুকু করিবেন। মতভেদ ও কার্য্যের স্বতন্ত্রতার গুরুতর ও অলঙ্ঘনীয় কারণ না থাকিলে কার্য্যের স্বতন্ত্রতা হইতে দিব না, এরূপ একটা প্রতিজ্ঞা প্রত্যেকেরই মনে থাকা ভাল।

নিত্য উপাসনা কর—"নিত্য উপাসনা কর, উপাসনা মনুষ্যকে জঘন্য অপরাধ এবং যাহা কিছু দূষণীয় তাহা হইতে রক্ষা করে; আর ঈশ্বরকে স্মরণ করা নিশ্চয়ই মনুষ্যের একটী অতি গুরুতর কর্ত্তব্য।"—কোরাণ।

মহাত্মা মহম্মদ যখন পৌত্তলিকতাকে বর্জ্জন করিয়া একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক হইলেন, তখন সর্ব্বাগ্রে এই উপাসনাকেই অবলম্বন করিলেন। তিনি ইহার আবশ্যকতা এতই প্রতীতি করিলেন যে আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে পাঁচ বার উপাসনার নিয়ম করিলেন। এ সম্বন্ধে মুসলমানদিগের মধ্যে একটী গল্প প্রচলিত আছে। মুসলমানগণ এই গল্পটিকে সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করেন। আমরা সেরূপ বিশ্বাস করি না, কিন্তু ইহার উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি। গল্পটি এই:—এক দিন রাত্রিতে ঈশ্বরের দূত জেব্রিল মহম্মদকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যায়। মহম্মদ জেব্রিলের সঙ্গে গিয়া ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি যখন ঈশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন তখন দেখিলেন স্বর্গ এক অপূর্ব্ব জ্যোতিতে আলোকিত হইয়াছে। তখন মহম্মদের প্রতি এই আদেশ হইল "মহম্মদ, তোমার শিষ্যদিগকে পঞ্চাশ বার উপাসনা করিতে আদেশ করিও"। মহম্মদ আজ্ঞা শিরোধারণ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। পথে মুষার সহিত সাক্ষাৎ হইল। মুষা ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন "মহম্মদ তুমি কি করিয়াছ, কেন পঞ্চাশ বার উপাসনার কথা স্বীকার করিলে? দুর্ব্বল, চঞ্চল মানুষ কি পঞ্চাশ বার উপাসনা করিতে পারে? আমি দুইবার উপাসনা করাইতে পারিলাম না, তুমি কি এত বার পারিবে? যাও ফিরিয়া যাও।" মহম্মদ ফিরিয়া ঈশ্বরের নিকট গেলেন। তখন তিনি ২৫ বারের আদেশ করিলেন। মহম্মদ চলিলেন, কিন্তু আবার মুষার অনুরোধে মহম্মদ ঈশ্বরের নিকট ফিরিয়া গেলেন। তখন ঈশ্বর পাঁচবার উপাসনার আদেশ দিলেন। এবারও মুষা মহম্মদকে ফিরিতে বলিলেন, কিন্তু আর তাঁহার কথা শুনিলেন না এবং আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে পাঁচবার উপাসনার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলেন।

এই গল্প হইতে বুঝা যায় মহম্মদ উপাসনার আবশ্যকতা কতদূর অনুভব করিয়াছিলেন। পঞ্চাশ বার উপাসনা করিতে হইবে এ ইচ্ছা তাঁহার হইয়াছিল।

এই উপাসনা কেবল নিয়মে ছিল তাহা নহে মহম্মদের জীবনে ইহা দেখা যায়। যখন তিনি প্রথম পৌত্তলিকতা ছাড়িলেন, তখন তাঁহার পত্নী খাদিজাকে লইয়া নির্জ্জনে উপাসনা করিতেন, তাহাতেই খাদিজা দীক্ষিত হইলেন। খাদিজা বক্তৃতাতে দীক্ষিত হন নাই, উপদেশে দীক্ষিত হন নাই, কিন্তু সত্য প্রভুর উপাসনা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

যখন চতুর্দ্দিকের লোকে জানিতে পারিল, মহম্মদ ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া উপাসনা করেন, তখন তাহারা দেখিতে আসিল আর উপাসনাতে দীক্ষিত হইতে লাগিল। এইরূপে একজন সস্ত্রীক দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার স্ত্রীর এক দুর্দ্দান্ত ভাই ছিল। সে ক্রুদ্ধ হইয়া তরবারী হস্তে মক্কা হইতে বহির্গত হইল এবং কোরেসদিগের নিকট গিয়া প্রতিজ্ঞা করিল যেরূপেই হউক সে মহম্মদের মস্তক কাটিয়া আনিবে। এই প্রতিজ্ঞাতে দৃঢ় হইয়া সে মদিনার অভিমুখে যাত্রা করিল। তাহার ভগিনী মদিনাতে থাকিতেন। সে ভগিনীর বাড়ীতে গেল, ইচ্ছা সেখানে মহম্মদকে দেখিলে কাটিবে। তথায় গিয়া দেখে তাহার ভগিনী স্বামীর সহিত উপাসনা করিতেছে। দেখিয়া তাহার ক্রোধ হইল এবং ভগিনীকে ফিরাইবার জন্য অনেক যন্ত্রণা দিতে লাগিল ও তাঁহার স্বামীকে প্রহার করিল। কিন্তু তাঁহারা কিছু বলিলেন না। শেষে ঐ ব্যক্তি শয়ন করিলে রাত্রিতে তাঁহারা আবার উপাসনা করিতে লাগিলেন। যখন সেই উপাসনার বাণী সকল তাহার শ্রুতিবিবরে প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন তাহার প্রাণে অসহ্য যাতনার উদয় হইল, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না; উঠিয়া আসিয়া ভগিনীকে বলিল "তোমরা কি করিতেছিলে, আমার প্রাণ কেন অস্থির হইল, আমি যে আর স্থির থাকিতে পারি না?" ভগিনী বলিলেন "আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছিলাম।" সেই ব্যক্তির প্রাণ আশ্চর্য্যরূপে

পরিবর্তিত হইয়া গেল। এমন যে দুর্দ্দান্ত লোক, যে মহম্মদের প্রাণনাশে উদ্যত হইয়াছিল, ভগিনী ও ভগিনীপতির প্রতি উপাসনার জন্য উৎপীড়ন করিয়াছিল, উপাসনার দ্বারা তাহার জীবনের পরিবর্ত্তন হইল, সে দীক্ষিত হইল। তখন মক্কায় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। মহম্মদ এই উপাসনা দ্বারাই প্রচার করেন। যে সাংঘাতিক রোগে মহম্মদের মৃত্যু হয় সেই দারুণ রোগের সময়েও তিনি প্রতিদিন ভজনালয়ে উপাসনা করিতে যাইতেন। এই নিয়ম ছিল রাত্রিশেষে একজন লোক রোজ আসিয়া বলিত "মহাপুরুষ, জাগ্রত হউন, সত্য প্রভুর উপাসনার সময় হইয়াছে, উপাসনা করুন।" তিনি গাত্রোত্থান করিয়া মন্দিরে যাইয়া উপাসনা করিতেন। যখন তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইল, তখন লোকে হাতে ধরিয়া তাঁহাকে মন্দিরে লইয়া যাইত, তিনি উপাসনা করিতেন। শেষে যে দিন একেবারে অক্ষম হইয়া পড়িলেন, সে দিন তিনি বলিলেন "আমি তোমাদের কাহার কাছে কি অপরাধ করিয়াছি বল, আর আমি তোমাদের সহিত উপাসনা করিতে পারিব না, এই আমার শেষ।" ইহা শুনিয়া সকলে উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিল। এই যে নিত্য উপাসনা তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার অবলম্বন ছিল। তিনি জানিতেন পৌত্তলিকতা ছাড়াইয়াছি তাহাতে কি, সত্য প্রভুর জীবন্ত উপাসনা দেওয়া চাই, তাই তিনি দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আমাদের ব্রাহ্মসমাজে দিবার কি আছে? এই সত্য-পুরুষের জীবন্ত উপাসনা যদি না দিতে পারি, তবে কিছুই হইবে না। ঈশ্বর করুন এই জীবন্ত উপাসনা আমাদের সকলের প্রাণের সম্বল হউক।

ব্রাহ্মগৃহে ব্রাহ্মধর্ম্ম—যখন একটী ব্রাহ্মবিবাহ হয়, তখন আমরা এই ভাবিয়া আনন্দিত হই, যে একটী ব্রাহ্ম-পরিবারের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইল। আমরা এই আশা করি, যে সেই নববিবাহিত দম্পতি নিজ গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিবেন ও সাধন করিবেন এবং তাঁহাদের ক্রোড়ে যে সকল পুত্র কন্যা জন্মিবে তাহারাও ভাবী ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত হইয়া ইহার বলবৃদ্ধি করিবে। কিন্তু তাহা না হইয়া যদি দেখিতে পাই যে ব্রাহ্মগৃহে যে সকল বালক বালিকা জন্মিতেছে, তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব প্রাপ্ত হইতেছে না; বরং অনেকে ভাবে ও চরিত্রে ব্রাহ্মবিরোধী হইয়া উঠিতেছে, তাহা হইলে ব্রাহ্মবিবাহে আনন্দিত হওয়া উচিত নহে। আমরা ইতিমধ্যেই দেখিতে পাইতেছি, অনেক ব্রাহ্ম-গৃহের বালকগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগবিহীন হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। বালিকাদিগের মধ্যে এ অনিষ্ট ফল এখনও তত প্রবলরূপে দৃষ্ট হয় নাই; কারণ বালিকাগণ বালক-দিগের ন্যায় বাহিরের লোকের সহিত সেরূপ মিশিতে পারি-তেছে না। কিন্তু বালকদিগের অনেকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরে পড়িতেছে। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত তাহারা ব্রাহ্মসমাজে একবার পা দেয় না; উপাসনার কোনও ধার ধারে না; কথা বার্ত্তাতে বরং ব্রাহ্মদিগকে উপহাস বিদ্রূপ করে। এরূপ হওয়ার কারণ কি? উত্তর—পিতা মাতার অনবধানতাই ইহার কারণ। শৈশব হইতে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় পুত্র কন্যাকে ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে (touch) রাখেন নাই; গৃহে তাহাদিগকে একটী দিনও ব্রাহ্মধর্ম্ম বা ব্রাহ্মসমাজের কথা বলেন নাই; বরং তাহাদেরই সমক্ষে ব্রাহ্মসমাজের লোক-দিগের সমালোচনা করিয়াছেন, হয়ত অনেক সময়ে উপহাস বিদ্রূপ করিয়াছেন; সমাজের যে সকল লোক তাঁহাদের পুত্র কন্যাগণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত, এরূপ সকল ব্যক্তিকে হয়ত পিতা মাতা সামান্য মতভেদের জন্য পুত্র কন্যারই সমক্ষে অবজ্ঞাসূচক ভাষাতে সমালোচনা করিয়াছেন। এই রূপে তাহারাও অবজ্ঞাসূচক ভাষাতে সমালোচনা করিতে শিখিয়াছে। এইরূপ নানা কারণে অনেক গৃহের বালক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। অথচ এই জাতিভেদ-প্রপীড়িত দেশে ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন এই সকল বালক বালিকার অন্য সমাজ নাই। ইহাদিগকে ব্রাহ্মসমাজেই বিবাহ করিতে হইবে; ব্রাহ্মসমাজেই বাস করিতে হইবে, ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি অবনতির ফলভোগ করিতে হইবে। তাহা হইলে এই দাঁড়াইল যে ভবিষ্যতে এরূপ অনেক পরিবার ব্রাহ্মসমাজে থাকিবে, যাহারা নামে ব্রাহ্মসমাজের লোক থাকিবে, কিন্তু আচরণে সম্পূর্ণ ব্রাহ্মবিরোধী হইবে। সেরূপ ব্রাহ্মসমাজের দশা কি হইবে, সেরূপ সমাজের প্রতি দেশের লোকের ভাব কি দাঁড়াইবে, সেরূপ সমাজের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব কতদূর রক্ষিত হইবে, তাহা ব্রাহ্মগণ একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করুন। এই বিষয় বার বার আলোচনা হইতেছে অথচ দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মগণের এ বিষয়ে মনোযোগ দৃষ্ট হইতেছে না। পুত্র কন্যার শিক্ষাবিষয়ে যেরূপ সতর্ক হওয়া উচিত সে সতর্কতা দৃষ্ট হইতেছে না। যতই চিন্তা করা যাইবে, ততই অনুভব করা যাইবে যে ব্রাহ্মবালক বালিকা-গণের শিক্ষার অপেক্ষা গুরুতর কার্য্যভার ব্রাহ্মসমাজের হস্তে অতি অল্পই আছে। এমন কি এ বিষয়ে অমনোযোগী থাকিলে ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারও বন্ধ হইয়া আসিবে। উদরাময়ের রোগী যেমন লোভবশতঃ এক দিক দিয়া আহার করে, কিন্তু তাহা অপর দিক দিয়া বাহির হইয়া যায়—তাহাতে শরীর পড়ে না; সেইরূপ প্রচার কার্য্যের দ্বারা এক দিক দিয়া লোক ডাকিবে, ঘরের লোক অপর দিক দিয়া বিকৃত হইয়া বাহির হইয়া যাইবে; সে প্রচারে ফল কি? অতএব প্রচারকার্য্যের অপেক্ষাও বালক বালিকার শিক্ষার উপায় বিধান গুরুতর কর্ত্তব্য। এজন্য যদি সকলে সমবেত হইয়া কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করিতে হয়, তাহা সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য। ইহা কি আবার বুঝাইয়া দিতে হইবে?

বাধা বাহিরে নহে—আমাদের অনেকের জীবনে এমন এক সময় ছিল, যখন মনে হইত বাহিরের প্রতিবন্ধকতাতেই সাধন ভজন ভালরূপে চলিতেছে না। এমন কি অনেকের পক্ষে এমন সময়ও ছিল, যখন উপাসনা করিতেও সুবিধা হইত না। যখন ব্রাহ্মসমাজের সহিত সবে পরিচিত হইতেছিলাম।

সময় সময় সামাজিক উপাসনায় উপস্থিত হইতাম, কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি নাই, তখন দৈনিক উপাসনার নিয়ম থাকিলেও উপাসনা করিবার স্থান ও সময় ভালরূপ যুটিত না। যাঁহাদের সহিত একত্রে থাকিতাম, তাঁহারা এরূপ উপাসনার সহিত পরিচিত নহেন। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপাসনা করিতে সুবিধাও হইত না, আবার ভয়ও হইত। তখন কোথায় একটু নির্জ্জন স্থান পাওয়া যাইবে, কোথায় নদীর ধারে বা অন্য কোন মনুষ্যের গতায়াতহীন স্থান পাইব সে জন্য কত চেষ্টা হইত। কত ভয়ে ভয়ে তখন উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইতাম। লোকে বা দেখিতে পায়, দেখিতে পাইলে নিন্দা করিবে এবং অভিভাবকগণকে বলিয়া দিলে বিষম অনর্থ ঘটিবে; এই সকল আশঙ্কায় তখন কত না সতর্ক ভাবে নির্জ্জন স্থানে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইতাম। সামাজিক উপাসনাস্থলে যাইতেও কত ঘুরিয়া ফিরিয়া বাঁকা পথ দিয়া সমাজে যাইয়া উপাসনা করিতাম। তখন মনে হইত, এই সকল বাধা যদি অতিক্রম করিতে পারি, তাহা হইলে আর কোন ভাবনা থাকে না। আশানুরূপ উপাসনাদি করিতে আর কোনই অসুবিধা থাকে না। তখন মনে করিতাম, যাঁহারা প্রাচীন সমাজ পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা কেমন সৌভাগ্যবান। তাঁহাদের কত সুবিধা। কেহ উপাসনা করিতে বাধা দিবার নাই। যখন ইচ্ছা হয় তখনই উপাসনা করিতে পারেন। কিন্তু যখন সেই দিন আসিল যখন বাহিরের প্রতিকূলতা কাটিয়া গেল, যখন সমস্ত দিন রাত্রি বসিয়া উপাসনা করিলেও নিষেধ করিবার কেহ থাকিল না বরং তাহাতে উৎসাহ পাইবারই সম্ভাবনা হইল। উপাসনা না করিলে নিন্দা করিবার লোক যুটিল, তখন দেখা গেল সাধন ভজনের প্রতিকূলতা শুধু বাহিরে নয়, কিন্তু ভিতরেই বেশী। যাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, সামাজিক উপাসনাস্থলে না গেলে বা নির্জ্জন উপাসনা না করিলে তাঁহারা নিন্দিতই হন। উপাসনা করিবার পক্ষে তাঁহাদের বাহিরে কোনই বিঘ্ন নাই, বরং সুবিধাই আছে। ব্রাহ্মগৃহের সন্তানগণ যদি উপাসনা করে, তাহাতে সকলে প্রশংসাই করে, উৎসাহই দেয়, কিন্তু নিষেধ করিবার কেহই নাই। এ অবস্থায় যদি দেখি যে উপাসনাতে তেমন মন নাই—মধ্যে মধ্যে উপাসনা-বিহীন হইয়া দিন কাটাইতেও কষ্ট হয় না। এমন যে প্রিয় সামাজিক উপাসনা যাহাতে যোগ দিতে যাইয়া কত সময় তিরস্কার এমন কি প্রহার সহ্য করিতেও হইয়াছে; তাহাতে অনুপস্থিত হইলেও তেমন কষ্ট হয় না, এমন কি সামান্য কাজের ওজর করিয়া উপাসনা স্থলে না যাইতে মনের আগ্রহ বেশী, সামান্য অসুবিধা ঘটিলে আর উপাসনা স্থলে যাইতে প্রবৃত্তি হয় না, এমন কি আমোদ প্রমোদ করিয়া সেই সময়টুকু কাটাইতে বরং ইচ্ছা হয়, তথাপি উপাসনা স্থলে যাইতে প্রবৃত্তি হয় না; তখন সহজেই মনে হয়, বাধা বিঘ্ন বাহিরে নয় কিন্তু ভিতরে। ভিতরের অক্ষুধা, অরুচিই প্রাণকে এমন হীন অবস্থায় উপস্থিত করিয়া থাকে। এজন্য দেখা যায় যখন প্রাণ শুষ্ক ও ক্ষুধাহীন হয়, তখন সহজে সামাজিক উপাসনা উপদেশ ও সংগীতাদির সমালোচনা করিতে, তাহার দোষ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্তি সমধিক প্রবল হয়। তখন সেই ভিতরের রোগ চাপা দিয়া রাখিয়া আত্মপ্রবোধের জন্য অপরের স্কন্ধে দোষারোপ করিয়া, সন্তুষ্টিলাভ করিতে প্রবৃত্তি হয়। যখন উপাসনা করিতে করিতে আন্তরিক রিপুসকলের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হয়, যখন প্রবৃত্তিকুলকে দমন করিয়া সংযতচিত্ত হইয়া চলিবার আবশ্যক হয়, বিষয়বাসনার মাত্রা হ্রাস করা আবশ্যক হয় তখনই বাস্তবিক সাধকের পক্ষে কঠিন সময় উপস্থিত হয়। বাহিরের প্রতিকূলতা বেশী দিন থাকে না। আর তাহা অতিক্রম করাও বেশী কঠিন নহে। কিন্তু ভিতরকার শত্রু—যাহার সহিত সংগ্রাম করিতে গেলেই আত্ম-নিগ্রহ করিতে হয়, আত্মসুখের কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করিতে হয়, তখনই প্রধান অন্তরায়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। সাধক এই সময় যদি দৃঢ় সংকল্প করিয়া—সাধনপথে অগ্রসর হইতে যত্নশীল না হন, তাঁহার পক্ষে এ পথে চলা দিনের পর দিন কঠিন হয়। তখন সাধক-সমাজে শরীরটা পড়িয়া থাকিলেও প্রাণ বহু দূরে চলিয়া যায়। এই সময়ের অবস্থা অতি শোচনীয়। এই সময়েই লোকে উপাসনাদিতে না যাইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকে। এই সময়ে কেবল কার্য্যবাহুল্য ঘটে। কিন্তু একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যাঁহারা নিয়মিত রূপে সাধন ভজন করেন, তাঁহারা যে অন্যান্যের অপেক্ষা কাজ কম করেন এমন নয়। তাঁহারা যে বিষয়কর্ম্ম না করেন তাহাও নয়। দেখা যায় নিয়মিত রূপে উপাসনা করিলে কাজের কোনই ক্ষতি হয় না বরং তাঁহারাই বেশী কাজ করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হন। তবে বৃথা জল্পনা গল্পাদি করিয়া বা ক্রীড়া ও আমোদ প্রমোদে হয়ত তাঁহারা সময় যাপন করিতে পারেন না। অভাব সময় বা সুবিধার নহে। অভাব—আন্তরিক পিপাসা ও প্রবৃত্তির। এই দুইটী থাকিলে সকল দিকেই সুবিধা হয়। সংসারের কাজও চলে, সাধন ভজনও চলে। আমরা আর কতকাল পরের উপর দোষারোপ করিয়া এবং বাহিরের প্রতিকূলতা নিবারণ করিয়া করিয়া বেড়াইব। অন্তরের রিপু সকল ধরিতে এবং তাহার মায়া এড়াইতেই আমাদের প্রবৃত্তি প্রবল হউক।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্যাপ্তি ও গভীরতা।

বর্ত্তমান যুগ ব্যাপ্তিরই অনুকূল, গভীরতার অনুকূল নহে। প্রত্যেক দেশের উৎপন্ন দ্রব্য, প্রত্যেক জাতির উৎপন্ন চিন্তাকে অল্পকালের মধ্যে দশদিকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিবার জন্য কত প্রকার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। সমুদ্র বক্ষে দিবারাত্র অগণ্য বাষ্পীয়পোত তরঙ্গ বক্ষ বিদারণ করিয়া ছুটিতেছে, স্থলভাগে অগণ্য বাষ্পীয় শকট মেদিনীকে কম্পিত ও দিগ্‌বলয়কে ধূমাকীর্ণ করিয়া ধাবিত হইতেছে—জগতের কৃষিজাত দ্রব্য, চিন্তাজাত সাহিত্য, ও বার্ত্তা বহন করা ইহাদের প্রধান

কার্য্য। ইহার উপরে লোকের ধনলাভের প্রবৃত্তি প্রবল। যদি এরূপ কোনও দ্রব্য উৎপন্ন হয়, যাহা ব্যয়সাধ্য ও অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোকের ভোগযোগ্য, তাহাকে ত্বরায় সুলভ ও বহুজন-ভোগ্য করিবার জন্য বিবিধ প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। চিন্তালব্ধ সত্য সকল সম্বন্ধেও এইরূপ। প্রভূত চিন্তার দ্বারা একজন যাহা লাভ করিতেছেন, তাহাকে সুবোধ্য করিয়া সর্ব্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য আকারে জনসমাজে ত্বরায় উপস্থিত করা হইতেছে। তাহার স্থূল স্থূল জ্ঞাতব্য কথা দুই মাসের মধ্যে সকলেরই কর্ণে উঠিতেছে। বিশেষতঃ জীবনসংগ্রামের কঠিনতা ও কার্য্যে অতিরিক্ত ব্যস্ততা বৃদ্ধি হওয়াতে, গভীররূপে কোনও বিষয়ের আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি মানুষের থাকিতেছে না। দৈনিক সংবাদপত্র, তাহাও চিন্তার সহিত পাঠ করিবার অবসর অনেকের হইতেছে না। সকলেই যেন কি এক চক্রের অঙ্গীভূত হইয়া ঘুরিতেছে, ঘুরিতে ঘুরিতে যে দুই একটা বিষয় দেখিয়া লইতে ও যে দুই একটা কথা শুনিয়া লইতে পারিতেছে, এইমাত্র। এইরূপে জ্ঞানালোচনা সম্বন্ধে এখন এই দেখা যায়, যে জ্ঞানের স্থূল স্থূল তত্ত্ব সকল বহুদূর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বহুসংখ্যক লোকের কর্ণগোচর হইয়াছে, কিন্তু অল্প লোকেই গভীরতা লাভ করিবার প্রয়াস পাইতেছে।

প্রাচীন কালের ভাব ইহার বিপরীত ছিল। তখন ব্যাপ্তি অপেক্ষা গভীরতাই অধিক ছিল। লোকে বহুকষ্টে একজন সৎ গুরু পাইত বা দুইখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিত। কিন্তু সেই দুইখানি গ্রন্থই গভীররূপে আলোচনা করিয়া ব্যুৎপত্তি লাভ করিত। যে দুই চারিটী জড়তত্ত্ব বা মনস্তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইত তাহাই গভীররূপে অনুশীলিত হইত। বর্ত্তমান কালের ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাচীন কালের গভীরতাও রাখিতে পারিলে ভাল হয়।

ধর্ম্মসাধন ও সদনুষ্ঠান সম্বন্ধেও ঐ কথা। এই দুই দিকেও বর্ত্তমান সময়ে লোকের প্রবৃত্তি গভীরতা অপেক্ষা ব্যাপ্তির দিকে অধিক দৃষ্ট হয়। প্রথম, সদনুষ্ঠান সম্বন্ধে চিন্তা করিলে অনেক স্থলেই এইরূপ দেখি যে সে সদনুষ্ঠানটী স্থায়ী ভিত্তির উপরে স্থাপিত হইল কি না এবং তাহার উত্তরোত্তর উন্নতির উপায় কি, এ সকল চিন্তা লোকের মনে উদয় না হইয়া সর্ব্বাগ্রে তাহাকে বহুসংখ্যক লোকের বিদিত করিবার প্রবৃত্তিই প্রবল হয়। ধর্ম্মকেও এইরূপ প্রদর্শনের বস্তু করিবার প্রবৃত্তিও প্রবল দৃষ্ট হয়। কোনও কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল। কিন্তু এরূপ প্রচারের স্থায়ী ফল দৃষ্ট হয় না। যেখানে গভীরতা অপেক্ষা ব্যাপ্তি অধিক সেখানে অসার ও গভীরতা-বিহীন লোক যুটিতে থাকে, এবং তাহারা অনেক সময় এক স্রোতে আসে, আর এক স্রোতে ভাসিয়া যায়। যদি একশত আসে তবে দুই বৎসর না যাইতে যাইতে তাহার ৭৫ জন স্খলিত হইয়া পড়ে। কিন্তু গভীরতার দিকে দৃষ্টি রাখিলে বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। যদিও অল্প সংখ্যক লোক থাকে, সেই অল্পসংখ্যক লোক স্থায়ী হয়, এবং সেই অল্পসংখ্যক হইতে উত্তরকালে বহুসংখ্যক লোক সেই ভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, যে ইহার কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে আমরা এতদিন গভীরতা অপেক্ষা ব্যাপ্তির দিকে অধিক দৃষ্টি দিয়া আসিতেছি। লোক আনিবার জন্য যেরূপ ব্যগ্রতা দৃষ্ট হইয়াছে, আনীত ব্যক্তিদিগকে উন্নত করিবার জন্য সেরূপ ব্যগ্রতা দৃষ্ট হয় নাই। এমন কি ইহার প্রচারক ও উপদেষ্টাগণকেও ব্রহ্মজ্ঞানে সুপরিপক্ক করিবার জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বিত হয় নাই। ইহার ফল এই হইতেছে যে এক সময়ে যাঁহারা উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন তাঁহারাই অপর সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মকে ও ব্রাহ্মসমাজকে বর্জ্জন করিয়া যাইতেছেন। দেখিলে বোধ হয় যেন তাঁহারা জোয়ারের জলে আসিয়াছিলেন ভাঁটার জলে বাহির হইয়া যাইতেছেন। যেখানে গভীরতা লাভ করিবার দিকে দৃষ্টি অল্প, যেখানে ভাবের উপরেই সকলেই আছে, সেখানে মত ও ভাবগত চঞ্চলতা ও অস্থিরতা অনিবার্য্য। ভবিষ্যতে আমাদিগকে ব্যাপ্তি অপেক্ষা গভীরতার দিকে অধিক মনোযোগী হইতে হইবে, তদ্ভিন্ন আমরা ব্রাহ্মসমাজের মত ও কার্য্যপ্রণালীকে স্থির রাখিতে পারিব না।

জীবনের প্রভু কে ?

(সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ)।

ঋষিরা ঈশ্বরের স্বরূপ কত প্রকারে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী এই,—

"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ"

তিনি মহান্, তিনি পুরুষ। প্রথমতঃ তিনি পুরুষ—অর্থাৎ তিনি অন্ধশক্তি নন, কিন্তু জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছাসম্পন্ন পুরুষ। আমাদের আত্মা যেমন পুরুষ, তেমনি তিনি পুরুষ। তাঁহার সহিত আত্মার যোগ, অন্ধশক্তির সহিত অন্ধশক্তির যোগ নয়। জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের, প্রেমের সহিত প্রেমের ও ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার যোগ, পুরুষে পুরুষে যোগ ; যেমন তোমায় আমায় যোগ। আকাশের সঙ্গে আকাশ মিলিয়া যায়, জলের সঙ্গে জল মিলিয়া যায়, মহাকাশের সঙ্গে ঘটাকাশ মিলিয়া যায়, সেরূপ নয়, কিন্তু পুরুষে পুরুষে যে যোগ এ যোগ তাহা। অর্থাৎ জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছার যোগ। আমাদের জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা যখন দেখি, তখন দেখি তাহারা জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছারই অনুসন্ধান করে। তাহা না হইলে চরিতার্থ হয় না। এমন এক বস্তু যদি আমার সম্মুখে রাখ, যাহার জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা নাই, আর তাহাকে যদি প্রীতি করিতে বল, তাহা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মনে কর আমি একটি কুকুরকে ভাল বাসি। তুমি যদি বেশ সুন্দর একটি কুকুর নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাকে কাচের চক্ষু দিয়া—নানা শোভায় সুশোভিত করিয়া আমার দিকে তাহার মুখ ফিরাইয়া রাখ, তাহা হইলে কখনও তাহাতে আমার প্রীতি হইবে না ; তাহার উপর আমার প্রেম যাইবে না। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে একটি জীবন্ত প্রাণী যদি আসে, তাহার প্রেম-পূর্ণ দৃষ্টি যদি আমার চক্ষের উপর পড়ে, তবেই আমার

প্রেম চরিতার্থ হয়, না হইলে নয়। লোকে যে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে, সেখানেও জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা আরোপ করিয়া লয়। তাহা না হইলে জ্ঞান, প্রেম ইচ্ছা চরিতার্থ হয় না। সুতরাং তিনি পুরুষ অন্ধশক্তি নন। যেমন তাড়িত্ একটা শক্তি আছে, তিনি সেরূপ নহেন। কিন্তু জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছাময় হইয়া আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি যে কেবল পুরুষ, তাহা নহে,—"তিনি মহান্ পুরুষ" ইহার মধ্যে গভীর অর্থ আছে। ঈশ্বর করুন, আমরা যেন তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হই।

"তিনি মহান্ ও প্রধান পুরুষ।" অনেক কার্য্যে এক একজন প্রধান পুরুষ থাকে। প্রত্যেকেই কাজ করে, কিন্তু তিনি অধ্যক্ষ। যেমন সৈন্যদিগের একজন অধ্যক্ষ থাকে। সৈন্যেরা তাহার অধীনে যুদ্ধ করে; তাঁহার কথায় প্রাণ দেয়। যখন জাহাজ সমুদ্রে যায়, একজন প্রধান অধ্যক্ষ, আর সকল তাহার অধীন থাকে। তাঁহার হুকুমেই কাজ করে। সংসারে একজন কর্ত্তা থাকে, সকলে তাঁহার অধীন হইয়া চলে। সেই প্রধান পুরুষের কর্ত্তৃত্ব। নিয়ম করিবার ভার তাঁহার, চালাইবার ভার তাঁহার উপর। তিনি নিয়ামক, অপর সকল তাঁহার নিয়মের অধীন। এক দিকে নিয়ন্তা, অপর দিকে বাধ্যতা। তাহা না হইলে কাজ হয় না। অধ্যক্ষের কথা যদি না শুনে তবে যে কার্য্যের জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে তাহা সম্পন্ন হয় না এবং তাহা হইলে এরূপ অধ্যক্ষের কোন অর্থ থাকে না। বাধ্যতা দ্বারাই কার্য্য হয়। তাঁহার ইচ্ছা প্রধান, অপর সকলের ইচ্ছা দ্বিতীয় স্থানে। তাঁহার ইচ্ছামত কাজ হয়। কিন্তু কার্য্যের গৌরব তাঁর।

কাজ করে সকলে, কিন্তু গৌরব তাঁর। প্রত্যেক সৈন্য যুদ্ধ না করিলে যুদ্ধে জয়লাভ হয় না, কিন্তু জয়ের প্রশংসা সেই সেনাপতির। তিনি হয়ত অশ্বারোহণে পশ্চাতে ছিলেন, সেনারা প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু গৌরব তাঁহারই। আপাততঃ একথা বোধ হইতে পারে একি অবিচার, তাঁহার গৌরব কেন? কিন্তু ইহাতে গম্ভীর অর্থ আছে। গর্ডন না থাকিলে হাজার সাহসী সৈন্য থাকিলেও চীনের যুদ্ধে জয় হইত না। তাঁহার শৃঙ্খলা, তাঁহার কার্য্য তৎপরতা, তাঁহার বীরত্ব, তাঁহার সাহস, তাঁহার ধৈর্য্য, তাঁহার শৌর্য্য না থাকিলে সৈন্যগণ হাজার সাহসী হইলেও কখনই যুদ্ধে জয় হইত না। সুতরাং গৌরব তাঁহারই।

ঈশ্বরকে প্রধান পুরুষ বলিলে এই বলা হয়, তাঁহার অধীন হওয়া, তাঁহাকে জীবনের কর্ত্তা করিয়া চলা। জীবনের সমস্ত কার্য্যের গৌরব তাঁহাকে দেওয়া এই ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেই বলা যায় "মহান প্রভুর্বৈ পুরুষঃ।"

ধর্ম্মের আর কোন অর্থ নাই, কেবল তাঁহাকে প্রধান পুরুষ করিলেই হয়, আর কিছু নয়। অনেক সময় দেখা যায় মানুষ আপনাকে প্রধান পুরুষ করিয়া মুখে বলে ঈশ্বর আমরা কর্ত্তা। অন্দর দেখিলে দেখা যায় নিয়ন্তা তিনি নন, কিন্তু মানুষ আপনি নিজে। তাঁহার ইচ্ছা নয় কিন্তু মানবের ইচ্ছাই প্রধান। আপনাদের জীবন পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, নিজেকেই প্রধান পুরুষ করিয়া রাখিয়াছি, আমরাই জীবনকে নিয়মিত করিতেছি। তিনি প্রভু, আমি দাস, এভাব নয়। আমি তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতেছি, আমি তাঁহার সন্তান হইয়াছি এভাব নয়, কিন্তু আমি এখানে প্রধান পুরুষ।

আপনার ইচ্ছাকে অনেক সময় প্রধান ভাবি। প্রার্থনা করি অনেক সময় এই ভাবে যে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তোমার দ্বারা। নিজের ইচ্ছাই পূর্ণ করিতে চাই তাঁহা দ্বারা। কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিকের প্রার্থনা এই "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক আমা দ্বারা।" "আমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক তোমার দ্বারা" এবং "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক আমার দ্বারা" এই উভয় প্রার্থনাতে অনেক প্রভেদ।

সেইরূপ গৌরবও আমরাই গ্রহণ করি। প্রধান পুরুষ তিনি নন, কিন্তু আমরা। "মহান প্রভুর্বৈ পুরুষঃ" বলা যায়, তখন, যখন জীবনের উপর তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। অর্থাৎ সকল কার্য্যে তাঁহারই গৌরব দেখি।

তিনি কেবল মহান পুরুষ নহেন কিন্তু প্রভু। প্রভু শব্দের অর্থ কি? না যাহার প্রভাব আছে, মনের উপর যাহার শক্তি আছে। প্রভুর যে শক্তি তাহা গূঢ়শক্তি, তাহা অব্যক্ত ভাবে মানবের চরিত্রের উপর কার্য্য করে। যেখানে পুরুষ দেখি, সেখানেই প্রভু দেখি, সেখানেই এই গূঢ়শক্তি দেখা যায়। এই গূঢ় শক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মনু বলিয়াছেন :—

"দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডোহি চরতিক্রমঃ।"

অর্থাৎ সকল লোক যখন নিদ্রিত থাকে, রাজার শাসনদণ্ড তখন জাগিয়া থাকে। তুমি সামান্য মানুষ, অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠানের চেষ্টা করিতেছ, মনে করিতেছ কেহ তোমাকে দেখিতেছে না, কিন্তু রাজশক্তি তোমাকে দেখিতেছে। তুমি যে তোমার পার্শ্বস্থিত লোকের বক্ষে ছুরিকা আঘাত করিতে সাহস কর না তাহার কারণ কি? রাজার শাসন-ভয়। এই কোটী কোটী লোকের মধ্যে দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী মানুষ কি নাই? আজ যদি দণ্ডশক্তি ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়, তবে কি ইহারা দেশকে অস্থির করিয়া তোলে না? পশ্চিমে কানপুর প্রভৃতি স্থান যখন বিদ্রোহ হইয়াছিল, তখন বাজার ব্যবসা বাণিজ্য সমুদায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, কেহ দোকান করিতে পারিত না, হাট বাজার বা বাড়ীর প্রবেশ দ্বার বন্ধ, লোক ভয়ে ঘরের বাহির হইত না। কোন মতে দিন কাটাইত। সৈন্যেরা তরবারি হস্তে নগরে বেড়াইতেছে! সে যে কি অরাজকতা তাহা ভাষায় বলা যায় না। আজ রাজার শক্তি ভঙ্গ করিয়া দেও, কল্য দেখিবে জনসমাজ ভগ্ন হইতেছে। কাল যদি শুনিতে পাই যে কেল্লাতে সৈন্য নাই, থানায় পুলিস নাই গবর্ণমেণ্টের ধনাগার লুঠ হইয়াছে, তবে কে ঘরের বাহির হয়? প্রভুশক্তি না থাকিলে শাসন চলিত না। প্রভুশক্তি দণ্ডের ন্যায় কার্য্য করে। এই শাসনদণ্ড যদি না থাকিত, তবে আজ এতগুলি লোক নিরাপদে এখানে বসিয়া ঈশ্বরের নাম করিতে পারিতাম না। প্রত্যেক পদ বিক্ষেপে এই রাজশক্তির কথা কেহ ভাবে না, কিন্তু অব্যক্ত রূপে প্রত্যেকের মধ্যেই ইহা আছে। সেইরূপ প্রভুর শক্তির

তারও অবাক। কোন বাড়ীতে গেলেই টের পাওয়া যায় গৃহস্বামী বাড়ীতে আছেন কি না? কর্ত্তা বাড়ীতে থাকিলে, ভৃত্যদের মধ্যে কর্ম্মের ব্যস্ততা ও শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়, প্রভুর ভয়ে সকলেই আপন আপন কার্য্য শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে সম্পন্ন করে। আর সেই প্রভু যদি বাড়ীতে না থাকেন, তবে সকল কাজেই বিশৃঙ্খলা।

আমরা যে ঈশ্বরকে প্রভু বলি আমাদের কি সেই শৃঙ্খলা ও নির্ভর আছে? তিনিত আমাদের প্রভু, কিন্তু আমরা কি অনুক্ষণ তাহা মনে রাখি, ও তাঁহার উপর নির্ভর করি? শিশুর গতি যখন দেখি সে স্বাধীনভাবে খেলা করিয়া বেড়ায়, সে আর কিছু জানে না তাহার নির্ভর আছে তাহার মায়ের উপর। সে যে প্রত্যেক কার্য্যে ভাবে তার মা আছে, তাহা নহে, কিন্তু সে অব্যক্ত ভাবে মায়ের উপর নির্ভর করে। এই নির্ভরের কারণ হরণ কর তাহার সব যাইবে, প্রসন্নতা যাইবে। যদি প্রভুর উপর নির্ভর করিতে পারিতাম তবে কি শিশুর ন্যায় নির্ভর করিয়া প্রসন্ন থাকিতে পারিতাম না?

আর দেখি যেখানেই প্রভু সেখানেই নির্ভর সেখানেই প্রতীক্ষা। আমরা কি নির্ভর করি? কত সময় কত গুরুতর প্রশ্ন আমাদের মনে উঠে, আমরা কি প্রতীক্ষা করি তিনি সে সম্বন্ধে আদেশ করেন কি না?

নির্ভরের সঙ্গে সঙ্গেই আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। আমাদের নিজেদের জীবন দেখিয়া কি বলিতে পারি যে নির্ভর করিতে পারিয়াছি, তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিয়াছি, এবং সে আদেশ পালন করিতে পারিয়াছি? আমরা তাঁহাকে প্রভু করিতে পারি নাই। পরমেশ্বর করুন আমরা তাঁহাকে জীবনের প্রভু করি। তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করি এবং তাঁহার আদেশ পালন করিয়া ধন্য হই।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধর্ম্মভাব।

১১ই মাঘ দিবসে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমাদের প্রত্যেক জ্ঞানের রশ্মি অন্য স্থান হইতে আসিতেছে। প্রত্যেক সত্যের কিরণ অন্যস্থান হইতে বিকীর্ণ হইয়া তোমার হৃদয়ে উপনীত হইতেছে। ইহার একটীও তোমার নয়। তবে এ সকলের কর্ত্তা কোন্ জায়গায়? বর্ত্তমান সময়ে utilitarian (হিতবাদীগণ) এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া neccessitarian হইয়াছেন, প্রাচীনকালে ভারতের ঋষিগণ ইহার সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া আত্মার স্বাধীনতা দেখিতে পান নাই। যদি কর্ত্তৃত্বই নাই তবে আত্মা কিরূপে এই অনিত্য জগতে আসিল? তাঁহারা এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া কর্ম্ম-নিয়ম অনুভব করিলেন। আত্মা কর্ম্মফল ভোগের জন্য আসিয়াছে। তাঁহারা দেখিলেন জড় রাজ্যের সর্ব্বত্রই নিয়ম, কোথাও কাহারও স্বাধীনতা নাই। বিশাল সূর্য্য নভোমণ্ডলে নিয়মাধীন হইয়াই ভ্রমণ করিতেছে, সুশোভন চন্দ্রমা নিয়মের বাধ্য হইয়া পূর্ণিমা-রজনীতে নয়নানন্দ দান করিতেছে, নিয়মাধীন থাকাতেই নক্ষত্র-মণ্ডল অমানিশার আকাশমণ্ডল সুশোভিত করিতেছে, মেঘ সকল বাধ্য হইয়াই জলধারা বর্ষণ করিতেছে, প্রকৃতি বসন্তকালে নব শোভায় শোভিত হইয়া জগজ্জনের মনোহরণ করিতেছে। এইরূপ জড়জগতের সর্ব্বত্রই নিয়ম— বাধ্যতা। ইহা হইতে তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে মানবের কার্য্য সমুদয়ও দুর্ভেদ্য নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। কর্ম্মের নিয়ম মানিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের ন্যায়কারিতা রক্ষা করিলেন—পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার স্বীকার করিলেন। জীবাত্মার সংসারে জন্ম, কর্ম্মফল ভোগের জন্য বলিয়া অবধারণ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা আত্মা, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিলেন যে ঈশ্বর নিত্য, আত্মা কর্ত্তৃত্ব-বিহীন, নিয়মাবদ্ধ এবং জগৎ অনিত্য, মানবাত্মার কর্ম্মভোগের স্থান। প্রাচ্য ধর্ম্মভাবের মধ্যে এই তিনটী ভাব প্রস্ফুটিত দেখা যায়।

এ সকল ভিন্ন ইহার আরও একটী প্রধান ভাব আছে। সেটী এই—অনিত্য জগতে নিত্য আত্মার বাস প্রার্থনীয় কি না? ইহার উত্তর, প্রার্থনীয় নয়। যেহেতু জগৎ দুঃখময়—দুঃখময় জগতে আত্মার বাস কিরূপে প্রার্থনীয় হইতে পারে? জন্মগ্রহণ দুঃখেরই কারণ। জন্ম হইতে নিষ্কৃতিই মুক্তি। সংসার শব্দ সংস্কৃত সৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন; ইহার অর্থ যাতায়াত,ভব শব্দের অর্থ জন্ম। তাঁহারা এই জগতে আগমন, এখানে জন্মকেই অত্যন্ত দুঃখময় মনে করিতেন। এই জন্যই সংসারও ভব শব্দ জন্মার্থক হইলেও দুঃখবাচক হইয়াছে। সংসারকে তাঁদের এত দুঃখময় মনে হইল কেন? দেখি সমুদয় প্রাণী জগৎকে মিষ্ট মনে করে। শিশুগণ মনে করে জগৎ মিষ্ট। তাদের নবীন চক্ষে সকলই নবীন, সকলই আনন্দদায়ক, যা দেখে তাতেই আনন্দ যা শুনে তাতেই তৃপ্তি। যত দেখে যত শুনে ততই কৌতূহল। আরও দেখিব আরও শুনিব আরও আনন্দিত হইব আরও মিষ্টতা উপভোগ করিব। তাদের নবীন হৃদয়ে কত আশা, কত উৎসাহ, উপভোগ-প্রবৃত্তি কত প্রবল। আর জগতে এত মিষ্ট জিনিষও রহিয়াছে। তবে এত দুঃখ কোথা হইতে আসিল? কেন প্রাচীন পণ্ডিতগণ জগৎকে দুঃখময় অনুভব করিলেন? বেদে কোথাও ত জগৎকে দুঃখময় দেখি না। বেদে enjoymentএর ভাব, জগৎকে উপভোগ করিবার ভাব, পূর্ণমাত্রায় দেখিতে পাই। বৈদিক ঋষিগণের ধর্ম্মভাব নূতন, তাঁদের দৃষ্টি নূতন, সমস্তই নূতন। তাঁদের নূতন চক্ষে তাঁহারা জগৎকে সৌন্দর্য্যের আকর, সুখের উৎস বলিয়া দেখিয়াছেন। বেদে কোনও কপটতা নাই, বৈষয়িক বিষয়ে প্রার্থনা করিতে হইবে না সে ভাব তখন ছিল না। তাঁহারা সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখের জন্যই ব্যস্ত। সেই সুখকেই ধর্ম্মের পুরস্কার-বলিয়া মনে করিতেন এবং ধর্ম্মপথে থাকিয়া তাহারই জন্য প্রার্থনা করিতেন। বেদে সর্ব্বদাই এরূপ প্রার্থনা প্রাপ্ত হওয়া যায়—"হে ইন্দ্র! আমাদিগকে ধন দেও, যাহা দিন দিন বর্দ্ধিত হয়; আমাদিগকে দুগ্ধবতী ধেনু দেও আমরা দুধ খাই।"

এমন কি ভেকের যে কুৎসিত শব্দ তাহার মধ্যে বৈদিক ঋষিগণ এক প্রকার স্বরমাধুরী অনুভব করিয়াছিলেন। বেদে বর্ষাকালে ভেকদিগের মক মকা ধ্বনির প্রশংসা আছে। কিরূপ সবল মন থাকিলে জীবনের সুখ এত অধিক অনুভব করা যায় যে ভেকের শব্দেও মন মুগ্ধ হইতে পারে। এই শৈশব-সুলভ সবলতা, এই জীবনের সুখভোগের শক্তি, এই ইন্দ্রিয়জনিত তৃপ্তির আস্বাদনের ক্ষমতা অতীব মধুর।

প্রথমে এই ভাব ছিল তবে কিজন্য জগৎ দুঃখময় মনে হইল? মহাত্মা বুদ্ধ দুঃখের চক্ষে জগৎকে দেখিয়াছিলেন। তিনি জগৎকে ভয়ানক দুঃখময় বলিয়া ধর্ম্মস্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক জগৎ দুঃখময় এ কথা সত্য কি না। জগৎ যদি দুঃখময় হয় তবে কি ঈশ্বর করুণাময় নহেন, অথবা পরমেশ্বর কি জগৎপিতা নহেন? জগৎকে যে দুঃখময় দেখি তাহার কারণ দুঃখের কথাটা আমাদের মনে থাকে সুখের কথা ভুলিয়া যাই। তজ্জন্য ঈশ্বরকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিই না। তুমি বৎসরের মধ্যে একদিন কি দুই দিন ভয়ানক রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছ সেই কথাটী হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছ আর এতদিন যে সুখভোগ করিলে, এতদিন যে সুস্থদেহে প্রফুল্ল মনে কাল হরণ করিলে তাহা আর মনে থাকে না। পরমেশ্বর আমাদের ধন্যবাদ চান না এই জন্যই সুখের কথা মনে থাকে না। আর আমাদিগকে দুঃখ পরিহার করিতে হইবে এজন্য তার ছাপ মনে বিশেষরূপে অঙ্কিত থাকে। চিন্তাশীল হইয়া আমরা অনেক সময় মিষ্টতা হারাই। *চিন্তাশীল হইয়া দেখিলে জগৎ দুঃখময়ই মনে হয়।* দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন কালের সহিত তুলনা করিয়া বর্ত্তমানকাল দুঃখময় মনে হয়। ইতিবৃত্তে ভাল কথাই লিখিত থাকে মন্দ কথা কেহ লিখিয়া রাখে না, ব্যাস বাল্মীকি ইহাঁদেরই কথা লেখা আছে আর যে কত 'হরে নবে' জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহার কেহ সন্ধান রাখে না। কাজেই ইতিহাস পাঠে প্রাচীনের তত্ত্ব অবগত হইতে যাইয়া আমরা ভাল দিকটাই দেখিতে পাই মন্দভাগ কখনই আমাদের নয়নপথে পতিত হয় না। এই জন্যই অনেকে প্রাচীন, প্রাচীন প্রাচীন করিয়া বর্ত্তমানকে মলিন দেখিয়াছেন—জগতকে দুঃখময় মনে করিয়াছেন। এভাব য়িহুদীদের মধ্যেও ছিল। এই দুই জাতি জগৎকে মলিন চক্ষে দেখিল কেন? এমন কোনও কারণ ছিল যাহা দুই জাতিতেই বিদ্যমান ছিল। অসভ্যেরা এই জগৎকে তাজা সম্ভোগ করে। চিন্তা করিলে মনে হয় রাজনৈতিক পরাধীনতা, উৎপীড়ন, সামাজিক দারিদ্র্য প্রভৃতি জগৎকে দুঃখময় দেখিবার কারণ। য়িহুদীদের মধ্যে বন্দীদশা ও দুর্ভিক্ষ এই ভাব আনিয়া দিয়াছে। এদেশেও ব্রাহ্মণদের অত্যাচার প্রবল হইয়াছিল: অন্যান্য জাতি সর্ব্বদা প্রপীড়িত হইত, তাহাদের মন নিয়ত ম্রিয়মাণ থাকিত। এ সকলের উচ্ছেদ করিবার জন্যই বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়। জগৎ দুঃখময় হওয়াতেই তৎপ্রতি বিরাগ উৎপন্ন হইয়াছে।

ঐ সকল কারণের সমাবেশে ১ম আত্মনিষ্ঠতা, ২য় বিষয়-বিরাগ ও ৩য় অদৃষ্টবাদের বিকাশ হইয়াছে। এই তিনটী ভাব প্রাচ্যধর্ম্মে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এবং তিনটীতেই আতিশয্য দেখা গিয়াছে। আত্মনিষ্ঠতা আত্মতৃপ্তিকে প্রসব করিয়াছে। প্রাচ্য ঋষিগণ সর্ব্বদা আপনার ধ্যান, চিন্তা ও সাধনেই তৃপ্ত থাকিতেন। ইহার দৃষ্টান্ত বেশী দিতে হইবে না। হাজার হাজার সন্ন্যাসী পরমহংস প্রভৃতি এবিষয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ২য় বিষয়-বিরাগ। ইহার মধ্যে সত্য আছে কিন্তু ইহা সন্ন্যাসকে উৎপন্ন করিয়াছে। ইহা হইতে এই ভাব জন্মিয়াছে যে মনুষ্য-সমাজ ঘৃণার বস্তু, দুঃখময়, উহা পরিত্যাগ কর। ৩য়তঃ অদৃষ্ট-বাদ। ইহাতেও সত্য আছে, সমুদয় নিয়মাবদ্ধ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার আতিশয্য বশতঃ নীতি বিষয়ে উদাসীন ভাব (Stagnation) উৎপন্ন করিয়াছে। নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক যে তিনটী মূল ভাব বলিয়াছি তাহার আতি-শয্য হইতে ঐ তিনটী উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার ফল—ধর্ম্ম ও নীতির মধ্যে বিচ্ছেদ। এদেশে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গে প্রধা-নতঃ ধর্ম্মসাধন হইয়াছে। পরমহংস প্রভৃতি জ্ঞানমার্গাবলম্বী ও বৈষ্ণবগণ ভক্তিপথাবলম্বী। উভয় সম্প্রদায় মধ্যেই নীতি এবং ধর্ম্মের যোগ অপ্রস্ফুটিত রহিয়াছে। প্রাচ্য ধর্ম্মভাব এই।

এক্ষণে আলোচ্য, প্রতীচ্য ধর্ম্মের ভাব কি? প্রতীচ্য ধর্ম্ম য়িহুদী ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন। তাঁহাদের মুখ্যভাব ঈশ্বর মানব কার্য্যের বিচারক ও মানব ইতিবৃত্তের নিয়ামক। সেমিটিক ও হিন্দু জাতির মধ্যে প্রভেদ এই যে হিন্দুগণ আত্মজগতে অধিক বাস করাতে ভাবপ্রবণ। য়িহুদীগণ মানব ইতিবৃত্তের আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া বহির্ম্মুখীন ও পরিচ্ছিন্ন ভাবাপন্ন (Exact) হইয়াছেন। হিন্দুদিগের ঈশ্বরের ভাব অব্যক্ত অনধিগম্য (Vague) তাঁহারা ঈশ্বরকে অচিন্ত্য, মহান্ ইত্যাদি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "তিনি অকায়, তিনি অব্রণ, তিনি স্থূল, তিনি স্থূল নহেন, তিনি চলেন, তিনি চলেন না।" এইরূপ অস্পষ্টভাবে তাঁহারা ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন

য়িহুদীগণ ইতিবৃত্তে দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের ঈশ্বর-জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন ভাবাপন্ন। ভারতের ঈশ্বর immanent in nature, প্রকৃতিতে, জড়ে চৈতন্যে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। য়িহুদীদের ঈশ্বর সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন, Extra cosmic Being প্রকৃতির বহিঃস্থ। তাঁহাদের ঈশ্বর স্বরূপ নির্দ্দেশে কোনও প্রকার গোলমাল নাই। তাঁহাদের ঈশ্বরের একস্থানে বাস। তিনি তথা হইতে জগৎ কার্য্য দেখিতেছেন। Old Testa-ment এর ঈশ্বর বৃক্ষতলে পদচারণা করিতেছেন; কাহারও বাটীতে একরাত্রি থাকিতেছেন; কাহারও উপর ক্রোধ করিতে-ছেন; একজনের পরামর্শে অন্যের সর্ব্বনাশ করিতেছেন, ইত্যাদি প্রকার। য়িহুদীদিগের ধর্ম্মবিষয়ে সকল ভাবই পরিচ্ছিন্ন, সীমাবদ্ধ। তাঁহাদের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে তার ওপারে যাও আর তোমার রক্ষা নাই। মুষার দ্বারা যে নিয়ম প্রকাশিত হইয়াছে তার অতিরিক্ত আর কিছুই তোমাতে প্রকাশিত হইতে পারে না। আর এদেশে দেখুন এ সকল বিষয়ে কেমন উদারতা। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এক ভগবদ্গীতা দেখুন—চিন্তার কেমন আশ্চর্য্য উদারতা।

বিতণ্ডাদের মধ্যে এই উদারতার অভাব। সেই জন্যই মত লইয়া কাটাকাটি। ঈশ্বর জগতের বাহিরে,বাহির হইতে জগতের সকল ঘটনা নিয়মিত করিতেছেন, মানবের কাজ দেখিতেছেন, তাঁহাদের মূলভাব এই প্রকার। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

ব্রাহ্মবালিকাদিগের শিক্ষা।

গত ১১ই মাঘের আলোচনা সভাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপরোক্ত বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ ভাবে প্রস্তাবের অবতারণা করেন তাহাতে ইহা অনুমান করা গিয়াছিল যে ব্রাহ্ম বালিকাদিগের শিক্ষার প্রণালী লইয়াই আলোচনা হইবে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্থলবিশেষে তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া আলোচনা অন্য পথাবলম্বন করিয়াছিল এবং তাহাতে সময়াতিবাহন ভিন্ন অন্য কোন ফললাভ হয় নাই। যাহা হউক মূল প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার যে ১। ২টী কথা বলিবার আছে তাহা এক্ষণে ব্রাহ্ম সাধারণের গোচর করিতে ইচ্ছা করি।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে আগেকার নারীগণ যেরূপ রন্ধনকুশল ছিলেন এখনকার ব্রাহ্ম মেয়েদিগকে সেরূপ দেখা যায় না, তাঁহারা রন্ধনশালার কার্য্যে তত পটু নহেন। আমি বলিতে বাধ্য যে এই কয়েকটী কথা কলিকাতার ব্রাহ্মগণের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, এবং তাহার কারণও রহিয়াছে। কলিকাতায় কয়লার আগুণ শরীরকে কত দুর্ব্বল ও মস্তিষ্ককে কত পীড়িত করে তাহা, যাহারা গৃহিণীর রন্ধন আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হন, তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিতে পারেন, এবং অনুসন্ধানেও জানা যায় যে এই হেতুই অনেক গৃহিণী রন্ধন করিতে পরাঙ্মুখ হন। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে মেয়েদের পক্ষে রন্ধনাদি যাবতীয় গৃহকার্য্য সুচারুরূপে না জানা বড়ই পরিতাপের বিষয়, কারণ নিজে না করিলেও তাহা অন্য দ্বারা করাইতে হইলে সে বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। ইহা স্বীকার্য্য হইলে সহজেই এই সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়িল, যে মেয়েদের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে গৃহকার্য্য শিক্ষা একটী মুখ্য স্থান অধিকার করিবে। এক্ষণকার মেয়েদিগকে রন্ধনাদিতে অকুশলতার জন্যও তত দোষ দেওয়া যায় না, আমি যদি ঠিক বুঝিয়া থাকি তবে বোধ হয় শ্রদ্ধেয় হেরম্ব বাবু ঐ সভায় ইহার ঠিক উত্তর দিয়াছিলেন; যে আগেকার গৃহিণীরা যেমন এখনকার গৃহিণীগণ অপেক্ষা গৃহকর্ম্মে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এক্ষণকার গৃহিণীরাও তেমনি তাঁহাদিগের অপেক্ষা সাধারণতঃ বিদ্যা ও মানসিক চর্চ্চা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছেন। গৃহকার্য্যের শৃঙ্খলাদি দ্বারা যেরূপ পরিবারবর্গের শারীরিক স্বচ্ছন্দতাবিধান করা যায় মানসিক ভাবের শৃঙ্খলা ও ভাব পর্য্যালোচনা দ্বারা সেইরূপ মানসিক স্বচ্ছন্দতা বিধান করা যাইতে পারে। যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মানসিক বিকাশও ভাবের মিলন অধিক বাঞ্ছনীয় হয়, তবে গৃহের সাধারণ কর্ম্মের ভার বেতনভোগী ভৃত্যের হাতে দিয়াও স্ত্রী যদি সেই সময়ে অপেক্ষাকৃত উন্নততর মানসিক ভাবোন্মেষকর কার্য্যে স্বামীর সাহচর্য্য বিধান করিতে পারেন তবে জ্ঞানপিপাসু স্বামীর পক্ষে ইহাপেক্ষা অধিক প্রার্থনীয় আর কিছুই হইতে পারে না। এই হেতু আমি সর্ব্বতোভাবে ইহা মনে করি যে বালিকাদিগের পক্ষে যেমন গৃহকার্য্য শিক্ষা করা প্রার্থনীয় তেমনি জ্ঞানচর্চ্চা করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি ব্রাহ্মবালিকা বিদ্বান ও জ্ঞানী স্বামীর সাহচর্য্য লাভে অভিলাষিণী হন তবে তাঁহাকে যেমন স্বামীর শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধান জন্য গৃহকর্ম্মের সুশৃঙ্খলা করিতে হইবে তেমনি তাঁহার মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যও তাঁহার কর্ত্তব্যবিধানের অন্তর্ব্বর্ত্তী থাকিবে। তৎপর সন্তানদিগকে লালন পালন ও কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে নিয়োজন, এবং তাহাদিগকে জীবনের মহদুদ্দেশ্য আয়ত্ত করিতে ও তৎসম্পূরণে যত্নশীল হইতে, শিক্ষা প্রদান ইত্যাদি যাবতীয় কার্য্য মাতৃহস্তে ন্যস্ত হইয়া থাকে। এই সকল কারণে আমার বোধ হয় যে ব্রাহ্মগণের পক্ষে বালকদিগের শিক্ষা অপেক্ষা বালিকাদিগের শিক্ষার গুরুত্ব অধিকতর অনুভব করা উচিত। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ দরিদ্রতা কেবল মাত্র উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে ঘটিতেছে। ব্রাহ্মিকাগণের মধ্যে যত অৰ্দ্ধশিক্ষিতা ও অশিক্ষিতার সংখ্যা বাড়িবে ততই গৃহকর্ম্মে বিশৃঙ্খলা, সন্তান পালনে অক্ষমতা, সন্তানগণের শিক্ষাভাব, ও আয় ব্যয়ের সঙ্কুলানের অভাব বিশেষরূপে লক্ষিত হইবে। এক্ষণে প্রত্যেক ব্রাহ্ম-বালিকাকে যদি শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেই হইবে তবে কিরূপে ঐ শিক্ষা প্রদান করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে সকলের চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মসমাজে 'আধ্যাত্মিক' কথাটী এত সাধারণ ভাবে প্রচলিত হইতেছে যে অনেকের কাছে তাহা নিত্যকর্ম্ম-সুলভ কথারূপে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু তাহার ভাব বিষয়ে কয়জন চিন্তা করেন বলা যায় না। সমাজ 'আধ্যাত্মিক বিবাহের অত্যন্ত পক্ষপাতী। কিন্তু সেই আধ্যাত্মিক মিলন বা বিবাহ যে কি তাহা কয়জন ভাবিয়াছেন বলিতে পারি না। সচরাচর দেখা যায় স্বামী স্ত্রীতে একত্রে 'ধর্ম্মসাধন' অর্থাৎ একত্রে নিত্য নিয়মিত উপাসনা করা, ও একত্রে সমাজে যাওয়া ইত্যাদিই আধ্যাত্মিক মিলনের অঙ্গ ও ক্রিয়া বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু এতদ্ব্যতিরিক্ত,ভাবের সমাবেশ দ্বারা মিলন,(যাহাকে আমি প্রকৃত 'আধ্যাত্মিক মিলন'বলি,)ঈশ্বর এবং জগতের যাবতীয় ভাব ও কার্য্যকে উভয়ে এক ভাবে গ্রহণ করা তাহা কয়টী স্বামী ও স্ত্রীর ঘটিয়াছে তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ। এমনকি কোন কোনও স্থলে ইহাও দেখা গিয়াছে যে ঐ সকল বিষয়ে স্বামী স্ত্রীর ভিতরে ভাববিরোধিতা পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার অধিকাংশ স্থল পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে যে জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা উভয়ের মানসিক বিকাশ একরূপ না হওয়াতেই ইহা ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে যদি আধ্যাত্মিক মিলনই প্রকৃত বিবাহ, তবে সেই বিবাহকে সফলকাম করণার্থ আমাদের বালিকা-

দিগকে কিরূপ শিক্ষিতা করিতে হইবে? যে স্থলে কেবল গৃহকর্ম্মকুশল রমণীকে স্ত্রী করা একমাত্র বাঞ্ছনীয় হয় সে স্থলে আমি স্ত্রী শব্দের অর্থ 'গৃহকর্ত্রী' (ইংরাজীতে যাহাকে 'house-keeper' বলে) করিতে পারি কিন্তু তাহাতে স্ত্রী সহধর্ম্মিণী হইল না, অথবা স্বামী স্ত্রীতে আধ্যাত্মিক মিলনও হইল না। আবার যে স্থলে স্ত্রী গৃহকর্ম্মে সম্পূর্ণ অকুশল, সে গৃহে শৃঙ্খলা থাকে না এবং মানুষের শারীরিক ধর্ম্মপালনে যথেষ্ট বিঘ্ন উৎপাদন করে; অতএব ধর্ম্মকে সর্ব্বতোমুখী সাধনবস্তু করিতে হইলে স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী করিতে হইলে, স্ত্রীর জ্ঞানোন্মেষকর শিক্ষা প্রধান এবং গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে; কিন্তু উভয়ই অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে পরিগণিত হইবে, নতুবা শিক্ষা অপূর্ণ থাকিবে।

এক্ষণে আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলে তাহার প্রণালী আলোচনা করিতে পারি। কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে আরও একটী বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। কি পরিমাণে বালিকাদিগকে শিক্ষার জন্য পরিশ্রম করাইতে হইবে তাহা বিচার করিতে গেলে সহজেই 'অতিরিক্ত পরিশ্রমের' কথাটী আসিয়া পড়ে। কোন বয়সে কতদূর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করাইলে তাহা মাত্রাতিরিক্ত হইয়া পড়িবে না তাহা এস্থলে বিচার করা কর্ত্তব্য। ইংরাজিতে একটী বই আছে তাহার নাম 'Overpressure in Schools'; ইহা ডাক্তার 'হর্ত্তেল' কর্ত্তৃক 'স্বদেশীয়' ভাষাতে প্রথম রচিত হয়; তৎপর প্রয়োজনীয়তা বোধে ইহা ইয়ুরোপের সকল সুসভ্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে বালক বালিকাদিগকে শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করাইবার কি কি বিষময় ফল ফলিয়াছে তাহা বিষদরূপে দর্শান হইয়াছে। কিশোর বয়স্ক বালিকাদিগের মধ্যে শিরঃপীড়া, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি মস্তিষ্ক হানিকর রোগের প্রাদুর্ভাবই প্রথমতঃ 'হর্ত্তেল'কে ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে নিয়োজিত করে। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে স্কুলের ছাত্রীদিগের মধ্যে ১০ হইতে ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রোগীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, এবং ১১ হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রায়শঃই শতকরা ৫০ জনের উপর রোগী দেখা যায়। এবং ইহাও দর্শান হইয়াছে যে ঐ বয়সে বালিকাগণ প্রায়ই ৮ হইতে ৯ ঘণ্টা করিয়া প্রতিদিন মানসিক পরিশ্রম করিয়া থাকে। অধিকন্তু বালকদিগের সহিত তুলনায় দেখা যায় যে ঐ বয়সে রোগী বালক অপেক্ষা রোগী বালিকার সংখ্যা প্রায় শতকরা ১৫ জন বেশী। ইহার কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া হর্ত্তেল দেখাইয়াছেন (এবং অনেক বিখ্যাত চিকিৎসা ব্যবসায়ীও তাহাতে একবাক্যে মত দিয়াছেন) যে ঐ বয়সে বালিকাদিগের শারীরিক বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটন হেতু তাহাদের ধমনীতে রক্ত সঞ্চালন অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলভাবে হইয়া থাকে, অতএব তখন মস্তিষ্ককে অধিক পরিচালিত করিলে তাহাতে তাহাদিগের রক্ত সঞ্চালিত হইয়া মস্তিষ্ককে নানারোগের আধার করিয়া তোলে।

ইংলণ্ডে এই গ্রন্থ অনুবাদিত হইবার পরে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল এবং তদবধি অনেক পিতামাতার চক্ষু ফুটিয়াছে; তাঁহারা এক্ষণে এই নিয়ম করিয়াছেন যে বালিকাদিগকে কিশোর বয়সে গ্রন্থপাঠে অধিক নিয়োজিত না করিয়া চিত্র ও সঙ্গীত বাদ্যাদি চিত্তপ্রফুল্লকর বিদ্যাশিক্ষাতে নিয়োজিত করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হওয়া সম্বন্ধেও এই নিয়ম রহিয়াছে যে ১৮ বৎসরের ন্যূন বয়সে কোন বালিকা কেম্ব্রিজ কিম্বা অক্সফোর্ডে প্রবেশাধিকার পায় না। তৎকালে তাহাদের ধমনীতে রক্ত সঞ্চালনের উদ্দমনীয় বেগ অপেক্ষাকৃত প্রশমিত হইলে তাহারা পুনরায় মস্তিষ্ককে নিয়োজিত করিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হয় বলিয়া ঐ বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থ কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত পরিশ্রমও তাহাদের শরীরের পক্ষে তত অনিষ্টকারী হয় না।

ব্রাহ্মসমাজেও বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহার সত্যতা অনুভূত হইবে। এইরূপ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য তাহা সমাজের শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদের বিশেষ বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত। আমার বিবেচনায় ইহা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় যে বালিকাদিগকে ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গৃহ কার্য্যের জন্য তাড়া না দিয়া এক মনে বিদ্যাশিক্ষা করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎপর ৪ বৎসর (অর্থাৎ ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত) বিদ্যা শিক্ষার ভাগ কমাইয়া দিয়া শারীরিক পরিশ্রম যথা গৃহকর্ম্ম এবং সঙ্গীত, বাদ্য ও চিত্রাঙ্কনাদি চিত্তপ্রফুল্লকর কার্য্যে নিয়োজিত করিলে অনায়াসেই একটী কর্ম্মদক্ষা অথচ অল্পাধিক পরিমাণে শিক্ষিতা মেয়ে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। অবশ্য এই সময়ে একেবারে বিদ্যাশিক্ষা বন্ধ করিয়া না দিয়া বরং শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং সময় স্মরণ রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সময়ে যে টুকু শিক্ষা আরম্ভ করা যায়, আমরা ভাষা বাদ দিয়া তদপেক্ষা অল্প সময়ে সেই পরিমাণ জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারিব কিনা তাহাই বিচার করিতে হইবে। ইংরাজি ভাষাকে গৌণ শিক্ষণীয় বিষয় করিয়া সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি বাঙ্গালা ভাষাতে শিক্ষা দিলে এই অভাব অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে, এবং ব্রাহ্মসমাজে বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য ইহা করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। তাই একান্ত কর্ত্তব্য বোধে আমাদিগকে ইহা করিতেই হইবে। অবশ্য যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থিনী তাঁহাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ খোলা রহিয়াছে, এবং তাঁহাদের জন্য স্কুল কলেজও রহিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা সেত পর্য্যন্ত পৌঁছিতে আশা করেন না তাহাদের জন্য কি করা যাইতে পারে? তাঁহাদিগকে কেন কেবল ২।১ সংখ্যা Royal Reader পড়াইয়াই কোন বিশিষ্ট জ্ঞান ব্যতিরেকে গৃহে ফিরাইয়া পাঠান হয়? কেহ কি মনে করেন যে বাঙ্গালাতে কৃতবিদ্যা সঙ্গিনী ইংরাজিনবিশ স্বামীর জ্ঞানগৌরব বুঝিতে সক্ষম নহে? কেবলমাত্র ২।৪টী ইংরাজি শব্দের জ্ঞানাভাবে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের স্থূল স্থূল বিষয় সকল সাধারণ ভাবে শিক্ষা দিলে অধিক উপকার দর্শিবে না? যাঁহারা বালিকাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়াইতে মনস্থ করেন তাঁহারা ঐ সময়টুকু পাঠের ভাগ কমাইয়া ১৬ বৎসরের পর পুনরায় তাহা বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারেন। Over-pressure

কথাটা আলোচনা করিতে হইলে কোন স্থানে pressure টী পড়ে এবং তাহার সহিত অন্য কোন pressure এর সংস্রব আছে কিনা তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা না করিলে ঐ আলোচনা ফলপ্রদ হয় না। এইরূপ বয়সানুক্রমে শিক্ষা নিয়মিত করিলে আমরা অনায়াসে শিক্ষার বিষয় ও তদুপযোগী প্রণালী বিচার করিতে পারি।

যাঁহারা বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীর বিরোধী, তাঁহাদের বিপক্ষে এই একটী যুক্তি খাড়া করা হইয়াছে যে এই প্রণালী ভিন্ন অন্য কিছু কার্য্যকরী হইবে না। যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং আমাদের উদ্দেশ্যের পার্থক্য বিচার না করিয়াই কথাটা বলিয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে কথ ও পরে ফলা বানান শিখান হয় আমরা কিছু আগে ফলা বানান ও পরে বর্ণমালা শিখাইতে চাই না। তবে পার্থক্য কোথায়?—সেই পার্থক্য না বুঝিলে সমস্ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে? স্বামী নিজের জ্ঞান ইংরাজি ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় ব্যক্ত করিলে তাহাতে কি জ্ঞানের অমর্য্যাদা হইবে মনে করেন, যে বাঙ্গালা শিক্ষিতা মেয়ে দ্বারা ঐ বিষয়ে তাঁহার সাহচর্য্য সুখ সম্ভোগ হইতে পারে না? আমিত এই বুঝি যে স্ত্রীর সুশিক্ষিতা হওয়া অত্যাবশ্যক; তাহার জ্ঞান পরিস্ফুট হইবে, ভাষা যাহাই হউক না কেন? অতএব আমার বোধ হয় ব্রাহ্মবালিকাদিগের জন্য এমত বিদ্যালয় হওয়া আবশ্যক যাহাতে কেবল বাঙ্গালাতেই সাধারণ জ্ঞানপ্রদ বিষয় সকল পঠিত হইবে এবং ইংরাজি একটী গৌণভাষারূপে শিক্ষার্থিনীদিগের ইচ্ছাধীন থাকিবে।

আমি এই স্থলেই আমার বক্তব্য শেষ করিয়া ব্রাহ্ম সাধারণের মতের প্রতীক্ষা করিব এবং তাহা জ্ঞাত হইতে পারিলেই তৎপর শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইব।

এস্থলে আনন্দের সহিত বিজ্ঞাপিত করিতেছি যে সম্প্রতি 'ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে' শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত মত কার্য্যে পরিণত করণার্থ কথঞ্চিৎ উদ্যোগ করা হইয়াছে। ইতি।

কলিকাতা, ফাল্গুন। ১৩০০। } বিনয়াবনত শ্রীতপূর্ণচন্দ্র দত্ত।

ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত বড়দিনের ছুটিতে চেরাপুঞ্জিতে খাসিয়া পাহাড়স্থ ব্রাহ্মদিগের এক সম্মিলনী সভা হইয়াছিল। নানা স্থান হইতে পুরুষ ও রমণী প্রায় ৪০ জন উপস্থিত হইয়াছিলেন; ইঁহাদের অধিকাংশই খাসিয়া। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী সভাপতির কার্য্য করেন। ২৩এ হইতে ২৮এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সম্মিলনীর কার্য্য হয়। তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছিল;—(১) খাসিয়া মিশনকে অর্থ, পরামর্শ ও অন্যান্য উপায়ে সাহায্য করা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারের সাহায্য করা। প্রত্যেকের ধর্ম্ম প্রচার করা। (২) প্রত্যেক সমাজের আবশ্যকীয় ব্যয়াদি স্থানীয় ব্রাহ্মদের বহন করা, পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতিবর্দ্ধন করা এবং সকলে সমবেত ভাবে সমাজের উন্নতি সাধনে চেষ্টা করা। (৩) উপাসনা, প্রার্থনা, সংগীত, আত্মচিন্তা প্রভৃতি দ্বারা নিজে ধর্ম্ম সাধন করা এবং পরিবারে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করা, স্ত্রী পুত্রাদি সকলকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া। এই সম্মিলনীতে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন সকলেই উপকার লাভ করিয়াছেন।

আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আগামী ৪ঠা এপ্রিল বিলাতযাত্রা করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা এই সুযোগে ইউরোপের নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া তথাকার সমাজ, নীতি ও ধর্ম্মের উন্নতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। আমরা আশা করি তাঁহার এ যাত্রায় যে কেবল স্বাস্থ্যেরই উন্নতি হইবে তাহা নহে, ব্রাহ্মসমাজেরও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

গত ২রা হইতে ৫ই মাঘ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নবদ্বীপচন্দ্র দাস ও অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় তথায় গমন করিয়াছিলেন। উৎসবে, উপাসনা, বক্তৃতা, নগরসংকীর্ত্তনাদি হয়। ইহার অধিকাংশ কার্য্য ইঁহারা সম্পন্ন করেন। নববিধান প্রচারক শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ক্ষীতিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই উৎসবের কতক কার্য্য সম্পন্ন করেন।

গত ৯ই হইতে ১১ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস, কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় তথায় গমন করিয়াছিলেন। বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র এক দিন "প্রকৃত জীবন" ও চৈতন্য ও তাঁহার ধর্ম্ম", বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এতদ্ভিন্ন উপাসনা আলোচনা, পাঠ ব্যাখ্যা নগরকীর্ত্তন ও দ্বারে দ্বারে উষাকীর্ত্তনাদি হয়। নগরকীর্ত্তনে কৃষ্ণবাবু বক্তৃতা করেন। উৎসবের কার্য্য উক্ত বন্ধুত্রয় ও বাবু ইন্দুভূষণ রায় সম্পন্ন করেন। করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় উৎসবে সকলেই উপকৃত হইয়াছেন।

প্রচার—পশ্চিম প্রচারযাত্রী দল ২৫শে ফেব্রুয়ারী ভাগলপুর হইতে রওনা হইয়া বাঁকিপুরে শ্রীযুক্ত বাবু ব্রহ্মদেব নারায়ণ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসায় অবস্থিতি করেন। সেখানে নিয়ত উপাসনা ও ছাত্রদিগকে লইয়া ধর্ম্মালোচনাদি করেন। একদিন শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব স্থানীয় বেহার ন্যাসন্যাল কলেজ গৃহে উর্দ্দু ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষাল এবং শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ তথা হইতে মজঃফরপুর নগরে গমন করেন। তথায় আমাদের প্রিয় ব্রাহ্মভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী বিশ্বাসের বাসায় ইঁহারা অবস্থিতি করেন। শ্রীযুক্ত বাবু হাজারিলাল ও কুঞ্জবাবু বাজারে উপাসনাদি করেন। স্থানীয় প্রধান উকিল শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসুর বাসায় একদিন রাত্রে কীর্ত্তন, প্রার্থনা এবং আলোচনা হয়। মুখার্জ্জি সেমিনরী নামক ইংরাজি স্কুলগৃহে এক দিন নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। উর্দ্দু ভাষায় শ্রীযুক্ত সুন্দর সিং এবং বাঙ্গলাতে কান্তি বাবু বলেন। স্থানীয়, প্রধান প্রধান উকীল হাকিম ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ছাত্রমণ্ডলীতে প্রায় আড়াই শত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা তথা হইতে রওনা হইয়া বাঁকিপুর

হইয়া ৭ই মাঘ তারিখে গয়া গমন করেন। সেখানে আমাদের শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মবন্ধু বাবু চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় অবস্থিতি করেন। উক্ত বাসায় পারিবারিক উপাসনা হয়। একদিন স্থানীয় স্কুলগৃহে নীতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুন্দর সিং উর্দ্দু ভাষায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা স্থলে স্কুলের ছাত্র ও অন্যান্য ভদ্রলোক প্রায় ১০০ শত শ্রোতা উপস্থিত হইয়াছিলেন। একদিন রবিবার রাত্রিতে ব্রাহ্মবন্ধু বাবু উমাচরণ সেনের বাসায় স্থানীয় ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে লইয়া উপাসনা করা হয়। কাশী বাবু উপাসনা করেন। ইহাঁরা সেখান হইতে রওনা হইয়া আরা গমন করেন। ইতঃপূর্ব্বে বাঁকিপুর হইতে শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব এবং গুরুদাস বাবু তথায় গিয়া ডেপুটি কালেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়ের বাসায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব, শ্রীযুক্ত সুন্দর সিং, শ্রীযুক্ত শ্রীবঙ্গবিহারী লাল এবং শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া বেহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচার করিবেন। শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল কলিকাতা পুনরাগমন করিয়াছেন। উক্ত দল শীঘ্রই লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে প্রচারার্থে বাহির হইবেন, সংকল্প জানাইয়াছেন।

গত ১৯ ফাল্গুন ঢাকা পেচার আশ্রমে মাণিকদহ নিবাসী শ্রীমান দেবেন্দ্রমোহন ভৌমিকের পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই অনুষ্ঠান করিয়া দেবেন্দ্রমোহনকে পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছে। ঈশ্বর তাঁহাকে বলবিধান করুন।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজদাস দত্ত তাঁহার পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে এক শত টাকা দান করিয়াছেন। অর্থাভাবে ব্রাহ্মসমাজের অনেক কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে না, ব্রাহ্মগণ পারিবারিক অনুষ্ঠানাদির সময় যদি দত্ত মহাশয়ের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন, তবে সমাজের যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে।

সাধনাশ্রমে বাবু হরিমোহন ঘোষালের পুত্রের নাম করণানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন। শিশুর নাম পূর্ণেন্দুমোহন রাখা হইয়াছে।

ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়া প্রভৃতি স্থানে লোকের অতিশয় অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তাহার বিবরণ আমরা প্রতি দিন সংবাদ পত্রে পাঠ করিতেছি। ফরিদপুর হইতে কয়েক জন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছেন। তাঁহাদের পত্রে জানা যায় যে লোকের অন্নকষ্ট এতদূর হইয়াছে যে, কোন কোন স্থলে দরিদ্রা স্ত্রীলোক নিরুপায় হইয়া শিশু সন্তানের ক্লেশ দেখিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে, দুর্গাবয়া নামক গ্রামে কয়েক জন স্ত্রীলোক আহারাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, একজন স্ত্রীলোক পেটের জ্বালায় আপন কন্যাকে একজন কুলটা স্ত্রীলোককে দান করিয়াছিল, ফরিদপুরের কতিপয় ভদ্রলোক তাহা জানিতে পারিয়া কন্যাটিকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, অনেকগুলি বিধবা স্ত্রীলোক অনন্যোপায় হইয়া বহুদূর হইতে হাঁটিয়া ফরিদপুর সহরে আসিয়াছে, "ফরিদপুর পারিবারিক সংস্থান সমিতির" সম্পাদক তাহাদিগের উপায় করিতে না পারিয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। ঐ সকল বিধবার নাম ও ধাম আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অন্নকষ্টগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সাহায্য করা আবশ্যক বোধ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মবালিকা বোর্ডিং ও শিক্ষালয়—বর্ত্তমান বর্ষের প্রারম্ভ হইতে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় ও বোর্ডিংএর কার্য্য নূতন প্রণালীতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রণালীটীর মধ্যে প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। এই প্রণালী অনুসারে বালিকাগণ সপ্তম বৎসরে পাঠ আরম্ভ করিয়া ১৬ বৎসর বয়সে পাঠ সাঙ্গ করিতে পারিবে। এই নয় বৎসর কাল প্রধানতঃ ৩ ভাগে বিভক্ত হইবে। প্রথম চারি বৎসর প্রধানতঃ বাঙ্গালা ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হইবে, কেবলমাত্র চতুর্থবর্ষে ইংরাজী প্রথম পাঠ্য দুই একখানি পুস্তক পড়াইয়া দেওয়া হইবে। এই চারি বৎসর অন্তে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একটী পরীক্ষা করিবেন ও সার্টিফিকেট দিবেন। এই চারি বৎসরে বালিকাগণ বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে শিখিবে, ও অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, সূচীকার্য্য, সংগীত, পদার্থবিদ্যার স্থূল স্থূল তত্ত্ব, নীতি ও ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রভৃতি বাঙ্গালাতে শিক্ষা করিবে। তৎপরে আর তিন বৎসর দ্বিতীয় কোর্স। এই তিন বৎসরেও বাঙ্গালার প্রতি বিশেষ মনোযোগ থাকিবে কিন্তু সেই সঙ্গে ইংরাজীতেও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ দেওয়া হইবে। এই কোর্সেও ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এই তিন বৎসরান্তে সমাজ আবার একবার পরীক্ষা করিবেন ও দ্বিতীয় সার্টিফিকেট দিবেন। এখান হইতে বালিকাগণ দুই দিকে গমন করিবে। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষাতে গমনেচ্ছু তাহারা দুই বৎসরে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবে, আর যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশেচ্ছু নহে তাহারা আর দুই বৎসর বিশেষ কোর্সে প্রস্তুত হইবে। অর্থাৎ ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃত, ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রভৃতি যে কোনও একটী বা দুইটী বিষয় লইতে চাহিবে তাহাকে তাহা দেওয়া হইবে, এবং সেই কোর্সের অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই কোর্সের শেষে সমাজ পুনরায় পরীক্ষা করিবেন ও শেষ সার্টিফিকেট দিবেন। এই সার্টিফিকেট হাতে থাকিলে যদি কোনও বালিকা কর্ম্ম কাজ করিতে চাহেন, তাঁহার কর্ম্ম কাজ পাইবার সুবিধা হইবে। দ্বিতীয়তঃ সমাজও জানিতে পারিবেন বালিকাদিগের শিক্ষা কি প্রকার হইয়াছে। এই নূতন প্রণালীর আর একটী গুণ এই, ইহার গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত নূতন প্রণালীর সহিত সাদৃশ্য আছে, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত কোর্স গুলিও গ্রহণ করা হইয়াছে। তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকট কিছু সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা আছে। এই নূতন প্রণালীর দ্বারা আমাদের মধ্যে সকল শ্রেণির মতের সমতা বিধান করা হইয়াছে। এক্ষণে সকলে শিক্ষালয়টীর উন্নতি বিধানে মনোযোগী হইয়া ইহাকে রক্ষা করুন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১২ই এপ্রিল বৃহস্পতি বার অপরাহ্ণ ৫½ ঘটিকার সময় ১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট সিটি কলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার প্রথম ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রথম ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ এবং আয় ব্যয়ের হিসাব।

২। অধ্যক্ষ সভার সভ্য বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পদ পরিত্যাগ হেতু শূন্য পদ পূরণ।

৩। হিসাব পরিদর্শক নিয়োগ।

৪। বিবিধ।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ আফিস
১৫ই মার্চ্চ
১৮৯৪

শ্রীরজনীনাথ রায়
সম্পাদক।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ৯ই চৈত্র প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

২৪শ সংখ্যা। ১৬শ ভাগ। | ১৬ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।৷০ মফস্বলে ৩ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে প্রভো! আমরা কেন অল্পে সন্তুষ্ট হইয়া পড়ি? ঊর্ণনাভির জালে পতিত মক্ষিকার ন্যায় কেন অনেক সময় ভগ্নোদ্যম হইয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ করি? এবং অল্প জ্ঞান, অল্প প্রেম, অল্প বিশ্বাস ও অল্প বৈরাগ্যে সন্তুষ্ট হইয়া গা ঢালিয়া দি? এই অল্প-সন্তুষ্টতা আমাদের জীবনে একটা ব্যাধির মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতি উচ্চ উচ্চ বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে, অতি মহৎ মহৎ আদর্শ সকল আমাদের সমক্ষে আসিতেছে, সমুদয় দেখিতেছি শুনিতেছি, আলোচনা করিতেছি, প্রশংসা করিতেছি, কিন্তু নিজেরা সেই পূর্ব্বকার হীন ও মলিন ভাব লইয়াই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতেছি। দিন দিন যে সকল উচ্চ উচ্চ সত্য রসনাতে প্রকাশ পাইতেছে, ও কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, তাহার দুইটী কার্য্যে পরিণত হইলে জীবনের অবস্থা ফিরিয়া যায়, কিন্তু সে চেষ্টা আমাদের আসিতেছে না। এই ঘোর ব্যাধিতে আমাদিগকে অন্তঃসার-বিহীন করিয়া ফেলিতেছে। তুমি আমাদিগকে এই ব্যাধি হইতে রক্ষা কর, যেন আমরা বিনীত, ব্যাকুল, ও ভগ্ন-মন লইয়া সত্যের নিকটবর্ত্তী হইতে পারি এবং প্রাণপণে তাহা সাধন করিতে সচেষ্ট হই। আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

শ্রদ্ধা ও অনুকরণ—ধর্ম্মজীবনে কোনও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলে যথাসাধ্য তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিবার জন্য যে আমরা দায়ী এ কথা আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই। লোকে যেমন দূর হইতে একটী উৎকৃষ্ট ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার প্রশংসা করে, এবং পরক্ষণে তাহা ভুলিয়া বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হয়, সেই ক্ষণিক আনন্দ ও প্রশংসার অতিরিক্ত তাহাদের করিবার কিছু থাকে না, সেইরূপ আমরাও অনেক সময় মহাজনগণের চরিত্র আলোচনা করি, যেন ক্ষণিক আনন্দ লাভ করা ও প্রশংসা করার অতিরিক্ত আমাদের করিবার কিছু নাই। বক্তা উজ্জ্বল বর্ণে চৈতন্যের প্রেম, যীশুর বিশ্বাস, মহম্মদের দাস্যভাব, বুদ্ধের বৈরাগ্য প্রভৃতির ছবি চিত্রিত করিলেন, শ্রোতাগণ পুলকিত হইয়া বলিলেন—"বাঃ কি সুন্দর ছবি!" এইখানেই যেন সকল দায়িত্ব পর্য্যবসিত হইয়া গেল। তৎপরে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হইলেন; কাহারই আর ভাবিবার বা করিবার কিছু রহিল না। আমরা যেন অনেকটা এইরূপ ভাবে মহাজনদিগের চরিত্রের আলোচনা করিতেছি। ব্রাহ্মগণ যেন জগতের সমুদায় মহাজনগণের মুরুব্বি (patron) হইয়া বসিয়াছেন। নিজেরা এক উচ্চস্থানে বসিয়া ইহাঁদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ দৃষ্টি করিয়া ইহাঁদের গুণাবলী স্বীকার করতঃ জগতের নিকট আপনাদের উদারতার পরিচয় দিতেছেন।

এই এক প্রকার ভাব আর বিনীত শিষ্যদের আর এক প্রকার ভাব। বিনয়ে অবনত হইয়া ইহাঁদের গুণাবলী স্মরণ করিতেছি, এবং প্রাণপণে ঐ বিশ্বাস, বৈরাগ্য প্রেম প্রভৃতি জীবনে লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমাদের মধ্যে এই বিনয়ের অভাব বড়ই লক্ষ্য করিতেছি। কি এক প্রকার অহমিকার উষ্মা যেন আমাদের সকল কার্য্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে অসার ও প্রেমবিহীন করিয়া দিতেছে। আত্ম-পরীক্ষা ও অনুতাপ হৃদয়ে জাগ্রত থাকিলে মানবের মুখে যে বিনয়ের ছায়া পড়ে ব্রাহ্ম-মুখে সেই বিনয়ের ছায়া দেখিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। আত্ম-পরীক্ষা ও অনুতাপে যাহাদের হৃদয় পূর্ণ থাকে, তাহারা পরদোষ চর্চ্চাতে অধিক সময় দিতে পারে না। এই একটী সংকেতের দ্বারা আমরা সর্ব্বদাই আপনাদিগকে পরীক্ষা করিতে পারি। যদি প্রত্যেকে আপনাকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন করি,—"আমরা দশজনে একত্র হইলে নিজ নিজ জীবনের দুর্গতির কথা অধিক হয় কি পর-দোষ কীর্ত্তন অধিক হয়?" তাহা হইলেই বুঝিতে পারি স্রোত কোন দিকে বহিতেছে। আমরা সকলে ঈশ্বর-চরণে এই প্রার্থনা করি যে তিনি আমাদের বিনয় ও ব্যাকুলতাকে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখুন।

গুণত্রয়—আমাদের দেশে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন প্রকার গুণকে দার্শনিক পণ্ডিতেরা কল্পনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে তমোগুণ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

তম—অন্ধকার, যে ভাবের দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে। ইহার ধর্ম্ম মোহ। যে সকল মানুষ তমোভাবাপন্ন তাহারা স্থূল ইন্দ্রিয়ের অতীত কিছু বুঝিতে পারে না; স্থূল সুখের অতিরিক্ত কিছু জানে না; স্থূল পদার্থ ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় লইয়াই বাস করে, আসক্তিতে অন্ধপ্রায় হইয়া আবদ্ধ থাকে, ইন্দ্রিয় সুখের বিষয়েতেই মুগ্ধ থাকে। এই হইল তমোগুণের কার্য্য।

রজোগুণের ধর্ম্ম অহং বুদ্ধি। রজোগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তির কার্য্যে উৎসাহ এবং অহং প্রাধান্য প্রকাশ পায়। মানুষ তম হইতে রজোগুণের মধ্যে যখন প্রবেশ করে,তখন তাহার সকল কার্য্যেই অহং ভাব প্রকাশ পায়। বাহিরের জাঁক জমক, আমি সব করিতেছি, কেবল এই ভাবে পরিপূর্ণ। এই গুণে প্রবেশ করিলে বুদ্ধি কিছু খোলে, মানুষ কিছু উপরে উঠিয়া আসে।

কিন্তু ইহা হইতে প্রধান সত্ত্বগুণ। ইহার ধর্ম্ম পবিত্রতা, নিষ্ঠা। এই গুণসম্পন্ন লোক স্বার্থবিরহিত, সর্ব্বদা মঙ্গলভাবে পূর্ণ। নিজের সুখ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া অপরের মঙ্গল সাধন করা তাঁহার স্বভাব। তিনি ধর্ম্ম করেন, কোন স্বার্থের জন্য নহে, তাহাতে তাঁহার আমিত্ব নাই, তাঁহার সকলি ঈশ্বরার্থে।

এই যে তিন প্রকার গুণের কথা বলা হইল, ইহার প্রথমটি তম,—এই তম মানুষের জ্ঞানকে আবৃত করে, মানুষকে ইন্দ্রিয়-সুখে মগ্ন করে এবং সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে যে দূষিত প্রবৃত্তিরূপ বাষ্প উত্থিত হয় তাহাতে মানবাত্মাকে অন্ধ করিয়া রাখে। তাহাকে ইন্দ্রিয়ের অতীত কোন বিষয় ভাবিতে দেয় না, পবিত্র বিষয় চিন্তা করিতে দেয় না; ধর্ম্ম করিতে দেয় না, ইহা নিকৃষ্টাবস্থা।

ইহার পর লৌকিক ক্রিয়া কর্ম্মে যাহারা লিপ্ত, যাহারা কর্ম্মফল কামনায় ধর্ম্মের কার্য্য করে, বাহিরের কার্য্য ও অনুষ্ঠান করে এবং সকল কাজেই অহং বুদ্ধি প্রবল থাকে, তাহারাও কিছু ভাল। ইহা রজোগুণের কার্য্য।

কিন্তু ইহার পর সত্ত্বগুণ, ব্রহ্মদর্শনের অবস্থা। ইহাতে কর্ম্ম থাকে কিন্তু কর্ম্মফলের কামনা থাকে না, লৌকিক ক্রিয়া থাকে কিন্তু মন তাঁহার জন্যই ব্যাকুল হয়। সর্ব্ব প্রকারের স্বার্থ হিংসা, দ্বেষ বিলুপ্ত হয়, প্রেমে হৃদয় পূর্ণ হয়, তাঁহাতেই চিত্ত নিমগ্ন থাকে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই অবস্থা না পাওয়া যায় ততক্ষণ ধর্ম্মের বিমল সুখ পাওয়া যায় না। যখন বাসনা যায়, বাহিরের ক্রিয়া কলাপ যায়, নিঃস্বার্থ ভাবে তাঁহার পূজার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়, তখনই বিমলানন্দ, সুখ পাওয়া যায়।

নীরব সাধন—নির্জ্জন বনে একাকী একটী গৃহে বসিয়া রহিয়াছি, বাহিরে সবেগে এক পসলা বৃষ্টি হইতেছে। ঝিমির ঝিমির ঝিম, বৃষ্টি ধারা তরুশিরে পড়িতেছে, পত্রে পত্রে পড়িতেছে, টপ টপ বৃক্ষতলে ঝরিতেছে. এক ধারা না পড়িতে আর এক ধারা আসিতেছে. তরু পত্র-গুলি ধারার আঘাতে নত হইয়া পড়িতেছে. যেন পরম সুখে সেই সুস্নিগ্ধ ধারা সম্ভোগ করিতেছে! অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ঐ সকল তরুপত্র প্রখর তাপে ম্লান ও ধূলিতে সমাচ্ছন্ন ছিল, আর অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে কি পরিবর্ত্তন! তরুপত্রে সহস্র ধারা পড়িতেছে দেখিয়া ও মনে সুখ হইতেছে. যেন বৃক্ষের সঙ্গে মাথা পাতিয়া তাহা নিজ মস্তকে লইতেছি। মনে প্রশ্ন উদিত হইল বৃক্ষটীর প্রতি প্রভুর এত করুণা কেন? সে কি করিয়াছে যে এত অনুগ্রহ পাইতেছে। মনেই উত্তর হইল—বৃক্ষ ত এই অনুগ্রহ পাইবারই উপযুক্ত। বৃক্ষ কথা বলে না, আমাদের ন্যায় লম্বা লম্বা প্রার্থনা করে না. ঈশ্বর চরণে বড় বড় সংকল্প ও বড় বড় প্রতিজ্ঞা জানায় না; কিন্তু নিঃশব্দে তাঁহার বিধি পূর্ণ করিতেছে; বৃক্ষ জীবনের যে কার্য্য তাহা নীরবে সাধন করিতেছে; সুতরাং সুসময়ে তাঁহার কৃপা বারিও পাইতেছে। আমরা ও যদি নীরবে আমাদের জীবনের বিধিকে পূর্ণ করিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে সুসময়ে তাঁহার সাহায্য পাইতে পারি। কিন্তু ভাবিয়া দেখি আমাদের অনেকের প্রকৃতি অতিশয় অসার. যদি মনে আকাঙ্ক্ষা করি একগুণ, করিব করিব বলিয়া হাঁক ডাক করি দশগুণ। কার্য্য করিবার পূর্ব্বেই গগন-মেদিনী ফাটাইয়া তুলি। ফলে কার্য্য অল্পই হয়। নীরব সাধনের এক প্রকার সৌন্দর্য্য আছে, এক প্রকার গাম্ভীর্য্য আছে, এক প্রকার প্রভাব আছে। ঈশ্বর করুন আমরা দিন দিন যেন তাহা অধিক পরিমাণে অনুভব করিতে পারি।

ঈশ্বরে আশান্বিত হও—সময়ে সময়ে পরমেশ্বরের বিধিপালন করিতে গিয়া আমাদের মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, যেন নিরাশ্রয় হইয়া পড়ি। তখন এরূপ মনে হয় যেন ঈশ্বর সাহায্য করিতেছেন না। বিপদের উপর বিপদ যাইতেছে, চারিদিক অন্ধকারময়; নিরাশা আসিয়া প্রাণকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে, চেষ্টা করিয়াও কার্য্যে ফল লাভ করিতে পারি না। এই অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য নিজে যে সকল উপায় অবলম্বন করিতেছি, সকলই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। একদিকে যখন এরূপ অবসন্নতা এবং কার্য্যে ফলহীনতা, তখন আবার চারিদিকে লোকের অবিশ্বাস। তাহারা আমার অবস্থা দেখিয়া বলে "তুমি যার উপর নির্ভর করিয়াছিলে, দেখ সে কিছু নয়।" এসময় মানুষের মন নিরাশ হইয়া যায়। এসময় যদি মনকে বলি "Hope thou in the Lord" তুমি ঈশ্বরে আশান্বিত হও, যদি তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া চলি, তাঁহাকে আমার করিতে পারি, তবেই মঙ্গল। বিপদ আসিয়াছে তাহাতে কি? তুমি আশান্বিত হও। দুর্দ্দিন আসিয়াছে, তাহাতে তুমি ভীত হইও না আশান্বিত হও। কৃষক যেমন বীজ বপন করিয়া আশা করে, ফল ফলিবেই, বিজ্ঞানবিৎ যেমন আশা করেন তাঁহার পরীক্ষায় ফল ফলিবেই, সেইরূপ ধর্ম্ম জগতেও

আশা চাই। তুমি তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আশান্বিত হও। তাঁহাকে মঙ্গলময় বিধাতা জানিয়া, তাঁহাকে বিপদের সহায় জানিয়া, তাঁহাকে পরিত্রাতা ও প্রেমের আধার জানিয়া আশান্বিত হও। তুমি ফলাফলের দিকে কেন দৃষ্টি কর? তুমি কতটুকু জানিতে পার যে ফলাফল দেখিবে? অনেকে নিষ্ফল হইয়াছে তাহাতে কি? তুমি আশা কর। আশা কর যে একজন আছেন; এমন একজন আছেন যিনি মানবের আশ্রয় স্থল; আশা কর একজন কর্ত্তা আছেন; এই আশা করিয়া তাঁহার বিধি পালন কর। সত্যকে আলিঙ্গন কর, পাপকে পরিত্যাগ কর, অবিশ্বাস দূর কর এবং তাঁহার উপর আশা স্থাপন কর। ফলের জন্য ভাবিও না, তিনি তাহা দিবেন। ঈশ্বর করুন, আমরা তাঁহার বিধি পালন করিতে সক্ষম হই।

খাসিয়া মিশন—কিছু দিন পূর্ব্বে খাসিয়া মিশনের কার্য্যবিবরণ সম্বন্ধে "খাসিয়া জাতি ও খাসিয়া মিশন" নামে এক খানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। খাসিয়া জাতি অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের মধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছে। তাহাদের কোনও ধর্ম্ম, ধর্ম্মশাস্ত্র বা ধর্ম্ম-শিক্ষক নাই। রোগ বা বিপদের সময় স্বার্থানুরোধে তাহারা নানা প্রকার উপদেবতার পূজা করিয়া থাকে। পড়িবার কোনও পুস্তক তাহাদের ছিল না, লিখিবার কোনও ভাষাও তাহারা জানিত না। এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে তাহাদের অজ্ঞ অবস্থার কথা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাহাদের এই অবস্থা ক্রমে ক্রমে অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ খাসিয়া পাহাড়ে আসিয়া নানা প্রকারে তাহাদের উন্নতির জন্য কার্য্য করিয়াছেন। খাসিয়া ভাষায় ইংরাজী অক্ষর প্রবর্ত্তিত করিয়া কয়েক খানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, নানা স্থানে পাঠশালা স্থাপন করিয়া খাসিয়াদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, ঔষধালয় খুলিয়া তাহাদের রোগের চিকিৎসার উপায় করিয়াছেন এবং অনেক লোককে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। কিন্তু সরল প্রকৃতি খাসিয়াগণ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ত্রিত্ববাদ বুঝিতে না পারিয়া উহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছে না। তাহারা উপদেবতার পূজা করে বটে, কিন্তু তাহারা সর্ব্বদাই স্বীকার করে যে একমাত্র ঈশ্বরই সকলের স্রষ্টা, পাতা ও পরিত্রাতা। তাই ব্রাহ্মধর্ম্মের মতের সঙ্গে তাহাদের হৃদয়ের সম্পূর্ণ সহানুভূতি। পরমেশ্বরের কৃপায় অতি আশ্চর্য্য কৌশলে খাসিয়া পাহাড়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছে এবং পাঁচ বৎসরের মধ্যে অল্পে অল্পে তাহা তাহাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইতেছে। খৃষ্টীয়ানদিগের ন্যায় আমাদের অর্থবল এবং কার্য্য করিবার লোক নাই; তথাপি আশাতীত ভাবে এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র মিশন উন্নতি লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে একজন মাত্র কার্য্য করিবার লোক ছিলেন, এক্ষণে অপর তিন জন (একজন বাঙ্গালী এবং দুই জন খাসিয়া) তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। কোনও খাসিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিলে তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে বেতন প্রদান করা হইয়া থাকে। যে দুই জন খাসিয়া বন্ধু খাসিয়া মিশনের কার্য্য করিতে আসিয়াছেন তাঁহারা নানা প্রকার অভাব ও অসুবিধার মধ্যে নিঃস্বার্থ ভাবে পরমেশ্বরের নামে কার্য্য করিতেছেন। খাসিয়া ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে পাঁচ খানি পুস্তক রচিত হইয়াছে। ছয় স্থানে ছয়টী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। তিন স্থানের খাসিয়া বন্ধুগণ আপনারাই আপনাদের সমাজের কার্য্য চালাইতেছেন। একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহাতে বালকবালিকা এবং যুবাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেক রোগী তথা হইতে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ঔষধাদি পাইতেছে। এতদ্ব্যতীত বালকবালিকাদিগের জন্য একটী ক্ষুদ্র নৈতিক বিদ্যালয় খুলিয়া তাহা হইতে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। স্থানে স্থানে অনেকগুলি পুরুষ ও রমণী ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং অন্যান্য অনেকে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। পাহাড়ের নানা স্থানের লোক এক বাক্যে স্বীকার করিতেছে যে ব্রাহ্মধর্ম্মই একমাত্র পরিত্রাণ-প্রদ সত্য ধর্ম্ম। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে প্রভু পরমেশ্বরের কৃপা অবতীর্ণ হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে খাসিয়া মিশনকে কেমন সবল ও পরিপুষ্ট করিয়াছে।

নানা ভাবে খাসিয়া মিশনের উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু অর্থাভাবে অনেক সময় আশানুরূপ কার্য্য হইতে পারিতেছে না। চেরাপুঞ্জিতে একটী সমাজ মন্দিরের নিতান্ত প্রয়োজন। যে গৃহে উপাসনাদি হয়, তাহাতে অধিক লোকের স্থান হয় না। এই জন্য অর্থের অভাবে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। যে প্রচার-আশ্রম নির্ম্মিত হইতেছে তাহারও নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইতে পারিতেছে না। যাহারা খাসিয়া মিশনের কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও অনেক অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি প্রচার, একটী চিকিৎসালয় গৃহ নির্ম্মাণ এবং নূতন ২।৩টী সমাজ গৃহ নির্ম্মাণের ও বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। খাসিয়া জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য সুদূরবর্ত্তী ইংলণ্ড হইতে খৃষ্টীয়ানগণ কত প্রকারেই সাহায্য করিতেছেন! আমাদের প্রিয় ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদেরই স্বদেশীয় খাসিয়া জাতিকে দিবার জন্য যদি আমরা তাহার কিয়দংশ সাহায্যও করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলেও যথেষ্ট হইতে পারে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।

প্রাচীন নীতিশাস্ত্রে একটী মহোপদেশ এই আছে :—

"ধর্ম্মংশনৈঃসঞ্চিনুয়াৎ বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।"

অর্থ—পুত্তিকারা যেরূপ ধীরে ধীরে বল্মীক নির্ম্মাণ করে সেইরূপ ধীরে ধীরে ধর্ম্মকে সঞ্চয় করিবে। মানব-চরিত্র অতি

ধীরে ধীরেই গঠিত হইয়া থাকে। অনেক সংগ্রাম ও অনেক আশা নিরাশা ভোগ করার পরে ধর্ম্মজীবনে একটু উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। বিধাতার বিধিই এই প্রকার। কেহ কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, ব্রহ্মসঙ্গীতে আছে,—

" নিমেষে পাতকী যায় পুণ্যধামে "

সে কি তবে কল্পনা বা কবির অত্যুক্তি? চিরদিন ভক্ত-মুখে শুনিয়া আসিতেছি, প্রভু নিমেষের মধ্যে পাতকীকে তরাইয়া লইয়া থাকেন, তাহা কি বাক্যের অলঙ্কার মাত্র? তাহা বাক্যের অলঙ্কার মাত্র নহে। তাহার মধ্যে সত্য আছে। এক মুহূর্ত্তে পাপীর মন পাপ-পথ পরিত্যাগ করিয়া ফিরিতে পারে; এক মুহূর্ত্তে মোহনিদ্রাভিভূত মানবের নিদ্রা ভাঙ্গিতে পারে; এক মুহূর্ত্তে মানুষের আকাঙ্ক্ষা সংসার হইতে ফিরিয়া ঈশ্বরমুখীন হইতে পারে। বহুসংখ্যক লোকের জীবনে এ কথার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সাধুজনের সঙ্গে গিয়া বা কোনও একটা বিপদে বা কোনও একটা আকস্মিক ঘটনাতে পড়িয়া তাহাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্ত ইতি-বৃত্তে অনেক পাওয়া গিয়াছে। মহাত্মা বুদ্ধ একদিন স্বীয় পিতার রাজপুরী হইতে নির্গত হইবার সময়ে জরামৃত্যুর ছবি দেখিয়া হঠাৎ বৈরাগ্যভাবে পূর্ণ হইয়াছিলেন। সেণ্ট ডামস্কস্ নগরাভিমুখে যাইবার সময় বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাতের মধ্যে পড়িয়া হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। লালাবাবু সন্ধ্যাকালে একটী সামান্ত স্ত্রীলোকের একটী কথা শুনিয়া জন্মের মত ফকীর হইয়াছিলেন। লুথার স্বীয় সমক্ষে স্বীয় বন্ধুকে বজ্রাঘাতে হত হইতে দেখিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শ্মশানে শবদাহ করিতে গিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। এইরূপ অনুসন্ধান করিলে হঠাৎ হৃদয় পরিবর্ত্তনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং "নিমেষে পাতকী যায় পুণ্য-ধামে" এ কথাটা সম্পূর্ণ অলীক বা কবির কল্পনা প্রসূত নহে।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটী কথা আছে। মানব-হৃদয় এক মুহূর্ত্তে ফিরিতে পারে, কিন্তু পুণ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও ধর্ম্ম জীবনকে গঠন করা একদিনের কর্ম্ম নহে, তাহা পুত্তিকা-দিগের বল্মীক নির্ম্মাণের ন্যায় শ্রমসাধ্য ও কাল সাপেক্ষ। এক মুহূর্ত্তে একজনের পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়া পুণ্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষার উদয় হইতে পারে, কিন্তু পাপ-পথকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া পুণ্যপথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া একদিনের কার্য্য নহে। ধর্ম্মজীবন গঠনের চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হইলেই আত্ম-নিগ্রহ করার প্রয়োজন হয়। আত্মনিগ্রহের প্রয়াস উপস্থিত হইলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অভ্যাস-শৃঙ্খল সকল শৃঙ্খল অপেক্ষা দৃঢ়। যে ব্যক্তি বহুদিন কোনও প্রবৃত্তি বিশেষের চরিতার্থতাতে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহার পক্ষে সেই প্রবৃত্তি বিশেষের দাসত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা বড় সহজ নহে। যখন সে সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকে দমন করিতে চাহিতেছে এবং সে জন্য কাতর অন্তরে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে, তখনও দেখা যায় যে, সে বার বার সেই পুরাতন শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইতে থাকে; তাহার পুরাতন প্রবৃত্তি প্রতিজ্ঞার রজ্জু ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাহাকে পুরাতন দুর্ব্বলতার মধ্যে পতিত করিতে থাকে। ব্যাকুল ও মুক্তি-পিপাসু আত্মার পক্ষে এই অবস্থা অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক। মন স্বর্গের পবিত্র বায়ুতে বিচরণ করিতে চাহিতেছে, কিন্তু রক্তমাংসের দুর্ব্বলতা তাহাকে বার বার কর্দ্দমে বিলুণ্ঠিত করিতেছে। এইরূপে বার বার প্রতিজ্ঞা, বার বার প্রার্থনা করিয়াও মানুষ যখন দেখিতে পায় যে তথাপি বার বার পতিত হইতেছে, তখন তাহার প্রার্থনার উপকারিতা বিষয়ে সন্দিহান হইবার সম্ভাবনা। এইরূপে অনেক লোক প্রার্থনাকে ও পরিশেষে ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়াছে।

একবার শোনা গেল যে একজন অতিশয় দুষ্ক্রিয়াম্বিত ছিলেন, হঠাৎ ব্রহ্মোৎসবে যোগ দিয়া তাঁহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইল। প্রথম উদ্যমে দেখা গেল যে এক সময়ে যেমন তাঁহার দুষ্ক্রিয়ার আতিশয্য ছিল, ধর্ম্মজীবনের প্রার্থী হইয়া তেমনি তাঁহার বৈরাগ্যের আতিশয্য হইল। তিনি সাধনের কঠোর নিয়মের দ্বারা আপনাকে শাসন করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রাণ শান্তিহীন হইয়া পড়িল। তাঁহার বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা দেখিয়া লোকে স্তব্ধ হইয়া গেল। কিন্তু কিছুদিন পরে হঠাৎ শুনিতে পাওয়া গেল যে তিনি আবার সেই পুরাতন দুষ্ক্রিয়া সকলে লিপ্ত হইয়াছেন। লোকে বিস্মিত ও অবাক হইয়া গেল। সকলেই জিজ্ঞাসা করে লোকটা আবার পতিত হইল কেন? ভিতরকার কারণ এই সে ব্যক্তি বাহিরে যখন ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য সংগ্রাম করিতেছিল, তখনও তাহার পুরাতন শত্রুকুলের হাত হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পায় নাই। লোকে না জানুক তখনও গোপনে সে বার বার পুরাতন প্রলোভনের নিকট পরাজিত হইতেছিল। বার বার প্রতিজ্ঞা ও প্রার্থনার দ্বারা আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইতেছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। অবশেষে প্রার্থনার প্রতি অবিশ্বাস ও নিজের প্রতি নিরাশার উদয় হইল। সে ভাবিল আর সংগ্রাম করা বিফল, তাহাতে কেবল জীবন তিক্ত হইয়া যায়। ঈশ্বর যদিও থাকেন, মানবের প্রার্থনা শ্রবণ করেন না। এই ভাবিয়া সে আবার পুরাতন স্রোতে গা ভাসাইয়া দিল।

আমাদের সকলেরই জীবনে এইরূপ বার বার প্রতিজ্ঞা ও বার বার পতন ঘটিতে পারে, তখন আমাদিগকে মনে করিতে হইবে—"বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ" পুত্তিকারা যেরূপ ধীরে ধীরে বল্মীক নির্ম্মাণ করে সেইরূপ ধীরে ধীরে মানবচরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। নিরাশ হইলে চলিবে না। ধর্ম্মজীবনের যে এই ক্রমোন্নতি ইহা বিধাতার বিধি। যেমন দৈহিক বল একদিনে লাভ করা যায় না, নিয়মিত রূপ অন্ন পান গ্রহণ করিতে করিতে কালে বলের সঞ্চার হয়, সেইরূপ মানসিক বলও একদিনে লাভ করা যায় না। মানসিক বল লাভের উপায় সকল অবলম্বন করিতে করিতে কালে বলের সঞ্চার হইয়া থাকে। জগদীশ্বর যদি পুণ্যকে এইরূপ আয়াস-সাধ্য না করিতেন তাহা হইলে আমাদের নিকট পুণ্যের মূল্য থাকিত না। ঘোর পাতকী যদি এক লম্ফে সপ্তম স্বর্গে উঠিতে পারিত, তাহা হইলে মানবকুলে স্বর্গরাজ্যের আদর থাকিত না মনুষ্য-জীবনের সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। যাহা একদিনে ভাঙ্গা যায়,

তাহা গড়িতে দশ দিন লাগে। ইহা আমাদিগের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, কারণ এইরূপ ব্যবস্থা থাকাতেই আমরা ভাঙ্গিতে ভীত হই ও গড়িতে প্রয়াস পাই।

ধর্ম্মজগতে দুই শ্রেণীর লোক। *

বাইবেলের এক স্থানে এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে— একদিন এক ব্যক্তি আসিয়া যীশুকে জিজ্ঞাসা করিল, "হে গুরো, পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে?" যীশু তদুত্তরে বলিলেন—"সকল প্রকার নীতি পালন কর এবং পিতা মাতাকে ভক্তি কর।" সে বলিল— "যৌবনকাল হইতে আমি ঐ সকল নীতি পালন করিয়া আসিতেছি।" তখন যীশু পুনর্ব্বার বলিলেন—"এক বিষয়ে তোমার অভাব রহিয়াছে দেখিতেছি, যাও তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, এবং তোমার যে সকল সম্পত্তি আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ কর, তাহা হইলে স্বর্গীয় ধনলাভ করিতে পারিবে। যাও, ফিরিয়া আসিয়া আমার অনুসরণ কর।" ঐ ব্যক্তির অনেক অর্থসম্পত্তি ছিল এবং সে তাহা ছাড়িতে প্রস্তুত ছিল না, সুতরাং সে যীশুর বাক্য শুনিয়া দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল। উক্ত বাইবেলের আর এক স্থানে সাধু দায়ুদ নিম্নলিখিত বাক্যগুলি বলিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে—"আমি মেষ, প্রভু পরমেশ্বর আমার মেষপালক। আমার কিছুরই অভাব হইবে না। তিনি আমাকে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে শয়ন করিয়া রাখিবেন, তিনি আমাকে নির্ম্মল নির্ঝরিণীর নিকটে লইয়া যাইবেন। যদি মৃত্যুর ছায়াচ্ছন্ন উপত্যকার মধ্যেও বিচরণ করি, তথাপিও আমি ভীত হইব না। কারণ, হে প্রভু, তুমি আমার সঙ্গে রহিয়াছ। তোমার শাসন দণ্ড আমাকে রক্ষা করিবে। তোমার করুণা ও মঙ্গলভাব চিরজীবন আমার অনুসরণ করিবে। আমি চিরকাল প্রভুর গৃহে বাস করিতে পাইব।" বাইবেলের দুই স্থান হইতে দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করা হইল। ইহা দ্বারা ধর্ম্মজীবনের অতি গভীর দুইটী ভাব আমরা বুঝিতে পারি। পূর্ব্বোক্ত দুই ব্যক্তিই ধর্ম্মপিপাসু, উভয়েই পরমেশ্বরকে লাভ করিতে চান। কিন্তু প্রথম ব্যক্তি পরমেশ্বরকে লাভ করিবার জন্য আপনার পার্থিব ধন মান ছাড়িতে প্রস্তুত নন। আমার সুখ সম্পদ সব পূর্ণ মাত্রায় থাকুক, আমার মস্তকের একটী কেশও না বিচ্যুত হয়, অথচ পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারি— যদি এমন হয়, তবে তাঁহাকে চাই। আর যদি বল, এ সকল ছাড়িতে হইবে, তবে তাঁহাকে পাইব,তাহা হইলে বলি, এত দুঃখ ক্লেশ ও অভাবের মধ্যে তাঁহাকে লইয়া কি লাভ? তাহার মনের এইরূপ ভাব। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির ভাব সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। তিনি আপনার প্রভুকে পাইবার জন্য আপনার সুখ দুঃখ, স্বার্থ সম্পদ সকল ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিলেন—"তুমি আমার জীবনের নেতা, আমি তোমার অনুগত দাস। মেষ যেমন আপনার প্রভুর অনুসরণ করে, আমি সেইরূপে তোমার অনুসরণ করিব। কোথায় ভাল খাদ্যদ্রব্য আছে, কোথায় উপযুক্ত পানীয় আছে, কোথায় আরামদায়ক বিশ্রামস্থান আছে মেষ ত তাহা জানে না। তাহার প্রভুই সে সকল জানেন, এই জন্য সে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার অনুগত হইয়া তাঁহারই অনুসরণ করে। কোনও বিপদজনক স্থানে গমন করিলেও সে ভীত হয় না, কারণ সে জানে যে তাহার প্রভু যখন তাহার সঙ্গে রহিয়াছেন, তখন তাহার সকল ভার ত তাহার প্রভুরই হস্তে। সেইরূপ আমি কি খাইব, কি পরিব, কোথায় থাকিব তাহা কি আমি জানি? আমার প্রভু আমার সে সকল ভার ত তোমার উপর। বিপদ, দুঃখ পরীক্ষা বা অন্ধকার আসে, তাহাতে আমি ভীত হইব কেন? তুমিত চিরদিন আমার সঙ্গে রহিয়াছ, তোমার করুণা,তোমার মঙ্গলভাব সর্ব্বদাই ত আমার জীবনের সঙ্গেই রহিয়াছে। আমি তোমারই, যেখানে লইয়া যাইবে যাও, যাহা করিবে কর, আমি তোমাকে পাইবার জন্য, তোমার ইচ্ছাকে জয়যুক্ত করিবার জন্য সব করিতে প্রস্তুত।

ধর্ম্মজগতে এইরূপ দুই শ্রেণীর লোক আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই। মানুষ যখন পরমেশ্বরকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া তাঁহার দ্বারে আসে,তখন সে তাঁহাকে সত্যসত্যই চায় কি না, ইহা তিনি পরীক্ষা করিতে চান। প্রাণের কাণে কাণে তিনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন—"যদি তুমি আমাকে চাও, তবে আর কিছুই চাহিতে পারিবে না, যদি আমার হইবে, তবে আর কাহারও হইতে পারিবে না; যদি আমাকে প্রাণ দিবে, তবে আর কাহাকেও প্রাণ দিতে পারিবে না।" এই কথা শুনিয়া এক শ্রেণীর লোকের প্রাণ স্তম্ভিত হইয়া যায়। তাহারা মনে করে দুই দিক থাকিবে সেই ত ভাল, এ আবার কি? তাহারা অনেক ভাবিয়া, চিন্তা করিয়া, তৌলদণ্ডের এক দিকে পরমেশ্বরকে রাখিয়া অন্য দিকে সংসারের সুখ সম্পদ প্রভৃতি রাখিয়া দেখে। তাহাদের নিকট সংসারের দিকটাই অধিক ভারী হয়। তখন তাহারা আর হইল না মনে করিয়া ক্ষান্ত হয়, ধর্ম্মজীবনের পথে আর অগ্রসর হইতে পারে না। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকে যখন আপনার প্রাণের মধ্যে পরমেশ্বরের ঐ বাণী শুনিতে পান, তখন বলেন "হাঁ, সত্য সত্যই ত আমি তোমাকে চাই, তোমাকে পাইবার জন্য যাহা করিতে হইবে, আমি সে সকলে প্রস্তুত। যদি তুমি আমার সমস্ত প্রাণ চাও, তবে তাহা এখনই গ্রহণ কর। আর আর আমার যাহা আছে, সব তুমি লও। আমি কেবল মাত্র তোমাকে চাই। ধন মান আমি বুঝি না,সুখ সম্পদ আমি জানি না, দুঃখ ক্লেশেও আমি ভীত নই। আমি তোমাকে লাভ করিতে চাই। তোমার সঙ্গে থাকিলে আমার আর কি ভয়? তোমার উপরেই ত আমার সকল ভার। আমাকে যেখানে রাখিলে ভাল হয় সেইখানেই তুমি রাখিবে, যাহা করিলে মঙ্গল হয় তাহাই তুমি করিবে, যে পথে লইলে প্রকৃত কল্যাণ হয়, সেই পথে লইবে।" এইরূপ লোকেই বস্তুতঃ পরমেশ্বরকে লাভ করিতে চান এবং তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা যখন আপনার প্রাণের তৌলদণ্ডের এক

* কোনও মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

দিকে আপনার প্রাণের দেবতাকে বসান এবং অন্যদিকে সংসার ও তাহার সকল সুখ সম্পদকে রাখিয়া তুলনা করেন, তখন পরমেশ্বর যে দিকে তাহাই তাঁহাদের নিকট ভারী হয়। অপর দিককে তাঁহারা কিছু নয় বলিয়া মনে করেন। ভক্ত সধন এইরূপ ব্যাকুলাত্মাদিগের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন;—

"এক বুদকে কারণ চাতক নিত দুঃখ পাবে,
প্রাণ গয়ে সাগর মিলে, ফুণ কাম ন আবে।

চাতক এক বিন্দু জলের জন্য সর্ব্বদা কতই ক্লেশ পাইয়া থাকে; সাগরে কত জল রহিয়াছে তাহাতে তাহার কিছুই কাজ হয় না। আমাদের দেশে এরূপ প্রবাদ আছে যে চাতক বৃষ্টির জল ব্যতীত অন্য জল পান করে না। কত দিন সে এক বিন্দু জলের জন্য শুষ্ককণ্ঠে উৰ্দ্ধমুখ হইয়া প্রতীক্ষা করে। পৃথিবীতে কত জল রহিয়াছে, পিপাসায় তাহার প্রাণও বহির্গত-প্রায়, তথাপি সে সে জল পান করে না। তাহার নিকট পৃথিবীর সমস্ত জল থাকিয়াও যেন নাই। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলাত্মাদিগের অবস্থাও সেইরূপ। তাঁহাকে না পাইলে সংসারের শত সহস্র সুখে তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র শান্তি দিতে পারে না। সে সকল সুখ তাঁহাদের নিকট থাকিয়াও যেন নাই। তাঁহার জন্য তাঁহারা সকল ছাড়িতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

উপরে যে দুই শ্রেণীর লোকের বিষয় উল্লিখিত হইল, আমরা তাহার মধ্যে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত? আমরা কি পরমেশ্বরকে লাভ করিবার জন্য সকল ছাড়িতে প্রস্তুত হইয়াছি? তিনি যদি বলেন, "সকল স্বার্থ বলিদান করিলে তবে আমাকে পাইবে," তবে কি আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি "এই লও, প্রভু, আমার সব লও"? প্রাণের তৌলদণ্ডের এক-দিকে যদি তাঁহাকে এবং অন্য দিকে সকল সংসারকে রাখি, তবে কি তাঁহার দিক আমাদের অধিক ভারী বোধ হয়? পরমেশ্বর করুন আমরা প্রকৃত ভাবে তাঁহার হই এবং তাঁহাকে জীবনের সার করি।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধর্ম্মভাব।

১২ই মাঘ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রাচ্য ধর্ম্মে পাপ কাহাকে বলে? মোহ,—অনিত্যকে নিত্য বলাই পাপ। য়িহুদীদিগের পাপ বিদ্রোহ, ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধ কাজ। আমাদের মুক্তি জ্ঞানে; তাহাদের মুক্তি ঈশ্বরেচ্ছার অধীনতাতে। এই বিদ্রোহ নিবারণ করিয়া মানবকে ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত করাই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। এদেশের ঋষি বলেন—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎস্মৃতি-বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

"বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহাতে পুরুষের আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনার উৎপত্তি হয়, এবং কামনার পথে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলেই ক্রোধের সঞ্চার হয়; ক্রোধ হইলে মানুষের হিতাহিত বুদ্ধি লোপ পায়; হিতাহিত বুদ্ধির বিনাশ বশতঃ আত্ম-বিস্মৃতি উপস্থিত হয়; আত্ম-বিস্মৃতি হইতে বুদ্ধি নাশ; এবং বুদ্ধি নাশ হইলে সর্ব্বনাশ ঘটে।" ঋষিগণ বলেন, অজ্ঞানবশতঃ বিষয়ের, অনিত্য বস্তুর চিন্তা হইতে সকল অনর্থের উৎপত্তি। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে ঐ সকল অনিত্য বিষয়কে বিনাশের কারণ জানিয়া সেই সকল হইতে চিত্তের প্রত্যাহার কর এবং নিত্য বস্তুর ধ্যানে নিমগ্ন হও। তাহা হইলেই নিত্যবস্তু জানিবে এবং মুক্তিলাভ করিবে। য়িহুদীগণ বলেন মুসাদ্বারা যে আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে তাহা পালন করিলেই মুক্তি। খৃষ্টান বলেন যীশুর দ্বারা যে আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা পালন কর। তবেই দেখ, মানবের ব্যক্তিত্বজ্ঞান ও দায়িত্বজ্ঞান য়িহুদী ধর্ম্মের মূলে নিহিত রহিয়াছে। খৃষ্টীয়ধর্ম্ম য়িহুদীধর্ম্ম প্রসূত। ইহাতে ব্যক্তিত্বজ্ঞান আরও প্রস্ফুটিত করিয়াছে। মুসার ধর্ম্ম নিয়মে বরং স্বাধীনতা কিছু খর্ব্ব হইয়াছে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মে উহা সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত। দুই মহাপুরুষের দ্বারা খৃষ্টীয় জগতে এই ব্যক্তিত্বজ্ঞানের বহুল প্রচার হইয়াছে ১ম সেণ্ট পল, ২য় মার্টিন লুথার। মানবাত্মার যে মূল্য আছে, মহত্ত্ব আছে, যীশুর উক্তিতে এই ভাব থাকিলেও সেণ্ট পল এবং লুথার ইহা বিশেষ রূপে ব্যক্ত করেন। যীশু নিজে মানবাত্মার মহত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ কোনও এক বিশ্রাম দিনে শস্যের শীষ ভক্ষণ করিয়াছিল। য়িহুদীগণ ইহা দেখিয়া মুসার নিয়মের ব্যতিক্রম হইল বলিয়া যীশুর শিষ্যগণের প্রতি বিষম আক্রোশ করিতেছিল। তখন যীশু বলিলেন—"Sabbath is made for man and not man for the Sabhath." মানবের জন্যই বিশ্রাম দিন, কিন্তু বিশ্রাম দিনের জন্য মানব সৃষ্ট নহে। তাঁহার এই উক্তিতে মানবাত্মার মহত্ত্বই প্রকাশ পাইতেছে। তার পর যীশুর মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা জেমস্ খৃষ্টীয়মণ্ডলীভুক্ত হইলেন। সেখানে তাঁহার বিষম প্রতাপ হইয়া উঠিল। তিনি একজন নিষ্ঠাবান্ য়িহুদী ছিলেন। য়িহুদী ধর্ম্মের যাবতীয় নিয়ম পালনে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ। তিনি খৃষ্টীয়মণ্ডলী মধ্যে যাইয়াও য়িহুদীর ভাব পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। মণ্ডলী মধ্যে অনেকের মনে এইভাব মুদ্রিত করিলেন, যাঁহারা য়িহুদীর অনুষ্ঠান সমুদয় সম্পাদন করেন নাই, তাঁহারা খৃষ্টান হইতে পারিবেন না, তাঁহাদের মুক্তির আশা সুদূরপরাহত। অনেকে তাঁহার এই মতের সমর্থন করিলেন। তাঁহার একটী গণ্ডী গঠিত হইল। যখন তাঁহাদের মধ্যে এই অসত্য প্রবেশ করিল, তখন ধর্ম্মবীর বিশ্বাসী সেণ্টপল নিজ বিক্রম ধারণ করিলেন। তিনি এই অসত্যের সমর্থন করিলেন না। বিশ্বাসে মানুষ তরিয়া যায়, নিয়ম পালন কিছুই নয়—পল ভীমনাদে এই মহাসত্য ঘোষণা করিলেন। তিনি বলিলেন য়িহুদী হও আর জেণ্টাইল হও, তাহাতে কিছুই যায় আসেনা, তুমি য়িহুদী অনুষ্ঠান প্রতিপালন কর আর না কর, তাহাতে কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই—যদি তুমি বিশ্বাসী হও,

যদি সন্দেহের বিষম ঝড়ে আন্দোলিত সংসার-সমুদ্র মধ্যে বিশ্বাসের নিরাপদ বন্দর পাইয়া থাক, তাহা হইলে মুক্তি তোমার করতলে। এই মত প্রচার করিয়া তিনি সকল খৃষ্টীয় ও য়িহুদীদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া নিজের জীবনে ব্যক্তিত্বের (individualism) পরাক্রম দেখাইলেন। ইহার কয়েক শত বৎসর পরে লুথার আবার দুর্দ্দান্ত পোপের পরাধীনতারূপ নিগড় ভগ্ন করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিলেন। তার পর ক্রমাগত এই ব্যক্তিত্বের আগুণ জ্বলিতে লাগিল। সমস্ত ইউরোপ বিপ্লবময় হইয়া উঠিল। বর্ত্তমান সময়ে এই ব্যক্তিত্বভাব অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। "যে যার আপনার" এই ভাব ইউরোপে অত্যন্ত প্রবল। আমাদের দেশে জাতিভেদের প্রবল প্রতাপে ব্যক্তিত্বের প্রভাব নিতান্ত হীন। আমি কি খাইব, কিরূপ কাপড় পরিব, আমি শ্মশ্রু রাখিব কি না সমস্তই সমাজ নির্ণয় করিয়া দিবে। কিন্তু সে দেশে প্রত্যেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রতিবেশী কি করে, কি খায়, কেহ তাহার কোন সন্ধান রাখে না। তাহাদের প্রত্যেকের সুখ দুঃখের সহিত অপরের কোনও সম্বন্ধ নাই। তুমি নিজ গৃহে যথারুচি খাও বা অনাহারে থাক, তুমি যথেষ্ট পরিধেয় ব্যবহার কর অথবা নগ্ন গাত্রে দিনযাপন কর—কেহ সে সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না। এই স্বাধীনতার জন্য প্রত্যেকে আপনাকে ইচ্ছানুরূপ গঠন করিতে পারে। সে দেশে স্বাধীনতার ভাব এতই প্রবল যে, কাহারও অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে সে রাগ করে। আমি কি খাই, কি পরি, কিরূপ ভাবে দিন কাটাই, আমার সঙ্গতি আছে কি না, তোমার তাহা জানিবার প্রয়োজন কি? সেরূপ জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার কি? ইংরেজদের আবার জাত্যভিমান অত্যন্ত অধিক। ইহাদের ব্যক্তিত্ব এত প্রবল যে, ইহারা ভাই বোনেরও খবর লয় না। সে জন্য যে কত সামাজিক দুর্নীতি ও ক্লেশ হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। তাহারা প্রত্যেকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে সচেষ্ট। এই ব্যক্তিত্বের মাত্রা এখানে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, আবার সেখানকার চিন্তাশীল লোকেরা অন্য দিকে এতই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন যে তাঁহারা ব্যক্তিত্ব সমূলে বিনাশ করিয়া সামাজিকতা (socialism) প্রতিষ্ঠিত করিতে উৎসুক হইয়াছেন এবং state কে সমুদয় ক্ষমতা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

এই ব্যক্তিত্বের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব বোধের প্রাবল্য বশতঃ খৃষ্টীয়ধর্ম্ম নীতি-প্রধান হইয়াছে। এইজন্য খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ইতিহাসে এক মহাভাব পরিলক্ষিত হয়। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম জন্মগ্রহণ করিয়াই সমাজের পাপ ও দুর্নীতি সকল দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। শিশু হত্যার (infanticide) নিবারণ নর-পশু ক্রীড়ার (gladiator shows) দমন ও দাম্পত্য নীতির উন্নতি, এই সকল বিষয়ে সেই মুষ্টিমেয় খৃষ্টানগণ আশ্চর্য্য পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছেন। তৎকালে এতদ্দেশীয় রাজপুতগণের ন্যায় রোমীয়গণ শিশুদিগকে হত্যা করিত। বর্ত্তমান কালে ইংলণ্ডীয়গণ গৃহে গৃহে উষ্ণ জলে নিক্ষেপ করিয়া বিড়াল-শিশুদিগকে হত্যা করেন। তাঁহাদিগকে এই অন্যায় কার্য্যের বিষয় বলিলে তাঁহারা তজ্জন্য কিছু মাত্র দুঃখিত হন না, প্রত্যুত হাসিতে হাসিতে বলেন "সকলেই এইরূপ করে।" সকলেই এমন কি পৃথিবীর সমস্ত লোকে অনুষ্ঠান করিলেও যে অন্যায় কখনও ন্যায় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারেন না। রোমবাসিগণ বিড়াল শিশু বধের ন্যায় মানব শিশুকে বধ করিতেন। কেহ প্রতীকারের কথা বলিলে হয় ত ঐরূপই উত্তর দিতেন। প্রাচীন খৃষ্টীয়গণ এই কুপ্রথা রহিত করেন।

রোমদেশে ইহা অপেক্ষাও এই এক বীভৎসকাণ্ড প্রচলিত ছিল যে তথাকার ধনীগণ স্ব স্ব দাসবর্গকে হিংস্র পশুর সহিত যুদ্ধ করিতেপ্রবর্ত্তিত করিতেন। কখনও তাহাদের হস্তে অস্ত্র প্রদত্ত হইত, কখনও হতভাগ্যগণ নিরস্ত্রই এই সিংহ ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হইত। এই ব্যাপার দেখিবার জন্য ভদ্র বংশীয় সহস্র সহস্র পুরুষও রমণী একত্র হইতেন এবং যখন হিংস্র শ্বাপদকুল হতভাগ্য দাসদিগের দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিত তখন তাঁহারা করতালি ধ্বনি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। যথাকালে রোমদেশে এই ভীষণ কাণ্ডের অনুষ্ঠানও সেই সময়ের অপরাপর পাপ ও দুর্নীতি দূর করিবার জন্য ঈশ্বরের বিধানে খৃষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি হইল। কাজেই ঐ নিষ্ঠুর কার্য্য আর অনুষ্ঠিত হইবার সুবিধা পাইল না। একদিন রঙ্গস্থলে ঐরূপ ক্রীড়া হইতেছে, সহস্র সহস্র নরনারী একত্রিত হইয়াছেন, ক্রীড়া আরম্ভ হইতেছে মাত্র। হতভাগ্য দাসগণ সশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে এখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই, এমন সময়ে একজন সাধুপুরুষ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন "হাঁ হাঁ কর কি! কর কি! একপ ভীষণ নিষ্ঠুর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না।" এই বলিতে বলিতে তিনি তাহাদের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দর্শক পুরুষ ও মহিলাগণ বিরক্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, কি! একটা সামান্য সন্ন্যাসীর এত বড় সাধ্য যে সে আমাদের কৌতুক বন্ধ করে! এখনি উহার প্রাণনাশ কর।" তাহাদের এই আদেশ চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হইবা মাত্র একজন সেই সাধু পুরুষের বক্ষে ছুরিকা আঘাত করিল। যখন সাধু পুরুষ ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন, যখন তাঁহার বক্ষঃ হইতে রুধির ধারা প্রবাহিত হইয়া রঙ্গভূমির অঙ্গনকে রক্তাক্ত করিতে লাগিল, তখন তাহাদের চৈতন্য হইল, তাহারা বলিল "দেখ দেখি এই সাধু পুরুষ কে?" অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিল তিনি একজন ধার্ম্মিক মহাপুরুষ। যখন সকলে এই কথা জানিতে পারিল তখন লজ্জা ও অনুতাপ সকলের অন্তরকে অভিভূত করিল। সেই দিন হইতে আর সেই ভীষণ ক্রীড়ার কথা কেহ মুখেও আনিত না। এইরূপে একজন খৃষ্টীয় সাধু পুরুষের রক্তে এই বিষম দুর্নীতি রোমনগর হইতে বিধৌত হইল।

তৎকালে দাম্পত্য নীতিও অত্যন্ত শিথিল ছিল। প্রাচীন গ্রীসে হেটিরি নামে এক শ্রেণীর কুলটা স্ত্রীলোক ছিল; তাহারা সমাজে সম্মান পাইত। এমন কি সক্রেটীশের ন্যায়

একজন মহাজ্ঞানীও এই শ্রেণীর নারীগণের গৃহে গমন করিয়া নানাবিধ প্রসঙ্গ করিতেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম এই কুপ্রথার মূলেও কুঠারাঘাত করিয়াছে।

নীতির প্রাধান্য এবং দায়িত্ব জ্ঞানের প্রবলতা থাকাতে, ঈশ্বর মানবের বিবেকে প্রতিষ্ঠিত, এবং চরিত্র দ্বারা ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে, এই ভাব খৃষ্টধর্ম্মে উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভাব প্রবল থাকাতেই খৃষ্টীয় জগতে মানবের অকস্মাৎ জীবন পরিবর্ত্তন (sudden conversion) এবং মৃত্যু-শয্যায় পাপ স্বীকার (death-bed confession) যত দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যত্র তত দেখা যায় না। এদেশেও লালা বাবু প্রভৃতির দৃষ্টান্ত আছে সত্য, কিন্তু খৃষ্টীয় জগতেই এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক অধিক।

প্রাচ্য ভাবের অতিরিক্ততা জন্য যেমন তিনটী দোষের উৎপত্তি সেইরূপ প্রতীচ্য ভাবের আতিশয্য হইতেও তিনটী দোষ উৎপন্ন হইয়াছে। (১ম) ঈশ্বর কার্য্যের বিচারক, এই ভাব হইতে অতিরিক্ত কার্য্য-তৎপরতা। (২য়) বিষয় ঈশ্বর সেবার ক্ষেত্র, ইহা হইতে বিষয়-তৎপরতা। এবং (৩য়) অতিরিক্ত ব্যক্তিত্ব হইতে সমাজিক বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হইয়াছে।

যদি এই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবদ্বয় মিলিত হয়,—আত্ম-নিষ্ঠতার সহিত কার্য্য-তৎপরতা, বিষয় বিরাগের সহিত নরসেবা, এবং ব্যক্তিত্বের সহিত একতার সম্মিলন হয় তাহা হইলেই পূর্ণ ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ এই জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যকে একত্র মিলাইবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জীবনের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য বেদান্তের এক নূতন ভাষ্য করিলেন। তাহাতে এদেশীয় নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের মধ্যে পাশ্চাত্য ক্রিয়াশীল ঈশ্বরকে প্রবেশিত করিলেন। এদেশের যে ব্রহ্ম শব্দ তাহার অর্থ অব্যক্ত চৈতন্য, যাহা জগতের অতীত। এই জন্য ব্রহ্ম শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। ব্রহ্মের যে প্রকাশ তাহাকে এদেশীয়গণ ঈশ্বর বলেন। ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় নহেন। আর কিছু দিন পরে সমগ্র ভারতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর শব্দ একার্থ হইবে। ব্রাহ্মসমাজ কেবল আত্মতৃপ্ত উৎপন্ন করিবে না। এখানে সমস্ত সম্মিলিত হইবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন তাহা কি সম্ভব? পশ্চিমের ভাব কি এদেশে আনা যায়? আমি বলি বসরাই গোলাপ, ও কপি এসব ভারতে কিরূপে আসিয়াছে? আধ্যাত্মিক জগতেও naturalisation আছে। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যাইতেছে যে কর্ম্ম-প্রধান ইংলণ্ড দেশেও জর্ম্মণীর চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে এবং ইংলণ্ডের কর্ম্ম-তৎপরতা জর্ম্মণ দেশে ক্রমশই পরিব্যাপ্ত হইতেছে। পাশ্চাত্য ভাব এদেশে আসিবে। যাঁহারা নিজ নিজ জীবনে এই উভয় ভাবকে সম্মিলিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারাই প্রকৃত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সাধন করিতেছেন; আর যাঁহারা একাঙ্গের সাধনা করিতেছেন তাঁহারা পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। ভগবান্ করুন আমরা সকলে স্ব স্ব জীবনে এই সম্মিলিত ধর্ম্মভাব সাধন করিতে পারি।

রামমোহন রায়ের মহত্ত্ব।

(প্রাপ্ত)

যাঁহারা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে কিছুমাত্র জানেন, তাঁহাদের অনেকেই তাঁহার অসাধারণ মহত্ত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, অতি অল্প লোকেরই মনে এই মহত্ত্বের প্রকৃত পরিমাণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা স্থির ও সুস্পষ্ট ধারণা আছে। এরূপ হওয়াও কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহার মহত্ত্ব মানব মনের মহত্ত্ব ছিল, তাঁহার শক্তি আত্মার শক্তি ছিল, তাঁহার চরিত্রের বহিঃজ্যোতিঃ অন্তরের আলোকের আভা মাত্র ছিল। আত্মার মহত্ত্বের ওজন কে করিবে? আত্মার গভীরতার নির্দ্ধারণ কে করিবে? আত্মার আলোক কোন্ চক্ষু দেখিয়া শেষ করিতে পারে? এবং আত্মার নিষ্ঠতা কত ঘন ঘন আস্বাদনে অরুচিকর করিয়া তুলিতে পারে? এই সকল উৎকর্ষ যদিও মানবের সংকীর্ণতার ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হয়, তথাপি প্রকৃতপক্ষে, মানবের নহে, কিন্তু বিধাতা পুরুষেরই গুণাভাস মাত্র, এবং তজ্জন্য সর্ব্বদাই অনন্তের সংবাদ বহন করে বলিয়া এ সকল মানব জ্ঞানের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হয় না। সেই জন্য মহৎলোকের চরিত্র চিরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্ট চিত্রফলকের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যত বেশীক্ষণ এই চিত্র নিরীক্ষণ করা যায়, যত সূক্ষ্মরূপে ইহাকে দৃষ্টি করা যায়, ততই ইহার সৌন্দর্য্য চক্ষুর উপরে প্রকাশিত হইতে থাকে, এবং ততই যতটুকু সৌন্দর্য্য দেখা ও ভোগ করা যায়, তাহার অতীত আরো অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য যেন তাহাতে আছে, এরূপ মনে হয়, ক্রমে দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বে যাহা অদৃষ্ট ছিল তাহা দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয়, পূর্ব্বে যাহা অস্পষ্ট ছিল তাহা সুস্পষ্ট হয়, এবং এইরূপে ক্রমে সেই চিত্রের মধ্যে যেরূপ আছে বলিয়া পূর্ব্বে কল্পনাও করা যায় নাই, তাহা বিকশিত হইয়া উঠে এবং দর্শকের চিত্তকে সেই সামান্য তিন চারি ইঞ্চি পরিসর চিত্রের এই নিয়ত-বিকাশোন্মুখ সৌন্দর্য্যের মধ্যে একেবারে নিমগ্ন করিয়া দেয়। রামমোহন রায়ের চরিত্র সম্বন্ধে কি ঠিক এরূপ হয় নাই? এদেশে তাঁহার সমসাময়িক লোক মণ্ডলীর চক্ষে তাঁহার সৌন্দর্য্যের কি শতাংশের একাংশও দৃষ্ট হইয়াছিল? এই মহৎ চরিত্রের সৌন্দর্য্যের আভাস মাত্র দেখিতে সমর্থ হইবার পূর্ব্বে এজাতির চক্ষুকে অর্দ্ধশতাব্দী-ব্যাপী শিক্ষা লাভ করিতে হইয়াছে। এবং তাহার পরে আরো দশ বৎসর ঘনিষ্ঠ ও নিবিষ্ট ভাবে তাহা নিরীক্ষণ ও আলোচনা করিয়াও আজ আমাদিগকে ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে, যে আমরা রামমোহন রায়ের চরিত্রের সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব

কেবল বুদ্ধির দ্বারাও, আংশিকরূপে, আয়ত্ত করিতে সমর্থ হই নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই মহত্ব, আত্মার মহত্ব। এবং আত্মার মহত্ব যাহা, তাহা সর্ব্বোপরি দৃষ্টি শক্তিরই মহত্ব। মানসিক ও আধ্যাত্মিক মহত্ব মাত্রই এইরূপ। বৈজ্ঞানিক, নৈয়ায়িক, কবি ও প্রবক্তা ইঁহাদের সকলেরই শক্তি দৃষ্টিতে। ইহাদের সমসাময়িক ও স্বদেশীয় লোকেরা যাহা দেখিতে পায় না, ইঁহারা তাহা দেখেন বলিয়াই ইঁহারা শ্রেষ্ঠ। গ্যালিলিও, নিউটন, কি ডারবিন জড় ও প্রাণী-জগতের সত্য সমস্ত আপন আপন সমসাময়িক জনগণ অপেক্ষা অধিক দেখিয়াছিলেন বলিয়াই ইঁহাদের নাম জড়বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়াছে। মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে এইরূপ ডেকার্ট, ক্যাণ্ট বা হিগেলের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কবি ও প্রবক্তার শক্তি যে দৃষ্টিগত ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু লোকে স্বীকার করুন আর নাই করুন,—সর্ব্ব প্রকারের মানসিক ও আধ্যাত্মিক মহত্বই যে দৃষ্টিগত একথা অগ্রাহ্য করা অসাধ্য।

এই দৃষ্টি-শক্তি আত্মার। এবং আত্মার চক্ষুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এই যে শরীরের চক্ষু যেস্থলে আকারের বিভিন্নতা দর্শন করে, আত্মার চক্ষু সেস্থলে মূল বস্তুর একত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকে। বাহ্য বিভিন্নতার মধ্যে আন্তরিক একতা স্থাপনের শক্তি দ্বারাই সর্ব্ব প্রকারের মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি ও শ্রেষ্ঠতার পরিমাণ হইয়া থাকে। এই জড় জগতের সর্ব্ব প্রকারের বিচিত্রতার মধ্যে একই পরমাণুপুঞ্জের লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়াই রসায়ন শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যে ডাল্টন এরূপ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। উদ্ভিদ্ ও জীব-জগতের একই ক্রমবিকাশ-শীল প্রাণতার ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন বলিয়াই—বিবর্ত্তন-বাদের প্রতিষ্ঠাতা ডারবিন্ বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সমাজের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন। মহামতি ক্যাণ্টের পূর্ব্বে আধুনিক দর্শন জড়বাদ ও মায়াবাদ, এই পরস্পর বিরোধী দুই দলে বিভক্ত ছিল, এবং এই বিরোধিতা-নিবন্ধন মনোবিজ্ঞানের সাংঘাতিক অপকার সাধিত হইতেছিল। এই পরস্পর বিরোধী দল দ্বয়ের মতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই ক্যাণ্ট সর্ব্ব সম্মতিতে আধুনিক দার্শনিকগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও আধুনিক দর্শনের উদ্ধার-কর্ত্তা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। এবং রসায়ন বিজ্ঞানে ডাল্টন, প্রাণীবিজ্ঞানে ডারবিন, মনোবিজ্ঞানে ক্যাণ্ট যাহা করিয়াছেন, ধর্ম্মবিজ্ঞানে, আধুনিক সময়ে, রাজা রামমোহন রায় ঠিক তাহাই করিয়াছেন, এবং ঠিক অনুরূপ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনিই সর্ব্ব প্রথমে, আধুনিক কালে, জগতের বিভিন্ন আকারের ধর্ম্ম বিশ্বাসের মধ্যে মূলগত একটা একত্ব দর্শন করিয়া, জনমণ্ডলীর নিকটে তাহার সত্যতা প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলরের কথায় তিনিই সর্ব্বাদৌ সর্ব্ব প্রকারের ধর্ম্মের অভ্যন্তরে মানবাত্মার এক অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলেন, এবং অব্যক্তকে ব্যক্ত করিবার জন্য, অজ্ঞেয়কে জানিবার জন্য মানবপ্রাণের একটা ব্যগ্রতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি সকল ধর্ম্মেই অনন্তের প্রতি প্রাণের একটা গভীর টান ও ঈশ্বরের প্রতি সরল প্রেম প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বিগত অর্দ্ধশতাব্দী সময় মধ্যে সভ্য জগতের ধর্ম্ম বিষয়ক চিন্তাতে এক মহা বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে। অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন তত্ত্ববিদ্যা-ধর্ম্ম-বিজ্ঞানকে আপনার আসন পরিত্যাগ করিয়া দিতেছে, জগতের সর্ব্বত্র শিক্ষিত লোকে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ অপেক্ষা ধর্ম্মের এক মহত্তর পূর্ণতর ও উদারতর আদর্শ লাভ করিয়াছেন। ধর্ম্ম-বিষয়ক সংকীর্ণতা ও অসহিষ্ণুতা আপনাদিগের চিরন্তন অধিকার হইতে এতটা চ্যুত হইয়াছে যে এক খৃষ্টধর্ম্ম-প্রধান দেশে সকল ধর্ম্মের এক মহা সমিতির অধিবেশন বিগত বর্ষে সম্ভবপর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, এবং আপনারা জানেন যে ভারতে প্রায় সপ্ততি বর্ষ পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায়ের মন যে সকল চিন্তা ও ভাবের দ্বারা আন্দোলিত হইয়াছিল, তাহার অনুরূপ চিন্তা ও ভাবের প্রাবল্যই সভ্য জগতের ধর্ম্ম বিষয়ক চিন্তা ও ভাবে এরূপ প্রলয় উপস্থিত করিয়াছে। তুলনায় বিভিন্ন ধর্ম্ম শাস্ত্র আলোচনার (Comparative Theology) প্রথম পথ-প্রদর্শক, রামমোহন রায়, ইহার প্রতিষ্ঠাতা তিনি একথা বলা অসঙ্গত নহে, কারণ তিনিই আধুনিক পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয় ও মুসলমান এই ধর্ম্মচতুষ্টয়ের তুলনায় পাঠ ও আলোচনা করিয়াছিলেন। মোক্ষমূলর প্রভৃতি তাঁহারই প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিয়া আজ সভ্য সমাজের ধর্ম্ম চিন্তাতে এই যুগান্তর উপস্থিত করিতেছেন। ধর্ম্মের দর্শন (Philosophy of religion) বা ধর্ম্ম বিজ্ঞান অতি অল্প দিন হইল পাশ্চাত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুতঃ ক্যাণ্ট, হিগেল, ও শ্লিয়ারমেকার, এই তিন জন সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত বর্ত্তমান সভ্য জগতের চিন্তাতে যে আমূল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছেন, তাহার দ্বারাই কেবল এই নূতন বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভাবিত হইয়াছে। এবং ক্যাণ্ট হিগেল, ও শ্লিয়ারমেকার, এই তিন জনই রাজা রামমোহনের সমসাময়িক লোক। ক্যাণ্ট রাজা অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বটে, এবং রাজা যখন ত্রিংশতি বর্ষের যুবক তখন তিনি পরলোক গমন করেন। কিন্তু হিগেল রাজা অপেক্ষা চারি বৎসরের বড় ও রাজার দুই বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত হয়েন। শ্লিয়ারমেকার রাজার ছয় বৎসরের বড় ছিলেন, এবং রাজার মৃত্যুর পর বৎসর মানব লীলা সংবরণ করেন। অতএব বিধাতা-পুরুষের পবিত্র নিঃশ্বাস হইতে উৎপন্ন হইয়া যে দার্শনিক চিন্তাস্রোত বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ক্যাণ্ট হিগেল প্রভৃতির মধ্য দিয়া স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল, তাহাই ভারতের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া রাজা রামমোহনের বুদ্ধি ও আত্মাকে জাগ্রত করিয়া,

তাঁহার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কোনও শক্তিশালী ব্যক্তি যে সকল কার্য্য জীবনে সম্পাদন করিয়া যাইতে সমর্থ হন, তদপেক্ষা, এই সকল সম্পাদিত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া মানব-মনে যে আশা ও আদর্শের উদয় করিয়াছিল, তদ্দ্বারাই তাঁহার মানসিক শক্তিশালীতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্যাণ্ট ও হিগেল প্রভৃতি মানব মনে যে আশা ও আদর্শ সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বহুসংখ্যক শিষ্য (এবং তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান কালের সভ্য জগতের অনেকানেক পণ্ডিতাগ্রগণ্য ব্যক্তি রহিয়াছেন) সে আশা ও আদর্শকে আরও পরিপূর্ণ করিবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া ক্যাণ্ট প্রভৃতির চিন্তা ও জ্ঞানকে ক্রমশঃ বিস্তৃত, বিকশিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়া জগতের অশেষবিধ কল্যাণ সাধনা করিতেছেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের চিন্তার আলোক, কি ব্রাহ্মমণ্ডলী মধ্যে কিম্বা তাহার বাহিরে, আজ অতি অল্প লোকই বহন করিতেছেন; এবং স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেন ব্যতীত আর কেহ সে অমৃত আলোককে বর্দ্ধিতও উজ্জ্বলতর করিতে সক্ষম বা যত্নবান হন নাই। আজ যে রাজা রামমোহনের নাম ও জ্ঞান-দীপ্তি ক্যাণ্ট প্রভৃতির নাম ও জ্ঞানের ন্যায় জগতে ব্যাপ্ত হইতে পারে নাই, ইহার কারণ রামমোহন রায়ের প্রতিভার ক্ষুদ্রতা নহে, কিন্তু যে জাতির মধ্যে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অপকৃষ্টতা, এবং এই সকল দেখিয়া শুনিয়া লোকের মনে সহজেই এই আক্ষেপ হইতে পারে যে বিধাতা কেন এমন ব্যক্তিকে এই নরাধম জাতিতে ও এই অধঃপতিত সমাজে প্রেরণ করিলেন।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

গুরুবাদ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রেরিত পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। মনোরঞ্জন বাবুর তৃতীয় পত্রও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাঁহার প্রথম দুই পত্রের অনেকগুলি প্রতিবাদ আসিয়াছে। সে সমুদয় মুদ্রিত করা সম্ভব নহে। এবারে তাঁহার প্রতিবাদের একখানি মুদ্রিত করা গেল। আগামী বারে মনোরঞ্জন বাবুর তৃতীয় পত্র ও আর একখানি পত্র ছাপিয়া এবিষয়ের বিচার বন্ধ করা যাইবে। ত—স।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

অভ্রান্ত গুরুবাদ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

মহাশয়,

আমার বক্তব্য অতি সংক্ষেপেই বলিতেছি। আশা করি অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবেন।

১। শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন বাবু তাঁহার প্রথম পত্রে লিখিয়াছেন, "মানুষ আপনার অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যে সকল কথা বলে তাহা আমরা বহুপরিমাণে বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু অভ্রান্তরূপে স্বীকার করিতে আপত্তি করিতে পারি।" অর্থাৎ বুদ্ধি ভ্রান্ত, সুতরাং বুদ্ধিপ্রসূত যুক্তি তর্ক দ্বারা মীমাংসিত সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। মনোরঞ্জন বাবু নিজেই যখন এরূপ সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, তখন অপরের নিকট ইহাকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য এত চেষ্টা করিতেছেন কেন? তিনি কি বলিতেছেন না "আমি যুক্তি তর্ক দ্বারা গুরুর অভ্রান্ততা প্রমাণ করিলাম। কিন্তু ইহাকে আমি অভ্রান্ত রূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি।" ইহা কি আত্ম-বিরোধ নহে?

২। "মানবাত্মায় ঈশ্বর-বাণী অভ্রান্তরূপে প্রকাশিত হইতে পারে না" এই ভয়ানক মতের প্রতিবাদে তিনি বলিয়াছেন "আত্মসংকল্প ও বিবেক-বাণীকে আদেশ ভাবিলেই এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়।" অর্থাৎ ভ্রান্ত আত্মসংকল্প ও ভ্রান্ত কিম্বা ভ্রান্তরূপে প্রকাশিত বিবেককে আদেশ ভাবিলেই আদেশবাদের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে।

বিবেকবাণীও যখন ভ্রান্ত বা ভ্রান্তরূপে প্রকাশিত, তখন বিবেক দ্বারা গুরুর অভ্রান্ততা নির্ণয় করা সম্ভব নহে।

৩। প্রত্যাদেশ অভ্রান্ত এবং অভ্রান্তরূপে প্রকাশিত, ইহা আমরা সকলেই স্বীকার করি। কিন্তু মনোরঞ্জন বাবুর মতে ব্রহ্মযোগে অযুক্ত আত্মায় ব্রহ্মবাণী প্রকাশিত হয় না, সুতরাং গুরু অভ্রান্ত কি না ইহাও প্রকাশিত হয় না। সুতরাং ব্রহ্মযোগে অযুক্ত ব্যক্তি গুরুর অভ্রান্ততা জানিতে পারে না।

৪। অভ্রান্ত সত্যের সঙ্গে গুরুবাক্য মিলাইয়া দেখিলেও গুরুবাক্যের সত্যাসত্য নির্ণয় করা যাইতে পারে। প্রত্যাদেশই একমাত্র অভ্রান্ত বাণী। কিন্তু ব্রহ্মযোগে অযুক্ত আত্মা অনাদিষ্ট। সুতরাং তাহার পক্ষে গুরুবাক্যের সত্যাসত্য নির্ণয় করা অসম্ভব। গুরুবাক্যের অভ্রান্ততা জানিতে হইলে শিষ্যকে পূর্ব্বেই উক্ত সত্য বিষয়ে অভ্রান্ত হইতে হইবে—ইহার প্রতিবাদে মনোরঞ্জন বাবু বলিয়াছেন—"ইহার উত্তর দেওয়া অতি সহজ, কেন না ব্রাহ্মগণ আপনারা অভ্রান্ত সর্ব্বজ্ঞ ও পূর্ণ পবিত্র ইত্যাদি না হইয়াও ঈশ্বরকে ঐ সকল গুণযুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।"

জ্ঞান জ্ঞাতবস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহার প্রতিবাদে লিখিত হইয়াছে:—

"এরূপ চিন্তা করা বালকতা মাত্র। কেন না আমরা আত্মবুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বরকে নির্ণয় করিয়াছি। এবং ঈশ্বরের অভ্রান্ততা জানিয়াছি। ইত্যাদি।"

মনোরঞ্জন বাবুর মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অভ্রান্ততা পূর্ণপবিত্রতা ইত্যাদি সমুদয়ই আত্ম-বুদ্ধি দ্বারা নির্ণীত। কিন্তু তাহার মতে আত্মবুদ্ধি দ্বারা নির্ণীত সিদ্ধান্তকে অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। সুতরাং "ঈশ্বর আছেন" "তিনি অভ্রান্ত," "তিনি সর্ব্বজ্ঞ", ইত্যাদি মতকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এরূপ কথা আমরা বলিলে মনোরঞ্জন বাবু আমাদিগকে নিশ্চয়ই বলিবেন,—

"এরূপ চিন্তা করা বালকতা মাত্র।" "ইহা যিনি বলেন তিনি অজ্ঞেয়তাবাদী" সন্দেহবাদী বা নাস্তিক "কিন্তু ব্রাহ্ম নহেন।"

বুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মকে প্রকাশিত করা যায় ইহা চিন্তা করিলেও মনে হয়, অমাবস্যা রজনীতে দেশলাই জ্বালিয়া সূর্য্য দর্শন করা অসম্ভব, এরূপ চিন্তা করাও বাতুলতা।

৫। যে উপায়ে ব্যক্তিবিশেষের অভ্রান্ততা প্রমাণ করা হইয়াছে, সেই উপায়ে সমুদয় মানবাত্মারই অভ্রান্ততা প্রমাণ করা যায়:—

(৩) "ঈশ্বরবাণী মানবাত্মায় প্রকাশ পায়।"

(৪) সুতরাং দুই একজন মানুষ কেন, সকলেই সেই বাক্য শুনিয়া উপদেশ দিতে পারে।

(৫) "ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া উপদেশ দিলে সে উপদেশ অভ্রান্ত।"

(৬) সকলেই যখন এইরূপ অভ্রান্ত উপদেশ দিতে পারে, তখন সকলেই ত অভ্রান্ত গুরু!

সুতরাং অভ্রান্ত গুরুবাদ মানববাদে পরিণত হইল।

৬। আপত্তি উঠিতে পারে—মানবাত্মা চৈতন্যযোগযুক্ত মানবাত্মাকেই বলা হইয়াছিল। তাহা হইলে আমরা তিনটী প্রশ্ন করিব।

(ক) একটী আত্মার পক্ষেও কি সদাসর্ব্বদা ব্রহ্মযোগে যুক্ত থাকা সম্ভবপর?

(খ) যোগযুক্ত হইলেই কি প্রত্যেক বিষয়ে, ব্রহ্মবাণী প্রকাশিত হয়?

(গ) গুরু কি কেবল আদিষ্ট বিষয়েই উপদেশ দেন?

ইহার একটীও যখন সত্য নহে, তখন কেমন করিয়া বলিব গুরুবাক্য অভ্রান্ত?

৭। দ্বিতীয় বক্তব্যে দেখান হইয়াছে যে মনোরঞ্জন বাবু বিশ্বাস করেন, বিবেকবাণীকে আদেশ বলিয়া ভ্রম করা সম্ভব। গুরুও যখন মানুষ, তখন তাঁহার পক্ষেও ত ভ্রম করা সম্ভব। সুতরাং গুরু অভ্রান্ত নহে।

৮। গুরু মহাশয়গণ অহরহ অভিজ্ঞতার কথাই বলিয়া থাকেন। ঈশ্বরবাণী বলিয়া অতি কম সত্যই প্রচার করা হয়। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্যারীলাল ঘোষ মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন বিগত পক্ষের তত্ত্বকৌমুদী হইতে তাহার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা গেল।

"আমি নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা জানিয়াছি .... সৎগুরুর কৃপা ভিন্ন তাহা (ব্রহ্ম দর্শন) হইবার নহে।"

এইরূপ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া সমুদয় গুরুই অনেক সময়ে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

মনোরঞ্জন বাবু অবশ্যই বিজয় বাবুর উক্ত মত অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। কারণ উক্ত কথা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া বলা হইয়াছে।

৯। মনোরঞ্জন বাবু আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছেন, গুরু অজ্ঞ হইতে পারেন, ভ্রান্ত নহেন। কিন্তু অজ্ঞতা কি ভ্রান্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর? অজ্ঞতা অভাবাত্মক অবস্থা, উক্ত অবস্থা হইতে পলায়ন করিবার সময় পদস্খলন হইলে সেই পদস্খলনকেই ভ্রান্তি বলা হয়। অজ্ঞতা জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব; ভ্রান্তি অপূর্ণ জ্ঞানের পরিণাম। জ্ঞানের অতীত বিষয় সম্বন্ধেই মানুষকে অজ্ঞ এবং জ্ঞানের বিষয়ীভূত বিষয় সম্বন্ধেই মানুষকে ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত বলা যায়। ভূকেন্দ্রস্থ উত্তাপ বিষয়ে শিশু অজ্ঞ, আর শিক্ষিত মানবকেই উক্ত বিষয়ে ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত বলা সম্ভব। অজ্ঞতার মূলে চিন্তাহীনতা নিশ্চেষ্টতা, উদ্যম-বিহীনতা এবং জড় প্রকৃতি, আর চিন্তাশীল ও উদ্যমশীল মানবের পক্ষেই চেষ্টাবলে ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত হওয়া সম্ভবপর। সুতরাং ভ্রান্তি অজ্ঞতা অপেক্ষা উন্নততর অবস্থা। উষালোক কি অন্ধকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে? সেই জন্যই আমরা বিশ্বাস করি অজ্ঞ গুরু অপেক্ষা ভ্রান্ত গুরু সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ; অজ্ঞ গুরুকেও এক সময়ে ভ্রান্ত গুরু হইতে হইবে।

১০। অভ্রান্ত গুরুবাদ না মানিলেই যে অভ্রান্ত অহংবাদ মানিতে হইবে কে বলিল? সাধন-পথকে অভ্রান্ত না মানিলে কখনই সাধন-নিষ্ঠা হয় না অতি সত্য কথা। কিন্তু বিধাতার নির্দ্দিষ্ট সাধন পথ অবলম্বন করিলে কি কম নিষ্ঠা হয়? মনোরঞ্জন বাবু কি সত্যই বলিতে চান গুরু ভিন্ন অপর সকলের সাধন পথই স্বকপোল কল্পিত? আর গুরুবাক্য অভ্রান্ত ইহা কল্পনা করিয়া লইলেও সাধন-নিষ্ঠা হওয়া সম্ভব নহে। কারণ ইহা কল্পনা।

১১। জগতের শৈশবকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রকাশিত সত্যকে অমান্য ও অগ্রাহ্য করিয়া একজন মানবকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করা বালকতা ও ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া মনে হয়। চার্ব্বাক, মিল স্পেনসার হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মা ঈশা পর্য্যন্ত সকলেই আমাদের গুরু। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, মৌখিক উপদেশ, বক্তৃতা গৃহকর্ম্ম সমুদয়ই ধর্ম্ম-পথের সহায়।

১২। সত্যাসত্য নির্ণয় না করিয়া ব্রাহ্মগণ অপরের মতামতকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। সত্য আমরা তিনটী উপায়ে গ্রহণ করিতে পারি।

(ক) অভ্রান্ত যুক্তি প্রণালী, যাহা অভ্রান্ত।

(খ) Conscience যাহা অভ্রান্ত।

(গ) সত্যের সাক্ষাৎ প্রকাশ, যে সত্য অভ্রান্ত।

প্রচলিত ভাষায় এই conscienceকেই বিবেক বলা হইয়াছে।

আজ এই স্থানেই উপসংহার করিতে হইল। সময় এবং সুবিধা হইলে ভবিষ্যতে আরও অনেক কথা বলিব ইচ্ছা আছে।

রামপুরহাট } বিনীত
১০ই জানুয়ারী ১৮৯৪। } শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

ব্রাহ্মসমাজ।

দুর্ভিক্ষ সংবাদ—ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়া প্রভৃতি স্থানে খুব দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। গত সংখ্যক

তত্ত্বকৌমুদীতে আমরা তাহার কথঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। অতঃপর কিছুদিন হইল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অন্নকষ্ট গ্রস্ত লোকদিগের সাহায্য করিবার জন্য কিছু টাকাসহ শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়কে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত স্থানে পাঠাইয়াছেন। তিনি কোটালিপাড়ার অন্তর্গত রাধা-গঞ্জ হইতে লোকের অন্নকষ্টের যে বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা অতীব শোচনীয়। তিনি লিখিয়াছেন যে তথায় অনেকেই দিনে একবারও খাইতে পায় না। কেহ কেহ বা কচু, লাউ সিদ্ধ করিয়া খাইতেছে। কাশী বাবু তথায় উপস্থিত হইলে সাহায্য প্রাপ্তির আশায় অনেকে তাঁহার পিছনে পিছনে ছুটিয়াছিল। তিনি প্রথমতঃ তাহাদিগকে দুই, চারি আনা করিয়া বিতরণ করেন। অবশেষে একমণ চাউল খরিদ করিয়া যাহারা ঐ দিবস সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কিছুই খাইতে পায় নাই তাহাদিগের প্রতি জনকে এক পোয়া হিসাবে দিতে লাগিলেন। দুর্ভিক্ষের বিবরণে আমরা কয়েকটী হৃদয় বিদারক সংবাদও পাইয়াছি। একজন বিধবার দুটী ছেলে ছিল; ছেলে দুটীকে খাইতে দিতে না পারিয়া সে উদ্বন্ধনে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে। অপর এক স্থানে মাঠের মাঝখানে শৃগাল কুকুরে একটী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ খাইয়াছে। জনরব স্ত্রীলোকটী অনাহারে মরিয়াছে।

শুনা গেল গবর্ণমেণ্ট অন্নকষ্ট-প্রাপ্ত লোকদিগকে ধান দিতেছিলেন। তাহারা ধান ভানিয়া দুই সের করিয়া চাউল রাখিয়া অবশিষ্ট চাউল ফেরত দিত। এইরূপে অনেকের বেশ সাহায্য হইতেছিল। কিন্তু যে সকল কর্ম্মচারী ধান বিতরণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাদের অসাধুতা এবং কাজের ত্রুটীতে গবর্ণমেণ্ট উক্ত সাহায্য বন্ধ করিয়াছেন।

কাশী বাবু লিখিয়াছেন যে তিনি ক্ষুধার্ত্তদিগের হাহাকার এবং ক্রন্দন ধ্বনিতে নিতান্তই ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছেন। এসময়ে যদি তিনি তাহাদিগকে উপযুক্তরূপে সাহায্য করিতে না পারেন তবে তাঁহাকে যারপর নাই কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। বাস্তবিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় তাহাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এইরূপ দুর্ঘটনায় কখনই উদাসীন থাকিতে পারেন না। অথচ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তহবিলে এমন অর্থ নাই যাহাতে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদিগকে যথোপযুক্ত রূপ সাহায্য করা যাইতে পারে। বিগত বর্ষাকালে বিক্রমপুরের দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ যে একটী তহবিল সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহারই উদ্বৃত্ত কিছু টাকা সঙ্গে করিয়া কাশী বাবু রওনা হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানাইয়াছেন যে উক্ত টাকা প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। আশা করি উপস্থিত দুর্ঘটনায় চারিদিক হইতে দেশ হিতৈষী সহৃদয় মহাত্মাগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবেন। এসম্বন্ধে যিনি যাহা কিছু দান করেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদিগের সহায্যার্থে প্রেরণ করা যাইবে।

চিঠিপত্র এবং টাকা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। তত্ত্ব-কৌমুদীতে টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইবে ইতি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা। } গুরুচরণ মহলানবিশ।

নামকরণ—গত ১৮ই মার্চ্চ বাবু শশিভূষণ বসু এম,এ, মহাশয়ের প্রথমা কন্যার নামকরণানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। কন্যার নাম সুব্রতা রাখা হইয়াছে।

জাতকর্ম্ম—গত ৪ঠা মার্চ্চ শিলংস্থ বাবু কৈলাশচন্দ্র সেনের দ্বিতীয় কন্যার জাতকর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন।

বিবাহ—গত ২০এ ও ২৪এ মার্চ্চ দুইটী ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। প্রথমটীর পাত্রের নাম বাবু রজনীকান্ত দাস, বয়স ২৫ বৎসর। পাত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারী ঘোষ, বয়স ১৫ বৎসর। এই বিবাহে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। দ্বিতীয় পাত্র আমাদের বন্ধু বাবু কামাখ্যাচরণ ঘোষের পুত্র শ্রীমান রজনীনাথ ঘোষ বি, এ বয়স ২৬ বৎসর। পাত্রী বাগআঁচড়া নিবাসী পরলোকগত মতিলাল মল্লিকের কন্যা শ্রীমতী রামরঙ্গিনী, বয়স ১৫ বৎসর। এ বিবাহে শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। দুই বিবাহই ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টরী করা হইয়াছে।

শোক সংবাদ—আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আমাদের বন্ধু বাবু গৌরীনাথ বসুর একমাত্র শিশু কন্যাটীর গত ২৭শে মার্চ্চ মৃত্যু হইয়াছে। পরমেশ্বর শোক সন্তপ্ত পিতা মাতার প্রাণে শান্তি বর্ষণ করুন।

আমরা ব্রাহ্মসমাজের আর একজন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হারাইলাম। গত ২৫শে মার্চ্চ রবিবার রায় গুলাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর একটী বিধবা কন্যা ও দুইটী নাবালক শিশু সন্তান রাখিয়া জ্বররোগে ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি অনেক দিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য ছিলেন। এবং নানারূপে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন। ইনি গবর্ণমেণ্টের পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ইঁহার অভাবে ইঁহার সন্তানগণ একেবারে অভিভাবক-বিহীন হইয়া পড়িয়াছে। পরমেশ্বর শোকার্ত্ত সন্তানদিগকে সান্ত্বনা এবং মৃত আত্মাকে শান্তি প্রদান করুন।

প্রচার—বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী শিলং হইতে কলিকাতা আগমনের পথে সুনামগঞ্জে একদিন ইংরেজি হাই স্কুলে "স্বাভাবিক ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। স্থানীয় মুনসেফ বাবু নিস্তারণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ. বি.এল. মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আর একদিন আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু কৃষ্ণদয়াল রায় মহাশয়ের গৃহে উপাসনা করেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১২ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫½ ঘটিকার সময় ১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ সিটিকলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার প্রথম ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রথম ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ এবং আয় ব্যয়ের হিসাব।

২। অধ্যক্ষ সভার সভ্য বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পদ পরিত্যাগ হেতু শূন্য পদ পূরণ।

৩। হিসাব পরিদর্শক নিয়োগ।

৪। বিবিধ।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ আফিস
১৫ই মার্চ্চ, ১৮৯৪। } শ্রীরজনীনাথ রায়
সম্পাদক।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১ম সংখ্যা।
১৭শ ভাগ।

১লা বৈশাখ, শুক্রবার, ১৮১৬ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে প্রভো! যাঁহারা বিশুদ্ধ অন্তরে তোমাকে অন্বেষণ করিয়াছেন ও তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা চিরদিন তোমার আশ্রয়কে সুশীতল ছায়ার ন্যায় অনুভব করিয়াছেন; সংসার-তাপে তাপিত হইলেই তাঁহারা তোমার চরণ-ছায়াতে গিয়া সকল তাপ জুড়াইয়াছেন। আমরা তোমাকে প্রতিদিন সত্য বলিয়া ঘোষণা করি, প্রতিদিন আরাধনাতে তোমার সত্যস্বরূপের মহিমা কীর্ত্তন করি, কিন্তু ভয়ে, বিপদে, দুঃখে, ক্লেশে, পাপ প্রলোভনে তোমার চরণ-ছায়াকে আশ্রয় করিতে পারি না কেন? আমাদের উদ্বিগ্ন চিত্ত শান্তভাব রক্ষা করিতে পারে না কেন? তবেই ত বুঝিতে পারিতেছি, তোমাকে মুখে সত্য বলিলেও তোমাকে সত্য বলিয়া চিনিতে এখনও বিলম্ব আছে। হে করুণাসিন্ধু! তোমার সুশীতল চরণ-ছায়া আমরা কত দিনে আশ্রয় করিব? কতদিনে তোমাকে জীবনের সত্য আশ্রয়রূপে অবলম্বন করিব? তুমি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা বিশ্বাসিগণের সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

নির্ম্মল বায়ু—যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত বচনটী প্রাপ্ত হওয়া যায়,—

"উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞান-কর্ম্মাভ্যাং জায়তে পরমং পদং॥"

অর্থ—"যেরূপ পক্ষিগণ উভয় পক্ষে ভর করিয়া আকাশে উড্ডীন হইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়কে অবলম্বন করিয়া সাধক পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" ইহার অনুরূপ একটী বচন খ্রীষ্টীয় সাধু টমাসএ কেম্পিসের প্রণীত "খ্রীষ্টের অনুকরণ" নামক গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন,—"অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা ও চিত্তের সরলতা এই উভয় পক্ষের উপরে ভর করিয়া মানুষ ঈশ্বর-চরণে উঠিয়া থাকে।" সকল সাধু জনের একই উক্তি। অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা এবং চিত্তের সরলতা এই দুইটী থাকিলেই, আত্মার চারিদিকে এক প্রকার নির্ম্মল বায়ু প্রস্তুত হয়; সেই নির্ম্মল বায়ুতে যে সকল সাধক বিহার করেন, তাঁহাদের পক্ষে ঈশ্বর-সহবাস লাভ করা স্বাভাবিক ও সহজ। তাঁহারা ঈশ্বরের আলয়েই সর্ব্বদা বাস করিতেছেন, এবং তাঁহার প্রেম-সুধা নিরন্তর পান করিতেছেন। কিন্তু জনসমাজের নানাবিধ কার্য্য, নানাবিধ অবস্থা ও নানা প্রকার পাপ-প্রলোভনের মধ্যে বাস করিয়া অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা ও চিত্তের সরলতা রক্ষা করা কঠিন। সচরাচর দেখিতে পাই যে, জগতের পাপ তাপের সহিত সংগ্রাম করিতে গিয়া অনেক লোকে আপনাদের অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা হারাইয়া ফেলেন। যাঁহারা এক সময়ে অতি মহৎ ও উদারভাবে কার্য্য করিতেছিলেন, তাঁহাদের কার্য্যের মধ্যে ক্ষুদ্রভাব প্রবিষ্ট হয়। যাঁহারা আঘাত পাইয়াও আঘাত করিবার ইচ্ছা করেন না, বিরুদ্ধাচরণ দেখিয়া সদ্ভাবের দ্বারাই চালিত হন, চতুর্দ্দিকে স্বার্থপরতা দেখিয়াও স্বার্থপর বুদ্ধিকে স্থান দেন না, তাঁহারা ধন্য; তাঁহারাই ঈশ্বরের সহবাস লাভের উপযুক্ত, কিন্তু ঈশ্বরে ও সাধুতাতে অকপট ও অটল বিশ্বাস ভিন্ন অভিসন্ধির এরূপ বিশুদ্ধতা চিরদিন রক্ষা করা দুষ্কর। ঈশ্বর করুন আমরা সেই অকপট বিশ্বাস লাভ করি।

ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন—শ্রীমদ্ভাগবতে আছে:—

সঙ্কীর্ত্ত্য-মানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনংহি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ॥

"অনন্ত পরমেশ্বরের নাম কীর্ত্তন এবং তাঁহার মহিমা শ্রবণ করিতে করিতে তিনি হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সূর্য্য যেমন অন্ধকার, প্রবল বাত্যা যেমন মেঘকে অপসারিত করে, তেমনি মনুষ্যগণের অশেষ দুঃখ বিদূরিত করেন।"

মানুষ যখন সেই অনন্ত ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করে ও শ্রবণ করে, তখন ঈশ্বর তাহার হৃদয়ে উদিত হন, এবং তাহার হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ দূর করেন। যেমন সূর্য্যের প্রকাশে পৃথিবীর অন্ধকার দূরীভূত হয়, এবং বায়ুর প্রভাবে আকাশের

মেব বিদূরিত হয়, সেই প্রকার ভগবানের প্রকাশে মানব-হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়া যায়।

অনেক সময় আমাদিগের আত্মার অবস্থা এরূপ হয় যে, আর ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ ভাল লাগে না, আর তাঁহার নামে রুচি হয় না, উপাসনায় প্রাণ বসে না, সাধু-সঙ্গ ভাল লাগে না। কিন্তু তখন যদি তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন না করি, তাঁহার গুণানুবাদ করিতে প্রবৃত্ত না হই, তাঁহার উপাসনা পরিত্যাগ করি, তবে আরও ভ্রষ্ট হইয়া অবশেষে তাঁহা হইতে একেবারে বিচ্যুত হইয়া পড়ি। কত লোকের অবস্থা এরূপ হইতে দেখা গিয়াছে। প্রথমে উপাসনায় অরুচি হইয়াছে, পরে ক্রমে তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া ম্লান হইয়া পড়িয়াছে, অবশেষে একেবারে পতন হইয়াছে।

আত্মার অবস্থা যখন এরূপ হয়, তখন তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন পরিত্যাগ করা সঙ্গত নয়। বরং এ অবস্থায় আরও বিশেষ ভাবে তাঁহার নাম করা উচিত। এরূপ করিতে করিতে তিনি অন্তরে প্রবিষ্ট হন এবং হৃদয়ের সমস্ত দুঃখভার হরণ করেন।

এই গুণ কীর্ত্তনের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে, এবং তাঁহার নামে ডুবিতে হইবে, তাঁহার চিন্তনে আপনাকে নিমগ্ন করিতে হইবে। তিনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা তাঁহার নাম কীর্ত্তনে ও তাঁহার ধ্যানে মগ্ন থাকি।

একনিষ্ঠ সাধন—তাঁহাতে প্রীতি এবং ভক্তিলাভ করিবার জন্য সজন এবং নির্জ্জন দুই প্রকারের সাধনেরই প্রয়োজন। প্রথমে তাঁহার বিষয় শুনিতে হইবে ও তাঁহার বিষয় কীর্ত্তন করিতে হইবে। ইহা অপর সাধকদের সঙ্গে এবং ভক্তদের সঙ্গে না হইলে হয় না। তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া কীর্ত্তন করিতে হইবে ও শুনিতে হইবে, এইরূপে সজনে সাধন করিতে হইবে।

একদিকে যেমন সজন সাধন প্রয়োজন, অপর দিকে তেমনি তাঁহাকে নির্জ্জনে ধ্যান করিতে হইবে এবং তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে। এই যে সজন ও নির্জ্জন সাধন এই উভয় যখন সম্মিলিত হইবে, তখন প্রেম ভক্তি জাগিবে। কিন্তু ইহা কি প্রকারে করিতে হইবে—না একাগ্র চিত্তের সঙ্গে, একনিষ্ঠ হৃদয়ের সহিত; তাঁহাকে সর্ব্বাবাধ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সকল হইতে মূল্যবান জ্ঞান করিতে হইবে। এইভাবে পূজা করিতে হইবে। এইভাবে না করিলে তাঁহাকে লাভ করা যায় না। এক মনের সঙ্গে অন্বেষণ করিতে হইবে। ইংরাজীতে একটী কথা আছে Singleness of mind, সকল প্রকার বস্তুর মধ্যে তিনি পরম বস্তু, সকল প্রকার সম্পদের মধ্যে তিনি পরম সম্পদ, এইভাবে যদি সাধন করা যায় এবং সর্ব্বপ্রকার বাধার মধ্যে যদি তাঁহার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়, তাহা হইলে এক মনের সহিত অন্বেষণ করা হয়। এই উপদেশ সর্ব্বশাস্ত্রেরই। বাইবেলে আছে—"Love thy Lord with all thy heart, with all thy mind and with all thy strength"—সমুদয় মন, সমুদয় শক্তি ও সমুদয় প্রাণের সহিত তাঁহাকে ভালবাস।" এখানেও তাই; এক মনে পূজা কর। এই এক-নিষ্ঠতা রক্ষা করা বড় কঠিন। সর্ব্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষার বস্তু তিনি, তাঁহাকে লাভ করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুখ, এরূপ অবস্থা লাভ করা বড় কঠিন। কত প্রকার অবস্থা আমাদের মনে আসে, তাহাতে হৃদয় অন্যদিকে যায়। একাগ্র-ভাবে তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে দেয় না। কিন্তু একাগ্র-ভাবে অন্বেষণ না করিলে তাঁহাকে লাভ করা যায় না। ঈশ্বর করুন, যেন আমরা সকলে একাগ্রভাবে তাঁহাকে পূজা করিতে পারি।

প্রকৃত নির্ভর—ভক্তগণ চিরদিন প্রার্থনা করিয়াছেন, "হে প্রভো! তোমার গুণে আমাকে বাঁধিয়া রাখ, আমার গুণে আমি বাঁধিয়া রাখিব তাহা নয় কিন্তু তোমার গুণে বাঁধ"। প্রকৃত নির্ভর যতদিন না থাকে, ততদিন এভাব থাকে যে আমার গুণে ঈশ্বরকে বাঁধিয়া রাখিব। আমরা তাঁহাকে ভক্ত-বৎসল বলি, তখন এই ভাবি যে আমার ভক্তিতে বাঁধিয়া রাখিব। আমার ব্যাকুলতাতে পাইব, আমার সাধনে তাঁহাকে পাইব, এই প্রকার নিজের সাধনের উপর নির্ভর থাকে। কিন্তু যখন প্রকৃত বিনয় আসে, তখন প্রাণ বলে "তোমার গুণে আমাকে বাঁধিয়া রাখ আমার গুণে নয়।"

যখন জীবনে নানারূপ পরীক্ষা উপস্থিত হয়, যখন বিপদের প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে পতিত হই, চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখি, সাহায্য করিবার আর কেহ থাকে না তখন বুঝিতে পারি, আমাদের গুণে বাঁধিয়া রাখা কত কঠিন। একটি আখ্যায়িকা আছে:—একটি লোক পাহাড়ের উপর দিয়া দুইটি শিশু সন্তান লইয়া যাইতেছিলেন। পথ অতি দুর্গম। তিনি সন্তান দ্বয়কে বলিলেন, "তোমরা সাবধানে এস, পথ বড় দুর্গম।" এই বলিয়া ছোট শিশুটীর হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন এবং বড়টিকেও ধরিয়া লইতে চাহিলেন। কিন্তু সে কোন মতেই তাঁহার হাত ধরিতে দিল না। সে বলিল, "না, তুমি ধরিও না, আমি নিজে ধরিয়া যাইব।" পিতা তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন, তাহার পড়িয়া যাইবার যে অনেক আশঙ্কা আছে তাহা বার বার বলিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই তাঁহাকে ধরিতে দিল না, নিজে পিতার হাত ধরিয়া চলিল। অগত্যা তিনি ছোট শিশুটীকে ধরিয়া চলিলেন। ক্রমে অধিকতর সঙ্কটাপন্ন স্থানে আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু এখানে আসিয়া বড় শিশুটী আর পিতাকে ধরিয়া থাকিতে পারিল না, তাহার পদস্খলন হইল, সে পড়িয়া গিয়া আঘাত প্রাপ্ত হইল। অবশেষে পিতা ছোট শিশুটীকে নিরাপদে পার করিয়া তাহাকে আসিয়া ধরিয়া তুলিলেন।

এই গল্পটি আমাদের জীবনে বড় খাটে। আমরা যখন তাঁহাকে ধরিয়া থাকি, তখন পড়িয়া যাই, সাজা পাই। আর তিনি যাহাকে ধরিয়াছেন, সে নিশ্চিন্ত। এই জন্য ভক্ত বলিয়াছেন, "হে মাতঃ তোমার গুণে আমাকে বাঁধিয়া রাখ।"

হঠাৎ যদি একটা তীর আসিয়া গায় লাগে, হঠাৎ বুঝিতে পারি না কতদূর বিঁধিল, তখন জানিতেও পারি না। পরে

যখন দেখি কতদূর বিঁধিয়াছে, তখন জানিতে পারি, কত বেদনা। মানুষ যখন পাপে প্রবেশ করে তাহাও এইরূপ। হঠাৎ যখন পাপে পড়ে বুঝিতে পারে না, কিন্তু পরে বুঝিতে পারে। তখন ব্যাকুল হইয়া পড়ে। তখন সেই পাপের যাতনা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে যাহা বলে তাহাই করে। মানুষ যখন রোগে পড়ে, তখন যে যাহা বলে তাহাই করে। কিন্তু কিছুতেই যখন আর ভাল হয় না, তখন যথার্থ চিকিৎসকের কাছে যায়।

আত্মার বিষয় এরূপ—প্রাণের ব্যাকুলতাতে, অশান্তিতে যে যাহা বলে সে দিকেই ছুটিয়া যায়। কখনও গ্রন্থের কাছে, কখনও মানুষের চরণে যাইয়া পড়ে। কিন্তু অবশেষে যখন দেখে যে কিছুতেই আর কিছু হয় না, তখন বুঝিতে পারে সত্য স্বরূপ যিনি, তিনি ভিন্ন আর গতি নাই। তখন তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তখন বলে "তুমি আসিয়া আমাকে ধর, আমার গুণে নয়, কিন্তু তোমার গুণে আমাকে বাঁধিয়া রাখ।"

আমাদের জীবনে ইহা কতবার অনুভব করিয়াছি। যখন বুঝিতে পারি আর কিছুতেই কিছু হইল না, তখন আমাদের এই অবস্থা হয়। পরমেশ্বর করুন আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হই তিনি আমাদিগকে ধরিয়া রাখুন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

"সত্যে কর প্রীতি পাইবে পরিত্রাণ।"

যীশু একদিন শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়া বলিলেন—"তোমরা সত্যকে জান সত্যই তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে।" মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় তাঁহার প্রণীত একটী সঙ্গীতে বলিয়াছেন—"সত্যে কর প্রীতি পাইবে পরিত্রাণ।" এই উপদেশের গূঢ় তাৎপর্য্য কি?

সাধারণ মানবের মন এ সংসারে নানা প্রকার ভয়ে আবদ্ধ থাকে, মৃত্যু ভয়, বিপদ ভয়, লোক ভয় ইত্যাদি। এই সকল ভয়ের জন্য মানব মন এ জগতে অসংকোচে কার্য্য করিতে পারে না, অনেক সময়ে কর্ত্তব্য বুঝিয়াও তাহার অনুসরণ করিতে পারে না, কিংবা কোনও কার্য্য করিয়া হৃদয়ে শান্তিলাভ করিতে পারে না। একদিকে যেমন ভয়-জনিত সঙ্কোচ অপরদিকে তেমনি আসক্তি-জনিত সংকোচ। বিশেষ বিশেষ মানবের বিশেষ বিশেষ পদার্থের প্রতি আসক্তি আছে। কাহারও ধনে আসক্তি, কাহারও মানে আসক্তি, কাহারও ইন্দ্রিয়জনিত সুখে আসক্তি। এই সকল আসক্তিকে ঋষিগণ আত্মার রজ্জুস্বরূপ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই সকল রজ্জু দ্বারাই মানবাত্মা পার্থিব বিষয় সকলের সহিত আবদ্ধ হইয়া থাকে।

যদি মানুষকে আসক্তি ও ভয় এই উভয় প্রকার পাশ হইতে মুক্ত করা যায়, তাহা হইলে সে অনেক পরিমাণে স্বাধীন হইতে পারে। এই উভয় প্রকার বন্ধন হইতে মানবাত্মাকে মুক্ত করিবার উপায় কি? রামমোহন রায় বলিলেন,—"সত্যে কর প্রীতি পাইবে পরিত্রাণ।"

যিনি বিশুদ্ধ অন্তরে সত্যকে প্রীতি করেন, তিনি আর এক জগতের লোক। তিনি এই সংসারে বাস করিয়াও ইহার মধ্যে অবস্থিতি করেন না। তিনি বাস্তবিক পদ্ম-পত্রের জলের ন্যায় সংসার মধ্যে রহিয়াছেন, অথচ ইহাতে লিপ্ত হইতেছেন না। বাহিরে দেখিতে তিনি সংসারে নানাপ্রকার কাজ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মন ঈশ্বর-চরণে অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং মৃত্যু-ভয়, বিপদ-ভয় বা লোক-ভয় কিছুতেই আর তাঁহার চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে না। প্রথম মৃত্যু-ভয়, ঋষিগণ বলিয়াছেন, "একমাত্র তাঁহাকেই জান, যাহাতে মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যথা দিবে না।" যে সকল বস্তুর উপরে মৃত্যুর অধিকার, মৃত্যু যাহাদিগকে বিকৃত ও পরিবর্ত্তিত করিতে পারে, আমাদের প্রীতি যতদিন সেই সকল বস্তুতে আবদ্ধ থাকে, ততদিন আমরা মৃত্যুর অধিকার মধ্যে বাস করি, এবং মৃত্যুর নামে কম্পিত হই; কিন্তু আমাদের প্রীতি যখন সত্যে অর্পিত হয়, তখন আমরা অমর-ভূমিতে আরোহণ করি, কারণ সত্য, ন্যায়, পবিত্রতা প্রভৃতি অমর। এ সকল বিষয় মৃত্যুর অধীন নহে। সুতরাং যাঁহাদের চিত্ত সত্য, ন্যায়, প্রীতি, পবিত্রতার আধারস্বরূপ পরমেশ্বরেতে প্রকৃতরূপে অর্পিত হয়, তাঁহারা এই মর্ত্ত্যধামে থাকিয়াও অমরধামে বাস করিতে থাকেন। মৃত্যু আর তাঁহাদিগকে ব্যথা দিতে পারে না।

মৃত্যু-ভয়ের ন্যায় বিপদ-ভয় বা লোক-ভয়ও তাঁহাদিগকে ভীত করিতে পারে না। লোকে বিপদের ভয় এত অধিক পরিমাণে করে, তাহার কারণ এই, পাছে তাহাদের অনিষ্ট হয়, কোনও প্রকার স্বার্থের হানি হয়। কিন্তু যাঁহাদের মন স্বার্থের পাশে বদ্ধ নহে, তাঁহাদের সে আশঙ্কাতে উদ্বেগ নাই। তাঁহারা ধীরচিত্তে বিপদের প্রতিকার করিবার চেষ্টা করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে যতটা হয়, প্রতিবিধানের চেষ্টা করিয়া নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন বলিয়া ধীর ও প্রশান্ত ভাবে বাস করিতে থাকেন, ফলাফলের ভার ঈশ্বরের হস্তে রাখিয়া দেন। এইরূপ লোকের প্রতিকূলতাচরণেও তাঁহাদের শত্রুতার ভাবের উদয় হয় না। যেখানে স্বার্থ লইয়া টানাটানি, সেই খানেই ঘোর শত্রুতা। গীতাকার বলিয়াছেন—"সঙ্গাৎ সংজায়তে ক্রোধঃ" আসক্তি হইতেই ক্রোধ বা শত্রুতার সঞ্চার হয়। যেখানে আসক্তি নাই, সেখানে শত্রুতারও কারণ নাই। সত্যে যাঁহার চিত্ত অর্পিত, তিনি নিঃস্বার্থতার বিমল ও সুস্নিগ্ধ বায়ুতে বাস করিতেছেন; সেখানে শত্রুতা নাই। সুতরাং সত্যে প্রীতি করিলেই প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা যায়।

জ্ঞান ও ভাব।

ভাব-স্রোতের জলের ন্যায় আসিতেছে ও যাইতেছে; প্রাতে জোয়ারের জলের ন্যায় খরতর বহিতেছে, অপরাহ্নে

ভাঁটার ন্যায় হৃদয়ক্ষেত্রকে শুষ্ক রাখিয়া যাইতেছে। এইরূপ, ভাব সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। অনেক সময়ে ভাবের উৎপত্তি ও বিলয়ের কারণ নির্ণয় করা যায় না। একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া সমুদায় যেন নূতন দেখিতেছি, হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছে, মনে নব স্ফূর্ত্তি আসিয়াছে, সমুদায় সরস ও প্রীতিপ্রদ বোধ হইতেছে, সকল কার্য্যেই কি এক মিষ্টতা অনুভব করিতেছি। প্রাতঃকাল এই ভাবে গেল; সন্ধ্যা না আসিতে সে আনন্দ ও সে মধুরতা তিরোহিত হইয়াছে; মন যেন অবসাদে ডুবিতেছে, চতুর্দ্দিক যেন নিরাশ অন্ধকারে পূর্ণ হইতেছে। অথচ এরূপ পরিবর্ত্তনের কোনও কারণ লক্ষ্য করিতে পারা যাইতেছে না। সমস্ত দিনের মধ্যে এমন কিছুই ঘটে নাই যাহাতে চিত্তকে অবসাদে মগ্ন করিতে পারে। এই কারণে বোধ হয় ভাবের উত্থান ও পতন অনেক পরিমাণে শারীরিক অবস্থার উপরেও নির্ভর করে। ভাবের এই পরিবর্ত্তনশীলতা লক্ষ্য করিয়াই ভগবদ্গীতাকার অর্জ্জুনের মুখে নিম্নলিখিত উক্তি দিয়াছেন :—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবৎ দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহংমন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং॥

"হে কৃষ্ণ মন অতিশয় চঞ্চল ও অতিশয় অনবহিত; সেই মনকে সংযত করাকে বায়ুর সংযমের ন্যায় দুষ্কর বলিয়া মনে করি।" বায়ু যেমন সতত চঞ্চল, সতত বহমান, হৃদয়ের ভাবরাশিও সেইরূপ সতত চঞ্চল ও সতত বহমান। কিন্তু জ্ঞান এ প্রকার নহে, তাহা নিরেট পাষাণ খণ্ডের ন্যায়; তাহা সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং তাহাতে পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না। এক ব্যক্তি যতদিন সুস্থ ও সবল রহিয়াছে, ততদিন উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছে, তাহার মুখে প্রসন্নতা ও উৎসাহের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে; সে কত আশার কথা বলিতেছে, কত আনন্দের সমাচার দিতেছে। কিন্তু সেই ব্যক্তি যখন রোগ শয্যাতে শয়ন করিয়াছে, তখন হয়ত তাহার মুখে অন্য বিধ কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, নিরাশা ও নিরানন্দের সমাচার শ্রবন করা যাইতেছে। জ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। মনে কর সে ব্যক্তি একটী স্থান বা কোনও একটী ঘটনা জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সেই বস্তু বা সেই ঘটনা তাহার স্মৃতিতে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার পক্ষে তাহা অস্বীকার করা কি সম্ভব? মহারোগে আক্রান্ত হইলেও যতক্ষণ তাহার সংজ্ঞা একেবারে বিলুপ্ত না হইতেছে, ততক্ষণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সে স্বীকার করিবে যে, সে তাহা দেখিয়াছে। জ্ঞানের পক্ষে আর প্রাতঃ সন্ধ্যা নাই; অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থা নাই। জ্ঞান চির-জাগ্রত।

জ্ঞান ও ভাবের মধ্যে প্রকৃতিগত এই বৈষম্য স্মরণ রাখিলে ধর্ম্মজীবন গঠন বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারে। ধর্ম্ম-জগতের সাধকদিগের মধ্যে আমরা দুই প্রকার ধর্ম্মজীবন দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর সাধকের ধর্ম্মজীবন ভাব-প্রধান, অপর শ্রেণীর ধর্ম্মজীবন জ্ঞান-প্রধান। যাঁহাদের ধর্ম্মজীবন ভাব-প্রধান তাঁহারা সর্ব্বদা ভাবের তরঙ্গের উপরে দুলিতেছেন। কখনও উৎসাহে ছুটিতেছেন, কখনও বিপদে ম্লান হইয়া পড়িয়া থাকিতেছেন। এই শ্রেণীর সাধকদিগের ধর্ম্মানুরাগ ও কার্য্যোৎসাহ অনেক পরিমাণে সমবিশ্বাসী ও সমসাধকদিগের উপরে নির্ভর করে। যদি সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা কতকগুলি উৎসাহী লোকের সহবাস লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও উৎসাহ প্রবল থাকে, তাঁহাদের ধর্ম্মানুরাগ উজ্জ্বল হয়; আর যখন তাঁহারা একাকী হইয়া পড়েন, তখন উৎসাহ মন্দীভূত হইয়া যায়। কিন্তু জ্ঞান-পথাবলম্বীর ভাব এ প্রকার নহে। জ্ঞান স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, তাহা পরমুখাপেক্ষী নহে। জ্ঞান, দশ জন সমবিশ্বাসী মিলিলে অধিক হয় না, কিংবা সঙ্গবিহীন হইলেও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। জ্ঞানের ভূমি সুদৃঢ় ভূমি।

কিন্তু ইহাও বিচার করিতে হইবে, কার্য্য ও উৎসাহের মূলে ভাব। যে জীবনে ভাব নাই, কেবল জ্ঞানেরই প্রাধান্য সে জীবন অনেক সময় নিষ্কর্ম্ম আত্ম-সুখ তৃপ্তিতে পর্য্যবসিত হইতে পারে। এই জন্য আমাদের ধর্ম্মজীবনে জ্ঞান ও ভাব উভয়েরই তুল্য মাত্রাতে সমাবেশ প্রার্থনীয়।

বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাওয়া যে, ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম-জীবনের মধ্যে ভাবেরই প্রাধান্য। ধর্ম্মজীবনকে জ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপন করিবার দিকে সেরূপ দৃষ্টি নাই। এই সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ যেন দশ জনের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন, একের অনুরাগে অপরের হৃদয়ে অনুরাগ সঞ্চারিত হইতেছে। তাহাতে কার্য্য এক প্রকার চলিতেছে। কিন্তু সেই উৎসাহ ও কার্য্যকে জ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত করিবার জন্য বিশেষ মনোযোগ দৃষ্ট হইতেছে না। ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের ন্যায় যে দুই একটী জ্ঞানালোচনার্থ উপায় আছে, তাহাও মনোযোগের অভাবে ভাল করিয়া চলিতেছে না। আমাদের কার্য্যের ভাবে এই প্রকার দেখাইতেছে যে, আমরা লোক ডাকিবার জন্যই ব্যগ্র, কিন্তু যাহারা আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে শিক্ষিত ও প্রকৃত ভিত্তির উপরে স্থাপিত করিবার জন্য আমাদের কোনও যত্ন নাই। এমন কি যে সকল বালকবালিকা আমাদের গৃহে জন্মিয়াছে ও আমাদের ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাদিগকেও সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত করিবার বিষয়ে আমাদের প্রয়াস নাই। আমরা এ বিষয়ে যতই চিন্তা করিতেছি, ততই অনুভব করিতেছি যে, বালকবালিকা ও যুবক-যুবতীদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে সুশিক্ষিত ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত করিতে না পারিলে ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্য কখনই স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইবে না।

বাহিরে দেখিতে, দুই শত লোক আকৃষ্ট হইয়া আসিল, কিন্তু কয়েক বৎসর না যাইতে যাইতে তাহার মধ্যে ১৫০ দেড় শত জন সমাজ ত্যাগ করিয়া গেল, তাহাতে লাভ কি? তাহা অপেক্ষা যদি পঞ্চাশ জন আসে ও সেই পঞ্চাশ জন, শিক্ষার গুণে প্রকৃত উন্নত জীবন লাভ করে, তাহা কি অধিক স্পৃহনীয় নয়। প্রচারের ব্যাপ্তি অপেক্ষা গভীরতা কি ভাল নহে? কার্য্যের ক্ষেত্র স্বল্পায়তন হয় তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সেই স্বল্পায়তন ক্ষেত্রে যাহাতে ভাল করিয়া কাজ করিতে পারি আমাদের সেই দিকে দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। এই বিষয়ে চিন্তা করিলেই দেখিতে পাই ব্রাহ্মসমাজ বালক বালিকার শিক্ষার

জন্য যে কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন, তাহাতে যদি সমুচিতরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারি তাহা হইলেও অনেক পরিমাণে ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। জগদীশ্বর আমাদিগের সকলকে এই সকল গুরুতর বিষয়ে মনোযোগী করুন।

ধর্ম্ম-জীবনের বর্ষ গণনা।

আজ বর্ষশেষ দিনে যদি আমরা আমাদের জীবন সমালোচনা করি, তাহা হইলে বোধ করি তাহা অসাময়িক হইবে না। প্রাচীন সঙ্গীত পুস্তকে,—রাজা রামমোহনের সঙ্গীত পুস্তকে, একটী সঙ্গীতে একটী পদ আছে :—

"গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হ'লো এত,
বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে।"

এই পদটী বলিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। আয়ু ক্রমে কমিয়াই যাইতেছে, ইহা সত্য কি না? পৃথিবীর জীবন যদি তোমার ৬০ বৎসর নির্দ্দিষ্ট থাকে, আজ তাহার এক বৎসর বাদ গেল কি না? কিন্তু এইরূপ কি আজই এক বৎসর শেষ হইল? না, যতদিন পৃথিবীতে আসিয়াছ বৎসর বৎসর এইরূপেই চলিয়া যাইতেছে? ইহার কি কোন খোঁজ খবর রাখ? এখন ত গোলে মালে ভুলিয়া আছ, খোঁজ খবর লইতেছ না; কিন্তু একদিন যে এইরূপ অহিসাবেই হিসাব শোধ হইয়া যাইবে, একদিন যে হঠাৎ দেখিবে ৬০ বৎসরের আর এক মুহূর্ত্তও বাকি নাই। তখন আর একটুকু বেশী চাহিলেও পাইবে না। তখন যতই কেন কান্নাকাটি কর না, তোমাকে সেদিন চলিয়া যাইতেই হইবে। অতএব আজ বর্ষশেষে এ বৎসরের হিসাব দেখ। গোলমালে আজ আর যাইতে দিও না। বর্ষের প্রথম দিনে বা জীবনের প্রথম দিনে যাহা বলিয়াছিলে তাহা করিয়াছ কি না? সেই সাধু বাক্য স্মরণ কর :—"যাহা কর্ত্তব্য ছিল, তাহা করিয়াছি, যাহা অকর্ত্তব্য ছিল তাহা করি নাই,—না যাহা অকর্ত্তব্য ছিল তাহাই করিয়াছি, যাহা কর্ত্তব্য ছিল তাহার কিছুই করি নাই, সবই ভুলিয়া গিয়াছি," এইরূপে হিসাব পরিষ্কার করিয়া রাখ, এবং পিতার হিসাবে স্বর্ণাক্ষরে নিজ নাম সই দিয়া রাখ। চূড়ান্ত হিসাবের দিনে দেখাইতে পারিবে। জীবনে হাল খাতা লও, আবার বর্ষশেষে তাহা উপস্থিত করিবে।

ভাই! পৃথিবীর জীবন কমিতেছে, তাহাতে ভাবিবার কিছু নাই; ইহা ত কমিবার জন্যই হইয়াছে, ইহা কমিবেই। কিন্তু সম্মুখে চাহিয়া দেখ অনন্ত জীবন বাড়িতেছে কি না? অনন্ত জীবন বাড়া কি? পৃথিবীর এক বৎসর কমিয়া, ধর্ম্মজীবনে এক বৎসর বাড়িল, ইহা যদি হয়, তাহারই নাম অনন্ত জীবনে বাড়া। ধর্ম্মজীবনে সেই নবজীবনের দিন হইতে বর্ষ গণনা করিয়া দেখ, এবার ২০ বৎসরের পর ২১ বৎসর হইল কি না? যদি এই এক বৎসরের সমুদয় দিন—৩৬৫ দিন—ধর্ম্মজীবনে যাপন করিতে না পারিয়া থাক, যদি ইহার অর্দ্ধেক ৬ মাসও যাপন করিতে পারিয়া থাক, তাহা হইলেও অনন্ত জীবনে সাড়ে কুড়ি বৎসর হইল। সত্য বটে পৃথিবীর জীবন এক বৎসর কমিয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মজীবন ছয় মাস বাড়িয়াছে। গেল এক বৎসর, হইল ছয় মাস, ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই, এক বৎসরে যতটা সময় তুমি ঈশ্বর মননে, ঈশ্বর-চিন্তায়, ঈশ্বর-সেবায় দিয়াছ, অর্থাৎ যতক্ষণ প্রভুকে প্রাণে রাখিতে পারিয়াছ, ততটাই তোমার যথার্থ জীবন, নতুবা অন্ন জলের জীবন এক বৎসর হইলে যে, ধর্ম্মজীবনও এক বৎসর হইল তাহা নয়। প্রাচীন ঋষিও বলিয়াছেন :—

"তরবো পি হি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ
সঞ্জীবতি মনোযস্ত মননেন হি জীবতি।"

তরুরাও জীবিত আছে, মৃগপক্ষিরাও জীবিত রহিয়াছে। সেই জীবনই যথার্থ জীবন, যাহা ঈশ্বর মননের দ্বারা জীবিত। তাই হিসাব করিয়া দেখ, এক বৎসরে কতটা হইয়াছে। ছয় মাস হইলে তাহাই জীবন বলিয়া গৃহীত হইবে। তাই এক বৎসর পৃথিবীর গেল, কিন্তু স্বর্গে ছয় মাস বাড়িল, এইরূপেও যাহাদের জীবন বাড়িতেছে, তাহারাও ধন্য। সকলেই এ হিসাবে দেখ কত জীবন বাড়িয়াছে।

এ জীবন বাড়ে কি উপায়ে? যদি ঈশ্বর মননাদি দ্বারা এ জীবনের হিসাব গণনা হয়, তবে তদ্দারাই ইহা বাড়ে। নিত্য ঈশ্বর আরাধনা করিবে, একদিনও যেন বন্ধ্যা না যায়, তাহা হইলেই এ জীবন বাড়িবে। কিরূপে সেই আরাধনা সম্পন্ন করিব? ভক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এ বিষয় এইরূপ উপদেশ দান করেন—"সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম ব্রহ্ম আনন্দরূপ মমৃতং যদ্বিভাতি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্" এই বীজ বা প্রাচীন ঋষির এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক নিজে স্বাধীনভাবে বা কোন পুস্তক অবলম্বন করিয়া নিত্য তাঁহার আরাধনা করিবে, আমরা ঐ প্রাচীন বীজের সঙ্গে "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশম্" এই বীজও যোগ করিয়া দিতে বলি। যাঁহারা নিজে স্বাধীনভাবে মুখে বলিয়া, বা চিন্তাতে ঐ বীজ সকল উচ্চারণ পূর্ব্বক উহাকে সম্মুখে রাখিয়া, উত্তমরূপ তাঁহার আরাধনা করিতে পারেন, তাঁহারা তাহাই করিবেন, আর যাঁহারা সেরূপভাবে আরাধনা করিতে পারেন না—তাঁহাদের প্রথম শিক্ষার জন্য বা চিরদিনের জন্যই পুস্তক অবলম্বনে আরাধনা করা উচিত। কিন্তু স্বাধীনভাবে প্রার্থনা করিবেন। আরাধনা বাদ দিয়া শুদ্ধ প্রার্থনা করিলে বা আরাধনার সঙ্গে প্রার্থনা, উদ্বোধন, উপদেশ সকল জড়াইয়া এক উপাসনা করিলে আত্মার পূর্ণ বিকাশ হইবে না। আরাধনা ভিন্ন কখনও আত্মার পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। আরাধনা বাদ দিলে তাহাকে এক-পেশে হইতেই হইবে, তিনি যতই কেন ধর্ম্মসাধন করুন না। তাঁহার খুব ধর্ম্মভাব বাড়িতে পারে, কিন্তু তাঁহার আত্মার পূর্ণ বিকাশ হইবে না। আত্মার সকল দিক বিকাশের জন্য আরাধনাই প্রকৃষ্ট উপায়; এবং মতেও স্থির থাকিবার এক প্রধান সহায়। আরাধনা দ্বারাই ধর্ম্মজীবন বাড়ে। আর সকল সাধনে ধর্ম্মভাবাদি বাড়িতে পারে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ জীবন বাড়িবার পক্ষে আরাধনাই একমাত্র উপায়। তাঁহার স্বরূপ জীবনে উপভোগ করিতে পারিলেই জীবনের বিকাশ হয়। যখন আমি মহর্ষির মুখে এই উপদেশ শুনিলাম, তখনই আমি দিব্যজ্ঞানে দেখিলাম যে,

ইহাতেই মহর্ষি এখনও ব্রাহ্মধর্ম্মকে চিরজীবনের সম্বলরূপে ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছেন। তাঁহার উপদেশে এক দিকে যেমন দৃঢ়তা দেখা যায়,—নিত্য "সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্" বীজ উচ্চারণ করিতেই হইবে—অপরদিকে খুব উদার ভাব। পুস্তক অবলম্বনেই হউক বা স্বাধীনভাবে মুখে বলিয়াই হউক আরাধনা করিবে।

আরাধনাতে স্বরূপ সকল কি ভাবে বা কোন্‌টীর পর কোন্‌টী এবিষয়ে সাধকের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। পুস্তক অবলম্বনে সাধন করিলে, তাহা ত বাঁধাই আছে, তবে নিজে যখন করিবেন তখন পূর্ণ স্বাধীনভাবে করিবেন। কিন্তু নিত্য সাধনে যেন একই ভাব বা শৃঙ্খলা থাকে। যাহা হউক আরাধনা সকলকেই করিতে হইবে। যেমন ঈশ্বর প্রীতি, তেমনই তাঁহার প্রিয় কার্য্য করা চাই। তুমি দিবারাত্রি ঈশ্বর ধ্যানধারণাতে কাটাইতেছ, আর যদি তাঁহার পুত্র কন্যার সেবার প্রয়োজন হয় তাহাতে মন যাইতেছে না, তবে জানিবে তাহা প্রীতি নয়, তাহা তোমার আধ্যাত্মিক এক প্রকার জড়তা। ইহা দ্বারা তোমার ধর্ম্ম-জীবন বাড়িবে না। অতএব যদি ধর্ম্মজীবন বাড়াইতে চাও, এই প্রীতি ও প্রিয় কার্য্যের সাধনে নিযুক্ত থাক।

এ পথ বড়ই পিচ্ছিল। যদি উঠিতে না পার, দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না, নিশ্চয় পড়িয়া যাইবে। তাই সর্ব্বদা প্রাণপণে চেষ্টা করিবে, যাহাতে অগ্রসর হইতে পার। পিতা হাত বাড়াইয়া রহিয়াছেন, তুমি এক পা বাড়াইতে না বাড়াইতে—এক পা অগ্রসর হইবার জন্য পা তুলিলেই—পিতা তোমাকে হাত বাড়াইয়া ধরিয়া লইবেন। এই রূপেই সমুদয় বিশ্বাসী জীবন-পথে অগ্রসর হইয়াছে। আহা! কতজন নিজের উপর নির্ভর করিতে গিয়া, ও কতজন এপথ ছাড়িয়া দিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। দেখিও যেন আমরা এপথ ছাড়িয়া দিয়া বিনাশের পথে যাইয়া না পড়ি। দেখ দেখি কতজন এ বৎসরে মারা গিয়াছে, অন্নজলের জীবনে যাহারা মারা গিয়াছে তাহাদিগকে আজ স্মরণ কর, তাহাদের আত্মার জন্য প্রার্থনা কর, আর যাহারা অন্নজলের জীবন লইয়া ধর্ম্ম জীবনে মারা গিয়াছে, তাহাদের জন্য কি আজ শোক করিবে না? তাহাদের আত্মার জন্য কি আজ প্রার্থনা করিবে না? আজ তাহাদেরই জন্য বিশেষ রূপে প্রার্থনা কর। ঈশ্বর সেই আত্মাদিগকে সুপথে আনিয়া পুনরায় নবজীবন দান করুন। যেন আগামী বৎসর তাহারা আসিয়া ধর্ম্ম-জীবনে অন্ততঃ ছয় মাস জীবিত ছিল, এই হিসাব দেখাইতে পারে।

বাহিরের খাতায় উঠুক বা না উঠুক, দেখ পরমেশ্বরের খাতায় কতজন এবার নবজীবন পাইয়াছে, কত জনের পৃথিবীতে ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হইয়াছে; এই ত বর্ষ শেষে আলোচনার বিষয়। কত টাকা আয় হইয়াছে কত ব্যয় হইয়াছে, কত কাজ হইয়াছে কত রিপোর্ট হইয়াছে এ হিসাব কর বা না কর তাহার জন্য ভাবি না; কিন্তু ধর্ম্ম-জীবন কত বাড়িয়াছে তাহাই দেখ। নিজের এবং পরের অনন্ত জীবন কতটা বাড়িল তাহাই দেখ, এবং কত নূতন জীবন আসিল তাহাই দেখ। নবজীবন দাতা ঈশ্বর আমাদের নিকট এই জীবন উজ্জ্বল করুন।*

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

তৃতীয় পত্র।

১৬ই অগ্রহায়ণের তত্ত্ব-কৌমুদীতে প্রকাশিত "অভ্রান্ত গুরুবাদ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম" শীর্ষক আমার পত্রের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল ১৬ই পৌষের তত্ত্ব-কৌমুদীতে আমি তাহার প্রত্যুত্তর দিয়াছি। তাহার পর আবার ভিন্ন প্রণালীর কোন কোন আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, এই পত্রে তাহার যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

১। কেহ কেহ মনে করেন ঈশ্বর-প্রত্যাদেশ অভ্রান্ত বটে, কিন্তু মানুষ প্রত্যাদেশের আধার মাত্র সুতরাং সে কিরূপে অভ্রান্ত হইবে? তাঁহারা এইরূপ বুঝেন, যেমন ঈশ্বরবাণী কিঞ্চিৎ তরল পদার্থ এবং গুরু একটী কঠিন ঘট, তরল পদার্থ ঘটে আছে, ইহাতে ঘট যেমন তরল হয় না, সেইরূপ মানুষে ঈশ্বরবাণী থাকিলেই মানুষ কখনও অভ্রান্ত হয় না। কথাটার পরিষ্কার ভাব এই যে ঘটেতে তরল পদার্থ থাকিলেই ঘট যেমন তরল হয় না, তরলতার আধার মাত্র হয়, তেমনি মানুষেতে অভ্রান্ততা থাকিলেই মানুষ কখনও অভ্রান্ত হয় না, অভ্রান্ততার আধার মাত্র হয়। ঘটের সহিত জলের এবং ঈশ্বরবাণীর সহিত মানবাত্মার আধার আধেয় সম্বন্ধের যে সমতা কোথায় তাহা স্থূল বুদ্ধিতেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমার মনে হয় ঈশ্বর-বাণী প্রাণে প্রাণে না বিশ্বাস করিয়া কেবল তর্কের অনুরোধে মানিয়া লইলে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদেরও এরূপ ভ্রম উপস্থিত হইবে। ঈশ্বর বাণী একটী চৈতন্য-বস্তু, মানুষও একটী চৈতন্য-বস্তু, ইহারা উভয়ই স্বজাতি ও সমধর্ম্মী, জল একটী তরল বস্তু, ঘট একটী কঠিন বস্তু এবং ইহারা উভয়ই বিজাতি ও অসমধর্ম্মী, সুতরাং ইহাদিগকে উপমান উপমেয় করিয়া প্রমাণ প্রয়োগ করিলে "স্বতঃই ভ্রমপ্রমাদযুক্ত সিদ্ধান্ত প্রসূত হইবে। একে ত জড়ের সহিত চৈতন্য বস্তুর দৃষ্টান্ত খাটে না, যদিও অপার্য্যমানে জড়ীয় দৃষ্টান্ত ব্যবহার করিতে হয়, কিন্তু জলও ঘটের দৃষ্টান্ত একেবারেই অকর্ম্মণ্য। ব্রহ্মসঙ্গীতে আছে "মিসে নদী জলধিতে হয় একাকার" ইহাও মানব-চৈতন্যের সহিত পূর্ণ-চৈতন্য মিলনের ঠিক দৃষ্টান্ত নহে। একটী দৃষ্টান্ত দিতে আমার ইচ্ছা হয়। অন্ধকার যতই গভীর হউক না কেন, তাহার মধ্যেও কিঞ্চিৎ আলো থাকেই থাকে কিন্তু সে আলো অতি ক্ষীণ এবং ঘোরতর তমসাবৃত, কৃষ্ণাই-

* বর্ষশেষ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় কর্তৃক পঠিত।

নীর অর্দ্ধরাত্রে চন্দ্রমা যখন তাহার উপর আপনার জ্যোৎস্না রাশি ঢালিয়া দেয়, তখন কি আর সেই তমসাবৃত ক্ষীণ আলোকের সহিত সুনির্ম্মল চন্দ্র কিরণের আধার আধেয় সম্বন্ধ থাকে? সেইরূপ ঈশ্বরবাণীরূপ চৈতন্য বস্তু যখন মানুষরূপ চৈতন্য বস্তুতে প্রকাশিত হন তখন আর উভয়ের আধার আধেয় সম্বন্ধ থাকে না। মানুষের তখনকার যাহা কিছু সমস্তই ঈশ্বরের এবং সে সমস্তই অভ্রান্ত। এই বিশ্বাসটুকু না থাকিলে আমার মতে ধর্ম্ম থাকে না।

২। কেহ কেহ বলিয়াছেন "কোন কথা কিম্বা কোন বিষয় অভ্রান্তরূপে জানিলেই যদি জ্ঞাতাকে অভ্রান্ত বলা হয় তবে ত ৩ বৎসরের শিশুকেও অভ্রান্ত বলিতে হয়।" এইরূপ দৃষ্টান্ত ব্যবহার করিতে দেখিয়া মনে হয় তাঁহারা বুঝি আলোচ্য বিষয় ভুলিয়া গিয়াছেন। বালক হাত পা চিনে কিম্বা গাভী আপনার বৎস চিনে, এইরূপ জানা চেনা লইয়া অভ্রান্ত গুরুবাদের প্রবন্ধ আরম্ভ হইয়াছে কি? দুজ্ঞেয় ধর্ম্মপথে ঈশ্বর প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া যিনি শিষ্যকে তদনুযায়ী উপদেশ দান করেন তাঁহাকেই অভ্রান্ত গুরু বলা হইয়াছে। এবিচারে উদ্দেশ্যকে দূরে রাখিয়া কেবল শব্দার্থ ধরিয়া বাগ্‌জাল বিস্তার করা নিষ্ফল। কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ঈশ্বর বাণী কয়টা শুনিলে অভ্রান্ত গুরু হওয়া যায়? ঈশ্বরের সব বাণীই শুনিতে হয় কি দু চারিটা শুনিলেই হয়? ইহার উত্তর এই যে তাঁহার অনন্ত ভাব সমগ্র ধারণা করিতে কে পারে? কিন্তু তাঁহার দশটী প্রত্যাদেশ শুনিয়াও অভ্রান্ত গুরু হওয়া যায়, দশ হাজার শুনিয়াও অভ্রান্ত গুরু হওয়া যায়, যদি গুরু কেবল মাত্র ঈশ্বর বাণী দ্বারাই শিষ্যকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় সহস্র ভুল থাকিলেও তিনি অভ্রান্ত গুরু। বালকের হাত পা চেনারূপ অভ্রান্ত সত্যকে ঈশ্বর প্রত্যাদেশ বলা হয় নাই। পুরুষ অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্য, প্রকৃতি অর্থাৎ জড়ের সহিত যখন যুক্ত হয়, তখন সেই জড়াশ্রিত চৈতন্যকে জ্ঞান বলে, উহা চিদাভাস মাত্র। জ্ঞান ইন্দ্রিয়াধীন, জড়াধীন। একটী আলো যখন নানা রঙ্গের কাঁচের আবরণে আচ্ছাদিত থাকে তখন যেমন বাহিরে নানারূপ আলোর প্রকাশ হয় কিন্তু তাহার কিছুই বিশুদ্ধ আলো নহে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়পথে প্রকাশিত বিচিত্র-বিষয়ে নিবিষ্ট আমাদের এই জ্ঞানও বিশুদ্ধ চৈতন্য নহে। জড়াতীত ও ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া আত্মা যখন স্বস্বরূপে অবস্থান করে তখনই সে নির্ম্মল হয় এবং অভ্রান্ত রূপে ঈশ্বর প্রত্যাদেশ লাভের অধিকারী হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় জ্ঞানী ও কর্ম্মী পৃথিবীতে কয় জন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? সমগ্র ভারত-মণ্ডল পাদদলে ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার, সমগ্র ভারতের বৌদ্ধ ও হিন্দু পণ্ডিতবর্গের সহিত বিচার, কত গ্রন্থ প্রণয়ন, যে দিকে দৃষ্টিপাত কর ইহাঁর জ্ঞান ও কর্ম্মের সীমা নাই, তিনি তাঁহার "বিবেক চূড়ামণি" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন "সমাধির মধ্য দিয়া ভিন্ন চিৎব্রহ্মের বিকাশের অন্য পথ নাই।" ইহা আরাম প্রিয় অলস অকর্ম্মণ্য লোকের কথা নহে কিন্তু মূর্ত্তিমান জ্ঞানী ও কর্ম্মী শঙ্করাচার্য্যের উক্তি। আমরা আদেশ কাহাকে বলি এবং কোন্ অবস্থায় মানুষ নির্ম্মল আদেশ লাভের অধিকারী হন তাহা সংক্ষেপে বলিলাম। যাহা কিছু সত্য তাহাকেই ঈশ্বরাদেশ বিশ্বাস করা এবং প্রকৃত ঈশ্বরাদেশ লাভ করা এক কথা নহে। আদেশের অনেক অপব্যবহার হওয়াতে ব্রাহ্মসমাজে আদেশ-ভীতি উপস্থিত হওয়া এবং আদেশকে বিদ্রূপের বস্তু মনে করা অস্বাভাবিক নহে, এই জন্যই আমরা কিরূপ আদেশবাদ মানি তাহা কিছু বলিতে হইয়াছে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে—**মানবাত্মায় ঈশ্বরের নির্ম্মল আদেশ প্রকাশিত হয় এবং মানুষ তাহা অভ্রান্ত রূপে ধরিতে পারে** ইহা সমস্ত ধর্ম্মের মূল মন্ত্র, যাঁহারা এই মূল মন্ত্র বিশ্বাস না করেন তাঁহাদের সঙ্গে কোন বিচারের প্রয়োজন নাই।

৩। কেহ কেহ বলেন, "মানুষ কখনই যে অভ্রান্ত আদেশ ধরিতে পারে না তাহা নহে, কখনও পারে কখনও নাও পারে।" এ কথা স্বীকার করিলে মানুষের অপূর্ণতাকে অভ্রান্ত আদেশ লাভের প্রতিবন্ধক বলা যায় না, কেননা মানুষ ত চির অপূর্ণ তবে আর কখনও আদেশকে কিরূপে অভ্রান্তরূপে ধরিবে? সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, মানুষ কখনও কখনও এরূপ নির্ম্মল হয় যে, তখন অভ্রান্ত বাণী ধরিতে পারে। এক্ষণ সেরূপ নির্ম্মল অবস্থা যে জীবনে স্থায়ী হইতে পারে না, তাহার কোন যুক্তি ত নাই। **অভ্রান্ত মানুষ নিয়া আমরা কোন আলোচনা** করি নাই, কিন্তু এক্ষণ কথা প্রসঙ্গে বলিতে হইল, "মানুষ অভ্রান্ত হইতে পারে" এ কথা যদি বলি, তবে তাহা কি ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী হয়? অথবা যুক্তি দ্বারা কেহ প্রমাণ করিতে পারেন যে মানুষ অভ্রান্ত হইতে পারে না? ভ্রান্তি আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা নহে, দেশ ও কালের আবরণ হইতে ভ্রান্তি জন্মে, আত্মার নিকট যদি এ আবরণ উন্মুক্ত হয়, তবে আপনার ভিতরে সে সমস্ত তত্ত্ব দেখিতে পাইবে আশ্চর্য্য কি? তখন তাহার ভ্রান্তিই বা হইবে কেন? আমরা চিরকাল উত্থান পতন মানি না, ইহা অতিক্রম করিয়া নিরাপদ স্থান আছে বিশ্বাস করি। এখন যে সমস্ত পাপ তাপ রহিয়াছে সম্পূর্ণ ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চিরকালের জন্য নিরাপদ অবস্থায় চলিয়া যাইতে আশা রাখি। ভ্রান্তিও একরূপ পাপ, ইহাও জন্মের মত চলিয়া যাইবে, এই সমস্ত চলিয়া গেলেই জীব মুক্ত হইল, আত্মার পরিত্রাণ হইল। ইহার পর অনন্ত উন্নতি আরম্ভ। পাপ ছাড়িয়া অনন্ত পুণ্যপথে ছুটিব এবং ভ্রান্তি ছাড়িয়া অনন্ত জ্ঞানের পথে ছুটিবে। চিরকাল ভ্রম থাকিলে সে জীবের আর পরিত্রাণ হইল কই? মানুষ পূর্ণ নহে, কিন্তু তাঁহার অনন্ত উন্নতি আছে। কতদূরকে অনন্ত বলে? পূর্ণ বলিলেই বা কি বুঝায়? অনন্ত উন্নতিও পূর্ণতার সীমারেখা কি কিছু নির্দ্দেশ করা যায়? আমাদের বর্ত্তমান জীবনের সীমাই কি পূর্ণ নাকি? চারিদিকে অভ্রান্ত দেখি না, অতএব অভ্রান্ত নাই এবং হইতেও পারে না, ইহা ত যুক্তি নহে। অনেকে হয় ত কাম ক্রোধ শূন্য লোক দেখেন নাই, তাঁহাদের ধারণাও এই যে, এরূপ লোক থাকিতে পারে না, যাঁহারা এক পলক চিত্ত স্থির করিতে পারেন না, তাঁহারা যদি শুনেন যে কোন

ব্যক্তি অনাহারে অনিদ্রায় একাসনে একাদশ দিবারাত্রি ব্রহ্ম-ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, হয়ত ইহাকে আরব্য উপন্যাসের গল্প মনে করিবেন। ভগবান যাঁহাকে যে অবস্থায় যতটুকু বিশ্বাস করিতে দেন, তিনি ততটুকু মাত্র করিতে পারেন, ইহাতে মানুষের কোন বাহাদুরী খাটে না এবং মানুষের গৌরব অগৌরবেরও কিছু নাই। হৃদয়ের অবস্থা এক না হইলে একের যুক্তি অন্যের প্রাণে লাগে না, তবে আলোচনা এইজন্য করিতে হয়, কথাগুলি সমবিশ্বাসীর উপকার জনক।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমার ৩টী প্রবন্ধে আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহাতে আমার এই একমাত্র লক্ষ্য যে আমার সমর্থিত বিষয়গুলি ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী নহে। সকলকে এই সকল মানিতে হইবে, তাহা আমি বলি নাই, কিন্তু যাঁহারা ইহা মানিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী কিছু করিলেন না ইহাই আমি বলিয়াছি।

নিবেদক
শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

অভিনন্দন পত্র।

হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন
শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু,
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি মহাশয়,
সমীপেষু।

মহাশয়!

আপনি স্বাস্থ্যের উদ্দেশে কিছুদিনের জন্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইয়োরোপ খণ্ডে গমন করিতেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম অবধি অদ্য পর্য্যন্ত আর কখনই আপনি, এত দীর্ঘকালের জন্য, আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। আমরা সর্ব্বদাই আপনার সৎপরামর্শ, অক্লান্ত উৎসাহ ও অকৃত্রিম অনুরাগের দ্বারা স্বীয় স্বীয় কার্য্যে উৎসাহিত হইয়াছি। বলিতে কি, পরমেশ্বরের কৃপায় আপনার উৎসাহ, অনুরাগ ও সদ্বিবেচনার গুণেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অনেক পরিমাণে কৃত-কার্য্যতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; সুতরাং আপনাকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালের জন্য বিদায় দিতে, আমাদের হৃদয় বিষাদে ম্লান হইতেছে। কিন্তু অপর দিকে আশা হইতেছে যে, আপনি নিজ স্বাস্থ্যে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া আরও অনেক বৎসর উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে পারিবেন; এবং বহুদিনের পর ইয়োরোপ খণ্ডে পুনরায় পদার্পণ করিয়া, নূতন চিন্তা ও নূতন কার্য্যোৎসাহের সংস্রবে আসিয়া, হৃদয়ে অনেক নূতন ভাব সঞ্চয় করিতে পারিবেন, এবং তদ্দ্বারা আপনার প্রিয় ব্রাহ্মসমাজ ভবিষ্যতে আরও উপকৃত হইবেন। আপনার জীবনে যে সর্ব্বতোমুখীন উন্নতির ভাব আমরা এতদিন লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, তাহা আরও বর্দ্ধিত হইবে, এবং আপনি আরও দক্ষতার সহিত ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে সমর্থ হইবেন। আপনার চরিত্রের যে কমনীয়তা, যে অকৃত্রিম বিনয়, যে হৃদয়ের প্রশস্ততা ও উদারতা এবং যে আড়ম্বরশূন্য ঈশ্বর-প্রীতির গুণে, আপনি এতদিন আমাদিগকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বিদেশে যাঁহাদিগের মধ্যে বাস করিবেন, তাঁহাদিগকেও মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনার প্রভাবে অনেক হৃদয় ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রীতিমান্ হইবে।

এই সকল আশা হৃদয়ে লইয়া, আমরা, আপনার সমবেত ধর্ম্মবন্ধুগণ, আপনাকে হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানাইয়া, প্রবাস গমনের জন্য বিদায় দিতেছি।

পরমেশ্বরত্বরায় আপনাকে নিজ স্বাস্থ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, নবোদ্যম ও নব আশা দিয়া, আমাদিগের মধ্যে পুনরায় আনয়ন করুন। আপনি আরও বহু বৎসর সুস্থ দেহে ও প্রসন্ন চিত্তে, আমাদিগের মধ্যে বাস করিয়া, তাঁহার সেবা করুন, এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

কলিকাতা, ১৭ই চৈত্র, ৬৫ ব্রাহ্মাব্দ।

আপনার ধর্ম্মবন্ধু
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় অভিনন্দন পত্রের উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সারাংশ।

বন্ধুগণ!

এই উপলক্ষে অধিক কিছু বলিতে আমার ইচ্ছা হয় না। এখন কেবল গভীর চিন্তাতে মগ্ন থাকিতেই ইচ্ছা হয়। এত ভাল বাসার কথা আপনারা আমাকে বলিয়াছেন যে, তাহা শুনিয়া এখন আমার দুর্ব্বলতার কথাই স্মরণ হইতেছে। এরূপ ভাল কথার আমি উপযুক্ত কি না এবিষয়ে বৃথা সমালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই, মনের আবেগে অনেক সময়ে অনেক উচ্চ কথা বলিয়াছি, অনেক উচ্চ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু এই চারি দিকের সংগ্রামের ভিতরে আমার অনেক সময়ে মনে হইয়াছে, ঈশ্বরের কৃপাই আমাদের একমাত্র সহায়। তাহা না হইলে আমাদের এই ব্রাহ্ম-সমাজ এত দিন জীবিত থাকিত কি না সন্দেহ। এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যখন স্থাপিত হয় সেই সময়ের কথা এখন আমার স্মৃতিপথে উদয় হইতেছে। কিন্তু এবিষয়ে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে মনে হইতেছে, কি করিতে পারিয়াছি যে জন্য আপনারা এত স্নেহের কথা বলিলেন? জীবনে অনেক কথা ছিল, অনেক করিবার ছিল, তাহার অতি অল্পই পূর্ণ হইয়াছে। ভবিষ্যতে কি হইবে, বলিতে পারি না। কিন্তু এই নিরাশার ভিতরেও আনন্দ হয়। এত ভাইভগিনীর প্রার্থনায় প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। যদিও এখন শরীর ভগ্ন, তথাপি ভবিষ্যতে ঈশ্বরের কৃপা আসিতে পারে। ঈশ্বরের কৃপা আসিলে কিনা হয়? অতি ক্ষুদ্র জীবের দ্বারাও সংসারের অনেক কাজ হয়। অনুবীক্ষণের দ্বারা কত ক্ষুদ্র জীবের অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়, তাহাদের দ্বারাও পৃথিবীর কত কার্য্য সাধিত হইতেছে।

তখন আমাদের মত অতি ক্ষুদ্র জীবের দ্বারাও যে ঈশ্বরের কার্য্য, তাঁহার অভিপ্রায়, কখন কখনও সিদ্ধ হইতে পারে ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার করুণার চিহ্ন অনেক পাইয়াছি। এখন এত লোক এত নরনারী ব্রাহ্মসমাজে দেখিয়া কত আনন্দ হয়। ইহাঁদের দ্বারা এখন কত কাজ হইতে পারে। সেই ১৮৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন আমাদের এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সূচনা হয়, সেই সময়ের কথা স্মরণ হইলে মনে হয়, নিতান্ত ঈশ্বরের কৃপাতেই আমরা যাহা কিছু করিতে পারিয়াছি। সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের চরণে সকলে প্রণাম করি। সেই সময়ে কত বিঘ্নবিপত্তি বিদ্যমান ছিল। রাত্রি ১টা ২টা পর্য্যন্ত কত কাজ করিতে হইয়াছে। যদি সেই সময়ের কথা কেহ পুস্তকাকারে লেখেন তাহা হ'লে একটা কাজের জিনিস হয়, একটা Interesting Record হয়। আশা করি কেহ লিখিবেন। সেই সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সম্পূর্ণ ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া কতিপয়মাত্র লোক কত গুরুতর কাজ করিয়াছেন। আমরা তখন জানিতাম না, ১৬ বৎসর পরে কি দাঁড়াইবে। আমরা তখন এ সকল চিন্তা মনে স্থান দিতাম না। সেই ক্ষুদ্র তরণী তাঁহারই নাম করিয়া তখন ছাড়া হইয়াছিল, এখন কত নরনারী উহার আশ্রয়ে আসিয়াছেন; কত বালক বালিকা ইহাতে আরোহণ করিয়া সুখে চলিয়াছে। যদি আপনারা নিজেদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া না যান, তাহা হইলে যাহাতে ইহারা ভাল হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে গৌরবান্বিত করে তাহারই চেষ্টা করুন।

এখন ব্রাহ্মসমাজে কত নূতন প্রশ্ন আসিতেছে, যাহা আগে ছিল না। কত নূতন Difficulties চারিদিক হইতে উপস্থিত। সেই জন্য এখন নূতন লোক চাই, নূতন উৎসাহ চাই। যাঁহারা ঈশ্বরের কৃপাতে লালিত পালিত হইতেছেন তাঁহাদের ভিতরে নূতন উৎসাহ চাই। নতুবা কিছু হইল না। এতদিন ব্রাহ্মসমাজে যাহা হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া ফল নাই। এখন যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের পুত্র কন্যারা পরে ব্রাহ্মসমাজকে যাহাতে গৌরবান্বিত করে, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। তখন কত বন্ধু রৌদ্রে বৃষ্টিতে কত কষ্ট পাইয়াছেন, তথাপি ঈশ্বরের বলে বলীয়ান হইয়া কত কাজ করিয়াছেন। এখন যাঁহারা কাজ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বলি, যত দায়িত্ব উপস্থিত হইয়াছে সেই গুলি মনে করিয়া, যাহাতে সমাজকে গৌরবান্বিত করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করুন।

Constitution এর কথা বলিয়া কোন কাজ নাই। এখন দুইটী বিষয়ে ব্রাহ্মদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। এই দুইটী বিষয়ে যদি ব্রাহ্মগণ মনোযোগী হন তাহা হইলে বিদেশ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া, তাঁহাদের উন্নতি দেখিয়া প্রাণে কত আনন্দ হইবে। সে দুইটী বিষয় এই—

১। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞানোপার্জ্জনের চেষ্টা করুন। আমরা যখন প্রথম ব্রাহ্মসমাজে আসিলাম তখন ধর্ম্মপুস্তক পড়িবার জন্য কত উৎসাহ ছিল। Parker এর পুস্তক, Newman এর পুস্তক, Miss Cabbeএর পুস্তক, এই সকল তখন আমরা কত উৎসাহের সহিত পড়িতাম। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞানোপার্জ্জনের চেষ্টা ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এখন তত দেখা যায় না। সেই ইচ্ছা ও চেষ্টা যাহাতে হয়, তাহা করা প্রয়োজন। আশা করি সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞানোপার্জ্জনের চেষ্টা যাহাতে হয়, সেই বিষয়ে কলিকাতাবাসী ব্রাহ্মগণ নূতন উৎসাহ লইয়া কার্য্য করিবেন।

২। কলিকাতাতে এত ব্রাহ্মপরিবার রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কত বালক বালিকা রহিয়াছে; বড় ইচ্ছা করে ইহাদের ভিতরে আধ্যাত্মিকতা—ধর্ম্মভাব—আসুক। ধর্ম্মভাব না হইলে কিছুই হইবে না। সেই ধর্ম্মভাব যাহাতে আসে তাহার জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন। ইচ্ছা করে যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য বলিতেই একজন নিষ্ঠাবান ঈশ্বর-ভক্ত লোক বুঝাইবে। যাহাতে তাঁহাদের নামের সহিত এই association আসিতে পারে সভ্যগণ তাহার জন্য চেষ্টা করুন। আমাদের congregation এর meetingএ যাহাতে সভ্যদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা বিকাশ হয় এই বিষয়ে একদিন আলোচনা হইয়াছিল, সকলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের কৃপার বন্যা আসিয়া আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। আমার ইহা দেখিয়া যে কেবল আনন্দ হইবে তাহা নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার দুর্ব্বলতার ভিতরে বলসঞ্চার হইবে। আর অধিক কি বলিব, আপনারা যে সকল দয়ার কথা বলিয়াছেন যেন একটুকুও তাহার উপযুক্ত হইতে পারি। আমি অতি অল্পদিনের জন্য বিদেশে যাইতেছি। একটা বিষাদের ভাবের মধ্যে মনে হইতেছে, সেই রামমোহন রায়ের বিলাত যাবার সময়ের সেই গান, যাহা এখনি গাওয়া হইল, যেন তাহার ভাব লইয়া যাইতে পারি। তাহা হইলে প্রাণে অনেক শান্তি পাইব। এই ১৬ বৎসর যে পরমেশ্বরের কৃপা দেখিয়াছি সেই পরমেশ্বর "কি স্বদেশে কি বিদেশে," সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে আছেন ইহা যেন মনে রাখিতে পারি। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু তাঁহার প্রার্থনার মধ্যে, দূরে থেকেও যে কথোপকথনের কথা বলিলেন, ইহাতে অতি গভীর ভাব—অতি মধুর ভাব নিহিত আছে। আজকাল বিজ্ঞানে টেলিফোনের তারে কথোপকথনের ব্যবস্থা করিয়াছে। এখন সেই তার পর্য্যন্ত উঠাইয়া দিয়া বিনা তারেই কথোপকথনের চেষ্টা হইতেছে। সেইরূপ হৃদয়ের প্রীতি যদি থাকে তাহা হইলে জিহ্বাতে কথা উচ্চারণ করিবার প্রয়োজন হয় না, দূরে থাকিয়াও কথোপকথন করা যায়।

গত বুধবার Executive Committeeতে আমাদের কতকগুলি কথার আলোচনা হইতেছিল। এমন উপাদেয় কথা হইতেছিল, যে কেমন একটা মধুময় ভাব উপস্থিত হইল, সেই স্থান ছাড়িয়া আসিতে কষ্ট হইল। আমাদের ব্রাহ্মসমাজের স্থাপয়িতা সেই রামমোহন রায়ের কথা, তাঁহার বিদেশে যাবার কথা, Miss Collet এর কথা, এই সকল কথা স্মরণ করিয়া হৃদয়ে কেমন এক প্রকার ভাবের আবির্ভাব হইল। মনে হইল পরের বুধবারে কতদূরে থাকিব। দূরে থাকিয়াও আপনাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন থাকিব না। ঈশ্বর করুন যেন ফিরিয়া আসিয়া

ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি দেখিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারি। ঈশ্বর করুন যেন ফিরিয়া আসিয়া আধ্যাত্মিকভাবে ব্রাহ্ম সমাজকে প্লাবিত দেখিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের দুর্ব্বলতার ভিতরে বলসঞ্চয় করিতে পারি। ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে; তাঁহার আলোকে আমরা সর্ব্বদা চলিতেছি। এতগুলি লোক আমরা তাঁহার দিকে চাহিয়া প্রার্থনা করি, যেন সেই প্রীতি পবিত্রতা লাভ করিয়া আমরা ইহকালে সুখী হই, পরকালে অনন্ত জীবনের জন্য উপযুক্ত হইয়া তাঁহারই পথে চলিতে পারি। দয়াময় পরমেশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন।

উপাখ্যানে পড়িয়াছি, Israelites দের বিপদে পরমেশ্বর তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অরণ্যেও তাহাদের জন্য অন্নপানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেইরূপ আমাদের বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে ঈশ্বর আমাদের হৃদয় সরস করুন। তিনিই আমাদের অন্নপানের ব্যবস্থা করুন। বন্ধুগণ, এখন বিদায় গ্রহণ করিতেছি। যদি ফিরিয়া আসিয়া দেখি ব্রাহ্মসমাজ নূতনভাবে কাজ করিতেছেন তাহা হইলে প্রাণে আনন্দলাভ করিয়া নিজকে কৃতার্থ বোধ করিব। ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। আমাদিগকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আমাদের চির কল্যাণ বিধান করুন।

ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্ম-বালকদিগের বোর্ডিং—একজন মহিলা বোর্ডিংএর কার্য্যে নিয়মিতরূপে সাহায্য করিতেছেন; ক্ষুদ্র বালকগণকে দেখিবার ভার এবং রোগীদিগকে শুশ্রূষা করিবার ভার বিশেষভাবে ইঁহার উপরে দেওয়া হইয়াছে। আগামী জুন মাস হইতে যাহাতে বোর্ডিংএর কার্য্যপ্রণালীর বিশেষ উন্নতি করিতে পারা যায়, বোর্ডিংএর কর্ত্তৃপক্ষ তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হইয়াছেন।

বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের—একত্রিংশ উৎসব নিম্ন-লিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে।

১০ই মার্চ্চ—শনিবার অপরাহ্নে হপ্তাবাজারে বাবু বিপিনচন্দ্র পাল বক্তৃতা করেন। সায়ংকালে মন্দিরে বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

১১ই মার্চ্চ—প্রাতঃকালে বরাহনগর ইনষ্টিটিউট্ হলে উপাসনা হয়। বাবু কেদার নাথ রায়ের উপদেশ প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। সায়ংকালে ঐ হলে উপাসনা হয়, বাবু বিপিন চন্দ্র পাল আচার্য্যের কার্য্য করেন।

ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজের—সপ্তত্রিংশ উৎসব নিম্ন-লিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে।

২২শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার—সায়ংকালে বাবু ভুবনমোহন সেন বি,এ, উদ্বোধন সূচক উপাসনা করেন।

২৩শে মার্চ্চ—প্রাতঃকালে উপাসনা; আচার্য্য বাবু কৈলাশ চন্দ্র বাগ্‌চি। তাঁহার উপদেশের বিষয় "ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্বে অবিশ্বাসই সকল পাপের মূল।" বাবু বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থ হইতে বচন ও তাহার ব্যাখ্যা পাঠ করেন। সায়ংকালে উপাসনা; আচার্য্য বাবু ভুবনমোহন সেন; তাঁহার উপদেশের বিষয় "প্রীতিঃ পরমসাধনম্।"

২৪শে মার্চ্চ—প্রাতঃকালে উপাসনা; আচার্য্য বাবু ভুবন মোহন সেন। তাঁহার উপদেশের সার এই—"যেমন অন্ন আছে জানিলেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না, তেমনি আধ্যাত্মিক সত্য সকল জানিলেই আত্মার ক্ষুধার তৃপ্তি হয় না। যেমন অন্ন গ্রহণ করা প্রয়োজন, তেমনি আধ্যাত্মিক সত্য সকলকেও জীবনে পরিণত করা প্রয়োজন।" সায়ংকালে বাবু ভুবনমোহন সেন উপাসনা করেন।

২৫শে মার্চ্চ—প্রাতঃকালে বাবু ভুবনমোহন সেন উপাসনা করেন। তাঁহার উপদেশের বিষয়—"কিমাত্মনা যো ন জিতেন্দ্রিয়োভবেৎ।" মধ্যাহ্নে দরিদ্র ও রুগ্নদিগকে চাউল ও অর্থ বিতরণ করা হয়। সায়ংকালে বাবু ভুবনমোহন সেন উপাসনা করেন, ও "ঈশ্বর সর্ব্বদা নিকটে আছেন" এ বিষয়ে উপ-দেশ দেন।

নামকরণ—ফরিদপুরের বাবু বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তীর প্রথম (পুত্র) সন্তানের নামকরণ উপলক্ষে ২৪শে মার্চ্চ উপাসনা হয়। বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগ্‌চি আচার্য্যের কার্য্য করেন। বালকের নাম করুণাবিহারী ও অমিয় কুমার রাখা হইয়াছে।

বিবাহ—৭ই এপ্রিল সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বাবু মহেশ চন্দ্র ভৌমিক বি,এর সহিত আমাদিগের বন্ধু বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসুর প্রথমা কন্যা কুমারী মৃণালিনী বসুর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই বিবাহ ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করা হইয়াছে। পরমেশ্বর বর কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

গত ১০ই এপ্রিল মঙ্গলবার বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভেটা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, বির সহিত বরিশাল জেলার অন্তর্গত গৈলা নিবাসী পরলোকগত বৈকুণ্ঠচন্দ্র সেনের ৪র্থা কন্যা শ্রীমতী সরলা সেনের শুভবিবাহ ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। ঐ বিবাহ ১৮৭২ সনের ৩ আইন অনুসারে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে।

প্রচার—পশ্চিম প্রচার যাত্রী দলের নিম্নলিখিত কার্য্য-বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

১৯শে মার্চ্চ বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ও বাবু শ্রীরজ বিহারী লাল বাঁকিপুরে উপস্থিত হন। ২০শে মার্চ্চ গুরুদাস বাবু ও ভাই সুন্দর সিংহ মজফঃরপুর অভিমুখে গমন করেন। তথায়

পৌঁছিয়া বাবু কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস ও বাবু গণেশ প্রসাদের বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনা করেন। পরদিন তাঁহারা মতিহারীতে উপস্থিত হন। ডেঃ মাজিষ্ট্রেট বাবু প্রসন্নকুমার দাসের ও বাবু উমাচরণ ঘটকের বাটীতে উপাসনা, উপদেশ ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা হয়। ২২শে ও ২৩শে সাধারণের জন্য সভা আহূত হয়। ২৩শে শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ "সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম" বিষয়ে উর্দ্দূ ভাষায় বক্তৃতা করেন। ২৫শে রবিবার উপাসনা হয়। উপদেশের বিষয়—"কি প্রকারে পরমেশ্বরকে প্রীতি করিতে ও তাঁহার সেবা করিতে হয়।" ২৬শে প্রাতঃকালে বাবু প্রসন্নকুমার দাসের বাটীতে উপাসনা হয়। উপদেশের বিষয় "আধ্যাত্মিক জীবন লাভ।" ২৬শে তাঁহারা আরা অভিমুখে যাত্রা করেন। ২৭শে তথায় উপস্থিত হন। ২৮শে বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ও বাবু শ্রীবঙ্ক বিহারীলাল বেনারস যাত্রা করেন; শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ অসুস্থ হওয়াতে আরাতেই থাকেন। বেনারসে বাবু জগন্নাথ প্রসাদ গুপ্তের বাটীতে উপাসনা ও ধর্ম্ম প্রসঙ্গ হয়। বেনারসে ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটী গৃহের অভাব অনেক দিন হইতে অনুভব করা যাইতেছিল; ঈশ্বরের কৃপায় সে অভাব পূর্ণ হইবার উপায় হইয়াছে। সকলেই শুনিয়া আনন্দিত হইবেন, বাবু জগন্নাথ প্রসাদ গুপ্ত তাঁহার ৩৫০০৲ টাকা মূল্যের একটী বাড়ী সামাজিক উপাসনার জন্য উপযুক্ত ট্রষ্টিগণের হস্তে সমর্পণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। সেখানে একজন স্থায়ী প্রচারকের থাকিবার বন্দোবস্তও করা হইবে।

শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু—বিগত ৪ঠা এপ্রিল বুধবার "মির্জাপুর" নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি লণ্ডনে কিছুদিন থাকিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য জর্ম্মাণি দেশে গমন করিবেন। বিগত ৩০শে মার্চ্চ ১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে তাঁহাকে বিদায় সূচক অভ্যর্থনা করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ সমবেত হইয়াছিলেন। সর্ব্বাগ্রে "কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি" এই সংগীতটী করা হইল; তারপর শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত একটী প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা করিলেন। সাঃ ব্রাঃ সমাজের সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য সমাজের সভ্যগণের অভ্যর্থনা সূচক অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন। ইহার পর আনন্দমোহন বাবু ব্রাহ্মসমাজকে নানারূপে যে সেবা করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কিছু বলেন; তিনি যখন আনন্দমোহন বাবুর ভগ্নস্বাস্থ্যের কথা হৃদয়স্পর্শী ভাষায় উল্লেখ করিলেন তখন অনেকেই অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তৎপর আনন্দমোহন বাবু উত্তরে যাহা বলিলেন, তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

ইহার পর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত নিম্নলিখিত সংগীতটী হইল—

কাফি—একতালা।

প্রাণ কাঁদে আজ ছাড়িতে তোমায় বিদায় কি দিতে পারি?
হৃদয় ডুবিছে বিষাদ-সলিলে নয়নে আসিছে বারি।
প্রথম যৌবনে দিবে দেহ মন পর-হিত-ব্রত সাধনে,
ভগ্ন রুগ্ন দেহ আজ লয়ে যাও প্রবাসে পরের সদনে।
ঘোর সিন্ধু জলে তরণী ভাসালে, চলিলে ছাড়িয়ে আলয়ে;
তোমার সুগন্ধ, স্মৃতির আনন্দ, রহিল পড়িয়া হৃদয়ে।
কি এক আলোক যেন দূরে যায়, আসিছে আঁধার ঘনায়ে;
শূন্য ঘরে মোরা রহিনু জাগিয়া তোমায় প্রবাসে পাঠায়ে।
বলী হ'য়ে এস, সুখী হ'য়ে এস, লয়ে নব ভাব-রাশি;
যাঁহারি সেবাতে ভগ্ন এই তনু, তিনি তব সহ-বাসী।
বিদেশে প্রবাসে পড়িলে নিরাশে স্মরিও এ প্রেম-কাহিনী;
জেনো তব তরে বিভুর দুয়ারে কাঁদিতেছে ভাই ভগিনী।

উৎসব—মেদিনীপুর হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের ৪৮শ ব্রহ্মোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখানে আগমন করিয়া উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করেন।

৫ই ফাল্গুন শুক্রবার—উৎসবের উদ্বোধন। শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপাসনা ও উপদেশ অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ভগবানকে ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করিলে তবে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। মুখের চাওয়া নয়, কিন্তু প্রাণের ব্যাকুল প্রার্থনা। রাজপুত্র বুদ্ধদেব রাজসিংহাসন পায়ে ঠেলিয়া, যেরূপ ব্যাকুল হইয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। সেইরূপ ব্যাকুলতা চাই। আচার্য্য মহাশয় এই ভাব সকলের হৃদয়ে জাগাইয়া দেন।

৬ই ফাল্গুন শনিবার—রাত্রিতে সমাজ মন্দিরে উপাসনা হয়। বাবু তারকচন্দ্র ঘোষ উপাসনার কার্য্য করেন। উৎসব ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইলে দীন, হীন, কাঙ্গাল হইয়া তাঁহার দ্বারে আঘাত করিতে হইবে। এই ভাবে উপদেশ দেন।

৭ই ফাল্গুন রবিবার—অদ্য সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব এই মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিররূপ বীজ বপন করিয়া যান ও তৎপরে ভক্তি-ভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ইহার মূল দেশে জল সেচন করিয়া সযত্নে ইহাকে বর্দ্ধিত করেন। আচার্য্য মহাশয় তজ্জন্য সেই ইহ পরলোক বাসী আত্মাদিগের মঙ্গল কামনা করিয়া সর্ব্ব-সিদ্ধিদাতা বিধাতার চরণে কৃতজ্ঞতা জানান। তাঁহার উপাসনা ও উপদেশে সকলের হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল।

৮ই ফাল্গুন সোমবার—অন্ধ, আতুর ও দরিদ্রদিগকে বস্ত্র ও পয়সা বিতরণ করা হয়।

৯ই ফাল্গুন মঙ্গলবার—অদ্য নগর সংকীর্ত্তন। কীর্ত্তন দল পাহাড়ীপুর ব্রাহ্ম সমাজ হইতে মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে বাহির হন। নগরের বড় বড় বাজারের মধ্য দিয়া উৎসাহের সহিত সুমধুর ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ফিরিয়া আসেন।

১০ই ফাল্গুন বুধবার—অদ্য পাহাড়ীপুর ব্রাহ্ম সমাজের

উৎসব। প্রাতে বাবু তারকচন্দ্র ঘোষ উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। সন্ধ্যার সময় আবার উপাসনার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রদ্ধেয় বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপাসনা ও উপদেশ সকলের হৃদয়কে বিশেষরূপ আকৃষ্ট করিয়াছিল।

১১ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার—রাজা কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র মহাশয়ের বাটীতে পারিবারিক উপাসনা হয়। শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন, এবং স্ত্রীলোকদিগের জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দেন।

১২ই ফাল্গুন শুক্রবার—স্থানীয় মুনসেফ বাবু জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে পারিবারিক উপাসনা হয়, এবং পরে প্রীতিভোজন হয়। বাবু অভয়চরণ বসু উপাসনার কার্য্য করেন।

১৩ই ফাল্গুন শনিবার—অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় মেদিনীপুর ব্রাহ্ম সমাজ গৃহে "ধর্ম্ম মতের বিরোধ ও সামঞ্জস্য" বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

১৪ই ফাল্গুন রবিবার—প্রাতে বাবু অভয়চরণ বসুর কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে উপাসনা হয়। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। বালকের নাম সবল কুমার রাখা হইয়াছে। রাত্রিতে সমাজ মন্দিরে উপাসনা হয়। বাবু তারকচন্দ্র ঘোষ উপাসনার কার্য্য করেন।

১৫ই ফাল্গুন সোমবার—গোপগিরি নামক সুরম্য স্থানে উপাসনা হয়। স্থানীয় কয়েকজন ব্রাহ্ম ও মহিলাগণ সম্মিলিত হইয়া প্রকৃতির নিভৃত কুঞ্জে লীলাময় পরম প্রভুর অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়া প্রাণ মন কৃতার্থ করেন। শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা করেন, তাঁহার উপাসনা অতি হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। প্রকৃতির উৎস খুলিয়া প্রেমময় পরমেশ্বর তাঁহার সন্তানদিগকে প্রতি বৎসর উৎসবান্তে অপূর্ব্ব লীলা দর্শন করাইয়া কৃতার্থ করেন।

দান—চাইবাসা ব্রহ্মমন্দিরের জন্য দান—

শ্রীমতী বিধুমুখী রায় চৌধুরী	৫৲
শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য	১৲
ডাঃ নীলরতন সরকার	২৲
শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মজুমদার	১
মিসেস্ ইউ, এন, মিত্র	২৲
শ্রীযুক্ত দুকড়ি ঘোষ	১৲
	১২৲

চেরাপুঞ্জি ব্রহ্মমন্দির ও প্রচারকাবাসের জন্য দান—

শ্রীমতী অম্বিকা দেবী, কলিকাতা	৫৲
জষ্টিস্ চন্দ্রমাধব ঘোষ (দ্বিতীয় বার)	১০৲
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দত্ত, বিজনী	৫৲
ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় (দ্বিতীয় বার)	২৲
শ্রীযুক্ত দীননাথ দাস, শিলং	২৲
„ উমাচরণ দত্ত, „	১৲
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদয়াল রায়, সুনাম গঞ্জ	১৲
„ দুকড়ি ঘোষ, কলিকাতা	১৲
	২৭৲
পূর্ব্বে স্বীকৃত	৪০৩৮৶১০
মোট	৪৩০৮৶১০

বরাহনগরস্থ কোন বন্ধু কোনও অনুষ্ঠান উপলক্ষে মিশন ফণ্ডে ১৲ দান করিয়াছেন।

বাগআঁচড়া শঙ্করপুরের শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র হালদার মল্লিক তাঁহার মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে মিশন ফণ্ডে ১৲ দান করিয়াছেন।

মাণিকদহের বাবু বিপিনবিহারী রায় তাঁহার পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে মিশন ফণ্ডে ২৲, দাসাশ্রমে ২৲ ও অনাথাশ্রমে ২৲ দান করিয়াছেন।

কাকিনিয়ার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দাস তাঁহার কোন বন্ধুর পীড়া আরোগ্য হওয়া উপলক্ষে মিশন ফণ্ডে ৬৲ সাধনাশ্রমে ২৲ ও দাতব্য বিভাগে ২৲ দান করিয়াছেন।

কলিকাতার শ্রীমতী বিনোদিনী মুখোপাধ্যায় পরলোকগত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে মিশন ফণ্ডে ১২৲ সাধনাশ্রমে ৮৲ ও দাতব্য বিভাগে ৫৲ দান করিয়াছেন।

বগুড়ার শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে মিশন ফণ্ডে ১৲ ও সাধনাশ্রমে ১৲ দান করিয়াছেন।

ফরিদপুরের বাবু বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী তাঁহার প্রথম পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে মিশন ফণ্ডে ২৲ দান করিয়াছেন।

শিলংএর বাবু ভারত চন্দ্র দেব তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে খাসিয়া মিশনে ১৲ দান করিয়াছেন; শঙ্করপুরের বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলীর এক এক খণ্ড খাসিয়া মিশনে দান করিয়াছেন।

পুঁটিয়ার রাণী শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী তাঁহার দেওয়ান্ শ্রীযুক্ত গোবিন্দমোহন রায়ের হাত দিয়া টাঙ্গাইলে ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণার্থ ২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ময়মনসিংহস্থ উকীল শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ বি এল্ মহাশয়ও ঐ কার্য্যের জন্য ১০০৲ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

আমরা দাতাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদিগের দান গ্রহণ করিতেছি।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২০শে এপ্রিল শুক্রবার অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় ১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ সিটিকলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার স্থগিত প্রথম ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

আগামী মঙ্গলবার সঙ্গত-সভার অধিবেশনে অপরাহ্ণ ৭॥০ টার সময় কলিকাতা এবং নিকটস্থ স্থান সকলের ব্রাহ্মসমাজে কি উপায় অবলম্বন করিলে ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা হয় তদ্বিষয়ে আলোচনা হইবে।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ৩রা বৈশাখ প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

২য় সংখ্যা।
১৭শ ভাগ।

১৬ই বৈশাখ, শনিবার, ১৮১৬ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে বিশ্বপতি! তুমি সত্যস্বরূপ, সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত, তোমার সকল কার্য্যে সত্যতা। যাহা মিথ্যা, যাহা ছায়া তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ নাই। মানব না বুঝিয়া হর্ষ বিষাদ প্রাপ্ত হয়, কোনও কোনও সত্যকে অপ্রিয় জ্ঞান করে কোনও কোনও সত্যকে একরূপ না দেখিয়া অন্যরূপ দেখিতে চায়, কিন্তু তুমি সে কাতরোক্তির প্রতি দৃকপাত কর না; অপ্রিয় সত্যকে প্রিয় করিবার জন্য ব্যগ্র হওনা, মানবের দুঃখ দেখিয়া ব্যগ্রতা প্রকাশ কর না। তোমার রাজ্যে যাহা আছে, তাহা আছে; তাহা থাকিবে; মানুষ আজ না দেখুক দশদিন পরে দেখিবে, আপনার ভ্রম আপনি সংশোধন করিবে। তোমার যে কার্য্য তাহা নীরবে অথচ অবিচলিত সংকল্পের সহিত সাধিত হইতেছে। এরূপ করিব, সেরূপ করিব বলিয়া তোমার রব নাই; যাহা করিবার তাহা নিঃশব্দে অথচ দুর্জ্জয় শক্তিতে করিতেছে। কেহ রুষ্ট, কেহ তুষ্ট হইতেছে, সে রোষ বা সে তোষের প্রতি তোমার দৃষ্টি নাই, তোমার শুভ সংকল্প সিদ্ধ করিতেছ। কোন কাজ কেন করিলে তাহার কারণ ও যুক্তি প্রদর্শন নাই, আত্ম-পক্ষ সমর্থন নাই; এই তোমার নিয়ম যে সত্য কালে আপনাকে আপনি বিদিত করিবে। হে প্রভো! আমাদিগকে এই নীরব সত্য-প্রিয়তা ও অবিচলিত শুভ সংকল্পের ভাব শিক্ষা দেও, আমরা যেন চিন্তা বাক্য ও কার্য্যে সত্যতাকে সর্ব্বদাই অন্বেষণ করি। এই তোমার নিকট প্রার্থনা।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ধর্ম্মের বহিরাবরণ ও ধর্ম্মের সার তত্ত্ব—একজন খৃষ্টীয় সাধু বলিয়াছেন:—"তুমি ত্রীশ্বরবাদ সম্বন্ধীয় গভীর তত্ত্ব সকল সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিতে পার, ইহাতে তোমার লাভ কি? যখন তোমার অবিনয় সেই ত্রিরূপী ঈশ্বরেরই বিরক্তিকর হইতেছে?" এই সদুপদেশটীর বিষয়ে চিন্তা করিলে আমরা অনেকেই উপকৃত হইতে পারি। ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য এই উজ্জ্বল জ্ঞান ও বিচারে পারদর্শিতা অপেক্ষা বিনয় কি প্রার্থনীয় নহে? তুমি একজনকে ঈশ্বর-বিশ্বাসী করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছ, সেই জন্য তর্কের উপরে তর্কের উদ্ভাবন করিতেছ, সেই জন্য ক্রোধ করিতেছ ও নিজ জ্ঞান-গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছ, ভাবিতেছ না যে জ্ঞান-গর্ব্ব দ্বারা যে অনিষ্ট হইতেছে তোমার সুযুক্তিপূর্ণ বিচার দ্বারা কখনই সে অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে না। যেমন প্রকৃত বিষয়ী ও কার্য্যকরী-বুদ্ধি-বিশিষ্ট লোকের দৃষ্টি সর্ব্বদা টাকা আনা গণ্ডার উপরে অর্পিত থাকে, বড় বড় প্রস্তাব কল্পনার রঙ্গে চিত্রিত হইয়া সুন্দর দেখাইতে পারে, তাঁহারা যেমন তাহাতে ভোলেন না, ফলে কি লাভ বা ক্ষতি দাঁড়াইবে, তাহাই যেমন দেখিয়া থাকেন, তেমনি প্রকৃত সাধকদিগের দৃষ্টি সর্ব্বদাই সত্যতা ও জীবনের উপরে অর্পিত। ভাষাময় আড়ম্বরে তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। লোকে যতই ভাষাময় জাল বিস্তার করিতে থাকে ততই তাঁহাদের মন বিরক্ত হইয়া বলিতে থাকে, 'দূর হউক, আমরা যে ভাল হইতে পারিলাম না। বিশ্বাস, বৈরাগ্য, সেবার ভাব যে সেরূপ লাভ করিতে পারিতেছি না। আমাতে বিশ্বাস, বিনয় শ্রদ্ধা ও নির্ভর নাই, আমি পরের দোষ গুণের চর্চ্চা করিয়া কি করিব?' চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে চিত্তের এই সারগ্রাহিতার গুণেই জগতের মহাজনগণ মহৎ হইয়াছিলেন। অপর সকলে কেবল মৌখিক শব্দ ও ধর্ম্মের বহিরাবরণ লইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল,—তাঁহারা তাহা হইতে পারেন নাই। তাঁহারা যেন মনে মনে বলিয়াছিলেন, 'কেবল উপরের তরঙ্গে ভাসিব না, একবার তলাইয়া দেখিব পাতাল কতদূর।' এই বলিয়া তাঁহারা তলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। গভীর সাধনে প্রবৃত্ত হইবার সময় এক এক জন ঈশ্বরের এক একটা স্বরূপ অবলম্বন করিয়া সাধন করিয়াছিলেন এবং সেই স্বরূপে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাহাই তাঁহারা জগতে দিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধ শান্ত ভাবে সিদ্ধ, যীশু পিতৃভাবে সিদ্ধ, মহম্মদ দাস্যভাবে সিদ্ধ, নানক গুরু ভাবে সিদ্ধ, চৈতন্য পতি ভাবে সিদ্ধ ইত্যাদি। এই সকল মহাজন যদি জন সমাজের প্রচলিত ধর্ম্মের বহিরাবরণে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন, তাহা

হইলে কি ধর্ম্ম তত্ত্বের গভীর স্থানে অবতরণ করিতে পারিতেন? ইঁহারা ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, এবং যতক্ষণ তাহা করিতে পারেন নাই, ততক্ষণ সন্তুষ্টও হইতে পারেন নাই। আমাদিগের অন্তরেও ধর্ম্মের সত্য ভাব ধারণ করিবার জন্য ব্যগ্রতা থাকা আবশ্যক। যতক্ষণ অন্তরে ও জীবনে সাক্ষাৎ জীবন্ত ধর্ম্মের অপূর্ব্ব তৃপ্তি না পাইতেছি, ততক্ষণ আর সকলি বাহিরের জল্পনা, এইরূপ একটী ভাব সর্ব্বদাই আমাদের অন্তরে থাকিলে ভাল হয়, তাহা হইলে আমরা ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া অপেক্ষা ধর্ম্মলাভ করা বিষয়ে অধিক মনোযোগী হইব।

কাজ ও হৃদয়ের সরসতা—অনেক লোকের মুখে সর্ব্বদা একটা অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়—"সংসারে অনেক কাজ করিতে হয়, ঈশ্বর-চিন্তা ধ্যান ধারণাদিতে অধিক সময় দিতে পারি না, সুতরাং অনেক সময়ে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়।" এই অভিযোগকারীদিগের প্রতি প্রথম বক্তব্য—সংসারের কাজের মাত্রা কখনই এত বাড়িতে দেওয়া উচিত নহে, যাহাতে ঈশ্বর-চিন্তা ও ধ্যান ধারণাদির সময় না থাকে। তাহা করিলে এই প্রকাশ পায় যে, তাঁহারা ঈশ্বরোপাসনাকে জীবনের একটা গুরুতর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন না। নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনার সময় রাখিয়া তবে অন্য কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। জেনেরল গর্ডন আমাদের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল, সুপ্রসিদ্ধ লর্ড রিপণ বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটরি হইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। কিন্তু ত্বরায় সে পদত্যাগ করিয়া দেশে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। যাইবার সময়ে লিখিয়া গেলেন—"যিনি রাজকার্য্যে হস্তার্পণ করিবার পূর্ব্বে দুই ঘণ্টা কাল ঈশ্বর-চিন্তায় যাপন করিয়া থাকেন, এরূপ ব্যক্তির হস্তে ভারত-সাম্রাজ্যের কোনও অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই।" ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল যদি তাঁহার রাজকার্য্যের বহুলতার মধ্যে ঈশ্বর-চিন্তাতে দুই ঘণ্টা যাপন করিবার সময় করিতে পারেন, তাহা হইলে কোন্ কাজের লোক এরূপ আছেন, যিনি মনে করিলে ঈশ্বরোপাসনার জন্য সময় রাখিতে পারেন না? অতএব উহা কথাই নহে, উহা কেবল আমাদের অলস ও সুখ-প্রিয় প্রকৃতির ছল মাত্র। দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা কাজের লোক, যাঁহাদিগকে সর্ব্বদা নানাপ্রকার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়, তাঁহাদিগকে আর একটী পরামর্শ দিবার আছে। কাজ ও ব্রহ্মোপাসনাকে এতটা স্বতন্ত্র করেন কেন? অনেক লোকের সংস্কার এই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাজ যেন ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্রের বাহিরে। যখন ঈশ্বর-চিন্তা ও ধ্যান ধারণাতে বসি, তখনই ধর্ম্মসাধন হইয়া থাকে, সেইগুলিই ধর্ম্মের কার্য্য; আর যখন সংসারে নিজ কর্ত্তব্য পালন করি, যখন পরের সেবা করি, তাহা যেন ধর্ম্মসাধনের অন্তর্ভূত নহে। এইরূপ ভাব থাকাতেও অনেক সময়ে কাজের দ্বারা হৃদয়ের ভাব শুকাইয়া যায়। অতএব পরামর্শ এই, কাজকেও ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ করিয়া লও। যেমন কোনও উৎসবে যাইবার সময় মনে কর, প্রভুর কৃপা সম্ভোগ করিতে যাইতেছ, সেইরূপ কোনও রোগীর সেবা করিতে যাইবার সময়েও অনুভব কর, যে প্রভুর কৃপা সম্ভোগ করিতে যাইতেছ। কাজ যখন জাগ্রত ঈশ্বর-প্রীতির দ্বারা উদ্দীপ্ত হইবে, তখন তাহা হৃদয়কে শুষ্ক না করিয়া বরং সরস করিবে।

ত্যাগ—এস ভাই তুমি আমি বেশ আরামে থাকি এবং নিজেদের বিশেষ ক্ষতি না করিয়া একটু একটু সময় দিয়া ধর্ম্ম প্রচার করি—এরূপ ভাবে অদ্যাবধি জগত কোনও ধর্ম্মই প্রচারিত হয় নাই। ধর্ম্মের কতকগুলি মত প্রচারিত হইলেই যদি ধর্ম্ম প্রচার হইল ভাবিতে পারা যাইত, তাহা হইলে বলা যাইত যে এ প্রকার স্বসুখ-প্রিয় লোকের দ্বারাও ধর্ম্মপ্রচার হইতে পারে। আমেরিকার প্রেততত্ত্ববাদিগণ দেশ বিদেশে প্রচারক প্রেরণ করেন নাই; নিজেদের দেশে বসিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা দেশ বিদেশে গিয়া তাঁহাদের মতকে প্রচারিত করিয়াছে, ইহাতে তাঁহাদের বিশেষ ত্যাগের প্রয়োজন হয় নাই। ডারউইন নিজ গৃহে বসিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সে গ্রন্থের দ্বারা অর্থ সম্বন্ধে যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন এরূপ বোধ হয় না, কিন্তু তাঁহার মত সমুদয় জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ত্যাগের বিশেষ প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু ধর্ম্মপ্রচার একরূপ নহে। মানবের হৃদয় পরিবর্ত্তন করা ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্য। বিষয়াসক্তকে ঈশ্বরানুরাগী করা, স্বার্থপরকে নিঃস্বার্থ করা, পাপাচারীকে পুণ্যবান করা যদি ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা কেবলমাত্র মত প্রচার দ্বারা হয় না। মানব-হৃদয়ে নূতন অগ্নি প্রবিষ্ট করা আবশ্যক হয়। এ অগ্নি হৃদয়ে থাকিলেই মানুষ অপর হৃদয়ে দিতে পারে। যার হৃদয়ের অগ্নি এত ক্ষীণ তেজ যে তাহার নিজের স্বার্থ ও সুখের একটু ব্যাঘাত করিবার শক্তি নাই, সে অপরের হৃদয়ে কি অগ্নি দিবে? যাহার জীবনে নিঃস্বার্থতা নাই, তাহা যেন অপর হৃদয়কে উদ্দীপ্ত করিবার প্রয়াস পায় না। জগতের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া দেখ, কোথায় করে কোন ব্যক্তি নিঃস্বার্থতার অগ্নি ব্যতীত মানবের অন্তরে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে? যাহা কাহারও দ্বারা কখনও হয় নাই, তাহা কি আমাদের দ্বারা হইবে? ব্রাহ্মগণ দেশ মধ্যে স্বার্থ-নাশের অগ্নি জ্বালাইতে সমর্থ না হইলে, তাঁহাদিগের অবলম্বিত ধর্ম্ম দেশের লোকের মনে নিবদ্ধ করিতে পারিবেন না। আমরা দেখিতেছি ব্রাহ্মসমাজে এই নিঃস্বার্থতার অগ্নি আশানুরূপ প্রজ্বলিত হইতেছে না, সেই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম এরূপ ম্লান অবস্থাতে রহিয়াছে।

শোকের সংবাদ—গভীর দুঃখের সহিত আমরা তত্ত্বকৌমুদীর পাঠকদিগকে সংবাদ দিতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজের চিরপরিচিত বন্ধু কুমারী সোফিয়া ডবসন কলেট বিগত ২৭শে মার্চ্চ লণ্ডন নগরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কুমারী কলেট না হইলে ইউরোপের লোক ব্রাহ্মসমাজের কথা জানিত কিনা সন্দেহ। তিনি ব্রাহ্ম না হইয়াও ব্রাহ্মসমাজকে ইউরোপ খণ্ডের লোকের নিকট সুপরিচিত করিবার জন্য কিরূপ শ্রম ও

যত্ন করিয়াছেন, ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তিনি বিকলাঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এক প্রকার চিররোগশয্যায় শয়ানা ছিলেন, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অথচ সেই রোগ শয্যাতেই শয়ন করিয়া নিরন্তর ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ-চিন্তাতে নিযুক্ত থাকিতেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক পুস্তক ও পত্রিকা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিতেন এবং সর্ব্বদাই সৎপরামর্শ দান দ্বারা আমাদের কার্য্যের সহায়তা করিতেন। ১৮৭০ সালে যখন পরলোকগত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, তখন কুমারী কলেট বিশেষরূপে তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করেন; এবং কেশব বাবুর বক্তৃতা ও উপদেশাদি সংগ্রহ করিয়া এক বৃহদায়তন পুস্তক মুদ্রিত করেন। তৎপরে যখনই ব্রাহ্মসমাজে কোনও বিশেষ ঘটনা ঘটিত, তখনই তাহা ইয়োরোপ খণ্ডের লোককে বিদিত করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করিতেন। এবং তদর্থেই ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রতি বর্ষান্তে "ব্রাহ্ম ইয়ার বুক" নামে এক একখানি পুস্তক মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'Brahmo Year Book' ১৮৮২ সাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। তৎপরে অর্থাভাবে এবং অন্যান্য কারণে বন্ধ হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন কুমারী কলেট ব্রাহ্মসমাজের একখানি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিখিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা ইয়োরোপের লোকে ব্রাহ্মসমাজের বিষয় বিশেষরূপে জানিতে পাবে। এই সকল কারণে ইয়োরোপের লোকে তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ সংবাদের উৎসস্বরূপ মনে করিত। Encyclopædia Britanica নামক সুপ্রসিদ্ধ অভিধানের বর্ত্তমান সংস্করণে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব উঠিয়াছে, তাহা তাঁহারই লিখিত। বলিতে কি, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ও সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার এত প্রেম ছিল যে, ভারতবর্ষীয় ডাকের দিন উপস্থিত হইলে তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণ বিদ্রূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন "তোমার স্বদেশ হইতে কি সংবাদ আসিয়াছে?" তাঁহারা অনেক সময় বলিতেন "আমরা নামে তোমার আপনার লোক, তোমার প্রকৃত আপনার লোক ভারতবর্ষে।" সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যখনি স্থাপিত হয় তখন কুমারী কলেট ইহার অভ্যুদয়কে ঈশ্বরের বিশেষ বিধি বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন এবং তদবধি ইহার কার্য্যের সহিত প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৮২ সালে "ব্রাহ্ম ইয়ার বুক" বন্ধ হইলে কুমারী কলেট আর একটী মহৎ কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের একখানি জীবন চরিত লিখিতে সংকল্প করেন এবং এই কয়েক বৎসর সেই কার্য্যেই ব্যাপৃত ছিলেন। রাজার জীবন চরিত সংক্রান্ত বিষয় সকল সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি কিরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন ও এক একটী বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন তাহা লিখিয়া লোকের হৃদয়ঙ্গম করা দুষ্কর। অনেক পরিশ্রম ও চেষ্টার পর তিনি কার্য্য এক প্রকার সমাধা করিয়া রাজার জীবন চরিত মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় তিন পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় যে তিনি কার্য্যটী সুসম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম বিশ্বাসিনী ছিলেন এবং প্রসন্নচিত্তে সর্ব্বদাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি পরোপকার ব্রতে যে পবিত্র জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফলস্বরূপ স্বর্গধামে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার জন্য কি প্রার্থনা করিব? তবে এই বলিয়া ক্ষোভ করি যে তাঁহার পরলোক গমনে ব্রাহ্মসমাজ একজন অকৃত্রিম হিতৈষিণী বন্ধু হারাইলেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭২ বৎসর হইয়াছিল।

ব্রাহ্ম বালকদিগকে বাঁচাও—আমরা আর কতদিন ব্রাহ্ম পিতামাতাকে সতর্ক করিব? কতবার তাঁহাদের কর্ত্তব্য তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিব? ব্রাহ্ম বালকদিগের পথে যে বিপদ রহিয়াছে তাহার প্রতি ব্রাহ্ম অভিভাবকগণ আর কতদিন উদাসীন থাকিবেন? আমরা দিন দিন দেখিতে পাইতেছি যে, স্কুলে বালকদিগকে প্রেরণ করা বিষম ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। সেখানে দুইটী বিপদ আমাদের বালকদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। প্রথম—হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের হাঙ্গামায় এখন দেশের চারি দিকেই ব্রাহ্মবিরোধী ভাব। এই ভাব স্কুলের বালকদিগের মধ্যেও প্রবিষ্ট হইয়াছে। কোনও শ্রেণীতে যদি ত্রিশটী বালকের মধ্যে দুইটী ব্রাহ্ম বালক থাকে, সেই দুইটীকে বাদ দিয়া অবশিষ্ট আটাশটী ব্রাহ্ম-বিরোধী। তাহারা কথায় কথায় ব্রাহ্মসমাজকে উপহাস ও বিদ্রূপ করিতে এবং গালি দিতে ত্রুটী করে না। এই প্রকার হাওয়ার মধ্যে যদি একটী বালক নিরন্তর বাস করে, তাহার কি প্রকার ভাবাপন্ন হওয়ার সম্ভব? ইহার উপর দেখিতে পাই, অনেক ব্রাহ্ম পিতামাতা স্বীয় স্বীয় বালকবালিকাকে ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রব হইতে অনেক সময় দূরে রাখেন। ইহার উপাসনা ও উৎসবাদিতে আনেন না, ব্রাহ্মসমাজ সংসৃষ্ট নৈতিক বিদ্যালয়ে তাহাদিগকে প্রেরণ করেন না, কিম্বা অন্য কোনও প্রকারে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণও ব্রাহ্ম বালকগণের সহিত মিশিতে দেন না। কিন্তু অপর দিকে নিরন্তর পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মবিরোধী ভাবের হাওয়ার মধ্যে বাস করিতে দিতে আপত্তি নাই। ইহার ফল এই হয় যে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব পাইবার যে সকল দ্বার আছে, তাহা বন্ধ থাকে কিন্তু তদ্বিরোধী ভাব পাইবার যে সকল দ্বার তাহা উন্মুক্ত থাকে। কালে ঐ সকল বালক ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী ও ব্রাহ্মদিগের বিদ্রূপকারী হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? অনেক ব্রাহ্মগৃহে তাহাই ঘটিতেছে। ব্রাহ্ম পিতামাতা যে ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সন্তানগণ, তাঁহাদের গৃহে বর্দ্ধিত ও প্রতিপালিত হইয়া তাঁহাদের বক্ষে বসিয়া সেই ধর্ম্মকে উপহাস করিতেছে। ইহা কেমন সুন্দর ফল? ব্রাহ্মেরা যে ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহার কেমন উৎকৃষ্ট পরিণাম? ব্রাহ্ম পিতামাতার চিন্তাবিহীনতার কেমন সুন্দর পুরস্কার?

আর একটী বিপদ ইহা অপেক্ষাও ভয়ানক। আমরা

দেখিয়া চিন্তিত হইতেছি যে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই বিশেষতঃ কলিকাতার স্কুলের বালকদিগের নীতি পুনরায় কলুষিত হইয়া যাইতেছে। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানকারিগণ আর কিছু করিতে না পারুন ব্রাহ্ম-রুচি ও ব্রাহ্ম-নীতির বিদ্রুপ করিয়া দেশের এই মহোপকার সাধন করিয়াছেন! স্কুলের বালকদিগের মধ্যে যেরূপ দুশ্চরিত্রতার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহা শুনিয়া লজ্জাতে মস্তক অবনত হয়। এই সকল দুশ্চরিত্র বালকের সংশ্রবে আসিয়া কোনও কোনও ব্রাহ্ম গৃহের বালক একরূপ দুশ্চরিত্র হইয়াছে যে তাহা বিশ্বাসের অতীত। ইহা দেখিয়া সহরের কোনও কোনও ব্রাহ্ম পিতামাতা পুত্রদিগকে স্কুলে পাঠাইবেন কিনা, এই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন। এ চিন্তার কারণ আমরা বুঝিতে পারি; কিন্তু এ সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মগণের যে উদাসীনতা তাহা বুঝিতে পারি না। তৎপরে চিন্তা কর, যদি সমাজের বালকগুলি অসৎ হইয়া উঠে, বালিকাগুলিকে সৎ রাখিতে পারিবে কি না? এক সমাজে বাস করিয়া তাহাদের মেশা বন্ধ করিতে পারিবে কি না? ব্রাহ্মবালকদিগের মধ্যে যদি দুর্নীতির স্রোত প্রবাহিত হয়, ভাবী ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির আশা কোথায় থাকিবে? গৃহের মধ্যে পুতিগন্ধ রাখিয়া কোন্ সাহসে ইহার প্রচারকগণ প্রচার করিতে যাইবেন? আর সে প্রচারের ফলই বা কি হইবে? এই সকল কারণে আবার বলিতেছি, ব্রাহ্মগণ সজাগ হউন। সময় থাকিতে ব্রাহ্ম-বালকদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করুন। নতুবা তাহাদের পথে সর্ব্বনাশ আসিতেছে। বলিতে দুঃখ হয়, দুই বৎসরের অধিক-কাল কলিকাতা সহরে ব্রাহ্মবালকদিগের জন্য একটী বোর্ডিং স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বালকদিগের তত্ত্বাবধান ও সুশিক্ষার যথেষ্ট বন্দোবস্ত আছে। যাঁহাদের বালকগণ ইহাতে ছিল, তাঁহারা ইহার সুশিক্ষার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। বিগত মাঘোৎসবের সময় ব্রাহ্মসম্মিলনীতে সিটী কলেজের তত্ত্বাবধায়ক সর্ব্বসমক্ষে এই বোর্ডিংএর বালকদিগের রীতিনীতির প্রশংসা করিয়াছেন। তথাপি ব্রাহ্ম-অভিভাবকগণের এ বিষয়ে মনোযোগ দেখা যাইতেছে না। যাহাদের জন্য বোর্ডিং স্থাপিত হইল, সেই ব্রাহ্মবালকের সংখ্যা এখানে বেশী নহে। আমরা এখনও বলিতেছি, ব্রাহ্মগণ যদি আপনাদের সমাজের কল্যাণ চান, তবে সকলে ত্বরায় সমবেত হউন। এই বোর্ডিংকে সহরের বাহিরে কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া যাউন। বোর্ডিং চার্জ্জ একরূপ করুন যাহা অধিকাংশ ব্রাহ্মের আয়ত্তাধীন হইতে পারে। সেখানে সকল ব্রাহ্মকে স্বীয় স্বীয় পুত্রদিগকে পাঠাইতে বাধ্য করুন; এবং জ্ঞানশিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষার উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করুন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মবালকদিগকে বাঁচাইবার উপায় দেখা যাইতেছে না। শিক্ষিত ব্রাহ্ম-যুবকদিগের মধ্যে এমন কি কেহ নাই, যাঁহারা এই গুরুতর কার্য্যে আপনাদের জীবন সমর্পণ করিতে পারেন?

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্রাহ্মসমাজে জ্ঞানালোচনার অভাব।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সর্ব্বপ্রথমে এদেশে গভীর জ্ঞানালোচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্ প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের হিন্দু শাস্ত্র সকল এদেশের সাধারণের অজ্ঞাত ছিল। এদেশের ব্রাহ্মণগণ ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায়ের দুই চারিটী বিষয় ও স্মৃতির দুই চারিটী কথা পাঠ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। অধিকাংশ ব্রাহ্মণ তাহাও জানিতেন না। তাঁহারা কোনও প্রকারে দশকর্ম্ম সমাধা করিতে শিখিতেন ও কতকগুলি উদ্ভট সংস্কৃত শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়া ধনিদিগের গৃহে তাহা উচ্চারণ ও ব্যাখ্যা করতঃ তোষামোদ ও উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ধর্ম্মের গভীর তত্ত্বসকল সাধারণ প্রজাপুঞ্জের নিকটে প্রচ্ছন্ন ছিল। তাহারা ধর্ম্মের নামে অনেক অধর্ম্মের আচরণ করিত; এবং তুচ্ছ ও লঘু-বিষয়ের চর্চ্চা ও চিন্তাতে সময়াতিপাত করিত। সেই লঘুতা হইতে স্বদেশবাসীদিগকে উদ্ধার করিবার মানসে রামমোহন রায় তাহাদিগকে গভীর জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত করিলেন। তিনি বেদ বেদান্ত উপনিষদাদি স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া সাধারণের বোধগম্য করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে যে এমন গভীর ও উচ্চ তত্ত্বসকল নিহিত আছে, ইহা দেখিয়া বঙ্গদেশের লোক বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া গেল। এবং ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, তাঁহার সময় হইতেই এদেশের লোকের শাস্ত্রালোচনা প্রবৃত্তি প্রবল হইল। কেহ বা তাঁহার সপক্ষতা কেহ বা তাঁহার প্রতিপক্ষতা করিবার জন্য বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের আলোচনা আরম্ভ করিলেন। রামমোহন রায় যে কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া গেলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন করিয়া তাহার উদ্যোগে সেই কার্য্যকে আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিলেন। এদেশের কোনও সভা যদি আপনার নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে তাহা তত্ত্ববোধিনী সভা। যখন সমগ্র দেশের লোক খেউড়, টপ্পা, পাঁচালী, কবি, আক্‌আখড়াই প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত, তখন একমাত্র তত্ত্ববোধিনী সভা পরমার্থ তত্ত্বের আলোচনাতে প্রবৃত্ত। এই তত্ত্ববোধিনী সভা হইতেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উহার খ্যাতনামা সম্পাদক পরলোকগত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় উহাতে কি প্রকার গভীর বিষয় সকলের আলোচনা করিতেন, তাহা তাঁহার প্রণীত "ধর্ম্ম-নীতি" "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" ও "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" প্রভৃতি গ্রন্থে সুপ্রকাশ। সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজই এদেশে গভীর জ্ঞানালোচনার পথপ্রদর্শক ছিলেন। তত্ত্ববোধিনীর পৃষ্ঠাতে যেমন একদিকে বেদ বেদান্ত, উপনিষদ্ প্রভৃতি অনুবাদিত ও বিচারিত হইত; তেমনি অপর দিকে পাশ্চাত্য জ্ঞানিদিগের জ্ঞানসম্ভূত অপূর্ব্ব তত্ত্ব সকল সন্নিবেশিত হইত।

এই কারণেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এবং ব্রাহ্ম-সমাজের এত গৌরব ছিল। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সুপ্রসিদ্ধ শ্যামা-চরণ সরকার প্রভৃতি জ্ঞানিগণ তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত ছিলেন ও ইহার কার্য্যের সহায়তা করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের ভার যতদিন মহর্ষির হস্তে ন্যস্ত ছিল তিনি ততদিন ইহার জ্ঞান গৌরব রক্ষা করিবার প্রয়াস পাই-য়াছেন। যে দিন হইতে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় আদি সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন, সে দিন হইতে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে আর এক স্রোত প্রবিষ্ট হইল। পূর্ব্বকার জ্ঞানপ্রধান ভাবের পরিবর্ত্তে ভক্তিপ্রধান ভাব আবির্ভূত হইল। ব্রাহ্ম আচার্য্য ও প্রচারকগণ জ্ঞানা লোচনাতে উদাসীন হইয়া 'গৌর নিতাই' 'গৌর নিতাই' করিয়া মাতিয়া উঠিলেন। এখন দেখিতেছি 'গৌর নিতাই' আমাদের কিঞ্চিৎ অনিষ্ট করিয়াছেন। আমাদের জ্ঞানা-লোচনা প্রবৃত্তি কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করিয়া দিয়াছেন।

"বিজ্ঞ ও সুসভ্য হ'তে নাহি চাই,
যে যা বলে যাক্ ব'লে, সে সব হেসে উড়াই"

এই বলিয়া গান করিয়া করিয়া আমরা অজ্ঞতাকে লজ্জার কারণ না ভাবিয়া গৌরবের বিষয় ভাবিতে শিখিয়াছি। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় একদিন টাউন হলে বক্তৃতাতে নিজের বিষয় বলিলেন "How can you call a man learned who does not read two books in three hundred and sixty-five days" অর্থাৎ "সে ব্যক্তিকে তোমরা কি প্রকারে বিদ্বান্ বলিতে পার যে, তিন শত পঁয়ষট্টি দিনে দুই খানি বই পড়ে না।" অতএব দেখা যাইতেছে যে তৎ-কালীন ব্রাহ্ম দলপতি স্বীয় অজ্ঞতাকে লজ্জার কারণ না ভাবিয়া গৌরবের বিষয় ভাবিয়াছিলেন। এই ভাব এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। অন্য ব্রাহ্মদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান ব্রাহ্ম আচার্য্য, উপদেষ্টা ও প্রচারকদিগের দৈনিক জীবন যদি লক্ষ্য করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে তাঁহাদের মধ্য হইতে জ্ঞানালোচনার অভ্যাস একবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেশবচন্দ্র সেন বলিয়াছিলেন তিনি ৩৬৫ দিনে দুই খানি গ্রন্থ পড়িতেন না, আমাদের মধ্যে এরূপ লোক পাওয়া অসম্ভব নহে, যাঁহারা হয়ত বিগত ৫ বৎসরে দুই খানি গ্রন্থ পড়েন নাই।

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই জ্ঞানালোচনার প্রবৃত্তি হ্রাস হওয়াতে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে স্থিরতা ও ধীরতা থাকিতেছে না। আজ যিনি উৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, কাল তিনি ভাবের স্রোতে ভাসিয়া আর এক রূপ ধারণ করিতেছেন। আমাদের অনেক কার্য্যে চিন্তাবিহীনতা, অসারতার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া আমাদের মনে হইতেছে যে, ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে জ্ঞানালোচনা-প্রবৃত্তি প্রবল করিবার জন্য উপায় বিধান করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। সুখের বিষয় যে, ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় প্রভৃতি কতিপয় চিন্তাশীল শিক্ষিত ও জ্ঞানিলোক এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহারা যেন লোকের ঔদাসীন্য দেখিয়া ভগ্নোদ্যম না হন। ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে জ্ঞানের প্রতি যে প্রকার অনাদর দাঁড়াইয়াছে, তাহার এ ভাব ভগ্ন করিতে কিছুদিন লাগিবে। আশা করা যায় উদ্যোগ কর্ত্তাগণ মনোযোগী থাকিলে কালে আবার হাওয়া ফিরিবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১ম ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

১৮৯৪।

বিগত ডিসেম্বর মাসে মাঘোৎসব কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত একটী সবকমিটি গঠিত হইয়াছিল। ঐ কমিটি অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সহিত পরামর্শ করিয়া নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

১লা মাঘ,	১৩ই জানুয়ারি		শনিবার—ব্রাহ্ম পরিবার সকলে উপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা।
২রা „	১৪ই	„	রবিবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। অপরাহ্নে বিডনপার্কে প্রচার; তৎপরে নগর সংকীর্ত্তন এবং উপাসনা।
৩রা „	১৫ই	„	সোমবার—সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন।
৪ঠা „	১৬ই	„	মঙ্গলবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে বক্তৃতা।
৫ই „	১৭ই	„	বুধবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উৎসব।
৬ই „	১৮ই	„	বৃহস্পতিবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে বক্তৃতা।
৭ই „	১৯এ	„	শুক্রবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে সঙ্গতের উৎসব।
৮ই „	২০এ	„	শনিবার—ব্রাহ্মিকাসমাজ ও বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব। সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন।
৯ই „	২১এ	„	রবিবার—প্রাতে উপাসনা। অপরাহ্নে আলোচনা, সায়ংকালে উপাসনা।
১০ই „	২২এ	„	সোমবার—প্রাতঃকালে উপাসকমণ্ডলীর উৎসব। অপরাহ্নে নগরসংকীর্ত্তন, সায়ংকালে উপাসনা।
১১ই „	২৩এ	„	মঙ্গলবার—সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব।
১২ই „	২৪এ	„	বুধবার—প্রাতঃকালে সাধনমণ্ডলীর উৎসব। মধ্যাহ্নে আলোচনা। সায়ংকালে বক্তৃতা।

১৩ই „ ২৫এ „ বৃহস্পতিবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। অপরাহ্নে বালকবালিকা-সম্মিলন। সায়ংকালে ছাত্রসমাজের উৎসব।

১৪ই „ ২৬এ „ শুক্রবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে বক্তৃতা।

১৫ই „ ২৭এ „ শনিবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। অপরাহ্নে রবিবাসরিক বিদ্যালয়ের উৎসব। সায়ংকালে বক্তৃতা।

১৬ই „ ২৮এ „ রবিবার—উদ্যানে ব্রাহ্মসম্মিলনীর উৎসব।

উৎসবের বিশেষ বিবরণ তত্ত্বকৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারে প্রকাশিত হইয়াছে, এজন্য তাহার বিশেষ বিবরণ এখানে দেওয়া অনাবশ্যক।

১১ই মাঘ রাত্রিকালীন উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার চৌধুরী সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত স্থান হইতে ব্রাহ্মবন্ধুরা উৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় আগমন করিয়াছেলেন,—

লাহোর, লক্ষ্ণৌ, গয়া, হাজারিবাগ, রামপুরহাট, মুর্শিদাবাদ, বোলপুর, নলহাটী, ধুলিয়ান, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, কাঁথি, চট্টগ্রাম, শিলং, ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, রাজসাহী, রংপুর, নেলফামারী, জলপাইগুড়ী, পাবনা, নওগাঁ (রাজসাহী) বসপুর, বানিবন, জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগর, মজিলপুর, হরিনাভি, শ্রীরামপুর, সাতক্ষীরা, কোন্নগর, হুগলি, বরাহনগর, নলধা, বাগআঁচড়া, চাহুড়িয়া, জামালপুর, নারায়ণগঞ্জ, বজ্রযোগিনী, ভরাকর, মানিকগঞ্জ, কুমারখালি, খলিলপুর, জগন্নাথপুর, কুষ্টিয়া, কুলবেড়িয়া, সঙ্করপুর, বাগুড়ী।

বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বর্তমান বৎসরের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠনের জন্য অধ্যক্ষ সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। তাহাতে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র, বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, ডাঃ প্রসন্নকুমার রায়, ডাঃ মোহিনীমোহন বসু, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস, বাবু উমাপদ রায়, বাবু মধুসূদন সেন, বাবু কালাশঙ্কর সুকুল, বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও বাবু বঙ্কবিহারী বসু বর্তমান বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রচারক মহাশয়দিগের প্রতিনিধি স্বরূপ বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার একজন অতিরিক্ত সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন পাঁচজন কর্ম্মচারী সমেত মোট ১৮ জন সভ্য লইয়া এ বৎসরের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে।

নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত নিয়মানুসারে গত বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সভাই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১ম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে সভা বিশেষ উপাসনান্তে এই বৎসরের কার্য্য ভার গ্রহণ করেন এবং সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতি, উপাসক মণ্ডলীর দায়ী আচার্য্য, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং খাসিয়া পর্ব্বতে প্রচার, ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষা, ব্রাহ্মদিগের আর্থিক উন্নতি, ব্রাহ্ম মিশন প্রেস ও সমাজ কার্য্যালয়ের সুব্যবস্থা, পুস্তক প্রচার এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তক বিক্রয়ের বন্দোবস্ত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয় ও সমাজ কার্য্যালয়ের হিসাব পরিষ্কার করিয়া রক্ষা করা, কর্ম্মচারিগণের প্রতি আস্থা, সামাজিক সম্মিলন, ধর্ম্মবিজ্ঞান সভা ও ব্রাহ্মবন্ধুসভা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও সমাজের কার্য্য সম্পাদন জন্য Business Committee গঠিত হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে সম্পাদকরূপে এবং প্রচারক মহোদয়গণ ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়দিগকে লইয়া এক বিশেষ সবকমিটি গঠিত হইয়াছে, আবশ্যক বোধে তাঁহারা সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেও পারিবেন। এই সবকমিটি কলিকাতার এবং তন্নিকটস্থ স্থান সমূহের ব্রাহ্মগণের ও ব্রাহ্ম পরিবারের আধ্যাত্মিক উন্নতি যাহাতে হয় তাহার সুব্যবস্থা করিবেন।

এই তিন মাসের মধ্যে পুরাতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ২টি সাধারণ, ১টি বিশেষ, এবং নূতন কমিটির ৪টি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছে।

বরাহনগর, কোন্নগর, রামপুরহাট, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, টাঙ্গাইল, জলপাইগুড়ি, ভবানীপুর, লক্ষ্ণৌ, মেদিনীপুর ও হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

পুস্তক প্রচার—Brahmoism নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকের ১ম সংস্করণ ও তাহার সত্ত্বাধিকার ক্রয় করা হইয়াছে।

ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়া অঞ্চলে লোকের অতিশয় অন্নকষ্ট উপস্থিত হওয়াতে তথাকার প্রকৃত অবস্থা কি তাহা অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত এবং অল্প কিছু অর্থ সাহায্য করিবার জন্যও বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষালকে কিঞ্চিৎ অর্থসহ সেই অঞ্চলে পাঠান হইয়াছে।

আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি বাবু আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের কয়েক মাস হইতে স্বাস্থ্য ভাল নাই এজন্য তিনি ইউরোপ যাত্রা করিতেছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আশা করেন যে তিনি এই সুযোগে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ ইউরোপে কিছু কার্য্য করিবেন। তাঁহার প্রতি যথাসাধ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন উদ্দেশে একটী বিশেষ সবকমিটি গঠিত করিয়া দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে যাহা যাহা কর্ত্তব্য এই সবকমিটিই তাহা করিয়াছেন। ঈশ্বর করুন্ তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নানা প্রকারের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

আমাদিগের প্রচারক মহাশয়গণ নিম্নলিখিতরূপ কার্য্য করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—মাঘোৎসবোপলক্ষে মন্দিরে পাঁচ দিন আচার্য্যের কার্য্য, একদিন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধর্ম্মভাব বিষয়ে মন্দিরে বক্তৃতা, ছাত্রসমাজে তিন দিন বক্তৃতা, অধিকাংশ সময় মন্দিরে ও সাধনাশ্রমে উপাসনায় আচা-

র্য্যের কার্য্য, একটী ব্রাহ্ম বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য, তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদন ও Indian Messenger পত্রিকা সম্পাদনের সহায়তা, সাধনাশ্রমবাসিদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা, কয়েকটী ব্রাহ্ম পরিবার ও ছাত্রবাস পরিদর্শন, এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় ও বোর্ডিং এবং ব্রাহ্মবালক বোর্ডিংএর তত্ত্বাবধান।

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—নিবৃত্তা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য, কলিকাতা ছাত্রসমাজে "বিবেক ও ঈশ্বর" বিষয়ে দুইটী বক্তৃতা, মাঘোৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক উৎসবে "পরকাল" বিষয়ে বক্তৃতা, ছাত্রসমাজের উৎসবে "ধর্ম্মহীন নীতি ও নীতিহীন ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা এবং তিন দিবস তিনি বেদীর কার্য্য এবং তৎপর কোন ব্রাহ্ম পরিবারে একটী শিশুর জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা, শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য, মেদিনীপুর উৎসবের উদ্বোধন, উৎসব দিবসে দুই বেলা বেদীর কার্য্য, পাহাড়ীপুর ব্রাহ্মসমাজে উৎসব উপলক্ষে বেদীর কার্য্য, কোন ভদ্রলোকের বাটীতে উপাসনা ও উপদেশ, সমাজ মন্দিরে "ধর্ম্ম মতের বিরোধ ও সামঞ্জস্য" বিষয়ে বক্তৃতা, কোন ব্রাহ্ম পরিবারে একটী শিশুর নামকরণ উপলক্ষে উপাসনা এবং গোপীগবিতে সপারিবে ব্রহ্মোপাসনা।

বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে সম্পাদক মহাশয়ের ভবনে উপাসনা ও উপদেশ এবং সমাজ বাটীতে সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন বামপুরহাট উৎসবের উদ্বোধন, উৎসব দিবসে দুই বেলা বেদীর কার্য্য এবং সম্পাদক মহাশয়ের ভবনে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইবার পূর্ব্বে "নাম মাহাত্ম্য ও ভক্তি" বিষয়ে বক্তৃতা, এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক রচনা, সাময়িক পত্রিকায় ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ লেখা, কলিকাতা ও মফঃস্বলে ব্রাহ্ম ও অন্যান্য লোকের সহিত ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে আলোচনা।

শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—

কলিকাতা—মাঘোৎসবের মধ্যে একদিন উদ্যান সম্মিলনীতে উপাসনা এবং উপদেশ দান, সমাজে উপাসনা, পরিবারে অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা এবং সাধনাশ্রমে মধ্যে মধ্যে উপাসনাদি, বরাহনগরে—একটী পরিবারে বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনাদি, ঢাকায়—মাঘোৎসব উপলক্ষে উপাসনা, পাঠ, ব্যাখ্যা এবং পরিবারে উপাসনা, একদিন ব্রাহ্মসমাজে "বন্ধকৃপা" বিষয়ে বক্তৃতা নারায়ণগঞ্জ-সমাজে একদিন উপাসনা, বাঁকুড়া উৎসবে উপাসনা উপদেশ, পাঠ ও ব্যাখ্যা, একদিন সমাজ মন্দিরে 'ব্রাহ্মসমাজে ভগবানের লীলা' এই বিষয়ে বক্তৃতা এবং আর একদিন স্থানীয় কোন ভদ্র লোকের বাসায় তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধে "যে চায় সেই পায়" এই বিষয়ে বক্তৃতা, বাজারে "ধর্ম্মে থাকিয়া ক্লেশ পাইতেছি দেখিয়া অধর্ম্মে মন দিবে না" এই বিষয়ে বক্তৃতা, বর্দ্ধমান উৎসবে উপাসনা ও উপদেশাদি, টাঙ্গাইল উৎসবে উপাসনা, উপদেশ, পাঠ ব্যাখ্যা এবং আলোচনা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, বাঘিলের শ্রদ্ধের ভ্রাতা বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে কীর্ত্তনাদি। করটিয়ার শ্রদ্ধের ডাক্তার বাবু হরনাথ ঘোষ মহাশয়ের পরিবারে এবং সমাজে উপাসনা, উপদেশ ও ব্যাখ্যা এবং স্থানীয় মাননীয় জমিদার শ্রীযুক্ত হাফেজ মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবের স্কুলে "ছাত্রজীবনের তপস্যা কি?" এই বিষয়ে বক্তৃতা তৎপর নগর সংকীর্ত্তন, জামুর্কীর—ডাক্তার রমণী মোহন ঘটক মহাশয়ের যত্নে স্থানীয় স্কুলে "প্রকৃত জীবনের লক্ষণ কি?" এই বিষয়ে বক্তৃতা, ভাদগ্রাম—তাঁহার জন্মভূমি দেখিতে যাইয়া গ্রামের ভদ্র লোকদের অনুরোধে "মানব আপনার কর্ম্মানুরূপ স্বভাব লাভ করে" এই বিষয়ে বক্তৃতা, কোন্নগর উৎসবে উপাসনা, উপদেশ, পাঠ ও ব্যাখ্যা জলপাইগুড়ি উৎসবে সমাজে এবং পরিবারে উপাসনা, উপদেশ, পাঠ, ব্যাখ্যা এবং আলোচনা, একদিন সমাজ মন্দিরে "বিশ্বাসে মিলিবে বস্তু?" বিষয়ে বক্তৃতা এবং বাজারে "মানব নিজ কর্ম্মের জন্য দায়ী" বিষয়ে বক্তৃতা, সৈদপুর—পরিবারে এবং সমাজে উপাসনা, উপদেশ এবং ব্যাখ্যাদি করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু—কলিকাতা—মাঘোৎসব উপলক্ষে মন্দিরে কয়েক দিন উপাসনা এবং "ধর্ম্মজীবনের বিকাশ" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। মাঘোৎসবের শেষ দিন হইতে প্রায় দুই মাস কাল শরীর অসুস্থ থাকায় কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই। একখানি বাঙ্গালা ও একখানি ইংরাজি পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত আছেন, এবং Brahmoism নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়া তাহার সত্বাধিকার সমাজে বিক্রয় করিয়াছেন।

বাবু লক্ষ্মণ প্রসাদ—লক্ষ্ণৌ অবস্থিতি কালে সামাজিক উপাসনা, দরিদ্রদিগকে ঔষধ বিতরণ এবং ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করিয়াছেন। মাঘোৎসবে লক্ষ্ণৌতে আচার্য্যের কার্য্য এবং বক্তৃতা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শাণ্ডিলা, হরদুই, সাজাহানপুর, বেরিলী, মুরাদাবাদ, সাহারাণপুর মজঃফরনগর, মিরট, দিল্লি, সেকেন্দ্রাবাদ, আলিগড়, মথুরা, বৃন্দাবন এবং আগ্রা প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া সেই সেই স্থানে উপাসনা, বক্তৃতা, ধর্ম্মালোচনা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি গোয়ালিয়া, ঝান্সি, ব্যাণ্ডা, এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

খাশিয়া মিশন ও বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী—একখানি বাঙ্গালা রিপোর্ট এবং খাসিয়া ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকার সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। একখানি ইংরাজি রিপোর্ট ও অন্য একখানি খাশিয়া পুস্তিকা প্রস্তুত হইতেছে। নীতি বিদ্যালয়, বঙ্গ বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতির কার্য্য রীতিমত চলিতেছে। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী এই মিশন কার্য্যের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। ইহার অর্থ সংগ্রহ হেতু তাঁহাকে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে হয়। সেই উপলক্ষে সমাজে ও পরিবারে উপাসনা, অনুষ্ঠান ও বক্তৃতা দ্বারা তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। বিগত মাঘোৎসবে কলিকাতায় ব্রহ্মমন্দিরে তিনি দুই দিন আচার্য্যের কার্য

করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রাতেও কয়েকদিন উপাসনা করিয়াছেন। সুনামগঞ্জে "স্বাভাবিক ধর্ম্ম" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন।

সাধনাশ্রম।

আশ্রমের দৈনিক উপাসনা নিয়মিতরূপে চলিয়াছে। এতদ্ভিন্ন মাসিক তিনটী উৎসব হয়। ১লা জানুয়ারি উৎসবে একজনকে আশ্রমের সহায় শ্রেণীভুক্ত করা হয়। ১লা ফেব্রুয়ারী আশ্রমের বাৎসরিক উৎসবে একজনকে ওয়ার্কাররূপে, দুই জনকে সংকল্পাধীন ওয়ার্কাররূপে (একজন মহিলা) এবং তিন জনকে আশ্রমের সহায়রূপে গ্রহণ করা হয়। বিগত মাঘোৎসবোপলক্ষে ১২ই মাঘ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে আশ্রমের উৎসব হয়। এই উৎসব উপলক্ষে একজন পাঞ্জাবী ভ্রাতা আপনাকে ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করেন। মাঘোৎসবের পূর্ব্ব হইতেই উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এক প্রচার দল পাঠাইবার সংকল্প করা হয়। তদনুসারে গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভাই প্রকাশদেব, ভাই সুন্দর সিং, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র ঘোষাল তৎপরে শ্রীমান্ শ্রীবঙ্গবিহারী উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করেন। এই উপলক্ষে মন্দিরে ৮ই ফেব্রুয়ারী তাঁহাদের বিদায় সূচক ব্রহ্মোপাসনা হয় এবং তৎপর তাঁহাদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থ সংগৃহীত হয়।

আশ্রম হইতে কয়েকটী ব্রাহ্ম ও হিন্দু পরিবার এবং ছাত্রাবাস পরিদর্শন করা হইয়াছে। এই পরিদর্শনে উপাসনা সঙ্গীত সংকীর্ত্তন ও আলোচনাদি হইয়াছে। প্রয়োজন মত কখন কখন রোগীর শুশ্রূষাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নিম্নে ওয়ার্কারগণের কার্য্য বিবরণ প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের কার্য্যবিবরণ স্থানান্তরে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়—ব্রাহ্মমিশন প্রেসের অধ্যক্ষের কার্য্য করেন। কখন কখন আশ্রমের উপাসনার কার্য্য করেন। মাঘোৎসবে মন্দিরে একদিন উপাসনা করেন। কোন কোন ব্রাহ্ম পরিবারে পরিদর্শন ও উপাসনার কার্য্য করেন। সম্প্রতি স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য কিয়দ্দিবসের অবকাশ গ্রহণ করিয়া পশ্চিমে গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—মাঘোৎসব উপলক্ষে মন্দিরে দুই দিন উপাসনা করেন। অন্যান্য সময়ও মন্দিরে প্রাতঃকালীন উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। নিমতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কার্য্য করেন। কয়েকটি ব্রাহ্ম পরিবার পরিদর্শন করেন। আশ্রমের উপাসনার কার্য্যও অনেক সময় করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব—মাঘোৎসবে মন্দিরে একদিন উপাসনা করেন। কখন কখন ব্রাহ্ম পরিবার পরিদর্শন করিয়াছেন। "ব্রাহ্ম প্রচারক" পত্রিকার সম্পাদনের সহায়তা করেন। ফেব্রুয়ারী মাসে উত্তর পশ্চিমে যাত্রা করিয়া প্রচার করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী—উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাইবার জন্য বিশেষরূপে প্রস্তুত হন। কখন কখনও সাধনাশ্রমে উপাসনার কার্য্য করেন। ফেব্রুয়ারী মাসে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করিয়াছেন এবং নানা স্থানে প্রচার করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র ঘোষাল—তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদনের সহায়তা করেন। ফেব্রুয়ারী মাসে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রচার করেন পরে কলিকাতা প্রত্যাগত হইয়া ফরিদপুর অঞ্চলে অন্নকষ্ট প্রপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ প্রেরিত হন। ইনি এখনও তথায় কাজ করিতেছেন। ইনি সাধনাশ্রমে কখনও কখনও উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত জয়শঙ্কর রায়—আশ্রমের ম্যানেজমেণ্টের ভার ইঁহার হাতে। আশ্রমবাসিনী মহিলাদিগকে প্রতিদিন শিক্ষা দিয়াছেন। প্রায়ই ব্রাহ্ম পরিবার পরিদর্শন করিয়াছেন। কিছুদিন ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়েও শিক্ষা দিয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রচার যাত্রীদল আপাততঃ আরাতে আশ্রমের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আরা জেলা বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের প্রায় সন্ধিস্থলে, এজন্য এবং আরও কোন কোন কারণে ঐ স্থলে তাঁহারা আপাততঃ অবস্থিতি করিয়া প্রচার করিতেছেন।

নিম্নে আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদত্ত হইল :—

আয়		ব্যয়	
দান প্রাপ্তি	৭২৮/০	ওয়ার্কার ও অতিথিদিগের আহারাদি বাবদ	২৭৭৸৶১০
সাঃ ব্রাঃ সমাজ হইতে প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ প্রাপ্ত	২০৲	পাথেয় হিঃ	৩৩॥০
বাড়ী ভাড়া হিঃ	২০৲	ডাকমাশুল ও অন্যান্য বাবদ	২৯॥/১৫
ওয়ার্কারদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত	১৫১॥০		
ভিক্ষা প্রাপ্তি	৩৯৵১০		৩৪১/৫
পাথেয় হিঃ	৫৲	স্থিত	৫॥/১০
পুস্তক বিক্রয় হিঃ	৪॥০		
বিবিধ হিঃ	২৮৲	মোট	৩৪৬॥৵১৫
	৩৪০৸৶১০		
গত বৎসরের স্থিত	৫॥৶৫		
মোট	৩৪৬॥৵১৫		

সঙ্গত সভা—এই তিন মাসে প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর সাঃ ব্রাঃ সমাজের উপাসনা মন্দিরে এই সভার ৯টী অধিবেশন হয়। তাহাতে গড়ে ১১ জন সভ্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই ৯টী অধিবেশনের মধ্যে তিনটী অধিবেশনে 'মহানির্ব্বাণ তন্ত্র' ও 'বাইবেল' পাঠ এবং ব্যাখ্যা হয়, বাকী ৬টী অধিবেশনে নিম্নলিখিত ৩টী বিষয়ের আলোচনা হয়। ১। "হিন্দু শাস্ত্র পাঠের ফলাফল কি?" ২। "সঙ্গতের সভ্যদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য বিধি ও নিষেধ।" ৩। "সত্যের সাধন।"

ব্রহ্মবিদ্যালয়—মাঘোৎসবের পর হইতে ইংরেজি ধর্ম্মবিজ্ঞানের শ্রেণী ও ভগবদ্গীতার শ্রেণী নিয়মিতরূপে চলিতেছে। ইদানিং বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শিক্ষাধীনে বাঙ্গালা ধর্ম্মবিজ্ঞানের শ্রেণী পুনরায় খোলা হইয়াছে। এই শ্রেণীতে মধ্যে মধ্যে ইংরেজিতেও বক্তৃতা হইয়া থাকে।

দাতব্য বিভাগ—

ঈশ্বর কৃপায় দাতব্য বিভাগের কার্য্য পূর্ব্ববৎই চলিয়াছে। এই তিন মাস মধ্যে ৮টী পরিবার, ১২টী ছাত্র, ১টী ছাত্রীর, দুইটী অন্ধ ও একটী কুষ্ঠ রোগীর এবং একটী লোকের পাথেয় সাহায্য করা হইয়াছে। অর্থাভাবে উপযুক্তরূপে দুঃখীদিগের সাহায্য করা যাইতেছে না। সর্ব্বসাধারণে বিশেষতঃ ব্রাহ্মগণ যদি অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে এই ফণ্ডে কিছু কিছু অর্থ দান করেন, তাহা হইলে এতদ্দ্বারা অনেক দুঃখীর দুঃখ মোচনের সাহায্য হইতে পারে। যাঁহারা এই ফণ্ডে অর্থ দান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

জমা		খরচ	
অনুষ্ঠান উপলক্ষে দান		মাসিক দান	৬৮৷৷০
প্রাপ্ত	২৮৲	এককালীন দান	১৫।০
বার্ষিক দান	২৩৷৷০	বিবিধ ব্যয়	১৷৷৶৫
বিবিধ হিঃ প্রাপ্ত	৩৷৷০		
			৮৫।৶৫
	৫৫৲	হস্তে স্থিত	১৪৩।১৫
পূর্ব্বকার স্থিত	১৭৩৸০		
			২২৮৸০
	২২৮৸০		

ব্রাহ্ম ছাত্রীনিবাস ও ব্রাহ্ম শিক্ষালয়—ছাত্রীনিবাসে গড়ে ছাত্রী সংখ্যা ২৮। বর্ত্তমান ছাত্রী সংখ্যা ২৭। ইহাদের মধ্যে একজন এখানে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেন ও বাকী ২৬ জন পাঠ করেন। ৭ জন নূতন ভর্ত্তি হইয়াছেন এবং ৫ জন ছাড়িয়া গিয়াছেন। শিক্ষালয়ে গড় ছাত্রী সংখ্যা ৭৭। বর্ত্তমান ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা ৭৯। ইহাদের মধ্যে ২৫ জন ছাত্রীনিবাসে থাকে। বাকী সকলেই বাড়ী হইতে আসিয়া পড়িয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ১৫ জন বালক। ১৩ জন নূতন ভর্ত্তি হইয়াছে এবং ২ জন ছাড়িয়া গিয়াছে। গত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ৩ জন ছাত্রী পরীক্ষা দিয়াছে। বর্ত্তমান এণ্ট্রান্স ক্লাশের ছাত্রী সংখ্যা ৬। দুই জন শিক্ষক কার্য্যত্যাগ করিয়াছেন এবং ১ জন শিক্ষয়িত্রী বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ১ জন শিক্ষক ও দুই জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে একজন শিক্ষয়িত্রী বিনা বেতনে কাজ করিতেছেন। গত জানুয়ারী মাসে বার্ষিক পরীক্ষা এবং ফেব্রুয়ারী হইতে নূতন বর্ষের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। শিক্ষাপ্রণালী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নিম্নশ্রেণী সমূহে বাঙ্গালা ও উচ্চশ্রেণী সমূহে ইংরাজির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। বাবু মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায় এক পক্ষ কাল বিনা বেতনে কাজ করিয়াছিলেন।

হিসাব।

জমা		খরচ	
ছাত্র ও ছাত্রীদের		ছাত্রীনিবাসের খাওয়া	
বেতন	১১৫৫৸০	খরচ	৪৫৮৶১৫
চাঁদা ও দান	৩৬৯৲৫	কর্ম্মচারী ও চাকর-	
		দের বেতন	৬৭৭৷৷০
	১৫২৪৸৫	গাড়ী	১১৫৸৭৷৷
পূর্ব্বস্থিত	১৩৬৶০	বাড়ীভাড়া	২৭৩৲
		বিবিধ	৫৭।৵৭৷৷
মোট	১৬৬০৸৶৫		
			১৫৮১৸৵১০
		হস্তেস্থিত	৭৯৲১৫
		মোট	১৬৬০৸৶৫

ছাত্রসমাজ—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় "সমাজের জীবনী শক্তি", "সামাজিক আশাশীলতা; শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "বিবেক ও ঈশ্বর" (১) "বিবেক ও ঈশ্বর" (২), "ধর্ম্মহীন নীতি ও নীতিহীন ধর্ম্ম।" শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বি,এ "প্রকৃত শিক্ষা", এতদ্ব্যতীত ৩রা মার্চ্চ "জীবনের কৃত কার্য্যতা" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম, এ, ও বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বি,এ বক্তৃতা করেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সভাপতি ছিলেন। ২টি মাত্র আলোচনা সভা হইয়াছে। উভয় সভাতেই শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন। ২৪শে মার্চ্চ ছাত্রসমাজে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। গত ১৯শে ফেব্রুয়ারি ডাঃ পি, কে, রায় ছাত্রসমাজের কয়েকটী সভ্যকে আপনার গৃহে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাহাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপাদি করেন। ছাত্রসমাজের বর্ত্তমান সভ্য সংখ্যা ১০৪ জন।

উপাসক মণ্ডলী—বিগত ৩ মাসে নিয়মিতরূপে মন্দিরে উপাসনা হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়গণ অধিকাংশ দিন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

মণ্ডলীর বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি সাধন জন্য বিগত জুলাই মাসে যে কমিটী গঠিত হইয়াছিল সেই কমিটির রিপোর্ট বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

আয় ব্যয়ের হিসাব

আয়		ব্যয়	
চাঁদা আদায়	৭০৶০	বেতন	৩১ ০
দান সংগ্রহ	১৵১৫	মন্দির মেরামত	২৩৷৵০
ছাত্রসমাজ হইতে গ্যাস		গ্যাসের আলো	৩৭৷৷০
হিঃ প্রাপ্ত	১২৲	ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যয়	১৬।৶২৷৷
হাওলাত	২৮৲	হারমোনিয়ম	
		মেরামত	৩০৲
	১১১৴১৫		
পূর্ব্বস্থিত	৩৩৮৶৭৷৷		১৩৯৴৭৷৷
		হস্তেস্থিত	৬।০
	১৪৫।৴২৷৷		
			১৪৫।৴২৷৷

আয় ব্যয়ের হিসাব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

আয়		ব্যয়	
সভ্য ও সহযোগিগণের		প্রচার ব্যয়	৬১৬৸৵১০
নিকট চাঁদা আদায়	৩৯৫৷৷৶১৫	কর্ম্মচারীর বেতন	৭৪৸৴১০
বার্ষিক ২৮৩৷৷৶১০		উপাসক মণ্ডলী	৫৸০
মাসিক ১১২৲৫		গচ্ছিত ও হাওলাত	২২৫৵০
৩৯৫৷৷৶১৫		ট্রাষ্টডিড	৴১০
প্রচারার্থ দান	৩০৮।৵১০	বিবিধ	৯।৴০
বার্ষিক ৯৫৸৵০		মুদ্রাঙ্কণ	১১৷৷০
মাসিক ১৪৪৷৷০		ডাকমাশুল	১।৫।১০
এককালীন ৬৮৲১০		উৎসব	৬৫৸০
		আসবাব	৫৲
৩০৮।৵১০		সিটী কলেজ বৃত্তি	৮৪৷৷০

স্থায়ী প্রচার ফণ্ড	১৭৷৷০	কাগজ খরিদ	২৭৷৷১০
পতিতারমণী-আশ্রম ফণ্ড	২৲	কমিশন	১৲
সৌদামিনী ফণ্ড	৩৭৷৷০	লাইব্রেরী	১৷০
গচ্ছিত ও হাওলাত	২২২৻৫	প্রচারক গৃহ হিঃ	৫৸/১০
		দুর্ভিক্ষ	৯০৷৷০
প্রচারক গৃহ হিঃ	৮০৷৷৶০	সৌদামিনী বৃত্তি	১০৲
দুর্ভিক্ষ	৪৭৷৷৶০		
সুদ হিঃ	৮৪৲		১২৬৬৷৷৵০
সিটী কলেজ বৃত্তি	৮৪৷৷০	হস্তেস্থিত	৩৭০৷৷৶১৫
দুর্গাময়ী ফণ্ড	৬৫৲		
উৎসব ফণ্ড	৮১৷৶১০		১৬৩৭৷/১৫
বিলডিং ফণ্ড	৩৷৷/৫		
ব্রাহ্ম মিশন প্রেস	১০০৲		
কাগজ বিক্রয়	২৯৻১০		
আসবাব	৫৲		
বিবিধ হিঃ	২৷৷/০		
	১৫৫৯৷৷৵১৫		
গত বৎসরের স্থিত	৭৭৷৷৶০		
	১৬৩৭৷/১৫		

পুস্তক।

সমাজের নগদ বিক্রয়	৪৮১৶৫	কর্ম্মচারীর বেতন	১২৸/১০
অপরের নগদ বিক্রয়	১৯৯৵৫	মুদ্রাঙ্কণ	২৭৲
বাকী আদায়	৮৷৷/১০	দপ্তরী	৩৯৲
ডাকমাশুল	১৫৸/৫	ডাকমাশুল	১৬৻৫
গচ্ছিত	৩৮৬৸৵১০	কমিশন	৩৬৲
কমিশন	৩৬৷০	অপরের পুস্তক বিক্রয়ের	
		মূল্য শোধ	১৮২৸৫
	১১২৭৸৵১৫	পুস্তক ক্রয়	১৯৪৷৷/১৫
গত বৎসরের স্থিত	১২৯৷০	গচ্ছিত	৩৮৫৸৶১৫
		হাওলত	২২৲
	১২৫৭৵১৫	বিবিধ	৫৵০
		কাগজ খরিদ	১৷৷০
			৯২২৸/১০
		হস্তেস্থিত	৩৩৪৷/৫
			১২৫৭৵১৫

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

মূল্য আদায়	২৮৪৷১০	কর্ম্মচারীর বেতন	৬৯৲
বিজ্ঞাপন	২৯৲	মুদ্রাঙ্কণ	১২০৷৵০
নগদ বিক্রয়	৸/০	কাগজ	৩২৷৷০
কাগজ	৸০	দপ্তরী	৯৸৵০
ডাকমাশুল	৶০	কমিশন	৪৷০
		ডাকমাশুল	১৩৻১৫
	৩১৫৻১০	বিবিধ	৫৸/০
গত বৎসরের স্থিত	১৷/৫		
			২৫৪৸/১৫
	৩১৬৷/১৫	হস্তেস্থিত	৬১৷৷০
			৩১৬৷/১৫

তত্ত্বকৌমুদী।

মূল্য আদায়	১৫৭৷৷৶১৫	কর্ম্মচারীর বেতন	৮৭৷৷০
নগদ বিক্রয়	৵০	কাগজ	৩০৸৶০
হাওলত	২২৲	মুদ্রাঙ্কণ	৬৯৸০
কাগজ	২৸/০	কমিশন	৪৲
		ডাকমাশুল	৷৷৶১৫
	১৮২৷৷৵১৫	দপ্তরী	৭৸৵০
গত বৎসরের স্থিত	১৫৷৷০	বিবিধ	১৸/০
	১৯৮৵১৫		১৯৭৷৷/১৫
		হস্তেস্থিত	৷৷/০
			১৯৮৵১৫

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস।

১ম ত্রৈমাসিক হিসাব।

আদায় (মুদ্রাঙ্কণ ইত্যাদি হিসাবে যাহা পাওয়া গিয়াছে)	১৭৯৯৬৸৵১০	মুদ্রাঙ্কণ কাগজ ইত্যাদি বাবদ যাহা ধার দেওয়া হইয়াছে	১৮৫০৷৷৶০
ছাপাই	১২৯০৷৷৶০	সুদ	৭৪৲
প্রেস প্রস্তত	১৭৩৷৷৵০	বাটী ভাড়া	৩০৲
গৃহ প্রস্তত	৬০৲	ওয়ার এণ্ড টিয়ার	১২৯৲
হাওলাৎ	১৩১৯৻৫	সরঞ্জামী	১১৫৸৶১০
সুদ ৭৩৲		বিবিধ	৪৷৵১০
কর্ম্মচারীর		ডাকমাশুল	৷৷/০
বেতন ৭০৬৷০		প্রেস প্রস্তত	৬৫৩৷৷১০
টাইপ ৫৩৯৸৫		বেতন	৭০৬৸/১০
		ছাড়	৮৷৷৶৫
	৪৬১০৶১৫	লাইসেন্স	১২৲
গত বৎসরের স্থিত	৮৯৷৷১০	ঋণ শোধ	১০০৲
		কাগজ খরিদ বিক্রয়	৷৷১০
	৪৬৯৯ ৸৻৫	হাওলাৎ	৯৯৭৷০
		সুদ ৭৩৲	
		কর্ম্মচারীর	
		বেতন ৭২৪৷৷৵০	
		টাইপ ১৯৯৷৷৵০	
			৪৬৮৩৷৷০
		হস্তেস্থিত	১৬ ৫
			৪৬৯৯৸৫

ব্রাহ্মসমাজ।

বিবাহ—বিগত ২১শে এপ্রিল শনিবার কোন্নগরনিবাসী শ্রীযুক্ত সাতকড়ি দেবের মাণিকতলা খালপারস্থ ভবনে তাঁহার কন্যা কুমারী সুবালা দেবের সহিত, দেরাদুন প্রবাসী আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু কালীমোহন ঘোষের পুত্র শ্রীমান্ বিপিনবিহারী ঘোষের শুভবিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্ম-পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের বয়স অনুমাণ ২৩।২৪ বৎসর, পাত্রীর বয়স ১৪ বৎসর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। বিবাহ ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টরি হইয়াছে।

শ্রাদ্ধ—বিগত ২১শে এপ্রেল শনিবার প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের কলিকাতাস্থ ভবনে তাঁহার পূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণীর আদ্যশ্রাদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। শ্রাদ্ধস্থলে হেরম্ব বাবু তাঁহার স্বর্গগতা জননীর যে সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া অনেকেই উপকৃত হইয়াছেন। এই সকল শ্রদ্ধেয় হিন্দু রমণীর গুণাবলী আমাদের মহিলাগণের অনুকরণীয়।

আদ্যশ্রাদ্ধ—নসীপুর নিবাসী (মুরশিদাবাদ) শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ গুপ্ত ১৬ই চৈত্র কাশীধামে তাঁহার পরলোকগতা মাতুলানীর আদ্যশ্রাদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। গুপ্ত মহাশয় তাঁহার মাতুলানীর উইলদ্বারা কাশীধামে যে বাড়ী পাইয়াছেন তাহা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে দান করিবেন বলিয়া শ্রাদ্ধ-বাসরে সংকল্প করিয়াছেন। বাড়ীর দাম ৩৫০০৲ টাকা হইবে। তিনি শ্রাদ্ধের পর নিম্নলিখিত অর্থ দান করিয়াছেন।

সাঃ ব্রাঃ মিশন ফণ্ড	১৲
ঐ সাধন আশ্রম	১৲
দাসাশ্রম	১৲
অনাথ আশ্রম	১৲

পরমেশ্বর পরলোকগত আত্মার শান্তিবিধান করুন।

দীক্ষা—মনাই চা বাগান নামে আমাদের বন্ধুদ্বয় শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু ও শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস মহাশয়দিগের আসামে একটী চা বাগান আছে। দার্জ্জিলিং নিবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল হালদার মহাশয় এই বাগানের অধ্যক্ষ। আমরা দেখিয়া সুখী হইতেছি যে, মতি বাবুর যত্নে ও চেষ্টাতে তদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইতেছে। পত্র পাঠে জানা গেল গত ৬ই মার্চ্চ তারিখে মনাই চা বাগান ব্রাহ্মসমাজে শ্রীযুক্ত বলেশ্বর আগরওয়ালা নামক একজন যুবক পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। ইনি তেজপুরস্থ সুবিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত শ্রীযুক্ত হরিবিলাস আগরওয়ালার ভ্রাতুষ্পুত্র; বয়স ২৩।২৪ বৎসর; বলেশ্বর বাবু তাঁহার দীক্ষা উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে এককালীন ৫৲ পাঁচ টাকা দান করিয়াছেন।

প্রচার—কলিকাতা সাধনাশ্রম হইতে শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও হরিমোহন ঘোষাল কাঁথি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া সম্প্রতি প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী চট্টগ্রাম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে গমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস বগুড়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছেন।

ছাত্র-সমাজ—বিগত ১৩ই এপ্রেল সায়ংকালে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী অবলা বসু কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রসমাজের কতকগুলি সভ্যকে আপনাদের ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, জগদীশ বাবু ছায়াচিত্র (Magic-lantern) যোগে নানাবিধ আশ্চর্য্য বিষয় প্রদর্শন করিয়া সমবেত ছাত্রদিগকে বিশেষ প্রীত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নী সৌজন্য ও আতিথ্যের দ্বারা সকলকে বিশেষ আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

কুমারী কলেট্—কুমারী কলেটের মৃত্যু সংবাদ যেদিন কলিকাতায় পঁহুছিল, তৎপর দিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আফিস ব্রাহ্ম মিশন প্রেস ও ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় বন্ধ রাখা হয় এবং সেই দিন যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল, তাহা বন্ধ থাকে এবং পরদিন সেই অধিবেশন হইয়া অপরাপর কার্য্যের মধ্যে কুমারী কলেটের মৃত্যু উপলক্ষে শোক সূচক প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয়। তৎপর দিবস অর্থাৎ ২০শে এপ্রেল শুক্রবার অধ্যক্ষসভার যে অধিবেশন হয়, তাহাতে অপর সকল কার্য্য বন্ধ করিয়া কেবল মাত্র শোকসূচক এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২১শে এপ্রেল সিটিকলেজ ভবনে অনেক ব্রাহ্মবন্ধু সমবেত হইয়া তাহার জন্য বিশেষ প্রার্থনা করেন।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়া অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থে নিম্নলিখিত মহোদয় মহোদয়াগণ অর্থদান করিয়াছেন। আর অনেকে পুরাতন এবং নূতন বস্ত্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ.
ধনাধ্যক্ষ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রীযুক্তা অনন্তবালা দেবী, গৌরীপুর (বস্ত্র ক্রয়ার্থ)		২৫৲
শ্রীযুক্তা কালিময়ী দেবী (বস্ত্র ক্রয়ার্থ)		১০৲
শ্রীযুক্তা কুঞ্জকুমারী গুপ্তা,	নসীপুর	২৲
„ কামিনীসুন্দরী দেবী	ঐ	॥০
„ গুদু বৈষ্ণবী	ঐ	।০
বচ্চন বিবি	ঐ	৴০
বাবু প্যারিলাল ঘোষ, মেদিনীপুর		।০
„ নির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী		৸০
„ মঙ্গলজান মণ্ডল		।০
„ ভুবনমোহন ঘোষ, কলিকাতা		২৲
„ অমৃতলাল দাস, ৩১নং রাজচন্দ্র দাসের লেন		॥০
কুমারী প্রেমকুসুম সেন,	কলিকাতা	১৲
মিষ্টার কে, জি, গুপ্ত	ঐ	৫৲
শ্রীমতী ক্ষিরোদবাসিনী সরকার,	ঐ	১৲

„	নির্ম্মলা দত্ত, ঐ	১৲
বাবু সুখচন্দ্রলাল রায়		৶০
১টী ব্রাহ্মিকা		১৶০
শ্রীমতী হেমন্তকুমারী সুকুল		১৲
„	গিরিবালা দাসী	১৲
„	কুন্দমালা সেন	১৲
„	অবলা বসু	১৲
„	বিরাজমোহিনী দেব, কলিকাতা	॥০
„	প্রেমলতা দেব ঐ	॥০
বাবু মতিলাল আলান, মল্লিক ষ্ট্রীট, বড়বাজার কলিকাতা		৩৲
শ্রীমতী হেমন্তকুমারী হালদার		।০
শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেব		।০
পুরাতন বস্ত্র বিক্রয়		৶০
বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা, কুমারখালি		২৲
		৬১৸০

বিজ্ঞাপন।

দুর্ভিক্ষ ফণ্ডের সাহায্য প্রার্থনা।

গত ভাদ্র মাসে পূর্ব্ব বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ বিক্রমপুরে ভয়ানক অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময় ঐ সকল লোকের সাহায্যার্থে আমরা সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম। অনেক মহোদয় ভ্রাতা ভগিনীগণ তখন অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। আমরা তদ্দ্বারা ঐ সকল স্থানে লোক পাঠাইয়া সাহায্য করিয়াছিলাম। তাহার দরুণ কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত হওয়াতে তাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে গচ্ছিত ছিল।

বিগত ফাল্গুন মাস হইতে ফরিদপুরের অন্তঃপাতী কোটালিপাড়া অঞ্চলে ভয়ানক অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তথা হইতে কোন কোন সহৃদয় লোক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় ঐ সংবাদ জানাইয়াছেন। তৎপরে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ৪০৲ চল্লিশটি টাকাসহ বাবু কালীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়কে ঐ সকল অঞ্চলে প্রেরণ করিয়াছেন। কালী বাবু তথায় যাইয়া অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন যে, বাস্তবিকই তথায় ভয়ানক অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এমন কি কয়েক জন লোক অনাহারে থাকিয়া কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ঐ সংবাদ পাইয়া ক্রমাগত টাকা পাঠাইতেছেন। অন্ততঃ আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত এইভাবে সাহায্য করিতে হইবে। এই জন্য আমরা সর্ব্ব সাধারণের নিকট বিনীতভাবে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যাঁহারা সুখ স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতেছেন, তাঁহারা যদি এই অনাহারে ক্লিষ্ট ভ্রাতা ভগিনীদিগের দুঃখের কথা একবার চিন্তা করেন এবং স্বীয় স্বীয় ক্ষমতা অনুসারে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করেন, তাহা হইলে অনেক পরিমাণে এই সকল দীন দরিদ্রদিগের দুঃখ মোচন হইতে পারে।

যাঁহারা এই দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগের দুঃখ মোচনের জন্য অর্থ সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সত্বর নিম্ন স্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় পাঠাইলে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। আমাদিগের নিকট টাকা আসিলে আমরা দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে তাহা পাঠাইয়া দিব। যাহাতে দুর্ভিক্ষ ফণ্ডের টাকা কোনও রূপে অযথা ব্যয় বা অপব্যয় না হয়, সে বিষয়ে আমরা বিশেষ দৃষ্টি রাখিব।

নিবেদক,

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ

ধনাধ্যক্ষ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

মৃত দেহের প্রতি সম্মাননা পৃথিবীর সকল জাতি মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও সম্মানপ্রকাশজন্য মৃত দেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার সময়ে আত্মীয় স্বজনগণ শবপর্যঙ্ক নিজ নিজ স্কন্ধে বা মস্তকোপরি বহন করেন, অথবা হাতে ঝুলাইয়া লইয়া যান। আমরা এ প্রথাকে অসম্মান করিতে পারি না। আত্মীয় স্বজনের মৃত দেহ অতি সাবধানে সম্মানসহকারে যাহাতে গন্তব্যস্থানে লওয়া যাইতে পারা যায়, আমরা তাহার একটি উপায় চিন্তা করিতেছি। শবদেহের গুরুভারবশতঃ অনেক সময় বহনকারীরা যথারীতি সময়োচিত ব্যবহারে বিমুখ হইতে পারেন। এই অযথা ব্যবহার দর্শন করিয়া আমরা অনেক সময় বড় কষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। এজন্য আমরা এমন একটি উপায় স্থির করিতে ইচ্ছা করিতেছি, যাহাতে মৃত দেহের প্রতি যথারীতি সম্মান থাকে, অথচ বহনভার লাঘব হইয়া অস্বাভাবিক রীতি ও ব্যবহার হইতে সকলকে রক্ষা করা যায়।

যদ্যপি এমন এক খানি শকট প্রস্তুত হয় যাহাতে মৃত দেহের খাটখানি স্থাপন করিয়া আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব দ্বারা উহা চালিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বর্ত্তমান অভাব অনেক পরিমাণে মোচন হইতে পারে। শকটখানি এমন ভাবে প্রস্তুত হইবে যাহা দেখিয়াই সকলের মনে বেশ সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইবে। আমরা অনুমান করিতেছি, আপাততঃ ন্যূনাধিক ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা হইলে ঐরূপ একখানি শকট প্রস্তুত হইতে পারে। ব্রাহ্ম মহোদয়গণের নিকট বিনীত ভাবে এই কার্য্যের জন্য আমরা সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি। আশা করি, সকলেই এ বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করিয়া যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা সেইরূপ ভিক্ষা প্রদান দ্বারায় আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

বলা বাহুল্য যে ব্রাহ্মমাত্রেই মৃত দেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় এই শকটখানি ব্যবহার করিতে পারিবেন। নগরের এমন কোন স্থানে একটি ঘর ভাড়া করিয়া হউক বা যে উপায়ে হউক শকটখানি রাখা হইবে যে সহজেই সকলে যথাসময়ে উহা পাইতে পারেন।

নিবেদক

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১৬ই বৈশাখ প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

৩য় সংখ্যা। ১৭শ ভাগ।

১লা জ্যৈষ্ঠ সোমবার, ১৮১৬ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা, রক্তমাংসময় জীব মানবকে তুমি দুর্ব্বল বলিয়াই জান। তুমি কি মানবের নিকট পূর্ণতার অপেক্ষা কর? তাহার অপূর্ণতার অর্থ এই যে, সে ভ্রান্তি ও দুর্ব্বলতা বশতঃ তোমার প্রদর্শিত আদর্শ হইতে সর্ব্বদাই আপনাকে হীন দেখিতে পাইবে। কিন্তু তুমি ইহা চাও যে, সে অকপটে তোমার প্রদর্শিত আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য প্রয়াস পাইবে। সরল ও অকপট আকাঙ্ক্ষা তোমার নিকটে অতীব স্পৃহনীয়। পুষ্পের সুঘ্রাণ যেরূপ, অকপট আকাঙ্ক্ষা মানবাত্মার পক্ষে সেইরূপ। ইহা পুষ্পের সুঘ্রাণের ন্যায় তোমার নিকট আদৃত হয়। যে প্রাণে আকাঙ্ক্ষা আছে, সেখানে তোমার শুভাশীর্ব্বাদও আছে। প্রভো, এই প্রার্থনা করি যে, সহস্র দুর্ব্বলতার মধ্যে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা যেন সর্ব্বদা ঊর্দ্ধমুখে থাকে। সে অগ্নি যেন কখনও নির্ব্বাণ হয় না।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

শান্তিধাম—এই গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে কয়েকজন পথিক এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্য দিয়া পথ চলিতেছে। কিছু পথ উত্তীর্ণ হইতে না হইতে তাহাদের কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া আসিল। তখন পিপাসার বারি কোথায় পাওয়া যায়, তাহাদের অন্তরে এই চিন্তার উদয় হইল। পথ পার্শ্বে যদি বৃক্ষবাটিকা দেখিতে পায়, জলের অন্বেষণে যায়, কিন্তু নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসে, কারণ দেখিতে পায় যে, যে দুই একটী তড়াগ বা বাপী আছে, তাহাতে জল এত অল্প, এরূপ পঙ্কিল ও এরূপ উষ্ণ যে তাহা পানের উপযুক্ত নহে। অবশেষে যখন তাঁহারা নিরাশ অন্তরে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, এরূপ সময়ে দূরে কতকগুলি ছায়াযুক্ত বৃক্ষ দেখিতে পাইল এবং ইহাও লক্ষ্য করিল যে, কতকগুলি পথিক লোক বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছে এবং অগ্নি জ্বালিয়া আহারার্থ রন্ধনাদি করিতেছে। তখন তাহারা আশান্বিত হইয়া বলিল, "ওই যে ছায়াযুক্ত বৃক্ষের নিম্নে মানুষ বিশ্রাম করিতেছে ও প্রশান্ত চিত্তে রন্ধনাদি করিতেছে, তবে নিশ্চয় ওখানে জলাশয় থাকিবে। চল ওই বৃক্ষতলে যাই।" ব্রাহ্মগণ চিন্তা করিয়া দেখুন, তাঁহারা যে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে বাস করিতেছেন, তাহা কি ঐ প্রকার সংসার-প্রান্তরে বট-চ্ছায়া সদৃশ? তাঁহারা কি এই বটচ্ছায়াতে বসিয়া শান্তি লাভ করিতেছেন? যদি ইহা তাঁহাদিগকে শান্তি দিয়া থাকে তবে সংসার পথের শ্রান্ত পথিকগণ নিশ্চয় এই বৃক্ষতলে আকৃষ্ট হইবে, আর যদি এতদ্দ্বারা তাঁহারা নিজেই শান্তি লাভ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহা পাপ-ভারাক্রান্ত নরনারীকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপন করিলে, *লোকে প্রাণের মধ্যে এমন একটী আলয় পায়, যেখানে* মনে করিলেই প্রবেশ করিতে পারে ও সকল তাপ নিবারণ করিতে পারে। সকল বিশ্বাসী ও প্রেমিকের জীবনে এই শান্তি ধামের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারা গুরুতর বিপদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অণুমাত্র বিচলিত হন নাই। প্রশান্ত ও অপরাজিত-চিত্তে সকল অত্যাচার বহন করিয়াছেন। এই প্রশান্ত ও অপরাজিত ভাব কোথা হইতে আসিয়াছিল? তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদা সুস্নিগ্ধ ব্রহ্ম-সহবাসে বাস করিত বলিয়াই ঐ প্রশান্ত ভাব জন্মিয়াছিল। এই প্রশান্ত ভাবের দ্বারা বিচার করিলে দেখিতে পাই আমরা কোন্ দূরে পড়িয়া রহিয়াছি। সামান্য একটু উত্তেজনার কারণ উপস্থিত হইলে আমাদের যে চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে তাহা স্থির হইতে অনেকক্ষণ লাগে। লোকে সামান্য একটু অনভিমত কথা বলিলে বা অনভিমত কার্য্য করিলে, অসহিষ্ণু ও উদ্ধত প্রকৃতি একেবারে উত্তপ্ত হইয়া উঠে ও তীব্র প্রতিবাদ করে। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয়, আমরা এখন প্রকৃত ভাবে সত্যস্বরূপের চরণাশ্রয় করিতে পারি নাই। ঈশ্বর করুন যেন আমরা তাঁহার চরণকে বাস্তবিক শান্তিধাম বলিয়া অনুভব করিতে পারি।

সাধনে ঔদাস্য—নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটী বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। মহাত্মা বুদ্ধ যখন রাজগৃহের সন্নিকটবর্ত্তী গৃধ্রকূট নামক পর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পার্শ্বস্থ শিষ্যগণের মধ্যে একজন যুবাপুরুষ ছিল, তাহাকে ধর্ম্ম-সাধন

বিষয়ে বড় অমনোযোগী দেখা যাইত। সে আলস্যে ও ঔদাস্যে দিন কাটাইত। সেই পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে এক ভীষণ অরণ্যময় স্থান ছিল, সেখানে নিরন্তর নানাপ্রকার শব্দ হইত, এই কারণে লোকে বলিত যে, সেখানে ভূত প্রেতের আবাস স্থান। এই ভয়ে কেহ সেখানে যাইত না। বুদ্ধ একদিন ঐ অলস ও উদাসীন যুবককে সেই ভীষণ অরণ্য মধ্যে এক বৃক্ষতলে গিয়া আত্মচিন্তা ও ধ্যানে রত থাকিতে আদেশ করিলেন। বলিলেন —"যতক্ষণ না আমি তোমাকে দেখিতে আসি, ততক্ষণ তুমি ঐ স্থান পরিত্যাগ করিবে না।" তাঁহার আদেশানুসারে ঐ যুবক গিয়া সেই বৃক্ষতলে আসীন হইল, এবং ধ্যানস্থ হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু চতুর্দ্দিকে এরূপ বিকট শব্দ হইতে লাগিল যে, তাহার চিত্তে বিষম ভয়ের সঞ্চার হইল। সে একবার মনে করিল পলায়ন করি, আবার বুদ্ধের আদেশ স্মরণ করিয়া তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। যখন সে এই প্রকার ইতস্ততঃ করিতেছে, এইরূপ সময়ে কিয়দ্দূরে দেখিল যে, একটী বন্যহস্তী ভয়ে পলায়ন করিয়া আসিতেছে। ক্রমে সেই হস্তীটী এক নিৰ্জ্জন গিরিকুঞ্জে লুক্কায়িত হইয়া নিরুপদ্রবে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইল। তখন সে ব্যক্তি চিন্তা করিল, এ স্থানে এরূপ নিরুপদ্রব যে, ভয়-ভীত বন্য-হস্তীও এখানে আশ্রয় লইয়া আপনাকে নিরাপদ মনে করে; এই ত নিরুপদ্রবে সাধন করিবার স্থান। এই ভাবিয়া সে আবার ধ্যানস্থ হইল। যথাসময়ে মহাত্মা বুদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে ধ্যানস্থ দেখিলেন। ধ্যানভঙ্গে কুশল প্রশ্ন করাতে সে ব্যক্তি তাহার ভয়, বন্যহস্তীর আগমন ও তাহার চিন্তার বিষয় সমুদায় ব্যক্ত করিল। বুদ্ধ কহিলেন—"তুমি উপদেশ প্রাপ্ত হও, ঐ যে বন্যহস্তী তুমি দেখিয়াছ, ওটী বন্ধন ভয়ে যূথ ভ্রষ্ট হইয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। লোকে হস্তিযূথ ধরিতেছিল, ঐ হস্তীটী বন্ধন-ভয়ে অরণ্যে পলাইয়া আশ্রয় লইয়াছিল। একটা সামান্য পশুও আত্মরক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত, আর তুমি এই প্রলোভনপূর্ণ সংসারে আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত নও, তুমি সে বিষয়ে উদাসীন।" তদবধি সেই অলস ও ঔদাসীন শিষ্যের চেতনা হইল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, সাধনে আর ঔদাস্য করিবে না।

কর্ত্তব্য-জ্ঞান-বিহীন ধর্ম্মভাব—বৌদ্ধগ্রন্থে আর একটী আখ্যায়িকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা এই—একজন গৃহস্থের একমাত্র পুত্র ভিন্ন সংসারে কেহ ছিল না। তাঁহারা পতি-পত্নীতে ঐ একমাত্র পুত্রকে অতিশয় আদর দিতেন। তাহার ফল এই হইল যে, তাঁহারা তাহার বিদ্যাশিক্ষার জন্য যে কিছু আয়োজন করিলেন, তাহার কোনও ফল দর্শিল না। সে পাঠে অমনোযোগী, অবাধ্য ও দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিল। তখন পিতামাতা তাহাকে গুরুকুল হইতে বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং তাহাকে বিষয় কার্য্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু সে বিষয়ে সে মনোনিবেশ করিল না। আপনার কর্ত্তব্য সাধনে উদাসীন হইয়া কেবল আমোদ প্রমোদে সময়াতিপাত করিতে লাগিল ও বিবিধ দুষ্ক্রিয়াতে রত হইয়া প্রতিবেশিবর্গের ও অপরাপর লোকের বিদ্বেষভাজন হইয়া উঠিল। বাধ্য হইয়া তাহার পিতা বিষয়ের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। তখন সে কর্ম্মবিহীন, অলস ও লোকের নিন্দিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে সে আর কিছু করিবার না পাইয়া মহাত্মা বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইল এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। বুদ্ধ বলিলেন—"তুমি যদি আমার সহবাসের সুখ চাও, তবে অগ্রে গিয়া আপনার স্বভাব-চরিত্র সংশোধন কর। গৃহে ফিরিয়া যাও, পিতা মাতার বাধ্য হও, নিত্য পূজা সমাপন কর, তোমার দৈনিক কর্ত্তব্য সকল সমুচিতরূপে সম্পাদন কর। তৎপরে আমার নিকট পুনরায় আগমন করিও, তাহা হইলে বোধ হয় আমি তোমাকে আমার শিষ্যদল মধ্যে গ্রহণ করিতেও পারি।"

এই আখ্যায়িকাটী হইতে আমরা একটী উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারি। জনসমাজে এক শ্রেণীর অলস ও অকর্ম্মণ্য লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা এরূপ শ্রম-কাতর যে শ্রম সাধ্য কোনও কার্য্যেই মনোনিবেশ করিতে পারে না। শিক্ষকতা করিতে দেও, অকর্ম্মণ্য শিক্ষক হইয়া পড়ে; আপীষ রাখিতে দেও, কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করে, কোনও বিষয়ের ভার দেও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার প্রয়াস পায় না। ইহারা কোনও দিকে কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে মনে করে ধার্ম্মিক ও সাধু হওয়াই ভাল, তাহাতে এ সকল হাঙ্গামা কিছুই নাই। এই ভাবিয়া গৈরিক বসন বা অন্য কোনও ধার্ম্মিকের বেশ পরিধান করিয়া বসে। আমাদের এদেশে ধার্ম্মিকের একটা প্রধান লক্ষণ অলসতা সুতরাং তাহারা ধার্ম্মিক সাধু নাম পাইয়াও থাকে। মহাত্মা বুদ্ধ যদি থাকিতেন তাহা হইলে হয় ত বলিতেন, "আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করা অলস ও অকর্ম্মণ্য লোকের কর্ম্ম নহে, অগ্রে কর্ত্তব্যের ভার ভাল করিয়া বহিয়া এস, পরে দেখিব তুমি ধর্ম্ম সাধনের উপযুক্ত কি না?" ব্রাহ্ম-সমাজে কর্ত্তব্য-জ্ঞান-বিহীন ধর্ম্মভাব যেন প্রশ্রয় প্রাপ্ত না হয়?

সাধুসঙ্গ—সাধুসঙ্গ দুই প্রকার, জীবন্ত সাধুসঙ্গ ও মৃত সাধুসঙ্গ। অনেক সময় জীবন্ত সাধুসঙ্গ অপেক্ষা মৃত মহাত্মাদিগের সঙ্গ লাভে অধিকতর উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। জীবিত সাধুদিগের দোষগুলি আমাদের চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে থাকে, সুতরাং তাঁহাদের প্রতি অনেক সময় অবিচলিত শ্রদ্ধার উদয় হয় না। কিন্তু মৃত মহাত্মাদিগের দোষ দেখা যায় না। তাঁহাদের জীবন চরিত্রে, তাঁহাদের সাধুতারই গন্ধ পাওয়া যায়। তাঁহাদের চরিত্রের কৃষ্ণ অংশ আমাদের কাছে অপ্রকাশিত; সুতরাং তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে।

কি উপায়ে মৃত সাধুসঙ্গ লাভ হয়? তাঁহাদিগকে চক্ষে দেখা যায় না, তাঁহাদের কথা কর্ণে শুনিতে পাওয়া যায় না। কেবল স্বহস্ত কিম্বা, পর হস্ত লিখিত জীবন চরিত পাঠ এবং তাঁহাদের চরিত্র অনুধ্যান দ্বারা তাঁহাদের সঙ্গ লাভ হইয়া থাকে। উপাসনাকালে, উদ্বোধনের সময় সাধুগণের মাহাত্ম্য চিন্তনে যথেষ্ট উপকার হয়। সাধুগণের সুবিমল চরিত্র সর্ব্বদা চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের সহিত আত্মার নিগূঢ় সম্বন্ধ

স্থাপিত হয়।' তখন তাঁহারা দূরে থাকিলেও অতি নিকটে, মৃত হইলেও জীবিতের ন্যায় বর্ত্তমান। ঐ যে বুদ্ধ, ঐ যে যীশু, চৈতন্য আমার প্রাণের চারিদিকে দণ্ডায়মান। তাঁহারা আমাকে উপদেশ দিতেছেন, ধর্ম্মের সুমিষ্ট কথা শুনাইতেছেন, জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মের আদর্শ দেখাইতেছেন, আমি কি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি? চঞ্চল মন, দশ মিনিট ধ্যানে বসে না; বুদ্ধদেব কি বলিবেন? ছয় বৎসর নির্জ্জনে, নিরশনে, একাসনে, ধ্যান করিলেন। তুমি দুটি পয়সার মমতা পরিত্যাগ করিতে পার না, ঐ দেখ কপিলাবস্তুর রাজ্যেশ্বর ধন মান, স্ত্রী পুত্র সকল সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া পরম ধনের অন্বেষণে দেশে দেশে ঘুরিতেছেন। তোমাকে কেহ নিন্দা করিয়াছে, প্রাণে ব্যাথা পাইয়াছ? রাত্রে ঘুম হয় নাই, তোমার নামে কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে। কি উপায়ে প্রতিশোধ লইবে, তাহার চেষ্টা করিতেছ, হা নির্ব্বোধ! তুমি এভাবে ধর্ম্মসাধন করিবে? ঐ দেখ ভক্ত যীশু ক্রুশ কাষ্ঠে ঝুলিয়া শত্রুদিগের সম্বন্ধে কি বলিতেছেন,—"প্রভো, তুমি ইহাদিগকে ক্ষমা কর, ইহারা জানে না যে, কি অপরাধ করিতেছে।" শরীরের বেদনা বোধ নাই, শত্রুর প্রতি কি অপূর্ব্ব প্রেম। তোমার হৃদয় শুকাইয়া গিয়াছে, মরুভূমির ন্যায় উত্তপ্ত হইয়াছে, ব্রহ্মের নাম উচ্চারণ করিতেও ভাল লাগে না। ঐ দেখ চৈতন্য সিংহ গর্জ্জনে নগর কাঁপাইয়া মহা সংকীর্ত্তনে প্রমত্ত। চক্ষে জল ধারা বহিতেছে, প্রাণ দেহ ছাড়িয়া যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে, প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে। এইরূপে দৈনন্দিন জীবনে, সাধুদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে না পারিলে সাধু সঙ্গ লাভ হয় না।

সাধুসঙ্গ লাভের উদ্দেশ্য সাধু হওয়া। ব্রাহ্ম যীশু হইবেন, কিন্তু খ্রীষ্টান হইবেন না, যোগেতে বুদ্ধ হইবেন কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইবেন না, চৈতন্যের ন্যায় ভক্ত হইবেন; কিন্তু চৈতন্য পদানুসরণকারী বৈষ্ণব হইবেন না। সাধু প্রশংসায় কোনও ফল লাভ হয় না, সাধুর সাধুতা জীবনে লাভ করিতে পারিলেই মঙ্গল। ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতায়, উপদেশে সাধু প্রশংসা যথেষ্ট হইতেছে, কিন্তু সাধুগণের মহাত্ম্য লাভের চেষ্টা তেমন ভাবে হইতেছে না। বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হইয়া সাধুতা গ্রহণ রূপ ব্রত অবলম্বন করিলে অচিরে ব্রাহ্মসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্য-বিস্তার—কেহ কেহ বলেন, ৬৫ বৎসর অতীত হইতে চলিল, এদেশে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু ব্রাহ্মের সংখ্যা এত কম যে, ২৮ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। একথা অতি সত্য। কিন্তু আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রসার এরূপ সংখ্যানুসারে স্থির করি না। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে নবীন সত্যালোক প্রদান করিবার জন্য পৃথিবীতে অভ্যুদিত হইয়াছে, সেই সত্য জনসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া আভ্যন্তরিক ক্লেদ দূর করিতেছে কিনা ইহাই আলোচনার বিষয়।

বুদ্ধদেব নিরঞ্জন নদী তীরে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। এই নদীর অপর নাম ফলগু। বর্ত্তমান সময়ে গয়ার প্রান্তদেশে এই নদী মরুভূমির ন্যায় বালুকাময়ী। দিবা দ্বি প্রহরের সময় যখন মার্ত্তণ্ড খরতর কিরণে ফল্‌গুর বালুকণাকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্বলন্ত করিয়া তুলে, তখন শ্রান্ত পথিকের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়; কিন্তু সেই উত্তপ্ত বালুকারাশির একটুকু খনন করিলেই স্ফটিকের মত অতি সুশীতল জল পাওয়া যায়। সৈকত ভূমির নিম্ন দিয়া অবিরত শীতল স্রোত ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের স্রোতও এরূপে লোক চক্ষুর অজ্ঞাত ভাবে অন্যান্য সমাজের অভ্যন্তর দেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। কি হিন্দুসমাজ, কি মুসলমান সমাজ, কি খ্রীষ্টান সমাজ সকল সমাজের অন্তস্তলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমন্ত্র কার্য্য করিতেছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পণ্ডিত দয়ানন্দ স্বরস্বতী হিন্দু সমাজে এক ব্রহ্মের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আর্য্য সমাজ স্থাপন করিয়াছেন। পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে আর্য্য সমাজের সভ্যগণ প্রকাশ্য সমর ঘোষণা করিয়াছেন। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সেবক পরলোকগত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে অবতার বাদের আবরণ দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যই প্রচার করিয়াছেন। যে সকল হিন্দু প্রচারক হিন্দু ধর্ম্মের পৌত্তলিক অংশ প্রচার করিতে গিয়া দেব দেবীর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাঁহারা অপ্রত্যক্ষ ভাবে দেব দেবীকে বিনাশ করিয়া এক ব্রহ্মের রাজত্ব স্থাপনেরই সহায়তা করিয়াছেন। ইংলণ্ডের খ্রীষ্টান সমাজে স্বাধীন খ্রীষ্টান নামে এক দল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাঁহারা যীশুকে ঈশ্বর বলেন না, বাইবেলকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন না। তাহাদিগকে খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে।

সম্প্রতি আমেরিকার মহা মেলায় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিরাট সভার অধিবেশনে নানা দেশের নানা ধর্ম্মসমাজের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হইয়া যেরূপ উদার ও সরল ভাবে আলোচনাদি করিয়াছেন, তাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সকলের মূলে যে একই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত এবং সকলের গতি ও পরিণতি যে একই সূত্রে গ্রথিত, তাহা অনুভব করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। ওদিকে সামাজিক বিষয়ে ও বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ প্রভৃতি যে সকল সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজ যুদ্ধ করিতেছেন, সে সম্বন্ধে এতদ্দেশে অতি সুফল প্রসূত হইতেছে। দিন দিন ঐসকল কুপ্রথার অনিষ্টকারিতা সকলে অনুভব করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় গণ্ডী মধ্যস্থিত ধর্ম্ম নহে, ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্য নির্দ্দিষ্ট রেখাঙ্কিত ধর্ম্ম নহে, ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বজনীন, সকলের সাধারণ সম্পত্তি, সকল মানবের চরম ধর্ম্ম। সুতরাং পৃথিবী যতই জ্ঞানে প্রেমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, ততই ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজত্ব বিস্তৃত হইবে। সত্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম; সত্যের জয় হইবেই হইবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

জ্ঞানালোচনা সাধনাঙ্গ।

সাধন শব্দটীকে অনেকে অতি সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে সময়টুকু উপাসনা, আরাধনা, বা নামজপে যাপন করা যায়, সেইটুকুই ধর্ম্ম সাধনে গেল; এবং এরূপ কার্য্যে যিনি যত অধিক সময় যাপন করেন, তিনি সেই পরিমাণে সাধক শব্দ-বাচ্য। একজন কোনও গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া একটী মন্ত্র পাইয়াছেন, একাকী বা ধর্ম্মবন্ধুদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া সেইটী জপিয়া থাকেন, সেইটী তাঁর ধর্ম্ম-সাধন। মুখে স্পষ্ট করিয়া না বলুন ভাবে এই প্রকার বোধ হয় যে জীবনের অপরাপর কার্য্যের সহিত ধর্ম্ম সাধনের বিশেষ সম্বন্ধ নাই।

ধর্ম্ম সাধনের এই সংকীর্ণ ভাব হৃদয়ে থাকাতে এই শ্রেণীর সাধকদিগের জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞান ও কর্ম্ম লইয়া কি হইবে, তাহা ত ধর্ম্ম সাধনের অন্তর্ভূত নহে; তাহা মায়িক অর্থাৎ লৌকিক ইষ্ট সাধনের উপায় মাত্র। কিন্তু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের সহায়তা ব্যতীত ভক্তি কখনই উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, চিত্ত-শুদ্ধি, মানব-প্রেম, সত্যনিষ্ঠা, ঈশ্বর-প্রীতি প্রভৃতি ধর্ম্ম সাধনের যে সকল উৎকৃষ্ট ফল উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা লাভ করিতে হইলে জ্ঞান ও কর্ম্মকে সর্ব্বদাই সহায়রূপে গ্রহণ করিতে হয়। প্রথমে জ্ঞানের বিষয় বিচার করা যাউক। তত্ত্বদর্শী সুধীগণ জ্ঞানের অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। ভগবদ্গীতাকার বলিয়াছেন:—

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহবিদ্যতে"

অর্থ—জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র বস্তু আর নাই।

যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে আছে:—

উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথাখে পক্ষিণাং গতিঃ,
তথৈব জ্ঞান-কর্ম্মাভ্যাং জায়তে পরমং পদং।

অর্থ—পক্ষিগণ উভয় পক্ষে ভর করিয়া যেরূপ আকাশে উড়িয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের সাহায্যে মানবের পরম পদ লাভ হয়।"

প্রাচীন আচার্য্যগণ জ্ঞানকে কেন ধর্ম্ম-সাধনের অঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করিলেন? ইহার কারণ এই, বাস্তবিক জ্ঞান চিত্তকে সমুন্নত ও পরিশুদ্ধ করে। একজনের হৃদয়ে যদি প্রকৃত জ্ঞানানুরাগ উদ্দীপ্ত হয় ও জ্ঞানানুশীলনে অভিনিবেশ জন্মে, দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিত্তের সকল ক্ষুদ্রতা চলিয়া যায়, তাঁহার চিত্ত স্বতঃই সংযত হইয়া আসে। ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সুখাসক্তির উপরে উঠিতে না পারিলে মানুষ প্রকৃতভাবে জ্ঞানানুশীলন করিতে পারে না। পরমার্থ জ্ঞানের কথা দূরে থাকুক, সামান্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোচনাতেও মানুষকে বৈরাগ্যভাবে পূর্ণ করিয়াছে; ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলাইয়া দিয়াছে, এবং অসহ্য দুঃখ সহ্য করিতে সমর্থ করিয়াছে। এতদ্দেশে বুনো রামনাথের যে গল্প প্রচলিত আছে, তাহা কেবল এদেশের জ্ঞানিদিগের পক্ষেই যে খাটে তাহা নহে, সকল দেশের জ্ঞানিগণ ঐ প্রকার বৈরাগ্য ভাবাপন্ন ছিলেন। বুনো রামনাথের গল্পটী এই।—ইনি একজন নবদ্বীপের মহাপণ্ডিত ছিলেন। একটী বনের মধ্যে ইহার সামান্য কুটীর ছিল। সেখানে এক বৃক্ষতলে বসিয়া তিনি সর্ব্বদা জ্ঞানালোচনা করিতেন। সাংসারিক অবস্থা অতিশয় হীন ছিল; রামনাথের সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। একদিন তিনি বৃক্ষতলে বসিয়া গভীর তত্ত্বালোচনাতে ও অধ্যয়নে নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে গৃহিণী আসিয়া ঘরে রাঁধিবার কিছু নাই বলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক তর্জ্জন গর্জ্জনের পর রামনাথ চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন, এবং কি রাঁধিবেন জিজ্ঞাসা করায় নিকটস্থ একটী তেঁতুল গাছের পাতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিয়া আবার জ্ঞানালোচনাতে মনোনিবেশ করিলেন। অর্থাৎ আজ ঐ তেঁতুল পাতার ঝোল করিয়া চালাও। আমেরিকা দেশের সুপ্রসিদ্ধ তাড়িততত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এডিসনের বিষয় এইরূপ একটী কৌতুককর গল্প প্রচলিত আছে, কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারা যায় না। সে গল্পটী এই, এডিসনের এইরূপ নিয়ম আছে যে, তিনি যখন তাঁহার (laboratory), বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে থাকেন, তখন ডাকিতে নিষেধ। তাঁহার আহারীয় সামগ্রী সেখানে দিয়া আসিতে হয়। যে তত্ত্বটী মনে জাগিয়াছে, যতক্ষণ তাহার একটা নিষ্পত্তি না হয়, ততক্ষণ তিনি সে ঘর পরিত্যাগ করেন না। যে কৌতুককর ঘটনাটীর উল্লেখ লোকে করিয়া থাকে, তাহা তাঁহার বিবাহের দিন ঘটিয়াছিল। ভজনালয়ে বিবাহান্তে তিনি সস্ত্রীক বন্ধুবান্ধব সহকারে স্বীয় ভবনে আসিলেন। আসিয়া সকলে আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, হাস্য পরিহাস প্রভৃতি চলিতেছে, ইতিমধ্যে কোন সময়ে এডিসন সে সভা হইতে সরিয়া পড়িয়াছেন। কি এক নূতন তত্ত্ব তাঁহার মনে জাগিয়াছে, তিনি তাঁহার পরীক্ষাগারে প্রবেশ করিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে যখন জানিতে পারিলেন যে, তিনি পরীক্ষাগারে গিয়াছেন, তখন সকলে তাঁহার পত্নীকে ডাকিতে নিষেধ করিয়া একে একে চলিয়া গেলেন। সে রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল, এডিসন শয়ন গৃহে থাকিলেন না; পরদিন বেলা ১০টা বাজিয়া গেল, তখনও বাহির হইলেন না। অবশেষে তাঁহার পত্নী আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাঁহার পরীক্ষাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশ করিয়া দেখেন, এডিসন একখানি বেঞ্চের উপরে শয়ন করিয়া দুই কক্ষতলে দুই হস্ত দিয়া, নয়ন মুদ্রিত করিয়া আছেন, দেখিলে বোধ হয় যেন নিদ্রা যাইতেছেন, কিন্তু তাহা নিদ্রা নহে, তিনি চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার পত্নী তাঁহাকে ঠেলিবা মাত্র চক্ষু চাহিয়া বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে? কেন আমার চিন্তার ব্যাঘাত করিতেছ? যখন বুঝিলেন যে, তিনি তাঁহার নব-পরিণীতা ভার্য্যা, তখন মার্জ্জনা চাহিয়া উঠিয়া বসিলেন, ও সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। এ গল্পটী সত্য না হইলেও এরূপ চিত্তের অভিনিবেশ অনেক জ্ঞানীর জীবনে দৃষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানালোচনাতে এরূপ অভিনিবেশ

থাকিলে কি আর ক্ষুদ্রাশয়তা থাকিতে পারে? যেখানে অজ্ঞতা সেখানে প্রায় ক্ষুদ্রাশয়তা দৃষ্ট হয়। ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তি যতই সাধন করুক, তাহার সাধন কখনই উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করে না। চিত্তের উদারতা ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের উজ্জলতা এই দুইটী গুণ যে চিত্তে নাই, সেখানে ধর্ম্ম সাধনের রঙ খোলে না; ধর্ম্ম-বিশ্বাস সেখানে কদাকার দেখায়। এই জন্য জ্ঞানালোচনাকে ধর্ম্ম সাধনের একটী প্রধান অঙ্গ স্বরূপ মনে করা কর্ত্তব্য। কেবল উপাসনা, প্রার্থনা, নাম-জপে হইবে না, সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানালোচনা ও সদনুষ্ঠানকেও রাখিতে হইবে।

এই জ্ঞানালোচনা বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের ঔদাসীন্যের বিষয় গতবারে উল্লেখ করা গিয়াছে। জ্ঞানালোচনার অভাবে ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মভাব দিন দিন সংকীর্ণ ও অনুজ্জল হইয়া যাইতেছে। আশা করি, এদিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

ব্রাহ্ম-বালক ও বালিকাদিগের শিক্ষা।

বহুদিন হইতে আমরা এবিষয়ে ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। সুখের বিষয় যে গতবারের তত্ত্বকৌমুদীতে "ব্রাহ্ম-বালকদিগকে বাঁচাও" এই শীর্ষক যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা কাহারও কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এসম্বন্ধে আমরা শিক্ষকতা কার্য্যে অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত একজন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম বন্ধুর নিকট হইতে একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা সুদীর্ঘ হইলেও সকলের বিশেষ আলোচনার বিষয় বলিয়া এই স্থানেই গৃহীত হইল। আশা করি সকলে এই বিষয়ে চিন্তা করিবেন ও যাহাতে এই সকল আলোচনার একটী ফল ফলে সে বিষয়ে সহায় হইবেন। পত্রখানি নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

"বিগত ১৬ই বৈশাখ তারিখের সম্পাদকীয় মন্তব্য মধ্যে "ব্রাহ্ম-বালকদিগকে বাঁচাও" প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে, যত সংক্ষেপে হয় তাহা লিখিতেছি। আমি কলিকাতায় গত ১৮ বৎসর কাল ছাত্রভাবে ও শিক্ষকভাবে কাটাইয়াছি। এই ১৮ বৎসরের মধ্যে ১০ বৎসরকাল শিক্ষকতা করিয়াছি। এত কাল কলিকাতায় প্রধানতঃ ২টী উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, এই সকল বিদ্যালয়ে যদি কেহ বালকদিগকে না পাঠাইয়া তাহাদের লেখা পড়ার বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহাই করা উচিত। আমি আজ কেবল এই কথা বলিতেছি না, যখনই আমার বন্ধুরা বালকদিগকে স্কুলে পাঠাইবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি সর্ব্বদাই তাঁহাদের বাড়ীতে রাখিয়া পড়াইবার বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছি। আমি কলিকাতার যত ব্রাহ্ম-বালক আছে, তাহাদের অধিকাংশকেই জানি।' তাহাদের মধ্যে যতগুলি স্কুলে পড়িয়া দুষ্ট ছেলেদের সহিত মিশিয়া তাহাদের পিতামাতার লজ্জার ও সমাজের কলঙ্কের কারণ হইয়াছে, তাহাও অবগত আছি। আমার যে বন্ধুরা কলিকাতার স্কুল সমূহে কাজ করেন আমার বোধ হয়, তাঁহাদেরও মধ্যে কেহই এইরূপ মনে করেন না যে, আমি একটী কথাও অতিরিক্ত করিয়া লিখিতেছি। কলিকাতার স্কুল সমূহের উন্নতি করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, তাহা আজ কালকার শিক্ষা-ব্যবসায়ী সকলেই স্বীকার করিবেন। এখন ঐরূপ বড় কাজে হাত দিবার শক্তি আমাদের আছে কি না তাহার বিচার না করিয়া, যাহাতে আমাদের ঘরের বালকদিগের কিছু করিতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থার কথা ভাবিলে হয়।

আপনি লিখিয়াছেন যে, ব্রাহ্ম-বালকদিগের জন্য কলিকাতায় বোর্ডিং স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাতে বালকদিগের সুশিক্ষার ও তত্ত্বাবধানের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি ব্রাহ্ম-অভিভাবকদিগের এই বিষয়ে মনোযোগ দেখা যাইতেছে না। আমাদের মনে হয়, অন্যান্য সামান্য কারণ থাকিলেও প্রধানতঃ দুইটী কারণে এই বোর্ডিংএ তাদৃশ অধিক বালক হয় নাই। (১ম) এই বোর্ডিংএ খরচ অধিক; এত খরচ দিয়া অতি অল্প পিতামাতাই এই বোর্ডিংএ বালকদিগকে রাখিতে পারেন। কলিকাতায় বোর্ডিং রাখিলে ইহা অপেক্ষা কম খরচে চালানও সহজ নয়। (২য়) এই বোর্ডিংএ শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র কোন বন্দোবস্ত নাই। বালকেরা বাড়ীতে থাকিলে যে স্কুলে গিয়া পড়িবে এবং যে সকল স্কুলের ছেলেদের সহিত মিশিবে, বোর্ডিংএ থাকিলেও যখন তাহারা তাহাই করিবে, তখন বোর্ডিংএ পাঠাইয়া বেশী লাভ দেখেন না বলিয়া কেহ বালকদিগকে তথায় পাঠাইতে চান না। এই দুইএর প্রতিকারের উপায় আপনিই লিখিয়াছেন, এই বোর্ডিংকে সহরের বাহিরে কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া যাইতে হইবে। কিভাবে বোর্ডিংটী সহরের বাহিরে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে, সেই সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে ইচ্ছা করি ক্রমে তাহা লিখিতেছি।

বিগত ২৯শে এপ্রেল তারিখের Indian Messenger পত্রে একখানি প্রার্থনা পত্র বাহির হইয়াছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, আমাদের ব্রাহ্ম-বালিকা বোর্ডিংএ ২৯টী বালিকা অবস্থান করিয়া শিক্ষা লাভ করিতেছেন, এবং বোর্ডিংএর ছাত্রী ব্যতীত আরও ৫৫টী বালকবালিকা ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়ে শিক্ষা পাইতেছেন। কিন্তু এই দুইটীর অত্যন্ত অর্থাভাব হইয়াছে। ছাত্র ছাত্রীদের বেতন লইয়া মাসিক আরও ২০০৲ টাকার কমে ইহার খরচ চলিতেছে না। গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য পাইবার জন্য বিগত ২ দুই বৎসর যাবৎ যথাসাধ্য চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু তাহা পাওয়া যাইতেছে না, কত দিনে বা কত পরিমাণে পাওয়া যাইবে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই। এই বৎসরের অবশিষ্ট অংশের জন্যই প্রায় ২০০০৲ টাকা আবশ্যক হইতেছে। সাধারণতঃ আমাদের আয় যেরূপ তাহাতে যে এতদিন এত ব্যয় করিয়া স্কুল ও বোর্ডিংটী রক্ষা করা গিয়াছে ইহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে। আর যে বেশী দিন রাখিতে পারা যাইবে বোধ হয় না। বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়গণ ইঁহাদের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া, কিরূপ কষ্ট করিয়া যে, এই দুইটী রক্ষা করিয়াছেন, তাহা সহজে বুঝা যায়। এত টাকা

খরচ করিয়া আর কত দিন আমরা ইহাদের রক্ষা করিব? ইহাদেরও মফস্বলে লইয়া যাওয়া ব্যতীত আর কোনও উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। যখন আমাদের স্কুল ও বোর্ডিং রাখিতেই হইবে, এখন কি উপায়ে তাহা রক্ষা করা যায়, সেই বিষয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত।

কয়েক বৎসর ধরিয়া তত্ত্বকৌমুদী স্তম্ভে ও উৎসবের সময় Conferenceএ সহরের বাহিরে ব্রাহ্ম-বালক ও বালিকাদিগের জন্য বোর্ডিং ও স্কুল স্থাপন করা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করিবার বিশেষ কোনও চেষ্টা করা হয় নাই। অনেকে আপত্তি করিয়া থাকেন, যাহা কার্য্যে পরিণত করা হইতেছে না, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লাভ কি? কিন্তু আর একটি কথা আছে, কোনও কাজ একদিনে সম্পন্ন হয় না, পূর্ব্বে অনেক আলোচনা করিতে হয়, সপক্ষে ও বিপক্ষে যতকিছু বলিবার থাকে, তাহা সব জানা আবশ্যক হয়, পরে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে হয়। বোধ হয় এই সম্বন্ধে আলোচনা অনেক হইয়াছে, এখন ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। ব্রাহ্ম-বালক ও বালিকাদিগের জন্য স্কুল ও বোর্ডিং যখন রাখিতেই হইবে এবং আমাদের সাধ্যমত ব্যয়ে তাহা যখন কলিকাতায় রাখা যাইতেছে না, তখন মফঃস্বলে লইয়া যাওয়া ব্যতীত আর উপায় দেখা যাইতেছে না। মফঃস্বলে স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে এই কয়েকটী দেখিয়া কাজ করিতে হইবে। কলিকাতা হইতে রেলপথ দিয়া ১০।১২ ঘণ্টা মধ্যে পৌঁছান যায়, এমন স্থানে যাইতে হইবে। স্থানটী প্রধানতঃ স্বাস্থ্যলাভ হওয়া চাই। যে স্থানে বোর্ডিং ও স্কুল হইবে, সেখানে অধিক পরিমাণে ও অল্প দামে জমী পাওয়া আবশ্যক। তথায় আহারীয় দ্রব্যাদি সস্তায় পাওয়া চাই এবং তাহার নিকট কোন স্থানে ডাক্তার থাকা চাই। এরূপ স্থান যে পাওয়া যায়, তাহা বোধ হয় আমরা সকলে জানি।

মফঃস্বলে বোর্ডিং ও স্কুল লইয়া গেলে যে যে সুবিধা ও ও অসুবিধা হইতে পারে তাহার সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে। সুবিধা এইগুলি (১ম) অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে বালক বালিকারা থাকিতে পারিবে; (২য়) কলিকাতা হইতে অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিলে বালকবালিকাদের শরীর ও মন প্রফুল্ল থাকিবে; (৩য়) কলিকাতার ন্যায় স্থানের নানা প্রকার কুশিক্ষা ও কুসংসর্গ হইতে বালকবালিকারা রক্ষা পাইবে। অসুবিধাগুলি এই—(১ম) কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন, সেখানে তাঁহারা থাকিবেন না। (২য়) পীড়া হইলে কলিকাতার যেরূপ চিকিৎসা হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইবে না। কয়েকটী বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিছু লেখা যাইতেছে।

(১ম) সুবিধা আমাদের মনে হয়, মফঃস্বলে থাকিলে আহার বাসস্থান, শিক্ষা ও ঔষধ হিসাবে ব্যয় মোট ১০৲ টাকার অতিরিক্ত হইবে না। স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা অধিক হইলে, চিকিৎসার জন্য অতিরিক্ত বন্দোবস্ত না করিতে হইলে কিম্বা গভর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য পাওয়া গেলে আরও অল্প ব্যয়ে চালান যাইতে পারে। এইরূপ কার্য্যের জন্য সমাজ ফণ্ড হইতে চাঁদা হিসাবে কিছু পাওয়া গেলে অপেক্ষাকৃত মন্দ অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মদিগের পুত্র কন্যাদিগের হার কম করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। এই ব্যয়ে কলিকাতা হইতে ভাল আহার দেওয়া যাইতে পারিবে। অল্প ব্যয়ে চালান হইবে বলিয়া যে প্রথমে বোর্ডিং স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন। উপরের হিসাবে বাড়ী ভাড়া কিছু ধরা হয় নাই। জমির খাজনা হিসাবে অতি সামান্যই খরচ হইবে। সম্প্রতি বাড়ী তৈয়ারি করিবার জন্য কিছু টাকা আবশ্যক। আমাদের এখন কলিকাতার ব্রাহ্ম-বালকদিগের বোর্ডিং ও ব্রাহ্ম-বালিকাদিগের স্কুল ও বোর্ডিংএর বাড়ী ও গাড়ির জন্য প্রতি মাসে প্রায় ২৫০৲ টাকা ব্যয় হইতেছে। আমাদের বোধ হয়, এই সমস্ত টাকা হয় ধার, না হয় ভিক্ষা করিয়া চালাইতে হইতেছে। ১০০৲ শত বালকবালিকার জন্য দুইটী স্বতন্ত্র বাড়ী ও বিদ্যালয় প্রস্তুত করিতে বোধ হয়, ৫০০০৲ টাকা লাগিবে। এই টাকায় পাকা বাড়ী হইবে না, বাঙ্গালা হইবে। কলিকাতায় রাখিতে হইলে বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য এই বৎসরই ২০০০৲ টাকা লাগিবে এবং বালকদের জন্যও ১০০০৲ টাকার কমে হইবে না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, এই এক বৎসর যে খরচ হইবে তাহা পাইলে কিছুকালের জন্য আর বাড়ীর ভাবনা ভাবিতে হইবে না। আমরা যদি শিক্ষকদিগকে এক একখানি ছোট ছোট বাড়ী তৈয়ার করিয়া দেই, তাহা হইলে আরও কিছু বেশী পড়িবে। সম্প্রতি যে, এত টাকার আবশ্যক হইবে, তাহা বোধ হয় না, কারণ একেবারেই আমরা এত বালকবালিকা পাইব না, আপাততঃ যত বালকবালিকা যাইবে, তাহার মত বাড়ী তৈয়ারি করিয়া পরে আবশ্যক মত বাড়াইয়া লইলে চলিবে।

(২য়) ও (৩য়) সুবিধা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ এ বিষয়ে যে দুই মত আছে, তাহা আমরা অবগত নহি।

এখন অসুবিধাগুলি দেখিতে হইবে। (১ম) তত্ত্বাবধানের অভাব;—স্কুল ও বোর্ডিং হইলেই যে স্থানে ৭।৮ জন অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী বাস করিবেন, তাঁহারা সকলেই বালক বালিকাদিগকে দেখিবেন। আর একটী কথা কলিকাতার বালক বালিকাদিগকে রাখিতে যেরূপ সাবধানতার আবশ্যক, সে স্থানে সে প্রকার সাবধানতা আবশ্যক হইবে না। কলিকাতা হইতে নবদ্বীপ বাবু, কি আদিনাথ বাবু, কি অঘোর বাবু একজন গিয়া সে স্থানে বাস করিতে পারেন। তাঁহারা একজন থাকিলে অনেক বিষয়ে সুবিধাও হইতে পারে। কাজটী যেরূপ গুরুতর তাহাতে সমাজ হইতে তাঁহাদের মতন একজনকে দিতেই হইবে। এইরূপ স্থানে বোর্ডিং ও স্কুল স্থাপিত হইলে অনেকগুলি ব্রাহ্ম পরিবারও সে স্থানে বাস করিবেন। আমাদের অধিকাংশের যেরূপ আর্থিক অবস্থা, তাহাতে রুগ্ন বা জরাগ্রস্ত হইলে বা অর্থোপার্জ্জনের উপায় না থাকিলে আমরা বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়ি। কলিকাতায় থাকিলে খরচ পত্র অনেক হয়,

মফঃস্বলে কোনও স্থানে স্কুল ও বোর্ডিং হইলে এই হইবে যে অনেকেই সে স্থানে গিয়া বাস করিতে পারেন। যে সকল ব্রাহ্ম কার্য্য উপলক্ষে বিদেশে যাইতেছেন, তাঁহাদের সন্তান সন্ততিদের কোথায় রাখিবেন, পড়া শুনার কি করিবেন, তাহার ভালরূপ বন্দোবস্ত করা কঠিন হইতেছে। এরূপ একটী স্থান হইলে তাঁহাদেরও সুবিধা হইতে পারে। বোর্ডিংএর ছাত্র ও ছাত্রী ব্যতীত এইরূপে আরও অনেক ছাত্র ছাত্রী পাওয়া যাইবে এবং তত্ত্বাবধান করিবার লোকও অনেক পাওয়া যাইবে। (২য়, চিকিৎসা) আমরা যদি সঙ্গে করিয়া একজন ডাক্তার লইয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে আর ভাবিতে হইবে না। ইহা যে বড় কঠিন, তাহা আমার মনে হয় না। নতুবা স্থানীয় সরকারী বা বেসরকারী কোনও ডাক্তারের সহিত বন্দোবস্ত করিলেও চলিতে পারে। যে উপায়ে হউক একজন Asst Surgeonএর পদস্থ লোকের সাহায্য পাওয়া কঠিন হইবে না। মফঃস্বলে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারা ইহা অপেক্ষা ভাল ডাক্তারের সাহায্য প্রায় পান না। তবে কলিকাতায় যেরূপ সুবিধা হয় সেরূপ হইতে পারে না। বিশেষ আবশ্যক হইলে আমরা রোগীদিগকে শীঘ্র কলিকাতায় আনিতে পারি কিম্বা কলিকাতা হইতে ডাক্তার ও লইয়া যাইতে পারি; ইহাও কঠিন হইবে না।

বালকবালিকাদের জন্য স্কুলের যেরূপ বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে, সেই বিষয়ে কিছু লিখিয়া আমি এই পত্র শেষ করিব। আমরা ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়ে ও Sunday schoolএ ছোট ছোট বালকবালিকাদের এক সঙ্গে শিক্ষা দিয়া দেখিয়াছি যে, তাহা দ্বারা বিশেষ অনিষ্ট হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। নিম্ন শ্রেণীর কয়েকটী ক্লাশে বালকবালিকারা এক সঙ্গে পড়িবে, পরে উচ্চ শ্রেণীতে বালকদিগকে ও বালিকাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে অধিক শিক্ষক আবশ্যক হইবে না, অথচ দুইটী স্কুলই চলিবে। ব্রাহ্ম-অভিভাবকেরা এ বিষয়ে নিজ নিজ মত প্রকাশ করিলে, যদি তাহা এই প্রস্তাবের সপক্ষে হয়, তাহা হইলে সাঃ ব্রাঃ সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে সেই মত অনুসারে কার্য্য করিতে অনুরোধ করা যাইতে পারে। আমরা ইতিমধ্যে অবগত হইয়াছি যে শিক্ষাবিভাগ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

ব্রাহ্মপর্য্যটকের পত্র।

(গত ১৬ই পৌষের পর)

আমি ওঁকারনাথ হইতে মধ্যে এক সপ্তাহের জন্য ইন্দোর ও উজ্জয়িনী সহর দেখিতে যাই। ইন্দোরে একটী ব্রাহ্মসমাজ আছে। স্থানীয় ব্রাহ্মদের মধ্যে আমাকে কেহ কেহ চিনিতেন। তাঁহাদের একজন আমাকে চিনিতে পারিয়া অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তাঁহাদের বাড়ী লইয়া গেলেন এবং তাঁহাদের মন্দিরে উপাসনাদি করিবার জন্য একান্ত অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহাদের আগ্রহ ও অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া একদিন প্রাতঃকালে বাঙ্গালা ভাষায় উপাসনা ও সন্ধ্যাকালে প্রার্থনা বিষয়ক আলোচনা করিয়াছিলাম।

উজ্জয়িনী।

এই উজ্জয়িনী সহর ইন্দোর হইতে ২৭।২৮ মাইল দূরে হইবে। রাজপুতনা ও মালয় রেলওয়ের একশাখা উজ্জয়িনী সহর পর্য্যন্ত গিয়াছে। উজ্জয়িনী সহর একটী প্রশস্ত ও উচ্চ পুরাতন প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এই সহর গোয়ালিয়ার মহারাজার অধীন, এখানে ইংরাজ রাজত্ব না থাকায় সহরটী সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবে অবস্থিতি করিয়া আপনার প্রাচীনত্বের গৌরব প্রচার করিতেছে। এই স্থানই মহারাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল; অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার সময়ের কোন চিহ্ন আছে কিনা জানিতে পারিলাম না। এই সহরটী একটা নদীর কিনারায় অবস্থিত। সেই স্থানের দৃশ্য অতি মনোহর, সম্মুখে প্রাচীর-বেষ্টিত সহর, অদূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় শ্রেণী ও মধ্যস্থলে রৌপ্য সূত্রবৎ নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই নদী-কিনারাটী প্রশস্ত ভাবে ইট ও প্রস্তর দ্বারায় বাঁধান। তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মন্দির সমূহ শোভা পাইতেছে।

সহরের প্রায় এক মাইল দূরে নদী-কিনারায় "ভর্ত্তৃহরির গুহা" নামে একটী প্রকাণ্ড গুহা দেখিলাম। তাহা এখন মাটির নীচে অতি অন্ধকারের মধ্যে অবস্থিত। এখানে ২ জন সন্ন্যাসী বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন আমাদিগকে প্রদীপ জ্বালিয়া এই গুহা দেখাইতে লইয়া গেলেন। ঘোরতর অন্ধকার মধ্যে প্রদীপ হস্তে অতি সন্ত্রাসে এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া গুহা পরিদর্শন করিতে লাগিলাম। প্রস্তরের গাঁথুনি বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরি তাহার মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। লোক প্রবাদ এই গুহাতে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরি অবস্থিতি করিয়া মহান পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। গুহার অবস্থা দেখিয়া তাহার প্রাচীনত্বের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সহরে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের কুলদেবতা "মহাকাল" নামক শিবলিঙ্গ অবস্থিত। ইহার দর্শন জন্য বহুতর যাত্রী সময়ে সময়ে এখানে আসিয়া থাকেন। স্থানীয় ভূমির সমতল ক্ষেত্র হইতে অনেক নীচে এই মহাদেবের স্থান। এই মহাদেব দেখিতে হইলে অন্ধকারময় সোপান সমূহ ভেদ করিয়া নিম্নে যাইতে হয়। সেখানে পুরোহিতগণ প্রদীপ জ্বালিয়া উচ্চরবে শিবের স্তুতি বন্দনা ও পূজাদি করিতেছেন। এই মন্দিরের প্রাঙ্গনের মধ্যে একজন মধ্যবয়স্কা বাঙ্গালী সন্ন্যাসিনী দেখিলাম, তিনি মারহাট্টা রমণীদিগের মত কাপড়াদি পরেন। আলাপ করিয়া জানিলাম তাঁহার বাড়ী গোবরডাঙ্গায় ছিল। এখানে ২।৪ জন সন্ন্যাসী বাস করেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও অবস্থা ভাল বলিয়া বোধ হইল।

একদিন বৈকালে নদীতীরে বেড়াইতে গিয়া দেখিলাম তথায় দলেদলে মারহাট্টা রমণীগণ (মারহাট্টি ভাষাতে সঙ্গীত

করিতে করিতে পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া একটী পিঠালীর নৈবেদ্যের চারি ধারে নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। অনুসন্ধানে জানিলাম ইঁহারা সকলেই ভদ্রমহিলা, অদ্য নাগ পঞ্চমী, এই নাগ পঞ্চমীর দিন ইঁহারা এইরূপ করিয়া কৌলিক প্রথানুসারে সঙ্গীত ও নৃত্য করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক সঙ্গীত ইঁহারা গাইতেছেন। এখানে স্ত্রীলোকদের অবরোধ প্রথা নাই, তাঁহারা সকলেই পুরুষের ন্যায় কাছাদিয়া কাপড় পরেন এবং আবশ্যকানুসারে সকলের সহিত কথাবার্ত্তা ও সকল স্থানে যাতায়াত করিতে পারেন। আমি এখানে তিনদিন ছিলাম, তৎপর ওঁকারনাথে ফিরিয়া আসি।

নাসিক।

ওঁকার নাথ হইতে বহির্গত হইয়া থাণ্ডোয়া আসি, সেখানে একদিন থাকিয়া নাসিক যাই। নাসিক ষ্টেসন হইতে নাসিক সহর প্রায় ৬ মাইল হইবে, ট্রামওয়ে যাওয়া যায়। এই নাসিক সহর গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত। বাঙ্গালীদের কাশী যেমন মহাতীর্থ, দাক্ষিণাত্য বাসীদের পক্ষে নাসিকও তেমনি মহাতীর্থ। কথিত আছে এখানে রাম কর্ত্তৃক রাবণ-ভগিনী সুর্পনখার নাক কাটা হইয়াছিল বলিয়া এই স্থানের নাম নাসিক হইয়াছে। গোদাবরীর অপর পারে পঞ্চবটী নামক স্থান। এ পঞ্চবটী দেখিয়া রামায়ণের সে পঞ্চবটীর কথা মনে হয় না। এপঞ্চবটী এখন একটী সহর। বড় বড় প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির সমূহ ও মারহাট্টা ধনীদিগের অট্টালিকা পুঞ্জে পরিপূর্ণ। যাহা হউক এই স্থানের এই গোদাবরী নদীর দৃশ্যটী অতি সুন্দর। এক পারে নাসিক ও অপর পারে পঞ্চবটী, মধ্য খানে গোদাবরী নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই নদীর গর্ভ মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির, গৃহ ইত্যাদি নির্ম্মিত হওয়ায় অতি সুন্দর দৃশ্য হইয়াছে। এখান হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে তপোবন, শুনিলাম তাহাও প্রায় সহরের ন্যায়। তবে সেখানে বহুল পরিমাণে রাম সীতার মন্দির ও তথায় সন্ন্যাসিগণই থাকেন। বলা বাহুল্য সীতামাইর কুটীর, লক্ষণের কুঠির, সুর্পনাখার নাক ইত্যাদি বলিয়া স্থানীয় লোকেরা যে সমস্ত দেখান তাহা বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া বোধ হয় না, আমি এখানে কয়েক ঘণ্টা থাকিয়া বোম্বাই যাত্রা করি।

পুষ্কর।

বোম্বাই সহরে ৪ দিন থাকিয়া বরদা আসি, তথা হইতে আজমীর যাই। এই আজমীর সহর হইতে পুষ্কর-তীর্থ ৬ মাইল হইবে। এক্কা করিয়া এই তীর্থ দেখিতে যাই। আজমীর হইতে পুষ্কর-তীর্থ যাইতে হইলে একটী ক্ষুদ্র পাহাড় অতিক্রম করিতে হয়। সেই পাহাড়ের উপর হইতে আজমীর সহর অতি মনোহর দেখায়।

যে স্থানে পুষ্কর-তীর্থ অবস্থিত, তাহার প্রায় চারিদিকে পাহাড়, সেই পাহাড়ের কয়েকটী আবার বালুময়। প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। পুষ্কর-তীর্থ আর কিছুই নহে চারিদিকে দেবালয় পরিবৃত একটী প্রকাণ্ড সরোবর। এই সরোবর কাহারও কর্ত্তৃক খোদিত নহে, ইহা পাহাড় পরিবেষ্টিত একটী স্বাভাবিক ক্ষুদ্র হ্রদ। এই হ্রদের জলে স্নান করিবার জন্যই নানাদেশ হইতে যাত্রিগণ উপস্থিত হইয়া থাকেন। হ্রদের জল দুর্গন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং তাহা সবুজ বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিমের ন্যায় পদার্থে পরিপূর্ণ। স্থানীয় পাণ্ডাগণ যাত্রী-দিগের নিকট অর্থ লইয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক এই হ্রদে স্নান করাইতেছেন, যাত্রিগণ আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে স্নান করিয়া আপনাদিগকে কৃত কৃতার্থ মনে করিয়া প্রত্যাগত হইতেছেন।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

গুরুবাদ সম্বন্ধে অনেক বিচার হইয়াছে। তত্ত্ব-কৌমুদীতে এবিষয়ে আর পত্রাদি মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা নাই, অতএব এই বারকার দুইখানি পত্র মুদ্রিত করিয়া শেষ করা গেল। ত, স।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রদ্ধাস্পদ্ শ্রীযুক্ত তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু—

গুরুবাদ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

মহাশয়,

উল্লিখিত বিষয়ে অনেকগুলি পত্র আপনার পত্রিকাতে বাহির হইয়াছে। ঐ সকল পত্রে যে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, সে সব গুলিকেই নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রশ্নে পরিণত করা যাইতে পারে :—

১। প্রত্যাদেশ কাহাকে বলে ?

২। কোন একটী সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে জানিলেই কি জ্ঞাতা অভ্রান্ত হইলেন ?

৩। কোন একটী সত্যকে সাক্ষাৎভাবে জানিলেই কি তিনি তৎসম্বন্ধে অভ্রান্ত গুরু হইতে পারেন ?

৪। অভ্রান্ত গুরু ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যে আবরণ কি না ?

৫। ভ্রান্ত ও অপূর্ণ এক কথা কি না ?

৬। অভ্রান্তগুরুবাদ ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী কি না ? বাক্যান্তরে, যিনি অভ্রান্ত গুরু স্বীকার করেন তিনি “ব্রাহ্ম” কি না ?

১। প্রত্যেক সত্যই জ্ঞাতা বা পরমেশ্বরের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ মাত্র। অনন্ত বিশ্বের অনন্ত পদার্থ নিচয় পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞানে নিত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া স্থিতি করিতেছে, সুতরাং ইহার প্রত্যেক সম্বন্ধই সত্য এবং চিন্তাদ্বারা ইহাদের মধ্যে যে কোন সম্বন্ধকে আয়ত্ত করিলেই প্রত্যাদিষ্ট হওয়া হইল, অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। অতএব কোন বিদ্যালয়ের অতি নিম্নশ্রেণীস্থ কোন ছাত্রও যখন কোন সত্য চিন্তাদ্বারা গ্রহণ করে, তখন সে যে পরিমাণে প্রত্যাদিষ্ট, কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি যখন

অধ্যাত্ম জগতের কোন গূঢ় সত্য লাভ করেন, তিনিও তখন সেই পরিমাণে প্রত্যাদিষ্ট। সত্যে সত্যে কোন প্রভেদ নাই, এবং জ্ঞানে জ্ঞানেও কোন প্রভেদ নাই। "প্রত্যেক ত্রিভুজের কোণত্রয় তিন সমকোণের সমান", ইহাও যেমন সত্য "জীবকে প্রেম কর" ইহাও তেমনই সত্য। অতএব মনোরঞ্জন বাবু যে বলিয়াছেন, সমাধির অবস্থায় সত্যকে সাক্ষাৎভাবে অবগত হওয়ার নামই প্রত্যাদিষ্ট হওয়া, অন্য অবস্থায় সত্য লাভ করিলে, অথবা যে কোন সত্য লাভ করিলে প্রত্যাদিষ্ট হওয়া হয় না, তাহা কদাপি সত্য নহে, এবং সত্যে সত্যে একরূপ একটা প্রভেদ করাতে কেবল চিন্তার জড়তা প্রকাশ পায় মাত্র। "সমাধি" কথাটা লইয়া বড়ই গোলমাল চলিতেছে। কোন্ অবস্থাকে সমাধির অবস্থা বলা যাইবে? ইহা কি আত্মার নিষ্ক্রিয় অবস্থা না সত্যোপলব্ধির অবস্থা? মানব যখন কোন সত্য উপলব্ধি করে, তখন সে তন্ময় হয়, অর্থাৎ তৎকালের জন্য সেই সত্য তাহার মনকে একেবারে অধিকার করিয়া ফেলে। ইহাই কি সমাধির অবস্থা নহে? যদি না হয়, তাহা হইলে শব্দটা বোধ হয় নিরর্থক, অথবা ধর্ম্মাভিমানী মহাপুরুষদিগের হস্তে চিন্তাহীন ব্যক্তিদিগকে স্তম্ভিত করিবার একটা যন্ত্র মাত্র।

শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন বাবুর প্রত্যাদেশের মত অতীব ভয়াবহ :—

"পুরুষ অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্য প্রকৃতি অর্থাৎ জড়ের সহিত যখন যুক্ত হয়, তখন সেই জড়াশ্রিত চৈতন্যকে জ্ঞান বলে, উহা চিদাভাস মাত্র। জড়াতীত ও ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া আত্মা যখন স্বরূপে অবস্থান করে, তখনই সে নির্ম্মল হয় এবং অভ্রান্তরূপে ঈশ্বর প্রত্যাদেশ লাভের অধিকারী হয়।"

কথাটা অত্যন্ত শ্রুতি-সুখকর বটে, কিন্তু ইহার কোন অর্থ নাই। চৈতন্য বলিতে বিষয়ী আত্মার বিষয়জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই বুঝি না। যাহাই বল না কেন, অন্তর্জ্জগতে অবগাহন করিলে এতদ্ব্যতীত আর কিছুই পাইবে না। সুতরাং বিষয় বা জড়াতীত চৈতন্যের সম্ভাবনা কোথায়? এবং জড়াতীত চৈতন্য বলাও যাহা, আত্মার গলা টিপিয়া দফা নিকাষ করিয়া দেওয়াও তাহা। চৈতন্যের সহিত জড়ের যখন যোগ হয়, একথা বলিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইল যে, এমন এক সময় ছিল, যখন চৈতন্যের সহিত জড়ের যোগ ছিল না, অর্থাৎ জড় চৈতন্য হইতে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করিত। কিন্তু জড় যদি চৈতন্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে চৈতন্যের আর প্রয়োজন কি? এবং চৈতন্য হইতে জড়ের উৎপত্তি, কি জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি তাহাই বা কি প্রকারে জানা যাইবে? এবং জড় ও আত্মা এই দুই বিপরীত প্রকৃতি সম্পন্ন পদার্থের যোগই বা হইল কি রূপে? এবং যোগ যদি সম্ভব না হয়, তবে চিদাভাসই বা কোথায় থাকে? জড় যদি চৈতন্য হইতে স্বতন্ত্র বস্তু হয়, তবেত চৈতন্য জড়ের দ্বারা পরিমিত, অর্থাৎ অনন্ত নহে, অর্থাৎ ঈশ্বর নাই। অতএব মনোরঞ্জন বাবুর দর্শন নাস্তিকতা প্রমাণ করিতেছে। তিনি অজ্ঞাতসারে সাংখ্য দর্শনের নাস্তিকতার ভিতর পড়িয়া গিয়াছেন।

২। কোন একটা সত্যকে সাক্ষাৎ ভাবে জানিলেই জ্ঞাতা অভ্রান্ত হইতে পারে না। মনোরঞ্জন বাবু হয়ত বলিবেন, যখন সে সত্যটী জানিল তখন ও সেই সত্য সম্বন্ধে ত সে অভ্রান্ত। সত্য; কিন্তু তাহার ব্যক্তিত্ব কি সেই মুহূর্ত্ত ও সেই জ্ঞানটুকু লইয়া? তাহার জ্ঞানে শত শত ভুল ভ্রান্তি সত্বেও তাহাকে ঐ একটী সত্যের জন্য অভ্রান্ত বলা কি যুক্তিসঙ্গত? এরূপ কথা বলিলে, "অংশ সম্পূর্ণের সমান" এই অসঙ্গত কথা কি বলা হয় না? কোন ব্যক্তিকে অভ্রান্ত হইতে হইলে, তাহার প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক কার্য্য অভ্রান্ত হওয়া আবশ্যক। নতুবা তাহাকে অভ্রান্ত বলিলে কেবল তাহাকে বিদ্রূপ করা হয় মাত্র। ঈদৃশী ব্যাজস্তুতিতে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সন্তুষ্ট হইতে পারেন না।

শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন বাবু এই যুক্তির একটা উত্তর দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দেশ ও কালের অধীনতা বশতই মানবের ভ্রান্তি হয়; সুতরাং মানব যখন সাধনবলে দেশকালের অতীত হইবে, তখন আর তাহার ভুল ভ্রান্তি থাকিবে না। এ আশা নিতান্ত দুরাশা। মানব অর্থই দেশ ও কালের অধীন আত্মা; সুতরাং দেশ ও কালের অতীত হওয়া আর মানবের মানবত্ব লোপ হইয়া ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া, একই কথা। কিন্তু যে স্বরূপতঃ পরিমিত, তাহার কি দেশ কালের অতীত অর্থাৎ অনন্ত হইয়া যাওয়া সম্ভব? ইহা কি ত্রিকোণ বৃত্তের ন্যায় অসম্ভব নহে? মনোরঞ্জন বাবুর এ মত বৈদান্তিক মায়াবাদ, ব্রাহ্মধর্ম্মের মত নহে।

৩। কোন একটী সত্যকে সাক্ষাৎ ভাবে জানিলেও জ্ঞাতা তৎসম্বন্ধে অভ্রান্ত গুরু হইতে পারে না; কারণ সত্যের সাক্ষাৎ দর্শন ব্যতিরেকে অভ্রান্ততার জ্ঞান হয় না, এবং গুরুর অন্তরে প্রকাশিত সত্য যখন শিষ্যের অন্তরে প্রকাশিত হয় নাই (কারণ তাহা হইলে আর গুরুর প্রয়োজন থাকিত না) তখন গুরু যাহা বলিতেছেন তাহা অভ্রান্ত হইলেও শিষ্য তাহাকে অভ্রান্ত বলিয়া জানিবে কিরূপে? এবং তাহা জানিতে না পারিলেই বা গুরুকে অভ্রান্ত বলে কি প্রকারে? মনোরঞ্জন বাবু ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন "নিজে অভ্রান্ত না হইলে যদি কাহাকেও অভ্রান্ত বলিয়া না জানা যায়, তবে ব্রাহ্মগণ স্বয়ং ভ্রান্ত হইয়াও ঈশ্বরকে অভ্রান্ত বলিয়া জানিলেন কি প্রকারে?" অতি দুঃখের কথা এই যে, ব্রাহ্মগণ কেন ঈশ্বরকে অভ্রান্ত বলেন, মনোরঞ্জন বাবু প্রচারক হইয়াও তাহা অবগত নহেন। ঈশ্বর প্রত্যেক মানব হৃদয়ে প্রত্যক্ষ; সত্যরূপে ঘটে ঘটে বিদ্যমান থাকিয়া প্রত্যেক জ্ঞান ক্রিয়ার সঙ্গে আপনার সত্তা স্বরূপের সাক্ষ্য আপনিই প্রদান করিতেছেন। মানবের সহিত মানবের সাক্ষাৎ যোগ নাই। তোমার মনের ক্রিয়া আমার মনের ক্রিয়া নহে; এমন কি তোমার যে আত্মা আছে তাহাও আমাকে নিজের জ্ঞানে প্রকাশিত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদক লক্ষণ তোমাতে দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে হয়। সুতরাং কোন ব্যক্তি যখন বলেন যে তাঁহার মধ্যে কোন সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, তখন, যদি আমার মধ্যে পূর্ব্বে কোন সত্য

প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে এই অনুমান মাত্র করিতে পারি যে, হয়ত তাঁহার মধ্যে কোন সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তাহার কথিত সত্য যখন আমার মধ্যে প্রকাশিত হইবে, তখনও তাঁহার মধ্যে যে সে সত্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা আমার অনুমানেরই বিষয় থাকিবে, কারণ তাঁহার মধ্যে যে ক্রিয়া হইয়াছিল ও আমার মধ্যে যে ক্রিয়া হইয়াছে, এই দুই ক্রিয়া তুল্য হইলেও এক নহে, সুতরাং তাঁহার মধ্যে প্রকাশিত ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমার সম্ভব নহে, অতএব তাঁহাকে অভ্রান্ত বলিয়া জানাও সম্ভব নহে। অভ্রান্ত বলিয়া না জানিয়া অভ্রান্ত বলি, কি প্রকারে? অতএব গুরু কখনই অভ্রান্ত হইতে পারেন না। ঈশ্বর প্রত্যেক জ্ঞান ক্রিয়ায়ই আমাদের অন্তরে প্রত্যক্ষ, সুতরাং আমরা নিজে ভ্রান্ত হইয়াও ঈশ্বরকে অভ্রান্ত বলিয়া জানিতেছি। যখন কোন সত্য আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়, তখন আমরা সমষ্টিভাবে ভ্রান্ত হইলেও ব্যষ্টিভাবে অভ্রান্ত।

৪। অভ্রান্ত গুরু মানব ও ঈশ্বরের মধ্যে যে আবরণ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। জ্ঞান হয় প্রত্যক্ষ না হয় অনুমানসিদ্ধ। গুরু যদি অভ্রান্ত হইলেন তবে তাঁহার বাক্যের উপরে আর বিচার অথবা অনুমান চলিবে না, কারণ তাহার কথা লইয়া যদি বিচার করিতে বসি, তাহা হইলে ত তাঁহার অভ্রান্ততা অস্বীকারই করা হয়, যেহেতু অস্বীকার না করিলে বিচার আইসে কেন? সুতরাং অনুমানের দ্বারা তৎকথিত সত্যের জ্ঞান আমার হইতে পারে না। আর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ত নাই, কারণ তাহা থাকিলে আর গুরুর প্রয়োজন কি? তাহা-হইলেই এই হইল না কি, যে গুরুর উপদেশকে অভ্রান্ত না জানিয়াও তাহাকে অভ্রান্ত বলিতে হইবে, অর্থাৎ না জানিয়াও বলিতে হইবে জানি? ইহা কি সম্ভব? অতএব অভ্রান্তগুরুবাদ কি মানবের ঈশ্বরদত্ত জ্ঞান বুদ্ধির অবমাননা নহে? আমরা দেখিয়াছি যে অভ্রান্ত গুরু স্বীকার করিলে অনুমান দ্বারা তদুপদিষ্ট বিষয়ে আমাদের কোন জ্ঞান লাভের আশা নাই। কেবল তাহাই নহে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও কোন আশা নাই। প্রত্যক্ষ জ্ঞান যে গুরুমুখ হইতে লাভ করা যায় না, তাহা আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। অভ্রান্ত গুরু স্বীকার করিলেই গুরুমুখাপেক্ষী হইতে হইল, সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পথও অবরুদ্ধ হইয়া গেল। আমার মনে হয়, যাঁহারা আপনাদিগকে অভ্রান্ত গুরু মনে করেন, তাহারা যেন বলিতেছেন, "হে অজ্ঞ মানব! তুমি জ্ঞান লাভের জন্য তোমার জ্ঞান-চক্ষু নিমীলিত কর, আমরা তোমাকে পরম সুন্দর আধ্যাত্ম জগৎ দেখাইব।" অতএব দেখা গেল যে, অভ্রান্ত গুরু মানবের জ্ঞান-পথের অবরোধক, অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যে আবরণ।

৫। ভ্রান্ত ও অপূর্ণ একই কথা। যে ভুল করে সেই ভ্রান্ত বটে, কিন্তু যে ভুল করে না সেই অভ্রান্ত নহে। যতক্ষণ কেহ কোন কার্য্য না করিতেছে, ততক্ষণ সে ভ্রান্তও নহে অভ্রান্তও নহে। সম্মুখস্থ কাষ্ঠখণ্ডকে ভ্রান্তও বলি না অভ্রান্তও বলি না। জ্ঞানের অপূর্ণতা থাকিলে কার্য্য করিতে গেলেই যখন ভুল করিতে হইবে, তখন অপূর্ণ ও ভ্রান্ত এক কথা হইল না কি?

৬। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে অভ্রান্তগুরুবাদ অসত্য; যাহা অসত্য তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী; অতএব অভ্রান্তগুরুবাদ ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী, এবং যাঁহারা অভ্রান্ত গুরুবাদী তাঁহারা সাধু ও সচ্চরিত্র হইলেও ব্রাহ্ম নহেন।

"ওঁ ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।"

কলিকাতা।
ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়।
২১এ বৈশাখ, ১৩০১ সাল।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়!

১লা বৈশাখের তত্ত্বকৌমুদীতে অভ্রান্ত গুরুবাদীর যে তৃতীয় পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রথমাংশ আমার পত্রের প্রতিবাদেই লিখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যখন তিনি আমার নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই, তখন তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমিও এই পত্রের কোন স্থলে তাঁহার নাম উল্লেখ করিব না। ঈশ্বর বাণী যে কিঞ্চিৎ তরল পদার্থ, এই অভ্রান্ত সত্য অভ্রান্ত গুরুবাদী আমার পত্রের কোন্ স্থান পড়িয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু প্রতিপক্ষের কথাকে আপনার কল্পনার সাহায্যে একরূপ বিকৃত আকার দিয়া দানব না সাজাইলে দানববধের গৌরব লাভ হয় না; অথচ দানববধ ধার্ম্মিকের এক প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সুতরাং অভ্রান্ত গুরুবাদী আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে অনুযোগ করিতে পারি না। "ঘটের সহিত জলের এবং ঈশ্বর-বাণীর সহিত মানবাত্মার আধার আধেয় সম্বন্ধের সমত্ব কোথায়" তাহা যখন "স্থূল বুদ্ধিতেও খুঁজিয়া পায় না," তখন যে, অভ্রান্ত গুরুবাদীর ন্যায় অতি সূক্ষ্মবুদ্ধি লোকে তাহা খুঁজিয়া পাইবেন না, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। জল তরল বস্তু, ঘট কঠিন বস্তু, সুতরাং তাহারা পরস্পর বিজাতীয় ও অসমধর্ম্মী, অভ্রান্ত গুরুবাদী সূক্ষ্মবুদ্ধি বলে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই উভয় বস্তুর সাময়িক ধর্ম্ম তরল ও কঠিন হইলেও যে, উহারা উভয়েই জড় পদার্থ এবং জড় পদার্থেরা যে পরস্পর বিজাতীয় ও সর্ব্বদাই অসমধর্ম্ম নহে, স্থূল হইতেও স্থূলতর বুদ্ধি লইয়া যদি আমি এই কথা বলি, আশা করি সূক্ষ্মবুদ্ধি মহাশয় আমার এ ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। জল তরল পদার্থ হইয়াও যখন বরফে পরিণত হয়, তখন ঘটের কাঠিন্য ভাঙ্গিতে যে শক্তির প্রয়োজন, বরফ ভাঙ্গিতে তদপেক্ষা অল্প শক্তি লাগে না। সূক্ষ্মবুদ্ধির একবার এই স্থূল কথাটা ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল। তিনি বলেন, "ঈশ্বর-বাণী একটী চৈতন্য পদার্থ, মানুষও একটী চৈতন্য বস্তু, ইহারা উভয়েই স্বজাতি ও সমধর্ম্মী।" ইহারা উভয়েই স্বজাতি ও সমধর্ম্মী কি না, তাহাই বিবেচ্য বিষয়, অথচ এই বিবেচ্য বিষয়কেই তিনি স্থির সিদ্ধান্তরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখন দেখা

আবশুক, ঈশ্বর-বাণী ও মনুষ্য স্বজাতি ও সমধর্ম্মী কি না। প্রথমতঃ মনুষ্য বলিলে কেবল তাহার অমরাত্মাকে বুঝায় না, দেহ ও আত্মা উভয়কেই বুঝাইয়া থাকে, দেহ জড় পদার্থ; বাণী বিশেষতঃ ঈশ্বর-বাণী জড় পদার্থ নহে। সুতরাং এস্থলে তাহাদিগকে স্বজাতি ও সমধর্ম্মী বলা কঠিন। জলে ও ঘটে যে পরিমাণ স্বজাতিত্ব ও সমধর্ম্মত্ব আছে, ইহাতে তাহাও নাই। তবে যদি ইহা বলা হয় যে, চৈতন্যরূপে উভয়েই সমধর্ম্মী ও স্বজাতি এস্থলে ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, তাহা হইলেও এই কথা জিজ্ঞাস্য যে, ঈশ্বর-বাণী যেরূপ চৈতন্য পদার্থ মনুষ্যও কি সেইরূপ? মানুষের সুষুপ্তি আছে, নিদ্রাবস্থায় চৈতন্য থাকে না, থাকিলেও অতি অল্পই থাকে; ঈশ্বর-বাণী কি নিত্য চৈতন্য পদার্থ নহে, উহারও কি হ্রাস বৃদ্ধি আছে, জাগ্রত ও নিদ্রাবস্থা আছে? যদি না থাকে, তবে ঈশ্বরবাণী ও মনুষ্যের স্বজাতিত্ব ও সমধর্ম্মত্ব যে পরিমাণ জল ও ঘটের ধর্ম্ম ও জাতিগত পার্থক্য তদপেক্ষা অধিক নহে। আমার দৃষ্টান্ত যদি "একেবারেই অকর্ম্মণ্য" হয়, অভ্রান্ত গুরুবাদীর অভ্রান্ত দৃষ্টান্তের পরিণামও তদপেক্ষা কোন অংশে শুভকর নহে। বরং তিনি যে দৃষ্টান্ত দ্বারা ঈশ্বর-বাণীর ও মনুষ্যের সমধর্ম্মত্ব ও স্বজাতিত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্ব প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে সেই দৃষ্টান্ত আর একটু প্রসারণ করিলেই অদ্বৈতবাদে উপস্থিত হইতে হয়, ঈশ্বরবাণী চৈতন্য বস্তু বলিয়া যদি মনুষ্যের স্বজাতি ও সমধর্ম্মী হয়, তবে ঈশ্বরও চৈতন্য স্বরূপ বলিয়া মানুষের স্বজাতি ও সমধর্ম্মী হইবেন। ইহাই কি ব্রাহ্মধর্ম্ম? অভ্রান্ত গুরুবাদী নিজেই বলিয়াছেন, "ঈশ্বরবাণী রূপ চৈতন্য বস্তু যখন মানুষরূপ চৈতন্য বস্তুতে প্রকাশিত হয়, তখন আর উভয়ের আধার আধেয় সম্বন্ধ থাকে না।" সুতরাং চৈতন্য স্বরূপ স্বপ্রকাশ ঈশ্বর যখন মনুষ্যে প্রকাশিত হন, তখন ঈশ্বরে ও মানুষে কোন প্রভেদ থাকে না, উভয়ে এক হইয়া যান, ইহা কি ব্রাহ্মের না অদ্বৈতবাদীর কথা? এই বিশ্বাসটুকু না থাকিলে যদি ধর্ম্ম না থাকে, তবে আমি বরং অধর্ম্মেই বাস করা শ্রেয়ঃ মনে করিব, তথাপি মানুষকে ঈশ্বরের স্বজাতি ও সমধর্ম্মী বলিয়া ঈশ্বরের অবমাননা করিতে অগ্রসর হইব না।

অভ্রান্ত গুরুবাদী আদেশ কাহাকে বলেন, তাহার সংক্ষেপ ব্যাখ্যায় যে সকল অসংক্ষিপ্ত কথা বলিয়াছেন, তাহার অনেক কথাই বুঝিতে পারি নাই, যে সকল সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি জীবের স্থূল দেহ হইতে সূক্ষ্মদেহ বাহির করিয়া তাহাদিগকে উন্মুক্ত অবস্থায় বায়ু মণ্ডলে বিচরণ করিতে দিয়া থাকেন, তাহাদিগের সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব ও গুহ্য ধর্ম্মতত্ত্ব আমাদিগের ন্যায় স্থূল হইতেও স্থূলতর বুদ্ধিদিগের না বুঝিবারই কথা। সুতরাং তজ্জন্য দুঃখিত হই নাই। আর অভ্রান্ত গুরুবাদীও আমাদিগের উপকারের জন্যে ঐ সকল কথা লেখেন নাই, সমবিশ্বাসীর উপকারের জন্যই লিখিয়াছেন। সুতরাং তিনি তাহার অভ্রান্ত সত্যের পক্ষ সমর্থক আর যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, তাহা যখন বুঝিলামই না, তখন তাহার আলোচনা না করাই শ্রেয়ঃ। তিনি মূর্ত্তিমান জ্ঞানী ও কর্ম্মী শঙ্করাচার্য্যের উক্তির উল্লেখ দ্বারা লোকের যে আতঙ্ক উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা না করিলেই ভাল হইত। শঙ্কর অভ্রান্ত গুরুর পদবী প্রয়াসী হন নাই; যাঁহারা অভ্রান্ত গুরুর অভ্রান্ততা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা বিনা প্রমাণে শঙ্করের বাক্যও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন কি না সন্দেহ স্থল। তাঁহারা শঙ্কর বলিয়াই শঙ্করের বাক্য গ্রাহ্য করিবেন না, আর কিঙ্কর বলিয়াও কিঙ্করের উক্তি উপেক্ষা করিবেন না। এস্থলে শঙ্করে কিঙ্করে কোন প্রভেদ নাই, অবিচারিত ভাবে কাহারও বাক্য গ্রাহ্য বা প্রত্যাখ্যান করা বিধেয় নহে। সে যাহা হউক, আমরা আলোচ্য বিষয় ভুলিয়া গিয়াও লক্ষ্য পথ হইতে বিশেষ বিচ্যুত হই নাই। আমার প্রশ্নের উত্তরে অভ্রান্ত গুরুবাদী স্বীকার করিয়াছেন, "দশটী প্রত্যাদেশ শুনিয়াও অভ্রান্ত গুরু হওয়া যায়, দশ হাজার শুনিয়াও অভ্রান্ত হওয়া যায়।" তবে দশকে ও দশহাজারী অভ্রান্ত গুরুর গুরুত্ব লঘুত্বের কোন প্রভেদ আছে কিনা তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই। যদি অভ্রান্তে অভ্রান্তে বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে কাহারও ভ্রান্তি স্বীকার করিতে হইবে কি না? আমার হৃদয়ের অবস্থা যখন তাঁহার হৃদয়ের অবস্থার সমতুল্য নহে, তখন তাঁহার নিকট আর কোন প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশা করা সঙ্গত নহে; কেননা তিনি কেবল সমবিশ্বাসীর উপকারের জন্যই লেখনি ধারণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে কেহ তাঁহার সমবিশ্বাসী আছেন কি না জানি না। থাকিলেও এ পর্য্যন্ত তাঁহারা দেখা দেন নাই। সুতরাং তাহার কথানুসারেই তত্ত্বকৌমুদীতে তাঁহার আর কোন পত্র স্থান পাওয়া উচিত নহে। অথচ পরিতাপের বিষয় এই, আপনি—তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়, তাঁহার পত্রকেই তত্ত্বকৌমুদীতে শেষ স্থান দিয়া তাঁহার প্রতিকূল পক্ষদিগের মুখ বন্ধ করিবার ভৈরব নাদ ঘোষণা করিয়াছেন। আপনার স্মরণ রাখা উচিত ছিল, তত্ত্বকৌমুদী ব্রাহ্মসমাজের পত্র, যে মত ব্রাহ্মসমাজে স্থান পায় নাই, চারিদিক হইতে যে মতের ঘোরতর প্রতিবাদ হইতেছে সেই মতের পারপোষককে শেষ বক্তব্য বলিবার সুযোগ দিয়া তাহার প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ করা, আর ব্রাহ্ম সমাজের মূলদেশে কুঠারাঘাত করা একই কথা। আশা করি আপনি আমার এই পত্রখানিকে স্থান দিতে বিরত হইবেন না।

নিবেদক,

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কুমারী এস্, ডি, কলেটের ভ্রাতুষ্পুত্রী কুমারী ই, এস্, কলেটকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই :—

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আপনার পিতৃষ্বসা এবং আমাদের বন্ধু কুমারী এস, ডি, কলেটের মৃত্যু জন্য তাঁহাদের আন্তরিক শোক আপনার পরিবারবর্গকে জানাইবার

জন্য আমার প্রতি ভারার্পণ করিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহকসভা আমার প্রতি যে কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহা দুই কারণে অতি পবিত্র কার্য্য। প্রথম কারণ এই যে, আপনার পিতৃস্বশা ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য অনেক শক্তি ক্ষয় করিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণ এই যে, লণ্ডন নগরে তাঁহার সহিত যখন আমার প্রথম দেখা হয়, তখন হইতে তিনি আমাকে আপন সহোদরের ন্যায় ভাল বাসিতেন। আপনার শোকগ্রস্ত পরিবার হয় ত শুনিয়া কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিবেন যে, ভারতবর্ষে সহস্র সহস্র ব্রাহ্ম-হৃদয় তাঁহাদের গভীর শোকের অংশ গ্রহণ করিতেছেন। আপনার পিতৃস্বশা ইংলণ্ডে থাকিয়াও আমাদের সঙ্গে হৃদয়ে যুক্ত ছিলেন ও সর্ব্বদা সৎপরামর্শ দ্বারা গুরুতর বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। বার্দ্ধক্য ও গুরুতর শারীরিক অসামর্থ্য সত্ত্বেও তিনি আমাদের কল্যাণজনক কার্য্যে পরিশ্রম করিতে কখনও ত্রুটি করেন নাই; সুতরাং আপনার পরলোকগত পিতৃস্বশার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা সূচক এই চিঠি গ্রহণ করুন এবং আমাদের শোক-সংবাদ আপনার পরিবারবর্গকে জ্ঞাপন করুন। তাঁহার প্রযুক্ত আত্মা স্বর্গে সুখে এবং শান্তিতে বিহার করে; আমরা আপনার পরিবারবর্গের সহিত একহৃদয় হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি।

বিগত ২০শে এপ্রিল শুক্রবার কুমারী এস, ডি, কলেটের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করিয়া "রামমোহন রায় সভাতে" এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। কুমারী কলেট্ রাজার একখানি বিস্তৃত জীবনী লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উক্ত সভা এই জীবনীখানি শেষ করাকে একটি পবিত্র কার্য্য মনে করেন। এই সভা হইতেও কুমারী ই, এস, কলেটের নিকট শোক-সহানুভূতি জ্ঞাপক একখণ্ড পত্র প্রেরিত হইয়াছিল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ষোড়শ সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব কার্য্যপ্রণালী নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

৩১শে বৈশাখ (১৩০১) ১৩ই মে (১৮৯৪) রবিবার—পূর্ব্বাহ্ন ও অপরাহ্ন ৭টার সময় সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। অপরাহ্ন ৪টার সময় শাস্ত্রপাঠ ও ধর্ম্মালোচনা।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৪ই মে, সোমবার—পূর্ব্বাহ্ন ও অপরাহ্ন ৭টার সময় সংকীর্ত্তন এবং উপাসনা।

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৫ই মে, মঙ্গলবার—পূর্ব্বাহ্ন ও অপরাহ্ন ৭টার সময় সংকীর্ত্তন এবং উপাসনা। অপরাহ্ন ৪টার সময় শাস্ত্রপাঠ ও ধর্ম্মালোচনা।

"মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায়, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক, উক্ত শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়ের অধিকারভুক্ত কাওরাদি নামক স্থানের নাতি দূরস্থিত ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত লেংটী পাড়া ও কংশের কুল গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত হৃদয়চন্দ্র আচার্য্য ও শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ আচার্য্য মহাশয় উভয়েই স্বীয় স্বীয় পরিবারসহ পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবান তাঁহার দরিদ্র ব্রাহ্ম সন্তানদিগকে অবস্থা সম্বন্ধীয় এবং লোক নির্য্যাতন ইত্যাদি নানাপ্রকার পরীক্ষা হইতে রক্ষা করুন, এই প্রার্থনা। ২০এ চৈত্র কাওরাদি ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে এই পল্লীগ্রাম নিবাসী নবীন ব্রাহ্মগণ সপরিবারে যোগদান করিয়াছিলেন।

চাইবাসা ব্রাহ্মমন্দিরের জন্য দান প্রাপ্তি—

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত	কলিকাতা	২৲
„ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	„	১৲
একজন গরিব ব্রাহ্ম	„	১৲
বাবু অবিনাশচন্দ্র সরকার	„	১৲
„ হরিমোহন দত্ত	„	১৲
„ প্রতুলচন্দ্র সোম	„	।০
শ্রীমতী অম্বিকা দেবী	কোন্নগর	২৲
বাবু বৈকুণ্ঠনাথ হাজরা	কণ্টাই	১৲
„ বিপিন চন্দ্র সাম্মল	„	১৲
„ তারাচাঁদ বসু	„	॥০
		১০৸০

নিবেদন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আর্থিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য "তত্ত্বকৌমুদী" ও "ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার" আমরা মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞাপন দিয়া থাকি। তদ্দৃষ্টে সমাজের সভ্য ও সহযোগী এবং উক্ত উভয় পত্রিকারই গ্রাহক মহোদয়গণের অনেকেই একটু আলস্য ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব দেয় টাকার কিছু কিছু পাঠাইয়া সমাজের অনেক উপকার করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

আমাদিগের প্রচারক মহাশয়গণকে যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করা যায় তাহা সম্প্রতি হ্রাস হইয়া যাইতেছে। প্রচারকের সংখ্যা অতি অল্প। যে অল্প সংখ্যক কয়েকজন আছেন তাঁহাদিগের উপর আবার ছাত্র-নিবাস, বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতির ভার অর্পিত আছে বলিয়া তাঁহারা সমস্ত সময় প্রচার কার্য্যাদিতে অক্ষম। এ অবস্থায় তত্ত্বকৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার পত্রিকা দুই খানি দ্বারা যে কিছু প্রচার হইতেছে গ্রাহক মহাশয়গণের নিকট হইতে তাঁহাদিগের মূল্য প্রাপ্ত না হইলে সমাজের কার্য্য চলা কঠিন। বস্তুতঃ ঋণ করিয়া আর কতদিন চলিতে পারে, আর ঋণ মুক্তই বা আমরা কিরূপে হইব?

সমাজের সভ্যগণের নিকট এত বাকি পড়িয়া রহিয়াছে যে তাহার একটা তালিকা প্রকাশ করিলে অনেকেই সমাজের নিয়মানুসারে সভ্যের অযোগ্য হইয়া পড়িবেন। আমরা এই তালিকাটি প্রস্তুত করিতে গিয়া দেখিতেছি দুই বৎসরের ত কথাই নাই কোন কোন সভ্যের নাম খাতায় আছে সত্য কিন্তু অর্থ সাহায্যের কোন চিহ্নই তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রচার কার্য্য অথবা পত্রিকায় সাহায্য হেতু এককালীন দান উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়।

এ অবস্থায় সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই নিকট আমাদিগের বিনীত নিবেদন সত্বর তাঁহারা যেন আমাদিগকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া এবং স্ব স্ব দেয় টাকা পাঠাইয়া বাধিত ও উপকৃত করেন।

নিবেদক,

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ১২ই মে ১৮৯৪।

শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক,
সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১লা জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

৪র্থ সংখ্যা। ১৭শ ভাগ। | ১৬ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, ১৮১৬ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷০ মফস্বলে ৩৲ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে বিশ্বপতি! যাঁহারা প্রেমের পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা যে জীবনকে মধুময় বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। তোমার এই সুন্দর জগৎ তাঁহাদের চক্ষে মধুময়, মানব-জীবন মধুময়, জীবনের সুখ দুঃখ মধুময়, জীবনের সম্বন্ধ ও কার্য্য সকল মধুময়। তাঁহারা সহজ ধর্ম্মভাবে শয়ন করেন, সহজ ধর্ম্মভাবে উত্থিত হন, সহজ ধর্ম্মভাবের বায়ুতে বাস করেন ও সেই বায়ুতে বিচরণ করেন। তোমার প্রত্যেক বিশ্বাসী ও প্রেমিক সন্তানের জীবনে এই মহাসত্য প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদিগকে এই প্রেমের পথে একবার দণ্ডায়মান কর, সেই প্রেমের সুখ একবার প্রাণ ভরিয়া সম্ভোগ করি, প্রেমে আত্ম সমর্পণ করিয়া আপনাকে হারাই, এবং প্রেমের বায়ুতে বাস করিয়া জল-পার্শ্ব-রোপিত বৃক্ষের ন্যায় সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে বর্দ্ধিত হই। তখন তোমাকে ধন্যবাদ করা আমাদের প্রাতিদিনের আনন্দকর ব্যাপার হইবে এবং তোমার সেবাই জীবনের সুমিষ্টতম কার্য্য হইবে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

দুই পথ—পাহাড়ে উঠিবার সময় অনেক স্থলে দুইটী পথ দেখিতে পাওয়া যায়। একটী প্রশস্ত; গাড়ি, ঘোড়া প্রভৃতি যাইবার জন্য রচিত, প্রস্তরাদি দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধান ও এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে, তদ্দ্বারা গমন করিলে গিরি আরোহণের ক্লেশ কিছুই অনুভব করা যায় না; যেন সহজ পথেই চলিতেছি। আর একটী পথ দুরারোহ, তাহাতে উন্নত শৈলশিখরে আরোহণ করিতে হয়, ত্বরায় শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। অতি সবলকায় পার্ব্বত্য জাতি সকলই এই সকল পথে গতায়াত করিতে পটু। তাহারাই পৃষ্ঠে ভার লইয়া ঐ সকল পথে উঠিতেছে ও নামিতেছে, তাহা তোমার আমার পক্ষে সহজসাধ্য নহে। ধর্ম্মরাজ্যেও যেন দুই প্রকার পথ দেখিতেছি, একটী প্রেমের পথ ও অপরটী কঠোর সাধনের পথ। প্রেমের পথ একবার ধরিতে পারিলে আর ক্লেশ থাকে না; মানুষ অতি সহজে অগ্রসর হয়। কিন্তু প্রেমের পথ যতদিন ধরিতে না পারা যায়, ততদিন মানুষ কঠোর সাধনের পথে চলিতে থাকে। এই পথে ধর্ম্ম অতিশয় তিক্ত ও শ্রম-জনক বলিয়া বোধ হয়। শরীর ও মনকে গুরুতর রূপে নিগ্রহ করিতে করিতে মন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। সাধনের যেরূপ দুইটী পথ, সাধকও দুই শ্রেণীর দেখা যাইতেছে। বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি যে পথে গিয়াছিলেন তাহা কিরূপ সহজ ও স্বাভাবিক পথ ছিল! মহাত্মা শাক্য সিংহ ৬ বৎসর কাল যে কঠোর সাধন করিলেন, অবশেষে তাহা অনাবশ্যক বোধে উপেক্ষা করিলেন; এবং নিজে সুজাতার হস্ত হইতে পরমান্ন আহার করিয়া কৃচ্ছ্র সাধনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিলেন। তাহাতে তাঁহার পঞ্চজন শিষ্য তাঁহাকে ব্রতত্যাগী বোধে বর্জ্জন করিলেন কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ভীত বা দুঃখিত না হইয়া স্বীয় আবিষ্কৃত মধ্য পথ অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন এবং প্রচার করিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। বুদ্ধ দেখিলেন একটী দেবদূত একটী বীণাযন্ত্র হস্তে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন, এবং যন্ত্রটী তাঁহার হস্তে দিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহাকে সপ্তমেরও উপরে সুর চড়াইয়া বাঁধিতে বলিলেন। শাক্য সিংহ তদনুরূপ করিলেন। তদনন্তর দেবদূত তাঁহাকে ঐ যন্ত্র বাজাইতে আদেশ করিলেন। বুদ্ধ বাজাইতে গেলেন, কর্ণের প্রীতিপ্রদ স্বর নির্গত হইল না। তদনন্তর দেবদূত আবার তাঁহাকে যন্ত্রটী একেবারে নীচে বাঁধিতে বলিলেন। বুদ্ধ তদনুরূপ করিলেন; আবার বাজাইতে আদেশ করিলেন। এবারেও কর্ণের প্রীতি-প্রদ স্বর নির্গত হইল না। অবশেষে মধ্য পথে যন্ত্র বাঁধা হইল, এবং উৎকৃষ্ট স্বর নির্গত হইতে লাগিল। তখন দেবদূত তাঁহাকে এই উপদেশ দিলেন "হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ! কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনও সাধকের পন্থা নয়, ইন্দ্রিয়সুখ পরতন্ত্রতা ও সাধকের পন্থা নয়; মধ্য পথই সর্ব্বদা অবলম্বনীয়। গীতাতে উপদেশ আছে;—

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্ত চেষ্টা কর্ম্মণি।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

অর্থ—যে ব্যক্তি উপযুক্ত পরিমাণে আহার বিহার করিয়া থাকেন, যিনি উপযুক্তরূপ শ্রম করেন এবং আবশ্যক মত

নিদ্রা ও জাগরণ করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তির পক্ষেই যোগ দুঃখ হানিকব হয়।" প্রেম পথাবলম্বী প্রত্যেক মহাজনই এই পথে গমন করিয়াছিলেন। যীশুর জীবনে কৃচ্ছ্রসাধন বা বাহ্য তপস্যা ছিল না। তিনি স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিতেন, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন, সুখে নিদ্রা যাইতেন, পথে, ঘাটে, বনে জঙ্গলে স্বাভাবিক ভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। তিনি একবার সমবেত য়িহুদীদিগকে লক্ষ্য কবিয়া বলিয়াছিলেন, "জন,উপবাসাদি দ্বারা কঠোর তপস্যা করিতেন তথাপি তাঁহাকে তোমরা মান নাই, আর আমি স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করি আমাকে কি মানিবে?" প্রেম পথাবলম্বী প্রত্যেক সাধকের নিকটেই ধর্ম্ম নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক।

ব্রাহ্মবালকদিগের শিক্ষা—একজন ব্রাহ্ম মহিলা মফস্বলের কোনও স্থানে বাস করিতেছেন। তিনি একটী মাত্র শিশু পুত্র লইয়া বিধবা হইয়াছেন। এত দিন পুত্রটী অতি শিশু ছিল, তাহাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণের চিন্তা মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে বালকটী পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া ছয় বৎসরে পড়িয়াছে, সুতবাং জননীর মনে তাহাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণেব চিন্তা উদিত হইয়াছে। তিনি নিতান্ত চিন্তিত হইয়া কলিকাতাস্থ একজন বন্ধুকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত কবা যাইতেছে;—"হিন্দুদের স্কুলে তাহাকে পড়িতে দেওয়া উচিত নয়;——পুরে ছোট ছেলেদের উপযুক্ত স্কুল নাই; আর যে সব স্কুল আছে তাহারা ব্রাহ্মদেব খুব নিন্দা করে, আমার মনে হয় তাকে কলিকাতা রাখাই ভাল।" এই মহিলা নিজ পুত্রকে ব্রাহ্মবিরোধী স্কুলে প্রেরণ করিতে যে চিন্তা করিতেছেন, অনেক ব্রাহ্ম পিতামাতা সে চিন্তা করেন না। একজন সুকুমার মতি বালক বিদ্যালয়ে যদি নিরন্তব ব্রাহ্মদিগের নিন্দা শ্রবণ করে, তবে তাহার কিরূপ ভাবে বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বালকেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যখন কলেজে যায়, তখন এরূপ নিন্দাবাদ শুনিলে তাহাদেব তত অনিষ্ট হয় না; কিন্তু শৈশবে শিশুগণ অতি সত্বর সহাধ্যায়ীদিগের ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইজন্য কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছেন, যে ব্রাহ্মবালকদিগের বোর্ডিং'এর সঙ্গে ব্রাহ্মবালকদিগের জন্য একটী স্কুল স্থাপন করা হউক। ষষ্ঠ কি সপ্তম শ্রেণী পর্য্যন্ত বালকগণ ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয়ে পড়িতে পারিবে, তৎপরে উপরকার কয়েকটী শ্রেণী স্বতন্ত্র স্থানে রাখা হইবে। নিকটে নিকটে বাড়ী দুটী রাখিতে পারিলে একই শিক্ষক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দুই স্থানে পড়াইতে পারিবেন। আমরা গণনা করিয়া দেখিয়াছি, কলিকাতার সমুদায় ব্রাহ্মবালক পাইলে প্রায় ৬০।৭০ টী বালক হয়, ইহাদিগকে লইয়া একটী স্কুল করা যাইতে পারে, এবং অনেক কৃতবিদ্য ব্রাহ্মযুবক এরূপ কার্য্যে খাটিতে পারেন। ক্রমে এই দুইটী বোর্ডিং ও স্কুল, মফস্বলে লইয়া যাইতে পারা যায়। আমরা দেখিয়া সুখী হইতেছি যে ক্রমেই এই গুরুতর বিষয়ে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগের দৃষ্টি পতিত হইতেছে। এরূপ আশা হয় যে ত্বরায় ইহার কোনও একটা উপায় নির্দ্ধারিত হইবে।

ব্রাহ্ম সাম্প্রদায়িকতা—একজন সুশিক্ষিত চিন্তাশীল বাঙ্গালি ভদ্রলোক একদিন, একজন ব্রাহ্ম প্রচারককে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"আপনারা ব্রাহ্ম না হইলে তাহাকে আর ভাল বাসিতে পারেন না; আপনাদের কথার ভাবে বোধ হয় অব্রাহ্ম মাত্রেই অসৎ লোক, আপনাদের এই প্রকার ধারণা। ব্রাহ্মদিগেব মধ্যে এরূপ সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা প্রবিষ্ট হইতেছে কেন?"

প্রচারক মহাশয় উত্তর করিলেন.—"ব্রাহ্মদিগেব অন্তরে কিয়ৎ পরিমাণে সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবিষ্ট হইয়াছে ও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে তাহা আমরাও অনুভব কবিতেছি। কিন্তু যে সকল কাবণের একত্র সমাবেশ হইয়া এই ফল ফলিতেছে তাহার উপরে যেন আমাদের হাত নাই। প্রথম আমাদের দেশে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকাতে এই এরূপ হইতেছে যে, যে কেহ ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে তাহাকে জাতিচ্যুত হইতে হইতেছে, অর্থাৎ তাহার আত্মীয় জ্ঞাতি কুটুম্বগণ তাহার সহিত আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিতেছেন। কাজেই ব্রাহ্মগণ যেন এক নূতন জাতি হইয়া দাঁড়াইতেছেন। একবার একজন খাসিয়া ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়াছিলাম, তিনি একে একে তাঁহার পুত্রগুলির সহিত আলাপ করিয়া দিলেন। একটী পুত্রকে পরিচিত করিয়া দিয়া বলিলেন "আমর এই পুত্রটী খ্রীষ্টান।" অর্থাৎ সে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। রবিবার ঘরে না থাকিয়া গির্জ্জাতে যায়, প্রচলিত খাসিয়া ধর্ম্মে যোগ দেয় না এই মাত্র। অপরাপর সমুদায় বিষয়ে সেই পুত্রে ও অপরাপর পুত্রে বড় অধিক প্রভেদ নাই। সে বাড়ীতে আছে, পিতামাতা ভাইভগিনীব নিকট বাস কবিতেছে। তাহাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা নাই সুতরাং জাতিচ্যুত করাও নাই। ইহাতে পুরাতন আত্মীয়তার ব্যাঘাত হয় না। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মদিগের অবস্থা অন্য প্রকার। ব্রাহ্ম হইলেই লোকে তাহাকে জাতিচ্যুত করে, কাজেই জাতিচ্যুত ব্যক্তি অপর জাতিচ্যুতদিগের সহিত মিলিয়া বাস করিতে বাধ্য হয়। পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত আত্মীয়তা সূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। দ্বিতীয় এখন দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মবিরোধী ভাব দৃষ্ট হয়। লোকের সহিত মিশিতে গেলেই অনেক সময় বাদবিতণ্ডা, বিবাদ কলহ উপস্থিত হয়, এইজন্য ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মদিগের সঙ্গেই অধিক মিশিয়া থাকে। যেখানেই দুই দল লোকের মধ্যে মিশামিশি বন্ধ হইয়া যায়, সেইখানেই পরস্পরের সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা জন্মিবার কারণ হয়। এই জন্য দেশের লোকের ব্রাহ্মদিগের সম্বন্ধে অনেক কুসংস্কার আছে, ব্রাহ্মদিগেরও দেশের লোকের সম্বন্ধে কুসংস্কার আছে। নানা প্রকার সদনুষ্ঠান উপলক্ষে অধিক পরিমাণে উভয় দলের মিশামিশি আরম্ভ হইলে বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িকতা অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে।

সংসার-ধর্ম্ম এবং সাংসারিকতা—সংসারই ধর্ম্মক্ষেত্র। ধর্ম্মসাধনের জন্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিতে হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্ম এ কথা বলেন না। "ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ" হইবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম উপদেশ দেন। যিনি সংসার-ক্ষেত্রে বিধাতার লীলা দর্শন করিতে পারিলেন না, বনে গিয়া তিনি কি বিশ্বপতির মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিবেন? বাস্তবিক সন্ন্যাসধর্ম্ম, বনচারীর ধর্ম্ম, প্রকৃত ধর্ম্মের বিকৃতি মাত্র। ধর্ম্ম-পথ সহজ ও সরল। সংসার-ত্যাগ, কৃচ্ছ্রসাধন কি পরম তত্ত্ব লাভের উপায়? বিশেষ বিশেষ মানবের এরূপ পন্থা অবলম্বনীয় হইতেও পারে; কিন্তু সাধারণ মানবের ঐ পথ আদর্শ স্থানীয় নহে। সংসারকে স্বর্গে পরিণত করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ। কিন্তু যিনি সাংসারিকতাকে সংসার ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তিনি বিষবৃক্ষকে চন্দনতরু ভ্রমে আলিঙ্গন করিবেন। যাঁহারা কার্য্যতঃ বিষয়াসক্ত, সাংসারিকতায় মগ্ন, অথচ সেই বিষয়াসক্তি ও সাংসারিকতাকেই সংসার-ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং যাঁহারা এই বিষয়াসক্তিকে ঘৃণা করিতেছেন, সাংসারিকতা দূর করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিতেছেন, তাঁহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। শরীরের ভিতরে ব্যাধি রহিয়াছে, যদি তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনে করে বেশ সুখে আছে, তবে যেমন অজ্ঞাতসারে সেই লুক্কায়িত ব্যাধি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ নষ্ট করিবে, এই শ্রেণীর সাধকগণের অবস্থাও সেইরূপ।

পুত্র কন্যাকে লালন পালন কর, স্ত্রীকে অলঙ্কার দেও, লোহার সিন্দুকে টাকা সঞ্চয় কর, পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ কর, রবিবার দিন মন্দিরে না গিয়া বাড়ীতে আমোদ প্রমোদ কর, বন্ধু বান্ধবদিগকে নিত্য প্রীতিভোজন করাইয়া বন্ধুত্বের প্রসার বৃদ্ধি কর ইত্যাদি কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিলেই সংসার-ধর্ম্ম হইল। ইহা যদি সংসার-ধর্ম্ম হয়, তবে পৃথিবীতে এরূপ ব্যক্তি অতি অল্পই আছে, যাহারা এই ধর্ম্ম পালন না করে। খাওয়া পরা সুখ সুবিধা এই পৃথিবীতে বেশ চলিতেছে। তজ্জন্য প্রচারকেরই বা প্রয়োজন কি? ধর্ম্ম-মন্দিরেরই বা আবশ্যকতা কি আছে? পশু পক্ষী নিয়ত যে ধর্ম্ম পালন করিতেছে, সেই ধর্ম্ম পালন করাইবার জন্য মানুষকে উপদেশ দিতে হয় না। কিন্তু কোনও সাধনশীল ও চিন্তাশীল ব্রাহ্ম এরূপ সংসার পালনকে সংসার-ধর্ম্ম বলিবেন না। যিনি পরমেশ্বরকে লক্ষ্য-স্থলে রাখিয়া সংসার পালন করেন; সংসার ঈশ্বর লাভের উপায়—ব্রহ্ম লক্ষ্য, সংসার গন্তব্য পথ, এইরূপে যিনি ধর্ম্মসাধন করেন, তিনিই সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতে সক্ষম হইবেন। দুঃখের বিষয় যে, অনেকেই সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া ঘোরতর বিষয়ী হইয়া পড়েন। বিষয়াসক্তিকে সংসার ধর্ম্ম মনে করিয়া কত লোকে ইহজগতে প্রতারিত হইতেছেন।

কে সংসারকে প্রভু পরমেশ্বরের লীলা-ক্ষেত্র করিয়াছে, কেইবা বিষয়ে মজিয়া আধ্যাত্মিক বিনাশ সাধন করিতেছে, তাহা আচরণেই চিনিতে পারা যায়। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি ধর্ম্মের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কত দিন কল্পিত রাজ্যে থাকিতে পারিবে? বিপদের দিনে, পরীক্ষার দিনে, তাহার লুক্কায়িত নিজ মূর্ত্তি বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়িবেই পড়িবে। কিন্তু যিনি ব্রহ্মের জন্য সংসার করিতেছেন, তিনি সমুদয় বিপদ আপদে স্থির অটল থাকিবেন, কিছুতেই তিনি শান্তিহারা হইবেন না। যাহাদের অর্থ কেবল গৃহিণীর সেবাতেই ব্যয়িত হয়,—দুঃখীর দুঃখ মোচনে, ধর্ম্ম প্রচারে, সাধু অনুষ্ঠানে যাহার কোনও অংশ ব্যয়িত হয় না, যাহার জীবন ধারণ কেবল ভোগ বিলাস চরিতার্থ করিবার জন্য, কিন্তু প্রভুর মহিমা বিস্তারের জন্য নহে; যাহার শক্তি সামর্থ্য কেবল স্বীয় মান সম্ভ্রম ও অবস্থার উন্নতি সাধনেই পর্য্যবসিত হয়, কিন্তু নর-নারীর সেবা, ও ধর্ম্ম প্রচারে যাহাদের রক্ত মাংস কিয়ৎপরিমাণেও ক্ষয় হয় না, তাহারাই বিষয়াসক্ত। যাঁহারা কেবল নিজের সুখ সুবিধা লইয়া ব্যস্ত, আর কোনও দিকে তাকায় না, তাহারাই সাংসারিক। অপর দিকে যাহাদের "প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কাজে তাঁর" যাঁহারা ঈশ্বর-প্রীতিকাম হইয়া সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, যাঁহারা অপরের সুখে সুখী, ধর্ম্ম প্রচারে উৎসাহশীল, দরিদ্রের অশ্রু মোচনে আনন্দিত, ক্ষুধাতুরের সাহায্যের জন্য যাঁহারা মুক্তহস্ত, যাঁহারা ধর্ম্মের রাজ্য, ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তারের জন্য না দিতে পারেন, এমন কিছু নাই, না ছাড়িতে পারেন, এমন কোনও বিষয় নাই, তাঁহারাই সংসার-ধর্ম্মী। বিষয়াসক্ত ও সংসার-ধর্ম্মীদিগের মধ্যে চিরকাল বিরোধ চলিয়া আসিতেছে।

বিশ্বাস দুর্গ—নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটী বৌদ্ধগ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাত্মা শাক্য সিংহের সময়ে একজন ব্রাহ্মণ যোগী প্রায় দ্বাদশ বৎসর কাল কোনও বৃক্ষতলে বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। কিন্তু ঐ তপস্বী কোনও প্রকারে ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসা-জনিত-চিত্ত চাঞ্চল্য নিবারণ করিতে সমর্থ হন নাই। বুদ্ধ এই ব্রাহ্মণের সংবাদ জানিতেন এবং তাহার চিত্ত-চাঞ্চল্যের বিষয় অবগত ছিলেন। একদা শুক্ল পক্ষের রজনীতে তিনি শ্রমণের বেশ ধারণ করিয়া ঐ তপস্বীর সন্নিধানে গিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে বসিয়া আছেন, এমত সময়ে সম্মুখস্থ নদীর গর্ভ হইতে একটী কূর্ম্ম উঠিয়া তাঁহাদিগের দিকে আগমন করিতে লাগিল। কিন্তু কূর্ম্মটী অধিক দূর অগ্রসর না হইতে হইতে কোথা হইতে একটী উদ্‌বিড়াল দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। কূর্ম্মটী প্রাণভয়ে আপনার দেহ-কোষের মধ্যে মস্তক ও হস্ত পদাদি সংকুচিত করিয়া লুকাইয়া রহিল। উদ্‌বিড়াল কূর্ম্মের সুদৃঢ় দেহ-কোষের উপরে বৃথা আঘাত করিয়া নিরস্ত হইয়া গেল। উদ্‌বিড়াল প্রতিনিবৃত্ত হইলে কূর্ম্ম আবার স্বচ্ছন্দ চিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন ঐ তপস্বী শ্রমণবেশধারী বুদ্ধকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দেখ কূর্ম্মটীর আত্মরক্ষার সুদৃঢ় উপায় থাকাতে কেমন বিপদ হইতে রক্ষা পাইল।" শ্রমণবেশ-ধারী বুদ্ধ বলিলেন—"আমি একজন মানুষের বিষয় জানি, সে তপস্যার দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে চায়, কিন্তু ঐ কূর্ম্মের ন্যায় আপনার প্রবৃত্তি সকলকে সংবরণ করিতে না পারাতে

অনেক ক্লেশ পাইয়া থাকে।" ইহাতে ঐ তপস্বীর দৃষ্টি নিজের উপরে পড়িয়া গেল এবং সে ক্রমে শ্রমণবেশধারী বুদ্ধের পরিচয় পাইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল।

এই আখ্যায়িকাটী হইতে আমরা একটী উপদেশ প্রাপ্ত হই। কূর্ম্মের অঙ্গ-রক্ষার জন্য যেমন একটী সুদৃঢ় আবরণ আছে, তেমনি প্রকৃত বিশ্বাসী ব্যক্তিরও একটী সুদৃঢ় আবরণ আছে। যখনি তিনি পাপ-প্রলোভনে, বা ভয় বিপদে পতিত হন, তখনি ঐ আবরণের মধ্যে আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া নিরাপদ হইতে পারেন। এই যে নিরাপদ অবস্থা, ইহাকে নানা ভক্ত নানা ভাষাতে বর্ণনা করিয়াছেন। বৃদ্ধ য়িহুদী নরপতি দায়ুদ ইহাকে পাষাণ নির্ম্মিত দুর্গ বলিয়াছেন। নানক এই অবস্থাতে পরমেশ্বরকে নিজের বর্ম্ম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বস্তুতঃ যে সকল ধর্ম্মবীর ধর্ম্মের জন্য অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, এমন কি সময়ে সময়ে প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছেন, তাঁহারা এই প্রকার বিশ্বাস-দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন, নতুবা কখনই এত ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেন না। ঈশ্বর করুন আমরা যেন বিশ্বাস দুর্গে আশ্রয় লইতে পারি।

উন্মাদিনী শক্তি—সাধু মহাজনগণ কোন গুণে জগতকে বশীভূত করিয়াছেন? যীশু যখন নব ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার স্বগ্রামবাসী ও পরিচিত ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিল, "এই না সেই যীশু আমাদের জোসেফ ছুতারের ছেলে, উহার ভাই ও ভগিনীগণ ত আমাদের সঙ্গেই আছে, ও ব্যক্তি ইহার মধ্যে কি দেখিল, যে এই সকল আশ্চর্য্য কথা বলে?" চৈতন্য যখন বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন নবদ্বীপের লোক বলিতে লাগিল—"ওরে আমাদের সেই নিমাই পণ্ডিত!" নানক যখন প্রভু পরমেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য বহির্গত হইলেন, তখন লোকে বলিতে লাগিল, 'সেই লবণ ব্যবসায়ীর চাকর!" এইরূপে পৃথিবীর অধিকাংশ মহাজন সামান্য অবস্থাতে জন্মগ্রহণ করিয়া সামান্য ভাবেই কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এমন কি ছিল, যাহাতে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে তাঁহাদের শিষ্যত্ব মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে? গড়ের উপরে বলিতে গেলে সকলেই এই কথা বলিবেন যে, এই সকল মহাজনের চরিত্রে কি এক উন্মাদিনী শক্তি ছিল, যে কেহ সেই চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়াছে বা তাহার অনুধ্যান করিয়াছে, সেই উন্মত্ত-প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। তাহাত বুঝিলাম, কিন্তু এই উন্মাদিনী শক্তির মূল কোথায়? কি দেখিয়া লোকে উন্মত্ত হইয়াছে? তাহাদের ধন বল বা পদমর্য্যাদা ছিল না যে, তাহা দেখিয়া লোক আকৃষ্ট হইবে। ইহাঁরা সকলে জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠও ছিলেন না যে, জ্ঞানগৌরব দেখিয়া কেহ আকৃষ্ট হইবে। তবে কি ছিল? ছিল ইহাঁদের ত্যাগ। ইহাঁরা সকলে ত্যাগী পুরুষ ছিলেন। ইহাঁদের চিত্ত স্বীয় স্বীয় অবলম্বিত ও প্রচারিত সত্যে এতদূর পরিব্যাপ্ত ছিল যে, স্বার্থচিন্তা আর মনে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। ইহাঁরা নিঃস্বার্থ-পরতার অগ্নিতে উদ্দীপ্ত ছিলেন এবং সেই অগ্নিতে সুখ ও স্বার্থকে আহুতি দিয়াছিলেন। এবিষয়ে মহম্মদের দৃষ্টান্ত বিশেষ আলোচনীয়। অপরাপর সাধুগণ এক প্রকার সন্ন্যাসী ও ফকীর হইয়া গিয়াছিলেন বলিলে হয়, কিন্তু মহম্মদ ফকীর হন নাই। তিনি গৃহী ছিলেন, গৃহস্থ ধর্ম্ম প্রচার করিতেন; স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করিতেন। কেবল তাহা নহে, তিনি বিপক্ষকুলের উপরে যখন জয়লাভ করিলেন, তখন তিনি চারিদিক হইতে একজন সম্রাটের সম্মান প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। যুদ্ধের পরে যুদ্ধে যখন তাঁহার সৈন্যগণ জয়লাভ করিতে লাগিল, তখন তাঁহার সেনাপতিগণ এক একজন রাজ সম্পদ লাভ করিতে লাগিল। মহম্মদের যদি পার্থিব সম্পদের প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি থাকিত তাহা হইলে সেই সময়ে রাজ্যেশ্বর রাজা হইয়া বসিতে পারিতেন এবং অতুল বিভবের অধিপতি হইয়া বিষয়-সুখ ভোগ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার সে দিকে দৃষ্টি ছিল না, তিনি যে কিছু সম্পদ প্রাপ্ত হইতেন তাহা তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম বিস্তারে নিয়োজিত হইত। এমন কি তাঁহার প্রিয় কন্যা ফাতেমা দেবীর যখন বিবাহ হয়, তখন তিনি সর্ব্বসাধারণে পূজিত মহাপুরুষ, কিন্তু তখনও তাঁহার এরূপ হীনাবস্থা যে অপরে বিবাহের ব্যয়ের সাহায্যার্থ কিছু কিছু দান করাতে বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছিল। ফাতেমার বিবাহের পর একদিন মহম্মদ কন্যাকে দেখিতে গেলে, ফাতেমা বলিলেন—"পিতঃ আমাকে সমুদায় গৃহ কর্ম্ম স্বহস্তে করিতে হয়, এবং পতি বাহিরের কাজ করিয়া থাকেন, যদি দয়া করিয়া আমাকে একটী পরিচারিকা দেন তাহা হইলে অনেক সাহায্য হয়। মহম্মদ উত্তর করিলেন "কল্যাণি। আমি তোমাকে পরিচারিকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যাহা তাহা দিব। তুমি প্রতিদিন দ্বাত্রিংশৎবার বলিবে "আল্লা" হো আকবর (পরমেশ্বরই মহান)। মহম্মদ যখন মানব লীলা সম্বরণ করিলেন, তখন একটী বসিবার মাদুর, একটী বদনা ও সামান্য দুই চারিটী দ্রব্য ভিন্ন তাঁহার নিজের আর কিছুই রহিল না।

এই সকল সাধুর জীবনের নিঃস্বার্থতা দেখিয়াই যুগে যুগে লোকের মন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই নিঃস্বার্থতাই ইহাঁদের উন্মাদিনী শক্তির মূল। জগতে যত ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া জয়লাভ করিয়াছে সকলের ইতিবৃত্তে এই একই কথা। কবে কোন ধর্ম্ম বিষয়াসক্তির সহিত মিত্রতা করিয়া জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে? লোকের চিত্তে উন্মাদিনী শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছে? যাহা কাহারও দ্বারা হয় নাই, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা হইবে? যাহা সাধন করিতে সকল সাধুজনকে স্বার্থনাশের অগ্নি জ্বালিতে হইয়াছিল, ব্রাহ্মগণ কি বিষয় বালিশে মাথা রাখিয়া সুখের ঘুম ঘুমাইয়া তাহা সাধন করিতে পারিবেন? আমাদিগের সুদৃঢ় বিশ্বাস ব্রাহ্ম সমাজ মধ্যে স্বার্থনাশের অগ্নি যতই প্রজ্জ্বলিত হইবে ততই ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্মাদিনী শক্তি বাড়িবে, ততই নরনারীর হৃদয় ইহার দিকে আকৃষ্ট হইবে। ঈশ্বর করুন স্বার্থনাশের অগ্নি আমাদিগের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হউক।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

প্রেম ও সামঞ্জস্য।

ধর্ম্ম কি মানুষকে অস্বাভাবিক করে? প্রাচীন কালের সাধকদিগের এপ্রকার বিশ্বাস ছিল বটে। অতি প্রাচীনতম কাল হইতেই প্রায় সকল জাতি মধ্যে উপাস্য দেবতার প্রীত্যর্থ বলিদানের প্রথা প্রচলিত ছিল। এতদ্দেশের প্রাচীন গ্রন্থে রামায়ণাদিতে মুনি-পুত্র শুনঃ-শেফের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। শুনঃ-শেফ এক মুনিতনয়; তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে অর্থলোভে বলিরূপে হত হইবার জন্য রাজার নিকটে বিক্রয় করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও অনেক নরবলির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীন ব্যাবিলন ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশে অবিবাহিতা বালিকাদিগকে বলিরূপে হত্যা করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। ফিনিশিয়ার রাজধানীতে এত বড় একটী দেবমূর্ত্তি ছিল যে, তাঁহার কুক্ষির মধ্যে এক সঙ্গে দুই তিনটী বালিকা ফেলিয়া দিতে পারা যাইত। সেই দেব মূর্ত্তির মধ্যে অগ্নি জ্বালিয়া হতভাগিনী বালিকাদিগকে ফেলিয়া দেওয়া হইত। এই বলিদানের ভাব কোন না কোন আকারে আবহমান কাল এদেশে ও অপরাপর দেশে চলিয়া আসিতেছে। ক্রমে নরবলি রহিত হইয়া পশু পক্ষী বলির বিধি প্রচলিত হইয়াছে। দেবতাকে প্রসন্ন করিতে হইলে কিছু বলি দেওয়া চাই, এই সংস্কারটা ধর্ম্ম সাধকদিগের মনে বদ্ধ মূল।

ইউরোপের ইতিবৃত্তের মধ্যকালে এবং এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পরে এই সংস্কার আর এক আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহা এই, সাধারণ মানব যে সকল সুখভোগ করে, তাহা বর্জ্জন না করিলে প্রকৃত আত্ম-বলিদান করা হইল না। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ মানব জীবনকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়া এক ভাগকে স্বাভাবিকজীবন ও আর এক ভাগকে ধর্ম্মজীবন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক মানুষ যাহা চায় তাহা ধর্ম্মের পক্ষে নিষিদ্ধ। এই ভাব খ্রীষ্টধর্ম্মের মধ্যে এক সময়ে এত প্রবল হইয়াছিল যে, আমাদের দেশের সন্ন্যাসের প্রথার অনুরূপ প্রথা খ্রীষ্টীয় সাধকদিগের মধ্যে বহুদিন প্রচলিত ছিল। তাঁহারা যেন এইরূপে বিচার করিতেন—স্বাভাবিক মানুষ স্ত্রী পুত্র ভাল বাসে অতএব তাহা পরিত্যাগ করিতে বল; স্বাভাবিক মানুষ ভাল খাইতে চায়, অতএব ধার্ম্মিকের জন্য কদর্য্য আহারের ব্যবস্থা কর; স্বাভাবিক মানুষ বন্ধু বান্ধবের নিকট থাকিতে ভাল বাসে অতএব ধার্ম্মিককে বন্ধু বান্ধব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অরণ্যে লইয়া যাও; স্বাভাবিক মানুষ হাস্য পরিহাসে আনন্দ পায়, অতএব ধার্ম্মিক সর্ব্বদা মুখ ভার করিয়া থাকিবেন। এইরূপে ধর্ম্ম ও স্বাভাবিক মানবের দৈনিক জীবনের মধ্যে ঘোর বিরোধ উৎপন্ন হইয়াছিল। এদেশের ত কথাই নাই। এদেশের সাধকগণ জীবনকে কর্ম্ম ফল ভোগ স্বরূপ মনে করিয়া থাকেন, সুতরাং জীবন ও জীবনের সমুদায় সম্বন্ধও সুখকে যে তাঁহারা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবেন না তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

প্রকৃত ভক্তির পথ যেদিন হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই দিন হইতে এই বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উপায় হইয়াছে। ঈশ্বর-প্রীতির সহিত অপর কোনও বিশুদ্ধ প্রীতির বিরোধ নাই। বরং এই প্রীতি আর সমুদায় প্রীতিকে সমুন্নত ও দৃঢ় করে। একথা অতি সত্য যে, যে জীবন ঈশ্বর-প্রীতিতে প্রতিষ্ঠিত তাহা "জলপার্শ্বে রোপিত বৃক্ষের ন্যায়।" নদীতীরবর্ত্তী সমুদায় তরুলতা যেরূপ সেই এক রসের দ্বারা সঞ্জীবিত ও সতেজ হয়, তেমনি একই প্রেমরস দ্বারা আর সমুদায় প্রেম সবল ও উন্নত হয়। একজন স্বাভাবিক অবস্থাতে পিতামাতার প্রতি ভক্তিমান, পত্নীর প্রতি প্রণয়ী, পুত্রকন্যার প্রতি স্নেহবান; তিনি ধর্ম্ম জীবন প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ সাধুসঙ্গে বসিয়া তিনি ঈশ্বরে প্রীতিমান হইলেন; তখন কি তাহার লক্ষণ এই হইবে যে, তাঁহার পিতামাতার প্রতি ভক্তির হ্রাস হইবে, পত্নীর প্রতি অনুরাগের অল্পতা জন্মিবে এবং পুত্র কন্যার প্রতি স্নেহের শিথিলতা হইবে? আমরা বলি প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেম হৃদয়কে অধিকার করিলে ঠিক ইহার বিপরীত ফলই ফলিয়া থাকে। তাহার সমুদায় প্রীতি সতেজ ও উন্নত হয়। ঈশ্বর-প্রীতি মানবের স্বাভাবিকতাকে হরণ না করিয়া বরং তাহাকে আরও ঘনীভূত করে। স্বাভাবিক মানব প্রকৃতির শোভা দর্শন করিয়া যে আনন্দ অনুভব করে, ঈশ্বর-প্রেমিক সেই শোভা দেখিয়া তদপেক্ষা ঘনীভূত আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। স্বাভাবিক মানব প্রণয়ের যে সুখ সম্ভোগ করে, প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমিকের নিকট তাহা আরও ঘনীভূত ও উন্নত হইয়া আসিয়া থাকে। অতএব ঈশ্বর-প্রীতি মানবকে জীবন হইতে দূরে না লইয়া বরং জীবনের সহিত আরও গাঢ়রূপে বদ্ধ করে। অথচ সে প্রেম আসক্তি নহে। যে অনুরাগ মানব চিত্তকে ঈশ্বর-চিন্তা হইতে দূরে রাখে এবং ঈশ্বরেচ্ছা সম্পাদনে পরাঙ্মুখ করে তাহাই আসক্তি-শব্দ-বাচ্য। ঈশ্বর প্রেমিকের অনুরাগ এপ্রকার নহে। তাহাতে সকল প্রেমের ও সকল কর্ত্তব্যের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়।

ধর্ম্মসাধনের অনুকূল অবস্থা।

দুঃখ দারিদ্র্য বা সুখ-সম্পদ কোন্ অবস্থা ধর্ম্মসাধন বা ধর্ম্মলাভের অনুকূল? জগতের সাধু মহাজনগণের অধিকাংশই অতি সামান্য ভাবে দিন কাটাইতেন, দুঃখ ও দারিদ্র্যকে যেন সমাদরের সহিত তাঁহারা আলিঙ্গন করিতেন। অনেকে দুঃখ দারিদ্র্যকে প্রার্থনীয় মনে করিয়া, সেই অবস্থা পাইবার জন্য আপনাপন অভীষ্ট দেবতার নিকট প্রার্থনাও করিতেন। তাঁহাদের এতাদৃশ ভাব অবলোকন করিলে সহজেই মনে হয় যে দুঃখ দারিদ্র্যই বুঝি ধর্ম্মসাধনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। বিশেষতঃ দেখা যায় যখন লোকে বিপদ্-গ্রস্ত হয়, রোগ শোক বা ধনাভাব আসিয়া যখন মানবকে আক্রমণ করিতে থাকে, তখন সহজেই মনের অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে কোমল

হয়। ঔদ্ধত্য, অহঙ্কার প্রভৃতি ধর্ম্মসাধনের প্রতিকূল ভাব সকল তখন বড় মনে স্থান পায় না। সহজেই লোকে ধর্ম্ম কর্ম্মে মন দেয়। যে কখনও উপাসনা আরাধনার দিক দিয়াও যাইত না, সেও তখন ব্যাকুল ভাবে উপাসনাদিতে রত হয়। এই দিক্ দিয়া দেখিলে দুঃখ দারিদ্র্য প্রভৃতিকে ধর্ম্মসাধনের অনুকূল বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু আবার যখন দেখি সাধারণ ভাবে অধিকাংশ দুষ্কার্য্য লোকে দারিদ্র্যের পীড়নেই করিয়া থাকে, অবস্থার প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিয়া করিয়া যখন আর সহ্য করিতে পারে না, যখন নিত্য নৈমিত্তিক অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলি সম্পন্ন করিতেও অসমর্থ হইয়া পড়ে তখন লোকে অধিক পরিমাণে দুষ্কার্য্যসাধন করিয়া থাকে। প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য প্রভৃতিতে নিতান্ত দুষ্ট প্রকৃতি না হইলে লোকে সহজে প্রবৃত্ত হয় না। নিতান্ত অনুপায় অবস্থাতেই যে লোকে অধিকতর অপরাধে প্রবৃত্ত হয়, তাহার প্রমাণ সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। পৃথিবীতে দরিদ্র বা দুঃখীর সংখ্যা সামান্য নহে। বরং সুখীও স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন লোক অপেক্ষা গরিব দুঃখীর সংখ্যাই অধিক। যদি দুঃখ দারিদ্র্য ধর্ম্মসাধনের অনুকূল বা উপায় স্বরূপ হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর বর্ত্তমান যে দুরবস্থা দেখিয়া ধর্ম্মাত্মা সাধুগণ নিরন্তর শোক করিয়া থাকেন, তাহা আর করিতে হইত না। ধর্ম্মের এরূপ মলিন ও দীন দশাও দেখিতে হইত না। আবার দেখা যায়, যাঁহারা সাধু সজ্জন, যাহারা নিরন্তর পরহিতে রত, যাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত, তাঁহারা নিজে দীন দারিদ্র্যের অবস্থায় থাকিয়াও লোকের যাহাতে দরিদ্রতার নিবৃত্তি হয়, লোকে যাহাতে স্বচ্ছন্দে গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হয়, রোগাদির প্রভাব যাহাতে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তাহারই জন্য নিয়ত চেষ্টা করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাঁহারা ব্যস্ত তাঁহারা যে লোককে দরিদ্র দেখিতে অধিক ব্যাকুল এমন মনে হয় না। দারিদ্র্য দুঃখ যাহাতে দেশ হইতে অন্তর্হিত হয়, তাহারই জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের ব্যবহার দ্বারা এমন প্রমাণিত হয় না যে লোকের ধর্ম্মলাভের পক্ষে দুঃখ দারিদ্র্যকে তাঁহারা নিতান্তই প্রার্থনীয় মনে করেন।

অন্য দিকে যদি দেখা যাইত যে লোকে সুখ সম্পদের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া বিশেষভাবে ধর্ম্মসাধনে মনোযোগী হইতেছে, যেখানে ধনসম্পদ সেই স্থানেই ধর্ম্ম বাস করিতেছে, সেখানেই লোকে সাধন ভজনে বিশেষভাবে মনোযোগী হইতেছে, তাহা হইলে না হয় বুঝিতে পারা যাইত যে সুখ সম্পদ এবং ধন ঐশ্বর্য্যই বুঝি ধর্ম্মসাধনের অনুকূল। সেরূপ দৃষ্টান্তও অধিক দেখা যায় না। বরং ধনীর গৃহে নানা প্রকার জনহিতকর কার্য্যের সহিত বহুবিধ অন্যায় অত্যাচার যেন নিত্য বাস করিয়া থাকে। দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার ধনীর গৃহে যত নির্দ্ধনের গৃহে তত নয়। ধনের সহচররূপে অনেক দুষ্কার্য্য সাধারণতঃ ধনীর গৃহেই অধিক পরিমাণে বাস করিতে থাকে। তবে দারিদ্র্য ও দুঃখের অপেক্ষা সুখ স্বচ্ছন্দতার মধ্যে প্রতিপালিত জনগণ নীতি সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত হইলেও হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলতা বা সেজন্য যে বিশেষ আগ্রহ যে তথায় বেশী দেখা যায় এমন নহে। যাহা দেখা যায় তাহা সেই ধন প্রভাবে যাহা হইতে পারে বা প্রশংসা লাভের জন্য যাহা ঘটিতে পারে। সুতরাং এমনও বলা যায় না যে সুখ সম্পদ ধর্ম্মসাধনের বা ধর্ম্মলাভের অনুকূল।

দরিদ্রকে যেমন উদরান্নের চিন্তায় নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, তাহার যেমন সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের আয়োজন করিতেই সময় কাটিয়া যায়, পরিশ্রম করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয়, আর ধর্ম্মসাধন ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য সময় দিবার অবসর থাকে না, ধনীর পক্ষে সেরূপ হা অন্ন হা অন্ন করিয়া চীৎকার না থাকিলেও ধনের চিন্তা, কিরূপে তাহার বৃদ্ধি হইবে, কিরূপে তাহা নিরাপদে রক্ষা পাইবে, কিরূপে নিত্য নূতন সুখ ভোগের কৌশল সকল অবলম্বিত হইবে, তাহার চিন্তাতেই ব্যস্ত হইতে হয়। তাহার সে সকল আশু-সুখপ্রদ চিন্তা ও খেয়াল পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসাধনে মন দিবার প্রবৃত্তি থাকে না।

এইরূপে দেখা যায় দুঃখ বিপদ বা সুখ সম্পদ ইহারা স্বতঃ কেহই লোককে ধর্ম্মপথে লইয়া যায় না বা বিশেষ ভাবে কোন সাহায্য করে না। কিন্তু যাহার প্রাণে ধর্ম্মক্ষুধা আছে, যাহার প্রাণে ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ আছে, তাহার পক্ষে কিছুই অনুকূল বা প্রতিকূল নহে। জনক ও শাক্যসিংহের রাজ-ঐশ্বর্য্য চৈতন্যের প্রবল পাণ্ডিত্য অথবা মহম্মদ ও যীশুখ্রীষ্ট বা নানক ও কবিরের দারিদ্র্য তাঁহাদের ধর্ম্ম পথের অন্তরায় হয় নাই অথবা বিশেষ সাহায্যও করে নাই। ধর্ম্মে মতি হওয়া বা না হওয়া এসকলের উপর নির্ভর করে না। ধনীর ঘরে ধনের প্রবল আকর্ষণের মধ্যেও ধার্ম্মিকপ্রধান অবস্থিতি করিতেছেন। আবার দরিদ্রের ঘরে দারিদ্র্যের প্রবল তাড়নার মধ্যেও ধর্ম্মপ্রাণ সাধুর অভাব নাই। এজন্য সহজেই মনে হয়, ধন রত্ন বা ধনহীনতা কিছুই মানবের ধর্ম্মসাধনের অনুকূল বা প্রতিকূল নয়। ব্যাকুল ও অনুরাগীর পক্ষে দারিদ্র্য ও দুঃখ যেমন সহায়তা করে, সংসারের সকল প্রকার ধনচিন্তার উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইয়া এবং বাহ্য সুখ ভোগের প্রলোভন হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া যেমন তিনি নিরন্তর ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলপ্রাণ ধনীও তেমনি আপন ধনৈশ্বর্য্য ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যে নিয়ত নিয়োগ করিয়া এবং নিরন্তর আত্মপ্রসাদের সহিত প্রফুল্ল মনে ধর্ম্মসাধনও ধর্ম্মচর্চ্চায় নিযুক্ত হইতে পারেন।

দারিদ্র্য বা সম্পদ, রোগ বা স্বাস্থ্য ইহাদের এমন কোন স্বাভাবিক শক্তি নাই, যাহা লোককে ধর্ম্মের দিকে বা প্রতিকূলে লইয়া যাইতে পারে। রোগে পড়িয়া লোকে যেমন ঈশ্বর স্মরণের সাহায্য পায়, শোকগ্রস্ত যেমন সহজেই ঈশ্বরপরায়ণ হয়, আবার রোগের তাড়না সহ্য করিয়া করিয়া বা প্রবল শোকের আঘাত পাইয়া লোকে ধর্ম্মবিশ্বাস হীন হইয়া পড়ে তাহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। তাহারা ঈশ্বরের করুণা এবং তাঁহার প্রেম-স্বরূপে সন্দিহান হইয়া ক্রমে ক্রমে নাস্তিক হইয়া পড়ে। এজন্য দুঃখ দারিদ্র্য বা সুখ সম্পদ ইহাদের কোন অবস্থারই এমন

বিশেষ কোন শক্তি দেখা যায় না, যাহা ধর্ম্মসাধনের অনুকূল বা প্রতিকূল বলিয়া নিশ্চয় রূপে নির্দ্দেশ করা যায়। অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা বাহিরে নহে। তাহা নিরন্তরই অন্তরে বাস করে। একজনের পক্ষে যাহা আনুকূল্য করে অপরের পক্ষে তাহাই প্রতিকূলতা করিয়া থাকে। একজনের পক্ষে যাহা প্রতিকূল অন্য ব্যক্তির পক্ষে তাহাই অনুকূল।

বাস্তবিক যাহারা মনে করেন পার্থিব দুঃখ বা সুখ ধর্ম্মসাধনের বা ধর্ম্মোন্নতি হইবার পক্ষে সহায় বা অসহায়, তাঁহারা ধর্ম্মের মহিমার কিঞ্চিৎ ন্যূনতা করেন। কারণ ধর্ম্ম স্বতঃই এমন বস্তু যে তাহা লাভের জন্য কোন বিশেষ অবস্থার অপেক্ষা নাই। তাহা সকল কালেই ও সকল অবস্থাতেই সম্ভব। প্রাণের আকর্ষণ ও কল্যাণকারী কোন অবস্থা বিশেষে যাহার আদর হয় তাহা কখনই চিরসঙ্গী হইবার উপযুক্ত নয়। ধর্ম্ম সুস্থের পক্ষে যেমন প্রার্থনীয় আরামদায়ক, অসুস্থের পক্ষেও তেমনি আরামদায়ক ও কল্যাণ কর। যাঁহারা দুঃখ দারিদ্র্যকেই ধর্ম্মসাধনের অনুকূল বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা প্রকারান্তরে ইহাই ব্যক্ত করেন যে ধর্ম্ম যেন ঔষধ বিশেষের ন্যায়। রোগী ব্যক্তি রোগের সময়ই ঔষধ-সেবা করে। রোগোপশমের সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ সেবন করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না। রোগের হাত এড়াইতে পারিলেই ঔষধের সঙ্গে সম্বন্ধ যায়। রুগ্ন অবস্থাতেই ঔষধের প্রয়োজন। কিন্তু ধর্ম্ম সেরূপ নহে। তাহা চিরসহচর। দুঃখ দারিদ্র্য বা সুখ সম্পদ সকল সময়েই ধর্ম্ম মানবাত্মার সঙ্গী ও তাহার কল্যাণকর। তাহা দুঃখ বা সুখ কোন অবস্থা বিশেষেরই একমাত্র সেব্য নহে।

অনুরাগই অনুকূল অবস্থা। অনুরাগীর পক্ষে দুঃখও আনুকূল্য করে—সুখও সহায়তা করে। যাহার প্রাণে অনুরাগ আছে সে সকল সময়েই আপনার প্রিয়তম পরমেশ্বরের জন্য ব্যাকুল। দুঃখ বা দারিদ্র্য সুখ বা সম্পদ সকল অবস্থাই তাহার অনুকূল। অপরের পক্ষে সকলই প্রতিকূল।

ব্রাহ্ম পর্য্যটকের পত্র।

জয়পুর।

আমি পুষ্কর হইতে জয়পুর আসি। জয়পুর ষ্টেশন হইতে সহর প্রায় ১ মাইল হইবে। চারিদিকে উচ্চ ও প্রশস্ত প্রাচীর বেষ্টিত জয়পুর সহর অতি সুন্দর ভাবে অবস্থিত। দেশীয় রাজাদের রাজধানীর মধ্যে জয়পুর অতি সুন্দর সহর। হোলকারের ইন্দোর, গুইকোয়ারের বরদা ও গোয়ালিয়ারের উজ্জয়িনী সহর অপেক্ষা জয়পুর অনেক উৎকৃষ্ট সহর। দুইধারে ফুটপাথ ও বৃক্ষাদি দ্বারা শোভিত প্রশস্ত রাজপথ। এখানে রাস্তায় জলের কল আছে, রাত্রে গ্যাসালোকে সহর আলোকিত হয়। রাস্তার দুইধারে বড় বড় সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে দেবালয়ের উচ্চ উচ্চ চূড়া মস্তক উন্নত করিয়া সহরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। এখানকার দেখিবার প্রধান জিনিষ রাজবাটী, রাজবাগান ও মিউজিয়ম, বিশেষ মিউজিয়মটী এমন সুন্দর ভাবে সাজান আছে যে দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়।

জয়পুর হিন্দুদের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ। এখানে রাজবাটীর মধ্যে গোবিন্দজী নামক একটী পাষাণময় বিগ্রহ আছেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য এখানে বহুযাত্রীর আগমন হইয়া থাকে। গোবিন্দজীর মন্দির রাজপ্রাসাদের মধ্যে থাকায় তাঁহাকে যখন তখন দর্শন করিতে পাওয়া যায় না। প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে ও সন্ধ্যার সময় নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, সেই সময় যাত্রীগণ যাইয়া তাঁহার দর্শন করিয়া আইসেন। আমি একদিন বিগ্রহজীকে দেখিতে গিয়াছিলাম। বিগ্রহজীর প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি প্রায় দুই ফুট উচ্চ হইবে। এখানকার রাজপুরোহিতেরা যাত্রীগণের প্রদত্ত কাপড়, টাকা, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া খাতায় জমা করিয়া লইয়া থাকেন। শুনিলাম, সেই সমস্ত দ্রব্য দেবসেবার খাতায় জমা হইয়া দেবসেবাতেই ব্যয় হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, যাত্রীগণের প্রদত্ত উপঢৌকন অনুসারে তাঁহাদের আদরেরও ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। জয়পুরে আমি ৩ দিন ছিলাম।

অমৃত সর।

জয়পুর হইতে দিল্লী যাই, সেখানে জুম্মা মস্‌জিদ, কেল্লা ও তন্মধ্যে সাজাহন বাদসার দরবার, মতিমস্‌জিদ ইত্যাদি দেখিয়া অমৃত সহর আসি।

এই অমৃত সরে শিখদিগের ধর্ম্মালোচনার একটী প্রধান আড্ডা আছে, তাহাকে গুরু দরবার কহে। ইহা সহরের প্রায় মধ্যস্থলে চারিদিকে প্রাচীর ও ধর্ম্মশালা পরিবেষ্টিত একটী প্রকাণ্ড দীঘির মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত। এই দীঘির চারিধারে বিস্তৃতরূপে শ্বেত প্রস্তর দ্বারায় বাঁধান এবং দীঘির মধ্যস্থলে সুবর্ণ-পাত মণ্ডিত ও তদুপরি নানাপ্রকার কারুকার্য্য খচিত একটী বৃহৎ শ্বেত প্রস্তরের মন্দির। এই মন্দিরের মধ্যে শিকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ গ্রন্থ-সাহেব অবস্থিত। এই দরবার ও এই মন্দির শিখদিগের ৪র্থ ধর্ম্মগুরু মহাত্মা রামদাসজী প্রতিষ্ঠা করেন।

শিখদিগের ধর্ম্মগুরু ১০ জন, তাহা এই :—১ম, বাবা গুরু নানক। ২য়, নানকের শিষ্য অঙ্গদজী। ৩য়, অঙ্গদের শিষ্য অমরদাসজী। ৪র্থ, অমরদাসজীর শিষ্য ও জামাতা রামদাসজী, ইনিই অমৃত সহরের বর্ত্তমান গুরু দরবার প্রতিষ্ঠাতা। ৫ম, রাম দাসের পুত্র অর্জ্জুনজী, ইনি বাবা নানকের ও অন্যান্য গুরুদিগের গ্রন্থ এবং উক্তি ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ সাহেব প্রস্তুত করেন। ৬ষ্ঠ, অর্জ্জুনের পুত্র হর গোবিন্দজী, ইনিই শিখদিগের মধ্যে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধার্থে প্রথম তরবার ধারণ করেন। ৭ম, হর গোবিন্দজীর পুত্র হররায়জী। ৮ম, হররায়জীর পুত্র হরকিষনজী। ৯ম, তেগবাহাদুরজী, ইনি ৬ষ্ঠ গুরু হর গোবিন্দজীর ভ্রাতা। ১০ম গুরু, তেগ বাহাদুরের পুত্র প্রসিদ্ধ গুরু গোবিন্দজী। ইনিই শিখজাতিকে যোদ্ধাজাতি রূপে পরিণত করেন। ইহাঁর পরে আর উপযুক্ত ব্যক্তি না থাকায় ইহাঁরপর হইতেই গুরুপদ উঠিয়া গিয়াছে।

অমৃত সরের এই গুরুদরবারে সর্ব্বদাই একটা ধর্ম্মের হাওয়া বহিতেছে। রাত্রী ৩টা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রী ১১টা পর্য্যন্ত ২২ ঘণ্টা কাল অনবরত এই মন্দিরের মধ্যে তান লয়

সহকারে ধর্ম্ম সঙ্গীত হইতেছে। একদল গাহক গান করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে আবার একদল গাহক লোক আসিয়া তাঁহাদের স্থান পূর্ণ করিয়া গান গাহিতেছেন। এই সকল গাহকদিগের মধ্যে অন্ধের সংখ্যাই বেশী। এই অন্ধগণ সুন্দর সুন্দর ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিয়া মন্দিরকে অপূর্ব্ব ভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। এখানে গ্রন্থ-সাহেবের দুই পাশে দুইজন শিখ বসিয়া আছেন, তাঁহারা যাত্রীগণের প্রদত্ত কড়াপ্রসাদ (মহনভোগ) গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে ফুল দিতেছেন। এই সমস্ত মহনভোগ এই স্থানেই বিতরিত হইতেছে। অনবরত যাত্রীগণ আসিতেছেন ও অনবরত মহনভোগ মন্দিরস্থ ব্যক্তিগণকে বিতরিত হইতেছে এবং এই মন্দির মধ্যেই তাহা সকলে ভোজন করিতেছেন। আমি সেখানে যাইয়া বসিবামাত্র আমাকে খানিকটা মনহভোগ দিয়া একজন শিখ বলিলেন যে, এখানে কেবল কড়া প্রসাদ খাইবার নিয়ম আছে, আর কিছু খাইবার নিয়ম নাই। আমি এখানে বসিয়া বসিয়া ধর্ম্ম সঙ্গীত শুনিয়া আত্মার ও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের প্রদত্ত কড়া প্রসাদ খাইয়া উদরের তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলাম।

পরে সন্ধ্যার সময় গ্রন্থ-সাহেবের নিকট আরতী হইল মহাত্মা নানকের সেই গান "গগনমে থালে ইত্যাদি" শত সহস্র লোকে গাহিতে গাহিতে আমাদের দেশের দুর্গ প্রতিমার নিকট আরতীর ন্যায় পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া প্রায় ১ ঘণ্টা ধরিয়া আরতী করিতে লাগিলেন। পরে আরতী শেষ হওয়ায় আবার পূর্ব্বের ন্যায় সঙ্গীত চলিতে লাগিল। এখানে শিখ ধর্ম্মাবলম্বী ২।৪ জন সাধুর সহিত আমার পরিচয় হয়। তাঁহাদিগকে "গগনমে থালে" এই সঙ্গীতের অর্থ ও এই প্রকার আরতীর কথা বলায় তাঁহারা কহিলেন যে, কি করিবে? ইহারা ত তাহা বোঝে না, ইহারা যাহা বোঝে তাহাই করিতেছে। তবে শিখদিগের মধ্যে এমন লোক আছেন, যাঁহারা বাস্তবিক গুরু নানকের ভাব বুঝিতে পারেন। তবে জন সাধারণের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা হইলেও তাঁহারা বাহিক ক্রিয়াতে যোগ দিয়া থাকেন।

কেবল মন্দিরের মধ্যে যে দিন রাত্রি এইরূপ সঙ্গীতাদি হইতেছে তাহা নহে, সেই দীঘির চারিপার্শ্বেই কোথাও সঙ্গীত, কোথাও বেদান্ত পাঠ, কোথাও গ্রন্থ-সাহেব পাঠ, কোথাওবা ধর্ম্মালোচনা ইত্যাদি হইতেছে। লোক সমস্ত দলে দলে এক এক স্থানে বসিয়া ধর্ম্ম-চর্চ্চায় ব্যস্ত রহিয়াছেন। বাস্তবিক আমি ভারতবর্ষে যত স্থান দেখিয়াছি, এই স্থানের মত ধর্ম্ম-চর্চ্চা ও ধর্ম্মভাব আর কোথাও দেখি নাই। বিশেষ এখানকার লোকের সেবার ভাব অতি চমৎকার। আমি মন্দিরের এক স্থানে বসিয়া আছি এমন সময় একজন প্রৌঢ়া রমণী আমার নিকট আসিয়া চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাবা রোটী খাওগে?" আমি বলিলাম "না"। রমণী আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন। মন্দিরের বাহিরে আসিয়া পুষ্করিণীর চারিধারে বেড়াইতেছি, এমন সময় একজন লোক কতকগুলি রুটী ও তরকারি আনিয়া বলিতেছেন, "রোটী খাওগে?" আমার ক্ষুধা হইয়াছিল, বলিলাম, "হাঁ," অমনি কিছু রুটী ও তরকারী আমার হাতে দিয়া চলিয়া গেলেন। আর এক স্থানে বেড়াইতেছি, সেখানে দেখিলাম একজন ব্যক্তি একটা মুটের মাথায় করিয়া এক ধামা লুচি লইয়া বেড়াইতেছে এবং "পুরি খাওগে, পুরি খাওগে" বলিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ও যিনি খাইতে চান, তাঁহাকে দিতেছেন। একদিন রাত্রি ১০।১১টার সময় আমি দুটী সাধুর সহিত ঐ পুকুরের পাড়ে বসিয়া আলাপ করিতেছি, এমন সময় এক ব্যক্তি ৩টী বড় বড় বাটীতে মারাদুগ্ধ আনিয়া আমাদের হাতে হাতে দিয়া বলিলেন, খাইয়া ফেল। আমি দেখিয়া অবাক্! সাধুরা বলিলেন খাও, কি দেখ্ছ; পরে তাঁহারাও খাইলেন, আমিও খাইলাম। শেষে ঐ ব্যক্তি পাত্রগুলিন ধুইয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

আবার একদল লোক দেখিলাম, তাঁহারা পাখা হস্তে করিয়া কেবল বাতাস করিয়া বেড়াইতেছেন। যেখানে লোক আছে, সেখানেই যাইয়া ২।৪ বার ব্যজন করিয়া আবার চলিয়া যাইতেছেন। পিপাসা পাইলে জলের অভাব নাই, পুকুরের চারিদিকে ১০।১৫ স্থানে জলছত্র আছে; এক এক স্থানে এক এক ব্যক্তি বসিয়া অনবরত জল দিতেছেন। জল খাইবার জন্য কতকগুলিন বাটী আছে, সেখানে যাইয়া জল চাহিলে বা বাটী ধরিলেই সুন্দর ঠাণ্ডা জল তাঁহারা দেন, জল খাইয়া বাটী একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিতে হয়, সেখানে বাটীটী রাখিলে তাহা গড়াইয়া যেখানে পরিষ্কার করে সেইস্থানে যাইয়া পড়ে। এইরূপে লোকের সেবার বন্দোবস্ত আর কোথাও দেখি নাই। এখানে বেদান্তাদি পাঠ দ্বারায় যেমন জ্ঞানের আলোচনা হইতেছে তেমনি সঙ্গীত, কীর্ত্তন, ভাগবত ইত্যাদি শাস্ত্র পাঠে ভক্তির আলোচনাও হইতেছে এবং লোক-সেবার জন্য উক্ত প্রকার বিবিধ আয়োজন করিয়া কর্ম্ম বা সেবারও চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রকাশ পাইতেছে। অধিক আর কি লিখিব, এখানে আসিলে শরীর ও আত্মার উভয়েরই ক্ষুধা তৃপ্তি হয় এবং জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সুন্দর আদর্শ স্থান দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

কাশীর মহাত্মা ভাস্করানন্দ।

অমৃতসর হইতে হরিদ্বার যাই। হরিদ্বারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিষয় আর কি লিখিব, তাহা না দেখিলে ধারণা করা যায় না। এখানে আসিয়া আমার শরীর বড় অসুস্থ হওয়ায় সাধুদিগের সহিত মিশিতে পারি নাই, সুতরাং পাঠকদিগের উপযোগী এখানকার কোন বিশেষ বিবরণ লিখিতে পারিলাম না। পরে হরিদ্বার হইতে কাশী আসি। আমি ইহার পূর্ব্বে আর একবার কাশী আসিয়া স্থানীয় বিশ্বেশ্বরের মন্দিরাদি দেখিয়াছিলাম সুতরাং এবার তাহার কিছুই দেখিবার আগ্রহ ছিল না। কেবল মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামীকে দেখিবার জন্যই এবারে এখানে আসিয়াছি সুতরাং বরাবর তাঁহার নিকট যাইলাম। তিনি কাশীর এক প্রান্তে দুর্গাবাড়ীর নিকট আনন্দ বাগ নামক একটী সুন্দর বাগানে

থাকেন। ইহা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় ৪ মাইল হইবে। স্থানটী বেশ নির্জ্জন ও মনোরম। আমি বাগানের দরজা খুলিয়া বরাবর তাঁহার নিকট যাইয়া দেখিলাম তিনি দিগম্বর বেশে সামান্য একখানা মাদুরের উপর বসিয়া গীতার সহিত অন্য একখানা হস্তলিখিত পুঁথি মিলাইতেছেন। আমি যাইবামাত্র তিনি আমার দিকে চাহিয়া আমাকে নিকটে ডাকিয়া বসাইলেন এবং আমার হাতের উপর নিজের হাত দিয়া অতি সপ্রেমে হিন্দি ভাষায় নানা প্রকার কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। পরে আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত জানিতে পারিয়া বলিলেন যে "আজ যাইয়া বিশ্রাম কর, কল্য খুব প্রাতে আসিবে সেই সময়ে উভয়ে বিশেষ ভাবে আলাপ করিব।" তাহার পরেই বাঙ্গালা ভাষায় রচিত তাঁহার একখানি জীবন চরিত আনিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন যে, "আমার জীবন চরিত একজন লিখিয়াছেন তুমি ইহা দেখ। আমি তাহা লইয়া বিশ্রাম জন্য তথা হইতে অন্য এক স্থানে যাইয়া বিশ্রাম ও আহারাদি করিলাম।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া তাঁহার নিকট যাইলাম। তিনি আদর করিয়া আমাকে নিকটে লইয়া বসাইলেন ও আমাকে নানা প্রকার প্রশংসা করিয়া আমাকে বাড়াইতে লাগিলেন। তদপরে নানা প্রকার ধর্ম্মালোচনা হইতে লাগিল। এমন সময় একজন লোক পঞ্চপ্রদীপ, কতকগুলি ফুলের মালা ও ফুল এবং খানিকটা মাথম হস্তে করিয়া আমাদের নিকট আসিল। স্বামীজী তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার হাতের মালাগুলি লইয়া আমার গলায় পরাইয়া দিয়া—"তুমি আজ আমার উপাস্য" বলিয়া আমাকে সেই মাথম সমস্তই খাইতে দিলেন। আমি বিনীতভাবে তাঁহার প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে করিতে তাঁহার দ্বারা বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া মাথম খাইতে লাগিলাম। পরে সে ব্যক্তি তাঁহাকে আরতী করিয়া চলিয়া গেল। তাঁহার সহিত যে সমস্ত আলাপ হয় তাহার কোন কোন বিষয়ের সারমর্ম্ম লিখিতেছি। বলা বাহুল্য যে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া তাঁহার নিকট পরিচয় দিয়াছিলাম। তিনি ব্রাহ্মসমাজের কাহাকেও কাহাকেও জানেন এবং ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের অনেক সংবাদ রাখেন।

১ম। জগৎ কি? এই বিষয় জিজ্ঞাসায় তিনি বলিলেন—জগৎ মায়া। আমি তাঁহার কথার প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ না করিয়া বলিলাম যে "আমার কাছে জগৎ ঈশ্বরের লীলাক্ষেত্র বলিয়া বোধ হয়।" তিনি বলিলেন "মায়া ও লীলা একই বাত হায়।"

২য়। গুরুর কথা জিজ্ঞাসায় বলিলেন যে আমি কাণে মন্ত্র দেওয়া গুরু মানিনা। যিনি শিক্ষা দেন তিনিই গুরু, দত্তাত্রেয়ের ২৪ জন গুরু ছিলেন।

৩য়। ইহাঁকে অনেক লোকে গভীর শ্রদ্ধা করেন ও দেবতার মত মান্য করেন। সেই জন্য কাশীতে ৪।৫ স্থানে ইহার শ্বেত প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া রীতিমত পূজাদি হইতেছে। বড়হর নগরের রাণী প্রায় ১ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া এক মন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাহার এক প্রকোষ্ঠে ইহাঁর এক প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেখানে পূজা ভোগ ইত্যাদি দ্বারা অন্যান্য দেবতার ন্যায় ইহাঁরও পূজাদি হইতেছে। আমি এই সমস্ত শুনিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে "লোকে আপনার প্রতিমূর্ত্তি এইরূপে পূজাদি করিতেছে আপনি ইহাতে কি মনে করেন?" প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন "লোক সমস্ত অজ্ঞান কিছুই বোঝে না; এই দেহ,—ইহাই দুদিন বাদে থাকিবে না, ইহার আবার প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজাদি করিতেছে। এসব অজ্ঞানতার কাণ্ড। তবে আমি ইহা কাহাকে করিতেও বলি না এবং বারণও করিনা, তাহাদের যাহা অভিরুচি তাহাই করিতেছে; ইত্যাদি।"

এইরূপ নানা প্রকার ধর্ম্মালোচনা হইল। তিনি "স্বারাজ্য সিদ্ধিঃ" নামক বেদান্ত সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন এবং তাহা অতি সুন্দর করিয়া পুস্তকাকারে তাঁহার শিষ্য একজন ছাপাইয়া দিয়াছেন। ভাস্করানন্দজী স্বয়ং আমাকে সেই গ্রন্থ একখানি উপহার দিলেন এবং আমি অনুরোধ করায় তাহাতে তিনি নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। স্বামীজীর বয়স প্রায় ৬০ বৎসর হইবে, একহারা চেহারা, দাঁতনাই, মস্তক মুণ্ডন, উলঙ্গবেশ, দেখিতে গৌরবর্ণ। স্বভাব অতি সুন্দর, বালকের মত ভাব, সরল, প্রেমিক, বিদ্বান ও জ্ঞানী। তাঁহার নিকট আমাদের অনেক শিখিবার জিনিষ আছে। তিনি আমাকে আরও ২।১ দিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন কিন্তু আমার শীঘ্র আসিবার প্রয়োজন থাকায় তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই।

সারনাথ।

স্বামীজীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া সারনাথ দেখিবার জন্য চলিলাম। কাশীর বাজারে আসিয়া এক্কা করিয়া সারনাথ যাইলাম। কাশী সহর হইতে সারনাথ ৪৫ মাইল হইবে। এই সারনাথে মহাত্মা বুদ্ধ ১ম পঞ্চ শিষ্যকে নিজধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তিনি যে স্থানে পঞ্চ শিষ্যকে বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ দেন সেই স্থানে একটী উচ্চ ও প্রশস্ত প্রকাণ্ড থাম রহিয়াছে। মহারাজ অশোক এই থামের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া শুনিয়াছি। স্থানীয় লোকেরা ইহার কিছুই খবর জানে না। স্থানীয় লোকদিগকে "ইহার নাম কি" এই কথা জিজ্ঞাসায় তাহারা বলিল যে ইহার নাম "লরিকৃকা ধামেক।" যাহা হউক তাহা দেখিয়া অদূরে আর একটী উচ্চ স্থানের উপর একখানি কুটীর রহিয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য তথায় যাইলাম, কিন্তু তাহা যে কি তাহার কিছুই বুঝিলাম না। স্থানীয় লোকে বলে ইহার নাম "সীতাকারসুন।" পরে সার নাথ হইতে ষ্টেসনে আসিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রাদ্ধ—খালোড় নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিত্রের মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ গত ২৯শে বৈশাখ উক্ত গ্রামে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কতিপয় ব্রাহ্মভ্রাতা তথায় গমন করেন।

শ্রাদ্ধ-বাসরে মহেন্দ্র বাবু উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করেন। যাত্রীগণ যে কয়দিন সেখানে ছিলেন, প্রতিদিন সমাজ গৃহে সমবেত উপাসনা করিয়াছেন। এক দিন প্রাতে বাড়ী বাড়ী সংকীর্ত্তন করেন, এবং এক দিন কালী বাড়ী নামক প্রকাশ্য স্থানে সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা, আর এক দিন বাজারে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা করেন। তৎপর ইহাঁরা কলিকাতা প্রতিগমন করেন। মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে রাম বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা এবং সাধনাশ্রমে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। পরমেশ্বর পরলোকগত আত্মাকে শান্তি দান করুন।

পরলোকগত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু কালীচরণ ঘোষের আদ্যশ্রাদ্ধ তৎপুত্র যদুনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক গত ১৮ই মে তারিখ কলিকাতা নগরীতে সম্পাদিত হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কালীচরণ বাবুর জীবনচরিত বলেন। যদু বাবু এতদুপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের নানা বিভাগে দুই শত টাকা দান করিয়াছেন। পরলোক গত আত্মাকে পরমেশ্বর শান্তি দান করুন।

আমাদের প্রেমাস্পদ বন্ধু শ্রীমান সত্যরঞ্জন খাস্তগিরির সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কুসুমকুমারীর শ্রাদ্ধ গত ২৩শে মে তারিখে তাঁহার কার্য্যস্থান সাহাবাদ জেলার দানোয়ার গ্রামে ব্রাহ্মপদ্ধতিতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনাদির কার্য্য করেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারী সরকার মহাশয় কুসুমকুমারীর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত পাঠ করেন। হিন্দু গৃহে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। স্বামীর সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য সর্ব্বদাই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ঈশ্বর তাঁহার স্নেহের কন্যাকে শান্তি ক্রোড়ে রক্ষা করুন। একটী মাত্র শিশু কন্যা রাখিয়া কুসুম অতি অল্প বয়সেই পরলোক গমন করিয়াছেন, প্রেমাস্পদ সত্যরঞ্জনকে পরমেশ্বর এই কঠিন শোকের সময় সান্ত্বনা দিন। সত্যরঞ্জন স্ত্রীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গরিব দুঃখীকে ও ব্রাহ্মসমাজকে ১৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

প্রচার—শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল কোটালী পাড়ায় দুর্ভিক্ষের সাহায্য কার্য্যে থাকিয়া সময় সময় বক্তৃতা, আলোচনা ও উপাসনা সংগীত ইত্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনি উনিশা আর্য্য বিদ্যালয়ে হিন্দু শাস্ত্র ও হিন্দু নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই আর্য্য বিদ্যালয়ে হিন্দু খ্রীষ্টান সকল জাতীয় ছাত্রদিগকেই সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয়। এরূপ সার্ব্বজনিক ভাবে সংস্কৃত শিক্ষার প্রণালী, এদেশে এক নূতন ব্যাপার। জাতিভেদের প্রকোপ দিন দিনই শিথিল হইতেছে।

সাধনাশ্রমের সংবাদ—কলিকাতা সাধনাশ্রম হইতে সম্প্রতি এক প্রচার যাত্রীদল রামপুর, নলহাটি পুর্ণিয়া হইয়া উত্তর বঙ্গে যাইতেছেন। এই প্রচার দলে শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু হরিমোহন ঘোষাল এবং বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ আছেন। কোটালী পাড়া অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য সাঃ ব্রাঃ সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল তথায় প্রেরিত হন। তিনি প্রায় এক মাস কাল সেখানে প্রতিদিন চাউল বিতরণ করিয়াছেন। এবং কলিকাতা ও ফরিদপুরের ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তৃক সংগৃহীত নূতন ও পুরাতন বস্ত্র বিতরণ করেন। ইতিমধ্যে ডিঃ বোর্ড এবং ফরিদপুর সুহৃদ সভা ও খ্রীষ্টান সমাজ হইতে সাহায্য আরম্ভ হওয়ায় কাশী বাবু ব্রাহ্মসমাজের সাহায্য বন্ধ করিয়া কলিকাতা প্রত্যাগত হইয়াছেন।

আরাতে এখন নিম্নলিখিত পরিচারক ও সংকল্পাধীন পরিচারকগণ আছেন। শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সুন্দর সিং, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শ্রীরঙ্গ বিহারী বি, এ, এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ। শ্রীযুক্ত সুন্দর সিং পীড়িত আছেন। গুরুদাস বাবু প্রচারার্থে দানাপুর ও বাঁকিপুর মোকামা গিয়াছিলেন। আরা আশ্রমে প্রতিদিন প্রাতঃকালে উপাসনা ও বিকালে আলোচনা হয়। শনিবার সায়ংকালে স্থানীয় কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে উপাসনা হয়। রবিবার সকালে বিকালে আশ্রমে বাঙ্গলা ও হিন্দিতে উপাসনা হয়। স্কুল বন্ধের পূর্ব্বে বক্তৃতা হইত। শ্রীযুক্ত শ্রীরঙ্গ বিহারী লাল শাস্ত্রী মহাশয়ের "ধর্ম্ম কি?" নামক বক্তৃতা হিন্দিতে ও শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধর্ম্মভাব" উর্দ্দুতে অনুবাদ করিতেছেন।

দান—শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী তাঁহার স্বর্গীয়া কন্যা অপরাজিতার জন্ম দিনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে ১৲ দাতব্য বিভাগে ১৲ এবং সাধনাশ্রমে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা দাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমাদের ঢাকার ব্রাহ্মবন্ধু বাবু অযোধ্যানাথ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ১৲ টাকা এবং সাধনাশ্রমে ১৲ টাকা দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

বগুড়াস্থ বন্ধু বাবু যাদবচন্দ্র পাল তাঁহার পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ৷৷০ আনা দান করিয়াছেন। এবং অন্যতম বন্ধু ডাক্তার কামিনীকুমার ঘোষ প্রচার ফণ্ডে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বগুরাস্থ ব্রাহ্মভ্রাতাগণ সাধনাশ্রমে ১১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

উৎসব—হাজারিবাগ ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবের নিম্নলিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ১১ই এপ্রিল হইতে ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত হাজারিবাগ ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাবু শশীভূষণ বসু এই উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করেন। তিনিই প্রায় উৎসবের সকল

কার্য্য সম্পন্ন করেন। উৎসবের কার্য্য ব্যতীত তিনি ২১শে এপ্রিল কেশব হলে নৈতিক বিদ্যালয়ের উৎসব উপলক্ষে "নীতি শিক্ষার আবশ্যকতা" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। এই সভায় রায় যদুনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ২৮শে এপ্রিল উক্ত হলে "আমাদের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নতি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ২রা মে ছাত্রেরা স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মরণার্থ এক সভা করেন, তাহাতে শশী বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বঙ্কিম বাবুর জীবন হইতে কি শিক্ষা লাভ করা যায় তদ্বিষয়ে কিছু বলেন। এই সভাটী কেশব হলে হইয়াছিল। ৬ই মে শশী বাবু উক্ত হলে ধর্ম্মবীর সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। ইহা ব্যতীত কোন কোন ভদ্র পরিবারে উপাসনা ও উপদেশ দান করেন, এবং ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের সহিত ধর্ম্মালাপ ও প্রার্থনাদি করেন। এবং তথায় অবস্থান কালীন সাপ্তাহিক উপাসনা সম্পন্ন করেন।

চট্টগ্রাম—বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছিলেন। কার্য্যানুরোধে তাঁহাকে প্রায় চারি সপ্তাহ তথায় থাকিতে হইয়াছিল। সমাজ মন্দির না থাকায় উৎসবের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে নাই। এজন্য বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী বন্ধুবান্ধবদিগকে একত্রিত করিয়া সভা করিয়া কিরূপে একটী মন্দির শীঘ্র নির্ম্মিত হইতে পারে তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া তথায় মন্দির নির্ম্মাণের জন্য চেষ্টা হইতেছে এবং তজ্জন্য কিছু অর্থও সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত স্থানের অভাবে মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। এবারে অনেক চেষ্টাতে পরমেশ্বরের কৃপায় সহরের মধ্যস্থলে একটী স্থান পাওয়া গিয়াছে। নদিয়ার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় মন্দির নির্ম্মাণের জন্য একখণ্ড ভূমি প্রদান করিয়াছেন। উক্ত স্থানে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। নীলমণি বাবুর অধিকাংশ সময় এই কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত তিনি নিম্নলিখিত কার্য্য সকল করিয়াছেন।

৬ই বৈশাখ বুধবার—চট্টগ্রাম হাই স্কুলগৃহে "জীবন্ত ধর্ম্ম" বিষয়ে সাধারণের জন্য বক্তৃতা। ৯ই শনিবার ন্যাসান্যাল ইনষ্টিটিউসন গৃহে "জীবনের ভিত্তি" বিষয়ে ছাত্রদিগের জন্য বক্তৃতা।

১৩ই বুধবার—চট্টগ্রাম অইল ও কটন মিল্‌স্ কোম্পানির তৈলের কল প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্মোপাসনাদি করিয়া খোলা হয়।

১৭ই রবিবার—মিঃ ডি, এন, মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যার শুভ নামকরণ কার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে সম্পন্ন হয়। শিশুর নাম কুসুমিকা রাখা হইয়াছে।

২৪এ রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন। প্রথমতঃ ব্রাহ্মগণ এবং অন্যান্য ভদ্রলোক সকলে স্থানীয় উকীল বাবু যাত্রামোহন সেন মহাশয়ের বাড়ীতে একত্রিত হইলে বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটী সঙ্গীত করিয়া প্রার্থনা করেন। তৎপরে সকলে মিলিয়া তথা হইতে কীর্ত্তন করিতে করিতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করেন। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী সংক্ষিপ্ত ব্রহ্মোপাসনা ও প্রার্থনার পর মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তৎপরে ভিত্তি স্থাপন পত্রিকা পাঠ করেন। তাহাতে ভিত্তি স্থাপনের তারিখ, ব্রহ্মমন্দিরের উদ্দেশ্য, ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমত এবং ব্রহ্মমন্দিরের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নিয়মাবলী লিখিত ছিল। ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকার সহিত ঐ পত্রিকা একত্রে এক বোতলে আবদ্ধ করিয়া ভিত্তির মধ্যে প্রোথিত করা হয়। পরে বাবু হরিশ্চন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রার্থনা করেন এবং মিঃ ডি, এন, মুখোপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতা করেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার সারমর্ম্ম এইরূপ;—"এইমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের যে সকল মূলমত পঠিত হইল, তদ্দ্বারা দেখা যায় যে, আদি ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান সমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এতদ্‌সম্বন্ধে কোনও মতভেদ হইতে পারে না। মতভেদ কেবল বিশেষ বিশেষ মত লইয়া। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় আমাদের সকলের বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। তাঁহার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ যে বিশেষ উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার এরূপ কতকগুলি মত ছিল, ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বাস করিতে গিয়া যাহা না মানিলেও চলে এবং যাহার সত্যতা এবং আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোনও নিসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এই সকল মত আমরা না মানিতেও পারি। নববিধান বাদীদিগের মধ্যে এরূপ লোক আছেন, যাঁহাদিগকে আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। আমরা সকলে ভাই ভাই হইলেও তাঁহাদের সহিত এক গৃহে আমরা স্থান পাইলাম না, আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র যাঁহারা, তাঁহারা তাঁহাদের মন্দিরের কার্য্য করিবার অধিকার পান না। সুতরাং বাধ্য হইয়া দুঃখের সহিত আমাদিগকে এই মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইল। এখানে বলা আবশ্যক যে, মিঃ মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য স্থানীয় বন্ধুগণের এইরূপ ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল যে, নববিধান বিশ্বাসী ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মতাবলম্বী স্থানীয় ব্রাহ্মগণ একত্রে এক সমাজে উপাসনাদি কার্য্য করেন। কিন্তু নববিধানবাদী ভ্রাতাগণ ব্রাহ্মসমাজের মতাবলম্বী কোনও ব্রাহ্মকে আপনাদের মন্দিরে উপাসনাদি করিতে দিতে প্রস্তুত হইলেন না বলিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণের আয়োজন হইয়াছে।" মিঃ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতার পর নীলমণি বাবু সময়োচিত ভাবে কিছু বলেন এবং প্রার্থনা করিয়া কার্য্য শেষ করেন।

এতদ্ব্যতীত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী কয়েকদিন ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা ও উপদেশ প্রদান এবং বন্ধু বান্ধবদের গৃহে উপাসনা প্রার্থনা এবং কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন।

চারিটী জেলা লইয়া চট্টগ্রাম বিভাগ গঠিত হইয়াছে। তাহার কেন্দ্র চট্টগ্রাম সহর। এই সহরে চারিটী এণ্ট্রান্স স্কুল, একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ এবং একটী নর্ম্মাল স্কুল আছে। এখানে অনেক ভদ্রলোকের বাস। এই জন্য এই স্থান ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের অনুকূল ক্ষেত্র। একজন প্রচারক এই স্থানকে কেন্দ্র করিয়া এই প্রদেশে প্রচারক্ষেত্র খুলিলে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এবং কুমিল্লা জেলাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের অনেক সুবিধা

হইতে পারে। চট্টগ্রামে কয়েকজন উৎসাহী ব্রাহ্ম আছেন। তাঁহারা নানাভাবে প্রচারককে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। এক জন উৎসাহী যুবক অধিক বেতনের চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য অল্প বেতনের কার্য্যে তথায় আসিয়াছেন।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—"ভক্ত-চরিতামৃত" এবং "রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবন-চরিত।" দুইখানি পুস্তকই শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ১৭ নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট, মণিকা প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ॥৵০ ও ৵০ আনা। ভক্ত-চরিতামৃত গ্রন্থে রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীর জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে। অঘোর বাবু দিন দিনই সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত হইতেছেন। আমরা পুস্তক দুইখানি পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার বিবিধ বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ সংগ্রহ করিয়া পুস্তক দুইখানিকে অধিকতর মূল্যবান করিয়াছেন। ভাষা বিশুদ্ধ ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তিগণ এরূপ গ্রন্থ আদরের সহিত পাঠ করিবেন সন্দেহ নাই।

"ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও মানবাত্মার স্বাধীনতা এবং এতদুভয়ের সামঞ্জস্য" শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন-প্রণীত। কলিকাতা ২১০।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বাগ প্রেসে শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে লেখক "সত্যদর্শী" ও "তত্ত্বান্বেষী" নামক কল্পিত গুরু শিষ্যের কথোপকথনের আকারে উপরোক্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে সৃষ্টি, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শুকবাদ, মধ্যবর্ত্তীবাদ, অবতারবাদ, পাপ-পুণ্য, মানবাত্মার উন্নতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। লেখক পুস্তকে যে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতিশয় প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁহার রচনা ও যুক্তি-প্রণালী কিছুই পরিপক্কতা লাভ করে নাই সুতরাং আলোচিত বিষয় সমূহের ব্যাখ্যা ও সমাধান সন্তোষকর হয় নাই। আমাদের বিবেচনায় এরূপ ক্ষুদ্র পুস্তকে এত বহু-সংখ্যক বিষয়ের অবতারণা না করিলে মূল আলোচনা সরল ও স্পষ্টতর হইত। যাহা হউক এই সকল আনুষঙ্গিক বিষয়ে বলিতে গিয়া লেখক স্থানে স্থানে অনেক উচ্চ সত্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপাঠে পাঠক উপকৃত হইতে পারেন।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার—কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নিম্নলিখিত মহোদয় ও মহোদয়াগণ এককালীন মাসিক, বার্ষিক ও অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে ১৮৯৩ সালের জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য বিভাগে অর্থ দান করিয়াছেন :—

একটী মহিলা মাং বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস ১৲, শ্রীমতী বসন্তকুমারী বসু, কলিকাতা ১॥০, একটী ব্রাহ্ম, কলিকাতা ২৫৲, বাবু চণ্ডীচরণ গুহ, বরিশাল ১৲, বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লাহোর ৫৮০, বাবু মতিলাল চৌধুরী কলিকাতা ৪৲, বাবু কালীনারায়ণ সেন বিক্রমপুর ১৲, মুন্সি এমাজুদ্দিন কলিকাতা ৪৲, বাবু বিপিনবিহারি দত্ত ঐ ১৲, বাবু বিহারীলাল মল্লিক ঐ ১৲, বাবু কেদারনাথ মিত্র ঐ ৩৲, বাবু কৈলাশচন্দ্র সাহা ঐ ॥০, বাবু যদুনাথ ঘোষ ঐ ৩৲, বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ ঐ ৩৲, বাবু গোপালচাঁদ বসু ঐ ১১৲, রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর ঐ ১২৲, বাবু কেদারনাথ ঘোষ ঐ ২৲, মহারাজা মহীশূর মাং ডাঃ পি, কে রায়, ১০০৲ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কলিকাতা ২৲, বাবু ভুবনমোহন ঘোষ ঐ ১॥০, বাবু সত্যরঞ্জন খাস্তগির ১৲, বাবু বাণীকান্ত রায় চৌধুরী কলিকাতা ১৲, বাবু শরচ্চন্দ্র মজুমদার মাং বাবু মধুসূদন সেন ১৲, বাবু ক্ষেত্রমোহন চন্দ্র কলিকাতা ১৲, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ঐ ॥০, বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ ॥০, বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক কলিকাতা ১৲, বাবু রাখালচন্দ্র সেন ঐ ১৲, বাবু নন্দলাল সেন ঐ ২৲, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাকিনীয়া ২৲, বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু, কলিকাতা ৩৲, শ্রীমতী জয়কালী গুপ্ত ১৲, বাবু প্রসাদদাস মল্লিক কলিকাতা ৫০৲, বাবু শরচ্চন্দ্র সিংহ বর্ম্মা ১৲, বাবু দীননাথ গাঙ্গুলী বারওয়ার ৫৲, বাবু কান্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঢক্কার ২৲, বাবু অভয়চরণ মল্লিক কলিকাতা ১৯৲, রায় বিপিনকৃষ্ণ বসু বাহাদুর নাগপুর ১০৲, বাবু রজনীকান্ত তপাদার পিরোজপুর ১৲, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা কুমারখালী ৪॥০, শ্রীমতী ক্ষেমদাসুন্দরী মিত্র কলিকাতা ৫৲, বাবু দুর্গাচরণ বিশ্বাস কুষ্টিয়া ১৲, বাবু নন্দকুমার চৌধুরি কলিকাতা ২৲, শ্রীরঙ্গবিহারী লাল ঐ ২৲, বাবু বেচারাম মল্লিক ঐ ॥০, বাবু কালীনারায়ণ রায় দিঘাপতিয়া ১৩৲, ডাঃ হরনাথ ঘোষ করটীয়া ২৲, বাবু প্রসন্নকুমার কুণ্ডু কলিকাতা ২৲, শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দাস পূর্ণিয়া ১০৲, বাবু কালীকৃষ্ণ বসাক কলিকাতা ১॥০, বাবু শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী লক্ষ্ণৌ ১৲ বাবু অভয়াচরণ বসু মেদিনীপুর ১৲, বাবু কানাইলাল সাহা দিল্লি ॥০, বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র কলিকাতা ১৲, শ্রীমতী সুশীলা মজুমদার নওগাঁ ১৲, বাবু শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বরাহনগর ৫৲, বাবু অনাথবন্ধু রায় কাকিনীয়া ২৲, বাবু গৌরলাল রায় ঐ ৩৲, বাবু বিপিনবিহারী রায় মাণিকদহ ১০৲, বাবু রামচন্দ্র মজুমদার নওগাঁ ৩৲, বাবু জানকীনাথ চট্টোপাধ্যায় বিক্রমপুর ১৲, বাবু দুর্গামোহন দাস কলিকাতা ৯৲, বাবু কুঞ্জবিহারী সেন ঐ ৵০। মোট ৩৬৭।৵০।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু রবিমোহন ঘোষাল ও বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে মফঃস্বল গমন করিয়াছেন। তাঁহারা তত্ত্ব-কৌমুদী, ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের মূল্য গ্রহণ করিবেন ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের চাঁদা আদায় এবং সাধনাশ্রমের জন্য ভিক্ষা করিবেন। সাধারণের সহায্য প্রার্থনীয়।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।
সাধনাশ্রমের তত্ত্বাবধারক।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১৬ই জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

৫ম সংখ্যা। ১৭শ ভাগ।	১লা আষাঢ় বৃহস্পতিবার, ১৮১৬ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫।	সাংবৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বলে ৩ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে প্রভো! জগতের মৃতপ্রায় আধ্যাত্মিক দেহে নবজীবন দিবার জন্য তোমার সত্য ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে। যে কেহ ইহাকে বিশ্বাসের সহিত ধারণ করিবেন ও দৃঢ়তার সহিত সাধন করিবেন, তিনিই নবজীবন পাইবেন ও অপরকে নবজীবন দিতে পারিবেন। আমরা এমন মহৎ বস্তু পাইয়াও ইহাকে বালকের ক্রীড়ার ন্যায় ব্যবহার করিতেছি। ইহার সাধনে আপনাদের দেহ মনকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করিতে পারিতেছি না। তুমি আমাদিগকে সেই শক্তি দেও, যাহাতে আমরা ইহার সাধনে দৃঢ় হইতে পারি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ব্রাহ্মণত্বের মূল কথা—প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণদিগের এই নিয়ম ছিল যে, তাঁহারা কোনও প্রকার বিষয় কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিতেন না; অর্থোপার্জ্জনের কোনও প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে পারিতেন না। এমন কি তাঁহারা যে সকল ছাত্রকে বিদ্যাদান করিতেন, তাহাদিগের নিকট কোনও প্রকার ভৃতি লইতে পারিতেন না। মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ ত বেতন ভোগী অধ্যাপক ব্রাহ্মণদিগের অনেক নিন্দা করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগকে কঠিন সামাজিক শাস্তি দিবার আদেশ করিয়াছেন। একদিকে ব্রাহ্মণগণের প্রতি যেরূপ কঠোর শাসন ছিল, অপরদিকে ধনী ও বিষয়ীদিগের প্রতি এই আদেশ ছিল যে, তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের ভরণপোষণের ভার বহন করিবেন। তদনুসারে ধনিগণ ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বদা দান করিতেন। তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের সাংসারিক প্রয়োজন সকল এক প্রকার নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু পরমুখাপেক্ষী হওয়াতে ব্রাহ্মণগণ এক চির দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিতেন। ধনবান ব্রাহ্মণের বিবরণ প্রাচীন ইতিবৃত্তে প্রায় দৃষ্টি গোচর হয় না। অপর দিকে ব্রাহ্মণগণ দরিদ্রতার মধ্যে বাস করিয়াও মহৎকার্য্য সাধন করিতেন। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এই সকল প্রধানতঃ তাঁহাদের কার্য্য ছিল। বিদ্যার অনুশীলন ও বিদ্যাদান এই উভয় কার্য্যে প্রধানতঃ নিযুক্ত থাকাতে তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানালোচনা সর্ব্বদা চলিত এবং ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণয়ন ও ব্যাখ্যা কার্য্যে সর্ব্বদা রত থাকাতে আধ্যাত্মিক বিষয়ের অনুশীলন সর্ব্বদাই হইত। এইরূপে সমাজ মধ্যে এক শ্রেণীর লোক জ্ঞানানুশীলনে সর্ব্বদা রত থাকিলে যে, সে সমাজ মধ্যে জ্ঞানের গৌরব রক্ষিত হয় তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এতদ্দ্বারা ভারতে অতি উৎকৃষ্ট ফলই ফলিয়াছে। তবে ইহা স্বীকার্য্য, ব্রাহ্মণত্ব জন্মগত না হইলে, এবং জ্ঞানালোচনা হইতে অপর বর্ণদিগকে নির্ব্বাসিত না করিলে আরও উৎকৃষ্ট ফল দর্শিতে পারিত। এই দুইটী আনুষঙ্গিক নিয়ম থাকাতে ভারতীয় জাতিভেদ প্রথা অতি জঘন্য আকার ধারণ করিয়াছে, দূষিত ও পূতিগন্ধময় হইয়াছে। কিন্তু মূল নিয়মটী যে উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজের সকল লোককেই যদি উদরান্নের জন্য বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে হয়, এবং কেহই যদি অনন্যকর্ম্মা হইয়া অভিনিবেশ সহকারে জ্ঞানালোচনা ও ধর্ম্ম চিন্তাতে নিযুক্ত হইতে না পাবে তাহা হইলে ত্বরায় সে সমাজের মানসিক ও আধ্যাত্মিক দুর্গতি উপস্থিত হয়। জগতে সাহিত্য বা বিজ্ঞান সম্বন্ধে যত কিছু আশ্চর্য্য কীর্ত্তি সাধিত হইতেছে, তাহা অনন্যকর্ম্মা লোকদিগের দ্বারাই সাধিত হইতেছে। যদি হার্ব্বার্ট স্পেনসারকে বা ডারউইন বা অন্যান্য কৃতিমানদিগকে উদরান্নের জন্য ধা ধা করিয়া বেড়াইতে হইত, তাহা হইলে কি ইংলণ্ডের এত উন্নতি হইতে পারিত? আমাদের দেশে অনন্যকর্ম্মা হইয়া জ্ঞানোন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইবার লোক নাই বলিয়াই জ্ঞানের তাদৃশ উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে না। যাঁহার কিঞ্চিৎ প্রতিভা আছে, তাঁহাকে উদরান্নের চিন্তায় ধা ধা করিয়া বেড়াইতে হইতেছে। মানুষ দুই প্রকারে অনন্যকর্ম্মা হইতে পারে, প্রথম কেহ কেহ পৈতৃক বিষয়ের অধিকারী হইয়া গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইয়া অনন্যকর্ম্মা হইতে পারেন; কেহ কেহ বা রাজার বা সমাজের সাহায্যে অনন্যকর্ম্মা হইতে পারেন। সভ্য দেশে রাজারা জ্ঞানীদিগকে অনন্যকর্ম্মা করিবার জন্য পেনসন দিয়া থাকেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যদি পেনসনের বন্দোবস্ত করিয়া প্রোফেসার মোক্ষ-মূলারকে অনন্যকর্ম্মা করিয়া না দিতেন তাহা হইলে কি তিনি জ্ঞানের যে আশ্চর্য্য উন্নতি করিয়াছেন, তাহা করিতে পারিতেন? যেখানে রাজা

উৎসাহদাতা নহে, সেখানে সমাজের উৎসাহদাতা হওয়া আবশ্যক, তদ্ভিন্ন আশানুরূপ উন্নতি হইতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজেরও এক শ্রেণী লোকের প্রয়োজন, যাঁহারা অনন্যকর্ম্মা হইয়া ইহার আধ্যাত্মিকতাকে রক্ষা ও পরিশোধন করিবেন। তদ্ভিন্ন এ সমাজের আধ্যাত্মিকতা ত্বরায় ম্লান হইয়া যাইবে।

ব্রাহ্মসমাজ আদর্শ কৃষিক্ষেত্র—আর এক দিয়া দেখিতে গেলেও এইরূপ একদল অনন্যকর্ম্মা সাধকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়। মান্দ্রাজ সহরে একটী কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে ছাত্রদিগকে সমবেত করিয়া কৃষিতত্ত্ব বিষয়ে গ্রন্থাদি পড়ান হইত ও উপদেশ দেওয়া হইত। কিন্তু মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট যখন ঐ কৃষি-বিদ্যালয়টী স্থাপন করিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই একটী "মডেল ফারম" আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিলেন। বিদ্যালয়ে গ্রন্থে ও উপদেশে যাহা শিক্ষা দেওয়া হইত, কৃষিক্ষেত্রে তাহা হাতে কলমে করিয়া দেখান হইত। ঐ কৃষিক্ষেত্রটী না থাকিলে বিদ্যালয়ের উপদেশ আশানুরূপ সুফল প্রসব করিতে পারিত না। নিবিষ্ট চিত্তে একটু চিন্তা করিলেই ইহা অনুভব করিতে পারা যাইবে যে, সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ যেন ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী কৃষিক্ষেত্র। গ্রন্থে ও উপদেশে আমরা যে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিখাইতেছি, এই ব্রাহ্মসমাজরূপ কৃষিক্ষেত্রে হাতে কলমে তাহা করিয়া দেখাইতেছি। এই দৃষ্টান্তটীর তাৎপর্য্য হৃদয়ে অনুভব করিলেই এই প্রশ্ন আমাদের মনে স্বতঃই উদিত হয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম যে উচ্চ আদর্শ আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজরূপ কৃষিক্ষেত্রে কি আমরা তাহা হাতে কলমে করিয়া দেখাইতে পারিতেছি? ব্রাহ্মসমাজ কি ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ উপদেশের অনুরূপ হইতেছে? এ প্রশ্নের বিচার এখন পরিত্যাগ করিয়া আর একটী বিষয়ের বিচারে মনোনিবেশ করা যাউক। সেটী এই—ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মধর্ম্মকে সাধন করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সেই সাধনশক্তিকে ঘনীভূত ও বর্দ্ধিত করিবার জন্য একদল অনন্যকর্ম্মা ও সাধনপরায়ণ লোকের প্রয়োজন। সকলেই যদি বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে, সকলেই যদি ধাধা করিয়া অর্থের চিন্তায় ঘুরিয়া বেড়ায় তাহা হইলে ইহার সাধনশক্তিকে ঘনীভূত ও বর্দ্ধিত করিবে কে? এরূপ একদল লোকের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করিবেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মে দুই দিক—সকল বস্তুর ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মেরও দুই দিক আছে। এক দিক দিয়া দেখিলে অপরাপর ধর্ম্মের সহিত ইহার প্রভেদ কোথায় তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। অপর ধর্ম্মে মধ্যবর্ত্তী মানে, ব্রাহ্মধর্ম্ম মানে না; অপর ধর্ম্মে অভ্রান্ত শাস্ত্র বা গুরু স্বীকার করে, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা করে না; ইত্যাদি। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের আর একটা দিক আছে, তাহা মিলনের ক্ষেত্র। ব্রাহ্মধর্ম্ম দুই মহাসত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত—ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব। ইহার দুই শ্রেষ্ঠ উপদেশ—"ঈশ্বরকে, মানবকে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রীতি কর।" প্রীতিই মিলনের ক্ষেত্র। এ বিষয়ে কাহার সহিত বিরোধ সম্ভব? কোন্ ধর্ম্মে এরূপ আছে, যে বলে ঈশ্বরকে মানবকে প্রীতি করিও না। সুতরাং অকপট ঈশ্বর প্রীতি ও নর-প্রেম হৃদয়ে জন্মিলে সকল সত্যের সঙ্গে, সকল সাধুতার সঙ্গে এক প্রকার আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত হয়। ঈশ্বরের বন্ধু অনেক, অতএব অকপট ঈশ্বর-প্রেমিকেরও বন্ধু অনেক। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম মিত্রতার ধর্ম্ম। যে বিষয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধ, সে বিষয়ের সঙ্গে সকল ধর্ম্মেরই বিরোধ। অসত্য, অন্যায় ও অপবিত্রতার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধ। কোন্ ধর্ম্ম বলে অসত্য অন্যায় বা অপবিত্রতাকে পোষণ কর? তবে ব্রাহ্মগণ যাহাকে অসত্য বলিয়া মনে করেন, অপরধর্ম্মিগণ তাহাকে অসত্য না ভাবিতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলেও মূল লক্ষ্যে প্রভেদ নাই এবং অকপট সত্য-প্রীতি যেখানে, সেখানে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন হওয়াও স্বাভাবিক। আমাদের প্রেমের অল্পতা বশতঃই আমরা মিলনের এই মহাভাবকে সাধন করিতে পারিতেছি না। ঈশ্বর-প্রীতি ও মানব-প্রীতির সাধন অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধীর দিকেই আমাদের অধিক দৃষ্টি। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধীর দিকেই যাহাদের অধিক দৃষ্টি, তাহাদের কার্য্য ত্বরায় ফুরাইয়া যায়। পৌত্তলিকতা ও জাতি-ভেদ পরিত্যাগ করিলেন, অভ্রান্ত শাস্ত্র ও গুরু পরিত্যাগ করিলেন তৎপরে আর করিবেন কি? কিন্তু প্রীতির উন্নতি অনন্ত, সুতরাং প্রীতির সাধনে যাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের সাধন ও কার্য্যের অন্ত নাই। ঈশ্বর প্রীতি ও নর-প্রেমের অনুশীলনের দিকে যদি আমরা অধিক দৃষ্টি দি, তাহা হইলে আমাদের জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম অধিক গৌরবান্বিত হইতে পারে।

একতারদিকে গতি—চিকাগো মহামেলাতে যে জগতের ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের মহা সম্মিলন হইয়াছিল, তাহার ভাব এখনও তিরোহিত হয় নাই। আমেরিকা দেশের স্থানে স্থানে সমভাবাপন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকলের সমবেত সভা চলিতেছে। বিগত মে মাসের শেষ ভাগে ঐ চিকাগো নগরে উদার ভাবাপন্ন ধর্ম্মসমাজ সকলের সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। কোন্ কোন্ বিষয়ে পরস্পরের মতদ্বৈধ না হইয়া সম্মিলিতভাবে কার্য্য হইতে পারে, সকলে এই চিন্তাতে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ড দেশেও কয়েক বৎসর হইতে "সিভিল চার্চ্চ" নামে এক আন্দোলন চলিতেছে, সমুদায় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোককে জনহিতকর কার্য্যে সমবেত করা এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। সুখের বিষয় যে, উদ্যোগকর্ত্তাগণ কিয়ৎপরিমাণে উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানগণ, যাঁহারা পূর্ব্বে কখনই এক সঙ্গে মিলিয়া কার্য্য করিতে চাহিতেন না, ইঁহাদিগের উদ্যোগে সমবেত হইয়া অনেক সদনুষ্ঠান করিতেছেন। ধর্ম্ম সম্প্রদায়দিগের পক্ষে চির প্রচলিত বিবাদ-প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া মিলনের ভূমি অন্বেষণ করা একটা নূতন কথা। এই প্রবৃত্তি প্রবল হইলে জগতে এক নূতন প্রেম ও শান্তির রাজ্য স্থাপিত হইবে। যে

উদারতার অর্থ বিশ্বাসের দুর্ব্বলতা, বা সত্যানুরাগের শিথিলতা আমরা তাহার পক্ষে নহি; কিন্তু প্রত্যেকে আপন আপন ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াও যে সকল বিষয়ে সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করা সম্ভব তাহা কেন করা হইবে না? আমরা দেখিয়া প্রীত হইতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজ মধ্যেও এইরূপ সম্মিলন প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। পরস্পরের বিশেষ ভাবের অপলাপ না করিয়া যতদূর মিলন সম্ভব, তাহার দিকে ব্রাহ্মসমাজের ভিন্ন ভিন্ন শাখা সকলের দৃষ্টি পড়িতেছে।

বালক বালিকার শিক্ষা—ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের অধিনায়ক জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সুবিখ্যাত ডাক্তার মার্টিনো অতি প্রাচীন হইয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ৮৩।৮৪ বৎসর হইবে। কয়েক বৎসর হইতে তিনি সমুদায় কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া আপনার স্কট্‌লণ্ডদেশীয় নিভৃত গিরিশৃঙ্গস্থ ভবনে বাস করিতেছেন। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি সমগ্র জীবনের চিন্তা ও সাধন-লব্ধ বিষয় সকল পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া সভ্য জগতের লোককে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়াছেন। সকলে মনে করিয়াছিল, যে তিনি এ বৃদ্ধ বয়সে আর প্রকাশ্য সভাদিতে উপস্থিত হইয়া কোনও কার্য্য করিবেন না। কিন্তু বালক বালিকাদিগের ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ে ডাক্তার মার্টিনোর অতিশয় মনোযোগ। এবিষয়ের গুরুত্ব, তিনি অতিশয় অনুভব করেন। বিগত মে মাসের শেষভাগে ইউনিটেরিয়ান এসোসিএসনের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে অপরাপর কার্য্যের মধ্যে "সণ্ডে স্কুল এসোসিএসন" নামক সভারও সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়। ঐ সভাতে উপস্থিত থাকিয়া ডাক্তার মার্টিনো, বালক বালিকাদিগের ধর্ম্ম শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন।

ইংলণ্ডে বাস কালে একজন ব্রাহ্ম একবার ডাক্তার মার্টিনোর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কথোপকথনের মধ্যে ডাক্তার মার্টিনো ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"যে কারণেই হউক মানুষ আমাদের (ইউনিটেরিয়ান) মধ্যে থাকে না; আমাদের ঘরের ছেলে ত্রীত্ববাদী, রোমান কাথলিক, এমন কি পজিটিভিষ্ট ও নাস্তিক হইয়া যাইতেছে।" কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "একটা কারণ এই বোধ হয়, ইউনিটেরিয়ান পরিবারে বালকবালিকার ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হয় না। ইউনিটেরিয়ান পরিবার সকল এবিষয়ে অতিশয় উদাসীন।" ১৮৮৮ সালের জুন মাসে এই কথোপকথন হয়। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে উক্ত সভার প্রযত্নে বালকবালিকাদিগের পাঠোপযোগী অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিবৃত্ত ও উপদেশাদি সম্বন্ধে। এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া বালকবালিকা কেন আমরাও অনেক উপকার লাভ করিয়াছি। ডাক্তার মার্টিনোর কন্যা কুমারী মার্টিনো এই সকল পুস্তক আমাদের রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ প্রেরণ করিছেন। ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষার উন্নতি বিধানার্থ ইউনিটেরিয়ানগণের প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্বোক্ত সভার অনুরূপ একটী সভা আমাদিগের মধ্যে স্থাপিত হইলে ভাল হয়। অথবা রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ যদি আপনাদের কার্য্যক্ষেত্রকে বিস্তার করিয়া সাধারণ ভাবে সমুদায় ব্রাহ্ম বালক বালিকার শিক্ষার উন্নতি বিধানে যত্নশীল হন তাহা হইলেও অনেক উপকার দর্শিতে পারে। যে কার্য্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া ডাক্তার মার্টিনোর ন্যায় অশীতিপর বৃদ্ধও প্রকাশ্য সভাতে উপস্থিত হইয়া উৎসাহ দান আবশ্যক মনে করিয়াছেন, ব্রাহ্ম পরিবারগণ আর কতদিন সেই কার্য্যের গুরুত্ব বিস্মৃত হইয়া ও নিজ সমাজের ভবিষ্যতের প্রতি উদাসীন হইয়া থাকিবেন? আমরা রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয়ের মহিলাদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি; ইহা বিশেষভাবে তাঁহাদেরই কার্য্য। তাঁহারা একটু যত্নশীল হইলে এবিষয়ে অনেক কার্য্য হইতে পারে।

ক্রোধ সংবরণ—ইন্দ্রিয় নিগ্রহের কথা উপস্থিত হইলেই অনেকের চক্ষু অতি জঘন্য ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার প্রতি নিপাতিত হয়; কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনিই দেখিয়াছেন যে, কোনও বিশেষ ইন্দ্রিয়কে দমন করাই সহজ সাধ্য নহে; সকল গুলিই সমান বলবান। দমন করিতে গেলেই তাহারা শির উন্নত করিয়া উঠে, তখন তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হয়। সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল রিপুকে দমন করিতে হইলে সাধকের যতদূর বলের আবশ্যক, অন্যান্য রিপুকে দমন করিতে হইলেও সেই পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন। অথচ অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য রিপুগুলিকে স্ববশে রাখা সহজ; কিন্তু ঐ রিপুবিশেষকে বশীভূত করা বড়ই কঠিন। ক্রোধ রিপু সহজে দমন হইয়া থাকে, এ কথাও অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের জন্য গীতার একটি অপূর্ব্ব শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।৬২

অর্থাৎ "বিষয়-চিন্তারত পুরুষের সেই সকল (বিষয়ে) আসক্তি জন্মে; আসক্তি হইতে কামনা জন্মে; কামনা হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়।" গীতাকারের মতে ক্রোধই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক রিপু। বাস্তবিক ধর্ম্মজগতের ইতিহাসেও ইহা দেখা যায় যে, অনেক সাধু মহাত্মা কাম, লোভ, মোহ, অহঙ্কার ইত্যাদির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অবশেষে ক্রোধের হস্তে পতিত হইয়াছেন। সাধুরা নানাপ্রকার বাহ্য ও আভ্যন্তরিক উপায় অবলম্বন করিয়া অনেক সময় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল রিপুটিকে নিস্তেজ করিয়া রাখিয়াছেন এরূপ দেখা গিয়াছে; কিন্তু যখনই কোনও প্রকার প্রতিকূল ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, তখনই তাহারা সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছেন। আমরাও দৈনন্দিন জীবনে ইহা সর্ব্বদা অনুভব করি যে, যখনই কোনও প্রকার অপ্রীতিকর কথা শ্রবণ করি, কোন প্রকার নির্যাতন প্রাপ্ত হই, কোনও প্রকার অন্যায় কার্য্য দর্শন করি, তখন দুঃখিত না হইয়া বিরক্ত ও ক্রোধযুক্ত হই। অন্যান্য রিপুকে যিনি কিয়ৎপরিমাণে স্ববশে আনিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি ক্রোধের কাছে গিয়া যেন অবশ হইয়া পড়েন।

ক্রোধ যেখানে অহঙ্কারও সেখানে উপস্থিত হয়। অহঙ্কার ক্রোধের নিয়ত সহচর। সুতরাং ক্রোধ এবং অহঙ্কার ব্রহ্মচর্য্যব্রত-পরায়ণ ঋষিকেও নরকের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। যিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া শুষ্ক কাষ্ঠের মত হইয়াছেন, কোনও বস্তুতেই যাঁহার আসক্তি নাই, কিছুতেই যাহার দৃষ্টি নাই, সেই সংসার প্রমুক্ত সাধকও ক্রোধের বেগ সংবরণ করিতে পারেন না, অহঙ্কারকে বলিদান করিতে পারেন না। অতএব ইহা অপেক্ষা দুর্জ্জয় রিপু আর কি আছে?

ব্যক্তিগত জীবনে অল্পাধিক পরিমাণে ইহা সকলেই অনুভব করিয়াছেন যে, কথাবর্ত্তায়, আলোচনায়, বক্তৃতায় পারিবারিক কার্য্যাদিতে সকল সময় শান্তভাব রক্ষা করা কতদূর কঠিন। অজ্ঞাতসারে, অনিচ্ছায়, অতর্কিতভাবে কোথা হইতে ক্রোধের বাতাস আসিয়া উপস্থিত হয় এবং মনকে অপ্রকৃতিস্থ করিয়া ফেলে, তাহা পূর্ব্বক্ষণে কিছুই টের পাওয়া যায় না। যাঁহাকে সকলে অত্যন্ত শান্ত, সুশীল, ধার্ম্মিক বলিয়া জানে, তিনিই কার্য্যকালে (অর্থাৎ তাঁহার পক্ষে যেরূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে, ক্রোধের উদ্রেক হইতে পারে) উষ্ণ-শোণিত হন। আমরা পরস্পর আলোচনায়, সভা সমিতিতে সকল সময়ই ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। অথচ ক্রোধ দমন না হইলে, চিত্ত শান্ত সমাহিত না হইলে কেহই ভগবানের রাজ্যে যাইতে পারিবে না। যাহার চিত্ত আসক্ত, বিরক্ত, উত্তেজিত সে কখনও ধ্যান-পরায়ণ হইতে পারে না। ভিতরে বাহিরে শান্তভাব অবলম্বন করিতে না পারিলে ব্রহ্মলাভ হয় না।

ঋণী ব্রাহ্ম।—একজন ব্রাহ্মবন্ধু এই গুরুতর বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, অনেক ব্রাহ্ম ঋণজালে জড়িত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে ও ব্রাহ্মসমাজকে লোকচক্ষে হীন করিতেছেন। যাঁহারা দারিদ্র্যের তাড়নায় ও সংসারের অসচ্ছলতানিবন্ধন ঋণ করিতে বাধ্য হইতেছেন ও সেই ঋণ-শোধের জন্য আপনাদিগের ব্যয় সংকোচ করিয়া ও বিবিধ ক্লেশভোগ করিয়া, ক্রমে ঋণমুক্ত হইতেছেন, তাঁহাদিগের প্রতি পত্রপ্রেরক বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু যাহা দেখিয়া তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন তাহা এই:—অনেকের পক্ষে ঋণ করাটা যেন অতি সহজকার্য্যের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঋণ করিবার জন্য যেরূপ ব্যগ্রতা, শোধ করিবার জন্য সেরূপ নহে। বাহিরের চাল চলনে ব্যয় সংকোচের প্রতি দৃষ্টি নাই। নানাবিধ ভোগ বিলাসে রত থাকিয়া নিশ্চিন্ত মনে কাল যাপন করিতেছেন, অথচ যাঁহারা এক সময়ে বন্ধুভাবে অর্থ দিয়া বিপদুদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা যথা সময়ে সেই অর্থ না পাওয়াতে ক্লেশ পাইতেছেন, সেদিকে দৃষ্টি নাই; ইহা অতীব শোচনীয়। পত্রপ্রেরক দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মসমাজের লোকের মধ্যে 'ধারে হাতী ক্রয় করা' নৈমিত্তিক কার্য্য মধ্যে গণ্য হইতেছে। ভবিষ্যতে কোথাও হইতে টাকা আসিবে, এই আশায় ধারে জিনিষপত্র ক্রয় হইতেছে। "আমি" বই লিখিলাম, সুতরাং ইহা বিক্রয় হইবেই, এই আশায় প্রেসে ধারে বই ছাপা হইতেছে। গাড়ী ঘোড়া কিনিয়া কেহবা চাল বাড়াইতেছেন। এ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অশুভ লক্ষণ।" বিষয়টী অতি গুরুতর। অধিকাংশ ব্রাহ্মের সাংসারিক অবস্থা যেরূপ মন্দ, তাহাতে অনেকেরই ক্রমে ঋণজালে জড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। ঋণগ্রহণ ও ঋণশোধ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মদিগের সাংসারিক অবস্থার উন্নতি বিধানের উপায় করা কর্ত্তব্য।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

অনুতাপ আধ্যাত্মিক জীবনের চিহ্ন।

পাপবোধ না হইলে পাপ দমনের চেষ্টা হয় না। রোগ রহিয়াছে; কিন্তু রোগ যন্ত্রণা নাই, ক্ষত রোগে শরীরের অভ্যন্তর দেশ পচিয়া যাইতেছে, কোনও বেদনা নাই, এরূপ অবস্থা বড়ই শোচনীয়। মঙ্গলময় পরমেশ্বর রোগ হইতে প্রমুক্ত হইবার জন্যই বেদনা দিয়াছেন। ক্ষুধা না হইলে বোধ হয় কেহই কর্ত্তব্য জ্ঞানে আহার করিত না, পিপাসা না হইলে কেহই জলপান করিত না, সেইরূপ বেদনা না জন্মিলে কেহই চিকিৎসিত হইবার জন্য অস্থির হইত না। শারীরিক সম্বন্ধে যে বিধান, মানসিক সম্বন্ধেও সেই বিধান। পাপে বিকৃত ব্যক্তির যখনই আত্মদৃষ্টি প্রখর হয়, অর্থাৎ পাপবোধ জন্মে, তখনই অনন্যোপায় হইয়া পরিত্রাণের জন্য ভগবানের আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত না পাপবোধ জন্মিবে, ততদিন তাহার অবস্থা অত্যন্ত ভয়ানক। ঈশ্বর কৃপায় সাধুসঙ্গ, জ্ঞানালোচনা ও অন্যান্য উপায়ে মানবের পাপবোধ জন্মিয়া থাকে।

পাপবোধ জন্মিলেই অনুতাপের উদয় হইয়া থাকে। এ সময় হইতে আধ্যাত্মিক চিকিৎসা আরম্ভ হয়। তখন সে ব্যক্তি নিজের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে সমর্থ হয়। যাহাদের পাপবোধ জন্মে নাই, তাহারা নিজের জীবন সম্বন্ধে প্রতারিত হইয়া কুৎসিতকে সুন্দর দেখে, অপবিত্রকে পবিত্র দেখে, এবং কুবাতাসকে ব্রহ্মসহবাসের অনুকূল বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। নরকে বাস করিয়া মনে করে যে, স্বর্গে বাস করিতেছে। প্রখর আত্ম-দৃষ্টি আসিয়া চক্ষে আঙ্গুল দিয়া প্রকৃত অবস্থা কি তাহা দেখাইয়া দেয়। তখন পাপ-ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে।

প্রকৃত অনুতাপ বড়ই যন্ত্রণা-দায়ক। পাপীর শাস্তি বিধানের জন্য নানা শাস্ত্রে নানা প্রকার বিভীষিকাপূর্ণ নরক কল্পিত হইয়াছে। সে স্থান মল মূত্র সাগরে পূর্ণ। তাহাতে কত কীট কিলিবিলি করিতেছে, সেই সাগরে পাপী ডুবিতেছে, উঠিতেছে, পড়িতেছে। আবার জলন্ত আগুনে পাপীকে পোড়াইতেছে, যমদূতগণ লোহার মুদগর দিয়া পাপীর মস্তকে আঘাত করিতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কল্পনায় শক্তিশালী

তুলিকার সাহায্যে যতদূর ক্লেশজনক স্থানের চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে, অনুতাপিত ব্যক্তির হৃদয় তদপেক্ষা কষ্টময়।

দুঃখ চারি প্রকার,—অনাহার জনিত দুঃখ, শোক, ব্যাধি এবং অনুতাপের ক্লেশ। এই চতুর্ব্বিধ দুঃখের মধ্যে অনুতাপের ন্যায় জ্বালাকর আর কিছুই নহে। অনুতাপের বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণা যিনি অনুভব করিয়াছেন, তিনিই সাক্ষ্য দান করিবেন, এমন কষ্ট পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। কিন্তু যেমন গ্রীষ্মাতিশয্য বৃষ্টিধারা পতনের পূর্ব্ব লক্ষণ, স্ফোটকে অস্ত্র প্রয়োগের ভয়ঙ্কর যাতনা আরোগ্য লাভের কারণ, তদ্রূপ অনুতাপ মানব হৃদয়ে ঈশ্বর প্রকাশের পূর্ব্ব লক্ষণ। প্রকৃত অনুতাপের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মকৃপা অভ্যুদিত হইয়া সাধককে শান্তি দান করে। তখন সাধকের প্রাণে যে অভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় প্রেমস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহা কল্পনার আয়ত্ত নহে।

অনুতাপের অশ্রুজলে যে হৃদয় কখনও ধৌত হয় নাই, তাহা ব্যাধি-শূন্য নহে। অনুতাপ ধর্ম্মজীবনের লক্ষণ। যে হৃদয় অনুতাপবিহীন, যে সমাজের লোক অনুতাপিত না হইয়া ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ করে, তাহারা পরমেশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হয়। মহাত্মা যীশু প্রধানতঃ দুইটি বিষয় জগতে প্রচার করিয়াছেন। "অনুতাপিত হও, স্বর্গরাজ্য তোমার নিকটবর্ত্তী ও সকলকে প্রেম কর।" খ্রীষ্টীয় সমাজ অনুতাপেই জীবিত। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে ইহজন্মের পাপ ও পুণ্য কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া বিশ্বাস থাকাতে এদেশে অনুতাপের ভাব তেমন প্রস্ফুটিত হয় নাই। ইহজন্মের কর্ম্ম যখন পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফলে অনুষ্ঠিত হইতেছে,তখন অনুশোচনা করা নির্ব্বুদ্ধিতা মাত্র। তবে যাহাতে পরজন্মে আর এরূপ ক্লেশ ভোগ না করিতে হয়, তজ্জন্য বিবিধ উপায়ে ধর্ম্মসাধন কর।" কিন্তু এরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হওয়া সত্বেও হিন্দুশাস্ত্রে অনুতাপের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। মনু বলিতেছেন ;—

কৃত্বা পাপানি সন্তপ্য, তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাং পুনবিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পাপ করিয়া পশ্চাৎ অনুতাপ করে ও আর এরূপ কর্ম্ম করিব না বলিয়া পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তিই পূর্ব্বকৃত পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত ও পবিত্র হয়।

ব্রাহ্মসমাজ অনুতাপের ভিতর দিয়াই সাধন-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল ; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বর্ত্তমান সময়ে অনুতাপের ভাব মৃত হইয়াছে। এখন অনেকেই কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে উচ্চৈঃস্বরে নাম করিতে, ভাবাবেশে মত্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা অনুতাপের বৃশ্চিকদংশন জ্বালা অনুভব করিতে প্রস্তুত নহেন। অনুতাপটা কি বস্তু, তাহা প্রাণে অনেকেই অনুভব করেন না। "অনুতাপ" বলিয়া একটা শব্দ সকলের মুখে মুখে ঘুরিতেছে মাত্র। আচার্য্য বলিলেন, "প্রেমময়ী জননী আসিয়া আমাদিগকে প্রেম-কোলে লইয়া বসিয়াছেন।" অমনি শত চক্ষু হইতে জলধারা পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু পাপীর পাপ বক্ষ বিদারণ করিবার জন্য ; বিষয়াসক্তিকে ছিন্ন করিবার জন্য, বিলাসের কোমল কুসুম শয্যায় শায়িত, ধর্ম্মের পরিচ্ছদধারী নরনারীর পৃষ্ঠে কশাঘাত করিবার জন্য যে তিনি "ভয়ানকের ভয়ানক" ও "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" হইয়া আসিয়াছেন, সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। মা বলিতে অনেকে রাজি, কিন্তু তিনি যে ন্যায়বান ও শাসনকর্ত্তা সে কথা উঠিলে, কেহ বড় ভীত হন না। ইহা সমাজের পক্ষে অতি কুলক্ষণ।

বিষয়াসক্ত লোকে যেমন ভাবিয়া থাকে যে, পুত্রকন্যাদিগকে উত্তমরূপে লালন পালন করিতেছি, স্ত্রীকে শিক্ষা দিতেছি, সুন্দররূপে সংসার পালন করিতেছি, ইহাই ধর্ম্ম। ইহা ছাড়া আর কিছু ধর্ম্ম নাই। তেমন অনুতাপবিহীন লোকেরা পাপের মধ্যে ডুবিয়া ও ঈশ্বরের প্রেমের কাহিনী গান করিয়া নিজকে ধার্ম্মিক মনে করিতেছে। পাপীর নিকট তিনি "বজ্র হস্ত" এ সত্যে বিশ্বাস থাকিলে যখন অনুতাপিত হওয়া কর্ত্তব্য তখন কেহ কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে পারে না, যখন পাপের বিষে জর্জ্জরিত, তখন "মাতিয়ে দে আনন্দময়ী একেবারে মেতে যাই" বলিয়া গান গাহিতে পারে না, যখন বিষয়াসক্তির ভারে হৃদয় অবসন্ন, তখন কেহ বলিতে পারেন না যে, "ডুবিব অতল সলিলে প্রেমসিন্ধু নীরে আজ।" পরমেশ্বর কৃপা করুন, আমাদের মধ্যে অনুতাপের ভাব প্রবল হউক।

পুরাতন কথা।

মোহ মমতা যে ধনজনেই আবদ্ধ থাকে, এমন নয়। কিন্তু দেখা যায় কোন রীতিনীতি বা সংস্কার বহুদিন হইতে কোন দেশে প্রচলিত থাকিলে, লোকে তাহার অসারতা বা অপকারিতা অনুভব করিয়াও তাহার মমতা ত্যাগ করিতে পারে না। ধন মানের আসক্তি পরিত্যাগ করা বরং সহজ। কিন্তু বদ্ধমূল সংস্কার এবং অজ্ঞানতার মমতা পরিত্যাগ করা বিষম কষ্টকর। নতুবা যে ধর্ম্ম সম্প্রদায় আপনাদিগকে পৃথিবীর অপরাপর ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করেন ; যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে আপনাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত মনে করেন ; যাঁহারা আপনাদিগকে ব্রহ্মবাদিগণের বংশধর বলিয়া গৌরবান্বিত মনে করেন এবং বাস্তবিকই যাঁহারা ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্মবিদগণেরই বংশধর, তাঁহারাই আবার নিরাকার চৈতন্যময় ব্রহ্মের উপাসনায় কেন আপনাদিগকে অনধিকারী বলিয়া অভিহিত করিতে সঙ্কুচিত হন না। ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য যে জাতির পূর্ব্ব পুরুষগণ বিখ্যাত,—যে দেশের প্রাচীন গ্রন্থসমূহ ব্রহ্মবাদের বিশদ ব্যাখ্যায় পূর্ণ ; তাঁহাদের বংশধরগণের পক্ষে ব্রহ্মোপাসনার অনধিকারী বলিয়া পরিচিত হইবার প্রবৃত্তি কি বাস্তবিকই শোচনীয় দুর্গতির পরিচায়ক নহে।

মুসলমান প্রভৃতি একেশ্বরবাদিগণ ত কখনও আপনাদিগকে নিরাকার ঈশ্বরোপাসনার অনধিকারী বলিয়া মনে করেন না। ভারতীয় আর্য্যবংশধরগণ কথায় কথায় যাহাদিগকে ধর্ম্মজ্ঞান ও জীবন সম্বন্ধে হীন বলিয়া ব্যক্ত করেন, তাঁহারা ত কখনও এমন মনে করেন না যে তাঁহারা ঈশ্বরারাধনার অনধিকারী। তবে এদেশের প্রাচীন সমাজের জনগণের এ প্রকার আপত্তিকে কি অজ্ঞানতার প্রতি মমতা বলিয়াই অভিহিত

করা উচিত নহে? পৌত্তলিক নামে অভিহিত হইতে বর্ত্তমান সময়ে কেহই বড় রাজি নহেন। কিন্তু পৌত্তলিকতার যে আবেশময় প্রলোভন সম্মুখে বিরাজ করিতেছে, তাহার হাত এড়াইতে পারা সহজসাধ্য নহে। এজন্যই দেখিতেছি যাঁহারা সর্ব্ব বিষয়ে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেছেন, তাঁহারাও নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনায় আপনাদিগকে অনধিকারী বলিয়া অভিহিত করিতে সঙ্কোচ করিতেছেন না। ইঁহাদের মোহ-নিদ্রা দূর করা সহজসাধ্য নহে। কারণ জাগিয়া যে নিদ্রিতের ভাণ করে তাহার ঘুম কে ভাঙ্গিতে পারে। তাঁহারা হস্তাবরণ দ্বারা প্রকাশিত সূর্য্যালোককে অবরুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন। চক্ষু মুদিয়া জগৎকে অন্ধকারময় মনে করেন। ইঁহাদের মোহ যাইয়াও যায় না। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনার আস্বাদন পাইয়াছেন, প্রাচীন সংস্কারের বন্ধন যাঁহারা কাটাইয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যেও যে অধিকারী ভেদে উপাস্যের ভেদের যুক্তির অভ্যুদয় হইতেছে, ইহা কি বিশেষ পরিতাপ ও শোককর নহে? পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী যেমন বহুদিন পরে দ্বার উন্মুক্ত পাইয়াও পিঞ্জরের মায়ায় তাহাতেই আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ ইঁহারাও যেন পূর্ব্ব সংস্কারের মায়া কাটাইতে পারিতেছেন না। তাই ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই অধিকার ও অনধিকারের যুক্তি আসিয়া মাঝে মাঝে দেখা দিতেছে।

ব্রহ্মোপাসনার অধিকার মানবাত্মার পক্ষে অতি উপাদেয় এবং অতি উচ্চ অধিকার। এবং মঙ্গলময় প্রভুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। যে ব্যক্তি আপনাকে এমন উচ্চ এবং উপাদেয় অধিকারের অনুপযুক্ত মনে করে এবং ঈশ্বরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দানকে অগ্রাহ্য করে সে বাস্তবিকই দীনহীন ও কৃপাপাত্র তাহার দুর্ভাগ্যের পরিসীমা নাই।

মানবাত্মার কল্যাণ লাভ—তাহার পরিত্রাণলাভ যদি এই ব্রহ্মোপাসনার উপরেই নির্ভর করে—তাহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি যদি এই মহিমাময় এবং করুণাময় পরমেশ্বরের উপাসনার প্রতিই নির্ভর করে এবং ব্রহ্ম যদি এক ভিন্ন দ্বিতীয় না থাকেন, তাহা হইলে অধিকারী ভেদে উপাস্যের ভেদ কিরূপে সম্ভবে? যাহার আর দ্বিতীয় নাই তাঁহার প্রকার ভেদ কিরূপ কথা। ন্যায় ও যুক্তিতে ত এরূপ সিদ্ধান্ত হয় না। তবে সিদ্ধান্তের অপব্যবহার সর্ব্বত্রই সম্ভবে।

এই জাতিভেদ-প্লাবিত দেশেই এরূপ উপাস্য-ভেদের কথা উঠিতে পারে। কারণ এদেশীয়গণ মানব সাধারণকে *বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত মনে করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই।* ইঁহারা আপনাদিগকে এক আকার প্রকারের দেখিয়াও একই শ্রেণীর মনে করিতে পারেন নাই। এজন্য শ্রেণীবিভাগ একমাত্র মানবেই আবদ্ধ রাখাও সঙ্গত মনে করেন নাই। সেই শ্রেণীবিভাগ ঈশ্বরেও যাইয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইঁহারা জ্ঞানগর্ব্বে স্ফীত হইয়া মনে করিতে পারেন নাই, যে আমরা এরূপ জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া যে ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছি, অপরেরা নিকৃষ্ট হইয়া কিরূপে সেই ঈশ্বরের আরাধনা করিবে। তাহারা কোন মতেই ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী নহে। শ্রেণীবিভাগ যেমন আপনাদিগের মধ্যে তেমনি ঈশ্বরেও আরোপিত হইয়াছে। জ্ঞান গরিমার অতিরিক্ত অভিমানের ফল অজ্ঞানতা। সেই অজ্ঞানতা প্রসূত ব্যবস্থার পরিণাম আরও শোচনীয়। যাহাদের জন্য অন্যরূপ উপাস্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল; এক ঈশ্বরের শ্রেণী বিভাগ হইয়াছিল; তাহাদের বংশধরেরাই যে সেই অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া আপনাদিগকে হীন করিয়াছে, তাহা নয়—ব্যবস্থাকর্ত্তাগণের বংশধরেরাও তাঁহাদের অজ্ঞতা ও অপরিণামদর্শিতার ফলস্বরূপ ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া অজ্ঞানতার পর অজ্ঞানতায় হীনতার পর হীনতায় নিমগ্ন হইতেছে। যে দেশে জাতি ভেদ নাই এবং সেই জাতি ভেদ উপাস্যে আরোপ করিবার প্রবৃত্তি নাই, সে দেশে এ প্রকার ভেদের কথা উপস্থিতই হয় না। কোন ব্যক্তিই আপনাকে ঈশ্বরাধনার অনুপযুক্ত মনে করে না।

ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী কে, সেই উপাসনার প্রকৃত আয়োজনই বা কি? এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত কি হওয়া উচিত? অল্পজ্ঞান মানব তুমি মনে করিতেছ আপনার জ্ঞানবলেই আমি তাঁহাকে আয়ত্ত করিব। আমি জ্ঞানী, আমিই তাঁহার উপাসনার অধিকারী। কিন্তু ভাবিয়া দেখ মহান্ অনন্তস্বরূপের ধারণা করিতে, তাঁহার সত্তা আয়ত্ত করিতে তোমার জ্ঞান, তোমার শক্তি কত সামান্য। সেই অনন্ত জ্ঞানের নিকট তোমার জ্ঞান, আর যাহাকে অজ্ঞান ভাবিতেছ তাহার জ্ঞানের প্রভেদ কত সামান্য। সে প্রভেদের তারতম্য এরূপ যে গণনার মধ্যেই আসে না। জ্ঞানবলে অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্মকে আয়ত্ত করা কি সম্ভব? যদি তাহা না হয় কিরূপে মানব তাঁহাকে লাভ করিবে? সে আয়োজন কিরূপ আয়োজন? তাহা কি ব্যাকুলতা ও দীনতার আয়োজন নয়? যে সর্ব্বাপেক্ষা আপনাকে দীনহীন মনে করে; যে আপনাকে অকিঞ্চন ভাবিতে পারে, সেই কি উপাসনার অধিকতর উপযুক্ত নহে? দুর্ব্বল সবলকে কি আত্মবলে লাভ করে, না সেই শক্তিশালীর প্রতি নির্ভর করিয়াই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়? এরূপ আত্মসমর্পণ এবং ব্যাকুলতা লাভের পক্ষে কি শ্রেণী বিশেষের বিশেষ অধিকার আছে? না; সকলের পক্ষেই তাহা সম্ভব। আত্মকল্যাণকারী প্রত্যেক দীনাত্মাই ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী। করুণাময় পরমেশ্বরই প্রত্যেক মানবকে তাঁহার উপাসনার অধিকারী করিয়াছেন। কিন্তু মানবের দুঃসাহসিকতা অতি প্রবল বলিয়াই কেহ কেহ সেই অধিকার কাহারও পক্ষে খর্ব্ব করিতে প্রয়াসী হয়। আবার কাহারও পক্ষে প্রশস্ততর করিতে আপনাকে সক্ষম মনে করে। এরূপ দুঃসাহস বা অতি বিজ্ঞতার গর্ব্বের পরিণাম অতি ভীষণ।

মানব কোন এক বিষয়ে একবার বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে নানাপ্রকারে তাহার প্রকাশ হইতে থাকে। তখন অপরের হিত করিবার প্রবৃত্তিতেও সে বিকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। উপাসকের অবস্থানুসারে উপাস্যের ভেদ কল্পনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়াও এক হিসাবে মানব-হিতৈষণা। কারণ যখন অতি বিজ্ঞগণ মনে করিলেন, নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনায় সাধারণ লোকের অধিকার নাই, তখন তাহারা যে

ধর্ম্মহীন ও পূজা হীন হইয়া থাকিবে, এরূপ আশঙ্কা তাঁহাদের মনে সহজেই উপস্থিত হইল। এরূপ হইলেত আরও সর্ব্বনাশ সুতরাং তাহাদের জন্য ত কোন ব্যবস্থা চাই। হৃদয়ের এরূপ অবস্থাকে অবশ্যই হিতৈষণাই বলিতে হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই পরহিতৈষিতা-প্রেরিত হইয়া তাঁহারা যে আত্ম-অকল্যাণ সাধন করিলেন, সে জ্ঞান তাঁহাদের হইল না। তাঁহারা ঈশ্বরের সম্বন্ধে যে প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সাধারণের জন্য তাহার পরিবর্ত্তে মনঃকল্পিত ঈশ্বর বা তাহার অবতারের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহার উপাসনায় সকলকে সন্তুষ্ট থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু পরহিতৈষিতার জন্য তাঁহারা যে সত্য-গোপন এবং অসত্যাচরণ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা যে আত্ম অকল্যাণ সাধন করিলেন, সেদিকে দৃষ্টি করিবার অবকাশ থাকিল না। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজে একরূপ হইয়া অন্যরূপে আপনাকে ব্যক্ত করে, সেই আত্মাপহারী চৌর কর্ত্তৃক কোন্ অপরাধ না কৃত হয়? নিজে এক প্রকারের হইয়া অন্য প্রকারের ব্যক্ত করাতেই যদি কেহ চোর নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে কোন বস্তু সম্বন্ধে একরূপ জানিয়া অন্যরূপে তাহাকে ব্যক্ত করিলে, তাহার কোন্ সংজ্ঞা পাওয়া উচিত? বিকৃত হিতৈষণা এতই প্রবল যে, নিজে যে অসত্যাচরণে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইলেন এবং তাহার ফল যে, কত নরনারীকে ভোগ করিতে হইবে সে বিষয়েও তাঁহাদের চিন্তা করিবার অবকাশ হইল না। "আত্ম-ক্ষতি করিয়াও পরের উপকার করা উচিত," ইহা কি সেই প্রকারের হিত সাধন অথবা ইহা জ্ঞানহীনা জননী যেমন সন্তানের আশুকষ্টদায়ক মনে করিয়া বিষাক্ত কগ্ন অঙ্গবিশেষ ছেদনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহা সেরূপ মমতা? বিকৃত মমতার পরিণাম বিষম বিকৃতি। তাই বহু শত বৎসরের জ্ঞানালোচনার ফলভাগী হইয়াও এবং বর্ত্তমান সময়ের জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত হইয়াও সেই প্রাচীন অপকার্য্যের পরিণাম স্বরূপ ব্রহ্মোপাসনা রূপ উন্নত অধিকার এবং পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হইতে এদেশের জনগণ বঞ্চিত রহিয়াছে। আরও যে কতকাল এরূপ দুর্গতি ভোগ করিতে বাকী আছে, তাহাই বা কে জানে।

সরল পিপাসুর পক্ষে ব্রহ্মোপাসনা সর্ব্বদাই সহজ ও আরামপ্রদ। যাহারা আত্ম-কল্যাণ-আকাঙ্ক্ষী তাহারা সর্ব্বদাই আপন মঙ্গলদাতা শুভদাতা বিধাতা রূপে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে এবং তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। সরল পিপাসুর পিপাসা কোন সময়েই অপূর্ণ থাকে না। তাহার দৃষ্টান্ত সর্ব্বদেশে সর্ব্ব কালেই পাওয়া গিয়াছে এবং পাওয়া যাইতেছে। এ প্রকার লোকে কখনও অধিকারী বা অনধিকারীর প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া আত্মহারা হয় না এবং লোককেও বিপথগামী করিতে প্রয়াসী হয় না। তবে যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনাকে একটা বিষম প্রহেলিকা বা রহস্যময় ব্যাপার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন এবং ইহাও একটা বুজরুগি বিশেষ বলিয়া যাহাদের ধারণা আছে কিম্বা ধর্ম্মসাধন প্রভৃতিকে যাঁহারা আকাশে ভ্রমণ বা তাদৃশ প্রলোভন জনক কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, শুধু তাঁহারাই ইহাকে সকলের সাধ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন না এবং যে যেমন ভাবে বিশ্বাস করিয়া তৃপ্তি পায়, তাঁহাকে সেইভাবেই তৃপ্ত থাকিতে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। নতুবা অন্নজল গ্রহণ যেমন সকলের পক্ষে স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয়, ঈশ্বরোপাসনাও তেমনি সর্ব্বজনের পক্ষেই স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয়। সকলেই ইহার অধিকারী। অধিকারী বা অনধিকারী মূল বস্তু সম্বন্ধে নহে, যে কিছু প্রভেদ তাহা অবস্থা সম্বন্ধে। অবস্থাগত প্রভেদ যাহা দেখা যাইতেছে তাহা কেহই অস্বীকার করে না। একজন বহুদিন হইতে সাধন ভজন করিতেছেন, তিনি যেরূপ নিষ্ঠা ও অনুরাগের সহিত উপাসনা করিবেন বা করিতে সমর্থ হইবেন; ধর্ম্মসাধনে নবপ্রবিষ্টের পক্ষে সেরূপ নিষ্ঠা বা অনুরাগের সহিত সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা কোথায়। অবস্থার পার্থক্য সাধকে সাধকে ভক্তি ও অনুরাগ প্রভৃতিতে চিরদিনই আছে এবং থাকিবে। কিন্তু যে যেমন অবস্থারই হউন না কেন সকলেই সেই একই উপাস্যের উপাসনার অধিকারী। অধিকারের ভিন্নতা নহে, কিন্তু অবস্থার ভিন্নতা। উপাস্যের ভিন্নতা নহে, কিন্তু অনুরাগ, ভক্তি প্রভৃতি বিষয়েই ভিন্নতা।

চিকিৎসালয়।

(সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ)

একবার একজন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের উদাসীন সাধু বেহার প্রদেশের কোনও নগরে বাঙ্গালী বাবুদের অনুসন্ধান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে,"এখানে কোনও ব্রাহ্মসমাজ আছে কিনা?" ব্রাহ্মসমাজ আছে এবং কোথায় আছে, কখন ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য হয় ইত্যাদি কথা বাবুরা তাঁহাকে বলিয়া দিলেন। তিনি একদিন ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে কেহ তাঁহার সঙ্গে আলাপে জানিতে পারিলেন, তিনি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এ সময় এখানে আসিয়াছেন। সমাজের উপাসনাদি হইয়া গেলে তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিতে বলা হয়, তিনি সেই সময় কি কি কথা বলিয়াছিলেন, সব কথা স্মরণ নাই। স্থূল সারাংশ এই "ধর্ম্মসমাজ সমূহকে যদি চিকিৎসালয় মনে করা যায়, তবে বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজ শ্রেষ্ঠ চিকিৎসালয়। এখানে সকল প্রকারের রোগীরা আসিয়া চিকিৎসা লাভ করিয়া সুস্থতা প্রাপ্ত হইতেছেন। আমি এবং আপনারা ঈশ্বর কৃপায় এই সুচিকিৎসালয়ে প্রবেশ করিয়াছি, এবং সুস্থতা লাভ করিয়া ধন্য হইতেছি, এ চিকিৎসালয় যেন কেহই ত্যাগ না করি।"

ধর্ম্ম সমাজকে চিকিৎসালয়ের সঙ্গে উপমা দেওয়া সুসঙ্গত বটে। চিকিৎসালয়ে যাইয়া যেমন শারীরিক ব্যাধিগ্রস্ত লোকেরা স্বাস্থ্য লাভ করে, এখানেও আধ্যাত্মিক পীড়াগ্রস্ত লোক সকল

উপস্থিত হইয়া আরোগ্য লাভ করে। ব্রাহ্মসমাজকে কেন তিনি এ সময়ের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসালয় বলিলেন? শরীর-চিকিৎসা শাস্ত্র অসম্পূর্ণ সত্ত্বেও শারীরতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের মধ্যে অনেকে এই চিকিৎসাকে মিশ্র ঔষধের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সামান্য অমিশ্র ঔষধ ব্যবহার করিতেছেন। এমন কি অনেকে একবারে ঔষধের সাহায্য না লইয়া স্বভাবে রাখিয়া রোগীকে সুস্থ করিবার জন্য পরামর্শ দিতেছেন এবং দেখিতে পাওয়া যায়, জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেরই গতি এদিকে। রোগীকে স্বভাবে রাখাই উত্তম চিকিৎসা। মিশ্র ঔষধকারীদের ভ্রমবশতঃ কত লোক মানবলীলা সংবরণ করিতেছে, তাহা কে গণনা করিবে? এই মিশ্রঔষধের হস্ত হইতে রক্ষা করাও এ সময়ের চিকিৎসকদিগের এক বিশেষ চেষ্টা।

ধর্ম্ম সমাজের মিশ্রকারীরাও অনেক সময় লোকদিগকে রোগমুক্ত না করিয়া এক রোগের হস্ত হইতে অন্য রোগের হস্তে লইয়া যান। ব্রাহ্মসমাজ এই মিশ্রকারীদের হস্ত হইতে রোগীদিগকে রক্ষা করিতেছেন।

বলিতে কি, প্রচলিত ধর্ম্মসমাজসকলের দুশ্চিকিৎসিত লোক সকল এখানে আসিয়া আরোগ্য লাভ করিতেছেন। হিন্দুর দুশ্চিকিৎস্য, মুসলমানের দুশ্চিকিৎস্য, খৃষ্টানের দুশ্চিকিৎস্য মানবকে ব্রাহ্মসমাজ রোগমুক্ত করিতেছেন। কেন ইহাঁর চিকিৎসার এত প্রশংসা? এখানে পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং চিকিৎসক, ব্যবস্থা পত্র এখানে তিনি স্বয়ং দান করেন, ছোট বড় সকল প্রকার রোগীকেই তিনি স্বয়ং দেখেন এবং রোগের উপযুক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করেন। ঔষধ ব্যবস্থা করেন শুধু তাহা নয়, আপনি স্বয়ং সেবন করান, এখানে কোন মিশ্রকারীর হাত নাই। এখানে কোন মহাজন চিকিৎসক কি পারিশদগণ মিশ্রকারী নন, এ চিকিৎসালয়ে পূর্ণব্রহ্ম স্বহস্তে সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, সুতরাং ব্যবস্থা পত্রে ভুল কি মিশ্রণের ভুলে, কাহারও প্রাণনাশের ভয় নাই। এখানে যাঁহারা উপদেষ্টা, যাঁহারা আচার্য্য, যাঁহারা প্রচারক, তাঁহাদের কেবল এই কায, রোগীকে সর্ব্বদা সেই পরম চিকিৎসকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পরামর্শ দান করা। তাঁহাদের উপদেশ, তাঁহাদের আচরণ, তাঁহাদের কায কর্ম্মে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে, পূর্ণব্রহ্ম রোগীর পরম চিকিৎসক তাঁহার নিকট উপস্থিত না হইলে রোগমুক্ত হইবে না। সাক্ষাৎভাবে তাঁহার নিকট আপনার রোগের বিষয় বল এবং তিনি স্বহস্তে যে ব্যবস্থা পত্র দেন তাহা গ্রহণ কর, তাঁহার হস্তে ঔষধ সেবনকর। তাহা হইলেই রোগ মুক্ত হইয়া সুস্থ হইতে পারিবে।

বাস্তবিক সেই উপদেষ্টাগণই শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা রোগীকে নিজ হস্তে না রাখিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বর সন্নিধানে উপস্থিত করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এই বিশেষ কার্য্য। ব্রাহ্মসমাজের এই মহাসত্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে নূতন উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু পূর্ব্বে ইহা কার্য্যতঃ তেমন ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। ঈশ্বর তাঁহার নব ব্যবস্থাকে এবার বিশেষ রূপে কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। আহা এমন ব্যবস্থা পাইয়াও মানুষ পুনরায় মিশ্রকারীদের হস্তে জীবন সমর্পণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে! ঈশ্বর কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হওয়া, মানবের ইহাপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? ইহা অপেক্ষা রোগীর নিশ্চিন্ত হইবার আর কি উপায় আছে? এবার পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং রোগীদের ভার লইয়াছেন, "ও ভাই! শুন সমাচার,পাপীদের ভার লয়েছেন আপনি দয়াময়।" এমন স্বর্গের সমাচার পৃথিবীতে আর ঘোষিত হয় নাই। শারীরিক ব্যাধিগ্রস্তদিগকে এখন যদিও হাসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসা করা হয়, কিন্তু কোন কোন পীড়া এমন সংক্রামক যে, তাহাদিগকে অন্যদের সঙ্গে রাখা হয় না, পাছে তাহারা সেই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। ধর্ম্মসমাজেও কোন কোনও স্থলে দেখা যায়, তাহারাও ঐরূপ ভয় প্রাপ্ত হন। "অমুক হীন, উহার সঙ্গে থাকিলে হীন হইয়া যাইব।" কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ এই কথা বলিতেছেন," এখানে পাপ সংক্রামিত হয় না, এখানে সাধুতাই সংক্রামিত হয়। তুমি যে পাপেই পাপী হওনা কেন, এখানে সাধু সঙ্গে পূর্ণব্রহ্মের চিকিৎসাধীন হও, সুস্থ হইয়া যাইতে পারিবে।" যে সমাজে পাপীর সংস্পর্শে সাধু মলিন হইয়া যায়, তাহাকে আর ধর্ম্মসমাজ কেমন করিয়া বলিব? যেখানে সাধুর সংস্পর্শে পাপী সুস্থতা লাভ করে সেই ত প্রকৃত ধর্ম্ম সমাজ। এখানে সকল প্রকার রোগী আসিয়াই সুস্থতা লাভ করিতে পারে। পাপিয়সী নারী হরিদাসের সাধুতা নষ্ট করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু কি হইয়াছিল তাহা কি জান না? সেই পাপিয়সী সাধুস্বভাবা হইয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজে কি এমন সকল লোক আইসে নাই, যাহারা অসাধু কামনায় আসিয়া সাধু হইয়া গিয়াছে? পীড়িত হইয়া আসিয়া সুস্থ দেহ লাভ করিয়াছে? ঈশ্বরের বিচিত্র লীলা ব্রাহ্মসমাজে সকলে দর্শন করুন। ঈশ্বর এবার স্বয়ং চিকিৎসক হইয়া এই ব্রাহ্মসমাজ চিকিৎসালয় খুলিয়াছেন। এস ব্যাধিগ্রস্ত ভাই ভগ্নি! আরোগ্য লাভ করিয়া সুস্থ, সুখী ও সুন্দর হও। এ গৃহ ছাড়িয়া আর কেহ রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিও না, ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

পরীক্ষাই জীবন লাভের উপায়।

(১০ই জুন রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত উপদেশ)

সর্ব্বাগ্রে যীশুর অন্যতম শিষ্য জেমসের পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

১। "ভ্রাতৃগণ, যখন তোমরা বিবিধ পরীক্ষা প্রলোভনে পতিত হও, তখন আনন্দ কর। জানিও বিশ্বাসের পরীক্ষাতে ধৈর্য্য শিক্ষা হয়।

২। কিন্তু ধৈর্য্যের কার্য্য যেন সম্পূর্ণ হয়, তাহা হইলে তোমরা পূর্ণ ও খাঁটি হইবে, কিছুরই অভাব থাকিবে না।

৩। তোমাদের মধ্যে যদি কাহারও জ্ঞানের অভাব হয়, ঈশ্বরের নিকট জ্ঞান ভিক্ষা কর। তিনি সকল মনুষ্যকেই মুক্তহস্তে দান করেন, প্রার্থনা করিলে তিরস্কার করেন না। যে চাহিবে, সে পাইবে।

৪। যিনি চাহিবেন, তিনি যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত চান, কিছুমাত্র সংশয় না করেন। যে ব্যক্তি সন্দেহ করে, সে সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় তাড়িত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। সে ব্যক্তি যেন মনে না করে যে, ঈশ্বরের নিকট হইতে কিছু পাইবে।

৫। দ্বিধাযুক্ত লোক সকল কার্য্যেই অস্থির ও অনিশ্চিত।

৬। নিম্নপদস্থ লোক উন্নত হইলে আনন্দ করুক, কিন্তু ধনী লোক অবনত হইয়া যেন আনন্দ করে, কারণ ঘাসের ফুলের ন্যায় তাহার গৌরব উড়িয়া যাইবে।

৭। সূর্য্য প্রখর তাপে উদিত হইতে না হইতে ঘাস শুকাইয়া যায় এবং তাহার ফুল ঝরিয়া পড়ে, তাহার লাবণ্য অদৃশ্য হয়। ধনী লোকের গতি এইরূপ।

৮। যে ব্যক্তি প্রলোভনে স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হন, তিনি ধন্য। কারণ পরীক্ষান্তে তিনি ঈশ্বরের হস্তে জীবনের মুকুট লাভ করিবেন। যাহারা প্রভু পরমেশ্বরকে ভাল বাসে, তাহাদিগকে এই পুরস্কার দানে তিনি প্রতিশ্রুত।

৯। প্রলোভনের সময় কোন ব্যক্তি যেন না বলে যে, ঈশ্বর তাহাকে প্রলোভনে ফেলিতেছেন, কারণ ঈশ্বর স্বয়ং পাপদ্বারা আকৃষ্ট হন না এবং তিনি কাহাকেও পাপে আকর্ষণ করেন না। প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার কুবাসনাদ্বারা ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া প্রলোভনে পড়ে ও তাহাদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

১০। কুবাসনা হইতে পাপের উৎপত্তি, পাপ অনুষ্ঠিত হইলে তাহার ফল মৃত্যু।

১১। ভ্রাতৃগণ, ভ্রান্ত হইও না। জানিও প্রত্যেক কল্যাণকর ও পবিত্র দান স্বর্গ হইতে—স্বর্গাধিপতি পরমেশ্বরের হস্ত হইতে আসিতেছে, যাঁহার কোন পরিবর্ত্তন নাই এবং যিনি সর্ব্বকাল নির্বিকম্প।

১২। তিনি আপনার ইচ্ছায় সত্যভাবে আমাদিগকে উৎপন্ন করিয়াছেন। আমরা সকল জীবের মুখপাত্র হইব, এই তাঁহার উদ্দেশ্য।

১৩। এই জন্য প্রিয় ভ্রাতৃগণ, প্রত্যেকে সদুপদেশ শ্রবণে তৎপর হও, কথা কম বল এবং ক্রোধ সংযম কর। মানুষের ক্রোধে ঐশ্বরিক সাধুভাব উৎপন্ন হয় না।

১৪। অতএব সকল মলিনতা ও শঠতা পরিহার কর এবং নম্রভাবে সেই উপদেশ শ্রবণ কর, যাহাতে আত্মা পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হইবে।

১৫। তোমরা উপদেশ অনুসারে কার্য্য কর, তাহা কেবল শ্রবণ করিয়া আত্মবঞ্চনা করিও না।

১৬। যে ব্যক্তি উপদেশ শুনিয়া তাহার মত কার্য্য না করে, সে আপনার মুখ দর্পণে দর্শন করে। সে আপনাকে দেখে, চলিয়া যায় এবং কিপ্রকার মনুষ্য, তখনি ভুলিয়া যায়।

১৭। যে ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রকৃত নিয়ম অবগত হয়, তদনুরূপ আচরণ করে, সে ব্যক্তি ভ্রান্ত শ্রোতা নয়, কিন্তু কার্য্যানুষ্ঠায়ী, সেই ঈশ্বরের নিকট পুরস্কার লাভ করিবে।

১৮। তোমাদের মধ্যে কোন ভ্রাতা যদি আপনাকে ধার্ম্মিক মনে করে এবং রসনাকে শাসন না করে, তবে সে ভ্রান্ত। আত্ম প্রবঞ্চিত এবং তাহার ধর্ম্ম মিথ্যা।

১৯। পবিত্র ধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে পরমপিতা পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে নির্ম্মল হওয়া চাই, অনাথ ও বিধবাদিগের দুঃখের সংবাদ লইলে এবং কলঙ্কের সংসারে আপনাকে নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারিলে এই ধর্ম্মের অধিকারী হওয়া যায়।”

এই নিদারুণ গ্রীষ্মে কতস্থান হইতে সূর্য্যের বিরুদ্ধে কত অভিযোগ উপস্থিত হইতেছে। সূর্য্য জলাশয় সকল শুষ্ক করিয়া পথ সকল ধূলিময় করিতেছে, জলচর স্থলচর জীবদিগকে জীবন্মৃত করিয়া ফেলিতেছে, যে সকল স্থান পর্ব্বতাকীর্ণ বালুকারণ্যে বেষ্টিত, সেখানে বাস করা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, কত স্থানের জলকষ্ট অবর্ণনীয়। কিন্তু সূর্য্য কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া আরও তাপ দিবার জন্য প্রস্তুত। সূর্য্যের এরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি? ইহাতে তাহার নিজের কোন স্বার্থ নাই, পৃথিবীর হিতের জন্যই পৃথিবীকে তাতাইয়া তাহার রস সকল শোষণ করিয়া লইতেছে। লবণাক্ত সলিল, পঙ্কিল জলাশয় সকল হইতে জল তুলিয়া তাহা নির্ম্মল ও সুস্বাদু করিয়া পৃথিবীময় ছড়াইবে যেখানে যেমন অভাব সেখানে সেই পরিমাণ জল যোগাইবে; সেই জলে হ্রদ, সরোবর তড়াগ প্রভৃতি পূর্ণ হইবে এবং তাহাদ্বারা ভূমি সকল আর্দ্র হইয়া জীবের সম্বৎসরের আহারোপযোগী বিবিধ ফল সস্য উৎপন্ন করিবে। পৃথিবী তাই নীরবে সকলি সহ্য করিতেছে এবং আপনার প্রকাশ্য ও লুক্কায়িত ভাণ্ডার হইতে রাজকীয় করস্বরূপ রস প্রদান করিতেছে। সূর্য্য পৃথিবীর বায়ু লইয়া তাহা বিশুদ্ধতর করিয়া পৃথিবীকে প্রত্যার্পণ করিতেছে। এইরূপে বাহ্য জগৎ রক্ষা পাইতেছে।

ধর্ম্মজগতে কি ঋতুভেদ নাই কখনও জীবনের বসন্তকাল—সকলি সরস, সকলি মধুর, সকলি অনুকূল। আবার অন্তর রাজ্যে নিদাঘ উপস্থিত হয়—কেবলি উত্তাপ, কেবলি শুষ্কতা, কেবলি কঠোর প্রতিকূল অবস্থা। সমাজগত ভাবে, ব্যক্তিগত ভাবে এ ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে। যে ধর্ম্মমণ্ডলী ভক্তির স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল তাহাই ব্রহ্ম ডাঙ্গার মত কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। এক ফোঁটা জল সেখানে যাক, কঠোর তাপে তাহা শত সহস্র পরমাণুতে বিভক্ত হয়, আর জমে না, ক্রমাগত ছাড়াছাড়ি। ব্যক্তিগত জীবনে এই অগ্নি পরীক্ষা আরও ভয়ঙ্কর। স্বর্ণের গহনা রীতিমত যাঁহারা দেখিয়াছেন জানেন, স্বর্ণকে নিখাদ খাঁটি করিবার জন্য তাহাকে কত ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। এক পিণ্ড মাটি হইতে মৃত্তিকার ঘটও ঐরূপ হয়। এক ঘটী দুগ্ধ হইতে ঘৃত করিতে গেলেও তাহাকে ঐরূপ তাড়না যথেষ্ট সহ্য করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ প্রণালী দ্বারা সেই সকল বস্তু মহদুদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকে। ধর্ম্মজীবনের নিদাঘকালে তাহার উপর কত দুঃখ দারিদ্র্য বিপদের পরীক্ষা হয়। এত কষ্ট, এত অপমান, এত লাঞ্ছনা যন্ত্রণা! কিন্তু যিনি পরীক্ষক, আরও ক্লেশ দেন। ইহার শেষ ফল এই হয় যে, জীবন হইতে মলিন প্রবৃত্তি সকল বিদায় লইয়া স্বর্গের ভাবে তাহা পূর্ণ করে। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নানক, কবীর, বুদ্ধ,

ঈষা, মুসা, মহম্মদ সকলের জীবনে দেখ এই পরীক্ষা। বর্ত্তমান-কালের সাধুগণের জীবনেও এই পরীক্ষা দৃষ্ট হয়। এক একটী সাধুজীবন এই পরীক্ষা দ্বারা স্বর্গীয়ভাবে গঠিত হইয়াছে।

গ্রীষ্মে পৃথিবী শিক্ষা দিতেছেন—ধৈর্য্য ও আত্মসমর্পণ। সে সূর্য্যের হাতে, সে আর কিছুই জানে না—সূর্য্য যেরূপে রাখে, সেইরূপে থাকে। তাহার বর্ষায় অগাধ জলরাশি, হাস্যময় শস্যক্ষেত্র, তাহার বসন্তের অতুল শোভাসৌন্দর্য্য এই তাপ হইতে। ধর্ম্মসাধক যদি ধৈর্য্যশীল হইয়া ঈশ্বরের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারেন, আত্মার অক্ষয় অন্নজলের ভাণ্ডার এবং আত্মার চিরবসন্ত শোভা তাহার লাভ হইবে। পরীক্ষার আগুনে গলিয়া নির্দোষ হইয়া যে আত্মা গঠিত হয়, তাহাই ভগবানের চরণে অলঙ্কাররূপ ধারণের উপযুক্ত হয়। পদ-দলিত হইয়া আগুনে পুড়িয়া পবিত্র অশ্রু গঙ্গাজলে যে ঘট পূর্ণ হয়, তাহাতেই দেবতার আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব বিশ্বাসিগণ পরীক্ষাতে নিরাশ ও নিরানন্দ না হইয়া আনন্দ করুন, কেননা তাহাতেই তাহার পরিত্রাণের উপায় হইবে।

ব্যাখ্যান-রত্নাবলী।

সাধনাশ্রম, ২৬এ ফেব্রুয়ারী।

য়ীহুদী ধর্ম্মগ্রন্থে নিম্নলিখিত বচনগুলি পাওয়া যায়:—

"আমি মেষ, প্রভু পরমেশ্বর আমার মেষপালক, আমার কিছুই অভাব হইবেনা। তিনি আমাকে সুশ্যামল, হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্রে শয়ন করান, তিনি আমাকে প্রশান্ত সলিলপূর্ণ জলাশয়ের নিকট লইয়া যান; তিনি আমার রুগ্ন আত্মাকে রোগ মুক্ত করিয়া থাকেন; তিনি তাঁহার নামেরই গুণে আমাকে মুক্তির পথে লইয়া যান; এমন কি আমাকে যদি মৃত্যুর অন্ধকার পূর্ণ উপত্যকা দিয়াও যাইতে হয়, তথাপি আমি ভয় করি না, কারণ তুমি আমার সঙ্গেই আছ। তোমার শাসনদণ্ড ও চালন যষ্টি দেখিলেও আমার সুখ হয়, তুমি আমার বিপক্ষগণের সমক্ষে আমার জন্য সুখাদ্য সকল প্রস্তুত করিয়াছ; তুমি আমার মস্তককে সুবাসিত তৈলে অভিষেক করিয়াছ; আমার জীবন পাত্রে সুখ ধরিতেছে না, তোমার কৃপা ও মঙ্গলভাব যে চিরজীবন আমার সঙ্গে থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমি চিরদিন প্রভু পরমেশ্বরের গৃহেই থাকিব।"

মেষ ও মেষপালকের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, তাহা যদি পরমেশ্বর সঙ্গে আমাদের হয়, তবে আমরা বলিতে পারি যে তিনি আমাদের মেষপালক। কিন্তু আমরা ঐ য়ীহুদি ভক্তের ন্যায় এমন তেজের সহিত এ কথা বলিতে পারিব না, কারণ ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সে সম্বন্ধ হয় নাই।

মেষপালকের সঙ্গে মেষের কি সুন্দর সম্বন্ধ! সে তাহার কণ্ঠের রব শুনিয়া আনন্দিত হয়। প্রভুর আদেশ শুনিবামাত্র ছুটিয়া যায়। মেষপালক তাহাকে শাস্তি দিতেছে, আঘাত করিতেছে, তথাপি সে তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া চলিতেছে, তাহার আদেশ পালন করিতেছে। কোথায় চলিতে হইবে, কোথায় জলপান করিতে হইবে, কোথায় বিশ্রাম করিতে হইবে, তাহা মেষপালক জানে। তিনি তাহাকে ক্ষুধার সময় হরিদ্বর্ণ শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে লইয়া যান, তিনি তাহাকে পিপাসার সময় সুশীতল প্রস্রবণের নিকট লইয়া যান, তিনি তাহাকে বিশ্রামের জন্য সুশীতল বৃক্ষের ছায়ার নিকট লইয়া যান। তাহার শরীরে ক্ষত হইলে তিনি সেই ক্ষত স্থানে ঔষধ লেপন করিয়া দেন। এই সকলের জন্য মেষকে ভাবিতে হয় না। সে কেবল প্রভুর ইঙ্গিতে চলিয়া থাকে।

আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি, প্রভু পরমেশ্বরের ইঙ্গিত অপেক্ষা করি কিনা এবং সেই অনুসারে চলি কিনা।

তৎপরে তাহার শাসনদণ্ড, শাস্তিতে আনন্দ। বিধাতার শাস্তি যখন পাই তখন কি আনন্দ হয়? "বেশ হইয়াছে" একথা কি বলি? শাস্তি যদি দেন তবেত প্রেম আছে। মেষপালকের শাসন দণ্ড দেখিয়া, মেষ আনন্দে ছোটে। কেন না তাহাতে সে প্রেম দেখিতে পায়। আমরা কি প্রভু পরমেশ্বরের প্রেম দেখিয়া আনন্দিত হই?

তাহার পর কোথায় বসিব প্রভু জানেন, কোথায় শীতল ছায়াযুক্ত গাছ আছে প্রভু তাহা জানেন, কোথায় সুশীতল বাড়ী আছে প্রভু জানেন; এসকল বিষয়ের জন্য কি তাঁহার উপর নির্ভর আছে?

যতই অনুসন্ধান করি ততই দেখি, মেষ ও মেষপালকের সঙ্গে যে সম্বন্ধ পরমেশ্বরের সঙ্গে আমাদের সে সম্বন্ধ নাই। সেই জন্য বলিতে পারি না "তোমার কৃপা ও মঙ্গলভাব যে চির-জীবনে আমার সঙ্গে থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই, আমি চিরদিন প্রভু পরমেশ্বরের গৃহে থাকিব।" প্রভু কৃপা করুন আমরা যেন তাহার প্রতি নির্ভর করিয়া একথা বলিতে পারি।

ব্রাহ্মসমাজ।

উত্তরবঙ্গ-প্রচারযাত্রীদলের কার্য্যবিবরণ—বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু হরিমোহন ঘোষাল এবং বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ প্রচারার্থে উত্তরবঙ্গে গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রচার বিবরণ এই;—

১৯এ মে, প্রাতঃকালে, বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং বাবু হরিমোহন ঘোষাল রামপুরহাট উপস্থিত হইয়া, বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষের গৃহে পারিবারিক উপাসনা করেন। রাত্রিতে রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা এবং "ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কে করিবে"; এই সম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হয়। মহেন্দ্র বাবু উভয় স্থলেই উপাসনাদি করেন।

২০এ মে, প্রাতে উষাকীর্ত্তন করিয়া যাত্রীদল নলহাটী গমন করেন। পূর্ব্বাহ্ণে বাবু নীলকান্ত সিদ্ধান্তের গৃহে পারিবারিক উপাসনা হয় এবং "ব্রাহ্মপরিবার ঈশ্বরের পবিত্র আশ্রম" বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হয়। মহেন্দ্র বাবু উপাসনাদি করেন। সন্ধ্যার সময় নলহাটী নৈশবিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ সভায় মহেন্দ্র বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্থানীয় সকল ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত হন। ৩০।৩৫ জন ছাত্রকে নানা-

বিধ পুস্তক এবং পেনসীল, হ্যাণ্ডেল, দোয়াত প্রভৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়। হরিমোহন বাবু এবং সভাপতি মহাশয় ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদান করেন। তৎপরে ছাত্রদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক আম এবং মিষ্টান্ন ভোজন করান হয়। রাত্রিতে উপাসনা হয় এবং "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কি?" এই সম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হয়। হরিমোহন বাবু উপাসনাদি করেন।

২১এ মে উষাকীর্ত্তন করিয়া দিবসের কার্য্য আরম্ভ হয়। স্নানান্তে নীলকান্ত বাবুর গৃহে পারিবারিক উপাসনা এবং "ব্রাহ্মদিগের গুরুতর দায়িত্ব" সম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হয়। বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ উপাসনা করেন। সন্ধ্যার সময় নলহাটী বাজারে কীর্ত্তন হয় এবং বাবু হরিমোহন ঘোষাল একটী সবল হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কি? সাধারণকে বুঝাইয়া দেন। রাত্রিতে নীলকান্ত বাবুর গৃহে উপাসনা হয়।

২২এ মে, যাত্রীদল প্রাতঃকালে রামপুরহাটে গমন করেন এবং বাবু যুগলকৃষ্ণ সরকারের গৃহে উপাসনা ও "ঈশ্বরই তৃপ্তির হেতু" বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হয়। মহেন্দ্র বাবু উপাসনাদি করেন। রাত্রিতে বাবু যদুনাথ রায়ের গৃহে উপাসনা হয় এবং "একটী পাপীও পরিত্যক্ত হইবে না" বিষয় উপদেশ প্রদত্ত হয়। মহেন্দ্র বাবু উপাসনা করেন।

২৩এ মে, উষাকীর্ত্তন। স্নানান্তে বাবু শিরীশচন্দ্র সোমের গৃহে উপাসনা ও প্রীতিভোজন হয়। হরিমোহন বাবু উপাসনা করেন। "ব্রাহ্মগণ পৌত্তলিক অনুষ্ঠানাদিতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ এবং রক্ষা করিতে পারেন কি না" সম্বন্ধে আলোচনা হয়। রাত্রিতে বাবু চন্দ্রকুমার রায়ের গৃহে উপাসনা হয়।

২৪এ মে, "ব্রাহ্মণী গ্রামে" উষাকীর্ত্তন হয়। বাবু পূর্ণচন্দ্র দাসের গৃহে উপাসনা হয়। মহেন্দ্র বাবু উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনা হয়, বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ উপাসনা করেন। রাত্রিতে বাবু অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে হরিমোহন বাবু উপাসনা করেন। উপাসনান্তে প্রীতিভোজন হয়।

২৫এ মে, প্রত্যূষে বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষের গৃহে পারিবারিক উপাসনা হয়। মহেন্দ্র বাবু উপাসনা করেন। তৎপরে যাত্রীদল নলহাটী হইয়া মুর্শীদাবাদ অভিমুখে গমন করেন।

২৬এ মে শনিবার রাত্রি ২টার সময় যাত্রীদল নশীপুরে উপস্থিত হন। পরদিন স্নানান্তে স্থানীয় ডাক্তার বাবু জানকীনাথ সেনের গৃহে বাবু মহেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় পারিবারিক উপাসনা করেন। রাত্রিতে জানকী বাবুর গৃহে স্থানীয় ব্রাহ্মগণ সমবেত হন। বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ উপাসনা করেন এবং "ব্রাহ্মজীবনের গুরুতর দায়িত্ব" সম্বন্ধে উপদেশ দেন।

২৭এ মে রবিবার নশীপুরে উষাকীর্ত্তন করিয়া যাত্রীদল মুর্শীদাবাদে গমন করেন। মধ্যাহ্নে বাবু রামগোপাল রায়ের গৃহে পারিবারিক উপাসনা হয়। রাত্রিতে মুর্শীদাবাদ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন এবং "ঈশ্বর জীবের পরম গতি" সম্বন্ধে উপদেশ দেন।

২৮এ মে সোমবার স্থানীয় ডাক্তার বাবু সুরেন্দ্রনাথ দত্তের গৃহে রামপুর হাট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু লোকনাথ দত্তের দ্বিতীয়া কন্যার নামকরণ হয়। কন্যার নাম নীলোৎপলা রাখা হয়। মহেন্দ্র বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। রাত্রিতে সুরেন্দ্র বাবুর গৃহে আলোচনার জন্য সকলে সমবেত হন। কুঞ্জ বাবু প্রার্থনা করিলে পর, বাবু হরিমোহন ঘোষাল "Blessed are they that suffer for righteousness-sake, for they shall inherit the kingdom of Heaven', বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করেন। উপস্থিত সকলেই আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

২৯এ মে মঙ্গলবার প্রাতে যাত্রীদল নশীপুরে প্রত্যাগমন করেন। প্রাতে বাবু জগন্নাথ প্রসাদ গুপ্তের গৃহে মহেন্দ্র বাবু উপাসনা করেন এবং উপদেশ দেন। বৈকালে সমবেত বন্ধুদিগকে লইয়া বিশেষ আলোচনা হয়। "পরিবার গঠন" এবং "জাতিভেদ" আলোচ্য-বিষয় ছিল। রাত্রিতে কুঞ্জ বাবু উপাসনা করেন এবং হরিমোহন বাবু উপদেশ দেন। জগন্নাথ বাবু সমবেত সকলকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করান। জগন্নাথ বাবুর স্ত্রী এবং ভগ্নী যাত্রীদলকে সদয় এবং সস্নেহ ব্যবহারে যারপর নাই আপ্যায়িত করিয়াছেন।

৩০এ মে বুধবার উষাকীর্ত্তন করিয়া যাত্রীদল মুর্শীদাবাদে প্রত্যাগমন করেন। মধ্যাহ্নে বাবু রামগোপাল রায়ের গৃহে মহেন্দ্র বাবু পারিবারিক উপাসনা করেন। বৈকালে মুর্শীদাবাদ টাউন হলে বাবু কুঞ্জ লাল ঘোষ এবং বাবু হরিমোহন ঘোষাল "স্বাভাবিক ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা স্থলে শতাধিক লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতায় কুঞ্জ বাবু অভ্রান্ত শাস্ত্রপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করেন এবং হরিমোহন বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা, উদারতা এবং স্বাভাবিকত্ব সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন।

৩১এ মে, বৃহস্পতিবার, আজ মুর্শীদাবাদ ব্রাহ্ম সমাজের জন্মোৎসব। প্রাতে মহেন্দ্র বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "Ask and ye shall find, knock and the door shall be opened unto you" এই বাক্য অবলম্বন করিয়া উপদেশ প্রদান করেন। ৫টার সময় আলোচনা হয়। রাত্রিতে বাবু হরিমোহন ঘোষাল আচার্য্যের কার্য্য করেন। "ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত সবল থাকে" এই বিষয়ে উপদেশ দেন।

১লা জুন, শুক্রবার যাত্রীদল আজিমগঞ্জে উপস্থিত হন। মধ্যাহ্নে স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার বাবু আশুতোষ গুপ্তের গৃহে উপাসনা হয়। কুঞ্জ বাবু উপাসনা করেন। তৎপরে কীর্ত্তন করিয়া যাত্রীদল রাত্রির গাড়ীতে নলহাটী উপস্থিত হন।

মুর্শীদাবাদ অঞ্চলে ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক বিক্রয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং পত্রিকাদির অনাদায়ী টাকা আদায় এবং সাধনাশ্রমের জন্য দান সংগৃহীত হইয়াছে। বন্ধুদিগের নিকট হইতে আশাতীত স্নেহ এবং সহায়তা পাইয়া যাত্রীদল উপকৃত এবং কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রভু পরমেশ্বর তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সকল কার্য্যের সহায়তা করিতেছেন।

কুমারী কুমুদিনী ঘোষ যাত্রীদলের সঙ্গে নশীপুর ও মুর্শীদাবাদে গমন করিয়া কয়েকটী পরিবারে মহিলাদিগকে লইয়া উপাসনা এবং আলোচনাদি করিয়াছেন। প্রভু পরমেশ্বর

তাঁহার জীবনকে ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্ম প্রস্তুত করুন। যাত্রীদল যেথানে যাইতেছেন সেথানেই ওয়ার্কারের অভাব বিশেষরূপে অনুভব করিতেছেন। প্রভু পরমেশ্বর আমাদের সে অভাব দূর করুন।

উৎসব—টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র তথায় গমন করেন। ৩রা জুন পূর্ব্বাহ্নে সমাজ মন্দিরে উদ্বোধন সূচক উপাসনা হয়, বাবু প্যারীমোহন দে উপাসনা করেন। অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় বাবু দুর্গানাথ চক্রবর্ত্তীর গৃহে সকলে সমবেত হইলে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র ঈশোপনিষদের কিয়দংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। রাত্রিতে বাবু রাসবিহারী সেনের বাড়ীতে উপাসনা হয়, কৃষ্ণকুমার বাবু উপাসনা করেন। ৪ঠা জুন উৎসবের দিন। পূর্ব্বাহ্নে সমাজ মন্দিরে কৃষ্ণ বাবু উপাসনা করেন এবং "ব্রাহ্মসমাজের মত ও উপাসনা প্রণালী" সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন, উপাসনা ও উপদেশ অতি গভীর হইয়াছিল। অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। রাত্রিতে বাবু নৃত্যহরি মিত্রের বাসায় সকলে সম্মিলিত হইলে কৃষ্ণ বাবু উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

বগুড়া ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় তথায় গমন করেন। ২৮এ ২৯এ এপ্রেল দুই দিন উৎসব হয়। এতদুপলক্ষে উপাসনা, সংকীর্ত্তন পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং বক্তৃতাদি হয়। "ধর্ম্মই জীবন" এ বিষয়ে স্থানীয় টমসন হলে নবদ্বীপ বাবু বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। নবদ্বীপ বাবু উক্ত স্থানে "ধর্ম্ম জীবন কি?" এ সম্বন্ধে আর একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

বিবাহ—সম্প্রতি মফঃস্বলে তিনটী ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরিশালে আমাদের পরলোকগত বন্ধু বাবু সর্ব্বানন্দ দাস মহাশয়ের পুত্র বাবু সত্যানন্দ দাসের সহিত, বাবু চন্দ্রনাথ দাসের কন্যা শ্রীমতী কুসুমকুমারী দাসের এবং বাবু মনমোহন চক্রবর্ত্তীর সহিত সর্ব্বানন্দ বাবুর কন্যা শ্রীমতী প্রেমদা দাসের বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। উভয় বিবাহেই শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু দুকড়ি ঘোষের পুত্র শ্রীমান জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের সহিত বাঁকিপুর নিবাসী বাবু প্রকাশচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ উক্ত স্থানে সম্পাদন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। সকল বিবাহই রেজেষ্টরী হইয়াছে। পরমেশ্বর নব দম্পতিদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নামকরণ—নলহাটির বাবু নীলকান্ত সিদ্ধান্তের প্রথম পুত্রের নামকরণ উক্ত স্থানে গত ২রা জুন তারিখে সম্পাদিত হইয়াছে। বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন। বালকের নাম নির্ম্মলকুমার রাখা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে নীলকান্ত বাবু সাঃ ব্রাঃ সমাজে ১৲ এবং সাধনাশ্রমে ৩৲ টাকা দান করিয়াছেন। পরমেশ্বর বালককে ধর্ম্মপথে রক্ষা করুন।

দান—বাবু সত্যরঞ্জন খাস্তগিরি পরলোকগত সহধর্ম্মিণীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে ৩৲ ও দাতব্য বিভাগে ১৲ এবং সাধনাশ্রমে ৩৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা দাতাকে কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতেছি।

রবিবাসরিক দৈনিক বিদ্যালয়ের সহকারী সম্পাদক লিখিয়াছেন:—আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দান স্বীকার করিতেছি—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু ২০৲ শ্রীযুক্তা কুমুদিনী খাস্তগির ১০৲ শ্রীযুক্তা শৈলবালা রায় ৬৲।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার—কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ নিম্নলিখিত মহোদয় ও মহোদয়াগণ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর—শ্রীযুক্ত মজুমদার এণ্ড কোং কলিকাতা ॥০, পি, এন, দত্ত স্কোয়ার ৫৲, বাবু অভয়াচরণ মল্লিক কলিকাতা ॥০, বাবু অমলধন পাল ॥০, বাবু মাখনলাল ঘোষ ॥০, বাবু হেমচন্দ্র দে ।০, বাবু যোগেশচন্দ্র কুণ্ডু ।০, বাবু পরেশ নাথ বিশ্বাস ১৲, শ্রীযুক্তা অম্বিকা দেবী কোন্নগর ২৲, বিদ্যাসাগর স্কুল ছাত্রগণ ৫৲, বাবু হেমচন্দ্র সুর কলিকাতা ॥০, বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী ১৲, বাবু আর, এন, চক্রবর্ত্তী ॥০, আর ভেন কাটা সি, ডু বিজোদার ১৲, বাবু সাতকড়ি দেবের ভগ্নি ১৲, ময়মনসিং ফেমিন দুর্ভিক্ষফণ্ড হইতে বাবু শ্রীনাথ চন্দ পাঠান ৫০৲, বাবু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ১৲, বাবু প্রসন্ন দাস গুঁই মাং বাবু বটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় নদীয়া ।০, জনৈক ভদ্রলোক কাকিনীয়া মাং বাবু যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৫৲, কুমারী কে, বসু মেদিনীপুর ২৲, বাবু অধরচন্দ্র মজুমদার মাণিকদহ ॥০, বাবু ললিতমোহন মল্লিক ঐ ৫৲, বাবু হরিদাস দে গিরিধি ১৲, একটী বন্ধু কলিকাতা ১৲, মোট ৮৫।০।

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ,
ধনাধ্যক্ষ সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

ভ্রম সংশোধন—মনাই চা বাগান হইতে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল হালদার লিখিয়াছেনঃ—"মহাশয়! গত ১৫ই বৈশাখের তত্ত্বকৌমুদীতে "ব্রাহ্মসমাজ" কলমে "দীক্ষা" শীর্ষকে কয়েকটি ভুল লেখা হইয়াছে, তাহা সংশোধন করা আবশ্যক। (১) দীক্ষিত যুবকের নাম "বলেশ্বর" আগরওয়ালা নয়, "বনেশ্বর" আগরওয়ালা। (২) আমি দারজীলিং নিবাসী নহি, তবে তথায় বহুদিন কার্য্যোপলক্ষে ছিলাম, যেমন এখানেও বহুদিন আছি। আমার পৈত্রিক নিবাস বারাকপুরে। (৩) আমার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কোন প্রকার রীতিমত চেষ্টা হইতেছে না। আপনি এসম্বন্ধে আমার নাম উল্লেখ করাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। মহান ঈশ্বরই তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। আমার ন্যায় দীনহীন পাপীর পক্ষে মহান ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রচার করা অসম্ভব।"

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১লা আষাঢ় প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

৬ষ্ঠ সংখ্যা। ১৭শ ভাগ। | ১৬ই আষাঢ় শুক্রবার, ১৮১৬ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বলে ৩৲ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে প্রভো! ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই প্রার্থনাকে জীবনের সম্বলরূপে ধরিয়াছি, কিন্তু সময়ে সময়ে দুর্ব্বলতা এতই অধিক হয়, আত্মশাসনে অসমর্থ হইয়া প্রবৃত্তির জালে এমনি জড়িত হইয়া পড়ি যে, তখন বার বার প্রার্থনা করিয়াও যেন জীবনের নিম্নাভিমুখী স্রোতকে ফিরাইতে পারি না। অবশেষে এমন যে জীবনের সম্বল প্রার্থনা তদুপরিও আর আশা রাখিতে পারি না। এইরূপে কি প্রার্থনাতে অবিশ্বাসী হইয়া পড়িব? নিরাশার হস্তে আপনাদিগকে সমর্পণ করিয়া নিম্নাভিমুখী স্রোতেই কি ভাসিয়া যাইব? তুমি ত বিচিত্র-কর্ম্মা পুরুষ; তুমি যুগে যুগে ভক্ত-হৃদয়ে বিচিত্র কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়াছ। যখন মানবের বিশ্বাস-বিহীন চক্ষু নিরাশার ঘন কুজ্ঝটিকা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় নাই, তখন তুমি আশার আলোক দেখাইয়া বিস্মিত করিয়াছ; ভূপতিত ভগ্ন-হৃদয় পাপীকে করে ধরিয়া তুলিয়া দণ্ডায়মান করিয়াছ। আমাদের জীবনেও ত হে বিধাতা! তুমি আপনার অপার কৃপার ও বিচিত্র শক্তির অনেক নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছ। তোমার সেই কৃপা স্মরণ করিয়া ও তোমার সেই জীবন্ত শক্তির আশ্রয়প্রার্থী হইয়া তোমার চরণে শরণাপন্ন হইতেছি। আমাদিগকে নিরাশাতে ডুবিতে দিও না, নিম্নাভিমুখী স্রোতে ভাসিয়া নীচ হইতে দিও না; তোমার কৃপার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আমাদিগকে ধারণ কর; প্রবৃত্তির জাল হইতে উদ্ধার কর; তোমার পথে সুপ্রতিষ্ঠিত কর।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

জোয়ার ভাঁটা—জোয়ার ভাঁটা যে কেবল নদীর স্রোতেই খেলে তাহা নহে, মানবের জীবনের স্রোতেও জোয়ার ভাঁটার আধিপত্য দেখা যায়। আমাদের চিন্তা ভাব ও কার্য্য সকল বিষয়েই জোয়ার আছে এবং ভাঁটাও আছে। এই জোয়ার ভাঁটার কারণ কি? তাহা সকল সময়ে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। কিন্তু আমরা একটু আত্ম-দৃষ্টি-পরায়ণ হইলে সকলেই ইহা লক্ষ্য করিতে পারি। নদীতে যখন জোয়ার আসে, তখন কেমন কানায় কানায় জল বহিতে থাকে। জল-স্রোতের সেই পূর্ণতা ও সেই গতি দেখিলেও কত আনন্দ হয়! নদীগর্ভে নয়নের অপ্রীতিকর যে কিছু বস্তু আছে, সমুদয় জলরাশি মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকে, সে সকল কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন ভাঁটা পড়ে, তখন নদীর বিশীর্ণতা উপস্থিত হয়! জলরাশি পঙ্কিল ও কর্দ্দমাক্ত হইয়া কোথায় নদীগর্ভে লীন হইয়া থাকে; এবং তখন ভগ্ন বৃক্ষ, মগ্ন নৌকার খণ্ড সকল, ইষ্টক, প্রস্তর, ভগ্ন কলস, নরাস্থি, গবাস্থি প্রভৃতি যে সকল নয়নের অপ্রীতিকর পদার্থ জোয়ারের জলে নিমগ্ন ছিল, সমুদয় প্রকাশ হইয়া পড়ে। তখন আমরা নদীর ভিতরকার দুর্ব্বলতা জানিতে পারি। মানব-চরিত্রের জোয়ার ভাঁটাও এই প্রকার। যখন ধর্ম্মভাবের জোয়ার প্রবলবেগে বহিতে থাকে, তখন আমাদের উৎসাহ, অনুরাগ, বিশ্বাস ও আশার জল কানায় কানায় উঠিয়া থাকে। তখন আমাদিগকে যে দেখে তাহার সুখ হয়; আমাদের কথা যে শুনে তাহার সুখ হয়, আমাদের সহিত যে মিলিত হয়, তাহার মন মুগ্ধ হয়। আমাদের চরিত্রের গূঢ় দুর্ব্বলতা সকল তখন প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু সকল সময়ে এই জোয়ার জীবনে স্থায়ী হয় না; আবার ভাঁটা পড়ে। যখন ভাঁটা পড়ে, তখন জীবন-স্রোত নিম্নাভিমুখেই বহিতে থাকে। কোনও রূপেই সে স্রোতকে নিবারণ করিতে পারা যায় না। সে স্রোতকে ফিরাইবার জন্য যত কিছু উপায় অবলম্বন করি, সকলি ব্যর্থ হইয়া যায়। বার বার প্রার্থনা করি, সকলি বিফল হয়। এই সময়ে আমাদের চরিত্রের ভিতরকার দুর্ব্বলতা সকল প্রকাশ হইয়া পড়ে; আমাদের প্রকৃতির অন্তস্তলের কুৎসিত পদার্থ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। জীবনের এই ভাঁটার সময় একটা বিপদ ঘটিয়া থাকে। যাঁহাদের প্রকৃতিতে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার ভাগ অল্প, তাঁহারা এই অবস্থাতে পড়িলে, কিছুদিনের মধ্যেই প্রার্থনাতে অবিশ্বাসী হইয়া পড়েন। আপনাদের জীবনের অধোগতি দেখিয়া ব্যাকুল চিত্তে বার বার প্রার্থনা করিতে থাকেন; এবং তদনুরূপ ফল না দেখিয়া ভগ্ন-হৃদয় হইয়া যান। অবশেষে

নিরাশা তাঁহাদের অন্তরকে গ্রাস করে; এবং জীবন-স্রোতকে ফিরাইবার চেষ্টা বিফল জানিয়া তাঁহারা সেই স্রোতে গা ভাসাইয়া দেন। যদি ধৈর্য্য ও বিশ্বাসের দৃঢ়তার প্রয়োজন কখনও থাকে, তবে তাহা এই জীবনের ভাঁটার সময়ে। যেমন ঝড়ে পড়িলে লোক একটা কোনও সুদৃঢ় পদার্থ ধরিয়া থাকে, পাছে ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া যায়, অথবা নদীর প্রবল স্রোতে পড়িলে যেরূপ লোকে নৌকার নঙ্গরের কাছি প্রাণপণে ধারণ করিয়া থাকে, পাছে ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ এই অবস্থাতেও প্রার্থনাকে সুদৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকিতে হয়। সেইরূপ জীবনের এই ভাঁটার টানের মধ্যেও প্রার্থনারূপ নঙ্গরের কাছি ছাড়িতে নাই, তাহা হইলে ভাসিয়া যাইতে হয়। জগদীশ্বর আমাদিগকে এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা প্রদান করুন।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী—আমরা যতই চিন্তা করিতেছি, ততই এতদ্দেশীয় প্রাচীন শিক্ষা প্রণালীর পক্ষপাতী হইতেছি। আমাদের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী এই ছিল;—প্রত্যেক ব্রাহ্মণ সন্তানকে গর্ব্ভাষ্টম বর্ষে উপনীত করিয়া বিদ্যা লাভার্থ গুরুকুলে অর্থাৎ আচার্য্যের গৃহে রাখা হইত। এক একজন আচার্য্য যত সংখ্যক বালকের শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতেন, তত সংখ্যক বালককেই নিজ ভবনে স্থান দান করিতেন। বিদ্যার্থিগণ আচার্য্যের পরিবার মধ্যে গণ্য হইয়া আচার্য্য-পত্নীকে জননী সম্বোধন করিত, আচার্য্যের পুত্র কন্যাদিগকে ভাই ভগিনীরূপে দেখিত। আচার্য্য অনেক সময়ে অপেক্ষাকৃত জ্ঞান-বৃদ্ধ ছাত্রদিগকে শিক্ষকতা কার্য্যে সহায়রূপে গ্রহণ করিতেন বটে, কিন্তু স্বয়ং প্রত্যেক ছাত্রের শিক্ষাকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন, ও প্রত্যেকের বিদ্যালাভ বিষয়ে মনোযোগী হইতেন। এই শিক্ষাকার্য্য প্রাতে, সন্ধ্যাতে রাত্রে, পথে ঘাটে চলিত। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় পরীক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না, আচার্য্যের সন্তোষলাভ করিতে পারিলেই, এবং ধনিগৃহে যজ্ঞাদি সভাতে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে শাস্ত্রীয় বিচারে নিপুণতা প্রদর্শন করিতে পারিলেই, একজন শিষ্য বিখ্যাত হইতেন ও পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট উপাধি-প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইবার উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। অন্ততঃ চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত এই শিক্ষা চলিত। এই কালের মধ্যে শিক্ষার্থিগণ দারপরিগ্রহ করিতে পারিতেন না; কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হইত। আচার্য্যগণ যে কেবল ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, দর্শন, বেদ বেদান্ত প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন তাহা নহে, গুরুভক্তি, বিনয়, সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টাও করিতেন। এইরূপে ছাত্রগণ এক একজন খ্যাতনামা আচার্য্যের নিকটে বহু বৎসর বাস করিয়া তাঁহাদের চরিত্র ও জ্ঞানানুরাগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া গৃহধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইত। আচার্য্যগণ ছাত্রদিগের নিকট কোনও প্রকার নির্দ্দিষ্ট ভৃতি বা অর্থ সাহায্য লইতে পারিতেন না। পাঠদ্দশা শেষ হইলে ছাত্রগণ অধিকাংশ স্থলে গুরুদক্ষিণা দিত বটে, কিন্তু সে সম্বন্ধেও কোনও নিয়ম ছিল না, যে যেরূপে দক্ষিণা সংগ্রহ করিতে পারিত, সে তাহাই দিত।

পূর্ব্বোক্ত শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল। প্রথম, এক এক আচার্য্য যতগুলির ছাত্রের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ করিতে সমর্থ, ততগুলির শিক্ষার ভার লইতেন ইহাতে প্রত্যেক বালকের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ থাকিত, অথচ দেশমধ্যে আচার্য্য সংখ্যা অধিক হইত। দ্বিতীয়তঃ চরিত্রবান ও জ্ঞানী পুরুষদিগের সংসর্গে থাকিয়া বালকগণ তদ্ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইত; তৃতীয়তঃ, বালকগণ যেমন গৃহ ও পরিবার ছাড়িয়া যাইত, তেমনি গৃহ ও পরিবার প্রাপ্ত হইয়া পারিবারিক শিক্ষার সুফল প্রাপ্ত হইত; চতুর্থতঃ, পরীক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকাতে, পরীক্ষাতে প্রশংসা লাভ অপেক্ষা জ্ঞানের গভীরতার দিকে অধিক দৃষ্টি থাকিত; পঞ্চমতঃ, ছাত্রদত্ত বেতনের উপর নির্ভর না থাকাতে আচার্য্যগণ অসংকোচে ও স্বাধীনভাবে স্বীয় স্বীয় অভীষ্ট প্রণালীতে জ্ঞানদান করিতে পারিতেন; ষষ্ঠতঃ, পাঠদ্দশাতে ব্রহ্মচর্য্যের রীতি থাকাতে বালকগণ অকালে হীনতেজ হইয়া পড়িত না। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই ইহার বিপরীত।

শ্রদ্ধাভক্তি—বর্ত্তমান সময়ে দেশের সর্ব্বত্রই এই এক ধ্বনি উঠিয়াছে যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ শ্রদ্ধা ভক্তি-বিহীন (irreverent) হইয়া উঠিতেছে। কলিকাতাতে এই অনিষ্ট আমরা গুরুতররূপে লক্ষ্য করিতেছি। রাজপথ দিয়া চারিটী বিদ্যালয়ের বালক, (যাহাদের বয়ঃক্রম ১৫ কি ১৬র অধিক হইবে না) যাইতেছে; অজ্ঞাতসারে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া তাহাদের কথোপকথনের প্রতি কর্ণপাত কর, তাহারা যেভাবে আপন আপন শিক্ষকের বা অপরাপর দেশের শ্রদ্ধেয় এমনকি তাহাদের পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের সমালোচনা করিতেছে, যে অভদ্র, অশ্লীল, ও ব্রীড়াজনক ভাষাতে তাঁহাদের দোষ-কীর্ত্তন করিতেছে, তাহা শুনিলে কর্ণে হাত দিতে হয়। ইহা দেখিয়া সকলেই শোক করিতেছেন, কিন্তু ইহার কারণ কেহই অনুসন্ধান করিতেছেন না। শ্রদ্ধা ভক্তি কি আকাশ হইতে পড়ে? না সভাতে বসিয়া লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিলে গড়ে? শ্রদ্ধার পাত্র যাঁহারা একপ ব্যক্তির সংসর্গে না রাখিলে মানব-চরিত্রে শ্রদ্ধা ভক্তি বাড়ে না। যেমন সন্তান ক্রোড়ে না ধরিলে, স্ত্রীলোকের অপত্যস্নেহ প্রকৃতভাবে ফোটে না; তেমনি শ্রদ্ধাভাজনের সাহায্য ব্যতীত শ্রদ্ধা ফোটে না। বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যালয়ের বালকগণ যে শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিহীন হইতেছে, তাহার কারণ বিদ্যালয়গুলির অবস্থা। বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যালয় স্থাপন করা একপ্রকার দোকানদারি হইয়াছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের জীবন ছাত্রদত্ত বেতনের উপরে নির্ভর করিতেছে, সুতরাং ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারকগণের প্রবল দৃষ্টি। ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। কলিকাতার কোন কোনও বিদ্যালয়ের এক এক শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা শতাধিক হইবে। এই শতাধিক বালকের শিক্ষার ভার যাঁহাদের হস্তে, তাঁহারা আবার

ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদল হইতেছেন। সুতরাং কোনও শিক্ষকই কোনও ছাত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে পারেন না। কাহারও সহিত আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপন হয় না। এরূপ স্থলে বালকদিগের চরিত্রে কি প্রকারে শ্রদ্ধাভক্তি বাড়িতে পারে? সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, যে ধর্ম্মই বল আর নীতিই বল সকলেরই ভিত্তি শ্রদ্ধা ভক্তির উপরে। এ ভিত্তি চরিত্রের অন্তস্তলে না থাকিলে সেখানে কোনও প্রকার আধ্যাত্মিক গুণ দাঁড়াইতে পারে না। সুতরাং এই শ্রদ্ধা-বিহীনতার যেরূপ ফলের আশা করা যায়, বঙ্গদেশের শিক্ষিত যুবকমণ্ডলীর মধ্যে সেই প্রকার ফলই ফলিতেছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই, এসম্বন্ধে ব্রাহ্ম পিতামাতার কর্ত্তব্য কি? তাঁহারা কি বর্ত্তমান অনিষ্টকারী শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে সন্তানদিগকে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন, না এতৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনও প্রকার কর্ত্তব্য আছে? কিরূপে তাঁহাদের সন্তানগণ শ্রদ্ধা-ভক্তি-সমন্বিত হইবে তাহার কি উপায় করিবেন? যে সকল ব্রাহ্ম পিতামাতা আপন আপন সন্তানদিগের শিক্ষার প্রতি নিজে মনোযোগ করিতে ও সেজন্য প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা সময় দিতে সমর্থ তাঁহাদিগের প্রতি পরামর্শ এই, তাঁহারা সন্তানদিগকে শ্রদ্ধা-ভক্তি সমন্বিত করিবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখুন। যাঁহাদিগের সেরূপ অবসর বা সুবিধা নাই, তাহাদিগের প্রতি পরামর্শ, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় সন্তানদিগকে উপযুক্ত ও শ্রদ্ধাভাজন ব্রাহ্ম শিক্ষকদিগের তত্ত্বাবধানে ও তাঁহাদের সহবাসে রাখিবার ব্যবস্থা করুন। ব্রাহ্ম বালকদিগের বোর্ডিংটী এই উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হইয়াছে। তাহার আরও উন্নতি বিধান করিয়া তাহাতে বালকদিগকে রাখিবার ব্যবস্থা করুন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও চরিত্রবান্ যে সকল শিক্ষক আছেন, তাঁহাদের পরিবার মধ্যে দুই চারিটী করিয়া বালক রাখা যাইতে পারে। ঐ সকল শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম বন্ধু যদি বালকদিগের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন, এবং সে জন্য যদি তাঁহাদিগকে অনন্যকর্ম্মা করিয়া দিতে পারা যায়, তাহা হইলে অনেক উপকার দর্শিতে পারে। আমরা বার বার এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেছি, কারণ আমরা দেখিতেছি ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব দিতে না পারিলে ভবিষ্যতে ব্রাহ্মসমাজের দুর্গতি অনিবার্য্য।

স্বার্থপরতার শাস্তি—রবীন্দ্রনাথ একটী সংগীতে বলিয়াছেন:—

"আপনি কেটেছে আপনার মূল,
না জানে সাঁতার নাহি পায় কূল।"

আপনি আপনার মূল কাটা বড় ভয়ানক কথা। সুপ্রসিদ্ধ কবি কালিদাসের বিষয়ে এরূপ লৌকিক কিম্বদন্তী আছে যে, তিনি যৌবনকালে এমনি অজ্ঞ ছিলেন যে, একদা এক তরু শাখাতে বসিয়া সেই শাখাই কাটিতেছিলেন। এ জগতে কেহ যদি আপনার মূল আপনি কাটে, সে, যে স্বার্থপর—সেই। স্বার্থপর মানুষ ভাবে আমি নিজের যাহা তাহা ত রক্ষা করিতেছি অপরের অনিষ্ট হউক তাহাতে আমার কি? কিন্তু সে একবার বিবেচনা করে না যে, আমি অপরদিগের প্রতি যেরূপ বিচার করিতেছি সেইরূপ বিচার যদি অপরে আমার প্রতি করে তবে কি হয়? এক জনের অনাথা বিধবা ও পিতৃহীন সন্তান ঘোর দুঃখে পড়িয়াছে, আমি দেখিয়াও দেখিতেছি না, স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে রাখিয়াছি, তাহার সুখ দুঃখের সহিত আমার সম্বন্ধ নাই। ভাবিতেছি না যে, আমার দেহাবসানে যদি আমার স্ত্রী পুত্র ঐ প্রকার অবস্থাতে পড়ে এবং অপরে যদি আমার ন্যায় স্বার্থের গণ্ডী দিয়া বসিয়া থাকে তাহা হইলে কি হইবে? লোকে এরূপ উদাসীন হইবে ইহা আমি পছন্দ করি কি না? যদি না করি তবে আমি কেন অপরের দুঃখের প্রতি উদাসীন হইতেছি? তুমি পরকে সাহায্য করিতে না চাও ঈশ্বরের রাজ্যে তুমি পরের সাহায্য পাইবে না এই তোমার শাস্তি। আপনাকে ভুলিয়া ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত হও তোমার জন্য সাহায্য আছে। স্বার্থপর ব্যক্তির আশয় অতি ক্ষুদ্র, তাহা একটী কূপের ন্যায়, সে ব্যক্তি ভেকের মত তাহার ভিতরে বাস করে। সে ভেকের সাধ্য নাই যে, ধর্ম্মের প্রমুক্ত বায়ুর সুখভোগ করে। স্বার্থপরতার ন্যায় পাপ নাই, ইহার ন্যায় ধর্ম্মের শত্রু আর নাই। নরঘাতক ঈশ্বরের কৃপা পাইতে পারে ও তরিয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বার্থপর কৃপণ-স্বভাব লোক তরিয়া যাওয়া সহজ নহে। সে বাহিরে নীতিমান ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিতে পারে, তাহা আকাশে মাকু চালানর ন্যায়, তদ্দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত হইবে না। এই জন্য সাধকগণ স্বার্থপরতা ও বিষয়াসক্তিকে ধর্ম্ম জীবনের পক্ষে বিষ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কে কত ধর্ম্মের কথা বলে তাহা দিয়া ধার্ম্মিকতার বিচার নহে, সে কত স্বার্থপরতা ও বিষয়াসক্তিকে খর্ব্ব করিয়াছে তাহা দিয়াই বিচার।

ধর্ম্ম জীবনের স্থূল স্থূল কথা—ধর্ম্ম জীবন গঠন করিতে সাধুরা সামান্য সামান্য বিষয়েও বিশেষ মনোযোগ দিয়া থাকেন। যাহারা সামান্য সামান্য বিষয়ে জীবনকে ধর্ম্ম পথে রক্ষা করিতে পারিতেছে না, তাহারা গুরুতর বিষয়ে আপনাদের জীবন ধর্ম্মপথে কিরূপে রক্ষা করিবে? সত্য বটে কখন কখনও বড় বড় মহাজনগণও সামান্য সামান্য বিষয়ে সাধারণ লোক অপেক্ষা ক্রটী দেখাইয়াছেন। সে বিষয়ে তাঁহাদের দুর্ব্বলতা ছিল, তাঁহারা সে জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী রহিয়াছেন, এবং সে বিষয় তাহাদের জীবন অপূর্ণ রহিয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যদিও তাঁহারা ক্রটী সত্ত্বেও সাধারণ লোক অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্থানে আছেন, কিন্তু তবুও তাঁহারা আপনাদের কার্য্যের জন্য বিচারাধীন রহিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া আমরা কেহই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি না। তুমি যদি কাহাকেও কথা দাও আর তাহা প্রতিপালন না কর তাহা হইলে কি তোমার মিথ্যা কথা বলা হইল না? তুমি একজনকে বলিলে "আমি কাল আপনার সঙ্গে দেখা করিব?"

কিন্তু পরদিন আর গেলে না। ইহাতে তোমার মনে হইতে পারে, যাইতে চাহিয়াছিলাম, নাইবা গিয়াছি ইহাতে ত কাহারও কোন বিশেষ ক্ষতি করি নাই? কিন্তু তুমি চিন্তা করিয়া দেখ, অবশ্যই ক্ষতি করিয়াছ। তুমি তোমার স্বভাবকে সত্যেতে শিথিল করিয়াছ; একরূপ মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছ। এইরূপে তুমি অবশেষে অপরের অপকার না হইলে কিম্বা পরের উপকার হইলে মিথ্যা বলিতে ও প্রস্তুত হইবে। মিথ্যা এইরূপেই কিছু কিছু করিয়া মানুষের চরিত্রে প্রবেশ করে। শেষে মিথ্যা ও সত্যে পার্থক্য থাকে না। সত্য আপেক্ষিক জিনিষ হয়। সত্য যে সকল স্থলেই সত্য সে জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়। তুমি যে তোমারই ক্ষতি করিলে কেবল তাহা নহে, যাহাকে বলিয়াছ যে "কাল দেখা করিব।" তিনিও ক্রমে লোকের কথায় অবিশ্বাস করিতে শিখিলেন। যদি তিনি তোমার মত লোক হন, তবে তিনিও তোমার পথ ধরিবেন। যদি তিনি বিশেষ সত্য-পরায়ণ সাধু লোক হন, তিনি বুঝিলেন, সংসার ও ধর্ম্ম দুই জিনিষ, সংসারের লোক সকলই এইরূপ। এইরূপই জনসমাজে মিথ্যা প্রবেশ করে।

যাহাকে যে কথা বলিয়াছ, যদি সত্যানুরাগী হও তবে তাহা প্রাণ দিয়া প্রতিপালন কর। ঋণ করিয়াছ, কিন্তু উত্তমর্ণের নিকট কখনই তেমন অঙ্গীকার করিবে না যাহা তুমি প্রতিপালন করিতে পারিবে না। এক সময়ে ব্রাহ্মগণ কথা বলিবার সময় "বোধ হয়" কথাটী ব্যবহার করিতেন, পাছে বা তাঁহাদের কথা মিথ্যা হয়। ব্রাহ্ম বিরোধীগণ "বোধ হয়" শব্দ লইয়া ব্রাহ্মদিগের উপহাস করিত। সেই উপহাস ব্রাহ্মদের প্রতি চিরদিন থাকুক। এখনও ব্রাহ্মেরা সত্যবাদী বলিয়া লোকের শ্রদ্ধা আছে।

সংসারে থাকিতে হইলে মধ্যে মধ্যে ঋণ করিতে হয় তাহা সত্য। কিন্তু তুমি সেই পরিমাণে ঋণ করিতে পার যে ঋণ তোমার শোধ করিবার শক্তি আছে। ঋণ শোধের উপায় না থাকিলে কখনই ঋণ করিবে না, বরং ভিক্ষা করিবে; যদি একবার কোন কারণে ঋণ করিয়া থাক, তবে সর্ব্বাগ্রে সেই ঋণ শোধ করিতে চেষ্টা কর, আর ঋণ বাড়াইও না। ঋণ বাড়িতে আরম্ভ করিলে তোমার সমুদয় ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট হইয়া যাইবে। কোথায় বা তোমার উপাসনা, কোথায় বা তোমার প্রচার এবং কোথায় বা তোমার পরসেবা। যদি দেখি ঋণগ্রস্ত রহিয়াছ, অথচ সুখে আহার বিহার বাবুগিরি চলিতেছে, ঋণের দিকে দৃষ্টি নাই, তাহা হইলে বুঝিব তুমি অপদার্থ ও ঘৃণাই জীব। তাহাতে যে কেবল তুমি অসত্যাশ্রয়ী হইলে তাহা নহে, যাহার নিকট হইতে ঋণ লইয়াছিলে তাহাকেও লোকের প্রতি [illegible]শ্বাস করিতে শিখাইলে। সে ব্যক্তি ইতঃপর যথার্থ ঋণ [illegible]ইবার যোগ্য লোককেও ঋণ দিবে না। ঋণ বিষয়ে মুসলমান ধর্ম্মে বিশেষ শাসন আছে। এক দিকে ঋণ দিয়া সুদ গ্রহণ করিতে নিষেধ অপর দিকে এই উপদেশ "ঋণগ্রস্ত হইয়া যদি পরলোকে যাও তাহা হইলে সে পাপের আর নিষ্কৃতি নাই; কেননা সেখানে আর তুমি তোমার দেনা শোধ করিতে পারিবে না।" সামান্য দেনা পাওনাতে যাহারা ধর্ম্ম রক্ষা করিতে না পারে, তাহাদের আবার ধর্ম্ম কি?

তুমি যদি কাহারও কোন কার্য্যের ভার লও তবে তুমি আর সে কাজে আপনার ক্ষতি বৃদ্ধি গণনা করিতে পার না। ভার লইবার পূর্ব্বে তুমি ইচ্ছা করিলে সে ভার না লইতে পারিতে, কিন্তু বুঝিয়া শুজিয়া ভার লইয়াছ, তখন তোমার কর্ত্তব্য তাহা সম্পন্ন করা। তোমাকে কোন লোকে ভার দিলেন—আমার ছেলেটিকে আপনি একটুকু পড়াইবেন এবং ইহার চরিত্রটী দেখিবেন, তুমি বেতন লও বা না লও তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে এ কার্য্যগ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু তাহার ছেলে তোমার ঘরে আসিয়া অপর ছেলের সঙ্গে মিশিয়া মন্দ কথা শিখিতেছে, মন্দ সঙ্গে একবারে মন্দ হইয়া যাইতেছে, লেখা পড়া কিছুই শিখিতেছে না তোমার সংসারে অনেক কাজ, তুমি ভাবিলে যাহা করিয়াছ ইহাই যথেষ্ট। এইরূপ মনে করিতেছ, আর দুই একটী কথা বলিয়া দিতেছ, কিন্তু ছেলেটী যখন একবার নষ্ট হইয়া গেল, তখন তোমার প্রতি তাহার পিতার কিরূপ মনের ভাব হইবে? যে ব্যক্তি কর্ত্তব্যে অবহেলা করে তাহাকে বিশ্বাস করিতে কে চায়? ব্রাহ্মেরা খুব কর্ত্তব্য-পরায়ণ এবিশ্বাস যতদিন থাকিবে লোকেরা কোন কার্য্যের ভার দিতে সঙ্কুচিত হইবে না। যখন লোকে দেখিবে ব্রাহ্মগণ কর্ত্তব্য-জ্ঞান-হীন হইতেছে, তখন তাহারা কখনও ব্রাহ্ম বলিয়া কাহাকেও ধার্ম্মিক মনে করিবেন না। কেহ কোন কাজ দিতে চাহিবে না। তুমি যখন যে কাজের ভার লইবে ধর্ম্মজীবন রক্ষার জন্য প্রাণপণে তাহা প্রতিপালন করিবে; নতুবা ধর্ম্মজীবন গড়িবে না। এইরূপ অনেক ছোট ছোট বিষয় আছে যাহাতে ধর্ম্মজীবন গঠনের পক্ষে অনুকূল প্রতিকূল দুই হয়! যদি ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে চাও, ছোট বিষয় বলিয়া কিছুই উপেক্ষা করিবে না, ছোট বিষয় যে জীবনে আয়ত্ত হয়, সে জীবন বড় বিষয়েও কৃতী হইতে পারে। অতএব ধর্ম্মজীবন গঠনের জন্য যেমন প্রেম ভক্তির সাধন করিবে তেমনি দেনা পাওনা কথাবার্ত্তা ঠিক রাখিবে। অনেকে নীতিকে অবহেলা করিয়া কেবল প্রেমভক্তি লাভের জন্য ব্যাকুল হন, কিন্তু প্রেমভক্তি সহজ কথা নয়। যাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা নাই, যে সামান্য নীতিকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, তাহার আবার প্রেম ভক্তি কি? এদেশে ধর্ম্মের এই এক দুর্দ্দশা দেখা যায়, নীতিতে জীবন হীন, কিন্তু ভক্তিতে উন্নত বলিয়া পরিচিত; ব্রাহ্মধর্ম্ম এই নীতি-হীন ভাব-প্রধান ধর্ম্মকে সমাজ হইতে দূর করিতে আসিয়াছে।

নিশীথ সাধন—দিনের বেলা চারিদিকে কোলাহল। কৃষক, পণ্যজীবী, শ্রমজীবী সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত। জীবিকাযুদ্ধে নরনারী রক্ত ক্ষয় করিতেছে। হাট বাজার, পথ ঘাট, নগরময় লোকারণ্য। যে দিকে দর্শন করি, সে দিকেই হাসি, ক্রন্দন, কোলাহল এবং কার্য্য-ব্যস্ততা। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই চঞ্চলতা আরম্ভ হয়, সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইয়া থাকে। গভীর রজনীতে সকলেই

নিস্তব্ধ। পক্ষীগণের কলরব শ্রুত হয় না, নরনারী নিদ্রায় অচেতন, কার্য্যক্ষেত্র বন্ধ। এই নিস্তব্ধ নীরব সময় সাধনের অত্যন্ত অনুকূল।

রাত্রি প্রভাত হইতে এখনও চারি দণ্ড বাকী আছে। নগর ও পল্লীতে সাড়া শব্দ নাই। রজনীর শেষে সকলে গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। সাধক এ সময় গাত্রোত্থান করিয়া হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হইয়া পরব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিলেন। প্রকৃতি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল, তিনি ধ্যান সাগরে ডুবিলেন।

দিনের বেলায় বিশেষতঃ জন কোলাহলময় স্থানে বসিয়া ধ্যানের তেমন সুবিধা ঘটে না। সাধারণতঃ দিবাভাগে মানব মন অপেক্ষাকৃত চঞ্চল থাকে। এই জন্যই পূর্ব্বকালের সাধকগণ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া ধ্যান করিবার উপদেশ দিয়াছেন। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে লিখিত আছে; "অনন্তর ভগবান হৃষীকেশ সুখে প্রসুপ্ত ও রজনী অর্দ্ধ প্রহরমাত্র অবশিষ্ট হইলে জাগরিত হইয়া ধ্যানে মনোনিবেশ পূর্ব্বক জ্ঞান সকল সন্দর্শন করিয়া, সনাতন ব্রহ্মের চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।"

কেবল ধর্ম্ম জগতেই যে নিশীথ সাধনের আবশ্যকতা আছে, তাহা নহে সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি সমুদয় উচ্চ উচ্চ বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে নিশীথ-সাধনের আবশ্যক। অনেক বিজ্ঞান আবিষ্কার, গ্রন্থ প্রণয়ন, যোদ্ধার যুদ্ধের আয়োজন, রাজ-নৈতিকের প্রণীত বিধি ব্যবস্থা নিশীথ-চিন্তার ফল।

ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতাপ্রধান স্থান। সুতরাং এ দেশের শাস্ত্রকারগণ ব্যক্তি মাত্রকেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া সাধন ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত সাধনের ফল তাঁহারা বিশেষরূপ অনুভব করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা নিশীথ-সাধন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ইহার উপকারিতা স্বীকার করেন। নিশীথ-সাধন চিত্ত স্থিরের অতি সুন্দর উপায়, নিশীথ-সাধন করিলে সমস্ত দিন অতি পবিত্রভাবে অতিবাহিত হয়, নিশীথ সাধন ধ্যানের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্রহ্ম-দর্শন।

ঈশ্বরের নামে অনেকেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। ঈশ্বর যে একজন আছেন, স্বীকার করেন। কিন্তু ঈশ্বর যে মানবাত্মার জানিবার বস্তু, দর্শনের বস্তু, লাভের বস্তু তাহা অনেকেই কার্য্যতঃ স্বীকার করেন না। দুগ্ধকে উত্তম পানীয় সুস্বাদু ও পুষ্টিকর বলিয়া প্রশংসা করিলেই কাহারও শরীর সবল হয় না বা রসনা তৃপ্ত হয় না। যতক্ষণ সে পান না করে, ততক্ষণ সেই বস্তু কি তাহা প্রকৃতরূপে বুঝিতেই সক্ষম হয় না। অপর দিকে যখন সে দুগ্ধ পান করে এবং তাহার শরীর সবল হইতে থাকে, তখন কেহ তাহাকে দুগ্ধের উপকারিতার বিরুদ্ধে কিছু বলিলে সে প্রত্যয় করে না, বরং মনে মনে উপহাসই করে। এইরূপ কোনও লোক যতক্ষণ ঈশ্বরের প্রতি কেবল শ্রদ্ধা করে কিম্বা ঈশ্বরকে স্বীকার করে, ততক্ষণ প্রভু পরমেশ্বর কর্তৃক তাহার আত্মা সবল হয় না, আত্মা তৃপ্তিও লাভ করে না। আবার যখন কোনও লোক পরমাত্মাকে মুখে স্বীকার কি শ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া তাঁহাকে অন্তরে জানে, দেখে এবং সম্ভোগ করে, তখন লোকে পরব্রহ্মের বিরুদ্ধে যতই বলুক না কেন, সে সকল কথায় সে কর্ণপাত করে না।

ঈশ্বরকে জানা, দেখা বা লাভ করার অর্থ কি? আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সকল যেমন জানি কি দেখি—এ কি সেইরূপ জানা কি দেখা? আমরা যেমন হাতে টাকা পাইলে টাকা লাভ হইল মনে করি, সে কি এইরূপ লাভ? ঈশ্বর-বিশ্বাসী প্রেমিক ভক্তলোকেরা বলেন যে, "হাঁ এইরূপই জানা, দেখা বা লাভ বটে, এমন কি ইহা অপেক্ষাও প্রত্যক্ষ।" তবে এ কি হইল? ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্য স্বরূপ, তাঁহাকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর মত কিরূপে দেখা যায়?

ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি বলেন, সে জানা এক অপূর্ব্ব জানা, সে দর্শন এক অপূর্ব্ব দর্শন। পৃথিবীতে অনেক পাইয়াছি, এ লাভের সঙ্গে সে লাভের তুলনা হয় না। ইহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে এইমাত্রই বলা যায়, ইহা এক অপূর্ব্ব অতি মনোরম প্রাণ- মন-মুগ্ধকারী দর্শন বা উপলব্ধি। এ সকল কথা সকলে বুঝিতে পারিবে না, তাই সাধকেরা ঈশ্বর-দর্শন কি ইহা বুঝাইতে চেষ্টা না করিয়া ঈশ্বর-দর্শনে লাভ কি, ঈশ্বরকে পাইতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাহারা ঈশ্বরকে দেখে নাই, তাহাদিগকে ঈশ্বর-দর্শনের কথা বলিলে অন্ধকারে নিপাতিত করা হইবে। তাহারা ঈশ্বর-দর্শন কি বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া ঈশ্বর-দর্শনে কি লাভ ইহাই জিজ্ঞাসা করিবে। তাহারা বলিবে "বুঝিলাম, ঈশ্বর শুধু মান্যের বা স্বীকারের বস্তু নন, তিনি দর্শনের বস্তু বা লাভের বস্তু, কিন্তু তাঁহাকে লাভ করিয়া বা দেখিয়া কি ফল? যেমন টাকা পাইলাম, তাহা ব্যবহারে সকল অভাব পূর্ণ হইয়া গেল, তেমন ঈশ্বরকে পাইলাম, আমার কি সকল অভাব দূর হইয়া যাইবে? প্রাচীন সাধু বলিয়াছেন, ঈশ্বরকে দর্শন করিলে, বাস্তবিক সকল অভাব দূর হয়,—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টেপরাবরে॥"

সেই মহান্ ঈশ্বরকে দর্শন করিলে হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হয়, সকল সংশয় ছেদ হয় এবং কর্ম্মসকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হয়, ইহার অর্থ কি? মানব-হৃদয়ে কতকগুলি গ্রন্থি আছে, সেই সকল গ্রন্থি আর কিছুতে ভেদ হয় না, সে গ্রন্থিভেদের তীক্ষ্ণ অস্ত্র পরব্রহ্ম। মানবাত্মা যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই মহান্ ঈশ্বরকে দেখিতে না পায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে গ্রন্থি ভেদ হয় না। মানবাত্মা নানারূপ আসক্তির বন্ধনে বাঁধা রহিয়াছে, কেহ বা ধনের আসক্তিতে, কেহ বা জাতির বন্ধনে, কেহ বা যশেরগ্রন্থিতে, এইরূপ নানা বন্ধনে মানবাত্মা বাঁধা রহিয়াছে। এ সকলকে প্রাচীন সাধুগণ অষ্টাদশ পাশ

বলিয়াছেন। জালবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় মানব পাপপাশে বদ্ধ থাকে। তখন তাহার মহাক্লেশ এবং যখন সে পাপমুক্ত হয় তখন সে পরম সুখী হয়। এই হৃদয়-গ্রন্থি আর কিছুতেই যায় না; একমাত্র "তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হয়, সংশয় গ্রন্থি সকল ছিন্ন হয়। "আমি আমার ধনের আসক্তিটী ছাড়িতে পারিব না বা জাতির বাঁধনটী ছিন্ন করিতে পারিব না," এইরূপ স্থির করিয়া যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথে দাঁড়াইয়াছিল, কত তর্ক কত যুক্তির দ্বারা আত্মপক্ষসমর্থন করিতেছিল, যখন সে ব্যক্তি সেই মহান্ পুরুষকে দেখিল, তখন তাহার সে তর্ক, সে যুক্তি কোথায় চলিয়া গেল, হৃদয়-গ্রন্থি খুলিয়া গেল। ঈশ্বর-দর্শনের ফল কি এখন সে তাহা বুঝিতে পারিল। যে আত্মা পাপ-বদ্ধ হইয়া ছটফট করিতেছিল, এখন সে মুক্ত হইয়া পরমানন্দে চিদাকাশে বিহার করিতে লাগিল! ইহা অপেক্ষা আর পরমলাভ কি আছে?

দ্বিতীয় লাভ, ঈশ্বর-দর্শনে মানবাত্মার সকল সংশয়েরচ্ছেদন হয়। কবিগণ সংশয়কে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। অন্ধকারে থাকিতে মানবের অত্যন্ত ভয়। লোকে কথায় বলে "অন্ধকার ঘরের সকল স্থানেই সাপ।" অন্ধকারগৃহে থাকিতে যেমন সে ত্রাসযুক্ত হয়, সেইরূপ সংশয় মহাশত্রু মানবাত্মাকে অন্ধকারে যখন ঢাকিয়া ফেলে, তখন সে সেইরূপ ভীত ও শঙ্কিত হয়। যতদিন মানবাত্মা সেই মহান্ ঈশ্বরকে দেখিতে না পায় ততদিন সংশয় অন্ধকার দূর হয় না। শাস্ত্রজ্ঞানে এ সংশয় যায় না, তর্ক যুক্তিতে যায় না, বহু উপদেশ শ্রবণেও না। "তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে" এসংশয় কেবল মাত্র ছেদন হয়। সংশয়ীর আত্মার অবস্থা অতি ভয়ানক। আজ ঈশ্বরকে সাকার মানিতেছে, কাল একজন বক্তা বুঝাইলেন ঈশ্বর নিরাকার, অমনি সাকার জ্ঞান চলিয়া গেল। আজ একজন নিরাকারবাদী ব্রাহ্মকে কেহ সাকারবাদ বুঝাইলেন অমনি নিরাকার জ্ঞান চলিয়া গেল। সংশয়ী একবার ভাবে "ইহাও হইতে পারে," আবার ভাবে "উহাও হইতে পারে।" কেন না তাহার কোনও নিশ্চিন্ত জ্ঞান নাই। সন্দেহাকুল ব্যক্তির কোন বিষয়েই নিশ্চিত জ্ঞান হইতে পারে না। যে জিনিস দেখা হয় নাই; তাহার কথা বলিতে কে সাহসী হইতে পারে? যে ঈশ্বরকে দেখে নাই, তাহার পক্ষে ঈশ্বরের কথা বলা, অন্যের কাছে শোনা কথা ভিন্ন আর কিছুই নয়। যে দেখিয়াছে, তাহাকে তুমি হাজার কথা বল, বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যতই ভয় প্রদর্শন কর না, সে কিঞ্চিৎ মাত্রও ভীত হয় না। মহাত্মা মহম্মদ যখন ঈশ্বরকে দেখিলেন, তখন পরমেশ্বর একজন ব্যতীত দ্বিতীয় নাই, সেই দেবদেবী পূজক আরব দেশে এই মহাসত্য ঘোষণা করিতে লাগিলেন। "ঈশ্বর এক, তাঁহার পূজাতেই জীবের পরিত্রাণ।" এই কথাই তাঁহার জপমালা হইল। তখন সেই দেশের বড় বড় লোকেরা একত্র হইয়া মহম্মদের খুল্লতাতকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল—"দেখুন আপনার ভ্রাতষ্পুত্র বলিতেছে ঈশ্বর একজন মাত্র, দেব দেবীর পূজায় কিছু হয় না, ইহা তাহাকে বলিতে নিষেধ করিয়া দিন, নতুবা তাহার সহিত আপনারও অনিষ্ট হইবে।" মহম্মদের খুল্লতাত মহম্মদকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন তিনি ভ্রাতষ্পুত্রকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ মহম্মদ! তুমি একথা আর বলিও না যে, ঈশ্বর এক এবং দেব দেবীর পূজায় কিছু হয় না।" মহম্মদ এই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, যদি কেহ আমার এক হস্তে চন্দ্রকে ও অন্য হস্তে সূর্য্যকে আনিয়া দেয়, তথাচ মহম্মদের রসনা হইতে ইহার বিপরীত কথা কখনই উচ্চারিত হইবে না।" তাঁহার পক্ষে ঈশ্বর এক ভিন্ন বহু বলা এবং দেবদেবীর পূজায় জীবের ত্রাণ হয়, এই উপদেশ দেওয়া অসম্ভব। যাহারা প্রভু পরমেশ্বরকে দেখে নাই তাহারাই একবার ঈশ্বর নিরাকার, একবার ঈশ্বর সাকার বলিতে পারে। যে তাঁহাকে দেখিয়াছে, সে তাঁহার সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান সংশয়রহিত জ্ঞান লাভ করিয়াছে। দর্শন ব্যতীত সংশয় কখনই তিরোহিত হয় না। সাধুগণ চিরজীবন যে কথা বলিয়াছেন, এবং প্রাণ দিয়া যে সত্য ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা কেবল দর্শনের কথা। যাহারা তাহাকে দেখে না, তাহারা ধর্ম্মভাবসম্পন্ন পিপাসু লোক হইলেও আজ একরূপ কাল অন্যরূপ বলিবে। ভাবই তাহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের নিয়ামক। যখন যেরূপ ভাব হয় তখন তাহাদের মত সেই আকার ধারণ করে। এই দেব দেবী-পূজক-দেশে মহাত্মা রাজা রামমোহন আজীবন একই কথা বলিতে পারিতেন না, বা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত একই সত্য প্রচার করিতে পারিতেন না, যদি তাঁহারা ঈশ্বর-সাক্ষাত লাভ না করিতেন।

প্রাচীন সাধু ঈশ্বর দর্শনের তৃতীয় লাভ বলিয়াছেন কর্ম্ম ক্ষয়। এদেশে যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কলাপের বড়ই প্রাদুর্ভাব ছিল, সম্ভবতঃ এই কর্ম্মক্ষয়ের কথাই তাঁহারা বলিয়াছেন। ঈশ্বরকে দেখিলে যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কলাপে প্রবৃত্তি থাকে না, তখন এসকল অতি অসার বলিয়া মনে হয়। যাগযজ্ঞাদি পুষ্করিণী খননাদি সমুদয় কর্ম্মই মানুষ নিজে কর্ত্তা হইয়া সম্পন্ন করে সুতরাং তাহার সঙ্গে সুখ্যাতি অখ্যাতির সম্বন্ধ রহিয়াছে, ফলাফল চিন্তা রহিয়াছে। এ সকল কর্ম্মে মানবপ্রাণে শান্তি না দিয়া অশান্তি আনয়ন করে। যখন মানব আপনার প্রভু পরমেশ্বরকে দেখে এবং তাঁহার আদেশে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় "তখন তাহার ফলাফল বা সুখ্যাতি অখ্যাতির চিন্তা থাকে না, তখন তাহার "আমার কায আমি কর্ত্তা" এজ্ঞান চলিয়া যায়। আমিত্বই মানুষকে সর্ব্বদা ক্লেশ দিতেছে। "আমার কায আমি কর্ত্তা," এই জ্ঞান ঈশ্বর দর্শনে বাধা দেয়। যতক্ষণ সাধক প্রভুকে দেখিতে না পায়, ততক্ষণ এসকল বন্ধন কিছুতেই যায় না। এই কর্ম্মক্ষয় ঈশ্বরদর্শন ব্যতীত হয় না। যে আমিত্বের জ্বালায় মানুষ দিবানিশি অস্থির, যদি সে জ্বালা হইতে মানুষ উদ্ধার পায়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা পরমলাভ আর কি আছে?

ঈশ্বরদর্শনেই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সকল সংশয় ছেদন হয় এবং কর্ম্ম সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরদর্শনে মানব যেমন ঈশ্বর সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে, তেমনই আত্মা সম্বন্ধেও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। মানবাত্মা যে পশু জন্ম

ধারণ করিবে না এসংশয়ও ঈশ্বর দর্শন ভিন্ন যায় না; আত্মার এখানেই শেষ এ সংশয়ও ঘুচে না। পরকালের জ্ঞান উজ্জ্বল হয় না। যতক্ষণ মানব ঈশ্বরকে দেখিতে না পায় ততক্ষণ ঘোর অন্ধকারের মধ্যেই বাস করে। আমরা এখন আপন আপন জীবনে ঈশ্বর দর্শন যথার্থ হইয়াছে কিনা এই সকল ফলের দ্বারা বিচার করি। ঈশ্বরকে না দেখিলে এ রাজ্যে ঠিক থাকা যায় না। ঈশ্বর দয়া করিয়া আমাদিগকে দেখা দিয়া সকল সংশয় দূর করুন; হৃদয়ের গ্রন্থি সকল ছেদন করিয়া দিন এবং আমিত্বকে বিনাশ করুন। আমরা তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার হইয়া তাঁহার সেবায় জীবন অতিবাহিত করি।

অবতারবাদ ও গুরুবাদ।

পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান—চিরসদয় ও অনুকূল। সুতরাং তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার তৃপ্তির জন্য কেন আকার পরিগ্রহ করিতে পারিবেন না? অনুকূল এবং সর্ব্বশক্তিমান যিনি ভক্তের অনুরোধে তিনি কি না করিতে পারেন? এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া অনেক অবতারবাদী ঈশ্বরের জগতে অবতীর্ণ হওয়ার মতকে সমর্থন করিয়া থাকেন এবং বলেন যিনি সদয় এবং ইচ্ছা করিলে সকলই সম্পন্ন করিতে পারেন, তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছাপূর্ণ করিবার জন্য অবশ্যই তাঁহার প্রার্থিত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইতেও পারেন।

যাঁহারা ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা এবং অনুকূলতার প্রতি এরূপ নির্ভরশীল ও বিশ্বাসী, যাঁহারা এই বিশ্বাস দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বরকে তাঁহার প্রকৃতি ও স্বরূপবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেও অনুরোধ করিতে পারেন অর্থাৎ অনন্ত চিন্ময়কে সান্ত ও ক্ষুদ্র আকার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে সঙ্কোচ মনে করেন না; তাঁহারা কেন সেই সর্ব্বশক্তিমানের অনুকূলতা ও সদয় ব্যবহারের প্রতি নির্ভর করিয়া, স্বাভাবিক ও সত্যের অনুমোদিতরূপে সেই চিন্ময় নিরাকার সত্তা ধ্যান করিবার জন্য এবং তাহা দর্শন করিবার জন্য সহিষ্ণুতার সহিত নির্ভরশীল ও প্রার্থী হইতে পারেন না? এইরূপে প্রার্থী হইলে ঈশ্বরকে তাঁহার স্বরূপের বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিতেও অনুরোধ করিতে হয় না এবং কল্পনার আশ্রয় লইয়া অসম্ভব যাহা তাহাকে সম্ভবপর মনে করিয়া প্রতারিতও হইতে হয় না এবং তাহাদ্বারা অপরাধের পরিমাণও বৃদ্ধি হয় না। যাঁহারা ঈশ্বরের আনুকূল্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী এবং সেই অনুকূলতায় নির্ভর করিয়া তিনি নিরাকার হইয়াও আকার গ্রহণ করিতে পারেন, ইহা সম্ভবপর মনে করেন অথচ তাঁহারা তিনি যে ব্যাকুলাত্মার ব্যাকুল প্রার্থনাপূর্ণ করেন, তিনি যে তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল ভক্তের আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তি পরিগ্রহ না করিয়াও, প্রকৃত ভাবেই পূর্ণ করিতে পারেন এবং তাহার নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিতে পারেন, এই সত্যে কেন সন্দেহ করেন। ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য তাঁহারা অপর কোন একজন দুর্ব্বল ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করাকেই কেন একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করেন? এদেশীয় অবতারবাদিগণ বিশ্বাস করেন ঈশ্বর ভক্তের সাংসারিক প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ক্ষুদ্র মানব রূপেও পরিণত হইতে পারেন। সর্ব্বশক্তিমানের ইচ্ছামাত্রেই যাহা হইতে পারে, তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবেন, তাঁহার প্রকৃতি ও স্বরূপের বিপরীত ভাবাপন্ন হইতে পারিবেন; যাঁহারা এতদূর মানিতে প্রস্তুত, তাঁহারা যে সেই সর্ব্বশক্তিমানের করুণায় নির্ভরশীল হইয়া ধর্ম্মজীবন লাভের আশায় আশান্বিত থাকিতে পারেন না, ব্রহ্মদর্শনের জন্য যে সামান্য লোক-প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই বলিয়া মনে করেন, ইহা নিতান্তই অসঙ্গত ও তাঁহাদের বিশ্বাসের বিপরীত ভাবব্যঞ্জক। অনন্ত স্বরূপ পরমেশ্বরকে ক্ষুদ্রতায় পরিণত হইতে—পূর্ণ জ্ঞানময়কে সামান্য জ্ঞানীরূপে—সর্ব্বশক্তিমানকে সামান্য শক্তিশালীরূপে দেখিতে তাঁহাদের এতই সাধ যে, এই প্রকারে অসঙ্গত প্রার্থনা করিতেও তাঁহারা সঙ্কোচ করেন না। কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত তাঁহার চিন্ময় সপ্রকাশ স্বরূপ দেখিবার জন্য যে অপেক্ষা করা, সেজন্য তাঁহার প্রতিই যে নির্ভরশীল হইয়া থাকা, ততদূর বিলম্ব করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের নাই। এজন্য সহজে রাতারাতি বড় লোক হইবার প্রত্যাশায় এক শ্রেণীর লোক জ্ঞান বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ ভাবেই ঈশ্বরকে আয়ত্ত করিবার প্রয়াস করিয়া থাকেন। সত্যের সেবক না হইয়া মনঃ কল্পিত ভাবে অতিরিক্ত অসহিষ্ণু হইলেই কি অভিলাষ পূর্ণ হইবে? যাহা সত্যের বিরোধী তাহার সম্ভাবনা কোথায়? সেরূপ আকাঙ্ক্ষা যেমন পূর্ণ হইবার নয়, তেমন স্বাভাবিক ও সরল সত্য পথ অনুসরণ না করিয়া অযথাভাবে মানবের পদানুসরণ করিয়া ধর্ম্মজীবন লাভ বা ব্রহ্মলাভেরই বা সম্ভাবনা কোথায়? ঈশ্বর যখন সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্বদাই অনুকূল তখন হে মানব! তুমি তাঁহার প্রতিই নির্ভর করিয়া থাক। তাঁহার দৃষ্টিতে যখন তোমার আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইবার সময় উপস্থিত হইবে,—যখন সত্য সত্যই তোমায় আর অন্য আকাঙ্ক্ষা বা লালসা না থাকিবে, তখন তিনি তোমার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখিবেন না। তখন সত্য ভাবেই তাঁহার চিন্ময় সত্তা প্রাণে উপস্থিত দেখিতে পাইবে। কল্পনার সাহায্য লইয়া আত্ম-কল্পিত ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিবার জন্য কেন প্রয়াসী হও। তিনি যেরূপ সেই ভাবেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য লালায়িত হও এবং তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাক, তবেই আশা পূর্ণ হইবে।

গুরুবাদ সমর্থনকারিগণ তাঁহাদের মতের পোষণার্থ বলিয়া থাকেন যে মানুষ মানুষের নিকট যদি শিক্ষা না পায়, তবে তাহারা শিক্ষা লাভই করিতে পারে না। যেমন কোন মানব শিশু ঘটনাক্রমে ভল্লুক বা ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইলে দেখা যায় তাহারা মানবপ্রকৃতি-বিচ্যুত হইয়া সেই সকল পশু প্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া থাকে। যদি ঈশ্বর হইতেই সমুদয় শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারিত, তবে এ স্থলে মানবশিশু হইয়াও কেন সে মানব-প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় না। ঈশ্বর কি তাহাকে মানবের মত হইতে শিক্ষা দিতে পারেন না? সুতরাং দেখা যাইতেছে মানবের শিক্ষা মানবের নিকট হইতেই হয়।

কিন্তু ইহাদ্বারা কি এরূপ প্রমাণিত হয় যে, মানব মানবের

নিকট শিক্ষা পায় বলিয়া আর কাহারও নিকট হইতে শিক্ষা পায় না বা পাওয়া আবশ্যক নয়। বরং ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে মানব যাহা দেখে, তাহাই শিক্ষা করে। তাহার শিক্ষক একমাত্র মানব নহে; কিন্তু জগতের সমস্ত পদার্থই শিক্ষক হইয়া তাহাকে শিক্ষা দিয়া থাকে। ভল্লুক বা ব্যাঘ্রের নিকট শিশুকে রাখিলে সে ব্যাঘ্র ও ভল্লুকের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহাদ্বারা সহজেই প্রমাণিত হয় যে মানব অন্য কিছু দেখিয়া শিক্ষা করে। শৈশবকালে যেরূপ দেখে সেইরূপই শিক্ষা করে। এবং সেইরূপই প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মানবকে মানবের নিকট রাখিয়া দিলেই তাহার মনুষ্যোচিত শিক্ষা লাভ হইতে পারে।

শিক্ষা লাভ করিতে হইলেই কিছু দেখিয়া শিক্ষা লাভ করিতে হইবে যদি ইহাই নিয়ম হয়, তাহা হইলে মানুষ যদি নিরবচ্ছিন্ন মানুষের নিকটেই অবস্থিতি করে, সে যদি এই মানবের অতিরিক্ত আর কিছুরই সন্ধান না পায়, তাহা হইলে এই মানবে যাহা আছে, সে ত তাহার অতিরিক্ত আর কিছুই শিখিতে পারে না। কিন্তু মানবের পক্ষে তাহাই কি প্রচুর? মনুষ্য মনুষ্যের মধ্যে যাহা দেখিতে পায় তাহাই কি তাহার শিক্ষার চরম সীমা। তাহা হইলে জনসমাজে বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞানের যে বিকাশ হইয়াছে, সভ্যতা ও ধর্ম্মের যে আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছে, তাহার ত কোনই সম্ভাবনা ছিল না। সৃষ্টির আদিম মানব এবং বর্ত্তমানের মানবকে যদি পাশাপাশি রাখিবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে এই দুই শ্রেণীর প্রাণী একই মূল মানববংশ হইতে উৎপন্ন কি না তাহাতেও বোধ হয় সন্দেহ হইত। সেই আদিকালের মানবের যে ছায়া এখন পার্ব্বত্য অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে আছে, তাহাদের সহিত বর্ত্তমান সময়ের উন্নত জ্ঞান বিজ্ঞানসম্পন্ন মানবগণের কি তুলনা হয়? এই যে উন্নতি, এই যে অতি উপাদেয় পরিবর্ত্তন যাহার চিন্তাতেও মন প্রাণ মুগ্ধ হয় এবং জগৎস্রষ্টা বিশ্বগুরুর শিক্ষা প্রণালীর চমৎকারিত্ব দেখিয়া বিমোহিত হইতে হয়, তাহা কি সেই একমাত্র মানবকে দেখিয়াই লাভ হইয়াছিল? সেই সৃষ্টির সমকালের মনুষ্যগণকে দেখিয়া ত মানবকুলের সেইরূপ পরিণাম হওয়াই সম্ভবপর ছিল— বর্ত্তমানের এই উন্নত মানব কিরূপে কোথা হইতে আসিল? জগৎগুরুর শিক্ষা ভিন্ন কে কবে লোকাতীত নূতন সত্য লাভে সমর্থ হইয়াছে? কি জড়বিজ্ঞান কি অধ্যাত্মবিজ্ঞান কোন্ বিজ্ঞানের মূল সূত্র সকল মানব মানবকে দেখিয়া শিখিয়াছে? নূতন তত্ত্ব, নূতন সত্যের শিক্ষা করিতে চিরদিনই মানবকে সেই সত্যের প্রস্রবণ সত্য স্বরূপ পরমগুরুরই মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। তিনিই সেই সত্য শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। মানবের সাধ্য একান্ত ব্যাকুল হওয়া, একান্ত নির্ভরশীল হওয়া; নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের শক্তি সে কোথায় পাইবে? যে সকল সত্য এখন পথে ঘাটে? যার তার মুখে শুনা যায়, যার তার নিকট শিক্ষা করা যায়, তাহার আদি প্রকাশ সেই সত্যের আধার হইতেই হইয়াছে। মানব যে সত্য একবার জানিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য অপরের পক্ষে কষ্টকর বা তেমন পরিশ্রম সাধ্য থাকে না ইহা সত্য এবং সেই সত্য মানবের নিকট শিক্ষা করিলে যে কোন দোষভাগী হইতে হয়, তাহাও নহে। কিন্তু সত্য স্বরূপকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মুখাপেক্ষী না হইয়া, কখনই কেহ কোন নূতন সত্যকে আবিষ্কার করিতে পারে নাই। যে সত্য শিক্ষা দিবার অধিকার মানবের নাই সে প্রকারের সত্য শিক্ষা করিতে হইলে, সেই সত্য স্বরূপেরই মুখাপেক্ষা করিতে হইবে।

মানবে যাহা আছে, তাহাকে দেখিয়া তুমি তাহাই শিক্ষা করিতে পার, তদতিরিক্ত কিছু শিক্ষা করিতে হইলেই মানবের অতীত আর কিছুর নিকট যাইতে হইবে। মানবের উন্নতির সীমা কোথায় শেষ হইবে, তাহা কে জানে? মানবাত্মার কল্যাণের জন্য এবং তাহার অসীম উন্নতির জন্য তিনি যে কত কি শিক্ষা দিবেন—এই অসীম ক্ষুধাসম্পন্ন মানবের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য কত যে কি প্রয়োজন তাহা এখন মানবের কল্পনায়ও উদিত হইতেছে না। সুতরাং সমগ্র উন্নতি বা কল্যাণ লাভের জন্য কি একমাত্র মানবের মুখাপেক্ষী হওয়া কর্ত্তব্য? মানব যাহা শিক্ষা দিতে পারেন, তাঁহার নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করিবার আছে, তাহা গ্রহণ কর, তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণ কর; তাহাতে আপত্তি কি? কিন্তু তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইও না। তাহাতেই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিও না। তাহাতে উন্নতি সীমাবদ্ধ হইবে। তদ্দ্বারা কল্যাণের পথ প্রশস্ততর না হইয়া সঙ্কীর্ণতর হইবে। তাহাতে অনেক সময় শিক্ষার সহিত অশিক্ষাও লাভ হইবে। ব্রাহ্মসমাজ লোকের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে কখনই নিষেধ করেন না। কিন্তু তোমার শিক্ষার সীমা ঐ লোকের নিকটেই অবরুদ্ধ নহে। তুমি লোক প্রদত্ত শিক্ষাকেই একমাত্র শেষ সীমা করিয়া রাখিও না, ইহাই বলেন। শিক্ষার বিষয় অনন্ত। শিক্ষক কি সান্ত হইবেন। শিক্ষকও অনন্তই হইবেন। যাহার নিকট যাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাহার নিকট হইতে তাহা পাইবার আশা করিলে কেবল প্রতারিত হইতে হয়। তাহাতে কেবলই অজ্ঞতার বৃদ্ধি হয়। সুতরাং অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী তুমি অনন্তের মুখাপেক্ষী হও। অনন্ত জ্ঞান সুধা পাইয়া কৃতার্থ হইবে। চিরদিন এই রীতিই চলিয়া আসিতেছে যে অনন্ত জ্ঞানময় পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ হইতেই এবং তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা হইতেই মানব উন্নত হইতে উন্নততর শিক্ষা এবং জীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে।

মৃত্যু ও পরলোক।

(শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পঠিত হইবার জন্য লিখিত)

সাধুগণ বলেন,"মৃত্যুতেই জীবন।" মৃত্যুই অমৃতের সোপান, মৃত্যু দ্বার দিয়া ভগবান জীবদিগকে অমৃতে—শান্তি নিকেতনে লইয়া যাইতেছেন। এই অমৃতের অধিকারী মানব, মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদাই অপেক্ষা করিতেছে। যাহার জন্য আমরা অপেক্ষা করিতেছি এবং যাহা আমাদিগকে অমৃতে লইয়া যাইবে, তাহাকে আর মৃত্যু অথবা বিনাশ বলি কিরূপে? তাহা মানবাত্মার একটী অবস্থা মাত্র। অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়া মৃত্যু নয়, তাহাকে পরিবর্ত্তন বা আত্মার দেহ ত্যাগ বলা যাইতে পারে, বরং যে অবস্থা

মানবকে অমৃতে লইয়া যায় তাহাকে অমৃতের সোপান বলাই যুক্তিযুক্ত। জীব পার্থিব জীবন শেষ করিয়া অনন্ত জীবনে প্রবৃত্ত হয়। এই জন্যই সাধুগণ "মৃত্যুতেই জীবন," এই উক্তি করিয়াছেন।

তবে মৃত্যু কি? অমৃত হইতে দূরে থাকা বা অমৃতকে ভুলিয়া থাকাই মৃত্যু। মানব যথন ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকে, তথনই তাহার মৃত অবস্থা। ঈশ্বরে যিনি জীবিত, তিনিই জীবিত। আধ্যাত্মিক রাজ্যে ঈশ্বর মনন দ্বারা জীবন এবং ঈশ্বর বিস্মৃতি দ্বারাই মৃত্যু গণনা হইয়া থাকে। জীব পৃথিবীর অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, ইহা যথার্থ মৃত্যুর চিহ্ন নয়; কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাসবিহীন হইয়া স্বর্গীয় প্রেমান্ন গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, ইহাই মৃত্যুর লক্ষণ। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিরোধ হইয়াছে, ইহা মৃত্যুর চিহ্ন নয়; কিন্তু সত্যের রক্ত ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে না, প্রেমপুণ্যের বায়ু আত্মায় প্রবাহিত হইতেছে না, ইহাই মৃত্যুর লক্ষণ।

যদি মৃত্যু বিশেষ অবস্থান্তর হইল, তবে কেন ভীত হইতেছ? সংসারে কি চিরদিন এক অবস্থায় কাটাইতে পারিয়াছ? যদি সে সকল অবস্থান্তরে আপনাকে ঠিক রাখিতে পারিয়াছ, তবে মৃত্যুতে ভীত হইতেছ কেন? যে মৃত্যুতে ঈশ্বর হইতে বিচ্যুতি হয়, তাহাকেই ভয় কর। সেই মৃত্যু সকলের ভীতি উৎপাদন করুক। বিশ্বাসীরা ঈশ্বরবিরহে কাতর হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়াছেন; কিন্তু যথন তিনি প্রাণে প্রকাশিত হইয়াছেন, তথন অতি হর্ষের সহিত শত্রুহস্তে, অগ্নিতে, জলে, ক্রুশে, পার্থিব জীবন শেষ করিয়াছেন। দেহনাশে জীবন শেষ হয় না। ইহার পর মানবাত্মা অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইবে। এই সীমাবদ্ধ অন্ন জলের জীবনই ইহ জীবন, ইহার অবস্থিতি স্থানের নাম ইহ-লোক এবং অবস্থিতি কালের নাম ইহকাল, এবং এই সীমাবদ্ধ জীবনের শেষে যে জীবন, তাহার নাম অনন্ত জীবন; তাহার অবস্থিতি স্থানের নাম পরলোক এবং কালের নাম পরকাল। এ পরলোক কি অন্ধকারময়? শিশু যেমন মাতৃগর্ভে অন্ধকারে থাকিয়া সকলই অন্ধকারময় দেখে, সেইরূপ অজ্ঞান শিশু আত্মার নিকটও পরলোক অন্ধকারময়, কিন্তু শিশু যেমন ভূমিষ্ঠ হইয়াই উজ্জ্বল আলোক-পূর্ণ পৃথিবী দেখে, সেইরূপ শিশু আত্মা পরলোক সম্বন্ধে এখানে অন্ধকার দেখিতেছে, সেথানে পৌঁছিয়াই দিব্য আলোকপূর্ণ রাজ্য দেখিয়া পুলকিত হইবে। আত্মা এখানে থাকিয়া জানুক বা না জানুক সে রাজ্য আলোক-পূর্ণ। যেমন গর্ভস্থ শিশুর জ্ঞানের উপর এ পৃথিবীর আলোকের কাজ নির্ভর করে না, সেইরূপ অমর আত্মার পক্ষেও সে রাজ্যের বিষয় জানা না জানার উপর কিছু নির্ভর করে না; তবে পৃথিবীর আলোর সঙ্গে অন্ধকার আছে, এখানে দিবা রাত্রি হয়, কিন্তু সে রাজ্যে আলো আছে, অন্ধকার নাই। দয়াময় ঈশ্বর জীবদিগকে সে রাজ্যের বিষয় বুঝাইবার জন্যই যেন অন্ধকার গর্ভবাসের ভিতর দিয়া মানবকে উজ্জ্বল-আলোক-পূর্ণ পৃথিবীতে আনিয়াছেন। তবে যে যায় সে আর ফিরে না বা ফিরিতে চায় না; যেমন যে শিশু একবার গর্ভযন্ত্রণা পাইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছে, তাহাকে হাজার প্রলোভন দেখাইলেও সে আর পুনরায় গর্ভ-বাসে যাইতে চায় না; এই গর্ভবাস ক্লেশজনক বলিয়াই পুনর্জ্জন্ম-বাদীরাও পুনর্জ্জন্মকে শাস্তি মনে করেন; আর যাঁহারা ইহাতে অবিশ্বাস করেন তাঁহারা ত ঈশ্বরের স্বরূপ বিরুদ্ধ বলিয়াই মনে করেন। পরলোকে যাহারা গিয়াছে, তথায় পুণ্যের পুরস্কার পাওয়া দূরে থাকুক, পাপের শাস্তি পাইলেও আর ফিরিয়া আসিতে চায় না। তাই যাহারা চলিয়া গিয়াছে, তাহারা আর কেহ ফিরিল না; কিন্তু বিশ্বাসীরা বিদায়কালেই সে রাজ্যের সাক্ষ্য দিয়া চলিয়া যান, তাঁহাদের ফিরিবার আর আবশ্যক নাই; ফিরিল না বলিয়া তাঁহাদিগের অস্তিত্ব সন্দেহ করিও না; তাঁহাদের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য আছে, ভক্তি নিষ্ঠার সহিত তাহা সম্পন্ন কর। এই কর্ত্তব্য পালন দ্বারা তাঁহাদের সঙ্গে ইহলোকবাসীদের এক বিমল যোগ সংস্থাপিত হইবে। মানব পৃথিবীতে থাকিয়াই স্বর্গবাস সুখ সম্ভোগ করিবে।

একজন বিশ্বাসী যথন ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে ইহ-লোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তাঁহার সে কথা শ্রবণ করিয়া কি আমরা পরলোকে আস্থাবান হইতেছি না? তাঁহার পরলোকগমন সময়ে ধর্ম্মভাবপূর্ণ উপদেশ স্মরণ করিয়া কি পরমেশ্বরে বিশ্বাসী হইতেছি না। সমুদয় বিশ্বাসী আত্মাই দেহত্যাগের সময় এইরূপ জীবন্ত বিশ্বাসের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সেই সমুদয় বিশ্বাসী আত্মাদিগকে স্মরণ করিয়া স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ করি।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রীযুক্ত তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনি "ব্রাহ্মণত্বের মূল কথা" প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "এই-রূপে সমাজ মধ্যে এক শ্রেণীর লোক জ্ঞানানুশীলনে সর্ব্বদা রত থাকিলে যে, সে সমাজ মধ্যে জ্ঞানের গৌরব রক্ষিত হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।" এই কারণে আপনি ব্রাহ্মসমাজেও এইরূপ এক শ্রেণীর লোক প্রস্তুত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, যাঁহারা "ইহার আধ্যাত্মিকতাকে রক্ষা ও পরিপোষন করিবেন।" আপনার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, এমন এক শ্রেণীর লোক না থাকিলে "ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিকতা ত্বরায় ম্লান হইয়া যাইবে।" আপনি যে ব্রাহ্মসমাজে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-সৃষ্টি করিবার বিশেষ পক্ষপাতী তাহার পরিচয় অনেক দিন হইতে পাইয়াছি। ব্রাহ্মণ অভাবে যদি ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিকতা রক্ষা না হয়, তবে ব্রাহ্মসমাজ যে লক্ষ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিল, তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের আবির্ভাবে সে সমাজের আদিলক্ষ্যগত আধ্যাত্মিকতা কথনই রক্ষিত হইবে না। আপনি নূতনবিধ আধ্যাত্মিকতার আশ্রয়দাতা হইতে পারেন। কিন্তু সে আধ্যাত্মিকতা ব্রাহ্মসমাজের কোন দিন

লক্ষ্য ছিল না। জগতে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতি যে কেবল অনন্যকর্ম্মা লোকদিগের দ্বারাই হইয়াছে, এ কথা যথার্থ নহে। অন্য কর্ম্ম করিয়াও শত শত লোকে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতি করিয়াছেন। গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা করিয়াও বহু লোকে বিজ্ঞানের উন্নতি করিয়াছেন, সাহিত্য জগতে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ওয়াটস্ ও ষ্টিবেনসন্ পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন না, রাজার বা সমাজের সাহায্যও পান নাই, তথাপি তাঁহারা নিজ অধ্যবসায় বলে জগতের পরম হিত সাধন করিয়া গিয়াছেন। হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সর সৌভাগ্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হন নাই, নিজ পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় ভার পর্য্যন্ত বহন করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না, জন ষ্টুয়ার্ট মিলের অর্থ সাহায্যে উহা মুদ্রিত হয়। মিল ইণ্ডিয়া আফিসে কেরাণীগিরি করিয়া জীবনটা কাটাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মত চিন্তাশীল লোক জগতে কত জন আছেন? (ক) মিলের সাহায্য ব্যতীত কোম্‌তের অন্ন সংস্থানের অন্য উপায় ছিল না, মিলও আহ্লাদের সহিত তাঁহার সাহায্য করিতেন। কিন্তু কোম্‌ত যখন আপনার ন্যায় এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সৃষ্টির প্রস্তাব করিলেন, জন সাধারণে জ্ঞানীর সাহায্য করিতে বাধ্য এই দাবি উপস্থিত করিলেন, তখনই মিল তাঁহার সাহায্য করিতে বিরত হইলেন। মিলের ন্যায় সাম্যবাদীর পক্ষে এইরূপ দাওয়া অতি অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। (খ) কোন সাম্যবাদীই কোম্‌তের কিম্বা আপনার এই ব্রাহ্মণ সৃষ্টির প্রস্তাব সমর্থন করিবেন না। আমি এতদিন জানিতাম, ব্রাহ্মসমাজ সাম্যমন্ত্রের উপাসক, প্রত্যেক ব্রাহ্মই সাম্যবাদী, কিন্তু এখন দেখিতেছি অনেক ব্রাহ্মের মতি বিপরীত দিকে ধাবিত হইতেছে, এখন ব্রাহ্মসমাজে গুরু চাই, ব্রাহ্মণ চাই, নেতা চাই, এ সকল না হইলে আর ব্রাহ্মসমাজ চলে না, ইহার আধ্যাত্মিকতা রক্ষা পায় না। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তি আধ্যাত্মিকতা রক্ষার প্রহরী নিযুক্ত হইলে সমাজের আধ্যাত্মিকতা প্রকৃত পক্ষে রক্ষা হইবে কি না, তাহা বিশেষ চিন্তার বিষয়। আধ্যাত্মিকতার প্রহরীবর্গ স্বয়ং আধ্যাত্মিক হইতে পারেন, কিন্তু সংসার হইতে নির্লিপ্ত না হইলে যদি কাহারও পক্ষে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা লাভ করা সম্ভব না হয়, তবে সংসার-লিপ্ত ব্রাহ্মদিগের আধ্যাত্মিকতা ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মণেরা কিরূপে রক্ষা ও পরিপোষণ করিবেন? কতিপয় ব্যক্তির আধ্যাত্মিকতা সজীব ও সতেজ থাকিলেই যে, সমাজের আধ্যাত্মিকতা ম্লান হইবে না, ইহা মনে করা সঙ্গত নহে। ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করিয়া প্রাচীন হিন্দু-সমাজের যে দশা হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজেরও সেই দশা হইবে। ব্রাহ্মণত্ব জন্মগত হওয়ায় এবং অপর বর্ণদিগকে জ্ঞানালোচনা হইতে নির্ব্বাসিত করায়ই যে "জাতিভেদ প্রথা অতি জঘন্য আকার ধারণ করিয়াছে" নতুবা করিত না, ইহা প্রমাণ সাপেক্ষ, স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে। সমাজ মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব প্রতিষ্ঠার যদি উপযুক্ত কারণ থাকে, তবে সেই ব্রাহ্মণত্বকে বংশগত করিবারও বিশেষ হেতু আছে। উন্নতির যে একটা বংশানুক্রমিক বিকাশ আছে, প্রাকৃতিক তত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা এখন একথা অসঙ্কোচে স্বীকার করিয়া থাকেন, আশা করি, আপনিও অস্বীকার করিবেন না; সুতরাং ব্রাহ্মণত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তাহা জন্মগত করাও আবশ্যক। তবে কেবলমাত্র জন্মগত অধিকারের উপর কোন প্রাধান্যই সংস্থাপিত হইতে পারে না। প্রাচীন ব্রাহ্মণত্বও কেবল জন্মগত অধিকারের উপর সংস্থাপিত হইয়াছিল না। আচারভ্রষ্ট ব্যক্তি ব্রাহ্মণত্ব হইতে বঞ্চিত হইতেন। তবে অপর বর্ণকে জ্ঞানালোচনা হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াই কি এদেশীয় জাতিভেদ "জঘন্য আকার ধারণ করিয়াছে?" ব্রাহ্মণেরা যে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানালোচনা হইতে অপর জাতিকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে জ্ঞান ও ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গের আলোচনা করিতে অপর জাতি অধিকারী ছিলেন না। ইহা বোধ হয় ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মণত্ব প্রতিষ্ঠার ফল ও সম্ভবতঃ তাহাই হইবে। আপনি নিজেই বলিয়াছেন, সমাজের আধ্যাত্মিক ও মানসিক উন্নতির জন্য কতকগুলি লোককে অনন্যকর্ম্মা হইয়া ধর্ম্ম-চিন্তা ও জ্ঞানালোচনায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। অনন্যকর্ম্মা না হইলে জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রকৃত উন্নতি সাধন কেহ করিতে পারে না। যদি এ সিদ্ধান্ত ঠিক হয়, তবে ইহাও ঠিক যে, উচ্চাঙ্গের জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ করা জন সাধারণের পক্ষে সম্ভব নহে; তাহারা প্রকৃত পক্ষে উহার অনধিকারী; পৃথিবীর অধিকাংশ লোককেই উদরান্নের জন্য ব্যস্ত থাকিতে হয়, সুতরাং আপনার সিদ্ধান্তানুসারে তাহাদিগের পক্ষে উচ্চ জ্ঞান ও ধর্ম্মের দ্বার ইহকালে রুদ্ধ থাকিবে। প্রাচীন ব্রাহ্মণত্ব যদি অপর বর্ণকে জ্ঞানালোচনা হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া থাকেন, তবে সে আপনার যুক্তিপথ অবলম্বন

(ক) অনন্যকর্ম্মা লোক ভিন্ন যে সাহিত্য বা বিজ্ঞানের উন্নতি হইতে পারে না একরূপ বলা আমাদের অভিপ্রায় নহে। পত্র প্রেরক এ দেশ হইতেই একরূপ অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তির নামোল্লেখ করিতে পারিতেন, যাঁহারা শ্রমকর রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও সাহিত্য চর্চ্চাতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। খ্যাতনামা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রমেশ চন্দ্র দত্ত মহোদয় দ্বয়ের নাম করিলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু পত্র প্রেরককে জিজ্ঞাসা করি যে ইংলণ্ডের ন্যায় এদেশে যদি একটা Literary Class থাকিত, সাহিত্যালোচনাই যাহাদের মুখ্য কার্য্য, তদ্দ্বারাই যাহারা প্রতিপালিত হন, তাহা হইলে কি সাহিত্যের আরও উন্নতি দৃষ্ট হইত না? ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার যদি অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাঁহার বিজ্ঞান সভাতে মনোযোগী হইতে পারিতেন, তাঁহাকে যদি উদরান্নের জন্য চিকিৎসা ব্যবসায়ে সময় না দিতে হইত, তাহা হইলে কি বিজ্ঞানের অধিক উন্নতি করিতে পারিতেন না? আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় সুযোগ্য ব্যক্তিদিগকে উদরান্নের জন্য যদি ওকালতী করিতে না হইত তাহা হইলে কি দেশের অধিক উন্নতি হইতে পারিত না?

(খ) অগস্ত কোম্‌ত জ্ঞানীদিগকেই সমাজের নেতা ও পরিচালক করিতে চাহিয়াছিলেন এবং অপরাপর শ্রেণীর সাহায্য দাওয়া করিয়াছিলেন, এই জন্যই মিল চটিয়াছিলেন। আমরা ত এরূপ প্রস্তাব করি নাই যে জ্ঞানিগণই সমাজের নিয়ন্তা ও পরিচালক হইবেন বা তাঁহাদের শক্তি নিরঙ্কুশ হইবে। তবে কোথায় সাম্যে ব্যাঘাত হইল? আমরা এইমাত্র বলিয়াছি যে জ্ঞানিগণ অনন্য-কর্ম্মা হইয়া জ্ঞানালোচনা করিবেন, এবং সমাজ বা রাজা তাঁহাদের অনন্য-কর্ম্মা হইবার সুবিধা করিয়া দিবেন সেই জ্ঞানালোচনাতেই তাঁহাদের জীবিকার উপায় করিয়া দিবেন; এইমাত্র। যেখানে শক্তির অধিকার ও চালনার কোন প্রসঙ্গ নাই সেখানে সাম্য বৈষম্যের প্রসঙ্গও নাই।

করিয়াই করিয়াছেন। আপনি বাক্যে জনসাধারণকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে না চাহিলেও কার্য্যে তাহারা সেই নির্ব্বাসন দণ্ডভোগ করিবে। (গ) আপনার সিদ্ধান্ত যে ঠিক নহে, মানুষ অন্য কর্ম্ম করিয়াও যে জ্ঞান ধর্ম্মের যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারে, তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই দিয়াছি। পেন্সনের বন্দোবস্ত না হইলে মোক্ষমূলর যে জ্ঞানের আশ্চর্য্য উন্নতি করিতে সমর্থ হইতেন না, আপনার এ কথা অনুমান মাত্র। সার উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক, উইলসন প্রভৃতি যে সকল মহাত্মার বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায় বলে সংস্কৃত শাস্ত্র ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাঁহাদিগের সকলেই অন্য কর্ম্ম করিয়াও জ্ঞানের আশ্চর্য্য উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন। গোল্ডষ্টুকার মোক্ষমূলর হইতে পাণ্ডিত্যে হীনকল্প ছিলেন না। বর্ত্তমান সময়ে এডিসন বিজ্ঞান চর্চ্চায় আশ্চর্য্য প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি কোন পৈতৃক ধনের অধিকারী ছিলেন না, রাজার অথবা সমাজেরও কোনরূপ সাহায্য পান নাই। ধর্ম্মজগতেও এরূপ দৃষ্টান্ত যথেষ্ট আছে, মহর্ষি পল আপনার অন্ন সংস্থানের জন্য পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করেন নাই। রাজদত্ত বৃত্তি ভোগ করিয়া কোন্ ধর্ম্ম-যাজক তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন? কেরি, মার্সম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতি শারীরিক পরিশ্রম করিয়া আপনাদিগের পরিবার পোষণ ও যাজন কার্য্যের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। কেরি সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপকতা করিয়া যে পাঁচ শত টাকা বেতন পাইতেন, তাহা মিশনের কার্য্যে অসঙ্কোচে ব্যয় করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল খৃষ্টধর্ম্ম-যাজক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া অনন্যকর্ম্মা হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কতজন কেরি, মার্সম্যান ও ওয়ার্ডের ন্যায় কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন? সেই সময় অপেক্ষা বর্ত্তমানে এদেশে খৃষ্টধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা কি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে? জন উইলিয়মসের ন্যায় বহুকর্ম্মা ধর্ম্মযাজক ধর্ম্মের জন্য যেরূপ অকাতরে আত্ম-প্রাণ উৎসর্গ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, অনন্যকর্ম্মাদিগের মধ্যে কয় ব্যক্তি তেমন পারিয়াছেন? সংস্থান থাকিলেই কার্য্যের অধিকতর সুবিধা হয়, জগতের ইতিহাস তাহা প্রমাণ করিতেছে না। কত লোক সৌভাগ্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইতেছে, কিন্তু তাঁহাদিগের দ্বারা মহৎ কার্য্য অতি অল্পই সাধিত হইতেছে। উদরান্নের জন্য যাঁহাদিগকে এক সময়ে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাঁহারাই আবার ধনী হইয়া কত লোকের উপকার করিয়াছেন; কত হিতকর বিষয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। মানুষ যাহা করিয়াছে, মানুষ তাহা করিতে পারে, বর্ত্তমান যুগের এই মহামন্ত্র। ধর্ম্ম ও জ্ঞান প্রত্যেক মনুষ্যেরই আয়ত্তাধীন, প্রত্যেকেরই পালনীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়। আশা করি, আপনি ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মণত্ব স্থাপন করিয়া মানুষকে এই উচ্চ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট করিবেন না। ব্রাহ্মসমাজ সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত, ইহাকে বৈষম্যের শিক্ষা দিবেন না। আমি এক প্রকার বাল্যকাল হইতেই সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি। (ঘ) সাম্যের উপাসক না হইলে আমার পক্ষে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করা অসম্ভব হইত। যে মন্ত্র আমাকে ব্রাহ্মসমাজে টানিয়া আনিয়াছে, সে মন্ত্রের প্রতিকূল কথা শুনিলে প্রাণে আঘাত লাগে। এই কারণে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মণত্ব সংস্থাপন প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম।

নিবেদক,

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

(গ) পত্র প্রেরকের এ যুক্তি মনে লাগিতেছে না; যদি কেহ বলেন এ দেশে যদি এমন এক শ্রেণীর লোক থাকিত, সাহিত্যালোচনাই যাঁহাদের প্রধান কাজ, সাহিত্যের উন্নতিবিধানে যাঁহাদের সতত যত্ন, তাহা হইলে দেশীয় সাহিত্যের আরও অনেক উন্নতি হইতে পারিত, তাহার অর্থ কি এই অন্য কাহারও দ্বারা সাহিত্যের উন্নতি হইতে পারে না, বা অন্য কর্ম্মা ব্যক্তিদিগের সাহিত্যে হস্তার্পণ করা কর্ত্তব্য নয়? ইংলণ্ডে এরূপ এক শ্রেণীর লোক আছেন বিজ্ঞানালোচনা যাঁহাদের প্রধান কাজ, তাঁহারা (Specialist) তাহার ফল কি এই হইয়াছে, যে অপরাপর শ্রেণী বিজ্ঞানালোচনা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে? না এই সুফল হইয়াছে যে দেশে একটা বিজ্ঞান-চর্চ্চার স্রোত বাহাল রহিয়াছে?

(ঘ) পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই প্রস্তাবের সহিত সাম্য বৈষম্যের কোন প্রসঙ্গ নাই। যেখানে এক শ্রেণীর হাতে সামাজিক শক্তি সঞ্চিত হয়, এবং অপর শ্রেণী তাহা হইতে বঞ্চিত থাকে সেইখানেই সাম্যের কথা উঠে। যদি কোনও বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলে সাম্যের ব্যাঘাত হয় তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দ্বারাও বৈষম্য উৎপাদিত হয়।—ত.-স.

ব্রাহ্মসমাজ।

উত্তরবঙ্গ-প্রচারযাত্রীদলের কার্য্যবিবরণ—২রা জুন শনিবার নলহাটী গ্রামের গৃহে গৃহে ঊষাকীর্ত্তন। আজ আমাদের বন্ধু বাবু নীলকান্ত সিদ্ধান্ত মহাশয়ের পুত্রের নামকরণ। স্নানান্তে বন্ধুবান্ধবগণ সমবেত হইলেন। বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপস্থিত বন্ধুগণ কেহ কেহ প্রার্থনা করেন। পুত্রের নাম নির্ম্মলকুমার রাখা হয়। সন্ধ্যার পর যাত্রীদল ধূলীয়ান রওয়ানা হন।

৩রা জুন রবিবার প্রাতে ধূলীয়ানে উপস্থিত হন। স্নানান্তে বাবু নন্দলাল পাল মহাশয়ের গৃহে পারিবারিক উপাসনা হয়। বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। রাত্রিতে ধূলীয়ান ব্রাহ্মসমাজে মহেন্দ্র বাবু উপাসনা করেন এবং "ব্রাহ্মধর্ম্মই জয়যুক্ত হইবে" এই বিষয়ে উপদেশ দেন।

৪ঠা জুন সোমবার ধূলীয়ানে ঊষাকীর্ত্তন হয়, তৎপরে যাত্রীদল কাঞ্চনতলায় গমন করেন। তথায় স্নানান্তে শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত ব্রহ্মদাস মহাশয়ের আশ্রমে কুঞ্জ বাবু উপাসনা করেন। বৈকালে স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ রায় মহাশয়ের ভবনে স্থানীয় ভদ্রলোক এবং মহিলাগণ সমাগত হন। সভায় মহেন্দ্র বাবু প্রার্থনা করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন এবং হরিমোহন বাবু "ব্রাহ্মধর্ম্ম কি?" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা এবং সংকীর্ত্তনকালে শ্রোতৃবর্গ আনন্দ প্রকাশ করেন। শ্রীনাথ বাবু যাত্রীদল এবং স্থানীয় ব্রাহ্মদিগকে প্রীতিভোজন করাইয়া বিদায় করেন।

৫ই জুন মঙ্গলবার—রাত্রিতে যাত্রীদল পূর্ণিয়া উপস্থিত হইয়া ষ্টেশন মাষ্টার বাবু তারাপ্রসন্ন বসুর গৃহে অবস্থিতি করেন।

৬ই জুন বুধবার—প্রাতে তারাপ্রসন্ন বাবুর গৃহে উপাসনা হয়, মহেন্দ্র বাবু উপাসনা করেন। সন্ধ্যার পর বাবু পার্ব্বতী চরণ দাস গুপ্ত মহাশয়ের ভবনে সভা হয়। সভায় অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত হন। সঙ্গীত এবং সংকীর্ত্তন করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। মহেন্দ্র বাবু আরম্ভ সূচক প্রার্থনা করিলে পর "বিশ্বাস" সম্বন্ধে কুঞ্জ বাবু এবং হরিমোহন বাবু Bible এবং হিন্দুশাস্ত্রের বাক্য অবলম্বন করিয়া ব্যাখ্যা করেন।

৭ই জুন বৃহস্পতিবার—প্রাতে ঊষাকীর্ত্তন। মধ্যাহ্নে পার্ব্বতী বাবুর গৃহে উপাসনা। মহেন্দ্র বাবু উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে হরিমোহন বাবু এবং কুঞ্জবাবু পুস্তক বিক্রয়ের জন্য Courtএ গমন করেন। সন্ধ্যার পর পার্ব্বতী বাবুর ভবনে কুঞ্জ বাবু "প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের বিকাশ" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং হরিমোহন বাবু সেই বিষয়েই বক্তৃতা করেন। স্থানীয় অনেক গণ্য মান্য লোক বক্তৃতা স্থলে উপস্থিত ছিলেন।

৮ই জুন, শুক্রবার—প্রত্যূষে বাবু তারাপ্রসন্ন বসুর গৃহে কুঞ্জ বাবু উপাসনা করেন। তৎপরে যাত্রীদল কাটিহারে গমন করেন। তথায় বাবু রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে মধ্যাহ্নে মহেন্দ্র বাবু উপাসনা করেন। বিকালে কাটিহার ব্রাহ্মমন্দিরে মহেন্দ্র বাবু উপাসনা করেন এবং উপদেশ দেন। তৎপরে যাত্রীদল বারসুইএ গমন করেন।

সকল স্থানেই ব্রাহ্মসমাজের নানা বিভাগের জন্য টাকা সংগ্রহ হইতেছে এবং পত্রিকার গ্রাহকও করা হইতেছে। প্রভু পরমেশ্বর তাঁহার দাসদলের সহায় হউন।

উৎসব—ভবানীপুর সুবার্ব্বান ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রমুখ কতিপয় ব্রাহ্মভ্রাতা তথায় গমন করেন। ৩রা আষাঢ় শনিবার সন্ধ্যার পর উৎসবের উদ্বোধনসূচক উপাসনা হয়, নবদ্বীপ বাবু উপাসনা করেন এবং উপদেশ দেন। তৎপর দিন পূর্ব্বাহ্নে ও তিনি উপাসনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন। অপরাহ্নে আলোচনা হয়। সন্ধ্যার সময় পুনরায় উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনা করেন এবং উপদেশ দেন। উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা এবং ভবানীপুর হইতে সমাগত ব্রাহ্মগণকে প্রিয়ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ মহাশয় তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করাইয়াছিলেন।

তত্ত্ববিদ্যা সভা—শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত এবং শ্রীযুক্ত বাবু প্রতুলচন্দ্র সোমের উদ্যোগে একটী তত্ত্ববিদ্যা-সভা স্থাপিত হইয়াছে। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ব্রাহ্ম সাধনাশ্রমে তাহার অধিবেশন হইতেছে। আমরা দেখিয়া সুখী হইতেছি যে, সভা দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। সভায় সামজিক ও আধ্যাত্মিক অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ আলোচিত হইয়া থাকে। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল গুরুকরন সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। "গুরুবিনে মুক্তি নাই," "সাধন দ্বারা সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করা যায়," "ধ্যান যোগে সাধক আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় দর্শন করিয়া থাকেন," "সমাধির অবস্থায় নৃসিংহ, কালী, দুর্গা প্রভৃতির মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়," নানাবিধ যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা মন্ত্রগ্রাহী ব্রাহ্মগণের এবম্বিধ কাল্পনিক মতের দৃঢ় প্রতিবাদ করেন। দ্বিতীয় সপ্তাহে বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "সত্য আপেক্ষিক কি নিরপেক্ষ," এই বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। সত্য যে নিরপেক্ষ এবং মানব যে তাহা নিরপেক্ষভাবেই জানিতে পারে, প্রবন্ধকার তাহা প্রতিপন্ন করেন। যাঁহারা সত্যকে অথবা সত্যের জ্ঞানকে আপেক্ষিক বলেন তাঁহাদের সহিত বিশেষ আলোচনা হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহ পর্য্যন্ত ইহাই আলোচ্য বিষয়। বাবু বিপিনচন্দ্র পাল একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া অবিনাশ বাবুর মতের প্রতিবাদ করেন, অবিনাশ বাবু সর্ব্বশেষে লিখিত উত্তর প্রদান করেন। তৎপর সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয় দার্শনিক যুক্তি পরম্পরা অবলম্বন করিয়া এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সত্য ও সত্যের জ্ঞান উভয়ই নিরপেক্ষ।

শ্রাদ্ধ—আমাদের বন্ধুবর বাবু ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয় গত পূর্ব্ব বৎসর ইহলোকলীলা সংবরণ করিয়াছেন। অল্পদিন হইল তাঁহার বিধবা সহধর্ম্মিণীও পরলোক গমন করিয়াছেন। তাহাদের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশচন্দ্র বসু এবং কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা ও সুবর্ণপ্রভা বসু প্রভৃতি তাঁহাদের ধর্ম্মতলার বাটীতে সম্মিলিত হইয়া শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্তানগণ শ্রাদ্ধোপলক্ষে সাঃ ব্রাঃ সমাজে ১০৲ সাধনাশ্রমে ২০৲ এবং ব্রাহ্ম-বালিকা বোর্ডিং ও শিক্ষালয়ে ১০০৲ এবং অন্যান্য স্থানে ৭০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

কলুটোলা নিবাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী ধরের মাতৃশ্রাদ্ধ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। বিপিন বাবু তদুপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১৲, সাধনাশ্রমে ১৲ এবং দাতব্য বিভাগে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

পরলোকগত বাবু কালীনাথ দের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে তদীয় সহধর্ম্মিণী সাঃ ব্রাঃ সমাজে ২৲ এবং সাধনাশ্রমে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৪ই জুলাই ১৮৯৪, শনিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় ১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ সিটিকলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ এবং আয় ব্যয়ের হিসাব।

২। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১৪ই জুন ১৮৯৪

শ্রীরজনীনাথ রায়
সম্পাদক।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১৬ই আষাঢ় প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

৭ম সংখ্যা। ১৭শ ভাগ। | ১লা শ্রাবণ সোমবার, ১৮১৬ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বলে ৩ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে প্রভো! আমরা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হস্তে তোমার সত্য-ধর্ম্মকে ভাল করিয়া ধরিতে পারিতেছি না। এই ধর্ম্মের মহৎ ভাব ভাল করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে, মানব জীবনের ও মানব-সমাজের নব-জীবন হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু ইহাকে সেভাবে সাধন ও প্রচাব করিতে পাবিতেছি না। কতবার সংকল্প করিতেছি, নিঃস্বার্থতার অগ্নি জ্বালিয়া তাহাতে জীবনকে আহুতি দিব, নিজের ইচ্ছাকে বলিদান দিয়া তোমার ইচ্ছার অনুগত হইব, জীবনের সকল কার্য্যকে তোমাব অনুগত করিব, কিন্তু প্রকৃতির দুর্ব্বলতা বশতঃ সে সংকল্পকে স্থির রাখিতে পারিতেছি না। যে আসক্তির পাশ এক সময়ে গলদেশ হইতে মুক্ত করিয়া দূরে নিক্ষেপ কবিতেছি, অপর সময়ে তাহা কুড়াইয়া লইয়া নিজের গলায় পরিতেছি; সুখাসক্তি ও স্বার্থপরতার জালে পুনরায় জড়াইয়া যাইতেছি; প্রবৃত্তিকুলকে শাসনাধীন রাখিতে না পারিয়া নিরাশ হইয়া তাহাদের হস্তে আপনাদিগকে সমর্পণ করিতেছি। এই ভয়ানক সঙ্কটের মধ্যে তোমার কৃপাই একমাত্র ভরসা। তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

একদিনের সংকল্প কিন্তু চিরজীবনের সাধন— নরনারী যখন পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়, তখন তাহারা পরস্পরের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে,—"ধর্ম্মে, অর্থে, ভোগে তোমাকে অতিক্রম করিব না।" প্রতিজ্ঞার এই অংশটুকু উচ্চারণ করিতে এক মিনিটও লাগে না; এবং যে ভাবের আবেগে এই প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হয়, সে আবেগও দীর্ঘকাল থাকে না। নব-বিবাহিত দম্পতি গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে নবানুরাগজাত আবেগ ও উচ্ছ্বাস শান্তভাব ধারণ করে। তখন উভয় স্কন্ধ একত্র করিয়া সংসার-ভার বহন করিবার দিন আসে। কিন্তু আবেগ ও উচ্ছ্বাস মন্দীভূত হয় বলিয়া কি এই প্রতিজ্ঞার গুরুত্ব হ্রাস হইয়া যায়? তাহা নহে। সাধু প্রকৃতির উপরে এই প্রতিজ্ঞার ভার চিরদিন সমান থাকে। তাঁহারা প্রেমের সরসতার অবস্থায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সংসারের সুখ, দুঃখ সরসতা নীরসতা সকল অবস্থাতেই সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন। এমন কি দম্পতির মধ্যে যদি একজন প্রতিকূলাচরণ করেন, যদি কর্কশ বাক্যে হৃদয়কে বিদ্ধ করেন, অথবা পৌরুষ ব্যবহারে মর্ম্মপীড়া উপস্থিত করেন, তথাপি ধার্ম্মিক পতিপত্নী ধর্ম্মে, অর্থে, ভোগে অপরকে অতিক্রম করিবার ইচ্ছা করেন না। একদিনের সংকল্প যখন চিরজীবনের বাধ্যতার দ্বারা সমর্থিত হয়, তখনি আমরা মানব-চরিত্রের মহত্ব লক্ষ্য করিয়া থাকি। প্রাচীন ঋষি বলিয়াছিলেন—"মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিবাকবণমস্তু" ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি, আমাদেব মধ্যে নিরাকরণ না থাকুক।" এইরূপে প্রত্যেক বিশ্বাসী ও প্রেমিক আত্মা বলিয়া থাকেন—আমি যেন ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি। একদিন কোনও শুভ মুহূর্ত্তে এ প্রকার সংকল্প হৃদয়ে উদিত হওয়া ও এরূপ সংকল্প প্রকাশ করা কিছুই বিচিত্র নয়। ভক্ত সঙ্গে বসিয়া আমরা যখন ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণ করি, যখন তান লয় বাদ্য সহকারে তাঁহার নাম সংকীর্ত্তন হয়, তখন ভাবের আবেগে তাঁহার চরণে আপনার দেহ, মন, প্রাণ অর্পণ করিতে ইচ্ছা হওয়া আশ্চর্য্য নহে, হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই এক মুহূর্ত্তের সংকল্পকে চিরদিন হৃদয়ে ধারণ করা এবং তদ্দ্বারা সমগ্র জীবনের সমুদায় কার্য্যকে নিয়মিত ও শাসিত করা অতীব কঠিন। ধন্য তাঁহারা যাঁহাদের হৃদয়ে এই সংকল্প চির জাগরূক, যাঁহাদের চিত্তে স্বার্থপরতা বা সুখ শান্তির প্রভাব উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহারা স্মরণ করেন, "আমরা যে ঈশ্বর-চরণে দেহ মন সমর্পণ করিয়াছি" এবং অমনি সমুদায় প্রলোভন অন্তর্হিত হয়। যিনি বাস্তবিক ঈশ্বর-চরণে আপনার দেহ মন দিয়াছেন, তিনি সর্ব্বদা অনুভব করিয়া থাকেন যে, তাঁহার সমুদায় বিষয়ের উপরে ঈশ্বরের দাওয়া আছে! তাঁহার সময়ের উপরে প্রভুর দাওয়া—সে সময় তিনি পরসেবাতে ও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে ব্যয় করিতে বাধ্য; তিনি যদি অর্থোপার্জ্জন করেন, সে অর্থের উপরে ঈশ্বরের দাওয়া, তাহা কেবল পরসেবার জন্য ও ঈশ্বরের

প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য। এরূপ যাঁহারা অনুভব করেন, তাঁহারাই ঈশ্বরের প্রকৃত দাস ও প্রকৃত সন্তান।

ব্রাহ্মদিগের গার্হস্থ্য জীবন—প্রাচীন সমাজে যে সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহার এই একটী দোষ অনেকে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, তাহাতে পতিপত্নীর মধ্যে সাহচর্য্য ও মিত্রতা নাই। একান্নভুক্ত হিন্দু পরিবার মধ্যে বাস করিয়া পতি ও পত্নী পরস্পরের সহিত সর্ব্ব সময়ে অসংকোচে মিশিতে পারেন না। এমন কি এক পরিবারস্থ রমণীগণের সহিত সেই পরিবারস্থ পুরুষদিগের মিশিবার প্রথা নাই। রমণীগণ অবরোধ মধ্যে অপরাপর নারীকুলের মধ্যে বাস করেন, পুরুষগণ বাহির বাটীতে পুরুষদিগের সঙ্গেই কালযাপন করিয়া থাকেন। এইরূপ পারিবারিক ব্যবস্থার এই একটী অনিষ্ট ফল ঘটিয়া থাকে যে, অনেক সময়ে যুবকগণ আমোদ প্রমোদের জন্য অন্যত্র গিয়া থাকে এবং কু-সঙ্গে পতিত হইয়া বিবিধ প্রকার পাপে লিপ্ত হয়। এই জন্য সমাজ ও নীতিতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের একটী মূলমন্ত্র এই,—যদি মানুষকে ভাল রাখিতে চাও, তবে তাহার গৃহকে তাহার পক্ষে আকর্ষণের বস্তু কর। আমরা আশা করিতেছি যে, দেশ হইতে নারীর অবরোধ প্রথা অন্তর্হিত হইলে এবং নারীগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হইলে, পতি ও পত্নীর মধ্যে সাহচর্য্য ও সখিত্বের ভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং লোকে আপনার গৃহকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণের স্থান বলিয়া অনুভব করিবে। লোকে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, "তোমরা যে এতগুলি ব্রাহ্ম-বিবাহ দিলে এবং বালিকাদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য এত চেষ্টা করিলে, তোমাদের মধ্যে পতিপত্নীর সাহচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে কি না? অর্থাৎ বিবাহিত ব্রাহ্ম-পতিগণ তাঁহাদের বিশ্রামকালের অধিকাংশ সময় কি নিজ নিজ পত্নীর সহবাসে যাপন করেন অথবা বিনোদনের জন্য অপরাপর বন্ধুবান্ধবকে অন্বেষণ করেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, এ বিষয়ে এখনও আশানুরূপ উন্নতি দৃষ্ট হয় নাই। ইহার কারণ এই, যদিও নামে ব্রাহ্ম-বিবাহ হইয়াছে এবং নামে পত্নীগণ শিক্ষিতা, তথাপি অনেক স্থলেই পত্নীগণের শিক্ষার অবস্থা সুশিক্ষিত পতির সাহচর্য্যের অনুরূপ নহে। এ বিষয়ে ঐ পতিগণই নিন্দনীয়। তাঁহারা বিবাহ করিবার সময় পাত্রী, শিক্ষা ও ধর্ম্মভাবাদি সম্বন্ধে নিজেদের অনুরূপ কি না তাহা তত দেখেন নাই, যত রূপ বা জাতিকুল প্রভৃতি দেখিয়াছেন। ইহার অনিবার্য্য ফল, একটু সময় পাইলেই বাড়ী ছাড়িয়া টো টো করিয়া বেড়ান অথবা বাড়ীতে থাকিয়াও বিনোদনের জন্য অপর বিষয়ে বা অপরের সঙ্গে কালযাপন করা। চারিদিকে শিক্ষার যেরূপ বিস্তার হইতেছে, তাহাতে ব্রাহ্মবালিকাদিগকে উত্তমরূপ জ্ঞানে উন্নত করিতে না পারিলে ভাবী ব্রাহ্ম পতি-পত্নীর সাহচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না এবং ব্রাহ্মদিগের গার্হস্থ্য জীবনের উন্নতি দৃষ্ট হইবে না।

ধর্ম্মানুগত ধনোপার্জ্জন ও ধনের ধর্ম্মানুগত ব্যবহার—ব্রাহ্মধর্ম্ম সামাজিক ধর্ম্ম। ধন উপার্জ্জন ও তাহার ব্যবহার সম্বন্ধেও ইহার কিছু বলিবার আছে। ব্রাহ্ম যে কোনও রূপেই হউক ধনোপার্জ্জন করিতে কিংবা যে কোনও প্রকারে হউক ব্যয় করিতে পারেন না। তাহার ধনোপার্জ্জনের প্রণালী ধর্ম্মানুগত হওয়া আবশ্যক। ইহা বলা বাহুল্যমাত্র, যে উপার্জ্জনের প্রণালীতে আংশিকরূপেও অসত্য ব্যবহার বা প্রতারণা করিতে হয়, বা অপরকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য অর্থে বঞ্চিত করিতে হয়, তাহা ব্রাহ্মের পক্ষে নিষিদ্ধ। কিংবা যে কার্য্যের দ্বারা চিত্তের অধোগতি হয় তাহা তাঁহার পক্ষে বর্জ্জনীয়। কেবল তাহা নহে, ব্রাহ্ম যদি ধনোপার্জ্জন লালসাতে এতদূর শ্রম করেন যে তাঁহার পাঠ, আত্মচিন্তা উপাসনাদির সময় না থাকে, তাহাও তাঁহার পক্ষে নিন্দনীয়। তদ্দ্বারা এই প্রকাশ পায়, যেন তিনি ধনের জন্যই জীবন ধারণ করিতেছেন, ঈশ্বরের জন্য নহে। ব্রাহ্মকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে এ সংসারে থাওয়া দাওয়া অর্থোপার্জ্জন করা ও পার্থিব সম্পদ সঞ্চয় করাই জীবনের লক্ষ্য নহে। ইহা অপেক্ষা জীবনের মহত্তর ও উচ্চতর লক্ষ্য আছে। তাঁহার দৈনিক জীবন এই বিশ্বাসের অনুরূপ হওয়া আবশ্যক। ধনের উপার্জ্জন সম্বন্ধে যেরূপ, ধনের ব্যয় সম্বন্ধেও সেইরূপ। ব্রাহ্ম যে কোনও প্রকারেই হউক ধন ব্যয় করিতে পারেন না। তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই যদি আপনার ও আপনার পরিবার পরিজনের ভোগ-বিলাস ও বাসনার চরিতার্থতাতেই নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তিনি অপরাধী। মনে কর একজন ব্রাহ্ম আছেন, তিনি মাসে সহস্রাধিক টাকা উপার্জ্জন করেন, তাঁহার পরিবারগণের সংখ্যা যেরূপ, তাহাতে মাসে ৫০০ শত টাকা ব্যয় করিলেই তাহাদিগকে সুখে রাখা যায় এবং উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া যায়। তিনি একটু সংযত হইয়া চলিলেই অপর পাঁচ শত টাকা হইতে উত্তর কালের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া ইচ্ছামত নানা সদনুষ্ঠানের সাহায্যার্থ দান করিতে পারেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন না। ধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ও তাঁহার পরিবার পরিজনগণের ভোগ বিলাসের লালসা এতই বাড়িয়া যায় যে, তিনি সদনুষ্ঠানের সহায়তা করিবেন কি? তাঁহার সহায়তা করিতে পারিলে ভাল হয়। আমরা বলি এরূপে ধনের ব্যয় করা ধর্ম্মবিগর্হিত। ধনসম্পদকে জগতের কল্যাণসাধনে ও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে নিয়োগ করিতে পারিলেই জীবনের সার্থকতা। ধন সম্পদকে সর্ব্বদা সেই ভাবে দেখা কর্ত্তব্য।

সাধারণ প্রজাপুঞ্জের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার—দিন দিন সাধারণ প্রজাপুঞ্জের নীতির কি দুর্গতি হইতেছে! বিচারালয়ে যাও, হাটে যাও, বাজারে যাও, দু জন কারিকর ডাকাইয়া কোনও কাজের ভার দেও, সর্ব্বত্রই অসত্য-পরায়ণতা ও প্রবঞ্চনা-প্রবৃত্তি দেখিয়া মন ম্লান হইয়া যাইবে। বাজারে যাও, দোকানদার দুই টাকা মূল্যের কোনও দ্রব্যের দর আট টাকা বলিবে, তারপর তুমি কষাকষি

ধস্তাধস্তি করিয়া যত নামাইতে পার, ভগ্ন বিকৃত বা অপকৃষ্ট দ্রব্য উৎকৃষ্ট বলিয়া দিবে, তুমি বুদ্ধিমান হও বাঁচিয়া এস, বিশ্বাস কর, তবে প্রতারিত হও। প্রতিদিনের আহারের দ্রব্য, ঘৃত তৈল প্রভৃতি যাহাতে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করিলে স্বাস্থ্য হানির সম্ভাবনা, লাভবান হইবার লোভে তাহাতে অন্য দ্রব্য মিশাইয়া বিক্রয় করিতেছে। একজন কারিকর ডাকিয়া কাজ বুঝাইয়া দেও, ত্বরায় কাজটী চাই বলিয়া বার বার জানাও, ত্বরায় পাইবে বলিয়া অগ্রিম টাকা দেও, তথাপি সময়ে পাইবে না, সে জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, মনে ক্লেশ হইবে, কিন্তু সেদিকে সে ব্যক্তির দৃষ্টি নাই, সে সময়ে কাজ দিবে না। বিচারালয়ের ত কথাই নাই; তাহা নামে ধর্ম্মাধিকরণ কিন্তু সেস্থানকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা, শঠতার আলয় বলিলেই হয়। দেশের লোকের এ কি শোচনীয় অবস্থাই ঘটিয়াছে! আমাদের যেন বোধ হয় সাধারণ লোকের নীতির দিন দিন অধিক দুর্গতি হইতেছে। এরূপ কেন হইতেছে? হিন্দুজাতি, সত্যপরায়ণতা সরলতা, বিশ্বাসিতার জন্য প্রাচীনকালে এত প্রসিদ্ধ ছিল, গ্রীক ও চীনদেশীয় পর্য্যটকগণ যাহাদের সত্যপরায়ণতার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাদের এত দুর্গতি হইল কেন? একটা প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, লোকের মন হইতে প্রাচীন ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে সাধারণ প্রজাপুঞ্জের মধ্যে যে সকল উপায়ে ধর্ম্ম ও নীতির নিয়ম সকল প্রচার করা হইত, সে সকল উপায় বর্ত্তমান সময়ে পরিত্যক্ত হইতেছে। ব্রাহ্মণগণের প্রভাব বিধ্বস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রজাকুল পালকবিহীন মেষদলের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছে। কারণ যাহাই হউক সাধারণ লোকের নীতির অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছে। এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? সাধারণ লোকের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবন্ত শক্তিরূপে উপস্থিত করিতে পারেন, এরূপ কতকগুলি প্রতিভাশালী প্রচারকের প্রয়োজন হইয়াছে। রাম সিং যেমন পঞ্জাবের অজ্ঞ কৃষক-দিগকে নীতিমান করিয়া তুলিয়াছিলেন, এইরূপ ব্রাহ্মধর্ম্মকে সামান্য লৌকিক নীতির মধ্যে লইয়া যাইতে পারেন, এরূপ ব্যক্তির প্রয়োজন হইতেছে। যে ধর্ম্ম লৌকিক নীতি নিরপেক্ষ হইয়া কেবল ভাবের তরল বায়ুতে বাস করে এবং নীতিকে নিম্নভূমির কথা বলিয়া উপেক্ষা করে, আমরা সে ধর্ম্মের প্রার্থী নহি, তাহা আধ্যাত্মিক অহিফেণ সেবন। অহিফেণসেবী যেমন গুলিতে দম দিয়া আপনাকে সপ্তম স্বর্গে উত্থিত বলিয়া মনে করে, এই আধ্যাত্মিক অহিফেণসেবীরাও সেইরূপ ভাবময় রাজ্যে বাস করিয়া চরিতার্থতা লাভ করে। সাধারণ লোক-দিগকে বলিয়া দিতে হইবে, হাজার কীর্ত্তন কর, হাজার ভাবে মাতামাতি কর, হাজার গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা দেও, ঘৃতে যদি অন্য পদার্থ মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় কর, তাহা হইলে তোমরা নারকী, তোমাদের ইহপরকাল দুই গেল, মহা কীর্ত্তনেও তোমাদের কিছু করিতে পারিবে না।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ।

যে দেশের লোকে ভারতবর্ষকেই একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র বা ধর্ম্মসাধনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনে করেন, সেই দেশে আমরা এ কি দৃশ্য দেখিলাম। দেখিলাম যে দেশে ছয় মাস কাল মধ্যে একবার ও সূর্য্যের মুখ দৃষ্ট হয় না আবার অপর ছয় মাস মধ্যে একবারও সূর্য্যের অস্ত হয় না, সেই দূরবর্ত্তী ল্যাপ্‌লাণ্ড দেশের সন্নিহিত সুইডেনের এক প্রান্তবাসীর পরলোক-গমনে বাঙ্গালির চক্ষে জলধারা পড়িতেছে। তাঁহার শ্রাদ্ধ বঙ্গবাসি ব্রাহ্মগণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশের লোকে তাঁহার শ্রাদ্ধ-কর্ত্তা। কোথায় তাঁহার আত্মীয় স্বজন? যাঁহা-দের সহিত তাঁহার রক্তের সম্পর্ক ছিল, তাঁহারা কোথায়? তাঁহারা আজও এ সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। এ দিকে তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে বাঙ্গালির প্রাণ হইতে ইহ-পরলোকের আশ্রয় পরমগতি পরমেশ্বরের অভিমুখে প্রার্থনা উত্থিত হইয়াছে। তাঁহার পারলৌকিক শুভবাসনা লইয়া শত শত বঙ্গবাসী সম্মিলিত হইয়াছেন। কেন এ দেশে এই দৃশ্য দেখিলাম? সেই সুইডেনেত আরও কত লোকের পরলোক-প্রাপ্তি হইতেছে। কই আর ত এমন দৃশ্য দেখা যায় না। বাঙ্গালি যে দেশভেদ ও জাতিভেদ অগ্রাহ্য করিয়া, সেই বিদেশাগত বন্ধুর জন্য এরূপে ব্যাকুল হইয়াছিল, ইহার মূলে কি দেখিতে পাওয়া যায়? রক্তের সম্পর্ক এখানে নাই, দেশের সম্পর্ক এখানে নাই, জাতীয়-তারও কোন বন্ধন এখানে নাই। তবে কোন্ সম্পর্কে আকৃষ্ট হইয়া তিনি আত্মীয় স্বজনগণের স্নেহ-বন্ধন অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়া, এই দূরদেশবাসী এবং অপরিচিতদিগকে আপনার জনরূপে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মগণ তাঁহার সহিত এরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন?—সে সম্পর্ক আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। তাহা পরম পিতা পরমেশ্বরের পিতৃত্ব হইতে পৃথিবীস্থ নরনারীতে যে মনোহর ভ্রাতৃ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সম্পর্ক। এক ধর্ম্মে বিশ্বাস, এক ঈশ্বরে বিশ্বাস হইতে যে আশ্চর্য্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় ইহা সেই সম্পর্ক। আমরা জাতি-ভেদাক্রান্ত দেশে পরি বর্দ্ধিত, আমরা এই সুমধুর সম্বন্ধের মাধুর্য্য ও মনোহারিত্ব সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে অসমর্থ। মহাত্মা শাক্য সিংহ স্বীয় পিতার নগরে ভিক্ষাপাত্র হস্তে বহির্গত হইয়া যখন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া বেড়াইতে-ছিলেন, যখন সেই দারুণ লজ্জাজনক মর্ম্মপীড়ক সংবাদ শাক্য সিংহের পিতা রাজা শুদ্ধোধনের কর্ণে পৌছিল, তখন তিনি আর সুস্থির থাকিতে না পারিয়া পুত্রের নিকটে যাইয়া বলিলেন,—"কেন উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া আমাদিগকে লজ্জা দেও? আমি কি এতগুলি ভিক্ষুর আহার দিতে পারিতাম না।" বুদ্ধ বলিলেন "মহারাজ ভিক্ষা বৃত্তিই আমাদিগের বংশের রীতি" "আপনি ও আপনার পরিবার রাজবংশ-জাত হইতে পারেন কিন্তু আমি পূর্ব্বতন বুদ্ধগণের বংশসম্ভূত, তাঁহারা ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে জীবন ধারণ করিতেন

মহামনা যীশুও এই আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ অনুভব করিয়া এরূপ ভাবের কথাই বলিয়াছিলেন। যখন তাঁহার মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনীগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিবার জন্য, আসিয়া জনতার জন্য তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার পার্শ্বস্থ লোকেরা তাঁহাকে বলিয়াছিল যে "দেখুন আপনকার মাতা ও ভ্রাতৃগণ, ও ভগিনীগণ বাহিরে আছে ও আপনার অন্বেষণ করিতেছে।" তখন তিনি উত্তর করিলেন যে "আমার মাতা কে? আর আমার ভ্রাতৃগণ বা কে? তিনি তাঁহার চারিদিকে উপবিষ্ট লোকদের প্রতি অবলোকন করিয়া কহিলেন, এই দেখ আমার মাতা ও আমার ভ্রাতৃগণ। কেন না যে কেহ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার ভ্রাতা ও ভগিনী ও মাতা" এই উভয় স্থলেই আমরা সেই সম্বন্ধেরই উল্লেখ দেখিতেছি। উভয়েই আত্ম পরিবার,বংশ ও জাতি প্রভৃতির সহিত যে পার্থিব সম্পর্ক ছিল, তাহার প্রতি গুরুত্ব না দিয়া আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ—এক ঈশ্বরের উপাসক পরিবারের মধ্যে যে সম্পর্ক সংস্থাপিত হওয়া উচিত, ঈশ্বরের অনুগত ও আশ্রিত জনগণের মধ্যে যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই যে উপাসক পরিবারের সম্পর্ক, যাহা পৃথিবীর লাভ ক্ষতি বা বংশ ও জাতি বা দেশের প্রতি নির্ভর করে না, এই সম্পর্কের কথাই চিরদিন সাধু সজ্জনেরা বলিয়া আসিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই মহৎ ও উদার সম্পর্কেই সকলকে আবদ্ধ হইতে অনুরোধ করিতেছেন। এই মধুর সম্বন্ধ সংস্থাপনই ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র লক্ষ্য। সে লক্ষ্যের দিকে আমরা যত অগ্রসর হইব, যত এই মধুর শোভন সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে আবদ্ধ হইতে পারিব, ততই এই পবিত্রধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব জগৎ অনুভব করিবে এবং ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছা পরিপূর্ণ হইবে।

পরলোকগত কারল হেমারগ্রেণ।

ব্রাহ্মসমাজে কাজ করিবার লোকের যে প্রকার অপ্রতুল, তাহাতে একটী কাজের লোক হারাইলে অতিশয় ক্ষতি বোধ হয়। সম্প্রতি আমাদিগকে এই প্রকার একটী ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে। আমরা একজন উৎসাহী, অনুরাগী ও কর্ম্মদক্ষ সভ্য হারাইয়াছি। ইঁহার নাম কারল হেমারগ্রেণ নামটী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত নহে। বিগত মাঘোৎসবের সময় অনেক ব্রাহ্ম-ভ্রাতা কলিকাতাতে আসিয়া ইঁহাকে দেখিয়া গিয়াছেন এবং যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়া যান নাই, তাঁহারা ইঁহার বিষয় শুনিয়া থাকিবেন। আমরা ইঁহার জীবনচরিত সংক্ষেপে পাঠকগণের গোচর করিতেছি।

ইউরোপের উত্তর প্রান্তবর্ত্তী সুইডেন দেশ ইঁহার জন্মভূমি। সুইডেনের উত্তর বিভাগে এক সামান্য গৃহস্থের গৃহে ইঁহার জন্ম হয়। শুনিতে পাওয়া যায় ইঁহার পিতা একজন খ্রীষ্ট ধর্ম্মযাজক ছিলেন। যে স্থানে ইহার জন্ম হইয়াছিল, সেখানে ভূমি বৎসরের অধিকাংশ কাল তুহিনাবৃত থাকে। সেই দুরন্ত শীতের মধ্যে সামান্যাবস্থ লোকদিগকে কিরূপ ক্লেশে বাস করিতে হয়, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। হেমারগ্রেণ দরিদ্রের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া বাল্যাবধি গুরুতর শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে স্থানে বাস করিতেন তাহার বিশ মাইলের মধ্যে ভাল ডাক্তার ছিল না। তাঁহার পিতা পীড়িত হইলে, তিনি বিশ মাইল হাটিয়া ডাক্তার আনিতে গেলেন, আসিয়া দেখিলেন পিতার মৃত্যু হইয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনে জ্ঞান পিপাসা অতিশয় প্রবল হইল। তিনি সুইডেনের দক্ষিণ-বিভাগবর্ত্তী অপশালা নগরে আগমন করিলেন, এবং তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল পাঠ করিলেন। কিন্তু অবস্থার প্রতিকূলতা-নিবন্ধন সে সুখও তাঁহার ভাগ্যে অধিক দিন ঘটিল না। তাঁহাকে অসময়ে পাঠ সাঙ্গ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টাতে ব্যস্ত হইতে হইল। একটী শিক্ষকতা কার্য্য অবলম্বনে কোনও প্রকারে আপনার ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়াও তাঁহার বিদ্যাচর্চ্চা গেল না। তিনি একাগ্রতা সহকারে অনেক আয়াসে জার্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ, ইংরাজী,লাটিন,প্রভৃতি নানা ভাষা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এবং স্থানীয় শিক্ষিত যুবকগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপন পূর্ব্বক উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার অন্তরে একটী গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিল। বিবিধ ভাষা অধ্যয়ন ও বিবিধ শাস্ত্র আলোচনা করিতে করিতে তদ্দেশ প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনাস্থা উপস্থিত হইল। প্রচলিত খ্রীষ্টীয় মত সকলকে অতিশয় ভ্রান্তি সংকুল বোধ হইতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার অবস্থা একবার কল্পনা কর। তিনি ধর্ম্ম যাজকের সন্তান, তাঁহার ভ্রাতা ভগিনী, আত্মীয় স্বজন সকলে খ্রীষ্টধর্ম্মে বর্দ্ধিত ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মানুরাগী। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা দেশের মধ্যে নূতন কথা। তিনি আর একটীও লোক দেখিতে পান না যে তাঁহার সমভাবাপন্ন বা তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায়। তথাপি তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া প্রচলিত খ্রীষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন বটে কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাস হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইল না। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও প্রার্থনাতে বিশ্বাস রহিয়া গেল। এই মাত্র সম্বল করিয়া তিনি পাঠ চিন্তা ও অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে এক দিন হঠাৎ কোনও সংবাদ পত্রে ব্রাহ্মসমাজের কিছু বিবরণ পাঠ করিলেন, পাঠ করিয়া ইঁহাদের বিষয়ে আরও জানিবার জন্য ঔৎসুক্য জন্মিল। কিছু দিন পরে ফরাসি ভাষাতে লিখিত একখানি গ্রন্থ তাঁহার হস্তে পতিত হইল, তাহাতে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সবিস্তর বিবরণ পাঠ করিলেন। পাঠ করিতে করিতে তিনি অনুভব করিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মই তাঁহার ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজই তাঁহার সমাজ। তদবধি যত্ন পূর্ব্বক তিনি ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত সমুদায় সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৮৮৬ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদককে, সভ্য হইবার অভিপ্রায় জানাইয়া পত্র লিখিলেন। যথাসময়ে তাঁহাকে সভ্য করিয়া লওয়া হইল।

ইহার কয়েক বৎসর পরে তিনি ইংলণ্ডে আগমন করেন। নিজের জ্ঞান ও শিক্ষার উন্নতি করা, তাঁহার ইংলণ্ড বাসের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া শিক্ষা করিবেন ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা ঘটিয়া উঠিল না। তিনি নিতান্ত দারিদ্র্যে ও দুরবস্থাতে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিয়াও আত্মোন্নতি সাধনে একটী দিনের জন্য অমনোযোগী ছিলেন না। ইংলণ্ডে বাস কালে নানা বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিলেন এবং অবাধে পাঠ করিতে পারিবেন বলিয়া "টএন বি হল নামক" স্থানের পুস্তকালয়ের সহিত সংসৃষ্ট হইলেন। ইংলণ্ডে আসারপর হইতেই তাঁহার মনে ভারতবর্ষে আসিবার বাসনা প্রবল হয়। তদবধি অবসর অন্বেষণ করিতেছিলেন। অবশেষে বিগত বর্ষের জুন মাসে সেই অবসর উপস্থিত হইল। কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে তিনি এদেশে আগমন করিলেন। আসিয়া একটী ব্রাহ্ম পরিবারে স্থান প্রাপ্ত হন। অতি অল্পদিনের মধ্যে জার্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ, লাটিন প্রভৃতি ভাষা শিখিবার জন্য অনেকগুলি ছাত্র ছাত্রী জুটিয়া গেল। তিনি উৎসাহের সহিত শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। এদেশে আসিয়াই তাঁহার প্রতীতি হইল যে ব্রাহ্মসমাজে জ্ঞানচর্চার অভাব আছে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ভাল ভাল লোক পড়া শুনা ত্যাগ করিয়াছেন। জ্ঞান চর্চা নাই বলিয়া, ব্রাহ্মগণের মতের স্থিরতা নাই, কেবল ভাবের তরঙ্গের উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। এই অভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি ইহা দূর করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন, এবং দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া একটী উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কাহারও দ্বারা কখনও যাহা হয় নাই, তিনি তাহা করিয়াছিলেন, তিনি মাসিক ত্রিশ টাকার অধিক চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ পুস্তকালয়ের "রামমোহন রায় পুস্তকালয়" নাম রাখিবেন ভাবিয়াছিলেন। তিনি জীবিত থাকিলে একার্য্য সিদ্ধ করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন তাঁহার এই এক সংকল্প ছিল যে তিনি অন্ততঃ পাঁচ ছয়টী ১৩।১৪ বৎসরের এরূপ বালক লইবেন, যাহাদের পিতামাতা যাহাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য অর্পণ করিবেন। তিনি তাহাদিগকে জার্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষা শিখাইয়া ও ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ভাল করিয়া শিক্ষা দিয়া উত্তরকালে প্রচারক করিয়া তুলিবেন। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন তোমরা মানুষ প্রস্তুত করিতেছ না কেন? এই সংকল্পিত কার্য্যগুলি আরম্ভ করিতে না করিতেই তাঁহার জীবন শেষ হইয়া গেল। তিনি নিজ শরীরের প্রতি দৃষ্টি করিতেন না, রৌদ্রে জলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাহার ফল এই হইল যে দুরন্ত জ্বরাতিসার রোগে আক্রান্ত হইলেন। ২৪এ জুন রবিবার পীড়ার সঞ্চার হইয়া ৩রা জুলাই মঙ্গলবার দেহান্ত হইয়া গেল। এই এক বৎসর কালের মধ্যে আমরা তাঁহার অনেক সদ্‌গুণ লক্ষ্য করিয়াছি। আমরা ভাবুকতা প্রধান জাতি তাহাতে ভাবুকতা অল্প ছিল। তিনি রামমোহন রায়ের জীবনের আদর্শকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি যেমন মুখে কিছু বলিতেন না কাজে সমুদায় করিতেন এবং মানব-সেবাকেই ঈশ্বর-সেবা বলিয়া মনে করিতেন, হেমারগ্রেণের আদর্শ তাহা ছিল। তিনি এই এক বৎসরের মধ্যে একবারও প্রকাশ্য বক্তৃতাদি করেন নাই, কিন্তু কার্য্যে যাহা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা সহজে ভুলিতে পারা যাইবে না। তিনি যে পরিবারে ছিলেন, তাহাদের সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে প্রেমের গুণে গৃহের কর্ত্তা ও কর্ত্রী দূরে থাক, শিশুদিগকে ও পশু পক্ষীদিগকে পর্য্যন্ত বশীভূত করিয়াছিলেন। তাহার মৃত দেহ যখন বহন করিয়া লইয়া যাওয়া যায়, তখন পল্লীস্থ সমুদায় নিম্নশ্রেণীর লোক হায় হায় করিতে লাগিল কারণ তিনি সকলের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার পীড়ার সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র ব্রাহ্মগণ দলে দলে তাঁহার সেবার জন্য উপস্থিত হইলেন এবং যথাসাধ্য তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিছুতেই আর রোগের উপশম করিতে পারা গেল না। অতি অল্প সময়েই তাঁহার জীবন শেষ হইল। মৃত্যুকালে তাহার বয়ঃক্রম ৩৩।৩৪ বৎসরের অধিক হয় নাই। মৃত্যু হইলে ইহার দেহকে নিমতলার ঘাটে লইয়া দাহ করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। কারণ খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি ইহার অতিশয় অনাস্থা ছিল, এবং ইনি কবর দিবার পক্ষ ছিলেন না, সুতরাং ইহাকে কোনও খ্রীষ্টীয় সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা কর্ত্তব্য বোধ হইল না। বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করিয়া ইহার মৃত দেহ গৃহ হইতে লইয়া যাওয়া গেল এবং ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে ব্রহ্মোপাসনা পূর্ব্বক চিতাগ্নিতে অর্পণ করা গেল। তিনি আমাদের মধ্যে বাস করিবার জন্য ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিবার জন্য এতদূর হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সকলেই শোকসন্তপ্ত হইয়াছি। বিগত ৭ই জুলাই শনিবার ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু নিজ ভবনে বন্ধু বান্ধবদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহার স্মরণার্থ বিশেষ উপাসনা করিয়াছিলেন। হেমারগ্রেণ তাঁহাদের বাড়ীতেই ছিলেন। ঐ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে মোহিনী বাবু একশত টাকা তাঁহার প্রস্তাবিত লাইব্রেরিতে দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তৎপর দিন অর্থাৎ ৮ই জুলাই রবিবার প্রাতে মন্দিরে তাঁহার স্মরণার্থ বিশেষ উপাসনা হয়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় মৃত বন্ধুর গুণাবলী কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া প্রার্থনা করেন, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাহাদের ৪ঠা জুলাইএর অধিবেশনে শোকসূচক এক প্রস্তাব পত্রস্থ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভ্রাতা ও ভগিনীর নিকট প্রেরিত হইবে। এইরূপে আমরা একটী উপযুক্ত ও কার্য্যদক্ষ লোক হারাইয়াছি। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে সুখ শান্তিতে রক্ষা করুন।

শোক-গীতি।

কোথা হ'তে এসেছিলে কোথায় চলিয়ে গেলে,
স্বর্গীয় বিহঙ্গ যেন বসন্তের শেষে;
দেখালে আশ্চর্য্য স্ফূর্ত্তি, স্বভাব সুন্দর মূর্ত্তি,
নিঃশব্দে গাইলে গীত মোহিয়া আবেশে!

শুনেছি হিমানী দেশে, দীন দরিদ্রের বেশে,
বাল্যকালে করেছিলে জীবন-সংগ্রাম ;
শৈশবেতে পিতৃহীন, অনাহারে তনুক্ষীণ,
জ্ঞান-পিপাসার কিন্তু ছিলনা বিরাম।

নিবিড় তুষারে ঢাকা, গভীর তিমির মাখা,
বৎসরেতে ছয় মাস থাকে যেই ভূমি ;
ব্রহ্মকৃপা পরকাশে, সেই অন্ধকার দেশে,
বিমল সত্যের জ্যোতিঃ পেয়েছিলে তুমি।

সত্য জাগে যার প্রাণে, সেকি কোন বাধা মানে ?
লঙ্ঘিয়া সাগর গিরি ঘুরি দেশে দেশে,
লভিয়া ধরম রত্ন, করিয়া কতই যত্ন,
অবশেষে এসেছিলে ভারত বরষে।

প্রেমেতে পাগল পারা, আত্মপর জ্ঞান হারা,
আত্ম গণি পর গৃহে করেছিলে বাস ;
আবাল বণিতা যত, তব প্রেমে বশীভূত,
পশু পক্ষী তোমা হেরি লভিত উল্লাস।

শিখেছিলে বহু ভাষা, করেছিলে বহু আশা,
ধর্ম্মের সেবায় আহা কাটাবে জীবন ;
আমাদের ভাগ্য দোষে, হতভাগ্য বঙ্গদেশে,
অকালে হইল হায় তোমার মরণ !!

মেরুদেশে ছিল ধাম, সেদিন শুনেছি নাম,
আত্ম বন্ধু পরিচিত নহ তুমি কেউ ;
স্মরিতে তোমার মুখ, তবু কেন ফাটে বুক ?—
হৃদয় ভেদিয়া উঠে বিষাদের ঢেউ !

কে তুমি মোদের ছিলে, কি যে ধন এনে দিলে ?
কি রহস্য আছে ইথে কে করে সন্ধান ?
চিত্ত নাহি স্থির রহে, দুনয়নে ধারা বহে,
"কারল্ হেমারগ্রেণ" ব'লে কাঁদে প্রাণ !

সত্যের সেবক তুমি, পেয়েছিলে সত্য ভূমি,
স্বদেশ বিদেশ সম ছিল হে তোমার ;
একই পিতার নামে, চলেছিলে নিত্যধামে,
তাতেই কি হয়েছিলে এত আপনার ?

রোগ শোক মৃত্যু জরা, পূর্ণ এই বসুন্ধরা,
ছাড়িয়া গিয়াছ তুমি অমৃত আলয়ে,
দেব তুমি, দেব লোকে, চিরকাল থাক সুখে,
এসেছিলে মর্ত্ত্যধামে দেবদূত হ'য়ে।

আছিলে "আপন" ভাই, এখনো রয়েছ তাই,
ক্রমে ক্রমে আমরাও নিজালয়ে যাব ;
ভাসিয়া প্রেমাশ্রু জলে, আনন্দময়ীর কোলে,
দেখিয়া তোমারে ভাই পরাণ জুড়াব।

জয় জয় বিশ্বপতি, জন্ম মৃত্যু সৃষ্টি স্থিতি,
সংযোগ বিয়োগ সব তোমারি বিধান ;
তোমারি ইচ্ছার জয়, হউক এ বিশ্বময়,
জয়, শিব সিদ্ধিদাতা মঙ্গল আলয় !

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ২য় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

১৮৯৪।

এই তিন মাসে—পরমেশ্বরের কৃপায় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১২টী সাধারণ অধিবেশন হইয়াছে। এই ১২টী অধিবেশনে প্রধানতঃ যে যে কার্য্য হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

(১) সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা হেতু সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের সংযোগে গবর্ণমেণ্টে দুইখানি আবেদন পত্র পাঠান হয়।

(২) ব্রাহ্মসমাজের পরম হিতৈষিণী কুমারী কলেটের সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাইয়া, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। উক্ত পত্র আমাদের সভাপতি মহাশয়ের বিলাত যাত্রাকালে তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় সভাপতি মহাশয় বিলাত পৌঁছিবার পূর্ব্বেই উক্ত মহোদয়া পরলোকগতা হইয়াছেন। এসংবাদে ব্রাহ্মসমাজের সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজনের নিকটে আমাদের শোকসূচক পত্রাদি লিখিবার পূর্ব্বে অধ্যক্ষসভার বিগত অধিবেশনে সমবেত সভ্যগণ সেই সভার সমুদয় কার্য্য স্থগিত রাখিয়া দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার পরলোকগমনে ব্রাহ্মসমাজ কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বক আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব নির্দ্ধারণ করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভাও ইতিপূর্ব্বে এই মর্ম্মে আর একটি প্রস্তাব নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। সিটিকলেজ ভবনে তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে অনেকে তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

(৩) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন উপলক্ষে কলিকাতা-উপাসনালয়ে ১৩, ১৪ও১৫ই মে, তিন দিবস সংকীর্ত্তন, উপাসনা, উপদেশ, শাস্ত্রপাঠ ও ধর্ম্মালোচনা হয় এবং লক্ষ্ণৌতে ও আমাদিগের প্রচারক বাবু লক্ষ্মণপ্রসাদ উপাসনা ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত ও কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

(৪) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে যে সভ্যের নিকট ২ বৎসরের অধিক কালের চাঁদা বাকি আছে, তাঁহাদিগকে সমাজের ৮ম নিয়ম অবগত করিয়া এক মুদ্রিত পত্র পাঠান হইয়াছে।

(৫) **দুর্ভিক্ষ**—গত ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণে আমরা জানাইয়াছিলাম যে, বাবু কালীচন্দ্র ঘোষালকে ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়ায় পাঠান হইয়াছে। তিনি এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া কাপড় ও অর্থাদি বিতরণ করিয়াছিলেন। তৎপর বিশেষ আবশ্যক না থাকায় এবং তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি উক্ত স্থান হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। দুর্ভিক্ষের ব্যয়ের হিসাব পরে দেওয়া যাইবে।

কাঁথি, মুর্শিদাবাদ, কাকিনিয়া, বাগেরহাট, বাঁশবেড়িয়া, চট্টগ্রাম বগুড়া ও হাজারিবাগ ও ভবানীপুর সুবার্ণ্ণ ব্রাহ্ম-সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সব স্থান এবং আরও কোন কোন স্থান হইতে প্রচারক পাঠাইবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল।

আমাদিগের প্রচারক মহাশয়গণ নিম্নলিখিত রূপ কার্য্য করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—ব্রাহ্ম-সাধনাশ্রমে অধিকাংশ সময় উপাসনা করিয়াছেন, কখন কখন ব্রহ্ম-মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। ব্রাহ্ম-বালিকা ছাত্রী নিবাস ও ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় এবং ব্রাহ্ম বালক ছাত্র-নিবাসের তত্ত্বাবধায়কের কার্য্য, তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদন ও মেসেঞ্জার সম্পাদনের সহায়তা এবং কোন কোন পারিবারিক অনুষ্ঠানে উপাসনা করিয়াছেন। একটী বিবাহোপলক্ষে বাঁকী-পুরে গমন করিয়াছিলেন; তথা হইতে আরায় গমন করিয়া তথাকার আশ্রমে উপাসনাদি করেন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—বরিশাল—ব্রহ্ম-মন্দিরে একটি বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন। বর্ষের শেষ দিন উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য, ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য,সমাজ মন্দিরে "নীতিশিক্ষা ও চরিত্র সংগঠন" বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা এবং ব্রজমোহন কলেজ গৃহে "ধর্ম্মের খোসা ও শাঁস" বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন।

কাকিনিয়া—উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য, ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য,কাকিনিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসব উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য এবং ছাত্রসমাজ মন্দিরে "অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম" বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন।

কলিকাতা—একটী বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য এবং অন্য সময়ে তিন দিবস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বাঁশবেড়িয়া—উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে সমাজ মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য, উৎসব উপলক্ষে কোন ভদ্রলোকের বাটীতে উপাসনা, গড়বাটীতে "ধর্ম্মমতের বিরোধ ও সামঞ্জস্য" বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা, মাদক সেবননিবারণী সভার সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সভাপতির কার্য্য, মাদক সেবনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা, স্কুলগৃহে ছাত্রসভায় সভাপতিরূপে "নিঃস্বার্থ হিতৈষণা" বিষয়ে বক্তৃতা এবং ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন।

এতদ্ভিন্ন কলিকাতা ও মফঃস্বলে ব্রাহ্ম ও অন্যান্য লোকের সহিত ধর্ম্মালোচনা এবং সাময়িক পত্রিকায় ধর্ম্ম বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ ও ধর্ম্ম বিষয়ে পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস—কলিকাতা সমাজে এবং ব্রাহ্ম পরিবারে উপাসনা ও উপদেশ দান, সাধনাশ্রমে মধ্যে মধ্যে উপাসনা ও শাস্ত্র পাঠ, নববর্ষ উপলক্ষে বিশেষ উৎসবে উপাসনা উপদেশ দান ও শাস্ত্র পাঠ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসবে দুই বেলা বিশেষ উপাসনা, উপদেশ দান ও শাস্ত্র পাঠ করেন।

বগুড়া—ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সমাজে উপাসনা, উপদেশ, পাঠ, ব্যাখ্যা এবং আলোচনাদি করেন। স্থানীয় "টাউন হলে" দুই দিবস "ধর্ম্মই জীবন" এবং "ধর্ম্মের লক্ষণ কি" এই দুই বিষয়ে বক্তৃতা এবং প্রকাশ্য স্থানে "ধর্ম্ম পরের জন্য নয়" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন, ইহা ব্যতীত বন্ধুদের গৃহে বিশেষ উপাসনা, অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনা এবং সুতরাপুর ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা, উপদেশদান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

নাটোর—একটী বন্ধুর গৃহে উপাসনাদি করেন।

দিঘাপতিয়া—একটী বন্ধুর পরিবারে উপাসনাদি এবং স্থানীয় বাঙ্গালা স্কুল গৃহে গীতার শ্লোক ব্যাখ্যা দ্বারা "জীবনের পরিবর্ত্তন" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

কাওরাইদ—ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা, উপদেশ দান, শাস্ত্র পাঠ এবং মন্দির প্রাঙ্গনে "ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল সত্য" বিষয়ে ট্রষ্টডিড পাঠ উপলক্ষে বক্তৃতা করেন।

ঢাকা—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে উপাসনা এবং পরিবারে উপা-সনা ও একদিন ছাত্রসমাজের বিশেষ অধিবেশনে "জীবনের চিহ্ন কি?" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

নারায়ণগঞ্জ—সমাজে উপাসনা ও উপদেশ।

আরা—সাধনাশ্রমে ও পরিবারে উপাসনাও আলোচনা করেন।

সাহাবাদজেলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত তিনটী গ্রামে উপাস-নাদি করেন।

কোয়াৎ—একটী ব্রাহ্ম-পরিবারে উপাসনাদি করেন।

দানোয়ায়—একটি বন্ধুর গৃহে প্রায় দুই সপ্তাহ কাল থাকিয়া নিত্য উপাসনাদি করেন এবং এক দিন একটী অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশেষ উপাসনাদি করেন।

নসরিগঞ্জ—একটী ভদ্রলোকের গৃহে সঙ্গীত ও প্রার্থনাদি করেন। এখানে স্থানীয় প্রধান প্রধান লোক উপস্থিত ছিলেন।

গয়া জেলার অন্তর্গত দাউ নগর—গ্রামে একটী বন্ধুর গৃহে বিশেষ উপাসনাদি করেন। উপাসনায় স্থানীয় কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন।

বরাহনগর—একটী অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশেষ উপাসনাদি করেন।

কোন্নগর—ব্রাহ্মসমাজে একদিন সাপ্তাহিক উপাসনাদি করেন।

ভবানীপুর—সুবর্ণ্ণ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে দুই বেলা উপাসনা, উপদেশ ও আলোচনাদি করেন। এতদ্ব্যতীত তত্ত্বকৌমুদীতে লেখেন এবং দুইখানি পুস্তিকা বাহির করেন।

বাবু শশিভূষণ বসু—হাজারীবাগ উৎসবের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করেন ও নৈতিক বিদ্যালয়ের উৎসব উপলক্ষে কেশব হলে "নীতি শিক্ষার আবশ্যকতা" এবং অন্য দুই দিন উক্ত হলে আমাদের "আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নতি" এবং "ধর্ম্মবীর" সম্বন্ধে ২টী বক্তৃতা করেন, আর এক দিন পরলোকগত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এতদ্ভিন্ন সাপ্তাহিক সামাজিক উপাসনা

কোন কোন পরিবারে উপাসনা, আলোচনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন।

গিরিধিতে সাপ্তাহিক উপাসনা করেন ও উপদেশ দান করেন। নিমতা সমাজে একদিন উপাসনা করেন ও উপদেশ দান করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সম্প্রতি "Lotus : or a series of meditations" P. I. নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন এবং "Aids to spiritual life" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিবার আয়োজন করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী যত্নের প্রয়োজন।

এই কয়েক মাস অসুস্থতার জন্য তাঁহার কার্য্যের কিছু ব্যাঘাত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ প্রসাদ—এই তিন মাস কাল মধ্যে নিম্নলিখিত কার্য্য ব্যতীত আর বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই।

তিনি প্রচারার্থে হরদুই ও সাহাবাদ এই দুই স্থানে গমন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত স্থানে তিনি এক নূতন প্রকারে প্রচার করিয়াছেন। অর্থাৎ এক বিবাহ স্থলে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় বৃথা আমোদের বিনিময়ে সঙ্গত ও ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। লক্ষৌতে অবস্থিতি কালে দরিদ্রদিগকে রীতিমত ঔষধি বিতরণ করিয়াছেন, প্রতি শনিবার সামাজিক উপাসনা, এবং বুধবার বাবু বিশ্বম্ভর রায় মহাশয়ের ভবনে সঙ্গত সভার কার্য্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কোন কোন পরিবারে পারিবারিক উপাসনা,এবং দুইটি জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা এবং তাঁহার ইতিবৃত্ত ও কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রায় প্রতিদিন তাঁহার প্রচার কার্য্যালয়ে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য হেতু প্রকাশ্য রাজপথে বক্তৃতা করিতে সমর্থ হন নাই। অসহ্য উত্তাপ জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য ও স্থগিত ছিল।

খাসিয়া মিশন ও বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী—এই তিন মাস কাল নীলমণি বাবু সমস্ত সময় খাসিয়া মিশন কার্য্যে যাপন করিতে পারেন নাই। অর্থ সংগ্রহ হেতু তাঁহাকে প্রায়ই নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। কোন কোন ব্রাহ্মসমাজে সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে গমন করিয়া উভয় কার্য্যই সমাধা করিয়াছেন। সেই সেই সময়ে খাসিয়াতে তাঁহার সহকারীগণই স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ সমূহে উপাসনা, ঔষধি বিতরণ, শিক্ষালয়ে শিক্ষকতা প্রভৃতি কার্য্য করিয়াছেন। চট্টগ্রাম উৎসব উপলক্ষে গমন করিয়া নীলমণি বাবু স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং নানাপ্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি পুনরায় খাসিয়াতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তথায় কার্য্য করিতেছেন।

সাধনাশ্রম।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের কার্য্যবিবরণ যথাস্থানে প্রচারক মহাশয়দিগের কার্য্যের সহিত প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়—রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতঃকালীন উপাসনায় কখন কখন আচার্য্যের কার্য্য, কোন কোন গৃহে পারিবারিক উপাসনা ও অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনা, তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদনের সহায়তা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ের কার্য্য, মধ্যে মধ্যে সাধনাশ্রমের উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য এবং ব্রাহ্ম-বালিকা বোর্ডিংএ নিয়মিতরূপে উপাসনা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—কখন কখন ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতঃকালীন উপাসনায় এবং নিমতা ব্রাহ্মসমাজে সাপ্তাহিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য এবং খালোড়ে এক ব্রাহ্মবন্ধুর মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে উপাসনা করেন। কাঁথি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করিয়া তথায় এবং চণ্ডীভেটী ও দগড়া গ্রামে উপাসনা ও আলোচনাদি দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করেন। রামপুরহাট, মুরশীদাবাদ, নলহাটী, আজিমগঞ্জ, ধুলিয়ান, পূর্ণিয়া, কাটিহার, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী, সিলিগুড়ী, খরসান ও দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থানে উপাসনা, উপদেশ ও আলোচনাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল—এপ্রেল মাস পর্য্যন্ত ফরিদপুরের অন্তর্গত রাধাগঞ্জ নামক স্থানে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। তৎপর পীড়িত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদনের সহায়তা করেন এবং "গুরু করণ" সম্বন্ধে তত্ত্ববিদ্যা সভায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত জয়শঙ্কর রায়—সাধনাশ্রমের তত্ত্বাবধায়কতা এবং মহিলাদিগকে শিক্ষা দান করিয়াছেন।

সাধনাশ্রমের আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
দানপ্রাপ্তি	১৩৬৷৹	আশ্রমবাসীদিগের	
সাঃ ব্রাঃ সমাজ হইতে		আহার ও অন্যান্য	
প্রাপ্ত	৪০৲	বাবদে খরচ	৩২১৻৫
ভিক্ষা	৩০৶৹	পাথেয় এবং আশ্রমের	
পুস্তক বিক্রয়	৪৷৹	সাধারণ খরচ	৫৭৸/৹
আশ্রমবাসীদিগের		আরা আশ্রমে পাঠান	
নিকটে প্রাপ্ত	১৪৪৸৶৹	হয় এবং ডাকমাশুল	২০৷৹
পাথেয়	৪০৻১৫		———
	———		৩৯৯/৫
	৩৯৩৸১৫	হস্তেস্থিত	৷/৹
হস্তেস্থিত	৫৷৴১০		———
	———		৩৯৯৷৶৫
	৩৯৯৷৶৫		

আরা শাখা-সাধনাশ্রম।

শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব—মার্চ্চ মাসের শেষভাগে লাহোর রাওলপিণ্ডি ও বেনারসে উপাসনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন, ১২ই এপ্রিল আরাতে ফিরিয়া আসেন এবং সাধনাশ্রমে আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "মানবজীবনের আদর্শ" ও "ব্রাহ্মধর্ম্ম" সম্বন্ধে দুইটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন; আশ্রমে অভ্যাগতদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনাদি করেন এবং মধ্যে মধ্যে

তাঁহাদের গৃহে যাইয়া ধর্ম্মালোচনাদিও করেন। স্থানীয় জজ আদালতের উকীল বাবু ভগবতী সহায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া উপাসনার জন্য তাঁহার বাটী আমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ায় প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে এই স্থানে উপাসনা হইত। এই উপাসনা স্থলে অনেক স্থানীয় বেহারি ভদ্রলোক উপস্থিত হইতেন। আরও তিনি দেশের নানাস্থানের বন্ধু ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সহানুভূতিকারীদিগের সহিত পত্র দ্বারা ধর্ম্মালাপাদি করিয়াছেন এবং লাহোরের "ব্রাহ্ম-প্রচারক" নামক উর্দ্দু পাক্ষিক পত্রিকায় কিছু কিছু লিখিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী—বেনারসে অবস্থিতি-কালে উপাসনাদি করেন এবং শ্রীযুক্ত জগন্নাথপ্রসাদ গুপ্তের খুড়ীমার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপরে তিনি আরা সাধনাশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীযুক্ত গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় ও ডাক্তার নৃত্য-গোপাল মিত্র মহাশয়ের বাটীতে ও অন্যান্য দিন আশ্রমে উপাসনা করেন। কলিকাতায় আগমন করিয়া আশ্রমে ও ব্রাহ্মবন্ধুদিগের গৃহে উপাসনাদি করেন। কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় চারি দিবস বাঁকিপুর মোকামা ও দানাপুরে সামাজিক ও পারিবারিক উপাসনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন। মফঃস্বলে বন্ধু ও সহানুভূতিকারীদিগের সঙ্গে পত্রে দ্বারা ধর্ম্মালাপ করিয়াছিলেন।

পরমেশ্বরের কৃপায় সাধনাশ্রমের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইতে চলিল। গত মাঘোৎসবের পর শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব প্রভৃতি কতিপয় পরিচারক মিলিত হইয়া প্রচারার্থে বেহার অঞ্চলে গমন করেন। উক্ত অঞ্চলে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারক নাই। এজন্য তাঁহারা আপাততঃ আরা সহরে আশ্রম সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহার চতুর্দ্দিকে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। ঐ স্থানে স্থায়ীরূপে প্রচারার্থে শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সুন্দর সিং ও শ্রীযুক্ত শ্রীরঙ্গবিহারীলাল অবস্থিতি করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী বন্ধু শ্রদ্ধেয় বাবু ব্রহ্মদেব নারায়ণের বিশেষ আগ্রহে এই সাধনাশ্রমটি স্থাপিত হইয়াছে। এজন্য তাঁহাকে আমাদিগের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতেছি। এই আশ্রমে প্রায় ১০।১১ জন লোক এক্ষণে স্থায়ীরূপে অবস্থিতি করিতেছেন।

আরা শাখা সাধনাশ্রমের আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
স্বতঃপ্রবৃত্ত দান	২২০॥৵৫	আহারাদির ব্যয়	১৩২৸৶০
কলিকাতার আশ্রম হইতে প্রাপ্ত	৫০৲	প্রকাশ দেবের পুত্র-কন্যাদিগের জন্য	৩৬৸০
		পাথেয়	৪৫৸৶০
মোট	২৭০॥৵৫	ডাকমাশুল	১০৲
		আসবাব	১।৶০
		বাটীভাড়া ও ভৃত্যের বেতন	৪২॥/৫
		মোট	২৭০॥৵৫

(ক্রমশঃ)

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রীযুক্ত শ্রদ্ধাস্পদ তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

আপনার প্রবন্ধ এবং আমার প্রতিবাদ যাঁহারা মনো-যোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর কোন কথা বলিবার প্রয়োজন আছে, এমন বোধ হয় না। তবে যাঁহাদিগের তেমন মনোযোগ দেওয়ার অবসর নাই, তাঁহারা আমার প্রতিবাদ পত্রের আপনি যে ফুটনোট (পদটীকা) করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া ভ্রমে পতিত হইতে পারেন, এই হেতু আপনার ফুটনোটের মন্তব্য সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা প্রয়োজন হইয়াছে। আপনি বলিয়াছেন, "অনন্যকর্ম্মা লোক ভিন্ন যে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতি হইতে পারে না, এরূপ বলা আমাদিগের অভিপ্রায় নহে।" আপনার অভিপ্রায় না থাকিলেও আপনার কথা আপনার অভিপ্রায়ের প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। অন্যকর্ম্মা লোকের দ্বারা জ্ঞানের সামান্য উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু "তাদৃশ উন্নতি" হইতে পারে না, তজ্জন্য অনন্যকর্ম্মা লোকের প্রয়োজন এ কথা আপনি স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন। আপনার কথাগুলি এই,—(ক) "আমাদের দেশে অনন্যকর্ম্মা হইয়া জ্ঞানোন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইবার লোক নাই বলিয়াই জ্ঞানের তাদৃশ উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে না," (খ) জগতে সাহিত্য কিম্বা বিজ্ঞান সম্বন্ধে যত কিছু আশ্চর্য্য কীর্ত্তি সাধিত হইতেছে, তাহা অনন্যকর্ম্মা লোকদিগের দ্বারাই সাধিত হইতেছে। যে কথাগুলি আপনার "ব্রাহ্মণত্বের মূল কথা" হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইল, তাহার দ্বারা কি স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে না যে, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের যত কিছু আশ্চর্য্য উন্নতি তাহা কেবলমাত্র অনন্যকর্ম্মা লোকেরাই সাধন করিতেছেন? নতুবা "দ্বারাই, বলিয়াই" এ কথাগুলির কোন অর্থই থাকে না। এখন আপনার কথায় বোধ হইতেছে, আপনার বাক্য আপনার অভিপ্রায়ের প্রতিকূল মত প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে আমার প্রতিবাদ সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় নাই; উহা অন্ততঃ আপনার প্রকৃত অভিপ্রায় প্রকাশের সুযোগ দিয়াছে।

আমার প্রতিবাদ পত্রে ইহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতি যে কেবল অনন্য-কর্ম্মা লোকদিগের দ্বারাই হইয়াছে, অন্যের দ্বারা হয় নাই, এ কথা যথার্থ নহে। বরং আপনি যে স্থলে একজন অনন্য-কর্ম্মা লোকের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, আমি তথায় পাঁচ জন অন্যকর্ম্মা লোকের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি। আমার ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে, অনুসন্ধান করিলে বরং ইহাই দৃষ্ট হইবে যে, অনন্যকর্ম্মা লোকদিগের অপেক্ষা অন্যকর্ম্মা লোকেরাই সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অধিক উন্নতি করিয়াছেন। আমি ইচ্ছা করিয়াই এদেশীয় কোন লোকের নাম করি নাই। কিন্তু আপনি যখন উল্লেখ

করিয়াছেন, তখন এ কথা বলা আবশ্যক, রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এদেশের সাহিত্যের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই অন্যকর্ম্মা লোকদিগের দ্বারা হইয়াছে, মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি যত কবি আছেন, এক রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর সকলকেই অন্নের জন্য ধা ধা করিয়া বেড়াইতে হইয়াছে। মদনমোহন সাহিত্যের জন্য পূর্ব্বে যাহা করিতে পারিয়াছিলেন, অর্থ স্বচ্ছলতা উপস্থিত হইলে তাহা করিতে পারেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আক্ষেপ বোধ হয় আপনি বিস্মৃত হন নাই। অন্নের অসচ্ছলতা মাইকেল মধুসূদনের প্রতিভা বিনষ্ট করিতে পারে নাই। আপনার প্রশ্নের উত্তরে এ কথা বলা আবশ্যক, ইংলণ্ডে Literary class রাজার বা সমাজের সাহায্যে জন্মে নাই, উহারা স্বয়ং নিজ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। তথাপি সেক্সপিয়র ও মিল্টনের ন্যায় কবি বর্ত্তমান সময়ে কয়জন জন্মিয়াছেন? রাজকবি টেনিসন্ ভিন্ন বর্ত্তমান সময়ে কবিদিগের মধ্যে আর কয়জন রাজবৃত্তি লাভ করিয়াছেন? আমার বক্তব্য এই, কোন এক ব্যক্তিকে রাজদত্ত কিম্বা সমাজদত্ত বৃত্তি দিয়া বিজ্ঞান কিম্বা সাহিত্য সমাজে প্রবেশ করাইয়া দিলেই যে তিনি বিজ্ঞানবিৎ হইতে পারিতেন কিম্বা সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা ঠিক নহে। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা যথেষ্ট কৃতজ্ঞ আছি, কিন্তু তাঁহাকে বৃত্তি দিলে যে তিনি আর অধিক কিছু করিতে সমর্থ হইতেন, সে ধারণা আমার নাই। তিনি এ পর্য্যন্ত অল্প অর্থ উপার্জ্জন করেন নাই, উদরান্নের জন্য তাঁহাকে এখনও যে বিশেষ ভাবিতে হয় তাহা সম্ভব নহে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ওকালতি কি উদরান্নের জন্য? তিনি পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন, রায়চাঁদবৃত্তি পাইয়াছেন। ইংলণ্ডে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা কোন বৃত্তি পান না, অথচ দিনান্তে একাহার করিয়াও সাহিত্য বা বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতেছেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অন্য কার্য্য করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু সে দিকে তাহাদিগের দৃষ্টি নাই। তাঁহারা জ্ঞানের উপাসক। তাঁহারা অন্নের মুখাপেক্ষা করেন না। আপনার গুণে তাঁহারা ক্রমে জগতের লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে বলেন না, অথচ জগতে তাঁহারাই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। এস্থলে সাম্য বৈষম্যের কোন কথা উঠিতে পারে না। যেখানে সমাজ নিজ হস্তে কিছু একটা গড়াইতে চাহেন তথায়ই গোলযোগ উপস্থিত হয়, সাম্যের স্থলে বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। আপনি যে এ কথাটা বিস্মৃত হইয়া যাইতেছেন ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। আপনি আপনার নিজ জীবনের শিক্ষার বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সমাজের অনিষ্ট ঘটাইবেন। ব্রাহ্মসমাজে যে প্রচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না, লোকে অনন্যকর্ম্মা হইয়া আধ্যাত্মিকতাকে রক্ষা করিতেছে না, তাহার কারণ সমাজে বৃত্তির ব্যবস্থার অভাব নহে। ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা প্রথম প্রচারক হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের জন্য কোন্ বৃত্তি নিয়োজিত ছিল? আপনার নিজের জন্যই বা অগ্রে কোন্ বৃত্তির ব্যবস্থা হইয়াছিল? অর্থোপার্জ্জনের পথ উন্মুক্ত থাকিতেও আপনি ব্রাহ্মসমাজের সেবাব্রত কেন গ্রহণ করিয়াছিলেন? আমি আবার বলিতে বাধ্য হইতেছি, আপনি নিজ জীবনের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া চিন্তার সাহায্যে নূতন পথ আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই নূতন পথে সহযাত্রীদিগকে লইয়া গিয়া আপনি সমাজের অনিষ্ট করিবেন। যদি সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের সম্মুখে আপনার জীবনকে শিক্ষাদাতারূপে উপস্থিত করুন। ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব ইতিহাসে এরূপ উপদেষ্টা আরও অনেক আছেন। আপনি ইহা স্বীকার করিবেন কি না জানি না, কিন্তু আমি এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের সাহায্য গ্রহণ করেন না, কিম্বা যাঁহারা সাহায্যের জন্য লালায়িত নহেন, যাহা পান তাহাতেই সন্তুষ্ট, না পাইলেও রুষ্ট হন না, তাঁহাদিগের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতি অল্প সাধিত হইতেছে না; তাঁহারা সমাজের অঙ্কুশাধীন থাকিতে অসম্মত নহেন। অথচ যাঁহারা অন্য উপায়ে সংসারকে অধিকতর সচ্ছল অবস্থায় আনিতে পারিতেন কি না সন্দেহ, বৃত্তি ভোগ করিয়া তাঁহারা কি অধিকতর আগ্রহ যত্নের সহিত ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে সমর্থ হইয়াছেন? আপনি এ কথার কি উত্তর দেন, তাহাই জানিতে চাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কি বৃত্তির ব্যবস্থা করেন নাই। তবে যাঁহারা এক সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন, আজ তাঁহাদিগের কেহ কেহ কোন্ ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন? তাঁহাদিগকে কি আমাদিগের আধ্যাত্মিকতা রক্ষা ও পরিশোধনের জন্য নিযুক্ত করিতে চাহেন? আগ্রহ, স্থিরমতিত্ব, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা মানুষের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। জীবন সংগ্রামে এই সকল ধর্ম্ম পরিপুষ্ট হয়; সচ্ছলতায়ই যে তাহা বিকাশ প্রাপ্ত হয় তাহা নহে। আপনি যাহা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসেও তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে না। বৈষম্যের ব্যবস্থা করা আপনার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু আপনি যে ব্যবস্থা করিতে চাহিতেছেন, সাম্যের বিনাশ তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। অগস্ত কোম্ত বলিয়াছিলেন, জ্ঞানীরা সমাজের মস্তকের কার্য্য করিয়া থাকে, সুতরাং মস্তকের পরিপোষণ জন্য অন্যান্য অঙ্গের সাহায্য করা কর্ত্তব্য। কোম্ত যাহা বলিয়াছেন, আপনিও অন্য কথায় তাহাই বলিতেছেন। আপনিও ব্রাহ্ম ব্রাহ্মণদিগের সপক্ষে সমাজের নিকট সেই দাওয়াই উপস্থিত করিয়াছেন। ইহার দ্বারা কিরূপে সাম্যের বিনাশ ও বৈষম্যের সৃষ্টি হইবে, আমি পূর্ব্ব পত্রেই তাহা প্রদর্শন করিয়াছি, আপনি সে সকল কথার কোন উত্তর দেন নাই, সুতরাং পুনরায় তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।*

নিবেদক,
শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

* আমাদের অভিপ্রায় বোধ হয় পাঠকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এ বিষয়ে আমাদের অধিক বাদ প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা নাই।

ব্রাহ্মসমাজ।

প্রচার—ইতি পূর্ব্বে উত্তর বাঙ্গালায় প্রচারার্থ যাঁহারা গমন করিয়াছিলেন তাঁহারা দিনাজপুর হইতে দার্জ্জিলিং এ গমন করেন। তথা হইতে ২৫এ জুন সোমবার— কার্শিয়ং উপস্থিত হন। রাত্রিতে শ্রদ্ধেয় বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে মহেন্দ্র বাবু পারিবারিক উপাসনা করেন।

২৬এ জুন মঙ্গলবার—প্রাতে রাধাকান্ত বাবুর গৃহে কুঞ্জ বাবু পারিবারিক উপাসনা করেন। রাত্রিতে যাত্রীদল জলপাইগুড়ী উপস্থিত হন।

২৭এ জুন বুধবার—মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত জালাল উদ্দীনের গৃহে কুঞ্জ বাবু পারিবারিক উপাসনা করেন। রাত্রিতে সমাজ গৃহে হরিমোহন বাবু উপাসনা করেন।

২৮এ জুন বৃহস্পতিবার—প্রাতে বাবু হরিমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহে মহেন্দ্র বাবু পরিবারিক উপাসনা করেন। এইদিন তাঁহারা সৈদপুর উপস্থিত হন।

২৯এ জুন শুক্রবার—প্রাতে উষাকীর্ত্তন। সন্ধ্যারপর সৈদপুর ব্রহ্মমন্দিরে "সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম" সম্বন্ধে কুঞ্জ বাবু এবং হরি মোহন বাবু বক্তৃতা করেন।

৩০এ জুন শনিবার—প্রাতে উষাকীর্ত্তন। তৎপরে মন্দিরে মহেন্দ্র বাবু উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। বৈকালে হাটে সংকীর্ত্তন হয়ও হরিমোহন বাবু বক্তৃতা করেন। বক্তৃতান্তে হাটে পুস্তকাদি বিক্রয় হয়। রাত্রিতে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বাবু আশুতোষ বসু মহাশয়ের গৃহে কুঞ্জ বাবু পারি-বারিক উপাসনা করেন।

১লা জুলাই রবিবার—প্রাতে যাত্রীদল রংপুরে উপস্থিত হন। স্নানান্তে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু বিশ্বেশ্বর সেন মহাশয়ের গৃহে কুঞ্জ বাবু উপাসনা করেন। রাত্রিতে সমাজ গৃহে মহেন্দ্র বাবু উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন।

২রা জুলাই সোমবার—প্রাতে উষাকীর্ত্তন। তৎপরে সমাজ গৃহে হরিমোহন বাবু উপাসনা করেন। রাত্রিতে সমাজ গৃহে কুঞ্জ বাবু ও হরিমোহন বাবু "কোন্ পথে যাই" এই সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৩রা জুলাই মঙ্গলবার—প্রাতে ব্রাহ্মবন্ধুদিগের গৃহে গৃহে যাইয়া আলাপ করা হয়। স্নানান্তে বিশ্বেশ্বর বাবুর গৃহে মহেন্দ্র বাবু উপাসনা করেন। বৈকালে সমাজ গৃহে উপাসনা হয়। কুঞ্জ বাবু উপাসনা করেন এবং বাবু বিশ্বেশ্বর সেন মহাশয় সাধনাশ্রম এবং যাত্রীদলের মঙ্গলার্থ বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করেন। তৎপরে যাত্রীদল কলিকাতা রওনা হন।

মূক ও বধির বিদ্যালয়—মূক ও বধির বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয় নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশার্থ আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি মূক ও বধির বালকদিগকে সকলেই এই বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া স্কুলের উদ্যোগ কর্ত্তাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। "এই বিদ্যালয় দ্বারা অনেক মূক বালক কথা বলিতে অভ্যস্ত হইতেছে। বিদ্যালয় এক বর্ষ পূর্ণ করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পড়িয়াছে। ইহার ছাত্র সংখ্যা এখন ১৫টী এবং শিক্ষক ৩ জন। কার্য্যের সুবিধার জন্য কলেজ স্কোয়ার ৪নং ভবন ভাড়া লওয়া হইয়াছে। এখানে ছাত্রদিগের বাসস্থান ও আহারাদির বন্দোবস্ত হইতে পারিবে। ৬টী বাসিন্দা ছাত্র পাইলেই বোর্ডিং খোলা হইবে এবং একজন শিক্ষক তত্ত্বাবধায়ক স্বরূপ বালকদিগের সহিত বাস করিবেন। আশা করি মফঃস্বলের অভিভাবকগণ কালা, বোবা বালকদিগকে অবিলম্বে এখানে ভর্ত্তি করিবেন।"

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা এবং অন্যান্য কারণে তিন মাসের জন্য প্রচার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পশ্চিমে গিয়াছেন। ঈশ্বর করুন তিনি সুস্থ ও সবল হইয়া ফিরিয়া আসুন এবং প্রভুর সেবায় দেহ মন অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হউন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় সাধনাশ্রমের তত্ত্বাবধান করিবেন।

দিনাজপুর হইতে বাবু ত্রৈলোক্যনাথ দাস লিখিয়াছেন :—

বিগত ১১ই জুন সোমবার—কলিকাতা হইতে ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু হরিমোহন ঘোষাল ও বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ মহাশয় এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ৬ দিন এখানে থাকিয়া উপাসনা, আলোচনা, বক্তৃতা ও সংগীত সংকীর্ত্তন দ্বারা সহরটীকে বেশ একটু ধর্ম্মান্দোলনে আন্দোলিত করিয়া গিয়াছেন। নিম্ন-লিখিত প্রকারে তাঁহারা এখানে কার্য্য করিয়াছেন।

১১ই জুন সোমবার—সৎপ্রসঙ্গ হয়।

১২ই মঙ্গলবার—ভোরে উষাকীর্ত্তন এবং তৎপর উপাসনা হয় শ্রদ্ধাস্পদ বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্নে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বাবু হরিমোহন ঘোষাল "মানব আত্মার স্বাভাবিক গতি" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন জ্ঞান প্রেম ও সেবার ভিতর দিয়া ভগবানের দিকে যাওয়াই আত্মার স্বাভাবিক গতি।

১৩ই বুধবার—প্রত্যূষে উষাকীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ দাস মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন এবং সন্ধ্যা ৭টার সময় স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে "ব্রাহ্মধর্ম্ম কি?" এই সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। "মানবাত্মার সমঞ্জসীভূত উন্নতি বা বিকাশই ধর্ম্ম। প্রত্যেক বস্তুতে প্রত্যেক ঘটনায় ঈশ্বরকে নিকটস্থ জানিয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধি করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব।" ইহাই তাঁর বক্তৃতার সার মর্ম্ম।

১৪ই বৃহস্পতিবার—প্রাতে উষাকীর্ত্তন তৎপরে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভুবনমোহন কর মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। ৪টার পর রেল বাজারের হাটে সংগীত, সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়। এখানে কুঞ্জ বাবু পাপী তাপী সকলকেই এক মাত্র পরিত্রাণপ্রদ ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গীয় সুসমাচার প্রদান করিয়া আহ্বান করেন। তৎপর হরনাথ বাবু হাটে আগত লোক-দিগকে আজকার এই সুসমাচার স্ত্রী পুত্র পরিবারদিগের জন্য

লইয়া যাইতে অনুরোধ করেন এবং জীবনের সন্ধ্যায় ভবের হাট হইতে যাইবার কালে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধন ধর্ম্মকে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতে উদ্বুদ্ধ করেন। তৎপর পণ্ডিত ভুবনমোহন কর ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর নিজ জীবনের পরীক্ষিত সত্য সকল অতি ওজস্বিনী ভাষায় বিবৃত করেন। সর্ব্বশেষে হরিমোহন বাবু জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার অযৌক্তিকতা অতি সরল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। ফিরিয়া আসিবার সময় অনুরুদ্ধ হইয়া এক বাড়ীতে কীর্ত্তন করা হয়।

১৫ই শুক্রবার—বাবু ভুবনমোহন কর মহাশয়ের বাসায় উপাসনা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুহ মহাশয়ের বাসায় উপাসনা হয়।

১৬ই শনিবার—প্রাতে বাবু যাদবচন্দ্র কর মহাশয়ের বাসায় উপাসনা হয়। বৈকালে ৫টার পর কালীতলায় সঙ্গীত সংকীর্ত্তন হয় এবং বাবু ভুবনমোহন কর ও বাবু হরিমোহন ঘোষাল মহাশয় উপদেশ দেন।

এখানকার জজ আফিসের এসিষ্টাণ্ট একাউণ্টেণ্ট বাবু যাদবচন্দ্র কর মহাশয় এতদিন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে মতে ও সহানুভূতিতে মিলিত ছিলেন, এবার তিনি প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে কৃতসংকল্প হইয়া ইহাঁর একটী ১০।১১ বৎসরের কন্যাকে ব্রাহ্মদের হাতে প্রদান করিয়াছেন। অনেক দিন হইতেই তিনি বালিকাটীকে ব্রাহ্মদের হস্তে দিতে সচেষ্ট ছিলেন, কেবল চতুর্দ্দিকের প্রতিকূলতা বশতঃ এতদিন উহা কার্য্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এবার আর কোন বাধাই তাঁর অভিপ্সিত কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই।

উৎসব—বাগেরহাট হইতে কোন বন্ধু লিখিয়াছেন :—

বাগেরহাট ব্রাহ্মসমাজের একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসবে কোন কোন সুবক্তা এবং সুগায়ক অনুগ্রহ পূর্ব্বক এখানে আগমন করিতে স্বীকৃত হন। ইহাতে আমাদের হৃদয় কেমন এক আনন্দে এবং উৎসাহে নাচিয়া উঠিল। আমরা ভাবিলাম এবার তা হইলে উৎসব দেখিতেছি খুব ভাল রকমের হইবে। নিকটস্থ ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমরা সেইরূপই আয়োজন করিতে লাগিলাম। কিন্তু উৎসবের ৬ একদিন পূর্ব্বে শুনিলাম, সুবক্তা এবং সুগায়ক কেহই এখানে পদার্পণ করিবেন না। সঙ্গে সঙ্গে মনে কেমন একটি দুঃখের উদ্রেক হইল, কিন্তু নিরাশ হইলাম না। দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। দয়াময় হাতে হাতে প্রার্থনার ফল দেখাইয়া দিলেন। খুলনা হইতে শ্রদ্ধেয় বাবু চন্দ্রকুমার ঘোষ বি,এল প্রভৃতি কয়েকজন ব্রাহ্ম আসিলেন। বরিশাল হইতে শ্রদ্ধেয় প্রচারক বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী এবং গায়ক বাবু বরদাপ্রসন্ন রায় আগমন করিলেন। অন্যান্য স্থান হইতেও কোন কোন বন্ধু উপস্থিত হইলেন। উৎসব অতি সুন্দর ভাবেই সম্পন্ন হইল। আমরা যে তাঁহার করুণার উপর নির্ভর না করিয়া মানুষের শক্তির উপর নির্ভর করিতেছিলাম, তাহা ভাবিয়া লজ্জিত হইলাম।

নিম্নলিখিত প্রকারে এবারকার উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার—রাত্রে উৎসবের উদ্বোধন হয়। বাবু চন্দ্রকুমার ঘোষ বি,এল মহাশয় উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার সকালে উপাসনা হয়, চন্দ্র বাবুই উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। বৈকালে চন্দ্র বাবু পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর আলোচনা হয়। রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন হইয়া উপাসনা হয়। প্রচারক নীলমণি বাবু উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনান্তে অনেকক্ষণ মত্ততার সহিত কীর্ত্তন এবং প্রার্থনাদি করা হয়।

২০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার—প্রাতঃকালে প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী গিয়া উষাকীর্ত্তন করা হয়। তৎপর উপাসনা। নীলমণি বাবু উপাসনার কার্য্য করেন। রাত্রে স্থানীয় স্কুল গৃহে (রিপণ হলে) "ধর্ম্মের প্রাণ" বিষয়ে নীলমণি বাবু একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর বাবু চন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার জীবনের কয়েকটি পরীক্ষিত সত্য অবলম্বন করিয়া কিছু বলেন।

২১শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার—সকালে উপাসনা হয়। চন্দ্র বাবু উপাসনার কার্য্য করেন। বৈকালে নগর সংকীর্ত্তন হয়। সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! আকাশের চারিদিকে মেঘ, খুব বৃষ্টি হইতেছে। "সঙ্কীর্ত্তন আর হইল না" ভাবিয়া অনেকে নিরাশ হইলেন, অনেকে আবার আশান্বিত হৃদয়ে প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই বৃষ্টি থামিয়া গেল—আকাশ পরিষ্কার হইল। দয়াময় পিতার এই জীবন্ত করুণার নিদর্শন পাইয়া তখন সকলেই বিশ্বাস এবং ভক্তির সহিত সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সমগ্র বাগের হাট প্রদক্ষিণ করিয়া বাজারে আসা গেল। বাবু বরদাপ্রসন্ন রায়, বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু ভক্তি-উচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিলেন। রাত্রে উপাসনা হইল। নীলমণি বাবু উপাসনা করিলেন। উপাসনান্তে প্রার্থনা পূর্ব্বক উৎসব সমাধা করা হইল।

শ্রাদ্ধ—দুঃখের সহিত জানাইতেছি আমাদের মুঙ্গেরস্থ বন্ধু বাবু কান্তিচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী অকালে ইহ সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। গত বৈশাখ মাসে এই ঘটনা ঘটে। অনবধানতা বশতঃ যথাসময়ে এই সংবাদ প্রকাশ না হওয়ায় আমরা ক্ষুব্ধ হইতেছি। কান্তি বাবু এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিশেষ দানাদি করিয়াছেন। ঈশ্বর পরলোকস্থ আত্মাকে শান্তি দান করুন এবং তাঁহার স্বামী ও পুত্র কন্যাদিগকে সান্ত্বনা দান করুন।

গত ৪ঠা জুলাই, কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব কয়েকটি স্থিরীকৃত হইয়াছে।

"এই সভা সুইডেনের কে, ই, হেমার গ্রেনের কলিকাতার প্রবাসে মৃত্যু গভীর দুঃখ ও শোকের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছেন, ইনি নিষ্ঠাবান খৃষ্টান গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বদেশে বাস কালে ১৮৮৬ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন এবং ১৮৯১ সালে জুলাই মাসে ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য আপনার শক্তি নিয়োগ করিতে কলিকাতায় আসেন, এবং যাঁহারা এই অল্প কালের মধ্যে তাঁহার সেই মধুর আড়ম্বর শূন্য ধর্ম্মভাব ও ব্রাহ্মসমাজের জন্য তাঁহার উৎসাহপূর্ণ কর্ম্মদক্ষতা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতিপটে সে ছবি চির দিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া থাকিবে।"

"স্থিরীকৃত হইল যে এই প্রস্তাব এক এক খণ্ড তাঁহার ইউরোপীয় বন্ধু ও আত্মীয়গণের নিকট প্রেরিত হইবে।"

"স্থিরীকৃত হইল যে স্বর্গীয় সাধুপুরুষের স্মৃতির জন্য সভার অন্যান্য কার্য্য অদ্য স্থগিত থাকিবে।"

ভ্রম সংশোধন।

গত বারের তত্ত্ব-কৌমুদীতে "ব্রহ্ম-দর্শন" নামক প্রবন্ধের মধ্যে একস্থানে "অষ্টপাশ" স্থলে "অষ্টাদশ পাশ" মুদ্রিত হইয়াছে।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২রা শ্রাবণ প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

৮ম সংখ্যা। ১৭শ ভাগ। | ১৬ই শ্রাবণ মঙ্গলবার, ১৮১৬ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷০ মফস্বলে ৩৲ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা

হে বিধাতা! তুমি আমাদিগকে যে ধর্ম্মবিশ্বাসের ভূমি প্রদান করিয়াছ, তাহার উপরে যাহাতে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারি, এরূপ আশীর্ব্বাদ কর। তোমার পিতৃত্ব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব এই উভয় মহাসত্যকে যেন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ধারণ করিতে পারি এবং একাগ্রতার সহিত সাধন করিতে পারি। প্রভো! আমরা নানা প্রকার প্রতিকূল স্রোতের মধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছি; দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই সকল প্রতিকূল স্রোতের মধ্যে তোমার বিজয় নিশান হস্তে লইয়া স্থির থাকা অতীব কঠিন। এই জন্য কত লোক এই স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। যাঁহারা এক সময়ে তোমার সত্যধর্ম্ম সাধন ও প্রচারের জন্য দেহ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন, এরূপ কত সবলচিত্ত সাধু সদাশয় ব্যক্তি স্রোতে ভাসিয়া তোমার সত্যধর্ম্ম হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছেন। যাঁহারা তোমার সত্যধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাও অনেক সময়ে নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ হইয়া আসিতেছেন। তুমি সত্যের প্রবর্ত্তক, ও রক্ষক। তুমি দুর্ব্বলচিত্তে বল বিধান কর। যাঁহারা তোমার সত্যধর্ম্মের আশ্রয় হইতে দূরে নীত হইতেছেন, তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া সত্যের আশ্রয়ে আনয়ন কর ও তোমার চরণে প্রতিষ্ঠিত কর, আমাদের সকলকে বিশ্বাস-বলে বলী কর, যেন আমরা দৃঢ়তার সহিত সত্যধর্ম্ম সাধন ও প্রচার করিতে পারি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ভিতরের কথা—ব্রাহ্মদিগের মধ্যে নানা প্রকার মতভেদ উপস্থিত হইতেছে; অপরাপর ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধ, উপাসনা-প্রণালী, সাধন-প্রণালী প্রভৃতি লইয়া মধ্যে মধ্যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইতেছে। কেহ বলিতেছেন, অপরাপর ধর্ম্মে যাহা আছে, তাহার প্রতি ব্রাহ্মগণ কেন উদাসীন হইবেন, সকল ধর্ম্ম ও সকল শাস্ত্র হইতে উদারভাবে সত্য সংগ্রহ করা ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য; কেহ বলিতেছেন ব্রাহ্মসমাজে যে উপাসনা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা কে বলিল? অন্য কোনও প্রণালী কি উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইতে পারে না? কেহ বলিতেছেন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সাধনের পন্থা নানা প্রকার থাকিবে, সকলকেই যে এক পথ দিয়া যাইতে হইবে, তাহার অর্থ কি? ইত্যাদি বাদানুবাদ ও তর্ক বিতর্কের মধ্যে আমাদিগের ভিতরের কথাটী ভুলিলে হইবে না। সেটী কি? সেটী এই, সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের পবিত্র আধ্যাত্মিক অর্চ্চনা ও মানুষের ভ্রাতৃত্ব এই উভয় সত্য হইতে দূরে গেলে চলিবে না। এই দুই মহাসত্য সাধনের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতকে এখনকার অপেক্ষা উন্নততর ভূমিতে তুলিয়া আনিবে, এই ইহার জীবনের লক্ষ্য। তুমি বেদ পুরাণ ফেলিয়া দিয়া কেবল বাইবেল কোরাণ পাঠ কর, অথবা বাইবেল কোরাণ ফেলিয়া দিয়া কেবল বেদ পুরাণ পাঠ কর, তুমি আমিষাশী হইয়া বিদেশীয় পরিচ্ছদে আপনাকে ভূষিত করিয়া বিদেশীয় রীতি নীতির অনুসরণ কর, অথবা নিরামিষাশী ও গৌরিকধারী হইয়া দেশীয় সন্ন্যাসী ও ফকিরের ন্যায় দিন যাপন কর, তুমি কর্ম্মক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত শ্রম সহকারে পরোপকারসাধনে রত থাক, অথবা মৌনব্রত ধারণ করিয়া বৎসরের পর বৎসর গিরিগুহাতে বাস কর, তুমি মস্তকে জটাজূট ও গলে জপমালা ধারণ করিয়া যোগাসনে উপবেশন কর, অথবা কেশভারকে সুগন্ধযুক্ত করিয়া যষ্টিহস্তে প্রাতঃসঞ্চরণ কর, আমরা তোমার সহিত বিবাদ করিব না, যতক্ষণ তুমি পূর্ব্বোক্ত মহা সত্যদ্বয় হইতে ভ্রষ্ট না হইতেছ। যতক্ষণ তুমি পুত্তলিকার নিকট মস্তক অবনত না করিতেছ, এবং জাতিভেদের জালে জড়িত না হইতেছ, এবং একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের পবিত্র আধ্যাত্মিক উপাসনার মহত্ত্ব রক্ষা করিতেছ ও তাহাকেই হৃদয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতেছ; ততক্ষণ তুমি সত্যধর্ম্মের আশ্রয়েই আছ। যে কোনও রূপেই হউক এই ভূমি হইতে বিচলিত হইলেই, তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মের মহৎ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইলে। ব্রাহ্মদিগের কাহারও কাহারও সন্ন্যাসীর বেশ পরিধানের জন্য ব্যগ্রতা দেখা যায়, এবং কেহ কেহ গুরুর আশ্রয় আবশ্যক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমরা এরূপ সন্ন্যাসী ও এরূপ গুরু দেখিতে চাই, যাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া এবং যাঁহার প্রভাবে লোকে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ, দুর্নীতি ও কুসংস্কারকে বর্জ্জন করিতেছে, বিশ্বাস ও কার্য্যকে

এক করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে, নিরাকার সচ্চিদানন্দ পুরুষের পবিত্র আধ্যাত্মিক উপাসনাতে মন প্রাণ সমর্পণ করিতেছে। তাহা না হইয়া যদি দেখি, গুরুর আশ্রয়ে গিয়া মানুষের জ্ঞান জড়তাগ্রস্ত হইতেছে, বিচার-শক্তি মন্দীভূত হইতেছে, বিবেক ম্লান হইতেছে, পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদে আপত্তি চলিয়া যাইতেছে, তবেই বলিব যে গুরু ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে লোককে ভ্রষ্ট করিতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনের ক্ষেত্র—পরলোকগত নববিধনাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় একবার ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কোনও নগরে গিয়াছিলেন। তত্রত্য বাঙ্গালি বাবুরা আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও ধর্ম্মবিষয়ে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি বিশেষ ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঈশ্বরোপাসনাতে চিত্ত স্থির রাখিবার উপায় কি?" সেই প্রাচীন প্রশ্ন যাহা ভগবদ্গীতাকার অর্জ্জুনের মুখে দিয়াছেন। কেশব বাবু তাঁহার আশ্চর্য্য মীমাংসা শক্তির বলে তাঁহাকে সদুত্তর দিয়া প্রীত করিলেন। কয়েক বৎসর পরে আর একবার কেশবচন্দ্র ঐ সহরে উপস্থিত হইলেন, তখন অপরাপর লোকের মধ্যে সেই বাঙ্গালি ভদ্রলোকটীও আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কেশববাবুর সেই পুরাতন প্রশ্নের কথা স্মরণ হইল। তিনি ভদ্রলোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি মহাশয়! এখন কি উপাসনাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনস্থির হয়?" ভদ্রলোকটী গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে, ঈশ্বর কৃপায় অনেকটা ভাল। একজন সাধকের পরামর্শক্রমে একটু একটু আফিং সেবন করিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহাতে ধ্যানের বেশ সুবিধা হয়।" শুনিয়া কেশবচন্দ্র হাস্য করিতে লাগিলেন। যেমন আফিং বা মরফিয়ার যোগী বা সাধু প্রস্তুত করিবার শক্তি নাই, সেইরূপ কোনও বাহিরের বেশ পরিধান বা চিহ্ন ধারণেরও যোগী বা সাধু প্রস্তুত করিবার শক্তি নাই। শস্যটা পাওয়া কঠিন বলিয়া খোসাটা মানুষ শীঘ্র ধরিয়া বসে। যাহাই কর, ঈশ্বরচরণে প্রাণমন সমর্পণ, সত্যের সেবা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা ভিন্ন ধর্ম্ম সাধনের অন্য পথ নাই। ইহা অগ্রে তৎপরে আর সমুদায়। এই টুকুকে অগ্রে রাখিয়া সহায়রূপে আর যাহা কিছু গ্রহণ করিতে পার, তাহাতে আপত্তি নাই। আবার বলিতেছি, ব্রাহ্মের সাধন সত্যপ্রিয়তাতে ও বিবেকপরায়ণতাতে। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের এই নৈতিক দিক বিস্মৃত হইতেছেন, তাঁহারা—ইহার পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছেন।

সাধারণ প্রজাপুঞ্জের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার—প্রাচীনকালে সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিবার অনেক প্রকার প্রণালী ছিল। কথকতা, শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা, রামায়ণাদি গান, ও যাত্রাদি দ্বারা অনেক পৌরাণিক কাহিনী ও তদন্তর্গত উপদেশ সকল সাধারণ প্রজামণ্ডলীর মনে মুদ্রিত হইত। এইরূপে সাপ্তাহিক সম্মিলিত উপাসনা, ও নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক না থাকিয়াও হিন্দুধর্ম্ম আপনাকে অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ধর্ম্ম শাস্ত্রের উপদেশ ও নীতির স্থূল সত্য, সকল শ্রেণীর প্রজাকুলের মনে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। অদ্যাপি ইহার প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে কৃষক হল চালনা করিতেছে, বা দুর্ব্বহ ভারে ক্লান্ত হইয়া যে ভারবাহী ভার বহন করিতেছে, সেই উভয়ের সহিত প্রসঙ্গক্রমে কোনও ধর্ম্মতত্ত্বের বিষয় উত্থাপন কর, দেখিবে প্রচলিত দর্শন সকলের কত মত, প্রচলিত ধর্ম্ম-শাস্ত্রের কত উপদেশ তাহাদের মনে নিবদ্ধ রহিয়াছে। পুনর্জ্জন্মের মত ও অদৃষ্টবাদ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মনে কিরূপ দৃঢ় নিবদ্ধ! কোনও গুরুতর বিপদ ঘটিলে, কেমন তাহারা অদৃষ্ট ও কর্ম্মফলের আশ্রয় লইয়া বিপদকে বহন করে! কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাচীন প্রচার-প্রণালী সকল পরিত্যক্ত হইতেছে। সে সকল আর নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের রুচির অনুযায়ী নহে; সুতরাং তাঁহারা এই সকলের উৎসাহদাতা নহেন। সত্যই এখন সাধারণ প্রজাকুল পালকবিহীন মেষযূথের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল ও ভ্রষ্টাচার হইয়া পড়িতেছে। দিন দিন আরও উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষিত হইবে। পাশ্চাত্য জ্ঞান ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ভঙ্গকারিণী শক্তি এখনও সম্পূর্ণরূপে তাহাদের মধ্যে কার্য্য করে নাই, যতই করিতে থাকিবে ততই প্রাচীন শৃঙ্খলার ব্যত্যয় দেখা যাইবে। এই সন্ধিকালে দেশের হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই সাধারণ প্রজাদিগকে নীতি ও ধর্ম্মের উপদেশ দিবার প্রণালী বিষয়ে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান প্রার্থীগণ ব্রাহ্মবিদ্বেষে ও ব্রাহ্মদিগের দোষ কীর্ত্তনে সমুদায় শক্তি পর্য্যবসিত না করিয়া যদি এবিষয়ে কিছু মনোযোগী হইতেন, তাহা হইলেও বুঝা যাইত যে, তাঁহারা বাস্তবিক নিষ্ঠাবান লোক। কিন্তু সে প্রবৃত্তি কাহারও দেখিতেছি না। এসম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটী গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে। সাধারণ প্রজাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে ভাল করিয়া প্রচার করিবার জন্য একদল প্রচারক প্রস্তুত করা আবশ্যক। শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে যে প্রণালীতে প্রচার হইয়া থাকে, সে প্রণালী সাধারণ লোকের উপযোগী নহে। ব্যাখ্যা, কীর্ত্তন, কথকতাদি দ্বারা প্রচার করিতে হইবে। যে শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে যে সকল পৌরাণিক আখ্যায়িকা বিশেষ ভাবে প্রচলিত তাহা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। হিন্দু সমাজে প্রচার করিবার সময় হিন্দু পুরাণাদি হইতে আখ্যায়িকা সংগ্রহ করিতে হইবে, মুসলমানদিগের মধ্যে প্রচারের সময় মুসলমান সাধকমণ্ডলীর জীবনের উপাখ্যানাদি সংগ্রহ করিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। যেরূপেই হউক পৌরাণিক আখ্যায়িকা সকল স্থলেই গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে একদল প্রচারক প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

সদ্দৃষ্টান্ত।—গত বারের তত্ত্ব-কৌমুদীতে আমরা বলিয়াছি—"ব্রাহ্মণগণের প্রভাব বিধ্বস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রজাকুল পালকবিহীন মেষদলের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছে।" প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এই বাক্যের সত্যতা অনুভব করিবেন। আমাদের বোধ হয় ইহা অনুভব করিয়াই পরলোকগত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় শেষ দশায় ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়া ছিলেন, এবং সেই জন্যই দেড় লক্ষের অধিক টাকা, বলিতে গেলে তাঁহার সমগ্র জীবনের শ্রম, ও সঞ্চয় শক্তির ফলস্বরূপ সঞ্চিত অর্থ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের উৎসাহ দানার্থ দিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং এদিকে দৃষ্টি পড়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, এবং এবিষয়ে যে তিনি কিরূপ চিন্তা করিতেন তাহা তাঁহার অর্থ দানেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। আমরা ব্রাহ্মণদিগের লুপ্ত প্রভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব মনে করি না। ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী সভ্যতা তাহার মূলে কীট হইয়া লাগিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের হাওয়ার মধ্যেই তাহার বিরোধী ভাব। যে সকল কারণের যোগাযোগ হইয়া পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে, সে সকল কারণকে শাসনাধীনে আনা সম্ভব নহে। আর যদি তাহা সম্ভবও হইত, তাহা হইলেও নানা কারণে আমরা প্রাচীন ভিত্তিকে বজায় রাখিবার পক্ষ হইতাম না। কিন্তু ভূদেব বাবুর অভিপ্রায় কি ছিল তাহা বুঝিতে পারিতেছি। বিশেষতঃ—দেশ মধ্যে সংস্কৃত চর্চ্চা প্রবল হয় ও সংস্কৃতের আদর বর্দ্ধিত হয়, এবিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়ের যোগ। সুতরাং আমরা মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিতেছি। নিজে দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়া ও নিজ-পরিশ্রমে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সেই অর্থ পরোপকারার্থ দান করা এদেশের পক্ষে একরূপ বিরল দৃষ্টান্ত। খ্যাতনামা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বাগ্রে এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। আমরা আশা করি ভূদেব বাবুর অনুকরণ করিবার লোক দেশ মধ্যে আরও দৃষ্ট হইবে।

ব্রাহ্মসমাজে সাহিত্য চর্চ্চা—ব্রাহ্মসমাজই বঙ্গ সাহিত্যে গদ্য লেখা সৃষ্টি করিয়াছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সর্ব্ব প্রথমে শিক্ষিত সমাজে গদ্য ভাষা প্রচলিত করেন, তৎপর অক্ষয়কুমার দত্ত এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নিপুণতার সহিত ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজ সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন। প্রাচীন লেখকদিগের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি এবং ঠাকুর বাড়ীর কোন কোনও লেখক ভিন্ন বঙ্গ সাহিত্যে অধিকাংশ ব্রাহ্ম লেখকেরই স্থান নাই। অথচ ব্রাহ্মসমাজে লেখকের অভাব নাই। দু কলম না লিখিতে পারেন, এমন লোক অতি বিরল। কিন্তু অধিকাংশ লেখাই প্রকৃত সাহিত্যের মধ্যে গণ্য নহে। বঙ্গ সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে হইলে দুইটি বিষয়ের প্রয়োজন; বহু অধ্যয়ন এবং সংস্কৃত শিক্ষা। অধিকাংশ ব্রাহ্মের এ দুইটি নাই। এই দুই সম্বল ভিন্ন বঙ্গ সাহিত্য-ক্ষেত্রে কেহ প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন না।

বৈষ্ণব সাহিত্য এ দেশে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। বৈষ্ণব কবির সুকোমল কবিতা পাঠকের প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করে। পাঠ করিতে করিতে পাঠক বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হইয়া যান। চণ্ডী দাস, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণ দাস প্রভৃতির অমৃতরসময়ী কবিতাবলীই এদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছে। ব্রাহ্মগণ সাহিত্য সেবক হইলে,তাঁহাদের দ্বারাও ব্রাহ্মধর্ম্ম এরূপে প্রচারিত হইবে। মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের গ্রন্থাবলী এবং ব্রহ্ম সংগীতাদি কি আমাদের শত শত প্রচারকের কার্য্য করিতেছে না? অক্ষয়কুমারের গ্রন্থ পাঠ করিয়া কত লোকের পৌত্তলিকতার বিশ্বাস দূরীভূত হইয়াছে। কত লোকে আমিষ ভোজন ত্যাগ করিয়াছে। ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণে কত লোকের হৃদয় পরিবর্দ্ধন হইয়াছে! বাস্তবিক, সাহিত্য প্রচারের উৎকৃষ্ট উপায়। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ এই উপায় অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মসমাজের মহোপকার সাধিত হইবে।

সাধু চিনিবার উপায় কি ?—শিরে জটা, পরিধানে গৈরিক বসন, গলায় মালা, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম, হস্তে ত্রিশূল কিম্বা চিমটা, নগ্ন-দেহ ফকির সন্ন্যাসীদিগকেই সাধারণ লোকে ধার্ম্মিক বলিয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজেও দেখিতে পাই, যাঁহারা দিবারাত্রি খোল করতাল লইয়া ব্যস্ত, আজ ইঁহার কাছে, কাল উঁহার কাছে গিয়া শিষ্য রূপে ধরা দিতেছেন, কিম্বা যাঁহারা উপাসনা কালে চক্ষের জলে বক্ষস্থল প্লাবিত করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সাধু বলিয়া অনেকের কাছে সম্পূজিত হইতেছেন। বাস্তবিক এ সকল বাহিরের উপায়ে সাধু অসাধু চিনিতে পারা যায় না। কার্য্য এবং ব্যবহারেই প্রকৃত চরিত্র সুস্পষ্ট প্রকাশিত হয়। যদি দেখি কোনও ব্রাহ্ম উপাসনায় আলোচনায় নিয়ত যোগ দিতেছেন, ধর্ম্ম প্রচারেও উৎসাহ আছে; কিন্তু উত্তমর্ণের সহিত কথা ঠিক রাখিতে পারিতেছেন না, আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য নাই, সত্যের প্রতি তেমন নিষ্ঠা নাই, তাহা হইলে বুঝিব প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে তিনি বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছেন। যদি দেখা যায়, কেহ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিতেছেন, বক্তৃতা ও লেখায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগের চিহ্ন প্রদর্শন করিতেছেন; কিন্তু প্রতি মাসের গচ্ছিত কোম্পানীর কাগজের কোনও ক্ষুদ্র অংশও অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য দান করিতেছেন না, বরং চাঁদার টাকা ক্রমশঃ কমাইতেছেন, তাহা হইলে তিনি যে ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী একথা কি রূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? যাঁহার বাক্যে সত্যনিষ্ঠা, আচরণে ধর্ম্মভীরুতা, সমুদয় কার্য্যে সরলতা ও নিস্বার্থতা প্রকাশ পায়, তিনিই সাধু। যে মানদণ্ড দ্বারা সাধারণ লোকে সচারাচর সাধুতার পরিমাণ করিয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে ঠিক নহে। বাহিরে সাধু হওয়া অতি সহজ, কার্য্যগত জীবনে সাধুতা রক্ষা করা বড়ই কঠিন। বাহির অপেক্ষা ভিতরে যাঁহার অধিকতর দৃষ্টি, ধর্ম্ম মত অপেক্ষা জীবন গঠনের প্রতি যাঁহার বিশেষ মনোযোগ, লোকের নিকট ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে যিনি অনিচ্ছুক, তাঁহার গন্তব্য পথই সাধুতার পথ। স্থূলদর্শী লোকেরা সূক্ষ্ম

ভাবে দেখে না, এজন্যই তাঁহাদের কাছে কখন কখন অসাধু ব্যক্তি সাধু বলিয়া পূজিত হয়, পরন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি তিরস্কৃত এবং লাঞ্ছিত হইয়া থাকেন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

বিধাতার বিধি।

অহঙ্কৃত ও স্থূলদর্শী লোকেরা না ঠেকিলে অন্যের কর্ত্তৃত্ব কিম্বা প্রভুত্ব স্বীকার করিতে চাহে না। যখন তাহারা দেখে নিজের শক্তি, চেষ্টা, পরিশ্রমে কোনই ফলোদয় হইতেছে না, কার্য্য সিদ্ধি হয় না, তখনই তাহারা "বিধির বিধি" বা "কপালের লেখা" কিম্বা "অদৃষ্ট" বলিয়া অপ্রত্যক্ষভাবে ঐশি-শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী লোকেরা নিয়ত সমুদয় কার্য্যের ভিতরেই বিধাতার বিধি দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত ও আশ্বস্ত হন। তাঁহারা দেখিতে পান, তাঁহাদের জীবনের প্রত্যেক ঘটনা পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট এবং মালার ন্যায় গ্রথিত। সেই মালা রচয়িতা স্বয়ং বিধাতা পুরুষ। জীবনে মরণে, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে সেই বিধাতার হস্ত নিয়ত বর্ত্তমান। যে বিধাতার বিধিতে সামান্য তৃণ হইতে অনন্ত সৌরজগত বিধৃত রহিয়াছে, যিনি সকল কার্য্যের মূলকারণ, ধর্ম্মসমাজ তাঁহারই সাক্ষাৎ লীলাক্ষেত্র। তিনি যেমন ক্ষুধার সময় আহার, পিপাসায় জল দান করেন, তেমন মানবের পরিত্রাণের জন্য ধর্ম্মসমাজের সৃষ্টি করিয়াছেন। ধর্ম্মসমাজ তাঁহার প্রত্যক্ষ বিধান। কিন্তু বিশ্বাসী ভিন্ন কেহ ধর্ম্মসমাজকে তাঁহার বিধিরূপে দেখিতে সমর্থ হয় না। যাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, ঈশ্বরের কার্য্যে তাহার কখনও বিশ্বাস হইতে পারে না। যিনি ধর্ম্মকে ঈশ্বরের আজ্ঞারূপে মানেন না, ধর্ম্মে তাহার কখনও আস্থা থাকিতে পারে না। লৌকিক ধর্ম্মমতই তাহার অবলম্বনীয় ও পরিচালক হয়।

সংসারে দেখিতে পাই, যখন দেশের রাজা কোনও আইনের পাণ্ডুলিপি করেন, তখন প্রজা সাধারণ সেই অনুশাসন অনুসারে চলে না; কিন্তু যেই একদিন সেই পাণ্ডুলিপি রাজস্বাক্ষর হইল, তখন হইতে সেই রাজবিধির নিকট সকলের মস্তক নত হইল; রাজবিধানরূপে সর্ব্বত্র আদৃত, স্বীকৃত এবং মান্য হইতে লাগিল। সেইরূপ যিনি দেখেন যে, ধর্ম্ম পরমেশ্বরের স্বাক্ষরযুক্ত বিধি, তিনিই অবনত হৃদয়ে ভক্তিপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করেন। কিন্তু যিনি পরমেশ্বরের স্বাক্ষর দেখিতে পাইবেন না, তিনি মানবরচিত অন্যান্য বিধি ব্যবস্থার ন্যায় ধর্ম্মকে একটা বিধি ব্যবস্থা মনে করিবেন,—স্বর্গীয় সুসমাচার বিধানরূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

ব্রাহ্মসমাজ ভগবানের লীলাক্ষেত্র। বর্ত্তমান যুগে নরনারীকে ধর্ম্মের উন্নতভাব, বিমলস্বাদ প্রদান করিবার জন্যই তিনি এ ধর্ম্মসমাজ সৃষ্টি করিয়াছেন। লোকে যেমন স্কুল কলেজ স্থাপন করিয়া থাকে, ব্রাহ্মসমাজ সেরূপ ভাবে স্থাপিত হয় নাই, স্বয়ং পরমেশ্বর এ সমাজের নেতা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মসমাজকে বিধাতার বিধিরূপে অনেকেই দেখিতে সমর্থ নহেন। ইহাকে বিধাতার বিধিরূপে যাঁহারা দেখিবেন, তাঁহারা নিশ্চয় ইহার কল্যাণের জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে কাতর হইবেন না।

একটী প্রশ্ন অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, খৃষ্টান মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্ম অভ্যুদিত হইবার সময় সেই সকল সম্প্রদায়ের লোক যেরূপে স্বার্থনাশ, বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মগণ সেরূপ পারিতেছেন না কেন? অদ্য পঁয়ষট্টি বৎসর হইল ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের দলভুক্ত সাধকদিগের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মপ্রাণ লোকের আবির্ভাব হইল না কেন? নানাজনে এ কথার নানা উত্তর দিয়া থাকেন। কেহ কেহ এদেশের জল বায়ুর দোষ দেন, কেহ বা এদেশের আধ্যাত্মিক অবনতির কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে বিধাতার বিধিরূপে না দেখাই ইহার মূলকারণ। কেবল ধর্ম্মমত বিশ্বাস করিলে স্বার্থনাশ ও বৈরাগ্যের উদয় হয় না। কেবল মত রক্ষার্থে কেহ জীবন দান করিতে পারে না। অবলম্বিত ধর্ম্মকে ঈশ্বরের বিধান ও আদেশ বলিয়া বিশ্বাস করিলে সেই ধর্ম্মের জন্য লোকে না করিতে পারে এমন কিছুই নাই। যাহারা ধর্ম্মকে বিধান বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারাই ধর্ম্ম রক্ষার্থে অগ্নিকুণ্ডে দেহ বিসর্জ্জন কিম্বা সিংহ-কবলে নিক্ষিপ্ত হইতে ভীত হন না। যাহারা স্বাক্ষর বিহীন রাজাজ্ঞা পত্রের ন্যায় ধর্ম্মকে কেবল লৌকিক মত বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহারা ধর্ম্মের জন্য একটি টাকা ব্যয় করিতেও সঙ্কুচিত হয়। মূলে ভুল থাকিলে এরূপ বিপদই হয়।

যে সাধক ধর্ম্মকে বিধাতার বিধিরূপে বিশ্বাস না করিবেন, তাহার ধর্ম্মে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা হইবে না। তিনি চঞ্চল চিত্ত লোকের ন্যায় আজ এ মত, কাল ও মত গ্রহণ করিবেন। মত বিশ্বাসে তাঁহার কোনই স্থিরতা থাকিবে না। হয়ত কিছুদিন পর তিনি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। আমরা নিয়ত ব্রাহ্মসমাজে এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ব্রাহ্মসমাজে বাস করিয়াও কেহ কেহ যেরূপ চঞ্চলতা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে কখনও অনুমিত হয় না যে, তাঁহারা কোনও কালে ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিধাতার বিধিরূপে বিশ্বাস-চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। যাঁহারা ইহাকে বিধিরূপে দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে ঐরূপ অবিশ্বাস সুলভ চপলতা কখনও তিষ্ঠিতে পারে না। ভগবান আশীর্ব্বাদ করুন, ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজকে তাঁহার বিধিরূপে দর্শন করেন।

সাধনাশ্রম

ব্যাখ্যান রত্নাবলি।

২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪।

"Are not two sparrows sold for a forthing? And one of them shall not fall ground without your father. But the very hairs of your head are

all numbered. Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows."—Matt. X. 29-31.

"দুইটী চটক পক্ষী কি সামান্য তাম্র খণ্ডে বিক্রীত হয় না? তথাচ তাহার একটীও তোমাদিগের পিতার কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত ভূতলশায়ী হয় না। তোমাদের মস্তকের প্রত্যেক কেশ তিনি দেখেন, অতএব তোমরা ভীত হইও না, অনেক চটকপক্ষী অপেক্ষা তোমরা অধিকতর মূল্যবান।"

পৃথিবীর মহাজনদিগের এই এক লক্ষণ দেখা যায় যে, সামান্য বিষয়, সামান্য ঘটনা যাহা তুমি আমি লক্ষ্য করি, প্রতিদিন অগ্রাহ্য করি, যাহা সর্ব্বদা চক্ষের সম্মুখে ঘটিতেছে অথচ কেহ মনোনিবেশ করিতেছে না, এমন সকল বিষয়, এমন সকল ঘটনা হইতে তাঁহারা অনেক তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, একজন কবি প্রেমের চক্ষে প্রকৃতিকে দেখিয়া মনে যে সুখ পায়, অন্যে তাহা পায় না। ঊষাকাল দর্শন করিয়া কবি যে আনন্দ অনুভব করেন, আমরা তাহা পাই না। প্রেমবিহীন চক্ষে দেখি বলিয়া প্রকৃতির শোভা পুরাতন, প্রেমবিহীন চক্ষে সমাজকে দেখি বলিয়া তাহার শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখি না, প্রেমবিহীন চক্ষে মানুষকে দেখি বলিয়া, মানুষের সৌন্দর্য্য ও সদ্গুণ দেখি না, মহাজনেরা প্রেমের চক্ষে দেখিতে পাইতেন বলিয়া যে সুখ পাইতেন আমরা তাহা পাই না। একটী চটক পক্ষী দু পয়সা হইলে পাওয়া যায়, তাহার মূল্য ত এই। কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কত বন্দোবস্ত! সে বাসায় বসিয়া বসিয়া প্রতিপালিত হয়, তাহাকে তিনিই রক্ষা করিতেছেন। মানুষের আত্মা কি ইহা অপেক্ষা মূল্যবান নয়? যিনি সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, সকলের জন্য যাহার বিধান, তিনি কি মানুষকে ভুলিতে পারেন? ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলের উপর যাঁহার প্রেম, আমাদের উপর তাঁহার প্রেম নাই, ইহা কি সম্ভব?

শীতের প্রকোপে যে বৃক্ষের পত্র শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল, বসন্তের হাওয়াতে আবার সে বৃক্ষে নূতন পাতা জন্মিতেছে, তিনি মৃতপ্রায় বৃক্ষকে নূতন জীবন দিয়া কেমন শোভাশালী করিতেছেন! যিনি একটী বৃক্ষ শুষ্ক হইলে, তাহাকে নবজীবন দিতেছেন, ইহা কি সম্ভব যে মানবাত্মা জীর্ণ হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া থাকিবে আর নূতন জীবন পাইবে না? সকলকে যিনি জীবিত রাখিয়াছেন, তিনি মানবাত্মাকে পরিত্যাগ করিবেন; ইহা কখনই সম্ভব নহে। তাঁহার বিধাতৃ শক্তি দেখিয়া মনে হয়, তিনি আমাদের জন্যও আছেন, আমাদিগের জন্যও তাঁহার প্রেম আছে, নিরাশার কোন কারণই নাই। তিনি করুন, তাঁহার বিধাতৃত্বের উপর নির্ভর করিয়া আমরা কৃতার্থ হই।

বৈরাগ্য।

(রামমোহন রায় ক্লবে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় কর্ত্তৃক বিবৃত)

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের বৈরাগ্যের বিষয়ে আমরা আজ এখানে আলোচনা করিতে আসিয়াছি। তিনি যেরূপ বৈরাগী ছিলেন, সেরূপ না হইতে পারিলে তাঁহার বৈরাগ্য সম্বন্ধে আলোচনা করাও কঠিন ব্যাপার। যদিও তিনি এখনও জীবন্ত পুরুষের ন্যায় আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান, তথাপি তাঁহার বিষয়ে আমরা অনেকেই অজ্ঞাত।

দেশপ্রচলিত বৈরাগ্যের ন্যায় তাঁহার বাহিরে কোন প্রকার বৈরাগ্যের চিহ্ন প্রকাশিত হইত না। বৈরাগ্যের সম্বন্ধে ভাবিতে গেলেই প্রথমতঃ সেই সকল বাহ্য বৈরাগ্যের কথাই আমাদের মনে পড়ে এবং তাহারই উল্লেখ করিতে ইচ্ছা হয়। বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ এবং তাঁহাদের শিষ্যগণের বৈরাগ্যের কথা সকলেই অবগত আছেন। তাঁহারা আহারে বিহারে পরিচ্ছদে ও শয়ন প্রভৃতি ব্যাপারে কি: যে ক্লেশ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এখনও ভাবিলে চক্ষে জল আইসে। জমিদারের পুত্র রঘুনাথ দাস ঠাকুরের জীবন যখনই মনে হয়, তখনই বৈরাগ্য শক্তির অপূর্ব্ব পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু আমাদের মহাত্মা রামমোহন সে শ্রেণীর বৈরাগী ছিলেন না, তাঁহার বৈরাগ্য অন্য প্রকার ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের বৈরাগ্যের সহিত অন্য ধর্ম্মের বৈরাগ্যের বাহিরে মিল নাই। তিনি সম্পূর্ণরূপে অন্তর বৈরাগী ছিলেন, তাঁহার রচিত সঙ্গীত পুস্তক যিনি মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন, অনেক সঙ্গীত বৈরাগ্যের কথায় পূর্ণ। বৈরাগ্য এই কথাটীইবা কতবার উল্লেখ করিয়াছেন।

'পড়লে অজ্ঞান কূপে ত্রাণ নাহি কোনরূপে
এখন এই যুক্তি কর বৈরাগ্য আশ্রয়"
"বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় রণে।"

তিনি সংসারের অনিত্যতা এবং ঈশ্বরের নিত্যতা প্রতি সঙ্গীতেই দেখাইয়াছেন। বৈরাগ্যভাবপূর্ণ সংগীত দ্বারাই তিনি বৈরাগ্যপ্রধান ভারতবর্ষবাসীদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখনও প্রাচীনগণ সেই সকল সংগীত যেমন ভাল বাসেন, এমন অন্য সংগীত ভাল বাসেন না।

"তুমি কার কে তোমার কারে বল রে আপন?"

একদিন একটী প্রাচীন হিন্দু পথিমধ্যে এই সংগীতের দ্বারা রাজার বৈরাগ্যের বিষয়ে কত কথা বলিলেন। প্রাণে প্রবল বৈরাগ্য না থাকিলে, এরূপ সঙ্গীত কখনই বাহির হইত না।

তাঁহার আহার পরিচ্ছদ এবং চলা ফেরা প্রভৃতি দেখিলে কেহ তাঁহাকে বৈরাগী বলিয়া বুঝিতে পারিত না। তিনি অবস্থানুসারে উত্তম আহার করিতেন, তিনি ভাল বস্ত্র পরিধান করিতেন। বিশেষতঃ ভজনালয়ে যাইবার সময় আপনাকে সুন্দর পরিচ্ছদে শোভিত করিতেন। তিনি আপন প্রভুর নিকট কখনও মলিন বেশে যাইতেন না। সেরূপে যাওয়া তিনি অন্যায় মনে করিতেন। ইহাতে তাঁহাকে কেহই বৈরাগী মনে করিতে পারিত না। কিন্তু তাঁহার বৈরাগ্য উচ্চ শ্রেণীর। তিনি আপন প্রভুর সেবার জন্য ধন, মান, প্রাণ সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তিনি লক্ষাধিক টাকা প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের সেবায় নিঃশেষ করিয়া শেষে দরিদ্র হইয়াছিলেন। তাঁহার বাসস্থান পর্য্যন্ত থাকিল না, তিনি

বহুল পরিমাণে নিজ অর্থব্যয়ে যদি আদি ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণ না করিতেন, তাহা হইলে আজ আমরা ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে পাইতাম কি না সন্দেহ। এরূপ ধনের বৈরাগ্য সকলেরই অনুকরণীয়।

তিনি সম্মান বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি যখন ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন, যখন গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে এক কমিটি গঠিত হইল; তখন প্রয়োজন বশতঃ তাহাতে তাঁহার নাম রহিল না। সে জন্য তিনি এক বিন্দুও দুঃখিত হইলেন না। বরং বলিয়া পাঠাইলেন "যে কার্য্যদ্বারা আমার দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহাতে আমার নাম থাকিলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিলে আমার নাম না থাকাই ভাল।" কয়জন লোক এরূপভাবে অকুণ্ঠিত চিত্তে আপনার মর্য্যাদা পরিত্যাগ করিতে পারেন? ইহাই যথার্থ বৈরাগ্য। গৃহ ছাড়িয়া অরণ্যবাসী হওয়া বরং সহজ। কিন্তু গৃহে থাকিয়া এরূপে ধন মান বিসর্জ্জন দেওয়া ত কত বড় প্রাণের প্রয়োজন! মানুষ সামান্য মানের জন্য কি না করিতেছে? যখন তিনি সমুদায় অর্থ ব্রাহ্মসমাজের সেবায় নিঃশেষ করিলেন, তখন মনে করিলেন যে, একবার বিদেশে বাহির হই, দেখি আমার প্রিয় সমাজের কিছু করিতে পারি কি না। তাই তিনি পরের সাহায্যে বিলাত গেলেন এবং সেখানেই প্রাণ দিলেন।

ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া একদিনে যীশুর প্রাণ বিনাশ করিয়াছিল, এই মহাত্মার প্রাণ তিল তিল করিয়া ক্রুশে অর্পিত হইয়াছিল। প্রভুর সেবায় এরূপে যাঁহারা তিল তিল করিয়া প্রাণ দিতে পারেন, তাঁহারা ধন্য। জগৎ যতই রাজার এই বৈরাগ্যের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবে ও সাধন করিতে পারিবে, ততই ধন্য হইবে। এ যুগে এই বৈরাগ্যই শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য।

সাম্যবাদ।

(প্রাপ্ত)

"The modern leveller, after having done away with conventional inequalities, arbitrary previlege and historical injustice, goes still further and rebels against the inequalities of merit, capacity and virtue. Beginning with a just principle he develops it into an unjust one. Inequality may be as true and just as equality · it depends upon what you mean by it . . . . The modern zeal for equality is a disguised hatred that tries to pass itself off as love."—*Amiel.*

"আধুনিক সাম্যবাদিগণ কৃত্রিম বৈষম্য, স্বেচ্ছা প্রসূত অধিকার ও চিরাগত অত্যাচারের প্রতিবিধান করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, কিন্তু তাঁহারা বুদ্ধি দক্ষতা ও চরিত্রমূলক বৈষম্যের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা সাম্যের মহামন্ত্রকে বিকৃত অর্থে গ্রহণ করিতেছেন। এক অর্থে বলা যাইতে পারে যে, সাম্যের মত বৈষম্যও সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। .... ইদানীং লোকে সাম্যের নামে যে মহা উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা প্রেমের ভাণ মাত্র, বস্তুতঃ তাহা এক প্রকার প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ।"

নির্ব্বিশেষে মানব সাধারণের কতকগুলি অধিকার আছে, যাহার মূলে মানবের সাধারণ ধর্ম্ম বা গুণ। কোন রাজা বা কোন সমাজের এই অধিকার হরণ করিবার ক্ষমতা নাই। জীবন রক্ষা, অর্থোপার্জ্জন, শিক্ষা, ধর্ম্মচর্চ্চা প্রভৃতি বিষয়ে মনুষ্য মাত্রেরই সমান অধিকার—ইহাই সাম্যবাদ। অবশ্য স্বাধীনতা ব্যতীত অধিকারের কোন অর্থ নাই। কিন্তু স্বাধীনতার শুষ্ক মরু অনেক সময়ে আমাদিগকে অধিকারের মরীচিকা দেখাইয়া উপহাস করে। জীবন রক্ষার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সত্ত্বেও অনাহারে লোকের প্রাণ যাইতেছে। আমি শিক্ষা লাভ করি, তাহাতে কাহারও কিছুমাত্র আপত্তি না থাকিলেও দারিদ্র্য বশতঃ বিদ্যালয়ের দ্বার আমার নিকট রুদ্ধ হইতে পারে। অতএব যাহাতে অধিকার কথাটা শুধু মুখের কথা না হয় অর্থাৎ যাহাতে কতকগুলি মূল বিষয়ে সকলেই কিছু পরিমাণে প্রকৃত অধিকার সম্ভোগ করিতে পারে, তাহার উপায় বিধান কর্ত্তব্য। অতি গরীবের সন্তানকেও এমন সুবিধা দিতে হইবে যে, যদি তাহার প্রতিভা থাকে সে যেন অতি উচ্চস্থান লাভ করিতে পারে, সমাজ যেন তাহার প্রতিভার গৌরব হইতে বঞ্চিত না হয়। ইহাই প্রকৃত সাম্যবাদ।

সাম্যবাদের অর্থ কদাচ ইহা নহে যে, সকল মানুষই সকল বিষয়ে সমান। সৃষ্টির কোথাও ত দুইটী বস্তু ঠিক একরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সকল দিকেই মানুষে মানুষে বিস্তর প্রভেদ। যদি কেহ বলেন যে, সকলেই সমান বলবান বা চেষ্টা করিলে সকলেই ভীমের ন্যায় মহাবিক্রম হইতে পারে, সকলেই সমান বুদ্ধিমান বা চেষ্টা করিলে সকলেই সেক্ষপীয়র নিউটন হইতে পারে, সকলেই সমান সাধু বা চেষ্টা করিলেই সকলে শাক্য বা ঈশার ন্যায় হইতে পারে,—সেই উৎকট সাম্যবাদের অপর নাম বালকত্ব। স্বভাবতঃ মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে, তাহার পর চেষ্টার শক্তিও ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন রূপ। বোপদেব গোস্বামী বা ডিমস্থিনিস সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে তাহা প্রত্যেক স্কুলের ছাত্রই জানেন। কিন্তু আমরা যে বড় অধিক ডিমস্থিনিস বোপদেব দেখি না তাহার কারণ এই যে, সে প্রকার অধ্যবসায় হওয়াও ঠিক মুখের কথা নহে। পরলোকের অনন্ত পথে চলিতে চলিতে আমরা কে কি প্রকার কবিতা লিখিব বা বক্তৃতা করিব, আমাদের ব্যাকরণ গণিতের অনুশীলন প্রয়োজন হইবে কি না—সে সব কল্পনার কথা। কিন্তু ইহজীবনে যে ইচ্ছা করিলেই আমরা নিউটন প্রভৃতি হইতে পারি না তাহা বোধ হয় স্বীকার্য্য।

মানুষে মানুষে যতদিন গুণের তারতম্য থাকিবে, ততদিন অধিকারেরও ইতর বিশেষ থাকিবে। অধিকারের মূলে যোগ্যতা। যদি কোন সমাজ অযোগ্য ব্যক্তিকে অধিকার দেয় এবং যোগ্য ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে, তাহাই অন্যায়, তাহাই বহু অনর্থের মূল। যদি কৃষ্ণদাস পালকে তাঁহার জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বনে বাধ্য করা যাইত, তবে যে শুধু ব্যক্তিগত ভাবে গুণের অবমাননা ও ঘোর অত্যাচার হইত তাহাই নহে, কিন্তু তিনি দেশের যে উপকার সাধন করিয়াছিলেন, সেই

উপকার হইতে বঙ্গভূমি বঞ্চিত হইত। জন্মগত জাতিভেদের মূলে কৃত্রিম বৈষম্য। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের স্বেচ্ছা-প্রসূত যে অধিকার, ইহার অর্থ গুণের অবমাননা, চরিত্রের মস্তকে পদাঘাত।

যদি বলাযায় যে,ব্যক্তি বিশেষের কোন গুণ যখন প্রাকৃতিক নিয়মে তাহার বংশগত হইবার কথা, তখন সেই গুণ মূলক অধিকার বংশগত করাও কর্ত্তব্য। এ কথার অনেক উত্তর। প্রথমতঃ প্রকৃতিতে দেখা যায় যে, প্রাণীবিশেষের কোন গুণ সমান ভাবে তাহার বংশাবলীতে অনুভূত হয় না। অর্থাৎ সন্তান সন্ততির মধ্যে কাহারও কাহারও সেই গুণ কম থাকে। যাহাদের বেশী থাকে তাহারা যেমন জীবন সংগ্রামে সুবিধা লাভ করিয়া প্রবল হয়, যাহাদের কম থাকে, তাহারা অসুবিধা ভোগ করিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অর্থাৎ গুণ বংশানুক্রমিক হইলেও প্রকৃতিই ঠিক গুণের পরিমাণ মত অধিকার প্রদান করিয়া থাকে। গুণীর বংশ বলিয়াই সকলকে সমান শ্রেষ্ঠতা দেয় না। দ্বিতীয়তঃ—অধিকার বংশগত হইলে বাহিরের লোকের সেই অধিকার লাভ করা কঠিন হইয়া পড়ে, অথচ বাহিরের লোকেরও প্রতিভা লইয়া জন্ম গ্রহণ করা কিছুই বিচিত্র নহে। গাউসের (Ganss) পিতা গণিত বিশারদ ছিলেন না। হ্যাণ্ডেলের (Handle) পিতা সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না; টিটিয়ানও (Titian) চিত্রকরের পুত্র নহেন। যদি জাতিভেদের নিয়মানুসারে ইহাদিগকে আপনাপন পৈত্রিক ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইত, তাহা হইলে জগতের কি ক্ষতি হইত বিবেচনা করা উচিত। তৃতীয়তঃ—মানুষের জীবন শিক্ষা ও স্বভাবের সম্মিলিত ফল। এই শিক্ষা শুধু স্কুলের শিক্ষা নহে। কিন্তু সেই জীবন ব্যাপী বিস্তৃত শিক্ষা,যাহা জ্ঞানের উন্মেষের সহিত আরম্ভ হয়। এত সামান্য সামান্য কারণে মানুষের জীবনের গতি ফিরিয়া যায় যে,ঘটনার নির্ব্বন্ধের উপর আমাদের হস্ত নাই এক প্রকার বলা যাইতে পারে। আবার বর্ত্তমান প্রাণীতত্ত্ববিদ্গণের অগ্রণী ওয়ালেস ভাইসমান প্রভৃতি স্বীকার করেন না যে, শিক্ষা বা অভ্যাস লব্ধ কোন গুণ বা বিদ্যা (acquired characters) সন্তান সন্ততিতে অনুসৃত হইতে পারে। এই কারণেই পণ্ডিতের পুত্রকেও মূর্খ দেখা যায়, সাধুর সন্তানও সমাজের বক্ষে কলঙ্ক হয়। তবে বিদ্যা ও চরিত্রমূলক অধিকার কে বংশগত করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করা উচিত। এই প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা বলিবার আছে; কিন্তু তাহার জন্য একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন।

জন্মগত কৃত্রিম বৈষম্য দূর করিতে ব্রাহ্মসমাজ বদ্ধ পরিকর। এই অর্থে প্রত্যেক ব্রাহ্মই সাম্যমন্ত্রের উপাসক। মানুষকে মানুষ বলিয়া সম্মান করিতে হইবে। মানুষ মাত্রেরই যে প্রকৃতিগত অধিকার আছে,তাহা হইতে সমাজের এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে বঞ্চিত করিতে পারে না, এই কথা প্রচার করিতে হইবে। কিন্তু সকল গুণে সকল মানুষ সমান—ইহা সত্যও নহে, ইহা সাম্যবাদের অর্থও নহে। ব্রাহ্মসমাজে কি গুণের আদর থাকিবে না? ব্রাহ্মসমাজে যোগদিলেই কি সকলে সমান হইয়া গেল, সকল গুণের পরাকাষ্ঠা লাভ করিল? এই কুসংস্কার যদি আমাদের সাম্যমন্ত্রের অর্থ হয়, তবে আমাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চট্টগ্রাম।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ২য় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

১৮৯৪

(পূর্ব্ব প্রকাশিতে পর)

দাতব্য বিভাগ—এই তিন মাস মধ্যে ১২টী পরিবার, ১১টী ছাত্র, ১টী ছাত্রী, ৩টী অন্ধ, এবং একটী কুষ্ঠ রোগীকে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে। যাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করা হয়, বৎসরের প্রথমেই তাহাদিগকে এক বৎসর সাহায্য করা হইবে বলিয়া অঙ্গীকার করা হয়। বিগত তিন মাসে ১০০ শত টাকা দেওয়া হইয়াছে, আর ৯ মাসে অন্ততঃ আরও ৩০০ শত টাকার প্রয়োজন। তহবিলে দুই শত দশ টাকা মাত্র আছে, আরও কয়েকজনের দরখাস্ত আমাদিগের হস্তে আসিয়াছে। সহৃদয় দাতাগণের নিকট এই প্রার্থনা যে, তাঁহারা অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে এবং এককালীন এই ফণ্ডে কিছু কিছু অর্থ দান করেন। যাঁহারা বিগত তিন মাস কাল মধ্যে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
এককালীন দান সংগ্রহ	৬৬।৹	মাসিক দান	৭২॥৹
বার্ষিক দান সংগ্রহ	১৭॥৹	বার্ষিক দান	৬৲
মাসিক দান সংগ্রহ	১০৲	এককালীন দান	২১৵৹
অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রাপ্তি	৪৪৲	বিবিধ ব্যয়	১৲১৫
পরলোকগতা সরলা মহলানবিশ ফণ্ডের ১০০৲ টাকার			১০০॥৵১৫
সুদ	১৮।৫	হস্তেস্থিত	২১০॥/১৫
বাবু কালীপ্রসন্ন বসু ফণ্ডের ১০০৲ টাকার সুদ	৯॥৹		৩১১।১৹
তহবিলে অতিরিক্ত	২৶১৹		
	১৬৭৸৶১৫		
পূর্ব্বকার স্থিত	১৪৩।১৫		
	৩১১।১৹		

নীতি-বিদ্যালয়—গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে নীতি বিদ্যালয়ের কার্য্য স্থগিত ছিল, পুনরায় ১লা জুলাই হইতে বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবে, গ্রীষ্মাবকাশের পূর্ব্বে ইহার কার্য্য রীতিমত চলিয়াছে। ইতিমধ্যে আমরা ৫৬৲ টাকা দানপ্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার কিয়দংশ বালকবালিকাদিগের ব্যায়ামের পুরস্কার স্বরূপ ব্যয়িত হইয়াছে। ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে।

উপাসকমণ্ডলী—বিগত তিন মাসে নিয়মিতরূপে মন্দিরে রবিবার প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় উপাসনা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কয়েকটী বন্ধু মিলিত হইয়া, প্রতিদিন প্রাতঃকালে

মন্দিরে উপাসনা করিয়াছেন। এই তিন মাস বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়েরা ও ছাত্রমণ্ডলী যাঁহারা নিয়মিতরূপে মন্দিরে উপাসনা করিতে আসিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অনেকে গ্রীষ্মাবকাশ বশতঃ সহরের বাহিরে গিয়াছিলেন, সুতরাং উপাসক সংখ্যা কিছু অল্প হইয়াছিল। বিগত সপ্তাহ হইতে পুনরায় উপাসক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই বৎসরের জন্য আচার্য্য এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ এবং ডাঃ প্রসন্নকুমার রায়, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র সহকারী আচার্য্য মনোনীত হইয়াছেন। ডাঃ প্রসন্নকুমার রায় সম্পাদক এবং বঙ্কবিহারী বসু সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়গণ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
চাঁদা আদায়	১০৩৸০	বেতন	৩৪।০
দান সংগ্রহ	১৸৴০	ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যয়	১৯৷৫
ছাত্রসমাজ হইতে গ্যাস		হাওলাত শোধ	২৮৲
হিঃ প্রাপ্ত	৯৲	গ্যাসের আলো	৩১॥০
	১১৪॥৴০		১১২৸৫
পূর্ব্বস্থিত	৬।০	হস্তেস্থিত	৮৷১০
	১২০৸৴০		১২০৸৴০

ব্রাহ্মছাত্রী-নিবাস ও শিক্ষালয়—ছাত্রীনিবাসের বর্ত্তমান ছাত্রীসংখ্যা ৩১। ইহার মধ্যে ২৪টী শিক্ষালয়ে পাঠ করে। গত তিন মাসের গড় ছাত্রীসংখ্যা ৩০। এই তিন মাসে ২টী ছাত্রী চলিয়া গিয়াছে, ৩টী নূতন ভর্ত্তি হইয়াছে।

শিক্ষালয়—বর্ত্তমান ছাত্রী ও ছাত্রসংখ্যা ৬৭। ইহার মধ্যে ৫৬টী বালিকা ও অবশিষ্ট ১১টী বালক। গত তিন মাসের গড় ছাত্রীসংখ্যা ৭২। একজন শিক্ষয়িত্রী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, অপর একজন তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এতদিন দক্ষতার সহিত ছাত্রীনিবাস ও শিক্ষালয়ের সম্পাদকের কাজ করিতেছিলেন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে তিনি সম্পাদকীয় কার্য্য আর করিতে পারিতেছেন না। ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় তাঁহার স্থানে সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
ছাত্র ও ছাত্রী বেতন	৯৯৮৸০	খাওয়া ও আলো	
চাঁদা ও এককালীন দান	৫১৪৲	ইত্যাদি	৪০৫॥৵৫
বাড়ী ভাড়া	১৮৲	কর্ম্মচারীর বেতন	৭৩২৶১০
গাড়ী ঘোড়া বিক্রী (অংশ)	১৭০৲	গাড়ী	১৪৭৶৫
ধার	১১৫৲	বাড়ী ভাড়া	২৭৩৲
		ধার শোধ	২৮৫৲
	১৮১৫৸০	বিবিধ	২৬৸১৫
পূর্ব্বস্থিত	৭৯৷১৫		
			১৮৬৯৸১৫
মোট	১৮৯৪৸১৫	হস্তেস্থিত	২৫৲
			১৮৯৪৸১৫

সঙ্গত সভা—এই তিন মাসে সঙ্গত সভায় ১৩টী অধিবেশন হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত ৭টী বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। (১) "সত্য-সাধন" (২) "কলিকাতা ও নিকটস্থ স্থান সকলে ব্রাহ্মসমাজ কি উপায় অবলম্বন করিলে ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা হয়।" (৩) "ন্যায়।" (৪) "গৃহস্থ প্রচারক।" (৫) "বিশেষ ঋতুতে ভগবানের বিশেষ আবির্ভাব।" (৬) "ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা।" (৭) "আদর্শ ব্রাহ্মজীবন।" ইহার মধ্যে কোন কোন বিষয় ২।৩ অধিবেশন ধরিয়া আলোচিত হইয়াছিল। সভ্যগণের উপস্থিতির সংখ্যা গড়ে ৯।১০ জন।

তত্ত্বকৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার—এই দুই পত্রিকাই নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তত্ত্বকৌমুদীর জন্য এতদিন কোনরূপ ঋণ হয় নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই তিন মাসে তত্ত্বকৌমুদীর জন্য ঋণ করিতে হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের জন্যও গত বৎসরে ঋণ করিতে হয় নাই, কিন্তু এই বৎসরে আবার ঋণ হইতেছে। এ বিষয়ে আমরা গ্রাহক মহাশয়দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহাদের সদয় ব্যবহার ভিন্ন পত্রিকাদির ব্যয় কখনই নির্ব্বাহিত হইতে পারে না।

ছাত্রসমাজ, ব্রহ্মবিদ্যালয় মিশনকমিটি, ব্রাহ্ম-সম্মিলনী, লাইব্রেরী, আধ্যাত্মিক-উন্নতি সাধন কমিটির বিশেষ কোন কার্য্যবিবরণ পাওয়া যায় নাই।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

আয়			ব্যয়	
সভ্য ও সহযোগিগণের			প্রচার ব্যয়	৭১১॥৵০
নিকট হইতে চাঁদা			কর্ম্মচারীর বেতন	১১২॥০
আদায়		২৮৯॥৵১৫	সুদ	২৭৸৫
বার্ষিক	১৬৫।০		বিবিধ	২৩৶১৫
মাসিক	১২৪।৵১৫		ডাকমাশুল	১৸০
			পুস্তক বাঁধাই	৫।৫০
	২৮৯॥৵১৫		মুদ্রাঙ্কন	৫২৲
প্রচারার্থ দানপ্রাপ্তি		২১৩।১০	দুর্ভিক্ষ	৫২।৶৫
বার্ষিক চাঁদা	২৬৷/১৫		প্রচারক গৃহ	৫৸৴১০
মাসিক চাঁদা	১২৭।৵১৫		পাথেয়	১১৮॥৫
এককালীন	৫৯॥০		উৎসব	২০৲
			সিটিকলেজ বৃত্তি	৭৯॥০
	২১৩।১০		সৌদামিনী বৃত্তি	১০৲
স্থায়ী প্রচার ফণ্ড		৪৲	বেনারস আশ্রম	১৶১০
প্রচারক গৃহ হিঃ		৪৯৲	বাগআঁচড়া মিশন	৭৮৸৶১৫
উৎসব হিঃ		২৲	হাওলাত ও গচ্ছিত	১৪০৭৸৵৫
পাথেয়		৮৬৲	লাইব্রেরি	।০
দুর্ভিক্ষ		১৫৭॥০		
সুদ		৭৯৸০		২৭২১।৵১০
বিবিধ		১৲	স্থিত	৪০৸৴১০
মেরি কার্পেণ্টার ফণ্ড		১৩০০৲		
মন্দিরে অনুষ্ঠান উপলক্ষে দান		১৫৲		২৭৬২।০
সিটি কলেজ বৃত্তি		৭৯॥০		
ট্রষ্টডীড		১৲		
ডাকমাশুল		৴০		
হাওলাত আদায় ও গচ্ছিত		১১৩৸০		
		২৩৯১॥৫		
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত		৩৭০॥৶১৫		
		২৭৬২।০		

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

আয়		ব্যয়	
মূল্য আদায়	২২৮।৶৫	মুদ্রাঙ্কন	১৪৭৲
নগদ বিক্রয়	৶০	কাগজ	৫২॥/৫
বিজ্ঞাপন	৫২॥০	কর্ম্মচারীর বেতন	১২৪॥০
বিবিধ	॥/০	বিবিধ	১১৸১৫
ডাকমাশুল	৬।৵১০	ডাকমাশুল	১০১৵১০
হাওলাত	৯২৲	কমিশন	২৸০
	৩৮০/১৫		৪৩৯৸১০
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	৬১॥০	স্থিত	১৸/৫
	৪৪১॥/১৫		৪৪১॥/১৫

তত্ত্ব-কৌমুদী।

আয়		ব্যয়	
মূল্য আদায়	২৪৪৵৫	ডাকমাশুল	৪২৶৫
নগদ বিক্রয়	।০	কাগজ	৩৫৲
কাগজ বিক্রয়	১২।৵০	মুদ্রাঙ্কন	১০৭॥০
ডাকমাশুল	৵০	কর্ম্মচারীর বেতন	৮২॥৶৫
হাওলাত	১২০৲	বিবিধ	৪৲
		কমিশন	১॥০
	৩৭৬৵৫		
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	॥/০		২৭২৸৵১০
		স্থিত	১০৪॥১৫
	৩৭৭।৶৫		
			৩৭৭।৶৫

পুস্তক ফণ্ডের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
নগদ বিক্রয়	১৬২।/১৫	অপরের মূল্য শোধ	১০৪৲১৫
সমাজের ১২০।৵৫		পুস্তক বাঁধাই	২৭॥৶০
অপরের ৪০৸৶১০		কর্ম্মচারীর বেতন	২৫৲
		ডাকমাশুল	৫৸/০
১৬২।/১৫		বিবিধ	৮৸/১৫
বাকী মূল্য আদায়	২১।/১০	কমিশন	৭।১০
কমিশন	৩৭৸৶১০	মুদ্রাঙ্কন	৫৲
ডাকমাশুল	৫৵০	হাওলাত	২১২৲
এককালীন দান	৪৲		
			৩৯৫॥৶০
	২৩০৸০	স্থিত	২৬৯।৶০
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	৩৩৪।/৫		
			৫৬৫৵০
	৫৬৫৵০		

মাঘোৎসব।

আয়		ব্যয়	
চাঁদা সংগ্রহ	৪২৩॥৵১০	অতিথিগণের বাড়ীভাড়া	৩৫৲
মন্দিরে দান সংগ্রহ	৬৪॥১০	ঘর প্রস্তুতের ব্যয়	৩৩৲
জিনিস বিক্রয়	৭৲১৫	মন্দিরের আলো	৩০৲
গত বৎসরের তহবিল	।৵১০	মুদ্রাঙ্কন ও কাগজ	২৯৵০
হাওলাত জমা	৩৩॥৵০	নগরসংকীর্ত্তনের ব্যয়	৪০॥/১০
		ডাকমাশুল	১০৲
	৫২৯।৫	বালকবালিকার উৎসবের ফুল ও মালা	৭॥০
		অতিথিগণের আহার ও বিবিধ ব্যয়	৩৪৪৲১৫
			৫২৯।৫

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস।

আয়		ব্যয়	
যত টাকা নগদ আদায় হইয়াছে	১২৫৬৸৶০	সুদ	৭২৲
ছাপাই হিঃ হাওলাত জমা	৯৫৪॥০	সরঞ্জামী	৬৮॥৶১৫
	২২১১।৶০	বিবিধ	২৫।৶৫
প্রথম ত্রৈমাসিকের হস্তেস্থিত	১৬।৫	ঋণদান	১১১৬॥৶১০
	২২২৭॥৶৫	প্রেস প্রস্তুত হিঃ	১০২৶১০
		ডাকমাশুল	॥৶১৫
		কর্ম্মচারিগণের বেতন	৬৭৩৶১০
		জলপানি	৭॥১০
		পূর্ব্বের টাইপ ক্রয়ের মূল্য শোধ	৫৬॥০
		হাওলাত শোধ	৫০৲
		দপ্তরী	৫৲
		ফেরত জমা	৫৲
		এপ্রেল ও মে মাসের কমিশন ইত্যাদি	২০৲
			২২০৩/১৫
		হস্তেস্থিত	২৪॥/১০
			২২২৭॥৶৫

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

গুপ্ত কণ্টক।

এক ব্যক্তি দিবারাত্রি দুষ্কর্ম্ম করিয়া হৃদয় মলিন এবং কলঙ্কিত করিতেছে। তাহার হৃদয়ের মলিনতা হৃদয়েই প্রচ্ছন্ন থাকিতেছে। কে তাহার প্রতি দৃকপাত করে? তাহার শরীর যদি বহুমূল্য ও সুরুচি সম্পন্ন আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত থাকে, তবে ভদ্রসমাজের উচ্চাসনে তাহাকে বসাইতে অল্প লোকেই কুণ্ঠিত হয়। শুদ্ধ শারীরিক আচ্ছাদনেরই এই শক্তি! ইহার সহিত যখন পদ, মান, ধন ও কুল মর্য্যাদা জড়িত হয়, তখন তাহার নিকট মস্তক অবনত না করে এমন মনুষ্য পৃথিবীতে দুর্লভ। যাহাকে সাধু ও উপকারী মিত্র বলিয়া নিঃসন্দিগ্ধভাবে বিশ্বাস করিয়াছি, সে যখন গোপনে শত্রুতাচরণ করে, তখন তাহার মত অনিষ্টকারী দ্বিতীয় ঘটা ভার হয়। পুষ্পহারে যে সর্প লুক্কায়িত থাকে, তাহার ন্যায় সম্মুখস্থ দংশনোন্মুখ সর্প কখনই ভয়ের আস্পদ নয়। সুমধুর মিষ্টান্নে যে বিষ মিশ্রিত থাকে তাহা ভক্ষণ করিয়া মনুষ্যের হানি হইবার যেরূপ সম্ভাবনা, বিষ-পাত্রস্থিত দৃশ্যমান্ বিষে কখনই তদ্রূপ সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই আজ কতগুলি উচ্চ বিষয় নিহিত দোষের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।—

ধর্ম্মও অনেক সময়ে সাংসারিক ভদ্রতার ন্যায় বহিরাবরণাদিতে পর্য্যবসিত হয়। সে ধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদী এসংসারে অতি দুর্লভ। আবার কতগুলি বিষয় পুষ্পহারের ন্যায় অতি পবিত্র ও রমণীয় হইলেও তাহার মধ্যে অনেক অবস্থাতেই

সর্পশিশু লুক্কায়িত থাকিয়া মনুষ্যকে গোপনে সাংঘাতিক রূপে দংশন করে। অতি সুমধুর হইলেও অনেক সময়েই তাহাতে গরল মিশ্রিত থাকে। চিরবিশ্বাসী উপকারী মিত্রের শত্রুতার ন্যায় ইহার শত্রুতাও মানুষের পক্ষে বিষম অপকারী। আমরা এই সকল জাতীয় ধর্ম্মের মধ্যে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিব, যদি আমাদের সকল কথা শুনিবার ধৈর্য্যকে ত্যাগ করিয়া প্রথমেই কেহ আমাদিগকে বিচারাধীন করেন, তবে তিনি আমাদিগকে অবশ্যই এবম্বিধ উপাধি দিবেন যে, তাহাকে আমরা আমাদের উপর অযথা গালি বর্ষণ বলিয়া দুঃখ করিব।

আমরা প্রধানতঃ ধর্ম্ম বাক্যের গুপ্ত কণ্টকের মধ্যে অবস্থা বিশেষে অনুষ্ঠান, ধর্ম্ম বাক্য, উপাসনা, পরিত্রাণ ও পরকাল এই কয়েকটী বিষয়কেই নির্দ্দিত করিয়াছি। একাদিক্রমে ইহার কারণ ক্রমে উল্লিখিত হইতেছে।

১। অনুষ্ঠান;—ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন ব্যতীত অন্য কোন অর্থে আমরা অনুষ্ঠান কথাটী ব্যবহার করিতে প্রস্তুত নই। সুতরাং মনুষ্যের যাহা কিছু করণীয় সমস্তই অনুষ্ঠান। অথচ অবস্থানুসারে এই অনুষ্ঠানকেই আবার ধর্ম্মপথের গুপ্ত কণ্টক মনে করি। অনুষ্ঠান দুই অবস্থাতে দূষিত হয়। প্রথম অজ্ঞানান্ধতামূলক কুসংস্কার বশতঃ, অপর উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতার অভাব জন্য। প্রথম কারণে জগতে কত নরহত্যা শিশুহত্যা, নারীহত্যা, পশুহত্যা, অত্যাচার, সংগ্রাম প্রভৃতি অকুণ্ঠিতভাবে সংসাধিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ হইলে পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিরও গাত্র কণ্টকিত হয়। ধর্ম্মের ইতিহাসই ইহার জাজ্বল্যমান সাক্ষী। দ্বিতীয় কারণে আদি-কাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত পৃথিবীর অধিকাংশ নরনারী প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে সমস্ত জীবন দূরে রহিয়াছে। একরূপ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, বোধ হয় যেন সমস্ত মানুষ ধর্ম্মরাজ্যে শস্য ত্যাগ করিয়া তুষ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। অনুষ্ঠান মাত্রেরই একটী প্রকৃত বা পরমেশ্বরনির্দ্দিষ্ট নিগূঢ় মূল আছে। সেই নিগূঢ় মূল ত্যাগ করিয়া যখন অনুষ্ঠান মনুষ্যের নীচ স্বার্থের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই উহা মনুষ্যকে বহন করিয়া ধর্ম্ম প্রাঙ্গন হইতে শূন্যে উড্ডীয়মান হয়। উহার সঙ্গে প্রকৃত ধর্ম্মের কিছুই আকর্ষণ থাকে না। এইজন্য অনুষ্ঠানকে আমরা পূর্ব্ব বর্ণিত উভয় অবস্থাতেই ধর্ম্ম পথের অতিশয় অনিষ্টকারী কণ্টক বলিয়া মনে করি। উহাকে এইজন্য গুপ্ত কণ্টক বলি যে, উহা মানুষের চক্ষুতে সহসা ধরা পড়ে না। আমরা বিশ্বাস করি যে, মানুষ সমস্ত জীবন এই অসার ভস্মের নীচে আপনাকে লুক্কায়িত রাখিয়া, অথচ কৃতার্থ মনে করিয়া বিলক্ষণরূপে প্রবঞ্চিত হইতে পারে। এইজন্য প্রত্যেক প্রকৃত ধর্ম্মার্থীর পক্ষে অতি সতর্কতার সহিত অনুষ্ঠানের সঙ্গে পরিশুদ্ধ জ্ঞান ও লক্ষ্যের পবিত্রতার সংযোগ সর্ব্বথা রক্ষণীয়।

দ্বিতীয় ধর্ম্মবাক্য;—ধর্ম্মসমাজ মধ্যে কতকগুলি উচ্চ ভাবের কথা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ কথা গুলিকে ধর্ম্মবাক্য বলা যাইতে পারে। উক্ত কথা সকল যে মূল্যহীন ও অনুপ-কারী তাহা নয়, কিন্তু উহার বিষম অপব্যবহার আছে। সেই অপব্যবহার ও অনুষ্ঠানের অপব্যবহারের ন্যায় অনিষ্ট-কারী। ঐ কথাগুলির সঙ্গে যতক্ষণ প্রকৃতভাবের যোগ থাকে, ততক্ষণ উহা মানুষের ধর্ম্মপথের বিশেষ সহায় হয়। উচ্চতম ধর্ম্মালাপে মানুষের হৃদয় উন্নতরূপে প্রস্তুত হয়। কিন্তু যখন উহা হইতে ভাবের বিয়োগ সংঘটন হয়, তখন উহা মানুষকে ক্রমে অধোগামী ও পদে পদে অপরাধী করে। দুঃখের বিষয় মানুষের অবিবেচনা ও অসতর্কতা উহা হইতে কুফলই সর্ব্বদা উৎপন্ন করিতেছে। পৃথিবীর বহুতর মানুষই ধর্ম্মবাক্য বিনিময় করিয়া ধার্ম্মিক নাম ক্রয় করিতে ব্যগ্র। এক ব্যক্তি দুই দণ্ড একস্থানে বসিয়া শান্তি অশান্তি, পাপ পুণ্য, অনুতাপ, হৃদয় আত্মা, ইহকাল পরকাল ব্রহ্ম, দয়া, ধর্ম্ম, প্রেম, সত্য ইত্যাদি নানা উচ্চ কথা ব্যবহার করিয়া আলাপ করিল। চারিদিকের মানুষেরা তাহাকে ধার্ম্মিক বলিল। হয় ত বক্তাও অনেক সময়ে তাহাতেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া প্রবঞ্চিত হইলেন। কিন্তু এমন ভাবশূন্য হৃদয়ে ঐ সকল মূল্যবান কথা উচ্চারণ করিলেন যে, যে সকল কথা ভাবের সহিত উচ্চারিত হইলে হৃদয়ের সমস্ত দ্বার উদ্ঘাটিত ও সর্ব্বস্থান আন্দোলিত হইত, সেই সকল কথাই তাহাকে অধঃপাতের দিকে চালিত করিল। এইজন্য ধর্ম্মকথা ব্যবহারেও সর্ব্বদা সতর্কতা রক্ষা প্রয়োজন। এমন কি ভাবশূন্য হইয়া বলা অপেক্ষা না বলা ক্ষতিকারক নয়। এবং ঐরূপ বলাকেই আমরা ধর্ম্মপথের গুপ্ত কণ্টক মনে করি।

তৃতীয় উপাসনা;—ভাববিহীন ধর্ম্মবাক্যের ন্যায় ভাবশূন্য উপাসনাকেও আমরা অতিশয় ভয়ানক মনে করি, উহা বিষম কপটতারূপ মহাপাপের সোপান স্বরূপ। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে স্বীকার করে না, তদপেক্ষা যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে লইয়া ক্রীড়া পুতুলের ন্যায় খেলা ও উপহাস করে, সে অতিশয় নারকী। সে যদি তাহার জিহ্বাকে শত সহস্রবার দগ্ধ করে, তাহাতেও তাহার এ অপরাধ ও পাপের মোচন হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই জ্বলন্ত অগ্নিতে অবগাহন করিতে মানুষ সর্ব্বদাই সাহস করিতেছে। ধর্ম্মবাক্যের ন্যায় মানুষ অনেক সময়েই দীর্ঘ দীর্ঘ উপাসনা বিনিময় করিয়া ধার্ম্মিক নাম কিনিয়া প্রবঞ্চিত হইতেছে। মানুষের এই ধৃষ্টতা দেখিয়া ও ভাবিয়া ইচ্ছা হয় প্রার্থনা করি—"প্রভো! তোমার ভীষণানাং ভীষণং রূপ প্রকাশিত করিয়া অজ্ঞান মানবসন্তানকে জ্ঞান দান কর। তোমার প্রেমকে কোমল ভাব দেখিয়া নির্ব্বোধ মানুষ আমরা দুঃসাহসী হইয়াছি।" এই জন্য আমরা মনে করি, যদি মানুষ বহু যত্ন ও চেষ্টা করিয়াও সমস্ত জীবনে খাঁটি পবিত্র এবং ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহার নামে একবিন্দু অশ্রুপাতও করে, তাহাও শতবর্ষব্যাপী ভাব-শূন্য কপট উপাসনা অপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেয়ঃ। কেবল শ্রেয়ঃ নহে, তাহাই অবশ্য করণীয়। দীর্ঘকালব্যাপী উপাসনা আবশ্যকীয়। দীর্ঘকাল কেন? প্রকৃত উপাসনাকে আমরা জীবনব্যাপী হওয়া শ্রেয়ঃ বোধ করি। কিন্তু ভাবশূন্য কপট উপাসনাকে আমরা ধর্ম্মপথের বিষম গুপ্ত কণ্টক মনে করি। আর ইহাও মনে করি, সহজে একদিন

দুই দিনেই মানুষ প্রকৃত উপাসক হইতে পারে না। ভাষায় যেমন "ক" হইতে শিক্ষা করিয়া অনেক দিনে উচ্চ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হয়, উপাসনায় যে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে তাহাতে আমাদের বিশ্বাস নাই। এইজন্যই ধর্ম্মসমাজে প্রবেশ করিয়াই যাঁহারা দীর্ঘকালব্যাপী উপাসনায় যোগ দেন তাঁহাদিগকে সাবধান করিতে ইচ্ছা হয়।

চতুর্থ পরিত্রাণ ;—পরমেশ্বরকে প্রাপ্তি বিষয়ে মনুষ্যের অগ্রগমন ভিন্ন আমরা পরিত্রাণ বা মুক্তির কোন অর্থ জানি না। আমাদের মনঃকল্পিত কোন শান্তি সুখময় স্থান বা অবস্থাকে লাভ করা পরিত্রাণ বলিয়া জানি না। স্থান, অবস্থা, সুখ, দুঃখ, শান্তি অশান্তি পাপ পুণ্য কিছুই আমাদের লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য আমাদের ঈশ্বর। সেই লক্ষ্যের দিকে অগ্রবর্ত্তী হওয়াই পরিত্রাণ। তাহাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। হয়ত আজ আমি যাহাকে সুখ, শান্তি বা পুণ্য কল্পনা করিয়া বসিয়া আছি, কাল সেপথে অগ্রগমন করিতে, তাহার বিপরীত পক্ষই আমার মঙ্গলের নিদান হইবে। এইজন্য ঐ সকল আমাদের লক্ষ্য হইতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ ধর্ম্মেই পরিত্রাণ পৃথক পদার্থ মধ্যে গণ্য। ঈশ্বর কেবল তৎপ্রাপ্তির সহায়। ব্রাহ্মসমাজের মতে এ পরিত্রাণ বিকৃত না হইলেও কার্য্যতঃ চিরকালের কুঅভ্যাস বশতঃ অনেক সময়ে মনে মনে স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই দূষিত পরিত্রাণ মানুষকে চিরদিন ঈশ্বর হইতে দূরে নিঃক্ষিপ্ত করে। ভাবিতে হৃদ্‌কম্প হয়, যে মানুষ সেই আদিকাল হইতে ঈশ্বররূপ মহাধনকে পণ স্বরূপে দান করিয়াও এই অসার কাল্পনিক পরিত্রাণ কিনিতে ব্যতিব্যস্ত। বস্তুতঃ এই সকল দূষিত সংস্কার বশতঃ ধর্ম্মরাজ্য একদিকে নিতান্ত স্বার্থ ও কপটতা পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। এই দূষিত পরিত্রাণ মানবের ধর্ম্ম পথের বিষম বাধা। এইজন্য ইহাকেও আমরা আর একটী গুপ্ত কণ্টক মনে করি।

পঞ্চম কণ্টক পরকাল ;—পরকালকে কণ্টক বলিলাম বলিয়া কেহ যদি মনে করেন যে, আমরা পরকাল অস্বীকার করি তাহা হইলে তিনি ভুল করিবেন। আমরা উহার অস্তিত্ব জলন্তরূপে বিশ্বাস করি। তথাপি বলিতেছি যে, আমরা মানব সন্তান, নিতান্ত অবোধ প্রকৃতি বলিয়াই এই জলন্ত সত্যও আমাদের পক্ষে অপকারক হইয়াছে। আমরা পরকালে বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু পরকালের অবস্থার কল্পনা ও তদনুযায়ী প্রস্তুত হইবার চেষ্টা উভয়ই ভুল। পরকাল বলিতে যদি পর মুহূর্ত্ত বুঝায়, তাহা হইলেই আমরা সাহসের সহিত পূর্ব্ববাক্য ব্যবহার করিতে পারি। কিন্তু যখন অনন্ত কালের জন্য মানুষকে ভাবিয়া ভাবিয়া ব্যতিব্যস্ত হইতেছে, দেখা যায়, তখন তাহা আরও অধিকতর গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ মানুষ যদি বর্ত্তমান প্রতি মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হয়, তাহা হইলেই তাহার অনন্ত জীবনের সমস্ত মুহূর্ত্তের প্রকৃত সুব্যবহার হইতে পারে। কিন্তু অনেক সময়েই মানুষ অনন্ত ভবিষ্যতের চিন্তায় মগ্ন থাকে, বর্ত্তমানের অপব্যবহার করে। অথচ অল্পকালের কথা দূরে থাকুক, পরমুহূর্ত্ত সম্বন্ধেও মানুষের সম্পূর্ণ আয়ত্ত না থাকায় তজ্জন্য বাস্তবিক প্রস্তুত হওয়া ঘটে না। প্রস্তুত না হইয়া কেবল পরকাল পরকাল করিয়া মানুষ প্রবঞ্চিত হয়। মানুষ পরকালে সমস্ত আশা ভরসা স্থাপন করিয়া সমুদায় জীবন কষ্টে, নিরানন্দ ভাবে যাপন করিয়া প্রকৃত পরিশুদ্ধ নিষ্কাম ধর্ম্মের বিমল আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকে। প্রকৃত নির্ভরশালী সাধুপুরুষ বর্ত্তমান মুহূর্ত্তকে যত্ন পূর্ব্বক পবিত্র রাখিয়া পরমুহূর্ত্তের চিন্তা পরিত্যাগ করেন। কারণ তিনি জানেন সাধনই জীবনের মূলমন্ত্র। এজন্য আমরা পরকালকে বর্ত্তমান ও পরমুহূর্ত্তের ন্যায় জলন্তরূপে বিশ্বাস করি, কিন্তু তৎকালীন অবস্থার কল্পনাও তজ্জন্য প্রস্তুত হওয়াকে ধর্ম্মপথে গুপ্ত কণ্টক মনে করি।

ব্রাহ্মসমাজ।

উৎসব—ময়মনসিংহ হইতে শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি গুপ্তা লিখিয়াছেন ;—

"শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের নবপ্রতিষ্ঠিত উপাসনা গৃহে নিম্নলিখিতরূপে ভগিনী সমাজের ২য় সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে আমরা করুণাময়ের অপার করুণার প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখিয়া ধন্য হইয়াছি।

২৮এ আষাঢ় বুধবার—প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্তা অন্নদাসুন্দরী বিশ্বাস উপাসনার কার্য্য করেন।

মধ্যাহ্নে—প্রার্থনা সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন। প্রবন্ধ পাঠ, সাধু জীবনী পাঠ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

অপরাহ্নে—সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্তা বামাসুন্দরী চন্দ উপাসনার কার্য্য করেন।

২৯এ আষাঢ় বৃহস্পতিবার—প্রাতে সঙ্গীত, উপাসনা। শ্রীযুক্তা সুশীলা বসু উপাসনার কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে—সঙ্গীত, প্রার্থনা, এবং "আমাদের জীবনের অভাব ও তাহা পূরণের উপায়" সম্বন্ধে আলোচনা। অপরাহ্নে—সঙ্গীত সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীমণি গুপ্তা উপাসনার কার্য্য করেন।

৩০এ আষাঢ় শুক্রবার—প্রাতে সঙ্গীত সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী চক্রবর্ত্তী উপাসনার কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে সঙ্গীত সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা। তৎপরে 'রিপোর্ট' পাঠ ও নূতন বৎসরের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ।

মধ্যাহ্নে—সঙ্গীত সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারী বসু উপাসনার কার্য্য করেন।"

খলিলপুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র নাথ লিখিয়াছেন ;—

"নিম্নলিখিত প্রণালীতে খলিলপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

৬ই শ্রাবণ—প্রাতঃকালে উৎসবের উদ্বোধন। বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন।

রাত্রিকালে সংগীত ও উপাসনা। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নাথ উপাসনা করেন।

৭ই শ্রাবণ—প্রাতঃকালে সংগীত ও উপাসনা, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন।—মধ্যাহ্নে ১টা হইতে অপরাহ্ন ৬½ ঘটিকা পর্য্যন্ত গ্রন্থাদি পাঠ, আলোচনা, সৎপ্রসঙ্গ হয়। রাত্রিকালে উপাসনা হয়। বাবু রজনীকান্ত সরকার উপাসনা করেন।

তত্ত্ববিদ্যা সভা—প্রতি সোমবার কলিকাতা সাধন-আশ্রমে নিয়মিতরূপে তত্ত্ববিদ্যা সভার প্রবন্ধ গঠিত ও আলোচিত হইতেছে। গত কয় সপ্তাহে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন;—বাবু সীতানাথ দত্ত—"শ্রুতি মূলক বিশ্বাস ও স্বাধীন চিন্তা", বাবু প্রতুলচন্দ্র সোম—"ধর্ম্ম-জীবনে সন্ন্যাস ও অবকাশ", বাবু প্যারীলাল ঘোষ—"ব্রাহ্ম-সমাজের ধর্ম্মোৎসাহ কি কমিয়াছে?" বাবু মনোরঞ্জন গুহ—"ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি।"

নামকরণ—বরিশালস্থ ব্রাহ্ম ভ্রাতা বাবু বরদাপ্রসন্ন রায়ের প্রথম পুত্রের নামকরণ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। বালকের নাম সুধীন্দ্র রাখা হইয়াছে। পরমেশ্বর বালককে ধর্ম্মপথে বর্দ্ধিত করুন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাঁহার কলেজ ষ্ট্রীটের হোমিওপ্যাথিক ষ্টোর হইতে আবা ও কলিকাতা সাধনাশ্রমের জন্য নিয়ত বিনামূল্যে ঔষধ দান করিতেছেন। আমরা দাতাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সাধুদৃষ্টান্ত—ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী কুমুদিনী ঘোষ যখন নলহাটিতে ছিলেন, তখন একদিন কোনও বালককে সঙ্গে করিয়া মাঠে বেড়াইতে যান। হঠাৎ একটা গোক্ষুর সাপ বালকের পদে দংশন করে। তিনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় না হইয়া তৎক্ষণাৎ আপন বস্ত্রাঞ্চল ছিঁড়িয়া ক্ষত স্থানের উর্দ্ধে দৃঢ়বন্ধন করিলেন এবং ক্ষত স্থানে মুখ দিয়া সমস্ত বিষাক্ত রক্ত চুষিয়া ফেলিলেন। অবসাঙ্গ চলচ্ছক্তিহীন বালককে পৃষ্ঠে বহন করিয়া প্রায় এক মাইল ব্যবধান বাসাতে উপস্থিত হইলেন। ঈশ্বরের কৃপায় বালকের জীবন রক্ষা পাইয়াছে। এই প্রকার ঘটনায় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অভাবে প্রায়শঃ দেখা যায় লোকে কোন প্রতিকারই করিতে পারে না। আমরা এই মহিলার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাধু কার্য্যের জন্য অতি সাহস দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। ঈশ্বর তাঁহাকে এই সদনুষ্ঠানের পুরস্কার প্রদান করুন।

শ্রাদ্ধ—পরলোকগত বাবু আশুতোষ বসু মহাশয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ গ্রে ষ্ট্রীটের নিজ ভবনে সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

পরলোকগত জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ শ্রীখণ্ডে তাঁহার বাড়ীতে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল তথায় গমন করিয়া আচার্য্যের কার্য্য করেন। জগদীশ্বর বাবুর বিধবা পত্নী শ্রাদ্ধের দিন অনাথদিগকে সাহায্য দান করিয়াছেন এবং সাধনাশ্রমে ২৲ টাকা দিয়াছেন।

মৃত্যু সংবাদ—আমরা অতীব দুঃখের সহিত কয়েকটী মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করিতেছি। আমাদের কটকস্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্ত্তীর পত্নী কিশোরীবালা চক্রবর্ত্তী একটি সন্তান রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। এই শোকে তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই ব্যথিত। পরমেশ্বর তাঁহাদের প্রাণে শান্তি প্রদান করুন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি পরলোকগত শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী অম্বিকা দেব মহাশয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে কলিকাতা দুই স্থানে ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ শঙ্কর ঘোষের লেনস্থ ভবনে তাঁহার কন্যা শ্রীমতী ক্ষেমদাসুন্দরী মিত্র শ্রাদ্ধ করেন। ইনি বিখ্যাত উকীল বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের পত্নী। তিনি এতদুপলক্ষে সাধনাশ্রমে ৫৲ টাকা এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৪৲ টাকা ও অন্য স্থানে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন। তৎপর অপর কন্যা শ্রীমতী রমাসুন্দরী ঘোষ সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থ ভবনে শ্রাদ্ধ করেন। ইনি শ্রীযুক্ত বাবু ছকড়ি ঘোষ মহাশয়ের পত্নী। এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে তিনি কলিকাতা কুষ্ঠাশ্রম, অনাথাশ্রম ও দাসাশ্রমের লোকদিগকে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করাইয়াছেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন। উভয় শ্রাদ্ধেই শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

গত ২৫শে জুলাই ২১০।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ ভবনে বাবু ভুবনমোহন ঘোষ মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বহুদিন ধরিয়া ব্যাধি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি মৃত্যুর জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে যখন রোগ যন্ত্রণা ভয়ানক বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যখন ভৃত্য ও আত্মীয়গণের যথোচিত সেবা ও ঔষধ সেবনেও যন্ত্রণার হ্রাস হইত না, তখন ব্রহ্মসঙ্গীত করিতে বলিতেন। সঙ্গীত আরম্ভ হইলে তিনি শান্ত হইতেন। তিনি যখনই যন্ত্রণায় ছটফট করিয়াছেন, আত্মীয়গণ তখনই সঙ্গীত করিয়া সান্ত্বনা করিয়াছেন। মৃত্যু এক দিন সকলেরই হইবে, কিন্তু যিনি ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে, তাঁহার সহিত যোগ যুক্ত হইয়া তনুত্যাগ করিতে পারেন তিনিই ধন্য। পরমেশ্বর তাঁহার অনাথাপত্নীর প্রাণে শান্তি প্রদান করুন।

কোনও ব্রাহ্ম কবি একটি আশা-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহা মুদ্রিত করিলাম।

আশা সঙ্গীত।

("তোমার কথা হেথা কেহ ত বলেনা" সুর)

ওরূপ নয়নে, হেরেছে যে সখা,
জগত আড়ালে গোপনে,
পথহারা হয়ে, ভ্রমে না সে কভু,
নিবিড় সংসার-কাননে।
লভে সে তোমায় যবে যায় চলে,
থাকিলে এ দেশে থাকে তব কোলে,
আঁখি দিঠি তার স্থির অনিবার
ও আনন্দ প্রেম-ভবনে।
তুমি আছ তার নাহি আর কেহ,
চির আপনার বিরামের গেহ,
জনকের প্রীতি, জননীর স্নেহ
পায় সে তোমার সদনে।
আয়ু রবি যবে অস্তাচলে যায়,
মৃত্যুর আঁধারে গ্রাসে সমুদায়,
সে আঁধার পারে দেখে চারিধারে
জ্যোতির্ম্ময় তব আননে;
প্রেমানন্দ রসে ফুটে ধর্ম্ম-মণি,—
অমর অমরী করে জয় ধ্বনি,
স্বরগ জ্যোতিতে মধুর সঙ্গীতে
লভে সে জীবন মরণে।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১৫ই শ্রাবণ প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

৯ম সংখ্যা।
১৭শ ভাগ।

১লা ভাদ্র বৃহস্পতিবার, ১৮১৬ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা

হে প্রভো! তুমি আমাদিগকে যে আধ্যাত্মিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছ, তাহার উচ্চতা আমরা কিরূপে রক্ষা করিব? বাহিরের ধূপ দীপ নৈবিদ্যাদিতে তুমি সন্তুষ্ট নও, নতুবা আমরা তাহা দিতাম। তুমি যে প্রকারে পূজা চাও, তাহা তোমাকে অর্পণ করা আমাদের দুর্ব্বল প্রকৃতির পক্ষে অতীব দুঃসাধ্য। তোমার সত্য ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতার এবং আপনাদের প্রকৃতির দুর্ব্বলতার বিষয়ে যখন চিন্তা করি, তখন আমরা অবসন্ন হইয়া পড়ি। আর কতদিন আমরা অন্তরের দুর্ব্বলতার দ্বারা পরাভূত হইব, আর কতদিন প্রবৃত্তিকুলের সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইব? হে অন্তর্যামি, তুমি আমাদের সকল যাতনা দেখিতেছ, আমাদের আকাঙ্ক্ষা কিরূপ এবং আমাদের জীবন কিরূপ তাহাও জানিতেছ। আমরা নিজ বলের উপর নির্ভর করিয়া সংগ্রাম ক্ষেত্রে অগ্রসর হই বলিয়া বার বার পরাস্ত হইয়া যাই। তুমি আমাদিগকে বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল কর, যেন আমরা সর্ব্বদা সর্ব্বান্তঃকরণে তোমারই শক্তি এবং তোমারই করুণার উপরে নির্ভর করিতে পারি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

রাজসিক ধর্ম্মভাব—রজোগুণের প্রধান লক্ষণ অহঙ্কার—আত্মশক্তিতে বিশ্বাস। যে ভাবের মধ্যে এই আত্ম প্রভাব-বোধ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান, তাহা রাজসিক ভাব। কখন কখনও মানুষের ধর্ম্মভাব এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যেও এই আত্ম-প্রভাব-বোধ লুক্কায়িত ভাবে কার্য্য করে, তখন সেই ধর্ম্মভাবকেও রাজসিক-ভাব-সম্ভূত মনে করা যায়। যেখানেই রাজসিক ভাব প্রবল সেই খানেই সাধক দলের মধ্যে সামান্য সামান্য কারণে বিবাদ; কারণ সকল ব্যক্তিই আপনার ব্যক্তিত্বকে প্রবল রাখিতে চায়, প্রত্যেকেই নিজে একটা কিছু করিতে চায়, নিজের অভিরুচি অনুসারে চলিতে চায়, এবং নিজেরাই গৌরব অন্বেষণ করে। বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ধর্ম্মভাবের লক্ষণ এ প্রকার নহে। সে ভাবের দ্বারা চালিত হইলে লোকে নিজের গৌরব অন্বেষণ না করিয়া ঈশ্বরেরই গৌরব অন্বেষণ করিয়া থাকে; সুতরাং সেস্থলে সাধকগণের মধ্যে মিলনের স্থান অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। এই ভাবেই বোধ হয় সেণ্টপল করিন্থবাসিদিগকে তিরস্কার করিয়া লিখিয়াছিলেন—"তোমরা carnal অর্থাৎ পার্থিব ভাব দ্বারা চালিত। তাহার প্রমাণ এই, তোমাদের মধ্যে এত বিবাদ।" তিনি যাহাকে carnal বা পার্থিব ভাব বলিয়াছেন, তাহাই আমাদের দেশীয় রাজসিক ভাব বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই আদর্শের দ্বারা বিচার করিলে ব্রাহ্মদিগের কার্য্যকলাপ অনেক পরিমাণে রাজসিক ভাব-সম্ভূত বলিয়া প্রতীত হইবে। সত্যানুরাগ ও ঈশ্বর প্রীতির দ্বারা চালিত হইয়া আমরা সকল কার্য্য করি না। আমাদের অনেক কার্য্যের অন্তরে আত্ম প্রভাব-বুদ্ধি সন্নিহিত থাকিয়া গুপ্তভাবে কার্য্য করে। সুতরাং সে সকল কার্য্যের ফল প্রেমকে বর্দ্ধিত না করিয়া অপ্রেমকেই উৎপন্ন করে। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন তাঁহারা যদি মধ্যে মধ্যে আত্ম-পরীক্ষার দ্বারা স্বীয় স্বীয় কার্য্যের প্রকৃতি ও ভাব বিষয়ে পর্য্যালোচনা করেন, তাহা হইলে অনেক উপকার হইতে পারে।

ব্রাহ্মপরিবারে জ্ঞানালোচনা—ব্রাহ্ম পরিবার এই শব্দটী উচ্চারণ করিলে কিরূপ ছবি চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হয়? আমরা প্রাচীন সমাজে পারিবারিক জীবনের যে আদর্শ দেখিয়াছি, ও যাহার মধ্যে আমরা বর্দ্ধিত হইয়াছি, ব্রাহ্ম পরিবারের আদর্শ তাহা হইতে বিভিন্ন কিনা? একথা বলার তাৎপর্য্য এরূপ নহে, যে প্রাচীন সমাজের যে পারিবারিক জীবনের আদর্শ তাহার মধ্যে সুন্দর এবং স্পৃহনীয় বিষয় অধিক নাই। কিন্তু আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই, ব্রাহ্ম পরিবারের আদর্শ প্রাচীন সমাজের পারিবারিক আদর্শের অনুরূপ নহে। বাল্যবিবাহ নিবারণ, নারীগণের শিক্ষা ও নারীর স্বাধীনতা এই যে ত্রিবিধ সংস্কার কার্য্যে ব্রাহ্মগণ হস্তার্পণ করিয়াছেন, এই ত্রিবিধ সংস্কারের গতিই ভাবী ব্রাহ্মসমাজের পারিবারিক জীবনের আদর্শকে নূতন করিয়া গঠন করিবার দিকে। পুত্র কন্যাদিগকে প্রাপ্ত বয়স্ক করিয়া বিবাহ দিবার ফল এই হইবে, যে কালে প্রাচীন একান্নভুক্ত প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে।

প্রাচীন সমাজে যেমন বালকগণ পিতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপরে নির্ভর করিয়া বিবাহ করে, নবাগত বধূগণ শ্বশ্রূর শাসনাধীন হইয়া বাস করে, ভাবী ব্রাহ্মসমাজে এরূপ নিয়ম আর থাকিবে না। পিতার আয়ের উপরে নির্ভর করিয়া পুত্রগণ বিবাহ করিবে না, এবং বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রবধূগণও শ্বশ্রূর সম্পূর্ণ শাসনাধীন থাকিবে না। যদিও এখন কোন কোনও ব্রাহ্মপরিবারে প্রাচীন রীতি কিয়ৎ পরিমাণে দেখা যাইতেছে, অর্থাৎ পুত্রগণ বিবাহ করিয়া পিতামাতারই অধীনে বাস করিতেছে, এবং ব্রাহ্ম পুত্রবধূগণ শ্বশ্রূর শাসনাধীন থাকিতেছেন, কিন্তু ইহা এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী বলিলেও হয়, যে কালে এক এক বিবাহিত ব্রাহ্ম দম্পতী এক একটী পরিবার হইবে। এটী প্রাচীন সমাজের প্রথা হইতে বিভিন্ন। আর একটী গুরুতর বিষয়ে প্রভেদ থাকিবে। প্রাচীন সমাজের একান্নভুক্ত পরিবার মধ্যে পতি ও পত্নীর অথবা পরিবারস্থ পুরুষ ও মহিলাগণের মধ্যে সাহচর্য্য নাই। দিবসের অধিকাংশ কাল পুরুষগণ বাহির মহলে পুরুষদিগের মধ্যেই বাস করেন, নারীগণ অন্তঃপুরে নারীকুলের মধ্যে অবস্থিতি করেন। এমন কি পতি পত্নীতে রজনীর কয়েক ঘণ্টা ব্যতীত অন্য সময়ে সাক্ষাৎকার সম্মিলন অথবা ভাব ও চিন্তার বিনিময় হইবার উপায় নাই। এই যে পরিবারস্থ পুরুষ ও মহিলাদিগের সাহায্যের অভাব ইহার অনেক বিষময় ফল প্রাচীন সমাজে প্রতিদিন ঘটিতেছে। নারীগণের শিক্ষা ও সামাজিক স্বাধীনতার রীতি প্রচলিত করিয়া ব্রাহ্মগণ পরিবারস্থ পুরুষ ও মহিলাগণের পরস্পর সহায্যের সূত্রপাত করিয়াছেন। কালে এই সাহায্য অধিক পরিমাণে স্থাপিত হইলে ব্রাহ্ম পরিবার সকল প্রাচীন সমাজের পরিবার সকল হইতে বিভিন্ন আদর্শে গঠিত হইবে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে নারীগণের শিক্ষা ও স্বাধীনতার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার ফল এখনও আশানুরূপ দেখা যাইতেছে না। অনেক ব্রাহ্মপরিবার চালচলনে প্রাচীন পরিবার হইতে কিছুই বিভিন্ন নহে। সেখানেও পরিবারস্থ পুরুষগণ বাহিরে থাকেন, নারীগণ নারীকুলের মধ্যে বাস করেন। চারিদিকের জ্ঞানালোচনা ও জগতের বিবিধ প্রকার উন্নতির সঙ্গে সে সকল ব্রাহ্ম পরিবারের কোনও সম্পর্ক নাই। সে সকল ব্রাহ্ম গৃহস্থের গৃহে এমন একটী ঘর নাই যেখানে সায়ংকালে পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী সকলে নিরুদ্বেগ চিত্তে দুই দণ্ড বসিয়া নানা বিষয়ে আলাপ করিতে পারে, দুই খানা খবরের কাগজ বা মাসিক পত্রিকা পড়িতে পারে বা জগতের উন্নতির কোনও সমাচার লইতে পারে। ব্রাহ্ম পরিবার মধ্যে জ্ঞানালোচনার নিয়ম নাই, সুতরাং ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগের জ্ঞানে রুচি জন্মিবে কিরূপে? পুত্র কন্যাগণ জ্ঞান-স্পৃহা লইয়া বর্দ্ধিত হইবে কিরূপে? ব্রাহ্মদিগের যে জ্ঞানে রুচি জন্মিতেছে না, জগতের উন্নতির সহিত সংস্রব থাকিতেছে না, ইহার ফল ভবিষ্যতে কি শোচনীয় হইবে, তাহা চিন্তা করিলে বিষন্ন হইতে হয়। ব্রাহ্মসমাজ জগতের উন্নতি ও উন্নত জ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অজ্ঞতা ও অশ্রদ্ধার নিম্নে পড়িয়া যাইবে, এবং বিবিধ প্রকার দুর্নীতির আলয় হইবে। এই কারণে বোধ হয় নিত্য ব্রহ্মোপাসনার ন্যায় জ্ঞানালোচনা ব্রাহ্ম পরিবারের একটী দৈনিক নিয়মের মত হওয়া আবশ্যক। এই সকল বিষয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেই, ইংরাজ পরিবারের বৈঠক ঘরের (drawing room) কথা স্মরণ হয়। নিষ্ঠাবান হিন্দু গৃহস্থের গৃহে যেমন একটী ঠাকুর ঘর রাখিতেই হয়, সেইরূপ মধ্যবিত্ত ইংরাজ গৃহস্থের গৃহে একটী ড্রয়িং রুম অর্থাৎ সাধারণের বসিবার ঘর রাখিতেই হয়। ঐ ঘরটীতে কেহ রাত্রে শয়ন করে না বা সেখানে আহারাদি করে না, সেটী কেবল সকলের বসিয়া আলাপাদি ও আগন্তুকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য থাকে। সচরাচর বৈকালে আহারান্তে পরিবারস্থ পুরুষ ও মহিলাগণ সকলে ঐ ঘরে গিয়া আসীন হন; তখন দিনের সংবাদ, জগতের উন্নতির বিশেষ বিশেষ সমাচার, বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত তত্ত্বাদির বিবরণ ও প্রতিবেশিদিগের সুখ দুঃখের কথাদি বলিতে থাকে। এরূপ একটী গৃহ না থাকিলে প্রত্যেককে নিজ নিজ শয়ন গৃহেই থাকিতে হয়, তাহাতে পারিবারিক সম্মিলন হইয়া উঠে না। আমাদের বোধ হয় প্রত্যেক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্ম পরিবারে একটী সাধারণের বসিবার ঘর রাখার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা ভাল, তদ্ভিন্ন পারিবারিক সম্মিলনের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে না এবং পারিবারিক সম্মিলনের প্রথা প্রবর্ত্তিত না হইলে পরিবার মধ্যে জ্ঞানালোচনাও প্রবর্ত্তিত হইবে না।

রামমোহন রায় সমিতি ও রামমোহন রায় পুস্তকালয়—কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধুর উৎসাহ ও যত্নে কিছুদিন হইতে রামমোহন রায় সমিতি নামে একটি আলোচনা সভা স্থাপিত হইয়াছে। সপ্তাহে সপ্তাহে সকলে সমবেত হইয়া রামমোহন রায়ের চরিত্র ও কীর্ত্তি বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়া থাকেন। এক এক জনের প্রতি এক একটী বিষয়ের অবতারণা করিবার ভার অর্পিত হয়, তিনি তদ্বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন, তৎপরে সেই সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। এতৎব্যতীত অল্প দিন হইল কয়েকজন বন্ধুর উদ্যোগে রামমোহন রায় পুস্তকালয় নামে একটী পুস্তকালয় স্থাপিত হইবার আয়োজন হইতেছে। আমাদের পরলোক গত বন্ধু কারস্টেয়ার্স হেমারগ্রেণ যে পুস্তকালয়ের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই পরিণাম মাত্র। এই দুইটী অনুষ্ঠানকে ব্রাহ্মসমাজের একটি সুমহৎ কল্যাণের উপায় স্বরূপ করা যাইতে পারে। আমাদের প্রস্তাব এই, কতিপয় কৃতবিদ্য অবিবাহিত ব্রাহ্মযুবক একত্র হইয়া একটী বাড়ী ভাড়া করুন এবং সেই স্থানে তাঁহারা বাস করুন। পুস্তকালয়ে পাঠাগার ও আলোচনা গৃহ হইবার উপযুক্ত কয়েকটী ঘর থাকিবে। সে বাড়ীটী বিশেষতঃ সে ঘরগুলি যেন এরূপ হয়, যাহাতে গিয়া দুদণ্ড বসিলে প্রাণ সন্তুষ্ট হয়। অর্থাৎ যেন বায়ু পরিবেষ্টিত, সুপরিষ্কৃত, শৃঙ্খলানুসারে সজ্জিত ও উপযুক্ত আলোকছায়া মণ্ডিত হয়। সেই পাঠাগারে ঐ ভবনস্থ ব্রাহ্মগণ ও তদ্ভিন্ন বাহিরের ব্রাহ্ম যুবকগণ সন্ধ্যাকালে একত্র হইবার নিয়ম থাকিবে। বিবাহিত ব্রাহ্মগণ অধিকাংশ সময় স্বীয় স্বীয়

স্থানেই থাকিবেন, কিন্তু তাঁহারাও ঐ পাঠাগারের সাহায্যার্থ অর্থ দান করিবেন এবং সপ্তাহের মধ্যে দুই এক দিন তথায় যাইবেন। এই পাঠাগার হইতে, ভাল ভাল মাসিক ও দৈনিক পত্রিকা লইবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইবে, তদ্ভিন্ন উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নবপ্রকাশিত গ্রন্থ ক্রয় করিবার জন্য একটী ফণ্ড থাকিবে। এরূপ হইলে আমাদের আশা হয় যে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জ্ঞানালোচনা আবার প্রবল হইবে এবং ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান মলিন অবস্থা অনেক পরিমাণে দূর হইবে।

সাময়িক উৎসাহ—অনেক ব্রাহ্মের জীবনেই একটি কুলক্ষণ দেখা যায়, তাঁহারা চির জীবন কোনও লক্ষ্য সাধনে নিরত থাকিতে পারেন না। তাঁহারা চির জীবন মন প্রাণ দিয়া সাধন করিবেন বলিয়া যাহা অবলম্বন করেন, দুদিন যাইতে না যাইতেই তাহা পরিত্যাগ করেন এবং উৎসাহ ও উদ্যম হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তাঁহাদের উৎসাহ তৃণের অগ্নির ন্যায়; সহসা প্রজ্জ্বলিত হয়; কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই নিবিয়া যায়। কত ব্রাহ্ম কত সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কার্য্যারম্ভ করিবার সময় কত উৎসাহ, আনন্দ, প্রফুল্লতা। তাহাদের উদ্যম দেখিয়া শুনিয়া সকলেরই আশা হইল। কিন্তু কয়েক দিন পর জানা গেল যে, যিনি মহোৎসাহে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, সান্নিপাতিক রোগীর ন্যায় তাঁহার চিত্ত অবসন্ন হইয়াছে, তিনি আরব্ধ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মদিগের দ্বারা কত সভাসমিতি স্থাপিত হয়, কত উপাসনা, আলোচনার আয়োজন হয়, কিন্তু দেখিতে দেখিতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মদিগের কার্য্যের প্রতি অনেকেই আস্থাবিহীন হইতেছেন। এরূপ জীবন দ্বারা কখনও কোন প্রকার উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। এস্থলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন অনুকরণীয়। তিনি যাহা ধরিয়াছেন, তাহা অদ্য পর্য্যন্ত প্রাণপনে সাধন করিতেছেন। তাঁহার সকল কার্য্যের সহিত আমরা মিলিতে পারি না বটে; কিন্তু একথা ব্রাহ্মমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, যে যৌবনের প্রারম্ভে যে ধর্ম্মোৎসাহ, কার্য্যোৎসাহ তাঁহার প্রাণে প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, সেই সময়ে যে সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, বার্দ্ধক্যে রোগ শয্যাতেও সেই উৎসাহ বহ্নি সমভাবে তাঁহার অন্তরে প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে ও সেই সাধন-প্রণালী অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। জরাজীর্ণ হইয়াও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাহার অনুরাগঅণুমাত্রও হ্রাস হয় নাই। তিনি যে, কার্য্য জীবনের ব্রত-স্বরূপ সাধন আরম্ভ করিয়াছিলেন, সুতরাং আজীবন তাহা পালন করিয়া আসিতেছেন। মহর্ষির ন্যায় প্রত্যেক ব্রাহ্মকেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইতে হইবে। লক্ষ্যের স্থিরতা ও সাধনের দৃঢ়তা এই উভয় সাধন ব্যতীত স্থায়ী ও সুদৃঢ় ধর্ম্ম-জীবন গঠিত হয় না। আমরা অনেকে যে প্রকার ক্ষণিক উৎসাহে কার্য্য করি, তাহা দেখিলে আমাদের প্রকৃতিকে বালকের প্রকৃতির ন্যায় অসার ও লঘু বলিয়া বোধ হয়।

সাধনে বিশ্বাস—কোনও কোনও ব্রাহ্ম বলিয়া থাকেন "এতদিন সাধন ভজন করিতেছি; কিন্তু সাক্ষ্য দিতে পারি এমনত কিছুই পাইলাম না। আরাধনা, ধ্যান সকলই কল্পনার ন্যায় বোধ হইতেছে। রিপুগুলিকে দমন করিতে পারিতেছি না, প্রলোভন দূর হইতেছে না। দশ বৎসর পূর্ব্বে যেখানে যে অবস্থায় ছিলাম, এখনও সেই অবস্থাতেই আছি।" সাধনে অবিশ্বাসই ইহার মূল কারণ।

জাপানে ও চীনে সম্প্রতি যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। চীন অতি বিস্তৃত রাজ্য, তাহার সৈন্য বল অপরিমেয়। বীরপ্রসবিনী ফ্রান্স একবার চীনের কাছে পরাভব স্বীকার করিয়াছে। জাপান অতি ক্ষুদ্র রাজ্য, সৈন্য সংখ্যা অতি কম। ধন বল, জন বলে চীনের নিকট নগণ্য। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, জাপান সাধনায় বিশ্বাসী। জাপান পাশ্চাত্য প্রণালীতে সমর শিক্ষা করিয়াছে। তাহার বিশ্বাস যে, এই সাধন বলে সে চীনের লক্ষ লক্ষ সেনাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে। এই বিশ্বাস থাকাতেই যুদ্ধের আয়োজন। সাধনায় বিশ্বাস থাকিলে আধ্যাত্মিক রাজ্যেও সাধক এ প্রকার রিপু ও প্রলোভনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কোনও বিষয়ে তাহার নিরাশা নাই। পূর্ণ প্রাণে নবোৎসাহের সহিত যিনি সমুদয় কার্য্যে প্রবেশ করিতে পারেন, তাঁহার ভয় কি? তিনি ব্রহ্ম মন্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন। সাধনায় বিশ্বাসী ব্যক্তি যেখানে যাইবেন, সেখানেই জীবন্ত ভাবের পরিচয় প্রদান করিবেন। প্রচার ক্ষেত্রে, উপাসনার সময়, কার্য্য জগতে, সকল স্থলেই তাঁহার সাহস, অধ্যবসায় দৃঢ়তা, উৎসাহ দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইবে। সাধনায় বিশ্বাস ভিন্ন কেহই পাপের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। সাধনায় বিশ্বাসই সাধুতার লক্ষণ।

অলখ নিরঞ্জন—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন, "একদিন রামমোহন রায় বলিলেন যে, 'ভাল ভাল গায়ক সংগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে সংগীত দিলে ভাল হয়,' অমনি গুণী গায়ক সকল সেখানে একত্রিত হইল এবং নানা ভাবের সংগীত চলিল। রামমোহন রায় বলিলেন, 'অলখ নিরঞ্জন গাও' তখন সেই অবধি ব্রহ্মসঙ্গীত হইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যে এতটুকুও তখন কাহারও বুঝা হয় নাই। যে, ব্রাহ্মসমাজে সংগীত গাইতে বলিলে ঈশ্বরের সংগীত গাইতে হয়।"

"অলখ নিরঞ্জন" এই সঙ্গীতটী রাজা রামমোহন রায়ের জীবন সঙ্গীত ছিল। ইহার প্রত্যেক অক্ষরের সহিত তাঁহার আধ্যাত্মিক রক্তের যোগ ছিল। সঙ্গীতে "অলখ নিরঞ্জন" প্রচারে "অলখ নিরঞ্জন" উপাসনায় ও আলোচনায় সর্ব্বত্র সকল সময় সেই একমাত্র মহামন্ত্র "অলখ নিরঞ্জন।" যখন তিনি পিতামাতার স্নেহ-ক্রোড়ে পালিত হইতেছিলেন, সেই ষোড়শানূর্দ্ধ বয়সে ভাগবত ও ইসলাম গ্রন্থ পাঠের সময় হৃদয়ে যে ভাব-কুসুম অঙ্কুরিত হইয়াছিল, অলখ নিরঞ্জনে

তাঁহারই বিকাশ। তিনি চির জীবন সেই একই ভাব সাধন, একই ভাব আলোচনা ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। প্রাণের অতি প্রিয়তম স্থানে যে ভাব সংরক্ষিত করিয়া ষোড়শ বর্ষের বালক রাধানগরের সুরম্য বাস ভবন পরিত্যাগ করেন; তিব্বতের বৌদ্ধ মণ্ডলীতে, রঙ্গপুরের কার্য্যক্ষেত্রে, বারানসীর অধ্যয়নে, কলিকাতার আলোচনায় ও সাধনে যে ভাব দিন দিন প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাহাই হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রিষ্টল নগরে রোগ শয্যায় তিনি ইহলোক লীলা সম্বরণ করেন। শৈশবে, প্রৌঢ়ে, বার্দ্ধক্যে সেই একই কথা, একই সাধন, একই তত্ত্বান্বেষণ "অলখ নিরঞ্জন।"

চক্ষের উপর দেখিলাম, ব্রাহ্মসমাজে কত জন মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইলেন, বক্তৃতায়, আলোচনায় কত লোককে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট করিলেন, ব্রহ্ম দর্শন করিলেন, ব্রহ্ম দর্শনের কথা বলিলেন, কিছু কাল পর তাঁহারা আবার বিপরীত সুর ধরিলেন। এক সময় বজ্র-গম্ভীর নীনাদে যে সকল কথা দেশে প্রচার করিয়াছিলেন, কিছুকাল পরে নিজেই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এরূপ চঞ্চলতার কারণ কি? কারণ এই যে, এই শ্রেণীর ব্রাহ্মগণ দাঁড়াইবার কোনই স্থল প্রাপ্ত হন নাই। যিনি সত্য স্বরূপকে ধরিতে পারিয়াছেন, তিনিই আলোকে অন্ধকারে, বিপদে সম্পদে, দুঃখে সুখে একই মন্ত্র জপ করিতে পারেন, এক কথা বলিতে পারেন। যাঁহারা সেই ভূমা পরব্রহ্মের সহিত পরিচিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা কি করিয়া আজীবন এক মন্ত্র জপ করিবেন?

সত্য বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ না হইলে কেহই এক স্থানে স্থির ভাবে দাঁড়াইতে পারেন না। তাঁহাকে নিশ্চয়ই মধ্যে মধ্যে কুপথে যাইতে হইবে। সমাজে তিনি সাধুভক্ত বলিয়া পরিচিতই হউন, শিষ্য-সেবকের স্তুতি দ্বারা তাঁহার তৃপ্তিলাভ হউক, তাঁহার সাময়িক মত লোকে গ্রহণ করুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। সকল আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার চঞ্চলতার চিহ্ন প্রকাশিত হইবেই হইবে এবং হঠাৎ এমন সময় উপস্থিত হইবে যে, যখন তটঘাতিনী পদ্মার তীরস্থ ভূখণ্ডের ন্যায় সেই দল ভগ্ন হইয়া যাইবে। সত্য স্বরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে, বিনাশ নাই, অস্থিরতা চঞ্চলতা থাকে না।

নাবিকগণ কূলশূন্য জলধিতে ধ্রুব নক্ষত্র অবলম্বন করিয়া তরণী চালায়। প্রতিকূল বায়ুতে, তরঙ্গাঘাতে সময় সময় তরণী পথভ্রষ্ট হয় বটে; কিন্তু নাবিকের লক্ষ্য স্থির থাকায় অবশেষে গম্য স্থানে উপনীত হইয়া থাকে। তদ্রূপ সময় সময় নানাপ্রকার ঘটনা পরম্পরা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সাধক পদ-স্খলিত হইলেও, লক্ষ্য ঠিক থাকিলে কখনও প্রকৃত পথ হইতে দূরে সরিয়া পড়েন না। পদস্খলিত ও পথচ্যুত এক কথা নহে। বিশ্বাসী নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অবশেষে সেই দেবাধিদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া থাকেন। অবিশ্বাসী চঞ্চলচিত্ত মানব ঘুরিয়া ফিরিয়া অন্ধকারের মধ্যেই বাস করে। অবিশ্বাসী একদিন সাকার, আর একদিন নিরাকার, একদিন কালী দুর্গা আর একদিন ব্রহ্ম এইরূপ অস্থিরতাতেই বাস করে। বিশ্বাসী ব্রাহ্ম চিরদিনই এক কথা বলেন "অলখ নিরঞ্জন।"

মহাত্মা রামমোহন রায় এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের শেষ নিগূঢ় মীমাংসাই ব্রাহ্মধর্ম্ম, একমাত্র নিরাকার সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা পরমেশ্বরই মানবের উপাস্য। এই উপাসনাই তাঁহার আজীবনের সম্বল ছিল। তিনি যে মহামন্ত্র সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মগণ সেই মহামন্ত্র দৃঢ়ভাবে ধারণ করিতে পারিলেই মুক্তিলাভ করিবেন। চঞ্চলতা, অস্থিরতাতে ধর্ম্ম হয় না বরং কুপথে গিয়া জনসমাজের ও নিজের অমঙ্গল সাধন করা হয়।

সাধুর লক্ষণ—ভক্তচূড়ামণি শ্রীচৈতন্য যখন নীলাচলে বাস করিতেন, সেই সময়ে প্রতি বৎসর বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহার সঙ্গলাভ করিবার জন্য তথায় গমন করিতেন। একবার কুলীন-গ্রামবাসী সত্যরাজ খাঁ প্রভৃতি কয়েকজন শিষ্য গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে চৈতন্যদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'ভগবানের নামসংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবা অর্থাৎ সাধুসজ্জনের পরিচর্য্যা দ্বারাই গৃহস্থগণ পরিত্রাণ লাভ করিবেন।' সত্যরাজ খাঁ বৈষ্ণব চিনিবার উপায় কি জিজ্ঞাসা করিলেন। চৈতন্য বলিলেন, 'যাঁহার মুখে একবার মাত্র হরিনাম শুনিবে তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে।'

এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া শিষ্যগণ নীলগিরি হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। নানারূপ পরীক্ষা ও চিন্তাদ্বারা তাঁহারা দেখিলেন যে, এই লক্ষণদ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে সাধু চিনিতে পারিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। কেন না সাধু অসাধু পাপী বা পুণ্যবান্ কখন একবারও ভগবানের নাম করেন না, এরূপ লোক অতি বিরল। তবে কি সকলেই সাধু? তাঁহারা এই রূপে সন্দিগ্ধ হইয়া পরবৎসর চৈতন্য সমীপে উপনীত হইলেন এবং সন্দেহ নিরাকরনের জন্য পুনর্ব্বার বৈষ্ণব-লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গৌরাঙ্গ বলিলেন, 'যিনি নিরন্তর ভগবানের নামরসাস্বাদন করেন, তিনিই ভক্তশ্রেষ্ঠ, এরূপ ভক্তের সেবা করিলে ভগবানকে লাভ করা যায়।' কিন্তু এবারেও শিষ্যদিগের সন্দেহ কিছুমাত্র নিরাকৃত হইল না। তাঁহারা দেখিলেন, এরূপ বৈষ্ণব অনেক রহিয়াছেন, যাঁহারা সর্ব্বদা হরিনাম জপ করিতেছেন, কৌপীন-পরিধান বা কণ্ঠী ধারণ প্রভৃতি বাহ্য আড়ম্বরের কোন ত্রুটী নাই; কিন্তু ইহাঁরা অভ্রান্ত চিত্তের বিশুদ্ধতা লাভ করিতে পারেন নাই। ইহাঁদের মধ্যে কেহ বা ঘোর বিষয়াসক্ত, এবং কেহ কেহ নানারূপ দুষ্কর্ম্মান্বিত। সুতরাং কেবল হরিনাম জপ করাই সাধুতার একমাত্র লক্ষণ হইলে এই সকল ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত নরাধমগণকেও সাধু বলিয়া অবধারণ করিতে হয়। শিষ্যগণ সংশয়াপন্ন হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পর বৎসর পুনর্ব্বার তাঁহারা নীলাচলে সমুপস্থিত হইয়া চৈতন্যদেবকে আপনাদের মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীচৈতন্য এবারে বলিলেন,—

"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান"॥

বাস্তবিক ইহাই সাধুর অতি উৎকৃষ্ট লক্ষণ। সাধুর দর্শনে প্রাণে সাধুভাব উদ্দীপিত হয়, ভক্তসঙ্গে হৃদয় নির্ম্মল ও ভগবদ্ভাবে পূর্ণ হয়, তখন স্বভাবতঃ মানব ভগবানের সুমধুর নাম উচ্চারণ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে। বাহিরের বেশভূষা বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের আড়ম্বর সাধুতার লক্ষণ নয়। সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরে যিনি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ সাধু, এরূপ সাধুর সঙ্গলাভ করিলেই মানবের হৃদয়ক্ষেত্র প্রেমপুণ্য বিবিধ সদ্ভাবকুসুমে সমলঙ্কৃত হইয়া থাকে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ঈশ্বর-বিস্মৃতি।

প্রবৃত্তিকুলের উত্তেজনা, বিষয়ের প্রলোভন, রোগ শোকের আঘাত ও জগতের কার্য্যকলাপের কোলাহল, এই সকলের মধ্যে আমরা সর্ব্বদাই ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া যাই। তাহা না হইলে আমরা পতিত হইব কেন? জীবনের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইব কেন? যাঁহারা সতত ঈশ্বরের নাম করেন, যাঁহারা তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারাও ভুলিয়া যান, অপরে ত ভুলিবেনই। এই বিষয়টী চিন্তা করিলে আমরা ধর্ম্ম সাধনের প্রয়োজনীয়তা অতিশয় অনুভব করি। যে বিষয়টী বিস্মৃত হইবার অধিক সম্ভাবনা, সেই বিষয়ই মানুষকে স্মরণ করাইয়া দিতে হয়. যে সকল বিষয় বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনা নাই—আপনারই হৃদয় দ্বারে সর্ব্বদা আঘাত করিতেছে, চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহাদিগকে আর স্মরণ করাইতে হয় না। একজন হীনাবস্থ ভদ্রলোক উদরান্নের জন্য সমস্ত দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহাকে আর এ কথা বলিবার প্রয়োজন নাই—"দেখিও, তোমাকে পরিবার প্রতিপালন করিতে হইবে, অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে, তাহা যেন ভুলিও না" বরং এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হয়—"সাবধান উদরান্নের চিন্তাতে মানসিক উন্নতির চিন্তা একেবারে বিস্মৃত হইও না; প্রতিদিন কিছু কিছু জ্ঞানের উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিও।" এবিষয়ে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ না করিলে ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। সেইরূপ সাংসারিক নানা প্রকার কাজ কর্ম্ম, ভাবনা চিন্তার মধ্যে যদি ধর্ম্ম সাধনের অর্থাৎ ঈশ্বরের শ্রবণ মননের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় না রাখা যায়, তাহা হইলে কাজ কর্ম্মের ব্যস্ততার মধ্যে ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া যাইবার অধিক সম্ভাবনা। এই কারণেই বোধ হয়, যীশু বলিয়াছিলেন—"স্বর্গ রাজ্য সর্ব্বাগ্রে অন্বেষণ কর, অপরাপর বিষয় সকল তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে।" অর্থাৎ যে সকল বিষয় সতত হৃদয় দ্বারে আঘাত করিতেছে ও আপনাদের বন্দোবস্ত করিয়া লইতেছে, তাহার জন্য ভাবিও না, তাহা ত আসিবেই, তাহা পাইবেই। যে স্বর্গ রাজ্যের বিষয় বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনা, তাহা সর্ব্ব প্রযত্নে অন্বেষণ কর; সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম মুখে রাখিয়াও কারণ আমরা তাঁহাকে অনেক সময় বিস্মৃত হইতেছি।

কিরূপ অবস্থাতে ও কি কি কারণে মানুষ ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়, সে বিষয়ে চিন্তা করিলে কয়েক প্রকার অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ—ইহা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রদ্ধাহীন চিত্ত ধর্ম্মভাব ধারণের অনুপযোগী, তাহা সর্ব্বদাই ঈশ্বর-বিস্মৃতির মধ্যে বাস করে। জনসমাজে কতকগুলি লোকের প্রকৃতি এরূপ বিকৃত হইয়া যায়, যে তাহারা আর শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া কোনও গম্ভীর ও পবিত্র বিষয়ের আলোচনা করিতে পারে না। সকল বিষয়েরই অতি লঘুভাবে সমালোচনা করে এবং সকল ভাল কথাই বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দেয়। এই সকল ব্যক্তি মানব-জীবনের গাম্ভীর্য্য কিছুই অনুভব করে না; জীবনকে একটা ক্রীড়া ও কৌতুকের ব্যাপার বলিয়া মনে করে, ও ইহা হইতে যতটা আমোদ আদায় করা সম্ভব তাহা আদায় করিতে চায়। কিরূপে মানব-প্রকৃতির বিকার হইয়া এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হয়, তাহা একটা গুরুতর প্রশ্ন। নিরন্তর সত্যের অবমাননা করাতে, এবং সর্ব্বদা একটা প্রবঞ্চনার পরিচ্ছদ পরিধান করা অভ্যাস হওয়াতে এরূপ দুর্দ্দশা ঘটে। মনুষ্যত্বের লক্ষণ যদি কিছু বুঝিয়া থাকি তবে তাহা এই, চিন্তাতে সত্যানুরাগ, বাক্যে সত্য-তৎপরতা ও ব্যবহারে সত্য-নিষ্ঠা; এ ভূমি হইতে যে ভ্রষ্ট হইল, সে মনুষ্যত্ব হইতেও ভ্রষ্ট হইল। সেরূপ চিত্তের পক্ষে ঈশ্বর বিস্মৃতি কি স্বাভাবিক নহে? এই সকল অসার লোক আপনাদের হৃদয় অন্বেষণ করিয়া ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, অপরে ঈশ্বরের কথা বলিলে বিদ্রূপ করে।

আর এক শ্রেণীর লোকের পক্ষে ঈশ্বর-বিস্মৃতি স্বাভাবিক। ইহাদের জীবনের লক্ষ্য ক্ষুদ্র, আদর্শ অতি হীন; ইহারা সংসারের সামান্য বস্তুকেই পরম পদার্থ জ্ঞান করিয়া তাহার সেবা করিতেছে। ইহাদিগকে প্রকৃত "বিষয়ী" শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কারণ, বিষয় যাহার লক্ষ্য সেই বিষয়ী। বিষয় যাহার লক্ষ্য, ঈশ্বর তাহার চিন্তাতে নাই; সুতরাং ঈশ্বর-বিস্মৃতি তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এরূপ ব্যক্তি যে ধর্ম্মের সঙ্গে বা ধর্ম্ম সমাজের সঙ্গে একেবারে সংস্রব-শূন্য হয় তাহা নহে; লোকসমাজে সম্ভ্রম ও প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য ইহারা অনেক সময়ে ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠানও করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাও ইহাদের স্বার্থসাধনের উপায় মাত্র, বিষয় সেবার আবরণ মাত্র। ইহারাও ঈশ্বর-বিস্মৃতির মধ্যে বাস করে; কিন্তু সংসার-কোলাহলে ও বিষয়-চিন্তার তরঙ্গের মধ্যে তাহা অনুভব করিতে পারে না।

তৃতীয় একশ্রেণীর লোক শ্রদ্ধাবান এবং উন্নত আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করেন, কিন্তু সম্যক জ্ঞানের অভাবে ঈশ্বরকে জানিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের চিন্তা উন্মার্গ-গামিনী হইয়া অপর দিকে গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে এক প্রকার জ্ঞানাভিমান আছে, যাহা অজ্ঞতাকে প্রসব করিয়াছে। তাঁহারা মুখে বলেন মানব অজ্ঞ, কি জানিতে পারে? ক্ষুদ্র পরিমিত মন, অসীমকে কি প্রকারে ধারণা করিতে পারে;

কিন্তু মনের কথা এই, যে তাঁহারা জ্ঞান দ্বারা জানিয়াছেন যে, তাঁহাদের জ্ঞানের সীমাই চরম সীমা, এবং অপরে যে যা বলে সমুদায় অজ্ঞের কথা। এই জ্ঞানাভিমান এক প্রকার ভ্রান্তির কুজ্ঝটিকা উৎপন্ন করে, যাহাতে মানুষকে ঈশ্বর বিস্মৃতির মধ্যে ফেলিয়া দেয়।

চতুর্থ আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা ঈশ্বর বিস্মৃতির মধ্যে বাস করে, অর্থাৎ যাহারা পাশব প্রবৃত্তি সকলের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগেরই চরিতার্থতার মধ্যে জীবন ধারণ করিতেছে। মানবের অশাসিত প্রবৃত্তিকুল হইতে এক প্রকার দূষিত ভাবময় বাষ্প উত্থিত হয়, যাহা সর্ব্বদাই আত্মার দৃষ্টিকে আবরণ করে। এই দূষিত বাষ্প ঈশ্বর দর্শনের এমনি বিরোধী যে, সকল দেশের সাধুগণ একবাক্যে বলিয়াছেন, "পবিত্র হৃদয়ই ঈশ্বর-দর্শনের উপযোগী। যে প্রবৃত্তিকুলের হস্তে আপনাকে অর্পণ করিয়াছে সে জীবনের পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার পক্ষে ঈশ্বরকে বিস্মৃত হওয়াই স্বাভাবিক।

আমরা পূর্ব্বোক্ত কয়েক শ্রেণীর বিষয়ে যদি নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করি তাহা হইলে প্রাচীন ঋষিগণের নিম্নলিখিত উপদেশের তাৎপর্য্য অনুভব করিতে পারি :—

"সত্যেনলভ্যস্তপসা হোষ আত্মা
সম্যক্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্॥"

সত্যের দ্বারা শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হয়, তপস্যা বা আত্ম নিগ্রহের দ্বারা নিত্যানিত্য বিবেক ও চিত্তের একাগ্রতা জন্মে; সম্যক জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয়, এবং ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা চিত্তের স্থিরতা ও পবিত্রতা লাভ হয়। এই সকল গুণ সম্পন্ন আত্মা ঈশ্বর দর্শনে সমর্থ হয়। এবং তাঁহাকে আর ঈশ্বর-বিস্মৃতির মধ্যে বাস করিতে হয় না।

মহাজনদিগের শক্তির মূল কোথায়?

পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই দুইটী বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়; ঈশ্বর ব্যক্তি বিশেষকে, বিশেষ কার্য্য সিদ্ধির জন্য সময় সময় এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। সেই প্রেরিত মহাজনগণ আপন আপন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া এই পৃথিবী হইতে চলিয়া যান। অপর, ঈশ্বর পৃথিবীর লোক বিশেষকে মনোনীত করিয়া তাঁহাকে বিশেষ শক্তি প্রদান করেন এবং তাঁহার দ্বারা বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রেরিত ও মনোনীত সাধু সম্বন্ধে চিন্তা করিলে এবং যাঁহারা প্রেরিত ও মনোনীত বলিয়া পূজিত হইয়াছেন তাঁহাদের জীবনী পাঠ করিলে প্রচলিত অর্থ অপেক্ষা অতি গূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।

অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রেরিতবাদে ও মনোনীতবাদে মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসিতেছে। এই বিশ্বাস উৎপত্তির কারণ কি? কোন ভ্রম ও কুসংস্কার বুদ্ধি হইতে কি এই বিশ্বাসের উৎপত্তি হইয়াছে? এই প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য প্রেরিত ও মনোনীত মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে অদ্য আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

মহাত্মা মূষা ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া অভিহিত। তাঁহার সম্বন্ধে বাইবেলে বর্ণিত আছে, ঈশ্বর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎভাবে কথা কহিতেন ও আদেশ করিতেন। মূষা সেই আদেশ প্রতিপালন বিষয়ে বিন্দুমাত্রও ইতঃস্তত করিতেন না। অত্যন্ত গুরুতর ও অলৌকিক কার্য্যের আদেশ পাইলেও মূষা তথনই তাহা প্রতিপালনে অগ্রসর হইতেন। বাইবেলে ইহাও কথিত আছে, ঈশ্বর মূষাকে কোন কার্য্যের আদেশ করিয়া সেই আদেশ প্রতিপালনের শক্তিও তাঁহাকে প্রদান করিতেন। ঈশ্বর আদেশ করিলেন, "ইস্রায়লদিগকে মিসর হইতে লইয়া যাইতে হইবে," মূষা তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। ঈশ্বর মূষার সাহায্যের জন্য মহামারি ইত্যাদি উপস্থিত করিবার শক্তিও তাঁহাকে প্রদান করিলেন। মূষা ঈশ্বরের নামে প্রস্তর হইতে জল, আকাশ হইতে ফল সংগ্রহ করিয়া ঈশ্বরের কার্য্য সাধন করিলেন; ঈশ্বর স্বহস্তে মূষাকে আদেশ লিখিয়া দিলেন. মূষা সকলের নিকট তাহা প্রচার করিলেন। মূষা স্বীয় জীবনে কোন্ লোকাতীত মহাশক্তির কার্য্য দেখিতে পাইয়াছিলেন?

যীশুর জীবনেও ঐরূপ ঘটনা দেখিতে পাই। তিনি আপনার নিজের ইচ্ছা কাহাকে বলে জানিতেন না। যে আদেশ তিনি প্রাপ্ত হইতেন, তাহা জীবনে আচরণ, প্রতিপালন করাই তাঁহার ব্রত ছিল। পৃথিবীর নিন্দা স্তুতি, অপমান নির্য্যাতন, অত্যাচার ও মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া "পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" এই মহামন্ত্র সাধন ও পালন করিয়াছিলেন। তিনি দরিদ্রের সন্তান, ধন জন বলে হীন ছিলেন। কিন্তু প্রাণে যে কি একটু সত্যের আলো পাইয়াছিলেন, তাহা ধরিয়া সমাজ শক্তি ও রাজশক্তির সহিত অতুল বিক্রমে সংগ্রামে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, কিন্তু কি যে প্রাণে একটু আলো পাইয়াছিলেন, তাহা ছাড়িতে পারিলেন না। সেই আলোটুকু প্রাণে পাইয়াছিলেন বলিয়াই মানবের দুর্জ্জয় শক্তিকে পদদলিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং সত্যের রাজ্য জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি এজন্যই জগতে প্রেরিত ও ঈশ্বর পুত্র বলিয়া অভিহিত।

হেরাপর্ব্বতের গহ্বরে বসিয়া মহম্মদ যে কি ধ্বনি প্রাণে শুনিয়াছিলেন, সেই ধ্বনির অনুসরণ করিবার জন্য পৃথিবীর ধনজনসুখ সম্পদকে পদদলিত করিয়া সমগ্র আরবজাতির সঙ্গে ধর্ম্মসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আত্মীয় স্বজনের নির্য্যাতন সংসারিক ক্লেশ, এমন কি আপনার জীবন নাশের পর্য্যন্ত সম্ভাবনা উপস্থিত হইল; কিন্তু মহম্মদ কিছুতেই সেই ধ্বনির অনুসরণ হইতে বিরত হইলেন না। মহম্মদ মূর্খ সামান্য লোক হইয়াও জগতে অলৌকিক শক্তির পরিচয় দেখাইয়া গিয়াছেন। আজ লক্ষ লক্ষ মুসলমান ঈশ্বর প্রেরিত মহাজন বলিয়া তাঁহার সম্মান করিতেছে।

অপর দিকে যীশুর শিষ্যগণ কেন মনোনীত বলিয়া পূজিত? সামান্য মৎস্যজীবী হইয়াও তাঁহারা অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া। সাধারণ লোকে যাহা করিতে

সমর্থ নহে তাঁহারা তাহা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের হৃদয়ে যে বিশ্বাসাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, অন্য হৃদয়ে তাহা জ্বলে না।

নেপোলিয়ান হানিমান, কেবল অসাধারণ মানসিক প্রতিভা প্রাপ্ত হইয়াও, ধনজন বিদ্যা ও ক্ষমতার অধিপতি হইয়াও প্রেরিত আখ্যা প্রাপ্ত হন নাই বা মানবমনে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। অনন্ত রাজ্যের আলো ভিন্ন, ঐশীশক্তির প্রভাব ভিন্ন মানবের মনোরাজ্যে কেহ আসন গ্রহণ করিতে পারেন না।

জগতে যে অর্থে প্রেরিতবাদ ও মনোনীতবাদ প্রচলিত, সেই অর্থে ইহা গ্রহণ করিলে ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়। তিনি কোন কোন ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করিয়া সত্য ও আলোক বিতরণ করেন, আর অন্য লোককে সেই সত্য গ্রহণ ও সেই আলোক দর্শন হইতে বঞ্চিত রাখেন।

ঈশ্বরের সত্য, দেশ ও লোক বিশেষে আবদ্ধ থাকে ইহা স্বীকার করিলে ঈশ্বরের প্রেম ও সমদর্শিতার ব্যাঘাত ঘটে। তবে কি এই প্রেরিতবাদ ও মনোনীতবাদে কোনও সত্য নাই? অবশ্য ইহার গূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ আছে।

ঈশ্বরের দ্বার সকলের নিকট উন্মুক্ত রহিয়াছে। তিনি মানব সন্তানকে তাঁহার সত্য গ্রহণ ও প্রতিপালন করিবার অধিকার দিয়াছেন। মানুষের একটা সুমহৎ অধিকার এই যে, সে ইচ্ছা করিলে সত্যের পথ অবলম্বন করিয়া, ঈশ্বরের সিংহাসন প্রাণে স্থাপন করিতে পারে, তাহার হৃদয়কে স্বর্গ রাজ্যে পরিণত করিতে পারে। আর ইচ্ছা করিলে সে পাপের পথও অনুসরণ করিতে পারে। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে বলিয়াই পাপপুণ্য, সৎ ও অসৎ কার্য্যের জন্য মানবের দায়িত্ব আছে। এই স্বাধীন ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম, পাপ পুণ্য গ্রথিত।

মানুষ অপূর্ণ, অপূর্ণ জীবকে কর্ত্তব্য ও হিতবুদ্ধি প্রদান করিবার জন্য সেই পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ মানব প্রাণে নিরত বাস করিতেছেন। সেই সত্য জ্যোতি প্রতিনিয়ত মানুষকে সত্যপথে যাইতে উপদেশ করিতেছেন। পার্কার এই বাণী প্রাণে শুনিয়াই কচ্ছপকে আঘাত করিতে বিরত হইয়াছিলেন, লোকে ইহাকে হিতাহিত বুদ্ধি, বিবেক বলে। আমরা পার্কারের মাতার সঙ্গে একবাক্যে ইহাকে ঈশ্বরের বাণী বলি। অপূর্ণ আত্মাকে সত্য ও জ্ঞানের আলো প্রদান করিবার জন্য জ্ঞানময় পরমেশ্বর সর্ব্বদা চেষ্টাবান। মানুষ যেমন বহিরিন্দ্রীয় দ্বারা বাহ্যজগত দর্শন ও শ্রবণ করে, সেই প্রকার প্রাণের চক্ষু ও কর্ণদ্বারা ধর্ম্মরাজ্যের তত্ত্ব সকল দর্শন ও শ্রবণ করে। যে ব্যক্তি স্বীয় চর্ম্মচক্ষুকর্ণকে বাহিরের দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ে ডুবাইয়া রাখিয়া অন্তচক্ষুকর্ণের দৃষ্ট ও শ্রুতবিষয়কে অবিশ্বাস করে, সে আত্মার রস, ধর্ম্মের রস, অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। স্বর্গরাজ্য, অধ্যাত্মিক রাজ্য তাঁহার নিকট কল্পনা মাত্র। পরমপিতা প্রাণের মধ্যে যাহা বলেন, বাধ্য সন্তানের মধ্যে যে তাহা প্রাণপণে প্রতিপালন করে—যে অবনত মস্তকে তাঁহার আদেশ পালন করিবার জন্য চেষ্টা করে, পরমেশ্বর তাহাকে অসাধারণ শক্তি প্রদান করেন। জগতের লোক দেখিয়া অবাক হয়। পৃথিবীতে উন্নতি কেনা চায়? পৃথিবীতে সত্যের জ্যোতি, ঈশ্বরের আদেশ কেনা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে? কিন্তু ধর্ম্মজগতে এই গূঢ় নিয়ম প্রতিপালন না করিলে কেহ সেই অধিকার লাভ করিতে পারিবে না। সকল সত্যের সার সত্য এই—"যাহা প্রাণে সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিবে, তাহা জীবন দিয়া প্রতিপালন করিবে।" যদি প্রাণে সত্যের জ্যোতি পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত থাক, আর যাহা সত্য ও কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে পার তৎক্ষণাৎ তাহা কার্য্যে পরিণত কর, দেখিবে তোমার জীবন উন্নতির সোপান হইতে সোপানান্তরে আরোহণ করিবে। পৃথিবীর সাধু ভক্তগণ চিরদিন সাক্ষ্য দিয়াছেন, "ঈশ্বরের আদেশ শুনা যায়," ইহা কি মিথ্যা, কল্পনা? যে ঈশ্বর, প্রাণে কথা বলেন না, তাহা কল্পনার ঈশ্বর। ধর্ম্মসাধন করা, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য আমাদের ইচ্ছানুরূপ কাজ করিবার জন্য ঈশ্বরকে আদেশ করা নহে; কিন্তু আমাদের অপূর্ণ ইচ্ছাকে সেই পূর্ণ মঙ্গল ইচ্ছাময়ের অধীন করা, তাঁহার অনুসরণ করা। আধ্যাত্মিক রাজ্যের নিয়ম এই, সত্যকে বুঝিয়া যদি তাহাকে জীবনে প্রতিপালন না কর তোমার চিত্ত দুর্ব্বল হইবে, নূতন সত্য তোমার প্রাণে আসিবার পথ বন্ধ হইবে। একটী অসত্য তোমার জীবনে জয়যুক্ত হইলে আর একটী তথায় প্রবেশ করিবার পথ পাইবে। মানুষ ইচ্ছা করিলে দেবতা হইতে পারে; মানুষ ইচ্ছা করিয়া নরকের কীটও হইতে পারে। সত্যের সহায় ঈশ্বর। জীবনে একটী সামান্য ক্ষুদ্র সত্যকেও যদি অবমাননা কর, তবে ঐশী শক্তির সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইবে। অপরাধী সন্তান যে প্রকার পিতার অনুগ্রহ পাইতে বঞ্চিত হয়, তেমনি তাঁহার আদেশকে যে অগ্রাহ্য করে, তাঁহার আত্মায় তিনি রস প্রেরণ করেন না। যে, যে পরিমাণে সেই মঙ্গল ইচ্ছা প্রতিপালনে যত্ন করিয়াছে সে সেই পরিমাণে ঐশী শক্তির পরিচয় জগতে দেখাইয়া গিয়াছে। মহাত্মা যীশুর জীবনে সত্য জয়যুক্ত হইয়াছিল। তাই তিনি প্রেরিত বলিয়া অভিহিত। প্রত্যেক মানব বিধাতার কোন না কোন মঙ্গল অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য জগতে আসিয়া থাকেন। যিনি কর্ণ দ্বারা বিধাতার বাণী শুনিয়া সেই আদেশ প্রতিপালনে জীবন মন প্রদান করেন, তিনি এই পৃথিবীতেই ঈশ্বর সহবাস সুখ সম্ভোগ করেন এবং জীবনকে ধন্য করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। একটী পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হওয়ার উপর যেমন আর একটী পরীক্ষা ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া নির্ভর করে; সেই প্রকার, একটী সত্য প্রতিপালন করার উপর অপর সত্যলাভ করা নির্ভর করে। কেহ কেহ মনে করেন, "এই সত্যটী প্রতিপালন করা আমার পক্ষে কঠিন, এটী নাই বা প্রতিপালন করিলাম, অন্যান্য গুলি প্রতিপালন করি, তাহাতেই হইবে।" কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে এই ব্যবস্থা কখনও হইতে পারে না। এ রাজ্যে উন্নতিলাভ করিতে হইলে প্রাণে যাহা সত্য বলিয়া

বুঝিবে তাহার ষোলআনা প্রতিপালন করিতে হইবে। একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া যেমন কলসীর সমুদয় জল পড়িয়া যায়, সেই প্রকার একটী সামান্য সত্যকে অগ্রাহ্য করিলে, সমস্ত ধর্ম্ম-জীবন নিস্তেজ হইয়া যায়।

জীবন গতি প্রথমে মন্দীভূত, পরে নিম্নগামী হয়। ঈশ্বরের রাজ্য সত্য, তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য সত্যবস্তু। এ রাজ্যে ফাকি দিয়া অসত্য আশ্রয় করিয়া কেহ পার পাইতে পারিবে না। ঈশ্বর প্রাণে যাহা বুঝিতে দিবেন, বিবেকের আদেশ বলিয়া যাহা অনুভব করিবে, তাহা তন্মুহূর্ত্তে প্রতিপালন করিতে হইবে। দুর্ব্বল সবল হয় সত্যের বলে। পৃথিবীর দরিদ্র ও মূর্খ অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করে ঈশ্বর শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া। এই জন্যই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছেন। "সত্যে কর প্রীতি পাইবে পরিত্রাণ।" মানব, তুমি আপনাকে দুর্ব্বল ভাবিয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিতেছ না। ঈশ্বরের প্রেম হস্ত দেখিতে না পাইয়া নিরাশ মনে পৃথিবীতে ভ্রমন করিতেছ, মানবের নিন্দা প্রশংসা তোমার প্রাণকে প্রতিনিয়ত আন্দোলিত করিতেছে। একবার মহাত্মা যীশুর ন্যায়, মহম্মদের ন্যায়, মুষার ন্যায় [illegible]হা সত্য বলিয়া জীবনে বুঝিব তাহা জীবন দিয়া প্রতিপালন করিব," এই মহামন্ত্র সাধন করিতে আরম্ভ কর। দেখিবে ঈশ্বরের আলোক আসিয়া তোমার প্রাণকে আলোকিত করিবে। এমন উপদেষ্টা, পথ প্রদর্শকের আশ্রয় পাইবে, যাঁহার ভ্রম হয় না, এমন শক্তি প্রাণে অনুভব করিবে, যে শক্তিকে পৃথিবীর কোন শক্তি পরাজয় করিতে পারে না।

যিনি সত্যকে এই ভাবে জীবনে মরণে রক্ষা করেন তিনি যথার্থই ঈশ্বরের প্রেরিত। তাঁহার সঙ্গে যে ঈশ্বর কথা বলেন ইহাতে কি সন্দেহ আছে? জীবন্ত ঈশ্বর প্রত্যেকের প্রাণে কথা বলেন, প্রত্যেক মানব সন্তান ঈশ্বর প্রেরিত আখ্যা পাইতে পারে, যদি যীশুর ন্যায় "পিতার ইচ্ছা পালন" জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করে। মুখে "ধর্ম্ম ধর্ম্ম" বলিলে হইবে না, ক্ষুদ্র হউক বড় হউক যাহা জীবনে সত্য বলিয়া বুঝিবে তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে। ক্রমে স্বর্গ রাজ্যের দ্বার খুলিয়া যাইবে। ঈশ্বর-বিশ্বাস, ঈশ্বরাদেশ,—আজ যাহা কল্পনা, সাধুভক্ত মহাজনদিগের একচেটিয়া বস্তু বলিয়া মনে করিতেছ—তাহা তোমার প্রাণের সম্পত্তি হইবে। মুক্তকণ্ঠে জগতের নিকট সাক্ষ্য দিতে পারিবে "মানুষ কেবল রুটী খাইয়া বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ নিঃসৃত বাণীরূপ সুধাপান করিয়াই মানব জীবন রক্ষা করে। জীবনের যে কর্ত্তব্য পথ আজ অন্ধকার বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা আলোকিত হইয়া যাইবে। দুর্ব্বলতা, অবিশ্বাস চলিয়া যাইবে। "যাহা সত্য বলিয়া বুঝিব তাহা জীবন দিয়া পালন করিব" এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করার উপর জীবনের উন্নতি, মহত্ব নির্ভর করিতেছে।

এক গাছি তৃণও বিধাতা বিনা অভিপ্রায়ে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন না। দেবত্ব লাভের অধিকারী মানব, তোমাকে বিনা উদ্দেশে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন? তৃণের স্বাধীন ইচ্ছা নাই, সেই মহানইচ্ছা অনিবার্য্য রূপে তাহার উপর কার্য্য করিতেছে। বুদ্ধি ও জ্ঞান সম্পন্ন স্বাধীন মানব, তুমি বুঝিয়া—অনুভব করিয়া বিধাতার অভিপ্রায় পালন করিবে ইহাই তাঁহার বিধান। সেই জন্যই তোমাকে জ্ঞান ও হিতাহিত বুদ্ধি দিয়াছেন। গভীর আধ্যাত্মযোগে তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া প্রাণে তাঁহার কথা শুনিবার অধিকার পাইয়াছ।

সম্পত্তি চতুষ্টয়।

(বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ বিনয় সূত্র হইতে সংকলিত)

একবার বুদ্ধোপাসক কয়েকজন গৃহস্থের গৃহে বুদ্ধের সহচর ভিক্ষুদলের উপর্য্যুপরি কয়েকদিন নিমন্ত্রন হইয়াছিল। নিমন্ত্রন স্থলে ভোজের ব্যাপারটা মন্দ হয় নাই। এই ভোজের ব্যাপার দেখিয়া একজন ব্রাহ্মণ চিন্তা করিল, "এই শাক্য পুত্রীয় শ্রমণদিগের দলভুক্ত হওয়াত মন্দ নয়। ইহারা উত্তম আহার করে ও উত্তম স্থানে শয়ন করে; ইহারাত পরমানন্দেই দিন যাপন করে।" এই রূপ চিন্তা করিয়া ঐ ব্রাহ্মণ ভিক্ষুদিগের নিকটে আসিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। ভিক্ষুগণ যথা-নিয়মে তাহাকে দীক্ষিত করিয়া স্বদলে গ্রহণ করিলেন। সে ব্যক্তির দীক্ষিত হওয়ার কিছুদিন পরেই নিমন্ত্রনাদি বন্ধ হইয়া গেল। তখন ভিক্ষুগণ একদিন প্রাতে উঠিয়া ঐ নব দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকে বলিলেন "এস ভাই আমরা ভিক্ষাতে গমন করি।" ব্রাহ্মণ কহিল, "সে কি? আমি কি ভিক্ষা করিবার জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি? আমি ভিক্ষাতে যাইব না, আমি বসিয়া থাকিব, ভিক্ষা করিতে হয় তোমরা ভিক্ষা করিয়া আনিয়া খাওয়াইবে।" এই কথা শুনিয়া অপর ভিক্ষুগণ আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি পেটের জন্য, স্বচ্ছন্দ আহার করিবার লোভে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছ? ব্রাহ্মণ সরল ভাবেই বলিল "হাঁ, পেটের জন্যই করিয়াছি।" শিষ্যগণ এই কথা মহাত্মা বুদ্ধের নিকটে নিবেদন করিলে তিনি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "হে ভিক্ষু! ইহা কি সত্য যে, তুমি পেটের জন্য ধর্ম্মজীবন আশ্রয় করিয়াছ?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, "হাঁ, প্রভু ইহা সত্য।" তখন মহাত্মা বুদ্ধ ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "হে নির্ব্বোধ! তুমি কি প্রকারে স্বচ্ছন্দে আহার করিবার লোভে এই সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে? হে মন্দমতে! এরূপ হইলে কি আর লোকের হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইবে ও শিষ্য সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে?" এইরূপে ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিয়া বুদ্ধ আদেশ করিলেন "হে ভিক্ষুগণ, আমি এই নিয়ম করিতেছি, যে কেহ কোনও ব্যক্তিকে দীক্ষিত করিবেন, তিনি সেই সঙ্গে সম্পত্তি চতুষ্টয়ের কথাও তাহাকে বলিয়া দিবেন।

ধর্ম্মজীবনের প্রথম সম্পত্তি এই, যে এতৎ পথাবলম্বীদিগকে মুষ্টিভিক্ষার দ্বারা জীবন ধারণ করিতে হয়। এই রূপেই তুমি

সমগ্র জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করিবে। সঙ্গীয় সমুদায় লোককে বা কতিপয় ব্যক্তিকে যদি কেহ নিমন্ত্রণ করে বা ভোজ্য বস্তু পাঠাইয়া দেয় কিম্বা পৌর্ণমাসী বা অন্য কোনও উপাসনাদিব দিবসে কিছু ভোজ্য বস্তু উপহার দেয়, তাহা অধিকন্তুর মধ্যে।

ধর্ম্মজীবনেব দ্বিতীয় সম্পত্তি এই যে, ছাই গাদা হইতে ছিন্ন বস্ত্র কুড়াইয়া যোড়া দিয়া অঙ্গাচ্ছাদনের বস্ত্র করিবে; এইরূপ পরিচ্ছদে সন্তুষ্ট হইয়াই তুমি সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিবার চেষ্টা করিবে। যদি কেহ কার্পাসজাত বা ক্ষৌম সূত্র নির্ম্মিত বা লোমজ বস্ত্রাদি দেয় তাহা অধিকন্তুর মধ্যে।

ধর্ম্মজীবনের তৃতীয় সম্পত্তি এই, তোমাকে তরুতলে রাত্রি যাপন করিতে হইবে, এইরূপে সন্তুষ্ট চিত্তে তুমি সমগ্র জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করিবে। যদি দৈবাৎ বিহার বা প্রাসাদ, হর্ম্ম্য বা গুহাদি যোটে সে অধিকন্তুব মধ্যে।

ধর্ম্মজীবনের চতুর্থ সম্পত্তি এই, রোগ হইলে গোমূত্রই একমাত্র ঔষধ। ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া তোমাকে চিরজীবন অতিবাহিত কবিতে হইবে; ঘৃত, তৈল, প্রভৃতি যদি দৈবাৎ যোটে তাহা অধিকন্তুর মধ্যে।

বর্ত্তমান ছাত্র জীবন।

(প্রাপ্ত)

বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অনেক সময় নিরাশ হইতে হয়। ধর্ম্মচর্য্যা বা চরিত্রোন্নতি এখন আর শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয় না। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী এসম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন। কেবল মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনই এখন শিক্ষার চরম লক্ষ্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপ্রণালী এরূপ সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল না। দেহ মন হৃদয় ও আত্মা এই চারিটী শিক্ষার বিষয়। দেহের স্বাস্থ্য ও বল, মনের বিকাশ, হৃদয়ের প্রশস্ততা এবং আত্মার চরমস্ফূর্ত্তি ও সৌন্দর্য্য, প্রাচীনকালে ভারতীয় আচার্য্যগণ এই চারিটী বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেন। মানুষ এসংসারে কেবল ঘটনা স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। বিধাতা মানবের অন্তঃকরণে যে সকল সদ্বৃত্তি নিহিত করিয়াছেন, উপযুক্ত পরিমাণে তাহার উন্নতি বিধান করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। সুতরাং মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে দেহ মন হৃদয় ও আত্মার সমভাবে বিকাশ আবশ্যক, বিকাশই শিক্ষা। শিক্ষার আর এক সাধারণ অর্থ এই,—সৎ ও অসৎ উভয় জ্ঞাত হইয়া সৎ অবলম্বন করার নাম শিক্ষা। যেরূপ নিয়মে আত্মশক্তি নিয়োগ করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহারও নাম শিক্ষা।

মানবের প্রবৃত্তি সমূহ একান্ত রিপুর উত্তেজনায় বিলাস বিভ্রমে আসক্ত হওয়ায় মানুষ কত না যাতনা ভোগ করে। পতঙ্গ যেমন অগ্নিশিখার বাহ্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া পুড়িয়া মরে, প্রবৃত্তি পরায়ণ অবোধ মানবও সুখের আশায় ইন্দ্রিয় সেবায় নিযুক্ত হইয়া চরিত্রকে কলুষিত করিয়া থাকে। সংহিতকার মনু বলিয়াছেন,—

"সারথি যেমন অশ্ব সকলের সংযম করেন, তদ্রূপ মোহময় বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় গ্রামের সংযমে জ্ঞানী ব্যক্তি যত্ন করিবেন।' প্রাচীন আচার্য্যগণ জ্ঞানানুশীলনকে ধর্ম্ম জীবন লাভের উপায় স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। অর্থোপার্জ্জনের কৌশলকে তাঁহারা জ্ঞান বলিতেন না। জ্ঞান বলিতে তাঁহারা ধর্ম্ম ও চরিত্রশূন্য আজ কালকার "কালেজী শিক্ষা" বুঝিতেন না। হৃদয় মনের যে শক্তি লাভ করিলে মনেব উত্তেজিত প্রবৃত্তিকুলকে সংগ্রামে পরাস্ত করিতে সমর্থ হয়, উৎকট রিপুপরতন্ত্রতা পরিহার করিয়া মানব যে শক্তিতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে, প্রাচীনেরা তাহাকেই শিক্ষা বলিতেন। এই জন্য ইন্দ্রিয়সংযমকে তাঁহারা শিক্ষার প্রথম সোপান বলিয়াছেন।

আমরা দেহ, মন, হৃদয় ও আত্মা, এই চারি বিষয়ে শিক্ষার কথা বলিয়াছি। কষ্ট সহিষ্ণুতা অভ্যাস না করিলে অর্থাৎ দৈহিক শ্রম ব্যতীত দেহ কখন বলিষ্ঠ হয় না। ইন্দ্রিয় নিগ্রহও এই শিক্ষাতে বিশেষ আবশ্যক। ইন্দ্রিয়শিথিলতা ও বিলাসানুষ্ঠান অনেক পরিমাণে দৈহিক অবনতির কারণ। এই জন্য প্রাচীনকালে শিক্ষার্থিগণ দীর্ঘকাল গুরুকুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিতেন। তাবপর মানসিক শিক্ষা। বলিতে কি আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষা একমাত্র মানসিক শিক্ষা। ইহাতে অনেকাংশে বুদ্ধিবৃত্তির পরিমার্জ্জন হয় বটে, কিন্তু মানবের সর্ব্বপ্রধান সম্পত্তি যে হৃদয় ও আত্মা; বিকাশের অভাবে তাহা নিতান্ত মলিন ভাবাপন্ন হইয়া যায়। আত্মার বিষয় ধর্ম্ম ও নীতি, আধুনিক শিক্ষা প্রণালীতে তাহাব নাম গন্ধও নাই, এবং মানসিক শক্তির অনুশীলনে শিক্ষার্থিগণকে এতদূর ব্যস্ত থাকিতে হয় যে, হৃদয়ের উপযুক্ত বিকাশের অবকাশই থাকে না। ইহার ফলও হাতে হাতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অধিকাংশ শিক্ষিত যুবক ধর্ম্মের নামে উপহাস বিদ্রূপ করিয়া থাকেন; ধর্ম্ম, নীতি, চরিত্র, এসকল যেন সংসার জ্ঞানশূন্য নির্ব্বোধ ব্যক্তির অবলম্বনীয়, ইহাই অনেকের ধারণা। কেবল অর্থ সংগ্রহই যে শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে, মানব প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের নামই যে শিক্ষা, শিক্ষাব প্রভাবে যে ভ্রান্ত কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া মানব সত্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়, ইহা অনেকেই চিন্তাও কবেন না। শিক্ষা সংকীর্ণকে উদার করে, এবং মানবকে সত্যানুরাগী ও সত্য অবলম্বনে সমর্থ করে। সত্যানুরাগ এবং সত্য গ্রহণই মনুষ্যত্বের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। সত্যানুরাগ ব্যতীত চরিত্র বল ও নৈতিক জীবন লাভের সম্ভাবনা নাই। যে শিক্ষাতে মানুষকে সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সত্যের উপার্জ্জন, প্রতিপালন ও প্রতিষ্ঠায় সমর্থ করে, যে শিক্ষায় চরিত্রের বল, ধর্ম্মের উন্নতি এবং মনুষ্যত্ব গঠিত হয়, তাহাই ত প্রকৃত শিক্ষা। নতুবা যাহাতে আত্ম-শাসন-শক্তিকে শিথিল করে, চিত্তকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ করে, জীবনকে কেবল স্বার্থপরতা ও সাংসারিকতার দাস করে, তাহা কখনও সুশিক্ষা নয়।

আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই যে দূষিত চরিত্র এবং আলস্যপরতন্ত্র তাহার প্রধান কারণ, শৈশবকাল হইতে প্রকৃত ভাবে শিক্ষা লাভ করেন না। ছাত্রজীবনে ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রবেশ করিলে কি নিদারুণ কাণ্ড সংঘটিত হয়, হতভাগ্য তিনকড়ি পালের জীবন তাহার জলন্ত প্রমাণ। সম্প্রতি সংবাদ পত্রে এইরূপ রোমহর্ষণ ঘটনার বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। শিক্ষার্থী অল্প বয়স্ক বালকগণের এইরূপ চরিত্র-হীনতার কথা চিন্তা করিলে প্রাচীনকালের গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ছাত্রগণের কথা মনে পড়ে। মনু বলিয়াছেন, যথাবিধানে উপনীত আচার্য্যকুলবাসী নৈষ্ঠিক ও উপকুর্ব্বাণ উভয় ব্রহ্মচারী মধুমাংস প্রভৃতি উত্তেজক বস্তু আহার, চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য বিলেপন, মাল্যধারণ, অক্ষাদি ক্রীড়া, বৃথা কলহ, পরের দোষোদ্‌ঘোষণ, স্ত্রীলোকের সঙ্গ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-উত্তেজক বিষয় হইতে দূরে থাকিয়া সংযমনশীলতা উপার্জ্জন করিবেন। প্রাচীনকালের শিক্ষার্থীরা এই প্রকারে কষ্ট-সহিষ্ণু, বিলাসবিরোধী, নিষ্ঠাবান এবং সম্পূর্ণরূপে আত্ম-শাসনক্ষম হইয়া সংসারে প্রবেশ করিতেন, সুতরাং তাঁহাদের সংসারধর্ম্ম অতি পবিত্র ভাবেই নির্ব্বাহ হইত। রাজা এবং প্রজা উভয় শ্রেণীই যৌবনের প্রারম্ভে এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিতেন।

বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্ত্তনা একান্ত অসম্ভব, ইহা বলাই বাহুল্য। আচার্য্য এখন আর পিতৃস্থানীয় নহেন, তাঁহারা এখন বেতনভুক্ কর্ম্মচারী মাত্র। ছাত্রের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধও অতি অল্প সময়ের জন্য। আচার্য্যের পবিত্রতা, ধর্ম্মভাব স্নেহ ও বাৎসল্য ছাত্রেরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখিতে পায় না, সুতরাং শিক্ষার্থিগণ আচার্য্য-চরিত্রের অনুকরণ দ্বারা এখন আর চরিত্র গঠনে সমর্থ হয় না। শিক্ষা-প্রণালীর দোষে এবং অভিভাবকবর্গের অমনোযোগিতায় এখনকার ছাত্রেরা দুর্বিনীত চঞ্চল প্রকৃতি ও বিলাসপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। ছাত্রজীবনে এখন আর কিছুমাত্র বিনয়, গুরুজনের প্রতি সম্মান ও গাম্ভীর্য্যের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না। এই সকল বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সংসারে প্রবেশ করিলে তাহারা যে ধর্ম্ম ও নীতিহীন অতি অসার জীবন যাপন করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি। বর্ত্তমান সময়ের চিন্তাশীল মনস্বী লোকেরা যুবকগণের চরিত্রোন্নতি সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। এবিষয়ে সত্বর কোন বিশিষ্ট উপায় অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক। আমরা ব্রাহ্মগণকে এবিষয়ে গভীররূপে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)।

শ্রীযুক্ত তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

আপনার ১৬ই শ্রাবণের তত্ত্ব-কৌমুদীতে "সাম্যবাদ" সম্বন্ধে যে প্রাপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার নিজ প্রবন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "ব্রাহ্মসমাজে কি গুণের আদর থাকিবে না? ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেই কি সকলে সমান হইয়া গেল, সকল গুণের পরাকাষ্ঠা লাভ করিল?" মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মনে হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন উপস্থিত হইল তাহার কারণ বুঝা যাইতেছে না। কোন ব্রাহ্ম যে সাম্য মন্ত্রের এই অর্থ করিয়াছেন তাহা তো আমাদিগের স্মরণ হইতেছে না। সাম্যবাদ সম্বন্ধে সংপ্রতি যে কোন আলোচনা ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়াছে তাহাও জানি না। তবে আমি আপনার "ব্রাহ্মণত্বের মূল কারণ" বিষয়ক প্রবন্ধের লক্ষ্যগত বিষয়ের প্রতিবাদে সাম্য সম্বন্ধে দুই একটী কথা লিখিয়াছিলাম, যদি মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহারই প্রতিবাদে এই প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন, তবে একথা বলা আবশ্যক যে, তিনি এই বৃথা পরিশ্রমে নিরত না হইলেও কোন্ ক্ষতি ছিল না। তিনি যে বৃথা আশঙ্কা করিয়া বলিয়াছেন, "তবে আমাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না," আমার পত্রের কোন স্থলেও এরূপ আশঙ্কা করিবার আমি কোন কারণ প্রদান করি নাই; তবে কোন কোন লোকের অভ্যাস আছে তাঁহারা কল্পনায় অসুর সৃষ্টি করিয়া তাহার নিধন সাধন পূর্ব্বক কীর্ত্তি সঞ্চয় করেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিও সেই পথানুসরণ করিয়াছেন এরূপ অনুমান করা সঙ্গত হইবে না। আমার পত্রের প্রতিবাদ করাই যদি তাঁহার অভিপ্রায় হয়, তবে আমার কোন্ কথায় তাঁহার এইরূপ অমূলক আশঙ্কা জন্মিয়াছে তাহা প্রদর্শন করা উচিত ছিল।

সে যাহা হউক, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত মূল বিষয় সম্বন্ধে যে আমার অধিক মতভেদ আছে, তাহা বোধ হয় না। তিনি বলিয়াছেন, "সাম্যবাদের অর্থ কদাচ ইহা নহে যে, সকল মানুষই সকল বিষয়ে সমান। সৃষ্টির কোথাও ত দুইটী বস্তু ঠিক একরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। শারীরিক, মানসিক, ও আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই মানুষে মানুষে বিস্তর প্রভেদ।" কথাটি ঠিক বটে; আমিও এই কথা বলিতে চাই যে. সকল মানুষই এক সমান ছাঁচে গঠিত হইবে ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় না। প্রকৃতিতে যেমন একতা আছে, তেমন বিচিত্রতাও রহিয়াছে। কিন্তু প্রকার ভেদই যে উৎকর্ষাপকর্ষের প্রমাণ তাহা ঠিক নহে। দুই ব্যক্তির মানসিক প্রভেদ স্বতন্ত্র হইলেও তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অপর অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইতে না পারেন। এক মানুষকে উৎকৃষ্ট এবং অপর জনকে অপকৃষ্ট করিয়া ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, একথা বলিতে গেলে ঈশ্বরের সমদর্শীতার উপর লোকের সন্দেহ হইতে পারে। প্রকার ভেদ যে উৎকর্ষাপকর্ষের জনক তাহা বলা যাইতে পারে না। তবে মানুষের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ যে দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ কি তাহাই অনুসন্ধান যোগ্য বিষয়। ইহার কতকগুলি বৈষম্য সমাজ-সৃষ্ট, কতকগুলি অবস্থাগত ও কতকগুলি বংশানুগত বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই প্রভেদ মনুষ্যের প্রকৃতিগত চিরস্থায়ী প্রভেদ বলিয়া স্বীকার করা যায় না; এই সমস্তই কৃত্রিম প্রভেদ। দেবেন্দ্র বাবু যে বংশানুগত গুণ সন্তান সন্ততিতে অনুসৃত হইতে পারে না বলিয়া ওয়ালেসের সিদ্ধান্তের কথা বলিয়াছেন, সে কেবল অর্জ্জিত গুণ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। অথচ গ্যাল্‌টন (Galton) প্রতিপন্ন করিয়াছেন এই অর্জ্জিত গুণও বংশানুগত হইয়া থাকে, তবে স্থল বিশেষে ব্যতিরেক নিয়ম দৃষ্ট হয়, সেই exception প্রাকৃতিক নিয়মেও (Natural law) বিদ্যমান দেখা যায়। সে যাহা হউক, মনুষ্য বংশানুগত গুণের কোনরূপ অধিকারী হয় কিনা উহা আমাদিগের আলোচ্য বিষয় নহে। অভ্যাস লব্ধ গুণ বংশানুক্রমিক না হইলে কৃত্রিম প্রভেদ আরও সহজে ভগ্ন করা সম্ভব হইবে। আমার পত্রে কেবল মাত্র এই কথাই বলিয়াছিলাম, ব্রাহ্মণের স্বতন্ত্র শ্রেণী রক্ষা করা যদি আবশ্যক হয়, তবে সেই সূত্রে সেই ব্রাহ্মণত্ব জন্মগত করাও প্রয়োজন হইবে, কেন না গুণের যে বংশানুগতিক বিকাশ আছে, পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে অনেকে এখন ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন; কেবল গুণের কেন, দোষ ও রোগাদিরও বংশানুগত বিকাশ দৃষ্ট হয় এবং একথা এখন অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব বংশানুক্রমিকই হউক আর ব্যক্তিগতই হউক, এই রূপ শ্রেণী বিভেদ সমাজের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর নহে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "সকলেই সমান বুদ্ধিমান বা চেষ্টা করিলে

সকলেই সেক্সপীয়র নিউটন হইতে পারে; সকলেই সমান সাধু বা চেষ্টা করিলে সকলেই শাক্য বা ঈশার ন্যায় হইতে পারে—সেই উৎকট সাম্য বাদের অপর নাম বালকতা।" উহা বালকতা হইতে পারে, কিন্তু এই আশার মূলে যে কর্ম্ম-নিষ্ঠার বীজ নিহিত রহিয়াছে, উহাই যে নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতার মধ্যে মনুষ্যকে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নিরন্তর পরিচালিত করিতেছে একথা অস্বীকার করিলেই কিছু বিজ্ঞতা জন্মে না। সকল মনুষ্য সেক্সপীয়র, নিউটন শাক্য বা ঈশা হইতে পারে না, একথা মানিলাম· কিন্তু কে হইতে পারে আর কে হইতে পারে না, ইহার নির্দ্দেশ কোন্ বিজ্ঞ করিতে সমর্থ হইবেন? যদি অন্ততঃ এক ব্যক্তিও এই মহাপুরুষদিগের কাহারও সমান হইতে পারে; এবং কে সেই ব্যক্তি তাহা নির্দ্দেশ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে সকলের জন্যই কর্ম্ম-ক্ষেত্রের পথ সমান ভাবে উন্মুক্ত রাখা কি অসঙ্গত? মানুষ যাহা করিয়াছে, মানুষ তাহা করিতে পারে, ইহার অর্থ এই নহে যে, এক মানুষ যাহা করিয়াছে, প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই সকল কালে সকল অবস্থায় তাহা করা সম্ভব হইবে। একথার ইহাই অর্থ যে, এক মানুষের পক্ষে যাহা করা সম্ভব হইয়াছে, অপর মানুষের পক্ষেও তাহা করা অসম্ভব নহে; সম্ভব কি অসম্ভব তাহা যত্ন, চেষ্টা, অধ্যবসায় প্রভৃতি দ্বারাই নিরূপিত হইয়া থাকে। সেক্সপীয়র যে অতুল কবিকীর্ত্তি লাভ করিবেন, অগ্রে কে তাহা মনে করিয়াছিল, বস্তুতঃ তাঁহার নামে প্রচারিত গ্রন্থ সমূহের তিনিই প্রকৃত লেখক কি না, এ সম্বন্ধে এখনও মত বিভেদ দৃষ্ট হয়; কেহ কেহ বেকনকেই উহার লেখক মনে করেন। যাঁহারা এই মতের পোষক তাঁহারা বলেন সেক্সপীয়রের মত অল্পবিদ্য লোকের পক্ষে এইরূপ গ্রন্থ লেখা অসম্ভব। লোকে যাহা অসম্ভব মনে করে, অনেক সময়ে তাহাও যে সম্ভব হয়, একথা অস্বীকার করা যায় না। ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া রাজপুত্র যে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন, সংযমন ব্রত অভ্যাস করিয়া জগতের পূজ্য হইবেন শাক্যের সম্বন্ধে তাঁহার আত্মীয় স্বজন কি একবারও একথা মনে করিয়াছিলেন? সূত্রধর পুত্র যে জগতের অতি প্রধান ধর্ম্মগুরু হইবেন, ঈশার সম্বন্ধে কে এই আশা করিয়াছিল? যাঁহাকে প্রবঞ্চক বলিয়া ইহুদিরা হত্যা করিয়াছিল, আজ তাঁহার সাধুতায় জগৎ মুগ্ধ। মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে উৎকট সাম্যবাদে বালকতা ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইতেছেন না, এই সকল ঘটনা সেই সাম্যবাদেরই সমর্থন করিতেছে। যিনি প্রকৃত সাম্যবাদী হইবেন তাহার পক্ষে একথা বলা অসম্ভব হইবে, অমুক মনুষ্যের উন্নতির এই শেষ সীমা তাহার পক্ষে ইহার অধিক অগ্রসর হওয়া সম্ভব নহে। সাগর যেমন এই আদেশ প্রতিপালন করে নাই, সীমা রেখা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, মানুষের অভ্যন্তরলুক্কায়িত শক্তি যখন বিকাশ পাইতে থাকে তখন সেও সেই সীমা রেখাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যায়। কাহার শক্তি কোন্ পথে বিকাশ প্রাপ্ত হইবে তাহা বলা যায় না। জগাই মাধাই যে ধর্ম্মজগতে সাধু ও সদাচারী বলিয়া গণ্য হইবেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্বজীবন দেখিয়া একথা কি কেহ মনে করিতে পারিয়াছিল? চোরের সন্তান যদি সাধু হয়, তবে তাহার গৌরব, সাধুর পুত্র সাধু অপেক্ষা অধিক। প্রতিকূল শক্তিকে পরাভব করিয়া যে অগ্রসর হইতে পারে সে ব্যক্তিই প্রকৃত ধর্ম্ম-বীর। কোন্ ব্যক্তি প্রতিকূল শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে পারিবে, আর কে পারিবে না তাহার যখন কোন নিশ্চয়তা নাই; তখন মানুষ যাহা করিয়াছে অপর মানুষেও তাহা করিতে পারে, এই বিশ্বাস লইয়া কর্ম্ম ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া কি বালকতা? মানুষে মানুষে এখন যে গুরুতর বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা কৃত্রিম ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, এই বৈষম্য যে এক শতাব্দীতেই দূর হইবে, তাহা কেহ বলিতেছে না। কিন্তু এই কৃত্রিম বৈষম্য দূর করাই সাম্যমন্ত্রের প্রধান সাধন। এ সাধনা উৎকট হইতে পারে কিন্তু অসঙ্গত নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শক্তির প্রকার ভেদ রহিত করা সাম্যের লক্ষ্য নহে, বৈষম্য দূর করাই উহার অভিধেয়। যে সাম্য আংশিক রূপে বৈষম্য দূরের প্রয়াসী, তাহা প্রকৃত সাম্য বলিয়া বাচ্য হইবার যোগ্য নহে।

নিবেদক,
শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রহ্মধর্ম্ম গ্রহণ—শ্রীযুক্ত জগন্নাথ প্রসাদ নামক মুক্তি-ফৌজ দলের একজন প্রচারক খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা সাধনাশ্রমে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন। পরমেশ্বর ইঁহাকে সত্যধর্ম্ম পথে রক্ষা করুন।

ব্রাহ্মসম্মিলনী—৫ই আগষ্ট রবিবার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ দাসের বেলঘরিয়াস্থ বাগানে ব্রাহ্মসম্মিলনীর উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ কতিপয় ব্রাহ্ম ভ্রাতা কলিকাতা হইতে তথায় গমন করেন। মধ্যাহ্নে উপাসনা হয়, উমেশ বাবু উপাসনা করেন। তৎপরে সুরেন্দ্র বাবু সকলকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান।

উৎসব—ঢাকা হইতে বাবু কামিনী কুমার ঘোষ লিখিয়াছেন, "নিম্নলিখিত প্রণালীতে ঢাকা পূর্ব্ব বাঙ্গালা ছাত্রসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

১৩ই শ্রাবণ—সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় বক্তৃতা, বক্তা শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিষয়—দেহ ও আত্মা।

১৪ই শ্রাবণ—পূর্ব্বাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় উপাসনা, বাবু রজনীকান্ত ঘোষ উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে আলোচনা, অপরাহ্নে কীর্ত্তন, সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় পুনরায় উপাসনা হয়, বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী উপাসনার কার্য্য করেন।

১৫ই শ্রাবণ—সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় উপাসনা, বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

১৬ই শ্রাবণ—সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র পুরস্কারের প্রবন্ধ পাঠ ও পুরস্কার বিতরণ হয়। প্রবন্ধ লেখক বাবু অভয়কুমার গুহ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৭ই শ্রাবণ—সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় উপাসনা, বাবু গিরিশ্চন্দ্র মজুমদার উপাসনার কার্য্য করেন।

১৮ই শ্রাবণ—সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় বক্তৃতা, বক্তা বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিষয়—পরকাল।

১৯শে শ্রাবণ—সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় সাধারণ সভার বার্ষিক অধিবেশন হয়।"

৫ই আগষ্ট শিবপুরে বার্ষিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে বাবু শরচ্চন্দ্র রায়, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এবং বাবু পার্ব্বতী নাথ দত্ত প্রভৃতি কতিপয় ব্রাহ্ম ভ্রাতা তথায় গমন করেন। তাঁহারা ৪ঠা তারিখ রজনীতে গঙ্গার ঘাটে বজরায় অবস্থিতি করেন, প্রাতঃকালে শিবপুরে পঁহুছিয়া কলেজের কতিপয় ছাত্রসহ কোম্পানীর বাগানে এক নির্জ্জন বনমধ্যে উপাসনা করেন। বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গঙ্গাতীরে এক প্রকাণ্ড সভার অধিবেশন হয়।

কলেজের ছাত্রগণ বক্তৃতা শুনিবার জন্য আগ্রহ সহকারে উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যাসমাগমে গঙ্গাতীর অধিকতর সুদৃশ্য হইল। উপরে সুনীল আকাশ, নিম্নে ধীরগামিনী স্রোতস্বতী প্রবাহিত, তীরে নানা জাতীয় বৃক্ষ লতা পুষ্পে পরিপূর্ণ সুরম্য উদ্যান। এই শোভা নিরীক্ষণ করিয়া অনেকেরই প্রাণ মুগ্ধ হইল। সকলে স্থান পরিগ্রহ করিলে প্রথমতঃ সংগীত ও প্রার্থনা হইল, তৎপর হেরম্ব বাবু সুললিত ইংরাজি ভাষাতে বিশ্বজনিন ধর্ম্ম কি তৎসম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। শ্রোতাগণ অতি মনোযোগের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতার পর তাঁহারা কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

বিবাহ—গত ৭ই আগষ্ট কলিকাতায় শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ রায়ের সহিত শ্রীমতী কামিনী সেনের শুভবিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু আদিত্য কুমার চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

৮ই আগষ্ট দেবাধূন সহরে শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র দেবের সহিত আমাদের বন্ধু বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সরলা মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ সম্পাদন হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহ উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস এবং শ্রীযুক্ত বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় তথায় গমন করেন। নবদ্বীপ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। উভয় বিবাহই ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টরী হইয়াছে। পরমেশ্বর নবদম্পতিদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দুর্ভিক্ষ সংবাদ—কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কোটালীপাড়ার দুর্ভিক্ষের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সাহায্য বিতরণের জন্য বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষালকে তথায় প্রেরণ করেন। তিনি রাধাগঞ্জ নামক স্থানের চতুঃপার্শ্বে এক মাস কাল চাউল ও কাপড় বিতরণ করিয়া পীড়িত অবস্থায় কলিকাতায় প্রত্যাগত হন। সে সময় ফরিদপুরের ডিঃ বোর্ড, খৃষ্টান সমাজ এবং ফরিদপুর সুহৃদ সভা সাহায্য করিতেছিলেন। সুহৃদ সভার যে প্রতিনিধি সেখানে সাহায্য করিতেছিলেন, তাঁহাকে স্বীয় কার্য্যোপলক্ষে বাধ্য হইয়া কলিকাতা আসিতে হইয়াছে। অথচ অনাহারকষ্ট এখনও প্রায় পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। ফরিদপুর সুহৃদ সভার সম্পাদক ঐ অঞ্চলে প্রেরণের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে লোক চাহিয়াছিলেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সাধনাশ্রম হইতে সম্প্রতি বাবু হরিমোহন ঘোষাল ও বাবু কুঞ্জলাল ঘোষকে তথায় পাঠাইয়াছেন। বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ ফরিদপুর সুহৃদ সভা প্রদত্ত সাহায্য এবং বাবু হরিমোহন ঘোষাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রদত্ত সাহায্য বিতরণ করিবেন। সহৃদয় মহোদয় ও মহোদয়াগণ দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে নিম্নলিখিত ঠিকানায় চাঁদা প্রেরণ করিয়া অনুগ্রহীত করিবেন। "শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ, ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।"

শ্রাদ্ধ—গত ২৩শে শ্রাবণ কলিকাতাস্থ ভবনে শ্রীমতী জগৎলক্ষ্মী ঘোষ তাঁহার পরলোকগত স্বামী বাবু ভুবনমোহন ঘোষের আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১৫০০৲ শত টাকা দান করা হইয়াছে। ভুবন বাবু মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার শ্রাদ্ধে এক হাজার টাকা দান করিবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন। কোন্ স্থানে কত টাকা দিতে হইবে তাহারও এক ফর্দ্দ রাখিয়া গিয়াছেন। এবং তাহার সহধর্ম্মিনী ৫০০৲ শত টাকা দান করিয়াছেন। ভুবন বাবুর ফর্দ্দ অনুসারে এক হাজার টাকা দানের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নিম্নলিখিত রূপে দান প্রাপ্ত হইয়াছেন; স্থায়ী প্রচার বিভাগ ৩০০৲ দাতব্য বিভাগ ৫০৲ মাঘোৎসবে আহারের জন্য স্থায়ী তহবিল ১০০৲ কলিকাতা উপাসক মণ্ডলী ৫০৲ এবং সাধনাশ্রম ৫০৲ মোট ৫৫০৲ টাকা।

ভুবন বাবুর ভগিনী শ্রীমতী থাকমণি ঘোষ ৫ই আগষ্ট তারিখে তাঁহার কলিকাতার বাটীতে পরলোকগত ভ্রাতার শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। তদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনা করেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন,—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সাধারণ বিভাগ ৮৲ প্রচার বিভাগ ৫৲, সাধনাশ্রম ৩৲, বালিকা বোর্ডিং ৫৲ মোট ২১৲ টাকা।

ভুবন বাবুর বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ বসু ঢাকা নগরীতে প্রচারাশ্রমে ২৪শে শ্রাবণ তারিখে শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী উপাসনা করেন, শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ভুবন বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী বলেন। এই উপলক্ষে হরনাথ বাবু দুঃখী কাঙ্গালদিগকে কিঞ্চিৎ দান করিয়াছেন। পরমেশ্বর পরলোকগত আত্মাকে তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান দান করুন।

আমাদের যশোহরস্থ ব্রাহ্মবন্ধু বাবু প্রসন্নকুমার চৌধুরীর ১ বৎসর বয়স্ক একটি পুত্র সন্তান গত ২রা আগষ্ট পরলোক গমন করে, ৬ই আগষ্ট ৬ বৎসর বয়স্ক একটি কন্যাও পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। প্রসন্ন বাবু কিছু কালের জন্য সপরিবারে কলিকাতা আসিয়া ব্রাহ্মপাড়ায় বাস করিতেছেন। গত ১৩ই আগষ্ট বালিকার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন, প্রসন্ন বাবু প্রার্থনা করেন এবং শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও প্রার্থনা করেন। পরমেশ্বর শোকসন্তপ্ত দম্পতির প্রাণে শান্তি দান করুন। প্রসন্ন বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ২৲ দুর্ভিক্ষ বিভাগ ১৲ সাধনাশ্রম ১৲ টাকা।

বিগত ২৪শে শ্রাবণ ঢাকা নগরীতে বাবু জ্যোতিরীন্দ্র প্রসাদ মিত্রের পত্নী শ্রীমতী নির্ম্মলা মিত্র তাঁহার পরলোক গতা পিতামহী অম্বিকা দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। শ্রাদ্ধকর্ত্রী এই উপলক্ষে পূর্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে ৪৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ঔষধ বিতরণ—আরা সহরে ভয়ানক বিসূচিকা আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিদিন অনেক লোক কাল গ্রাসে পতিত হইতেছে। সেখানে চিকিৎসকের কোনও ভাল বন্দোবস্ত না থাকায়, আরা সাধনাশ্রমের পরিচারকগণ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। লোকে ৫।৬ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আসিয়া ঔষধ লইয়া যাইতেছে।

দান—আমাদের আগ্রাস্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি ধরের পত্নী শ্রীমতী সত্যবতী ধর নূতন বাটী ক্রয় উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন;—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, সাধনাশ্রম ৫৲ দাতব্য বিভাগে ১৲ টাকা। আমরা এই দানের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

মাসিক পত্রিকা—"জ্যোতিঃ" নামক একখানি নূতন মাসিক পত্রিকা আমরা নিয়মিত রূপে প্রাপ্ত হইতেছি। ইহাতে সমাজ-নীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি সম্বন্ধীয় উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। আমরা নবোদিত জ্যোতির দীর্ঘজীবন ও মঙ্গল কামনা করি।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১লা ভাদ্র প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১০ম সংখ্যা।
১৭শ ভাগ।

১৬ই ভাদ্র শুক্রবার, ১৮১৬ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে প্রভো! তোমার সত্যধর্ম্মের মহৎ লক্ষ্য যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। তোমার প্রতি এবং তোমার সত্যধর্ম্মের প্রতি আমাদের প্রেম এরূপ বর্দ্ধিত হউক, যাহাতে আমরা ইহার জন্য আপনাদের দেহ মন সমর্পণ করিতে পারি। তোমার বিশ্বাসী সন্তানদিগের বিশ্বাস ও প্রেমের শক্তি সমবেত না হইলে ত এ ধর্ম্মের পরাক্রম জগতে প্রকাশ পাইবে না। কেন তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছেন? তোমার উপরে কি আমাদের এতটুকু প্রেম নাই, যাহাতে সমুদায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রভেদ ভুলিয়া আমরা তোমার সত্যধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিবার জন্য তোমার চরণে সমবেত হইতে পারি? সেই প্রেম আমাদের অন্তরে উদ্দীপ্ত কর, যাহাতে মানুষকে আত্ম-হারা করিয়া দেয়।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সত্যের জন্যই সত্যকে প্রীতি কর—একজন আমিষাশী একজন নিরামিষাশীকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়। আপনি কি মনে করেন জগৎ হইতে মাছ মাংস খাওয়া উঠিয়া যাইবে, যদি তাহা না হয় তাহা হইলে, মাছ মাংস ছাড়িয়া শরীরটা নষ্ট করেন কেন?" নিরামিষাশী উত্তর করিলেন—"আমিষ ভোজন জগৎ হইতে উঠিয়া যাওয়া ত অসম্ভব মনে করি না, কারণ মনুষ্যসমাজ যতই সভ্য হইবে, হৃদয়ের কোমল ও সাধু ভাব সকল যতই বিকশিত হইবে, ততই প্রাণি-হত্যার প্রতি লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিবে। আর মনেই করা গেল, যেন জগতে আমিষাশী লোক চিরদিনই থাকিবে, তাহার সঙ্গে আমার নিরামিষাশী হওয়া না হওয়ার সম্পর্ক কি? আমিষ ভোজন নিষিদ্ধ কার্য্য বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, সুতরাং আমি আমিষ ভোজন করি না,—আর কেহ এ মতাবলম্বী হইল কিনা, তাহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? যাহা সত্য, আমি তাহার অনুসরণ করিব; আর কেহ করুক, আর নাই করুক। দশজনে অনুসরণ করিলে, সত্য অধিক সত্য হয় না, কিংবা দশজনে অনুসরণ না করিলে তাহার মহিমার এক কণিকাও বিনষ্ট হয় না। এই স্থূল কথাটী ভুলিয়া যাওয়াতে অনেক দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির বড় দুর্দ্দশা দেখিতে পাই। তাঁহারা জ্ঞানের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার উদার ও সার্ব্বভৌমিক সত্য সকলকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন; ব্রহ্মোপাসনাদিতে প্রীতি লাভ করেন ও তাহাতে যোগ দিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা পূর্ণভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকলকে পালন করিতে পারিতেছেন না; ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে পারিতেছেন না। তাহার কারণ এই, বহু বৎসরেও তাঁহাদের এই প্রশ্নটা মীমাংসা হইতেছে না যে, ব্রাহ্মসমাজ স্থায়ী হইবে কিনা? তাঁহারা যখন নির্জ্জনে চিন্তা করেন, তখন বলেন—"কৈ ইহার উন্নতির চিহ্ন ত দেখি না। ইহার প্রসিদ্ধ প্রচারকগণ ইহাকে বিকৃত করিয়া তুলিলেন, এবং অনেকে ইহাকে পরিত্যাগ করিলেন; লোকের মুখে ইহার সভ্যদিগের কত নিন্দা শুনিতে পাই,—ইহার ভিতরে পা বাড়াই কিরূপে? কাঁচা মাটীতে পা দিয়া কি "ইতঃভ্রষ্টস্ততো নষ্ট" হইব?" লোকে জিজ্ঞাসা করিলেও এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন। মহম্মদ কোরাণে এই শ্রেণীর লোকের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা সন্দেহে দোলায়মানচিত্তে চিরদিন ধর্ম্ম রাজ্যের দ্বারেই দণ্ডায়মান থাকে; ভিতরেও আসে না, দূরেও যায় না। এই সকল ব্রাহ্মও সেইরূপ। ইহাদিগকে বলি—কে আসিবে কে না আসিবে তাহা গণনা করিওনা, তুমি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছ, তাহা যথাসাধ্য প্রতিপালন কর, তাহাতেই তোমার মনুষ্যত্ব, মহত্ত্ব ও ঈশ্বরের আনুগত্য, তদ্ভিন্ন তুমি ঈশ্বরের চরণে অপরাধী।

একাকিত্ব—নদী সকলের উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ দেখা যায় যে, তাহারা নির্জ্জন পর্ব্বত শৃঙ্গে, মানব চক্ষুর অগোচরে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সজনে কোলাহলময় নগরের পার্শ্ব দিয়া স্বীয় কার্য্য সাধন করিয়া যায়। জগতের ধর্ম্ম সকলকে যদি এক একটী স্রোতস্বতীর ন্যায় কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে তাহাদেরও সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তটী খাটে। ঘোর একাকিত্বের মধ্যে তাহাদের অধিকাংশের জন্ম হইয়াছে।

সাধু মহাজনের মুখনিঃসৃত সত্যবারি দ্বারা সেই সকল স্রোতস্বতী পূর্ণ হইয়াছে, তাঁহারা সে সকল সত্য ঘোর নির্জ্জনতার মধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা কেবলমাত্র বাহিরের নির্জ্জনতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কথা বলিতেছি না; ঘোর আধ্যাত্মিক নির্জ্জনতাই আমাদের লক্ষ্য। শাক্য সিংহ নিরঞ্জন নদীর তীরবর্ত্তী অরণ্যমধ্যে ছয় বৎসরকাল কঠোর তপস্যাতে যাপন করিয়াছিলেন,—সেই অরণ্যের নিস্তব্ধতা হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের জন্ম, ইহা বলা আমাদের অভিপ্রায় নহে; কিন্তু সেই নির্জ্জনতার মধ্যে আরও ঘোর নির্জ্জনতা ছিল, তাহার প্রতি আমাদের লক্ষ্য। মহম্মদ হরা পর্ব্বতের কন্দরে একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেন, সে হরা পর্ব্বতকন্দরের নির্জ্জনতা ত সামান্য, কিন্তু তাহার ভিতরে যে একাকিত্ব ছিল, সেই একাকিত্ব হইতেই ইসলাম ধর্ম্মের অভ্যুদয়। এই সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাজনদিগের জীবন-চরিত সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, তাঁহারা জগতের পাপ তাপ দর্শনে হৃদয়ে আঘাত পাইয়া চিন্তাতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, সেই চিন্তাতে আত্ম-নির্ভর ও জগতের প্রতি নির্ভর চলিয়া গিয়াছিল এবং সম্পূর্ণরূপে একাকী হইয়া ঈশ্বর-চরণে পড়িয়াছিলেন ও সেইখান হইতেই জীবনপ্রদ মন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন। একাকী ও অনন্যগতি হইয়া ঈশ্বর-চরণে পড়া বড় সহজ কথা নহে। ইহা ত আমরা অনেকবার বলিয়াছি, লিখিয়াছি, উপদেশ দিয়াছি; কিন্তু অনুভব করিয়াছি অল্পই। আমরা সর্ব্বদা যেরূপ জনকোলাহলের মধ্যে বাস করি, তাহাতে মধ্যে মধ্যে আপনাদিগকে একাকী করিবার চেষ্টা করা অতীব বাঞ্ছনীয়।

ঈশ্বর-প্রীতির অধিকার—সকলেই কি ঈশ্বর-প্রীতির অধিকারী? অর্থাৎ যে সে ব্যক্তি মনে করিলেই কি ঈশ্বর-প্রীতি লাভ করিতে পারে? অথবা ঈশ্বর-প্রীতি বিষয়ে অধিকারীভেদ আছে? ব্রাহ্মদিগের বিরোধিগণ সর্ব্বদা উপহাস করিয়া বলিয়া থাকেন,—"অজাতশ্মশ্রু বালক, যাহার গলা টিপিলে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠে, সে মহাভক্ত ব্রাহ্ম হইয়া উঠিল, ব্রহ্মজ্ঞান কি এমনই জিনিষ? ব্রহ্মজ্ঞানকে এইরূপ ছকড়া নকড়া করে বলিয়াই ত আমরা ব্রাহ্মসমাজকে ঘৃণা করি।" আবার ব্রাহ্মদিগের মধ্যেই অনেকে বলিয়া থাকেন—"ব্রাহ্মধর্ম্ম অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের জন্য নহে, মার্জ্জিতজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন এ ধর্ম্ম কেহ পালন করিতে পারে না। সাধারণ লোকের মধ্যে ইহা প্রচার করিবার চেষ্টা করাই বৃথা।" এ সমুদায় অধিকারীভেদের কথা। বয়সের অল্পতা অথবা মার্জ্জিত শিক্ষার অভাব বশতঃ যে লোকে ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে অসমর্থ হয়, আমরা এরূপ মনে করি না। ছয় মাসের শিশু এবং পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ সন্তান উভয়েই পিতাকে প্রীতি করিতে পারে। কিন্তু একটী সদ্‌গুণ এমন আছে, যাহার অভাবে মানুষের আর ঈশ্বরকে প্রীতি করিবার অধিকার থাকে না। মানুষ যদি আপনার ধর্ম্মবুদ্ধির বা বিবেকের বিরুদ্ধ কার্য্য করে, যদি জীবনের কর্ত্তব্য সকল পালনে উদাসীন থাকে, তাহা হইলে আর তাহার ঈশ্বর-প্রীতির অধিকার থাকে না। তুমি যাহাদিগের সুখ দুঃখের জন্য দায়ী, তাহাদের সুখ দুঃখের প্রতি তোমার দৃষ্টি নাই; তাহাদের যে ক্লেশ নিবারণ করিবার সাধ্য আছে, সে বিষয়ে তোমার মনোযোগ নাই; তুমি যে কার্য্যের ভার লইয়াছ তাহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য ব্যগ্রতা নাই; তুমি ঋণ শোধ দিবে বলিয়া ঋণ করিয়াছ, সেই অর্থের অভাবে তোমার উত্তমর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, সে বিষয়ে তোমার দৃষ্টি নাই; ঈশ্বর তোমাকে যে সকল শক্তি দিয়াছেন, তাহার যথাযথ ব্যবহারের জন্য তোমার ব্যগ্রতা নাই;—কিন্তু তুমি পর্ব্বত কন্দরে গিয়া ধ্যান করিবার জন্য, বা ভক্তসঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া ধর্ম্মালাপ শুনিবার জন্য বা উৎসব ক্ষেত্রে সমস্ত রজনী কীর্ত্তন ও সিংহবিক্রমে নৃত্য করিবার জন্য ব্যস্ত। তোমার ধারণা আছে, এতদ্বারা তুমি ঈশ্বর-প্রীতি লাভ করিবে। কিন্তু এটা তোমার পক্ষে জানা থাকা ভাল, যে তোমার ঈশ্বর-প্রীতিতে অধিকার নাই। তুমি ১২ বৎসর পর্ব্বতগুহাতে বাস করিলেও তাহা বিফল হইবে। ঈশ্বর এরূপ আগ্রহ শুনিবেন কেন? এক গৃহস্থ বহুদিন বিদেশে বাস করিতেন, অনেক বৎসর পরে বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার কন্যাটী বড় হইয়াছে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে ভাবকতাটা কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত মাত্রায় পাইয়াছে। যখন তখন যেখানে সেখানে "বাবা মণি," "বাবা মণি" বলিয়া পিতাকে আদর করে। তিনি বসিয়া লিখিতেছেন, "বাবা মণি।" বলিয়া আসিয়া চুম্বন করে এবং সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতে ভাল বাসে। প্রেমের সীমা পরিসীমা নাই—সে পিতার জন্য প্রাণ দিতে পারে। কিন্তু পিতার অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য পিতা বার বার আদেশ করিয়াও দেখিতে পান যে তাহা হয় না। তিনি বাহিরে যাইবার সময় দেখিলেন, জামাগুলিতে বোতাম নাই; মোজা যোড়া পায়ে দিতে গিয়া দেখিলেন, ছেঁড়া মোজা যোড়াটী সেলাই করে নাই; আহার করিতে গিয়া দেখিলেন, ভাত পুড়িয়া গিয়াছে, দেখে নাই; শয়ন করিতে গিয়া দেখিলেন, শয্যাগুলি বৃষ্টিতে ভিজিয়াছে, তোলে নাই। এইরূপে কয়েকদিন দেখার পর একদিন কন্যাটী "বাবামণি!" বলিয়া চুম্বন করিতে আসিল, তখন মুখ ফিরাইয়া বিরক্তি-কর্কশস্বরে বলিলেন—"আঃ কর কি! আর "বাবামণি" "বাবামণি" ভাল লাগে না। ঘরের কাজটাতে একটু মনোযোগ করিলে ভাল হয়।" আমাদের বোধ হয়, অনেকের ঈশ্বর-প্রীতি সাধন এই প্রকার। ঈশ্বরের আদেশ ও কর্ত্তব্য পালনের দিকে দৃষ্টি নাই। কেবল ঈশ্বর সন্নিধানে বসিয়া "বাবামণি। বাবামণি!" বলিয়া প্রীতি সাধন করিবার জন্য ব্যস্ত। এরূপ প্রীতি সাধনে ঈশ্বর প্রসন্ন হন না, সুতরাং সে সাধন নিষ্ফল।

জগতে উদারভাবের বিস্তার—আমাদের ১৮৭২ সালের ৩ আইনের মূলে একটী উদার ভাব নিহিত আছে, "যাহারা প্রচলিত কোনও ধর্ম্মের নিয়মানুসারে বিবাহিত হইতে চাহে না, এবং সেরূপে বিবাহিত হইতে যাহাদের আপত্তি আছে, তাহাদের কি বিবাহ করিবার অধিকার থাকিবে না?

অথবা তাহারা যদি বিবাহ করে, তবে তাহাদের সন্তান সন্ততি কি আপন আপন পিতামাতার সম্পত্তি অধিকার করিতে পারিবে না? ৩ আইন বলিয়াছে, অবশ্য পারিবে। ক্রমে ক্রমে জগতের সমুদায় সভ্যদেশে এই উদার ভাবটী ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। হঙ্গেরি ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে একটী সামান্য প্রদেশ। সেখানে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রবল। এতদিন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসমাজের নিয়মানুসারে বিবাহাদি হইত। কিন্তু অনুমানে বোধ হয়, সেখানে এরূপ নরনারীর সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, যাঁহারা আর খ্রীষ্টীয়সমাজের রীতি পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিতে চাহেন না। এই সকল নরনারীর জন্য আমাদের ৩ আইনের অনুরূপ একটী আইনের প্রয়োজন হইয়াছে। এইরূপ একটী আইনের পাণ্ডুলিপি তাঁহাদের পার্লেমেণ্টের নিম্নতন সভা হইতে পাশ হইয়া ঊর্দ্ধতন সভাতে গমন করে; সেখানে প্রথমে পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু তাহাতে এত প্রবল আন্দোলন হয় যে, অবশেষে সেই আইন পুনরায় উপস্থিত করিয়া পার্লেমেণ্টের উভয় সভার দ্বারা পাশ হইয়াছে, রাজাও তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় সমাজের প্রতাপ চারিদিকেই খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে।

শিশুদিগের ধর্ম্মশিক্ষা—শিশুদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ার ন্যায় কঠিন কার্য্য আর নাই। কিরূপে শিক্ষা দিলে তাহাদিগের উপযোগী হয়, কি প্রণালীতে নীতি ও ধর্ম্মের স্থূল নিয়ম সকল তাহাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করাই কঠিন। এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হওয়ায় এ প্রশ্ন আরও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা বাহুল্যরূপে প্রচার হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক নিষ্ঠাবান হিন্দু গৃহস্থের গৃহে শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার একপ্রকার প্রণালী প্রচলিত ছিল। অষ্টম বর্ষে উপনীত প্রত্যেক ব্রাহ্মণবালককেই সন্ধ্যাবন্দনাদি শিক্ষা দেওয়া হইত। গৃহের বৃদ্ধ বৃদ্ধাগণ মুখে মুখে পৌরাণিক আখ্যায়িকাদি দ্বারা তাহাদিগকে অনেক কথা শিখাইতেন। তাহারা রামায়ণ ও মহাভারত পড়িত বা অপরকে পড়িতে শুনিত। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সে সমুদায় লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। নব্যশিক্ষিত পিতামাতা যাহা নিজেরা বিশ্বাস করেন না, তাহা কিরূপে শিক্ষা দিবেন? এইরূপে শৈশবে ধর্ম্মশিক্ষা হিন্দুসমাজ হইতে একপ্রকার উঠিয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে এ প্রশ্ন নূতন। আমাদের ঘরে ঘরে শিশু সন্তানের সংখ্যা যতই বাড়িতেছে, ততই এই প্রশ্ন গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। আমাদের মধ্যে অনেকে কয়েক বৎসর হইতে রবিবাসরিক নীতি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া এই অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বদাই দুইটী অভাব অনুভব করিতেছেন। প্রথম শিশুদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার উপযোগী গ্রন্থাবলীর অভাব, দ্বিতীয় গৃহে পিতামাতার নিকটে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা লাভের অভাব। এই দ্বিতীয় অভাব নিবন্ধন তাঁহাদের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের অনুরূপ ফল ফলিতেছে না। সপ্তাহে একবার দুই ঘণ্টার জন্য শিশুদিগকে ডাকিয়া দুইটী ভাল কথা বলিলে, কত উপকার হয়? যদি সপ্তাহের সমস্ত দিন পিতামাতার নিকটে সৎশিক্ষা না পায়, তাহা হইলে এক দিনের শিক্ষাতে কি করিতে পারে? শিশুদিগের ধর্ম্ম-শিক্ষা-বিষয়ক প্রশ্নের কঠিনতা যে কেবল আমরাই অনুভব করিতেছি তাহা নহে। ইংলণ্ডেও এবিষয়ে আন্দোলন চলিতেছে। সেখানে "রবিবাসরিক বিদ্যালয়" অসংখ্য। তাহাতে শিক্ষা দান করা একটা শ্লাঘার কথা। বড় বড় লোক রবিবাসরিক বিদ্যালয়ে শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকেন। কিন্তু কিছুদিন হইল, সেখানেও এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, "শিশুদিগকে বাইবেলের আখ্যায়িকা সকল হইতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য কি না।" এতদিন বাইবেল অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়া আসিতেছে, ও প্রশ্নোত্তরচ্ছলে খ্রীষ্টধর্ম্মের মূল মূল মত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাইবেলের প্রতি লোকের আস্থা চলিয়া যাইতেছে। অনেকে এখন অনুভব করিতেছেন, যে যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায় না তাহা শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া অকর্ত্তব্য। ইংলণ্ডের ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায় একেশ্বরবাদী, তাঁহাদের রবিবাসরিক বিদ্যালয়ে শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য নিজেদের মতানুযায়ী পাঠ্য গ্রন্থাবলী রচনা করিয়াছেন। তাহাতে বাইবেলকে অবলম্বন করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহার ভ্রম প্রমাদ পরিহার করিয়াছেন। আমাদেরও বোধ হয় আমাদের দেশের পুরাণ সকলের কল্পনা ও নিষিদ্ধ ভাগ বাদ দিয়া, শিশুদিগের পাঠোপযোগী ও ধর্ম্মোপদেশোপযোগী আখ্যায়িকা সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল হয়, কারণ শিশুদিগকে যেরূপেই উপদেশ দেওয়া যাউক না কেন, কেবল সাধারণ ভাবে শুষ্ক নীতি উপদেশ করিলে ফলোদয় হইবে না, সর্ব্বদাই আখ্যায়িকাদি দ্বারা তাহাদিগকে উপদেশ দিতে হইবে।

জাতি-গর্ব্ব কি দুষ্পরিহার্য্য?—আমেরিকার প্রশংসা আমাদের মুখে ধরে না। আমেরিকা, জ্ঞানবিজ্ঞানে অগ্রসর, সভ্যতাতে উন্নত, শিল্প বাণিজ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য ও সর্ব্ববিধ উন্নতিতে জগতের আদর্শ স্থানীয়, এরূপ প্রশংসা সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমেরিকার একটা ভিতরপিঠ আছে, তাহা এদেশের অনেকে অবগত নহেন। যেমন চন্দ্রের দেহে কলঙ্ক, তেমনি আমেরিকারও যশের উপরে একটী প্রকাণ্ড কালির দাগ আছে। আমেরিকার সমাজে জাতিভেদ অতিশয় প্রবল ও অসহনীয়। ইহা সেই পুরাতন বৈদিক শুক্ল কৃষ্ণের, আর্য্য অনার্য্যের বিরোধ। অনেকে স্থূলভাবে অবগত আছেন যে, আমেরিকাতে এক সময়ে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল, এখন উঠিয়া গিয়াছে, ক্রীতদাসগণ সকলে স্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু এখনও কি ব্যাপার সেখানে চলিয়াছে, তাহা অনেকে অবগত নহেন। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ বিভাগে জাতি বিদ্বেষের অগ্নি এখনও প্রবল ভাবে জ্বলিতেছে। প্রায় ২৭ বৎসর হইল, ঘোর অন্তর্বিদ্রোহ ও অনেক রক্তপাতের পর আইনের দ্বারা ক্রীতদাসদিগকে স্বাধীন করা হইয়াছে বটে,

কিন্তু জাতিবৈরের অগ্নি এখনও নির্ব্বাণ হয় নাই। বরং কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রিগণ যতই উন্নতি লাভ করিতেছে, ততই তাহাদের পুরাতন শুক্লবর্ণ প্রভুগণ গাত্রদাহে অস্থির হইতেছেন; এবং কথায় কথায় সামান্য অপরাধে দোষী নির্দ্দোষী বিচার না করিয়া কৃষ্ণকায়দিগকে ঘোর যাতনা দিয়া হত্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আইন আদালত অধিকাংশ শুক্লবর্ণদিগের হস্তে সুতরাং আশানুরূপ সাজা হইতেছে না। ভারতীয় পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, আমেরিকার অনেক রাজ্যেই এই আইন প্রচলিত আছে যে, কোনও কৃষ্ণকায় পুরুষ যদি কোন শ্বেতাঙ্গিনী নারীর পাণিগ্রহণ করে, তবে সে বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে, ও সেই পুরুষ সেই অপরাধের জন্য কয়েদ হইবে। ইহা হইল, মনুর প্রতিলোম বিবাহ। কিন্তু কৃষ্ণকায়দিগের প্রতি এই ঘোর অত্যাচারের মধ্যে একটি বিষয় দেখিয়া সুখ হইতেছে। স্বাধীনতার যে কি গুণ তাহা কৃষ্ণকায়দিগের উন্নতিতে প্রমাণিত হইতেছে। আমেরিকার একখানি সংবাদপত্রে দেখা গেল যে, ২৭ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে দক্ষিণ প্রদেশে প্রায় ৪,০০০,০০০ চল্লিশ লক্ষ কাফ্রি-দাস লেখাপড়া করিতে পাইত না। দেশের আইন তাহাদিগকে [illegible] লাভ করিতে দিত না। কিন্তু এই ২৭ বৎসরের মধ্যে অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বিগত ১৮৯০ সালের লোকসংখ্যা গণনার সময় জানা গিয়াছে যে, এক্ষণে ২,৫০০,০০০ পঁচিশ লক্ষ কৃষ্ণকায় পুরুষ ও স্ত্রীলোক লিখিতে ও পড়িতে পারে; প্রায় ১,২৩৮,২৩০ জন বালকবালিকা নিম্নতন বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতেছে; প্রায় ২০,০০০ বিশ হাজার কৃষ্ণকায় পুরুষ ও মহিলা শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন; এই ২৭ বৎসরের মধ্যে এই কৃষ্ণকায়গণ নিজ অর্থে ও নিজ চেষ্টাতে উচ্চশিক্ষার জন্য ৩০টী একাডেমি, ৮০টী কলেজ ও প্রায় ২০০০০ বিশ হাজার মধ্যমশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। ইহাদের মধ্য হইতে প্রায় এক সহস্র ব্যক্তি সুশিক্ষিত হইয়া ধর্ম্মপ্রচার ব্রতে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন। ২৭ বৎসরে এই ফল, জাতিভেদ এমনই জিনিস যে এই উদ্যোগ ও আত্মোন্নতির শক্তিকে শত শত বৎসর চাপিয়া রাখিয়াছিল। আইন, জাতিভেদের মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়াছে, কিন্তু বৈরানলকে নির্ব্বাণ করিতে পারে নাই। ব্রাহ্মসমাজেও দেখিতেছি, জাতিভেদ ছাড়িয়াও আমাদিগকে ছাড়িতেছে না। ব্রাহ্ম-পরিবার সকলের কেহ কেহ পুত্র কন্যার বিবাহ দিবার সময় স্বজাতীয় বর কন্যা খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। ভারতের জাতিভেদ জিনিসটী এইরূপ।

পঞ্চম পুরুষার্থ—হিন্দুশাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারি প্রকার পুরুষার্থের বিষয় উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে মোক্ষ বা মুক্তি পাঁচ প্রকার। ভক্তিশাস্ত্রে ভগবৎপ্রেমের নিকট এই পাঁচপ্রকার মুক্তি অতি তুচ্ছ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফলস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের সেবাময় বিশুদ্ধ প্রেমকেই জীবের চরম লক্ষ্য বলিয়া থাকেন। ইহাই পঞ্চমপুরুষার্থ। ব্রাহ্মধর্ম্মও বলিতেছেন, ঈশ্বর-প্রীতি ও ঈশ্বর-সেবাই যথার্থ উপাসনা এবং ইহাই মানবের ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্টধর্ম্ম। ভক্তিশাস্ত্রের সহিত এ বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের চমৎকার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করাই ঈশ্বর-সেবা। ঈশ্বর-সেবার অর্থ, নরনারীর সেবা অর্থাৎ জনসমাজের হিতানুষ্ঠান। পরমেশ্বরের প্রিয়কার্য্য—তাঁহার ইচ্ছানুগত কার্য্য কি?—না জগতের মঙ্গলসাধন। ঈশ্বর প্রেমময় মঙ্গলময়, জগতের মঙ্গলই তাঁহার উদ্দেশ্য। আমরা যখন সর্ব্বপ্রকার অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া সরলভাবে পবিত্র অন্তঃকরণে জগতের কল্যাণজনক সাধু অনুষ্ঠানে যোগদান করি, তখনই আমরা পরমেশ্বরের প্রিয়কার্য্য অর্থাৎ তাঁহার সেবা করিয়া চরিতার্থ হই। এই কর্ম্মযোগাত্মক উপাসনাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ। সেবা দ্বারাই প্রীতির পরিচয়, সেবাশূন্য প্রীতির কোন অর্থ নাই।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

সার্ব্বভৌমিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা।

প্রত্যেক মানবের চরিত্রে দুইপ্রকার গুণ আছে, এক প্রকার গুণ মানবসাধারণ, অপরবিধ গুণ বিশেষ বিশেষ জাতি সাধারণ; তেমনি সকল ধর্ম্মেরই দুইদিক আছে, একটা সার্ব্বভৌমিক দিক, অপরটা সাম্প্রদায়িক দিক। এই যে আমরা বাঙ্গালি তুমি, আমি, রাম শ্যাম, গোপাল প্রভৃতি এই আর ঐ যে ইংরাজদল, ওয়েভ, বীমস্ কটন প্রভৃতি। দুই দলকে একত্র আনয়ন কর, তুলনাতে সমালোচনা কর, দেখিবে আমাদের চরিত্রে এমন কিছু কিছু আছে যাহা সকল দেশের সকল মানবের চরিত্রেই পাওয়া যায়, যাহা ঐ ইংরেজদিগের চরিত্রেও আছে; আবার এমন কিছু আছে, যাহা বিশেষভাবে হিন্দুর-বঙ্গের বাঙ্গালির, যাহা ঐ ইংরাজ চরিত্রে পাওয়া যায় না। আবার ঐ ইংরাজদিগের চরিত্রে এমন কিছু কিছু পাইবে, যাহা মানব সাধারণের গুণ, যাহা এই বাঙ্গালি চরিত্রেও আছে, অথচ এমন কিছুও দেখিবে যাহা সর্ব্বতোভাবে ইংলণ্ডের ইংরাজের, বাঙ্গালিতে তাহা নাই। মানবচরিত্রের এই সার্ব্বভৌমিকতা ও জাতীয়তার বিষয়ে চিন্তা করিলে আর একটী তত্ত্ব নিরূপণ করা যায়। কোন কোন মানুষ এমন দেখি, যাঁহাদের চরিত্রে সার্ব্বভৌমিকতা বেশি, তাহাদের মন স্বদেশ ও স্বজাতির মধ্যে একান্ত বদ্ধ নহে, তাঁহারা উদারভাবে সমগ্র জগতকে আপনাদের প্রেম বাহুর মধ্যে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। আবার কোন কোনও লোককে দেখি, যে তাঁহাদের চরিত্রে জাতীয়তার ভাবই প্রধান। সত্তর বৎসর পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে দুইজন খ্যাতনামা ব্যক্তি বিদ্যমানছিলেন। দুইজনেই স্বাবলম্বন শক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, এবং দুইজনের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ছিল। সেই দুই জনের নাম উল্লেখ করিলেই আমাদের অভিপ্রেত অর্থ সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। একজন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, অপর জন প্রসিদ্ধ রাজা রাধাকান্ত দেব। রামমোহন রায়ের চরিত্রে সার্ব্বভৌমিকতা প্রবল ছিল। তাঁহার কি আর দৃষ্টান্ত দিব? ইটালীর লোকে স্বাধীনতার

যুদ্ধে হারিয়া যাইতেছে শুনিয়া যিনি মনের ক্লেশে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই; স্পেনে স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়াছে শুনিয়া যিনি কলিকাতার টাউন হলে মনের আনন্দে প্রকাশ্য ভোজ দিয়াছিলেন, তাঁহার সার্ব্বভৌমিকতার আবার কি প্রমাণ দিব? তাহার ফল দেখ, ইংরাজ, ফরাসি, মার্কিন সকলেই তাঁহার মহত্ব বুঝিয়াছে। রামমোহন রায় "এন্‌সাইক্লোপিডিয়াতে জগতের মহাপুরুষদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাধাকান্ত দেব ও বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্, কৃতী ও প্রতিষ্ঠাভাজন ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহারও সুখ্যাতি আমাদের মধ্যে রহিয়াছে; কিন্তু তিনি প্রধানতঃ ভারতের হিন্দু ও বঙ্গের বাঙ্গালি ছিলেন। তাঁহাকে বাহিরের লোকে বুঝিতে পারে নাই।

আবার আর একদিকে এই সার্ব্বভৌমিকতা ও জাতীয়তার প্রভেদ দেখ। সাহিত্যে ইহার কেমন বিভিন্ন ফল! ইংরাজী সাহিত্যাভিজ্ঞ সকলেই জানেন, যে চিন্তাশীল পাঠকগণ সকলেই সেক্ষপীয়ারকে মানব সাধারণের কবি (Poet of humanity) বলিয়া থাকে। কেন? কারণ এই, সেক্ষপীয়ার যে সকল রুচি ও ভাব বর্ণন করিয়াছেন, তাহা সার্ব্বভৌমিক, তাহা টেমস্ নদী তীরে যেরূপ আদৃত, সুদূর পূর্ব্বে জাহ্নবীতীরেও সেইরূপ আদৃত। রোমিও জুলিয়েটের প্রেমের মধুরতা, ডেস্‌ডিমোনার প্রণয়ের গভীরতা, ইয়াগোর ধূর্ত্ততা, যুবরাজ হামলেটের আক্রোশ, ম্যাকবেথের লোভ ও তাহার শাস্তি, কে না অনুভব করিতে পারে, কিন্তু সেই ইংলণ্ডেই আর একজন কবি জন্মিয়াছেন, তাঁহার নাম কাউপার (Cowper)। ইঁহাকে সকলে (most English of English poets)—"ইংরাজ কবিদিগের মধ্যে বিশেষ ইংরাজ" বলিয়া থাকে। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই, কাউপার মানব-সাধারণের রুচি ও ভাব সেইরূপ ব্যক্ত করেন নাই, ইংরাজ জাতির বিশেষ বিশেষ রুচি ও ভাব যে পরিমাণে ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে দেখ, ইংরাজ কবিদিগের মধ্যে সেক্ষপীয়ার সার্ব্বভৌমিক; কিন্তু কাউপার সাম্প্রদায়িক।

ধর্ম্ম সকলের মধ্যেও এইরূপ প্রভেদ দেখিবে। এমন কোনও ধর্ম্মই নাই, যাহাতে কিছু না কিছু সার্ব্বভৌমিকভাব নাই, আবার এমন ধর্ম্মও নাই, যাহাতে কিছু না কিছু সাম্প্রদায়িক বা জাতীয় ভাব নাই। অথচ এরূপ দেখি, কোনও ধর্ম্মে সার্ব্বভৌমিক ভাব কিছু অধিক, কোনও ধর্ম্মে বা সাম্প্রদায়িক ভাবটা কিছু অধিক। খ্রীষ্টধর্ম্ম, য়িহুদীধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত, তথাপি খ্রীষ্টধর্ম্মে সার্ব্বভৌমিক ভাব প্রবল, য়িহুদীধর্ম্মে সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবল। য়িহুদী ধর্ম্মের সংস্রবে আর একটা ধর্ম্ম অভ্যুদিত হইয়াছে, তাহা ইস্‌লাম ধর্ম্ম, তাহাতে তাতারের সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবল। খ্রীষ্টধর্ম্মের যে সার্ব্বভৌমিকতা তাহা গ্রীক সভ্যতার সংস্রব জাত ও সেণ্টপলের প্রধান কীর্ত্তি। সে যাহাই হউক, খ্রীষ্টধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক বলিয়া জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছে; য়িহুদী ধর্ম্ম অতি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বাস করিতেছে।

কিন্তু এখানে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, নদী যেমন অতি স্বচ্ছ তুষারময় উৎসে জন্মিলেও যেরূপ ভূমির ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহার রং কিয়ৎপরিমাণে গ্রহণ না করিয়া যাইতে পারে না, তেমনি কোনও প্রবল ধর্ম্মভাব যেরূপ হৃদয়েই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তাহা যেরূপ সমাজ মধ্যে প্রবাহিত হয়, যেরূপে চিন্তার সংস্রবে আসে, তাহার ভাব কিয়ৎপরিমাণে গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে না। এক ব্রাহ্মধর্ম্ম ইংলণ্ডে ও বঙ্গদেশে কি মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, তাহা তুলনা কর। ভয়সি সাহেব যদি কোনও দিন ব্রাহ্মদিগের কীর্ত্তনে উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে এতই বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন যে, দশদিনে সে বিস্ময় মন হইতে যাইবে না। অতএব প্রচলিত ব্রাহ্মধর্ম্মের যেমন একটা সার্ব্বভৌমিক দিক আছে, তেমনি একটা জাতীয় দিকও আছে। ইহার সার্ব্বভৌমিকতা খ্রীষ্টধর্ম্মের সংস্রবে উৎপত্তি হইয়াছে এবং ইহার জাতীয়তা হিন্দুধর্ম্মের গর্ভে জন্মিয়াছে কেবল জাতীয়তা নহে, সাম্প্রদায়িকতাজনিত সংকীর্ণতাও ইহার মধ্যে আছে। সেটুকু অনিবার্য্য ও অতীব প্রয়োজনীয়। ইহা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে। সংক্ষেপে সেই যুক্তি নির্দ্দেশ করিতেছি:—

১ম। কোনও দলের কার্য্যকারিতা, তাহাদের লক্ষ্যের সুনির্দ্দিষ্টতা ও তল্লক্ষ্য সাধনার্থ মনের অনুরাগের উপর নির্ভর করে।

২য়। লক্ষ্যের সুনির্দ্দিষ্টতা ও তৎসাধনে অনুরাগ,—কতিপয় সত্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার উপরে নির্ভর করে।

সুতরাং কতিপয় সত্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগজনিত যে সংকীর্ণতা, তাহা ঐ দলের কার্য্যকারিতার জন্য প্রয়োজনীয়। ইংলণ্ডের ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কবডেন ও ব্রাইট যখন বাণিজ্যের স্বাধীনতা স্থাপনের জন্য মাতিয়াছিলেন, তখন তাহাই ধ্যান, তাহাই জ্ঞান যদি না করিতেন, তাহা হইলে কি কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন? ব্রাহ্মগণ সাম্প্রদায়িক হইতেছেন বলিয়া দুঃখ করা দূরে থাকুক, এই দুঃখ করি যে, আরও সাম্প্রদায়িক হইতেছেন না কেন? ইহার কতিপয় সত্যকে আরও দৃঢ়রূপে ধরিতে পারিতেছেন না কেন? লোকে যাহাই বলুক সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলে চলিবে না, আমরা যেন বজ্রগম্ভীরস্বরে সর্ব্বদা বলিতে পারি, পৌত্তলিকতার বিনাশ, পরব্রহ্মের পূজা, জাতিভেদের বিনাশ, মানবের ভ্রাতৃত্ব —ইহা অগ্রে তৎপরে অপর কথা। সে উদারতা অসার,—অজ্ঞানোচিত ও ঘৃণিত, যাহা এই সত্যদ্বয় হইতে ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টিকে অন্যত্র লইয়া যাইবে। আমরা জানি, ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক, কিন্তু ইহার সাম্প্রদায়িক দিকও আছে, তাহা আমাদের জীবন ও কৃতকার্য্যতার পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়।

আপ্ত-বাক্য ও স্বাধীন চিন্তা।*

আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে, যে সমাজ বহুকাল পূর্ব্বেই অভ্রান্ত শাস্ত্র ও গুরুবাদ খণ্ডন করিয়া আত্মপ্রত্যয় ও যুক্তির উপর ধর্ম্মকে স্থাপন করিয়াছেন, সেই সমাজে বর্ত্তমান বিষয়ের আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন নাই। কিন্তু কতকগুলি কারণে এই বিষয়ের গভীর আলোচনা আবশ্যক বলিয়া

* "তত্ত্ববিদ্যা সভায়" শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ।

বোধ হয়। স্বাধীন চিন্তা থর্ব্ব করিয়া অবিচারিত ভাবে গুরুবাক্যে নির্ভর করিবার প্রবণতা সমাজের কোন কোন বিভাগ বা ব্যক্তির মধ্যে যে দেখা দিয়াছে, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। কিন্তু যাঁহাদের মধ্যে এই প্রবণতা স্পষ্টরূপে দেখা দিয়াছে, কেবল তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই যে আমরা এই বিষয়ের অবতারণা করিতেছি তাহা নহে। যে সমাজের অনেকগুলি সুবিবেচক ও সাধন-পরায়ণ ব্যক্তির মধ্যে এই প্রবণতা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, সেই সমাজ মধ্যে যে এই প্রবণতার বীজ প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন। শরীরের স্থান বিশেষে স্ফোটক উদ্ভূত হইলে বুঝা যায় শরীরের সমগ্র রক্তই কিয়ৎ পরিমাণে দূষিত হইয়াছে। আমাদের সাধারণ অবস্থা দেখিয়াও বুঝা যায় যে স্বাধীন চিন্তা সমাজের জীবনে তাদৃশ বদ্ধমূল হয় নাই। যে সমাজে সাহিত্যানুরাগ নাই, সাহিত্যের উন্নতি নাই, জ্ঞানালোচনায় উৎসাহ নাই, সেই সমাজে উল্লিখিত রোগের স্পষ্ট প্রকাশ না হইলেও বুঝা যাইত যে, সমাজ স্বাধীন চিন্তার মাহাত্ম্য অনেকটা কেবল কথায়ই স্বীকার করিয়াছেন, স্বাধীন চিন্তাকে প্রাণের সহিত আলিঙ্গন করেন নাই। আমাদের অনেক দিন হইতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে যাঁহাদের মধ্যে উক্ত প্রবণতা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে এবং অপর দিকে যাঁহারা ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন, এই উভয় দলের মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিশেষ পার্থক্য নাই। সাধারণভাবে উভয় দলই অল্প বা অধিক পরিমাণে আপ্ত-বাক্যের উপর দণ্ডায়মান। অনেক স্থলেই প্রভেদটা কেবল এই মাত্র যে এক দলের পরতন্ত্রতা স্পষ্ট ও সজ্ঞান; অপর সম্প্রদায়ের পরাধীনতা অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত। অর্থাৎ যাঁহারা ব্যক্তি বিশেষের উপর কোন কোন ব্রাহ্মের অন্ধ নির্ভর দেখিয়া এরূপ নির্ভরের প্রতিবাদ করিতেছেন, আমার বোধ হয় অধিকাংশ স্থলে তাঁহারাও সমাজের নেতা অর্থাৎ আচার্য্য, প্রচারক ও লেখকদিগের কথা, অথবা সমাজ-প্রচলিত সাধারণ মতের উপর তদ্রূপ অন্ধভাবেই নির্ভর করিতেছেন। তবে প্রভেদটা এই যে প্রথমোক্ত দল নিজের পরাধীনতা বুঝিতে পারিতেছেন, শেষোক্ত দল তাহা না বুঝিয়া নিজের অধীন ও অন্ধ মতকে স্বাধীন মত বলিয়া মনে করিতেছেন। ফল সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত দল অপেক্ষা শেষোক্ত দলকে প্রকৃত স্বাধীন চিন্তার দিকে অগ্রসর করা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ, কেন না তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে পরাধীন হইয়াও স্বাধীন চিন্তার মাহাত্ম্য স্বীকার করিতেছেন এবং ইহার উন্নতির পক্ষপাতী। অপর দল সম্বন্ধে এই আশা পোষণ করা যাইতে পারে না।

কিন্তু কেবল স্বাধীন চিন্তার পক্ষ সমর্থনই অদ্যকার আলোচনার বিষয় নহে। যে যে স্থলে বয়স, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার অল্পতা বশতঃ স্বাধীন চিন্তার স্ফূর্ত্তি বা উন্নতি অসম্ভব, সেই সেই স্থলে আপ্ত-বাক্যে বিশ্বাসকে কতটা প্রশ্রয় দিতে হইবে, এবং ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, এই বিষয়ে বিচারের অবতারণা করাও এই প্রবন্ধের অন্যতর উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাধীন চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন স্বাধীন চিন্তার স্ফূর্ত্তি বয়স, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার উপর নির্ভর করে, এবং সমাজভুক্ত সকল ব্যক্তিই যখন পরিপক্ক বয়স্ক, অভিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত নহেন, এবং স্বাধীন চিন্তার অভাবে আপ্ত-বাক্যে বিশ্বাসই যখন ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মজীবন লাভের একমাত্র উপায়, তখন ব্রাহ্মসমাজকে অনেক পরিমাণে আপ্ত-বাক্যে বিশ্বাসের প্রশ্রয় দিয়া চলিতে হইবে, ইহাও অনিবার্য্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই প্রশ্রয়ের সীমা নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

স্বাধীন চিন্তা স্ফুরিত হইবার পূর্ব্বে মানুষ নিজ সমাজ-প্রচলিত মত নিশ্বাস বায়ুর ন্যায় স্বভাবতঃ গ্রহণ করে, ইহার সত্যাসত্যতা বিচার করে না। ব্রাহ্মসমাজ এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত নহেন। হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান বালক বালিকা যেমন হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান সমাজে জাত বলিয়াই হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম বালক বালিকাও তেমনই ব্রাহ্মসমাজে জাত বলিয়াই ব্রাহ্ম। এই নিয়মানুসারেই নাস্তিক পরিবার ও নাস্তিকতার প্রভাব মধ্যে জাত জনষ্টুয়ার্ট মিল্ ধর্ম্মবিশ্বাস-বিহীন হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। বিশ্বাস সম্বন্ধে সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে বিপরীত বিশ্বাসের সংস্রবে না আসিলে পূর্ব্ব বিশ্বাস বিচলিত হয় না। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের বিপরীত বিশ্বাসের আঘাতে এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎপত্তি। যাঁহারা দেশ-প্রচলিত সাকারোপাসনা ও জাতি-ভেদ প্রভৃতি সামাজিক প্রথা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছেন, তাঁহাদের মত-পরিবর্ত্তন অনেক স্থলেই স্বাধীন চিন্তা-প্রসূত, সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রচলিত ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে যে সকল মত সাধারণ, যথা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পূর্ণতা, আত্মার অমরত্ব, উপাসনার আবশ্যকতা, ইত্যাদি সেই সকল মত সম্বন্ধে যে সাধারণ ব্রাহ্মগণ স্বাধীন চিন্তায় আরূঢ় হইয়াছেন তাহা বোধ হয় না। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ মতের সঙ্গে এই সকল সাধারণ মত ও অবিচারিত ভাবে নিশ্বাস বায়ুর ন্যায় গৃহীত হইয়াছিল, এবং যেরূপ অবিচারিত ভাবে গৃহীত হইয়াছিল, আমাদের বিবেচনায় অনেক স্থলেই সেরূপ অবিচারিত ভাবেই পোষিত হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের সাহিত্য, বক্তৃতা, আলোচনা, ও সাধারণ আলোচনাদিতে এই সকল বিষয়ে চিন্তার যেরূপ অপরিপক্কতা দেখা যায়, তাহাতেই এই কথার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা ব্রাহ্ম সাধারণের কথা বলিতেছি, ২।৪ জন বিশেষ চিন্তাশীল ব্যক্তির কথা বলিতেছি না। সাধারণ ব্রাহ্মগণ উপরোক্ত বিশ্বাস সমূহের যুক্তিযুক্ত ভিত্তি দেখাইতে পারেন না, এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিতে কিছু কিছু জ্ঞানের আভাস পাওয়া গেলেও এই সকল বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাস সাধারণের গৃহীত কোন বিজ্ঞান শাস্ত্রে পরিণত হয় নাই। ইহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে এই সকল বিষয়ে ব্রাহ্মগণ স্বাধীন চিন্তায় আরূঢ় হন নাই, হিন্দু মুসলমান প্রভৃতির ন্যায় তাঁহারাও এই সকল বিষয়ে লোক-প্রচলিত মত অবিচারিতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে একটা মত প্রচলিত আছে,

তাহা আমাদের নিকট ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। সেই মতটা এই যে, এই সকল মূল সত্যে সাধারণের যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস সহজজ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয়-মূলক। সুতরাং এই বিশ্বাসকে অন্ধ বা আপ্ত-বাক্যে বিশ্বাস বলা যাইতে পারে না। সহজ-জ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয়ের মতকে অস্বীকার করা দূরে থাকুক, আমরা এই মতকে গভীর দর্শন-সম্মত বলিয়া মনে করি। কিন্তু সেই দর্শন-সম্মত মত এই যে ধর্ম্মের মূল বিশ্বাস সমূহ সভ্য, অসভ্য, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, নাস্তিক, আস্তিক সকলের চিন্তাকে অনতিক্রমনীয়রূপে, অথচ অস্ফুট অজ্ঞাতভাবে নিয়মিত করিতেছে। অসভ্য, অজ্ঞানীর মধ্যে এই বিশ্বাস স্পষ্টতঃ দেখা যায় না বটে, কিন্তু দার্শনিক বিশ্লেষণ দ্বারা দেখাইতে পারা যায় যে এই সকল বিশ্বাস অজ্ঞাতভাবে তাহাদেরও সমুদয় সংস্কারের মূলে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু প্রচলিত সহজ জ্ঞানের মত এই যে "এই সকল বিশ্বাস সজ্ঞানভাবে সকলেরই মধ্যে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু বস্তুতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, জগতের সহস্র সহস্র উপধর্ম্ম বিশ্বাসী সজ্ঞানভাবে এই সকল মত পোষণ করে না। শত শত চিন্তাশীল নাস্তিক সজ্ঞানভাবে এবং স্পষ্টরূপে এই সকল বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা বিশ্বাসী বলিয়া পরিগণিত, তাঁহারাও ইন্দ্রিয় বোধ-লব্ধ বিশ্বাস সমূহের ন্যায় এই সকল বিশ্বাসকে অনতিক্রমনীয়, অপরিহার্য্য বলিয়া অনুভব করা দূরে থাকুক, পরীক্ষা, বিপদ ও সংসারের কোলাহলে পড়িয়া অনেক সময়েই এই সকল সত্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হন। তাঁহাদের নিকট এই সকল সত্য কখনই ইন্দ্রিয়-বোধ-লব্ধ সত্যের ন্যায় স্পষ্ট ও ধ্রুব বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং প্রচলিত বিশ্বাসে সহজ-জ্ঞান-ঘটিত বিশ্বাসের বিশ্বজনীনত্ব কি অনতিক্রমনীয়ত্ব কোন লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রচলিত বিশ্বাস শাস্ত্র বা গুরূপদেশ-ঘটিত অথবা পরম্পরাগত জনশ্রুতি-মূলক বিশ্বাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। জ্ঞানালোচনা দ্বারা এই বিশ্বাস যতদিন পর্য্যন্ত আপনাকে মৌলিক ও প্রকৃতি নিহিত বলিয়া বুঝিতে না পারে এবং অনতিক্রমনীয় বলিয়া অনুভব না করে, ততদিন পর্য্যন্ত ইহাকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে যাঁহারা আপনাদের বিশ্বাসকে স্পষ্ট, সুনির্ণীত, অপরিহার্য্য স্বাধীন জ্ঞান বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে না পারেন, তাঁহারা গুরুবাদের যতই তীব্র প্রতিবাদ করুন্ না কেন, সে প্রতিবাদ তত কার্য্যকর হইবে না। গুরুবাদী এরূপ প্রতিবাদকারীগণকে সহজেই বলিতে পারেন যে "যাহারা স্ফটিক-গৃহে বাস করে তাহাদের পক্ষে অন্যের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করা কদাচ নিরাপদ নহে।"

প্রচলিত আপ্ত-বাক্যে বিশ্বাস মৌলিক আত্মপ্রত্যয় নহে, আমরা ইহাই বলিলাম; আপ্তবাক্যে বিশ্বাসের একান্ত নিন্দা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। অল্প বয়স, অল্প অভিজ্ঞতা ও অল্প শিক্ষার অবস্থায় আপ্ত-বাক্যে বিশ্বাস স্বভাবতঃই হৃদয়ে স্থান পায় এবং নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে জীবনে প্রভূত সুফল প্রসব করে। এই আপ্ত-বাক্যে বিশ্বাসকে অসময়ে চেষ্টা করিলেও ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় না এবং ভাঙ্গিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্তও নহে। ইহা যতদিন কার্য্যকর হয় হউক, যতদিন সম্ভব বিশ্বাসীকে সুনীতি-পরায়ণ করুক, সাধনশীল করুক, সরল প্রেম ভক্তিদ্বারা হৃদয়কে সরস করুক। যতদিন পর্য্যন্ত স্বাধীন চিন্তা স্ফুরিত না হয়, আত্মা ব্রহ্মজিজ্ঞাসু না হয় এবং বুদ্ধি ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এরূপ বিশ্বাসকে ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে অনিষ্ট বই ইষ্ট নাই; সুতরাং আমরা এরূপ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পক্ষপাতী নহি। কিন্তু ধর্ম্মের এই বাল্যাবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে কিরূপ প্রণালীতে ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে তাহা স্পষ্ট বুঝা কঠিন। ব্রাহ্মসমাজ শাস্ত্র ও গুরুর আধিপত্য বিনাশ করিয়া অশিক্ষিত ও অজ্ঞানীদিগের উপর কোন্ শক্তির আধিপত্য বিস্তার করিবেন, শাস্ত্র ও গুরুর দোহাই দেওয়া হইতে বিরত হইয়া, সত্যপ্রচারে কাহার দোহাই দিবেন, এই বিষয় বিচার-সাপেক্ষ এবং এ বিষয়ে বিচার করিয়া একটা প্রণালী নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।

কিন্তু এই ধর্ম্ম ও সমাজবিপ্লবের সময়ে, উজ্জ্বল জ্ঞান বিজ্ঞানের সময়ে, সাধারণ শিক্ষা ও স্বাধীনতার বহুল প্রচারের সময়ে, আপ্ত-বাক্যে বিশ্বাস যে বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে অবিচলিত থাকিবে তাহা বোধ হয় না, বিশেষতঃ প্রতিবাদে যে সমাজের জন্ম, পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তা যে সমাজ মধ্যে অপেক্ষাকৃত বহুলরূপে প্রচারিত হইয়াছে, সেই সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অতি অল্প বয়সেই আপ্ত-বাক্যে বিশ্বাস অল্লাধিক পরিমাণে বিচলিত হইয়া যায়। যখন এই সকল বা এতাদৃশ অন্যান্য কারণে বিশ্বাসের বাল্যাবস্থা তিরোহিত হইয়া যৌবনাবস্থা উপস্থিত হয়, তখন ধর্ম্মজীবন এই ত্রিবিধ পথের কোন এক পথ অবলম্বন করে। প্রথমতঃ, কেহ কেহ আপ্ত-বাক্যে বিশ্বাস হারাইয়া কোন উৎকৃষ্টতর উপায়ে উজ্জ্বলতর বিশ্বাস লাভের চেষ্টা করেন না; সন্দিগ্ধমনা ও অর্দ্ধ-বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী হইয়া, শুষ্ক ও উন্নতি-বিহীন জীবন লইয়া সমাজ মধ্যে বাস করেন। এরূপ পথকে কেহই যুক্তিযুক্ত মনে করিবেন না। সুতরাং ইহার সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, কেহ কেহ ধর্ম্মচিন্তার এই বাল্যাবস্থার তিরোধানকে ভয়ের সহিত নিরীক্ষণ করেন এবং ইহাকে দুর্নীতি ও শুষ্কতার আকর মনে করিয়া সেই বাল্যাবস্থার সংরক্ষণে যত্নবান্ হন। প্রাচীন শাস্ত্র ও গুরুতে লোকের অবিশ্বাস অপরিহার্য্য জানিয়া নূতন গুরু ও শাস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হন। এমন কি এরূপ শাস্ত্র বা গুরুর উপর অন্ধ নির্ভর যুক্তিদ্বারা সমর্থন করিতেও কেহ কেহ অগ্রসর হন। কিন্তু আপ্ত-বাক্যে বিশ্বাসের উপর নির্ভর একবার বিচলিত হইলে এবং স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ হইলে এরূপ গুরুবাদ স্থাপন কেবল হাস্যজনকই হয়। কোন বিশেষ ব্যক্তি আমাকে ব্রহ্ম লাভের সাহায্য করিবেন, আমার মুক্তিপথের সহায় হইবেন, এরূপ বিশ্বাস করিতে হইলে পূর্ব্বাহ্নে আমাকে গুরু-নিরপেক্ষভাবেই এই বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, ঈশ্বর মঙ্গলময় ও পরম প্রাপ্যবস্তু, মুক্তিলাভ সম্ভব এবং ঈশ্বর আমার মুক্তি-বিধাতা। সুতরাং এরূপ গুরুবাদেও স্বাধীন চিন্তারই প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। তৎপরে সেই গুরুর

উপযুক্ততা নির্দ্ধারণেও অনেক পরিমাণে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন ধর্ম্মাভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়। এতদূর স্বাধীন-চিন্তা ও স্বাধীন অভিজ্ঞতা যিনি লাভ করিয়াছেন, যিনি অন্ধভাবে নহে, কিন্তু বাস্তবিকই স্বাধীন বুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া গুরু-নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তিনি গুরূপদেশে উপকার লাভ করিতে পারেন সন্দেহ নাই, গুরু-প্রদর্শিত সাধন-প্রণালী শ্রদ্ধার সহিত অবলম্বন করিয়া পরীক্ষা করিতে পারেন সন্দেহ নাই, গুরু-প্রচারিত সত্য শ্রবণ করিয়া নিজের যুক্তি, অনুভব ও অভিজ্ঞতার সহিত মিলাইয়া গ্রহণ করিতে পারেন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার পক্ষে অন্ধ, অবিচারিতভাবে গুরু-প্রচারিত মত গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব। তিনি যদি বলেন যে, যুক্তি এরূপ অন্ধ নির্ভরের পক্ষপাতী, তিনি যদি বলেন যে, যুক্তি যে গুরুর আশ্রয় লইতে বলে, সে গুরুর বাক্য অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইলেও গ্রহণ করা উচিত, তবে ইহাই বলা হইল যে, যুক্তি অযৌক্তিক কথা গ্রহণ করিতে বলে। ইহার ন্যায় স্ববিরোধী অসঙ্গত কথা আর কি হইতে পারে?

পূর্ব্বোল্লিখিত তৃতীয় পথ স্বাধীন চিন্তা। প্রকৃত সত্যানুরাগী ব্যক্তি আপ্ত বাক্য-জনিত সংস্কারে সন্দিহান হইয়া এই সন্দেহকে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন না, বিশ্বাস সম্বন্ধে মনের উপর কোন বলপ্রয়োগ করেন না। তিনি জানেন এরূপ বলপ্রয়োগে অন্তরের গূঢ় সন্দেহ দূর হয় না, হৃদয় প্রকৃত বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হয় না। তিনি কোন সামাজিক প্রয়োজনে নিজ মনের সরল ও নির্দ্দোষ সন্দেহের অপলাপ করেন না, তিনি এরূপ অপলাপকে ভণ্ডতা ও ভীরুতা বলিয়া মনে করেন। মনের সরল সন্দেহ ও বিশ্বাস তাঁহাকে কোন সমাজের অন্তর্গত বা কোন্ সমাজের বহির্গত করিবে, তিনি তাহা দেখেন না, আত্মার সরলতা ও সাধুতা রক্ষাই তাঁহার একমাত্র যত্নের বিষয়। তিনি প্রাচীন শাস্ত্র ও গুরুর উপর অন্ধনির্ভররূপ গলিত শব পরিত্যাগ করিয়া জীবিত গুরুর উপর নির্ভর রূপ সদ্য শব আশ্রয় করেন না। তিনি জানেন উভয়ই মৃত, ধর্ম্মজীবনের পক্ষে পর-মুখ-শ্রুত মৃত মতের প্রয়োজন নহে, স্বাধীন-চিন্তা-লব্ধ, সাক্ষাৎ অনুভব-লব্ধ জীবন্ত সত্যেরই প্রয়োজন। তিনি প্রাচীনকালের সঞ্চিত চিন্তাও অভিজ্ঞতা এবং বর্ত্তমান ধার্ম্মিকদিগের উপদেশকে অগ্রাহ্য করেন না। কিন্তু তিনি এই সমুদায়কে তাঁহার স্বাধীন চিন্তাস্ফুরণের সহায়রূপেই গ্রহণ করেন, এই সমুদায়ের উপর অন্ধভাবে নির্ভর করেন না। তিনি ধর্ম্মসাহিত্য ও ধর্ম্মালোচনার সাহায্যে স্বাধীন-চিন্তার পথে অগ্রসর হইয়া নিজের সাক্ষাৎ অনুভব দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্য আবিষ্কারের জন্য যত্নবান্ হন, এবং যতদিন না ধর্ম্মজীবনের উপযোগী প্রত্যেক সত্য নিজের সাক্ষাৎ অনুভবের বিষয় হইয়াছে, ততদিন নিশ্চিন্ত হন না। আমাদিগের কাছে এই পথই একমাত্র সত্যপথ বলিয়া বোধ হয়। এই পথের প্রথমাংশ সন্দেহ, শুষ্কতা, অশান্তি এবং কঠোর-চিন্তা ও অধ্যয়ন-জনিত ক্লেশে পরিপূর্ণ। সেই জন্যই যাহারা ধর্ম্মজগতে আসিয়াও সুখ-লালসা পরিত্যাগ করিতে পারে না, পরন্তু ধর্ম্মসাধনকে সুখ-লালসা পরিতৃপ্তির উপায় রূপেই গ্রহণ করে, তাহারা এই পথকে পছন্দ করে না এবং এই পথে ২।৪ পা অগ্রসর হইয়াও নিজের সুখ লালসা ও আলস্য বশতঃ ফিরিয়া আসে। সত্যই যাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য, সত্যের জন্য যাঁহারা সমুদায় বাহিক ও আন্তরিক ক্লেশ সহ্য করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই এই পথে চলিতে পারেন এবং সত্যের সাক্ষাৎ দর্শনরূপ গম্যস্থানে উপনীত হইতে পারেন। ব্যক্তিগত স্বাধীন-চিন্তা প্রথমে পরস্পরের বিরোধী হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। কিন্তু এই অনৈক্যে কেবল ইহাই প্রকাশ পায় যে, এরূপ স্বাধীন-চিন্তা এখনও প্রকৃতরূপে স্বাধীন হয় নাই। স্বাধীন-চিন্তার অর্থ—যে চিন্তা স্ব, অর্থাৎ নিজের অধীন, পরের অধীন নহে। এই 'স্ব'ও 'পর'এর প্রকৃত অর্থ বুঝা আবশ্যক। 'পর' অর্থ শাস্ত্র, 'পর' অর্থ গুরু, 'পর' অর্থ ধর্ম্মবন্ধু, 'পর' অর্থ জনশ্রুতি। কিন্তু কেবল এই সমুদায় 'পর' হইতে মুক্ত হইলেই চিন্তা প্রকৃতরূপে স্বাধীন হইল না এবং সকলের ঐক্যস্থলরূপ নিরপেক্ষ সত্যলাভের উপযোগী হইল না। আরও 'পর' আছে। আমার আলস্য, জড়তা 'পর'; ইহাও সত্য-দর্শনের বিরোধী; আমার সুখপ্রিয়তা 'পর,' ইহাও সত্যকে অসত্য ও অসত্যকে সত্য বলিয়া ভ্রম জন্মায়। আমার কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার প্রভৃতি প্রবৃত্তিনিচয়ও 'পর,' ইহারা আত্মার চক্ষুকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সত্যদর্শন করিতে দেয় না। এই সমস্ত 'পর'এর অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া চিন্তা যখন নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক ও জাগ্রত ধর্ম্মবুদ্ধি বা প্রজ্ঞার অধীন হয়, তখনই ইহা প্রকৃতরূপে স্বাধীন হয়। এই নির্ম্মলা প্রজ্ঞাই আমাদের প্রকৃত 'স্ব,' আমাদের প্রকৃত 'আত্মা'। এই নির্ম্মলা প্রজ্ঞা সমুদায় মানবের অন্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া মানবকে প্রকৃত সত্যে লইয়া যাইতেছেন। যাঁহাদের চিন্তা এই প্রজ্ঞার অধীন হয়, তাঁহাদের মধ্যে অনৈক্য থাকিতে পারে না। তাঁহারা অবশ্যম্ভাবিরূপেই এক ধ্রুব, অপরিবর্ত্তনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কেননা এই প্রজ্ঞা অন্য কিছু নহে, আর কেহ নহেন; যিনি এক অদ্বিতীয় ধ্রুব সত্য, যিনি সমুদায় সত্যের আশ্রয়, ইনি সেই সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ আলোক। এই প্রজ্ঞাই ধর্ম্মজীবনের একমাত্র পরিচালক। স্বাধীন ধর্ম্ম সাধক মাত্রেই এই প্রজ্ঞা দেবতাকে বলেন—

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাক পথহারা॥"

সমালোচনা।

সম্প্রতি "কৌমুদী" নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহা শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত। পত্রিকা খানিতে নূতন কি আছে, তাহা আমরা এখনও ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না—স্থূলতঃ বুঝিতেছি, সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মপ্রচার করা ইহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের ভাবটা ইহাদের মনে কি প্রকার, তাহা বুঝা যাইতেছে না। সম্পাদক প্রথম সংখ্যার একস্থানে বলিয়াছেন—"জগতের সকল ধর্ম্মই বিধাতা প্রতিষ্ঠিত। কোন ধর্ম্মই

অভ্রান্ত সত্যের অনন্তাধার বা মানবের অনন্ত মুক্তিপন্থা নহে। সকল ধর্ম্মেই সত্য আছে।” শব্দের পশ্চাতে ছুটিলে হইবে না, একটু ধীরচিত্তে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। “জগতের সকল ধর্ম্মই বিধাতা প্রতিষ্ঠিত”—এ উক্তির অর্থ কি? জগতের ধর্ম্ম বলিলে, কতকগুলি মতের সমষ্টি, কতকগুলি অনুষ্ঠান ও ক্রিয়ার সমষ্টি ও কতকগুলি নীতি বা আচারের সমষ্টি বুঝায়। কৌমুদীর লেখকগণ কি বাস্তবিক বিশ্বাস করেন যে, প্রত্যেক ধর্ম্মের সমুদায় মত, অনুষ্ঠান ও আচার সমষ্টি ভ্রমশূন্য ও ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত? অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়ের অবতারবাদ, অনন্তনরকবাদ, ত্রীশ্বরবাদ, সয়তানবাদ প্রভৃতি মত; জলাভিষেক, প্রভুর ভোজ প্রভৃতি অনুষ্ঠান ও রবিবারকে পবিত্রবাররূপে রক্ষা করা প্রভৃতি আচার, এবং মুসলমানের কোরাণের অভ্রান্ততাতে বিশ্বাস, মহম্মদের প্রেরিতত্বে বিশ্বাস, স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাস প্রভৃতি মত, ত্বকচ্ছেদ প্রভৃতি অনুষ্ঠান, রোজা নমাজ প্রভৃতি আচার সমুদয় কি ভ্রমপ্রমাদশূন্য ও ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত? যদি তাহা হয়, তবে তৎসমুদায় আমাদের প্রত্যেকেরই অবলম্বনীয়। লেখকদিগের বোধ হয় তাহা অভিপ্রায় নহে। কারণ পরেই লিখিয়াছেন, “কোনও ধর্ম্মই অভ্রান্ত সত্যের আধার নহে।” এবং “সকল ধর্ম্মেই সত্য আছে।” বেশকথা, সকল ধর্ম্মেই সত্য আছে, তেমনি ভ্রান্তি বা অসত্যও আছে। আচ্ছা যাহা ভ্রান্তি তাহাও কি ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত? অবশ্য এরূপ কেহ বলিবেন না। তবে কি এই দাঁড়াইতেছে যে, সকল ধর্ম্মেই সত্য আছে এবং সেই সত্যাংশ ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত? ইহা ত ব্রাহ্মধর্ম্মের পুরাতন মত। ইহার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইবার প্রয়োজন কি? এতদুপলক্ষে আমাদের একটী ঘটনা স্মরণ হইতেছে। একবার একজন ইউরোপীয় খ্রীষ্টান মিশনারির সহিত একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের কয়েকদিন বিচার হইয়াছিল। “ঈশ্বর সকল দেশে ও সকল জাতিমধ্যে সত্য প্রকাশ করিয়াছেন।” এই বিষয়ে বিচার চলিতেছিল। শেষ দিনে ব্রাহ্মপ্রচারক বলিলেন —“আচ্ছা আপনি যীশুর উক্তির মধ্যে এমন কিছু দেখান, যাহা আপনি মনে করেন, অন্য কোনও দেশে ও অন্য কোনও সাধুর মুখদ্বারা প্রকাশিত হয় নাই। তখন ইউরোপীয় মিশনারি মহাশয় বলিলেন—“অপরের নিকট তুমি যেরূপ ব্যবহার চাও, অপরদিগকে সেইরূপ ব্যবহার দেও”—ইহার অনুরূপ বাক্য কোন্ শাস্ত্রে বা কোন্ দেশে প্রকাশিত হইয়াছে?” ব্রাহ্ম প্রচারক উঠিয়া গিয়া চীনদেশীয় সাধু কংফুচের একখানি গ্রন্থ আনয়ন করিলেন। ইউরোপীয় মিশনারি দেখিলেন যে, তাহা তাঁহারই ন্যায় একজন খ্রীষ্টীয় মিশনারির দ্বারা অনুবাদিত সুতরাং পুস্তকের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ রহিল না। তৎপর ব্রাহ্মপ্রচারক একটী স্থান বাহির করিলেন, সে স্থানটীতে এরূপ লিখিত হইয়াছে, যে একবার কংফুচের কতিপয় শিষ্য গুরুসন্নিধানে আসিয়া কহিল “গুরো আপনি আমাদিগকে অনেক ধর্ম্মনীতি উপদেশ দিয়াছেন, আপনার সকল উপদেশের সার যাহা, তাহার নিষ্কর্ষ করিয়া আমাদিগকে বলুন।” কংফুচ বলিলেন—“যে ব্যবহার অন্যের নিকট চাও না, সে ব্যবহার অপরকে দিও না।” ব্রাহ্মপ্রচারক সেই অংশটুকু পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহাতে এবং যীশুর উপদেশে প্রভেদ কি?” ইউরোপীয় মিশনারি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন, “কোনও প্রভেদ নাই।” তখন ব্রাহ্মপ্রচারক জিজ্ঞাসা করিলেন, “যাহা সত্য তাহা ঈশ্বরের প্রকাশিত, না সয়তানের প্রকাশিত?” ইউরোপীয় মিশনারি বলিলেন— “অবশ্য ঈশ্বরের প্রকাশিত।” মীমাংসা—“কংফুচ যীশুর পাঁচ শতের অধিক বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন, তবে দেখুন যীশু জন্মিবার পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বর ঐ সত্য চীনদেশে প্রকাশ করিয়াছেন।” বিবাদটা এই স্থানে থামিয়া গেল। ইহা কি ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষে নূতন কথা যে, সকল ধর্ম্মেই সত্য আছে? মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের কার্য্যের ভিত্তিভূমি তাহাই ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যদিও হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশে হিন্দু শাস্ত্রকেই প্রধানরূপে অবলম্বন করিয়াছেন, তথাপি যাঁহারা তাঁহার সহিত একদিন কথা কহিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, এই উদারসত্যে তাঁহার কতদূর আস্থা। হাফেজের নামে তাঁহাকে উন্মত্তপ্রায় হইতে যাঁহারা একবার দেখিয়াছেন, তাঁহারা আর তাঁহার উদারতাতে সন্দেহ করিবেন না। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ত কথাই নাই, তিনি এই ভাবের প্রচারক ছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ ইহার দেদীপ্যমান প্রমাণ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই উদার ভূমি হইতে এক দিনের জন্যও বিচলিত হন নাই। তবে এমন নূতন কথা কি আসিল, যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইতে হয়? আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

আর এক স্থানে লিখিত হইয়াছে—“সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্ম-জীবন গঠনই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনার প্রধান লক্ষ্য।” ইহাতেই বুঝিতে হইবে, জগতে যত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম আছে, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্ম জীবন সাধিত হয় না, সেই জন্য এই সার্ব্বভৌমিক পত্রিকার প্রয়োজন। অথচ সম্পাদক আর এক স্থানে বলিয়াছেন—“হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টীয়ান, মুসলমান, জৈন, পার্শী, জগতের প্রচলিত প্রধান প্রধান ধর্ম্মমণ্ডলীর সকলের মধ্যেই অল্প বিস্তর সংখ্যক বিগতবাসনা, বিগতশোক, বিগতপাপ, বিগতসন্দেহ ভগবদ্ভক্ত রহিয়াছেন।” বিগতবাসনা, বিগতশোক, বিগতপাপ, বলিতে ত জীবন্মুক্ত লোক বুঝায়। যাঁহারা জীবন্মুক্ত লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্ম-জীবন লাভ করেন নাই, এ কেমন? এ সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্ম-জীবন তবে কিরূপ, যাহা না পাইয়াও মুক্তি লাভ করা যায়? আর যদি হিন্দু, খ্রীষ্টীয়ান প্রভৃতি ধর্ম্মে লোকে জীবন্মুক্তি লাভ করিল, তাহা হইলে কৌমুদীর লেখকগণের সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্মজীবন দিবার জন্য এতটা আগ্রহ ও পরিশ্রমের প্রয়োজন কি? ফল কথা এই, সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্মজীবন একথাও ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা। ব্রাহ্মগণ চিরদিন বলিয়া আসিতেছেন, বুদ্ধের যোগ, যীশুর বিশ্বাস, চৈতন্যের প্রেম এই সকলের সমাবেশ করিতে হইবে, যদিও এই সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্মজীবন এক ব্যক্তিতে সাধিত হইতে পারে কিনা তাহা বিচার সাপেক্ষ। যাহাহউক আমরা

কৌমুদীর উদ্দেশ্য সকলের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অতিরিক্ত নূতন কথা এমন কিছু দেখিলাম না, যে জন্ত একখানি স্বতন্ত্র কাগজের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়। তবে একটা কথা লিখিয়াছেন, যাহাতে ইহার জীবনের কিয়ৎপরিমাণে সার্থকতা দেখা যাইতেছে। সম্পাদক বলিযাছেন—"আট বৎসর পরে কাশীধামে ইহার (চিকাগো মহাধর্ম্মমণ্ডলের) দ্বিতীয় অধিবেশন হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই আট বৎসর কাল ইহার মহান্ আদর্শ ও উদার ভাবকে লোক সমক্ষে উজ্জলরূপে ধারণ করিয়া রাখিতে হইবে। নতুবা চিকাগো মহাধর্ম্মমণ্ডলের মহতী আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এই মহতী আশা হৃদয়ে ধাবণ করিয়া * * * কৌমুদী জন্মগ্রহণ করিল।" ইহা একটা কাজ বটে। আশাকরি, আমাদের শ্রদ্ধেয়বন্ধু বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমেরিকাপ্রাপ্ত অর্থ হইতে এই পত্রিকাব বিশেষ সহায়তা করিবেন। কারণ ইহা সেই মহাধর্ম্মমণ্ডলেবই কার্য্য করিবে।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকদিগের মতামতেব জন্ম সম্পাদক দায়ী নহেন)।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

আপনাব "ব্রাহ্মণত্বের মূল কথা"র প্রতিবাদে দ্বারিক বাবু প্রসঙ্গ ক্রমে সাম্যবাদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা আমার কাছে অতিশয় আপত্তিজনক বলিয়া মনে হইয়াছিল। প্রত্যেক ব্রাহ্মই সাম্যবাদী বলিয়া পরিচয় দেন অথচ সাম্যের মতটী আমাদের মধ্যে ভাল পরিষ্কার নাই, তাহার এই যে প্রথম প্রমাণ পাইলাম তাহাও নহে। বিষয়টী অতিশয় গুরুতর। সাম্যবাদের বিকৃত অর্থ হইতেই নিহিলিজম্, সোসিয়ালিজম্ ও কমিউনিজমের উৎপত্তি। একদিকে উৎকট সাম্যের উপাসনা হইতে যেমন বিপ্লবের বহ্নি জ্বলিতেছে, তেমনই অপর দিকে স্বেচ্ছাচার মূলক কৃত্রিম বৈষম্যে সমাজের স্বাধীনতা ও জীবন পর্য্যন্ত নিষ্পেষিত হইতেছে। এই সকল মনে করিয়াই আমার প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে অনেক কথা ছিল, যাহা দ্বাবিক বাবুর কোন কথার প্রতিবাদ নহে এবং তাহার প্রতি লক্ষ করিয়াও লিখিত হয় নাই।

আমার প্রবন্ধে সংক্ষেপতঃ তিনটী কথা ছিল :—

(১) সাম্যবাদের অর্থ মানুষের প্রকৃতিগত কতকগুলি অধিকারের ক্ষমতা। সমাজের একশ্রেণী অপর শ্রেণী হইতে সেই সকল অধিকার হরণ করিতে পারে না। জন্মগত কৃত্রিম অধিকার দূর করাই সাম্যবাদের উদ্দেশ্য।

(২) সকল মানুষ সকল বিষয়ে কদাচ সমান নহে। বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্রে মানুষে মানুষে বিস্তর প্রভেদ। সমাজে গুণের পুরস্কার থাকা সর্ব্বথা বিধেয়। ইহাকে যদি কেহ বৈষম্য সৃষ্টি বলেন, তবে বলা যাইতে পারে যে, এক অর্থে বৈষম্য, সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(৩). সমাজ গুণী ব্যক্তিকে যে সম্মান বা অধিকার প্রদান করিবে, তাহা বংশগত করা উচিত নহে। একবার বংশগত হইলে পরে যোগ্যতা সত্ত্বেও বাহিরের লোকের ঐরূপ সম্মান ও অধিকার লাভ করা কঠিন হইয়া উঠে, সুতবাং গুণের পুরস্কার হয় না। বিজ্ঞান ও জাতিভেদের বিরোধী। কোন গুণই সমান ভাবে সন্তান সন্ততিতে অনুস্যুত হয় না এবং অর্জ্জিত কোন গুণই আদৌ বংশানুসারী নহে।

গত ১লা ভাদ্রের তত্ত্ব-কৌমুদীতে দ্বারিক বাবু আমার প্রবন্ধের একটী প্রতিবাদ করিয়াছেন। মূল কথায় সহিত তাঁহার বড় মতভেদ নাই, কিন্তু আমার প্রবন্ধের তিনি যে ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইচ্ছা করিলেই যে কেহ মহাপুরুষ হইতে পারে না,—এ কথার অর্থ কাহারও প্রতি কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বার রুদ্ধ করা নয়। বাস্তবিক কে কত বড় হইতে পারে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানা থাকে না, তবে উচ্চ আশা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে দোষ কি, বাধা কোথায়? সুতরাং আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা উন্নতির বিরোধী নহে, চেষ্টারও প্রতিরোধক নহে। কিন্তু "মানুষ যাহা করিয়াছে (অপব) মানুষ তাহা করিতে পারে" এ প্রবচন সত্য বলিয়া মানি না। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সেক্ষপীয়র হওয়া সম্ভব হইতে পারে, কাহারও পক্ষেই আশা ও যত্ন করায় দোষ নাই; কিন্তু যে কেহ ইচ্ছা করিলেই সেক্ষপীয়র হইতে পারে না। দ্বারিক বাবু বলেন যে, "এক ব্যক্তির পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছে, অপর ব্যক্তির পক্ষেও তাহা অসম্ভব নহে; সম্ভব কি, অসম্ভব তাহা চেষ্টা দ্বারাই নিরূপিত হয়।" অর্থাৎ এক ব্যক্তি যাহা করিয়াছে, অপর ব্যক্তি তাহা পারে কি না, সে চেষ্টা করিয়া না দেখিলে বলা যায় না,—পারিতেও পারে, নাও পারে। সত্য কথা—তাহা তর্ক নহে। চেষ্টা করিলে সকলেই মহাপুরুষ হইতে পারে কি না ইহাই বিচার্য্য। দ্বারিক বাবু উপরিউক্ত প্রবচনেব যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহার সহিত সাম্যবাদেব আর বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উপলব্ধ হয় না।

তাঁহাব আর এক কথা এই যে, সমদর্শী ঈশ্বর কাহাকেও উৎকৃষ্ট কাহাকে নিকৃষ্ট করিয়া সৃজন করেন নাই, মানুষে মানুষে যে স্বাভাবিক প্রভেদ আছে, তাহা উৎকর্ষাপকর্ষের জনক নহে, তাহা প্রকার ভেদমাত্র, তবে যে কেহ ভাল, কেহ মন্দ দেখা যায়, তাহা সমাজ বংশ ও অবস্থার ফল —সে সমুদায় কৃত্রিম বৈষম্য, চিরস্থায়ী প্রভেদ নয়। তিনি আবও বলিয়াছেন যে, এক শতাব্দীতেই এই প্রকার প্রভেদ দূব করা যাইবে না। এ সকল কথাও ভাল বুঝিলাম না। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, ধনী নির্ধন, ভদ্রাভদ্রের প্রভেদই কৃত্রিম বলিয়া মনে করি, কিন্তু সাধু অসাধু, বুদ্ধিমান্ নির্ব্বোধ, অলস ও অধ্যবসায়ীর ভিন্নতা যে সম্পূর্ণ অবস্থা বংশ ও সমাজের ফল তাহা স্বীকার করিতে পারি না। তাহাই যদি হয়, তবে ত এ প্রকার প্রভেদ চিরস্থায়ী, কারণ অবস্থাও বংশ যে কখন সকলের পক্ষে সমান হইয়া যাইবে, তাহা সোসিয়ালিষ্টদিগেরও কল্পনার অতীত। আর একই পিতামাতার সন্তানদিগের মধ্যে এমন কি যমজ সন্তানদিগের মধ্যেও যখন সকলকে সমান ভাল লোক, বুদ্ধিমান বা যত্নশীল দেখা যায় না, তখন কেমন করিয়া বলিব যে, এই সকল গুণেব ভিন্নতা বংশ অবস্থা ও সমাজগত বৈষম্যের ফল? আবও কথা আছে, সমদর্শী ঈশ্বর একটী পক্ষীকে তজ্জাতীয় আর একটী পক্ষী অপেক্ষা অধিক পালক দিয়া শীত হইতে রক্ষা করেন কেন? একটী পতঙ্গের রং আর একটী পতঙ্গ হইতে বিভিন্ন করিয়া পক্ষীর গ্রাস হইতে রক্ষা করেন কেন? পণ্ডিতেরা বলেন যে, জীবমাত্রেরই এমন কোন গুণ নাই, দেহের এমন অংশ নাই, যাহাতে পরস্পরের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষিত না হয়। যখনই এই প্রকার ভিন্নতা প্রাণী বা উদ্ভিদ বিশেষের পক্ষে অনুকূল হয়, তখনই উহা জীবন সংগ্রামে তজ্জাতীয় অন্যান্য উদ্ভিদ বা প্রাণী হইতে প্রবল হয়। এই ইতরবিশেষ ঈশ্বরেরই কার্য্য। ইহা যদি তাঁহার সমদর্শীতার বিরোধী না হয়, তবে মানুষে মানুষে যে গুণের প্রভেদ লক্ষিত হয়, তাহাই বা তাঁহার সমদর্শীতার বিরোধী হইবে কেন? ঈশ্বর সত্য স্বরূপ। তিনি মিথ্যা মুখের চাটুকারিতায় যে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন, তাহাও মনে করা অপরাধ।

আমার পত্র দীর্ঘ হইয়া পড়িল, সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। আরও দু একটী কথা উল্লেখের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তাহার স্থানাভাব।

বিনীত,
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
চট্টগ্রাম।

ব্রাহ্মসমাজ।

দুর্ভিক্ষে সাহায্য দান—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নির্দ্দেশ অনুসারে বাবু হরিমোহন ঘোষাল ফরিদপুরের অন্তর্গত মাদরা নামক স্থানে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগকে চাউল বিতরণ করিতেছেন। যথাসময়ে চাউল বিতরণ আরম্ভ না করিলে কেহ কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইত। অন্নাভাবে অত্যন্ত হাহাকার উঠিয়াছে। পরমেশ্বর ক্ষুধাতুরদিগকে অন্নদান করুন।

ঔষধ দান—লক্ষ্ণৌ নগরে বিসূচিকাগ্রস্ত রোগীদিগকে আমাদিগের প্রচারক লক্ষ্মণ প্রসাদ অতি যত্নও পরিশ্রমের সহিত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দান করিতেছেন। বাবু হীরালাল রায় এবং সুধীরকুমার সেন এই মহৎকার্য্যে প্রাণপণে খাটিতেছেন।

বিবাহ—গত ২০শে আগষ্ট ব্রহ্মমন্দিরে আমাদের বন্ধু পরলোকগত বাবু কালীনাথ দেবের কন্যা শ্রীমতী কুন্দা দেবের সহিত, বিলাত প্রত্যাগত ডাক্তার শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। বিবাহ ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টরী করা হইয়াছে।

জাতকর্ম্ম—দেরাধুনের বাবু ললিতমোহন বসাক এবং বাবু মঙ্গল দেবের সন্তান দ্বয়ের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনা করেন। এতদুপলক্ষে ললিত বাবু সাঃ ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

দান—বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে সাঃ ব্রাহ্মসমাজে ৩৲ ও সাধনাশ্রমে ৩৲ টাকা এবং ডিব্রুগড়স্থ বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ তাহার ৪র্থ পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে সাঃ ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রাদ্ধ—স্বর্গীয়া অম্বিকা দেবের পুত্র বাবু সত্যপ্রিয় দেব কলিকাতায় তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং অম্বিকা দেবের দৌহিত্র জীবন চরিত পাঠ করেন। এতদুপলক্ষে সত্যপ্রিয় বাবু সাঃ ব্রাহ্মসমাজে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন। জীবনচরিতের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"পুণ্যবতী স্ত্রী স্বামীর শিরোভূষণ" এই মহাবাক্যের জলন্ত দৃষ্টান্তস্থল তিনি, যাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধোপলক্ষে অদ্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। কিঞ্চিদধিক ৭৭ বৎসর পূর্ব্বে হুগলি জেলার অন্তঃপাতী গোপালনগর গ্রামে এক সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা, তাঁহার নাম "অম্বিকা" রাখিয়াছিলেন। কোন্নগর নিবাসী পরলোকগত সাধু শিবচন্দ্র দেবের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তখন কন্যার বয়স ৯ ও বরের বয়স ১৫ বৎসর মাত্র। নববধূ যখন স্বামীগৃহে বাস করিতে আইসেন, তখন এই বঙ্গদেশে কোনও ভদ্র পরিবার "কেনা ভাত" খাইতেন না। সুতরাং তাঁহাকে বালিকা বয়সেই পর্য্যায়ক্রমে শ্বশুর মহাশয়ের বৃহৎ পরিবারের উপযোগী অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতে হইত। তিনি সেই কুসংস্কারপূর্ণ সময়ে গোপনে স্বামীর নিকট সপ্তাহান্তে সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর, রজনীযোগে বিদ্যাভ্যাস করিতেন ও রন্ধন করিতে করিতে অঙ্গারখণ্ড লইয়া ভূতলে বর্ণমালা লিখিতে শিখিতেন। তাহার সবিস্তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি স্বামীর যত্নে ও নিজের ঐকান্তিক অধ্যবসায় গুণে অচিরাৎ এতাদৃশী উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন যে যোগবাশিষ্ট রামায়ণ প্রভৃতি দুরূহ গ্রন্থ সকল অবলীলাক্রমে পড়িতে ও বুঝিতে পারিতেন এবং অসাধারণ মেধা প্রভাবে ঐ সকল অধীত গ্রন্থের অনেকাংশ অতি প্রাচীন বয়সেও বিস্মৃত হয়েন নাই। ফলতঃ তাঁহার জ্ঞানলিপ্সা এত বলবতী ছিল যে মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বেও আমাকে বারম্বার এই বলিয়া অনুরোধ করিতেন, "আমাকে কোন গ্রন্থের সারমর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া শুনাও।" আমি তাঁহার ইচ্ছামত কোনও রূপ সৎপ্রসঙ্গের উত্থাপন করিলে তিনি তাহা অতীব আগ্রহ সহকারে শুনিতেন। এই সময়ে তিনি আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন। তখন সেই বর্ষীয়সীর মুখে তরুণীর নব-উৎসাহ প্রতিভাত হইত। বস্তুতঃ জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন করাই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি সংসারধর্ম্মের অতি ক্ষুদ্রতম কর্ত্তব্যপালনেও কদাপি অনাস্থা দেখান নাই। তাঁহার স্বামীসেবা, অতিথিসেবা, গোসেবা, সন্তানপালন ও পরিজনপালন তুলনা রহিত। তাঁহার শরীরে আলস্য ছিল না। যৌবনে যখন তিনি স্বামীর সহিত প্রবাসে গমন করেন, তখন তিনি দাসদাসীগণে পরিবৃতা হইয়াও কখন ভোগবিলাসে মন দেন নাই। বরং এই সময়ে যৎপরোনাস্তি কায়িক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া স্বামীকে ও তদ্বন্ধুবর্গকে সাদরে খাওয়াইতেন। অতি প্রাচীন বয়সেও তাঁহার গৃহসজ্জা দেখিলে বিস্মিত হইতে হইত। যেখানে যে দ্রব্যটী রাখা উচিত, তাহার অনুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যাইত না। তাঁহার সংসারে কোনও প্রকার বিশৃঙ্খলতা বা অপরিচ্ছন্নতা স্থান পাইত না। তিনি উপযুক্ত বিষয়ে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন, কিন্তু কখনও কোনও রূপ অপব্যয় করিতেন না। তিনি পরিজনের মুখাপেক্ষা করিয়া কখনও নিজের হস্তপদ চালনা করিতে বিরত হন নাই। তাঁহার ন্যায় দয়াশীলা রমণী অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। পরের দুঃখ দূর করিতে তিনি বিবিধমতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার দরিদ্র প্রতিবেশীদিগকে তিনি নানা প্রকারে সাহায্য করিতেন। রুক্ষকেশার মস্তকে স্বহস্তে তৈলঢালিয়া দিতেন, ক্ষুধার্ত্তকে বসাইয়া পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইতেন, বস্ত্রহীনাকে বস্ত্র দান করিতেন, কাহাকেওবা সৎপরামর্শ দিয়া উপকৃত করিতেন, কাহাকেও বা গোপনে অর্থ সাহায্য করিতেন। একবার তিনি কোন্নগর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসী সমস্ত কাঙ্গালদিগকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়াছিলেন। এই ভোজে তিনি যেরূপ আয়োজন করিয়াছিলেন, অনেকে আত্মীয় কুটুম্বকে খাওয়াইবার জন্য তত আয়োজন করেন না। তিনি গোপনে কত দান করিতেন, তাঁহার পুত্রকন্যাগণও তাহা জানিতে পারেন নাই। সেদিন শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, একবার তিনি নিজের নাম গোপন করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে একটী হারমোনিয়ম কিনিবার জন্য চারিশত টাকা দান করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি উক্ত ব্রাহ্মসমাজে, কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজে, কোন্নগর বালিকাবিদ্যালয়ে ও অন্যান্য বিবিধ হিতকর অনুষ্ঠানে বহু অর্থ দান করিয়াছেন। তাঁহার নিজ ব্যয়ে কোন্নগর গ্রামে তিনি একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন

ও পিতৃদেবের স্মরণার্থ একটী সুন্দর ঘাট প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন এবং ঐ চিকিৎসালয় যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন।

তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কর্ম্মযোগী স্বামীর সহধর্ম্মিণী ছিলেন। সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহার স্বামীই তাঁহাকে দীক্ষিত করেন। এই দীক্ষার পর তিনি স্বামীর সহিত প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন, ইহাতে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যে অপূর্ব্ব অধ্যাত্মযোগ সংস্থাপিত হয়, মৃত্যুও তাহা বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই। তিনি ৬৫ বৎসরকাল স্বামীর সহিত সুখে কাটাইয়াছিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে এক দিনের জন্তেও তাঁহাদের কথান্তর বা মনান্তর উপস্থিত হয় নাই। এরূপ সুখ কয়জন ভাগ্যবতীর ভাগ্যে ঘটিয়াছে? স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ কেশপাশ ছেদন করিয়া ফেলেন এবং যে তিন চারি বৎসর জীবিত ছিলেন, ব্রহ্মচর্য্য সাধনে তাহা পর্য্যবসিত করেন। বিবাহের প্রকৃত মর্ম্ম তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রের ৩৭ বৎসর বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হইলে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে পরামর্শ দেন নাই। বৈধব্য দশায় তাঁহার স্বামীর সহিত সম্বন্ধ এক মুহূর্ত্তের জন্যও শিথিল হয় নাই। তিনি প্রতিনিয়ত কেবল এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেন, "কে আর তেমন করিয়া আমাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবেন ও আমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।" তিনি সর্ব্বদাই কেবল ব্রহ্মনাম জপ করিতেন। স্বামীর সহিত পুনর্মিলন হইবে এই আনন্দে অধীরা হইয়া মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার কন্যাদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোরা ত আমাকে রাঙ্গাপেড়ে কাপড় পরাইয়া তাঁহার কাছে পাঠাইতে পারলিনি, কিন্তু তাহাতে আমার দুঃখ নাই, এই বিশুদ্ধ বেশই তাঁহার মনোনীত। পক্ষাধিক কাল তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ানা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মধুময়ী প্রকৃতি রোগের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণাতেও কিঞ্চিন্মাত্র বিকৃতি প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহার শুশ্রূষাকারিণীদিগকে "যাদু" "ধন" ইত্যাদি মিষ্ট সম্বোধন ভিন্ন অন্য সম্বোধন করেন নাই। মৃত্যু যতই সন্নিহিত হইতে লাগিল, ততই তিনি মহানন্দে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত ব্রহ্মনাম গান ও ব্রহ্মনাম জপ করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে বাহ্যিক সংজ্ঞা হারাইয়াও ব্রহ্মনাম জপ করিতে বিরত হয়েন নাই। পাছে ঐ নাম ভুলিয়া যান, এই জন্য তাঁহার এক প্রিয় দুহিতাকে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "আসন্নকালে আমাকে ব্রহ্মনাম শুনাইতে ভুলিও না।" তাঁহার আদেশ যথাকালে পালিত হইয়াছিল। নামামৃত পান করিতে করিতে তিনি "আবার আবার" এই কথাটী বারম্বার উচ্চারণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর দুই একদিন পূর্ব্বে তাঁহার এক প্রিয়দুহিতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "মা! আমাদিগকে এত ভালবাসিতে, এখন ছাড়িয়া যাইতে তোমার মন কেমন করিতেছে না?" তাহাতে তিনি "না" বলিয়া উত্তর দেন, বস্তুতঃ তিনি জীবন্মুক্তা হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পরেও তাঁহার মুখের প্রশান্ত ভাবের কোনওরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। তিনি বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, যেখানে আমার স্বামীর দাহ হয় সেইখানেই যেন আমার চিতা সাজান হয়। সতীর ইচ্ছাপূর্ণ হইবে বলিয়াই যেন যেদিন তাঁহার সৎকার হয়, সেদিন নিমতলার শ্মশান ঘাটে সমস্ত দিবারাত্রির মধ্যে অপর একটীও শব আনীত হয় নাই। শ্মশানভূমির এরূপ শান্তিময় দৃশ্য আর এখনও দেখি নাই। বিশ্বমাতা লোকশিক্ষার জন্যই যেন সেই আদর্শ দম্পতিকে এই মর্ত্ত্যধামে পাঠাইয়াছিলেন এবং এ মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইলে নিজের স্নেহক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। তাঁহাদের পবিত্র জীবনের ভাব আমাদের নিজ নিজ ধর্ম্মজীবনে বিলীন হউক।"

গত ৯ই ভাদ্র শুক্রবার ঢাকা প্রচারনিবাসে শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার ঘোষ তাঁহার পরলোকগত পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। দয়াময় পরলোকগত আত্মাদিগের শান্তি বিধান করুন্।

ব্রাহ্মসম্মিলনীর উৎসব—গত ১২ই ভাদ্র সোমবার হইতে ব্রাহ্ম সম্মিলনীর উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় ব্রহ্ম-মন্দিরে সংকীর্ত্তন, উপাসনা, পাঠ ইত্যাদি হইতেছে। শনিবার পর্য্যন্ত এইরূপে কার্য্য হইবে। তৎপরবর্ত্তী রবিবারে পূর্ণ উৎসব। রবিবারের কার্য্যবিবরণের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল।

বিজ্ঞাপন।

সত্যমেবজয়তে। একমেবাদ্বিতীয়ম্। ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

সম্মিলনীর বিশেষ উৎসব।

১৮ই ভাদ্র, রবিবার।

প্রাতঃকাল ৫॥টা সঙ্কীর্ত্তন; ৬॥টা উপাসনা।
মধ্যাহ্ন— ধ্যান ও প্রার্থনা।
অপরাহ্ন—৩টা, শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা।
" ৪টা, প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনা।
" ৫টা, জীবনের সার কথা ও প্রার্থনা।
" ৬টা, সংকীর্ত্তন।
রাত্রি— ৭টা, রাত্রিকালীন উপাসনা।

দুর্ভিক্ষ ফণ্ডের সাহায্য প্রার্থনা।

গত ফাল্গুন মাস হইতে ফরিদপুরের অন্তঃপাতী কোটালি পাড় প্রভৃতি স্থানে অত্যন্ত অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষালকে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি রাধাগঞ্জ নামক স্থানে অবস্থিতি করিয়া অতি যত্নের সহিত দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন। তৎপরে শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ তিনি তথা হইতে চলিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্তও ঐ সকল স্থানের অন্নকষ্ট দূর হয় নাই, বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। আগামী অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত এরূপ কষ্ট থাকিবে। সুতরাং কার্য্যনির্ব্বাহক সভা পুনর্ব্বার শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন ঘোষালকে ঐ অঞ্চলে প্রেরণ করিয়াছেন। হরিমোহন বাবু তথাকার অবস্থা দর্শন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্র পাঠ করিলে নিতান্ত পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়। অন্নাভাবে লোকের শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে, পরিধানে বস্ত্র নাই, ঘরের চালে খড় নাই, এই ভয়ানক বর্ষার জলধারা তাহাদিগের মস্তকের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, মানুষের ইহা হইতে আর দুর্দ্দশা কি হইতে পারে? এই জন্য আমরা সর্ব্ব সাধারণের নিকট বিনীতভাবে অর্থ সাহায্যের প্রার্থনা করিতেছি। যদি সকলে আহারক্লিষ্ট ভ্রাতা ভগিনীদিগের দুঃখের কথা একবার চিন্তা করেন, এবং স্বীয় স্বীয় ক্ষমতা অনুসারে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করেন, তাহা হইলে অনেক পরিমাণে ইহাদিগের দুঃখ মোচন হইতে পারে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক সকলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট সাহায্য পাঠাইলে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। আমাদিগের নিকট টাকা আসিলে আমরা দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে পাঠাইয়া দিব এবং যাহাতে দুর্ভিক্ষ ফণ্ডের টাকা কোনও রূপে অপব্যয় না হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিব। নিবেদক

শ্রীরজনীনাথ রায়, সম্পাদক।
শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ, ধনাধ্যক্ষ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ;
২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১৬ই ভাদ্র প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১১শ সংখ্যা।
১৭শ ভাগ।

১লা আশ্বিন রবিবার, ১৮১৬ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৴০

প্রার্থনা।

হে জাগ্রত জীবন্ত প্রভু পরমেশ্বর! তোমার বাণী জীবন্ত বাণী, তাহা অগ্নির স্থায় মানব হৃদয়ে প্রবেশ করে, নিদ্রিত হৃদয়কে জাগ্রত করে; ঘৃতাহুতির স্থায় সাধু আকাঙ্ক্ষার অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে, বিশ্বাস চক্ষুকে উজ্জ্বল করে এবং আত্মাকে ধর্ম্ম জীবনের অমৃতরস পান করিতে সমর্থ করে। তোমার সংস্পর্শ ও তোমার জাগ্রতবাণী ভিন্ন ধর্ম্ম নাই। আমরা জগতের কোলাহল শুনিয়া কি করিব? কেবল সাধু মহাজনদিগের বাণী শুনিয়া কি করিব? তাহাতে আমাদিগকে প্রকৃত জীবন প্রদান করিতে পারিবে না। আমরা দেখিয়াছি, যখন আমরা প্রকৃত একাকী হইয়া তোমার সম্মুখীন হই, তখনি আমরা প্রকৃত ধর্ম্মের সন্ধান পাই। যখন জগতের প্রতি, বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি, সাধু মহাজনের উক্তির প্রতি, বাহিরের সকল প্রকার অবলম্বনের প্রতি নির্ভর চলিয়া যায় এবং তোমার প্রতি পূর্ণ ও ঐকান্তিক নির্ভর উপস্থিত হয়, তখনই আমরা তোমার মহিমা কিছু বুঝিতে পারি। এইরূপ অনন্যগতি ও অশরণ হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইবার উপদেশ আমরা অনেকবার পাইয়াছি; কিন্তু এই জীবনে অতি অল্প সময়েই সেই শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়, যখন আমরা বাস্তবিক অশরণ হইয়া তোমার শরণাপন্ন হই। তাই তোমার চরণে প্রণত হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি, যেন আমরা অশরণ হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতে পারি। জগতের কোলাহলে, বাহিরের ধর্ম্ম সাধনের অসার আড়ম্বরে, অন্যান্য কারণে যেন আমাদের নির্ভর তোমা হইতে অন্য কিছুরই উপর না লইয়া যায়। আমরা যেন সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র, সর্ব্বাবস্থাতে তোমারই উপর একান্ত নির্ভর করিতে পারি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ধর্ম্মভীরুতা—মফঃস্বলে আমাদের একজন ব্রাহ্মবন্ধু বাস করেন, তাঁহাকে সকলেই অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকে। তিনি যখনই যেখানে থাকেন, ব্রাহ্মধর্ম্মসাধন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে অপনার দেহ মন নিয়োগ করিয়া থাকেন। আমরা অনেক সময়ে অনুভব করিয়াছি, যে তিনি যদি অনন্যকর্ম্মা হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে জীবন সমর্পণ করিতে পারেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। বন্ধু বান্ধবের মধ্যে অনেকে অনেকবার তাঁহার নিকটে এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। যখনই তাঁহার নিকটে এরূপ প্রস্তাব করা গিয়াছে, তখনই একই উত্তর পাওয়া গিয়াছে;—"আমার যে স্বাধীনতা নাই, আমি ঋণী লোক।" বহুদিন হইল তাঁহার আয় যখন অল্প ছিল, তখন তিনি নানাপ্রকার সাংসারিক বিপদে পড়িয়া ঋণজালে জড়িত হইয়াছেন। এই ঋণ বহু বৎসর ধরিয়া শোধ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকাতে উত্তমর্ণগণ তাঁহাকে এই দীর্ঘকালের মধ্যে কোনও প্রকারে ক্লেশ দেয় নাই। আর এরূপ কর্ত্তব্য-পরায়ণ ব্যক্তিকে ক্লেশ দিবার প্রয়োজনই বা কি? তিনি নিজে আপনাকে এজন্য প্রচুর ক্লেশ দিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে তাঁহার প্রাণ পড়িয়া রহিয়াছে, প্রতিজ্ঞা এই যে, ঋণ শোধ না হইলে, তিনি কিছু করিবেন না। হয়ত ঋণ শোধ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন, তাঁহার অভীষ্ট আর পূর্ণ হইবে না। আমরা বলি, তাঁহার আর প্রচারকপদ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? তাঁহার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা দ্বারা তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। ব্রাহ্মেরা এদেশে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ জীবনের আদর্শ দেখাইবেন, প্রকৃত মনুষ্যত্বের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন। তাহা না হইয়া যদি দেখা যায়, যে ব্রাহ্মগণ কর্ত্তব্য-জ্ঞান-বিহীন, ঋণ করিয়া শোধ দিতে ব্যগ্র নহেন, তামাদির আইনের সুবিধা লইতে প্রস্তুত, লোককে বঞ্চিত করিতে ইহাঁদের মনে বাঁধে না। তাহা হইলে আর লম্বা চৌড়া ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া কি ফল হইবে? কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মভীরু জীবনের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা রক্ষা করিতে না পারিলে মুখের প্রচারে কি কাজ?

একতার ভূমি—ইংলণ্ডে বাসকালে ভয়সি সাহেবের উপাসকমণ্ডলীর একজন গণনীয় সভ্যের সহিত একজন

ব্রাহ্মের কথোপকথন হয়। ঐ ব্যক্তি একজন সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ লোক, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ব্রাহ্ম তাঁহাকে বলিলেন—"ভয়সি সাহেব, তাঁহার উপাসকমণ্ডলীকে একঘেয়ে করিয়া ফেলিয়াছেন, লণ্ডনে এত প্রকার সদনুষ্ঠান চলিতেছে, কিছুরই সহিত তাঁহার উপাসকমণ্ডলীর সংস্রব নাই। দেখিলে বোধ হয় খ্রীষ্টধর্ম্মের দোষ কীর্ত্তন ভিন্ন ভয়সি সাহেবের উপাসকমণ্ডলীর যেন কার্য্য নাই। আপনাদের ন্যায় শিক্ষিত, চিন্তাশীল ও পদস্থ ব্যক্তি সকল ইহার মধ্যে থাকিতে, কেন এরূপ একপেশে হইতে দেন?" তিনি উত্তর করিলেন—"মিষ্টার ভয়সির প্রকৃতি এরূপ নয়, যে তিনি দশজনের সঙ্গে মিলিয়া, দশজনের অধীনে থাকিয়া কাজ করিতে পাবেন। আমাদের মধ্যে অন্য কোন লোকও নাই যে এ বিষয়ের জন্য সময় ও মনোযোগ দিতে পারেন। আমরা নিজে যখন বিশেষ কিছু করিতে পারিব না, তখন যে ব্যক্তি করিতেছেন ও খাটিতেছেন, এবং অনেক ক্রটী-সত্ত্বেও একেশ্বরবাদের মহিমা ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহার কার্য্যের ব্যাঘাত করিয়া ফল কি? তিনি দশজনের সঙ্গে কাজ করিতে না পারেন, একা একা কাজ করুন, তাহাই ভাল। বৃথা বিবাদে সময় নষ্ট করা অপেক্ষা তাঁহার সহায়তা করাও ভাল। এই জন্য আমরা তাঁহার কার্য্যে হস্তার্পণ করি না, বরং যথাসাধ্য অর্থাদি দ্বারা সহায়তা করিয়া থাকি।" এইরূপ সদ্বিবেচনা যদি আমাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইত, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকে অনেক পরিমাণে সুশৃঙ্খল দেখিতে পাওয়া যাইত। অনেকের মুখে মধ্যে মধ্যে এইরূপ অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য কলাপ তাঁহাদের সম্পূর্ণ মনোমত হইতেছে না। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যে কাজ করেন তাহা তাঁহাদের অনুমোদিত নহে; সুতরাং সমাজের কার্য্যে সাহায্য করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় না। এই সকল ব্যক্তির প্রতি প্রশ্ন এই, তাঁহারা সমাজের কার্য্যে এখন যতটা সময় ও মনোযোগ দিতেছেন তাহা অপেক্ষা অধিক সময় ও মনোযোগ দিতে সমর্থ কি না? যদি সমর্থ হন, তবে তাঁহারা অগ্রসর হইয়া সমাজের কার্য্য সুচারুরূপে চালাইবার ভার গ্রহণ করুন, এবং বর্ত্তমান সময়ে কার্য্যভার যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহাদের ক্রটী নিবন্ধন যে অনিষ্ট হইতেছে তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করুন। আর যদি নিজেরা অধিকতর সময় ও মনোযোগ দিতে সমর্থ না হন, বর্ত্তমান ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া যাঁহাদিগকে মনে করেন, তাঁহাদিগকে মনোনীত করিয়া তাঁহাদের হস্তে কার্য্যভার অর্পণ করিবার চেষ্টা করুন। যদি উপযুক্ততর ব্যক্তি না পান, তাহা হইলে বর্ত্তমান কার্য্যভার যাঁহাদের হস্তে আছে, তাঁহাদের সহায়তা করুন; কারণ ঠিক মনের মত কাজটা না হইলেও বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য চালাইবার উপায়ান্তর নাই। এই একতা-বুদ্ধি ও এই সাহায্য-প্রবৃত্তি আমাদের নাই বলিয়া আমাদের এত দুরবস্থা। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া কার্য্য করাতে কতলোকের শক্তির অপচয় হইতেছে। জগদীশ্বর কবে আমাদিগকে সেই শুভবুদ্ধি বিধান করিবেন, যদ্দ্বারা আমরা নানাপ্রকার মতভেদের মধ্যেও একতার ভূমি দেখিতে পাইব।

রামমোহন রায়ের স্মৃতি—২৭এ সেপ্টেম্বর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন, উক্ত দিনে বর্ষে বর্ষে আমরা সেই পরলোকগত মহাজনকে স্মরণ করিয়া থাকি। সেই ২৭এ সেপ্টেম্বর নিকটে আসিতেছে। আমরা রামমোহন রায়ের অনুগামী ব্যক্তিদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, এবং উক্ত দিনের জন্য প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করিতেছি। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দলের এই সম্মিলিত হইবার সময়। সেই মহাপুরুষের নিশানের নিম্নে সকলেই পাশাপাশি দাঁড়াইতে পারেন। যতই মতভেদ থাকুক, তাঁহার সহিত সকলেরই ঐক্য। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও আত্মীয়তা স্থাপন করা যাঁহার জীবনের মহা উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহার নামেও ব্রাহ্মগণ যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য বিস্মৃত না হইতে পারেন, তাহা হইলে এই প্রমাণ দিবেন, যে তাঁহারা রাজার মহৎকার্য্যের উত্তরাধিকারী হইবার উপযুক্ত নহেন। প্রাচীন রোমের ইতিবৃত্তে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়। একবার একদল প্রবল শত্রু আসিয়া রোম নগরকে অবরোধ করিয়াছিল। রোমকগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও শত্রুকুলকে বিদ্রাবিত করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহারা গতিকপ্রায় দেখিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। ডেলফাই পাহাড় প্রভৃতি মন্দিরে দেবতার নিকটে হত্যা দিয়া পড়িলেন। যথাসময়ে দৈববাণী হইল, যে রোমীয় সেনাপতিদিগের মধ্যে একজন বলি না গেলে, অর্থাৎ বিনষ্ট না হইলে, তাঁহারা জয়যুক্ত হইতে পারিবেন না। এই দৈববাণীর কথা যখন রোম নগরে পৌঁছিল, তখন সকলেই চিন্তা করিতে লাগিল, কোন্ সেনাপতিকে মরিতে হইবে ও কিরূপে মরিতে হইবে? একদিন সেনাপতি সকলে অশ্বারোহণে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইলেন। সমবেত হইয়া কিরূপে শত্রুকুলের হস্ত হইতে নগর রক্ষা করা যায় সেই চিন্তাতেই সকলে নিমগ্ন হইলেন। তখন দৈববাণীর কথা সকলের স্মরণ হইল। পরস্পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, এ দৈববাণীর অর্থ কি? "আমাদের মধ্যে কাহাকে মরিতে হইবে ও কি প্রকারে মরিতে হইবে?" এইরূপ কথোপকথন ও চিন্তা চলিয়াছে, ইতিমধ্যে সেনাপতিদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হঠাৎ সেই দল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অশ্বারোহণে নক্ষত্রবেগে ধাবিত হইলেন। অপর সকলে বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন 'কেন তিনি হঠাৎ' কিছু না বলিয়া কহিয়া এরূপ বেগে ধাবিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়স্থিত প্রশ্নের উত্তর স্থির না করিতে করিতে দৃষ্ট হইল যে, উক্ত সেনাপতি অশ্বসহ সভাস্থানের অদূরবর্ত্তী এক প্রকাণ্ড গভীর গর্ত্তের মধ্যে লম্ফ দিয়া পড়িলেন। একি হইল, একি হইল বলিয়া সকলে সেই গর্ত্তের দিকে ধাবিত হইলেন। কিন্তু সকলি বৃথা, তিনি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া অশ্বসহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন সকলে বুঝিতে পারিলেন, যে একজন সেনাপতি বিনষ্ট না হইলে রোম রক্ষা পাইবে না, জানিয়াই তিনি আপনাকে

বিনষ্ট করিয়া রোম রক্ষার উপায় করিয়াছেন। একজন প্রধান সেনাপতি রোম রক্ষার জন্য বিনষ্ট হইয়াছে, এই সংবাদ যখন নগরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তখন বিপদ ভয়ে বিষন্ন ক্লান্ত ও শ্রান্ত যোদ্ধাদিগের দেহে যেন অলৌকিক বল আসিল; রোমীয় সৈন্যগণ উৎসাহে অগ্নিময় হইয়া আবার রণসজ্জা করিতে লাগিল; এবং সেই সংবাদ শত্রুশিবিরে পৌঁছিবামাত্র তাহাদের অন্তরেও ত্রাসের সঞ্চার হইল। তাহারা নগর অবরোধ করিয়া থাকা বৃথা জানিয়া স্বস্থান পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। জিজ্ঞাসা করি, উক্ত রোমীয় সেনাপতিগণ যখন নগর রক্ষার উপায় চিন্তা করিবার জন্য সম্মিলিত হইয়াছিলেন, তখন এই আত্মবিনাশের বুদ্ধি হৃদয়ে না জাগিয়া যদি তাঁহারা তুচ্ছ কথা লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন, কে কিরূপ সম্ভ্রমের পাত্র তাহা বিচার করিতে যদি নিযুক্ত হইতেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ লইয়া যদি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেন, তাহা হইলে কি প্রকাশ পাইত? তাহা হইলে কি ইহাই প্রকাশ পাইত না যে, তাঁহারা যেরূপ মহৎ কার্য্যের ভার প্রাপ্ত, তাঁহারা তাহার উপযুক্ত নহেন? এইরূপ ব্রাহ্মদিগের হস্তে যে সকল গুরুতর কার্য্যের ভার রহিয়াছে, তাহা সাধন করিবার উপায় চিন্তাতে সমবেত না হইয়া যদি তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেও প্রকাশ পায় যে তাঁহারা ঐসকল মহৎ কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

স্মৃতি-চিহ্ন—রামমোহন রায়ের ন্যায় মহৎ ব্যক্তিদিগকে বুঝিতে অনেক বিলম্ব হয়। ইহাঁরা সময় আসিবার অনেক অগ্রেই অভ্যুদিত হইয়া থাকেন। ইহাঁরা বিশ্বাসনয়নে যাহা দর্শন করেন, তাহা বহুকাল পর্য্যন্ত ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত থাকে। সুতরাং যতই সময় যায়, যতই দেশে জ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতি হইতে থাকে, ততই লোকে ইহাঁদের মহত্ত্ব অনুভব করিতে থাকে। রামমোহন রায়ের দেশবাসিগণ রামমোহন রায়কে সমুচিতরূপে ভক্তি শ্রদ্ধা দিতেছেন না, ইহা দেখিয়া অনেকে অনেক দিন দুঃখ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এই বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিতেছেন যে, বৎসরের পর বৎসর যেমন যাইবে, দেশে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ও জ্ঞানের উন্নতি যত হইবে, রামমোহন রায় যে সকল সংস্কারে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, সেই সকল সংস্কার কার্য্যে লোকের অনুরাগ যত বাড়িবে, ততই তাঁহাকে বুঝিবার ও শ্রদ্ধা ভক্তি করিবার লোক সংখ্যা বাড়িবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কিছুদিন হইতে দেশ মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মের একটা বিকৃত পুনরুত্থান স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। ইহাতে রামমোহন রায়ের কীর্ত্তিকে উজ্জ্বল না করিয়া যেন কিয়ৎ পরিমাণে ম্লান করিয়াছে। যাঁহারা ঐ সকল সংস্কারের পক্ষ, যাঁহারা পুনরুত্থানকারীদিগের চেষ্টার বিকৃত ফল দেখিয়া দুঃখ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সকলেরই রামমোহন রায়ের নাম ও কীর্ত্তিকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করা উচিত। রামমোহন রায় জাগিয়া থাকিলেই ভারতের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির আশা জাগিয়া রহিল। কেবল কলিকাতাতে রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা হইলে যথেষ্ট নহে, মফঃস্বলেও নানা স্থানে স্মরণার্থ সভা হওয়া কর্ত্তব্য। এই সময়ে আমাদের পরলোকগত বন্ধু কারল হেমারগ্রেণকে স্মরণ হইতেছে, তিনি রামমোহন রায়ের কোনও প্রকার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবার জন্য প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি জীবিত থাকিলে একটা কিছু করিয়া তুলিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু একার্য্য অবলম্বন করিবার কি কেহ নাই? পরলোকগত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় যুবরাজ এলবার্টের ভারতাগমনের স্মরণার্থ এলবার্ট হল স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ কোনও প্রকার চিহ্ন স্থাপন করিব এরূপ ব্রত লইবার কি কেহ নাই? এ বিষয়ে যদি কেহ উদ্যোগী থাকেন, তিনি ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম শিক্ষিত বাঙ্গালি মাত্রেরই নিকট সাহায্য পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনাময়-অবস্থা—সেই অবস্থাই উত্তম অবস্থা, যে অবস্থায় লোকে সত্যের উৎপত্তি স্থলের অনুসন্ধানের জন্য লালায়িত না হইয়া,সত্য কি না,তাহার অনুসন্ধানের জন্যই লালায়িত হয়। যখন কোন গ্রন্থ বিশেষের ছিন্ন পত্রাংশ বায়ু-তাড়িত হইয়া নয়ন পথে উপস্থিত হয়, তখন তাহা কোন্ গ্রন্থের পত্রাংশ এরূপ অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি প্রবল না হইয়া, তাহা সত্য কি না তাহাই নির্ণয়ের জন্য যদি ব্যাকুলতা হয়, তাহাই উত্তম অবস্থা; কারণ তদ্দ্বারা মানব সত্যেরই সমাদর করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায় এবং তাহাই নিরাপদ অবস্থার জ্ঞাপক। বাইবেল, কোরাণ কিম্বা বেদ পুরাণের সহিত সকল সময় একত্র অবস্থিতি করা যাইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। কখন কোন্ অবস্থায় মানবকে কোথায় যাইয়া পড়িতে হইবে, কে জানে? তখন সঙ্গে বাইবেল কিম্বা কোরাণ আদি না থাকিলেও উদারভাবে সত্য গ্রহণের প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে, তাহাই মানবকে কর্ত্তব্যের পথে স্থিরতর রাখিতে সমর্থ হয়। তখন হয় ত কোন রাখালের একটী সংগীতে এমন উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে,যাহা কোন ধর্ম্মগ্রন্থ দ্বারা অন্য সময়ে পাওয়া যায় নাই। সত্য অনুসন্ধান এবং গ্রহণের প্রবৃত্তি প্রবল হইল কি না ইহাই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাহা যাহার হয়, সে যে কোন দেশে গমন করুক যে কোন অবস্থায় পতিত হউক না কেন, তাহার ভয়ের কারণ কিছুই নাই। সে পাখীর গানেও উপদেশ পায়। সে নির্জীব প্রস্তর খণ্ড হইতেও উপদেশ লাভ করে। সমস্ত প্রকৃতিই তাহার উপদেষ্টা। অখিল বিশ্ব শাস্ত্রই তাহার সদুপদেশ-পরিপূর্ণ অমোঘ শাস্ত্র। প্রস্তর-খোদিত সদুক্তি যেমন সে আগ্রহে গ্রহণ করে, কোন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের উক্তিও সে সেই ভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু লোকে এরূপ উদার সত্যের পক্ষপাতিত্ব করিতে অতি অল্প পরিমাণেই সমর্থ হইয়াছে। কোন কথা শুনিলেই তাহা কোন ব্যক্তির উক্তি, তাহারই অনুসন্ধানে লোকে সর্ব্বাগ্রে ব্যস্ত হয়। সেই ব্যক্তির গুরুত্বানুসারেই সত্যের বা সদুক্তির গুরুত্ব নির্ণয় করিয়া থাকে। লোকের এমনই প্রবৃত্তি যে এক খানা নূতন গ্রন্থ হাতে আসিলেই প্রথমেই সেই গ্রন্থ কোন্ ব্যক্তির প্রণীত, তাহারই অনুসন্ধান করে এবং ব্যক্তির দ্বারাই গ্রন্থ সম্বন্ধে মনে একটা ভাব সংগ্রহ করিয়া তাহার বিচারে

প্রবৃত্ত হয়। এজন্য দেখা যায় সমালোচকগণ অনেক সময় গ্রন্থের সমালোচনা না করিয়া ব্যক্তির সমালোচনা করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা প্রকৃত রূপে সত্যের সমাদর করা হয় না। সত্যের সমাদর করিতে যিনি অভ্যস্ত বা ইচ্ছুক তিনি স্থান কাল এবং ব্যক্তি নিরপেক্ষ হইয়াই বিচার করিবেন এবং সত্য বলিয়া প্রতীতি হইলে তাহারই অনুসরণ করিবেন। এই অবস্থাই স্বাস্থ্যের প্রকাশক। সুস্থ আত্মার প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ এই যে তিনি সত্যকে পরিগ্রহ করিতে কাহারও উপরোধ বা অনুরোধের বশীভূত হন না। কিন্তু আভ্যন্তরীণ প্রবল সত্যানুরাগ এবং সত্যেরই বিমোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাহার পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। আত্মায় এই অবস্থা উপস্থিত হইলেই সুখ দুঃখে, বিপদ সম্পদে, সজন নির্জ্জনে সত্যের শরণাপন্ন হইয়া আত্ম কল্যাণ লাভে সমর্থ হন। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব এবং এই বিশেষত্বই চির কল্যাণের প্রস্রবণ হইয়া আত্মাকে পোষণ করিবে।

অভিনব উদারতা—মধ্য আসিয়াতে এখনও এমন এক এক শ্রেণীর লোক দেখা যায় যাহারা যাযাবর। তাহারা কোন নির্দ্দিষ্ট প্রদেশের অধিবাসী নহে। যখন যেখানে তাহাদের সুবিধা হয়, সেই স্থানেই যাইয়া বাস করে। সুস্থির হইয়া, দীর্ঘকাল কোন স্থানে বাস করা তাহাদের রীতি নহে। যতদিন যে প্রদেশকে তাহারা আপনাদের বাসের উপযুক্ত জ্ঞান করে, ততদিন তাহারা সেই প্রদেশে বাস করে, আবার সেই সুবিধার অন্ত হইলেই অন্যত্র চলিয়া যায়। এই শ্রেণীর লোকেরা যেমন কোন বিশেষ স্থানের নহে, তেমনি কোন বিশেষস্থানও ইহাদের নহে। ইহারা কোন স্থানের মঙ্গলের জন্য যেমন বিশেষভাবে কিছুই করে না, তেমনি কোন স্থানও ইহাদের জন্য বিশেষভাবে কিছুই করে না। ইহারা নিয়ত চঞ্চলভাবেই ঘুরিয়া বেড়ায়। নিত্য নূতন স্থানের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং প্রয়োজন ফুরাইলেই আবার নূতন স্থানের অতিথি হয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, ইহারা যেমন কোন স্থানেরই স্থানীয় উন্নতির জন্য ব্যস্ত নয়, তেমনি নিজেদেরও কোন স্থায়ী উন্নতি লাভে সমর্থ হয় না। তাহারা অতি নিকৃষ্ট অবস্থায় জনসমাজের অতি নিম্নস্তরেই বাস করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ের উন্নত জ্ঞান বিজ্ঞান বা অন্য প্রকার উন্নতি লাভে ইহারা সমর্থ হয় নাই। ইহারা নিয়ত সুবিধাবাদী। সুবিধাই খুঁজিয়া বেড়ায়। নিজেদের বিশেষ উন্নতি লাভের জন্য বা কোন স্থানের উন্নতির জন্য ইহারা কিছুই করে না, কারণ ইহারা জানে কোন স্থানই ইহাদের নহে। সুতরাং তাহার উন্নতির জন্য যত্ন করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? আপনাদিগকে কোন স্থানবাসী বলিয়া মনে না করার ফল এই হইয়াছে যে, ইহারা নিজেও উন্নত হইতেছে না এবং কোন বিশেষ স্থানের স্থানীয় উন্নতিও ইহাদের দ্বারা সাধিত হইতেছে না। কোন এক স্থানকে আপনাদের চিরবাসস্থান জ্ঞান না করায় ইহাদের যেমন হীনতাই থাকিয়া যাইতেছে, কোনরূপ উন্নতি হইতেছে না, তেমনি যাঁহারা কোন ধর্ম্ম বিশেষকে আপনাদের ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান না করিয়া সকল ধর্ম্মকেই আপনাদের মনে করিতেছেন, যখন যেরূপ সুবিধা হয়, সেইরূপে জীবন যাপন করিতেছেন, তাঁহাদের দ্বারাও কোন ধর্ম্ম বিশেষ পরিপুষ্ট হয় না এবং তাঁহারাও কোন ধর্ম্মের দ্বারা পরিপুষ্ট হন না। এই সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনকারীজাতীয় লোকেরা যখন যেরূপ সুবিধা, তখন সেইরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। কিছুতেই আবদ্ধ নহেন। কোন ধর্ম্মের প্রতি তেমন অনুরাগ বা আস্থা নাই। নিষ্ঠার সহিত সত্যাসত্যের বিচার নাই এবং নিষ্ঠার সহিত কোন ধর্ম্মেরই সাধন অবলম্বন নাই। এই শ্রেণীর লোক কোন ধর্ম্মেরই নহেন অথচ সকল ধর্ম্মেরই। সুতরাং ইঁহাদের উন্নতিও সেই যাযাবরগণের মতই হয়। উদার হইতে হইবে, কিছুতেই আবদ্ধ থাকা হইবে না, সুতরাং কোন ধর্ম্মের নামে নিজে পরিচিতও হইবেন না। এজন্য ইঁহারা সার্ব্বভৌমিকতার ভাণ করিয়া থাকেন। এই প্রকার সার্ব্বভৌমিকতার ফল এই হয় যে, কোনরূপ স্থায়ী উন্নতি লাভে তাঁহারা সমর্থ হন না। তাঁহারা স্রোতে আসেন আর স্রোতে যান। যখন যে ধর্ম্মের জয় হয়, তখন তাঁহারা সেই ধর্ম্মের মহিমা গান করেন। এই প্রকারের অস্থিরচিত্তদিগের যেমন কোন ধর্ম্মই আপনার নয়, তেমনি ইঁহারাও কোন ধর্ম্মের নহেন। সুতরাং ইঁহারা ভাবাবেশে চলিতেই অভ্যস্ত। দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া, আপন কল্যাণ সাধনে ইঁহারা কখনই সক্ষম নহেন। বর্ত্তমান সময়ে এই প্রকারের উদারতার নামে সত্যাসত্য বিচারবিমুখ এক শ্রেণীর লোক দেখা দিয়াছেন। তাঁহারা অতি উদার সুতরাং কিছুতেই আবদ্ধ নহেন। ইঁহাদের অবস্থা সেই অতি উদারতার অনুরূপই হইতেছে।

উদারতা শব্দের এমন সৃষ্টি ছাড়া অর্থ হইবে, তাহা বোধ হয় কেহ কখনও কল্পনাও করিতে পারেন নাই। যে কোন মত প্রাচীন গ্রন্থ বিশেষে লিখিত আছে, তাহাই সত্য; তাহাই ঈশ্বরানুমোদিত সুতরাং তাহাই অবলম্বনীয়। ইহার মত মারাত্মক কথা আর কি হইতে পারে? উদার হইবার আকাঙ্ক্ষায় যদি এরূপ মতাক্রান্ত হইতে হয়, তাহা হইলে অনুদারতাই বোধ হয় অবলম্বনীয়। উদারতা শব্দের এরূপ বিকৃত অর্থ যাঁহারা করেন তাঁহারা ধর্ম্মজগতে এক অদ্ভুত পদার্থের সৃষ্টি করিবার প্রয়াসী হইতেছেন। যাহা অতি ভীষণ পদার্থ। যাহার সংস্পর্শে আত্মার সমূহ অকল্যাণ সাধিত হইবে। প্রকৃত উদারতা আর সত্যপ্রিয়তা একই পদার্থ। সত্যাসত্যের বিচার বিমুখ হইয়া প্রাচীন কোন গ্রন্থ প্রচারিত, বা কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক প্রচারিত হইলেই যদি তাহা অবলম্বনীয় হয় এবং ঈশ্বরানুমোদিত বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মে সত্যাসত্যে কোন প্রভেদ থাকিতে পারে না, সকল ধর্ম্মই ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত এরূপ মত মানিতে হইলে, দুর্নীতিকে নীতি বলিতে হয়—অনেক কুৎসিত আচারকে সদাচার নামে অভিহিত করিতে হয়; ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদ বিস্মৃত হইতে হয়। আশা এই, এইরূপ সার্ব্বভৌমের সংখ্যা বেশী নহে এবং ইঁহাদের দ্বারা কোন সমাজ পরিচালিত হইবারও সম্ভাবনা নাই।

উদারতা বা সার্ব্বভৌমিকতার প্রকৃত অর্থ ব্রাহ্মধর্ম্মই গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ সত্য মাত্রই অবলম্বনীয়। সত্যই ধর্ম্মের সার ও প্রাণ। তাহা যে কোন সময়ের, জাতির বা ব্যক্তির হউক না কেন। শত ক্ষতি সহ্য করিয়াও তাঁহাই অবলম্বন করিতে হইবে। উদারতার এই প্রকার অর্থ ভিন্ন, বিচারবিহীন ভাবে যাহা কিছু ধর্ম্মের নামে অভিহিত হয়, তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, উদারতার নামে মহাবিপজ্জনক মত প্রচারিত হইবে এবং তাহা কখনই মানবের কল্যাণকর হইবে না। সত্য মাত্রকেই অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যেন আত্ম-অস্তিত্ব বিলুপ্ত না হইয়া যায়। অস্তিত্ব-বিহীন হইয়া সর্ব্বত্রভ্রমণকারীর দলে মিশিলে কেবলই দিশেহারা পথিকের দশা পাইতে হয়। কেবলই যাযাবরত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়। কোন স্থায়ী উন্নতি লাভেই সমর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এজন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম, আত্ম-অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া সর্ব্বত্র হইতে সত্য গ্রহণের উপদেশ দিতেছেন এবং ইহাই কল্যাণকর।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের সমকালে ব্রাহ্ম সমাজের অবস্থা।

(রামমোহন রায় ক্লাবে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র কর্ত্তৃক বিবৃত)

মহাত্মা রামমোহন রায় ঈশোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় লিখিয়া গিয়াছেন "আমার স্বদেশবাসিগণ সাংঘাতিক পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতি অন্ধবিশ্বাসী,—তাহারা মনঃকল্পিত দেবদেবীর প্রীতির জন্ত স্বাভাবিক স্নেহ মমতা ছিন্ন করিয়া ভীষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে,—আমি অত্যন্ত যাতনার সহিত অবিশ্রান্ত সেই চিন্তা করিতাম। তাহারা ধর্ম্মের আদেশ মনে করিয়া আত্মহত্যা করে ও আত্মীয় স্বজনকে বলিদান করে। আমার স্বদেশবাসিগণ বিনয় ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি অনেক সদ্গুণে অলঙ্কৃত—তাহারা হীন হইয়া থাকিবে আমি ইহা সহ্য করিতে পারিতাম না।"

"ঈশ্বরের বিশুদ্ধ উপাসনা, পবিত্র নীতি ও সংস্কৃত মত ইহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার হীনতা হইতে উদ্ধার করিবে, এই আশায় আশান্বিত হইয়া আমি ধর্ম্ম পুস্তকের বিশেষ বিশেষ অংশ অনুবাদ করিতে আরম্ভ করি। অনেক প্রকার পৌত্তলিকতা আছে, কিন্তু হিন্দু পৌত্তলিকতার যেমন অনিষ্টকর অনুষ্ঠান আছে এবং ইহার ধর্ম্মশাসন জনসমাজের বন্ধনকে যেমন শিথিল করে, আর কিছুতেই তেমন করে না। স্বদেশবাসিগণ আমার প্রিয়;—কিরূপে তাহারা.. সর্ব্বপ্রকারহীনতা হইতে উদ্ধার পাইবে, এই চিন্তায় আমি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম। অবশেষে দেখিলাম, স্বদেশবাসিগণ যতদিন প্রকৃত প্রেমের সহিত ঈশ্বরের একত্ব ও সর্ব্বব্যাপীত্ব ধ্যান করিতে না পারিবে, ততদিন তাহাদের কল্যাণ নাই, তাই ধর্ম্ম পুস্তকের অর্থ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।" ধর্ম্ম হীনতায় জাতীয় হীনতা দেখিয়া স্বদেশপ্রেমিক মহম্মদের প্রাণ ক্রন্দন করিয়াছিল। এই ক্রন্দনের ফল মুসলমান ধর্ম্মের আবির্ভাব। স্বদেশের মারাত্মক পৌত্তলিকতা ও ভীষণ অনুষ্ঠান দেখিয়া স্বজাতি প্রেমিক মহাত্মা রামমোহনের প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তাঁহার অশ্রুজলে ব্রাহ্ম সমাজের আবির্ভাব। যেখানে ব্যাকুল ক্রন্দন, সেখানেই ঈশ্বরের শক্তি অবতরণ করে। রামমোহনের অশ্রুজলেই ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মশক্তি লইয়া এদেশে অবতীর্ণ হন।

চিরদিনই এক হইতে বহুর সৃষ্টি হয়। এক বুদ্ধকে লইয়াই প্রথম বৌদ্ধসমাজ, এক মহম্মদকে লইয়াই প্রথম মুসলমান সমাজ। এক রামমোহনকে লইয়াই প্রথম ব্রাহ্ম সমাজের পত্তন হয়। ষোড়শ বর্ষের রামমোহন যখন পৌত্তলিক উপাসনার অসারতা ও একমাত্র পরব্রহ্মের উপাসনার সারবত্তার কথা প্রচার করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হন, তখনই এদেশে ব্রাহ্মসমাজের পত্তন হইয়াছে। কিন্তু তখন রামমোহন একাকী।

রামমোহন যখন রঙ্গপুরে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখনই সর্ব্ব প্রথমে দশ জনে মিলিত হইয়া ব্রহ্ম-তত্ত্ব আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। সন্ধ্যার পর আপনার বাসায় ধর্ম্মালোচনার জন্ত নানা লোককে আহ্বান করিতেন। তিনি পৌত্তলিকতার অসারতা ও ব্রহ্মোপাসনার সারতত্ত্ব সকলকে বুঝাইয়া দিতেন। রঙ্গপুরপ্রবাসী অনেকগুলি মাড়োয়ারী এই সভার সভ্য ছিলেন। এখানেই ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত।

সত্য ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী চিরদিন সকল দেশে আবির্ভূত হইয়াছে। রাবণ না হইলে রামের মাহাত্ম্য জগতের লোক সম্যক্ রূপে বুঝিতে সমর্থ হইত না। রামমোহন কালেক্টরের দেওয়ান, তিনি সভা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রঙ্গপুরের জজের দেওয়ান গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য রামমোহনের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে মস্তকোন্নত করিলেন। তিনি সকলকে রামমোহনের বিরুদ্ধাচারী হইতে পরামর্শ দিলেন। প্রভঞ্জন প্রবলবেগে পর্ব্বতের গাত্রে আঘাত করিলেও পর্ব্বতের কিছু করিতে পারে না। কেবল শাঁ শাঁ একটা শব্দ হয়; গৌরীকান্তের দশাও তাই হইয়াছিল। শান্তি লইয়া নহে, কিন্তু সংগ্রাম লইয়াই ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত।

রঙ্গপুরে গৌরীকান্ত এবং রামমোহনের জন্মভূমি কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রামনগরের রামজয় বটব্যাল "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বটব্যাল চারি পাঁচ হাজার লোক লইয়া এক দল করিয়াছিলেন। ভোর বেলায় রামমোহনের বাটীর নিকট যাইয়া কুকুট ধ্বনি করিতেন এবং বাড়ীর ভিতর গো-অস্থি নিক্ষেপ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান দূর করিবার চেষ্টা করিতেন! ব্রাহ্মদের প্রতি অত্যাচার রামমোহন রায়ের উত্তরাধিকার সূত্রে ব্রাহ্মসমাজ ভোগ দখল করিতেছেন।

১৭৩৬ শকে ইংরাজী ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ৪০ বৎসর বয়সে রামমোহন ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্ত কলিকাতায় আগমন করি-

লেন। মাণিকতলায় লোয়ার সার্কুলার রোডের যে বাড়ীতে এখন সুকিয়া ষ্ট্রীট থানা, সেই বাটী ক্রয় করিয়া তথা হইতে পৌত্তলিকতার উপর গোলাগুলি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

রামমোহন রায়ের শারীরিক বল ও মানসিক শক্তি উভয়ই পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তাঁহার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া লোকে শ্রদ্ধা করিত, তাঁহার নম্রতা, বিনয় ও স্নেহ প্রবণতা দেখিয়া লোকে অনুগত ভৃত্যবৎ হইত। একদিকে ঈশ্বর বিশ্বাস, অপর দিকে লোকানুরাগ তাঁহাকে অনেকের প্রিয় করিয়াছিল। তৎকালে তাঁহার মত বিষয়বুদ্ধি ও ধর্ম্মবুদ্ধি সম্পন্ন লোক বিরল ছিল। কলিকাতা আসিয়া তিনি চতুর্বিধ উপায়ে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনার প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১ম তর্ক বিতর্ক, দ্বিতীয় শিক্ষাদান, ৩য় পুস্তক প্রচার, ৪র্থ ব্রাহ্মসভা স্থাপন। ধর্ম্মপ্রচারের এই সকল উপায় অবলম্বন রামমোহন রায়ের সময়ে যেমন প্রয়োজন ছিল, আজও তেমনই প্রয়োজন রহিয়াছে।

কলিকাতা এক বৎসর বাস করিয়া রামমোহন রায় মাণিকতলায় ভবনে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে "আত্মীয়সভা" সংস্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের ইহাই দ্বিতীয় অনুষ্ঠান। কলিকাতার যাঁহারা তৎকালে প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এই আত্মীয় সভার সভ্য ছিলেন। আত্মীয়সভা সপ্তাহে একদিন হইত। শিবপ্রসাদ মিত্র সভায় বেদ পাঠ করিতেন, গোবিন্দ মালা নামক একব্যক্তি সঙ্গীত করিতেন। বেদাদির বাঙ্গলা ব্যাখ্যা হইত না।

সভ্যগণ সকলেই যে ব্রহ্মানুরাগী হইয়া সভায় আসিতেন তাহা নহে। রামমোহন রায়ের মত তীক্ষ্ণ মনীষাসম্পন্ন লোক তৎকালে বিরল ছিল। তিনি বিষয়ীদিগকে বিষয় রক্ষার সুন্দর উপায় বলিয়া দিতেন, সুতরাং কলিকাতার বড় বড় বিষয়ী লোকেরা নানা বিষয়ের মন্ত্রণার জন্য তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন। রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসনা ভাল বাসেন, লোকদের অনেকে তাঁহার মনোরঞ্জনের জন্য আত্মীয় সভার সভ্য হইয়াছিলেন। তৎকালের বড় লোকের মধ্যে ভূকৈলাসের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, টাকীর জমিদার কালীনাথ রায়, ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়ার জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা বদনচন্দ্র রায়, ৺ জষ্টিস্ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পিতামহ গোপীমোহন ঠাকুর, রাজারবাগানের জয়কৃষ্ণ সিংহ, যোড়াসাঁকোর রাজকৃষ্ণ সিংহ ও আন্দুলের কাশীনাথ মল্লিক প্রভৃতি আত্মীয় সভার সভ্য ছিলেন। ইহাঁদের কেহই যে ব্রহ্মানুরাগী হইয়া আত্মীয় সভায় আসিতেন না, এমন কথা বলা যায় না

আত্মীয় সভা সংস্থাপিত হওয়াতে পৌত্তলিকদের ক্রোধ বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহারা চারিদিকে প্রচার করিতে লাগিলেন। "আত্মীয় সভায় বেদ পাঠের কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা, ওখানে কেবল সুরাপান, অভক্ষ্যাচরণ ও গোমাংস আহার হয়।" নিন্দা ও অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকে আত্মীয় সভার সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন। আত্মীয় সভার যিনি সম্পাদক ছিলেন, তিনিও সমাজের ভয়ে পৌত্তলিকদের নিকট আত্মীয় সভার নিন্দা করিতেন। জয়কৃষ্ণ সিংহ পৌত্তলিকদের সঙ্গে যোগদান করিয়া রটনা করিলেন যে, তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, আত্মীয় সভায় গোহত্যা করা হয়। আত্মীয় সভার সভ্যের প্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া সকলেই নিঃসন্দেহচিত্তে তাহা বিশ্বাস করিলেন। ব্রাহ্মসমাজে এখনও জয়কৃষ্ণ সিংহের অভাব নাই। অনেকে রামমোহন রায়কে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন বটে; কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথ ও "পৌত্তলিক মুখ চপেটিকা" প্রণেতা ব্রজমোহন মজুমদার প্রভৃতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না।

কিয়দ্দিন পরে বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা তেজশ্চন্দ্র প্রভৃতি অনেকে রামমোহন রায়কে জব্দ করিবার জন্য বিবিধ হেতুতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। রামমোহন ব্যতিব্যস্ত হইলেন, তিনি সর্ব্বদা আত্মীয় সভায় উপস্থিত হইতে পারিতেন না। সভা কখনও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতামহ বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্রের ভবনে, কখনও ভূকৈলাসের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের বাটীতে, কখনওবা তুলাপটীতে বিহারীলাল চৌবের বাড়ীতে হইত। রামমোহনের একান্ত যত্নের অভাবে অবশেষে আত্মীয় সভা উঠিয়া গেল। বিপক্ষ দলে জয় ধ্বনি পড়িল।

আত্মীয় সভা উঠিয়া গেল, কিন্তু রামমোহন তর্ক বিতর্ক ও পুস্তক প্রচার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিতে বিমুখ হইলেন না। এই সময়ে তিনি উইলিয়াম এডাম নামক একজন খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারককে ইউনিটেরিয়ান মতে দীক্ষিত করিলেন। এডাম অতঃপর উৎসাহের সহিত একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। "হরকরা" নামক তৎকালের প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রের কার্য্যালয়ের দ্বিতল গৃহে ইউনিটেরিয়ান সোসাইটী স্থাপন করিয়া একেশ্বরবাদী খৃষ্টানদের ন্যায় উপাসনার পদ্ধতিপ্রচলিত করিলেন। রামমোহন রায়, তাঁহার পুত্রগণ এবং অন্যান্য কয়েকজন শিক্ষিত শিষ্য সেখানে ঈশ্বরোপাসনা করিতে যাইতেন। ক্ষুদ্র বীজ হইতে বিশাল বটবৃক্ষের উদ্ভব হয়, একদিনের একটা সামান্য কথা হইতে "ব্রহ্মসভার" প্রতিষ্ঠা হইল।

একদিন রামমোহন রায়, এডাম সাহেবের উপাসনা সভা হইতে বাটীতে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময় তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন "বিদেশীয়দিগের উপাসনা সমাজে না গিয়া নিজেদের একটী উপাসনা গৃহ করিলে ভাল হয় না?" রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, টাকীর কালীনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ও হাবড়ার মথুরানাথ মল্লিকের সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন। তাঁহারা ধনী, ধন দানে সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন। সিমলায় এক খণ্ড ভূমি ক্রয়ের প্রস্তাব হইল, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের পক্ষে স্থানটি আনুকূল বোধ না হওয়াতে ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র শনিবার যোড়াসাঁকোর মধ্যে, চিৎপুর রোডের উপর কমললোচন বসুর বাড়ী ভাড়া করিয়া "ব্রহ্মসভা" নামে এক উপাসনা সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হইল।

এই বাটীতে যে সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা ব্রাহ্মসমাজ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহাই জগতের পাপী তাপী নরনারীর আশ্রয় স্থল হইয়াছে। কমললোচন বসুর এই বাটী এখন হরনাথ মল্লিকের সম্পত্তি। এই বাটী ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে স্মরণীয় বিষয়। দ্বারকনাথ ঠাকুর প্রভৃতির অর্থ সাহায্যে যোড়াসাঁকো চিৎপুর রোডের উপর এক দ্বিতল গৃহ নির্ম্মিত হয়। ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ কমল বসুর বাটী হইতে ব্রহ্মসভা এই নূতন গৃহে উঠিয়া আইসে। ৬ই ভাদ্র ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন, ১১ই মাঘ আদি সমাজগৃহ প্রতিষ্ঠার দিন।

প্রতি শনিবার সন্ধ্যা সাতটা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য হইত। তখন সমাজের ত্রিতল গৃহ ছিলনা, ত্রিতলগৃহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়ে নির্ম্মিত হয়। দ্বিতলে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল। সূর্য্য অস্ত হইবার কিছু পূর্ব্বে শিব প্রসাদ মিত্র নামক একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ একটী কক্ষে উপনিষদ পাঠ করিতেন। সেখানে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহ যাইতে পারিত না। হিন্দুদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্যই তিনি এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সূর্য্য অস্ত হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও উৎসবানন্দ গোস্বামী সমাজগৃহে আসিয়া বেদীর উপর উপবেশন করিতেন। উৎসবানন্দ উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিতেন। কিন্তু উপনিষদের শ্লোক পাঠ করিতেন না। বিদ্যাবাগীশ কখনও রামমোহন রায়ের রচিত ব্যাখ্যান কখনওবা বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যান পাঠ করিতেন। তৎপর সঙ্গীত হইয়া সমাজ ভঙ্গ হইত। তারা-চাঁদ চক্রবর্ত্তী সমাজের সম্পাদক ছিলেন। সমাজগৃহে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকই আগমন করিতেন। বেদীর পূর্ব্বদিকে ফরাস চাদর পাতা থাকিত, সভ্যগণ এখানে উপবেশন করিতেন। পশ্চিম দিকে চৌকি থাকিত তাহাতে আগন্তুকেরা আসিয়া বসিতেন।

দুই চারিজন লোক ব্যতীত সভ্যদের আর কেহ ব্রহ্ম সভার উদ্দেশ্য পর্য্যন্ত বুঝিত না। গায়কগণ ব্রহ্মসভায় বসিয়া কখনও কালী বিষয় কখনও রাধা কৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক গান গাহিতেন। রামমোহন রায় একদিন বলিলেন "ওসব গাও কেন? অলখ নিরঞ্জন গাও।" ব্রাহ্মসমাজে যে, ব্রহ্ম বিষয়ক গান গাইতে হয় তাহা অনেকে জানিতেন না। অনেকেই রামমোহন রায়ের মনস্তুষ্টির জন্য আসিতেন, ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান অনেকেরই ছিলনা। শনিবার রাত্রে তৎকালে আমোদ প্রমোদের সময় ছিল। ব্রহ্মসভার সভ্যগণ আমোদ ছাড়িয়া উপনিষদ্‌পাঠ শুনিতে আসিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই অবশেষে শনিবারের পরিবর্ত্তে বুধবার সমাজের দিন স্থির হয়। রামমোহন রায়ের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত আদি সমাজ বুধবারেই হইয়া আসিতেছে। তৎকালে সভ্যদের মধ্যে দুই একজন যে ব্রহ্মানুরাগী ছিলেন না, এমন কথা বলা যায় না। তেলিনী পাড়ার জমিদারপুত্র অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মসভাকে প্রকৃতই ভাল বাসিতেন। তাঁহার পিতা ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী ছিলেন। অন্নদাপ্রসাদ প্রতি শনিবার এবং তৎপর প্রতি বুধবার দ্রুতগামী নৌকাযোগে পলাইয়া সমাজে আসিতেন। এবং সমাজ অন্তে আবার নৌকায় করিয়া তেলিনীপাড়া যাইতেন। ইহা তাঁহার কম অনুরাগের পরিচয় নয়।

ব্রহ্মসভা সংস্থাপিত হওয়াতে পৌত্তলিকগণ আতঙ্কিত হইলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, আত্মীয় সভা মরিয়াছে, আর ভয় নাই। ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহারা একলক্ষ টাকা মূলধন করিয়া ধর্ম্মসভা স্থাপন করিলেন। রাজা রাধাকান্ত সভাপতি, মতিলাল শীল প্রভৃতি ইহার উৎসাহী সভ্য হইলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভার সম্পাদক হইয়া ঘরে ঘরে ব্রহ্মসভার নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং সকলকে ব্রহ্মসভায় যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা তাঁহার নিষেধ বাক্য অগ্রাহ্য করিল তাহারা সমাজচ্যুত হইল। ব্রহ্মসভার দল ও ধর্ম্ম সভার দলে কলিকাতা দুই ভাগে বিভক্ত হইল। ব্রহ্মসভার দলস্থ লোকেরা প্রায় সকলেই অনুষ্ঠানে পৌত্তলিক ছিলেন, নিজের দলে ব্রাহ্মণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য তখন অজস্র অর্থ ব্যয় করা হইত। ১১ই মাঘের উৎসবের দিনেও ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় দেওয়া হইত। রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসনা প্রচারের জন্য ব্রহ্মসভা স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু সভ্যগণের অনেকেই সে বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। এমন কি রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের পরে ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন নামক একজন আচার্য্য বেদী হইতে রামচন্দ্রের অবতারত্ব প্রতিপন্ন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বদেশবাসীকে সর্ব্বপ্রকার হীনতা হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই রামমোহন রায় সমবেত ব্রহ্মোপাসনার প্রথা প্রচলিত করেন। কিন্তু নির্জ্জন ধ্যান ধারণা ব্যতীত যে মানবের কল্যাণ হয় না তাহাও তিনি বুঝিতেন সুতরাং নির্জ্জন ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। নির্জ্জন ব্রহ্মোপাসনার প্রণালীতে ধ্যানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। (রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

পরমেশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই যে প্রকৃত উপাসনা রামমোহন রায়ই এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। (গ্রন্থাবলী ৫২৫ পৃষ্ঠা।)

রামমোহন রায় সকল জাতীয় লোকের উপাসনার জন্য ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন এবং ব্রাহ্মদের প্রাত্যহিক উপাসনার জন্য এক উপাসনা প্রণালী প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন এবং ব্রহ্মো-পাসনা ও জনহিতকর কার্য্যে ব্রতী হওয়া যে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য তাহা নিজ জীবনে ও উপদেশে প্রকাশ করিয়াছেন।

রামমোহন রায় বেদের অভ্রান্ততায় কখনও বিশ্বাস করিতেন না। তিনি কেনউপনিষদের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকাতে স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন, "শ্রুতি সকল পরস্পর বিরোধী। তাহাদের উপর নির্ভর করা যায় না। মানববুদ্ধি সম্পূর্ণ নহে সুতরাং তাহার উপরও নির্ভর করা যায় না। অতএব শাস্ত্র ও বুদ্ধি এই উভয়ের যথামর্ম্ম ব্যবহার দ্বারা এবং যিনি প্রার্থনার বস্তু বিধান করেন, তাঁহার মঙ্গল ভাব, অনন্ত শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উন্নতি সাধনে চেষ্টা করিতে হইবে।"

ব্রাহ্মসমাজকে সকল ধর্ম্মাবলম্বীর গ্রাহ্য যোগ্য সমাজ করা রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্যই তিনি সমাজের ট্রষ্টডিডে এই বিধি করিয়া গিয়াছেন যে, কোন সাম্প্রদায়িক নামে ব্রহ্মোপাসনা হইতে পারিবে না।

সকল ধর্ম্ম মুক্তিপ্রদ কি না ?*

(প্রাপ্ত)

কোন্ ধর্ম্ম মুক্তিপ্রদ এবং কোন্ ধর্ম্ম মুক্তিপ্রদ নহে, এই প্রশ্নের সন্তোষকর উত্তর সূক্ষ্ম বিচার-সাপেক্ষ হইলেও বর্ত্তমান বিষয় সম্বন্ধীয় ২।১টা কথা সহজেই মীমাংসিত হয়। যে ধর্ম্ম দেশ বিশেষ, স্থান বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে, সেই ধর্ম্ম যে মানব সাধারণের মুক্তির জন্য একান্ত আবশ্যক নহে, তাহা সহজ যুক্তিতেই বুঝা যায়। আর মোক্ষ-সাধনের সামগ্রী কি কি এবং প্রচলিত সকল ধর্ম্মে তাহা আছে কি না, এই বিষয়ের বিচার না করিয়া "ধর্ম্মমাত্রই মুক্তিপ্রদ" এই কথা বলা যে নিতান্ত স্থূলদর্শিতার ফল, ইহাও অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং মূল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে পূর্ব্বে এই বিচার আবশ্যক যে, মুক্তি কি এবং কোন ধর্ম্ম বা সাধন-প্রণালী কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইলে তাহা মুক্তিপ্রদ হইতে পারে।

মুক্তি কি ? আমরা কি হইতে মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করি ? মুক্তি বলিলেই কোন বন্ধন হইতে মুক্তি বুঝায়। সেই বন্ধন কি ? ব্রাহ্মসমাজে এই প্রশ্নের সাধারণতঃ এই উত্তর পাওয়া যায়—মুক্তির অর্থ পাপের বন্ধন হইতে মুক্তি। এই উত্তর আমার বিবেচনায় সম্পূর্ণ উত্তর নহে। কিন্তু আমি সম্প্রতি এই উত্তর নিরাপত্তিতে গ্রহণ করিতেছি, কারণ আমার বিশ্বাস যে, কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই ইহার ভিতর হইতে পূর্ণ উত্তর বাহির হইতে পারে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, পাপের কারণ কি ? মানুষ কেন এবং কি অবস্থায় পাপ করে ? ইহার উত্তর—প্রবৃত্তির অধীনতা। মানুষের মন প্রবৃত্তির অধীন থাকিলেই মানুষ পাপ করে। মানুষ প্রবৃত্তির অধীন হয় কেন ? নীচ বাসনা-পরতন্ত্র হয় কেন ? ইহার উত্তর—মোহবশতঃ। যাহা শ্রেয়স্কর নহে, কেবল মাত্র সুখকর, অথবা বাস্তবিক সুখকরও নহে, কেবল আপাত-সুখকর, এরূপ বিষয়ে অতিনিবেশের নামই মোহ। মোহের কারণ কি ? মোহের কারণ—শ্রেয়ঃ অর্থাৎ প্রকৃত মঙ্গল সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব। 'জ্ঞান' অর্থ কেবল বুঝা নহে, অন্ততঃ সেই অর্থে আমি 'জ্ঞান' ব্যবহার করিতেছি না। এস্থলে জ্ঞানের অর্থ—পরিষ্কার বোধ, দৃঢ় বিশ্বাস এবং উজ্জ্বল ও স্থায়ী উপলব্ধি। শ্রেয়ঃ সম্বন্ধে এরূপ জ্ঞানের অভাবই মোহের কারণ। এরূপ জ্ঞানে মোহ দূর হয়, মোহ দূর হইলে প্রবৃত্তি বশীভূত হয়, এবং প্রবৃত্তি বশীভূত হইলেই মানুষ পাপবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। সুতরাং পাপ হইতে মুক্ত হওয়ার নামই যদি মুক্তি হয়, তবে শ্রেয়ঃ সম্বন্ধীয় উক্ত লক্ষণাক্রান্ত জ্ঞান লাভই মুক্তি লাভের উপায়।

কিন্তু শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান প্রভৃতি মানসিক ও নৈতিক সম্পত্তি লব্ধ না হইলে উপরোক্ত জ্ঞানলাভ অসম্ভব। সুতরাং শম দমাদি সাধন যোগে শ্রেয়ঃ সম্বন্ধীয় উজ্জ্বল ও স্থায়ী জ্ঞান লাভই মুক্তির উপায়। কিন্তু এরূপ জ্ঞান লাভ ও নিষ্পাপ হওয়ার মধ্যে কালের ব্যবধান নাই। এরূপ জ্ঞানে অবস্থিতি করা আর নিষ্পাপ হওয়া একই কথা, সুতরাং ইহাকে মুক্তির উপায় না বলিয়া ইহাকেই মুক্তি বলা যাইতে পারে। অন্ততঃ ইহাকে মুক্তির একাঙ্গ বলিতে হইবে। সুতরাং মুক্তির অর্থ কেবল পাপ হইতে মুক্তি নহে, শ্রেয়ঃ বিষয়ক অজ্ঞানতা হইতে মুক্তিও বটে।

কিন্তু শ্রেয়কে জানিতেছি কার্য্যে শ্রেয়ের অনুসরণ করিতেছি, অথচ চিত্ত শ্রেয়কে প্রীতি করে না, শ্রেয়ঃ প্রিয় হয় নাই, এই অবস্থা সম্পূর্ণ বাঞ্ছনীয় অবস্থা নহে, সম্পূর্ণ শ্রেয়স্কর অবস্থা নহে। চিত্তবৃত্তি শ্রেয়কে আলিঙ্গন না করিলে আত্মাতে শ্রেয়ের পূর্ণ রাজত্ব স্থাপিত হইল না, পবিত্রতা পূর্ণ হইল না। সুতরাং প্রীতি ও মুক্তির অঙ্গ। তাহা হইলে মুক্তির পূর্ণ অর্থ অজ্ঞানতা, অপ্রীতি ও অপবিত্র কার্য্য হইতে মুক্ত হওয়া। অন্য কথায়,—শ্রেয়কে জানা, প্রীতি করা ও কার্য্যগত জীবনে শ্রেয়ের অনুসরণ করা।

কেহ কেহ হয়ত: বলিবেন যে, জ্ঞান ছাড়াও মুক্তি সম্ভব, শ্রেয়ঃ সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসই মুক্তির পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমার বিবেচনায় জ্ঞানবিহীন বিশ্বাস বাহ্যিক চরিত্রকে সংশোধন করিতে পারে বটে, অনেক পরিমাণে চিত্তকেও পবিত্র করিতে পারে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি অন্ধবিশ্বাসের সাধ্যায়ত্ত নহে। এরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এই,—ব্রহ্মবস্তু যে কি, এবং গভীর ব্রহ্মযোগে জীবন কিরূপ আকার ধারণ করে, কিরূপ আদর্শ মানবের সমক্ষে প্রকাশিত হয়, এই সমস্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানগোচর বস্তু, কেবল শ্রুতিমূলক বিশ্বাসে এই সকল বস্তু সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা হয় না। সুতরাং কেবল এরূপ বিশ্বাসের উপর দাঁড়াইয়া ব্রহ্মোপলব্ধি ও ব্রহ্মীকৃত জীবনের সাধন চলিতে পারে না। আর, ব্রহ্মোপলব্ধি ব্যতীত অহঙ্কার বিনষ্ট হয় না। যতদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মকে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বময়, প্রাণরূপী, অন্তরাত্মা বলিয়া উপলব্ধি না করা যায়, ততদিন পর্য্যন্ত হৃদয়ের গূঢ় অহঙ্কার বিনষ্ট হয় না, এবং অহঙ্কার বিনষ্ট না হইলে সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না। ধর্ম্মের ইতিহাসে যে সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক বড় বড় ভক্ত এবং সেবকগণও অভিমান ও আত্মাদর ভুলিতে পারেন নাই, তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা ভক্তি ও সেবায় উচ্চ সাধক হইয়াও সেই প্রত্যক্ষ ও উজ্জ্বল ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা করেন নাই, অন্ততঃ তাহার অধিকারী হন নাই, যাহাতে ব্রহ্মের সর্ব্বময়ত্ব এবং ব্যক্তিগত অহংভাবের অসারতা দেখাইয়া দেয়। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মীকৃত জীবন প্রত্যক্ষ জ্ঞানযোগে উপলব্ধি করা মুক্তির পক্ষে একান্ত

* "তত্ত্ববিদ্যা সভায়" শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয়ের পঠিত ও বিবৃত প্রবন্ধ, কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত।

আবশ্যক। শুধু বিশ্বাস' এই জ্ঞানের স্থান অধিকার করিতে পারে না।

আর একটী কথা পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। শ্রেয়ঃ সম্বন্ধীয় জ্ঞান মুক্তির পক্ষে একান্ত আবশ্যক, ইহা বুঝা গেল। যাহা লাভ করিতে হইবে, যাহার জন্য সাধনা করিতে হইবে, তাহার সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না থাকিলে সাধনাও চলিতে পারে না, বস্তুলাভও হইতে পারে না। যে পরিমাণে এই জ্ঞান বিকৃত ও ভ্রমযুক্ত থাকিবে সেই পরিমাণে মুক্তি অপ্রাপ্ত থাকিবে। সুতরাং পূর্ণ মুক্তির পক্ষে শ্রেয়ঃ সম্বন্ধে অবিকৃত, ভ্রমশূন্য জ্ঞান আবশ্যক। ব্রহ্মের সহিত প্রত্যক্ষ ও স্থায়ী আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপনই যে শ্রেয়ঃ, এই বিষয়ে এস্থলে মতভেদ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপনের পক্ষে ব্রহ্মের সহিত জীবের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ বিষয়ে অবিকৃত, নির্ম্মল জ্ঞান আবশ্যক। ব্রহ্মের অনন্ত ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে মানবের জ্ঞান কোন কালে পূর্ণ হইতে পারে না, ইহা সত্য; মানবের ব্রহ্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান ক্রমশঃই উন্নত হইতে উন্নততর হইতে থাকিবে, ইহা সত্য, কিন্তু এই জ্ঞান যখন যতটুকু আমাদের মধ্যে থাকিবে, সেই-টুকু যে অবিকৃত ও নির্ম্মল হইতে পারে না, তাহা মনে করি না। ব্রহ্ম অনন্ত শক্তি ও অনন্ত জ্ঞানের আধার, তিনি অন্তর্যামী, অন্তরাত্মা, তিনি পূর্ণপ্রেম ও পূর্ণ পবিত্রস্বরূপ, তাঁহার সহিত চিন্তা, ভাব ও কার্য্যে যুক্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ, এই সাধারণ ধারণাতে কোন ভ্রম নাই, এবং এই ভ্রমশূন্য নির্ম্মল জ্ঞান মোক্ষ সাধনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

এই আলোচনা হইতে কয়েকটী বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে। যে সকল ধর্ম্মে উপরোক্ত মুক্তি-সাধন-সামগ্রী বর্ত্তমান নাই, পরন্তু যে সকল ধর্ম্ম ঐ সকল সামগ্রী-প্রাপ্তির বিরোধী, সেই সকল ধর্ম্ম যে মুক্তিপ্রদ নহে, তাহা নিঃসন্দেহ রূপে সপ্রমাণ হইতেছে। সুতরাং সাধারণভাবে বলা যায় যে,—

প্রথমতঃ, যে সকল ধর্ম্ম শ্রুতিমূলক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ জ্ঞানযোগে উপলব্ধি করা যে সকল ধর্ম্মের লক্ষ্য নহে, সে সকল ধর্ম্ম মুক্তিপ্রদ নহে।

দ্বিতীয়তঃ, যে সকল ধর্ম্ম ব্রহ্ম বিষয়ে ব্রহ্মের সহিত জীবের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ বিষয়ে, অনুপযুক্ত ধারণা আছে, সে সকল ধর্ম্ম মুক্তিপ্রদ নহে।

তৃতীয়তঃ, যে সকল সাধনপ্রণালীতে ব্রহ্মীভূত জীবন প্রাপ্তির সহায়তা না করিয়া ব্যক্তিগত সুখও স্বার্থ সাধনের সহায়তা করে, সে সকল ধর্ম্ম মুক্তিপ্রদ নহে।

যে সকল ধর্ম্ম মুক্তিপ্রদ নহে, তাহাদের সাধারণ লক্ষণ সকল দেখা গেল, এখন বিশেষভাবে এরূপ ধর্ম্মের আলোচনা করা যাক্। আমি কোন ধর্ম্মের নাম করিব না, নাম অনেক স্থলেই বুদ্ধিকে ভ্রমে নিক্ষেপ করে। কেবল মুক্তিবিরোধী বা মুক্তিদানে অসমর্থ ধর্ম্ম সমূহের বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলির উল্লেখ করিব।

(১) যে ধর্ম্মে সর্ব্বাধার সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত ব্রহ্ম উপাস্য নহেন, কোন পরিমিত দেবতা উপাস্য, সে ধর্ম্ম মুক্তিপ্রদ নহে।

(২) যে পূজার উপকরণ জ্ঞান, প্রীতি, আত্মসমর্পণ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বস্তু নহে, কিন্তু পুষ্প, পত্র, খাদ্য, পশুবধ প্রভৃতি বাহ্যবস্তু, সে পূজা মুক্তিপ্রদ নহে।

(৩) যে সাধনের লক্ষ্য ধন, যশ, ঐশ্বর্য্য, বা ইন্দ্রলোকাদি সুখকর স্থান লাভ, ব্রহ্মলাভ নহে, সে সাধন মুক্তিপ্রদ নহে।

(৪) যে ধর্ম্মে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে শাস্ত্র বা গুরু মধ্যবর্ত্তী, যে ধর্ম্ম সাধককে সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরের সম্মুখীন করে না, সে ধর্ম্ম মুক্তিপ্রদ নহে।

(৫) যে ধর্ম্মের লক্ষ্য চির বর্ত্তমান পূর্ণ পরব্রহ্মের সহিত যোগ নহে, যাহার লক্ষ্য সমুদায় জ্ঞান, চিন্তা, ভাব ও কার্য্যের সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ, সে ধর্ম্ম মুক্তিপ্রদ নহে।

(৬) যে ধর্ম্মের ঈশ্বর ক্রোধ ও দ্বেষ-পরায়ণ, পাপীও ভ্রান্ত মানবের পক্ষে অনন্ত-নরক বিধায়ক, সুতরাং যাঁহার সংস্পর্শে উপাসক ক্রোধ ও দ্বেষশূন্য হইতে পারেন না, সে ধর্ম্ম মুক্তিপ্রদ নহে।

(৭) যে ধর্ম্মে ব্যক্তি, শ্রেণী বা জাতি বিশেষ ঈশ্বরের কৃপা পাত্র, এবং অপর ব্যক্তি, শ্রেণী বা জাতি বিশেষ ঈশ্বরের পরিত্যক্ত, যে ধর্ম্ম সাধকের হৃদয়ে অপক্ষপাতিত্ব ও বিশ্বপ্রেম সঞ্চার করিতে পারে না, সে ধর্ম্ম মুক্তিপ্রদ নহে।

৮। যে উপাসনাতে ঈশ্বর আত্মার বাহিরে, যে উপাসনাতে ঈশ্বর অন্তর্যামী, অন্তরাত্মা, প্রাণের প্রাণ রূপে উপলব্ধ হন না, সে উপাসনা অজ্ঞানতা ও অহংকার বিনাশ করিতে পারে না, সুতরাং তাহা মুক্তিপ্রদ নহে।

এখন মুক্তিপ্রদ ধর্ম্মের লক্ষণ সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করিতেছি। যে ধর্ম্মে পূর্ণ, অনন্ত পরব্রহ্ম উপাস্য; ব্যক্তিগত অহংকার, অপ্রীতি ও অপবিত্রতা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের সহিত পূর্ণ আধ্যাত্মিক যোগ যে ধর্ম্মের সাধ্য অর্থাৎ লক্ষ্য; আধ্যাত্মিক উপাসনা ও শমদমাদি জ্ঞানসম্মত স্বাভাবিক উপায়ে ব্রহ্মযোগ লাভের চেষ্টা যে ধর্ম্মের সাধন, কেবল সেই ধর্ম্মেই মোক্ষসাধন-সামগ্রী পূর্ণরূপে বর্ত্তমান আছে, সুতরাং কেবল সেই ধর্ম্মই একমাত্র মুক্তিপ্রদ ধর্ম্ম। এরূপ ধর্ম্মকে আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম বলি, কিন্তু ইহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে বর্ত্তমান থাকিতে পারে ও আছে। ইহাকে কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান, কেহ খ্রীষ্টান, কেহ বৌদ্ধধর্ম্ম বলিতে পারেন। কিন্তু এরূপ সাম্প্রদায়িক নামে ইহার মুক্তিপ্রদ শক্তি বিনষ্ট হয় না।

যে সকল ধর্ম্মে মুক্তি-সাধনের উপকরণ পূর্ণরূপে বর্ত্তমান নাই, এবং যে সকল ধর্ম্ম অল্পাধিক পরিমাণে মুক্তি-বিরোধী বস্তু-সংবলিত, সে সকল ধর্ম্ম পূর্ণ মুক্তি দানে অসমর্থ বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে মুক্তি-সাধন-সামগ্রী যে পরিমাণে বর্ত্তমান, সেই পরিমাণে তাহারা মুক্তির সহায়, এবং সেই পরিমাণেই তাহারা আমাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির উপযুক্ত।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যতীত মুক্তি নাই। অথচ প্রেমময় ঈশ্বরের সন্তান মাত্রই মুক্তির অধিকারী। সুতরাং আমার বিশ্বাস এই যে শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, ইহকালে হউক, পরকালে হউক, সকলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন দ্বারা মুক্তি লাভ করিবে।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়,

বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমার পত্রের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া অবগত হইলাম, আমি সাম্যবাদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম, তাহা তাঁহার "কাছে অতিশয় আপত্তিজনক বলিয়া মনে হইয়াছিল।" "প্রত্যেক ব্রাহ্মই সাম্যবাদী বলিয়া পরিচয় দেন, অথচ সাম্যের মতটা কি" তাহা পরিষ্কার জানেন না, দেবেন্দ্র বাবু ব্রাহ্মদিগের সেই অনভিজ্ঞতা দূর করিতে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু তিনি সাম্যের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মদিগের অনভিজ্ঞতা দূর হইয়াছে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আমি যে অন্ধকারে ছিলাম, তথায়ই পড়িয়া রহিয়াছি, আলোক প্রাপ্ত হই নাই।

আমার কোন্ কোন্ কথা তাঁহার নিকট অতিশয় আপত্তিজনক বলিয়া গণ্য হইয়াছে, দ্বিতীয় পত্রেও তাহার উল্লেখ করেন নাই; সুতরাং তাহার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কমিউনিজমকে তিনি যেরূপ বিকৃত পদার্থ বলিয়া মনে করেন, অনেক চিন্তাশীল ইউরোপীয় তাহা করেন নাই। Christ and communism নামে একখানি গ্রন্থ অনেক দিন হইল পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছিল, যিশু অনেক পরিমাণে কমিউনিজমই প্রচার করিয়াছেন। এই গ্রন্থের এক স্থানে লেখা ছিল, জগতে প্রচলিত ধন বিভাগ দ্বারা যত অনিষ্ট হইয়াছে, কমিউনিজমের মূলতত্ত্ব ভ্রমাত্মক বলিয়াও যদি প্রমাণিত হয়, তথাপি তদ্দ্বারা সেরূপ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। জনষ্টুয়ার্ট মিলও যে এরূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন দেবেন্দ্র বাবুর বোধ হয় তাহা অবিদিত নাই। মিল আরও বলিয়াছেন, কমিউনিজমকে নির্ব্বাসিত করিবার চেষ্টা না করিয়া উহার ফলাফল স্থিরচিত্তে পরীক্ষা করা আবশ্যক। কেন না উহার দ্বারা বর্ত্তমান ধন বিভাগের অনিষ্টকারিতা নিবারণ পক্ষে কোনরূপ সুসিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার সুযোগ হইতে পারে। সে যাহা হউক, কমিউনিজম প্রভৃতির ফলাফল বিচার করা এপ্রস্তাবের লক্ষ্য নহে। ডাক্তার টমাস চামার্স প্রভৃতি Christian socialsism নামে যাহা প্রচার করিতেছেন এবং কার্য্যতঃ শিক্ষা দিতেছেন, তাহাকে বালকতা বলা সাহসিকতার কার্য্য বটে।

দেবেন্দ্র বাবু বলেন, "সাম্যবাদের অর্থ মানুষের প্রকৃতিগত কতকগুলি অধিকারের ক্ষমতা।" জনষ্টুয়ার্ট মিল বলেন, greatest good of the greatest number, সুখ ও সমাজ নীতির মূল। হারবার্ট স্পেন্সর বলেন, মিলের উক্তি প্রকৃত বিষয়ের মীমাংসার বিশেষ সহায়তা করিতেছে না। what constitutes the greatest good of the greatest number তাহাই মীমাংসার বিষয় মানুষের প্রকৃতিগত অধিকার কি, তাহা দেবেন্দ্র বাবু নির্দ্দেশ করেন নাই। অথচ তাহাই নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। প্রকৃতিগত শক্তি ও অসামর্থ্য যে অনেক পরিমাণে জন্মগত হইয়া থাকে, দেবেন্দ্র বাবু তাহা কি অস্বীকার করিতে চাহেন? বংশধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার উপস্থিত করা আমার অভিপ্রায় নহে। তবে যদি দেবেন্দ্র বাবু সে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন, তত্ত্বকৌমুদীর পরিবর্ত্তে Indian Messenger এ তাহা করাই উচিত, কেন না আমাকে এবং তাঁহাকে এসম্বন্ধে অনেক কথা উদ্ধৃত করিতে হইবে। একবার ইংরাজীতে উহা উদ্ধৃত করিয়া পরে বাঙ্গালায় তাহার অনুবাদ করিতে হইলে অনর্থক তত্ত্বকৌমুদীর অনেক স্থান অধিকৃত হইবে, তাহা নিষ্প্রয়োজন। দেবেন্দ্র বাবু বলেন, "সাধু অসাধু, বুদ্ধিমান নির্ব্বোধ, অলস ও অধ্যবসায়ীর ভিন্নতা যে সম্পূর্ণ অবস্থা, বংশ ও সমাজের ফল তাহা স্বীকার করিতে পারি না।" "সম্পূর্ণ" কথাটা আমি কি ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহা ত আমার স্মরণ হইতেছে না। উহা আংশিক রূপে সত্য হইলেই আমার পক্ষ সমর্থিত হয়। ব্রাহ্মণত্ব বংশগত কিম্বা ব্যক্তিগত করিবার একটা বিশেষ আবশ্যকতা আছে, একটা নূতন বর্ণ ভেদের প্রয়োজন রহিয়াছে ইহা আমি স্বীকার করি না। গুণ, চরিত্র বা ধর্ম্মের একটা পৃথক দাবি দাওয়া সংস্থাপন করিতে হইবে, না করিলে মানুষের ধর্ম্মও থাকিবে না, চরিত্রও থাকিবে না, সমাজ দুর্গতির চরম সীমায় উপস্থিত হইবে, ইহা আমার নিকট একটা অসঙ্গত বিভীষিকা বলিয়া বোধ হয়। এস্থলে Mrs Humphry ward এর marcella এর কথা মনে উদয় হয়:—"It makes one man master, instead of all men brothers. And who is fit to be master? Which of us?"

মানুষ মানুষকে ভাই বলিয়া স্বীকার করিলে সংসার যেন চলে না, প্রভুত্বের একটা দাবি দাওয়া উপস্থিত করা যেন একটা অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়, না করিলে পৃথিবী রসাতলে যাইবে।

"ইচ্ছা করিলেই যে কেহ মহাপুরুষ হইতে পারে না।" একথার অর্থটা কি দেবেন্দ্র বাবু তাহা বুঝাইয়া দিলে ভাল হইত। তিনি তাহা খুলিয়া বলিবেন না, এক কথারই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিবেন। সুতরাং আমাকেও পুনরায় পূর্ব্ব উত্তরই দিতে হয়। ইচ্ছা করিলে লোকে যদি সাধু হইতে না পারে, ধার্ম্মিক হইতে না পারে, তবে ধর্ম্ম-চর্চ্চার আর কোন প্রয়োজনই থাকে না। আমি কোথাও "প্রকার ভেদ" variability লোপ করিতে চাই নাই। এক শতাব্দী কেন, শত শতাব্দীতেও "প্রকার ভেদ" লোপ হইবে না। বৈষম্য সম্বন্ধেই বলিয়াছি, যে উহাও এক শতাব্দীতে দূর হইবে না। এক পিতা মাতার সন্তানদিগের মধ্যে যে সকলে সমান হয় না, তাহা কি কতক পরিমাণে পিতা মাতার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ফল নহে? দেবেন্দ্র বাবু ইহা অস্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু যাহারা এ সকল তত্ত্ব নিবিষ্টচিত্তে অনুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহারা একথা যে স্বীকার করিয়া থাকেন ইহার প্রমাণ তিনি যদি চান আমি Indian Messeugerএ তাহা প্রদর্শন করিব

ঈশ্বর যে একটী কপোতকে আর একটী কপোত অপেক্ষা অধিক পালক দিয়া তাহাকে শীত হইতে রক্ষা করেন, অপরকে শীতে কষ্ট দেন, একথা আমি নূতন শুনিলাম। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ ব্যতীত উহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। তবে কপোত অপেক্ষা ঘুঘুর পালক অধিক বা অল্প হইলে তদ্দ্বারা অসমদর্শীতার পরিচয় দেওয়া হয় না, কেবল প্রকার ভেদেরই প্রমাণ হয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি "প্রকার ভেদ" দোষাবহ নহে। কাফ্রি ও ইংরেজ যদি দুই স্বতন্ত্র প্রাণী species হইতেন, এবং তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃতিগত বৈষম্য থাকিত, তাহা হইলে ঈশ্বরের সমদর্শীতার প্রতি দোষারোপ করা যাইতে পারিত না। কিন্তু এক জাতীয় প্রাণী আপনার দোষে সাম্যাবস্থা হইতে ভ্রষ্ট না হইলেও যদি ঈশ্বরই তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট করিয়া সৃজন করিতেন, তাহা হইলে ঈশ্বরকে কিরূপে সমদর্শী বলিতাম। পিতা যদি এক সন্তানের শিক্ষার জন্য যত্ন করেন, অপর সন্তানকে মূর্খ করিয়া রাখেন, তাঁহাকে কি সমদর্শী বলিতে পারা যায়? যাঁহারা রে ল্যাঙ্কাষ্টারের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, কাফ্রি ও ইংরেজ এক জাতীয় মনুষ্য কি না, তৎসম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু উহারা যে ভিন্ন species নহে, এক জাতীয় মনুষ্য, এখন আর সে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। সুতরাং এখন মানুষে মানুষে যে বিস্তর বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তাহা নানা কারণে উপস্থিত হইয়াছে, চেষ্টা করিলে কালে সে বৈষম্য দূর হইতে পারিবে; ইহা দূর করা যে অসম্ভব পণ্ডিত মণ্ডলী তাহা বলিতেছেন না। এস্থলে আমি variability র কথা বলিতেছি না, inequalityর কথা বলিতেছি। একজন কবি, আর একজন চিত্রকর, ইহা inequalityর লক্ষণ নহে, variability মাত্র। শেষোক্ত "প্রকার ভেদ" দূর করা কাহারও অভিপ্রায় নহে। ঈশ্বরেরও তাহা অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু inequality দূর করা আবশ্যক এবং উহা করা সৃষ্টি নিয়মের বিরোধী বলিয়া মনে হয় না। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। এক ব্যক্তির পুত্র সুস্থ, আর এক ব্যক্তির পুত্র হৃদরোগ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। এই যে বৈষম্য ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলা যায় না। এ বৈষম্য অন্য কোন কারণ বশতঃ ঘটিয়াছে, সুতরাং সেই কারণ দূর করিতে পারিলে সেই বৈষম্য দূর হইবে। এক পুরুষে উহা দূর না হইতে পারে, কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন বংশগত রোগ দূর করা অতিশয় কঠিন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে। দৈহিক শক্তির এইরূপ বৈষম্য যেমন দূর করা যাইতে পারে, মানসিক শক্তির বৈষম্যও সেইরূপ দূর করা সম্ভবপর। নৈতিক শক্তি দুর্ব্বল থাকিলে তাহা যে অনায়াসে সবল করা যায়, তাহা অস্বীকার করিলে ধর্ম্মচর্চ্চার আর কোন প্রয়োজন থাকে না।

নিবেদক,
শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজ।

উৎসব—গত ২রা সেপ্টেম্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনা মন্দিরে ব্রাহ্মসম্মিলনীর সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ২৭শে আগষ্ট সোমবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত রাত্রে মন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন বসু এবং বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাসনাদি করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে "জয় দেব জয় দেব" এই বন্দনাটি সমস্বরে গীত হইত। রবিবার সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব হইয়াছিল। প্রাতে সংকীর্ত্তনের পর উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে ধ্যান ও প্রার্থনা হয়। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন প্রভৃতি প্রার্থনা করেন। অপরাহ্নে ৩ ঘটিকার সময় শাস্ত্র পাঠ হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ৪ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল "ভক্তি ও ভক্ত" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপর কিরূপে সাধু সঙ্গ করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত আলোচনা আরম্ভ করেন। শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিশ ও শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় মত প্রকাশ করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বসু জীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু বলেন। সন্ধ্যাকালে কীর্ত্তন হইয়া উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

আরা সাধনাশ্রম—কোয়েটা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে তথাকার ব্রাহ্মগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ভাই প্রকাশ দেব ও ভাই সুন্দর সিং কোয়েটায় গমন করিয়াছেন। অন্যান্য পরিচারকগণ আশ্রমে থাকিয়া বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা করিতেছিলেন। সম্প্রতি রোগের প্রকোপ প্রশমিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বাঁকিপুর, ভাগলপুর অঞ্চলে প্রচারে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

শোক-সংবাদ—আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, আমাদের শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মবন্ধু বাবু মোহিনীমোহন মজুমদার মহাশয় ইহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অনাথা পত্নী এবং পুত্রকন্যাগণ এবং আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহার অসাময়িক মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়াছেন। তাঁহার চরিত্র সকলের স্মরণীয়। তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় অধ্যবসায়, পরিশ্রম, মিতব্যয়িতা এবং সাধুতা প্রভৃতি গুণে প্রথম শ্রেণীর পুস্তকালয় স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং সাংসারিক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি অতি ধীর ও প্রশান্ত ছিল। তাহাতে বাহিরের আড়ম্বর কিছুই ছিল না। তিনি নির্জ্জনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উপাসনায় যাপন করিতেন এবং নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্মানুমোদিত

সাংসারিক কর্ত্তব্যাদি সুন্দররূপে সম্পাদন করিতেন। পরমেশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গল বিধান করুন এবং তাঁহার অনাথ পরিবারকে শান্তি দান করুন।

শ্রাদ্ধ—শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরলোকগতা পত্নীর শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মহেন্দ্র বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেনের বাসায় শ্রাদ্ধ হয়। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রাদ্ধোপলক্ষে মহেন্দ্র বাবু সাঃ ব্রাঃ সমাজে নিম্নলিখিত রূপ দান করিয়াছেন; সাঃ ব্রাঃ সমাজ ২৲ সাধনাশ্রম ২৲ ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয় ২৲ দুর্ভিক্ষ তহবিল ১৲ দাতব্য বিভাগ ১৲ টাকা।

শ্রীমতী লীলাবতী বসু তাঁহার পরলোকগত পিতা বাবু মোহিনীমোহন মজুমদারের শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রমোহন বসু মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় মোহিনী বাবুর জীবনের দু চারিটি কথা বলেন। শ্রাদ্ধোপলক্ষে শ্রীমতী লীলাবতী বসু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৩৲ ও সাধনাশ্রমে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

নামকরণ—দাসাশ্রমের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ দাসের কন্যার নামকরণ উক্ত দাসাশ্রমে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। কন্যার নাম বিভা রাখা হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ সংবাদ।

মাদরা নামক স্থানে বাবু হরিমোহন ঘোষাল অবস্থিতি করিয়া নিয়মিত রূপে দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোক দিগকে সাহায্য করিতেছেন। কলিকাতা হইতে বহু বস্ত্র এবং ঔষধাদি সংগ্রহ করিয়া পাঠান গিয়াছে। দিন দিনই দুর্ভিক্ষ বাড়িতেছে। এক মুষ্টি চাউলের জন্য বহু দূর হইতে লোক আসিতেছে। এই কয় সপ্তাহে সাহায্য প্রার্থীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। কোন কোনও গরিবের গৃহ সংস্কার করিবার জন্য এবং কাহাকেও বা নৌকা মেরামতের জন্য টাকা দেওয়া হইতেছে। বর্ষাকালে নৌকা ব্যতীত ভিক্ষা লইতে আসিতে পারে না। দেশবাসিগণের প্রমুক্ত দানের উপর ইহাদের জীবন নির্ভর করিতেছে। আমরা বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি যে, সকলে যথা সাধ্য সাহায্য করিয়া শত শত লোকের প্রাণ রক্ষা করুন।

দান প্রাপ্তি স্বীকার—কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে যে নিম্নলিখিত মহোদয় মহোদয়াগণ ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তি দিগের সাহায্যার্থে নিম্নলিখিত চাঁদা দান করিয়াছেন।—

শ্রীমতী সুবোধকামিনী মজুমদার লাহোর২৲, বাবু বরদাকান্ত বসু ময়মনসিং ১৲, বাগেরহাট হইতে বাবু হরিনাথ দাস সংগ্রহ করিয়া পাঠান ৫৲, বাবু বিশ্বেশ্বর সেন রঙ্গপুর হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠান ৩৵, বাবু প্রমথনাথ সরকার আসেনসোল ১৲, বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় নলহাটী ৸০, বাবু অবিনাশ চন্দ্র মিত্র বর্দ্ধমান ২৲, বাবু কামিনীকুমার গুপ্ত বর্দ্ধমান ২৲, কলিকাতা ৪নং ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট হইতে বাবু হরিমোহন দত্ত সংগ্রহ করিয়া পাঠান ৩।০, ১জন বন্ধু বম্বে ১২৲, বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ সভাপতি রামপুর হাট নীতি সভা ৬৲, বাবু অতুলচন্দ্র কর সম্পাদক যশোহর জিলায় পুওর রিলিফ ফণ্ড ২৲, বাবু শরৎচন্দ্র রায় কলিকাতা ২৲, বাবু কেদারনাথ রায় কলিকাতা ১৲, চুকড়ি ঘোষ কলিকাতা ১৲, বাবু রজনীনাথ গুহ কলিকাতা ১৲, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত কলিকাতা ১৲, বাবু উমাকান্ত দাস গুপ্ত কলিকাতা ৪৲, বাবু প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৲, বাবু মোহিনীমোহন বসু কলিকাতা ১৲, বাবু অভয়চরণ মল্লিক কলিকাতা ॥০, বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল খাস্তগির কলিকাতা ১৲, মেশার্স দত্ত মিত্র এণ্ড কোম্পানি কলিকাতা ।০, বাবু দেবেন্দ্রনাথ পাল কলিকাতা ॥০, ডাক্তার ডি, এন, রায়, কলিকাতা ২৲, বনগাঁ মিডিল ক্লাস ইংলিস স্কুলের ছাত্রগণ নিদাম্দদীন মোল্লার মারফৎ ৭॥৵০, বাবু জগদীশচন্দ্র বসু কলিকাতা ১৲, বাবু আশুতোষ ঘোষ কলিকাতা২৲,বাবু রাধানাথ বসু কলিকাতা॥০,ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রগণ বাবু হরনাথ বসুর মারফৎ ২৲, বাবু বরদানাথ হালদার কলিকাতা ১৲, শ্রীযুক্তা স্বর্ণময়ী দাস কলিকাতা ১৲, বাবু গিরিশচন্দ্র শর্ম্মা কলিকাতা ৩০৲, মাণিকদহ হইতে বাবু উমেশচন্দ্র নাগ সংগ্রহ করিয়া পাঠান ৩৩॥৫, বাবু অবিনাশচন্দ্র সরকার কলিকাতা ২৲, বাবু নির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক কলিকাতা ৵০, বাবু বেচারাম মল্লিক কলিকাতা ।০, বাবু রামদুর্লভ মজুমদার নওগাঁ আসাম ৪৲, বাবু ত্রৈলোক্য নাথ দেব কলিকাতা ।০, গয়া হইতে বাবু চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সংগ্রহ করিয়া পাঠান ২৫৲, বাবু বেণীমাধব মিত্রের স্ত্রী কুথ, ডুমরাউন ৫৲, একটী বন্ধু মাঃ বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ৫৲, শ্রীমতী কুসুম কুমারী মৈত্র কলিকাতা ২৲, বাবু মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্তিপুর ২৲, বাবু সত্যপ্রিয় দেব কলিকাতা১৲, বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতা ॥০, কালীমোহন দাস নওগাঁ আসাম ২৲, শ্রীমতী চিন্ময়ী দাস নওগাঁ আসাম ১৲, বাবু গৌরলাল রায় কাকিনীয়া ২৲, শ্রীমতী হেমলতা সরকার ভবানীপুর ৩৲, বাবু শ্রীনাথচন্দ দুর্ভিক্ষ ফণ্ডের উদ্বৃত্ত টাকা ময়মনসিং হইতে পাঠান ৩৪॥৵০, শ্রীমতী সুশীলা বসু ময়মনসিং ভগিনীসমাজ হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠান ২৫৲, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ধাড়া গেঁওখালী ২৲, বাবু কালীকৃষ্ণ বসাক কলিকাতা ॥০, বাবু পার্ব্বতীনাথ দত্ত কলিকাতা ১৲, বাবু চণ্ডীচরণ সিংহ জামালপুর হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠান ২৫৲, বাবু হরিমোহন দত্ত ব্রজ দুলালের ষ্ট্রীট হইতে সংগ্রহ করিয়া দেন ৪৲, বাবু জহরীলাল শীল কলিকাতা ১৲, বাবু বিপিন বিহারী দত্ত ॥০, বাবু সত্যব্রত সিংহ চাঁদপুর ।০, বাবু যোগব্রত সিংহ নওয়াখালি ।০, শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত কাঁটাল পাড়া একটী বন্ধু মাঃ প্রবোধচন্দ্র মহলানবিশ ১৲, বাবু তারণচন্দ্র দাস লাহোর ২৸৵০, বাবু কানাইলাল সেন কলিকাতা ১৲, বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ৫৲, একটী বন্ধু কলিকাতা ৵০, বাবু রামলাল মজুমদার এবং বঙ্কিমচন্দ্র রায় পুরুলিয়া স্কুলের ছাত্রগণ হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠান ১৬৲, বাবু ভোলানাথ সরকার পুরুলিয়া হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠান ১৭।০, শ্রীমতী হৈমবতী সেন চুঁচড়া ১৲, ডাঃ কালীপ্রসন্ন সেন দারজিলিং হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠান ২৫৲, একটী ব্রাহ্মিকা কলিকাতা ২॥৵০।

১৬ই বৈশাখের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত ৬১৵০।

১লা আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত ৮৫।০,।

মোট ৫০২৵৫

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ৩১এ ভাদ্র প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১২শ সংখ্যা।
১৭শ ভাগ।

১৬ই আশ্বিন সোমবার, ১৮১৬ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে করুণাসিন্ধু! আমরা ব্রাহ্মসমাজকে তোমার মঙ্গলবিধি বলিয়া বিশ্বাসচক্ষে দেখিতে পারিতেছি না, সেই জন্যই ইহার সেবাতে আপনাদিগকে সমুচিতরূপে অর্পণ করিতে পারিতেছি না। বিশ্বাসচক্ষে যদি তোমাকে প্রভু ও অধিপতিরূপে দেখিতাম এবং ব্রাহ্মসমাজের সেবাকে যদি তোমার সেবা বলিয়া দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে, ইহার জন্য আপনাদের দেহ মনের শক্তি-সমূহকে নিয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। আমাদিগকে বিশ্বাসচক্ষু দেও, যেন সেই চক্ষে আ... ব্রাহ্মসমাজকে দর্শন করি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

শক্তিদ্বয়ের সমাবেশ—ভৌতিকজগত সম্বন্ধে ইহা একটী পুরাতনসত্য যে, প্রত্যেক জড়ীয় পরমাণুর উপরে পরস্পর বিসম্বাদী দুইটী শক্তি কার্য্য করিতেছে, একটী কেন্দ্রাভিসারিণী অপরটী কেন্দ্রাপসারিণী। একটী পবমাণু পুঞ্জকে পরস্পরেব নিকটে রাখিতে চায় অপরটী সেই পরমাণু সকলকে পরস্পর হইতে দূরে ফেলিতে চায়। এইরূপ প্রত্যেক জড়ীয় পরমাণুতে দুইটী শক্তি আছে, বিয়োজক ও সংযোজক। বিয়োজক শক্তির গতি ভাঙ্গিবার দিকে, সংযোজক শক্তির গতি গড়িবার দিকে। এই ভাঙ্গা ও গড়া প্রকৃতিরাজ্যে নিরন্তর চলিতেছে। গূঢ়রূপে চিন্তা করিলে দৃষ্ট হইবে, যে মানবহৃদয়েও ভাঙ্গিবার ও গড়িবার উপযোগী দ্বিবিধশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে; স্বাধীনচিন্তা ও বিবেক সর্ব্বদা দোষগুণ বিচাব করে, ও যাহা নিষিদ্ধ তাহাকে বর্জ্জন করে, আবার শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম প্রভৃতি যাহা কিছু ভাল তাহাকে গঠন করে। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে এবং ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষার মধ্যে এই উভয় শক্তির সমাবেশ আবশ্যক, অর্থাৎ একদিকে যেমন মার্জ্জিত জ্ঞান ও বিবেকের উজ্জ্বলতা, অপরদিকে তেমনি শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতির বিকাশ। এই উভয় দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমরা দেখিতেছি, দুই শ্রেণীর লোক দুই অতিরিক্ত সীমাতে যাইতেছেন। এক শ্রেণী পৌরুষবুদ্ধিকে নিতান্ত প্রবল কবিতে চাহিতেছেন, অপর শ্রেণী গুরুভক্তির হস্তে আত্মবিক্রয় করিতে চাহিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজকে এই উভয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করিতে হইবে। উভয় দলের বিবাদ দ্বারা একটা মহোপকার সাধিত হইতেছে। আমরা মধ্যপথটী পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইতেছি।

হর্ষ শোকৌ জহাতি—উপনিষদের একটী প্রাচীন শ্লোকের এক অংশ এই;—

"অধ্যাত্ম যোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষ শোকৌ জহাতি।"

ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্মযোগ দ্বারা সেই পরব্রহ্মকে জানিয়া হর্ষ ও শোক উভয়কে পরিত্যাগ করেন। মানবসমাজের চিন্তা ও ভাবের স্রোতকে অতি সুন্দররূপেই একটী নদীর স্রোতের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। নদীর জলরাশির উপরকার জল সর্ব্বদাই বায়ুব দ্বারা তাড়িত। বায়ুর আঘাতে সেখানে সর্ব্বদাই নানাপ্রকার তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে। সে জলরাশি কখনই সুস্থির নহে। কিন্তু নদীব তলবর্ত্তী জলের গতি ও ভাব সে প্রকার নহে। সেখানে উপরকার চঞ্চলতা নাই, বিপুল জলরাশি নিঃশব্দ গতিতে এক মুখেই বহিতেছে। যদি জলনিম্নবর্ত্তী ইষ্টকখণ্ডের সহিত উপরিভাগবর্ত্তী কাষ্ঠখণ্ডের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে কত প্রভেদ লক্ষিত হয়। উপরিভাগবর্ত্তীকাষ্ঠখণ্ড তরঙ্গাঘাতে নৃত্য করিতেছে, দুলিতেছে, উঠিতেছে, পড়িতেছে, ঘুরিতেছে, বায়ুর অগ্রে ছুটিতেছে; কিন্তু জলনিম্নবর্ত্তী ইষ্টক বা উপলখণ্ড অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। এ সংসারে সত্যে প্রতিষ্ঠাবিহীন ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত এই উভয় শ্রেণীর লোকের মধ্যেও ঐ প্রকার প্রভেদ। যাহাদের সত্যে প্রতিষ্ঠা নাই, তাহারা বায়ুতাড়িত তৃণ বা কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় সতত বিক্ষিপ্ত হইতেছে, বায়ুর অগ্রে নীত হইতেছে। তাহাদের জীবন জনসমাজের চিন্তা ও ভাব স্রোতের ক্রীড়ার দ্রব্য হইয়া রহিয়াছে। যখন যে দিকে স্রোত বহিতেছে, তাহারা সেই দিকেই নীত হইতেছে; কখনও হর্ষে উৎফুল্ল কখনও বা বিষাদে ম্রিয়মাণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু যাহাদের সত্যে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাঁহারা ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠা লাভ

করিয়াছেন। সত্যরাজ্য বিশ্বাসের রাজ্য, বিমল বায়ুময় রাজ্য। বাহিরের বিক্ষেপকারী কারণ সেখানে বিদ্যমান নাই। তাহা ব্রহ্মের পবিত্র ও শান্তিপ্রদ আবির্ভাবে পরিপূর্ণ। এ রাজ্যে যিনি একবার স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি বাহিরের বিক্ষেপকারী হর্ষ ও শোকের বিক্ষোভকে অতিক্রম করিয়াছেন। আমরা সত্যকে যতই অকপট চিত্তে প্রীতি করিতে পারিব,যতই একান্ত অন্তরে সত্যের অনুসরণ করিতে পারিব, ততই এই বিক্ষোভ-বিহীন শান্তিময় রাজ্যে প্রবেশের অধিকারী হইব। আমরা অকাতরে ঈশ্বরের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারি না বলিয়াই সর্ব্বদা হর্ষ শোকের অধীন হইয়া এ সংসারে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করি। ঈশ্বর করুন, আমরা সত্যে আত্মসমর্পণ করিয়া যেন তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে বাস করিতে পারি।

ভবিষ্যৎ ব্রাহ্মসমাজ—ভবিষ্যৎ ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গ-পুষ্টি কি প্রকারে হইবে? তাহার দুই উপায় আছে;—প্রথমতঃ সমুচিতরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া উত্তরোত্তর যদি নূতন নূতন ধর্ম্মভাবসম্পন্ন লোক আকৃষ্ট হয়, তদ্দারা,—দ্বিতীয়তঃ যাহারা ব্রাহ্মগৃহে জন্মিতেছে, তাহাদের ধর্ম্মজীবনের উন্নতির দ্বারা। কিন্তু চিন্তা করিলে দৃষ্ট হইবে, যে যাহারা সমাজের অন্তর্ভূত, তাহাদের ধর্ম্মজীবনের উপর বাহিরের লোকের আকৃষ্ট হওয়া না হওয়া অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। কারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভূত ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মভাব যদি ম্লান হয়, এবং তাহাদের চরিত্র যদি অসৎ হয়,তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ যে নৈতিক শক্তির বলে এতদিন লোককে আকৃষ্ট করিয়াছেন, তাহা বিনষ্ট হইবে। যে সকল ধর্ম্মভাবসম্পন্ন লোক আকৃষ্ট হইয়া আসিবে তাহারা তিষ্ঠিবে না, এবং আভ্যন্তরীণ কথা যতই প্রকাশিত হইবে ততই ধর্ম্মভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আর আকৃষ্ট হইবে না। অতএব ব্রাহ্মসমাজের ক্রোড়জাত ও ইহার অন্তর্ভূত নরনারীর ধর্ম্মজীবনের উন্নতির উপরে ইহার ভবিষ্যৎ প্রধানরূপে নির্ভর করিতেছে। সে বিষয়ে আমাদের অবস্থা যদি বাস্তবিক আশাজনক হয়, তাহা হইলে অপর সহস্রপ্রকার দুর্ব্বলতা সত্বেও ভয় বা চিন্তার কারণ নাই। আমাদের অনেকদিকে অনেক ত্রুটী রহিয়াছে, কিন্তু যদি দেখিতে পাই যে, পশ্চাতে এরূপ একদল বালক বালিকা প্রস্তুত হইতেছে, যাহারা জ্ঞানে ধর্ম্মে স্বার্থনাশে ও ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আমাদিগকে অতিক্রম করিবে, তাহা হইলে এ সমুদায় ত্রুটী উপেক্ষা করিতে পারা যায়। কিন্তু প্রশ্ন এই, এরূপ একদল নরনারী কি পশ্চাতে আসিতেছে? তোমাদের বালকবালিকাদিগকে দেখিয়া কি আশা হইতেছে যে,তাহারা ধর্ম্মজীবনের পথে বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইবে? প্রকৃত কথা কি? ব্রাহ্মবালকগণ সহরের যে যে স্কুলে পাঠ করে, তাহাদের শিক্ষক মহাশয়দিগের মুখে শুনিতেছি যে, ব্রাহ্মবালকদিগকে তাঁহারা আশানুরূপ দেখিতেছেন না। বিদ্যাশিক্ষাতে নিকৃষ্ট স্বভাবচরিত্রেও অনেকে নিকৃষ্ট। অনেক ব্রাহ্মবালকের এরূপ দুর্নীতির কথা শুনা যাইতেছে যে, তাহা শুনিলে হৃদয় আশঙ্কা ও বিষাদে পূর্ণ হয়। ব্রাহ্মবালকদিগের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে, বিদ্যাশিক্ষায় উৎকর্ষ দেখাইতেছে, এমন বালকের সংখ্যা অধিক নহে। যে দুই চারিটী ব্রাহ্মবালক উৎকৃষ্ট হইতেছে, তাহাদেরও মনে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে না।

এই ত গেল বালকদিগের অবস্থা। বালিকাদিগের শিক্ষার ভার যাঁহাদের হস্তে তাঁহাদের মুখে শুনিতেছি যে, বালিকাগণ লিখিতে, পড়িতে, গাইতে, বাজাইতে, পদ্মফুলটীর মত সাজিতে শিখিতেছে বটে; কিন্তু হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত ধর্ম্মানুরাগের কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। উপাসনার কথা ও ধর্ম্মোপদেশ সকল পদ্ম পত্রের জলের ন্যায় তাহাদের মনের উপর দিয়া গড়াইয়া যাইতেছে, তাহাদের মন ভিজিতেছে না। ইহাদিগকে দেখিয়া এখনও আশা করা যাইতেছে না, যে ইহারা বিবাহিত হইয়া যখন গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে ইহাদের বিশেষ উৎসাহ থাকিবে, বরং ইহাই মনে হইতেছে যে, ইহারা গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, আত্মসুখে সুখী হইয়া সংসারসুখেই নিমগ্ন হইবে। তবে ভবিষ্যৎ ব্রাহ্মসমাজের আশাটা কোথায় রহিয়াছে?

যুবকগণের ধর্ম্মশিক্ষা—ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ যাহাদের উপরে নির্ভর করিতেছে, সেই সকল বালকবালিকার অবস্থা ত গেল এই। যে সকল যুবক ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, তাহাদের ধর্ম্মশিক্ষার এমন কি উপায় বিধান করা হইতেছে, যদ্দারা আশা করা যাইতে পারে যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া শ্রীবৃদ্ধিশালী হইবে? এমন দশজন লোক দেখাও—যাহাদের অন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি সুন্দররূপে স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। বরং এই কথাই কি সত্য নহে যে, যে সকল যুবক ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, তাহাদিগকে সমুচিতরূপে শিক্ষিত ও বিনীত করিবার বিশেষ উপায় নাই। এক ধর্ম্ম বিজ্ঞান বিদ্যালয় (Theological Institution) আছে, তাহাও সকলের উৎসাহ ও চেষ্টার অভাবে যুবকদলকে বহুল পরিমাণে আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না। সমুচিত ধর্ম্মশিক্ষার অভাবেই যুবক দলের মধ্যে শোচনীয় চঞ্চলতা দৃষ্ট হইতেছে। আজ যাঁহারা উৎসাহী ব্রাহ্ম, কল্য তাঁহারা হিন্দুযোগী, সার্ব্বভৌমিক বা হিন্দু পুনরুত্থানকারী। ধর্ম্মশিক্ষার বর্ত্তমান শিথিল অবস্থাতে এরূপ চঞ্চলতা অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী। যদি এরূপ শিথিল অবস্থা থাকিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার ফল এই হইবে যে, ব্রাহ্ম প্রচারকগণ একদ্বার দিয়া যাহাদিগকে ডাকিয়া আনিবেন, তাহারা অপর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। সুতরাং বাহিরের লোক আসিয়া যে ভবিষ্যৎ ব্রাহ্মসমাজের পুষ্টিসাধন করিবেন, তাহাও হইয়া উঠিবে না। যে দেহে একদিক দিয়া পুষ্টিকর সামগ্রী দিলে আপরদিক দিয়া বাহির হইয়া যায়, সে দেহ যেমন গড়ে না, যে বণিকের একদিক দিয়া উপার্জ্জন হয়, কিন্তু অপর দিক দিয়া অপব্যয় হইয়া যায় তাহার ধন সম্পদ যেমন বাড়ে না, তেমনি যাহারা লোক ডাকিতে ব্যগ্র, কিন্তু তাহাদের শিক্ষায় উপায় বিধান করে না, তাহাদেরও সমাজ গড়ে না।

সামাজিক-শ্রমবিভাগ—নানা জনে একটী কার্য্যের নানা ভাগের ভার লওয়ার নাম শ্রম-বিভাগ। সূচিটী প্রস্তুত হইবে, একজন লোহার তার কাটিয়া দিতেছে, অপর জন ঘষিতেছে, একজন অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করিতেছে, একজন পশ্চাতে ছিদ্র করিতেছে,—এইরূপে কার্য্য ভাগ করিয়া দেওয়াতে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কার্য্য হইয়া যাইতেছে। তাহা না হইয়া যদি এক ব্যক্তিকেই তার কাটিতে, ঘষিতে, অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করিতে ও পশ্চাতে ছিদ্র করিতে হইত তাহা হইলে, সমস্ত দিনে দুইটী সূচ হইত কি না সন্দেহ। ইংলণ্ড হইতে যে সকল উৎকৃষ্ট দ্রব্য এদেশে আসিতেছে, তাহার অধিকাংশ এইরূপ শ্রম-বিভাগ জাত। দশ জনের হাত দিয়া যে দ্রব্যটি উৎপন্ন হয়, তাহা এপ্রকার উৎকৃষ্ট হয় কিরূপে? ইহার গূঢ় কারণ এই, প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় অংশটী সুন্দররূপে গড়িবার চেষ্টা করে। প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় অংশটুকু যদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করে, তাহা হইলে, সমগ্র বস্তুটী উৎকৃষ্ট হয়। জনসমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতি বিষয়ে এই সত্যটী স্মরণ রাখিলে উপকার আছে। জনসমাজের পাপ তাপ দুর্নীতি দেখিয়া আমরা অনেক সময়ে নিরাশ হইয়া পড়ি। বহুদিনের সঞ্চিত পাপরাশি কিরূপে দূর হইবে, এই চিন্তাতে আমাদের মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু তখন আমরা প্রত্যেকে যদি এই চিন্তা করি, যে আমার উপরে যতটুকুর ভার আছে, সেটুকু যদি আমি সুচারুরূপে সম্পন্ন করি তাহা হইলে ঐ বহুদিনের সঞ্চিত পাপরাশি দূর হইবার পক্ষে অনেক সাহায্য হইতে পারে। প্রত্যেক গৃহস্থ যদি আপনার গৃহের প্রাঙ্গণ ও আপনার ভবনের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি পরিষ্কার রাখিতে যত্ন করেন, তাহা হইলে সমগ্র সহরের স্বাস্থ্য-রক্ষা কঠিন হয় না। "হায় কি হইবে? কিছুতেই কিছু হইতেছে না, কি করা যায়?" ইত্যাদি প্রকার আর্ত্তনাদ ও ক্ষোভ প্রকাশে সময় পর্য্যবসান না করিয়া প্রত্যেকে যদি স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যের ক্ষেত্র দেখিয়া লইয়া নিজ সাধ্যে যতটা হয় করিবার জন্য চেষ্টা করেন, তাহা হইলে অধিক দিন আর ক্ষোভ করিতে হয় না। একবার সমুদ্র মধ্যে একখানি জাহাজে আগুন লাগিয়াছিল। কোথায় আগুন লাগিয়াছে, তাহা কেহ জানিতে পারিল না। জাহাজখানি মালে পূর্ণ ছিল, সে সমুদায় মাল সরাইয়া অগ্নির উৎপত্তি স্থান নির্ণয় করিবার সুবিধা হইল না। ক্রমে উত্তরোত্তর ধূমরাশি বাড়িতে লাগিল, সকলেই বুঝিতে পারিল যে, আগুন অগ্রসর হইতেছে। এই বিপদে আরোহিগণের অনেকে হতবুদ্ধি হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটী ও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সৌভাগ্য বশতঃ কাপ্তেন একজন তেজস্বী ও জিতচেতা ব্যক্তি ছিলেন, তিনি সকলকে তিরস্কার করিয়া শান্ত হইতে বলিলেন, এবং নাবিকদিগকে একাগ্রতার সহিত স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে নিযুক্ত হইতে বলিলেন। অগ্নি নিবারণের অবিশ্রান্ত চেষ্টা চলিল। কূল দৃষ্ট হইতেছে, সকলে অভিনিবেশ সহকারে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিলে, কূল পাইবার আশাও আছে। নাবিকগণ দৃঢ়তার সহিত প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে নিযুক্ত হইল। তন্মধ্যে জাহাজের কল ঘুরাইবার ভার যে ব্যক্তির উপরে ছিল তাহার কি ভয়ানক অবস্থা। সে ব্যক্তিকে জাহাজের নিম্নতলে অন্ধকার গৃহের মধ্যে অগ্ন্যাগারের সন্নিধানে দাঁড়াইয়া কাজ করিতে হয়। অল্প কালের মধ্যে সেস্থান ধূমরাশির দ্বারা ঘন অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। আর চক্ষে কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার পদতলে আগুন অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। তথাপি সে ব্যক্তি স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত আছে। কাপ্তেন উপর হইতে এক এক বার চীৎকার করিয়া তাহার নাম ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহার উত্তর পাওয়া যাইতেছে, সে বলিতেছে,—"ভয় নাই, তোমরা আপনাপন কাজ কর।" ক্রমে জাহাজ কূলের অভিমুখে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই সেই ব্যক্তির রব ক্ষীণ ও বিকৃত হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু তখনও সে কল ঘুরাইতেছে। অবশেষে আর তাহার সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না, কিন্তু কল ঘুরাইতেছে। ক্রমে জাহাজ তীরের সন্নিধানে পৌঁছিলে, কয়েকজন লোক অন্ধকারে কোনও প্রকারে প্রবেশ করিয়া ঐ ব্যক্তিকে ধরিয়া বহন করিয়া উপরে আনিল, তখন দেখা গেল যে, তাহার দুইখানি পা একেবারে ঝলসিয়া গিয়াছে, এবং আর একটু বিলম্ব হইলেই শ্বাসরোধ হইয়া তাহার মৃত্যু হইত। ইহা একটী সত্য ঘটনা। ঐ জাহাজে আগুন লাগিলে প্রত্যেক নাবিক যাহা করিয়াছিল, তাহা যদি তুমি আমি করি তাহা হইলে, অনেক নিরাশজনক অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি। নাবিকগণ সে দিন যেরূপ দৃঢ়তার সহিত স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিল, তাহা না করিয়া যদি পরস্পরে "হা হতোস্মি" করিয়া ছুটা ছুটী করিত, তাহা হইলে সেই জাহাজ আর কূলে পৌঁছিত না, আরোহীদিগের সকলেরই প্রাণ যাইত। আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্যপরায়ণতার মধ্যে আমাদের অধিকাংশ সামাজিক ব্যাধির ঔষধ নিহিত হইয়া রহিয়াছে। ঈশ্বর করুন, স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য পালনের দিকে আমাদের অধিক মনোযোগ হয়।

জল্পনা-প্রিয়তা—উপরে যে সকল অবস্থা বর্ণিত হইল তাহা গুরুতর চিন্তার বিষয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না এবং তত্ত্বকৌমুদীর পৃষ্ঠাতে এসকল বিষয়ের এই প্রথম অবতারণা নহে। এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? এক একবার মনে হয় এসকল বিষয়ের আলোচনা না করাই ভাল, মুখে আর কিছু না বলাই ভাল। কারণ মুখে আলোচনা করিয়া আমাদের একটী গুরুতর ব্যাধি জন্মিয়াছে। আমরা দশজনে একত্র হইলেই, বা কমিটীতে বসিলেই এই সকল বিষয় আলোচনা করি, "হায় হায়" করি, তৎপরে কাহারও কার্য্যে কিছু করিবার প্রবৃত্তি দেখা যায় না। যেন হায় হায় করিলে, দুঃখ প্রকাশ করিলেই আমাদের সমুদায় দায়িত্বের পর্য্যবসান হইয়া যায়, যেন তদধিক আমাদের আর কিছু করিবার নাই। ইহা দেখিয়া এক একবার মনে হয়, আমরা প্রত্যেকে যদি এই প্রতিজ্ঞা করি যে, আর মুখে এসকল বিষয়ের আলোচনা করিব না, প্রত্যেকের যতটুকু করিবার আছে স্থিরচিত্তে বসিয়া করিব, তাহা হইলে এ অবস্থা ত্বরায় দূর হইতে পারে। আমরা জল্পনা প্রিয় ব্রাহ্মদিগকে তাঁহাদের কর্ত্তব্যেরপথ

প্রদর্শন করিবার জন্য পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয় সকলের অবতারণা করিলাম। আমাদের পরলোকগত বন্ধু কারল্ হেমারগ্রেণকে একজন ব্রাহ্মযুবক একবার বলিয়াছিলেন "আপনি আমাদিগকে কিছু উপদেশ দিন," তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—"উপদেশ আর কি দিব, উপদেশ দেওয়া আমার আসে না। আমি ব্রাহ্মদিগের নিকটে আসিয়া দেখিতেছি, ব্রাহ্মেরা বড় বেশি কথা বলে, তোমরা মুখে বলা অপেক্ষা কাজে বেশি কর, এই আমার উপদেশ।" বিদেশীয় লোক, তাহাদের দেশে অধিক কথা বলিবার নিয়ম নাই. সুতরাং আমাদের জল্পনাপ্রিয়তাটা তাঁহার মনে বড় লাগিয়াছিল। কি আমাদের দুর্ভাগ্য এই সকল গুরুতর বিষয়ে সময়ে সময়ে যে কনফাবেন্স হয়, তাহাতেও কাজের কথা অপেক্ষা জল্পনাপ্রিয়তা অধিক থাকে। কনফাবেন্স হইতে উঠিয়া আসিবার সময়ে আমরা কাজে কিছু করিবার প্রতিজ্ঞা লইয়া, বা কাজে কিছু হইল, জানিয়া সুখী হইয়া ঘরে আসি না, কিন্তু পরস্পরে যাহা বলিয়াছি তদ্বিষয়ে বাদানুবাদ লইয়া ঘরে আসি। অতএব আমাদের অনুরোধ, এই সকল গুরুতর বিষয়ে সমাজের অগ্রণী ব্যক্তিগণ কাজে কিছু করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হউন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

অধিকারিভেদ।

বঙ্গদেশীয় সাকারবাদীদিগের দুর্গোৎসব সন্নিকট, এ সময়ে অধিকারিভেদের বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ করা অসাময়িক নহে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় স্বদেশীয়দিগের সহিত বিচারে যখন প্রবৃত্ত হন, তখন হিন্দু শাস্ত্রকেই প্রমাণ্য রূপে গ্রহণ করিয়া বিচার করিয়াছিলেন। বেদ, বেদান্ত উপনিষৎ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ হইতে অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়া, তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ এবং শাস্ত্রের অনুমোদিত; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে ইহাও স্বীকার করিতে হইয়াছিল, যে দুর্ব্বলঅধিকারীদিগের জন্য শাস্ত্রে সাকারোপাসনার বিধি আছে। এইটুকু স্বীকার করাতে দেশের সমূহ অনিষ্ট হইয়াছে। অনেকের মনে এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছে, যে দুর্ব্বল অধিকারীদিগের পক্ষে সাকারোপাসনা নিষিদ্ধ নহে। এই উক্তির আশ্রয় লইয়া অনেকে জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও সাকারোপাসনার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। আমাদের এবিষয়টী একটু তলাইয়া বুঝিতে হইতেছে।

জ্ঞান রাজ্যে যে অধিকারিভেদ আছে, ইহা কেহ কখনও অস্বীকার করে না। সকল প্রকার জ্ঞান সকল লোকের ধারণ করিবার শক্তি নাই। বয়স ও শিক্ষার তারতম্য অনুসারে ধারণাশক্তির তারতম্য হইয়া থাকে। প্রতিদিন অর্থনীতি (Political Economy) সম্বন্ধে এমন সকল বিষয় বড় বড় সংবাদ পত্রে আলোচিত হইতেছে, যাহা তুমি আমি পাঠ করিয়া ধারণা করিতে পারিতেছি না। আমরা সে সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ নহি। ঐরূপ বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের সভাতে যখন কোনও নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের আলোচনা হয়, তখন যদি তুমি আমি সেখানে উপস্থিত থাকি, তাহা হইলে হয় ত তাঁহাদের অধিকাংশ কথারই তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিব না, কারণ আমরা সে বিষয়ে অভিজ্ঞ নহি। এই কারণেই সাধারণ প্রজাগণের বোধসৌকার্য্যার্থে নিরন্তর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসকলের কোমলতা বিধানের চেষ্টা হইতেছে। পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে কৃপা-পরবশ হইয়া প্রজা-সাধারণের বোধগম্য ভাষাতেও ধারণার উপযোগী যুক্তিপরম্পরা দ্বারা সেই সকল তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করিতেছেন। নিতান্ত চিন্তাবিহীন লোক না হইলে কেহই এরূপ বলিবেন না যে, জ্ঞানে অধিকারিভেদ নাই। যে যুক্তি একজন বয়ঃপ্রাপ্ত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তির উপযোগী, সেই যুক্তি একজন অজ্ঞ অশিক্ষিত ব্যক্তির বা শিশুরও উপযোগী, ইহা কেহই বলিবেন না। গ্যালিলিও অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা অনেক অঙ্ক কষিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। কোন্ ব্যক্তি এরূপ বলিবেন যে সেই সকল যুক্তি একজন অজ্ঞ কৃষকের নিকট বা একজন পঞ্চমবর্ষীয় স্কুলের বালকের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে? কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপ কি কেহ বলিবেন যে অজ্ঞকৃষক ও বিদ্যালয়ের বালকগণ, পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি ধারণ করিবার অধিকারী নয় অতএব তাহাদিগকে এখন শিখাও যে পৃথিবী স্থির ও সূর্য্য ঘুরিতেছে, তৎপরে তাহারা যখন জ্ঞানলাভ করিবে বা প্রাপ্তবয়স্ক হইবে, তখন শিখাইতে হইবে যে পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘোরে। একথার অর্থ এই যে. জ্ঞানীর জন্য সত্য অজ্ঞের জন্য মিথ্যার ব্যবস্থা কর। ইহা যুক্তি ও ধর্ম্ম উভয় বিগর্হিত। কারণ সত্যের প্রয়োজন কাহার অধিক? যে জ্ঞানী, তাঁহার না যে অজ্ঞ তাহার? অজ্ঞেরই জ্ঞানলাভের প্রয়োজন। কিন্তু এই ধর্ম্ম বিগর্হিত মত বলে, যে অজ্ঞ তাহাকে আরও অজ্ঞতাতে নিমগ্ন রাখ এবং উৎকৃষ্ট জ্ঞান কতিপয় জ্ঞানীর জন্য রক্ষা কর। যাঁহারা বলেন যে, সাকারোপাসনা দুর্ব্বলঅধিকারীদিগের জন্য, নিরাকারোপাসনা জ্ঞানীদিগের জন্য; তাঁহাদের উক্তিতেও এইরূপ ধর্ম্ম-বিগর্হিত যুক্তি প্রকাশ পায়।

কথা এই, সাকারোপসনা সত্য কি না? কেহই বোধ হয় বলিবেন না যে, ঈশ্বরকে সাকারভাবে পূজা করা, সত্য পূজা। কারণ তাহা যদি সত্য-পূজা হয়, তবে তাহা দুর্ব্বল সবল সকল অধিকারীর পক্ষেই অবলম্বনীয়; তাহা পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। তাহা যখন এক অবস্থাতে বর্জ্জনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইতেছে, তখন ইহা বলা হইতেছে যে তাহা মিথ্যা বলিয়াই বর্জ্জনীয়। যাহা মিথ্যা বলিয়া বর্জ্জনীয় হইল, তাহা কাহাকেও বিশেষ অজ্ঞব্যক্তিদিগকে শিক্ষা দিলে কি পাপ হয় না? সত্য যাহা তাহাই মানুষকে দিতে হইবে। দুর্ব্বলঅধিকারীদিগকে তাহাদের ধারণার উপযোগী যুক্তির সহিত দিতে হইবে, সবল অধিকারীদিগকে তাঁহাদের উপযোগী যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক দিতে হইবে। পৃথিবী গোল ইহা সকলেই বলে,—পাঁচ বৎসরের স্কুলের

বালককেও বল, বিংশতিবর্ষবয়স্ক সুশিক্ষিত যুবককেও বল, কিন্তু বালককে বালকের উপযোগী যুক্তি প্রদর্শন করিতে হইবে।

দুর্ব্বলঅধিকারীদিগকে সাকারোপাসনা লইয়া থাকিতে দিতে হইবে, কারণ ইহা তাহাদের উপযোগী, ইহা কখনই নহে। সাকারোপাসনা অসত্য, ঘোর ভ্রান্তি সুতরাং তাহা বর্জ্জনীয়; সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়, তোমার আমার পক্ষে বর্জ্জনীয়, শিশু ও বৃদ্ধের পক্ষে বর্জ্জনীয়, কৃষক ও পণ্ডিতের পক্ষে বর্জ্জনীয়। একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরই মানবের উপাস্য, ইহা হইতে এক চুল বিচলিত হইলে চলিবে না। তবে এই মাত্র স্বীকার করা যাইতে পারে, অজ্ঞ ও অশিক্ষিত সরল বিশ্বাসীদিগের পক্ষে পৌত্তলিকতাচরণ মার্জ্জনীয় অপরাধ, জ্ঞানালোক প্রাপ্তব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা নহে। ঈশ্বরকে যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞানকৃতপৌত্তলিকতাচরণে ঈশ্বরাবমাননাজনিত পাপ জন্মে। ইহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে। একবার একজন যুবক কর্ম্মোপলক্ষে বিদেশে বাস করিতেন। দেশে তিনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন, কেহ তাঁহাকে জানিত না, বিদেশে তিনি অর্থোপার্জ্জন করিয়া পদস্থ লোক হইয়াছিলেন। কিন্তু পদস্থ লোক হইয়া তিনি আর স্বীয় দরিদ্র পিতা মাতাকে স্মরণ করিতেন না। পিতার নিকট হইতে পত্রের উপর পত্র যাইত, তিনি উত্তর দিতেন না। একবার তাঁহার পিতা বহুদিন পুত্রের অদর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিধানে সেই সামান্য বস্ত্র ও বেশ ভূষা সমুদায় দরিদ্রের মত। একদিন উপযুক্ত পুত্র বন্ধু বান্ধব সমভিব্যাহারে নৃত্য গীত দেখিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার পিতা আসিয়া নাম ধরিয়া 'তুই" "তুই" করিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। কে সামান্য বস্ত্র পরিধায়ী বৃদ্ধটী বন্ধুকে ডাকিল, এই ভাবিয়া বন্ধু বান্ধব কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। উপযুক্ত পুত্রকে জিজ্ঞসা করাতে তিনি ইংরাজীতে বলিলেন "আমাদের বাড়ীর একজন পুরাতন ভৃত্য." বন্ধু বান্ধবের নিকট নিজ সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সে আপনার পিতাকে অস্বীকার করিল। এই এক আচরণ, আর এক আচরণ পরলোক গত কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের দেখা গিয়াছিল। তাঁহারও পিতা সেকেলে লোকের মত সামান্য বেশে থাকিতেন। একদিন প্রাতে তাঁহার পিতা বাড়ীর দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময়ে কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর তদানীন্তন সভাপতি হগ সাহেব অশ্বারোহণে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া কৃষ্ণদাস বাবু উপর হইতে নামিয়া বহির্দ্বারে আসিতেছেন, এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন, যে হগ সাহেব তাঁহার পিতাকে সামান্য ভৃত্য জ্ঞানে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া থাকিবার জন্য আদেশ করিতেছেন। ইহা শুনিয়াই কৃষ্ণদাস বাবু দৌড়িয়া আসিয়াই বলিলেন "ও মিষ্টার হগ, উনি আমার ভক্তিভাজন পিতৃদেব।" ইহাতে হগ সাহেব অতিশয় লজ্জিত হইলেন। জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াও স্বীয় পিতাকে চিনিয়াও যিনি লোকভয়ে পৌত্তলিকতাচরণ করেন, তিনি প্রথমোক্ত পুত্রের ন্যায় পিতৃত্যাগী ঈশ্বরাবমাননাকারী। কে পৃথিবীর লোক যাহাদের ভয়ে আমি ঈশ্বরকে অস্বীকার করিব? আগামী পৌত্তলিকউৎসবের সময় ব্রাহ্মমাত্রেরই এই সকল কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

ভক্তি ও ভক্ত।*

শ্রীমদ্ভাগবতকার ভক্তির এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—

মদ্‌গুণ শ্রুতি মাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতি রবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তি যোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।
ভাঃ ৩য় স্কন্ধ।

আমি সর্ব্বান্তর্যামী ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। আমার গুণ শ্রবণ মাত্র সমুদ্রগামী গঙ্গাসলিলের ন্যায় আমাতে অবিচ্ছিন্না ও ফলানুসন্ধান-রহিতা এবং ভেদদর্শন-বর্জ্জিতা মনের যে গতি হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাই অহৈতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তি।

নারদ পঞ্চরাত্রে আছে;—

অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধব নারদৈঃ॥

ভক্তি কি, তাহা বাক্যে প্রকাশ করিবার বিষয় নহে, উপলব্ধির বিষয়। সাধু-হৃদয়ই ভক্তিবিকাশের ক্ষেত্র। সমুদ্রগামী গঙ্গাসলিলের ন্যায় যাঁহাদের হৃদয় অনন্ত প্রেমসিন্ধুর অভিমুখে ছুটিয়াছে, যাঁহাদের ভক্তিবারির সংস্পর্শে পাপীর শুষ্ক জীবনতরু মুঞ্জরিত হয়, মৃতদেহে নবজীবন সঞ্চার হয়, যাঁহাদের সহবাসে আসিয়া ঘোরবিষয়ী, বিষয়-সুখ-লালসা পরিত্যাগ করিয়া পরম সুখের অন্বেষণে ধাবিত হয়, সংসার দগ্ধ অশান্তিময় জীবনে মধুরউৎস উৎসারিত হয়, সেই সকল পুণ্যশ্লোক মহাত্মাগণই বুঝিয়াছেন, ভক্তি কি বস্তু। অন্যে কি বুঝিবে? সন্তানবিহীন দম্পতি, সন্তান বাৎসল্য কি মধুময় তাহা জানে না, অবিবাহিতজন দাম্পত্য প্রেমের পবিত্রস্বাদ কিরূপে গ্রহণ করিবে?

আমেরিকায় যখন দাসত্বপ্রথা প্রচলিত ছিল, তখন দাসদিগের প্রতি ভয়ঙ্কর অত্যাচার হইত। দাসস্বামী, মাতা ও পুত্রকে নগরে বিক্রয় করিতে আনিয়াছে। মাতাকে একজন ক্রয় করিল, পুত্রকে অপরে ক্রয় করিয়া বহু দূরে লইয়া গেল। মাতা পুত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া অসহনীয় ক্লেশে দিন যাপন করিতে লাগিল। তাহাদের সেই মানসিক নিদারুণ কষ্ট, বর্ণনাতীত। ঘটনাক্রমে দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাহারা মাতা পুত্রে যদি একত্র হয়, তবে সেই অভূতপূর্ব্ব মিলনে কতই আনন্দের উদয় হয়। জননী অধীরা হইয়া প্রেমভরে বারংবার সন্তানের মুখ চুম্বন করিতেছেন; সন্তান মাতার স্নেহক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া আত্মহারা হইয়াছে। উভয় হৃদয়ে যুগপৎ প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইতেছে। কবির কল্পনাময়ী তুলিকাও এই হৃদয়চিত্র অঙ্কনে অসমর্থ। ভগবৎ

* ১লা সেপ্টেম্বর রবিবার ব্রাহ্মসম্মিলনীর উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র ঘোষাল কর্ত্তৃক পঠিত।

প্রেমও এইরূপ। যখন বহু অনুসন্ধান, বহু তপস্যা ও সাধন ভজনের পর ভগবানের সহিত উপাসকের সাক্ষাৎ হয়, তখন উপাসকের প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে। পাপাসক্ত সন্তান অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া, অনেক দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, অনেক দিনের পর স্বগৃহে আগমন করিয়াছে, আনন্দময়ী জননী বাহু বিস্তার করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন, সন্তানও চির অভিলষিত বস্তু লাভ করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছে। এই আনন্দোচ্ছ্বাস কে বর্ণন করিতে পারেন?

ভক্তজীবন, ঈশ্বর সম্ভোগময়। ভক্তজীবন তিলার্দ্ধ কালও ভগবানের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থ। হরি একটু কাছ ছাড়া হইলেই প্রেমিক চৈতন্য ক্রন্দন করিয়া উঠিতেন। বন্ধুগণ রজনীতে চৈতন্যের সহিত নিদ্রা যাইতেছেন। হঠাৎ তাহারা জাগ্রত হইয়া দেখেন, চৈতন্যের শয্যা শূন্য, উদ্বিগ্ন চিত্তে চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, অতিদূরে বনমধ্যে গিয়া চৈতন্য, প্রাণ-দেবতার উদ্দেশে ক্রন্দন করিতেছেন। কি প্রবল অনুরাগ! শিশু সন্তান, জননীকে একটু না দেখিতে পাইলে কাঁদিয়া আকুল হয়, ভক্তগণের অবস্থাও সেইরূপ। পরমেশ্বরের সহিত যাঁহাদের অভেদ প্রেমযোগ স্থাপিত হইয়াছে, তাঁহারা ভিন্ন সেই অপূর্ব্ব ভক্তিরস-সুধা কেহ পান করিতে পারে না।

যাহাদের প্রেম স্ত্রী পুত্র পরিবারে, সংসারে আবদ্ধ, তাহারা ভগবৎ প্রেমে বঞ্চিত। এবং যাঁহারা সেই অতুলনীয় স্বর্গীয় ঈশ্বর প্রেম লাভ করিয়াছেন, সংসার-প্রেমলাভ তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। সেই জন্যই প্রেমিক চৈতন্য নিজ মুখে বলিয়াছেন ;—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতুভক্তির হৈতুকী ত্বয়ি।

চৈতন্যচরিতামৃত।

হে জগদীশ, আমি ধন জন বা সুন্দরী স্ত্রী বা পাণ্ডিত্য এ সকল কিছুই প্রার্থনা করি না, আমার জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি অবিচলিত ভক্তি থাকে।

ভক্তের আর কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই, তিনি আর কিছুই চাহেন না, প্রাণসখার দর্শন লাভ হইলেই তাঁহার সকল লাভ হয়। সে জন্যই তিনি নিয়ত লালায়িত। যাঁহার প্রাণের গতি অমৃতের দিকে তিনি পৃথিবীর অসার অকিঞ্চিৎকর বস্তুতে কি ভুলিয়া থাকিতে পারেন? ভীমগতি স্রোতস্বতীর ন্যায় যাঁহার প্রাণ অনন্তের পানে ছুটিয়াছে, সংসারের কোনও বন্ধনই তাহাকে বাঁধিতে পারে না। বাস্তবিক এই রূপ অনন্ত-মুখী প্রবল অনুরাগ ভিন্ন কেহই ভগবানকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। মন সংসারের কোনও তিলমাত্র বস্তুতে আসক্ত থাকিলেও ঈশ্বরের রাজ্যে, ভক্তির রাজ্যে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। শুষ্ক জ্ঞানের সাহায্যেও ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশের অধিকার নাই। ভক্তি ভিন্ন মুক্তি অসম্ভব। ভক্তি শাস্ত্র ভাগবত বলিতেছেন ;—

শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তি মুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যতি যে কেবল বোধ লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূল তুষাবঘাতিনাং।

ভাঃ ১০ম স্কন্ধ, ১৪শ অধ্যায়।

হে ভগবন্, যে সকল সাধক সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল শুষ্ক জ্ঞান লাভার্থ ক্লেশ করে, তাহাদের তুষাবঘাতী লোকদিগের ন্যায় কিছু লাভ না হইয়া কেবল শ্রম মাত্রই সার হয়।

আর্য্যঋষিগণ উপনিষদ-শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা ভক্তিময় জ্ঞান। জ্ঞানবিহীন ভক্তি, ভক্তিই নহে। এবং ভক্তিবিহীন জ্ঞান ও প্রকৃত জ্ঞান নহে। যাহারা কেবল বুদ্ধিদ্বারা, আলোচনা ও শাস্ত্র পাঠ দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, ভাগবতকার সেই শ্রেণীর লোকদিগকেই "তুষাবঘাতী" শুষ্ক জ্ঞানী বলিয়াছেন। জ্ঞান ও ভক্তি দুই অভিন্ন আকারে সাধকের হৃদয়ে বাস করে। জ্ঞান ও ভক্তিতে পার্থক্য করা সুকঠিন। বৈষ্ণবগণ যাহাকে ভক্তি বলিয়াছেন, উপনিষদের ঋষি তাহাকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়াছেন। কেবল ভাষার ভিন্নতা, ভাবের ভিন্নতা নাই। এই জন্যই ভাগবতকার, জ্ঞান ও ভক্তি লাভের একই প্রকার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি জ্ঞান লাভের উপায় বলিয়াছেন এই রূপ ;— "বাহ্যাভ্যন্তর শূন্য, পরিপূর্ণ, অপরিচ্ছন্ন এবং নির্ব্বিকার জ্ঞানই পরমার্থ সত্য। সেই জ্ঞানের নাম ভগবৎ।" * * "এই প্রকার জ্ঞান মহাপুরুষদিগের পদধূলীর অভিষেক দ্বারাই অর্জ্জিত হয়, নতুবা তপস্যা বা বৈদিক কর্ম্ম কিম্বা অন্নাদি সংবিভাগ অথবা গৃহস্থ ধর্ম্মার্থ পরোপকার কিম্বা বেদাভ্যাস অথবা জল ও অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা কিছুতেই ইহা পাওয়া যায় না।" ভাঃ ৫ম স্কন্ধ, রহূরাজগণের প্রতি জড় ভরতের জ্ঞানোপদেশ।

ভক্তিলাভের উপায়ও ঐ রূপই বলিয়াছেন। যথা ;— "সাধুজনের সহিত প্রকৃষ্ট রূপে সঙ্গ হইলে হৃদয় ও কর্ণের সুখদায়ক আমার বীর্য্যপ্রকাশক কথা উপস্থিত হইয়া থাকে। তৎসেবনেই শীঘ্র অপবর্গবর্ত্মস্বরূপ শ্রীহরিতে প্রথমতঃ শ্রদ্ধা, তৎপরে রতি ও অবশেষে ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।" ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ।

উক্ত উভয় প্রণালীতে মূলগত কোনও বৈষম্য দেখা যায় না। এবং ভক্তি ও জ্ঞানলাভের এই প্রণালী সম্পূর্ণ উপধর্ম্ম দোষ বর্জ্জিত। পুতুল পূজা কর, কিম্বা কোরাণ, পুরাণকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার কর, অথবা ব্যক্তিবিশেষকে অভ্রান্ত গুরু কিম্বা মধ্যবর্ত্তী রূপে আশ্রয় করিয়া, তদনুসরণ কর, তাহা হইলেই ভক্তি কিম্বা জ্ঞানলাভ হইবে, তাঁহারা এরূপ ভ্রান্ত উপদেশ প্রদান করেন নাই। তাঁহারা ঋষি ছিলেন, ঋষির মতই কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদের কথার অর্থ এই যে, ধার্ম্মিকদিগের সহিত বাস কর, তাঁহাদের ধর্ম্মালোচনা এবং উপদেশাদি শ্রবণ কর, তবেই ঈশ্বর ভক্তির উদ্রেক হইবে। যুদ্ধ ব্যবসায়ীদিগের সংসর্গে থাকিলে, যুদ্ধবিষয়ে মন উত্তেজিত হয়, বৈজ্ঞানিকের নিকট বাস করিলে বিজ্ঞানানুশীলনে মতি যায়, ভক্তসঙ্গ লাভ করিলে ভক্তির উদ্রেক হইবে না কি? বাস্তবিক সাধুসঙ্গ ভক্তিলাভের অতি উৎকৃষ্ট উপায়।

পূর্ব্বকালে ঋষিগণের পুণ্যময়আশ্রমে বাস করিয়া কত বিশ্বাসহীন ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, কত নিরাশপ্রাণে আশাসঞ্চারিত হইয়াছে। প্রেমপ্রবণহৃদয় চৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রভৃতির সঙ্গ লাভ করিয়া কত কঠোরহৃদয় সংসারাসক্তলোক হরিভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। আতসী কাঁচে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইলে যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তেমন ভক্তের সঙ্গ লাভ হইলেই মানবহৃদয়ের অন্তস্তল নিহিত ভক্তিবারি উথলিয়া উঠে। এজন্যই সাধুসহবাস প্রয়োজনীয়। একজন ভক্তের সঙ্গলাভ করিয়া অপর দশ জন লোক ভক্তিমান হয়। চৈতন্যপ্রমুখ বৈষ্ণবগণ, কঠোর শক্তি উপাসকময় বঙ্গদেশে প্রেমের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। ভক্তিলাভের পক্ষে সাধুসঙ্গ মহা তীর্থ স্বরূপ।

অনন্ত উন্নতিপথে মুক্তি কোথায় ?

"মানবাত্মা অনন্ত উন্নতিশীল"—এই মহাবাক্যের দার্শনিক বিচার বর্ত্তমান সময়ে নিতান্তই অনাবশ্যক। যাঁহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা অনন্তউন্নতি স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর দেখিতেছেন না। অনন্ত নবকবাদিগণও নীরব এবং নিরুত্তর। আত্মার বিনাশ যদি মান, তাহা হইলে উন্নতির একটা সীমা নির্দ্ধারণ করিলেও করিতে পার। আত্মা অমর বলিলেই অনন্তউন্নতি মানিতে তুমি বাধ্য। শাস্ত্রের দোহাই দিবার দিন অবসান হইতে চলিয়াছে। স্বর্গেরবিহঙ্গ ঐ দেখ অনন্ত মুক্ত আকাশে উড়িয়াছে, অভ্রান্ত শাস্ত্রকে পিঞ্জরে কে আবদ্ধ করিবেন ?

আত্মা যখন অনন্ত উন্নতিশীল, তখন তাহার কোন্ অবস্থাকে মুক্তি বলিব ?—অনন্ত জীবন পথের কোন স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলে—হে পথিক, তুমি মুক্তি লাভ করিয়াছ বলিয়া মনে করিবে ? স্থূলদর্শী শাস্ত্রবাদিগণ শাস্ত্রোক্ত কোন অনুষ্ঠান বা উদযাপন হইতে মুক্তি গণনা করেন। জন্মান্তরবাদিগণ পূর্ব্ব জন্মেরস্মৃতির উদয়কেই মুক্তাবস্থা মনে করেন। জেনেরাল বুথের শিষ্যগণের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তাঁহারা এই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করেন—"are you saved ?" "তুমি কি মুক্তি লাভ করিয়াছ ?" ইহাদের মুক্তি শব্দের অর্থ "যীশুকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা।" এই সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গ্রন্থাদিতে মুক্তি শব্দটার একটা বিশেষ অর্থ আছে। কিন্তু ব্রাহ্মগণ মুক্তি বলিলে কি বুঝিবেন, এবং কাহাকে মুক্তির অধিকারী নির্দ্দেশ করিবেন—ইহাই বিচার্য্য বিষয়।

মুক্তি শব্দের সাধারণ অর্থ পাপের বন্ধন হইতে মুক্তি। এ অর্থ ধরিতে গেলে—ধর্ম্মজীবনের সমস্ত পথেই মুক্তি ছড়ান রহিয়াছে, কোন অবস্থা বিশেষ মুক্তি নহে। ইহাই যদি মুক্তির অর্থ হয়, তাহা হইলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে, সকল ধর্ম্মেই এ মুক্তিলাভ করা যায়, কারণ সকল ধর্ম্মেই কতকটা আত্মার বিকাশের এবং উন্নতির সহায়তা করিতেছে। "সকল ধর্ম্মেই মুক্তি আছে" এই নিরপেক্ষ উদারতার কথা—এই সাধারণ অর্থে আমরা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি।

কিন্তু মুক্তির একটী বিশেষ অর্থ আছে। ধর্ম্মজীবনের মধ্যপথে, মরুভূমির ওয়েসিসের ন্যায়, বিষম শত্রুবেষ্টিত স্থানে সুরক্ষিতদুর্গের ন্যায়, শিশুর পক্ষে মাতৃক্রোড়ের ন্যায় একটী নিরাপদ অবস্থা, একটী সুন্দর স্থান আছে। ইহা সেই অবস্থা, যে অবস্থায় উপস্থিত হইলে, পাপের সহিত সংগ্রাম থামিয়া যায়, আত্মার পক্ষে কোনরূপে পাপচিন্তা করা এবং অনুষ্ঠান করা অসম্ভব হয়, পতনের আশঙ্কা আর থাকে না। যে দিন পাপের সহিত সংগ্রামে জয়ী হইয়া আত্মা শান্তিলাভ করিবে, সেই শুভমুহূর্ত্ত হইতে আমরা আত্মার মুক্তি গণনা করি। অনন্ত করুণাময় এবং শান্তিস্বরূপের রাজ্যে চিরসংগ্রাম কখনই সম্ভব নয়। প্রতিদিন সংগ্রাম ও শান্তি পর্য্যায়ক্রমে আসিতেছে, যাইতেছে। সাধক প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারেন, এই সংগ্রামে ক্রমশই পাপের হ্রাস এবং শান্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক সাধকই এই চিরস্থায়ী শান্তির জন্য লালায়িত। মুক্তির এ পারে উত্থান ও পতন,—ওপারে কেবলই উত্থান, পতন নাই। ইহা কল্পনার অবস্থা নয়, সত্য অবস্থা।

এই মুক্তাবস্থা কোথায় লাভ করা যায় ? সে কোন্ ধর্ম্ম, যে ধর্ম্মে এই মুক্তি প্রদান করে ? আত্মার অনন্তউন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের ও ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং হইতেছে। যে ধর্ম্ম অভ্রান্ত শাস্ত্র এবং অভ্রান্তমহাপুরুষের দ্বারা শাসিত, গুরু এবং পুরোহিতেরা লগুড় হস্তে যে ধর্ম্মের উন্নতিকে বাধা দিয়া বলিতেছেন "Thus far shalt thou go and no further." দর্শন এবং বিজ্ঞানের উন্নতি যে ধর্ম্ম গ্রাহ্য করে না, অর্থাৎ যে ধর্ম্ম অনন্ত উন্নতিশীল নহে, সে ধর্ম্ম এই মুক্তি প্রদান করিতে সমর্থ নহে। একদিকে কুসংস্কারাদি বন্ধন ছেদন অন্যদিকে জ্ঞান, প্রেম এবং ইচ্ছার সমভাবে বিকাশ ভিন্ন, এই মুক্তি কখনই নিকটস্থ হইবে না। মানবজীবনের স্বাধীনতার উপর যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত নয় সে ধর্ম্ম মুক্তির অন্তরায়। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে যে একটা উৎকট উদারতার কথা শুনিতেছি—"সকল ধর্ম্মেই মুক্তি আছে" ইহা অতীব অলৌকিক এবং হাস্যাস্পদ। জগতের শিশুকাল হইতে এ পর্য্যন্ত সমগ্র উন্নতির উত্তরাধিকারী হইয়া অনন্ত উন্নতিশীল, সার্ব্বভৌমিক, সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম অবতীর্ণ। আত্মার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি অন্যত্র নাই। মুক্তিস্থান লাভ করিতে হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আশ্রয় করিতেই হইবে। যথা সময়ে প্রভু পরমেশ্বর জগতের পরিত্রাণের জন্য এই ধর্ম্মের অভ্যুদয় করিয়া দিয়াছেন। জগতের সমস্ত নরনারী ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মুক্তিলাভ করিবে।

আত্ম-চিন্তা।

(প্রাপ্ত)

১

বিঘ্ন কি ? কেন হয় না ? পথে অন্তরায় কি ? দোষ ত অনেকের উপর চাপাইলাম ; অনেক অবস্থা, অনেক ব্যক্তি, অনেক নিয়মের দোষ দিয়া আপনাকে মুক্ত করিলাম। ভাবি-

লাম, সঙ্গীরা তেমন করিয়া আমার সাহায্য করে না - সংসর্গ, নিতান্তই সাধনের প্রতিকূল, তাই হইতেছে না—সকল দোষ সঙ্গীদের উপর চাপাইলাম—নিজে মুক্ত। বিধাতা বলেন— সঙ্গীর দোষ? এই "দেখ, এই সঙ্গী তোমায় ছাড়িল—এখন হউক।" কিন্তু তবু হইল না। অভিযোগও যায় না—আমার সংসার টা বড় প্রতিকূল তাই হয় না। আমার সংসারের ধাঁধায় দিন কাটে—তাই আমার হয় না। অন্য অভিযোগ, "সমাজের অবস্থা ভাল হইতেছে না, পরস্পরের মধ্যে মিল নাই।" এইরূপে সকল দোষ ভাগাভাগী করিয়া অন্যের উপর দিয়া নিজে নিশ্চিন্ত হইতেছি। বিধাতা কিন্তু ছাড়িতেছেন না—দেখ, সকল প্রতি বন্ধক কাটিয়া যাইতেছে। বিধাতা বলিতেছেন—"দেখ, এই তোমার সংসারের ভার লইলাম, এই তোমার সমাজের প্রতিবন্ধক কাটিয়া দিলাম—এখন?" অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছেন—"নিয়ম তন্ত্রে হয় না? তবে দরবারে এত গোল কেন? একছত্রের এত দুর্দশা কেন?" নিদ্রিত প্রাণে চৈতন্য হইল—তাই ত। তবে কেন হয় না? তখন আত্মদৃষ্টি ফুটিল—নিজের দিকে দৃষ্টি পড়িল, কাতর প্রার্থনা হৃদয় হইতে উঠিল—"প্রভো, পথ দেখাও কেন হয় না। প্রভো কেন এ জীবনে তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না, কেন ভাইএ ভাইএ মিল হইতেছে না, কেন তোমার ঘরে অশান্তি? যাঁহারা জগতে শান্তির খবর প্রচার করিবে বলিয়া দলবদ্ধ হইয়াছে, সত্য, প্রেম ও শান্তির রাজ্য জগতে প্রতিষ্ঠা করিবে বলিয়া যাঁহারা জগতের নিকট ঘোষণা করিতেছে, তাঁহারা আজও যে শান্তির রাজ্য হইতে দূরে রহিল—প্রেম পরিবার যে তাঁহাদের মধ্যে আজও প্রতিষ্ঠিত হইল না। প্রভো সুপথ দেখাও।"

কেন হয় না? ঈশ্বর ও বিবেকের আদেশে সকলই ছাড়িয়াছি। জাতিভেদ ছাড়িয়াছি, পিতামাতাকে কাঁদাইয়া তাঁহাদিগকে ছাড়িয়াছি। ধনজনের মায়াও রাখি না, তবে কেন হয় না, ঈশ্বর-প্রেম কেন জীবনে স্থায়ী হয় না? হৃদয় হইতে উত্তর আসিল—"এসকলই ছাড়া সহজ।" এসকল ছাড়িলে হইবে না। মুখে "একমেবাদ্বিতীয়ং" "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্" বলিলে হইবে না। দুরন্ত "আমি" কে কি ছাড়িয়াছ? অনুসন্ধান কর—দেখিতে পাইবে—বিঘ্ন কি? বিঘ্ন "আমি।" বাহিরের সব ছাড়া সহজ—কিন্তু নিজের ইচ্ছা, রুচি, মান, গৌরব, স্বার্থ, সুখ সুবিধা পরিত্যাগ করিয়া সমুদয় হৃদয়ের সহিত ঈশ্বরের গৌরব, সত্যের গৌরব চাওয়া কি সহজ? "দুরন্ত আমি ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপনের বিঘ্ন। এই "আমি" ঈশ্বর ও মানবাত্মার সম্মিলনের অন্তরায়, এই আমি ভাইএ ভাইএ মিলনের পরম শত্রু। এই "আমি" নানা বেশে আসে। এই আমি প্রথমে দীনতাকে বিনাশ করে, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাহীন করে। নিজের স্বেচ্ছাচারী ইচ্ছাকে principle ও conscience বলে। ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপনের নামে নিজের মতের রাজ্য স্থাপন করিতে চায়। নিজের ইচ্ছা ও রুচিকে বিবেকবাণী বলিয়া ধুঁয়া ধরে। বাহিরের ত্যাগ ত সহজ। হঠাৎ ভাবের উত্তেজনায় এক জনে লক্ষ টাকা দান করিতে পারে; অথবা কোন সুমহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্ম জগতের ত্যাগ বড় কঠিন। বিন্দু বিন্দু করিয়া আপনাকে কাটিয়া ঈশ্বরচরণে উপহার দিতে হয়। নিজের ইচ্ছা নাই, রুচি নাই, মান নাই, অপমান নাই, লাভ নাই, ক্ষতি নাই—আছে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও তাঁহার গৌরব। যদি চারিজন ভাই আমার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যায়, ঈশ্বরের গৌরব বাড়ে, তবে নত হইয়া পড়িয়া থাকিব—এই ধর্ম্মের কথা। কিন্তু দুরন্ত "আমি" বুঝুক আর না বুঝুক প্রতিবাদ করিবে, নিজের সত্যের ধুঁয়া ধরিবে। এই জন্যই বিশ্বাসী টমাস কেম্পীস্ বলিয়াছিলেন "You rather follow the will of others than your own" বরং অন্যের ইচ্ছার অনুসরণ কর—কিন্তু নিজের ইচ্ছায় চলিও না। ইহার অর্থ এই, যে বিষয়ে তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা ও আদেশ অনুভব কর, সে বিষয়ে তোমার অন্য পথ নাই। কিন্তু যে কার্য্যে তেমন কিছু বুঝ না, সেই কার্য্যেই অন্যের ইচ্ছার অধীন হওয়া তোমার মঙ্গল। হায়, এই নীতি অনুসরণ করিলে জীবনে দীনতা ভক্তি, বিশ্বাস কত বর্দ্ধিত হইত, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কত প্রেম ও শান্তি আসিত। জগতে যাঁহারা "আমি" ছাড়িয়া ছিলেন, তাঁহারাই বড়। সাধুজীবন স্বর বর্ণের ন্যায়,—আপনাকে লুপ্ত করিয়া অন্যের সঙ্গে মিলিয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের অস্তিত্ব থাকে না এমন নহে। স্বর যেমন ব্যঞ্জনের নিয়ামক ও পরিচালক, সাধু জীবনও সকলের নিয়ামক ও পরিচালক।

২

ব্রাহ্মসমাজে কেন আসিলাম? অন্য লোককেই বা কেন এখানে আসিতে বলি? কতগুলি বিশুদ্ধ মত আছে—এই কি কারণ? ব্রাহ্মেরা এক ঈশ্বর মানেন সকল নরনারীকে ভাই বোন বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী। বাল্য বিবাহ তাঁহারা দেন না, বিধবা বিবাহ প্রচলনে তাঁহারা যত্নশীল। তাঁহারা আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস করেন। এই বিশুদ্ধ মত গুলির আকর্ষণেই কি আসিয়াছি? অন্যকে কি এই জন্য ডাকিব? ইহা এক ভাল সমাজ—যাহারা নীতির পক্ষপাতী—এই সমাজে তাহাদের বাস করা সুবিধা—এই কি উদ্দেশ্য? যত চিন্তা করি, এই উত্তরে মন সন্তুষ্ট হয় না—এই অভিপ্রায়ে মানুষকে ডাকিতে আর ইচ্ছা হয় না।

জীবনের দুই একটী অভাব—তাহা না মিটিলে আর কিছুতেই পরিতৃপ্তি পাওয়া যায় না ১ম স্রষ্টার একটু সত্য পরিচয় পাওয়া। ২য় নিজ জীবনের পরিণাম সম্বন্ধে জ্ঞান পরিস্ফুট হওয়া।

অনেকদিন এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে—জীবনের ভিত্তি সুদৃঢ় হইল না কেন? কিন্তু অনেকবার এই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছি—মানুষ একদিনে "ঈশ্বরকে জানিতে পারে না—অনন্ত কাল ব্যাপিয়া জানিবে, ব্যস্ত হইলে কি হবে? উন্নতি অনন্তকাল ব্যাপিয়া।

"পরকাল সম্বন্ধে বিশেষ কি জানিবে? এবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান এ পৃথিবীতে আর কি লাভ হইবে? আত্মা অমর

জানিয়া রাখ, সৎকার্য্যকর, সংগতি হইবে।" কতবার মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছি, কিন্তু মন যে এই প্রবোধে স্থির থাকে না, সকল ধর্ম্মের কোলাহলের মধ্যে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, জীবনের অভাব পূর্ণ হইল কৈ? যখনই এই প্রশ্ন তুলিতে চাই, বন্ধুগণ এই বলিয়া প্রবোধ দেন "এত ব্যস্ত কেন—সিদ্ধি লাভ একদিনের কার্য্য নহে, অনন্তকাল ব্যাপিয়া হইবে, কার্য্য কর, অনন্তকাল ব্যাপী উন্নতি লাভ করিবে।"

বন্ধুগণ খবর লন, আমি কয়টা সৎকার্য্য করিয়াছি, ব্রাহ্মসমাজে কয়জন লোক আনিয়াছি, ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষে কয়খানা বই লিখিয়াছি; কিন্তু কেহ খবর লন না—আমার জীবনের অভাব পূর্ণ হইল কি না। নিজকে নিজে কত তাড়না করি—কেন কাজ কর্ম্ম হইল না, কেন সকলের ইচ্ছামত খাটি না? কিন্তু কতবার যে প্রাণ হইতে এই কথা আসে—কেন আসিয়াছিলে, সকলকে সন্তুষ্ট করিতে? দল করিতে? দল বাড়াইতে? এই জন্য কি এত সংগ্রাম? পিতামাতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হওয়া, তাঁহাদের সেবা ও আনুগত্য ধর্ম্মনীতি সংগত, বল কোন্ উচ্চনীতির জন্য এই নীতিকে ভাঙ্গিলে? সংসারে এত সংগ্রাম আনিলে, বিচ্ছেদ ও ক্লেশ দুঃখ বাড়াইলে কেবল কি একটা দলের জন্য? এত যে অশান্তি উৎপন্ন করিলে, তাহার পরিবর্ত্তে কি পাইলে, পৃথিবীতে কি দিলে? যাঁহাদিগকে কাঁদাইলে তাঁহাদিগের নিকট কি বলিতে পার, "দেখ দেখ এই বস্তু পাইয়াছি—ইহা গ্রহণ কর তোমরাও সুখী হইবে।"

অন্ধ অনুকরণ দুর্গতির কারণ। বুদ্ধ সত্যের অনুরোধে পিতামাতা স্ত্রীকে ক্লেশ দিয়াছিলেন, অতএব আমিও দিব। মন! বল ত জীবনে সত্যের আনুগত্য কতটুক, বুদ্ধের বৈরাগ্য কতটুক পাইয়াছ? মন, তোমার হিংসা বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়াসক্তি ত সব রহিয়াছে—ধ্যান, হোম, তপস্যার ত কোন লক্ষণ দেখি না—তবে বুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করিতে লজ্জা হয় না? সত্যের অনুরোধে,ধর্ম্মের অনুরোধে পিতামাতাকে ক্লেশ দিয়াছ, ধর্ম্মের অনুরোধ কৈ? তোমার ক্রোধ ত দমন হয় নাই, স্বার্থপরতা ত যায় নাই, সাধন ভজনের ত কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় না, তবে কি ইহকাল পরকাল সকল নষ্ট করিবে? মন, জাগ্রত হও—কেন আসিয়াছ তাহা ভাব।

প্রভো, আমি ত আসি নাই, তুমি আনিয়াছিলে। কিন্তু ধরা দিলাম কৈ? দল ভাঙ্গিয়া যে দল বাঁধিতেছি। তোমাকে পাইব, তোমার অধীন হইব, সংকল্প করিয়াছিলাম, তাহা হইল কোথায়? যাহা দ্বারা সংসারের সকল বন্ধন কাটিল ভাবিয়াছিলাম—এখন দেখি আস্তে আস্তে তাহাই গলায় জড়িত হইতেছে—সাড়া শব্দও ত করিতেছি না। আমার যে ইহকাল, পরকাল সব নষ্ট হইল—আমায় বাঁচাও—নূতন প্রার্থনা মুখে তুলিয়া দাও! "চাই দয়ালের নাম চাই, আর অভয়চরণ চাই—আমরা সামান্য ধন নাহি চাই, অন্য কিছু নাহি চাই।"

তবে এই "আমি" কে সরাইয়া দিব। প্রভো, বুঝিয়াছি এই আমি সকল অনর্থের মূল। লেক্‌চার করি, আর কমিটি করি, দরবার করি, আর দেবসমাজ করি, এই "আমি" কে না তাড়াইলে তোমার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে না। প্রভো তুমি এস, তুমি বস, তুমি জীবন। তুমি যদি "আমির" স্থান পূর্ণ কর, তবে আর দুঃখ কি থাকে! প্রভো, তুমি জীবনের অধিপতি হইয়া বস, সমাজপতি হইয়া বস, লেক্‌টারপতি হইয়া বস "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" তুমি এক প্রভু, কর্ত্তা, নেতা। আমরা সকলে সরিয়া দাঁড়াই। অন্যের উপর দোষ দিব না। ব্রাহ্মজীবনে তুমি বস, ব্রাহ্মসমাজে তুমি বস—আমরা আপনাকে ছাড়িয়া কেবল তোমার গৌরব অনুসন্ধান করি।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

দ্বারিক বাবুর কোন্ কোন্ কথায় আমার আপত্তি, তাহা এখন পর্য্যন্তও উল্লেখ করি নাই শুনিয়া, সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠান্তে সীতাদেবীর পরিচয় জিজ্ঞাসার কৌতুক মনে পড়িল। তিনি বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্র মূলক অধিকারকে যে সাম্যের বিরোধী মনে করিতেছেন, এই ত প্রথম ও প্রধান আপত্তি। তিনি বলিতেছেন যে, গুণমূলক অধিকার সৃষ্টি করিলেই উহা বংশমূলক করাও উচিত; কারণ প্রাকৃতিক নিয়মে, গুণ বংশানুগামী, এবং তাহা হইলেই জাতিভেদ উপস্থিত হইল—এই দ্বিতীয় আপত্তি। তিনি বলিয়াছিলেন যে, একজন মানুষ যাহা করিয়াছে, অপর একজনও ইচ্ছা করিলে তাহা করিতে পারে, এই আমার তৃতীয় আপত্তি। দ্বারিক বাবুর ব্যাখ্যা কৌশলে শেষ কথাটীর অর্থ পরে এই দাঁড়াইয়াছে যে, অনুকূল অবস্থায় কেহ কেহ মহাপুরুষ হইতে পারে। এই অর্থের সহিত আমার কোনও তর্ক নাই; কিন্তু ইহার সহিত সাম্যবাদেরও বড় সম্পর্ক নাই। প্রথম দুটি কথার উত্তর আমি সাধ্যমত দিয়াছি, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আমি বলিয়াছিলাম যে,সকল মানুষ সমান বা ইচ্ছা করিলে সমান হইতে পারে, তাহা সত্যও নহে, সাম্যবাদের অর্থও নহে। দ্বারিক বাবুও তাহা অস্বীকার করেন না; কিন্তু তিনি বলেন যে, মানুষে মানুষে যে প্রভেদ তাহা প্রকার ভেদমাত্র, তবে যে উৎকর্ষাপকর্ষ দৃষ্ট হয়, তাহা মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম অবস্থার ফল, সমদর্শী ঈশ্বরের কার্য্য নহে। আমি সম্পূর্ণ স্বীকার করি নাই। দ্বারিক বাবু উল্লাসের সহিত বলিতেছেন, সম্পূর্ণ স্বীকার না করি, অংশতঃ স্বীকার করিলেই তাঁহার পক্ষ সমর্থিত হইল। কিন্তু তাঁহার পক্ষ কি? মানুষে মানুষে যে ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয়, তাহার কতকটা অবস্থা বংশ সমাজের ফল হইলে বাকীটা কাহার কার্য্য? বাকীটার জন্য যদি ঈশ্বর দায়ী হন, তাহা হইলেও ত তিনি সমদর্শী নহেন। তবে বোধ হয়, অল্প পরিমাণ বৈষম্য সৃষ্টির অপরাধ দ্বারিক বাবু অনুগ্রহ পূর্ব্বক উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত।

আমি আরও বলিয়াছিলাম যে সমগ্র প্রাণী জগতেই বৈষম্য দৃষ্ট হয়। জীব মাত্রেরই এমন কোন গুণ নাই, দেহের এমন কোন অংশ নাই, যাহাতে ভিন্নতা লক্ষিত হয় না। ইহা

যদি ঈশ্বরের সমদর্শিতার বিরোধী না হয়, তবে মানুষের মধ্যে যে ইতর বিশেষ থাকে, তাহাই বা তাঁহার সমদর্শিতার বিরোধী হইবে কেন? দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক জাতীয় দুইটী পক্ষীর মধ্যে যে পালকের ইতর বিশেষ, কিম্বা এক জাতীয় দুইটী পতঙ্গের মধ্যে রঙ্গের ইতর বিশেষে, তাহাদের জীবন সংগ্রামে সুবিধা অসুবিধা হয় তাহার উল্লেখ করিয়াছিলাম। উত্তরে দ্বারিক বাবু বলিতেছেন যে, এপ্রকার ভিন্নতার কথা এই তিনি নূতন শুনিলেন ও ইহার প্রমাণ চাহিয়াছেন। আমি তাঁহাকে ওয়ালেস্ প্রণীত Darwinism নামক গ্রন্থের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়, বিশেষতঃ ৪র্থ অধ্যায়ের শেষ কথাগুলি পড়িতে অনুরোধ করি। আমার কথা তাঁহার নিকট নূতন হইতে পারে, কিন্তু ইহা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের "কথা।" প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের মতটী যে সকলে মানেন না তাহা জানি। কিন্তু তাহার মূল কথাটী যাঁহার নিকট নূতন লাগে, তাঁহার সহিত বর্ত্তমান চিন্তা জগতের কিরূপ সংস্পর্শ বলিতে পারি না। বিশেষ যিনি কথা কহিলেই মিল, কোমৎ স্পেন্‌সার বর্ষিত হয়, তাঁহার নিকট হইতে এরূপ কথা বিস্ময়জনক।

দ্বারিক বাবু ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন যে, আমার প্রবন্ধে ও পত্রে তাঁহার মনের অন্ধকার ঘুচিল না। কিন্তু আমার কথায় তাহার অন্ধকার ঘুচিবে, তাহা আশা করাও আমার পক্ষে দুঃসাহসিকতা বটে। এ বিষয়ে এই আমার শেষ পত্র।

বিনীত

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চট্টগ্রাম।

ব্রাহ্মসমাজ।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে উপাসনা—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিন উপলক্ষে সাধনাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়। নিমন্ত্রিত অনেক ভাই ভগিনী উপস্থিত হইয়া উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা করেন। উপদেশ অতি গভীর ও প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। উপদেশের দুইটি বিষয়ের স্থূল মর্ম্ম উল্লিখিত হইতেছে।—"আজ আমরা মহাত্মা রামমোহন রায়ের সেই উদারবিশ্বজনীন প্রেমের বিষয় চিন্তা করি। সুদূর ইটালিবাসিগণ স্বাধীনতার যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে, একথা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া রামমোহন রায় শয্যাগত হইলেন; স্পেনদেশীয়গণ স্বদেশে সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে শুনিয়া তিনি আনন্দে টাউন হলে ভোজ দিলেন; ইংলণ্ড যাত্রাকালে সমুদ্র মধ্যে ফরাসী দেশীয় জাহাজে সাধারণ তন্ত্রের বিজয়-বৈজয়ন্তি দেখিয়া তাহাকে সম্মান করিবার জন্য কাপ্তানের কথা না শুনিয়াও সেই অর্ণবযানে গেলেন, এবং তিনি তাহাতে পদে এরূপ গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডে খোঁড়া হইয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপ, সকল দেশের প্রতি, সকল মানবের প্রতি তাঁহার কি গভীর বিশ্বজনীন প্রেম ছিল, তাহা আমাদের ধারণা করাও কঠিন।"

"মহাত্মা রামমোহন রায় ১৬ বৎসর বয়সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে সঙ্গে নানা স্থান পর্য্যটন করেন। এই সময় তিনি তিব্বৎদেশে তিন বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। তিনি ভারতের নানা শ্রেণীর সাধকগণের সাধন পন্থা দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, "ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন ও তাঁহাকে প্রীতি করাই তাঁহার উপাসনা।" এই প্রণালীই শ্রেষ্ঠ। এই হইতে তিনি লোকহিতকর ব্রতে প্রাণ মন অর্পণ করিলেন। আমরাও যেন তাঁহার এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করি।"

উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও অতি উপাদেয় দু একটি কথা বলেন। অদ্যকার অনুষ্ঠান অতি মধুময় হইয়াছিল।

রামমোহন রায়ের স্মরণার্থসভা—উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৫½ ঘটিকার সময় এই সভার অধিবেশন হয়। অত্যন্ত বৃষ্টিপাত হইলেও সিটীকলেজের বিস্তৃত হল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অনেকে স্থান না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। মাননীয় বিচারপতি ডাঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাগ্মীপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু কালাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্নিময় ভাষাতে রামমোহন রায়ের গুণাবলী ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার বক্তৃতায় সভাস্থলে এক বৈদ্যুতিক শক্তি সকলের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বাঙ্গালাতে এবং শ্রীযুক্ত বাবু চিত্তরঞ্জন দাস ব্যারিষ্টার ইংরাজিতে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গলা প্রবন্ধপাঠ করেন।

দুর্ভিক্ষসংবাদ—বাবু হরিমোহন ঘোষাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে মাদরা নামক স্থানে নিয়মতরূপে চাউল বিতরণ করিতেছেন। অগামী ধান্যের ফসল না উঠা পর্য্যন্ত সাহায্য দিতে হইবে। যাহারা ক্ষুধার্ত্তদিগের প্রতি দয়া করিয়া অর্থ সাহায্য প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহাদের দেয় সাহায্য স্থানান্তরে স্বীকৃত হইতেছে। একটি সাধুদৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা পরমপুলকিত হইয়াছি, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। আসাম মনাই চা বাগানের কর্ম্মচারিগণ চাঁদা সংগ্রহ করিয়া কিছু টাকা পাঠাইলে, সেই বাগানের শ্রমজীবিগণ ইহা জানিতে পারিয়া নিজেদের মধ্য হইতে সংগ্রহ করিয়া ১২টি টাকা পাঠাইয়াছেন। এই শ্রমজীবি ভ্রাতাগণের সহৃদয়তা এবং পরোপকার প্রবৃত্তি অনেকেরই অনুকরণীয়। আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি!

শ্রাদ্ধ—শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার সেনের পরলোকগতা পত্নী বরদাসুন্দরী সেনের আদ্যশ্রাদ্ধ সাধনাশ্রমে সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়গণ

উপাসনাদির কার্য্য করেন। এতদুপলক্ষে রাজকুমার বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ও সাধনাশ্রমে একটি স্বর্ণমুদ্রা (তাহার মূল্য ২৮৷২৯৲ টাকা) দান করিয়াছেন।

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে পরলোকগত বাবু মোহিনীমোহন মজুমদারের আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রমোহন বসু মোহিনী বাবুর জীবনী সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন। পরমেশ্বর পরলোকগত আত্মাদিগকে শান্তি দান করুন।

বিবাহ—গত ২রা আশ্বিন ঢাকা নগরীতে পরলোকগত বাবু গোপীমোহন ঘোষের গৃহে একটি ব্রাহ্ম-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী ঘোষ, পাত্র শ্রীমান প্যারীকান্ত মিত্র। শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

গত ৯ই আশ্বিন মেদিনীপুর নগরে শ্রীমান প্যারীলাল ঘোষের সহিত শ্রীযুক্ত বাবু অভয়চরণ বসুর তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী ক্ষীরোদ কুমারীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেখানে গমন করিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। উভয় বিবাহই ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টরী হইয়াছে। পরমেশ্বর নবদম্পতিদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

চুঁচুড়াতে রবিবাসরীয় বিদ্যালয় স্থাপন—শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী সেন চুঁচুড়া বাস করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি কয়েকটি বালক বালিকা লইয়া রবিবাসরীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। পরমেশ্বর সাধু কার্য্যের সহায় হউন।

বানিবনে ব্রাহ্ম-পল্লী—বানিবনের ব্রাহ্মপল্লীর বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বে তত্ত্ব-কৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছে। বাবু হারাণচন্দ্র রায় স্থায়ী রূপে বাস করিবার জন্য তথায় বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই বাড়ীতে সম্প্রতি অপর ২।১টী ব্রাহ্মপরিবারও বাস করিতেছেন। বাবু উমাপদ রায় এবং বাবু তারকগোপাল ঘোষ কৃষিকার্য্যের জন্য জমি ক্রয় করিয়াছেন এবং ক্রমশঃ আরও ক্রয় করিবেন। ধনবান ভদ্র লোকের অভাব এবং অন্যান্য কারণে বানিবনে নাখেরাজ ও জমিদারীর অন্তর্গত জোতস্বত্ব অতি কম মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। হারাণ বাবুর বাড়ী, খালের ধারে অতি সুবিধাজনক স্থানে হইয়াছে। উলুবেড়িয়া হইতে নৌকাতে অনায়াসে গমন করা যায়। পরমোৎসাহী বাবু এককড়ি সিংহের যত্নেই এই পল্লীস্থাপিত হইতেছে। বানিবনের মাইনর স্কুল সুন্দর রূপে চলিতেছে। স্কুলের হেডমাষ্টার ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। এককড়ি বাবু স্কুলের জন্য নিজে অনেক অর্থ ব্যয় করিতেছেন। তিনি গরিব হইলেও সাধু কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতে অনেক ধনবান অপেক্ষা মুক্ত হস্ত। আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

নামকরণ—গত ১৭ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় বাবু ত্রৈলোক্যনাথ [illegible] কন্যার নামকরণ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। কন্যার নাম প্রফুল্লবালা রাখা হইয়াছে। এই উপলক্ষে ত্রৈলোক্য বাবু সাঃ ব্রাঃ সমাজে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনী—ব্রাহ্মসম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ দত্ত লিখিয়াছেন;—

"পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর আগামী অধিবেশন ঢাকা নগরে ২৬শে আশ্বিন আরম্ভ হইবে। ঐ তারিখে প্রারম্ভিক অধিবেশন ও ২৭শে এবং ২৮শে মূল অধিবেশন হইবে। ব্রাহ্মবন্ধুগণ উপস্থিত হইয়া আলোচনার সহায়তা করেন, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

আলোচ্য বিষয়—

১। ব্রাহ্মবিবাহ আইন বিষয়ক পাণ্ডুলিপি।
২। প্রচলিত সামাজিক উপাসনাপ্রণালী।
৩। বিবিধ।

দুর্ভিক্ষের দানপ্রাপ্তি স্বীকার—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থে নিম্নলিখিত অর্থ প্রেরণ করিয়াছেন। বাবু নিবারণচন্দ্র দাস পটুয়াখালী স্কুল হইতে সংগ্রহ করেন ১৶০ বাবু বিশ্বেশ্বর কর্ত্তৃক নেলফামারি হইতে সংগ্রহ ১৫৷৹ সিটিকলেজের ২য় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণ ১০৲ বাবু এস, সি কয়াল-মনিয়া ৫৲ বাবু পূর্ণচন্দ্র দত্ত কলিকাতা ৫৲ বিপিন বিহারী মিত্র ঐ ১৲ জানকীপ্রসাদ দে ঐ ১৲ ভৈরবচন্দ্র বসু ঐ ১৲ আবদুল হামিদ খাঁ শিয়ালদহ ২৲ সেখ আবদুল গণি ঐ ১৲ সেখ আবদুল মজিদ ঐ ১৲ বাবু শরৎচন্দ্র দত্ত কলিকাতা ৷৹ চণ্ডীচরণ ঘোষ ঐ৷৹ কৃষ্ণলাল দে ঐ৷৹ অক্ষয়চন্দ্র ঘোষাল ঐ।৹ যোগেন্দ্রনাথ পাল ঐ।৹ অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য ঐ ৹ অমৃতলাল মিত্র ঐ ৹ বিনোদ বিহারী বসু ঐ ।৹ পরেশনাথ ঘোষ ঐ ।৹ কালীকান্ত ও দীনবন্ধু ঐ।৹ অধরচন্দ্র বসু ঐ ।৹ হরেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক ঐ ।৹ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।৹ শ্রীমতী শরৎকুমারী মিত্র মাণিকতলা ১৲ বাবু মদনমোহন বসু কলিকতা ১৲ উমাকান্ত দাস ঐ ১৲ শ্রীমতী নলিনী বালা বসু ঐ ২৲ সাঃ ব্রাঃ সমাজের রবিবাসরীয় বিদ্যালয় ১৸৶৹ বাবু রজনীনাথ দত্ত বাগেরহাট হইতে পাঠান ২৲ শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার লাহোর ২৲ বাবু বিপিনবিহারী গুপ্ত কর্ত্তৃক সৈয়দপুর হইতে সংগ্রহ ২৫।৶৹ বাবু রামনাথ বিশ্বাস সম্পাদক বাগুটিয়া নমঃশূদ্র হিতসাধিনী সভা ১৲ বাবু বেণীমাধব পাল ২৲ জেনাবেল এসেম্ব্লির ১ম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণ ৩৹ বাবু শ্রীধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ময়মনসিং ঝাওয়াইল হইতে সংগৃহীত ১০৲ বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী কটক ৫৲ উদয়রাম দাস মিসা ২৲ শ্রীমতী সরলাসুন্দরী দাস ঐ ২৲ বাবু কালীপ্রসন্ন সেন এল, এম্, এস দার্জ্জিলিং ৩৫৲ একজন ভদ্রলোক ৴৹ বাবু চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গয়া হইতে সংগৃহীত ৭২।৹ অধরচন্দ্র মজুমদার কলিকাতা ১৲ নবীনচন্দ্র সিংহ উকিল কর্ত্তৃক সংগৃহীত বাগেরহাট ৮৲ শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা মিত্র ৫৲ অনৈক ছাত্রী ব্রাহ্ম বালিকা ছাত্রনিবাস ১৲ বাবু চন্দ্রনাথ চৌধুরী বরাহনগর ১৲ শ্রীমতী চারুমতী দেবী পুরুনঅপড়া১৲ বাবু মহেশ চন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক সংগ্রহ রামপুরহাট ৯৲ মুন্সী ইমাদুদ্দিন সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত কলিকাতা১০৲ মনাই আসাম চা বাগানের কর্ম্মচারীগণ২১৲ বাবু অভয়চরণ মজুমদার কর্ত্তৃক সংগৃহীত কলিকাতা ১১৶৫ পূর্ব্ববারের সংগৃহীত অর্থসহ মোট ৭৮৬৸১০।

পত্র প্রেরকদিগের প্রতি—বাঁকুড়া হইতে শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্ম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ কুলভি মহাশয় লিখিয়াছেন;—"আজকাল সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম, বিশ্বজনীন প্রেম কথাগুলির বেশী প্রাদুর্ভাব দেখা যায়; কিন্তু ইহার তলে তলে কোন না কোনও সম্প্রদায় বা দলের প্রতি অপ্রেম বা তদপেক্ষায় ও দূষণীয় ভাব,—বিদ্বেষবুদ্ধি লুক্কাইত রহিয়াছে।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ থিওলজিকেল সোসাইটির সভা কর্ত্তৃক সম্পাদিত "কল্প নামক" পত্রিকার উল্লেখ করা যাইতে পারে। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের পত্রিকায় এক স্থানে লিখিত হইয়াছে যে, "যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিবেন, তাহারা কেন ব্রাহ্ম থাকিবেন?" আমি বলি, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিবেন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের বা হিন্দু সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতর, অনাচারের ভিতর কখনই থাকিতে পারেন না।"

"ব্রাহ্মেরা জাতিভেদ মানে না, স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করে, মৃত্তিকা বা পাষাণনির্ম্মিত দেবতা কল্পনা করে না। এই সকল যদি অহিন্দুয়ানী হয়, তবে তুমি তোমার হিন্দুয়ানী লইয়া সুখে থাক, ব্রাহ্মেরা তাহার বাহিরে, এবং সে জন্য তুমি তাহাদের প্রতি কটাক্ষ করিবার সুবিধা পাইলেই দু চার কথা বলিতে পার, সে জন্য ব্রাহ্মেরা দুঃখিত হইবেন না।"

পত্রখানি "কল্প" পত্রিকার সম্বন্ধে লিখিত, সুতরাং কল্প পত্রিকাতে প্রকাশিত হইলেই ভাল হইত। এজন্যই আমরা কেবল সারমর্ম্ম প্রদান করিলাম।

দুর্ভিক্ষ ফণ্ডের সাহায্য প্রার্থনা।

গত ফাল্গুন মাস হইতে ফরিদপুরের অন্তঃপাতী কোটালিপাড় প্রভৃতি স্থানে অত্যন্ত অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহকসভা শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষালকে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি রাধাগঞ্জ নামক স্থানে অবস্থিতি করিয়া অতি যত্নের সহিত দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন। তৎপরে শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ তিনি তথা হইতে চলিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্তও ঐ সকল স্থানের অন্নকষ্ট দূর হয় নাই, বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। আগামী অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত এরূপ কষ্ট থাকিবে। সুতরাং কার্য্যনির্ব্বাহক সভা পুনর্ব্বার শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন ঘোষালকে ঐ অঞ্চলে প্রেরণ করিয়াছেন। হরিমোহন বাবু তথাকার অবস্থা দর্শন করিয়া যে পত্র লিখিতেছেন, সেই সকল পত্র পাঠ করিলে নিতান্ত পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়। অন্নাভাবে লোকের শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে, পরিধানে বস্ত্র নাই, ঘরের চালে খড় নাই, এই ভয়ানক বর্ষার জলধারা তাহাদিগের মস্তকের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, মানুষের ইহা হইতে আর দুর্দ্দশা কি হইতে পারে? এই জন্য আমরা সর্ব্ব সাধারণের নিকট বিনীতভাবে অর্থ সাহায্যে প্রার্থনা করিতেছি। যদি সকলে আহার-ক্লিষ্ট ভ্রাতা ভগিনীদিগের দুঃখের কথা একবার চিন্তা করেন, এবং স্বীয় স্বীয় ক্ষমতা অনুসারে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করেন, তাহা হইলে অনেক পরিমাণে ইঁহাদিগের দুঃখ মোচন হইতে পারে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক সকলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট সাহায্য পাঠাইলে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। আমাদিগের নিকট টাকা আসিলে আমরা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থানে পাঠাইয়া দিব এবং যাহাতে দুর্ভিক্ষ ফণ্ডের টাকা কোনও রূপে অপব্যয় না হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিব।

নিবেদক

শ্রীরজনীনাথ রায়, সম্পাদক।

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ, ধনাধ্যক্ষ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা।

নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বর্ষের পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষার্থিগণকে আগামী ৩রা নবেম্বর বা তৎপূর্ব্বে সম্পাদকের নিকট আবেদন করিতে হইবে। প্রত্যেক আবেদন পত্রে পরীক্ষার্থীর নাম, বয়স, ঠিকানা, ব্যবসায়, (ছাত্র বা ছাত্রী হইলে কলেজ বা স্কুল ও শ্রেণীর নাম), ধর্ম্মমত এবং অভিভাবকের নামের উল্লেখ এবং তৎসঙ্গে কোন সুপরিচিত ব্রাহ্মের লিখিত প্রশংসাপত্র থাকা আবশ্যক। মফস্বলবাসী পরীক্ষার্থিগণ আপন আপন স্থানে কোন সুপরিচিত স্থানীয় ব্রাহ্মের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা দিতে পারিবেন। অত্রত্য পরীক্ষার্থিগণের পরীক্ষা উপাসনা-মন্দিরে গৃহীত হইবে।

পরীক্ষার প্রণালী।

১০ই নবেম্বর, শনিবার, অপরাহ্ন ৩টা হইতে ৬টা।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' প্রথম-ভাগ ও আদিব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত 'ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস'।

১১ই নবেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ন ২টা হইতে ৫টা।

[*The New Testament* in English].

১৭ই নবেম্বর, শনিবার, অপরাহ্ন ৩টা হইতে ৬টা।

'ভগবদ্গীতা,' মূলসংস্কৃত। উত্তর বাঙ্গালা বা ইংরেজিতে দেওয়া যাইতে পারিবে।

১৮ই নবেম্বর, পূর্ব্বাহ্ন ১১টা হইতে অপরাহ্ন ২টা।

Principal Caird's *Introduction to the Philosophy of Religion.*

অপরাহ্ন-২½টা হইতে ৫½টা। বাবু সীতানাথ দত্ত-প্রণীত 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত 'ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা' দ্বিতীয়ভাগ।

পরীক্ষার্থিগণ উপরোক্ত কোর্স সমূহের কোন একটী বা একাধিক কোর্সে পরীক্ষা দিতে পারেন। উত্তীর্ণ ছাত্র ও ছাত্রীগণকে মাঘোৎসবের সময় পুরস্কার প্রদত্ত হয়। বিশেষ কথা সম্পাদকের নিকট জ্ঞাতব্য।

২১০।৩।২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
২৬এ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

শ্রীসীতানাথ দত্ত,
ব্রহ্মবিদ্যালয় সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ই অক্টোবর শুক্রবার অপরাহ্ন ৫½ ঘটিকার সময় কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনামন্দিরে অধ্যক্ষ সভার ৩য় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

কার্য্যবিবরণ।

১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ৩য় ত্রৈমাসিক রিপোর্ট এবং আয় ব্যয়ের হিসাব।

২। বিবিধ—

সাঃ ব্রাঃ সমাজ
কলিকাতা

রজনীনাথ রায়।
সম্পাদক সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৬ই আশ্বিন প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ সংখ্যা। ১৭শ ভাগ।

১লা কার্ত্তিক বুধবার, ১৮১৬ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

তোমাতেই মুগ্ধ হয়ে থাকি অনুক্ষণ।

হিমালয়ে বেগবতী নির্ঝরিণী যত,
বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করি অবিরত,
মহাসিন্ধু দরশনে আকুল অধীর মনে
ছুটিয়াছে তুলি কত তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস।
নিরখিয়া তাদের আনন্দ-উল্লাস,—
ক্ষুদ্রতম নির্ঝরিণী অতি ক্ষীণ কায়,
অনন্ত সাগর পানে ছুটে যেতে চায়।
কিন্তু হায়! পথে তার প্রস্তর যে স্তূপাকার;
একটু চলিয়া আর চলিতে না পারে।
হে পিতা! তেমনি যে গো আমিও সংসারে,—
করিলাম দরশন সাধু ভক্ত অগণন
কি এক ভাবেতে যেন হয়ে মাতোয়ারা
কি এক আনন্দে যেন হয়ে আত্ম-হারা,
চলেছেন তোমাপানে; তোমায় হেরিলে, প্রাণে
না জানি কি পাইবেন শান্তি অনুপম।
ধন্য হবে ধরণীতে মানব জনম।
তাই যে গো ক্ষুদ্র আমি, কত কি আশায়,
চলেছিনু তোমাপানে, এখন যে হায়!
প্রস্তর স্তূপের মত, বাধা বিঘ্ন শত শত,
দাঁড়াল সম্মুখে এসে পাপ-রিপু-দল।
আমার যে নাহি কোন সাধনের বল।
তাই ত গো করি কত চেষ্টা নিরন্তর,
নাহি পারি একপদ হতে অগ্রসর।
নিজ দুর্ব্বলতা স্মরি কতবার মনে করি,
ফিরে যাই পূর্ব্বস্থানে; তাহাতেও প্রাণ,
মর্ম্মান্তিক দুঃখে যেন হয় ম্রিয়মাণ!
শুনিয়াছি যে দুর্ব্বল অতি অসহায়,
অথচ সরল প্রাণে তোমারেই চায়,
তুমি না কি দয়া করে তার দুটি করে ধরে
কাছে ডেকে লও পিতা! আমি আজ তাই,
সকাতরে ও চরণে এই ভিক্ষা চাই,—
ব্যাকুল হৃদয় মোর যেতে তব কাছে,
বাধা বিঘ্ন সম্মুখেতে যাহা কিছু আছে,
দাও তাহা দূর করি, আকুল এ প্রাণ ভরি,
নিরখি তোমার প্রেম-মুখ অতুলন,
তোমাতেই মুগ্ধ হয়ে থাকি অনুক্ষণ।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

প্রেম সাধন—"প্রীতি পরমসাধনং" ব্রাহ্মসমাজে এ কথা বহুল প্রচারিত। কৃচ্ছ্রসাধন, বৈরাগ্যসাধন প্রকৃত পক্ষে সাধনের লক্ষ্য হইতে পারে না। সাধনের লক্ষ্য ভগবৎ-প্রেম, সেই প্রেমসাধনের ফলে বৈরাগ্য ও সংসারে অনাসক্তি স্বতঃই অঙ্কুরিত হয়। প্রেম সকল সাধনার মূল। যেমন কোনও জিনিষে রঙ্গ ফলাইতে হইলে প্রথমতঃ আস্তর দিতে হয়, আস্তর না দিলে কোনও রঙ্গই ধরেনা, তদ্রূপ প্রেম না থাকিলে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম কোনও সাধনই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। প্রেম-বিহীন-জীবন নাস্তিকতার প্রতিমূর্ত্তি। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে;—

Love is the fulfilling of the law—ROM XIII. 10.

প্রীতিই ধর্ম্মের সাধন।

He that loveth not knoweth not God, for God is love—1 John IV. ৪.

যে প্রীতি করে না সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর প্রীতিস্বরূপ।

প্রেমের দুইটি দিক আছে; ঈশ্বরের দিক এবং মানবের দিক। যিনি ঈশ্বর-প্রেমিক নহেন, তিনি মানবকেও প্রকৃতরূপে প্রেম করিতে পারেন না। ঈশ্বর-প্রেমিকের হৃদয় নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক। নিষ্কামভাবে তাঁহারাই কেবল কার্য্য করিতে পারেন। এই প্রেমই সাধনীয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়। সাধকগণ ইহাকেই অহৈতুকী প্রেম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রতিদিন সকলেরই আত্মপরীক্ষা করা কর্ত্তব্য, তিল তিল করিয়া প্রেমের বিমলসংস্পর্শে প্রাণ পবিত্রীকৃত হইতেছে

কি না। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে সাধন সম্বন্ধে এই রূপ লিখিত আছে যে,—"তাঁহারা কখনও মৈত্রীভাবনায় নিযুক্ত হইবেন। এই সময়ে সর্ব্বজীবের বিষয় চিন্তা ও তাহাদের সুখ-ইচ্ছা করিবেন; নিজের মুক্তি সুখ ও সেই সুখ যাহাতে সর্ব্বপ্রাণীতে বিস্তৃত হয়, শত্রুগণও যাহাতে সুখী হইতে পারে, সেই আকাঙ্ক্ষা করিবেন। শত্রুর গুণ চিন্তা ও মঙ্গল কামনা করিবেন। কখনও তাঁহারা করুণা ভাবনায় নিযুক্ত হইবেন। এই সময় দুঃখসন্তপ্ত সকল প্রাণীকে স্মরণ করিয়া লোকের দুঃখের অবস্থা উপলব্ধি করিবেন এবং এই উপায়ে দুঃখীর জন্য দুঃখ উদ্দীপিত করিবেন।"

মহাত্মা যীশুও উপদেশ দিয়াছেন; "তুমি সমগ্রহৃদয় মন প্রাণ ও সমুদয় শক্তি দ্বারা প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম কর এবং প্রীতিবেশীকে আত্মতুল্য ভাল বাস।" আর্য্য ঋষিও বহুকাল পূর্ব্বে আধ্যাত্মিকতার উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "মানুষ, পশু পক্ষী সকলকে আপনার ন্যায় প্রেম কর, বসুধা তোমার কুটুম্ব।"

অল্পাধিক পরিমাণে সকল সাধকই এইরূপে প্রেমের স্বর্গীয় মহিমা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। প্রেম ভিন্ন সাধনভজন সকলই বৃথা। শুষ্ক কঠোরহৃদয় ব্যক্তি নানা শাস্ত্রে পারদর্শী, বুদ্ধিমান, তার্কিক হইতে পারেন, ধর্ম্মশাস্ত্রের সূক্ষ্মাদ্‌সূক্ষ্ম মীমাংসা করিতে পারেন; কিন্তু প্রেমের অভাবে তিনি চিরদিনই শ্মশানবৎ মরুভূমিতে বাস করিবেন, ঈশ্বর সহবাসের সুস্নিগ্ধ শ্যামল প্রীতি-নিকেতন কখনও লাভ করিতে পারিবেন না।

আত্ম-তৃপ্তি ও ব্যাকুলতা—আত্ম-তৃপ্তি, ব্যাকুলতার অন্তরায়। যেখানে আত্ম-তৃপ্তি, সেখানেই ঈশ্বর লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা শিথিল-ভাবাপন্ন। উপাসক মনে করিতে পারেন, দিন ত বেশ যাইতেছে, দুই বেলা নিয়মিত উপাসনা করিতেছি; নিশীথ সময়ে ধ্যান করিতেছি; নানা গ্রন্থপাঠ ও ধর্ম্মালোচনা করিতেছি, "দৈনিক লিপি" লিখিতেছি, আত্ম-চিন্তারও বিরাম নাই; অপর দিকে নানাবিধ হিতকর কার্য্যও যথা সাধ্য করিতেছি, সাধু সঙ্গে বাস করিতেছি। এইরূপে সচ্চিন্তায়, ধ্যান ও আরাধনায় এবং নানারূপ "প্রিয়কার্য্য" সাধনে অতি সাধুভাবে দিন যাইতেছে। উপাসনার সময় ভাবোচ্ছ্বাসও হইয়া থাকে, কঠোরপ্রাণ বিগলিত হইয়া যায়, ভাবাবেশে হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠে। অপর দিকে কার্য্য করিবার সময়ও হৃদয়ে প্রবল উৎসাহ। সকল দিকেই দিন অতি সুন্দর ভাবে অতিবাহিত হইতেছে, তবে আর ভাবনা কি?

গূঢ়ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, বাস্তবিক এ অবস্থা আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিচায়ক নহে। যখন আত্মা ঈশ্বর সহবাস লাভের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়, সংসারের কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে না পারিয়া ভগবানের জন্য লালায়িত হয়, সেই অস্থিরতাই আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষণ। ঈশ্বরকে না পাইয়া যাঁহার প্রাণ ছটফট করে না, ঈশ্বরকে ভুলিয়া যিনি রজনী সুনিদ্রায় যাপন করেন, আনন্দচিত্তে কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরলাভ সুদূরপরাহত। ব্যাকুলতা-বিহীন-আত্মা যত কালই সাধন ভজন করুক না, কখনও ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিবে না। এক বিন্দু ব্যাকুলতা থাকিলে সেই অনন্ত ভূমা পরমেশ্বরকে লাভ করা যায়। সাধক ভগবানকে লাভ করিবার জন্য কিরূপ ব্যাকুলতা প্রার্থনা করেন, তৎসম্বন্ধীয় বৈষ্ণবকবির একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে;—

অজাতপক্ষা ইব মাতরংখগাঃ
স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতা বিষণ্ণা
মনোরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাং॥

অর্থ—"হে অরবিন্দাক্ষ! অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকগণ যেরূপ উৎকণ্ঠার সহিত মাতার জন্য অপেক্ষা করে, গোশালাতেবদ্ধ গোবৎস যে ভাবে মাতার অপেক্ষা করে, প্রোষিতভর্ত্তৃকা কুলকামিনী যে ভাবে প্রবাসগত পতির পথ চাহিয়া থাকে, সেইরূপ আমার মন তোমার দর্শনের জন্য উৎসুক হইতেছে।"

ব্যাকুলতা যে হৃদয়ে উদয় হইয়াছে, সে হৃদয়ই ভগবানের লীলাবিহার স্থল। আত্ম-তৃপ্তি ব্যাধির লক্ষণ। অনেক সাধক এই আত্ম-তৃপ্তিকেই ব্রহ্ম লাভ বা ব্রহ্মানন্দ উপভোগের অবস্থা মনে করেন; কেহ কেহ বা ইহাকেই সিদ্ধাবস্থা বলিয়া প্রতারিত হইয়া থাকেন। সাধন রাজ্যে আত্ম-তৃপ্তি এক ভয়ানক শত্রু। সাধক অনেক শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া পরিশেষে আত্মতৃপ্তির হস্তে পতিত হন। ব্রহ্মের আবরণস্বরূপ আত্মতৃপ্তি যাহাতে না আসিতে পারে, তজ্জন্য সকলকেই সজাগ থাকা কর্ত্তব্য। অপরদিকে ব্রহ্মলাভের জন্য যাহাতে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, সেজন্য প্রার্থনাপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহার কৃপাভিন্ন মানবের সাধ্য নাই, তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। তাঁহার কৃপাতেই ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়, ঈশ্বর লাভ হয়, মুক্তি হয়। সেই কৃপা স্রোত আসিবার পথ যেন আমরা বন্ধ না করি।

সংগ্রামে ধর্ম্ম-সাধন—ধর্ম্ম সাধন সকলের পক্ষে সমান আয়াসকর নহে। কোনও কোনও ব্যক্তি এরূপ প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যে, তাঁহারা স্বভাবতঃ সাধু, স্বভাবতঃ বিনয়ী, মিষ্টভাষী, ক্রোধহীন, পরোপকারী ও পবিত্রচেতা। এই সকল সৌভাগ্যবান পুরুষ ও রমণীর পক্ষে ধর্ম্মের আদেশের অনুগত হওয়া আয়াসসাধ্য নহে। তাঁহাদের প্রবৃত্তিকুল এমনি নিস্তেজ যে, তাহাদিগকে শৃঙ্খলিত করিতে বিশেষ ক্লেশ হয় না। কিন্তু সংসারে আর এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই, যাঁহারা বিভিন্ন প্রকার প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রবৃত্তিকুল সতেজ, রিপুকুল স্বভাবতঃ প্রবল। ইহাঁদের পক্ষে ধর্ম্মের আদেশের অনুগত হওয়া অতীব কষ্টসাধ্য। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, ইহাঁরা বহু বৎসরের তপস্যাতে যে উন্নতিলাভ করেন, তাহা হয় ত একদিনের দুর্ব্বলতা বশতঃ ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু তাহা বলিয়া এই দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ কি নিরাশ হইয়া ধর্ম্মসাধন পরিত্যাগ করিবেন, আপনাদের প্রকৃতিকে প্রতিকূল জানিয়া কি প্রবৃত্তি-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবেন? কখনই নহে; সকলকেই ধর্ম্মের আদে-

শের অনুগত হইতে হইবে। যাঁহাদের প্রকৃতি প্রতিকূল, তাঁহারা না হয় ঘোর সংগ্রামের মধ্যে বাস করিয়াই তাঁহার সেবা করিবেন। আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তার নিকটে আমাদের কোন্ দুর্ব্বলতা, কোন্ সংগ্রাম প্রচ্ছন্ন আছে? যাহারা ঘোর সংগ্রামের মধ্যে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার প্রয়াস পাইতেছে, তাহাদের সেই প্রেম কি তাঁহার নিকট মূল্যবান নহে? যে অশ্বদ্বয় লৌহনির্ম্মিত পথে ট্রামগাড়ি টানিতেছে, তাহাদের অপেক্ষা যে অশ্বদ্বয় বন্ধুর পথে গাড়ি টানিতেছে, তাহারা কি অধিক প্রশংসনীয় নহে? সেইরূপ হে বন্ধু! যদি তোমার ভাগ্যে ইষ্টকাকীর্ণ পথ দিয়া গাড়ি টানা পড়িয়া থাকে, তুমি ক্ষোভ করিও না, বা নিরাশ হইও না, যথাসাধ্য টানিয়া যাও যিনি আমাদের সকল দুর্ব্বলতা ও সকল দুঃখ জানেন তাঁহার চক্ষে তোমার তপস্যা বৃথা হইতেছে না। বরং এরূপ অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহারা সংগ্রামবিহীন নিরুপদ্রব শান্তিতে ধর্ম্মসাধন করিতেছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা শত দুর্ব্বলতার মধ্যে অনুতাপিত চিত্তে, ঘোর সংগ্রামের মধ্যে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারাই ঈশ্বরের বিশেষ করুণার নিদর্শন সকল প্রাপ্ত হন। মহাত্মা যাশুর উল্লিখিত "পতিত পুত্র" নামক উদাহরণে এই সত্যই প্রকাশ করা হইয়াছে। সে দৃষ্টান্তটী ব্রাহ্ম-পাঠকদিগের অনেকেই অবগত আছেন তথাপি আর একবার উল্লেখ করাতে হানি নাই, নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

পাপীর প্রত্যাবর্ত্তন—একজন ধনীর দুই পুত্র ছিল, এক পুত্র পিতার বাধ্য, অপর জন উচ্ছৃঙ্খল। উচ্ছৃঙ্খল পুত্র যৌবনের মদে ও কুসঙ্গিদিগের প্ররোচনায় অন্ধপ্রায় হইয়া স্বীয় পিতাকে বলিল—"আপনি আমাকে যাহা দিবার সংকল্প করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা এখনই দিন, আমি দেশান্তরে গিয়া সেই অর্থ বাণিজ্যে লাগাই, আমার আর গৃহে থাকিবার ইচ্ছা নাই।" সে পিতার প্রদত্ত ধন লইয়া বিদেশে গেল এবং নানা-প্রকার পাপাচরণে লিপ্ত হইল। মানুষ পাপের নেশায় মাতিলে কুবেরের ধনভাণ্ডারও শূন্য হইতে অধিক দিন লাগে না, সুতরাং ঐ যৌবন মদান্ধ-যুবক অল্পকাল মধ্যে যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইয়া দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হইল। দারিদ্র্যে শীর্ণ ও রোগে ভগ্ন হইয়া মনে করিল, "আবার একবার পিতার নিকটে যাই, তিনি ভিন্ন আমার সহায় আর কেহ নাই।" ইহা ভাবিয়া স্বীয় পিতার ভবনাভিমুখে চলিল। পিতা যখন দেখিলেন যে, তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল সন্তান দারিদ্র্যে ও রোগে ভগ্নপ্রায় হইয়া আবার তাঁহারই ভবনাভিমুখে আসিতেছে, তখন অগ্রসর হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন ও তাহার প্রত্যাগমনজনিত আনন্দ প্রকাশের জন্য গৃহে আনন্দোৎসবের আদেশ করিলেন। যখন আনন্দোৎসব চলিয়াছে, তখন যে পুত্রটী পিতার গৃহে বাধ্য ছিল, সে কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিল। দ্বারে আসিয়া গৃহে আনন্দোৎসব দেখিয়া ভৃত্যদিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ভৃত্যগণ বলিল,—"আপনার উচ্ছৃঙ্খল ভ্রাতা অনুতাপিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, সেইজন্য বড় খাসিটী মারা হইয়াছে ও আনন্দোৎসব চলিয়াছে। ইহা শুনিয়া সেই পুত্রটী ঈর্ষান্বিত হইয়া আর গৃহে প্রবেশ করিল না, দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল। পিতা এই সংবাদ পাইয়া দ্বারে আসিলেন ও তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করিয়া আনন্দোৎসবে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিলেন। সে বলিল,—"আপনার এই পুত্র আপনাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তথাপি ইহার আগমনে আপনি বড় খাসি মারিয়াছেন, আর আমি এতদিন আপনার গৃহে আপনার অনুগত রহিয়াছি, কিন্তু আমার বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া আমোদ করিবার জন্য কোন দিন একটা মেষশিশুও মারিতে হুকুম দেন নাই, এ কি প্রকার?" তখন পিতা সেই ঈর্ষান্বিত পুত্রকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "আমি ত তোমার প্রাপ্যধনে তোমাকে বঞ্চিত করি নাই, তুমি ঈর্ষান্বিত হও কেন?"

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণটীতে যীশুর মানব-হৃদয়াভিজ্ঞতাই প্রকাশ হইতেছে। পিতার গৃহস্থিত পুত্রটী যখন ঈর্ষান্বিত হইল, তখন বলিল—"আপনার এই পুত্র।" কিন্তু "এই আমার ভাই" এরূপ কথা বলিল না। ঈশ্বর যাহাদিগকে আদর করিয়া বরণ করেন, আমরা অনেক সময়ে তাহাদিগকে "ভাই" বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হই না। এইরূপে গৃহস্থের গৃহমধ্যে, ভাই-ভগিনীদিগের মধ্যে যখন বিবাদ ঘটে তখন বালক-বালিকারা অনেকসময় জননীকে ডাকিয়া বলে "দেখ মা, তোমার ছেলে আমাকে মারিল।" তখন আর দাদা কি দিদী কি ভাই কি বোন বলে না। আমাদের মন যখন বিদ্বেষ বা ক্রোধ দ্বারা উত্তেজিত হয়, তখন আমরা ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ ভুলিয়া যাই। দ্বিতীয়তঃ এরূপ ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটিতেছে যে, যাঁহারা অনেক দিন ঈশ্বরাশ্রিত হইয়া রহিয়াছেন, অনেক দিন ধর্ম্মসাধন করিতেছেন, ধর্ম্ম সমাজের মধ্যে মান্য গণ্য ব্যক্তি হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত ঈশ্বরের বিশেষ করুণার কোন নিদর্শন পাইতেছেন না, আর ওদিকে এক ব্যক্তি যে বহুদিন পাপের সেবা করিয়া ভগ্ন প্রায় হইয়াছে, এবং সম্প্রতি নবজীবন পাইয়াছে, সে হয় ত বিশেষ করুণার অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হইতেছে।

যখন এইরূপ কোনও নবাগত ব্যক্তি আমাদের চক্ষের উপর দিয়া অগ্রসর হইয়া যায়, তখন পুরাতন যাঁহারা আছেন তাঁহারা অনেক সময়ে ঈর্ষান্বিত হইয়া বাধা দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিধাতার নিকটে প্রেমেরই আদর, প্রেম-বিহীন নিয়ম পালনের আদর নাই।

জীবনবিহীন সাধন—ইউরোপের সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত স্পিনোজার বিষয়ে এইরূপ কথিত আছে যে, বাল্যকালে তাঁহার পিতা একবার তাঁহাকে কতকগুলি মুদ্রা আনিবার জন্য এক মহিলার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ধার্ম্মিকা বলিয়া ঐ মহিলার সুখ্যাতি ছিল। নিত্য উপাসনা, ভজনালয়ে গমন, ধর্ম্মার্থে দান প্রভৃতি ধর্ম্মের নিয়ম সকল তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিতেন। ধার্ম্মিকা বলিয়া সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। বালক স্পিনোজাও তাঁহাকে সম্ভ্রমের সহিত দেখিতেন। স্পিনোজা যখন স্বীয় পিতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই রমণীর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি সম্মুখস্থ টেব-

পেব উপরে মুদ্রাগুলি ঢালিয়া এক দুই করিয়া গণনা করিতে লাগিলেন। স্পিনোজা দেখিতে পাইলেন, ঐ রমণী মুদ্রাগুলি গণিতে গণিতে টেবলের তক্তাদ্বয়ের মধ্যস্থিত ফাঁক দিয়া একটী মুদ্রা নিম্নে ফেলিয়া দিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে স্পিনোজাকে মুদ্রাগুলি তুলিয়া লইতে আদেশ করিলেন। চতুর বালক আবার মুদ্রাগুলি গণিতে আরম্ভ করিল। গণিয়া দেখে যে, একটী মুদ্রা কম আছে। বালক একবার বৃদ্ধার মুখেরদিকে ও আর একবার টেবলের তলে চাহিবামাত্র বৃদ্ধা বলিলেন—"ও একটা মুদ্রা বুঝি পড়িয়া গিয়াছে," এই বলিয়া সেটী কুড়াইয়া দিলেন। এই প্রতারণাতে বালক স্পিনোজার মনে এমনি আঘাত লাগিল, যে তিনি জন্মের মত ধর্ম্মসাধনের প্রতি আস্থা-হীন হইয়া গেলেন। আর একজন মানুষের জীবনে এইরূপ একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় কোয়েকার সম্প্রদায়ের প্রতি-ষ্ঠাতা জর্জ্জ ফক্সের বিষয়ে এইরূপ কথিত আছে, যে তাঁহার ঊনবিংশ বৎসর বয়ক্রমের সময় একদিন তিনি স্বসম্পর্কীয় দুই জন যুবকের সহিত কোনও স্থানে গিয়াছিলেন। তাহাদের দুইজনকে তিনি ধর্ম্মানুরাগী ও নিষ্ঠাবান লোক বলিয়া জানি-তেন। তাহারা সর্ব্বদাই মুখে ধর্ম্মের কথা বলিত। কিন্তু ফক্স দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, যে তাহারা উভয়ে অপরাপর কুসঙ্গীদের সহিত মিলিয়া বাজি রাখিয়া সুরাপান করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে সরলমতি জর্জ্জের মনে এমনি আঘাত লাগিল যে, তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করি-লেন। কিন্তু মনের ক্লেশ এত অধিক হইল যে, আর গৃহে যাইতে পারিলেন না, সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া ও ঈশ্বরচরণে প্রার্থনা করিয়া পথে পথে ভ্রমণ করিলেন। অবশেষে যেন তিনি ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিলেন—"তুমি দেখিতেছ কি প্রকারে যুবাদিগের অধোগতি হয়, এবং বৃদ্ধেরাও বিনষ্ট হয়, অতএব যুবক ও বৃদ্ধ সকলকে পরিত্যাগ কর।" জর্জ্জ ফক্স বলিয়াছেন—"এই বাণী শুনিয়া ১৬৪৪ সালের জুলাই মাসের নবম দিবসে আমি আমার আত্মীয় স্বজন, যুবক বৃদ্ধ সকলকে পরিত্যাগ করিলাম।" যুবক বৃদ্ধ সকলকে বর্জ্জন করিয়া তিনি আশ্রয়হীন, গৃহহীন হইয়া দুইবৎসর কাল একাকী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহার নবধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করেন। সেই প্রচারে জীবন-বিহীন সাধনের প্রতি অতিশয় ঘৃণা প্রকাশ করিতেন।

বিশ্বাসী ও বিষয়ী—বিশ্বাসী নানক বলিতেছেন—"হে মন, তোমার আহার যখন হরি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, তখন চিত্ত মধ্যে চিন্তা কেন পোষণ করিতেছ? পর্ব্বত ও প্রস্তরের মধ্যে তিনি জন্তু সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের আহার সামগ্রী তাহাদিগের সম্মুখে দিতেছেন। যিনি জগতের পতি, তিনি যদি সঙ্গী হন, তবেই জীব নিস্তার পায়। পরমগুরুর প্রসাদে শুষ্ক কাষ্ঠও হরিদ্বর্ণ হইয়া যায়। পিতামাতা, বা পুত্র কন্যা শেষ দিনে কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারে না। প্রতি জনকে ঠাকুর আহার যোগাইতেছেন, তবে হে মন, কেন ভয় করিতেছ? স্মরণ কর, পক্ষীবিশেষ পশ্চাতে শাবক রাখিয়া শত ক্রোশ উঠিয়া আসিতেছে, কে তাহাদিগকে আহার করায়, কে চঞ্চু দ্বারা তাহাদিগকে আহার দেয়? সর্ব্ব প্রকারের নিধি, অষ্টাদশ সিদ্ধি, ঠাকুর নিজ করতলে ধারণ করেন। দাস নানক কহেন তাঁহাকে বলিহারি, তাঁহাকে বলিহারি, সদা বলিহারি যাই; প্রভো, তোমার অন্ত ও পারাপার পাওয়া যায় না।" চিরদিন পৃথিবীতে এই সংগ্রাম—বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে, সংসার ও ঈশ্বর নির্ভরের মধ্যে। ঈশ্বরকে মান, ঈশ্বরের পূজা—স্তব স্তুতি কর, ইহাতে পৃথিবীর লোক কখনও আপত্তি করিবে না। কিন্তু বিশ্বাসীরা যে শান্তিময় বিশ্বাসের নিরাপদ ভূমিতে বাস করেন, সংসার সেই ভূমিকে স্পর্শ করিতে চায় না। সাধু নানক যেমন অবিশ্বাসী পৃথিবীর দ্বারে সাক্ষ্য দিতেছেন—"হরি আমার আহার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন" সেইরূপ সকল সময়ে সকল বিশ্বাসী পৃথিবীর নিকট, ক্ষুদ্র সুখ-স্বার্থে অন্ধ-মানবদিগের নিকট এই বিশ্বাসের কথা বলিতেছেন। কিন্তু সংসার ইঁহাদের ভাষা বুঝিতেছে না। ইঁহারা বলেন, "ঈশ্বর সত্য, ইঁহার উপর নির্ভর কর—তাহা সত্য নির্ভর।" কিন্তু সংসার বলে, উপাসনালয়ে, গির্জ্জাতে, মসজিদে ঈশ্বরের নাম কর—যাহাতে নিজের সুখ সুবিধা হয় তাহা কর। সংসারের ধন মানের হানি করিয়া কিছু করিও না। একের দৃষ্টি স্থূল জগতে আবদ্ধ, অন্যের দৃষ্টি স্থূলের অতীত সত্য বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত। এক দল ধর্ম্মকে কল্পনার চক্ষে দেখে, অপর, বিশ্বাসীরা ধর্ম্মকে সত্য বস্তু বলিয়া ধরেন। যে ভূমিতে বিশ্বাসীরা দাঁড়াইয়া এই সকল উক্তি করিয়াছেন, সে স্থান সংসারের দৃষ্টির অতীত। নানক বলিতেছেন,—"আমার আহার হরি প্রস্তুত রাখিয়াছেন।" স্থূলদর্শী সংসারাসক্ত লোকেরা হরির হাত খুঁজিয়া পায় না, সে আপনার ক্ষুদ্র "আমিকে" সেখানে দেখিতেছে। যীশু বলিতেছেন, "কল্যকার জন্য ভাবিও না।" সংসার হাস্য করিয়া বলিতেছে, "ইহা বাতুলের কথা।" আবার বিশ্বাসীকে পার্থিব অভাবে পতিত দেখিয়া সংসার কেমন অট্টহাস্য করিতেছে? বিশ্বাসী দাউদ নরপতিকে বিপদগ্রস্ত দেখিয়া তাহার শত্রুগণ বলিতেছে, "তোমার ঈশ্বর কোথায়? তোমার ঈশ্বর কোথায়?" যীশু ক্রুশকাষ্ঠে হত হইতেছেন, আর অবিশ্বাসিগণ বলিতেছে, "যীশু অন্যকে ত্রাণ করিতে পারেন, নিজকে বাঁচাইতে পারেন না?" এই স্থূল জগতে কৃতকার্য্যতাকেই সংসারের লোক জয় বলিয়া গণনা করিয়া থাকে। কিন্তু বিশ্বাসীর জয় কি কেবল এই পৃথিবীতে? এই পৃথিবীর দেহ পৃথিবীতে পড়িয়া দুঃখ দারিদ্র্যে, উৎপীড়ন ও মৃত্যুতে নিঃশেষ হইতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসীর আত্মা, আপনাকে এমন স্থানে স্থাপন করিয়াছেন, এমন সুদৃঢ় অচল স্থানে তিনি দণ্ডায়মান, যে পৃথিবীর কোন শক্তি তাহাকে চঞ্চল করিতে পারে না। পৃথি-বীর ধর্ম্মের দাম কত? কত লোক ত মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম, ঈশ্বর ঈশ্বর বলে। এই সংসারের ধর্ম্ম ক্রয় করিয়া লইতে কত খরচ? আমাদের চক্ষের সম্মুখে কি শত শত লোক এক পয়সার জন্য—সামান্য স্বার্থ ও সুখের জন্য—ঈশ্বরকে, ধর্ম্মকে বিক্রয় করিতেছে না? সংসার, কোলাহল করিয়া ঈশ্বরের নাম করে, কত স্তুতি বন্দনা করে; কিন্তু সামান্য প্রতিবন্ধক আসুক, সামান্য পরীক্ষা আসুক—সব কোথায় চূর্ণ হইয়া যাইবে।

বিশ্বাসী জীবনের লক্ষণ কি? যীশু উত্তর করিতেছেন, Love, peace righteusness. ধর্ম্ম মানুষকে প্রেমিক করে, ধর্ম্ম মানুষকে শান্তি দেয়, ধর্ম্ম মানুষকে পাপ হইতে বাঁচায়। বিশ্বাস-বিহীন ধর্ম্ম-জীবনে প্রেমের কথা, শান্তির কথা, সাধুতার কথা ফাঁকা।

জুডাস সামান্য অর্থের জন্য যীশুকে শত্রুহস্তে অর্পণ করিয়াছিল, সেইজন্য জুডাসের নাম চির কলঙ্কিত। উমীচাঁদ সামান্য অর্থের জন্য স্বদেশের স্বাধীনতাকে বিক্রয় করিয়াছিল, সেই জন্য সে চির-নিন্দিত। কিন্তু পৃথিবীতে অনুসন্ধান করিলে কি দেখিতে পাই? সামান্য অর্থের জন্য, সামান্য স্বার্থের জন্য কত লোক ন্যায় ও সত্যকে, ঈশ্বর ও ধর্ম্মকে বিক্রয় করিতেছে। এইজন্যই বলিতেছিলাম বিশ্বাসীর ধর্ম্ম ও সংসারের ধর্ম্ম দুই ভিন্ন বস্তু। মৃতে ও জীবিতে যত পার্থক্য, এই সংসারের ধর্ম্মে ও বিশ্বাসীর ধর্ম্মেও তত দূরত্ব। বিশ্বাসীর ঈশ্বর জীবন্ত, কথা বলেন, বিপদে বন্ধু, পরকালে ত্রাণকর্ত্তা। আর সংসারীর ঈশ্বর মৃত শব—যাহা ইচ্ছা হয় কর, বাধা নাই। নব নব বিশ্বাসী ও ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের কার্য্য কি? তাঁহারা কি কতগুলি নূতন মত দিয়া জগতকে ভাসাইয়াছেন? তাঁহাদের সংগ্রাম সেদিকে তত নয়। কিন্তু তাঁহারা মানুষের নিকট এই সাক্ষ্য দিয়াছেন—"আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তিনি আমার ক্রন্দন শুনিয়াছেন।" "প্রভু আমার রক্ষক, আমার অভাব হইবে না।" সংসারের লোকের দুরবস্থা দেখিয়াই বোধ হয় মহম্মদ আপনার ধর্ম্মকে "ইসলামধর্ম্ম" আখ্যা দিয়াছিলেন। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী জীবনের পার্থক্য মহাত্মা মহম্মদের জীবনের একটী ঘটনা দ্বারা বড় সুন্দর বুঝিতে পারা যায়। এক দিন মহম্মদ নিদ্রিত আছেন। তাঁহার পরম শত্রু সেই নিদ্রিত অবস্থায় তরবারি হস্তে মহম্মদের বুকে চড়িয়া বলিল "মহম্মদ তোমায় এখন কে রক্ষা করে?" মহম্মদ হঠাৎ জাগ্রত হইয়াই মহা তেজের সহিত উত্তর করিলেন—"কেন ঈশ্বর রক্ষা করিবেন" মহম্মদ এত সাহস ও উৎসাহের সহিত এই বাক্য বলিয়াছিলেন যে শত্রু ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল ও তাহার হস্ত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল। মহম্মদ তখন তরবারি হাতে লইয়া শত্রুর বুকের উপর বসিয়া কহিলেন, "কাফের, তোমায় এখন কে রক্ষা করে।" উত্তর হইল—"প্রভো আপনি রক্ষা করুন।" মহম্মদ সেই কাপুরুষকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন —"মৃত্যু সময়েও ঈশ্বরকে দেখিলে না?" বিশ্বাসী, মানবশক্তির অতীত ব্রহ্ম-শক্তির উপর দণ্ডায়মান—আর সংসারের মানুষ কেবল জড়শক্তি দেখে। ঈশ্বর করুন, আমরা বিশ্বাসের ধর্ম্ম গ্রহণ করি—সংসারের ধর্ম্মে কি জীবন তৃপ্ত হয়?

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

"গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং।"

আমাদের প্রাচীন উপনিষদে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া যত কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান কথা এই, যে তিনি হৃদয়-বাসী। উপনিষদের সে বচনটী এই,—

"তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং।"
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবংমত্বা ধীরো হর্ষ শোকৌ জহাতি।"

অর্থ—যিনি দুর্দর্শ, যিনি গূঢ়রূপে তাবত পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি হৃদয়রূপ গুহাতে বাস করিতেছেন, ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা জানিয়া হর্ষ ও শোক উভয়কে অতিক্রম করেন।"

"ঈশ্বর অন্তরে"—এই মহা সত্যে উপনীত হইতে যে মানব জাতির কত দিন লাগিয়াছে, তাহা আমরা এক্ষণে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। বহু বহু শতাব্দীর ধর্ম্ম-চিন্তার পর মানুষ এই সত্য প্রতীতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। ঈশ্বরের ভাব সর্ব্বাগ্রে কি প্রকারে মানব-হৃদয়ে আসিল? পূজার ভাব কি রূপে প্রস্ফুটিত হইল? এই চিন্তাতে বর্ত্তমান সময়ের চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ বহুদিন নিযুক্ত রহিয়াছেন, এবং এই প্রশ্নের মীমাংসার নিমিত্ত প্রভূত গবেষণা চলিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, পিতৃলোক-পূজা (ancestor-worship) হইতে ঈশ্বরোপাসনার সৃষ্টি। জুলুদিগের মধ্যে ঈশ্বরের অনুরূপ শব্দ নাই, কিন্তু তাহারা এক আদি পিতৃপুরুষ কল্পনা করে, যাঁহাতে সমুদয় ঈশ্বরীয় গুণের আরোপ করিয়া থাকে। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে, ইহা হইতে পূজার সৃষ্টি। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ভয় হইতে ধর্ম্ম ভাবের জন্ম। আদিম মনুষ্য প্রকৃতির দুর্জ্জয়শক্তি দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া তাহাকে কোনও অলৌকিক ব্যক্তি জ্ঞানে প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্য পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা হইতে এখন পূজা, উপাসনা-পদ্ধতি প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ ইঁহারা বলিয়া থাকেন যে, এখনও অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে দুইটী ঈশ্বরে বিশ্বাস দেখা যায়। এক ভাল ঈশ্বর, এক দুষ্ট ঈশ্বর। দুষ্ট ঈশ্বরকেই ইহারা পূজা করিয়া থাকে, ভাল ঈশ্বরের পূজা করে না, কারণ তিনি অনিষ্টকারী নহেন! কেহ কেহ বলিয়াছেন, নিজের দুর্ব্বলতা জ্ঞান ও নির্ভরের ভাব হইতেই পূজার উৎপত্তি হইয়াছে, মানুষ দেখিয়াছে, নিজের বুদ্ধি, নিজের শক্তি ও নিজের ইচ্ছাতে আত্মরক্ষা হয় না, তাই শক্তি বিশেষের উপরে স্বতঃই নির্ভর করিয়াছে। এই নির্ভরের ভাব মানবের প্রকৃতি নিহিত ও ইহার উপরেই ধর্ম্মভাব প্রতিষ্ঠিত। মানব হৃদয়ের ধর্ম্মভাব ও ঈশ্বর জ্ঞানের উৎপত্তি যেরূপেই হউক না কেন "ঈশ্বর হৃদয়ে" এই মহাসত্য ধরিতে অনেক শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে। আদিতে অজ্ঞমানব প্রাকৃতিক পদার্থ সকলকে প্রভূত শক্তিশালী দেখিয়া তাহাদিগকে নির্ভরের স্থল বিবেচনা করিয়া অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাকে মানব জ্ঞানের বৈদিক কাল বলা যাইতে পারে। এই কালে মানব বলিয়াছে, "হে ইন্দ্র, হে ঊষা, হে অগ্নি, হে বায়ু, আমাকে রক্ষা কর।" এই বৈদিক উপাসনা যে কত শত বৎসর চলিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? তৎপরে পৌরাণিক কাল—যখন মানুষ বিশ্বাস করিল যে, মেঘ, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি পদার্থ সকল আরাধ্য ও নির্ভরের স্থল নহে, কিন্তু ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ আরাধ্য। এই সকল দেবতাগণ রূপ ও মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তের মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকেন। এই কালে কবির কল্পনা হইতে নানাপ্রকার রূপ ও মূর্ত্তি

প্রসূত হইতে লাগিল। এরূপ বিশ্বাসে আরও কত শত বৎসর অতীত হইয়া গেল। ক্রমে জগতের লোক বহু দেবতাতে বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া একত্বে উপনীত হইল। কিন্তু একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপিত হওয়ার পরেও বহুকাল হৃদয়বাসী ঈশ্বরের ভাব আসে নাই। প্রাচীন য়িহুদী জাতির ধর্ম্মবিশ্বাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদের আরাধ্য ঈশ্বর স্বর্গে বাস করিতেন এবং সেখান হইতে মানবের পুণ্যাপুণ্যের বিচার করিতেন। পার্থিব রাজা যেমন নিজ ভবনে অবস্থিতি করিয়াই সমুদায় রাজ্যের সংবাদ পাইয়া থাকেন, বিশ্বের রাজাও তেমনি স্থান বিশেষে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিশ্ব-কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। ইসলাম ধর্ম্ম, য়িহুদী ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত, সুতরাং ইসলাম ধর্ম্মেও ঈশ্বরকে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। ঈশ্বর স্বর্গে থাকেন, এমন কি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মহম্মদকে একদিন স্বর্গে যাইতে হইয়াছিল। অতএব একেশ্বরবাদিদিগের মধ্যেও বহুকাল বহিঃস্থ ও দূরস্থিত ঈশ্বরের ভাব বিদ্যমান ছিল। "ঈশ্বর অন্তরে" এই ভাব গ্রহণ করিতে অনেক দিন লাগিয়াছে। ইহা উপনিষদকার ঋষিদিগের বিশেষ ভাব। তাঁহারা বলিয়াছেন, "আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন কর।"

যতক্ষণ উপাস্য দেবতা বাহিরে, ততক্ষণ সাধনের আয়োজন যাহা কিছু সকলই বাহিরে। যিনি বাহিরে থাকিয়া আমার কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, তাঁহার সন্তোষ সাধনের জন্য আমাকে বাহিরের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। ধূপ চাই, দীপ চাই, বলি চাই, নৈবেদ্য চাই। এই বাহ্যপূজার ভাব একবার প্রবল হইলে, উপাসকের হৃদয়ের সহিত আর কোনও সম্বন্ধ থাকে না। তোমার হৃদয়ের অবস্থা যে প্রকার হউক না কেন যতক্ষণ তুমি বাহিরের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছ, ততক্ষণ দেবতা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। এই বাহ্যপূজার ভাব এতদূর যাইতে পারে যে, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রথার ন্যায় কলে নাম জপ হইতে পারে। বৌদ্ধেরা নাম জপের একপ্রকার কল নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাতে নাম জপ হয়, অথচ সে নাম জপে যাহার পুণ্য হইবে, সে ব্যক্তি হয় ত সে সময়ে আহার বিহার করিয়া বেড়াইতেছে।

আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শনই বাহ্যপূজা হইতে চিত্তকে উদ্ধার করিবার সর্ব্বপ্রথম উপায়। ঈশ্বর অন্তরে সুতরাং মানবের ধর্ম্মজীবনের সংগ্রামক্ষেত্রও অন্তরে। সাধন ভজন সমুদায়ই আধ্যাত্মিক ব্যাপার। এইজন্যই উপনিষদ বলিয়াছেন, "অধ্যাত্ম যোগাধিগমেন" অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের, প্রেমের সহিত প্রেমের এবং ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার যে যোগ তাহাই "অধ্যাত্ম যোগ"। যখন এই প্রকার যোগে আমরা ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হই, তখনই তাঁহার প্রকৃত অর্চ্চনা হয়। কিন্তু ঈশ্বরকে হৃদয়বাসী না জানিলে এই যোগের ভাব অন্তরে আসে না।

ধর্ম্মজীবন।

আমাদের ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে বৃক্ষের সুন্দর তুলনা হয়। কোনও বৃক্ষ উৎপন্ন করিতে হইলে দুইটী উপকরণ চাই—ভূমি ও বীজ। এই দুই উপকরণ সম্বন্ধে মানবের কোনও হাত নাই। ভূমি ও বীজ ব্যতীত কে বৃক্ষ উৎপন্ন করিতে পারে? এই দুইটী ঈশ্বর দিয়াছেন। মানুষ শত চেষ্টা করিয়াও ভূমি ও বীজের সৃষ্টি করিতে পারে না। এই দুই বস্তুর উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা বৃক্ষপূর্ণ সুন্দরউদ্যান প্রস্তুত করিতে পারা যায়। মানুষের প্রথম কর্ত্তব্য, যে ভূমি টুকু আছে তাহাকে উর্ব্বরা করা। সকল ভূমি সমান থাকে না। নানা কারণে ভূমির উর্ব্বরতা কখনও কখনও হ্রাস হয়। তখন ভূমিতে সার দিয়া উর্ব্বরতা বর্দ্ধিত করিতে হয়। সার দ্বারা অনুর্ব্বরা-ক্ষেত্রেও সতেজ বৃক্ষ জন্মাইতে পারা যায়। বীজ হইতে যেই পত্র বহির্গত হইল, মানুষের তখন কর্ত্তব্য বেড়া দিয়া ইতর জন্তুর গ্রাস হইতে চারা বৃক্ষকে রক্ষা করা। যখন চারা বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইয়া পত্র ও শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে, তখন মানুষ কত যত্নে বেড়াদিয়া গো, ছাগ প্রভৃতির উপদ্রব হইতে ইহাকে রক্ষা করে। নতুবা বহুদিনের যত্নবর্দ্ধিত বৃক্ষ এক দিনে ছাগাদির গ্রাসে বিনাশ পাইতে পারে, সকল শ্রম ও চেষ্টা নিষ্ফল হইতে পারে।

ইহার সঙ্গে জল সিঞ্চনও প্রয়োজনীয় কার্য্য। স্থানভেদে এই জলসিঞ্চন ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। স্বাভাবিক উর্ব্বর ভূমিতে অল্প জল দিলেও ফল হয়, কিন্তু যে ভূমি স্বভাবতঃ শুষ্ক, যে দেশে জলের অল্পতা, সেস্থানে গভীর কূপ হইতে জল উত্তোলন করিয়া বৃক্ষকে সজীব রাখিতে হয়। জল দ্বারা ভূমিকে সিক্ত না করিলে বৃক্ষ সর্ব্বাঙ্গ হয় না; সময়ে ফল ফুলও প্রদান করে না, অকালে পক্ক দশা প্রাপ্ত হয়। উল্লিখিত উপায়ে বীজ হইতে সুন্দর বৃক্ষ উৎপন্ন করা যায়, যাহা হইতে ফল ফুল পাইয়া এবং যাহার ছায়ায় উপবেশন করিয়া পৃথিবীর লোক কত আনন্দ লাভ করে।

মানবের ধর্ম্মজীবনও এই প্রকার। ঈশ্বর স্বয়ং নিজ হস্তে মানবাত্মারূপ ভূমিতে ধর্ম্মের বীজ, বিশ্বাসের বীজ রাখিয়াছেন। এই মানবাত্মা ও বিশ্বাস-বীজ ঈশ্বর-হস্ত-প্রসূত। নানা কারণে যেমন ভূমি অনুর্ব্বরা হয়, তেমনি আত্মাও অনুর্ব্বর হয়। তখন বিশ্বাসী আত্মার সংস্পর্শে আনিয়া আত্মাকে উর্ব্বরা করিতে হয়। তখন সেই বিশ্বাসের বীজ হইতে ধর্ম্মজীবনের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। বিশ্বাসী-আত্মার সংস্পর্শে যখন ধর্ম্মজীবনের সূচনা হয়, তখন মানুষের গুরুতর সংগ্রাম। সংযমের বেড়া দিয়া তখন এই জীবনকে রক্ষা করিতে হয়। ধর্ম্মজীবন গঠন সম্বন্ধে মানবের হাত যদি কোথাও থাকে, তাহা এই স্থানে। ধর্ম্মজীবনের আরম্ভে যদি মানুষ সংযম অবলম্বন না করে, তাহা হইলে সেই জীবনতরু অকালে বিনষ্ট হইয়া যায়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত রিপু গুলি মানুষকে বিনাশের পথে লইয়া যাইতে চায়। এখানেই

মানবের গুরুতর সংগ্রাম। নূতন-পত্র-পুষ্প-শোভিত চারা গাছ দেখিলেই যেমন গো, ছাগ প্রভৃতি রসনা বিস্তার করিয়া ভোজন করিতে চায়, সেইরূপ ধর্ম্মজীবনের সূচনাকালে পাপপ্রবৃত্তিগুলি ধর্ম্মজীবনকে উৎসন্ন করিয়া স্বেচ্ছাচারিতার রাজত্ব বিস্তার করিতে চায়। বিশ্বাসের বাণী বলে, "ঈশ্বরকে ভয় কর, স্বেচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ করিয়া সত্যের অধীন হও" কুপ্রবৃত্তিগুলি আপনাদের কার্য্যের ব্যাঘাত উৎপন্ন হয় দেখিয়া, সেই বীজকে উৎপাটন করিতে চায়। শত উর্ব্বরা ভূমি হউক, বিশ্বাসীর সংস্পর্শে এই বীজকে সতেজ রাখা হউক, কিন্তু প্রারম্ভে বেড়া না দিলে এই বীজকে বর্দ্ধিত করা কখনই সম্ভব নহে। ধর্ম্মজীবনের অঙ্কুর দেখা দিলেই ইহার উপর সর্ব্বদা জল সিঞ্চন করিতে হইবে। এখানেও ভয় ও প্রলোভন আছে। ভক্তি ও প্রেমে জীবন সতেজ না হইলে ফল জন্মে না। কিন্তু মানুষ এই চারা বৃক্ষ হইতে ফলের প্রত্যাশা করিয়া স্বজীবনকে পাতলা ও নিস্তেজ করিয়া ফেলে। ভক্তি ও প্রেমে অভিষিক্ত না হইলে কখনও ধর্ম্মজীবন দৃঢ় হয় না, ফলও প্রদান করে না। বৃক্ষের ন্যায় ধর্ম্মজীবনকে ভক্তিজলে বর্দ্ধিত করিতে হয়। ঈশ্বর-প্রীতি সাধন না হইলে প্রিয়-কার্য্য সাধন, মানব-সেবা হয় না। সংসার, প্রশ্ন করে—"কত কাজ করিয়াছ," কিন্তু ধর্ম্ম, জিজ্ঞাসা করেন "কিভাবে করিয়াছ?"—অতি দীনভাবে ভক্ত ও সাধু-সঙ্গে বাস করিয়া এই ঈশ্বর-প্রেম ঈশ্বর-ভক্তি জীবনে লাভ করা আবশ্যক। কার্য্যক্ষেত্রে আনুগত্য, অধীনতা এই ভক্তি হইতেই হয়। যাঁহার প্রতি প্রেম নাই তাঁহার আনুগত্য কি কখনও হয়? শুষ্ক ভূমির বৃক্ষাদি কি কখনও ফল প্রসব করে? পৃথিবীর বাদানুবাদ, নিন্দা চর্চ্চা, প্রভৃতি রাজসিক ভাবের মধ্যে বাস করিলে এই ভক্তি জীবনে আসে না। সুতরাং আনুগত্য কোথায়? প্রেম না হইলে আনুগত্য হয় না। বিশ্বাসে যেমন তাঁহার প্রকাশ দেখি, ভক্তিতে সেইরূপ তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া গ্রহণ করি। ধর্ম্মজীবনের সৌন্দর্য্য ও মধুরতা এই প্রেমে। বিশ্বাসী ও কর্ম্মী জীবনে মানুষকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতে পারে, কিন্তু ভক্ত-জীবন মানুষকে একেবারে ডুবাইয়া ফেলে। ঈশ্বর-প্রেমের ন্যায় সুমিষ্ট বস্তু আর কি আছে? ইহা হইতেই নব-প্রীতির সৃষ্টি। প্রকৃত আনুগত্য ইহা হইতেই উৎপন্ন। সাধুদিগের জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহাদিগের জীবনের সৌন্দর্য্য জগৎমুগ্ধকারী ভাব এই প্রেম হইতেই উৎপন্ন। ভক্তজন সত্য সত্যই অনুভব করিয়াছেন "তুমি আমার স্ত্রী পুত্র ধন জন হইতে প্রিয়।" নতুবা তাঁহারা জীবনকে কোন্ প্রেমের জন্য বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন?—এই ঈশ্বর-প্রেমের জন্যই তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হইতে পারিয়াছিলেন।

জীবনকে সর্ব্বদা ভক্তিরসে জীবিত রাখিবার জন্য প্রথমে দীনতা চাই—পরচর্চ্চা পরনিন্দা হইতে দূরে থাকিতে হইবে। আমরা বিশ্বাসী, ভক্ত ও আনুগত্যের জীবন অনুসরণ করিব। ধর্ম্মজীবনের যদি একটু অঙ্কুর জন্মিয়া থাকে, তাহাকে সংযমের বেড়া দিয়া রক্ষা করিব ও ঈশ্বরপ্রীতির রস দ্বারা সঞ্জীবিত করিব। ঈশ্বরভক্তি তাঁহারই করুণাতে জীবনে আসে ইহা সত্য, কিন্তু আমাদিগকে আবর্জ্জনা তাড়াইয়া দিয়া দীন ভাবে প্রতীক্ষা করিতে হইবে। পর-দৃষ্টি অপেক্ষা আত্ম-দৃষ্টি ও আত্মপরীক্ষা প্রবল করিতে হইবে। শয়নে স্বপনে সর্ব্বদা তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করা, তাঁহাকে স্মরণ রাখা আমাদের সাধন। ঈশ্বর-ভক্তি মানব জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ। সমস্ত জীবন দিয়া যদি তাঁহার প্রতি ভক্তিলাভ করিতে পারি, তবে কি না লাভ হইল? পরমেশ্বর কৃপা করুন তাঁহার চরণে একবিন্দু ভক্তিলাভ করিয়া কৃতার্থ হই।

পরিমিতের পূজা।

পরিমিতের পূজা দুই প্রকার; পরিমিতকে পরিমিত জ্ঞানে পূজা ও পরিমিতকে অনন্তজ্ঞানে পূজা।

পরিমিতকে পরিমিত জ্ঞানে পূজা করা সম্ভব, এবং আমরা সর্ব্বদাই তাহা করিয়া থাকি। ভক্তসন্তান যখন তাঁহার প্রতি মাতার অলোকসামান্যপ্রেম অনুভব করিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া বলেন,—

"যা ভূতলে ব্রহ্মকৃপৈব মূর্ত্তা
বাল্যে সদা পালয়তি প্রসন্না।
স্নেহাহ্বয়ৈকপয়োনিধিং তাং
নমামি দেবীং জননীসমাখ্যাম্॥"

অর্থ—যিনি ভূতলে মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মকৃপাস্বরূপিনী; অসহায় বাল্যকালে যিনি প্রসন্ন হইয়া পালন করিয়াছেন; যিনি স্নেহরত্নের একমাত্র পয়োনিধি; জননী আখ্যাধারিণী সেই দেবীকে প্রণাম করি।"

তখন তাঁহার ভাব ও বাক্য উভয়ই বুঝিতে পারি। তিনি যে জননীকে জননীই মনে করিয়া কৃতজ্ঞতাভরে প্রণত হইয়া তাঁহাকে ভক্তিউপহার প্রদান করিলেন, ইহাতে তাঁহার পূজা করাই হইল। পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা উপদেষ্টা সকলেরই সম্বন্ধে ইহা সত্য। পরিমিতকে পরিমিত বলিয়া জানা এবং পরিমিত জ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা করা সম্ভব।

কিন্তু পরিমিতকে অনন্ত জ্ঞানে পূজা করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব, কারণ পরিমিতকে অনন্ত বলিয়া জানা জ্ঞানের মূলসূত্রের বিরোধী। যে বস্তু যাহা নহে, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া ভাবা, কি ঈশ্বর কি মানব সকলেরই পক্ষে অসম্ভব। পরিমিতের উপাসক হয়ত এই আপত্তি করিবেন, তবে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা কোথায় রহিল? এই আপত্তির মূলে বিষম ভ্রান্তি রহিয়াছে।

আমার পক্ষে যদি এরূপ চিন্তা করা সম্ভব হইত যে, আমি নাই, তাহাহইলে বাস্তবিকই আমি থাকিতাম না, কারণ চিন্তাতে যাহা সত্য, বাস্তবিকও তাহাই সত্য। সুতরাং ঈশ্বর স্বরূপতঃ অনন্ত হইয়াও যদি তিনি ভাবিতে পারেন যে তিনি স্বয়ং পরিমিত, তাহা হইলে তিনি আর অনন্ত রহিলেন না, অর্থাৎ তাঁহার আর ঈশ্বরত্ব রহিল না। এতটুকু তলাইয়া দেখিলে আর বলা সম্ভব হয় না, যে ঈশ্বর অনন্ত হইয়াও আপনাকে পরিমিত বলিয়া ভাবিতে পারেন অথবা পরিমিত আকার ধারণ করিতে পারেন। ঈশ্বর

আপনাকে কখনও পরিমিত বলিয়া ভাবিতে পারেন না, ইহাতে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার অভাব প্রমাণ হয় না, বরং যদি তিনি পারিতেন, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর থাকিতেন না, জগৎ থাকিত না, ধর্ম্মও থাকিত না। পরিমিত ও অনন্ত সম্বন্ধবাচক শব্দ; পরিমিতকে না ভাবিয়া অনন্তকে ভাবা যায় না, উভয়কে এক সঙ্গেই ভাবিতে হয়। কিন্তু পরিমিতকে অনন্ত বলিয়া ভাবা সম্ভব নহে। পুত্রকে যেমন পিতা বলিয়া ভাবা যায় না, অথচ উভয়কেই একত্র ভাবিতে হয়, ভাইকে যেমন ভগ্নী বলিয়া ভাবা যায় না, অথচ উভকেই একত্রই ভাবিতে হয় স্ত্রীকে যেমন স্বামী বলিয়া ভাবা যায় না, অথচ উভয়কে একত্রই ভাবিতে হয়, তদ্রূপ পরিমিতকে অনন্ত বলিয়া ভাবা যায় না, অথচ উভয়কে একত্রই ভাবিতে হয়।

সুতরাং দেখা গেল যে, পরিমিতকে অনন্ত বলিয়া ভাবিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। ইহা দ্বারা কোন ধারণাই সম্ভব নহে, কোন জ্ঞানই হইতে পারে না। যখন কোন জ্ঞানই হইবে না, ধারণাই যখন সম্ভব নহে, তখন পূজা হইবে কিসের? শূন্যের না হাওয়ার?

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, রাখিয়া দাও তোমাদের তর্ক যুক্তি; আমরা কার্য্যে দেখিতে পাইতেছি, যে পরিমিত দেবতার উপাসকও তাঁহার দেবতাতে অনন্তের গুণ আরোপ করিতেছেন; যিনি দুর্গার উপাসক তিনি এক দিকে যেমন "অতসী পুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং" বলিয়া স্বীয় ইষ্টদেবতার ধ্যান করিতেছেন, অপরদিকে তেমনই সেই দেবীর সম্বন্ধেই বলিতেছেন;—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

সুতরাং পরিমিতকে অনন্ত বলিয়া ভাবা অসম্ভব হইল কিরূপে? কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, "অনন্ত অনন্ত" বলিলেই অনন্ত বুঝা হইল না। অনন্তকে বুঝিলে আর পরিমিতকে অনন্ত বলা সম্ভব হয় না, কেন হয় না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে যিনি পরিমিতে অনন্তের গুণ আরোপ করেন, অথবা অনন্তের পক্ষে পরিমিত হওয়া সম্ভব মনে করেন, তিনি অনন্তও বুঝেন না, পরিমিতও বুঝেন না, সুতরাং যাহা মনে আইসে তাহাই বলেন।

আজ কাল এক শ্রেণীর নূতন তার্কিক দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ বিশেষ মানবের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিতে অতিশয় ব্যগ্র। কয়েকমাস পূর্ব্বে এই শ্রেণীর কোন এক তার্কিকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি পরলোকগত মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য। তিনি বলিয়াছিলেন "আত্মা যখন এক অখণ্ড অনন্ত বস্তু, এবং রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে যখন আত্মা ছিল, তখন তিনি অনন্ত অর্থাৎ ঈশ্বরই ছিলেন।" ইহাঁর যুক্তিতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে, যে তোমার আমার এবং তাঁহার নিজেরও আত্মা নাই, কেবল রামকৃষ্ণেরই আত্মা ছিল, এবং যদিও তাঁহার নিজের মধ্যে আত্মা নাই বটে, তথাপি তিনি পরমহংস মহাশয়ের অন্তরস্থ আত্মাকে চিনিতে পারিয়াছেন! কিন্তু আমরা অনুভব করি যে, আমাদের আত্মা আছে; সুতরাং তাঁহার যুক্তিতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তুমি আমি প্রত্যেকেই অনন্ত এবং এই ক্ষুদ্র জগতে বহু অনন্তের মিলন হইয়াছে। কি অদ্ভুত যুক্তি! অনন্ত যে আবার বহু হইতে পারে, তাহা আমরা এই প্রথম শুনিলাম। যাহা হউক প্রশ্ন এই যে, পূর্ণব্রহ্ম কি কোন মানুষে পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন না? এবং যদি পারেন, তাহা হইলে ঈদৃশ ব্যক্তিকে পূজা করিলে কি অনন্তের পূজা হয় না? আমরা বলি—না; কারণ যিনি কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে জগতে আসিলেন, তিনি সেই শৃঙ্খলের মধ্যে একটী অংশ মাত্র, এবং যিনি এই কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের আধার অর্থাৎ যাঁহার জ্ঞানে এই কার্য্যকারণশৃঙ্খল সম্ভব হইতেছে, তিনি অবশ্যই শৃঙ্খলের অন্তর্বর্ত্তী প্রত্যেক অংশ হইতে ভিন্ন। অর্থাৎ এই অংশ কখনও অনন্ত নহে; সুতরাং পরিমিত মানব কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না, এবং কোন ব্যক্তি যতই উন্নত হউন না কেন, তাঁহার পূজা করিলে কখনই অনন্ত ঈশ্বরের পূজা হয় না।

অতএব অনন্তের পূজা পুতুলেও হয় না মানবেও হয় না।

এক্ষণে দেখা যাউক অনন্তের পূজা ও পরিমিতের পূজা একই পদার্থ কি না। অনন্তের পূজা কি? আত্মজ্ঞানে নিজকে ও অনন্তকে নিত্যযুক্ত বলিয়া জানিলে, ও তাঁহাকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দং এবং নিজকে তাঁহার চির আশ্রিত বলিয়া যে অহেতুকী ভক্তির উদয় হয়, তাহারই নাম অনন্তের পূজা। যাঁহার কিঞ্চিৎ মাত্রও আত্মদৃষ্টি জন্মিয়াছে, এবং যাঁহার জ্ঞান জড়ভাব হইতে কিয়ৎ পরিমাণেও মুক্ত হইয়াছে, তিনিই সর্ব্বান্তঃকরণে এই সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। ইহাই পরমাত্মার সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ, এবং জ্ঞানে ও প্রেমে এই সম্বন্ধের বিকাশই ধর্ম্ম। অনন্তের পূজায় অনন্তই উপাস্য, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, সত্যনিষ্ঠা সৎকর্ম্মশীলতা প্রভৃতি জ্ঞানোদ্দীপক ও প্রেমোদ্দীপক ক্রিয়া ইহার সাধন, এবং অনন্তকে দিন দিন অধিকতররূপে আত্মস্থ করিয়া হৃদয়ের স্বাভাবিক ভক্তি ও নিঃস্বার্থ প্রেম তাঁহাকে উপহার দেওয়াই ইহার লক্ষ্য।

কিন্তু পরিমিতের পূজা কি? আমরা প্রচলিত দুর্গা পূজার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখাইব যে পরিমিতের পূজা কি? এস্থলে উপাস্য দেবতা কিরূপ এবং উপাসক অন্তরে কি ধ্যান করিতেছেন তাহা শ্রবণ করুন:—

"ওঁ জটাজুটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং॥
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং॥
সুচারুদশনাং দেবীং পীনোন্নতপয়োধরাং।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীং।
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

উপরোক্ত রূপধারিণী যে দেবী তিনিই উপাস্য দেবতা। সাধন কি? প্রতিমাগঠন, নৈবেদ্যাদির আয়োজন, ও ছাগ

মহিষাদি ক্রয়। পূজা কি? নৈবেদ্যাদি উৎসর্গীকরণ ছাগমহিষাদি বধ। লক্ষ্য কি?

"রূপন্দেহি জয়ন্দেহি যশোদেহি দ্বিষোজহি।
ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি সর্ব্বাং কামাংশ্চ দেহি মে॥"

"রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, এবং শত্রুদিগকে বিনাশ কর; মনোরমা ভার্য্যা দাও,এবং সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তু দান কর।"

এখন জিজ্ঞাসা করি, এই দুই কি এক? যাঁহারা এক ভাবিতে পারেন, তাঁহাদের চিন্তা ও উদারতা অতি আশ্চর্য্য বটে!

কোন বাহ্য বস্তুতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করিলেই সে বস্তু ব্যক্তি হইল না, এবং সে ব্যক্তিও প্রকৃত ব্যক্তি হইল না। অতএব পরিমিতের উপাসক যখন কোন বস্তুতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া তাহার পূজা করেন, তখন তিনি অন্য কোন ব্যক্তির পূজা করেন না, কিন্তু নিজেরই গুণসমূহকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করিয়া সেই কল্পিত ব্যক্তিরই পূজা, করিতেছেন, অর্থাৎ তিনি নিজেরই পূজা করিতেছেন। আত্ম-পূজা আর অনন্তের পূজা কি এক? যে ভক্তি অনন্তের স্বরূপ জানিয়া স্বভাবতঃ অনন্তের দিকে ধাবিত হইতেছে না, সে ভক্তি কখনও ভগবদ্ভক্তি নহে।

অপাত্রে স্থাপিত ভক্তিকে ভগবদ্ভক্তি বলাতে যে কি কুফল ফলে, আমাদের দেশের প্রচলিত বৈষ্ণবধর্ম্ম তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। রাধাকৃষ্ণের ভক্তির কথা শুনিয়া শুনিয়া কাণ ঝালাপালা হইয়া গেল। কোন কোন বন্ধুর নাকি রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-সূচক সঙ্গীত না শুনিলে ভক্তির উদয় হয় না। যে ভক্তি কোন ব্যক্তি বা বস্তু সাপেক্ষ সে ভক্তি কখনও ভগবদ্ভক্তি,নহে। কারণ চিন্ময় পরমেশ্বরের সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ জ্ঞান হইলে যে ভক্তি হয়, তাহা অহেতুকী ও সর্ব্ব প্রকার পার্থিব সম্বন্ধ বিবর্জ্জিত, ও নিরপেক্ষ। তিনি যদিও সর্ব্ব প্রকার পার্থিব সম্বন্ধের মূলে, তথাপি তাঁহার সহিত মানবাত্মার যে সম্বন্ধ তাহা কোন পার্থিব সম্বন্ধেরই অনুরূপ নহে; কারণ তিনি পার্থিব অর্থে পিতাও নহেন, মাতাও নহেন, ভ্রাতাও নহেন, সখাও নহেন, যদিও তাঁহারই প্রেম হৃদয়ে হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সম্বন্ধকে মধুময় করিয়াছে। যিনি পার্থিব অর্থে তাঁহাকে স্বামী মনে করিয়া রাধাকৃষ্ণের দাম্পত্যবিলাসে তাহার দৃষ্টান্ত দর্শন করিতে চাহেন, তাঁহার হৃদয় কখনও নির্ম্মল ও শুদ্ধ হইতে পারে না, এবং মুখে যাহাই বলুন না কেন, তিনি ও তাঁহার ভাব দূষিত। সংসারের দিক হইতে ঈশ্বরকে দেখিলে, ঈশ্বরও সংসারী হইয়া পড়েন; ঈশ্বরের দিক হইতে সংসারকে দেখিলে সংসার ব্রহ্মময় হইয়া যায়। অনেকে বলিয়া থাকেন, রাধা কৃষ্ণের মধ্যে যে প্রেম ছিল তাহা পার্থিব দাম্পত্য প্রেম নহে, কিন্তু অপার্থিব ভগবদ্ভক্তি। কথাটা নিতান্তই অসঙ্গত; কারণ দেহধারী কোন ব্যক্তির প্রতি চিন্ময় অনন্ত পরমেশ্বরের প্রতি যে ভাব তাহা উদয় হইতে পারে না; যেহেতু এই দুই এক নহে, এবং পদার্থের বিভিন্নতা নিবন্ধন ভাবের বিভিন্নতা হইবেই হইবে।

শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য।

(প্রাপ্ত)

বিশ্বস্রষ্টার অসীম প্রকৃতিতে কি এক মহাশৃঙ্খলা এবং মহান্ সৌন্দর্য্য বিদ্যমান! সেই অসীমপ্রকৃতি সৃষ্টিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর সর্ব্বত্র কেমন এক অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা! কেমন এক অনুপম সৌন্দর্য্য! আমরা যখন নিবিষ্টচিত্তে এই সৃষ্টি এবং সৃষ্টি রক্ষার বিষয় চিন্তা করি, তখন তাহার মূলেও নিরীক্ষণ করি—একমাত্র শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্য্য।

ব্রহ্মের প্রকৃতি যাহা, এবং সৃষ্টি রক্ষার মূলে যাহা, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলেও এই শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্য্য। আমাদের মনে হয়, যে ব্রাহ্ম, জীবনে যতটা এই শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্য্যে রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই ততটা ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন। আর যিনি যতটা উচ্ছৃঙ্খল ও অশোভন হইয়া পড়েন, তিনিই ততটা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যান। আমার বিশ্বাস, বর্ত্তমান সময়ে উচ্ছৃঙ্খল ও অশোভনভাব ব্রাহ্মসমাজে একটু বেশি পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে, তাই আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ লক্ষ্য হইতে ক্রমশঃ যেন নিম্নে নামিয়া যাইতেছি।

প্রথমতঃ দেখুন, ব্রাহ্মসমাজের মতের ভিতর আজকাল কেমন এক উচ্ছৃঙ্খল ও অশোভন ভাব প্রবেশ করিয়াছে। অনেক ব্রাহ্ম বলেন, মতটা নাকি খাঁটি জিনিষ নয়—একটা খোসা মাত্র! একথাকি সত্য? মত কি আমাদের অনন্ত গন্তব্যপথে একটি দিগ্‌দর্শন যন্ত্র নয়? নাবিকের যেরূপ অর্ণবপোত লইয়া সীমাহীন সমুদ্রে প্রবেশ করিতে হইলে, দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের দিকে স্থির লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন,—নহিলে দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া বিষম বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা, সেইরূপ ব্রাহ্ম যে তাঁহার জীবনতরণী লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অকুল পাথারে অনন্ত উন্নতিউদ্দেশে যাত্রা করিবেন, বিজ্ঞান-দর্শনসম্মত সুসংস্কৃত মতের দিগ্‌দর্শনযন্ত্রের উপর স্থির লক্ষ্য না রাখিলে চলিবে কেন? ব্রাহ্মকে যে তাহা হইলে জীবনের লক্ষ্য হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতে হইবে। কিন্তু হায়! আজ কাল কুসংস্কার এবং উচ্ছৃঙ্খল ভাবগুলি এমনই এক উৎকট উদারতার ছদ্ম-বেশে আমাদের ভিতর প্রবেশ করিতেছে, যেন আমরা মতের দিক্‌নির্ণায়ক যন্ত্রের উপর আর স্থির লক্ষ্য রাখিতে পারিতেছি না! আমরা মনে করিতেছি—সত্যও ভাল, মিথ্যাও ভাল। আলোও যাহা, অন্ধকারও তাহা। নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা এবং জাতিভেদ বর্জ্জন পূর্ব্বক স্বজাতি সমন্বয়, সেও ভাল, ও পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ (যাহাতে ভারতের সর্ব্ব প্রকার অপ্রেম এবং অমঙ্গল সংঘটন হইয়াছে এবং হইতেছে) তাহাও ভাল! কিন্তু মানুষের মনের ধারণা এরূপ অস্বাভাবিক হইলেও স্বভাবতঃ আর অন্যভাব হইতে পারে না; যে "হাঁ" কি "না" এই দুইটীর একটিকে গ্রহণ করে ত অন্যটিকে নিশ্চয়ই বর্জ্জন করিবে। ফলে কিন্তু তাহাই হইতেছে! পূর্ব্বে যাহারা অসত্যকে তুচ্ছ করিয়া সত্যকে আদর করিতেন, এখন তাহারা

সত্যাসত্য এ দুই এক মনে করাতে, তাঁহাদের অসত্যের অবহেলা আসিয়া সত্যের উপর পড়িতেছে! সত্যের আদর অসত্যের উপর বাইতেছে। দিন দিনই তাঁহারা সত্যধর্ম্ম হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন!

মত ছাড়িয়া যদি আমরা আমাদের কার্য্যের উপর দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলেও এই উচ্ছৃঙ্খল এবং অশোভনভাবই যেন অনেকটা দেখিতে পাই। প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে, আমাদের সাধারণতন্ত্রপ্রণালীর উপর। এই শাস্ত্র এবং গুরু পুরোহিত প্রপীড়িত দেশে, ছোট বড় সকলে মিলিয়া মিশিয়া সকলের শক্তি সমবেত করিয়া প্রিয়তম ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সুসম্পন্ন করিব, ইহা কি আনন্দের বিষয়! কিন্তু হায়! আমরা তাহা পারিয়া উঠিলাম কই? আমাদের যখন এক একটী সভার অধিবেশন হয়, তখন এমন গোলমাল এবং অপ্রেমসূচক বাদানুবাদ হইতে থাকে যে, শক্তি সকলেরই ক্ষয় হইয়া যায়, অথচ কোন একটা কার্য্য সুচারুরূপে হইয়া উঠে না! আমাদের জাতীয় প্রকৃতির গোড়ায় গলদ বলিয়া বুঝি বা এপ্রকার হয়। আমাদের জাতি শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্য্যকে বড়ই উপেক্ষা করিয়াছে। এইজন্যই বুঝি বা এদেশে জাতীয়একতা এবং জাতীয়প্রেম কখনো প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। আমরা যখন সেই জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, তখন যে অতি সহজে আমরা ব্যক্তিগতস্বার্থ এবং অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ভাই ভাই পরস্পর প্রেমে সম্মিলিত হইয়া ঈশ্বরের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিব, এরূপ মনে হয় না। কিন্তু উদারপ্রেমের ধর্ম্ম যখন অবলম্বন করিয়াছি, তখন যেরূপে হউক এ সাধন আমাদিগকে করিতেই হইবে। এতদিন যে করিতে পারি নাই, তজ্জন্য আক্ষেপ করিয়া বলা অসঙ্গত নয় যে, শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্য্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নাই।

আমাদের সমাজে পুরুষ রমণীর সমান অধিকার। পুরুষ রমণী সকলেই সুশিক্ষিত এবং ধর্ম্মশীল হইয়া মিলিয়া মিশিয়া যদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিতে পারিতাম, তাহা হইলে কঠোরে কোমলে মিলিয়া আমাদের কার্য্যগুলি কি সুন্দর কি সুশৃঙ্খলই না হইত। কিন্তু হায়! আমাদের মধ্যে বুদ্ধিমতী সুশিক্ষিতা, ধর্ম্মশীলা অনেক রমণী আছেন, কিন্তু কার্য্যের সময় কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখা যায় না। "পাছে লোকে কিছু বলে" এই ভয়ে অথবা এই লজ্জায়ই বুঝিবা সর্ব্বদা তাঁহারা ম্রিয়মাণ হইয়া আছেন। নইলে আমাদের জেনারেল কমিটিতে যে সকল মাননীয়া মহিলাদিগের নাম দেখা যায়, তাঁহারা কি উক্ত কমিটিতে রীতিমত উপস্থিত থাকিয়া, পুরুষের এক তরফা ডিক্রীর বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারেন না? না,—কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য হইয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য যাহাতে সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে পারেন না? ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা সম্বন্ধে যখন আলোচনার জন্য কোন সভা হয়, কত শ্রদ্ধেয়া ভগিনী সেস্থলে উপস্থিত থাকেন, ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ কামনায় তাঁহারা কি মনের কোন ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন না? বলিতে দুঃখ হয়, যে ব্রাহ্মসমাজের সঞ্জীবনী মন্ত্রে রমণীরা আমাদের মৃতদেহে প্রাণ পাইয়াছেন, সেই ব্রাহ্মসমাজে এক্ষণ মহিলা প্রচারিকার কত প্রয়োজন; তথাচ আজ পর্য্যন্ত একটি ভগিনীকেও প্রচারিকা হইতে দেখিলাম না! ছাত্রসমাজে অনেক মহিলা মেম্বর আছেন; কিন্তু পুরুষসম্পাদক এবং পুরুষই সহকারী সম্পাদক থাকায়, মহিলা মেম্বরের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিবার সুবিধা হয় না। তাই এবার অনেক পুরুষ মেম্বরের ইচ্ছাছিল, দুইজন সহকারী সম্পাদকের মধ্যে একজন পুরুষ এবং একজন কোন মহিলা নিযুক্ত হন। কিন্তু কোন মহিলাই তাহাতে স্বীকৃতা হইলেন না। মূর্ত্তিমান সৌন্দর্য্য স্বরূপ যে রমণীজাতি, ভগবানের অনুপম শৃঙ্খলা যাঁহাদের স্বাভাবিক ভাব তাঁহারা যে কেন সৌন্দর্য্য এবং শৃঙ্খলাকে এরূপ অবহেলা করেন, তাহাত বুঝিতে পারি না।

আমাদের সম্মিলিত সাধারণকার্য্য ছাড়িয়া যদ্যপি আমাদের ব্যক্তিগতকার্য্য পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে জনকয়েক কর্ম্মশীল উদ্যোগী পুরুষ ব্যতীত আর যুবক বল, বৃদ্ধ বল, অনেকের কার্য্যেরই যেন একটা শ্রীনাই একটা শৃঙ্খলা নাই। আমাদের নেতাদিগের মুখেত সর্ব্বদাই এই বলিয়া আক্ষেপ শুনিতে পাই, ব্রাহ্মসমাজে এমন লোক খুব কমই আছেন, যাঁহাদের হস্তে কোনরূপ একটা দায়িত্বপূর্ণকার্য্য অর্পণ করিলে, তাঁহারা তা সুন্দর সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন। অনেক ব্রাহ্মের যে হিসাব এবং তাল জ্ঞান নাই, একথা বলিয়া হিন্দুরা পর্য্যন্ত ব্যঙ্গ করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্ম, এই বে-তালা, বে হিসাব শব্দের অর্থ বৈরাগ্য এবং সংসারে উদাসানতা বুঝিয়া লইয়া বেশ আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন। সংসারপরিত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে ইহা আত্মপ্রসাদের কথা হইলেও সাধন এবং সংসার এ দুয়ের সমবায়ে যে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ব্রাহ্মধর্ম্ম, সেই ব্রাহ্মসাধনকারীর পক্ষে ইহা কখনই আনন্দের কথা নহে।

জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম অথবা জ্ঞান, সাধন, সংসার এই তিনটির সামঞ্জস্যে সত্য সত্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম কি সুশৃঙ্খল কি সুন্দরই না হইয়াছে। কিন্তু হায়! ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম স্তর যে জ্ঞান, সে জ্ঞানকে আমরা অনেকেই তুচ্ছ করিতেছি, অনেকেই ভাবের মাদকতা নিয়া প্রমত্ত হইয়াছি! আবার যে দু দশজন ব্রাহ্ম একটু বিশেষভাবে জ্ঞানালোচনা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ ভক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া শুধু জ্ঞানকে লইয়া কেমন একঘেয়ে হইয়া যাইতেছেন। অনেক সংসারীত "সুখ-শয্যায় শয়ন করিয়া বিষয় বালিশে মাথা রাখিয়া" সংসারের সঙ্গে জীবনের অস্থায়ী বন্দোবস্তটা কিসে চিরস্থায়ী হয়, সেই উপায় আবিষ্কারে বিশেষ চিন্তিত আছেন; সুতরাং তাঁহাদের মহামূল্য সময়ের কিঞ্চিৎ যে সাধনে কিম্বা ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যে ব্যয় করিবেন, সে আশা দুরাশা মাত্র। কিন্তু অনেক সাধকও যে আবার সংসারকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছেন, ইহা কি অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় নয়? এক সময় যাঁহারা মহাকর্ম্মী ছিলেন, যাঁহাদের উৎসাহের জ্যোতিতে ব্রাহ্মসমাজ প্রদীপ্ত ছিল, অতিরিক্ত আধ্যাত্মিকতার কোলাহলে তাঁহাদের সেকর্ম্ম ক্রমশঃ থামিয়া যাইতেছে—তাঁহাদের সে জ্যোতিঃ ধীরে ধীরে নিবিয়া যাইতেছে। কাজেই বলিতে হইবে, ব্রাহ্মের সে

সামঞ্জস্যের ভাব আর থাকিতেছে না; ব্রাহ্মধর্ম্মের যে মৌলিক সৌন্দর্য্য এবং শৃঙ্খলা ছিল, তাহা যেন নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে!

উল্লিখিত বিশৃঙ্খল এবং অশোভন ভাবের একমাত্র কারণ মনে হয়, ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা। শৃঙ্খলাও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে হইলেই ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং স্বেচ্ছাচারিতাকে খর্ব্ব করা আবশ্যক, এবং পরস্পর ভাবের সমতা রক্ষাকরা প্রয়োজন। যুদ্ধের সময় সেনাপতির আদেশে সৈনিকেরা যখন সারি সারি শৃঙ্খলার সহিত সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া যায়, তখন তাহাদের কি চমৎকার শোভা হয়! কোনও শত্রুর আর সে ব্যূহ ভেদ করিয়া যাইবার সাধ্য থাকে না। কিন্তু সৈনিকেরা যদ্যপি বিশৃঙ্খল হইয়া যে যাহার স্বেচ্ছামত এদিক্ সেদিক্ দাঁড়াইয়া যায়, তাহা হইলে সে চমৎকার সৌন্দর্য্যও যেমন থাকেনা, তৎসঙ্গে যুদ্ধ জয়ের আশাও তিরোহিত হয়। আমাদের যেন তাহাই হইতেছে! অতএব সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকারই এই দৃঢ়সংকল্প করা আবশ্যক হইয়াছে যে, আমরা ব্রহ্মসমাজাধিপতি সেই মহান্ পরমেশ্বরের আজ্ঞার সম্পূর্ণ অধীন হইয়া, ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলেই ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপ সংগ্রাম ক্ষেত্রে সারি সারি শৃঙ্খলার সহিত দণ্ডায়মান হইব, এবং আপন আপন ক্ষুদ্র বৃহৎ শক্তি দ্বারা সুশৃঙ্খল এবং সুশোভন ভাবে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিব।

ব্রাহ্মসমাজ।

রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা—মফঃস্বলের নানা স্থানে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থসভা হইয়াছিল। আমরা এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত স্থানের কার্য্যবিবরণ পাইয়াছি।

মেদিনীপুর 'বেলী হলে' এক সুবৃহৎ সভার অধিবেশন হয়। স্থানীয় প্রধানউকীল শ্রীযুক্ত বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ওজস্বিনী ভাষায় রাজার গুণাবলী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

ভাগলপুর ব্রহ্মমন্দিরে রাজার স্মরণার্থ উপাসনা ও জীবনী পাঠ হয়। শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ মজুমদার মহাশয় উপাসনা করেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জীবনী পাঠ করেন।

মাণিকদহ মধ্য ইংরাজি স্কুল গৃহে "আশাদলের" এক বিশেষ অধিবেশন হয়। রাজার জীবনচরিত আলোচনা হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা স্থগিত ছিল এবং দেড় ঘটিকার সময় স্কুল বন্ধ দেওয়া হইয়াছিল।

চেরাপুঞ্জী সাধনাশ্রমে প্রাতঃকালে বাঙ্গালীদিগকে লইয়া এক সভা হয়। এই সভায় প্রবন্ধ পাঠ ও প্রার্থনাদি হয়। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে খাসিয়া বন্ধুদিগকে লইয়া এক সভা হয়। দুইজন খাসিয়া বন্ধু রাজার জীবনচরিত সম্বন্ধে খাসিয়া ভাষায় বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যার সময় মৌসমাই ব্রাহ্মসমাজে এক বৃহৎ সভার অধিবেশন হয়। গৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। খাসিয়া ভাষায় বক্তৃতা, সংগীত ও প্রার্থনাদি হয়।

ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজে এক সভা আহূত হয়। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় ও শরচ্চন্দ্র বসু বক্তৃতা প্রদান করেন।

আরা সাধনাশ্রমে রাজার স্বর্গারোহণের দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয় এবং সাধনাশ্রমের পরিচারকগণ কর্ত্তৃক সন্ধ্যাকালে এক সভা আহূত হয়। শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরীলাল হালদার, ভারতী সাহা, নৃত্যগোপাল মিত্র এবং বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা করেন।

লক্ষ্ণৌ নগরে আমাদের প্রচারক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণপ্রসাদের গৃহে রাজার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে উপাসনা হয় এবং স্থানীয় Queen's Anglo Sanskrit School গৃহে বক্তৃতা হয়। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ প্রসাদ এবং বাবু বিপিনবিহারী বসু এম, এ, এবং হিরালাল রায় বি, এ, বক্তৃতা করেন।

বোয়ালীয়া ছাত্রসমাজের অধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে একটী সভা আহূত হয়। বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্র প্রার্থনা করেন এবং রাজার জীবনী সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন।

খাসিয়া পর্ব্বতে সেলা ব্রাহ্মসমাজে বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী রাজার জীবনচরিত সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

শারদীয় উৎসব—ঢাকা হইতে কোনও ব্রাহ্মবন্ধু লিখিয়াছেন,—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে ঢাকা পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজের শারদীয় উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

১৩ই আশ্বিন শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকা—সংকীর্ত্তন। ৬॥ ঘটিকা—উপাসনা, বাবু রজনীকান্ত ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন।

১৪ই শনিবার অপরাহ্ণ ৬॥ ঘটিকা—বক্তৃতা। বিষয়-শবসাধনা বা মুক্তিতত্ত্ব। বক্তা, বাবু শরচ্চন্দ্র বসু বি, এল,।

১৫ই রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৬॥ ঘটিকা—উপাসনা, বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার আচার্য্যের কাজ করেন। অপরাহ্ণ ৩' হইতে ৫ ঘটিকা—গীতাদি গ্রন্থ পাঠ ও সৎপ্রসঙ্গ, বাবু চণ্ডী কিশোর কুসারী পাঠ করেন তৎপরে আলোচনা হয়। ৫॥ ঘটিকা—সংকীর্ত্তন, ৬॥ ঘটিকা—উপাসনা। বাবু চণ্ডী কিশোর কুসারী আচার্য্যের কাজ করেন।

মাণিকদহের শাবদীয় উৎসব সমাবোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দাস প্রভৃতি কতিপয় ব্রাহ্ম ভ্রাতা তথায় গমন করেন এবং ঢাকা ও বরিশাল প্রভৃতি স্থান হইতেও অনেকে গিয়া যোগ দান করেন। উৎসবে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মল্লিক আচার্য্যের কার্য্য করেন। বাবু হরিমোহন ঘোষাল একদিন বিল্বমঙ্গলের জীবন চরিত অবলম্বন করিয়া সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা বা কথকতা করেন।

দুর্ভিক্ষ—মাদরা অঞ্চলে এখনও অন্নাভাব রহিয়াছে। বাবু হরিমোহন ঘোষাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে সাহায্য প্রদান করিতেছেন। সাহায্য দাতা মহোদয় ও মহোদয়াগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ, ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা।

বিবাহ—কলিকাতা ২১০৫ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে মজিলপুরের আমাদের ব্রাহ্ম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ বসুর কন্যা শ্রীমতী প্রফুল্লবালা বসুর সহিত পরলোক গত ব্রাহ্মবন্ধু বাবু সর্ব্বানন্দ দাসের পুত্র শ্রীমান্ যোগানন্দ দাসের বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

আমাদের প্রাচীন ব্রাহ্ম বন্ধু ঢাকার শ্রীযুক্ত বাবু কালী নারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুবালার সহিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের বিবাহ উক্ত নগরীতে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন আচার্য্য এবং কালী নারায়ণ বাবু উভয়েই পাত্র পাত্রীকে সময়োচিত উপদেশ প্রদান করেন। দুইটি বিবাহই ৩ আইন অনুসারে রেজিষ্টারী হইয়াছে। পরমেশ্বর নবদম্পতিদিগের কল্যাণ বিধান করুন।

শ্রাদ্ধ—ডোমরাওনের আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু বাবু সারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর খুড়ীমাতার আদ্যশ্রাদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু গুরু দাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং সারদা বাবুর পত্নী, পরলোকগতা খুড়ীমাতার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন। এতদুপলক্ষে সারদা বাবু সাঃ ব্রাঃ সমাজে ১৲ ও আরা সাধনাশ্রমে ৩৲ টাকা দান করিয়াছেন ও উপস্থিত গরিব দিগকে কিছু কিছু পয়সা ও আহারীয় দ্রব্য প্রদান করিয়াছেন।

গত ৫ই অক্টোবর কলিকাতায় শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ দেবের পরলোকগতা শ্বশ্রূঠাকুরাণীর আদ্য শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। ত্রৈলোক্য বাবু এই উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজে নিম্নলিখিতরূপ দান করিয়াছেন, সাঃ ব্রাঃ সমাজ ১৲ সাধনাশ্রম ১৲।

শ্রীযুক্ত জগমোহন দাসের পিতৃশ্রাদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে সম্পাদিত হইয়াছে। ২১০।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে এতদুপলক্ষে দুই বেলা উপাসনা হয়। জগমোহন বাবু পরলোকগত পিতার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন। তিনি সাধনাশ্রমে ২৲ টাকা এবং সাঃ ব্রাঃসমাজের দুর্ভিক্ষ বিভাগে ৪৲ টাকা দান করিয়াছেন।

নামকরণ—গত ১৫ই আশ্বিন মেদিনীপুরের অন্তর্গত পাহাড়িপুর নামক স্থানে শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীলাল দত্তের পুত্রের নামকরণ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। বালকের নাম সত্যরঞ্জন রাখা হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্যারী বাবু সাঃ ব্রাঃ সমাজে ১৲ ও সাধনাশ্রমে ১৲ এবং মেদিনীপুর ব্রাঃ সমাজে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগর গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু এককড়ি সিংহ রায়ের কন্যার নামকরণ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু হারাণ চন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। বালিকার নাম সুষমা রাখা হইয়াছে। এই উপলক্ষে এককড়ি বাবু সাঃ ব্রাঃ সমাজে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার—আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষের জন্য নিম্নলিখিত সাহায্য প্রেরণ করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন।

(ঝাওয়াইল ময়মনসিংহ কাছারির অমাত্যবর্গ কর্ত্তৃক সংগৃহীত)।

মাং বাবু শ্রীধর চট্টোপাধ্যায়	১০৲
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী, কটক	৫৲
বাবু উদয়রাম দাস, মিসা, আসাম	২৲
শ্রীমতী সরলাসুন্দরী দাস	২৲
ডাক্তার কালীপ্রসন্ন সেন (ডার্জ্জিলিং হইতে সংগৃহীত)	৪৫৲
একটী বাবু মাঃ মহলানবিশ মহাশয়	।০
বাবু চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (গয়া হইতে সংগৃহীত)	৭২।০
বাবু অধরচন্দ্র মজুমদার, কলিকাতা	১৲
বাগেরহাট হইতে বাবু নবীনচন্দ্র সিংহ, উকিল কর্ত্তৃক সংগৃহীত	৮৲
শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা মিত্র, কলিকাতা মাঃ	
বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল দাস	৫৲
জনৈক ছাত্রী, ব্রাহ্ম বালিকা বোর্ডিং	১৲
বাবু চন্দ্রনাথ চৌধুরী, বরাহনগর	১৲
শ্রীমতী চারুমতি দেবী পূর্ব্বনপাড়া	১৲
বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ (রামপুরহাট হইতে সংগৃহীত)	৯৲
বাবু অভয়চরণ মজুমদার (কলিকাতাস্থ ভিন্ন ভিন্ন বাসা হইতে সংগৃহীত)	৭॥০
জেনারেল এসেম্ব্লী কলেজের সেকেণ্ডইয়ার ক্লাসের ছাত্রগণ মাঃ বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ	১৬৸৵১০
বাবু নগেন্দ্রনাথ রায়, দিনাজপুর	৵০
বাবু হরনাথ বসু (ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ৮ম শ্রেণীর ছাত্রগণ হইতে সংগৃহীত)	২৲
ধুবড়ি হইতে বাবু চণ্ডীচরণ গুহ কর্ত্তৃক সংগৃহীত	৭১৲
কলিকাতার বাবু পূর্ণানন্দ সাহার গদি হইতে সংগৃহীত	৭।৵০
একটী বন্ধু	॥০
মহিষাদল রাজস্কুলের ৩য় শিক্ষক বাবু জলধর সেন ঐ স্কুল হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠান	২০৲
রামপুরহাট হইতে বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ	৮৲
ফরিদপুর হইতে শ্রীমতী বিনয়কুমারী চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সংগৃহীত	২৫
বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক, কলিকাতা	৫৲
বাবু করুণাকুমার সেন গুপ্ত (কাকিনিয়া হইতে সংগৃহীত)	৬৲
বেথুন কলেজ হইতে সংগৃহীত	৮৩।৫
বাবু মতিলাল হালদার (ক্যাম্পবেলটি কোম্পানির শ্রমজীবিগণের নিকট হইতে সংগৃহীত)	১৫৲
চেলা গঙ্গারাম, নরসিপটন	২৲
বাবু কালিদাস সরকার (গয়া দাউদনগর হইতে সংগৃহীত)	২৩০
বাবু জগমোহন দাস, কলিকাতা, মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে	৪৲
বাবু চকড়ি ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত কলিকাতা	৫॥৵০
বাবু হরিদাস শ্রীমানি কলিকাতা	১৲
বাবু রজনীনাথ রায়ের সন্তানগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত	১০৲
শ্রীযুক্তা জগত্তারিণী মৈত্র	১৲
কোনও গ্রামের পঞ্চায়েৎ কর্ত্তৃক আদায়	১৲
ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের নিম্নশ্রেণীর ছাত্রীগণ	১॥/১০
সর্ব্বমোট	৭৬৪।৵৫

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীবাড়িবচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১লা কার্ত্তিক প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ সংখ্যা।
১৮শ ভাগ।

১৬ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, ১৮১৬ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৸০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে করুণাময় প্রভো। যাহারা ধর্ম্মজীবন পাইয়াছে ও ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত আছে তাহারাও নিরাপদ নহে। আমাদের পুরাতন দুর্ব্বলতা সহজে যায় না; পুরাতন শত্রুগণ শীঘ্র ছাড়ে না। যদিও বা গুরুতর পাপ গুলির হাত ছাড়ান যায়, কোথা হইতে আত্ম-তৃপ্তি আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করে। বাহিরের কতকগুলি সাধন ও কতকগুলি কাজ লইয়া আমরা তৃপ্ত হইয়া থাকি, মনে করি ইহার অধিক আর কি হইবে। কোনও প্রকারে বাহিরের স্রোতের সঙ্গে চলিয়া এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দি যে, আমাদের দ্বারা যাহা হইতে পারে তাহা হইতেছে। এইরূপে ধর্ম্মজীবনের সকল প্রকার উন্নতির মূল কারণ যে ব্যাকুলতা তাহা হ্রাস হইয়া যায়। তৎপরে উপাসনাতে যোগ দিতে হয় বলিয়া যোগ দি, কাজ করিতে হয় বলিয়া কাজ করি; তোমাকে প্রাণে পাইলাম কিনা, তোমার প্রসাদ লাভ করিলাম কিনা সেদিকে আর দৃষ্টি থাকে না। দিনের পর দিন উপাসনা স্থানে আসিয়া বসি, পদ্মপত্রের জলের ন্যায় উপাসনার শব্দ সকল মনের উপর দিয়া গড়াইয়া যায়; সময়ে সময়ে ক্ষণিক ভাবেরও উদয় হয়; কিন্তু প্রাণ তোমার সংস্পর্শ লাভ করিল কিনা, অন্তরাত্মাতে তোমার আলোক প্রকাশ পাইল কি না তাহা দেখি না। তোমার বিশ্বাসী ও ব্যাকুল সন্তানদিগের জীবনে কি ক্ষুধা ও তৃষ্ণার পরিচয় পাই! তোমার অদর্শন যন্ত্রণা তাহাদিগকে অস্থির করিয়া তোলে। আহারে শান্তি নাই, বিহারে শান্তি নাই, শয়নে নিদ্রা নাই! তোমার সহিত অগ্রে মিলন না হইলে কোনও কাজেই তাঁহাদের হাত উঠে না। আমাদের সে ব্যাকুলতা কোথায় গেল? মৃত্যুর পূর্ব্বাভাস এই আত্ম-তৃপ্তি কোথা হইতে আসিল? হে বিধাতা! আমাদের মুক্তির উপকরণ সামগ্রী ত চারিদিকে রাখিয়াছ। এই জগৎশাস্ত্র আমাদের চক্ষের সমক্ষে নিরন্তর উদ্ঘাটিত রহিয়াছে, এই শাস্ত্র পাঠ করিয়াই জ্ঞানিগণ জ্ঞানী হইয়াছেন; ভক্তগণ অমূল্য উপদেশ পাইয়াছেন; এই মানব-প্রকৃতিরূপ শাস্ত্র চিরদিন সমক্ষে রহিয়াছে। কত সাধু মহাজন, কত সৎগ্রন্থ, কত সৎসঙ্গ, সমুদায় হাতের নিকটেই রহিয়াছে, কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণার অভাবে এ সমুদায় বৃথা। এই ঘোর বিপত্তি হইতে তুমি আমাদিগকে উদ্ধার কর। তোমাকে যে আমরা লাভ করিব তাহার উপায়ও তোমাকে করিয়া দিতে হইবে। তোমার চরণাশ্রিত দাসদিগকে আত্মতৃপ্ত হইয়া মোহ নিদ্রায় শয়ন করিতে দিও না। আমরা তোমার করুণার উপরেই একান্ত নির্ভর করিতেছি। ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ধর্ম্ম প্রচার ও প্রাচীন রীতি—ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে পোপ গ্রেগরি ইংলণ্ডে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য চল্লিশজন পরিব্রাজক সমভিব্যাহারে অগষ্টিন নামক একজন ধর্ম্মপ্রচারককে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অগষ্টিন ইংলণ্ডে গিয়া দেখিলেন, তথাকার আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে এমন অনেক প্রকার রীতি নীতি প্রচলিত আছে, যাহা তাহারা প্রিয় জ্ঞান করে। তন্মধ্যে একটা রীতি এই ছিল যে, তাহারা বৎসরের মধ্যে কয়েকবার উৎসব করিত। তাহাতে আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলে আনন্দের সহিত যোগ দিত। কিন্তু ঐ সকল উৎসব তাহাদের দেশপ্রচলিত প্রাচীন পৌত্তলিকতার সহিত সম্বদ্ধ ছিল। অগষ্টিন দেখিলেন, দেশের লোক এই উৎসবগুলি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে। ঐ উৎসবগুলিই খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের পথে বিঘ্নকারী হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তখন তিনি ধর্ম্মসমাজপতি পোপের অভিপ্রায় জানিবার জন্য রোমে পত্র লিখিলেন। রোম হইতে উত্তর আসিল—"সাধারণতঃ প্রজাদিগের প্রাচীন রীতি নীতিতে হস্তার্পণ করিও না। তাহারা সে সকল রীতি নীতি রক্ষা করুক; কিন্তু ঐ সকল উৎসবকে রক্ষা করিয়া নূতন অর্থ দিয়া খ্রীষ্টীয় উৎসবে পরিণত করিবার চেষ্টা কর।" এই পরামর্শানুসারে কার্য্য হইল এবং পোপ যে ফলের আশা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান খৃষ্টমাস্ মহোৎসব ও ইষ্টার উৎসব এই দুইটী খ্রীষ্টীয় আকারে পরিণত স্যাকসন্ জাতির প্রাচীন উৎসব

দ্বয়ের ভগ্নাবশেষ মাত্র। এই বিবরণটী পাঠ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের অদ্ভুত সম্প্রসারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রীষ্টধর্ম্ম যে দেশে যে জাতি মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদিগকে অধিকার করিবার জন্য সর্ব্বদাই আপনাকে তাহাদের ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। পোপ গ্রেগরি অগষ্টিনকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন সে বিষয়ে চিন্তা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, কেন রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় ধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছে। তাঁহারা যখন যে দেশে প্রচার করিতে গিয়াছেন, তখন খৃষ্টধর্ম্মকে যথাসাধ্য তাহাদের চিরাগত রীতি নীতির অনুরূপ করিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে এরূপ একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে রোমান ক্যাথলিক প্রচারকগণ সর্ব্বপ্রথমে যখন সে দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন সন্ন্যাসীর বেশ পরিধান করিয়া প্রচার করিবার জন্য বৃক্ষতলে বসিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম-গ্রন্থ পঞ্চম বেদ। এই বলিয়া বাইবেলের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা যে সকল হিন্দুকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন, তাঁহাদিগকে জাতিভেদ রক্ষা করিতে দিতেন। এইরূপে এখনও দাক্ষিণাত্যে বহুসংখ্যক উপবীত ধারী ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টান দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা শূদ্র খ্রীষ্টানদিগের সহিত আহার বিহার বা আদান প্রদান করেন না। তবে এ স্থলে ইহা বক্তব্য যে, জাতিভেদ প্রথা নিবন্ধন হিন্দুসমাজ মধ্যে যে সকল অনিষ্ট ঘটিয়াছে ও যে সকল অসুবিধা লোকে প্রতিদিন ভোগ করিতেছে, এই জাতীয় খ্রীষ্টানগণকে সে সকল অসুবিধা আরও গুরুতররূপে ভোগ করিতে হইতেছে। রোমান ক্যাথলিকগণ যে কেবলমাত্র জাতিভেদ রাখিতে দিয়াছিলেন তাহা নহে, অপরাপর রীতি নীতিও খ্রীষ্টীয় আকারে পরিণত করিয়া রাখিতে দিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে একটী বিশেষ প্রথা আছে যে বিশেষ বিশেষ পর্ব্বের দিনে উপাসকগণ দলবদ্ধ হইয়া মহাসমারোহ সহকারে স্বীয় স্বীয় উপাস্য দেবমূর্ত্তিকে এক মন্দির হইতে অপর মন্দিরে লইয়া যায়। সেখানকার নগরে নগরে এরূপ লোকযাত্রা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সাধারণ লোকের একটা ধর্ম্মামোদের ব্যাপার, এতদ্দারা হিন্দুধর্ম্মকে সে প্রদেশে অনেক পরিমাণে জাগ্রত রাখিয়াছে। রোমান কাথলিকগণ যখন দলে দলে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন, তখন বোধ হয় তাহারা এই ধর্ম্মামোদের অভাবটা বড় অনুভব করিতে লাগিল। সেই জন্য রোমান কাথলিক নেতাগণ আদেশ করিলেন, তোমরাও সমারোহ সহকারে যীশু ও মেরীর মূর্ত্তি বহন করিয়া লইয়া যাও। তদনুসারে মান্দ্রাজ প্রদেশের অনেক সহরে এখনও মধ্যে মধ্যে যীশু ও মেরীর মূর্ত্তি বহন করিয়া লইয়া যাইতে দেখা যায়। খ্রীষ্টধর্ম্ম এইরূপে দেশ কালপাত্র ভেদে আপনাকে রূপান্তরিত করিয়া জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রশংসার বিষয় এই, অপরকে গ্রহণ করিতে গিয়া নিজের অস্তিত্ব হারায় নাই, তাহাদিগকেই রূপান্তরিত করিয়া নিজ ভাবাপন্ন করিয়া লইয়াছে। ইহার কারণ এই খ্রীষ্টধর্ম্মের কেন্দ্র স্থানে এমন কিছু শক্তি ছিল, যাহা বিজিত না হইয়া সর্ব্বদা জয়শালী হইয়াছে। যে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সে শক্তি নাই, অপরের ভাবে রূপান্তরিত হইতে গেলেই তাহার মৃত্যু।

ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গসন্ধির শিথিলতা—অঙ্গসন্ধির শিথিলতা বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ-গঠনপ্রণালীর একটী প্রধান ত্রুটি বলিয়া লক্ষিত হয়। ব্রাহ্মগণের সংখ্যা অতি অল্প, ইহা তত দুঃখের বিষয় নহে, কিন্তু এই অল্প সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যেও যে ঘন-নিবিষ্টতা নাই, ইহাই ইঁহাদের দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ। এই অঙ্গসন্ধির শিথিলতা বশতঃই ব্রাহ্মসমাজে আশানুরূপ কার্য্যশক্তি প্রকাশ পাইতেছে না। এই অঙ্গসন্ধির শিথিলতার বিষয় চিন্তা করিলেই অনুভব করা যায় যে, যে প্রণালীতে অদ্য পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইয়া আসিতেছে, তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। এই অঙ্গ-সন্ধির শিথিলতার মূল কারণ কি? তাহা স্থিরচিত্তে আলোচনা করিতে হইবে। সচরাচর লোকে বলিয়া থাকেন, ব্রাহ্মেরা কোনও প্রকার অভ্রান্তশাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না, প্রত্যেকেই নিজের শাস্ত্র। সুতরাং এই সমাজ মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ও যথেচ্ছাচারের যথেষ্ট স্থান আছে। এই উৎকট ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই ব্রাহ্মদিগকে ঘননিবিষ্ট হইতে দিতেছে না। এই যুক্তির মধ্যে কিঞ্চিৎ সত্য থাকিলেও ইহাকে সচরাচর যত সারবান মনে করা হয় তাহা নহে। সামাজিক ঘন নিবিষ্টতা প্রেম সম্ভূত, পরস্পরের প্রতি প্রেম ও সমস্ত সমাজের প্রতি প্রেম, প্রেম প্রেমাস্পদের সহিত মিলন ও আত্মীয়তা সম্ভূত। ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত প্রত্যেক সমাজকে ও প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরস্পরের সহিত ও সমস্ত সমাজের সহিত মিলিত করিবার উপায় এখনও অবলম্বিত হয় নাই। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায় আপন আপন সমাজের পুষ্টি সাধন, রক্ষা ও শিক্ষার নিমিত্ত যে সকল প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বপ্রথমে মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ ও আলোচনা করা কর্ত্তব্য। শুধু আমরাই যে এজগতে ধর্ম্মসমাজ গঠন করিতে অগ্রসর হইয়াছি তাহা নহে। অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায় আমাদের অগ্রে গিয়াছেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞতার ফল কি আমাদের গ্রহণ করা উচিত নয়? দুঃখের বিষয় এ বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের বিশেষ অজ্ঞতা দৃষ্ট হয়। অপরাপর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত আলোচনা করা আমাদের তত অভ্যাস নাই। তাহা যদি থাকিত তাহা হইলে হয়ত আমরা অনেক ভ্রান্তি পরিহার করিতে পারিতাম ও অনেক উৎকৃষ্টতর প্রণালী অবলম্বন করিতে পারিতাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আদিম কাল হইতে এই নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে যে এক একটী উপাসক মণ্ডলীর উপরে একজন আচার্য্য নিযুক্ত থাকিবেন, এবং কতকগুলি উপাসকমণ্ডলীর উপরে একজন করিয়া বিশপ বা তত্ত্বাবধায়ক থাকিবেন। এই নিয়মের একটী গুণ এই যে যাঁহাদের প্রতি কার্য্যভার অর্পিত হয়, দায়িত্বজ্ঞান থাকাতে কার্য্য অনেকটা সুশৃঙ্খলরূপে চলে, দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদের সহিত উপাসকগণের একটা আধ্যাত্মিক

আত্মীয়তা স্থাপিত হয়, যাহা ধর্ম্মসমাজের ঘন-নিবিষ্টতার একটা প্রধান উপায় বলিয়া গণনীয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে এই প্রণালী অবলম্বন করিতে গেল পূর্ব্বে দেখিতে হইবে কোরেকার সম্প্রদায়ের ন্যায় যে সকল খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় এই প্রণালীর প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের যুক্তি কি? পাঠ আলোচনা ও চিন্তা ভিন্ন তাহা কি প্রকারে সম্ভবে? বিশেষ আলোচনা ও গভীর চিন্তার পর যে প্রণালী অবলম্বনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাই অবলম্বিত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান কাজের মধ্যে এই চিন্তাশীলতা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইতেছে না। আমরা ক্ষণিক ভাবের উত্তেজনাতে অনেক কার্য্য করিতেছি; তাহার ফল এই হইতেছে যে আমাদের অনেক কার্য্যের মধ্যে স্থিরতা থাকিতেছে না। আজ যে প্রণালী অবলম্বনীয় বলিয়া মনে করিতেছি, দুই দিন পরে তাহা পরিহার করা আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। ধর্ম্ম-সমাজকে লইয়া এইরূপ বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিলে ঈশ্বর ও মানবের নিকট অপরাধী হইতে হয়।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত—ইহা সকলেই বিদিত আছেন, যে মহাপুরুষ মহম্মদ তাঁহার শিষ্যদিগকে উপাসনাকালে সঙ্গীত করিবার অধিকার দেন নাই। সর্ব্বপ্রকার পৌত্তলিকতা ও অংশিত্ববাদের উপরে তাঁহার এমন বিজাতীয় বিরাগ ছিল যে, তিনি সঙ্গীতকেও ভয় করিতেন। বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, যদি উপাসনাকালে সঙ্গীত করিবার অনুমতি দি, তাহা হইলে সেই দ্বার দিয়া সকল প্রকার কবিত্ব প্রবেশ করিবে এবং হয়ত চরমে বিশুদ্ধ একত্ববাদ রক্ষা হইবে না, লোকে ঈশ্বরের উপর নির্ভর না করিয়া অপরাপর পদার্থের উপর নির্ভর করিতে শিখিবে। তাঁহার হৃদ্গত ভাব যাহাই হউক, সঙ্গীতকে ধর্ম্ম সাধনের অঙ্গরূপে ব্যবহার করার যে গুরুত্ব আছে, তাহা আমরা অনেক সময় অনুভব করি না। সঙ্গীতের দ্বারা যে উপদেশ দেওয়া হয়, সঙ্গীতের মধ্যে ধর্ম্মজীবনের যে আদর্শ লোকের চক্ষে ধরা হয়, তাহা অপর সকল উপদেশ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে লোকের মনে মুদ্রিত হইয়া থাকে। একজন প্রতিষ্ঠাশালী উপদেষ্টা বাগ্মিতাপূর্ণ ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষাতে যে উপদেশ দেন, তাহা কিছু দিনের জন্য চিত্তকে উদ্দীপ্ত করে, হয়ত হৃদয়ে কোনও সাধুভাবের উদয় করে, কিন্তু কালে লোকে তাহা বিস্মৃত হইয়া যায়, সে উপদেশ আর কাহারও স্মৃতিতে থাকে না। কিন্তু একজন সুকবি তান লয় বিশুদ্ধ সঙ্গীতে যে উপদেশটী নিবদ্ধ করিয়া দেন, তাহা আর পুরাতন হয় না, কতস্থানে কত উপাসনা-ক্ষেত্রে কতদিন সেই সঙ্গীতটী গীত হইয়া থাকে। যতবারই সেটী গান করা যায়, ততবারই সে উপদেশটী নূতন হইয়া মনের সমক্ষে আসে ও সেই আদর্শটী হৃদয়ে মুদ্রিত হয়। এই জন্য মনে হয়, উপাসনাকালে ব্যবহারের জন্য যাঁহারা সঙ্গীত রচনা করেন, তাঁহাদের দায়িত্ব অতি গুরুতর। যে দলের মধ্যে যেরূপ ভাবের সঙ্গীত অধিক পরিমাণে গাওয়া হয়, সে দলের সাধকদিগের চিত্ত ও ধর্ম্মজীবন অল্পে অল্পে সেই ভাবেই গঠিত হইয়া থাকে। যদি ঈশ্বরকে মানব-ভাবাপন্ন করিয়া সঙ্গীত রচনা কর, "পাপীর দুঃখে তোমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, না জানি তুমি কত কাঁদিতেছ, তুমি কি জান্‌তে আমি এমন হব? ঈশ্বর আমি তোমাকে নিরাশ করেছি," ইত্যাদি ভাব বহুল পরিমাণে যে সকল সঙ্গীতে আছে, তাহা যদি সর্ব্বদা গাওয়া যায়, ক্রমে দেখা যাইবে আমাদের আরাধনা, প্রার্থনা, উপদেশাদিতে মানবীয় ভাবের আরোপ হইতেছে। ক্রমে সেই সমাজ মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান ম্লান হইয়া যাইবে। সেইরূপ যে সকল সঙ্গীতে কেবল ভাবোচ্ছ্বাসকেই ধর্ম্মজীবনের শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা,

হাসিব কাঁদিব নাচিব গাইব
ক্ষেপা পাগলের মত"

সে সকল সঙ্গীত যদি সর্ব্বদা গাওয়া যায়, সে দলের ধর্ম্মজীবন অল্পে অল্পে ভাবুকতাপ্রধান হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা। সঙ্গীত গ্রন্থ মুদ্রিত করিবার সময় অতিশয় সাবধানতার সহিত সঙ্গীত নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। আমরা মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মের মুখে এরূপ সঙ্গীতও শুনিতে পাই, যাহাতে ইন্দ্রিয়াসক্তির গন্ধ আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঐ সকল ইন্দ্রিয়াসক্তির গন্ধদূষিত সঙ্গীত সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। তাহা সমাজ মধ্যে প্রচলিত হইলে সমাজের নৈতিক আদর্শ হীন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সঙ্গীত বিষয়ে ব্রাহ্মগণের সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

ধর্ম্মের মুখস—একবার এদেশীয় একজন হিন্দু বড় লোক কোনও উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। উভয়ে কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া একখানি কার্ড সাহেবের হস্তে অর্পণ করিল। সাহেব দেখিলেন যে, একজন পদস্থ মুসলমান ভদ্র লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। ইহা জানিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন যে, "এই মুসলমানদিগকে আমি দেখিতে পারি না। বিশেষতঃ এই ব্যক্তি অতি অসার লোক, কেবল বড় লোকের তোষামোদ করে, ইহাকে আমি ভাল বাসি না।" এমন সময় আগন্তুক মুসলমানটি গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। অমনি সাহেব তাড়াতাড়ি আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন, ও সম্ভ্রমসূচক অনেক কথা বলিলেন, যেন ঐ ভদ্রলোকটির আগমনে কতই আপ্যায়িত হইলেন। ইহা দেখিয়া সেই হিন্দু ভদ্রলোক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এ কিরূপ ভাব, আমার নিকট একরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন, মুসলমান ভদ্রলোকটি উপস্থিত হইলে অন্যরূপ ব্যবহার করিলেন?"

কেবল ইংরাজ ভদ্র লোকই যে এইরূপ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, সভ্য সমাজে প্রতিদিন এরূপ চলিতেছে। লোকে প্রতিদিন সৌজন্য-মুখস পরিয়া পরস্পরকে অভ্যর্থনা করিতেছে। ছেলেরা মুখস পরিয়া যেমন কেহ বাঘ হয়, কেহ সিংহ হয়; তদ্রূপ মানুষে মুখস্ পরিয়া যে যাহা নয় তাহা দেখাইয়া থাকে। অন্তরে যাহার প্রতি ঘৃণা, বাহিরে তাহার প্রতি সম্ভ্রম; ভিতরে

প্রেম নাই, বাহিরে প্রেমের উপহার; ভিতরে আত্মীয়তা নাই, বাহিরে আত্মীয়তার ছড়াছড়ি।

এইরূপে কেবল যে প্রতিদিন লোকে সভ্যতার ও সৌজন্যের মুখস্ পরিতেছে তাহাও নহে, ধার্ম্মিকতারও মুখস্ পরিয়া থাকে। যিনি ধার্ম্মিক নহেন, তিনি ধার্ম্মিকের বেশ ধারণ করেন, যিনি সাধন ভজন করেন না, তিনি সাধক বলিয়া পরিচিত হন। ইহাকে "ধর্ম্মকঞ্চুক" কহে।

ধর্ম্মকঞ্চুক দুই প্রকার। এক প্রকার প্রতারণার উদ্দেশ্যে অবলম্বিত হয়। এই উপায়ে ঘোর দস্যু সন্ন্যাসীর পোষাক পরিয়া এদেশে স্বার্থ সাধন করিতেছে। শুনিয়াছি, একজন লোক ব্রাহ্ম প্রচারক সাজিয়া মফঃস্বলে গিয়া চুরি করিয়াছিল। দ্বিতীয় প্রকার ধর্ম্মকঞ্চুকধারিগণ ধর্ম্ম চায়, ধর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে চায়, অথচ তাহারা দুর্ব্বলতাবশতঃ সাধন ভজন করিতে পারে না। তাহাদের প্রাণে অগ্নি নাই, উত্তাপ নাই, তেজ নাই, ব্যাকুলতা নাই, সংগ্রামও নাই। তাহারা প্রতিদিন অন্তরের দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেছে, অথচ বাহিরে ধর্ম্মের কথা বলিতেছে। নিজের বিশ্বাস নাই, অথচ বিশ্বাসের কথা বলিতেছে। প্রতারণা ইহাদের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু দুর্ব্বলতা বশতঃ এবং সুখ্যাতির প্রত্যাশী হইয়া বাহিরে ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ কথা বলিতেছে। নিজের চেষ্টা, আগ্রহ কিছুই নাই।

যখন বাহিরে ধর্ম্মের কথা বলিয়া বলিয়া অভ্যাস হইয়া যায়, তখন আর নিজের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। এই বিপদ হইতে আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। আমরা যেন মুখস্ না পরি, আমরা যেন আত্ম-প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত না হই। আমাদের মধ্যে যেন ব্যাকুলতা, একাগ্রতা থাকে, দৃষ্টি যেন সজাগ থাকে। আমরা যে আদর্শ অপরের নিকট ধারণ করিব, তাহা যেন অগ্রে সাধন করি।

ব্যবসায়ী ভিক্ষুক—পথে চলিতে চলিতে অনেক সময় দেখা যায় যে, ভিক্ষুকের বেশধারী বালকগণ "পয়সা দেও, পয়সা দেও" বলিয়া পথিকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়। তাহাদের পরিধানে ভিক্ষুকের ন্যায় বস্ত্র, হাব ভাব ও ভিক্ষুকের ন্যায়, স্বর বিকৃত। তাহাদের আকার প্রকার দেখিলেই মনে হয় যে, তাহারা বাস্তবিক গরিব নহে। তাহারা অন্ন বস্ত্রাভাবে যে বিশেষ ক্লেশ পাইতেছে, এরূপ বোধ হয় না। কিন্তু তাহারা অন্য কোন প্রকার অভাব পূরণের জন্যই এই উপায়ে পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে বলিয়া সন্দেহ হয়। কিন্তু সেই ভিক্ষাব্যবসায়ীদিগের মধ্যে এরূপ দুই এক জন লোকও থাকে যাহাদিগকে দেখিলে, যাহাদের কথা শুনিলে মনে কোনও প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয় না। তাহাদের সকাতর প্রার্থনা শুনিলে ও মলিন মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহারা বাস্তবিক দরিদ্র।

উক্ত ভিক্ষুকদিগের সহিত আমাদের জীবনের তুলনা হয়। আমরা যে উপাসনা করি, প্রার্থনা করি; তাহার মধ্যে অনেক সময় পরমেশ্বরের নিকট কত কি চাই। কিন্তু হয় ত যাহা চাহিতেছি, তাহা লাভের জন্য প্রাণ বাস্তবিক ব্যাকুল নহে। উপাসনার সময় উচ্চ উচ্চ বিষয়ের প্রার্থনা করিতে হয় বলিয়াই যেন প্রার্থনা করিয়া থাকি। অতি ক্ষুদ্র পাপের কথা স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিতে পারি না। এই জন্যই আমাদের প্রার্থনা দ্বারা জীবন প্রস্তুত হয় না। তাহা উপাসনা গৃহেই আবদ্ধ থাকে। এরূপে আমরা বিরক্তকারী সেই ভিক্ষাব্যবসায়ীদিগের মত হইয়াছি। ঈশ্বরের নিকট কত স্তুতি মিনতি করি, বড় বড় বিষয়ে প্রার্থনা করি, কিন্তু অন্তরে সে ভাব নাই। পৃথিবীর লোক ভিক্ষাব্যবসায়ীদিগের নিকট প্রতারিত হইয়া থাকে, কিন্তু অন্তর্যামী ভগবান প্রতারিত হন না। তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টির নিকট আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতাও প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

আমাদের ব্যাকুলতা কেবল ভাষায় এবং সঙ্গীতেই প্রকাশ পায়। "কাতরে তোমায়, ডাকি দয়াময়" বলিয়া গান করি; কিন্তু কাতরতা কোথায়? সংগীতের ভাষায় এরূপ শব্দ না থাকিলে হয় ত আমাদের এরূপভাব প্রকাশের কোন প্রয়োজনই হইত না। কাতরতা থাকিলে কি আমরা এমন করিয়া উপাসনা শেষ করিতে পারি? যে ক্ষুধার্ত্ত, সে যদি ভিক্ষার্থে কাহারও দ্বারে যায়, গৃহস্বামী কিছু না দেওয়া পর্য্যন্ত, সে কি উঠিয়া যাইতে পারে? যতক্ষণ না ভিক্ষা পায়, গৃহদ্বারে পড়িয়া থাকে। আমরা প্রকৃত ভিক্ষুক হইলে, প্রকৃত অভাবগ্রস্ত হইলে ঐরূপে প্রভুর দ্বারে পড়িয়া থাকিতাম। আমাদের মধ্যে যিনি প্রকৃত কৃপাপ্রার্থী, তাঁহার লক্ষণও এইরূপ।

আমাদের উপাসনা, প্রার্থনায় যে সকল সময় বিশেষ ফলোদয় হয় না, তাহার কারণও এই। আমরা ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করি না। নিজের অভাব কি তাহা তলাইয়া দেখি না। দিনের পর দিন উচ্চ উচ্চ কথায় যাপন করিতেছি। উচ্চ কথায় যে ক্ষণিক উচ্ছ্বাস হয়, তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট হই। আমরা ক্ষুধিত নই, অথচ ক্ষুধিতের ভাণ করিয়া প্রভুর দ্বারে উপস্থিত হইতেছি; ব্যাকুলতা নাই, অথচ ব্যাকুলতার ভাব প্রকাশ করিতেছি; এরূপে কখনও ব্রহ্মকৃপা লাভ হয় না।

পণ্ডিত-মূর্খ—একখানি গ্রন্থে "পণ্ডিত-মূর্খের" বিষয় লিখিত আছে। অনেক শাস্ত্র পাঠ, অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াও লোকে কিরূপ মূর্খ থাকে, ঐ গ্রন্থে তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। এই মূর্খেরা একদিন নদী পার হইয়া নিজেদের সংখ্যা গণনা করিতে লাগিল। যিনি গণিতে আরম্ভ করিলেন, তিনিই নিজকে বাদ দিয়া গণিতে লাগিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ তাহারা চারি জন লোক ছিল; কিন্তু যতবারই গণে, তিন জন বই আর হয় না। প্রত্যেক বারেই আপনাকে ছাড়িয়া "এক দুই তিন" গণিয়া শেষে কাঁদিতে আরম্ভ করিল—"হায় হায়, এক জন লোক মারা গিয়াছে।"

আমরাও এইরূপে অনেক সময় আপনাকে ছাড়িয়া গণনা করিয়া থাকি। সমাজের লোককে ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া অনেক সময় ক্ষোভ করি; কিন্তু আপনাকে তাঁহাদের মধ্যে গণনা

করি না। ব্যাধি অন্যান্যের আছে, আমার নাই। আমি যে রুগ্ন, তাহা মনে থাকে না। ব্যাধির ঔষধের যে আমারও প্রয়োজন, তাহা ভ্রমেও চিন্তা করি না।

এইরূপ অনেক স্থলেই আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া বিচার করা হয়। এরূপ অনেক লোক দেখা যায়, যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে নিজ জীবনে ও অনুষ্ঠানে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, অথচ প্রচারক ডাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা অপরকে শুনাইতে অতিশয় উৎসাহী। তাঁহারা আচরণে অনুষ্ঠানে প্রাচীন সমাজের সহিত যুক্ত আছেন; পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ রক্ষা করিয়া চলিতেছেন; অথচ ব্রাহ্মপ্রচারক ডাকিয়া লোককে বক্তৃতা শুনাইবার জন্য খুব ব্যস্ত। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, ইহার কারণ কি? তাঁহারা যদি মন খুলিয়া উত্তর দেন, তবে ইহাই তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে যে, "লোকে ধর্ম্ম করুক, পাপ পরিত্যাগ করুক, আনুষ্ঠানিক হউক, আমরা ইহাই চাই।" এস্থলে তাঁহারা আপনাকে বাদ দিয়াই গণনা করেন। আমি ছাড়া আর সকলে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করুক, আমি ছাড়া আর সকলে ভাল হউক, আমি ছাড়া আর সকলে অনুষ্ঠান করুক, তাঁহাদের মনের ভাব যেন এই প্রকার।

আমরাও অনেক সময় আপনাকে ছাড়িয়া সংসারকে ভাল করিতে চাই। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছি, তাহা শুনিয়া সকলে ভাল হউক, আমার উপাসনা হউক বা না হউক অন্যের উপাসনা হউক। সপ্তাহে সপ্তাহে সমাজের বেদী হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হউক। এ সকল অপরের জন্য, আমার জন্য নহে। ধর্ম্ম যে আমাকে আয়ত্ত করিতে হইবে, সে দিকে দৃষ্টি নাই। এইরূপে নিজকে বাদ দিয়াই মানুষ সংসারকে বিচার করে। নিজকে বাদ দিয়াই মানুষ পাপে পতিত হয়; নিজকে বাদ দিয়াই স্বার্থপর হয়।

আমরা যদি নিজকে আগে গণনা করি, তাহা হইলে এই চিন্তা স্বতঃই উঠিবে, আমার কিছু হইতেছে কি না? পাঠ ও আলোচনার দ্বারা আমার চিত্ত উন্নত হইতেছে কি না? যদি না হয়, তবে বলিতে পারি, যাহা বলিতেছি বা করিতেছি, অন্যের তদ্দারা উপকার হইতেছে না। আত্ম-দৃষ্টিপরায়ণ ব্যক্তিগণ অন্যের হউক বা না হউক সে দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া আপনাকে সর্ব্বাগ্রে উন্নত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকেন। অপরকে লইয়া যাহারা সর্ব্বদাই ব্যস্ত, পরচর্চ্চাতে যাহাদের উৎসাহ, তাহারা সচরাচর নিজ উন্নতির প্রতি উদাসীন হইয়া থাকে। এই ব্যাধি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমাদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে।

এরূপ জীবনের সহিত তুলনা করিলে আমাদের কি শোচনীয় অবস্থাই দেখিতে পাই। বিপদে পতিত হইলে আমাদের মন সর্ব্বাগ্রে কাহাকে অন্বেষণ করে? আমরা কি তাঁহার নিকট হইতে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করি? তাঁহার নিকট হইতে কি আশা ও বল পাই? সকল কার্য্যের মধ্যে কি সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই দেখি? এই সকল প্রমাণের দ্বারা আত্মপরীক্ষা করিলে অনুভব করা যায় যে, আমাদের জীবনের সহিত তাঁহার তেমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই। তজ্জন্যই আমাদের দুঃখ কষ্ট। জীবন তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে ধর্ম্মসাধন হয় না। ধর্ম্মসাধন বাহিরের বিষয় নহে। আমাদের কি অবস্থা? আমরা যে মানুষকে দুর্ব্বল হীন বলিয়া থাকি, সেই মানবের উপরেই নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হই। জগতে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, আজ যিনি অনুকূল, কাল হয় ত প্রতিকূল; আজ যিনি সহায়, কাল তিনি শত্রু, এরূপ মানুষের উপর নির্ভর করিয়া কতবার প্রবঞ্চিত হইতেছি, তথাচ তাহাদের উপর নির্ভর করিতেছি; কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর, যাঁহার প্রেমের পরিবর্ত্তন নাই, তাঁহার প্রতি নির্ভর করিতে পারিতেছি না। ইহাই আমাদের ভয়ানক ব্যাধি! আমরা তাঁহার চরণে শরণ লইতে পারিতেছি না। সকল দেশের সকল সাধু বলিতেছেন, "মানবাত্মার জীবন তাঁহার চরণে। অনন্যগতি হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন না হইলে কল্যাণ নাই।" অথচ তাঁহার চরণে পড়িয়া থাকিতে পারি না। তাঁহাতে ঔষধ আছে জানি; কিন্তু লাভ করিবার জন্য ব্যাকুলতা নাই, একাগ্রতা নাই, অস্থিরতা নাই। এজন্যই আমরা দুর্ব্বল ও হীনাবস্থায় পতিত হই। ঈশ্বর কৃপা করুন, আমরা যেন বিপদে ক্লেশে দুঃখে একান্ত মনে তাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দান করি।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্রহ্ম-কৃপার আবির্ভাব।

এই পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর লোক দুই ভিন্ন পথ অনুসরণ করিয়া ঈশ্বরসমীপে উপস্থিত হন ও তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। প্রথম যাঁহারা সাধুগৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সাধু এবং পুণ্যবান পিতা মাতার নিকট প্রতিপালিত হইয়াছেন, কখনও কুসঙ্গে পড়েন নাই, শিশুকাল হইতে ভাল দেখিয়াছেন, ভাল শুনিয়াছেন, সর্ব্বদা সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যৌবনে পদার্পণ করিয়া সৎসঙ্গে কাটাইয়াছেন, সৎবিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। এইরূপে ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানী হইয়াছেন। যাঁহাদের সৎ বিষয়েই সর্ব্বদা মতি, সৎ বিষয়েই একান্ত উৎসাহ, তাঁহারা স্বভাবতঃই সৎ হইয়া থাকেন এবং এই রূপেই ক্রমে ভগবানের নিকট উপস্থিত হন। এই সকল লোক জ্ঞান এবং মানবপ্রেম, পরোপকার ও প্রিয়কার্য্য সাধনের দ্বার দিয়া ঈশ্বরের নিকট উপনীত হন। অতি ধীরে ধীরে, কখন যে কিরূপ ভাবে ঈশ্বর-সন্নিধানে উপস্থিত হন তাহা বলিতে পারেন না। যেমন নদীর জল স্বভাবতঃই সাগরে যায়, এক খণ্ড কাষ্ঠ জলে পড়িলে ভাসিয়া আপনা আপনি সাগরের জলে গিয়া উপনীত হয়, সেইরূপ ইঁহারাও ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া ঈশ্বরের ক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হন। দেখিয়াছি মানুষ সরলও প্রমুক্ত হৃদয়ে সত্যের সেবা করিয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। জীবনে হয় ত বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তাঁহারা ঈশ্বরে একান্ত বিশ্বাসী এবং অনুরাগী হইয়া অজ্ঞাতসারে স্রোতস্বতীর ন্যায় ক্রমে ঈশ্বরসন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছেন।

একজন জ্যোতির্ব্বেত্তার সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, একদা রাত্রিতে একাগ্রচিত্তে গগনবিহারী জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় ঈশ্বরের মহিমার ভাবে এত পূর্ণ হইয়া উঠিল যে, তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া-উঠিলেন, "O God, O God! I think thy thoughts after thee" হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর তোমার চিন্তার পশ্চাতে আমার চিন্তা ঘুরিতেছে। এই জ্ঞানীর জ্ঞান স্বাভাবিক ভাবে তাঁহাকে ঈশ্বরে উপনীত করিয়াছিল। তিনি কোনও উপাসনা মন্দিরে হয় তো উপাসনা করেন নাই, সুমিষ্ট সংগীত কিম্বা কীর্ত্তন শুনিয়া হয় তো মত্ত হন নাই, কিন্তু তবুও জ্ঞান তাঁহাকে ঈশ্বরচরণে লইয়া গিয়াছে। আবার যাঁহারা নিজের দেহ মন প্রাণ সমুদায় ঈশ্বরচরণে দিয়াছেন, তাঁহার সেবায়, তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধনে উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারাও মানব-প্রেম রূপ দ্বার দিয়া ঈশ্বরচরণে উপনীত হইয়াছেন। ইটালীর দেশ হিতৈষী স্বদেশপ্রেমিক ম্যাটসিনির জীবন পর্য্যালোচনা করিলে কি দেখিতে পাই?—তিনি স্বদেশবাসিগণের দুঃখ দেখিয়া যারপর নাই ব্যথিত হইয়াছিলেন। স্বদেশের দুঃখ দূর করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; দেহ, মন, প্রাণ বৈরাগ্যের আগুণে আহুতি দিয়াছিলেন, শান্তি কিম্বা আরাম কিরূপ, একবার আস্বাদনও করিয়া দেখেন নাই। মানব প্রেমের বহ্নি তাঁহার স্বার্থকে একেবারে ভস্ম করিয়া দিয়াছিল। এই জন্যই স্রোতস্বতী নদী যেরূপ ক্রমে সাগরের জলে বিলীন হইয়া যায়, তিনিও ক্রমে সেইরূপ ঈশ্বর বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছিলেন। সাধু, নির্ম্মল এবং প্রেমিকহৃদয় ব্যক্তিই স্বভাবতঃ ঈশ্বরচরণে উপনীত হইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধকের মনকে টানিয়া ঈশ্বরের চরণে আনিতে হয়। হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে পাপের বীজ উৎপাটিত করিয়া তবে ঈশ্বরচরণে উপনীত হইতে হয়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা, যাঁহারা পাপের তীব্র যাতনায় অনুতপ্ত হইয়া ঈশ্বর চরণে আসেন, তাঁহারা অতিশয় দুর্ভাগা। বালককালে (যাহা না শিখিলে আত্মার কল্যাণ হইত,) এমন কিছু শিখিয়াছেন, যৌবনে এমন কিছু করিয়াছেন, যাহার স্মৃতি চিরকালের জন্য হৃদয়ে সঞ্চিত রহিয়াছে ও দুঃখ দিতেছে। কুসঙ্গের দোষে পাপের বাণ হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছে। বাণের সঙ্গে পাপের তুলনা এই জন্য যে, তীর গায় ফুটিলে তখন বুঝা যায় না। তলোয়ারের চোট যখন লাগে, সেই মুহূর্ত্তে কিছুই অনুভূত হয় না। এক মিনিট পরে মাথায় হাত দিয়া দেখা যায়, রক্তে মুখ ভাসিয়া যাইতেছে। পাপের প্রকৃতিও এইরূপ। মানুষ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যখন পাপে লিপ্ত হয়, সে মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারে না, কি সর্ব্বনাশ হইল। পরে তাহার ফল জানিতে পারে। তীরের সহিত পাপের তুলনা করিবার দ্বিতীয় কারণ এই,—দেহে তীর সহজে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু উৎপাটন করা সেরূপ সহজ নহে। পাপের অভ্যাস ও সহজে হয়, কিন্তু উৎপাটন করা অতীব দুঃসাধ্য। পিতা মাতা যতই কেন সাবধান হউন না, ছেলেরা মন্দটা সহজেই শিখিয়া ফেলে; কিন্তু পশ্চাৎ টানিয়া বাহির করা যায় না। আমাদের অনেককে আজ এই বলিয়া অশ্রুপাত করিতে হইতেছে যে, যাহা শিখিয়াছি তাহা আজ অনেক চক্ষের জল দিয়াও ভুলিতে পারিতেছি না। এই তীর তুলিবার উপায় কি, এ চিন্তা কি মনে হয় না? যখন এ তীর প্রাণে বিদ্ধ হইয়াছিল, তখন বুঝিতে পারি নাই, এখন কে তাহা উৎপাটন করে? কে সান্ত্বনা দেয়? এই ভগ্নহৃদয়কে আশার বাণী শুনাইয়া কে রক্ষা করে? এইরূপ অবস্থায় মানুষ উপস্থিত হইলে আপনাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে এবং পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়। তখন স্বভাবতঃই মন ঈশ্বর চরণে যাইতে চায়। এই ব্যাকুল অবস্থায় লোকে তাহাদিগকে যাহা ধরাইয়া দেয় তাহাই ধরে। যাহারা পাপীর সান্ত্বনার কারণ জানে না, কি উপায় অবলম্বন করিলে পাপী শান্তি লাভ করিবে বুঝিতে পারে না, তাহারাই নামের মালা জপ কর, তন্ত্র মন্ত্র অবলম্বন কর ইত্যাদি বলিয়া দেয়; কিন্তু প্রাণ তাহাতে শান্তি পায় না, তৃপ্তি লাভ করে না। তপস্যা করিলে শান্তি পাইবেন এই আশায় বুদ্ধ ৬ বৎসরকাল দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞাবলে তপস্যা করিলেন; কিন্তু কোথায় শান্তি; শান্তি পাইলেন না। বেদনা কিছুতেই যায় না। অবশেষে পাপী ঈশ্বর চরণে পড়িয়া বলে—"তুমি ত দূরে নও, ত্বরায় নিকটে এস" যতক্ষণ তাঁহার সহিত মিল না হয় ততক্ষণ কিছুতেই প্রাণ শান্তি লাভ করে না। ঈশ্বরের হৃদয়ে আসার অর্থ কি? এই স্থলে আমরা প্রায়ই ভ্রমে পতিত হইয়া থাকি। যখন আমরা তাঁহাকে পাইবার জন্য তাঁহার চরণে বসিয়া চিত্তকে একাগ্র করিতে চেষ্টা করি এবং তাঁহাকে ডাকি, তখন প্রায়ই দেখা যায় যে, অন্তঃকরণে একপ্রকার অন্তঃস্ফূর্ত্তআনন্দের সঞ্চার হয়; এবং সাময়িক ভাবের উত্তেজনায় মন উত্তেজিত হয়। ইহা দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে, প্রভু হৃদয়ে আসিলেন। যদি বিশেষ ভাবে একটু আত্ম-পরীক্ষা করা যায়, তবে দেখিতে পাই যে, এ আনন্দ কল্পনাপ্রসূত ও ক্ষণিক; যেমন একজন দরিদ্র ব্যক্তি দারিদ্র্যে চিরনিমগ্ন থাকিয়াও কল্পিত সম্পদ ও সুখ ভোগ করিতে পারে, সেইরূপ মানুষও "এই প্রভু হৃদয়ে আসিলেন," এরূপ কল্পনা করিয়া আনন্দিত হইতে পারে। মানুষ কল্পিত অবস্থায় আপনাকে ফেলিয়া যেমন হর্ষ শোক অনুভব করে, আমরাও তেমনি অনেক বার আপনাদিগকে কল্পিত অবস্থায় ফেলিয়া, প্রেম, বৈরাগ্য প্রভৃতির উচ্চাবস্থা ভোগ করিতে পারি; ক্ষণকালের জন্য মনে করিতে পারি, ঈশ্বরকে অদেয় আমার কিছুই নাই। এই মনে করিয়া ক্ষণিকভাবের উত্তেজনা হয়। যাহাদের ঈশ্বরচরণে সব দিবার ভাব কিছুই নাই, একান্ত স্বার্থপর, এক টাকাকে পিতৃঅস্থি তুল্য জ্ঞান করে, তাহারাও ক্ষণিকভাবের উত্তেজনায় মনে করে "এই ত প্রভু এসেছেন, এই ত এখন আমি সব দেহ মন প্রাণ তাঁর চরণে দিতে পারি।" এইরূপ সাময়িক উত্তেজনার আনন্দের দ্বারা প্রতারিত হওয়া উচিত নয়। এ অবস্থাকে কেহ হৃদয়ে ঈশ্বরের আগমন বলিয়া যেন মনে না করেন।

আর এক প্রকার ভাব আছে, তাহাকেও চেষ্টা করিয়া বর্জ্জন করিতে হইবে। দশ জন ভক্ত সাধুর সঙ্গে একত্রে

উপাসনাতে বসিয়াছি, দশ জনের উৎসাহে আনন্দে আমারও হৃদয় উৎসাহিত ও আনন্দিত হইয়াছে। উৎসবে বসিয়াছি, দশজন সাধু ভক্তের সঙ্গে মিলিত হইয়া হৃদয় নাচিয়া উঠিল, উৎসাহিত হইল। এইরূপ যে হৃদয়ের আনন্দ ইহাও ঈশ্বরের কৃপাতেই হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাকেও সম্পূর্ণ ঈশ্বরের আগমন মনে করা উচিত নয়। ইহা অনেক পরিমাণে সেচন করা জলের ন্যায়; দুই দিনেই শুকাইয়া যাইবে। আমার নিজের ক্ষেত্রে জল নাই; পরের ক্ষেত্র হইতে জল সেচন করিয়া আনিলে কতক্ষণ থাকিবে? আমার হৃদয়ে সে কূপ চাই, যাহা হইতে নিরন্তর সুস্নিগ্ধ বারি পাইব। এইরূপ সাময়িক অবস্থা বিশেষের উত্তেজনাকে ঈশ্বরের আগমন মনে করিবে না। তবে তাঁহার আগমন কি প্রকারে বুঝা যাইবে? আগমনের ব্যাপার বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। তথাপি কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। আত্মা ও পরমাত্মাতে যে মিলন, তাহার ফল ক্ষণিক ও অস্থায়ী নহে, অথবা তাহা কেবল ভাবের উচ্ছ্বাসও নহে। জ্ঞান যখন তাঁহাকে পরম সত্য বলিয়া অবলম্বন করে, প্রেম যখন তাঁহাকে প্রেমাস্পদ বলিয়া আলিঙ্গন করে এবং ইচ্ছা যখন তাঁহাকে প্রভু বলিয়া তাঁহার অনুগত হয়, তখন ঈশ্বর আত্মার অন্ন পান স্বরূপ হইয়া আত্মার পুষ্টি সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহার সংস্পর্শে আত্মাতে স্থায়ী বল, আশা ও আনন্দের আবির্ভাব দেখা যায়। এই বল আশা ও আনন্দ আত্মার সম্পত্তিস্বরূপ হইয়া তাহাকে উন্নত করে? এবং তাঁহার আগমনের ফলস্বরূপ ইহার সৎসংকল্প সকল জাগ্রত হয়।

শ্রেয় ও প্রেয়।

(পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক ১৪ই অক্টোবর ১৮৯৪ রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে বিবৃত উপদেশের সারাংশ)

বাল্যকালে যখন খেলা করিতাম, তখন কোনও কোনও খেলাতে দুইদল হইয়া খেলা হইত। কে কোন্ দলে যাইবে, তাহা ঠিক করিবার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করা হইত। একজন বালক এক হস্তের মুষ্টিতে বেলপাতা, অপর হস্তে কচুপাতা লুকাইয়া আসিয়া বলিত—"কে নেবে বেলপাতা কে নেবে কচুপাতা?" যে বেলপাতা লইত সে বেলপাতার, যে কচুপাতা লইত সে কচুপাতার দলে যাইত। তৎপরে খেলাতে যদি বেলপাতার দল হারিয়া যাইত, তবে ভাবিতাম, হায়রে যদি কচুপাতার দলে থাকিতাম তাহা হইলে হারটা সহ্য করিতে হইত না।

কেবল বালকদিগের ক্রীড়াতে নহে, বয়োবৃদ্ধদিগের কার্য্যেও সর্ব্বদা দুই দলে ভাগ হইতেছে। যখন কুরু-পাণ্ডবের বিরোধ উপস্থিত হইল, তখন উভয় দলের হিতার্থী কৃষ্ণ যাহাতে সন্ধি স্থাপিত হয় তাহার জন্য প্রথমে যথেষ্ট প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু কিছুতেই শান্তি স্থাপিত হইল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ কাহাকে ছাড়িয়া কোন্ দলে যাইবেন, তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া এক উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি একদিকে স্বয়ং, অপর দিকে তাঁহার নারায়ণী সেনা রাখিয়া উভয় দলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে নেবে একা কৃষ্ণকে,' কে নেবে নারায়ণী সেনাকে?" স্থূলবুদ্ধি দুর্য্যোধন ভাবিল, কৃষ্ণ একাকী, ইহাকে লইয়া কি হইবে? একটী শরনিক্ষেপ বৈ ত নয়? একা কৃষ্ণ মরিলেই ত সব ফুরাইয়া গেল। নারায়ণী সেনা, সংখ্যাতে অনেক, ইহারা আমার দলে মিশিলে আমার দলের যথেষ্ট পুষ্টিসাধন হইবে। দুর্য্যোধন নারায়ণী সেনাই গ্রহণ করিল। আর সত্যনিষ্ঠ ধার্ম্মিক পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকেই গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদেরই থাক।" তখন প্রজাবর্গ এই বলিয়া জয়ধ্বনি করিল যে, "জয়োস্তু পাণ্ডু-পুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দন।" পাণ্ডবদিগেরই জয়—স্বয়ং জনার্দ্দন যে পক্ষে গেলেন।"

সংসারে এইরূপ দল-বিচ্ছেদ সর্ব্বদাই সংঘটিত হইতেছে। তোমার জীবনে, আমার জীবনে, সকলের জীবনেই ঘটিতেছে। ভগবানকে নেবে না বিষয়-সুখ নেবে—এই প্রশ্ন আসিতেছে সত্য চাই কি বিষয় চাই? এই সকল প্রশ্নের উত্তর অনুসারেই মানুষ দুইভাগে বিভক্ত। চীনদেশীয় মহাত্মা কংফুচ বলিয়াছেন,—"The mind of the superior man is conversant with *righteousness*; the mind of the mean man is conversant with *gain*" অর্থাৎ যথার্থ মনস্বী পুরুষ সত্যে এবং ধর্ম্মে সর্ব্বদা রত থাকেন, আর নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা পার্থিব লাভালাভে ব্যস্ত থাকে। একদিকে ধর্ম্ম, অপরদিকে লাভ; একদিকে সত্য, অপরদিকে বিষয়-সুখ, একদিকে কর্ত্তব্য, অপরদিকে আরাম। এইরূপ দুইটী পথ মানবের সম্মুখে সর্ব্বদাই আসিতেছে। যে, যে পথ অনুসরণ করে, সেইঅনুসারে অপরের সঙ্গে তাহার প্রভেদ। একজন সাধুতে, আর আমাতে কিম্বা তোমাতে কি প্রভেদ? কে লাভ চাও? হাত তোল—কে ঈশ্বরকে, ধর্ম্মকে চাও? হাত তোলা বিষয়সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে যদি লোভ থাকে, তবে প্রেয়ের দলে যাও; যদি ধর্ম্ম চাও, সত্যপ্রিয় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইতে চাও, তবে শ্রেয়ের দলে এস।

সংসারে দেখা যায় যে, যাঁহারা ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, প্রথম প্রথম তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। এইরূপ অবস্থা বর্ত্তমান সংসারে রহিয়াছে। কিন্তু এমন দিনও আসিতে পারে যখন ধার্ম্মিকতা (Rightousness) এবং লাভ (gain) দুইই একত্রে মিলিত হইবে,—ধর্ম্মকে আশ্রয় করিলে আর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। বর্ত্তমানে দেখিতে পাই, ধর্ম্ম এবং লাভ পরস্পর বিরোধী। ধার্ম্মিক প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। ধর্ম্মের আশ্রয় লইলে আপাততঃ ক্ষতি হইতে পারে বটে, কিন্তু ধার্ম্মিক চরমে লাভবান হইবেনই হইবেন। "জয়োস্তু পাণ্ডু-পুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দন।" এই উক্তিটিতে গূঢভাবে এই কথা নিহিত রহিয়াছে যে, যিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করেন না, চিরকাল ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকেন, তিনি পরিণামে লাভবান হইবেনই হইবেন।

একবার কয়েকজন ব্রাহ্মবন্ধু কলিকাতার চিনেবাজারে একটী দোকান খুলিয়াছিলেন। তাঁহারা একদরে জিনিসপত্র

বিক্রয় করিবেন বলিয়া সংকল্প করিলেন। প্রথম প্রথম লোকে বিশ্বাস করিল না; একদরে জিনিস বিক্রয় করিবে, দর দস্তর করিবে না. ইহা লোকের নিকট বাতুলতা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; দোকানে লোক আসে, দর জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যায়। এক দরের দোকান হইতে কেহ জিনিস ক্রয় করে না। তাঁহাদের ক্ষতি হইতে লাগিল। এমন কি মূলধন বেশী না থাকাতে কিছুদিন পরে তাঁহারা দোকান বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, যদি তাঁহারা কিছুকাল টেঁকিয়া থাকিতে পারিতেন,তবে লাভবান হইতেন। তাহার প্রমাণ, একদিন এক জন ইংরাজ তাঁহাদের দোকানে আসিয়া একটী জিনিস দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার দর কত?" তাঁহারা বলিলেন, "৭৷৷০ টাকা।" সাহেব ইহা শুনিয়া অন্য দোকানে গেলেন। কিন্তু দেখিলেন, কেহ তদপেক্ষা কম মূল্য বলিল না। তখন তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই দোকানে আসিয়া বলিলেন, "Babus are you Brahmo Samaj?" বাবু তোমরা কি ব্রাহ্মসমাজের লোক? বলা বাহুল্য তাঁহাদের দোকানের সেই জিনিসটীই সাহেব গ্রহণ করিলেন। ইহাতে দেখা যায় যে, যদি তাঁহারা প্রথম প্রথম ক্ষতি সহ্য করিয়া দোকান রক্ষা করিতে পারিতেন, তবে শেষে নিশ্চয়ই লাভবান হইতেন।

লাহোরে একবার কয়েকজন লোকে এক দরের দোকান খুলিল। দোকানের নাম রাখিল, "সাচ্চি দুকান।" যেই আসুক না কেন, একদর। প্রথমে বড় বেশী বিক্রয় হইত না, কিন্তু ক্রমে এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইল যে, কাহারও কোন জিনিষ কিনিবার প্রয়োজন হইলে বলিত, "সাচ্চি দুকান হইতে আনিও।" এই সকল কারণে দেখা যায় যে, ধার্ম্মিকতা ও লাভ প্রথমে বিরোধিভাবাপন্ন থাকিলেও চরমে উভয় মিলিত হয়। বর্ত্তমান জগতে এতদুভয়ে মিলন দেখা যায় না। সংসারে নরনারীদিগের মধ্যে কে কোন্ দলের লোক, তাহা কে শ্রেয় কে প্রেয় চায়, এই প্রশ্ন করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। দুঃখের বিষয়, সংসারের অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, যাহারা শ্রেয়কে লঙ্ঘন করিয়া প্রেয়কেই আশ্রয় করিয়াছে, তাহারাই প্রতিপত্তিশালী হইয়া থাকে। যদি সংসারে ধনী হইতে চাও, তবে লাভের দিকেই যাও। সংসারে সত্যনিষ্ঠ, সারবান ধার্ম্মিক লোকেরা আদর পায় না,আর কত অসার মনুষ্য,যাহারা প্রেয়তে ডুবিয়া রহিয়াছে, তাহাদেরই উন্নতি হইয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া দুর্ব্বল লোকেরা প্রেয়কেই আশ্রয় করিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা প্রত্যেক জীবনে এবং রাশি রাশি উদাহরণে প্রমাণিত হয়।

মানবের জীবনে এইরূপ দুইটি অবস্থা নিয়তই উপস্থিত হইয়া থাকে। "শ্রেয় না প্রেয়?" "বেলপাতা না কচুপাতা?" ব্রাহ্মগণ একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমব্রহ্মের উপাসনাকে অবলম্বন করিয়াছেন। এই হৃদয়বিহারী পুরুষকে জ্ঞান দ্বারা অর্চ্চনার যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন,সেই শ্রেয়পথ,এই পথ পরিত্যাগ করিয়া যদি বলেন "ইহা কিছুই নয়," তবে দেশের লোকে তাঁহাদের প্রশংসা করিবে, তাঁহারা লাভবান হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবু কেন তাঁহারা প্রেয়কে দূর করিয়া শ্রেয়কে অবলম্বন করিয়াছেন? দুর্ব্বলচিত্ত লোকেরা প্রায়ই দেখিতে পায় যে, প্রেয়কে আশ্রয় করিয়া বহু লোক ধনী হইতেছে, এরূপ অবস্থায় তাহারাও ঠিক থাকিতে পারে না। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম পথে বিচরণ করা কঠিন জ্ঞান হওয়াতে তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

প্রথমে দেখা চাই যে. শ্রেয় ও প্রেয় এই দুইএর কোন্‌টা আমরা চাই। যাঁহারা সেই পরমপুরুষের উপর বিশ্বাস করেন, ধর্ম্ম তাঁহাদের আলো। সেই আলোকে যাঁহারা চলেন, তাঁহারা দুঃখ, ক্লেশ, বিপদে সর্ব্বদাই সত্যের দিকে থাকেন। সংসারের সুখ সম্পদ বিপদ সকলই অনিত্য; আজ যাহা আছে, কাল তাহা নাই। আজ যার প্রতি একান্ত অনুরাগ, কাল তার প্রতি বিরাগ। আজ তোমাকে যে বলিতেছে ভাল, কাল সে বলিতেছে মন্দ। সকলই চঞ্চল, সম্পদ বিপদ সকলই চঞ্চল। এই অনিত্য চঞ্চল জগতে একমাত্র সত্যস্বরূপ প্রভু পরমেশ্বরই স্থির. ধীর, নিত্য সত্য, তিনি একমাত্র গতি। ধর্ম্ম এবং সত্য আজও উজ্জ্বল, কালও উজ্জ্বল এবং চিরকালই সমভাবে উজ্জ্বল থাকিবে। যিনি এই অসার অনিত্য অকিঞ্চিৎকর সংসারে লাভালাভ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ের পথ অবলম্বন করিয়াছেন, একমাত্র ধর্ম্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই ধন্য, তাঁরই চরমে কল্যাণ। আর প্রেয়কে যে আশ্রয় করে, পরমার্থ হইতে সে বঞ্চিত হয়। ঈশ্বর করুণা করুন, আমরা যেন প্রেয়কে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই সত্যধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়া পরমার্থ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

ব্যাখ্যান রত্নাবলী।

২২ শে অক্টোবর ১৮৯৪।

সাধনাশ্রমের উপাসনা কালে বিবৃত।

চীনদেশীয় সাধু কংফুচস্ তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন,—"তোমরা যাহা নও, তাহা উপদেশ দিওনা, এবং যদি উপদেশ দেও, তবে স্বরায় তদ্রূপ হইতে চেষ্টা কর।" উপদেষ্টাগণ যদি নিজে স্থির করেন যে. "আমি যাহা নিজে করিব না অথবা করিয়া দেখি নাই, তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিব না। তাহা হইলে অনেক উপদেশ বন্ধ হইয়া যায়। অন্ততঃ যদি এরূপও মনে করা যায় যে, পরের উপকারের জন্য যাহা বলি, অগ্রে তথা নিজে করিতে চেষ্টা করি; তাহা হইলেও মঙ্গল হয়।

মানুষ যে সকল বিষয় উপদেশ দেয়, তাহা যখন উপদেষ্টার পরীক্ষিত সত্য হয়, তখনই তাহা নরনারীর হৃদয়ে প্রবেশ করে, তাহাতেই কাজ হয়। অতএব যাহা উপদেশ দিব, তাহা প্রাণপণে অগ্রে নিজ জীবনে সাধন করিব।

একবার ইংলণ্ডে কোনও বক্তা সাধারণ লোকদিগের নিকট সুরাপানের সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছিলেন। ইংলণ্ডের লোকে

সুরাপান করিয়া যে রূপ দুরবস্থায় পড়ে, তাহা স্মরণ করিলে হৃদকম্প হয়। সুরাপান করিয়া নরনারী কি ভয়ানক কষ্টে পতিত হয়, বক্তা তাহা যখন বর্ণন করিতে লাগিলেন, তখন যেন তাঁহার মুখ হইতে অগ্নি বৃষ্টি হইতে লাগিল। শত শত ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল যে, তাহারা আর কখনও সুরাপান করিবে না। বক্তা বক্তৃতা করিতে করিতে বলিলেন, "পরিমিত সুরাপান করাও অনুচিত।" এই কথা বলিতে গিয়া তাহার স্মরণ হইল যে, তিনিও পরিমিত সুরাপান করেন। ইহা স্মরণ হইবামাত্র তিনি বলিতে লাগিলেন,—"তোমরা শুন, আমিও পরিমিত সুরাপান করিয়া থাকি, কিন্তু আজ তোমাদের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিতেছি আর কখন পরিমিত সুরাও পান করিব না।" ইনি উপদেশ দিতে গিয়া নিজে সুরাপান পরিত্যাগ করিলেন, কনফুচের নীতি অনুসরণ করিলেন।

আমরা যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য জগতকে নিমন্ত্রণ করিতেছি, সাধু উক্তি সকল ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে সাধু হইতে বলিতেছি, নিস্বার্থভাব জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিতেছি, সে সমুদয় বিফল হইয়া যাইবে, যদি সেই সকল উপদেশ নিজে পালন না করি। যে মুহূর্ত্তে বলিতেছি, "তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, সেই মুহূর্ত্তে যেন প্রকৃত বিশ্বাসীর মত আচরণ করিতে পারি; যখন অপরকে বলিতেছি, "সাধন ভজন কর" তখন যেন মনে উদয় হয়, আমি এই মুহূর্ত্ত হইতে সাধনশীল হইব। এইরূপে আমরা যখন যে উপদেশ দান করি, তদনুসারে যেন নিজ জীবন গঠনে যত্নশীল হই।

একজন সাধু বলিয়াছেন, "ঈশ্বরাশ্রিত লোকদিগের লক্ষণ এই;—ঈশ্বরে তাঁহাদের চিন্তার গতি, ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহাদের স্থিতি, ঈশ্বরোদ্দেশ্যে তাঁহাদের কার্য্যানুরক্তি হয়।" এই ব্যক্তির মধ্যে বিশ্বাসের যে তিনটি লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিলে ইহাই দেখা যায় যে, বিশ্বাসের প্রথম লক্ষণ, সমুদয় পদার্থে ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখা; ২য়, লক্ষণ সকল কার্য্যে ঈশ্বর-মুখীন হওয়া, তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করা, সকল কার্য্যেই তাঁহার সহায়তা লাভের জন্য প্রার্থনা করা। ১ম বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করা যাউক। এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৌন্দর্য্য রাশি দর্শন করিয়া তাঁহার কথা মনে পড়ে কিনা? সুনীল ঘন ও আকাশের শোভা; অভ্রভেদী অত্যুন্নত গিরিরাজির বিশাল সৌন্দর্য্য ইত্যাদি দর্শন করিয়া তাহার কথা মনে পড়ে কিনা? নির্জ্জন বন মধ্যে বিহঙ্গমের সুললিত স্বর শ্রবণ করিয়া, প্রভাতের নবোদিত সূর্য্যের তরুণ কিরণ এবং সন্ধ্যা সমাগমে প্রকৃতির স্নিগ্ধভাব অবলোকন করিয়া তাঁহার কথা স্মরণ হয় কিনা? ইহা হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বিষয়। জড় এবং চেতনের মধ্যে যাহা দর্শন করিতেছি, শ্রবণ করিতেছি, আস্বাদন করিতেছি, উপলব্ধি করিতেছি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাণদেবতার দিকে চাহিতেছি কিনা? যে কোন অনুষ্ঠান করিতেছি, মন তাঁহাতে নিমগ্ন হয় কিনা?

২য়—সকল কার্য্যে ঈশ্বরমুখীন থাকা। সংসারে দেখি বাড়ীতে কোনও বিপদ ঘটিলে কর্ত্তার মন অহোরাত্র যে দিকেই রহিয়াছে। তিনি আফিসে যাইতেছেন, বাজারে যাইতেছেন, লোকের সহিত কত কারবার করিতেছেন, কিন্তু মন সেই গৃহের পীড়িত পুত্রের দিকে। যাহারা বিষয়ী লোক সর্ব্বদা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকে, তাহাদের মন বিষয়েতেই লাগিয়া থাকে। তাহারা গঙ্গা স্নান করিতে যায়, মালা জপ করে, কিন্তু মন অর্থোপার্জ্জনের দিকে, মামলা মোকদ্দমার দিকে। তদ্রূপ কি হে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা! তোমাদের মন সংসারের সকল কার্য্যে, আহার বিহারে, কার্য্যক্ষেত্রে ও নির্জ্জনে সর্ব্বত্র সকল অবস্থায় সেই ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে? মনের গতি কি সেই দিকে? যেমন পথিক গন্তব্য স্থানে উপনীত হইবার জন্য হাঁটিতেছেন, তিনি প্রতিপদ বিক্ষেপে গন্তব্য স্থানের কথা স্মরণ করিতেছেন না এবং ঠিক পথে যাইতেছি কিনা ইহাও ভাবিতেছেন না, তথাচ তিনি যেমন কিছুকাল পরেই গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন, তোমরা কি ভগবানের দিকে সেই রূপে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে গমন করিতেছ?

৩য় সাহায্য প্রার্থনা। কি রূপে ভাল হইব, এই প্রশ্ন উদয় হইলে অমনি প্রার্থনা-চক্ষু তাঁহার দিকে পতিত হইবে। সমাজ ও বন্ধুগণ কি রূপে ভাল হইবেন, অমনি প্রার্থনা; কোনও অভাবের কথা উঠিলেই প্রার্থনা, এরূপ প্রার্থনাই বিশ্বাসের লক্ষণ। অন্যের দোষ দেখিলে নিন্দা না করিয়া প্রার্থনা; সকল অভাবের সময়, বিবাদের সময় প্রার্থনা; প্রার্থনাই সহায়, প্রার্থনাই সম্বল। এইরূপে যখন যে কোনও বিষয় উপস্থিত হয়, যদি প্রার্থনার দিকেই চক্ষু পড়ে, তাহাই বিশ্বাসের লক্ষণ। সাধুগণ বিশ্বাসের যে তিনটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অতি গভীর তত্ত্বমূলক। ঈশ্বর করুন, এই সাধনে যেন আমরা কৃতকার্য্য হই।

একজন সাধুর উক্তি হইতে কিয়দংশ পাঠ করিতেছি;—

"ঈশ্বরের উপর তুমি নির্ভর স্থাপন করিও, তাহা হইলে ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকিবেন, তুমিও তাঁহাতে স্থিতি করিবে; দুঃখ কষ্টের সময় অন্যকে না বলিয়া তাঁহাকে বলিবে, যেহেতু লোক সমুদায় তোমার ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই করিতে পারে না। তাঁহার নিকটে সমুদায় মহোষধ রহিয়াছে, যদি তুমি কোনও প্রার্থনা কর, তাঁহার নিকটেই করিবে। কোন দুঃখ বা কোনরূপ বিপদ কিম্বা কোন প্রকার অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে, জানিও তাহা গোপন করিলেই তাহার দ্বার উন্মোচন হইবে।" এই উপদেশ অতি প্রাচীন। ঈশ্বরকে সত্যবস্তু বলিয়া, অতি নিকটস্থ সহায় বলিয়া, নিকটতম বন্ধু বলিয়া যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের উপর এই প্রকারেই নির্ভর করিয়া থাকেন। যখন বিপদ, ক্লেশ, দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন তাঁহাদের দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের উপরেই পড়ে। তাঁহারা দুঃখ বিপদের কথা বাহিরে প্রকাশ না করিয়া গোপনে ঈশ্বরচরণে নিবেদন করেন; তাঁহারা ঈশ্বর হইতে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হন। এরূপ জীবনকেই প্রকৃত নির্ভরশীল জীবন বলা যায়।

এরূপ জীবনের সহিত তুলনা করিলে আমাদের কি শোচনীয় অবস্থাই দেখিতে পাই। বিপদে পতিত হইলে আমাদের মন সর্ব্বাগ্রে কাহাকে অন্বেষণ করে? আমরা কি তাঁহার

নিকট হইতে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করি? তাঁহার নিকট হইতে কি আশা ও বল পাই? সকল কার্য্যের মধ্যে কি সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই দেখি? এই সকল প্রমাণের দ্বারা আত্ম-পরীক্ষা করিলে অনুভব করা যায় যে, আমাদের জীবনের সহিত তাঁহার তেমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই। তজ্জন্যই আমাদের দুঃখ কষ্ট।

জীবন তাহাতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে ধর্ম্মসাধন হয় না। ধর্ম্মসাধন বাহিরের বিষয় নহে। আমাদের কি অবস্থা? আমরা যে মানুষকে দুর্ব্বল হীন বলিয়া থাকি, সেই মানবের উপরেই নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে ইচ্ছা করি। জগতে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, আজ যিনি অনুকূল, কাল হয় ত প্রতিকূল, আজ যিনি সহায়, কাল তিনি শত্রু, এরূপ মানুষের উপর নির্ভর করিয়া কতবার প্রবঞ্চিত হইতেছি, তথাচ তাহাদের উপরেই নির্ভর করিতেছি; কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর—যাঁহার প্রেমের পরিবর্ত্তন নাই, তাঁহার প্রতি নির্ভর করিতে পারিতেছি না। ইহাই আমাদের ভয়ানক ব্যাধি! আমরা তাঁহার চরণে শরণ লইতে পারিতেছি না। সকল দেশের সকল সাধুগণ বলিতেছেন, "মানবাত্মার জীবন তাঁহার চরণে। অনন্যগতি হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন না হইলে কল্যাণ নাই।" অথচ তাঁহার চরণে পড়িয়া থাকিতে পারি না। তাঁহাতে ঔষধ আছে জানি; কিন্তু লাভ করিবার জন্য ব্যাকুলতা নাই, একাগ্রতা নাই, অস্থিরতা নাই। এজন্যই আমরা দুর্ব্বল ও হীনাবস্থায় পতিত হই। ঈশ্বর কৃপা করুন, আমরা যেন বিপদে ক্লেশে দুঃখে একান্ত মনে তাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দান করি।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আমার শরীর নিতান্ত অসুস্থ ছিল বলিয়া বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের শেষ পত্রের শেষ উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। এ পত্রখানও রোগশয্যায় থাকিয়া লিখিতেছি।

(১) আমি বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্রমূলক অধিকারকে সাম্যের বিরোধী মনে করিয়াছি, দেবেন্দ্র বাবু আমার কোন্ কথায় এরূপ বুঝিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। শিক্ষকতা করিতে হইলে যে বিদ্যার প্রয়োজন, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। ধর্ম্মোপদেশ দিতে হইলে যে অগ্রে ধার্ম্মিক হওয়া আবশ্যক তাহা আমি অজ্ঞাত নহি। কিন্তু শিক্ষক বলিয়া একটা শ্রেণী স্বতন্ত্র সৃষ্টি করিতে হইবে, ধর্ম্মযাজনার জন্য ব্রাহ্মব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিতে হইবে, আজ যিনি শিক্ষক কাল তিনি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইতে পারিবেন না, যিনি একবার ধর্ম্মযাজকের ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন তিনি আজীবন সেই ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিবেন, ইচ্ছা হইলে অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিবেন না, এই ভাবে ব্যবসায় বর্ণ বা জাতিবিভাগ করিতে হইলে ইহার ভবিষ্যৎ ফল অশুভজনক হইবে আমি এ কথাই বলিয়াছিলাম, এইরূপ ভাবে বর্ণবিভেদ যে সাম্যের বিরোধী তাহা আমি বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। অধিকারের দাবি দাওয়া হইতেই সংসারে যত অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে। এই জন্যই মার্সেলোর কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। কে কাহার অপেক্ষা বড় এবং কত বড় ইহা নির্দ্ধারণ করাই যেন জীবনধারণের প্রধান লক্ষ্য; না করিলে যেন মনুষ্যত্ব রক্ষা পায় না। মানুষ মানুষের ভাই ইহা স্মরণ রাখিয়া সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে গেলে সমুদায় উন্নতি-স্রোত বন্ধ হইয়া যাইবে, পৃথিবী রসাতলে যাইবে একথা আমি স্বীকার করি না। কিন্তু দেবেন্দ্র বাবু ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার প্রথম পত্রে একথা স্পষ্ট লিখিত আছে; শেষেও তিনি একথা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঈশ্বর কাহাকেও শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, কাহাকেও নিকৃষ্ট করিয়াছেন এই তাঁহার মত। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলিয়াছিলেন, এক জাতীয় দুইটী পক্ষীর মধ্যে ঈশ্বর একটীকে অধিক পালক দিয়া শীত হইতে রক্ষা করিতেছেন, আর একটী শীতের উপদ্রব ভোগ করিতেছে। আমি একথা স্বীকার করি নাই। তিনি আমাকে ওয়ালেস্ প্রণীত Darwinism অধ্যয়ন করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার এই অনুগ্রহের জন্য বিশেষ বাধিত হইলাম। মনে করিয়াছিলাম, পূর্ব্বে ওয়ালেসের উক্ত গ্রন্থে যাহা খুঁজিয়া পাই নাই, মুখোপাধ্যায় মহাশয় অধ্যায় ও স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়ায় অবশ্যই তাহা পাইব, একটা ঘোর অজ্ঞানতা দূর হইয়া যাইবে, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হইল না, নির্দ্দিষ্ট রত্নরাজির অনুসন্ধান করিয়াও তাহা পাইলাম না। তিনি যে তিনটী অধ্যায় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহার প্রথমটী On the variability of species in a state of Nature, দ্বিতীয়টী On variation of domesticated animals and cultivated plants তৃতীয়টী On natural selection by variation and survival of the fittest সম্বন্ধে লিখিত। প্রকৃতিতে যে variability আছে তাহা আমি অস্বীকার করি নাই, বরং তাহা আমি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি। Variability দূর করা যে সম্ভব নহে এবং সাম্যের লক্ষ্যও নহে তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। Inequality দূর করাই সাম্যের লক্ষ্য। কিন্তু যিনি Variability এবং Inequalityকে একার্থবোধক মনে করেন, বর্ত্তমান চিন্তাজগতের সহিত তাঁহার অতি নিগূঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান তাহার সন্দেহ নাই। Variability নানারূপে সংঘটিত হয়, by natural selection, by artificial selection, acclimatisation by occasional crossing &c. Diversity of physical condition বশতঃ কোন দেশের লোক শ্বেতকায়, কোন দেশের লোক তাম্রবর্ণ, আবার কোন স্থানের লোক কৃষ্ণবর্ণ। এইরূপ বর্ণবিভেদ Variability কিন্তু Inferiority নহে। মানুষে মানুষে যে Inequality সংঘটিত হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল নহে, সামাজিক অবস্থা প্রভৃতির ফল মাত্র, তজ্জন্য ঈশ্বর দায়ী নহেন। শীতপ্রধান দেশের পক্ষী গ্রীষ্ম-

প্রধান দেশে আনীত হইলে তাহার পালকের যে ইতরবিশেষ হয় তাহা প্রাকৃতিক অবস্থার ফল, নতুবা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উহার পক্ষে অবস্থিতি করা অসম্ভব। কিন্তু ইহা হীনতার লক্ষণ নহে, প্রকারভেদ মাত্র। যে স্থলে হীনতা ঘটে, তথায় মনুষ্যের হস্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। মনুষ্য কৃত নির্ব্বাচনে অনেক সময়ে যে ফল সংঘটিত হয় তৎসম্বন্ধে ওয়ালেসই বলিয়াছেন, "not only are they often of no use to the animals or plants themselves, but they are not unfrequently injurious to them." মানুষ কেবলমাত্র পশুপক্ষী এবং বৃক্ষ লতারই এইরূপ অনিষ্ট সাধন করিয়াছে তাহা নহে, নিজেরও যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে, সেই ক্ষতি, সেই অনিষ্ট নিবারণ করাই সাম্যের লক্ষ্য। যাঁহারা তাহা নিবারণ করিতে সমুৎসুক নহেন, উহাও বিধাতার বিধান বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা কখনও সাম্যবাদী নহেন।

(২) আমি বলিয়াছিলাম, ব্রাহ্মণত্ব সৃষ্টি করিতে হইলে তাহা বংশানুগত করাও উচিত, ইহাও দেবেন্দ্র বাবুর অতিশয় আপত্তির বিষয়। কিন্তু তাঁহার স্মরণ রাখা উচিত ছিল, "it is only by isolation and pure breeding that any specially desired qualities can be increased by selection." এই isolation এর জন্যই বংশগত ব্রাহ্মণত্বের সৃষ্টি।

(৩) কেহ কেহ মহাপুরুষ হইতে পারে আমি একথা বলি নাই। সকলের পক্ষেই মহাপুরুষ হওয়া স্বাভাবিক, সকলে যে হইতে পারে না সে অস্বাভাবিকতার ফল। এই অস্বাভাবিকতা দূর করা সাম্যের লক্ষ্য। তবে কে কোন্ প্রকারের মহাপুরুষ হইবে তাহা মানুষের স্বাভাবিক শক্তির দ্বারা নির্ণীত হইবে। প্রকৃতিতে variation আছে। Inequality প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের "ক খ" নহে, variabilityই তাহার আদি বর্ণ। জীব জগতে ও উদ্ভিদরাজ্যে variationএর শক্তি বিদ্যমান আছে বলিয়াই উহারা আপনাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার উপযোগী করিয়া অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়, it brings "the species into harmony with its new conditions." অবস্থাভেদ যোগ্যাযোগ্যতার নিয়ামক নহে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল শুভজনক। ওয়ালেসই বলিতেছেন, as natural selection acts solely by the preservation of useful variations or those which are beneficial to the organism under the conditions to which it is exposed, the result must necessarily be that each species or group tends to become more and more improved in relation to its conditions." মানুষকে এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের পথে আকৃষ্ট করাই সাম্যের মূলমন্ত্র। মানুষ চেষ্টা করিয়াও ধার্ম্মিক হইতে পারে না, দেবেন্দ্র বাবুর এই কথা ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী, কেন না তাহা হইলে সাধনার আর কোন প্রয়োজনই থাকে না।

দেবেন্দ্র বাবু পরিশেষে বলিয়াছেন আমি "কথা কহিলেই মিল্ কোমৎ স্পেন্সার বর্ষিত হয়।" ইহা শুনিয়া চালনীর ছুঁচের নিন্দার কথা মনে পড়িল। পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, কে পরের নজির নিজ প্রস্তাবের শিরোদেশে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, কে ওয়ালেসের নাম লইয়া প্রতিপক্ষকে বিভীষিকা দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, কে communism, Socialism, Nihelism প্রভৃতিকে একত্রে যুথবদ্ধ করিয়া নিজের বিজ্ঞতা প্রদর্শনে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, যিনি আপনার পাণ্ডিত্যের অভিমানে অপরকে বালক, অনভিজ্ঞ প্রভৃতি বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না, তিনি যে একটু সামান্য শ্লেষ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারেন না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। তিনি যে ফলের প্রত্যাশী না হইয়াই নিষ্কাম মসালচীর ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন ইহা শুনিয়া প্রীত হইলাম। *

নিবেদক

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজ।

আশ্চর্য্য সহানুভূতি—কোনও ব্রাহ্ম যুবকের প্রতি এক হিন্দু গরিব পরিবারের আশ্চর্য্য সহানুভূতি সম্বন্ধে আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু বাবু প্রতাপচন্দ্র নাগ মহাশয় নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়াছেন ;—

"বিগত ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে একজন ব্রাহ্মযুবক স্কুলের অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, একদা কোনও নূতন স্থানে যাইতেছিলেন। নৌকায় উঠিলে, নানা বিষয়ের চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিল। তিনি মনে করিলেন,—"আমি একেবারে অপরিচিত স্থানে যাইতেছি, বিশেষতঃ সেই স্কুলটী গবর্ণমেণ্টের স্কুল নহে, স্থানীয় লোকেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁহারা আমাকে গ্রহণ করিবেন কি না, কেহ একটু আশ্রয় দিবেন কি না, কোন পীড়া হইলে কে শুশ্রূষা করিবে,—কে দেখিবে,—কে বিপদের সময় সহায় হইবে?" সেই স্থানটী অতি ভয়ঙ্কর বলিয়া তাঁহার জানা ছিল। তথাকার লোকেরা অতি সামান্য কারণেই ক্রোধান্বিত হয়, সুবিধা পাইলে প্রাণ বিনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তাঁহার চিন্তিত হইবার অন্য কারণ এই যে,—তিনি জাতিভেদ মানেন না,—প্রাচীন সমাজ হইতে তাড়িত, জ্ঞাতিবন্ধুগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত; সুতরাং এইরূপ অবস্থায় সেই প্রকার নির্ব্বান্ধব ও ভীষণ স্থানে অবস্থান করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সুচারুরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে কত দূর সক্ষম হইবেন?

এইরূপে চিন্তিত হৃদয়ে তিনি গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলেন এবং স্কুলের সম্পাদক মহাশয়ের বাসায় উঠিলেন। সম্পাদক মহাশয় বাসায় নাই, কোনও কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র গমন করিয়াছেন। তখন শিক্ষক মহাশয়, বাহিরের ঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া রহিলেন। কতক্ষণ পরে ঘটনাক্রমে একটী ভদ্রলোক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরিচয়ে জ্ঞাত হইলেন,—ইনি সেই স্কুলের একজন শিক্ষক। তাঁহাকে সমস্ত কথা বলা হইল। ক্ষণকাল পরে সেই ভদ্রলোকটী তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ঐ স্কুলের সহকারী সম্পাদক একজন উকীল বাবুর বাসায় লইয়া গেলেন। তিনি বিলক্ষণ ভদ্র ব্যবহার দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া, তাঁহার বাসাতেই প্রথমতঃ স্থান দান করিলেন। ক্রমে কথোপকথন দ্বারা অবগত হইলেন যে, আগন্তুক শিক্ষক মহাশয় সমাজচ্যুত ব্রাহ্ম। ইহা শ্রবণ করিয়া উকীল মহাশয় কিছু উদ্বিগ্ন ও ভীত হইলেন! তিনি হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী, এই প্রকার লোককে বাসায় স্থান দান করিলে, তাঁহাকে বিপদে পতিত হইতে হইবে। তিনি শিক্ষক মহাশয়কে কোনও কোনও বিষয় গোপন করিয়া চলিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া, অন্য বাসার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই স্থানটী সবডিভিসন। সুতরাং ভদ্রলোকের বাসার অভাব নাই। উক্ত উকীল বাবু কয়েক দিন অবধি সমস্ত ভদ্রলোকের বাসায় তন্ন তন্ন করিয়া খুজিলেন; কিন্তু কেহই একটু স্থান দিতে সাহসী হইলেন না। একটী উচ্চ ইংরেজী স্কুল আছে, তাহার ছাত্র ও শিক্ষকগণের থাকিবার বোর্ডিং আছে তথায়ও স্থান মিলিল না।

বহু অনুসন্ধানের পর বাজারে এক খানা সামান্য খড়ের ঘর মিলিল। ঘর খানায় বাস করা কিছু সুকঠিন, কেন না

---

* এবিষয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদ হইয়াছে আর পত্র মুদ্রিত হইবে না।

ত. স.

চারিদিকের বেড়া, অতি সামান্য বিশেষতঃ শীতকাল! শিক্ষক মহাশয় অগত্যা তথায় গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার জিনিস পত্র একটী মুটের মাথায় তুলিয়া দিবেন, এমন সময় সহসা একটী যুবক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী নহেন,—সামান্য কিছু বাঙ্গালা লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছেন। দরিদ্রের সন্তান, বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। সেই অপরিচিত যুবক, শিক্ষক মহাশয়ের দুঃখ ও বিপদের কথা লোক পরম্পরায় শ্রুত হইয়া, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যুবক সুমিষ্টস্বরে শিক্ষক মহাশয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—"আপনি কেন একাকী সেই ভগ্ন গৃহে বাস করিতে যাইতেছেন? এই ভয়ানক শীতে মারা যাইবেন, যদি কিছু মনে না করেন, তবে আমার বাড়ীতে আপনাকে স্থান দিতে পারি। এ সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় কি?" এই কথা শ্রবণ মাত্র শিক্ষক মহাশয় একেবারে স্তম্ভিত হইলেন! সহর শুদ্ধ লোকে যাঁহাকে সমাজের ভয়ে একটু স্থান দিতে সাহসী হইলেন না, একটী পল্লী-বাসী অপরিচিত দরিদ্র লোক অযাচিত ভাবে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন! ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম নির্ণয় করা সহজ নহে। তিনি সেই যুবকের নিকট জানিলেন যে, তাঁহার বাড়ীতে চারিখানা খড়ের ঘর, বাহিরে কোন ঘর নাই, তাঁহার একটী যুবতী সহধর্ম্মিণী, একটী যুবতী সহোদরা আর বৃদ্ধ পিতা মাতা আছেন। সামান্য বেতনে চাকরী করেন। শিক্ষক মহাশয় বলিলেন,—"আমাকে কোন্ গৃহে বাস করিতে দিবেন? বাহিরে কোন ঘর নাই, আমি কোথায় থাকিব? আর যে গৃহে আমি থাকিব, সেই স্থানটী কেবল আমার শয়নের নিমিত্ত নহে;—আমি তথায় অধিকাংশ সময় বাস করিব, পুস্তক অধ্যয়ন করিব, গান করিব, ভগবানের নাম করিব।" যুবকটী বলিলেন,—"আপনার যে ঘর ইচ্ছা সেই ঘরে বাস করিবেন, সেই স্থানে দিবা রাত্র থাকিবেন, পরমেশ্বরের নাম করিবেন, আমাদের তাহাতে কোনও আপত্তি নাই। আমরা আপনাকে পরমযত্নে রাখিব।"

শিক্ষক মহাশয় সেই যুবকটীর আগ্রহাতিশয়দর্শনে চমকিত ও সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং প্রত্যূষে সেই যুবকটী পুনরায় সমাগত হইলে, শিক্ষক মহাশয় পরমানন্দে তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। তিনি সেই পরিবারে অতি স্নেহে ও অতি আদরে বাস করিতে লাগিলেন। নিয়মিত সময়ে তাঁহার সম্মুখে অন্নজল আসিত, অতি তৃপ্তির সহিত তাহা আহার করিতেন, বাড়ীর সকলেই তাঁহার উচ্ছিষ্টাদি পরিষ্কার করিতেন। কোন প্রকার ঘৃণার ভাব প্রকাশ করিতেন না। সেই যুবকটীর মাতা তাঁহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন, ভগিনীটী তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ভক্তি করিতেন। কতক দিন পরে শিক্ষক মহাশয় সেখানে পরিবার লইয়া আসিলেন। এমন কি সেই পল্লীর মুসলমান বন্ধুগণের বাড়ী হইতে সময় সময় খাদ্য দ্রব্য আসিত, তজ্জন্য তথাকার কেহই ঘৃণা করিত না, হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাকে স্নেহচক্ষে দর্শন করিত।"

নামকরণ—বিগত ২৬শে আশ্বিন ভাগলপুরে শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রের নামকরণ হইয়াছে। বালকের নাম অমিয় চন্দ্র রাখা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে জ্ঞান বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২৫শে ভাদ্র জগন্নাথপুরের শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দের প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু দেবী প্রসন্ন রায় চৌধুরী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এতদুপলক্ষে কৃষ্ণ বাবু সাঃ ব্রাঃ সমাজে ২৲ সাধনাশ্রমে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন। পরমেশ্বর শিশুদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দান—কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি স্বীকার করা যাইতেছে। মেদিনীপুরস্থ বাবু অভয়াচরণ বসু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১৲ দাতব্য বিভাগে ১৲ সাধনাশ্রমে ১৲ এবং বাবু প্যারীলাল ঘোষ নিজের বিবাহ উপলক্ষে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে ২৲ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১৲ সাধনাশ্রমে ৯৲ ও দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ১৲ টাকা একজন সেবক মাত্রাবাটী ৭৲ বাবু মহেন্দ্রনাথ দাঁ তেজপুর ১৫৲ বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক জন্মদিন উপলক্ষে ১৲ দান করিয়াছেন।

জাতকর্ম্ম—কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ ২১৭নং ভবনে শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নবজাত পুত্রের জাতকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। পরমেশ্বর শিশুর কল্যাণ বিধান করুন।

দুর্ভিক্ষ সংবাদ—মাদরা নামক স্থানের দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগের অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে ভাল হইয়াছে। এজন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি বাবু হরিমোহন ঘোষাল তথাকার সাহায্য দান বন্ধ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি কতক লোককে ১৫ই কার্ত্তিক ও কতক লোককে ৩০শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত চাউল দিয়া আসিয়াছেন। তিনি কোটালীপাড় অঞ্চলেও গিয়াছিলেন, সেখানেও আর বেশীদিন বিশেষ সাহায্যের আবশ্যক নাই বলিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে সাহায্য দান বন্ধ করা হইয়াছে।

রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা—বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর দেবাধুন সহরে আমাদের ব্রাহ্মভ্রাতা শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র দেবের গৃহে প্রাতে উপাসনা হয়। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত মঙ্গল দেব, রাজার জীবন সম্বন্ধে প্রকাশ্যে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাস্থলে অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

বগুড়া সুতরাপুর ব্রাহ্মসমাজ গৃহে রাজার স্মরণার্থ একটী সভা আহূত হইয়াছিল। যথারীতি সভার কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর একজন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মবন্ধু রাজার মহত্ত্ব ও দেশহিতৈষণায় এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি উক্ত সভাতে এই মর্ম্মে একটী কৃতজ্ঞতাসূচক প্রস্তাব করেন যে, তিনি "রাজা রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মধর্ম্ম" সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে অন্যূন দশ টাকা মূল্যের একটী ওয়াচ উপহার প্রদান করিবেন।

"সভায় সর্ব্বসম্মতি ক্রমে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, আগামী ৩১শে ফাল্গুনের মধ্যে যে সকল প্রবন্ধ উক্ত সভার সেক্রেটারী বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইবে, তন্মধ্যস্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধলেখককে উক্ত উপহার প্রদত্ত হইবে এবং প্রবন্ধটী মুদ্রিত করা হইবে।"

উৎসব ও প্রচার—বাবু শশিভূষণ বসু চাঁইবাসার উৎসবে গমন করিয়া উপাসনা উপদেশ বক্তৃতাদি করেন। তথা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনের সময় পুরুলিয়াতে অবতরণ করেন। সেখানে ইতঃপূর্ব্বে কোনও সমাজ ছিল না। শশি বাবু কয়েক দিন তথায় থাকিয়া একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করেন। পরমেশ্বরের কৃপায় তথায় একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি তত্রত্য টাউন হলে মানব জীবনের মহত্ত্ব সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। ডাঃ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতা স্থলে অনেক ভদ্রলোক ও বিদ্যালয়ের ছাত্র উপস্থিত ছিলেন।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৬ই কার্ত্তিক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৪শ সংখ্যা। ১৮শ ভাগ। | ১লা অগ্রহায়ণ শুক্রবার, ১৮১৬ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বলে ৩ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

জীবন ও মরণ।

জীবন ত ক্ষুদ্র নয় প্রকাশ যে অসীমের,
জীবন কি বদ্ধ রয় সীমা-মাঝে সসীমের!
সংসারের খেলা ধূলা, তুচ্ছ সুখ, ধন মান,
এসবে কি তৃপ্তি পায় অনন্তের যাত্রী-প্রাণ?
মৃত্যু সে ত ক্ষুদ্র অতি বদ্ধ থাকে মৃত্তিকায়,
ধরণীর তুচ্ছ ধূলি তাহাতেই তৃপ্তি পায়!

জীবনে জীবন তাই আছিল না যত দিন,
ধরণীর তুচ্ছ খেলা সুখ দুঃখ অতি হীন,
মৃত্যু-মাঝে তাহা নিয়া পরিতৃপ্ত আছিলাম;
অনন্ত কি অসীম কি কিছুই না জানিতাম।
জানি না কি মন্ত্র বলে দয়াময় ভগবান,
মৃত্যু-মাঝে সঞ্চারিত করেছিলে নব প্রাণ!
দিয়াছিলে বুঝাইয়া ধন মান ধূলিময়,
ধূলি নিয়ে ছেলা খেলা জীবনের লক্ষ্য নয়!
ক্ষুদ্র সুখে তুচ্ছ কাজে আসি নাই এ ধরায়,
অসীম এ জীবনের তৃপ্তি নাই ক্ষুদ্রতায়।

পশ্চাতে সংসার ফেলি, সীমা ছাড়ি মরণের,
সেই হতে ছুটেছিল নির্ঝরিণী জীবনের,
তোমার চরণ-তলে; হে অনন্ত পারাবার!
সমর্পিতে চির তরে প্রাণ মন আপনার!

কিন্তু পিতা, এ কি হ'ল—এ কি মোর হ'ল হায়!
মৃত্যু করিয়াছে গ্রাস জীবন যে পুনরায়!
মৃত্যুমগ্ন হয়ে আত্মা তোমায় যে ভুলিয়াছে;
ক্ষুদ্র সুখে তুচ্ছ কাজে আবার সে ডুবিয়াছে!

দয়াকর তুমি পিতা, তোমা বিনা কোথা যাই?
মরণে জীবন দেয় এমন ত কেহ নাই।
মৃত্যু-মাঝে দেখ পিতা, জলে মরি যন্ত্রণায়,
করুণা করিয়া দেহ নব প্রাণ এ আত্মায়।
মরণের ক্ষুদ্র সুখ, তুচ্ছ কাজ, স্বার্থ আর—
দুরন্ত প্রবৃত্তি যাহে বদ্ধ আছে অনিবার;
নবীন জীবন পেয়ে ঠেলি' তাহা ছুটি পায়,
জগতের মহকাজে ঢেলে দিয়া আপনায়।
পশ্চাতে ফেলিয়া সীমা অসীমে ছুটিয়া যাই!
পূরাও এ মনস্কাম এই আজ ভিক্ষা চাই।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

আত্মার প্রতিষ্ঠা—উপনিষদে আছে,—

যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সংপ্রতিষ্ঠন্তে।
এবং সবৈ তৎ সর্ব্বং পরআত্মনিসংপ্রতিষ্ঠতে।২

"হে প্রিয়! যেমন পক্ষিসকল তাহাদিগের বাসস্থান বৃক্ষেতে স্থিতি করে, তদ্রূপ সকলই পরমাত্মাতে স্থিতি করিতেছে।

বৃক্ষ এবং পক্ষী এই উভয়ের সঙ্গে পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহারা উভয়ে উভয়ের উপযোগী। পক্ষীকে এমন করিয়া বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন যে, সে বৃক্ষে বসিবার উপযুক্ত; বৃক্ষকে এরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, সে পক্ষীকে নিজ দেহে স্থান দিবার উপযুক্ত। পক্ষীর পা দুখানি এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, সে বৃক্ষে বসিয়া থাকিতেই আরাম পায়; আবার বৃক্ষের শাখা প্রশাখা এমনি যে পক্ষী তাহাতে বসিয়া সুখী হয়। বৃক্ষ দেখিলে মনে হয় যেন পক্ষীকে বসাইবার জন্যই বৃক্ষের সৃষ্টি। পক্ষী ও বৃক্ষের সহিত এমন নিকট সম্বন্ধ যে, উভয়ের মধ্যে একটী দেখিলে অপরটীকে মনে হয়।

বৃক্ষই পক্ষীর নিরাপদ স্থান। তুমি তাহাকে ভয় দেখাইলে সে অমনি বৃক্ষে গিয়া বসিবে। ভয়ঙ্কর বৃষ্টিপাত হইলে, ঝঞ্ঝাবাতে বাড়ী ঘর ভূপতিত হইতে থাকিলে, পক্ষী বৃক্ষকেই আশ্রয় করে। আবার যখন প্রচণ্ডরৌদ্রতাপে পৃথিবী জ্বলন্ত অনলের ন্যায় উত্তপ্ত হয়, তখন পক্ষী পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষশাখায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শান্তি লাভ করে।

আত্মাও পরমাত্মার সহিত ঐ প্রকার নিগূঢ়সম্বন্ধ। এই উভয়ের মধ্যে যে সম্মিলন, যোগ, তাহা স্বাভাবিক। পক্ষীকে দেখিলে বৃক্ষকে এবং বৃক্ষকে দেখিলে পক্ষীকে যেমন মনে হয়, তেমনি আত্মাকে দেখিলে পরমাত্মাকে মনে হয় এবং পরমা-

ত্মাকে দর্শন করিলে তাঁহার আশ্রিত জীবকে স্মরণ হয়। উভয়ের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। বৃক্ষ যেমন পক্ষীর পক্ষে নিরাপদ ও আশ্রয় স্থান, আত্মার পক্ষে পরমাত্মা তেমনই আশ্রয়ভূমি, ও নিরাপদ ভূমি। যতক্ষণ মানব ঈশ্বরকে আশ্রয় না করে, ততক্ষণ সে নিরাপদ অবস্থা লাভ করে না। পক্ষী যেমন সূর্য্যকিরণে সন্তাপিত হইলে শান্তির জন্য বৃক্ষকে অবলম্বন করে, মানবও তেমনি সংসার-রৌদ্রে তাপিত ও তৃষিত হইয়া শান্তিস্বরূপ ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি দাতা, আমরা গ্রহীতা। তিনি প্রেম দিতেছেন, আমরা গ্রহণ করিতেছি, আমাদের প্রার্থনা তাঁহাতে স্থান প্রাপ্ত হইতেছে। এই যোগই স্বাভাবিক যোগ। অতএব আমাদের মন সংসারের পাপ তাপে জর্জ্জরিত হইলে তাঁহার চরণ আশ্রয় করিতে ইচ্ছুক কি না ইহাই অনুসন্ধানের বিষয়। পক্ষী ভয়ে, বিপদে যেমন স্বতঃই আশ্রয়বৃক্ষের দিকে যায়, তেমনি আমাদের মন ভয়ে, বিপদে স্বতঃই পরমাশ্রয় পরমেশ্বরের দিকে যায় কি না ইহাই দ্রষ্টব্য।

আকাঙ্ক্ষা—একজন সাধু বলিয়াছেন, "তোমরা অল্প সাধনে সন্তুষ্ট হইও না। সর্ব্বদাই ধর্ম্মের অত্যুচ্চ অবস্থা লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা কর।" বাস্তবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানবের সর্ব্ববিধ উন্নতির একমাত্র উপায় ও উপকরণ। যাহার হৃদয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই, তাহার হৃদয়ে উন্নতির জন্য সংগ্রামও নাই।

কবি মাইকেলের জীবনচরিত-লেখক লিখিয়াছেন যে, মধুসূদন যখন বাল্যকালে বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন, তখন সহাধ্যায়ীদিগকে এই কথা বলিতেন যে, "আমি একজন প্রথম শ্রেণীর কবি হইব। তোমরা আমার জীবনচরিত লিখিবে।" এই কথা শুনিয়া তখন সমপাঠীরা কত বিদ্রূপ করিত, কিন্তু মধুসূদন সেই উপহাস ও বিদ্রূপে দৃক্‌পাত না করিয়া অতি তেজের সহিত বলিতেন "তোমরা দেখিও, আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হইব।" বালক মধুসূদনের মনে যে প্রতিজ্ঞার উদয় হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহাকে কালে সুকবি করিয়াছিল। সামান্য আকাঙ্ক্ষা লইয়া যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট, সে কখনও জীবনের উচ্চশিখরে আরোহণ করিতে পারে না। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, প্রতিভার লক্ষণ মানবহৃদয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ক্ষুদ্র মানবের লক্ষণ এই যে, তাহার প্রাণে উচ্চ-আকাঙ্ক্ষা নাই। উচ্চ-আকাঙ্ক্ষা যাঁহাদের হৃদয়ে বিদ্যমান, তাঁহারা সংসারের কোনও বাধা বিঘ্নেতেই সঙ্কুচিত হয় না। উচ্চাকাঙ্ক্ষা অগ্নির মত তাহাদিগকে সর্ব্বদা সতেজ রাখে। যাহাদের আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র, তাহাদের মনও ক্ষুদ্র। তাহারা বিঘ্ন বাধা দেখিয়া ভয় পায়, সংসারের কোনও মহৎ কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারে না। তাহারা কখনও মহত্ব লাভ করিতে পারে না।

ফরাসী দেশের সম্রাট নেপোলিয়নের সম্বন্ধে এরূপ কথিত আছে যে, তিনি বলিয়াছিলেন, "ইউরোপের সমুদয় রাজগণ যতদিন না আমার চরণতলে আসিতেছে, ততদিন আমার বিশ্রাম নাই।" তিনি ফরাসী ভাষার অভিধান যখন খুলিতেন, 'অসম্ভব' এই কথাটা পাঠ করিয়া বিরক্ত হইতেন। জগতে কিছু অসম্ভব আছে, ইহা তিনি মানিতে চাহিতেন না। তাঁহার হৃদয়ে এমনি দুর্জ্জয়শক্তি ছিল যে, সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন।

এক দিকে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, অপর দিকে সাহস, এই দুই একস্থলে দেখা যায়। ধর্ম্মসাধন বিষয়ে এই দুইটিই নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যে ব্যক্তি সাধনে বিঘ্ন বাধা দেখিয়া ভয় পায়, সে কখনও ধর্ম্মলাভ করিতে পারে না। যে অল্প সাধনে সন্তুষ্ট হয়, স্বার্থত্যাগ, ঈশ্বরলাভ, পাপদমন তাহার হয় না। ছোট খাটতে যে সন্তুষ্ট, সে কখনও ধর্ম্মজীবনে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবার উপযুক্ত নয়। যে ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া বসিয়া আছে, সে নিজে ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতা ডাকিয়া আনিতেছে। মানুষ এ জগতে যে, যে অবস্থায় থাকে, সে সেই অবস্থা সৃষ্টি করে।

তুমি যদি ক্ষুদ্র লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পার, তবে তুমি ক্ষুদ্র। যাহার আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান নাই, দুই আনার পয়সা হাতে দিলে সন্তুষ্ট হয়, সে ছোট হইয়া যায়। তুমি যা চাও, তাহাই পাইবে। বড় হইতে চাও, বড় হইবে, ক্ষুদ্র হইয়া থাকিতে চাও, তাহাই হইবে।

আত্মদৃষ্টিদ্বারা বিচার করা উচিত আমরা কিরূপ ধর্ম্মজীবন লইয়া সন্তুষ্ট আছি। উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, কি নীচ আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়ে রহিয়াছে? হৃদয় পরীক্ষা কর, যাহা করিতেছ, তাহাতে সন্তুষ্ট আছ কিনা? সন্তুষ্ট থাকিলে উন্নতি হইবে না। যদি প্রাণের ভিতর দেখ, তোমার কিছুতেই তৃপ্তিলাভ হইতেছে না, ইহা অপেক্ষা অধিক চাই—প্রকৃত প্রেম চাই, প্রকৃত পুণ্য চাই,—তবে তুমি উন্নতি লাভ করিতেছ, বলিয়া জানিবে।

আমাদের প্রত্যেকের দেখা উচিত, আমরা ছোট আদর্শ লইয়া সন্তুষ্ট আছি কিনা। উৎসবের সময় খুব ব্যাকুলতা আসিল, তখন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জ্বলিয়া উঠিল। তৎপর উৎসবের পরে আবার নিজকে ছোট খাট করিয়া বাঁধিয়া লওয়া হইল। এরূপ দেখা যায়, ১০।২০।৩০ বৎসরেও সেই লোক সাধনরাজ্যে অগ্রসর হয় না। নৌকার দড়ি গাছে বাঁধিয়া দাঁড় টানিলে যেমন নৌকা অগ্রসর হয় না, তেমনি ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষাতে আপনাকে বাঁধিয়া রাখিলে উন্নতি হয় না। অতএব আমরা সর্ব্বদা আত্ম-পরীক্ষা করিব, আমরা অল্পেতে সন্তুষ্ট কি আরও কিছু চাই? অল্প স্বার্থত্যাগ, অল্প প্রেম, অল্প ধর্ম্মে সন্তুষ্ট আছি, না প্রাণের মধ্যে ধূ ধূ করিয়া ব্যাকুলতার অগ্নি জ্বলিতেছে।

জ্ঞান, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—ইহা পুরাতন কথা যে জ্ঞান দুই প্রকার, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। কিন্তু পুরাতন হইলেও এই প্রভেদের বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা মন্দ নহে। মানব-সমাজের অধিকাংশ কার্য্যই পরোক্ষ-জ্ঞানে চলিতেছে। কে আমরা পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছি যে পৃথিবী গোলাকার, অথবা পৃথিবী অপরাপর গ্রহের ন্যায় সূর্য্যমণ্ডলকে নিরন্তর প্রদক্ষিণ করিতেছে। অথচ প্রত্যেকেই বিশ্বা

করি যে এই ধরা গোলাকার এবং সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। এই জ্ঞানের উপরে ভিত্তি স্থাপন করিয়া সমগ্র জ্ঞানের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছি। এই রূপে পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা সংসারের কার্য্য সাধন হয় বটে, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ন্যায় বলবান নহে, ও তৃপ্তিপ্রদ নহে। পৃথিবী ঘুরিতেছে এই কথা বলাতে গালিলিয়কে কারাগারে যাইতে হইয়াছিল, তিনি বহুল যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা ইহাকে পরীক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপনীত হইয়াছিলেন, এই জন্য কারাগারে বন্দিদশাতে বাস করিয়াও তেজের সহিত বলিতে পারিয়াছিলেন, হাঁ এখনও ঘুরিতেছে; এবং এজন্য যে কিছু নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহাও তিনি অম্লানচিত্তে বহন করিয়াছিলেন। গালিলিয়র ন্যায় যাহার জ্ঞান পরীক্ষালব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে, তিনি কখনই গালিলিয়র বল ও তাঁহার আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে পারিবেন না। জ্ঞান ও বিজ্ঞান রাজ্যে দেখিতে পাই, পণ্ডিতগণ প্রভূত চেষ্টা ও পরীক্ষা দ্বারা যাহা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা জনসাধারণের গোচরার্থ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তুমি আমি মনে করিলেই ঐ সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া কবে কোন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা জানিতে পারি। কিন্তু গ্রন্থে পাঠ করিয়া জানিয়া রাখিলেই কি সে সকল তত্ত্ব প্রকৃতরূপে জানা হইল? পণ্ডিতগণ যে সে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য কি? তাহার উদ্দেশ্য কি এই যে তুমি আমি তাঁহাদের গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরোক্ষভাবে কতকগুলি তত্ত্ব জানিয়া রাখিব, না, ঐ সকল গ্রন্থের সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা নিজেরা ঐ সকল তত্ত্বের প্রমাণ প্রাপ্ত হইব? তবে আমরা যে পরোক্ষ জ্ঞানে তৃপ্ত হই তাহা আমাদের স্বাধীন পরীক্ষার অবসরাভাব বা অশক্তি নিবন্ধন। বিজ্ঞান বিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞানের অবস্থা কখনই প্রার্থনীয় অবস্থা নহে। কেবল বিজ্ঞান সম্বন্ধে কেন, ধর্ম্মসম্বন্ধে সাধুরা যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য ইহা নহে, যে লোকে তাঁহাদের প্রমুখাৎ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবে, এবং অসমর্থ শিশুদিগের ন্যায় চিরদিন তাঁহাদেরই স্কন্ধ আশ্রয় করিয়া থাকিবে? তাহার উদ্দেশ্য এই যে তাঁহাদের উপদেশ ও দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া সকলে সাক্ষাৎ ভাবে ঐ সকল জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করিবে। বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোনও ব্যক্তিকে যদি এরূপে দেখা যায় যে সে চিরদিন কোনও পণ্ডিত বিশেষের উক্তির পুনরাবৃত্তি করিয়া আসিতেছে, নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখে না, তবে সে যেমন অবজ্ঞার পাত্র, তেমনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে ব্যক্তি গুরু-বাক্যের মধ্যেই আবদ্ধ, নিজে কিছু পরীক্ষা করিয়া দেখে না, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের সন্নিহিত হইবার শক্তি হারাইয়াছে, তবে সেও অজ্ঞ ও কৃপার পাত্র। ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ কথা লক্ষ লক্ষ ধর্ম্ম গ্রন্থে পড়িয়া বা সাধুমুখে শুনিয়া রাখিলে ধর্ম্ম হয় না। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের এক কণিকা পাইলেই ধর্ম্ম হয়। আমাদিগকে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপনীত করিবার জন্য শাস্ত্র ও সাধুগণ উপায় স্বরূপ। তাঁহাদের সাহায্যে আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ত্বরিত উপনীত হইতে পারি এই মাত্র। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপরে জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান হইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কারণ যাহা প্রত্যক্ষ নহে, তাহা আমার আত্মার সম্পত্তি নহে, সুতরাং তাহা দ্বারা আমার আত্মা প্রকৃত ভাবে পরিপুষ্ট হইতে পারে না। যাহা আমার আত্মাতে শক্তিরূপে বাস করে, তাহাই আমার জীবনের উৎসস্বরূপ হইতে পারে, পরোক্ষ জ্ঞানের শক্তি নাই সুতরাং তাহা জীবনকে নিয়মিত করিতে পারে না।

ভাল মানুষ—এদেশের ভাল মানুষের বড় প্রশংসা। ভাল মানুষ কাহাকেও মর্ম্মান্তিক কথা বলে না। কাহারও বিরোধী না হইয়া থাকিতে পারা কিছু মন্দ নয়। বরং তাহা প্রশংসনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় একরূপ ভাবে কাহারও দিন কাটে না। একমাত্র দেশ-প্রচলিত ভাল মানুষ নামে অভিহিত হইবার সাধ থাকিলেই লোকে কাহারও বিরোধী না হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সত্য-বাদী ও সত্যানুরাগী সত্যপিপাসুর পক্ষে সকল সময় সকল অবস্থায় কাহারও বিরোধী না হইয়া থাকা পোষায় না। যদি জগতের অবস্থা এরূপ হইত যে এখানে আর সত্যের বিরোধী কেহই নাই। সকলেই সত্যের সেবক, সকলেই সত্যের উপাসক, সত্য ভিন্ন অসত্য সেবক আর কেহ নাই, তাহা হইলেই এরূপ নির্ব্বিরোধ লোকের অস্তিত্ব সম্ভবপর হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় জগতে সকলেই এক কথা বলে না, একরূপ ধর্ম্মাক্রান্ত নয়। সুতরাং বিরোধ থাকা যেন অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। নিরাকারোপাসক সাকারবাদের বিরোধী হইবেন, ইহাতে অস্বাভাবিকত্ব বা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কিছুই লক্ষ্য হয় না। উদাসীন থাকা বা কিছুই না বলা এক স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু উদ্যোগী হইয়া কিছু করিতে বা বলিতে হইলেই অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয়। তাহার বিরুদ্ধাচারী হইতে হয়। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া জানে এবং বিশ্বাস করে তাহার পক্ষে সাকারবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা বা তাহার বিরোধী হওয়া অথবা যে ঈশ্বরকে সাকার বলিয়াই জানে এবং বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে নিরাকারবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা বা বিরোধী হওয়া কখনই অস্বাভাবিক বা নিন্দনীয় নহে। কোনও ব্যক্তিকে ঘৃণা করা বা হীন ও তুচ্ছভাবে দেখা সকল সময়েই নিন্দনীয়। কিন্তু সকল সময়েই ব্যক্তির প্রতি উপযুক্ত সম্মান ও প্রীতির সহিত তাঁহার ভ্রমাত্মক মতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভবপর। এইজন্য কাহারও বিরোধী হওয়া অপ্রার্থনীয় হইলেও সত্যানুরাগী ও সত্যসেবকের পক্ষে অসত্যের বিরুদ্ধে চিরদিন সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। নিরাকারোপাসকের পক্ষে সাকারোপাসকের ভক্তি নিষ্ঠার অনুসরণ করা অনাবশ্যক নহে। বরং বিশেষ ভাবেই আবশ্যক। যাহা কিছু কল্যাণকর যাহা কিছু সাধু তাহা গ্রহণ করা সকল অবস্থাতেই প্রশংসনীয় এবং আবশ্যক। কিন্তু অসত্যের পরিহার এবং তাহার প্রতিবাদ সকল সময়েই কর্ত্তব্য।

নিষ্ঠা, ভক্তি এবং সদ্‌ভাব সকল গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, এবং তাহা সকল সময়েই কল্যাণকর ও শোভনীয়। কিন্তু নিরাকার-উপাসকের পক্ষে সাকারের বিরোধী হওয়ায় এক বিন্দুও অধর্ম্ম বা প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা নাই। সরল বিশ্বাসী প্রতিকূল

বিশ্বাসের বিরোধী হইবে ইহা তাহার স্বভাব এবং ইহার সত্যের প্রতি সমাদর-জ্ঞাপক। এই বিরোধে নীচতা বা ঈর্ষ্যা নাই। এবং ইহাতে ধর্ম্ম হানিও হয় না। ধর্ম্ম হানি অন্ধতা দ্বারা হয়, ধর্ম্ম হানি দ্বেষ বা শত্রুতা দ্বারা হয়। অসত্যের প্রতিকূলে সংগ্রাম করা কথনই নিন্দনীয় নহে এবং তাহা চিরদিনই সাধুজন প্রদর্শিত পথ। যাঁহাদের নামে কোটী কোটী মানবের মস্তক অবনত হয়, সেই সকল সাধু পুরুষেরা কেহই অসত্যের সহিত সন্ধি করিয়া কার্য্য করেন নাই। তিলমাত্র অসত্য তাঁহাদের অসহ্য ছিল। তাই তাঁহারা অসত্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং তাহাই তাঁহাদের কত জনের পক্ষে অসহ্য যন্ত্রণা-লাভের হেতু হইয়াছে। তাঁহারা যদি আজ কালের ভাল মানুষ গোছের উদাব মতাবলম্বী হইতেন, বুঝি বা তাহাতে ধর্ম্মের এমন উজ্জ্বল শক্তি প্রকাশিত হইত না। বুঝি বা তাহাতে ধর্ম্মের এমন মহিমা প্রচারিত হইত না।

সত্যেতে এবং অসত্যেতে বিরোধ থাকিবে এবং আছে। যথন অসত্যের কোন চিহ্ন থাকিবে না, তথন যদি সম্পূর্ণ বিরোধ চলিয়া যায়। সেই দিন কবে আসিবে কে জানে, বর্ত্তমান সময়ে সাকারবাদের সপক্ষতা করা একটা বিশেষ বাহাদুরির মধ্যে গণ্য হইয়াছে। কিন্তু তাহা দ্বারা কি সরলতা বা সত্যানুরাগের পরিচয় দেওয়া হয়? এদেশের সাকারবাদ এক চমৎকার বস্তু। কারণ তাহা এক মুখে বলিতেছে "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা" "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা, যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা, যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে, যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা" ইত্যাদি আবাব সেই মুখেই "ওঁ জটাজুটসমাযুক্তাং মন্দুর্দ্ধকৃতশেখরাং। লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দু সদৃশাননাং তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং" ইত্যাদি রূপে সেই দেবীর আরাধনা করিতেছে। যে দেবী সর্ব্বভূতে চেতনা, বুদ্ধি, দয়া, শক্তি, প্রভৃতি রূপে অবস্থিতি করেন, তাহার পূর্ব্বোক্ত আকৃতিও অবস্থা কিরূপে সম্ভবে? এসকলের প্রতি উদাসীন হইয়া থাকিতে ইচ্ছা কর তাহাতে প্রশংসা পাইবে। কিন্তু তদ্দ্বারা সত্য-প্রেম বা নর-প্রেমের পরিচয় পাওয়া যাইবে না। ইহা সেই ভীরু ও অনুচিত স্নেহশীল পিতামাতার সদৃশ কার্য্য হইবে, যাহারা শিশুর স্ফোটকে অস্ত্রাঘাত করিতে চিকিৎসককে নিষেধ করে।

কাহারও বিরোধী না হওয়া দেশ প্রচলিত ভাল মানুষ নামে অভিহিত হইবার সুযোগ তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা সাতেও হাঁ পাঁচেও হাঁ দিতে পাবেন, তাঁহাদের লোকসমাজে কোন নিন্দার হেতু না থাকিতে পারে। এবং তাঁহারা গো-বেচারি নামেও অভিহিত হইতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ লোকের মূল্য প্রকৃত ভাবে বেশী নয়। লোক প্রশংসা ইহাদের জন্য চিরদিনই থাকিবে, উভয় পক্ষের সুখ্যাতিরই ইহাঁরা অধিকারী। কিন্তু লাভ ঐ পর্য্যন্ত। তাঁহাদিগকে লোকে কথনই আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহিবে না। যথন লোকে চিনিয়া লইবে তথন এরূপ অব্যবস্থিত-চিত্তকে কেহই আপনার সঙ্গী করিবে না। তাহাদের হরিশ্চন্দ্রের দশাই প্রাপ্ত হইতে হইবে।

আমরা কি চাহিতেছি?—আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকটে কি চাহিতেছি? জ্ঞানের চরিতার্থতা, কি ভাবের উন্মত্ততা, বা অন্য কিছু অন্বেষণ করিতেছি? ইহা নিবিষ্টচিত্তে মধ্যে মধ্যে চিন্তা করিয়া দেখিলে উপকার আছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ধর্ম্মজীবনের ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে আশ্রয় করিতেছেন। কাহার কাহারও অন্তরের ভাব এই যে, এতদ্দ্বারা তাঁহাদের জ্ঞানের চবিতার্থতা হইয়াছে, ইহা তাঁহাদের উন্নত চিন্তা ও সুমার্জ্জিত জ্ঞানকে তৃপ্ত করিয়াছে। ইহাই বর্ত্তমান সময়ের সুযুক্তিসম্মত ধর্ম্ম। এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহাদের প্রাণের টান। এক সময়ে এরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক ছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে ও তৎপরবর্ত্তী মধ্যকালে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশের ভাব এই প্রকার ছিল। এক্ষণে এরূপভাবাপন্ন লোকের সংখ্যা অধিক নহে। এখনকার ব্রাহ্মগণেব অনেকে ভাবের চরিতার্থতাকেই ধর্ম্মজীবনের শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ভাবেব দ্বারা তাঁহারা স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মজীবনের বিচাব কবেন; সুতরাং যদি কিছু দিন ভাবের নীরসতা লক্ষ্য করেন, যদি উপাসনা কালে প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস না হয়, লোকের কথা বার্ত্তা সেরূপ সতেজ ও সরস দেখিতে না পান, তাহা হইলেই মনে করিতে থাকেন যে, তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের কোনও উন্নতি হইতেছে না; অমনি চারিদিকে এই ধ্বনি উত্থিত হয়, "কিছু হইতেছে না, কৈ যে আশা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে আশ্রয় কবিলাম তাহার কি হইল?" অমনি এই শ্রেণীর সাধকেরা হা হতোস্মি রবে গৃহ পূর্ণ করিয়া তোলেন। অতএব মধ্যে মধ্যে আপন আপন হৃদয়কে প্রশ্ন করা ভাল, "আমরা কি চাহিতেছি?" মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একদিন বলিয়াছিলেন, ভাব জোয়ারের জলের ন্যায় সকালে বাড়ে বৈকালে কমিয়া যায়, কিন্তু জ্ঞান সত্যবস্তু, ইহা সকালে বৈকালে সর্ব্বদা সমান থাকে।" এ কথাব মধ্যে সত্য আছে। ভাব শরীর মনের বিশেষ অবস্থা, সঙ্গের গুণ, ঘটনার যোগাযোগ প্রভৃতি কত বিষয়ের উপরে নির্ভর করে। তুমি রাজপথে আসিবার সময়ে একটী অশুভ সংবাদ শুনিয়া আসিয়াছ, যে জন্য তোমার মন অতিশয় উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ আছে, তুমি সেই রূপ মন লইয়াই উপাসনা মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছ, আসিয়া দেখিলে সেখানে ভাবের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইতেছে; লোকে ভাবোচ্ছ্বাসে মত্তপ্রায় হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু সে তরঙ্গ তোমাকে স্পর্শ করিল না। তুমি যেরূপ শুষ্কহৃদয় লইয়া আসিয়াছিলে, সেইরূপ শুষ্কতা লইয়া ফিরিয়া গেলে। এরূপ কতবার হইয়াছে। যে দিন শরীরে কোনও গ্লানি থাকে, সে দিন উপাসনাদিতে সরসতা অনুভব করিতে পারা যায় না; ইহা কতবার দেখিয়াছি। জ্ঞান এপ্রকার নহে, জ্ঞান নিত্যবস্তু, জ্ঞান সত্যবস্তু। যাহা জানিয়াছি, তাহা অদ্যকার জন্যও জানিয়াছি, কল্যকার জন্যও জানিয়াছি। তাহার আর ব্যত্যয় হইতে পারে না। তুমি যদি রোগশয্যায় পড়িয়া দেখিয়া থাক, যে কোনও একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক আসিয়াছিলেন, তোমার মৃত্যুর সময়ে

জ্ঞান থাকিলে এবং জিজ্ঞাসা করিলে নিশ্চয় বলিবে হাঁ অমুক আসিয়াছিলেন। তোমাকে মরিতে মরিতেও সাক্ষ্য দিতে হইবে। জ্ঞান এমনি বস্তু। সেইরূপ যাহারা জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপের প্রমাণ আপনাদের অন্তরে পাইয়াছেন, তাঁহারা মরিতে মরিতেও সেই সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। অতএব জ্ঞানের সুদৃঢ়ভিত্তিতে যে বিশ্বাস স্থাপিত, তাহাই আত্মার চিরন্তন সম্পত্তি হইয়া থাকে।

কিন্তু জ্ঞানের চরিতার্থতা ও ভাবের সরসতা, ইহার অতিরিক্ত আরও কিছু আছে, যাহাকে লোকে ধর্ম্মজীবনের আদর্শ করিয়া থাকে। সে অবস্থা জ্ঞান ও ভাব উভয়ে জড়িত এবং এই উভয়ের কার্য্যের ফলস্বরূপ। তাহা আত্ম-বল বা বিশ্বাসের শক্তি। আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই, লোকে জ্ঞানে প্রবীন ও ভাবে সরস হইয়াও এই আত্ম-বল বিষয়ে হীন হয়। আমি জ্ঞানে বুঝিয়াছি, ঈশ্বর বিধাতা, ভাবের উচ্ছ্বাসের সময়েও তাঁহাকে বিধাতা বলিয়া মোহিত হই; কিন্তু তিনি বিধাতা এ বিশ্বাস আমার আত্মার অস্থি-মজ্জাতে বসিতেছে না, আমার চরিত্রকে শাসন করিতে পারিতেছে না, আমার চিন্তা ও কার্য্যকে নিয়মিত করিতে পারিতেছে না। কেহ হয়ত বলিবেন, "তবে যে বিধাতা বলিয়া জ্ঞানদ্বারা বুঝিয়াছ, তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। সে বিষয়ে তোমার সন্দেহ আছে।" অবশ্য এক অর্থে ইহা সত্য যে, সে জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান হইলে তাহার ফল অন্য প্রকার হইত; কিন্তু অনেক সময়ে ইহা দেখিতে পাই যে, জ্ঞানকে সাধন দ্বারা আত্ম-বলে বা বিশ্বাস-শক্তিতে পরিণত করিতে হয়। জ্ঞান ও প্রেম, উভয় সাধনই ঘনীভূত ও কেন্দ্রগত হইয়া আত্ম-বলকে উৎপন্ন করে। যতক্ষণ ধর্ম্মবিশ্বাস এই আত্ম-বলে পরিণত না হয়, ততক্ষণ মনে করা উচিত নয় যে, আমরা ধর্ম্মজীবনের শ্রেষ্ঠ অবস্থা পাইয়াছি।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

জীবন্ত যোগসাধন।

(৪ঠা নবেম্বর রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক বিবৃত উপদেশের সারাংশ)

উপনিষদকার ঋষি বলিতেছেন;—"অন্ধকারের পরপারে আমি এই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।" এই উক্তির বিষয়ে আমরা একটু আলোচনা করি। বর্ত্তমান সময়ে এই প্রশ্নের বিচার চলিতেছে যে, মানব অনন্তকে জানিতে পারে কি না, ধারণা করিতে পারে কি না? এক অনন্ত, অবিনাশী সত্তা যে জগতের মূলে আছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত এবং ইহা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের প্রচলিত কথা। কিন্তু এই অনন্ত, অবিনাশী সত্তাকে মানুষ জানিতে পারে কি না? ধারণা করিতে পারে কি না? সর্ব্বাগ্রে বক্তব্য এই ধারণা এবং জানা, এই উভয়ের অন্তর্গত পার্থক্য বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। এরূপ অনেক বিষয় আছে, যাহা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু ধারণা করিতে পারি না। ধারণার অর্থ কি? ধারণার অর্থ:—কোন বিষয় কিম্বা কোন বস্তুকে মনের চিন্তা দ্বারা আয়ত্ত করা; মনের চিন্তার অধীন করা, বা চিন্তা দ্বারা কবলিত করা; সুতরাং সেই বিষয়েরই ধারণা হওয়া সম্ভব, যাহা আমাদের ধারণাশক্তি অপেক্ষা হীন। যাহা ধারণা করিয়াছি, কিম্বা সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছি, তাহাই মনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে কবলিত এবং আয়ত্ত করিয়াছি; তাহাই ধারণা শক্তির অধীন হইয়াছে। যদি তুমি ইউক্লিডের জ্যামিতি সম্যক্‌প্রকারে বুঝিয়া থাক, তবে তাহা তোমার মনের শক্তি অপেক্ষা হীন হইয়াছে; যদি নিউটনের ক্যালকুলাস না বুঝিয়া থাক, তবে উহা তোমার মনের শক্তির বাহিরে রহিয়াছে। যাহা তুমি আয়ত্ত করিতে পার, তাহাই তোমার শক্তি অপেক্ষা হীন। জ্ঞানের পক্ষে তাহা নহে; কোনও বিষয়ের জ্ঞান থাকিতে পারে, ধারণা না হইতেও পারে। দুই মাইল পথ বলিলে তুমি একটা ধারণা করিতে পার, কেন না দুই মাইল কতটা দূর তাহা তোমার জানা আছে। কিন্তু যখন বলা যায়, পৃথিবী হইতে চন্দ্র দশলক্ষ মাইল দূরে, তখন সে দূরত্ব কি ধারণা করিতে পার? সেই দূরত্ব তুমি মনে আয়ত্ত করিতে পার না। সেই দূরত্ব সমগ্র মনের মধ্যে আনিতে পার না। কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা কি বলিতে পার যে, পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্বের বিষয় কিছুই জানি না, কেন চক্ষুতে ত দূরত্বের কিঞ্চিৎ দেখিতেছ? তুমি বলিবে, ও জ্ঞান অতি অসম্পূর্ণ; অর্থাৎ জ্ঞান আছে, ধারণা নাই। 'Apprehension এবং Comprehension' ইংরাজী এই দুই শব্দে যে প্রভেদ, ঈশ্বরকে জানা এবং ধারণা করাতেও সেই প্রভেদ। ঈশ্বরকে জানা যায় না বলিয়া, গোলমাল করিলে হইবে না। তাঁহাকে apprehend করিতে পারি; কিন্তু comprehend করিতে পারি না। যে দিন এরূপ সম্ভব হইবে যে, আমরা ঈশ্বরকে ধারণা করিতে পারিব, সেদিন তাঁহার ঈশ্বরত্ব লোপ পাইবে এবং আমাদেরও মনুষ্যত্ব লোপ পাইবে। অতএব যদি তর্ক করিয়া বল যে, ঈশ্বরকে জানা যায় না, তবে ইহা বলিতে হইবে যে, তাঁহাকে জানা যায় অথচ জানা যায় না। "নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ নোন বেদেতি বেদ চ।" অর্থ:—"আমি যে ঈশ্বরকে সুন্দররূপে জানিয়াছি এমন নহে, তাঁহাকে যে একবারে জানি না এমনও নহে, তাঁহাকে জানি অথচ জানি না, ইহার অর্থ যিনি আমাদের মধ্যে বুঝিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে জানিয়াছেন।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন, ঋষিগণ তাঁহাকে জানিতে গিয়া কি দেখিলেন? দেখিলেন, তিনি মহান্ পুরুষ। পুরুষ অর্থ কি? তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া জানিয়াছ, ইহার তাৎপর্য্য কি? এই জগতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কর্ত্তৃক ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সকল ভাব প্রচারিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। প্রথম ভাব, বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের ভাব। এই ভাবে ব্যক্ত করে যে "এই জগৎ এক শক্তি হইতে প্রসূত। তাহা এক অবিনাশী ও অনন্ত শক্তি। এই রূপ, রস গন্ধ স্পর্শাদি বিশ্লেষণ করিয়া বিজ্ঞান মৌলিক পদার্থে উপনীত

হইবার পথ পাইয়া এক অব্যক্ত শক্তিমাত্র নির্ণয় করিতে পারিয়াছে। ইহা গীতার সেই পুরাতন কথা—অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত। অব্যক্ত নিধনান্যেব।'—আদিতে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত, চরমে অব্যক্ত সেই অব্যক্ত, বা invisible বস্তু কি? বিজ্ঞান তাহার নাম দিয়াছেন, Force। বিজ্ঞান বলে এই জগৎ Force বা শক্তি হইতে উৎপন্ন। বিজ্ঞান বলেন, এই Force এক এবং অবিনশ্বর। সবই এক অবিনাশী অনন্ত মহাশক্তি হইতে উৎপন্ন। যে শক্তি বীজরূপে ফলের ভিতরে বর্ত্তমান, তাহাই আবার বৃক্ষরূপে ছাগের উদরে যায়; এক পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। একই জলীয়বাষ্প কুজ্ঝটিকারূপে এবং অবস্থা বিশেষে অন্য আকারে বর্ত্তমান কিন্তু সবই এক। বিজ্ঞান এখন যাহা বলেন, বহুশতাব্দীপূর্ব্বে প্রাচীনঋষিরাও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। "যিনি এক এবং বর্ণহীন হইয়া বহুবিধ শক্তি যোগে বিবিধ কাম্যবস্তু উৎপন্ন করিতেছেন।" বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের উপরে জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছা প্রভৃতি কিছুই আরোপ করা যায় না; কেবল সত্তামাত্র। কিন্তু এই সত্তামাত্র হৃদয়ের অনুরাগের বস্তু হইতে পারে না। ইহার উদ্দেশে প্রার্থনা আরাধনা, স্তুতি, পূজা প্রভৃতি কিছুই সম্ভব নয়। কল হইতে কাপড় প্রস্তুত হয়, কিন্তু কল তাহা কিছুই জানে না। যদি কলকে সম্বোধন করিয়া বলি "হে কল! তুমি দয়া করিয়া আমাদিগের জন্য কাপড় প্রস্তুত করিতেছ, আমাদিগের কত উপকার করিতেছ।" তাহা হইলে যেরূপ হয়, এই জ্ঞানহীন শক্তিকে বা সত্তাকে পূজা করিলেও সেই প্রকার হয়।

আর এক ঈশ্বরের ভাব জগতে প্রচার হইয়াছে, তাহা দার্শনিক ঈশ্বর। দার্শনিক ঈশ্বর কিরূপ তাহা বিগত শতাব্দীতে ইউরোপে প্রচার হইয়াছে। আমাদের দেশের বৌদ্ধদের মধ্যে এবং জৈনদের মধ্যেও প্রচারিত হইয়াছে। এই মতে বলে কার্য্যকারণশৃঙ্খলা দ্বারা এই জগৎ নিয়মিত। এই কার্য্যকারণশৃঙ্খলাবদ্ধ জগতের সঙ্গে সৃষ্টিকর্ত্তার কোনই সম্বন্ধ নাই। এই শৃঙ্খলের এক পাশে আমরা অপরপার্শ্বে তিনি রহিয়াছেন। সংসারের দুঃখ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, পাপের তীব্রযাতনায় ছট্ ফট্ করিয়া ক্রন্দন কর, কিছুতেই কিছু হইবে না; তিনি শৃঙ্খল ভগ্ন করিবেন না; নিয়ম রহিত হইবে না। এই কার্য্যকারণশৃঙ্খলার সহিত তোমার মনোগত ভাবের কোনই সম্পর্ক নাই। এই ভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকে বিগত শতাব্দীর শেষে "Deist" বলিত। এই Deist. গণ বলিতেন, "প্রভু, প্রভু, বলিয়া প্রার্থনা করিবার কিছুই প্রয়োজন নাই। কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা বিশেষরূপে উপলব্ধি কর এবং তাহা কি চায়, জানিয়া তাহা বাঁচাইয়া চল, তোমার কিছুরই অভাব হইবে না। পৃথিবীতে সুখে থাকিবে। এইরূপ বিশ্বাস থাকিলে ঈশ্বরের প্রতি আরাধনা, কৃতজ্ঞতা, প্রেম, প্রীতি প্রভৃতি কোনও ভাবই উৎপন্ন হয় না।

তৃতীয়তঃ আর এক ভাব আছে, তাহা পৌরাণিক ঈশ্বর। এই পৌরণিকমতে ঈশ্বরে মানবীয় ভাবের আরোপ দেখা যায়। ঈশ্বর জগতের ভার মোচনের জন্য, পাপীর উদ্ধারের জন্য, রক্তমাংসময় দেহ ধারণ করিয়া কোনও কালে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি মানুষের ন্যায় পৃথিবীতে কতিপয় বৎসর সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া কালক্রমে অন্তর্হিত হইয়াছেন। মানবের সমুদায় ভাব তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। হিংসা, দ্বেষ ক্রোধ বৈরনির্য্যাতন প্রভৃতি নিকৃষ্টভাবনিচয় তাঁহাতে দেখা যায়। এই পৌরাণিকভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের আর একদল, এই মতে বিশ্বাস করেন অথচ অবতারবাদের বিরোধী। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, অনন্ত আকাশের কোনও কোণে স্বর্গ নামে এক অমৃতময় ধাম আছে; তথায় অসীমজ্ঞান সম্পন্ন, দুর্জ্জয় শক্তিশালী এবং ক্রোধপরায়ণ এক মহাপুরুষ বাস করেন, তিনিই ঈশ্বর। তিনি সেখান হইতে জগতের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিতেছেন ও দণ্ড এবং পুরস্কার বিধান করিতেছেন। এই উভয়ভাবই ধর্ম্মজীবনের অনুকূল নহে। প্রথম যিনি অবতার তিনি বিশেষ সময়ে বিশেষ দেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তাঁহার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? তিনি কেন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? না—ভূভার হরণের নিমিত্তই। বেশ কথা; কিন্তু এখন কি ভূভার নাই, তাহা কি কমিয়া গিয়াছে? এই উনবিংশ শতাব্দীতে প্রত্যেক নরনারীকে জিজ্ঞাসা কর "আজ কি ভগবানে তোমার প্রয়োজন নাই? এখন কি জগতের দুঃখ যন্ত্রণা কমিয়া গিয়াছে, পাপের সংখ্যা কি হ্রাস হইয়াছে? "ঈশ্বর জগতের দুঃখভার অপহরণ করিতে এক সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাতে আমার কি? আমার প্রাণ তাহাতে সন্তুষ্ট হয় না, তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। আমি যে এখন সংসারের পাপ তাপে ক্লিষ্ট এবং জর্জ্জরিত হইতেছি, ডুবিয়া যাইতেছি, আমাকে এখন তোলে কে? ঈশ্বর অমুক দেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন শুনিলেই কি হইল? ১৮৭৬ সালে প্রিন্স অব ওয়েলস্ আমাদের ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, ইহা শুনিলে কি রাজদশন হইল? ঈশ্বরকে সেরূপ ভাবে জানিয়া প্রাণ তৃপ্ত হয় না। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এই যে, তিনি জীবন্ত পুরুষ, জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাময় দেবতা, আমাদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ এবং নিকট যোগ রহিয়াছে। এই জগতের প্রত্যেক পদার্থে তিনি বিরাজিত, তিনিই প্রাণের প্রাণ এবং নিকট হইতে নিকটতম। অতীতকালে তিনি প্রকাশিত হইয়াছিলেন, অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ইহা তো গল্পে পড়ি, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি আমাদের সকলের মধ্যে, বিধাতা রূপে, প্রাণের প্রাণ হইয়া বিরাজ করিতেছেন না কি? প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি বিধাতা হইয়া এই দেহের প্রত্যেক শিরাতে বিদ্যমান; এই দেহের অস্থি, মাংস এবং ধাতু পুঞ্জ তাঁহারই শক্তিতে পরিচালিত হইতেছে। তিনিই সর্ব্বদা আমাদিগের আত্মাকে রক্ষা করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব এই খানে। তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভাবে অবিনাশী সত্যরূপে নিকটে অনুভব করা, প্রাণের ভিতরে উপলব্ধি করা এবং তাঁহাকে প্রতীতি করাই ত ব্রাহ্মধর্ম্ম। পূর্ব্ব ভাব ছাড়িয়া, এই পরম পুরুষকে জীবনে একমাত্র সত্যস্বরূপ দেবতা জানিয়া তাঁহার পূজা করা, সাধনা করাই ত ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই

ভাব আমরা যে পরিমাণে অনুভব করি, সেই পরিমাণে আমরা তাঁহার নিকটস্থ হই, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করি। একজন পল্লীগ্রামের লোক যদি শুনিতে পায় যে, আলিপুরের প্রাণী-বাটিকায় সিংহ আসিয়াছে, তাহাতে যেমন তাহার সিংহ দেখা হয় না, সেইরূপ তুমি কেবল মাত্র যদি শুনিয়া রাখ এবং পুস্তকে পড়িয়া রাখ যে, তিনিই বিধাতা, তিনিই আমাদিগের পরম পিতা পরমেশ্বর, তবে কিছুই হইল না! তিনি কিরূপ বস্তু তাহা বুঝিতে পারিলে না। যতক্ষণ জীবনে তাঁহাকে এক মাত্র সত্যস্বরূপ বলিয়া না ধরিতে পারিবে, ততক্ষণ জানিও যে, বই পড়িয়া এবং লোকমুখে শুনিয়া কিছুই হইবে না। ঈশ্বর করুন, আমরা যেন সত্য ধর্ম্মকে জীবনে সাধন করিতে পারি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও বর্ত্তমান খ্রীষ্টধর্ম্ম।

(প্রাপ্ত)

ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমরা অনেকসময় যুগধর্ম্ম বলিয়া বর্ণনা করি, কেননা এই ধর্ম্ম দেশ কালে নিবদ্ধ নহে, ইহা সময়ের পূর্ণতায় ভারতবর্ষে প্রকাশ হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের যাহা মূলধর্ম্ম তাহা বর্ত্তমান সময়ে কি বিজ্ঞান কি দর্শন প্রত্যেকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মকে মনুষ্যরচিত এবং অল্পকাল স্থায়ী বলিয়া কি প্রকারে মনে করিতে পারি? দর্শন বিজ্ঞান ছাড়িয়া বর্ত্তমান সময়ের খ্রীষ্টধর্ম্মের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে আরও সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, চারিদিকে ব্রাহ্মধর্ম্মেরই জয়ঘোষণা হইতেছে। আমি ইংলণ্ডে কিছুকাল খ্রীষ্টসমাজে বাস করিয়া আসিয়াছি এবং এবিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতাও আছে। বর্ত্তমান খ্রীষ্টধর্ম্মের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, ঐ ধর্ম্ম ক্রমশঃই জগতের ক্রমবিকাশ নিয়মের অধীন হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। এ কথা আমাদের কাহারও নিকট নূতন নহে; কিন্তু আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আমার ব্রাহ্মধর্ম্মের উপরে বিশ্বাস শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমি সংক্ষেপে এবং সাধারণ ভাবে আমার অভিজ্ঞতার দুই একটী কথা বলিব।

আমাদের দেশে যেমন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত পুরুষদিগের মধ্যেই প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, ঠিক সেইরূপ খ্রীষ্টসমাজে ও খ্রীষ্টানধর্ম্মে বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এবং অর্দ্ধশিক্ষিত বৃদ্ধপুরুষদিগেরই আস্থা দৃষ্ট হয়। এখনও তাহারা খ্রীষ্ট স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার অথবা তাঁহার পুত্র এবং বাইবেল ঈশ্বরের নিজরচিতগ্রন্থ ইহা বিশ্বাস করে। উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদিগের মধ্য হইতে যে এই সকল বিশ্বাস একেবারেই তিরোহিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। আমরা সকলেই জানি, গ্লাডষ্টোন রাজনীতি বিষয়ে অতি উদার ভাবাপন্ন, কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি ঠিক তাহার বিপরীত। কিছুকাল গত হইল, কোন কোন ধর্ম্মমত লইয়া হক্স্লী সাহেবের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে এবং তৎপরেই গ্লাডষ্টোন সাহেব একখানা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার নাম "Inpregn rock o the Holy Scriptures" অর্থাৎ পবিত্র ধর্ম্ম-শাস্ত্ররূপ দুর্ভেদ্য পাহাড়। তাহাতে বাইবেলকে অভ্রান্ত গ্রন্থ বলিয়াছেন। এইরূপ সুবিখ্যাত স্পার্জিয়ন সাহেব (যিনি কিছুকাল হইল পরলোকে গমন করিয়াছেন) সম্বন্ধেও এই প্রবাদ যে, তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম্ম সেই ষোড়শ শতাব্দীর খ্রীষ্টধর্ম্ম। যাহা হউক শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ শিক্ষিত যুবা পুরুষদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের অবস্থা অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন যুবা পুরুষকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, "আপনি কি ত্রিত্ববাদ মানেন? অথবা খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া কি বিশ্বাস করেন?" তবে তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন, যে, এ সকল সেকেলে মত, এখন আর ওসব কেহ মানে না। ইউরোপের মধ্যে জর্ম্মনি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের অবস্থা অবলোকন করিলে যেন বোধ হয় যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম ঐ সকল দেশকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ঐ সকল দেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের অভাবে ধর্ম্মাচরণে একেবারে শৈথিল্য ঘটিয়াছে। এতকাল রবিবার দিনটী খ্রীষ্টানদের বড়ই পবিত্র দিন বলিয়া বিবেচিত হইত; সেইদিন গির্জ্জাতে যাওয়া ও বাইবেল পড়া ভিন্ন কোনও প্রকার সাংসারিক কাজ বা আমোদ প্রমোদ একেবারে নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু এখন প্যারিস এবং বার্লিন্ নগরে রবিবারে নৃত্যগীতের খুব প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; মদ্যপানের ত কথাই নাই। সৌভাগ্যক্রমে ইংলণ্ডে ধর্ম্মের এতদূর দুরবস্থা দৃষ্ট হয় না। সেখানে এখনও রবিবার দিনে এতটা আমোদ প্রমোদ প্রচলিত হয় নাই, এখনও লোকে রীতিমত রবিবার দিন গির্জ্জাতে যাইয়া থাকে। কিন্তু রবিবারের পবিত্রতা সম্বন্ধে মতি গতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। রবিবার দিনটী যে ঈশ্বরের একটী বিশেষ নির্দ্দিষ্ট দিন তাহা অনেকেই বিশ্বাস করেন না। অনেকেরই এই মত যে, সপ্তাহের মধ্যে একটী কোনও বিশেষ দিন বিশ্রাম ও ধর্ম্মালোচনার জন্য রাখা উচিত। রবিবার দিনটী যখন এতকাল এইভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তখন এখনও তাহাই হউক। আমরা সকলেই জানি স্কটলণ্ডবাসিগণ ধর্ম্মের অত্যন্ত গোঁড়া। সেখানে সকলেই রবিবারে রীতিমত গির্জ্জাতে যান। সেখানকার অবস্থাও আজকাল অতি চমৎকার। রবিবার দিন এডিনবর্গ নগরের অনেক স্থানে ব্যাণ্ড প্রভৃতি বাজিয়া থাকে। অনেক সময় খবরের কাগজে এইরূপ আলোচনা হইতে দেখা গিয়াছে যে, রবিবার দিনটী শুষ্ক যাইবে কেন? সে দিনে একটু বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত কেন থাকিবে না? এই জন্য কনসার্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হউক।

এডিনবর্গ নগরের অনেক শিক্ষিত যুবা পুরুষের সহিত এ সম্বন্ধে আমার কথা হইয়াছে। যখনই আমি তাঁহাদের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছি, তখনই তাঁহারা বলিয়াছেন যে "এই ত প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম।" খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম আর ইহা হইতে স্বতন্ত্র কি? খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ মতগুলির কথা উল্লেখ করিলে তাঁহারা বলিতেন যে, ঐ সকল মতের বিশেষ তাৎপর্য্য ও দার্শনিক অর্থ আছে। ঐ সকল মতকে বড়

করিয়া লওয়া ঠিক্ নয়।" যেমন আজ কাল হিন্দু পুনরুত্থান কারীরা তাঁহাদের হিন্দুমতের নানারূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইংলণ্ডেও ঠিক সেইরূপ হইতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকদের মধ্যে ধর্ম্মমতের অবস্থাও এইরূপ। অধিকাংশ ছাত্রই ধর্ম্মমত সম্বন্ধে উদাসীন। যাঁহাদের এ বিষয়ে একটু অনুরাগ আছে, তাঁহাদের খ্রীষ্টধর্ম্ম ও আমরা যাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলি তাহার প্রভেদ খুবই কম বলিয়া মনে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ অধ্যাপকও ধর্ম্মের উদারতা বিষয়ে ছাত্রদিগকে বিশেষ উপদেশাদি প্রদান করিয়া থাকেন। আমি দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলাম যে, একদিন এডিনবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসার তাঁহার ছাত্রদের সমক্ষে বাইবেল হইতে তর্কশাস্ত্রের ভ্রমের একটী উদাহরণ উদ্ধার করিলেন এবং বাইবেলকে So called word of God (যাহাকে লোকে ঈশ্বরদত্ত গ্রন্থ বলে) বলিয়া অভিহিত করিলেন। ইহাতে ছাত্রদের মধ্যে মহা করতালি ধ্বনি পড়িয়া গেল; এডিনবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত দুইটী "খ্রীষ্টধর্ম্ম রক্ষিণী" সভা আছে।

সার উইলিয়ম মনিওর (যিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল) ঐ সভাদ্বয়ের সভাপতি। আমাদের ছাত্রসমাজের মত ঐ দুই সভায় ভাল ভাল বক্তাদিগকে ডাকিয়া বক্তৃতা করান হয়। ঐ সকল বক্তাদের মধ্যে প্রোফেসার ড্রমণ্ডই সর্ব্বপ্রধান। প্রোফেসার ড্রমণ্ডের নাম বোধহয় অনেকেই শুনিয়াছেন। আমেরিকা এবং স্কটলণ্ডে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি। বিশেষতঃ তিনি "Ascent of man" নামক গ্রন্থে সুবিখ্যাত হইয়াছেন। প্রোফেসার ড্রমণ্ডের সহিত আমার কথা বার্ত্তা হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে বিশেষরূপে জানি। তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসার। সেখানে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য বিষয়ে উপদেশ দেন। এডিনবর্গের খ্রীষ্টধর্ম্ম রক্ষিণী সভার সভ্যগণ তাঁহাকে অনেক সময়ে নিমন্ত্রণ করিয়া বক্তৃতা করান। তিনি যেমন সুলেখক, তেমনি সুবক্তা। যুবকদিগের মনে খ্রীষ্টধর্ম্মের সত্যসকল বদ্ধমূল করাই তাঁহার বক্তৃতার উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই সকল বক্তৃতায় যাহা খ্রীষ্টীয়ভাব ও মত বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইত, তাহা কোনও অংশেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী নহে। আমি প্রোফেসার ড্রমণ্ডকে যতদূর জানি, তাহাতে আমার বিশ্বাস যে, তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম্মে ও বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মে খুব কমই প্রভেদ। তিনি একদিন বক্তৃতাতে স্পাজিয়ান সাহেবের মত সমালোচনা করিয়া বলিলেন যে, তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মকে উন্নতিশীলধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার না করিয়া ঐ ধর্ম্মের বড়ই ক্ষতি করিয়াছেন। তাঁহার শেষপুস্তকে (অর্থাৎ Ascent of man এ) তিনি বর্ত্তমান বিবর্ত্তনবাদের সহিত খ্রীষ্টধর্ম্মের কোথায় সামঞ্জস্য তাহাই দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু যাঁহারা ঐ পুস্তকখানা পড়িয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, আমরা যাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলি, এ গ্রন্থে বিবর্ত্তনবাদের সহিত ঠিক্ তাহারই সামঞ্জস্য করা হইয়াছে। কি প্রকারে এই প্রকৃত ধর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধর্ম্মভাব সকল বিকশিত হয়, তাহা তিনি অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। পুস্তকখানার উপসংহার কালে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মের বিশেষ মতগুলির কথা উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু কি প্রকারে বিবর্ত্তনবাদের সহিত তাহার সামঞ্জস্য হয়, তাহা কিছুই বলেন নাই। প্রোফেসার ড্রমণ্ডের মতে খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং প্রেমের ধর্ম্ম একই কথা। তাঁহার লিখিত "The Greatest thing in the world" নামক ক্ষুদ্র পুস্তক খণ্ডে ইহার বিশেষ প্রমাণ হইয়াছে; ড্রমণ্ডের মতে প্রেমই জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু। স্কটলণ্ডের যুবকদের মধ্যে ড্রমণ্ড সাহেবের খুব প্রতিপত্তি এবং তাঁহাকে অনেক সময় ছাত্রদিগের আদর্শ উপদেষ্টা বলিয়া বর্ণনা করা হয়। তাঁহার ধর্ম্মভাব ও মত সকল সেখানকার ছাত্রদের মনে যে বিশেষরূপপ্রবিষ্ট হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কেবল যুবকদের মধ্যেই যে ধর্ম্মমতের উদারতা প্রবেশ করিতেছে এমন নহে। স্কটলণ্ডের বড় বড় প্রচারকদের মধ্যেও ধর্ম্মমতের যথেষ্ট বিপ্লব দেখা যায়।

খ্রীষ্টসমাজের এইরূপ উদারতা দেখিয়া মনে হইতে পারে যে ইউনিটেরিয়ানদিগের বুঝি সেখানে খুব প্রতিপত্তি আছে; কিন্তু তাহা নহে। খ্রীষ্টসমাজ হীনতেজ হইলেও সেখানে ইউনিটেরিয়ানদের প্রতি জনসাধারণ অত্যন্ত বীতরাগ। ইহার কারণ এই যে সকলেই মনে করেন যে, ইহারা কেবল ভাঙ্গেন, গড়িবার দিকে দৃষ্টি নাই। একথার কতদূর সত্যতা আছে জানি না। অনেকেই জানেন ডাক্তার মার্টিনো ইউনিটেরিয়ান দলের বর্ত্তমান নেতা। তিনি গত কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মমত বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাতে ইউনিটেরিয়ান মতের যুক্তিযুক্ততা প্রমাণিত হইয়াছে। ইউনিটেরিয়ানগণ অনেক পরিমাণে ভাঙ্গিতে পটু, গড়িতে নহে। কিন্তু ইউনিটেরিয়ানদের মধ্যে আজকাল একটী বিশেষ ভাব লক্ষিত হয়। তাঁহারা এতকাল কেবল খ্রীষ্টধর্ম্মের সমালোচনা করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অন্যদেশে এবং অন্যধর্ম্মে কি সত্য আছে তাহা জানিবার জন্য এবং আপনাদের ধর্ম্মে তাহা প্রবিষ্ট করিবার জন্য তাঁহারা বিশেষ ব্যগ্র।

খ্রীষ্টসমাজ ও খ্রীষ্টধর্ম্মের এরূপ ক্রমোন্নতি দেখিয়া আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়াশা বর্দ্ধিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে মৃত বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের একবার ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রতি দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মদের দোষে ব্রাহ্মসমাজের অনেক অবনতি হইতে পারে, কিন্তু এই ব্রাহ্মধর্ম্ম যে ক্রমশঃ পৃথিবীতে জয়লাভ করিতেছে, তাহা অস্বীকার করা অত্যন্ত অন্ধের কাজ।

আমার সামান্য ক্ষমতানুসারে আমি ইংলণ্ডে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর বিশ্বাস এবং ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা আমার অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান দেখিয়া যাঁহারা ভীত হইতেছেন, তাঁহাদের এই ভয় নিতান্তই অমূলক, কেননা চারিদিকের এই পুনরুত্থানকে আমি ধর্ম্মের পুনরুত্থান বলিয়া মানিতে প্রস্তুত নই। ইহাকে হিন্দু পুরাতনসাহিত্যের পুনর্জীবন বলিলেই যুক্তিযুক্ত হয়। আমাদের দৃষ্টি যখন কেবল স্বদেশেই নিপতিত থাকে, তখনই

আমাদের ভীত হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে সে ভয় অনায়াসেই চলিয়া যায়।

কিন্তু এখন কথা এই যে, সময়ের অবস্থা দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেই কি আমাদের যথেষ্ট করা হইবে? আমাদের কি আর কোনও কর্ত্তব্য নাই? ব্রাহ্মধর্ম্মকে কি প্রকারে এই দেশে জয়যুক্ত করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে কি কোনও কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিব না? আজকাল ব্রাহ্মসমাজে হিন্দু ভাবের খুবই প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। ইহা একদিকে খুব সুখের বিষয়, কেননা ইহাতে স্বদেশের প্রতি অনুরাগ এবং জাতীয় জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাই পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু কেবল জাতীয় জীবন অথবা উহার আধিক্যদ্বারাই ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ সিদ্ধ হইবে কি? আমার এই ধারণা যে, হিন্দুভাবের প্রাদুর্ভাব এবং খ্রীষ্টীয় ভাবের কিঞ্চিৎ তিরোভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। আমরা ক্রমশঃ পুরাতন হিন্দু কুসংস্কার এবং অলসতায় জড়িত হইয়া পড়িতেছি। ধর্ম্মপ্রচারের ভাব, বল এবং বীর্য্য ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। প্রকৃত কথা বলিতে কি, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে হিন্দুভাবের প্রাদুর্ভাবে অতি দূষণীয় গুরুবাদ (যাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের দারুণ বিরোধী এবং অস্বাভাবিক) যোগবাদ (যাহাতে মানবের সমুদায় মানসিক শক্তিকে একেবারে সমূলে বিনাশ করে) ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতেছে। এই সকল বিষয় এই প্রবন্ধের বিবেচ্য বিষয় নহে। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই, যে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের প্রভাব ব্রাহ্মসমাজের উপর পড়িয়া ইহাকে বলবীর্য্যশালী করিয়াছিল এবং ব্রাহ্মসমাজের গৌরব দিগ্‌দিগন্তরে বিস্তার করিয়াছিল, সেই খ্রীষ্টীয়ভাব অনেক পরিমাণে অন্তর্হিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে হীনবীর্য্য করিয়া ফেলিতেছে। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস যদি পর্য্যালোচনা করা যায় তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, হিন্দুভাবের সহিত খ্রীষ্টীয়ভাবের সংমিশ্রণই ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির একমাত্র কারণ মহাত্মা রামমোহন রায় খ্রীষ্টীয়ভাবের সাহায্যেই ব্রাহ্মসমাজ সংগঠন করেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই বল কথঞ্চিৎ খর্ব্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু কেশবচন্দ্র সেনের দ্বারা সেই ভাব পুনঃ প্রবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে কি যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে তাহা কোনও ব্রাহ্মের অবিদিত নাই। ইহা নিশ্চিত, যদি খ্রীষ্টকে ছাড়িয়া দি, তাহা হইলে মনে হয় বৈরাগী হইয়া খোল করতাল বাজাইয়া পুনরায় হিন্দুসমাজের আশ্রয় লইব, না হয় শ্বাসরুদ্ধ করিয়া এমনি যোগী হইব যে, আমাদের দ্বারা পৃথিবীর আর কোনও উপকারের আশা থাকিবে না। কেশবচন্দ্র সেনও শেষ জীবনে যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার "যোগ" নামক পুস্তক খানা পড়িলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা কি সুন্দর এবং স্বাভাবিক ভাবে পরিপূর্ণ। তিনি একদিকে আমাদিগের পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ এবং অপরদিকে যীশুর নিকট হইতে সেই যোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনই সর্ব্বপ্রথমে যীশুকে মহাযোগী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে যদি যীশুর সেই যোগ (যদ্দ্বারা তিনি একটী উড্ডীয়মান কপোতে ঈশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন) বহুল পরিমাণে সাধিত হয়, তবে বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। চক্ষু বন্ধ করিলেই যোগী হওয়া যায় না। খ্রীষ্ট পাপীর পাপ বিমোচন করিয়া, এবং শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া মহাযোগ সাধন করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে আর কোথাও এরূপ দৃষ্টান্ত নাই। এই জন্যই খ্রীষ্টের মহত্ব, এই জন্যই আজ তাঁহার জয়পতাকা পৃথিবীতে উড়িতেছে।

খ্রীষ্টের নাম করিলে এবং খ্রীষ্টীয় ভাবের কথা বলিলে অনেকেরই বৈদেশিকভাব বলিয়া মনে হয়, এই কুসংস্কার বশতঃই আমরা অনেক সময়ে খ্রীষ্টের আদর্শ অনুকরণ করিতে বিশেষ যত্নশীল হই না। আমরা মনে করি যে, আমাদের স্বদেশে কি উচ্চ ধর্ম্ম নাই, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেন খ্রীষ্টের অনুসরণ করিতে যাইব? কেশবচন্দ্র সেন এই ভ্রম দূর করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে প্রচুর পরিমাণে সিদ্ধমনোরথও হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার নিকটেই খ্রীষ্টকে সমাদর ও শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছি। আমি এই সকল কথা দ্বারা হিন্দুভাব অথবা হিন্দুধর্ম্মের উচ্চতা কিছুমাত্র অস্বীকার করিতেছি না, কিন্তু আমার এই বিশ্বাস যে, ব্রাহ্মসমাজে কেবল হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ কখনই সংরক্ষিত হইবে না। আশা করি, ব্রাহ্মসাধারণ এই সত্য ত্বরায় উপলব্ধি করিবেন এবং তদনুসারে ব্রাহ্মধর্ম্মের কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন।

শ্রীপূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

১৮৯৪

ঈশ্বরের কৃপায় নিম্নলিখিত ভাবে এই তিন মাসে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সমাজের নানা বিভাগের কার্য্যসম্পন্ন করিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১২টী অধিবেশন হইয়াছিল।

বাবু মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় গুরুবাদ সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদী পত্রে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, বিগত অধ্যক্ষসভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনে সেই বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার মনযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছিল। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সেই বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত আছেন। আজিও তাহার শেষ হয় নাই।

সহকারী সম্পাদক বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তিন মাসের জন্য ছুটী লইয়া উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে গমন করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত স্থানসমূহে উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে—টাঙ্গাইল, ভবানীপুর, খলিলপুর, ঢাকা, শিবপুর, ধুবড়ীছাত্রসমাজ, কোয়েটা ও চাইবাসা। এই সকল স্থানে ও নিম্নলিখিত স্থানসমূহে আমাদের প্রচারক মহাশয়গণ ও অন্যান্য বন্ধুরা প্রচারার্থে গমন করিয়াছিলেনঃ—

রামপুরহাট, নলহাটী, মণীপুর, মুর্শিদাবাদ, আজিমগঞ্জ, ধুলিয়ান, কাঞ্চনতলা, পূর্ণিয়া, খারসুঁই, দিনাজপুর, খরসান, দার্জ্জিলিং, রংপুর, পুরুলিয়া, বড়বাজী, দেরাদুন, ঢাকা, মেদিনীপুর।

খাসিয়াপর্ব্বত, লক্ষ্ণৌ ও আরামনগরে স্থায়ী প্রচারক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট আছে।

প্রচার—প্রচার কমিটির অনুরোধ অনুসারে বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা প্রচারক নিয়োগ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর ১৪ন নিয়মানুসারে প্রবেশার্থী প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছেন। এইরূপ নির্দ্ধারণের কারণ এই যে নীলমণি বাবু কয়েক বৎসর খাসিয়া পর্ব্বতে থাকিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। বাবু কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয় (Missionary on probation) সম্প্রতি কলিকাতায় থাকিয়া কার্য্য করিবেন এইরূপ স্থির হইয়াছে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—নির্জ্জনবাস ও জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তিন মাসের ছুটি গ্রহণ করিয়া বোলপুরের শান্তিনিকেতনে অবস্থিতি করেন। এ সময়েও তিনি তত্ত্ব-কৌমুদীর সম্পাদকীয় কার্য্য করিয়াছেন। তৎপর কলিকাতায় আগমন করিয়া সাধনাশ্রমে ও কখন কখন অন্যান্য স্থানে উপাসনাদি করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস—প্রথম মাসে কলিকাতায় থাকিয়া নিয়মিতরূপে মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন এবং কখন কখন প্রাতেও উপাসনাদি করিয়াছেন। সাধনাশ্রমের বিশেষ ভার প্রাপ্ত হইয়া ইহার কাজ সব দেখিয়াছেন। বালক বোর্ডিংএ মধ্যে মধ্যে উপাসনাদি করিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে পরিদর্শকের কাজ করিয়াছেন। ছাত্রসমাজে একদিন "বিদ্যাসাগরের মহত্ব" এই বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। ছাত্রাবাসে উপাসনা ও আলোচনাদি করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ব্রাহ্মপরিবারে পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে এবং সাধারণ ভাবে মধ্যে মধ্যে উপাসনাদি করিয়াছেন। ব্রাহ্মপরিবারাদি পরিদর্শন করিয়াছেন, ভবানীপুরে ব্রাহ্মপরিবারে উপাসনাদি করিয়াছেন। প্রায় প্রতিদিনই এইরূপে উপাসনা আলোচনা পাঠাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা ও ব্রাহ্মপরিবার সংগঠনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তিনটী উপদেশ মুদ্রিত করিয়াছেন এবং তাহার কিছু কিছু বিতরণও করিয়াছেন।

জুলাই মাসের দুই একদিন থাকিতে একটী পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে দেরাদুন নগরে গমন করেন। দেরাদুনে সপ্তাহাধিককাল থাকেন। এই সময় তথায় তিনটী পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনা করেন, ইহা ব্যতীত সামাজিক ও পারিবারিক উপাসনা উপদেশ পাঠ-ব্যাখ্যা ও আলোচনাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিয়াছিলেন। দেরাদুন হইতে প্রত্যাগমনের সময় আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, ফয়জাবাদ, আরা, ভাগলপুর, নলহাটী এবং বোলপুরে কিছু কিছু কাজ করেন। ইহার মধ্যে আরা সাধনাশ্রমের কার্য্যাদির বিষয় আলোচনা করেন এবং একটা অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশেষ উপসনা করেন, লক্ষ্ণৌতে কিছু বিশেষ রূপে কায হয়। দুদিন বিশেষ আলোচনা হয়। লক্ষ্ণৌতে "দেবাসুর সংগ্রাম" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন ইহা ব্যতীত ভগবদাশ্রমে এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে উপাসনা উপদেশ পাঠ ব্যাখ্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন। অন্যান্য স্থানে কোথাও উপাসনা কোথাও বা কেবল ধর্ম্মালোচনাদি করিয়াছেন। এইরূপ প্রায় একমাস কাল বাহিরে যাপন করিয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিশেষরূপে কলিকাতার কোন কোন কার্য্যের ভার থাকাতেই এরূপভাবে শীঘ্র শীঘ্র ফিরিতে হইয়াছে।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্ম-সম্মিলনীর ভাদ্রোৎসবের কার্য্যের কিছু কিছু সহায়তা করেন। এই এক মাস কালের মধ্যে মন্দিরে তিন দিবস সন্ধ্যাকালে ও কোন কোন দিন প্রাতঃকালে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। মধ্যে এক রবিবার ঢাকাতে বিশেষ একটী অনুষ্ঠান উপলক্ষে যান, সেখানে দুই দিন থাকিয়া অনুষ্ঠান উপলক্ষে ও সাধারণভাবে উপাসনা, উপদেশ ও পাঠাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করেন। কলিকাতাতে বালক বোর্ডিং এবং ছাত্রাবাসে মধ্যে মধ্যে উপাসনাদি করিয়াছেন। একদিন বালিকা বোর্ডিংএ একটী অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনা করেন,ইহাব্যতীত সাধনাশ্রমে এবং ব্রাহ্মপরিবারে প্রায় প্রতিদিনই উপাসনাদি করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে তত্ত্বকৌমুদীতে কিছু কিছু লিখিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু—চাইবাসা—উৎসব উপলক্ষে গমন করেন, কয়েকদিন আচার্য্যের কার্য্য করেন। ইহা ব্যতীত কোন কোন পরিবারে উপাসনা করেন ও উপদেশ দান করেন। বন্ধুদিগের সহিত একত্রে উপাসনা ও আলোচনাদি করেন এবং "ধর্ম্মের শক্তি" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন।

সম্বয়—এখানে একটী পরিবারে উপাসনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন।

পুরুলিয়া—এখানে কোন ব্রাহ্মসমাজ ছিল না, সেজন্য একটি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করেন। কোন কোন পরিবারে উপাসনা করেন ও উপদেশ দান করেন এবং "জীবনের মহত্ব" সম্বন্ধে টাউন হলে একটি বক্তৃতা করেন।

কলিকাতা—মন্দিরে রবিবার সায়ংকালে একদিন আচার্য্যের কার্য্য করেন। কোন কোন পরিবারে উপাসনাদি করেন এবং Aids to Spiritual Life নামক একখানি পুস্তক সঙ্কলনে প্রবৃত্ত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত লছমনপ্রসাদ—মধ্যে একবার বড়বাঙ্কী জেলায় প্রচারার্থ গমন করেন। তদ্ভিন্ন অধিকাংশ সময় লক্ষ্ণৌ-সহরে থাকিয়া কার্য্য করেন। এই তিন মাসই নিয়মিতভাবে লক্ষ্ণৌসমাজে উপাসনা করিয়াছেন এবং প্রায় প্রত্যহ যুবক-দিগের সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়াছেন। প্রত্যহ প্রাতে হোমিও-প্যাথি ঔষধ বিতরণ করিয়াছেন। সম্প্রতি যখন লক্ষ্ণৌসহরে ওলাউঠা রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল—তখন ঔষধ বিতরণ ও রোগীদের শুশ্রূষা করিয়াছেন। গোমতী নদীতে বন্যা হইলে অনেক লোক আশ্রয়হীন হইয়াছিল, তিনি তাহাদের নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বসু—তিনি নিম্নলিখিত স্থানে ভ্রমণ করিয়া উপাসনা, উপদেশ, আলোচনা, প্রার্থনা ও বক্তৃতা করিয়াছেন—খান্‌খানাপুর, তিল্লি, টাঙ্গাইল, করটীয়া। আগষ্ট মাসের প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া, সাধনাশ্রমে ও কোন কোন পরিবারে উপাসনাদি করেন।

শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী—চেরাপুঞ্জী প্রচার আশ্রমের প্রাত্যহিক মিলিত উপাসনায় পাঠ ও উপাসনা করেন। সংক্ষি

মৌরেই এবং মৌসমাই এই তিন ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় উপাসনা ও উপদেশ প্রদান করেন। শনিবার বাঙ্গালা উপাসনা সমাজে পাঠ ও উপাসনা করেন। প্রত্যহ রোগীদিগকে ঔষধ প্রদান করেন। এক খাসিয়া রমণীকে মৌসমাই ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষিত করেন। মোরা এবং মৌপুন কাটিয়াং নামক গ্রামে প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। শেষোক্ত স্থানে প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে এরূপ প্রচার হইয়া থাকে। দুইবার শেলা এবং লাইক্যানসেউএ এবং একবার শিলঙ্গে গমন করেন। প্রথমোক্ত দুই স্থানে উপদেশ প্রদান করেন। শিলঙ্গে মৌথার ব্রাহ্মসমাজ, লাবান উপাসনা সমাজ এবং শিলং ব্রাহ্মসমাজে তিন সপ্তাহ উপাসনাদি করেন। লাবান সমাজের উৎসবে আচার্য্যের কার্য্য করেন। শিলং মহিলাসমাজে তিন সপ্তাহ উপাসনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন এবং সঙ্গতে আলোচনাদি করেন। পারিবারিক তিনটী অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—কলিকাতা—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ছাত্রসমাজে জড় ও আত্মা এবং সংশয় ও বিশ্বাস বিষয়ে দুইটী প্রকাশ্য বক্তৃতা। সাধনকুটীরে তত্ত্ববিদ্যা সভার অধিবেশনে সভাপতিরূপে ৩টী ক্ষুদ্র বক্তৃতা, অন্য দুই দিন আলোচনা সভায় দুইটী বিষয়ে ক্ষুদ্র বক্তৃতা, কোন ভদ্রলোকের বাটীতে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য, ব্রাহ্ম-সম্মিলনীর উৎসব উপলক্ষে উপাসনা ও উপদেশ, কোন ভদ্রলোকের বাটীতে সঙ্গীত ও কীর্ত্তন;

ঢাকা—ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রহ্ম-মন্দিরে "দেহ ও আত্মা" এবং "পরকাল" বিষয়ে ২টী বক্তৃতা, একদিন অপরাহ্নে ধর্ম্মালোচনা। পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রহ্ম-মন্দিরে ছাত্র-সমাজের উৎসব উপলক্ষে বেদীর কার্য্য, উপদেশের বিষয় "বিশ্বাসের লক্ষণ।" পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রহ্ম-মন্দিরে স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের স্মরণার্থ "চরিত্রের উপর ধর্ম্মের প্রভাব" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ উপলক্ষে সভাপতির কার্য্য ও বক্তৃতা। পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রহ্ম-মন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ; পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে সঙ্গত-সভার অধিবেশনে ধর্ম্মালোচনা, বিষয় "ব্রাহ্মধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্মে মুক্তি হয় কি না?" একটি আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য;

মেদিনীপুর—ব্রহ্ম-মন্দিরে একটি ব্রাহ্ম বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য বেদী হলে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে প্রকাশ্য বক্তৃতা, বক্তৃতার বিষয় "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মহত্ত্ব;"

এতদ্ভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ লেখা, ধর্ম্ম-বিষয়ক পুস্তক রচনা; এবং কলিকাতা ও মফস্বলে ব্রাহ্ম ও অপরাপর লোকের মধ্যে কথোপকথন ও আলোচনা দ্বারা সত্য প্রচার করেন।

সাধনাশ্রম—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ৩ মাসের অবকাশ গ্রহণ করিলে বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার স্থানে সাধনাশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত জয়শঙ্কর রায়—সাধনাশ্রমের সম্পাদকীয় কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মবালিকা ছাত্রীনিবাসে মাসাধিক-কাল নিয়মিতরূপে উপাসনা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়—সাধনাশ্রমের দৈনিক উপাসনায় কখন কখন আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদনের সহায়তা করিয়াছেন এবং কোন কোন অনুষ্ঠানে উপাসনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নিয়মিতরূপে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে কার্য্য করিয়াছেন। ব্রাহ্ম বালিকা ছাত্রীনিবাসে প্রাতে উপাসনা করিয়াছেন। কখন কখন মন্দিরে রবিবার প্রাতে উপাসনা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—উত্তর বাঙ্গালায় প্রচারার্থে গমন করিয়া সৈদপুর ও রংপুরে উপাসনা উপদেশ প্রদান ও আলোচনাদি করেন। নিমতা ব্রাহ্মসমাজে কখন কখন আচার্য্যের কার্য্য করেন। কয়েকটি ব্রাহ্মপরিবার পরিদর্শন করেন। কয়েকদিবস সাধনাশ্রমে প্রাতে ও সন্ধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দুইটি পরিবারে কয়েকদিবস আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল—একটী পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রীখণ্ডে গমন করিয়া উপাসনাদি করেন। কাটোয়াতে ধর্ম্মব্যাখ্যা করেন। কখন কখন সাধনাশ্রমে উপাসনা করিয়াছেন এবং নিয়মিতরূপে তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদনের সহায়তা করিয়াছেন। তত্ত্ববিদ্যাসভাতে "ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি" এবং ব্রাহ্মসম্মিলনীর উৎসব উপলক্ষে মন্দিরে "ভক্তি ও ভক্ত" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সম্প্রতি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক মুদ্রিত করিতেছেন।

সাধনাশ্রমের আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা		খরচ	
আশ্রমবাসীদিগের নিকট হইতে প্রাপ্তি	৩৯৷০	পাথেয় ও আশ্রমের নানাবিধ ক্ষুদ্র ব্যয়	১০৮৷৷৵১০
দানপ্রাপ্তি	১৩৫/১০	আশ্রমবাসী পরিচারক এবং অন্যান্যের আহারাদির ব্যয়	১৮৯৷০
পাথেয় হিঃ	৭৯৷৵১৫		
পুস্তকফণ্ড হইতে প্রাপ্ত	৩৫৷৷৶		
ভিক্ষা	১৩৷৷৵১০	স্থিত	৫৷৫
	৩০৩/১৫		২৯৮৵১০
পূর্ব্বস্থিত	।/০	স্থিত	৫৷৫
	৩০৩৷৵১৫		৩০৩৷৵১৫

ছাত্রসমাজ—বিগত ১৪ই ও ১৫ই জুলাই উপাসনামন্দিরে নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে ছাত্রসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হয়; তদনন্তর নববর্ষের কার্য্যারম্ভ হয়।

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মসমাজ।

প্রচার যাত্রা—সাধনাশ্রম হইতে পরিচারক বাবু কালীচন্দ্র ঘোষাল ও সহায় বাবু অমৃতলাল গুপ্ত, কৃষ্ণনগর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানহইয়া ময়মনসিংহ যাইবেন। এবং সংকল্পাধীন পরিচারক বাবু হরিমোহন ঘোষাল ও সহায় বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ খুলনা, যশোহর, বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানে যাইবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের চাঁদা, তত্ত্বকৌমুদী ও মেসেঞ্জারের মূল্যও ইঁহারা আদায় করিবেন। আশা করি আমাদের বন্ধুগণ দেয় অর্থ প্রদান করিয়া এবং প্রচার কার্য্যের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া বাধিত করিবেন।

নামকরণ—সুনামগঞ্জে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণদয়াল রায়ের ষষ্ঠকন্যার নামকরণ হইয়াছে। কন্যার নাম সুহাসিনী রাখা হইয়াছে। এই উপলক্ষে কৃষ্ণদয়াল বাবু সাঃ ব্রাঃ সমাজে ১৲ ও সাধনাশ্রমে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

কালীগচ্ছ গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দীর পুত্রের এবং শ্রীযুক্ত প্যারীনাথ নন্দীর দ্বিতীয় কন্যার নামকরণ উক্তস্থানে সম্পন্ন হইয়াছে। পুত্রের নাম অজিতনাথ ও কন্যার নাম নির্ম্মলাবালা রাখা হইয়াছে। দুই স্থলেই শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

জাতকর্ম্ম—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মহলানবিসের কন্যার জন্ম উপলক্ষে কলিকাতা ২১০নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীটস্থ ভবনে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে কন্যার মাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

২৩শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে পাবনা নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বাগছির চতুর্থ পুত্রের (নবম সন্তান) জাতকর্ম্ম উপলক্ষে তাঁহার বাটীতে উপাসনা হয়। উপাসনার কার্য্য শশী বাবু সম্পন্ন করেন।

উৎসব—পাবনা হইতে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বাগছি লিখিয়াছেন,—"গত ২০শে ও ২৩শে কার্ত্তিক বুধ ও বৃহস্পতিবার পাবনা ব্রাহ্মসমাজের অষ্টত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে প্রচারক বাবু শশিভূষণ বসু ও বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন মহাশয়দ্বয় এখানে আসিয়াছিলেন। বুধবার প্রাতে ও সায়ংকালে উপাসনা হয়। উপদেশের বিষয় প্রাতে "শিশুর ন্যায় সরল পবিত্র ও বিশ্বাসী না হইলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা যায় না," সায়ংকালে "সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন"। বৃহস্পতিবার প্রাতেও উপাসনা হয়। উপদেশের বিষয় "ধর্ম্মের আলোকে সংসারের বস্তু দর্শন," সায়ংকালে "মুক্তির উপায়" সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। বক্তা প্রথমে জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মুক্তি সম্বন্ধে মত বিবৃত করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় মুক্তি সাধনের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১) জ্ঞানসাধন, (২) সত্যসাধন, (৩) উদারতা (অর্থাৎ অভ্রান্ত গুরু ও অভ্রান্ত শাস্ত্রের বন্ধন ছিন্ন করা) (৪) বিশ্বাস। উপাসনা ও বক্তৃতাদি শশিবাবু করেন। কৈলাস বাবু তাঁহার সুললিত সংগীতদ্বারা সকলকে প্রীত করেন।

রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা—বাঁকিপুর হইতে জনৈক বন্ধু লিখিয়াছেন,—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে অত্রস্থ বেহার ক্যাসনেল কলেজ হলে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ এক সভা হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাবু দেবেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, রাজার সমসাময়িক সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা এবং তৎপূর্ব্বের এ দেশের ধর্ম্মের স্থূল স্থূল আভাস প্রদান করিয়া একটী সারগর্ভ সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। দেবেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে সভাপতি মহাশয়ের সম্মতি মতে স্থানীয় খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক রেভারেণ্ড মিঃ কলিয়ার তাহার স্বচক্ষে দৃষ্ট ব্রিষ্টল নগরে রাজার সমাধিস্তম্ভ সম্বন্ধে জলন্ত ও জীবন্ত ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভায় স্থানীয় বেহারী ভদ্রলোক অনেক উপস্থিত ছিলেন।

কৃতজ্ঞতার সহিত ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি স্বীকার করা যাইতেছে।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

সঞ্জীবনী কার্য্যালয় হইতে প্রাপ্তি মাঃ গুরুচরণ সমদ্দার ৯১০, যশোহর জেলার অন্তর্গত আউড়িয়া গ্রাম বাসী কোন ভদ্রলোক ১১৶১৭॥ ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস লাহোর২৲, বাবু কালীশঙ্কর সুকুল সিটিকলেজের শোভাবাজার ব্রাঞ্চ হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠান ১০॥০, একটী বালিকা কলিকাতা ১৲, রাধাগোবিন্দ সাহা কলিকাতা ২৲, শ্যামলাল ভড় কলিকাতা ॥০, একজন ভদ্রলোক কলিকাতা ।০, জেনেরল এসেম্ব্লি কলেজ হইতে বাবু সিদ্ধেশ্বর দত্ত ও সুবোধচন্দ্র রায় পাঠান ১৶০, বাবু যোগেন্দ্রনাথ সরকার কলিকাতা ৫৲, বাবু কেদারনাথ সরকার বোয়ালিয়া ১৲, বাবু শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঐ ১৲, বাবু বিহারীলাল রায় ঐ ১৲, শ্রীমতী উষাবতী ঘোষ দেওঘর, একটী সোণার আংটী, শ্রীমতী বিনয়কুমারী চক্রবর্ত্তী ফরিদপুর হইতে সংগ্রহের অবশিষ্ট ।০, শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু ৩৲, বাবু দ্বারকানাথ দাস (জামালপুর ময়মনসিংহ) হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠান ২২।৶০, শ্রীমতা বিধুমুখী দাসী কলিকাতা ১৲, বাবু গোপেশ্বর দত্ত ঐ ১॥০, বাবু সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ ॥০, বাবু সাতকড়ি আইচ ঐ ।০, নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের ছাত্রগণ বাবু নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ১১৲, বাবু প্রসন্নকুমার চৌধুরী কলিকাতা ॥০, বাবু মুকুন্দলাল বর্ম্মণ সৈদাবাদ ২৫৲, একটী বন্ধু (মাং শরচ্চন্দ্র রায়) কলিকাতা ১০৲, সম্পাদক পুয়র রিলিফফণ্ড যশোহর ১০৲, বাবু মধুসূদন রাও কটক ৪৬৶০, বাবু বৈকুণ্ঠচন্দ্র আচার্য্য, নর্ম্মাল স্কুল ঢাকা ১৬৲, বাবু অধরচন্দ্র মজুমদার ৬০, শ্রীমতী মোক্ষদা মিত্র কলিকাতা ১৲, একজন সেবক (মাং কৈশিকীচরণ গুপ্ত) মাদারঘাট আসাম) ৩৲, বাবু আর, এম, বি, গৌহাটী ১৲, বাবু শৈলেন্দ্রভূষণ দত্ত, সত্যেন্দ্র ভূষণ দত্ত মণীন্দ্রভূষণ দত্ত দ্বারভাঙ্গা ৮৲, উপেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক সৈয়দপুর হইতে সংগৃহীত ১০৲ বঙ্কবিহারী দাস কর্ত্তৃক বর্ম্মা হইতে সংগৃহীত ২৫৲, মাণিকদহ হইতে বাবু হরিমোহন ঘোষাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৩৲, শ্রীমতী শৈবলিনী দেবী মোহালি ঢাকা ১৲, ইন্দুমতী দেবী ঐ ১৲, ঐ বাবু চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গয়া হইতে সংগৃহীত ৮৲, শ্রীমতী চন্দ্রশোভা হালদার কলিকাতা ১৲, বাবু মনোমোহন বিশ্বাস কৃষ্ণনগর ১৲, অনৈক ভদ্রলোক পোতজিয়া পাবনা ১৲, বাবু বঙ্কবিহারী চৌধুরী কর্ত্তৃক ভাণ্ডারহাটী হইতে সংগৃহীত ১০৲, মিঃ সমদার দয়াল সিংহ লাহোর ২৫৲, কোন বন্ধু কর্ত্তৃক (মনিয়র বর্ম্মা) হইতে সংগৃহীত ২২।০ বাবু প্যারালাল ঘোষ কলিকাতা ১৲, শ্রীমতী তীর্থমণি ঘোষ ময়মনসিংহ ॥০ বাবু কালিদাস সরকার কর্ত্তৃক (দাউদ নগর গয়া) হইতে সংগৃহীত ৩॥০। মোট ২৬৯।৴১৭॥।

পূর্ব্বে প্রকাশিত ১২৬৭৶১৫

১৫৩৬॥১২॥

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ২রা অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৫শ সংখ্যা। ১৮শ ভাগ।

১৬ই অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৮১৬ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে সত্যস্বরূপ! মঙ্গলস্বরূপ! পরমেশ্বর তোমাকে সত্য জানিয়া তোমার করুণার উপর নির্ভর করাই ত ধর্ম্ম। কিন্তু হে প্রভো! আমরা যখন তোমার উপরে নির্ভর করিতে যাই, তখন কত প্রতিকূল তরঙ্গ আসিয়া আমাদিগকে আঘাত করে। নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আমরা জীবনের লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া যাই। প্রবৃত্তিকুলের তাড়নাতে ভয়ভীত হইয়া নিরাশ হইয়া পড়ি। বার বার উত্থান, বার বার পতন, এই যাতনাতে পড়িয়া মনে করি, তুমি বুঝি আমাদের প্রার্থনা শুনিতেছ না। যখন প্রতিকূল ঘটনা সকল ঘটিতে থাকে, বড় আশা করিয়া যাহা গড়িতে যাই, যখন তাহা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়, হস্তের কার্য্য সকল যখন বিফল হইতে থাকে, লোকের সাহায্য না পাইয়া যখন প্রতিকূলতাই পাইতে থাকি, তখন মন বিষণ্ণ ও হতাশ হইয়া বলে, বুঝি তোমার করুণার উপর নির্ভর করা প্রকৃত পথ নহে। তখন আবার আপনাদের উপরে নির্ভর করিবার বুদ্ধি জন্মে। কিন্তু তাহাতেই বা সুখ কৈ? কে তদ্দ্বারা অদ্যাপি শান্তিলাভ করিয়াছে? তোমার করুণার উপরে সত্য ভাবে নির্ভর করিতে পারিলে, জীবনে বল ও শক্তি আসে। ধর্ম্ম তখন মুখের কথায় না থাকিয়া প্রাণের পরীক্ষিত সুমিষ্ট বস্তু হয়। আমরা এই নির্ভরের ধর্ম্মের জন্য লালায়িত। তোমার নিকটে ইহাই চাই। আমরা যেন সর্ব্বদা ইহা জানিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি যে, তুমি আমাদের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সর্ব্ববিধ অভাব মোচন করিতেছ। যে তুমি আমাদিগকে এত অনুপযুক্ত জানিয়াও ভরণ পোষণ করিতেছ, সেই তুমি কি আমাদের আত্মার অভাব সকল মোচন করিবে না? সেই তুমি কি আমাদিগকে প্রবৃত্তিকুলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিবে না? সেই তুমি কি আমাদিগকে চরণাশ্রয়ে স্থান দান করিবে না? অবশ্যই করিবে। আমরা যেন নিরুদ্বেগে সমুদায় মন প্রাণের সহিত আপনাদিগকে তোমার হস্তে দিয়া তোমার অনুগত ভৃত্য হইয়া থাকিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সত্যের অভিনব বিপদ—সম্প্রতি একটী কথা শ্রুতিগোচর হইতেছে যে সত্যের নাকি নির্দ্দিষ্ট নিরপেক্ষতা নাই। প্রাচীন কালে যে সকল তত্ত্ব সত্য বলিয়া লোকে প্রচারিত ছিল, বর্ত্তমান সময়ে তাহার কোন কোনটী অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। হয় ত এখন যাহা সত্যনামে অভিহিত. তাহাই আবার কালে অসত্যে পরিণত হইবে। যখন স্থায়ী সত্য কিছুই দেখা যায় না, তখন সত্যের নিরপেক্ষতা স্বীকার করা কখনও সঙ্গত নহে।

সত্য যদি এমন কাদার তালের মত বস্তুই হয় যে, যখন যেরূপ ইচ্ছা তাহার আকৃতির পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে এবং বিদ্যাবুদ্ধি ও তর্ক প্রভাবে সত্যকে অসত্য.আর অসত্যকে সত্যে করিণত করা যাইতে পারে, তাহা হইলে ত কোনও সত্যের প্রতি নির্ভর করা সম্ভব নয়। তাহা হইলে সত্য সত্য করিয়া চিরদিন যে একটা রব উত্থিত হইতেছে, তাহার ত কোনও সার্থকতা থাকে না। এ দেশীয় প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে সত্যের যে মহিমা বর্ণিত আছে, তাহা কি কেবলই কবির কল্পনা? শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে:—

"নাস্তি সত্যসমোধর্ম্মো ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম।
নহি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহ বিদ্যতে॥"
"সত্যান্ন প্রমদিতব্যং"
"সত্যধর্ম্মং সমাশ্রিত্য যৎ কর্ম্মকুরুতে নরঃ।
তদেব সফলং কর্ম্ম সত্যং জানীহি সুব্রতে॥
নহি সত্যাৎ পরোধর্ম্মো ন পাপমনৃতাৎ পরম।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ॥
সত্যহীনা বৃথাপূজা সত্যহীনো বৃথাজপঃ।
সত্যহীনং তপোব্যর্থমূষরে বপনং যথা॥
সত্যরূপং পরংব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরং নহি॥"
"তস্য হ,বা এতস্য ব্রহ্মণোনাম সত্যম্"
"সত্যমেব জয়তে"

এই সকল বাক্যের যে কোন অর্থ নাই এমন নহে। যদি সত্য নামে কোন তত্ত্বই না থাকে, যদি সত্য এমন বস্তুই হয় যে ইচ্ছামত তাহার পরিবর্ত্তন করিলেও করিতে পারা যায়, তাহা হইলে উক্ত প্রকার উক্তির কোনই সার্থকতা থাকে না। এই সকল শাস্ত্রীয় বাক্য বা অন্য প্রকার যুক্তি যদি কাহারও মনোমত না হয়, যদি এ সকলকে অতিক্রম করাও তাঁহাদের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা হইলেও আরও সহজে সত্যের নিরপেক্ষতা প্রমাণিত হইতে পারে।

সত্য, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতির আদর্শ সকলের মধ্যেই নিহিত আছে। যখন সকল প্রকার স্বার্থ এবং নিজের বিজ্ঞতার অভিমান প্রভৃতির উপদ্রব না থাকে, তখন সহজেই তাহা অনুভূত হয়। আমরা যখন কোন কাব্য বা উপন্যাস পাঠ করি, সেই কাব্যোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের সহিত আমাদের কোনই স্বার্থের সম্বন্ধ না থাকায়, অতি সহজেই তাহাদের কাহারও উপর বা বিরক্ত হই; কাহারও উপর বা শ্রদ্ধাযুক্ত হই। সে সকল স্থলে আমরা অতি সহজভাবে ধর্ম্মাধর্ম্ম সত্যাসত্য নীতি দুর্নীতির বিচার করিতে পারি। কারণ সে সকলের সহিত আমরা কোনরূপে সংসৃষ্ট নহি। রামায়ণের বর্ণিত রাবণ ও তাহার অনুচর প্রভৃতির প্রতি সহজেই সকলে বিরক্ত এবং রাম প্রভৃতির প্রতি সকলেই অনুরক্ত। মহাভারতের দুর্য্যোধন ও তৎসহচরগণের প্রতি বিদ্বেষ এবং যুধিষ্ঠির ও তৎসঙ্গীদিগের প্রতি অনুরাগ অতি সহজেই লোকের মনে উদিত হয়। কতদিন হইল এই দুই মহাগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থদ্বয় সুজন দুর্জন সকলেরই মনে একইভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। নিয়ত যে এরূপ ঘটনা ঘটে, তাহার কারণ কি? রাবণ বা দুর্য্যোধন কি আমাদের কাহারও পার্থিব কোনরূপ অনিষ্ট করিয়াছে, না রাম ও যুধিষ্ঠির আমাদের কাহারও স্বার্থসাধনের সহায়তা করিয়াছে? তবে কেন এরূপ সহজে, বিনা বিচার বিতর্কে, এক শ্রেণীর লোকের প্রতি বিরক্তি, বিদ্বেষ ও অপর শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি ও অনুরাগ জন্মিয়া থাকে? ইহার কারণ সত্য, ধর্ম্ম, নীতি সম্বন্ধে সহজ জ্ঞানলব্ধ আদর্শ মানব মাত্রেরই মনে আছে। সেই সত্যের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ বা সমাদর হইতেই এরূপ সর্ব্বজন সাধারণ অনুরাগ বা বিরাগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ অনুরাগ বা বিরাগ কোন এক দেশে নয়, কিন্তু সর্ব্বদেশে সর্ব্ব সময়েই ঘটিয়া থাকে, সত্য সম্বন্ধে সাধারণের মনে এরূপ একটা সাধারণ আদর্শ না থাকিলে এরূপ সর্ব্বজনসাধারণ অনুরাগ বা বিরাগ জন্মিবার কোনই হেতু দেখা যায় না। জ্ঞানের অল্পতাবশতঃ, বিচার করিতে গিয়া মানুষ ভ্রান্ত হইতে পারে বা স্বার্থবশতঃ অন্য সংস্কারাপন্ন হইতে পারে; কিন্তু যেখানে সেরূপ কোন হেতু নাই! কোন লাভ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, সেখানেই সত্যে সমাদর, ধর্ম্মে আস্থা প্রকাশিত হইয়া থাকে। সত্যের দৃঢ়ভিত্তি এবং নিরপেক্ষতা না থাকিলে কখনই এরূপ সম্ভাবনা থাকিত না। অন্য নিরপেক্ষ বলিয়াই তাহার নাম সত্য। সত্য যাহা তাহা চিরদিনই বর্ত্তমান আছে। চিরদিন যাহা অপরিবর্ত্তনীয় এবং নিরপেক্ষ নহে এমন কিছুই সত্য নামে অভিহিত হইতে পারে না। সত্যকেও যদি অন্যের উপর নির্ভর করিয়া সত্য হইতে হয়, তবে আর দাঁড়াইবার ভিত্তি কোথায়?

ভজন সাধনের প্রয়োজন কি?—অনেকগুলি সন্তান লইয়া যে মাতাকে সংসার করিতে হয়, সেই মাতার দৃষ্টি সকল সন্তানের প্রতি থাকিলেও যে সন্তানটী নিতান্ত শিশু, যাহার চলিবার ও বলিবার শক্তি নাই—এবং ক্রন্দন ভিন্ন যাহার আর কোন সম্বল নাই, সেই সন্তানটীর প্রতিই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ থাকে, এবং সর্ব্বদাই তাহার অভাব মোচনের জন্য তাঁহার ব্যগ্রতা দৃষ্ট হয়। অন্য শিশুরাও মাতাকে নানা বিষয়ের অভাব জানাইতেছে, নানা প্রকারে ক্রন্দনাদি দ্বারা তাঁহার কার্য্যের ব্যাঘাত উৎপন্ন করিতেছে, কেহ বা পড়িয়া গিয়া আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে, মাতা অন্যান্য কাজের ব্যস্ততার মধ্যে যতটা পারেন তাহাদেরও অভাব মোচন করিতেছেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ঐ শয্যাশয়ী শিশুটী কাঁদিয়া উঠিতেছে সেই মুহূর্তেই মাতার অন্য কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইতেছে। তাহার অভাব মোচন করিতে মাতার আর কালবিলম্ব হয় না। অপর কোন কার্য্যানুরোধ তাঁহাকে তখন আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। যতক্ষণ তাহার অভাব-মোচন না হয় ততক্ষণ তিনি অপর সন্তানদিগকে যেন দেখিয়াও দেখেন না। তাহাদের সম্বন্ধে যে তাঁহার কোন কর্ত্তব্য আছে তাহাও যেন তাঁহার স্মরণে আসে না। তাঁহার ব্যবহারে মনে হয় যেন ঐ শিশু ভিন্ন আদর যত্ন পাইবার উপযুক্ত সন্তান তাঁহার আর নাই। এইরূপ ঘটনার কারণ সহজেই অনুভব করা যায়। জননী ভাবেন অন্য সন্তানগণ চলিয়া বলিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের প্রতি কিছুকাল মনোযোগের হানি হইলে তত ক্ষতি নাই। অথবা যাহা তাহারা চাহিতেছে, তাহা কিছু বিলম্বে প্রদান করিলেও চলে; কিন্তু শয্যাতে অসহায় অবস্থায় যে শয়ন করিয়া আছে, তাহার ত মাতা ভিন্ন আর গতি নাই। মাতা গিয়া যদি তাহাকে আহার দেন, তবে সে আহার পাইবে, নতুবা নহে। তাহার নিজের যখন কিছুই করিবার বা বলিবার সামর্থ্য নাই, তখন মাতার দৃষ্টি তাহার প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

পৃথিবীর মাতার ব্যবহারে যেমন দেখা যায়, নিতান্ত নিরুপায় সন্তানটীকেই তিনি সর্ব্বাগ্রে কোলে লন, এবং তাহার অভাব অন্যদের অভাব মোচনের পূর্ব্বে মোচন করেন। আমাদের পরম জননীর ব্যবহারেও কি আমরা তাহারই পরিচয় পাই না? ধর্ম্মজগতেও যে সর্ব্বাপেক্ষা নিরুপায়, সর্ব্বাপেক্ষা অসহায় এবং পরম মাতার প্রতি নির্ভরশীল, যাহার নিজের করিবার ও বলিবার শক্তি নাই, সেই যেন তাঁহার করুণা সর্ব্বাগ্রে প্রাপ্ত হয়। তাহার প্রার্থনাই যেন পরম মাতা সর্ব্বাগ্রে পূর্ণ করেন। এরূপ ব্যবহারদ্বারা তাঁহার পক্ষপাতিতা প্রকাশ পায় না। যে শক্তি সামর্থ্যহীন সেই ত সর্ব্বাগ্রে সাহায্য পাইবার উপযুক্ত। পক্ষপাতিতা সমান অবস্থাপন্নের প্রতি বিভিন্ন ব্যবহার দ্বারাই

প্রকাশ পাইয়া থাকে। চক্ষুহীন এবং চক্ষুষ্মান্ এই দুইএর মধ্যে চক্ষুহীনকে যদি কেহ ২টি পয়সা দেয় তাহারদ্বারা চক্ষুষ্মানের প্রতি কখনও অবিচার করা হয় না। তবে কথা এই জগন্মাতার নিকট সকলেই অসহায় শিশু। এমন কে আছে নিজ বলে যে আধ্যাত্মিক আহার সংগ্রহ করিতে পারে? এখানে সবল দুর্ব্বলের প্রভেদ কোন্ লক্ষণ দ্বারা হয়। বাস্তবিক অবস্থাগত প্রভেদ অতি সামান্য হইলেও দেখা যায়, এ রাজ্যে এক শ্রেণীর লোক আপনাদিগকে সর্ব্বদাই অসহায়, নিরুপায় এবং দুর্ব্বল বলিয়া অনুভব করিতে পারে। তাহারা আপনাদের অক্ষমতার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া অতি সহজেই পরম মাতার মুখাপেক্ষী হইতে পারে। তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল হইতে পারে। অপরেরা সেইরূপ দুর্ব্বল ও অসহায় নিরুপায় হইয়াও তাহা অনুভব করিতে পারে না; এবং আত্মবলে যতটা পারা যায় ততটা করিতে যায় বলিয়া, স্বভাবতঃ পরম মাতার প্রতি তেমন নির্ভর থাকে না। এজন্য তাঁহারা পরম মাতার করুণা সম্ভোগ করিবার সুবিধাও তেমনভাবে প্রাপ্ত হন না। তিনি সমভাবে সকলের প্রতি সদয় হইয়াও যেন এক শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করেন এবং অপর শ্রেণীকে যেন একবারে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াই আছেন বলিয়া অনুভূত হয়। পরম মাতার ব্যবহার সকলের প্রতি সমান হইয়াও আমাদের অবস্থানুসারে বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই যে নিরাশ্রয় অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিরুপায় বলিয়া অনুভব করা, ইহা কেহ ইচ্ছা করিলেই প্রাপ্ত হয় না। যতক্ষণ নিজের প্রকৃত অবস্থার পরিচয় পাওয়া না যায়, আমাদের শক্তির অকিঞ্চিৎকরতা, কার্য্যসাধনে তাহার অক্ষমতা, যতক্ষণ বাস্তবিকরূপে অনুভূত না হয়, ততক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া কেহই তেমন ভাবে আপনাকে অসহায় বলিয়া জানিতে পারে না; এবং সম্পূর্ণ নিঃসম্বলের ও অক্ষমের ন্যায় আত্মনির্ভরও করিতে পারে না। অনেক চেষ্টা করিয়া বারম্বার উঠিয়া পড়িয়া যখন দেখা যায় স্বকীয় শক্তিতে আর কুলায় না, তখনই সেই নির্ভর আসে ও প্রকৃতরূপে আপনাকে অসহায়রূপে অনুভব করিবার সুযোগ ঘটে। এই সুযোগ পাইবার জন্যই সাধন ভজন করা আবশ্যক। নতুবা কল্পনা করিয়া কেহই এরূপ অবস্থাতে যাইতে পারে না।

উপাসনা সজন ও নির্জ্জন—বাগানে নানাবিধ কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে। কেহ যদি সেখানে প্রবেশ করেন, তবে সেই সুদৃশ্যে এবং সুসৌরভে তাঁহার মন প্রাণ বিমুগ্ধ হইয়া যাইবে। তিনি আত্মহারা হইয়া সেই কুসুমিত ও সৌরভপূর্ণ বাগানে বিচরণ করিবেন। কিন্তু কিছুকাল তথায় অবস্থিতি করিলেই দেখা যায় আর তাঁহার নাসিকায় তেমন সেই গন্ধ উদ্বুদ্ধ হয় না। তিনি তখন সেই পুষ্প কাননে ভ্রমণ করিতে করিতে আর পূর্ব্বের ন্যায় আমোদও প্রাপ্ত হন না। অনেকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া এবং সৌরভ গ্রহণ করিয়া করিয়া তিনি এমন অভ্যস্ত হইয়া যান যে, তাহাতে কিছুমাত্রও নবীনত্ব থাকে না, সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় সুখোদয় হয় না।

উপাসনা ক্ষেত্রেও আমরা এইরূপ দেখিতে পাই। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে প্রথমে যোগ দেন, উপাসনা করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাদের কত উৎসাহ, কত আগ্রহ! তখন উপাসনাতে তাঁহারা কত আনন্দ প্রাপ্ত হন। তখন সাধুসজ্জনগণের সহিত এবং সমবিশ্বাসীজনের সহিত উপাসনা করিয়া তাঁহারা বিশেষ তৃপ্তি পাইয়া থাকেন। কিন্তু যতই সময় যাইতে থাকে, ততই তাঁহারা উপাসনা ক্ষেত্রে যেন আর তেমন রস পান না। ক্রমে ক্রমে তাহা পুরাতন ও নীরস হইয়া পড়ে। তখন তাহার উপকারিতা বোধ ও যেন ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে। এ সময় অনেকের পক্ষেই অতি কঠিন পরীক্ষার সময়। কিন্তু এ স্থলে একটি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক। আমরা যদি কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন করি, তখনও যেমন অজ্ঞাতসারে আমাদের শরীর ভাল হইবেই হইবে। কোনও ভাল স্থানে থাকিলেই শরীর সুস্থ, সবল হইবেই হইবে। সেইরূপ আমরা যদি সাধুসঙ্গে, উপাসনা-ক্ষেত্রে নিয়মিত রূপে যোগ দান করিতে পারি, তাহাতেও জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আমাদের আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের নিশ্চয়ই উন্নতি হইবে।

যখন আমরা একাকী থাকিতে বাধ্য হই, তখনই এই উপাসনা-ক্ষেত্রের ও সাধুসংসর্গের উপকারিতা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, ধর্ম্মবন্ধুদের সঙ্গে সজন উপাসনাবিহীন হইলে আমরা আধ্যাত্মিক অবসন্নতা অনুভব করি। তখন হৃদয়ে এমন শুষ্কতা উপস্থিত হয় যে উপাসনাতে মন উদ্বুদ্ধ হয় না। আমরা যে প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বন্ধুগণের সহিত পরমেশ্বরের উপাসনায় যোগ দান করিয়া জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে প্রভূত বল লাভ করিয়া থাকি, তাহা সজনে তত বুঝিতে পারি না; কিন্তু একাকী হইলেই স্পষ্ট অনুভব করি।

আমরা যদি কোনও উপাসক দলের সহিত নিয়ত যোগ রাখি, সমধর্ম্মী ও সমবিশ্বাসীদিগের সহিত একত্রে সাধন ভজন করি, তবে নিশ্চয়ই আমাদের বিশেষ উপকার হইবে, তদ্দ্বারা আত্মা ক্রমশঃ বল লাভ করিবে। কিন্তু এই সজন উপাসনাকে সজীব করিবার জন্য নির্জ্জনে উপাসনা ও আত্মপরীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। নির্জ্জনে প্রতিদিন আত্মচিন্তা ও ধ্যান ভিন্ন সজন উপাসনার ফল স্থায়ী হয় না; এবং সজন উপাসনা ভিন্নও নির্জ্জন উপাসনাতে সরসভাব উপস্থিত হয় না। দুইটিই চাই। সজন নির্জ্জন উভয়বিধ উপাসনাই আত্মার কল্যাণের জন্য অবলম্বনীয়। ব্রাহ্ম কোনটিই পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

ধর্ম্মভাবের উৎস—আমরা নানাস্থানে বড় বড় নদী দেখিতে পাই; এক একটী নদীর বিস্তার ৩।৪ মাইল। ভয়ঙ্কর স্রোত অবিরত চলিতেছে। কিন্তু এই সকল নদীর উৎপত্তি স্থান দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। যে পদ্মা নগর গ্রাম, জনপদ ইত্যাদি ধ্বংস করিয়া প্রবল গতিতে সাগরাভিমুখে ছুটিতেছে,

তাহার উৎপত্তি স্থান এমন সঙ্কীর্ণ যে,একটী বালকেও অনায়াসে পার হইয়া যাইতে পারে। এই নদী সকলের গতি ও উৎপত্তি স্থান যেমন আশ্চর্য্য জনক, জগতের ধর্ম্মসমাজের গতিও এইরূপ। খৃষ্টধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্ম এক এক জন সামান্য মনুষ্যের জীবন ও কার্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উৎপত্তি স্থানে এক এক জন লোক, কিন্তু তৎপর দেশ বিদেশকে আয়ত্ত করিয়া, অন্যান্য ধর্ম্মকে কম্পান্বিত করিয়া পদ্মার ন্যায় অপ্রতিহতগতিতে প্রবাহিত হইতেছে। সামান্য এক এক জন লোকের মধ্যে কিরূপে এমন দুর্জ্জয় শক্তি আসিল? আমরা তাহাদিগকে এই জন্য সামান্য বলিতেছি যে. পৃথিবীর ধনবল ও লোকবল তাঁহাদের কিছুই ছিল না। ইহা অত্যন্ত গভীর চিন্তার বিষয় যে পৃথিবীর নরনারীর চিন্তাকে তাঁহারা কিরূপে আলোড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন!

খৃষ্ট ধর্ম্ম দুই হাজার বৎসরে যে কার্য্য করিয়াছে, তৎ-সম্বন্ধে একজন চিন্তাশীল লেখক বলেন যে "বন্ধুগণ, তোমরা একটা কথা মনে রাখিও যে, দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এমন একজন আশ্চর্য্য শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন, যাঁহার শক্তিতে জগতের এমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে শক্তি সামান্য শক্তি নহে। যিশুর জীবন অধ্যয়ন করিলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার ঈশ্বর-জ্ঞান সম্বন্ধীয় উজ্জ্বল ভাবের প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়। কি উজ্জ্বল ঈশ্বর-প্রতীতি! তাঁহার জীবন, তাঁহার চিন্তা, তাঁহার মনের ভাব, ঈশ্বর দ্বারা অনুবিদ্ধ। প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে সুস্নিগ্ধ আকাশ-মণ্ডল দর্শন করিলে তাঁহার প্রাণ ঈশ্বরেতে সমাকৃষ্ট হইত। তিনি যাহা কিছু দর্শন করিতেন, যাহা স্পর্শ কবিতেন, সকল বিষয়েই ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিতেন। তিনি চারি দিক ঈশ্বরময় দেখিতেন। তিনি জীবন্ত সত্তাময় ঈশ্বর হইতে বল লাভ করিতেন। তাঁহা হইতেই শক্তি এবং তাঁহা হইতেই জ্ঞানলাভ করিতেন। তিনি সকল বিষয়েই পরমেশ্বরেব নিকট প্রার্থনা করিতেন, যদি কখনও কোন প্রার্থনা পূর্ণ না হইত, তবে তিনি মনে করিতেন যে, এ সম্বন্ধে ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্য প্রকার।" এই জীবন্ত ঈশ্বর-প্রতীতিই যিশুর শক্তির উৎস স্বরূপ ছিল।

ঈশ্বর-প্রতীতি—এই ঈশ্বর প্রতীতি এমন বস্তু যে, ইহার আবির্ভাবে মানুষ সকল শক্তি লাভ করিয়া থাকে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, "পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান কে?" তবে তাঁহার এই উত্তর যে, "যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বর-প্রতীতি লাভ করিয়াছেন।" তাঁহার কার্য্য ঈশ্বর চরণে, আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বর-চরণে এবং চিন্তা ঈশ্বর চরণে। তাঁহার হৃদয় বিশুদ্ধ, আকাঙ্ক্ষা পবিত্র এবং সঙ্কল্প সাধু। তিনি আপনাকে হারাইয়াছেন, এ জন্যই সংসার জয় করিতে পারেন। আমরা যে এত দুর্ব্বল, নিরাশহৃদয়, নিরুৎসাহ নিরুদ্যম, এবং মরার মত রহিয়াছি, ইহার কারণ এই যে, আমাদের অন্তরে ঈশ্বর-প্রতীতি নাই।

আমরা কি বলিতে পারি যে, আমাদের ঈশ্বর ভিন্ন লক্ষ্য নাই, আশা নাই বল নাই? আমরা কি বলিতে পারি যে, আমাদের জীবনতরু পরমেশ্বরেতে রোপণ করিয়াছি? আমাদের মধ্যে একথা কে বলিতে পারেন? যিনি বলিতে পারেন, তিনি অতি বিশ্বাসী সাধু বীর। তাঁহাতে পৃথিবীর পাপ প্রলোভন, ও ইন্দ্রিয়াসক্তি স্পর্শ করিতে পারিবে না। তিনি হৃদয়-বলে দুর্জ্জয় হইয়াছেন।

মহাজনগণ স্বীয় জীবনতরু ঈশ্বর চরণে রোপণ করিয়াছিলেন, আমরা দূরে পড়িয়া রহিয়াছি। যিনি যে পরিমাণে ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে সাহস ও বল পাইয়াছেন। একবার মহম্মদের শিষ্যগণ কোন যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিলে, দলস্থ অন্যান্য লোকদিগের অত্যন্ত বিষণ্ণ ভাব উপস্থিত হয়। চারিদিকে বিধবাদের ক্রন্দন উঠিতেছে। কিন্তু মহম্মদ নিশ্চিন্ত, প্রশান্তভাবে উপবিষ্ট আছেন। মহম্মদকে এই দুর্দ্দিনে শান্তচিত্ত দেখিয়া, শিষ্যগণ কহিল, "আপনি কিরূপে নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন?" মহম্মদ কহিলেন, "প্রভু পরমেশ্বর আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই. এই জন্য নিশ্চিন্ত". মহম্মদের নির্ভর লোকজনের উপর ছিল না। ঈশ্বর তাঁহার নির্ভরের স্থান। সুতরাং তিনি বিপদে স্থির ছিলেন। আমরা যে মুহূর্ত্তে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হই, সেই মুহূর্ত্তেই আমরা ঐ প্রকার সাহস প্রাপ্ত হই। আমরা যে মুহূর্ত্তে তাহাকে দেখি. সেই মুহূর্ত্তেই জীবিত হই ঈশ্বর-প্রতীতি যেখানে, জীবনও সেখানে। আমাদের সকল অভাব, খাওয়া পড়া, আত্মীয়তা ভালবাসা সকল যদি তাঁহার চরণে রাখিতে পারি, তবেই আমরা যথার্থ তেজীয়ান, যথার্থ শক্তিশালী আর যখন ঈশ্বরকে না দেখিয়া সকল কাজ করি, আমাদের আত্মীয়তা আমাদের সাংসারিক কার্য্য কেবল আমাদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়, তিনি আর মধ্যে থাকেন না, তখনই আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ি।

বিশ্বাসী সাধুগণ জীবনের সকল কার্য্যেই পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করিতে উপদেশ দেন। জীবনের সকল ঘটনাতেই ঈশ্বরের কৃপার আলোক লাভ করিবার জন্য উপদেশ দেন। জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাতেও যেমন মানব তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইবে, তেমনই প্রতিদিনের আরাধনা উপাসনা করিবার সময়ও তাঁহার করুণার উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর এবং বল ভিক্ষা করিতে হইবে।

উপাসনায় যখন আমরা বসি, তখন কাহার উপর নির্ভর থাকে? উৎকৃষ্ট সংগীত সুললিত ভাষায় প্রার্থনা এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যার উপর কি আমাদের নির্ভর থাকে? ভাল গায়ক, উৎকৃষ্ট বক্তা একত্র হইলেই কি উপাসনা সরস হইবে? না, তাহা নহে। সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করিতে হইবে। তাঁহার কৃপা ভিন্ন, তাঁহার পূজা অসম্ভব। তিনি স্বয়ং হৃদয়ে প্রকাশিত না হইলে কি সুললিত সংগীত ও প্রাণ-তৃপ্তিকর বাক্য দ্বারা তাঁহাকে আনয়ন করা যায়? আমরা যদি ঐ রূপে উৎকৃষ্ট আয়োজন করিয়া, সমস্ত দিন বসিয়া পূজা করি, তাহা হইলেই. যে ঈশ্বর আসিবেন, এ কথা কে বলিতে পারেন? এখানেও তাঁহার করুণার উপর নির্ভর। তিনি হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া পূজা গ্রহণ করিলেই তবে পূজা হয়। নতুবা সহস্র চেষ্টা করিলেও উপাসনা হয় না। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যেই

তাঁহার কৃপার ভিখারী হইতে হইবে। সাধক তাঁহার কৃপা ভিন্ন আর কিছুই জানেন না।

ধর্ম্ম, ভাবে ও কার্য্যে—ভাবুকতার ধর্ম্মে ও কার্য্যগত ধর্ম্মে অনেক প্রভেদ। আমরা সংসারে সচরাচর দুই প্রকৃতির লোক দেখিতে পাই। কাহারও কাহারও প্রেম ভাবুকতাতে প্রকাশ পায়; কাহারও কাহারও প্রেম কার্য্যে প্রকাশ পায়। কোনও কোনও লোকের প্রকৃতির গভীরতা স্বভাবতঃ অল্প। সামান্য কারণেই তাহাদের ভাবরাশির উপরে তরঙ্গ উত্থিত হয়। তখন তাহারা ভাবের উচ্ছ্বাসে কত কথা বলে! কিন্তু কার্য্য-কালে তদনুরূপ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা অল্প কারণে আনন্দ প্রকাশ করে, অল্পে অশ্রুপাত করে, অল্পে ক্রোধ করে ও কটু কথা বলে, অল্পে আবার কণ্ঠালিঙ্গন করে ও চুম্বন করে। তাহাদের হৃদয় যেন তাহাদের ওষ্ঠাধরের উপরে ভাসিতেছে! কিন্তু কার্য্যে যখন সেই প্রেম দেখাইবার সময় উপস্থিত হয়, তখনি তাহাদের প্রেমের অগভীরতা অনুভব করিতে পারা যায়। ঐ সকল লঘু-প্রকৃতি লোক তখন পশ্চাৎ-পদ হইয়া থাকে। এমন কতবার দেখিয়াছি, একজন আর এক জনের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিতেছে "ভাই। তোমাকে বড় ভাল বাসি, তোমার জন্য মরিতে পারি, তোমাকে কি না দিতে পারি।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু যেই সেই বন্ধুটী বিপদে পড়ি-লেন বা গুরুতর রূপে রোগগ্রস্ত হইলেন, যখন তাঁহার সাহায্যের জন্য অর্থব্যয় বা রাত্রি জাগরণ আবশ্যক হইতে লাগিল, অমনি ভাবুক বন্ধুর আর দেখা নাই। ভাবের প্রকাশে খরচ নাই; সুতরাং তিনি তাহা বন্ধুকে দিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু যখন কিঞ্চিৎ খরচের আবশ্যক হইল, তখন আর হাত পা উঠে না।

অপর প্রকৃতি ঠিক ইহার বিপরীত! তাঁহাদের হৃদয়স্থ ভাবের প্রকাশ নাই। তাঁহাদের কি এক প্রকার স্বাভাবিক লজ্জাশীলতা আছে, যন্নিবন্ধন তাঁহারা সর্ব্বদাই আত্মগোপন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মুখের কথা সর্ব্বদাই কাজের পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। তাঁহারা যাহা করিবার তাহা কাজে করিয়া থাকেন, ভাবে বড় প্রকাশ করেন না। ইঁহাদের প্রেম পরীক্ষাকে ভয় করে না, বরং তাহাতে আনন্দিত হয়।

এই দুই প্রকার প্রেমের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ? ঈশ্বরকে আমরা কিরূপ প্রেম দিব? ভাবের উচ্ছ্বাসে তাঁহাকে মিষ্ট মিষ্ট সম্বোধন করাতে কিছুই ব্যয় হয় না; প্রত্যুত নিজের আত্মার এক প্রকার তৃপ্তি হয়। যখন ঈশ্বর-প্রীতিকে আমরা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করি, তাহার আলোকে জীবনের কর্ত্তব্য সকল পালন করিতে সচেষ্ট হই, তখনই আমাদের প্রেমের পরীক্ষা আরম্ভ হয়। যাঁহার প্রকৃতিতে প্রেমের গভীরতা যত অধিক, তিনি তত এই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাইতেছি যে প্রেমের এই পরীক্ষাতেই আমরা হারিয়া যাইতেছি। জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছি না; প্রবৃত্তিকুলকে সংযত করিয়া ঈশ্বরেচ্ছার অধীন হইতে পারিতেছি না; স্বার্থপরতাকে খর্ব্ব করিয়া ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে আপনাদিগকে নিয়োগ করিতে পারিতেছি না। কত বার গভীর দুঃখের সহিত এই কথা বলিতে হইতেছে, "হায়! হায়! দশজনে উপাসনাতে বসিলে সময়ে সময়ে যেরূপ ভাবো-চ্ছ্বাস হয়, ঈশ্বরকে যে প্রেমের কথা বলি, জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে যদি সে প্রকার বল লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে ধন্য হইয়া যাই। প্রভু আমাদিগকে কার্য্যগত প্রেম প্রদান করুন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

সাধন-সিদ্ধ ও প্রেম-সিদ্ধ।

বুদ্ধ ও চৈতন্যে, সক্রেটিস ও যীশুতে কি প্রভেদ। এক প্রকার চরিত্র সাধন-সিদ্ধ অপর চরিত্র প্রেম-সিদ্ধ। ইতিবৃত্তে শুনা যায়, গ্রীক সাধু সক্রেটিস যৌবন কালে অতিশয় কোপন-স্বভাব ও দুর্ব্বৃত্ত ছিলেন; কিন্তু সাধনের দ্বারা ক্রোধকে সম্পূর্ণ-রূপে দমন করিয়াছিলেন। শেষে এত দূর অক্রোধী হইয়া-ছিলেন, যে লোকে তাঁহাকে রুষ্ট করিবার জন্য বিবিধ প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে পারিত না। একবার কতকগুলি দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় তাঁহার ভৃত্য তাঁহাকে বিরক্ত করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছিল। শয়ন করিতে গিয়া দেখেন শয্যাটী প্রস্তুত নাই; জল পান করিতে গিয়া দেখেন জলপাত্রে জল নাই; বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া দেখেন বস্ত্র নাই; এইরূপে বার বার অনবধানতা ও অবাধ্যতা দেখিয়া একদিন সক্রেটিস বাস্তবিক বিরক্ত হইলেন; এবং ভৃত্যকে বলিলেন "কি বলিব, আমার ক্রোধ হইয়াছে, নতুবা তোমাকে শাস্তি দিতাম।" বিরক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া শাস্তি দিলেন না। গ্রীসের জগদ্বিখ্যাত বক্তা ডিমস্থিনিস যেমন আপনার তোত্‌লামি দূর করিবার জন্য মুখের মধ্যে প্রস্তর খণ্ড পূরিয়া, সমুদ্রের উপকূলে গিয়া চীৎকার করিতেন, এবং তদ্দ্বারা আপনার উচ্চারণের দোষ সংশোধন করিয়াছিলেন, সক্রেটিসও তেমনি আপনার ক্রোধকে দমন করিবার জন্য অদ্ভুত উপায় সকল অবলম্বন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটী এই, যখনি তাঁহার ক্রোধের উদয় হইত তখনি তিনি মনে মনে "আল্‌ফা" "বিটা" প্রভৃতি গ্রীক বর্ণমালার বর্ণসকল উচ্চারণ করিতেন, বর্ণমালা শেষ না করিয়া কথা কহিতেন না। এরূপ নিয়ম করিবার অভিপ্রায় এই ছিল; বর্ণমালা শেষ না করিতে করিতে তাঁহার ক্রোধ শান্ত হইয়া যাইত। রিপু দমনের এই একটী গূঢ় সন্ধান। যখন কোনও রিপু বিশেষ প্রবল হইতেছে, দেখিতে পাইবে, তখন চিন্তাকে সেই প্রলোভনের বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে লইয়া যাও। যদি ঈশ্বরের স্বরূপ ও সত্তার চিন্তাতে চিত্তকে নিয়োগ করিতে পার ভালই, নতুবা যাহা কিছু হয়, অপর একটা বিষয় চিন্তা কর। অন্ততঃ তৎপূর্ব্বদিন একজন তোমাকে কি কথা বলিয়াছিলেন তাহা ভাবিতে আরম্ভ কর। দেখিবে মনের উত্তেজনা শান্ত হইয়া যাইবে। ইহা সক্রেটিসের অবলম্বিত উপায়।

মহাত্মা বুদ্ধও প্রবৃত্তি সকলকে সংযত করিবার নানাপ্রকার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। আত্ম-প্রভাবের উপরে তাঁহার ধর্ম্মের প্রধান নির্ভর। মৃত্যুশয্যায় শিষ্যদিগের প্রতি তিনি শেষ উপদেশ এই দিলেন, "তোমরা সর্ব্ব প্রযত্নে নিজ নিজ মুক্তি সাধনে নিযুক্ত থাক।" নিজের মুক্তি নিজে সাধন করিতে হইবে, এই তাঁহার ধর্ম্মের প্রধান ভাব। সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মে মানবের নিজের সাধনই একমাত্র অবলম্বন।

কিন্তু এই সাধনলব্ধ সিদ্ধির পথ সুখের পথ নহে। ইহাতে দুরন্ত পরিশ্রম করিতে হয়, এবং প্রবল ইচ্ছা শক্তির প্রয়োজন। ইহা যেন সবলে সবলে সংগ্রাম! কথনও আমি প্রবৃত্তিকুলের উপরে কখনও বা প্রবৃত্তিকুল আমার উপরে। এই গজ কচ্ছপের যুদ্ধে মানবাত্মা শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে; এবং অনেক সময়ে পরাস্ত হইয়া যায়। দুর্জ্জয় ইচ্ছাশক্তির বলে বুদ্ধ এবং সক্রেটিস, এইরূপ সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অপর সাধারণের পক্ষে তাহা সহজসাধ্য নহে।

সিদ্ধিলাভের আর একটী পথ আছে তাহা অপেক্ষাকৃত সুখকর, যীশু অথবা চৈতন্য যে পথাবলম্বী ছিলেন; ইহা প্রেমের পথ। ইহাতে এক একটী প্রবৃত্তির সহিত বিশেষ বিশেষ ভাবে দুরন্ত সংগ্রাম করিতে হয় না; কিন্তু অন্তঃস্থিত প্রেমের প্রভাবে প্রবৃত্তিকুল আপনাপনি সংযত হইয়া যায়। হৃদয়ের প্রবল অনুরাগ ঈশ্বরেতে অর্পিত হওয়াতে স্বাভাবিক ভাবে বিষয়ে বিরাগ উপস্থিত হয়; এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে সমুদায় পাপ প্রলোভন খসিয়া পড়িয়া যায়; এবং প্রবৃত্তি কুল আপনাপনি সংযত হইয়া আসে। ধর্ম্মরাজ্যের চিন্তাশীল সাধকেরা এই প্রেমের পথকেই শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু প্রেমিকগণ যে সাধন-বিমুখ হন তাহা নহে। তাঁহাদের সমুদায় সাধন প্রেম-প্রসূত ও প্রেমের অনুগত এই মাত্র প্রভেদ। তাঁহাদিগেরও নিয়মাধীন হওয়ার প্রয়োজন। তাঁহাদের পক্ষেও ব্রত-নিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। তাহার অভাবে প্রেম উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ধর্ম্মজীবনের সৌন্দর্য্য ও সামঞ্জস্য বিনষ্ট করিয়া দেয়। এই কারণে প্রেম ও সাধন উভয়ই আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে।

অনিরাকরণমস্তু।

(১৮ই নবেম্বর, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ)

উপনিষদে একটী বচন আছে; বচনটী এই,—"মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ।" অর্থ ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই; আমি যেন ব্রহ্মকে নিরাকরণ না করি।" এ স্থলে ঈশ্বরকে নিরাকরণ করার অর্থ কি? যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে সকলের প্রাণের প্রাণ হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন, এই দেহের প্রত্যেক পরমাণুর সহিত, বায়ুর প্রত্যেক তরঙ্গের সহিত এবং জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়ার সহিত যিনি বিদ্যমান রহিয়াছেন, আমরা কিরূপে তাঁহাকে নিরাকরণ করিতে পারি? তাঁহা হইতে সরিয়া দূরে যাইতে পারি? তবে কেন প্রাচীন ঋষিরা এইরূপ প্রার্থনা করিলেন। বিশেষভাবে বিবেচনা করিলে এই নিরাকরণ শব্দের একটা গূঢ় অর্থ দেখিতে পাই। সংসারে এইরূপ মধ্যে মধ্যে দেখি, যে এক জনের প্রেম অপর একজনের প্রতি প্রবলভাবে প্রবাহিত, কিন্তু সে ব্যক্তি তাহার কিছুই জানে না; সে সেই প্রেমের প্রতি অন্ধ, একবার মনেও করে না, চাহিয়াও দেখে না। এইরূপ দৃষ্টান্ত সকল সমাজেই দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় সাধু অগষ্টিনের মাতা মনিকা দেবী অত্যন্ত সন্তানবৎসলা ধর্ম্মপরায়ণা নারী ছিলেন। একমাত্র পুত্র অগষ্টিনের কল্যাণ-চিন্তাই দিবানিশি তাঁহার অন্তরে জাগরূক থাকিত। আগষ্টিনের পিতা অগষ্টিনকে ধন দিয়া স্বাধীন করিয়া বিদ্যালাভের জন্য বিদেশে প্রেরণ করিলেন। তথায় আগষ্টিন কুসঙ্গে পড়িয়া কালক্রমে দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া উঠিলেন। মনিকা দেবীর কষ্টের সীমা রহিল না। প্রতিদিন পুত্রের মঙ্গলোদ্দেশে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রতি রবিবারে আচার্য্যের নিকট বলিতেন, "আপনি আমার পুত্রের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন, যাহাতে তিনি তাহাকে পাপ হইতে উদ্ধার করেন।" প্রতি রবিবার প্রার্থনা করিয়া করিয়া অবশেষে বিরক্ত হইয়া এক রবিবার আচার্য্য মনিকাকে বলিলেন,—"হে ভদ্রে! তুমি গৃহে যাও, যে সন্তানের জন্য এত অশ্রু পড়িতেছে সে মরিবে না।" সেই ধর্ম্মপরায়ণা মাতা পুত্রের জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; পুত্রের প্রতি প্রেম ও তাহার জন্য ব্যাকুলতা হৃদয় হইতে নির্ব্বাণ হইতে দিলেন না; কিন্তু দুর্বৃত্ত পুত্র তাঁহার এই অকৃত্রিম প্রেম একবার চাহিয়াও দেখিল না; তাহার অশ্রুর প্রতি অন্ধ এবং আর্ত্তনাদের প্রতি বধির হইয়া রহিল। এরূপে কতকাল কাটিয়া গেল; পরে মাতার প্রার্থনা পূর্ণ হইল। কেবল এই সাধুর জীবনেই যে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা নহে। আমাদিগের জনক জননী আমাদিগকে যে স্নেহ করেন তাহা কি আমরা সকল সময়ে অনুভব করি? আমাদের মঙ্গল-উদ্দেশে কত অনুষ্ঠান করেন তাহা কি স্মরণ করি? এ জগতে কত প্রেমের মধ্যে বাস করিতেছি তাহা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া থাকি। যেমন শিশু রজ্জু-নির্ম্মিত দোলায় শয়ান থাকে, চারিদিক হইতে রজ্জু আসিয়া শিশুকে ধারণ করিয়া থাকে, তেমনি আমরা এ জগতে যেন প্রেমের দোলায় রহিয়াছি, কত দিক হইতে কত প্রেম আসিয়া আমাদিগকে ধরিয়াছে! যাহারা পাপাচারী তাহারাও প্রেম হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয় না। একটু চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবে এরূপ পাপী অল্পই আছে, যাহাকে কাহার না কাহারও প্রেম আলিঙ্গন করিয়া রহে নাই।' এই প্রেম অজ্ঞাতসারে এবং জ্ঞাতসারে সর্ব্বদাই আমাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে, আমরা কত সময়ে তাহা দেখি না; এবং অনুভব করিতেও পারি না।

ঈশ্বর এই একটী নিয়ম আধ্যাত্মিক জগতে রাখিয়াছেন, যে তোমার হৃদয়ে যদি প্রেম থাকে তবেই তুমি অপরের প্রেমকে দেখিবে ও সেই প্রেম তোমার হৃদয়ে কাজ করিবে। তোমার জননী তোমার জন্য দিন রাত্রি ক্রন্দন

করিতেছেন, কিন্তু তুমি তাহা দেখিতে পাওনা, কারণ তোমার হৃদয়ে প্রেম নাই। যে দিন তোমার প্রেমচক্ষু ফুটিবে, সেই দিন জননীর প্রেমের গাঢ়তা অনুভব করিতে পারিবে; তোমার হৃদয়ে সে প্রেমের শক্তি আসিবে। প্রেম না থাকিলে প্রেম জানা যায় না; এবং প্রেম জানিলেই প্রেমের শক্তি হৃদয়ে উপস্থিত হয়। এই নিয়ম যদি হৃদয়ঙ্গম করি, তবেই ঈশ্বরকে নিরাকরণ করার অর্থও বুঝিতে পারিব। ইহা কবিত্ব নয়, কল্পনা নয়, ইহা অতি সত্য কথা। তাঁহার প্রেম নিরন্তর অবিচলিত ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। সেই অনন্ত প্রেম সর্ব্বদাই আমাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া আছে; আমরা সেই প্রেমের কার্য্য দেখি না এবং তাহা অনুভব করি না। এই জন্যই তাঁহার শক্তি আমাদের হৃদয়ে কাজ করে না। যখন ঈশ্বরের কৃপা এবং প্রেম আমাদের হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া আমাদের হৃদয়কে উন্নত, মিষ্ট ও দৃঢ় করে, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে ঈশ্বর হৃদয়ে সন্নিহিত রহিয়াছেন। আর যখন সেই প্রেম দেখি না, তাহা ভুলিয়া যাই এবং সে জন্য তাঁহার উপরে নির্ভর করিতে পারি না, তখনই আমরা বলি "ঈশ্বরকে নিরাকরণ করিয়াছি অর্থাৎ হৃদয় হইতে তাঁহাকে দূরে রাখিয়াছি।" তাঁহার শক্তি সর্ব্বদাই আমাদিগকে পরাজয় করিতে উন্মুখ। যখন আমরা তাঁহার প্রেম ও করুণার উপর নির্ভর করি তখনই তাঁহাকে হৃদয়ের অতি নিকটে দেখিতে পাই; আর তাহা না হইলেই আমরা তাঁহাকে নিরাকরণ করি।

এই ভাবে আমরা কতবার যে ঈশ্বরকে নিরাকরণ করি তাহা বলিতে পারি না। সংসারে দুই প্রকৃতির লোক দেখি, কেহ কেহ সম্পদে এবং সুখের অবস্থায় ঈশ্বরকে স্মরণ করে, কিন্তু বিপদে ও দুঃখে বা প্রতিকূল অবস্থাতে পড়িলে তাঁহাকে ভুলিয়া যায়, তখন চিত্তের স্থৈর্য্য থাকে না; তখন তাহারা ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপের কথা ভুলিয়া যায়; অসহিষ্ণু হৃদয় দুঃখে চঞ্চল হয়, তাঁহার প্রেম দেখিতে পায় না এবং তাঁহাকে নিরাকরণ করে। আবার কেহ কেহ বা সুখের অবস্থায় ঈশ্বরকে নিরাকরণ করে। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণাও সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বেশ ঈশ্বরে নির্ভর রাখিয়া চলে; কিন্তু যেই সুখের অবস্থা আসিল অমনি সুখদাতাকে ভুলিয়া গেল; সুখের মাদকতা শক্তির গুণে তাঁহাকে নিরাকরণ করিল।

তৃতীয়তঃ, কেহ কেহ বা অহঙ্কার বশতঃ ঈশ্বরকে নিরাকরণ করে। ভজনের অহঙ্কার, সাধুতার অহঙ্কার, নিজে বড়ই জ্ঞানী পণ্ডিত, নিজের শক্তির উপরই নির্ভর এবং নিজের পায়ে সর্ব্বদা দণ্ডায়মান এই ভাবিয়া বড়ই অহঙ্কার! ইহারাও ঈশ্বরকে নিরাকরণ করে। তাঁহার উপর নির্ভর রাখে না। তাহাদের ভাবটা যেন এই প্রকার,—"সমুদায় ঘর যুড়িয়াই আমি, ঈশ্বর তুমি যাও তোমার জন্য জায়গা নাই।" এইভাব ভক্তিলাভের বিরোধী, এ অবস্থায় ঈশ্বর নিরাকৃত হন। যেমন পিচ্‌কারীতে বায়ু পরিত্যক্ত স্থানটাই জল আসিয়া অধিকার করে, সেইরূপ অহমিকা-পরিত্যক্ত হৃদয়কেই ব্রহ্মকৃপা পূর্ণ করিয়া থাকে।

চতুর্থতঃ বিষয়াসক্ত লোক সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরকে নিরাকরণ করে। যে ঈশ্বরের উপরে বিষয়কে স্থান দেয় সে ঈশ্বরকে নিরাকরণ করে। এরূপ লোক তাঁহাকে সত্য বলিয়া বুঝিতে পারে না; তাঁহার প্রতি নির্ভর করিতে পারে না; তাঁহার শক্তির অধীন হয় না।

এইরূপে নানাপ্রকারে আমারা ঈশ্বরকে নিরাকরণ করি। সময়ে সময়ে প্রবৃত্তির প্রবলতা বশতঃও ঈশ্বরকে নিরাকরণ করিয়া থাকি। মাতার প্রেম শিশুর প্রতি সর্ব্বদা অবিচলিত ভাবে প্রবাহিত। ক্রোধের ক্ষণিক উত্তেজনা বশতঃ সেই প্রেমের পথে বিঘ্ন আসিলেও দেখিতে পাই স্থায়ী প্রেমের ব্যাঘাত হয় না; এবং পর মুহূর্ত্তেই আবার সন্তানের প্রতি প্রেম প্রবাহিত হয়। পতি পত্নীর প্রেমে কত সময়ে বিরোধ উপস্থিত হয়, কিন্তু স্থায়ী প্রেম প্রবাহ একেবারে বিশুষ্ক হইয়া যায় না। এইরূপ যদি দেখিতাম যে প্রবৃত্তির উত্তেজনা বা মানসিক বিকার বশতঃ ঈশ্বরকে ক্ষণিকভাবে নিরাকরণ করিলেও তাঁহার প্রতি আমাদের অবিচলিত প্রেম বর্ত্তমান রহিয়াছে, তবে দুঃখিত হইতাম না। যদি দেখিতাম যে রোগ শয্যায় পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছি বটে কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি প্রেম রহিয়াছে, নির্ভর রহিয়াছে। কত সময়ে কত সংকল্প করি এবং সেই সংকল্প ভগ্ন হইলে কাঁদি বটে, কিন্তু তাঁহার করুণার প্রতি অটল বিশ্বাস রহিয়াছে, তাহা হইলে এত দুঃখিত হইতাম না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও নির্ভর স্থায়ী হয় না। মুখে বলি বটে তিনি জীবন্ত জাগ্রত দেবতা কিন্তু তাঁহার প্রতি সেরূপ নির্ভর নাই। আমরা কি শরীর মন এবং আত্মার জন্য তাঁহার প্রতি নির্ভর করি? পদে পদে পদস্খলিত হইয়া এবং অন্ধকারে পড়িয়াও কি তাঁহারই উপর নির্ভর করি? বিশ্বাসী, প্রেমিক যিনি তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে চির সন্ধি-সূত্রে বদ্ধ। "ঈশ্বর আমাকে নিরাকরণ করেন নাই, আমিও তাঁহাকে নিরাকরণ করিব না; তাঁহার সঙ্গে আমার divorce যেন হয় না। এই সন্ধি-পত্র জন্মের মত লিখিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সাধু প্রেমিক ব্যক্তি তাঁহার চরণে জন্মের মত পড়িয়া থাকেন। ঈশ্বর করুণা করুন যেন এই ভাবে তাঁহাকে আমরা ধরিতে পারি, তাঁহাকে যেন কখনও নিরাকরণ না করি।

শ্রীমান্ প্রকাশচন্দ্র বসুর দীক্ষা উপলক্ষে শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশ।

(প্রাপ্ত)

শ্রীমান্ প্রকাশচন্দ্র, আজ তোমার বড় ভাগ্যোদয়, বড় সৌভাগ্যের দিন। তুমি এই শুভদিনে, শুভমুহূর্ত্তে ঈশ্বরের পূজার জন্য দীক্ষিত হইতেছ। তুমি তোমার সমস্ত জীবনকাল—যতদিন জীবিত থাক, ঈশ্বরের পূজা অর্চনা করিবে। যাবজ্জীবন তাঁর সত্যধর্ম্মের অনুসরণ করিবে, তাহা হইলে এই সংসারে তোমার কল্যাণ হইবে ও অন্তে মুক্তিলাভ করিবে। সমস্ত জীবন সর্ব্বদা হৃদয়ে এইটী ধারণ করিবে—ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র

আসীৎ নান্যৎকিঞ্চিনাসীৎ। এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না একমাত্র পরব্রহ্মই বিরাজিত ছিলেন। জগৎ প্রকাশ করিয়া এখন তিনি ইহার অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বব্যাপী হইয়া রহিয়াছেন। এই সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের স্বরূপ কি? তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। কেবলমাত্র তাঁহারই উপাসনাতে আমাদের ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গল হয়। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তাঁহার উপাসনার প্রকার কি? তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব। তাঁহাকে প্রীতি কর এবং তাঁহার আদেশানুসারে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সকল সাধন কর সর্ব্বকাল তাঁহারই উপাসনাতে দেহমনকে নিযুক্ত রাখ। ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ এই। এই বীজে চিরকাল বিশ্বাস কর, নির্ভর কর এবং জীবনাবধি তাঁর উপাসনা কর। ব্রাহ্মধর্ম্ম অপৌত্তলিক ধর্ম্ম, একমাত্র পরব্রহ্মেরই উপাসনা কর, কোন জল্পনা কল্পনার ভিতরে যাইও না। কেবলমাত্র তিনি নিত্যসত্য। তাঁহাকে ছাড়িয়া তাঁহার সৃষ্ট কোন বস্তুরই উপাসনা করিবে না। জগতের পশু, পক্ষী কিম্বা কোন মানুষকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিও না। কেহ কেহ বা চন্দ্র, সূর্য্য, কালী, শক্তি প্রভৃতির উপাসনা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা কখনই ঈশ্বরের উপাসনা নহে। ব্রহ্মের উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা। তাঁহাকে জ্ঞানে প্রদর্শন করিয়া, আত্মার আত্মা পরমাত্মা জানিয়া উপাসনা করিবে। যাগ যজ্ঞ হোম পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা তাঁহার উপাসনা হয় না; কেবল হৃদয়ের ভক্তিদ্বারাই তাঁর উপাসনা হয়। এইরূপ প্রেমভক্তি দ্বারা তাঁহার উপাসনা করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ণ লক্ষণ। অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণএবচঃ। যে কাহারও প্রতি দ্বেষ করে না, নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি যার করুণা ও মৈত্রভাব, সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বর সকলেরই সুহৃৎ, তিনি সকলের সখা, প্রভু, নিয়ন্তা, ঈশান ও আশ্রয়। তাঁহাকে জীবন-পথের আদর্শ করিয়া, তাঁহার প্রেম ও মঙ্গলের ভাব অনুকরণ করিয়া যে সকলকে প্রীতি করিতে পারে, সকলের কল্যাণসাধন করিতে পারে, সেই প্রকৃত ব্রাহ্ম। এই আদর্শই পূর্ণ আদর্শ। এই আদর্শ গ্রহণ করিয়া সংসারে ধর্ম্মসাধন কর তোমার কল্যাণ ও জগতের কল্যাণ হইবে। সর্ব্বদা সৎকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে এবং অসৎকার্য্য হইতে বিরত থাকিবে। যদি কখন মোহ বশতঃ কোন পাপাচরণ কর, তবে অনুতপ্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবে এবং "আর এরূপ কর্ম্ম করিব না" বলিয়া ক্রন্দন করিবে, তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিবে; তিনি তোমাকে ক্ষমা করিবেন; পাপ-তাপ হইতে মুক্ত করিবেন। সন্তপ্তচিত্তে প্রার্থনা করিলে, পতিতপাবন পরমেশ্বর ক্ষমা করেন। এই বলিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিও—"পাপে মলিন হয়ে কার কাছে কাঁদিব, কৃপা কর হে কৃপানিধান।" পরিত্রাণ কেবল মাত্র তাঁর কাছেই পাওয়া যায়। তিনি ধর্ম্মের যে আদেশ করিয়াছেন তাহা লঙ্ঘন করিয়া দোষ করিলে আর কেহই পরিত্রাণ করিতে পারে না। এই সংসারে বিপদের সময় মানুষ মানুষকে রক্ষা করিতেও পারে, কিন্তু পাপতাপে পতিত মনুষ্যকে একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই পরিত্রাণ করিতে পারে না। তিনি ধর্ম্মাবহ ও পাপনুদ; তিনি ধর্ম্ম প্রেরণ করেন এবং তাঁহার প্রেরিত ধর্ম্মাবলম্বনকারীকে সংশোধন করিয়া তাঁহার দিকে আনয়ন করেন। কল্পিত উপাসনাতে কিম্বা গঙ্গাস্নানাদিতে হৃদয়ের পাপ দূরীভূত হয় না; ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেই তিনি পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবেন। পাপের জন্য অকৃত্রিম অনুশোচনাপূর্ব্বক তাঁর নিকট দাঁড়াও, তিনি ক্ষমা করিবেন। যেরূপে এই ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি করিতে পার সর্ব্বদা তার চেষ্টা করিবে। অর্থ দ্বারা, উপদেশ দ্বারা যেরূপে পার, কখনও এই ধর্ম্মের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতে অবহেলা করিবে না। এই উপদেশ গ্রহণ এবং এই প্রতিজ্ঞা কর যে এই উপদেশানুযায়ী জীবন যাপন করিবে। এই বিষয়ে ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা কর।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

১৮৯৪

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১৪ই জুলাই প্রাতে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ মহাশয় ব্রহ্মোপাসনা করেন। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র বি,এ ব্যাখ্যা করেন ও সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম্, এ "ধর্ম্মাচরণ কি সংসার ত্যাগ?" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১৫ই অপরাহ্ন ৪ঘটিকার সময় বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়; তাহাতে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্,এ।
সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র বি,এ।
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল খাস্তগির বি,এ।
সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চৌধুরী।
শ্রীযুক্ত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ।

এ বৎসর ছাত্রসমাজ অনেকগুলি কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন। ছাত্রসমাজের কার্য্যের সম্যক্ সুশৃঙ্খলা সম্পাদনার্থ সমগ্র ছাত্রসমাজকে কয়েকটী "অঙ্গমণ্ডলী"তে বিভাগ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক বিভাগে "তত্ত্বাবধায়ক" নিযুক্ত করা হইয়াছে। (১) শুশ্রূষা বিভাগ (২) নৈতিক বিভাগ (৩) চরিত্র-সংশোধনী বিভাগ (৪) দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যদান বিভাগ। এই বিভাগে একটী ছাত্রকে সাহায্য করা হইয়াছে। (৫) বিজ্ঞান আলোচনা বিভাগ; শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু বি, এস্, সি, এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত বক্তাগণ এই সময়ের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে বক্তৃতা করিয়াছেন।—

বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বি,এ "ঈশ্বর বিশ্বাসের ভিত্তি কি?" ৭ই জুলাই ১৮৯৪।
" কৃষ্ণকুমার মিত্র বি,এ } "ধর্ম্মাচরণ কি সংসার ত্যাগ?" ১৪ই " " ।
" হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম্,এ }
" নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় "জড় ও আত্মা" ২১শে " "

„	নবদ্বীপচন্দ্র দাস	"বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব"	২৮শে জুলাই ১৮৯৪	
„	কৃষ্ণকুমার মিত্র বি,এ,	"বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব"	৪ঠা আগষ্ট	„
„	কালীশঙ্কর স্বকুল এম্,এ	"জাতীয় উন্নতির মূলমন্ত্র"	১১ই „	„
„	কৃষ্ণকুমার মিত্র বি,এ	"সেণ্ট্ অগষ্টাইন্"	১৮ই „	„
„	উমেশচন্দ্র দত্ত বি,এ	"প্রজ্ঞা ও ইহার উৎকর্ষ সাধন"	২৫শে „	„
„	বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এম্,এ	"ছাত্রজীবনের কার্য্য"	৮ই সেপ্টেম্বর	„
„	নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	"সংশয় ও বিশ্বাস"	১৫ই „	„

বিগত ২২শে সেপ্টেম্বর সায়াহ্ন ৭ ঘটিকার সময় সিটী কলেজে ছাত্রসমাজের একটী "সামাজিক সম্মিলন" হয়।

আরা সাধনাশ্রম

বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী প্রধানতঃ আরায় থাকিয়া এই তিন মাস কার্য্য করিয়াছেন। এই সময়ে আরা সহরে বিসূচিকা রোগের আবির্ভাব হওয়াতে তাঁহাকে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া ঔষধ বিতরণ ও শুশ্রূষা করিতে হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নিয়মিত ভাবে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণও করিয়াছেন। ইতিমধ্যে ডোমরাও, রক্সাব, বাঁকীপুর, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়া উপাসনাদি করিয়াছেন। ডোমরাওতে তিনি তিনবার গমন করেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ এক সভায় বক্তৃতাদি করেন। কয়েকটী অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব এবং শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ কোয়েটায় গমন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কার্য্যের কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

আরা সাধনাশ্রম।

আয়		ব্যয়	
চাঁদা এবং এককালীন দান	২১৫৲	আশ্রমের ব্যয়	১২৯॥০
আগন্তুক প্রদত্ত আহারাদির ব্যয়	৩৲	প্রকাশ দেব জিউর পুত্রদিগের জন্য অর্থ পাঠান হয়	৩৩৸০
মফস্বলের বন্ধুদিগের প্রদত্ত পাথেয়	১২৬৸/০	বাটীভাড়া	৩৫॥০
		ভৃত্যাদিগের বেতন	১৩৵১৬
		বিবিধ	৪।৮
	৩৪৪৸/০	আগন্তুকদিগের আহারাদির ব্যয়	৭/৬
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	১১	পাথেয় ব্যয়	১২০॥/৩
	৩৪৪৸/১১		৩৭৩৸/১১
		হস্তেস্থিত	১৲
			৩৪৪৸/১১

দুর্ভিক্ষ—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে বাবু হরিমোহন ঘোষাল জেলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতী মাদারীপুর সবডিভিজনের অধীন মাদরা নামক স্থানে অবস্থিতি করিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগকে সাহায্য করিতেছেন। প্রতি সপ্তাহে ৫০০ শত আন্দাজ লোককে প্রায় ২০/ মণ চাঁউল বিতরণ করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন কয়েক জনের ঘর মেরামত করাইয়া দিয়াছেন, এক জনকে নৌকা খরিদ করিয়া দিয়াছেন। অনেক লোককে নূতন এবং পুরাতন বস্ত্র বিতরণ করিয়াছেন। অনেক রোগীকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। এই সময় মধ্যে দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ৯৬৮॥৶১৫ আয় এবং ৫২১৵৫ ব্যয় হইয়াছে।

লাইব্রেরী—সম্প্রতি আমাদের কয়েকটী বন্ধুর উদ্যোগে রাজা রামমোহন রায়ের নামে একটী লাইব্রেরী খোলা হইয়াছে। এই লাইব্রেরীর সম্পাদক ডাঃ মোহিনীমোহন বসুর প্রার্থনানুসারে আমাদের লাইব্রেরীর পুস্তক সকল তাঁহার দায়িত্বে প্রদান করা হইয়াছে। আবশ্যক হইলে আমরা এই পুস্তক সকল ১ মাসের নোটিস দিয়া ফিরাইয়া আনিতে পারিব এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

ব্রাহ্মসম্মিলনী—এই তিন মাসের মধ্যে ইহার তিন বার অধিবেশন হইয়াছিল। জুলাই মাসের প্রথম রবিবারে ডাঃ মোহিনীমোহন বসুর বাড়ীতে ইহার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। আগষ্ট মাসে বেলঘরিয়ায় বাবু সুরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের বাগানে ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সুরেন্দ্র বাবু নিজ হইতে এই সম্মিলনীর আহারাদির ব্যয় বহন করিয়াছেন। তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া যাইতেছে। বিগত ২৭শে আগষ্ট তারিখ হইতে ১লা সেপ্টেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সমাজ মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয় এবং ২রা সেপ্টেম্বর রবিবারে সমস্ত দিনব্যাপী বিশেষ উৎসব হইয়াছিল।

দান—বাবু জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয়ামাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন ফণ্ডে২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীমতী জগৎলক্ষ্মী ঘোষ তাঁহার স্বামী বাবু ভুবনমোহন ঘোষ মহাশয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন ফণ্ডে ৫৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। বাবু যদুনাথ ঘোষ মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয়পিতা বাবু কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন ফণ্ডে ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

তত্ত্বকৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার—এই তিন মাস এই কাগজ দুইখানি নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে দুই খানিরই আর্থিক অবস্থা ভাল নয়।

নূতন সমাজ—পুরুলিয়াতে একটী নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

নূতন সভ্য ও সহযোগী—এই তিন মাসের মধ্যে দুইজন নূতন সভ্য ও দুইজন নূতন সহযোগী মনোনিত হইয়াছেন।

অনুষ্ঠান—এই তিন মাসের মধ্যে ৮টী বিবাহ, ৬টী নামকরণ ও ৯টী শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

মৃত্যু—এই তিন মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী সভ্যের মৃত্যু হইয়াছে। মিঃ কারল হেমারগ্রেণ—১৮৮৬ সালে ইহার জন্মভূমি সুইডেন দেশ হইতে আমাদের সমাজের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আমাদের সমাজের সভ্য হন। বিগত বৎসরের জুলাই মাসে এদেশে আসিয়াছিলেন। এখানে থাকিয়া "রামমোহন রায় পুস্তকালয়" সংস্থাপনার্থ বিশেষ পরিশ্রম করিতেছিলেন। বিগত ৩রা জুলাই তারিখে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। কোন্নগর নিবাসী আমাদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি পরলোকগত শিবচন্দ্র দেব মহা-

শয়ের পত্নী অম্বিকা দেবী বিগত জুলাই মাসে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বাবু ভুবনমোহন ঘোষ মহাশয় অনেক-কাল হইতে রোগযন্ত্রণায় কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন, তিনিও বিগত জুলাই মাসে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। বাবু মোহিনীমোহন মজুমদার মহাশয় প্রায় মাসাবধি রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ভগবান পরলোকে ইহাদিগকে শান্তিদান করুন।

সঙ্গত-সভা—এই তিন মাসের মধ্যে সঙ্গত সভার অধি-বেশন তিন দিবস স্থগিত ছিল। কারণ এই তিন দিনে আমাদের তিন জন ব্রাহ্মবন্ধুর মৃত্যু হইয়াছে। ৮ দিবস ইহার অধিবেশন হয়। তাহাতে নিম্নলিখিত ৬টী বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। (১) ব্রাহ্মসমাজে জমাট ভাব হয় না কেন? এবং কি উপায়ে হইতে পারে? (২) অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। (৩) গুরুর আবশ্যকতা আছে কি না? (৪) বালক বালিকাদের ধর্ম্ম দীক্ষা। (৫) ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন। (৬) পারিবারিক উপাসনা।

ইহার মধ্যে কোন বিষয়ে দুই দিন আলোচনা হইয়াছিল।

দাতব্য বিভাগ—এই তিন মাস ৪টী অন্ধকে ১টী কুষ্ঠ রোগীকে ১১টী ছাত্রকে ১টী ছাত্রীকে এবং ১৪টী পরিবারে ও বিধবাকে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে।

বিগত ৩ মাস মধ্যে যাঁহারা এই ফণ্ডে দান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্য বাদ দিতেছি।

আয়ে ব্যয়ের হিসাব।

জমা		খরচ	
এককালীন দানপ্রাপ্তি	৬৯॥০	মাসিক দান	৮২৲
বার্ষিক দানপ্রাপ্তি	১১॥০	এককালীন দান	১০৵০
মাসিক দানপ্রাপ্তি	৮॥০	বিবিধ ব্যয়	॥৶০
অনুষ্ঠান উপলক্ষে দান প্রাপ্তি	৮৯৲		
			৯২৸/০
	১৭৮॥০	হস্তেস্থিত	২৯৬।১৫
পূর্ব্বকারস্থিত	২১০॥/.৫		
			৩৮৯/১৫
	৩৮৯/১৫		

উপাসক মণ্ডলী—বিগত ৩ মাস কলিকাতাস্থ উপা-সক মণ্ডলীর কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস, শশিভূষণ বসু, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়গণ উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
চাঁদা আদায়	৬১৵০	বেতন হিঃ	২৬৸০
দান সংগ্রহ	২৶০	গ্যাসের আলো	২৪॥০
শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দানপ্রাপ্তি	৫০৲	ক্ষুদ্র ব্যয়	১৭।১০
বিবাহ উপলক্ষে দান	৫৲	গচ্ছিত শোধ	১৫৲
	১১৮॥/০		৮৩।১০
পূর্ব্বস্থিত	৮।১৫	হস্তেস্থিত	৪৩।/৫
	১২৬॥/১৫		১২৬॥/১৫

নূতন পুস্তক—চরিত-রত্নাবলী। শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল প্রণীত। ২১০।৬ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ০ আনা। এই পুস্তকে করমেতি বাই, সঙ্ঘমিত্রা, তপস্বিনী রাবেয়া, কুকাগুরু রাম সিং, ওমর প্রভৃতি একাদশটী পুরুষ ও রমণীর ধর্ম্মজীবনী সন্নিবেশিত আছে।

ব্রাহ্মছাত্রীনিবাস ও শিক্ষালয়—ছাত্রী নিবাসের বর্ত্তমান ছাত্রী সংখ্যা ৩০। ইহার মধ্যে দুইটী অন্য স্কুলে পাঠ করে। শিক্ষালয়ের ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা ৭৮। বিগত তিন মাসের গড় সংখ্যা ৭৭। একজন শিক্ষক ছুটী লইয়া যাওয়াতে আর একজন তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
বেতন	১১৬৫৸৵০	বোর্ডিংএর আহারাদির খরচ	৫১৭॥১০
চাঁদা ও দানপ্রাপ্তি	৩৩৮৷৹৫	কর্ম্মচারীর বেতন	৭৪১৸১০
গাড়ী বিক্রী হিঃ প্রাপ্তি	৪০৲	গাড়ী	১৩২৸/৫
বিবিধ	১৸/১০	বাড়ীভাড়া	১৮২৲
ধার	১০৫৲	বিবিধ	৫৭/.৫
	১৬৬১।৫	ধারশোধ	৪০৲
পূর্ব্বস্থিত	২৫৲		
			১৬৭১।০
	১৬৮৬।৫	হস্তেস্থিত	১৮৸৫
			১৬৮৬।৫

আয় ব্যয়ের হিসাব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

আয়		ব্যয়	
সভ্য ও সহযোগিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত চাঁদা	২৮০৲	প্রচার ব্যয়	৪৮৭॥৵৫
বার্ষিক	১৩৩॥০	কর্ম্মচারীর বেতন হিঃ	৭১॥০
মাসিক	১৪৬॥০	ডাকমাশুল হিঃ	৩৶০
		বিবিধ হিঃ	১২৶০
		মুদ্রাঙ্কন হিঃ	৪৲
প্রচারার্থ দানপ্রাপ্তি	৪৩৭।৵১৫	পাথেয় হিঃ	৬১৲
মাসিক	২১৫॥০	উৎসব হিঃ	৭৲
বার্ষিক	৯৮॥৵১৫	কমিশন হিঃ	১৪৸৵০
এককালীন	১২৩০	প্রচারক গৃহ হিঃ	৬।/১৫
		দুর্ভিক্ষ হিঃ	৫২১৵৫
স্থায়ী প্রচার ফণ্ডের		নবদ্বীপ বৃত্তি	৩৲
দানপ্রাপ্তি	৩০৯॥০	দান	২৲
সুদ হিঃ	৭৩॥০	সিটি কলেজের প্রদত্ত	
বিলডিং ফণ্ড	॥/১৫	বৃত্তি দান	১২০৲
দুর্ভিক্ষ হিঃ	৯৬৮॥৶১৫	সুদ	১৭॥০
নবদ্বীপবৃত্তি	১৭॥০	সৌদামিনী বৃত্তি	১০৲
স্থায়ী উৎসব ফণ্ড	১০০৲	হাওলাত ও গচ্ছিত	
সিটি কলেজ বৃত্তি	১২০৲	শোধ	৩১৩।০
হাওলাত ও গচ্ছিত	৩৮৭।০		
বিবিধ হিঃ	১০৲		১৬৫৫॥৵৫
পাথেয় হিঃ	৫৭৲	স্থিত	১১৪৬॥৶১০
	২৭৬১॥৫		২৮০২।/১৫
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	৪০৸/১০		
	২৮০২।/১৫		

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

আয়		ব্যয়	
মূল্যপ্রাপ্তি	৪০৮/১০	কর্ম্মচারীর বেতন	৯৯৲
বিজ্ঞাপন হিঃ	৩৮৲	মুদ্রাঙ্কন	১৩০॥০
নগদ বিক্রয়	।৶১০	কাগজ	১০৭/১০
বিবিধ	॥/১৫	কমিশন	১৫।১৫
হাওলাত	৮০৲	ডাকমাশুল	১০৫৮/১০
		বিবিধ	৭।১০
	৫২৭৶১৫		
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	১৮/৫		৪৬৩৻৫
		স্থিত	৬৫৸৶১৫
	৫২৯৲		৫২৯৲

তত্ত্ব-কৌমুদী।

আয়		ব্যয়	
মূল্যপ্রাপ্তি	২৯৩॥১০	কর্ম্মচারীর বেতন	৬৭৲
নগদ বিক্রয়	॥০	কাগজ	৭০৻১০
		মুদ্রাঙ্কন	৮১॥০
	২৯৪৻১০	কমিশন	১৯৷০
গত মাসের স্থিত	১০৪॥১৫	বিবিধ	৬।০
		ডাকমাশুল	৩২৶১০
	৩৯৮॥/৫		
			২৭৬।০
		স্থিত	১২২।৶৫
			৩৯৮॥/৫

পুস্তক ফণ্ড।

আয়		ব্যয়	
নগদ বিক্রয়	২২২৸৶১৫	অপরের পুস্তক বিক্রয়ের	
সমাজের ১৮৬৶০		মূল্য শোধ	৫৫৸৶১০
অপরের ৩৬॥৶১৫		কর্ম্মচারীর বেতন	২২॥০
		ডাকমাশুল	৮৶০
বাকী বিক্রয়ের মূল্য		কমিশন	২২৸৶১০
আদায়	২৬৶০	বিবিধ	॥৶১৫
ডাকমাশুল	৬॥১০	পুস্তক বাঁধাই	৫৲
কমিশন	৩৶১৫	হাওলাত দান	৮০৲
	২৫৮৸/০		১৯৫৶১৫
গত ত্রৈমাসিকের		স্থিত	২৩৩/৫
স্থিত	১৬৯।৶০		
			৪২৮।০
	৪২৮।০		

ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেস।

আয়		ব্যয়	
ছাপাই কাগজ ইত্যাদির—		সরঞ্জামী	২০৶০
হিসাবে	২২১৭৶০	বিবিধ	১৭৻১৫
গ্রন্থকারদিগের নিকট কাজের		ঋণদান	১৭১৭।১০
দরুণ হাওলাত জমা	১২৪৪৸৶০	ডাক মাশুল	॥৶১০
		টাইপ খরিদ	৫৪৶১০
	৩৪৬২ /০	পূর্ব্বের টাইপ খরিদের	
হস্তেস্থিত	২৪॥/১০	মূল্য শোধ	৭০৲
		জলপানি	২৪৶৫
	৩৪৮৬॥৶১০	কর্ম্মচারীর বেতন	৬১০।৶১০
		দপ্তরী	২০৸০
		সুদ	৭২৲
		কমিশন	২০৲
		গচ্ছিত শোধ	৫॥০
		নগদ কাগজ খরিদ	২০/৫
		জর্জ্জ হাণ্ডার সন কোং	৩৯৪৶৫
			৩১৫৬॥/১০
		হস্তেস্থিত	৩৩০/০
			৩৪৮৬॥৶১০

ব্রাহ্মসমাজ।

প্রচার—সাধনাশ্রম হইতে প্রচারার্থ যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গাভিমুখে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিম্নলিখিত কার্য্যবিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

২০এ নবেম্বর কৃষ্ণনগর A V স্কুল গৃহে অপরাহ্ন আড়াইটার সময় বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল নীতি সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। ছাত্র এবং শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিবস রাত্রে উকীল বাবু প্রসন্নকুমার বসু এম,এ বি,এল, মহাশয়ের গৃহে স্থানীয় কয়েকজন উকীল মোক্তার নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করেন। কাশী বাবু সেস্থানে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা এবং সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনাদি করেন।

২১এ নবেম্বর প্রাতঃকালে কৃষ্ণনগর কলেজের দর্শনাধ্যাপক বাবু শিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম,এ, মহাশয়ের বাসায় উপাসনা হয়, কাশী বাবু উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় গোয়াড়ি গোবিন্দ সড়ক স্কুল গৃহে একটি সভার অধিবেশন হয়। কলেজের অধ্যাপক এবং অনেক উকীল মোক্তার সেস্থানে আগমন করেন। কাশী বাবু "সাধনা ও সিদ্ধি" বিষয়ে তথায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর পূর্ব্বোক্ত শিবেন্দ্র বাবুর গৃহে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের মেম্বরগণ এবং অন্যান্য কতিপয় ভদ্রলোক আগমন করেন। কাশী বাবু সেস্থানে উপাসনা করেন এবং দুটি সাধু জীবনের আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া উপদেশ দেন।

২২শে নবেম্বর অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর কলেজ গৃহে কাশী বাবু নীতি সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা স্থলে কলেজের অনেক ছাত্র এবং শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ইংলিসের প্রোফেসার বাবু দেবেন্দ্রনাথ বসু এম্. এ, সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। ঐ দিবস রাত্রে কলেজিয়েট স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার জগৎ বাবুর গৃহে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের মেম্বরগণ আগমন করেন। কাশী বাবু সেস্থানে উপাসনা করেন এবং উপদেশ দেন।

২৩শে নবেম্বর অপাহ্ন ৫টার সময় কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ গৃহে একটি সভায় অধিবেশন হয়। কাশী বাবু "ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকতা" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন।

নামকরণ—গত ১৭ই নবেম্বর শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী সরকারের, ভবানীপুরস্থ বাটীতে তাঁহার প্রথম পুত্রের নামকরণ সম্পন্ন হইয়াছে। বালকের মাতামহ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। বালকের নাম বিজলীবিহারী রাখা হইয়াছে।

শ্রাদ্ধ—গত ১৭ই নবেম্বর শনিবার আমাদের পরলোকগত বন্ধু বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে তাঁহার বিধবা পত্নী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ৩৲ এবং সাধনাশ্রমে ৩৲ দান করিয়াছেন।

সাধনাশ্রম—ব্রাহ্মবন্ধুগণের স্বতঃ প্রবৃত্ত দানের দ্বারাই সাধনাশ্রম চলিতেছে। পূর্ব্বে মাসে একবার কলিকাতাতে বাড়ীতে বাড়ীতে ভিক্ষা করা হইত। বহুদিন হইল তাহাও রহিত করা হইয়াছে। অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, কিপ্রকারে সাধনাশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। যাঁহাদের উপরে ইহার কার্য্যভার আছে, তাঁহারাও তাহা জানেন না। জগদীশ্বর ইহার ব্যয় একপ্রকার চালাইয়া দিতেছেন। বিগত মাসে স্বতঃ প্রবৃত্ত দানদ্বারা ৫৪/০ পাওয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি সাধনাশ্রম হইতে দুই দল দুইদিকে প্রচারার্থে বহির্গত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ, খাঁটুরা, বনগাঁ, যশোহর, বাগেরহাট হইয়া বরিশালের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। অপর দলে শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল গুপ্ত আছেন, তাঁহারা কৃষ্ণনগর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থান হইয়া ঢাকা ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানের অভিমুখে গমন করিয়াছেন। জগদীশ্বর ইহাদের ক্ষুদ্র চেষ্টার সহায় হউন।

দীক্ষা—কিছুদিন হইল ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের মজিলপুর নিবাসী ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ প্রকাশচন্দ্র বসুকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। মহর্ষি মহাশয় তদুপলক্ষে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা স্থানান্তরে মুদ্রিত করা গেল।

মৃত্যু—আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে আমাদের বন্ধু বাবু রামলাল সাহা গত ৩রা অগ্রহায়ণ অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি ইহার বিশেষ অনুরাগ ছিল।

আমাদিগের শ্রদ্ধের বন্ধু প্রাচীন ব্রাহ্ম সোলাকুড়া নিবাসী দ্বারকানাথ ঘোষ মহাশয় দীর্ঘকাল ব্যাপী জ্বর ও উদরাময় রোগ ভোগ করিয়া বিগত ১১ই অগ্রহায়ণ বেলা অনুমান ১ ঘটিকার সময়ে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি ইহারও বিশেষ অনুরাগ ছিল।

দান—কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য বিভাগের জন্য নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুত রাজা বনবিহারী কপূর, বর্দ্ধমান ১০৲ শ্রীযুক্ত বাবু রজনীনাথ রায়ের পত্নী, ভবানীপুর ২০৲,

প্রোফেসার নিউম্যানের নাম ব্রাহ্মসাধারণের নিকট সুপরিচিত। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইহার এবং থিওডোর পার্কারের চরণে বসিয়া আমরা ধর্ম্মের অনেক তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছি। ইহার প্রণীত soul ও Theism; নামক গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়া অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা উপকৃত হইয়া থাকিবেন। ইনি এখনও জীবিত রহিয়াছেন। ইহার বয়ঃক্রম প্রায়স নবতি বৎসর হইয়াছে, তথাপি কার্য্য করিবার শক্তি যায় নাই। এখনও ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণচিন্তা হইতে বিরত হন নাই। ইনি সম্প্রতি ৪ পাউণ্ড ৭১৴০ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নিকট প্রেরণ করিয়া তাহার দুই পাউণ্ড ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে ও দুই পাউণ্ড বরাহনগরের শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবাশ্রমের সাহায্যার্থ ব্যয় করিতে আদেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের সাহায্যার্থ প্রেরিত দুই পাউণ্ড সাধনাশ্রমে দান করা হইয়াছে।

এবার মান্দ্রাজ সহরে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইবে। তদুপলক্ষে সেখানে অনেক ব্রাহ্মের সমাগম হইবার সম্ভাবনা। সে সময়ে যাহাতে ব্রাহ্মদিগের একটী সম্মিলনী (Conference) হইতে পারে, সেজন্য মান্দ্রাজ-ব্রাহ্মসমাজের সভাগণ চেষ্টা করিতেছেন। এজন্য তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সমাজে নিমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আশা করি তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে।

প্রাপ্তি স্বীকার।

কৃতজ্ঞতার সহিত ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি স্বীকার করা যাইতেছে।

বাবু বৈকুণ্ঠ চন্দ্র আচার্য্য (নর্ম্মাল স্কুল ঢাকা) কর্তৃক সংগৃহীত		৬৲
" গিরিশ্চন্দ্র চৌধুরী	মাইয়াংগাং	৫৲
,, গুরুদয়াল সিংহ	কুমিল্লা	২৲
,, নবীন কৃষ্ণ গুপ্ত	মুর্শিদাবাদ	৫৲
,, ভগবতী চরণ পাল	নাংলে০	২০৲
,, অধরচন্দ্র মজুমদার	কলিকাতা	।০
,, নবীনচন্দ্র মিত্র	ঐ	১৲
,, রজনীকান্ত নিয়োগী	ঐ	১৲
,, উপেন্দ্র নারায়ণ নিয়োগী	সাকরাইল	৵০
,, উপেন্দ্র নাথ রায়	সৈয়দপুর	৪৲
,, গিরিশ্চন্দ্র দত্ত	শিবসাগর	১৲
,, মুঙ্গের হইতে বাবু চণ্ডীচরণ সিংহ সংগ্রহ করিয়া পাঠান		১০৲
,, বাবু ভুবন মোহন কর	দিনাজপুর	১৸০
,, বাবু দেবী প্রসন্ন রায় চৌধুরী ফরিদপুর সুহৃদসভার সম্পাদক		৫০৲
,, কোন ভদ্রলোকের নিকট হইতে হরিমোহন বাবু প্রাপ্ত হন		।০
,, শ্রীমতী প্রভাবতী দাস	কলিকাতা	১৲
,, বাবু বিপিন বিহারী রায়	মাণিকদহ	১০৲
,, ফরিদপুর হইতে শ্রীযুক্তা বিনয় কুমারী চক্রবর্ত্তী কর্তৃক কোন ভদ্র মহিলা হইতে সংগ্রহ করেন		২০৲
,, এবং অন্যত্র হইতে প্রাপ্ত হন		।০

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্তৃক ১৬ই অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৮শ সংখ্যা।. ১৭শ ভাগ। | ১লা পৌষ শনিবার, ১৮১৬ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹ মফস্বলে ৩ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵৹

প্রার্থনা।

হে কৃপাসিন্ধু! আমরা আবার, মহোৎসবের দ্বারে সমুপস্থিত হইতেছি। সুখে দুঃখে, আশা নিরাশাতে, সম্বৎসর অতীত-প্রায়। বৎসর যত শেষ হইতেছে, ততই ঘনবিষাদে আমাদের মন আচ্ছন্ন হইতেছে। বৎসরের প্রারম্ভে যে সকল সংকল্প করিয়াছিলাম, তাহার কতই অপূর্ণ রহিল। হে পিতা আমরা যে নিরন্তর আপনাদের দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেছি। সর্ব্বদাই আমাদের কার্য্য, আমাদের আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা অনেক নিম্নে পড়িয়া থাকিতেছে। সেই লজ্জায় আমরা অভিভূত হইয়া পড়িতেছি। এক একবার মনে হয়, এরূপ দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ তোমার সত্যধর্ম্ম, এই মহৎ ও উদার ধর্ম্ম সাধনের উপযুক্ত নহে। কিন্তু সবল হই, দুর্ব্বল হই, তোমার আশ্রয়ে থাকা ভিন্ন আমাদের অন্য গতি আর কি আছে? তোমার দ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়া উপস্থিত হওয়া ব্যতীত অন্য উপায় আর কি আছে? তাই আমরা দুর্ব্বল হইয়াও তোমার চরণে উপনীত হইতেছি। মহোৎসবের দ্বারের সন্নিহিত হইয়া তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি। তুমি আমাদের হৃদয়ে নববল ও নব সংকল্প প্রেরণ কর।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সব থাকিতে বঞ্চিত—বিগত শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসি দেশের সহিত স্পেন দেশবাসিদিগের যখন যুদ্ধ হয়, তখন একটী মহা সত্যের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। স্পেনবাসিদিগের সাহস সমরোৎসাহ ও ফরাসিবিদ্বেষের কিছু অপ্রতুল ছিল না। সুশিক্ষিত সৈন্যদল এবং উপযুক্ত সেনাপতিগণেরও অভাব ছিল না। তথাপি স্পেন ফরাসিদিগের নিকট পরাজিত হইয়া গেল। ইহার একটী প্রধান কারণ এই স্পেনের সেনাপতিগণ পরস্পরের সহিত এক পরামর্শে কাজ করিতে পারিলেন না। প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেহই আপনার মত বা স্বাধীনতাকে বিন্দুমাত্র সংকোচ করিতে চাহিলেন না। বৃথা বিবাদে অনেক সময় পর্য্যবসিত হইয়া যাইতে লাগিল, কি প্রণালীতে যুদ্ধ চলিবে সে বিষয়ের নির্দ্ধারণ করা কঠিন হইল। ওদিকে শত্রুগণ একাগ্রতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিল। কাজেই স্পেন বল থাকিয়াও একতার অভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, সব থাকিতে বঞ্চিত হইল। এ সংসারে জন-সমাজের কার্য্য দুই প্রকারে চলিতে দেখা যায়। প্রথম কোনও প্রতিভাশালী ও শক্তিশালী কার্য্যদক্ষ নেতার অধীন হইয়া লোকে কার্য্য করে। যেমন নেপোলিয়ানের অধীনে থাকিয়া ফরাসিগণ যুদ্ধ করিয়াছিল। দ্বিতীয়, যাহাদের মধ্যে এরূপ প্রতিভাশালী ও সর্ব্বজনের পূজিত নেতা নাই, তাহারা দশজনে পরামর্শ করিয়া কার্য্য করে। ইহাকে নিয়মতন্ত্র প্রণালী বল, আর সাধারণ তন্ত্রপ্রণালীই বল, বিষয়টী এক। কিন্তু যাহাদের মধ্যে সর্ব্বজনের পূজিত প্রতিভাশালী নেতাও নাই, এবং যাহারা দশজনে পরামর্শ করিয়াও কাজ করিতে পারে না, তাহাদের দ্বারা কোনও কাজ হওয়া কঠিন হয়। অনেক চিন্তাশীল লোকে বলিয়া থাকেন এ দেশবাসিদিগের পক্ষে দশজনে মিলিয়া মিশিয়া পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবার সময় এখনও আসে নাই। বহু বহু শতাব্দী ধরিয়া যাহারা সর্ব্ববিধ প্রভু-শক্তির মধ্যে বাস করিয়াছে, গৃহে, পরিবারে, সমাজে, ধর্ম্মক্ষেত্রে, রাজনীতিতে যাহারা অপরের আদেশে উঠিয়াছে বসিয়াছে, তাহারা কি ইচ্ছা করিলেই স্বাধীনভাবে ও নিয়মতন্ত্রের অধীন হইয়া দশজনে মিলিয়া কাজ করিতে পারে? ধর্ম্মে গুরু, সমাজে কর্ত্তা, ও রাজনীতিতে রাজা, এই নিয়ম এখনও অনেক দিন ইহাদের পক্ষে চাই। আমরা মনে করি ব্রাহ্মসমাজ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার জন্মদাতা; এখানে মানব-বিবেকের আদর; অতএব ব্রাহ্মগণ এ দেশবাসিদিগকে দশজনে মিলিয়া কাজ করিবার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু এখনও ব্রাহ্মগণ সুচারুরূপে সে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। এক দিকে ইহাঁদের অনেকে গুরু ও কর্ত্তা না ধরিলে দাঁড়াইতে পারিতেছেন না; অপর দিকে অনেকে দশজনে মিলিয়া কাজ করিতেও পারিতেছেন না; উপরি উল্লিখিত স্পেন দেশীয় সেনাপতিদিগের ন্যায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছেন; সব থাকিতে বঞ্চিত হইতেছেন।

গুরু ও বিচার-ক্ষমতা—উৎকৃষ্ট গুরুর উপদেশই যে একমাত্র অবলম্বন নহে এবং স্বকীয় বিবেচনা ও বিচারশক্তির উৎকৃষ্টতারও যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের ষড়বিংশ অধ্যায় হইতে কয়েক পংক্তি নিয়ে উদ্ধৃত হইল। যাঁহারা উৎকৃষ্ট গুরু লাভ হইলেই সিদ্ধকাম হইলেন এরূপ মনে করেন, তাঁহারা এই উদ্ধৃত অংশ পাঠ দ্বারা সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন যে, যেমন উৎকৃষ্ট উপদেষ্টার প্রয়োজন, তেমনি উপদিষ্টেরও সেই উপদেশের অর্থ গ্রহণ করিবার শক্তি থাকা আবশ্যক। বিচারশক্তি, বা উত্তম অর্থবোধশক্তি না থাকিলে কেবল গুরু কখনই কাহারও পরিত্রাণের উপায় করিয়া দিতে পারেন না। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—"পন্নগ ও দেবর্ষিগণ প্রজাপতির নিকটে যাহা কহিয়াছিলেন, পণ্ডিতেরা এই স্থলে সেই সংবাদ সংবলিত এই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দেবতা, ঋষি, নাগ ও অসুর সকলেই প্রজাপতির নিকট গমন পূর্ব্বক সমাসীন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন যে, 'ভগবন্! আমাদিগের যাহাতে শ্রেয় হয়, আপনি আমাদিগকে তাহা বলুন।' ভগবান প্রজাপতি কুশল জিজ্ঞাসু সেই আদি দেব অসুর সকলকে কহিলেন যে, ওঁকার স্বরূপ একাক্ষর ব্রহ্মই একমাত্র শ্রেয়। তাহারা এই কথা শুনিয়া নানাদিকে পলায়ন করিল। তদীয় উপদেশ ওঁকারাত্মক একাক্ষর ব্রহ্মের প্রকৃত অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া পলায়মান সেই আদি দেব অসুর সকলের মধ্যে প্রথমতঃ সর্প সকল ওঁকার উচ্চারণে নিজ মুখের উন্মীলন ও নিমীলন হওয়ায় স্বীয় স্বভাবজ মুখোন্মীলন-সাধ্য দংশনই শ্রেয়, ইহা বিবেচনা করতঃ দংশন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইল। পরে দানবদল ওঁকার উচ্চারণে ওষ্ঠ চালন হওয়ায় দম্ভই শ্রেয়ঃ ইহা বিবেচনা করিয়া স্বভাবজ দম্ভভাব, দেবতাগণ ওঁকারের অর্থ প্রার্থিত বস্তুর স্বীকার এইরূপ অবগত হইয়া দানব্যবসায় এবং মহর্ষি সকল ওঁকার উচ্চারণে ওষ্ঠ প্রবৃত্তির উপসংহার দর্শন করিয়া সর্ব্বপ্রবৃত্তির উপসংহারার্থ দমই শ্রেয়; ইহা বিবেচনা করতঃ দম অবলম্বন করিলেন। দেব, ঋষি, দানব এবং সর্প সকল একমাত্র গুরু লাভ করতঃ এক শব্দ দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া নানা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল। শিষ্যগণ এই গুরুকে (যিনি হৃদয় মধ্যে বাস করেন) যাহা জিজ্ঞাসা করে ইনি তাহা শিষ্যগণকে শ্রবণ এবং যথাতথরূপে গ্রহণকরান বলিয়া, ইনি ভিন্ন দ্বিতীয় গুরু আর কেহই বিদ্যমান নাই।" এই অধ্যায়ের অন্যত্র লিখিত হইয়াছে যে, "যিনি জীবগণের হৃদয়মধ্যে বাস করেন, সেই নারায়ণ দেবই একমাত্র গুরু, তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় গুরু আর কেহই নাই, আমি তাঁহারই বিষয় তোমাকে কহিতেছি।" মহাভারতের এই অংশে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাদ্বারা "ঈশ্বরকেই পরমগুরু জানিয়া তাঁহারই ইচ্ছানুসারে চলিতে হইবে, তাঁহার প্রদর্শিত পথেই চলিতে হইবে"; ব্রাহ্মগণের এই উক্তিরই সমর্থন হইতেছে। ব্রাহ্মগণের গুরুবাদ সম্বন্ধীয় মতের ভিত্তি একমাত্র যুক্তির উপরেই নির্ভর করিতেছে এমন নয়। গুরুবাদের সর্ব্বপ্রধান সমর্থনকারী ধর্ম্মশাস্ত্রেও তাহার উল্লেখ দেখা যাইতেছে।

প্রাচীন ও নবীন—জনসমাজের নিকট দুইটি স্রোত বিদ্যমান রহিয়াছে। একটি নবীন অপরটি প্রাচীন। যাঁহারা নবীনকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রাচীনকে অবলম্বন করিতেছেন, তাঁহারা বর্ত্তমান শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও বহুপূর্ব্ব শতাব্দীতে বাস করিতেছেন। বর্ত্তমান উন্নত জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত তাঁহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয়টি পরিষ্কাররূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমান সময়ে রেল ও ষ্টীমার প্রভৃতি হওয়াতে গমনাগমনের অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছে। কল কারখানা হওয়াতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হইতেছে। যদি কেহ এখন এ সকল ব্যবহার না করিয়া প্রাচীন প্রথা অনুসারে গোযানে কিম্বা পদব্রজে গমনাগমন করেন, কলে সূতা ও বস্ত্র প্রস্তুত না করিয়া চরকাতে সূতা প্রস্তুত ও হাতে বস্ত্র বয়ন করেন, তবে তাঁহাকে সকলে কি বলিবেন? তিনি কখনও বর্ত্তমান দুরন্ত প্রতিযোগিতার সময়ে জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারিবেন না।

নিউটন বহু চিন্তা ও গবেষণার পর যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কেহ যদি অদ্য তাহা লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন, তদতিরিক্ত আর কিছুই না জানেন, যদি কেহ সভ্যতার বর্ণ পরিচয়ের প্রথম ভাগ আবৃত্তি করাকেই আর্য্যত্ব রক্ষা মনে করেন, তবে তাঁহাকে বর্ত্তমান শতাব্দীর লোক মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না।

প্রাচীনকালে প্রবৃত্তিবিশেষকে দমন করিবার জন্য কত শারীরিক উপায় অবলম্বন ও ঔষধাদি সেবন করা হইত, অর্থাদির ব্যবহার এবং স্ত্রী পুত্রকে সাধনবিঘ্ন মনে করিয়া নির্জ্জনে গমন করাকেই ঋষি-জনোচিত কাজ বলিয়া বর্ণন করা হইত এবং দিনের পর দিন উপবাস করিয়া দেহ শুষ্ক ও অকর্ম্মণ্য করিয়া প্রলোভনের দ্বার রোধ করিতে চেষ্টা করা হইত, বর্ত্তমান যুগে ঐ সকল নিয়ম পরিত্যক্ত হইয়াছে। যাঁহারা বর্ত্তমান উজ্জ্বল জ্ঞানালোকের যুগে ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবেন, তাঁহাদিগকে সেই প্রাচীন কালের লোক বলিয়া গণ্য করা হইবে। জ্ঞানরাজ্যে তাঁহাদের দণ্ডায়মান হইবার ভূমি থাকিবে না। আধ্যাত্মিক রাজ্যে যে সকল নূতন নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সাধন না করিয়া একমাত্র প্রাচীন কালের আবিষ্কৃত সত্য ধরিয়া থাকিলে কখনও উন্নত জীবন লাভ হইবে না। এমন এক সময় ছিল, যখন লোকে পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিত, আমমাংস আহার করিত, কাষ্ঠ ও প্রস্তরনির্ম্মিত যন্ত্রাদি ব্যবহার করিত; এখন সেইরূপ আচরণ করিয়া যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি রক্ষা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা নিজকে নিজে জ্ঞানরাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া দিতেছেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বিজ্ঞান এবং রাজনীতি সম্বন্ধে যেমন পৃথিবীর সভ্যতা দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে তদ্রূপ নহে। এমন কি সে বিষয়ে নবীন প্রাচীন অপেক্ষা নিকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থিত। এ কথার উত্তর দিতে হইলে অনেক কথা বলা আবশ্যক হয়। আমরা এই

মাত্র বলিতে পারি যে, যাঁহারা ব্রাহ্ম হইয়াছেন, অথবা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা কথনও ঐরূপ উক্তি অনুমোদন করিতে পারেন না। কোরাণ, বাইবেল এবং উপনিষদোক্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম অপেক্ষা বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মধর্ম্ম বিভিন্ন ও অনেক বিষয়ে সমধিক উন্নতিশীল। এই উন্নতিশীল ধর্ম্মই বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম যাঁহারা গ্রহণ না করিবেন, তাঁহারা কথনও বর্ত্তমানের নব জ্ঞানালোক লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না। এই ধর্ম্ম যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা এই ধর্ম্ম সাধন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারাই আধ্যাত্মিকরাজ্যে নবীন বলিয়া আখ্যাত। যাঁহারা এই নবীন ভাবের বশবর্ত্তী না হইয়া সম্পূর্ণরূপে প্রাচীনের অনুসরণ করিতেছেন, তাঁহারা বহুশতাব্দী পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছেন। নবাবিষ্কৃত কোন বিজ্ঞানের সহিত যোগ না থাকিলে সকলকেই হীনবল হইতে হইবে। বর্ত্তমান যুগে তাঁহারা কথনও সফলমনোরথ হইতে পারিবেন না।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

নিরাকারের ধ্যান।

"নিরাকারের ধ্যান সম্ভবপর নহে" এই যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক এদেশের সাকারবাদিগণ সাধারণতঃ নিরাকারোপাসনার প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রকার উক্তি দ্বারা তাঁহারা যে আপনাদের আধ্যাত্মিক-দৃষ্টিহীনতারই পরিচয় দেন, তাহা সম্ভবতঃ স্থিরভাবে অনুধাবন করিয়া দেখেন না। বিপক্ষ-দমনের প্রবৃত্তি এতই প্রবল যে, এইরূপ যুক্তিদ্বারা আত্ম-পক্ষকে প্রকারান্তরে হীন করিতেও তাঁহারা বিরত হন না। আমরা একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি, যদ্দ্বারা অতি সহজেই আমাদের উক্তির সমর্থন হইবে।

ব্রাহ্মণগণের পক্ষে গায়ত্রী মন্ত্র জপ একটী অবশ্যপ্রতিপাল্য দৈনিক কর্ত্তব্য। এই গায়ত্রীকে বেদমাতা নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। গায়ত্রীর অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে এবং ইহার অন্তর্নিহিত ভাব অনুভব করিলে, সহজেই তাঁহারা আপনাদের উক্তির অসারতা অনুভব করিতে সমর্থ হইতে পারিবেন; এবং নিরাকারের ধ্যানসম্ভবপর নয় বলিয়া আত্ম-পক্ষ সমর্থনেরও আর সুবিধা পাইবেন না। সাধারণতঃ যেভাবে গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা তেমন শ্রদ্ধেয় বা আধ্যাত্মিকতার পরিচায়ক নহে। অর্থাৎ সবিতা শব্দের অর্থ যদি "সূর্য্য" করা যায়, তাহা হইলে উক্ত মন্ত্রের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বের বিশেষ লাঘব করা হয়, এবং তদ্দ্বারা হিন্দুসমাজের একটী প্রধান শাখাকে জড় সূর্য্যোপাসকরূপে জগতের সমীপে উপস্থিত করা হয়। উপনিষদাদিতে যে উচ্চ একেশ্বরবাদের তত্ত্ব প্রকাশিত আছে এবং যাহা বাস্তবিক হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের কারণ, তাহারও অমর্য্যাদা এবং অন্যথা করা হয়। জড়োপাসক নামে বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজ কথনই পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন না। এজন্য সবিতা শব্দের প্রকৃষ্ট অর্থই গ্রহণ করা উচিত ও তাহাই গৌরবাত্মক। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সময়। এখন জন্ম মরণের অধীন, এবং সচরাচর মানবে যে সকল দোষ ও দুর্ব্বলতা দৃষ্ট হয়, সেরূপ দুর্ব্বল ও দোষাক্রান্ত মনুষ্য বিশেষকেও যখন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সাহায্যে ঈশ্বরের অবতাররূপে গ্রহণ করা হইতেছে, তখন গায়ত্রী মন্ত্রের ন্যায় একটী মন্ত্রের গৌরবকর প্রকৃষ্ট অর্থই গ্রহণ করা উচিত।

বাস্তবিক গায়ত্রী মন্ত্রের দুই প্রকার অর্থই প্রচলিত আছে। বেদের ব্যাখ্যাকারক খ্যাতনামা সায়নাচার্য্য ও সবিতা শব্দে সূর্য্য ও পরমেশ্বর দুই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা নিম্নে গায়ত্রী মন্ত্রের কয়েক প্রকার অর্থ উদ্ধৃত করিতেছি। হিন্দুসমাজ হইতে প্রকাশিত এবং বহুজন প্রশংসিত হিন্দু-পত্রিকা গায়ত্রী মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রথমে তাহাই উদ্ধৃত করা গেল। হিন্দু-পত্রিকার গত আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের সংখ্যায় গায়ত্রীর তিন প্রকার অর্থ করা হইয়াছে; যথা—অন্বয়:—তস্য সবিতুঃ* দেবস্য বরেণ্যং ভর্গো* ধীমহি। তস্য কস্য? যো সবিতা নঃ ধিয়ো প্রচোদয়াৎ।

যথার্থ! যে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম সৎকার্য্যানুষ্ঠানের জন্য আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন, আমরা সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সর্ব্বত্তম পূজনীয় পাপনাশকারী তেজ ধ্যান করি।

অর্থান্তর,—সবিতু দেবস্য তৎবরেণ্যং ভর্গো ধ্যায়ামঃ যশ্চ নো ধিয়ো প্রচোদয়াৎ। অর্থাৎ সাবিতাদেবের সেই বরেণ্য ভর্গ ধ্যান করি। যিনিই আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করিয়া থাকেন।

অর্থান্তর,—সবিতু দেবস্য তৎ বরণ্যেং ভর্গো ধীমহি যো (যৎ) ভর্গো নো বুদ্ধীঃ প্রেরয়তি। অর্থাৎ সবিতা দেবের সেই বরেণ্য ভর্গ ধ্যানকরি যে ভর্গ আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়া থাকে।

আদি সমাজ কর্ত্তৃক প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে এই গায়ত্রীর অর্থ এইরূপ করা হইয়াছে। "সেই জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে "তৎসবিতুঃ" শব্দের অর্থ এইরূপ করা হইয়াছে; তস্য সবিতুঃ জগৎ প্রসবিতুঃ প্রেরকস্য সর্ব্বকামানাম্ বিজ্ঞানানন্দস্বভাবস্য অন্তর্যামিনো ব্রহ্মণঃ, এবং ভর্গঃ শব্দের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে "ভর্গঃ" ভর্গঃ তেজঃ জ্ঞানং শক্তিঞ্চ।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়-কৃত ঋক্‌বেদের অনুবাদে গায়ত্রী মন্ত্রের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে,—"যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই সবিতা দেবের সেই বরণীয় তেজঃ ধ্যান করি।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সেই অতি প্রাচীনকালেও এদেশীয় ব্রাহ্মণগণ জগৎপ্রসবিতা পরমেশ্বরের বরণীয়

* সবিতুঃ সর্ব্বান্তর্যামিনো বিজ্ঞানানন্দ স্বভাবস্য ব্রহ্মণঃ, সর্ব্বান্তর্যামী বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব ব্রহ্মের। * সর্ব্বপাপানাং ভর্জ্জন সমর্থং তেজঃ—সকল পাপ নাশকারী তেজ।

তেজের (জ্ঞান ও শক্তি) ধ্যান করিতে সমর্থ ছিলেন। অষ্টম বর্ষের ব্রাহ্মণ-শিশুর পক্ষেও এরূপ ধ্যানপরায়ণ হওয়া সম্ভবপর এবং সহজসাধ্য ছিল। কারণ ব্রাহ্মণ-বালকের অষ্টমবর্ষে উপনীত হইবার বিধি দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণের পক্ষে সন্ধ্যাবন্দনা ও গায়ত্রী মন্ত্র জপ নিত্য ক্রিয়ার মধ্যে পরিগণিত। সন্ধ্যা বন্দনা করেন না, এরূপ ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব পূর্ব্বে ছিল না। সন্ধ্যাবন্দনাহীন ব্রাহ্মণের ভীষণ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। সুতরাং উপনীত প্রত্যেক বালককেই সন্ধ্যাবন্দনা এবং গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতে হইত। এখন জিজ্ঞাস্য এই তেজের (জ্ঞান ও শক্তির) ধ্যান করা যদি অষ্টম বর্ষের বালকের পক্ষেও সহজসাধ্য ছিল, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ের জ্ঞানোন্নত আর্য্যবংশধরগণ কেন সেই উচ্চ অধিকার হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন? যদি বর্ত্তমান আর্য্যগণ গায়ত্রী মন্ত্রকে জড়সূর্য্যের উপাসনার উদ্বোধন স্বরূপ মনে করিয়া সম্মানিত হইবার প্রয়াসী হইতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলেও "বরণীয় তেজের ধ্যান করি" ইহাদ্বারাও কোন আকৃতি বিশিষ্ট পদার্থের ধ্যান করি, এমন প্রতিপন্ন হয় না; কারণ তেজের কোনই আকার নাই। সুতরাং আকারহীন তেজের ধ্যান কিরূপে সম্ভবে। তবে কি এই অতি প্রসিদ্ধ মন্ত্রটীর কোনই সার্থকতা নাই। কতকগুলি কথা উচ্চারণ মাত্র কি ইহার উদ্দেশ্য? কেহই এমন অশ্রদ্ধেয় কথায় আস্থাবান হইবেন না। তবে নিরাকার বস্তুর ধ্যান হয় না, এ কথাটা কি একমাত্র গায়ের জোরে বিপক্ষ দমনের জন্যই উক্ত হয়? যাঁহারা আপনাদের দৈনিক অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্ম্ম-সাধনকে পরনিগ্রহের জন্য এরূপ হীনতাতে পরিণত করিতে ইচ্ছুক হন এবং কোন্ কার্য্য গৌরবকর, কোন্ কার্য্য অগৌরবকর তাহার অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগের আরোপিত যুক্তির সারবত্তা যে কত তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে।

এমন সময় ছিল যখন এদেশের আর্য্যগণ পরমেশ্বরের জ্ঞান ও শক্তির ধ্যান করিতে সক্ষম ছিলেন, অর্থাৎ নিরাকার পদার্থের ধ্যান করিতে পারিতেন; তাঁহার বরণীয় পরিত্রাণপ্রদ তেজের ধ্যান দ্বারা তাঁহারা মুক্তিলাভ করিতেন এবং তেজস্বী হইতেন। এখন সেই উন্নত এবং গৌরবাত্মক অবস্থা হইতে বিচ্যুত হওয়াই গৌরবের কারণ হইয়াছে। যাহা শোচনীয় তাহাই গৌরব ও উল্লাসের কারণে পরিণত হইয়াছে। সকল দেশেই লোকে প্রাচীনতার পক্ষপাতী, যাহা কিছু ভাল তাহা পূর্ব্বে ছিল; বর্ত্তমানের সকলই মন্দ। স্বর্ণযুগ বা সত্যযুগ পূর্ব্বে ছিল, এই বিশ্বাস অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশেও প্রচলিত। অথচ পূর্ব্বকালে যে মুনি ঋষিগণ আধ্যাত্মিকতা ও নিরাকার একেশ্বরবাদের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধর নামে আখ্যাত যাঁহারা, তাঁহারাই আবার সাকার-বাদের সমর্থন দ্বারা তাঁহাদের সেই উজ্জ্বল প্রতিভা এবং মহত্বের হানি করিতেছেন! নিরাকার ঈশ্বরোপাসনার বিরোধী হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন! ইহা বিস্ময়কর তাহাতে সন্দেহ নাই।

আত্মার এরূপ বিকৃতি কেন?

ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্বতঃ॥" অর্থাৎ অনেক সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ কেহ আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত প্রযত্ন করেন। প্রযত্নকারিগণের অনেক সহস্রের মধ্যে কেহ কেহ আত্ম-জ্ঞান লাভ করেন এবং অনেক সহস্র আত্মজ্ঞানীর মধ্যে কেহ পরমাত্মাকে (আমাকে) স্বরূপতঃ জানিতে পারেন। গীতাকার লোকদিগের যে প্রকার প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশে লোকসমূহের অবস্থার অনুরূপ না হইলেও, সাধারণতঃ মানব-সমাজের অবস্থা উক্ত উক্তির সমর্থন করিয়া থাকে। আমরা সচরাচর আত্মতত্ব এবং পরমার্থ-তত্ব লাভের জন্য অতি অল্প লোককেই ব্যাকুল দেখিতে পাই। শারীরিক প্রয়োজন সাধনের জন্য লোকের যাদৃশ যত্ন আত্মিক প্রয়োজন সাধনের জন্য সেরূপ ব্যাকুলতার নিতান্ত অভাব সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অথচ যে কোন ধর্ম্ম-সমাজের ধর্ম্মশাস্ত্র বা উপদেশাবলী অন্বেষণ কর সর্ব্বত্রই এই আত্মজ্ঞান এবং পরমাত্ম-জ্ঞানলাভের জন্য উত্তেজনা বাক্য পরিলক্ষিত হইবে। ধর্ম্মের প্রয়োজন ঈশ্বরলাভের আত্যন্তিক আবশ্যকতা সেই সকল উপদেশ বা সদুক্তি সমূহের সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইবে। কোন ধর্ম্মশাস্ত্র বা উপদেষ্টার বাক্য তাহার বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নাই। শৈশবকাল হইতে মানবগণ এই প্রকার শিক্ষা ও উপদেশ পাইয়াও কেন ধর্ম্মতত্ব, আত্মতত্ব ও পরমাত্ম-তত্ব জানিতে এমন উদাসীন? বাক্যে অনেক সময়ে ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলতা প্রদর্শিত হইলেও কার্য্যকালে তাহার অন্যথা কেন পরিলক্ষিত হয়? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া এদেশীয় ধর্ম্মতত্ববিদ্গণ সর্ব্বাগ্রে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের প্রতিই সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। পূর্ব্ব-জন্মে যিনি যেরূপ কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছেন, এই জন্মে তদনু-রূপ ফলই ফলিতেছে। কিন্তু গীতাতেই আবার অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"
ইত্যাদি

অর্থাৎ ইনি (আত্মা) কখনও জন্মধারণ করেন না অথবা অন্যান্য জাত বস্তুর ন্যায় উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমানও থাকেন না। জন্ম রহিত নিত্য (হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য) শাশ্বত (অপক্ষয় শূন্য) এবং পুরাণ। শরীরের বিনাশ হইলেও ইনি হত হন না। হে পার্থ যিনি ইহাকে অজ, অব্যয় (ক্ষয় শূন্য) নিত্য এবং অবিনাশী বলিয়া জানেন, তিনি কিরূপে কাহাকে হনন করান কাহাকেই বা হনন করেন। যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর ধারণ করে।

আত্মা যদি এইরূপই প্রকৃতি বিশিষ্ট হন যে, তাঁহার জন্ম মৃত্যু, হ্রাস, বৃদ্ধি প্রভৃতি কিছুই নাই, তাহা হইলে পূর্ব্বজন্মের বা পরজন্মের কথাটার কোনই অর্থ থাকে না; অথচ পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মের কথার উপর এদেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিত্তি অনেক পরিমাণে অবস্থিত। তাহা হইলে মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নবীন বস্ত্র গ্রহণ করে, অজ ও অমর আত্মার পক্ষে সেই বাস পরিবর্ত্তন রূপ দেহধারণ ও পরিত্যাগ ক্রিয়াকেই জন্ম ও মৃত্যু শব্দে অভিহিত করিতে হয়। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন স্বতঃই উপস্থিত হয়। আত্মা অনাদি অজ, অমর; অক্ষয় অব্যয় প্রভৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া কেন এই শরীররূপ বস্ত্র গ্রহণ করেন। তিনি কি স্বীয় ইচ্ছায় এই বন্ধন মধ্যে আগমন করেন অথবা ইহাতে আর কোন ইচ্ছা বর্ত্তমান আছে। আত্মার যেরূপ প্রকৃতি উপরে বর্ণিত হইয়াছে তাহা সত্য হইলে, আত্মার এপ্রকার প্রবৃত্তির উদয় হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই থাকে না।

যে আত্মা অনাদি, নিত্য ও হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য তাহার এই প্রকার ইচ্ছার উদ্রেক হইবার সম্ভাবনা কি? এবং যে আত্মা এরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট তাহার পক্ষে শরীরাশ্রয় করিয়া এরূপ মোহাভিভূত হইবারই বা সম্ভাবনা কি? এবং তাহার শরীরাশ্রয়ের প্রয়োজনই বা কি? এই সকল প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। আত্মার শরীরাশ্রয়রূপ ব্যাপারে তাহার ইচ্ছাই একমাত্র কারণ কি না, তাহাও একটি বিশেষ জিজ্ঞাস্য। এই সকল প্রশ্নের উত্তর যাহাই হউক, তাহার নূতন বস্ত্র গ্রহণ রূপ জন্মের পর হইতেই যে সে বর্ত্তমান প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়াছে এ মীমাংসায় বোধহয় কাহারও সন্দেহ নাই। এরূপ দুরবস্থাপন্ন হইবার ইচ্ছা তাহাতে পূর্ব্বে ছিল না। হঠাৎ তাহার এরূপ প্রকৃতিরই উদয়ের বা সম্ভাবনা কি? সাধ করিয়া কে আপনার স্বাধীনতা পরিত্যাগ করিয়া এমন দুর্ব্বলতা ও অজ্ঞানতার আশ্রয় লইতে প্রস্তুত হয়? তবে আত্মার কি কেহ স্রষ্টা আছেন? যাঁহার ইচ্ছাতে সে এরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। গীতায় বর্ণিত হইয়াছে যে, অনেক সহস্রের মধ্যে কেহ কেহ আত্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রয়াসী হয়, তাহার আবার অনেক সহস্রের মধ্যে কেহ কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহারও অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি পরমাত্মার জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। যদি দেখা যাইত সহস্রের মধ্যে ২।১ ব্যক্তি এরূপ যে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল নয়, তদ্‌বাদে অন্যান্যেরা আত্মজ্ঞান ও পরমাত্মজ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল, তাহা হইলে ইহাকে প্রকৃতির ব্যতিক্রম মনে করা যাইত হইত। এরূপ হইবার হেতুরূপে সেই ব্যক্তিকেই দায়ী মনে হইত। কিন্তু এখানে তাহা অনুমান করিবার কোন সুবিধা নাই। এখানে সহজেই মনে হয় যে তাহার স্রষ্টা হইতেই সে এরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাঁহারই বশীভূত হইয়া সে মোহাভিভূত হইয়া সংসারে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে, কেবলই দুর্গতির পর দুর্গতি ভোগ করিতেছে। কিন্তু তাহাও ত সম্ভবে না। কারণ চিরমঙ্গলময় যিনি, চিরপুণ্যময় যিনি তাহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া, তাঁহা হইতেই যে আত্মা এরূপ হীনপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে—এরূপ অশিবপ্রকৃতি লাভ করিয়া জন্ম গ্রহণ করিবে তাহাও ত মনে হয় না। তিনি আত্মাকে এরূপ মলিন প্রকৃতি দিয়া যে পাঠাইয়াছেন, তাহা কিছুতেই প্রত্যয় হয় না। তবে কি সে পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলেই এরূপ দুর্দ্দশাভোগ করে? তাহাতেও মন প্রবোধ পায় না; কারণ এই জন্মে যদি পূর্ব্বজন্মের ফলভোগ করিতেছে, তবে সেই পূর্ব্বজন্মে কাহার দোষে সে দুষ্কৃতপরায়ণ হইয়াছিল? তাহাও যদি পূর্ব্বজন্মের দোষে ঘটিয়া থাকে, তবে সেই জন্মেই বা কেন সে দুষ্ক্রিয়াশীল হইয়াছিল? এইরূপে চলিয়া যাইতে যাইতে এমন এক স্থানে যাইতে হইবে, সেখানে আত্মার নবীন বস্ত্রগ্রহণ-রূপ শরীরধারণ ক্রিয়ার আদিতে যাইয়া উপস্থিত হইতে হয়। সেই প্রথম জন্মে সে কোন্ কারণে এরূপ দুষ্কৃতিপরায়ণ হইয়াছিল? যে দুষ্কর্ম্মের জন্য তাহাকে এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে। নববস্ত্রধারণরূপ শরীরগ্রহণক্রিয়াও যে অনাদি তাহার কোন উপযুক্ত প্রমাণ নাই। বরং পৃথিবীর সৃষ্টিপ্রকরণ দেখিলে আত্মার মানবদেহ-ধারণ ক্রিয়া যে খুব দীর্ঘকালের নহে, তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং এস্থানে কারণান্তরের কল্পনা করিতে হয়। যদি মানবাত্মার বর্ত্তমান প্রকৃতি যাহা লোক-চক্ষুর গোচর হইতেছে এবং গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছাপ্রসূত না হয়, এবং যদি তাহা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলেও না ঘটে; তবে এরূপ প্রকৃতির উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? খৃষ্টান ও মুসলমানগণ এরূপ স্থলে সয়তান নামক পরাক্রান্ত জীব বা অপর কিছুর শরণ লইয়াছেন এবং হিন্দুশাস্ত্রে তৎপরিবর্ত্তে মায়ার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। কিন্তু সয়তান বা মায়া তাহাই বা কোথা হইতে আসল? তাহা কি সৃষ্টিকর্ত্তার সমকক্ষ আর কোন স্বতন্ত্র শক্তি বা অপর কিছু যাহা স্বতঃই আছে? কিম্বা সৃষ্টিকর্ত্তাই তাহাদেরও সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এরূপ প্রবলশক্তির সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য মানবাত্মাকে এরূপ দুর্ব্বল ও অজ্ঞান করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহা হইলেও তাঁহাতেই দোষ বর্ত্তে। কিন্তু এরূপ প্রবলের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য এরূপ দুর্ব্বলের সৃষ্টি করা ত জ্ঞানময়, প্রেমময়ের প্রকৃতির অনুরূপ নহে। আর যদি তাহারা স্বতঃই অনাদিকাল হইতে আছে এমন হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর ভিন্ন তৎপ্রতিযোগী বিরুদ্ধাচারী দ্বিতীয় সত্তার কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু অনন্ত শক্তিশালী পরমেশ্বরের এরূপ প্রতিযোগী শক্তির অস্তিত্ব মানিলে, তাঁহার অনন্ত শক্তির অনন্তত্ব আর থাকে না। সুতরাং এরূপ কারণ অনুমান করিলেও নিরুপদ্রব হওয়া যায় না। তবে কেন মানবের এরূপ প্রকৃতিলাভ হইল? এই প্রশ্নের উত্তর আর কিছু হওয়াই সম্ভব।

এই প্রশ্নের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে মানবাত্মার স্বাধীনতার কথা মনে হয়। আত্মার স্বাধীনভাব বর্ত্তমান আছে দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার হিতাহিত বোধ আছে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার সুবিধা এবং শক্তি

আছে এবং ভাল মন্দ সকল পথেই যাইবার সুযোগ ও সুবিধা আছে। ঈশ্বর যে মানবাত্মাকে বৃক্ষাদির ন্যায় নির্দ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ রাখেন নাই এবং একমাত্র অন্ধভাবে আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করিবার অবস্থায় ফেলেন নাই, তাহার প্রমাণ যথেষ্টই পাওয়া যায়। সংগ্রাম করিয়া, যত্নপরায়ণ হইয়া সে আপনার গন্তব্যপথে চলিবে, উন্নতি লাভ করিয়া আত্মপ্রসাদ প্রাপ্ত হইবে, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা হইতেই আত্মার স্বাধীনতার সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই স্বাধীনতাই আত্মার অশেষ কল্যাণলাভের হেতু। তুমি যদি ইচ্ছা করিয়া সুপথে না চল, আত্ম-বিকাশের পথ প্রশস্ত না কর, তোমার দুঃখ দারিদ্র্যই বৃদ্ধি হইবে; যন্ত্রণার পর যন্ত্রণা, অনুতাপের পর অনুতাপই ভোগ করিতে হইবে। আর যদি সুপথে চল, সঙ্গে সঙ্গে শান্তি ও আরাম পাইবে এবং আত্মজ্ঞান ও পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। ধর্ম্মসাধনের অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার তোমার জন্য নির্দ্ধারিত আছে। তুমি সে জন্য লালায়িত হইও না, হওয়া উচিতও নয়; নিষ্কাম হইয়াই তোমার ধর্ম্ম-সাধন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু পুরস্কার তোমার জন্য আছেই, সৌভাগ্য তোমার জন্য নির্দ্ধারিতই আছে। এরূপ অবস্থাতেও যে মানব সুপথে না চলিয়া বিপথগামী হয়, তাহার জন্য অপরে দায়ী নহে, তাহার জন্য সে নিজেই দায়ী।

ধর্ম্মে বীতরাগ হইবার পক্ষে আর একটী কথা মনে উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা এই যে ধর্ম্ম সাধনও একমাত্র আত্ম-কল্যাণ-সাধনের জন্য নিষ্কাম ভাবে না হইয়া গৌরব ও মর্য্যাদা লাভের উপায় স্বরূপ হইয়াছে। ইহা যদি অন্নপান গ্রহণের ন্যায় স্বাভাবিক থাকিত, অন্নপান গ্রহণে যেমন লোকে কোনরূপ সুখ্যাতি বা গৌরবলাভের আশা করে না, কিন্তু না করিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই করে, যদি তেমনি স্বাভাবিক ভাবেই ধর্ম্মসাধন করিত, তাহা হইলে বোধ হয় সাধন ভজনের পথে এত আড়ম্বর আসিত না। সচরাচর লোকে যে বৈরাগ্য অবলম্বন করে তাহাতেও যেন একটা বাহাদুরি লইবার ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে। কে কত কঠোর সাধনা করিতে পারে, কে কত শারীরিক নিগ্রহ সহ্য করিতে পারে, তাহার চূড়ান্ত করিবার জন্য যেন একটা জেদ উপস্থিত হয়। কোনরূপ প্রশংসালাভের সম্ভাবনা না থাকিলে এরূপ কঠোরতা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় না। দারুণ শীতের সময় অনাবৃত দেহে থাকা এবং জলনিমগ্ন হওয়া বা প্রচণ্ড সূর্য্যোত্তাপের মধ্যে অগ্নিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করা, প্রখর-রশ্মি সূর্য্যের দিকে অনিমেষে তাকাইয়া থাকা, গৃহ-পরিজন পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলবাসী হওয়া, অনাহারে অনিদ্রায় দিনের পর দিন যাপন করা প্রভৃতি ধর্ম্মসাধনের যে সকল প্রক্রিয়া নানা দেশে নানা আকারে বর্ত্তমান আছে, যাহা দেখিয়া সহজেই লোকের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয় যে, ধর্ম্মসাধন করিতে হইলেই বুঝি এরূপ ভীষণ কষ্টকর অবস্থার আশ্রয় লইতে হয়। অনেক সময় অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা বা বাহাদুরী লইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় মানুষ এপ্রকার কঠোর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সরল পিপাসা বা নিষ্কাম ধর্ম্মসাধন কখনই এরূপ আড়ম্বরপূর্ণ ও লোক ভীতির উদ্রেককারী-সাধনপ্রণালীর উদ্ভাবনে উৎসাহিত করে না। তাহা বরং গোপনীয় হইতে গোপনীয়ভাবে আত্মার নিভৃত প্রদেশেই পরমাত্মার জন্য ব্যাকুলতার সৃষ্টি করে এবং ফল্গুনদীর অদৃশ্য স্রোতের ন্যায় অন্তরেই প্রবাহিত হইতে থাকে।

কঠোর সাধনার্থীদিগের দৃষ্টান্ত লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিকাশের আনুকূল্য না করিয়া বরং ভীতির সঞ্চার করিয়াছে এবং ধর্ম্মভাব বিকাশের অন্তরায় হইয়াছে। লোকে দূর হইতে এরূপ ধর্ম্মসাধনের প্রশংসা করিতে পারে, কিন্তু সকলের পক্ষে তাহাতে নিযুক্ত হইবার প্রবৃত্তির উদয়ের কোনই সম্ভাবনা নাই। বরং ইহাই লোকের মনে সহজে উদিত হয় যে, ধর্ম্ম বুঝি সকলের জন্য নয়। কারণ সেরূপ কঠোরতা অবলম্বন করিবার আকাঙ্ক্ষা সহজে কাহারও হয় না, তাহার পরিবর্ত্তে ওকাজ আমার নয় বলিয়া তাহাতে প্রবৃত্তির অভাবই জন্মিয়া থাকে। বহুকাল হইতে মানব-সমাজে ধর্ম্মসাধনের নামে যে সকল ভীষণ কঠোরতার সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে, তাহা সাধারণ জনসমাজে ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্তির উদ্রেকের সহায়তা না করিয়া বরং তাহাতে বাধাই জন্মাইতেছে। ধর্ম্মসাধন যে সহজ ও অন্নজল গ্রহণের ন্যায় সকলের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এবং সুখসাধ্য; সে জ্ঞান যতদিন মানব অন্তরে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ না হইবে, ততদিন সমাজের এই বিকৃত ছবিই দেখিতে হইবে। ধর্ম্মসাধন সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত সংগ্রাম নয় বা একটা বিশেষ প্রহেলিকাপূর্ণ রহস্যের মধ্যেও নিহিত নয়। ইহা অতি উপাদেয় এবং বিধাতার পরমোৎকৃষ্ট দান। পরিবার পরিজন পরিত্যাগ করিয়া বিধাতা-প্রদত্ত সদ্বৃত্তিগুলি বিনাশ করিয়া, তাঁহার প্রদত্ত দানের অপব্যবহার নয়, কিন্তু তাহার সদ্ব্যবহার। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই স্বাভাবিক সহজসাধ্য ধর্ম্মেরই পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিতেছেন এবং তাহাই ইহার লক্ষ্য। অস্বাভাবিক ভীতির উদ্রেককারী কঠোর বৈরাগ্য কখনই ব্রাহ্মধর্ম্মের অভিপ্রেত নয়। ধর্ম্ম-সাধনকে লোকের ভীতির কারণ না করিয়া প্রলোভনের ব্যাপার করিতে পারিলেই, লোকে আকুল প্রাণে ধর্ম্মের অনুসরণ করিবে এবং ধর্ম্মের শোভন ছবি অনুভব করিয়া ইহাতেই প্রবৃত্ত থাকিবে।

তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।

(২৫এ নবেম্বর, রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।)

উপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ে, ও ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যত উপদেশ আছে, তন্মধ্যে "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জান, ইহা একটী অতি উত্তম উপদেশ। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে এই উপদেশটী একটু বিস্ময়কর। "তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জান"—উপনিষদকার ঋষিগণ কেন

এরূপ কথা বলিলেন ? যদি বলিতেন, "উপযুক্ত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁর উপদেশ লইয়া ব্রহ্মকে জান"—যদি বলিতেন, "উপযুক্ত বিচার দ্বারা ঈশ্বরকে জান," তাহা হইলে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু থাকিত না। কিন্তু "জীবন দ্বারা ঈশ্বরকে জান" ইহা কেন বলিলেন ? এই যে জীবন দ্বারা ঈশ্বরকে জানা, ইহাতে একটী নিগূঢ় তাৎপর্য্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ আমাদের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই যে, মানুষের নিজের অন্তরে যে গুণ নাই তাহা যে অপরের অন্তরে আছে সে তাহা বুঝিতেও পারে না। এদেশে একটী প্রচলিত কথা আছে, "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে"। তোমার ভিতরে যাহা নাই, ব্রহ্মাণ্ডময় খুঁজিয়া তাহা পাইবে না। সংস্কৃতে একটী চলিত বাক্য আছে "গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণী" তোমার অন্তঃকরণে যদি দয়া থাকে, তবে অপরের দয়া কিরূপ তাহা বুঝিতে পারিবে। তোমার হৃদয়ে যদি প্রেম থাকে তবে প্রেম কি জিনিস তাহা বুঝিতে পারিবে, নতুবা পারিবে না। এইরূপ তোমার প্রাণ যদি ন্যায়পরতার অগ্নিতে উদ্দীপ্ত হয়, তবে অন্যের হৃদয়ে ন্যায়পরতার আগুন কিরূপ জ্বলে, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে। হৃদয়ে সাধুতা থাকিলে জগতের সকল সাধু মহাজনদিগকে চিনিতে পারিবে। এখন ভাবিয়া দেখ, তুমি ঈশ্বরকে সত্যস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, ন্যায়বান বলিয়া কিরূপে অনুভব করিবে; যদি তোমাতে সত্য, প্রেম এবং ন্যায়পরায়ণতা না থাকে ? তুমি আগে সত্যবান ও প্রেমিক হও, তবে ঈশ্বরকে সত্যস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারিবে। প্রকৃত জীবন না থাকিলে ঈশ্বরকে জানা যায় না। একমাত্র জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে জানা জানাই নয়। প্রকৃত জীবন না থাকিলে দেখিতে পাই শুধু জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় না। বহু বচন কিম্বা বহু শাস্ত্রপাঠাদি দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় না। প্রকৃত ভক্ত বলেন,—"হে প্রভো! তুমি যে ন্যায়কারী ভগবান, তাহা আমাদের ন্যায়পরতা দ্বারা জানিতে পারি।" এইরূপ যীশুও প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"Forgive us our trespasses as we forgive those that trespass against us" আমার ক্ষমা দ্বারা, প্রেমদ্বারা তাঁহার ক্ষমাগুণ ও প্রেম ধারণা করিতে পারি। তুমি যদি সত্যেতে, প্রেমেতে হীন হও, ক্ষুদ্রচেতা, অন্যায়কারী, হও তবে কি প্রকারে তুমি শুধু জ্ঞানদ্বারা ঈশ্বরকে ধরিবে ? যে পরিমাণে আমরা সত্যপরায়ণ ও ধার্ম্মিক হইব সেই পরিমাণে ঈশ্বরকে জানিতে পারিব। "তপসা ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসস্ব" বুদ্ধি দ্বারা নয়, ঈশ্বরকে জীবন দ্বারা, তপস্যার দ্বারা জানিতে চেষ্টা কর।

দ্বিতীয়তঃ জীবন দ্বারা যাহা না ধরা যায় তাহার গভীরতা বুঝিতে আমরা সক্ষম হই না। প্রকৃত ধর্ম্মজীবন দ্বারা যতক্ষণ আমরা ঈশ্বরকে উপলব্ধি না করি ততক্ষণ তাঁহাকে ধারণা করিতে সক্ষম হই না। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, একখণ্ড প্রস্তর পড়িয়া রহিয়াছে, তিনজন লোক দূর হইতে তৎসম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছে। একজন বলিতেছে এটা ১০ সের; অপর এক ব্যক্তি বলিতেছে "না হে ১৫ সের।" তৃতীয় ব্যক্তি বলিল "না ২০ সের হইবে!" কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহারা সেই প্রস্তরখণ্ড নিজ হাতে তুলিবার চেষ্টা না করিবে, সে পর্য্যন্ত তাহা কত ভারি তাহার কিছুই জানিতে পারিবে না। সেইরূপ যতক্ষণ আমরা কেবলমাত্র দূর হইতে সত্যের বিচার করি, জীবনে তাহা সাধন করিতে সচেষ্ট না হই, ততক্ষণ তার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারি না। জীবনে সাধন করিতে চেষ্টা কর, বুঝিতে পারিবে।

মানুষ সত্যকে দুই ভাবে দেখিতে পারে। প্রথম—যেরূপ চিত্রশালিকাতে (Art gallery) নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর ছবি রহিয়াছে; আমরা দূরে দাঁড়াইয়া সেই সকল দেখি এবং বলি, "বাঃ, বেশ সুন্দর ছবি;" কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের জীবনের, বা চরিত্রের যে কোনও সম্বন্ধ আছে, তাহা বোধ হয় না। শুধু সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার চরিতার্থতা ছাড়া আর কিছুই হয় না। এইরূপ সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার চরিতার্থতার ভাবে অনেকে সত্যকে দেখিয়া থাকেন। বাঃ বুদ্ধের কেমন বৈরাগ্য; বাঃ চৈতন্যের কেমন প্রেম; বাঃ, যীশুর কেমন বিশ্বাস! এইরূপ একটু চমৎকারিত্ব ভাব, তৎপরেই শেষ। চিত্রশালিকার ছবি যে ভাবে দেখ, হে মানব! সত্যকেও কি সেই ভাবে দেখিবে ? কাণে শুনিয়া, চক্ষে দেখিয়াই কি শেষ হইবে ? না জীবনে পরীক্ষা করিয়া দেখিবারও কিছু আছে ?

দ্বিতীয়তঃ, নিলাম ঘরে গিয়া লোকে যে ভাবে জিনিসপত্র দেখে, সেই ভাবে অনেকে সত্যকেও দেখিয়া থাকেন। অর্থাৎ তদ্দ্বারা সংসারের কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইবে তাহাই গণনা করেন। এইরূপ স্বার্থসাধনের চক্ষে সত্যকে দেখিলে অপরাধ হয়। তবে সত্যকে কি ভাবে ধরিব, কিরূপে দেখিব ? খাঁচাতে বদ্ধ পাখী যেরূপ আকাশের দিকে চায়—ঐখানেই তাহার বাস ও জীবনধারণ; ঐখানেই তাহার বিহারের স্থান। তেমনি হে মানব! সত্যকে কি "ঐখানেই আমার বাস, ঐখানেই আমার জীবন" এই ভাবে দেখিবে না ? যদি এই ভাবে দেখিতে না পার তবে সত্যকে অপমান করা হইবে, ঈশ্বরকে অপমান করা হইবে। যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছি, ধরিয়াছি, তাহা অপর ১০ জনে পালন করুক বা না করুক আমি তাহা জীবন বিনিময়ে পালন করিব; যাহাকে সত্য বলিয়া ধরিব তাহাতেই আমার জীবন, তাহাতেই আমার বাস। উৎকৃষ্ট উপদেশ শুনিয়া কেহ যদি শুধু বলে, বাঃ বেশ উপদেশ হয়েছে, তাহাতে কিছুই হইল না; সেই অনুযায়ী জীবনকে গঠন করা চাই। সত্যকে "ইহাতেই আমার জীবন, ইহাতেই আমার বাস," এই ভাবে ধরা চাই, তাহা না হইলে কিছুই হইবে না। "তপসা ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসস্ব" ঋষিরা বলিয়াছেন "জীবন দ্বারা ব্রহ্মকে জান।" তপস্যার অর্থ ঈশ্বরে আসক্তি এবং বিষয়ে অনাসক্তি ও আত্মনিগ্রহ। সকলের মূলেই এই তিনটী। বিজ্ঞানের মূলেও এই তিনটীই রহিয়াছে। নিউটন গ্যালিলিও প্রভৃতি কেহই এই তিনটী ছাড়া কিছু করিতে পারেন নাই। এই তিনটী দৃঢ় করিয়া ধর, ঈশ্বরকে জানিতে পারিবে।

ঈশ্বরকে জানিতে গেলে তপস্যা দ্বারা জীবন দ্বারা জান।

প্রত্যেক ব্রাহ্ম পরিবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও "ধর্ম্মকে জীবনে পরিণত করিব"। সত্যকে কোন কালে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার দিক দিয়া, স্বার্থসাধনের দিক দিয়া দেখিবে না। মাছের পক্ষে যেমন জল, পাখীর পক্ষে যেমন আকাশ, সেইরূপ আমাদের পক্ষে সত্য হউক; তাতে জীবন, তাতেই আমাদের বাস হউক। ঈশ্বর করুণা করুন আমরা যেন তপস্যা দ্বারা, প্রকৃত জীবন দ্বারা তাঁহাকে জানি।

(শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী সেনের প্রচার ব্রত গ্রহণ উপলক্ষে শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশের সারাংশ।)

শ্রীমান্ কুঞ্জবিহারি!

তোমাকে পরমেশ্বর শুভ ইচ্ছা দিয়াছেন; তুমি তাঁহারই আদেশে এই ব্রত গ্রহণ করিতেছ। তিনি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। তুমি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারব্রত গ্রহণ কর। তোমার প্রচারে সকল লোক আকৃষ্ট হউক। ইহাই আমার আশীর্ব্বাদ।

তুমি লোককে বুঝাইবে যে জগতেই তাঁহার প্রকাশ রহিয়াছে। এই জগতে তাঁহার কত কৌশল রহিয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। এই জগতই তাঁহার মন্দির। "জগত মন্দিরে বিরাজেন স্বপ্রকাশ।" তুমি এই সকল কৌশল দেখাইয়া সহজেই তাঁহার বিষয় বুঝাইয়া দিতে পারিবে। এই বিশ্বই আশ্চর্য্য গ্রন্থ। উপরে ঐ আকাশ, আর এই নানা বিচিত্রতা পরিপূর্ণ পৃথিবী। এই জগৎ পাঠ করিলেই তাঁহাকে জানিতে পারিবে। তিনি জগতের মধ্যেই রহিয়াছেন; তাঁহাকে খুঁজিতে বাহিরে যাইতে হইবে না। তিনি এই জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কিন্তু তিনি কেবল জগতে আছেন তাহা নহে; তিনি সকলের আত্মাতে এবং হৃদয়েতেও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি যেমন সর্ব্বব্যাপীরূপে জগতে বিরাজ করিতেছেন সেইরূপ সর্ব্বান্তর্যামী রূপে সকলের আত্মাতে রহিয়াছেন। এই আমাদের কাছে যেমন তিনি আছেন তেমনি আমাদের প্রত্যেকের আত্মাতে তিনি রহিয়াছেন। এবং হৃদয়নাথরূপে প্রত্যেকের হৃদয়েতেও তিনি বর্ত্তমান আছেন। তিনি আত্মাতে থাকিয়া বুদ্ধিবৃত্তি জ্ঞান, শিক্ষা, প্রেরণ করিতেছেন এবং হৃদয় স্বামী হইয়া হৃদয়েতেও তিনি আছেন। হৃদয় তাঁহাকেই চায়। যে পর্য্যন্ত তাঁহাকে না পায় সে পর্য্যন্ত অতৃপ্ত থাকে; কিন্তু তাঁহাকে পাইলেই তৃপ্ত হয়। তিনি এই হৃদয়ে বাস করিতেছেন তিনি কোথায় না আছেন? বহির্জগতে, আত্মাতে, হৃদয়ে সর্ব্বস্থানেই তিনি রহিয়াছেন। কিন্তু এই জ্ঞান দ্বারা কেবল তাঁহাকে জানিলে চলিবে না; প্রেম ও ভক্তি দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হইবে। প্রেম ভক্তি বিহীন জ্ঞান শুষ্ক জ্ঞান। একটি গান আছে—

"অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রণমি চরণে তব
প্রেমভক্তি ভরে শরণ লাগি।
দুর্ম্মতি দূর করি শুভমতি দেও হে
এই বর দান ভগবান মাগি"

ভক্তের এই সঙ্গীতটির মধ্যেই সমস্ত ভাব নিহিত রহিয়াছে। তাঁহাকে কেবল শুষ্ক জ্ঞান দ্বারা দেখিলে হইবে না; প্রীতি দ্বারা পূজা করিতে হইবে। পৌত্তলিকগণ যেমন তাহাদের দেবতা প্রস্তুত করেন, ফুল চন্দনাদি দ্বারা তাহার পূজা করিয়া থাকেন, আমাদেরও দেবতাকে ভক্তি দ্বারা পূজা করিতে হইবে। অবশ্য কাহাকেও পুতুল পূজা করিতে বলি না; কেবল দৃষ্টান্তের জন্যই এই কথাটি বলিলাম। আমাদের দেবতা প্রস্তুত করিতে হইবে না। তিনি সকলকে গঠন করিতেছেন তাঁহাকে কেহ গঠন করিতে পারে না। তিনি সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন, তাঁহাকে জগতে আত্মাতে ও হৃদয়ে দেখিয়া প্রেম ও ভক্তি দ্বারা তাঁহার পূজা করাই শ্রেয়ঃ। প্রতিদিনই এইরূপ পূজা করিতে হইবে। যেমন প্রতিদিনই অন্ন গ্রহণ করা আবশ্যক সেইরূপ প্রতিদিনই উপাসনা করা প্রয়োজন। তুমি সকলকে বুঝাইবে যে কোন দিনই যেন উপাসনা বন্ধ না হয়।

এই প্রেম ভক্তি উদ্দীপনা করিবার উপায় কি? মানুষের কত পাপ তাপ রহিয়াছে; কত দুঃখ দারিদ্র্য কত রোগ শোক রহিয়াছে। এই সকল বিপদ হইতে উদ্ধার কে করিতে পারে? তুমি বুঝাইবে যে তিনিই পাপ তাপ রোগ শোক হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। তাহা হইলে কি লোকের মন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইবে না? তিনিই পাপ হইতে পরিত্রাণ করেন; তিনিই সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করেন; তিনিই বিদ্যা, বুদ্ধি সম্পদ সকল প্রেরণ করেন। ইহা জানিতে পারিলে সহজেই লোকে তাঁহাকে প্রেম দান করিবে।

ঈশ্বর মস্তিষ্ক হৃদয় ও হস্ত, পদ প্রদান করিয়াছেন; মস্তিষ্কে জ্ঞান, হৃদয়ে প্রেম ভক্তি ও হস্ত পদে কার্য্য করিবার শক্তি দিয়াছেন। মস্তিষ্ক তাঁহার তত্ত্ব অবগত হউক; হৃদয় প্রেম ভক্তি দ্বারা তাঁহার পূজা করুক এবং হস্ত তাঁহার আজ্ঞা পালন করুক। এইরূপ উপদেশ দ্বারা তুমি একজন লোককেও যদি সৎপথে আনিতে পার, তাহা হইলেও তোমার শ্রম সার্থক মনে করিবে। আর তুমি নিজেও এইরূপ জীবন গঠন করিবে। তুমি জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকেই জানিবে; হৃদয় দ্বারা তাঁহারই পূজা করিবে এবং হস্ত দ্বারা তাঁহারই কার্য্য করিবে। তাহা হইলেই লোকে তোমার কথা শ্রবণ করিবে। দৃষ্টান্ত দ্বারাই লোককে সৎপথে আনা যায়। তুমি আপনার উপর নির্ভর করিবে না। আপনার অহঙ্কার অভিমান একেবারে পরিত্যাগ করিবে। ফলের প্রতি দৃষ্টি করিবে না। তুমি তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার আদেশ মত কার্য্য করিবে। তিনিই ফল দাতা; তুমি কেবল কার্য্য করিবে। তুমি আপনাকে ভুলিয়া যাইয়া কেবল তাঁহার মহিমাই কীর্ত্তন করিবে। তুমি তুল্যনিন্দাস্তুতি হইবে। কাহারও নিন্দা বা প্রশংসা গ্রাহ্য করিবে না। আর যে কিছু পাও তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে। সন্তুষ্টঃ যেন কেনচিৎ ইহাই প্রচারকের ধর্ম্ম। তুমি প্রাণপণে তাঁহার আদেশ পালন করিবে। ফলের প্রতি যেন দৃষ্টি না থাকে। তুমি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হইয়া কার্য্য করিবে। তুমি যদি একটিও লোক না পাও তাহা হইলেও নিরাশ হইবে না। তোমার কর্ত্তব্য তুমি করিবে। ঈশ্বর তোমাকে আদেশ

কহিয়াছেন; তুমি সেই আদেশ পালন করিবে। তাঁহার ইচ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। বন্ধু কিম্বা শত্রু সকলের প্রতিই সমবুদ্ধি হইবে। তাহা হইলেই লোকে তোমার কথায় আকৃষ্ট হইবে। আমার উপদেশ এই।

তুমি ঈশ্বরের দিকে তাকাও তিনিই তোমাকে বুদ্ধি প্রদান করিবেন। সেই বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিবে। যদি একজনও তোমার ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলেই নিজকে ধন্য মনে করিও। তাহা হইলেই জানিবে যে তুমি জগতের মধ্যে অন্ততঃ একজন লোককে ঈশ্বরের দিকে আনয়ন করিয়াছ।

ব্রহ্মকে সাক্ষাৎভাবে জগতে আত্মাতে ও হৃদয়ে জানা তাঁহাকে প্রেম ও ভক্তি দ্বারা পূজা করা এবং তাঁহার আদেশ পালন করাই ধর্ম্ম। প্রেম যেখানে সেখানে প্রদান করিলে উহার সার্থকতা লাভ হয় না। এই প্রেম যেন ঈশ্বরেতেই নিত্য থাকে, অন্যে যেন ইহা লইতে না পারে। যে এই প্রকার জ্ঞান প্রেম ও ধর্ম্ম লাভ করিয়াছে; যে জগতে আত্মাতে ও হৃদয়ে তাঁহাকে জানিয়াছে প্রেম ও ভক্তি দ্বারা তাঁহার পূজা করে তাঁহার আদেশ পালন করে সেই প্রকৃত ব্রাহ্ম। যাহাতে লোক এই সকল লক্ষণাক্রান্ত হয়, তুমি তাহার চেষ্টা কর এবং এই প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কর।

ঈশ্বর তোমাকে এই শুভ বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় উহা আরও উজ্জ্বল হউক। তিনি তোমার হাত ধরিয়া লইয়া যাউন্; তিনি তোমাকে সমস্ত পাপ প্রলোভন, বিঘ্ন বিপদ হইতে রক্ষা করুন।

ব্রতনিষ্ঠা।

(প্রাপ্ত)

বৃত্রাসুর-বধ অবলম্বন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে দেখা যায়, বৃত্রাসুর মহাদেবের বরে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল; এবং আপনার বাহুবলে ও অন্যান্য দৈত্যগণের সাহায্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জয় করিয়া অবশেষে স্বর্গরাজ্য অধিকার করিল। স্বর্গের রাজা ইন্দ্র দৈত্যের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া অন্যান্য দেবগণের সহিত পাতালপুরে যাইয়া আশ্রয় লইলেন! সেখানে দেবগণের দুরবস্থা দেখিয়া এবং আপনার ভুজবলে দৈত্যদমন করা অসম্ভব মনে করিয়া, ইন্দ্র মেরুপ্রদেশে যাইয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, যে পর্য্যন্ত দেব-প্রসাদলাভ না হইবে, যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের নিকট বর প্রাপ্ত না হইবেন, ততক্ষণ আর উঠিবেন না। কিন্তু এদিকে দেবতাগণ আপনাদের শোচনীয় অবস্থায় অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। নানা প্রকার অসার তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন। আপনাদের বল বীর্য্যের অহঙ্কার করিতে লাগিলেন। সংস্কৃতে একটী শ্লোক আছে—

> অগাধজলসঞ্চারী বিকারী নচ রোহিতঃ
>
> গণ্ডূষ জলমাত্রেন সফরি ফর্ফরায়তে।

দেবতাগণের অবস্থাও তাহাই হইল। অমিততেজসম্পন্ন ইন্দ্র দেবপ্রসাদ ব্যতীত দৈত্যগণের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিতে সাহসী হইলেন না। কিন্তু বায়ু বরুণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাগণ আপনাদের বলবীর্য্যে গর্ব্বিত হইয়া স্বর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু গর্ব্ব থাকিলে কি হয়? বল যে সেরূপ নাই; তাই তাঁহারা বার বার পরাজিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে ইন্দ্র যখন তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের বর লাভ করিয়া আসিলেন, তখন তাঁহারই সেনাপতিত্বে দেবগণের জয় হইল। বৃত্রাসুর অন্যান্য অসুরগণের সহিত নিহত হইল।

এই আখ্যায়িকা হইতে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের দুর্ব্বলতার সময় আসিয়াছে, আমাদের দুর্ব্বলতার সময় আসিয়াছে, বলিয়া চীৎকার করিলে কিছু লাভ নাই। যাহাতে আমাদের অভাব মোচন হয়, তজ্জন্য প্রত্যেকের তপস্যায় প্রবৃত্ত হওয়ার আবশ্যক। আমাদের এখন যে শক্তি আছে তাহা চারিদিকের কুসংস্কার, পাপ প্রলোভনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে আমাদের আরও শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে, তপস্যা দ্বারা দেব-আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে হইবে। নতুবা ব্রাহ্মসমাজের আর উপায় নাই। আমরা এ কথা বলিতেছি না যে আমাদের শক্তি অল্প বলিয়া শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। সময়ের স্রোতে যেদিকে লইয়া যায় সেই দিকেই যাইতে হইবে। আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সকলেরই যেন মনে থাকে, যে শক্তি আমাদিগের আছে তাহা লইয়া বর্ত্তমান সভ্যজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা অসম্ভব। আমাদিগকে তপস্যায় নিযুক্ত হইতে হইবে। যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রের ন্যায় কেহ তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া না আসিবে, সে পর্য্যন্ত আমাদের কল্যাণ নাই। আমাদিগকে তপস্যা করিতে হইবে তাহার অর্থ এই নয় যে, সকলকে বিষয়কার্য্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতগুহায় বসিয়া কেবল ধ্যান ধারণাই করিতে হইবে। কিন্তু প্রত্যেককেই ব্রহ্মগত-প্রাণ হইতে হইবে। ভাবিয়া দেখুন আমরা আদর্শ হইতে কত দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আমরা সংসার ও ধর্ম্মকে এক করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম। সংসারকে ধর্ম্মানুগত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের জীবনে কি তাহা দেখাইতে পারিতেছি? ঈশ্বরের জন্য কি সমস্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি? সুখের সময় তাঁহাকে মঙ্গলময় বলি বটে, কিন্তু দুঃখ, বিপদ, শোকতাপের মধ্যেও কি তাঁহার মঙ্গল হস্ত দেখিতে পাই? তাঁহাকে কি প্রাণের প্রাণরূপে জানিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার উপর আমরা নির্ভর করিতেছি? এই সকল বিষয় চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, আমরা ব্রহ্মগতপ্রাণ হইতে পারি নাই। এই ব্রহ্মগতপ্রাণ হইতে হইলেই ব্রহ্মনিষ্ঠার আবশ্যক। আমাদিগকে ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া এই ব্রহ্মব্রত আরম্ভ করিব। যে পর্য্যন্ত সিদ্ধি না হইবে, যে পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিতে না পারিব, যে পর্য্যন্ত প্রাণের ভিতর তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত এই ব্রতের উদ্যাপন নাই। এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞাই তপস্যার প্রথম নিয়ম। তপস্যায়

আর একটী নিয়ম সত্যানুরাগ। যাহার সত্যানুরাগ নাই, তাঁহার সাধনা কখন সিদ্ধ হয় না। এই সত্যানুরাগ দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমাদিগকে নানা শাস্ত্র মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে হইবে। এই চক্ষের সম্মুখে যে বিশ্বগ্রন্থ রহিয়াছে এবং বহিশ্চক্ষুর দুর্গম স্থানে যে বিশাল মনোরাজ্য রহিয়াছে, তাহা যত্নের সহিত পাঠ করিতে হইবে। ব্যাকুল ভাবে সাধু সজ্জনের নিকট যাইয়া ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব সমূহ শিক্ষা করিতে হইবে, এবং সর্ব্বোপরি যিনি অন্তর্দর্শী ভগবান, তাঁহার কাছে কাতরে প্রার্থনা করিতে হইবে। সত্যনিষ্ঠা দ্বারা পরিচালিত হইয়া ব্যাকুল ভাবে যাহা করা যায়, তাহার ভিতর দিয়াই ভগবান সত্য প্রেরণ করেন। তপস্যার আর একটী নিয়ম সাধনে দৃঢ়তা। এই সকল অনুসন্ধান দ্বারা যাহা সত্য বলিয়া মনে ধারণা জন্মিবে, তাহা দৃঢ়তার সহিত পালন করিতে হইবে। এবং যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহাই ভগবানের বিধান, এইরূপ মনে করিতে হইবে। এই প্রকার ব্রতনিষ্ঠার দ্বারা তাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে হইবে। তাঁহার আদর্শ পাইয়া যিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন তিনিই কৃতকার্য্য হইবেন। এইরূপ একটী লোকও যদি ব্রতনিষ্ঠার দ্বারা সিদ্ধ হইয়া, ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া কার্য্য করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলেও তাঁহার সংস্পর্শে অনেক লোক নূতন জীবন প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। কিন্তু আমাদিগকে আর একটী বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে যাঁহারা তপস্যা করিতেন, তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য নানাপ্রকার দৃশ্য আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইত। কখনও নানা প্রকার ভয়ানক আকৃতি, কখনও বা মনোমুগ্ধকর দৃশ্য সকল তাঁহাদের নয়নগোচর হইত। এই সকল দেখিয়া যাঁহারা ভীত বা মুগ্ধ হইতেন, তাঁহাদিগের আর সিদ্ধিলাভ হইত না। আমাদের তপস্যায় ঐরূপ সাকার মূর্ত্তি না আসিতে পারে, কিন্তু উহাতে বিঘ্ন জন্মাইবার জন্য অনেক রকম প্রলোভন আসিবে। সময় সময় সুখস্পৃহা আসিয়া তপস্যার কঠোরতা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইবে। আবার সময় সময় ভাবুকতা আসিয়া বলিবে ব্রহ্মদর্শন আর কি? এই ত তুমি ব্রহ্মকে পাইয়াছ। বাস্তবিক অনেক সময় নিজের ঐকান্তিক ইচ্ছাকে ব্রহ্মের আদেশ বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি। তপস্বীদিগকে সাবধান থাকিতে হইবে যে, যেন কোনরূপ আরামপ্রিয়তা কিম্বা ভাবুকতা আসিয়া কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচলিত না করে। যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ ভাবে ব্রহ্মকে দেখিতে না পাইব ও তাঁহার বাণী স্পষ্টরূপে শুনিতে না পাইব, সে পর্য্যন্ত প্রতিনিবৃত্ত হইব না। এইরূপ ক্রমাগত তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মগতপ্রাণ হইতে হইবে। যে পর্য্যন্ত এই প্রকার ব্রহ্মগতপ্রাণ হইতে না পারিব সে পর্য্যন্ত যে কোন কাজ করিব না তাহা নহে। সকল সময়েই আমাদের শক্তি অনুসারে জগতের হিতের জন্য কার্য্য করিতে থাকিব, কিন্তু যাহাতে আমরা তপস্যা দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারি তৎপ্রতিই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে। আমরা সর্ব্বদাই শিক্ষার্থী থাকিব। সর্ব্বদা মস্তক অবনত করিয়া সকলের নিকট শিক্ষালাভ করিব। বিনয়ই ভক্তিপথের প্রধান সহায়। আর আমরা যতটুকু বুঝি ততটুকু মাত্রই অন্যকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। অনেক সময় এই বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি থাকে না; এবং তাহাতে নিজের ও সমাজের যথেষ্ট অমঙ্গল হয়। আর এই তপস্যা করিতে করিতে যতই সত্যলাভ করিতে থাকিব ততই আমাদের নিজের ও জগতের মঙ্গল হইবে। যাঁহারা তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদের প্রচার করিবার জন্য বেশী প্রয়াস পাইতে হয় নাই। মহর্ষি ঈশা তিন বৎসরের মধ্যে যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহা অন্য লোকে শত বৎসরেও করিতে পারিত না। তাঁহাদের জীবনের এমনই এক মাধুর্য্য দেখা যায় যে, তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিলেই লোকের মন বদলাইয়া যায়; তাঁহাদিগকে আর বেশী বক্তৃতা করিতে হয় না। এই তপস্যা ব্যতীত কোন লোকই সিদ্ধ হইতে পারেন নাই। যিনি যে দিকে উন্নতি করিয়াছেন, তাহার মূলেই তপস্যা। ব্রাহ্মগণের দৃষ্টি যেমন সমাজের অভাবের দিকে পড়িয়াছে, তেমন এই উপায়টির দিকেও পতিত হউক। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এই তপস্যা ও ব্রতনিষ্ঠার উন্নতির একমাত্র সহায়। প্রত্যেকে তপস্যা দ্বারা নিজের জীবনকে নিয়মিত করিতে চেষ্টা না পাইয়া বাহিরে যতই উদ্যোগ কর, সমস্তই বিফল হইবে। আর এই তপস্যার ভাব আমাদের মধ্যে যত প্রবল হইবে, ততই দেখিতে পাইব যে আমাদের ধর্ম্মপ্রাণতা বাড়িতেছে। সুতরাং তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমের ভাব দেখা যাইবে। জ্ঞান ও সেবার ভাব ক্রমে বর্দ্ধিত হইবে। এইরূপ করিলে ব্রাহ্মসমাজ আবার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে। যে উদ্দেশ্য লইয়া ব্রাহ্মসমাজ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহা সুসিদ্ধ হইবে। ভগবান করুন ব্রাহ্মগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দেব আশীর্ব্বাদ লাভ করিবার জন্য গভীর তপস্যায় নিযুক্ত হউন।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদীসম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়! এই পত্রখানি যথাস্থানে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

"সকল ধর্ম্মেই সত্য আছে" এবং "সকল ধর্ম্মই সত্য" এই দুইটী কথাতে যে প্রভেদ আছে, তাহা বিস্মৃত হইয়াই সম্ভবতঃ কৌমুদী সম্পাদক মহাশয় "সকল ধর্ম্মই ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত" এবং "সকল ধর্ম্মই সত্য" এরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন। নতুবা জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকিতে, এরূপ কথায় সায় দিবার কোন সুবিধা ত দেখা যায় না। কৌমুদীসম্পাদক কৌমুদীর ভাদ্রমাসের ১ম পক্ষের সংখ্যায় ধর্ম্মের কয়েকটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—"ধর্ম্মও একটা abstiaction নহে, কিন্তু ধর্ম্মীর আত্মান্তরীণ ভাবের বিকাশ ও বিবর্ত্তনমাত্র" "সান্তের অনন্তের দিকে গতিই ধর্ম্ম" এই গতি জীবের প্রাণগত, জীব

সজ্ঞানে অজ্ঞানে সর্ব্বদাই আপনার সীমা ছাড়াইয়া অনন্তে উড়িতে চেষ্টা করিতেছে। ইহাই জীবের ধর্ম্ম। অগ্নির ধর্ম্ম যেমন উষ্ণতা জলের ধর্ম্ম যেমন শৈত্য,......জীবের ধর্ম্মই সেইরূপ এই অনন্ত লিপ্সা।" অগ্নির ধর্ম্ম উষ্ণতা, জলের ধর্ম্ম শৈত্য, ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। যখন ব্যতিক্রম হয় তখন সে তাহার ধর্ম্মচ্যুত হয়, ইহা বলাই সঙ্গত। জলে যখন উষ্ণতানুভব হয় তখন সে ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছে ইহা বলাই সঙ্গত, কিন্তু তাহা না বলিয়া যদি জলের উষ্ণতাবস্থাকেও সধর্ম্মেস্থিতি বলিতে হয়, তবে এরূপ উক্তিকে কি বিচারবিকৃতি বলা উচিত নহে। তেমনি অনন্তলিপ্সাসম্পন্ন জীব যদি কোন সসীম জড় বস্তুকেই অনন্ত জ্ঞান করিয়া, তাহাকেই আপনার লক্ষ্য করে, তাহা কি সেই জীবের পক্ষে ধর্ম্মচ্যুতি নহে। তাহার উদ্দেশ্য ভাল হইলেও হইতে পারে। কিন্তু সে অজ্ঞতা প্রযুক্ত এক বস্তুকে অপর বস্তু মনে করিলে, কি উদ্দেশ্য ভাল বলিয়াই তাহার সাধনা সিদ্ধ হইবে। একব্যক্তি কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমানে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া, যদি ডায়মণ্ড হারবারের গাড়ীতে চলিতে থাকে, তাহাদ্বারা কি তাহার বর্দ্ধমান যাওয়া হইবে? তাহার উদ্দেশ্য বা লিপ্সার কোন ত্রুটি বা অল্পতা নাই। কিন্তু যতদিন তাহার এই ভ্রান্তির সংশোধন না হইবে, ততদিন বর্দ্ধমানের দিকে তাহার একপদও অগ্রসর হওয়া ঘটিবে না। সুতরাং অনন্তলিপ্সাশালী মানব যত দিন জড় বা সীমাবদ্ধ অন্য বস্তুকে অতিক্রম না করিবে, ততদিন তাহার গতি অনন্তের দিকে কখনই হইবে না। তাহার পরিশ্রম বৃথা পরিশ্রম হইবে। তবে এরূপ পরিশ্রম করিতে করিতে যখন সে বুঝিবে যে বৃথা পরিশ্রম হইতেছে, উল্টাদিকে দাঁড় টানা হইতেছে, তখন যদি সুবুদ্ধি হয়, তবেই সে আবার সুপথে আসিতে পারিবে এবং ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হইবে। নতুবা একমাত্র লিপ্সা থাকিলেই কাহারও সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই।

ধর্ম্ম যদি ধর্ম্মীর আভ্যন্তরীণ ভাবের বিকাশ ও বিবর্ত্তন মাত্র হয় এবং তাহার প্রতিষ্ঠাতা যদি ঈশ্বর হন, তাহা হইলে ঘটনা কিরূপ হয় দেখা যাউক। কৌমুদীর ভাদ্রের ২য় পক্ষ এবং আশ্বিনের ১ম পক্ষের সংখ্যার ১ম পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, "এসলাম ধর্ম্মের মূলমন্ত্র এই যে, নিরাকার ঈশ্বরের কেহ সমকক্ষ নাই, এবং কখনই হইতে পারে না; তিনি কাহারও রূপ ধারণ করিয়া ইহজগতে আসেন নাই এবং তাঁহার কেহ অবতারও নাই। তিনি কোন বস্তুজাতও নন এবং কোন বিশেষ স্থানে আবদ্ধও নন ইত্যাদি।" এসলাম ধর্ম্মের এই যে মূলমন্ত্র, ইহা অবশ্যই এসলামধর্ম্মীদিগের আভ্যন্তরীণ বিকাশ ও বিবর্ত্তন। সুতরাং ইহা ধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ও ঈশ্বর। আবার অন্যদিকে হিন্দুগণের আভ্যন্তরীণ বিকাশ বা বিবর্ত্তনের ফল যাহা, তাহা আমরা সকলেই জানি, যথা— ঈশ্বরের মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, ও নর প্রভৃতির আকার পরিগ্রহ পূর্ব্বক পৃথিবীতে অবতরণ। এই যে ধর্ম্মীর আভ্যন্তরীণ ভাবের বিকাশ বা বিবর্ত্তনরূপধর্ম্ম ইহাও ঈশ্বরেরই প্রতিষ্ঠিত। কারণ "জগতের সকল ধর্ম্মই এক ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত," এখন এসলামধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম, যাহা পরস্পরের বিরোধী, যাহা একের সহিত তুলনায় অপরের বিপরীত ভাবের জ্ঞাপক, এই উভয় বিরুদ্ধভাবাপন্ন বিকাশ বা বিবর্ত্তন পরম জ্ঞানবান পরমপবিত্র পরমেশ্বরেরই প্রতিষ্ঠিত বলিলে বা তাঁহারই প্রস্তুত করা জিনিস বলিলে, তাঁহার জ্ঞান ও পবিত্রতার কি দশা হয়? আমরা অপূর্ণ, ও জ্ঞানে অতি হীন মানব হইয়াও আপনাদিগকে এরূপ দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকি। এক মুখে দুই কথা যাহারা বলেন, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে কে প্রস্তুত? তবে ঈশ্বরের সম্বন্ধে এরূপ অযথা উক্তিতে কি কোন অপরাধের অংশী হইতে হয় না? ভাল কাজ করিবার শক্তি না থাকে নাই বা করিলাম; কিন্তু অকার্য্য করিয়া প্রত্যবায়ভাগী হইবার প্রয়োজন কি? বরং এরূপস্থলে নিষ্ক্রিয় থাকাই প্রার্থনীয়। ধর্ম্মের সদ্‌ব্যাখ্যা না করিতে পারা যায়, কুব্যাখ্যা করিয়া কি ফল? তদ্দ্বারা সামান্য-জ্ঞান লোকের বিচার শক্তিকেই বিপথগামী করা হয়, এবং কেবলই কুসংস্কারসকলকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এরূপ চেষ্টায় যদিও মানবীয় ধন্যবাদ লাভের সম্ভাবনা আছে, প্রশংসার শ্রুতিমধুর ধ্বনি শ্রবণ করিবার আশা আছে, কিন্তু কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। সুতরাং এরূপ কার্য্যের প্রয়াসী যাঁহারা, তাহাদের সুমতি হউক ইহাই পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা।

সকল ধর্ম্মেই সত্য আছে; তাহা স্বীকার করিতে সঙ্কোচ করা যেমন নিতান্তই অজ্ঞের কার্য্য, "সকল ধর্ম্মই সত্য" তাহা স্বীকার করাও তেমনি বিচারবিহীন এবং জ্ঞানবুদ্ধির অবমাননাকারীর কার্য্য। যে ধর্ম্মের যেটুকু সত্য, তাহাই ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাই ধর্ম্ম। এরূপ না বলিয়া সত্যাসত্য মিশ্রিত ধর্ম্মমাত্রকেই ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত বলিলে তাহা দ্বারা সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে অতি ভীষণ ও মারাত্মক অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। শুভমতিদাতা পরমেশ্বর এই প্রকার সংস্কার হইতে জনসমাজকে উদ্ধার করুন।

নিবেদক
কলিকাতা শ্রী...... . ...

ব্রাহ্মসমাজ।

আমাদের পরলোকগত বন্ধু আসাম নিবাসী গুণাভিরাম বড়ুয়া মহাশয় ব্রাহ্মদিগের নিকট বহুদিনের পরিচিত লোক। বিগত কয়েক বৎসরে মৃত্যু তাঁহার পরিবার মধ্যে প্রবেশ করিয়া একে একে সমুদায় পরিবারটী নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটী গেল, পত্নী গেলেন, জামতাটী গেলেন, স্বয়ং গেলেন, তৎপরে সম্প্রতি তাঁহার মধ্যম পুত্র কমলাভিরাম তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এ সংবাদে তাঁহার বন্ধু বান্ধব সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইবেন। বিগত ১০ই ডিসেম্বর সোমবার তাঁহার ভগিনী স্বর্ণলতা রায়ের ভবানীপুরস্থ ভবনে কমলাভিরামের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। কমলাভিরামের ভগিনী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা এতদুপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের নানাবিধ কার্য্যে ১০০ একশত টাকা দান করিয়াছেন। পরমেশ্বর পরলোকগত আত্মাকে শান্তিতে রক্ষা করুন।

সাধনাশ্রম—পূর্ব্বেই সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে সাধনাশ্রম হইতে দুইটী দল বহির্গত হইয়া দুই দিকে প্রচার করিতে গিয়াছেন। এক দল বরিশালের অভিমুখে গমন করিয়াছেন, অপর দল কৃষ্ণনগর, কুষ্টীয়া, পাবনা প্রভৃতি স্থান হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের অভিমুখে গিয়াছেন। বাবু কুঞ্জলাল ঘোষের শরীর ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়া অসুস্থ হওয়াতে বরিশালের দল সম্প্রতি কলিকাতাতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা কিছু দিনের জন্য নলহাটী রামপুর হাট প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের স্বাস্থ্যলাভ মুখ্য উদ্দেশ্য।

উভয়ই দলই সর্ব্বত্র যথাসাধ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন এবং প্রচুর পরিমাণে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক পুস্তকাদি বিক্রয় করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় বিগত ১৩ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কলিকাতাবাসী ব্রাহ্মদিগের অনেকে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গঙ্গার ঘাটে গিয়াছিলেন। গঙ্গার ঘাট হইতে পরিবার পরিজন ও বন্ধুবান্ধবসহ তিনি স্বীয় ভবনে উপস্থিত হইলে, সেখানে সর্ব্বাগ্রে সকলে সমবেত হইয়া একটু উপাসনা হয়, তৎপরে আনন্দমোহন বাবুর পত্নী মিষ্টান্নের দ্বারা উপস্থিত বন্ধুমণ্ডলীর পরিচর্য্যা করেন।

১৬ই ডিসেম্বর রবিবার হাইকোর্টের এটর্ণি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের বেলঘরিয়াস্থ উদ্যানে ব্রাহ্মসম্মিলনীর এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে কলিকাতাবাসী ব্রাহ্মগণ আনন্দমোহন বাবুকে অভিনন্দন করিয়াছেন।

আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সেন সম্প্রতি ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। তদুপলক্ষে মহর্ষি যে উপদেশ দিয়াছেন। তাহা স্থানান্তরে মুদ্রিত হইল। কিন্তু ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে কুঞ্জ বাবু আদি সমাজের বা অন্য কোন সমাজের প্রচারক হইলেন। তিনি স্বাধীন ভাবে প্রচার করিবেন।

উৎসব—শিলং ব্রাহ্মসমাজের বিংশতিতম জন্ম দিন উপলক্ষে বিগত ৩রা হইতে ১১ই নবেম্বর পর্য্যন্ত নয় দিনব্যাপী উৎসব হইয়াছিল। ইহার মধ্যে তিন দিন শিলং ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, একদিন লাবান উপাসনা সমাজে উপাসনা হয়। অবশিষ্ট কয়দিন স্থানীয় ব্রাহ্ম পরিবার সকলে উপাসনা এবং নানাস্থানে বক্তৃতা ও আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস, বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী, বাবু সদয়াচরণ দাস, বাবু দুর্গাদাস রায় এবং বাবু শিবনাথ দত্ত এই সকল উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। নবদ্বীপ বাবু 'ব্রাহ্মধর্ম্মের মন্ত্র,' "আধ্যাত্মিক উন্নতি' প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দেন ও বক্তৃতা করেন এবং আলোচনা করেন। 'শিশুর ন্যায় সরলতা,' 'সাধুদিগের নবজীবন লাভ' নীলমণি বাবুর উপদেশ ও বক্তৃতার বিষয় ছিল।

প্রচার—শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস খাসিয়া পাহাড়ের নানাস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। তিনি মৌথার ব্রাহ্মসমাজে একদিন "ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ কার্য্য এবং তজ্জন্য খাসিয়া ভ্রাতৃগণের দায়িত্ব" এই বিষয়ে উপদেশ দেন। নীলমণি বাবু খাসিয়া ভাষায় সমাগত ভ্রাতাদিগকে তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন।

সাধনাশ্রমের পূর্ব্ববঙ্গ প্রচারযাত্রিগণের কার্য্য বিবরণ।

পাবনা—২৬ শে নবেম্বর রজনীতে বাবু যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাসায় সংগীত ও ধর্ম্মব্যাখ্যা হয়।

২৭ শে নবেম্বর প্রাতে ব্রাহ্মবন্ধু বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগছির বাসায় প্রাতে পারিবারিক উপসনা হয়। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় জেলাস্কুল গৃহে নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।

২৮ নবেম্বর প্রাতে কৈলাস বাবুর বাসায় পারিবারিক উপাসনা হয়; সন্ধ্যা ৬½ ঘটিকায় সময় ব্রহ্মমন্দিরে সংগীত, সংকীর্ত্তন সহযোগে ধর্ম্মব্যাখ্যা হয়।

কুষ্টীয়া—১লা ডিসেম্বর ব্রাহ্মবন্ধুগণের বাসায় উষাকীর্ত্তন হয়। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় কুষ্টীয়া এন্ট্রান্স স্কুলে নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।

২রা ডিসেম্বর রবিবার ভোর কীর্ত্তন হয়, তৎপরে মন্দিরে সমবেত উপাসনা হয়। সন্ধ্যা ৬½ ঘটিকায় সময় মন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ হয়।

কুমারখালি—৩রা ডিসেম্বর রজনীতে বাবু হারাণচন্দ্র সরকারের গৃহে সমবেত উপাসনা হয়।

৪ঠা ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬½ ঘটিকার সময় স্থানীয় ব্রাহ্মমন্দিরে ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।

৫ই ডিসেম্বর প্রাতে মন্দিরে সমবেত উপাসনা হয়।

খলিলপুর—৭ই প্রাতে ভোর কীর্ত্তন হয়। শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত সরকারের গৃহে উপাসনা ও উপদেশ হয়।

রাজবাড়ী—৮ই ডিসেম্বর প্রাতে বাবু যদুনাথ সেনের বাসায় ভোর কীর্ত্তন হয়। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় স্থানীয় এন্ট্রান্স স্কুলে নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং সন্ধ্যা ৬½ ঘটিকায় সময় রেলওয়ের দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের গৃহে সংগীত ও ধর্ম্মব্যাখ্যা হয়।

দান—মেদিনীপুর হইতে শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গানারায়ণ বসু মহাশয় পুত্রের পদোন্নতি উপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ১৲ ও সাধনাশ্রমে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ভ্রমসংশোধন—গত ১৬ই অগ্রহায়ণের তত্ত্বকৌমুদীতে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণীতে যে "নূতন পুস্তক" শীর্ষক প্যারাটী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা ব্রাহ্মসমাজ কলমে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। ভ্রমক্রমে উক্তরূপ হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ই জানুয়ারি শুক্রবার ৫½ ঘটিকার সময় সাঃ ব্রাঃ সমাজমন্দিরে অধ্যক্ষ সভার চতুর্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব।

২। নিয়মাবলী সংশোধন।

৩। বিবিধ।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৩রা পৌষ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৭শ সংখ্যা।
১৭শ ভাগ।

১৬ই পৌষ রবিবার, ১৮১৬ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে মুক্তিদাতা! সম্বৎসর পরে আবার আমরা আশাপূর্ণ নয়নে তোমার দিকে চাহিতেছি। শত দুর্ব্বলতার মধ্যে পড়িয়াও তোমার দিকে চাহিতেছি। নূতন বৎসর আসিতেছে, ইচ্ছা হইতেছে যে ঐ সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জন্যও নূতন জীবন আসুক; আমরা অভ্যাসের জীর্ণ কন্থা ফেলিয়া দিয়া নব আশার নূতন বস্ত্র পরিয়া তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই। আমাদের সমক্ষে কি বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র রহিয়াছে, অথচ আমরা এরূপ ভাবে চলিতেছি যেন আমাদের করিবার কিছু নাই। যাহাদিগের উপরে গুরুতর দায়িত্ব ভার পড়ে, তাহারা কখনই আপনাদের অবস্থা বিস্মৃত হয় না, কিন্তু আমরা এরূপ ভাবে চলিতেছি যেন আমাদের উপর কোনও গুরুতর দায়িত্ব ভার নাই। আমাদের লঘুচিত্ততা বশতঃ আমরা আপনাদের দায়িত্বভার সমুচিত রূপে অনুভব করিতে পারিতেছি না। যে সকল শক্তি সমবেত হইলে তোমার কার্য্য সুচারুরূপে হইতে পারে, সেই সকল শক্তিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বৃথা ক্ষয় করিতেছি। তোমার প্রতি যদি আমাদের সমুচিত প্রেম থাকিত, এবং নিজ নিজ গৌরব অন্বেষণ না করিয়া, যদি একান্ত অন্তরে বাস্তবিক তোমার গৌরব অন্বেষণ করিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় এরূপ করিতে পারিতাম না। উৎসবের প্রাক্কালে তোমার চরণে পড়িয়া প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগকে স্বীয় স্বীয় জীবনের দায়িত্ব ভার অনুভব করিতে সমর্থ কর; এবং নিজ গৌরব অপেক্ষা তোমার গৌরব অন্বেষণে প্রবৃত্ত কর।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

মহোৎসব—দেখিতে দেখিতে একটী বৎসর চলিয়া গেল। যে সংকল্প ও ভাব লইয়া গত বৎসর কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলাম, আত্মশোধনের যে ব্রত লইয়াছিলাম, তাহা কি পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা দেখিবার সময় উপস্থিত। এই উৎসবের পূর্ব্বে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকার আত্ম জীবন পরীক্ষা করিবার সময়। যে সকল লোক সংসারে উদ্দেশ্য-বিহীন, সংকল্পবিহীন, সাধনবিহীন জীবন যাপন করেন, তাঁহারা আত্মপরীক্ষা দ্বারা আনন্দ বা সুখ, অনুতাপ বা ক্লেশ কিছুই অনুভব করেন না। কিন্তু যাঁহারা ব্রাহ্মজীবনের আদর্শ পাইয়াছেন, ব্রহ্মসাধন ব্রত জীবনে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্থিরচিত্তে স্বীয় স্বীয় জীবনের অবস্থা পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন। উৎসব বাৎসরিক ভাবতরঙ্গের খেলা নহে। জীবন সংশোধনের জন্য, প্রভুর সেবার জন্য, নূতন সংকল্প ও ব্রত গ্রহণ করিবার এই উপযুক্ত সময়। গত বৎসর উৎসবের সময়ে যাঁহারা বিশেষ বিশেষ ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, উৎসবের পূর্ব্বে ঈশ্বরচরণে বসিয়া দেখা কর্ত্তব্য সেই সকল ব্রত জীবনে কি পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে। গভীর আত্মপরীক্ষা ও অনুতাপ ব্যতীত জীবন কি সংশোধনের পথে অগ্রসর হয়? যাঁহার সংকল্প আছে, উদ্দেশ্য আছে, তাঁহার জীবনে অনুতাপ এবং অশ্রুও আছে। চিন্তাবিহীন ও উদ্দেশ্য-বিহীন জীবনে অনুতাপ নাই, সংশোধনের প্রবৃত্তিও নাই।

উৎসবের পূর্ব্বে আমাদের মনে এই প্রশ্ন উদয় হইতেছে; কি করিলে উৎসবটা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইবে। সাধনবিহীন ও চিন্তাবিহীন জীবন লইয়া উৎসবে গেলে কি উহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে? যিনি নূতন সংকল্প লইয়া গতবৎসরে কার্য্যক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, এবং সমগ্র বৎসর সেই ব্রত পালনে যত্নশীল ছিলেন দুঃখ ও দুর্ব্বলতার মধ্যে সেই সংকল্প ভুলেন নাই, তিনি আজ উৎসবের দ্বারে নব বলের জন্য উপস্থিত। এইরূপ আশাতেই তিনি আজ অনুতাপ ও দুর্ব্বলতার মধ্যেও ঈশ্বরের করুণাস্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ হইতেছে, এবং দুর্ব্বলতার মধ্যে বল লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। এইরূপ ব্যাকুলাত্মাদিগের সম্মিলনেই উৎসব হয়। উৎসব এরূপ কোনও যন্ত্র নহে যাহাতে আরোহণ করিলে মানুষ ধার্ম্মিক হয়; উৎসব সাধনশীল ও চিন্তাশীল এবং ব্রতপরায়ণ জীবনকেই উন্নত করে। ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ উৎসবের দ্বারে এই ভাবে উপস্থিত হইলে উৎসব সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইবেন; জীবনে নূতন বল আসিবে, উৎসব জমাট হইবে।

প্রেমের ভাষা—সুবিখ্যাত পর্য্যটক মহাত্মা লিভিংষ্টোন আফ্রিকা ভ্রমণের সময় সেই দেশীয় লোকদিগের ভাষা জানিতেন না, তাঁহার ভাষাও তাহারা বুঝিত না। কিন্তু কি এক অস্ফুট ও শব্দবিহীন ভাষাতে তিনি কথা বলিতেন যে সেই অসভ্য লোকেরাও তাঁহার অনুগত হইয়া যাইত।

কুকুর প্রভৃতি ইতর প্রাণীগুলি নিজ নিজ প্রভুর অধীন হয় কেন? প্রভুর ভাষা কি তাহারা বুঝিতে পারে? কোন্ কথা শুনিয়া এই অধীনতা, এই আনুগত্য। ইহা প্রেমের ভাষা—ইহা নীরবে মানবের হৃদয়কে অধিকার করে। প্রেমিকের সংস্পর্শে আসিলে কি এক শব্দবিহীন বাণী প্রাণকে হরণ করিয়া থাকে।

প্রেম জগতে মহাশক্তি। প্রথমে ইহা অনুভব করা যায় না। জীবন যত উন্নত হয়, ততই ইহার সত্যতা অনুভূত হইতে থাকে।

আমরা কাহার কল্যাণসাধন করিতে পারি? যাহাকে ঘৃণা করি? যাহার বিরুদ্ধে শত কুভাব পোষণ করি? না যাঁহার মঙ্গল চাই, যাঁহার প্রতি প্রেম আছে। সর্ব্বদা এই কথা শুনা যায় যে উপদেষ্টার প্রতি যদি শ্রোতার বিশ্বাস থাকে, তবেই উপদেশের দ্বারা উপকার হয়। ইহা সত্য হইলেও, ইহার বিপরীত কথা কি ততোধিক সত্য নহে যে উপদিষ্টের প্রতি যদি উপদেষ্টার বিশ্বাস থাকে, তবেই উপদেশের দ্বারা উপকার হয়।

এই প্রেমের আদর্শ দিয়া যদি আমাদের অবস্থা বিচার করি তবে আমরা সেই আদর্শ হইতে অনেক নিম্নে পতিত বলিয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিব। আমরা উপাসনা ও প্রার্থনা দ্বারা প্রতিদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধন কি? "প্রীতিঃ পরম সাধনং।" ঈশ্বরে প্রীতি ও মানবে প্রীতি ব্রাহ্মের সাধন। জীবনে যদি প্রতি দিন প্রেম-বিরোধী কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, প্রেম-বিরোধী ভাব, ভাষা ও চিন্তা পোষণ করি, তবে কি আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন হইতে বহু দূরে পতিত হই না? যাহা প্রার্থনাতে ঈশ্বরের নিকটে চাই, প্রতিদিন জীবন সংগ্রামে যদি তাহার জন্য যত্নশীল না হই, তবে আমাদের সেই প্রার্থনার মূল্য কি? যদি জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম চাই, ব্রাহ্মধর্ম্ম নরনারীর মধ্যে জয়যুক্ত হউক বলিয়া ইচ্ছা করি, তবে এই প্রীতি জীবনে সাধন করিতে হইবে। এই উৎসব আসিতেছে যদি ভাই ভগিনীর প্রতি প্রেম না থাকে, তবে কোন্ সাহসে উৎসবের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইব? আমরা সকলে যদি প্রেমে তাঁহার চরণে সম্মিলিত হইতে পারি, তবেই তাঁহার করুণা অবতীর্ণ হইবে এবং আমাদের জীবন ধন্য হইবে।

সকল কার্য্যেই প্রেমের জয়। ধর্ম্মসমাজ প্রেমহীন হইলে তাহার দুরবস্থার আর কি সীমা থাকে?

সত্য সত্যই ইহা মহাপুরুষের উক্তি "যদি আমার মঙ্গল করিতে চাও, তবে প্রথমে আমাকে প্রীতির চক্ষে দেখ।"

ব্রাহ্ম-বালক—কলিকাতাতে যে সকল ব্রাহ্ম বাস করেন তাঁহাদের অধিকাংশই দরিদ্র। তাঁহারা নামে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, কিন্তু বস্তুতঃ দরিদ্র। তাঁহাদিগকে ক্লেশে পরিবারের ভরণপোষণ করিতে হয়। অধিকাংশ ব্রাহ্মপরিবারই অতি সামান্য ভাড়া দিয়া দুই একটী ঘর ভাড়া করিয়া কোনও প্রকারে তন্মধ্যে সপরিবারে বাস করেন। সেরূপ গৃহে বালক বালিকারা যখন বাড়ীতে থাকে, তখন তাহাদিগকে সেই সকল ক্ষুদ্র স্থানে ধরিয়া রাখা ভার হয়, এবং অধিকাংশ স্থলেই পিতামাতা ধরিয়া রাখিতে পারেন না। একটী ৮ কি ১০ বৎসরের বালক, ক্রীড়া যাহার পক্ষে স্বাভাবিক, সে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর স্কুল হইতে আসিল। স্কুলে সে ৫ ঘণ্টা একটী ঘরে বদ্ধ ছিল। সে বাড়ীতে আসিয়াও কি আবার ১২ হস্ত দীর্ঘ ও ৭ হস্ত বিস্তার একটী ঘরে বদ্ধ থাকিবে? তাহা কি উচিত? সে খেলে কোথায়? সুতরাং তাহাকে খেলিবার জন্য রাস্তাতে বা পাড়াতে বাহির হইতে হয়। পিতা আপীসে, রাস্তাতে তাহাকে দেখে কে? সেখানে সে কাহার সঙ্গে মিশিতেছে তাহার সংবাদ রাখে কে? কাজেই সে অনেক সময় অসৎ বালকের সঙ্গে মিশিয়া অসৎ হইয়া যায়। এইরূপে কলিকাতার অনেক ব্রাহ্মপরিবারের বালকগণ অসৎ হইয়া যাইতেছে। যদি কোনও ব্রাহ্ম পিতামাতা এই বলিয়া গর্ব্ব করেন, যে তাঁহারা তাঁহাদের বালকদিগকে শাসনে রাখেন, অর্থাৎ বাড়ীর বাহির হইতে দেন না; তদুত্তরে আমরা বলি, ইহাও সন্তোষের বিষয় নহে। বালকগণ সর্ব্বদা ক্ষুদ্র স্থানে বদ্ধ থাকে, ইহা কোনও মতেই প্রার্থনীয় নহে। তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়া অনিবার্য্য। *বালকদিগের জন্য খেলিবার স্থান থাকা নিতান্ত আবশ্যক।* তাহা অতি অল্প পরিবারের ভাগ্যেই ঘটে। এইজন্য আমাদের বোধ হয়, ব্রাহ্ম বালকদিগের জন্য কলিকাতার বাহিরে যদি একটী বোর্ডিং স্কুল করিতে পারা যায় এবং তাহাতে যদি সকলে স্বীয় স্বীয় বালকদিগকে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে এই অনিষ্ট অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। তাহাতে কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় হইলেও বালকদিগের ও ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া সেরূপ করা কর্ত্তব্য। অন্ততঃ কয়েক জন ব্রাহ্মযুবক যদি দলবদ্ধ হইয়া, এই ব্রত গ্রহণ করেন, যে তাঁহারা প্রতিদিন বৈকালে ব্রাহ্মবালকদিগকে দলবদ্ধ করিয়া মাঠে খেলিতে লইয়া যাইবেন এবং যথাসময়ে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিবেন, তাহা হইলেও অনেক উপকার হইতে পারে। নতুবা ব্রাহ্ম বালকদিগের স্বাস্থ্য ও নীতি দুই নষ্ট হইতেছে।

ব্রাহ্মসমাজে নারীশক্তি—ব্রাহ্মসমাজে সুশিক্ষা প্রাপ্ত নারীর সংখ্যা এখনও অতিশয় অল্প। তাঁহাদিগকে অঙ্গুলির অগ্রভাগে গণনা করা যায়। কিন্তু এই অল্প পরিমিত নারীর-শক্তি ও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে সমুচিতরূপে লাগিতেছে না। যে সকল মহিলা রবিবাসরিক নীতি বিদ্যালয় করিয়া, তাহার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং উৎসাহের সহিত সে কার্য্য চালাইতেছেন; তাঁহারা আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও কত মহিলা আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন, তাঁহারা মনে করিলে আপনাদের শক্তিকে আরও কত দিকে নিয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের শক্তির সহায়ত

আমরা সমুচিত রূপে পাইতেছি না। ইহার কারণ কি? পুরুষগণ কি নারীগণের শক্তি অবরোধ করিয়া রাখিতেছেন? অথবা তাঁহাদের মধ্যে সেই ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে না, যাহা মানুষকে উৎসাহ আনিয়া দেয়, এবং স্বার্থনাশে সমর্থ করে? এ ধর্ম্মাগ্নি তাঁহাদের অন্তরে কেন জ্বলিতেছে না? পুরুষদিগের মধ্যে ত এমন অনেককে দেখিতেছি যাঁহারা নবজীবন পাইয়া ঈশ্বরের কার্য্যে আপনাদের অর্থ ও সামর্থ্য দিতে আনন্দিত হইতেছেন,নারীগণের মধ্যে কেন এভাব অধিক পরিমাণে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে না? ইহার কারণ বোধ হয় এই যে বিশেষ ভাবে নারীগণের মধ্যে কাজ করিবার জন্য কোনও উপায় অবলম্বিত হইতেছে না? যাহা হউক নববর্ষের প্রাক্কালে এ চিন্তা আমাদের হৃদয়ে আসা ভাল, তাহা হইলে আগামী বর্ষে এবিষয়ের কিছু উন্নতি দৃষ্ট হইতে পারে?

ঈশ্বরের জন্য কি ত্যাগ করিতে পারি—এ দেশের সাধকগণ বার বার সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। মানব তুমি ভুলিও না, এ জগতে তুমি চিরস্থায়ী নও; তোমার জন্য মৃত্যু নিশ্চিত আছে। অনেক সাধকের জীবনচরিতে এরূপ দেখা যায় যে তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্ম সাধনের অঙ্গস্বরূপ প্রতিদিন মৃত্যুকে স্মরণ করিতেন। বার বার এ প্রকার উপদেশ দিবার তাৎপর্য্য এই, যে এদেশের সাধকগণ অনুভব করিয়াছিলেন, যে মৃত্যুকে বিস্মৃত হওয়াই মানবের মোহজালে জড়িত হইবার একটী প্রধান কারণ। মৃত্যুকে মানুষ যদি বিস্মৃত না হয়, তাহা হইলে এত মোহে নিমগ্ন হয় না। কেহ যদি বিদেশে চাকুরী করিতে গিয়া জানে যে পাঁচ বৎসর পরেই তাহাকে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে হইবে, তবে কি সে সেখানে কোনও প্রকার স্থায়ী সম্পত্তি করিতে পারে? যদি করে লোকে তাহাকে নিশ্চয় বাতুল বলে।

সময়ে সময়ে মৃত্যু চিন্তার ন্যায় আর একটী চিন্তার দ্বারা আমাদের অনেক উপকার হইতে পারে। আমরা যদি মধ্যে মধ্যে আপনাদিগকে এই প্রশ্ন করি যে, আমরা ঈশ্বরের জন্য কি ছাড়িতে পারি? তাহা হইলে আমাদের আত্ম-পরীক্ষার অনেক সাহায্য হয়। প্রেমের পরীক্ষা ত্যাগ স্বীকারে। মৌখিক প্রেম প্রকাশে কাহারও কিছু ব্যয় হয় না। সেরূপ মৌখিক প্রেম প্রকাশ জনসমাজে প্রতিনিয়ত চলিতেছে। মানুষ মানুষকে প্রেমের কোন্ কথা না বলিতেছে! কিন্তু প্রেমের পরীক্ষাও প্রতিদিন হইতেছে। মানুষ মুখে পরস্পরকে যত প্রেমের কথা বলে, স্বার্থত্যাগ দ্বারা যদি তাহার দশ ভাগের এক ভাগের প্রমাণ দিতে পারিত, তাহা হইলে মনুষ্যসমাজ আর এক আকার ধারণ করিত। মানুষকে মৌখিক প্রেম প্রদর্শনের ন্যায় ঈশ্বরকেও মৌখিক প্রেম প্রদর্শন করা সহজ, তাহাতে কিছুই ব্যয় নাই। কিন্তু এই প্রশ্ন যখনই আপনাদিগকে করি, ঈশ্বরের কার্য্যের জন্য কতটা স্বার্থনাশ করিতে প্রস্তুত আছি, অমনি প্রেমের পরীক্ষা আরম্ভ হয়।

জগন্নাথ তীর্থে যাহারা যায়, তাহারা অনেক সময়ে জগন্নাথকে একটা কিছু দিয়া আসে। সচরাচর যে যে বস্তুকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসে সে সেইটা দিয়া থাকে। যে পরমান্ন ভাল বাসে, সে পরমান্ন দিয়া আসিল। যে আম্রে অনুরক্ত সে আম্র দিয়া আসিল। তৎপরে আর তাহারা সমগ্র জীবনের মধ্যে সে সকল বস্তু আস্বাদন করে না। ইহাতে প্রেমের ও বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়; তাহাতে সন্দেহ কি?

নূতন বৎসর ও তৎসঙ্গে মহোৎসব আসিতেছে, এসময়ে আমাদের প্রত্যেকেরই স্বীয় স্বীয় আত্মাকে এই প্রশ্ন করা ভাল "আমি ঈশ্বরের জন্য কি ছাড়িতে পারি?" প্রত্যেকে চিন্তা করুন আগামী বর্ষে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কি দিবেন। যাঁহারা বিষয় কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাহারা চিন্তা করুন, তাঁহারা আগামী বর্ষে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের সাহায্যার্থ কি পরিমাণ অর্থ দিবেন; যাঁহাদের সময় ও সামর্থ্য আছে, তাঁহারা ভাবুন আগামী বর্ষে কোন্ কোন্ কার্য্যে হস্তার্পণ করিবেন; যাঁহারা প্রচারব্রতে ব্রতী, তাঁহারা চিন্তা করুন এবার কি বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিবেন।

প্রলোভন ও পরীক্ষা—মহাত্মা যীশু স্বীয় শিষ্যদিগকে যে প্রার্থনা শিখাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কথাটী আছে—"আমাদিগকে প্রলোভন ও পরীক্ষাতে ফেলিও না।" এই বিষয়টী লইয়া ধর্ম্ম সাধকদিগের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, আমাদের চরিত্রকে বিকশিত করিবার জন্য প্রলোভন ও পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে, এরূপ স্থলে কিরূপে প্রার্থনা করা যায়,—"আমাদিগকে প্রলোভন ও পরীক্ষাতে ফেলিও না।" এই মাত্র বলিতে পারি, প্রলোভন ও পরীক্ষার মধ্যে যেন তোমাকে না, ভুলি ইহাই সঙ্গত। বাস্তবিক প্রলোভন ও পরীক্ষা আমাদের পক্ষে মহোপকারী। প্রথমতঃ এতদ্দ্বারা আমাদের শক্তির প্রকৃত পরিমাণ আমাদের নিকট প্রকাশ পায়। যতক্ষণ মানুষ কোনও গুরুতর কাজে হাত না দেয়, প্রলোভন ও পরীক্ষার মধ্যে না পড়ে, ততক্ষণ আপনার শক্তির পরিচয় আপনি প্রাপ্ত হয় না, দুর্ব্বল হইয়া আপনাকে সবল ভাবিতে থাকে, অথবা স্বীয় বলের পরিচয় না পাইয়া আপনাকে দুর্ব্বল ভাবিয়া অবসন্ন হইতে থাকে। প্রলোভন ও পরীক্ষার মধ্যে পড়িলে সেই ভ্রান্তি ঘুচিয়া যায়। অনেক সময়ে দেখি পূর্ব্বে নিজের প্রতি যতটা নির্ভর ছিল তাহা বিদূরিত হয়, এবং বিনয় হৃদয়কে অধিকার করে, নির্ভর বর্জ্জিত হয়। আপনার প্রতি নির্ভরের হ্রাস হইলেই ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর বাড়িতে থাকে। তখন ব্যাকুল প্রার্থনা স্বতঃই হৃদয় হইতে উত্থিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ প্রলোভন ও পরীক্ষাতে ঈশ্বরের কৃপাকে আমাদের নিকট সুমিষ্ট ও মূল্যবান করে। মানুষ যখন সুখ স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে থাকে, তখন ব্রহ্মকৃপার মূল্য যেন বুঝিতে পারে না। ঈশ্বর কি করিতেছেন তাহা দেখিয়াও দেখে না। কিন্তু প্রলোভন ও পরীক্ষাতে পড়িলে অনেক সময়ে মানব অন্ধকারভীত শিশুর ন্যায় ব্রহ্মকৃপার ক্রোড়কে আশ্রয় করে, ও তাহার অমৃত রস তখন আস্বাদন করে। এই জন্য আমাদের

আত্মার কল্যাণের নিমিত্তই প্রলোভন ও পরীক্ষা অনেক সময়ে আমাদের পথে আসিয়া থাকে।

বিধাতার বিশ্বরাজ্যের সর্ব্বত্রই এই নিয়ম দেখিতে পাই, সংগ্রামের দ্বারা শক্তির বিকাশ, বিনা সংগ্রামে কিছুই বৃদ্ধি পায় না। মানব জীবন কেন বিনা সংগ্রামে উন্নতি লাভ করিবে? ইহা তাঁহার সৃষ্টির নিয়মবিরুদ্ধ। মানবকুলের মধ্যে তাঁহারাই দৃঢ়, তাঁহারাই কর্ম্মক্ষম, তাঁহারাই বলশালী, যাঁহারা অনেক সংগ্রামে পড়িয়াছেন ও জয় লাভ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি জীবনে অনেক রৌদ্র, অনেক বৃষ্টি সহ্য করেন, তাঁহারই দেহ দৃঢ় ও কর্ম্মক্ষম হয় যাহারা সম্পদের ও বিলাসের ক্রোড়ে লালিত, তাহারা শীতাতপ সহ্য করিতে পারে না। সেইরূপ যাহারা সংগ্রামবিহীন জীবন যাপন করে, তাহাদের অন্তরাত্মাও সুদৃঢ় হয় না। অতএব প্রলোভন ও পরীক্ষাকে জীবন গঠনের সহায় জানিয়া তদুপরি জয়শালী হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

উপাসনা—হলণ্ড দেশ সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। ইহার ভূমি সমুদ্রের জল অপেক্ষা নিম্ন। প্রজাগণ দেশ রক্ষার জন্য সমুদ্রের দিকে এক বাঁধ দিয়াছে, সেই কারণে সমুদ্রের জল ইহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। সেই বাঁধে একটী ছিদ্র করিয়া দিলে দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশ জলমগ্ন হইয়া যাইতে পারে, এই কারণে হলণ্ডবাসিগণ অতি সতর্কতার সহিত সমুদ্রের দিকে যে বাঁধ (Dyke) আছে তাহা রক্ষা করিয়া থাকে। সমুদ্রের জল হলণ্ডবাসিদিগকে ডুবাইবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত, যখন যে কোন ছিদ্র পায় তদ্দ্বারাই প্রবেশ করিতে থাকে, কিন্তু দেশবাসিগণ অতি সাবধানতার সহিত সেই সকল ছিদ্র বন্ধ করিয়া দেয়, এবং বহুব্যয়ে এই বাঁধ রক্ষা করে।

মানবজীবনের অবস্থার সহিত এই ঘটনাটীর বড় সুন্দর তুলনা হয়। ঈশ্বরের শক্তি ও করুণা মানব জীবনের দ্বারে সর্ব্বদাই অপেক্ষা করিতেছে, যখন সুবিধা পায়, তখনই মানব জীবনকে ডুবাইয়া ফেলে। বিষয় চিন্তার বাঁধ দিয়া মানুষ ঈশ্বরের করুণাকে দূরে রাখে। ধর্ম্মজীবনের সূচনায় মানুষ যখন এই করুণার জন্য জীবনের ভিতরে একটী ছিদ্র করিয়া দেয়, তখনই আস্তে আস্তে ঈশ্বরের শক্তি আসিয়া মানবের প্রাণকে অধিকার করে। ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে প্রার্থনা, উপাসনা এই ছিদ্রের কার্য্য করে। যখন মানুষ উপাসনার দ্বারটী খুলিয়া রাখে, তখন দেখা যায় ঈশ্বরের শক্তি আসিয়া মানুষের প্রাণকে অধিকার করিয়া বসিতেছে; যাঁহারা জীবনে সত্য উপাসনা, ব্যাকুল প্রার্থনা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারাই এই সত্যের সাক্ষ্য দিবেন।

এই দেখিতেছিলাম মানুষটা বড় সংসারী, টাকা টাকা করিয়া বেড়াইতেছিল, কিন্তু যেই উপাসনার দ্বার, প্রার্থনার ছিদ্র, খুলিয়া দিল, অমনি ব্রহ্মকৃপার জলে স্বার্থ সুখ সব ডুবিয়া গেল। ঈশ্বরের শক্তি আসিয়া সমস্ত স্থান অধিকার করিল। আবার অন্য দিকেও দেখিতে পাই লোকটা খুব উপাসনার কথা বলে, ধর্ম্মসমাজে আসে, কিন্তু জীবনে প্রেম নাই, পর নিন্দা পরচর্চ্চাতে বড় পটু। তখন বুঝিতে হইবে ঐ উপাসনার দ্বারটী বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ঈশ্বরের শক্তি আসিয়া জীবনে কাজ করিবার পথ রুদ্ধ হইয়াছে।

উপাসনা প্রার্থনা আর কি? ঈশ্বরের শক্তি আসিয়া জীবনকে অধিকার করুক বলিয়া আত্মাকে ঈশ্বরের দিকে ফিরান। আমি যাহা আছি তাহাই থাকিব এই ভাব লইয়া থাকিলে উপাসনা হয় না। সুরাপায়ী যেমন সজ্ঞানে পান করে, পরে সুরার অধীন হয়, মানুষ সেই প্রকার আপন ইচ্ছাতেই উপসনার দ্বার খোলে, পরে ঈশ্বরের শক্তির অধীন হইয়া যায়। প্রথম প্রথম মানুষ ভাবে কেবল উপাসনার ঘরে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিব। কিন্তু পরে দেখিতে পায় যে তাহার জীবনের সকল স্থান পূর্ণ করিয়া ঈশ্বরের দয়া ঈশ্বরের শক্তি কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে সত্যভাবে উপাসনা করে, সে জীবনে কোনও সীমা রাখিতে পারে না।

মানুষ আগে ভাবিতেছিল, বিষয়ক্ষেত্রে, খেলার স্থানে, আমোদের গৃহে ঈশ্বরকে স্থান দেওয়া হইবে না। কিন্তু ঐ উপাসনার দ্বার দিয়া তিনি মানব জীবনের সকল বিভাগ অধিকার করিয়া বসিলেন। তখন গোপনে বসিয়া মানুষ আর পাপচিন্তা করিতে পারে না। সেখানে ঈশ্বর তাহাকে লজ্জা দিয়া থাকেন। সে মানব চক্ষুর অজ্ঞাতস্থানে অন্যের বিরুদ্ধে একটী চিন্তা করিল, প্রাণ হইতে কে তাহাকে তিরস্কার করিল "ছি প্রেম বিরোধী কার্য্য করিলে।" এই উপাসনা ও প্রার্থনার দ্বার দিয়া ঈশ্বর মানব প্রাণকে সম্পূর্ণ রূপে অধিকার করেন। কত সময় মানুষ উপাসনাক্ষেত্রে এ দিকে, ওদিকে ছুটাছুটী করিয়া কাটায়, ঈশ্বরের সম্মুখীন হইতে চায় না, পাছে সে ধরা পড়ে। এই উপাসনা গৃহে মানব ঈশ্বরের করুণা বহন করিতে না পারিয়া আত্মসমর্পণ করে। তাই সাধক আপনার প্রেম হীনতা দেখিয়া এই প্রার্থনা করেন—

"তুমি ভাল বাস যেমন, আমি কি মা পারি তেমন,
আমায় ভাল বাসাও তেমন, আমার প্রতি তোমার যেমন।"

ঈশ্বর করুন আমরা জীবনে সত্য উপসনা অবলম্বন করিয়া, তাঁহার শক্তির সম্পূর্ণ অধীন হইয়া যাই।

মালা ও সূত্র—মণি সকল এবং পুষ্প সকল একত্রিত করিয়া এক একটী মালা রচিত হয়। এক এক ফুলের এক এক প্রকার আকার, এক এক রকম বর্ণ, এক এক রকম সৌরভ। এই সকল ফুল যখন চারিদিকে বিক্ষিপ্ত থাকে, তখন পরস্পরের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ থাকে না—তখন তাহারা সকলেই ভিন্ন, সকলেই পরস্পর হইতে দূরে দূরে অবস্থিত। কিন্তু এই সকল ফুল সূত্রের দ্বারা একত্র বদ্ধ হইলে তাহাদের পরস্পরের সঙ্গে একটী সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তখন তাহারা এক লক্ষ্য সাধনে মিলিত হয়। তাদের মধ্যে এক প্রকার একতা স্থাপিত হয়। কিন্তু এই যে সূত্র, যাহা এই সকল ফুলকে একত্রিত রাখিয়াছে, তাহা দেখা যায় না; উহা লুক্কায়িত থাকে। কিন্তু

লুক্কায়িত থাকিলেও উহা এক মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। চিন্তাশীল লোকেরা চিন্তাদ্বারা দেখিয়াছেন, আমাদের মনে প্রতি মুহূর্ত্তে কত প্রকার বিভিন্ন অবস্থার উদয় হইতেছে। এখন যে অবস্থা, পরক্ষণে আর তাহা দেখা যায় না। এখন হর্ষ পরক্ষণে বিষাদ। কখনও আশা, কখনও ভয়, কখনও সন্দেহ মনোমধ্যে কত তরঙ্গই উঠিতেছে। অবস্থার কতই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এক অবস্থার সহিত অন্য অবস্থার কোনও প্রকার মিল নাই, এই সকল হর্ষ বিষাদের মধ্যে বিচিত্রতা রহিয়াছে। কিন্তু এই যে অবস্থাগত তারতম্য,—বিচিত্রতা, ইহার মূলে এক প্রকার একতা আছে। ইহার মূলে এমন একটী সূত্র আছে, যাহা এই সমুদয়কে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াছে। সেই একতা—সেই সূত্র কি? এসমুদয় আমার, সমস্ত আমাতে সম্বদ্ধ, এই প্রকার জ্ঞান। মালার মধ্যে যেমন সূত্র লুক্কায়িত, সেইরূপ মনের সমুদয় পরিবর্ত্তনশীল ভাবের মূলে আমিত্ব লুক্কায়িত। তেমনি ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল জড় ও চেতন দেখিতেছি, যে সমুদয় পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের সহিত সাদৃশ্য রহিত, এসকলের মূলে কি সূত্র আছে? মনের ভাব সমূহের মধ্যে যেমন একতা আছে, তেমনি এই জড় ও চেতনকে কোন সূত্র একত্র বাঁধিয়াছে, অথবা এ সকল —পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ রহিত হইয়া বিদ্যমান আছে? নিমগ্ন চিত্তে দেখিলে দেখা যায়, ইহাদের মূলে এক মহাসূত্র বর্ত্তমান আছে। মণিগণ যেমন সূত্রে আবদ্ধ থাকে, তেমনি সমুদয় সূত্রের সূত্র—পরম সূত্র দ্বারা এসমস্ত আবদ্ধ রহিয়াছে। এই সূত্রের সূত্রকে দেখিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। জড়েতে এবং চেতনেতে তাঁহাকে সূত্ররূপে দেখিতে হইবে। —তিনি সমুদয় বস্তুতে ওতপ্রোত হইয়া আছেন, জ্ঞাননেত্রে ইহা বিশেষরূপে দেখিতে হইবে। যতক্ষণ তাঁহাকে এইরূপ আশ্রয় ও আধাররূপে দেখিতে পাওয়া না যায়, ততক্ষণ আমাদের সত্যজ্ঞান হয় না। পরমেশ্বর করুন আমরা যেন এই মালা—জড় ও চেতনরূপ অনন্ত মালা—এই মালার পরম সূত্রকে দর্শন করি। আমরা যেন আত্মার পরমাকাশে তাঁহাকে আত্মার পরমাত্মারূপে, আধার ও আশ্রয়রূপে প্রেমদাতা পিতারূপে এবং বহির্জগতে সমুদয় বিচিত্রতার মূলাধাররূপে সমুদয়ের নিয়ন্তা বিধাতারূপে সন্দর্শন করি।

বনে না মনে?—ফরীদ কহেন,—"বনের কণ্টক দলন করিয়া বনে বনে কেন ভ্রমণ কর? হৃদয়ের মধ্যে তিনি বসিয়া আছেন, অরণ্যে কেন তাঁহাকে অন্বেষণ কর।"

পরমেশ্বরকে লাভ করা না করা, আমাদের আত্মার অবস্থার উপর নির্ভর করে। আত্মা যদি তাঁহাকে লাভ করিবার অনুকূল অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে গৃহে, সংসারে জন কোলাহলের মধ্যে থাকিলেও আমরা ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারি। আর আত্মা যদি ঈশ্বর লাভের অনুকূল অবস্থায় না থাকে, তাহা হইলে, নির্জ্জন বনে প্রকৃতির প্রশান্ত ভাবের মধ্যে, সৌন্দর্য্য শোভার মধ্যেও আমরা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি না। মানুষ সংসারের অনেক দুশ্চিন্তাতে ক্লান্ত হইয়া, এখানকার পাপ তাপ, দুঃখ শোকে জর্জ্জরিত হইয়া, অনেক সময় আশা করে, নির্জ্জন বনে, গভীর অরণ্যে, বিজন গিরি-কান্তারে, পর্ব্বতের গুহাতে অন্বেষণ করিলে পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইব। যাহারা সংসারে থাকে তাহাদের পক্ষে নির্জ্জন বাস উপাদেয় সন্দেহ নাই। উত্তপ্ত চিত্তকে প্রশান্ত করিবার জন্য, বিক্ষিপ্ত মনকে সংযত করিবার জন্য, সময়ে সময়ে নির্জ্জন বাস নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু যে ব্যক্তির চিত্তে ব্যাকুলতা নাই, ঈশ্বরকে দর্শন করিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা নাই, সে নির্জ্জন বনে যাইয়া কি করিবে? তাঁহাকে লাভ করিবার প্রধান উপায় ব্যাকুলতা, প্রাণের গভীর আকাঙ্ক্ষা, ব্যাকুল ও সবল প্রার্থনা। যদি প্রাণে ব্যাকুলতা থাকে, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ থাকে, ঐকান্তিক নিষ্ঠা থাকে, তবে জন কোলাহলের মধ্যে সংসারের প্রবল ঝটিকার মধ্যেও প্রভু পরমেশ্বরের সন্নিধানে বাস করা যায়। এসব না থাকিলে নির্জ্জন বনে, বিজন গিরিগহ্বরে, কোথাও তাঁহাকে পাওয়া যায় না। হৃদয়েতে যে তাঁহাকে না পায়, সে তাঁহাকে বাহিরে কখনই পায় না। এই একটী সার সত্য কথা, ইহা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। জড়জগতে প্রকৃতির বিচিত্র শোভার মধ্যে তিনি আছেন, ইতিহাসে তাঁহার সত্তা রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে অন্তরে দেখে না সে কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পায় না। অন্তরে আত্মার পরমাত্মারূপে, আশ্রয় ও আধাররূপে তিনি নিত্য বাস করিতেছেন। সেইখানে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। অন্তরে অমৃতের আস্বাদন না করিলে আর কোথায় করিবে? নির্জ্জনেই যাই আর গৃহেই থাকি, অন্তরে না দেখিলে তাঁহাকে কোথাও দেখা যায় না। এইজন্য ভক্ত ফরীদ বলিয়াছেন,—"বনের কণ্টক দলন করিয়া বনে বনে কেন ভ্রমণ কর? হৃদয়ের মধ্যে তিনি বসিয়া আছেন, অরণ্যে কেন তাঁহাকে অন্বেষণ কর?" আমরা অন্তরে দেখি না, এইজন্য তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পাই না। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে অন্তরে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। প্রাণের প্রাণরূপে আত্মার আধাররূপে তাঁহাকে দেখ। তবে সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দেখিবে। প্রভু পরমেশ্বর কৃপা করুন আমরা যেন সর্ব্বদা তাঁহাকে অন্তরে দেখিতে চেষ্টা করি।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

চিত্ত-স্থৈর্য্য।

আমাদের মন কিরূপ চঞ্চল, অল্লাধিক পরিমাণে আমরা তাহার পরিচয় সর্ব্বদাই পাইয়া থাকি। মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; তাহাকে এক বিষয়ে ধরিয়া রাখা বিষম কষ্টকর ব্যাপার। ধর্ম্মসাধনের বিঘ্নরূপে যে সকল অন্তরায় বর্ত্তমান আছে, চিত্তচাঞ্চল্য তাহার মধ্যে একটী প্রধান। কোনও প্রকারে সাংসারের চিত্ত-বিক্ষেপকারী কার্য্য সকলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া উপাসনা করিতে আসিয়া বসিলাম, একটুকু সময় যাইতে না যাইতেই মন কোথায় চলিয়া গেল। আবার তাহাকে ধরিয়া আনিলাম,

আবার একটুকু সময় অতীত হইতে না হইতেই দেখি সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এই প্রকারে অনেক সময় উপাসনা-স্থলে শরীর থাকিলেও মন সেস্থানে থাকে না। এই অসুবিধা আমরা সকলেই কিছু না কিছু পরিমাণে ভোগ করিয়া থাকি। মনের উপর যেন দুইটী শক্তির কার্য্য হইয়া থাকে। একটী শক্তিতে মনকে উপাসনাতে আবদ্ধ রাখিতে চাহে, অপর শক্তি যেন তাহাকে অন্যত্র লইয়া যায়। এই সংগ্রাম সর্ব্বদাই চলিতেছে। এই সংগ্রামে যিনি কিয়ৎ পরিমাণে জয়যুক্ত হইতেছেন, ধর্ম্মসাধন তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য হইতেছে। এজন্য মনঃস্থৈর্য্য ধর্ম্মসাধনের পক্ষে একটী অতি গুরুতর প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সুমীমাংসার উপরেই ধর্ম্মসাধনের পন্থার কাঠিন্য ও সারল্য নির্ভর করিতেছে। কারণ সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের নিত্য বর্ত্তমান সত্তাসাগরে আমরা সর্ব্বদাই নিমগ্ন হইয়া থাকিলেও এক মাত্র অনবধানতা ও চিত্তের বিক্ষেপ বশতঃই তাঁহাকে আমরা অনুভব করিতে পারি না।

মনের প্রকৃতি নিতান্ত চঞ্চল হইলেও এবং সে নিরন্তর বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হইলেও একবারেই যে কোন বিষয়ে গাঢ়ভাবে ব্যাপৃত হইতে পারে না, তাহা নহে। নিয়ত চঞ্চলপ্রকৃতি মনও নানা সময়ে নানা বিষয়ে গাঢ়ভাবে লিপ্ত হইয়া থাকে।

আমরা জানি শিশুরাই সর্ব্বাপেক্ষা চঞ্চল। চঞ্চলতার দৃষ্টান্ত দিতে হইলেই শিশুদিগের উল্লেখ করিতে হয়। কিন্তু দেখ ঐ বালিকা কেমন মনোযোগের সহিত তাহার খেলার পুতুলগুলিকে সাজাইতেছে, কেমন গাঢ় মনোযোগের সহিত তাহাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। বালিকার উক্ত কার্য্য দেখিলে কি তাহাকে আর চঞ্চল বলিতে পারা যায়? সে তাহার আহার ভুলিয়া ঐ কার্য্য করিতেছে। আহ্বান কর, উত্তর নাই, তিরস্কার কর, চৈতন্য নাই, সে আপন মনে ক্রীড়াই করিতেছে। আবার চিন্তা করিয়া দেখ, শিশুরা যখন গল্প শুনিতে বসে, তখন কেমন তাহাদিগের মনোযোগ? একটী রূপকথা শুনিবার জন্য কেমন তাহাদের আগ্রহ? যাহারা অন্য সময় বারম্বার বলিয়া দিলেও একটী বিষয় মনে ধারণা করিতে পারে না, বারম্বার না বুঝাইয়া দিলে যাহারা অঙ্ক বা শিক্ষার অন্য বিষয় সকল মনে রাখিতে পারে না, এমন কি কোন একটা বস্তু স্থানান্তর হইলে, লইয়া আসিবার জন্য বলিয়া দিলে, যাহারা পথ হইতে হয় ত ফিরিয়া আসিয়া আবার জিজ্ঞাসা করে,—কোন্ বস্তু আনিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। তাহারাও কেমন মনোযোগের সহিত ঐ রূপকথা শুনে এবং একবার শুনিয়াই কেমন তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে সমর্থ হয়। বিদ্যালয়ে দেখা যায়, যখন আর কোন প্রকারেই শিশুদিগকে শান্ত করিতে পারা যায় না, তখন যদি বলা যায় এস তোমরা গল্প শুনিবে, অমনিই সকলে শান্তভাব ধারণ করে। এজন্য সুশিক্ষকগণ মধ্যে মধ্যে শিশুদিগকে গল্প শুনাইয়া, তাহাদিগকে শান্ত করেন এবং মনোযোগের সহিত অধ্যয়নের বিষয় সকলে অভিনিবিষ্ট করেন। খেলায় এবং গল্প শুনিতে যেমন শিশুদিগকে অতি গাঢ়ভাবে মনোযোগী হইতে দেখা যায়, বয়স্কগণের পক্ষেও সেরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যখন আমরা কোন উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হই, কত শীঘ্র তাহা পড়িয়া শেষ করিয়া থাকি। তখন কেহ যদি বিষয়ান্তরে মনোযোগ করিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করে, তাহাতে কত বিরক্ত হই। শিক্ষাপ্রদ অন্য বিষয়ের একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতে যে সময় লাগে, তত্তুল্য একখানি উপন্যাস পাঠে, আমাদের কত অল্প সময় লাগে, তাহা আমরা সকলেই জানি। অন্য বিষয় মনে করিয়া রাখা কেমন কষ্টকর; বারম্বার পড়িয়া পড়িয়া, তবে তাহা আয়ত্ত করিতে হয়। কিন্তু উপন্যাস খানি একবার পাঠ করিলেই তাহার সমস্ত ঘটনা স্মৃতিপটে মুদ্রিত হইয়া যায়। এই প্রকার যখন আমরা কোন সদ্বক্তার জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণ করি, তখন কত মনোযোগের সহিত তাহা শুনিয়া থাকি এবং তাঁহার বর্ণিত বিষয়গুলি আমাদের মনে কেমন মুদ্রিত হইয়া যায়। অভিনয় দর্শন করিতে গিয়া সকলকেই গাঢ়ভাবে মনোযোগ প্রদান করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও প্রকার মনোহর দৃশ্য দর্শন করিতে আমরা কেমন মনোযোগী হইয়া থাকি, আমাদিগকে এই সকল স্থানে ও এই সকল অবস্থাতে কেহ যদি দর্শন করেন, তবে তিনি আমাদিগকেই সেই চঞ্চলমতি লোক বলিয়া অনুভব করিতে পারেন না। এই প্রকার বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে যে আমাদের মন স্বভাবতঃ চঞ্চল হইলেও সে যে কোন বিষয়েই গাঢ়ভাবে নিযুক্ত হইতে পারে না এমন নহে। বরং বিষয় বিশেষে আমরা অতি সহজেই গাঢ় মনোযোগী হইয়া থাকি। এমন কি চঞ্চলমতি শিশুরাও বিষয়বিশেষে অতি গভীর মনোযোগের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া থাকে। তাহা হইলেই সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে আমাদের পক্ষে কোন বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কখনই তেমন কষ্টকর ব্যাপার নহে। সুতরাং ইহা বলা অত্যুক্তি নহে যে বিষয়বিশেষে আমরা অতি সহজেই গাঢ় মনোযোগ প্রদান করিতে পারি এবং দীর্ঘকাল কোন বিষয়ে আমরা গাঢ়ভাবে স্থির ও মগ্ন থাকিয়া যোগ দিতে পারি। তবে সকল বিষয়ে মন দিতে পারি না কেন?

তাহার হেতু অনুভব করাও কিছু তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। ইতিপূর্ব্বে যে কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল তাহাতে দেখা যাইতেছে যে আমরা কিরূপ বিষয়ে গাঢ় মনোযোগী হইয়া থাকি। যাহা আমাদিগকে তৃপ্তি দেয়—যাহা আমাদিগকে আরাম প্রদান করে, যাহাতে নিযুক্ত হইলে সুখের আস্বাদন পাইয়া থাকি, এরূপ বিষয়েই আমাদের গাঢ় অভিনিবেশ হইয়া থাকে। যাহা তেমন আশুপ্রীতিকর নয়, যাহা তেমন চিত্তের আকর্ষক নয়, তাহাতে মনকে নিযুক্ত করিতে হইলে অনেক সংগ্রামের প্রয়োজন হয়। শিশুর খেলার বস্তুতে আসক্ত হওয়া বা রূপকথায় গাঢ় মনোযোগী হওয়া বা বয়স্কের উপন্যাস পাঠ, কিম্বা মনোহর দৃশ্য দর্শনে গভীর মনোযোগ প্রদান একই কারণে হইয়া থাকে। অর্থাৎ সেই সকল বিষয় এমন কিছু প্রীতি প্রদান করে, এমন কিছু আরাম দেয়, যাহার পরিবর্ত্তে তখন অন্য কিছুরই জন্য চিত্তের আগ্রহের উদয় হয় না। ইহাদ্বারা সহজেই বোধ-গম্য হইতেছে, যে যাহা আরামদায়ক;

যাহা তৃপ্তিকর এবং যাহা অনুরাগের পাত্র, তাহাতেই মন সহজে ব্যাপৃত হয়, তাহাতেই মনের গতি সহজে হয়। সে বিষয় কঠোর পরিশ্রমসাধ্য হইলেও লোকে সহজে তাহাতে নিযুক্ত হইয়া থাকে।

যদি ইহা সত্য হয় যে প্রীতিকর, তৃপ্তিকর এবং অনুরাগের পাত্রেই লোকের মন সহজে নিমগ্ন হয়, তাহার অনুধ্যান করিতে লোকে সহজে সমর্থ হয়, তাহা হইলেই এই মীমাংসায় উপস্থিত হইতে হয়, যে আমাদের মন যে উপাসনায় তেমন নিমগ্ন হয় না,—চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, অনেক সংগ্রাম করিয়া, অনেক আয়াস সহকারে উপাসনায় মনকে নিয়োগ করিতে হয়, ইহার কারণ অন্য কিছু নয়, কেবল এই যে আমরা উপাসনায় সেরূপ তৃপ্তি পাই না; তেমন প্রীতি পাই না এবং যাঁহাকে লইয়া উপাসনা করিতে হয়, তিনি আমাদের তেমন অনুরাগের পাত্র নহেন।

সুতরাং মনঃস্থৈর্য্যের প্রধান সাধন—অনুরাগ সাধন। যাহাতে মনোনিবেশ করিতে হইবে, তাহাতে অনুরক্ত হইতে হইবে। অনুরাগের অভাবে যে কোন বিষয়েই গাঢ় মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। ঈশ্বর যদি আমাদের অনুরাগের পাত্র হন, তিনি যদি আমাদের চিত্তের প্রীতি ও তৃপ্তির কারণ হন, তাহা হইলে অতি সহজেই আমরা তাঁহার শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনে অভিনিবিষ্ট হইতে পারি। অনুরাগের অভাবেই আমাদের উপাসনা এমন অরুচিকর এবং চিত্তের অশান্তির কারণ স্বরূপ হয়; অনুরাগের অভাবেই আমাদের চিত্তের বিক্ষেপ এত প্রবল হইয়া থাকে। সুতরাং চিত্ত স্থৈর্য্যের প্রধান সাধন অনুরাগ সাধন। ঈশ্বরে যাঁহারা অনুরক্ত, যাঁহারা তাঁহাতে অনুরাগশীল, তাঁহারা অতি সহজেই তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হন এবং স্থির ভাবে তাঁহাতে মন সংস্থাপন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। আমরা জানি আমাদের উপাস্য দেবতা আনন্দ স্বরূপ, অমৃতময় পুরুষ তাঁহাতে আসক্ত হইতে পারিলে, চিত্তের অবসাদের কোনই সম্ভাবনা নাই বরং তাহার পরিবর্ত্তে মনের প্রসন্নতাই লাভ হইয়া থাকে। তাঁহাতে মনোনিবেশ করা কিছু কঠোর ও বিরক্তিকর পদার্থে মন প্রদানের ন্যায়ও নহে। কিন্তু অতি উপাদেয় পদার্থে মনোসংযোগের ন্যায় সুমিষ্ট। সুতরাং তাঁহাতে অনুরক্ত হওয়া কিছু কষ্টকর বা তেমন বিরক্তিকর সাধন নহে।

সচরাচর আমরা যে সকল পদার্থে বা বিষয়ে অনুরক্ত হই, তাহার হেতু অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যাহা আমাদের সঙ্গে অধিক সময় থাকে, তাহাদের প্রতিই আমাদের অনুরাগ সহজে জন্মিয়া থাকে। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অনুরাগের পাত্র পরিবারস্থ জনগণ। তাহার মধ্যে আবার মাতা পিতা এবং ভাই ভগিনী প্রভৃতির প্রতি অধিক অনুরাগ সহজে হইয়া থাকে। কারণ তাঁহাদের সহিত সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতে হয়। তৎপরে প্রতিবেশী এবং গ্রামস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণের উপর আমাদের অনুরাগ সহজে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যে সকল লোকের সহিত একত্র কাজ করা যায় একত্র শিক্ষা করা যায় সেই সকল লোকের প্রতিও সহজে আমাদের অনুরাগ জন্মিয়া থাকে। পরিবারস্থ সকলেই যে খুব সুন্দর বা গুণবান তাহা কখনও নহে। সকলেই যে আমাদিগকে সমান ভাবে আদর করিয়া থাকে বা সকলেই যে আমাদের সমান উপকারী, তাহাও নহে। তথাপি তাঁহাদের প্রতি অপর পরিবারস্থ জনগণের অপেক্ষা আমাদের অনুরাগ জন্মিয়া থাকে। আমরা অন্য লোক অপেক্ষা তাঁহাদের প্রতি অধিক পক্ষপাতি হই। এইরূপে উত্তরোত্তর যাহাদের সহিত আমাদের সংস্রব কম বা যাহাদের সহিত জানা শুনা কম, তাহাদের প্রতি অনুরাগেরও সেই হারে ন্যূনতা হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যাহাদের সহিত আলাপ পরিচয় অধিক এবং যাহাদের সহিত অধিক সময় যাপন করা যায়, তাঁহারাই আমাদের অনুরাগ আকর্ষণ করে। এইরূপে, নিজের গ্রাম অপর গ্রাম হইতে কদর্য্য হইলেও সুন্দর, নিজের ভাষা অপর ভাষাপেক্ষা হইলেও অনুরাগের পাত্র হইয়া থাকে। এই নিয়ম প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়, যে যাহার সহিত অধিক সময় যাপন করা যায় তাহাতেই অনুরাগ সহজে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং অনুরাগ লাভের মূল হেতু অধিক সময় একত্র অবস্থিতি, অধিক পরিমাণে জানা শুনা। অনুরাগের হেতু যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ত আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের প্রতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুরক্ত হওয়া উচিত। তিনিই ত সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের অনুরাগের পাত্র হইতে পারেন। কারণ তাঁহার সহিত যেমন অধিক সময় আমরা যাপন করি, তেমন ত অপর কাহারও সহিত একত্র থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তবে তাঁহাতে আমাদের অনুরাগের এত অল্পতা কেন। তাহার কারণ আমরা যে সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকি, তাহা আমাদের জ্ঞাতসারে নহে। তিনি যে আমাদের সঙ্গে আমাদের সহায়, সুহৃদ ও আশ্রয় হইয়া আছেন, তাহা আমরা তেমন অনুভব করি না।

তাঁহাতে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিয়াও আমরা তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা দূরেই মনে করি। আমাদের উদাসীনতা তাঁহার প্রতি যেমন, এমন সংসারের আর কিছুরই সম্বন্ধে নহে। আমাদের মধ্যে যাঁহার এই উদাসীনতা যে পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে বা তাঁহার বিদ্যমানতা যিনি যে পরিমাণে অনুভব করিতে সমর্থ, তিনি তাঁহাতে সেই পরিমাণে অনুরক্ত হইতে পারেন। তাঁহার সহবাস জ্ঞাতসারে হইলে, তাঁহাতে অনুরাগী হইবার কোনই বাধা থাকে না। কারণ তিনি চিরসুন্দর, চিরঅনুকূল, আমাদের প্রাণের চিরআরামের হেতু, তাঁহার এই বিদ্যমানতা অনুভব হইতেই তাঁহাতে আমাদের প্রকৃত অনুরাগের সঞ্চার হইয়া থাকে।

এই নিত্য-বর্ত্তমান ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা অনুভব করিতে হইলে, যত অধিক পরিমাণে তাঁহার স্মরণ মননে নিযুক্ত হওয়া যাইবে, যত অধিক পরিমাণে তাঁহার গুণরাজির অনুধ্যান ও মহিমা কীর্ত্তনে ব্যাপৃত থাকা যাইবে, ততই সফলকাম হইতে পারা যাইবে। নিত্য এইরূপ অভ্যাস দ্বারা তাঁহার বর্ত্তমানতা প্রাণে অনুভব করিতে হইবে, অভ্যাসই তাঁহার বর্ত্তমানতা

অনুভবের প্রকৃষ্ট উপায়। এজন্য গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

"অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন॥"

অর্থাৎ হে পার্থ অভ্যাসরূপ উপায় দ্বারা একাগ্র এবং অনন্যগামী চিত্তদ্বারা প্রভাময় পরম পুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং আমরা যাঁহার সত্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিয়াও অনবধানতা ও উদাসীনতা বশতঃ তাঁহাতে অনুরক্ত হইতে পারিতেছি না এবং তাঁহার উপাসনায় বিফলমনোরথ হইতেছি, বারম্বার স্মরণ, মনন, অনুধ্যান ও তাঁহার গুণ এবং মহিমা কীর্ত্তন দ্বারা সেই উদাসীনতা তিরোহিত করিয়া, তাঁহার সহবাসে অধিক সময় যাপন করিতে হইবে, এবং অভ্যাস দ্বারা তাঁহাকে ক্রমশঃ প্রিয় রূপে অনুভব করিতে হইবে। তাঁহাতে একবার অনুরাগ বদ্ধমূল হইলে তাঁহার পূজা অর্চনায় মনোনিবেশ করা আর কঠিন বা অপ্রীতিকর কার্য্যের মধ্যে থাকিবে না। সুতরাং চিত্ত-স্থৈর্য্যের প্রধান ও সহজ উপায় অভ্যাস যোগে তাঁহার স্মরণ মনন কীর্ত্তনে প্রতি-নিয়ত নিযুক্ত হওয়া। চিত্ত-স্থৈর্য্যের জন্য প্রাণায়াম প্রভৃতি বাহ্য উপায় সকলও অবলম্বিত হইয়া থাকে, কিন্তু অনুরাগ সাধনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল অনন্যসাধারণ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন বা বর্ত্তমান সময়ে যে সকল গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া মানব মনের উৎকর্ষের আশ্চর্য্য পরিচয় দিতেছেন, যাহা সাধারণ জনগণের পক্ষে অলৌকিক ব্যাপারের ন্যায় হইতেছে, তাহাতে তাঁহাদের সামান্য মনঃস্থৈর্য্যের প্রয়োজন হয় না। তাঁহাদের এক এক-জনের গভীর মনোযোগের সংবাদ শুনিয়া অবাক হইয়া যাইতে হয়। অনেক সময় তাঁহারা বাহ্য জ্ঞান হারা হইয়া সেই সকল গূঢ় তত্ত্বের অনুধ্যানে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। দিনের পর দিন এই ভাবে তাঁহারা গাঢ় অভিনিবেশ সহকারে বিষয় বিশেষের চিন্তায় নিযুক্ত থাকেন। এই সকল বৈজ্ঞানিকগণ কিছু প্রাণায়াম বা তৎসদৃশ অন্য কোন উপায় অবলম্বন করেন না, কিন্তু দৃঢ়তার সহিত অভ্যাস দ্বারাই এ প্রকার মনঃস্থৈর্য্য সাধনে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। সঙ্গীত ও বাদ্য শিক্ষা করিতে এবং চিত্র বিদ্যা প্রভৃতি সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যে কত গভীর মনোযোগ প্রদান করিতে হয় এবং কত দীর্ঘকাল গাঢ় অভিনিবেশের সহিত সেই সকল কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তবে সিদ্ধমনোরথ হওয়া যায়। ইহারাও কিছু প্রাণায়ামাদির অনুসরণ করেন না। একমাত্র অভ্যাস অনুরাগ সহকারে গাঢ় মনোনিবেশই তাঁহাদের কৃতকার্য্য হইবার প্রধান কারণ।

সুতরাং প্রতিনিয়ত অভ্যাস দ্বারাই সেই নিত্য বর্ত্তমান পরমেশ্বরের সত্তানুভব করিতে হইবে এবং তাঁহার সত্তানুভব হইলেই, তাঁহার প্রতি অনুরাগ এবং মনের স্থিরতাও তৎসঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম—সার্ব্বভৌমিক ও জাতীয়।

(প্রাপ্ত)

(নাম স্বাক্ষর পূর্ব্বক যে সকল প্রাপ্ত প্রবন্ধ তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইবে তাহার মতামতের জন্য লেখকই দায়ী।)

("তত্ত্ববিদ্যা সমিতি"তে পঠিত ও বিবৃত প্রবন্ধের সারাংশ।)

কোন বিশেষ দেশ, কাল, জাতি বা ব্যক্তির উপর ব্রাহ্মধর্ম্ম নির্ভর করে না, অনুকূল অবস্থা সংঘটনে সকল দেশে, সকল কালে, সকল জাতি ও ব্যক্তিই বিশুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আবিষ্কার করিতে পারে। কোন বিশেষ শাস্ত্র বা গুরুর উপর ব্রাহ্মধর্ম্ম নির্ভর করে না, সত্যমাত্রই ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্র, সত্যের শিক্ষক মাত্রই ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরু। কোন জাতি, সম্প্রদায় বা ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের একমাত্র অধিকারী নহে, উপযুক্ত সাধন সম্পন্ন প্রত্যেক জাতি, সম্প্রদায় ও ব্যক্তিই ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকারী। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধারণত্ব ও সার্ব্বভৌমিকত্ব।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়ের অনুকূল অবস্থা অনেক স্থলেই বিশেষ বিশেষ দেশ কাল, ও জাতির মধ্যে উপস্থিত হয়। বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র ও গুরু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদন করেন; বিশেষ বিশেষ জাতি, সম্প্রদায় বা ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ আবিষ্কর্ত্তা বা রক্ষকরূপে জগতের সমক্ষে উপস্থিত হন; ইহা হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব ও জাতীয়তা উৎপন্ন হয়।

জাতীয়তার আর একটী বিশেষ কারণ এই,—অনেক উৎকৃষ্ট ও সুন্দর দেশ আছে, অথচ প্রকৃতিস্থ মানব মাত্রেরই পক্ষে স্বদেশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়; অনেক উৎকৃষ্ট ও মধুর ভাষা আছে, অথচ মাতৃভাষা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়; অনেক উৎকৃষ্ট নারী আছেন, অথচ স্বীয় মাতা, ভার্য্যা ও ভগিনী সকলেরই অধিক প্রিয়; অনেক শিশু সন্তান আছে, অথচ নিজ সন্তান সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহাস্পদ, এই কারণেই সকল শাস্ত্র, সকল গুরু, সকল সাধু-জীবন শ্রদ্ধার বস্তু হইলেও দেশীয় শাস্ত্র, গুরু ও সাধুজীবন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় এবং ধর্ম্মজীবনের উপযোগী। এই নিয়ম সাধারণ, কেবল যেখানে কোন জাতি, সম্প্রদায় বা ব্যক্তি কোন বিশেষ কারণে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে জাতীয়তা বিহীন হইয়া গিয়াছে, সেখানেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

জাতীয়তা যেখানে যত প্রবল, যে জাতির সভ্যতা যত উচ্চ ও প্রাচীন, সেই জাতির মধ্যে বিদেশ-জাত ধর্ম্ম প্রচার করা তত কঠিন। অপেক্ষাকৃত অসভ্য, অনুন্নত জাতির মধ্যে নূতন ও বিদেশীয় ধর্ম্ম প্রচার করা অপেক্ষাকৃত সহজ। অসভ্য ব্রিটন ও জার্ম্মান জাতির মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করা তাদৃশ কঠিন হয় নাই, কিন্তু সুসভ্য গ্রীক্ ও রোমান্ জাতি সহজে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই এবং যখন করিল, তখন ইহাকে তাহাদের জাতীয় দর্শন ও দেব-তত্ত্বের মিশ্রণে এতদূর পরিবর্ত্তিত করিল যে ইহা আর সেই আদিম খ্রীষ্টধর্ম্ম রহিল না। হিন্দু-জাতির সভ্যতা এত প্রাচীন ও সুদৃঢ়, এবং জাতীয়ভাব এত প্রবল, যে এই জাতি এখন পর্য্যন্ত কোন বিদেশীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক অধিবাসী মুসলমান বটে,

কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীস্থ লোক। আর বঙ্গদেশ অনেক কাল হইতেই ধর্ম্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে হিন্দুজাতি সমূহের মধ্যে অপেক্ষাকৃত হীন বলিয়া পরিচিত। আর, ইহাও ঠিক যে বঙ্গদেশের মুসলমান ধর্ম্ম খাঁটি মুসলমান ধর্ম্ম নহে, পীর পূজা ও হিন্দু দেবদেবীতে বিশ্বাস ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহাকে অনেক পরিমাণে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অনুরূপ করিয়া তুলিয়াছে।

এ দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে দেশীয় প্রণালী অবলম্বন করা উচিত; ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। দেশীয় শাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক শ্লোকোদ্ধার, দেশীয় সাধু ও সাধ্বীদিগের জীবন ও জীবন-ঘটিত আখ্যায়িকার বহুল প্রচার, সংকীর্ত্তন ও কথকতা প্রভৃতি দেশীয় প্রচার-প্রণালী অবলম্বন, বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে যতদূর সম্ভব দেশীয় প্রথার অনুসরণ, এই সমুদায়ের প্রয়োজনীয়তা অল্লাধিক পরিমাণে সকলেই স্বীকার করেন। আমি এই সকল বিষয়ে বিশেষ ভাবে কিছু বলিতে চাই না। আমি ইহা অপেক্ষা আরো গাঢ়তর জাতীয়তার পক্ষপাতী। এই গাঢ়তর জাতীয়তার অর্থ কি তাহাই বলিতেছি।

একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক, যাঁহার শিক্ষা জাতীয় ভাবে হয় নাই, যিনি জাতীয় শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, সুতরাং স্বভাবতঃ জাতীয়তার বিশেষ পক্ষপাতী নহেন, তিনি আমাকে একদিন বলিলেন, "আজকাল ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুশাস্ত্র-প্রতিপাদিত বলিয়া ব্যাখ্যা না করিলে লোকে ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনিতে চায় না, আর উক্তভাবে প্রচার করিলে লোকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শুনে।" আমার বোধ হয় অনেকেই এই কথার সত্যতায় সাক্ষ্য দিবেন। এরূপ হইবার দুইটি কারণ আছে। প্রথম কারণ হিন্দু জাতির বদ্ধমূল জাতীয়তা। দ্বিতীয় কারণ এই যে আজকাল হিন্দুশাস্ত্রের বহুল প্রচার বশতঃ লোকে দেখিতে পাইতেছে যে ব্রাহ্মেরা এমন কোন উচ্চ কথা বলিতেছেন না, ধর্ম্মমত বা, ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে এমন কোন সত্য প্রচার করিতেছেন না যাহা হিন্দুশাস্ত্রে নাই। আমি হিন্দুশাস্ত্রের যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে আমার এই ধারণা হইয়াছে, যে উপনিষদ্-লেখক ঋষিগণ অতি উচ্চ অঙ্গের ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যায় ব্রাহ্মধর্ম্ম উপনিষদ্ প্রতিপাদিত ধর্ম্মরূপেই প্রথমে প্রচারিত হইয়াছিল, এবং আদি ব্রাহ্মসমাজ বরাবরই ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকত্ব স্বীকার করিয়াও ইহাকে হিন্দুশাস্ত্র প্রতিপাদিত ধর্ম্মরূপে প্রচার করিয়া আসিতেছেন। আমি আদি ব্রাহ্মসমাজের আত্যন্তিক সঙ্কীর্ণতা ও রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী নহি, কিন্তু উক্ত সমাজের এই মতের সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি যে হিন্দুজাতীয় ব্রাহ্মদের পক্ষে উপনিষদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করা উচিত এবং হিন্দুজাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে উপনিষদ্ প্রতিপাদিত ধর্ম্মরূপে প্রচার করা উচিত। এই মতের প্রধান প্রধান যুক্তি গুলি আমি পরে পরে উল্লেখ করিতেছি।

১। ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক ও শাস্ত্রনিরপেক্ষ ধর্ম্ম বটে, কিন্তু উপনিষদ্ এই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মই শিক্ষা দিতেছেন, সুতরাং ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক শাস্ত্র অর্থাৎ ধর্ম্ম-সাহিত্য-রূপে গ্রহণ করা আবশ্যক।

২। ইহা দেশীয় শাস্ত্র, ইহার প্রতি আমাদের স্বভাবতঃই বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকৃষ্ট হয়, সুতরাং ইহার উচ্চ শিক্ষা আমরা অন্যান্য শাস্ত্রের শিক্ষা অপেক্ষা সহজতররূপে গ্রহণ করিতে সক্ষম।

৩। সাধ্য ও সুবিধা অনুসারে সমুদায় শাস্ত্র ও শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণই উচিত বটে; কিন্তু বিশেষ ভাবে কোন শাস্ত্র ও শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ না করিলে ধর্ম্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে শৈথিল্য ও স্বেচ্ছাচারিতা আসিয়া পড়ে। ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ অবস্থা এখন এইরূপ। এমন অনেক ব্রাহ্মপরিবার আছে, যেখানে নিয়মিতরূপে কোন শাস্ত্রাধ্যয়ন হয় না, কোন সাধুজীবনের আলোচনা হয় না। এই শৈথিল্য ও স্বেচ্ছাচারিতা দূর করিবার পক্ষে ব্রহ্মবাদ-প্রতিপাদক স্বদেশীয় উপনিষদ্ শাস্ত্রের এবং স্বদেশীয় সাধুজীবনের বিশেষ আলোচনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকর।

৪। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় হিন্দুজাতির মধ্যে উপনিষদ্-প্রতিপাদিত ধর্ম্মই প্রচার করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদ বেদান্তের অভ্রান্ততা অস্বীকার করিয়াও ব্রাহ্মধর্ম্মকে বেদান্ত-প্রতিপাদিত ধর্ম্মরূপেই প্রচার করেন। তাঁহার ধর্ম্মজীবন ও উপদেশ, যদ্দ্বারা এদেশীয় ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্গপুষ্টি ও সৌষ্ঠব সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ উপনিষদনুপ্রাণিত। সুতরাং ঐতিহাসিক ভাবে দেখিতে গেলে আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম অনেকাংশেই উপনিষদ্ প্রতিষ্ঠিত ও উপনিষদনুপ্রাণিত। ইহার উপাসনা-প্রণালী প্রায় সম্পূর্ণরূপেই উপনিষদ্ প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মকে উপনিষদ্ প্রতিপাদিত ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিলে যুক্তি বা ইতিহাস কিছুরই বিরুদ্ধাচরণ হইবে না, এবং ইহা একটী নূতন কার্য্যও হইবে না।

৫। ব্রাহ্মসমাজ ইদানীং কার্য্যতঃ অনেক পরিমাণে উপনিষদ্ হইতে দূরে পড়িয়াছেন, উপনিষদের আলোচনা ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহা হইতে কয়েকটী বিষময় ফল ফলিয়াছে— (১) গভীর জ্ঞানালোচনায় শৈথিল্য, (২) উপাসনার গাঢ়তার অভাব, (৩) গভীর ধ্যান ধারণায় বিতৃষ্ণা। এই অবস্থা বেশি দিন চলিলে ব্রাহ্মসমাজ আধ্যাত্মিকতা-বিহীন সমাজসংস্কারক দল রূপে পরিণত হইবে এবং সমাজসংস্কারও প্রকৃত সংস্কার না হইয়া বাহ্য সভ্যতা ও স্বেচ্ছাচারিতার আকার ধারণ করিবে। পূর্ব্বপুরুষদিগের যুগযুগান্তরব্যাপী সাধনালব্ধ সঞ্চিত ধর্ম্মাভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত হইলে, এরূপ আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী। গাছের কাটা ডাল শীঘ্রই শুকাইয়া যায়।

৬। এককালে এদেশের শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় নিরবচ্ছিন্ন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে অনেক পরিমাণে জাতীয়তাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেশের সর্ব্বসাধারণও অনেক পরিমাণে শাস্ত্রালোচনা-বঞ্চিত ছিলেন। সেই সময়ে জাতীয়তা নিরপেক্ষ প্রচার অনেক পরিমাণে কার্য্যকর হইয়াছিল। তখন ইংরেজির একাধিপত্য ছিল, সুতরাং ইংরেজি উচ্চ শিক্ষা-প্রাপ্ত, ইংরেজি

ভাষায় সুবক্তা ও সুলেখক মহাত্মা কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সহযোগিগণের ইংরেজি ভাবাপন্ন প্রচারচেষ্টা অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছিল। আজকাল জাতীয়তার বিশেষ অভ্যুত্থান ও জাতীয় ধর্ম্ম-সাহিত্যের বহুল প্রচার বশতঃ যুগ-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নূতন যুগে যুগের উপযোগী প্রচার-প্রণালী অবলম্বন না করিলে প্রচারচেষ্টা তাদৃশ সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। কেশব বাবুর সম্বন্ধে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে তিনি শেষ জীবনে অত্যন্ত হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার *Liberal and New Dispensation* পত্রে "Our Return to the Vedanta" শীর্ষক একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বা প্যারা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে লেখক তাঁহার সধর্ম্মাবলম্বীদিগের হইয়া এই লিখেন যে তাঁহারা বৈদান্তিক ধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আরও লিখেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তিমূল অনেক দিন পূর্ব্বেই উপনিষদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৭। সমুদায় হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে আমি যে উপনিষদ্‌কে বিশেষরূপে অবলম্বনীয় বলিয়া উল্লেখ করিতেছি, তাহার কারণ এই যে আমি হিন্দুশাস্ত্র-সমূহের মধ্যে কেবল উপনিষদ্‌কেই অনন্ত পূর্ণপরব্রহ্ম-প্রতিপাদক শাস্ত্র বলিয়া মনে করি। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি শাস্ত্রও অনেক স্থলে আপন আপন দেবতাকে পরব্রহ্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন বটে, কিন্তু অন্যান্য স্থলে আবার এই সকল দেবতাকেই সাকারও পরিমিতরূপে বর্ণনা করেন। আর একটী কারণ এই যে উপনিষদ্‌কে সকল শ্রেণীর হিন্দুই ভক্তি করেন। ইহা হিন্দুর অসাম্প্রদায়িক শাস্ত্র। অন্যান্য শাস্ত্র সাম্প্রদায়িক, সর্ব্ব-মান্য নহে। এমন কি বেদের সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ শ্রুতি বলিয়া মানাস্পদ হইলেও তৎপ্রতিপাদিত দেব-পূজা ও যজ্ঞাদি ক্রিয়া বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ের নিন্দার বস্তু। কিন্তু উপনিষদ্-প্রতিপাদিত ব্রহ্মোপাসনা সকল সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধার বস্তু।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসীতানাথ দত্ত।

ব্রাহ্মসমাজ।

উৎসব—শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি উৎসব উপলক্ষে "ধর্ম্মের শিক্ষা" বিষয়ে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন এবং উৎসব উপলক্ষে উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রতিনিধি নিয়োগ—জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন উপলক্ষে মান্দ্রাজ নগরে একেশ্বর বাদীদিগের যে সম্মিলন হইবে, তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বিএ শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু মহাশয়গণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রাক্কালে লণ্ডনের একেশ্বরবাদিগণ এসেক্সহলে তাঁহার বিদায় সূচক এক সভা করেন। মিঃ আই এম্, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সহানুভূতি এবং শুভইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। উক্ত সভায় অনেক গণ্যমান্য ভিন্ন ভিন্ন সহরবাসী একেশ্বরবাদিগণ উপস্থিত ছিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম মাঘোৎসবের কার্য্য প্রণালী।

নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আগামী মাঘোৎসব সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে এই প্রণালীর কোনও কোনও অংশের পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। আমরা ব্রাহ্ম এবং ধর্ম্মানুরাগী প্রত্যেককে এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি।

১লা মাঘ (১৪ই জানুয়ারি) সোমবার—ব্রাহ্ম পরিবারে, ও ব্রাহ্মছাত্রনিবাসে ব্রাহ্ম সমাজের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা।

২রা মাঘ—(১৫ই জা) মঙ্গলবার—উদ্বোধন।

৩রা মাঘ—(১৬ই জা) বুধবার—প্রাতে উপাসনা; সায়ংকালে—বক্তৃতা।

৪ঠা মাঘ—(১৭ই জা) বৃহস্পতিবার—প্রাতে উপাসনা; সায়ংকালে—ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক উৎসব।

৫ই মাঘ—(১৮ই জা) শুক্রবার—প্রাতে উপাসনা; সায়ংকালে—সঙ্গত সভার উৎসব।

৬ই মাঘ—(১৯শে জা) শনিবার—প্রাতে উপাসনা; সায়ংকালে—ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে পাঠ।

৭ই মাঘ—(২০শে জা) রবিবার—প্রাতে উপাসনা; বৈকালে—বাহিরে প্রচার; সায়ংকালে—উপাসনা।

৮ই মাঘ—(২১শে জা) সোমবার—প্রাতে উপাসনা; বৈকালে—রবিবাসরিক বিদ্যালয়ের উৎসব; সায়ংকালে—বক্তৃতা।

৯ই মাঘ—(২২শে জা) মঙ্গলবার—প্রাতে ব্রাহ্মিকা সমাজ; মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মসম্মিলন, সায়ংকালে—বার্ষিক সভা।

১০ই মাঘ—(২৩শে জা) বুধবার—প্রাতে উপাসকমণ্ডলীর উৎসব, বৈকালে—নগর কীর্ত্তন; সায়ংকালে—উপাসনা।

১১ই মাঘ—(২৪শে জা) বৃহস্পতিবার—সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসব।

১২ই মাঘ—(২৫শে জা) শুক্রবার—প্রাতে সাধন আশ্রমের উৎসব; মধ্যাহ্নে—আলোচনা এবং সায়ংকালে—বক্তৃতা।

১৩ই মাঘ—(২৬শে জা) শনিবার—প্রাতে উপাসনা; বৈকালে—বালক বালিকাসম্মিলন। ছাত্রসমাজের উৎসব।

১৪ই মাঘ—(২৭শে জা) রবিবার—ব্রাহ্ম সম্মিলনীর উৎসব।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ই জানুয়ারি শুক্রবার ৫½ ঘটিকার সময় সাঃ ব্রাঃ সমাজমন্দিরে অধ্যক্ষ সভার চতুর্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব।

২। নিয়মাবলী সংশোধন।

৩। বিবিধ।

ভোটিং পত্র।

আগামী বর্ষের অধ্যক্ষ সভা গঠনের নিমিত্ত ভোটিং পত্র সভ্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। যদি কোন সভ্য ভোটিং পত্র প্রাপ্ত না হইয়া থাকেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে জানাইলে পাইতে পারিবেন। আগামী ৫ই জানুয়ারি ১৮৯৫ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ভোটিং পত্র পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ
২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১লা পৌষ ১৩০২

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য
সহকারী সম্পাদক।

পঞ্চষষ্টিতম মাঘোৎসব উপলক্ষে ১লা হইতে ১৫ই মাঘ পর্য্যন্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যালয়ের পুস্তক সকল নিম্ন লিখিত নির্দ্দিষ্ট নগদ মূল্যে বিক্রীত হইবে। মফস্বল হইতে এই সময়ের মধ্যে কেহ মূল্য পাঠাইলে ভি, পি পার্শেলে পুস্তক পাঠাইতে পত্র লিখিলে উক্ত-রূপ সুলভ মূল্যে বই পাইতে পারিবেন।

অঞ্জলি ৷৷৶
অন্নপূর্ণা চরিত ১৲
*অধ্যাত্ম যোগ ও প্রেম সাধন ।০ স্থলে ৶
*অলর্ক চরিত ।০ „ ৶০
অমরকীর্ত্তি বা ফাদার ডামিয়নের জীবন চরিত ৷৷
*আলোক ।০ স্থলে ৶
*আত্ম-পরীক্ষা ৴১৫ স্থলে ৴১০
আত্মোন্নতি ৶০
আনন্দ লীলা ৵০
আহ্বান ৴০
আত্মচিন্তা (পাপীর নবজীবন প্রণেতা কৃত) ৶০
আখ্যান কুসুম ।৴০
আদর্শ নরনারী ৵০
*আসাম ভ্রমণ ৷০
ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও মানবাত্মার স্বাধীনতা এবং এতদুভয়ের সামঞ্জস্য ।৵০
*উপনিষদঃ (ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই ছয়খানি উপনিষদের সরল টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ) ১৲ স্থলে ৷৵০
*উপহার ।০ স্থলে ৶০
*উপদেশমালা (আচার্য্য গণের উপদেশ) ।৵০ স্থলে ৶০
উপন্যাস মালা ৴১০
উদ্গীথা ।০
এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব ৴১০
*কবির (তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ) ।০ স্থলে ৶০
*কেন আছি ? ৴১০
কারাকুসুমিকা ।৵০
কুমুদনাথ ৵০
কুমুদিনী চরিত ।০
কৃষকবালা ।৵০
*ক্রিয়াশীল ব্রহ্ম ৴৫
খাসিয়া জাতি ও খাসিয়া মিসন ৴০
*গৃহধর্ম্ম(পরিবর্দ্ধিত) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত ।৵০ স্থলে ।০
গান ও বচন ৵০
চানক্য নীতি ৴১০
চিন্তাশতক ৶০ স্থলে ৵০
চরিত রহস্য ।০ „ ৵
*চিন্তাকণিকা (বাবু সীতানাথ দত্ত কৃত) ৴১০
*চিন্তামঞ্জরী ৶০ স্থলে ৵০
চিন্তাবিন্দু ৵০
চিরদিন কি দুঃখে যায় ? ৵০
ছায়াময়ী পরিণয় (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত ৷৷০
*জাতিভেদ(১ম প্রবন্ধ) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত ৴১০
*জাতিভেদ ২য় প্রবন্ধ (ঐ) ৵০ স্থলে ৴১০
জাতিভেদ ৴১০
.জীবনকাব্য (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও অন্য কয়েক্ জনের লিখিত পদ্য) ৵০ স্থলে ৴০
জীবনালোক (কাপড়ের মলাট) ।৵০ স্থলে ।১০
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি ৷৷০
জাতীয় সংগীত ৶০ স্থলে ৵০
জাগ্রত জীবন ৴০
জীবন্ত ও মৃতধর্ম্ম ৷৷০
জীবনছায়া ৵০
জ্যোতিকণা ৴০
ড্রিঙ্কিং ।০
তীর্থযাত্রা ৷৷০ স্থলে ।৵০
*তত্ত্ব কৌমুদী একত্রে বাঁধা প্রতিখণ্ড ২৲
ঐ ১৫ ভাগ একত্রে লইলে ১৫৲
*দাস ৵০ স্থলে ৴০
*দীপ্তি ঐ ৴১০
*দুইখানি ছবি ৷০ „ ৷৵০
*দীপ্তশিরার অভিষেক ৴১০
দয়ানন্দ সরস্বতীর জীবন চরিত ৴১০
*ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা (বাবু রাজনারায়ণ বসু কৃত ৷৷০ স্থলে ।৵০
ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর (পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ (গোস্বামী কৃত) ৴০ স্থলে ৴১০
ধর্ম্মকুসুম ৴০ „ ৴১০
*ধর্ম্মজিজ্ঞাসা (বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত, ১ম ভাগ, ২য় সংস্করণ ৷৷০ স্থলে ।৵০
* ঐ ২য় ভাগ ৷৷ „ ।৵০
*ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন মটো, প্রতি খণ্ড ৴১০
* ঐ ছোট ৴৫
ঐ অন্য প্রকারের ৴১৫
ধর্ম্ম সাধন ১ম ভাগ ।০
ঐ ২য় ভাগ ৷৵০
নীতিমালা ৵০
নারীশিক্ষা ১ম ভাগ ৷৷০
ঐ ২য় ভাগ ৷৷০
*নগেন্দ্র বালা ৴০ স্থলে ৴১০
নবযুগ ৴০
নীতি কুসুম ৶০
নীতিপদ্য ৴৫
নিত্যকৃত্য ১ম ভাগ ৴১০
ঐ ২য় ভাগ ৴০
*প্রকৃতি চর্চ্চা ।০ স্থলে ৶০
*প্রকৃত বিশ্বাস ৴০ „ ৴১৫
*প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তি যুক্ততা ৴১০
*পাপীর নবজীবন লাভ ৵ স্থলে ৴১০
*পুষ্পাঞ্জলী (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত পদ্য) ।০ স্থলে ৶০
*পরিবারে শিশুশিক্ষা ৴০ স্থলে ৴১০
*পূজার ফুল ৵০ „ ৴১০
*পূজার আয়োজন ৵০ „ ৴১০
*প্রসাদি ফুল ৶ স্থলে ৴১০
প্রমদাচরণ ৴১০
পুরুষকার মহাবীর গারফীল্ড (কাপড়ের মলাট)৷৷০ স্থলে ।৵০
পঞ্চোপনিষৎ (ঈশ, কেন, কঠ, মণ্ডুক ও মাণ্ডুক্য এই পাঁচখানি উপনিষৎ একত্রে পকেট এডিশন) ৷৷০ স্থলে ।০
প্রাকৃত তত্ত্ব বিবেক ১।০
* পুনর্জন্ম আছে কি না ? (বাবু কুঞ্জবিহারী সেন-কৃত) ৴০ স্থলে ৴১০
প্রকৃতির শিক্ষা ।৵০
ঐ কাপড়ে বাঁধা ৷৷০
পারিবারিক ঈশ্বরোপাসনা প্রণালী ৴০
* ফুলের মালা ৴১০
ব্রহ্ম সাধন (বাবু কালীনাথ দত্ত কৃত) ।৵০

পুস্তক	মূল্য
* ব্রহ্মচর্য্য ভগিনী ডোরা (জীবনালোক প্রণেতা কর্ত্তৃক প্রণীত) ।৵০ স্থলে	।০
* ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী ৵০ „	/১০
* ব্রহ্মসঙ্গীত ১ম ভাগ ৪র্থ সং (কাগজের মলাট)	॥০
* ঐ ৫ম সং (কাপড়ের মলাট)	৸০
* ঐ ৫ম সং (কাগজের মলাট)	॥০
* ঐ ১৷০ স্থলে ৬ষ্ঠ সং (কাগজের মলাট)	১৲
* ঐ ১॥০ স্থলে ৬ষ্ঠ সং (কাপড়ের মলাট)	১।০
* ব্রাহ্মধর্ম্ম সূত্র	৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ১ম ভাগ (হিন্দি)	॥০
ঐ ২য় ভাগ ঐ	॥০
* ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত বিষয় (পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কৃত) ৶০ স্থলে	৵০
* ব্রহ্মোপাসনা কর্ত্তব্য কেন? (পণ্ডিত শিবনাথশাস্ত্রী কৃত)	৴১০
* বক্তৃতা স্তবক (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত) ৸৵০ স্থলে	।০
বুদ্ধদেবচরিত	১৲
* ব্রাহ্মধর্ম্ম তত্ত্ব I/০ স্থলে	।০
* ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধান ৵০ „	/০
ব্রাহ্ম বচন সংগ্রহ ১ম ভাগ	।০
ঐ ২য় ভাগ	৵০
ব্যথার ব্যথী	৵০
বাল্যবিবাহ (বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা)	৵০
বাল্যজীবন	।০
* ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর /০ স্থলে	৴১০
বামা রচনাবলী	॥০
বেদীয়া বালিকা	৵০
বৈরাগ্য ৵১০ স্থলে	/১০
* ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (বাবু সীতানাথ দত্ত প্রণীত) ॥০ স্থলে	।৵০
বনফুল	।/০
বিদ্যাসাগর চরিত (সচিত্র)	৴১৫
বনবাসিনী	/১০
বনপ্রসূন	/০০
বালিকা	/০
বাঙ্গালি রমণীর গৃহধর্ম্ম	/০
ভক্তিসাধন। (থিওডোর পার্কারের কয়েকটী উপদেশের বঙ্গানুবাদ)	॥০
ভক্তিলীলা	।০
ভক্ত-চরিতামৃত	॥৵০
মাতৃভক্তি ও মাতৃপূজা	।০
* মনোরমার গৃহ	৸০
* মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় (পদ্য)	৴১০
মহাত্মা থিয়োডোর পার্কারের জীবনচরিত (বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত)	৸০
মার্টিন লুথারের জীবনচরিত (বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত)	।০
মহম্মদচরিত (বুদ্ধদেবচরিত-প্রণেতা বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রণীত)	১৲
মহাপুরুষ জীবনী	।০
মেরি কার্পেণ্টার	৵০
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত ২য় সংস্করণ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত (বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত)	১৲
মানব ইতিবৃত্তে বিধাতার লীলা /০ স্থলে	৴১০
মানব সখা	৶০
মহাবাক্যাবলী	/১০

পুস্তক	মূল্য
যুবক-ধর্ম্ম-নীতি	৵০
যুগপূজা	।০
* যোগ	৴১০
* যাজ্ঞবল্ক্য জীবনী	।০
যোগনাথ	।৵০
রমণীর কর্ত্তব্য	।৵০
রাজা রামমোহন রায় (বালক বালিকাদিগের জন্য)	৴১৫
লক্ষ্মীমণি চরিত	।০
লহরী (শ্রীমতী কুমুদিনী বসু প্রণীত)	॥০
শান্তিজল	।৵০
* শান্তি ৶০ স্থলে	৵০
শৈব্যা	৴১০
* শ্মশানভস্ম ১ম মুষ্টি ।০ স্থলে	৶০
* ঐ ২য় মুষ্টি ।০ স্থলে	৶০
শৈলবেদীর উপদেশ	৴১০
শিক্ষা	।০
শঙ্করাচার্য্য	৵০
* সরোজকুসুম /০ স্থলে	৴১০
সময় ও সংস্কার	/০
* সাধুদৃষ্টান্ত (জীবনালোক প্রণেতা কৃত)	৴১০
* সৎপ্রসঙ্গ /১০ স্থলে	/০
* সৎসঙ্গী (জীবনালোক প্রণেতা কৃত) ।০ স্থলে	৶০
* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী	/০
* সাধন বিন্দু (বাবু সীতানাথ দত্ত কৃত) ।০ স্থলে	৶০
সুখ কিসে?	/০
সুরাপান বিষয়ে বক্তৃতা	/০
সঙ্গীত লতিকা (প্রথম খণ্ড) (সিন্দুরিয়া পটী পারিবারিক সমাজ হইতে প্রকাশিত)	॥০
সঙ্গীত মঞ্জরী (বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত)	।০
সত্যসঙ্গীত	॥০
সঙ্গীত প্রবন্ধ	৵০
সঙ্গীতরঞ্জন	।০
সঙ্গীতহার ১ম ভাগ	।০
ঐ ২য় ভাগ	।০
সারধর্ম্ম (বাবু রাজনারায়ণ বসু কৃত)	/১০
সত্যদাসের সৎপ্রসঙ্গ	।/০
সুরাপান বা বিষপান	॥০
সক্রেটিশ	৵০
* সাকার ও নিকাকার উপাসনা (হিন্দি) ।০ স্থলে	৶০
স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা	৴১০
স্ত্রী-ধর্ম্ম-নীতি (পণ্ডিতা রমাবাই প্রণীত)	১৲
স্বর্গের ফুল	/১০
সাধুজীবন	৵০
সাধুচরিত (কাগজের মলাট)	॥৵০
ঐ কাপড়ে বাঁধা	৸০
* সাথী ৴১৫ স্থলে	৴১০
সচন্দন পুষ্প	/০
স্ত্রীর কর্ত্তব্য	৴১০
হরিদাসের ধর্ম্মকথা	৵০
হিন্দুশাস্ত্র (জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড)	১॥০
হিন্দু ধর্ম্ম-তত্ত্ব	।৵০
হিমালয়ে প্রার্থনা	/১০
হরি লীলা ১৶০ স্থলে	॥৵০

* চিহ্নিত পুস্তকগুলি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব।

স্থানাভাবে এবারে অনেকগুলি পুস্তকের তালিকা প্রকাশিত হইল না; আগামীবারে হইবে।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীকার্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৭ই পৌষ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৯শ সংখ্যা।
১৭শ ভাগ।

১লা মাঘ সোমবার, ১৮১৬ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

উৎসবের দেবতা! আমরা মহোৎসবের দ্বারে উপনীত হইতেছি, সম্বৎসরের সুখ দুঃখের বোঝা বহন করিয়া, তোমার চরণে উপস্থিত হইতেছি, মহোৎসবের ভেরীর নিনাদ উঠিতেছে, ভক্তগণ আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছেন; আমরাও নূতন বল ও নূতন উৎসাহের জন্য আশাপূর্ণ নয়নে তোমার দিকে চাহিতেছি। এই প্রার্থনা হৃদয়ে লইয়া উৎসবের দ্বারে প্রবিষ্ট হইতেছি যে এবার যেন তোমার শক্তি ভাল করিয়া আমাদের হৃদয়কে অধিকার করে, এবং সেই শক্তির প্রভাবে আমরা যেন নবজীবন প্রাপ্ত হই। আমাদের হৃদয় মনে কি বিঘ্ন আছে, যাহার জন্য আমরা সম্পূর্ণরূপে তোমার ইচ্ছার অধীন হইতে পারিতেছি না? তুমি সে সকল বিঘ্ন দূর কর।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

প্রেম-সাগরের নীরেতে ডুবিয়া, জীব কেন মর পিপাসায়?—একদা কোনও এক নদীর নীরবাসী মৎস্যগণ সকলে সমবেত হইয়া পরস্পরকে বলিল,—"লোক মুখে শুনি জলেই আমাদের উৎপত্তি, জলেই আমাদের জীবন, কিন্তু কৈ, জল কিরূপ তাহা ত দেখিলাম না, এবং জলের প্রকৃতি কি তাহাও ত জানিলাম না! ঐ মৎস্যগণের মধ্যে কয়েকটী জ্ঞানী মৎস্য ছিল, তাহারা বলিল,—আমরা শুনিয়াছি যে সমুদ্রে একজন জ্ঞানী ও সুপণ্ডিত মৎস্য বাস করেন, তিনি সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ, এস আমরা সকলে তাঁহার নিকটে যাই, এবং তাঁহাকে জল দেখাইবার জন্যও জলের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিবার জন্য অনুরোধ করি।" এই পরামর্শ শুনিয়া উক্ত মৎস্যগণের অনেকে সাগরাভিমুখে যাত্রা করিল, এবং অবশেষে সমুদ্র মধ্যে সেই জ্ঞানী ও সুপণ্ডিত মৎস্যের সন্নিধানে উপস্থিত হইল। তাহাদের প্রশ্ন শুনিয়া উক্ত সুপণ্ডিত মৎস্য উত্তর করিলেন;—

"জানিতে গভীর তত্ত্ব হয়েছ ব্যাকুল;
যাতে আছ, তাঁকে ভোল এ কেমন ভুল;
বসিয়া নদীর পাশে মর পিপাসায়,
অশেষ সুভক্ষ্য কোলে, মরিছ ক্ষুধায়।"

কনওয়ে সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত Sacred Anthology নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত মুসলমান সুফী সম্প্রদায়ের উক্তি।

তপস্যা—তপস্যা বলিতে এ দেশে কৃচ্ছ্রসাধন বুঝায়, একজন যোগী পঞ্চতপা হইতেছেন, অর্থাৎ দিবা দ্বিপ্রহরে চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া তন্মধ্যে আসীন আছেন, কেহ বা বহু বৎসর ঊর্দ্ধবাহু হইয়া রহিয়াছেন, কেহ বা লৌহশলাকা নির্ম্মিত শয্যার উপরে শয়ান আছেন, সকলেই বলিতেছেন, "ওঃ কি কঠোর তপস্যা!" এ তপস্যা যে অতি কঠোর তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এরূপ তপস্যা যে হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও আগ্রহ ব্যঞ্জক তাহাও নিশ্চিত, কিন্তু আর এক প্রকার তপস্যার কথা বলিতেছি। একবার একখানি জাহাজ সমুদ্র মধ্যে ঝটিকাবেগে বিপথে নীত হইয়া বহুদূরে পড়িয়াছিল। যাত্রা কালে তাহারা এক মাসের মত খাদ্যদ্রব্য লইয়াছিল, কারণ এক মাসের মধ্যে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার আশা ছিল। ঝটিকাবেগে বিপথে পড়িয়া গণনা করিয়া দেখিল যে আর তিন মাসের মধ্যে কোনও বন্দরে পৌঁছিবার আশা নাই। তখন জাহাজস্থ ব্যক্তিদিগের মহা দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল, এক মাসের খাদ্যে তিন মাস কিপ্রকারে চলিবে? প্রথমে স্থির হইল যে জাহাজে যে সকল মাল বোঝাই আছে, তাহা সমুদ্র জলে ফেলিয়া দিতে হইবে। কারণ জাহাজের ভার কমিলে অপেক্ষাকৃত অধিক দ্রুত চলিবার সম্ভাবনা। তদনুসারে প্রথমে জাহাজস্থ পণ্যদ্রব্যের কিয়দংশ সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করা হইল। তাহাতে জাহাজ লঘু হইয়া কয়েকদিন কিঞ্চিৎ দ্রুতগতিতে চলিল। কিন্তু তখন গণনা করিয়া দেখা হইল, যেরূপ গতিতে চলিতেছে তাহাতে যথাসময়ে বন্দরে পৌঁছিবার আশা নাই। আবার আরও কিয়দংশ মাল ফেলিয়া দেওয়া হইল। এইরূপে কয়েক-দিনের মধ্যে সমগ্র মাল জলে নিক্ষিপ্ত হইল। তখনও গণনা করিয়া দেখা হইল, যে যথাসময়ে বন্দরে পৌঁছিবার আশা নাই; এইবারে সর্ব্বনাশ, হয় কিয়দ্দিবস পরে সকলকে অনাহারে মরিতে হইবে, না হয় প্রতিদিন কয়েকজন করিয়া মানুষ

ফেলিয়া দিতে হইবে। অবশেষে শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। তদনুসারে প্রতিদিন সুরতী করিয়া পাঁচ পাঁচ জন মানুষ সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপে যে জাহাজ দুই শত লোক লইয়া যাত্রা করিয়াছিল, তাহা ২০ জন লোক লইয়া বন্দরে পৌছিল। আমরা যে তপস্যার কথা বলিতেছি তাহার সঙ্গে এই ব্যাপারের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। হে মানব! তুমি হৃদয় পোতে বহু সামগ্রী বোঝাই লইয়া ব্রহ্মধামের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছ; সময়ে সময়ে পথের দূরতা ভাবিয়া কি নিরাশ হইতেছ? তবে হৃদয় পোত অনুসন্ধান করিয়া দেখ কিজন্য তোমার গতি মন্দ হইতেছে। এক একটী করিয়া অগাধ সিন্ধুজলে নিক্ষেপ করিতে থাক। আজ অর্থ গেল, কল্য মান গেল, পরশু, আত্মীয় স্বজনের প্রেম গেল; এইরূপ করিয়া ফেলিতে ফেলিতে যাও, হয়ত এমন দিন আসিবে, যেদিন জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু ও শ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া যাহা বিবেচনা করিয়াছিলে, তাহাও নিক্ষেপ করিতে হইবে। ঈশ্বরের জন্য এবং ব্রাহ্মসমাজের জন্য যদি তাহাও করিতে সমর্থ হও তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে তুমি তপস্বী। ব্রাহ্মেরা এইরূপ তপস্যার দিকে মনোনিবেশ করুন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্রহ্মোৎসবের প্রকৃতি ও তাহার ফল।

মধুকরের মধুচক্রে মধুসঞ্চয়ের প্রথা আমরা জানি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৌমাছি সকল নানা ফুল হইতে নিয়ত মধু আহরণ করিতেছে, এবং তাহা আপনাদের বাসস্থল-চক্রে আনিয়া সঞ্চয় করিতেছে। বিন্দু বিন্দু পরিমাণে আনিতেছে, বিন্দু বিন্দু পরিমাণে জমা হইতেছে। কিন্তু কিছুকাল যাইতে না যাইতেই দেখা যায়, তাহারা একটী প্রকাণ্ড চক্র মধুতে পরিপূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যদি ঐ সকল মধুজীবী এপ্রকারে এক স্থানে তাহাদের উপার্জ্জিত মধু বিন্দু সকল সংস্থাপিত না করিত এবং যদি তাহা ঐ সকল ক্ষুদ্র প্রাণীর মুখে মুখেই ঘুরিয়া বেড়াইত অথবা তাহারা সম্মিলিত না হইয়া নিজে নিজেই তাহা উদরস্থ করিয়া ফেলিত, তবে তাহা কাহারও দৃষ্টিগোচর হইত না, বা জগতের অপরের কোন কাজেই লাগিত না। তাহা ঐ সকল সংগ্রহকারীদিগেরই উদরে থাকিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইত। কিন্তু তাহাদের এই প্রকার সম্মিলন এপ্রকার একত্র সঞ্চয়প্রবৃত্তি হইতেই উহা লোক-চক্ষুগোচর হয়। এবং জগতের ব্যবহারে আসিয়া থাকে। এই যে মধুজীবিগণের মধুচক্রে মধুসঞ্চয় ব্যাপার, ইহার সহিত ব্রহ্মোৎসবের সাদৃশ্য আছে। দূরে দূরে এক একজন ঈশ্বরপিপাসু, তাঁহার প্রেমিক ও ভক্ত, অবস্থিতি করিতেছেন; দিনের পর দিন যত্ন অধ্যবসায় সহকারে বিন্দু বিন্দু ঈশ্বর-প্রেম, বিন্দু বিন্দু ঈশ্বর-ভক্তি সঞ্চয় করিতেছেন, যদি তাঁহারা সেই ভাবেই অবস্থিতি করেন, কখনও পরস্পরের সহিত মিলিত না হন, আত্মসঞ্চিত রত্ন সকল আত্মভোগে, আত্মপরিতৃপ্তির জন্যই, রাখিয়া দেন এবং নিজেই তাহা লইয়া বিভোর থাকেন, তবে তাহা আর লোকচক্ষুর গোচর হয় না; এবং তদ্দ্বারা জগতের কার্য্যও সিদ্ধ হয় না। তাহা লোকচক্ষুর অগোচরে সঞ্চিত হইয়া, অগোচরেই থাকিয়া যায়। নির্ঝরিণী নিভৃত গিরিশৃঙ্গে জন্মিয়া যদি স্বার্থপরের ন্যায় সেই জনচক্ষুর অগোচর স্থানেই বাস করে, তাহাতে জগতের লাভ কি? তেমনি ভক্তহৃদয়ে সঞ্চিত বিন্দু বিন্দু প্রেম যদি সেই হৃদয়েই লুক্কায়িত থাকে, তবে তাহা আর অপর হৃদয়কে পবিতৃপ্ত করিতে পারে না। তাহাতে তিনি নিজে চরিতার্থ হইতে পারেন, কিন্তু অপরকে পরিবেশন করা রূপ মধুরতর সুধাস্বাদন তাঁহার ভাগ্যে ঘটে না। মধুকরের বিন্দু বিন্দু মধুসঞ্চয়ের ন্যায় ভক্ত হৃদয়ে সঞ্চিত প্রেমবিন্দু সকল সম্মিলিত হইয়া উৎসবক্ষেত্রে প্রকাণ্ড মধুচক্রের আকার ধারণ করে এবং তখন সঞ্চয়কারীর সঙ্গে সঙ্গে অপরেও তাহার আস্বাদ প্রাপ্ত হয়। ইহারই নামই ব্রহ্মোৎসব। একা একা যাহা সম্ভোগ করা যায়, তাহাই যদি দশ জনে মিলিয়া মিশিয়া সম্ভোগ করা যায় তাহারই নাম উৎসবভোগ। প্রতিদিন একাকী উপাদেয় বস্তু সকল আহার করিতে পারি, কিন্তু তাহাই যদি দশজনে মিলিয়া আহার করি, তবে তাহারই নাম হয় মহাভোজ। ব্রহ্মোৎসবও তাহাই। একা একা যাহা সম্ভোগ করা যায় তাহা দশ জনে মিলিয়া সম্ভোগ করার নামই মহোৎসব।

দীনহীন, দুঃখী, দরিদ্র, সকলেই মহোৎসবে যাইবার অধিকারী; সে স্থান অবারিত। কাহারও পক্ষে উৎসবগৃহের দ্বার অবরুদ্ধ নহে। যাহারা নিজেরা সঞ্চয় করিতে পারে নাই বা করিবার যত্ন করে নাই, তাহারাও এই সময়ে দশ জনের সহিত সম্মিলিত হইয়া সেই সুখ সম্ভোগ করিতে পারে। এই জন্য যাহা পৃথক্ পৃথক্, দূরে দূরে, বিচ্ছিন্ন ভাবে, থাকিয়া জগতের সাধারণের সম্পত্তি হইয়াও অপ্রকাশিত থাকে এবং লোকের ব্যবহারের পক্ষে অনুপযুক্ত থাকে, সম্মিলন দ্বারা তাহাই সকলের পক্ষে সহজলভ্য হয়, এবং সকলের সম্ভোগের বস্তুরূপে পরিণত হয়। এই জন্য উৎসবের বিশেষ প্রয়োজন। যাহা নিজে সম্ভোগ করিতেছ তাহা দশজনের সহিত মিলিয়া ভোগ কর। দশ জনের সহিত মিলনে যাহা পূর্ব্বে দৃষ্টির বাহিরে ছিল তাহা দৃষ্টির মধ্যে আসিবে, এবং যাহা সকলের পক্ষে উপার্জ্জন করা বিশেষ আয়াস-সাধ্য ছিল, তাহা সহজলভ্য হইবে। এই জন্যই উৎসব চিত্তের এরূপ আকর্ষক এবং মহদুপকারী। ইহাকে প্রেম-পিপাসু ঈশ্বরভক্তগণের মেলা বলাই সঙ্গত। উৎসবকে পিপাসু ও অনুরাগিগণের সম্মিলন নাম দিলেই ইহার উপযুক্ত আখ্যা দেওয়া হয়।

মধুকরগণ যখন একা একা আপনাপন গুণ গুণ ধ্বনির সহিত এক একটী ফুল হইতে মধু সঞ্চয় করে কে তাহার সংবাদ পায়। কিন্তু যখন কোন বিশেষ বিশেষ সময়ে ফুলসাজে বৃক্ষগণ সজ্জিত হয়, আর হাজার হাজার মধুকর তাহাতে মিলিত হইয়া মধু সঞ্চয় করিতে থাকে, তখন তাহাদের সেই অস্ফুটধ্বনি, যাহা একাকী অবস্থিতি কালে কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই, তাহাই কেমন শ্রুতিমধুর প্রবল শব্দে পরিণত হইয়া পথিকদিগের চিত্ত বিমুগ্ধ করিয়া থাকে।

আমরাও যখন একাকী থাকি কে আমাদের সন্ধান পায়, আমরা যে ব্রহ্মের মহিমা গান করি তাহাতে কোন্ অন্যমনস্ক ব্যক্তির আকর্ষণের কারণ হয়? তখন সে সঙ্গীত কেহই তেমন ভাবে শোনে না। কিন্তু উৎসবক্ষেত্রে দেখ আমাদেরই সম্মিলিত ধ্বনি, বিশ্বেশ্বরের মহিমা গান রব, যখন আকাশের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দেয়, তখন কেনা তাহাতে আকৃষ্ট হয়। সম্মিলনেরই গুণ। সম্মিলনেই শক্তির বিকাশ। সম্মিলনেই নিদ্রিত সমাজ বা জাতির নিদ্রাবসানের উপায়ের আবিষ্কার। যাহা অদৃশ্য ভাবে ছিল, তাহাই সম্মিলনে দৃষ্টিগোচর হইয়া লোকচক্ষুর প্রীতিকর হইয়া প্রকাশিত হয়।

সেই মহা সম্মিলনরূপ উৎসব আবার আসিয়াছে। ইহা দুর্ব্বলকে সবল এবং উদাসীন ও আলস্যের ক্রোড়ে শায়িত ব্যক্তির নিদ্রাবসানের কারণ হউক। 'এদেশে বৈষ্ণবসমাজে মহোৎসব হইয়া থাকে। তাহার নিমন্ত্রণের বিশেষ কোন বন্দোবস্ত নাই। হয় ত কোন মতে দেশমধ্যে সংবাদ প্রচার করিয়া দেওয়া হয়। আর দেখা যায় হাজার হাজার লোক সমবেত হইয়া পান ভোজন করিতেছে। কেহ কাহারও আদর যত্নের অপেক্ষা করে না। যেখানে সুবিধা পায় বসিয়া যায় এবং তৃপ্তির সহিত উদরপূর্ণ করিয়া চলিয়া যায়। কাহারও প্রতি অনুযোগ নাই। কাহারও প্রতি অভিমান প্রকাশ নাই। সকলেই মনে করে, ইহা মহোৎসব। ইহা কাহারও বাড়ীর নিমন্ত্রণ নহে। সুতরাং আদর যত্ন করিবার জন্য বিশেষ কেহ নাই। এবং তাহা পাইবার কাহারও তেমন আকাঙ্ক্ষাও নাই। সুতরাং সকলেই সন্তুষ্ট, সকলেই সম্প্রীত।' আমাদের উৎসবও তাহাই। ইহার উদ্যোগ কর্ত্তা তেমন বিশেষ ভাবে কেহই নয়। আমরা এই উদার ভাবেই যেন ব্রহ্মোৎসবে নিযুক্ত হইতে পারি এবং উৎসবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠদান যে প্রেমভক্তি পুণ্য তাহা লাভ করিয়া যেন কৃতার্থ হইতে পারি।

ব্রহ্মোৎসবকে আমরা আর এক ভাবে দর্শন করিতে পারি, যাহাদিগকে পরের বাড়ী ভাড়া লইয়া বাসকরিতে হয়, তাহাদিগকে বাধ্য হইয়াই মধ্যে মধ্যে বাটী পরিবর্ত্তন করিতে হয়। একটীর পর আর একটী বাটীতে উঠিয়া যাইতে হয়। এই বাটি পরিবর্ত্তনের সময় দেখাযায়, যে গৃহে উঠিয়া যাওয়া হইতেছে, তাহাতে যদি কোনও রূপ অপরিচ্ছন্নতা থাকে, সর্ব্বাগ্রে তাহার দিকে আগন্তুকের দৃষ্টি পড়ে। সে বাড়ীটী পরিষ্কার করিবার জন্য তখন বিশেষ পরিশ্রম করিতে কাহাকেও পরাঙ্মুখ দেখা যায় না। অর্থব্যয়, শারীরিক পরিশ্রম প্রভৃতি যাহা আবশ্যক সকলেই তাহা অম্লানবদনে বহন করে। স্বাস্থ্যরক্ষার অনুরোধ এবং সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা সকলই তখন আসিয়া দেখা দেয়। এই নূতন বাটীতে আগমনের পূর্ব্বে যে বাটীতে বসতি ছিল, তাহা যে ইহাপেক্ষা কিছু অধিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল, এমনও নহে। হয় ত ইহাপেক্ষা তাহা আরও অপরিচ্ছন্ন এবং আরও অস্বাস্থ্যকরই ছিল। কিন্তু সেখানে অবস্থিতি কালে তাহার অপরিচ্ছন্নতার দিকে তেমন দৃষ্টি ছিল না এবং সে অপরিচ্ছন্নতা দূর করিবার জন্য তেমন কোন উদ্যোগও ছিল না। কোনমতে তাহাতেই দিন কাটিয়া যাইতেছিল। এই প্রকার হইবার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, যে পূর্ব্বে যে বাটীতে অবস্থিতি হইতেছিল এবং তাহাতে যে অপরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি ছিল, তাহার সহিত অনেক দিন বাস করিয়া করিয়া সেই সকল মলিনতার সঙ্গে একটা সন্ধিবন্ধন হইয়া গিয়াছিল। সেই হীনতাও কদর্য্যতার তীব্রতা তখন অনুভব করিবার শক্তিও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইয়াছিল এবং তাহার সহিত সন্ধি করিয়া কোন মতে দিন চলিতেছিল। কিন্তু নূতন গৃহে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেই গৃহের কদর্য্যতা নূতন ভাবে মনকে অক্রমণ করিল, তাহার অপরিচ্ছন্নতার সহিত ত আর সন্ধি হয় নাই। সুতরাং তাহার সহিত বাস করাও অসহ্য ও বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। যাহা অভ্যাস বশতঃ এক সময় সহ্য হইয়া গিয়াছিল তাহাই নূতন বলিয়া অতিশয় কুৎসিত এবং বিষম অপ্রীতিকর হইয়া পড়িল। এই জন্য লোকে নূতন বাটীতে যাইয়া তাহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতে বিশেষ যত্নশীল হইয়া থাকে।

উৎসব আমাদের পক্ষে এই নূতন গৃহে গমনের অবস্থার ন্যায়। উৎসবে আমরা নূতন ভাবাপন্ন হই। যাহা অভ্যাস বশতঃ সহিয়া গিয়াছিল, তাহার সহিত আর বাস করিবার প্রবৃত্তি থাকে না। উৎসব যেন আমাদিগকে নূতন গৃহে লইয়া যায়। এবং যে সকল মলিন চিন্তা, মলিন আকাঙ্ক্ষার সহিত সন্ধি বন্ধন করিয়া এক সঙ্গে বাস করিতেছিলাম, যাহারা কুৎসিত হইয়াও সখ্যতা নিবন্ধন চিত্তের অশান্তির উদ্রেক করিতে পারে নাই এবং যাহারা মলিন হইলেও উদাসীনতা বশতঃ চিত্তের অতৃপ্তির কারণ হয় নাই; উৎসব যেন সেই সকলের তীব্রতা, কদর্য্যতা ও হীনতা নূতন করিয়া চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করে। উৎসবে আমরা নবীন সত্যই যে সর্ব্বদা পাইব, তাহা নাও হইতে পারে। কিন্তু উৎসব পুরাতন হীনতা, পুরাতন সংসারাসক্তির প্রতি বিরক্তিউৎপাদনের এক প্রধান সহায় হয়। উৎসবে পুরাতন হীনতাসক্তির কদর্য্যতা যেমন বোধগম্য হয় এবং তাহার সহিত বাসে যেমন অপ্রবৃত্তি হয়, তেমনি সাধুতা, পুণ্য, ও সৌন্দর্য্য লাভের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষারও উদ্রেক হয়। তখন সেজন্য পরিশ্রম করিতে এবং সময় দিতে এবং সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সুবিধা পরিত্যাগ করিতেও আমরা প্রস্তুত হই। এপ্রকার পরিবর্ত্তন কি শুধু উৎসবের সময়েই হয়? তাহা কি কেবল সাময়িক উত্তেজনারই ফল? দশ জনে পরামর্শ করিলেই কি আমরা এরূপ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারি? না তাহা পারি না। ভাবিয়া চিন্তিয়া যদি কিছু করিতে পারা যাইত তবে আমরা সকল সময়েই তাহা পারিতাম। কিন্তু তাহা হয় না। ইহাতে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদই আমাদের প্রধান সম্বল। তাহা পাওয়া সকল সময়েই সম্ভবপর হইলেও যখন আমরা পরস্পরের সহিত ব্যাকুল প্রার্থনা লইয়া মিলিত হই এবং তাহাও যখন বিশেষ ভাবে হয়, তখনই সেই অবস্থা আমরা পাইতে পারি এবং তখনই বাটী পরিবর্ত্তনের ন্যায় সত্য সত্যই আমরা আপনাপন জীবনের প্রাচীন হীনতানুভব করিয়া নবজীবনের নবীন সৌন্দর্য্য লাভের জন্য ব্যাকুল হই। তখনই যে জীবন পাইতে পারি এবং সেজন্য পরিশ্রমও যত্ন করিতে পারি।

ইহা উৎসব রূপ শুভ সম্মিলন দ্বারা সহজে সুসিদ্ধ হয়। কারণ যে সকল সদ্ভাব লুক্কায়িত ভাবে থাকে, তাহা পরস্পরের সম্মিলনে অনুকূল অবস্থার সহযোগে বিকশিত হয় এবং নবীন সৌন্দর্য্য, পুণ্য, পবিত্রতা লাভের আশাও প্রবল আকঙ্ক্ষার উদ্রেক হয়। উৎসব নূতন গৃহে গমনের ন্যায় আমাদের প্রাচীন মলিন বাস পরিত্যাগের প্রধান উপায় স্বরূপ হউক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম—সার্ব্বভৌমিক ও জাতীয়।

(প্রাপ্ত)

(নাম স্বাক্ষর পূর্ব্বক যে সকল প্রাপ্ত প্রবন্ধ তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইবে তাহার মতামতের জন্য লেখকই দায়ী।)

("তত্ত্ববিদ্যা-সমিতি"তে পঠিত ও বিবৃত প্রবন্ধের সারাংশ।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

উপনিষদের ধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলাতে এবং সাধারণতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধে জাতীয়তা অবলম্বন করা সম্বন্ধে অনেক আপত্তি উঠিতে পারে। আমি এরূপ কতিপয় আপত্তির উল্লেখ করিয়া সংক্ষেপে উত্তর দিব।

১। ব্রাহ্মধর্ম্ম অভ্রান্ত শাস্ত্র মানেন না। কিন্তু, কেহ কেহ বলিতে পারেন যে উপনিষদ্ বেদের পূর্ব্বভাগকে এরূপ শাস্ত্র বলিয়া মান্য করেন। এরূপ আপত্তির উত্তর এই যে আমি প্রাচীন ও প্রামাণিক উপনিষদ্ সমূহে এরূপ অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ কোথাও পাই নাই। উপনিষদ্-লেখকগণ অত্যন্ত সাহসী ও স্বাধীন। এমন কি তাঁহারা বেদের নিন্দা করিতে, অর্থাৎ ইহাকে অপরা বিদ্যা ও নিম্নসাধকের অবলম্বনীয় বলিয়া বর্ণনা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। অভ্রান্ত শাস্ত্র মানা সম্বন্ধে পরবর্ত্তী হিন্দু লেখকগণই দায়ী, উপনিষদের ঋষিগণ দায়ী নহেন।

২। 'উপনিষদে অদ্বৈতবাদ আছে; অদ্বৈতবাদের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সামঞ্জস্য কোথায়?' এই আপত্তির উত্তর এই যে, উপনিষদের অদ্বৈতবাদকে আমি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া মনে করি না। ব্রহ্মই একমাত্র নিরপেক্ষ সত্য বস্তু, অন্যান্য সমুদায় বস্তু আপেক্ষিক ও ব্রহ্মাশ্রিত, এরূপ অদ্বৈতবাদ ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-বিরোধী হওয়া দূরে থাক্, প্রত্যেক ব্রাহ্মই বোধ হয় গভীর উপাসনার সময়ে এই সত্য অনুভব করিয়া থাকেন। ব্রাহ্ম-আচার্য্যগণের উপাসনার সময়ে স্পষ্টরূপেই এই সত্য উচ্চারিত হয়।

৩। 'উপনিষদে নির্গুণ ব্রহ্মের মত আছে, এরূপ ব্রহ্ম অজ্ঞেয়; ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈশ্বরের সহিত এরূপ ব্রহ্মের সাদৃশ্য কোথায়?' এই আপত্তি একটী মহা ভ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ও প্রামাণিক উপনিষদ্ সমূহে এ 'সগুণ' 'নির্গুণ' কথাগুলিই নাই। কিন্তু এই শব্দ দুটীর ভাব যাহা তাহা কোন কোন উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদে ব্রহ্ম সগুণ নির্গুণ, অর্থাৎ বিশ্বরূপী ও বিশ্বাতীত এই উভয়ভাবেই বর্ণিত। উপনিষদ্-লেখকগণ এই দুই ভাবে কোন অসামঞ্জস্য দেখিতে পান না। আর তাঁহাদের নির্গুণ ব্রহ্মও অজ্ঞেয় নহেন। তিনিও সৎ, চিৎ, ও আনন্দস্বরূপ।

৪। উপনিষদে জন্মান্তরবাদ আছে। কেহ কেহ জন্মান্তরবাদকে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী মনে করেন। জন্মান্তরবাদ ইদানীন্তন অধিকাংশ ব্রাহ্মের মত-বিরোধী বটে, কিন্তু অধিকাংশ ব্রাহ্মের মত বিরোধী হওয়া আর ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী হওয়া এক কথা নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, আত্মা অমর ও অনন্ত উন্নতিশীল। আত্মা অশরীরী হইয়া অমর হইবে কি শরীরান্তর গ্রহণ করিবে, এই বিষয়ের মতামত ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যের অন্তর্গত নহে। জন্মান্তরবাদ অমরত্ব ও অনন্ত উন্নতির বিরোধী নহে, সুতরাং ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধীও নহে।

৫। 'উপনিষদে নানা অবৈজ্ঞানিক ও অদার্শনিক কথা কথা আছে। এরূপ শাস্ত্রকে কিরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক বলা যায়?' এই আপত্তির উত্তর এই যে ধর্ম্মের মূল ও অবান্তর মতের মধ্যে প্রভেদ করা আবশ্যক। উপনিষদের অবৈজ্ঞানিক মতগুলি উপনিষদের মৌলিক ধর্ম্মের অঙ্গীভূত নহে, সুতরাং সেই সকল মতকে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী বলা যাইতে পারে না। ইহার আমাদের মধ্যে এরূপ অনেক মত প্রচলিত আছে যে সকল মত ভবিষ্যতে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া প্রদর্শিত হইবে। কিন্তু আমরা অবৈজ্ঞানিক মতে বিশ্বাস করিতাম বলিয়া আমাদের ভাবী বংশীয়দের দ্বারা অব্রাহ্ম বলিয়া গৃহীত হইলে আমাদের উপর বড়ই অবিচার করা হইবে।

৬। 'ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের নিকটও ঋণী। সুতরাং ইহাকে বিশেষভাবে উপনিষদ্-প্রতিপাদিত ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করা হইবে কেন? ইহাতে অন্য ধর্ম্মের উপর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইবে।' এই আপত্তির উত্তর এই যে আমি অন্যান্য ধর্ম্মের আলোচনা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মজীবনের অঙ্গ-পুষ্টি হইতেছে ইহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি বটে, কিন্তু হিন্দু-জাতি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য-শিক্ষার জন্য যে অন্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নিকট ঋণী ইহা আমি স্বীকার করি না। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণ কেবল দেশীয় শাস্ত্রের সাহায্যে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মূল সত্য আবিষ্কার ও প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মকে দেশীয় শাস্ত্র-প্রতিপাদিত ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না, এবং অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিও অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হয় না। ইংরেজী ভাষা ইহার অঙ্গপুষ্টির জন্য নানাভাষার নিকট ঋণী, কিন্তু ইহা যে মূলে য়্যাঙ্গলো-স্যাক্‌সন্ ভাষা, ইহা সত্য, এবং এই সত্য কথা বলাতে অন্য ভাষার ঋণ অস্বীকার করা হয় না।

৭। 'উপনিষদ্ দেববাদী। দেববাদের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সামঞ্জস্য কোথায়?' উত্তর—ব্রহ্ম যে এক অদ্বিতীয়, এবিষয়ে উপনিষদে কোন দ্বিরুক্তি নাই। তবে ইহা মনুষ্যাপেক্ষা উচ্চতর দেবতা প্রভৃতি জীবের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। আমরা এরূপ জীবের কোন প্রমাণ পাই না, তাই বিশ্বাস করি না। কিন্তু যদি কেহ এরূপ জীবে বিশ্বাস করেন, তাঁহাকে অব্রাহ্ম বলিবার কোন কারণ দেখি না। মনুষ্যাপেক্ষা উচ্চতর জীব নাই, এরূপ মত কখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইতে পারে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ব্যাখানে "দেবতা" শব্দেরও বহুল উল্লেখ দেখা যায়।

৮। 'উপনিষদ্ বেদের অংশ। বেদ দেবপূজা-প্রতিপাদক, সুতরাং উপনিষদ্‌কেও কিয়দংশে সেই দোষে দোষী মনে করিতে হইবে।' এই কথায় উত্তর এই যে বৈদিক সাহিত্যে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের পরিষ্কার প্রভেদ করা হইয়াছে। বেদের পূর্ব্ববিভাগ দেবপূজা প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের পক্ষপাতী। বেদের অন্তভাগ উপনিষদ্ ব্রহ্মোপাসনা, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মসমাধি প্রভৃতি জ্ঞানগত সাধনের পক্ষপাতী। সুতরাং উপনিষদ্ বেদের অংশ হইয়াও স্পষ্টতঃই ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক।

৯। 'ধর্ম্ম সম্বন্ধে জাতীয়তা অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকত্ব নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।' এই আপত্তির উত্তর এই,—জাতীয়তায় সার্ব্বভৌমিকত্ব নষ্ট হয় না, জাতিগত সঙ্কীর্ণতায়ই সার্ব্বভৌমিকত্ব নষ্ট হয়। আমরা যদি আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুকরণে সামাজিক উপাসনায় কেবল জাতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করি, এবং সমাজের সভাশ্রেণী কেবল হিন্দুজাতির 'একচেটীয়া' করি, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকত্ব নষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উদার খ্রীষ্টানগণ যেরূপ বাইবেলের শিক্ষায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াও সকল ধর্ম্ম সাহিত্যেরই আলোচনা করিতেছেন, আমাদিগকে তদ্রূপ,—তদপেক্ষাও অধিক—নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হইবে, এবং কেবল বিদেশীয় নহে, এদেশীয় ব্রাহ্মসমাজের দ্বারও সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়ের জন্য অবারিত রাখিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি কোন অহিন্দুজাতীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিশ্বাসী আমাদের দেশীয় সাধন, সামাজিকতা ও প্রচার-প্রণালীর পক্ষপাতী হইয়া এ দেশীয় ব্রাহ্মমণ্ডলীভুক্ত হইতে চান, এরূপ ব্যক্তিকেও আমাদের পরমাদরে গ্রহণ করিতে হইবে। এরূপ উদার নীতি অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকত্ব নাশের কোন সম্ভাবনা নাই।

এখন বর্ত্তমান বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া আমি বক্তৃতা শেষ করিব।

প্রথমতঃ, ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকত্ব রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে এই সকল প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।

১। দর্শনবিজ্ঞানের আলোচনা। এতদ্দ্বারা আমাদের সত্যাসত্য-বিচারশক্তি উজ্জ্বল থাকিবে।

২। নানা জাতীয় শাস্ত্রের আলোচনা। এতদ্দ্বারা আমাদের উদারতা বৃদ্ধি ও সঙ্কীর্ণতা দূর হইবে।

৩। নানা দেশীয় সাধুজীবনালোচনা।

৪। বিদেশীয় সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস আলোচনা ও তৎসাহায্যে দেশীয় কুপ্রথার উচ্ছেদসাধন ও জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টি।

দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের জাতীয়তা রক্ষার জন্য আমাদিগকে এই সকল নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে।

১। ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধন-প্রতিপাদক উপনিষদ্ শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা।

২। সাধারণভাবে দেশীয় সকল শাস্ত্রের আলোচনা।

৩। দেশীয় সাধুজীবনালোচনা।

৪। প্রচারকালে দেশীয় শাস্ত্র ও সাধুজীবন বিশেষভাবে অবলম্বন।

৫। গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানও সামাজিক আচার ব্যবহারে যথাসম্ভব জাতীয়তা রক্ষা। সত্য ও বিবেকের অনুরোধ ভিন্ন কেবল স্বেচ্ছাচার বা পাশ্চাত্য রীতির অন্ধ-অনুকরণে অনর্থক বিজাতীয় ব্যবহার-অবলম্বন না করা।

শ্রীসীতানাথ দত্ত।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার চতুর্থ ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ

১৮৯৪।

ভগবানের কৃপায় নিম্নলিখিত ভাবে এই কয়েক মাস কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সমাজের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ইতিমধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ৯টী অধিবেশন হইয়াছিল। শারদীয় অবকাশ উপলক্ষে অনেক সভ্য সহরের বাহিরে গমন করাতে, রীতিমত সভার অধিবেশন হয় নাই।

প্রচার—এই কয় মাসে আমাদের প্রচারক মহাশয়েরা নিম্নলিখিত ভাবে প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদ—ইনি লক্ষ্ণৌএ থাকিয়া তথাকার সমাজমন্দিরে উপাসনাদি করিয়াছেন। দাতব্য ঔষধালয়ে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দান করিয়াছেন এবং একখানি হিন্দি সঙ্গীত-পুস্তক প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন, এবং রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় উপাসনা ও বক্তৃতা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মেদিনীপুর।—কোন ভদ্রলোকের বাটীতে নূতন নির্ম্মিত উপাসনা-ঘর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উপাসনাদি করেন। পাহাড়ীপুরে কোন ব্রাহ্মপরিবারে একটী শিশুর নামকরণে আচার্য্যের কার্য্য করেন।

কলিকাতা।—কোন ব্রাহ্মের বাটীতে শারদীয় ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপদেশের বিষয় 'বিশ্বাস'। কোন ভদ্রলোকের বাটীতে সবান্ধবে পারিবারিক উপাসনা করেন। ব্রাহ্মপরিবারে ৪টী শিশুর জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে এক দিবস, বেদীর কার্য্য। 'তত্ত্ববিদ্যাসভা'র অধিবেশনে 'ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তি', 'ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা', "আমাদের ধর্ম্মমতের উৎপত্তি ও উন্নতি", 'ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব', 'ধর্ম্মের ভিত্তি' প্রভৃতি আলোচ্য বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতা। সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ছাত্রসমাজে একটী বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয় 'বুদ্ধিগত জ্ঞান ও পারমার্থিক জ্ঞান'।

বরাহনগর।—ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে একটী শিশুর নামকরণ উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য করেন।

শ্রীরামপুর।—ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে উপাসনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন।

চুঁচুড়া।—ব্রহ্মমন্দিরে, উৎসবের প্রারম্ভিক প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয়—"ভক্তিসাধন"।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।—ছাত্র সমাজে "মানবজীবনের গূঢ় রহস্য" এবং "সভ্যতার গূঢ় রহস্য" বিষয়ে ২টী বক্তৃতা করিয়াছেন। সিলস্ ফ্রি কলেজে 'জাতীয় জীবনের উন্নতির ভিত্তি' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। নিয়মিতরূপে মেলটারের উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন এবং তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর আচার্য্যের কার্য্য বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে সামাজিক অনুষ্ঠানে উপাসনা করেন। এতদ্ভিন্ন আলোচনা, প্রবন্ধ লেখা ইত্যাদি দ্বারা বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—অক্টোবর মাসের কয়েক দিন কলিকাতায় থাকিয়া পরিবারে ও সাধনাশ্রমে উপাসনাদি করেন। তৎপর তিনি মাণিকদহ শারদীয় উৎসব উপলক্ষে আহূত হইয়া তথায় গমন করেন। তথায় ৪।৫ দিন থাকিয়া উৎসবে উপাসনা পাঠ ও আলোচনাদি করেন। একদিন মহিলাদিগকে লইয়া বিশেষ ভাবে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন, "ব্রাহ্মসমাজে নারীজাতির সেবা বিশেষরূপে চাই" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তৎপর ঢাকাতে একটী অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। এতদ্ব্যতীত পারিবারিক উপাসনা করেন ও ব্রাহ্ম সম্মিলনীতে উপস্থিত থাকেন। তৎপর একটী বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে তাঁহার পারিবারিক বিশেষ কাজে বিক্রমপুর স্বগ্রামে যান, তথায়ও কয়েক দিন থাকিয়া উপাসনা করেন এবং একদিন কয়েকটী পল্লীতে গমন করেন। শ্রীনাথ সম্প্রদায় নামক একেশ্বর বাদীদের আকড়ায় যাইয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করেন। তথা হইতে পুনরায় ঢাকায় আগমন করেন। এবার ২।১ দিন থাকিয়া বিশেষ অনুরোধে কালিকচ্ছ গ্রামে গমন করেন। এস্থলে ৩।৪ দিন থাকিয়া পারিবারিক উপাসনাও ধর্ম্মপ্রসঙ্গাদি করেন। এক দিন অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। এখান হইতে তিনি কিছুদিনের জন্য আসামে গমন করেন। প্রথমে সুনামগঞ্জ নামক স্থানে উপস্থিত হন, সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া সমাজেও পরিবারে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন এবং ধর্ম্মালোচনা করেন। একদিন একটী অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। এ স্থান হইতে খাসিয়া মিশন দেখিবার জন্য চেরাপুঞ্জি গমন করেন। পথে থাইরা ঘাটে ২ দিন অবস্থিতি করেন। এখানে উপাসনাদি করেন। এইরূপে অক্টোবর মাস শেষ হয়। তৎপর এখান হইতে বাবু রাইচরণ দাসকে সঙ্গে করিয়া চেরাপুঞ্জি যান এবং পথে শ্রীমান বর্দ্ধন রায়ের সহিত মিলিত হন। আশ্রমে যাইয়া বেশী সময় থাকিতে পারেন নাই। এখানে পৌঁছিয়াই শিলং ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করেন। এখানে প্রায় দুই সপ্তাহকাল অবস্থিতি করেন। উৎসব উপলক্ষে সমাজেও পরিবারে বিশেষ উপাসনা করেন, এবং মুদ্রিত উপদেশ পাঠ করেন ও বিতরণ করেন এবং বিশেষরূপে আলোচনাদি করেন। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং দুইদিন মহিলাদিগকে লইয়া বিশেষ উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন এবং দুইদিন সমাজ মন্দিরে দুইটী বক্তৃতা করেন ১ম বক্তৃতা—"একজন ঈশ্বর মানিবার প্রয়োজন কি?" ২য় বক্তৃতা—"উপাসনাতত্ত্ব" এতদ্ব্যতীত নিকটস্থ মৌথার ব্রাহ্মসমাজে "ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ কাজ কি?" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এখান হইতে বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গে চেরাপুঞ্জি গমন করেন। সেখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্ম দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন এবং সকলের সহিত বিশেষ রূপে খাসিয়া মিশন সম্বন্ধে এবং ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে কয়েক দিন আলোচনা করেন। একদিন একটী অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনা করেন এবং একদিন স্থানীয় বাঙ্গালীদিগকে লইয়া স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার বাবুর গৃহে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। এ স্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী ৪টী খাসিয়া সমাজ দেখেন। একদিন নংরিম ব্রাহ্মসমাজ ও একদিন মৌসমাই ব্রাহ্মসমাজে—"খাসিয়া জাতিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য এ বিষয়ে কিছু কিছু বলেন। তৎপর লাইকনসেউ ব্রাহ্মসমাজে খাসিয়া জাতিতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ কার্য্য" এই বিষয়ে বলেন। তৎপর শেলা ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হন। এইখানে উপাসনা হয় এবং খাসিয়া পর্ব্বত ও ব্রাহ্মধর্ম্ম এই বিষয়ে কিছু বলেন? তৎপর বিদায়ের দিন একটী বাবুর বাসায় উপাসনাদি করিয়া বিদায় লন। তৎপর শ্রীহট্টে গমন করিয়া সেখানে সপ্তাহ কাল অবস্থিতি পূর্ব্বক সমাজে ও গৃহে গৃহে উপাসনা করেন এবং উপদেশ দেন ও বিশেষ রূপে আলোচনাদি করেন এবং কয়েকটী বক্তৃতা করেন। সমাজ মন্দিরে "কোন্ ধর্ম্ম মানব?" স্থানীয় ন্যাশন্যাল স্কুলে "পথের কণ্টক" এবং প্রকাশ্য স্থানে "নিজের দায়িত্ব স্মরণ কর" এবং "অধর্ম্মেতে বিষম দুঃখ"। এস্থান হইতে কাছাড় (সিলচর) গমন করেন তথায় ১০।১২ দিন থাকিয়া সমাজে ও পরিবারে বিশেষ উপাসনাদি করেন এবং উপদেশ দেন ও আলোচনা করেন। একদিন একটী বন্ধুর নবজাত শিশুর জন্ম উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন ও স্থানীয় হাইস্কুলে "বর্ত্তমান জনসমাজে ধর্ম্মের অবস্থা" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই স্থানে অবস্থিতি কালে এক দিন সিলকুড়ি চা বাগানে যে সমাজ আছে তথায় গমন করেন। সেখানে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। তৎপর বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া তথাকার কাজ বন্ধ করিয়া, পুনরায় কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করেন। প্রায় দেড় মাস কাল আসামে থাকেন। এখন কুমিল্লা সমাজের উৎসবের কাষ শেষ করিয়া বিশেষ অনুরোধে নোয়াখালি গমন করিতে সংকল্প

করিয়াছেন। কুমিল্লাতে সমাজে ও গৃহে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন এবং আলোচনা করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু—কলিকাতা অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে কোন কোন পরিবারে উপাসনা করিয়াছেন। দাসাশ্রমের উৎসব উপলক্ষে এক দিন উপাসনা করেন ও উপদেশ দান করেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে একখানি বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়াছেন, সেখানি মুদ্রিত হইতেছে।

পাবনা—উৎসব উপলক্ষে তথায় কয়েক দিন আচার্য্যের কার্য্য করেন। কোন পরিবারে অনুষ্ঠান উপলক্ষে এক দিন উপাসনা করেন। এবং "মুক্তির পথ" বিষয়ে সমাজ গৃহে একটি বক্তৃতা করেন।

সিরাজগঞ্জ—উৎসব উপলক্ষে কয়েক দিন আচার্য্যের কার্য্য করেন। ছাত্রদিগের জন্য এবং সাধারণ লোকদিগের জন্য দুই দিন দুইটি বক্তৃতা করেন, এবং "ধর্ম্মের শিক্ষা" সম্বন্ধে আর এক দিন আর একটি বক্তৃতা করেন।

মুঙ্গের—এখানে কোন পরিবারে এক দিন উপাসনা করেন।

বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী—চেরাপুঞ্জী অবস্থান কালে প্রচার আশ্রমের প্রাত্যহিক মিলিত উপাসনায় পাঠ ও উপাসনা করেন এবং নংরিম, মোব্রেই ও মৌসমাই এই তিন ব্রাহ্ম সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় উপাসনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন। রোগীদিগকে চিকিৎসা ও পরিদর্শন করেন। মোয়া নামক স্থানে একদিন প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা করেন। দুইবার শেলা, লাইক্যানসেউ, মস্ত এবং শিলঙ্গে গমন করেন। শেলায় উপাসনা এবং "ঈশ্বরের প্রেম" ও "স্ত্রীজাতির উন্নতি" বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য দুইবার আলোচনা সভা করেন। মস্তে "স্বাভাবিক ধর্ম্ম" এবং "ব্রাহ্মধর্ম্ম ও অন্য ধর্ম্মে প্রভেদ কি?" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। পূর্ব্ববাঙ্গালা সম্মিলনীতে যোগ দিবার জন্য ঢাকা গমন পূর্ব্বক আলোচনায় যোগ দান করেন এবং আরম্ভ সূচক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। একদিন ঢাকা প্রচারকনিবাসে, একদিন পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে এবং একদিন এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন। দুইটী নামকরণ, একটী বার্ষিক শ্রাদ্ধ এবং একটী বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন। অন্য একটী জাতকর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন এবং আর একটী পারিবারিক অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন। শিলং ব্রাহ্ম সমাজে, মহিলা সমাজে এবং মৌথায় সমাজে কয়েকবার উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। কোন কোন বন্ধুর গৃহে পারিবারিক উপাসনা করেন। শিলং ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে দুইদিন উপাসনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন এবং দুইদিন "সাধুগণের নবজীবন লাভ" এবং "সেণ্টফ্রান্সিস্" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। চেরপুঞ্জী প্রচার-আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে উপাসনাদি করেন। খাসিয়া পাহাড়স্থ ব্রাহ্মসম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে উপাসনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন এবং সভাপতির কার্য্য করেন। পাঁচজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোককে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

খাসিয়া মিশন—চারটী ব্রাহ্মসমাজের ও নীতি বিদ্যালয়ের কার্য্য ভাল চলিতেছে। কার্য্যক্ষম লোকের অভাবে অপর দুইটী সমাজের কার্য্য সামান্য ভাবে চলিতেছে। তিন মাসের মধ্যে সর্ব্বসমেৎ ৭ জন দীক্ষিত হইয়াছে। চেরাপুঞ্জী মিশন স্কুলের কাজ নিয়মিতরূপে চলিতেছে। আসামের ডিরেক্টর সাহেব সম্প্রতি তাহা পরিদর্শন করিয়া প্রশংসাপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। চিকিৎসালয়ে রোগীর সংখ্যা প্রায় ৪০০ হইয়াছে। ব্রাহ্ম সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে কয়েক স্থান হইতে বন্ধুগণ আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত স্থান হইতে প্রচারক পাঠাইবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। গিরিডি, বোয়ালিয়া, কোচবিহার, ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালি, সিরাজগঞ্জ, মুঙ্গের, মানিকদহ, পাবনা, কুমারখালি ইহার মধ্যে গিরিডি, কুমিল্লা, নোয়াখালি, মানিকদহ, সিরাজগঞ্জ ও পাবনাতে কেহ কেহ গিয়াছিলেন।

ডিসেম্বর মাসে মান্দ্রাজ সহরে Theistic Conference হইয়াছে। আমাদের মান্দ্রাজবাসী বন্ধুদের অনুরোধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে ডাঃ মোহিনীমোহন বসু, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র ঐ conferenceএর প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন।

সাধনাশ্রম।

শ্রীযুক্ত জয়শঙ্কর রায়—মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্ম ছাত্রী নিবাসে প্রাতঃকালে উপাসনা করিয়াছেন, রোগীর সেবা করিয়াছেন। ব্রাহ্মপরিবার পরিদর্শন ও লোকের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপাদি করিয়াছেন। নিয়মিত রূপে শেল্‌টারে বালিকাদিগকে শিক্ষা দান করিয়াছেন এবং শেল্‌টারের কার্য্যাধ্যক্ষতা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল—ইনি পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিয়া নিম্নলিখিত রূপে কার্য্য করিয়াছেন। কৃষ্ণনগর—এ, ভি, এণ্ট্রান্স স্কুলে এবং কৃষ্ণনগর কলেজে নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। গোবিন্দ সড়ক বিদ্যালয় গৃহে "সাধন ও সিদ্ধি" এবং স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে "ধর্ম্ম কি?" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। কোন কোন বাসায় উপাসনা এবং ধর্ম্মব্যাখ্যা করেন।

পাবনা—জেলা স্কুলে নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং ব্রাহ্মসমাজ গৃহে সঙ্গীত সংকীর্ত্তন ও ধর্ম্মব্যাখ্যা করেন। কোন কোন বাসায় উপাসনা ও ধর্ম্মব্যাখ্যা করেন।

কুষ্টিয়া—এণ্ট্রান্স স্কুলে নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা, সমাজ গৃহে ধর্ম্মব্যাখ্যা, উপাসনা ও সঙ্গীতাদি করেন।

কুমারখালী—সমাজ মন্দিরে সাধুজীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং সাপ্তাহিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

খলিলপুর—সমবেত উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং বাঙ্গালা স্কুলের ছাত্রদিগকে নীতি সম্বন্ধে উপদেশ দেন।

রাজবাড়ী—স্থানীয় এণ্ট্রান্স স্কুলে নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং রেলওয়ে দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের ক্লবে ধর্ম্মব্যাখ্যা ও সঙ্গীত করেন।

ফরিদপুর—ব্রহ্মমন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। কোনও বাসায় পারিবারিক উপাসনা করেন। এবং একদিন মন্দিরে ধর্ম্মব্যাখ্যা ও সঙ্গীত করেন।

ময়মনসিংহ—কোন বাসায় ধর্ম্মব্যাখ্যা ও সঙ্গীতাদি করেন। মন্দিরে মুক্তিপ্রদ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এক দিন মন্দিরে ধর্ম্মব্যাখ্যা ও সঙ্গীতাদি করেন।

ঢাকা—ছাত্রসমাজে "আমাদের আশা ও দায়িত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। কোনও বাসায় উপাসনা করেন।

নারায়ণ গঞ্জ—স্থানীয় এণ্ট্রান্স স্কুলে নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সাপ্তাহিক উপাসনায় সমাজ গৃহে উপাসনা করেন এবং একদিন সমাজ ঘরে 'প্রকৃত ধর্ম্ম' বিষয়ে বক্তৃতা ও সঙ্গীতাদি করেন।

কুমিল্লা—ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে টাউন হলে 'আমাদের আশা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে কোনও বাসায় উপাসনা করেন এবং উৎসবে দুই দিবস মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন। কোনও বাসায় ধর্ম্মব্যাখ্যা ও সঙ্গীতাদি করেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সাধনাশ্রমের দৈনিক উপাসনায় কখন কখন আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজে দুই দিবস ও নিমতাব্রাহ্মসমাজে সাপ্তাহিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। কয়েকটী ব্রাহ্মপরিবার পরিদর্শন করিয়াছেন। গিরিডি ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়—সমাজ আফিসে নিয়মিতরূপে কার্য্য করিয়াছেন। মফঃস্বলে ও কলিকাতার অনেক পরিবারে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে এবং নিয়মিত পারিবারিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। সাধনাশ্রমে এবং সমাজ মন্দিরে মধ্যে মধ্যে প্রাতঃকালের উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন এবং তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছেন। ব্রাহ্মবালিকা বোর্ডিংএ উষাকালে উপাসনা করিয়াছেন এবং মাণিকদহ ও গিরিডি ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে গিয়া উপাসনাদি করেন।

সাধনাশ্রমের আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা		খরচ	
দান	১৬২৶০	প্রচার যাত্রার পাথেয় ও	
পুস্তক বিক্রয়ের আয়	৩৯৸৴১৫	অন্যান্য খরচ	৩০৴২॥
ঘর ভাড়া আদায়	৪৲	আশ্রমবাসিগণের	
খোরাকী বাবত	১৩॥০	আহারাদির ব্যয়	১৯৩॥৶০
জয়শঙ্কর বাবুর আয়	৬।০		
পাথেয় বাবত	৭।৶০		২২৩৸২॥
ভিক্ষা	৫৲	স্থিত	১৯৸৴১৭॥
	২৩৮।৴১৫		২৪৩॥৵০
পূর্ব্বস্থিত	৫।৫		
	২৪৩॥৵০		

আত্মসাধনাশ্রম।

শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব—আগষ্ট মাসে কোয়েটা গমন করিয়া তথায় একমাস কাল অবস্থান করিয়া প্রচার করেন। তৎপরে বেলুচি স্থানের নানা স্থানে প্রচার করিয়া রাউলপিণ্ডিতে গমন করেন। তৎপর ঝেলম ও জম্বুতে গমন করেন। ইহার পর সাদনরা নামক স্থানে গমন করিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন। সেখান হইতে আরায় ফিরিয়া আসেন। এখানে থাকিয়া নানা প্রকারে প্রচার করেন। মধ্যে একবার ডোমরাও এবং গাজীপুরে গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী—প্রধানতঃ আরায় থাকিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইতিমধ্যে গাজীপুর ও ডোমরাও প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
চাঁদা ও এককালীন দান—	২১৪৶০	ওয়ারকারদের ব্যয়	১৯৮৸০
		বাড়ী ভাড়া	৩৬৲
কলিকাতা সাধনাশ্রম হইতে প্রাপ্ত	২০৲	চাকরদের বেতন	১৭॥৴১০
		ঔষধাদি	৮৸০
পুস্তক বিক্রয়	৯৶১০	পুস্তক	১৲
পুস্তক বিক্রয়ের কমিশন—	৯॥১৫	বিবিধ	১০৴৫
		অতিথি হিঃ	১৪৸০
আহারাদি হিসাবে প্রাপ্ত—	২১।০	পাথেয়	৮৭॥৫
পাথেয়	১০০॥৴১০		৩৭৫॥০
গত ত্রৈমাসিকের—স্থিত	১৲	হস্তে স্থিত	।৴০
	৩৭৫৸৴০		৩৭৫৸৴

ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়—এই বিদ্যালয়ে এখন ৭৬ জন ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা পাইতেছে। ইহার মধ্যে বালকের সংখ্যা ১২। বোর্ডিংএর ছাত্রী সংখ্যা ২৬ জন। গত মাসে ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা ৭২ জন ছিল। বোর্ডিং এর গত মাসে ২৮জন ছিল।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
চাঁদা	১৬২৲	আহারাদি	৪৪৯৷৶৫
বেতন	৯৭২॥০	বেতনাদি	৭৪৬॥৶১৫
এককালীন দান	২২৫৲	গাড়ীভাড়া	১১২।০
ধার	৩০০৲	বাড়ীভাড়া	২৭৩৲
বিবিধ	৸৶০	বিবিধ	১৫॥৶০
		ধার শোধ	৩৭॥০
	১৬৬০৷৶০		
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	১৪৸৫		১৬৩৪৸৵০
		হস্তেস্থিত	৪০।৴৫
	১৬৭৫৶৫		১৬৭৫৶৫

সঙ্গতসভা—এই তিন মাসের মধ্যে সঙ্গত সভার ১১টী অধিবেশন হয়। কেবল দুই দিবস অধিক সংখ্যের সভ্যের অনুপস্থিত নিবন্ধন সভা স্থগিত ছিল। দুই দিবস গীতাপাঠ, তিন চারি দিবস সাধারণ আলোচনা ও নিম্নলিখিত ৫টী বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। ১। ধর্ম্মনিষ্ঠা। ২। ব্রাহ্মের সংসার কিরূপ হওয়া উচিত। ৩। ধর্ম্মানুগত সংসার। ৪। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা হয় কিরূপে। ৫। নিয়মিত উপাসনা।

দাতব্য বিভাগ—দাতব্য বিভাগের কার্য্য প্রায় পূর্ব্ববৎই চলিয়াছে। এই তিন মাস মধ্যে ১৩টী ছাত্র ১টী ছাত্রী, ১৩টী অসহায় পরিবার, ৪টী অন্ধ ও ১টী কুষ্ঠ রোগীকে অর্থ সাহায্য

করা হইয়াছে। অনেক দুঃখীকে উপযুক্তরূপে অর্থ সাহায্য করিতে পারা যায় নাই। নিম্নে দাতব্য বিভাগের আয় ব্যয়ের বিবরণ দেওয়া গেল।

জমা		খরচ	
এককালীন দান সংগ্রহ	১৩৲	মাসিক দান	৮৫৲
অনুষ্ঠান উপলক্ষে	৬১৲	এককালীন দান	১৷৷০
মাসিক দান সংগ্রহ	৬৷৷০	বিবিধ ব্যয়	।৶০
সুদ হিঃ জমা	২৷৷১৫		
			১০০৷৷৶০
	৮৩৲১৫	হস্তে স্থিত	২৭৮৷৷৵১০
পূর্ব্বের স্থিত	২৯৬।১৫		
			৩৭৯।/১০
	৩৭৯ /১০		

ব্রাহ্মসম্মিলনী—বিগত ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে বেলঘরিয়ায় বাবু সুরেন্দ্রনাথ দাসের উদ্যানে ব্রাহ্মসম্মিলনীর এক অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথমে উপাসনাদি হয়। পরে বিলাত হইতে প্রত্যাগত আমাদের সভাপতি বাবু আনন্দমোহন বসু মহাশয়কে এক অভিনন্দন দেওয়া হয়। সভাপতি মহাশয় বিলাতের ধর্ম্মসমাজ সকল পরিদর্শন করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহার কিছু কিছু বর্ণনা করেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় উপস্থিত ব্রাহ্ম মহাশয়দিগকে নিজ ব্যয়ে ভোজন করাইয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া যাইতেছে।

রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা—বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রাতে সাধনাশ্রমে রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ উপাসনা হয় ও অপরাহ্নে সিটি কলেজ-গৃহে এক মহতী সভা হয়। মাননীয় জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানেও রাজার স্মরণার্থ সভা হইয়াছিল।

ছাত্রসমাজ—শারদীয় অবকাশ উপলক্ষে ছাত্রসমাজের কার্য্য বন্ধ ছিল। অবকাশের পরে ৪টী সভা হইয়াছে এবং তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

১লা ডিসেম্বর—বক্তা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বিষয় "সত্যতার গূঢ়তত্ত্ব"।

৮ই ডিসেম্বর—বক্তা বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিষয় "বুদ্ধিগত জ্ঞান ও পারমার্থিক জ্ঞান"।

১৫ই ডিসেম্বর—বক্তা বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিষয় "বন্দী কমিব পুস্তিকা"।

২২শে ডিসেম্বর—বক্তা বাবু প্রমথনাথ সেন, বিষয় The worship of sorow

দান—আমরা আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীমতী জগৎলক্ষ্মী ঘোষ মহাশয়া ব্রাহ্মসন্তানদিগের শিক্ষার্থ ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার সুদ শিক্ষার জন্য ব্যয় হইবে। আমরা এই দানের জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি।

দুর্ভিক্ষ—ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষ শেষ হওয়াতে বাবু হরিমোহন ঘোষাল তথা হইতে চলিয়া আসিয়াছেন। গত মার্চ্চ মাস হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ইহার আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

জমা	খরচ	
গত মার্চ্চ হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নানা স্থান হইতে দানপ্রাপ্তি	রাধাগঞ্জে বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষালের মাঃ, চাউল, কাপড নগদদানাদিতে ব্যয় হয়	১৩২৶০
মোট জমা—১৫২৫৲২৷৷	মাদরাতে কর্ম্মচারিগণের যাতায়াতের এবং স্থানীয় অনুসন্ধানের পাপের ব্যয়	২।৵১৫
	মাদরাতে বাবু হরিমোহন ঘোষালের মাঃ, চাউল, কাপড নগদ দানাদিতে ব্যয় হয়	৫৫০৷৷১০
	বিবিধ চিঃ	
	প্রয়োজনীয় জিনিষ (কর্ম্মচারীর বস্ত্রাদি কাগজ, খাতা ও অপরাপর জিনিষ খরিদ)	২০৲১০
	এবং টাকা পাঠাইবার ডাক মাশুল	১৷৷৵১০
	ঔষধ	১১৶০
	ফরিদপুর সুহৃদসভার সম্পাদক বাবু দবাপ্রসন্ন রায় চৌধুরীকে দেওয়া হয়	৫০৲
		৭৮ ৷৷৫
	স্থিত	৭৩৭।৶১৭৷৷
		১৫২৫৲২৷৷

নূতন সমাজ—গোবরপুর একটী নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অনুষ্ঠান—যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, এই তিন মাস মধ্যে ১৩টী নামকরণ ও জাতকর্ম্ম, ৫টী বিবাহ ও ৬টী শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে।

মৃত্যু—আমরা দুঃখের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে সমাজের সভ্য বাবু রামলাল সাহা ও বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঈশ্বর ইঁহাদের আত্মাকে শান্তিদান করুন।

আয়ব্যয়ের হিসাব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ফণ্ড।

আয়		ব্যয়	
সভা ও সহযোগিগণের নিকট হইতে চাঁদা প্রাপ্তি	৩০৮॥৫	প্রচার ব্যয়	৩৮১৸/৫
বার্ষিক চাঁদা ২০৬৲		কর্ম্মচারীর বেতন	৮২১৵
মাসিক চাঁদা ১০২॥৫		বিবিধ হিঃ	৯/২॥
	৩০৮॥৫	কমিশন হিঃ	১/০
		ডাকমাশুল হি	৮৲
		মুদ্রাঙ্কন হিঃ	২৲
প্রচারার্থ দানপ্রাপ্তি	২৪১।৵৫	পাথেয় হিঃ	১৬॥/
বার্ষিক চাঁদা ৮॥৫		বিল্‌ডিং ফণ্ড হিঃ	৩॥০
মাসিক চাঁদা ১২৮৲		রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা হিঃ	১১৵
এককালীন দান ১০৪৸৵		সিটি কলেজ বৃত্তি (ব্রাঃ বালকদিগের বেতন দান)	৬০৲
	২৪১।৵৫		
সিটিকলেজ বৃত্তি	৬০৲	প্রচারক গৃহ হিঃ	২৭।১৫
জন্ম রেজিষ্টারির ফিস	১৸০	নবদ্বীপ বৃত্তি	৩৲
স্থায়ী প্রচার ফণ্ডের চাঁদা	১৫৲	দুর্ভিক্ষ হিঃ	১৩৬৵
সুদ হিঃ	৭২৲	ঋণদান	৮০০৲
ব্রাহ্ম বালকবালিকা শিক্ষার্থ স্থায়ী ফণ্ড হিঃ	৫০০৲	হাওলাত ও গচ্ছিত শোধ	৭৬৲
উৎসব হিঃ	২৲		১৪৫৮৵২॥
বিল্ডিং ফণ্ড হিঃ	৫১.৫	স্থিত	১৫১৮॥৫
দুর্ভিক্ষ হিঃ	৪৪৩॥৭॥		
রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা হিঃ	১২৵৫		২৯৭৬৸৵৭॥
পাথেয় হিঃ	১৭॥০		
হাওলাত আদায় ও গচ্ছিত হিঃ	১৫১৲		
	১৮৭০৵১৭॥		
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	১১৪৬।৵১০		
	২৯৭৬৸৵৭॥		

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

আয়		ব্যয়	
মূল্যপ্রাপ্তি	১৭১॥৵১০	কর্ম্মচারীর বেতন	৯৯৲
বিজ্ঞাপন হিঃ	২৲	মুদ্রাঙ্কন	১৩০৲
নগদ বিক্রয়	৪৲	ডাকমাশুল	১১১॥৵৫
বিবিধ হিঃ	৩৲	বিবিধ	১০৸/১০
ডাকমাশুল হিঃ	।৵	কমিশন	॥০
হাওলাত (পুস্তক ফণ্ড হইতে)	১৬৫৲	কাগজ খরিদ	৫২॥/১৫
			৪০৪॥৵১০
	৩৪৬৵১০	স্থিত	৭৵১৫
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	৬৫৸৵১৫		৪১২৵৫
	৪১২৵৫		

তত্ত্ব-কৌমুদী।

আয়		ব্যয়	
মূল্যপ্রাপ্তি	২৪৩৵	কর্ম্মচারীর বেতন	৬৯৲
বিবিধ	১।০	মুদ্রাঙ্কন	৮১৲
		বিবিধ	৬।/১০
	২৪৪।৵	ডাকমাশুল	৪৬/১০
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	১২১৵৫	কাগজ খরিদ	৩৫/০
		কমিশন	৪৵০
	৩৬৬৸/৫		২৪১॥৵
		স্থিত	১২৫৵৫
			৩৬৬৸/৫

পুস্তক ফণ্ড।

আয়		ব্যয়	
নগদ বিক্রয়	২৩৫॥/১০	কর্ম্মচারীর বেতন হিঃ	২২।৵
সমাজের ১৯৪৸৵		অপরের মূল্য শোধ হিঃ	৩০/১০
অপরের ৩৭॥৵১০		ডাকমাশুল হিঃ	১০৸৵
		বিবিধ হিঃ	॥৵১০
	২৩১॥/১০	কমিশন হিঃ	২৩৸৵
বাকী মূল্য আদায়	৩১॥৵১০	পুস্তক বাঁধাই হিঃ	৩৵০
ডাকমাশুল	৯॥৫	পুস্তক খরিদ হিঃ	১৸০
কমিশন	৩।/১০		
			৯১৸৵
	২৭৭৵১৫	হাওলাত দান	১৬৫৲
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	২৩৩/৫		২৫৭৸৵
	৫১০॥	স্থিত	২৫২॥৵
			৫১০॥

ব্রাহ্মমিশন প্রেস।

আয়		ব্যয়	
অক্টোবর মাস	৩৩৫৵৫	সরঞ্জামী	৫২৬৸৵১২॥০
নভেম্বর মাস	৪৩২৵০	জলপানি	৪৩।০
ডিসেম্বর মাস	৬৮৪৸/০	বিবিধ	৩০॥০
		ঋণদান	১৬৭৸/৫
	১৪৫২/৫	(গ্রন্থকারদিগকে কাগজ ইত্যাদির জন্ত পাব্লিকেশন হিঃ	৪৫৲
পূর্ব্ব ত্রৈমাসিকের স্থিত	৩৩০/০	সুদ	৭২৲
		কর্ম্মচারীদের বেতন	৮৭৯।/১৫
		ডাকমাশুল	৭॥৵০
মোট জমা	১৭৮২৵৫	জন ডিকেনসন এণ্ড কোং দর কাগজ ও কালী	৮৩৸০
		জর্জ হ্যাণ্ডারসনএণ্ড কোঃ	২২০৲
		টাইপের দেনশোধ	৭৮৲
		কমিশন	৩০৲
		গচ্ছিত জমা শোধ	৫০৲
		অতিরিক্ত জমা ফেরত	২৸৵১০
		ষ্টক খাতায় খরচ	১০৸৵১০
		দালালী	৮৲
			১৭৭৭/১২॥
		হস্তেস্থিত	৫/১২॥
			১৭৮২৵৫

এই তিন মাসে মোট কাজ হইয়াছে—১৪৭০ টাকার।

ব্রাহ্মসমাজ।

পঞ্চষষ্টীতম মাঘোৎসবের কার্য্যপ্রণালী।

নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা আগামী মাঘোৎসব সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে এই প্রণালীর কোনও কোনও অংশের পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। আমরা ব্রাহ্ম এবং ধর্ম্মানুরাগী প্রত্যেককে এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি।

১লা মাঘ (১৪ই জানুয়ারি) সোমবার—ব্রাহ্ম পরিবারে, ও ব্রাহ্মছাত্রনিবাসে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা।

২রা মাঘ—(১৫ জা) মঙ্গলবার—উদ্বোধন।

৩রা মাঘ—(১৬ই জা) বুধবার—প্রাতে উপাসনা; সায়ংকালে—বক্তৃতা।

৪ঠা মাঘ—(১৭ই জা) বৃহস্পতিবার—প্রাতে উপাসনা, সায়ংকালে—ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক উৎসব।

৫ই মাঘ—(১৮ই জা) শুক্রবার—প্রাতে উপাসনা; সায়ংকালে—সঙ্গত সভার উৎসব।

৬ই মাঘ—(১৯শে জা) শনিবার—প্রাতে উপাসনা; সায়ংকালে—ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে পাঠ।

৭ই মাঘ—(২০শে জা) রবিবার—প্রাতে উপাসনা; সায়ংকালে—বাহিরে প্রচার, সায়ংকালে—উপাসনা।

৮ই মাঘ—(২১শে জা) সোমবার—প্রাতে উপাসনা। বৈকালে—রবিবাসরিক বিদ্যালয়ের উৎসব, সায়ংকালে—বক্তৃতা।

৯ই মাঘ—(২২শে জা) মঙ্গলবার—প্রাতে ব্রাহ্মিকা সমাজ; মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মসম্মিলন, সায়ংকালে—বার্ষিক সভা।

১০ই মাঘ (২৩শে জা) বুধবার—প্রাতে উপাসকমণ্ডলীর উৎসব; বৈকালে—নগর কীর্ত্তন; সায়ংকালে—উপাসনা।

১১ই মাঘ—(২৩শে জা) বৃহস্পতিবার—সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসব।

১২ই মাঘ—(২৫শে জা) শুক্রবার—প্রাতে সাধন আশ্রমের উৎসব, মধ্যাহ্নে—আলোচনা এবং সায়ংকালে—বক্তৃতা।

১৩ই মাঘ—(২৬শে জা) শনিবার—প্রাতে উপাসনা, বৈকালে—বালক বালিকাসম্মিলন। ছাত্রসমাজের উৎসব।

১৩ই মাঘ—(২৭শে জা) রবিবার—ব্রাহ্ম সম্মিলনীর উৎসব।

কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলী—কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর কার্য্যাদি নূতনভাবে আবদ্ধ হইয়াছে। উপাসকমণ্ডলীর সম্পাদক ডাঃ পি, কে, রায় বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী নিয়মিত আচার্য্য পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার অবস্থিতির জন্য ২২০নং কর্ণওয়ালীসস্থ ষ্ট্রীট ভবন ভাড়া করা হইয়াছে। সেই বাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে ও উপাসকমণ্ডলীর কার্য্যালয় এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজ্জনবাসের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রবিবার সন্ধ্যাকালের উপাসনায় কি বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হইবে, তাহা অগ্রে বিজ্ঞাপনদ্বারা প্রকাশ করা হইয়া থাকে। এই সমস্ত উপদেশ ক্রমশঃ মুদ্রিত হইবে। অনেকেই উপাসকমণ্ডলীর সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই নূতন বন্দোবস্তে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া, উপাসকমণ্ডলীর সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন; এবং প্রতি মাসে ১০ টাকা করিয়া সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তদ্ভিন্ন এককালীন ৬০০শত টাকা দান করিয়াছেন। রবিবার সন্ধ্যাকালের উপাসনায় এত লোক সমাগম হয় যে, অনেকে স্থানাভাবে দণ্ডায়মান থাকেন। সোমবার দিবস আচার্য্যের বাসভবনে অনেক ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়া ধর্ম্মালোচনাদি করিয়া থাকেন।

সাধনাশ্রম—আমাদের প্রিয় মাঘোৎসব নিকটবর্ত্তী দেখিয়া পরিচারকগণ চারিদিক হইতে আসিয়া সাধনাশ্রমে সম্মিলিত হইতেছেন। আরা আশ্রম হইতে ভাই প্রকাশ দেব, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত শ্রীরঙ্গবিহারী লাল এবং পূর্ব্ববাঙ্গালা হইতে শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত, রামপুরহাট হইতে শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় শিলং, শ্রীহট্ট, কাছাড় ও কুমিল্লা, নোয়াখালী ভ্রমণ করিয়া আশ্রমে উপনীত হইয়াছেন। ১লা জানুয়ারী আশ্রমের মাসিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে দুই বেলা উপাসনা এবং মধ্যাহ্নে পাঠ ও আলোচনা হয়। উপাসনায় শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রাতঃকালীন উপাসনার পরে প্রেমাস্পদ শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ঘোষ সাধনাশ্রমের পরিচারক হইবেন বলিয়া সংকল্প গ্রহণ করেন। পরমেশ্বর তাঁহার প্রাণে নবশক্তি প্রদান করুন।

উৎসব—বিগত ২৪ ও ২৫এ ডিসেম্বর নলহাটী ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা, রামপুরহাট, দিনাজপুর, আসেনসোল এবং ধুলায়ান হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত প্রণালীতে উৎসবের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়,—

২৪এ ডিসেম্বর প্রত্যূষে পরলোকগতা স্বর্ণময়ী ঘোষের মৃত্যুদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা। মধ্যাহ্নে স্বর্ণময়ীর জীবনচরিত পাঠ এবং প্রার্থনা। রাত্রিতে স্বর্ণময়ীর একমাত্র কন্যার নামকরণ হয়। বালিকার নাম "ডোরা নির্ঝরিণী" রাখা হইয়াছে। পরমেশ্বর বালিকার জীবনে মাতার সদ্গুণরাশী প্রস্ফুটিত করুন।

২৫এ ডিসেম্বর—প্রাতে এবং রাত্রিতে উপাসনা। মধ্যাহ্নে নলহাটী মিশন সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। অপরাহ্নে বাজারে সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়।

গত ২২শে পৌষ হইতে ২৬শে পৌষ পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে আমাদের ঢাকাস্থ প্রাচীন ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু কালানারায়ণ রায় তথায় গমন করিয়াছিলেন। নগরকীর্ত্তন উপাসনা ও সংগীতাদি প্রতিদিন অতি সরলভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

রাজসাহী ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিতরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। ৮ই পৌষ সমাজ মন্দিরে উদ্বোধন হয়, শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৯ই পৌষ ভোর কীর্ত্তন হয়, তৎপরে মন্দিরে উপাসনা হয়। বাবু শ্যামাচরণ ধর আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১০ই পৌষ প্রাতে বাবু রামচন্দ্র সিংহ উপাসনা করেন। অপরাহ্নে গরিবদিগকে বস্ত্র ও পয়সা বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যাকালে রামচন্দ্র বাবু উপাসনা করেন। ১১ই পৌষ প্রাতে ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন হয়, তৎপরে মন্দিরে রামচন্দ্র বাবু "চরিত্রবল" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১২ই পৌষ উদ্যান সম্মিলন হয়। তথায় উপাসনা, আলোচনা ও পাঠাদি হয়।

গিরিডি ব্রাহ্মসমাজের বিংশতিম সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিতরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। ৯ই পৌষ প্রাতে উদ্বোধন সূচক উপাসনা হয়। সন্ধ্যার সময় উপাসনা হয়, বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১১ই পৌষ প্রাতঃ

কালে উপাসনা হয়, বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে গরিবদিগকে দান করা হয়, অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যার পরে সমাজ মন্দিরে প্রার্থনা ও সংকীর্ত্তনাদি হয়। ১২ই পৌষ প্রাতে শ্রীযুক্ত যোগানন্দ দাসের বাসায় উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনা করেন।

কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস এবং শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল গুপ্ত এবং ময়মনসিংহ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ চন্দ কুমিল্লায় গমন করেন। নিম্নলিখিত রূপে উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ৯ই পৌষ রাত্রে সমাজমন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন হয়, শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল উপাসনা করেন। ১০ই পৌষ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় টাউন হলে কাশীবাবু "আমাদের আশা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১১ই পৌষ প্রাতে শ্রীনাথ বাবু উপাসনা করেন। অপরাহ্নে সংগীত ও আলোচনা হয়। রাত্রে নবদ্বীপ বাবু উপাসনা করেন। ১২ই পৌষ শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বর্দ্ধনের বাসায় উপাসনা হয়, নবদ্বীপ বাবু উপাসনা করেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় টাউন হলে শ্রীনাথ বাবু "উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ও ব্রাহ্মসমাজ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বক্তাকে ধন্যবাদ দেন এবং বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্থানীয় প্রধান উকিল বাবু কৈলাসচন্দ্র দত্ত উক্ত বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের স্মরণীয় বিষয়। তিনি বলেন যে, "জাতিভেদ সম্বন্ধে মুখে যিনি যাহা বলুন এবং কার্য্যে যিনিই যাহা করুন কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিরা সরল ভাবে প্রাণ খুলিয়া যদি কথা কহেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, তাঁহারা অনেকেই জাতিভেদ মানেন না, মানা উচিতও মনে করেন না। আমি স্বীকার করিতেছি, দুর্ব্বলতা বশতঃ জাতি মানিয়া চলিতেছি; কিন্তু আমি বিশ্বাস করি জাতিভেদ এদেশের সর্ব্বপ্রকার অনিষ্টের মূল। জাতিভেদ উঠিয়া না গেলে এদেশের উন্নতির আর আশা নাই।" ১৩ই পৌষ দুর্গাচরণ বসুর বাসায় উপাসনা হয়, নবদ্বীপ বাবু উপাসনা করেন। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বর্দ্ধনের বাসায় সমবেত মহিলাদিগের নিকট কাশী বাবু কয়েকটী ধর্ম্মশীলা সাধ্বী রমণীর জীবন অবলম্বন করিয়া উপদেশ দান করেন এবং সংগীত করেন।

ঢাকা ছাত্রসমাজ—বিলাত হইতে আগত ডাক্তার পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ঢাকা কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাদি করিবার জন্য বিশেষভাবে মনোযোগী হইতেছেন দেখিয়া, আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইতিমধ্যে তিনি ছাত্রসমাজের সভাপতি পদে বৃত হইয়া বক্তৃতাদি করিতেছেন এবং ছাত্রদিগকে তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য আয়োজন করিতেছেন। পরমেশ্বর করুন, এ সকল কার্য্যে তাঁহার উৎসাহাগ্নি দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হউক।

বিবাহ—বিগত ২৪শে ডিসেম্বর (১৮৯৪) তারিখে ভাগলপুর নগরে শ্রীযুক্ত বাবু বামাচরণ ঘোষের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলা ঘোষের সহিত বাবু বিহারী কৃষ্ণ দেবের শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

উক্ত তারিখে মুঙ্গের নগরে শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের পুত্র শ্রীমান্ চারুচন্দ্র সিংহের সহিত শ্রীমতী বিষ্ণুমোহিনীর বিবাহ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন।

সিলং সহরে শ্রীযুক্ত বাবু লালমাধব বাবুর কন্যা শ্রীমতী গিরিবালার সহিত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নাথের বিবাহ হইয়াছে। এই উপলক্ষে বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১৲ এবং সাধনাশ্রমে ১৲ দান করিয়াছেন। সকল বিবাহই ৩ আইনানুসারে রেজেষ্টারী হইয়াছে। পরমেশ্বর নবদম্পতিদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নামকরণ—৫ই জানুয়ারী ২১০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিসের পুত্র শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্র মহলানবিসের পুত্র ও প্রথমা কন্যার নামকরণ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন। পুত্রের নাম প্রশান্তচন্দ্র ও নীরদচন্দ্র এবং কন্যার নাম জ্যোৎস্না ও হিমানী রাখা হইয়াছে।

নারায়ণগঞ্জে বাবু দীনবন্ধু মিত্রের পুত্রের নামকরণ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল উপাসনা করেন। বালকের নাম সত্যেন্দ্রমোহন রাখা হইয়াছে।

কলিকাতায় শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রমোহন বসুর প্রথম পুত্রের নামকরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করিয়াছিলেন। বালকের নাম হিতেন্দ্র মোহন রাখা হইয়াছে।

নোয়াখালীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু সুরেশচন্দ্র সিংহের দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ কার্য্য উক্ত স্থানে সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। বালকের নাম নির্ম্মলকুমার রাখা হইয়াছে। এই উপলক্ষে সুরেশ বাবু নিম্নলিখিতরূপ দান করিয়াছেন। সাঃ ব্রাঃ সমাজ প্রচার ফণ্ড ৩৲ দাতব্য বিভাগ ১৲ সাধনাশ্রম ৪৲ নোয়াখালী ব্রাহ্মসমাজ ৭৲ কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজ ১০৲ মোট ২২ টাকা।

পরমেশ্বর শিশুদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার—সুনামগঞ্জস্থ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণদয়াল রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীমান্ অক্ষয়নাথ রায় সাঃ ব্রাহ্মসমাজে নিম্নলিখিতরূপ দান করিয়াছেন; প্রচার বিভাগ ২৲ দাতব্য বিভাগ ১৲ এবং সাধনাশ্রম ২৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র সিংহ তাঁহার নবজাত পুত্রের কল্যাণার্থে নিম্নলিখিতরূপ দান করিয়াছেন; প্রচার বিভাগ ১৲ সাধনাশ্রম ১৲ টাকা। আমরা দাতাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১লা মাঘ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

২০শ সংখ্যা। ১৭শ ভাগ। | ১৬ই মাঘ মঙ্গলবার, ১৮১৬ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৬। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বলে ৩ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে প্রেমময় পরমেশ্বর, প্রেমই তোমার মুখের জ্যোতি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার প্রেমের সুবর্ণে অনুরঞ্জিত। তুমি প্রেম-মূর্ত্তি। তুমি জীবন্তভাবে সর্ব্বত্র প্রেমরূপে বিকশিত আছ বলিয়া জগৎ এত সুন্দর ও মনোহর হইয়াছে। তুমি প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছ, তাই জননীর স্নেহ, পত্নীর প্রেম, শিশুর কোমল অনুরাগ এত মধুর। তুমি প্রেমরূপে সাধুর হৃদয়ে বাস কর বলিয়া, সাধুগণ জগৎকে প্রেমালিঙ্গন দ্বারা মাধুর্য্য দান করিতেছেন। তুমি প্রেমরূপী হইয়া জড়জগতে বাস করিতেছ বলিয়া নদনদী, গিরিকন্দর, বন উপবন এবং অনন্ত আকাশের অনন্ত গ্রহমণ্ডলীতে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য রাশি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। জগৎ তোমারই প্রেমের বিচিত্র নিদর্শন। তোমার প্রেমের মহা আকর্ষণে নরনারীর হৃদয় কেন্দ্রীভূত এবং জড়জগৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ। জড় ও চেতন প্রেমের এক মহাসূত্রে গ্রথিত, এই বন্ধন ছিন্ন হইলে জগৎ এক মুহূর্ত্ত মাত্রও জীবিত থাকে না। ধন্য তুমি জগদীশ। তোমার এই প্রেম লাভ করিবার জন্য মানব প্রাণকে ব্যাকুল করিয়াছ। তোমার প্রেমসুধাবারি একবিন্দু পান করিবার জন্য তৃষিত মানবাত্মা নিয়ত লালায়িত। তোমার অনন্ত প্রেমজলধির এক কণা যখন তৃষিত মানব প্রাণে পতিত হয়, তখনই প্রকৃত ব্রহ্মোৎসব হইয়া থাকে। প্রভো, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন, তৃষিত হইয়া তোমার দ্বারে উপস্থিত হই, এবং এক বিন্দু প্রেম লাভ করিয়া মহোৎসব সম্ভোগ করিতে পারি, যেন তোমার প্রেমে আপন পর ভুলিয়া যাই, সুখ স্বার্থ ভুলিয়া যাই, সম্পূর্ণ-রূপে আপনাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হই।

তোমার প্রেম ত অযাচিতরূপে আমাদের হৃদয় দ্বারে উপস্থিত, আমরা আপনাকে ভুলিতে পারি না বলিয়াই সেই প্রেমের অংশী হইতে পারি না। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আগামী বর্ষে যেন আমরা আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া তোমার প্রেমে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারি। যেন তোমার সেবা করিতে গিয়া আমরা তোমাকেই দর্শন করি, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তোমারই গৌরব অন্বেষণ করি।

পঞ্চষষ্টিতম মাঘোৎসব।

তৃষিত শুষ্ককণ্ঠ চাতক এক বিন্দু বারির জন্য উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছিল, প্রখর মধ্যাহ্ন-গ্রীষ্মপ্রতপ্ত পথিক পিপাসায় অস্থির হইয়া জলের অন্বেষণে ছুটিতেছিল, হঠাৎ সুপানীয় প্রাপ্ত হইলে তাহাদের হৃদয়ে যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়, তাহা অবর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যে মানবাত্মার যখন ঐরূপ শুষ্কতা উপস্থিত হয়, যখন প্রেমময়ের প্রেমবারি পান করিবার জন্য পরিশ্রান্ত, তৃষিত আত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন যদি সে এক বিন্দু স্বর্গের অমৃতবারি প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার আনন্দ আরও অধিক হয়। সেই আনন্দোচ্ছ্বাসের নামই ব্রহ্মোৎসব অথবা মহোৎসব।

যেখানে ব্যাকুলতা নাই, সেখানে উৎসব বাহ্যব্যাপার মাত্র। ফুলের মালা, নিশান এবং প্রীতিভোজনেই তাহার পরি-সমাপ্তি। ব্যাকুলতা হইতেই উৎসবের প্রকৃত উৎস উৎসারিত হইয়া থাকে।

পিপাসার উদ্রেক ভিন্ন যেমন জলপানের প্রয়োজন হয় না, ক্ষুধার উদ্রেক না হইলে যেমন আহারের প্রয়োজন হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্ম প্রেমসুধা পান করিবার জন্য প্রাণ তৃষ্ণার্ত্ত না হইলে, প্রেমবারির প্রয়োজন হয় না। অন্তর্যামী ভগবান মানব অন্তর দর্শন করেন, বাহিরের আয়োজন দেখিয়া ভুলিয়া যান না। অতএব আমাদের মধ্যে যিনি তৃষিত ও ব্যাকুল, তিনিই বিশেষরূপে উৎসব সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন।

উপাসকের অন্তরে প্রতি নিয়ত নানারূপ পিপাসা উপস্থিত হইতেছে। কখন জ্ঞানের পিপাসা, কখন প্রেমের পিপাসা, কখন বা পবিত্রতার জন্য পিপাসা হইয়া থাকে। এইরূপে ধর্ম্মসমাজের অধিকাংশ লোকের প্রাণ যে জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, প্রভু পরমেশ্বর উৎসবে তাহাই পূরণ করিয়া থাকেন।

আমাদের প্রিয় ১১ই মাঘের উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এবার আমরা কি জন্য ভিখারীর বেশে তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলাম? কি অভাব তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম? সেই প্রার্থনা কি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন? তিনি তাপিত অন্তরে সুশীতল হস্ত অর্পণ করিয়া হৃদয়ের জ্বালাময় ক্ষত সকল

আরোগ্য করিয়া ছন কি? উৎসবান্তে একবার তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখি।

ব্রাহ্মগণ কয়েক বৎসর হইতে বিশেষভাবে ইহা অনুভব করিতেছেন যে, পরস্পরের প্রতি প্রেমের অভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনে ও প্রচারে বড় বিঘ্ন হইতেছে। যাঁহারা জগতে প্রেম প্রচার করিতে যাইতেছেন, তাঁহাদের গৃহে প্রেম নাই, শান্তি নাই। ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা দলে ব্রাহ্মগণ বিভক্ত হইয়া বিচ্ছিন্ন হইতেছেন। মতগত ও সাধনগত পার্থক্যে মনোবাদ ঘটিতেছে। শ্রদ্ধা ও ভক্তিই সমবেত ধর্ম্ম সাধনের মূলমন্ত্র, সেই শ্রদ্ধা ভক্তি বিহীন হইয়া ব্রাহ্মগণ অবিনয়ী হইতেছেন। সুতরাং এই ভয়ানক রোগের প্রতীকার না হইলে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ হইবে না।

এই মহামন্ত্র পালনের উদ্দেশ্যেই সকলে প্রেমে একীভূত হইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্যই সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ব্রাহ্মসম্মিলনী স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা বলা বাহুল্য যে, কোন্ রোগে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ আহত সৈনিকের ন্যায় শয্যায় শায়িত হইয়াছেন, তাহা অনেক দিন হইতেই বুঝিতে পারা গিয়াছে। পরমেশ্বরের কৃপায় এইবার অনেকের চক্ষুই এই দিকে ধাবিত হইয়াছে। এই জন্যই এবার অনেকেই প্রেম-ভিক্ষার্থী হইয়াছেন; সংগীত সংকীর্ত্তনে প্রেমের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, উপদেশে আলোচনায় প্রেমের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং প্রার্থনাকালে প্রেমের আকাঙ্ক্ষাই জাগ্রত হইয়াছে।

প্রত্যেক বারেই উৎসবের একটী বিশেষ ভাব থাকে। এবারের বিশেষ ভাব এই যে, আমাদিগকে প্রেমে সম্মিলিত হইতে হইবে। আমাদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য রাখিয়াও আমরা প্রেমে এক হইয়া যাইব। এবার প্রেম পিপাসু হইয়া সাধকগণ তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাই জগজ্জননী প্রেমে সকলকে বাঁধিবার আয়োজন করিয়াছেন। ব্রাহ্ম ভাই ভগিনি, এবার যে প্রেমের সুকোমল করস্পর্শ অনুভব করিয়াছ, তাহা বিস্মৃত হইও না। প্রেমময়কে সকলের মধ্যস্থলে দর্শন করিয়া প্রেমে এক হইয়া যাও, প্রেম মন্ত্র জপ কর, প্রেমের ধর্ম্মসাধন কর। এই প্রেম জাগিলেই ব্রাহ্মধর্ম্ম উজ্জ্বল হইবে, ব্রাহ্মসমাজ গৌরবান্বিত হইবে এবং আমরা ধন্য হইয়া যাইব।

যিনি তৃষিত আত্মাকে উৎসবক্ষেত্রে শান্তি দান করিয়াছেন, যিনি ভগ্ন প্রাণগুলিকে একত্র গাঁথিয়া সঞ্জীবিত করিয়াছেন। যিনি তাপিত, শোকসন্তপ্ত হৃদয়কে প্রেমবারি দানে শীতল করিয়াছেন, সেই প্রেমময় সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের পবিত্র চরণে বার বার নমস্কার করিয়া মাঘোৎসবের মধুময় কার্য্য-বিবরণ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হই। বিদেশস্থ ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ আমাদের হৃদয়ের প্রেমপূর্ণ অভিবাদন গ্রহণ করুন, এবং প্রভু পরমেশ্বর এবার উৎসবক্ষেত্রে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা শিরোধার্য্য করিয়া প্রেম সাধনে নিয়োজিত হউন।

১লা মাঘ সোমবার।

অদ্যকার দিন ব্রাহ্মপরিবারে ও ব্রাহ্মছাত্রাবাস সমূহে উপাসনা এবং ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থে প্রার্থনার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। রজনী প্রভাতে দেখা গেল যে, ব্রাহ্মপরিচারকাশ্রম, কোন কোনও ছাত্রাবাস এবং অনেক ব্রাহ্মগৃহ ফুলের মালা ও লতা পাতায় সুসজ্জিত হইয়াছে। কোন কোনও প্রাসাদের শীর্ষদেশে "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্" "ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্" "সত্যমেবজয়তে" ইত্যাদি বচন অঙ্কিত নিশান উড়িতেছে। যুবকগণ অতি উল্লাস ও আনন্দে উপাসনাদির আয়োজন করিতেছেন, তাঁহাদের মুখে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়াছে। সাধনাশ্রমে কেহ রজনী ২ ঘটিকার সময়, কেহ ৩ ঘটিকার সময় সাধনকুটীরে প্রবেশ করিয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন। ৪½ ঘটিকার সময় সুমধুর সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। উষাকালে সংকীর্ত্তন শ্রবণে সাধকগণের প্রাণ মুগ্ধ হইয়া গেল। ৫ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা আরম্ভ করিলেন। সংগীত ও উপাসনাদি অতীব প্রাণস্পর্শী ও গভীর হইয়াছিল। যে ব্রাহ্মসমাজের শীতল ছায়াতে উপবেশন করিয়া শত শত পাপভারাক্রান্ত তৃষিত তাপিত আত্মা বিশ্রামলাভ করিতেছে, শান্তি পাইতেছে, সংসারের পাপ ও মোহান্ধকারের মধ্যে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ আলোক বর্ত্তিকা লইয়া পথ প্রদর্শন করিতেছেন, যে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়ে ভারত নবজীবন লাভের পথে অগ্রসর হইয়াছে, সেই ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলার্থে অদ্য পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে সকলে সম্মিলিত হইয়াছেন, আজ কি কেহ উদাসীন থাকিতে পারেন? নিজ নিজ জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এবং ব্রাহ্মসমাজ সেই জীবনের উন্নতি পথে কিরূপ সহায়তা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া অনেকেই অশ্রুজলে সিক্ত হইলেন এবং প্রাণের মর্ম্ম স্থান হইতে অনেকেরই প্রার্থনা উত্থিত হইল।

এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবস শ্যামাচরণ দেব ষ্ট্রীটের ছাত্রাবাসে শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন এবং মদন মিত্রের লেনের ছাত্রাবাসে শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল উপাসনা করেন। অপরাহ্নে ব্রাহ্ম-বালক বোর্ডিংএ শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন এবং কোনও পরিবারে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস উপাসনা করেন। কলিকাতার প্রায় সকল ব্রাহ্মপরিবারেই এই বিশেষদিনে উপাসনা এবং ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনাদি হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যে দিন দিন লোকের অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতেছে, এই অনুষ্ঠানে তাহারই চিহ্ন দেখা যাইতেছে।

২রা মাঘ মঙ্গলবার।

অদ্য উৎসবের উদ্বোধন। সন্ধ্যা সমাগমে ব্রহ্মমন্দির লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মৃদঙ্গ ও করতাল সহযোগে সুমধুর ব্রহ্মসংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ৬½ ঘটিকার সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বেদী গ্রহণ করিলেন। তিনি

এই মর্ম্মে উদ্বোধন করিলেন ;—"শীতের অন্ত হইলেই আমরা বসন্ত ঋতুর অনুভব করিয়া থাকি। নব বসন্তের আগমন সূচক দক্ষিণবায়ু মৃদু মৃদু প্রবাহিত হইতে থাকে; শীতের দারুণ প্রকোপে যে সকল বৃক্ষের পত্র ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, তাহাতে নব পত্রোদয় হয়; কোকিল পঞ্চমস্বরে মধুর ধ্বনি করিয়া উঠে; বসন্তকালীয় নানাজাতি ফুল প্রস্ফুটিত হয়। এই সকল চিহ্ন দর্শন করিয়া আমরা অনুভব করিয়া থাকি যে, বসন্ত ঋতু আগমন করিতেছে আধ্যাত্মিক রাজ্যে, আত্মার ভিতরে কি ঐরূপ বসন্তোদয় হয় না? বৃক্ষ, লতা, পাতা, ফুল প্রভৃতি নূতন বেশ ধারণ করিবে, বসুন্ধরা সুন্দর বেশে সুসজ্জিত হইবে; আত্মার কি বলও আসিবে না? আমরা অমরাত্মা, আমরা কি নূতনত্ব লাভ করিব না? আমাদেরপক্ষে কি বসন্ত নাই? বৃক্ষের পাতা শুকাইয়া গেলে, যিনি নব পত্র প্রদান করেন, আমাদের আত্মা শুষ্ক হইলে, তিনি কি নবভাবে সাজাইতে পারেন না? কোন্ বিশ্বাসী ব্যক্তি এ কথা না বলিবেন যে আত্মার ভিতরেও নব বসন্তের উদয় হয়?"

"ইহা কি সম্ভব যে, আমরা নিরাশ ও শুষ্কতায় একেবারে মরিয়া যাইব? এ কথা কেহই বলিতে পারেন না। কিন্তু যেমন পৃথিবী বসন্তের আগমন সংবাদ নানা ভাবে জানা যায়, তেমনি হে সাধক! তুমি কি নানা উপায়ে আত্মায় বসন্তের আগমন জানিতে পার না? আত্মার মধ্যে বসন্তের আগমন কি উপায়ে জানা যায়? প্রথমতঃ নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইলেই বসন্ত আসিতেছে, জানিবে। ২য়, যদি দেখ, হৃদয়ে প্রেম জন্মিতেছে। অপ্রেম, বিদ্বেষে সময় যাপন করিয়াছ, কত অশান্তিতে দিন অতিবাহিত হইয়াছে, কত দিন রজনীতে নিদ্রা হয় নাই, দারুণ বিদ্বেষের বিষে জর্জরিত হইয়া সমুদয় বৎসর যাতনায় অস্থির হইয়াছ। এখন কি হৃদয়ে প্রেমের স্ফুরণ হইতেছে? যদি দেখ, হৃদয়ে প্রেম জাগিতেছে, তবেই জানিবে বসন্ত আসিতেছে। ৩য়, বিনয় আসিতেছে কিনা? আমরা অনেক সময়েই আপনাকে ভুলিতে পারি না। এই উৎসবের প্রারম্ভে আপনাকে ভুলিয়া কি তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি? আমরা অতি ক্ষুদ্র, অতি দুর্ব্বল, তিনি সকল শক্তিদাতা, এই ভাবে মন কোমল হইতেছে কি? বিনয় আসিতেছে কি? অবশেষে দেখিতে হইবে, হৃদয়ে নবসংকল্প জাগিতেছে কিনা? যিনি অনেকসময় উপাসনা করেন নাই, তাঁহার মনে কি উপাসনা করিবার সংকল্প জাগিতেছে? ব্রাহ্ম সমাজের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য কি প্রাণে ইচ্ছা হইতেছে? বিশ্বাস, বৈরাগ্য, সেবাতে আত্মহারা হইয়া যাইবার জন্য কি প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে? এই সকল চিহ্ন যদি প্রকাশিত হয়, তবে নিশ্চয় জানিবে, বসন্ত আসিতেছে। অদ্য সকলে একবার এ বিষয় চিন্তা করি। যদি দেখি, হৃদয়ে আশা হইতেছে প্রেম জাগিয়া উঠিতেছে, নবসংকল্প হইতেছে, তবেই জানিব উৎসব আসিতেছে, বসন্ত আসিতেছে। তাই ভগিনি! এস, আমরা এই সকল আশা লইয়া উৎসবে প্রবেশ করি।"

তৎপর অতি গভীর ভাবে আরাধনা হয়। সমবেত প্রার্থনা ও সংগীতের পরে আচার্য্য নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করেন ;—

"গভীর দুঃখ বা আনন্দের দিনের কথা চিরকালের জন্য মানব অন্তরে মুদ্রিত হইয়া থাকে। সন্তান যে দিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কোন্ দিন কোন্ গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রায় মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছে, পিতা মাতার মনে তাহা বৎসর বৎসরই জাগে। আমরা যে বৎসর বৎসর দেশ বিদেশ হইতে আগত বন্ধুবান্ধবগণসহ সম্মিলিত হইয়া এই মহা উৎসবে মত্ত হই, এমন কি অমূল্য ধন আমরা পাইয়াছি, যে জন্য বৎসরের এই বিশেষ সময়ে সকলে সমবেত হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করি, এবং পরস্পরকে এত প্রেম বিতরণ করিয়া থাকি? এরূপ কি অমূল্য ধন আমরা লাভ করিয়াছি? মহাত্মা যীশু বলিয়াছেন,—"কোনও বণিক বাজারে গিয়া যদি মহামূল্য মণি দেখিতে পায় এবং যদি সে জানিতে পারে যে, এই ধন তাহার সমস্ত সম্পত্তি অপেক্ষাও মূল্যবান ও ইহা ক্রয় করিলে সে উত্তরকালে মহা ধনী হইতে পারিবে, তবে সে তাহার সমস্ত সম্পত্তি বেচিয়া তাহা ক্রয় করে।" এইরূপ যদি আমি বলি যে "তোমরা তোমাদের সাংসারিক সমস্ত ধন সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া এই অমূল্য ধন গ্রহণ কর, তখন কি ইহা তোমাদের মনে হয় না যে, এই নূতন অমূল্য ধন গ্রহণ করিয়া তোমরা লাভবান হইবে?" যীশু যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপ আমাদের কি মনে হয় না যে, আমরা এমন কি অমূল্য ধন পাইয়াছি? ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতে এমন কি প্রচার করিয়াছেন যাহা নূতন, কোনও কালে কোনও দেশে যাহা প্রচারিত হয় নাই, কিম্বা প্রাচীন কোন শাস্ত্রে ছিল না? "একমাত্র সত্য স্বরূপ ঈশ্বরই মানবের উপাস্য, মানবাত্মার সঙ্গে এবং জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের চির সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে।" এইরূপ যে সকল আধ্যাত্মিকতত্ত্ব ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তাহা কি নূতন কথা? ব্রাহ্মগণ যে অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিতেছেন, তাহাতেই বা কি সাধন প্রণালীর নূতনত্ব আছে? জ্ঞানের কথা বলিতে গেলে তাহাতে এমন কি নূতন ভাব রহিয়াছে, যাহা প্রাচীন জ্ঞানিগণ জানিতেন না? যদি ব্রাহ্মদের প্রেমের কথা বলি, তাহাও বৈষ্ণবদের প্রেমের নিকট পরাজিত। ব্রাহ্মগণ ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে তৎপর, কিন্তু এবিষয়েও তাঁহারা খৃষ্টসম্প্রদায়ের নিকট পরাজিত। তবে কেন তোমরা উৎসবে এত মাতিয়াছ, এত আনন্দ কর, নৃত্য কর? তোমারা এমন কি মহানিধি লাভ করিয়াছ?

এইরূপ প্রশ্ন অনেকেই করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা সত্য নয় যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতে এইরূপ নূতন কিছুই আনয়ন করেন নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহা বলেন, তাহা জগতের নানা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্রে নানাভাবে আছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতনভাবে পরিবর্ত্তন আনিয়াছেন; অনেক নূতন কথা ব্রাহ্মধর্ম্মে থাকিলেও তাহা ইহার শক্তির কারণ নহে। প্রথম দেখা যাউক, ব্রাহ্মধর্ম্ম কি নূতন কথা বলেন। দেখিতে পাই প্রধানতঃ চারিটী বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশে পরিবর্ত্তন আনয়ন

করিয়াছেন; প্রথমতঃ—আমাদের দেশে এইভাবই প্রবল যে ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম, পূজা, আরাধনা প্রভৃতি হৃদয়ের ভাব সমুদায় কোনও সাকার বস্তুকে অবলম্বন না করিলে উদিত হয় না; কাজেই সাকার উপাসনায়বর্দ্ধিত বংশানুক্রমে সকলেরই চিন্তা এইদিকে প্রবাহিত। সাকার ভিন্ন নিরাকার যে প্রেম, পুণ্য প্রভৃতি দ্বারা আরাধ্য হইতে পারে, এই ভাব এদেশের সাধারণ লোকের মনে ধারণাই হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, নিরাকারই প্রেমের আস্পদ এবং মানবের একমাত্র উপাস্য। "সাকারকে যেরূপ ভক্তি প্রভৃতির দ্বারা অর্চ্চনা করা যায়, নিরাকারকেও তদ্রূপ করা যায়," ইহা বলা সঙ্গত নয়। কারণ নিরাকারই সৎ বস্তু। অসত্যের সহিত সত্যের তুলনায়, সত্যের অপমান হয়।

দ্বিতীয়তঃ—সকলেরই মনে ইহা বদ্ধমূল সংস্কার যে, "ব্রহ্মজ্ঞানলাভপ্রয়াসী ব্যক্তি মাত্রকেই সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে হইবে। যদি ব্রহ্মকে লাভ করিতে চাও, ব্রাহ্ম হইতে চাও, তবে তোমার সংসার বন্ধন ছিন্ন কর, সংসার পরিত্যাগ কর। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা বলেন না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছেন, "আমরা সংসারে থাকিয়া গৃহীর কর্ত্তব্য পালন করিব এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মকে দর্শন করিব।"

তৃতীয়তঃ—দেখিতে পাই যে, এদেশে সমাজের ভিত্তি বৈষম্যের উপরে স্থাপিত। জাতিতে জাতিতে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এই বৈষম্যের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। "ঈশ্বর আদিতে মানবজাতিকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এই ভাব প্রবল থাকাতেই চিন্তার মূলে, ধর্ম্মের মূলে এবং সমাজবন্ধন প্রভৃতি সকলের মূলেই বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম সমাজকে সাম্যের ভূমিতে স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। "যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি, নাহি জাতি বিচার।"—ব্রাহ্মধর্ম্মই ইহা জগতে প্রচার করিয়াছেন এবং ইহা নূতন।

চতুর্থতঃ—ধর্ম্মেতে এবং নীতিতে বিচ্ছেদ। এদেশে সাধারণতঃ ধর্ম্ম নীতির সহিত ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ নাই। "ব্যক্তিগত রীতিনীতি যাহাই হউক না কেন, তুমি ধর্ম্মের উচ্চ সিংহাসনে আরোহণ করিতে পার, সেই পরম বস্তুকে লাভ করিতে পার।" মিথ্যাবাদী ঘোর পাপাচারী হইয়াও ধর্ম্মলাভ করিতে পার, রীতি নীতির সঙ্গে ধর্ম্মের কোনও সংস্রব নাই। ব্রাহ্মসমাজ বলেন, "ব্যক্তিগত এবং সামাজিক রীতি নীতিকে ধর্ম্মের ভূমিতে স্থাপন করিতে হইবে।

এদেশ ছাড়িয়া জগতের প্রতি দৃষ্টি করিলেও দেখি, এই প্রকার চারিটী ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন,—"ঈশ্বর ও মানবের মধ্যবর্ত্তী কিছুই নাই। জগতে যত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, প্রায় সকল ধর্ম্মেই এই মধ্যবর্ত্তীবাদ দেখা যায়। খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্ম মধ্যবর্ত্তীবাদ মূলক, হিন্দুধর্ম্মেও দেখিতে পাই, ব্রাহ্মণেরাই সকলের উপাস্য দেবতার মধ্যবর্ত্তী। ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিতে হইলেই ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিতে হইবে। সুতরাং প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মও মধ্যবর্ত্তীবাদমূলক। একমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই জগতে এই নূতন সত্য প্রচার করিয়াছেন, "যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি।" অর্থাৎ অনার্য্য ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলের সঙ্গেই সেই পরম দেবতার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিদ্যমান; মধ্যবর্ত্তীর সাহায্য ভিন্নও সকলেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বিতীয় লক্ষণ, স্বাধীনতা। সকল ধর্ম্মই অল্পাধিক পরিমাণে কোন না কোন গ্রন্থের অধীন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, "যেখানে সত্য পাইব, তাহাই গ্রহণ করিব।" ব্রাহ্মধর্ম্মই আত্মচিন্তা এবং প্রেমের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের তৃতীয় লক্ষণ উদারতা। "দেশ কাল ভেদে সকল সাধুদিগকে এবং সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকে সমাদর করিতে হইবে" ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের চতুর্থ লক্ষণ—"আধ্যাত্মিকতা।" সকল ধর্ম্মই বাহ্যিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপাস্য, আত্মা, স্বর্গ ও নরক সকলই আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিকতা ইহার প্রাণ, লক্ষণ এবং ভিত্তি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতে এই চারিটী ভাব প্রচার করিয়াছেন; অতএব ইহা সত্য নয় যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতে নূতন কিছুই আনয়ন করেন নাই। কিন্তু এজন্যও ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব নহে, যীশু বলিয়াছেন:—"নূতন কিছুই আনয়ন করি নাই, সকলই পুরাতন, কেবল মাত্র পুরাতন বিধিকে পূর্ণ করিতেছি। তিনি এমন কিছুই বলেন নাই, যাহা প্রাচীন য়ীহুদী গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে তিনি কি নূতন কথা বলিয়াছেন? তিনি প্রাচীনের মধ্যে নূতন শক্তির সঞ্চার করিয়াছেন, পুরাতন শৃঙ্খলার নূতন বিধান দিয়াছেন, শাস্ত্র মৃত কথা ছিল তাঁহার সংস্পর্শে জীবন্ত হইয়াছে। সকল মহাজনের সম্বন্ধেই এই কথা। বুদ্ধ এমন কিছুই নূতন বলেন নাই, যাহা প্রাচীন শাস্ত্রে ছিল না। তবে তিনি নূতন এই করিয়াছিলেন যে, সেই প্রাচীন কথাকে জীবন দান করিয়াছিলেন। মহম্মদও সেইরূপ জীবন্ত প্রেম দ্বারা পুরাতন সত্যকে ধরিয়া জীবন্ত করিয়াছিলেন। এইরূপ ব্যক্তিগত জীবনে এবং সামাজিক জীবনে যে শক্তি চালনা হয়, তাহাই নূতন। এই সকলই বিকাশের নিয়ম। উত্থানের প্রণালী কি? যে শক্তি দ্বারা নূতন ধর্ম্ম জগতে জয় লাভ করিয়াছে, তাহার উৎস কোথায়? ইহা বিশ্বাস, প্রেম এবং স্বার্থত্যাগের শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রাচীন খৃষ্ট ধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, সেই সময়ের জ্ঞানীরা খৃষ্টের শিষ্যদের কথা বলিতে গেলেই কত অবজ্ঞা সূচক বাক্য ব্যবহার করিতেন। পণ্ডিতেরা যখন এরূপ ব্যবহার করিতেন, তখন অপর দিকে আবার দেশের রাজাও তাঁহাদের বিনাশে উদ্যত। প্রকাশ্য জায়গায় জীবন সংশয় দেখিয়া ভূমির গর্ভে উপায়হীন খৃষ্টশিষ্যগণ উপাসনা করিতেন, এবং তাঁহারা দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহারা জগৎ বদলাইয়া দিবেন। প্রত্যেকেই বিশ্বাস করিতেন যে, যীশু পুনরায় অবতীর্ণ হইবেন এবং জগৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। কি আশ্চর্য্য প্রেম এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি। তৎপর তাঁহাদিগের স্বার্থত্যাগ। যীশুর শিষ্য হইতে হইলেই সংসারের যা কিছু বিষয় সম্পত্তি সমস্ত পরিত্যাগ করিতে হইত। সেই পরিত্যাক্ত

সম্পন্ন শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কোন অপরাধ করিলে কঠোর শাস্তি পাইতেন। কিন্তু তথাচ তাঁহারা মণ্ডলী পরিত্যাগ করিতেন না, কারণ তাঁহাদের ভিতর প্রেম ও স্বার্থত্যাগ প্রভৃতির ভাব প্রবলরূপে জাগিয়াছিল। উননের ভিতরে যেরূপ বড় কাঠের সঙ্গে ছোট কাঠও জ্বলিয়া থাকে, সেইরূপ প্রেমিক বিশ্বাসীদের সঙ্গে লাগিয়া দুর্ব্বলেরা ও বল লাভ করে।

ব্রাহ্মসমাজও ব্যক্তিগত জীবনে এবং সামাজিক জীবনে এই শক্তি প্রদান করিবেন। অগ্নি হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়াই ত মানুষ জাতিভেদ ছাড়িতেছে, কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। সামাজিক জীবনে এই শক্তি ব্রাহ্মসমাজ দিয়াছেন। এই যে আজ এতগুলি স্ত্রীলোক এই মন্দিরে আসিয়াছেন, ইহা তাহারই প্রমাণ। এই শক্তি ব্রাহ্মসমাজ নূতন দিয়াছেন। হে ব্রাহ্ম ভাইভগিনিগণ! তোমরা প্রত্যেকে বিশ্বাস এবং প্রেম দ্বারা এই শক্তি হৃদয়ে জাগাইবে। হে ব্রাহ্ম ভগিনি! তুমি মনে করিও না যে, আমি স্ত্রীলোক আমার দ্বারা কিছুই হইবে না। হে ব্রাহ্ম যুবক! তুমিও মনে করিও না যে, আমার দ্বারা কিছুই হইবে না। যে, যে পরিমাণে বিশ্বাস প্রেম বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধন করিবে, সে সেই পরিমাণে কাজ করিবে। হে দুর্ব্বল ব্রাহ্ম! যদি তোমার জীবনে বিশ্বাস, প্রেম এবং বৈরাগ্যের অগ্নি জ্বালিতে পার, তবে তুমি ক্ষুদ্র হইয়াও বিজ্ঞ জ্ঞানীর অপেক্ষা উত্তম প্রচার করিবে এবং সেই শক্তি জাগ্রত করিবে। এই শক্তি যদি ব্রাহ্মসমাজ দিতে পারেন, তাহা হইলে সকলই হইবে। এই শক্তি যে দিন আমাদিগের ভিতর আসিয়াছিল, তাহা কি আমরা ভুলিতে পারি? সে দিন কি আমাদের পক্ষে বিশেষ দিন নহে? দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে অশ্বশালায় একটী বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সে দিন কি বিশেষ দিন নহে? তদ্দ্বারা জগতের ইতিহাস কি পরিবর্ত্তিত হয় নাই? সেইরূপ যে দিন ব্রাহ্মসমাজে জন্ম, সেদিন কি বিশেষ দিন নহে? হে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা! যদি তোমরা অপদার্থ না হও, তবে ইহা নিশ্চয় বিশ্বাস করিবে যে, ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস কার স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন যে, এই ১১ই মাঘ একটী বিশেষ দিন। অতএব এস, সকলে আনন্দের সহিত এই মহোৎসবে প্রবৃত্ত হই? সেই সত্য প্রভুকে যদি বিশ্বাসের সহিত সত্য বলিয়া ধরিতে পারি, স্বার্থকে যদি বলিদান করিতে পারি, তবে আমরা যে আগুন জ্বালিবার বিশেষ সাহায্য করিব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব আর উদাসীন থাকিও না, সকলে উত্থিত হও, জাগ্রত হও, ঈশ্বরকরুণা স্মরণ কর, মহাশক্তি জাগাও। করুণাময় প্রভু আমাদের সহায় হউন।

৩রা মাঘ, বুধবার।

অদ্য প্রাতে সংকীর্ত্তনের পরে সমবেত উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় বেদী গ্রহণ করেন। আরাধনান্তে তিনি নিম্নলিখিতরূপ উপদেশ প্রদান করেন।

"মাঘ মাস আসিলেই ব্রাহ্মগণ উৎসব করিবার জন্য চারিদিক হইতে আসিয়া মিলিত হন। মাঘ মাসে ব্রাহ্মগণ চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না, আর সংসারের কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারেন না, উৎসবের আনন্দে সকলে মত্ত হইয়া যান। হৃদয়ে প্রেম, বিশ্বাস এবং ভক্তি প্রভৃতি ভাবের বিশেষ অভ্যুদয় হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাবে মত্ত হইয়া তাঁহারা সংকীর্ত্তনাদি করিয়া কাটাইয়া থাকেন। এ সময় উৎসাহহীনকে উৎসাহী; অলস ও শ্রমবিমুখকে শ্রমশীল উদ্যোগী, ধর্ম্মক্ষুধাবিহীনকে ধর্ম্মের জন্য বিশেষ ব্যাকুল করে, এমন কি অনেকের এ সময়কার ছবি দেখিলে ইহারা সেই পূর্ব্বের মানুষ কি না তাহাতে সন্দেহ জন্মে। উৎসবের মধ্যে এই ভাবে সময় অতিবাহিত হইলেও উৎসবের পরে সাধারণতঃ সে সকল ভাব যেন ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতে থাকে। আবার সংসারের শীতল বাতাস আসিয়া ব্রাহ্মগণের উৎসাহাগ্নিকে যেন নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়। আবার মৃত ভাব আসিয়া তাহাদিগকে অধিকার করে। যদি পরিণাম এইরূপই হইবে, তবে কেন আমরা প্রতি বৎসর এই উৎসবের আয়োজন করিয়া থাকি? সাময়িক উৎসাহে ত বারইয়ারির জন্যও লোকে মত্ত হইয়া থাকে, আমাদের উৎসবও কি সেই প্রকার? আমাদের আচার ব্যবহার দেখিলে সহজেই লোকে এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে। কিন্তু বন্ধুগণ, ব্রহ্মোৎসব নিরর্থক নহে। ইহা জীবন লাভের প্রধান উপায় এবং মুক্তিশৈলে যাইবার পথের একটী সোপান স্বরূপ। ইহা অতি সত্য যে, এই প্রকার উৎসব সম্ভোগের সুযোগ হইয়াছে বলিয়াই, আমরা জীবনের আস্বাদন পাইতেছি। সৌভাগ্য ক্রমে আমার জীবনে এই সুবিধা বিশেষ ভাবে ঘটিয়াছে, তাহা না হইলে এতদিনে হয়ত অন্যরূপ হইতাম।

আমাদের উৎসবের আয়োজনকে পক্ষিশাবকের আকাশে উড়িতে শিখিবার প্রণালীর সহিতও তুলনা করিতে পারা যায়। পক্ষিশাবক যখন বাসায় বসিয়া থাকে, তখন তাহার দূরে যাইয়া আহার সংগ্রহ করিবার শক্তি না থাকিলেও এবং বিশেষ কিছু করিবার না থাকিলেও সে বাসায় বসিয়া বসিয়া ডানা নাড়িতে থাকে। পক্ষিশাবক দেখিতে পায় যে, তাহাদের পিতামাতা উড়িয়া গিয়া তাহাদিগের জন্য আহার সংগ্রহ করিয়া আনয়ন করে। ইহা দেখিয়া তাহাদিগকেও যে সময়ে উড়িতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারে এবং স্বভাবের তাড়নায় তাহারা ডানা নাড়িতে থাকে। ডানা নাড়িলে সেই মুহূর্ত্তেই যে উড়িতে পারে তাহা নহে, কিন্তু তাহাই উড়িতে শিক্ষা করিবার প্রথম সোপান। যদি তাহারা শিশুকাল হইতে এইরূপ অনুকরণ না করে, তবে কখনও যে উড়িতে শিখিবে তাহার সম্ভাবনা থাকে না। সেইরূপ আমাদিগকেও জ্ঞান, পুণ্য, প্রেমের আকাশে উড়িতে হইবে। পক্ষিশাবক আপন পিতা মাতাকে উড়িতে দেখে, আমরা কি তাহা দেখি নাই? আমাদের সমক্ষে কি কেহ জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যের আকাশে উড়িতেছে না? আমাদের সকলকেই সেইরূপ উড়িতে হইবে। সংসার রূপ বাসায় আমরা চিরদিন থাকিব না। আমাদের প্রত্যেককেই উড়িতে হইবে। পক্ষীশাবকের ন্যায় আমাদিগকেও সংসাররূপ বাসায় থাকিয়াই পুণ্য, প্রেম, পবিত্রতার আকাশে উড়িবার জন্য এখন হইতেই চেষ্টা করিতে হইবে। এখন হইতে চেষ্টা করিলেই সময়ে উড়িতে পারিব নচেৎ সমস্তই বৃথা হইবে। পক্ষিশাবক

চেষ্টা করিয়া করিয়া শেষে একদিন হঠাৎ উড়িয়া যায়, এবং উড়িতে যাইয়া যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহার পিতামাতা আসিয়া তাহাকে সাহায্য করে। আমরা যখন উড়িতে উড়িতে ক্লান্ত হইয়া পড়িব, আমাদের কি সাহায্য করিবার জন্য কেহ থাকিবেন না? আমাদের কি পিতা মাতা নাই? যিনি আমাদিগকে সাহায্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন, তাঁহার সত্তাকাশে উড়িতে যাইয়া যখন আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িব, তিনিই আমাদিগকে তখন সাহায্য করিবেন, বল দিবেন, এবং স্বীয় অভয় ক্রোড়ে বিশ্রামের স্থান দেখাইয়া দিবেন। আমরা দুর্ব্বল ও অজ্ঞান, সুতরাং উড়িবার সময় যে অনেকবার পড়িয়া যাইব, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তখন ঈশ্বরের করুণাই আমাদিগকে তুলিয়া ধরিবে। এক একটী উৎসব এইরূপ পাখীর ডানা নাড়ার ন্যায়। আমরা প্রত্যেক উৎসবে একটু একটু করিয়া উড়িতে শিখিয়া ক্রমে ক্রমে ব্রহ্ম সন্নিধানে উপস্থিত হইব, ঈশ্বরে বিশ্রাম করিব। অতএব এস, আমরা সকলে উৎসাহী হই এবং নিজ নিজ কার্য্যপ্রবৃত্তি হ্রাস করিয়া উৎসবে যোগ দিবার জন্য ব্যস্ত হই। কার্য্য অনেক করিয়াছি, সে প্রবৃত্তি এখন কিছুদিনের জন্য দুর্ব্বল হউক। সকলে মিলিয়া পক্ষিশাবকের ন্যায় আমরা ডানা নাড়িতে থাকি, ঈশ্বর আমাদিগের সহায় হউন।

সন্ধ্যা ৬½ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র "যে বলে পৃথিবী চালিত হয়" বিষয়ে নিম্নলিখিত মর্ম্মে বক্তৃতা করেন,—

"পঞ্চদশ শতাব্দী অতীত প্রায়, তখন বাঙ্গালায় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত হইতেছিল। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তক চৈতন্য ইহার বহুকাল পূর্ব্বেই ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। চৈতন্যের পর যে সকল বৈষ্ণবসাধু আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও ক্রমে পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বঙ্গদেশে যে বৈষ্ণবধর্ম্ম, ভক্তির ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছিল, তাহার পথ বন্ধ হইয়া গেল। জীবনের শেষ ভাগে চৈতন্য বঙ্গদেশ হইতে উড়িষ্যা দেশে গমন করেন। তাঁহার সঙ্গে সাধু বৈষ্ণবগণও গমন করিয়াছিলেন। এই কারণেই বঙ্গে এই ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিবার উপযুক্ত সাধু পুরুষ তখন ছিলেন না।

এই সময়ে বৃন্দাবন হইতে দুই জন বৈষ্ণব সাধু বঙ্গে আগমন করিলেন। অনেক বৈষ্ণব সাধু বৃন্দাবনে বাস করিতেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও মনে এই ভাব উদয় হইল যে, "যে বঙ্গদেশ হইতে এই ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, সেই বঙ্গেই এখন এই ভক্তির ভাব নীরস হইয়া গিয়াছে, ইহার কারণ কি? এই নীরসতার ভাব কোথা হইতে আসিল? বঙ্গের এখন অনেকই শক্তির উপাসক, প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করে এরূপ লোক নাই, সেখানে আর এখন প্রেমের মাহাত্ম্য নাই।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা বিষণ্ণ হইলেন এবং দুই জন বৈষ্ণব-সাধুকে বিশেষ ভাবে প্রেমের ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বঙ্গে প্রেরণ করিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দুই জন বৈষ্ণব সাধু এই উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন হইতে বঙ্গদেশে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে কিছুই সম্বল নাই, কেবল মাত্র কতকগুলি ভক্তিধর্ম্মের মাহাত্ম্য সূচক গ্রন্থ। পরিধানে জীর্ণবস্ত্র, ধুলি-ধূসরিত বেশ। এইরূপ অবস্থায় দুইজন সাধু বঙ্গে প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিতে চলিলেন। ধন বল নাই, লোক বল নাই, একেবারে নিঃসহায়, তাঁহারা কি সাহসে এই মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইলেন? এই দুই জনের মধ্যে এক জন রাজসাহী জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম সাধু নরোত্তম দাস। তিনি ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, শৈশবাবস্থা হইতেই নানা প্রকারে চৈতন্যের ভক্তি এবং প্রেমের কথা শুনিয়া তাঁহার মনে প্রেমধর্ম্ম জাগিয়া উঠিয়াছিল। যাহা পাইয়া চৈতন্য প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিলেন কোথায় গেলে, কাহার নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি সেই ধন লাভ করিবেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নরোত্তম এই কথাই ভাবিতে লাগিলেন। দিন দিন তাঁহার প্রাণে ব্যাকুলতা বাড়িতে লাগিল। ক্রমে তিনি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম লাভার্থে বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। সেখানে তিনি সাধুসঙ্গে বাস করিয়া ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং ভক্তিসাধন করিতে লাগিলেন। এইরূপ ক্রমে তিনি প্রেমের ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বঙ্গে প্রেরিত হইলেন, সঙ্গীয় অপর ব্যক্তির নাম শ্রীনিবাস আচার্য্য।

তাঁহাদের সঙ্গে যে সকল ধর্ম্ম গ্রন্থ ছিল, পথে বিষ্ণুপুরের সন্নিকটে তাহা দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। সেই সকল গ্রন্থ অন্বেষণ করিতে করিতে পণ্ডিত শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষ্ণুপুরে উপনীত হইলেন। বিষ্ণুপুরের রাজা ঘোর অত্যাচারী ছিলেন। তাঁহারই আদেশে তাঁহার অনুচরগণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম-গ্রন্থগুলি অপহরণ করিয়াছিল। শ্রীনিবাস রাজসভাতে উপস্থিত হইয়া ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। একদিন ভাগবত হইতে একটী বাক্যের ব্যাখ্যা কালে "পাপীর পরিণামে কি দণ্ড হয়, অন্তিমে কি শাস্তি হয়" এ বিষয় বলিতে ছিলেন। শ্রীনিবাসের ব্যাখ্যা শুনিয়া এবং তাঁহার ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া সেই দুর্দ্দান্ত রাজার হৃদয়ে হঠাৎ পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইল। যে ব্যক্তি চিরজীবন পাপের ক্রোড়ে বর্দ্ধিত, ঘোর অত্যাচারী, হঠাৎ আজ ঈশ্বর-কৃপায় তাঁহার হৃদয় বদলাইয়া গেল। তাঁহার প্রাণ বিগলিত হইয়া গেল, জগতের পরিত্রাতা প্রভু পরমেশ্বর রাজার হৃদয়ে নিজ শক্তি বিকশিত করিলেন; অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠিল, রাজা চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীনিবাস অনেক কথা বলিয়া রাজাকে আশ্বস্ত করিলেন। অবশেষে রাজা হাম্বীর নূতন প্রেম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন এবং "হরিনারায়ণ দাস" এই নূতন নাম গ্রহণ করিলেন। এইরূপে প্রথমে প্রেমের ধর্ম্ম বঙ্গে প্রচার হইল।

ওদিকে নরোত্তম জীর্ণকন্থা সম্বল লইয়া ধনী পিতার গৃহে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহার ভগবদ্ভক্তি, প্রেম, বিশ্বাস, সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য এবং সর্ব্বসাধারণের প্রতি প্রেম দেখিয়া ব্রাহ্মণেরাও মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং অবশেষে কেহ কেহ তাঁহার নিকট প্রেমের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এই ঘটনার পর গ্রামশুদ্ধ লোক তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। "নরোত্তম

ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম লোপ করিতে আসিয়াছে" এই কথা চারিদিকে উত্থিত হইল; তাঁহার প্রচারের পথ বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু নরোত্তম ইহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। "প্রভু, শীঘ্র বঙ্গদেশকে প্রেমের ধর্ম্মে প্লাবিত কর, বঙ্গের গৃহে গৃহে প্রেমের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হউক" এই বলিয়া দিবা রাত্র জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রার্থনার ফল ফলিল। কতিপয় দিবস পরে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ সেই গ্রামে আসিলেন এবং নরোত্তমের জীবে-দয়া দেখিয়া তাঁহারা মোহিত হইয়া গেলেন। তাঁহারা এতদিন বাহিরের অনুষ্ঠানকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন; কিন্তু নিজ আরাধ্য দেবকে ডাকিয়া যে কাহারও চক্ষে ধারা বহিয়া থাকে, তাহা কখনও দেখেন নাই। অনেকেই নরোত্তমের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। নরোত্তমের জীবনী পাঠ করিলে দেখিতে পাই যে, তিনি নিঃসম্বল হইয়াও নিজ চরিত্রগুণে এবং প্রেমের বলে অনেক লোককে এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, এই বৈষ্ণবধর্ম্মের বিস্তারের কারণ নরোত্তমের জীবনের বিশ্বাস, প্রেম এবং আত্মোৎসর্গ। এই শাক্ত-প্রধান বঙ্গে, এই নব প্রেমের ধর্ম্ম প্রচারের মূলে বিশ্বাস, প্রেম এবং আত্মোৎসর্গ। জগতে যত ধর্ম্ম জয়লাভ করিয়াছে, সকলের মূলেই দেখিতে পাই এই তিনটী বর্ত্তমান। এই তিনটী বস্তু যে ধর্ম্মের মূলে নাই, সে ধর্ম্ম কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। এই ভাব যে ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রবল নয়, তাহারা লোক-দিগকে দলভুক্ত করিতে পারে বটে, কিন্তু জগতে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারে না, দেশের মুখ ফিরাইয়া দিতে পারে না। অনেকেই মুখে অনেক কথা বলিতে পারে বটে; কিন্তু ধর্ম্মের জন্য সকল পরিত্যাগ করা বড় কঠিন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার হাতে জীবন অর্পণ না করিলে, প্রাণের পিপাসা প্রশমিত হয় না, জ্বালা দূরে যায় না। যতদিন ঈশ্বরকে সত্য বলিয়া ধরিতে না পারা যায়, ততদিন কাহারও দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার হয় না।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই বিশ্বাস কি করিয়া পাইব? সাধু-জীবনে দেখিতে পাই যে, তাঁহারা জন্মিয়াই সাধু হন নাই। সকলেই ঈশ্বর হইতে সাধুতার বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন; পরে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাঁহাদের জীবনেই দেখিতে পাই যে, প্রথম তাঁহাদের প্রাণে ধর্ম্মচিন্তারূপ অঙ্কুর উৎ-পন্ন হইয়াছে, পরে ক্রমে তাঁহারা ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছেন। ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তির উচিত ব্যবহার করিলেই প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠে। ঈশ্বরপ্রদত্ত সৎগুণেরই বীজ আত্মাতে নিহিত রহিয়াছে, কর্ষণ কর, সুফল উৎপন্ন হইবে। লক্ষ লক্ষ লোক কত গ্রন্থ পড়িয়াছেন, কত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তথাচ দেখিতে পাই যে, তাঁহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে অজ্ঞান। বৈজ্ঞানিকদিগের কথা মনে হইলে, তাঁহাদের চরণে মস্তক অবনত হয়, কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহারা অজ্ঞান। ধর্ম্ম সম্বন্ধে চিন্তার উন্মেষ না হইলে কেহ ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারেন না। প্রথম দেখিতে পাই, ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রাণে প্রশ্নের উদয় হয়; সেই প্রশ্ন মীমাংসা করিতে গিয়া মানুষ সত্যে উপনীত হয়। মহম্মদের প্রাণে প্রথমে মৃদু ধর্ম্মভাব ছিল; কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে বাস করিতে করিতে যখন তাঁহার প্রাণে প্রশ্ন উত্থিত হইল, "কে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা?" অমনি সেই সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার উদয় হইল এবং তিনি অবশেষে ধর্ম্মজীবন লাভ করিলেন। এখন প্রশ্ন এই যে, "কিরূপে চিন্তার উন্মেষ হয়?" প্রথম প্রকৃতি-তত্ত্ব আলোচনা করিলে, বাহ্যজগৎ, অন্তর্জ্জগৎ বা দেহতত্ত্ব আলোচনা করিলে আমাদিগের প্রাণে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে "এই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা কে?" আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহাদের সকলের মূলেই এক জীবন্ত শক্তি বিদ্যমান এবং এই শক্তিই বৃক্ষ, লতা, পাতা, প্রভৃতির মধ্যে কার্য্য করিতেছে। জগতের সর্ব্বত্রই এই একই শক্তি বিদ্যমান। তাঁহার রূপ, প্রকৃতি ও ভাব সর্ব্বত্রই এক। এই শক্তিই জাগ্রত, জীবন্ত প্রভু পরমে-শ্বর। তাঁহাকে পাইতে হইলে একমাত্র তাঁহার কৃপাই ভরসা, এবং তাঁহার চরণেই শরণাপন্ন হইতে হয়। যখন দেখিতে পাইবে, জগতে মানবের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, শক্তি কাজ করিতেছে না, তখনই বুঝিতে পারিবে, এই শক্তির উপরেও এক মহাশক্তির কাজ হইতেছে এবং তখন স্বভাবতই তাঁহার চরণে মস্তক অবনত হইবে। এইরূপে নিরাশ প্রাণ যখন ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বর কৃপার প্রার্থী হয়, তখন কি ঈশ্বর লুক্কায়িত থাকিতে পারেন? তিনি তখন স্বয়ং প্রাণে প্রকাশিত হন। পাপী যখন ঈশ্বরের এই শক্তি প্রাণে অনুভব করে তখন আর বলিতে পারে না যে, "ঈশ্বর নাই।" এইরূপ অনুভব ঈশ্বরকৃপায় আমাদিগের অনেকেই করিয়াছেন।

এই দেহের শক্তি যদি ঈশ্বর গ্রহণ করেন, দেহের পতন হয়, এই শক্তি তাঁহারই। তাঁহারই শক্তিতে আমরা শক্তি-শালী, জগতে দ্বিতীয়শক্তি আর নাই। যখন আহার করিতে বসি, দেখিতে পাই, ঈশ্বর স্নেহে বিগলিত হইয়া মুখে গ্রাস তুলিয়া দিতেছেন, কণ্ঠে পানীয় ঢালিয়া দিতেছেন, সকলই তাঁহার করুণা। জগতের অপর সমুদায় পদার্থ ক্ষুদ্র, একমাত্র ঈশ্বরই মহৎ।

জগতের সকল সাধু এইরূপে ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত করিয়া-ছেন। এই বিশ্বাস, প্রেম এবং আত্মোৎসর্গ লাভ করিতে হইলে প্রথম আমরা চিন্তাশীল হইব, তৎপরে প্রাণে সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষা আসিবে এবং তৎপর প্রার্থনার ভাব জাগ্রত হইবে। এই প্রার্থনাই মানবজীবনের সম্বল। মহাত্মা আগষ্টিনের জীবনে এই প্রার্থনার মাহাত্ম্য দেখা গিয়াছিল। আগষ্টিন পাপাসক্ত হইলে তাঁহার মাতা মনিকা দেবী ঈশ্বরের চরণে পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া নিরন্তর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রার্থনা বিফলে যায় নাই। ঈশ্বরের রাজ্যের নিয়মই এই যে, ব্যাকুল হইয়া যে চক্ষের জল ফেলে, তাহার প্রার্থনা বিফল হয় না। এই বিশ্বাস লাভের জন্য যদি আমরা ব্যাকুল হইয়া সকলে ঈশ্বরচরণে প্রার্থনা করি, তিনি অবশ্যই আমাদের প্রার্থনা পূরণ করিবেন, দেশের দুঃখ দুর্গতি দূর হইবে, নিজে ধন্য হইয়া যাইব। এই বিশ্বাস আমাদিগের মধ্যে আসুক; উৎসবের প্রাক্কালে ঈশ্বরচরণে এই ভিক্ষা যে, আমাদের প্রাণে তিনি এই বিশ্বাস দিন। ঈশ্বর করুণা করুন।

৪ঠা মাঘ বৃহস্পতিবার।

অদ্য প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় কীর্ত্তন হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। তিনি উপদেশ প্রদান করেন নাই। সন্ধ্যা ৬½ ঘটিকায় সময় ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের উৎসব এবং তদুপলক্ষে "আমাদের ধর্ম্মের বিশেষত্ব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা হইবার কথা ছিল; নগেন্দ্র বাবুর শরীর অসুস্থ হওয়ায় উক্ত উৎসব ও বক্তৃতা অদ্য বন্ধ থাকে। তৎপরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণপ্রসাদ অদ্য হিন্দি ভাষায় "ইহকাল ও পরকাল" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৫ই মাঘ শুক্রবার।

পূর্ব্বাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় কীর্ত্তন হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস উপাসনা করেন। তিনি সমবেত প্রার্থনার পরে নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করেন;—

"আমরা ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মের লক্ষণ কি? একমাত্র সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করা, প্রতি সপ্তাহে রবিবার দিন ভজনালয়ে যাওয়া, ব্রাহ্মের প্রথম অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থা এই:—"ঈশ্বরকে সত্যস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করা, তাঁহার উপাসনা করা, এবং গৃহের সমুদয় অনুষ্ঠানকালে তাঁহারই নিকট বল ভিক্ষা করা।" এরূপ অবস্থায় পরিমিতের উপাসনা কিরূপে করিতে পারিব? কেবল মাত্র এক পরব্রহ্মের উপাসনা করিবার জন্য প্রথমে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ একত্র হইয়াছিলেন। তৎপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মমতে পিতার শ্রাদ্ধ করিলেন। তাঁহার প্রাণে এই ভাব উদয় হইয়াছিল যে, আমি ব্রাহ্ম হইয়াছি, কিরূপে পরিমিতের উপাসনা করিব? কি করিয়া পরিমিতের অর্চ্চনা দ্বারা পিতার শ্রাদ্ধ করিব? গৃহের প্রত্যেক অনুষ্ঠানাদিতে সেই সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের পূজাই করিতে হইবে।

প্রকৃত উপাসনা কি? প্রকৃত উপাসনা এই যে, উপাস্য দেবতা যিনি, তাঁহার চরিত্র অনুকরণ করিয়া সেইরূপ হইতে চেষ্টা করা। জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিলে এ বিষয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবশাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, চৈতন্য অল্পবয়সে বড়ই দুরন্ত ও চঞ্চল ছিলেন। কিন্তু যেই হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রীতির উদয় হইল, অমনি শান্ত বিনীত এবং নম্র হইলেন। চৈতন্যের উপাসক বৈষ্ণবদের প্রধান লক্ষণ এই যে, তাঁহারা অত্যন্ত বিনয়ী এবং শান্তস্বভাব। প্রকৃত উপাসক বিনয়ী না হইয়া পারেন না। উপাস্যের অনুকরণ করা উপাসকের একটি প্রধান লক্ষণ। খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ে দেখিতে পাই, কত নরনারী স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পরোপকারব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। "গরিবের ছোট ভগিনী সম্প্রদায়" পরের সেবার জন্য কি না করিতেছেন? নিজের জন্মভূমি, পিতামাতা, ভাই বন্ধু প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া এই ভারতে আসিয়া মানব-প্রেমে নিজ জীবন একেবারে ঢালিয়া দিয়াছেন। পরের সেবা করিতে করিতে যে কখনও তাঁহারা বিরক্তি বোধ না করেন তাহা নহে। কিন্তু বিরক্তির সময় ইঁহারা কি করিয়া থাকেন? তখন ইঁহারা ভজনালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া যিশুর মূর্ত্তি এবং তাঁহার প্রেম পুণ্য পবিত্রতা প্রভৃতির ধ্যান করিতে থাকেন। এইরূপে প্রাণে বল সঞ্চয় করিয়া পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হন।

খৃষ্টান যুবক যুবতীগণ নিজ স্বার্থকে সমূলে বিনাশ করিয়া এইরূপে যে পরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, ইহা কেবল তাঁহাদের উপাস্য দেবতার অনুকরণেরই ফল। সকল ধর্ম্মা-বলম্বীদের মধ্যেই ঐরূপ দেখিতে পাই। বুদ্ধের জীবনেও ইহাই দেখি;—রাজার পুত্র, সংসারের সুখ, ঐশ্বর্য্য সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অনেক সাধনার পর সিদ্ধ হইয়া জগতে নিজের ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কত লোক তাঁহার অনুসরণ করিল।

উপাস্য দেবতার অনুকরণ করাই উপাসকের লক্ষণ। ব্রহ্ম-উপাসকের আদর্শ কি? ব্রাহ্মের আদর্শ ক্ষুদ্র নয়। বুদ্ধ, চৈতন্য, যিশু, মহম্মদ প্রভৃতি কেহই ব্রাহ্মের আদর্শ নহেন। ইহা সত্য যে তাঁহাদের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইবে, তাঁহাদের উচ্চ ভাব সমূহ হৃদয়ে ধারণ করিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু তাঁহারা আমাদিগের আদর্শপুরুষ নহেন। কেবল মাত্র সেই পবিত্র-স্বরূপ, সত্যস্বরূপ, পরমপবিত্র, পরমসুন্দর পুরুষই আমাদিগের একমাত্র উপাস্য এবং আদর্শ। বৈষ্ণবেরা যেমন চৈতন্যকে আদর্শ করেন, খ্রীষ্টানেরা যেরূপ ঈশাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেন, সেইরূপ ঈশ্বর আমাদের আদর্শপুরুষ। এই যে ব্রহ্ম-উপাসনার জন্য সমবেত হইয়াছি, ইহার উদ্দেশ্য এই যে, সেই পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া, অনুকরণ করিয়া ব্রহ্ম-চরিত্র লাভের চেষ্টা করিব। যদি ব্রহ্ম-চরিত্র অনুকরণ করিয়া আমরা তদনুরূপ জীবন যাপন না করি, তবে আমরা প্রকৃত ব্রহ্মের উপাসক নই। ব্রহ্মই আমাদের আদর্শ, তাঁহার চরিত্রই আমরা অনুসরণ ও অনুকরণ করিব।

জগতের লোক কতজনে কত কথা বলে,—কেহ বলে ঈশ্বর নাই, কেহ বলে তিনি সগুণ, কেহ বলে নির্গুণ; লোকে যাহা বলে বলুক, আমরা ক্রীয়াশীল ব্রহ্মেরই উপাসক, সেই সচ্চিদানন্দময় পুরুষকে সর্ব্বদা প্রাণের ভিতরে রাখিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে হইবে। সপ্তাহান্তে ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইলে কিম্বা ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে অনুষ্ঠান করিলেও ব্রাহ্ম হওয়া যায় না। প্রকৃত ব্রাহ্মের জীবন এরূপ ভাবে গঠিত হইবে যে, লোকে দেখিলেই মনে করিবে, "হাঁ বাস্তবিক ব্রহ্মের উপাসক।" যখন দেখিব, ব্রাহ্ম শান্ত এবং নিয়ত কার্য্যশীল; যখন দেখিব, তিনি ঈশ্বরের গুণসমূহ জীবনে লাভ করিতেছেন, তখনই বুঝিব যে, তিনি প্রকৃত ব্রাহ্ম হইয়াছেন। হে ব্রাহ্ম ভাই ভগিনি! আমরা সেই ব্রহ্মচরিত্র জীবনে অনুকরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি কিনা, অদ্য একবার বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখি, এবং সেই আদর্শ অনুকরণ করিয়া প্রকৃত জীবন লাভ করি।

সন্ধ্যা ৬½ ঘটিকার সময় সঙ্গতসভার উৎসব হয়। এতদুপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনা করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সেন নিম্নলিখিতরূপে সঙ্গতসভার বার্ষিক-কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন ;—

করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় আমাদের এই সঙ্গতসভা ৩৫ বৎসর অতিক্রম করিয়া, অদ্য ৩৬ বৎসরে পদার্পণ করিল। এই সভার নিয়মিত সভ্যসংখ্যা ১০।১২ জনের অধিক নহে। ধর্ম্মোৎসাহী ভ্রাতৃগণ ইহাতে যোগ দান করিয়া সভার পুষ্টি সাধন করেন, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

গত মাঘোৎসবে, ৭ই মাঘ মঙ্গলবার এই সভার বিশেষ উৎসব হয়, তাহাতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপরে বাবু কুঞ্জবিহারী সেন সঙ্গতের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, মথুরামোহন গাঙ্গুলী, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বাবু হরগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়গণ নিজ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন।

গত বৎসর এই সভার উপস্থিত সভ্যের সংখ্যা গড়ে ৮।১০ জন করিয়া হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে কোনও কোনও মহিলা ও আলোচনায় যোগ দিয়াছেন। পারিবারিক অনুষ্ঠান, কোনও ব্রাহ্মবন্ধুর মৃত্যু ও অন্যান্য কারণে ৬।৭ মঙ্গলবার বাদে এ বৎসর এই সভার সর্ব্বসমেত ৪৩টী অধিবেশন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৬টী অধিবেশনে মহানির্ব্বাণতন্ত্র, বাইবেল, গীতা এবং চৈতন্য ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অবশিষ্ট ৩৭টী অধিবেশনের মধ্যে ১৫টী অধিবেশনে নানা বিষয়ে আলোচনা, বাকী ২২টী অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ের আলোচনা হয় ;—

১। হিন্দু শাস্ত্র পাঠের ফলাফল কি?
২। সঙ্গতের সভ্যদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য বিধি ও নিষেধ।
৩। সত্য সাধন।
৪। কলিকাতার নিকটস্থ স্থান সকলে কি প্রণালী অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা হয়।
৫। স্তায়।
৬। গৃহস্থ প্রচারক।
৭। বিশেষ বিশেষ ঋতুতে ভগবানের বিশেষ আবির্ভাব।
৮। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাদি আলোচনা।
৯। আদর্শ ব্রাহ্মজীবন।
১০। ব্রাহ্মসমাজে জমাট ভাব হয় না কেন?
১১। অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম।
১২। গুরুর আবশ্যক আছে কি না?
১৩। বালক বালিকাদিগের ধর্ম্ম-দীক্ষা।
১৪। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন।
১৫। পারিবারিক-উপাসনা।
১৬। ধর্ম্মনিষ্ঠা।
১৭। ব্রাহ্মের সংসার কিরূপ হওয়া উচিত?
১৮। ধর্ম্মানুগত-সংসার।
১৯। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা হয় কিরূপে?
২০। উপাসনাশীলতা।
২১। যোগ।
২২। বৈরাগ্য।
২৩। দয়া।
২৪। ভক্তি।
২৫। কর্ম্ম ও সেবা।
২৬। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের মহত্ব।

এই সকল বিষয়ের কোন কোনটী দুই দিন ধরিয়া আলোচিত হয়। আলোচিত বিষয় গুলির কয়েকটীর সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। সঙ্গতের সভ্যদিগের পক্ষে নিষেধ ও বিধি।

(১) প্রতিদিন অন্ততঃ দেড় ঘণ্টাকাল উপাসনার জন্য সময় দেওয়া কর্ত্তব্য।

(২) প্রতিদিন সাধুসঙ্গ অথবা সৎগ্রন্থ পাঠ।

(৩) প্রতিদিন আত্মচিন্তা ও আত্মানুসন্ধান করা।

(৪) পরস্পরের মধ্যে যোগরক্ষার জন্য প্রত্যহ যথাসাধ্য সকলে একত্র হইবার চেষ্টা করা।

(৫) ত্যাগস্বীকার,—প্রতিদিন কিছু কিছু দান করা।

(৬) সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে চেষ্টা করা।

১। নীতি বিরুদ্ধ ও বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্য না করা।

২। শরীর মন ও বাক্য দ্বারাই পাপ হইয়া থাকে, ইহাদিগকে সংযত করিয়া পরিমিতাহারী, পরিমিত ভাষী ও পবিত্র ভাবে চিন্তা করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

২। সত্য সাধন—সত্য সাধন সকল বিষয়েই করিতে হইবে। মনকে সত্যজ্ঞানে উজ্জ্বল করিবে, সত্য কথা বলিবে, প্রাণে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবে কার্য্যে তাহা করিতে চেষ্টা করিবে ইত্যাদি। আমরা যদি সর্ব্বদা সত্য বলিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে কোন পাপ আসিতে পারে না।

সত্য সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে পাওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু সাধারণের ভাগ্যে তাহা হয় না। আমাদিগকে তাহা সাধন করিতে হইবে। যাঁহারা সামান্য সামান্য বিষয়ে সত্য প্রতিপালন করেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সত্যের দিকে অগ্রসর হন। সেই সামান্য সত্যের মধ্যে ভগবানের ভাব দেখিয়া মনে তাহা ধরিয়া রাখিতে এবং কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

"সত্যং" বলিলে যদি ঈশ্বরের সত্য ভাব প্রাণে জাগ্রত হয়, তাহা হইলেই ঠিক সত্য সাধন হইল।

সত্যই ব্রাহ্মের শাস্ত্র। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে এই মহৎ অধিকার দিয়াছেন যে, যেখানে যে সত্য পাওয়া যাইবে, সেখান হইতেই সেই সত্য গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহাই আমাদিগের শাস্ত্র। অন্য কোনও ধর্ম্মে এ অধিকার নাই।

সত্য অর্থ—সত্য স্বরূপের প্রকাশ। অনন্তকালে অনন্ত সত্য সমূহ প্রকাশিত হইবে। সুতরাং তাহা অনন্তকাল ধরিয়া আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে।

যাঁহারা সত্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের এমন একটী বিশেষ অবস্থা হয় যে, তাঁহাদের জীবন সত্যের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। তাঁহাদের কথা, ভাব, কার্য্য প্রভৃতি, সমস্তই সত্যময় হয়।

৩। ন্যায়—যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা তাহাকে দেওয়ার নাম ন্যায়। অন্যে আমার নিকট যাহা পাইবে, তাহা আমি তাঁহাকে দিতে বাধ্য, ইহাই ন্যায়ের মূল তত্ত্ব।

জগতের সকল লোকের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। ঈশ্বর আমাদের ন্যায়বান প্রভু, তিনি আমাদের কিয়ৎ পরিমাণে কর্ত্তৃত্ব শক্তি দিয়াছেন, সুতরাং আমরা বিবেচনা করিয়া কতক পরিমাণে স্বাধীন ভাবে কাজ করিতে পারি। এই স্বাধীনভাবে কাজ করিবার শক্তি থাকায় ন্যায়ের ভাব প্রস্ফুটিত হইতেছে। আমরা যতক্ষণ আমাদের চরিত্র ভাল করিতে না পারিব, ততক্ষণ আমাদের মঙ্গল নাই, ঈশ্বর কখনও অপবিত্রতার প্রশ্রয় দেন না। তাঁহার কাছে যাইতে হইলে, সরল ও পবিত্র ভাব অবলম্বন করিতে হয়। আমাদের যে সকল কর্ত্তব্য আছে, তাহা সাধন করিতে হইবে।

যাঁহারা ধর্ম্ম জগতে ঈশ্বরের করুণা পাইয়া তাহার অন্যায় ব্যবহার করেন, তাঁহাদের বড় দুর্দ্দশা হয়। তাঁহার করুণা পাইবার বিষয়ে জাতি বর্ণ ভেদ নাই, সকলেই তাঁহার করুণার অধিকারী।

গৃহস্থ প্রচারক—গৃহে থাকিয়া স্ত্রীপুত্র প্রতিপালন এবং ধর্ম্ম সাধন করিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম উপদেশ দেন। গৃহস্থ ব্যক্তিগণ ধর্ম্ম প্রচারও করিবেন। ব্রাহ্মসমাজ এমন কথা বলেন না যে, যাঁহারা ধর্ম্ম প্রচার করিবেন তাঁহারা গৃহস্থ হইতে একটী পৃথক শ্রেণী হইবেন। এরূপ হইলে পৌরহিত্যের সৃষ্টি হইবে এবং তদ্দ্বারা সমাজের কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণ হইবে।

৫। বিশেষ ঋতুতে ভগবানের বিশেষ আবির্ভাব।—মরুভূমি প্রদেশে ভগবানের বিশেষ করুণা প্রত্যক্ষ করা যায়। যেখানে এক বিন্দু জল নাই, সেখানে ভগবান পান্থ পাদপ ও বড় বড় তরমুজ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া প্রাণিগণের পিপাসা দূর করিবার জন্য কেমন সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। গ্রীষ্মের সময়ে সমুদ্র প্রভৃতি হইতে জল আকর্ষণ করিয়া বর্ষার আয়োজন করেন। এমন সকল স্থানও আছে যেখানে মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় না, কোয়াসার দ্বারা বৃষ্টি হইয়া থাকে।

মানুষের দৃষ্টি যখন ভৌতিক জগৎ ছাড়িয়া অন্তর্জগতে প্রবেশ করে, তখন সে অতি সামান্য ঘটনার মধ্যে ভগবানের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। বসন্তের পূর্ব্বে ভগবান বৃক্ষ সমূহকে নূতন নূতন পত্রদ্বারা কেমন সুন্দর সাজে সাজাইয়া দেন। তেমনি প্রাণে নবরসের সঞ্চার হইলে পুরাতন জড়তা ক্রমে ক্রমে চলিয়া গিয়া নব নব ভাবকুসুম প্রস্ফুটিত হয়।

৬। ব্রাহ্মসমাজে জমাট ভাব হয় না কেন এবং কি উপায়ে হইতে পারে?—মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন থাকিলে, যেমন তাহার জীবন আছে বলিয়া মনে হয় না, আমাদের সমাজের অবস্থাও যেন সেইরূপ। এইজন্যই আমরা সমাজের মধ্যে জমাট ভাব দেখিতেছি না, বা তেমন শক্তি জাগিতেছে না।

অহঙ্কার একটী প্রধান শত্রু, তাই বর্ত্তমান সময়ে মিলেমিশে কাজ করাও অসম্ভব। আমরা তৃণের সমান হীন হইয়া, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া, অমানীকে মান দিতে পারি না। এই জন্যই ধর্ম্মভাবের অভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য এই;—মনে যে সকল সাধু ভাবের উদ্রেক হইবে, তাহা কার্য্যে পরিণত করা। কথায় বলিলে কিছুই হইবে না। যাহাতে বাক্য, কার্য্যে পরিণত হয়, প্রত্যেকের তাহার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

৭। গুরুর আবশ্যক আছে কিনা?—খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি ধর্ম্ম সম্প্রদায় গুরু বা শাস্ত্রবাক্য অবনত মস্তকে গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম এরূপ করিতে উপদেশ দেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, সাধু বা শাস্ত্রবাক্যে যাহা সত্য আছে তাহাই গ্রহণীয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম, ধর্ম্মপথপ্রদর্শক ও ধর্ম্মসাধনের সহায় আচার্য্য বা উপদেষ্টার আবশ্যকতা অস্বীকার করেন না। ভগবান মানবসমাজের মধ্যে লীলা করিতেছেন। ব্রাহ্ম যেখানে সত্য, সাধুতা, ন্যায় দেখিবেন, সেখানেই নত হইয়া সেই সকল গ্রহণ করিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহাই শিক্ষা দেন। দুর্ব্বল ব্যক্তি সবলের সাহায্য পাইবে। সামান্য শিক্ষার যদি শিক্ষকের আবশ্যক হয়, তবে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম ধর্ম্মসাধন-পথে চলিতে উপদেষ্টার আবশ্যক হইবে না কি? সাধু লোকের সাহায্য না লইব কেন?

৮। বালক বালিকাদিগের ধর্ম্মশিক্ষা—আমাদের বালকবালিকারা যাহাতে ধর্ম্মভাবে বর্দ্ধিত হইতে পারে, এমন বিশেষ কোন চেষ্টা হইতেছে না। ব্রাহ্ম বালকবালিকাদের ধর্ম্মশিক্ষার বিশেষ অভাব রহিয়াছে। আমরা সন্তানদের বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য যেমন ব্যগ্র, ধর্ম্মজীবন প্রস্তুত করিবার জন্য তেমন নহি।

সহজে যাহাতে ধর্ম্মভাব জাগ্রত হয়, সে বিষয়ে ধর্ম্ম সমাজের বিশেষ দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়। সন্তান প্রথমতঃ পিতা মাতাকে ভক্তি করিবে; পরে যথাসময়ে তাহার ধর্ম্মদীক্ষা হইবে। অন্যান্য ধর্ম্মসমাজে দীক্ষার নিয়ম আছে। হিন্দুসমাজে এইরূপ দীক্ষা হইলে, তাহাকে দ্বিজত্ব লাভ বলে। দ্বিজত্ব লাভ দুই প্রকার,—

(১) ঈশ্বর স্বয়ং যাহাকে দীক্ষিত করেন।

(২) ধর্ম্মোপদেশে যে দীক্ষা হয়।

বালকের অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য যেমন সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজন, তেমনি ধর্ম্মশিক্ষার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। আমাদের সন্তানগণ যাহাতে অতি শৈশব হইতে ধর্ম্মভাবে বর্দ্ধিত হয়, তাহার আয়োজন করা প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য।

৯। ধর্ম্মানুগত সংসার—সংসার ধর্ম্মের অঙ্গ। সকলকেই সংসারধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। সংসার একটী পরীক্ষার স্থল। ইহার মধ্যে ঠিক ভাবে চলা ও ভগবানকে সকল সময়ে উপলব্ধি করা অতীব কঠিন। কিন্তু বিশ্বাসী হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, সংসার মধুময় হয়।

১০। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা হয় কি রূপে?— ঈশ্বরকে আমরা সার, সত্য, নিত্য বলিয়া বুঝি নাই, বিশ্বাসের অল্পতা বশতঃই তাঁহার বিচ্ছেদ ভাব অনুভব করিতে পারি না।

ব্যাকুলতা বাড়াইবার এই কয়েকটী উপায়;—সাধুগণের জীবন চরিত পাঠ, অভাব চিন্তা করা ও সেই সঙ্গে অভাব পূরণ করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা।

অভাব হইতে দীন ভাবের উদ্রেক হয়। সামান্য একটু উপায় পাইলে, ক্রমে আত্মদৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয়, এবং তাহা হইতে সাধক ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করেন।

বিশ্বাসের সহিত তাঁহাকে সার সত্য বলিয়া ধরিতে পারিলেই, আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয়। তাঁহাকে ভিন্ন দিন চলে না।

পার্থিব সামান্য বস্তুর অভাবে বা বিচ্ছেদে আমরা প্রাণে কত কষ্ট পাই, আর ভগবান আমাদের পরম বস্তু, যাহা বিনা আমরা এক দিনও জীবিত থাকিতে পারি না, তাঁহার জন্য কি আমরা ব্যাকুল হইব না?

পার্থিব বস্তুতে আসক্তি থাকিলে ব্যাকুলতা বাড়ে না। ঈশ্বর প্রীতিই ব্যাকুলতা আনয়ন করে।

ঈশ্বর-কৃপায় এবৎসরও ১লা পৌষ হইতে সমস্ত মাস ভোর-সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল এবং যথাসাধ্য নগরবাসী ব্রাহ্মদিগের দ্বারে দ্বারে নাম কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

৬ই মাঘ শনিবার।

অদ্য প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। তৎপর আমাদের আর্য্য সাধনাশ্রমের পরিচারক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব বেদী গ্রহণ করিয়া হিন্দী ভাষাতে উপাসনা করেন। তিনি যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা লিখিত হয় নাই।

অপরাহ্ণ ৩½ ঘটিকার সময় প্রথমতঃ সংকীর্ত্তন হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভক্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বাইবেল-গ্রন্থ ও খৃষ্টধর্ম্মের স্থূল মর্ম্ম সংক্ষেপে অথচ অতি উজ্জ্বলরূপে বর্ণনা করিয়া বাইবেলের নানা স্থান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার পাঠ ও ব্যাখ্যা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব গুরু নানকের "আদি গ্রন্থ" হইতে কিছু পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণপ্রসাদ কবিরের কোন কোনও দোহা অবলম্বন করিয়া কিছু বলেন। এই সকল পাঠ ও ব্যাখ্যা অতি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল।

৭ই মাঘ রবিবার।

অদ্য রবিবার প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দাস উপাসনা করেন। সমবেত প্রার্থনার পরে তিনি নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করেন;

"মানবজীবন প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। শৈশব, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য। ধর্ম্মজীবনেও এইরূপ তিন ভাগ দেখিতে পাই; সাধারণ জীবন, নবজীবন এবং প্রেম-জীবন। সাধারণ ধর্ম্ম-জীবনে দেখিতে পাই, মানুষ মাত্রেই নিজ নিজ ধর্ম্মানুযায়ী সাধনপ্রণালী অনুসারে কর্ত্তব্য পালনে রত; দিবসে ৩।৪ বার ভজন সাধন করিয়া থাকে। দেখিলেই বেশ মনে হয়, এ লোকটী বেশ ধার্ম্মিক। এমন কি এই সাধারণ ধর্ম্মাবলম্বনকারী ব্যক্তি, তদবস্থাপন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও দেখিলে বলিয়া থাকেন "এ বেশ ধার্ম্মিক ইহার ধর্ম্মজীবন বেশ সুন্দর।" এইরূপ সাধারণ ধর্ম্ম-জীবন অধিকাংশ লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্ম ভ্রমে যাহারা পাপে ডুবিয়াছে, তাহাদের কথা বলিবার আবশ্যক নাই। যাহারা গৃহে অনুষ্ঠান করিতেছে, কর্ত্তব্য পালনরূপ সদনুষ্ঠানেও রত, তাহাদের জীবনও সাধারণ ধর্ম্ম-জীবনেরই অন্তর্ভুক্ত। যে পর্য্যন্ত না জীবনে ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের আবির্ভাব হয়, সাধক নবজীবন প্রাপ্ত না হন, সে পর্য্যন্ত তদ্রূপ জীবন প্রশংসনীয় হইলেও তাহা মূল্যবান ধর্ম্মজীবন বলিয়া গ্রহণীয় নয়, তাহা বাল্যজীবনেই গণ্য, কেননা সাধক তখনও প্রাণে প্রকৃতরূপে ঈশ্বর-সত্তা অনুভব করিতে পারেন নাই।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে দেখিতে পাওয়া যায়, গুরু আসিয়া প্রাচীন দীক্ষাপদ্ধতি অনুসারে শিষ্যকে দীক্ষিত করিয়া থাকেন। শক্তির উপাসক হইলে গুরু আসিয়া বিশেষাদনে শিষ্যকে স্নান করাইয়া শক্তির বীজ মন্ত্র দিয়া থাকেন। এই মন্ত্রদান সময়ে শিষ্যকে বলিয়া দেওয়া হয় যে, ইহা বিশেষ-ভাবে গোপন করিয়া রাখিবে। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এবং সাধারণ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিতরে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। শিষ্য যতদিন এইরূপ দীক্ষা গ্রহণ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত শিষ্যের শরীর অশুদ্ধ, তাহার হাতের জলে দেব-পূজা পর্য্যন্ত হইতে পারে না। এই সংস্কার চিরপ্রচলিত। দীক্ষা না হইলে, নবজীবন না পাইলে, শরীর অশুদ্ধ থাকে। এইরূপ দীক্ষার অবস্থাই নবজীবনের অবস্থা। যাঁহারা প্রাচীন রীতি অনুসারে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রকৃত নবজীবন প্রাপ্ত হন কিনা তাহা সকলেই একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। যদি এই উপায়ে লোকের নবজীবন লাভ হইত, তাহা হইলে জগতের সকলেই নবজীবন লাভ করিত। কিন্তু ইহা নবজীবন নহে, ইহাও সাধারণ জীবনের মধ্যেই গণ্য। তবে কি মানুষ চিরকালই সাধারণ জীবন লইয়া থাকিবে, নবজীবন পাইবে না? তাহা কখনই হইতে পারে না। ঈশ্বর মানুষকে নবজীবন দিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কোন্ আত্মা তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল, তাহা তিনি সর্ব্বদাই দেখিতে-ছেন। সংসারের গুরু, শিষ্য দীক্ষিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া থাকেন; জগতের গুরু, স্বর্গের ঈশ্বরও তাঁহার কোন্ সন্তানের প্রাণ তাঁহাকে পাইবার জন্য কখন পিপাসিত হয়, তাহা দেখিয়া থাকেন। এইরূপে

যখন তিনি দেখিতে পান যে, কোনও আত্মা তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, তখন তিনি নিজেই তাহাকে দীক্ষিত করিয়া থাকেন এবং এইরূপ দীক্ষাতেই মানুষ নবজীবন প্রাপ্ত হয়।

এই যে আমরা উৎসব ক্ষেত্রে বসিয়াছি, নিজ নিজ জীবনে অনেকেই কি সাক্ষ্য দিতে পারি যে আমরা ঈশ্বরের নিকট দীক্ষিত হইয়াছি। এইরূপেই ঈশ্বরের পুত্র কন্যাগণ দীক্ষিত হইয়া থাকেন। এইরূপ জীবন লাভ না করিলে মানুষ প্রকৃত পথ প্রাপ্ত হয় না; সাধারণ জীবন লইয়াই চিরকাল বাস করে এবং তাহা পাইয়াই তৃপ্ত থাকে। আমরা সকলেই কি এই নবজীবন লাভ করিয়াছি? ঈশ্বর কি দীক্ষা কালে আমাদের কর্ণে কোনও বিশেষ গোপনীয় কথা বলিয়া দিয়াছেন? ঈশ্বর যদি আমাদিগকে নবজীবন প্রদান না করেন, তবে শত সদনুষ্ঠান করিলেও তাহা মৃত জীবনই থাকিবে। নবজীবন আমরা পাইয়াছি কিনা তাহা দেখিতে হইবে।

আমাদের কি কোনও গুরু আছেন? এমন গুরু কেহ আছেন কি যাঁহার কথা শুনিয়া চিরদিন চলিতে পারি? হাঁ, ইহা ঠিক, যে, জগতের অপর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ন্যায় আমাদেরও গুরু আছেন। পূর্ণ জ্ঞানময় পবিত্র পুরুষ পরমেশ্বরই একমাত্র আমাদের গুরু। যদি সেই পূর্ণপুরুষ পরব্রহ্ম বাস্তবিকই আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়া থাকেন, তবে ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, যখন পৃথিবীর গুরুই শিষ্যকে পরিত্যাগ করেন না, তখন সেই জগতের গুরু কি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন? এখন জিজ্ঞাস্য এই, অপর সম্প্রদায়ের লোকের ন্যায় গুরুর নিকট হইতে কি কেহ কাণে কাণে কোন মন্ত্র পাইয়াছেন? যে মন্ত্র পাইলে শরীর বিশুদ্ধ হয়, আত্মা পবিত্র হয়; সেরূপ কোনও মন্ত্র পাইয়াছেন কি? কি মন্ত্র পাইয়াছেন বলিতে পারেন কি? না আপনাদের মন্ত্রও গোপনীয়? না তাহা কখনই নহে। জগতের গুরু পরমপিতা পরমেশ্বর আমাদের কর্ণে যে মন্ত্র দিয়াছেন, তাহা কখনই গোপনীয় নহে; তাহা জগতের নিকট উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে হইবে। আমাদের মন্ত্র কি? "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি। ইহা গোপনে সাধন করিব; কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে জগতের নিকট প্রচার করিব। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা বড়ই দুর্ব্বল, মন্ত্রের কথা ভুলিয়া যাই, কেন আসিলাম, কেন মন্ত্র গ্রহণ করিলাম, তাহা ভুলিয়া যাই এবং চিরকাল মৃতজীবন লইয়া ধর্ম্মসমাজের অঙ্গকে দুর্গন্ধময় করিতে থাকি।

আমাদের উৎসব আসিয়াছে। আমাদের প্রাণে সেই মন্ত্র জাগাইবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "মন্ত্র আমাদের মনে আছে কিনা?" যদি বলি মনে আছে, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবেন "মন্ত্র সাধন করিয়া জীবনের উন্নতি হইয়াছে কিনা?" যদি মন্ত্র ভুলিয়া গিয়া থাকি, তিনি পুনরায় তাহা জাগাইয়া দিবেন। উৎসবে কি জন্য আসিয়াছি? তাঁহার দিকে অগ্রসর হইব,মন্ত্র ভুলিয়া থাকিলে আবার প্রাণে তাহা জাগাইব, সাধনে প্রবৃত্ত হইব। "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয় কার্য্য সাধনং" ইত্যাদি যে প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলাম, যৌবনে বার্দ্ধক্যে যেন তাহা পালন করিতে পারি। এই জন্য ঈশ্বরের নিকট বল ভিক্ষা করিব।

অদ্য অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় ব্রাহ্মগণ দলে দলে বিডন উদ্যানে সমবেত হইলেন। একটী সংকীর্ত্তনের পরে আমাদের লক্ষৌ নগরের প্রচারক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণপ্রসাদ হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা করেন। তৎপর আরা সাধনাশ্রমের পরিচারক শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ও প্রচারক নবদ্বীপচন্দ্র দাস বক্তৃতা ও প্রার্থনাদি করেন। অবশেষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঘোষাল বক্তৃতা করেন। পরে পুনরায় সংকীর্ত্তন করিয়া প্রচারযাত্রীদল মন্দিরে প্রত্যাগত হন।

সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় মন্দিরে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র উপাসনা করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ এই;—

"একদিন মহম্মদ অনেক বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী এবং বালকগণদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—"এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা একমাত্র পরমেশ্বর, তিনিই জগতের প্রাণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন; তাঁহারই ভজনা কর, তিনিই ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ কল্যাণের আকর, তাঁহাকে ছাড়িয়া মানবের আর দ্বিতীয় পরিত্রাণের উপায় নাই।" তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে অবলম্বন না করিলে দেশের দুর্গতি দূর হইবে না, তাই বার বার উচ্চৈঃস্বরে সকলকে এই কথা বলিতে লাগিলেন। বৃদ্ধেরা নীরব, কেহই তাঁহার কথার উত্তর দিলেন না। অবশেষে তিনি নারীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমাদের হৃদয় স্বভাবতঃ কোমল, তোমরা কি এই সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের ভজনা করিবে না?" সকলেই নীরব, কেহই তাঁহার কথার উত্তর প্রদান করিল না। অবশেষে যুবকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। যুবকগণ কেহ কেহ তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল, অপর সকলে নীরব হইয়া রহিল। অবশেষে যখন তিনি বালকদিগকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিলেন, তখন একটী ১৪ বৎসরের বালক গম্ভীর ভাবে বলিয়া উঠিল, "হাঁ আমি প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছি যে, একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বরই মানবের উপাস্য দেবতা; তাঁহাকেই আমি একমাত্র সত্যস্বরূপ বলিয়া প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছি।" বালকের এই কথা শুনিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া গেল; অপর যুবকেরা বলিতে লাগিল "আমরা তোমা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী, আমরা কিছুই বলিলাম না, আর তুমি এই কথা বলিলে?" বালকের আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহাকে নানারূপ ভয় দেখাইতে লাগিল। বালক নীরব, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। বালক বলিতে লাগিলেন,—"যে যাহাই বলনা কেন, আমাকে যেরূপ ভয়ই দেখাও না কেন, আমার বিশ্বাস দৃঢ়, অটল, কিছুতেই ভঙ্গ হইবার নহে। মহম্মদ বালকের কথা শুনিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—"জগদীশ্বর! তোমাকে ধন্যবাদ যে, একজন লোককেও তোমার সাক্ষ্য দিবার জন্য পাইলাম" এই জ্ঞানহীন বালকের সাক্ষ্যেরই ফল জগতে সংক্রামক হইয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই যে, ইহার পর মহম্মদের নিকট এইরূপ অনেক জ্ঞানহীন লোক ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ২রা ফাল্গুন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

২১শ সংখ্যা।
১৭শ ভাগ।

১লা ফাল্গুন মঙ্গলবার, ১৮১৬ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৬।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥•
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

পঞ্চষষ্টিতম মাঘোৎসব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মহাত্মা যীশুর প্রচারিত সত্যে যাঁহারা বিশ্বাস করিয়া ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও দেখিতে পাই, অনেকেই অতি হীন, মূর্খ এবং নীচজাতীয় লোক ছিলেন। সাক্ষ্য দান করিয়া ক্রমে তাঁহারা ঈশ্বরবিশ্বাসী, ধার্ম্মিক হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত সেই ১৪ বৎসরের বালক, কালে মুসলমানসম্প্রদায়ে একজন সম্ভ্রান্ত, পূজনীয়, ধার্ম্মিকপুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজও ঘোষণা করিতেছেন—"সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে উপাসনা না করিলে আমাদের দুঃখ এবং দেশের দুর্গতি দূর হইবে না।" এখানে আমরা অনেকেই সমাগত হইয়াছি, কে ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিতে দণ্ডায়মান হইবেন? কে প্রাণে বিশ্বাস করিয়াছেন যে, "ঈশ্বর একমাত্র মানবের পূজনীয় দেবতা?" কে এই সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত? ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা জ্ঞানী, ধনবান, তাঁহারা কি এই সাক্ষ্য দিতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন? না—তাঁহাদের অনেকেই উদাসীন? অনেক অজ্ঞান, হীন, অল্পবয়স্কলোকই এই সত্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন; অনেক পাপী, পুণ্যবান হইয়াছেন, চণ্ডাল ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন। আমরা সকলেই কি জীবন দিয়া ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি? ব্রাহ্মসমাজের বালকগণ! তোমরা ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিয়া তাহা চিরজীবন পালন করিতে প্রস্তুত হইয়াছ কি? এখানে অনেক বয়স্কবৃদ্ধ উপস্থিত রহিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদগকেও আহ্বান করিতেছেন, তাঁহারা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছেন কি? নিজকে অজ্ঞান, অসার ভাবিয়া দূরে থাকিলে চলিবে না। অনেক মহিলা এখানে উপস্থিত রহিয়াছেন, নিজ জীবনদ্বারা ঈশ্বর-মহিমা ঘোষণা করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, আপনারা প্রস্তুত আছেন কি? আমরা আমাদিগের চরিত্রকে প্রেম এবং বিশ্বাস দ্বারা এরূপ সংগঠিত করিব, যেন লোকে আমাদিগের জীবন দেখিয়া বলিতে পারে যে "হাঁ, ইহারা যে ঈশ্বরের সত্যবিশ্বাসী তাহা ইহাদিগের চরিত্রদ্বারাই বেশ বুঝিতে পারা যায়।" এই সাক্ষ্য না দিলে আমাদের দুর্দ্দশা ঘুচিবে না, জগতের দুঃখ দূর হইবে না। ঈশ্বর আমাদের বালক, বৃদ্ধ, যুবক, স্ত্রীলোক সকলকেই উৎসবের দ্বারে আহ্বান করিয়াছেন, সকলকেই এই সাক্ষ্য দিতে হইবে। আচার্য্যের মুখ হইতে প্রাণস্পর্শী বাক্য শুনিবার জন্য নহে, সুধু ভাবের উচ্ছ্বাসে কীর্ত্তনে মত্ত হইবার জন্য নহে; কিন্তু এই সত্য প্রাণে লাভ করিয়া সাক্ষ্য দিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। এখন আমরা নিজের দুর্ব্বলতা দেখিয়া, অপ্রেম দেখিয়া, ম্রিয়মান হইয়া থাকিব না, সাহস এবং উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিবার জন্য জগতের দ্বারে দণ্ডায়মান হইব; আমাদিগের চরিত্রদ্বারা দেশে ঈশ্বরের নাম প্রচার করিব। আমাদিগের ন্যায় অপদার্থ লোককেও যখন ঈশ্বর আহ্বান করিয়াছেন, তখন ইহার ভিতর তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব আসুন, নরনারী আমরা সকলে মিলিয়া উৎসবের দ্বারে দাঁডাইয়া, বিশ্বাস এবং প্রেমের ভিখারী হইয়া তাঁহার নিকট যাই। এই ব্রাহ্মসমাজকেই ঈশ্বর এদেশে তাঁহার সত্যপ্রচারের স্থান করিয়াছেন, এই ব্রাহ্মসমাজই আমাদিগের গৃহস্থলী হউক, পাপী তাপীর আশ্রয়-স্থান হউক, আমরা সকলে মিলিয়া ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছা সুসম্পন্ন করিবার সাহায্য করি। ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

৮ই মাঘ, সোমবার।

প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় সংকীর্ত্তন হয়, তৎপরে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ প্রসাদ হিন্দিতে উপাসনা করেন। তাঁহার উপদেশ লিখিত হয় নাই।

অপরাহ্নে ৩ ঘটিকার সময় ১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ ভবনে রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয়ের উৎসব হয়। এতদুপলক্ষে নিমন্ত্রিত অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী একটী প্রার্থনা করেন,

তৎপর বার্ষিক রিপোর্ট পঠিত হইলে বালক বালিকাগণ উপদেশপূর্ণ এবং আমোদ জনক কোন কোনও বিষয় অভিনয় করে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতা আবৃত্তি এবং অভিনয় ইত্যাদি ভালই হইয়াছিল। তৎপর ছাত্র ও ছাত্রী-দিগকে পারিতোষিক বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ন ৬½ ঘটিকার সময় মন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী "সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মসমাজ গঠন" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য মন্দিরে বহু লোকসমাগম হইয়াছিল। অনেকে স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনেকে দণ্ডায়মান থাকিয়া অতি উৎসুক-চিত্তে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিতরূপে বক্তৃতা হইয়াছিল ;—

"সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মভাব এবং ধর্ম্মসমাজ সংগঠনের কথা অনেকেই জানেন। এই সম্বন্ধে প্রথমে সর্ব্বসাধারণের সুবিদিত স্থূল স্থূল কথা বলিব। অনেকেই অবগত আছেন যে, প্রাচীনকালে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই পৃথিবীকে গ্রহগণের মধ্যে প্রধান বলিয়া গণনা করিতেন এবং মনে করিতেন যে, ইহা সৌরজগতে মহারাণীর ন্যায় প্রতিষ্ঠিত। সূর্য্য এবং অপর গ্রহগণ ইহাকে আবেষ্টন করিয়া নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইহা জানিতে পারিয়াছেন যে, পৃথিবী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে একটী ক্ষুদ্র গ্রহ, সৌরজগতের মহারাণী নহে। ইহা অন্যান্য গ্রহের ন্যায় সূর্য্যকে আবেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। আপততঃ এইরূপ মতের পরিবর্ত্তন সামান্য বোধ হইতে পারে; কিন্তু এই দুইটী কথায় জগতে বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে, তাহা কি সুমহৎ এবং কত শতাব্দী হইতে সংগঠিত!

বর্ত্তমান এই বৈজ্ঞানিক গবেষণাপ্রণালীর চারিটী ক্রম আছে,—১ম বস্তু পরীক্ষা, দ্বিতীয় তুলনায় বিচার বা সম্বন্ধ নির্ণয়, তৃতীয় স্বাধর্ম্ম্যনিরূপণ এবং চতুর্থ জাতিবিভাগ। প্রথমতঃ—কোনও নূতন বস্তু দেখিলেই তাহা পরীক্ষা করা, তাহার স্বভাব, গুণ, ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার বিচার করা। যখন তাহার স্বরূপ এবং গুণ জানা হইল, তখন তুলনায় বিচার আরম্ভ হইল। তৎপর অন্য বস্তুর সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ নির্ণয় করা দ্বিতীয় কাজ। এইরূপ অন্য পদার্থের সহিত সম্বন্ধ ঠিক করিতে করিতে মানুষ দেখিতে পায় যে, ইহার সহিত অন্য বস্তুর সাদৃশ্য রহিয়াছে—ইহার নাম স্বাধর্ম্ম্যনিরূপণ। এই স্বাধর্ম্ম্য নিরূপণের পরে এক ভাবাপন্ন বস্তুদিগকে একটী শ্রেণীতে আবদ্ধ করা হয়। ইহাই বৈজ্ঞানিক গবেষণার রীতি। এই রীতি সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত, ইহার কাজ সর্ব্বত্রই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। জ্যোতি-র্ব্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, সমাজ-তত্ত্ব সর্ব্বত্রই এই বৈজ্ঞানিক গবেষণার রীতি দেখিতে পাই।

একজন উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিৎ নির্জ্জনে হঠাৎ কোনও নূতন গুল্ম পাইলে, প্রথমেই তাহার স্বরূপ, প্রকৃতি এবং গঠন প্রণালী পরীক্ষা করেন, যে যে বস্তুর বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে, সেই সেই বস্তুর সহিত তুলনা করেন। যখন অপর বস্তুর সহিত সমগুণ বলিয়া বুঝিতে পারেন, তখন কোনও এক শ্রেণীতে তাহাকে সংবদ্ধ করেন। এইরূপ প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কোনও নূতন প্রাণী দেখিতে পাইলে, তাহার স্বভাব, গঠন প্রণালী প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া তুলনাদ্বারা তাহাকে শ্রেণীবদ্ধ করেন। মনুষ্যসমাজকেও এইরূপে বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বারা শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। মানুষের আকৃতিগত পার্থক্য, প্রভৃতি দ্বারা আর্য্য, অনার্য্য প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে মানব সমাজকে বিভক্ত করা হইয়াছে।

এই বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রণালী এক্ষণে ধর্ম্মের বিচারেও প্রযুক্ত হইতেছে। প্রাচীনজ্যোতির্ব্বিদদিগের ন্যায়, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাবলম্বীগণ নিজ নিজ ধর্ম্ম ও দলকে প্রধান এবং অপরকে নিকৃষ্ট স্থান দিতেন। বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক রীতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ ধর্ম্মকে তুলনা দ্বারা চিন্তা করা হইতেছে। বর্ত্তমানে কোনও ধর্ম্মসমাজের চিন্তাশীল লোকই নিজ ধর্ম্মকে স্বতন্ত্রভাবে ভাবিতে পারেন না; জগতের অপরাপর ধর্ম্মের সহিত দেখিতে পান। এইরূপ বিচার করিতে গিয়া আমরা এক মহা সত্যে উপনীত হই। তাহা এই—প্রথমতঃ এক আধ্যাত্মিক দৃষ্টি মানব সাধারণে দেখা যায়; অর্থাৎ যে দৃষ্টি দ্বারা মানব পরমসত্তাকে প্রতীতি করে, তাহাই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি। কোনও সময়ে চিন্তাশীল লোকমাত্রেই বিশ্বাস করিতেন যে, পৃথিবীতে এরূপ অনেক লোক রহিয়াছে, যাহাদিগের মধ্যে এই আধ্যাত্মিকদৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয় নাই। আদিমকালে খৃষ্টীয়ান পাদ্রীগণ বর্ব্বর জাতীয়দিগের ভাষা বুঝিতে না পারিয়া জগতের সম্মুখে তাহাদিগের সম্বন্ধে যাহা বলিতেন, তাহাতেই লোকের মনে এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল যে,জগতে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিবিহীন লোক ও রহিয়াছে। বর্ত্তমান ৫০ বৎসরের গবেষণায় যে নূতন চিন্তা স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এমন কোনও বর্ব্বর জাতি নাই, যাহাদিগের ভাষায় এক অনন্ত পরম সত্তার প্রতীতির প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমন কোনও জাতি নাই, যাহাদিগের মধ্যে আধ্যাত্মিকদৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয় নাই।

দ্বিতীয়—তুলনায়বিচার। এই দ্বিতীয় অবস্থায় মানব আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সাহায্যে এক মহা সত্তায় উপস্থিত হয়। সেই সত্তাদ্বারাই মানবের জীবন নিয়মিত। এস্থলে অনেকেই বলিতে পারেন যে,—বহুদেব বিশ্বাসীও অনেকে আছেন! এখানে আমাদিগকে একটী কথা স্মরণ করিতে হইবে। মোক্ষমুলার তাঁহার কোনও গ্রন্থে একটী নূতন কথা সৃষ্টি করিয়াছেন,—"বেদে ঊষা, বরুণ, প্রভৃতি যে সকল দেবতার নাম আছে, অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদিগের সকলের মূলে একই ভাব রহিয়াছে, ভিন্ন প্রয়োগ মাত্র। 'সর্ব্বজ্ঞ', 'দয়াময়' প্রভৃতি যে সকল স্বরূপ স্বভাবতঃ ঈশ্বরে অর্পণ করা হয়, সে সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন দেবতার প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছে। "হে বরুণ! তোমার স্তবকারী বন্ধুদিগকে রক্ষা কর, তুমি সকলই করিতে পার, তোমার অজ্ঞাত কিছুই নাই।" এই স্থানে দয়াময় প্রভৃতি কথা বরুণের প্রতিই প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইন্দ্রের স্তবকালেও এই এক ভাব

প্রকাশ করা হইয়াছে। ফলতঃ সর্ব্বত্রই এই একই ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। নাম ভিন্ন, ছবি একই। আমাদের দেশে নানা দেবতা লইয়া বিচার হইয়াছে। কৃষ্ণভক্তেরা কৃষ্ণকে, কালীভক্তেরা কালীকে, বিষ্ণুভক্তেরা বিষ্ণুকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়াছেন। কিন্তু দেখিতে পাই যে, এক অনন্তের গুণই ভিন্ন ভিন্ন উপাসকেরা তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় দেবতাকে অর্পণ করিয়াছেন। আস্তিক হিন্দুর নিকট যদি বল, "কালী ত ইহা করিতে পারে না?" তিনি তোমার প্রতি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইবেন। একদিন আমার মাতৃঠাকুরাণী আমাকে বলিয়াছিলেন "বাবা, তারকনাথ তোমাকে সুখে রাখুন।" আমি বলিলাম "তোমার তারকনাথ ত তারকেশ্বরে, সেখান হইতে আমাকে কিরূপে রক্ষা করিবেন?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন—"বাছা! তারকেশ্বর কি সুধু ঐ মন্দিরেই বসিয়া রহিয়াছেন? তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া সকলই দেখিতেছেন।" এইরূপ দেখিতে পাই, মানবের ভাব সর্ব্বত্রই এক, ইহাকে "Henotheism" বলে।—অর্থাৎ একই ভাব ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং পদার্থে আরোপ করা হইয়াছে।

প্রাচীন লোকেরা নিজের ভিতরে কোনও এক শক্তির প্রমাণ পাইয়া বহির্জ্জগতে তাহার অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন। অগ্নির প্রবলশক্তি দেখিয়া, বায়ু তরঙ্গের পরাক্রম অনুভব করিয়া, তাঁহারা মনে করিতেন, এই বুঝি আমাদিগের সেই উপাস্য দেবতা। হৃদয়ের ভাব বাহিরে নানা বস্তুতে আরোপ করিয়া তাহাকেই উপাস্য জ্ঞান করিতেন। এই স্থানেই গূঢ়তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, তাহা এই যে, মানবাত্মার সঙ্গে সঙ্গে পরমাত্মার জ্ঞান। যদি বলা যায় যে, "এই টেবিলের উপরিস্থিত সেজটীকে ভাব" তাহা হইলে যেরূপ চতুর্দ্দিকের আকাশের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সেজটীর ধারণা করা সম্ভব নহে, সেইরূপ মানব যখন নিজজীবনের বিষয় চিন্তা করে, তখন জীবনের ভিত্তিস্বরূপ সেই মহাসত্ত্বাকে ছাড়িয়া চিন্তা করা সম্ভব নহে। আমার ইচ্ছায় এই জীবন থাকিবে না। এই দেহরূপ মাংস পিণ্ডে যখন জীবন সঞ্চারিত হইয়াছিল, তখন আমার ইচ্ছায় হইয়াছিল কি? জীবনের উপর আমার কোনও হাত নাই, এই জীবনস্রোত, শ্বাস, প্রশ্বাস, কিছুই আমার হুকুম মানিয়া চলে না। যে জীবনের উপর আমার হাত নাই, তাহার কর্ত্তা কি আমি? তবে এই জীবনের উৎস কোথা হইতে উৎসারিত হইতেছে? ইহার মূল কোথায়? ইহার আদি কোথায়? এইরূপ চিন্তা স্বভাবতই মানব মনে উদিত হয়। জড়ের সঙ্গে আকাশের জ্ঞান যেরূপ, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার জ্ঞানও সেইরূপ। এই মহাসত্ত্বা দেখিয়াই অসভ্য বর্ব্বর জাতি চমকিত হইয়াছে, এবং ইহার বিষয় চিন্তা করিতে গিয়াই ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে এই সত্ত্বাকে আরোপ করিয়াছে।

সকল ধর্ম্মাবলম্বিগণই ইহা বিশ্বাস করেন যে, "এক ইন্দ্রিয়াতীত মহাসত্ত্বা বিদ্যমান রহিয়াছেন, যদ্দ্বারা মানবজীবন নিয়মিত।" এ স্থলে কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, "বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিরা ত ঈশ্বর মানেন না?" তাঁহারা এরূপ ঈশ্বর মানেন না বটে; কিন্তু তাঁহাদের জীবন কর্ম্মের (Law of Karma) অধীন, ইহা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ বিশ্বাস করেন। ইহার অর্থ এই যে, জীবন পার্থিব নিয়মের অধীন নহে, ইহা এক ইন্দ্রিয়াতীত নিয়মের দ্বারা শাসিত। জীবনের এক অনন্তপ্রসারিত ইন্দ্রিয়াতীত ক্ষেত্র রহিয়াছে, তাহা হইতে জীবন আইসে। ইহাও এক অনন্ত সত্ত্বা ও শাসনশক্তিতে বিশ্বাসের ফল।

তৃতীয়তঃ—ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম তুলনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সত্ত্বা বা শক্তি যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, জীবনকে ইহার অধীন করাই ধর্ম্ম। জগতের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরই এই বাসনা যে, জীবনকে কি উপায়ে এই শক্তির অধীন করা যায়। বৌদ্ধদিগের উদ্দেশ্য তাহাই। তাঁহারা ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া, হৃদয়ের সমগ্র বাসনাকে বিনাশ করিয়া জীবনকে এই নিয়মের অধীন করেন। হিন্দুর মনে এই বাসনা যে, জীবনের অধিপতি যিনি, জীবন তাঁহার অধীন করিতে হইবে। খ্রীষ্টান প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগেরও এই বিশ্বাস যে, এই ইন্দ্রিয়াতীত শক্তিদ্বারা জীবনকে নিয়মিত করাই ধর্ম্ম। এইরূপ বিশ্বাস সকল জাতিতেই প্রস্ফুটিত। অসভ্য বর্ব্বরদিগের মধ্যে ইহার ভাব কিঞ্চিৎ স্থূল। খাসিয়া জাতীয় লোকেরা মনে করে যে, মুরগীর ডিম ভাঙ্গিয়া দেবতাকে দিলেই তিনি প্রসন্ন হইবেন। কেহ কেহ মনে করে, কঠোরতপস্যা দ্বারা দেবতা প্রসন্ন হইবেন। সকলের এই একই উদ্দেশ্য যে, সেই পুরুষ যাহা চাহেন, তাঁহাকে তাহা দিতে হইবে, তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইতে হইবে, ইহাই ধর্ম্ম।

চতুর্থতঃ—আধ্যাত্মিকতত্ত্ব যুগে যুগে সকল জাতিতেই অভিব্যক্ত (Revealed) হইয়াছে, এবং নানা গ্রন্থেও সেই অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন জাতিতে কোনও সত্য অধিক পরিমাণে প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং কোনও জাতিতে বা অল্প ফুটিয়াছে। যেমন মানবচরিত্রের গুণাবলী ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রস্ফুটিত, সেইরূপ ধর্ম্মজীবনেও ভিন্ন ভিন্ন গুণ ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্ম্ম ধর্ম্মের এই তিনটী অঙ্গ। এই আধ্যাত্মিকতত্ত্ব সকল জাতিতেই অল্পাধিক পরিমাণে অভিব্যক্ত হইয়াছে। হিমালয় হইতে কুমারিকাপর্য্যন্তবিস্তৃত ভারতবর্ষ নামক স্থানে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কেবল মাত্র তাঁহাদের মধ্যেই ঈশ্বর সত্য ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহা নহে। বাহিরের বাণিজ্য যখন ছিল না, লোক ভিন্ন দেশে যায় নাই, তখন লোকে মনে করিত "আমাদের দেশে যেরূপ পাট হয় এরূপ আর কোথায়ও নাই। কিন্তু এখন লোকে বলে "ভাল পাট ত আমাদের দেশ ছাড়া অন্য দেশেও আছে।" পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করিতেন যে, "আমাদিগের ধর্ম্মের ন্যায় আর ধর্ম্ম জগতে নাই।" কিন্তু এখন চিন্তাশীল লোকেরা বিশ্বাস করেন যে, "সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সত্যই ঈশ্বর-প্রেরিত, সেই ইন্দ্রিয়াতীত পরমসত্য হইতেই সকল প্রকাশিত।" এই আধ্যাত্মিক সত্যের

অভিব্যক্তি সকল দেশেই ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ফুটিয়াছে। কোনও সভ্য অভিব্যক্ত হয় নাই, এমন দেশ কোথায় আছে? আবার ইহাও সত্য যে, আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব সমূহ অপূর্ণ মানবভাষায় বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং তাহাতে অনেক ভ্রম প্রমাদও বিদ্যমান রহিয়াছে। সকল ধর্ম্ম গ্রন্থেই যেমন ঈশ্বর-প্রকাশিত-সত্য রহিয়াছে তেমন তাহার সঙ্গে জাতিগত ভ্রমও মিলিত আছে।

ইহা হইতে আমরা এক মূল সত্যে উপনীত হই। প্রথম ধর্ম্মের ভিত্তি মানব সাধারণের প্রকৃতিতে, অতএব ধর্ম্মের ভিত্তি সার্ব্বভৌমিক। দ্বিতীয়তঃ—ধর্ম্মের মূল সত্য সার্ব্বভৌমিক। প্রথম অস্থি-সংস্থান, তৎপর রক্ত মাংস গঠন হইয়াছে। তৃতীয়তঃ—ধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা এবং অভিব্যক্তি সার্ব্বভৌমিক। এই সার্ব্বভৌমিক অস্থিসংস্থানের উপর বিশেষ বিশেষ জাতি এবং ধর্ম্ম বিশেষ বিশেষ অঙ্গ গঠন করিয়াছেন।

অনুধাবন করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, মানবজাতি একটী বৃহৎ পরিবার, ঈশ্বর পিতা, পৃথিবী বাসস্থান এবং সকলে ভাই ভগিনী। সমগ্র মানব-জাতি ধর্ম্মের প্রশস্ত ক্ষেত্র। যখন দেখিতে পাই যে, ঈশ্বর সকলের পিতা, পৃথিবী বাসস্থান এবং জগতের সাধু ব্যক্তিগণ জ্যেষ্ঠসহোদর, তখন মনে কি মহৎ উদার বিশ্বজনীন ভাবের উদয় হয়! এই সংসাররূপ রঙ্গভূমিতে আমরা এক এক জন নট, অধিকারী পশ্চাতে রহিয়াছেন। তাঁহার বেহালার সহিত সুর মিলাইয়া জগতের সাধুরা গান করিতেছেন।

বৈষ্ণবকবি মানবের ধর্ম্মভাবকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন;—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। এই সকল ভাব কি আশ্চর্য্য রূপে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে! মহাত্মা বুদ্ধের শান্তভাব, মহম্মদের দাস্য ভাব, যীশুর বাৎসল্য ভাব, হাফেজের সখ্য ভাব এবং চৈতন্যের মাধুর্য্য ভাব। এক একজন সাধু এক এক ভাবের অবতার ছিলেন। এই সকল চরিত্র আলোচনা করিয়া আমাদিগের মনে কি মহৎ উদার ভাবের উদয় হইতেছে।

সৌভাগ্যবশতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণার গুণে যে মহৎ ভাব আমাদিগের অন্তরে আসিতেছে, তাহা যদি কেবলমাত্র ভাবেতেই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে মানবের হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইবে না। যে চিন্তা কেবলমাত্র মানবের মনেই রহিয়াছে, সে চিন্তা জনসমাজের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সমর্থ হইবে না। কোনও নূতন ভাব আসিলে তাহার মূর্ত্তি গ্রহণ করা চাই। অর্থাৎ কতকগুলি জীবন্ত লোকের মধ্যে সে ভাব বদ্ধমূল হওয়া চাই এবং সেই ভাবের সাধন হওয়া আবশ্যক। এস্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি,—আমাদের দেশে দুইটী সত্য আবির্ভূত হইয়াছে। প্রথম—বৌদ্ধধর্ম্মের বাসনাবিনাশ, দ্বিতীয়—অদ্বৈতবাদ। বাসনা বিনাশের ভাব এই যে, সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে হইবে। অদ্বৈতবাদের মর্ম্ম এই, "কেবা কার কারে বলরে আপন।" বুদ্ধের বাসনাবিনাশ সম্বন্ধে যে উপদেশ, তাহা কেবল তাঁহার চিন্তার ভিতরেই ছিল না; কিন্তু সকল শিষ্যকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন। এইরূপে ইহার শক্তি বাড়িল মানবের চিন্তাকে ফিরাইল। এইরূপ অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধেও দেখা যায় যে, শঙ্করাচার্য্যের পরে পরমহংস দল এই মত প্রচার করিতেছেন। ডারুইনের ক্রমবিকাশের মত অনেকের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। এইরূপ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মভাব যদি কেবল কল্পনাতেই থাকে, তবে মানবসমাজের চিন্তাকে পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না। অতএব ইহা সাধন করিবার জন্য সাধক দল চাই, গুরু পরম্পরা চাই, অন্যথা ইহার শক্তির বিকাশ হইবে না।

বর্ত্তমান সময়ে এই সার্ব্বভৌমিক ভাবের ক্ষেত্র ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজ বলেন,—"জগতের পশ্চাৎ এক সত্তা বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহা হইতেই জীবন উৎপন্ন।" এই ভাবের উপরই ব্রাহ্মসমাজ দণ্ডায়মান। এই ভাব সাধন করিলেই শক্তি জাগিবে। একবার মান্দ্রাজে দেখিয়াছিলাম যে, একটী "কৃষিকলেজ" রহিয়াছে, তাহাতে ছাত্রদিগকে বিদেশীয় কৃষিপ্রণালী হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। এইরূপ করিবার কারণ এই যে, কেবলমাত্র উপদেশে পরিষ্কার জ্ঞানলাভ হয় না। সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মভাব যে জগতে প্রকাশ হইতেছে, কাজ করিবার যদি ক্ষেত্র না থাকে, তাহা হইলে ইহা মানবচিত্ত অধিকার করিতে পারিবে না। ব্রাহ্মসমাজই সেই ক্ষেত্র।

খৃষ্টধর্ম্ম জগতে জয়ী হইবার কারণ কি? যীশু নিজের চিন্তার ভিতরে উপদেশের জ্বলন্ত ছবি দেখাইয়াছিলেন। সত্যকে প্রাণ দিয়া না ধরিলে তাহার শক্তি হয় না। প্রেমের বলে সত্যের বল, অতএব ইহা সাধনের জন্য ক্ষেত্র চাই। ব্রাহ্মসমাজ সেই ক্ষেত্র। তাই বলিয়া মনে করিতে হইবে না যে, ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী সকল সমাজই আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় হইবে। ভারতে হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়াছে অতএব হিন্দুর রক্ত ইহার দেহে না লাগিয়া পারে না। ইউরোপ কিম্বা আরব দেশে যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম যায়, সেখানকার রক্ত গায়ে লাগিবেই লাগিবে। ইংলণ্ডে ভয়সী সাহেবের সম্প্রদায় কি ব্রাহ্ম নন? তাঁহারাও আমাদিগের ন্যায় সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের উপাসক। তাঁহাদিগের ভাবের অঙ্গ খৃষ্টীয়ান রক্ত দ্বারা গঠিত, কাজেই আমাদিগের সহিত কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। ব্যক্তিগত বিভিন্নতা থাকিলেও জগতে এই শক্তি অভ্যুদিত হইবে, জগতে উহা ব্যক্ত হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে কোন কোনও বিজ্ঞ লোক মনে করেন যে, অভ্রান্ত গুরু না হইলে ধর্ম্মসমাজ স্থাপিত হইতে পারে না। আবার কোন কোনও বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল লোকের মুখে ইহা শুনিয়াছি যে, সার্ব্বভৌমিকভাব গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মসমাজ গঠন করিতে পারা যায় না। ইংলণ্ডে একজন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী প্রতি রবিবারে যীশুর নাম পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু তথাচ তিনি

ভিন্ন ধর্ম্মসমাজ গঠন করেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন যে,—"আমার বিশ্বাস যে, এই সার্ব্বভৌমিকভাব লইয়া ধর্ম্ম সমাজ গঠন হইবে না।" এইরূপ কোনও সময়ে জগতের লোক ইহা বলিত যে, রাজার শক্তি ছাড়িয়া, রাজাতন্ত্র ছাড়িয়া, রাজ্য থাকিতে পারে না। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণেরা বলেন যে "বর্ণভেদ পরিত্যাগ করিলে জনসমাজ থাকিতে পারে না।" এখন দেখিতে পাই, প্রজাতন্ত্র প্রবল হইয়াও রাজ্য চলিতেছে, জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া দিয়াও সমাজ চলিতেছে, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অতি সুন্দর রূপেই চলিতেছে।

যাঁহারা রাজতন্ত্রে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বলা স্বাভাবিক যে, রাজাকে বাদ দিলে রাজ্য থাকিবে না। অভ্রান্তশাস্ত্র বিশ্বাসকারীরা এবং গুরুবাদিগণেরও এই বিশ্বাস স্বাভাবিক যে, গুরু ও অভ্রান্ত শাস্ত্র ভিন্ন কি করিয়া ধর্ম্ম থাকিবে? মানবের প্রকৃতির উপরেই ধর্ম্মের ভিত্তি। অদ্য যাহা লোকে বিশ্বাসকরে, কল্য তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া মানবের বিশ্বাসের শিথিলতা হইবে না।

লক্ষ্যের স্থিরতা, উদ্দেশ্যের একতা এবং সাধনের দৃঢ়তা এই তিনটী গুণ ছাড়া ধর্ম্মসংস্কার, সমাজসংস্কার কিম্বা রাজনৈতিক সংস্কার হইতে পারে না। ব্রাহ্ম মাত্রকেই এই কথা মনে রাখিতে হইবে। যদি এই উদার ধর্ম্মাবলম্বী সমাজকে রক্ষা করিতে চাও, দশজনে মিলিয়া ঠিক কর, কি করিতে হইবে, চিত্তকে চঞ্চল হইতে দিও না, লক্ষ্যকে দৃঢ় রাখ; ঈশ্বরের মহিমা অপেক্ষা নিজের মহিমা যদি অনুসন্ধান করিয়া বেড়াও, নিজের মাথা যদি বড় করিতে চাও; কিছুই হইবে না। যতক্ষণ না বিমল হৃদয়ে সত্যকে চাও, ততক্ষণ উদ্দেশ্যের একতা হইবে না। প্রত্যেকে চাও কি যে, পৌত্তলিকতা এবং সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার দেশ হইতে দূর হইয়া যায়? একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের আরাধনা চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়? তোমরা চাও কি, মানবসমাজে ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হয়, নরনারীর দুঃখ দুর্দ্দশা দূর হয়, জগতের পরিবর্ত্তন হয়? যদি তাহাই চাও, তবে অগ্রসর হও। নিজের মাথা বড় করিবার ইচ্ছা রাখিও না, তাহা হইলে এই ধর্ম্মে তোমার অধিকার নাই, তুমি এই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুপযুক্ত, ঈশ্বরের অনুপযুক্ত এবং মহৎ বিষয়ে হাত দিবার অনুপযুক্ত। উদ্দেশ্যে এক হও, সাধনে দৃঢ় হও, বৎসরের পর বৎসর যাউক নিরাশ হইও না। অদ্য একটুক দুর্ব্বলতা আসিল, মতের পার্থক্য হইল; কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইও না, দৃঢ়ভাবে সাধন কর। সত্য ধর্ম্মের সাধন কর। এই মহৎ উদার এবং সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ঈশ্বর জগতে আনয়ন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। এই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম আমরা পাইয়াছি, তিনি করুণা করুন, আমরা যেন আমাদিগের দায়িত্ব অনুভব করিতে সক্ষম হই এবং তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি এবং তাঁহার কৃপার প্রার্থী হই।"

৯ই মাঘ মঙ্গলবার।

অদ্য মন্দিরে ব্রাহ্মিকাসমাজের উৎসব হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা করেন। তিনি যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। শ্রীমতী চঞ্চলা ঘোষ ও শ্রীমতী হেমলতা সরকার অপরাহ্নে প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীমতী অবলা বসু মৌখিক কিছু বলেন। অপর দিকে ব্রাহ্মগণ ১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে সমবেত হইয়া প্রাতে উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি সমবেত প্রার্থনার পরে নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ দেন;—"বন্ধুগণ, অনেক উপদেশ শ্রবণ করা হইয়াছে, কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখিলাম, উপদেশে বিশেষ ফলোদয় হয় না। আমরা অনেকেই উপদেশের অনুসরণ করি না। আমাদের প্রাণের ভিতরে গুরুরূপে, আচার্য্য রূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নিয়ত সেই মহান পরমেশ্বর যে সকল উপদেশ দিতেছেন, তাহা আমরা কয়জনে পালন করিয়া থাকি? তাহা যদি পালন করিতে পারিতাম, তবে কোনই অভাব থাকিত না। অতএব আসুন, আমরা সকলে মিলিত হইয়া সেই বিশ্বপতি পরম গুরুর মহোপদেশ সকল প্রাণপণে পালন করিতে আরম্ভ করি। সেই উপদেশের ন্যায় জগতে আর কোনও উপদেশই নাই। আমরা ব্যাকুল অন্তরে যদি প্রার্থনা করি, আত্মচিন্তা করি, তবেই তিনি আমাদিগকে ধর্ম্ম-পথ দেখাইয়া দিবেন। এমন উপদেষ্টা আর আমরা কোথায় পাইব? তাঁহার উপদেশের ন্যায় এমন উপদেশ আর কোথায় শুনিব?

অপরাহ্ণ ৩½ ঘটিকার সময় ব্রাহ্মসম্মিলনীর অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আমাদের ময়মনসিংহের ব্রাহ্মভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত বসুর হরিনাম সম্বন্ধীয় একখানি সুদীর্ঘ পত্র সভাতে পঠিত হয়। তৎপর উক্ত সম্বন্ধে কেহ কেহ স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিলে সভা ভঙ্গ হয়। সন্ধ্যা ৬½ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়।

১০ই মাঘ বুধবার।

অদ্য প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বেদী গ্রহণ করিয়া উপাসনা করেন। তিনি নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করেন,—

"মহাত্মা যীশু যখন ধর্ম্ম প্রচারে রত ছিলেন, তখন তাঁহার অবস্থা ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় হইয়াছিল। কখন কোথায় থাকিতেন, কি খাইতেন, কি বলিতেন, কিছুই ঠিক ছিল না। একদিন পদব্রজে কোনও প্রদেশে প্রায় ৩০।৪০ ক্রোশ যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে বেলা দুই প্রহরের সময় পথশ্রান্ত হইয়া একটী কূপের সন্নিকটে উপবিষ্ট হইলেন। এমন সময় একজন স্ত্রীলোক সেই কূপ হইতে জল লইবার জন্য উপস্থিত হইল। যীশু শ্রান্ত কলেবর, পিপাসায় তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; কিন্তু

তথাপি তাঁহার নিজের দুঃখ ভুলিয়া সেই স্ত্রীলোকটীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তুমি যে জল লইতে আসিয়াছ, তাহা পান করিলে পুনরায় তৃষ্ণা পায়; কিন্তু আমার নিকট এরূপ জল আছে যে, পিপাসিত প্রাণ হইয়া তাহা পান করিলে আর তৃষ্ণা পায় না। যীশুর কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী অবাক্ হইয়া গেল। কথা প্রসঙ্গে ঈশ্বরের কথা উঠিলে সেই স্ত্রীলোকটি যীশুকে বলিলেন "Our fathers worshipped in the mount but you say that Jerusalem is the place where we ought to worship God." অর্থাৎ আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পর্ব্বতের উপরে উপাসনা করিতেন; কিন্তু আপনি বলিতেছেন, জেরুজেলম নগরে ঈশ্বরোপসনা করা কর্ত্তব্য। যীশু তদুত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার তৎপর্য্য এই, "ভদ্রে! আমার কথা প্রত্যয় কর। পরমেশ্বর চিন্ময় পরমাত্মা, তাঁহার উপাসনার কোনও স্থান, কাল নাই। যেখানে ইচ্ছা হয়, উপাসনা কর।" যীশুর এই কথার মধ্যে ব্রহ্মপূজার যথার্থ তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। পর্ব্বতবাসিগণ জড়কে দেবতা বলিয়া পূজা করিত, তাহা অতি নিকৃষ্ট পূজা। অপর দিকে য়িহুদীরা জেরুসালেমের দেবমন্দিরে উপাসনা করে, আরাধনা করে, ইহাও প্রকৃত পূজা নহে। এই জন্য যীশু বলিয়াছিলেন যে "এই দেব মন্দিরে ঈশ্বরের পূজা আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না।" তবে কেমন করিয়া এবং কোথায় তাঁহার উপাসনা হইবে? ইহার উত্তরে যীশু বলিয়াছিলেন,—"ঈশ্বর প্রাণস্বরূপ, তাঁহাকে কেবল সত্যভাবে উপাসনা করিতে হইবে, দেশ কালের বিচার নাই।" কথিত আছে, যীশুর এই কথায় স্ত্রীলোকটী দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া নগরবাসীদিগকে বলিতে লাগিল যে "এক মহাপুরুষ আসিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরের আশ্চর্য্য তত্ত্বসকল প্রকাশ করিতেছেন।"

এই আখ্যায়িকাতে চিন্তা এবং আলোচনা করিবার বিশেষ কথা আছে। প্রথমতঃ ঈশ্বরকে "জানিয়া পূজা করা।" দ্বিতীয়তঃ "ঈশ্বরকে প্রাণ যোগে সত্য ভাবে উপাসনা করা।" তৃতীয়তঃ—"ঈশ্বর তাঁহার প্রকৃত উপাসককে অন্বেষণ করেন।" না জানিয়া অনেকে ঈশ্বরের পূজা করে, তাহা সত্য পূজা নহে। এই জগতের পালনকর্ত্তা পরমেশ্বরের পূজা জগতের সর্ব্বত্রই হইতেছে, অনেকেই তাঁহাকে না জানিয়া পূজা করিতেছে। কেহ বা জড়ের পূজা করিতেছে, কেহ বা চন্দ্রকে, সূর্য্যকে কেহ বা পঞ্চভূতের পূজা করিতেছে। বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদিকেও কত লোক দেবতা ভাবিয়া পূজা করিয়া থাকে। সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর সৃষ্টির অতীত, তিনি কোন সৃষ্টবস্তু হইতে পারেন না, এই জ্ঞান না থাকায় মানুষ ঈশ্বরের প্রতি, 'তিনি মরেন, বাঁচেন, রোগগ্রস্ত হন,' প্রভৃতি মানবীয় ভাব আরোপ করিয়া থাকে।

এই পূজাতে জীবের যে কিছু উপকার হয় না, তাহা কে বলিতে পারেন? গীতায় আছে,—"ঐরূপ সাধকেরা দেবলোক, স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহারা আমাকে পায় না।" অর্থাৎ তাহারা সত্যস্বরূপ ঈশ্বর হইতে বঞ্চিত হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাম্যানুযায়ী ফল লাভ করে; কিন্তু যে পরমবস্তু লাভ করিবার জন্য মানবের জন্ম, সত্য ভাবে ঈশ্বর পূজা না করিলে তাহা লাভ হয় না। উপনিষদে আছে:—"এই অমর পুরুষকে না জানিলে কেহ নবজীবন লাভ করিতে পারে না।"

পৌরাণিকভাবে এবং প্রতিমাতে মানুষ প্রকৃত ভাবে ঈশ্বরের পূজা করিতে পারে না এবং তাঁহার জন্য প্রার্থী হইতে পারে না। অধিকাংশ স্থলেই "ধনং দেহি, যশো দেহি" প্রভৃতি কোনও কাম্যবস্তুর জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকে। কেবল মাত্র ঈশ্বর লাভের জন্য যে পূজা, তাহাই প্রকৃত পূজা। প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান না হইলে, সেইরূপ ভাবে ঈশ্বরের পূজা করিতে পারে না। 'পরম জ্ঞান লাভ' করিলেই নিকৃষ্টকে ছাড়িয়া প্রকৃষ্টকে ধরিতে পারে। বেদব্যাস পুরাণ রচনা করিয়া ঈশ্বরের নিকট এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে,—"হে ভগবন! অজ্ঞতা ও চঞ্চলতা প্রযুক্ত তোমার আকার কল্পনা করিয়া যে দোষ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর।" ঈশ্বরকে না জানিয়া যে পূজা করে, জ্ঞানোদয় হইলে সে সন্তপ্ত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ—ঈশ্বরকে জানিয়া পূজা করা। ইহা কি সম্ভব, অগম্য অপার যিনি, তাঁহাকে মানুষ জানিতে পারিবে? বস্তুতঃ তাঁহাকে জানার অর্থ এই নহে যে, তাঁহার বিষয়ে সকলই জানিবে। কিন্তু "তিনি অনন্ত" এই বলিলেও তাঁহার সম্বন্ধে কিছু জানা হইয়াছে বলিতে হইবে, অন্যথা কি করিয়া বলিবে যে, তিনি অনন্ত? তাঁহার জ্ঞান, প্রেম, প্রভৃতি স্বরূপের যে ছায়া মানুষের অন্তরে তিনি দিয়াছেন, মানুষ তাঁহারই পূজা করিয়া থাকে।

আমরা দেখিতে পাই যে, যে তাঁহাকে অন্বেষণ করে, সেই তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হয়। প্রাচীন ঋষিদিগের অনেকেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বহু তপস্যার পরে জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া তাঁহারা কেমন সুন্দর সুন্দর কথা বলিয়া গিয়াছেন। মধ্যযুগে ঈশা, মহম্মদ, নানক প্রভৃতি সাধু ভক্তগণও ঈশ্বরকে লাভ করিয়া কত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদিগের পূজ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ অভিজ্ঞতার কথা এই বলিয়াছেন—"এই অন্তর্যামী অমৃত পুরুষই সকলের উপাস্য, অন্তরে আত্মাদ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করা যায়, এই আত্মজ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। আমাদিগের আত্মাতে ঈশ্বরের মন্দির আছে, তথায় তিনি বিরাজ করিয়া থাকেন।

অনেকের ইচ্ছা যে, ঈশ্বরকে চক্ষে দেখিবে। কিন্তু ইহা বৃথা চেষ্টা। ঈশ্বর ইন্দ্রিয়গোচর নহেন, ইন্দ্রিয়গোচর সমুদায় বস্তুই বিনাশশীল। যিনি চিরসত্য, অবিনাশী, তাঁহাকে বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিবার চেষ্টা বৃথা।

তৃতীয়তঃ—"God is a spirit and you must &c &c. আমাদিগের প্রাচীন উপনিষদকার ব্রহ্মবাদী ঋষির সঙ্গে যীশুর কেমন ঐক্যভাব! সত্য দুই ভাবের হয় না, সত্য প্রকাশিত হইলে সকলেই এক হইয়া যায়। জেরুসালেমের ঋষি যাহা বলিয়াছেন, আমাদিগের ঋষিরাও তাহাই বলিয়াছেন। ঈশ্বর জড় পদার্থ নহেন, তাঁহার প্রতিমা হইতে পারে

না। অনন্ত, অব্যক্ত যিনি, তাঁহার তুলনা কোথায়? তাঁহাতেই তাঁহার তুলনা, তাঁহা ছাড়া সকলই অনিত্য। বাহ্য উপকরণে ঈশ্বরের পূজা হয় না; যাহার যেরূপ ভক্তি, সেই অনুসারে সে ফল পাইবে। ইন্দ্রিয় যজ্ঞ করিল, ঈশ্বরকে পাইল না, বাক্যসমূহ আড়ম্বর করিয়া যজ্ঞ করিল, ঈশ্বরকে পাইল না, সর্ব্বশেষে প্রাণের যজ্ঞে ঈশ্বর প্রকাশিত হইলেন। এই যে প্রাণযোগে ঈশ্বর উপাসনা, ইহাই প্রকৃত উপাসনা। এই উপাসনাতে হৃদয়ই আসন, বাহ্য আসনের প্রয়োজন নাই। নিজ হৃদয়কে পরিষ্কার করিয়া সেই পবিত্রস্বরূপকে বসাইতে হইবে, এখানে দীপ 'আত্মজ্ঞান', পুষ্পাঞ্জলী "ভক্তি, প্রেম, শ্রদ্ধা।" বলিদান কোন বাহ্য পদার্থ নহে, কিন্তু অন্তরের "কুবাসনা।" নৈবেদ্য "আত্মসমর্পণ;" আত্মাকে ইষ্টদেবের চরণে দিতে হইবে। এইরূপ প্রাণযোগে ঈশ্বরের পূজাই প্রকৃত পূজা। তিনি বাক্যের আড়ম্বর চাহেন না, প্রাণের অনুরাগ এবং চক্ষের জল চাহেন। তিনি এই বিশ্বের প্রাণ হইয়া রহিয়াছেন, তিনি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছেন। জেরুসালেমে, পর্ব্বতে, তীর্থে, সর্ব্বত্রই তাঁহার পূজা হয়। যদি এই প্রাণযোগে তাঁহাকে পূজা করা যায়, তবে সর্ব্বত্রই পূজা হয়। কাম্যবস্তু লাভের আশা বিবর্জ্জিত হইয়া, নিঃস্বার্থভাবে তাঁহাকে প্রেম করিলেই তাঁহার প্রকৃত পূজা হয়।

ঈশ্বর সর্ব্বদাই অপরকে তাঁহার প্রেমের অংশী করিতে চাহেন। মানবকে প্রেমের পাত্র করিয়া প্রেম বিনিময় করিতেই যেন ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার এই সংকল্প কোথায় সিদ্ধ হইবে? জড় জগৎ তাঁহাকে জানেনা, উদ্ভিদজগত অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে, কত কোটি কোটি নিকৃষ্ট জীব রহিয়াছে, তাহারা কি তাঁহাকে প্রেম করিবার অধিকারী? কেবল মাত্র মানব আত্মাই এই পরম পিতাকে লাভ করিয়াছেন। মানবাত্মা তাঁহাকে জানিয়া পূজা করিবে, তাহা হইলেই তাঁহার সংকল্প পূর্ণ হইবে। তাঁহার ইচ্ছা মানবপ্রাণ তাঁহাকে জানিবে, পরমধন বলিয়া বুঝিবে, প্রেমেতে এবং সত্য ভাবে মিলিবে। এই বিশাল আশা করিয়া তিনি বসিয়া রহিয়াছেন। "দুই পক্ষী এক বৃক্ষে, উভয়ে উভয়ের সখা হইয়া প্রেম সম্ভোগ করে, প্রেম পায় এবং প্রেম দেয়, প্রেম বিনিময় করে।" মানবপ্রাণ তাঁহার প্রেমেতে মগ্ন হইয়া তাঁহাতেই বাস করিবে, তাঁহাতেই ক্রীড়া করিবে এবং আনন্দ উপভোগ করিবে। ঈশ্বরের কৃপায় আমাদিগের কি সেই সৌভাগ্য হইবে যে, তাঁহাকে সত্য স্বরূপ দেবতা বলিয়া আমরা লাভ করিব? তাঁহার প্রকৃত পূজার জন্য এই মন্দিরে সমবেত হইয়াছি। কত সাধক পাইয়াছি; কিন্তু প্রকৃত ভাবে তাঁহার পূজা যদি করিতে না পারি, তবে সকলই নিষ্ফল। আমরা তাঁহার সঙ্গে এক প্রাণে মিলিত হইব, এই প্রতিজ্ঞা লইয়া উপাসনায় প্রবেশ করি এবং যাহাতে তাহা পালন করিতে পারি, তজ্জন্য সকলে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার করুণা ভিক্ষা করি, ঈশ্বর আমাদিগের সহায় হউন।

অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় গোলদিঘির ধারে সকলে সমবেত হইলে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যাকুল প্রার্থনা করেন। প্রার্থনায় ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইল, অনেক নিদ্রিতপ্রাণ জাগ্রত হইল। প্রার্থনার প্রত্যেক কথায় এক আশ্চর্য্য শক্তি প্রকাশিত হইল। পরে নিম্নলিখিত নূতনরচিত সংকীর্ত্তনটী গাহিতে গাহিতে কীর্ত্তনদল কলেজ স্কোয়ার, হারিসনরোড্ ও অপারসারকিউলাররোড্ এবং সুকিয়াষ্ট্রীট হইয়া মন্দিরে প্রত্যাগত হন।

রূপক।

'যদি চাহ এ ভবে রে ভাই পরিত্রাণ, (নগরবাসি রে)
সঁপ সঁপরে ব্রহ্মপদে মন প্রাণ।
(হ'য়ে) দীনের দীন, তৃণেরো হীন,
হও রে তাঁর কৃপার অধীন, (নগরবাসি রে)
পাবে পাবেরে হৃদয়মাঝে স্বর্গধাম

খয়রা।

এস ত্বরা করি, অলস থেকোনারে (দূরে থেকোনা রে)
পিব পিবরে সুধা প্রাণভরি। (জনম সফল হবে)
আপনা দিলে, সেই ধন মিলে,
হৃদয়ে বহে প্রেম লহরী। (তাঁর পরশ পেলে)
সেই প্রেমের সরসে, ডুব ডুব রে হরষে,
পিব পিবরে সুধা নিজে পাশরি। (জ্বালা দূরে যাবে)

লোফা।

অপূর্ব্ব প্রেমের রীতি কে বাখানে তায়,
(তার তুলনা নাই রে,) (অতুলন প্রেম সে যে)
বলিতে রসনা হারে বলা নাহি যায়,
হৃদয়ে পশিলে সে প্রেম মৃতপ্রাণ জাগে; (প্রেমের এমনি গুণ রে)
পরশে হরষ কত সুধা-সম লাগে;
মরমে রাখিলে সে প্রেম, কুবাসনা হীন; (আর বাসনা থাকে না, প্রেমের পরশ পেলে)
নয়নে রাখিলে সে প্রেম দৃষ্টি হয় নবীন;
শ্রুতি যুগে রাখ সে প্রেম নাম গুণগানে,
মধুর আনন্দ রস উথলিবে প্রাণে;
রসনাতে রাখ সে প্রেম, নাম সংকীর্ত্তনে
ডুবিবে সে প্রেমামৃত রস আস্বাদনে;
সে প্রেম জানিও রে ভাই সর্ব্ব বস্তু সার, (তার তুলনা নাইরে অতুলন প্রেমমণি)
তার কাছে ধন মান সকলি অসার।

দশকুশী।

(মন) কেন রে সে প্রেম ফেলি, বিষয় কুহকে ভুলি,
(ও দিন যায় যায় রে)
নিজ হিত কর না বিচার (এ কি ভ্রান্ত মতি রে)
অসার সুখের আশে, ছুটিতেছ দশদিশে
(আশা মিটে না মিটে না)
আনিতেছ বহি দুঃখ ভার; (কিবা লাভ তায় রে,
সুখ তাহে মিলে না রে)

ভোগের বিষয় কত, ঢালিতেছে অবিরত
(আশা পুরে না পুরে না যত ঢাল বেড়ে যায়)
নিবেনা ত বাসনা আগুণ (কেবল জ্বলে উঠে রে)
নিজ হাতে নিজ আঁখি, ভাবিছ ঢাকিয়া রাখি,
তাহে জ্বালা বাড়িছে দ্বিগুণ; (জ্বালা নিভে না নিভে না)
এখনো সুমতি ধর, আপনারে পরিহর,
সে শ্রীপদে লহ রে শরণ! (নইলে গতি যে নাই রে)
তাঁহার প্রেম পরশে, ডুবি সে অমৃত রসে।
পাবে পাবে মরণে জীবন। (পাপী তরে যাবে রে,
পুণ্যময়ের পরশ পেয়ে)

একতলা।

আনন্দে হৃদয়ে আজি গাও ব্রহ্ম নাম রে,
গাও রে সকলে মিলে দিও না বিরাম রে।
নগর মাতায়ে গাও, সে মধুর নাম রে;
নামরসে প্রেমাবেশে দেখ স্বর্গধাম রে।
কৃপাময়ের কৃপা রে ভাই কারু নহে বাম রে,
নিবাব পাপের জ্বালা হব পূর্ণকাম রে।
ঐ দেখ ব্রহ্ম কৃপার উড়িছে নিশান রে,
কি ভয় কি ভয় সবে পাব পরিত্রাণ রে)
(সবে যাব স্বর্গধাম রে,) (আমরা হব পূর্ণকাম রে)

রূপক।

মিশ্র। পাপী ডাকে নাথ সকাতরে,
বিন্দু প্রেম দেও হে তারে; (প্রেমময় হে;)
সেই বিন্দু হয় সিন্ধু প্রায় (যাহে) বাঁচে প্রাণ।'

"হয়ে দীনের দীন, তৃণেরো হীন, হও রে তাঁর কৃপার অধীন" এই পদটী প্রমত্তভাবে গাহিতে গাহিতে কলেজ স্কোয়ারে সঞ্জীবনী কার্য্যালয়ের নিকট দিয়া যখন কীর্ত্তন দল যাইতেছিল, তখন এক অপূর্ব্ব ভাবের উচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়াছিল। "দীন না হইলে কেহ তাঁহার দ্বারে যাইতে পারে না," এই ভাবটী সকলের প্রাণে অতি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। এমন কি কাহার কাহারও বাহিরেও দৈন্যভাব প্রকাশিত হইয়াছিল।

সংকীর্ত্তনের তৃতীয় অন্তরাতে প্রেমমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। "অপূর্ব্ব প্রেমের রীতি কে বাখানে তায়, বলিতে রসনা হারে বলা নাহি যায়।" এই পদ আরম্ভ করিয়া পরিশেষে "সে প্রেম জানিওরে ভাই সর্ব্বরত্ন সার, তার কাছে ধন মান সকলি অসার।" এই পদটী গাহিতে গাহিতে গায়কগণ ভাবে বিভোর হইয়া গেলেন। প্রেমে স্বার্থ ও অভিমান আহুতি প্রদান না করিলে সেই পরমধন মিলে না, প্রেমই ধর্ম্মের আদ্যন্ত, প্রেম পথ ভিন্ন অন্য কোনও পথে অমৃত ধামে উপস্থিত হওয়া যায় না। সেই অপূর্ব্ব প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গায়কগণ, শ্রোতাগণ ধন্য হইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রেমমাহাত্ম্য শ্রবণ কীর্ত্তন, প্রেমসাধন, প্রেমরসাস্বাদনে মানব জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন প্রেম নিকেতনের দ্বার সকলের সম্মুখে উন্মুক্ত হইল। ভাই ভাই পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, পূর্ব্ব অপরাধের জন্য চরণে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। অভিমান, অহঙ্কার দূরে পলায়ন করিল। শুষ্ক মরুভূমিতে যেন স্বর্গের অমৃত-বারি বর্ষিত হইল। ধন্য প্রেমময় পরমেশ্বর, উৎসবে প্রেমান্ন বিতরণ করিবার জন্যই কি তিনি তাঁহার দুর্ব্বল দুঃখী সন্তানদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন!

কীর্ত্তনদল বিহ্বলচিত্তে কীর্ত্তন করিতে করিতে সড়ক পার্শ্বস্থিত স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের গৃহে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কিয়ৎক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের গৃহে উপস্থিত হইয়া কীর্ত্তন করেন। রাত্রি প্রায় ৭ ঘটিকার সময় কীর্ত্তনদল মন্দিরে উপস্থিত হইলে উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র উপাসনা করেন। তিনি নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করেন,—

"সাধু নানকের বিষয় আমরা অনেকেই অবগত আছি। নানকের অনেক শিষ্য ছিলেন। তাঁহার শিষ্যসংখ্যা যখন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল তখন কোনও সাধু নানককে বলিলেন,—"তোমার অনেক শিষ্য আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকৃত বিশ্বাসী কয়জন? তাহারা প্রকৃত বিশ্বাসী ভক্ত কিনা পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, অন্যথা তুমি ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক আনয়ন করিবে। এরূপ অনেক শিষ্য আছে, যাহারা তোমার ধর্ম্মের কথা কিছুই অবগত নহে।" নানক যেখানেই যাইতেন, তাঁহার শিষ্যেরা সঙ্গে যাইত। তাহাদিগকে কিছুই কাজ করিতে হইত না, বিনা পরিশ্রমে আহারাদি করিয়া সুখে দিন কাটাইত। একদিন নানক শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—"যাহারা আমার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিবে, অদ্য হইতে তাহারা আর এরূপে থাকিতে পারিবে না, নিয়ম মত পরিশ্রম করিয়া আহার সংগ্রহ করিতে হইবে। যে পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছুক, সে এক বেলা আহার করিতে পাইবে।" এই কথা শুনিয়া যাহারা কেবল মাত্র আহারের লোভে শিক্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা নানককে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। অন্য একদিন নানক পুনরায় শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—"অদ্য হইতে তোমাদিগকে কৃষিকাজ করিতে হইবে, সমস্ত দিন কাজ করিয়া যখন গৃহে ফিরিয়া আসিবে, তখন খাইতে পাইবে।" এই কথা শুনিয়া আরও অনেক শিষ্য নানককে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল অবশিষ্ট শিষ্যেরা কঠিন পরিশ্রম করিয়া অনেক শস্য উৎপাদন করিয়া সংগ্রহ করিল। নানক একদিন বলিলেন,—"শস্যাগার আগুন লাগাইয়া দগ্ধ করিয়া ফেল।" "এতদিন পরিশ্রম করিয়া শস্য সংগ্রহ করিলাম, তাহা আগুন দিয়া পোড়াইয়া ফেলিব!" এই বলিয়া অনেক শিষ্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। অবশিষ্ট যাহারা রহিল, তাহাদিগের প্রতি নানক দিন দিন কঠোর ব্যবহার করিতে লাগিলেন। আরও কতকগুলি শিষ্য চলিয়া গেল। অবশেষে নানক যেন পাগলের ন্যায় হইয়া গেলেন। একদিন শিষ্যদের পাথর ছুঁড়িয়া মারিলেন, এইরূপ অবস্থায় আরও শিষ্য তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

অবশিষ্ট অতি কম সংখ্যক শিষ্যকে লইয়া নানক একদিন বাহির হইলেন। কিয়দ্দূর গিয়া একটী শব দেখিতে পাইয়া

শিষ্যদিগকে বলিলেন—"এই শব তোমাদিগকে ভক্ষণ করিতে হইবে।" এই কথায় আরও কয়েক জন তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। অবশিষ্ট দুইজন শিষ্য বলিল—"প্রভো, আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই আমাদিগের পক্ষে মঙ্গলজনক, অতএব আমরা এই শব ভক্ষণ করিব।" এই বলিয়া তাহারা শব ভক্ষণে উদ্যত হইল। কিন্তু নানক তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন।

নানক যে উপায়ে নিজ শিষ্য বাছিয়া লইয়াছিলেন, ঈশ্বরও এই উপায়ে নিজের সুসন্তানদিগকে বাছিয়া লন। কত লোক কত ভাব, কত আকাঙ্ক্ষা লইয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে; কিন্তু ঈশ্বর যখন পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, তখন অনেকেই পশ্চাৎপদ হয়। ঈশ্বরের ধর্ম্মরাজ্যে এই এক রীতি দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি নিজ মধুর স্বরূপ জীবের নিকট প্রকাশ করিয়া জীবকে প্রলুব্ধ করিয়া থাকেন। যে পর্য্যন্ত মনের মধ্যে পাপ এবং ভোগবাসনা থাকে, সে পর্য্যন্ত এই রাজ্যে কেহ স্থান পায় না। কত সাধকের নিকট তিনি প্রকাশিত হইয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া পুনরায় লুক্কায়িত হইয়াছেন। আমাদিগের মধ্যেও কত লোককে তিনি তাঁহার প্রেমের রাজ্যের সুন্দর ছবি দেখাইয়া আকর্ষণ করিয়াছেন, পরে তিনি লুকাইয়াছেন; পৃথিবী অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, পাপ-ইচ্ছা মনে প্রবল হইয়া কুপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছে। তখন মনে হইয়াছে যে, "যাহা দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সকল বুঝি মরীচিকা; দূর হইতে যাহা সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছিলাম, সকল বুঝি মিথ্যা, প্রেমের কথা সকল বুঝি ভুল।" ধর্ম্মরাজ্যে যাঁহারা প্রবেশ করেন, সকলেরই জীবনে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। সময় সময় বড়ই দুঃখের দিন উপস্থিত হয়, আশার আলোক নিভিয়া গিয়া পাপের অন্ধকার গাঢ় হয়। এইরূপ অবস্থায় অনেকেই পুনর্বার অবিশ্বাসী হইয়া পড়ে।

আগামী কল্য ১১ই মাঘ, এইদিনে অনেক পাপী পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে, এই দিনে জগতের অধীশ্বর মানবের প্রাণে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। আজ তাহার পূর্ব্বদিন, আজ আমরা নিজেকে নিজে এই প্রশ্ন করি, "যে আশার কথা শুনিয়া আমরা এই ধর্ম্মরাজ্যে আসিয়াছিলাম, আমাদের অনেকে কি আশানুরূপ ফল দেখিতে না পাইয়া দূরে সরিয়া গিয়াছি?" যদি কেহ এরূপ থাকেন, তবে তাঁহাদিগকে বলি যে, তাঁহারা জানেন না যে, ঈশ্বরের রাজ্যের নিয়মই এই—"একপদ অগ্রসর এবং পরীক্ষা।" যে এই পরীক্ষায় ভীত হয়, সে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। এইরূপ দুঃখের দিন আসিলে কে এই বলিয়া থাকিতে পারে—"হাঁ পরিশ্রম করিতে হয়, কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, করিব; কিন্তু তবুও এই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না?" এইরূপ আমরাও যদি বলিতে পারি—"হে ঈশ্বর, তুমি তোমার এই ধর্ম্মে আনিয়াছ, এখন চারিদিক যদি অন্ধকার দেখি, তবু তোমাকে পরিত্যাগ করিব না; তোমাকে দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু তবুও তুমি আছ এই বিশ্বাস করিয়া পড়িয়া থাকিব। মানুষ এইরূপ অবিশ্বাস অন্ধকারে পতিত হইয়া যদি তাঁহাকে পরিত্যাগ না করিয়া কাতর প্রাণে ডাকিতে থাকে, তবে তিনি প্রাণে প্রকাশিত হইবেন।

পার্ব্বত্য প্রদেশে পাষাণের ন্যায় কঠিন ভূমি বৃষ্টির জল পড়িলেও যেমন কোমল এবং চাষের উপযুক্ত হয়, সেইরূপ আমাদিগের পাপ-মলিন এবং কঠোর প্রাণও অনুতাপের অশ্রুতে সিক্ত হইলে কোমল হয় ও তাহাতে পরব্রহ্মের নামের বীজ রোপণ করিলে সুন্দর অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। হে ঈশ্বরের রাজ্যের যাত্রীগণ এস তবে আমরা প্রাণের মলিনতা দূর করিয়া, অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া প্রাণকে ব্রহ্মবীজোৎপাদনের উপযুক্ত করি।

ধর্ম্মরাজ্যের যাত্রীদিগকে অনেক বাহ্যিককষ্ট পাইতে হয়। কিন্তু বাহ্যিকক্লেশ অপেক্ষা প্রাণের ক্লেশ অধিক। প্রাণে এক একটী পাপপ্রবৃত্তি প্রবল রহিয়াছে, যাহাকে বড়ই ভালবাসি, ঐ পাপ পরিত্যাগ করিতে ঈশ্বর বলিতেছেন, তাহা পরিত্যাগ না করিতে পারিলে, ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিব না। অতএব সকলে মিলিত হইয়া সেই সাধনে প্রবৃত্ত হই। এই জন্য জীবনে অনেক ক্লেশ পাইতে হইবে। ঈশ্বর প্রিয়রূপে আমাদের নিকটে প্রকাশিত হন, যখন তিনি অপ্রিয়রূপে প্রকাশিত হইবেন, তখন ঠিক থাকিতে পারিব না কি? ঈশ্বর জননী রূপে প্রকাশিত হন, আবার যখন রুদ্র-রূপে প্রকাশিত হইবেন, তখন কি স্থির থাকিতে পারিব না? ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে অনেক পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। যখন ঈশ্বরের স্পর্শ প্রাণে অনুভব করিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার মাধুর্য্য অনুভব করি, তখন নিশ্চয় জানি ঈশ্বর আছেন; কিন্তু আমার মলিন আত্মায় প্রকাশিত হইতেছেন না। "ঈশ্বর আছেন" এই বলিয়া ব্যাকুল প্রাণে ক্রন্দন করুন, তাঁহার করুণায় পাষাণ প্রাণ গলিবে, হৃদয় কোমল হইবে এবং ব্রহ্মনামের বীজ অঙ্কুরিত হইবে।

১১ই মাঘ বৃহস্পতিবার।

অদ্য ভারতের বিশেষ দিন। অদ্য মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জাতিভেদ প্রপীড়িত, পৌত্তলিক দেশে একমাত্র পরব্রহ্মের পূজা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই দিনে ব্রহ্মকৃপা বিশেষভাবে ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং ব্রাহ্মজীবনের সহিত এই পবিত্র দিবসের অতি ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ। ১১ই মাঘের নাম স্মরণ হইলেই ব্রাহ্মের প্রাণে আশা ও আনন্দের সঞ্চার হয়। যিনি সারা বৎসর আধ্যাত্মিক শুষ্কতার মধ্যে বাস করেন, তাঁহার কঠোর হৃদয়ও এই পবিত্র দিবসে ব্রহ্মকৃপার পবিত্র প্রেম বন্যাতে প্লাবিত হইয়া যায়। সারা বৎসর যাহার চক্ষু হইতে এক বিন্দু অনুতাপের অশ্রু পতিত হয় নাই, তিনিও এই দিবসে নিজের পাপ ও দুষ্কৃতি স্মরণ করিয়া ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকেন। পাপী, তাপী, অসাধু, উপাসনা বিহীনের হৃদয়েও ১১ই মাঘের উপাসনায় আশ্চর্য্য ঈশ্বরাবির্ভাব লক্ষিত হয়। সকলের হৃদয় যন্ত্রই এক সুরে বাজিয়া উঠে।

অদ্য সেই শুভ দিন উপস্থিত। উষার সুস্নিগ্ধ নবারুণের

সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মগণের প্রাণ ব্রহ্ম-প্রেমালোকে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। মৃত, অবসন্ন, শোকসন্তপ্ত প্রাণ নববেশে নবভাবে প্রবুদ্ধ হইতে লাগিল, সংসার, জড় জগৎ সকল বিস্মৃত হইয়া ব্রাহ্মসাধক অপার অনন্ত সচ্চিদানন্দময় রাজ্যে প্রবেশোন্মুখ হইলেন।

অদ্য রজনী ৩ ঘটিকা অতীত হইতে না হইতে দলে দলে সাধকগণ আসিয়া মন্দিরে উপবিষ্ট হইতে লাগিলেন। রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় মন্দির লোকসমাগমে পূর্ণ হইয়া গেল। বেদীর চতুর্দ্দিকে যাঁহারা বসিয়াছিলেন, তাঁহারা কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সকলের প্রাণে ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হইল। সূর্য্যোদয় হইলে, উপাসনার ঘণ্টাধ্বনি হইল। তখন দ্বিতলস্থ সংগীতস্থান হইতে অতি সুমধুর কণ্ঠে সংগীত হইতে লাগিল। ১১ই মাঘ সংগীত করিবার জন্য কয়েকটী মহিলা পূর্ব্ব হইতে বিশেষ-ভাবে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধুর কণ্ঠ নিঃসৃত ব্রহ্ম সংগীত শ্রবণে সাধকগণ বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। সংগীতের পরে আচার্য্য মাঘোৎসবের মহাপূজার প্রারম্ভের উপযোগী গম্ভীর ভাবসূচক উদ্বোধন আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্ম দর্শন-পিপাসু সাধকগণের প্রাণ একীভূত হইয়া আচার্য্যের ভাবের সহিত যোগদান করিল। চতুর্দ্দিকে সভাসাগরে যেন প্রেম তরঙ্গ উত্থিত হইল। যে স্বরে যে ভাবে অদ্যকার উপাসনা, উপদেশ হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে লেখা পাঠ করিয়া অনুমিত হয় না। নিম্নলিখিত মর্ম্মে উদ্বোধন হইয়াছিল,—

"মাঘোৎসবের মহা আরাধনাতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বরের সেবকদিগকে স্মরণ করি, স্বদেশে, বিদেশে, ইহকালে পরকালে, যিনি যেখানে আছেন, তাঁহার মহাউপাসকসভার সকলকে স্মরণ করি। তাঁহার জন্য ব্যাকুল প্রাণ যিনি যেখানে আছেন, তাঁহাদিগকে স্মরণ করি। তাঁহার প্রেমে নিজকে সমর্পণ করিয়া, তাঁহার প্রেমামৃত পান করিয়া যিনি যে সময়ে যে দেশে ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলকে স্মরণ করি। জগতের সাধু মহাত্মাদিগকে স্মরণ করি, তাঁহাদিগের চরণে প্রণত হই, আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া, শুভকামনা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার মহা পূজাতে প্রবৃত্ত হই।

মহোৎসবের সময়ে কোনও ভবনে যজ্ঞের আয়োজন হইলে, সেই ভবনে অতিথিদের বসিবার জন্য ঘর রাখিতে হয়, বিশ্রাম-সুখলাভ ও আলোচনাদি করিবার জন্য স্বতন্ত্রগৃহ রাখিতে হয়, নিমন্ত্রিতব্যক্তিদিগকে সেই গৃহে আদর পূর্ব্বক বসিতে দেওয়া হয়। আমাদের উৎসবেরও এইরূপ অনেক ঘর আছে। ঈশ্বরের ভবনে অনেক ঘর আছে। মহাত্মা যীশু বলিয়াছিলেন —"পিতার ভবনে অনেক ঘর।" কোথায়ও জ্ঞানীগণ জ্ঞানের গভীর সাগরে নিমগ্ন, কোনও ঘরে ভক্তেরা ভক্তিরসে ডুবিয়া রহিয়াছেন, কোনও ঘরে কর্ম্মিরা আনন্দিত চিত্তে বসিয়াছেন। এইরূপ অনেক ঘরে অনেকে বসিয়াছেন; এসো ভাইভগিনি, সকলের জন্যই ঘর রহিয়াছে কাহাকেও বিমুখ হইতে হইবে না। প্রভুর গৃহে জ্ঞানী, ভক্ত, কর্ম্মী সকলেই বসিয়া উৎসব সম্ভোগ করিতেছেন। যাও, যাহার যেখানে ইচ্ছা, উপবেশন কর।

কিরূপে আমরা এই উৎসবে প্রবৃত্ত হইব? আমরা কি ভয়ে ভয়ে প্রবৃত্ত হইব? ভিড়ের মধ্যে যাইবার কালে যেমন সতর্ক হই, পাছে পকেট হইতে কেহ কিছু চুরি করে, আমরা কি তেমনি সন্দেহাকুলচিত্তে যাইব? ভিড়ের মধ্যে গেলে, আমারা প্রায়ই এই জন্য সতর্ক হই যে, পাছে কিছু হারাই। কিন্তু বিশেষ বিশেষ স্থানে ভয় পাই না। কিছু লুকাইবার জন্য সেখানে যাই না, কিন্তু কিছু দিবার জন্য যাই। কোনও মেলা হইলে সেখানে যখন আমরা যাই, তখন স্বভাবতঃই আমরা চারিদিকে চাহিয়া দেখি—"ঐ যে, যাহাকে বড়ই ভাল বাসিতাম, সে আসিয়াছে কিনা?" কোনও স্থানে নিমন্ত্রণে গেলে মাতার যেমন পুত্রের কথা মনে হয়, সেইরূপ কোনও বিষয়ে কিম্বা কোনও স্থানে গিয়া বিশেষ আনন্দ সম্ভোগ করিলে ভালবাসার পাত্রদের কথা মনে পড়ে। আমাদের মধ্যে যিনি যাহাকে ভাল বাসেন, অদ্য কি তাহাদের কথা স্মরণ হইতেছে? যখন কোনও মেলাতে যাই, তখন ব্যয় করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকি, আজ আমরা কি এখানে ভয়ে ভয়ে বসিব? পাছে কোনও প্রিয় জিনিষ হারাইয়া ফেলি, পাছে ঈশ্বর হৃদয়টা, ধনমান সব লইয়া যান! অদ্য সে জন্য চিন্তা করিব না, অদ্য আনন্দের মেলা, সকলে দিবার জন্য আসিয়াছি। আজ আর পকেটের দিকে নজর রাখিব না। নিশ্চিন্ত মনে বসিব এবং ভাব বিতরণ করিব। এসো দুইজনে মিলিয়া, পাঁচজনে মিলিয়া বসি, প্রেম বিতরণ করি। দেখ, কেমন মহাজনেরা ঘরে ঘরে ঈশ্বর চরণে বসিয়া প্রেম বিতরণ করিতেছেন। দেখ, ঈশ্বর মন্দিরের কি আশ্চর্য্য শোভা! ভক্তবৃন্দ তাঁহার মন্দির পূর্ণ করিয়াছেন। দেশ কালের ভেদ নাই। কেহ ভারতে, কেহ জুডিয়ায় জন্ম গ্রহণ করিয়া সকল ভুলিয়া গিয়া প্রেমেতে ঈশ্বর চরণে এক হইয়াছেন।

অদ্য আমরাও উৎসবের দ্বারে হৃদয় খুলিয়া সকলে মিলিয়া প্রবেশ করিব। যেরূপ পূর্ব্ব দ্বার খুলিয়া অরুণ উদিত হইয়াছে, সেইরূপ ঈশ্বরও উৎসবের দ্বার খুলিয়া আমাদিগকে প্রবেশের জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছেন। আজ এসো সকলে, উৎসবের দ্বারে প্রবিষ্ট হও, সাধুসভায় প্রবিষ্ট হই। আজ তিনি নিশ্চয় দূরে নহেন। নিকটে, অতি নিকটে; "ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে;"—আজ কি তাঁহার হাত সকলের মাথায় পড়ে নাই? রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই যে এখানে তাঁহার পুত্র কন্যাগণ সম্মিলিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কি তিনি স্পর্শ করেন নাই? এ তাঁহারই উৎসব, তিনিই ইহার কর্ত্তা। সমস্ত দিন তাঁহাকে ডাক, তাঁহার নাম গান কর, তাঁহাকে প্রাণ দেও। হৃদয় যেন আজ আর নিস্তেজ, মলিন না থাকে। সমস্ত তাঁহার চরণে দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই, তিনি আমাদিগের সহায় হউন।"

আরাধনাও অতি গভীর হইয়াছিল। সচ্চিদানন্দময়, শিব সুন্দর পরমেশ্বর প্রাণে প্রকাশিত হইলেই প্রকৃত আরাধনা হয়। যে উপাসক তাঁহাকে দর্শন করেন না, তাঁহার প্রকৃত আরাধনা হয় না। অদ্য আর দ্বিভাব নাই, আচার্য্য উপাসক সকলের প্রাণেই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ প্রকাশিত।

আরাধনা কালে সেই প্রেমময়ের সুশীতল সংস্পর্শ প্রাণে পাইয়া অনেকেই আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। ঈশ্বরের পূর্ণ আবির্ভাব অনেকেই প্রাণে উপলব্ধি করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। আরাধনার পর ধ্যান, ধ্যানের পরে সহস্র কণ্ঠ হইতে সমবেত প্রার্থনা-ধ্বনি উত্থিত হইল। তৎপর সংগীত হইলে আচার্য্য প্রেমমাহাত্ম্য বিষয়ে নিম্নলিখিত সারগর্ভ উপদেশ জলন্ত ভাষায় বিবৃত করিলেন।

"আজ প্রেমের মহিমা বিবৃত করিব। শরীরে শরীরে যেরূপ সংস্পর্শ হয়, আত্মাতে আত্মাতেও সেইরূপ হইয়া থাকে। শরীরের সংস্পর্শ কিরূপ, তাহা আমরা সকলেই অনুভব করিয়াছি। পৃথিবীর পথে চলিতে চলিতে কত লোকের সঙ্গে সংস্পর্শ হয় তাহার কিছুই শক্তি নাই। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, যাঁহাকে ভাল বাসি, যাঁহার সহিত প্রীতির যোগ রহিয়াছে, তিনি যখন আমাদিগকে স্পর্শ করেন, কাঁধে হাত দেন, বাহু দ্বারা আবেষ্টন করেন, তখন তাহার যে আশ্চর্য্য শক্তি আমাদের উপর কার্য্য করে, তাহা আমরা বিলক্ষণ অনুভব করিয়া থাকি। যেখানে প্রীতির যোগ আছে, সেখানেই লোক সংস্পর্শ করিয়া থাকে। যখন শিশু শয্যায় শয়ন করিয়া খেলা করিতে থাকে, প্রস্ফুটিত নয়ন দ্বারা জননীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, জননী তাহাকে চুম্বন না করা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রাণ যেন তৃপ্ত হয় না। জননী শিশুকে বুকে ধরিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া কি স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন, তাহা অপরে কি বুঝিবে? এক মাত্র পিতা মাতাই তাহা অনুভব করিয়া থাকেন।

গতকল্য যখন কীর্ত্তনে বাহির হইয়াছিলাম, কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রাণে অপূর্ব্ব উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু গায়কগণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরস্পরকে বাহু দ্বারা বদ্ধ না করিলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেন প্রাণ তৃপ্তি লাভ করিল না। শরীরে শরীরে এইরূপ সংস্পর্শ আমরা অনেক দেখিয়াছি, ইহার মধ্যে বাস্তবিকই মধুরতা আছে। এইরূপ আত্মাতে আত্মাতেও সংস্পর্শ হইয়া থাকে এবং তাহাতেও প্রাণে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। উৎসবের প্রারম্ভে চারিদিক হইতে ব্যাকুল অবসন্ন আত্মা সম্মিলিত হইয়াছেন, সকলে আনন্দ উপলব্ধি করিতেছেন কি? কত জনে প্রাণে কত নিস্তেজভাব লইয়া আসিয়াছিলাম। উৎসবের সময় উপাসনা মন্দিরে কত সাধু ভক্তের সমাগম হইয়াছে, উৎসবে প্রবেশ মাত্র যেন প্রাণের মলিনতা দূর হইয়া গেল, প্রাণে কি এক অপূর্ব্ব ভাব আসিল, প্রাণ জাগিয়া উঠিল, হৃদয় কাঁদিল, কি আশ্চর্য্য সংস্পর্শ?

আমরা অনুভব করি নাই কি যে, ঈশ্বরের মন্দিরে আমরা অপ্রেমিক হইয়া আসিয়াছিলাম, হঠাৎ কোথা হইতে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইয়া হৃদয় ডুবিয়া গেল? এই সংস্পর্শ যখন প্রেমিক জনের প্রেমের সহিত সম্মিলিত হয়, তখনই অমৃত ফল প্রসূত হইয়া থাকে।

মানুষে মানুষে সংস্পর্শ হওয়ার ন্যায় ঈশ্বরের সহিতও প্রেমের সংস্পর্শ হইয়া থাকে। তাঁহার সংস্পর্শে আমাদের চৈতন্য হয়, আধ্যাত্মিক চক্ষু খুলিয়া যায়। সেই সংস্পর্শ কি কেহ প্রাণে অনুভব করেন নাই? আজ এই ব্রহ্মমন্দিরে এমন কেহ আছেন কি, যিনি বলিতে পারেন যে, এই বিশেষ দিনে ঈশ্বরের সংস্পর্শ প্রাণে অনুভব করেন নাই?

বড় বাড়ী প্রস্তুত করিলে বৈদ্যুতিক অগ্নি সঞ্চালিত করিয়া আনিবার জন্য বাড়ীর গায়ে লোহার শিক দেওয়া হয়। Benjamiue Frankiin রেশমের সূতায় ঘুড়ি উড়াইয়া বিদ্যুৎ আনিয়াছিলেন। এই যে প্রেমের সংস্পর্শ, যাহা হৃদয়ে অনুভব করিয়া থাকি, ইহা হৃদয়ের গুণ, ভাব ও চিন্তাশক্তিকে সঞ্চালিত করে। এই সঞ্চালনে এক হৃদয়ের ভাব অদ্ভুত উপায়ে অন্য হৃদয়ে সংক্রামিত হয়। যেখানে এই প্রেমের সংস্পর্শ নাই, সেখানে ভাব ও শক্তি বিনিময়ের উপায় নাই। আমি যদি তোমাকে প্রীতি না করি, কি করিয়া প্রেমের শক্তি আসিবে? যেখানে প্রেম, সেখানেই কথায় কাজ করিয়া থাকে। আমার প্রতি যদি তোমার প্রেম থাকে, তবে আমার কথার শক্তি তোমার উপরে নিশ্চয়ই কাজ করিবে।

মহম্মদের জীবনচরিত পাঠ করিলে দেখিতে পাই যে, মিশরের রাজা মহম্মদকে উপঢৌকন দিবার জন্য তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। মহম্মদ মক্কা জয় করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিবার জন্য দেশের সমস্ত রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। অপর সকল রাজাই মহম্মদের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিলেন, একমাত্র মিশরের রাজাই উপঢৌকন দিয়া মহম্মদের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। দূত মহম্মদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া উপঢৌকন প্রদান করিল এবং মহম্মদের প্রজাবর্গ দেখিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া রাজার নিকট এই বলিল যে 'মহারাজ দশ হাজার মাথা না কাটিলে মহম্মদের বিনাশ সম্ভাবনা নাই, তিনি এমনই প্রেমের দ্বারা সুরক্ষিত।" রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া অবাক হইয়া গেলেন। মহম্মদের এই প্রেমাকর্ষণ শক্তিই তাঁহার ধর্ম্ম জয়ী হইবার কারণ। প্রেমের ভিত্তি ছিল বলিয়াই তাঁহার ধর্ম্ম জগতে জয় লাভ করিয়াছিল।

মহম্মদ যখন রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন, তখনও তিনি প্রত্যহ উপাসনার জন্য মসজিদে যাইতেন। ক্রমে যখন তাঁহার উত্থানশক্তি রহিত হইল, তখন দুই জন লোকের স্কন্ধে ভর করিয়া উপাসনা করিতে যাইতেন। যখন লোকে দেখিতে পাইল যে, মহম্মদ দাঁড়াইতে পারেন না, দুইজন লোক তাঁহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, তিনি সেই অবস্থায় উপাসনা করিতেছেন, তখন চারিদিকের লোক উন্মত্তপ্রায় হইয়া "আল্লা হো আকবর" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। মহম্মদের সেই বিশ্বাসের আগুন সকলের হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল। প্রেমের যোগেই এই বৈদ্যুতিক শক্তি সকলের হৃদয়ে ব্যাপৃত হইয়াছিল।

নেলসন যখন যুদ্ধকালে জাহাজের উপরে গিয়া সকলের নিকট দণ্ডায়মান হইতেন, তখন সমস্ত সৈন্য পাগল হইয়া যাইত, কেননা তাহারা জানিত যে, তাঁহার ন্যায় দেশহিতৈষী আর কেহ নাই। নেলসন তাঁহার পতাকায় লিখিয়াছিলেন—"England expects her every son to do his duty" "ইংলণ্ড আশা করেন যে, প্রত্যেক ইংলণ্ডবাসী কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে।" জেনারেল গর্ডন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতেন, তাঁহাকে দেখিয়া সেনাগণ পাগল হইয়া যাইত। ইহাতেই প্রেমের যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্পর্শেই প্রেমের ভাব এবং চিন্তার সঞ্চার হয়, ইহাই অগ্নিসঞ্চালক দণ্ড। দ্বিতীয়তঃ প্রেম গঠন

করে, অপ্রেম ভঙ্গ করে। মিছরির যেরূপ দানা বাঁধে, সেই-রূপ প্রেমেতে মানব সমাজবদ্ধ হয়। প্রেমেতে পুরুষ নারীর হৃদয় এক হয়, ক্রমে শিশু সন্তানাদি সকলে প্রেমে বদ্ধ হইয়া এক পরিবার হয়। এই প্রেমেতেই প্রতিবাসীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া পাড়া হইল। চারিদিকেই প্রেমে গঠন করিতেছে।

মাধ্যাকর্ষণী শক্তিদ্বারা সৃষ্টি রক্ষিত, ইহাকে রহিত কর, সূর্য্য রেণু হইয়া, মেদিনী রেণু হইয়া উড়িয়া যাইবে। সেইরূপ প্রেমের বন্ধন খুলিয়া দাও, সমগ্র মানবসমাজ সেই মুহূর্ত্তেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

তৃতীয়তঃ প্রেমের আর একটী গুণ এই যে ইহা সংরক্ষণ করে। প্রেম বিনাশ হইতে রক্ষা করে। জগতের সাধুদিগের জীবন আলোচনা করিলে আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতে পাই, মহম্মদ অজ্ঞ ছিলেন, মহাত্মা যীশু কিছুই লিখিয়া রাখিয়া যান নাই, চৈতন্য ভক্তিলাভের পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা ভক্তিলাভের আগেই গঙ্গার জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তবে কোথা হইতে এই ভক্তির কথা, প্রেমের কথা জগতে প্রচারিত হইল? কে এ সকল তত্ত্ব রক্ষা করে? সকলের মূল এবং ভিত্তি, প্রেম। শিষ্যদিগের প্রেমের দ্বারাই মহাত্মাদিগের উক্তি সকল রক্ষিত ও সঙ্কলিত হইতেছে।

প্রেমের আর একটী গুণ এই যে, প্রেম, চক্ষের জ্যোতি প্রকাশ করে। প্রেমহীন চক্ষে জগত দেখ, সকলই পুরাতন, কিছুই নূতন নাই। কিন্তু ঈশ্বর-প্রেম হৃদয়ে আসুক, চক্ষু খুলিয়া যাইবে, সকলই নূতন হইবে, জগতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রাণ মুগ্ধ হইয়া যাইবে বিশ্বাসীরা আর এক চক্ষে জগত দেখিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে তাঁহারা অমূল্য উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। পাখী ডাকে, ফুল ফুটে ইহা চিরকালই হইতেছে, কিন্তু ইহা দেখিয়াই যীশু বলিয়াছিলেন "পাখীরা বীজ বপন করে না, কিন্তু তবুও ঈশ্বর তাহাদিগকে খাইতে দেন।" ফুলকে কেমন সুন্দর করিয়া ঈশ্বর সাজাইয়াছেন? প্রেমের চক্ষে গাছের দিকে চাও, অনেক উপদেশ লাভ করিবে। বসন্ত সমাগমে বৃক্ষ নূতন পত্রে শোভিত হয়, ইহা কি সম্ভব যে ঈশ্বর আমাকে সাজাইবেন না? প্রেমের চক্ষে চারিদিকে চাও উপদেশ পাইবে। জগৎপিতা প্রেমদ্বারা জগৎকে চিত্রিত না করিলে জগত এত সুন্দর হইত না। শীত নিবারণের জন্য পাখীকে পালকদ্বারা তিনি আবৃত করিয়াছেন, আমার আত্মাকে কি তিনি রক্ষা করিবেন না? বিশ্বাসীরা কেন জগত হইতে উপদেশ গ্রহণ করেন? তাঁহারা জগতকে প্রেমের চক্ষে দেখেন বলিয়া। প্রেমের চক্ষে প্রাচীন সাধুদের দিকে দৃষ্টিপাত কর, প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ দর্শন কর, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইবে। প্রেমবিহীন চক্ষে দেখিয়াছিলে বলিয়াই কোনও তত্ত্ব গ্রহণ করিতে পার নাই। অপ্রেমের চক্ষে পুস্তক পড়িয়া দেখিয়াছি, পাতার পর পাতা উল্টাইয়া গিয়াছি, কিছুই পাই নাই, কিন্তু যখন ঈশ্বর-কৃপায় প্রেমের চক্ষু খুলিয়াছে, দেখিয়াছি প্রতি পংক্তি আমার নিকট আশার কথা বলিতেছে। প্রেমই চক্ষের আলোক। প্রেমহীন চক্ষে মানুষকে প্রকৃত ভাবে চিনা যায় না। প্রেমহীন হইলে অপরের দোষ সহজেই চক্ষে পতিত হয়। "অমুকে বড় অহঙ্কারী, অমুকের অমুক দোষ" ইত্যাদি ভাব মনে উদয় হয়। প্রেমহীন হইলে "ঈশ্বরের ঘরের একমাত্র আমিই অধিকারী, অন্য কেহ আসিতে পারিবে না" ইত্যাদি ভাব মনে উদয় হয়। ঈশ্বর-কৃপায় হৃদয়ে প্রেম আসিলে আর কাহাকেও পর ভাবিতে পারি না, সকলই যেন আপন, কাহাকেও দূরে রাখিতে ইচ্ছা হয় না। যাহাকে পাপী বলিয়া ঘৃণা করিয়াছি, প্রেমের চক্ষে সে ভাল লোক হইয়া গেল!

প্রেমবিহীন হইয়া কখনও উপাসনা করিবে না। স্বার্থপরের জন্য ধর্ম্ম নহে। কেবল ঈশ্বরের নাম করিলে উপাসনা হয় না; প্রেম দিয়া পূজা না করিলে তাঁহার পূজাই হয় না। হৃদয়ে প্রেম না পাইয়া থাকিলে কিছুই জানিতে পারিবে না, পরস্পরকে চিনিতে পারিবে না। "ঈশ্বরই প্রেম প্রেমই ঈশ্বর।"

ব্রাহ্মসমাজ কিরূপে সংগঠিত হইবে? যত প্রকার বন্ধনের রজ্জু (মত প্রভৃতি) আছে, সকলই বাহিরের বন্ধন, তাহা খুলিয়া যাইবে, যদি প্রেমহীন হস্তে বাঁধা হয়। বিবাহ বন্ধন, পরিবার সংমিলন প্রভৃতি কিসের দ্বারা হয়? প্রেমের বন্ধনে। যদি আমরা অপ্রেমের অস্ত্র দিয়া প্রেমের রজ্জু কাটিয়া দিই, তবে কিরূপে ব্রাহ্মসমাজ সংগঠিত হইবে? প্রেমাপরাধ অতি গুরুতর অপরাধ।

যেখানে অধীনতা সেখানে প্রেম হয় না। অধীনের সঙ্গে স্বাধীনের প্রেম হয় না। প্রেমের প্রাণ স্বাধীনতা। জগদীশ্বর কি আমাদিগকে জগতের অপর নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের ন্যায় করিয়া সৃষ্টি করিতে পারিতেন না? কেন তবে আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন? যেখানে ভয় আছে, সেখানে প্রেম নাই। যেখানে পত্নী পতিকে ভয় দেখাইয়া বাধ্য করিতে চান, সেখানে প্রেম নাই। তবে কিরূপে স্বাধীন থাকিবে, অথচ অধীন হইবে? প্রেম পূর্ণস্বাধীনতা প্রদান করে পূর্ণ অধীনতাও আনয়ন করে। ঐকতানবাদ্য কেমন সুন্দর। যন্ত্রগুলি এক সঙ্গে বাজিতেছে, প্রত্যেকের নিজ নিজ সুর বাজিতেছে, কিন্তু সকলের সংমিশ্রণে কেমন সুন্দর শব্দ হইয়া থাকে। যখন আমাদের ভাইএ ভাইএ ভালবাসা হইবে, পরস্পর প্রেম হইবে, তখন সকল সুর মিলিয়া একতানে ঈশ্বরের নাম গান করিবে। রৌপ্য এবং স্বর্ণ মিশেনা; কিন্তু আগুন দাও, সকল গলিয়া যাইবে। এইরূপ প্রেমহীন দুটী কঠিন হৃদয় গলিবে না, প্রেমের উত্তাপ দাও তখনই গলিয়া যাইবে। "প্রেমের অপূর্ব্ব রীতি বলা নাহি যায়" ইহা অতি সত্য কথা। ব্রাহ্মসমাজে যদি এই প্রেম অবতীর্ণ না হয় তাহা হইলে সকলই বিফল। এই পথে কি সে বাধা জন্মায়? আমাদিগের মিলনের পথে কিসে বিঘ্ন উৎপাদন করে? আমরা কেবল প্রেমের এবং ঈশ্বরের শক্তির অধীন ত নই, যদি তাহাই হইতাম তবে অবশ্যই মিলিয়া যাইতাম। ইহা নিশ্চয় যে, আমরা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার কৃপার অধীন নহি। আমার যে নিজ ইচ্ছা প্রবৃত্তি এবং পার্থিবভাব আছে, তাহাই এই মিলনের পথে বিঘ্ন উৎপাদন করে। অহঙ্কার অভিমান বিদ্বেষের ভাবই বাধা প্রদান করিতেছে। "কি! আমার কথা রাখিল না, এত বড় যোগ্যতা!" এই ভাব কি মনে উদয় হয় না? এই সকল কারণেই প্রেম কাজ করে না। আজ যিনি নিজকে ছাড়িতে আসিয়াছেন তিনিই ঈশ্বর করুণা সম্ভোগ করিবেন। দেখিতে পাই যে, কোনও দেবালয়ে প্রবেশ করিতে হইলেই পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, আমাদের ঈশ্বর আজ বলিতেছেন "নিজকে রাখ, তৎপর উৎসবের দ্বারে প্রবেশ কর।" ব্রাহ্ম ভাই বোন্! আমরা কি নিজকে ছাড়িয়া আসি নাই "আমার ইচ্ছা ডুবিয়া যাউক, কেবল তাঁহারই ইচ্ছার জয় হউক" এই ভাব লইয়া যিনি আজ আসিয়াছেন, তিনিই প্রবেশের অধিকার পাইবেন। আজ এই উৎসবের দিনে সকলে এক হইয়া প্রার্থনা করিব, আর যেন প্রেমাপরাধ না করি। নূতন বৎসরের জন্য প্রতিজ্ঞা করি যে "প্রেমাপরাধ আর করিব না।" প্রেম! এসো। তিনিই প্রেম, তিনিই প্রেম, আজ এস সকলে মিলিয়া প্রেমের গুণ গান করি। তাঁহার ক্রোড়ে নিজকে সমর্পণ করি। প্রেমহস্ত প্রাণে অনুভব করি, তাঁহার প্রেমের হস্ত একদিকে পড়ুক, এবং সকলের হাত অপর দিকে পড়ুক। ঈশ্বরকরুণা করুন, আমাদিগের সহায় হউন। (ক্রমশঃ)

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৯ই ফাল্গুন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

২২শ সংখ্যা।
১৭শ ভাগ।

১৬ই ফাল্গুন বুধবার, ১৮১৬ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৬।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ৩
মফস্বলে ২৸৹
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵৹

পঞ্চষষ্টিতম মাঘোৎসব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর).

১১ই মাঘ।

মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনা করেন। তিনি নিম্নলিখিতরূপ উপদেশ প্রদান করেন,—

সন্তানের প্রতি মাতার প্রেম যেরূপ উজ্জলভাবে প্রকাশিত হয়, এরূপ আর কাহারও প্রতি হয় না। এই মাতৃ-প্রেম প্রত্যেক সন্তান উপভোগ করে, কিন্তু সুসন্তান না হইলে এই প্রেম কেহ বুঝিতে পারে না। সন্তান যত দুরন্ত হউক, মাতার প্রতি উদাসীন হউক, তাঁহার দয়া করুণা অগ্রাহ্য করুক, তবুও মায়ের প্রাণ সন্তানের জন্য লালায়িত। এসম্বন্ধে একটি গল্প আছে;—

কোনও এক গৃহস্থের পরিবারে কর্ত্তার মা এবং স্ত্রীর সঙ্গে বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। স্ত্রীর ইচ্ছা গৃহে কর্ত্তৃত্ব করে; কিন্তু বৃদ্ধা শ্বশ্রূর জন্য তাহা সম্পন্ন হয় না। বধূর কোনও দোষ করিলেই শ্বশ্রূ তাঁহাকে তিরস্কার করেন, এই কারণে সর্ব্বদাই তিনি শ্বশ্রূর প্রতি বিরক্ত। বধূ শাশুড়ীর প্রতি স্বামীর বিরক্তি উৎপাদনের জন্য নানা উপায় কল্পনা করিতে লাগিল। স্বামীকে একদিন বলিল:—"তোমার মাতা 'ডাইনমন্ত্র' জানেন, তুমি যখন নিদ্রা যাও, তখন তিনি তোমার রক্ত শোষণ করিয়া খান।" স্বামী এই কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন; যে মা সন্তান কার্য্যস্থল হইতে বিলম্বে আসিলে, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া একদৃষ্টে পথপানে চাহিয়া থাকেন, সেই মায়ের কি এরূপ ব্যবহার! তিনি এই কথা কখনই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সুতরাং স্ত্রী বিফল-মনোরথ হইয়া স্বামীর বিরুদ্ধে মায়ের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল; সে বলিল:—"তোমার সন্তান ঘোর সুরাপায়ী। একদিন নিদ্রিত অবস্থায় যদি তাঁহাকে পরীক্ষা কর, তাহা হইলে এই কথার প্রমাণ পাইবে।" এদিকে একদিন স্বামীকে বলিয়া রাখিল যে, তুমি কপট নিদ্রা করিয়া থাকিও, আমি প্রমাণ করিয়া দিব যে, তোমার মা ডাইন। এদিকে শাশুড়ীকে পরীক্ষা করিতে বলিল। এইরূপ পরীক্ষাকালে হঠাৎ সন্তান চক্ষু মেলিয়া মায়ের তদ্রূপ ব্যবহার দেখিয়া মাকে বলিলেন,—"তুমি বাস্তবিকই ডাইন, আমার রক্ত শোষণ করিয়া খাও।" তৎপর স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল যে, মাকে বনবাস দিবে। সন্তান স্ত্রীর কথায় কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়া, ভক্তি ভালবাসা ভুলিয়া গিয়া, মাকে লইয়া বনবাস দিতে গেলেন। মা কি করিবেন, সন্তানের এরূপ ব্যবহারে মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইলেন; সেই সংসারে আর থাকিবার একটুও ইচ্ছা রহিল না। সন্তান মাকে ঘোর জঙ্গলে রাখিয়া যখন ফিরিয়া আসিবেন, তখন হঠাৎ আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইল। মাতার সন্তানের জন্য বড়ই ভাবনা হইল। নিজে ঘোর অরণ্যে অসহায় অবস্থায় থাকিবেন, চারি দিকে ব্যাঘ্র ভল্লুক তাহাতে ভয় নাই; কিন্তু সন্তান কিরূপে নিরাপদে গৃহে পৌছিবে, এই একমাত্র ভাবনা। সন্তানকে বলিলেন,—"তাড়াতাড়ি যাও বাবা, যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র গিয়া জনপদে পৌছিতে পার।" সন্তান তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। সন্তানের শত অত্যাচার সত্ত্বেও মাতা সন্তানের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন।

যিনি জননীর জননী, জগতের জননী, তিনি অপার অনন্ত প্রেমের একবিন্দু সংসারের জননীর হৃদয়ে প্রদান করিয়াছেন। পৃথিবীর জননী চিরকালের নহেন, দুই দিন পরে এ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করেন; সন্তান হাজার কাঁদিলেও তাঁহাকে রাখিতে পারে না। এই মাতৃপ্রেমের আস্বাদন যে সুসন্তান পাইয়াছেন, তিনি কি বুঝিতে পারেন না যে, এই পৃথিবীর জননীর অন্তরালে অপর এক জননী রহিয়াছেন? তাঁহার অনন্ত প্রেম, অপার স্নেহ কি আমরা পৃথিবীর জননীর ভিতর দিয়া দেখিতে পাই না? পৃথিবীর জননীর ভিতর দিয়া তাঁহার স্নেহ তিনি জগতে পরিবেশন করিয়া থাকেন। কেবল জননী কেন, জগতের সাধু মহাপুরুষদের মধ্য দিয়াও তাঁহার করুণা তিনি পরিবেশন করিয়া থাকেন। এই জননীকে কি আমরা দেখিব না? তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া কি তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিব না? আমরা কুসন্তান

হইয়া নিজ সুখে মত্ত থাকি, তাঁহার দত্ত সম্পত্তি ভোগ করিতে জানি না কুব্যবহার করিয়া নানাপ্রকারে জননীর মর্ম্মবেদনার কারণ হই। কিন্তু তিনি চিরক্ষমাশীলা, চিরধৈর্য্যশীলা, সকল সহ্য করিয়া থাকেন। সন্তান নিজ সুখে উন্মত্ত, তিনি তাহাকে প্রকৃত সুখী করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত।

আমরা সারা বৎসর তাঁহাকে ভুলিয়া ধূলা খেলা লইয়া ব্যস্ত থাকি; কিন্তু তিনি আমাদিগের সুখের আয়োজন করিয়া থাকেন। এক একটী উৎসবে আমরা তাঁহার কতই করুণা সম্ভোগ করি, তিনি আমাদিগের জন্য কতই সুধা প্রদান করেন। আমরা পাপের আগুন জ্বালিয়া তাঁহার সংসারকে ছারখার করিতে চেষ্টা করি, তাঁহার পুত্র কন্যাকে কতপ্রকারে যাতনা দি; এত দুরন্ত যে আমরা, তবু তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না।

বিশ্বজননী এই উৎসবে তাঁহার কত দুরন্ত সন্তানকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। তিনি সকল সন্তানকে সমান ভাল বাসেন; দুর্ব্বল পাপীর প্রতি বরং তাঁহার বেশী করুণা। বিশ্বজননী যিনি, তিনি কি পাপী দুর্ব্বল সন্তানকে পরিত্যাগ করিতে পারেন? তাহা কখনই নহে। তিনি তাঁহার প্রেম পরিবেশন করিয়া সকলের প্রাণের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবেন।

এই উৎসবের দিনে, এই দুর্ব্বল সন্তানদিগের প্রতি তাঁহার কতই দয়া দেখিতে পাইতেছি। আজ এখান হইতে ক্ষুধিত কেহই ফিরিয়া যাইও না, অনশনে কেহই থাকিও না, সকলেই তাঁহার প্রেম সুধা পান কর, তাঁহার ভাণ্ডার অক্ষয়। এসো তবে ভাই বোন্! আজ আমরা জননীর প্রসাদ সকলে মিলিয়া ভোগ করি, কেহই ক্ষুধিত অবস্থায় ফিরিয়া যাইব না।"

মাধ্যাহ্নিক উপাসনার পরে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস বেদীতে সমাসীন হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করেন। তৎপর তিনি মহম্মদের জীবনচরিত অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা করেন। তৎপর কীর্ত্তন হয়।

সন্ধ্যা ৬½ ঘটিকার সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা করেন। মন্দিরে এত লোক সমাগম হইয়াছিল যে, তজ্জন্য উপাসনার প্রাক্কালে উপাসকগণের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল. শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নলিখিত মর্ম্মে উদ্বোধন করেন;—

"ঈশ্বরপূজা দুই প্রকার, লৌকিক পূজা ও নিষ্ঠা। পূজা। লৌকিক পূজা কিরূপ? প্রতিদিন পূজার নিয়ম বজায় রহিয়াছে; পূজা না করিয়া অন্নগ্রহণ করা হয় না, কোনও রকমে পূজার নিয়ম রাখা চাই। পৈতৃকদেবতা ঘরে আছেন, তাঁহার অৰ্চ্চনা করা। গৃহস্থের যে তাঁহার প্রতি বিশেষ নিষ্ঠা আছে, তাহা নহে, কিন্তু তবুও পূজা বজায় রাখা। ইহা এক রকম পূজা, ইহাকে লৌকিক পূজা বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ নিষ্ঠার সহিত পূজা। যাহাদের অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি ও ধর্ম্মের প্রতি আস্থা আছে, তাহাদের পূজা অন্য প্রকার। বৎসরের উৎকৃষ্ট ফুল বা ফল, যাহা তাঁহারা খুব ভাল বাসেন, তাহা দেবতার চরণে অর্পণ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে এইরূপ নিয়ম আছে যে, যাহারা তীর্থে যায়, তাহারা তাহাদের ভালবাসার অনেক জিনিষ দেবতার চরণে অর্পণ করিয়া আসে। আর সে সকল দ্রব্য তাহারা জীবনে ব্যবহার করে না। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে অনেক স্ত্রীলোক এইরূপে নিজ শিশু সন্তানকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিত। কিন্তু এইরূপ পূজাও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় জিনিষ ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করিলেই যে, ধর্ম্ম হইল, প্রকৃত নিষ্ঠা দেখান হইল, তাহা নহে। ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ অবস্থা এই যে, কোন প্রকার প্রিয়বস্তু ঈশ্বর-চরণে না দিয়া নিজকে, সমগ্র হৃদয়কে, ঈশ্বর-চরণে দিতে হইবে।

এই ধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে নিজকে ঈশ্বর-চরণে অর্পণ করিতে হয়, সত্যকে দৃঢ় করিয়া ধারণ করিতে হয়, সাধুতাকে ধারণ করিতে হয়। যদি সত্য পাইতে চাও, নিজকে একেবারে ঈশ্বর-চরণে সমর্পণ কর। এই পূজা কোনও শব্দ সাপেক্ষ নহে। প্রার্থনা করিতে পার আর নাই পার, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, সর্ব্বান্তঃকরণে নিজকে ঈশ্বর-চরণে সমর্পণ করিতে পারিলেই তাহার প্রকৃত উপাসনা হইল।

আজ আমরা দেখিব যে, ঈশ্বর-চরণে কি সমর্পণ করিয়াছি? নিজকে দিতে পারিয়াছি কি? যদি পারিয়া থাকি, তাহা হইলেই প্রকৃত পূজা হইবে।

নিজকে ঈশ্বর-চরণে দিলে আমি তাঁহার হইয়া যাইব, আমার ধন, জন, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সকলই তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিব। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত দেখা হইবে, তাহাই যথার্থ পূজা। আজ উৎসবের দিনে হৃদয়ে এই মহৎ ভাব লইয়া ঈশ্বরের আরাধনাতে প্রবৃত্ত হই।"

সমবেতপ্রার্থনার পরে নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ প্রদত্ত হয়,—

"বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ-চরিত্র সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, একদিকে একটী অসহায় শিশু, অপরদিকে একজন প্রবলপরাক্রান্ত রাজা। ঐ অসহায় শিশুকে রক্ষা করিবার কেহই নাই, অবলম্বনের কিছুই নাই, তবুও তাহার সাহস কত, দাঁড়াইবার স্থান নাই, তবুও সে দাঁড়ায়। অপর দিকে প্রবলপরাক্রান্ত রাজা, তাহার উপর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। "আমার সন্তান হইয়া আমার সমক্ষে আমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে?" এই ক্রোধে তিনি নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া শিশুকে পরাজয় করিতে কৃতসংকল্প।

এখানে আমরা দেখিতে পাই যে, এই দুই জনের দুই বিভিন্ন স্থলে নির্ভর রহিয়াছে। শিশুর নির্ভর ঈশ্বরের উপরে, রাজার নির্ভর নিজ শক্তির উপরে, ধনের উপরে। এই যে দুই জাতীয় চরিত্র এক স্থানে সন্নিবেশ করা হইয়াছে, জগতের এইরূপ দুই জাতীয় চরিত্র সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মহাত্মা যীশুকে যখন হত্যা করা হয়, সেই চিত্র একবার মনে করিয়া দেখ। একদিকে প্রতাপশালী যীহুদী পুরোহিতগণ দণ্ডায়মান, রোমের সমগ্র রাজশক্তি তাঁহাদিগের অনুকূল; অপর দিকে একমাত্র সূত্রধরের সন্তান। তিনি নিজের কথা নিজে এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—"পাখীর বাসা আছে, শেয়াল কুকুরের গর্ত্ত আছে; কিন্তু আমার মাথা

স্নাধিবীর স্থান নাই।" রাজশক্তিহীন, ধনহীন, পৃথিবীর মান সম্ভ্রমবিহীন গরীবের সন্তান, অপরদিকে পরাক্রান্ত রাজশক্তি এবং পুরোহিতগণ।

যীশু যখন দেখিলেন, সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাঁহার শিষ্যেরাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"ইলি ইলি লামা শবাক্তানি" "হে পিতা, হে পিতা! কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতেছ?" কেমন ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর। দেখ এখানে কাহার জয়? হিরণ্যকশিপুর না প্রহ্লাদের? ইহুদী রাজার, না গরীব সূত্রধর তনয়ের?

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন ঈশ্বর উপাসনা আরম্ভ করিলেন, তখন সহরের অনেক লক্ষপতি ধনীরা তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন যে,—"পুঁটী মাছের পোঁটার মতন রামমোহনের ধর্ম্মের পোঁটা বাহির করিয়া দিব।" এঁরাই হিরণ্যকশিপু এবং রামমোহন প্রহ্লাদ। তাঁহাদের নির্ভর ছিল ধনের উপরে, জুড়ী গাড়ীর উপরে, অতএব তাহারা হিরণ্যকশিপু। রামমোহন রায়ের মৃত্যু হইলে পর অনেক উপাসক তাঁহার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। সকলেই মনে করিল, তাঁহার ধর্ম্মের আগুন নিভিয়া গিয়াছে। কিন্তু কোথায় যে একটু স্ফুলিঙ্গ লুক্কায়িত রহিয়াছিল, তাহা কেহই দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ পুনবায় ঘরে আগুন ধরিল, দেখিতে দেখিতে আগুন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাই আজ ব্রাহ্মসমাজের এইরূপ অবস্থা। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম ছড়াইয়াছে, ২০০ শতের ও অধিক উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জগতে হিরণ্যকশিপুর ন্যায় ঈশ্বর-বিরোধী ব্যক্তির আশা কখনই পূর্ণ হয় না।

প্রকৃত বিশ্বাসীর লক্ষণ কি? "অকপটচিত্তে ঈশ্বরে নির্ভর করা।" বিশ্বাসী যদি নিজকে দেখিতে পাইত, তবে তাহার ভয় হইত। বিশ্বাসী ব্যক্তি নিজকে দেখিতে পায় না। যে নিজকে ভুলিয়া কেবল মাত্র ঈশ্বরকেই সত্য বলিয়া ধারণা করিতে পারে, সেই প্রকৃত বিশ্বাসী।

সকল ছাড়া সহজ; কিন্তু রাজসিক ভাব পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন। কোন মেলায় গেলে মানুষ কিছু না কিছু হারাইয়া আসে; সভায় গিয়ে জুতো হারায়, গায়ের কাপড় হারায়। বল ত ভাই বোন! কে নিজকে হারাইবে? ঘরে গিয়া কে বলিবে "নিজকে হারাইয়া আসিয়াছি?" কয়জন লোক এইরূপ ভাব লইয়া এখানে আসিয়াছ? যদি দশজন এইরূপ ভাবাপন্ন লোক থাক, তাহা হইলেই দুর্গ জয় হইবে। প্রহ্লাদ হওয়া বড়ই কঠিন। তোমার পার্থিব বলের কামানের গোলা কিরূপে তাহার বিশ্বাসের শরীরকে বিদ্ধ করিবে? এইরূপ বিশ্বাসের বলে যদি ব্রাহ্মগণ বলী হইতে পারে, তাহা হইলে আর ভাবনা থাকিবে না। সকল জগৎ একদিকে তবুও কাহাকে গ্রাহ্য করিব না" এইরূপ বিশ্বাসী হওয়া চাই। এরূপ হইতে হইলে নিজকে ঈশ্বর চরণে দিতে হয়। নিজকে না ছাড়িলে প্রেম হয় না। নিজকে ছাড়িলেই জগতের সাধুদিগের সঙ্গে, বন্ধুদিগের সঙ্গে এবং ভগবানের সঙ্গে মিলন হইবে। নিজকে ছাড়, মিলন আরম্ভ হইবে। প্রকৃত বিশ্বাসীর নিকট হিরণ্যকশিপুর পরাজয় হইবে। "জয়স্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ" কৃষ্ণকে পাইয়া পাণ্ডুপুত্রগণ জয়ী হইয়াছিলেন। অতএব হে ব্রাহ্ম ভ্রাতা ভগিনীগণ! জীবনে সুখ দুঃখ প্রতিকূল অবস্থা আসিবে; কিন্তু প্রেমের বিরোধী কাজ কখনই করিও না। যদি সর্ব্বান্তকরণে হৃদয়কে ঈশ্বর চরণে দিতে পার, তবে হিরণ্যকশিপুর ভয় নাই। অতএব এস সবে আজ বলি—"আমাদের কাহার মাথা বড় হইবে, কাহার মাথা ছোট হইবে তাহা আমরা জানিনা; হে প্রভু তোমার জয় হউক। তোমার ইচ্ছার জয় হউক। "ঈশ্বর করুন, আমরা যেন নিজকে তাঁহার চরণে অর্পণ করিতে পারি।"

১২ই মাঘ, শুক্রবার।

অদ্য পূর্ব্বাহ্নে সাধনাশ্রমের উৎসব। অতি প্রত্যূষে আশ্রমের পরিচারকগণ সাধনকুটীরে সমবেত হইয়া সঙ্গীত ও প্রার্থনা করেন, তৎপরে "শোন রে শোন রে তাঁর বাণী" এই সংকীর্ত্তনটী গাহিতে গাহিতে মন্দির অভিমুখে গমন করেন এবং মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। ৬½ ঘটিকার সময় আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বেদী, গ্রহণ করিয়া উপাসনা করেন। সমবেত প্রার্থনার পরে তিনি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার স্থূলমর্ম্ম লিখিত হইল।

"অদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিব না, অদ্য কেবল তাঁহার করুণার সাক্ষ্য দান করিব। তিন বৎসর পূর্ব্বে আমার প্রাণে ভয়ানক অশান্তি উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নানা প্রকার অভাব ও বিঘ্নের বিষয় চিন্তা করিয়া আমি অবসন্ন হইয়া পড়ি। ১৮৯২ সালের মাঘোৎসবের পূর্ব্বে এজন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছিলাম। যখন আমি উপায় নির্দ্ধারণের জন্য প্রার্থনা ও চিন্তা করিতেছিলাম, তখন প্রাণে এইরূপ ভাব উদয় হইল যে, "এমন একদল সাধক চাই, যাঁহারা অনন্যকর্ম্মা হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবার্থ সমুদয় দেহ মন অর্পণ করিবেন এবং ঘনিষ্ঠএকতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া সমাজ মধ্যে নূতন জীবন আনিবার চেষ্টা করিবেন।" এই ভাব লইয়াই আমি ১৮৯২ সালের ১১ই মাঘ প্রাতঃকালের উপদেশ দিয়াছিলাম। এবং এই সংকল্প গ্রহণ করিয়াই ১৮৯২ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী দিবসে সাধনাশ্রম স্থাপন করি। ক্রমে একটী একটী করিয়া সাধনার্থিগণ আসিয়া ইহাতে যোগ দান করিলেন। এখন আমাদের পরিচারক ও সংকল্পাধীন পরিচারক এই কয়েক ব্যক্তি আছেন;—

(পরিচারক)

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
" আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।
" প্রকাশ দেব।
" গুরুদাস চক্রবর্ত্তী।
" জয়শঙ্কর রায়।
" কালীচন্দ্র ঘোষাল।
(সংকল্পাধীন পরিচারক)
শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ঘোষ।
" সুন্দর সিংহ।
" হরিমোহন ঘোষাল।
" শ্রীবঙ্গবিহারী লাল।
" জগদীশচন্দ্র রায়।
শ্রীমতী চঞ্চলা ঘোষ।

যখন সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করি, আমার হাতে একটী পয়সাও ছিল না। কিরূপে খরচ চলিবে এসম্বন্ধে আমার মনে কখনও চিন্তার উদয় হয় নাই। এখানে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিবেন। এবিষয়ে দুইটী মূলমন্ত্র স্মরণ করিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সেই মন্ত্র দুইটী এই,—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।
গীতা।

অন্য কামনাবিহীন হইয়া আমাকে চিন্তা করতঃ যাঁহারা উপাসনা করেন, আমি সর্ব্বপ্রকারে মৎপরায়ণ তাঁহাদের যোগক্ষেম (সমুদয় ভার) বহন করিয়া থাকি।

The Lord is my sheppred ; I shall not want.
Psalm X X III

"প্রভু পরমেশ্বর আমার রক্ষক, আমার কোনই অভাব হইবে না।

আশ্রমের ইতিবৃত্ত পুস্তকের ১ম পৃষ্ঠাতে ঐ দুইটী বচন লিখিত আছে। আশ্রম পরিচালনের ইহাই মূলমন্ত্র। প্রভু পরমেশ্বর অদ্য তিন বৎসর যেরূপ অযাচিতভাবে কৃপা করিয়া আসিতেছেন, তাহা বিস্ময়জনক। অদ্য মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিতেছি, প্রভু তাঁহার দাস দলকে এক দিনও অভুক্ত রাখেন নাই। অতি আশ্চর্য্য রূপে তিনি আশ্রমবাসীদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। ১৮৯৪ সালে কলিকাতা ও আরা সাধনাশ্রমে ২৮৩৮ টাকা ব্যয় হইয়াছে, ১৮৯৩ সনে কলিকাতা আশ্রমে ২৩৬৫৲ টাকা এবং ১৮৯২ সালে ৮৪৩৲ টাকা ব্যয় হয়। আশ্রম স্থাপনাবধি এপর্য্যন্ত মোট ৬০৪৬ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

বিগতবর্ষে যে টাকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ১৪১৫ টাকা দান এবং পুস্তক বিক্রয়ের কমিশনবাবত ১০৩৲, ভিক্ষাতে মাত্র ৯৪৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা আশ্রমে অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নাম আশ্রম হইতে প্রকাশিত হয় না। অদ্য আমি বিশেষভাবে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

গত বৎসর আমাদের পরিচারকগণ নিম্নলিখিত স্থান সমূহে ভ্রমণ করিয়া পরমেশ্বরের নাম প্রচার করিয়াছেন,—ভাগলপুর, মুঙ্গের, বাঁকিপুর, মজফরপুর, মতিহারী, গয়া, আরা, ডুমরাউন, গাঁজিপুর, এলাহাবাদ, সাঢড়া, জগাদরি, লাহোর, রাউল পিণ্ডি, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, কোয়েটা, হিরাট, নিউমস্, পণির, পসিন, নিউচামন, শক্কর, ভাগলপুর, ঝেলম, জম্বু, গিরিধি এবং কাঁথি, পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং, যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, বরিশাল, কৃষ্ণনগর, কুষ্টিয়া, পাবনা, কুমারখালী, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা। এস্থলে আমার কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের কার্য্য উল্লিখিত হইল না।

কোটালীপাড়ায় দুর্ভিক্ষে আমাদের তিনজন পরিচারক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও ফরিদপুর সুহৃদসভার পক্ষ হইতে ৩।৪ মাসকাল সাহায্য বিতরণ করিয়াছেন, এবং আরা সহরে ভয়ানক বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে, তথাকার পরিচারকগণ যথাসাধ্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণও চিকিৎসাদি করিয়াছেন।

বিগত বর্ষে সাধনাশ্রম হইতে দুই খানি পুস্তক (চরিতরত্নাবলী ও সেবকের গান) মুদ্রিত হইয়াছে। অদ্য বন্ধু বান্ধবগণ আশ্রমবাসীদিগের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তাহারা পরমেশ্বরের বিশ্বাসী সন্তান হইয়া তাঁহার সাধন, তাঁহার সন্তানগণের সেবা এবং তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতে সমর্থ হয়।"

অদ্য অপরাহ্ন ২½ ঘটিকার সময় ধর্ম্মালোচনা হয়। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, বাবু চন্দ্রকুমার ঘোষ, মুন্সী জালালউদ্দিন মিঞা, শ্রীমতী চঞ্চলা ঘোষ, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিস প্রভৃতি মহাশয়গণ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি এবং কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে সাধন ভজনের সুব্যবস্থা হইতে পারে, ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথা বলেন।

সন্ধ্যা ৬½ ঘটিকার সময় ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় "আমাদের ধর্ম্মের বিশেষত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা লিখিত হয় নাই, ভবিষ্যতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে পারে। বক্তৃতার স্থূল মর্ম্ম এই,—ব্রাহ্মধর্ম্মের তিনটী লক্ষণ। প্রথম লক্ষণ, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগ। উপনিষদের মধ্যে এই ভাবটী প্রস্ফুটিত আছে। কিন্তু দেশ-প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত ইহার অত্যন্ত বিরোধ। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম অবতারবাদ, মধ্যবর্ত্তীবাদ, সাকারবাদ, অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ প্রভৃতি দ্বারা সংকীর্ণতাপ্রাপ্ত ও আবদ্ধ। এ সকল ধর্ম্মের অন্তরায় স্বরূপ, ইহারা মানবাত্মাতে পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগের ব্যাঘাত ঘটে। মহম্মদীয় ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মও মধ্যবর্ত্তীবাদমূলক, সুতরাং তদ্দ্বারাও ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, তাহাতেও ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ লাভের উপায় নাই। দ্বিতীয় লক্ষণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞানমূলক। এই জ্ঞান তিন ভাগে বিভক্ত

সহজজ্ঞান, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা এবং যুক্তি। বক্তা অতি পাণ্ডিত্যসহকারে জ্ঞানই যে ধর্ম্মের ভিত্তি, শাস্ত্র, গুরু-বচন ইত্যাদি যে ধর্ম্মের ভিত্তি হইতে পারে না, তাহা অতি দক্ষতার সহিত বর্ণন করেন। ৩য় লক্ষণ অসাম্প্রদায়িক ভাব। অন্যান্য সমুদায় ধর্ম্মই অল্পাধিক পরিমাণে সংকীর্ণভাবাপন্ন, কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মই উদার, বিশ্বজনিন।

১৩ই মাঘ শনিবার।

অদ্য প্রাতে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত লক্ষণপ্রসাদ হিন্দিতে উপাসনা করেন। তাঁহার উপদেশ লিখিত হয় নাই।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বালকবালিকা সম্মিলন হয়। বালকগণ একদিকে এবং বালিকাগণ অপরদিকে উপবিষ্ট হইয়া প্রথমত গান করে, তৎপর বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রার্থনা করেন. এবং বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন :—"বিলাতের কোনও একটী বালক খ্রীষ্টমাসের উৎসবের সময় এক দোকানে কতকগুলি হাড় বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। দোকানদার মনে করিল যে, বালকটী হাড় বিক্রয় করিয়া সেই পয়সাদ্বারা বোধ হয় খৃষ্টমাসের উৎসবে নানা প্রকার আমোদ করিবে। এজন্য মূল্য প্রদানের সময় দোকানদার বালককে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এই পয়সা দিয়া কি করিবে?" বালক বিনম্রভাবে উত্তর করিল,—"ভারতবর্ষের গরিব বালকদিগকে শিক্ষাদান করিবার জন্য সেখানে একটী স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, সেই স্কুলের সাহায্যার্থে আমি এই পয়সা পাঠাইব।" দোকানদার বালকের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

এই বালকের মহত্বের বিষয় স্মরণ করিয়া আমরাও বিস্মিত হই। কোথায় ইংলণ্ড, আর কোথায় ভারতবর্ষ! বহুদূর-স্থিত ভারতের গরীব বালকগণের শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডীয় বালকের প্রাণে কেমন অনুরাগ! বিশেষতঃ উৎসবের দিনে, যে দিনে বালকবালিকারা কেবল আমোদ প্রমোদই ভাল বাসে, সেই দিনে বালকের প্রাণ পরোপকারের জন্য ব্যস্ত!

হে বালকবালিকাগণ! তোমরা কি জীবনে কখনও এরূপ ভাল কাজ করিয়াছ? যদি করিয়া না থাক, তবে ঐরূপ কোনও কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত হও। তোমরা ইচ্ছা করিলে আজই একটী ভাল কাজ করিতে পার। বোধ হয় তোমরা শুনিয়াছ যে, আজ কাল কলিকাতা সহরে ভয়ানক বসন্ত রোগ হইতেছে। শিয়ালদহ হাসপাতালে কত বালক বালিকা বসন্ত রোগে ভয়ানক যাতনা পাইতেছে। তোমাদের হাতে যে সুন্দর ফুলের তোড়া এবং গলায় যে মালা আছে, তাহা যদি তোমরা সেখানে পাঠাও, তবে কত ছেলে এই সুন্দর সুন্দর ফুল দেখিয়া আনন্দিত হইবে। তাহাদের ব্যাধিযন্ত্রণা কিছু কমিবে। অথবা তোমরা চাঁদা করিয়া কিছু টাকাও পাঠাইতে পার, তাহা দ্বারা ফুল কিনিয়া দেওয়া যাইতে পারে।"

দ্বারিক বাবুর উপদেশ শ্রবণ মাত্র বালকবালিকাগণ স্বীয় স্বীয় কণ্ঠ হইতে মালা এবং হাতের তোড়া উক্ত উদ্দেশ্যে প্রদান করিল। তৎপর সংগীত হইলে, তাহারা ১৩নং ভবনে গমন করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিল।

অদ্য সন্ধ্যা ৬½ ঘটিকার সময় ছাত্রসমাজের উৎসব হয়। তদুপলক্ষে বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র "অভাব ও আশা" (Need and hope) বিষয়ে ইংরাজিতে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। হেরম্ব বাবুর বক্তৃতা শেষ হইলে সভাপতি মহাশয়ও ওজস্বী ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ করেন।

১৪ই মাঘ রবিবার।

অদ্য উদ্যান-সম্মিলন। শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসুর দমদমার বাগানে সকলে রেলযোগে গমন করেন। পুরুষ ও মহিলায় যাত্রীসংখ্যা প্রায় চারি শত হইয়াছিল। বৃক্ষতলে সমবেত উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনা করেন। তিনি যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই ;—

"প্রাচীন ঋগ্বেদে আছে, "অগ্নি মিলে পুরোহিতং" "অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত হইয়া উপাসকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।" প্রাচীন ঋষিগণ অগ্নি দ্বারা যজ্ঞ করিতেন, সেই উপলক্ষে কত উৎসব করিতেন। অবশেষে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ উপাসক, তাঁহারা সেই অগ্নি রক্ষা করিতেন।

আমাদের ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, আমরা কি তাহা রক্ষা করিব না? সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ জড় অগ্নিকে রক্ষা করিতেন, আমরা ভিতরের অগ্নিকে রক্ষা করিব। অদ্য বিশেষ ভাবে সাগ্নিক হইবার দিন। মহাভাবের অগ্নি—ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিয়াছে, তাহা কি আমরা নির্ব্বাণ করিব?

অগ্নির অনেক গুণ। অগ্নির উত্তাপে নানা জাতীয় ধাতু গলিয়া এক হইয়া যায়। অগ্নির সংস্পর্শে ধাতু সমূহ উজ্জ্বল হয়। ব্রহ্মাগ্নিও মানব অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া পাপ মলিনতা বিদূরিত করে, অন্তর পবিত্র করিয়া দেয়। দশটী আত্মাকে একীভূত করে। কঠিন মন গুলিকে দ্রব করিয়া দেয়।

ব্রহ্মযজ্ঞের অগ্নি আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা জীবনকে অগ্নিময় করিব, আমরা প্রত্যেকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইব। আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, কার্য্য, অনুষ্ঠান অগ্নিময় হইবে। অতএব ব্রাহ্ম ভাই ভগিনি! এস, আমরা সকলে সাগ্নিক হই। আমাদের জীবন দ্বারা পরিবার ও নিকটস্থ সকলকে অগ্নিময় করিয়া তুলি। দেশে এই অগ্নি বিস্তৃত হইয়া পাপ ও কুসংস্কারের আবর্জ্জনা ভস্মীভূত করিবে।"

তৎপর শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু এবং শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস বসু, বাবু চন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি প্রার্থনা করেন। উপাসনান্তে প্রীতিভোজন হইলে সকলে কলিকাতা প্রত্যাগমন করেন।

মন্দিরে ৬½ ঘটিকার সময় উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তদবলম্বনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী রচিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাগণ! আমরা ব্রহ্মোৎসবের জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করিয়াছিলাম, বাহিরের যে সকল আয়োজন হইতে যে ফল প্রত্যাশা করা যায়, তাহা পাওয়া গিয়াছে; বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, আমাদের সঙ্কল্প একরূপ সিদ্ধ হইয়াছে। ১লা মাঘ হইতে ১৪ই মাঘ পর্য্যন্ত উৎসব করিব বলিয়া আমরা স্থির করিয়াছিলাম, অদ্য সেই ১৪ই মাঘ। অদ্যকার উপাসনাদি শেষ হইলেই পঞ্চষষ্টিতম মাঘোৎসব পরিসমাপ্ত হইল।

এখন প্রশ্ন এই, ব্রহ্মোৎসব শেষ করিয়া আমরা কি কোনও উন্নতলক্ষ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিব, না ভাবের ক্ষণিকমত্ততা লইয়া ফিরিব? এই যে সুন্দর পুষ্প-গুচ্ছ দ্বারা মন্দির সুসজ্জিত হইয়াছিল, আগামী কল্য এই সকল শুষ্ক-কুসুম রাজপথে পরিত্যক্ত হইবে; মন্দিরশীর্ষে যে সকল "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলং" "সত্যমেবজয়তে" প্রভৃতি উক্তি লিখিত পতাকা উড়িতেছিল, তাহা তুলিয়া রাখা হইবে। যেমন এই সকল বাহ্যচিহ্ন বিলুপ্ত হইবে, তেমন কি হে ব্রাহ্ম ভাইভগিনি! উৎসব ক্ষেত্রে তোমাদের গলায় প্রেমময় বিধাতা যে প্রেমের মালা পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া গৃহে চলিয়া যাইবে? উৎসব ক্ষেত্রে তিনি যাঁহাকে যাহা দিয়াছেন, তিনি কি তাহা অন্ধেরযষ্টির ন্যায় ধরিয়া রাখিবেন না? আজ উৎসবের শেষ দিনে সকলে একবার এই বিষয়টী চিন্তা করুন।

এ কয়েকদিনে ধর্ম্মের অনেক উচ্চতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সাধন ভজনের কথা, গভীর ধর্ম্মমতের কথা, যোগ ভক্তির কথা ইত্যাদি অনেক কথাই এই বেদী হইতে বলা হইয়াছে, এ সকল কথা শুনিতেও ভাল, বলিতেও ভাল, কিন্তু কার্য্যতঃ গ্রহণ করা বড়ই কঠিন। অনেকেই বলিতে পারেন এবং শুনিতেও অনেকে পারেন; রক্ষা করিতে পারেন কয় জনে? এই জন্যই একজন পশ্চিম দেশীয় সাধু দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, যে "অনেকেই আহূত হয়; কিন্তু অল্প লোক মনোনীত হয়।"

বিশেষতঃ প্রেমের কথা বলিতে ও শুনিতে বড়ই মিষ্ট, সেই ধন লাভ করা কত কঠিন? প্রেম, ধর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। ইহা অতি অল্প লোকেই লাভ করিতে পারেন এবং রক্ষা করিতে পারেন। যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনিই ভক্ত প্রেমিক বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। যিনি প্রেম লাভ করেন নাই, তিনি শুষ্কনীতির ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন। তাহার জীবন মধুময় হয় না।

এই প্রেম লাভ করিবার জন্য কি মানুষের কিছু করিবার নাই? আছে বৈকি? প্রেম লাভের জন্য সাধন ভজন, তপস্যা সকলি মানুষ করিবে, কিন্তু প্রেম দান করা না করা তাঁহার ইচ্ছা। ব্রহ্মকৃপা ব্যতীত সেই প্রেম কেহ লাভ করিতে পারে না। সকল চেষ্টার পরিসমাপ্তি হইলে, যখন সাধক অতি ব্যাকুলভাবে তাঁহার প্রেমের প্রার্থী হয়, তখনই ব্রহ্মকৃপা আসিয়া তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ করেন।

আজ কয়দিন হইতে প্রেমের কত কথা হইতেছে। ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে আচার্য্য প্রেম-তত্ত্বের সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এখন প্রশ্ন এই, সেই প্রেম কিরূপে লাভ হইবে? প্রেম সাধনার ফল, কি সাধন করিলে প্রেমরূপ ফল আমরা প্রাপ্ত হইব? প্রেম ত সকলেই চায়, ইহা কিরূপে মিলিবে? বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে;—

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥"

সকল সাধকের আকাঙ্ক্ষাই প্রেম লাভের দিকে; কিন্তু লাভ হইবে কিরূপে? তাহার পথ কি? কেহ কেহ বলিতেছেন, "কিরূপে সাধন করিতে হয়, তাহা সিদ্ধপুরুষেরাই বলিতে পারেন। ব্রাহ্মসমাজে সেইরূপ সিদ্ধপুরুষ কোথায়? যাঁহারা স্বয়ং অসিদ্ধ তাঁহারা সাধনের প্রণালী কিরূপে বলিয়া দিবেন?"

এ কথা কি সম্পূর্ণ সত্য যে, ব্রাহ্মসমাজে সিদ্ধপুরুষ নাই? ৬৫ বৎসর যাবৎ এদেশে ব্রাহ্মগণ সাধন ভজন করিয়া আসিতেছেন, ইহার মধ্যে কি কেহই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই? পদ্মপত্রের জলের ন্যায় সকলের হৃদয়ের উপর দিয়াই কি ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সমূহ গড়াইয়া পড়িয়া যাইতেছে, কোনও হৃদয়েই কি তাহা ফলপ্রদ হয় নাই? বোধ হয় এই কথায় কোনও ব্রাহ্ম অথবা ব্রাহ্মসমাজের হিতার্থী যোগ দান করিতে পারেন না।

সিদ্ধপুরুষ কাহাকে বলে? তামাকে সোণা করিতে পারিলে, অথবা তত্তুল্য কোনও প্রকার অদ্ভুত কার্য্য করিতে পারিলেই এদেশে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া পূজিত হওয়া যায়। গৈরিকবস্ত্র পরিধান, জটাধারণ, ভস্ম লেপন, বৃক্ষতলে বাস ইত্যাদিও সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ; ঊর্দ্ধবাহু হওয়া, দণ্ডধারণ করাও সিদ্ধত্বের লক্ষণ। কিন্তু ব্রাহ্মসাধন এরূপ সিদ্ধত্বের পক্ষপাতী নহে। পরমেশ্বর অনন্ত, অনন্তকাল মানব তাঁহাকে জানিবে, জানিয়া জানিয়া কখনও তৃষ্ণার বিরাম হইবে না। মানবাত্মা অনন্ত উন্নতি পথে নিয়তই অগ্রসর হইবে, নিয়তই জ্ঞান প্রেমে উন্নত হইবে, ইহাই ব্রাহ্মসাধকের লক্ষণ। তবে পাপের সহিত যে একটা সংগ্রাম মানব জীবনে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ইহজীবনেই বিদূরিত হইয়া যাইতে পারে। উক্ত লক্ষণাক্রান্ত সিদ্ধপুরুষ কি ব্রাহ্মসমাজে এক জনও নাই? নাম করিব না, কিন্তু এই কথা অতি বিশ্বাসের সহিত বলিতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজে সিদ্ধ-পুরুষ আছেন। কিন্তু যেমন পাণ্ডুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি জগৎকে পীতবর্ণ দেখে, তেমন অসিদ্ধ লোকেরা আপনার ন্যায় সকলকেই অসিদ্ধ ভাবিবে বিচিত্র কি? যাঁহারা এরূপ ভাবেন এবং বলেন যে, ব্রাহ্মসমাজে কেহ সিদ্ধপুরুষ নাই, তাঁহাদের প্রকৃত বিনয়ের অভাব, শ্রদ্ধার অভাব, সাধু-প্রীতির অভাব আছে বলিয়াই মনে হয়।

যাহা হউক এখন আমি মূল বিষয়ে প্রবেশ করি। প্রেম-ধন লাভ করিতে হইলে, কিরূপে সাধন করিতে হয়, সংক্ষেপে তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। প্রেম শূন্যে প্রতিষ্ঠিত হয় না, অথবা অনিত্য বস্তুতে হয় না; সারবস্তু, সত্যবস্তু ভিন্ন প্রেমের উদয় হয় না। সাংসারিক-প্রেমের দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিষ্কার-রূপে বুঝাইতেছি। মাতা সন্তানকে ভাল বাসেন, যদি মাতা

মনে করেন যে, ছেলেটী শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, অথবা চিররুগ্ন হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে, তবে কি তাহার প্রতি মাতৃস্নেহ তেমন বলবতী হইত? যেখানেই প্রেম, সেখানেই অস্তিত্বে বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। পত্নী ভাবেন,তিনি সধবা অবস্থায় পরলোকে গমন করিবেন; পতি ভাবেন, তাহাকে কখনও পত্নীবিয়োগ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না। অপর দিকে ধনী যদি ভাবেন যে, রজনী প্রভাতেই তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, তবে কি তিনি সেই সম্পদে সুখ লাভ করিতে পারেন? রাজা যদি ভাবেন যে, শীঘ্রই তিনি রাজপদ হইতে অবসৃত হইবেন, তবে কি তিনি সেই রাজ্যের প্রতি আসক্ত হইতে পারেন? একটী গল্প আছে যে, এক জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। ৭ দিন পরে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে স্থির হইল। এই ৭ দিন সেই ব্যক্তিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। ৬দিন পরে তাঁহাকে কেহ বলিলেন যে, "মহারাজ! আপনি পরম সুখে আছেন।" তিনি বিষণ্ণচিত্তে উত্তর দিলেন, "যাঁহার মস্তক ছেদন করিবার জন্য খড়্গ শাণিত হইতেছে, তাহার আবার আনন্দ কি?" বাস্তবিক যেখানেই অনিত্যতা বোধ, সেখানে স্থায়ী প্রেম জন্মিতে পারে না। যাহাকে ভাল বাসিব, তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস না থাকিলে ভালবাসা জন্মে না। ইহা মানব-প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্য। প্রেম স্থায়ী বস্তু চায়, নিত্য বস্তু চায়, অনিত্যের প্রতি প্রেম জন্মে না।

সত্যেই প্রেমের জন্ম, সত্যেই প্রেমের পরিপুষ্টি এবং সত্যেই প্রেমের উন্নতি ও বিস্তৃতি। ঈশ্বর পূর্ণ সত্য, তাঁহাকে ধরিতে পারিলেই প্রকৃত প্রেমসাধন আরম্ভ হয়। নির্ভর যেখানে নাই, সেখানে প্রেম জন্মিতে পারে না। ঈশ্বর যেমন নির্ভরের স্থল, এমন নির্ভরের স্থল আর কোথায়? ঈশ্বর মানব প্রাণের অন্তস্তলে "আমি আছি" নিয়ত এই মহাধ্বনি করিতেছেন। এই সত্যের প্রকাশ অনুভব করিয়া, তাহার অনুসরণ কর। প্রাণের প্রাণ হইয়া তিনি হৃদয়ে বাস করিতেছেন, সেই পরম সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিলেই তাঁহার প্রতি প্রেম জন্মিবে। মানুষ সংসারের অনিত্য বস্তুকে নিত্যজ্ঞান করিয়া তদুপরি প্রেম স্থাপন করে, তুমি কি প্রকৃত নিত্য-চৈতন্যময় বস্তুতে বিশ্বাসী হইয়া প্রেম করিতে পারিবে না? নিত্য চৈতন্যময় বস্তুকেই নিত্যকাল, অনন্তকাল প্রেম করা যাইতে পারে। যতদিন সেই সত্য, কল্পনার বিষয় থাকিবে, ভাবের রাজ্যেই থাকিবে, ততদিন বাহিরের ব্যাপার। তাহাতে প্রকৃত প্রেমোদয় হয় না।

দ্বিতীয়,—প্রেমধন লাভ করিতে হইলে আপনাকে শুদ্ধ করিতে হয়। এদেশের কোন কোনও মলিনচিত্ত সাধকের মধ্যেও এক প্রকার প্রেমের বিকাশ দেখা যায়; কিন্তু সেই প্রেম ভগবৎ প্রেম নহে, বাহিরের বস্তু, অথবা ঈশ্বর প্রেমের বিকৃত অবস্থা। শারীরিক, আধ্যাত্মিক, মানসিক সর্ব্বপ্রকার ব্যভিচার হইতে আপনাকে রক্ষা না করিলে ভগবৎ প্রেমের উদয় অসম্ভব। শরীর শুদ্ধ করিতে হইলে, বাহিরের সমুদয় ইন্দ্রিয়দিগকে শাসনে রাখিতে হয়, মানসিক শুদ্ধতা রক্ষা করিতে হইলে, মনের ইন্দ্রিয়দিগকে শাসনে রাখিতে হয় এবং আধ্যাত্মিক পবিত্রতা লাভ করিতে হইলে কুবাসনা বিনাশ করিতে হয়। বাক্য সংযম, পরনিন্দা হইতে জিহ্বাকে সংযত রাখা, সত্য কথা, সত্য ব্যবহার,পরোপকার ইত্যাদি আধ্যাত্মিক শুদ্ধতার বাহ্য লক্ষণ। এই সকল পবিত্রতা লাভ না করিলে প্রেমোদয় হয় না।

তৃতীয়ত;—প্রেম স্বরূপ যিনি, তাঁহাকে লাভ করিলেই প্রেম লাভ হয়। তাঁহাকে লাভ করিবার পথে যতক্ষণ অন্য কোনও ব্যক্তি থাকেন, তিনি গুরুই হউন, মহাপুরুষই হউন—এরূপ হইলে প্রকৃত প্রেম হয় না। যাঁহার সহিত প্রেম হইবে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ যোগ হওয়া চাই। মধ্যস্থলে আকাশের ব্যবধান থাকিলেও প্রেম হয় না। অখণ্ড যোগই প্রেমের পরিণতি।

প্রেমাস্পদকে না জানিলে, কিরূপে প্রেম হইবে? যতক্ষণ সাধক তাঁহাকে জানেন না, ততক্ষণ প্রেম হয় না। খৃষ্টেতে প্রেম স্থাপিত হইলেই খৃষ্টানের প্রেম হয়, চৈতন্যে প্রেমোদয় হইলেই বৈষ্ণবেরা কৃতার্থ হন; কিন্তু ব্রাহ্ম-প্রেম সেরূপ নহে। পরব্রহ্মের সহিত আধ্যাত্মিক যোগ ভিন্ন এই প্রেমের উদয় হয় না। পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগই ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীর ব্রহ্ম-প্রেম।

এস্থলে বলা আবশ্যক, ধন মানে প্রেম অপেক্ষা ঈশা, মুষা, চৈতন্যে প্রেম, শ্রেষ্ঠ প্রেম; তাহাতে চিত্তের সাধুভাব সকল জাগ্রত হয়, সাধুভক্তির উদয় হয় এবং মনকে ধর্ম্মপথে রক্ষা করে; কিন্তু তাহাও অনিত্য প্রেম। সত্য স্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতি প্রেম ভিন্ন কেহ নিত্য প্রেম লাভ করিতে পারেন না। অতএব ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎ যোগ স্থাপনই ব্রহ্মপ্রেম লাভের একমাত্র উপায়।

আমি সর্ব্বপ্রথমে যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি,তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া উপসংহার করিতেছি। উৎসবক্ষেত্রে প্রভু পরমেশ্বর যাঁহাদের কণ্ঠে প্রেমের মালা দিয়াছেন, সে মালা আর কিছুই নয়, ব্রহ্মের সহিত যোগ। এই যোগ রক্ষা করিতে পারিলেই, মালার সম্মান রক্ষা করা হয়। পৃথিবীর রাজা যদি কাহাকেও কোনও উপহার প্রদান করেন, তবে তাহা কত যত্নে সে রক্ষা করিয়া থাকে। রাজদত্ত দ্রব্য বলিয়া কত আদর যত্নে তাহা রক্ষিত হয়। শুনিয়াছি, বহু শতাব্দী পূর্ব্বে হিন্দু রাজগণ ব্রাহ্মণদিগের গলদেশে যজ্ঞোপবীত প্রদান করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি ব্রাহ্মণ সন্তানগণ তাহা কত যত্নে রক্ষা করিতেছেন। মহান্ রাজাধিরাজ পরমেশ্বর কৃপা করিয়া শুভক্ষণে আমাদিগকে যে মহামূল্য প্রেমধন দান করিয়াছেন, তাহা কি আমরা প্রাণপণে রক্ষা করিব না? অদ্য বিশেষভাবে এই চিন্তাই আমার মনে উদয় হইতেছে। তিনি যাহা প্রদান করিয়াছেন, তাহা যেন বক্ষে ধারণ করিয়া গৃহে যাইতে পারি। তবেই জীবন ধন্য হইবে। ব্রাহ্ম ভাই, ব্রাহ্মিকা ভগিনি! আজ তোমাদিগকে বিনয়ের সহিত অনুরোধ করি, প্রভু পরমেশ্বরের দান উপেক্ষা করিও না, হৃদয়ের মধ্যে অতি সংগোপনে তাহা রক্ষা কর। উৎসবের শেষ দিনে ইহা আমার প্রাণগত অনুরোধ।

এইরূপে মাঘোৎসব শেষ হইল। এবার উৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত স্থান হইতে প্রায় দুই শত ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা আসিয়া উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। মেদিনীপুর, কাঁথি, বাগনান, বানিবন, হাবড়া, জঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগর, কোন্নগর, চুঁচুড়া, রামপুরহাট, মুর্শীদাবাদ চণ্ডীবাড়ী, দাহগড়া, পাবনা, পিঙ্গনা, বাখির, সাঁকিপুর, আরা, ডোমরাউন, বারসুঁই, কুমারখালী, মজফরপুর, বাঁকুড়া, নলধা. রাজসাহী, বনগ্রাম, ঢাকা, পুরুলীয়া, কুষ্টিয়া, হোসেঙ্গাবাদ, নাগপুর, সিউরি, ঝান্সী, খলিলপুর, জগন্নাথপুর, যশোহর, পিরিজপুর, সিরাজগঞ্জ, মাণিকদহ, ফরিদপুর, বাগআঁচড়া, খালোড়, মালদহ, ভাগলপুর, চন্দননগর, খুলনা, হাজারিবাগ, বরাহনগর, জলপাইগুড়ী, লক্ষৌ, চেরাপুঞ্জি ও ময়ূরভঞ্জ, কোথ প্রভৃতি।

উৎসব উপলক্ষে অনেক দান পাওয়া গিয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিশেষ দান করিয়াছেন।

পূর্ণিয়ার শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দাস অতিথিগণের বিছানা ক্রয়ের জন্য ৫০৲ টাকা দিয়াছেন।

শ্রীমতী থাকমণি ঘোষ উদ্যান সম্মিলনের নেবু সন্দেশাদির জন্য ৫৫৲ টাকা দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায় আনন্দবাজারের জন্য ১৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বাবু নীলরতন সরকার বালকবালিকা-সম্মিলনের দিন সমুদয় বালকবালিকা এবং মফঃস্বল হইতে আগত অতিথিদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছেন এবং বালক বালিকাদিগকে ফুলের মালা ও তোড়া উপহার প্রদান করিয়াছেন।

ভক্তিই ধর্ম্মজীবনের সার।

(প্রাপ্ত)

স্বর্গ বলিলে সাধারণ লোকের মনে কি ভাবের উদয় হয়? উর্দ্ধদিকে কোনও স্থান বিশেষ। সেই স্থানের বর্ণনা করিতে হইলে তাহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন—"তাহা পুণ্যধাম; ধার্ম্মিক ব্যক্তি সে স্থানে বাস করেন। সে স্থানে কোনও অভাব নাই—সকলেই আনন্দ সুখ ও শান্তিতে বাস করেন।" স্বর্গে কেবল পুণ্যাত্মারা বাস করেন তাহা নহে, সেই স্বর্গে জগতের অধিপতি ঈশ্বরও বাস করেন। স্বর্গ পৃথিবী অপেক্ষা সুন্দর ও উৎকৃষ্ট স্থান এবং নরনারী অপেক্ষা উন্নতজীবের বাসভূমি ও ঈশ্বরের বাসস্থান, ইহাই সাধারণ লোকের স্বর্গের ভাব।

আমাদের স্বর্গ সম্বন্ধে ভাব কি? আমরা উর্দ্ধদেশে কোনও স্থান বিশেষকে স্বর্গ মনে করি না। আমরা ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া বিশ্বাস করি—তিনি সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন—সুতরাং স্বর্গের যে প্রথম লক্ষণ—ঈশ্বরের অধিষ্ঠান ভূমি—সেই সম্বন্ধেই আমাদের সঙ্গে উল্লিখিত মতে মিল নাই। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী—তিনি যখন সকল স্থানেই আছেন তখন উর্দ্ধে কোনও স্থান বিশেষে স্বর্গ আবদ্ধ থাকিতে পারে না—স্বর্গ সকল স্থানেই হইতে পারে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, "ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন বটে; কিন্তু যে স্থানে পুণ্যাত্মারা বাস করেন, সে স্থানকেই স্বর্গ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সাধু ও পুণ্যাত্মাদিগের জন্য যে স্থান আছে, বিশেষ মৃত্যুর পর যেখানে যাইতে হইবে, তাহাই স্বর্গ।" মানুষ কি কেবল মৃত্যুর পরেই পুণ্যাত্মা হয়, তবে পুণ্যাত্মা লোক কি এই পৃথিবীতে বাস করিতে পারেন না? সুতরাং স্বর্গকে কোনও দেশে ও কালে আবদ্ধ করা যাইতে পারে না। স্বর্গ সকল কালে ও সকল দেশে হইতে পারে।

এইরূপ সকলেই এক স্বর্গলোক, পুণ্যলোকের ভাব জীবনে পোষণ করেন। আমরা এই পৃথিবীতে থাকিয়াই সেই পুণ্যলোকে বাস করিতে পারি, সেই স্বর্গের আস্বাদন পাইতে পারি—ইহাই আমাদের বিশ্বাস! আমাদের জীবন, আমাদের সমাজ সেই স্বর্গ রাজ্য হইবে সেই পুণ্যলোকের আভাস মানুষকে প্রদান করিবে। জগতের লোক বলে এই পৃথিবীতে স্বর্গ হয় না, আমরা বলি এই পৃথিবীতেই স্বর্গ হয়। এই যে আমাদের কথা, তাহা কার্য্যে পরিণত হয় না কেন? আমাদের জীবনে, আমাদের সমাজে সেই স্বর্গ রাজ্যের ছায়া কেন পড়িতেছে না? আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ যায় না কেন? সমাজের মধ্যে প্রেম ও শান্তি স্থাপিত হয় না কেন? আমাদের বিশ্বাসে কি ভ্রম আছে? আমরা কি অসাধ্য সাধন করিতে যাইতেছি? এরূপ মনে হয় না। কিন্তু মানবাত্মার যে প্রকার অবস্থা হইলে স্বর্গের শোভা প্রকাশ পায় সেই উপকরণের অভাব। পিতা ও পুত্র এক স্থানে বাস করিতে পারেন, কিন্তু সন্তান যদি পিতার প্রতি শ্রদ্ধা বিহীন হয়, পিতা যদি পুত্রের প্রতি স্নেহ হীন হন, সেখানে পিতা পুত্রের সম্বন্ধের মধুরতা দেখা যায় না। মানবাত্মা যখন ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার প্রকৃত সম্বন্ধে উপস্থিত হয়, তখনই স্বর্গের শোভা প্রকাশ পায়। সেই সম্বন্ধ প্রেমের মিলন। যখন মানবাত্মা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ভরে পরমেশ্বরের পূজা, বন্দনা ও গুণগান করে, তখনই ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক জীবনে স্বর্গের শোভা পায়। ভক্তিহীন জীবনে ধর্ম্মের শোভা প্রকাশ পায় না। জগতের সৌন্দর্য্য প্রেমে, আর ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য কি প্রেমহীনতায়? তর্ক করিবার জন্য বলিতে পারা যায়, "কেন জ্ঞান চাই, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান চাই, তবেই স্বর্গ হয়। ভক্তিকে সর্ব্বপ্রধান স্থান কেন দাও?" জ্ঞান, নীতি কি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কাহাকেও তাড়াইয়া দিবার কথা হইতেছে না। এ সকলই থাকিতে পারে, অথচ জীবন ভক্তিহীন হইলে, স্বর্গ দূরে থাকুক, ইহা শ্মশান তুল্য স্থান হইয়া যায়।

বর্ত্তমান সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির প্রতি নানা প্রকার অভিযোগ আসিতেছে। ভক্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করা হইতেছে। আর 'বর্ত্তমান জনসমাজ এরূপ অবস্থায় অবস্থিত আছে যে, ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ ভক্তিকে রক্ষা করাকঠিন হইয়াছে। কিন্তু স্থিরভাবে চিন্তা করিলে কি দেখিতে পাই? ভক্তি ও ভক্তজীবন সম্বন্ধে যে সকল অভিযোগ দেখা যায় তাহা কি সত্য? চুণ খাইয়া পুড়িলে দধিকে কি কেহ ভয় করে, ভক্তজীবনের অভাব দেখিয়া ভক্তিকে—ধর্ম্মজীবনের সার বস্তুকে, দূরে নিক্ষেপ করিলে কেবল বিচার শক্তির হীনতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

বিনয়, দীনতা ও শ্রদ্ধা, ভক্তির সহায়। অতিরিক্তব্যক্তিত্ব, নিন্দা ও সমালোচনা, ভক্তির বিরোধী। বর্ত্তমান সময়ে সকল কার্য্যই যেন যন্ত্রের দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া মানুষ জ্ঞানী হইতে পারে, দেশে নানাপ্রকার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ভাল লোকও হইতে পারা যায়। এমন কি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে অকর্ম্মণ্য লোকও সৎকর্ম্মশীল হইতে পারে, কিন্তু এরূপ কোনও যন্ত্র নাই, যাহাতে আরোহণ করিলে মানুষ ভক্ত হইতে পারে। প্রেমজগতের সূক্ষ্ম নিয়মের অধীন না হইলে, প্রেম হয় না। ঈশ্বরের প্রীতি, ধর্ম্মের সার, মানব প্রীতি ইহার বল। মহাত্মা যীশু এই তত্ত্বের সার বুঝিয়াছিলেন, তাই এক কথায় সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রের এই সার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন,—"সমুদয় হৃদয়ের সহিত ঈশ্বরকে প্রেম কর, ইহাই প্রথম উপদেশ। তৎপরে তোমার প্রতিবেশীকে আত্মবৎ প্রীতি কর।" মহর্ষি নারদ ব্যাস মুনিকে যে ভক্তি শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহারও তাৎপর্য্য এই।

'নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়েনচ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ।' উক্তি, ভগবানের উক্তরূপে লিখিত হইয়াছে,—"আমি বৈকুণ্ঠেও বাস করি না, যোগিদিগের হৃদয়েও থাকি না, যেখানে আমার ভক্ত গান করেন, আমি সেই খানেই থাকি।" ঈশ্বরের আবির্ভাব সর্ব্বত্রই আছে। কিন্তু ভক্ত যেথানে ভক্তিতে তাঁহার পূজা বন্দনাদি করেন, সেই খানেই স্বর্গের ছবি প্রকাশ পায়।

ভাবুকতাতে এবং যথার্থ ভক্তিতে অনেক প্রভেদ। নারদের ভক্তি-তত্ত্ব, শাণ্ডিল্যের ভক্তি-ব্যাখ্যা পাঠ করিলে ভক্তি কি তাহা বুঝা যায় না। ঈশ্বরকৃপায় যিনি সেই বস্তু প্রাণে এক বিন্দু পাইয়াছেন, তিনিই জানেন ইহা কি বস্তু!

ব্যক্তিগতজীবন ও ব্রাহ্মসমাজের জীবন আলোচনা করিলে বড়ই অভাব দৃষ্ট হয়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, অনেক স্থানেই ব্রাহ্ম জীবনের অবস্থা এই ভক্তি সাধনের অনুকূল নহে। তার পর জীবনের গতিও ভিন্ন দিকে ধাবিত। ভক্তজীবন সমাজের প্রাণ। অনেক স্থলে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রহ্মোপাসনা-ক্ষেত্র যে আকর্ষণ শূন্য হইয়া পড়িতেছে, তাহার কারণও এই, যেখানে ভক্ত জীবনের বস্তু নাই এবং যেখানে ভক্তি বিকাশ পায় না, সেখানে মানবপ্রাণ স্ফূর্ত্ত হইতে পারে না। যাঁহারা ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহারা সমাজের লোককে মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় এক প্রাণ করিয়া রাখেন। কিরূপে পরস্পরের মধ্যে মিল হয়, কি প্রকারে সমাজের কার্য্য ভাল রূপে চলে, তাহার চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু যথার্থ উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে না। জীবনকে পরিত্রাণের পথে যদি লইয়া যাইতে চাই, সমাজকে যদি জীবন্ত করিতে চাই, তবে জীবনে ভক্তি মন্ত্রসাধন করিতে হইবে। ঈশ্বর-প্রেম প্রাণে জাগ্রত হউক, ঈশ্বর-প্রীতি জীবনকে অধিকার করুক, ভক্তের সংখ্যা ব্রাহ্মসমাজে বর্দ্ধিত হউক, মহা পরিবর্ত্তন আসিবে। অনেক সময়ে কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে যাইয়া, সার বস্তুকে ফেলিয়া দিয়াছি। সাধুভক্তদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁহাদিগকে সেবা করা এবং জীবে প্রেম ও নামে রুচি ভক্তি লাভের উপায়। ব্রাহ্মসমাজে এই সকল উপায়ের প্রতি আস্থা বর্দ্ধিত হওয়া আবশ্যক। যেমন জ্ঞানীর চরণে বসিয়া জ্ঞান শিক্ষা করা যায়, তেমনই জগতের সকল ভক্ত সাধুর চরণে বসিয়া ভক্তি-তত্ত্ব শ্রবণ এবং লাভ করিতে হইবে।

যদি ভক্তিগত জীবনে স্বর্গের ছবি দেখিতে চাই, যদি ব্রাহ্মসমাজ নরনারীর প্রাণ জুড়াইবার স্থান করিতে চাই, আমাদিগকে ভক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে, প্রেম মন্ত্র সাধন করিতে হইবে। মহাত্মা পল জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছিলেন, প্রেমই ধর্ম্মের সার। জীবনের প্রারম্ভে তিনি বিশ্বাসকেই সর্ব্বোপরি স্থান দিতেন। কিন্তু সকলের শেষে প্রেমকে বিশ্বাসের উপর দাঁড় করাইয়া বলিলেন,—"Faith hope and love abide, but the greatest of these is love" বিশ্বাস, আশা ও প্রেম চিরদিন থাকিবে; কিন্তু প্রেমই সর্ব্ব প্রধান স্থানীয়।" ভক্তি-তত্ত্ব শিক্ষা ও ইহা লাভের সূচনা জীবনে ঈশ্বরের করুণা দর্শন করিয়াই হয়। "I love Him because He has loved me first." "তাঁহাকে ভাল বাসি, কারণ তিনি আমাকে প্রথম ভাল বাসিয়াছেন।" জীবনে ঈশ্বরের করুণাকে কে অস্বীকার করিতে পারে? যখনই স্থিরচিত্ত আপনার গুপ্ত ঘরে বসিয়া চিন্তা করি, তখনই সেই প্রেমের চিহ্ন জীবনে দেখিয়া ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাতে তাঁহার চরণে অবনত হই। প্রেম, প্রেমকে উৎপন্ন করে। ঈশ্বরের করুণা দেখিলেই জীবনে প্রেমের সঞ্চার হয় এবং নরনারীর প্রতি প্রেম ছড়াইয়া পড়ে।

বাহিরের এবং ভিতরের নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া এই প্রেমকে বর্দ্ধিত করিতে হয়। পূর্ব্বে কয়েকটী উপায় উল্লেখ করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তিনটী উপায় উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা গেল। ১ম উপায় ভক্ত-সঙ্গ। অগ্নির সংস্পর্শে বসিলে যেমন উত্তাপ অনুভব করা যায়, তেমনি ভক্ত-সঙ্গে উপবেশন করিলে জীবনে ঈশ্বর-প্রীতি জাগ্রত হয়। ২য় উপায়, ভগবানের গুণকীর্ত্তন, শ্রবণ ও প্রসঙ্গ। ৩য় উপায়—জীবে দয়া ও জীব সেবা।

ঈশ্বর করুন আমরা জীবনে ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হই।

দরবেশগণের যোগরহস্য।

(উদ্ধৃত)।

গত ১লা মাঘের "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকায় "দরবেশগণের যোগরহস্য" সম্বন্ধে একখানি প্রেরিতপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে পাঠকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা পত্রখানি অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"এই বর্ত্তমানযুগে গুরুবাদের এমনই প্রভাব বাড়িয়াছে যে, ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি পবিত্র বিধানের বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক কেহ কর্ত্তাভজা, কেহ ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক অস্বাভাবিকউপায়ে মনঃকল্পিত দেবতার দর্শনকামনায় উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক ও মার্জ্জিত জ্ঞানের জলন্ত দৃষ্টান্ত সত্বেও অবৈজ্ঞানিক ও আদর্শনিক

ভাব প্রদর্শন করিতেছেন। এই সকল বিস্ময়কর ব্যাপারদর্শনে বিস্ময়সাগরে একেবারে নিমগ্ন হইয়াছি। কেন, আমি বিদ্যাবুদ্ধিহীন নিতান্ত অর্ব্বাচীন হইয়াও যখন দরবেশদিগের কল্পিত যোগাদি সাধন ও কল্পিত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মদর্শন করিয়া তাহা ঘৃণার সহিত পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এ পর্য্যন্ত নিজ বিশ্বাস উজ্জ্বল রাখিয়াছি, তখন উঁহারা বিদ্যাবুদ্ধিসত্বে কিরূপে নর-পূজা, গুরু-পূজা ও ভূত-পূজা করিতে সম্মত হইলেন, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর!

আমি সাধারণের বিদিতার্থ দরবেশদিগের সাধন-প্রণালী ও নিজ জীবনে এবং সমসাধকগণের জীবনে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

দরবেশদিগের নিকট কোনও দীক্ষার্থী উপস্থিত হইলে, গুরু তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়া কোনও একটী বস্‌জোখ্ (আবরণ) দেন। বস্‌জোখ্ প্রধানতঃ তিন প্রকার; যথা কোন সুন্দরী নারী চিন্তা, নিজরূপ চিন্তা ও সূর্য্যমণ্ডলে দীক্ষা গুরুর চিন্তা।

নারী-চিন্তা। কোন সুন্দরী রমণীর মুখমণ্ডল সুন্দররূপে মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া হেফ্‌জদম্ (শ্বাস রোধ) পূর্ব্বক সাধক সর্ব্বদা ঐ রমণীর রমণীয় মুখমণ্ডল চিন্তা করিবেন। এইরূপে কিছু দিন চিন্তা করিতে করিতে, যখন মোরাকেব (চিন্তাতে মন মগ্ন) হইয়া যাইবে, তখন সেই নারী সাধকের মানসচক্ষের নিকট অপ্সরানিন্দিত রূপ ধারণ করিয়া নগ্ন বেশে প্রকাশিত হইবেন এবং সাধক যে নারীর চিন্তা করিবেন তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় তাঁহার সন্দর্শনের জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করিবেন। দরবেশগণ বলেন, এস্ক মেজাজি না হইলে, এস্কহকিকি লাভ হয় না। এস্ক মেজাজি শব্দের অর্থ নারীর প্রতি আসক্ত হওয়া। আমার দুই তিন জন বন্ধু বা সমসাধক উক্ত বস্‌জোখে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তন্মধ্যে জনৈক কুমার সমসাধক ভয়ঙ্কর ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইয়া, আপনাকে তিন চারি মাস কলঙ্কিত রাখিয়াছিলেন। পরে তিনি অনুতপ্ত হইয়া গুরুর চরণ ধারণপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হন।

নিজরূপ চিন্তা। দর্পণে নিজ মুখ সর্ব্বদা অবলোকন করিতে করিতে, যখন মনের মধ্যে নিজ মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত হইল, তখন শ্বাসরোধপূর্ব্বক প্রত্যহ চারি পাঁচ ঘণ্টা গভীর চিন্তার নিমগ্ন হওয়া আবশ্যক। এইরূপে কিয়দ্দিন চিন্তা করিলে নিজ দেহের প্রতিরূপ সর্ব্বত্র অর্থাৎ অন্তরে বাহিরে দেখা যাইবে। (আমার জনৈক সাধক বন্ধু বলেন, সকল সময়ে বা সর্ব্বত্র দেখা যায় না।) নিজ দেহের জ্যোতিঃপূর্ণ প্রতিরূপ দর্শনকে দরবেশগণ মলকুত মোকামে রুহেরদিদার (আত্মার-দর্শন) কহেন। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর সাধকগণ নিজ দেহের প্রতিরূপ দর্শনকে আত্মার দর্শন বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, আপনার মধ্যে ঈশ্বরের জ্ঞান প্রেম ইত্যাদি সুন্দররূপে দর্শন করাই রুহেরদিদার বা আত্মদর্শন। ইটি সাধন করিয়াছি।

সূর্য্যমণ্ডলে গুরু দর্শন। অরুণোদয়ের সময় অঙ্গুলির উপর অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া তচ্ছিদ্র দ্বারা সূর্য্যের তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় গোলাকার মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে গুরুর মূর্ত্তি কুম্ভকের সহিত কিয়দ্দিবস চিন্তা করিলে সাধক মানস-চক্ষে দেখিবেন যে, সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে তাঁহার গুরু বিরাজ করিতেছেন। ইহাকে দরবেশগণ সমছ (সূর্য্যের) বস্‌জোখ্ কহেন। ইহা সাধন করিয়াছি।

জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মদর্শন। ইহা সাধন করিবার অগ্রে সাধককে অন্ততঃ পঁচিশ মিনিট শ্বাসরোধ অভ্যাস করিতে হইবে। পরে নবদ্বার বন্ধ করিয়া ললাটে দৃষ্টি ও চিন্তা স্থাপনপূর্ব্বক প্রত্যহ একাসনে তিন চারি ঘণ্টা সাধন করা একান্ত আবশ্যক। এইরূপে কিছুদিন সাধন করিলে প্রথমতঃ ললাট হইতে জ্যোতির কণাসকল বাহির হইতে থাকে। সময়ে সেই কণাগুলি ক্রমশঃ বৃহৎ হইয়া সাধককে জ্যোতির সাগরে ডুবাইয়া দেয়। কোন কোন সাধক ঐ জ্যোতির মধ্যে গুরুরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার দীক্ষা গুরুকে দর্শন করেন, কিন্তু আমি কেবল জ্যোতির সাগরে ডুবিয়া যাইতাম। এইরূপ জ্যোতিদর্শনকে অজ্ঞ সাধক জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম মনে করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। ইহা সাধন করিয়াছি।

ফনোফেল গুরুর (দেহের লয়প্রাপ্তি)। সাধক নিজরূপ চিন্তা করিতে করিতে এমনি দৃষ্টিবিকার প্রাপ্ত হন যে, তিনি আপনাকে সর্ব্বত্র দর্শন করেন।

ফনোফেহ শে'য়াগ্ (গুরুতে লয়প্রাপ্তি)। গুরুরূপ নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে, দীক্ষাগুরুকে সর্ব্বত্র দর্শন করা ফেনোফেহ শেয়াখ। ইহা বলা বাহুল্য যে, সাধক আপনাকেও ইহাতে গুরুর মত দর্শন করেন। উন্নত সাধকগণ গুরুরূপ অর্থাৎ গুরুর মধ্যে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যরূপে ঈশ্বরের যে প্রকাশ তাহাই চিন্তা করিয়া উক্ত জ্ঞান প্রেম পুণ্যাদিতে আপনাকে পূর্ণ বোধ করেন।

ফনোফেরসুল (হজরৎ মহম্মদে লয়প্রাপ্তি)। খোলাসোতল্‌আম্বিয়া প্রভৃতি গ্রন্থে হজরৎ মোহম্মদের যেরূপ রূপ বর্ণন আছে, তাহা মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া, শ্বাসরোধপূর্ব্বক কিছুদিন চিন্তা করিলে উক্ত সাধক হজরতের রূপ সর্ব্বত্র দর্শন করেন। সাধক এ অবস্থায় আপনাকে হজরতের ন্যায় দেখেন। উচ্চ শ্রেণীর দরবেশগণ হজরতের মধ্যে ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ইত্যাদির জলন্ত প্রকাশ দর্শন করিতে করিতে, তাহার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন অর্থাৎ হজরৎ মোহম্মদে আমিত্ব নাশ করিয়া, তাঁহার সহিত অভিন্নভাবে জ্ঞান প্রেম পুণ্যাদিতে স্থিতি করেন। ইহাই প্রকৃত ফনোফেরসুলের দরেশ।

ফনোফিল্লা (ঈশ্বরে লয়প্রাপ্তি)। ইহা সাধন করিবার জন্য সাধক প্রথমে গভীর সত্যচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আমিত্ব নাশপূর্ব্বক ভেদাভেদজ্ঞানশূন্য হইয়া যখন নিরন্তর ব্রহ্মে স্থিতি করেন, তখন তাহাকে ফনোফিল্লা (ঈশ্বরে লয়প্রাপ্তি) কহে। ফনোফিল্লার অবস্থায় সাধক অদ্বৈত ভাবাপন্ন হইয়া অনোল্ হক্ (সোহং) শব্দ উচ্চারণ করেন, এজন্ত নিজের ক্ষুদ্রত্ব, দাসত্ব ইত্যাদি স্মরণ করিয়া, দ্বৈত অদ্বৈত ভাবের সম্মিলনভূমিকে আশ্রয়পূর্ব্বক স্থিতি করেন। ইহাকে দরবেশিমতে ফনোফেল বকো কহে। ইহার উপর দরবেশদিগের আর উচ্চ সাধন নাই।

ফনোফেরছুল, ফনোফিল্লা ও ফনোফেল বকো, এই ত্রিবিধ অবস্থা লাভ করি নাই, সাধকগণের নিকট শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম, সুতরাং নির্ভুল হইতে পারে না।

দরবেশি মত চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যথা কাদ্‌রিয়া, চিস্তিয়া, নক্সবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদিয়া। ইহার মধ্যে কেবল নক্সবন্দিয়া মতে বরজোথ নাই। ইহারা বলেন, বরজোথ ও পৌত্তলিকতা স্বতন্ত্র নহে।

হাবড়ার কিঞ্চিৎ পশ্চিম কাসুন্দিয়া গ্রামে তাপস নেহালুদ্দিন সাহ নামক যে দরবেশ ছিলেন, তাঁহার একটি হিন্দু শিষ্যার প্রমুখাৎ যাহা শুনিয়াছি, তাহা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। উক্ত নারী বলেন, যখন আমি ধ্যান করিতে বসি, তখন আমার সম্মুখে কালীঘাটের কালীমন্দির উপস্থিত হয়। পরে অনতিবিলম্বে মা স্বয়ং দ্বারের অর্গল উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া আমাকে দর্শন দেন। আমার ঈশ্বরপ্রাপ্তির বাকি কি?

কলিকাতা শিয়ালদহ নামক স্থানে হাজি মোহম্মদ সাহ নামে এক জন দরবেশ বাস করেন। তাঁহার জনৈক শিষ্য সাধন ভজন করিবার সময়, কখন রোদন, কখন বক্ষে করাঘাত, কখন ভূতলে অবলুণ্ঠন ও কোন কোন সময় অট্টহাস্য করেন। সে ব্যক্তির অবস্থা দর্শনে আমার অত্যন্ত সন্দেহ হয় এবং তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া বলি যে, তুমি কি দেখিয়া থাক, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। যাহা দেখিয়া থাক, তাহা তোমার মনঃকল্পিত দেবতা ভিন্ন কিছুই নহে। তদুত্তরে তিনি বলেন, যখন আমি সাধন করিতে বসি, তখন আমার প্রিয় (দীক্ষাগুরু) আমার সম্মুখে উপস্থিত হন। এই কথা বলিয়া উক্ত সাধক রোদন করিতে থাকেন। পরে তাঁহাকে নিরাকার ঈশ্বর দর্শন সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলে, তিনি বলিলেন আমার কিছুই হয় নাই; আমি হিন্দুদের ন্যায় পুত্তলিকা লইয়া ক্রীড়া করিতেছিমাত্র।

মুন্সি গোলাম পাঞ্জাতন প্রভৃতি কতিপয় সাধকের জনৈক শিষ্য বলেন, আমি ঈশ্বর লাভ করিয়াছি। পরে নানা কৌশলে জানিলাম, তিনি রূহের দিদার (নিজ দেহের প্রতিরূপ দর্শন) করিয়াছেন।

তাপস নেহালুদ্দিন সার জনৈক শিষ্য (আমার প্রতিবেশী) ধ্যানের সময় গুরুর জ্যোতিঃপূর্ণ দিব্য মূর্ত্তি দর্শন করিতেন ও সময়ে সময়ে প্রশ্ন করিয়া তাঁহার নিকট সদুত্তর লাভ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইতেন। দুঃখের বিষয়, তিনি ঐ গুরুমূর্ত্তিকে ঈশ্বরজ্ঞানে নিজ আত্মার উন্নতি সাধনে পরাঙ্মুখ ছিলেন। আমি কয়েকটী ঘটনার দ্বারায় উহা সুন্দররূপে বুঝিয়াছিলাম। উক্ত সাধক অনুমান পনের বৎসর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আমার জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় নিমাইচরণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তাভজা ছিলেন। আমি তাঁহার নিকট দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় দীক্ষিত হইয়া অনুমান চারি পাঁচ বৎসর সাধন ভজন করিয়াছিলাম। জ্যেষ্ঠতাত প্রায়ই বলিতেন, আমি সতী মায়ের (৺রামশরণ পালের স্ত্রী ও ৺দুলালচাঁদের মাতা) জ্যোতিপূর্ণ দিব্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকি; তুমি চেষ্টা কর, অচিরে মায়ের পাদপদ্ম লাভ করিবে। কিন্তু আমি দরবেশি গ্রহণ করিয়া যেমন প্রত্যহ উনিশ কুড়ি ঘণ্টা কঠোর সাধন করিতাম, সেইরূপ সাধনের অভাবে সতীমায়ের দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই নাই। সুতরাং আমি উক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পাছে বা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি এই ভয়ে তিনি প্রায়ই বলিতেন, ব্রহ্মজ্ঞানীরা কিছু পায় না, কিছু দেখে না, কেবল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধোঁয়া বা অন্ধকার দেখে; উহাদের মাথা মুণ্ড মত; কথায় বলে 'অদৃষ্টে ভাবনা নাস্তি'। কিছুদিন পরে দরবেশি গ্রহণ করিয়া, অনুমান তিন চারি বৎসর কঠোর সাধনাদি দ্বারা কল্পিত দেবদর্শন করিয়া সুখী হইতে পারিলাম না। কেন না আমি হিন্দুধর্ম্মসাধনের সময় বহুদিন সূর্য্যমণ্ডলে নারায়ণের ধ্যান করিয়াছিলাম। পরে গুরু সন্নিধানে গমন করিয়া, বলিলাম যে, আমি কল্পনাপ্রসূত দেবদর্শন লাভ করিয়া, আদৌ সুখী হইতে পারিতেছি না; আপনি আমাকে যথার্থ মোহম্মদী ধর্ম্ম দিন। আমার কথাশ্রবণে তিনি ক্ষণকাল সান্ত্বনার জন্য উপদেশ দিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, আমার মন কিছুতেই শান্তিলাভ করিতেছে না, তখন নিরুপায় হইয়া ঈশ্বরের সত্তা চিন্তা শিক্ষা দিয়া বলিলেন, আমরা অজ্ঞ সাধককে বশীভূত করিবার জন্য ঐরূপ বরজোথ শিক্ষা দিয়া থাকি, কারণ গুরুবাক্যে শিষ্যের অকৃত্রিম ভক্তি বিশ্বাস না জন্মিলে বৈরাগ্যাদির দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া সংসারে পলায়ন করে। পরে উঁহার নিকট আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের গুণের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মসমাজে গমন ও যোগদান পূর্ব্বক উপাসনা ও নির্জ্জনে সত্যসাধন করিয়া এ পর্য্যন্ত স্থিতি করিতেছি। মনঃকল্পিত দেবতার উপাসকগণ সাবধান।

আমার দীক্ষাগুরু (তাপস নেহালুদ্দিন সা) এক দিবস বলিয়াছিলেন যে, আমার নিকট জনৈক মেষপালক আসিয়া দীক্ষিত হইবার জন্য অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করিত। আমি অযোগ্য জ্ঞানে তাহাকে দীক্ষিত করিতাম না। কিন্তু মেষপালক সময়ে সময়ে অত্যন্ত বিরক্ত করিত এবং বলিত খোদাকে (ঈশ্বরকে) কিরূপে ভাবিব? আমি এক দিন বলিলাম মেষের ন্যায় তাঁহাকে চিন্তা কর। তুমি মূর্খ! খোদাতালায় বুঝিবে কি? কিন্তু সেই সবল বিশ্বাসী মেষপালক মেষচারণ করিতে করিতে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া দিব্যমেষজ্ঞানে ঈশ্বরের গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইত। পরে এক দিবস ঘটনাক্রমে উক্ত মেষপালক সন্নিধানে উপস্থিত হই। সে আমাকে দর্শন করিয়া পদতলে গড়াগড়ি দিতে ও রোদন করিতে থাকে, এবং বলে খোদা বেহেস্ত (স্বর্গ নিকেতন) হইতে দিব্য মেষের ন্যায় ভূতলে অবতরণ-পূর্ব্বক আমার চারিদিকে নৃত্য করেন। আমি তাহার ভক্তি বিশ্বাস দর্শনে একান্ত মুগ্ধ হইয়া, উক্ত মেষপালককে প্রকৃত ধ্যান ও দর্শন শিক্ষা দিয়া গন্তব্য স্থানে গমন করি।

ভক্তিভাজন মহাশয়, আপনার অভিলাষমতে নিতান্ত উচিত মনে করিয়া দরবেশদিগের সাধন প্রণালী ও নিজ জীবনে এবং সমসাধকদিগের জীবনে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম। মহাশয়, আমার পত্রখানি অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্মতত্ত্বপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া এ দাসকে কৃতার্থ করিবেন। ধর্ম্মতত্ত্বপত্রিকার উপযোগী প্রবন্ধ লেখা আমার সাধ্যাতীত।"

"আপনারদাসানুদাস শ্রীবিহারীলাল নাথ। মোঃ ধোপাপাড়া।"

ব্রাহ্মসমাজ।

প্রচার যাত্রা—মাঘোৎসবের পরে, পরমেশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া সাধনাশ্রম হইতে একটী প্রচার দল ইতিপূর্ব্বে মফঃস্বলে গিয়াছেন। তাঁহারা রাজসাহী, রঙ্গপুর, কোঁচবিহার হইয়া আসামের স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিবেন; অপর দল পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে যাইতেছেন। আসামযাত্রী প্রথমোক্ত দলে শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঘোষাল এবং শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত গিয়াছেন। শেষোক্ত দলে শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র ঘোষাল এবং অন্য একজন 'সহায়' যাইবেন। মফঃস্বলস্থ

বন্ধুগণের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা যেন প্রভু পরমেশ্বরের নাম প্রচার এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দেয় চাঁদা, তত্ত্বকৌমুদী, মেসেঞ্জারের মূল্য প্রভৃতি আদায় সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করিয়া বাধিত করেন।

উৎসব—বাঁকুড়া হইতে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কেদার নাথ কুলভি লিখিয়াছেন;—

করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ নিম্নলিখিত প্রণালীতে উক্ত সমাজের চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

১১ই ফাল্গুন, শুক্রবার, সায়াহ্নে—উৎসবের উদ্বোধন। ১২ই ফাল্গুন, শনিবার, প্রাতে—উপাসনা। অপরাহ্নে—বক্তৃতা। রাত্রে—সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। ১৩ই ফাল্গুন, রবিবার, প্রাতে—উপাসনা। অপরাহ্নে—বক্তৃতা। রাত্রে—উপাসনা। ১৪ই ফাল্গুন, সোমবার, প্রাতে—উপাসনা। মধ্যাহ্নে—আতুর ও গরিবদিগকে কিছু দান। অপরাহ্নে—নগর সংকীর্ত্তন। রাত্রে—উপাসনা। ১৫ই ফাল্গুন মঙ্গলবার প্রাতে—উপাসনা। মধ্যাহ্নে—শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা। অপরাহ্নে—সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন। সায়াহ্নে—উপাসনা।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার—আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য বিভাগে ময়ূরভঞ্জের মহারাজা ৫০৲, কলিকাতা নাথের বাগানের জমিদার শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পারিবারিক শুভানুষ্ঠান উপলক্ষে ১০৲, এবং খলাসির জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু ১০৲ টাকা এককালীন দান করিয়াছেন।

বিবাহ—ঢাকাস্থ ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র শ্রীমান সীতাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বাগআঁচড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হলধর মল্লিকের কন্যা শ্রীমতী সুহাসিনীর বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—প্রাঙ্গনে বিবাহ হয়। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

গত ২৭ শে মাঘ, ভাগলপুর নগরে আর একটী ব্রাহ্মবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্র মেদিনীপুর নিবাসী বাবু দুর্গানারায়ণ বসুর তৃতীয় পুত্র শ্রীমান হেমেন্দ্র নাথ বসু, পাত্রী ভাগলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বামাচরণ ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বিমলা ঘোষ। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। উভয় বিবাহই রেজেষ্টরী হইয়াছে। পরমেশ্বর নবদম্পতিদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নামকরণ—শ্রীযুক্ত বাবু নীলরতন সরকারের দ্বিতীয় সন্তান (কন্যার) এবং শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ সরকারের দ্বিতীয় সন্তানের (পুত্রের) নামকরণ একযোগে সম্পন্ন হইয়াছে। বালিকার নাম নির্ম্মলনলিনী এবং বালকের নাম সচীন্দ্রনাথ রাখা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের প্রথম সন্তানের (পুত্রের) নামকরণ সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। বালকের নাম হিরন্ময় রাখা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোমের প্রথম সন্তানের (পুত্রের) নামকরণ সম্পন্ন হইয়াছে। বালকের নাম অমলচন্দ্র রাখা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত উপাসনা করেন।

সাধনাশ্রমে ক্রমান্বয়ে তিন দিনে নিম্নলিখিত তিনটী নামকরণ হইয়াছে;—বনগ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মবন্ধু আব্দুল গফুরের কন্যার নাম শ্রীমতী সুফিয়া ও রাবেয়া এবং পবিত্রকুমারী রাখা হয়।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর চতুর্থ সন্তানের (পুত্রের) নাম শ্রীমান অজিত কুমার রাখা হয়।

শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র ঘোষালের দ্বিতীয় সন্তানের (পুত্রের) নাম শ্রীমান সুবিমলচন্দ্র রাখা হয়। এই তিনটী অনুষ্ঠানেই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

আব্দুল গফুর স্বীয় কন্যার নামকরণ উপলক্ষে সাধনাশ্রমে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। পরমেশ্বর শিশুদিগকে ধর্ম্মপথে বর্দ্ধিত করুন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান বর্ষের গণ্য অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনিত হইয়াছেন।

সদর—১ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ২ বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, ৩ বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, ৪ ডাঃ প্রসন্নকুমার রায়, ৫ বাবু হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র, ৬ বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, ৭ বাবু দ্বারিকা নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৮ বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস, ৯ বাবু নীলরতন সরকার, ১০ বাবু কালীশঙ্কর সুকুল, ১১ বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১২ বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৩ বাবু আনন্দ মোহন বসু, ১৪ বাবু সীতানাথ দত্ত, ১৫ বাবু উমাপদ রায়, ১৬ ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, ১৭ বাবু দুর্গা মোহন দাস, ১৮ বাবু মধুসূদন সেন, ১৯ বাবু আদিত্য কুমার চট্টোপাধ্যায়, ২০ বাবু শশিভূষণ বসু, ২১ কুমারী কুমুদিনী খাস্তগির, ২২ বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ২৩ বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, ২৪ বাবু বঙ্কুবিহারী বসু, ২৫ বাবু কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, ২৬ বাবু যোগেন্দ্র নাথ মিত্র, ২৭ বাবু হরিমোহন ঘোষাল, ২৮ বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ২৯ বাবু গোবিন্দ নাথ গুহ, ৩০ বাবু পরেশনাথ সেন। মফঃস্বল—১ বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী, খাসিয়া পাহাড়, ২ শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ প্রসাদ লক্ষ্ণৌ, ৩ বাবু ধর্ম্মদাস বসু পুরুলিয়া, ৪ বাবু কেদারনাথ রায় ঢাকা, ৫ বাবু রজনীকান্ত ঘোষ ঢাকা ৬ বাবু ভুবন মোহন সেন ফরিদপুর, ৭ মুন্সী জালালদ্দিন মিঞা জলপাইগুড়ি, ৮ বাবু ভুবন মোহন কর দিনাজপুর, ৯ বাবু পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ঢাকা, ১০ বাবু রাধাকান্ত বন্দোপাধ্যায় মুঙ্গের, ১১ বাবু ব্রজেন্দ্র নাথ শীল বহরমপুর, ১২ বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী ঢাকা, ১৩ বাবু হীরালাল হালদার বহরমপুর, ১৪ বাবু শ্রীনাথচন্দ্র ময়মনসিং, ১৫ বাবু নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর, ১৬ বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগচি পাবনা, ১৭ বাবু পার্ব্বতীনাথ দাস গুপ্ত পূর্ণিয়া, ১৮ বাবু পার্ব্বতীনাথ দত্ত মধ্য ভারতবর্ষ, ১৯ বাবু মধুসূদন রাও কটক, ২০ বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আরা।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মফঃস্বলস্থ অঙ্গীভূত ব্রাহ্মসমাজ হইতে অধ্যক্ষসভার সভ্য মনোনিত হইয়াছেন;—১ বাবু সাতকড়ি দেব কোন্নগর, ২ বাবু কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত কৃষ্ণনগর, ৩ বাবু বিশ্বনাথ কর কটক, ৪ বাবু ভুবন মোহন সেন ফরিদপুর, ৫ বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র টাঙ্গাইল, ৬ বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী সিলং, ৭ বাবু দ্বারিকানাথ সরকার ময়মনসিংহ, ৮ বাবু মধুসূদন জানা কাঁথি।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য হইয়াছেন;—বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, বাবু মধুসূদন সেন, বাবু কালীশঙ্কর শুকুল, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ প্রসন্নকুমার রায়, বাবু বঙ্কুবিহারী বসু।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন;—বাবু আনন্দ মোহন বসু সভাপতি, বাবু রজনীনাথ রায় সম্পাদক, বাবু শশিভূষণ বসু এবং বাবু অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক, বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ ধনাধ্যক্ষ।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৭ই ফাল্গুন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

২৩শ সংখ্যা।
১৭শ ভাগ।

১লা চৈত্র বৃহস্পতিবার, ১৮১৬ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৬।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ৩৲
মফস্বলে ২॥০
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে করুণাসিন্ধু! যাহাকে তুমি যত দেও, তাহার নিকটে তত চাও, যাহার যত আছে, তাহার দায়িত্ব তত অধিক। যে যালোক পায়, সে সে আলোক অনুসারে চলিতে বাধ্য, না লিলে তোমার নিকট অপরাধী। ব্রাহ্মসমাজকে তুমি কি ধন সম্পদের অধিকারী করিয়াছ, তাহা যখন ভাবি তখন ইহার দায়িত্বভার স্মরণ করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ি। তুমি এই ক্ষুদ্র শিশুকে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সত্য রত্নের উত্তরাধিকারী করিয়াছ। যাহার যাহা ভাল আছে, সমুদায় আদর্শরূপে আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতি মধ্যে তোমার সত্যের সাক্ষীস্বরূপ যে সকল সাধু মহাজন জন্মিয়াছেন, সকলের পদধূলি এই শিশুর মস্তকে পড়িতেছে। ইহার অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? কিন্তু প্রভো! এই সঙ্গে সঙ্গেই যে আমাদের দায়িত্বভার বাড়িয়া গিয়াছে। আমাদিগকে যত দিয়াছ, আমাদিগের নিকট তদনুরূপ চাও। হে প্রভো! এই বিষয়েই আমরা অপরাধী হইয়া পড়িতেছি। প্রতিনিয়ত অনুভব করিতেছি যে, এই দুর্ব্বল প্রকৃতির লোকদিগের দ্বারা এই উদার ও মহৎ ধর্ম্মের উপযুক্তরূপ সাধন ও প্রচার হইতেছে না। তুমি আমাদিগকে বল দেও, যেন আমরা কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের দায়িত্বভার পূর্ণ করিতে পারি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বিশ্বাসীর মূলধন—সংসারে যাহারা ব্যবসা বাণিজ্য করে, তাহারা একটা মূলধন স্থির রাখে। মূলধন ছাড়া ব্যবসা চলে না। যে যাহাই করুক মূলধনকে অতিক্রম কখনও করে না। মূলধন যাহাতে নষ্ট না হয়, সেইজন্য সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকে। যদি তাহাকে কেহ একটা বড় দরের কারবারে লাগিতে পরামর্শ দেয়, সে সঙ্কুচিত হইয়া বলে "আমার মূলধন অল্প—পুঁজী কম।" মূলধনের দ্বারা সংসারের ব্যবসায়ী লোকের সকল কার্য্য নিয়মিত হয় এবং সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়—পাছে মূলধন নষ্ট হয়।

সংসারে বিশ্বাসীদিগের অনুষ্ঠিত অনেক মহৎ ব্যাপার দেখিতে পাই। বিশ্বাসীকে কোন বাধা, বিঘ্ন, বিপদ ও ভয়ে ভীত করিতে পারে না। ইহাদের কার্য্য দেখিলে অবাক্ হইতে হয়,—কিন্তু ইহাদের মূলধন কোথায়? এক এক জন দরিদ্র, অসহায় ব্যক্তি সমস্ত সংসারকে কাঁপাইয়া তুলিলেন,—কিসের জোরে, ইহাদের এমন কি পুঁজী ছিল? তাহাদের মূলধন অক্ষয়। সেই মূলধন পরমেশ্বরের করুণা; তাঁহার উপরেই তাঁহাদের নির্ভর। সুতরাং তাহাদের মূলধন কখনও ফুরায় না। যে সকল ঘটনাতে বিষয়ী লোক নিরাশ, ভয়, হইয়া যায়, বিশ্বাসী সেখানে অটল। কারণ বিষয়ীর নির্ভর ক্ষুদ্র পার্থিব ধনে, বিশ্বাসীর নির্ভর ব্রহ্মকৃপার উপরে। তাঁহাদের কি সৌভাগ্য।

এই কারণে দেখি, যখন চারিদিক প্রতিকূল, সকলেই নিরাশার কারণ ভিন্ন কিছু দেখিতেছে না, সকলের বোধ হইতেছে, এই বার এই ব্যক্তি গেল, এমন সময়ে সকলের অতর্কিত ভাবে কোথা হইতে সে ব্যক্তির অন্তরে বল আসিল! সে হঠাৎ বিক্রমশালী বীরের ন্যায় সকল বাধাকে অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইল। জগত স্তব্ধ হইয়া গেল, জানিতে পারিল না যে তাহার অক্ষয় মূলধনের ভাণ্ডার হইতে সে ব্যক্তি নূতন বল লাভ করিয়াছে। বিশ্বাস ও প্রার্থনার গূঢ় তত্ত্ব যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহারা অক্ষয় ধন ভাণ্ডার লাভ করিয়াছেন।

আমরা কিরূপ শান্তি চাই?—আমরা কি প্রকার শান্তি অন্বেষণ করি? শান্তি সম্বন্ধে সকলের কি একই প্রকার ধারণা? তাহা নহে। শান্তি বলিলে দুই শ্রেণীর সাধকের মনে দুই প্রকার বিপরীত ভাবের উদয় হয়। এক শ্রেণীর লোক, সকল প্রকার কার্য্য, শ্রম, চিন্তা, ও সংগ্রাম হইতে নিষ্কৃতি পাওয়াকেই শান্তি নাম দিয়াছেন। এই প্রকার শান্তিপ্রার্থী লোক জগতে অনেক আছে। আজ যদি সংসারের ত্রিসীমার বাহিরে যাইয়া বাস করিতে পারি, তাহা হইলে এক প্রকারের শান্তি পাওয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ কি? সমস্ত দিন নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া সায়ংকালে মানুষ যখন আপন আলয়ে প্রবেশ করে, তখন স্বভাবতই তাহার প্রাণে এক

প্রকার শান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাকে বলে বিশ্রাম-জনিত শান্তি।

আর এক প্রকার শান্তি আছে, তাহাকে বলে—"ঈশ্বরের উপর নির্ভর-জনিত শান্তি।" কার্য্য আছে, শ্রম আছে, চিন্তা আছে, সংগ্রাম আছে,—অথচ শান্তি। প্রেমের বোঝা দিবানিশি বহিয়া বহিয়া ক্লান্তি নাই; প্রেমের খাটুনি খাটিতে পারিয়া শান্তি,—খাটিতে না পারিলে যেন প্রাণে দারুণ অশান্তি। আমরা কোন্ প্রকার শান্তির অন্বেষণ করি? সকল প্রকার শ্রম হইতে অবসৃত হইয়া যে শান্তি তাহাই চাই? না, খাটিয়া খাটিয়া মরিতে পারিলে যে শান্তি তাহাই চাই? অলসের শান্তি চাই? না নির্ভরের শান্তি চাই? এই সংসারে সংগ্রাম-বিহীন লোক প্রায় পাওয়া যায় না। সকল লোককেই শ্রম করিতে হয়,—সংগ্রাম করিতে হয়। বিধাতা যেন এই প্রকারই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, তাঁহার দাসদাসীগণ সংগ্রামের মধ্যেই তাঁহার সেবা করিবে। সংগ্রামের মধ্যে বাস করিতে হইতেছে বলিয়া যে ব্যক্তি পরমেশ্বরকে প্রীতি দিতে পারিল না, তাহার প্রীতির আবার মূল্য কি? যাহার জন্য যাহা আবশ্যক, তিনি তাহার জন্য তাহাই ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদি কেহ এমন থাকেন—যাঁহার জীবনে সংগ্রাম নাই, তাঁহাকে ঈর্ষা করি না, কিন্তু আমার পক্ষেও তাহাই হউক তাহাও ইচ্ছা করি না। মহাত্মা যীশু শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন—"আমি তোমাদিগকে আমার শান্তি দিয়া যাইব। কিন্তু সংসার যে শান্তি দেয় তাহা নহে।" যীশুর জীবন কি ভীষণ সংগ্রামময় ছিল! অথচ তিনি বলিলেন "আমি যে শান্তি ভোগ করিতেছি,—তাহাই তোমাদিগকে দিব।" তাঁহার শান্তি বিশ্বাসের শান্তি, নির্ভয়ের শান্তি, প্রেমের শান্তি।

জীবনাদর্শ ও ধর্ম্ম-সাধন—মানুষের যে কথা ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই, যে কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য নানাবিধ আয়োজন রহিয়াছে, সে কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। যেমন একথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না,—"তুমি আহার করিও, বা তুমি ঘুমাইও," তেমনি একথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না যে, "তুমি তোমার স্ত্রী পুত্রকে ভালবাসিও।" ইহা প্রকৃতিতেই করাইবে, কাহাকেও আয়াস করিয়া ওকথা স্মরণ করাইয়া দিতে হয় না। যাহা ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাই স্মরণ করাইতে হয়। শরীরের কথা বলিয়া দিতে হয় না,—শারীরিক অভাব কাহাকেও দেখাইয়া দিতে হয় না—ক্ষুধার তাড়নায় ও শারীরিক অভাবে তাহা করিবেই; কিন্তু জ্ঞানালোচনার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হয়। কেরাণীদিগকে মাঝে মাঝে বলিয়া দিতে হয়—"ওগো মানসিক উন্নতির কথাটা একেবারে ভুলিও না" নতুবা দুরন্ত কার্য্যের পেষণে তাহারা নিশ্চয়ই সে কথাটা ভুলিয়া যাইতে পারে। শ্রমজীবীদিগকেও মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয়ে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক, নতুবা প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত খাটিয়া খাটিয়া তাহারা আত্মোন্নতির কথা ভুলিয়া যাইবে। যে মহৎ বিষয় মানুষকে পশু হইতে পৃথক করিয়াছে,—সে বিষয়ের জন্য উপদেশ চাই, পরামর্শ চাই; তজ্জন্য আয়োজন চাই; নতুবা মানুষ পরামর্শ, চিন্তা বিবর্জ্জিত হইয়া সংসারাসক্তিতে ডুবিবে। এই জন্য উপাসনার স্থান ও কাল, উপাসনা-মন্দির, ধর্ম্মাচার্য্য, ধর্ম্মমণ্ডলী ও ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতির ব্যবস্থার প্রয়োজন।

জীবনের একটা মহৎ আদর্শ ধরিয়াছি বলিয়া মানবের নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নয়। সে আদর্শ ভুলিয়া যাইতে কতক্ষণ লাগে? সংসারের চতুর্দ্দিকেই ত দেখিতে পাইতেছি, আজ যে ব্যক্তি মহৎ উদ্দেশ্য হৃদয়ে লইয়া সংসার সমরে বীরের ন্যায় দাঁড়াইতেছেন, কাল সেই ব্যক্তিই আত্মবিস্মৃত হইয়া বিপথে গমন করিতেছেন। ইহাত কতবার দেখিয়াছি, যে মানুষ প্রথমে ধন উপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হয়, পরিবার পরিজনের সুখের জন্য, দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য, সৎকার্য্যের সাহায্যের জন্য, কিন্তু পরে দেখি, সেই ব্যক্তিই সে সকল মহৎ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া, কেবল ধনের জন্য ধন উপার্জ্জন করিতে থাকে। অতএব নিজ নিজ জীবনের আদর্শের বিষয়ে মধ্যে মধ্যে চিন্তা করা ধর্ম্মসাধকদিগের সাধন প্রণালীর একটী অঙ্গস্বরূপ হওয়া কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম জীবনে মণ্ডলীর সহায়তা—কিরূপে আমাদিগের অধ্যাত্মিক জীবন প্রতিপালিত ও পরিপোষিত হয়, তাহার সন্ধান না পাইয়া আমরা অনেক সময় বিবেচনা করি, আমি একাকী অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া উন্নতি করিতে পারি। অপরের সাহায্য ব্যতীত যে আমরা নিরাপদে অগ্রসর হইতে পারি না, অপরে যে আমাদিগের ধর্ম্ম জীবনকে নানা ভাবে প্রতিপালিত এবং পরিপোষিত করিতেছেন, তাহা আমরা চিন্তা করিয়া দেখি না। আমাদিগের ধর্ম্ম জীবন বিশ্বাসীমণ্ডলী দ্বারা সর্ব্বদাই প্রতিপালিত ও পরিপোষিত হইতেছে। গগনবিহারী গ্রহ ও তারকামণ্ডল যেমন পরস্পরের আকর্ষণ দ্বারা নিজ নিজ স্থানে রক্ষিত হইতেছে এবং নিরাপদে আপন আপন কক্ষে আবর্ত্তন করিতে পারিতেছে, আমাদের ধর্ম্মজীবন তেমনি সাধুমণ্ডলী দ্বারা সর্ব্বদাই রক্ষিত এবং নিরাপদে প্রতিপালিত হইতেছে। কিন্তু অপরের নিকট সাহায্যটুকু পাইতে গেলেই, তাঁহাদের ক্রটী ও দুর্ব্বলতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যও প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। সাহায্য পাইবার জন্য যেমন প্রস্তুত থাকা আবশ্যক, ক্রটী পাইবার জন্যও সেইরূপ প্রস্তুত থাকা আবশ্যক; কারণ এমন মানুষ কোথায় পাইব, যাঁহাতে কোনও ক্রটী নাই! নিজের দুর্ব্বলতার সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিতে করিতে যাঁহারা এক এক পা অগ্রসর হইতেছেন তাঁহারা কিরূপে আশা করেন, যে অন্যের ক্রটী ও দুর্ব্বলতা থাকিবে না। আমি কি আমাকে ক্ষমা করি না? নিজের অপরাধকে কোমল হস্তে স্পর্শ করি না? কি ভ্রান্তমতি জীব আমরা যে, নিজের অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত, কিন্তু অপরের দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নই। ইহার কারণ কি, তাহা কি কেহ

অনুসন্ধান করিয়াছেন? এই যে নিজকে সর্ব্বদাই কোমল ভাবে দর্শন করিতেছি, ক্ষমা করিতেছি, ইহার মূলে "প্রেম"। নিজের প্রতি যে প্রেম আছে, অপরের প্রতি সে প্রেম কোথায়? আমি অনায়াসে অপরের প্রতি কত কর্কশ, অন্যায় ব্যবহার করি কিন্তু অপরে একটু ভুল ও ত্রুটী করিলেই অসহ্য হইয়া উঠে। যে চক্ষু দ্বারা নিজকে দেখি, সে চক্ষু দ্বারা অপরকে দেখি না। নিজের বেলা প্রেমের চক্ষু, অপরের বেলা কঠিন বিধি—দেখিয়াছি যাহারা নিজে স্বার্থপর ও অপরের প্রতি উদাসীন, তাহারাই অপরের ঔদাসীন্যের বিষয় অধিক অভিযোগ করে। "অপরে আমাকে দেখিল না"—কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "তুমি কত দেখ?" তাহা হইলেই বিপদ। একটা কথা মনে রাখিলে ভাল হয়, "আমি যখন আমার মনেরমত হইতেছি না, ২০ বৎসর চেষ্টা করিয়াও হইতে পারিলাম না" কিরূপে বাতুলের ন্যায় এই আশা করি যে, অপরে ঠিক আমার মনের মত হইবে? আমি যদি দুর্ব্বল হইয়াও ক্ষমার আশা করি, অন্যের বেলায় এ উদারভাব মনে থাকে না কেন?" বিধাতা আমাদিগকে রক্ষা করুন। যাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া এত উপকার পাইতেছি, তাঁহাদের সহায়তা ও দুর্ব্বলতা দুই যেন লইতে পারি, সহিতে পারি। গোলাপ ফুল তুলিতে গেলে কাঁটার আঁচড় লাগিবেই, সহ্য করিবার জন্য যদি প্রস্তুত থাক, গোলাপ বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হও, নতুবা যাইও না। কেন বিধাতা এমন করিলেন?—তাঁহার বিশ্ব বিদ্যালয়ের এক প্রকার শিক্ষা! অসাধুতার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয় কেন? দেব ও অসুর দুই, কেন মানব প্রকৃতিতে স্থান পাইল? এই জন্য যে, অসাধুতার সহিত সংঘর্ষণে সাধুতা ফুটিয়া উঠিবে। অন্ধকার না থাকিলে কে আলোর মর্য্যাদা বুঝিত? বিপদ না থাকিলে কি সম্পদের আদর কেহ করিত? আমরা যেন অপরের সবলতা দুর্ব্বলতা দুই দেখিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকি।

সাংসারিকতা—সাংসারিকতার প্রভাব ও কার্য্য অতি বিচিত্র, সে কোন্ রূপে প্রাণে দেখা দেয় এবং কোন্ ভাবে আমাদিগকে বশীভূত করে, কেহই তাহা সম্যক্ অবধারণ করিতে পারে না। এজন্য দেখা যায় সাংসারিকতার মূর্ত্তি নানা আকারে আমাদিগের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা পৃথিবীর ধনাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে পরসেবায় অর্পণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও দেখা যায়, সূক্ষ্মবেশে অন্য আকারে আবার সেই স্বার্থপরতা দেখা দিতেছে। তাঁহারা বাহিরের আমিত্ব ছাড়াইয়া ভিতরকার আমিত্বে জড়াইয়া পড়িতেছেন। প্রশংসাপ্রিয়তারূপে—গৌরব লাভের আকাঙ্ক্ষারূপে তাহাই সে সকল স্থানে আবার দেখা দিতেছে। উপদেষ্টা যে সাংসারিকতার বিরুদ্ধে উপদেশ দিতেছেন, তিনিই হয়ত আবার সেই উপদেশ শুনিয়া লোকে প্রশংসা করে কিনা তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন। তাঁহার সাংসারিকতা বাহির পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

ধর্ম্মপ্রচারক প্রচারের উদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়াছেন, প্রচারই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু দেখা যাইতেছে তাহার মধ্যেও সাংসারিকতা অন্য আকারে প্রবিষ্ট হইতেছে। তিনি সকল স্থানে প্রচার করিতে পারেন না। তিনি সকল সময় সকল সত্য প্রচার করিতে পারেন না। কোথাও লোক গঞ্জনার ভয়, কোথাও প্রশংসার আশা, তাঁহাকে স্থান বিশেষে অধিকতর মনোযোগী করিতেছে, আবার স্থান বিশেষের প্রতি উদাসীন করিতেছে। একই উদ্দেশ্যে যাহারা মিলিয়াছেন—ধর্ম্মপ্রচার এবং লোকহিতৈষণাই যাঁহাদের মূল লক্ষ্য, তাঁহারাও আবার এই সূক্ষ্ম সাংসারিকতার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া লক্ষ্য সাধনের মূলমন্ত্র স্বরূপ একতা অবলম্বন করিতে এবং পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারিতেছেন না। মহৎ উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতে যাইয়াও আপনাকে ভুলিতে না পারিয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছেন। আমরা গান করি "ছাড় আপনারে প্রেমে পাবে তাঁরে" কিন্তু আত্মত্যাগ কার্য্যতঃ আমাদের মধ্যে স্থান পাইতেছে না। এখানেও সাংসারিকতাই ভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইতেছে।

আমরা উৎসব করিব বা অপর কোন প্রকার সৎকার্য্য করিব, তাহাতে অর্থের প্রয়োজন, কাহার উপর তাহা সংগ্রহের ভাব অর্পণ করিতে হইবে, এই প্রশ্ন উপস্থিত হইলেই, সকলের মুখেই এক কথা, যিনি সকলের শ্রদ্ধেয়, যিনি সংগ্রহ করিতে গমন করিলে লোকে, চক্ষু লজ্জার খাতিরেও কিছু না দিয়া থাকিতে পারিবেন না, তাহাকেই এই কার্য্যে নিযুক্ত কর, তাঁহার উপরেই এই কার্য্যের ভারার্পণ কর। কার্য্যেও তাহাই দেখা যায়। যিনি পদস্থ, যিনি সম্মানিত এবং যাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া সহজ নহে, সেরূপ ব্যক্তি যখন অর্থ সংগ্রহের ভারগ্রহণ করেন, তখন প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয়। কার্য্য সুনির্ব্বাহ হয়। এখানেও সেই সাংসারিকতারই মূর্ত্তি আর এক আকারে প্রকাশিত। যদি কার্য্যের প্রতি অনুরাগ থাকে, তবে আর পদস্থ ব্যক্তির উপর অর্থ সংগ্রহের ভারার্পণ করিতে হইবে কেন? যদি কার্য্য সুসম্পন্ন হউক ইহাই সকলের আন্তরিক বাসনা হয়, তবে আর লোক দেখিয়া দানের পরিমাণের লঘুত্ব গুরুত্ব হইবে কেন? আপনা হইতেই সমুচিত দান করিতে সকলেরই আগ্রহ হইতে পারে। কিন্তু এখানেও লোকের অনুরাগ বিরাগের আশা বা আশঙ্কা সাংসারিকতার আকারে দেখা দিতেছে। অর্থের প্রতি মমতা হইতে যে প্রদানের অপ্রবৃত্তি হইতেছে তাহা নহে। কারণ তাহা হইলে লোকবিশেষের গমনে দানের তারতম্য হইত না। লোকের মনস্তুষ্টির বা অসন্তুষ্টির গণনা হইতেই কার্য্য হইতেছে। কার্য্যানুরাগ যদি প্রবল থাকিত, তবে কি আর লোককে এরূপ তাড়না করিয়া বেড়াইতে হয়? উৎসবের দান সংগ্রহ করিবার জন্য কি বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়? তাহা হইলে দিবার জন্যই সকলের ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হইত। দান সংগ্রহের জন্য কেহ বাড়ীতে গেলে লজ্জা ও সঙ্কোচেরই উদয় হইত। কোন মতে সেই ব্যক্তিকে পরিহার করিবার প্রবৃত্তি হইত না। প্রচার করিতে হইবে, তাহার জন্য অর্থের

আবশ্যক। কিন্তু দেখা যায় তাহাতেও সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধের পর অনুরোধ এবং কত কল কৌশল অবলম্বন করিলে, তবে কোনরূপে যদি কিছু আদায় করা যায়। কিন্তু যদি সকলেই ইহাকে আপনার করণীয় কার্য্য মনে করেন, তবে আর কি এত অনুরোধ উপরোধ করিতে হয়? আপনাপন শক্তি মত যাহা দিতে পারা যায়, তাহাত সহজেই দেওয়া যাইতে পারে। এখানেও সেই সাংসারিকতা আমাদিগকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। তাহারই মূর্ত্তি এখানেও পরিলক্ষিত হইতেছে। লোক মনোরঞ্জন বা বিরাগ ভয় এখানে সাংসারিকতার আকারে প্রকাশ পাইতেছে। "ছাড় আপনারে প্রেমে পাবে তারে" ইহা সকল সময় সকল অবস্থাতেই প্রয়োজন। সংসার আপনা ছাড়িয়া কর, তাহা পরম সুখের হেতু হইবে। ধর্ম্ম আপনারে ছাড়িয়া কর, পরম লাভের কারণ হইবে। সদনুষ্ঠান করিতে যাইয়া আপনাকে ভুলিয়া তাহাতে নিমগ্ন হও, তাহাতে দেখিবে কেমন সুফল ফলিবে। আপনার গণ্ডী পরিত্যাগ করিয়া, প্রেমে আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়া, সকল প্রকার সাধু কার্য্যে আমরা যদি প্রবৃত্ত হই তাহাতে কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে, আমরাও পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হইব। ভাব প্রাণে দেখিয়া এবং পরস্পরকে প্রেম দিয়া ও নিজে তাহা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব।

বিচিত্রতা ও একতা—একজন হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক একবার ব্রাহ্মদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম ত বৈরাগীদের আলখাল্লা বিশেষ। অর্থাৎ বৈরাগীরা যেমন নানা বর্ণের ছিটের টুকরা সকল সংগ্রহ করিয়া এবং তাহা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করিয়া, একটা কিম্ভূত কিমাকার গোছের পোষাক প্রস্তুত করে, ব্রাহ্মধর্ম্মও সেই প্রকার। ইহাও সেই নানা স্থান হইতে ভিক্ষা করা, নানা প্রকারের বস্তুতে প্রস্তুত করা বস্তু বিশেষ। বিদ্রূপ করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছিল (যদিও তাহা বিদ্রূপের হেতু নয়) তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব ও গৌরববোধক। এই বিশেষত্ব নষ্ট হইয়া গেলে আর ইহার স্বাতন্ত্র্যও বিশেষ প্রয়োজনীয়তাই থাকে না। যদি কেহ মনে করেন যে, ব্রাহ্মগণ কোন নূতন সত্য প্রচার করিতেছেন না বা সাধনপ্রণালী সম্বন্ধেও কোন নবীন পন্থা আবিষ্কার করিতেছেন না, তাহা হইলে ঐ সংগ্রহ রূপ বিশেষত্ব ভিন্ন ইহার আর কি থাকে? নূতন সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, কি না হইয়াছে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়াও ইহা বলা যায়, এই যে সংগ্রহ ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের নূতনত্ব এবং ইহাই ইহার জীবন। নূতনত্ব এই জন্য যে চিরদিন পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ঔদাসীনতা ও বিদ্বেষ প্রকাশের লক্ষণই ধর্ম্মসমাজে ছিল। কেহ সাক্ষাৎ ভাবে অপরের নিকট হইতে শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হয় নাই, কিন্তু কেবল শিক্ষাদিতেই ব্যস্ত ছিল। অপরের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ না হইয়া কেবল প্রদানের ব্যবস্থাই দৃষ্ট হইতেছিল, ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়েই এই সত্য ঘোষিত হইয়াছে, যে কেবল অপরকে দিতে হইবে, তাহা নহে; কিন্তু যেখানে যাহা ভাল আছে, তাহা গ্রহণও করিতে হইবে। এই উদার ভাবই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এই প্রকৃতি নষ্ট করিলে ইহার বিশেষত্ব এবং প্রাণই নষ্ট করা হয়। ইহাকে কোন গ্রন্থ বিশেষে আবদ্ধ করিলে, ইহার নবীনত্ব বা প্রয়োজনীয়তাই বিলুপ্ত হয়। জাতীয়তা ও উদারতার মধ্যে যে একটা অচ্ছেদ্য বৈরভাব বদ্ধমূল আছে তাহা মনে হয় না। জাতীয়তা এবং উদারতা একই ক্ষেত্রে বাস করিতে পারে এবং করিতেছে। জাপানদেশে জাতীয়তার অভাব নাই এবং চীনদেশেও জাতীয়তা ষোলকলাতেই বর্ত্তমান। কিন্তু একের চেষ্টা দশ স্থান হইতে সংগ্রহ পূর্ব্বক আপনার দেহে শক্তি ও জীবনের সঞ্চার করা ও সর্ব্ব প্রকার মহত্বের সমাদর করিয়া নিজে মহৎ হওয়া, অপরের চেষ্টা আপন সীমার বাহিরে পদক্ষেপ না করিয়া আপনাকে আপনাতে আবদ্ধ রাখা এবং আত্মগৌরবে স্ফীত হওয়া এবং অন্যকে আপনার ত্রিসীমা মধ্যে আসিতে না দেওয়া, নিজেও গণ্ডীর বাহিরে পদার্পণ না করা। এই দুই জাতির জাতীয়তার প্রতি কাহারও সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু উভয়ের রীতি নীতি এবং উন্নতি লাভের উপায় অবলম্বনের প্রকারের বিশেষ প্রভেদ এবং তাহার ফলের তারতম্যও জগতের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং জাতীয়তা এবং উদারতা, এক ক্ষেত্রে এক সঙ্গে মিশিয়া যে শুধু কার্য্য করিতেছে তাহাই নহে, কিন্তু তাহাই প্রকৃষ্ট উপায়। ভিন্ন দেশের বা জাতির কিছুকে আদর করিতে হইলে যে আপনার দেশের মূল্যবান বস্তুকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা নহে। বরং তাহারই অঙ্গপুষ্টি সাধন করিবার জন্যই নানা স্থান হইতে আরও সম্পত্তি সংগ্রহ করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই প্রকৃতি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পরলোকগত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মকে যে নববিধান নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন, তদ্দারা ব্রাহ্মধর্ম্মের এই প্রকৃতির বিশেষ বিকাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। যদি তিনি তাঁহার সেই উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া কোন একখানি গ্রন্থ বা কোন দেশ বিশেষের প্রতি বিশেষ প্রীতি জ্ঞাপন করিয়া থাকেন, তদ্দারা তাঁহার ধর্ম্মসমন্বয়রূপ নববিধানের প্রকৃতিরই ব্যতিক্রম করিয়াছেন। তদ্দারা স্বপ্রচারিত ধর্ম্মের শক্তির বিকাশ বা অঙ্গপুষ্টি হয় নাই। আমরা খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের মধ্যে কাহার অধিক প্রশংসা করি বা লোকে করিয়া থাকে? যাঁহারা খৃষ্টধর্ম্মকে একমাত্র য়িহুদিদিগের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছিলেন বা যাঁহারা সেই জাতিকেই এই ধর্ম্মলাভের উপযোগী মনে করিয়াছিলেন তাঁহাদের? কিম্বা যিনি ইহাকে সকল জাতির সম্পত্তি ও ইহাতে সকলের সমান অধিকারবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, সেই পলেরই? প্রশংসা সংকীর্ণতার নহে, কিন্তু উদারতার। এবং এই উদারতাই কল্যাণকর ও ইহাই আমাদের জীবনদায়ক।

আত্ম কল্যাণের জন্য নানাস্থান হইতে রত্ন সংগ্রহ করা কখনই নিন্দনীয় বা সৌন্দর্য্যহীনতার কারণ নহে। বরং উৎকৃষ্ট নিপুণ শিল্পীর হাতে পড়িলে তাহাই পরমশোভার কারণ হয়। নানা বর্ণের ছিটের টুকরা যাহা অব্যবসায়ী

বৈষ্ণবের হস্তে পড়িয়া, উপহাসের কারণ স্বরূপ হয়, তাহাই উত্তম শিল্পীর হাতে পড়িলে, চিত্তমুগ্ধকর সৌন্দর্য্যে পরিণত হয়। নানা বর্ণের মিশ্রণে যে গালিচা বা কার্পেট প্রস্তুত হয়, তাহা কি চিত্তের আনন্দদায়ক নহে? নানা প্রকারের এবং নানা বর্ণের হীরক, মণি, মুক্তা সংগ্রহ করিয়া যদি একছড়া হার গাঁথা যায় এবং তাহা যদি উত্তম শিল্পীর হাতে পড়িয়া যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবিষ্ট হয়, তাহা কি মনোমুগ্ধকর এবং রাজাভরণ রূপে পরিণত হয় না? উদ্যানের নানা বৃক্ষের নানাবিধ ফুল পত্র সংগ্রহ-করিয়া উৎকৃষ্ট মালী যখন তোড়া বাঁধে, তাহা কাহার না চিত্তের পরিতোষের কারণ হয়? ফুলগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যখন থাকে, তখন তাহাদিগের এক প্রকার শোভা—পত্রগুলি বিচ্ছিন্নভাবে যখন থাকে, তখন তাহাদের আর এক প্রকার শোভা, কিন্তু যখন তাহা উৎকৃষ্ট মালীর হস্তে পড়িয়া যথাযোগ্য স্থানে নিয়োজিত হয়, তখন তাহাতে কি অপূর্ব্ব মনোহারিত্ব। সুতরাং নানা স্থান হইতে ভিক্ষা দ্বারাই হউক, আর অন্য প্রকারেই হউক, সংগ্রহে কোনই দোষ নাই, বরং তাহাই নবীন সৌন্দর্য্য ও নব বল সঞ্চারের কারণ। সেই দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যাহাতে সংগৃহীত বস্তু সকল যথাযোগ্য ভাবে সম্মিলিত হইতে পারে, কুশিল্পীর হাতে পড়িয়া কুৎসিত না হয়। উত্তম শিল্পীরই প্রয়োজন এবং প্রশস্ত উদার মনেরই প্রয়োজন। তাহা হইলেই সংগ্রহ সর্ব্বপ্রকারের কল্যাণকর হয়। আমরা নানারূপে নানা স্থানে নানা ভাবে ছড়াইয়া আছি, উৎকৃষ্ট মালী—পরম মালী আমাদিগের দ্বারাই উত্তম তোড়া প্রস্তুত করিবেন। তখন আমাদের শ্রী অন্য প্রকার হইবে। শক্তির সহিত শক্তি মিশিবে, প্রেমের সহিত প্রেম মিশিবে, ভক্তির সহিত ভক্তি মিশিবে এবং পরস্পর পাশাপাশী হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিবে। এই তোড়া বাঁধিবার মালী স্বয়ং পরমেশ্বর। তোড়ার বন্ধন রজ্জু যেমন দেখা যায় না, সে অদৃশ্য ভাবে থাকিয়া যেমন ঐক্যের কারণ হয়, তেমনি পরম মালী পরমেশ্বর আমাদিগের বিচ্ছিন্নতা নষ্ট করিয়া এবং স্বয়ং অদৃশ্য থাকিয়া সকলকে মিলাইবেন। তখন আমাদের শোভা দেখিয়া জগৎ হাসিবে, প্রীত হইবে। আমরাও বাঁচিব, এক গুণ শক্তিস্থলে শতগুণ শক্তি লাভ করিয়া, জগতে অজেয় হইয়া বেড়াইব এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে সমর্থ হইব।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্তপ্রবন্ধ।

আশা ও বিশ্বাস।

সর্ব্বদাই এই দেখি যে, মানুষের আশা কোনও সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান; সত্য অবস্থা, প্রকৃত ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াই দণ্ডায়মান। প্রকৃতি রাজ্যে, জড় জগতে ভৌতিক নিয়ম সকলের মধ্যে দেখি, আমাদের আশা প্রকৃত ঘটনার উপরে দণ্ডায়মান। আশা করি, কাল প্রাতে সূর্য্যোদয় হইবে,—কেন করি? কারণ দেখিয়াছি, প্রতিদিন প্রাতে নবরাগে রঞ্জিত হইয়া নবসূর্য্য পূর্ব্বাকাশে উদয় হয়—ইহার ব্যতিক্রম কদাচ হয় না; আশা করি, একটী ভারি বস্তু ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলে নিম্নে পতিত হইবে,—কারণ প্রতিদিন এই ঘটনা প্রত্যক্ষ নয়নগোচর করিতেছি; আমার বন্ধু, দশ বৎসর যাঁহার সহিত অকৃত্রিম মিত্রতাসূত্রে গ্রথিত আছি, রোগে শোকে, দুঃখ বিপদে সংসারের নানাবিধ ঘটনার মধ্যে যাঁহার প্রেম ও সাহায্যে কখনও বঞ্চিত হই নাই, আশা করি যে, আবার যখন বিপদ ঘটিবে, তখন তাঁহাকে পার্শ্বে দেখিব। এক জনের প্রতি কোনও গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া দেখিয়াছি, তিনি উহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন, তাই আশা করি, তাঁহার দ্বারা অন্য কার্য্যও সুসম্পন্ন হইবে। এইরূপ সর্ব্বত্রই আশা ভূতকালের সত্য ঘটনার উপর দণ্ডায়মান। যদি দেখিতাম, মধ্যে মধ্যে প্রাতে সূর্য্যোদয় হয় না, যদি দেখিতাম, ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত বস্তু ধরাতলে পতিত হইল না, যদি দেখিতাম, বন্ধু আমার সুখ দুঃখে কখনও কখনও উদাসীন থাকেন, যদি কাহাকেও কোন কার্য্যভার দিয়া তৎসম্পাদনে ক্রটী দেখিতাম, তাহা হইলে আর দৃঢ়তার সহিত এ সকলের উপর আশা স্থাপন করিতে পারিতাম না। সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই মানবের আশা দণ্ডায়মান। কিন্তু একটী স্থান আছে, যেখানে আশা রাখিবার এমন কোন ভিত্তি নাই, তথাপি আশা করিতেছি। সেখানে অতীতের প্রকৃত ঘটনা এরূপ আশা স্থাপনের বিরোধী তথাপি আশা স্থাপন করিতেছি। আপনার জীবনের ও চরিত্রের উন্নতির বিষয়ে যে আশা—তাহার ভূমি নাই, তথাপি তাহা আমাদিগকে ছাড়ে না। জীবন সম্বন্ধে যখন পশ্চাতে চাহিয়া দেখি—তখন কি দেখি? ইহাই কি দেখি না,—যে মানব নিরন্তরই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে, তাহার সাধু ইচ্ছা, সাধু সঙ্কল্প, সংসারের সংগ্রামে কতবারই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, মানুষ পুনঃপুন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও যেই দাঁড়াইতেছে, আবার অমনি প্রতিকূলতার আঘাতে পড়িয়া যাইতেছে, অথচ যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তোমার সাধু সঙ্কল্পের জয় হইবে—ইহাতে আশা রাখ কি না? তখনি হয়ত সে ব্যক্তি বলিবে, হাঁ, সত্যের ও সাধুতার জয় হবেই হইবে। এ কিরূপ বিসদৃশ আশা! যে শতবার পড়িতেছে, সে ভাবিতেছে যে, চরমে সে দাঁড়াইবে! যদি বল—"এমন আশা কেন কর? নিত্যই ত দেখিতেছ যে, তুমি পথ-ভ্রষ্ট, সঙ্কল্প-চ্যুত হইতেছ, পুনঃপুন পড়িয়া যাইতেছ—তবুও এমন আশা কিরূপে প্রাণে স্থান দেও?" ইহার উত্তর মানুষ দিতে পারে না। যদি কেহ বলেন, সূর্য্য দুই দিন উদয় না হইলে আর তৃতীয় দিনে তাহার প্রতি আশা স্থাপন করিতে পার না—পুনঃপুন পাপে পড়িয়াও কিরূপে আশা করিতেছ, তুমি উদ্ধার পাইবে? কেন আশা করি—তাহার কারণ জানি না। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি পাপ, প্রলোভন পতন, দুর্ব্বলতা ও কুপ্রবৃত্তির জয়—অথচ আশা করি, উদ্ধার পাইব। একবার চিন্তা করা যাউক, এই আশার মূল কোথায়! ইহার কোন ভিত্তি আছে কি না?

ইহার গূঢ় কারণ এই, পতন ও উদ্ধার-একজনের কাজ

মনে করি না। যে পতিত হয় সেই আপনাকে উদ্ধার করিবে —ইহা ভাবিলে আশা করিতে পারিতাম না। আমরা ভাঙ্গিয়া বলিতে পারি আর না পারি, স্পষ্ট বুঝিতে পারি আর না পারি, আমাদের অন্তরাত্মা অনুভব করে যে, এ দুই কাজ দুই জনের। পতন আমার কিন্তু উদ্ধার আর এক জনের হাতে। আমি যতই দুর্ব্বল হই না কেন, ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এক অজেয় শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে,যাহা সত্যকে ও সাধুতাকে জয়যুক্ত করিবেই করিবে। দশ বৎসর সংগ্রাম করিয়া যে পাপকে পরাজয় করিতে পারিতেছি না—সেই অব্যর্থ অজেয় শক্তি—অবতীর্ণ হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে হয়ত সেই পাপের বিনাশ সাধন করিবে। আমার পুনঃপুন পতন হইতে পারে—ইহাও যেমন সত্য, এক মহাশক্তি আমাকে রক্ষা করিতেছে, ইহাও তেমনি সত্য। যখন পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন আমার দুর্ব্বলতা দেখি, কিন্তু যখন ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন সেই দুর্জ্জয় ব্রহ্মাণ্ড পতির প্রতি আশা ও নির্ভর স্থাপন করি।

এইরূপ আমাদিগের জীবনের একদিকে দুর্ব্বলতা অপর দিকে আশা। এই আশা যে পরিমাণে প্রবল হয়, সেই পরিমাণে আমরা বিশ্বাসী। আশা ম্লান হইলেই বিশ্বাসও ম্লান হইয়া যায়। স্বীয় জীবনে তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার কার্য্য যে পরিমাণে দেখি না—সেই পরিমাণে নিরাশ এবং অবিশ্বাসী হইয়া যাই। ধর্ম্ম সমাজে যাঁহারা বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নিত্যই আত্ম-পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়—বিশ্বাস বাড়িতেছে কি না। যদি বিশ্বাস বর্দ্ধিত না হয়—তাহা হইলে সঙ্গীত, উপাসনা, ব্রত, সংযম সকলই বৃথা।

হৃদয়ের যে কোমল ভাবগুলি আছে, তাহাদের পরাক্রম আমরা সচরাচর দেখিতে পাই না। জননী সন্তানদিগকে পালন করিতেছেন, কখনও ক্রোধ করিতেছেন, কখনও তিরস্কার করিতেছেন, কখনও বা প্রহার করিতেছেন—মনে হয়, কৈ মাতৃস্নেহের শক্তি কোথায়? কিন্তু যখন ঐ সন্তান রোগশয্যায় শয়ন করিয়া ছটফট্ করে, পীড়ার জ্বালায় অস্থির হইয়া আর্ত্তনাদ করে—তখন দেখি মাতৃস্নেহের কি অপরিসীম শক্তি। তখন জননী আর সন্তানের পাশ ছাড়িতেছেন না, আহার নাই, নিদ্রা নাই, মুখে কথা নাই, প্রাণে শান্তি নাই—সন্তানের রোগ যাতনাতে জননী যন্ত্রণাগ্রস্ত। বন্ধুর ভালবাসার পরাক্রম ততক্ষণ দেখিতে পাই না, যতক্ষণ না বিপদ উপস্থিত হয়। মানবীয় শক্তির প্রকাশ যেমন সর্ব্বদা দেখিতে পাই না, ঈশ্বরের শক্তি সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই। আমরা অনেক সময় তাঁহার কৃপা বুঝিতে পারি না। যখন ধর্ম্মবীরদিগের বীরত্ব কাহিনীর পাঠ করিয়াছি, তখন ভাবিয়াছি প্রয়োজন উপস্থিত হইলে বুঝি আমিও, ঐরূপ করিতে পারি। আমার বেশ মনে হয়, বালককালে একদা একজন খ্রীষ্টান বালক আমাকে বলিয়াছিলেন—"ঈশা যে বিশ্বাস প্রেম দেখাইয়া গিয়াছেন—তাহা অতুলনীয়, অন্যের জীবনে তাহা সম্ভব নহে।" আমি তাহার উত্তর করিয়াছিলাম "কেন, একজন যাহা করিয়াছে অন্যে তাহা কেন পারিবে না?" কিন্তু পরীক্ষার দিনে বুঝিতে পারিয়াছি—কথা বলা কত সহজ এবং প্রকৃত প্রেমিক এবং বিশ্বাসী হওয়া বড কঠিন। সংসারে এইরূপে আমরা কতবারই আত্মপ্রতারিত হই। যে বল আপনাতে নাই, তাহা আছে বলিয়া মনে করি। সাবধান—আত্মপ্রতারণার বিরুদ্ধে সকলে সাবধান হউন। সমুদ্রের মধ্যে ঝড় উঠিলে দেখিতে পাই, নাবিকগণ প্রাণপণে জাহাজকে বন্দরের দিকে চালাইতেছে: শিশুর কোন ভয়ের বা দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে দেখিতে পাই, সে জননীর দিকে ছুটিয়াছে; পতিপ্রাণা নারীর কোন ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলে, পতির পাশে ছুটিয়া যান—সেইরূপ প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার জন্য, এ প্রাণ কি বিপদ ও পরীক্ষার দিনে নিজ প্রাণেশ্বরের পাশে ছুটিয়া যায়? যখন দেখিব—রোগে, শোকে, দারিদ্র্যে, দুঃখে, চিন্তাতে মন সহজে তাঁহার দিকে যায়, তখনই বুঝিব নিজ দুর্ব্বলতার মধ্যে আশার ভূমি ধরিয়াছি। যখন দেখি, পাপ,দুর্ব্বলতার কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ নিরাশায় ডুবিয়া যায়, তখন কিরূপে বলিব—বিশ্বাস পাইয়াছি! অতএব সকলে একবার অতীত ও ভবিষ্যতের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি। একবার পশ্চাতের দিকে চাহিয়া দুর্ব্বলতার কথাগুলি ভাল করিয়া ভাবি—আবার সম্মুখের দিকে আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভগবানের করুণার দিকে চাহি। ঐ পশ্চাতে পড়িয়া রহিল অন্ধকার, আর সম্মুখে করুণার আলোক। অন্ধকারের দিকে ভাল করিয়া চাহিলে আলোকের মর্য্যাদা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম হইবে। নিজের দুর্ব্বলতার দিকে এই জন্য চাহিবে যে, যেন ব্যাকুলভাবে তাঁহার শক্তির নিকট নিজকে উৎসর্গ করিতে পারি। বিশ্বাস, বিশ্বাস করিলে বিশ্বাসী হওয়া যায় না, ইহা অনেক সাধনের ফল, বহু দিনের তপস্যার ফল। ঈশ্বর করুন, যেন আমরা একদৃষ্টি নিজ দুর্ব্বলতার উপরে, অপর দৃষ্টি তাঁহার করুণার উপরে রাখিয়া অগ্রসর হইতে পারি।

পশ্চাতে না সম্মুখে?

বর্ত্তমানে অতৃপ্তি মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থা। যাহা এখনও অপরিজ্ঞাত, তাহা জানিবার জন্যই মানব মন কৌতূহল পরবশ, কিন্তু তাহা একবার পরিজ্ঞাত হউক, আর মানবচিত্ত তাহাতে তৃপ্ত থাকিবে না, আবার অজ্ঞতার যবনিকা সরাইয়া অন্ধকারের গর্ভে কি আছে, তাহা দেখিবার প্রয়াস পাইবে। ক্ষুধার্ত্ত কুক্কুর যেমন একখণ্ড মাংস আহার করিবার সময় সম্মুখস্থ আর এক খণ্ডের দিকে চাহিয়া থাকে, তেমনি যেন মানব বর্ত্তমানকে ভোগ করিবার সময় অজ্ঞাত রাজ্যের দিকে চাহিয়া থাকে। এই বর্ত্তমানে অতৃপ্ত হইতেই মানবের সর্ব্ববিধ উন্নতি প্রসূত হইয়াছে। বিজ্ঞান বল, বিষয় বাণিজ্য বল, সাহিত্য বল, রাজনীতি বল, দণ্ডনীতি বল, সমাজনীতি বল, সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে এই অতৃপ্তি। এই অতৃপ্তি দ্বারাই প্রমাণিত হয়, ঈশ্বর মানবচিত্তে বাস করিতেছেন, এবং মানবকে অনন্ত আকাঙ্ক্ষা দিয়া তাহাকে আপনার সহিত সম্বদ্ধ করিয়াছেন। ইতর প্রাণীরাই বর্ত্তমানে তৃপ্ত; মানবকুলের মধ্যে যাহাদের প্রাণের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা একেবারে নির্ব্বাণ হইয়াছে,

তাহারাও বর্ত্তমানে তৃপ্ত। নতুবা মানবমাত্রেই বর্ত্তমানে অতৃপ্ত।

এই বিষম অতৃপ্তি হৃদয়ে লইয়া দুই শ্রেণীর লোক, দুই বিপরীত দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ এক শ্রেণীর লোক আশার সহিত অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, অপর শ্রেণীর লোক ভবিষ্যতে আপনাদের আশা ভরসা ও লক্ষ্যস্থাপন করিয়া তাহারই দিকে চাহিয়া থাকেন। প্রথম শ্রেণীর নিকটে অতীতের শোভা, অতীতের উন্নতি, অতীতের সভ্যতা, অতীতের জ্ঞান, অতীতের বীরত্ব, অতীতের ধর্ম্ম, অতীতের সমাজ, অতীতের যাহা কিছু ছিল, সকলি সুন্দর দেখায়; এবং তাহারা অতীতকে ফিরাইয়া আনিতে চান। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, অতীতকে যদি ফিরাইয়া আনা যায়, তাহা হইলেই এ জগৎ পরম সুখের স্থান হইবে, মানব সমাজ উন্নতির চরমসীমায় পদার্পণ করিবে। এই অতীতের আদর যাঁহারা করেন—অতীতকে যাঁহারা ফিরাইয়া আনিতে বাসনা করেন—তাঁহাদিগকে রক্ষণশীল (Conservative) বলা যাইতে পারে। ইহাঁদের মতে উন্নতির অর্থ পশ্চাতে ফিরিয়া যাওয়া।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বিশ্বাস করেন—সত্য যুগ পশ্চাতে নহে সম্মুখে। জগৎ উন্নতির অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দিন দিন দুর্গতিপ্রাপ্ত হইতেছে না, কিন্তু কি জড় রাজ্যে কি মানবসমাজে সর্ব্বত্রই কদর্য্যতার মধ্যে সৌন্দর্য্য, বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইতেছে, সুতরাং মানবীয় উন্নতির আদর্শ ভবিষ্যতে রহিয়াছে। এইরূপে ভবিষ্যতের দিকে যাঁহারা চাহিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারাই সংস্কারক (Reformer) ইহারা বলেন গতির নাম সম্মুখদিকে অগ্রসর হওয়া পশ্চাদ্গমন নহে। জগতের সাধু মহাজনদিগের অনেকে এই শ্রেণী গণ্য। মহাপুরুষগণ অভ্যুত্থিত হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবার জন্যই জনসমাজকে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। জগৎ যে ইঙ্গিতে অগ্রসর হইয়াছে। মহাত্মা যিশু শিষ্যদিগকে যে স্বর্গ রাজ্যের কথা বলিয়াছিলেন—তাহা পশ্চাতে নহে সম্মুখে। তিনি পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলিয়াছিলেন পশ্চাতে নহে সম্মুখে। তিনি পুনঃপুনঃ এই কথাই বলিয়াছিলেন—"স্বর্গরাজ্য আসিতেছে।" মহাত্মা বুদ্ধ যে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন—তাহার লক্ষ্যও সম্মুখেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। মহাত্মা মহম্মদ দেশপ্রচলিত পৌত্তলিকতা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া মুসলমান জগৎকে সম্মুখের দিকেই অগ্রসর করিয়া দিয়া গিয়াছেন—এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকেই যাইতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা চৈতন্য যে প্রেমরাজ্যের আভাষ দিয়া গিয়াছেন—তাহাও তিনি সম্মুখে দেখিয়াছিলেন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ও তাঁহার দেশবাসীদিগকে সম্মুখে অগ্রসর হইতেই আহ্বান করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে রাজ্যের মূলধন লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন—সে রাজ্য কি সম্মুখে না পশ্চাতে? অতীতের সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, উন্নতি, সভ্যতার উত্তরাধিকারীরূপে যে ব্রাহ্মসমাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং অনন্ত উন্নতি যাহার লক্ষ্য, তাহার গতি কোন্ দিকে যাইবে, পশ্চাতে না সম্মুখে? ব্রাহ্মসমাজ সত্যই বলিয়াছেন—"সম্মুখেতে স্বর্গরাজ্য পশ্চাতে চেয়ো না ফিরে" উন্নতির অর্থই অতীতকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসা। তোমরা একদিকে যেমন বর্ত্তমানে পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছ না—অন্যদিকে তেমনি অতীতকেও আলিঙ্গন করিবার জন্য হাত বাড়াইও না। যাঁহার কৃপাতে এত দূর অগ্রসর হইয়াছ—তিনিই হাত ধরিয়া অপরিচিত অনন্ত উন্নতির পথে দিন দিন আমাদিগকে অগ্রসর করিবেন। পরের কথায় ভুলিও না—দুদিন যদি অন্ধকারেই পড়িয়া থাক—তাই বলিয়া কি যাহা পশ্চাতে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ—তাহাকেই আবার অবলম্বন করিবে? বিধাতা আমাদিগের অনন্ত উন্নতি পথের সহায় হউন।

বিষয়ী ও বিশ্বাসী।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে সংসার এবং ধর্ম্মে কিছু বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। ধার্ম্মিক বলিলেই এতদ্দেশের আপামর সাধারণ সকল লোকেই সংসার-বিরাগী বা সংসারত্যাগী বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। আমাদিগের দেশের প্রাচীন শাস্ত্র, প্রাচীন বিধি এবং প্রাচীন ব্যবহার এই ভাবকে জাতীয় জীবনে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজ অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া সংসার এবং ধর্ম্মের এই বিরোধ ভাঙ্গিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। মানবের দৈনিক জীবনকে আধ্যাত্মিক আলোকে উজ্জ্বল করিয়া সমুদায় জীবনের ক্ষেত্রকে ধর্ম্মক্ষেত্র করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম অবতীর্ণ। হিন্দু শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া ব্রাহ্মসমাজ—

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ"

এই মহাবাক্য উদ্ধার এবং প্রচার করিলেন। জনসাধারণ এখনও এই মহাবাক্যের ভাব গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। ব্রাহ্ম গৃহস্থগণ ইহা কতদূর পারিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে তাহাই চিন্তার বিষয় হইয়াছে। সংসার করিব কিন্তু সংসারাসক্ত হইব না, বিষয়ের মধ্যে বাস করিব কিন্তু "বিষয়ী" হইব না—এ কথা উপদেশেই রহিয়া যাইতেছে—কি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে—তাহা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ এখন একটী বিস্তীর্ণ সমাজরূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে। প্রভু পরমেশ্বরের কৃপায়—শত শত ব্রাহ্ম পরিবার নানা স্থানে বাস করিতেছেন। ব্যারীষ্টার ব্রাহ্ম, উকীল ব্রাহ্ম, ডাক্তার ব্রাহ্ম, ব্যবসায়ী ব্রাহ্ম, কেরাণী ব্রাহ্ম, শিক্ষক ব্রাহ্ম, চাষী ব্রাহ্ম—সংসাররূপ সংগ্রামক্ষেত্রে সহস্র সহস্র ব্রাহ্ম নানারূপে বিচরণ করিতেছেন। বিষয়ী ব্রাহ্ম ও বিষয়ত্যাগী ব্রাহ্মও দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু অনাসক্ত বিষয়ী ব্রাহ্মের সহিত এখনও ভাল করিয়া সাক্ষাৎ হইতেছে না। ৬৫ বৎসরের অভিজ্ঞতারপর কি বলিতে হইবে—যে বিষয়ী এবং বিশ্বাসীর দুই পৃথক দল ভাঙ্গিয়া ব্রাহ্মসমাজ এক

করিতে সমর্থ হন নাই? অব্রাহ্ম বিষয়ী যেমন নিজ স্বার্থে ডুবিয়া আছেন, ব্রাহ্ম-বিষয়ীও কি তাহাই করিতেছেন? কথা বার্ত্তা, আচার ব্যবহার, চলন চরিত্রে—উভয়কে পৃথক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, এরূপ বিশেষ চিহ্ন কি বিষয়ী ব্রাহ্ম চরিত্রে দেখিতেছি? ব্রাহ্ম, তুমি কি এমন কিছু পাও নাই—যাহার গুণে তুমি বিষয়ী হইতে পৃথক? হায়! সে দিন কবে হইবে—যে দিন ব্রাহ্ম বলিলেই "বিশ্বাসী" বলিয়া জানা যাইবে, বিষয়াসক্ত জীব হইতে তাঁহারা পৃথক হইয়া পড়িবেন।

"বিষয়ী এবং বিশ্বাসী কি এক হইবে না?" এই প্রশ্ন মনে হইলেই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার ত্রাসের সঞ্চার হয়। বিশ্বাসী বলিয়াছেন, "কল্যকার জন্য ভাবিও না"—বিষয়ী বলিতেছেন "আগে আমার স্ত্রী পুত্রের জন্য কিছু সঞ্চয় করিতে দেও, তৎপরে আমার এ জীবন আমি প্রভুর কার্য্যে উৎসর্গ করিব।" একজন ত্যাগী, অন্যজন ভোগী (পরিমিত ভোগী?) অথবা একজন বিষয় কার্য্যের উপযোগী করিয়া বিশ্বাসকে গঠন করিয়াছেন—অন্যজন বিশ্বাসের অনুগামী করিয়া সংসারকে চালাইতেছেন। সেই জন্য মনে হয়—বিষয়ী এবং বিশ্বাসী দুই পৃথক দল জগতে চিরদিনই থাকিবে। ব্রাহ্মসমাজেও ইহার অন্যথা হয় নাই এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। একদল সত্য, ন্যায়, সরলতা ও বিশ্বাসের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজকে গঠন করিতে চেষ্টা করিবেন—অপর দল তীক্ষ্ণ প্রতিভা, কৌশল এবং চলন সই ন্যায়কে অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য চালাইবেন। এই দুই দলের সমবেত চেষ্টাতেই ব্রাহ্ম সমাজ শক্তিশালী হইবে। বিষয়ী এবং বিশ্বাসী একযোগে ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতির জন্য খাটিয়া ইহাকে পরাক্রান্ত শক্তিরূপে জগতের সম্মুখে ধরিবেন। ব্রাহ্মসমাজে এই দুই দলেরই স্থান আছে। এক দল জীবন্ত বিশ্বাসী লোক প্রস্তুত হইয়া যতদিন না ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যক্ষেত্রের সমস্ত ভার গ্রহণ করিতেছেন—ততদিন ইহা বিষয়ী লোকের লীলাক্ষেত্রই থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, তাহাতে বড় ক্ষতিও নাই।

ব্রাহ্ম সমাজ ক্রমোন্নতিশীল। ইহার গঠন কার্য্য ভগবান যে ভাবে চালাইতেছেন, তাহাতে নিশ্চয়তার সহিত বলিতে পারা যায় যে, এখানে বিশ্বাসিগণ চালক হইবেন এবং বিষয়িগণ তাঁহাদের অনুসরণ করিবেন। ব্রাহ্মসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থিগণের ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে, বিশ্বাস ও ত্যাগের বল ভিন্ন ধর্ম্ম সমাজ অন্য বলের দ্বারা চলে না, অন্য বলের দ্বারা তাহার দেহ পুষ্টি হয় না। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি ও অঙ্গপুষ্টিতে যাহারা বিশ্বাস, বৈরাগ্য প্রভৃতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান না দিয়া অন্য বলের উপরে নির্ভর করেন, তাঁহারা বালুকারাশির উপরে অট্টালিকার ভিত্তি নিহিত করেন, সেরূপ বিষয়বুদ্ধির হস্ত হইতে ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন।

প্রশ্নোত্তর।

বাক্যসংযম।

প্রশ্ন।—বাক্য সংযত রাখিবার পক্ষে কি কি কর্ত্তব্য?

উত্তর।—বিশেষ গুরুতর কারণ ব্যতীত অপরের সম্বন্ধে কোন প্রকার মতামত প্রকাশ করিবে না। অন্যকে কোন প্রকার ক্ষতি বা প্রতারণা হইতে রক্ষা করিবার জন্য, কিম্বা অন্য কোন বিশেষ গুরুতর কারণে, কাহারও সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে হইলে, বিশেষ সতর্কতা ও দুঃখের সহিত বলিতে অভ্যাস করিবে। গুণ কীর্ত্তন সম্বন্ধেও সংযত হওয়া আবশ্যক।

২। পরচর্চ্চার প্রবৃত্তি সর্ব্বথা নিন্দনীয়। এই প্রবৃত্তি প্রবল হইলে চিত্ত-বিক্ষেপ জন্মে; নিজের প্রতি দৃষ্টি হ্রাস হয়; গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি অন্তর্হিত হয়, এবং অশেষ দোষের আকর স্বরূপ যে অহঙ্কার তাহা আসিয়া মানুষকে অপদার্থ করিয়া ফেলে। এই প্রকার ব্যক্তির মনে ভক্তি স্থান পায় না।

৩। স্থানে অস্থানে উচ্চ ধর্ম্মের কথা বলার অভ্যাস নিন্দনীয়। ইহাতেও অহঙ্কার আসিয়া গ্রাস করে। অহঙ্কারীর নিকট ধর্ম্মের দ্বার অবরুদ্ধ। ধর্ম্মের কথার ছড়াছড়ি করিবে না; ধর্ম্ম প্রদর্শনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিবে।

৪। নিজের সঙ্কল্প সহসা অন্যের কাছে প্রকাশ করিবে না। ইহাতে চিত্তের লঘুতা জন্মে ও কর্ম্ম করিবার শক্তি হ্রাস হয়। যাহার অন্তরে ষ্টীম না জমিতে জমিতে সুখের ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়, তাহার কল ভাল চলে না।

৫। প্রার্থনাসংযম ও বাক্যসংযমের অন্তর্গত। প্রভু পরমেশ্বরের নিকট বাকপটুতা দেখাইবে না। "বলব কম ও করিব বেশী" ইহাই সাবধান লোকের লক্ষণ।

১ম প্রশ্ন। মনুষ্য জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য কি?

উত্তর। বৃক্ষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য যেমন বৃক্ষের প্রকৃতি আলোচনা করিলেই অনুমিত হয়, তেমনি মানবের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেই মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি তাহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, মানবাত্মার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনই মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের মধ্যে প্রেম, পবিত্রতা, জ্ঞান প্রভৃতি যে সকল উচ্চ বৃত্তি আছে, তাহা কখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। কেহ কি বলিতে পারেন যে, "আমি জ্ঞানের চরম সীমায়, অথবা প্রেমের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছি?" দিন দিন জ্ঞান প্রেম যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ততই আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হয়, সুতরাং অপূর্ণতা অনুভূত হয়। এই যে মানবাত্মার অনন্ত উন্নতি অভিমুখীন গতি, এই গতি লাভ করিবার পক্ষে ঈশ্বরের অনুগত হওয়াই একমাত্র উপায়। যিনি জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার হস্তে জীবনকে অর্পণ করিতে পারিলেই মানবজীবনের উদ্দেশ্য সফল হয়।

জীবনের উপরে মানবের কোনই কর্ত্তৃত্ব নাই। আমি কি ইচ্ছা করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি? ইচ্ছা করিয়া কি আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছি? এখন যে জীবিত রহিয়াছি, তাহাও

কি আমার ইচ্ছাতে? আমার ইচ্ছায় জীবন হয় নাই, আমার ইচ্ছায় ইহা পৃথিবীতে বাস করে না এবং আমার ইচ্ছাতে পরলোকগমন করিবে না। আমি ইচ্ছা করিলে আত্মহত্যা করিতে পারি; কিন্তু জীবনকে ত এক মুহূর্ত্তও মৃত্যু গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারি না। ইচ্ছা করিয়া হাত মুষ্টিবদ্ধ করিতে পারি; কিন্তু তখন যে তর তর বেগে আমার প্রত্যেক ধমনী দিয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহা আমার ইচ্ছা সাপেক্ষ নহে। এই জীবনের আদিতে, মধ্যে, অন্তে আমার হাত নাই, এই জীবন সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই হস্ত রচিত এবং তাঁহার দ্বারা পরিরক্ষিত, সুতরাং তাঁহাকে অর্পণ করাই ইহার উদ্দেশ্য। যিনি পূর্ণ পবিত্র, পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ জ্ঞান তাঁহাকে আদর্শ করিয়া অনন্ত উন্নতিপথে গমন করা ও তাঁহাকে লাভ করাই মানবজীবনের লক্ষ্য।

দুই জাতীয় চরিত্র।

বিস্তীর্ণ এক সরোবর বক্ষে দুটী সুন্দর প্রস্ফুটিত পদ্মফুল শোভা পাইতেছিল। দুটীকে দেখিতে ঠিক একই প্রকার। দুয়েরই অনুপম শোভায় চারিদিক আলোকিত হইতেছিল। দূর হইতে কোন বৈলক্ষণ্য, কোন পার্থক্য দেখা যাইতেছিল না। কিন্তু তাহার একটী মৃণালদ্বারা মূলের সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল, অপরটী ছিন্নমূল হইয়া ভাসিতেছিল। হঠাৎ একদিন পাহাড় অঞ্চলে মুষলধারে বর্ষণ হইয়া সরোবরের জল স্ফীত হইয়া উঠিল। তীর অতিক্রম করিয়া দ্রুতবেগে স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মূলহীন পদ্মটী ভাসিয়া কোথায় চলিয়া গেল। যেটী মূলের সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল, সেটী স্রোতের বেগে ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইল বটে, তরঙ্গের আঘাতে একবার উর্দ্ধে একবার অধোতে, একবার উত্তরে একবার দক্ষিণে হেলিতে দুলিতে লাগিল বটে, ঘোর আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া কখনও চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল বটে—কিন্তু স্বস্থান চ্যুত হইল না, বন্যাবসানে যথাস্থানে স্থিত হইয়া শোভাবিস্তার করিতে লাগিল। মানব সমাজে সচরাচর আমরা এই প্রকার দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া থাকি। দুই প্রকারের সাধুতা, সদনুষ্ঠান ও সচ্চরিত্রতা মানব সমাজ-বক্ষে প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। বাহির হইতে উভয়ের সৌন্দর্য্যে, উভয়ের কার্য্যে উভয়ের অনুষ্ঠানে কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য ও পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। সকল সাধুতা, সদনুষ্ঠান এবং সচ্চরিত্রতাই সুন্দর, পবিত্র এবং স্পৃহনীয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাই, যখন দারুণ বিপ্লব উপস্থিত হয়, যখন বিঘ্ন বিপত্তি ও পরীক্ষার ভীষণ তরঙ্গ উত্থিত হয়, তখন এক প্রকারের সাধুতা, সদনুষ্ঠান ও সচ্চরিত্রতা মূলহীন পদ্মের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যায়, আর এক প্রকারের সাধুতা, সদনুষ্ঠান ও সচ্চরিত্রতা বিষম তরঙ্গাঘাতে আন্দোলিত হয় বটে, ইতস্ততঃ হেলিতে দুলিতে থাকে বটে, কিন্তু কখনই স্বস্থান-চ্যুত হয় না, তরঙ্গাবসানে স্থিরভাব ধারণ করে ও অটল হইয়া থাকে। ইহার কারণ কি? একই বস্তুর এমন বিসদৃশ পরিণাম কেন ঘটে? এ প্রশ্নের উত্তর কোথায়?

এক প্রকারের সাধুতা, সদনুষ্ঠান, পবিত্রতা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার মূল সুদৃঢ় ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ঈশ্বর প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত জগৎ চূর্ণ হইয়া গেলেও এই সাধুতা, সদনুষ্ঠান ও সচ্চরিত্রতার মূল ছিন্ন হয় না। ইহা এমন সার বস্তু, যাহা তরঙ্গে ডোবে না, অগ্নিতে ভস্ম হয় না, কঠিন আঘাতেও চূর্ণ হয় না। জগতের প্রকৃত ধর্ম্মবীরগণের জীবনে এই প্রকারের সাধুতা, সদনুষ্ঠান ও সচ্চরিত্রতা দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছে। এইরূপ বিশ্বাসী-দিগকেই পরমেশ্বর আপনার কার্য্যের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। আর এক প্রকারের সাধুতা, সদনুষ্ঠান ও সচ্চরিত্রতা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা ছিন্নমূল পদ্মের ন্যায় স্রোতে ভাসিয়া যায়। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এই প্রকারের সাধুতা প্রভৃতি আত্মগৌরব, লোকের প্রশংসা প্রভৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। প্রশংসার জন্য লোক কি না করিতে পারে? এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, প্রশংসার লোভে কতজন নিজ জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিয়াছেন, কতজন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। কিছু কাল পূর্ব্বে আমাদের দেশে চৈত্র সংক্রান্তির সময়ে চড়ক পূজার প্রথা ছিল, ঐ চড়কের সময় দেখিতাম, কোন কোনও লোক লৌহশলাকার দ্বারা পৃষ্ঠদেশ ফুঁড়িয়া তদবস্থাতে ঝুলিয়া চড়কগাছে পাক খাইত। সে কি ভীষণ দৃশ্য। এইরূপ দুষ্কর লোমহর্ষণ তপস্যাতে যাহারা প্রবৃত্ত হইত তাহারা সকলে কি বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব দ্বারা চালিত হইত? তাহা নহে। তাহাদের অনেকে গ্রামের মধ্যে অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর ও নিকৃষ্ট চরিত্রের লোক, তাহারা সম্বৎসর কাল গ্রামের লোকের উপরে উপদ্রব করিয়া কাটাইত, বৎসরান্তে গাজনের সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইত। তবে তাহারা কোন শক্তির বলে এই দুষ্কর কার্য্য করিতে সমর্থ হইত? চিন্তা করিলে অনুভব করা যাইবে যে, চতুর্দ্দিকের লোকের প্রশংসা বলিয়া উন্মাদিনী শক্তিই তাহাদিগকে এইরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত করিত। এইরূপ এ জগতে অহরহ এমন অনেক দুষ্কর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত, যাহার মূলে প্রশংসাপ্রিয়তার গূঢ় শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তি বিদ্যমান নহে। যে সকল বীর সমরক্ষেত্রে শৌর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, যে সকল ধর্ম্মবীর জ্বলন্ত বৈরাগ্য ও স্বার্থনাশের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন, সেই সকল বীরত্বের কত অংশ যে প্রশংসাপ্রিয়তা প্রণোদিত, তাহা কে বলিতে পারে। প্রশংসাপ্রিয়তা অতি গূঢ় ও সূক্ষ্মভাবে আমাদের চরিত্রে কার্য্য করিয়া থাকে। জগতের অনেক সাধুতা ও সদনুষ্ঠান এই প্রশংসাপ্রিয়তার গূঢ় শক্তি হইতে উৎপন্ন। বাহির দেখিয়া বিচার করিতে গেলে প্রকৃত বিশ্বাসী এবং এই আত্মগৌরবান্বেষীদিগের কার্য্যের বড় তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সূক্ষ্মবিচারে ইহাদের মধ্যে স্বর্গ ও নরকের ব্যবধান লক্ষিত হয়। অতএব ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ, ব্রাহ্মিকা ভগিনীগণ, একবার হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আত্ম-পরীক্ষা কর। তোমাদের সাধুতা, সদনুষ্ঠান ও সচ্চরিত্রতার মূল কোথায়, একবার ভাল করিয়া অনুসন্ধান কর। যদি

সুদৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তির উপর তোমার জীবন প্রতিষ্ঠিত না হইয়া থাকে, আজ হউক আর কাল হউক বিষম তরঙ্গাঘাতে তুমি কোথায় যাইয়া পড়িবে তোমাকে কেহ খুঁজিয়া পাইবেন না। সাবধান, সাবধান, সাবধান। আত্মগৌরব অন্বেষণ করিও না, অকূলে ডুবিয়া মরিবে। এই ভীষণ নরকে অনেককে ডুবিয়া মরিতে হইয়াছে। বিশ্বাসে আপনাকে বাঁধ. ইহলোক ও পরলোকে জয়লাভ করিবে, সকল আবর্ত্তের মধ্যে বিধাতা তোমাকে রক্ষা কবিবেন।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

গীতা ও বাইবেল।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

গীতার আদর্শ উচ্চ কি, বাইবেলের আদর্শ উচ্চ, ইহা লইয়া "যুগান্তর" নামক নবোপন্যাসে পঙ্কুর সহিত বিজয়ার তর্ক হয়। পঙ্কুর মতে বাইবেলই শ্রেষ্ঠ। বিজয়া গীতার আদর্শকে উচ্চ মনে করেন। বিচারে বিজয়ার জয় হয়। কিন্তু বিচারটা বড় একতরপা হইয়াছিল মনে করিয়া এই কয়েকটী কথা লিখিতে সাহসী হইলাম। ভরসা করি, ভক্তি-ভাজন গ্রন্থকার আমাদের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিয়া ভ্রান্তি দূর করিয়া দিবেন।

বিজয়া বলেন—"বাইবেলের ভক্তি সকাম।" আর গীতা নিষ্কাম ভাবে ধর্ম্মাচরণ করিতে উপদেশ দেন। বাইবেলের কোন স্থানে এরূপ সকাম ভক্তির উল্লেখ আছে. তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। যীশুর উপদেশের মধ্যে Sermon on the mountই শ্রেষ্ঠ। তাহা এই—"Blessed are the poor in spirit, for theirs is the Kingdom of Heaven Blessed are they that mourn, for they shall be comforted Blessed are the meek, for they shall inehrit the earth Blessed are they that hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Belssed are pure in heart for they shall see God Blessed are the peace makers, for they shall be called the children of God."

যদি ভগবানের পুত্র রূপে পরিগণিত হইতে উপযুক্ত হইবার জন্য, তাঁহার শান্তির রাজ্যে প্রবেশ করিতে অধিকারী হইবার জন্য বা তাঁহার সন্নিকটে থাকিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার-রূপ বিমল ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিবার আশায়, যিনি জগতের হিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহার কর্ম্মও সকাম হয়, তবে নিষ্কাম কাহার? ইহা অপেক্ষা গীতাতেই বা কি উচ্চাদর্শ আছে। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতেও ত এইরূপ বলিয়াছেন। নিষ্পাপ যোগী ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার জনিত বিমলানন্দ প্রাপ্ত হন—সুখেন ব্রহ্ম সংস্পর্শ মত্যন্তং সুখমশ্নুতে। তিনি নিত্য. শান্তি লাভ করেন, শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ইত্যাদি। গীতার যাহা "পরা গতি" তাহাই বাইবেলের (kingdom of Heaven) বাইবেলের ন্যায় গীতাতেও নরকাদির ভয় বিলক্ষণ দেখান আছে। অধিকন্তু গীতার ব্রহ্মবিদেরা যে পথে গমন করিয়া ব্রহ্মকে লাভ করেন, তাহার বর্ণনা শুদ্ধ আছে।

অগ্নি জ্যোতিরহঃ শুক্ল ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ ইত্যাদি হরচন্দ্র মনে করেন খৃষ্টীয়ানের স্বর্গ ও হিন্দুর স্বর্গ একই প্রকার। শেষোক্তটীতে যেমন কতকগুলি বিদ্যাধরী আছে. প্রথমটীতে সেইরূপ পরী আছে। বাইবেলের স্বর্গে যে সকল পরী (angels) আছে তাহারা নিষ্পাপ আত্মা; ঈশ্বরের সন্নিধানে থাকিয়া তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তনে কালাতিপাত করেন। পুরাণের স্বর্গ সৌখিন বাবুর বিহার উদ্যান। বাইবেলের স্বর্গ ব্রহ্ম মন্দির। উভয়ের প্রভেদ বড় সামান্য নয়। মনে করুন, বাইবেলের আদর্শ উচ্চ দরের নয়। দেখা যাউক. গীতারই বা শিক্ষা কত দূর নিষ্কাম। গীতার বাসুদেব "হতোবা প্রপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্" যুদ্ধে হত হইলে তুমি স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে এবং জয়ী হইলে জগতের অধিপতি হইবে।

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূণ ভুংক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্। অতএব যুদ্ধ দ্বারা শত্রুগণকে জয় করিয়া যশস্বী হও এবং সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ধনসম্পত্তি লাভ রূপ পার্থিব সুখের আশায় অর্জুনকে পুনঃ পুন অম্লান বদনে গুরু হত্যা, জ্ঞাতি হত্যা রূপ মহা অধর্ম্মকর কর্ম্মে (কর্ম্মনি ঘোরে) নিযুক্ত হইতে পরামর্শ দিতেছেন। যোগ-সাধন কৃষ্ণের মতে মহৎ ধর্ম্ম। যোগে লোককে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য কৃষ্ণ বলেন, যদি কেহ যোগ সামান্য রূপও অভ্যাস করেন, তিনি বহু বৎসর স্বর্গভোগ করিয়া অবশেষে ধনীদিগের গৃহে (শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে) জন্ম গ্রহণ করেন। এ সকল উপদেশের ভিতর নিষ্কামত্বের কোন সংস্রব নাই। আর গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মের অর্থই বা কি। উক্ত পুস্তকে লিখিত আছে যদি কেহ আপনাকে কর্ত্তা মনে না করিয়া, বুদ্ধিকে কার্য্যে আসক্ত না করিয়া অর্থাৎ নিষ্কাম ভাবে জগতের সমস্ত লোককে হত্যা করে, তবে তাহার নরহত্যা জনিত পাপের ফল (পুনঃ জন্মাদি) ভোগ করিতে হয় না। (১৮ অধ্যায় ১৭ শ্লোক)

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে "সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলী" মুক্তি অর্থে কি বোঝেন। ভক্তি এবং বিশ্বাস বলে পাপ জয় করিয়া ভগবানের অনুগ্রহে তাঁহার রাজ্যে উপনীত হওয়াকে খৃষ্টীয়ান salvation বা মুক্তি মনে করেন। গীতা ভক্ত, আপনার আত্মাকে পরমাত্মার অংশ মনে করিয়া, যোগাদি প্রক্রিয়া দ্বারা কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন, অতএব পুনঃর্জ্জন্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আপনাকে ত্রিগুণের অতীত করিয়া পরব্রহ্মে লীন হওয়াকেই মুক্তি মনে করেন। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে পরব্রহ্মের অংশ হইবার আশা কত দূর যুক্তি সঙ্গত তাহা আপনি বিচার করিবেন। ইহার মধ্যে কোনটী ব্রাহ্মমণ্ডলীর আদর্শ?

রাভেনসা কলেজ কটক। } বশম্বদ শ্রীজয়গোপাল দে।

ব্রাহ্মসমাজ।

উৎসব ঃ—বিগত ৯ই মাঘ হইতে ১৫ই পর্য্যন্ত কাকিনীয়া ব্রাহ্ম সমাজে মাঘোৎসব হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে ছাত্রসমাজ গৃহে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য বাবু গৌরনাথ রায় মহাশয় "ধর্ম্মের উন্নতি" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন।

বিগত ৫ই ফাল্গুন হইতে ১০ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস এবং শ্রীযুক্ত বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মেদিনীপুর গমন করেন। উপাসনা, উপদেশ এবং বক্তৃতাদি অতি জীবন্ত ভাব আনয়ন করিয়াছে। দয়াময় প্রভু পরমেশ্বর এই উৎসবের ফল স্থায়ী করুন।

নাম করণ ঃ—বিগত ১৮ই মাঘ কাকিনীয়া ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দাসের দ্বিতীয় পুত্রের নাম শ্রীমান চিত্তরঞ্জন রাখা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে অক্ষয় বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১৲ এবং ককিনীয়া ব্রাহ্মসমাজে ১৲ দান করিয়াছেন।

বিবাহ ঃ—বিগত ৯ই মার্চ্চ রামপুরহাট নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষের ভাগিনেয়ী কুমারী কুমুদিনী ঘোষের সহিত খালোড় নিবাসী শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্যের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহে শ্রীযুক্ত বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বর ও কন্যাকে উপদেশ দান করেন। বিবাহ ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টরী হইয়াছে।

শোক সম্বাদ ঃ—বাবু প্যারীলাল ঘোষের নাম তত্ত্ব-কৌমুদীর পাঠকমাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। ইনি প্রায় ৭ বৎসর হইল চিত্রকূট এবং ওঁকারনাথ পর্ব্বতের গুহায় কঠোর সাধনায় লিপ্ত ছিলেন। সংপ্রতি ওঁকারনাথ পর্ব্বত গুহায় ৩৭ বৎসর বয়সে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ওঁকারনাথবাসীগণ তাঁহার দেহ সসম্মানে সমাধিস্থ করিয়াছেন।

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী আযুদিয়া গ্রামে একটী সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি পিতা, মাতা, ভাই ভগ্নী এবং একমাত্র কন্যাকে শোকে ডুবাইয়া গিয়াছেন। ইনি শৈশব হইতেই সরল, সত্যনিষ্ঠ এবং ধর্ম্মভাবপ্রবণ লোক ছিলেন। ইনি বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন। বাল্যকাল হইতে ইঁহার জীবনে অনেক বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। অন্যান্য বালকেরা যখন বাল্যক্রীড়া করিত—তিনি তখন ধীর, গম্ভীরভাবে একধারে দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিতেন। প্রায় ১৮।১৯ বৎসর বয়সে ইনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সুসমাচার প্রাপ্ত হন। তদবধি ইঁহার জীবনে ব্যাকুলতা ও বৈরাগ্য বিশেষ ভাবে আরম্ভ হয়। বিষয় কর্ম্মের কোলাহলের মধ্যেও তিনি ধ্যানশীল, জিতাত্মা ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ব্যাকুল ও দীনাত্মা লোক এ সংসারে বড় মেলে না। অতি তীব্র ভাবে তাঁহার কার্য্যের সমালোচনা করিলেও তিনি কখন বিরক্ত হইতেন না। ধীরভাবে বলিতেন—"জানই ত আমি অতি হীন দুর্ব্বল লোক, পদে পদেই কত ত্রুটী করি। আমার ন্যায় হতভাগ্য পাপী আর কে আছে?" তাঁহার এই দীনতা ও বিনয়ের গুণে তিনি এক জনও শত্রু পশ্চাতে রাখিয়া যান নাই। প্রায় ২৬।২৭ বৎসর বয়সে কন্যার নামকরণ উপলক্ষে পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হন, এই বৎসরই তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়। তদবধি তিনি বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসর লইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু ভাই এবং ভগ্নীর শিক্ষার জন্য আরও চারি বৎসর বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে হইল। তিনি রংপুরের অধীন গোপালপুর মধ্য ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। দিনে বিষয় কার্য্য করিতেন—প্রায় সমস্ত রাত্রি একাসনে বসিয়া ধ্যান করিতেন। অবশেষে একান্ত অতৃপ্ত হইয়া ১৮৮৮ সালের ১২ই আগষ্ট চিত্রকূট গমন করেন। যাইবার সময় বলিয়া যান, "যদি প্রাণের বাসনা মিটাইতে পারি, ফিরিয়া আসিয়া প্রাণ ভরিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিব।" চিত্রকূট পর্ব্বতে পূর্ণ ৩ বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া অবশেষে ওঁকারনাথ পর্ব্বতে গমন করেন। চিত্রকূট অবস্থানকালে মাঝে মাঝে ভাই ভগ্নীদিগকে পত্রাদি লিখিতেন কিন্তু ওঁকারনাথ গমন করিয়া মৌনব্রত অবলম্বন করেন ও বাহিরের সঙ্গে সকল সংশ্রব ছিন্ন করিয়া ফেলেন। আমাদিগের একজন বন্ধু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ওঁকারনাথ গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে ২।৩ ঘণ্টার বেশী তিনি বিশ্রামাদি করিতেন না। সামান্য একটুকুন দুগ্ধ পান করিয়া জীবনধারণ করিতেন। পূর্ব্বোক্ত বন্ধু আরো বলিয়াছেন—"বুদ্ধদেবের পর এমন উৎকট তপস্যার কথা আর শুনি নাই।" যদি এই বৈরাগ্য, ব্যাকুলতা ও বিনয়ের সহিত সেবার সাধন হইত, তাহা হইলে আজ এই সাধুপুরুষ দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজের এবং এই হতভাগ্য দেশের কতই না মঙ্গল সাধিত হইত! দেশের জল বায়ুর মধ্যে কি বিষ আছে যে, বিশ্বাস, বৈরাগ্য ও সেবা একাধারে ফুটিতেছে না! কি পরিতাপের বিষয় যে, এমন দীন ও ব্যাকুলাত্মাকে এক প্রকার আত্মহত্যার দ্বারা জীবন শেষ করিতে হইল! হায়! ব্রাহ্ম

সমাজের মধ্যে এরূপ বিশ্বাসী ও দীনাত্মার কত প্রয়োজন! এরূপ ব্যক্তির জীবন যে ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আনিতে পারিল না এই ক্ষোভ রহিয়া গেল।

সাধনাশ্রম—ব্রাহ্মসাধনাশ্রম হইতে দুই দল মফঃস্বল যাত্রা করিয়াছেন, এসংবাদ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। একদল রাজসাহী রঙ্গপুর, কুচবিহার প্রভৃতি স্থান হইয়া আসামের অভিমুখে যাইতেছেন, অপর দল ফুলবাড়ী, নেলফামারী প্রভৃতি স্থান হইয়া দিনাজপুর পূর্ণিয়া প্রভৃতির অভিমুখে যাইতেছেন। আসাম যাত্রীদলে শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত অমৃত লাল গুপ্ত আছেন, দ্বিতীয় দলে শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র কাঞ্জিলাল আছেন। সাধনাশ্রমের নিয়ম এই যে মফস্বলে বাহির হইতে হইলে কেহ একাকী যাইবেন না, অন্ততঃ অপর একজন সঙ্গে চাই, তদনুসারে দুই দুই জনে বাহির হইয়াছেন। আমরা ধন্যবাদ সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের অধ্যক্ষগণ এতদর্থ ফ্রী পাশ দিয়াছেন।

আসাম যাত্রীদল—ইঁহারা ১৯শে ফেব্রুয়ারী রাজসাহীতে উপস্থিত হন। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু ও স্থানীয় কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ সেন মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ইঁহাদিগকে নিজ ভবনে স্থান দিয়া আতিথ্য ও সৌজন্যে ইঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। ইঁহারা ২০শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২৫শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত রাজসাহীতে কার্য্য করেন। ব্রাহ্মদিগের ভবনে ভবনে উপাসনা, উষাকীর্ত্তন, সমাজে উপাসনা, বক্তৃতা, কথকতা প্রভৃতির দ্বারা যথাসাধ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের গ্রন্থাবলী অনেক বিক্রয় করেন, তৎপরে ২৬শে ফেব্রুয়ারী তাহারা রঙ্গপুরে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁহারা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর সেন মহাশয়ের ভবনে স্থান প্রাপ্ত হন। সেই রাত্রেই একটী বক্তৃতা হয়। তৎপরে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তাহারা রঙ্গপুরে অবস্থিতি করিয়া ভবনে ভবনে উপাসনা, সামাজিক উপাসনা ও বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। ১লা মার্চ্চ তাঁহারা দীনহাটাতে উপস্থিত হন। সেখানে তত্রত্য পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে অবস্থিতি করিয়া ৩রা মার্চ্চ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত উপাসনা, ধর্ম্মালোচনা, সংগীত সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতির দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। ৩রা মার্চ্চ তাঁহারা কুচবিহারে উপস্থিত হন। কুচবিহারের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান কালিকাদাস দত্ত মহাশয় ইঁহাদিগের কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এখানেও বিশেষ বিশেষ ভবনে ও সমাজে উপাসনা, পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, সংকীর্ত্তন, ও কথকতা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হয়। ইহার পর ইঁহারা যেখানে যেখানে গমন করিবেন, তথাকার কার্য্যবিবরণ ক্রমে প্রকাশিত হইবে। স্থানীয় ব্রাহ্মবন্ধুগণের প্রতি অনুরোধ, ইঁহাদের কার্য্যের দোষগুণ যাহা দেখিতেছেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক সাধনাশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে জানাইয়া বাধিত করিবেন।

উত্তর-বঙ্গ যাত্রীদলের কার্য্যবিবরণ এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

আরা সাধনাশ্রম—আরা হইতে এই সন্তোষজনক সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যে এবৎসরের প্রারম্ভ হইতে এখানকার পরিচারকগণের কার্য্যের প্রতি স্থানীয় লোকের অধিক মনোযোগ দৃষ্ট হইতেছে। পরিচারকগণ সপ্তাহে এক দিন প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্নেহাস্পদ ভাই সুন্দর সিং উৎসাহের সহিত এই সকল বক্তৃতা করিতেছেন। ভাই প্রকাশ দেব মজাফরপুরের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীমান সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে সঙ্গে লইয়া মধ্যে বাঁকীপুরে গিয়াছিলেন। আরা হইতে আশ্রম তুলিয়া লইয়া বাঁকীপুরে যাইবার প্রস্তাব হইতেছে। কারণ বাঁকীপুর একটী প্রধান কার্য্যক্ষেত্র। জগদীশ্বর তাঁহার এই দাসদিগের কার্য্যের সহায় হউন।

দান প্রাপ্তি স্বীকার—বাবু ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার পরলোকগতা স্ত্রী কিশোরবালা চক্রবর্ত্তীর স্মরণার্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থায়ী প্রচার ফণ্ডে ৫০৲ টাকা এবং ব্রাহ্মবালিকা বোর্ডিংএ ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য দাতাকে বিশেষ ধন্যবাদ।

গত মাঘোৎসবের সময় বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের স্ত্রী ব্রাহ্মিকা উৎসবের দিন সমস্ত ব্রাহ্মিকা ও তাঁহাদের সন্তানগণকে (প্রায় ২৫০ শত লোককে) পরিতোষ পূর্ব্বক খাওয়াইয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ২রা চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

২৪শ সংখ্যা। ১৭শ ভাগ।

১৬ই চৈত্র শুক্রবার, ১৮১৬ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৬।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময় বিধাতা! যখন আমরা প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কোনও হীন কার্য্যের অনুষ্ঠান করি, তখন আমরা আপনাদের চক্ষে আপনারা ক্ষুদ্র হইয়া যাই, এই মানব-জীবনের মহত্ত্ব মনে থাকে না; তখন আর পাপ প্রলোভনের সমক্ষে দাঁড়াইতে সাহস হয় না। কিন্তু হে প্রভো! আমাদের জীবন ত ক্ষুদ্র নহে। যে জীবন দ্বারা আমরা তোমাকে জানিব, তোমাকে প্রীতি করিব, এবং তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিব, সে জীবন কিরূপে ক্ষুদ্র? যাহা তোমার সেবার উপযুক্ত হইতে পারে তাহা ত ক্ষুদ্র নহে। তোমার সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ তাহা যখনি অনুভব করি, তখনি এ জীবনের মহত্ত্ব আমাদের অন্তরে উদ্দীপ্ত হয়; তখনি এ জীবনের দায়িত্ব ও গুরুত্ব জ্ঞান উজ্জ্বল হয়। তুমি করুণা কর, যেন আমরা আত্মবিস্মৃত হইয়া ক্ষুদ্রতার মধ্যে পতিত না হই। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের যে ভার আমাদের প্রতি অর্পণ করিয়াছ তাহার গুরুত্ব যেন সর্ব্বদা প্রতীতি করি, এবং সর্ব্বাবস্থাতে তোমাকে আশ্রয় করিয়া আপন জীবনের মহত্ত্ব সাধন করিতে পারি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

আধ্যাত্মিক বায়ু—একজন মানুষ যদি দিনের মধ্যে ২৩ ঘণ্টা দুর্গন্ধময়, অস্বাস্থ্যকর, আবর্জ্জনা ও দূষিত বায়ু পূর্ণ গৃহে বাস করে, আর একঘণ্টা মাঠে, অনাবৃত মুক্ত-স্থানে পরিষ্কার বায়ু সেবন করিয়া আসে, তাহা হইলে কি তাহার স্বাস্থ্য রক্ষা হয়? কোনও গৃহস্থ যদি তাহার নিজের গৃহটী পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখে, গৃহগুলিতে প্রমুক্ত বায়ু সঞ্চারের সুব্যবস্থা করে, গৃহ হইতে আবর্জ্জনা রাশি দূরে নিক্ষেপ করে কিন্তু যে পল্লীতে তাহার বাস, তাহা যদি অতিশয় কদর্য্য, দুর্গন্ধময়, বিষাক্ত ম্যালেরিয়াতে পূর্ণ থাকে, তাহা হইলে কি সে তাহার গৃহকে স্বাস্থ্যকর রাখিতে সমর্থ হয়? স্থান সম্বন্ধে যেমন মানব-পরিবার সম্বন্ধেও ঠিক সেই রূপ। একটী বালক যদি সর্ব্বদা পিতামাতার অসৎ দৃষ্টান্তের মধ্যে বর্দ্ধিত হয়, উপাসনাহীনতা, ভক্তি-হীনতা, হৃদয়হীনতা, অসত্যাচরণ অভদ্রালাপ, কুৎসিত আমোদ ও অন্যের সমালোচনা প্রভৃতির দূষিত ও বিষাক্ত বায়ুর মধ্যে বাস করে, আর সপ্তাহে এক দিন রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ে গিয়া নীতি শিক্ষা করিয়া আসে, তাহাতে কি কখনও তাহাদের নীতি শিক্ষা হয়? সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছি, বালক বালিকাগণ গৃহের শিক্ষার অনুরূপ চরিত্র লইয়াই বর্দ্ধিত হয় এবং জীবন ধারণ করে। ঐ যে পুস্তক-ভার-বহনকারী বালক ও যুবকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছে, কত উন্নত নীতি, উন্নত জ্ঞান ও উন্নত দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইতেছে, ইহাদের অনেকের চরিত্র এত হীন, এত নীচ হইতেছে কেন? ইহার কারণ আছে; ইহার কারণ এই যে, ইহারা সর্ব্বদা যে হাওয়াতে বাস করিতেছে, তাহা ইহাদের চরিত্রের প্রকৃত উৎকর্ষের অনুকূল নহে। আমরা জীবনের অধিকাংশ সময় যে গৃহে, যে পরিবারে, যে সমাজে বাস করি এবং যাহার মধ্যে আমরা বর্দ্ধিত হই, তাহাতে যদি ধর্ম্ম, সুনীতি, সদনুষ্ঠান এবং সচ্চরিত্রতার বায়ু প্রবাহিত না থাকে, তাহা হইলে দুই ঘণ্টার উপদেশ কিম্বা জ্ঞান চর্চ্চা দ্বারা কি ফললাভ হইবে? দিনের অধিকাংশ সময় যদি কদর্য্য বিষয়ের মধ্যে, অসার কোলাহলের মধ্যে ধর্ম্মভাবহীন হইয়াই বাস করি, দুই এক ঘণ্টার উপাসনাতে বসিয়া কি ফল হইবে? দেহের পক্ষে যেমন, আত্মার পক্ষেও ঠিক তাহাই হইয়া থাকে।

কিন্তু দুই এক জন সৌভাগ্যবান পুরুষ দেখিতে পাই—যাঁহাদিগকে দেখিলেই বোধ হয় যেন এই দূষিতভাব তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহাদের মন যেন সর্ব্বদাই উন্নত চিন্তা, উন্নত আকাঙ্ক্ষা এবং মহৎ কার্য্যের বায়ুর মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে। যেন তাঁহারা সংসারের নীচতা, ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা, অপ্রেম এবং দূষিত ভাবের নিম্ন ভূমিতে কখনই অবতরণ করেন না। এইরূপ সাধু পুরুষ আমাদের মধ্যেই দেখিয়াছি। ইঁহাদিগকে দেখিলেই মনে হয় ইঁহারা যেন এ জগতের লোক নহেন। নিম্ন বঙ্গের ম্যালেরিয়া দূষিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া দার্জ্জিলীং পর্ব্বতে আরোহণ করিলে যেমন

দেহ স্বাস্থ্যলাভ করে, বিশ্বাসের এই উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিতে পারিলে আত্মা তেমনি স্বাস্থ্যলাভ করে।

এখন প্রশ্ন এই যে, উন্নত ভূমি ত দেখিতেছি। কিন্তু সেখানে আরোহণ করিবার উপায় কি? সংসারের কদর্য্য বিষয়ে বেষ্টিত থাকিব, অথচ মন ঐ উচ্চ ভূমিতে বিচরণ করিবে, ইহা সম্ভব হয় কিরূপে? এ প্রশ্নের উত্তরে, এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, আত্মার ঐকান্তিক অকপট ভাবের বিশেষ প্রয়োজন। যাহা সত্য বলিয়া জানিবে অকপট ভাবে তাহার অনুসরণ কর। সর্ব্বদা তোমার বাহির এবং ভিতর একইরূপ রাখিবার জন্য চেষ্টা কর। সর্ব্বদা আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখ তোমার অন্তর এবং বাহির এক কি না। যেখানে আত্মার ঐকান্তিকতা এবং শিশুর ন্যায় সরলতা নাই, বিমল আধ্যাত্মিকতা সেখানে জন্মে না। জ্ঞানের অভিমান, ধনের অভিমান, সাধনের অভিমান, প্রচারের অভিমান, সকলপ্রকার অভিমানকে বিদায় দিতে না পারিলে ঐকান্তিকতা জন্মে না। সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে খাঁটি থাকিবার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে। আমরা অনেক সময় আত্ম-প্রতারিত হই। নিজের যাহা নাই, তাহাই আছে বলিয়া ভাবি। ইহাই বড় সর্ব্বনাশের ব্যাপার। ঐকান্তিকতা এবং সরলতা থাকিলেই, মানুষ একটা উচ্চভূমি প্রাপ্ত হয়। তখন আর আত্মগৌরব বুদ্ধি থাকে না। তখন আপনাকে দেখা ঘুচিয়া যায়, ভগবানের শক্তি ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না।

আত্মার-তৃপ্তি—ক্ষুধার্ত্ত প্রাণী এবং আহারের দ্বারা পরিতৃপ্ত প্রাণী এই উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। পশুশালাতে যেখানে নানাপ্রকার পশু রক্ষা করা হয় এবং তাহাদিগকে দিনান্তে আহার দেওয়া হয়, সেখানে প্রবেশ করিলেই এই প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। পশুদিগের আহারের পূর্ব্বের এবং পরের অবস্থা যদি দেখা যায় তাহার মধ্যে কত প্রভেদ। ক্ষুধার্ত্ত সিংহ এবং ব্যাঘ্র যখন খাঁচার মধ্যে থাকে, তখন তাহাদের অবস্থা কি চঞ্চল! নিরন্তর এদিকে ওদিকে ঘুরিতেছে, বিশ্রাম নাই, আরাম নাই, কি ভীষণ অবস্থা। কিন্তু যখন তাহারা আহার পাইল, ক্ষুধানল নির্ব্বাণ হইল, তখন যাইয়া দেখ, তাহাদের কেমন শান্ত, স্থির ও নিরুপদ্রব ভাব। কেমন সুখে শয়ন করিয়া আছে, ক্রোধের কারণ উপস্থিত করিলেও আর ক্রুদ্ধ হয় না। ক্ষুধার্ত্ত প্রাণী ও পরিতৃপ্ত প্রাণীর যে প্রভেদ, ঈশ্বরকে যিনি অন্বেষণ করিতেছেন এবং যিনি ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছেন, এ দুইয়েও সেই প্রভেদ। যখন প্রাণে ভয়ানক সংগ্রাম চলিয়াছে, তখন কি চঞ্চলতা, অস্থিরতা এবং উদ্বেগ। কিন্তু ঈশ্বরেতে যাঁহার বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে চিত্ত কেমন শান্ত, সমাহিত, গম্ভীর ও নিশ্চিন্ত। পরিতৃপ্ত প্রাণীকে দেখিলে যেমন বোধ হয়, বিশ্বাসীকে দেখিলেও তেমনই বোধ হয়। এই যে প্রশান্ত ভাব ইহা বহু সাধনসাধ্য, বহু আয়াসসাধ্য। এই অবস্থা আমাদিগকে লাভ করিতে হইবে। চিরদিনই কি আমরা সংগ্রাম ও অস্থিরতা লইয়া থাকিব? চিরদিনই কি অতৃপ্ত ভাবে হাহাকার করিব? যদি কাহাকেও এই ভাবেই জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কাটাইতে হয়, তাহাতেও তাঁহার অধীর হওয়া কর্ত্তব্য নয়। বিধাতা যদি কাহাকেও অল্পদিনের সংগ্রামের পর শান্তি দেন, তিনি তো পরম সৌভাগ্যবান, তিনি দুই হাত তুলিয়া ধন্য ধন্য করুন। আর যাঁহারা তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল রহিয়াছেন, তাঁহারাও সৌভাগ্যবান, কারণ তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইবেন। কেবল যে ব্যক্তি না পাইয়াও নিশ্চিন্ত সেই ব্যক্তিই হতভাগ্য। ভারবাহী গর্দ্দভের ন্যায় তাহারা বড় বড় বাক্যের বোঝা বহিয়া মরিতেছে, মনে করিতেছে, ধর্ম্মজীবনে খুব অগ্রসর হইতেছে। আহার করে নাই, তবুও ক্ষুধার উদ্রেক নাই—বিষম পীড়ার লক্ষণ জানিবে। আমরা অনেক সময় এই অবস্থাতে পড়িয়া বিষম আত্ম-প্রতারিত হই। দশ, বিশ বৎসর ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া, উপাসনা করিয়া ধর্ম্মের বড় বড় কথা কহিয়াও ঈশ্বরকে লাভ করা হইল না, তাহার জন্য তেমন ব্যাকুলতাও নাই,—এমন হতভাগ্য আমরা অনেকেই আছি। এ বড় বিষম ব্যাধি। এরূপ যিনি আছেন, তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। বিষম সঙ্কটে পড়িয়াও যে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যায়, সে কি বাতুল!

ঈশ্বরের চরণছায়া—গ্রীষ্মের দিনে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্য দিয়া অনেকবার পথ চলিয়াছি। যতই বেলা বাড়িতেছে, রৌদ্রের তাপ অধিক হইতেছে, পথশ্রম বৃদ্ধি হইতেছে, শরীর ঘর্ম্মাক্ত ও অবসন্ন হইতেছে, পিপাসাতে কণ্ঠতালু শুষ্ক হইতেছে, এমন সময়ে দূরে দেখিলাম একটী ছায়াযুক্ত বৃক্ষ, দেখিয়াই তাহার সুশীতল ছায়াতে বসিবার জন্য, মন ব্যাকুল হইল। কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিবার জন্য,—তপ্ত,অবসন্ন দেহকে জুড়াইবার জন্য উৎসাহ ও একান্ত ব্যাকুলতার সহিত বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখি,—কেবল বৃক্ষ নয়, সুশীতল বারিপূর্ণ সুন্দর সরোবর সুমন্দ হিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে, হংস, সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ সুখে সন্তরণ করিতেছে। যে বায়ু এতক্ষণ দেহকে দগ্ধ করিতেছিল—তাহাই সেখানে সুশীতল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। এখানে উপস্থিত হইয়াই মনে হইল, কোন দয়ালু, পরোপকারী, ধার্ম্মিক লোক পথিকের শ্রান্তি দূর করিবার জন্য এই সরোবর খনন করিয়া তাহার কূলে এই বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন। সরোবরের জলে স্নান করিয়া এবং তাহার জল অঞ্জলি ভরিয়া পান করিয়া শীতল হইলাম—এইরূপ কতবার হইয়াছে।

বিশ্বাসিগণ বলেন, যাঁহারা পরমেশ্বরের উপর প্রকৃত নির্ভর করিয়াছেন, তাঁহারা এ জীবনে অনেকবার তাঁহার করুণাকে প্রান্তরের মধ্যস্থিত বটবৃক্ষের ছায়ার ন্যায় অনুভব করিয়াছেন। সংসারের উত্তপ্ত বাতাসে শ্রান্ত, ক্লান্ত এবং অবসন্ন হইয়া তাঁহারা পরমেশ্বরের কৃপাতরুমূলে, প্রেম সরোবরের সুশীতল হিল্লোলে প্রাণ মনকে জুড়াইয়াছেন। প্রান্তরের মধ্যে একটী বটবৃক্ষ দেখিলে পথিক যেমন ব্যাকুল ভাবে সেই দিকে ধাবিত হয়—তেমনি হে ব্রাহ্মসাধক! সংসারের শোক, তাপ, দুঃখ, বিপদ্ ও পরীক্ষার দিনে তোমার প্রাণ কি স্বভাবতঃ পর-

মেশ্বরের শীতল চরণ ছায়াতে বসিবার জন্ত ব্যাকুলভাবে ধাবিত হয়? ক্ষণিক শীতল ছায়াতে বসিলে শরীর যেমন শীতল হয়—তোমার প্রাণ কি নামের ছায়াতে বসিয়া তেমনি শীতল হয়? এমন কি কখনও অনুভব করিয়াছ? এমন সৌভাগ্যবান পুরুষ এবং সৌভাগ্যবতী নারী আমাদের মধ্যে কত জন আছেন, যিনি রোগ, শোক, দুঃখ, দরিদ্রতার পেষণে পেষিত হন নাই? দুঃখ সকলের জন্যই বিচরণ করিতেছে। কিন্তু পথিক যেমন সুশীতল ছায়ার অন্বেষণ করে, হে ঈশ্বরের সাধক, তুমি কি তেমনি আশাপূর্ণ হৃদয়ে ঈশ্বরের দ্বারস্থ হও? যখন শোক আসে, কোন আত্মীয়জনের মৃত্যু সমাচার পাও, তখন কি তুমি ঈশ্বরের চরণ ছায়াতে উপবেশন কর, না মানুষের নিকটে গমন কর? বাঁশ না ফেলিলে কিম্বা রজ্জু নিক্ষেপ না করিলে যেমন জলের গভীরতার পরিমাণ হয় না, তেমনি আত্ম-পরীক্ষার রজ্জু নিক্ষেপ না করিলে বিশ্বাসের গভীরতার পরিমাণ হয় না। রোগ, শোক, দুঃখ, দরিদ্রতা, বিপদ, পরীক্ষা ইহারাই বিশ্বাস পরীক্ষার রজ্জু। কোন কোনও কুকুর যেমন ক্ষুধার সময় এ বাড়ী ও বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়, বিশ্বাসের সহিত, ধৈর্য্যের সহিত প্রভুর দ্বারে পড়িয়া থাকিতে পারে না, তেমনি হে মানব, তুমিও কি বিপদের দিনে এ বাড়ী ও বাড়ী করিয়া ঘুরিয়া বেড়াও? কুকুর যেমন সকল দ্বার হইতে নিরাশ হইয়া অবশেষে সন্ধ্যাকালে প্রভুর দ্বারে আসিয়া পড়িয়া থাকে—তুমিও কি তেমনি তুচ্ছ মনুষ্যের দ্বারে, গুরুর দ্বারে ঘুরিয়া অবশেষে প্রভু পরমেশ্বরের দ্বারস্থ হও। ছিঃ ছিঃ একথা ভাবিলেও প্রাণে অশেষ ক্লেশ হয়। আমরা বিশ্বাসী হইতে পারিলাম না। এখনও প্রভুভক্ত কুকুরের ন্যায় প্রভুর দ্বারেই পড়িয়া থাকিবার বুদ্ধি জন্মিল না।

নির্ভর—এ জগতে নির্ভরের উপর কত কার্য্য চলিতেছে, যদি আমরা একবার তাহা চিন্তা করি তাহা হইলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাই। যদি পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস একদিনের জন্য বিচলিত হয়, তাহা হইলে এ সংসারে বাস করা একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে। কোন স্থানে যাইব বলিয়া পথে বাহির হইয়াছি, কোন পথে গেলে গম্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারিব জানি না; সে গৃহও জানি না, পথে একজনকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, অমুক গলির অমুক স্থানে। যদি সে কথায় অবিশ্বাস করি, তাহা হইলে আর যাওয়া হয় না। কবিরাজ বলিয়া দিলেন, অমুক ঔষধের অনুপান অমুক গাছড়া। বাজারে এক সামান্য বেদের দোকান হইতে সেই অপরিচিত গাছড়া আনিয়া ঔষধ সেবন করা হইল, যদি অবিশ্বাস করি, ঔষধ সেবন হয় না। ডাক্তারের নিকট হইতে ব্যবস্থাপত্র লইয়া ঔষধালয়ে গেলাম, কম্পাউণ্ডার নানাবিধ বিষাক্ত বস্তু সংযোগে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিল, তাহাতেই বিশ্বাস করিলাম। একটী বাড়ী ভাড়া করিলাম, লেখা পড়া হইয়াছে, নিশ্চিন্ত মনে সে বাড়ীতে বাস করিতেছি। বাড়ীর অধিকারীর যখন ইচ্ছা তাড়াইয়া দিবে, এ সন্দেহ মনে থাকিলে আমার বাস করা চলে না। রাজশক্তি আমাদিগের ন্যায্য দাওয়া ও অধিকার প্রদান করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে; এ বিশ্বাস না থাকিলে সুখে আহার নিদ্রা করা আমাদের ভাগ্যে ঘটে না। এই যে বিশ্বাসের বলে সংসারটা চলিতেছে, ইহাতে অবিশ্বাসী মানুষের উপরে বিশ্বাস! একাদশ বৎসর একজনকে সমভাবে বিশ্বাস করিয়া কি দ্বাদশ বৎসরে প্রতারিত হই না? যে ভৃত্য আজ আমাকে সেবা করিতেছে, সে কি কল্য আমার গলে ছুরী বসাইয়া দিতে পারে না? আমার পার্শ্বে যে পত্নী ঘুমাইতেছেন, তিনি কি একদিন বিকৃত হইয়া আমাকে বিষপান করাইতে পারেন না? ইহা ত কতবার দেখিয়াছি। তবুও আমাদের প্রকৃতিই এই যে, আমরা মানুষকে বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করিয়াই বাঁচিয়া থাকি। বিশ্বাস না করিলে একদিনও চলিতে পারে না। ভ্রান্তিশীল, পরিবর্ত্তনশীল দুর্ব্বল মানুষের উপর এত নির্ভর করিতে পারি কেন?

পক্ষান্তরে যিনি অপরিবর্ত্তনীয়, অভ্রান্ত, পরমকৃপাময়, সর্ব্বদর্শী এবং সর্ব্বশক্তিমান্ সেই পরমপুরুষকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, ইহা কি বিসদৃশ ঘটনা! কি অস্বাভাবিক ব্যাপার! এই অবিশ্বাসের জন্য কত জীবন দুঃখময়, পাপময়, ভারবহ হইয়াছে, এ অবিশ্বাসের জন্য সোণার সংসার বিষময় হইয়া উঠিতেছে, তবুও আমরা তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না। একবার ভাবিয়া দেখি, মানুষকেই অধিক বিশ্বাস করি, কি ঈশ্বরকেই অধিক বিশ্বাস করি। হায়! হায়! কি দুঃখের বিষয় আমরা পরমেশ্বরে উপযুক্ত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না। কেন পারি না? দেখিতেছি এ জগতে বিশ্বাসী লোকই জয়লাভ করিয়াছেন এবং করিতেছেন; অবিশ্বাসীর জীবন কি দুঃখময়, কি শোচনীয়! নিজের জীবনের বিষয় আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার প্রতি কণামাত্র বিশ্বাস যখনই স্থাপন করিতে পারিয়াছি, তখনই এ জীবন, এ সংসার সুধাময় হইয়াছে। অতএব পরমেশ্বরের শক্তি, পরমেশ্বরের করুণা আমরা যেন না ভুলি। সর্ব্বদা তাঁহাকে এই হৃদয়াসনে বসাইয়া অকপটে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারি। অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার নিকট সর্ব্বদা বিশ্বাসী হইবার জন্ত প্রার্থনা করিতে পারি।

নিয়মিত জীবন—বিশ্বপতি পরমেশ্বরের কার্য্যপ্রণালী যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, তিনি এক দিকে পূর্ণ স্বাধীন, অপর দিকে পূর্ণ অধীন। তিনি স্বয়ম্ভু, স্বতন্ত্র, সর্ব্বশক্তিমান্, সকলের প্রভু; সুতরাং স্বাধীন। তিনি জড়ের মধ্যে শক্তি রূপে, আত্মার মধ্যে পরমাত্মারূপে বসতি করিতেছেন; কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন। পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁহাতেই চিরবিরাজমান; অথচ তিনি আপনাকে নিজ প্রতিষ্ঠিত নিয়মের এমন অধীন করিয়াছেন যে, তাহাদিগকে কখনই অতিক্রম করেন না। সর্ব্বত্র, সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়ম দ্বারা সমস্ত জগৎকে এমন করিয়া নিয়মিত করিয়াছেন যে, কোন মতেই তাহার এক চুলও ব্যতিক্রম ঘটিতে

পারে না। স্নেহময়ী জননীর ক্রোড় হইতে অকালে প্রাণসম সন্তান চলিয়া যায়, শত শত লোক মাথা ভাঙ্গিয়া মরিলেও এ বিধির অতিক্রম হইবে না। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রাষ্ট্রবিপ্লব, সমাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়া দেশ উৎসন্ন গেলেও এক চুলও তাঁহার নিয়মের ব্যতিক্রম করেন না। এমন নিয়ম ও শৃঙ্খলার অধীন হইয়া কার্য্য করিতে আর কোথায় দেখিয়াছ? জগতের অধিপতি স্বাধীন হইয়াও মহা অধীন।

এই নিয়মের অধীনতা দর্শন করিয়া পূর্ব্বকালের বৌদ্ধ এবং জৈন সাধকগণ ভাবিয়াছিলেন যে, যিনি কার্য্য কারণ, শৃঙ্খলে এতদূর আবদ্ধ, পূজা, অর্চনা ও আরাধনাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া কোনই ফল নাই। নিয়মকে মানিলেই যথেষ্ট, তিনিও সেই নিয়মেরই অধীন। তিনি এই নিয়মের অধীনতা স্বীকার করেন সত্য; কিন্তু তিনি স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র পুরুষ। নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য করেন বলিয়াই আমরা তাঁহার উপর পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি। একদিন সূর্য্য উদিত হইয়া আর দুই দিন যদি অনুদিত থাকিত, অগ্নিতে জল সিঞ্চন করিলে যদি তাহা কখনও নির্ব্বাণ হইত, কখনও ব্যতিক্রম ঘটিত, তাহা হইলে কে তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারিত। বিশ্বাস আছে, তাঁহার জগৎ নিয়ম দ্বারা সুপরিচালিত, তাই তাঁহার উপর নির্ভর করা সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়াছে।

বিশ্ব-বিধাতার এই প্রকৃতি দর্শন করিয়া আমরাও স্বাধীনতা ও অধীনতার শাস্ত্র শিক্ষা করিতে পারি। নিজের স্বাধীনতা সত্ত্বেও আমরা নিয়ম এবং শৃঙ্খলার অধীনতা শিক্ষা করিতে পারি। আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতেছি, যাঁহারা নিয়ম ও শৃঙ্খলার অধীন, তাঁহাদেরই সাধন হয় এবং উন্নতি হয়। কিন্তু এই অধীন হওয়ার মধ্যেও স্বাধীনতা চাই। স্ব-ইচ্ছায়, আহ্লাদের সহিত যে অধীন হওয়া তাহাতেই আত্মার কল্যাণ হয়, ভয়ে যে নিয়মের অধীন হওয়া, তাহাতে আত্মার অশেষ দুর্গতি হইয়া থাকে। প্রেমের অধীনতা আর ভয়ের অধীনতা দুই স্বতন্ত্র পদার্থ। প্রেমের অধীনতাতে আত্মা স্বাধীন হয়। অতএব সর্ব্বদা সকল অবস্থাতে নিজের ইচ্ছা এবং শক্তিকে তাঁহার অধীন করিয়া দিয়া, তাঁহার বিনীত ভৃত্য হওয়াই মানবের প্রকৃত স্বাধীনতা। প্রভু পরমেশ্বর করুন আমরা এই স্বাধীনতার শাস্ত্র ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করি এবং তাঁহারই নিয়মের অধীন হইয়া আপনাদের জীবনকে সুনিয়মিত করি।

স্বেচ্ছাচারিতা—স্বেচ্ছাচারিতা বলিলে আমরা সচরাচর এই বুঝি যে, যে ব্যক্তি নিজের দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান করে না, আপনার সুখকেই অন্বেষণ করে, প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে ইচ্ছা করে না, সেই স্বেচ্ছাচারী। কিন্তু দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইলেই যে কেবল স্বেচ্ছাচার হয় তাহা নহে, সৎপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াও লোকে স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে। যে ব্যক্তি নিজের রুচি ও ভাবের অনুসারেই চলিতে চায়, আপনার জীবনকে শৃঙ্খলা ও নিয়মের অধীন করিতে চায় না, সে স্বেচ্ছাচারী। একজন স্ত্রীপুত্রকে ভুলিয়া, তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য ভুলিয়া সুরাপানে মত্ত রহিয়াছে সে স্বেচ্ছাচারী; আর এক ব্যক্তি যখন যাহা ভাল লাগিতেছে তাহা করিতেছে, জীবনে নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই, যাহা মিষ্ট লাগিতেছে তাহাতেই রত হইতেছে, সেও সুখপ্রিয় এবং স্বেচ্ছাচারী। এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা আপনার জীবনকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনয়ন করে না; কর্ত্তব্যজ্ঞান দ্বারা আপনার জীবনকে নিয়মিত করে না; অথচ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে "হে ঈশ্বর আমাকে তোমার ইচ্ছাধীন কর।" এ প্রার্থনার কোন মূল্য নাই। এ প্রার্থনার অর্থ এই যে, "আমি আমার মত চলি, হে ঈশ্বর তুমি দয়া করিয়া তাহাতে যোগ দেও, ও সে বিষয়ে কৃতকার্য্য কর। তাহাদের প্রার্থনার মধ্যে যেন এই ভাব লুক্কায়িত আছে, "হে ঈশ্বর, আমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক তোমার দ্বারা।" "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক আমার দ্বারা" এবং "আমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক তোমার দ্বারা" এ দুই প্রার্থনাতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। যে স্বেচ্ছাচারী সে দ্বিতীয় প্রকারের প্রার্থনা করে। যাহার জীবন কর্ত্তব্য জ্ঞানদ্বারা সুনিয়মিত, সুপরিচালিত নয় সে ব্যক্তির প্রার্থনা করিবার অধিকার কোথায়? অতএব আমরা যেন এই স্বেচ্ছাচারিতায় জীবন যাপন না করি। সৎকার্য্য ও সৎপ্রবৃত্তিকেও তাঁহার ইচ্ছার অধীন করিয়া দিতে হইবে। তোমার ইচ্ছা হইতেছে যে, তোমার ধর্ম্মবন্ধুর সহিত বসিয়া ধর্ম্মালাপ কর, আর ওদিকে একজন লোক রোগশয্যায় শয়ন করিয়া আছে। যাহাকে দেখা তোমার কর্ত্তব্য। তুমি তোমার এ সদিচ্ছাকেও সংযত করিয়া রোগীর সেবায় নিযুক্ত হও। যদি তুমি ইহা না কর, তবে একজন মাতালে ও তোমাতে প্রভেদ কি রহিল? সেও সুখপ্রিয় তুমিও সুখপ্রিয়। যাহা মিষ্ট লাগে, তাহা করা তো সহজ, নীরস কর্ত্তব্যসাধন করিতে অভ্যাস কর। সুন্দরকে ভাল তো সকলেই বাসে, তোমরা কদর্য্যকে ভাল বাসিতে অভ্যাস কর।

লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য—মানুষ এই পৃথিবীতে যত প্রকার কাজ করে, সেই সকল কার্য্যের মধ্যে দুই শ্রেণীর কার্য্য থাকে। কতকগুলি কার্য্যকে লক্ষ্য বলা যায়, আর কতকগুলিকে উপলক্ষ্য বলা যায়। যে ব্যক্তি ব্যবসা করিবার জন্য কলিকাতায় রহিয়াছে, প্রতিদিন তাহার উন্নতির চেষ্টা করিতেছে, তাহার কলিকাতায় থাকার "লক্ষ্য" ব্যবসায়। ব্যবসা করিবে বলিয়া কি সে আর কোন কার্য্য করিবে না? এখানকার নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদ, এখানকার দেশহিতকর নানাপ্রকার অনুষ্ঠান, এ সকলে কি সে যোগ দিবে না? অর্থোপার্জ্জন করিতে আসিয়াছে বলিয়া কি আর কোন কার্য্য করিবে না? তাহা কেন? এইরূপ ব্যবসায়ী লোকেও কতপ্রকার সদনুষ্ঠান করিতেছেন। তবে অন্য কার্য্য গুলি উপলক্ষ্য—বাণিজ্যই তাহার লক্ষ্য। যে যুবক বিদ্যাশিক্ষার জন্য এই সহরে আছে, সে কি অন্য কার্য্যে যোগ দিবে না? অবশ্যই দিবে। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা তাহার লক্ষ্য—অন্য কার্য্য গুলি উপলক্ষ্য।

কোন্‌টী কার লক্ষ্য এবং কোন্‌টী উপলক্ষ্য কিরূপে জানা যায়? জানিবার উপায় আছে। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, মানুষ লক্ষ্যের জন্য উপলক্ষ্যকে সহজে ছাড়িতে পারে, লক্ষ্যের অনুরোধে উপলক্ষ্যকে অবহেলা করিতে পারে। যাহাতে বাণিজ্যের ক্ষতি হয় বণিক সেইরূপ কার্য্যে কখনই হাত দিবে না। যাহাতে শিক্ষার ব্যাঘাত হয়, শিক্ষার্থী তেমন কার্য্যে কখনই যোগ দিবেন না। কিন্তু আমরা এরূপ মূর্খ লোকও দেখিতে পাই, যাহারা উপলক্ষ্যের অনুরোধে লক্ষ্যকে অবহেলা করে। আমাদেরও অনেক সময় এই দশা ঘটিয়া থাকে। আমরা সকলেই জানি প্রভু পরমেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাত যোগ স্থাপনই ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষ্য। কিন্তু দেখিয়াছি, মন অনেক সময়ই লক্ষ্যকে ছাড়িয়া উপলক্ষ্যের পশ্চাতে ছুটিতে থাকে। সময় সময় পরমেশ্বর দয়া করিয়া কোন ঘটনার মধ্য দিয়া একটা মহৎ ভাব, একটা মহৎ সত্য, একটা মহৎ আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন—কিন্তু আমরা কি সেই ভাব, সত্য এবং আদর্শ হারাইয়া শোক প্রকাশ করি নাই? বার বার এইরূপ হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও প্রকৃতিতে এই চঞ্চলতা কিছু অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কোন কোন ব্যক্তি চরিত্রের এমন দৃঢ়তা পাইয়াছেন যে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, চলিয়া যায়—সে দৃঢ়তা কিছুতেই ছাড়েন না। তাঁহাদের কথায়, কার্য্যে, ব্যবহারে, চরিত্রে, বন্ধুতাতে সকল দিকেই দৃঢ়তা। কিন্তু কেহ কেহ আবার এমন আছেন, যাহাদের কি শিক্ষা, কি ধর্ম্মসাধন, কি কর্ত্তব্য কার্য্য, কি চরিত্র কি বন্ধুতা, কিছুতেই দৃঢ়তা নাই। এই প্রকৃতির লোকেরা স্থিরভাবে কিছুই করিতে পারে না। ইহাদের কি কিছুই হইবে না? ইহারা কি নিরাশ হইয়া বাহিরে থাকিবে! না, কখনই না। যাহাদের কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার দৃঢ়তা নাই, তাহাদিগকে স্বীয় প্রবৃত্তি সকলকে পরমেশ্বরের ইচ্ছার শাসনের মধ্যে আনিতে হইবে। যাহাদের প্রকৃতি যে পরিমাণে চঞ্চল তাহাদিগকে সেই পরিমাণে শাসনের মধ্যে থাকিয়া দৃঢ়তা অভ্যাস করিতে হইবে। এইরূপ করিতে করিতে অনেক দিন যাহা অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভব হইয়া যাইবে। জগতের অনেক শ্রেষ্ঠ লোকের চরিত্রে এই দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্তপ্রবন্ধ।

সাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ।

ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, মহাত্মা যীশু সর্ব্বদা নানাপ্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। আজ তাহার দুইটী উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথমটী এই,—একজন লোক মুক্তার ব্যবসায় করিত। নিজের ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিবার জন্য তাহার মন সর্ব্বদা ব্যগ্র ছিল। একবার সে মুক্তার জন্য পারস্য উপসাগরের সন্নিকটবর্ত্তী জেলেদের পাড়াতে অন্বেষণ করিতে গেল। গিয়া একজন সামান্য জেলের কুঁড়ে ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে, তাহার নিকট একটী মুক্তা রহিয়াছে। ওরূপ বড় ও সুন্দর মুক্তা প্রায় দেখা যায় না। দেখিয়া আনন্দে তাহার মন নৃত্য করিতে লাগিল। মূল্য জিজ্ঞাসা করাতে ঐ জেলে এত দাম বলিল যে, সে ব্যক্তির জিনিস পত্র সমুদায় বিক্রি না করিলে সে দাম উঠে না। মূল্যটা অধিক বলিল বটে, কিন্তু ঐ জাতীয় উৎকৃষ্ট মুক্তার সঙ্গে তুলনায় সে দাম সস্তা বলিতে হইবে। বণিক জেলেকে বলিল,—বেশ, কাল আমি এই দাম তোমাকে দিব, এই মুক্তা আর কাহাকেও দিও না। এই বলিয়া সে গৃহে গেল এবং নিজে যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সেই দাম লইয়া আসিল। সে কি আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত বিবেচনা করিল না, লাভবান মনে করিল?

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত যথা,—একদা একজন মজুর তাহার প্রভুর জমি খনন করিতেছিল; এমন সময়ে হঠাৎ তাহার কোদালের মুখে একটা কি শক্ত জিনিস ঠেকিল। কোদাল উঠাইবামাত্র একটা উজ্জ্বল ও দীপ্তিশালী কি পদার্থ দেখিতে পাইল। সে উৎসাহ ও দৃঢ়তার সহিত আরো খনন করিতে লাগিল এবং চারিদিকের মাটি সরাইতে লাগিল। খুঁড়িতে খুঁড়িতে দেখিতে পাইল যে, একটা পাত্রে অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা ও অপরাপর মূল্যবান পদার্থ নিহিত রহিয়াছে। দেখিবামাত্র সে ব্যক্তি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, সে সমুদায়কে মাটিতে চাপা দিয়া রাখিল। কাহাকেও কিছু বলিল না। অবশেষে সেই ক্ষেত্রস্বামীর নিকটে গিয়া সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। ক্ষেত্রস্বামী যে মূল্য বলিলেন, তাহা ঐ ব্যক্তির যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় না করিলে উঠে না। সে কাল বিলম্ব না করিয়া নিজের বাস্তুভূমি তৈজস পত্র যাহা কিছু ছিল, সমুদয় বিক্রয় করিল। অর্থ সংগৃহীত হইলে সে উপযুক্ত মূল্য দিয়া ঐ জমি ক্রয় করিল। সর্ব্বস্ব যে গেল তাহাতে তাহার দুঃখ নাই; তাহার মনে এই সন্তোষ যে, সে অল্প মূল্যে বহুমূল্য পদার্থ পাইল।

এই দুইটী কল্পিত আখ্যায়িকার মধ্যে একটী গূঢ় প্রভেদ আছে। প্রথম দৃষ্টান্তে দেখা যাইতেছে, যে বণিক মুক্তারই কারবার করিত, মুক্তার অন্বেষণে নানাস্থানে যাইত, মুক্তার জন্যই পারস্য উপসাগরের তীরস্থিত জেলেদিগের ভবনে গিয়াছিল; এবং তাহার শ্রমের পুরস্কারস্বরূপ মহামূল্য মুক্তা লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের ঘটনা সেরূপ নহে। যে দরিদ্র মজুর অল্পকালের মধ্যে ধনবান হইয়া গেল, সে ধনের জন্য ভূমি খনন করে নাই; ধনের আশা তাহার মনেও ছিল না; সে একাগ্রতার সহিত নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিতেছিল, হঠাৎ তাহার ভাগ্যে ধন লাভ হইয়া গেল।

জগতে যত লোক ধর্ম্মধন লাভ করিয়া ধনী হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যেও এই দুই শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বহু সাধনের ফলে ধর্ম্মবস্তু লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত রহিয়াছেন; নিরন্তর চেষ্টা করিতেছেন; ধর্ম্মতত্ত্বেরই অনুসন্ধানে নানাস্থানে গমন করিতেছেন;

নানা সাধুর সহিত আলাপ করিতেছেন; নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন; পরিশেষে তাঁহাদের শ্রম অন্বেষণ ও সাধনার ফলস্বরূপ ধর্ম্মতত্ত্বে উপনীত হইতেছেন। ইহাঁরা সাধন-সিদ্ধ। কিন্তু কখন কখনও এরূপ দেখা যায়, যে বিনা চেষ্টা বিনা সাধনাতেও কোন কোনও লোকের নিকটে ধর্ম্মরাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে। এরূপ ঘটনা কতবার ঘটিয়াছে, যে এক ব্যক্তি রাজপথ দিয়া বয়স্যগণের সহিত হাস্য পরিহাস করিতে করিতে যাইতেছিল, উপাসনা মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া হঠাৎ তাহার মনে ইচ্ছা হইল যে একবার মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, ব্যাপারখানা কি হইতেছে। সে বন্ধুগণকে বলিল—"ওহে এস না ইহারা কি করিতেছে একবার দেখিয়া যাই," এই বলিয়া উপাসনা মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইল; ঘটনাক্রমে সেদিনকার উপদেশ যেন তাহারই জন্য প্রদত্ত হইতেছিল। ঐ উপদেশের প্রত্যেক বাক্য যেন তাহার হৃদয়ে আঘাত করিতে লাগিল, এবং যে ভাব তাহার হৃদয়ে কখনও ছিল না তাহা যেন জাগাইয়া তুলিল। তৎপরে সংগীত প্রার্থনাদিতে তাহার হৃদয়কে আর্দ্র করিয়া ফেলিল। সে হাসিতে হাসিতে উপাসনামন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু অনুতাপাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইল। তদবধি তাহার জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

ধর্ম্মজগতের ইতিবৃত্তে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। আমেরিকা দেশের একজন সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্যের বিষয়ে এরূপ কথিত আছে যে তিনি একদিন অপর একজন ধর্ম্মাচার্য্য কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া, তাঁহার উপাসনামন্দিরে উপাসনা করিতে গিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণকর্ত্তা সেদিন পীড়িত ছিলেন। ঘটনাক্রমে উপাসনাকালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাহ্ণ হইতে মুষলধারাতে এরূপ বৃষ্টি হইতে লাগিল যে লোকের পক্ষে গৃহের বাহির হওয়াও দুষ্কর। তিনি কর্ত্তব্যানুরোধে একাকী উপাসনা মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখেন কেহই নাই। উপাসকদিগের মধ্যে এক প্রাণীও আসিতে পারে নাই। তিনি ক্ষণকাল বিলম্ব করিয়া একাকী বাইবেল খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন ও উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে একজন পথিক লোক জল ঝড়ের ভয়ে আশ্রয় লইবার জন্য আসিয়া মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এক ব্যক্তি আসিয়াছে দেখিয়া সেই ধর্ম্মাচার্য্য নিজের অভীষ্ট উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যথাসময়ে উপাসনা সাঙ্গ হইলে বৃষ্টির জন্য আরও কিয়ৎকাল তাঁহারা দুই জনে উপাসনা মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া অনেক কথাবার্ত্তা কহিলেন। তৎপরেই, উভয়ে স্বীয় স্বীয় গন্তব্য পথের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পরে, এক দিন এক সভা মধ্যে একজন লোক আসিয়া উক্ত ধর্ম্মাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মহাশয় কি আমাকে চিনিতে পারেন?" বৃদ্ধ (কারণ তখন তিনি বৃদ্ধ) কহিলেন—না কৈ চিনিতে পারিতেছি না!" তখন সেই ব্যক্তি সেই বৃষ্টির দিনের ঘটনা, আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া বলিলেন—সেই দিনের সেই উপদেশ আমাকে নবজীবন দিয়াছে। তৎপূর্ব্বে আমি ধর্ম্মহীন ও পাপাচারী ছিলাম, সেই দিন হইতে আমার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তৎপরে আমি বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া এই পঁচিশ ত্রিশ বৎসরকাল ধর্ম্মপ্রচারে জীবন সমর্পণ করিয়াছি; এবং প্রভু পরমেশ্বরের কৃপায় আমি শত শত ব্যক্তির জীবন পরিবর্ত্তনের উপায় স্বরূপ হইয়াছি।"

এইরূপ অযাচিত কৃপা আরও অনেকের জীবনে ঘটিয়া থাকিবে। অনেকে অন্বেষণ এবং প্রার্থনা করিয়াও যে অবস্থা পাইতেছে না, তাহা এই সকল ব্যক্তির জীবনে অযাচিতরূপে কি প্রকারে ঘটিল? ইহা একটী ব্রহ্মকৃপার আবির্ভাবের গূঢ় রহস্য। কিন্তু ইহা দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন, ঈশ্বরের করুণা যখন হইবে, তখন অমূল্য ধন আপনি আসিবে, সাধনের প্রয়োজন কি? তবে তিনি মহাভ্রমে পতিত হইবেন। সংসারে বিষয় বাণিজ্য যাহারা করে, তাহাদের কাহার কাহারও ভাগ্যে কখন কখনও এরূপ ঘটনা ঘটিয়া যায়, যে তাহারা হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রচুর ধন সম্পদ লাভ করে। ইহাকে বণিকদিগের ভাষায় "দাঁও" বলে। কিন্তু দুই চারি জনের ভাগ্যে "দাঁও" লাগিয়াছে বলিয়া কি সহস্রের অপরাপর বণিকগণ স্বীয় স্বীয় কার্য্যে উদাসীন হয়? তাহারা কি মনে করে—"ছুটাছুটি করিয়া কি করিব? দোকান রক্ষা, ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতির শ্রম স্বীকার করিয়া ফল কি, নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকি যে দিন একটা "দাঁও" মারিব সেই দিন একেবারে ধনী হইয়া যাইব?" কোনও বুদ্ধিমান বণিক এরূপ চিন্তা করে না, হঠাৎ ধনী হইব এই আশা করিয়া বসিয়া থাকে না, প্রত্যহ যথারীতি, ক্রয় বিক্রয় হিসাব নিকাষ করিতে থাকে, এবং দৈনিক শ্রমের দ্বারা অল্পে অল্পে উন্নতিলাভ করে। ধর্ম্মসাধকদিগকে সেইরূপ করিতে হইবে। কোন্ দিন অপ্রত্যাশিত ভাবে ব্রহ্মকৃপা কাহার হৃদয়ে আসিল, তাহা দেখিয়া অলস ও উদাসীন হইয়া থাকিলে হইবে না। প্রত্যেককেই সাধনের শ্রম স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু সাধন বিষয়েও একটী কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, নিজ সাধনের গুণেই ঈশ্বরকে পাইব, এরূপ অভিমান যেন কখনও হৃদয়কে অধিকার না করে। প্রকৃত প্রেম কখনও নিজের গুণ দেখিতে পায় না; সর্ব্বস্ব দিয়াও কিছু দিয়াছি বলিয়া মনে করে না, সুতরাং প্রেম যেখানে আছে সেখানে সাধনের গুণের প্রতি সাধকের দৃষ্টি থাকে না। যেখানে সাধনের গুণের প্রতি সাধকের দৃষ্টি পড়ে, সেখানে প্রেমের অভাব। অতএব সাধনের নিষ্ঠার মধ্যেও ব্রহ্ম কৃপার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রকৃতি।

মানব অপূর্ণ, তাহার জ্ঞানও অপূর্ণ। সুতরাং চির-অবিচলিত অবস্থা পাওয়া তাহার পক্ষে অতীব কঠিন। সে আজ যাহা ধ্রুব সত্যরূপে জানিতেছে, এবং সত্যরূপে গ্রহণ করিয়া যাহাকে জীবনের অটলভিত্তিরূপে অবলম্বন করিতেছে;

দুই দিন যাইতে না যাইতে হয়ত তাহাতেই আবার সংশয় জন্মিতেছে। অপূর্ণ-জ্ঞান-বিশিষ্ট জীবের পক্ষে এ প্রকার অস্থিরতা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এ জন্য অনেক সময় দেখা যায় কিছুদিন একরূপ বিশ্বাস লইয়া, জীবন যাপন করিতে করিতে, লোকের প্রাণে অন্যবিধ বিশ্বাসের সঞ্চার হইয়া থাকে। এরূপ পরিবর্ত্তন যে সকল সময় বা সকল অবস্থাতে নিন্দনীয় তাহা নহে, বরং সত্যপ্রিয় ও সত্যানুসন্ধিৎসু আত্মার পক্ষে এরূপ পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। সুতরাং তাহা কখনই অগৌরবের হেতু নহে। কিন্তু এরূপ পরিবর্ত্তনের লক্ষণ সর্ব্বদাই উপস্থিত হইলেও সর্ব্বত্রই যে তাহার কার্য্য দৃষ্ট হয় তাহা নহে। লোকে সহজে পূর্ব্বসংস্কার ও বিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয় না। এমন কি এক আশ্চর্য্যরূপ মোহ এ সময়ে মানব অন্তরকে মোহিত করিয়া রাখে। সেই মোহ এবং পূর্ব্বাবলম্বিত বিশ্বাসের প্রতি অনুরাগ লোকে সহজে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। অথচ বিশ্বাসের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে যে সংগ্রাম উপস্থিত হয়,তাহাও অন্যদিকে লোককে সুস্থির থাকিতে দেয়না। এরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ লোকের মধ্যে এই প্রবৃত্তির উদয় হইতে দেখা যায় যে তাহারা নব উপার্জ্জিত বিশ্বাসকে পূর্ব্বাবলম্বিত বিশ্বাসরূপে পরিচিত করিবার আশায় বুদ্ধি ও বিচার শক্তির সাহায্যে প্রচলিত শাস্ত্রাদির অর্থান্তর করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হয়। নবার্জ্জিত বিশ্বাসকে অবলম্বন করিতে যাইয়া, সহজে প্রাচীনকে একবারে বিদায় দিতে প্রাণ যেন সম্মত হয় না। তখন লোকে ব্যাখ্যার সাহায্য গ্রহণ করিতে বিশেষ ভাবে ব্যগ্র হয় এবং প্রাচীন বিশ্বাসের পোষক গ্রন্থসকলের কোথায় কোন্ একটী বাক্য, শ্লোক বা উক্তি দ্বারা নবার্জ্জিত বিশ্বাসের সমর্থন হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধানে সর্ব্বাগ্রে প্রবৃত্ত হয়। যাঁহারা সমধিক প্রতিভাশালী তাঁহারা আত্মবিদ্যা ও বুদ্ধিপ্রভাবে প্রচলিত শাস্ত্র সকলের যেরূপ অর্থ সাধারণে প্রচারিত ছিল, তাহার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া, নূতন ভাবে তাহার অর্থ ও ব্যাখ্যা করিতে বিশেষ যত্নবান হইয়া থাকেন এবং অনেক স্থলে তাঁহারা কৃতকার্য্যও হইয়া থাকেন। যে ধর্ম্মের ভিত্তি কোন গ্রন্থ বিশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। যাঁহারা গ্রন্থ বিশেষে আপনাদের বিশ্বাসানুযায়ী তত্ত্ব সকল লিপিবদ্ধ করিয়া, তাহাকে অভ্রান্ত শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে এ প্রবৃত্তির উদয় হওয়া যেমন স্বাভাবিক, তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনাও তেমনই অধিক। কিন্তু যে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় গ্রন্থ বিশেষকে অভ্রান্ত বলিয়া সম্মান করেন এবং সেই সকল গ্রন্থকেই আপনাদের ধর্ম্মমতের স্থির ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও এই রীতির দৃষ্টান্ত বিরল নহে। দুই একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেই বুঝা যাইবে লোকে আত্মবিদ্যা ও প্রতিভা বলে ব্যাখ্যা দ্বারা কেমন আশ্চর্য্যরূপে নবলব্ধ বিশ্বাসের সহিত প্রাচীন শাস্ত্রসকলের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

অধিক দিনের কথা নয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয় যখন আপন প্রাণে নবীন বিশ্বাসের সঞ্চার অনুভব করিলেন, যখন তিনি প্রচলিত পৌত্তলিকতার অসারতা উপলব্ধি করিলেন এবং তাহাকে সত্যের বিরোধী বলিয়া অনুভব করিলেন, তখন সহজ ভাবে তাহা পরিত্যাগ না করিয়া শাস্ত্রের সহায়তায় তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রয়াসী হইলেন; এবং আপনার অসাধারণ জ্ঞান ও প্রতিভা দ্বারা বেদের প্রচলিত অর্থের ব্যতিক্রম করিতে বিশেষ ব্যগ্র হইলেন। ব্যাখ্যার সাহায্যে এবং আপনার পাণ্ডিত্যের সাহায্যে তিনি প্রমাণিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন যে বেদের কোথাও পৌত্তলিকতার সমর্থন নাই। অগ্নি, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি শব্দের নূতন অর্থ প্রকাশ করিয়া, লোককে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। সকলকেই বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন, উক্ত শব্দ সকল একমাত্র ব্রহ্মেরই পরিচায়ক। লোকে সাধারণতঃ উক্ত শব্দ সকল দ্বারা যাহা বুঝিয়া থাকে, তাহা প্রকৃত নহে। তাঁহার সহিত বিচারে অনেকে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ক্রমে তিনি সেই নানা দেববাদী বেদকেই একব্রহ্মবাদীরূপে পরিণত করিয়া, এক নবীন অপৌত্তলিক ধর্ম্মসমাজ সংগঠন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজ এখন বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বেদের বহু দেববাদকে অগ্রাহ্য করিতেছেন, তাঁহারা বহু দেববাদীদিগকে সময় সময় প্রকাশ্য ভাবে তর্কসংগ্রামে আহ্বান করিতেছেন। এমন কি কেহ বেদে পৌত্তলিকতার সমর্থক উক্তি প্রদর্শন করিতে পারিলে, তাঁহাকে বহু অর্থ প্রদান করিবেন বলিয়া সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপনও প্রদান করিতেছেন। কিন্তু বেদের অধিকাংশ স্থলের সরল অর্থ যাহা, তাহা দ্বারা যে বহু দেববাদ প্রমাণিত হইয়া থাকে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এখানে আমরা বিশ্বাসের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা পরিবর্ত্তন করিবার প্রবৃত্তির বিশেষ দৃষ্টান্ত দেখিতেছি।

অন্যত্র আবার দেখা যায়, জ্ঞানী ও তার্কিক-প্রধান গৌরাঙ্গ যখন বুঝিলেন যে ভক্তিই ধর্ম্ম সাধনের শ্রেষ্ঠ পথ,এবং যখন তিনি প্রাণে নূতন বিশ্বাসলাভ করিলেন,তখন তিনিও এইরূপ ব্যাখ্যার সাহায্য লইয়াছিলেন। তৎকালে লোকে বেদান্ত গ্রন্থকে শঙ্কর ভাষ্যের সহিত ঐক্য করিয়াই তাহার অর্থ গ্রহণ করিত; এবং মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদকেই ধর্ম্ম সাধনের ভিত্তি করিয়া সেই ভাবে সাধন করিত। প্রেমিক গৌরাঙ্গ দেখিলেন ও ব্যাখ্যাতে প্রাণের ভক্তিবৃত্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তি হয় না। প্রেমিকের প্রাণ তাহাতে পরিতৃপ্ত হয়না। এজন্য তিনি আপন প্রতিভাবলে ব্যাখ্যা দ্বারা সেই বেদান্ত গ্রন্থ হইতেই স্বমত পোষণ করিতে লাগিলেন এবং সার্ব্বভৌম বাসুদেব পণ্ডিতকে বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা দ্বারা প্রদর্শন করিলেন যে বেদান্তের সূত্রগুলি ভগবানের প্রতি ভক্তি উদ্দীপক। ঈশ্বর ও মানবাত্মায় প্রভু ও দাসের সম্বন্ধই বর্ত্তমান। মানবাত্মা এবং পরমাত্মাকে এক ভাবা বেদান্তের সদর্থ নয়। এই প্রকার রীতি সর্ব্বত্রই অবলম্বিত হইয়া আসিয়াছে। নবীন বিশ্বাসকে প্রাচীনের সহিত এক ভাবাপন্ন করিয়া প্রচার করিতে এবং নবীনকে প্রাচীনের অবিরোধী রূপে প্রমাণ করিতে সর্ব্বত্রই লোকে যত্নপরায়ণ হইয়াছে।

যখন বহুদিনের প্রচলিত অভ্রান্তরূপে গৃহীত গ্রন্থেরই অর্থান্তর করিবার এরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তখন যাহাদের কোন অভ্রান্ত শাস্ত্র নাই, বহুদিনের অবলম্বিত কোন বিশেষ রীতি পদ্ধতি নাই, তাহাদের মধ্যে এই রীতি যে বিশেষভাবে প্রচলিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই জন্য দেখা গিয়াছে যখন কোন ব্রাহ্ম আপন পূর্ব্ব বিশ্বাসচ্যুত হইয়াছেন, এবং নবীন বিশ্বাস লাভ করিয়াছেন; তখন তাঁহার নবাবলম্বিত বিশ্বাস যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী নয় তাহা প্রদর্শনের জন্যও ব্যগ্র হইয়াছেন। তাঁহারা শুধু তাহাতেই পরিতৃপ্ত না হইয়া যখন যিনি যাদৃশ সংস্কার প্রাপ্ত হন, তাহাই যে ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত এবং তাহাই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপে পরিগৃহীত হওয়া আবশ্যক, তখন এরূপ প্রমাণিত করিবার জন্যও বিশেষ ব্যগ্র হইয়া থাকেন। এখানে তাঁহাদের পথ অতি সহজ। কারণ ব্রাহ্মগণের ত কোন এরূপ গ্রন্থ নাই, যাহা দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে যে তাঁহার নবীন ব্যাখ্যা ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ। তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে যেন নিতান্তই কর্দ্দমের তালের ন্যায় মনে করেন। কাদার তাল লইয়া শিশু যেমন ক্রীড়া করিতে করিতে, যেরূপ ইচ্ছা তাহাকে পরিবর্ত্তিত করে, ইঁহারাও সেই প্রকারে ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে যে ভাবে ইচ্ছা পরিবর্ত্তিত করিতে বদ্ধপরায়ণ হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মসমাজ এই কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন বিশেষ গ্রন্থে আপনাকে আবদ্ধ না করিলেও, ইহার যে কোন নির্দ্দিষ্ট অবয়ব নাই বা ইহার যে কোন নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতিরও গঠন হয় নাই, তাহা নহে। ইহার পরিবর্ত্তন অনেক হইয়াছে এবং আরও হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার মূল অবয়ব ইহারই মধ্যে গঠিত হইয়াছে এবং তাহাই মূলে অস্থিরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে। সুতরাং কখনও ইহা কোন নির্দ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ না হইলেও আপন মূল প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তন করিবে না। সেই প্রকৃতিই যদি পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে ইহার আর ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে অভিহিত হইবারও কোন সার্থকতা থাকিবে না। এই মূল প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াও যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম নামেই ইহা অভিহিত হয়, তবে তাহাকে এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ও অত্যাচারবিশেষ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের সমগ্র প্রকৃতির সম্যক্ প্রকাশ এই অল্প সময় মধ্যে হওয়া কখনই সম্ভবপর নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়। কিন্তু ইহার প্রকৃতি ইহারই মধ্যে গঠিত হইয়াছে। তাহা এই—ইহা একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মেরই উপাসনাকে আপনার চিরসম্বল করিবে। পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় ব্রাহ্মধর্ম্ম কখনই দিবে না। পৌত্তলিকতার-সমর্থনকারী কেহ কখনই ইহার অঙ্গীভূত হইবে না। পৌত্তলিক এবং ব্রাহ্ম পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট। এই দুইয়ের সম্মিলন যদি কখনও হয়, তাহা অন্য কোন নূতন ধর্ম্মসমাজ নামে অভিহিত হইবে। কখনই ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে অভিহিত হইবে না। অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ সুতরাং অভ্রান্ত গুরুবাদ ও মধ্যবর্ত্তীবাদ কখনই ইহার অন্তর্গত হইবে না। আগুন ও জল যেমন দুইয়ে মিলিয়া থাকিতে পারে না; তেমনিই অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ ও অভ্রান্ত মধ্যবর্ত্তীবাদ এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম সন্ধিবন্ধনপূর্ব্বক একত্র অবস্থিত করিবে না।

যাঁহারা মনে করেন যে ব্রাহ্মগণ কখনও সকলে মিলিয়া সভা সমিতি করিয়া এরূপ নির্দ্ধারণ ঐকবাক্যে গ্রহণ করেন নাই। ব্যক্তি বিশেষ কোন কোন গ্রন্থে আপনাপন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাই কেন সকলের গ্রাহ্য হইবে? সকল ব্রাহ্ম যে একবাক্যে কখনও কোন সভায় উক্তপ্রকার নির্দ্ধারণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সত্য না হইলেও এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির লিখিত গ্রন্থের মত সকল সমুদায় ব্রাহ্মকর্ত্তৃক সমর্থিত না হইলেও, ব্রাহ্মসমাজ সকল যে ভাবে আপনাদের কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উপরোক্ত প্রকৃতি নির্ব্বাচন করিতে আর অধিক আয়াস করিতে হয় না। সকল ব্রাহ্ম বা যে কোন সমাজের সমস্ত লোক যে একসঙ্গে সভায় যুটিতে পারে, তাহা নহে। কিন্তু সকলে একসঙ্গে না যুটিলেও কি তাহাদের ধর্ম্মের মূল প্রকৃতি, এবং মূল মত নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। এই সম্ভাবনা না থাকিলে কখনই কোন সমাজ আপনাদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিত না। যাহা হউক ব্রাহ্মগণ একবাক্যে কোন সভায় সমবেত হইয়া আপনাদের মূল মতগুলি গ্রহণ না করিলেও তাহাপেক্ষা অতি উত্তম প্রণালীতে আপনাদের মূল মত ও প্রকৃতির গঠন করিয়াছেন। যাঁহারা মনে করেন যে যখন যে কোন মত অবলম্বন করা যায়, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত, তাহাদের ভ্রম অপনোদনের জন্য আমরা ব্রাহ্মসমাজ সকলের মন্দির প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান পত্র এবং মন্দিরসমূহের ট্রাষ্টডীডসমূহের উল্লেখ করিতেছি। অনুষ্ঠান পত্র সমূহ ব্রাহ্মসমাজের সকল সভ্যেরই মত প্রকাশক বলিয়াই মনে করিতে হইবে। কারণ যদিও তাহা সকল সময় কোন সভাদ্বারা গৃহীত না হউক, কিন্তু সকলেই তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। অন্ততঃ যতদিন তাহার প্রতিবাদ না হয়; ততদিন তাহা সকলেরই অনুমোদিত বলিয়াই মনে করিতে হয়। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠিত মন্দির সমূহের ট্রাষ্টডীডসমূহ সম্বন্ধেও ইহাই উক্ত হইতে পারে। এবং যতদিন কোন ব্রাহ্ম বা বহু ব্রাহ্ম তাহার প্রতিবাদ না করেন, ততদিন তাহাকে তাঁহাদের সকলের সমর্থিত বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। কোন সভায় বরং মতদ্বৈধ হইয়া থাকে এবং অধিকাংশের মতেই প্রায়শঃ নির্দ্ধারণ সকল গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু ট্রাষ্টডীডসমূহ সকলের মতে প্রচারিত হইতেছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কারণ কেহ কোন ট্রাষ্টডীডের প্রতিবাদ প্রকাশ্যভাবে করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

আমরা কোন কোন ব্রহ্ম মন্দিরের ট্রাষ্টডীড হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রকৃতির পোষক নির্দ্ধারণ উদ্ধৃত করিতেছি। প্রায় সকল ট্রাষ্টডীডই একভাবাপন্ন। সুতরাং বেশী উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। প্রথমতঃ আদি ব্রাহ্মসমাজের শাখা বা অন্তর্ভুক্ত সমাজ "কালনা" ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টডীড হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। কালনা সমাজের ট্রাষ্টডীডে আছে "উক্ত সমাজ গৃহে কেবল চিরকালই এক ব্রহ্মের উপাসনা হইবে, এক ব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত কোন সম্প্রদায় বিশেষের অভীষ্ট দেবতা বা পশু পক্ষী মনুষ্যের বা মূর্ত্তির অথবা কোন চিত্র

বা চিহ্নের পূজা এই গৃহে হইবে না, এই গৃহে অপর সাধারণের একজন বা অনেকে মিলিত হইয়া নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবেন।” “সমাজে এরূপ উপদেশাদি দিতে হইবে যে যাহা দ্বারা সার্ব্বজনীন ধর্ম্মভাব ও ভ্রাতৃভাব সম্বর্দ্ধিত হয়, এবং সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মনীতির ও উপচিকীর্ষা বৃত্তির স্ফূরণ হয়। এ গৃহে পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা কলহাদি একেবারেই হইতে পারিবে না।”

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত যে সকল সমাজের সহানুভূতি আছে, সেই সকল সমাজের ট্রাষ্টডীড সমূহের ভাষা প্রায়ই একরূপ। এজন্য আমরা একখানি ট্রাষ্টডীড হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—তদ্দ্বারাই প্রমাণিত হইবে ব্রাহ্মসমাজের মূল প্রকৃতি কি? ব্রাহ্মসমাজ যে কখনই পৌত্তলিকতার বা অবতারবাদের সমর্থন করিবে না, তাহা এই ট্রাষ্টডীড দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে। কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টডীড হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। “এই মন্দির কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ নামে আখ্যাত হইবে। এই গৃহে প্রতিদিন অথবা অন্ততঃ প্রতি সপ্তাহে একমাত্র অদ্বিতীয়, পূর্ণ অনন্ত, সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বমঙ্গলময়, পরম ন্যায়বান্ ও পবিত্র ঈশ্বরের উপাসনা হইবে। এখানে কোন সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা হইবে না। কোন সৃষ্ট বা নিকৃষ্ট জীব বা জড়-পদার্থ ঈশ্বর জ্ঞানে অথবা ঈশ্বরের সমান জ্ঞানে কিম্বা ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে এখানে পূজিত হইবে না এবং ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও নিকটে অথবা কাহারও নামে প্রার্থনা, স্তব বা সঙ্গীত হইবে না। কোন খোদিত বা চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি অথবা কোন বাহ্যিক চিহ্ন যাহা সম্প্রদায় বিশেষে পূজার্থে বা কোন বিশেষ ঘটনা স্মরণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইবে তাহা এখানে রক্ষিত হইবে না। “কোন বিশেষ পুস্তক এখানে ঈশ্বর প্রণীত ও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত বা সমাদৃত হইবে না। “এখানকার কোন স্তোত্র, প্রার্থনা সঙ্গীত, উপদেশ বা ব্যাখ্যান দ্বারা কোন প্রকার পৌত্তলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা বা পাপে অনুমোদন ও তৎপ্রতি উৎসাহ প্রদান করা হইবে না। যদ্দ্বারা সকলে নারীজাতি বর্ণ ও অবর্ণ নির্ব্বিশেষে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন এবং উদার ও পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের সাহায্যে সকল প্রকার ভ্রম ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান, প্রীতি, ভক্তি ও সাধুতাতে উন্নত হইতে পারেন এমন ভাবে ও প্রণালীতে এখানে উপাসনা হইবে।”

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল তাহাতেই প্রতীয়মান হইবে ব্রাহ্মধর্ম্ম চিরদিন অপৌত্তলিক ধর্ম্ম। এক মাত্র নিরাকার সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠা করাই ইহার উদ্দেশ্য। সকল পাপ ও দুর্নীতি এবং ভ্রাতৃভাবে বিরোধ ভাবাত্মক জাতি-ভেদ প্রথা প্রভৃতি কুসংস্কার ও অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ প্রভৃতির দমন পূর্ব্বক প্রীতিভাব ও পবিত্রতার জয় স্থাপনই ইহার এক মাত্র লক্ষ্য এবং ইহাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল প্রকৃতি।

জীবনের মধ্যপথ।

(কলিকাতা সাঃ ব্রাঃ সমাজ-ছাত্রসমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

সাধারণ মনুষ্যের প্রতিদিনের কার্য্যের পক্ষে কোন্ পথ অবলম্বনীয়—ইহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অদ্যকার বক্তৃতার উদ্দেশ্য। সাধারণ জনমণ্ডলীর প্রতিদিনের কার্য্য—‘সাধারণ জনমণ্ডলী’ একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে আমাদের এই মানবকুলে একশ্রেণীর মনুষ্য দেখি যাঁহারা সাধারণ শ্রেণীভুক্ত নহেন। তাঁহাদিগকে বলে ‘One Idead men.’ তাঁহারা বিশেষ কোনও ভাবদ্বারা চালিত হন, তাঁহারা সেই ভাবের অবতার-স্বরূপ জগতে বাস করেন. তাঁহাদের সমুদয় কার্য্যের স্রোত একই ভাবে চলিতে থাকে; মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই ভাব তাঁহাদিগকে অধিকার করিয়া থাকে, গ্রাস করিয়া থাকে। তাই তাঁহাদের চিন্তা, তাই তাঁহাদের নিদ্রা, তাই তাঁহাদের অন্ন, তাই তাঁহাদের নেশা। এই প্রকার অসাধারণ ব্যক্তি এরূপ অনেক কাজ করেন যাহাতে আমরা উৎকেন্দ্রতাদোষ (eccentricity) দেখিতে পাই। তাঁহারা মহাপুরুষ, Prophet ইত্যাদি বলিয়া আখ্যাত হন। সাধারণের সঙ্গে তাঁহাদিগকে তুলনা করিতেছি না। তাঁহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে। এই সকল মহাজনের চরিত আলোচনা করিলে জানা যায় যে একটা ভাব, একটা সত্য তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়াছিল। এই সত্য এই ভাব তাঁহাদের জীবনকে এরূপ ভাবে গ্রাস করিয়াছিল যে তাহাতেই তাঁহাদের উত্থান, তাহাতেই তাঁহাদের পতন, তাহাতেই তাঁহাদের অশন, তাহাতেই তাঁহাদের শয়ন ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক জন মহাপুরুষের বিশেষ ভাবের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন যীশুর বিশেষ ভাব ছিল স্বর্গরাজ্য kingdom of God এই ভাবেই তিনি কার্য্য করিয়াছেন, এই ভাবই তিনি প্রচার করিয়াছেন, মরিবার সময় এই কথাই মুখে করিয়া মরিয়াছেন। ইঁহাদের বিষয়ে কিছু বলিব না, বলা অদ্যকার উদ্দেশ্যও নহে। ইঁহাদিগকে আপাততঃ বাহিরে রাখিয়া সাধারণ জনমণ্ডলী সম্বন্ধে কিছু বলিব।

ছাত্রসমাজের সভ্যগণের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই বুদ্ধের জীবনের স্থূল স্থূল ঘটনাগুলি জানেন। মহাত্মা বুদ্ধের জীবনের একটা প্রধান ঘটনা এই:—তিনি ৬ বৎসর কাল অতি কঠোর তপস্যায় যাপন করেন। এই তপস্যাতে তাঁহার শরীর একেবারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাকে দেখিলে মৃত বলিয়া মনে হইত। এই তপস্যা সাধন করিতে করিতে হঠাৎ একদিন তিনি আহার করিতে চাহিলেন। কোনও এক ধনীর কন্যার নিকট পরমান্ন চাহিয়া খাইলেন। ৬ বৎসর কাল কঠোর তপস্যার পরে তাঁহাকে আহার করিতে দেখিয়া তাঁহার ৫ জন শিষ্য বিরক্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। যাঁহারা তাঁহার অরণ্যের সঙ্গী ছিল তাঁহারাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। বুদ্ধ যে আহার করিলেন, তাহা তপস্যা পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া তিনি সেই পথ ছাড়িলেন, কারণ সেই পথে তাঁহার অভীপ্সিত বস্তু পাইলেন না। তিনি

বুঝিলেন যে এজন্মে তাঁহার কিছুই হইবে না, যে পথ তিনি অন্বেষণ করিতেছেন ইহা তাহা নয়। কথিত আছে যে এই সময়ে তিনি এক স্বপ্ন দেখিতে পাইলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীরা ইহা প্রকৃত ঘটনা বলিয়া মনে করেন। সে যাহা হউক, স্বপ্নটী এই,—এক স্বর্গীয় দূত একটী বীণা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রথমে বলিলেন যে সপ্তমের উপরে চড়াইয়া বীণ, আর বাজাও। বুদ্ধ বাজাইতে গিয়া দেখিলেন যে বিকৃত স্বর উৎপন্ন হইল। তখন স্বর্গীয় দূত খুব নামাইয়া বাঁধিতে বলিলেন। তাহাতেও বিকৃত স্বর উৎপন্ন হইল। অবশেষে মধ্যপথে বাঁধিতে বলিলেন। এইবার বাজাইয়া দেখিলেন যে খুব সুন্দর স্বর উৎপন্ন হইল। অবশেষে দূত বলিলেন—"হে রাজকুমার কঠোর বৈরাগ্যের পথ প্রকৃত পথ নহে, ইন্দ্রিয় সেবার পথও প্রকৃত পথ নহে, প্রকৃত পথ মধ্য পথ।" ইহা বলিয়া দূত অন্তর্হিত হইলেন। মহাত্মা বুদ্ধ ইহা প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বত্র বলিতে লাগিলেন, মধ্য পথই প্রকৃত পথ। আসক্তি ও বিরক্তি কোনটিই প্রকৃত পথ নহে। একদিকে আসক্তির মোহিনী মূর্ত্তি ও অপর দিকে বিরক্তির রিক্তমূর্ত্তি—এই দুয়ের মধ্যস্থলেই প্রকৃত পথ। ইহাই বুদ্ধ উপদেশ দিতেন। এই উপদেশ অন্যত্রও পাওয়া যায়। ভগবদ্গীতার এক স্থলে আছে,—

> নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
> ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥১৬
> যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
> যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥১৭
>
> গীতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

ইহার অর্থ এই যে অতিরিক্ত আহার যে করে, তাহার যোগ হয় না। অনাহারে যে থাকে তাহারও যোগ হয় না। অনিদ্রা ও অতি নিদ্রা যাহারা করে, তাহাদেরও যোগ হয় না। উপযুক্ত শ্রম, উপযুক্ত আহার, উপযুক্ত নিদ্রা যে করে তাহারই যোগ হয়। বুদ্ধ যে সত্য প্রচার করিতেন এখানেও অন্যভাবে সেই সত্যের কথা বলা হইতেছে। লোভী, অনশনকারী, অলস, ও অনিদ্রাক্লিষ্ট কাহারও প্রকৃত যোগ হয় না। শরীর ও মনকে অকারণে ক্লেশ দিলেও যোগ হয় না, ইন্দ্রিয় সুখে ডুবিয়া থাকিলেও যোগ হয় না।

কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়ে, এই নিয়ম তাহা নহে। সকল কার্য্যের সকল ভাবের, সকল সত্যের অতিরিক্ত সীমা আছে। কোনও কোনও সমাজ, কোনও কোনও লোক সেই অতিরিক্ত মাত্রার দিকে গিয়া পড়িতেছে। আবার কোনও কোনও ব্যক্তি অপর দিকের অতিরিক্ত সীমাতে গমন করিতেছে। এক সীমা হইতে অপর সীমার দিকে চলিয়াছে। এই ঘাত প্রতিঘাতে জনসমাজ সতত আন্দোলিত হইতেছে, এবং গড়ের উপরে সমাজ মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া চলিতেছে।

আজ কাল 'সামাজিকতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা' (Socialism and Individualism) সর্ব্বত্রই এই দুইটী ভাবের ঘাত প্রতিঘাত চলিয়াছে। কোনও কোনও জাতিতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এত প্রবল যে সামাজিকতা নাই বলিলেও চলে। আবার কোনও কোনও জাতিতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নাই বলিলেও হয়—শুধু সামাজিকতা। যেমন আমাদের দেশে ও চীন দেশে সামাজিকতা এত প্রবল যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অতি সামান্য। আর পাশ্চাত্য দেশ সকলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এত প্রবল যে সামাজিকতা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশে জাতিভেদ প্রথা ও একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা; ব্যক্তিগত শক্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে। এখানে সামাজিক শক্তি এত প্রবল যে অতি অল্প লোকেই সমাজের শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হয়। আহার বিহার, বেশ, ভূষা সকল বিষয়েই সমাজের অধিকার—সমাজের হাত। মানুষ কি ভাবে আহার করিবে, কিভাবে শরীর রক্ষা করিবে, কি ভাবে কেশবিন্যাস করিবে—সকল বিষয়েই সামাজিক শাসন। সমাজের শক্তির নিকট মানুষ সর্ব্বদা ভীত ও কুণ্ঠিত। এই জাতিভেদ প্রথা সমাজের হস্তে এমন একটা Engine, বা যন্ত্র দিয়াছে, যদ্দ্বারা মনে করিলেই দশ জন মিলিয়া সমাজের অঙ্গীভূত কোনও ব্যক্তিকে গুরুতর শাস্তি দিতে পারে, আবার এই জাতিভেদ প্রথা বংশগত হওয়াতে মানুষের উদ্যোগ, সামর্থ্য, ও পুরুষকার অন্তর্হিত হইয়াছে। এই জন্যই আমাদের দেশে প্রতিভা (Genius) এবং উদ্যমশীলতা (Spirit of enterprise) অন্তর্হিত হইয়াছে। একদিকে এই সামাজিকতা প্রবল বলিয়া যেমন অপকার হইতেছে অপরদিকে ইহাতে একটী মহা সত্য নিহিত রহিয়াছে। আমরা প্রত্যেকে জনসমাজের কাছে ঋণী, আমরা সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারি না। আমাদের শরীরের উপর, আমাদের ধনের উপর সমাজের অধিকার আছে। মনুষ্য ত আদিমকালে বনে বনে ভ্রমণ করিত, এরূপ সমাজ বদ্ধ হইল কেন? কারণ দেখিল একা একা থাকা যায় না; প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহায়তা চায়। প্রথম যখন মানব-সমাজ গঠিত হয়, তখন এই অন্তর্নিহিত চুক্তি (implicit contract) রহিল যে আমরা পরস্পরের সাহায্য করিব। আমি তোমার স্ত্রী পুত্রকে রক্ষা করিব, তুমি আমার স্ত্রী পুত্রকে রক্ষা করিবে। প্রত্যেক মানুষ সমাজের নিকট ঋণী। সুতরাং সম্পূর্ণরূপে স্বার্থপর মানুষ পাপী, স্বার্থপরতাই সকল পাপের নিদান ভূত।

কিন্তু সমাজের এই শক্তিকে যখন অতিরিক্ত সীমাতে লইয়া যাওয়া যায়, এবং ব্যক্তিগত শক্তি লোপ প্রাপ্ত হয়, তখন জনসমাজ মানবের উন্নতির সহায় না হইয়া অবনতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ব্যক্তিগত সুখকে বৰ্দ্ধিত করিবে, ব্যক্তিগত শক্তিকে বিকাশিত করিবে, ব্যক্তিগত জীবনকে উন্নত হইতে সমর্থ করিবে, ইহাই সমাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সেই সমাজই ঈশ্বরানুগত সমাজ যাহাতে বাস করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় আত্মাকে অবাধে উন্নত করিতে পারে। আর যে সমাজ মানবের আত্মাকে অধোগতিপ্রাপ্ত করে, তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা-বিরুদ্ধ। প্রত্যেকের উপরে সমাজের অধিকার আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই অধিকার অতিরিক্ত মাত্রায় গিয়া যেন অনিষ্ট না করে। তাহা হইলে অবনতি হইবে।